

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

সাম্বতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালী ও গ্রীষ্ম শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আর্য, পারস্য, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও ভাষাভেদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও ভাষাভেদের মত ও বিশ্বাস ; মনুস্মৃতি এবং
আর্য ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দোবিদ্যা, ভাষ্য,
জ্যোতিষ, অক্ষ, উদ্ভিদ, রসায়ন, কৃত্ত্ব, প্রাণিভাষ্য, বিজ্ঞান, আলোচ্যার্থী,
ষোড়শোপাখী, বৈদ্যক ও হকিমীমতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিভাষ্য, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নামা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহত্ত্ববিধান।

ষষ্ঠ ভাগ।

ঘ—জক্ষন্।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম বোম্বের লেন, গ্রেট ইন্ডিয়ান প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

14

15



বিশ্বকোষ।

ষষ্ঠ ভাগ।

ঘ

ঘট

ঘ

ঘ ঘকার, ব্যঞ্জননের চতুর্থ বর্ণ। মুক্‌বোধের মতে ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। পাণিনি প্রথমে ইহাকে কণ্ঠ্য বলিয়া গণনা করিয়া পরে শিক্ষাগ্রন্থে জিহ্বামূলীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। [শিক্ষা দেখ।]

কামদেহুতন্ত্রের মতে এই বর্ণটি চতুর্কোণযুক্ত, পঞ্চদেবতা-ময় ও অরুণপ্রভ।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পর্শ, জিহ্বামূল স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাকে স্পর্শ বর্ণ বলে। বাহ্যপ্রযত্ন ঘোষ, নাদ, সংবার ও মহাপ্রাণ। (সি. কো.)

ইহার বঙ্গে লেখনপ্রণালী—প্রথমে বামদিকে অধোভাগে একটি বক্ররেখা টানিয়া তাহার অগ্রে কুণ্ডলী করিয়া অধো-ভাগে বক্রভাবেই বাড়াইবে। এই কুণ্ডিত রেখাটির নিম্ন অগ্র হইতে একটি সরল রেখা উর্দ্ধমুখে টানিবে। ইহা ছাড়া অপরপর অক্ষরের জার মাজাও দিতে হয়।

ইহার নাম—ধড়ী, ঘূরুর, ঘটি, মুণ্ডী, ত্রিপুরাস্তক, বায়ু, শিবোত্তম, সত্যা, কিক্বী, ঘোরনাদক, মরীচি, বরুণ, মেধা, কালরূপী, দান্তিক, লঘোদর, লঘোদরী, আলমালা, নন্দেশ, হনন, ধনি, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, সংহর্তা, কামাখ্যা, মনবা ও মবা।

ইহার ধ্যান—বর্ণ মালতী পুষ্পের জার, ছয়টি ভুজ, নয়ন রক্তবর্ণ, পরিধানে গুরুবস্ত্র, গলায় শাদাফুলের মালা, মুখ-খানি সর্কদাই জীবৎ হস্তযুক্ত, ইহার নয়ন তিনটি অতিশয়

মনোহর। সাধিক ঘকারের এইরূপ ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র ১০ বার জপ করিবে। ইহার প্রণামের মন্ত্র—

“নিগুণঃ ত্রিগুণোপেতঃ সদা ত্রিগোলসংযুতম্।

সর্বগঃ সর্বদা শাস্তং ঘকারং প্রণমাম্যহম্॥” (বর্ণোক্তারতন্ত্র)

মাতৃকাক্রান্তে ডান হাতে অঙ্গুলীতে ইহার জাগ করিতে হয়। [মাতৃকাক্রান্ত দেখ।]

ঘ (পুং) ঘটরতি ঘরাদি লক্ষ্যং করোতি ঘট বাহুলকাৎ ড। ১ ঘটী। ২ ঘররক্ষক। (মেদিনী) ৩ বৎসর।

ঘকার (পুং) ঘ-স্বরূপে কার (বর্ণস্বরূপে কারতকারো)। বৈয়া-করণ*)। ঘ স্বরূপ বর্ণ, ঘ।

“এবং ধাত্বা ঘকারন্ত তন্মন্ত্রঃ দশধা জপেৎ।” (বর্ণোক্তারতন্ত্র)

ঘট (পুং) ঘটতে ঘট-অহ। ১ কল্পগ্রীবা দি যুক্ত মূর্তিকাদি নির্মিত পাত্র, কলস।

“যন্ত রজ্জ্বং ঘটং কৃপাকরেন দতিম্যাক্ষ যঃ প্রণাম্।” (মহু ৮।৩১৯)

[ইহার পরিমাণাদি কলশ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ প্রাণায়াম

বিশেষ, কুন্তক। এই প্রাণায়ামে ঘটের জার নিশ্চল হইতে পারা যায়, তাই ইহাকে ঘট নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। [কুন্তক ও প্রাণায়াম দেখ।] ৩ হস্তিকুন্ত।

৪ কুন্তরাশি। “হরিকীটঘটেন চ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৫ পরিমাণবিশেষ, ত্রোণ। (বৈদ্যকপরিভাষা) ৬ কুন্ত-পরিমাণ, কুড়িপ্রোণ।

“দশপ্রোণো তবেৎ খারী কুন্তন্ত্র প্রোণবিংশতিঃ।” (প্রারম্ভিকতত্ত্ব)

(দেশজ) ৭ শরীরের অন্তর্গত অবয়ব বিশেষ।

“বুদ্ধি নাইকো ঘটে।” বঙ্গাখা।

ঘটক (পুং) ঘটরতি পরস্পরসম্বন্ধাদিকং ঘট-গিহ্ । ১ কুলা-
চার্য্য। ঘটক ছয় প্রকার—ধাবক, ভাবক, অংশক, যোজক,
দুবক ও স্তাবক।

“ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।

দুবকস্তাবকশ্চৈব যড়োতে ঘটকাঃ স্তবতাঃ ॥” (কুলদীপ)

মহিবমর্দিনীতন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণ ঘটক হইলে তাহাকে
স্পর্শ করিবে না।

“ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি ! স্পর্শেযু বহুতন্ত্যজেন্ ।”

(শাক্তানন্দতরং ১৬ উল্লাস)

এদেশে কুলাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—

“অংশং বংশং তথা দোবং বে জানন্তি মহাজনাঃ।

ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নাম-গ্রহণাং পুনঃ ॥”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অংশ, বংশ ও কুলের দোষাদোষ নির্ণয়
করিতে পারেন, তাহাকেই ঘটক বলে। কেবল নাম
জানা থাকিলে তাহাকে ঘটক বলা যায় না।

(ত্রি) ২ যোজক, যে যোজন্য করে। ৩ স্তায়প্রসিদ্ধ
পারিভাষিক পদার্থ বিশেষ। বাহার জ্ঞান না হইলে বাহার
জ্ঞান হইতে পারে না, তাহাকে তাহার ঘটক বলে। যেরূপ
“বহিমান্ পর্ততঃ” এইরূপ জ্ঞান বহি ও পর্তত এই দুয়ের
জ্ঞান না হইলে হইতে পারে না, অতএব “বহিমান্ পর্ততঃ”
ইহার ঘটক বহি ও পর্তত। স্তায়মতে ইহার লক্ষণ—
“স্ববিষয়াভাব্যাপকবিষয়তাকঙ্ঘ ঘটকত্বং। যঃ স্বার্থঘটকার্থত
স্বার্থাধরিনি বোধনে।” (শব্দশক্তি) (পুং) ৪ বনস্পতি,
পুষ্প ব্যতিরেকে যে বৃক্ষের ফল হয়।

ঘটকর্পর (পুং) ১ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাহ একজন
কবি। (জ্যোতির্বিদ্যা) ইনি নীতিসারখা নামে একখানি
কাব্য প্রণয়ন করেন।

ঘটক কপরঃ ৬তৎ। ২ তদ্ব্যঘটাদির অবয়ব, ধাবর।

“তন্মৈ বহেরমুদকং ঘটকপরেণ” (নীতিসার)

ঘটকার (ত্রি) ঘটং করোতি ঘট-কৃ-অণ্ উপপদস্। কুন্তকার,
কুমার। “ঘটকারপুরোহিতাজ্ঞাঃ।” (বৃহৎসং ১৬ অঃ)

ঘটকারক (ত্রি) ঘটক্ কারকঃ ৬তৎ। ঘটনির্ম্মিতা, কুন্তকার।

ঘটকালি (দেশজ) ঘটকের কর্তব্য কাজ, ঘটকতা।

ঘটকী (স্ত্রী) ঘটকের স্ত্রী। ২ যে স্ত্রীলোক ঘটকালি করে।

ঘটকৃৎ (ত্রি) ঘটং করোতি ঘট-কৃ-কিপ্। কুন্তকার।

“বিষদমাত্যবগিকজনঘটকৃচ্ছিত্রাজ্ঞাজিকলাঃ।” (বৃহৎসং ১৬ অঃ)

ঘটগ্রহ (ত্রি) ঘটং গৃহ্মতি ঘট-গ্রহ-অচ্ (শক্তিলঙ্কারসু-
তোমরয়টিঘটঘটীধমুঃ গ্রহেরূপসম্মানম্। পা ৩.২.৯ বাস্তিকং)
কুন্তগ্রাহক, যে কুন্ত গ্রহণ করে।

ঘটজ (পুং) ঘটং জায়তে জন-ড। কুন্তসম্ভব, অগস্ত্যমুনি।

“কিং বহুজেন ঘটজঃ কালীপ্রাপ্তাধ তেন বৈ।” (কালীখণ্ড ৩০ অঃ)

ঘটজাতাদি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঘটদাসী (স্ত্রী) ঘটরতি নারকো পরস্পরং যোজয়তি ঘট অচ্
টাপ্ ঘটাদানো দাসীচেতি কর্ম্মধাঃ হ্রস্বচ্। কুটনী।

পর্য্যায়—কুটনী, ইজা, রততালী, গণেশক। (ত্রিকাণ্ড)

ঘটন (স্ত্রী) ঘট-লুট্। যোজনা, সংমেলন।

“তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্।” (বিতাং)

ঘটনা (স্ত্রী) ঘট-গিহ্-যুচ্-টাপ্। ১ সংহতকরণ। ২ হস্তীসমূহ।

“করিধাং ঘটনা ঘটঃ।” (অমর)

৩ যোজনা। ৪ মেলন।

“প্রিয়জনঘটনামাত্তঃশীলতাক্।” (বৃহৎসং ৫২ অঃ)

৫ আকস্মিক ব্যাপার, যে বিষয়টা সহসা হইয়া পড়ে।

৬ দৈবগতি, বিধিনির্বদ্ধ।

ঘটনামুভাবকতা, যে বৃত্তিধারা ঘটনার অমুভব করিতে
পারা যায় না।

ঘটনীয় (ত্রি) ঘট-অনীয়ন্। ঘটনার যোগ্য, যাহা ঘটিবে।

ঘটভব (পুং) ঘটে ভবঃ ৭তৎ। ১ ঘটজ, কুন্তযোনি। (ত্রি)

২ যাহা ঘটে উৎপন্ন হয়।

ঘটভেদনক (পুং) ঘটন্ত ভেদনকঃ ৬তৎ। যে যন্ত্রে ঘটের
ভেদ প্রাপ্ত হয়।

ঘটয়িতব্য (ত্রি) ঘট-গিহ্-তব্য। ১ ঘটনার যোগ্য। ২
বাহার ঘটনা করা উচিত।

“কথমেতৎ মহচ্ছিত্রং ঘটয়িতব্যম্।” (পঞ্চতন্ত্র)

ঘটযোনি (পুং) ঘটঃ যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যন্ত বহুব্রী।
কুন্তযোনি, অগস্ত্যমুনি। [কুন্তযোনি দেখ।]

ঘটপর্য্যাসন (স্ত্রী) ঘটন্ত পর্য্যাসনং ৬তৎ। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে
পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করি-
বার জন্য তাহার জ্ঞাতিগণের অমুষ্ঠের ক্রিয়াবিশেষ, জীব-
দশার পতিতের প্রোতকার্য্য। মিতাক্ষরার মতে পতিত
ব্যক্তি ঔদ্ধত্যবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার সপিও
জ্ঞাতি ও মাতৃপক্ষীয় বান্ধবগণ মিলিত হইয়া গ্রামের বাহিরে
জীবদশাতেই তাহার প্রোতকার্য্য করিবে। সকলে মিলিত
হইয়া দাসীদ্বারা জলপূর্ণ একটা কুন্ত আনয়ন করিয়া স্থাপন
করাইবে। পরে সকলে মিলিত হইয়া বিধানানুসারে
তাহার উদকপিণ্ডদানাদি সমস্ত প্রোতকার্য্য শেষ করিবে।
কার্য্যশেষ হইলে দাসী দক্ষিণমুখিনী হইয়া পদাবাতে সেই জল-
পূর্ণ কুন্তটিকে ফেলিয়া দিবে, যেন তাহাতেই কুন্তটী জলশূণ্য
হয়, ইহার নাম ঘটপর্য্যাসন। রিক্তপ্রভৃতি নিষিদ্ধ তিথিতে

লাগাকে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। পরে মুকশিখ ও প্রাচীনাধীতী হইয়া স্নান করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। পতিত ব্যক্তিকে সকলে মিলিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিবে। তাহাতে সে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এইরূপ ভাবে তাহাকে ত্যাগ করা উচিত। ইহার পরে সেই পতিতের সহিত সম্ভাষণ ও একাসনে উপবেশনাদি কিছুই করিবে না, সকল কার্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। মেঘবশতঃ আলাপাদি করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মমুর টীকাকার কুলুক-ভট্টের মতে ঘটপূর্ণ্যসনের পর সমানোদক ও সপিও সকলেই একরাত্র অশোচ প্রত্যাগমন করিবে। [বিশেষ বিবরণ পতিত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ঘটপ্রক্ষেপ (পুং) ঘটত্ব প্রক্ষেপঃ ৬তৎ। প্রায়শ্চিত্তের পর অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মবিশেষ। পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কোন পুণ্যপ্রদ জলাশয়ে স্নান করিবে। সেই জলাশয় হইতে এক কলসী জল লইয়া সপিওগণের সমক্ষে আসিয়া অপবর্জন করিবে। ইহার নাম ঘটপ্রক্ষেপ।

গোতমের মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইলে পরে একটি সুবর্ণ কুম্ভ কোন একটি পুণ্যতম হ্রদ হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিবে। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি ঐ কুম্ভটীকে স্পর্শ করিয়া, “শান্তা দ্যোঃপৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্র জপ ও হোম করিয়া ত্র্যক্ষণকে দক্ষিণা দিবে।

কোন সংগ্রহকারের মতে—সকল রকম প্রায়শ্চিত্তের পরেই ঘটপ্রক্ষেপ বিধি অনুষ্ঠেয়। আবার কোন কোন সংগ্রহকার কেবল পতিত প্রায়শ্চিত্তের পরেই ইহার অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

ঘটরাজ (পুং) ঘটেন যোজনেন রাজতে রাজ-অচ্। কুম্ভ, ঘড়া। **ঘটরিকা (স্ত্রী)** একপ্রকার বীণা। [বীণা দেখ।]

ঘটসম্ভব (পুং) ঘটঃ সম্ভব উৎপত্তিস্থানমন্ত বহুব্রী। কুম্ভ-সম্ভব, অগস্ত্যমুনি।

ঘটস্বপ্নয় (পুং) [বহব] ১ দক্ষিণস্বপ্নজনপদবিশেষ। ভারতে ভীষ্মপর্বে এই জনপদের উল্লেখ আছে।

ঘটস্থাপন (স্ত্রী) ঘটত্ব স্থাপনং ৬তৎ। মন্ত্রপূর্বক ঘটের স্থাপনা। [পূজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ঘটা (স্ত্রী) ঘট অঙ্-টা। ১ সমূহ।

“যদাগারঘটাকুট্টিমস্তবদিস্পৃপলতুল্লাপয়া।” (নৈষধচ°)

২ ঘটনা। ৩ গোষ্ঠী। ৪ সভা। (মেদিনী) ৫ যুদ্ধস্থলে হাতীগুলিকে একত্রকরণ। ৬ ধুমধাম, উৎসব।

“আয়ামবন্তিঃ করিণাং ঘটশতেঃ।” (মাঘ)

৬ ঘটন। (দেশজ) ৭ জাঁকজমক।

ঘটাতোপ (পুং) ঘটরা আটোপঃ ৩তৎ। ১ আড়ম্বর। ২ বান ও আসবাবাদির আবরণ।

ঘটাত্ত (পুং) হিরণ্যকশিপুর সেনাপতি অনুরবিশেষ।

(হরিবংশ ২৩২ অঃ)

ঘটাল (ত্রি) ঘট নিলিতা ঘটনা অন্ত্যস্ত। ঘট-লচ্ (সিদ্ধাদি-ভ্যশ্চ। পা ৫।২।৫৭) কুৎসিত ঘটনাবৃত্ত।

ঘটালাবু (স্ত্রী) ঘটইবালাবুঃ। কুম্ভভূমী, গোললাউ। (রাজনি°)

ঘটিক (ত্রি) ঘটেন তরতি ঘট-ঠন্। ১ যে ঘটধারা নদী প্রভৃতি উত্তরণ করিতে পারে, নৌকা বিশেষ। (পুং) ঘটিং কারতি বাদয়তি ঘটবাদনে সময়ং জাপয়তিতি যাবৎ। কৈ-ক পূর্বভূষঃ। ২ যে ঘটবস্ত্র বাজায়। (স্ত্রী) ৩ নিতম্ব।

ঘটিকা (স্ত্রী) ১ কালের পরিমাণ বিশেষ, একদণ্ড।

“শুর্লক্ষরাণামুদিতঞ্চ ঘট্যা পলং পলানাং ঘটিকা কিলৈকা।”

(জ্যোতিষি°)

ঘটয়তি বিহিতকার্য্যকরণায় ঘট-গিচ্ ঘুল-টা। ২ মুহূর্ত্ত, হইদণ্ড। অন্নোঘটঃ ঘট-ভীপ্ স্বার্থে কন্। ৩ ক্ষুদ্র ঘট। ৪ পাশ্চাত্য মতে ২৫ দণ্ডে এক ঘটিকা হয়।

ঘটিকাচল, মাজাজ নগরের পূর্বাংশে স্থিত চিতোরনগরের নিকটবর্তী একটি পর্বত। এখানে নৃসিংহের মন্দির আছে। ঘটিকাচল মাহাঘোষ ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ঘটিকায়ন্ত্র (স্ত্রী) সময়নির্ণায়ক যন্ত্রবিশেষ। [ঘটায়ন্ত্র দেখ।]

ঘটিঘট (পুং) ঘট্যা ঘটতে ঘট-অচ্ সংজ্ঞাত্বাৎ হ্রঃ। মহাদেব।

“নমো ঘটায় ঘটায় নমো ঘটঘটায় চ।” (হরিব° ২৭৮ অঃ)

ঘটিতি (ত্রি) ঘট-গিচ্-ক্ত। ১ যোজিত। ২ রচিত। ৩ সংক্রান্ত।

৪ জ্ঞানপ্রসিদ্ধ পারিভাষিক পদার্থ। যাহার জ্ঞান হইতে অপরের জ্ঞানের আবশ্যক, তাহাকে সেই অপর পদার্থ ঘটিত বলে। যেমন “বহিমান্ পর্বতঃ” এই জ্ঞান করিতে হইলে অবশ্যই বহি ও পর্বতের জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব “বহিমান্ পর্বতঃ” ইহা বহি ও পর্বত এই উভয় দ্বারা ঘটিত। ইহার লক্ষণ—

“অবিষয়তা ব্যাপ্যবিষয়তাকল্পঃ ঘটত্বং”।

ঘটিতব্য (ত্রি) ঘট-তব্য। যাহা ঘটিবে।

ঘটিন্ (পুং) ঘটস্তদাকারোহস্ত্যস্ত ঘট-ইনি। ১ কুম্ভরাশি।

“মংস্তৌ ঘটিন্মিথুনং সগদং সবীণং।” (জ্যোতিষতত্ত্বঃ)

(ত্রি) ২ কুম্ভযুক্ত, যাহার কুম্ভ আছে।

ঘটিক্রম (ত্রি) ঘটীং ধমতি ঘট-খ্যা থন্ মুন্ হ্রস্বশ্চ। যে ব্যক্তি মুখদ্বারা ঘট বাজায়।

ঘটিক্রয় (ত্রি) ঘটীং ধরতি ঘটী ধেট্-থশ্ মুন্ হ্রস্বশ্চ। যে ক্ষুদ্র ঘট পান করে, ঘটধারক।

ঘটীযন্ত্র [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

ঘটিল (ত্রি) ঘটোহস্ত্যন্ত ঘট পিচ্ছাদিৎ ইলচ্। (লোমাদি
পামাদি পিচ্ছাদিত্য শনেনচঃ। পা ৫।২।১০০) ঘটযুক্ত, বাহার
ঘট আছে।

ঘটিনেওড়া, একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

ঘটী (স্ত্রী) ঘটঃ কালমানজ্ঞাপকঃ সচ্ছিন্নঃ, কৃষ্ণঃ জ্ঞাপকতয়া
অন্ত্যন্তঃ ঘট-অচ্ গোরাতি* ভীষ্। ১ দণ্ডপরিমাণকাল।
সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে ১০টী শুক্ল অক্ষর উচ্চারণ করিতে
যত সময় লাগে, তাহার নাম অক্ষু, ৬ অক্ষু বা ৬০ শুক্লকরে
এক পল এবং ৬০ পলে এক দণ্ড হয়।

ঘট অনার্থে ভীপ্। ২ ক্ষুদ্রকৃষ্ণ, ছোট ঘট।

ঘটীকার (স্ত্রী) ঘটঃ করোতি ঘটী-ক-অণ্ উপপদস*।
কৃষ্ণকার, যে ক্ষুদ্র ঘট নির্মাণ করে।

ঘটীগ্রহ (ত্রি) ঘটঃ গ্রহাতি ঘটী গ্রহ-অচ্। ঘটীগ্রাহক,
যে ঘটী গ্রহণ করে। উদ্যমম বুঝাইলে অণ্ প্রত্যয় হইয়া
ঘটীগ্রাহ শব্দ হয়।

ঘটীযন্ত্র (স্ত্রী) ঘট্যাঃ দণ্ডরূপকালজ্ঞাপকং যন্ত্রং। কালনির্ণা-
য়ক যন্ত্রবিশেষ, ঘড়ী। প্রাচীন ভাগতবানী আখ্যায়িকায়
প্রতিভাবলে নানাবিধ কালনির্ণায়ক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া-
ছেন। যখন অপর দেশীয় লোকেরা ঘটীযন্ত্র বা কালমান-
জ্ঞাপক কোন যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না, অপর কোন
দেশেই ঘটীযন্ত্র উদ্ভাবিত হয় নাই, সে সময়েও ভারতে ঘটীযন্ত্রের
চলন ছিল। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই ঘটীযন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ইহার অপর নাম
কপালকযন্ত্র। ঘটের অধোভাগের ন্যায় একটি তাম্রময় পাত্রে
নির্মাণ করিয়া তাহার তলদেশে একরূপ ভাবে একটি ছিদ্র
করিবে, যেন ঐ ছিদ্রটি দ্বারা ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করিয়া
ঠিক একদণ্ড সময়ে ঐ পাত্রটি জলপূর্ণ হইতে পারে এবং
ডুবিয়া যায়। পাত্রে প্রথম জলপ্রবেশ হইতে ডুবিয়া যাওয়া
পর্য্যন্ত এক দণ্ডের অধিক না হয় এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে
হয়। যে পাত্রটি অহোরাত্রে ৬০ বার মাত্র জলময় হয়,
তাহাই ঠিক হইল জানিবে। পরে একটি জলপূর্ণ পাত্রে
তাম্রময় ঐ পাত্রটি রাখিয়া দিবে, পাত্রের জলে নিমজ্জনা-
সারে কালের পরিমাণ স্থির করিবে (১)।

সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকাকার রজনীধের মতে দশপল তাম্রাধারা
ঘটের অধস্তন ভাগের ন্যায় একটি পাত্র নির্মাণ করিবে।
পাত্রটির উচ্চতা ৬ আঙ্গুল এবং মুণ্ডের বিস্তার তাহার ষিগুণ

(১) "তাম্রপাত্রমধ্যস্থিত্বং স্তম্ভং কুণ্ডলমলাভদি।

যষ্টীর্জজাত্যহোরাত্রে কুটং যন্ত্রং কপালকম্।" (সূর্য্যসি ১৭৭৩)

করিতে হয়। ৩৬ মাঘ পরিমিত স্বর্ণে চারি আঙ্গুল পরিমাণ
শলাকা প্রস্তুত করিয়া ঐ তাম্রপাত্রে বিদ্ধ করিবে। ইহার
নাম ঘটীযন্ত্র। এই পাত্রটি কোন একটি জলপূর্ণ পাত্রে
রাখিলে একদণ্ডে জল পূর্ণ হইয়া থাকে (২)।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে—ঘটের অধোভাগের দ্বার
একটি তাম্রময় পাত্র নির্মাণ করিবে। একটি ছিদ্রযুক্ত
করিয়া একটি জলপূর্ণ টবে রাখিয়া দিবে। এই পাত্রের
কোন পরিমাণ নাই, ইচ্ছানুসারে যত ইচ্ছা পরিমাণ করা যায়।
উহার পরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দেখিবে যে, যে দিনরাত্রে
কয়বার নিমজ্জিত হয়। যতবার নিমগ্ন হয়, তাহার অক্ষুপাত
অক্ষুসারে প্রত্যেক বারে কত সময় হয়, তাহা স্থির করিবে।
ইহার নাম ঘটীযন্ত্র। কোন কোন মতে এই যন্ত্রের নির্দিষ্ট
পরিমাপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সঙ্গত
নহে, কারণ তাহার কোন যুক্তি নাই (৩)।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ১২২ পল তাম্রাধারা মগধ দেশে
চলিত প্রত্নপরিমিত উচ্চায়িত একটি পাত্র নির্মাণ করিবে।
চারিমাঘ সোণায় চারি আঙ্গুল পরিমাণ-শলাকা প্রস্তুত
করিয়া পাত্রটি ছিদ্র করিবে, ইহার নাম ঘটীযন্ত্র। ইহাকে
জলে রাখিয়া দিলে ঠিক একদণ্ডে জলপূর্ণ হইয়া থাকে (৪)।
ভারতের গোরবের সহিত দিন দিন এই সকল ভারতীয় যন্ত্রের
ব্যবহারও কমিয়া আসিতেছে। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য
কালনির্ণায়ক যন্ত্রই বহুল পরিমাণে প্রচলিত। কোন কোন
স্থানে বর্তমান সময়ে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।
চলিত কথায় ইহাকে তাত্রী বা তামী বলে। [ইহার অপর
বিবরণ যন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(২) "তদঘটনস্ত..."

শব্দতঃ দিগ্‌বিহিতং পলৈর্ঘং বড়ুলোচ্চ ষিগুণারতাত্তম্।

তদন্তমা যষ্টীপলৈঃ প্রপূর্ণ্য পাত্রং ঘটীর্জজাতিমঃ ঘটী ত্রাং।

সত্র্যংশমাবতরনির্মিতা বা হেমঃ শলাকা চতুরঙ্গুলা ত্রাং।

বিদ্ধং তত্র্য প্রাক্তনমত্র পাত্রং প্রপূর্ণ্যাতো নাড়িকরাযুক্তিস্তং।"

(সূ. সি. ১৩.২৩ রজনীধ)

(৩) "ঘটজলরূপা ঘটতা ঘটিকা তাত্রী তলে পৃথুহিতা।

দ্যুশিশনিমজ্জমিতা তত্ত্বং দ্যুশিশং ঘটীমানম্।"

অত্র দশভিঃ শব্দতঃ পলৈরিতি দ্যুশিশং ঘটীলক্ষণং কৈচ্চিৎ কৃতং তদ-
যুক্তিশূন্যং দৃষ্টকোতোত্তমপেক্ষিতং। ইষ্টপ্রমাণাকারস্থিঃ পাত্রং ঘটী
সংজ্ঞমলীকৃতম্।" (যজ্ঞাধ্যায় ৮ শ্লোকঃ)

(৪) "নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশচ পঞ্চ চ।

উদ্যানেনোক্তসঃ সাত্ত্ব পলাভর্জজরোদশ।

হেমমণিবৈঃ কৃতজিহ্বা চতুর্ভিঙ্গতুরঙ্গুলৈঃ।

মাপদেন প্রমাণেন অক্ষয়শব্দ সংযুক্তঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ)

২ কৃপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, জল তোলার কল।
৩ শুষ্কবিলেপনযন্ত্রবিশেষ। (আজেরী) ৪ গ্রহীরোগ
বিশেষ। সূর্য্য, পার্শ্বশূল ও পেটের ভিত্তর জলপূর্ণ
ঘটীর ভায় শব্দ হইলে তাহার নাম ঘটীযন্ত্র গ্রহীরোগ। ইহা
অসাধ্য। (বিজয়)।

ঘটোৎকচ (পুং) ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে
উৎপন্ন একজন রাক্ষস। মহাভারতে লিখিত আছে—
জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে বনপথে পলায়ন
করেন। তাহার পথে হিড়িম্বা নামক একটা রাক্ষসের
রাজত্বে উপস্থিত হন। রাক্ষস তাহাদিগের সংহার-কাগনায়
নিজ ভগিনী হিড়িম্বাকে প্রেরণ করে। হিড়িম্বা বলশালী
ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করে। তাহার
গর্ভে ঘটোৎকচের উৎপত্তি হয়। রাক্ষসপ্রকৃতি স্বভাব,
জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ এক ভয়ানক বীর হইয়া উঠিল।
বালক একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলে
হিড়িম্বা “ঘটোহাতোৎকচঃ” এই শব্দ করিয়া ডাকে, তাহা
হইতে ঘটোৎকচ নাম হয়। ইহার চক্ষু দুইটা বিবর্ণ, মুখখানি
অতিশয় বৃহৎ, কাণ দুইটা খোঁটার আয়, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও
শরীর সমধিক বলশালী ছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণের হাতে
ইহার মৃত্যু হয়। [ভীম ও কর্ণ দেখ।]

ঘটোৎকচাস্তক (পুং) ঘটোৎকচাস্তকঃ ৬তৎ। কর্ণ।
ঘটোৎকচারি প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঘটোদর (পুং) ঘটইব উদরমস্ত বহত্রী। অসুরবিশেষ,
হিরণ্যকশিপুর একজন সেনাপতি। (হরিব* ২৩২ অঃ)
এই অসুরটা বরুণসভার এক সভ্য ছিল।

ঘটোদ্ভব (পুং) ঘটউদ্ভব উৎপত্তিস্থানং যন্ত বহত্রী। অগস্ত্যমুনি।
ঘট্ট (পুং) ঘটতে হস্মিন্ ঘট্ট-ঘঞ্। ১ যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী
প্রভৃতি জলাশয়ে নামা যায়, ঘাট। ২ শুষ্ক গ্রহণের স্থান,
ঘাট, কূতঘাট। (অমর) ঘট্ট ভাবে ঘঞ্। ৩ চালন।

ঘট্টকুটীপ্রভাত (ক্লী) ঘট্টকুটী তত্র প্রভাতমিব। ভ্রায়-
বিশেষ। [ভ্রায় দেখ।]

ঘট্টগা (ক্লী) নদীবিশেষ। (রাজনিঃ)

ঘট্টজীবিন্ (পুং) ঘট্টেন ঘট্টে দেয়তরপণেন শুকাদিনা
জীবতি জীব-গিনি। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, পাটুনি, যাহারা
পায় করে। বিবাদবর্জবসন্তর মতে বৈশ্যার গর্ভে রজকের
ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। [পাটুনি দেখ।]

ঘট্টন (ক্লী) ঘট্ট-লুট্। চালন।

“জগদস্পর্শ ইব দণ্ডঘট্টনাৎ” (রঘু ১১।৭১)

ঘট্টনা (ক্লী) ঘট্ট-ঘৃচ্-টাপ্। (ঘট্ট-বন্ধি-বিন্ধ্যাশ্চেতি বাচ্যম্।

পা ৩।৩।১০৭ বার্তিক) ১ চালন। “রণভিরাঘট্টনয়া নভবতঃ।”
(মাঘ ১।১০) ২ ঘৃষ্ণি। (হেম)

ঘট্টানন্দ (পুং) ছন্দোভেদ।

ঘট্টিকা (ক্লী) ঘটিকা।

ঘট্টিত (ত্রি) ঘট্ট-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ নির্ম্মিত। ২ চালিত। ৩ কলপ
দিয়া যাহা ঘোটা হইয়াছে। (শকার্ধচিঃ)

ঘট্টীত্ (ত্রি) ঘট্ট-তৃচ্। চালক।

ঘট্টী (ক্লী) ঘট্ট-অন্নার্থে-ভীপ্। ক্ষুদ্র ঘাট। [ঘট্ট দেখ।]

ঘড়়া (ঘট্টশব্দজ) জলপাত্রবিশেষ, বড় কলস।

ঘড়ি (ঘট্টা শব্দজ) ১ ঘড়ী। ২ আড়াইদণ্ড।

ঘড়িয়া (ঘট্টিকাশব্দজ) একপ্রকার মন্ত্র।

ঘড়িয়াল (দেশজ) যে ঘড়ী বাজায়।

ঘড়ী [ঘট্টা শব্দ] ১ কালনির্ণায়ক যন্ত্রবিশেষ।

“রাত্রিদিন আটপূর ঘড়ী পিটে মরে।

তার ঘড়ী কে বাজায় তন্নাস না করে।” (বিদ্যাসুং)

একাল পর্য্যন্ত কাল-বিভাগজ্ঞাপক যত প্রকার উপায় ও
যন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয় ঘড়িই সর্বোৎকৃষ্ট।
ঘড়ির এ উন্নতি একজনের অসুস্থদান, পরিশ্রম বা
অধাবসায়ের ফল নহে। বিলাতী ঘড়ির ইতিহাস অসুস্থরূপ
করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে আজ প্রায় ৪০০ বৎসরের
চেষ্টায় ঘড়ির এই উন্নতি দাঁড়াইয়াছে। [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

গ্রহাদির গতি দেখিয়া সময়কে প্রথমতঃ বৎসর, মাস,
দিন এই তিন স্থূলভাগে বিভক্ত করা হয়, শেষে যখন দিনকে
আবার ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন
নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে লম্বভাবে
স্থাপিত একটা স্তম্ভ, ধ্বজ বা বংশকাষ্ঠাদি নির্ম্মিত
সরল দীর্ঘ দণ্ডের ছায়া দৃষ্টে দণ্ডাদি নিকূপণ করা হইত।
পাশ্চাত্য দেশাদিতেও ঐ উপায়ে দিবসকে কএকটি সমভাগে
বিভাগ করিয়া লইত। ইহার পরই সূর্য্যঘড়ি (Sun-dial)
বা রবিচক্র, জলঘড়ি (Clepsydra) ও বালুঘড়ি
(Sand-glass) উদ্ভাবিত হয়। রবিচক্রে সূর্য্যের উদয় কাল
হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত ছায়াসম্পাত দেখিয়া সময় নিকূপণ
করা হইত। জলঘড়ি ও বালুঘড়িতে কোন একটা নির্দিষ্ট
সময় বুঝা যাইত। জলঘড়ির দুইটা আধার থাকিত,
তন্মধ্যে একটা প্রায় জলপূর্ণ থাকিত ও অপরটা শূন্য থাকিত।
এই উভয় আধার একপ ভাবে সংযুক্ত থাকিত যে তন্মধ্যে
বাহ্য বায়ু বা তাপাদি প্রবেশ করিতে পারিত না। উভয়
আধারের সংযোগস্থলে একপ একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিত যে
সেই ছিদ্র দ্বারা এক আধারের জল ক্রমশঃ নিঃসৃত হইয়া

অপর আধারে আসিয়া জমিত। এক আধার হইতে অপর আধারে জলগমনকালকে কালের কোন এক নিরূপিত অংশ ধরিয়া লওয়া হইত। বালুঘড়ি ও ঠিক এইরূপে প্রস্তুত হইত, তবে তাহাতে জলের পরিবর্তে শুষ্ক সূক্ষ্মবালুকা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহাতে সূক্ষ্মরূপে সময় নিরূপিত হইত না, কারণ জলঘড়িতে জলের ভার বাহুভাপাদি, জলের ঘনত্ব বা তারল্য ও বালুর শুষ্কতা, সূক্ষ্মতা এবং সংযোগ স্থলের হিঙ্গটীর বেধের হ্রাসবৃদ্ধি অসুসারে অনেকটা ব্যত্যয় ঘটিত। [বিচক্র, জলঘড়ি ও বালুঘড়ি দেখ।]

এখন আমরা যাহাকে সাধারণতঃ ঘড়ি বলিয়া থাকি, তাহার সমস্তই পাশ্চাত্যদেশাদিতে প্রস্তুত এবং একমাত্র গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে গঠিত। ঘড়ি আপাততঃ ৪ প্রকার দেখা যায়;—(১) ঘড়ি (Clock) ইহাতে যন্ত্রসংযুক্ত লৌহ-শলাকার সাহায্যে দিবসের দ্বাদশটী সমান অংশ (ঘণ্টা, হোরা) উক্ত বৃন্দেশাংশের প্রত্যেক অংশের ঘণ্টাংশ (সেকেন্ড) নিরূপিত ও প্রদর্শিত হয় এবং প্রত্যেক দ্বাদশাংশ উত্তীর্ণ হইবার সময় ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা প্রত্যেক উত্তীর্ণ দ্বাদশাংশের সংখ্যা জ্ঞাপন করে। (২) টাইমপিস্ (Time-piece) ইহাতেও ঐ এক উপায়ে দিবসের ঐ সকল বিভাগ নিরূপিত ও প্রদর্শিত হয়, কেবল ঘণ্টাধ্বনি হয় না। (৩) ট্যাক-ঘড়ি (Watch or pocket-timepiece) অতি ক্ষুদ্র-কার, মাথুবে ইহা ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে পূর্বোক্ত উপায়ে এবং অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র সাহায্যে দিবসের ঐ সকল বিভাগ নিরূপিত ও প্রদর্শিত হয় এবং ঘণ্টাধ্বনি হয় না। (৪) ক্রোনোমিটার—ইহাতে দিবসের সমস্তই বিভাগ নিরূপিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অথচ তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রাদিতে দেশান্তর নিরূপণ করা যায়। স্থান ও কালের তারতম্যানুসারে, এই ঘড়ির গতির তারতম্য যাহাতে না হয় অর্থাৎ সময়নির্দেশের অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও না ঘটে, তাহার উপায়ও সংলগ্ন করা পাকে। এতস্ত্রি ঘড়ি ও ট্যাকঘড়িতে মাস, বার ও দিবসের নাম নিরূপণ করিবার উপায়ও সংলগ্ন করা হইয়া থাকে। ঘড়িতে দিবসের দ্বাদশাংশের প্রত্যেক অংশের এক চতুর্থাংশও বাজিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ট্যাক ঘড়িতেও ইচ্ছামত বাজিবার ব্যবস্থা করা যায়। এরূপ ট্যাকঘড়িকে রিপিটার (Repeater) বলে। ঘড়িতে ও টাইমপিসে ঘণ্টাধ্বনি বাজীত আর একপ্রকার নির্দোষবস্ত্র সংলগ্ন করা যাইতে পারে যে, তদ্বারা লোকের কোন একটা আরম্ভক মন্ত সময়ে ঐ বস্ত্র বাজাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে নিজালু অন্ত-

মনক আলতপন্নতন্ত্র লোকের বড় সুবিধা হয়, এই যন্ত্র সাহায্যে তাহার প্রয়োজন মন্ত সময়ে যন্ত্রের ক্রত ও কর্কশ শব্দ শুনিয়া কখনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই যন্ত্রের নাম 'চৈতন্তোৎপাদক' (Alarm)।

সর্বপ্রথমে কে এই ঘড়িযন্ত্র আবিষ্কার করে, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। পূর্বকালে যুরোপের নানান্থানে ক্লক বা টাইমপিস্ শব্দের পরিবর্তে ঘড়ি বুঝাইবার জন্য 'হরলজিয়ম্' (Horologium) শব্দ ব্যবহৃত হইত, কারণ সময়-বিত্তাজক শাস্ত্রকে উক্তস্থানে হরলজি (Horology) বলে। ঘণ্টাধ্বনিযুক্ত ঘড়ির ব্যবহার প্রাচীনকালে যুরোপের যে সকল দেশে হইত, তন্মধ্যে ইটালীদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকালের কথা পাওয়া যায়। সেখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘড়ির প্রচলন ছিল তাহা জানা যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে কিংসবেঞ্চ (King's Bench) নামক আদালতের প্রধান বিচারকের যে অর্থদণ্ড হয়, তাহাতে ওয়েস্টমিনিস্টার হল নামক প্রাসাদের নিকট যে বিখ্যাত ঘড়িঘর (Clock-house) আছে, তাহারই প্রথম ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা বর্ড হেনরি সেন্টটিফেল গির্জার প্রধান যাজক উইলিয়ম ওয়াবিকে এই ঘড়ির জন্য প্রতিদিন ৬ পেন্স করিয়া খরচ দিতেন। বোলগনার প্রথম ঘড়ি ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। হেনরি-ডি-ওয়ারাইক নামক একজন জর্জন শিল্পী ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম চার্লসের প্রাসাদে ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে এক ঘড়ি স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে যে সকল ঘড়ি ছিল অর্থাৎ যে নিয়মে ঘড়ি প্রস্তুত হইত, ইনি তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। রাইমার নামক কবির 'কিডেরা' নামক কাব্যে দেখা যায়—৩য় এডওয়ার্ড তিনজন ঘটিশাস্ত্রবিৎ ওলন্দাজকে প্রতিপালন করিতেন। ইহার ডেল্ট (Delft) হইতে ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আগমন করেন। ১৩৭০ সালে ব্রাসবর্গ নগরে এক ঘড়ি নির্মিত হয়, কন্রেন্ডাস্ ডাসিপোডিয়াস্ এই ঘড়ির বিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ফ্রাইসার্টের মতে এই সময়ে কুট্টেরও এক ঘড়ি ছিল, এই ঘড়ি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ বায়গাণ্ডি কাড়িয়া লইয়া আসেন। ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারারে একটা ঘড়ি ছিল। লেমান ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সুয়ংবর্গে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে, অক্সিয়ারে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে, ও তিনিসে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে এক একট ঘড়ি ছিল জানা যায়। আন্টোনিয়াস্ কামাল যুলেনিস্ ফ্লোরেন্স নগরে নিকোলাসকে যে পত্র লেখেন, সেই পত্রে (Lib. xv. epis. ৬)

জানা যায়, ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে যুরোপের প্রায় সকল দেশে বহু লোকের গৃহে ঘড়ির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে হেনরি-ডি-ওরাইকের ঘড়ির পর আরও দেড়শত চুইশত বৎসরের মধ্যে যুরোপে কেহ ঘড়ি চূর্ণত আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া বোধ করিত না, সাধারণ লোকের বাসিতেও ঘড়ির ব্যবহার চলিয়াছিল। হেনরি-ডি-ওরাইকের পর ঘড়ির এতটা উন্নতি অবশ্য একজনের চেষ্টায় হয় নাই, একের পর অপর লোকে একটু একটু করিয়া বহু চেষ্টায় উন্নতিসাধন করিয়াছেন, ওরাইকের সময় যে স্থলে ঘড়ি স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইত, সেই স্থলেই ঘড়িটি প্রস্তুত করিতে হইত, প্রস্তুত করা ঘড়ি এক স্থান হইতে অপর স্থলে নড়াইবার উপযোগী ছিল না; কিন্তু ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন উহা সাধারণ ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিল, তখন বুঝা বাইতেছে যে, উহা স্থানান্তর-করণোপযোগী হইয়াছিল। এই অনুমান হইতে ইহাও বুঝা যায় যে হেনরি-ডি-ওরাইকের ঘড়ি তৎপূর্ব্ববর্তী ঘড়ি-নির্ম্মিত্বগণের সমবেত চেষ্টার ফল।

তখন ঘড়ির পেণ্ডুলুম বা দোলক ছিল না, তৎপরিবর্তে ঘড়ির গতি-সৃষ্টির নিমিত্ত একটা মোটা রোলার বা সিলিণ্ডারের মুখে দড়ি জড়াইয়া সেই দড়ির এক মুখে একটা ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। এই ভারবশে রোলার বা সিলিণ্ডার হইতে দড়ির পাক ঝুলিবার সময় তৎসংলগ্ন অস্থান্য চাকাগুলিতে গতি উৎপাদন করিত।

১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কলেরই দ্বিগুণ উন্নতি করিয়া ঘড়ি নির্মাণ চলিত। ঘড়ি-নির্ম্মিত্বগণের মধ্যে যিনি যত পরবর্তী তিনিই এই কলের একটু না একটু উন্নতি সাধন করিয়া ঘড়ি নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর ঘড়িকে সাধারণতঃ ব্যালান্স ক্লক (Balance Clock) বলিত। ইহাতে স্প্রিং বা পেণ্ডুলুম ছিল না, অথচ ইহা দ্বারা যে কার্য্য কিছু কম হইত তাহা নহে। জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনার জন্ত ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াথার এই ব্যালান্স ক্লক ব্যবহার করেন, তাহার পর জ্যোতিষিক ল্যাণ্ডগ্রেভও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। জেম্মা ফ্রিসিয়াস ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রে দেশান্তর-নিরূপণার্থ স্থানান্তরকরণোপযোগী ঘড়িনির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাইকোব্রেহির চারিটা ঘড়ি ছিল, তাহাতে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড জানিবার উপায় ছিল। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বোটা বড় তাহাতে কেবল তিনখানি রাজ চাকা ছিল, তন্মধ্যে একখানির ব্যাস ৩ ফিট। এই চাকাখানিতে ১২০০ দাঁত কাটা ছিল। তাইকোব্রেহি এই

সকল ঘড়িতে শৈত্যতাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে সময় নিরূপণের অনেকটা গোলমাল লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু তখন বৃত্তিতে পারেন নাই যে কিসে এমন হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মোএটলিনের একটা ঘড়ি ছিল, তাহাতে ২৫২৮ বার আঘাত (টক্ টক্ শব্দ) হইত। সূর্য্যের উদয়াস্তের মধ্যে এই ঘড়ির আঘাতের শব্দসংখ্যা গণিয়া সূর্য্যের ব্যাস নিরূপণ করা হয়; স্থির হয় যে সূর্য্যের ব্যাস ৩৪'৩"। কোন সময় হইতে আরম্ভ হয় তাহা স্থির জানা যায় না; কিন্তু ইহা যে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়, কারণ ঐ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরের ঘড়ি-নির্ম্মাতারা ১ম ফ্রান্সিসের নিকট হইতে অনুমতি লয় যে যে ব্যক্তি ঘড়ি নির্মাণপটু বলিয়া চিহ্নিত না হইবে, ঘড়ি কি ট্যাকঘড়ি কি বড় বা ছোট আকারে প্রস্তুত করিতে পাইবে না। স্থানান্তর-করণোপযোগী ঘড়ি প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই বা তাহার কিছু পূর্ব্ব ভার ঝুলাইয়া গতি উৎপাদনের স্থলে স্প্রিং আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতে থাকে। স্প্রিং ব্যবহারের কাল হইতে ঘড়ির উন্নতির দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ। এই সময় হইতে স্প্রিংয়ের গতিপ্রদায়ক 'ফ্রিসি' নামক চক্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। (Beckmann's History of Inventions, Vol. I. p. 340—355. ঘড়ির পুরাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।)

ঘড়ির উন্নতি যখন এতটা হইয়াছে, তখন গ্যালিলিও স্থির করেন যে কোন ভার যদি তাহার সমদীর্ঘ সূত্রে লব্ধিত হয়, তবে তাহা একবার ছুলিয়া যে অগ্রপশ্চাৎ গতি উৎপাদন করে, তাহাতে যে পরিমিত কাল অতীত হয় দ্বিতীয়বার ছুলিবার সময়েও কালের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে। ইহা হইতেই পেণ্ডুলুমের সৃষ্টি হয়। লণ্ডন নগরের রিচার্ড হ্যারিস নামক একজন শিল্পী ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পেণ্ডুলুম নির্মাণ করেন। তিনি পেণ্ডুলুমবৃত্ত ঘড়িও ঐ সালে নির্মাণ করেন। পেণ্ডুলুম আবিষ্কৃত হইলে পর হাইঘেন্স নামক এক ব্যক্তি জেম্মা ফ্রিসিয়ানের মত অবলম্বন করিয়া নাবিক-ব্যবহারার্থ দেশান্তর-নিরূপক ঘড়ি নির্মাণ করেন। তিনি ঘড়ির সাহায্যে পৃথিবীর আকারও নিরূপণ করেন। তাহার এই ঘড়ি বিষুবরেখার বত নিকটবর্তী হইত, ইহার পেণ্ডুলুমের গতি ততই কমিয়া আসিত, ইহা হইতেই তিনি স্থির করেন যে পৃথিবী ঠিক বর্ত্তলাকার নহে, মেরুদণ্ডের উত্তর-দক্ষিণদিকে কিছু চেপ্টা। তৎপরে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বর্লো নামক একজন শিল্পী ঘড়িতে বাজিবার যন্ত্র বাহির করেন। তৎপরে ঘড়িতে বিশুদ্ধ সময় নিরূপণার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে থাকে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনবাসী ক্রেমেন্ট নামক শিল্পী "একর এক্সপেনেন্ট" চক্রের

উদ্ভাবন করেন, ইহাওয়াই পেণ্ডুলমের দোলকের পরিবর্তে পাতলা ইম্পাত স্প্রিংয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেকেন্ড নিরূপণের পেণ্ডুলম এইরূপ স্প্রিংয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে 'রয়্যাল পেণ্ডুলম' আখ্যা পাইত। তৎপরে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ গ্রেহাম নামক এক ব্যক্তি দ্বারা পেণ্ডুলমের একটি মহ-দোষ সংশোধিত হয়। তিনি দেখিলেন শীততাপের পরি-বর্তনের সহিত পেণ্ডুলমের ধাতুর আকৃষ্ণ ও প্রসারণ দ্বারা তাহার গতির তারতম্য ঘটে, সুতরাং সময় নিরূপণ বিঘ্নক ভাবে হয় না। তিনি অমুসন্ধান করিয়া এই দোষ নষ্ট করিলে হারিসন নামক অপর একজন সেই ব্যবহার আরও উন্নতি সাধন করেন। তৎপরে গ্রেহাম আপনাদি উদ্ভাবিত শব্দহীন এস্কেপমেন্ট চক্র (Dead-beat escapement) ব্যবহার করেন। এই স্থান হইতেই ঘড়ির উন্নতির তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয়।

তৎপরে এই একশত বৎসরের মধ্যে আবার ঘড়ির কলের এত উন্নতি হইয়াছে যে ঘড়িতে সেকেন্ডের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কালবিভাগ নিরূপিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এক বৎসরের মধ্যে শত, মাস, পক্ষ, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, তিথি, বার, মাসের তারিখ ইত্যাদি নিরূপণের ব্যবস্থা হইয়াছে। জাহাজে, রেলগাড়ীতে, হিমালয় শিখরে বা বিষুবরেখার উপরিস্থ মরুভূমিতে লইয়া গেলেও এখনকার ঘড়ির গতির তারতম্য হয় না। গির্জা ও প্রাসাদসমূহাদিতে ব্যবহারের জন্য একপ্রকার বৃহৎ ঘড়ি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাকে টার্নেটরক বলে, ইহা রুক ঘড়ির যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে নির্মাণ করা হয়। টেলিগ্রাফ বিভাগে বা জ্যোতি-র্ষিদিগের ব্যবহারার্থ একপ্রকার ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার গতি বৈজ্ঞানিক বলে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাকে বৈজ্ঞানিক ঘড়ি বলে। বিদ্যাসাহায্যে দিবসের মধ্যে কোন একটি বিশেষ সময় নিরূপণের জন্য টাইমবল বা সময়-গোল-কের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজিতে গির্জা বা স্তম্ভোপরি স্থাপিত ঘড়ি দেখিবার জন্য ঘড়িতে স্বচ্ছ ডায়েল ব্যবহার করিয়া তাহার মধ্যে আলোক দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই আলোক একরূপ কোশলে সংযোগ করিতে হয় যে ঘড়ির মধ্যস্থ যন্ত্রাদির দ্বারা যেন ডায়েলের উপর না পড়ে। এতদ্ভিন্ন ঘড়ির সঙ্গে নানাবিধ দৃশ্য ও সংযোজিত হইয়া থাকে। কোন কোন ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিবার সময় ঘড়ির একস্থানের একটি ক্ষুদ্র গর্তের ডালা খুলিয়া যায় ও তদ্ব্যবহাৎ একটি ঘুঘু পাখী বাহির হইয়া যে কয় ঘণ্টা বাজিবে, সেই কয়বার 'ঘু' 'ঘু' শব্দ করে।

কোন ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টার অর্ধঘণ্টার একটি বানর বা মনুষ্য-মূর্তি বাহির হইয়া একটি লম্বমান ঘণ্টার হাতুড়ির বা মারিরা বাজায়। কোনটীতে প্রতিঘণ্টার গান বাজিতে থাকে। কোনটীতে বরষাজী ঠাকুরবিসর্জনে ও বাদ্যভাওসহ মনুষ্য-মূর্তি বাহির হইয়া থাকে। কোন ঘড়িতে আবার একটি কটকওয়ালা কাঠের ক্ষুদ্রকার বাড়ী সংযুক্ত থাকে, তাহার সম্মুখে একটি দরওয়ান মূর্তি থাকে, প্রতি সেকেন্ডের গতির সহিতই দরওয়ান এক কোণ হইতে ঘুরিয়া অপর দিকে যায় ও কটক একবার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া আবার খুলিয়া যায়। এইরূপ নানাবিধ দৃশ্যমুক ঘড়ি দেখা যায়।

যুরোপে বহু দেশে ঘড়ি প্রস্তুত হয়, তদ্ব্যধ্যে লন্ডনের ঘড়িই সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান, কিন্তু সুইজার্লণ্ড ও জার্মানিতে সর্বাধিক অধিক ঘড়ি প্রস্তুত হয়। আজকাল ঘড়ির ব্যবহার এত বাড়িয়াছে যে সুইজার্লণ্ডের কোন এক কারখানায় বৎসরে ২ লক্ষ ট্যাকঘড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলিকাতার কয়েকটি বিখ্যাত মসজিদ, অষ্টালিকা ও গির্জার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি দেওয়া আছে, তাহাতে পথিকের বড় সুবিধা হয়।

আমেরিকার জীলোক, বালক ও বালিকারা সাধারণতঃ ঘড়ির নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে। ভারতে যদিও সকল পল্লীগ্রামে ঘড়ির ব্যবহার এখনও হয় নাই, কিন্তু এতটা হইয়াছে যে অন্ততঃ বাজালার যে কোন গ্রামে সাবেক হিসাবে দণ্ডপলাদি দ্বারা দিবা পরিমাণ না বলিয়া ঘণ্টা মিনিট হিসাবে দিবার পরিমাণ বলিলে সকলেই বুঝিতে পারে।

২ একদণ্ড। ৩ পান্চাত্য মতে আড়াই দণ্ড।

ঘড়ীয়াল (দেশজ) ১ বাহারি বটীয় ব্রজ বাজায়। ২ পক্ষীবিশেষ। ৩ মৎস্তবিশেষ।

ঘড়েল (দেশজ) যে ঘটীয় ব্রজ বাজায়, ঘড়ীয়াল।

"আর রামা বলে সেই এত শুনি ভাল।

ঘড়েল পতির জালে আমি হৈছ কাল ॥" (বিদ্যাসু°)

ঘড়্ ঘড়িয়া (দেশজ) ১ বাহারি কণ্ঠে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করে। ২ হায়না নামক বাঘ।

ঘড়্ ঘড়ী (দেশজ) মৃত্যুকালীন কণ্ঠস্বর।

ঘণ্ট (পুং) ঘণ-কৃত। ১ দীপ্তিযুক্ত। ২ বনামধ্যাত মৎস্ত ও শাক প্রভৃতির ব্যঞ্জনবিশেষ। ইহার গুণ—বলবর্দ্ধক, রুচিকর ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ঘণ্টক (পুং) ঘণ্ট সংজ্ঞায়াং কন্। ক্ষুণ্ণবিশেষ, ঘটকাণ। (রাজনি°) ইহার মূলের গুণ—ক্ষুণ্ণনাশক, কটুপাক ও পিত্ত-বৃদ্ধিকর। (রাজবলজ)

ঘণ্টকর্ণ (পুং)। ত্র্যম্বকীঃ কণ্ঠঃ পদ্মকম্ব রহসী।। কুপ
বিশেষ, ঘটিকাণ। [ঘটিক দেখ।]

ঘণ্টা (স্ত্রী) ঘটি শব্দকরণে অর্থে কাংক্রাদি নির্মিত বাজ্যবস্তু-
বিশেষ। “ঘণ্টাঃ বা পরশ্ব বাপি বাসন্তঃ সমিবেশয়েৎ।”
(তুর্গাখ্যান)

রান ও পূজা কালে ইহার বাদ্য প্রযুক্ত। স্বল্পপুরাণের
মতে বাহুবল্লভের নিকটে পূজাকালে ঘণ্টা বাজাইলে একশত
কোটি হাজার বৎসর দেবলোক বাস হয় এবং বনোহারিণী
অম্বরগণ তাহার পরিচর্যা করে। ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী
বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়া, অপর বাদ্যের অভাবে কেবল ঘণ্টা
বাজাইলেও পূজা সিদ্ধি হয়। ঘণ্টা দেওর উপরে গরুড় মূর্তি ও
চক্র নির্মাণ করিতে হয়। এরূপ ঘণ্টা বাজাইলে বিষ্ণু
সর্বদাই তথায় উপস্থিত থাকেন।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে গরুড়মূর্তিযুক্ত ঘণ্টা বাজাইলে
তাহার আর জন্মমৃত্যুর ভয় থাকে না। ঘণ্টা দেওর অগ্র-
ভাগে চক্রযুক্ত গরুড়মূর্তি স্থাপন করিলে জিজ্ঞাসন স্থাপনের
ফল হয়। থাকে। যে গৃহে গরুড়মূর্তিযুক্ত ঘণ্টা থাকে,
তথায় সর্পভয় নিবারিত হয়। যাহার ঘণ্টা নাই, তাহাকে
বিষ্ণুভক্ত বা ভাগবত বলা যাইতে পারে না। অতএব সমস্ত
বৈষ্ণবের পক্ষেই গরুড়মূর্তিযুক্ত ঘণ্টা রাখা উচিত। (ইহার
বিশেষ বিবরণ স্বল্পপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর ও হরিতত্ত্ববিলাস
প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

ঘণ্টা দুইপ্রকার দেখা যায়। যে সকল ঘণ্টা হিন্দু, বৌদ্ধ ও
জৈনেরা নিত্য পূজা ও উপাসনার সময় ব্যবহার করেন, তাহা
স্বল্পকায়। মুঠা করিয়া ধরিয়া বাজাইবার জন্য এই সকল
ঘণ্টার উপরিভাগে দীর্ঘ হাতল থাকে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরা-
দির দ্বারদেশে বা দেবগৃহের সম্মুখের দালানে একপ্রকার
ঘণ্টা ঝুলান থাকে, তাহাতে হাতলের পরিবর্তে কড়া দেওয়া
হয়। ঐ কড়ায় ঘণ্টার ভার অঙ্গুষ্ঠের দড়ি বা লৌহশৃঙ্খল
দিয়া ঝুলান থাকে।

মন্দিরাদিতে ঘণ্টা ঝুলাইবার ব্যবহার যদিও অতি
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত আছে, তবু যুরোপে
গির্জাদিতে বৈষ্ণব বৃহদাকার ঘণ্টা দেখিতে পাওয়া যায়,
এদেশে তত বড় ঘণ্টা নাই।

মিসরবাসী, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকের মধ্যেও হাতে
ধরিয়া বাজাইবার উপযুক্ত ঘণ্টার যথেষ্ট প্রচলন ছিল।
মিসরে ‘ওরিসিসের ভোজ’ নামক উৎসবের সময় ঘণ্টা
বাজাইয়া সাধারণকে জানান হইত। প্রাচীন রিহদীদিগের
মধ্যে আরন নামক প্রধান যাজকশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণঘণ্টা

অঙ্গরাধায় গাঁথিয়া পরিধান করিতেন। আথেন্স নগরে
সিভিলিয়ান্সেরা পূজার ঘণ্টা ব্যবহার করিতেন। গ্রীক-
গণ শিবিরে ও ছাউনিতে ঘণ্টা (কোড়া) ব্যবহার করিত।
রোমকেরা ‘টিনটিমাবুলাম’ বাজাইয়া স্নানের ও বৈবয়িক
কার্যে আবৃত হইবার সময় সাধারণকে জানাইত।

৪০০ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পানিয়ার অন্তর্গত নোমার বিশপ
পলিনিয়াস সর্বপ্রথম বৃহদঘণ্টা ব্যবহার করেন। ক্যাম্পানিয়ারে
ঘণ্টা প্রথম প্রয়ুক্ত হয় বলিয়া কিছুদিন ঘণ্টাকে ‘ক্যাম্পানি’
বলিত এবং তাহা হইতেই এখনকার গির্জার যে চূড়ায় বৃহৎ
ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহাকে ‘ক্যাম্পেনাইল’ বলে।

ফ্রান্সে ৫৫০ খৃষ্টাব্দে ঘণ্টার ব্যবহার আরম্ভ হয়। উইয়ার-
মথের আদর্শ বেনেডিক্ট ৬৮০ অব্দে ইটালী হইতে একটা
ঘণ্টা নিজ গির্জার জন্য আনাইয়াছিলেন। পোপ সাবি-
নিয়ান (৬০০ খৃষ্টাব্দে) নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রতিঘণ্টায়
গির্জা হইতে বৃহৎ ঘণ্টা বাজান হইবে, কারণ তাহাতে
সাধারণে উপাসনার সময় জানিতে পারিবে। এই সকল
ঘণ্টা বৃহদাকারের এবং দক্ষিণ যুরোপেই দেখা যাইত।
যুরোপের পূর্বাংশে ৯ম শতাব্দীতে এবং সুইজারল্যান্ড ও
জার্মানিতে ১১শ শতাব্দীতে ঘণ্টা প্রচলিত হয়। আয়ারল্যান্ড
ও ওয়েলসে কতকগুলো পুরাতন ঘণ্টা সুরক্ষিত
আছে, শুনা যায় এগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত। পেটা
লোহের চাদর বাঁকাইয়া চোপলা করিয়া রিভেট দিয়া
জুড়িয়া এই সকল ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাদের উপর
পিত্তলের রঙ লাগান আছে। ইহার মধ্যে একটীর
নাম সেন্ট প্যাট্রিকের ঘণ্টা, ইহা ৬ ইঞ্চি উচ্চ, ৫ ইঞ্চি
চওড়া ও ৪ ইঞ্চি গভীর; ইহা একটা পিত্তলের কোটার
রক্ষিত। কোটাটা রত্নখচিত ও রৌপ্যের কাজ করা।
আইরিস শেয়ার (Irish Shewas) একটা খোদিত লিপি
পাঠে জানা যায় যে এই ঘণ্টাটা ১০৯১ হইতে ১১০৫ খৃষ্টাব্দের
মধ্যে নির্মিত হয়। The Annals of Ulster নামক পুস্তকে
নাকি এই ঘণ্টাটা ৫৫২ খৃষ্টাব্দে ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।
সেন্টপল নামক একজন আইরিস মিসনারীর (৬৪৬ খৃষ্টাব্দে)
একটা চোপলা ঘণ্টা ছিল। এই ঘণ্টাটা এখনও সুইজারল্যান্ড
নামক নগরীর মধ্যে বর্তমান আছে ও সকলকে দেখান
হইয়া থাকে।

অরলিন্স নগরের গির্জায় কোন রাজা একটা ঘণ্টা দান
করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই ঘণ্টা বড় প্রসিদ্ধি
লাভ করে, ইহার ওজন ইংরাজী ২৬০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায়
১৩০০ সের বা ৩২১০ মণ। ১৩শ শতাব্দীতে ইহা অপেক্ষাও

বৃহৎ বৃহৎ ঘণ্টা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসনগরে “জ্যাকেলিন” নামক ঘণ্টা ঢালাই হয়, ইহা ওজনে ১৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৮৭১০ মণ। প্যারিসনগরের আর একটা ঘণ্টা ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে ঢালাই হয়, তাহা ওজনে ২৫০০০ পাউণ্ড বা ৩১২১০ মণ। কঁয়া নগরের বিখ্যাত ঘণ্টাটা ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ঢালাই করা হয়, তাহা ওজনে ৩৬৩৬৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৫৪৪১ সের।

কসিয়ার মস্কাউনগরে যে বৃহৎ ঘণ্টাটা আছে, তাহার ভার বৃহৎ ঘণ্টা যুরোপে আর ইতিপূর্বে ছিল না। ইহা কখন প্রথম প্রস্তুত হয় তাহা জানা যায় না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই বটে। ইহার নাম ছিল “জার কোলো-কোল” অর্থাৎ ঘণ্টারাজ। শুমা যায়, মস্কাউনগরে একসময়ে ১৭০৬টা বৃহৎ ঘণ্টা ছিল। ইহার মধ্যে একটা এত বড় ছিল যে তাহার মধ্যের আঁবাতে-দণ্ডটা ঢুলাইয়া বাজাইবার জন্য ২৪ জন লোকের প্রয়োজন হইত। ইহার ওজন ছিল ২৮৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৬০০ মণ। ইহা একবার ছিঁড়িয়া যায় এবং ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হয়। তাহার পর আবার পড়িয়া যায়; সেই সময় ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ও আরও খাতু মিশাইয়া বড় করিয়া (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় ঢালাই করা হয়। এইবার এই ঘণ্টার নাম হয় “জার কোলোকোল।” এই ঘণ্টারাজ ১৯ ফিট ৩ ইঞ্চি উচ্চ, বেড় ৬০ ফিট ৯ ইঞ্চি, ও ২ ফিট পুরু, ইহাতে খরচ পড়ে প্রায় ৬৭০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ (১০৭ হিসাবে পাউণ্ড ধরিলে) ৬৭০০০০ টাকা। ইহার ওজন ১৯৮ টন অর্থাৎ প্রায় ১০৩৬ মণ। বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে এই ঘণ্টা এক সময়ে ব্যবহার হইত, পরে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে ইহা পড়িয়া গিয়া মাটির মধ্যে বসিয়া যায়, কিন্তু শেষে সে ভ্রম গিয়াছে। অনেক স্মৃদ্ধর্শী ও ধীরবুদ্ধির বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে ইহা কোনদিন সুলান হয় নাই, যে ছাঁচে ইহা ঢালাই হইয়াছিল, সেই ছাঁচ হইতে ইহা কখন উদ্ধার হয় নাই। এইরূপ ৮০ টন ওজনে আর একটা ঘণ্টা মস্কাউ নগরে আছে। এ ছাড়া যুরোপের নানাদেশের প্রধান গির্জাতে ১৮ হইতে ৫ টন ওজনের অনেক ঘণ্টা দেখা যায়।

মস্কাউএর “ঘণ্টারাজ” সম্বন্ধে ক্রাঙ্কের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে ইহার খাতু যখন গলান হইতেছিল, তখন সাধারণ ও সম্ভ্রান্তলোকে ধর্মোদ্দেশ্যে ইহাতে এত স্বর্ণ, মুদ্রা, অলঙ্কার, তৈজসাদি নিক্ষেপ করিয়াছে যে ইহা দেখিতে যেন সমস্তটা রূপার গঠিত বলিয়া বোধ হয়। সম্ভ্রান্ত নিকোলাস এই ঘণ্টা ভগ্ন হইতে উঠাইয়া একটা গ্রেগাইট

প্রস্তরেরদ্বার উপরে বসাইয়া ছিলেন। সেই সময় ইহার একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া বাওয়ার সেই ভয়মুখ ঘণ্টাগর্ভের দ্বার স্বরূপ হওয়াতে ইহা এক্ষণে স্মৃত্ত গির্জা (Chapel) স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গা অংশ ওজনে প্রায় ১১ টন।

খৃষ্টানেরা এইরূপে বহুকাল হইতে গির্জার ঘণ্টা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ঘণ্টার কোন রূপ ব্যবহার নাই; উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে সাধারণকে জানাইবার জন্য গির্জার বেমন ঘণ্টাধ্বনি করিবার ব্যবস্থা আছে, মুসলমানেরা সেইরূপ মসজিদে উঠিয়া ‘আজান’ দিয়া থাকেন। এই ‘আজান’ দিবার ব্যবস্থা বোধ হয় হিন্দু ও খৃষ্টানের ঘণ্টা ব্যবহারের প্রতি বিধেয় দেখাইবার জন্যই অবলম্বিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন বহু ব্যবহারে ঘণ্টার পবিজ্ঞতা, ঘণ্টার লক্ষণালক্ষণ ও ঘণ্টার দেব-প্রিয়তা কীর্তিত হইয়াছে, প্রাচীন খৃষ্টানদের মধ্যেও সেইরূপ ঘণ্টার পবিজ্ঞতা ও ঘণ্টা-পবিজ্ঞীকরণ প্রচলিত ছিল। ঘণ্টা প্রস্তুতের সময় নানাবিধ ধর্ম্মাঙ্কন করা হইত, শেষে তাহাকে মস্তুরের দ্বারা অভিব্যেক (ব্যাপ্টাইজ) করিয়া নামকরণ ও স্মরণাদির দ্বারা লেপন করা হইত, এবং শাদা বা লাল রঙের ঘেরাটোপ বা অন্য কোন প্রকার সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে ঢাকা হইত। এই সকল ব্যবহার আলকুইনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। খৃষ্টানেরা ঘণ্টাকে এত পবিত্র মনে করিত যে, তাহার গাজে নানাবিধ পবিত্র স্লোকাদি খুদিয়া দিত, বিশ্বাস ছিল যে, ঘণ্টায় বা দিলে তাহাতে বান্যের ঐ মস্তুরোদিত অংশোৎপন্ন শব্দও মিশ্রিত হইয়া মঙ্গল বিধান করিবে এবং ঝড়, মড়ক, শত্রুর হুস্তভঙ্গি, অগ্নিভয় এই ঘণ্টাবাদ্যে নষ্ট হইবে। মধ্যযুগে প্রায় সকল ঘণ্টাতেই নিম্নলিখিত স্লোকটা খোদিত হইত—

“Funera plango, fulgura frango, Sabbata pango, Excito lentos, diaspio ventos, paco cruentos.”

এই সকল কুসংস্কার সেকালের লোকের মনে বহুমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহার বড় স্মরণ ছবি ওয়াশিংটন আর-ভিংয়ের Sketch book নামক পুস্তকে দেখা যায়। ঘণ্টা-বাদ্যে যে ঝড় নিবারণ হয় এ বিশ্বাস এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুলভা সুলক্ষিত যুরোপীয়ের মন হইতে দূর হয় নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মাল্টার উপকূলে বিষম ঝড় উপস্থিত হইলে মাল্টার বিশপ নিজে সমস্ত গির্জার আদেশ পাঠাইয়া যেন যে, ঝড় নিবারণার্থ যেন কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত বৃহৎ ঘণ্টা-গুলি বাজান হয়।

পূর্বে কোন খুঁটানের মত্ন হইলে ঘণ্টা বাজান হইত। ক্রমে মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা হয়। এই ঘণ্টাকে মৃত্যুঘণ্টা অর্থাৎ Passing bell বলিত; এই ব্যবস্থা প্রচলনের সময় লোকের বিশ্বাস হইরাছিল যে ঘণ্টাধ্বনি মৃত্যুবৃত্ত ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তাহার দেহ পবিত্র হইত এবং ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া পিশাচাদি পলায়ন করিত। ১৭শ শতাব্দীতে এ প্রথা রহিত হয় এবং “মৃত্যুঘণ্টা” এই নামটিও লোপ পায়, কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গোরস্থানে উপস্থিত হওয়া অবধি যতক্ষণ না তাঁহার সমাধি শেষ হইত, ততক্ষণ ঘণ্টা বাজান হইত, ইহাতে কোন কুসংস্কার ছিল না, মৃতের প্রতি কেবল সম্মান প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য, এ প্রথা এখনও অনেক স্থলে আছে। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে এখন আর এক প্রকার ঘণ্টা-বাদনানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। গির্জার উপাসনা আরম্ভ হইবার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জড় করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মেরীর উপাসনা করিয়া এবং উপাসনা শেষ হইলে ক্রমা প্রার্থনা-পূর্বক উপাসনা করিবার সময় পুনরায় ঘণ্টা বাজান হইত। এই দুইবার বাদনকে “ক্ষমাবাদন” অর্থাৎ pardon-bell বলিত। খৃষ্টীয় সমাজসংস্কারের (Reformation) পূর্বে এই ব্যবহার সকল গির্জায় ছিল; কিন্তু তাহা প্রোটেষ্টান্ট গির্জা হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু ‘মৃত্যুঘণ্টা’ বাজাইবার প্রথা এককালে উঠিয়া যায় নাই।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে “কার্ফিউবেল” নামক এক প্রকার ঘণ্টাবাদন প্রচলিত ছিল। ইহাতে ধর্মসংশ্রব ছিল না। রাত্রি ৮টার সময় সমস্ত লোককে অগ্নি এবং আলোক নিবাইয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া প্রথম উইলিয়ম আদেশ প্রচার করেন, এই আদেশমত সকলকে সতর্ক করিবার জন্য সহরে সহরে যথাসময়ে ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা করা হয়, উইলিয়ম রুফাসের সময় পর্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। এখনও ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের অনেক স্থলে রাত্রি ৮টার সময় ঘণ্টা বাজান হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীদিগকে আলোকাদি নিবাইতে হয় না।

অবশেষে ঘণ্টার সঙ্গীতধ্বনি উৎপাদনের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। এই উপায়টি সর্বপ্রথমে নেদারলণ্ডের লোকেরা বাহির করে। সে দেশের অনেক গির্জায় ঘণ্টা সর্বদাই মুহু মুহুরে বাজিতেছে, এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ির ন্যায় সিকি ঘণ্টা, অর্ধ ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা বাজিয়া থাকে, ইহার কতকগুলি ব্যারেল দেওয়া অর্গ্যান নামক বাদ্যযন্ত্রের নিয়মে বাজান হয়, আর কতকগুলি চাবির সাহায্যে বাদক

আসিয়া বাজায়। ফরাসীরা একরূপ সঙ্গীতকে ‘কারিলল’ বলে। ইংলণ্ডেও একরূপ ঘণ্টা আছে, কিন্তু তাহা একটা নহে, ৬৬টা ঘণ্টা আর মিলাইয়া কোশলে একরূপ করিয়া রাখে যে বাজিবার সময় সেই কয়টা ঘণ্টা হইতে বিভিন্ন আর উঠিয়া বড় সুরের ধ্বনি উৎপাদন করে। ইংরাজেরা এইরূপ ঘণ্টাকেই ‘কারিলল’ বলে, বার্গেস্ নগরের ‘লি হল’ নামক প্রাসাদ-চূড়ায় এইরূপ কারিলল নামক ঘণ্টা আছে, সমগ্র যুরোপে সেরূপ সর্বাঙ্গ সুরের সর্বোৎকৃষ্ট সুরবাদক ঘণ্টা আর নাই। লণ্ডনের অনেক ঘণ্টায়ও কারিলল ঘণ্টার ন্যায় ৫৬ ঘণ্টার আর মিলান থাকে, তবে তাহার মত গান বাজে না—টিং টাং ঢং টুং টাং ঢং করিয়া বেশ সুমিষ্ট শ্রবে বাজিতে থাকে অথচ অতি উচ্চ দূরপ্রাবী শব্দ হয়। এই বাজনার এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে ১২টি ঘণ্টা মিলাইয়া লইলে ৪৭২,০০১,৬০০ ভিন্ন ভিন্ন সুরের বাজিতে থাকে। চিপসাইড নামক স্থানের সেন্ট মেরি-লি-বো নামক গির্জার ঐ প্রকার ঘণ্টা এত বিখ্যাত যে তাহা হইতে ইংলণ্ড সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন ব্যক্তির লণ্ডন নগরে জন্মস্থান এই কথা বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে বলিয়া থাকে “Born within the sound of bowbells”। এই সকল ঘণ্টা কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে বাজাইবার জন্য প্রতিদিন লোকে অর্থ দান করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত Bowbells প্রতিদিন প্রাতঃকালে গভীররবে বাজিয়া থাকে। লণ্ডনবাসী এক ব্যক্তি এই বাদ্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য যে এই শব্দ শুনিয়া লণ্ডনের শিক্ষকগণ জাগিয়া স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইবে।

যুরোপে রোমকেরা অখাদি পণ্ডুর গলায় ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার নিয়ম প্রচলিত করে। ঘোড়ার গলায় সন্ধ্যাকালে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে অন্ধকারে পথিকেরা অশ্বের আগমন বুঝিতে পারে। গৌর, ছাগল, ভেড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে তাহা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে হারাইয়া গেলে খুঁজিবার সুবিধা হয়।

সাহেবদিগের বাড়ীতে কোন লোকের আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য যে সকল ঘণ্টা খুলান থাকে, তাহা ইংলণ্ড রাজী অ্যানির রাজত্বকালে ছিল না, তৎপরে প্রচলিত হয়। সাহেবেরা চাকরদিগকে ডাকিবার জন্য বাজালীর ছায় গলা-বাজী করেন না। এক প্রকার ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন। এই ঘণ্টাকে ‘আহ্বান-ঘণ্টা’ (Calling bell) বা গৃহঘণ্টা (Room-bell) অথবা টেবিল ঘণ্টা (Table bell) বলে।

সাহেবেরা হোটেল, বাসাবাড়ী প্রভৃতির প্রতিবছর সংবাদাদি দিবার জন্য একপ্রকার তারে বাঁধা ঘণ্টা ব্যবহার করেন। এই সকল তারের এক এক মুখ চাকরদিগের ঘরে, এক এক মুখ ঘরের নিকট থাকে, সেইখানে কোন এক তারের মুখ ধরিয়া নাড়া দিলে অতিশ্রুত গৃহে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

এসিয়ার দক্ষিণপূর্বাংশে বৃহদঘণ্টার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। ব্রহ্মদেশের কতকগুলি ঘণ্টার মধ্যে আশাতক দোলক থাকে না, উপরে হরিণশৃঙ্গের মুণ্ডর মারিয়া বাজাইতে হয়। ব্রহ্ম প্রায় সকল প্রধান মন্দিরে ঘণ্টা আছে। রেঙ্গুনের গুয়েদাগন মন্দিরের ঘণ্টা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ঢালাই হয়, ইহার ওজন ৪২ টন ৫ হান্স ৪০ পাউণ্ড। ইহা উচ্চে ২½ হাত, ইহার ব্যাস ৫ হাত, মোটা ১৫ ইঞ্চি। মেঙ্গুনের ঘণ্টা ১৮ ফিট উচ্চ, ওজনে ৮৮ টন ৭ হান্স ১০৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৫০ মণ।

পিকিন চীনের রাজধানী। এখানে একটা ক্ষুদ্র মাঠে একটা ঘণ্টা আছে, তাহার ওজন ৫৩½ টন, ইহার উপর চীন ভাবার সহস্র সহস্র উচ্চ অক্ষরে বৌদ্ধধর্মের অনেক উপদেশ খোদিত আছে। তদ্বারা এই মঠের স্মরণ ইতিহাসে জানা যায়। কারণ প্রত্যেক মঠস্থায়ী মৃত্যুর পূর্বে ইহার গায়ে কিছু না কিছু খোদাইয়া গিয়াছেন। পিকিনের ৭টা ঘণ্টা ৫০ টন বা তাহার কিছু অধিক ওজনের হইবে। ইহার মধ্যে একটা ঘণ্টা পৃথিবীর মধ্যে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ এবং মস্তাউয়ের ঘণ্টারাজ্যটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়।

হিন্দুরাও দেবমন্দিরে ঘণ্টা ঝুলাইয়া থাকে। প্রত্যেক দর্শনার্থী এই ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। বিলাতী ক্যারিলন্সের জায় ৫৭১২টি ঘণ্টা একত্র প্রস্তুত করিবার নিয়ম হিন্দুর মধ্যে বহুকাল প্রচলিত আছে। কোন কোন মন্দিরে এইরূপ ১০৮ ঘণ্টাও দেখা যায়, তবে যুরোপীয় ক্যারিলন্স যেমন সুর মিলাইয়া রাপা হয়, ইহা তেমন নহে।

নেপালের কোন কোন প্রাচীন দেবমন্দিরে হাজার দেড় হাজার বর্ষের পুরাতন ঘণ্টা দৃষ্ট হয়।

দেবপূজার ধূপ ও দীপ দানের পরে বাম হস্তে ঘণ্টার দণ্ডটি ধরিয়া বাজান উচিত। তন্ত্রসারের মতে অঙ্গমন্ত্রে (ফট) ঘণ্টার পূজা করিবার বিধান আছে।

২ ঘণ্টাপাটলী বৃক্ষ। ৩ অতিবলা। ৪ নাগবলা। (রাজনিং) ঘণ্টাক (পুং) ঘণ্টা ইব কারতি কৈ-ক। ঘণ্টাপাটলী বৃক্ষ। ঘণ্টাকর্ণ (পুং) ঘণ্টাবৎ কর্ণবস্ত্র বহুব্রী। ১ শিবের একজন অতি প্রিয় অঙ্গুচর। মীন সংক্রান্তিতে নুহী বৃক্ষের মূলে ইহার পূজা করিতে হয়। পূজার মন্ত্র—

“ঘণ্টাকর্ণঃ! মহাবীর! সর্বব্যাবিধিনাশন!

বিফোটকভরে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল!” (তিথ্যাদিত্য)

ঘণ্টাকর্ণের শিবাঙ্গুচর হইবার বিষয়ে এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে—ইনি মল্লের পুত্র, মেধার গর্ভজাত, ইহার অপর নাম ঘণ্টেশ্বর। ইনি অতিশ্রুত হইয়া উজ্জয়িনী নগরে মল্লরূপে জয়গ্রহণ করেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রধান রত্ন হইবার জন্য শিবের আরাধনা করেন। শিব সন্তুষ্ট হইলেন, বর দিতেও আসিলেন, কিন্তু ইহার অতীষ্ট পূর্ণ হইল না। শিব বর দিলেন যে “তুমি কালিদাস ব্যতীত অপর সকলকেই পরাজিত করিতে পারিবে। কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র, তাহাকে পরাজয় করিবে এরূপ বর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। যদি তাহাকে পরাজয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সরস্বতীর আরাধনা কর।” ঘণ্টাকর্ণ তাহাতে সন্মত হইলেন না, তিনি পুনর্বার শিবেরই আরাধনা আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতেও মনোভীষ্ট পূরণ হইল না। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দেহ থাকিতে মুখে আর শিব নাম লইব না। কিন্তু শিবের চরণে তাঁহার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস কিছুতেই হ্রাস হইল না। পরিশেষে বিক্রমজ্ঞতার সভ্যদিগকে পরাজয় করিতে ঘণ্টাকর্ণ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার বিশ্বাস যে শিবের চরণে অচলা ভক্তি থাকিলে তিনি কালিদাস প্রভৃতি সকল পণ্ডিতকেই পরাজয় করিতে পারিবেন। দেবাদিদেব মহাদেবও অলঙ্কিত তাঁবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

এদিকে তিনি যে মহাদেবের নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এই কথা রাজধানীতে রাষ্ট্র হইল। ঘণ্টাকর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কালিদাস ব্যতীত অপর সকলকে পরাজয় করিলেন। কালিদাস দেখিলেন যে গতিক বড় ভাল নহে। তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বলিয়া বসিলেন যে “মহাশয়! আপনি যদি দীর্ঘকাল মহাদেবের স্তব করিতে পারেন, তবে আপনার সহিত বিচার করিতে পারি।” এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সম্ভবতঃ আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইনি শিবের স্তব করিবেন না, চালাক কালিদাস বিবাদ না করিয়াই জয়লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মহাদেবের প্রতি ইহার অতঙ্কি নাই, কেবল মনের ছুঁথে নাম উচ্চারণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং ইনি শিবের নামমূল্য স্তব আরম্ভ করিলেন। কথা—

“কিংবাচ্যো মহিমা মহাজলনিধে যজ্ঞৈঃস্বজ্ঞাহতি

জ্ঞাতো ভূভূদমজ্ঞানমুনিচয়ে কোনিরপোতাকৃতিঃ।

মৈনাকো হতিগভীরনীরবিলসং পাঠীনপ্ঠোন্নসং
শৈবালাছুরকোটিকোটরকুটাকুটাস্তরে নিবৃত্তঃ ।
তাবৎ সপ্তসমুদ্রযুজিতমহী ভূভূতিরজ্রকটৈঃ
তাবন্তিঃ পরিবারিতাঃ পৃথুপৃথু বীণা সমস্তাদিরং,
যস্য ক্ষারফণামণৌ বিলুলিতে ধন্তে কলঙ্কাকৃতিং
শেষঃ সোপাগমং যদজ্ঞদপদং কঠৈষিচিদমৈ নমঃ ॥

এই স্তব শুনিয়া সভাপক্ষ সকলেই তাঁহার প্রশংসা
করিতে লাগিল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। কালিদাস বিনা
বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ শাপ মুক্ত
হইলেন। মহাদেব ইহার অচলা ভক্তি দেখিয়া ইহাকে
আপনার প্রিয় পার্শ্বদ করিলেন।

ঘণ্টাগার (পুং) ঘণ্টায়া আগারঃ ৬তৎ। যে গৃহে ঘণ্টা
রাখা হয়।

ঘণ্টাতাড় (পুং) ঘণ্টাং কালজ্ঞাপকঘণ্টাং তাড়য়তি ঘণ্টা
তাড়ি-অণ্ উপপদসং। ১ কালমুদ্রক ঘণ্টাবাদক, বর্ণসঙ্কর
জ্ঞাতিবিশেষ। নৃপতিগণের প্রবোধ সময়ে যাহারা ঘণ্টা
বাজায়, তাহাকে ঘণ্টাতাড় কহে।

“মৈত্রেয়সকন্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রস্মরতে।

নূনং প্রশংসত্যজ্ঞসং যো ঘণ্টাতাড়ো হরুণোদয়ে ॥”

(মহু ১০।৩৩)

ঘণ্টানাদ (পুং) ঘণ্টায়া নাদঃ ৬তৎ। ১ ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টায়া
নাদইব নাদোহি যন্ত বহুব্রী। ২ কুবেরের একজন মন্ত্রী।

(শব্দার্থচিঃ)

ঘণ্টাপথ (পুং) ঘণ্টানাং ঘণ্টাদিবাণ্যানাং ঘণ্টায়ুক্তহস্ত্যা-
দীনাং বা পস্থাঃ ৬তৎ সমাং অচ্ (ঋক্পুরকুঃ পথ্যমানক্ষে।
পা ৫।৪.৭৪) বৃহৎ রাজপথ, হস্ত্যাদির গমনযোগ্য গ্রামমার্গ।
চাণক্যের মতে দশধনু বিস্তৃত রাজপথের নাম ঘণ্টাপথ।

“দশধনুস্তরো রাজমার্গো ঘণ্টাপথঃ স্মৃতঃ।” (চাণক্যঃ)

ঘণ্টাপাটলি (স্ত্রী) ঘণ্টাচাসৌ পাটলিচেতি কর্মধাং। বৃক্ষ-
বিশেষ। বঙ্গভাষায় ঘণ্টাপাটল ও হিন্দীতে মোবা বলে।
(Biguonia Suaveolens) পর্যায়—গোলীচ, ঝাটল, মোক্ষ,
মুদ্রক, গোলিহ, ক্ষারক্র, কালমুদ্রক, পাটলি, ঘণ্টাক, ঝাট,
ভীক্ষ, ঘণ্টক, মোক্ষক, কাঠপাটলী, কালাহালী, কাচহালী।

(ভাবপ্রকাশ)

ঘণ্টাভ (ত্রি) ঘণ্টায়া ইব আভা যন্ত বহুব্রী। [ঘটাভ দেখ।]

ঘণ্টারবা (স্ত্রী) ঘণ্টারববৎ রবঃ পক্ষফলেনু যন্ত বহুব্রী টাপ্।
বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় বনশগ ও স্থানবিশেষে ঝনঝনিয়া
বলে। পর্যায়—শগপুন্দিকা, শগপুন্দী।

ঘণ্টারবী (স্ত্রী) ঘণ্টারব বাহুলকাৎ ভীপ্। [ঘণ্টারবা দেখ।]

Vf

ঘণ্টালিকা (স্ত্রী) ঘণ্টালী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ।

[ঘণ্টালী দেখ।]

ঘণ্টালী (স্ত্রী) ঘণ্টাং তচ্ছবৎ অলতি অল-অণ্-ভীপ্। ১ কোষা-
তকী। ২ ঘণ্টানামালী ৬তৎ। ঘণ্টাশ্রেণী।

ঘণ্টাবৎ (ত্রি) ঘণ্টা মতুপ্ প্রত বঃ। ঘণ্টায়ুক্ত, যাহার ঘণ্টা
আছে।

ঘণ্টাবীজ (পুং) ঘণ্টেব বীজন্ত বহুব্রী। জয়পাল বৃক্ষ।

ঘণ্টাশব্দ (পুং) ঘণ্টায়াঃ শব্দঃ ৬তৎ। ১ ঘণ্টারব। ঘণ্টায়াঃ
শব্দইব শব্দোযন্ত বহুব্রী। ২ কাংস্ত। (হেমং)

ঘণ্টিক (পুং) জলজন্তবিশেষ, বড়িয়াল।

ঘণ্টিকা (স্ত্রী) ঘণ্টা অন্নার্থে ভীপ্ ততঃ স্বার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ।

১ ক্ষুদ্র ঘণ্টা। ২ তালুহ জিহ্বা।

“ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টাচ মহামায়া চ তালুকে।” (চণ্ডীকবচ)

৩ গলরোগবিশেষ। (হারীত, চিকিৎসিতং ৪৫ অঃ)

ঘণ্টিন্ (ত্রি) ঘণ্টাহস্তান্তি ঘণ্টা-ইনি। ১ ঘণ্টায়ুক্ত, যাহার
ঘণ্টা আছে।

ঘণ্টিনীবীজ (স্ত্রী) ঘণ্টিনী বীজং ৬তৎ। জয়পাল। (রাজনিং)

ঘণ্ট (পুং) ঘটি-উণ্। ১ গজঘণ্টা। ২ প্রতাপ। (উণাদিকোষ)

ঘণ্টেশ্বর (পুং) মঙ্গলের ঔরসে মেধার গর্ভে উৎপন্ন দেব-
বিশেষ। ইনি ব্রহ্ম দান করেন। ইহার পূজা করিলে ব্রহ্মরোগ
আরোগ্য হয়। (ব্রহ্মবৈং)

ঘণ্টোদর (পুং) [ঘণ্টোদর দেখ।]

ঘণ্ট (পুং) ঘণিতি শব্দং কুর্কন্ ডরতে উড্ডীয়তে ঘণ-ভী-ড।
ভ্রমর। (সংক্ষিপ্তং)

(ত্রি) হস্তি হন্ যুন্ নিপাতনে সাধু। মারক, যাহা

হিংসা করে। (উণাদিবৃত্তি)

ঘন (পুং) হন্ অপ্ ঘনাদেশশ্চ। (মুর্ত্তৌ ঘনঃ। পা ৩।৩।৭৭) ১ মেঘ।

“ভাস্করোপ্যানবরাংশসমীপোপগতান্ ঘনান্।”

(ভারত ১।১৩৭।২৪)

২ যুক্তক, মুখা। ৩ সমূহ। ৪ দার্ঢ্য। ৫ বিস্তার লৌহমুকর।

(মেদিনী) “প্রতি জঘান ঘনৈরিব মুষ্টিভিঃ।” (ভারবি ১৮।১)

৭ শরীর। ৮ কক্ষ। ৯ অভ্রক। (ত্রি) ১০ নিবিড়, নিরন্তর।

“তদলক্ষণং হৃদি শোকঘনে

প্রতিঘাতমিবাস্তিকমস্যা স্তরোঃ।” (রঘু ৮।৯১)

১১ দৃঢ়।

“যজ্ঞকার বিবরঃ শিলাঘনে।” (রঘু ১।১১।১৮)

১২ পূর্ণ। “কিংবদিত্যপূর্ণ্যতে যোম জলধারা ঘনৈরঘনৈঃ।”

(ভারত ১।১৩৬।২৮)

১৩ সম্পূর্ণ। (শব্দরং)

১৪ করতালাদি কাংস্তবাদ্য। ১৫ মধ্যম নৃত্য। (মেঘিনী)
১৬ লৌহ। ১৭ স্বচ। (রাজনি) ১৮ পুরু, স্থূল। ১৯ অবিরত,
অবিচ্ছিন্ন।

“ঘনবাজে ঘন ঘোর দামামা দগড়।” (ঐশ্বর্যম ২।১৭২)

(পুং) ২০ বেনপাঠবিশেষ।

“জটায়ুক্তাং বিপৰ্য্যস্ত ঘনমাহর্মনীষিণঃ।”

[ঋকশব্দে বিদ্যুত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২১ গণিতবিশেষ, সমান তিন অঙ্কের ঘাত, অর্থাৎ পূরণ
করিয়া গুণফলকে পুনর্বার তাহা দ্বারা গুণ করিলে বাহা হয়,
তাহার নাম ঐ রাশির ঘন। যেমন ৩এর ঘন করিতে হইলে
৩কে ৩ দিয়া গুণ করিলে ফল হইলে ৯; গুণফলকে পুন-
বার ৩ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ২৭; অতএব তিনের ঘন
হইল সাতাইশ। দুই বা ততোধিক রাশির ঘন করিবার
সহজ নিয়ম লীলাবতীতে লিখিত আছে।

একটা মাত্র রাশির ঘন করিতে হইলে সেই রাশটিকে
তাহা দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে পুনর্বার সেই রাশি দ্বারা গুণ
করিলে বাহা হইবে তাহাই সেই রাশির ঘন। দুই বা
তাহার অধিক রাশির ঘন করিবার নিয়ম।

১ম নিয়ম।—যে দুইটা রাশির ঘন করিতে হইবে, তাহার
ডানদিকেরটিকে অন্ত্য ও বামের অঙ্কটিকে আদি বলে।
প্রথমে অন্ত্য অঙ্কটির ঘন স্থাপন করিবে। তৎপরে অন্ত্যের
বর্গকে ৩ ও আদি দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব স্থাপিত অঙ্কের
নীচে একস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাখিবে এবং আদির
বর্গকে ৩ ও অন্ত্য দ্বারা গুণ করিয়া দ্বিতীয় পঙ্ক্তির নীচে
এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া সূচ ঘন করিবে। পরে
আদির ঘনকে তৃতীয় পঙ্ক্তির নীচে এক স্থান পরিত্যাগে
স্থাপন করিয়া যোগ করিবে। এই যোগফলই ঐ দুই রাশির
ঘন হইবে। ইহার বামদিকে আরও রাশি থাকিলে
যে দুইটা রাশির ঘন করা হইয়াছে, উহাদিগকে অন্ত্য
ও তৎপূর্ববর্তী একটা রাশিকে আদি করিয়া করিয়া পূর্ব
নিয়মে প্রক্রিয়া করিবে। তৃতীয় অঙ্কটিকে আদি করিয়া
করিয়া প্রক্রিয়া করিতে হইলে উপরের পঙ্ক্তির দুই অঙ্ক
পরিত্যাগ করিয়া তাহার নীচে অপর পঙ্ক্তির স্থাপন
করিতে হয়। এই প্রকার তৎপরবর্তী রাশি থাকিলে
তাহাদেয়ও প্রক্রিয়া করিবে।

উদাহরণ।—২৭ ও ১২৫, ইহাদের ঘন হির কর?

প্রক্রিয়া।—২৭ এই দুইটা রাশির ঘন করিতে হইলে ৭
অন্ত্য ও ২ আদি। ৭ এর ঘন ৩৪৩কে এক পঙ্ক্তিতে
স্থাপন কর। অন্ত্যবর্গ ৪৯ আদি ২×৩ দ্বারা গুণ করিলে

ফল হইল ২৯৪, ইহা পূর্ব পঙ্ক্তির নীচে এক স্থান পরি-
ত্যাগ করিয়া রাখিরা দেও; এবং আদি ২এর বর্গ ৪কে
অন্ত্য ৭×৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ৮৪; ইহাকে দ্বিতীয়
পঙ্ক্তির নীচে একস্থান পরিত্যাগে স্থাপন কর। পরে
আদির ঘন ৮কে একস্থান পরিত্যাগ স্থাপন করিয়া যোগ
করিলে ফল হইবে ১২৬৮৩। অতএব ২৭এর ঘন ১২৬৮৩।
দুইটা রাশির ঘন প্রক্রিয়া ৪টা পঙ্ক্তি হয়, তাহার রাখিবার
প্রণালী।

$$২৭^৩ = ১২৬৮৩।$$

৩৪৩

২৯৪

৮৪

৮

১২৬৮৩

প্রক্রিয়া।—১ম প্রক্রিয়ায়সারে ৫ অন্ত্য ও দুই আদি করিয়া
করিয়া প্রক্রিয়া করিলে ২৫ ঘন হইবে ১৫৬২৫। তৎপরে
২৫কে অন্ত্য ও ১কে আদি করিয়া করিয়া প্রক্রিয়া করিবে।
অন্ত্য ২৫এর বর্গ ১৫৬২৫কে এক পঙ্ক্তিতে স্থাপন কর।
অন্ত্যের বর্গ ৬২৫কে আদি ১×৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল
হইল ১৮৭৫; ইহাকে প্রথম পঙ্ক্তির দুইস্থান পরিত্যাগে
রাখিরা দেও। আদির বর্গ ১কে ২৫×৩ দ্বারা গুণ করিলে
ফল হইবে ৭৫, ইহাকে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির নীচে দুই স্থান
পরিত্যাগে রাখ, পরে ১এর ১কে তৃতীয় পঙ্ক্তির নীচে
দুই স্থান ত্যাগে স্থাপন করিয়া যোগ করিলে ফল হইবে
১২৫৩১২৫। অতএব ১২৫এর ঘন হইল ১২৫৩১২৫।
পঙ্ক্তি রাখিবার প্রণালী—

$$১২৫^৩ = ১২৫৩১২৫।$$

১৫৬২৫

১৮৭৫

৭৫

১

১২৫৩১২৫

এই নিয়মে আদি অঙ্ক হইতে প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেও
চলিতে পারে।

২য় নিয়ম।—যে রাশির ঘন করিতে হইবে, ইচ্ছাযুসারে
তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া খণ্ডদ্বয়ের ঘাতকে ঐ রাশি দ্বারা
পূরণ করিলে বাহা হইবে, তাহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিয়া স্থাপন
করিবে, পৃথকরূপে খণ্ডদ্বয়ের ঘন করিয়া তাহার যোগফলকে
পূর্ব স্থাপিত রাশির সহিত যোগ করিলে বাহা হইবে, তাহাই
ঐ রাশির ঘন। এইরূপ স্থানে রাশিকে যে খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত

করিলে প্রক্রিয়া সহজে নিশ্চয় হয়, সেইরূপে খণ্ডে বিভক্ত করিবে।

উদাহরণ।—২ ও ২৭ এই দুইটা রাশির ঘন স্থির কর।

১ প্রক্রিয়া।—২কে ৫ ও ৪ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত কর। উভয়ের ঘাত ২০ ঘারা ২কে পূরণ করিয়া তাহাকে ৩ ঘারা গুণ করিলে ফল হইবে ৫৪০। উভয় খণ্ডের ঘন ৬৪ ও ১২৫ এর যোগফল ১৮৯কে পূর্ণ স্থাপিত ৫৪০এর সহিত যোগ করিলে ফল হইল ৭২৯। অতএব ২য় নিয়মানুসারে ৯এর ঘন হইল ৭২৯।

২ প্রক্রিয়া।—২৭কে ২০ ও ৭ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত কর। উভয়ের ঘাত ১৪০ ঘারা ২৭কে পূরণ করিয়া তাহাকে ৩ ঘারা গুণ করিলে ফল হইবে ১১৩৪০। উভয় ঘন ৮০০০ ও ৩৪৩এর যোগফল ৮৩৪৩কে পূর্ণ স্থাপিত রাশির সহিত যোগ করিলে ফল হইবে ১৯৬৮৩। অতএব ২৭এর ঘন হইল ১৯৬৮৩।

৩য় নিয়ম—যে রাশির ঘন করিতে হইবে সেই রাশিটি যদি বর্গরাশি হয়, তবে বর্গমূলের প্রক্রিয়ানুসারে তাহার মূল বাহির করিয়া সেই মূলের যে ঘন, তাহার বর্গই বর্গ-রাশির ঘন জানিবে।

উদাহরণ।—৪ ও ১৬ এর ঘন কত?

প্রক্রিয়া।—৪এর বর্গমূল ২; ২এর ঘন ৮, তাহার বর্গ ৬৪। অতএব তৃতীয় নিয়মানুসারে ৪এর ঘন হইল ৬৪। ১৬এর বর্গমূল ৪; ৪এর ঘন ৬৪, তাহার বর্গ ৪০৯৬। অতএব তৃতীয় নিয়মানুসারে ১৬এর ঘন হইল ৪০৯৬। (১)

ঘনকফ (পুং) ঘনস্ত মেঘস্ত কফইব ৬তং। করক, শিল। (ত্রিকাণ্ড)

ঘনকাল (পুং) ঘনস্ত কালঃ ৬তং। বর্ষা ঋতু। (শব্দরত্না)

ঘনক্ষেত্র (ক্লী) যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ বা উচ্চতা পরস্পর সমান তাহাকে ঘনক্ষেত্র বলে।

ঘনগোলক (পুং) ঘনেন মূর্ত্যা গোল ইব কায়তি কৈ-ক। মিশ্রিত স্বর্ণ রৌপ্য। (হেম)

ঘনঘন, অতিশয় নিরন্তর, যাহার মধ্যে ফাঁক নাই।

ঘনচতুষ্কোণ (পুং) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা বেধবিশিষ্ট চতুষ্কোণের নাম ঘনচতুষ্কোণ।

(১) "সমপ্রতিঘাতক ঘনঃ প্রতিষ্টঃ স্থাপ্যো ঘনোহস্ত্যন্ত ততোহস্ত্যবর্গঃ।

আদিপ্রতিঘাতক আদিবর্গ ত্র্যস্ত্যাহতোহথবাদিবনন্ত সর্কে।

স্থানান্তরঘনমূতো ঘনঃস্তাৎ একস্ত্য তৎখণ্ডমূলং ততোহস্ত্যব।

এবং মুহূর্বর্গঘনপ্রসিদ্ধা বাদ্যাক্রতো বা বিধিরেষ কার্ধ্যঃ। ১।

খণ্ডাত্ম্যং বা হতো রাশিপ্রতিঘাতকবর্ণেকাবৃক্। ২।

বর্গমূলঘনবনো বর্গরাশেবনোভবেৎ। ৩।" (লীলাবতী)

ঘনচ্ছদ (পুং) ঘনা নিবিড়াচ্ছদাযন্ত বহুব্রী। শিগু। (শব্দার্থচি°)

ঘনজ্ঞানাল (পুং) ঘনশ্চানৌ জ্ঞানালশ্চেতি কর্মধা°। চুপুক, চলিত কথায় ঘনসোয়াল। (ত্রিকাণ্ড)

ঘনজ্বালা (ক্লী) ঘনস্ত জ্বালেব। ১ বজ্রাশ্বি। ঘনস্ত জ্বালা ৬তং। ২ মেঘের দীপ্তি। (শব্দরত্না)

ঘনতা (ক্লী) ঘনস্ত তাবঃ ঘন-তল-টাপ্। ঘনের ভাব, ঘনের ধর্ম।

ঘনতাল (পুং) ঘনতায়ঃ নিবিড়তায়ঃ অস্রাতি পর্য্যাপ্রোতি অল-অচ্। ১ সারঙ্গ পাখী। ক্লীলিঙ্গে ভীষু হয়। (পুং)

ঘনশ্চানৌ তালশ্চেতি কর্মধা°। বাদ্যাদির তালবিশেষ। [তাল দেখ।]

ঘনতোয় (পুং) হ্রদবিশেষ।

ঘনতোল (পুং) ঘনং মেঘং তোলয়তি উর্দ্ধং নয়তি আহ্বানেন ঘন-তুল্ অণু উপপদস°। চাতকপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘনত্ব (ক্লী) ঘনস্ত তাবঃ ঘন-ত্ব। ঘনতা।

ঘনত্বচ (পুং) ঘনা নিবিড়া ত্বচ্ যন্ত বহুব্রী। শিগু। (শব্দার্থচি°)

ঘনক্রম (পুং) ঘনশ্চানৌ ক্রমশ্চেতি কর্মধা°। বিকটক বৃক্ষ। (রাজনি°)

ঘনধাতু (পুং) ঘনশ্চানৌ ধাতুশ্চেতি কর্মধা°।

ঘননাভি (পুং) ঘনস্ত মেঘস্ত নাভিরিব যোনিহ্মাৎ। ধূম। (শব্দরত্না°) ধূম মেঘের উৎপত্তিস্থান বলিয়া তাহার নাম ঘননাভি। [মেঘ দেখ।]

ঘনপত্র (পুং) ঘনানি পত্রাণি যন্ত বহুব্রী। ১ পুনর্নবা। (রাজনি°)

২ ঘনচ্ছদ, শিগু।

ঘনপদবী (ক্লী) ঘনস্ত পদবী ৬তং। আকাশ। (শব্দার্থচি°)

মেঘের আধার ও মেঘের সঞ্চারণ-স্থান বলিয়া আকাশের ঘন পদবী নাম হইয়াছে।

"ক্রামস্তির্ঘনপদবীমনেকসংখ্যৈঃ।" (কিরাত ৫।৩৪)

ঘনপল্লব (পুং) ঘনা নিবিড়াঃ পল্লবা যন্ত বহুব্রী। শোভাজন, সজনে। (জটা°)

ঘনপাষণ্ড (পুং) ঘনেন মেঘধ্বনিয়া পাষণ্ডইব। ময়ূর। (শব্দমালা।) ক্লীলিঙ্গে ভীষু হয়।

ঘনফল (পুং) ঘনানি নিবিড়ানি ফলানি যন্ত বহুব্রী। বিকটক বৃক্ষ। (রাজনি°)

ঘনমূল (ক্লী) ঘনস্ত সমপ্রতিঘাতস্ত মূলং ৬তং। যে সমান

অঙ্কের ত্রিঘাতকে ঘন বলে সেই সমান অঙ্কই সেই ঘন রাশির ঘনমূল। ইংরাজিভাষায় ইহার নাম Cubic root. যেমন ৩এর ঘন ২৭ অতএব ২৭ ঘনমূল হইবে ৩। এই প্রকার ৬৪এর ঘনমূল ৪ এবং ১২৫এর ঘনমূল ৫ ইত্যাদি। কোন একটা রাশিকে সেই রাশি দিয়া গুণ করিয়া

ঐ গুণফলকে পুনর্বার ঐ রাশি দিয়া গুণ করিলে যে ফল লক হয়, তাহাকে ঐ রাশির ঘন কহে, যেমন ৫ এর ঘন $৫ \times ৫ \times ৫$ অথবা ১২৫।

কোন রাশির ঘন ব্যক্ত করিতে হইলে উহার মন্তকের একটু ডানদিকের উপরে ক্ষুদ্রাকারে একটা ৩ লিখিলেই বুঝা যাইবে, ঐ রাশির ঘন করিতে হইবে, যেমন ৫ এর ঘন = $৫^৩$, কিম্বা $৫^৩ = ৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$ ।

যে রাশিকে ঐ রাশি দ্বারা গুণ করিয়া পুনর্বার ঐ রাশি দিয়া গুণ করিলে গুণফলটি কোন প্রস্তাবিত রাশির সমান হয়, তাহাকে ঐ প্রস্তাবিত রাশির ঘনমূল কহে। যেমন ১২৫ এর ঘনমূল ৫, কারণ $৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$ ।

যে রাশির ঘনমূল বাহির করিতে হইবে, তাহার বাম দিকে $\sqrt{\quad}$ এই মৌলিক চিহ্ন অথবা মন্তকের একটু ডানদিকে ক্ষুদ্রাকারে ৩ এই ভগ্নাংশটি প্রদত্ত হইয়া থাকে। যেমন, $\sqrt[3]{১২৫}$ অথবা $(১২৫)^{\frac{১}{৩}}$ এইরূপ লিখিলে বুঝিতে হইবে যে, ১২৫ এর ঘনমূল নির্দেশ করিতে হইবে। যথা $৩১২৫ = (১২৫)^{\frac{১}{৩}} = ৫$ ।

নিয়ম। যে রাশির ঘনমূল বাহির করিতে হইবে, প্রথমে উহার ডানদিকের একক স্থানীয় অঙ্কের মন্তকে একটা বিন্দুপাত করিয়া দুইটা অন্তর বামদিকের প্রত্যেক তৃতীয় অঙ্কের মন্তকে বিন্দুপাত করিলে মূলে কটা অঙ্ক হইবে, তাহা ঐ বিন্দু সংখ্যায় জানা যাইতে পারে। যথা—৬৭৭ এর ঘন মূল একাঙ্ক বিশিষ্ট; ১৯৮৯৯ এর ঘনমূল দুই অঙ্কবিশিষ্ট হইবে।

বিন্দুপাতের পর যে কয়টা ভাগ হইবে, তাহার প্রথম ভাগ হইতে একরূপ এক গরিষ্ঠ রাশির ঘন অন্তর করিতে হইবে যে যেন উহা ঐ প্রথম অংশকে অতিক্রম না করে। এইরূপে যে রাশির ঘন অন্তর করিবে তাহাই মূলের প্রথম অঙ্ক হইবে।

অন্তর করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ডানদিকে প্রস্তাবিত রাশির আর একটা বিন্দুকৃত নামাইয়া আনিবে। তাহাতে যে ফল লক হইবে, তাহার অন্তর দুইটা অঙ্ক বাদ দিয়া মূলে প্রথমে যাহা লক হইয়াছে, তাহার বর্গকে তিন গুণ করিয়া ঐ বাদ দেওয়া অঙ্ককে ভাগ দিবে এবং প্রথমে যাহা লক হইয়াছে তাহার পরে ঐ ভাগফল রাখিবে। এইরূপ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে গণনা করিবে।

মূলে যাহা লক হইবে, তাহার প্রথম অঙ্কটির দশ গুণের বর্গকে তিন গুণ করিয়া যাহা হইবে তাহা + মূলের দুইটা গুণ ফলের তিন গুণ + মূলের শেষ লক অঙ্কের বর্গ, ইহাতে যে ফল হইবে, মূলের দ্বিতীয় লক ফলদ্বারা তাহাকে গুণ কর

এবং ঐ গুণফল, প্রথম অবশিষ্টের পর প্রস্তাবিত রাশির যে দ্বিতীয় ভাগ নামান হইয়াছে, তাহা হইতে অন্তরিত কর। যদি প্রস্তাবিত রাশিতে আরও অঙ্ক থাকে এইরূপে নামাইবে আর প্রক্রিয়া করিবে।

প্রথমে, প্রথম বিন্দু-অধিকৃত রাশিকে একরূপ একটা রাশির ঘন দিয়া অন্তরিত করিতে হইবে যে যেন উহা ঐ প্রথম অংশকে অতিক্রম না করে।

উদাহরণ। ১১৯৫২ এর ঘনমূল কত? বিন্দুপাত করিলে জানা গেল যে এই রাশির ঘনমূল দুইটা অঙ্ক হইবে। পরে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিলে পাওয়া যাইবে।

১১৯৫২ (২৮

$৩ \times ২^৩ = ১২$	১৩৯৫২
$৩ \times (২০)^৩ = ১২০০$	
$৩ \times ২০ \times ৮ = ৪৮০$	
$৮^৩ = ৫১২$	
১৭৪৮	
৮	
১৩৯৫২	১৩৯৫২

পূর্বেলিখিত নিয়মানুসারে ১৩৯৫২ কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে ঐ ভাগফল ৮ এর অধিক হয়। কিন্তু একরূপ হলে ৮ ব্যতীত তদতিরিক্ত ৯, ১০ বা ১১ দিয়া গুণ করিলে উহা প্রস্তাবিত রাশিকে অতিক্রম করিবে। এই কারণে যে রাশি না অতিক্রম করে, এইরূপ রাশি ধরিয়া গণনা করিবে।

ঘনমূলে দুইটা অঙ্ক হইবে, একরূপ হলে ২ দশক স্থানীয়, এ কারণ $৩ \times (২০)^৩$ লিখিত হইল।

সাধারণের সুবিধার জন্য সামান্য রাশির ঘনমূল নিরাকরণ হেতু নিম্নলিখিত কয়টা রাশি আনিয়া রাখা আবশ্যক।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১, ৮, ২৭, ৬৪, ১২৫, ২১৬, ৩৪৩, ৫১২, ৭২৯, ১০০০, ইহার পরবর্তী রাশি হইতে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিবে।

উদাহরণ।

১১৯৫২ (২৮

$৪ \times ৩০০ = ১২০০$	১৩৯৫২
$২ \times ৮ \times ৩০ = ৪৮০$	
$৮^৩ = ৫১২$	
১৭৪৮	
৮	
১৩৯৫২	১৩৯৫২

প্রথম বিন্দুকৃত রাশিকে এরূপ কোন অঙ্কের ঘন দিয়া অন্তর করিবে যে যেন উহা ঐ প্রথম্যাংশকে অতিক্রম না করে। এতলে যে রাশির ঘন অন্তর করা হইল উহার মূলের প্রথমাক অন্তর করিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দক্ষিণ-ভাগে প্রস্তাবিত রাশির আরও একটা বিন্দুকৃত রাশি নামাইয়া আনিবে। পরে মূল বাহা প্রথমে লক হইয়াছে সেই অঙ্কটির বর্গকে ৩০০ দিয়া গুণ করিলে বাহা থাকিবে তাহা + ঐ মূলের প্রথম লক অঙ্কে আনুমানিক মূলের দ্বিতীয় অঙ্ক (৮) দিয়া গুণ করিয়া পুনরায় ৩০ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে তাহাকে + মূলের শেষ লক (৮) অঙ্কের বর্গ হইতে যে বোগফল হইবে তাহাকে ঐ দ্বিতীয় লক অঙ্ক দিয়া গুণ কর এবং ঐ গুণফল উক্ত অবশিষ্ট রাশি হইতে অন্তরিত কর। যদি প্রস্তাবিত রাশিতে আরও ভাগ থাকে, এইরূপে নামাইবে আর প্রক্রিয়া করিবে। প্রথমে দেখিতে হইবে যে ঐ আনুমানিক দ্বিতীয় অঙ্ক কত হইবে? উহা ৮ না হইয়া ৯, বা ১০ হইলেও হইতে পারে। এরূপ স্থলে উক্ত ৯ বা ১০কে দ্বিতীয় অঙ্ক অনুমান করিয়া উক্ত প্রক্রিয়ায়সারে কার্য করিবে। • যদি দেখিতে পাও যে ৯এর প্রক্রিয়ার ফল প্রস্তাবিত রাশিকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা হইলে ৮কেই যথার্থ অঙ্ক অনুমান করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। সকল অঙ্কেই এইরূপ অনুমান আবশ্যক, ইহার কোন দ্বিগতা নাই।

ঘনযন্ত্র, কাংশাদি ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্র। সপ্তশরাব, মন্দিরা, ঘটতালী (খটতাল), করতালী, রামকরতালী, ঘণ্টা, কাঁশর, ঘড়ি, বাঁজর, ঘুটিকা, নূপুর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা বাতীত কাচ নির্মিত যন্ত্রও ঘনযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মাদ্রাসা। মন্দিরা, ঘটতালী ও করতালী অমুগতসিদ্ধ এবং সপ্তশরাব স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র।

ঘনরস (পুং) ঘনত্ব মেঘস্ত মুগ্ধকস্ত বা রসঃ ৬তৎ। ১ জল। ২ কপূর। ঘনশাস্ত্রো রসশ্চেতি কশ্মধা। ৩ সাজেরস। ঘনো-রসোহস্ত বহুব্রী। ৪ পীলুপর্ণী। ৫ মোরটবৃক্ষ। (জি) ৬ যাহার রস ঘন। রত্নকোষের মতে জল বুঝাইলে ঘনরস শব্দ ক্রীবাঙ্গ।

ঘনরাম, একজন বঙ্গীয় প্রধান কবি। বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে কবির কৃতিবাস ও কবিকল্প প্রভৃতি বৈরূপ উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, ইনিও তাহা হইতে কোন অংশে কম নহে। ইহার রচিত কেবল শ্রীধর্মজল নামক একখানিমাত্র মহাকাব্য পাওয়া যায়। ইহার ভাষা অতিশয় সরল ও অনেকাংশে গ্রাম্যদোষরহিত। ইনি ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ

মাসে স্বরচিত ধর্মমঙ্গল গ্রন্থ শেষ করিল (১)। ধর্মমঙ্গলের প্রথমে লিখিত আছে যে—

“উরগো আসরে আসি লীলারী অভয়া।

অন্তরদায়িনী মা বালকে কর দয়া।”

ইহাতে বোধ হয় যে মহাকবি ঘনরাম বালককালেই ধর্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন বলা যাইতে পারে।

ঘনরামের বাল্যকালেই কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। তিনি সমর পাইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতেন। তাঁহার মধুময় কবিতাগুলি পাঠ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার গুরু তাঁহার অধিতীয় কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে অনুমতি করেন। ঘনরাম গুরুর আদেশেই শ্রীধর্মমঙ্গল প্রণয়ন করিয়াছেন (২)। ইহার কাব্যরচনার সন্তুষ্টি হইয়া গুরু ইহাকে কবিরত্ন উপাধি দেন। বর্ধমান জেলার কইখড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মবংশে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহের নাম ধনঞ্জয় ও ঐপিতামহের নাম পরমানন্দ। ইহার মাতামহের নাম গঙ্গারাম ও মাতার নাম নীতা। ইহারা বংশপরম্পরাক্রমে চক্রবর্তী উপাধিধারী ছিলেন। ইনি স্বরচিত গ্রন্থের অনেক হানেই রাজা কীর্তি-চন্দ্র ও তাঁহার ধর্মসভার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যেন কবি ঘনরাম রাজা কীর্তিচন্দ্রের ধর্মসভায় সভ্য ছিলেন। কবি আপনাকে রামের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ঘনবর (ক্রী) মুখ, আশ্র।

ঘনবত্সানু (ক্রী) ঘনত্ব বত্স ৬তৎ। আকাশ।

“ঘনবত্সানুহস্তধেব কুর্কন।” (কিরাতঃ)

ঘনবল্লিকা (ক্রী) ঘনা নিবিড়া বল্লী যন্তাঃ বহুব্রী, কপ্ হ্রস্বশ্চ।

১ অমৃতস্রবা লতা। ঘনত্ব বল্লীব ৬তৎ। ২ বিছাৎ। (রাজনিঃ)

(১) “সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।

শুন সবে যে কালে হইল সঙ্গাঙ্গন।

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।

মার্গকাণ্ড অংশে হংস ভাগ্যবাসর।” (ধর্মমঙ্গল ২৪ স)।

(২) “ভাবিতব পদযন্ত, ছই এক ভাষা ছন্দ,

কবিতা কবিতাম পূর্বকালে।

শুনে হয়ে কৃপাধিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,

গুরু ব্রহ্ম বদনকমলে।

মিল গুণে করি বহু, নাম দিলা কবিরত্ন।”

(শ্রীধর্মমঙ্গল ১ম সর্গ)

ঘনবল্লী (জী) ঘনস্ত মেঘস্ত বল্লীব। ১ বিহাং। ২ অমৃত-
অবালতা। (রাজনি°)

ঘনবাত (পুং) ঘনোনিবিড়োবাতোহিহ। ১ নরকবিশেষ। (হেম°)
ঘনস্ত বাতঃ ৬তৎ। ২ মেঘবাত।

ঘনবাস (পুং) ঘনোবাসো গন্ধোহস্ত বহতী। কুয়াণ্ড। (হারা°)

ঘনবাহন (পুং) ঘন ইব তত্রঃ বাহনঃ যস্ত বহতী। ১ শিব।
ঘনো মেঘো বাহনঃ যস্ত বহতী। ২ ইহ্র। (হেম°)

ঘনবীধি (জী) ঘনানাং বীধিঃ ৬তৎ। আকাশ।

“ঘনবীধিবীধিমবতীর্ষতঃ।” (মাঘ)

ঘনব্যপায় (পুং) ঘনস্ত ব্যপায়ঃ ৬তৎ। ১ বর্ষার অবসান।

“ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।” (রঘু ৩।৩৭)

২ মেঘের অবসান।

ঘনশ্যাম (পুং) ঘনঃ মেঘ ইব শ্যামঃ। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ।

“অয়ে রাম ঘনশ্যাম! চুখামি মুখপঙ্কজম্।” (মহানটক)

ঘনসার (পুং) ঘনস্য মুক্তকস্য সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূরবিশেষ।

“শরদিন্দুকুলঘনসারনীহারহারঃ” (দশকুমার) ঘনো নিবিড়ঃ
সারোহস্য বহতী। ২ দক্ষিণাবর্ত্ত পারদ। (মেদিনী) ৩ বৃক্ষ-
বিশেষ। ৪ জল। (ধরণী) ঘনস্ত সারঃ ৬তৎ। ৫ শ্রেষ্ঠ মেঘ।

ঘনস্কন্ধ (পুং) ঘনঃ স্কন্ধো বস্য বহতী। কোশাস্ত্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

ঘনস্বন (পুং) ঘনস্য স্বনঃ ৬তৎ। ১ মেঘের শব্দ। ঘনেন
তজ্জলেন স্তূৰ্ণ অনিতি অনু-অচ্। ২ তণ্ডুলীয় শাক। (রাজনি°)

ঘনহস্ত (পুং) ঘনঃ সমজিঘাতমিতো হস্তোহিহ বহতী। ১ বার-
কোণযুক্ত এক হাত উচ্চ, এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত
ক্ষেত্রের নাম ঘনহস্ত। ২ মাগধ দেশে ধাত্তাদি পরিমাণে
ব্যবহৃত ধারিকা।

“হস্তোন্মিঠৈবিস্তৃতিদৈর্ঘ্যাপিঠে-

র্ষদ্বাদশাঙ্গঃ ঘনহস্তসংজ্ঞম্।

ধাত্তাদিকে তদ্বনহস্তমানঃ

শাত্তোদিতা মাগধধারিকা সা ॥” (লীলাবতী)

ঘনা (জী) ঘন অন্ত্যর্থে-অচ্ টাপ্। ১ মাঘপর্ণী। ২ রত্নজটা।
(রাজনি°)

ঘনাকর (পুং) ঘনানাং মেঘানামাকরঃ ৬তৎ। বর্ষাকাল।
(শব্দরত্না°)

ঘনাগম (পুং) আগম্যভেহ্য আ-গম-আধারে ঘঞ্। ঘনানা-
মাগমঃ ৬তৎ। ১ বর্ষাকাল।

“নহি ঘনাগমরীতি কদাছত।” (সাহিত্যদ°)

আ-গম-ভাবে ঘঞ্ ঘনানাগমঃ ৬তৎ। ২ মেঘের আগমন।

ঘনাবন (পুং) হন-অচ্ নিপাতনে সাধু। (হস্তের্যবৃক্ষ।
বার্তিক) ১ ইহ্র। ২ বর্ষক মেঘ।

“সমুহমানা বহধা যেন নীতা পৃথক্ ঘনাঃ।

বর্ষমৌলিকতরিত্তান্তে তবন্তি ঘনাবনাঃ।” (ভারত ১৩।৩৩০)

৩ বাতুক, মত্ত হতী। ৪ পরস্পর সন্মর্ষণ। (ধরণী।)

(জি) ৫ নিরস্তর। ৬ বাতুক।

“আতঃ শিশানো বুযভো ন ভীমোঃ

ঘনাবনঃ কোতপশ্চর্ষণীনাং ॥” (শব্দ ১০।১০৩।১)

“ঘনাবনো ঘাতকঃ শত্রুণাং হস্তা”। (সারণ।)

ঘনাবনা (জী) ঘনাবন-টাপ্। কাকমাটা। (শব্দচঞ্জিকা)

ঘনাঞ্জনী (জী) ঘনং নিবিড়ং অঞ্জনং যস্তাঃ বহতী। দুর্গা।

ঘনাত্যগ্ন (পুং) ঘনানামত্যগ্নো যজ্ঞ বহতী। ১ শরৎকাল।

“বাতিকানাং ঘনাত্যগ্নে” (ভূপ্রত ১।৬ অঃ) ঘনানামত্যগ্নঃ
৬তৎ। ২ ঘনাতিক্রম।

ঘনাময় (পুং) ঘনো দৃঢ় আময়ো বস্মাং বহতী। ধর্ম্মরবৃক্ষ।

ঘনামল (পুং) বাতুক শাক। (জিকাণ্ড°)

ঘনাবৃত (জি) ঘনেন আবৃতঃ ৩তৎ। মেঘাচ্ছাদিত।

ঘনাশ্রয় (পুং) ঘনানামশ্রয়ঃ ৬তৎ। আকাশ। (হেম°)

ঘনিষ্ঠ (জি) অতিশয়েন ঘনঃ ঘন-ইষ্টন্। (অতিশায়নে তম-
বিষ্টনো। পা ৫।৩।৫৫) ১ অতিশয় ঘন। ২ ঘোষণ, অতি
নিকট। (দেশজ) ৩ যে সর্ষদা যাতায়াত করে, যে সর্ষদা

আহুগত্য করে, যাহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

ঘনিষ্ঠতা (জী) ঘনিষ্ঠস্ত ভাবঃ ঘনিষ্ঠ-তল্ টাপ্। ১ সবিশেষ
আত্মীয়তা। ২ নিকট সম্বন্ধ।

ঘনীভাব (পুং) ঘন-ঢ়ি-ভূ-ঘঞ্। ঘন হওয়ার।

ঘনীভূত (জি) ঘন-ঢ়ি-ভূ-ক্ত। যাহা ঘন হইয়াছে।

ঘনুয়া (হিন্দী) উপপতি। কোটনা।

ঘনোত্তম (পুং) ঘনেষু উত্তমঃ ৭তৎ। মেঘশ্রেষ্ঠ।

ঘনোদ (পুং) যে সমুদ্র বা পুষ্করিণীর জল ঘন বা ভারি।

ঘনোদধি (পুং) ঘন উদধিরজ বহতী। নরকবিশেষ। (হেম°)

ঘনোপল (পুং) ঘনস্য উপলঃ ৬তৎ। করকা, শিল।

ঘয়ির মহদী, শোলাপুরনিবাসী মুসলমানদিগের সম্প্রদায়-
বিশেষ। ইহাদের বিশ্বাস যে শেষ ইমাম বা জাপকর্তা
জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। জোনপুরবাসী সয়েদখাঁর পুত্র
মুহম্মদ মহদী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ৮৪৭ হিজিরায়
মুহম্মদের জন্ম হয়। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ‘ওয়ালী’
হইয়া মক্কা ও জোনপুরে স্বমত প্রচার করিয়া অনেক শিষ্য
সংগ্রহ করেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনাকে ভাবী মহদী
বলিয়া প্রচারিত করিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি জনসমক্ষে
অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বুদ্ধরূপী দেখাইয়া ছিলেন। ১৫০৪
খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র সশিষ্যে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বাস করেন।

১৫২০ খৃঃ অব্দে আকবরনগররাজ খুর্শান নিজামশাহ মহাদী সম্প্রদায় তুলত হন। ইহার অনেক বিষয়ে গোড়া মুলমলান-দিগের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইহার। মুহম্মদ মহাদীকে শেষ ইমাম বলিয়া জানে এবং স্বকৃত পাপের জন্য পরিতাপ বা মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্ধার উদ্দেশে তজনা করে না।

ঘর (পুং) স্ব-অহ্। ১ গৃহ। (দেশজ) ২ ভবন। ৩ সংসার।

ঘরকন্না (দেশজ) গৃহকার্য।

ঘরকুটলী (দেশজ) গৃহকার্যস্বকীয়, গৃহস্বকীয়।

ঘরটু (পুং) ঘরং সেকং অটুতি অতিক্রমতি ঘর-অটু-অণ্ উপসং। পেশনী, চলিত কথায় খাঁতা।

ঘরনী (গ্রহণী শব্দজ) গ্রহণী, ভাষা।

ঘরবসত (দেশজ) কন্নার পিতৃগৃহ হইতে স্বভ্রাতৃগণের গিয়া বাস।

ঘরবারী দত্তী, একপ্রকার সম্প্রদায়। দত্তী নামে পরিচয় দিলেও ইহার গৃহস্থ, জীপুত্রাদি লইয়া সংসারধর্ম পালন করে, অথচ দশনামীদের মত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি এবং মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিকবাস ধারণ করিয়া তীর্থ ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ বারানসী জেলায় এই সম্প্রদায়ের অনেকের বসবাস আছে। স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি চলে, নিজ মঠের দণ্ডি-গৃহে বিবাহ করিতে নাই। প্রবাদ এইরূপ কোন দত্তী এক রূপসী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইতেই কোতুকাবহ ঘরবারীদত্তী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ঘরবারীসন্ন্যাসী—একপ্রকার সম্প্রদায়। মুওমালাত্রে গৃহাবধূত * নামে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের নানাস্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। ঘরবারী দত্তীদের মত ইহারাও স্বমঠে বিবাহ করেন না, শৃঙ্গগিরিমঠের পুরি গোঁসাই জ্যোষীমঠের গিরি গোঁসাইয়ের গৃহে বিবাহ করিতে পারেন। অপরাপর সন্ন্যাসীরা ইহাদিগকে নিভান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জানেন, আহার ব্যবহার দূরের কথা, তাঁহারা ইহাদের স্পৃষ্ট অন্নও ভোজন করেন না।

ঘরসজ্জান (দেশজ) গৃহের ভাল মন্দ অবস্থা জানা, গৃহ-ছিদ্র জ্ঞান।

ঘরা (দেশজ) আধার, ছিদ্র।

ঘরাও (দেশজ) ১ ঘরপোষা, অন্তবর্তী। ২ গৃহস্বকীয়।

ঘরাঘরি (দেশজ) আপমানি কুটুম্বাদির মধ্যে। কোন নিকটাত্মীরের গৃহে পুত্র বা কন্নার বিবাহকে ঘরাঘরি বিবাহ বলা হয়।

ঘরাণী (দেশজ) গৃহস্বকীয়।

ঘরানী (দেশজ) গৃহনির্মাতা, গৃহকারক।

ঘরানীগরী (দেশজ) ঘরানীর কাজ।

ঘরানীপনা (দেশজ) ঘরানীর কাজ।

ঘর্ঘট (পুং) স্ব-বিচ্-ঘরে সেকার ঘটতে ঘট-অহ্। ত্রিকণ্টক মৎস্য, টেঙুরা মাছ। (শব্দরত্নাং)

ঘর্ঘর (পুং) ঘর্ঘতি অব্যক্তশব্দং রাতি রা-ক। (আতোহ-মুপদর্গে কঃ। পা ৩।২।৩১) ১ ধ্বনিবিশেষ, বাতা প্রভৃতির শব্দ। “কলহার বনান্ যজ্ঞখিতাদধুনা পুত্রাতি ঘর্ঘরঃ।” (নৈষধচ) ২ পর্কতঘর। ৩ ঘর, ছয়ার। ৪ উলুক। ৫ নদবিশেষ। “যে নদা লোহিতাদ্যাশ্চ নদাভিদ্ধ্যোঽক্ঘর্ঘরঃ।”

(জর্গোৎসবপদ্ধতি)

বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড় পর-গণায় ঘর্ঘর নামে একটি নদ আছে। প্রবাদ এই যে পূর্বে এই নদ অতিশয় বিস্তৃত ছিল। কোন এক মহাপুরুষের শাপে দিন দিন এইরূপ ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উভয় কূলেই ৪৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিলময় স্থান। ইহাতে বোধ হয় যে ঐ নদ পূর্বে অতিশয় বিস্তৃত ছিল, দিন দিন ধরতর প্রবাহ হ্রাস হওয়ায় তাহার গর্ভই বিলরূপে পরিণত হইয়াছে। এই নদের বর্তমান বিস্তার ৮০।৯০ ফিটের অধিক নহে।

৬ ধ্বনি। ৭ হাস্য। ৮ ভূধানল। (ভূরিপ্রয়োগ)

ঘর্ঘরক (পুং) ঘর্ঘর স্বার্থে কন্। একটি প্রসিদ্ধ নদ, বিষ্ণাচল হইতে প্রবাহিত হইয়া চম্পানগরীর অনতিদূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার জল রুচিকর, সস্তাপ ও শোষণশীল, পথ্য, অমিষ্টিকর, বলকারী, ক্ষীণ ও শরীরের পুষ্টিকারক।

“শোণে ঘর্ঘরকে জলজন্তুচিহ্নং সস্তাপশোষণহম্।” (রাজনি)

ঘর্ঘরা (স্ত্রী) ঘর্ঘর-টাপ্। ১ ক্ষুদ্র ঘটিকা। “ঘর্ঘরা ক্ষুদ্রঘটী-স্যাৎ।” (মল্লিনাথ) ২ বীণাবিশেষ। (মেদিনী) ৩ গঙ্গা। গঙ্গা বুঝাইলে বিকল্পে ভীষ্ম হইয়া ঘর্ঘরী শব্দ হয়।

“স্বপাবতী স্বগিনিধি ঘর্ঘরীযুকনাদিনী।” (কাশীখণ্ড ২৯ অঃ)

৪ অযোধ্যা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীবিশেষ। হিমালয়পর্বতের উচ্চস্থান হইতে নেপালের মধ্য দিয়া কোরিয়ালা নামে প্রবাহিত। পর্বতের নিম্নস্তরে জীবাগনি

* “অবধূতস্ত্রিবিধো গৃহস্থস্ত্রিভিঃ।

সদারঃ সর্বদায়গো অটুহাসো দিগধরঃ।

গৃহাবধূতো দেবেশি বিতীর্ণস্ত্রিভিঃ।”

প্রাণভোজিনীভূত মুওমালাত্রে।

নামক স্থান হইতে বহুসংখ্যক শাখা আসিয়া ইহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে। উক্ত স্রোত তরাই ভূমিতে পড়িয়া ছই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, পশ্চিম শাখার নাম কোরিয়ালা ও পূর্বশাখার নাম গিরবা নদী। ঘর্ষরা অপেক্ষা এই গিরবার জল অধিক। আর ১৮ মাইল পথ লাগবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ শাখার অক্ষা° ২৬° ২৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ১৭' পূঃ মধ্যে বৃটীশরাজ্যে পড়িয়াছে, পুনরায় তরখাপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ঐ ছইটি শাখা একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে থেরি জেলা হইতে সুহেলী নামক নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পরে আর ৪৭ মাইল দক্ষিণাভিমুখে বাইরা থেরি ও বরাইচের মধ্য দিয়া সরযুনদী কাটাই-বাটের নিকটে এবং ইহার অব্যবহিত দক্ষিণে বহরামবাটের নিকট চোকা ও মহাবাড় নদীদ্বয় মিলিয়া সঙ্গমস্থল হইতে জলরাশির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই স্থানের পর হইতেই নদী প্রকৃত ঘর্ষরা নামে খ্যাত। ক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ব গতিতে উত্তরে বরাইচ ও গোণ্ডা রাজ্য, দক্ষিণে বারাবাকী ও ফরজাবাদ, এবং পশ্চিমে অযোধ্যাকে রাধিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যেখানে এই নদী উত্তরে বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলা এবং দক্ষিণে আজম-গড় রাধিয়াছে, সেইখানে ইহার বামকূলে রাণ্ডী ও মুচোরানদী মিশিয়াছে। দরৌলীর নিকটে ইহা বঙ্গপ্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং ছাপরায় আসিয়া গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উভয় তটে অনেক নদীগর্ভ দেখা যায়, সম্ভবতঃ পূর্বকালে ঐ সকল খাত দিয়া এই নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমান সময়ে নদীর গতি বদলাইয়া ক্রমা-বয়ে মধ্যবর্তী হইয়াছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঘর্ষরা নদীতে ভয়ানক বন্যা হয়, তাহাতে গোণ্ডা জেলার খুরাশা নগর একেবারে ধোত হইয়া যায়।

ঘর্ষরিকা (জী) ঘর্ষরোহিত্যাস্যঃ ঠন্ টাপ্। ১ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। ২ নদীবিশেষ। ৩ বাদ্যভাণ্ড। ৪ ভাজাধান। ৫ বাদ্য-বিশেষ। (বিশ্ব)

ঘর্ষরিত (ক্ৰী) ঘর্ষরং করোতি গিচ্ ভাবে ক্ত। শূকরজাতীয় ধ্বনিবিশেষ। “নিশমাতে ঘর্ষরিতং শ্রুতেনং

করিস্থ মায়ায় শূকরস্য।” (ভাগবত ৩।১৩।১৫)

ঘঘূর্ধা (জী) ঘ-বিচ্ ঘুর-ধ্বনৌ কিপ্ তৌ হস্তি হন-ড নিপাতনে সাধু ততঃ টাপ্। কীটবিশেষ, ঘঘূর্ধর কীট, ঘঘূর্ধরে পোকা।

ঘর্ষ (পুং) ঘরতি অজাৎ করতি স্ব-মক্। গুণশ্চ নিপাতনে সাধুঃ। (ঘর্ষঃ। উণ্ ১।১৪৮) ১ শ্বেদ, অঙ্গনিষাল, ঘাম। সাহিত্যদর্পণের মতে ইহা সাংখ্যিকগুণের অন্তর্গত। রতি, গ্রীষ্ম ও শ্রম প্রভৃতি দ্বারা শরীরের অলোদগমের নাম শ্বেদ।

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°) ঘরত্যঙ্গমনেন স্ব-করণে মক্। ২ আতপ। ৩ গ্রীষ্মকাল। ৪ আতপযুক্ত দিন। ৫ যজ্ঞ। (নিঘণ্টু)

“পিতৃভির্ঘর্ষ সতিঃ।” (ঋক্ ১০।১৫৯) ‘ঘর্ষসত্ত্বিগা-সাদিতিঃ’ (সায়ণ) ৬ রস। “মধু নঃ সারবত্ ঘর্ষং পাত বসবঃ।” (যজুঃ ৩৮।৬) ‘ঘর্ষং রসং’ (মহীধর)। ৭ ছুট্।

(ত্রি) ৮ দীপ্তিযুক্ত।

ঘর্ষচর্চিকা (জী) ঘর্ষকৃত্য চর্চিকা। ঘামাণী।

“বেদবাহিনী ছব্যস্তি ক্রোধশোকশ্রমৈস্তথা।

ততঃ শ্বেদঃ প্রবর্তেত দৌর্গন্ধং ঘর্ষচর্চিকা।” (প্ররোগামৃত)

ঘর্ষদীধিতি (পুং) ঘর্ষো দীধিতৌ যত্ বহত্ৰী। সূর্য্য।

“যঃ স সোম ইব ঘর্ষদীধিতিঃ।” (রঘু)

ঘর্ষদুহা (জী) [বৈ] যে গাভীর দুগ্ধদোহন করা হইয়াছে।

“ঘর্ষদুহায়া দোহনপ্রদেশে।” (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।৬।২ কর্ক)

ঘর্ষদুহ্ (জী) ঘর্ষং দুগ্ধং দোদ্বি দুহ-ক্ৰিপ্ ৬তৎ। যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে।

“ঘর্ষদুগ্ধালা চাদোহ চ।” (কাত্যায়ন শ্রৌ° ২৫।৬।২)

ঘর্ষপায়স্ (ক্ৰী) ঘাম, গরমজল।

ঘর্ষপাবন্ (পুং) ঘর্ষমুদ্রাণং পিবতি ঘর্ষ-পা-বন্নিপ্। উদ্রপা নামক পিতৃগণ।

“বাহা পিতৃভ্য উর্জ বহিভ্যো ঘর্ষপাবভ্যঃ।”

(বাকসনের° ৩৮।১৫)

ঘর্ষমাস (পুং) গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠমাস।

ঘর্ষরশ্মি (পুং) ঘর্ষো রশ্মৌ যত্ বহত্ৰী। সূর্য্য।

ঘর্ষবৎ (ত্রি) ঘর্ষঃ অন্ত্যস্ত ঘর্ষ মতূপ্ হত্ বঃ। ঘর্ষযুক্ত, ঘর্ষাক্ত।

ঘর্ষসদৃ (পুং) ঘর্ষে যজ্ঞে সীদতি সদ-ক্ৰিপ্। পিতৃগণবিশেষ, অপর নাম যজ্ঞসাদী।

“পূর্বেঃ পিতৃভির্ঘর্ষসতিঃ।” (ঋক্ ১০।১৫।৯)

‘ঘর্ষসতিঃ যজ্ঞসাদিতিঃ।’ (সায়ণ)

ঘর্ষস্তম্ভ (ত্রি) ঘর্ষং স্তম্ভাতি স্তম্ভ-ক্ৰিপ্। বায়ু। বায়ু বহিলে ঘর্ষনাশ হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

“ঘর্ষস্তম্ভে দিব আপুর্থে যজ্ঞেন।” (ঋক্ ৫।৪৪।১) ‘ঘর্ষস্তম্ভে নর্ষস্য স্তোভয়িত্বে’ (সায়ণ)

ঘর্ষস্বরস্ (পুং) ঘর্ষা দীপ্তাঃ স্বরসো ধ্বনয়োযস্য বহত্ৰী। দীপ্তধ্বনিযুক্ত।

“ঘর্ষস্বরসো নদ্যো অপ ত্রন্” (ঋক্ ৪।৫৫।৬) ‘ঘর্ষস্বরসো দীপ্তধ্বনয়ঃ’ (সায়ণ)

ঘর্ষশ্বেদ (পুং) ঘর্ষোদীপ্তঃ শ্বেদঃ কর্ধধা°। ১ দীপ্তগমন। ঘর্ষঃ করন্ শ্বেদঃ কর্ধধা°। ২ গলিত শ্বেদজল। ঘর্ষে যজ্ঞে শ্বেদো গতির্ভক্ত বহত্ৰী। ৩ যজ্ঞে গম্ভা, যে যজ্ঞে গমন করে।

“ব্রহ্মগণ্ঠতি বৃষেতিবরাটৈ বর্ষশ্বেদেতিব্রহ্মবিণম্।”

(শ্লক ১০।৬৭।৭) ‘বর্ষশ্বেদেতি ব্রহ্মগণ্ঠতিবরাটৈ বর্ষশ্বেদেতিব্রহ্মবিণম্।’

অথবা বর্ষো বহুঃ তৎ প্রতিগন্তুঃ। (সারণ।)

বর্ষাংশু (পুং) বর্ষঃ অংশো বহু বহুতী। স্বর্ষ্য।

বর্ষাক্ত (ত্রি) বর্ষোক্তঃ ৩তৎ। বর্ষাষিত, বাহার বর্ষ হইরাছে।

বর্ষাক্তকলেবর (ত্রি) বর্ষাক্তঃ কলেবরঃ যন্ত বহুতী। বাহার শরীর বর্ষে আত্ম হইরাছে।

বর্ষান্ত (পুং) বর্ষান্ত উন্নয়োক্তোযন্ত বহুতী। বর্ষাকাল।

“বর্ষান্তে তোরদোর্মিতিঃ” (হরিবংশ ১৭৭ অঃ)

বর্ষান্তকামুকী (স্ত্রী) বর্ষান্তে বর্ষান্ত কামুকী ৭তৎ। বলাকা, বর্ষাকালে বলাকার কাম্পূহা হয় বলিয়া এই নাম হইরাছে।

[বলাকা দেখ।]

বর্ষান্ত (স্ত্রী) শ্বেদজল, বাম।

বর্ষান্তস্ (স্ত্রী) শ্বেদ জল, বাম।

বর্ষান্ত (ত্রি) বর্ষোক্তঃ ৩তৎ। বাহার অত্যন্ত বাম হইতেছে।

বর্ষান্তকলেবর (ত্রি) বর্ষান্তঃ কলেবরঃ যন্ত বহুতী।

[বর্ষাক্তকলেবর দেখ।]

বর্ষিন্ (ত্রি) বর্ষেণ চরতি বর্ষ-বাহুলকাৎ ইনি। ১ বাহার। বর্ষদ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

“অধবর্বো বর্ষিণঃ সিদ্ধিদানাঃ।” (শ্লক ৮।১০৪।৮ ‘বর্ষিণো’

‘বর্ষেণ প্রবর্গেণ চরন্তঃ।’ (সারণ।)

বর্ষোহস্ত্যন্ত বর্ষ ইনি। ২ বর্ষযুক্ত।

বর্ষোদক (স্ত্রী) শ্বেদ জল।

বর্ষ্য (ত্রি) বর্ষশ্বেদঃ বর্ষ-যৎ। বর্ষ্য সঞ্চীয়। “উপযমন্তা-
মাসিঞ্চতি বর্ষম্” (কাত্যায়নশ্রো ২৭।৬।১৭) ‘বর্ষ্যঃ বর্ষ
সঞ্চি’ ভাষ্য।

বর্ষ্যেষ্ঠ [বর্ষ্যেষ্ঠ দেখ।]

বর্ষ (পুং) স্বর্ষ-ঘঞ। স্বর্ষণ, ঘষা।

“শলো বারিণো বারিবর্ষজঃ।” (রামা ২।৪৪।৬)

বর্ষক (ত্রি) স্বর্ষ-বুল। যে স্বর্ষণ করে।

বর্ষকপদী, (Rasesores) যে পাখীরা নথদ্বারা ভূমিবিদারণ
করে। কুকুট, ময়ূর ও মোনাল প্রভৃতি।

বর্ষণ (স্ত্রী) স্বর্ষ ভাবে লুট্। ১ ঘষা, মাজা। ২ কোন সারি-
কায় তার চাপিয়া আঘাতানন্তর সেই আঘাতের অনুকরণ
থাকিতে থাকিতে বাম হস্তের অঙ্গুলীর বর্ষণযোগে এক
বা ততোধিক সূরে ক্রমান্বয়ে বাওয়ার নাম বর্ষণ বা আশ।

বর্ষণাল (পুং) বর্ষণালতি পর্যাণোতি অল অচ্। শিলা-
পুত্র, লোড়। (ত্রিকাণ্ড)

বর্ষণী (স্ত্রী) স্বর্ষভাতেনো স্বর্ষ-কর্ণনি-লুট্-স্ত্রীপ্। হরিণী।

(ত্রিকাণ্ড)

বর্ষণীয় (ত্রি) স্বর্ষ-অনীয়ন্। বাহা বর্ষণ করা হইবে।

বর্ষিত (ত্রি) স্বর্ষ-ক্ত। বাহা বর্ষণ করা হইরাছে।

বর্ষিন্ (ত্রি) স্বর্ষ-গিনি। যে বর্ষণ করে।

ঘল (স্ত্রী) [ঘোল দেখ।]

ঘষা (বর্ষ শব্দজ) বর্ষণ।

ঘষাচুল (দেশজ) যে চুল ঘষা হইরাছে।

ঘষি (দেশজ) শুক গোমরচূর্ণ, কোন কোন স্থানে ঘুটিয়াকে
চলিত কথায় ঘষি বলে।

ঘসি (পুং) ঘস-ভাবে ইন। ভক্ষণ।

“ঘসিনা মে মাসং পৃক্থা” (বাজসনেয়)

ঘস্মর (ত্রি) ঘস-স্মরচ্ (স্বঘস্যদঃ স্মরচ্। পা ৩।২।১৬০)
১ ভক্ষণশীল।

“ঘস্মরা নষ্টশৌচাশ্চ ঘস্মর ইত্যনুশ্রমঃ।” (ভারত ৮।৪০ অঃ)

২ কালজরগিরিহিত সপ্ত মৃগের অন্ততম। সপ্তের
শাপে মৃগঘোনিপ্রাপ্ত কৌশিক পুত্র। [সপ্তব্যাধ দেখ।]

ঘস্র (পুং) ঘসত্যধকারঃ ঘস্র-রক্। ১ দিন। (অমর)

(ত্রি) ২ হিংস্র। (মেদিনী) (স্ত্রী) ৩ কুক্ষম। (ত্রিকাণ্ড)

ঘা (স্ত্রী) হন-ড হস্য যন্ত বাহুলকাৎ টাপ্ চ। ১ কাঞ্চী। ২
ঘাত। (মেদিনী) (ঘাতশব্দজ) ৩ আঘাত।

“প্রগতি করিয়া ভূপে শিরে হানে ঘা।

অভিমানে হুংথে কাঁদে মুখে নাই রা।” (ধর্মম ২।১১২)

৪ ক্ষত চিহ্ন।

ঘাইট (দেশজ) অপরাধ, দোষ, অজ্ঞায়।

ঘাইটবাড়ী (দেশজ) কমবেশ।

ঘাইল (দেশজ) আহত, ক্ষত বিক্ষত।

ঘাঁটন (দেশজ) ১ আলোড়ন। ২ মিস্ত্রীকরণ। ৩ চটুকান।

ঘাঁটা (দেশজ) ১ [ঘাঁটন দেখ।] ২ ঘাড়।

ঘাঁটি (ঘট্টশব্দজ) চৌকিদারের নির্জনে বসতিস্থান, থানা।

ঘাঁটু (ঘটা শব্দজ) দেবতাবিশেষ, প্রকৃত নাম বণ্টাকর্ণ।

বাঁটুভাঙ্গাসংক্রান্তি, ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি। এই দিন
খোস পাঁচড়া নিবারণের জন্ত এদেশীয় অনেকে বণ্টাকর্ণের
পূজা দিয়া থাকে। কোন সাধারণ পথে একটা কালহাঁড়ির
তলে গোবর মাখাইয়া সেই হাঁড়ির মধ্যে ভাত, কড়ি ও
ভাতফুল রাখিতে হয়। পূজার পর হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলে।
বণ্টাকর্ণের পূজা উপলক্ষে হাঁড়ি ভাঙিতে হয় বলিয়া ইহার
নাম বাঁটুভাঙ্গা বা বাঁটুভাঙ্গাসংক্রান্তি।

[বণ্টাকর্ণ দেখ।]

বাগ্গার, নদীবিশেষ, - বাঙ্গালার অন্তর্গত বাকরগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ের জলা হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-মুখে গঙ্গার একটি প্রশাখা মধুমতী নদীর সহিত মিশিয়াছে।
বাগ্গার নদীর দক্ষিণভাগকে শিলদাহ নদী বলে।

বাগ্গার, পরিধের বস্ত্রবিশেষ, কটদেশে পরিধের এক রকম পোষাক। স্থানবিশেষে বাঘরাও বলিয়া থাকে।

বাগী (দেশজ) ১ ভুক্তভোগী। ২ পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইয়া যে সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ৩ ছুট চতুর।

“কোটাল কহিছে রাণি, কি বলেরে বুড়াবাগী,
ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর,
এ বড় কুটিনী বাগী।” (বিদ্যাসুন্দর)

বাগ্গার, নদীবিশেষ, পঞ্জাব ও রাজপুতানার মধ্যে এই নদী প্রবাহিত। এক সময় এই নদী সিন্ধুনদের একটি বিখ্যাত উপনদী ছিল, কিন্তু আজকাল ইহা একটি সামান্য প্রোতবতী মাত্র। ইহার আর এখন বহতাও নাই, তাটনের নামক স্থানের মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হিমালয় প্রদেশে নাহন বা সিন্ধুর নামক দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ইহার উৎপত্তি। মণিমাঙ্গরা নামক নগরের নিকট ইহা পর্বত ত্যাগ করিয়া সমতলে পড়িয়াছে। সেখান হইতে অঝালা জেলার প্রবেশ করিয়াছে। অঝালার এই নদী অতি অপ্রশস্ত। তৎপরে পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্য দিয়া ইংরাজ রাজ্যের সীমার নিকট দিয়া বহিয়া অঝালা সহরের ৩ মাইল পশ্চিমে আসিয়াছে, তৎপরে হিলার জেলার অকালগড় সহরের নিকট ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া সিরসার মধ্য দিয়া রাজপুতানার প্রবিষ্ট হইয়াছে। একটি শাখা হিসারের শতক্ষেত্রে জলসেচনার্থ নীত হইয়াছে। তাটনের দুর্গের সম্মুখে এই নদী আছে, কিন্তু তাহার পর বহাবলপুর রাজ্যের মধ্যে মীরগড় নামক স্থান পর্যন্ত ইহার শুষ্ক খাত লক্ষিত হয়। পুরাবিদগণ এই নদীর দক্ষিণাংশকে বেদোক্ত প্রাচীন সরস্বতী নদী বলিয়া অনুমান করেন। পাতিয়ালায় মধ্যে সরস্বতী নামে এখনও ইহার একটি ক্ষুদ্র উপনদী আছে। যে সকল স্থানের মধ্য দিয়া এখন এই নদী প্রবাহিত সেই সকল দেশের জলসেচন এই নদী হইতেই হয় বলিয়া ইহাতে অনেক রকম বাঁধ দেওয়া আছে। এই বাঁধের জন্ত আরও নদীর খাত দিন দিন ভরিয়া আসিতেছে ও জলপ্রবাহ কমিতেছে। সিরসার যে শাখা নষ্ট হইয়াছে, তাহার মুখে তিনটি বৃহৎ ঝিল বিল বা জলা হইয়া আছে, জলসেচনার্থ এই ঝিলে কতক পারস্র যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার জল একান্ত অব্যবহার্য্য, ইহা পান করিলেই জ্বর, প্রীহা, বৃদ্ধি ও গলগণ্ড জন্মে।

ইহার তীরবর্তী গ্রামাদির যত্নবিবরণী দেখিরা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহার জল যে পরিবার ব্যবহার করে, সেই পরিবারে ঐ সকল রোগ এত বহুল হয় যে ঐ পরিবার পুরুষেই সেই পরিবার নির্মূল হয়। এই জন্য ইহার তীরস্থ গ্রামাদিতে লোক প্রায়ই ক্রম, আর সংখ্যাও বড় অল্প। কার্তিক অগ্রহারণ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত ইহার দক্ষিণাংশে জল থাকে না। অল্পটুকু হইলে ইহার তীরে বেশ গম ও ধাতু হয়।

বাঘর (দেশজ) বর্ষর ধ্বনি।

বাঘরনাদিনী (স্ত্রী) যে স্ত্রী বর্ষর শব্দ করে।

“চারি মুখে ত্রুঙ্গাণী পূরণে শব্দধ্বনি।

বারাহী খেটকধরা বাঘরনাদিনী।” (কবিকল্প)

বাঘরা, [বাগরা দেখ।]

ঘাট (পুং) ঘট চুরাদি অচ্। ১ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ, বাড। (শব্দরত্না) ঘাটা অস্যাতি-ঘাটা-অচ্ (অর্শ আদিভ্যোহচ্। পা ৫।২।২৭) ২ ঘাটায়ুক্ত, যাহার ঘাটা আছে।

৩ নদ্যানিতে নামিবার জন্ত ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলীকে ঘাট বলে। নদীতীরে যেখানে লোকে প্রত্যহ স্নানাদি করে, নৌকাযাত্রীরা আরোহণ করে বা মালামাল আমদানী রপ্তানী হয় সেই স্থানকেও ঘাট বলে। নদীর একস্থানে পারাপার করিবার জন্ত একখানি নৌকা উপস্থিত থাকে, সেই স্থানকে ‘ধেরা ঘাট’ বলে।

৪ ‘গিরিবন্ধকে’ সাধারণতঃ ‘ঘাট’ বলে।

৫ দুইখানি তক্তার জোড় মিলাইবার জন্ত ছুতারেরা যে ‘রিভেট’ বা ‘রাবিট’ কাটিরা লম্বতাহাকেও “ঘাট” কাটা বলে। কজা, কল, পতর, টানা-ছিটকিনী ইত্যাদি বসাইবার জন্ত কাঠের গায়ে ঐ সকল দ্রব্য যতটা পুরু থাকে, ততটা গভীর করিয়া, ঐ সকল দ্রব্যের মাপ মত যে গহ্বর করিয়া লয়, তাহাকেও ‘ঘাট’ বলে। কেহ কেহ বা ‘ত’ কাটাও বলে।

৬ বাঙ্গালাদেশে সামান্য কথোপকথনের মধ্যে অপরাধ-স্বীকার করাকে ঘাট বলে। “যেমন আমার ঘাট হয়েছে তাই।” এই ঘাট শব্দ ‘ঘাটি’ (অর্থাৎ হীনতা) শব্দজ।

৭ ভারতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুইটা পর্বতমালাকে ঘাটপর্বত বলে। পূর্বদিকস্থ পর্বতমালার নাম পূর্ব-ঘাট ও পশ্চিমদিকস্থ পর্বতমালার নাম পশ্চিম ঘাট। পূর্বঘাট করমণ্ডল বা পূর্বোপকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত, কিন্তু পশ্চিমঘাট মলবার বা পশ্চিমোপকূল হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, তবে একবারে কূলে স্থাপিত নহে বটে। সমুদ্রতীর ও পশ্চিম-

ঘাটের মধ্যে নাতি বিস্তৃত কচকটা উর্করা জনপদাদি বিশিষ্ট স্থান আছে। পর্বতের পূর্বাংশ হইতে পশ্চিমে এই স্থানে আসিবার জন্ত ইহাতে অনেকগুলি গিরিবন্ধ আছে। এই সকল পথের জন্তই ইহাদের নাম ঘাট হইয়া থাকিবে অথবা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে সমুদ্রকূলে অবতরণের জন্ত এই পর্বতগুলিই সোপান স্বরূপ বলিয়া 'ঘাট' নাম হইয়াছে।

পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্বত কুমারিকার নিকট পরস্পর মালাকারে মিলিত হইয়াছে। পর্বতমালার সর্ব দক্ষিণাংশকে নীলগিরি বলে। এই নীলগিরি পর্বতেই মাজাজনগরী অবস্থিত। এই সকল পর্বতমালার মধ্যে উত্কাশমন্দির ৭০০ ফিট উচ্চ, এই পর্বতে মাজাজন গব-মেন্ট গ্রীষ্মবাস আছে, ইহার সর্বোচ্চশিখর দোদাবেন্তা ৮৭৬০ ফিট উচ্চ, ইহা মহিস্থরের দক্ষিণে অবস্থিত, পশ্চিমঘাটের পর্বতগুলিতে যত নদী জন্মিয়াছে, তাহার সকলগুলিই পূর্বাভিমুখে সমস্ত মালভূমি বাহিয়া পূর্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এইরূপে কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরী নামক বিখ্যাত নদী তিনটি পশ্চিমঘাটে উপর হইয়া সমস্ত মালভূমি বাহিয়া অত্যানাশাখা প্রশাখা লইয়া পূর্বঘাট তেজ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

এই পর্বতমালা দুইটিতে দাক্ষিণাত্যের নানাবিধ পরি-বর্তন ঘটাইয়াছে। পূর্বঘাট পর্বতমালা উপকূল হইতে অনেকটা দূরে বলিয়া পর্বতের উত্তরপার্শ্বে যাতায়াতের কোন বিশেষ বাধা হয় না; কিন্তু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্শ্বত অগ্রশস্ত ভূখণ্ডে সে সুবিধা নাই। পূর্বভাগে অপেক্ষাকৃত বৃষ্টি কম হয়, সুতরাং জমী কিছু শুষ্ক। বড় বড় নদীর অববাহিকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যেরূপ সাময়িক বর্ষণ হয়, তাহাতেই শতাব্দী জন্মে। সে বৃষ্টিও বৎসরে গোটের উপর ৪০ ইঞ্চির বেশী হয় না। জমীর অবস্থা তত ভাল নহে। জমী সাধারণতঃ উচ্চ। পর্বতের উপরেও জঙ্গল বড় বেশী নাই। সরকারী বনবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এই সকল বনে জালানি কাঠরক্ষার জন্ত বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। পশ্চিমাংশে নদীতে তত উপকার হয় না, কিন্তু দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম বায়ুর সঙ্গে এত মেঘ আসে ও বৃষ্টি হয় যে তাহাতে সমস্তদেশ ও পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত বৃষ্ণলতা শস্যাদিতে ভরিয়া যায়। সমুদ্রোপকূলে খান্দেশ হইতে মলবারের মধ্যে সর্বত্র বৎসরে প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের উপর অনেক স্থানে প্রতিবৎসর ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। পশ্চিমভাগে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রাকৃতিক শোভা বর্তমান, ভারতের আর কোথাও তেমনি নাই। কনাড়া, মলবার,

মহিস্থর ও কুর্গের বনবিভাগে যথেষ্ট মূল্যবান সামগ্রী পাওয়া যায়। পর্বতের উত্তরপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ চিরগ্রাম বন বৃক্ষের বন, ইহার মধ্যস্থ 'পুন' নামক বৃক্ষের আদর যথেষ্ট, ইহা উচ্চতার সামান্যতঃ ১০০ ফিট হইয়া থাকে। এই ১০০ ফিট উচ্চবৃক্ষে শাখা প্রশাখা হয় না, অতি সরল-ভাবে উর্কে বাড়িতে থাকে, এই জন্ত এই বৃক্ষে আহাঙ্গের মাস্তুল, কড়ি, পালের পাড় ইত্যাদি ভালরূপ হয় বলিয়া ইহা অতি যত্নে রক্ষিত হয়। অত্যান্য বৃহৎ বৃক্ষের মধ্যে কাঁটাল, নাগকেশর, মেহগনি, আবলুশ ও চাঁপাই প্রধান। এই সকলের মধ্যে মধ্যে আবার দারুচিনি এবং পিপুলগাছ যথেষ্ট, এই ছই দ্রব্যের ব্যবসায় খুব প্রবল।

মহিস্থরের মধ্যে শ্বেতশাল বা বোম্বাই শিল্প সেগুন, চন্দন ও বাঁশ প্রধান। কুর্গের বনবিভাগের শোভার ন্যায় ভারতের বনসৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। এই সকল পর্বতে সকলপ্রকার বন্যপশু আছে, তবে বৃহৎ বন্য মেঘ, হস্তী, ব্যাঘ্র ও শামর হরিণই বেশী এবং বিখ্যাত।

পূর্বঘাট পর্বতমালা উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার আরম্ভ হইয়া কটক ও পুরীর মধ্য দিয়া গঞ্জাম, বিশাখপত্তন, গোদাবরী, নেল্লুর, চেন্নলপুট, দক্ষিণ আর্কট, ত্রিচীনপল্লী ও তেনিবেল্লী জেলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা উপকূল হইতে কোথাও ৫০ কোথাও ১৫০ ফোশ দূরে অবস্থিত। কেবল গঞ্জাম ও বিশাখপত্তন জেলার ইহা একবারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। গড়ে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০ ফিট। প্রান্তরের স্তরভেদে গ্রেণাইট, মেইস্, মাইকা স্ট্রুট, কর্দমযুক্ত স্ট্রুট, হরগ্রেণ্ড ও চুনাপাথর আছে। উপরিভাগে পেরার পর্য্যন্ত গ্রেণাইটময় ও পেরার নিকটবর্তী স্থানে মুগনিপাথরময়, কৃষ্ণা হইতে উত্তরদিকে গ্রেণাইট ও হরিতাভ প্রস্তরময়, পঞ্জাবের নিকট গ্রেণাইট, গিইস্ ও মুগনিপাথর মিশ্রিত।

পশ্চিম ঘাট তান্ত্রীর কোড়ে আরম্ভ হইয়া খান্দেশ, নাসিক, ঠাণা, সাতারা, রত্নগিরি, কনাড়া, মলবার, কোচীন ও ত্রিবাঙ্গুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তান্ত্রী হইতে পাল-ঘাট গিরিপথ পর্য্যন্ত ইহার দীর্ঘতা ৮০০ মাইল, ইহার পর কুমারিকা পর্য্যন্ত ২০০ মাইল, ইহার পশ্চিমে তীরভূমি প্রায় সমতল ও নিম্ন, পশ্চিমভাগে ইহার উচ্চতা ২০০০ ফিট পর্য্যন্ত, পূর্বদিকে ক্রমশঃ নাবাগ, উত্তরাংশে মহাবলেশ্বর (৪৭০০ ফিট), পুরন্দর (৪৪৭২ ফিট) সিংহগড় (৪১৬২ ফিট) প্রভৃতি শিখর প্রধান। মহাবলেশ্বরের শিখরের দক্ষিণাংশে পর্বতপৃষ্ঠের উচ্চতা একেবারে ১০০০ ফিট নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরে দক্ষিণে আবার ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া কুর্গের মধ্যে

সর্কাপেকা উচ্চতা লাভ করিয়া ৫৫০০ ফিট হইতে ৭০০০ ফিট পর্যন্ত উঠিয়াছে। পশ্চিম ঘাটের প্রান্তরেয় গঠন বড় আধুনিক বলিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন। অনেক কানেক স্তর আগের উৎপাতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল পর্বতের উপর গিরিজুর্গ আছে। দক্ষিণাংশের পর্বত-পৃষ্ঠ প্রায়ই যুগ্মনিখাধরময়। [যে সকল জেলায় এই দুই পর্বত-মালা অবস্থিত তত্ত্ব জেলার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ঘাটকর্করী (জী) একপ্রকার বীণা।

ঘাটকুল, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ইহার ভূপরিমাণ ৩৬৮ বর্গমাইল। ৮১ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার পূর্বাংশ বেণগঙ্গার ধার ভিন্ন অপর সঞ্চল হান পার্শ্বতীর ও বন জঙ্গলময়। এখানে তেলিঙ্গ-দিগের বাস। কিছুদিন পূর্বে ডাকাতের উপদ্রবে এখানকার গ্রামগুলি এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

ঘাটপ্রভা, কর্ণাটকপ্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। বেলগাম্ নগরের ২৫ মাইল দূরে সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া বেলগাম্ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যদিয়া প্রায় ১৪০ মাইল আসিয়া বাঘলকোট প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে পূর্বে প্রায় ২৯ মাইল গিয়া বাঘলকোট নগরের নীচে উত্তরমুখী হইয়াছে। বাঘলকোট ও ঘের্কেলের মধ্যে প্রাকৃতিক সোন্দর্য্যময় দুইসার গরিমালা ভেদ করিয়া চিমলগি গ্রামের উত্তরপূর্বে কৃষ্ণা-নদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার মোহানা প্রায় শত গজ বিস্তৃত হইবে, বর্ষাকালে আবার ইহার বিগুণ হয়।

ঘাটম্পুর, ১ কাণপুর জেলার একটা দক্ষিণ তহশীল, যমুনা-তীরে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৩৫ বর্গমাইল।

২ অযোধ্যা দেশের উনও জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ভূপরিমাণ ২৫২ বর্গমাইল। এই পরগণায় জমিদারী, পট্টদারী ও তালুকদারী এই তিন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। এখান-কার অধিবাসীর মধ্যে বাইস-কড্রিয়ই অধিক।

ঘাটম্পুর কলানু, উনও জেলার একটা নগর। উনওনগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২২' উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৬' পূঃ। এখানকার সোণার ও ছুতা-রের কার্য অতি চমৎকার। বহুকাল হইল একজন ভিবারী ব্রাহ্মণ এই নগর পত্তন করেন, তাঁহার বংশধরেরা এখনও এখানে বাস করিতেছেন।

ঘাটমারনিয়া (দেশজ) বাহার ঘাট মাসুল না দিয়া বেআইনী করিয়া দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করে।

ঘাটমারী (দেশজ) ১ ঘাট মাসুল না দিয়া গুপ্ত ভাবে পারা-পার করা। ২ ঘাটমারনিয়া।

ঘাটবাল, ১ বেহারের মাদ্রাগিরের উপাধি, ঘাট ও পারা পারের নৌকা ইহাদের কর্তৃত্ব থাকে।

২ ছোট নাগপুর ও পশ্চিম বঙ্গে বাহারী গ্রামস্থ পুলিশে কর্ম করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে ও তজ্জন্ত কোন কোন গরিপথ রক্ষা বা ভূতাগের জমি জমা ভোগ করে, তাহাকে ঘাটবাল বলে। ছোটনাগপুরে ঘাটবালেরা অনেকেই ভূমিজ, খরসার, বাউরি ইত্যাদি জাতি। [ঘাটোয়ালী দেখ।]

ঘাটরী (জী) ঘাটকর্করী।

ঘাটা (জী) ঘট-চুরাদি অঙ্ক-টাপ্। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ, ঘাড়। পর্যায়—অবটু, কুকাটিকা, শিরঃপশ্চাৎসন্ধি, ঘাট, কুকাটা, ঘাটিকা। “দোষান্ত ছষ্টাঙ্গর এবমন্তাঃ

সংগীডা ঘাটাঃ স্কন্ধাঃ স্ত্রীত্ৰাম্।” (সুশ্রুত, উত্তরতঃ ২৫ অঃ) ঘাটাল (পুং) ঘাটা সিদ্ধাদি অন্ত্যর্থে লচ্। স্ক্রজ্যন্তোক্ত সান্নিপাতিক বিজয়িরোগের লক্ষণবিশেষ।

“নানারূপ ক্রজ্যন্তাবো ঘাটালো বিষমো মহান্।”

(সুশ্রুতঃ নিধানঃ ৯ অঃ)

২ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখন হগলী জেলার অধীন। শিলাইনদী যেখানে রূপনারায়ণে পড়িয়াছে, সেইখানে এই নগর অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪০' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৪৫' ৫০" পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। চাউল, চিনি, তুলা, রেশম ও কাপড় ব্যবসার জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ঘাটিকা (জী) ঘাটা-স্বার্থে কন্-টাপ্। ঘাটা, ঘাড়। (শব্দরত্নাঃ) ঘাটী (দেশজ) ঘাইট, অপরাধ।

ঘাটোয়াল (দেশজ) যে ঘাটোয়ালী জমি ভোগ করে।

ঘাটোয়ালী, ঘাটওয়াল বা ঘাটরক্ষা প্রভৃতি পুলিশের কার্য ক্রিয়দংশ করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্ন খাজনায় যে ভূমি দখল করে, উহাকে ঘাটোয়ালী কহে। [ঘাটবাল দেখ।]

ঘাড় (ঘাট শব্দজ) গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ।

ঘাড়সে (ঘড়সে) দাক্ষিণাত্যের নিম্নশ্রেণীর গায়ক সম্প্রদায়। ইহাদিগকে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও আচার ব্যবহার কথাবার্তা মরাঠী চাষীদিগের জায়। ইহার ভাট ও বহুরূপী কার্য করে। কখন বা গোঁসাই ও বৈরাগীদিগের মত অর্দ্ধ উল্ল-বেশে গান গাহিয়া তিকা করিয়া বেড়ায়। আবার কোন ধনবান্ লোকের আগমন সংবাদ পাইলে মাথায় জরির পাড় দেওয়া পাগড়ি আঁটিয়া সাজগোজ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। ইহার বড়লোক পাইলে তাহার নিকট পরস বা সিকি ছানানী লয় না, নূতন পাগড়ি বা একজোড়া শাল আদায় করে। ইহার বলে, রামসীতার যখন বিবাহ

হয়, তখন কোন গায়ক ছিল না, তাই রামচন্দ্র চন্দনকাঠে তিনটা গায়কমূর্তি গড়িয়া তাহাদের জীবনদান করেন, তাহাদের একজনকে শবাল, অপর দুইজনকে সুর ও সানাই বাজাইতে দেন। এই তিনজনই প্রথম বড়সে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে লক্ষ্মণের রাবণ বড়সেদিগকে বসমস্তাক্ষিণাত্য দান করেন।

ইহাদের মধ্যে ভোল্লৈ, জাধব, জগতাপ, মোরে, পোবার, সালুকে ও সিন্দে এই কয়টা উপাধি দৃষ্ট হয়। পরস্পর এক পদবী হইলে বিবাহ হয় না। ইহাদের ধর্মকর্মাদি অনেকটা কুণ্ণবী-জাতির মত।

ঘাণ্টিক (পুং) ঘণ্টয়া চরতি ঘণ্টা-ঠক্। ১ নৃপতিগণের নিদ্রাভঙ্গ সময়ে যে স্তম্ভতিপাঠক ঘণ্টাবাদ্য করে।

“রাজ্যং প্রবোধসময়ে ঘণ্টাশিল্পাস্ত ঘাণ্টিকাঃ।” (বৈয়াকরণ) পর্যায়—ঘাটিক, চাক্রিক। (ত্রি) ২ ঘণ্টাবাদক, যে ঘণ্টা বাজায়। ঘণ্টা তদাকারং পুষ্পং অন্ত্যস্ত ঠন্। ৩ ধ্বস্তর। “উপতাপং যান্তি চ ঘাণ্টিকা বিভেদশ্চ মিজ্রাণাম্।”

(বৃহৎসং ১০ অঃ)

(পুং) ৪ শপথপূর্বক বিচারকর্তা। (প্রায়শ্চিত্তবিং) ঘাণ্টিক ব্রাহ্মণ দৈব ও পৈত্রিকার্ঘ্যের অযোগ্য। ইহাদের অন্ন খাইতে নাই।

“পাপা তথামং শৌণ্ডিত্য ঘাণ্টিকস্ত তথৈবচ।

ইতরে যে ভোজ্যাদ্যা স্তেষামন্নং বিজ্জয়েৎ ॥” (যমং)

ঘাত (পুং) হন-ঘঞ। ১ প্রহার।

“মুষ্টিভিঃ পাণ্ডিঘাতৈশ্চ বাহুঘাতৈশ্চ শোভনে।

ঘোঠৈর্জাহ্নুপ্রহাঠৈশ্চ নয়নাঙ্গনপীড়নৈঃ।” (রামাং ৬৯৮২৪)

২ কাণ্ড। ৩ মারণ। ৪ পূরণ, গুণন।

“সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃপ্রদিষ্টঃ।” (নীলাবতী) হস্তি অনেক হন-করণে ঘঞ। ৫ বাণ। (মেদিনী) ৬ চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় গয়ের ঘুটা প্রভৃতি কোম একটা বল অপসারিত করিয়া সেই স্থান আক্রমণ করার নাম ঘাত। [চতুরঙ্গ দেখ।] ৭ লুণ্ঠন।

“ধামঘাতে হিতাভঙ্গে পথিমোহাভিদর্শনে।” (মহু. ২।২৭৪)

৮ উৎখাত, হানি।

“মাসানষ্টৌতু মহিষী শতঘাতস্ত কারিণী।” (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৬২)

৯ জন্মতারা অপেক্ষা লগ্নম, ষোড়শ ও পক্ষবিংশতি তারা, ইহাতে কোম শুভকার্য্য করিতে নাই। [তারাগুচ্চ দেখ।]

ঘাতক (ত্রি) হন-ঘুল। ১ হস্তা, যে হনন করে। ময়ূর মতে অমুমস্তা, বিশসিতা, নিহস্তা, ক্রয়বিক্রয়ী, সংস্কর্তা, উপহর্তা ও খাদক ইহাদের সকলকেই ঘাতক বলে। যে ক্রিয়ার প্রাপবিয়োগ হয় তাহার নাম হিংসা। বাহার

ব্যাপার বা ক্রিয়ার প্রাপবিয়োগ হইয়া থাকে, তাহার নাম ঘাতক। মিতাক্ষরার মতে যে ব্যক্তির ক্রিয়া বা ব্যাপার প্রাপবিয়োগের সাক্ষাৎ কারণ, তাহাকে হস্তা বা নিহস্তা বলে। যিনি পলায়মান শত্রুকে ধরিয়া দেন ও হস্তার বিশেষ সাহায্য করেন তাহাকে অমুমস্তাক ঘাতক বলে। হিংসা করিতে উদ্যত ব্যক্তিকে যে নিযুক্ত করে তাহাকে প্রযোজক ঘাতক বলে। প্রযোজক তিনপ্রকার—আজ্ঞা-পরিতা, অভ্যর্থমান ও উপদেষ্টা। [প্রযোজক দেখ।] হিংসা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ২ তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত মস্তের শুভাশুভজ্ঞাপক রাশিচক্রের কোঠবিশেষে অবস্থিত সাধ্য রাশি। [চক্র দেখ।]

ঘাতকর (ত্রি) ঘাতং করোতি ঘাত-ক-অচ। আঘাতকারী।

ঘাতকী (স্ত্রী) পুষ্করদ্বীপের অন্তর্গত একটা গিরি। (লিঙ্গ৫৩২৬)

ঘাতন (স্ত্রী) হন-প্রার্থে-গিচ্ ভাবে লুট্। ১ মারণ, হিংসা, বধ। ২ যজ্ঞার্থে পশুহিংসা।

“পশুবদ্ ঘাতনং বামে দহনং বা কটামিনা।” (ভারত ২।৪৪।৪০)

(ত্রি) ঘাতয়তি হন-গিচ্-কর্তরি লুট্। ৩ মারণ, হিংসাকারক। ক্রীলিঙ্গে ভীষ্ হয়।

“ঘাতনীতিশ্চ শুক্লীভিঃ শতশ্লীভিত্তথৈবচ।” (হরিবংশ)

ঘাতবার (পুং) ঘাতোঅমঙ্গলজনকোবারঃ কর্মধাং। অমঙ্গল-জনক বারবিশেষ। ইহা সকলের পক্ষে সমান নহে, জন্ম-রাশি অনুসারে ইহার ভেদ হয়। শকার্ধচিহ্নামগির মতে মকররাশিতে জন্ম হইলে মঙ্গলবার, বুধ, সিংহ ও কন্যা রাশিতে জন্মিলে শনিবার, মিথুনে জন্ম হইলে সোমবার, মেঘ রাশিতে জন্মিলে রবিবার, কর্কটে জন্মিলে বুধ; ধনু, বৃশ্চিক ও মীন রাশিতে জন্মিলে শুক্র এবং কুম্ভ ও তুলা রাশিতে জন্ম হইলে বৃহস্পতিবার ঘাতবার হইয়া থাকে। ঘাতবার কোন কার্য্য প্রশস্ত নহে (১)।

ঘাতব্য (ত্রি) হন-গিচ্ কর্মণি তব্য। বাহার হিংসা করা হইবে, হিংসার যোগ্য।

ঘাতস্থান (স্ত্রী) ঘাতস্য স্থানং ওতৎ। ঞ্চান। (শকার্ধচিং)

ঘাতি (পুং) হন-ইণ্। ১ পক্ষিবন্ধন। ২ প্রহার। (সজ্জিগুণার)

ঘাতিন্ (ত্রি) হন-তাক্ষীল্যার্থে গিনি। হিংসুক।

ঘাতিপক্ষিন্ (পুং স্ত্রী) ঘাতী চাসৌ পক্ষীচেতি কর্মধাং। শ্বেনপক্ষী। (হারাবলী) ক্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

(১) “নক্রে ভোমো গোহরিক্রীড়মল্লকশ্রোতশ্চৈকোহলভেজশ্চ কক্কে।

শুক্রে কোদণ্ডানিমীনেষু কুন্তে বৃকে জীবে ঘাতকাবারা ন শত্ভাঃ।”

(শকার্ধচিং)

বাতুক (ত্রি) হন উক্ণ (পা ৩২।১৫৪) ১ হিংশ। ২ ক্রুর।
(অমর) "ততঃ কিশোরা ত্রিংশে বৎসান্চ বাতুকোবৃকঃ।"

(অথর্ষ ১২।৪।৭)

বাত্য (ত্রি) হন-গাং। ১ হননের যোগ্য, বধাই।

২ বধা। ৩ গুণনীয়, বাহার গুণ করা হইবে।

বান, বেরারের বুলদানী জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। অক্ষা° ২০° ২৬' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৩' ৩০" পূঃ। পেনগঙ্গার অধিত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ণা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

বানসোর, মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। অক্ষা° ২২° ২১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫০' পূঃ। সিওনি নগর হইতে ৩২ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে অতি চমৎকার বালু পাথরের উপর নির্মিত ৪০।৫০ টা ভগ্ন বিষ্ণু-মন্দির আছে, তাহার শিরোনৈপুণ্য অতি প্রশংসনীয়। এখানে একটা ফাঁড়ি আছে।

বানি (দেশজ) তৈল প্রস্তুত করিবার কাঠময় যন্ত্র।

বানিগাছ (দেশজ) যে মোটা কাঠখানির উপরে বানি ব্রাণ হয়।

বাম (বর্ষ শব্দজ) বর্ষ, শ্রেয়স্জন।

বামাচি (বর্ষচর্চিকা শব্দজ) বর্ষ জন্য ত্রণ।

বামান (দেশজ) বর্ষযুক্ত হওয়া।

বামুখ, ক্ষতস্থান, যে স্থান হইতে রক্ত বা পু্য নির্গত হয়।

বার (পুং) স্ব-অচ্। সেচন, হেঁচা।

বারি (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। অষ্টাক্ষর সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণে এক একটা গুরু পর লঘু এইরূপে সমস্ত অক্ষর নিবদ্ধ হইলে তাহার নাম বারিবৃত্ত।

"রং বিধায় লংনিধায় বারি নাম বৃত্তমেহি।"

উদাহরণ—"রাম রাম রাম রাম।

সারমেতদেব নাম" (শকার্ণাটিক)

বার্তিক (পুং) স্তনের নিবৃত্তঃ স্তত ঠক্। ১ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, ঘিওর। (ত্রি) ২ স্ততযুক্ত।

বার্তেয় (পুং) স্ততয়া অপত্যঃ স্তত-চক্। ১ স্ততার অপত্য। ২ তাহাদের রাজা। স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

বালি (দেশজ) অধম, ক্ষত বিক্ষত, আঘাতপ্রাপ্ত।

বাস (পুং) যন্ততে ঘস কর্ণপি ঘঞ্। ত্রুর্দানি তৃণ, গো প্রভৃতি পশুর ভক্ষণীয় তৃণ। পর্যায়—ঘবস, অবস, যবাজ।

"বাসমুষ্টিং পরগবে দদ্যাৎ সংবৎসরঞ্চ যঃ॥" (ভারত ১৩।৬৯ অঃ)

বাসকাটা (বাসকর্তন শব্দজ) তৃণাদির ছেদন।

বাসকুন্দ (পুং) বাসার্ধ কুন্দ, যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে কুন্দ আছে।

বাসকুন্দিক (ত্রি) বাসকুন্দ কুমুদাদি ঠক্ (পা ৪।২৮০) বাসকুন্দের সন্নিবৃষ্ট বোশাদি।

বাসকুট (স্ত্রী) বাসান্নাং কুটং ৬তৎ। বাসকুপ, তৃণাদির পাল।

বাসি (পুং) যন্ততি ভক্ষয়তি হব্যং ঘস কর্ণরি ইন্। (জনি বসিত্যামিন্। উণ্ ৪।১৩০) ১ অগ্নি। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ঘস কর্ণপি ইন্। ২ ভক্ষণীয়। "ঘচ্চ পপৌ ঘচ্চ বাসিং জবান।" (ঋক্ ১।১৬২।১৪) 'বাসিমদনীরম্' (সারণ)

৩ ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশবাসী এক নীচ জাতি। ইহারা মৎস্ত ও কৃষিকারী। বিবাহাদিতে পারক ও অনেক স্থলে দাসত্ব করিয়াও জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের জীলোকেরা ধাত্রীর কার্য করে। তাহাদের চরিত্র অতি জঘন্ড। ইহাদের সামাজিক অবস্থা ডোম ও মেথরের সমান। ইহাদের মধ্যে সোনজাতি, সিমরলোকা ও হাড়ি এই তিন বিভাগ ও কসিরর নামে এক গোত্র আছে। কোলদিগের সহিত ইহাদের সংশ্রব বেশী বলিয়া ইহাদের আচার ব্যবহার কোল জাতির মত। অনেকে ইহাদিগকে চণ্ডাল অপেক্ষা নীচজাতি বলিয়া মনে করেন। ইহারা গোমাংস ও শূকরমাংস প্রভৃতি খায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বরহর বিবাহ সকলই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার বাসির বাস।

বাসিয়াড়া, বাহারী বাসের কারবার করে।

বাসীদাস, ছত্রিশগড়ের চামারদিগের মধ্যে সতনামী মত-প্রবর্তক। ইনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু কতকগুলি বুদ্ধকীর জন্ত চামারদিগের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে ইনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রদ্য-শ্রম অবলম্বন করেন এবং শ্রীম শিষ্যবর্গকে ৬ মাস পরে গিরোদ নগরে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। ঐ নির্দিষ্ট দিন আগত হইলে চামারেরা একত্র হইয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাতে বাসীদাস গ্রামের নিকটবর্তী পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগের নিকট জৈম্বরের অভিমত প্রকাশ করেন। ইনি দেবদেবী মূর্তিপূজা নিষেধ ও সকল মনুষ্যই সমান বলিয়া প্রচার করেন। ইনি আপনাকে শ্রীম প্রতিষ্ঠিত নূতন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য এবং ঐ কার্য্য তাহার বংশানুগত থাকিবে বলিয়া প্রকাশ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বালকদাস উক্ত পদ পান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বালক নিহত হন। ছত্রিশগড়ের সমগ্র চামারেরা এই নূতন সম্প্রদায় তুচ্ছ।

বাহুড়ীয়া (দেশজ) বাহারী বাস কাটির বিক্রয় করে।

ঘাফ্ফা (দেশজ) > [ঘাসড়ীয়া দেখ।] ২ ঘাস নির্মিত, বাহা
ঘাস ঘারা প্রস্তুত হয়।

ঘি (ঘতশব্দজ) ঘৃত।

ঘিকুমারী (ঐতকুমারী শব্দজ) [ঘৃতকুমারী দেখ।]

ঘিচপিচ্, নিবিড়, কাঁকশূন্য, তিড়।

ঘিজ্জি [ঘিচপিচ্ দেখ।]

ঘিণঘিণ্ (দেশজ) ঘৃণার মানসিক অনুভূতি।

ঘিতরই, একরকম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

ঘিতুলী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Gobius electricus.)

ঘিনালিতা (দেশজ) একপ্রকার ছোট গাছ। (Orchopus
capularis.)

ঘিয়া (দেশজ) ঘৃতস্বকীর।

ঘিয়াকড়ি (দেশজ) উজ্জল ও চক্চকে কড়ি।

ঘিরপুরণ্য (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Luffa pentanda.)

ঘিলজাই, আফগানস্থানবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা স্বাভা-
বিক বলশালী ও যোদ্ধা। পূর্বে জলালাবাদ, পশ্চিমে
কলাতি ঘিলজি এবং তৎপার্শ্ববর্তী সুরফদ-কো, সুলিমান-
কো ও গুল-কো প্রভৃতি গিরিপার্শ্ব ও ঢালুর মধ্যে সমুদায়
স্থানে ইহাদের বাস আছে। আফগানদিগের প্রবাদ অনু-
সারে জানা যায় যে কোহিকারেস কো-কাশি নামক স্থানে
ইহাদিগের আদিবাস ছিল। কিন্তু ঐ স্থান যে কোথায়
আজ পর্য্যন্তও তাহা স্থির হয় নাই। কাহার মতে ইহা
সুলিমান শ্রেণীর অন্তর্গত, কেহ বা বলেন যে উহা সিদ্দাবন্দ
পর্বতের মধ্যে ছিল।

উক্ত প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে, আফগান-
জাতির আদি পিতা কারেসের দুইটা পুত্র ছিল। দ্বিতীয়
পুত্রের নাম বতন। বতন স্বদলে আসিয়া সিদ্দাবন্দে
বাসস্থান মনোনীত করেন। এইস্থানে থাকিয়া বতন
স্বজাতীয়ের সর্বময়কর্তা এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্যে তাহার
বিশেষ মতি থাকার তিনি শেখ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

হিজিরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে খলিফা ওয়ালিদের
রাজত্ব সময়ে খোরাসান ও ঘোর জয় করিবার জন্য বোদ্-
দাদ হইতে একদল আরবী সৈন্য পাঠান হয়। ঐ সৈন্যদল
ঘোররাজ্যের নিকটবর্তী হইলে সেইস্থানবাসী কোন এক
পলাতক পারস্তরাজপুত্র শেখ বতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন।
বতন এই অভ্যাগত অতিথিকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া
লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত রাজকীয়
ও পারিবারিক সকল বিষয়ের পরামর্শ করিতেন।

ঐ শেখের “মন্তু” নামে একটি পরমাত্মজরী কন্যা ছিল।

ক্রমে একত্র বসবাস হেতু রাজপুত্রের সহিত মন্তুর প্রণয়
জন্মে। কন্তার মাতা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ শেখকে জানাই-
লেন। বৃদ্ধ ক্রোধে অন্ধ হইয়া উভয়কেই নিহত করিতে
উদ্যত হন। কিন্তু মাতা অনেক বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া
স্বামীকে বলেন, “যদি এই হসেনশাহ রাজপুত্র হন, তাহা
হইলে আমাদের বিবাহ দিবার আপত্তি কি। অতএব
তুমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান লও”। শেখ যখন জানিতে
পারিলেন যে হসেনশাহ রাজপুত্র বটে, তখন তিনি এই
বিবাহে সম্মত হইলেন ও বর্তমান লোকোপবাদের
ভয়ে ঐ নব দম্পতীকে শীঘ্রই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।
কিছুদিন পরে মন্তু একটা পুত্রস্বয় প্রসব করেন। বৃদ্ধ শেখ
আন্তরিক ক্রোধে নিজ দৌহিত্রের “ঘালজৈ” (চোরের
পুত্র) নাম রাখিলেন। কালে সমগ্রজাতিতে ঘালজৈ
নামে উল্লেখ করা হয় এবং ক্রমে তাহা অপভ্রংশে ঘিলজাই
নামে অভিহিত হইয়াছে।

ঐ প্রবাদানুসারে আরও জানা যায় যে বিবি মন্তুর
ইব্রাহিম নামে দ্বিতীয় পুত্র ছিল। শেখ তাহাকে আদর
করিয়া “লো” (মহৎ) উপাধি দেন। কালে ঐ লো শব্দ
অপভ্রংশে লোদীরূপে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে
লোদীবংশীয় রাজগণ দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন।
আফগান ঐতিহাসিকগণের মতে লোদী ও সুরবংশীয় দিল্লী
রাজগণ ঘিলজাইবংশ সজ্জত। কিন্তু ইহা কতদূর সম্ভবপর
তাহার স্থিরতা নাই। আরও জানা যায় যে বিবি মন্তুর
তুরাণ, তোলার, বুরান ও পোলার নামে কয়েকটা পুত্র
জন্মে এবং তাহাদের নামানুসারে এক একটা শাখার
উৎপত্তি হয়। *

গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ঘিলজাইগণ আফগানস্থানের
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিছুদিনের জন্য
ইহারা ইস্পাহানের সিংহাসন অধিকার করে। ১৮৩৯
খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করিলে ইহারা ইংরাজ-
রাজের বিরুদ্ধে দোস্তমুহম্মদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

তুর্কজাতির সহিত এই ঘিলজাইজাতির অনেকটা সৌসাদৃশ্য
আছে বলিয়া খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর আরবদেশীয়
ভূগোলবেত্তারা এই ঘিলজাইদিগকে খিলজি ও তুর্কবংশ-
সজ্জত বলিয়া অনুমান করেন।

ঘিসাড়ি, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রেসিডেন্সিবাসী এক শ্রেণীর
কামার। কাহারও মতে মরাঠী “ঘিৎগে” অর্থাৎ ঘর্ষণ হইতে
ঘিসাড়ি শব্দের উৎপত্তি। বোধ হয় ইহারা লোহা ঘষিত
বলিয়া ইহাদের ঘিসাড়ি নাম হইয়াছে। বেলগাম্ প্রভৃতি

কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে “রইলনুনে কোষার” অর্থাৎ “বাহিরে কামার” বলে।

ঘিসাড়িরা কহিয়া থাকে যে তাঁহাদের আদিবাস গুজরাট। প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল তথা হইতে মানাহানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সর্বদাই গুজরাটী ভাষায় কথা কয়, তবে সকলেই মরাঠী ও হিন্দুস্থানী ভাষায়ও কথা কহিতে পারে।

ইহারা দেখিতে কিছু বর্ষ ও স্থলকায়, নহিলে সকল বিষয়ে কুণ্ণবীদিগের সহিত সৌন্দর্য্য আছে। ইহারা মাথায় টিকি ও দাড়ি রাখে, এক স্থানে থাকিতে ভালবাসে না। ইহারা যখন নানাহানে বেড়াইয়া থাকে, তৎকালে কতলের পাল খাটাইয়া তাহার নিম্নে বসবাস করে। স্থায়ী বাসিন্দাদের ছোট খাট বাড়ী বা খড়ো ঘরে বাস। ইহাদের বহির্বাস মরাঠীদিগের মত। রাজ্যিকালে লেজট পরিয়া কাটায়। ইহারা অতি পরিশ্রমী, কলহপর, অপরিষ্কার এবং মদ ও মাংস-প্রিয়। লোহস্রব্য গড়াই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের বালকেরা দশ বার বর্ষ পর্য্যন্ত পিতা বা জ্যেষ্ঠের নিকট কাজ কর্ষ করে, তারপর নিজে নিজে একখানি দোকান করিয়া লয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের কার্য্যে সাহায্য করে এবং পুরুষেরা যাহা তৈয়ার করে, তাহা মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। বিলাতী লোহস্রব্যের দিন দিন আমদানী বৃদ্ধি হইলেও ইহাদের ব্যবসায় তত ক্ষতি হয় নাই। বহিরি, গিরির বালাজি, ভবানী খণ্ডোবা, বটাই, ও যমুনা এই কয়টা ঘিসাড়িদিগের কুলদেবতা। সোম ও শনি-বারে ঘিসাড়িরা উপবাস করিয়া থাকে। আশ্বিনের “দশরা” ইহাদের প্রধান উৎসব।

ভূতের উপর ইহাদের বড় ভয়। কাহারও রোগ হইলে সহজে সে যদি ভাল না হয়, তবে সকলেই মনে করে যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে, একরূপ স্থলে তাহারা তাহাদের “দেবঋষি” অর্থাৎ রোঝাকে ডাকাইয়া আনে। দেবঋষি ভয়, নারিকেল, মুরগী ও কএকটা নেবুলইয়া রোগীর কাছে ছলাইতে থাকে, তাহাতেও যদি ভূত না ছাড়ে, তবে কুলদেবতার পূজা দিয়া তাহার নিকট রোগীর মঙ্গল প্রার্থনা করে।

সন্তান জন্মিলে ষষ্ঠদিনে ইহারা ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে একটা ছাগ বলি দেয় এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই মাংস ভোজন করায়। ৭ম দিনে ইহাদের “ষেটেরা” পূজা হয়।

ইহারা ৫ হইতে ২৫ বর্ষের মধ্যে কত্থার বিবাহ দেয়। কাহারও মৃত্যু হইলে ১১ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

মোটের উপর ইহাদের অবস্থা মন্দ নয়। নিজ জাতীয় ব্যবসা ছাড়া ইহারা কোন নূতন ব্যবসা করিতে চায় না।

ঘু (পুং) ঘু বাহুলকাৎ ডু। ১ ধ্বনি। ঘু ঘু পাখীর ডাক। ২ পাণিনীয় সংজ্ঞাবিশেষ, পাণিনীয় মতে দাপ ধাকু ভিন্ন দা ও ধাকুপ ধাকুর ঘু সংজ্ঞা হয়।

“দাধাধদাপ।” (পানিনীয় সংজ্ঞা)

“সর্গং বিশ্বত্যা দৈবাৎ স্মৃতিমুৎসি গতাং যোষয়ন্ যো ঘুসংজ্ঞাং প্রাকসংস্কারেণ সম্ভ্রাত্যপি ধুবতিশিরঃপট্টিকা পাঠজেন।” (নৈষধ)

ঘুঁজি (দেশজ) গুপ্তস্থান, একাবাকী জায়গা।

ঘুঁটনি (ঘোটনী শব্দজ) কাটিবিশেষ, যাহা দ্বারা ঘোট্টা হয়।

ঘুঁটি (ঘুটিকা শব্দজ) ইষ্টকাদির খণ্ড।

ঘুঁটিফেলা (দেশজ) ঘুঁটি লইয়া খেলা, দাৰা খেলা, অদৃষ্টপরীক্ষা।

ঘুঁৎঘুতিয়া, অনতিশ্রেষ্ঠ কার্য্যে স্পষ্টাক্ষরে কোন কথা না বলিয়া ভদ্রী দ্বারা অল্পে অনতিশ্রম প্রকাশ।

ঘুঘু (দেশজ) শব্দবিশেষ, বনকপোত। [কপোত দেখ।]

ঘুঘুর (দেশজ) ১ ঘুরঘুরে পোক। (Gryllus Grilla Talpa.)

২ পায়ে ও পায়ের তলে উৎপন্ন একপ্রকার দারুণ ক্ষতরোগ।

ঘুঘুরা (শব্দজ) পোকাবিশেষ। [ঘুঘুর দেখ।]

ঘুঘোকল (দেশজ) যে কল দ্বারা ঘুঘুপাখী ধরা যায়।

ঘুঘুর (ঘাটিকা শব্দজ) কটিদেশের অলঙ্কারবিশেষ।

ঘুচন (দেশজ) ১ মোচন, ত্যাগ। ২ নাশ। ৩ গোময় লেপনাদি দ্বারা উচ্ছিষ্টাদি মার্জন।

ঘুট (পুং) ঘুট-কুটাদি অচ্। চরণগ্রস্থি, গোড়ালি। (হেম)

ঘুটমণ্ডল (দেশজ) ঘোট, গোলমাল।

ঘুটি (স্ত্রী) ঘুট ইন্ বাহুলকাৎ ডীপ্। গুল্ফ। (ধিকৃপকোষ)

২ (দেশজ) গুটিকা।

ঘুটিক (পুং) ঘুট অন্ত্যার্থে ঠন্। গুল্ফ। (হেম)

ঘুটিকা (স্ত্রী) ঘুটি-স্বার্থে-কন্ টাপ্। গুল্ফ। অমর ২।৬।৩২)

ঘুটী (স্ত্রী) ঘুটি-ডীষ্ (কৃদিকারাদতিনঃ। পা) ১ গুল্ফ।

২ চতুরঙ্গ খেলা।

ঘুটুঘুটু (দেশজ) ঘোর অন্ধকার।

ঘুড়ি (দেশজ) ১ কাগজ নির্মিত উড়াইবার ক্রীড়ন দ্রব্যবিশেষ।

২ পক্ষীর উড়ন।

ঘুড়ী [ঘুড়ি দেখ।]

ঘুণ (পুং) ঘুণ-ক। কাষ্ঠভক্ষক কীটবিশেষ। পর্য্যায়—কাষ্ঠবেধক, কাষ্ঠলেখক। “ভগ্নং শব্দু ধমুতুগৈ রূপহতম্।” (মহানটক)

ঘুণপ্রিয়া (স্ত্রী) ঘুণস্ত্র প্রিয়া ৬তৎ। উদ্ভব বৃক্ষ। (শকার্ণচিৎ)

ঘুণবল্লভা (স্ত্রী) ঘুণস্ত্র বল্লভা ৬তৎ। অতিবিষা, লঘুদস্তী।

ঘুণাকর (স্ত্রী) ঘুণকৃতমক্ষরং মধ্যলো। ১ ঘুণকৃত অক্ষর।

ঘুণ আপন স্বভাবে কাঠ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন

কাটা অক্ষরের দ্বায় হইয়া যায়, সেই অক্ষরাকৃতি কাটাকে

ঘূণাকর বলে। ২ অতি সামাজ্যরূপ। (পুং) ঘূণাকরং তুল্যতয়া
অন্ত্যস্ত ঘূণাকর-অচ্। ৩ জ্ঞানবিশেষ। ঘূণ অক্ষর কাটিব
বলিয়া চেষ্টা করে না, কিন্তু কখন কখন অক্ষরের মত হইয়া
পড়ে, সেইরূপ যাহা করিব বলিয়া মনহ নাই অথচ ঘটয়া
উঠে, তাহাকে ঘূণাকর বলে।

“অবৈদ্যাজীবনাং সিদ্ধিঃ জ্ঞান্ ঘূণাকরবৎ কচিং।” (রত্নাবং)

ঘূণি (ত্রি) ঘূণ-ইন্। ভ্রাস্ত।

“স্যাৎ বা শরিয়তে ঘূণির্বা ভবিষ্যতি।” (শতপথব্রা ১১।৪।২।১৪)

ঘূণী (দেশজ) মাছ ধরবার বাঁশের যন্ত্র।

ঘূণ্ট (পুং) ঘূট-ক নিপাতনে সাধু। গুল্ফ, গোড়ালি। (শব্দমাং)

ঘূণ্টক (পুং) ঘূণ্ট-স্বার্থে-কন্। গুল্ফ, গোড়ালি। (হেমং)

ঘূণ্টিক (ক্ৰী) ঘূণ্টস্তদাকারোহন্ত্যস্ত ঘূণ্ট-ঠন্। বনহ করীষ,
বিল ঘূটে। (শব্দচম্পি)

ঘূণ্টী, ১ ছোট ঘণ্টা। ২ বোতাম।

ঘূণ্টীঘরা (দেশজ) যেখানে ঘূণ্টী দেওয়া হয়, বোতামের গর্ত।

ঘূণ্ড (পুং) ঘূণ-ড নিপাতনান্নেৎ। ভ্রমর। (উগাদিকোং)

ঘূতসানন্দেবী, পঞ্জাবের সিরমুর বিষয়ের অন্তর্গত গিরিসঙ্কট।

খিয়াদা-ছন হইতে হিমালয় পর্বতের শিবালিকশ্রেণী পর্য্যন্ত
বিস্তৃত একটা নিম্ন পর্বতশ্রেণীর উপরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে
২৫০০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। অক্ষা° ৩০° ৩১' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°
২৮' পূঃ। এই পর্বত যমুনার ভূতলাধা হইতে মার্কণ্ড নদকে
বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে শতক্রু অভিমুখে বহিয়াছে।
দেহরা হইতে নাহন যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাইতে হয়।

ঘূণ্ণা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ।

ঘূম (দেশজ) নিদ্রা।

ঘূম (অব্যং) ঘূণ-বাহুলকাৎ ডুম্। অব্যক্ত শব্দ।

ঘূমগড়িয়া (দেশজ) অলস, নিদ্রালু।

ঘূমন (দেশজ) নিদ্রা, ঘুম।

ঘূমনিয়া (দেশজ) নিদ্রালু, নিদ্রাশীল।

ঘূমান (দেশজ) ঘুম, নিদ্রা।

ঘূমানিয়া (দেশজ) নিদ্রালু।

ঘূর (ত্রি) ঘূর-ক। বিশেষ ধনিকারক।

ঘূরি, ঘূরী (ক্ৰী) ঘূর বাহুলকাৎ কি ততো বা ভীপ্। শূকরতুণ্ড।

“কঃ কঃ কুত্র ন ঘূরায়িত ঘূরীষোরোংস্কঃ শূকরঃ।”

(সাহিত্যদর্পণ)

ঘূরুণে (ঘূর্ণশব্দজ) ১ ঘূর্ণবাতাস। ২ জলজন্তু।

ঘূরুঘূর (পুং) ঘূর-প্রকারে বিশ্বে। শব্দবিশেষ, শূকরের শব্দ।

ঘূরু (পুং) ঘূরিত্যব্যক্তং ঘূরতি ঘূর-ক। ১ ঘমকীট, ঘুগয়া।

(ত্রিকাণ্ড) ২ শূকরের শব্দ। (চিন্তামণি)

ঘূরুরক (পুং) ঘূরুরইব কার্যতি কৈ-ক। উপদ্রববিশেষ,
দরকীর বিষে এই উপদ্রব ঘটয়া থাকে।

“তত্র দরকীরবিষেণ জুগুৎ বেপুথু স্বরাবসাদো ঘূরুরকো
জড়ত।” (সুশ্রুত সঙ্গ ৩ অঃ)

ঘূরুরিকা (ক্ৰী) ঘূরুরোবরাহধ্বনি রন্ত্যভাঃ ঘূরুর-ঠন্। তমক
কাশের উপদ্রববিশেষ। (Harpe exedens) গলা ঘড়ঘড়ে।

“তট্টশ্বেদবমথুগ্রাঃ কঠ-ঘূরুরিকারিতঃ।

বিশেষবাহুর্দিনে তাম্যোচ্ছাসঃ স্যাস্তমকোমতঃ।”

(সুশ্রুত ৪।৫১ অঃ)

ঘূরুরী (ক্ৰী) ঘূরুরঃ শূকরশব্দঃ অন্ত্যস্ত ঘূরুর অচ্ গৌরাদিস্বাৎ
ভীষ্। জলজন্তুবিশেষ, মৃৎকিরা। (ত্রিকাণ্ড)

ঘূরুল (পুং) ঘূর-কিপ্ তমকতি অন্-অণ্ উপসং, রন্ত লঃ।
ধাতুবিশেষ, গবেধুকা, গড়গড়ে ধান। (রত্নমালা)

ঘূল্‌ঘূলারব (পুং ক্ৰী) ঘূল্‌ঘূলইত্যব্যক্তমারোতি আ-ক্-
অচ্। পারাবতবিশেষ। (রাজনিং)

ঘূষ (দেশজ) ১ কার্য্যাসম্পাদনের জন্ত গোপনে উৎকোচ দেওয়া।
২ ক্ষুদ্র।

ঘূষথেকো, যে ঘূষ খাইয়া কাজ করে।

ঘূষখোর (পারসী) যে ঘূষ খাইয়া কাজ করে, যে ঘূষ লইয়া
শ্রমপাতী হয়।

ঘূষডান (দেশজ) ঘূষডান, ঘূষডে নে যাওয়া।

ঘূষণ (দেশজ) জোরে কীলমারা।

ঘূষা (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র। ২ হাত মুঠা করিয়া জোরে আঘাত।

ঘূষাঘূষি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরকে ঘূষা মারা।

ঘূষামাছ (দেশজ) ছোট মাছ।

ঘূষিত (ত্রি) ঘূষ-ক্ত বা ইট্। ১ শব্দিত, নাদযুক্ত। (ক্ৰী)
ঘূষ ভাবে ক্ত। ২ ঘোষণা।

ঘূলী (দেশজ) গুণবেশা, গোপনে উপপতির সহিত ক্রীড়া-
কারিণী।

ঘূষ্ঠ (ত্রি) ঘূষ-ক্ত পক্ষে ইড্‌ভাবঃ। ১ শব্দিত। (ক্ৰী) ২
বাক্যবিশেষ, উচ্চৈঃস্বরে যাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

ঘূষ্ঠান্ন (ক্ৰী) ঘূষ্টং কো ভোক্তা ইত্যাদেভ্যে দেয়মন্নম্। ভোক্তা
কে আছে কে খাইবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া যে অন্ন দেওয়া
হয় তাহাকে ঘূষ্ঠান্ন বলে। মন্থর মতে ইহা অভোজ্য,
খাইলেই পাপ হয়।

ঘূম্য (ত্রি) ঘোষণীয়।

ঘূমুড়ী, গঙ্গার পশ্চিমতুল্লস্থিত হগলীজেলার অন্তর্গত একটা
উপনগর। কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে
অবস্থিত। এখানে ধুতি ও সাড়ীর যথেষ্ট কারবার আছে।

ঘূর্ণোপীর ব্যবসায়ীদিগের হুতা, চট, লোহ ঢালাই ও গ্যাস প্রভৃতির কল কারখানা আছে। সাধারণের সুবিধার জন্য একটা বাজার আছে। এখানে চাউল ও জাত শস্যাদির বিকৃত ব্যবসা হইয়া থাকে। এই উপনগরের পূর্বসীমায় গঙ্গার কূলে অতি বিস্তীর্ণ একটা চড়া আছে। উহাকে চলিত কথায় “ঘুড়ির ট্যাক” বলে। ভরা জোয়ারের সময় উহা ডুবিয়া যায় এবং তাঁটার সময় সহজেই তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করা যায়।

ঘুশূণ (ক্ৰী) ঘুসি বাহুলকাৎ ঋণক প্ৰবোধদাদিত্বাৎ নলোপঃ।
কুশূষ। (ত্রিকাণ্ড°)

“ঘুশূর্ণৈর্ঘজ্জলাশরোদয়ে।” (নৈষধ°)

ঘুশূর্ণাপিজ্জরতনু (ক্ৰী) ঘুশূর্ণমিব ঘুশূর্ণেন বা আপিজ্জরাতমুখ্যতাঃ বহুব্রী। গঙ্গা।

“ঘুশূর্ণাপিজ্জরাতমুখ্যবীর্য বর্ষরত্ননাঃ।” (কাশীখণ্ড ২৯ অঃ)

ঘুক (পুং ক্ৰী) ঘু ইত্যব্যক্তং কায়তি কৈ-ক। উলুক, পেচক।
ক্রীলিঙ্গে ভীষু হইয়া থাকে।

ঘুকনাদিনী (ক্ৰী) ঘুক ইব নদতি নদ-গিনি ভীপ্। গঙ্গা।

“ঘর্ষয়া ঘুকনাদিনী” (কাশীখণ্ড ২৯ অঃ)

ঘুকারি (পুং ক্ৰী) ঘুকন্ত অরিঃ ৬তৎ। কাক। (হেম°)
ক্রীলিঙ্গে বিকল্পে ভীপ্ হয়।

ঘুকাবাস (পুং) ঘুকতাবাসঃ ৬তৎ। শাখোটি বৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

ঘূরণ (ঘূর্ণ শব্দজ) ভ্রমণ করণ, চক্রেয় ভ্রায় ফিরণ।

ঘূরণাক (দেশজ) সমভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া আসা, চারিদিক ঘূরণ।

ঘূরাগিয়া (ঘূর্ণ ধাতুজ) যে চতুর্দিকে ঘুরাইয়া থাকে।

ঘূরাগিয়া বাতাস, যে বাতাস সোজাপথে না বাইয়া তির্ঘ্যগ্ ভাবে গমন করে, ঘূর্ণ বাতাস।

ঘূর্ণ (পুং) ঘূর্ণতি ঘূর্ণ-অচ্। ১ শাকবিশেষ, ঐয়ম্বল্লর, চলিত কথায় গিমা বলে। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ ভ্রান্ত। (পুং) ঘূর্ণি-ভাবে ঘঞ্। ৩ ভ্রমণ। ঘূর্ণ-গিচ্-অচ্। ৪ ঘূর্ণকারক রোগবিশেষ।

ঘূর্ণন (ক্ৰী) ঘূর্ণ-ভাবে লুট্। ভ্রমণ, চক্রাকার আবর্ত।

ঘূর্ণনা (ক্ৰী) ঘূর্ণন-টাপ্। ভ্রমণ, চক্রাকারাবর্ত, চক্রেয় ফিরণ।

ঘূর্ণি (পুং) ঘূর্ণ-ভাবে ইন্। ভ্রমণ। (হেম°)

ঘূর্ণিত (ত্রি) ঘূর্ণ-গিচ্-কর্মণি ক্। ১ ভ্রমিত। ঘূর্ণ-গিচ্-কর্তৃরি ক্। ২ ভ্রান্ত।

ঘূর্ণনীয়া (ত্রি) ঘূর্ণ-অনীয়ায়। ঘূর্ণনের যোগ্য।

ঘূর্ণ-বায়ু (পুং) ঘূর্ণশালৌ বায়ুশ্চেতি কর্মধাঃ। ঘূরাগিয়া বাতাস।

ঘূর্ণমান (ত্রি) ঘূর্ণ কর্তৃরি শানচ্। যাহা ঘুরিতেছে।

“ভ্রমন্তঃ ঘূর্ণমানঞ্চ জুতিং দেবাপ্রচক্রিরে।” (হরিব° ৪৮।৩৬)
ঘূর্ণা (দেশজ) ১ ঘূর্ণনশীল, গতিবিশিষ্ট। ২ চকল। ৩ মাথাঘোরা।
ঘূর্ণায়মান (ত্রি) ঘূর্ণঃ ভ্রান্তইব আচরতি ঘূর্ণ ভ্রূশাদি°
স্বার্থে বা ক্যড্ কর্তৃরি শানচ্। ভ্রাম্যমাণ, যাহা মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণশীল।

“ইচ্ছাদৈ্য রথিলার্থসাধনপটৈঃ সংস্করমাটৈর্মুহঃ

পীতোন্নমন্তকলাতুলানসতয়া ঘূর্ণায়মানেক্ষণম্।” (কলাপব্যাক্যাসা°)

ঘূর্ণিকা (ক্ৰী) শুক্রেয় কন্যা দেবযানীর একজন সখী। (ভারত)

ঘূর্ণায়মান (ত্রি) ঘূর্ণাতে ঘূর্ণ-গিচ্-কর্মণি শানচ্। ভ্রাম্যমাণ।

ঘূড়করিক্র (ত্রি) মেঘ বা ভেড়ার মত রব।

ঘূর্ণ (পুং) ঘূর্ণ-ক। ১ দিবস। (নিঘণ্ট°) ২ দীপ্ত। ৩ উষ্ণ।

“অহা শং তামুনাশং হিমাশং ঘূর্ণেন।” (ঋক্ ১০।৩৭।১০)

“ঘূর্ণেন উষ্ণেন” সায়ণ।

ঘূর্ণা (ক্ৰী) ঘ্রিয়তে সিচ্যতেহনয়া ঘূ-সেকে বাহুলকাৎ নক্
ততঃ টাপ্। ১ কাক্ণা, দয়া।

“মন্দমতন্নিঘুলতাং ঘূর্ণয়া মুনিরেষ বঃ।

প্রগুদত্যাগতাবজ্জং জঘনেষু পশুনিব।” (কিরাত ১৫।১৩)

আচ্ছাদ্যতে শুণাদিকমনয়া ঘূ-নক্ টাপ্। ২ জুগুপ্সা।

পর্যায়—অবর্তন, অতীয়া, হনীয়া, রীজ্যা, হুগিয়া, স্থিগীয়া।

“তাংবিলোক্য বণিতা বধে ঘূর্ণাং

পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ।” (রঘু ১১।১৭)

ঘূর্ণার্চিস্ (পুং) অগ্নি। [ঘূতার্চিস্ দেখ।]

ঘূর্ণালু (ত্রি) ঘূর্ণা বাহুলকাৎ আলুচ্। কৃপায়ুক্ত।

“নিম্পাদিতশ্চ কাং স্নেন ভগবন্তিঃ কৃপালুভিঃ।”

(ভাগবত ৪।২২।৪১)

ঘূর্ণাবৎ (ত্রি) ঘূর্ণা-অন্ত্যার্থে মজুপ্ মত্ বঃ। কৃপায়ুক্ত, দয়ালু।

ঘূর্ণাবতী (ক্ৰী) ঘূর্ণাবৎ-ভীপ্। গঙ্গা। [ঘূর্ণিনিধি দেখ।]

ঘূর্ণাবাস (পুং) ঘূর্ণায়া আবাসঃ ৬তৎ। ১ কুয়াণ্ড। (ত্রিকাণ্ড°)
২ কৃপাধার।

ঘূর্ণি (পুং) জঘর্ষি দীপ্যতে ঘূ-নি-নিপাতনে সাধু। (ঘূর্ণিপুত্রি
পাঞ্চিচূর্ণিভূর্ণি। উণ্ ৪।৫২) ১ ফিরণ। ২ জালা। ৩ ভরল।

৪ সূর্য। (ক্ৰী) ৫ জল। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ দীপ্তিশালী,

ভেজবী। “তত্ত্ব ত্যক্তস্বভাবস্য ঘূর্ণেরয়া বনোকসঃ।”

(ভাগবত ৩।২।৬)

ঘূর্ণিত (ত্রি) ঘূর্ণা-ইতচ্। ১ যাহাকে সকলে ঘূর্ণা বা হেম
জ্ঞান করে। ২ ঘূর্ণায়ুক্ত, অবজাত, যাহা দেখিলে বা শুনিলে
ঘূর্ণা জন্মে। ৩ অনিগ্রহপ্রাপ্ত দর্য।

ঘূর্ণিনিধি (পুং) ঘূর্ণেনিধি ৬তৎ। ১ সূর্য। ২ গঙ্গা।

“ঘূর্ণাবতী ঘূর্ণিনিধিঃ” (কাশীখণ্ড)

স্বশিন্ (জি) স্বণা অন্ত্যস্ত স্বশি-ইনি। স্বণায়ুক্ত, বাহার স্বণা আছে। “জীবী স্বণীষ সন্তঃ ক্রোধনোনিত্যশক্তিঃ।” (পঞ্চতন্ত্র) স্বণীবৎ (জি) [বৈ] স্বণিরন্ত্যস্ত মতৃপ্ ছান্দসছাৎ মত ন বঃ দীর্ঘশ্চ। ১ দীপ্তিযুক্ত।

“স্বণীবা চেততিঅন্যনা” (জক্ ১০।১৭৬।৩) ‘স্বণীবান্ দীপ্তিমান্’ (সায়ণ।) (পুং) ২ তেজস্বী পণ্ডবিশেষ।

“ঋজ আদিত্যানামষ্ট্রী স্বণীবান্ বার্জীনসন্তেমত্যা” (বাজসনেয়ঃ ২৪।৩২) ‘স্বণীবান্ তেজস্বী পণ্ডবিশেষঃ সংহিতারাম্ স্বণিশব্দ দীর্ঘঃ’ (মহীধর।)

স্বণ্য (জি) স্বণার যোগ্য।

স্বত (পুং) জঘর্ষি ক্ররতি স্ব-ক্। (অজিহুসিভ্যঃ ক্ঃ। উণ্ ৩।৮২)। পক্ নবনীত, হবিঃ, চলিত কথায় বি বলে। পর্যায়—আজ্য, হবিস্, সর্পিস্, পবিজ্, নবনীতক, অমৃত, অভিচার, হোম্য, আয়ুস্, তৈজস্, আজ।

স্বতের সাধারণ গুণ—রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তিকারক, শীতবীৰ্য্য, অন্ন অভিঘাতী, কাস্তিজনক, ওজোধাতুবর্ধক, তেজস্কর, লাভণ্যবর্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বর-বৃদ্ধিকর, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলকর, গুরু, ত্রিধ, কফকর, রক্ষোয় এবং বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীদর্প ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড)

রাজবল্লভের মতে স্বতের সাধারণ গুণ—বুজি, অগ্নি, গুরু, ওজঃ, মেদঃ, স্মৃতি ও কফবর্ধক, বাত, পিত্ত, বিষ, উন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী ও জ্বরনাশক এবং মাংস অপেক্ষা অষ্টগুণ গুরু।

গব্যস্বতের গুণ—অত্যন্ত চক্ষুর হিতকর, গুরুবর্ধক, অগ্নি-বৃদ্ধিকর, মধুর রস, বিপাকে মধুর, শীতবীৰ্য্য, বাতঘ্ন, পিত্ত ও কফনাশক, মেধাজনক, লাভণ্যবৃদ্ধিকর, কাস্তিজনক, ওজোধাতুবর্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, হৃর্ভাগ্যবিনাশক, পাপ-হারক, রক্ষোয়, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিজ্, আয়ু-কর, মঙ্গলকর, রসায়ন, স্মৃগন্ধি, রুচিকারক এবং মনোজ্ঞ। গব্য স্বত সকল রকম স্বত হইতে শ্রেষ্ঠ।

মাহিষ স্বতের গুণ—মধুররস, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, শীতবীৰ্য্য, কফকারক, গুরুবৃদ্ধিকর, গুরু ও পাকে মধুর।

ছাগীস্বতের গুণ—অগ্নিবর্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলকারী, কটুবিপাক এবং কাশ, শ্বাস ও যক্ষ্মা রোগে উপকারী।

উদ্বীস্বতের গুণ—কটু বিপাক, অগ্নিবর্ধক, এবং শোথ, ক্রিমি, বিষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক।

মেঘীস্বতের গুণ—পাকে লঘু, সর্ষ্পরোগঘ্ন, অস্থিবৃদ্ধি-

কারক, চক্ষুর হিতকর, জঠরাগ্নির উত্তেজক এবং অশ্মরী, শর্করা ও বাতদোষনিবারক।

মাছুবীর ছুঙ্কজাত স্বতের গুণ—চক্ষুর হিতকর, এবং কফ, বায়ু, যোনিবিপত্তি ও রক্তপিত্তে উপকারী। ইহার গুণ—অমৃতের সমান।

ঘোটকীস্বতের গুণ—দেহ ও অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাকে লঘু, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ, নেত্ররোগ ও দাহরোগনাশক।

হুঙ্ক মহন করিয়া যে স্বত শ্রুত করা হয়, তাহার গুণ—ধারক, শীতবীৰ্য্য এবং নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মুচ্ছা, ভ্রম ও বায়ুনাশক।

গতদিবসীর হুঙ্কে যে স্বত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম হৈয়-জবীন। হৈয়জবীন স্বতের গুণ—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নি-দীপ্তিকর, অত্যন্ত রুচিজনক, বলকারী, শরীরের উপচয়-কারক, গুরুবৃদ্ধিকর এবং জ্বরে অতিশয় উপকারী।

পুরাতন স্বতের গুণ—ত্রিদোষ, মুচ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমিররোগনাশক।

এক বৎসরের পর স্বতকে পুরাতন বলা যায়। সকল রকম স্বতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের নিজ গুণের আধিক্য হয়।

ভোজন, তর্পণ, শ্রমে বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্র-রোগে নূতন স্বত ব্যবহার্য্য। রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমলজ্বর রোগ, বিসৃচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও মন্দ্যগ্নি এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে স্বত উপকারী নহে।

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ২য় ভাগ)

হুঙ্কস্বতের মতে স্বতের সাধারণ গুণ—সৌম্য, শীতবীৰ্য্য, লঘু, মধুর, অন্ন অভিঘাতী, ত্রিধিকর; উদাবর্ত, উন্মাদ, অপ-স্মার, শূল, জ্বর, আনাহের ও বাতপিত্তের শাস্তিকর, অগ্নি-বর্ধক; স্মৃতি, মতি, মেধা, কাস্তি, স্বর, লাভণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, বল ও আয়ু বৃদ্ধিকর, পুরুষষবর্ধক, পবিজ্, বয়ঃস্থাপক, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর, পাপ ও অলক্ষ্মীর বিনাশক, বিষঘ্ন ও রক্তোনাশক।

একশক জন্তুর স্বতের গুণ—লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, কষায়, কফ-নাশক, অগ্নির দীপ্তিকর ও কফনাশক। হস্তিনীছত্রে গুণ—ভাবপ্রকাশোক্ত মাছুবীছত্রে গুণের সমান।

স্বতমণ্ডের গুণ—মধুর, সারক, যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুঃ-শূল, ও শিরঃশূলে উপকারী। ইহা বস্তিক্রিয়া, নস্ত ও অক্ষিপূরণে প্রযোজ্য।

একাদশশত বৎসরের পুরাণ স্বতকে কুন্তগণি বলে। ইহা অপেক্ষা অধিক কালের স্বত হইলে তাহার নাম মহাস্বত।

ইহা ককর, বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে উপকারী, রক্তকর, মেধাজনক এবং ভিমির রোগনাশক। এই স্বত সকল প্রাণীর পক্ষেই হিতকর ও প্রশস্ত।

(সুশ্রুত, সূত্র ৪৫ অঃ)

(ত্রি) স্ব-দীপ্তৌ কর্তরি ক্ত। ২ দীপ্ত। ৩ সেবক, যে সেবন করে। (শব্দরত্ন) এই শব্দটি স্বতাদি গণাস্তর্গত বলিয়া ইহার অন্ত উদ্ভূত হয়। (ক্লী) ৪ জল। (শব্দার্থচিঃ)

স্বতকরঞ্জ (পুং) স্বতমিব করঞ্জঃ। করঞ্জবিশেষ, ঘিয়া করম্ভা। পর্যায়—প্রকার্য, স্বতপর্ণক, স্নিগ্ধগজ, তেজস্বী, বিহারি, স্নিগ্ধশাক, বিরোচন। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত, ত্রণ, স্বপ্নদোষ ও বিষম্পর্শনাশক। (রাজনিঃ)

স্বতকুমারিকা (স্ত্রী) স্বতেন স্বতসদৃশ রসেন কুমারিকেব। স্বতকুমারী।

স্বতকুমারী (স্ত্রী) স্বতেন স্বতসদৃশ রসেন কুমারীব। স্বনাম-প্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। (Aloe Indica.) পর্যায়—কুমারী, তরগি, সহা, কজ্জকা, দীর্ঘপত্রিকা, স্থলেকহা, মুছ, কজ্জা, বহুপত্রা, অমরা, অজরা, কণ্টক, প্রাবৃত্তা, বীরা, ভূপেষ্ঠা, বিপুলাস্ত্রবা, ব্রহ্মস্রী, তরুণী, রামা, কাপিলা, অম্বুশ্রবী, স্বকণ্টকা, স্থলদলা, গৃহকজ্জা। হিন্দীতে ঘি-কুমার, বা বনউত্তকী, পঞ্জাবী—কুমার, গন্দল বা মসি, দক্ষিণে কুণ্ডাব, তামিল—কন্তলে, তেলগু—কলকন্দা, মলয়—উলনাতন।

ভারতের নানাহানে শুখনার সময় ইহার গাছ জন্মে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কিছু অধিক। বর্ষাকালে ইহার ফুল হয়, ইহার ডাঁটা এক একটা ১০।১২ ফিট বড় হয়। ইহার পাতার আঁশে দড়ি হয়। তাহাতে বেশ রঙ ধরে। দেশীয় লোকে শীতল জলে ধুইয়া অন্ন চিনি দিয়া ইহার শাঁস আহার করে।

ইহার গুণ—হিম, তিক্ত, মদগন্ধযুক্ত, রসায়ণ, কফ, পিত্ত, শ্বাস ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনিঃ) ভেদক, চক্ষুর হিতকর, মধুর, বৃংহণ, শুক্র ও বলকারী, বাত, গুল্ম, প্রীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধি, অর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, পিত্তরক্ত ও অক্লেশে বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ)

[কুমারী শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্বতকুল্যা (স্ত্রী) স্বতপূরিতা কুল্যা মধ্যলো। স্বতপূর্ণ ক্রত্বিম নদী।

স্বতকেশ (পুং) স্বতোদীপ্তঃ কেশইবজ্জালা যন্ত বহব্রী। বহিঃ।

“উর্জোনপাতং স্বতকেশমীমহে” (শব্দ ৮।৬০।২)

‘স্বতকেশ প্রদীপ্তকলশহানীর জলং।’ (সায়ণ)

স্বতকৌশিক (পুং) স্বতোদীপ্তঃ কৌশিকঃ। ১ গোত্রবিশেষ। ২ প্রবরবিশেষ।

“স্বতকৌশিকগোত্রস্ত কৌশিককৌশিকস্বতকৌশিকা প্রবরাঃ।” (উদাহতঃ) এই গোত্র যজুর্বেদীয় বংশাস্তর্গত।

“স্বতকৌশিকাং স্বতকৌশিকঃ।” (শতপথব্রাং ১৪।৫।৫২১)

স্বতচ্যুতা (স্ত্রী) কুশবীপহ নদীবিশেষ।

স্বততৈলাদিকল্প (পুং) স্বততৈলাদীনাং রোগবিনাশক-পকস্বততৈলাদীনাং কল্পোবিধিঃ ৬তৎ। স্বত ও তৈল প্রভৃতি পাক করিবার বিধান।

স্বতদীপ্তি (পুং) স্বতেন স্বতাদীপ্তা বা দীপ্তিতরস্য বহব্রী। অগ্নি। (ত্রিকাণ্ডঃ)

স্বতদুহ (ত্রি) স্বতং দোদ্ধি স্বতঃস্বহ-কিপ্। যে স্বতদোহন করে। “চতুঃস্বতঃস্বতঃস্বতঃ” (শব্দ ৮।৮২।৫)

‘স্বতদুহঃ স্বতদোদ্ধী’ (সায়ণ)

স্বতদোদ্ধি (ত্রি) স্বততঃ দোদ্ধা ৬তৎ। যে স্বত দোহন করে, যাহা হইতে স্বত ক্রিয়িত হয়। ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হইয়া থাকে। [উদাহরণ স্বতদুহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

স্বতধারা (স্ত্রী) স্বতং তৎসদৃশং জলং ধারয়তি স্বতধারি-অণ্ উপাং সঃ। ১ পশ্চিম দেশীয় নদীবিশেষ।

“শুভ্রায়তিরসাতৈকৈব স্বতধারৈতি বিশ্রুতাম্।” (হরিবংশ ২২৫ অঃ)

স্বতজ্জ-ধারা ৬তৎ। ২ স্বতের ধারা।

স্বতনির্গিজ (ত্রি) স্বতং দীপ্তং নির্গিক্ রূপং যন্ত বহব্রী পত্নং হান্সগত্বাৎ। ১ দীপ্তরূপ, উজ্জল রূপশালী।

“দীপ্যায় নিগ্ধো স্বত নির্গিগ্জঃ” (শব্দ ২।৩৫।৪) ‘স্বতনির্গিক্ নির্গিগতি রূপনাম দীপ্তরূপঃ’ (সায়ণ।) (পুং) ‘স্বতং নির্গে-গেতি। নিজ-কিপ্ ৬তৎ। ২ স্বতশোধক অগ্নি, যাহার তাপে গলাইয়া স্বতশোধন করা হইয়া থাকে।

“শোচিক্ষেশো স্বতনির্গিক্ পাবকঃ।” (শব্দ ৩।১৭।১) ‘স্বত-নির্গিক্ স্বতস্ত তাপনধারা শোধকঃ’ (সায়ণ।)

স্বতপ (পুং) [বহ] স্বতং আজ্যং পিবন্তি পা-ক উপপদসং। ১ আজ্যপ নামক পিতৃগণবিশেষ।

“স্বতপাঃ সোমপা সবা বৈশ্বানরমরীচিপাঃ।”

(ভারত ১৩।১৬৬ অঃ)

(ত্রি) ২ স্বতপারী, যে স্বত পান করে।

স্বতপদী (স্ত্রী) স্বতং পাদে সংস্থিতং যন্তাঃ বহব্রী, ভীষি পাদস্ত পদ্যাবঃ। ১ ইড়া দেবতাবিশেষ। “স্বতপদীতি যদে-বাত্ত স্বতং পদে সমতিষ্ঠত তন্মাদাহ স্বতপদীতি।” (শতপথ ব্রাং ১৮।১।২৬) স্বতা দীপ্তাঃ পাদা যন্তাঃ বহব্রী, পূর্ব্ববৎ সাধু। ২ ইড়া নারী সরস্বতী।

“হবিষীড়া দেবী স্বতপদী জুযন্ত।” (শব্দ ১০।৭০।৮) ‘ইড়ে তন্মামিকা দেবী সরস্বতী স্বতপদী দীপ্তপদোপেতা।’ (সায়ণ।)

স্বতপূর্ণক (পুং) স্বতমিব স্বাহ্ পূর্ণমত্ বহব্রী কপ্। স্বতপূর্ণকরঞ্জ। [স্বতকরঞ্জ দেখ।]

স্বতপীত (ত্রি) স্বতং পীতং যেন বহব্রী, পীতত্ পরনিপাতঃ। স্বতপানকর্তা, যিনি স্বতপান করিয়াছেন।

স্বতপু (ত্রি) স্বতেন পুমাতি স্বত-পু-কিপ্। ১ যিনি গবাসার পবিজ করেন। ২ যিনি জলদ্বারা পবিজ করেন।

“স্বতেন নো স্বতপুঃ পুনস্ত” (ঋক্ ১০।১৭।১০) ‘স্বতপুঃ স্বতমুদকং তেনাতান্ পুনস্তীতি, যদা স্বতপুঃ স্বতং গব্যং তেন পুনস্তি।’ (সায়ণ।)

স্বতপূর (পুং) স্বতেন পূর্যতে পূরি-কর্মণি অপ্। পকানবিশেষ, বিওড়। পর্যায়—পিষ্টপূর, স্বতবর, ষাটিক। ইহার সাধারণ পাকপ্রণালী—দুগ্ধ, নারিকেল ও স্নাতাদির সহিত ময়দা বা সূজী ভাল করিয়া মর্দন করিবে। ভালরূপ মর্দিত হইলে পিষ্টকাকার করিয়া ঘূতে পাক করিবে। ইহার নাম স্বতপূর। ইহার গুণ—গুরু, বলকারী, কফবর্ধক, রক্ত ও মাংসবৃদ্ধিকর, রক্তশিশ্ননাশক, রুচিকর, স্বাহ্, পিত্তনাশক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। (দ্রাক্ষবল্লভ) চিহ্নামণির মতে ময়দা বা সূজী কেবল দুগ্ধদ্বারা মর্দন করিয়া চিনির সহিত পাক করিয়া লইলে তাহাকে স্বতপূর বলে। পাক হইয়া আসিলে অল্পপরিমাণ মরিচ ও কপূর দিতে হয়। উপরে যে দুইপ্রকার স্বতপূরের পাকপ্রণালী লিখিত হইল উহাকে সাধারণ স্বতপূর বলে। ইহা ছাড়া আরও কএক রকমের স্বতপূরের উল্লেখ আছে। যথা—১ নারিকেলজ। ইহার পাকপ্রণালী—নারিকেল, চিনি ও আদার সহিত দুগ্ধে ময়দা বা সূজী গুলিয়া পিষ্টকাকারে ঘূতে পাক করিবে। ইহাকে নারিকেলজ স্বতপূর বলে।

২ দুগ্ধজ।—দুগ্ধপাক করিতে করিতে যখন পিণ্ডীকৃত হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে শর্করার্চুণ মিশাইয়া অল্পপরিমাণ ঘূতে পাক করিবে, ইহাকে দুগ্ধজ স্বতপূর বলে।

৩ শালিভব।—উত্তমশালী ধানের চাউলের চূর্ণ ও দুগ্ধ মিশাইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যা কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে শর্করা মিশাইয়া লইবে। পরে ঘূতে পাক করিবে। ইহার নাম শালিভব স্বতপূর।

৪ কসেরুজ।—কসেরু চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিবে, যখন পিণ্ডাকার হইয়া আসিবে, তখন নামাইতে হয়। ইহাকে কসেরুজ স্বতপূর বলে।

৫ আশ্বরসজ।—স্বত ভাল করিয়া উত্তপ্ত হইলে তাহাতে পাক আমের রস ঢালিয়া দিবে। কিছুকাল জ্বালে থাকিলে ঐ রসগুলি পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। তাহার সহিত শর্করা মিশাইবে। ইহার নাম আশ্বরসজ স্বতপূর।

স্বতপূর্ণক (পুং) স্বতং পূর্ণমত্ বহব্রী, কপ্। করঞ্জবৃক্ষ-বিশেষ, স্বতপূর্ণকরঞ্জ। (ভাবপ্রকাশ) [করঞ্জ দেখ।]

স্বতপৃষ্ঠ (পুং) স্বতং দীপ্তং পৃষ্ঠমত্ বহব্রী। ক্রৌঞ্চবীপের অধিপতি, প্রিয়ত্রতের পুত্র একজন পরাক্রান্ত রাজা। [ক্রৌঞ্চ দেখ।] (ত্রি) ২ যাহার পৃষ্ঠ অতিশয় দীপ্তযুক্ত, দীপ্তপৃষ্ঠ। “শ্রুতমগ্নিং স্বতপৃষ্ঠমোক্ষণং” (ঋক্ ১০।১২২।৫) ‘স্বতপৃষ্ঠং দীপ্তপৃষ্ঠং’ (সায়ণ।)

স্বতপ্রতীক (ত্রি) স্বতং প্রতীকং মুখং যন্ত বহব্রী। যাহার মুখে স্বত আছে, অগ্নি। “স্বতপ্রতীকোহুতযোনিঃ” (বাক্যসময়ে ৩৫।১৭)

স্বতপ্রায়ম্ (পুং) স্বতং তৎসহিতং প্রয়োহন্নং যন্ত বহব্রী। অগ্নি। “স্বতপ্রয়াঃ সধমাদে মধুনাং” (ঋক্ ৩।৪৩।৩) ‘স্বতপ্রয়াঃ স্বতসহিতানি প্রয়াংসি অমানি যন্ত’ (সায়ণ।)

স্বতপ্রসত্ত (পুং) স্বতেন প্রসত্তঃ ৩তৎ। অগ্নি। “স্বতপ্রসত্তো অমরঃ শুশেবঃ” (ঋক্ ৫।১৫।১)

স্বতগ্রী (ত্রি) [বৈ] স্বতপ্রিয়, অগ্নি।

স্বতপ্রতম্ (ত্রি) [বৈ] ১ স্বতপূর্ণ। ২ শুভকর।

স্বতমণ্ড (পুং) স্বতত্ মণ্ডঃ ৬তৎ। গলিত স্বতের নীচে পতিত সারাংশ বিশেষ, চলিত কথায় জমানা ঘি বলে।

“ততঃ স স্বতমণ্ডেন হৃদ্যোনেজ্জিয়বোধিনা।” (জুশ্রুত)

স্বতমণ্ডলিকা (স্ত্রী) স্বতত্ মণ্ডলং সমূহঃ তদিব নির্যাসো হস্তাত্মং স্বতমণ্ডল-ঠন্ (অত ইনিষ্ঠনৌ। পা ৫।২।১২৫) হংসপদী বৃক্ষ। (রাজনিং)

স্বতমণ্ডা (স্ত্রী) স্বতমণ্ডবৎ নির্যাসো হস্তাত্মাঃ স্বতমণ্ড-অচ্ (অর্শ আদিভ্যোহচ্। পা ৫।২।১১৭) বায়সোলী বৃক্ষ, চলিত কথায় মাকড় হাতা বলে। (শব্দচঞ্জিকা)

স্বতমণ্ডোদ (পুং) মন্দরগিরিহ্ব একটা হ্রদ।

স্বতযোনি (পুং) অগ্নিবিশেষ।

স্বতরৌচ্য (পুং) স্বতভিলাষী রৌচ্য।

স্বতলেখনী (স্ত্রী) স্বতং লিখাতেহনয়া স্বত-লিখ করণে লুট্ ভীপ্। কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ, যাহা দ্বারা স্বত লেখন করা যায়। (হেমং)

স্বতবতী (স্ত্রী) [দ্বিবং] স্বতমুদকং হেতুত্বেন কার্যাত্বেন বা অন্ত্যাত্ম স্বত-মতুপ্ মত্ বঃ ততো ভীপ্। স্বর্গ ও পৃথিবী।

স্বতবৎ (ত্রি) স্বতং অন্ত্যাত্ম স্বত-মতুপ্ মত্ বঃ। ১ স্বতযুক্ত, যাহার স্বত আছে। ২ দীপ্তপদযুক্ত। জ্বালিছে ভীপ্ হয়। “তৈলং প্রতিনিধিং কুর্য্যাৎ স্বতার্থে যাজ্ঞিকো যদি। প্রকৃতৈব তদা ক্রয়াৎ হোতাংস্বতবতীমিতি।” (তিথ্যাদিভূত)

স্বতবর (পুং) স্বতং বরমত্ বহব্রী। পকানবিশেষ, স্বতপূর। (হেমং)

স্বতবর্তনি (ত্রি) স্বতং বর্তমাং পথি-যত্ৰ বহত্ৰী। যাহার পথে
জল থাকে। “স্বতবর্তনিঃ পবিত্রীকৃতান।” (ঋক্ ৭।৬৯।১)

‘স্বতমুদকং বর্তমাং যত্ৰ তাদৃশঃ’ (সায়ণ।)

স্বতবর্তি (জী) স্বতযুক্ত বর্তিঃ মধ্যলোঃ। স্বতযুক্ত দীপের দশা।

“যথা প্রদীপো স্বতবর্তিমগ্নঃ।” (ভাগবত ৫।১।১৮)

স্বতবৃদ্ধ (পুং) স্বতেন বৃদ্ধঃ ৩তং। অগ্নি। স্বত চালিয়া
দিলে অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

“সমিকো অগ্নিঃ সমিধানো স্বতবৃদ্ধো স্বতাহতঃ” (অথর্ব ১৩।১।২৮)

স্বতব্রত (ত্রি) স্বত খাইয়া জীবনধারণ।

স্বতশ্চুৎ (ত্রি) স্বতং শ্চোততি শ্চুত-কিপ্। যে স্বত ক্ষরণ করে।

“স্বতং হি শব্দন্ত দ্বৈগতে স্রষ্টা দেবঃ স্বতশ্চুতা” (ঋক্ ৫।১৪।৩)

‘স্বতশ্চুতা স্বতং ক্ষরন্ত্যা’ (সায়ণ।)

স্বতশ্চ্যুত (ত্রি) স্বতং শ্চোততি স্বতশ্চ্যুত-কিপ্। স্বতপ্রাবী।

“স্বতশ্চ্যুতোমধুশ্চ্যুতো বিরাজো নাম।” (বাজসনয় ১৭।২)

‘স্বতশ্চ্যুতঃ স্বতপ্রবিণঃ’ (মহীধর।)

স্বতশ্রী (ত্রি) স্বতেন শ্রীঃ শোভাযত্ৰ বহত্ৰী। স্বতদ্বারা যাহার

শোভা হইয়াছে। “হোতা যক্ষত্বষ্টারমিজং দেবঃ ভিষজং

স্বয়জং স্বতশ্রিয়ম্।” (শুক্রযজুঃ ২৮।৯) ‘স্বতশ্রিয়ঃ স্বতেন শ্রীঃ

শোভা যস্য তম্।’ (মহীধর।)

স্বতসদ (ত্রি) স্বতে সীদতি স্বত-সদ-কিপ্। যে স্বতে অবস্থিতি

করে। “অপ্সু বদং স্বা স্বতসদং ব্যোমসদম্।” (শুক্রযজুঃ ৯।৩)

স্বতস্থলা (জী) স্বতং স্থলং উৎপত্তিস্থানং যস্যঃ বহত্ৰী।

অপ্সরাবিশেষ। (হরিবংশ ১২৬ অঃ)

স্বতস্না (ত্রি) স্বতবৎস্নাতি পবিত্রো ভবতি স্না-বিচ্। স্বতের

স্নায় পবিত্র। “উতথো বপুশি যঃ স্নরাড়ুত বায়ো স্বতস্নাঃ।”

(ঋক্ ৮।৪৩।২৮) ‘স্বতস্না স্বতবচ্ছুকঃ’ (সায়ণ।)

স্বতস্নু (ত্রি) স্বতং স্নোতি স্বত-স্নু-কিপ্ ছান্দসস্তার ভূগাগনঃ।

১ যে স্বত ক্ষরণ করে।

“স্বতস্য বা কেশিনা যোগ্যাস্তি স্বতস্নুবা” (ঋক্ ৩।৬।৬)

‘স্বতস্নুবা স্বতং ক্ষরন্তো’ (সায়ণ।)

স্বতং জলং স্নোতি স্নু-কিপ্ পূর্ববৎ সাধু। ২ যে জলক্ষরণ করে।

“স্বতস্নু বহিরাসদে।” (ঋক্ ৩।৪।১৯) ‘স্বতস্নু শ্রমজনিভ-

জলপ্রসবণযুক্তো’ (সায়ণ।)

স্বতস্পৃশ্ (ত্রি) স্বতং স্পৃশতি স্পৃশ-কিন্। যে স্বত স্পর্শ করে।

স্বতহ্রদ (পুং) স্বতস্য হ্রদঃ ৩তং। স্বতপূর্ণ হ্রদ।

স্বতাক্ত (ত্রি) স্বতেন অক্তঃ ৩তং। যাহা স্বতে লিপ্ত হই-

য়াছে, যে সর্পিণ্ডে বি মাখিয়াছে।

স্বতাচি (ত্রি) স্বতাক্ত, স্বতময়।

স্বতাচী (জী) স্বতং জলং কারণতয়া অক্ষতি অক্ষ-কিপ্। ন

লোপে ত্রিমাং জীপ্। ১ অপ্সরাবিশেষ। এক সময়ে ইহাকে

দর্শন করিয়া ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হন। ইহাকে

দেখিয়া ব্যাসদেবের কামোদ্বেগ হয়, তাহাতে শুকদেবের

জন্ম হয়। (ভারত শাস্তি ৩২৫ অঃ) [শুকদেব দেখ।]

২ রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী, ইহার গর্ভে শত কন্যার জন্ম হয়।

(রামায়ণ ১।৩২ সঃ) [কুশনাভ দেখ।]

৩ প্রেমতির পত্নী ও ঋকর মাতা। ৪ রাজি। (নিষট্)

৫ সরস্বতী। ৬ নাগবিশেষ।

স্বতাক্ত (ত্রি) স্বত অক্ষতি কিপ্। ১ যে স্বত প্রাপ্ত হয়।

“স্বতাক্তসি জুহুর্নামা” (শুক্রযজুঃ ২।৬)

২ জলযুক্ত, যাহাতে জল আছে।

“জং বহন্তি সূর্য্যং স্বতাচীঃ” (ঋক্ ৭।৬।১৩) ‘স্বতাচীঃ উদক-

বতাঃ’ (সায়ণ।) স্বতং দীপ্তরূপং অক্ষতি অক্ষ-কিপ্। ৩

দীপ্তরূপযুক্ত। “স বিশ্বাচী রতিচেষ্টে স্বতাচীঃ” (ঋক্ ১০।১৩৯।২)

‘স্বতাচী দীপ্তরূপবতীঃ’ (সায়ণ।)

স্বতাচীগর্ভসম্ভবা (জী) স্বতাচ্যা গর্ভেইব সম্ভবতি সম্ ভূ-

অচ্। ১ স্থল এলা, বড় এলাচী। (রাজনিঃ) ২ স্বতাচীর কন্যা।

[স্বতাচী দেখ।]

স্বতাদি (পুং) স্বতমাদির্ঘসা বহত্ৰী। পাণিনীয় একটা গণ-

বিশেষ। স্বতাদি আকৃতিগণ। (সিঃ কোঃ)

স্বতান্ন (পুং) স্বতমাজ্যমন্নমদনীয়ং যস্য বহত্ৰী। ১ হবির্ভূজ,

অগ্নি। (ত্রি) ২ স্বতভোজী। (জী) ৩ স্বতমিশ্রিত অন্ন।

স্বতার্চ্চিস্ (পুং) স্বতেনার্চ্চির্ঘসা বহত্ৰী। অগ্নি।

“স্বতার্চ্চিঃ প্রীতিমাংসচাপি প্রজ্জ্বাল দিধক্ষ্য।”

(ভারত ১।৫৮ অঃ)

স্বতাবনি (জী) স্বতস্যাবনিরিব। যুগকর্ণ। (হেমঃ)

স্বতাবধ্ (ত্রি) স্বতমুদকং বর্ধিতেহনেন বধ-কিপ্ পূর্বদীর্ঘশ্চ।

যাহা দ্বারা জলের বৃদ্ধি হয়, উদকবর্ধক।

স্বতাস্তি (পুং) স্বতমুদকং বৃষ্টিরূপং আস্তয়তে যেন আ-সু-

ক্টিচ্। ১ বৃষ্টিকারক মিত্রাবরণ।

“ভা সম্রাজা স্বতাস্তী যজ্ঞে যজ্ঞ উপস্ততা।” (ঋক্ ১।১৩৬।১)

‘স্বতমুদকং বৃষ্টিরূপং প্রস্রুতে সর্গদ্রাহুজ্ঞায়তে যাত্যঃ

তৌ তাদৃশৌ’ (সায়ণ।) (ত্রি) স্বতং আস্ততিরন্নং যত্ৰ বহত্ৰী।

স্বতভোজী। “স্বতাস্তী ত্রিবিণং ধত্তমস্মৈ সমুদ্রঃ।” (ঋক্ ৬।৬৯।৬)

‘স্বতাস্তী স্বতাস্তৌ’ (সায়ণ।)

স্বতাহবন (পুং) স্বতেনাহবতেহস্মিন্ আ হ-আধারে লুট্।

যাহাতে স্বতদ্বারা আহুতি দেওয়া হয়, অগ্নি।

“স্বতাহবন! দীদিবঃ প্রতিগ্নরিষতোদহঃ।”

(ঋক্ ১।১২।৫।) ‘স্বতাহবন অগ্নে’ (সায়ণ।)

যুতাহতি (জী) যুতেনাহতি: ৩৩৭। যুতারা যে আহতি দেওয়া হয়।

“যদ যজুঃষি যুতাহতিভিঃ।” (আশ্বগু° ৩।৩২)

যুতাহ্ (পুং) যুতং তদগন্ধমাহ্বয়তে স্পর্ধিতে নির্ধাসেন যুত-
আ-হ্বে ক উপপদনং। সরল বৃক্ষ, ইহার নির্ধাসের গন্ধ যুত-
তুল্য বলিয়া যুতাহ্ নাম হইয়াছে।

যুতিন্ (ত্রি) যুতমাজামুদকং বা প্রাশস্তোত্র অস্ত্যন্ত যুত-
ইনি। ১ প্রশস্ত যুতযুক্ত, যাহার ভাল যুত আছে। ২ যাহাতে
উৎকৃষ্ট জল আছে।

যুতিনী (জী) যুতিন্-ভীপ্। গন্ধা।

“পর্যম্বিনীঃ যুতিনী মতুদারাম্।” (ভারত ১৩।২৬ অঃ)

যুতেয় (পুং) পুরুষাংশীয় রৌদ্রাশ্ব নামক নৃপতি-পুত্র।

[কৃত্যেয়ু দেখ।]

যুতেলী (জী) যুতে স্নেহদ্রব্যে ইলতি ইল-অচ্ গোরাদি-
ত্বাং ভীষ্। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা। (হেম°)

যুতোদ (পুং) যুতমিব আচ্ উদকমস্য বহুতী। সমুদ্রবিশেষ,
ইহা দ্বারা কুশদ্বীপ বেষ্টিত। [কুশ দেখ।]

যুতোদন (পুং) যুতেন মিশ্র ওদনঃ মধ্যালো°। যুতমিশ্রিত ওদন।

“দধোদানঞ্চ জীবায় শুক্রায়চ যুতোদনম্।” (সংস্কারতত্ত্ব°)

যুত্য (ত্রি) যুতে ভবঃ যুত-যৎ। যুতসম্বন্ধীয়, যাহা যুতে উৎপন্ন হয়।

যুৎসমদ (পুং) গৃৎসমদ পৃষোদরাদিত্বাৎ গস্য যত্বঃ। ঋষি-
বিশেষ। (বিষ্ণুপুং) [গৃৎসমদ দেখ।]

যুযু (ত্রি) [বৈ] প্রধান, শ্রেষ্ঠ। “যুযু বা যে নিনিদ্রঃ
সখায়ঃ” (ঋক ১০।২৭।৬) “যুযু মহাশ্রম্।” (সায়ণ।)

যুযু (ত্রি) যুযু কৰ্ম্মণি ক্রি। ১ মর্দিত, যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে,
চলিত কথায় ঘষা বলে। “যুযুতসাজননার্যাঃ ক্ষীরেণ” (অশ্বত)
(পু) ২ চন্দনবিশেষ। (শব্দার্থচি°)

যুষ্টি (জী) যুষ্টিতেহসৌ যুযু-কৰ্ম্মণি ক্রিচ্। ১ বারাহী, চলিত
কথায় চামর আলু বলে। ২ অপরাজিতা। যুযু ভাবে ক্রিন্।
৩ ঘর্ষণ, ঘষা। ৪ স্পর্ধা। (পুং) যুযু-কৰ্ম্মণি ক্রিচ্।
৫ শূকর। (মেদিনী)

যুষ্টিলা (জী) যুষ্টিং লাতি লা-ক। পুষ্টিগণী, চাকুলিয়া।

যুষ্টি (পুং জী) যুযুতি ভূমিং তুণ্ডেন যুযু ক্রিন্ নিপাতনে সাধু
(কৃষি যুষ্টিচ্ছবীতি। উণ ৪।৫৬) ১ বরাহ। (ত্রি) ২ ঘর্ষণ-
শীল। “মদন্তি বীরা বিদথেযু যুষ্টিয়ঃ” (ঋক ১।৮৫।১) জীলিঙ্গে
বিকল্পে ভীপ্ হয়। (জী) যুযু ভাবে ক্রিন্। ৩ ঘর্ষণ।

যুষ্টিরাধস (ত্রি) যুষ্টানি রাধাসি সোমলক্ষণানি হবীঃষি
যস্য বহুতী। পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতনে সাধু। যাহাদের
সোমরূপ হবিঃ পরম্পর যুষ্টি হইয়া থাকে, মরুৎ।

“ঐযু যুষ্টিরাধসো যাতানান্ধাসি গ্রীতয়ে।” (ঋক ৭।৫২৫)

ঘেউয়া (দেশজ) ঘা যুক্ত।

ঘেঁচড়া (দেশজ) অবাধ্য, যে কথা শুনে না, হুমুংগ।

ঘেঁচু (যেগুলিকা শব্দজ) এক প্রকার মূল (Arum Orissense),
ইহা খাইতে অন্ন মিষ্ট।

ঘেঁটকচু (যেগুলিকা শব্দজ) এক প্রকার কচু।

ঘেঁটু (ঘণ্টাকর্ণ শব্দজ) থোস্ পাঁচড়ারোগের দেবতা, ঘণ্টা-
কর্ণ। [ঘণ্টাকর্ণ দেখ।]

ঘেঁষ (দেশজ) ঘন ঘন, অবকাশশূন্য।

ঘেঁষণ (দেশজ) ঘর্ষণ।

ঘেঁষড়ন (দেশজ) ভূমের উপর দিয়া টানা।

ঘেঁষা (দেশজ) ১ নিকটবর্তী। ২ অহুগত। ২ ঘর্ষণ।

ঘেঁষাঘেঁষি, ১ নৈকট্য সম্বন্ধ। ২ আত্মগত।

ঘেঁষণ (দেশজ) ১ নিকটবর্তীকরণ। ২ অহুগত করা।

ঘেঁষা (দেশজ) ১ বিরক্তিকর প্রার্থনা। ২ বিরক্তিকর কার্য।

ঘেঁষান (দেশজ) আগ্রহের সহিত কোন বস্তু চাহিয়া বিরক্ত
করা।

ঘেগুলিকা (জী) ক্রৌঞ্চাদন, চলিত কথায় ঘেঁচু বলে।

ঘেটকচু (দেশজ) ঘেঁচু।

ঘেটকুল (দেশজ) যেগুলিকা, ঘেঁচু।

ঘেরঘার (দেশজ) ১ প্রাচীর, বেড়া, আবরণ। ২ নগরাদি
অবরোধ বা বেঠন।

ঘেরণ (দেশজ) বেঠন, চতুর্দিক ঘেরিয়া অবস্থান।

ঘেরণ্ড, একজন গ্রন্থকার। ইনি শাক্ত উপাসনার যোগ-
শিক্ষার্থ ঘেরণ্ডসংহিতা নামে একখানি তন্ত্র রচনা করেন।
ঐ গ্রন্থে যথাক্রমে এই কয়টি বিষয় বর্ণিত আছে—১ উপ-
দেশ, ধোতাদিষট্ কৰ্ম্মকথা, ২ ঘটহ যোগকথা, ৩ ঘটহ
যোগমুদ্রাশ্রকরণ, ৪ প্রত্যাহারপ্রয়োগকথা, ৫ প্রাণায়াম-
লক্ষণ, ৬ ধ্যানযোগকথা ও ৭ সমাধিযোগ।

ঘেরা [ঘেরণ দেখ।]

ঘেরাণ (দেশজ) বেঠন করান।

ঘেরিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র নগর।
স্থতীর দক্ষিণে অক্ষা° ২৪° ৩৬' ১৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৮'
১৫" পূর্বে অবস্থিত। এখানে দুইটা প্রধান যুক্ত ঘাটে—

১ম, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণেচ্ছ
সরফরাজ খাঁর সহিত প্রতিলক্ষ্মী নবাব আলীবর্দীখাঁর যুক্ত
হয়, ঐ যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত হন।

২য়, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব গীর কাসিমের
সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুক্ত হয়। ইংরাজেরা তাঁহাকে

পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে দ্বিতীয়-বারের জন্ত মুর্শিদাবাদের নবাবী পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ঘোশ, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার সামন্তের অধীন একটি রাজ্য। সম্বলপুর হইতে প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার মধ্যে সর্বসমেত ১২ খানি গ্রাম আছে, ভূমির পরিমাণ প্রায় ১২ বর্গমাইল হইবে, তন্মধ্যে ১ অংশ জমিতে কেবলমাত্র ধাতের চাষ হইয়া থাকে।

২ উক্ত বিষয়ের প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ২১° ১১' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ২০' পূঃ। এখানে একটি বিদ্যালয় আছে। সর্দারেরা "বিজ্জবাবা" বংশসম্ভূত।

ঘেসেড়া (দেশজ) ঘে ঘাস কাটে।

ঘৈরা (গভীর শব্দজ) অগাধ, গভীর।

ঘোঁজ (দেশজ) ছাজ পথ, বাকা পথ।

ঘোঁট (দেশজ) ১ হামামিন্দিয়া কোন বস্তু গুঁড়া করা।
২ কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন।

ঘোঁটনা (দেশজ) যাহা দিয়া ঘোঁটা যায়।

ঘোঁটা (দেশজ) গুঁড়া করিবার জন্ত আঘাত করা বা ঘষা।

ঘোগ (দেশজ) ১ বাঁধের মধ্যকার গর্ত, যাহা দিয়া জল ঝরে। ২ রক্তবর্ণ হংস। ৩ চতুর্হস্ত জন্তু বিশেষ। ভারতের নানাস্থানে বৃক্ষাদিতে ইহারা বাস করে। ইহাদের গায়ের লোম বেশ নরম, ঘন ও পশমের মত। ইহাদের নাসিকা-বিবর বানরের ছায়। লালু আছে বটে, কিন্তু বানরের মত তাহাতে সকল জিনিস ধরিতে পারে না। ইহাদের মুখ অনেকটা খেক্শিয়ালের মত, নথ অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইহারা সামান্য জন্তু হইলেও নিবিড়বনে বাঘের নিকট থাকে। এই জন্তু প্রবাদ আছে, "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।"

ঘোঘারো, সিদ্ধপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২৭° ২৯' উঃ, ও দ্রাঘি° ৬৮° ৪' পূঃ। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান মজন, সিয়াল ও বগন জাতীয় লোক বেশী। এখানে চাউলের ব্যবসা বিস্তৃত।

ঘোটক (পুং লি) ঘোটতে পরিবর্ত্তে গম্বা প্রত্যগচ্ছতি ঘুট-ধূল। পশু বিশেষ, ঘোড়া। পর্যায়—পীতি, তুরগ, অশ্ব, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অশ্বর, গন্ধর্ব, হয়, গৈন্ধব, সপ্তি, ঘোট, পীতী, পীপি, তাক্ষ্য, হরি, বীতী, মৃদগভোজী, ঘারাট, জবন, জিতব, জবী, বাহনশ্রেষ্ঠ, ত্রীভ্রাতা, অমৃতসোদর, মৃগভূক, শালিহোত্র, লক্ষ্মীপুত্র, প্রকীরণক, বাতায়ন, ত্রীপুত্র, চামরী, হ্রেষী, শালিহোত্রী, মরুদ্রথ, রাজক্ক, হরিদ্রাক্ত, একশক, কিকী, ললাম, বিমানক, অত্য, বহি, দধিক্রা, দধিক্রাবা, এতথ, এতশ, পৈক, দোগহ, উচ্চৈঃশ্রবস্, অশু,

ব্রহ্ম, অশ্ব, মাংস্চজ, অব্যথয়, শ্রোনাগ, অর্পণস্, পতঙ্গ, নয়, হংসাত্ম। পারসী—অশ্ব, জল—অশ্ব, আরবী—হিসান্, হিন্দী—ঘোড়া, তামিল—কুদরি, তেলগু—গুরমু, তুর্ক—অশ্ব, ব্রহ্ম—সোন, লাতিন—Equus, caballus, হিব্রু—অশ্ব, জার্মান—Pferd, gnu, ইতালী ও পর্তুগীজ—Cavallo, ফরাসী—Cheval, ওলন্দাজ—Paard, দিনেমার—Hest, পোলণ্ডে কোণ, রুশ—লোস্চদ্, স্পেনীয়—কাবালো, স্বন্দনাভ—হস্ত।

এতদেক্ষীয় প্রাচীন অশ্ববিদগণের বিশ্বাস যে, পূর্বে সমস্ত ঘোটকেরই পাখা ছিল, বৃহৎ বৃহৎ পক্ষীর ছায় ইহারাও পাখায় ভর করিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতে পারিত। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দের আদেশে শালিহোত্র ইহাদের সমস্ত পাখাগুলি কাটিয়া ফেলেন, তদবধি ইহারা পক্ষহীন ও ভুলচরী হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন অশ্ববেত্তারা মোটামোটি চাররকমের ঘোড়ার নির্দেশ করেন। যথা—উত্তম, মধ্যম, কনীয়ান্ বা কনিষ্ঠ ও নীচ। দেশান্তরে এই চারি প্রকার ভেদ ঘটয়া থাকে। যথা, তাজিক, খুরাশাণ ও তুবার-দেশে যে সকল ঘোড়া উৎপন্ন হয় তাহারা উত্তম, গৌজিকাণ, কেকাণ (কোকাণ) ও প্রোচাহার ইহাদিগকে মধ্যম, গন্ধার, সাধ্যাবাস ও সিন্ধুবারে যাহারা থাকে তাহাদিগকে কনিষ্ঠ, ইহা ছাড়া অপরদেশে যে সকল ঘোড়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নীচ জানিবে (১)।

ভোজের যুক্তিকল্পিত গ্রন্থে লিখিত আছে—জগ হইতে এক রকম ঘোড়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে জলজ, বহি হইতে যে সকল ঘোড়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বহিজ ও বায়ু হইতে একপ্রকার ঘোড়া জন্মে, তাহাদিগকে বায়ুজ বলে। ইহা ছাড়া ঘোটকীর গর্ভে ঘোটকের গুঁরসে আর এক রকমের ঘোড়া হয়, তাহাদিগকে মৃগজ বলে। জলজ ঘোটক ব্রাহ্মণ, বহিজ ঘোটক ক্ষত্রিয়, বায়ুজ ঘোটক বৈশ্য এবং মৃগজ ঘোটকদিগকে শূদ্রজাতীয় জানিবে। ব্রাহ্মণ জাতীয় ঘোড়ার শরীর হইতে পুষ্পগন্ধ, ক্ষত্রিয় জাতির শরীর হইতে অশুরগন্ধ, বৈশ্যজাতীয়ের শরীরে ঘৃতের গন্ধ এবং শূদ্র ঘোটকের শরীর হইতে মাছের গন্ধ পাওয়া যায়। আবার ব্রাহ্মণের ছায় ব্রাহ্মণজাতীয় ঘোটক বিবেকী ও দয়ালু, ক্ষত্রিয় বলশালী ও তেজস্বী, বৈশ্য জঘন্য ভাবযুক্ত

(১) "তাজিকা খুরাশাণ্ড তুবারশোভমা হয়ঃ।

গৌজিকাণ্ড কেকাণঃ প্রোচাহারান্ড মধ্যমাঃ।

তাড়জা উত্তমাণ্ড বজ্রশূলাণ্ড মধ্যমাঃ।

গন্ধারাঃ সাধ্যাবাসান্ড সিন্ধুবারাঃ কনীয়সঃ।"

(ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পিত)

এবং শূদ্রজাতীয় ঘোটক অতিশয় দুর্বল হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় ঘোটকই রাজগণের পক্ষে প্রশস্ত; শূদ্রজাতীয় ঘোটক অমঙ্গলকারী।

অশ্ববিদগণ ঘোটকের অঙ্গসংস্থান মোটামোটা এইরূপ নিরূপণ করেন।

ঘোড়ার মুখ ২৭ আঙ্গুল, কর্ণ ৬ আঙ্গুল, কপাল ৪ আঙ্গুল, স্বক্শদেশ ৪৭ আঙ্গুল, পৃষ্ঠবংশ ২৪, ও কটি ২৭ আঙ্গুল, লিঙ্গ এক হাত, অণ্ড ৪ আঙ্গুল, মধ্যস্থান ২৪, হৃদয় ১৬, কটি ও কক্ষির মধ্যস্থান ৪০, গণিবন্ধ ও প্রত্যোক খুর ৪ এবং পাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ আঙ্গুল হইয়া থাকে।

ঘোড়ার দাঁত দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা যাইতে পারে, ইহাদের দাঁতের যথাক্রমে এষ্ট আটটি অবস্থা ঘটে। যথা—কালিকা, হরিণী, গুল্লা, কাচা, মক্ষিকা, শঙ্খ, মুষল ও চলতা।

কালিকা।—দন্তের স্বাভাবিক রঙ যাইয়া যখন কাল হইতে থাকে, তাহাকে কালিকা বলে। প্রথমে ঘোড়ার সকল দাঁতই শাদা থাকে, বয়োবৃদ্ধি অনুসারে কাল হয়। ঘোড়ার চারিবৎসর বয়সের সময় কেবল চারিটি দন্ত কাল হয়। এই প্রকার পাঁচবৎসরে পাঁচটি, ছয় বৎসরে ৬টি, সাত বৎসরে সাতটি ও অষ্টমবর্ষে সকল দন্তগুলিই কাল হইয়া যায়।

হরিণী।—দাঁতের কাল রঙ যাইয়া যখন পীতবর্ণ হয়, তাহাকে হরিণী বলে। নবমবর্ষেই পীতবর্ণ হইতে আরম্ভ হয় এবং দশম ও একাদশ বর্ষে সম্পূর্ণ পীতবর্ণ হইয়া যায়।

গুল্লা।—পীতবর্ণ দন্তগুলি যখন শাদা হইতে থাকে, তখন তাহাকে গুল্লা বলে। ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত দাঁত শাদা থাকে।

কাচা।—দাঁতের রঙ কাচের আয় হইতে থাকিলে তাহার নাম কাচা। ১৫ হইতে ১৭ বর্ষ পর্য্যন্ত এই অবস্থা হয়।

মক্ষিকা।—দাঁতের রঙ মক্ষিকার সদৃশ হইলে তাহাকে মক্ষিকা বলে। ১৮ হইতে ২০ পর্য্যন্ত এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

শঙ্খ।—ঘোড়ার দাঁত শঙ্খের আয় আভাশালী হইলে তাহার নাম শঙ্খ। ২১ হইতে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা থাকে।

মুষল।—যে সময়ে দাঁতগুলি মুষলাকৃতি হইয়া উঠে, তখন তাহাকে মুষল বলে। ২৪ হইতে ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে।

চলতা অর্থাৎ দাঁত নড়া। ২৬ বৎসরের পরে ঘোড়ার দাঁত নড়িয়া থাকে। সেই অবস্থায় ৩ বৎসর থাকিয়া পড়িয়া যায়। ভোজের মতে ঘোড়া ৩২শ বৎসরের অধিক বাঁচে না।

ঘোটকের গুণ লক্ষণ।—ঘোড়ার শরীর দীর্ঘ ও ক্লশ এবং মুখখানি অপেক্ষাকৃত বড় হইলে ভাল। এই ঘোড়া যান ও বাহনকর্মে প্রশস্ত। ঘোটকের মুখ, ভুজ যুগল ও কৃকাটিকা এই চারিটি স্থান দীর্ঘ হইলে ভাল। নাসিকা পুটবয়, ললাট ও কক্ষ (অবয়ব বিশেষ) এই চারিটি স্থান উন্নত থাকিলে তাহাকে প্রশস্ত ঘোটক জানিবে। যে ঘোটকের কর্ণদ্বয়, গণিবন্ধ, পুচ্ছ এবং কোষ্ঠ প্রশস্ত অথচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, গায়ের রঙ পীত এবং পা চারিখানি ও চক্ষু শ্বেতবর্ণ, তাহাকে চক্রবাক বলে। এই জাতীয় ঘোড়া প্রভুভক্ত ও রাজগণের উপযুক্ত। যে ঘোটকের মুখে পক্ষ অঙ্গুলের আয় চাঁদ চিহ্ন থাকে ও পাগুলি শাদা তাহাকে মল্লিক বলে। যে ঘোড়ার সর্পশরীর শুভ্রবর্ণ, কেবল একটা কাণ কাল সেই অশ্বই অশ্বমেধযজ্ঞের উপযুক্ত। এই ঘোড়া অতিশয় তৃষ্ণি। যাহার পুচ্ছ, মুক, মুখ ও মাথার চুল শুভ্র এবং পাগুলি শ্বেতবর্ণ তাহাকে অষ্টমঙ্গল বলে। যাহার পাগুলি শাদা ও কপালে চাঁদ থাকে, তাহার নাম কলাগণধক, ইহার পালনে স্বামীর মঙ্গল হয়। নানা রঙের ঘোটকও প্রশস্ত। তাহার মধ্যে যে গুলির গায়ের উৎকৃষ্ট রঙ দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং অপকৃষ্টবর্ণের নাশ হয়, সেই ঘোড়া হইতে অপর ঘোড়ার ত্রীবৃদ্ধি হয়।

আবর্তের গুণ।—ভ্রমির নায় রোমাবলীকে আবর্ত বলে। আবর্ত ৬ প্রকার। ঘোটকের ডাটনদিকে আবর্ত থাকা ভাল। নাসিকাগ্র, ললাট, শঙ্খ, কর্ণ, বা মস্তকে আবর্ত থাকিলে অশ্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে অশ্বের ললাট, কুকুন্দর ও মস্তক এই তিন স্থান তিনটি আবর্তে পরিশোভিত, সেই অশ্বই সর্বোত্তম। অশ্বের দক্ষিণগণ্ডে আবর্ত থাকিলে তাহার নাম শিব। ইহা পালকের পক্ষে নিতান্ত হিতকারী। কর্ণমূল অথবা স্তনমধ্যে আবর্ত থাকিলে তাহাকে বিজয় বলে। এই জাতীয় অশ্ব যুদ্ধকালে অতিশয় বল প্রকাশ করিয়া প্রায়ই জয় লাভ করে। ঘোটকের স্বক্শপার্শ্বে আবর্ত থাকিলে সুখকর হয়। নাসিকার মধ্যে একটা অথবা তিনটি আবর্ত থাকিলে তাহাকে চক্রবর্তী বলে। এই জাতীয় অশ্ব অপর জাতীয় অনেকের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। যাহার কর্ণে আবর্ত থাকে, তাহাকে চিন্তামণি বলে। এই জাতীয় অশ্বও পালকের গুণকারী হইয়া থাকে।

অশ্বশরীরের কোন কোন স্থানের রোমগুলির অবস্থানানুসারে ঠিক বৃশ্চিকের আয় দৃষ্ট হয়। প্রাচীন অশ্ববিদগণ উহাকে শুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। যে যে স্থলে

আবর্ত থাকিলে অশ্বের যে গুণ হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে গুণিত থাকিলেই সেই সেই গুণ প্রকাশ পায়।

অশ্বের দোষ।—যে ঘোড়ার সকল শরীর গুণবর্ণ, কিন্তু পা চারিখানির রঙ কাল, তাহাকে যমদূত বলে। ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। অশ্বের চারিখানি পা চারিবর্ণের হইলে তাহার নাম সুবলী, এই জাতীয় অশ্ব হইতে কুলনাশ হয়। বাম কপালে একটি মাত্র আবর্ত থাকিলে তাহাকে চক্করী বলে। এই জাতীয় অশ্ব শালকের অহিতকারী। বামগণ্ডে আবর্ত থাকিলে ধনক্ষয়, কক্ষ থাকিলে মৃত্যু, জাম্বুদেশে থাকিলে ক্লেণ অথবা প্রবাল এবং ত্রিবলীতে আবর্ত থাকিলে ত্রিবর্ণের বিনাশ হইয়া থাকে। যে ঘোড়ার মেট্রদেশে আবর্ত থাকে, সেই ঘোড়া রাজগণের পক্ষে পরিত্যজ্য।

পৃষ্ঠবংশে একটি মাত্র আবর্ত থাকিলে ঘোটককে ধুমকেতু বলে, ইহার পরিত্যাগ করা উচিত। গুহ, পুচ্ছ ও বলিহানে তিনটি আবর্ত থাকিলে তাহার নাম কৃতান্ত, এই জাতীয় ঘোড়াও পরিত্যাগ করিবে।

হীনদন্ত, অধিকদন্ত, করালী, কৃষ্ণতালুক, সুবলী ও শূদ্রী এই ৬ প্রকার ঘোড়াকে ঘাতক বলে। অশ্বের দন্ত সংখ্যা কম হইলে হীনদন্ত ও অধিক হইলে অধিকদন্ত বলে। যাহার তিনটি পা খেত ও অপরটার রঙ কাল অথবা তিনখানি কৃষ্ণবর্ণ এবং অপরখানি শুভ্র, তাহার নাম সুবলী। যে ঘোড়ার দন্তগুলি দেখিতে অতিশয় ভীষণ ও উন্মাতাবনত তাহার নাম করালী। তালুদেশের রোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে কৃষ্ণতালুক বলে। যদি কর্ণ ও কর্ণমূলের অন্তর্ভাগে শৃঙ্গের স্তায় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শূদ্রী নামে অভিহিত।

অশ্ব-তাড়ন করিবার নিয়ম।—রক্তহলী, মুখ, ওষ্ঠ, গলদেশ ও পুচ্ছ এই কয়টি স্থানে তাড়না করা উচিত। কিন্তু কোন কারণে অশ্ব ভীত হইলে বক্ষঃস্থলে, উন্মার্গগামী হইলে মুখে, কুপিত হইলে পুচ্ছসংস্থানে এবং ভ্রান্ত হইলে উভয় জাম্বুতে আঘাত করা উচিত। অস্থানে আঘাত করিলে অনেক দোষ ঘটবার সম্ভাবনা, এই কারণে ভালরূপে দেখিয়া আঘাত করিবে।

যে ঘোড়া ১৬ মাত্রাকালে একশত ধনু পরিমিত পথ অতিক্রম করিতে পারে, তাহাকে উত্তম, বিংশতি ধনু যাইতে পারিলে মধ্যম, ইহার নূন হইলে সেই ঘোড়াকে অধম জানিবে। ভাত্র আশ্বিনমাসে অশ্বের পিত্ত অধিক বর্দ্ধিত হয়, সেই জন্ত অধিক চালনা করা উচিত নহে। কাষ্ঠিকমাসে

মহৎকার্য্যে এবং হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত ঋতুতে ইচ্ছামুসারে চালনা বা কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। অশ্বশাবক, বৃদ্ধ, কৃশ, ক্রম, দন্তদেহ, বৃহৎ বলিবৃদ্ধ ও পূর্ণ বা অতিরিক্ত কোষ্ঠযুক্ত ঘোটক এবং গতিগী ঘোটকী কোন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে নাই।

ঘোটকের শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া তাহাদের জীবন নাশ করে। এই কারণে শরীর হইতে দূষিত রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। প্রাচীন অশ্বচিকিৎসকগণের মতে ঘোড়ার শরীরে সর্বসমেত বাহ্যন্তর হাজার নাড়ী আছে। উহার প্রত্যেকটিতেই রক্ত থাকে। কর্ণ, কক্ষ, লোচনযুগল, অংস, মুখ, অণ্ডদ্বয়, পা ও পার্শ্ব এই কয়টি রক্তমোক্ষণের স্থান। আবার কোন চিকিৎসক বলেন, গুলফ, গলদেশ, মেট্র, কক্ষান্ত, পত্রক, গুদস্থান, পুচ্ছ, বস্ত্রি, জজ্বা, সন্ধিস্থান, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ, নেত্রযুগল, কর্ণমূল, মণিবন্ধ ও গণ্ড এই সতরটি রক্তমোক্ষণের স্থান।

শূক্রেতের মতে, মুখ হইতে একশত পল পরিমিত রক্তমোক্ষণ করা উচিত। এইরূপ কক্ষ হইতে এক, পল, নয়ন ও মেট্র হইতে ৫০ পল, গণ্ড ও অণ্ড হইতে ২৫ পল এবং গুদস্থান হইতে ১২ পল রক্ত নিঃসৃত করিবে। পৈত্তিক হইলে কালিক, বাতিক হইলে ফেনায়ুক্ত ও পিচ্ছিল এবং স্রৈয়িক হইলে পাণ্ডুবর্ণ ও কষায় জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

ঋতুচর্যা।—বর্ষাকালে অশ্বের অতিশয় চালনা করা উচিত নহে, করিলে দশমাস মধ্যে মারা পড়ে। এই কালে কুপোদক, কটুতৈল, ও বাতশূন্য গৃহে রাখা প্রশস্ত, একদিন পরে পরে অর্দ্ধপল লবণ দেওয়া উচিত। ইহার অন্যথা করিলে স্বাস্থ্য ও বীৰ্য্যহানি হয়। দিন দিন বল কমিয়া যায় ও আয়ু ক্ষয় হইয়া থাকে। শরৎকালে গুড়, ঘৃত, আট পল পরিমিত চিনি, স্বচ্ছ ও মধুর রসযুক্ত সরোবরের জল, ঘৃতযুক্ত কুঁড় এই সকল দ্রব্য ঘোটকের পক্ষে হিতকর। হেমন্ত ঋতুতে ঘৃত, তৈল, মাষকড়াই, বায়ুশূন্য গৃহে বাস, দুগ্ধ ও ধীরে ধীরে চালনা করা উচিত। যব সিদ্ধ করিয়া থাইতে দিতে হয়। শীতকালে সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন আটপল করিয়া তৈল পান করাইবে। পরে প্রাতে যব থাইতে দিবে। বসন্তকালে ইচ্ছামুসারে ঘোটকের চালনা করিবে। এই কালে ঘৃত, তৈল ও লবণ মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া উচিত। বসন্ত সময়ে ঘোড়াকে ভ্রমণ না করাইয়া সর্বদা একস্থানে বাধিয়া রাখিলে অল্পদিন মধ্যেই উৎসাহবিহীন হইয়া পড়ে ও অলসতা উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকালে রক্তমোক্ষণ, বর্ণ-নিবারণ, ছায়ায় বন্ধন,

শরীর মর্দন প্রশস্ত এবং যুত, শীতল জল, দুর্দ্বাস বা
অপর কোন নরম বাস খাইতে দেওয়া উচিত।

কোন কোন অশ্ববিদের মতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও
তামসিক এই তিনপ্রকার অশ্ব আছে। বাহার বর্ণ গুরু,
বেগ অপেক্ষাকৃত বেশী, অনেক দূরে গমন করিলেও বাহার
শ্রম বোধ হয় না, ভোজন অধিক ও স্বাভাবিক ক্রোধ-হীন,
কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠে, সেই ঘোড়াকে
সাত্ত্বিক জানিবে। যে অশ্বের বর্ণ রক্ত, বেগ ও রোষ অতিশয়
অধিক, বাহার পক্ষে কষাঘাত নিতান্ত অসহ্য ও শরীর অপেক্ষা-
কৃত লম্বা তাহাকে রাজসিক বলে। যে ঘোটক কৃষ্ণবর্ণ,
অল্প বেগ ও রোষযুক্ত, অল্পভোজী, দুর্বল ও সকল গুণশূন্য
তাহাকে তামসিক বলে। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

পরশরসংহিতায় ভোম, আপ্য, বায়ব, তৈজস ও
নাভস এই পাঁচ প্রকার ঘোড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
যায়। ঘোটক-শরীরের উপাদান ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও
আকাশের তারতম্যে এই পাঁচ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।
বাহার শরীরে ক্ষিতির অংশ অধিক তাহাকে ভোম বা পার্থিব
বলে। ভোম ঘোটকের শরীর স্থূল, শ্রমসহ ও ক্রান্তিশূন্য,
ভোজন অতিশয় অধিক, আকৃতি দীর্ঘ এবং স্বর উচ্চ।
এই জাতীয় ঘোটক স্বাভাবিক ক্রোধহীন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে
অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বাহার শরীরের অপর উপাদান অপেক্ষা জলের অংশ
অধিক, তাহাকে আপ্য বলে। আপ্য ঘোটকের অঙ্গ শিথিল,
বল অল্প, শরীর শ্রমাসহ। ইহারা ক্রোধ ও বেগশূন্য এবং
সর্বদাই নিদ্রা বাইতে ভালবাসে। সকল রকমের ঘোটকের
মধ্যে এই জাতীয় ঘোটকই নিতান্ত অধম।

শরীরে বায়ুর অংশ অধিক হইলে তাহাকে বায়ব বলে।
ইহাদের বেগ বায়ুর ন্যায় অতিশয় অধিক, শরীর শুষ্ক, দীর্ঘা-
কৃতি ও শ্রান্তিশূন্য। এই ঘোটক বহুদূর গমন করিতে পারে।

ঘোটক-শরীরে তেজের পরিমাণ অধিক হইলে তাহাকে
তৈজস বলে। ইহারা ক্রোধশীল বেগযুক্ত ও একদিনে
এক শত ক্রোশ গমন করিতে পারে। পুণ্যবান ব্যক্তির
অদৃষ্টে এইরূপ অশ্ব ঘটয়া থাকে। সকল ঘোটকের মধ্যে
এই জাতীয় ঘোটকই প্রশস্ত।

শরীরে আকাশের ভাগ অধিক থাকিলে নাভস বলে।
ইহাদের গমন উৎস্নত, ক্রোধ ও বেগ অধিক। ইহারা বৃহৎ
পরিধা লব্ধন করিতে পারে। ভোম প্রভৃতি ঘোটকের যে
সকল লক্ষণ লিখিত হইল, ইহার দুইটা লক্ষণ কোন একটীতে
লক্ষিত হইলে তাহাকে দ্বিতীতিক বলে।

স্বভাতি ও গুণশালী অশ্ব আরোহণ করিয়া গমনাগমন
করা উচিত। দুইটা আরোহণ করিতে নাই। দৈবক্রমে
দুইটা আরোহণ করিতে হইলে কাঞ্চনের সহিত তিল অথবা
জড়ের সহিত লবণ দান করিবে কিম্বা রেবন্তকে পূজা করিয়া
শরীর মর্দন করিবে। ইহার যে কোনটাই করিতে না পারিলে
এক পল তামা দান করিবে। (ভোজকৃতযুক্তিকল্পতরু)

নকুল একখানি অশ্বচিকিৎসা লিখিয়াছেন। তাহার
মতেও ঘোটক প্রথমত চারিপ্রকার উত্তম, অধম, কনীয়ান্
ও নীচ। ইহাদের লক্ষণ পূর্বে বেরূপ লিখিত হইয়াছে,
নকুলের অশ্বচিকিৎসাতেও প্রায় সেইরূপ। নকুলের মতেও
প্রথমে অশ্বের পাখা ছিল। ইজের আদেশে শালিহোত্রমুনি
ঈশিকান্ন দ্বারা পক্ষ ছেদন করেন।

ঘোটকের অবস্থানুসারে স্বামীর তাবী শুভাশুভ জানিতে
পারা যায়। ঘোটক সুসজ্জিত হইলে যদি উর্দ্ধ অবলোকন
করিয়া ভয়ানক শব্দ ও খুরের অগ্রভাগে ভূমিকুটন করিতে
আরম্ভ করে, তবে সেই যুদ্ধে ঘোটকস্বামীর জয় হয়।
কিন্তু বার বার মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ কিম্বা অশ্রুপাত
করিতে থাকিলে পরাজয় ঘটয়া থাকে। বিশেষ কারণের
অভাবে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় ঘোটক অনিদ্রিত থাকিলে
অল্পদিন মধ্যেই তাহার স্বামীর কোন একটা যুদ্ধযাত্রা
করিতে হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করিবে। ব্যাধি না
থাকিলেও যদি ঘাসগ্রাস পরিত্যাগ ও অশ্রুপাত করিতে
থাকে, তবে স্বামীর অমঙ্গল ঘটে। রাত্রি উপস্থিত হইলে
অকস্মাৎ যদি ঘোটকের পৃষ্ঠ পুলকিত হয়, তবে স্বামীর মরণ
হয়। পৃষ্ঠদেশে অগ্নিস্থলিঙ্গ দেখিতে পাইলে শীঘ্রই কোন
বিপদসংগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইবে, এইরূপ অসুমান
করিবে (১)। যদি কোন প্রকারে অশ্বশালায় কুকলাস প্রবেশ
করে, তবে আর অশ্বের বুদ্ধি হয় না, এই কারণে সর্বদাই

(১) "বঃ সরস্বোহরোরাবমুর্দ্ধমুর্দ্ধং করোতি চ।

খুরাগ্রাণ লিখন্ ভূমিং স শংসতি রণে জয়ম্।

বঃ করোত্যাসকুয়ুঃ পুরীষকাক্রমোক্ষণম্।

স শংসতি পরাকৃতিং যৈন্তব্যং বর্ততে হয়ঃ।

নিরামিষং নিনীথে যো জাগর্গি নৃপতেহরঃ।

স শংসতি ক্রন্তং তন্ত স্থিরতাপি প্রয়াগকম্।

যদা ব্যাধিঃ বিদ্যা বাজী গ্রাসং ভাজতি দুর্মদাঃ।

অশ্রুপাতক ক্লান্তে তদা ভর্তুরশোভনম্।

পুলকাক্রিতপৃষ্ঠা যে জাগতে ভূপতেহরঃ।

নিরীক্ষতঃ প্রত্যোনীশং তে বদন্তি নিশাংঘে।

ক্ষুলিঙ্গা বস্ত্রদৃষ্টে পৃষ্ঠদেশে চ বক্ষজাঃ।

পরচক্রাণমাশিশী বিজেরো হয়পতিভৈঃ।" (নকুলকৃত অশ্ব ২ অঃ)

যহ্ন রাখিবে, যেন কোন প্রকারে কুকলাস ঘাইতে না পারে। মধুমক্ষিকা অশ্বশালায় যাইয়া ঘোটক প্রস্তুত করিলে সকল অশ্বের বিনাশ হয় (২)। অশ্বের মঙ্গলের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা তিলহোম ও শতরুদ্রির জপ করিবে। অশ্বশালায় দ্বারে সর্পদাই একটা লালমুখ বড় রকমের বানর রাখিবে, এইরূপ করিলে অশ্বের কোন অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকে না, দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে (৩)। নকুলের অশ্বশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ঘোটক সাত রকম রঙের হইয়া থাকে। শ্বেত, রক্ত, পীত, সারঙ্গ, পিঙ্গল, নীল ও কৃষ্ণ। ইহার মধ্যে শ্বেতবর্ণ ঘোটকই সর্বশ্রেষ্ঠ। শরীর ও মস্তক প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ অনুসারে চক্রবাক ও মল্লিক প্রভৃতি কতকগুলি ভেদ হইয়া থাকে। তাহার লক্ষণ পূর্লিখিত লক্ষণের প্রায় সমান।

স্থানবিশেষে আবর্তের দোষ গুণ ও তারতম্য পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

অশ্বচিকিৎসার মতেও ঘোটকের দস্তোভেদ অনুসারে তাহাদের বয়স জানিবার উপায় আছে। পূর্বে কালিকা প্রভৃতি যে সকল অবস্থা লিখিত হইয়াছে, ইহাও প্রায় তদনুরূপ। ঘোটকের আকৃতি দীর্ঘ, স্থূল ও মুণ্ডখানি অপেক্ষাকৃত মাংসহীন হইলে রাজগণের পক্ষে তাহা প্রশস্ত। স্বল্প দেশ উন্নত ও দীর্ঘ, গ্রীবা বক্র চমরালঙ্কৃত ও অল্প রোমযুক্ত, পৃষ্ঠ-বিপুল, ত্রণশূণ্ড ও মধ্যে নিম্ন এবং পৃষ্ঠবংশটি সুন্দর হইলে সে ঘোটক অতিশয় উৎকৃষ্ট।

নকুলের মতে অশ্বের মুখ ২৭ আঙ্গুল, কর্ণ ৬ আঙ্গুল, তালু ৪ আঙ্গুল, স্বন্দ ১৭ আঙ্গুল, পৃষ্ঠবংশ ২৪, কটি ২৭ আঙ্গুল, পুচ্ছ ২ হাত, লিঙ্গ ১ হাত, অণ্ড ৪ আঙ্গুল, গুহদেশ ২৪, হৃদয় ১৬, কটি ও কক্ষের অন্তর ৪০ আঙ্গুল, মণিবন্ধ ও থুর প্রত্যেক ৩ আঙ্গুল, উৎসেধ ৮০ এবং দৈর্ঘ্য ১০২ আঙ্গুল। যে ঘোটকের অবয়বগুলি এইরূপ প্রমাণে নির্মিত তাহাকে শ্রেষ্ঠ জানিবে।

মুখ, ভুজ, কেশ ও কুকাটিকা এই চারি অবয়ব দীর্ঘ হওয়া ভাল। নাসিকাপুট, ললাট, শফ ও চরণদ্বয় উন্নত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও মেট্র রক্তবর্ণ হইলে পালকের মঙ্গল হয়। বক্র, চরণ কোষ্ঠ, কর্ণ ও পুচ্ছ লম্বা এবং কর্ণ, কর্ণান্তর ও বংশ অতি ক্ষুদ্র হইলে প্রশস্ত।

(২) "শরৎ: রক্ষয়েৎ যজ্ঞাৎ প্রবিশস্ত: হয়ালয়ে।

যদীচ্ছেক্ষাযতীং বৃদ্ধিঃ তেষাংকৈব তথান্ননঃ।

অশ্বশালাং সমাসানাং বদান্ত মধুমক্ষিকাঃ।

মধুজালং প্রকুর্ত্তি তদানান্ যস্তি সর্বশ:।"

(৩) "নন্দুরান্তে সদা ধাওঁ রক্তবজ্রা মহাকপি:।" (নকুল' ২ অঃ)

অশ্ব-শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপন্ন এবং রক্তদোষ প্রোক্ষিত হইলে রোগের প্রতীকার হয়। কোন কারণে অশ্ব-শরীরের বিপুল রক্ত দূষিত হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে শিরামোক্ষণপ্রণালীতে সেই দূষিত রক্ত-গুলি বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। আষাঢ় মাসে রক্ত-মোক্ষণ করা কর্তব্য। রক্তমোক্ষণের পর ভাল ঘাস ও বল-কর আহারীয় দ্রব্য খাওয়াইয়া পুনর্বার সবল করিতে হয়। ঘোটক-শরীরে রক্ত দূষিত বা অধিক থাকিতে তাহাকে তৃণ বা শস্ত খাইতে দিবে না। ঐ অবস্থায় শস্ত খাইলে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই প্রাণ বিনাশ করে। শ্বাসপুট রক্তাধিক্য হইলে যদি মেহাদির সহিত শস্ত খায় এবং শ্লেষ্মা ও রক্তের হীনাবস্থায় শস্ত খাইলে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া অশ্বকে বিপন্ন করে। এই যে সকল কথা বলা হইল, ইহাই রক্তপ্রকোপের লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পিত্ত রক্ত-প্রকোপের লক্ষণ।—ইহাতে অশ্বশরীরে কণ্ডু জন্মে। অশ্ব সর্পদা শরীর ঘর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। পিত্ত রক্ত প্রকোপ হইলে ঘোটক ছায়ায় ও জলে থাকিতে ভালবাসে এবং মুহুমুহু পিপাসা ও ক্ষুধা হয়। এইরূপ অবস্থায় শিরামোক্ষণ করিয়া মরিচ বা অন্য কোন কটুজ্বায়ুক গুড় খাওয়াইলে প্রতীকার হয়। কিন্তু যদি মুহুমুহু অশ্রুপাত এবং নেত্রের প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ হয়, তবে সেই ঘোটকের প্রাণরক্ষা হওয়া দুষ্কর।

শ্লেষ্ম রক্ত প্রকোপের লক্ষণ।—কাস, আহারে অনিচ্ছা, উৎসাহহীনতা ও পার্শ্ব আসন ও কশাঘাত অগ্রাহ্য করা এবং নাসাগ্র দ্বারা জলক্ষণণ। এই অবস্থায় ঘোটক সর্পদাই অধোবদন হইয়া থাকে এবং বাহিরে ও উচ্চ স্থানে থাকিতে ভালবাসে। রক্ত শোধন করিয়া গুঁঠ ও গুড় খাইতে দিলে প্রতীকার হয়। কিন্তু চক্ষুর প্রান্ত ও উদরে বিদ্যুৎ দাগ হইলে ছয় মাস মধ্যে নিশ্চয়ই সেই ঘোড়ার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বাতরক্ত প্রকোপের লক্ষণ।—অধিক শ্বাস, একস্থানে অনেকক্ষণ থাকিতে অনিচ্ছা ও নিরর্গলভাবে মুহুমুহু চীৎকার। রক্তমোক্ষণ করিয়া যথানিয়মে মহাঘৃত সেবন করাইলে প্রতীকার হয়। কিন্তু লোচনপ্রান্তে শ্বেত ও রক্ত চিহ্ন, কাশ মুখে কণ্ডু হইলে এবং আমিষ অথবা মাংস দধিযুক্ত অশ্বক না খাইলে সেই ঘোটকের প্রাণরক্ষা পায় না।

স্নিগ্ধপাতের লক্ষণ।—শরীরে কন্প, কাশ, অর্গল ফেলিয়া দেওয়া, নিদ্রা, আলস্য, অগ্নিমান্দ্য, বস্তিতে মলবদ্ধ, কর্ণ দ্বয় হেলিয়া যাওয়া ও মুখ হইতে লাল পতন। এই অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়া ঘোটকে নীরোগ হওয়া পর্য্যন্ত

কিছুই থাইতে দিবে না, কেবল উষ বা শীতলজলে ঔষধ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। হরীতকী, আমলকী, কটুকী ও বচ মিশাইয়া খাওয়াইলে সান্নিপাতিক জ্বর ভাল হয়। শিরীষ, বিষফল ও বেতস মিশ্রিত করিয়া সেবনে মন্দাগ্নির প্রতীকার হইয়া থাকে। যষ্টিমধু, শিরীষ ও লাকার কাথ করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক রোগের প্রতীকার হয়।

নকুলের মতে ঘোটকের অরিষ্ট।—সুস্থ শরীর ঘোটকের নেত্রের প্রান্তভাগে নীলবর্ণ ও শরীর হইতে মুক্তিকার গন্ধ আসিলে ২ মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। চক্ষুর প্রান্ত নীলের আভাযুক্ত পীতবর্ণ হইলে ৩ মাস, নেত্রে বহু বর্ণ রেখা ও স্রব ভেদ হইলে ৫ মাস আয়ু জানিবে। হঠাৎ অশ্বের জিহ্বায় বিন্দু দেখিতে পাইলে সেই অশ্ব অতি কষ্টে একমাস মাত্র জীবিত থাকে। ঐ বিন্দুগুলি পীতবর্ণ হইলে ২ মাস, রক্তবর্ণ হইলে ৩ মাস, নানারঙের হইলে ৪ মাস, নীলবর্ণ হইলে ৫ মাস, বজ্রাকৃতি হইলে ৬ মাস, পাটলবর্ণ হইলে ৭ মাস, চম্পক ফুলের ন্যায় বর্ণ হইলে ৮ মাস, হরিদ্রাভ হইলে ৯ মাস, জন্তুর ন্যায় হইলে ১০ মাস, দুর্লার ন্যায় রঙ হইলে ১১ মাস এবং বিন্দুগুলি হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে ১২ মাস বা একবৎসর কাল ঘোটক জীবিত থাকে। ঘোটকের জিহ্বা চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে ৬ মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। যে ঘোটকের ঐবার অগ্র ও অধরে পিণ্ডিকা জন্মে এবং মূত্র রক্তমিশ্রিত, তাহারও ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। চক্ষুর বর্ণ শাদা হইলে সেই ঘোড়া দশমাস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বাতরোগাক্রান্ত ঘোড়ার চক্ষু নীল বর্ণ হইলে অতি কষ্টে ৩ মাস কাল জীবন ধারণ করিতে পারে। শ্লেষ্মাক্রান্ত ঘোটকের চক্ষু রক্তবর্ণ ও মূত্রের গন্ধ মদের ন্যায় উগ্র হইলে সেই ঘোটক দশমাস জীবিত থাকে। পিত্তরোগাক্রান্ত ঘোটকের চক্ষু হরিদ্রাভ হইলে আয়ু ৭ মাস জানিবে। নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ও ঘন বলিয়া বোধ হইলে ঘোটকের আয়ু ৭ দিন মাত্র জানিবে। যাহার একটা চক্ষু নীল ও দ্বিতীয়টা রক্তবর্ণ তাহাকে পিত্ত রোগাক্রান্ত এবং তাহার একমাস মাত্র আয়ু জানিবে। বর্ষাকালে ঘোটক পিত্তরোগাক্রান্ত হইলে ১৫ দিন মাত্র বাঁচিয়া থাকে। যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল ইহা দ্বারা ঘোটক-শরীরের কোন্ ধাতুর বিকার হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া প্রতিক্রিয়া বিধান করিতে হয়। (নকুলঅশ্ব ১০ অঃ।) অশ্বচিকিৎসায় নশ, পিণ্ড, ঘৃত, কাথ ও বিষ ব্যবহৃত হয়। নকুলের অশ্বচিকিৎসা ও জয়দত্তের অশ্ববৈদ্যকে এ সম্বন্ধে

বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। [অশ্বশালা নির্মাণ করিবার নিয়ম মন্দুরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন অশ্ববিদগণের মতে গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে সময়ে সময়ে ঘোটকের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। যে সকল গ্রহ অশ্বের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহাদের নাম—লোহিতাশ্ব, বিক্র-পাশ্ব, হরি, বলি, সকাশী, সন্ধাশী, সুর্য্যস্বিত, কুবের, বৈশাখ, বড়বিধ, বক্রগ, বৃহস্পতি, সোম ও সূর্য্য এই সকল গ্রহের মধ্যে যে কোন গ্রহের দৃষ্টিতেই ঘোটকের প্রাণনাশ হয়। গ্রহের দৃষ্টিতে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। হরিগ্রহের দৃষ্টি হইলে ঘোটক-শরীরের পূর্ণাঙ্গ কম্পিত হয়, কিন্তু অপরাঙ্গ নিশ্চল থাকে। ইহা ছাড়া ঘোটক অতিশয় খেদযুক্ত ও হইয়া থাকে। হরিতাক্ষের দৃষ্টিতে চক্ষুতে রক্তবর্ণ বিন্দু জন্মে ও থাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। গাত্র-শ্বেদ, শরীরে ভারাক্রিয়া, সর্সদা বমন করিবার ইচ্ছা এবং চক্ষুর উন্নীলন ও নিম্নীলন সহসা ঘটিয়া থাকে। (জয়দত্ত-কৃত অশ্ববৈদ্যক ৫৮ অঃ)

ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের দৃষ্টিতে আরও নানাবিধ শরীরের বিকৃতি প্রকাশ পায়। এই সকল উপসর্গ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া শেষে ঘোটকের প্রাণবিনাশ করে। এই সকল গ্রহদোষ নিবারণের জন্য শাস্তিকর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজক, গুরু ও বৃদ্ধদিগকে বস্ত্র, গো ও কাঞ্চন প্রভৃতি দান ও নানাবিধ স্মৃষ্টি ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়। রাত্রিকালে অশ্বশালার নিকটে চতুর্দিক মন্ত্র, মাংস, পক্ষ্মণ ও খিচুড়ি প্রভৃতি উপহারে বলি প্রদান করিবে এবং তিন রাত্রি, পঞ্চরাত্রি বা সপ্তরাত্রি পর্যন্ত নীরাজন করিয়া অশ্বদিগকে পৃথক পৃথক স্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপ করিলে গ্রহদোষ শাস্তি হয়।

প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসকগণের মতে অশ্ব-মাংসের গুণ—উষ্ণ, বাতনাশক, অগ্নি পরিমাণে গুরু, বেশী আহারে পিত্তদাহ ও অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বলকর, হিতকর ও মধুর। (ভাবপ্রকাশ)

প্রাচীন ভারতীয় আর্ষ্যগণ ঘোটক সম্বন্ধে যতদূর জানিয়া ছিলেন, তাহার সারসংগ্রহ উপরে লিখিত হইল। এখনকার পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদেরা নানা জাতীয় অশ্বের বিষয় ও অশ্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অশ্ব শব্দে এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এছাড়া প্রাণিতত্ত্ববিদগণের অমুসন্ধানে এই ভারতবর্ষেই কএক প্রকার অশ্বের অমুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ইংরাজেরা ভারতের নানা প্রদেশে বেড়াইয়া গির করিয়াছেন যে ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষে দেশীয় অশ্বের সংখ্যা

কমিয়া গিয়াছে। কারণ ইংরাজরাজ দেশীয় ঘোড়ার রক্ষায়, পালনে ও ব্যবহারে আবশ্যক মত যত্ন লয়েন না। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে রাজপুতানার কএক স্থলে দেশীয় অশ্বের হাট হইত, তন্মধ্যে ভালোজ ও পুন্ডরের হাটই বিখ্যাত। এই সকল হাটে কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, মুলতানের ও লক্ষ্মীজঙ্গলের ঘোড়াই বেশী আসিত। লুণী নদীতীরে ঘোড়ার উত্তমোত্তম শাবক উৎপাদনের জন্ম বেশ যত্ন লওয়া হইত। রড্‌জুরো নামক স্থানের ঘোড়াই লোকে বেশী আদর করিত। ইংরাজেরা মরাঠা ও পিণ্ডারীদিগকে পরাজয় করিবার পর এদেশের এই অশ্বোৎপাদন সম্বন্ধে যত্ন লোপ হয়। ইহার পর শিখেরা যত্ন লইতে থাকে, কিন্তু তাহাদের ও ইংরাজের সৈন্য মধ্যে অশ্বের বহুল ব্যবহার হওয়ার শ্রেষ্ঠ অশ্বের আকর লক্ষ্মীজঙ্গল ক্রমশঃ অশুশ্রুত হইয়া পড়ে। ইংরাজ-রাজ বিদেশীয় দীর্ঘাকার অশ্বের আদর করায় দেশীয় ক্ষুদ্র-কায় অশ্বের আদর কমিয়া যায়। দেশীয় রাজারাও অধীনতাবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় বলিষ্ঠ ঘোটক-সংগ্রহের দিকে ও তাহার বাতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজসৈন্যে যে সকল ঘোড়া আছে, তাহার মধ্যেও প্রায় ঘোটকী দেখা যায় না, সুতরাং নানা কারণে ভারতের অশ্ববংশ নিশ্চল হইয়া যাইতেছে।

পঞ্জাব।—এদেশে শিখ ও দেশীয় রাজগণ যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতেন, তাহার ঘোড়া অধিকাংশ স্বদেশ-জাত, কিন্তু পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হওয়া অবধি এই সেনাদলের ব্যবহারার্থ উপযুক্ত দেশীয় অশ্ব পাওয়া যায় না। ইহার ১ম কারণ ইংরাজেরা অনেকগুলি ঘোটকী এদেশ হইতে অস্ত্র চালাই দিয়াছেন, ২য় সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঘোটক ঘোটকী নানাস্থানে চালাই হইয়াছে। ৩য় শিখসৈন্যের জন্ম অধিকাংশ ঘোটক ব্যবহৃত হওয়ার দেশীয় অস্ত্র রাজারা স্ব স্ব সৈন্যের ব্যবহারার্থ যত পারিলেন ঘোটকী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধের জন্ম তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্ম তাহাদের সম্ভানোৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহারা ঘোড়ার ব্যবসা করিত ও ঘোটকী রাখিয়া ভাল শাবক উৎপাদন করাইয়া লইত, এই সময় তাহার অধিক মূল্যে নিজ নিজ ঘোটকীগুলি বেচিয়া ফেলে। এইরূপে রাবলপিণ্ডীজেলার অশ্বব্যবসায়ী মুন্সিফাভীয়েরা এ ব্যবসা হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়াছে। যাহা হউক রাবলপিণ্ডী, ঝিলম্, শুজরাট, শুগৈরা, লাহোর, বধু, কোহাত, ডেরাইয়াইল খাঁ, ডেরাগাজী খাঁ প্রভৃতি জেলার এখনও অনেক পালিতা ঘোটকী আছে, এই সকল হইতে প্রতাপালকের যত্নে উত্তমোত্তম শাবক উৎপাদন

হয়। পঞ্জাবের ঘোটকের কষ্টসহিষ্ণুতা বেশী ও তাহার সন্দেহের সর্বপ্রকার গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পালনপূর।—এখানকার ঘোড়া অতি উত্তম। দেশীয়েরা এখানকার ঘোড়া পাইলে বেশী দাম দিয়াও ক্রয় করেন। এখানকার পালিতা ঘোটকী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া অতি যত্ন ও আদরপ্রাপ্ত হয়।

রাজপুতানার—ভাল ঘোড়া আর এখন সর্বত্র নাই। মাড়বারের ঠাকুরেরা ঘোড়া প্রতাপালন ও উৎপাদন করাইয়া থাকে। এখানকার ঘোড়া কাঠিয়াবাড়ের ঘোড়া-জাতীয়। এদেশে নানাস্থানে উত্তম উত্তম ঘোটকী দেখা যায়, কিন্তু ভাল ঘোটক দেখা যায় না। জয়পুরের ঘোড়ার অবস্থা অতি মন্দ। কএক জন ঠাকুর ভাল ভাল ঘোড়া উৎপাদন করাইয়া থাকেন। শিখাবতীর ঘোড়াই জয়পুরের ঘোড়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আলবারের রাজা ব্রুসিংহ অশ্বের উৎপাদন বিষয়ে বেশ সন্মোদিত করিয়াছেন, তিনি নিজ সৈন্য মধ্যে অশ্ব-পালক রাখিয়া উত্তম আরবীয় ও কাঠিয়াবাড়ের ঘোড়ার সহযোগে একজাতীয় সঙ্গর ঘোড়া উৎপাদন করাইয়াছেন। রাজপুতানার অস্ত্র রাজসৈন্যের অশ্ব অপেক্ষা আলবারের অশ্বারোহী সৈন্যের অশ্ব উৎকৃষ্ট। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সৈন্যদল প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভরতপুরের ও ভাল ঘোড়া উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আলবারের মত ভাল ঘোড়া জন্মে নাই।

হিমালয়ে—ঘুঁট নামে একপ্রকার পাহাড়ী ঘোড়া দেখা যায়, ইহার ক্ষুদ্রকায়, বলিষ্ঠ, দৃঢ়মুখ ও হৃদ্বর্ষ। ইহার পাহাড়ের সর্বটময় সঙ্গীর্ণপথে বেড়াইতে পটু। সম-তল ভূমির ঘোড়ার মত ইহার স্রীজ পাহাড়ে উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদের চেয়ে অতি দ্রুতবেগে নামিতে পারে। পাহাড়ের শিখরে যেখানে অপর কোন ঘোড়া যাইতে পারে না, সেখানে ও বরফাবৃত স্থানে ইহার যাইতে পারে। স্পিতি নামক স্থানে বিক্রয়ের জন্ম ইহাদের প্রতাপালন করা হয়। ইহার ১২ হাতের অধিক বড় হয় না। কিন্তু চীনদেশ হইতে একপ্রকার ঘুঁট আসে, তাহার ১৩১৪ হাত বড় হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের কএক স্থানে আপাততঃ বেশ ভাল ঘোড়া পাওয়া যায়। গোদাবরী তীরে গাসীখের নামক স্থানের ২৫ মাইল দূরে মল্লিগাম্ সহরে দাক্ষিণাত্যের ঘোড়ার সর্বপ্রধান হাট হয়। ভীমা উপত্যকার ও মান উপত্যকার একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় অশ্ব পাওয়া যায়, সেই ঘোড়া আরবীয় অশ্বের মিশ্রণে

উৎপন্ন। তাহার দৃঢ়কায়, স্নানদর্শন, প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট, দেখিলে হঠাৎ আরবীর ঘোড়া বলিয়া ভ্রম হয়। আলিগাম্, পুণা ও আন্ধ্রদেশের মধ্যপ্রদেশে গোরনদীতীরে অপেক্ষাকৃত উচ্চকায় অশ্ব পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের টাটু বা পনি ঘোড়া অতিশয় লঘুগতি, অতি বলবান্ ও সকলপ্রকার কষ্টসহিষ্ণু। ইহার ঘণ্টার ৪:৫ মাইল চলিতে পারে। কাঠিরাবাড়ের ‘কাঠি’ নামক ঘোড়া বন্ধুকধারী অশ্বারোহী সৈন্তের পক্ষে উপযুক্ত। বিগত কাঠিতে কএকটি সামান্য দোষ আছে, কিন্তু স্ককবর্ণ কাঠিতে কোন দোষ নাই বলিয়া দেশীয় রাজারা বেশী মূল্য দিয়াও এই জাতীয় ঘোড়া খরিদ করেন।

উপরোক্ত ভারতীয় ঘোড়া ছাড়া এশিয়ার নান্যস্থানে নানাজাতীয় ঘোড়া পাওয়া যায়। ইয়াকন্দদেশীয় টাটু পার্শ্বতাপথে বেশী উপযুক্ত বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পার্শ্বতাপ আড্ডার ইহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন হয়। ইহার দেখিলেই প্রথমে ঈষৎ ভীত ও কুণ্ঠিত বলিয়া বোধ হয়।

তিব্বতের তঙ্গন নামক ঘোড়ার কষ্টসহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের খুর জোড়া নহে, কাহারও বিধণ্ড, কাহারও বা ত্রিখণ্ড, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া থাকে, সেই সকল এক-চক্ষু অশ্বকে ‘জেমিক’ বলে। এক চক্ষু বলিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ইহার ১০০ হইবে ৫০০ টাকায় বিক্রীত হয়। তিব্বতদেশীয়েরা ইহাদিগকে শূকরের কাঁচা রক্ত ও যকৃৎ খাইতে দেয়। ইহারও অতি আদরে তাহা খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইহাদিগকে তৎপরিবর্তে ভেড়ার মাথা খাইতে দেয়। ইহাতে নাকি ইহাদের বলবৃদ্ধি হয়। তিব্বতের টাটু বাঙ্গালদেশে বড় কার্য্যপটু হয়।

চীনদেশের ঘোড়া বিলাতি শেটলও পনি অপেক্ষা কিছু বড় হয়, কিন্তু ইহার তেমন যত্ন পায় না এবং দেখিতেও তেমন সুদৃশ্য নয়।

পূর্বসাগরের দ্বীপবলীর মধ্যে সুমাত্রার ‘আটিন’ ‘বাটুবার’, সম্বের ‘ভীমা’, বালীদ্বীপের “গুয়েজ্ আণী” নামক স্থানের ঘোড়া বিশেষ বিখ্যাত। সম্বের ‘ভীমা’ ভারতীয় দ্বীপবলীর ‘আরবীর ঘোড়া’ বলিয়া সুখ্যাতি পাইয়া থাকে। সিলিবিস্ দ্বীপের ‘বুগি’ ও ম্যাকেসার দ্বীপে “ববদ্বীপের মহিষ” নামক ঘোড়া বিখ্যাত। ফিলিপাইনের টাটু ভারতীয় দ্বীপবলীর বাবতীয় ঘোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট।

আফ্রিকার বর্বরী প্রদেশজাত ‘বর্বর’ ঘোড়া যুরোপে বিশেষ খ্যাত ও আদৃত। ইহা ভারতে আসে না।

অশ্বজাতির মধ্যে আরবীর অশ্বই সর্ববিধে সর্বোৎকৃষ্ট।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই—কর্ণ, ঐরা ও সম্মুখের পদবয় দীর্ঘ, লাজুল, পশ্চাত্তাগ ও পশ্চাত্তের পদবয় হ্রস্ব, চক্ষু, চর্খ ও খুর পরিষ্কার এবং চিকণ। ইহাদের মধ্যে ধূসরবর্ণের ঘোড়া বেশী আদরণীয়, সম্পূর্ণ কৃষ্ণকায়, অধিক মূল্যবান্ ও সচরাচর অপ্রাপ্য। এদেশে সেই ঘোড়া ‘নীলা’ ও ধূসরবর্ণের ঘোড়া ‘সব্জা’ নামে খ্যাত।

তুরকদেশজাত ঘোড়ার মধ্যে দামাস্কাসের ঘোড়া এবং সিরীয়ার ঘোড়া বিশেষ বিখ্যাত। আরবীর ঘোড়ার পরই তুরকের ঘোড়ার বিশেষ আদর।

সিরীয়ার ৫ শ্রেণীর ঘোড়া আছে, ইহাদের ‘খামশা’ বলে। বেছুইনেরা এই সকল ঘোড়ার পালনে ও উৎপাদনে যত্ন লয়। খামশা ৫ ভাগে বিভক্ত—(১) কেহিলান্—সর্কাপেক্ষা দ্রুতগামী, কিন্তু সর্কাপেক্ষা দৃঢ়কায় নহে। জুলকা, বসোরা, মর্দিন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের উৎপত্তি। জুলকার ঘোড়া অধিক মূল্যবান্। (২) সেগলবী—ইহার মধ্যে সেগলবি গর্ডন নামক শ্রেণীই প্রধান। (৩) আবের—দ্রুতকায়। কিন্তু বড় স্নানদর্শন। (৪) হামদানী—সাধারণতঃ ছশ্রাপ্য, কিন্তু উৎকৃষ্ট। (৫) হাদান—অল্পই পাওয়া যায়। তুরকের ঘোড়া কদমে কদমে চলিতে গেলে ডাহিনে বামে হেলিতে চলিতে থাকে।

তুর্কী ঘোড়া তুর্কীস্থানে পাওয়া যায়। দেখিতে বড় স্নানদর্শন। তুরকের ঘোড়া অপেক্ষা কার্য্যক্ষম। হিন্দুকুশের নিকটে এই জাতীয় অশ্বের আদর বেশী, সেখানকার লোকেরা ইহাদের উৎপাদনে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। ইহাদের তুল্য কষ্টসহিষ্ণু ঘোড়া পৃথিবীতে আর নাই। পারস্যের মক্ক স্থান দিয়া ইহার একদিনে এক শত মাইল যাতায়াত করিতে পারে। পুরাণেও বাহুলীক দেশীয় অশ্বের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। বলথ, অক্কু ও মৈমানা হইতে এই জাতীয় অশ্ব অল্পপরিমাণে ভারতে আসে। তাতারদেশীয় ঘোড়ার মধ্যে মানাঠির আর্গমক, বোখারার উজবক, সমরকণ্ডের কোকাণ, কিয়-যিজের করবে আইরি ও কাজক প্রধান। আর্গমক দীর্ঘকায় ও স্নানদর্শন, উজবক বলবান্ এবং কোকাণ দৃঢ়কায়। কাজক ঘোড়া ছুটিতে পটু। কাজক ঘোড়ার বহুদূর যাইতে হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাকে কুরুত নামক একপ্রকার দধি খাইতে দিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্ত তাহার বিশেষ কষ্ট হয় না।

এশিয়ার রুসিয়ার তর্পণ ও খুসিন নামক অশ্ব আছে। ইহার বশীভূত হয় না। মধ্যএশিয়াতেও একপ্রকার দ্রুতগামী স্নানদর্শন বস্ত্র অশ্ব দেখা যায়। ইহার দলে দলে ভ্রমণ করে, কিছুতেই মানবের বশীভূত হয় না। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা

বলিয়া থাকেন যে দিন ইহারা বণীভূত হইবে, সে দিন হইতে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিবে।

খিরগিজে মুস নামে এক জাতীয় বন্য অশ্ব আছে। দক্ষিণ আমেরিকার বন্য অশ্ব ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহার গর্দভ অপেক্ষা ও ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর।

অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়া ভারতবর্ষে ওয়েলার নামে খ্যাত। ওয়েলার মাড়ী টানিবার পক্ষে অতি উপযুক্ত। [ঘোড়া সম্বন্ধে অপর বিবরণ অশ্ব ও অশ্বমেধ শব্দ ও বিলাতী অশ্বের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে Encyclopædia Britannica ও English Cyclopædia দ্রষ্টব্য।]

ঘোটকমুখ (পুং) ঘোটকশ্রু মুখমিব মুখং যন্ত বহুব্রী। ১ কিস্তরবিশেষ। ২ প্রবর অধিবিশেষ। (হেমাদ্রিঃ)

ঘোটকসেনা (স্ত্রী) ঘোটকারোহী সৈন্য, যাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করে।

ঘোটকারি (পুং স্ত্রী) ঘোটকশ্রু অরিঃ ৬তং। ১ মহিষ। (শব্দার্থচিঃ) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ভীপ্ হয়। (পুং) ২ হয়ারি বৃক্ষ, করবীর। [হয়ারি দেখ।]

ঘোটকী (স্ত্রী) ঘোটক ভীপ্। ১ ঘোটক জাতীয় স্ত্রী।

২ সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক, পরিমাণ ৩৭২ বর্গমাইল।

এই তালুকের প্রধান সহর ঘোটকী, ২৮°০' ১৫" উঃ, অক্ষা° ৬০° ২১' ১৫" পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানই অধিক। এই সহরটি ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পীর মুসাশা এই নগরের স্থাপনকর্তা। তাঁহার একটা দরগা আছে, তাহা লম্বে ১১৩ ফিট ও প্রস্থে ৬৫ ফিট। ইহার তুল্য বৃহৎ দরগা সিন্ধুপ্রদেশে নাই, মুসলমানেরা এই দরগাকে বড় পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহা একটি রেল স্টেশন, নীল, গশম ও ইক্ষু এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঘোটকীর ধাতু ও কাষ্ঠের খোদিত দ্রব্য এবং রং করা কার্য বিশেষ খ্যাত।

ঘোটান, সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার একটি সহর, অক্ষা° ২৫° ৪৪' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ২৭' পূঃ। এখানে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে মুহানো ও লোহানো জাতিই অধিক। এট সহরে শিকারপুর, আদম্জো, তান্দো প্রভৃতি সহরের উৎপন্ন দ্রব্য আসিয়া রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। এখান হইতে প্রতি-বর্ষে বহু পরিমাণে শস্ত, তুলা, বীজ ও ফার প্রভৃতি রপ্তানী হয়।

ঘোটিকা (স্ত্রী) ঘোটকে পরিবর্তে ঘুট ও লু-টাপ্ অত ইৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, কর্কটী। পর্যায়—কর্কটী, তুঙ্গী, চতুরঙ্গ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, মধুর এবং বাত, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও শ্বশু-নাশক। (রাজনিঃ) ২ লোনী শাকবিশেষ। ৩ অশ্বী, ঘুড়ী।

ঘোটিকায় স্ত্রী) লোনীশাক। (ভাবপ্রকাশ)

ঘোটা (স্ত্রী) ঘোটতে পরিবর্তে ঘট-পরিবর্তনে অচ্ স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্। ঘোটকী, ঘোড়ী।

“ঘোটা ছেঁষা বিকৃত-বিকৃতং হেতুহীনং হসন্তী”। (সাহিত্যমঃ)

ঘোড় (দেশজ) ১ জুতার পশাদংশ।

২ বোম্বাই প্রদেশের পুণা জেলার অন্তর্গত খেড়বিভাগের আশ্বিগাওয়ার অন্তঃপাতী ~~কুদ~~ কুদ নদী। এই নদীতীরে ঘোড়ে নামক গ্রাম। এই গ্রামে প্রতি শুক্রবারে হাট হয়। এখানে ডাকঘর, থানা ও স্কুল আছে। এখানে একটি তিন খিলানবিশিষ্ট পুরাতন মসজিদ আছে। এই খিলানগুলি দুইটি পাথরের থামের উপর অবস্থিত। এক একটি থাম এক একখানি পাথরে প্রস্তুত। প্রতিস্থম্বে পারসী ভাষায় খোদিত লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মীর মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করান। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোলি জাতীয় একদল লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া থাননাথানা লুটবার চেষ্টা করে। তখনকার সহকারী কালেক্টার সাহেবের চেষ্টায় তাহাদের অনেকেই বন্দী হয়।

ঘোড়করণ (ঘোটকর্ণ শব্দজ) এক জাতীয় বৃহৎ গাছ, ইহাতে তক্তা হয়। (Ailanthus excelsa.)

ঘোড়গোতা (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

ঘোড়চড়া (দেশজ) ১ ঘোড়ায় আরোহণ। ২ অশ্বারোহী।

ঘোড়চেলা (দেশজ) এক জাতীয় চেলা মাছ। [চেলা দেখ।]

ঘোড়দৌড় (দেশজ) ঘোটকচালনরূপ ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ায় অনেকগুলি ঘোড়াকে একেবারে দৌড় করান হয়। যাহার ঘোড়া সর্বাপেক্ষে নিদিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তাহারই জয় হইয়া থাকে। সকল সভ্যদেশে ঘোড়দৌড়ের আদর আছে।

ঘোড়বেড় (দেশজ) চারিদিকে আচ্ছাদিত, চারিগাশে ঘেরা।

ঘোড়াশালা (দেশজ) অশ্বশালা, যে গৃহে অশ্ব বাঁদিয়া রাখা হয়, আস্তাবল।

ঘোড়া (ঘোটক শব্দজ) ঘোটক। [ঘোটক দেখ।]

ঘোড়ানিম (দেশজ) এক জাতীয় বৃক্ষ। (Melia Azadirachta.)

ঘোড়ামুগ (দেশজ) একপ্রকার বন্য মুগ, ঘোড়া এই জাতীয় মুগ পাইতে ভালবাসে। ইহা দেখিতে অনেকটা দেশীয় মুগের সদৃশ। (Phaseolus lobatus.)

ঘোড়ায়নী (স্ত্রী) একপ্রকার গাছ। (Phellandrium Catifolium, Buch.)

ঘোড়ারু, এক জাতীয় বৃক্ষ মুগ। (Elk)

ঘোড়াশালা, অশ্বশালা, যে গৃহে ঘোড়া রাখা হয়, আস্তাবল।

ঘোড়ী (ঘোটকী শব্দ) ঘোটক জাতীয় স্ত্রী, অর্থাৎ, তুরকী।
ঘোণস (পুং) ঘোনস পুণ্ডরিকাদিবৎ সাধু। সর্পবিশেষ।

[গোনস দেখ।]

ঘোণা (স্ত্রী) ঘৃণ-অচ্-টাপ্। ১ অশ্বের নাসিকা।

“জবনিরোধকীতরোবঘুরঘুরায়মাণঘোর-ঘোণেন।” (কাদম্বরী)
২ নাসিকা।

“গোরঃ প্রলঘোজ্জলচাক্ষুণঃ।” (ভারত ১।১৮৯ অঃ)

ঘোণিন্ (পুং স্ত্রী) প্রশস্তা ঘোণা অন্ত্যস্ত ঘোণা-ইনি।
শুকর। স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

ঘোণ্টা (স্ত্রী) ঘৃণাতে গৃহতে ভক্ষার ঘৃণ বাহুল্যং টঃ।
১ বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় ঘেরাকুল বলে। পর্যায়—বদর,
গোপঘন্টা, লুগাল, কোলি, কশিকোলি, হস্তিকোলি,
বদরীচ্ছদা, কর্ককু। ২ পুণ্ড্রবৃক্ষ। (মেদিনী)

ঘোতন, বোম্বাই প্রদেশে আন্ধ্রদেশের জেলার একটি বড়
গ্রাম। শিবগ্রাম (শিবগাঁও) হইতে ৬ মাইল উত্তরে অব-
স্থিত। ইহাতে একটি পুরাতন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি
গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গৃহটির চতুর্দিকে কারুকার্য,
সারি সারি প্রস্তরের ধাম, তাহার উপর কারুকার্য
খোদিত প্রস্তরের ছাদ, দেখিতে মনোহর। গৃহটির শেষে
একটি দ্বার, এই দ্বার দিয়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিয়া
গর্ত্বে গৃহে বা দেবস্থানে পড়িতে হয়, এইখানে জলের একটি
কুণ্ড বা লহর আছে।

ঘোনস (পুং) সর্পবিশেষ। [ঘোণস দেখ।]

ঘোপ (ক্লপশব্দ) ক্লপ, ক্ষুদ্র বৃক্ষবেষ্টিত স্থান, ঝোপ।

ঘোপঘোপ (দেশজ) বৃহৎ ঝোপ, গোপনীয় স্থান।

ঘোপনগর, বন্দর, উপকূল।

ঘোপাল (দেশজ) ঘোপযুক্ত, যে স্থানে ঘোপ আছে।

ঘোমটা (দেশজ) অবগুণ্ঠন, মুখাচ্ছাদন। এদেশীয় ভদ্র-
মহিলাগণ যৌবনকালে ঘোমটা দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখেন।
পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারাই ঘোমটা টানা হয়।
কোন কোন স্থানে উত্তরীয় বস্ত্রে বা বস্ত্রান্তরেও ঘোমটা
দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন-
কালে সভ্য মহিলারা ঘোমটা দিতেন না। মুসলমান
আধিপত্যের সময় হইতেই ঘোমটা দেওয়া চলিত হইয়াছে।
কিন্তু মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠে জানা
যায় যে, বনবাসী শকুন্তলা যখন দুয়ন্তের রাজসভায়
উপস্থিত হন, তখন তিনি ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিলেন।
এরূপ হলে ঘোমটা দিবার নিয়ম যে বহু পূর্বকাল হইতেই
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘোর (স্ত্রী) হস্ততে বধ্যতেহমেন হন্ অচ্ ঘুরাদেশঃ (হস্তের
ঘূর্ণ। উণ্ ৫।৬৪।) ১ বিব। (রাজনিং) (পুং) ২ শিব।
(ভারত ১।৩।১৭।৪) (ত্রি) ৩ ভয়ানক, ভীষণ।

“বহু বর্ষগণান্ ঘোরান্ননরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ।” (মহু ১২।৫৪)

৪ আফগানস্থানের পশ্চিমাংশে স্থিত আফগান জাতির এক
পূর্বতন পার্শ্ববর্তী রাজ্য। হিরাতের ১২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে
ইহার রাজধানী অবস্থিত, এক্ষণে কালকবলে বিধ্বস্ত।

গজনী ও ঘোররাজ্যে পরস্পর বহুদিন হইতে বিবাদ বিস-
বাদ চলিয়াছে। গজনীপতি মাক্দুদ ১০১০ খৃষ্টাব্দে ঘোর
আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রায় ১০৫১ খৃষ্টাব্দে ঘোরপতি গজনী
আক্রমণ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ঘোরে তাড়াইয়া
আনেন এবং তাহাদের কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই রক্তে দুর্গ-
নির্ম্মাণের মসলা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। বহুদিন যুদ্ধের পর
১১৫২ খৃষ্টাব্দে ঘোরপতি সম্পূর্ণরূপে গজনীবংশের উপর
আধিপত্য বিস্তার করেন। শেষে গজনীরাজ লাহোরে
পলাইয়া আসেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী (বিখ্যাত
সহাবুদ্দীন) পঞ্জাব জয় করেন। তাহার সহিত বহুবীর
হিন্দুরাজগণের যুদ্ধ ঘটে, শেষে তিনি ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর
পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুস্বাধীনতা ও হিন্দুসাম্রাজ্য
বিলুপ্ত করিবার পথ প্রদর্শন করেন।

ঘোররাজ্যে অর্জস্বাধীন মোগল ও হাজারাগণের বাস।
ইন্ডথর ও ইবন্ হকলের মতে ঘোররাজ্যের চতুঃসীমায় হিরাত,
ফরা, নবার, রবৎ, কুরবান্ ও ঘজিহান ছিল। ইহার চতুঃ-
সীমায় মুসলমানগণের বাস থাকিলেও এখানে হিন্দু প্রভৃতি
তিন ধর্ম্মাবলম্বীগণের বাস এবং খোরাসানের ভাষা হইতে
তাহাদের ভাষাও স্বতন্ত্র ছিল। পুরাবিদগণের মতে ঘোররাজ্যে
ঘোর, কিরোজকো ও বামিয়ান এই কয়টি প্রধান নগর ছিল।

ঘোরক (পুং) [বহ] দেশবিশেষ।

“কান্দীরশ্চ কুমারশ্চ ঘোরকা হংসকায়নাঃ।” (ভারত ২।৫১ অঃ)

ঘোরঘট্ট, ১ কীকটের অন্তর্গত একটি জনপদ। (ব্রহ্মণ্য ৩।১।৩২)।

২ দেশাবলী মতে অজ্ঞের অন্তর্গত একটি নগর।

ঘোরঘুম্বা (স্ত্রী) ঘোরং ঘুম্বাতে ক্যাপ্। কাংত্। (রাজনিং)
কোন কোন গ্রাছে ঘোরঘুম্বা স্থলে ঘোরঘুণ্ট পাঠ দৃষ্ট হয়।

ঘোরঘোরতর (পুং) ঘোর প্রকারে বিধ্বং তত স্তরপ্।
১ শিব। (ত্রি) ২ অত্যন্ত ঘোর।

ঘোরতর (ত্রি) ঘোর-তরপ্। অত্যন্ত ঘোর, অতিশয় ভীষণ

ঘোরতা (স্ত্রী) ঘোরত্ব ভাবঃ ঘোর-তন্ টাপ্। অতিভীষণতা।

ঘোরদর্শন (পুং স্ত্রী) ঘোরং ভয়ানকং দর্শনং যন্ত বহুব্রী।
১ উল্লুক। (রাজনিং) (ত্রি) ২ ভয়ানকরূপ।

“কবক্ং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্।” (রামায়ণ ১।১।৫৫)

ঘোররাসন (পুং স্ত্রী) ঘোরং ভয়ানকং রাসনং শব্দোচ্চ
বহতী। ১ শৃগাল। (ত্রি) ২ ঘোরতর শব্দযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে
ভীষ্ হয়।

ঘোররাসিন্ (পুং স্ত্রী) ঘোরং রসতি রস-গিনি। ১ শৃগাল।
(হেম) স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়। (ত্রি) ২ যে ঘোরতর শব্দ করে।

ঘোররূপ (পুং) ঘোরং উগ্রং রূপং যন্তাঃ বহতী। ১ মহাদেব।

“ঘোরর ঘোররূপাঙ্গ ঘোরঘোরতরার চ।” (ভারত ১৩।১৭।৪৯)

(ত্রি) ২ উগ্ররূপবিশিষ্ট।

ঘোররূপা (স্ত্রী) ঘোরং উগ্রং রূপং যন্তাঃ বহতী টাপ্।
চণ্ডী, দুর্গা।

“ঘোররূপা ঘোরতম ঘোর যে ভুবন।

ঘোররব কৈলে ঘন ঘটার বাজন।” (কবিকঙ্কণ)

ঘোরবর্ষস্ (ত্রি) ঘোরং বর্ষঃ রূপং যন্তাঃ বহতী। উগ্ররূপ-
বিশিষ্ট। “যে ওড়া ঘোরবর্ষসঃ সূক্ষ্মত্রাসো রিশাদসঃ।”
(ঋক্ ১।১৯।৫) ‘ঘোরবর্ষস উগ্ররূপধরাঃ’ (সারণ।)

ঘোরবস্ত বা ঘোরবন্দ, মক্ৰাণ প্রদেশে যে সমস্ত ধ্বংসা-
বিশিষ্ট প্রাচীর আছে ও এখানকার পর্কত হইতে যে যে স্থানে
প্রবল বেগে জলস্রোত বহিয়া পড়ে সেই সেই স্থানে ইটকাদি
নির্মিত যে সমুদায় বাঁধ আছে তাহার নাম ঘোরবন্দ। বর্ত-
মান মক্ৰাণ-অধিবাসীরা এই “ঘোরবন্দ” নির্মাতাদিগকে
ঘোরবন্দ বা ঘোরবস্ত নামে অভিহিত করিয়াছে। যুরোপের
স্থানে স্থানে যে রূপ কাইক্লোপীয়দিগের নির্মিত প্রাচীরাদির
ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এই ঘোরবন্দদিগের পূর্ব কীর্তিও ঠিক
তদনুরূপ। বর্তমান মক্ৰাণবাসীরা এই দেশে আসি-
বার বহুপূর্বে এই স্থানে ঘোরবন্দজাতির বাস ছিল।
মক্ৰাণবাসীরা তাহাদের প্রাচীর ভবনাদির কোন প্রকৃত
তত্ত্বাদি নিরূপণ করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র ইসলাম-
ধর্ম-বিষেবী কোন কাফেরজাতি কর্তৃক নির্মিত বলিয়া মনে
করিয়া থাকে। বাঘবানার নিকটবর্তী উপত্যকা ও ঝালা-
বন প্রদেশে ইহাদের কৃত অনেক আশ্চর্য্যান্বিত কীর্তি
দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে সময়ে ঘোরবন্দজাতি
কর্তৃক প্রাচীন গুজর নগরী নির্মিত হয়। সেই সময়কার
ইহাদিগের অসংখ্য কীর্তি দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হয় যে এই
জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। ইহারা মানসিক
বল, সহিষ্ণুতা ও নিজ বুদ্ধিকোশলে আশ্চর্য্য করিবার লক্ষ্য
সীমাস্ত্র প্রদেশে এইরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও গড় প্রভৃতি
নির্মাণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা মক্ৰাণ হইতে

পূর্বাভিমুখে পর্কতের উপরে বাস করিত। কালক্রমে
ইহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ইহারা উত্তর ও পূর্বাভি-
মুখে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে ইহারা কলাং (খিলাং)
উপত্যকার আইসে এবং এই স্থান হইতে মুন্না গিরিসঙ্কট দিয়া
ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে। অদ্যাবধি
এই জাতির কোন প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায় নাই।

গ্রীসের কাইক্লোপীয়ার প্রাচীর নির্মাতা পেলাস্গি
জাতি এবং এই ঘোরবন্দজাতি সম্বন্ধে দুই একটি বিশেষ
সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তদ্বারা অনুমান করা যায় যে
ইহারা পরস্পরে একজাতি ও একপ্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট।
গ্রীস ইতিহাসে লিখিত আছে যে এই পেলাস্গিজাতি
এসিয়াখণ্ড হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহারা এসিয়া মাইনর,
সিরীয়া, এসিরীয়া বা পারস্তদেশ হইতে আসে নাই।
এসিয়ারাজ্যের যে খণ্ড হইতে ভূমণ্ডলের সমস্ত সভ্যজাতিই
বিস্তৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই পেলাস্গিজাতিও সেইস্থান
হইতে আসিয়া থাকিবে। সেইরূপ বেলুচিস্থানবাসী এই
ঘোরবন্দ জাতিও সেই স্থান হইতে মক্ৰাণ অভিমুখে
আসিয়াছিল। যখন ইহারা কলাং উপত্যকা হইতে মুন্না
সঙ্কট দিয়া ভারতের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে,
তাহার বহুপূর্ব হইতেই ইহারা প্রাচীর ও ভবনাদি নির্মাণ-
কৌশল ও বহুতর শিল্পকার্য্য অবগত ছিল।

ঘোরবাশন (পুং) ঘোরং বাশতে শব্দায়তে বাশ-ল্য। ১
শৃগাল। স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্। (ত্রি) ২ ভয়ানক শব্দকারী।

ঘোরবাশিন্ (পুং) ঘোরং বাশতে শব্দায়তে বাশ-গিনি। ১
শৃগাল। স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্। (ত্রি) ২ ভয়ানকশব্দকারী।

ঘোরা (স্ত্রী) ঘুর অচ্-টাপ্। ১ দেবতাড়ী লতা, চলিত কথায়
ঘোবাললতা। ২ রাজি। ৩ সাধ্যামতসিক রাজসিক
মনোবৃত্তি। ৪ রবিসংক্রান্তি বিশেষ, ভরণী, মঘা, পূর্নকল্বনী,
পূর্নাবাদা ও পূর্নভাদ্রপদ এই কয়টি নক্ষত্রের কোন একটি
নক্ষত্রে রবিসংক্রান্তি হইলে তাহাকে ঘোরা বলে।

“রবাবৃথভেসংক্রমে ভাস্করত ভবেদ্বঘোরনারী।” (জ্যোতিঃ)

ঘোরাল (ঘোর শব্দজ) ১ ঘূর্ণায়মান। ২ অন্ধকার।

ঘোরাসর, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত মহীকান্ডা
এজেন্সীর মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে তুলা প্রধান
উৎপন্ন দ্রব্য। এখানকার রাজার উপাধি ঠাকুর, তিনি
জাতিতে কোলি। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়।
রাজার পোষাপুত্র লইবার ক্ষমতা নাই। প্রধান নগর
ঘোরাসর ২৩° ২৮' উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৩° ২০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
অবস্থিত। এখানে দুইটি বিদ্যালয় আছে।

ঘোল (পুং) ঘুর কর্ণশি ঘঞ্ উত্ লঃ । ১ মথিত দধি, তক্র ।
 পর্যায়—দগ্ধাহত, কালসেদ, অরিষ্ট, গোরস, ঘল, মলিন,
 কেবল ও ভগ্নসন্ধিক। সুশ্রুতের মতে নির্জল দধি মছন করিয়া
 নবনী তুলিয়া লইলে ঘোল প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ছুঁড়ে
 দধি হয়, তত প্রকার ছুঁড়ে ঘোল হইয়া থাকে। ঘোল তিন
 প্রকার—পাদজল, অর্দ্ধজল ও নির্জল। যাহাতে সিকি
 ভাগ জল থাকে তাহাকে পাদজল, অর্দ্ধেক জল থাকিলে
 অর্দ্ধজল ও জল না মিশান হইলে তাহাকে নির্জল বলে।
 সুশ্রুত ও ভাবপ্রকাশের মতে নির্জল দধি হইতেই ঘোল হয়।
 কিন্তু এখন পাদজল ও অর্দ্ধজলযুক্ত দধি মথিত হইলেও
 তাহাকে ঘোল বলে। কিন্তু পূর্বকালে ইহার নাম ভেদ
 ছিল। [তক্র শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।] ইহার গুণ—
 মধুর, অম্ল, কষার, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, রুক্ষ, অমিবর্জক, পাকে
 মধুর, মুখপ্রিয় এবং সরল, শোধ, অতীসার, তৃষ্ণা, বদনমল,
 এসেক, শূল, মেদ, প্লেগা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক, স্নেহপান
 ও ভক্ষণজনিত রোগে শাস্তিকর ও তেজোদীপক।

নির্জল ও শরযুক্ত ঘোলের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক।
 দধির মাত ফেলিয়া একখানি শাদা কাপড়ের উপরে রাখিবে।
 জলীয়ংশ ভালরূপে নিঃসৃত হইলে তাহাতে জীরে ও সৈন্ধব
 মিশাইবে। এইরূপে একপ্রকার ঘনতর ঘোল উৎপন্ন হয়।
 ইহার গুণ—বাতনাশক, অতীসার ও অগ্নিমান্দ্যে হিতকর,
 রুচিজনক ও বলকারী। (শকার্ণচি°) ভাবপ্রকাশের মতে
 ঘোলের সহিত হিন্দু, জীরে ও সৈন্ধব মিশাইলে তাহার গুণ—
 বাতনাশক, অর্শ ও অতীসারে উপকারী, রুচিকর, পুষ্টিজনক,
 বলকারী, বস্তি ও শূলনাশক। শুঁড়ের সহিত ঘোল খাইলে
 মূত্রকৃচ্ছ্র এবং চিতা মিশাইয়া ঘোল খাইলে পাণ্ডুরোগ ভাল
 হয়। আরব, পারস্ত এবং বিলাতেও ঘোলের যথেষ্ট আদর।
 বিলাতের সকল লোকই প্রায় ঘোল খাইতে ভালবাসেন।
 তথায় প্রতিবর্ষে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘোল বিক্রয় হইয়া থাকে।
 গরম ভাতে ঘোল খাইবার বিধান আছে—

“পাত্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয়।

পণ্ডিতাতে পাতিনেবু সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

কড় কড় হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল।

তপ্ত ভাতে বড় মজা যদি মেলে ঘোল ॥”

ঘোলঘাট, হুগলীর নিকটবর্তী পৰ্ব্বতগিরির পুরাতন গড়।
 ইহাকে পৰ্ব্বতগিরির “গলগোথা” নামে বর্ণনা করিয়া গিয়া-
 ছেন। ইহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। [হুগলী দেখ।]

ঘোলজ (স্ত্রী) ঘোলাৎ জারতে ঘোল-জন-ড। ঘোল হইতে
 উৎপন্ন স্ত্র।

ঘোলমছন (স্ত্রী) ঘোলস্ত মছনং ৬তৎ। ঘোল প্রস্তুত
 করিবার জন্ত দধির আলোড়ন।

ঘোলমছনী (স্ত্রী) ১ ঘোলমছন দণ্ড, যে দণ্ডটা দ্বারা ঘোল
 মছন করা হয়। ২ একপ্রকার বৃক্ষ, ঘোলমোনী গাছ।

ঘোলবটক (পুং) ঘোলমিশ্রিতো বটকঃ মধ্যলো°। বটক-
 বিশেষ। মদনপালের মতে ঘোলবটক বিদাহী ও বাতনাশক।

ঘোলা (দেশজ) ১ বিকৃত, অপরিষ্কৃত। ২ বিকার, অপরিষ্কার।

ঘোলাটিয়া (দেশজ) [ঘোলাদেখ।]

ঘোলান (দেশজ) কর্দমযুক্ত, আবিল।

ঘোলানিয়া (দেশজ) কাদাটে।

ঘোলি (স্ত্রী) ঘুন্-ইন্ উত্ লঃ বা ভীপ্। ঘোলীশাক।

ঘোলিকা (স্ত্রী) ঘোলী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ পুৰ্ণোহুবঃ। ঘোলি-
 শাক। [ঘোলী দেখ।]

ঘোলী (স্ত্রী) ঘোলি ভীপ্। পত্রশাকবিশেষ, ঘোলমোনী।
 পর্যায়—ঘোলিকা, ঘোলি, কলজু, কুবকালুকা। ক্ষেত্রজাত
 ঘোলীশাকের গুণ—লবণ, রস, রুচিকর, অম্ল, বায়ু ও
 কফনাশক।

বনজাত ঘোলীশাকের গুণ—অম্ল, রুক্ষ, রুচিকর, বায়ু-
 নাশক এবং পিত্ত ও প্লেগবৃদ্ধিকর।

সূক্ষ্মঘোলীশাকের গুণ—জীর্ণ জরনাশক। (রাজনি°)

ঘোষ (পুং) ঘোষন্তি শব্দ্যন্তে গাবোঘশ্বিন্ ঘুষ-আধারে ঘঞ্।
 (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১)

১ আভীরপল্লী, গোয়ালা-পাড়া। ঘোষন্তি শব্দ্যন্তে
 ঘুষ-কর্ত্তরি-অচ্। ২ গোপাল, গোয়াল। “হৈয়দবীনমাদার
 ঘোষব্রাহ্মপুহিতান্।” (রঘু ১৪৫) ঘুষভাবে ঘঞ্।
 ৩ ধ্বনি। ৪ মশক। (ত্রিকাণ্ড°) ৫ বর্ণ উচ্চারণ করিবার বাহ
 প্রযত্নবিশেষ। (শিক্ষা) (স্ত্রী) ৬ কাংস্ত। ৭ বঙ্গীয় কায়স্থ,
 গোপ প্রভৃতির উপাধিবিশেষ।

“বহুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষণপুষণৌ।

ঘোষেযু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভূজৌ মহাকৃতৌ ॥” (কায়স্থকুলদীপিকা)

৮ হিমালয়স্থ জনপদবিশেষ।

ঘোষক (পুং) ঘোষ-স্বার্থে কন্। ১ [ঘোষ দেখ।] ঘোষ-
 সংজ্ঞার্থে কন্। ২ ঘোষালতা। পর্যায়—ধামার্গব, ঘোষকা-
 কৃতি, আদানী, দেবদানী, তুরঙ্গক, ঘোষ, ঘোষালতা ও
 ঘোষকাল। (জটধর)

ঘোষকাকৃতি (পুং) ঘোষকাকৃতিরিবা কৃতির্ঘাত বহুব্রী।

১ খেত কোষাতকীলতা। ২ মহাকাল, মাকাল। (রাজনি°)

ঘোষকৃৎ (ত্রি) ঘোষং করোতি কৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ যে
 শব্দ করে, শব্দকারী। ২ যে আভীরপল্লী নির্মাণ করে।

ঘোষকোটি (ক্রী) একটি পর্বত শৃঙ্গ।

ঘোষণ (ক্রী) ঘূষ-ভাবে লুট। ১ ধ্বনি। ঘূষ-গিচ্-ভাবে লুট।

২ ইত্যন্ততঃ বিজ্ঞাপন প্রচার, সাধারণ লোকের বিদিতার্থে উচ্চঃশব্দে কোন ঘটনা প্রকাশ করা। “বীৰ্য্যবিক্রম-শৌর্য্যাগাং ঘোষণং সহিতং ভবেৎ।” (রামায়ণ ৬.৫৮ অঃ)

ঘোষণা (ক্রী) ঘূষির বিশকনে ঘূষ যুচ্-টাপ্ (ণ্যাসপ্রহো যুচ্। পা ৩.৩.১০৭) [ঘোষণ দেখ।]

ঘোষণীয় (ত্রি) ঘূষ-অনীয়ন্। বাহার ঘোষণা করা হইবে, বাহা ঘোষণা করিবার যোগ্য।

ঘোষপাড়া, নদীয়াজেলায় একটি বিখ্যাত পল্লীগ্রাম। এখানে কৰ্ত্তাভজাদিগের প্রধান ও প্রাচীন আড্ডা আছে। [কৰ্ত্তাভজা দেখ।]

ঘোষয়িত্ব (পুং ক্রী) ঘূষ-গিচ্ বাহুলকাৎ ইত্বচ। ১ ব্রাহ্মণ। ২ কোকিল। (ত্রি) ৩ যে বন্দনা করে, বন্দী। (শব্দরত্নাং)

ঘোষবৎ (ত্রি) ঘোষো ধ্বনিঃ বর্ণবিশেষো বাহুপ্রযয়বিশেষো বা অন্ত্যন্ত ঘোষ-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ যে সকল বর্ণের উচ্চারণে ঘোষরূপ বাহুপ্রযয় আবশ্যক হয়, তাহাকে ঘোষবৎ বলে। কলাপের মতে গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ এই নয়টি বর্ণকে ঘোষবৎ বলে।

(ঘোষবস্তো হস্তে। কলাপ ১।১।১২) ২ ধ্বনিযুক্ত।

“তং বজ্রমতুলং ঘোষং ঘোষবাংঘুং বলাহকঃ।”

(ভারত ১।২৫ অঃ)

ঘোষবতী (ক্রী) ঘোষবৎ ভীপ্। বীণা। (হেমচং)

ঘোষবহু (পুং) কাবৎবৎসীয় একজন রাজা। (বিষ্ণুপুং)

ঘোষা (ক্রী) ঘূষাতে ভ্রমরৈরিয়ঃ কৰ্ম্মণি-যঞ্। ১ মধুরিকা, মোরী। (মেদিনী) ২ শতপুষ্পা। ৩ কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়া-শৃঙ্গী। ৪ কোশাতকী। ৫ গজা।

“ব্রাগতুষ্টিকরী ঘোষা ঘনানন্দা ঘনপ্রিয়া।” (কাশীখঃ ২৯।৫৫)

৬ গায়ত্রী স্বরূপা মহাদেবী।

“যুগি মন্ত্রমগ্নী ঘোষা ঘনসম্পাতদায়িনী।” (দেবীভাগঃ ১২।৬।৪৪)

ঘোষাতকী (ক্রী) কোশাতকী পুষ্পদরাদিবৎ সাধুঃ। কোষাতকীলতা, কোন আভিধানিকের মতে খেত কোশাতকীর নাম ঘোষাতকী। (রত্নমালা)

ঘোষাদি (পুং) ঘোষ আদির্ঘন্ত বহুব্রী। পাণিনীর একটি গণ, এই গণ পরবর্ত্তী হইলে পূৰ্ব্ববর্ত্তী পদের আদি স্বর উদাত হয়। ঘোষ, কট, বজ্রভ, হ্রদ, বদরী, পিঙ্গল, পিঙ্গল, মালা, রক্ষা, শালা, কুটশাখলী, অম্বখ, তুণ, যুনি, প্রেক্ষা, ইহা-দিগকে ঘোষাদিগণ বলে।

ঘোষযাত্রা (ক্রী) ঘোষে যাত্রা ৭তৎ। ঘোষণীতে যাত্রা।

পূৰ্বে রাজগণ সৰ্বদাই অধীনস্থ ঘোষণীতে বাইরা গোসমু-নায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহাই ঘোষযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। কুরুরাজ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে আপনায় সমুদ্বি-দেখাইবার জন্য একটি বিরাট ঘোষযাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। (ভারত)

ঘোষালতা (ক্রী) একপ্রকার স্বনামপ্রসিদ্ধ লতা। [ঘোষ দেখ।]

ঘোষিত (ত্রি) ঘূষ-ক্ত। বাহার ঘোষণা করা হইরাছে, ব্যক্ত, সাধারণের নিকট প্রকাশিত।

ঘোষিতব্য (ত্রি) ঘূষ-তব্য। বাহার ঘোষণা করা উচিত, ঘোষণীয়।

ঘোষিন্ (ত্রি) ঘূষ-গিনি। যে ঘোষণা করে।

ঘোর (পুং) ঘোরন্ত ধ্বংসপ্রভাৎ ঘোর-অণ্। কাবৎবৎসীয় একজন প্রবর ঋষি। (আখ্যলাং ১২।১০।১)

ব্রংস (পুং) ব্রন্তস্তে রসা অস্মিন্ এস-আধারে ঘঞ্ পুষো-দরাদিবৎ সাধু। ১ দিবস। (নিঘণ্টু) “যো অস্মৈ ব্রংস উত য উধনি।” (ঋক্ ৫।৩৪।৩) “ব্রংস ইত্যহ্নানাম ব্রন্তস্তে হস্মিন্ রসাঃ” (সায়ণ) (ত্রি) ২ দীপ্ত। “পরিব্রংসমোহনা বাং বয়োগাং,” (ঋক্ ৭।৬২।৪।) “ব্রংসং দীপ্তম্” (সায়ণ।)

ব্রাণ (ক্রী) ব্রা করণে লুট। ১ নাসিকেন্দ্রিয়। [ইন্দ্রিয় দেখ।]

নৈয়ামিক মতে ব্রাণেন্দ্রিয় পাণিবি, গন্ধ গ্রহণ করাই ইহার ব্যাপার। সাংখ্যাদি মতে ব্রাণেন্দ্রিয় অহঙ্কারজ ভৌতিক নহে।

(ত্রি) ব্রা কৰ্ম্মণি-ক্ত বিক্রেতে ভকারন্ত নকারঃ। ২ ব্রাত, বাহার ব্রাণ লওয়া হইরাছে। (ক্রী) ৩ গন্ধ গ্রহণ, সোঁথা।

“গাবো ব্রাণেন পশুতি চক্ষুভ্যামিতরে জনাঃ।” (নীতিশাস্ত্র)

ব্রাণজ (ক্রী) ব্রাণে জায়তে ব্রাণ-জন-ড। নাসিকেন্দ্রিয়জাত জ্ঞানবিশেষ। “ব্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং বড়্ বিধং মন্তং।” (ভাবাপরিঃ)

ব্রাণতর্পণ (পুং) ব্রাণং নাসিকেন্দ্রিয়ং তর্পয়তি তৃপ-গিচ্-ল্য। সুগন্ধ, যে গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে সুখ হয়।

ব্রাণচুঃখদা (ক্রী) ব্রাণন্ত চুঃখং দদাতি দা-ক-টাপ্। ছিড়নী।

ব্রাণশ্রবস্ (পুং) ব্রাণশিব শ্রবঃ কর্ণোহন্ত বহুব্রী। কাণ্ডি-কেয়-সৈচ্ছবিশেষ। (ভারত ১৩।৪৬ অঃ)

ব্রাত (ত্রি) ব্রাণ কৰ্ম্মণি-ক্ত। ১ বাহার ব্রাণ লওয়া হইরাছে।

(ক্রী) ব্রা-ভাবে ক্ত। ২ গন্ধ গ্রহণ।

ব্রাতি (ক্রী) জিহ্বাতনয়া ব্রা করণে জিন্। ১ নাসিকা।

(শব্দচং) ব্রা-ভাবে জিন্। ২ আশ্রাণ।

“ব্রাহ্মণস্য কজঃ কৃত্য ব্রাতিরশ্বেদমদ্যয়োঃ।” (যজু ১।১৬৮।)

ঙ

ঙ, বাঞ্জনবর্ণের পঞ্চম অক্ষর। ইহার উচ্চারণ স্থান জিহ্বা-মূল ও নাসিকা। “জিহ্বামূলেত্ কুঃ শ্রোতঃ” “অমোহস্থ-নাসিকা নহৌ” (শিক্ষা।) ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, কণ্ঠমূলে জিহ্বামূল স্পর্শ। বাহ্য প্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকাক্রান্তে ডান হাতের অঙ্গুলীর অগ্র-ভাগে ইহার গ্রাস করিতে হয়। ইহার নাম—শম্মী, ভৈরব, চণ্ড, বিম্বন্তংস, শিশু, প্রিয়, এক, রুদ্র, দক্ষনথ, খর্পর, বিষয়-স্পৃহ, ক্রান্তি, খেটাহর, ধীর, বিজায়া, জালিনী, বিয়ং, যন্ত্রশক্তি, মদন, বিয়েশী, আশ্বিনারক, একনেত্র, মহানন্দ, হরুর, চন্দ্রমাঃ, মতি, শিবযোষা, নীলকণ্ঠ, কামেশী, ময় ও অংগু। (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব)

ইহার ধ্যান—ইনি সর্বদেবময়, পরকুণ্ডলীস্বরূপ, ত্রিগুণা-ত্মক ও পঞ্চপ্রাণময়। ইহার বর্ণ ধূম, দেখিতে অতিশয় ভয়ানক, চারিখানি হাত, জিহ্বা বহির্গত, পরিধানে পীতবস্ত্র। ইহার ধ্যান করিলে সাধকের সকল অভীষ্টপূর্ণ হয়। (বর্ণো-চ্চার তত্ত্ব।) কোন কাব্যের আদিতে ওকার স্থাপন করিতে নাই, করিলে রচয়িতায় অযশ হইয়া থাকে। “কঃ খঃ গোবিন্দ লক্ষ্মীং বিতরতি বিষণো ওন্তথা চঃ স্তুং ছঃ।”

(ব্রতরত্নাকরটীকা)

ঙ (পুং) ঙ্ বাহুলকাৎ ড। ১ বিষয়। ২ বিষয়স্পৃহা। (মেদিনী) ও ভৈরব। (একাক্ষরকোষ)

“ঙ বন্দিতে ও লিপ্সিতে ওকারবর্ণরূপিনী।” (স্ততিপঞ্চাশৎ)

চ

চ, বাঞ্জনবর্ণের ষষ্ঠ অক্ষর, দ্বিতীয়বর্ণের প্রথম। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু।

“কণ্ঠা বহা বিচূষান্তালবা। ওষ্ঠজাবু।” (শিক্ষা) ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রযত্ন—তালুতে জিহ্বার মধ্যস্পর্শ। বাহ্য প্রযত্ন—শ্বাস, বিবার, ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। মাতৃকাক্রান্তে বায়বাহর মূলে ইহার গ্রাস করিতে হয়। [মাতৃকাক্রান্ত দেখ।]

ইহার নাম—পুঙ্কর, হলী, বাণী, আশ্বশক্তি, সুদর্শন, চর্মমুণ্ডর, ভোম, মহিষাসুরমধিনী, একরূপ, রুচি, কৃষ্ণ, চামুণ্ডা, দীর্ঘবালুক, বামবাহুমূল, মায়া, চতুর্মুর্তি-স্বরূপিনী, দয়িত, দিনেত্র, লক্ষ্মী, জিতয়লোচন, চন্দন, চন্দ্রমা, দৈব, চেতন, বৃশ্চিক, বৃধ, দেবী, কেটমুখ, ইচ্ছায়া, কুমারী, পূর্ণফল্গুনী, অনঙ্গমেখলা, বায়ু, মেদিনী ও মূলাবতী।

বদ্যাকরে ইহার লেখন প্রাণী—বার্তাকুর জায় বর্তলুকার রেখাক্রমে উর্দ্ধ ও অধোগামী করিবে। ইহাকেই চ বলে। অপরাপর অক্ষরের জায় ইহাতেও একটা মাত্রা দিতে হয়। এই অক্ষরটীতে গোলাকার বার্তাকুর সাদৃশ্য আছে, এই কারণে বালকদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে বৃদ্ধেরা উহাকে বেগুনিয়া চ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

ধ্যান—ইহার বর্ণ তুষার অথবা কুন্দপুষ্পের জায় অতিশয় শুভ্র, শরীর নানাবিধ মনোহর অলঙ্কারে পরি-শোভিত, বয়স ষোলবৎসর, একহাতে বর ও অপর হাতে অভয়, পরিধানে গুরুবস্ত্র কটিদেশে আঁটা, গুরুবস্ত্রের উত্ত-রীয় ও আঁটখানি হাত। এই প্রকারে চকারের ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব।) চকারের রেখা তিনটিকে যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির জায় ভাবনা করিতে হয়। মাত্রাটিকে শক্তিস্বরূপ চিন্তা করিবে। কাব্যের আদিতে চকারের বিজ্ঞাপন করিলে রচয়িতার অযশ হয়। [ও দেখ।]

চ (অব্য) চণতি চণ বাহুলকাৎ ড, অথবা চিনোতি চি—বাহুলকাৎ ড। ১ সমুচ্চয়। “পরস্পরনিরপেক্ষতানেকস্ত একস্মিন্ অযয়ঃ—সমুচ্চয়ঃ।” (সিং কোঃ) যে স্থলে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা-শূন্য দুই বা ততোধিক পদার্থের একধর্মাবচ্ছিন্নে অর্থাৎ এক ক্রিয়াদিক্রূপ পদার্থে অযয় হয়, সেইস্থলে চকারের অর্থ সমুচ্চয়। যথা “চৈত্রোগচ্ছতি পচতি চ।” এই স্থলে পরস্পর নিরপেক্ষ “গচ্ছতি ও পচতি” এই পদদ্বয়-প্রতিপাদ্য গমন ও পাক এই পদার্থদ্বয় একধর্মাবচ্ছিন্ন চৈত্রপদার্থে অধিত। অত-এব এই স্থলে ক্রিয়ার সমুচ্চয় হইল। “জৈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজয়” এই স্থলে পরস্পর নিরপেক্ষ জৈশ্বর ও গুরু এই পদার্থদ্বয় এক-ধর্মাবচ্ছিন্ন ভজনরূপ পদার্থে অধিত। অতএব এই স্থলে দ্রব্যের সমুচ্চয় হইল।

২ অযাচয়। “যত্র একস্য প্রাধায়েনাপরস্ত গোণেন অযয়ঃ সোইযাচয়ঃ।” যে স্থলে একটা পদার্থের প্রাধায়ে ও অপরটির অপ্রাধান্যভাবে অযয় হয় সেই স্থলে চকারের অর্থ অযাচয়। যথা “ভো বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়” এই এই স্থলে ভিক্ষা আহরণপদার্থের প্রাধায়ে ও গবানয়ন-পদার্থের অপ্রাধায়ে অযয় হইয়াছে। অযাচয় স্থলে বাক্যের তাৎপর্য এইরূপ—ভিক্ষা অবশ্যই করিবে, যদি গোক দেখিতে পাও তবে গোকও লইয়া আসিবে। ৩ ইতরেতর যোগ। “মিলিতানামদ্বয় ইতরেতরযোগঃ।” যে স্থলে উভুতাবয়বভেদ পরস্পরসাপেক্ষ পদার্থসমূহের একধর্মাবচ্ছিন্নে অযয় হয়, সেইস্থলে চকারের অর্থ ইতরেতর

যোগ। ৪ সমাহার। “সমূহঃ সমাহারঃ।” (সি কো) যে স্থলে অল্পভূতাবয়বভেদপদার্থসমূহের একধর্মাবচ্ছিন্নে অবয়ব হয়, তথায় চকোরের অর্থ সমাহার। অমরটীকাকার ভরতের মতে—যে স্থলে এক ক্রিয়ার অনেক পদার্থের আধাতে অবয়ব হয়, তথায় সমাহার হইয়া থাকে। কিন্তু সমাহার স্থলে যে কয়টি পদার্থের আধান্যে অবয়ব হয়, তার সেই কয়টি চকার প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—“ধবাংশ্চ খদিরাংশ্চ ছিদ্ধি।” ৫ পাদপূরণ। ছন্দোশাস্ত্রের নিরমালুসারে রচনা দ্বারা বৃত্তপাদের পূরণ না হইলে কেবল পাদপূরণ উদ্দেশ্যেই চ বৈ প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়ের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সেই স্থলের চকারকে পাদপূরণার্থক চকোর বলে। বাস্তবিক তথায় চকোরের কোন অর্থ থাকে না, কেবল পাদপূরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আলঙ্কারিকগণের মতে রচনার এইরূপ চকার বিন্যাস করিলে নিরর্থকতা-দোষ হইয়া থাকে। “নিরর্থকং চাদি পাদপূরণৈকপ্রয়োজনম্।” (চন্দ্রালোক) ৬ পক্ষান্তর, অথবা।

“শাস্তিমিদমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ বাহঃ কৃতঃ কলমিহান্ত।”

(শাকুন্তল ১ অঙ্ক)

৭ অবধারণ। (মেদিনী) ৮ ছেতু। (ত্রিকাণ্ড) ৯ তুল্য যোগিত্ব, উভয়ের সাম্য। এই অর্থে চকার তুল্যযোগিতা-লঙ্কারের দ্যোতক হইয়া থাকে।

“সকুচস্তি সরোজানি শৈবিরীণী-বদনানি চ।” (চন্দ্রালোক)

কোন কোন আলঙ্কারিকের মতে চকার দীপকালঙ্কারেরও দ্যোতক হইয়া থাকে। [দীপক দেখ।]

চ (পুং) চণতি চিনোতি বা চণ বা-চি-ড। (অন্যোষপি দৃষ্টান্তে। পা ৩২।১০।) ১ চক্র। ২ কচ্ছপ। ৩ চোর। ৪ চণ্ডেশ্বর। ৫ চর্বণ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ নিবীজ। ৭ চূর্জন। (শব্দরত্ন)

চই (চবি শব্দজ) চবিকা, লতাকার একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ, ইহা খাইতে কটুরস, লক্ষা বা মরিচের ন্যায় ইহাও ব্যজনা দিতে দেওয়া হয়। ইহাতে ব্যজন স্থপ প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সজ্জা হইয়া থাকে। [চবিকা শব্দ দেখ।]

চংসিল, পঞ্জাবের বসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটি পর্বতশ্রেণী। অক্ষা° ৩০° ৫৬' হইতে ৩১° ২০' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪' হইতে ৭৮° ২২' পূঃ। হিমালয়শ্রেণী হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে কুণাবারের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখানে ১৩।১৪ হাজারকিটু উচ্চে অনেকগুলি গিরিসঙ্কট আছে।

চক্ (চক্র বা চক্ শব্দজ) ১ চতুশালায় মধ্যস্থান। ২ বাজারের স্থান বিশেষ। ৩ চতুঃসীমা বন্ধ বিস্তৃত স্থান বা ক্ষেত্র। গ্রামের মধ্যে কিংবা পরিমাণ ভূমিকেও চক বলিয়া

থাকে। ৪ উত্তর তিব্বতবাসী ভোট জাতির এক শাখা। ৫ খড়ি।

চক (পুং) চক প্রতীযাতে অচ্। ১ খল। ২ সাধু।

চকটোদন, খায়াপ ভাত। (দিব্যাবদান ৪২৬)।

চকার (পুং) চ-ধ্বরণার্থে কার। (বর্ণধ্বরণে কারতকারো। বৈয়াকরণ) দ্বিতীয় বর্ণের প্রথম বর্ণ, চ।

চকিত (ক্ৰী) চক-ভাবে ক্ত। ১ ভয়। ২ সন্ত্রম। ৩ নারিকার সাধিক অলঙ্কার বিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে কোন কারণে নারিকের সম্মুখে নারিকার ভয় সন্ত্রমের নাম চকিত। “কুতোহপি দয়িতভ্যাগ্রে চকিতং ভয়সন্ত্রমঃ।” (সাহিত্য ৩ পরি°)

(ত্রি) চক কর্তরি ক্ত। ৪ ভীত। ৫ শঙ্কিত। (মেদিনী)

চকিতা (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ঘোলাটী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবন্ধ এবং প্রত্যেক চরণে প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও বোড়শ অক্ষর গুরু, ইহা ছাড়া অপর গুলি লঘু। তাহাকে চকিতা বলে। ইহার অষ্টম অক্ষরে যতিহান।

“ভাৎসমতনগৈ রষ্টচ্ছেদে ত্রাদিহ চকিতা।” (ছন্দোমঞ্জরী)

চকোর (পুং) চকতে চক্রকিরণেন তৃপ্যতি চক-ওরন্ (কঠি চকিত্যামোরন্। উণ ১।৬৫) পর্যায়—চকোরক, জীবজীব, জীবজীব, জীবজীবক, চলচক্, জ্যোৎস্নাপ্রিয়, বিষদর্শন-মৃত্যুক, চন্দ্রিকাপায়ী ও চন্দ্রিকাজীবন। এই পাখী অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি, দেখিতে অনেকাংশে চটকের সমূহ। অনেকেই ইহাকে একজাতীয় চটক বলিয়া অনুমান করেন। ইহার বর্ণ ঘোরকৃষ্ণাভ, সন্ধ্যার সময়ে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। কবি-সমর-সিদ্ধি অনুসারে ইহার চাঁদের জ্যোৎস্না পান করিয়া থাকে। অনেক প্রাচীন কাব্যে চকোরের চন্দ্রিকাপানের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বকালে এদেশীয় প্রায় রাজ রাজড়াই যত্ন করিয়া চকোর পালন করিতেন। খাইবার সময়ে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী প্রথমে চকোরকে দেখাইয়া পরে খাওয়া হইত। ইহার কারণ যে খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে বিষ থাকিলে তদদর্শনে চকোরের চক্ লাল হইয়া উঠে ও ক্রমে চকোরের মৃত্যু হয়। এই কারণে চকোরের একটি নাম বিষদর্শনমৃত্যুক রাখা হইয়াছে। ইহার মাংসের গুণ—গীতল, রুচিকর, বৃষা ও পুষ্টিকর। (রাজনিঃ) হারীভসংহিতার মতে চকোরের মাংস বাতপ্লেককর, গুরুবর্জক, অঙ্গরীনাশক, বিশদ ও বলকারী।

ইহার ডিমের গুণ—কাল, কঠ ও ক্ষত্রোগে কিংবা অধিক পরিমাণে রেতঃক্ষেপে বিশেষ উপকারী, বধুর ও লম্বাঃ বলকর। (চরক সূত্র ২৭ অঃ)

চকোরক (পুং) চকোর এর স্বার্থে কন্। চকোর পাখী।

চকোরী (স্ত্রী) চকোর-স্ত্রীপু। চকোর-জাতীয় স্ত্রী।

“চকোর্য এবচ্চুরাশ্চক্রিকাপান-কর্ণশি।” (সাহিত্যদ্রঃ ১০ পরিঃ)

চক্ৰ (পুং) চক্ৰ পীড়ারূপে চুরাদিৎ অণ্। ১ পীড়ন, পীড়া।

চক্ৰন (স্ত্রী) চক্ৰ-সুট্। পীড়ন। এই শব্দটী পাণিনীর-
চূর্ণাদি পশাস্তর্গত। (৬।২।১০৪)

চক্চক্ (চাক্চিক্য শব্দজ) ১ বজ্জতা, উজ্জলতা, দীপ্তি। ২
তেজস্বী, প্রভাশালী।

চক্চকি (চাক্চিক্য শব্দজ) উজ্জলতা, দীপ্তি।

চক্চকানি (দেশজ) উজ্জলতা, প্রভা, লাবণ্য।

চক্চকিয়া (দেশজ) উজ্জল, প্রভাশালী।

চক্দার (হিন্দি) যে অপরের জমিতে ইনারা কাটিয়া লয় ও
উক্ত জমির জন্য ধাজনা দেয়।

চক্দিলাবাড়ী, পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা।
ভূপরিমাণ ৩৮.৩৬ বর্গ মাইল। এই পরগণার মধ্যে ৫টা
জমিদারী আছে। রাজস্ব প্রায় ৫১৪০০ টাকা। এখানকার
বিচারকার্য কৃষ্ণগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফি আদালতের
এলাকাধীন। এখানে কলাই, নীল, তিসি, সরিষা ও ভাদই
ধানের চাষ হইয়া থাকে।

চক্ৰদীঘি, বর্ধমানের অন্তর্গত একটা বিখ্যাত স্থান। এখানে
অনেক ভক্তলোকের বাস আছে। তন্মধ্যে একঘর পুরাতন
জমীদার বংশই প্রধান। ঐ জমীদারবংশ “চক্ৰদীঘির বাবু”
বা “চক্ৰদীঘির রায়” নামে খ্যাত। এই বংশের আদিপুরুষের
নাম নলসিংহ রায়। নলসিংহ জাতিতে ছত্রী বা ক্ষত্রিয়।
ইনি পূর্ণনিবাস রাজপুতানা হইতে আসিয়া বর্ধমানে বাস
করেন। ইনি জমীদারী কার্য ভাল বুঝিতেন বলিয়া
মৃত্যুকালে ষষ্ঠে জমিদারী রাখিয়া যান। ইহার ভবানী,
দেবী, ভৈরব ও হরি নামে চারিটি পুত্র ছিল। ভবানী ও
দেবী নিঃসন্তান-ছিলেন। ভৈরবের অধিকা নামে এক পুত্র
ও দুর্গা নামে এক কন্যা ছিল। দুর্গার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র
এবং বৃন্দাবনচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন। চক্ৰদীঘির নিকটেই
ইহার মণিরামবাটী নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান
করেন। কৃষ্ণ নিঃসন্তান। বৃন্দাবনের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ সিংহ
হুগলী কলেজের একজন প্রশংসার্হ ছাত্র। অধিকার
সায়দা নামে এক পুত্র হয়। সায়দা বাবু বিশেষ খ্যাতি ও
প্রতিপত্তি লাভ করেন। সায়দা নিঃসন্তান। ইনি মৃত্যু-
কালে নিজ ভগিনী সীরোদাশ্রমিকীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতমোহন
সিংহকে উত্তরাধিকারী হিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। সায়দা
বাবুর অর্থেই চক্ৰদীঘির সাতব্য ইন্সপাতাল ও ডাক্তারখানা

স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অন্যান্য সংকর্ণের মধ্যে চক্ৰদীঘির
টোল, অনাধনিবাস এবং মেমারী হইতে চক্ৰদীঘি পর্য্যন্ত
পাকা রাস্তা প্রধান। ইহাদের বন্ধে এখানে একটা পোষ্ট
আগিস হইয়াছে। ললিতমোহন কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডদের
অধীনে শিক্ষিত হন। নলসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র হরিসিংহের
ছক্ৰনলাল ও শশিভূষণ নামে দুই পুত্র হয়। ইহার পৃথক্
হইয়া চক্ৰদীঘিতেই বাস করিতেছেন।

চক্ৰমামা (দেশজ ও পারসী মিশ্রিত) কোন জমির স্বত্ব-
নির্গায়ক নিদর্শনপত্র।

চক্ৰবন্দী (দেশজ ও পারসী মিশ্রিত) ১ চতুঃশালার চারিদিকের
গৃহগুলি পরস্পর মিলিত ও সমানাকারের হইলে তাহাকে
চক্ৰবন্দী বলে। ২ কোন জমির কিছা কোন সম্পত্তির
সীমা নিরূপণ করা। ৩ যতদূর পর্য্যন্ত পুলিশের অধীনে
থাকে। ৪ গ্রামসীমা নিরূপণ।

চক্ৰবাল, জেলম্ জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। জেলার
মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া লবণশৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষা°
৩২° ৪৫' হইতে ৩৩° ১৩' উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৩১' হইতে ৭৩° ১৭'
পূঃ। ভূপরিমাণ ৮১৮ বর্গমাইল। এখানকার জমি—জমিদারী,
পট্টিদারী ও ভরাচার সর্বো বিলি আছে। বিচারবিভাগে
একজন তহসীলদার ও মুন্সেফ আছে। তাঁহার দেওয়ানী ও
ফৌজদারী উভয় আদালতের কার্য করিয়া থাকেন। এখানে
অনেকগুলি পুলিশ আছে।

২ উক্ত তহসীলের সদর ও প্রধান নগর। শিওদাদন থা
ও রাবলশিওর মধ্যস্থলে এবং জেলম্ নগর হইতে ৫৪
মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৫৫' ৫০" উঃ ও
দ্রাঘি° ৭২° ৫৪' পূঃ। জম্বু হইতে মঠের বংশীয় কোন
রাজপুত আসিয়া এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বংশ-
ধরেরা অদ্যাপি এখানকার ভূমি ভোগ দখল করিতেছেন।
এখানে জুতা ও কার্পাসবস্ত্র তৈয়ার হইয়া নানাহানে বিক্রয়ার্থ
প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও চোলাই-
ভাটা আছে।

চক্ৰমক্ (দেশজ) প্রভামণ্ডল, উজ্জল্য।

চক্ৰমকানি, উজ্জলতা, প্রভা বিস্তার।

চক্ৰমকিপাথর, অগ্নিপ্রদ একরকম পাথর। ইহাতে ইম্পাত
দ্বারা জোরে আঘাত করিলে অগ্নিকণা বাহির হয়। যখন
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ দেশলাইর আবিষ্কার করিতে পারেন
নাই, সঙ্গে আগুন রাখিবার অল্প কোন সহজ উপায়ও
ছিলনা, তখন এদেশীয় লোকেরা এই পাথর ব্যবহার করি-
তেন। প্রত্যেক ঘরেই আবশ্যকমত ইহা হইতে আগুন বাহির

করিয়া কার্যনির্বাহ করা হইত। একখানি শুকনা শোলা বা যাহা সহজেই আগুনে ধরে এমন কোন পদার্থ রাখিয়া তাহার উপরে চক্ৰমকি পাথরে একরূপভাবে আঘাত করিতে হয় যেন চক্ৰমকি হইতে নির্গত অগ্নি কণাগুলি দাহ পদার্থের উপরে পড়ে। তাহাতেই ঐ শোলা বা দাহ পদার্থ ধরিয়া ক্রমে আগুন বৃদ্ধি হয়। বিলাতী দেশলাই প্রচলিত হওয়া অবধি চক্ৰমকিপাথরের ব্যবহার একরূপ উষ্ণিয়া গিয়াছে।

চক্ৰমণি, ত্রিহত জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ইহাতে ৮৮খানি গ্রাম আছে। বিচারকার্য্য দ্বারভাঙ্গার মুন্সিফ আদালতের এলাকাধীন। এই পরগণা দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণপূর্ব অংশের উত্তরসীমা জখালপুর ও অহিলবাড়, দক্ষিণে হামিদপুর, পূর্বে তর্সান ও উত্তরে উঝারা, পশ্চিমে ভানবাড় ও উঝারা। বাঘমতী, কমলা ও করাই নদী এই পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সিংহিয়া, হরদেব, সলাপুর, সুলহোল ও হযৌরী নামক গ্রামগুলি প্রসিদ্ধ। হযৌরী গ্রামে নীলকুঠী ও বাজার আছে।

চক্ৰমা, চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী প্রদেশবাসী এক জাতি। কাহারও মতে—ইহার। খেয়োদ্ধা জাতির এক শ্রেণীভূক্ত। [খেয়োদ্ধা দেখ।] কোথাও ইহার। শক ও কোথাও ঠেক নামে খ্যাত।

চক্ৰমদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—

১, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ও চন্দ্রানগরে তাঁহাদের বাস ছিল, খ্রীস্ট ১৪শ শতাব্দে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া এখানে আসিয়া তাঁহারা বসবাস ও এখানকার রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ২, পূর্বকালে চক্ৰমদিগের আদিপুরুষেরা মলয় উপদ্বীপ হইতে এখানে আসিয়াছে। ৩, আরাকানরাজকে জয় করিবার জন্য চট্টগ্রামের উজীর মোগলসৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন, উজীর একজন বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় উপহার গ্রহণ না করায়, তাঁহার ইচ্ছাজান-বলে প্রেরিত মোগলসৈন্ত পরাজিত হয়। আরাকানরাজ তাহাদিগকে আপনাদের কৃতদাস করিয়া রাখেন। তাহারা দেশীয় রমণী বিবাহ করিয়া ও রাজার নিকট কর্ম লইয়া বাস করিতে থাকে। চক্ৰমারা তাহাদেরই বংশধর। পূর্বে চক্ৰমা রাজ্যদিগের মধ্যেও “খান” উপাধি দৃষ্ট হইত।

যাহা হউক, চক্ৰমারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোন জাতি-সম্প্রদায় তাহা ঠিক জানা যায় না। আরাকানী সম্রাটদিগের সহিতও তাহাদের কোন সংস্রব নাই। খান উপাধি দৃষ্টেও ইহাদিগকে মোগলজাতীয়

বলিতে পারা যায় না, কারণ মোগল-শাসনের সময় হইতে অনেক হিন্দুরাজ ও “খান” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে চট্টগ্রামের মোগলশাসনকর্তার অনুকরণে চক্ৰমা সন্দেহেরা যে “খান” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহাদের মধ্যে তিনটা প্রধান শ্রেণী আছে—চক্ৰমা, দোইজনক, তুঙ্গজৈন্ত বা তংজৈন্ত। এতদ্ব্যতীত এই তিন শ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি “গোজ” বা গুজ আছে। যথা—চক্ৰমা শ্রেণীর মধ্যে অম্বু, বাম্বু, ইচপোচা, কলা, কুর্ঘা, কুতুরা, কুরা, কেংরাগতি, খেঁষ, থিওজ্জৈ, বড়ুবা, বর্বরা, বতলিয়া, বোগ, বোরমেগে, বুং, বুংজা, দরজিয়া, দবিন্, ধওনা, ধুর্ঘিয়া, লরমা, লেবা, লঙ্গরা, মোলিমা, পীরভঙ্গা, ফেহুংসা ইত্যাদি।

তংজনাদিগের মধ্যে আকুয়াই, বাদাল, বাঙ্গাল, ভুমর, ইচা, কড়ুই কল্লয়া, মঙ্গলা, পুমা ইত্যাদি।

প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের প্রথাব্যবহার রাজনৈতিক কার্য্যাদির যে রূপ ব্যবহা ছিল, এই চক্ৰমা জাতিরও সেইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক একজন “দেওয়ান” আছেন। ঐ “দেওয়ান” পদ এক্ষণে তাহার বংশানুগত উপাধি ও কর্মস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুঙ্গজৈন্তেরা এই দেওয়ানকে “অহন” বলিয়া থাকে। এই ব্যক্তি করসংগ্রহ করিয়া কতকাংশ নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ জাতীয় সন্দারকে দিয়া থাকে।

বিবাহাদি বা কোন পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে দেওয়ান তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দেয় এবং ঐ সম্পর্কে যদি কোন জরিমানা আদায় হয় তাহাও সন্দার সমীপে পাঠাইতে বাধ্য হয়। যেখানে ইহাদের সংখ্যা অধিক সেখানে দেওয়ান নিজ অধীনে ‘খেজা’দিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু ২৪।২৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যুবকদিগকে অববিবাহিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ পিতা মাতা বা পুত্র কন্যা অনুসন্ধান করে। পরে বরের পিতা এক বোতল মদ্য লইয়া কন্যার বাড়ী যায় এবং কন্যার পিতাকে বলে যে “আপনার বাটার নিকটে একটা সুন্দর বৃক্ষ দেখিতেছি, আমি ইহার ছায়ায় বসন করিতে ইচ্ছা করি।” অন্তঃপর সসম্মানে বিদায়গ্রহণপূর্বক যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার কালে যদি বরের পিতা শুভ চিহ্নাদি দেখিতে পান, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। পুনর্বার অপর এক সময়ে বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় কুটুম্বেরা

একত্র হইয়া বিবাহের অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় চুক্তি করিয়া লয়। বর কস্তার বাড়ীতে আসিয়া কস্তার সহিত একখানি ক্ষুদ্র তক্তার উপর বসে এবং বরের পশ্চাতে “সোবারা” ও কস্তার পশ্চাতে “সোবারা” নামে এক এক জন পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া থাকে। ইহারা সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বর ও কস্তাকে গাঁটছড়া দিয়া আবদ্ধ করে। এই সময় নবদম্পতী একত্র ভোজনে বসে এবং বর কস্তাকে এবং কস্তা বরকে পরস্পর ভোজন করাইয়া দেয়। ভোজন শেষ হইলে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের মস্তকে নদীর জল ছিটাইয়া দিলে উভয়ে পতিপত্নীরূপে গণ্য হয়। সকল বিবাহই এরূপ সুন্দর প্রথায় সম্পন্ন হয় না। কোথাও কোথাও পাত্র স্বয়ং কস্তা মনোনীত করিয়া লয়। কিন্তু পিতামাতা এ বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন না। এরূপ স্থলে পাত্রী পাত্রের সহিত পলায়ন করে; যদি পাত্রীর পিতা এ বিবাহের বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা হইলে বিবাহ নামঞ্জুর হইতে পারে এবং পাত্রী তাহার নামকের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্বে যদি কোন স্ত্রীলোক পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে কোনরূপ বিশেষ সাজা পাইতে হয় না, বিবাহ হইয়া গেলে তাহার পূর্বকৃত অপবাদ ঘুচিয়া যায়। কোন পুরুষ বালিকাধারণ করিলে তাহাকে ৬০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। কোন স্ত্রীলোক গ্রামাসভায় বিবাহ-চ্যুতির আবেদন করিলে তাহাকে পূর্বপ্রদত্ত কস্তাপণ, বিবাহের খরচাদি ও অতিরিক্ত ৫০ কি ৬০ টাকা জরিমানা-রূপ স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে হয়।

বিধবারা নিজ দেবরকে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল সময়ে বিবাহ করিতে বাধ্য নহে।

চক্রাদিগের মধ্যে অশ্রেণী বা থাকে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহারা মাতুলগোত্রে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদিগকে সৎমা, মাসী, ভগিনী, ভাগিনেময়ী, মাতুলকস্তা, পিসির কস্তা, স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কে বিবাহ করিতে নাই, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহার বনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহাদের বৌদ্ধধর্ম পূর্ববঙ্গের হিন্দুধর্মের বহু ক্রিয়া-কলাপে রঞ্জিত দেখা যায়, এরূপ ভাব চক্রগারাজ ধর্মবন্ধ্য ণী ও তদীয় পত্নী কালিন্দীরায়ীর সময় হইতেই ঘটয়াছে। রাণী কালিন্দী সমস্ত হিন্দুপূজাদি পালন করিতেন এবং কাণীর প্রাত্যহিক পূজার জন্য চট্টগ্রাম হইতে একজন

ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল রাজার মৃত্যুর পর আরাকান প্রদেশ হইতে একজন বৌদ্ধ কৃষ্ণ আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ চেষ্টা পান। তাহারই যত্নে পরিশেষে রাণী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মে আস্থা প্রদর্শন করেন।

তুঙ্গজৈন্তেরা লক্ষ্মীমাতার উপাসনা করে। বৌদ্ধধর্ম প্রাবর্তিত হইবার পূর্বে ইহারা যে অসভ্য ছিল, তাহা অদ্যাপি “শোনবাসা” পর্কে লক্ষিত হয়। তৎকালে ইহারা মশা, জলশ্রোত, বিহুচিকা, অর প্রভৃতির পূজা ও তত্পলকে জীবাদি উৎসর্গ করে।

কিছুদিন হইল বৈরাগী বৈষ্ণবেরা পার্কৃত্য প্রদেশ পরিদর্শনে বাইয়া চক্রাদিগের মধ্যে অনেকগুলি শিষ্য করিয়াছেন। ইহারা সকলেই তুলসীমালা লইয়া হরিনাম জপ করে। কোন মাছ মাংসাদি ভোজন করে না।

ইহারা মৃতদেহ দাহ করে। শবের মস্তক পশ্চিমমুখে রাখে। ওলাউঠা বা বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে পুঁতিয়া ফেলে। যদি ডাইনের উপদ্রবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এরূপ জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বিথণ্ড করিয়া বাস্মমধ্যে রাখিয়া পোড়ান হয়। মৃত্যুর সাতদিন পরে পুরোহিত বাইয়া মৃতের মঙ্গলকামনায় মন্ত্রপাঠ করে। মাসের শেষেও এইরূপ করিবার নিয়ম আছে।

ইহারা ‘কুম’ প্রণালীতে চাষ করিয়া জীবিকানির্ভাহ করে। ইহাদের “নবান্ন” পর্কে বিশেষ ধুমধাম হইয়া থাকে।

চক্রমুকী (তুর্কীশব্দ) [চক্রমুকী পাথর দেখ।]

চক্র (পুং) ক্রিয়তে হনেন ক্র-ঘঞার্থে ক নিপাতনাৎ দ্বিত্বং।

১ চক্রবাক পক্ষী। [চক্রবাক দেখ।] (স্ত্রী) ২ রথাস, চলিত কথায় চাকা বলে। “যথাহেকেন চক্রেণ রথশ্চ ন গতির্ভবেৎ।” (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৫১)

৩ সৈন্ত। ৪ সমূহ, সমুদায়। ৫ রাষ্ট্র, রাজ্য দেশ।

“অবিচালিতচাকচক্রয়োঃসুভাগাঃপূতসোঃশ্রিরা।” (মাঘ)

৬ দস্তবিশেষ। ৭ কুস্তকারের মৃদুপ্রভৃতি প্রভৃতি নির্মাণোপযোগী উপকরণ বিশেষ।

“মৃদুপ্রভৃতিচক্রসংযোগাৎ কুস্তকারো যথা ঘটম্।”

(যাজ্ঞ ৩.১৪৬)

৮ অস্ত্রবিশেষ, চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার একপ্রকার সাংগ্ৰাহিক অস্ত্র, পূর্বকালে যুদ্ধ সময়ে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হইত। শুক্রনীতির মতে এই অস্ত্র তিনপ্রকার—উত্তম, অধ্যম ও মধ্যম। চক্র আটটি শলাকাযুক্ত হইলে উত্তম, ছয়টি শলাকাযুক্ত হইলে মধ্যম এবং চারিটি শলাকা থাকিলে সেই চক্রকে

অধম বলে (১)। আবার পরিমাণভেদে চক্র তিন প্রকার হইয়া থাকে, বালকের পক্ষে দ্বাদশপলে যে চক্র নির্মিত হয় তাহা উত্তম, একাদশপলে নির্মিত হইলে মধ্যম ও দশপলে বাহা নির্মিত হয়, তাহাকে অধম বলে। কিন্তু যুবকের পক্ষে পঞ্চাশপল ওজনের চক্র উত্তম, ৪০ পল ওজনের চক্র মধ্যম ও ৩০ পল ওজনের চক্র অধম। বিস্তার ভেদেও তিন প্রকারের চক্র হইয়া থাকে। বালকের পক্ষে আট আঙ্গুল বিস্তৃত চক্র উত্তম, ৭ আঙ্গুল বিস্তৃত মধ্যম ও ৬ আঙ্গুল বিস্তৃত চক্রকে অধম জানিবে। যুবকের পক্ষে ষোল আঙ্গুল উত্তম, ১৪ আঙ্গুল মধ্যম ও ১২ আঙ্গুল চক্র অধম (২)। চক্রের নেমি সৈক্যালোহা দ্বারা নির্মাণ করিতে হয়। নেমির পরিমাণ তিন আঙ্গুল হইলে উত্তম, ২½ আঙ্গুল হইলে মধ্যম ও ২ আঙ্গুল নেমিকে অধম বলে। চক্রটি ও সৈক্য লোহেতেই প্রস্তুত করিবে। ইহার মুখ ধারাল করিতে হয়। (হেমাদ্রি পরিশিষ্ট।)

২ বাহুবিশেষ। [বাহুচক্র শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ১০ জলাবর্ত। (মেদিনী) ১১ গ্রামজাল। (ত্রিকাণ্ড) ১২ তগরপুষ্প। (রাজনি) ১৩ তৈলযন্ত্র।

“স্নেহময়ান্ পীড়য়তঃ কিং চক্রেণাপি তৈলকারন্ত।”
(আর্য্যাসপ্তশতী ৫২২।) ১৪ তন্ত্রোক্ত মূলধারাদি নামক ষট্-পদ্য। [মূলধারাদি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ১৫ সর্পতো-ভদ্রাদি। ১৬ দেবতার্চন যন্ত্র।

“শ্রীচক্রমেতচ্ছিতং পরদেবতায়াঃ।” (তন্ত্রসাং)

১৭ অকড়মাদি, এই সকল চক্র মন্ত্রোচ্চারের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ১৮ অলঙ্কারশাস্ত্র প্রসিদ্ধ কাব্যবন্ধ বিশেষ। [অলঙ্কার দেখ।] ১৯ ভৈরবী প্রভৃতি চক্র। তন্ত্রশাস্ত্রে তন্ত্রচক্র নামে ভৈরবীচক্রের উল্লেখ আছে। নিকাম ব্যক্তিই সেই চক্রের অধিকারী। [ভৈরবীচক্র দেখ।]

ঋত্নযামলে মহাচক্র, রাজচক্র, দিব্যচক্র, বীরচক্র ও পশু-চক্র এই পাঁচপ্রকার চক্রের কথা আছে। এই সকল চক্রে সকাম ব্যক্তির অধিকার। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ তত্ত্ব শ্লোকে দ্রষ্টব্য।] মঙ্গের শুভাশুভ বিচারের জন্ত কতকগুলি চক্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া আর কতকগুলি চক্রের কথা

আছে, কিন্তু আধুনিক তান্ত্রিকগণ সেই সকল চক্রের ব্যবহার করেন না।

অরোদর গ্রন্থে ২০টা স্বরচক্র ও ৬৪টা সর্পতোভদ্রাদি, সর্পসমেত ৮৪টা চক্রের উল্লেখ আছে। জয় পরাজয় প্রভৃতি ও শুভাশুভ নিরূপণ করিবার জন্ত এই সকল চক্রের প্রয়োজন।

স্বরচক্র যথা।—১ মাজিচক্র, ২ বণস্বরচক্র, ৩ গ্রহস্বরচক্র, ৪ জীবস্বরচক্র, ৫ রাশিস্বরচক্র, ৬ ঋক্ষস্বরচক্র, ৭ পিণ্ডস্বরচক্র, ৮ যোগস্বরচক্র, ৯ দ্বাদশবার্ষিকস্বরচক্র, ১০ ঋতুস্বরচক্র, ১১ মাসস্বরচক্র, ১২ পক্ষস্বরচক্র, ১৩ তিথিস্বরচক্র, ১৪ ঘট-স্বরচক্র, ১৫ তিথিবার্ষিকাদিস্বরচক্র, ১৬ তাৎকালিক দিনস্বর-চক্র, ১৭ দিক্চক্র ও ২০ দেহজস্বরচক্র।

সর্পতোভদ্রাদি চক্র—১ সর্পতোভদ্র, ২ শতপদ, ৩ অংশ, ৪ ছত্রভয়, ৫ সিংহাসন, ৬ কূর্ম, ৭ পদ্ম, ৮ ফলীশ্বর, ৯ রাহুকালানল, ১০ সূর্য্যকালানল, ১১ চন্দ্র-কালানল, ১২ ঘোরকালানল, ১৩ গুটুকালানল, ১৪ শশি-সূর্য্যকালানল, ১৫ সংঘট্ট, ১৬ কুলাকুল, ১৭ কুম্ভ, ১৮ প্রস্তার, ১৯ তুষর, ২০ তুষর, ২১ ভূচর খেচর, ২২ পথ, ২৩ নাড়ী, ২৪ কাল, ২৫ সূর্য্যাকালী, ২৬ ছত্রাকালী, ২৭ কবি, ২৮ বল, ২৯ কোট, ৩০ গজ, ৩১ অশ্ব, ৩২ রথ, ৩৩ বাহ, ৩৪ কুম্ভ, ৩৫ খজা, ৩৬ ছুরিকা, ৩৭ চাপ, ৩৮ শনি, ৩৯ সেবা, ৪০ নর, ৪১ ডিম্ব, ৪২ পক্ষী, ৪৩ বর্গ, ৪৪ আয়, ৪৫ বিরিকি, ৪৬ সপ্ত-শলাক, ৪৭ পঞ্চশলাক, ৪৮ চক্র, ৪৯ ভাস্কর, ৫০ প্রথম-মাতৃকা, ৫১ দ্বিতীয়মাতৃকা, ৫২ তৃতীয়মাতৃকা, ৫৩ বিজয়, ৫৪ শ্রেন, ৫৫ তোরণ, ৫৬ অহি, ৫৭ চন্দ্রশ্লোমতি, ৫৮ জীব, ৫৯ লাল্লল, ৬০ বীজোপ্তি, ৬১ বৃষ, ৬২ সপ্তনাড়ী, ৬৩ সংবৎ-সর ও ৬৪ হানচক্র। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।] বৃহৎসংহিতায় অন্তর, যুগ, খচক্র ও বাতচক্র এই চারিটা চক্রের বিষয় লিখিত আছে।

উপরে যে সকল চক্রের কথা লিখিত হইয়াছে তাহার কএকটির বিবরণ যথাস্থানে লিখিত না হওয়ায় এইস্থানে লিখিত হইল।

অংশচক্র।—এই চক্রটি ঋত্নযামল সম্বন্ধ। উর্দ্ধগামী অষ্টাবিংশতিটা রেখা টানিয়া তাহার উপরে ত্রিধা-ভাবে আবার অষ্টাবিংশতিটা রেখা টানিবে। ইহারই নাম অংশচক্র। ঈশানকোণের রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাবিংশতি রেখায় যথাক্রমে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের পাদ-দ্যোতক অক্ষর বিহীন করিবে। জুতিজিৎটিকেও ইহাতে একটা নক্ষত্র বলিয়া ধরিতে হয়। নক্ষত্রের পাদদ্যোতক অক্ষর যথা—অ, ই, উ, এ ও ব বিবুঃ। বে বো ক

(১) “অষ্টার সূত্রমঃ চক্রং বড়ারং মধ্যমঃ ভবেৎ।

জঘন্তঃ চতুরারং স্তাৎ ইতি চক্রং ভবেৎত্রিধা।” (হেমাদ্রি)

(২) “দ্বাদশৈকাদশ দশ পলাদি ক্রমশঃ শিশোঃ।

অবালন্ত ধিরষ্টোহ্যঃ বিঃসপ্ত দ্বাদশাপিচঃ।

বালানাং ত্রিবিধং চক্রমষ্ট-সপ্তযজ্ঞম্।

যোড়শাঙ্গুলমন্তেবাং দ্বিহীনে মধ্যমাধমে।” (হেমাদ্রি পরিশিষ্ট)

কি ৫। কু. ব. ও. ছ. ৬। কে. কো. হ. হি. ৭। ছ. হে. ছো. ড. ৮।
ডি. ডে. ডো. ৯। ম. মি. মু. মে. ১০। মো. ট. টি. টু. ১১। টে. টো.
প. পি. ১২। পু. ষ. ঞ. ১৩। পে. পোর. রি. ১৪। র. রে. রো. ত. ১৫।
তি. তু. তে. তো. ১৬। ন. নি. ছু. নে. ১৭। নো. য. যি. যু. ১৮।
যে. যো. ত. ভি. ১৯। ভু. ধ. ফ. চ. ২০। ভে. ভো. জ. মি. ২১।
জু. জে. জো. ব. ২২। গ. গি. গু. গে. ২৩। গো. শ. শি. শু. ২৪।
শে. শো. দ. দি. ২৫। ছ. থ. ঝ. ঞ. ২৬। দে. দো. চ. চি. ২৭।
চু. চে. চো. ল. ১। জি. লু. লো. ২। এইরূপে যথাক্রমে অক্ষরবিশ্তাস করা হইলে যে গ্রহ যে নক্ষত্রের
যে পাদে অবস্থিত, তাহাকে সেইস্থানে স্থাপন করিবে। ইহার পরে সেই রেখাস্থিত বর্ণ কয়টির পরস্পর বেধ করিয়া
দিবে। নক্ষত্রের চতুর্থপাদে গ্রহ থাকিলে আদি, ও আদিতে থাকিলে চতুর্থ,
দ্বিতীয়ে থাকিলে তৃতীয় ও তৃতীয়ে থাকিলে দ্বিতীয়পাদ বিদ্ধ হয়।
অংশচক্রের বেধামুসারে যদি মনুষ্যের নামের আদ্য অক্ষর শুভগ্রহ দ্বারা
বিদ্ধ হয়, তবে হানি হইয়া থাকে। এইরূপ নামের আদ্য অক্ষর ক্রুরগ্রহ
কর্তৃক বিদ্ধ হইলে নানাবিধ রিষ্ট ও দুই বা ততোধিক গ্রহ দ্বারা
বিদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। নামের আদ্য অক্ষর উভয়স্থিত
ক্রুর গ্রহদ্বারা বিদ্ধ হইলে মৃত্যু, একটা ক্রুর ও অপর একটা শুভগ্রহ
কর্তৃক বিদ্ধ হইলে বিয় এবং উভয় শুভগ্রহ দ্বারা বেধে ব্যাধি, পীড়া ও
বহন ঘটয়া থাকে। অংশচক্রে নক্ষত্রের যে পাদ গ্রহবিদ্ধ হয়, সেই
পাদে বিবাহে বৈধব্য, যাত্রা করিলে মহাভয়, রোগ উৎপত্তি হইলে
মৃত্যু ও সংগ্রামে ভঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপ বিদ্ধ নক্ষত্রপাদাশ্রিত
পর্বত, সাগর, নদী, দেশ, গ্রাম ও পুর বিনষ্ট হয়। যে দিনে চক্র
যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিত করে, সেই নক্ষত্রের সেই পাদ যদি চক্র
ভিন্ন অপর গ্রহ কর্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে সেই সময়ের মধ্যে কোন
শুভকার্য্য করিতে নাই, করিলে অমঙ্গল ঘটয়া থাকে। (নরপতিজয়চর্যা)

অয়নচক্র—এই চক্রটি স্বরোদয় প্রকরণে প্রয়োজনীয়।
অয়নস্বরচক্র এইরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। যথা—

অ	ই	উ	এ	ও
দক্ষিণায়ণ শ্রবণাদি	উত্তরায়ণ	অ. স্বরোদয় ১৬।	দিনাদি ২১। ৪৯	

অয়নস্বর চক্রের প্রয়োজন ও অপর বিবরণ স্বরোদয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

অংশচক্র।—একটা ঘোটকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার মুখাদি ক একটা অবয়বে জন্ম নক্ষত্র ক্রমে অষ্টা-
বিংশতি নক্ষত্র বিস্তার করিবে। মুখ, চক্ষু, কণ্ঠ, মস্তক, পুচ্ছ ও পাদযুগল এই নয়টা অবয়বে যথাক্রমে দুই
দুইটা করিয়া আঠারটা ও উদরে পাঁচটা এবং পৃষ্ঠে পাঁচটা নক্ষত্র
স্থাপন করিতে হয়। ইহারই নাম অংশচক্র। নক্ষত্রে সূর্য্যের
অবস্থিতি অনুসারে অংশচক্রের মুখ, চক্ষু, উদর বা মস্তকে
সূর্য্যের অবস্থান হইলে অর্থাৎ সূর্য্যাস্থিত নক্ষত্র ইহার কোন
স্থানে থাকিলে যুদ্ধ জয় হয়। শনি গ্রহাশ্রিত নক্ষত্রটি
অংশচক্রের কণ্ঠ, পুচ্ছ, পাদ বা পৃষ্ঠে থাকিলে বিভ্রম, ভঙ্গ ও
হানি ঘটয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে সূর্য্যাস্থিত নক্ষত্র থাকিলে
পটু বস্ত্র পরিধান, যাত্রা ও যুদ্ধের উদ্যোগ করিবে না,
করিলে বিপদ ঘটে। (নরপতিজয়চর্যা)

অহিচক্র—কোন কোন পুস্তকে অহিবলচক্র নামেও ইহার উল্লেখ আছে। এই চক্র দ্বারা নিধি অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত
রত্ন প্রভৃতি বাহির করা যাইতে পারে। চারি হাতে একবংশ হয়,
বিংশতিবংশপরিমিত ক্ষেত্রকে নিবর্ত্তন বলা যায়। যে
নিবর্ত্তন ক্ষেত্রের মধ্যে নিধি প্রভৃতি আছে, তাহার কোন
একস্থানে অহিচক্র স্থাপন করিতে হয়, উর্দ্ধদিকে আটটা
রেখা টানিয়া তাহার উপরে ত্রিযুগ্গভাবে পাঁচটা রেখা
টানিলে একটা অষ্টাবিংশতি কোষ্ঠচক্র অঙ্কিত হইবে,
তাহার প্রথমপঙ্ক্তিতে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা,
মঘা, পূর্বাফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী এই সাতটা, দ্বিতীয়
পঙ্ক্তিতে পূর্বভাদ্র, উত্তরভাদ্র, শতভিষা, রোহিণী, অশ্লেষা,
পুষ্যা ও হস্তা এই সাতটা, তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অভিজিৎ,
শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, মঘা, পুনর্ব্বসু ও জ্যেষ্ঠা এই
সাতটা, চতুর্থ পঙ্ক্তিতে পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মূল্য, জ্যেষ্ঠা,
অশ্বরাধা, বিশাখা ও স্বাতী বিস্তার করিবে। এই প্রকারে
সম্পূর্ণতা চক্র হয়। মঘা ও ভরণী এই দুইটা নক্ষত্রদ্বারের
উভয়পার্শ্বস্থিত এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রকে অহির মুখ জানিবে।
ইহার মধ্যে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা,
মঘা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রবণা, পূর্বভাদ্র ও
রেবতী এই কয়টা নক্ষত্র চক্রের, ইহা ছাড়া অপর নক্ষত্র
সূর্য্যের জানিবে। প্রায় সময় পর্য্যন্ত চক্র নক্ষত্রের যত
দণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহার নাম উদয়াদিগত নাড়ী।
উদয়াদিগত নাড়ীকে ২৭ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে
৬০ দ্বারা ভাগ করিবে বাহা লব্ধ হইবে, তাহা চক্রভুক্ত নক্ষ-

জের সহিত যোগ করিলে যদি ২৭এর অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই ভুক্ত নক্ষত্রের সংখ্যা জানিবে এবং ৬০ বার। ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভুক্তমান নক্ষত্র শরীর জানিবে। যে কোণে ভুক্তমান নক্ষত্র পতিত হয়, তথায় চক্রস্থাপন করিবে। ইহাকে অহিচক্র শ্রুত তাত্‌কালিক চক্র বলে। এই প্রক্রিয়া অনুসারে তাত্‌কালিক সূর্য্য ও স্থাপনা করিতে হয়। ফল—যদি চক্র নক্ষত্রে অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত অখিনী প্রভৃতিতে তাত্‌কালিক চক্র ও সূর্য্য থাকে, তবে নিশ্চয়ই নিধি আছে, আর যদি সূর্য্য নক্ষত্রে তাত্‌কালিক চক্র ও সূর্য্য অবস্থিত হয়, তবে শলা আছে জানিবে। তাত্‌কালিক চক্র ও সূর্য্য স্বীয় স্বীয় নক্ষত্রে স্থিত হইলে চক্রস্থানে নিধি ও সূর্য্যস্থানে শলা থাকে। চক্র সূর্য্যনক্ষত্রে ও সূর্য্য চক্রনক্ষত্রে থাকিলে নিধি বা শলা কিছুই নাই স্থির করিতে হয়। তাত্‌কালিক চক্র ক্রুরযুক্ত হইলে নিধি বা দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং শুভগ্রহ-যুক্ত হইলে পাওয়া যায়। চক্রে অপরাপর গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে স্তব্ধ প্রভৃতি কোন দ্রব্য মৃত্তিকার নীচে আছে তাহা নিশ্চয় করা যায়। [ইহার অপর বিবরণ রত্নোক্তার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

আয়চক্র।—পূর্ব্বপশ্চিমে চারিটা সরল রেখা টানিয়া তাহার উপরে উত্তরদক্ষিণে আর চারিটা সরলরেখা টানিবে। ইহাতে নবকোষ্ঠযুক্ত একটি চক্র উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যকোষ্ঠটি পরিত্যাগ করিয়া অপর আটটিকে অষ্টদিক্ বলিয়া কল্পনা করিবে। ধ্বজ, ধূম্র, সিংহ, কুকুর, সৌরভেয়, ধ্বজ, গর্দভ ও হস্তী ইহার প্রতীপদিক্রমে তিথিভুক্তি প্রমাণানুসারে এই আটদিকে উদ্ভিত হইয়া এক প্রহর পরে তৎপরবর্তী দিকে যায়, এই নিয়মে দিন রাত্রিতে আটটি দিক্ ভ্রমণ করে। যেমন প্রতীপদ্ তিথিতে প্রথম মাসে ধ্বজ পূর্ব্বদিকে উদ্ভিত হয়, প্রথম যাম অতীত হইলে অগ্নিকোণে চলিয়া যায়, তথায় এক প্রহর থাকিয়া দক্ষিণ দিকে যায়। এই নিয়মে প্রতীপদ্ তিথির অষ্টপ্রহরে যথাক্রমে ধ্বজ আটটি দিক্ ভ্রমণ করে। এই প্রকার দ্বিতীয়া প্রভৃতি তিথিতে ধূম্র প্রভৃতির উদয় ও ভ্রমণ জানিবে। ধ্বজ প্রভৃতির উদয় অনুসারে গ্রন্থের শুভাশুভ নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রমুখকালে ধ্বজাদির কোন একটীর উদয় বা অবস্থিতি পূর্ব্বদিকে হইলে মহাশাস্ত্র, অগ্নিকোণে মরণ, দক্ষিণে বিজয় ও সৌখ্য, নৈঋত কোণে বন্ধন ও মৃত্যু, পশ্চিমে সর্ব্বশাস্ত্র, বায়ুকোণে হানি, উত্তরে ধন ধান্য এবং ঈশাণকোণে উদয় বা অবস্থিতি হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। সৌরভেয়, সিংহ ও ধ্বজ ইহাদের

উদয়ে বা অবস্থানে ঐ সকল ফল অতীত, ধ্বজ ও গর্দভে বর্ত্তমান এবং ধূম্র, কুকুর বা হস্তীর উদয়ে বা অবস্থানে ফল পরে হইবে এইরূপ নিরূপণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া বৃষ ও ধ্বজে ফল সমীপস্থ, গজ ও সিংহে দূরস্থ, কুকুর ও গর্দভে মাগস্থ এবং ধূম্র ও ধাতুক্ষে নিষ্ফল নিশ্চয় করিতে হয়। পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণে ভাবের উদয়ে বা অবস্থানে মূলচিন্তা, দক্ষিণ, নৈঋত ও পশ্চিমে ধাতু এবং উত্তরে ভাবের উদয় বা অবস্থানে জীবচিন্তা নির্ণয় করিতে হয়। [ঋকস্মরণচক্রের বিবরণ নক্ষত্র-চক্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ঋতুস্বর চক্র—অকারাদি পাঁচটা স্বরে যথাক্রমে বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর উদয় হয়। প্রত্যেক স্বরে ৭২ দিন উদয় হইয়া থাকে। অন্তরোদয়ের পরিমাণ ৬ দিন ৩২ দণ্ড ও ৩৪ ফল। বর্গস্বরোদয় প্রকরণে ইহার প্রয়োজন হয়। ঋতুস্বর-চক্রের প্রতিকৃতি এইরূপে অঙ্কিত করিতে হয়।

ঋতুস্বর চক্র।

অ ৭২	ই ৭২	উ ৭২	এ ৭২	ঙ ৭২
বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হিম
বৈশাখ ১৮	জ্যৈষ্ঠ ১৮	শ্রাবণ ৬	কার্ত্তি ২৪	পৌষ ১২
মুর্শাভা ১৮	আষাঢ় ৩০	ভাদ্র ৩০	অগ্র ৩০	মঘ ৩০
পৌষ ১৮	শ্রাবণ ২৪	আশ্বিন ৩০	পৌষ ১৮	ফাল্গুন ৩০
৭২	৭২	৭২	৭২	৭২
অন্তরোদয় দিনাদি ৬৩১৫৩				

কবিচক্র—মুদ্রযাত্রা শব্দে ইহার বিবরণ জ্ঞাতব্য।

কালচক্র—উর্দ্ধদিকে দশটা রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্ঘাকভাবে চারিটা রেখা টানিলে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠযুক্ত একটি চক্র হয়, ইহার উপরের পঙ্ক্তিতে যে দিনে এই প্রক্রিয়া করিবে, সেইদিনের নক্ষত্র প্রভৃতি নয়টি নক্ষত্র স্থাপন করিবে এবং দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে তৎপরবর্তী নয়টি নক্ষত্র ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অপর নয়টি নক্ষত্র যথাক্রমে স্থাপন করিবে। ইহার মধ্যে ঋকস্মরণবর্জিত চতুর্দশীগত বেদ করিবে। [নাড়ীচক্র দেখ।] সর্পাকার এই চক্রের নাম কালচক্র। মধ্যস্থিত তিনটি নক্ষত্রকে কালের মুখ ও কোণস্থিত নক্ষত্রদ্বয়কে কালের দংষ্ট্রা বলে। যে দিন যাহার নাম নক্ষত্র এই চক্রানুসারে কালের মুখে বা দংষ্ট্রার পতিত হয়, সেই দিন কোন শুভকর্ম্ম করিতে নাই, করিলে বিপদ হয়। ইহা ছাড়া অন্য অবয়বে নাম নক্ষত্র থাকিলে শুভ হয়। নাম নক্ষত্র দংষ্ট্রা বা মুখগত হইলে জর, নষ্ট

দক্ষ ও বিবাদ প্রভৃতিতে যুত্মা ঘটনা থাকে অথবা মহাত্ম্য উপস্থিত হয়।

কুস্তচক্র—এই চক্রাঙ্কসারে যাত্রার শুভাশুভ ফল নিরূপণ করা যাইতে পারে। তিথ্যাক্ষ রেখাদি দ্বারা কুস্তের ন্যায় একটা চক্র অঙ্কিত করিবে। চক্রের উর্দ্ধাধোদিকে একান্তর কোঠে শূন্য দিবে। যে কোঠে শূন্য পড়ে, সেই সেই কোঠকে রিক্ত ও অপর কোঠকে পূর্ণ বলে। পরে তদ্বিনে যে নক্ষত্রে সূর্য্য থাকে, সেই নক্ষত্র হইতে সমস্ত নক্ষত্র ঐ চক্রে নিবেশিত করিবে। রিক্ত কোঠে যে নক্ষত্র পতিত হয়, তাহাতে যাত্রা করিলে মনোভীষ্ট নিফল ও পূর্ণ কোঠে যে নক্ষত্র, তাহাতে যাত্রা করিলে অভীলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে।

কুলাকুলচক্র—ইহার বিবরণ কুলাকুল শব্দে দ্রষ্টব্য। ইহা দ্বারা তিথি, বার ও নক্ষত্রের মধ্যে কোনটা কুল, কোনটা অকুল এবং কোনটা কুলাকুল তাহা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

কুস্তচক্র—এই চক্রাঙ্কসারে যুদ্ধের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। কুস্তাঙ্গের দ্বারা একটা চক্র প্রস্তুত করিয়া যেদিন কার্য্য করিবে, সেই দিনের নক্ষত্র হইতে নয়টা কুস্তের ধারাল স্থানে, তৎপরবর্তী নয়টা দণ্ডে এবং তৎপরবর্তী নয়টা নক্ষত্র কুস্তের পৃষ্ঠে স্থাপন করিবে। নাম নক্ষত্র কুস্তের ধারাল স্থানে পড়িলে যুদ্ধে মৃত্যু ও দণ্ডে পড়িলে যুদ্ধে জয় হয় এবং পৃষ্ঠে পড়িলে জয় বা পরাজয় হয় না, সমান হইয়া থাকে।

কোটচক্র—এই চক্রটি আটপ্রকার হইয়া থাকে। ১ মুণ্ডয়, ২ জলকোটক, ৩ গ্রামকোট, ৪ গহ্বর, ৫ গিরি, ৬ ডামর, ৭ বক্রভূমি ও ৮ বিষম। অবস্থান্তরেও দুর্গের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে যথা—অতিদুর্গ, কলিকর্ণ, চক্রাবর্ত, টিকর, তলাবর্ত, পদ্ম, বক ও সার্কত। যে বর্ণের যে ভক্ষ্য বলিয়া নিরূপিত আছে, সেই দুর্গ হইতে তাহারা ভক্ষ্য দিয়া পলায়ন করে। অতএব দুর্গ বর্ণের ভক্ষ্য অথবা তন্মামক মনুষ্যকে দুর্গে রাখিবে না। অবর্ণের ভক্ষ্য গরুড়, কবর্ণের মাক্সার, চ বর্ণের সিংহ, ট বর্ণের কুকুরছানা, ত বর্ণের সর্প, প বর্ণের আয়ু, য বর্ণের গজ ও শ বর্ণের ভক্ষ্য মেঘ বা ছাগল, অবর্ণের পঞ্চম স্থানে খণ্ডভক্ষ্য হইয়া থাকে। অবর্ণ প্রভৃতি আটটা বর্ণ যথাক্রমে পূর্বাদিকে স্থাপন করিতে হয়। চতুরঙ্গ ত্রি নাড়িক একটি কোটচক্র নির্মাণ করিয়া তাহার বাহিরের কোটে কুস্তিকা, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, স্বাতী, বিশাখা, অমুরাধা, অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, অশ্বিনী ও ভরণী এই বারটা। প্রাকারে রোহিণী, পুনর্ভঙ্গ, ভার্গ্যা, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, উত্তর-

ফল্গুনী, শতভিষা ও রেবতী এই আটটা এবং মধ্যস্থানে যুগশিরা, আর্দ্রা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্র এই আটটা নক্ষত্র স্থাপন করিবে। পূর্বদিকে আর্দ্রা, দক্ষিণে হস্তা, পশ্চিমে পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরে উত্তরভাদ্র এই চারিটা নক্ষত্রকে স্তম্ভ বলে। কুস্তিকাদি ৩টা, মঘাদি ৩টা, অমুরাধাদি তিন ও বাসবাদি তিনটা প্রবেশ ও অবশিষ্ট ১৬টিকে নির্গম বলে। দুর্গ নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া গ্রাহাঙ্কসারে ফল স্থির করিতে হয়।

দুর্গনাম স্থিত বর্ণ যদি দুর্গের আদি স্থিত হয়, তবে সেই দিক হইতে ক্রমে এই কয়টা চক্র অঙ্কিত করিবে, চতুরঙ্গ, বর্জুল, দীর্ঘ, ত্রিকোণ, বৃত্ত দীর্ঘ, অর্ধচন্দ্র, গোহল ও ধমুরা-কুতি। চতুরঙ্গ যে প্রকার নক্ষত্র সন্নিবেশের কথা বলা হইয়াছে ইহাতেও প্রবেশ, নির্গম ও স্তম্ভ সেইরূপ জানিবে। দুর্গে ভিত্তি বিভাগ করিয়া যথাক্রমে নক্ষত্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবে। সেই সকল নক্ষত্রাশ্রিত গ্রাহাঙ্কসারে ফল স্থির করিয়া লইবে। যেস্থানে রাজ্য নক্ষত্র ও মধ্য নক্ষত্রে ক্রুরগ্রহ অবস্থিত, তথায় দুর্গ করিতে নাই, করিলে সমস্ত সৈন্য সামন্তের সহিত দুর্গ বিনষ্ট হয়। স্তম্ভ নক্ষত্র বা প্রবেশ নক্ষত্রে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র অবস্থিত হইলে যথাক্রমে সোম, বৃহস্পতি বা শুক্রবারে পুরের অবরোধ করা উচিত। এইরূপ প্রবেশ নক্ষত্রে বা স্তম্ভ নক্ষত্রে এবং লগ্নে মঙ্গল থাকিলে যুদ্ধে মঙ্গল হয়। ক্রুর-গ্রহ মধ্য থাকিলে পূর বিনষ্ট করে, প্রাকারে থাকিলে খণ্ড-কারক এবং বহিস্থ হইলে সমস্ত সৈন্যবিনাশক হইয়া থাকে। মধ্য ক্রুর ও বাহিরে শুভগ্রহ থাকিলে নগরাধিকার অবশ্য-স্বাভাবী, শত্রুপক্ষের ভেদ হয় অথবা তাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। বিনা যুদ্ধেই রাজ্য বা নগর লাভ হইয়া থাকে। মধ্য ভাগে চারিটা ক্রুরগ্রহ ও প্রাকারে সৌম্য থাকিলে আত্মবিচ্ছেদ হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ হইয়া থাকে। বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকৃত হয়। মধ্য সৌম্য ও বাহিরে ক্রুর থাকিলে দুর্গ অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রাকারে ক্রুর ও মধ্য সৌম্য থাকিলে দুর্গের বেষ্টক ভাঙ্গিয়া যায়। মধ্য নাড়ীতে সৌম্য এবং বাহিরে ক্রুরগ্রহের অবস্থানে বিনাযুদ্ধে শত্রুসৈন্যের ধ্বংস হয়। প্রাকারে ও মধ্য ক্রুর এবং বাহিরে সৌম্য-গ্রহ অবস্থিত হইলে অযত্নেও দুর্গাসক্তি ঘটয়া থাকে। মধ্য ও কোটস্থানে সৌম্য এবং বাহিরে ক্রুরগ্রহ থাকিলে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও দুর্গাধিকারে সমর্থ হন না। প্রাকার ও বাহিরে ক্রুর এবং সৌম্য মধ্যগত হইলে যুদ্ধে প্রাকার ভঙ্গ অথবা পূরভঙ্গ হয় না। শুভ গ্রহযুক্ত শুভগ্রহ স্তম্ভাস্তরগত হইলে সেই দুর্গ চিরস্থায়ী হয়, শত্রু কর্তৃক ধ্বংস হয় না।

রবি, রাহু, শনি ও মঙ্গল শুভাস্তর গত হইলে সেই দুর্গ কিছু-তেই রক্ষা করা যাইতে পারে না। বাহিরে সৌম্য এবং কোট ও মধ্যে ক্রুরগ্রহ অবস্থিত হইলে দুর্গাধিপতি স্বয়ংই সেই দুর্গটিকে শত্রুহস্তে অর্পণ করেন। বাহিরে ও মধ্যে ক্রুর এবং প্রাকারে শুভগ্রহ থাকিলে আক্রমণকারীগণ বিনা যুদ্ধেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকারে ক্রুর এবং বাহিরে ও মধ্যে শুভগ্রহ অবস্থিত করিলে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় ঘটনা, দিনে দিনে খণ্ডিত হইয়া থাকে। সৌম্য ও ক্রুর গ্রহ সকল প্রাকার মধ্য বা বাহির, ইহার কোন এক স্থানে থাকিলে ভয়ানক যুদ্ধ ঘটয়া থাকে, হত্যা, অশ্ব, পদাতি, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। একরূপ যুদ্ধে উভয় পক্ষই কালগ্রাসে পতিত হয়। বাহিরে ও মধ্যে সমসংখ্যক ক্রুর ও শুভগ্রহ থাকিলে প্রায়ই সন্ধি হইয়া যায়। এইরূপে কোট-চক্রে ফলাফল বিচার করিয়া যুদ্ধ করা উচিত। প্রবেশ-নক্ষত্রের জীবপক্ষ নক্ষত্রে (?) চক্রে থাকিলে নিশীথসময়ে অবরোধকারী নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ করা কর্তব্য। চন্দ্র নির্গম নক্ষত্রে স্থিত হইলে রাজ্যিকালে বাহিরে সকলে সুখ হইলে অভ্যন্তরস্থিত নৃপতিগণের যুদ্ধ করা উচিত। বক্রী ক্রুরগ্রহ প্রবেশ নক্ষত্র ও পুর মধ্যে স্থিত হইলে বহিঃস্থিত নর-পতি হইতে কোটের বিনাশ ঘটয়া থাকে। বক্রী ক্রুর গ্রহ বাহিরে ও প্রবেশ নক্ষত্রে স্থিত হইলে সৈন্তগণের মধ্যে আত্মকলহ, হৃদিক ও মরণ হয় এবং বাহিরে সৈন্তেরা ভয় দিয়া পলায়ন করে। নির্গম ও বহিঃস্থ নক্ষত্রে ক্রুর গ্রহ থাকিলে প্রাকার ভয় এবং প্রাকারে ক্রুর গ্রহ থাকিলে পুর-ভয় হইয়া থাকে। পুরনক্ষত্রে ও নির্গম নক্ষত্রে বক্রী ক্রুরগ্রহ অবস্থিত হইলে দুর্গস্থ ব্যক্তির যুদ্ধ সময়ে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। গ্রহের নীচতা, উচ্চতা ও সমতা ভেদে আরও কতকগুলি ফলাফল নিরূপণ করা যাইতে পারে। তাহা জানিতে হইলে স্বরোদয় গ্রহের নরপতিজয়চর্যা দ্রষ্টব্য।

খড়াচক্র—ইহা দ্বারাও যুদ্ধের শুভাশুভ নিরূপণ করা যাইতে পারে। নয়টি ভেদযুক্ত খড়াকার একটি চক্র অঙ্কিত করিয়া যোজনক্ষত্র হইতে তিন তিনটি নক্ষত্র তাহার নয়টি স্থানে যথাক্রমে বিভাজ্য করিবে, ইহার নাম খড়াচক্র। নয়টি স্থান যথা—১ যব, ২ বজ্র, ৩ মুষ্টি, ৪ পালিকা, ৫ বক্র, ৬ ও ৭ ধারদ্বয়, ৮ খড়া ও ৯ তীক্ষ্ণ। ফল—নক্ষত্রানুসারে যব-হইতে বক্র পর্যন্ত যে পাঁচটি স্থান ইহার কোন একস্থানে ক্রুর গ্রহ থাকিলে যুদ্ধে মৃত্যু, ভয় ও জয় হয়, এবং সৌম্য গ্রহ থাকিলে লাভ ও জয় ঘটয়া থাকে। খড়া, ধারদ্বয় ও তীক্ষ্ণ এই চারিটি স্থানের কোনস্থানে ক্রুর

গ্রহ থাকিলে যুদ্ধে জয় হয়। কিন্তু এই চারিস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে যুদ্ধে ভয়, শুভ ও ক্রুর উভয় গ্রহ থাকিলে মিশ্রিত ফল হয়।

খলচক্র—এই চক্রানুসারে যুদ্ধের জয় পরাজয় প্রভৃতি জানা যাইতে পারে। চতুরঙ্গ ও চতুর্বারযুক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। পূর্বদ্বার হইতে চারিটি দ্বারে যথাক্রমে নন্দাদি তিথি, পূর্ব প্রভৃতি চারিদিকে যথাক্রমে কৃত্তিকাদি সাত সাতটি নক্ষত্র স্থাপন করিবে। প্রবেশ করিতে যে দিক্টি বামভাগে থাকিবে, সেইদিক্ হইতে দিক্চতুষ্টয়ে যথাক্রমে শনি ও চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ, রবি ও শুক্র এবং বৃহস্পতিকে খলচক্রের মধ্যে ও বাহিরে স্থাপন করিবে। যে দিনে তিথি ও নক্ষত্রের অধিপতি যে দিকে থাকে সেই দিনে সেই দ্বারে খল প্রবেশ করিতে হয়। খলের মধ্যে শনি, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও মঙ্গল এবং বাহিরে বুধ, শুক্র ও চন্দ্র গ্রহানুসারে স্থায়ী, যাত্রী ও জয়ী এই তিনটি কাল নিরূপিত হয়। খলের মধ্য নক্ষত্রে যে গ্রহ যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানে চন্দ্রের গতি অনুসারে ফল নিরূপণ করিবে। চন্দ্র সূর্য্য স্থানে গত হইলে যুদ্ধে বীরপুরুষের মৃত্যু হয়। এইরূপে মঙ্গল স্থানে চন্দ্র থাকিলে মহাক্রোধ, বুধস্থানে মহাভয়, শুক্র স্থানে ভয়, শনি স্থানে দারুণ আঘাত ও রাহু স্থানে চন্দ্র থাকিলে নিশ্চয়ই মরণ ঘটয়া থাকে। উভয় যোদ্ধার পৃষ্ঠগত ক্রুরগ্রহ হইলে যুদ্ধে উভয়েরই মরণ হইয়া থাকে। সৌম্যগ্রহ থাকিলে সন্ধি এবং ক্রুর ও শুভ এই উভয় গ্রহ থাকিলে মিশ্রিত ফল হয়।

গূঢ়কালানলচক্র—ইহাতে যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণীত হইয়া থাকে। উর্দ্ধদিকে সাতটি রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্ঘ্যাক্রমে আর সাত রেখা টানিবে। এই চক্রে উর্দ্ধদিকের বাম রেখার চন্দ্রাশ্রিত নক্ষত্র ও তৎপরে পরে তৎপরবর্তী নক্ষত্র যথাক্রমে স্থাপন করিবে। এই চক্রে ৬টি স্থান কল্পনা করিতে হয়—১ গূঢ় বা মস্তক, ২ সম্পূট, ৩ কর্তরী, ৪ দণ্ড, ৫ কপাল ও ৬ বজ্র বা চক্র। যে নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত তাহা হইতে তিনটি নক্ষত্রকে মস্তক, তৎপরবর্তী নয়টিকে সম্পূট, তৎপরে তিনটিকে কর্তরী, তৎপরবর্তী তিন নক্ষত্র দণ্ড, তারপর সাতটি কপাল এবং তিনটিকে বজ্র বা চক্র বলে। নাম নক্ষত্র যে অঙ্গে পতিত হয়, তদনুসারে শুভাশুভ ফল নিরূপণ হইয়া থাকে। ফল মস্তকে বিভ্রম, সম্পূটে জয়, কর্তরীতে প্রহার, দণ্ডে ভয়, কপালে মৃত্যু ও বজ্র বা চক্রে মহাভয়।

গ্রহস্থচক্র—স্বরোদয় প্রকরণে ইহার প্রয়োজন হয়। চতুরঙ্গ চক্রের মধ্যে উর্দ্ধাধোভাবে চারিটি রেখা টানিলে

পাঁচটি পঙ্ক্তিবৃক্ক একটা চক্র হয়। উহার বামভাগে পঙ্ক্তিতে অশ্বর ও তাহার নীচে মেঘ, সিংহ ও বৃশ্চিক, দ্বিতীয়টিতে ইশ্বর ও কন্যা, মিতুন, কর্কট, তৃতীয়টিতে উ এবং ধনু ও মীন, চতুর্থে এশ্বর তুলা ও বৃষ এবং পঞ্চম পঙ্ক্তিতে ওশ্বর এবং মকর ও কুম্ভরাশি স্থাপন করিবে। তাহার নীচে যে পঙ্ক্তিতে বেরাশি পড়িয়াছে, তাহার অধিপতি গ্রহও সেই রাশিতে স্থাপন করিতে হয় এবং এই চক্রে গ্রহের বাল্যাঙ্গ অবস্থাও লিখিত থাকে। [অরোদয় প্রকরণ দেখ।] গ্রহশ্বর চক্র আঁকিবার প্রণালী—

অ	ই	উ	এ	ও
মেঘ সিংহ বৃশ্চিক	কন্যা মিতুন কর্কট	ধনু মীন	তুলা বৃষ	মকর কুম্ভ
বাল রবিমঙ্গল	কুমার বৃষ চক্র	যুবা বৃহস্পতি	বৃদ্ধ শুক্ৰ	মৃত শনি

ঘটীশ্বর চক্র—অরোদয় প্রকরণে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাতে শ্বর, দণ্ড, পল ও অন্তরোদয় অঙ্কিত থাকে। [অরোদয়প্রকরণ দেখ।]

ঘটীশ্বরচক্র।

অ	ই	উ	এ	ও
দণ্ড ৫ পল ২৭ অন্তরোদয় ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০

ঘোরকালানল।—এই চক্রে শুভাশুভ নির্ণয় হইয়া থাকে। কোন কোন পুস্তকে “ঘোরকালানল” স্থলে ‘সপ্তকালানল’ পাঠও লক্ষিত হয়। উর্দ্ধদিকে সাতটি রেখা টানিয়া তাহার উপরে ত্রিধাক্ভাবে সাতটি রেখা আঁকিবে। যে নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত, সেই নক্ষত্রটি বামদিকের উর্দ্ধগামী রেখার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া তৎপরবর্তী নক্ষত্র তৎপরপর রেখার অগ্রে স্থাপন করিবে। চন্দ্রাশ্রিত নক্ষত্র হইতে তিন তিনটি নক্ষত্রে রবি প্রভৃতি নবগ্রহ যথাক্রমে বসাইবে। চক্রস্থ নক্ষত্রে রবি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান অনুসারে শুভাশুভ নিরূপিত হয়। পুরুষের নাম নক্ষত্রে স্থাপ্য অবস্থিত হইলে শোক ও সম্ভাপ, চন্দ্র হইলে মঙ্গল ও সুখ, মঙ্গল হইলে মৃত্যু, বৃষ থাকিলে বুদ্ধি, বৃহস্পতি থাকিলে লাভ, শুক্র থাকিলে

শুভ, শনি থাকিলে মহাভয়, রাহু থাকিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাত্রা, জন্ম, বিবাহ ও সংগ্রামে ঘোরকালানল চক্র বিচার করিয়া কার্য্য করা যায়। (নরপতিজয়চর্যা)

রুদ্রধামলে দীক্ষাপ্রকরণে ১৬ প্রকার চক্রের উল্লেখ আছে। ১ অকড়ম, ২ অকথহ, ৩ শ্রীচক্র, ৪ কুলাকুল, ৫ তারী, ৬ কুর্শচক্র, ৭ রাশিচক্র, ৮ শিবচক্র, ৯ বিষ্ণুচক্র, ১০ ব্রহ্মচক্র, ১১ দেবচক্র, ১২ ঋণিনি, ১৩ রামচক্র ১৪ চতুশ্চক্র ১৫ হৃদয় ও ১৬ উদ্যচক্র। ইহাদের বিবরণ তৎতৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

চক্র, অনেক কবি, সাধারণতঃ শ্রীচক্র নামেই প্রসিদ্ধ। ক্ষেমেন্দ্রপ্রণীত ঐতিহ্যবিচারচর্চা ও সুবৃত্তিতিলক গ্রন্থের মধ্যে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

২ অপর একজন কবি, চক্রকবি নামেই খ্যাত, ইহার প্রণীত চিত্ররত্নাকর নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য আছে। চক্রক (পুং) চক্রমিব কার্য্যতি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ তর্ক বিশেষ। তর্কশাস্ত্র মতে ইহার লক্ষণ যথা “আপেক্ষণীয়াপেক্ষিত-সাপেক্ষত্বনিবন্ধনঃ প্রসঙ্গশ্চক্রকঃ।” (জগদীশ) যে স্থলে কোন পদার্থের জ্ঞান উৎপত্তি বা স্থিতি সেই পদার্থের জ্ঞান উৎপত্তি বা স্থিতির অপেক্ষণীয় পদার্থাপেক্ষিত কোন পদার্থের অপেক্ষা করে তথায় চক্রক হইয়া থাকে। অপেক্ষা কোন স্থলে সাক্ষাৎ কোথাও বা পরস্পরায় ঘটয়া থাকে। উদাহরণ যথা ১ “এতদ্ ঘটজ্ঞানং যদ্যেতদঘটজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞান-জ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানং তদা এতদ্ ঘটজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানভিন্নং তদা” ২ “ঘটোহয়ং যদি এতদ্ ঘটজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানঃ তদা এতদ্ ঘটজ্ঞানজ্ঞানভিন্নং তদা” ৩ “ঘটোহয়ং যদ্যেতদঘটবৃত্তি-বৃত্তিঃ স্যাৎ তথাহেন উপলভ্যতে।” (জগদীশ*)

২ রাজমজ্জাতীয় সর্পবিশেষ, চলিত কথায় চক্রবোড়া বলে। চক্রকা (স্ত্রী) কাকাদনীর সদৃশ স্তূপবিশেষ; সূক্ষ্মতের মতে ইহার বর্ণ শাদা কিন্তু ফুলের বর্ণ বিচিত্র, দেখিতে প্রায় কাকাদনীর সদৃশ। ইহার গুণ জর্য ও মৃত্যুনাশক। (সূক্ষ্মতঃ) চক্রকারক (স্ত্রী) চক্রং চক্রাকারলেখ্যং কথোতি কু-খুল ৬তৎ। ১ নথ। ২ বায়ননথ নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (অমর) চক্রকুল্যা (স্ত্রী) চক্রত্ব তদাকারত্ব কুল্যেব। চিত্রপর্গী, চাকুলে। চক্রগজ (পুং) চক্রে চক্রাকারে দক্ষরোগে গজ ইব। চক্রমর্দ বৃক্ষ, চাকুলে গাছ। (রাজনিঃ) চক্রগণ্ডু (পুং) চক্রমিব গণ্ডুঃ। চক্রাকার উপাধান, গাল-বালিশ। (হেমঃ) স্থানবিশেষে ইহাকে চলিত কথায় গোলবালিশও বলিয়া থাকে।

চক্রগদাধর (পুং) চক্রং মনস্তত্ত্বং গদা বুদ্ধিতত্ত্বং ধরতি ধারয়তি অন্তর্ভূতোণ্যর্থঃ ধু-অচ্। বিষ্ণু।

“মনস্ত্বাশ্বকং চক্রং বুদ্ধিত্বাশ্বিকং গদাম্।

ধারয়ন্ লোকরক্ষার্থং শুশ্রূষচক্রগদাধরঃ।” (বিষ্ণুসংহিতা)

চক্রগুচ্ছ (পুং) চক্রবৎ গুচ্ছঃ পুষ্পগুচ্ছঃ অত্র বহুব্রী।
অশোক বৃক্ষ। (শব্দচ°)

চক্রগোপ্তৃ (ত্রি) চক্রস্ত গোপ্তা ৬৩৭। ১ সৈন্যরক্ষক, সেনা-
পতি। ২ চাকলারক্ষক, যে চাকলা রক্ষা করে। ৩ রাজ্য-
রক্ষক। ৪ যে রথ চক্রাদির রক্ষা করে, যোদ্ধাবিশেষ।

চক্রগ্রহণ (ক্লী) চক্রস্ত গ্রহণং ৬৩৭। ১ চক্রের অবলম্বন।
২ হুগের চতুর্দিকস্থ প্রাচীর, গড়বন্দী।

চক্রচর (ত্রি) চক্রেণ সজ্বশচরতি চর ট। যাহারা দলে দলে
বিচরণ করে, হস্তী বিহগ প্রভৃতি।

“তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাশ্চক্রচরাস্তথা।” (ভারত ৩ অঃ)

চক্রচারিন্ (ত্রি) চক্রেণ চরতি চর-গিনি। যে চক্রদ্বারা এক
স্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত হয়।

“বিধিরেকক চক্রচারিণঃ কিমু নির্মিৎসতি মায়াথং রথম্।”
(নৈষধ°)

চক্রচূড়ামণি (পুং) ১ চূড়ামণি বা কিরীটে সংলগ্ন মণি।
২ বোপদেবের একটি উপাধি। [বোপদেব দেখ।]

৩ “চক্রবর্তী চূড়ামণি শব্দের সংক্ষেপ প্রয়োগ। কবি-
চূড়ামণি চক্রবর্তী উপাধিদারী ভট্টনক ব্যক্তি, ইনি ভাগবত
পুরাণটীকা, অম্বয়বোধিনী নামে বেদান্তটীকা (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে
রচিত), হুগামাহায়াটীকা, রাসপঞ্চাধ্যায় টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ
প্রণয়ন করিয়াছেন। [নারায়ণ চক্রচূড়ামণি দেখ।]

চক্রজীবক (পুং) চক্রেণ কুন্তসাধনচক্রেণ জীবতি জীব-বুল।
কুন্তকার, কুমার। (হেম°)

চক্রগদী (ক্লী) [চক্রগদী দেখ।]

চক্রটক্ৰ (দেশজ) ষড়যন্ত্র। সুযোগ অহুসন্ধান।

চক্রতীর্থ (ক্লী) চক্রেণ সুদর্শনক্ষালনেন কৃতং তীর্থং মধ্যলো°।
তীর্থবিশেষ। ভারতে চক্রতীর্থ একটি নয়, প্রায় সকল প্রধান
তীর্থস্থানে এক একটি চক্রতীর্থ আছে, তন্মধ্যে কালী, হিমালয়,
কামরূপ, নন্দদাতীর, শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি
স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন চক্রতীর্থ আছে, তাহাই প্রসিদ্ধ।
(হিমবৎখণ্ড ৮৯৮, যোগিনীতন্ত্র ৪৪১২, কুর্মপু° ১২৪১,
নৃসিংহপু° ৩৫২০)

১ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বৈষ্ণবতীর্থ। স্বন্দপুরা-
ণীয় প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে যে পূর্বকালে বিষ্ণুর সহিত
অম্বরের একটি ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, সুদর্শন চক্রে
আঘাতে অনেক অম্বর প্রাণ হারাইল, যুদ্ধে বিষ্ণুর জয়
হয়। বিষ্ণু আপনার চক্রটিকে রক্তাক্ত দেখিয়া তাহার

পরিকার ও পবিত্রতা করিবার জন্য প্রভাসক্ষেত্রের একটি
ঘাটে যাইয়া তীর্থের আবাহন করিলেন। বিষ্ণুর আদেশে
আট কোটি তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, তারপর সেই স্থানে
চক্রটিকে প্রক্ষালন করেন। প্রভাসক্ষেত্রের যে ঘাটে এই
কার্য সম্পাদন হয়, তাহারই নাম চক্রতীর্থ। বিষ্ণুর আদেশ
মতে আটকোটি তীর্থ সর্বদাই এই স্থানে অবস্থিতি করে।
চক্রতীর্থের পূর্বসীমা যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমনাথ, উত্তরে
বিশালাক্ষী ও দক্ষিণে সরিৎপতি সমুদ্র। (১) কার্তিকমাসের
ষাদশীতিথিতে চক্রতীর্থে স্নান, উপবাস, ত্র্যক্ষণদিগকে স্তব্ধ
দান ও বিষ্ণু পূজা করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। এক মন
হইয়া চক্রতীর্থে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থস্নানের ফল হয়।
একাদশী, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যাগ্রহণে এই তীর্থস্থানে কোটি
যজ্ঞের সমান ফল হয়। কলভেদে এই তীর্থ ভিন্ন ভিন্ন
নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম কল্ল কোটিতীর্থ,
দ্বিতীয় কল্ল ত্রীনিধান, তৃতীয় কল্ল শতধার এবং বর্তমান
চতুর্থ কল্ল চক্রতীর্থ নাম হইয়াছে। ইহার আয়তন
অর্দ্ধকোশ পর্য্যন্ত বিষ্ণুক্ষেত্র। এই স্থানে এক মাস
উপবাস, অগ্নিহোত্রের অমুষ্ঠান, মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন,
যজ্ঞের অমুষ্ঠান, তপস্বী, চান্দ্রায়ণ, পিতৃ উদ্দেশে তিলোদক
শ্রাদ্ধ, এবং একরাত্র বা ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত করিবার
বিধান আছে। এই ক্ষেত্রে কোন ধর্ম কার্যের অমুষ্ঠান
করিলে অত্র ক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিগুণ ফল হয়। এই
ক্ষেত্রে সুদর্শন নামে একটি তীর্থ স্থান আছে, তথায় গোদান
করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধি
হইয়া থাকে। এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি
হইয়া থাকে। (স্বন্দপু° প্রভাসখ°)

২ মথুরার সন্নিহিত যমুনার তীরস্থ একটি তীর্থ, এইস্থলে
তিন রাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ
বিনাশ হয়।

৩ গোবর্দ্ধন পর্বতের নিকটস্থ একটি তীর্থ। এখানে
চক্রেশ্বর নামে মহাদেব আছেন।

৪ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ছুটী চক্রতীর্থ আছে, একটি সমুদ্র-
তীরে দেবীপুর নামক স্থানে এবং অপরটি অম্বিতীর্থের নিকট।

প্রথমটির অপর নাম ধর্মপুষ্করিণী। স্বন্দপুরাণীয় সেতু-
মাহাশ্লোকে লিখিত আছে—পূর্বকালে ধর্ম মহাদেবের তপস্বী
করিবার জন্য ক্ষীরসরের নিকট ১০ যোজনব্যাপী এক
তীর্থ খনন করেন, তাহাই ধর্মপুষ্করিণী। ইহার তীরে

(১) “পূর্ণে যমেশ্বরং যাবৎ শ্রীসোমেশস্ত পশ্চিমে।

উত্তরে তু বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিৎপতিঃ।” (স্বন্দ° প্রভাস খ°)

কুলগ্রামের নিকট গালব অশুভবর্ষ বিষ্ণুর ভগ্নতা করেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসেন ও গালবকে বলেন যে, “দেহান্ত পর্যান্ত তুমি এই পুত্রিরী তীরে অবস্থান কর, তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আমার চক্র আসিয়া তোমার রক্ষা করিবে।” মাঘ মাসে গুরুপক্ষীয় হরিবাসরে উপবাসী থাকিয়া গালব তৎপরদিন ধর্মসরোবরে স্নান করিতে যান, সেই সময় চুর্জয় নামে এক রাক্ষস গালবকে গিলিয়া ফেলে। গালব বিষ্ণুর আশ্রয় প্রার্থনা করিলে ভগবান্ ভক্তের উদ্ধার জন্য চক্র পাঠাইলেন। চক্র আসিয়া রাক্ষসকে সংহার করিয়া গালবকে উদ্ধার করিল, সেই অবধি ধর্মপুত্রিরীর নাম চক্রতীর্থ হইল। ইহা এক সময়ে দর্ভশয়ন হইতে দেবীপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যে একটি পাহাড় আসিয়া উহার মধ্যস্থলে পতিত হয়, তদবধি দুইটা চক্রতীর্থ হইয়াছে, একটি দেবীপত্তনে ও একটি দর্ভশয়নে। শেষোক্ত চক্রতীর্থের অপর নাম অহিবুর্তীর্থ। এখানে গন্ধমাদন পর্বতের উপর অহিবুধ্ মুনী স্মরণের উপাসনা করেন। মূনির প্রার্থনা মত তপোবিয়কারী রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে ভক্তের রক্ষার জন্য বিষ্ণুচক্র এখানে রহিল। এই তীর্থে স্নান করিলে রাক্ষসগণশাচাদিজাত পীড়া ভাল হয়, অন্ধ, বধির, কুজ, খজ, বিকল প্রভৃতি সঙ্করপূর্বক স্নান করিলে পুনর্দেহ প্রাপ্ত হয়। (সেতুমাহাত্ম্য ৭ম ও ২৩ অঃ)

চক্রতৈল (ক্ৰী) চক্রশ্র তৎফলশ্র তৈলং। চক্রমর্দফল হইতে উৎপন্ন এক প্রকার তৈল। “চক্রতৈলেন বাত্যাঙ্গ্য সর্জুচূর্ণেন চূর্ণয়েৎ।” (সুশ্রুত চিকিৎ ২০ অঃ) কোন কোন আতিধানিকের মতে সদ্য নিপীড়িত অর্থাৎ টাটকা তৈলকে চক্রতৈল বলে।

চক্রদংষ্ট্র (পুং ক্রী) চক্রং চক্রাকৃতি দংষ্ট্রী যন্ত বহবী। শূকর।

চক্রদত্ত (ক্ৰী) চক্রপাণি কৃত একখানি বৈদ্যক শাস্ত্র, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন রোগাধিকারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা ও প্রস্তুত প্রণালী অতি সুন্দররূপে লিখিত আছে। [চক্রপাণি দেখ।]

চক্রদন্তী (ক্ৰী) চক্রমিব ফলরূপদন্তোহস্তাঃ বহবী, ভীপ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। ২ জয়পাল বৃক্ষ।

চক্রদন্তীবীজ (ক্ৰী) চক্রদন্ত্যা বীজং ৬-তৎ। জয়পালের বীজ। চক্রদীপিকা, ১ তন্ত্রসংগ্রহত একখানি তন্ত্র। ২ বেদান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ। বেদান্তদীপিকার চক্রদীপিকা ব্যাখ্যা নামক একখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে।

চক্রদ্বীপ, [চাকদহ দেখ।]

চক্রদৃশ্ (পুং) বলি রাজার সেনাপতি একটা অশুর।

(ভাষা ৮।১০।২১)

চক্রদেব (পুং) বাদকবংশীয় একজন রাজা। (ভারত ২।১৩ অঃ) চক্রদ্বার (পুং) চক্রমিব দ্বারমজ বহবী। পর্বতবিশেষ।

(ভারত ১৩।৩২২ অঃ)

চক্রধর্মুস (পুং) সূর্য্য হইতে উৎপন্ন ঋষি বিশেষ, ইহার অপর নাম কপিল। মহাত্মারতের মতে ইহার কোপানলেই সগর সন্তানেরা ভস্মীভূত হয়। (ভারত ৫।১০৮ অঃ)

চক্রধর (পুং) চক্রং বনস্তত্ত্বং স্মদর্শনাখ্যমন্ত্রং বা ধরতি ধু-অচ্। ১ চক্রধারী, বিষ্ণু। ২ গ্রামবাসী। (ত্রি) ৩ যে চক্রাশ্র ধারণ করে।

“বজ্রন্তে ক্রতুভির্দেবাস্থথা চক্রধরা নৃপাঃ।” (ভারত ৩।৮৫ অঃ)

(পুং) চক্রং ফণাং ধরতি ধু-অচ্। ৪ সর্প।

“অঙ্গিরঃ প্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়োঃপরে।

তথা নাগাঃ স্পর্গাশ্চ সিদ্ধাশ্চক্রধরাস্থথা।” (ভারত ৩।৮৫।৭০)

৫ ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থতন্ত্র নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৬ পৈতৃকতিথিনির্ণয় গ্রন্থপ্রণেতা।

৭ যজ্ঞচিন্তামণি নামক গ্রন্থকার।

৮ রাগবিশেষ, নটের ঠাটে। স্বরগ্রাম—“স ঋ গ ম ০ ধ নি।” (সঙ্গীতরং) [বিদ্যুৎ দেখ।]

চক্রধর্ম্মন (পুং) বিদ্যাধরগণের অধিপতি। (ভারত ৫।১০৮ অঃ)

চক্রধারণ (ক্ৰী) চক্রং ধার্য্যতে অনেন ধারি-করণে লুট্। রথাবরব বিশেষ, অক্ষনাভি।

চক্রধারা (ক্ৰী) চক্রশ্র ধারা ৬তৎ। চক্রের অগ্র। (শঙ্কার্হচিৎ)

চক্রধ্বজ, কম্বাপুর ও কামরূপের জটনক রাজা। ইনি ব্রাহ্মগদিগকে অভিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ইহার পিতার নাম নীলধ্বজ ও পুত্রের নাম নীলাধর। রাজা চক্রধ্বজই কমতেশ্বরীর মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভগদত্তের কবচ উদ্ধার করেন।

[কম্বাপুর ও কামরূপ দেখ।]

চক্রনথ (পুং) চক্রমিব নথঃ নথাকৃতিরংশবিশেষোহস্ত্যস্ত চক্র নথ-অচ্। ব্যাঘ্রনথ নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনিং)

চক্রনদী (ক্ৰী) চক্রপ্রধানানদী মধ্যলোং। গিরিনদ্যাং বিকল্পে গতং। গণ্ডকী নদী। “যত্রাপ্রমপদাভ্যভ্যন্তঃ নাভি-দৃশ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্কতঃ পবিত্রী-করোতি।” (ভাগবত ৫।৭।১০) ‘চক্রনদী গণ্ডকী’ (ত্রিধর।)

চক্রনাভি (পুং) চক্রশ্র নাভিঃ ৬তৎ। চক্রের নাভি, চাকার মধ্যস্থল। “সিরাতিরারূতানোভি শক্রনাভিরিবারকৈঃ।”

(সুশ্রুত শারীরঃ ৫ অঃ)

চক্রনাম্ন (পুং) চক্রং মক্ষিকানির্শিত মধুচক্রং তন্নামৈব নাম বস্ত্র বহবী। ১ মাক্ষিক ধাতু, চলিত কথায় স্বর্ণমাক্ষিক বলে। চক্রো নামোযন্ত বহবী। ২ চক্রবাক পক্ষী।

চক্রনায়ক (পুং) চক্রং তদাকারং নয়তি-নীধূল ৩তং ।
ব্যাঘ্রনখ মামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ । (রাজনিং)

চক্রনারায়ণীসংহিতা—রঘুনন্দন ধৃত গ্রন্থবিশেষ ।

চক্রনিতম্ব (পুং) চক্রস্ত নিতম্বঃ ৩তং । গিরিনদ্যাধি বিকস্মে
৭তং । চক্রের নিতম্ব ।

চক্রনেমি (স্ত্রী) চক্রস্ত নেমিঃ ৩তং । চক্রধার, চক্রের অগ্র ।
“নীচৈর্গন্ধতাপরি চ দশা চক্রনেমি-ক্রমেণ ।” (মেঘদূত)

চক্রন্যাস—একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ ।

চক্রপদ্মটি (পুং) চক্রশচক্রাকারো দক্ষরোগঃ তত্র পদ্মমিব
অটতি প্রভবতি অট-অচ্ । চক্রমর্দবৃক্ষ, চাকুলে । (শব্দরত্ন)

চক্রপদ (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ, সমবৃত্ত । ইহার প্রত্যেক চরণে
১০টি অক্ষর বা স্বরবর্ণ থাকে । তাহার মধ্যে কেবল
প্রথমটি ও ত্রয়োদশটি গুরু, অপর সমস্তই লঘু ।

“চক্রপদমিহ তনননগুরুভিঃ ।” (বৃত্তরত্নাকর টীকা)

চক্রপরিব্যাধ (পুং) চক্রং দক্ষরোগঃ পরিবিধ্যাতি পরি-ব্যধ
অণ্, উপপদসং । আরথ, সোঁদাল । (বৈদ্যক)

চক্রপর্ণী (স্ত্রী) চক্রমিবপর্ণমন্তাঃ বহুব্রী ঙীপ্ । চক্রকুলা,
চাকুলে । (শব্দচং) চক্রপর্ণিকা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত ।

চক্রপাণি (পুং) চক্রং পাণাবত বহুব্রী, সপ্তম্যাং পরনিপাতঃ ।
১ বিষ্ণু । “নিয়মমিজান্ সমরে চক্রপাণিরিবাস্তুরান্ ।”

(ভারত ৬.৪৮ অঃ)

২ একজন সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদবিৎ ও গ্রন্থকার । বৈদ্য-
কুলোৎপন্ন দত্ত উপাধিধারী । ময়ুরেশ্বর গ্রামে ইহার বাসস্থান
ছিল, জীবনের শেষ অবস্থায় চৌপাড়িয়ায় অবস্থিতি করেন ।
ইনি নিদানপ্রণেতা মাধবকরের সমসাময়িক ও নরদত্তের
ছাত্র । [মাধবকর দেখ।] ইহার প্রণীত চক্রদত্ত নামে
সংস্কৃত চিকিৎসাসাশ্র, “দ্রব্যগুণ” নামে আয়ুর্বেদীয় দ্রব্য-
গুণাভিধান, সর্কসারসংগ্রহ ও চরকটীকা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ-
গুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ ও চিকিৎসকগণের বিশেষ আদরণীয় ।
ইনি শব্দচক্রিকা নামে একখানি অভিধান এবং মাঘ,
কাদম্বরী ও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন ।

৩ জনৈক কবি, সংস্কৃত “পদাবলী” নামক কাব্যপ্রণেতা ।

৪ জনৈক পণ্ডিত, চক্রপাণিপণ্ডিত নামেই খ্যাত,
কবীন্দ্রচন্দ্রোদয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায় ।

৫ কালকৌমুদীচম্পুপ্রণেতা । ৬ জ্যোতিষাঙ্গর ও বিজয়কর-
লতা নামক জ্যোতির্গ্রন্থকার ।

৭ প্রোচমনোরমাখণ্ডনপ্রণেতা । ৮ জনৈক মৈথিল কবি ।

চক্রপাণিদাস, অভিনবচিন্তামণি নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা ।

চক্রপাত (পুং) ছন্দোভেদ । [চক্র দেখ।]

চক্রপাদ (পুং) চক্রং পাদ ইবাত বহুব্রী । ১ রথ । চক্রবৎ
পাদা বত বহুব্রী । ২ হতী । (অজয়পাল)

চক্রপাল (পুং) চক্রং পালয়তি, চক্র-পালি অণ্ । ১ সেনাপতি,
চক্ররক্ষক বোদ্ধাবিশেষ । [চক্ররক্ষ দেখ।]

২ কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মান সত্যার জনৈক কবি । ইহার
ভ্রাতার নাম মুক্তাকর্ণ । ক্ষেমেস্তের কবিকণ্ঠভরণে চক্রপালের
কবিতা উদ্ধৃত আছে ।

চক্রপালিত, শুভসম্রাট কলকুশল ১৩৬ শুভসম্বতে প্রাণদত্ত
নামক জনৈক ব্যক্তিকে সুরাষ্ট্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত
করেন । এই প্রাণদত্তের পুত্রের নাম চক্রপালিত । চক্রপালিত
পিতৃনিয়োজিত হইয়া গিরিনগরের (জুনাগড়) শাসনকর্তা
হন । ইহার সময় উজ্জয় (গিরনর) পর্বতের পাশদেশে
সুদর্শনহ্রদের (হ্রদটি স্বাভাবিক নহে, তৎকালে এইস্থানের
একটি প্রস্তরচ্যুতিজনিত গহবরের মুখে বাধ দিয়া এই হ্রদ-
কার জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছিল) বাধ বৃষ্টি জলে ভাঙ্গিয়া
নিকটস্থ দেশাদি প্রাণিত হইয়া যায়, তৎকাল ইনি ছইমাস
কাল পরিশ্রম করিয়া ঐ ভাধ বাধের সংস্কার করাইয়া দেন ।
১৩৮ শুভসম্বতে এই নির্মাণকার্য সমাধা হয় । ১৩৮ শুভ-
সম্বতে এই চক্রপালিত “চক্রভূৎ” নামক নারায়ণপ্রতিমা
ও তাহার জন্ত মন্দির নির্মাণ করেন । চক্রপালিতের এই
সকল কার্য ৪৫৬ হইতে ৪৫৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ঘটিয়াছিল ।

চক্রপুর (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ একটা প্রাচীননগর । রাজা ললিতা-
দিত্যের পত্নী চক্রমর্দিকা নিজ নামে এই নগর স্থাপন করেন ।

চক্রপুষ্করিণী (পুং) কাশ্মীরস্থ একটা পুষ্করিণী, ইহার উৎপত্তির
কথা এইরূপ লিখিত আছে যে কোন সময়ে হরি চক্রধারী
এই পুষ্করিণীতে খনন করিয়াছিলেন । তাহার শরীর হইতে
যে ঘাম নির্গত হয়, তাহাতেই পুষ্করিণী পরিপূর্ণ হয় ।
পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া চক্রধারী পঞ্চাশ হাজার বৎসর
তপস্যা করেন । তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব আসিয়া
মন্তক আন্দোলন করিলেন, তাহাতে শিবের কর্ণ হইতে
মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ সেইস্থানে পতিত হয়, এই
কারণে ইহার অপর নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে । বিষ্ণুর
প্রার্থনায় শিব বর দিয়াছিলেন যে, যে কোন জন্তু
এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, সে সংসারের সমস্ত যাতনা-
মুক্ত হইয়া নির্বাণপদ লাভ করিবে । যিনি এই তীর্থে
আসিয়া সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন,
তর্পণ, পিণ্ডদান, দেবগণের পূজা, গো, ভূমি, তিল, স্রবণ,
দীপমালা, অন্ন, উৎকৃষ্ট ভূষণ, এবং কড়াদান অথবা বাজ-
পেয়াদি যজ্ঞ, ত্রতোৎসর্গ, বুধোৎসর্গ ও লিঙ্গাদি স্থাপন

প্রভৃতি কোন পুণ্যকর্ম করেন, তাহাকে আর সংসারের তীব্র
যাতনা অনুভব করিতে হয় না। [কাশী ও মলিকর্গিকাদেব।]

চক্রপূজা, ১ তান্ত্রিক গ্রন্থ। ২ তান্ত্রিক আচার।

চক্রফল (ক্ৰী) চক্রমিব ফলমগ্রঃ বশা বহত্ৰী। চক্রাকার
অগ্রযুক্ত অনবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

চক্রবক্ষু (পুং) চক্রস্ত বক্ষুঃ ৬তৎ। সূর্য্য। (হেম°)

চক্রবাক্রব (পুং) চক্রস্ত বাক্রবঃ ৬তৎ। সূর্য্য। (হেম°)

চক্রভূৎ (পুং) চক্রং বিতর্জি ভূকিপ্। ১ বিজু, ইনি সূদর্শন
নামক চক্রধারণ করেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। (ত্রি)
২ চক্রধারী, যে চক্রনামক অস্ত্রধারণ করে।

চক্রভেদিনী (ক্ৰী) চক্রৌ চক্রবাকৌ তিনন্তি বিযোজয়তি
ভিন্-গিনি-ভীপ্। রাজি। (ত্রিকাণ্ড°) রাজিকালে চক্রবাক-
মিথুনের বিচ্ছেদ হয় বলিয়া রাজির নাম চক্রভেদিনী হইয়াছে।

চক্রভোগ (পুং) চক্রস্ত রাশিচক্রস্ত ভোগঃ ৬তৎ। গ্রহ
আপনার গতি অনুসারে যে স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ
করে, পুনর্বার সেইস্থানে উপস্থিত হয়, রাশিচক্রে গ্রহের
এইরূপ গতির নাম চক্রভোগ, ইহার অপর নাম পরিবর্ত।

‘যৎস্থানমারভ্য চলিতোগহঃ পুনন্তংস্থানমায়াতি স চক্র-

ভোগঃ পরিবর্তসংজ্ঞঃ।’ (সূর্য্যসি° টীকা রত্ননাথ।)

চক্রভ্রম (পুং) চক্রমিব ভ্রমতি ভ্রম-অচ্। ১ যন্ত্রবিশেষ, কুন্দ।

চক্রস্ত ভ্রমঃ ৬তৎ। ২ চক্রের ভ্রমণ। ৩ চক্রবিষয়ক ভ্রান্তি।

চক্রভ্রমি (পুং) ভ্রম-ভাবে ইন্ চক্রস্ত ভ্রমিঃ ৬তৎ। ১ চক্রের
ভ্রমণ। ২ চক্রবাকবিষয়ক ভ্রান্তি।

“কলসে নিজ-হেতুদণ্ডজঃ কিমু চক্রভ্রমিকারিতা গুণঃ।” (নৈষধ)

চক্রমুক্ত (দেশজ) ষড়যন্ত্র।

চক্রমণ্ডলিন্ (পুং ক্ৰী) চক্রমিব মণ্ডলোহস্ত্যস্ত চক্রমণ্ডল-
ইনি। অজগর সর্প। (হেম°) জীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

চক্রমন্দ (পুং) নাগবিশেষ।

“তথা নাগৌ চক্রমন্দাতিষণ্ডৌ।” (ভারত ৬।৪ অঃ)

চক্রমর্দ (পুং) চক্রং চক্রাকারং দক্ষরোগং মৃদ্রাতি চক্র-মৃদ-অণ্
উপপদস্। কৃপবিশেষ, চলিত কথায় চাকুন্দে বা এড়াকি
হিন্দীভাষায় চকরড বলে। পর্য্যায়—এড়গজ, অড়গজ,
গজাখা, মেঘাঙ্কর, এড়হস্তী, বাবর্তক, চক্রগজ, চক্রী,
পুরাট, পুরাড়, বিমর্দক, দক্ষর, তর্কট, চক্রাঙ্ক, শুকনাশন,
দৃঢ়বীজ, প্রপূরাড়, ঋজুর্জ, চক্রমর্দক, পদ্মাট, উরণাখা,
প্রপূরড়, প্রপূরাড়, উরণাক। ইহার গুণ—কটু, তীব্র, মেদ,
বাত, কফ, কণ্ডু, কৃষ্ঠ, দক্ষ ও পামাদিদোষনাশক।
(রাজনি°)। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—লঘু, ঝাঁহ,
ক্ষক, পিত্ত, ঝাঁস ও ক্রমিনাশক, কটিকর ও শীতল। ইহার

ফলের গুণ—উষ্ণবীৰ্য্য, কটুরস এবং কৃষ্ঠ, কণ্ডু, দক্ষ, বিষ,
বাত, গুণ্ড, কাশ, ক্রমি ও ঝাঁসনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চক্রমর্দক (পুং) চক্রং দক্ষরোগবিশেষঃ মৃদ্রাতি মৃদণুল্।
চক্রমর্দ। (অমর)

চক্রমর্দিকা (ক্ৰী) রাজা ললিতাদিত্যের প্রধানা মহিষী।

“ললিতাদিত্যভূতভূর্বল্লভা চক্রমর্দিকা।” (রাজতর° ৪।২১৩)

চক্রমাসজ (ত্রি) [বৈ] যে রথচক্র সংযোজিত করে।

“বিশ্বকর্ণঃ সমুত্তৌ চক্রমাসজঃ।” (ঋক্ ৫।৩৪।৩) ‘চক্রমাসজো
রথচক্রতাসজয়িতা।’ (সারণ।)

চক্রমীমাংসা (ক্ৰীঃ) ১ বৈষ্ণবদিগের আচরিত ধাতুচক্রদণ্ড
চিহ্নধারণ। ২ উক্ত আচারনির্ণায়কগ্রন্থ, বিজয়েশ্বরামৌ
ইহার প্রণেতা।

চক্রমুখ (পুং ক্ৰী) চক্রাবিব মুখঃ ষষ্ঠ বহত্ৰী। শূকর।
(হারাবলী) জীলিঙ্গে ভীষ্ হয়।

চক্রমুদ্রা (ক্ৰী) দেবপূজার অঙ্গ মুদ্রাবিশেষ। তন্ত্রসারের
মতে সূন্দররূপে প্রসারিত হস্তের সম্মুখীন করিয়া মিলিত
করিবে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুষ্ঠে বোগ করিবে,
ইহার নাম চক্রমুদ্রা।

“হস্তৌতু সম্মুখৌ কৃত্বা সংলগ্নৌ সূপ্রসারিতৌ।

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মূদ্রেষা চক্রসংজ্ঞিকা।” (তন্ত্রসার)

চক্রমুঘল (পুং) চক্রং মুঘলঞ্চ সাধনতয়া অত্রাতি চক্রমুঘল-
অচ্। চক্র ও মুঘল লইয়া যে যুক্ত করা হয়, তাহাকে
চক্রমুঘল বলে। হরিবংশের মতে চক্র, লাজল, গদা ও মুঘল
লইয়া যে যুক্ত প্রদর্শিত হয় এবং ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে শত
সহস্র ভূমিপালগণের মৃত্যু হয়, সেই ভয়ানক যুদ্ধের নাম
চক্রমুঘল। (হরিবংশ ১০.৭ অঃ)

চক্রযান (ক্ৰী) চক্রযুক্তং যানং মধ্যলো°। রথ প্রভৃতি।

(অসৌ পুষ্পরথশ্চক্রযানং ন সমরায় ষৎ। অমর)

চক্রমেলক (পুং) কাশ্মীরস্থ একটা গ্রাম।

চক্রমৌলি (পুং) চক্রমিব মৌলিঃ শিরোভাগোযন্ত বহত্ৰী।
রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৬।৬৯।১৪।)

চক্রযোগ (পুং) চক্রস্ত তৈলস্ত যোগ ৬তৎ। চক্রতৈল লেপন।

“মতিমাংশ্চক্রযোগেন আচ্ছেদুর্কস্থিনির্গতম্।” (সুশ্রুত)

চক্ররক্ষ (পুং) চক্রং রক্ষতি অণ্ উপসং। সেনাপতি, চক্র-
রক্ষক, যোদ্ধাবিশেষ।

“মাদ্রেয়ো চক্ররক্ষৌ কাক্তনশ্চ তদাকরোৎ।”

(ভারত ১।১৩৮ অঃ)

চক্ররদ (পুং ক্ৰী) চক্রমিব বৃত্তোরদোহস্ত বহত্ৰী। শূকর।
(ত্রিকাণ্ড°) জীলিঙ্গে ভীষ্ হয়।

চক্রলক্ষণা (জী) চক্রে মণ্ডলাকারকূটে লক্ষণং প্রদীপ্য-
সাধন রূপং চিত্রমন্ত বহতী। শুদ্ধী, গুলক। (রাজনি°)

চক্ররিখা (জী) বস্ত্রা পক্ষী। (রাজনি°)

চক্রলক্ষণিকা (জী) চক্রলক্ষণা স্বার্থে কন্ ইত্বক। শুদ্ধী।

চক্রলতাত্র (পুং) চক্রঃ কৃষ্ণসাধনং লতাত্রঃ। বুদ্ধরসাল
বৃক্ষ। (রাজনি°)

চক্রলা (জী) চক্রং দক্ষরোগং লাতি লা-ক। উচ্চটা,
চেচুয়া। (অমর)

চক্রলিপ্তা (জী) চক্রস্ত লিপ্তা ৩তং। রাশিচক্রে কলায়ক
ভাগ। রাশিচক্রে ২১৬০০ ভাগের একভাগকে চক্রলিপ্তা
বলা যাইতে পারে।

চক্রবৎ (ত্রি) চক্রমন্ত্যস্ত চক্রমতুপ্ মন্ত বঃ। ১ যাহার চক্রান্ত
আছে। ২ তৈলিক।

“সুনাচক্র ধ্বজবতাং বিশেষে নৈব জীবতাম্।” (মহু)

‘চক্রবান্ বীজবধবিক্রয়জীবিতৈলিকঃ।’ (কুল্লুক)

(পুং) চক্রং তদাকারোহস্তান্ত মতুপ্ মন্ত বঃ। ৬ চক্রে
জ্ঞান আকৃতিযুক্ত পক্ষিতবিশেষ।

“তত্রৈব চক্রসদৃশং চক্রবন্তং মহাবলম্।” (হরিবংশ ২২৫ অঃ)

চক্রবর্তিন্ (ত্রি) চক্রে ভ্রমণে বর্তিতুং চক্রং সৈন্যচক্রং সর্প-
ভ্রমো বর্তয়িতুং বা শীলময়া বৃত-গিনি, বৃত-গিচ্-গিনি বা। ১
বহুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, অনেক রাজা বাহাকে কর দান
করেন, আসমুদ্র করগ্রাহী।

“ভরতাজ্জুনমাক্ষাত্তগীরথধৃষ্টিরাঃ।

সগরো নহবশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্তিনঃ।” (গাথা)

[চক্রচূড়ামণি দেখ।]

২ বাস্তব শাক, বেতোশাক। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ শ্রেষ্ঠ।

“বাগদেবতা চরিতচিত্রিতচিত্তসম্মা

পদ্মাবতী চরণধারণচক্রবর্তী।” (গীতগো° ১১২)

১। ফা হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ১৭শ অধ্যায়ে “চক্রবর্তী”

উপাধিধারী রাজার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে
চক্রবর্তী উপাধির বাহুল্য দেখা যায়। ভারতবর্ষ ভিন্ন
অন্যান্য দেশে বুদ্ধদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল মৌলিক গ্রন্থ
পাওয়া যায়, তাহাতে প্রচার যে, বুদ্ধ দেবদেবীর বীৰ্য্যে জন্ম
গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ বিল অহুমান করেন যে বুদ্ধ এই
কথাই চক্রবর্তী উপাধি ধারণ করিতেন। বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে
অমুরোধ করিয়া গিরাছিলেন যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন
চক্রবর্তী সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মামুসারে সম্পন্ন হয়।
মিঃ বিলের মতে, বৌদ্ধ চক্রবর্তী শব্দ “ব্রাহ্মবর্তিন্” শব্দ
হইতে উৎপন্ন। “ব্রাহ্মবর্তিন্” শব্দের অর্থ “আদর্শ”।

চক্রবর্তিনী (জী) চক্রাকারেণ বর্ততে বৃত-গিনি ভীপ্। ১

জনী নারিক গন্ধদ্রব্য। ২ অলঙ্কার, আলতা। ৩ জটামাংসী।

৪ পপ্টি, উত্তর দেশে চলিত কথায় পপ্পী বলে। চক্রং সেনা-

বৃন্দং বর্তয়িতুং শীলমত্যাঃ চক্রবৃত্ত-গিনি-ভীপ্। ৫ সর্পভ্রমির

অধীশ্বরী। চক্রেবু সমুদ্রেবু বর্ততে বৃত-গিনি-ভীপ্। ৬ যুগের

অধিষ্ঠাত্রী, দলাধীশ্বরী।

“এবং বাল্যেইপি জাতাহং ডাকিনী চক্রবর্তিনী।”

(কথাসরিৎ ২০।১১৪)

চক্রবর্তী, কাশ্মীরের একজন রাজা, নির্জিতবর্মার পুত্র।

[কাশ্মীর দেখ।]

চক্রবাক (পুং জী) চক্রশব্দেন উচ্যতে বচ-বাক্। অলচর

পক্ষিবিশেষ, চলিত কথায় চকাচকি ও স্থানবিশেষে রামচকা

বলেন। “পরম্পরাক্রান্তি চক্রবাকরোঃ।

পুরা বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী।” (কুমার)

“বক্ণায় চক্রবাকীম্” (শুক্রযজু ২৪।২২)

পর্যায়—কোক, চক্র, রথাজাহ্নব, নামক, ভুরিগ্রেমন,

বন্দচাক্রী, মহায়, কান্ত, কামী, রাজি, বিশেষগামী, রাম,

বক্কোজোপম, কামুক। ইহারা হংসজাতীয়। দেখিতেও হংসের

জায়। আকারে রাজহংসের জায় দীর্ঘ। পুংজাতির দৈর্ঘ্য ২৫।২৬

ইঞ্চি। প্রবাদ আছে সমস্ত দিন এই জাতীয় পক্ষিরা জীপুর্কবে

একত্র মুখামুখী হইয়া বসিয়া থাকে, পাশাপাশি হইয়া সীতার

দেয়, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর ইহারা পৃথক্ অবস্থান করে;

রাজিতে চক্রবাক চক্রবাকী কখন এক সঙ্গে থাকে না।

বাঙ্গলার একজন কবি (রসলাগর) একটা কবিতায় এই

বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এক ব্যাধ চক্রবাক ও

চক্রবাকী ধরিয়া আনিয়া রাজিকালে একত্র রাখিয়াছে, তাহা

লইয়া কবিতাটী এই—“চকা কহে চকী প্রিয়ে এ বড় কোঁহুক।

বিধি হইতে ব্যাধ ভাল বড় দুখে সুখ ॥”

ইংরাজীতে কেহ Ruddy shelldrake, কেহ বা ruddy

goose বলেন। সংস্কৃতকাবে ইহার বর্ণনার আতিশয্য দেখিয়া

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে “ব্রাহ্মণী হংস” (Brahminy

duck) বলিয়া থাকেন। (Cusarca rutila.)

ইহাদের গাত্রের নানাতানে নানাবিধ বর্ণ থাকায়

দেখিতে অতি সুন্দর। মস্তকের চূড়ান্ন ও পার্শ্বের পাট-

কিলা রং, বক্ষে ও পিঠে গাঢ় কমলানবুর বর্ণ। ঘাড়ের

নীচে ও বকের উপরিভাগে, বক্ষ ও পৃষ্ঠের উপর বেড় দিয়া

৩৫ অঙ্গুলি প্রশস্ত একটা চক্চকে কালরঙ্গের ডোরা আছে।

এ ডোরা পুরুষেই দেখা যায়, সকল শ্রেণীতে আবার পুরুষেও

নাই। পাশ্চাত্যিকের নিরীক্ষণ পীতাত লোহিত। কোন

কোন শ্রেণীতে আবার এই স্থানের পালকগুলিতে লাল কাল রঙের ডোরা টানা। পুজু হরিতাভ, এতস্তির ডানা, পেট প্রভৃতি স্থানে নানাবর্ণের পালক দেখা যায়। জী-জাতির গাত্রবর্ণ পীত ও রক্তাভ খেত, মাথা ও ষাড় মুখিক-ধূসর, চক্ষু ও পদব্রজ কৃষ্ণবর্ণ।

ইহারা অতি অল্পেই চকিত হইয়া উঠে। শীকারে ইহা-দিগকে সহজে মারিতে পারা যায় না। অতি অল্প শব্দে চমকিত হইয়া উড়িয়া যায়, উড়িবার সময়ে একপ্রকার শব্দ করিতে থাকে, তাহাতে সমস্ত ঝাঁকটি চমকিয়া উড়িয়া পড়ে। ইহারা বড় বেশী উচ্চে উড়িতে পারে না, কিন্তু হংসাদির অপেক্ষা দ্রুত উড়ে। ভারতবর্ষে শীতকালে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। সিঙ্গু, পারশু, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, পূর্বতুর্কীস্থান, পঞ্জাব, উঃ পঃ প্রদেশ, অযোধ্যা, বাঙ্গালা, নেপাল, রাজপুতানা, মধ্যভারত, কচ্ছ, গুজরাট, কোঙ্কণ ও দাক্ষিণাত্যের অপর্যাপ্ত দেশে ইহাদের বাস। বৈদ্যক মতে, ইহার মাংসের গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ ও বলকারী। (রাজনি°)

চক্রবাকবন্ধু (পুং) চক্রবাকশু বন্ধু: ৬তং। স্বর্ঘ্য। দিনের বেলা চক্রবাক তাহার প্রিয়তমা চক্রবাকীর সহিত থাকিতে পারে বলিয়া স্বর্ঘ্যকে চক্রবাকের বন্ধু বলে। চক্রবাকবান্দব প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চক্রবাকবতী (স্ত্রী) চক্রবাকী ভূয়া সন্ত্যজ চক্রবাক-মতুপ-মতু বঃ ভীপ্। যে নদীতে অনেক চক্রবাক অবস্থিতি করে।

চক্রবাকিন্ (ত্রি) চক্রবাকোহস্ত্যজ চক্রবাক ইনি। চক্রবাক যুক্ত, যাহাতে চক্রবাক আছে।

চক্রবাট (পুং) চক্রস্যেব বাটো বেটনং যস্য বহত্ৰী। ১ ক্রিয়া-রোহ, কর্ণের প্রারম্ভ। ২ পর্যন্তসীমা। ৩ শিখাতরু। (মেদিনী)

চক্রবাড় (পুং) চক্রমিব বাড়তে বেটয়তি বাড়-অচ্। ১ লোকালোক পর্তত। (মেদিনী) (স্ত্রী) ২ মণ্ডল। ৩ মণ্ডলাকারে অবস্থিত সমূহ।

“এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবাটৈরলঙ্কৃতঃ।” (হরিবংশ ৭৭অঃ)

চক্রবাড়ী, বল্লের হাবড়া জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানকার প্রস্তুত হুতি ও সাড়ী বল্লের সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

চক্রবাত (পুং) চক্রমিব বাতঃ। ত্রিমিবায়ু, বাত্যা, চলিত কথায় ঘূর্ণী বলে।

“চক্রবাতশব্দপেণ জহরাসীনমর্ডকম্।” (ভাগবত ১০।৭।২০)

চক্রবাল (পুং) চক্রেণ চক্রাকারেণ বলতে বল বাহুল্যকাং ৭। ১ লোকালোক পর্তত। (স্ত্রী) ২ মণ্ডলাকারে অবস্থিত সমূহ। ৩ মণ্ডলাকার দিক্ সমূহ।

“হিহা গৃহং সংস্থতি চক্রবালং

নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোহন্তরম্॥” (ভাগবত ৫।১৮।১৪)

চক্রবালধি (পুং) কুকুর।

চক্রবিপ্রদাস, ভাস্করী নামক জ্যোতিষশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

চক্রবুদ্ধি (স্ত্রী) চক্রমিব বুদ্ধিঃ। ১ সুদের সুদ, বুদ্ধির বুদ্ধি।

“বুদ্ধেরপি পুনর্বুদ্ধিঃ চক্রবুদ্ধিরদাহতা।” (নারদ)

মহুর মতে চক্রবুদ্ধি অতিশয় নিম্ননীর। (মহু ৮।১৫০)

চক্রমস্ত্যন্ত চক্র-অচ্ চক্রে চক্রযুক্তঃ শব্দাদি তন্নিমিত্তা বুদ্ধিঃ। ২ শব্দাদির ভাটকরূপ লাভ, গাড়ী প্রভৃতির ভাড়া, ইহা দেশ ও কালভেদে দুইপ্রকার। [ভাটক দেখ।]

“চক্রবুদ্ধিঃ সমাক্রোডো দেশকালব্যবস্থিতঃ।” (মহু ৮।১৫৬)

চক্রব্যূহ (পুং) চক্রাকারো ব্যূহঃ। ব্যূহবিশেষ, চক্রাকার সেনাসমিবেশ। আচাৰ্য্য ভ্রোণ এই ব্যূহ নির্মাণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে মহাবীর অভিমহা কালগ্রাসে পতিত হন। [ব্যূহ দেখ।]

চক্রশকুল (পুং) শালমৎশ, গজাল মাছ।

চক্রশল্য (স্ত্রী) চক্রমিব শল্যমত্র বহত্ৰী। ১ খেতগুঞ্জ। (রাজনি°) ২ কাকতুণ্ডী।

চক্রশাল, চটগ্রামের অন্তর্গত একটি পরগণা। (দেশাবলী)

চক্রসিকন্দর, তৈরভূক্তের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম।

(ভ° ব্রহ্মধ° ৪৭ ১২২-১২৩)

চক্রশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ।

চক্রশ্রেণী (স্ত্রী) চক্রাণাং শ্রেণির্যত্র বহত্ৰী, ভীপ্। অজশূলী বৃক্ষ, ইহার ফল চক্রাকার শৃঙ্গের স্থায়, এই কারণে ইহার নাম চক্রশ্রেণী হইয়াছে।

চক্রসংজ্ঞ (স্ত্রী) চক্রশ সংজ্ঞা সংজ্ঞাত বহত্ৰী। ১ ধাতুবিশেষ, বঙ্গ। (হেম°) ২ চক্রবাক। (অমর)

চক্রসংবর (পুং) চক্রমিজ্জিয়চক্রেং সংবরণোতি চক্র-সম্-ব-অচ্। বৃদ্ধবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

চক্রসকৃৎ (ত্রি) চক্রমিব সকৃধি অশু বচ্। চক্রতুল্যসকৃধি-যুক্ত, যাহার উক্ত চক্রের স্থায়।

চক্রসাহস্রয় (পুং স্ত্রী) চক্রেণ সমানা আস্থা যস্য বহত্ৰী। চক্র-বাক। এই শব্দটি যোপধ বলিয়া ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইয়া থাকে।

“চকোরান্ বানরান্ হংসান্ সারসান্ চক্রসাহস্রান্।”

(ভারত ১৩।৫৪ অঃ)

চক্রস্বস্তিকনন্দাবর্ত, বুদ্ধের নামান্তর। (দিব্যাবদান ৫৬)

চক্রস্বামিন্ (পুং) চক্রস্য স্বামী ৬তং। চক্রের অধিপতি, চক্রে যাহার স্বত্ব আছে।

চক্রহস্ত (পুং) চক্রং হস্তে যস্য বহত্বী। ১ চক্রপাণি বিষ্ণু।

(ত্রি) ২ চক্রধারী, যাহার হাতে চক্র আছে।

চক্রা (স্ত্রী) চক্-তৃণৌ রক্-টাপ্। ১ নাগরমুক্তা। ২ কর্কট-শৃঙ্গী। (রাজনি°)

চক্রাংশ (পুং) চক্রস্য রাশিচক্রস্যাংশঃ। রাশিচক্রের ৩৬০ ভাগের এক ভাগকে চক্রাংশ বলে।

চক্রাকী (স্ত্রী) চক্রাকারেণ অকতি অক-গতো-অচ্ গোৱাদি° ভীষ্। হংসী। (শব্দরত্ন°)

চক্রাকৃতি (ত্রি) চক্রমিব আকৃতিৰ্যস্য বহত্বী। যাহার আকৃতি চক্রের তুল্য। চক্রাকার শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চক্রাখ্যরস (পুং) চক্রাখ্যাস্যো রসশ্চেতি কর্মধা°। ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রস সিন্দূর, অভ্র, হীরাভ্র, তাম্র ও কাংসা ইহার প্রত্যেক সমভাগ এবং ইহাদের সমুদায়ের যত পরিমাণ হইবে, তত পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ভেলার কাথে এক দিবস মর্দন করিয়া ছুই রতি পরিমিত বটা করিবে। ইহার নাম চক্রাখ্যরস। ইহা সেবনে বৃক্ষজ সর্ষপ্ৰকার অর্শরোগের বিনাশ হয়। (রসেজসার° অর্শচি°)

চক্রাক্রিতা (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ।

চক্রাকী (স্ত্রী) চক্রাকারেণ অকতে গচ্ছতি অকি-গতো অচ্ গোৱাদি° ভীষ্। হংসী। (শব্দরত্ন°)

চক্রাঙ্গ (পুং) চক্রমিবান্ধচক্রমিবান্ধং যস্য বহত্বী। ১ হংস। “ইদমুচ্চ চক্রাঙ্গা বচঃ কাকং বিহঙ্গমাঃ।” (ভারত ৮।৪।২১) চক্রমঙ্গস্য বহত্বী। ২ রথ। (অমর°)

৩ চক্রবাক।

“কলবিকং প্রবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামাকুটুম্।” (মহু ৫।১২)

চক্রাঙ্গা (স্ত্রী) চক্রমিবান্ধমন্ত্যাস্যাঃ চক্রাঙ্গ অচ্-টাপ্। ১ স্তূর্দর্শনা লতা। (রাজনি°) ২ কর্কটশৃঙ্গী, চলিত কথায় কাকড়াশৃঙ্গী।

চক্রাঙ্গী (স্ত্রী) চক্রমিবান্ধমন্ত্যাস্যাঃ বহত্বী, ভীষ্। ১ কর্কট-রোহিণী, কর্কটী। (মেদিনী) ২ হংসী, মাদীহাঁস। (শব্দরত্ন°) ৩ হিলমোচিকা, হিষ্ণা। (ত্রিকাণ্ড°) ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

৫ বৃষপণী। (রাজনি°) ৬ কর্কটশৃঙ্গী। (রত্নমালা°)

চক্রাট (পুং) চক্রং চক্রাকারমটতি চক্র-অট্-অণ্ উপস°। ১ বিবটবদ্য। ২ ধূর্ত, কপট। ৩ পরিমাণ বিশেষ। দীনার। (মেদিনী)

চক্রাতা, উঃ পঃ প্রদেশের দেৱাদুনজেলার মধ্যস্থিত একটা গিরিভূগ। অক্ষা° ৩০° ৪৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪' ২০" পূঃ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই ভূগটি জোনসার বাবর নামক স্থানে যমুনা ও তমসা নদী-অভিমুখী গিরিমালা

উপর অবস্থিত। এখানে ডাকঘর, একজন মাজিষ্ট্রেট ও একদল যুরোপীয় সৈন্য আছে।

চক্রাথ (পুং) কোরব যোদ্ধাবিশেষ।

চক্রাধিবাসিন্ (পুং) চক্রং তুণ্ডিকরং অধিবাসরতি অধি-বস গিচ্ গিনি। নাগরদ বৃক্ষ, নারকানেবু।

চক্রাস্ত (পুং) চক্রস্য সমুহস্যাস্তো নৈকট্যং মেলনং যত্র বহত্বী। কোন ব্যক্তির অনিষ্টসাধনের জন্য একাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া যে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করে, তাহাকে চক্রাস্ত বলে।

চক্রাস্তকারিন্ (ত্রি) চক্রাস্তং করোতি চক্রাস্ত কৃ-গিনি। যে চক্রাস্ত করে।

চক্রাস্তুর, বৃদ্ধভেদ। (অবদানশতক°)

চক্রাযুধ (পুং) চক্রমায়ুধস্য বহত্বী। ১ বিষ্ণু।

“চক্রাযুধেন চক্রেণ পিবতোহস্বজমোজসা।” (ভারত ১।১২২অ°)

(ত্রি) ২ চক্রধারী, যে চক্র ধারণ করে।

চক্রাবর্ত (পুং) চক্রস্যোবাবর্তঃ। মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ।

চক্রাহ (পুং) চক্রেতি আহ্বা যস্য বহত্বী। ১ চক্রমর্দ। (রাজনি°) ২ চক্রবাক।

“হংসসারসচক্রাহবকাকোলুকাদয়ঃ খগাঃ।” (ভাগ° ৩।১০।২৪)

চক্রাসী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Swietenia Chikrassa)

চক্রি (ত্রি) করোতি কৃ-কিন্ ষিতধ্ব (আদৃগমহনজনঃ কি-কিনৌ লিট্ চ। পা ৩।২।৭১) ১ কর্তা, করণশীল।

“চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে।” (ঋক্ ১।৯২) ‘চক্রয়ে কৃতবতে’ (সারণ°)

চক্রিক (পুং) চক্রধারী।

চক্রিকা (স্ত্রী) চক্রং তদাকারোহস্ত্যাস্যাঃ চক্র ঠন্-টাপ্। ১ জাহু। (রাজনি°)

চক্রিন্ (পুং) চক্রমন্ত্যাস্য চক্র-ইনি। ১ বিষ্ণু।

“ততোহতিকোপপূর্বস্য চক্রিণোবদনান্ততঃ।” (মার্ক° চণ্ডী)

২ গ্রামজালিক। (পুং স্ত্রী) ৩ চক্রবাক। ৪ সর্প। (ত্রি)

৫ কুন্তকার। ৬ স্বেচক। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৭ অজ, ছাগল।

(ত্রি) ৮ তৈলিক। (শব্দরত্ন°) (পুং) চক্রং রাষ্ট্রচক্রং অন্ত্যাস্য

চক্র ইনি। ৯ চক্রবর্তী। (হেম°) ১০ চক্রমর্দ। ১১ তিনিশ।

১২ বালনখ নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। হিন্দীতে বঘনহা বলে।

(পুং স্ত্রী) ১৩ কাক। ১৪ গর্দভ। (রাজনি°) (ত্রি)

১৫ চক্রযুক্ত, যাহার চক্র আছে। ১৬ যে চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করে।

“চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্রিয়াঃ।” (মহু ২।১২৮)

‘চক্রিণশ্চক্রযুক্তরথাদিয়ানাকটস্য’ (কুঙ্কু°)

(পুং স্ত্রী) ১৭ সত্তরজাতিবিশেষ। ঔশনস জাতিবিবেক

মতে বৈশ্বার গর্ভে চোর শূদ্রের ঔরসে চক্রীজাতির উৎপত্তি হয়।

“বৈজ্ঞান্য শূদ্রতঃচোরাঙ্জাতঃচক্রী স উচ্যতে।” (উশনঃ)

চক্রীবৎ (পুং স্ত্রী) চক্রং তদ্বদভ্রমণমন্ত্যাসা চক্র-মতৃপ্ ময়া
বঃ নিপাতনাৎ চক্রশব্দস্য চক্রী ভাবঃ। (আসন্যী বদন্তীচক্রী-
বৎ কক্ষীবক্রমণচ্চর্যবতী। পা ৮।২।১২।) ১ গদ্যত, গাথা।

“চক্রীবদলক্ষহৃদ্রুচো বিসমুঃ।” (মাঘ)

(পুং) ২ রাজবিশেষ। (সিং কোং) (ত্রি) ৩ চক্রযুক্ত,
যাহার চক্র আছে।

“সদো হবিধানানি চক্রীবন্তি।” (কাত্যায়নশ্রৌঃ ২৪।৩।৩০)

চক্রু (ত্রি) ক্রু কৃ দ্বিত্বক (কৃত্রশ্চ। উণ ১।২৩।) কর্তা।

“প্রাক্ প্রত্যয়নির্দেশাদভ্যতোহপি ভবতি চক্রুঃ কর্তা।”

(উগাদিবৃত্তি)

চক্রেশ্বর (পুং) চক্রস্য মণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ মথুরার সন্নি-
হিত চক্রতীর্থে অবস্থিত মহাদেব। [চক্রতীর্থ দেখ।]
২ তান্ত্রিক চক্রের অধিপতি। ৩ চক্রবর্তী।

চক্রেশ্বররস (পুং) ঔষধবিশেষ। রসসিন্দুর চারভাগ, সোহাগা
পাঁচভাগ ও অভ্র পাঁচভাগ, স্বেত পুনর্গবার রসে তিনদিন
ভাবনা দিয়া ছুইরতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহার নাম
চক্রেশ্বর রস। প্রতিদিন সেবনে অর্শনাশ হয়।

(রসেন্দ্রসারঃ অর্শোদিকার)

চক্রেশ্বরী (স্ত্রী) চক্রস্য ঈশ্বরী ৬তৎ। ১ জিনদিগের বিদ্যা-
দেবীবিশেষ। (হেমঃ) ২ রাজ্যের ঈশ্বরী।

চক্রোপজীবিন্ (ত্রি) চক্রং তৈলনিম্পীড়নযন্ত্ৰং উপজীবতি
উপ-জীব-গিনি। তৈলিক।

চক্ৰা (চাক্ৰা) কোন এক দেশের এক বিস্তৃত বিভাগ,
অনেকগুলি পরগণা ইহার অন্তর্গত থাকে। মীরজাফর এই
বঙ্গদেশকে ১৩টি চাক্ৰায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক চাক্-
লায় এক একজন চাক্ৰাদার বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।
স্থান ও কালভেদে ইহার পরিমাণের তারতম্য আছে, কোন
কোন স্থানে একটা গ্রাম বা মুন্সেফের এলাকাধীন স্থানকে
চাক্ৰা বলে। ২ নগরের যে অংশে বেশ্যা বাস করে।
৩ জাঁতা।

চক্ষুণ (স্ত্রী) চক্ষু-ল্যুট্ ছান্দসহাৎ ন খ্যাদেশঃ। ১ অমুগ্রহদৃষ্টি।
“কদ্বক্ণস্য চক্ষুণম্।” (ঋক্ ১।১০৫।৬) ‘চক্ষুণং অমুগ্রহদৃষ্টি-
দর্শনঃ’ (সায়ণ।)

২ মদ্যপানরোচক ভক্ষ্যদ্রব্য, চাট্টনী। (হেমঃ) ৩ কথন।

চক্ষুণি (ত্রি) চক্ষ-অনি। প্রকাশক।

“সনো বিভাবা চক্ষুণিণ” (ঋক্ ৬।৪।২)

‘চক্ষুণিঃ প্রকাশকঃ’ (সায়ণ)

চক্ষু (স্ত্রী) [বৈ] চক্ষ-ল্যুট্ নিপাতনে সাধু। চক্ষু।

“কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষুণী মুখম্।” (অথর্ব ১০।২।৬)

চক্ষু (পুং) চক্ষ-অমি নখ্যাদেশঃ। ১ বৃহস্পতি। (ত্রিকাণ্ডঃ)
২ উপাধার। (উগাদিকোষ)

চক্ষু [বৈ] চক্ষ-উস্ ছান্দসহাৎ সকারলোপঃ। ১ নেত্র,
দর্শনেন্দ্রিয়। [চক্ষুঃ দেখ।]

“চক্ষুমা মনসো জাতঃচক্ষোঃ সূর্যোহজারত।”

(ঋক্ ১০।৯০।১৩) ‘চক্ষোঃ চক্ষুঃ’ (সায়ণ।)

(পুং) ২ অজমীঢ়বংশীয় একজন রাজা, ইহার পিতার
নাম পুষ্কজাহ্নু ও পুত্রের নাম হর্যাহ। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯ অঃ)
৬ দিবের পুত্র। (স্ত্রী) ৪ নদীবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণের মতে
ব্রহ্মপুত্রী প্রাবিত করিয়া গঙ্গা যখন মর্ত্তে পতিতা হন, তখন
তাহার স্রোত চারিদিকে ঘাইয়া চারিটা নদীরূপে পরিণত
হয়। তাহার একটির নাম চক্ষু। চক্ষু নদী সমস্ত পশ্চিম
গিরি প্রাবিত করিয়া কেতুমালবর্গের মধ্য দিয়া পশ্চিম
সাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম অক্সস্।
(Oxus) (বিষ্ণুপুরাণ ২।২ অঃ) [বংকু দেখ।]

৫ কোন কোন আভিধানিকের মতে ২, ৩ ও ৪র্থ অর্থ
বুঝাইতে চক্ষু শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহার লোক-
ব্যবহারে চক্ষু শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করেন না। চলিত
বাঙ্গালায় নেত্র বুঝাইতে ‘চক্ষু’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

চক্ষুঃপথ (পুং) দৃষ্টিপথ, যতদূর দৃষ্টি চলে।

চক্ষুঃপীড়া (স্ত্রী) চক্ষুঃ পীড়া ৬তৎ। নেত্ররোগ।

[চক্ষুরোগ দেখ।]

চক্ষুঃশ্রবস্ (পুং স্ত্রী) চক্ষুঃ শৃণোতি ঋ-অহ্ন-চক্ষুরেব শ্রবঃ
কর্ণোদয়া ইতি বা। সর্প। (অমর)

“ইতি ঋ চক্ষুঃশ্রবসাং প্রিয়ানলে

স্তবন্তি নিন্দন্তি হৃদা তদাশ্রয়ঃ।” (নৈষধচ ১।২৮)

চক্ষুখেঁকুয়া (চক্ষুখাদকজ) যাহার চক্ষু নাই। যে ব্যক্তি
দেখিয়াও না দেখায় ভান করে, চলিত বাঙ্গালায় তাহাকে
চক্ষুখেঁকুয়া বা চোকখেঁকো বলিয়া গালি দেওয়া হয়।

চক্ষুর্গোচর (ত্রি) চক্ষুর্ষোদর্শনেন্দ্রিয়স্য গোচরঃ ৬তৎ।
যাহা চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায়, চক্ষুর বিষয়। জীলিঙ্গে
টাপ্ হয়।

চক্ষুপ (পুং) প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজা, নেদিষ্ঠ বংশীয়
খনিনেত্রের পুত্র।

চক্ষুর্দান (স্ত্রী) চক্ষুর্ষোদানঃ ৬তৎ। - নেত্র অর্পণ, জ্ঞানদান,
উপদেশ দিয়া চতুর বা চালাক করা।

চক্ষুরিন্দ্রিয় (স্ত্রী) চক্ষুশ্চ তদিন্দ্রিয়ধেতি কর্মধাণ্ডা। নেত্র।

চক্ষুগ্রহণ (স্ত্রী) চক্ষুর্ষোগ্রহণঃ ৬তৎ। চক্ষুঃপ্রাপ্তি।

চক্ষুর্দা (ত্রি) চক্ষুর্দাদি দা-কিপ্। যে চক্ষু দান করে, চক্ষু-প্রদাতা। “কনীনকশ্চক্ষুর্দা অমি চক্ষুর্মে দেহি।” (শুক্রযজুঃ ৪।২)

চক্ষুর্ভূৎ (ত্রি) চক্ষুর্ভূত্বি ভূ-কিপ্ ভূগাগমঃ। ১ লোচনযুক্ত। ২ যে চক্ষু প্রতিপালন করে, চক্ষুরক্ষক।

চক্ষুর্মন্ত্র (ত্রি) নেত্রমুদ্বকর।
“চক্ষুর্মন্ত্রস্য হৃদ্যর্দঃ পুণ্ডীরপি শৃণীমসি।” (অথর্ব ২।৭।৫)

চক্ষুর্ময় (ত্রি) চক্ষু-ময়ট্। যাহার অনেক চক্ষু আছে।

চক্ষুর্মল (ক্ৰী) চক্ষুবোমলং ভতৎ। নেত্রমল, পিচুটী। (শব্দার্থচিৎ)

চক্ষুলোক (ত্রি) চক্ষে দর্শন।

চক্ষুবৃত্ত (ত্রি) চক্ষুরোগে পীড়িত।

চক্ষুর্ভূত্বিক (ত্রি) শাকবীপহ নদী বিশেষ। (ভারত ৩।১১ অঃ)

চক্ষুর্ভূত্বিক (ক্ৰী) চক্ষুভূত্ব্যোতির্বহতি বহ-কর্তরি ল্য। মেঘ-শুকী বৃক্ষ। (রত্নমালা)

চক্ষুর্বিষয় (পুং) চক্ষুষো বিষয়ঃ ভতৎ। ১ চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপাদি। ভাষাপরিচ্ছেদের মতে উদ্ভূতরূপ, উদ্ভূতরূপযুক্ত দ্রব্য, পৃথক্, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপারত্ব, স্নেহ, পরিমাণ, দ্রবত্ব ও যোগ্যবৃত্তি ক্রিয়া, জাতি এবং সমবায় এই নয়টি পদার্থ চক্ষুর বিষয়।

“উদ্ভূতরূপং নয়নত গোচরো দ্রব্যানি তদ্বস্তি পৃথক্‌সংখ্যে।

বিভাগসংযোগপরাপরত্ব স্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্।

ক্রিয়াঃ জাতিঃ যোগ্যবৃত্তিসমবায়ঞ্চ তাদৃশম্।

গৃহ্যতি চক্ষুঃ সংযোগাৎ।” (ভাষাপরিচ্ছেদ)

২ নেত্রপ্রচারস্থান, যতদূর পর্য্যন্ত চক্ষুর দৃষ্টি চলে।

“পুরোস্ত চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টা মনোভবেৎ।” (মহু ২।১২৮)

চক্ষুর্হন (ত্রি) চক্ষুর্হা হন্তি-হন-কিপ্। ১ যাহার দৃষ্টিতে বিনাশ হয়, দৃষ্টিনাশক। (পুং) ২ এক প্রকার সর্প, ইহাদের দৃষ্টি মাত্রেরই জীব জন্তুর বিনাশ হইয়া থাকে।

“সর্পা স্পর্শসমাঃ কেচিৎ তথাচ্ছৈ মকরস্পৃশঃ।

বিভাষা যাতিনং কেচিৎ তথা চক্ষুর্হণোহপরে।”

(ভারত ১।৩।৫ অঃ)

চক্ষুশিচৎ (ত্রি) দৃষ্টিশক্তিসঞ্চরকারী।

চক্ষুকাম (ত্রি) চক্ষুঃ কামরতে অভিলষতি চক্ষুস্ কাম-অণ-উপসৎ। যে ব্যক্তি চক্ষুর কামনা করে।

চক্ষুর্ময় (ত্রি) চক্ষুস্ পঞ্চমাত্তসিল্ তকারস্য টকারঃ। চক্ষু হইতে বা চক্ষুহেতুক।

চক্ষুপতি (পুং) চক্ষুর অধিপতি, স্বর্ঘ্য।

চক্ষুপা (ত্রি) চক্ষুবী পাতি চক্ষুস্-পা-কিপ্। চক্ষুরক্ষক।

“প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুপাঃ প্রোতপাশ্চমে।”

(শুক্রযজুঃ ২।১৩৪)

‘চক্ষুবী পাতিতি চক্ষুপা’ (মহীধর)

চক্ষুশ্চৎ (ত্রি) প্রশস্তঃ চক্ষুরন্ত্যস্য চক্ষুস্ মতৃপ্। ১ প্রশস্ত লোচনযুক্ত। ২ দৃষ্টিশক্তিসম্বন্ধে।

“চক্ষুশ্চৎ শ্রুতে তে ব্রবীমি।” (ঋক্ ১০।১৮।১)

‘চক্ষুশ্চৎ দর্শনবভে’ (সায়ণ।)

চক্ষুশ্চৎ (ত্রি) চক্ষুশ্চৎ ভাবঃ চক্ষুশ্চৎ-তল-টাপ্। প্রশস্ত চক্ষু।

“চক্ষুশ্চৎ শাস্ত্রেন স্তম্ভকার্যার্থদর্শিনা।” (রঘু ৪।১৩)

চক্ষুষ্য (ত্রি) চক্ষুবে হিতং চক্ষুস্-ষৎ। ১ চক্ষুর হিতকর।

“দক্ষিণোমাক্রতঃ প্রেষ্ঠশ্চক্ষুষ্যো বলবর্ধনঃ।” (সুশ্রুত স্বত্ ২০ অঃ) ২ প্রিয়দর্শন।

“অতুংসর্কস্য চক্ষুষ্যঃ সতু হ্রলভবর্ধনঃ।” (রাজতরং ৩।৪২৫)

৩ নেত্রজাত, যাহা নেত্রে বা নেত্র হইতে উৎপন্ন হয়। “চক্ষুষ্যঃ খলু মহতাং পটেরলজ্বাঃ।” (মাঘ ৮।৫৭)

‘চক্ষুষি ভবঃ চক্ষুষ্যঃ প্রিয়োহক্ষিজনশ্চ।’ (মল্লিনাথ)

(পুং) ৪ কেতকবৃক্ষ। ৪ পুণ্ডরীকবৃক্ষ। (মেদিনী)

৫ শোভাজন বৃক্ষ। (রাজনিং) ৬ রসাজন। (হেমং) (ক্ৰী)

৭ সৌবীরাজন। ৮ খর্পরীতুখ। ৯ প্রপৌণ্ডরীক। (রাজনিং)

চক্ষুষ্য (ত্রি) চক্ষুষ্য-টাপ্। ১ কুলখিকা, কুলখকলাই। ২ স্তভগা। (মেদিনী) ৩ অজশৃঙ্গী। ৪ বনকুলখিকা। (রাজনিং)

চক্ষুস্ (ক্ৰী) চষ্টে ধাতুনা মনেকার্থত্বাৎ পশুত্যানেন চক্ষকরণে উসি শিচ্চ (চক্ষেঃ শিচ্চ। উণ্ ২।১২০) ১ দর্শনেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা উদ্ভূতরূপ ও তদ্বিশিষ্ট দ্রব্য প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়।

[চক্ষুবিষয় দেখ।] পর্য্যায়—লোচন, নয়ন, নেত্র, দৈক্ষণ, অক্ষি, দৃক্, দৃষ্টি, অধক, দর্শন, তপন, বিলোচন, দৃশা, বীক্ষণ, প্রেক্ষণ, দৈবদীপ, দেবদীপ, দৃশি, দৃশী। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বর্ঘ্য। জ্ঞান ও বৈশেষিক মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজসিক ও মধ্যম পরিমাণ শরীরাবয়ব চক্ষুর অধিষ্ঠানগোলকে অবস্থিত। সাংখ্যাচার্য্যেরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চক্ষু আহঙ্কারিক, কিয়ৎপরিমাণ তেজ অবলম্বন করিয়া চক্ষুগোলকে অবস্থান করে। ভ্রান্তলোকেরা চক্ষুর অধিষ্ঠানকে ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। (ষড়্‌ধারী ২ অধ্যায়)

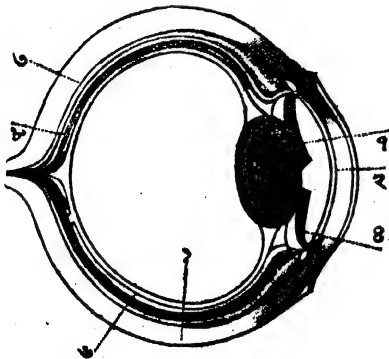
২ শরীরাবয়ব। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, নাসিকামূলের উভয়দিকে অবস্থিত, শরীরের প্রথমোক্ত মস্তকের উপাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। ইহার মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ গোলকের অভ্যন্তরে অতিশয় উজ্জ্বল যে দুইটা পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে উহার কনীনিকা বা তারার বলে। ইহা ছাড়া কৃষ্ণ-গোল, দৃষ্টি, গুরুমণ্ডল, বর্জ ও পদ্ম এই নয়টি চক্ষুর অবয়ব। শরীরাবয়ব মধ্যে প্রাণীগণের এই অবয়বটী অতিশয়

প্রয়োজনীয় ও মনোহর। ইহার অভাবে রূপ, বোবন, হস্ত, পর প্রভৃতি কোন অবয়বেই শরীরের সৌন্দর্য থাকে না। ইহার বিষয় সূক্ষ্মে এইরূপ লিখিত আছে—

নয়নের বৃদ্ধবৃদ্ধ অর্থাৎ শরীরের যে অবয়বটিকে চক্ষু বলিয়া সাধারণে ব্যবহার করে, তাহার বিস্তার দুই বৃদ্ধবৃদ্ধ-ভেদ, যাহার চক্ষু তাহার বৃদ্ধবৃদ্ধই মাপিতে হয়, ইহার আকার গোস্তনের ছায় বর্তুল এবং ইহা সকল ভূতের অংশ হইতে উৎপন্ন। নেত্র-বৃদ্ধবৃদ্ধের মাংস ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন, এইরূপে অগ্নি হইতে রক্ত, বায়ু হইতে কৃষ্ণভাগ, জল হইতে শ্বেতভাগ ও আকাশ হইতে অশ্রুমাংসসমুদ্ভূত। নেত্রের তৃতীয়াংশ কৃষ্ণমণ্ডল এবং দৃষ্টিস্থান কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমাংশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। নেত্রের মণ্ডল পাঁচটি, সন্ধি ছয়টি ও পটল পাঁচটি। মণ্ডল পাঁচটি যথা— ১ পশ্চিমমণ্ডল, ২ বক্ষমণ্ডল, ৩ শ্বেতমণ্ডল, ৪ কৃষ্ণমণ্ডল ও ৫ দৃষ্টিমণ্ডল। ইহাদের পর পরটি যথাক্রমে পূর্ব পূর্বের মধ্যগত। সন্ধি ছয়টি যথা— ১ পশ্চিম ও বক্ষমধ্যগত সন্ধি, ২ বক্ষ ও শ্বেতমধ্যগত সন্ধি, ৩ শ্বেত ও কৃষ্ণমধ্যগত সন্ধি, ৪ কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি, ৫ কনীনিকাগত সন্ধি ও ৬ অপাঙ্গগত সন্ধি। পটল পাঁচটি যথা— ১ বাহ্য বা প্রথম পটল তেজ ও জলাশ্রিত, ২ মাংসাশ্রিত, ৩ মেদ আশ্রিত, ৪ অস্থিাশ্রিত ও ৫ দৃষ্টিমণ্ডলাশ্রিত। (সূত্রত উঃ ১ অঃ)

যুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে—যে ইঞ্জিয় দ্বারা দর্শনজ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম চক্ষু। চক্ষুর গঠনপ্রণালী অতি মনোহর। শারীরযন্ত্রের মধ্যে মস্তিষ্কের গঠনের পরই চক্ষুর গঠন। এরূপ অনির্বচনীয় কৌশল ভাষায় বর্ণনা করিয়া ঠিক বুঝান যায় না।

যুরোপীয় শারীরতত্ত্ববিদেরা চক্ষুস্তম্বনরূপে যতদূর কৃত-কার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে নেত্রমণ্ডলে ১১টি প্রধান উপাদান আছে। ১ ঘনত্বক (Sclerotic), ২ শার্দ্ভক



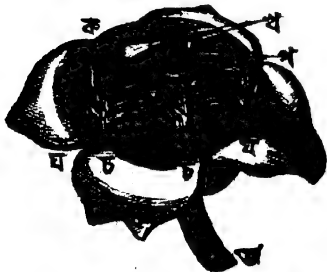
বা স্বচ্ছাবরণী (Cornea), ৩ কৃষ্ণাবরণক বা কৃষ্ণমণ্ডল

(Choroid) ৪ তারকামণ্ডল (Iris), ৫ কনীনিকা (Pupil), ৬ চিত্রপত্র (Retina), ৭ তারকামণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগ (The posterior chamber of the eye), ৮ তারকামণ্ডলের সম্মুখভাগ (The anterior chamber of the eye), ৯ দীপ্তোপল বা মণি (Crystalline lens), ১০ স্বচ্ছ-রস (Vitreous humour), ১১ দর্শনস্নায়ু (Optic nerve.)

চক্ষুর প্রধান আবরণ, যাহাকে সাধারণতঃ চক্ষুর পাতা বলা যায়, তাহাকে চক্ষুপল্লব বা অক্ষিপুট (Eyelids) বলে। ইহার ধারে কতকগুলি লোম থাকে, তাহাকে পশ্ম (Eyelash) বলে, এই অক্ষিপুটের পেশীভাগ যে শৈল্পিক ঝিল্লী দ্বারা ভিতরের দিকে আবরিত অর্থাৎ অক্ষিপুটের যে অংশ ঠিক অক্ষিগোলকের উপর থাকে, তাহাকে যোজকত্বক (Conjunctiva) বলে। এই যোজকত্বকের নিম্নে আর একটা কঠিন আবরণ আছে। ইহার পশ্চাদ্ভাগ স্বচ্ছ ও সম্মুখ ভাগ স্বচ্ছ, ঐ স্বচ্ছাংশকে ঘনত্বক বা শুক্রমণ্ডল (Sclerotic) বলা হয়। চক্ষুতারকার সম্মুখভাগে ঘনত্বকের যে স্বচ্ছাংশ থাকে, উহা বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একখানি উৎকৃষ্ট পালিশ করা কাচখণ্ডে তারকাটি ঢাকা দেওয়া আছে। এই কাচখণ্ডবৎ পদার্থ ঠিক যেন বাটির মত খুঁকলে এবং যেন উবুড় করিয়া দেওয়া আছে, স্তরাতঃ বাহির হইতে দেখিলে ইহার মধ্যস্থল উবুড় করা বাটির তলার ছায় উচ্চ দেখায়, বাস্তবিকও তাহাই। ইহারই নাম স্বচ্ছাবরণী বা শার্দ্ভক (Cornea)। ঘনত্বকই প্রকৃতপক্ষে অক্ষিগোলকের বহিরাবরণ। ইহা কতকগুলি বৃহতস্ততে নির্মিত। এই তন্তুগুলি শ্বেতবর্ণ, ঘন ও কঠিন। ইহা দ্বারা অক্ষিগোলক প্রায় ১/২ অংশ আবৃত থাকে। এই আবরণ অক্ষিগোলকের পশ্চাদিকের মধ্যস্থলে যে স্থান দিয়া দর্শনস্নায়ু আসিয়া দীপ্তোপল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেই স্থলে ইহা ঐ স্নায়ুকোঠের দৃঢ়মাত্রিকার (Dura mater) সহিত মিলিয়া গিয়াছে। দর্শনস্নায়ু যে স্থলে নেত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে ইহা প্রায় ১ ইঞ্চির ২/৩ অংশ পূর এবং ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া স্বচ্ছাবরণীর নিকটে ১/৩ অংশ দাঁড়াইয়াছে। স্বচ্ছাবরণী কিন্তু আবার অত্যন্ত মোটা। এই আবরণীই চক্ষুর প্রকৃত রক্ষক, ইহা দ্বারাই বাহিরের কোন বস্তু দ্বারা চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না। স্বচ্ছাবরণী শুক্রমণ্ডল বা ঘনত্বকের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা মোটা ও কঠিন। মানবের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই স্বচ্ছাবরণের শৃঙ্গস্থান অর্থাৎ উচ্চাংশের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে ইহার পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়। ইহারই জন্ত লোকের কীর্ণদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি

(Short or long sight) হইয়া থাকে। ইহা যদিও ভ্রম, কিন্তু হস্ত ব্যবচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইহাতে এটা স্তর আছে। ইহার ১ম স্তর সৈদ্যিক খিলীয় উপস্থ-নির্গিত, চক্ষুতে বায়ুকাপি পড়িলে এই স্তরে আটক হয়। এই স্তরটি অতিশয় স্পর্শচৈতন্যবিশিষ্ট যোজকত্বের ন্যায় ২য় স্তরটি স্বচ্ছাবরণীয় প্রকৃত বহিরাবরণী, ইহা আকৃকন ও প্রসারণীয়তাবিশিষ্ট, ইহা এক ইঞ্চির ১/১০ অংশ মোটা। ইহা দ্বারাই স্বচ্ছাবরণীর বহির্ভাগের হ্রাসভাব সংরক্ষিত হয়। তৃতীয় স্তরটিই প্রকৃত স্বচ্ছাবরণী, ইহাতেই এই আবরণটির ঘনত্ব ও দৃঢ়তা নির্ভর করে। ৪র্থ স্তরটি ২য় স্তরের স্বচ্ছাবরণীর পশ্চাদাবরণী। ইহা দ্বারা স্বচ্ছাবরণীর অন্তর্ভাগের হ্রাসভাব সংরক্ষিত হয়। ইহা এত হৃদয়, যে ইহার পঠনাদি বুঝিয়া উঠা হ্রাসাধ্য। ইহা দ্বারা দৃষ্টিবিভ্রম নষ্ট হয়। ৫ম স্তরটি ১ম স্তরের জলীয় রসাবরক উপস্থ-মাত্র। অনেক অনুমান করেন যে এই জলীয় রস এই স্ব-হইতে নিঃসৃত হয়।

চক্ষুসগুল সরাইয়া দিলে একটি কৃষ্ণবর্ণ আবরণ দৃষ্টি-গোচর হয়, ইহাকে কৃষ্ণাবরক (Choroid) বলে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমষ্টিতে গঠিত ও অতি আন্তরিকভাবে যোজক-শিরাদ্বারা চক্ষুসগুলের সহিত সংযুক্ত। ইহার মধ্যে তারকামণ্ডলগামী কতকগুলি ধমনী আছে। ইহার বহিঃভাগ স্বচ্ছরসের সহিত সংযুক্ত, এই সংযোগনের জন্ত অক্ষিসংস্থানের মধ্যে ক্রমবিকীর্ণ ৬০।৭০টা তাঁজ আছে। এই তাঁজগুলির কোনটা হ্রস্ব বা কোনটা দীর্ঘ; এই গুলি আবার স্বচ্ছরসের মধ্যে প্রবিষ্ট। অভ্যন্তরভাগেও ইহা চিত্রপত্রের সহিত ঐরূপ আলগাভাবে সংযুক্ত। কৃষ্ণ-মণ্ডলটি প্রবর্তিত শাখাশিরাসমষ্টিতে নির্গিত, ইহা দেখিতে ঘূর্ণীগুলের কুণ্ডলীর স্তর (Vasa vorticiosa)। এই কুণ্ডলী অষ্টকোণবিশিষ্ট। ইহারই মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ স্লেয়াবৎ পদার্থাধার আছে, ইহার বাস এক ইঞ্চির ১/১০ অংশমাত্র। এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থকে পিগমেন্টম্ নাইগ্রাম্ (Pigmentum nigrum) বলে।

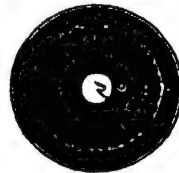


উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল, ইহাতে চক্ষুস চক্ষুসগুল

কাটিয়া পড়ের পাণ্ডুর মত উন্টাইয়া কেলা হইয়াছে। চ চ তারকাসংযুক্ত শিরাদি, ঘ ঘ চক্ষুসগুলের কাটা অংশ। অ দর্শনমায়, ক চক্ষুপেশী, খ গ তারকায় শিরা।

চক্ষুস দুইটা কোণ, একটি নাসিকার দিকে ও অপরটি কর্ণের দিকে থাকে, ইহাকে অশ্রুপথ বলে। উর্দ্ধ ও অধঃ এই দুইটা পাতার নাসিকাক্রিমুখী প্রান্তভাগে এক একটি ছিদ্র আছে, তাহাকে অশ্রুপ্রণালীর রন্ধ (Puncta lachrymalia) বলে। নাসিকার অভিমুখে ঐ রন্ধ হইতে নাকের ভিতরে অশ্রু গমনের জন্ত যে পথ আছে, তাহার নাম অশ্রুপথ। এই পথে ক্ষুদ্রমালী (Canaliculi), অশ্রুজনক হ্রদ (Lacus Lachrymalis) ও অশ্রুজনক কোষ (Lachrymal sack) প্রভৃতি পার হইয়া নাসিকাপ্রণালী (Nasal duct) দিয়া নাসিকা মধ্যে স্লেয়াকারে পরিণত হয়। যে সন্ধি হইতে অশ্রু বাহির হইয়া ঐ পথ দিয়া চক্ষুকে সজল ও মন্থন রাখে, তাহাকে অশ্রুগন্ধি (Lachrymal gland) বলে। অশ্রুসঞ্চালী ঐ সকল যন্ত্রের সাধারণ নাম অশ্রুযন্ত্র (Lachrymal apparatus.)

চক্ষুতারকা বা তারকামণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলেরই ক্রমবিকাশ বলা যায়। তবে ইহার খিলী দুইখানির গঠন সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন। এই মণ্ডলটি অতি হৃদয় চেন্টা খিলীমাত্র। ইহা



লব্ধভাবে দীপ্তোপলের মধ্যবর্তী স্থানকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। সম্মুখে সম্মুখগর্ভ ও পশ্চাতের ভাগকে পশ্চাদগর্ভ বলে। স্বচ্ছাবরণীর মধ্য দিয়া দেখিলেই এই অংশটি রঞ্জিত দেখায়। ইহার মধ্যস্থল তারার জন্ত সছিদ্র, ইহা ক্রমবিকীর্ণ শিরাসমষ্টিতে প্রথিত। এইরূপ গঠিত বলিয়াই ইহা আকৃকন ও প্রসারণে উপযুক্ত এবং ইহারই জন্ত আলোকের প্রভাবে আকৃকন প্রসারণ বোধ হয়। ইহা দ্বারাই চক্ষুতার বা দীপ্তোপলে অধিক আলোক লাগিতে পায় বা অধিক আলোকপ্রবেশ করিলেও তাহাতে কোন হানি হয় না।

পূর্বোক্ত দুই গর্ভে জলীয় রস (Aqueous humour) বর্তমান। এই রসে ইহা একপ্রকার ভাসমান বলিয়া ইহা সহজে সরিয়া যায়।

ইহার ঠিক পরেই দীপ্তোপল বা অক্ষিসূত্র (Crystalline lens), ইহা ঘন স্বচ্ছ ও উভয়দিকে হ্রাসভাবিশিষ্ট বৈদিক পদার্থ। ইহার সম্মুখভাগের হ্রাসভা পশ্চাত্তাগের হ্রাসভা অপেক্ষা কম। ইহা কৃষ্ণমণ্ডলের শেষসীমায় প্রথিত।

এই সকল পদার্থ ভিন্ন আর বস্তু হানে শূন্যগর্ভ, সমস্ত অংশই একপ্রকার বস্তু রসে (Vitreous humour) পূর্ণ।

কক্ষমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুর প্রধান অঙ্গ চিত্রপত্র (Retina) বর্তমান। ইহা দীপ্তোপলের সম্মুখে ও তারকান্ডলের পশ্চাতে অবস্থিত। ইহাও একটি আবরণ। এই আবরণটিতে আলোকপ্রভাবে দৃশ্যবস্তুর স্নিককর্ণরূপ স্পর্শচৈতন্য জন্মে। ইহা অর্দ্রবচ্ছ ও কোমল। সামান্যতঃ ইহাকে দর্শনশাস্ত্রের বিদ্যুতভাগ বলা হইয়া থাকে। ইহার গঠন-প্রণালী অতি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর।

চারিদিকের চারি কোণে চক্ষু উত্তর পার্শ্ববর্তী পেশী (Muscles) দ্বারা পরিচালিত হয়।



চক্ষুর পেশী।

চারিটি সরল পেশী (Rectus) চক্ষুকে কোটরাভ্যন্তরে আসিবার ও তিষ্ঠাৎ পেশীদ্বয় কোটর হইতে বহির্গত হইবার শক্তি প্রদান করে। কোন দিকে চক্ষু আবৃত্ত হইলে তৎকালিক পেশী সকল সেই সময় ক্রীণবল হইয়া পড়ে। উক্ত চিত্রের উপরস্থ লিভেটার প্যালিট্রী নামক পেশী দ্বারাই চক্ষু উন্মীলিত ও অর্বিউলেজ নামক পেশী দ্বারা পাতা নিমীলিত হয়।

এতদ্ভিন্ন চক্ষুতে আরও নানাবিধ স্নায়ু স্নায়ু বস্তু আছে। অক্ষিবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে ও পর্য্যালোচনা দ্বারা অতি সূক্ষ্মদর্শী বিবেচক ব্যক্তির তত্ত্বাবতের গঠন-প্রণালী, কার্য এবং উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছেন, সে সমুদয়ের সম্যক আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব।

৩ তেজ। “স্বর্বাশ্চক্ষুঃ” (তাণ্ড্যং ব্রাং) ‘চক্ষুঃ তেজসে’ (তাণ্ড্যং) চক্ষুরাগ (পুং) চক্ষুরোগো রক্ততা ৬তৎ। ১ চক্ষুর অরুণতা, রক্তিম। ২ চক্ষুর আকর্ষক অমুরাগবিশেষ, নারক বা নারিকার কামজ দশাবস্থার সর্বপ্রথম অবস্থা, অলসারশাস্ত্রে নয়নপ্রীতি নামে ইহার উল্লেখ আছে। [নয়নপ্রীতি দেখ।]

চক্ষুরোগ (পুং) চক্ষুরোগো ৬তৎ। নেত্ররোগ, নেত্রমণ্ডলে সর্বসময়ে ৭৮ প্রকার রোগ জন্মিতে পারে। তাহার মধ্যে ১২টি দৃষ্টিগত, ৪টি কক্ষগত, ১১টি গুরুমণ্ডলগত, ২১টি বস্তুগত, ২টি পক্ষগত, ৯টি সন্ধিগত, সমস্ত নেত্রব্যাপক ১৭টি এবং অন্তরকক্ষের দুইটি এই আটাত্তরটি রোগকেই নেত্ররোগ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। (তাবপ্রকাশ মধ্যখণ্ড ৩ ভাং)

সুশ্রুত ৭৬ প্রকার নেত্ররোগ নির্ণয় করেন। তাহার মধ্যে— ১০টি বায়ুজন্ম, ১০টি পিত্তজন্ম, ১০টি কফজ, ১৬টি রক্তজন্ম ও ২৪টি সন্ধিপাত জন্ম। ইহা ছাড়া আরও দুইপ্রকার বায়ুরোগ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত উত্তরং ১ অঃ)

নেত্ররোগের নিদান।—রৌদ্রাদি দ্বারা উত্তপ্ত ব্যক্তির কলে অবগাহনে নয়নতেজের অতিভব, দূরস্থ বস্তুদর্শন, দিবানিত্রা ও রাত্রিজাগরণ, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা উপঘাত, নেত্রে ধূলী বা ধূমপ্রবেশ, বমনবেগধারণ, অত্যন্ত বমন, শুষ্ক, কালিক, কুলখ কলাস, ও মাষকলাই এই সকল দ্রব্যের অতিরিক্ত সেবন, মল বা মূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজন্ম সন্তাপ, মস্তকে আঘাত, ঔষতগামী দান আরোহণ, শাঙ্গবিহিত ঋতুচর্যায় বিপরীত আচরণ, কাম-ক্রোধাদি জনিত শারীরিক পীড়া, অতিরিক্ত জীসন্তোষ, অশ্রুবেগধারণ ও অতি স্নান বস্তু নিরীক্ষণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষ এই সকল কারণে দূষিত হইলে শিরাসমূহ দ্বারা উর্দ্ধদেশ আশ্রয় করে। তাহাতে দৃষ্টি প্রভৃতি নেত্র-বস্তু কষ্টকর রোগ উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টিগত রোগের বিবরণ।—দৃষ্টি কক্ষমণ্ডলের মধ্যস্থিত, আকারে একটি ময়ূরভালের অর্দ্ধপরিমাণ, নিম্নেবে জোনাকী পোকের ছায় ও নিম্নেবের অভাব হইলে বিক্ষলিতের সূচন, হ্রিৎস্বক চক্ষুর বাহুপটল দ্বারা আবৃত এবং ক্ষীণ প্রকৃতি। ইহা পঞ্চভূতায়ক ও চিরস্থায়ী তেজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। চক্ষুতে চারিটি পটল আছে, তাহার প্রথমটির নাম বাহুপটল রক্ত ও রসের আধার, দ্বিতীয়টি মাংসাধার, তৃতীয়টি মেদের আধার ও চতুর্থটি কালকাস্থির আশ্রয়। মিলিত চারিটি পটলের স্থূলতা নেত্রমণ্ডলের পঞ্চমাংশের এক অংশ। দোষ চতুর্থ পটলগত হইলে রোগী কখন বা অস্পষ্টরূপে ও কখনও বা স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। দ্বিতীয় পটলে দোষের সঞ্চয় হইলে সম্যকরূপে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয় না।

মক্ষিকা, মশক, কেশ, জালক, মণ্ডল, পতাকা, মরীচি ও কুণ্ডলাকৃতি দর্শন হইয়া থাকে, কখনও বা জল প্রাবিতবৎ অথবা বৃষ্টি ও অন্ধকার ইত্যাদি বিবিধপ্রকার প্রতিক্রিয়ার দর্শন হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে দূরস্থ বস্তুকে নিকটবর্তী ও নিকটস্থকে দূরবর্তী বলিয়া বোধ করে। অতি যত্নে ও সূচিকাহিত্র দর্শন করিতে পারে না।

চক্ষুর তৃতীয় পটলদোষযুক্ত হইলে উর্দ্ধদিকে বেশ দর্শন করিতে পারে। কিন্তু অধোদিকে কিছুই দেখিতে পায় না। উর্দ্ধদিকের স্থলকার পদার্থ সকল বজ্রাবৃত্তের ভাঙ্গ বোধ হয়

এবং প্রাণী সকলের কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকৃতাকার দৃষ্ট হয়। উহাতে যে দোষ বলবৎ হইয়া কুশিত হয়, সেই দোষ অনুসারে বস্তুর নানাবিধ রঙ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ বায়ু প্রবল হইলে রক্তবর্ণ, পিত্তপ্রাধান্যে পীত বা নীলবর্ণ এবং কফ অধিক হইলে শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পটলের অধোদেশে দোষ অবস্থান করিলে সমীপস্থ বস্তু, উর্দ্ধভাগে দোষ থাকিলে দূরস্থ বস্তু ও দোষ পার্শ্বগত হইলে পার্শ্বস্থ কোন বস্তু দেখা যায় না। পটলের সর্বস্থান ব্যাপিয়া দোষ অবস্থিতি করিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়, মধ্যভাগে দোষ অবস্থিত হইলে বৃহৎ বস্তুকে হ্রস্বাকার ও দৃষ্টিতে ত্রিযুগভাবে দোষ অবস্থান করিলে একটা দ্রব্য দুইটির ভ্রায় দেখা যায়, দুই পাশে দোষ থাকিলে এক বস্তু দ্বিধাকৃত বোধ হয় এবং দোষ একস্থানে স্থিরভাবে না থাকিলে এক বস্তুকে বহু সংখ্যক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

কুশিতদোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিত হইলে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই থাকে না। প্রাচীন আয়ুর্বিদেয়া ইহাকে তিমির বা লিঙ্গনাশ নামে উল্লেখ করেন। এই তিমির রোগ অচিরজাত হইলে রোগী চক্ষু, স্বর্ষা, নক্ষত্র, বিদ্যাৎ ও সূর্যবর্ণ প্রভৃতি নিখল তেজ দীপ্তিনীল বস্তুর ভ্রায় দেখিতে পায়। এই রোগকে নীলিকা বা কাচ নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

দৃষ্টিরোগ সর্বসমেত দ্বাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে লিঙ্গনাশ ছয়প্রকার যথা—বাতিক, পৈতিক, শৈথিলিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও পরিম্নায়ী। অপর ছয়প্রকার যথা—পিত্তবিদগ্ধ, শ্লেষবিদগ্ধ, ধূমদর্শী, হ্রস্বজাডা, নকুলান্ধ ও গম্ভীরক।

ছয় প্রকার লিঙ্গনাশের লক্ষণ—ইহাতে চক্ষুলবৎ আবিল, অপচ কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ ও কুটিলরূপ বস্তুদর্শন হয়। পৈতিক লিঙ্গনাশে রোগী স্বর্ষা, জোনাকীপোকা, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের ভ্রায় রূপ দর্শন করে এবং সমস্ত বস্তু ময়ূরপুচ্ছের ভ্রায় নীলবর্ণে চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়। শৈথিলিক লিঙ্গনাশে রোগী সকল বস্তু স্নিগ্ধ, শুক্লবর্ণ, স্থূল, জলপ্রাবিতের ভ্রায় এবং জালকের ন্যায় দর্শন করে। সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে রোগী নানাপ্রকারে চিত্রিত বৈপরীত্যরূপ দর্শন করে ও বস্তু সকল বহুপ্রকার বা দুইপ্রকার অথবা হীনজ বা অধিকাজ ও নানাপ্রকার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকে। রক্ত জনা লিঙ্গনাশে পদার্থ সকল রক্তবর্ণ, হরিৎবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রঙের দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিম্নায়ী রোগের লক্ষণ—রক্তের সহিত পিত্ত বর্জিত

হইয়া পরিম্নায়ী নামক রোগ জন্মে। এই রোগে দিক্ সকল পীতবর্ণ ও বৃক্ষ সকল জোনাকীপোকা বা অগ্নিধারা পরিবেষ্টিতের ন্যায় এবং স্বর্ষ্য উদিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বাতিকরোগে নেত্রমণ্ডল রক্তবর্ণ, পরিম্নায়ী ও শৈথিলিকরোগে নীলবর্ণ, শৈথিলিক লিঙ্গনাশে শুক্লবর্ণ, রক্তজ দৃষ্টিনাশে রক্তবর্ণ এবং ত্রৈদোষিক রোগে নেত্রমণ্ডল চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়।

পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ—দূষিতপিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তুই পীতবর্ণ দর্শন করে। ইহার নাম পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি-রোগ। দূষিত পিত্ত তৃতীয় পটলাশ্রিত হইলে রোগী দিবাভাগে কিছুই দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে দর্শন করিতে পারে। রাত্রিতে পিত্তের সমতা ও দৃষ্টি নীতভাবাপন্ন হয়, এই কারণে সমস্ত পদার্থই যথার্থরূপে তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শ্লেষবিদগ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ—দূষিত কফ প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে রোগী সমস্ত বস্তু শুক্লবর্ণ দেখিতে পায়। তৃতীয় পটলে দূষিত কফ অবস্থান করিলে রোগী রাতকণা হয়। ইহাকে শ্লেষবিদগ্ধ দৃষ্টিরোগ বলে।

ধূমদর্শীর লক্ষণ—শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও রোজাদির সন্তাপে দৃষ্টি আহত হইলে রোগী সমস্ত দ্রব্য ধূমাবৃতের ন্যায় দর্শন করে। ইহাকে ধূমদর্শীরোগ বলে।

হ্রস্বজাডোর লক্ষণ—যে রোগে দিবসে অতিকষ্টে বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্রবৎ ও রাত্রিকালে প্রকৃতরূপে দৃষ্ট হয়, তাহার নাম হ্রস্বজাডা।

নকুলান্ধ রোগের লক্ষণ—যে রোগে দোষের উদ্রেকে দৃষ্টির দীপ্তি নকুলের চক্ষুর ন্যায় হয় ও দিবাভাগে নানাপ্রকার চিত্রিত রূপ দর্শন করে, তাহাকে নকুলান্ধ বলা যায়।

গম্ভীরিকার লক্ষণ—যে রোগে বায়ুপ্রাকোপ প্রযুক্ত দৃষ্টি বিকৃত ভাবাপন্ন এবং পার্শ্ববেষ্টনহেতু সঙ্কোচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও অত্যধিক বেদনায়ুক্ত হয়, তাহাকে গম্ভীরক বলে।

সুশ্রুত যে দ্বাদশপ্রকার রোগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়া চরকে আরও দুইপ্রকার রোগের উল্লেখ আছে, যথা অনিমিত্তজ ও নিমিত্তজ। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহাসর্প কিম্বা স্বর্ঘ্যাদর্শনহেতু যদ্যপি দৃষ্টিনাশ হয়, তবে তাহাকে অনিমিত্তজ লিঙ্গনাশ কহে। শিরোভিত্তাপ হইতে যে দৃষ্টিনাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম নিমিত্তজ।

কৃষ্ণগত রোগ চারিপ্রকার—গত্রণ্ডক, অত্রণ্ডক, অঙ্গি-

পাকাতার ও অজকা। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নেত্রসন্ধিগতরোগ ২০ প্রকার—পুণ্ডালন, উপনাস, পৈত্তিক-প্রাব, মেঘপ্রাব, সন্নিপাতপ্রাব, রক্তজপ্রাব, পৰ্ণগিকা, অলম্বী ও জন্তগ্রহি। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গুরুগত রোগ ১১ প্রকার—প্রত্যাবান্দ, গুরুান্দ, রক্তান্দ, অধিমাংসান্দ, দ্রাবান্দ, শুক্তি, অর্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপীড়কা ও বলান্দগ্রহি। [তৎ তৎ শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বদ্ব্যজরোগ ২১ প্রকার—উৎসজিনী, কুন্তিকা, পোথকী, বদ্ব্যশর্করা, বদ্ব্যর্শ, গুরুান্দ, অজুনদ্রবিকা, বহলবদ্ব্য, বদ্ব্যবন্ধক, ক্রিষ্টবদ্ব্য, বদ্ব্যকর্ম্ম, শ্রাববদ্ব্য, প্রক্লিন্নবদ্ব্য, অক্লিন্নবদ্ব্য, ব্যতহতবদ্ব্য, বদ্ব্যবৃন্দ, নিমেঘ, শোণিতার্শ, নগণ, বিষবদ্ব্য এবং কুঞ্চন।

পদ্মগত নেত্ররোগ ছই প্রকার—পদ্মকোণ ও পদ্মশাত।

সমস্ত নেত্রগত রোগ ১৭ প্রকার—বাতিকাভিযান্দ, শ্লৈষ্মিকাভিযান্দ, পৈত্তিকাভিযান্দ, রক্তজাভিযান্দ, চারিপ্রকার অধিমহ, সশোধ অক্ষিপাক, শোধহীন অক্ষিপাক, হতাধিমহ, অনিলপর্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক, অনাতোবাত, অম্মাঘ্রাষিত, শিরোংপাত ও শিরাগ্রহর্ষ।

নেত্ররোগের চিকিৎসা—শরীরে পদব্রত হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটা অপেক্ষাকৃত ছলশিরা সন্নিবেশিত আছে, ঐ শিরাব্রত হইতে বহুতর শিরা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নেত্রগত হইয়াছে, একারণ পরিষেক, উত্তর্জন ও বিলেপনাদি পদব্রতে প্রয়োগ করিলেই ঐ শিরাব্রত মননে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ধূলী প্রভৃতি মল বা সজ্জটন ও পীড়নাদি দ্বারা ঐ শিরা-ব্রত দূষিত হইলে চক্ষুও দূষিত হয়, অতএব উপানং ধারণ, পানাতাজ ও পানপ্রক্ষালনাদি সর্ব্বদা করিবে। শালিতুল, সুগ, যব, জালল মাংস, পক্ষীমাংস, বাস্তকশাক, নটেশাক, পটোল, কাঁকড়, করলা, পক্কস্বত কচিবেগুণ, এবং মধুর ও তিক্তরস চক্ষুর হিতকারক।

কই ও অরস, গুরু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য, মাংসকলার, রাজ-মাষ, জীলন্তোগ, মদ্যপান, শুষ্কমাংস, তিলকাদির কক, মংত্র, শাক, অজ্বরিত ধান্যাদির অন্ন ও বিনাহী চক্ষুরোগে খাইতে নাই।

পরিষেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ, পুটপাক এবং অঞ্জন এই সকল দ্বারা নেত্ররোগীর চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকের বিধান।—রোগীর চক্ষু উল্লীলিত করিয়া সমস্ত

নেত্রে চারি অঙ্গুলী পুরু বস্ত্র ধণ্ড নেত্রোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি হস্তধারার সেক প্রদান করিবে। বাতজ চক্ষুরোগে শিথিলসেক, পিত্তজ ও রক্তজ নেত্ররোগে রোপণসেক এবং ককজ নেত্ররোগে লেখনসেক প্রদান করা উচিত। ছয় মত বাক্য উচ্চারণে যত সময়ের আবশ্যক ততক্ষণ দৈহিক সেক প্রদান করিবে।

সেক যথা—ডেরেওয়ার পাতা ও মূলের ছাল দিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া জ্বহুকাবহার নেত্রে সেক প্রদান করিলে বাতাত্তিযান্দ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পোস্তদানা ও দারুচিনি এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া হস্ত বস্ত্রে পোটলী করিয়া অহিকেনের জলের সহিত নেত্রে ধারণ করিলে সর্ব প্রকার অভিযান্দ প্রশমিত হয়।

আশ্চ্যোতন বিধি—উল্লীলিত নেত্রের উপরে দুই অঙ্গুল পুরু বস্ত্র ধণ্ড রাখিয়া তাহার উপরে কাথ, ছত্র, মেহ বা অন্ত কোন তরল পদার্থপাতনের নাম আশ্চ্যোতন। লেখন আশ্চ্যোতনে আট বিন্দু, রোপণ আশ্চ্যোতনে দশবিন্দু ও মেহন আশ্চ্যোতনে বার বিন্দু আশ্চ্যোতন তরল পদার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। নেত্র শীতল থাকিলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও উষ্ণ নেত্রে শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করা উচিত। এক মতটী গুরু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহার অতিরিক্ত কাল আশ্চ্যোতন ধারণ করিতে নাই এবং রাত্রিকালে আশ্চ্যোতনপ্রয়োগ একান্ত নিষিদ্ধ।

পিণ্ডীবিধি—এক তোলা পরিমিত পেষিত ঔষধ বস্ত্রে পোটলী করিয়া নেত্রে বুলাইলে তাহাকে পিণ্ডী বলে। ইহার ব্যবহারে সর্ব প্রকার অভিযান্দ ও ত্রণ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পোস্তদানা ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য অহিকেনের জলের সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডী প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

বিড়ালক বিধি—নেত্রের বহির্ভাগে পদ্ম পরিভ্যাগ করিয়া প্রলেপ দেওয়ার ক বিড়ালক কহে, ইহার মাত্রা সুখালেপের ত্রায়। সুখালেপের হীনমাত্রা এক অঙ্গুলীর চতুর্থাংশের এক অংশ, মধ্যমমাত্রা এক অঙ্গুলীর তিন অংশের এক অংশ এবং উত্তম মাত্রা এক অঙ্গুলীর অর্দ্ধাংশ। এই লেপ যে পর্য্যন্ত শুক না হয়, সেই পর্য্যন্ত ধারণ করিবে; শুক হইলে পরিভ্যাগ করা উচিত। কারণ শুক হইলে উহা ঞ্গহীন হইয়া যায় ও চর্ম দূষিত করে। ষষ্টিমধু, গেরিমাটি, সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা ও রসাজন এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। রসাজন, হরীতকী

ও বেলপাতা দ্বারা কিম্বা বচ, হরিদ্রা ও শুষ্ঠী দ্বারা অথবা শুষ্ঠী ও গেরিমাটি দ্বারা নেত্রের বহির্ভাগে লেপ দিলেও চক্ষুরোগে উপকার হয়।

তর্পণবিধি—মাষকলাইচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকৃতি দুইটা আধার প্রস্তুত করিবে। উহা নেত্রকোষের তুল্য পরিমাণ হওয়া আবশ্যিক। তৎপরে ঐ আধার মধ্যে উষ্ণ জলে দ্রবীকৃত ঘৃতমণ্ড বা হৃৎমহনোত্তর অথচ শতধোত ঘৃত পূরণ করিবে। রোগীকে বায়ু, রোদ্র ও ধূলিশূন্য গৃহে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া নিম্নলিখিত নেত্রে উক্ত মাষকলার কৃত আধার দুইটা নিম্নীড়ন করিয়া রস দিবে। সেই রসে নেত্ররোম পর্যন্ত নিমগ্ন হইলে আর না দিয়া রোগীকে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে বলিবে। নেত্র রুদ্ধ, অতিশয় শুষ্ক, কুটিল, আবিল ও লীর্ণপদ্ম হইলে তর্পণপ্রয়োগ করা উচিত। ইহা ছাড়া যে নেত্র শিরোপাত, ক্লেচ্ছান্মীলন, তিমির, অন্ধুর্ন, শুষ্ক, অভিমান্দ, অধিমহ, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্ধিশোথ ও বাতবিপ-র্যাদিযুক্ত হয়, সেই নেত্রও তর্পণের সম্যক উপযুক্ত। তর্পণের ধারণকাল বসন্তরোগে একশত মাত্রা, সন্ধিরোগে পাঁচশত, কক্ষরোগে ছয়শত, কৃষ্ণগত রোগে সাতশত, দৃষ্টিগত রোগে আটশত, এবং অধিমহ ও বাতরোগে এক সহস্র মাত্রা। যথোক্ত সময়ের পর ঐ নেত্রতর্পণের স্নেহ-ত্যাগ করিয়া সিদ্ধ যবচূর্ণ দ্বারা নেত্র শোধন করিবে। ইহার পরে ধূমপান ক্রিয়ায় কফবিরেচন করা উচিত। দোষাস্ত-সারে বিবেচনা করিয়া একদিন, তিনদিন অথবা পাঁচদিন পর্যন্ত তর্পণক্রিয়া করা কর্তব্য। সম্যকরূপে তর্পণ প্রযুক্ত হইলে স্নানিভ্রা, চক্ষুর নির্মলতা, দৃষ্টির পটুতা, ও নিমেষ উন্মেষ প্রভৃতি ক্রিয়ায় নেত্র লঘু হয় এবং রোগ ভাল হইয়া থাকে। অতিরিক্ত তর্পণপ্রয়োগে চক্ষু শুষ্ক, আবিল, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, প্রলিপ্তপ্রায় বোধ, ও হৃচী-বিক্ষেপ বেদনায়ুক্ত হয় এবং সর্বদা কর্ কর্ করে। হীন তর্পণে চক্ষুস্রাবহীন, শোথযুক্ত, রোগাধিক্যবিশিষ্ট, প্রলিপ্ত প্রায়, রুদ্ধ, পক্ষ ও আবিল বর্ণ হয় এবং রোগী রূপ দর্শনে অক্ষম হয়। অতি তর্পণ বা হীনতর্পণপ্রযুক্ত দোষাধিক্য হইলে যত্নের সহিত অতি তর্পণে রুদ্ধ ক্রিয়া, ও হীন তর্পণে স্নিগ্ধ ক্রিয়া কর্তব্য। যেদিন অতিশয় বর্ষা বা বাতাস হয়, সেই দিনে, এবং অতি উষ্ণ বা অতি শীতকালে চিস্তাবস্থায়, ভীতাবস্থায় এবং নেত্র রোগের উপদ্রব প্রশান্ত না হইলে তর্পণপ্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

পুটপাকবিধি—স্নিগ্ধ মাংস দুই পল, অল্প ঔষধ দ্রব্য এক

পল ও দ্রব্যদ্রব্য চারিপল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ, করিবে। তৎপর সম্যক আলোড়ন করিয়া পুটপাকের বিধান অনুসারে ভেত্রেণাদির পত্র দ্বারা পরিবেষ্টনপূর্বক পুটপাক করিবে। [পুটপাক দেখ।] তর্পণের নিয়মে রোগীকে শয়ন করাইয়া এই রস দৃষ্টিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে পুটপাকবিধি বলে। নেত্রে তর্পণ কিম্বা পুটপাক প্রয়োগ করিলে রোগীকে কোন প্রকার তেজ, বায়ু, আকাশ কিম্বা সূর্যালোক দেখিতে দিবে না।

অঞ্জনবিধি—দোষের পরিপাক হইলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অগন্ধ দোষে অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে দ্রব্য দ্বারা নেত্রে কাজল দেওয়া হয়, তাহাকে অঞ্জন বলে। এই অঞ্জন তিন প্রকার—বটিকা, রস ও চূর্ণ। তিন প্রকার অঞ্জনই ধাতুনির্মিত শলাকা দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত, শলাকার অভাবে অঙ্গুলী দ্বারা অঞ্জন দিতে হয়। স্নেহন, রোপণ ও লেখনভেদে অঞ্জন আবার তিন প্রকার হয়। মধুর দ্রব্য ও স্নেহ দ্বারা যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে স্নেহন, কবার ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য এবং স্নেহ দ্বারা যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে রোপণ এবং তিক্ত, অম্লরস ও ক্ষার দ্বারা যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে লেখন অঞ্জন কহে। তীক্ষ্ণজনে (বটিকাজনে) একটা মটর প্রমাণ বটী, রসাজনে ১২টা মটর কলায়ের প্রমাণ বটী এবং চূর্ণাজনে ২৪টা মটরের সমান বটী প্রস্তুত করিতে হয়। রসক্রিয়ার শ্রেষ্ঠমাত্রা তিনটা বিড়লের তুল্য, মধ্যমমাত্রা দুইটা বিড়লের তুল্য এবং হীনমাত্রা একটা বিড়লের সমান করা উচিত। স্নেহ ও চূর্ণ অঞ্জে চারিটা, রোপণে তিনটা এবং লেখন অঞ্জে দুইটা শলাকা কৃষ্ণিতভাবে প্রয়োগ করা কর্তব্য। শলাকার অগ্রভাগ মধুরপাথর ন্যায় বর্জুলাকৃতি, মুখ কৃষ্ণিতাকার আটআঙ্গুল দীর্ঘ ও ধাতু বা প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত করা উচিত। ত্রিফলা, শুড়ঙ্গক ও শুষ্ঠীর কাথ, গোমূত্র, মধু ও ছাগ দুগ্ধে সীসক ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই সীসক আগুনে গলাইয়া শলাকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে দৃষ্টি-প্রসাদনীশলাকা বলে। এই শলাকা দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণমণ্ডলের অধোভাগে অঞ্জন দেওয়া আবশ্যিক। হেমন্ত ও শিশির-কালে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রাতে বা অপরাহ্নে, বর্ষাকালে মেঘহীন অথচ অতিশয় অমৃষ্ণ না হয় এমন সময়ে এবং বসন্তকালে সকল সময়ে অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত। পরিশ্রান্ত, রোদনকারী, ভীত, মদিরাপানে মত্ত, নবজরাক্রান্ত, অজীর্ণপ্রসূত এবং যাহার মলমূত্রাদির বেগ উপ-

চিত্ত ভাহার পক্ষে অজ্ঞান নিষিদ্ধ। মেহনী, রোপণী, লেখনী, বর্ণী প্রভৃতি ঔষধ নেত্ররোগে প্রযোজ্য।

মুক্তা, কর্পূর, কাচলবণ, অণুর, মরিচ, পিঙ্গলী, সৈন্ধব, এলবালুকা, গুটি, কাকলা, কাণ্ড, বদ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, তুঁতিয়া, কুঁকুড়ার ডিমের খোলস, বহেড়া, কুহুম, হরিতকী, যষ্টিমধু, রাজাবর্জ, জাতীপুষ্প, জুলসীর নুতন মঞ্জরী, পীতশাল, ডহরকরঞ্জ, নিষ, অর্জুন, নাগরমুখা, মারিততাম্র, মারিত লৌহ এবং রসাজ্ঞান ইহার প্রত্যেক ১ মাষা মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিবে। ইহার নাম মুক্তাদিমহাজ্ঞান। ইহা সেবনে সকলপ্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয়। ইহা ছাড়া ত্রিফলাদ্রব্যত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগেও নেত্ররোগ ভাল হয়।

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখণ্ড ৪ ভাঃ) [ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নেত্ররোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ প্রভৃতি সেই সেই শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এদেশীয় প্রাচীন আর্ষাচিকিৎসকদিগের মত যুরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসকগণ চক্ষুর নানা প্রকার রোগের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা হাইপারমিট্রোপিয়া (Hypermetropia) বা অস্পষ্টদৃষ্টি, মাইওপিয়া (Myopia) বা অদূরদৃষ্টি, এস্তিনোপিয়া (Asthenopia) বা ক্ষীণদৃষ্টি, এস্টিগ্‌মাটিজম্ (Astigmatism) অর্থাৎ বিষম বা ত্রিভ্যকৃ দৃষ্টি, চালশেখরা (Presbyopia), আফেকিয়া (Aphakia) বা চক্ষুতে মণি না থাকা, যোজকত্বকে রক্তাধিক্য (Hyperæmia), চক্ষুর যোজকত্বক্ আওরান (Conjunctivitis), চক্ষু উঠা (Catarrhal or muco-purulent conjunctivitis), সপুষ্ট চক্ষু উঠা (Purulent conjunctivitis), যোজকত্বকে মেহজ রোগ (Gonorrhæal ophthalmia), নব প্রসূত বালকের চক্ষু উঠা (Neonatorum ophthalmia), যোজকত্বকে দ্ব্যচ্ছাদনরোগ (Diphtheritic conjunctivitis), যোজকত্বকে গণ্ডমালাপ্রিত রোগ (Scrofulous ophthalmia), স্ফাবরণীর নিকট ব্রণোৎপত্তি (Pustular conjunctivitis), কাঙ্ক্ষিক রোগ (Exanthematous conjunctivitis), স্বেতমণ্ডলে খড়ি উঠা (Xerophthalmia), অচুপক্ষ (Pterygium), অর্জুনরোগ (Chemosis), কালশিরা (Ecchymosis), যোজকত্বকে অর্জুন (Tumour), শাল'হগৌব (Keratitis), শাল'হকে বিসর্পিকা (Herpes of cornea), শাল'হকে ক্ষতরোগ (Ulcers), পুষজ শাল'হগৌব (Suppurative corneitis), বহিঃসরণ (Staphyloma), বার্দ্ধক্যমণ্ডল (Arcus senilis), শাদা

দাগ বা অস্বচ্ছতা (Opacity), স্বেতমণ্ডলরোগ (Episcleritis), দৃষ্টিনাশ (Ciliary staphyloma), তারকামণ্ডল-প্রদাহ (Iritis), তারকা বাহির হওয়া, বৃহত্তারা (Mydriasis), ক্ষুদ্রতারা (Myosis), গোলকবিপর্কায় (Nystagmus), হিপস্ (Hippus) অর্থাৎ আলোকাক্রমকার বাতীত পর্যায়ক্রমে তারার সঙ্কোচন ও প্রসারণ, তারকাকম্পন (Iridodonesis), শিলাইটিস্ (Cyclitis), কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ (Choroiditis Disseminata), চক্ষুর সর্কাদপ্রদাহ (Panophthalmitis), হায়েরাইটিস্ (Hyalitis), চক্ষুর স্বচ্ছরসে স্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ মক্ষিকার ছাদ পদার্থদৃষ্টি (Mucosa Volitantis), গ্লকোমা (Glaucoma) বা তিমির রোগ, চিত্রপত্রে রক্তাধিক্য, নানাপ্রকার চিত্রপত্রে (Retinitis), পিগ্মেন্টোসা (Pigmentosa) বা চিত্রপত্রের বিচ্ছেদ (Detachment of the retina), গ্লিওমা (Glioma) বা বাল্যকর্কুদ, আক্ষিক ন্নায়ুপ্রদাহ (Optic Neuritis), অন্ধতা (Amaurosis and atrophy of the optic nerve), দৃষ্টিহানি (Amblyopia), অন্ধপ্রতারণা (Simulation of blindness), রাতকণা (Hemeralopia), দিনকানা (Nyctalopia), চিত্রপত্রে আলোকাধিক্যজ্ঞান (Hyperæsthesia), আলোকে অবশতা (Anæsthesia), ছানি (Cataract), মণিবিচ্যুতি (Dislocation), দ্বিদর্শন (Diplopia), পেশীর পক্ষাঘাত, টেরা (Strabismus), ব্লেকারাইটিস্ (Blepharitis) বা অক্ষিপুটপ্রদাহ, এক্সি লিলিয়ারিজ (Acne Ciliaris) বা উপর পাতায় গ্যাজ উঠা ও বর্ন্তুলাকার বিসর্পিকা (Herpes Zoster frontalis) এক্ট্রোপিয়াম্ (Ectropium) বা পর্যন্তাক্ষিপুট, এন্ট্রোপিয়াম্ (Entropium) বা বিপর্যন্তাক্ষিপুট, বক্রপক্ষ (Trichiasis), অর্জনি (Hordeolum or Stye), ফোটক (Abscess), উপরের পাতায় পক্ষাঘাত (Ptosis), ল্যাগফথ্যালম্ (Lagophthalmus) বা শশচক্ষুরোগ, ব্লেকারস্পাসম্ (Blepharospasm) বা অক্ষিপুটাক্ষেপ, চক্ষুস্পন্দন (Nictitation), জলপড়া (Epiphora), অক্ষগহবরে ফোটক (Dacryocystitis), ফিস্টুলা ল্যাক্রিমেলিস্ (Fistula Lachrymalis) বা অক্ষনালী, ব্লেনোরিয়া (Blenorrhæa) বা অক্ষপতনরোগ, অক্ষগ্রহির পীড়া (Dacryo-adinitis), হাইড্রোফথ্যালমিয়া (Hydrophthalmia) বা নেত্রোদক, এক্সোফথ্যালমিক্ গয়েটার (Exophthalmic goitre) বা অক্ষিগোলকের বহিবৃদ্ধি, সর্কোমা (Sarcoma) বা মাংসকর্কুদ, সাঙ-

গুরুমূত্ররোগজ (Albuminurica) ও উপদংশরোগজ (Syphilitica) চক্ষুরোগ, চিহ্নগত্রে রক্তস্রাব (Apoplectica)। এতদ্বিধ পাতা ঘাড়িয়া বাইলে, যোজকত্বকে চূর্ণ, চক্ষুতে কোন প্রকার এসিড বা বাকুদাদি পড়িলে, চিহ্নগত্রে কোন পদার্থ বিদ্ধ হইলে, এবং একটা চক্ষু আহত বা বিনষ্ট হইলে সেই প্রদাহে অপর চক্ষুটিরও নানা প্রকার পীড়া জন্মাইতে পারে।

চক্ষুর ভার সামগ্রী মানবের আর নাই, সুতরাং এমন চক্ষুর কোনপ্রকার রোগ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত অথবা সূচিকিংসককে দেখান আবশ্যিক। চক্ষুরোগ হইলে প্রথমে ভালরূপে চক্ষুপরীক্ষা করিতে হয়। চক্ষু পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে এমন স্থানে রাখিবে যেন তাহার নেত্রে পরিষ্কার আলোক ভির্ধ্যাক্তাবে পতিত হয়। পরে সেই আলোক পাতার বহির্ভাগ, কিনারা, পল্ল, অক্ষিগোলকের অবস্থা প্রভৃতি মন দিয়া দেখিবে, পরে নীচের ও উপরের পাতা উটাইয়া পাতার ঘনতা, ভিতর দিকের বর্ণ ও মন্থগতা, গুরুমণ্ডল ও চক্ষুর যোজকত্বের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য, পাতা ও চক্ষুর সন্ধিহান, শার্ঙ্গত্বের স্বচ্ছতা, কুজতা, বর্ণ ও মন্থগতা, তারার স্বাভাবিক গোলাকৃতি ও সঙ্কোচন প্রসারণ, নেত্রের কাঠি, কোমলতা, বিঘূর্ণন, জলপড়া, তারকামণ্ডল বা রঙ্গিণচক্রের বর্ণ ও গঠন, নাসিকার দিকে নেত্রকোণের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় চিকিৎসক নিজে দেখিয়া লইবেন, পরে রোগীর পূর্ণাঙ্গর আত্মপূর্ণিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন।

উপরের পাতার ভিতরদিকে পাতা ও চক্ষুর সন্ধিহানে বাহ্য পদার্থ দেখিতে হয়। পিঁচুটি, পুষ, চক্ষুর করকরাণি ও প্রদাহ থাকিলে জানিবে যোজকত্বগত্বীয় রোগ হইরাছে। চক্ষুর কোল ও দৃষ্টিপথের কোন পীড়া হইলে দৃষ্টিহানি হয়। শার্ঙ্গত্ব, তারকামণ্ডল, অক্ষিপুট ও ক্রকমণ্ডলের প্রদাহে চক্ষুর ভিতরে খুব বেদনা জন্মে। এই বেদনা অতি যন্ত্রণাদায়ক। চক্ষু টিপিলে সজ্ঞ ও বেদনা, সময়ে সময়ে দৃষ্টিহানি, চক্ষুলাল ও দীপালোকের চারিদিকে রাসমধুর মত রঞ্জিতমণ্ডল দেখা গেলে ম্লকোমা বা তিমির রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি চক্ষুতে ব্যাধি না থাকে অথচ দৃষ্টি ব্যাপসা ও আলোকে ভয় হয় এবং চক্ষুর গুরুমণ্ডলের যোজকত্বক কিছু লাল দেখায়, তবে রেটিনাইটিস্ অর্থাৎ চিহ্নগত্বীয় জন্মে। এইরূপ এন্থিমোপিয়া বা ক্রীণদৃষ্টিরোগে অধিকক্ষণ দৃষ্টির গোলযোগ ঘটে, আবার কিছুকাল বিশ্রাম করিলে সারিরা যায়। মাইওপিয়া বা অদূরদৃষ্টিরোগে দৃষ্ট পদার্থ নিকটে অতি স্পষ্ট দেখায়, কিন্তু যতই দূরে যায়, দৃষ্টিও সেই

সদে অস্পষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ নিকট ও দূরে অস্পষ্ট দৃষ্টি এবং কন্ডের চক্ষুতেও ভাল দেখা না গেলে হাইপারমিট্রোপিয়া নামক রোগ প্রকাশ পায়। নিকটে দৃষ্টির ব্যাঘাত এবং দূরে স্বাভাবিক দৃষ্টি চালশেরোগের লক্ষণ। হানির পূর্ণলক্ষণেও দিব্যভাগে দৃষ্টি বোলা, কিন্তু রাত্রিকালে ও অন্ধকারে স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রকাশ হয়। কোন প্রকার সাধারণ চক্ষুমার দৃষ্টির উন্নতি না হইলে ও অল্প কোন রোগ না থাকিলেও যদি বিবিধপ্রকার দৃষ্টি বিকার জন্মে, তাহাকে এট্রোপিয়া বা ক্রীণদৃষ্টিরোগ বলা যায়। চিহ্নগত্রে ও ক্রকমণ্ডলগত রোগেও চক্ষুমার কোন উপকার হয় না, রোগী বড় বড় অক্ষর পড়িতে পারে না, চক্ষুর নিকট অল্পলি দেখাইলে তাহা গণিরা বলিতে পারে। যখন তাহাও না পারে, তখন কেবল আলোক ও অন্ধকারভেদজ্ঞান থাকে, শেষে চক্ষু জন্মের মত অন্ধ হয়। তখন আর চিকিৎসা চলে না।

চক্ষুর সকল অবয়ব বা যন্ত্র স্বর্ধ্যালোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল স্থান দেখিবার জন্য অক্ষিবীক্ষণযন্ত্র (Ophthalmoscope) আনিষ্ঠিত হইরাছে। তারার সন্ধির্ঘ ছিঁদ্র দিয়া অক্ষিগর্ভে যে আলোক প্রবেশ করে, এই আলোকে এই অক্ষিবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে তথাকার অবয়ব সকল প্রত্যক্ষ হয়। এই যন্ত্রের ব্যবহার ও অক্ষিগর্ভের আকৃতি সমাক্ জানা না থাকিলে মেন্ডিকোষ (Meningitis), মস্তিষ্কোষ (Encephalitis) মস্তিষ্কোদক (Hydrocephalus), মস্তিষ্ক রক্তস্রাব (Hæmorrhage), অর্কুদ, অপস্মার, উন্মাদ, স্পন্দনরোগ, অসম (Ataxy), দায়বীরজর, পুরাতন মাথাধরা রোগ প্রভৃতি মস্তিষ্ক ও মাদুলস্বকীয় পীড়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

অক্ষিবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা চক্ষুর পরীক্ষা করিতে হইলে একটা অন্ধকারগৃহ, একটা উজ্জল ও হিরণিখ আলোক ও এট্রোপিন্ প্রয়োগে তারার প্রসারণ করা চাই। রোগীর কর্ণের নিকট ও কিছু পশ্চাতে উজ্জ আলোক থাকিবে। পরীক্ষকের ও রোগীর চক্ষু আর দীপশিখা বাহ্যতে পৃথিবীর সমান্তরভাবে থাকে, একরূপ করিবে। চিকিৎসকের চক্ষু রোগীর চক্ষু হইতে ১৮ ইঞ্চির অধিক দূরে যেন না থাকে। পরোক্ষভাবে পরীক্ষা করিতে রক্ত চক্ষুর শার্ঙ্গত্ব (Cornea) হইতে দেড় ইঞ্চি দূরে ২ ইঞ্চি অধিশ্রণের একটা ম্যাকিকাইং গ্লাস দিয়া চক্ষু দর্শন করিবে। অক্ষিকচক্র (Optic disk) দেখিতে হইলে রোগীর বাম চক্ষুর দৃষ্টি চিকিৎসকের কর্ণের উপর রাখিবে, ইহাতে

চক্র গর্ভদেশ লোহিতবর্ণ ও তন্মধ্যস্থ চক্র গোলাকার ও ঈষৎ আরক্ত শ্বেতবর্ণ দেখায়। প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে হইলে ঐ গ্রাসখানি ধরিতে হয় না। যোগীর চক্ষু হইতে দেড় বা দুই ইঞ্চি দূরে আপন চক্ষু লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। [নেত্র, চন্ডা, ছানি, চালশে, জলপড়া, রাতকাণা দিনকাণা প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হকিমী নানা গ্রন্থে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে ঐষধ ভক্ষণ ও চক্ষুতে লেপনের অনেক বিধি আছে। হকিমী মতে শ্বেত পুনর্ব্যব পাতা একমাস খাইলে সকল প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। বিবিধ অঙ্গন ব্যবহার করিলেও চক্ষুরোগ হয় না অথবা রোগ হইলেও শীঘ্র ভাল হয়। বোগদাদনিবাসী হোসেন জোর্জনির পৌত্র ইসমাইল রচিত “তিব্ব জখিরহ” নামক বৃহৎ গ্রন্থে চক্ষু সম্বন্ধীয় নানারোগের চিকিৎসা প্রণালী বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। [হকিমী দেখ।]

চগ (দেশজ) পক্ষীবিশেষ। (Scolopix Gatera)

চগ্তাই (চঘতাই), তুর্কীজাতির একশ্রেণী। এই শ্রেণীর তুর্কী-বংশেই ভারতীয় মোগল সম্রাটগণের আদিপুরুষ বাবরের জন্ম হয়। বাবর চগ্তাই তুর্কীভাষায় কথাবার্তা কহিতেন ও সেই ভাষাতেই লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীদরবারে ঐ ভাষাই কিছুদিন প্রচলিত ছিল। তৎপরে দ্বিবিধ লোক ও দ্বিবিধ ভাষা দেখা যায়। ইরান, তুর্বাণ ও পারস্যদেশীয় লোকের পারস্যভাষাবাদী সিয়ামতাবলম্বী ছিলেন, আর তুর্কীরা চগ্তাই ভাষাবাদী স্কিমিতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানের মধ্যে একস্থানে বলিয়াছেন যে এই চগ্তাইজাতিই সংস্কৃত পুরাণোক্ত “শকতই” নামক শক-জাতি। এই জাতিই শেষে গ্রীকগণ কর্তৃক স্কিথিয়ান (Scythian) নামে উক্ত হইত। তৈমুরবেগ যখন প্রবল হইয়া উঠেন, তখন (১৩৩০ খৃষ্টাব্দে) চগ্তাই রাজ্যের পশ্চিমে ‘ধস্তিকপচক’ ও দক্ষিণে জক্জর্টিস নদীই সীমা ছিল। এই নদীতীরে গেটিক খাঁ নামক এতদেশের একজন বিখ্যাত নরপতি টমিরিসের জায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কোজেন্দ, তাম্বন্দ, উটরার, সিরোপলিস এবং আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তরবর্তী অনেকানেক নগর এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিওহসন বলেন, ১২২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ট্রানসোক্সিয়ান রাজ্যের সিংহাসনে ৩৬ জন চগ্তাই রাজা হন। ক্রমে যখন পূর্ব তুর্কীস্থানে ইহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিল, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মযাজকতা অবলম্বন করিল। ১৬৭৮

খৃষ্টাব্দে জুজেরিয়ার কাশকজাতির অধিপতি শ্বেতপর্কতে খোজাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার শতবৎসর পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের অধিকাংশ চীনদিগের অধিকারে আসে, সেই সময়ে ইহাদের প্রভাব একবারে লুপ্ত হয়। ইহাদের অধিপতিগণের মধ্যে অনেকেই কবি, জ্যোতিষিৎ, ঐতিহাসিক, রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপয়িতা ও বীর ছিলেন। অনেকেই সভ্যজাতির নিকটও প্রশংসা পাইয়া আসিয়াছেন। [চগ্তাই খাঁ দেখ।]

চগ্তাই খাঁ, অশ্রমিক মোগলবীর চঙ্গজ খাঁর এক পুত্র। চঙ্গজখাঁর যতগুলি পুত্র, তাঁহাদের সকলের চেয়ে ইনি ধার্মিক ও কর্মকুশল ছিলেন। চঙ্গজ খাঁ ইহাকে (১২২৭ খৃষ্টাব্দে) ট্রান্সক্সোনিয়া, বালখ, বদাক্শান ও কাশঘরের অধিপত্য দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চগ্তাই নিজে না শাসন করিয়া সহকারীদ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং শিষ্য যেমন গুরুর নিকট থাকে, ইনিও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওক্তাই খাঁর নিকট সর্বদাই থাকিতেন। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ইহার মৃত্যু হয়। অশ্রমিক আমীর তৈমুরের প্রপৌত্রের পুত্র করাচর নবীমান ইহার সভাপতি একজন আমীর ও সেনাপতি ছিলেন।

এই চগ্তাইখাঁর বংশধর মোগল বাদশাহগণ ভারতে চগ্তাই মোগল নামে খ্যাত। [চগ্তাই দেখ।]

চক্র, ১ উত্তর ভারতে ধাতাদি কর্তনের সময় আচারিত উৎসব বিশেষ। ইহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রথায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। শস্য ঝাড়িয়া লইয়া পাছড়াইবার পূর্বে এক ফুট উচ্চ করিয়া একটা রাশি করে, তৎপরে একজন লোক মৌন অবস্থায় এক হস্তে একখানি কুলা ও অপর হস্তে এক মুঠা (যে শস্যের রাশি করা হইয়াছে সেই) শস্য লইয়া দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। প্রদক্ষিণের সময় শস্যমুষ্টি অল্প অল্প করিয়া ছড়াইয়া দেয় এবং শস্য-রাশির তল পর্য্যন্ত যাহাতে বাতাস পায়, এরূপ ভাবে কুলায় বাতাস দিতে থাকে। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় কুলা ও শস্যমুষ্টি হাত বদলাইয়া লয় ও আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া শস্ত্তূপের সম্মুখে অন্নদেবতাকে প্রণাম করে। প্রণামের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করে—

“অন্ন দেওতাজী—

সহেশ গুণী হজিয়ে।”

নিম্ন ও মধ্য দোয়াবে এবং মধ্যপ্রদেশের সাগর নামক স্থানে গোময় বা ডিম্বদ্বারা শস্ত্তূপের চারিপার্শ্বে একটা রেখা দিয়া বেটন করিয়া লয় এবং রেখা দিবার সময়

পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করে এবং দক্ষিণ দিয়া ঘুরিয়া আসে। এই বৃত্তটি দিব্যর সময় খাসকক্ষ করিয়া রাখে। স্বটলেশ্বর পার্শ্বত্যা প্রদেশেও আর এইরূপ প্রথা আজও প্রচলিত আছে।

২ কাঠখোদিত ছাঁচ—ইহাকে চক বা ছপা বলে। এই পদকে হয় “আকিবৎ বা খয়ের বদ্” (পরিণাম উন্নতিশালী হউক) বা “ইমান্ কি সেলামতি” (তোমার ধর্মেই আমার বিশ্বাস) এই বাক্য খোদিত থাকে। তৎপরে একপ্রকার কোমল মুক্তিকায় (বরকত কি-মাটি) ঐ ছাঁচের ছাপা তুলিয়া শতরাশির উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই শতরাশি অধিকারীদিগের মধ্যে ভাগ করিবার সময়ে পাছে বিবাদ ঘটে বলিয়া এইরূপ ধর্মের দোহাই দেওয়া হয়। শত রাশি কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিবার সময় এরূপ করে। মাটির ছাপাখানি শতরাশির একপার্শ্বে গুঁজিয়া দেওয়া হয়, কখনও রাশির উপরে দেওয়া হয় না, বিশ্বাস যে রাশির মাথার উপর মোহর মারিয়া দিলে শতরাশি বাড়িবে না বা তাহাতে আয় দিবে না। এই প্রথা ভারতের নানাস্থানে, আফ্রিকায় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও প্রচলিত আছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহাকে ‘টাৰু’ আর ভারতের কোন কোন স্থলে ‘ছতর’ বলে।

চক্কি (দেশজ) পাণিকলাজাতীয় জলজ লতা বিশেষ।

চক্ৰণ (পুং) রাজা ললিতাদিত্যের প্রধান মন্ত্রী, ভূখারদেশে ইহার জন্ম হয়, ইহার ভ্রাতার নাম কঙ্কণবর্ষ। মহারাজ ললিতাদিত্য ইহার গুণের পরিচয় পাইয়া প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ইনি একটা বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মহারাজ ললিতাদিত্য সসৈন্তে পঞ্চনদে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দুষ্টর সিন্ধুসঙ্গম দেখিয়া কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিয়া মন্ত্রীর নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, মন্ত্রী চক্ৰণ একটা মণি জলে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার প্রভাবে জল দুইদিকে সরিয়া গেল, রাজা সসৈন্তে সরিৎপার হইলেন। ইহার পরে চক্ৰণ অপর একটা মণি দ্বারা ঐ মণিটিকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, রাজা মণিঘরের অলৌকিক গুণ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, পরে মন্ত্রীর নিকটে মণিঘর প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী প্রথমে দিতে বাধ্য হন নাই। রাজার অনুরোধে মগধদেশ হইতে আনীত একটা সুগতমুষ্টি লইয়া মণিঘর রাজাকে অর্পণ করেন এবং সেই মনোহর জিন প্রতিমূষ্টি আপনার বিহারে স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ কেশানচন্দ্রভট্টবকের ভগিনী ইহার পত্নী ছিলেন।

(রাজতরঙ্গিনী ৪।২১২-৬৩) [ললিতাদিত্য দেখ।]

চকুর (স্ত্রী) চকতি ভ্রাম্যতি অনেন চক-উরহ। ১ বান। (ত্রিকাণ্ড) (পুং) ২ বৎ। ৩ বৃক্ষ। (মেদিনী)

চক্ৰক্ৰমণ (স্ত্রী) ক্রম-যঙ-সূট যঙো লুক। ১ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ। “নুনং চক্ৰমণং দেব! সত্যং সংরক্ষণায় তো।” (ভাগবত ৩।২১ ৪৮) ২ অতিশয় ভ্রমণ।

“হানাসনং চক্ৰমণং যানায়ানাতি ভাবণং।” (সুশ্রুত ১।১৯ অঃ)

চক্ৰক্রমা (স্ত্রী) পথ, বেড়াইবার স্থান। (দিব্যাবদান)

চক্ৰক্রায়ণ (পুং) প্রবরভেদ।

চক্ৰ (ত্রি) চকতি ভ্রমোতি চক অচ্ নিপাতনে সাধু। ১ সূত্র।

২ শোভাযুক্ত। ৩ দক্ষ। (মেদিনী) (পুং) ৪ রাজা ভূক্তের অন্তরঙ্গ বিশেষ। (রাজতরঙ্গিনী ৭।৮৭)

৫ (ভোটশব্দ) ভোটদেশে চলিত একপ্রকার মদ্য, যব হইতে এই সুরা প্রস্তুত হয়।

চক্ৰদাস, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত, চাক্স নামে খ্যাত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বৈয়াকরণজীবাত্ম প্রণয়ন করেন।

চক্ৰদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু সাধু, ইনি যোগভ্রষ্ট, যুগসাধু বা যুগব্যাস নামেও আপ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইনি বহু শতবর্ষ বাঁচিয়া ছিলেন। অনেকেই ইহাকে বিশেষ ভক্তি প্রদা করিতেন। প্রায় ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মণিষ্য ইনি শ্রীরঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, হিন্দু হইলেও টিপু সুলতান অতি ভক্তিভাবে ইহাদের আস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ৰদেব টিপুর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা বৃক্ষতলই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত স্থান।”

চক্কারী [চক্কারী দেখ।]

চক্ৰেজ খাঁ, সাধারণ ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে জঙ্গিস্ খাঁ নামে খ্যাত। ইহার প্রথম নাম তেমুচীন বা তামুজীন। ওনোন নদীতীরে ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে মোগল ছিলেন। ইহার পিতার নাম য়েজুজী; তিনি মোগলদিগের একজন সর্দার ছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে চক্ৰেজ খাঁ পিতৃপদবী লাভ করেন, কিন্তু শত্রুগণের ঘড়ঘস্ত্রে নিজ জীবন বাঁচাইবার জন্ত তাতাররাজ অবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবস্থার ঐ শত্রু কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। চক্ৰেজ খাঁর সাহায্যে অবস্থার রাজ্যলাভ করেন এবং নিজ কন্যার সহিত চক্ৰেজের বিবাহ দেন। কিন্তু স্বপুত্র ‘অন্ন দিন পরেই জামাতার প্রতি বিরক্ত হইলেন। অবস্থার চক্ৰেজের শত্রুদলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু চক্ৰেজ বৃষ্টিতে পারিয়া কোশলে সে বিপদ কাটাইয়া উঠিলেন এবং পরে একে একে আপন শত্রুকুল জয় করিতে লাগিলেন। ৪৯ বৎসর বয়সে চক্ৰেজ

তাতারের খাদিগের নিকট হইতে 'খাকান' উপাধি পাইয়া ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র তাতার রাজ্যের সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কারাকুরম্ নগরে চন্ডেজের রাজধানী ছিল। ২২ বৎসর কাল তিনি কোরিয়া, কাথি, চীনের কতকাংশ, এবং এসিয়ার আরও অনেকানেক দেশ জয় করিয়া গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের ন্যায় দিখিজরী সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন। ইনি ১২০৫ খৃষ্টাব্দে চীনাধিকৃত টংগুট হইতে আরম্ভ করিয়া ১২১৪ খৃষ্টাব্দে চিংতু বা পিকিন পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমাংশ জয় করিতে আরম্ভ করেন এবং বোলরতাগ পর্য্যন্ত হইতে কাস্পীয় সাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড স্ববশে আনিয়াছিলেন। ইহার সেনাপতিরা আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার এবং কবিরার অধিকাংশ স্ববশে আনয়ন করেন। চন্ডেজ খাঁ ১২১৭ খৃষ্টাব্দে খারিজম্ রাজ্যের সুলতানের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সুলতান তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন। চন্ডেজ খাঁ ইহাতে অতি রুষ্ট হইয়া সুলতানকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সুলতান প্রাণভয়ে কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্তী এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই স্থলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতানের পুত্র জলানুদ্দীন চন্ডেজের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ পূর্বাঞ্চলে পলাইতে থাকেন। শেষে গজনীর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন। চন্ডেজ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সিন্ধুর তীর পর্য্যন্ত উপনীত হন। জলানুদ্দীন রাজ্যে সিন্ধু নদী সাঁতার দিয়া অপর পারে পলায়ন করেন। এই সময়ে ভারতের পশ্চিমের রাজ্যগুলি এক প্রকার তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। জলানুদ্দীন যখন সিন্ধুবক্ষে সাঁতার দিয়া পূর্বপারে পলায়ন করিতেছিলেন, তখনও চন্ডেজের সেনাদল বর্ষার বারিধারার ন্যায় তীরবৃত্তি করিতেছিল। ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কোনরূপে প্রাণটা লইয়া সুলতান জলাল দিল্লীতে দাসবংশীয় সম্রাট আলতামাসের আশ্রয় লন। আলতামাসের নিকট ইনি যে ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন, আলতামাস তাহাতে স্বীকার না হওয়ায় জলাল খকরগণের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্জাবের অনেক স্থান লুণ্ঠপাট করিয়া সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করেন। তদানীন্তন সিন্ধুর সুলতান নসিরুদ্দীন কুবচী সুলতানে আশ্রয় লন। সুলতান জলাল তৎপরে পারস্তের সিংহাসন অধিকারের আশায় সিন্ধুতাগ করিয়া পারস্তে প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে চন্ডেজ খাঁ সিন্ধুপার হইয়া সুলতান অবরোধ করেন এবং প্রায় লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া আহাধ্য অভাবে ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে পুনরায়

চীনাভিমুখে অভিযান করেন এবং টংগুটের নিকট যুদ্ধে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে ২৯এ আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে ইহার রাজ্য পূর্বপশ্চিমে ২৭০০ কোশ বিস্তৃত ও উত্তর দক্ষিণে ১৫০০ কোশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার চারি পুত্র—জুজি, ওকতাই, চগতাই ও তুলি খাঁ পিতৃরাজ্য বিভাগ করিয়া লন। তুলি খাঁ সম্রাটপদ লাভ করেন।

চচ, পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডী জেলার আটক তহনীলের অন্তর্গত একটা জনপদ। আটক পাহাড়ের উত্তরে ও সিন্ধুনদের পূর্বকূলে অবস্থিত। এখানকার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার জমি বেশ উর্বরা। এখানকার চচহাজারো নামক স্থানই বাণিজ্য ও কৃষি-প্রধান। প্রবাদ এইরূপ, ওহিন্দের একজন চচব্রাহ্মণের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চচবংশীয় এক ব্যক্তি সিন্ধুপ্রদেশে ব্রাহ্মণরাজ্য স্থাপন করেন, তাহারও পূর্ব হইতে চচ জনপদের নামকরণ হইয়া থাকিবে। সিন্ধুনদতীরে এই চচ বংশের নামে অনেকগুলি নগর স্থাপিত হইয়াছিল, যথা—চচপুর, চচর, চচগাঁ, চচি ইত্যাদি।

পূর্বে সিন্ধুপ্রদেশে রায়বংশ রাজত্ব করিতেন, একজন চচ ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লন। তিনি শহরাম বা শাহরিয়ারের সমসাময়িক। কাহারও মতে ইনিই প্রথমে চতুরঙ্গ খেলা বাহির করেন।

চচবংশ ৪৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১৩৭ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আরবীয়গণ এই বংশ উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। এই উপলক্ষ করিয়া ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় "চচনামা" নামক গ্রন্থ রচিত হয়, ১২১৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ নামে এক ব্যক্তি "তারিখ-ই-হিন্দ-ও-সিন্দ" নাম দিয়া এই গ্রন্থ পারস্ত ভাষায় অনুবাদ করেন।

চচর (জি) চর-অচ্ বাহুলকাৎ দ্বিভং। গমননীল।

"পতরেব চচরা চন্ডনির্গিণ্ডমঃ" (স্বক্ ১০।১০৬।৮)

'চচরা সঙ্করস্তো' (সায়ণ।)

চচান, কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবার রাজ্যের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে একজন সামন্ত থাকেন, তাঁহার আয় প্রায় তিন হাজার, কিন্তু গবর্মেন্টকে ৩১৮ টাকা মাত্র কর দিতে হয়।

চচেণ্ডা (স্ট্রী) চচেণ্ডা, চলিত কথায় চিচিঙ্গে বলে।

চচেণ্ডা (স্ট্রী) পটোললতার সঙ্গুল লতাবিশেষ। ইহার ফলের গায়ে খেতবর্ণ দীর্ঘরেখা আছে। চলিত কথায় চিচিড়া বা চিচিঙ্গে বলে। পর্য্যায়—বেশকুল, খেতরাজী,

বৃহৎফল। ইহার গুণ প্রায় পটোলের সদৃশ, শুক শরীর রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। (মদনবিনোদ।)

চঞ্চ (পুং) চঞ্চ-অচ্। পরিমাণ বিশেষ, পাঁচ আঙ্গুল। (শব্দার্থচি°)

চঞ্চৎক (ত্রি) লক্ষ, অল্প, চঞ্চল, নড়াচড়া।

চঞ্চৎকুঠাররস (পুং) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ ও অত্র প্রত্যেকের দুইভাগ, লাজলিচা বিষ ছয় ভাগ, গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড় ও দস্তী, প্রত্যেকের এক ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও সোহাগা প্রত্যেকের পাঁচভাগ, গোমূত্র বত্রিশ ভাগ এবং সিজদুহ্ব বত্রিশভাগ একত্র পাক করিয়া দুইমাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম চঞ্চৎকুঠার-রস। স্থানবিশেষে চঞ্চৎকুঠার নামেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সেবনে অর্শ বিনাশ হয়। (রসসংগ্রহসংগ্রহ, অর্শচি°)

চঞ্চৎপুট (পুং) বাদ্যের তালবিশেষ। যে তালের প্রথমে দুইটি গুরু, তৎপরে লঘু ও প্লুত থাকে, তাহাকে চঞ্চৎপুট বলে।

“তালে চঞ্চৎপুটে জেয়ং গুরুধ্বং লঘুপ্লুতম্।” (সঙ্গীতদামোদর)

চঞ্চনিয়া (দেশজ) চঞ্চল, যে স্থির থাকিতে পারে না।

চঞ্চরিন্ (পুং স্ত্রী) চংচূর্যতে চর-যজ্-তন্ত লুক্-ণিনি। ভ্রমর। জীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

চঞ্চরী (স্ত্রী) চংচূর্যতে চর-যজ্-তন্ত লুক্-টক্ স্ত্রিয়াং ভীপ্। ভ্রমরী।

“কবীবরীভরীতি চেৎ দিশং সরীসরীতিকাম্।

হিরীচরীকরীতিচেৎ ন চঞ্চরীতি চঞ্চরী।” (উদ্ভট)

চঞ্চরীক (পুং স্ত্রী) চর ঙ্গক্ নিপাতনে সাধু। ভ্রমর।

চঞ্চরীকাবলী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণে ১৩টি অক্ষর থাকে এবং তাহার প্রথম, অষ্টম ও একাদশ অক্ষর লঘু ও তাহা ভিন্ন অপর সকল অক্ষর গুরু হয়, তাহার নাম চঞ্চরীকাবলী।

“যমৌ রৌ বিখ্যাতা চঞ্চরীকাবলীগঃ।” (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

চঞ্চল (পুং) চঞ্চ-অলচ্, চঞ্চং গতিং লাতি লাক বা। ১ কামুক। ২ বায়ু। (শব্দার্থচি°) (ত্রি) ৩ চপল। ৪ অস্থির। পর্যায়—চলন, কম্পন, কম্প, চল, লোল, চলাচল, ভ্রল, পরিপ্লব, চপল, চটুল, পারিপ্লব, পরিপ্লব।

“এবং বংসান্ পালয়ন্তৌ শোভমানৌ মহাবনম্।

চংচূর্যন্তৌ রমন্তৌ স্ম কিশোরাবিব চঞ্চলৌ।” (হরিবংশ ৬৪।৭)

চঞ্চলা (স্ত্রী) চঞ্চল-টাপ্। ১ বিছাৎ। ২ লক্ষ্মী। (মেদিনী) ৩ পিঙ্গলী। (শব্দরত্ন°)

চঞ্চলাক্ষী (স্ত্রী) চঞ্চলে অক্ষিণী বস্তাঃ সমাসান্ত-টচ্ ভীপ্। যে জীর নয়নযুগল অতিশয় চঞ্চল। চঞ্চলাক্ষিকা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চঞ্চলাস্ত্র (পুং) স্নগন্ধিষ্য।

চঞ্চা (স্ত্রী) চন্-অচ্-টাপ্। ১ নল নির্মিত আস্তরণ বিশেষ, চলিত কথায় চাঁচ বলে। (মেদিনী) চঞ্চবেতি চঞ্চা-ইকার্থে কন-তন্ত-লুপ্ (লুম্ভুষ্যে। পা ৫।৩।৯৮) ২ তৃণনির্মিত পুরুষ। (মেদিনী)

চঞ্চু (পুং) চন্-উন্। ১ এরগুবৃক্ষ। (মেদিনী) ২ মৃগ। (শব্দরত্ন°) ৩ রক্ত এরগু, রাজা ভেরেণ্ডা। ৪ ক্ষুদ্র চঞ্চুবৃক্ষ। (রাজনি°) (স্ত্রী) ৫ পত্রশাকবিশেষ, হিন্দীতে চেবুনা বলে। পর্যায়—বিজলা, কলভী, চীরপত্রিকা, চঞ্চুর, চঞ্চুপত্র, শ্মশাক, ক্ষেত্রসম্ভব। ইহার গুণ—মধুর, তীক্ষ্ণ, কষায়, মলশোধক, এবং শুষ্ক, উদর, বিবন্ধ, অর্শ ও গ্রহণীরোগ-নাশক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, সারক, রুচিকর, স্বাদু, দোষত্রয়নাশক, ধাতুপুষ্টিকর, বলকর, পবিত্র ও পিচ্ছিল। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার বীজের গুণ—কটু, উষ্ণ, শুষ্ক, শূল, উদররোগ, বিষ, স্বপ্নদোষ, কণ্ঠ, খর্জুরোগ ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনি°) ৬ পাখীর ঠোঁট।

“ভ্রাতৃশ্চাতক! পাতকং কিমপি তে সমাভ্য ন জানীমহে।

যত্তেহস্মিন্ ন পতন্তি চঞ্চুপুটকে দ্বিজাঃ পরোবিল্ববঃ॥”

(চাতক্যষ্টক ৬)

চঞ্চুকা (স্ত্রী) চঞ্চু স্বার্থে কন্-টাপ্। পাখীর ঠোঁট। (শব্দরত্নাবলী)

চঞ্চুতৈল (স্ত্রী) এরগুতৈল, ভেরেণ্ডাতৈল।

চঞ্চুপত্র (পুং) চঞ্চুরি পত্রমন্ত বহুব্রী। চঞ্চুশাক। (রাজনি°)

চঞ্চুভৃৎ (পুং স্ত্রী) পক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

চঞ্চুমৎ (পুং স্ত্রী) পক্ষী। (হারাবলী)

চঞ্চুর (পুং) চন্-উরচ্। ১ চঞ্চু নামক শাক, পত্রশাকবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ দক্ষ।

“বিজ্ঞাতাখিলশাস্ত্রার্থো লৌকিকাচারচঞ্চুরঃ।” (কাশীখ° ১০।৪৬)

চঞ্চুল (পুং) বিশ্বামিত্র মুনির একটা পুত্রের নাম। (হরিবংশ ২৭অঃ) কোন কোন স্থানে চঞ্চুল শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

চঞ্চুশাক (স্ত্রী) চঞ্চু নামক চঞ্চুসদৃশ বা শাকমন্ত বহুব্রী। শাকবিশেষ। [চঞ্চু দেখে।]

চঞ্চুসূচি (পুং স্ত্রী) চঞ্চুঃ সূচিরিব যন্ত বহুব্রী। কারগুব পক্ষী, চলিত কথায় খড়্‌ইস বলে। পর্যায়—সুগৃহ, পীতভূণ, মরুণ, চঞ্চুহটিক। জীলিঙ্গে বিকরে ভীপ্ হয়।

চঞ্চুসূচিক (পুং স্ত্রী) চঞ্চুহটিক-স্বার্থে-কন্। চঞ্চুহটিক পক্ষী।

চঞ্চু (স্ত্রী) চঞ্চু-উজ্ (অশ্রাণিজাতেশ্চারণ্যাদীনামুপসংখ্যানম্। পা ৪।১।৬৬ বাস্তিক) ১ চঞ্চুশাক। (রাজনি°) ২ পাখির ঠোঁট।

চক্ষুক (ক্ৰী) তৃণশাকবিশেষ, চলিত কথায় চেচুর বলে।

চট্ (দেশজ) ১ গুণ, থলিয়া। ২ শীত।

চটাই (চটক শব্দজ) [চটক দেখ।]

চটক (পুং) চটতি ভিনক্তি খাখাদিকং চটকুন্। ১ কলবিক পক্ষী, চলিত কথায় চড়া বা চড়ুই পাখী ও হিন্দীতে গবুরৈয়া বলে। (Sparrows.) পর্যায়—কলবিক, চিত্রপৃষ্ঠ, গৃহনৌড়, ব্রহ্মায়ণ, কামুক, নীলকণ্ঠক, কালকণ্ঠক, কামচারী, কলাবিকল। ইহার মাংসের গুণ—শীতল, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারী। বহু চটকের মাংস লঘু ও পথা। (রাজনিঃ) বাতটের মতে চটকের মাংস কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, শুক্রবর্দ্ধকর, শুষ্ক, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও মধুর। (বাতট সূত্র ৬ অঃ।) চরকের মতে চটকের মাংস সরিষাপাত ও বায়ুপ্রশমকারী। (চরক সূত্র ২৭ অঃ।) চটক শব্দ অজাদিগণাস্তর্গত বলিয়া জাতিবাতক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়। ২ কাশ্মীরবাসী একজন কবি ও মহারাজ জয়্যাপীড়ের মন্ত্রী। (রাজতরঙ্গিনী ৪৪৯৬) (ক্ৰী) ৩ পিঙ্গলীমূল। (অমরটকা)

চটককা (স্ত্রী) চটক-স্বার্থে-কন্ টাপ্ পক্ষে ইদাদেশাভাবঃ (উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্য্যায়ঃ। পা ৭.৩.৪৬) [চটক দেখ।]

চটকা (স্ত্রী) চটক-টাপ্। ১ চটকজাতীয় স্ত্রী, মাদি চটক পাখী। চটকায়া অপত্যং স্ত্রী চটকা-এরক্, অপত্যপ্রত্যয়ন্ত লুক্ তত্ঠাপ্। ২ চটকের স্ত্রী অপত্য। (অমর) ৩ শ্রামা-পক্ষী। (রাজনিঃ)

চটকামুখ (ক্ৰী) চটকায়া মুখমিব মুখমন্ত বহুব্রী। অস্ত্রবিশেষ, প্রাচীনকালে যুদ্ধে এই অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। ভারতযুদ্ধে ইহার উল্লেখ আছে। (ভারত ৮৪০ অঃ)

চটিকাশিরস্ (পুং) চটকায়াঃ শির ইব ৬তৎ। পিঙ্গলীমূল।

চটিককা (স্ত্রী) চটকা-স্বার্থে কন্ ইদাদেশঃ। (উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্য্যায়ঃ। ৭.৩.৪৬) চটকা। (মুদ্রবোধ)

চটন (দেশজ) রাগ, ক্রোধ।

চটা (দেশজ) ১ রাগী, যাহার সহজেই রাগ হয়। ২ চাঁচ।

চটচটি (দেশজ) রাগায়াগি, পরস্পর পরস্পরের প্রতি রাগ প্রকাশ।

চটান (দেশজ) রাগান, কোপ জন্মান।

চটাফল (পুং) নারিকেল। (শব্দরত্নঃ)

চটাল (দেশজ) বিস্তৃত, চওড়া।

চটিকা (স্ত্রী) চটক-টাপ্ ইদাদেশঃ। ১ মাদিচটক, চটকজাতীয় স্ত্রী। ২ পিঙ্গলীমূল। (হলায়ুধ) [চটকা দেখ।]

চটিকাশিরস্ (ক্ৰী) চটিকায়াঃ চটকপদ্ব্যাঃ শির ইব আকৃতি-রস্যা বহুব্রী। পিঙ্গলীমূল।

চটিকাশির (পুং) চটিকায়াঃ শির ইব পুষোদরাদিহাং সকার লোপে সাধু। পিঙ্গলীমূল। (অমর)

চটী (দেশজ) ১ চট। ২ দুর্গম রাস্তার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রপাহ-নিবাস। ৩ গোড়ালীহীন জুতা।

চটু (পুং) চট্-কু। (মৃগযাদয়শ্চ। উণ্ ১.৩৮) ১ প্রিয় বাক্য, চাটু। “ছায়া নিজস্বী চটুলানসানং।” (মাঘ ৪৬)

সংক্ষিপ্তসারের মতে প্রিয়বাক্য বুঝাইতে চটুশব্দ স্ত্রীব-লিঙ্গ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) ২ উদর। ৩ ব্রতীদিগের আসনবিশেষ। (মেদিনী)

চটুল (ত্রি) চটুরন্ত্যচ্ চটুলচ্ (সিদ্ধাদিভ্যশ্চ। পা ৫.২.১৭) ১ চঞ্চল, চপল। (হেম)

“জ্ঞাপাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ স্মনেত্রৈঃ।” (রঘু ৯৫৮)

৩ স্মন্দর। (উণাদিকোষ)

চটুলা (স্ত্রী) চটুল-টাপ্ (অজাদাত্ঠাপ্। পা ৪.১.৪১) ১ বিহ্বাৎ। (জটাধর)। ২ গায়ত্রীরূপা ভগবতী।

“চটুলা চণ্ডিকা চিত্রা চিত্রমালাবিভূষিতা” (দেবীভাগ ১.২.৬.৪৭)

চটুল্লোল (ত্রি) চটুলশচাসৌ লোলশ্চেতি কর্মধাৎ। নিপাতনে সাধুঃ। ১ চাটুকারক। ২ চঞ্চল। (ত্রিকাণ্ড) ৩ স্মন্দর। (উণাদিকোষ) ৪ অতিশয় চঞ্চল। (হারাবলী)

চটুল্লোল (ত্রি) চটৌ চাটুবাচ্যে উল্লোলঃ ৭তৎ।

[চটুল্লোল দেখ।]

চট্কান (দেশজ) মাড়ান। কচড়ান।

চট্চট্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ, শুষ্ক পদার্থ আঙুনে পুড়িতে আরম্ভ করিলে চট্চট্ শব্দ হয়। ২ আটাল, হাতে লাগিলে সাহার ঘনরস জানা যায়।

চট্টগ্রাম, একটা বিস্তৃত জনপদ, বাঙ্গালা বিভাগের অন্তর্গত। [চাটগাঁ শব্দে বিস্তৃতবিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চট্টভট্ট, তাম্রশাসন বর্ণিত জাতিবিশেষ।

চট্টল, [চাটগাঁ দেখ।]

চট্পট্ (দেশজ) ত্বরান্বিত, অতি শীঘ্র।

চট্পটিয়া (দেশজ) অস্থির।

চট্পটী (দেশজ) খাদ্যবিশেষ।

চড় (চপেট-শব্দজ) ১ করতল, চাপড়। ২ নদীগর্ভ হইতে উথিত নূতন জমি।

চড়ই (চটক শব্দজ) চটক পক্ষী, চড়া।

চড়ক (দেশজ) তৈজসমাসের সংক্রান্তির দিনে অমৃত্যু প্রাপ্ত-বিশেষ। স্থানবিশেষে গাজন বলে। এই দিনে শৈবপ্রধান বাণ রাজা দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রীতিকামনায় বন্ধুবর্গের সহিত শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত হইয়া শ্রী

গাত্র জ্বির দিরা শিবকে তুই করেন। তদন্তসারে শিবজ্ঞান
হিন্দু সম্প্রদায় ঐ দিনে শিবপ্রীতির জন্য উক্ত উৎসব
করিয়া থাকে। চৈত্র মাসে ৫।৭ দিন থাকিতেই ঐ উৎ-
সবের আরম্ভ হয়।

বৃহৎসংখ্যায় লিখিত আছে—

“চৈত্রে শিবোৎসবঃ কুর্যাৎ নৃত্যাগীতমহোৎসবৈঃ।

স্মার্যঃ ত্রিসংখ্যং রাজ্যোচ হবিষ্যাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

শিবব্রহ্মপতাং যতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ।

কত্রিয়াদিষু যো মর্ত্যো দেহং সংপীড্য ভক্তিতঃ॥

অশ্বমেধকলং তন্ত জারভে চ পদে পদে।

সর্পকর্ষপরিভ্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ॥

ভক্তৈর্জাগরণং কুর্যাৎ রাজ্যো নৃত্যকুতুহলৈঃ।

নানাবিধৈর্মহাবাদৈর্নৃত্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥

নানাবেশধরৈর্নৃত্যৈশ্চ প্রীয়েতে লব্ধকঃ প্রভুঃ।

কিমলকঃ ভগবতি প্রসঙ্গে নীললোহিতে॥

তস্মাৎ সর্পপ্রযত্নেন ভোষণীয়া মহেশ্বরঃ।

শঙ্খবাদ্যং শঙ্খতোয়ং বর্জয়েৎ শিবসন্নিধৌ॥

গ্রামাঘহিরিমং শস্তোক্ষসংবং কারয়েন্মুদা।

উপোষ্য হস্তা সংক্রান্ত্যঃ ব্রতমেতৎ সমর্পয়েৎ॥”

(উত্তরখণ্ড ৯ অঃ।)

চড়কোৎসবে স্থানভেদে প্রতিদিন শিবপূজা, শিবভক্তি-
সূচক গান ও হরগৌরী সাজাইয়া নগর ভ্রমণ হইয়া থাকে।
একখানি পরিষ্কার ৩৪ হাত লম্বা তক্তায় সিন্দূর মাখাইয়া
শিবের পাট প্রস্তুত করা হয়। শিবপূজার ছায় প্রতিদিন
শিবপাটের ও পূজা করা হইয়া থাকে। যাহারা শিবভক্তি-
বিষয়ক গান ও হরগৌরী সাজিয়া নগর ভ্রমণ করে,
তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে। শিব ও পাট পূজা ব্রাহ্মণ
পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে প্রায়
সকল স্থানে চড়ক প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল হিন্দুই
এই সন্ন্যাসী হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে তামিলেরা এই
উৎসবকে “চেড্ডুল” বলে।

সন্ন্যাসীরা পবিত্র ও উপাস্যী থাকিয়া এই কয়দিন শিবের
আরাধনা করে। সন্ধ্যার পরে শিবের নামে ধূনা পোড়ান
হয়। ধূনা পোড়াইবার মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম
ও চলিত ভাষায় রচিত। সন্ন্যাসীরা ভক্তি দেখাইবার জন্য
শিবের সাক্ষাতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি লোহশলাকার বা বটীর
উপরে ঝাঁপ দিয়া পতিত হয়, তাহাতে ঐ অর্ধচন্দ্রের বা বটীর
আঘাত বৃকে লাগিয়া রক্ত বাহির হয়। ইহার নাম ঝাঁপ
বা পাটাল। ঝাঁপ তিন প্রকার—ঝুল ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ ও

বটী ঝাঁপ। স্থানবিশেষে চড়কপূজার দুইদিন পূর্বে সন্ন্যাসী-
সীরা গজমাধন-পর্কত-আনন্দ অভিনয় করে, ইহাকে
গিরিসন্ন্যাস বলে। ইহার পরে মহাসমারোহে একটি
আমগাহের নিকটে বাইরা অনেক মন্ত্রপাঠ ও ভক্তিসূচক
গান করিয়া একটি শাখার সহিত একটি বা ততোধিক
আমফল তালিয়া আনে। কোথাও এই দিন বাগফোড়া
ও নীলবস্ত্রের পূজা হয়। ইহার নাম বানরসন্ন্যাস। চড়ক-
পূজার পূর্বদিন রাজ্যে খিচুড়ী ও লব্ধ গজাল মাছ প্রভৃতি
উপহারে পূজা করা হয়। অর্ধরাত্রে সন্ন্যাসীরা ভাষামন্ত্রে ধূনা
পোড়াইয়া ও মাথা ঘুরাইয়া শিবের আরাধনা করে। এই সময়ে
দুই একজন সন্ন্যাসী সংজাহীন হইয়া অনেক কথা বলিতে
থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে শিবের আবির্ভাব বা অদ্বৈতহেই
সন্ন্যাসী ঐরূপ করিতে থাকে। সেই সময়ে ঐ ব্যক্তির
মুখে স্বয়ং মহাদেবই অতীত বা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ প্রকাশ
করেন। যেদিন চৈত্রমাসের সংক্রান্তি সেইদিন অতি প্রত্যা-
সেই মহাসমারোহে শিবপূজার আয়োজন হইতে থাকে।
ভক্তি দেখাইবার জন্য সন্ন্যাসীরা লৌহনির্মিত বাণ জিহ্বায়
বিদ্ধ করে। ইহাদিগকে বাণসন্ন্যাসী বলে। অর্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুল
সদৃশ স্থল সরল লোহশলাকার অগ্রভাগে একটি ফলা করিয়া
ক্রমে সরু ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাকেই বাণ বলে।
ইহার একটি লম্বায় ২½ হাত হইতে ৪½ হাত পর্যন্ত দেখিতে
পাওয়া যায়। বাণসন্ন্যাসীরা ভক্তিভরে উন্মত্তের ছায়
নৃত্যাগীত করিয়া দিন অতিবাহিত করে। বাণটী সেইরূপেই
জিহ্বাবিদ্ধ থাকে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে জলে বাইরা বাণটী
খুলিয়া ফেলে; অসমর্থ হইলে দিনেও বাণ খুলিতে পারে।
আর এক দল উভয় পার্শ্বের চর্মবেশ করিয়া তন্মধ্যে সূত্র
বা সরু আস্ত বেত ভরিয়া রাখে। ইহাদিগকে সূত্রসন্ন্যাসী বা
বেত্রসন্ন্যাসী বলে। ইহারাও সমস্ত দিন নৃত্যাগীতে উন্মত্তের
ছায় থাকিয়া সন্ধ্যাবেলায় সূত্র বা বেত খুলিয়া ফেলে। অপর
সন্ন্যাসীরা পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে বড়িশী বিদ্ধ করে, ইহা-
দিগের নাম বড়িশী সন্ন্যাসী। ইহারা বড়িশীর গোড়ায় দড়ি
লাগাইয়া চড়কগাহে ঘুরিয়া থাকে। [চড়কগাহ দেখ।]
১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নূতন আইনবলে এই উৎসব এক রকম
উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই পূর্বের মত চড়ক-
পূজায় সমারোহ নাই। যেখানে আছে, তথাও কেবলমাত্র
পূজাই আছে, বাণ, বড়িশী সূত্র বা বেত ভরিবার প্রথা
উঠিয়া গিয়াছে।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ে বুড়াঠাকুর
নামে একটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছে, চৈত্রসংক্রান্তিতে তাহার

উৎসবে এখনও পূর্বের নিয়মে চড়ক হইয়া থাকে। উধার বাণ, বড়িশী, বেত্র ও স্ত্রজ বিক্রয় করিয়া এখনও পূর্বের নিয়মে নৃত্যগীত হয়। বিপদ বা উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া অনেকেই ‘বুড়াঠাকুরের লাক্ষাতে বাণ, বড়িশী প্রভৃতি ধারণ করিব’ বলিয়া মানসিক করে ও যণাসময়ে যথানিয়মে ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ধোপা ও চণালের সংখ্যাই বেশী।

[বুড়াঠাকুর দেখ।]

ঐশ্বর্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে রাণী রজাবতী ধর্মকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে গাজন করিয়া ধর্মের উপাসনা করেন। তাহাতে বাঁশ, ধূনাপোড়া প্রভৃতি চড়কপূজার অনেক অঙ্গের উল্লেখ আছে। [ধর্মপূজা দেখ।]

চড়কগাছ (দেশজ) একটি শুষ্ক তাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার মাধায় একটি স্তম্ভর আল প্রস্তুত করিবে। এক পানি কাঠের ঠিক মধ্যে একটি ছিদ্র করিয়া একপ ভাবে আলে বসাইবে যেন চারিদিক ঘুরাইতে পারা যায়। এই স্ফিট কাঠখানির নাম আল পাট। শুষ্কতা তালরূপে দাঁড় করাষ্টবে, ইহার নাম চড়কগাছ। আলপাটের উত্তর অঙ্গে ছুইগাছী দড়ি বাঁধিবে। চড়কে যে বড়শী-সন্ন্যাসীর কথা আছে, তাহার পৃষ্ঠবিদ্ধ বড়শী ঐ দড়িতে বাঁধিয়া ঘুরাইতে হয়। [চড়ক দেখ।]

চড়াচড়ি (দেশজ) এক প্রকার বাজনা।

“মীনী চড়াচড়ি কুমড়াবড়ি।” (কবিকল্প)

চড়ন (দেশজ) আরোহণ, উঠন।

চড়নদার (দেশজ ও পারসীমিশ্রিত) আরোহণকারী, যে চড়িয়া যায়, চলিত কথায় চড়ন্নার বলিয়া থাকে।

চড়া (দেশজ) ১ কর্ণিন। ২ আরোহণ। ৩ দ্বীপ, নদী প্রভৃতি মধ্যে মাটি জমাট হইয়া যে ভূভাগ উৎপন্ন হয়। ৪ চটক পাখী।

এ মানভূমের অন্তর্গত পুরুলিয়ার নিকটবর্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি পাথরের দেবালয় ও কএকটি বৃহৎ সরোবর দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে জৈন শ্রাবকেরা ঐ সকল মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্বে এখানে বৃহৎ সপ্তদেউল ছিল, এখন তাহার পাঁচটা পতিত ও অপর ছুইটা তম্বাবস্থায় রহিয়াছে। এই সকল মন্দিরে জৈনদেবমূর্তি ছিল।

চড়াকথা (দেশজ) পরবোস্তি, ক্রুদ্ধভাবে বলা, কথায় তেজ-স্বিতা প্রকাশ।

চড়াচড়ি (দেশজ) হস্ততল বিস্তার করিয়া তদ্বারা আঘাত করার নাম চড়, যে ক্রুদ্ধ বিরোধ পরস্পর পরস্পরকে চড় মারিয়া খটিয়া থাকে, তাহার নাম চড়াচড়ি।

চড়াদর (দেশজ) মহার্ঘ, অধিক মূল্য।

চড়ান (দেশজ) ১ বর্জিত। ২ চড় দেওয়া।

চড়ানিয়া (দেশজ) ১ যে চড় দিয়া আঘাত করে। ২ অধিক।

চড়্‌চড়্‌ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

চড়্‌চড়ী (দেশজ) একরকম ঝোলশূন্য বাজনা।

চড়্‌তি (দেশজ) বুদ্ধি, আধিক্য।

চণ (পুং) চণ-অচ্। শস্যবিশেষ, ছোলা। [চণক দেখ।]

শস্যের উত্তর বিখ্যাতার্থে চণ প্রত্যয় হয়। (তেন বিত্‌শ্চুগ্‌শ্‌ চণপো। পা ৫:২:২৬।)

চণক (পুং) চণ্যতে দীপ্যতে চণ ক্‌নু। ১ শস্যবিশেষ, ছোলা, বুট। (Oicer arietinum) পর্যায়—হরিমহুক, হরিমহজ, চণ, হরিমহ, স্ত্রগন্ধ, কৃষ্ণচক্ষু, বালভোজ্য, রাজভিক্ষা, কক্ষুকা। ইহার গুণ—মধুর, রুক্ষ, মেহ, বমি ও রক্তপিত্ত নাশক, দীপন এবং বর্ণ, বল, রুচি ও আশ্বাসকারক। কাঁচা ছোলার গুণ—শীতল, রুচিকর, সন্তর্পণ, দাহ, তৃষ্ণা, অশ্মরী ও শোষণনাশক, কষায় এবং অন্ন পরিমাণে কফবর্দ্ধক। তাজা ছোলার গুণ রুচিকর, বাতনাশক ও রক্তদোষকারী।

ইহার যুগের গুণ—মধুর, কষায় কফ, বাত, বিকার, শ্বাস, উর্দ্ধকাশ, ক্রম ও পীনসনাশক, বলকারী এবং দীপন। প্রাতে ছোলা তিজান জলপানের গুণ—চক্ষুরিরণের জ্বায় শীতল, পিত্তরোগনাশক, সন্তর্পণ, মজ্জা ও মধুর। (রাজনি°)

ভিজা ছোলার গুণ—পিত্ত ও কফনাশক। ইহার যুগের গুণ ক্ষোভকর। ইহার শাকের গুণ—রুচিকর, গুরুপাক, কফ ও বাতবর্দ্ধক, অন্ন বিষ্টভজনক, পিত্ত ও দস্তশোথনাশক। (ভাবপ্র°)

ভারতের সর্বত্রই, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহার আধার অধিক। তথাকার অধিবাসীরা ইহার সহিত গোধূম চূর্ণ মিশাইয়া খাইয়া থাকে। উক্ত প্রদেশের অশ্ব ও গো-মেঘদিগকে ইহার চূর্ণ (ছাড়ু) খাওয়ান হয়। স্পেনবাসী দরিদ্র লোকেরা গমের পরিবর্তে ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রহ্মদেশে ইহার অত্যধিক চাষ হইয়া থাকে। অপরক অবস্থায় এই গাছের আশ্বাদ অন্নযুক্ত বলিয়া অম্লমিত হয়। এই বীজ মধ্যে যে কএকটি বিভিন্ন পদার্থ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটির আংশিক পরিমাণ এইরূপ;—জল ১০.৮০, আটা ৬২.২০, যবক্ষার ১৯.৩২, তৈল ৪.৫৬ এবং মৃত্তিকাংশ ৩.১২। ২ মুনিবিশেষ।

চণকরোটিকা (জী) ছোলাচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত রোট। ইহার গুণ—রুক্ষ, স্নেহ, পিত্ত ও রক্তনাশক, গুরু, বিষ্টভ ও চক্ষুর হিতকর।

চণকা (জী) অতঙ্গী। (Linum Usitatissimum)

চণকাঙ্ক (পুং) চণকশাস্ত্রজ্ঞঃ ৬৩৭। চণক্য, বাংডায়ন
মুনি। (হেম°)

চণকাম্ব (ক্লী) চণকজাতমন্মথ। চণকলবণ। ছোলায় শাক
সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম চণ-
কাম্ব। ইহার গুণ—অতিশয় অম্ল, দীপন, দস্তর্হর্ষণ, লবণা-
মূরস, কটিকর এবং শূল, অজীর্ণ ও অনাহারোগনাশক।
(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ।)

চণকাম্বক (ক্লী) চণকাম্বমেব চণক-স্বার্থে কন্। চণকাম্ব।

“চণকাম্বকমতাম্ব দীপনং দস্তর্হর্ষণম্।” (ভাবপ্রকাশ)

চণকাম্ববারি (ক্লী) চণকাম্বস্ত চণকলবণস্ত বারি ৬৩৭।
ক্ষেত্রস্থ ফলযুক্ত চণকের পত্রহিত শিলির প্রভৃতি। (শকার্থচি°)

চণক্রম (পুং) চণচণকইব ক্রমঃ। কুজগোকুর। (রাজনি°)

চণপত্রী (স্রী) চণস্ত চণকস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী। কদম্বী
বৃক্ষ। (রাজনি°)

চণশব্দ (পুং) চণশ শব্দঃ ৬৩৭। ছোলাচূর্ণ।

চণিকা (ক্লী) চণতি রসং দদাতি চণ-বাহলকাৎ কণ্ঠাপ-
অত ইত্য়ক। তৃণবিশেষ, ইহা গোবর পক্ষে অতিশয় হিতকারী।
পর্য্যায়—গোছক্ষা, সুনীলা, ক্ষেত্রজা, হিমা। ইহার বীজের
গুণ—বৃষা, বলকর ও অতিশয় মধুর। এই তৃণ খাইলে
গোবর ছদ্ম বৃদ্ধি হয় ও শরীর ঠাণ্ডে পুষ্ট হইয়া থাকে। (রাজনি°)

চণীক্রম (পুং) কুজ গোকুর।

চণ্ড (ক্লী) চণ্ডতে চড়ি-কোপে পচাদ্যচ্। ১ তীক্ষ্ণ। (শব্দরত্না°)
(পুং) চণতি চণয়তি বা অম্লরসং চণ-ড (এমস্তান্‌ডঃ।
উণ° ১।১১৪) : তিস্তি ত্রী বৃক্ষ। চণ্ডতে কুপ্যতি চড়ি-অচ্।
৩ বমকিঙ্কর। ৪ একজন প্রসিদ্ধ দৈত্য। শুভ্রদৈত্যের রাজত্ব-
কালে এই দৈত্য তাঁহার অশ্রুতম সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিল।
শুস্তের আদেশে সংগ্রামস্থলে যাইয়া চণ্ডিকার হস্তে নিহত
হয়। ইহার ভ্রাতার নাম মুণ্ড। (দেবীমাহাত্ম্য) ৫ একজন
অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ, ইনি ‘প্রাকৃতলক্ষণ’ রচনা করেন।
(ত্রি) ৬ অতিশয় কোপন স্বভাব, অত্যন্ত কোপন।

“চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ

চৌরাশ্চ ছুটাশ্চ পলাশ্চ বর্জ্যাঃ।” (ভারত ৩.২৩৩।১১)

৭ তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট।

“দহন্তমিব তীক্ষ্ণাংগুং চণ্ডবায়ুমীরিতম্।” (ভারত ১।৩২।২৩)

চণ্ডশব্দটী বহ্বাদিগণান্তর্গত বলিয়া ইহার উত্তর বিকল্পে ভীষ
হয়। (পুং) ৮ বৎসরী নরপতির নবম পুত্র। (মার্ক° ১১৮।২)

চণ্ড, মিবরপতি লক্ষ্মণার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একজন উদারচেতা
মহাপুরুষ। স্বদেশাহরণ ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের জন্ত তিনি
রাজধানের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ।

বাল্যকাল হইতে নানা সঙ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া মিবরবাসী
চণ্ডকে অতি ভালবাসিতেন, লক্ষ্মণাও পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ
করিতেন। রাজবাড়ের বিভিন্ন নৃপতিবর্গ ইহাকে জামাতৃত্বে
বরণ করিবার ইচ্ছা জানাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে মাড়বার
রাজ রণমল্ল একজন।

চণ্ড সবে যৌবনসীমার পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার
বিবাহ দিবস কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজা রণমল্ল
বিবাহ সম্বন্ধজ্ঞাপক একটী নারিকেল ফল প্রেরণ করিলেন।
লক্ষ্মণা পাত্রমিত্রসহ সভায় সমাসীন, প্রজাপতির প্রিয়
দূত নারিকেল হস্তে ভথায় উপস্থিত হইল। চণ্ড তখন
কার্য্যাহুরোধে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া
বিবাহে সম্মতি দিলেন। রাণা দূতকে সেই শুভ
সংবাদ জানাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বোধ হয়
এ বুড়ার জন্ত এমন খেলার জিনিষ আসে নাই।”
মিবরপতির এই সুমিষ্ট বাক্যে সভায় সকলেই প্রীতিলভ
করিল। কিন্তু সে কথা শুনিয়া চণ্ডের তাবাস্তর উপস্থিত
হইল। চণ্ড ভাবিলেন, পিতা যাহাকে মুহূর্ত্তের জন্ত আপনার
বলিয়া মনে স্থান দিয়াছেন, তাহার পাণিগ্রহণ করা পুত্রের
কখনই উপযুক্ত নহে। চণ্ড মনের কথা পিতৃচরণে প্রকাশ
করিলেন। এখন রাণার উত্তর সঙ্কট উপস্থিত! তিনি
পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দূতপ্রতিজ্ঞ চণ্ডের হৃদয়
কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ পিতাকে
বলিলেন, “বাবা! আমি জোড়হাত করিয়া জানাইতেছি,
আমাকে একপ অহুরোধ করিবেন না।”

রাণালক্ষ পুত্রের ব্যবহারে কষ্ট হইয়া নিজেই রণমল্লের
কন্ডাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং চণ্ড যাহাতে
আর উত্তরাধিকার না পায়, তজ্জন্তু কহিলেন যদি সেই রমণীর
গর্ভে পুত্র জন্মে, সেই পুত্রই মিবরের অধিপতি হইবে।
দূতপ্রতিজ্ঞ চণ্ড তাহাতেই সম্মত হইলেন।

যথাকালে লক্ষ্মণার গুহসে সেই মাড়বাররাজকন্ডার
গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মিল। তাহার নাম হইল মুকুলজি।
মুকুল পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। সেই সময়ে পুণ্যক্ষেত্র
গয়াধামে মুসলমানসংঘর্ষ উপস্থিত! বৃদ্ধ মিবরপতি বিধর্ম্মীর
করাল কবল হইতে হিন্দুর মোক্ষস্থান উদ্ধার করিবার
জন্ত প্রস্তুত হইলেন, যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি চণ্ডকে
আজ্ঞান করিয়া অতি নম্রভাবে বলিলেন, “আমি যে মহা-
কার্য্যে যাইতেছি, বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিতে পারিব না।
যদি না আসিতে পারি, তবে আমার মুকুলের ভাগ্যে কি
হইবে? তাহাকে কি দিয়া যাইব?”

বীরবর চণ্ড বীর গভীরভাবে উত্তর করিলেন, “চিতোরের রাজসিংহাসন।” বৃদ্ধ রাণা তখন কতক আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু পাছে পিতার মনস্তি না হয়, এই ভাবিয়া বীরচেতা চণ্ড পিতার গয়াযাত্রার পূর্বেই মুকুলের অভিষেককার্য সমাধা করিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে রাজোপযোগী বলি প্রদান করিয়া নব রাণার চিরতরুণ ও অমররূপ থাকিতে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং মিবারের সর্বপ্রধান মন্ত্রীস্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সাক্ষাতিক ভল্লচিহ্ন না লইয়া চিতোরেশ্বর কোন সামন্তকে ভূমিদান করিতেন না। চণ্ড পিতার অর্ন্তমানে কনিষ্ঠ মুকুলকে অতিশয় যত্ন করিতেন, মুকুলের পায়ে একটা কুশাগ্র বিদ্ধ হইলেও তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিত। বিমাতার সন্তানের প্রতি এত অমুরাগ এত ভালবাসা রাজপুত্রসমাজে কেহ কখন দেখে নাই।

এদিকে রণমল্লহিতা মুকুলজননীর মনের ভাব ভিন্নরূপ। তিনি ভাবিলেন মুকুল রাণা হইলে কি হইবে? প্রকৃত রাজক্ষমতা চণ্ডের হাতে। চণ্ড মনে করিলে এখন মুকুলের সিংহাসন পর্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারেন। একরূপ বৃথা রাজমাতা হওয়া না হওয়া সমান কথা। তিনি এইরূপ অমূলক স্বার্থস্ফূহার বশবর্তী হইয়া মহাত্মা চণ্ডের ছিদ্রাদ্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ছিদ্র না পাইয়া সর্বসমক্ষে চণ্ডের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, “মুকুল নামে মাত্র রাণা, চণ্ডই প্রকৃত রাজা, ‘রাণা’ শব্দটা নামমাত্র করিতেই চণ্ডের একান্ত ইচ্ছা।” চণ্ড সব শুনিলেন, তিনি বুঝিলেন মূর্খা স্বার্থপর। মুকুল-জননীর সকলই সম্ভব। ভাবিলেন যে, নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়া রাজ্যের ত্রিবিক্রি জন্ত তিনি যে প্রাণপণে এত যত্ন করিতেছেন, তাহার কি এই পরিণাম? তাঁহার বড়ই ঘৃণা হইল। তিনি বিমাতাকে বেশ স্নিগ্ধ ভৎসনা করিলেন ও শিশোনীর বংশের বাহাতে মঙ্গল হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া চিতোর ছাড়িয়া মান্দুরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

চণ্ড চিতোর ছাড়িয়া গেলে মুকুল-জননীর পিতৃকুটুম্বগণ একে একে মরুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিতোরে আসিতে লাগিলেন। প্রথমে মুকুলের মাতুল যোধ, পরে তাঁহার পিতা রণমল্ল ও অপরাপর পৌরজন আসিয়া চিতোর নগর ছাইয়া ফেলিলেন। ছষ্ঠ রণমল্ল দৌহিত্র মুকুলকে কোলে লইয়া চিতোরের সিংহাসনে বসিতে লাগিলেন। মুকুল স্থানান্তরে গেলেও রণমল্লের শিরে মিবারের রাজচ্ছত্র অশোভিত হইত। মুকুলের মাতুলগোষ্ঠী ক্রমে চিতোরের সকল উচ্চপদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সকল

দেখিয়া শুনিয়া একজনের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল, তিনি মুকুলের বৃদ্ধা ধাত্রী। ধাত্রী ক্রমশঃ রণমল্লের হ্রস্ত-সন্ধি বুঝিতে পারিয়া মুকুলের মাতাকে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন, “তোমার পিতৃকুল হইতে তোমার শিশুসন্তান নিজ পিতৃরাজ্য হারাইবে নাকি?” প্রথমে রাজমাতার ততটা সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু কিছুদিন মধ্যে তিনিও সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। একদিন তিনি অতি মাত্র ব্যথিত হইয়া রণমল্লকে তাঁহার হ্রস্তসন্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু পিতার মুখে রাজমাতা যে নিদারুণ কথা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! বুঝিলেন যে তাঁহার অঞ্চলের নিধি মুকুলের জীবনহরণের যড়যন্ত্র হইতেছে। এই দারুণ বিপত্তিকালে সংবাদ আসিল যে চণ্ডের দ্বিতীয় সহোদর পরমধার্মিক রঘুদেবকে পাপাত্মা রণমল্ল গুপ্তভাবে বিনাশ করিয়াছে। রাণী সহস্র হুশিচন্ডায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করে কে? তাঁহার হৃদয়ের নিধিকে কে রক্ষা করে? আজ চণ্ডের সেই স্নিগ্ধ ভৎসনা ও চণ্ডের সেই ভবিষ্যবাণী একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এখন কোথায় চণ্ড! চণ্ড থাকিলে তাঁহাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। তিনি লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়া গুপ্তভাবে চুঃখের কথা জানাইয়া চণ্ডকে আহ্বান করিলেন।

চণ্ড যখন মান্দুরাজ্যে গমন করেন, তখন দুইশত ভীল জ্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডের অনুগমন করিয়াছিল। রাজমাতার পত্র পাইবামাত্র চণ্ড তাহাদিগকে চিতোরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা জ্রীপুত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ভাণ করিয়া চিতোরে প্রবেশ করিল। চণ্ডের পরামর্শ মত মুকুলজননী চিতোরের পার্শ্ববর্তী পল্লিসমূহে ভোজ দিবার জন্ত মুকুলকে পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এক গ্রাম দুই গ্রাম করিতে করিতে চিতোর হইতে কিছুদূরেও যাতায়াত হইতে লাগিল। সে সময়ে মুকুলের সঙ্গে কেবল কতকগুলি বিশ্বাসী অশুচর ও রক্ষক থাকিত। চণ্ডের কথা ছিল যেন দেওয়ালীর দিন মুকুল (চিতোর হইতে ৩০ ক্রোশদূরে অবস্থিত) গোহস্তনগরে উপস্থিত হন।

নির্দিষ্ট দিন আসিল। গোহস্তনগরে সকলে সোৎসুক চণ্ডের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কুম্ভা চতুর্দশী নিশির ঘোরা তামসীমূর্ত্তি জগৎকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনও চণ্ড আসিলেন না। তখন সকলে নিরাশ হইয়া চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা চিতোরী নামক স্থানে পৌছিয়াছেন, এমন

সময়ে অথ কুরখনি শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে চলিশজন অশ্বারোহী তাঁহাদের সমুখ দিয়া চলিয়া গেল, চণ্ড তাঁহাদের সর্বাঙ্গে যাইতেছিলেন। ক্রমে সকলে তোরণদ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালগণ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা উত্তর করিলেন, “আমরা চিতোররাজ্যের অধীন সর্দার। গোমুন্দের উৎসবে মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে প্রাসাদে পৌছিয়া দিবার জন্ত যাইতেছি।” সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্রত্যাহত দ্বাররক্ষকগণের চমক ভাবিল, তাহারা সেই অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিতে সকলে অগ্রসর হইল। মহাবীর চণ্ড উন্মুক্ত অলিহস্তে জলদগভীরনিমানে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। পরিচিত রণনিখোঁষ প্রবণতায় সেই অমূল্য ভীষণ বাহির হইয়া দ্বারপালদিগকে বিমোহিত করিতে লাগিল। তখনকার ভট্টবংশীর প্রবীণসচিব চণ্ডের তীক্ষ্ণকৃপাণবলে শমন সদনে প্রেরিত হইলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত রণময় ও অন্তঃপুরে একপ্রকার বন্দী হইরাছিলেন, চণ্ডের অমুচরেরা গিয়া সেই পাশিষ্ঠকেও যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিল। [রণময় দেখ।]

পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বোধরাও গুপ্তভাবে চিতোর হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্ত চণ্ড মন্দেরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিঃসহায় যোধ মন্দের পরিত্যাগ করিয়া হরবান্দর নামক জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রের নিকটে আশ্রয় লইলেন। চণ্ড মন্দের অধিকার করিলেন। তাঁহার ছই পুত্র কঠ ও মূঙ্গ সদলে মন্দেরনগরে উপস্থিত হইলে তিনি চিতোরে প্রত্যাগমন করেন।

মহাবীর চণ্ড পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রাণান্তেও তাহা বিশ্বস্ত হন নাই। তিনি আবার কনিষ্ঠ মুরুগকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইলেন। আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল।

চণ্ড মন্দেরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধরাও জাণ্ডকবনে মাড়বারের একজন স্বাধীন ব্যক্তির অমুগ্রহে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু তিরসিন লম্বান যায় না। বোধরাওর অদৃষ্ট স্প্রশম হইল, তিনি অনেক অম্বনর বিনয়ের পর মহারাণার নিকটে হইতে মন্দের-অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। মিবারণতি চণ্ডকে চিতোরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আদেশ পাঠাইলেন। চণ্ড রাণার আদেশ মত কোঠপুত্রের সহিত মন্দের পরিত্যাগ করিলেন,

দুইক্রোশ পথ আসিতে না আসিতে দেখিলেন, হঠাৎ মন্দের আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আর কিরিলেন না। তাঁহার কোঠ পুত্র মূঙ্গ মন্দেরে কিরিলেন, তিনি সেখানে গিয়া শুলিলেন তাঁহার ছই ভ্রাতা বোধরাওর হস্তে নিহত হইয়াছে এবং মন্দেরের দুর্গচূড়ে বোধের বিজয়পতাকা উড়িতেছে। মূঙ্গ নিজ ভ্রাতৃদ্বয় ও সৈন্যগণের পরাজয়সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে পলাইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বোধের সৈন্তগণ পথিমধ্যে তাঁহাকেও নিহত করিল।

চণ্ড যে সময়ে আরাবল্লীর দুর্গ মধ্যে উপস্থিত, সেই সময় এই শোচনীয় সংবাদ তাঁহার কর্ণপোচর হইল। তিনি অবিলম্বে মন্দেরবাড়া করিলেন। বিজয়ী বোধরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাণার অমুজ্ঞাপত্র প্রদান করিয়া মন্দের ও মিবারের সীমানিকারণ জন্ত অমুগ্রোধ করিলেন। রাজতন্ত্র চণ্ড রাণার আদেশপত্র পাঠ করিয়া ছুর্জিসহ গুজলোক ভুলিয়া গেলেন ও প্রতিহিংসাসাধনে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি মনোভাব চাপিয়া বোধকে এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন,—

“আওনলা আওনলা মেবার।

বাবুল বাবুল মাড়বার ॥”

অর্থাৎ যে পর্যন্ত গীতকুসুম আওনলা দেখা যাইবে, সে পর্যন্ত রাণার রাজ্যসীমা নির্দিষ্ট রহিল।

এইরূপে মন্দেরের অধীন সমগ্র গড়বার (গদবার) প্রদেশ মিবারের অন্তর্গত হইল। মাড়বারের অধিকাংশ মিবারের অধিকারভুক্ত হওয়ার মিবারবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

তারপর চণ্ড আর রাজনৈতিক কার্যে মনোযোগ করিলেন না। জীবনের অবশিষ্টকাল পরোপকার ও ধর্মচর্চার অতিবাহিত করেন। এখনও রাজধানের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি প্রদা করিয়া থাকে।

চণ্ডকৌশিক (পুং) ১ অধিবেশ, কাকীবানের পুত্র। ইনি একজন মহাতপস্বী ও উদার চরিত্র ছিলেন।

চণ্ডতা (স্ত্রী) চণ্ডত ভাষা: চণ্ড-তল্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, উগ্রতা। (হেম)

চণ্ডতুণ্ডক (পুং) চণ্ডতুণ্ডমুখং যন্ত বহব্রী কপ্। গরুড়ের পুত্র পক্ষীবেশে। (তারত ৫।১০০ অঃ)

চণ্ডহ (স্ত্রী) চণ্ডত ভাষা: চণ্ড-হ। ১ চণ্ডতা, উগ্রতা।

“শৌর্য্যাপরাধাদিভবং ভবেচ্চণ্ডমুগ্রতা।” (সাহিত্যদণ্ড ৩ প)

চণ্ডদণ্ড, কাকীপুরের একজন পন্নবরাজ। ইনি কদম্বরাজ রবিবর্মার হস্তে পরাজিত হন।

চণ্ডদীপ্তি (পুং) চণ্ডা তীক্ষ্ণা দীপ্তির্ভবত বহব্রী। চণ্ডাংস্ত, হৃদ্য।

চণ্ডনায়িকা (স্ত্রী) চণ্ডী কোপনা নায়িকা কর্মধা, পূর্ণপদ্য পুংবদভাষা:। ১ দুর্গা। (শকরস্বামী)

“উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোপ্রা চণ্ডনারিকা।

চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চাণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥” (হুগাধ্যানঃ)

২ অষ্টনারিকার অন্তর্গত চণ্ডবতীর এক নবী। ইহার বর্ণ নীল, ঘোলবানি হাত, বামহস্তে কপাল, খেটক, কটা, দর্পণ, বহু, জল, পাশ ও সুল্লার শক্তি এবং ডান হাতে মুদগর, ফুল, বজ্র, খড়্গ, অকুণ, বাণ, চক্র ও শলাকা আছে।

“চণ্ডনারিকাঃ নীলবর্ণাঃ ঘোড়শৃঙ্গাঃ।

কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্ ॥

পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিঃ বামহস্তেন বিব্রতীম্।

মুদগরং শূলবজ্রঞ্চ খড়্গমৈকৈব তথা কুশম্ ॥

শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিব্রতীম্ ॥”

(দেবীপুরাণোক্ত হুগোৎসবপদ্ধতি)

চণ্ডপরশু, ত্রিভুজাশ্রিতক বিখ্যামিজগোত্রীর একজন রাজা, মার্কণ্ডের পুত্র ও ভীমরথের পিতা। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ১২৭১৬৬।)

চণ্ডপাল, একজন সংস্কৃতবিৎ, যশোরাজের পুত্র, চণ্ডসিংহের ভ্রাতা ও লুণ্ঠির শিষ্য। ইনি সম্রাটকথাটিকা প্রণয়ন করেন।

চণ্ডবল (পুং) বানরবিশেষ। (ভারত ৩।২৮৬ অঃ)

চণ্ডভণ্ড, স্থলবনবাসী পূর্বকালীন লবণপ্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ।

চণ্ডভার্গব (পুং) চ্যবনবংশীর একজন ঋষি, ইনি মহারাজ অম্বোজয়ের সর্পযজ্ঞে হোতা ছিলেন। (ভারত ১।৫০ অঃ)

চণ্ডমহাসেন (পুং) একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। ইনি সাধারণের অসাধ্য অনেক কার্য সম্পাদন করিবেন এই ভাবিয়া কোন মহাপুরুষ ইহার নাম চণ্ডমহাসেন রাখিয়াছিলেন। (কথাসরিৎ) [মহাসেন দেখ।]

চণ্ডমারুতস্বামী, হরিদিনতিলক নামক ধর্মশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

চণ্ডমুণ্ডা (স্ত্রী) চণ্ডোমুণ্ড বধাঘোষাত্মকঃ চণ্ড-মুণ্ড-অচ্-টাৎ। চামুণ্ডা [চামুণ্ডা দেখ।]

চণ্ডমুণ্ডী (স্ত্রী) মহাশ্মানহিত দেবীবিশেষ।

“চণ্ডমুণ্ডী মহাশ্মানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী ॥” (তন্ত্রসাং)

চণ্ডরব (স্ত্রী) ঘোরনাদযুক্ত, যে ভীষণ চীৎকার করে।

চণ্ডরুদ্রিকা (স্ত্রী) চণ্ডো রুদ্রো বেনাঘোষাত্মক চণ্ডরুদ্র-ঈন্। বিদ্যাবিশেষ। (শঙ্করবাবলী)

চণ্ডবতী (স্ত্রী) চণ্ডশচণ্ডতা বিমাত্রে ২তাঃ চণ্ড-মতুপ্ মতা বঃ। ১ হুগা। (শঙ্করবাবলী) ২ অষ্টনারিকার অন্তর্গত একটী হুগার নবী। ইনি ধূম্রবর্ণ। আর সকলই চণ্ডনারিকার সমান।

ইহার ধ্যান—“চণ্ডবতীং ধূম্রবর্ণাং ঘোড়শৃঙ্গাম্ ॥”

(অপর অংশ চণ্ডনারিকার সমান।)

(দেবীপুরাণোক্ত হুগোৎসবপদ্ধতি)

চণ্ডবিক্রম (স্ত্রী) চণ্ডো বিক্রমোবস্যা বহত্ৰী। বিক্রমশালী। (পুং) ২ রাজবিশেষ।

চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত (পুং) দণ্ডক ছন্দবিশেষ। বাহার প্রত্যেক চরণ ২৭টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং ৭,৯,১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫ ও ২৭শ অক্ষর গুরু, ইহা ছাড়া অপর সব ছর তাহার নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। “যদিহ ন যুগলং ভুতঃ সপ্তরেকা-তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদগুরুকঃ ॥” (বৃহস্পতিসংহিতা)

চণ্ডবেগ (স্ত্রী) চণ্ডো বেগো যন্ত বহত্ৰী। অতিশর বেগশালী। চণ্ডশক্তি (পুং) চণ্ডা শক্তিরন্ত বহত্ৰী। ১ বলিরাজের এক সৈন্য। (হরিবংশ ২৪ অঃ) (স্ত্রী) ২ চণ্ডবিক্রম।

চণ্ডা (স্ত্রী) চণ্ড-টাৎ। ১ অতিশর কোপনা স্ত্রী। ২ অষ্টনারিকার অন্তর্গত একটী। ইহার বর্ণ শাদা ও হাত ঘোল বানি। অপরাপর অষ্ট চণ্ডনারিকার সমান। ইহার ধ্যান—“চণ্ডাং গুরুবর্ণাং ঘোড়শৃঙ্গাম্ ॥” (অপর অংশ চণ্ডনারিকার ধ্যানের সমান।) [চণ্ডনারিকা দেখ।] ২ জৈন শাসন-দেবতা বিশেষ। (হেম) ৩ চোর নামক গজদ্বন্দ্ব। (অমর) “স সর্বপং তুঘুরখাতবন্তং চণ্ডাঞ্চূর্ণানি সমানি কুর্যাৎ ॥”

(চরক সূত্র ৩ অঃ)

৪ শতপুন্দ্রী। (মেদিনী) ৫ লিঙ্গিনীলতা। ৬ কপিকঙ্কু। ৭ খেতদুর্গা। ৮ আধুকর্গী, ইজুরকাণী। (রাজনি) ৯ নবীবিশেষ। (শঙ্করবাবলী)

চণ্ডসিংহ, প্রাচ্যটবংশীয় একজন বিখ্যাত কবি, যশোরাজের পুত্র ও চণ্ডপালের ভ্রাতা। ইনি চণ্ডিকাচরিতনামক মহাকাব্য রচনা করেন। দত্তই এর শিলাফলকে ইহার কীর্তি বিঘোষিত হইরাছে। (Ephigraphia Indica, Vol. I. p. 31.)

চণ্ডাংশু (পুং) চণ্ডাংশবো যন্ত বহত্ৰী। সূর্য্য।

চণ্ডাত (পুং) চণ্ডবততি চণ্ড-অত-অণ্ উপপদসং। করবীর। (অমর)

চণ্ডাতক (পুং স্ত্রী) চণ্ডাঃ কোপনামততি অত-কুল্। স্ত্রীলোকের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বস্ত্র, কাচ। (অমর)

বোপালিভের মতে চণ্ডাতক শব্দটা পুংলিঙ্গ।

চণ্ডাল (পুং) চড়ি কোপে আলঞ্ (পতিচণ্ডিত্যামালঞ্। উণ ১।১১৬) যদা চণ্ডং বিকটং অলং ভূষণং যন্ত বহত্ৰী, নিপাতনে সাধু। (উজ্জলদত্ত) ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত ভাষায় চাঁড়াল বলে। পর্যায়—প্রব, মাতল, দিবা-কীষ্টি, জনকম, নিষাদ, খপাক, অস্ত্রবানী, চাঁড়াল, পুঙ্কল,

জলদ্রব, নিশাদ, ঋগ, পুষ্ক, পুষ্ক, নিক। মনুস মতে
শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হয়।

“শূদ্রাদারোগবঃ ক্ষত্যা চাণ্ডালশাধমোনাশম্।

বৈশ্বরাজ্যবিপ্রাশু জায়ন্তে বর্ণশঙ্করা ॥” (মনু ১০।১২)

পরশুরামপদ্ধতির মতে তীব্রের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার
গর্ভে চণ্ডালের জন্ম।

“চণ্ডালোহিড়িপেঃ কাঁণ্ডো ডোপ্খলঃ স্ত্রবন্তথা।

পঞ্চৈতে তীবরাজ্জাতাঃ কত্মাং ব্রাহ্মণস্ত বৈ ॥” (পরশুরাম)

ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাদের দান গ্রহণ, অন্ন ভোজন ও ইহা-
দের স্ত্রীগমন একান্ত নিষিদ্ধ। অজ্ঞানে এই সকল করিলে
ব্রাহ্মণ পতিত হয়, কিন্তু জ্ঞানপূর্বক করিলে চণ্ডালের সমান
হইয়া থাকে।

“চণ্ডালান্ত্যদ্বিরো গচ্ছা ভুক্তাচ প্রতিগৃহ্যচ।

পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞান্যং সাম্যন্ত গচ্ছতি ॥” (মনু)

শূলাগি প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিসংগ্রহকারগণের মতে
“চণ্ডালান্ত্য” ইত্যাদি বচনের “বিপ্র” পদটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়
বৈশ্য ও শূদ্র, এই বর্ণ চতুষ্টয়ের উপলক্ষণ। তাহাদের
মতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ জ্ঞানে ঐ সকল কার্য করিলে
পতিত হয়। [পতিত শব্দে বিবৃত বিবরণ প্রথবা [ইহা-
দের স্পষ্ট জলপান বা ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে নাই।
[অপের, অগ্রাহ ও অস্পৃশ্য শব্দ দেখ।]

মনু ইহাদিগকে অতি হীন জাতির মধ্যে স্থান দিয়া-
ছেন এবং অতিশয় কঠোর নিয়মে জীবনযাপন করিবার
বিধান করিয়াছেন। মনু সংহিতার মতে ইহাদের বাসস্থান
গ্রামের বাহিরে। গ্রামের মধ্যে ইহাদিগকে বাস করিতে দিবে
না। সোণা ও রূপা ভিন্ন অপর কোন নিকৃষ্ট ধাতুতে ইহা-
দের ভোজনপাত্র প্রস্তুত হইবে। ইহারা যে পাত্রে ভোজন
করিবে সেই পাত্রের আর সংস্কার করিবে না অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট
অণুচি পাত্রে ভোজন করিলেও ইহাদের ধর্ম্যনষ্ট হয় না, কিন্তু
ইহারা সৌবর্ণ ও রজতপাত্র ভিন্ন অপর যে কোন পাত্র
ভোজন করে, তাহার সংস্কার করিলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির
ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। কুকুর ও গর্দভ প্রভি-
পালন, মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ, ভাঙ্গা শরা প্রভৃতি নিকৃষ্ট
পাত্রে ভোজন, লোহাদি নির্মিত অলঙ্কার ও সর্ষদা গমনা-
গমন ইহাদের কর্তব্যকর্ম। ধর্ম্যকর্মীমুঠান সময়ে এই
জাতির দর্শন প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহাদের বিবাহ,
অগদান ও অগ্নগ্রহণ প্রভৃতি ব্যবহার সমান জাতীয়দিগের
সহিতই হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সাক্ষাৎ অন্ন দিতে নাই,
কৃত্য প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন পাত্রে অন্ন দেওয়াইবে। রাজ্যকালে

গ্রাম বা নগরে বিচরণ করা ইহাদের একান্ত নিষিদ্ধ। দিনের
বেলা রাজার আদেশমতে বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়া ক্রম-
বিক্রম প্রভৃতি আবশ্যক কার্যে গ্রামে গমন করিতে পারে।
বান্ধবহীন মৃতব্যক্তিকে নাহ ও রাজার আদেশে বধ্য ব্যক্তির
প্রাণ সংহারক, তাহার বস্ত্র শয্যা ও অলঙ্কার প্রভৃতি গ্রহণ করাই
ইহাদের কর্তব্যকর্ম (১)। মনুস্মৃতিতে চণ্ডালের ধর্ম্য যেরূপ
দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমান সময়ে তাহার অনেক ব্যবহার
চণ্ডাল জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় না। তাহাদের আহার
ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদের মধ্যে যে মনু-নিরূপিত নিয়ম চলিত
ছিল, তাহা অমুমান করাও হুঙ্কর। মনুস্মৃতিতে চণ্ডাল
ধর্ম্য অশানবাসী মূর্খাকরাস জাতির মধ্যে অনেকটা লক্ষিত
হয়। ইহাতে অনেকেই মূর্খাকরাসদিগকে মনুবর্ণিত চণ্ডাল
বলিয়া নির্ণয় করিতে চাহেন।

ঢাকাবাসী চণ্ডালদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহার
পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল, শূদ্রের সহিত একত্র ভোজন করার
এরূপ অবনতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহারা আরও
বলে যে গয়াবাসী গোবর্দ্ধন চণ্ডালেরা তাহাদিগের পূর্বপুরুষ।
তাহারা উক্ত প্রদেশ হইতে এইখানে আসিয়াছে। তাহারা
প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণদিগের দাস ছিল, কারণ তাহাদিগকে
ব্রাহ্মণদিগের শ্রাদ্ধাদির অমুকরণে ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতে
দেখা যায়। গয়াবাসী বঙ্গীর চণ্ডালের পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ায়
কোনরূপ দানগ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত আরও একটি
প্রবাদ আছে যে রঘুকুলপুরোহিত বিশিষ্টদেবের পুত্র বাম-
দেব রাজা দশরথকে যজ্ঞীয় কুণ্ড হইতে শান্তিজল প্রদানের
সময় ভ্রমক্রমে কোনরূপ অস্তায়কার্য্য করায় পিতৃশাপে
এইরূপ চণ্ডাল হইয়া গিয়াছেন।

ফরিদপুর অঞ্চলের চণ্ডালদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে—
পূর্বকালে তাহারা উচ্চ হিন্দুসমাজে গৃহীত ছিল। তাহাদের

(১) “চণ্ডালবর্ণচানাজ বহির্গ্রাম্য প্রতিজ্ঞঃ।

অপপাত্রাশ কর্তব্য্য ধনসেবাঃ বর্ণদ্রবম্।

বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেব ভোজনম্।

কাঁকীরসমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ।

ন তৈঃ সমরমন্দিরেণ পুরুষোধ্যর্ষ্যচরম্।

ব্যবহারো মিথ্যেবাঃ বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ।

অন্নসেবাঃ পরাধীনং দেয়ং ভাদ্ ভিন্নভোজনে।

রাত্রৌ ন বিচরেন্তু গ্রামে ন নগরেব চ।

দিবা চরেন্তুঃ কার্ধ্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।

অবাকবঃ শব্দৈক্য নির্হরের মিত্তিহিতৈঃ।

বধ্যাংক হত্যাঃ সন্ততঃ বধ্যাশাঃ স্তৃপাক্ষরা।

বধ্যাশাংসি পুত্রীমুঃ শব্যাশাভরণানি চ।” (মনু ১০।৫১-৫৩)

সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই হানি পাইত ও ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী বিভাগ ছিল। পরে ঢাকার কতকগুলি হুট ব্রাহ্মণের উদ্ভেজনার তাহার সমাজচ্যুত হয় ও বদেশ পরিত্যাগ করিয়া করিমপুর, যশোর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আলিয়া বাস করিতে থাকে।

কাহারও মতে বেহারের দৌলধ, পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি প্রভৃতি জাতিও এই চণ্ডালজাতির শাখাভেদ মাত্র। কিন্তু পরস্পরের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি পরিদর্শন করিলে ঠিক এক জাতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। [ভূমি ও দৌলধ দেখ।]

বঙ্গদেশে পূর্বকালে চণ্ডালের বেশ প্রাচুর্য ছিল, তাওয়ারের জঙ্গলে চণ্ডালরাঙ্গদিগের বৃহৎ জুর্গের আজও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বর্তমান প্রভৃতি কোন কোন স্থানের চণ্ডালের আপনাদিগকে লোমশ বা নোমশ খবির সন্তান ও নমশূদ্র নামে পরিচয় দেয়। এই নমশূদ্র নাম শুনিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে শূদ্রের নমস্র বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা নহে, নমন অথবা অবনত শূদ্র বলিয়া ইহাদের নাম নমশূদ্র হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে—চণ্ডালদের মধ্যে কাশুপ গোত্র এবং হালবা, ঘাসি, কাঁধো (বেহার), কড়াল, বারি, বেড়ুয়া, পোদ, বকাল, সরালিয়া, অমরাবাদি, বাছার ও শগবীপা প্রভৃতি শ্রেণী ;

মধ্যবঙ্গে—ধানী, জালিয়া, জিউনি, কারাল, হুনিয়া ও সিরালি প্রভৃতি শ্রেণী।

পশ্চিমবঙ্গে—ভরদ্বাজ, লোমশ ও শাণ্ডিয়া এই কয় গোত্র এবং চাসি, হেলো, জেলো, কেসরখলো, কোটাল, মাজিলা, নোলো, হুনিয়া, পাণফুল, সরো প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়।

বঙ্গের চণ্ডালদের মধ্যে এই সকল উপাধি আছে—খাঁ, টেঙ্গরা, ঢালী, দাউক, দাস, জুলে, নমধানি, পধ্বান বা প্রধান, পণ্ডিত, পরামাণিক, পাজ, ফলিয়া, বাগ, বিশ্বাস, ভালো, মজুমদার, মণ্ডল, মাকি, মহারা, মির্দাদা, মিত্রী, রায়, লস্কর, গুয়ারদার, সামজা, সিংহ, সিউলি, সেনা, হাজরা, হাণি, হাউইকর, হালদার, হাইত ইত্যাদি।

হালবা শ্রেণী আপনাদের পূর্বপ্রথা বজায় রাখিয়া চলে বলিয়া অপর শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহার কড়াল ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না। পোদ শ্রেণী হুগলী ও যশোর জেলার কিছু অধিক, তাহার চাবী, কুয়ার, জেলে ও লাঠিয়ালের কাজ করে। তাহার আপনাদিগকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচয়

দেয়। ইহাদের মধ্যে হেলো বা হালিয়া, সরালিয়া, সরো ও বাছার এই কয় শ্রেণী কৃষিকার্য করে ; জেলো বা জালিয়া, অমরাবাদি ও হুনিয়ারা মৎস্য ধরে, সিউলীরা খেজুর ও তাল গাছ কাঠিরা রস বাহির করে এবং শগবীপারা পাণের কাজ করে। এ ছাড়া উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কোতোয়াল, চৌকিদার, দারবান, ফলমূলবিক্রেতা প্রভৃতি নানা কার্য করিয়া থাকে।

চণ্ডালদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পূর্বে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে। ১৮ মাস বয়সের পর কাহার মৃত্যু হইলে ইহার দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে, একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। পুত্র সন্তান জন্মিলে প্রসূতি ১০ দিন অন্তর্গত থাকে।

বঙ্গের চণ্ডালদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। পৌষ সংক্রান্তির দিন ইহার বস্ত্রপূজা করিয়া থাকে। মধ্য বঙ্গের জেলো চণ্ডালেরা বনসুয়া নামক এক মদীদেবতার পূজা এবং সকলেই মহা লমারোহে শ্রাবণমাসে মনসাদেবীর পূজা করে।

বর্ণ ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালের পৌরোহিত্য করে। চণ্ডালদের স্বতন্ত্র ধোবা নাপিত নাই, নিজেরা ধোবা নাপিতের কর্ম করে। ইহার অপর সকল জাতি অপেক্ষা হীন হইলেও শুড়ীকে কখন স্পর্শ করে না। যে আসনে শুড়ী বসে, সে আসন ঘটনাক্রমে স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অন্তর্গত মনে করে।

(ত্রি) ২ ছরায়া, জুরকর্মী, জুঠানকারী। যে ব্যক্তির কিছুমাত্র দয়া বা মমতা নাই, সর্বদাই লোকের প্রতি নির্ভর ব্যবহার করে, তাহাকে চণ্ডাল বলে। [চণ্ডাল দেখ।]

(পুং) ৩ বৃক্ষবিশেষ। [চণ্ডালকন্দ দেখ।] ৪ পক্ষীবিশেষ।

চণ্ডালকন্দ (পুং) চণ্ডালগ্রন্থঃ কন্দঃ মধ্যলোণ। কন্দ-বিশেষ। ইহার গুল মধুর, কফ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক, বিষ ও ভূতদোষ প্রভৃতির প্রশমকারী এবং রসায়ন। চণ্ডালকন্দ পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। বর্ণা—১ একপত্র, ২ দ্বিপত্র, ৩ ত্রিপত্র, ৪ চতুপত্র ও ৫ পঞ্চপত্র। (রাজনিঃ)

চণ্ডালত্ব (স্ত্রী) চণ্ডালত্ব ভাবঃ। ১ চণ্ডালের ধর্ম, চণ্ডালতা, ২ দয়ামায়ীশূত্র নির্ভর আচরণ।

চণ্ডালতা (স্ত্রী) চণ্ডালত্ব ভাবঃ চণ্ডাল-তল্-টাপ্ [চণ্ডাল দেখ।]

চণ্ডালবল্লকী (স্ত্রী) চণ্ডালস্য বল্লকী ভবত্।

বীণা, অপর নাম কণ্ডোল। [কণ্ডোলবীণা দেখ।]

চণ্ডালামি (চণ্ডাল শব্দজ) চণ্ডালত্ব, চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার।

চণ্ডালিকা (স্ত্রী) চণ্ডালো ভক্ষকস্বেন বান্ধকস্বেন বাস্ত্যভাঃ চণ্ডাল ঠন্-টাপ্। ১ চণ্ডাল বীণা, কণ্ডোল। ২ ওষধি

যুদ্ধবিশেষ, চলিত কথার চাড়া বল। চণ্ডমলতি অল-
বুল্ টাপ্ ইত্। ৩ উমা। (মেদিনী)

চণ্ডালিকাবন্ধ (পুং) বন্ধবিশেষ।

চণ্ডালীয়া (ত্রি) চণ্ডাল বাহুলক্য-ঈয়। চণ্ডাল সম্বন্ধীয়।

চণ্ডালীয়া (চণ্ডাল শব্দ) চণ্ডাল সদৃশ।

চণ্ডাশোক (পুং) বৌদ্ধপ্রতিপালক একজন রাজা, অপর
নাম কামাশোক।

চণ্ডি (স্ত্রী) চণ্ডি-কোপে ইন্। চণ্ডী, দুর্গা। (অমরটীকা)

চণ্ডিকঘণ্ট (পুং) চণ্ডীক্করনোহন্ত্যাতা: চণ্ড-ঠন্ চণ্ডিকা
তীক্করনা ঘণ্টাযন্ত বহুব্রী। শিব।

“নমচণ্ডিকঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টি-ঘণ্টিনে।” (ভারত ১৩।১৮৬ অঃ)

চণ্ডিকা (স্ত্রী) চণ্ডী স্বার্থে-কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বচ। ১ দুর্গা।

“ইতু্যক্তা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডিক্রমা।” (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)
অমরকটকে এই দেবীই পীঠশক্তিরূপে প্রসিদ্ধ।

“ছলগণ্ডে প্রচণ্ডাতু চণ্ডিকামরকটকে।”

(দেবীভাগবত ৭।৩০।৭৩)

২ গায়ত্রীদেবী। “চণ্ডিকা চটুলা চিত্রা চিত্রমালাবিভূষিতা।”

(দেবীভাগবত ১২।৬।৪৭।) [চণ্ডী দেখ।]

চণ্ডী (স্ত্রী) চণ্ডি-ভীষ্। (বহ্বাদিত্যচ। পা ৪।১।৪৫) ১ দুর্গা।

“চণ্ডী মামন্ত্রয়েন্ বিদ্বান্ নাত্র বধী পুরস্ত্রিয়াঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

২ হিংস্রা, হিংসাকারিণী। ৩ অতি কোপনা স্ত্রী।

“সা কিলান্বাসিতা চণ্ডী ভজা তৎসংশ্রিতৌ বরৌ।” (যযু ১২।৫)

৪ ছন্দোবিশেষ, যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৩টী
অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও নবম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষর
গুরু, ইহা ছাড়া অপর সকল অক্ষর লঘু হয়, তাহার নাম চণ্ডী।

“ন যুগ স যুগশ্চক্ৰিত: কিলচণ্ডী।” (বৃত্তরত্নাকর)

৫ মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যপ্রকাশক স্তব-
বিশেষ, দেবীমাহাত্ম্য নামেও ইহার উল্লেখ আছে।

চণ্ডীপাঠ করিবার নিয়ম—প্রথমে অর্গল, কীলক ও চণ্ডীর
কবচ পাঠ করিয়া পরে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। অর্গল পাঠে
পাপনাশ; কীলক চণ্ডীপাঠের ফলোপযোগিতা ও কবচ
পাঠ করিলে সকল বিষয় বিনাশ হইয়া থাকে (১)। কোন
স্তবাদি পাঠ করিতে হইলে তাহার প্রথমে একটি প্রণব ও
অন্তে আর একটি প্রণব যোগ করিতে হয়। এই নিয়মা-
নুসারে চণ্ডীর প্রথম ও শেষে দুইটি প্রণব যোগ করিয়া পাঠ
করিবে। ইহা না করিলে চণ্ডীপাঠ নিফল হয়। পাঠকালে
পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইতে হয়, তখন মনে মনে অপর

কোন কার্যের চিন্তা করিবে না। একটি আধারের উপরে
চণ্ডী পুথিখানি রাখিয়া পাঠ করিবে। হাতে লইয়া পাঠ
করিলে কোন ফল হয় না। স্বয়ং মূর্খ বা অপণ্ডিত বা অত্রা-
ক্ষণ কর্তৃক লিখিত পুস্তক দেখিয়া পাঠ করিতে নাই। পাঠের
পূর্বে ঋষিছন্দাদি জ্ঞাস করিতে হয়। একটি অধ্যায়ের শেষ
হইলে বিরাম করিবে, অধ্যায়ের মধ্যে পড়িতে পড়িতে কখনও
থামিবে না, যদি কোন কারণে অধ্যায়ের মধ্যে বিরত হইতে
হয়, তবে সেই অধ্যায়টী পুনর্বার প্রথম হইতে পাঠ করিবে (২)।
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর পাঠকের মুখে কোন স্তবাদি শুনিলে নরক
হইয়া থাকে। পাঠক সর্বপ্রথমে দেব ও ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া
পুথির গ্রন্থি শিথিল করিবে, স্ত্রীচণ্ডী পুথি রাখিয়া রাখিবে।
স্ত্রী মুক্ত করিয়া রাখিবে না। বিম্পষ্ট, অক্লান্ত, শান্ত, কলম্বর
ও রসভাবযুক্ত পাঠ করিতে হয়। পাঠের সময়ে বর্ণোচ্চারণ
অতি স্পষ্টরূপে করিতে হয়। যিনি স্বয়ং সকল গ্রন্থের অর্থ
বুঝিতে পারেন ও এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন
যে শ্রবণমাত্রেই অপরে তাহার অর্থ অনায়াসে বুঝিত
পারেন, তিনি পাঠের উপযুক্ত অধিকারী। এই সকল গুণ-
সম্পন্ন পাঠককে ব্যাস বলা হইয়া থাকে। পাঠকালে যথা-
নিয়মে সাতটি স্বরের সমাবেশ থাকা আবশ্যক এবং সমস্ত রস
প্রদর্শন করাইতে হয়।

চণ্ডীপাঠের ফল।—প্রথমে সকল পূজা ও অঙ্গে মন্ত্রজ্ঞান
করিয়া চণ্ডীপাঠ করিবে, তৎপরে বলিপ্রদান করিলে
সিদ্ধি হয়। উপসর্গশাস্তির জন্ত ত্রিরাবৃত্ত, গ্রহকোপ-
শাস্তির জন্ত পঞ্চাবৃত্ত, মহাভয় উপস্থিত হইলে সপ্তাবৃত্ত,
শাস্তি ও বাজপেয় ফলশাতকামনায় নবাবৃত্ত, রাজবশীকরণ
বা সম্পদপ্রাপ্তির অভিলাষে একাদশবার, শত্রুনাশ বা
অভিলাষপূরণকামনায় দ্বাদশবার, স্ত্রী বা রিপুবশীকরণ
কামনায় চতুর্দশবার, সৌখ্য বা ত্রীকামনায় পঞ্চদশবার,

(২) “জপ্তা চ প্রণবং চান্দৌ স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।

অন্তে চ প্রণবং দক্ষ্যৎ ইতু্যবাচাদিপূর্ব্বকঃ।

সর্বত্র পাঠে বিজ্ঞেয়ো হস্তথা বিকলং ভবেৎ।

স্তোত্রে নানন্তচিত্তেন পঠিতবাং অযত্নতঃ।

ন কার্যাসম্ভবনসা কার্যং স্তোত্রোক্ত বাচসম্।

আধারে স্থাপয়িত্বা তু পুস্তকং বাচরেৎ স্থাঃ।

হস্তসংস্থাপনাদেব বস্মাদম্ভকলং লভেৎ।

স্বয়ং লিখিতং বস্তু কৃতিনা লিখিতং ন যৎ।

অত্রাক্ষণেন লিখিতং তচ্চাপি বিকলং ভবেৎ।

ঋষিছন্দাদিকং স্তোত্র পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ৰণঃ।

অধ্যায়ং প্রাপ্য বিরমেরতু মধ্যো কদাচন।

কৃত্তে বিরামে মধ্যো তু অধ্যায়াদিৎ পঠেরতঃ।” (বৎসাসূক্ত)

(১) “অর্গলং কীলকং চান্দৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।

জপেৎ সপ্তসতীং পঞ্চাং ক্রমএব পিবেদিতঃ।” (বারাহীতত্ত্ব)

পুত্র, পৌত্র, ধন ও ধাতুকামনায় বোধশব্দার, রাজতর-
নিবারণ ও অরতিধ্বলের উচ্চাটন কামনায় সপ্তদশবার বা
অষ্টাদশবার, মহাত্রণ বিনাশের জন্ত ত্রিংশৎবার এবং বন্ধন-
মুক্তিকামনায় পঞ্চবিংশতিবার চণ্ডীপাঠ করার বিধান
আছে। ভীষণ সঙ্কট, দুশ্চিকিৎস্য রোগ, জাতিধ্বংস, কুলো-
চ্ছেদ, আয়ুক্ষয়, শত্রুবৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, ধননাশ ও ক্ষয় এই সকল
উৎপাত অথবা অভিপাতক হইলে শাস্তির জন্ত শতাবৃত্ত চণ্ডী
পাঠ করিতে হয়। শতাবৃত্ত চণ্ডী পাঠ করিলে সমস্ত অন্তঃ
বিনাশ হয় এবং রাজ্যবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক
শত আটবার চণ্ডী পাঠ করিলে মনে যাহা চিন্তা করিবে,
তাহাই সিদ্ধ হয় ও শতান্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।
সহস্রাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে লক্ষ্মী হিরা হইয়া সর্দদা বিরাজ
করেন, ইহজন্মে বহুবিধ সুখভোগ ও চরমে মুক্তিপদ
লাভ হইয়া থাকে। বেক্রপ যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ ও দেব-
গণের মধ্যে হরি সর্গপ্রধান, সেইরূপ এই সপ্তশতী স্তব
সমস্ত স্তবের প্রধান জানিবে। (মৎস্যসূক্ত)

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী এ দেশীয় আন্তিকগণের নিকট
বড়ই আদরনীয়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণের মধ্যে
ইহার পাঠ প্রণালী প্রচলিত আছে। কালক্রমে অথবা
বহু গ্রন্থের ভিন্ন মতে চণ্ডীপাঠবিধান সমন্ধে মতামত
হইয়াছে। টীকাকার বা উপাসকসম্প্রদায় ইহার পাঠ হির
করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও
ঐক্যমত লক্ষিত হয় না। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর অনেক টীকা
আছে, তাহার কতকগুলি প্রচলিত ও অপর কতকগুলি
অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। [চণ্ডীটীকা দেখ।]

তন্ত্রে চণ্ডীপাঠের নিয়মপ্রভাবে লিখিত আছে—

“সকামৈঃ সম্পূটো জাপোয়া নিকামৈঃ সংপুটং বিনা।

শতমাদৌ শতকান্তে সংপুটোহয়মুদাহৃতঃ।”

এই বচন অনুসারে সকাম ব্যক্তির চণ্ডীপাঠে ছইটী মত
হইতে পারে। যথা সকাম ব্যক্তি নবাক্ষর প্রভৃতি চণ্ডীমন্ত্রে
পুটিত করিয়া সপ্তশতী স্তব জপ করিবে অথবা সপ্তশতী দ্বারা
পুটিত করিয়া নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে।

চণ্ডীটীকাকার ভাস্কররায়ের মতে সপ্তশতী স্তবে পুটিত
করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। সর্গ প্রথম ঋষ্যাদিষ্টাস করিয়া
চরিত্রয় পাঠ, তৎপরে সঙ্কলিত সংখ্যাসূত্রে নবাক্ষর মন্ত্র
জপ ও পুনর্বার চণ্ডীপাঠ, তৎপরে অষ্টোত্তর শতবার নবাক্ষর
মন্ত্র জপ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিয়মে চণ্ডীপাঠ
করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। (১) ইহা ছাড়া পূর্নপ্রদর্শিত

বচন অনুসারে অপর যে যে মত উদ্ভাবিত হইয়াছে টীকাকার
তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিবিহীন বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। [সেই
সকল জানিতে হইলে ভাস্কররায়ের গুপ্তবতীটীকা দ্রষ্টব্য।]

চণ্ডীর অপর নাম সপ্তশতীস্তব। এই নামানুসারে
আপাততঃ বোধ হয় যে, চণ্ডীতে সাত শত শ্লোক আছে,
কিন্তু চণ্ডীর শ্লোকসংখ্যা গণনা করিলে ছয় শত হইতেও
অনেক কম হয়। এই কারণে কোন কোন মীমাংসক
কবচ, কীলক, অর্গলা স্ততি ও রহস্যত্রয়যোগে চণ্ডীর সপ্ত-
শতীত্ব ব্যবহার রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত
নহে, চণ্ডীর সহিত কবচ প্রভৃতির যোগ করিলে শ্লোক
সংখ্যা সাত শতের অনেক বেশী হয়, বিশেষতঃ “জপেৎ সপ্ত-
শতীং চণ্ডীং কৃৎস্না কবচমাদিতঃ।” চণ্ডীকবচের এই বাক্যানু-
সারে কবচ ভিন্নই চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া স্বীকার করিতে
হয়। গুপ্তবতীর মতে মালাস্বরূপ চণ্ডী মন্ত্রকে ছোমাক্স অথবা
সম্পুটিত করিবার জন্ত সাত শত ভাগে বিভক্ত করা হইয়া
থাকে এবং এই কারণেই চণ্ডীকে সপ্তশতী বলা হইয়া
থাকে। বারাহীতন্ত্রের মতে চণ্ডী কলিকালে অতিশয়
প্রশস্ত। স্তবপাঠের সাধারণ নিয়ম অনুসারে সর্গপ্রথমে
ঋষি-ছন্দ ও দেবতার উল্লেখ করিতে হয়। মার্কণ্ডেয়পুরা-
ণের ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ “সাবরিঃ
সূর্যাতনয়ঃ” ইত্যাদি “সাবরিভবিভা মহুঃ” পর্যন্ত অংশকে
চণ্ডী বলে। চণ্ডী তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম চরিত, মধ্যম
চরিত ও উত্তর চরিত। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায় বা মধুটকটভব
প্রথম চরিত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় মধ্যম চরিত
এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ এই কয়টা অধ্যায়কে
উত্তরচরিত বলে।

চণ্ডীর প্রথম চরিতের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, ছন্দ
গায়ত্রী, শক্তি নন্দা, বাগবীজ, অমিত্য এবং বিনিয়োগ

জপেনাপ্রোতি বাহিতমিতি পুটিমিতি। পাঠক্রিয়াবিশেষঃ, পুটিত্বং সং-
পুটাকারতা, তথাচ স্তবোযথা মূলমন্ত্রজপত সংপুটাকারো ভবতি তথা
পঠনানুমূলজপত বদ্বাহিতং কলং তৎসিদ্ধতিভ্যর্থঃ। ভক্তবীর্যাদিষ্টাস
পূর্নকরিত্রয়ঃ পঠিত্বা মধ্যে স্বকলিত সংখ্যাসূত্রায়ৈ সহস্রাদিসংখ্যকং
নবার্গ জপিত্বা পুনশ্চতীস্তবঃ পূর্নবৎ পঠেৎ। পরং যেতদন্তে পুনমূল-
যতোত্তরশতমাত্রং জপ্ত্বান্নিবেদনাদিকং কুর্থাৎ। অরক জপোহজজুতোন
প্রধানসংখ্যায়ানুপযুক্তো ইতি বিশেষঃ। তদনুজ্ঞাতত্রেব ঋষ্যাদীষ্টজ্ঞা
এবং সংস্কৃত্য ঋষ্যাদীন ধ্যাওয়া পূর্নোক্তমার্গতঃ।

সার্থস্তুতিঃ পঠেচ্চতীস্তবঃ স্পষ্টপদাক্ষরম্।

সযাভৌত মহালক্ষ্মীং ধ্যাওয়া কৃৎস্না বড়নকম্।

জপেদই শতং মূলং দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।” (ভাস্কররায়স্বত গুপ্তবতী)

(১) “মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তং নিত্যং চণ্ডীস্তবং পঠন্ পুটিতং মূলমন্ত্রত

বা পাঠের উদ্দেশ্য ধর্ম। (ডামর) প্রথম চরিত পাঠে দেবীর
তামসিক মূর্তির ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

“দশভুজা দশভুজা দশপাদাননপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা জিহ্মলোচনমালয়া ॥
ক্ষুদ্রদশনদংষ্ট্রাচা ভীমরূপা তম্বুরী।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাপ্রিয়াম্।
খড়্গবাণগদাশূলচক্রশঙ্খভূতশিখরং ॥
পরিধং কার্শ্বকং শীর্ষং নিশ্চোভকুধিরং দধৌ।
মধুকৈটভদ্রোমুকে ধ্যায়ৈষা তামসী শিবা ॥”

মধ্যম চরিতের কবি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দ উচ্চৈশ্বর্য,
শক্তি শাক্তরী, দুর্গা বীজ। বায়ুতত্ত্ব ও পাঠের উদ্দেশ্য
মোক্ষলাভ। (ডামর)। মধ্যম চরিতপাঠে দেবীর রাজসিক
মূর্তি মহালক্ষ্মীর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

“ষেতাননা নীলভূজা স্নেহতপ্তনমগুলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজভ্রুবোরুগদা।
চিত্রাঙ্কুলেপনা কান্তা রূপসৌভাগ্যশালিনী।
অষ্টাদশভূজা পূজ্যা সা সহস্রভূজা রণে।
আয়ুধান্ত্রা রক্ষন্তি দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ।
অক্ষমালাঞ্চ মূলং বাণোসিকুলিশং গদাম্।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুং শঙ্খঘণ্টাচ পাশকম্।
শক্তির্দণ্ডশর্মাচাপং পানপাঞ্জং কমণ্ডলুম্।
অলঙ্কৃতভূজা ঐতৈরাযুধৈঃ পরমেশ্বরী।
অর্ন্তব্যা স্ততিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দিনী।
ইত্যেবা রাজসী মূর্তিঃ সর্বদেবময়ী মতা।
যাং ধ্যায়া মানবোনিত্যং লভতেষ্টিতমাজ্জনঃ ॥”

উত্তর চরিতের কবি রক্ত, দেবতা সরস্বতী, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্,
শক্তি ভীমা, কাম বীজ ও সূর্য্য তত্ত্ব এবং পাঠের উদ্দেশ্য
কামনাসিদ্ধি। (ডামর)

উত্তরচরিত পাঠে দেবীর সাত্ত্বিক মূর্তি সরস্বতীর ধ্যান
করিতে হয়। ধ্যান যথা—

“গৌরীদেহাং সমুদ্ভূতা যা সর্বৈকগুণাঞ্জরা।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাসুরনিবহিণী।
দধৌ চাষ্টভূজা বাণং মূলং শূলচক্রকম্।
শঙ্খঘণ্টাফলকৈবং কার্শ্বকঞ্চ তথাপরম্।
ধ্যয়া সান্ত্তিকালাদৌ বধে শুভনিশুভয়োঃ।” (কাত্যার্ননীর্ত্ত)

ডামরতন্ত্রে লিখিত আছে (২) —

(২) “সপ্তশতাব্দিত্ত্বং প্রথমে পদ্মভূমিনি।
ছন্দো গারভমুদিতং মহাকালীত্বং দেবতা।
বাপ্‌বীজং পাদতত্ত্বং ধর্মার্থে বিনিবোজনম্।

“হ্রীং চণ্ডিকাট্রৈ” এই মন্ত্রে বড়লক্ষ্মী করিবে। বাগ্-
বীজ ঐ, দুর্গাবীজ হ্রী, ও কামবীজ ক্রী।

মন্ত্রাদি সিদ্ধি করিতে হইলে সর্ব প্রথমে বেরূপ সেই
মন্ত্রের পুরস্করণ করিতে হয়, সেই প্রকার চণ্ডীতন্ত্রেরও
পুরস্করণ করিবার বিধান আছে। মরীচিকমন্ত্রের মতে কৃষ্ণা-
ষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণচতুর্দশী পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর এক
বৃদ্ধি করিয়া পুটিত চণ্ডীপাঠ করিবে। তাহার পরে প্রতি
শ্লোকে পায়স হোম করিবে। রাজিসূক্ত ও দেবীসূক্ত
পুটিত চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। হোমের পরে পুনর্বার স্তোত্র
পাঠ ও সর্ব প্রথমে পূজা করিতে হয় (৩)।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে “বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীম্”
ইত্যাদি স্তবটিকে রাজিসূক্ত এবং “নমো দেব্যা মহাদেব্যা”
ইত্যাদি স্তবটিকে দেবীসূক্ত বলে। শুণ্ডবতীটীকাকার তাহা
স্বীকার করেন না। তাহার মতে রাজিসূক্ত ও দেবীসূক্ত
বৈদিক মন্ত্র। অথেষ্টের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তকে দেবী-
সূক্ত এবং ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তকে রাজিসূক্ত বলে।
চণ্ডীপাঠে এই দুই বৈদিক সূক্তই পাঠ করা উচিত। বর্ত্ত-
মান সময়েও এই মতটাই আদরণীয়। আবার কোন কোন
তন্ত্রের মতে বিশ্বেশ্বর্যাদি সূক্ত দেবীর তুষ্টিকর, মহিষাস্ত-
করী সূক্ত সর্বসিদ্ধিপ্রদ। ‘দেব্যা যয়া’দি ও ‘দেবি! প্রপন্নার্জি-
হরে’! ইত্যাদি সূক্ত দিব্য, নারায়ণীজ্জতিসূক্ত দেবীর সন্তোষ-
কর এবং ‘নমো দেব্যাদি’ সূক্তটি সর্বকামফলপ্রদ বলিয়া
উক্ত হইয়াছে (৪)।

মধ্যমজ চরিত্র মূর্তিবিষ্ণুকদাহতঃ।

উচ্চৈশ্বর্যো মহালক্ষ্মী দেবতাবীজমজিহা।”

বায়ুতত্ত্বঃ ভবন্তর মোক্ষার্থে বিনিবোজনম্।

উত্তরজ চরিত্র কবি: শকর দ্বিতঃ।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দো দেবতাঃ মহাপূর্বা সরস্বতী।

কামোবীজং রবিতত্ত্বং কামার্থে বিনিবোজনম্।” (ডামরতন্ত্র)

(৩) “কৃষ্ণাষ্টমীং সমারম্ভা বাণং কৃষ্ণচতুর্দশীম্।

বুদ্ধাকোত্তরমাজাপাং পূর্ণসংপুটিতং তৎ।

এবং দেবি! ময়া প্রোক্তঃ পৌরন্দরশিকঃ ক্রমঃ।

তত্ত্বং হবনং কুর্বাণ্য প্রতিশ্লোকেন পায়সম্।

রাজিসূক্তং প্রতিশ্লোচং তথা দেব্যাক্ত সূক্তকম্।

হৃদ্যং প্রজপেৎ স্তোত্রমাকৌ পূজাদিকং সুধে।” (মরীচিকজ)

(৪) “বিশ্বেশ্বর্যাদিকং সূক্তং দৃষ্টং বদ্রকণা পূজা।

স্তব্রে বোধদিত্তারা মম দেব্যাঃ পুরন্দর।

মহিষাস্তকরী সূক্তং সর্বসিদ্ধিপ্রদস্তথা।

দেব্যা যয়াদিকং দিব্যং দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।

দেবি! প্রপন্নার্জি হরে প্রসীদেত্যাদিকং তথা।

কামাধ্বোদগে একাবৃত্ত প্রভৃতি চণ্ডীপাঠে সংকর, পূজা, অঙ্গ মন্ত্রস্তান করিয়া বলি প্রদান করিতে হয়। এই বলি ব্রাহ্মণদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। (বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে কালিকাপুরাণ ত্রুট্য।) [বলি দেখ।]

বাহার পক্ষে বৈষ্ণব বলির বিধান আছে, সেই ব্যক্তি যদি সেইরূপ প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তবে কুম্ভাণ্ড, ইন্দু-দণ্ড, মদ্য ও আসব প্রদান করিবে। ইহা প্রদানেও ছাগল-বলির ভার ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে। (৫) গুপ্ত-বতী-টীকাকার বলেন যে, বাস্তবিক ব্রাহ্মণের পক্ষে ছাগ বলিদান বা মদ্য ও আসব দান উচিত নহে। তাহার কুম্ভাণ্ড ও ইন্দুদণ্ডই বলি দিবে (৬)।

হরগৌরীতন্ত্রের মতে সকল কামনার চণ্ডীর সকল অংশ পাঠ করিতে হয় না, কামনা বিশেষে চণ্ডীর কতক অংশ পাঠ করিলেও চলিতে পারে। ধন বা শোভা ও পুত্রকাম-নার সৃষ্টি ক্রমে শক্রাদিসাহায্য হইতে আরম্ভ করিয়া শুভদৈত্যবধ পর্য্যন্ত পাঠ করিবে। আদি হইতে পাঠ আরম্ভ ও তৎপরে শেষ সমাপন করিবে। এইরূপ শান্তি প্রভৃতি কামনা থাকিলে হিতক্রমে “সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ” হইতে “সাবর্ণির্ভবিভামনুঃ” পর্য্যন্ত এবং শব্দটো অন্ত হইতে আরম্ভ ও তৎপর আদিতো সমাপন করিতে হয় [৭] (৭)।

কেরলবাসীদের মধ্যে চণ্ডীপাঠের দুইটি মত আছে। অনেকের মতে প্রতিদিনে এক এক চরিত্র পাঠ করিয়া তিন

দিনে চণ্ডীপাঠ সমাপন করিবে অর্থাৎ তিন দিনে একাবৃত্তি চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম দিন ১ অধ্যায়, দ্বিতীয় দিন ২ অধ্যায়, তৃতীয় দিন ১ অধ্যায়, চতুর্থ দিন ৪ অধ্যায়, পঞ্চম দিন ২ অধ্যায়, ষষ্ঠ দিনে ১ অধ্যায় এবং সপ্তম দিনে ২ অধ্যায় পাঠ করিবে, এইরূপে সাত দিনে একাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিবে।

গুপ্তবতী টীকাকার বলেন যে, কেরলবাসীদের ঐ মতের কোন প্রমাণ নাই। যদি কোন প্রামাণিক তত্ত্ব তাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা অসমর্থের পক্ষে বলিয়াই হিঁস করিতে হইবে (৮)।

ইচ্ছা হইলে স্বয়ং চণ্ডী পাঠ না করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারাও চণ্ডী পাঠ করান যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইলে যথানিয়মে দক্ষিণা দিতে হয়। শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে পঞ্চাবর্ণ বা পাঁচটি মোহর, পঞ্চাবৃত্তিতে ৩ অবর্ণ, পঞ্চাবৃত্তিতে ১ অবর্ণ, ত্রিরাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে ১ অবর্ণ এবং একাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে ১ অবর্ণ দক্ষিণা দিতে হয়। অসমর্থ পক্ষে যথাসম্ভব দক্ষিণা দিলেও চলিতে পারে (৯)।

বিধানপারিজাতের মতে অধ্যায়ের অন্তে ইতি বা বধ লক্ষ করিতে নাই। [পাঠ দেখ।]

হোমাদি বা পুটিত করিবার জন্য চণ্ডীকে সাতশত ভাগ করা হয়। তাহার প্রত্যেক অংশকেই মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাব্যায়নী ও বারাহীতন্ত্র প্রভৃতিতে চণ্ডীবিভাগপ্রণালী লিখিত আছে। গুপ্তবতী-টীকাকার তাহার সারসংগ্রহ করিয়া যেরূপ লিখিয়াছেন এই স্থানে তাহাই লিখিত হইল। চণ্ডীকে সাতশত ভাগে বা মন্ত্রে বিভক্ত করিতে হইলে কোন স্থলে একটা শ্লোককে একটা মন্ত্র বলিয়া ধরিতে হয়, কোথাও বা শ্লোকার্দ্ধ, শ্লোকের ত্রিাংশ, পুনরুক্ত বা রাজোবাচ, মার্কণ্ডেয় উবাচ প্রভৃতিকে এক একটা মন্ত্র স্বীকার করা হইয়া থাকে। যে স্থলে একটা শ্লোকই একটা মন্ত্র তাহাকে শ্লোকাত্মক, অর্দ্ধশ্লোকমন্ত্রকে অর্দ্ধশ্লোকাত্মক,

নারায়ণীস্তুতিনাম সূক্তং পরশোভনম্ ।
অনুযাঃ স্ততরে দৃষ্টং ব্রহ্মাণ্যঃ সকলৈঃ সুরৈঃ ।
নমো দেবাদিকং সূক্তং সর্গকামকলপ্রদম্ । (গুপ্তবতীটীকা)
(৫) “কুম্ভাণ্ডসিদ্ধদণ্ড মদ্যাসবমেবচ ।
এতে বলিসমাঃ প্রোক্তান্ত্তো ছাগসমাঃ সমাঃ”
ছাগসমাঃ পঞ্চবিংশতি-বর্ষাবধি তৃপ্তিজনকাঃ ।
“অজাবিকানাং রুধিরৈঃ পঞ্চবিংশতিবাহিকীম্ ।
তৃপ্তিমাধোতি পরমাঃ শাদুলরুধিরৈস্তথোতি ।” (কালিকাপুরাণ)
(৬) “বস্তস্ত ন হিংস্তাহিতি বিবেধসা সঙ্কোচমন্তবের্ধৈব ছাগ-
সমান তৃপ্তিসম্ভবে ছাগবলিভ্রাক্ষর্পণে কার্ধ্যএব এবং মদ্যাসবে অপিমদেয়
“বরং প্রাণাঃ অগচ্ছন্ত ব্রাহ্মণোদার্পণেং সুরামিতি বচনাং ।” (গুপ্তবতী)
(৭) “শ্রীকামঃ পুত্রকামো বা সৃষ্টিমার্গক্রেমতু ।
অগেচ্ছত্রাদিমারভ্য শুভদৈত্যবধাবধি ।
আদিমারভ্য এজপেৎ পশ্চাদ্বেষৎ সমাপয়েৎ ।
শতোদিকামঃ সর্গজ হিতমার্গক্রেমণ তু ।
সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ সাবর্ণির্ভবিভামনুঃ ।
শব্দটো চান্তমারভ্য পশ্চাদাহি সমাপয়েৎ ।” (হরগৌরীতন্ত্র)

(৮) “কেরলাস্ত এটেকস্মিন্ দিনসে এটেকমেব চরিত্রং পঠেদিতি
দিনত্রয়েনৈকাবৃত্তিরিত্যেকঃ পক্ষঃ । চম্রাক্ষিভূষেৎকরেন্দ্রদ্রসংখা-
কান্ অধ্যায়ান্ ক্রমেণ দিনভেদেন পঠেদিতি সপ্তভির্দিনৈরেকাবৃত্তিরিতি
অন্তঃ পক্ষ ইত্যাহঃ তত্র মূলভূতানি তএব জানন্তি সন্ধ্যাপি তানি তত্রবচ-
নানি একদিনেনৈকাবৃত্ত্যশক্তপরাণি ।” (গুপ্তবতী)

(৯) “পঞ্চাবর্ণাঃ শতাবৃত্তেঃ পঞ্চাবৃত্তেস্ত তৎত্রয়ম্ ।

পঞ্চাবৃত্তেঃ বর্ণমেকং ত্রিরাবৃত্তেস্তত্বর্দ্ধকম্ ।

একাবৃত্তৌ পাদমেকং মদ্যাদি বা শক্তিভা বুধঃ ।” (গুপ্তবতী)

জিপিংমন্ত্রকে জিপিং ও রাজোবাচ প্রভৃতি মন্ত্রকে উবাচাঙ্কিত মন্ত্র বলে (১০)।

চণ্ডীর প্রথমাদ্বায়ে বা প্রথম চরিতে সর্বসমেত ১০৪টী মন্ত্র। তন্মধ্যে উবাচাঙ্কিত মন্ত্র ১৪টী, অর্ধশ্লোকাক্ষক ২৪টী এবং শ্লোকাক্ষক মন্ত্র ৬৬। সর্বপ্রথমে মার্কণ্ডের উবাচ ১ মন্ত্র, 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যভনয়' হইতে 'তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে' পর্য্যন্ত ১০টী শ্লোকাক্ষক, 'সোহচিন্তয়ৎ' ইত্যাদি অর্ধশ্লোকাক্ষক ১, 'মৎপূর্নৈঃ পালিতং পূর্নং' হইতে 'প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৭, 'বৈশ্ত উবাচ' ১, 'সমাধিনাম বৈশ্তোহহং' হইতে 'দারাণাকাজ সংহিতঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৩, 'কিন্নু তেবাং গৃহেক্ষম' ও 'কথন্তে কিন্নুসভৃতা' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, রাজোবাচ ১, 'বৈনিরন্তো ভবান্নুতৈঃ' ও 'তেষু কিং ভবতঃ স্নেহ' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, বৈশ্ত উবাচ ১, 'এবমেতন্ যথা গ্রাহ' হইতে 'বিশ্বশেষবিশবন্ধু' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৩, 'তেবাং কৃত্তে মে 'নিখাসা' ও 'করোমি কিং যন্নমনো' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, মার্কণ্ডের উবাচ ১, 'ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্রঃ' ও 'সমাধিনাম বৈশ্তোহসৌ' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, 'কৃষাত্তৌ যথা জ্ঞারং' শ্লোকাক্ষক ১, রাজোবাচ ১, 'ভগবৎস্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং' ও 'হঃখায় বস্মে মনসঃ' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, 'মমস্বঃ মম রাজত' হইতে 'বিবেকাক্ষস্যা মৃত্যু' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৪, ঋষিকবাচ ১, 'জ্ঞানমন্তি সমস্তস্য' হইতে 'সৈব সর্বেষ্বরেষ্বরী' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ১০, 'সাবিন্দ্যা পরমা মুক্তেঃ' ও 'সংসারবন্ধহেতুশ্চ' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, রাজোবাচ ১, 'ভগবন্ কাহি সা দেবী' শ্লোকাক্ষক ১, 'সংস্রভাবাচ সা দেবী' ও 'তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, ঋষিকবাচ ১, 'নিঠৈব সা জগন্মূর্খি' ও 'তথাপি তৎসমুৎপত্তি' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, 'দেবানাং কাব্যসিদ্ধার্থ' হইতে 'অতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ' পর্য্যন্ত ৬, রাজোবাচ ১, 'স্বং স্বাহা স্বং স্বাহা' হইতে 'অনুরৌ মধুকৈটভৌ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ১৩, 'প্রবোধক জগৎস্বামী' ও 'বোধশ্চ ক্রিয়তামত' অর্ধশ্লোকাক্ষক ২, ঋষিকবাচ ১, 'এবং স্ততা তদা দেবী' হইতে 'বাহুগ্রহরণো বিভুঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৫, 'ভাবপ্যতিবলোমন্তৌ', 'উক্তবস্তৌ বরোহস্বজঃ' 'ভবেতাসদা মে তুষ্ঠৌ' ও 'কিমন্তেন বরণাজ' অর্ধশ্লোকাক্ষক ৪, ভগবাহুবাচ ও ঋষিকবাচ ২, 'বক্তিতাত্ম্যামিতি' শ্লোকাক্ষক ১, 'আবাহ জহি' অর্ধশ্লোকাক্ষক ১, ঋষিকবাচ ১, ও 'তথৈতু্যক্ত'।

(১০) "একমন্ত্রজিপিং মন্ত্রঃ পুনরুক্তোহর্ধমন্ত্রকঃ।

উবাচাঙ্কিত ইত্যোং মন্ত্রঃ প্রোক্তোহয়ং পঞ্চম।

মন্ত্রপিণ্ডঃ শ্লোকপিণ্ডোহধ্যায়পিণ্ড ইতি জিপি।" (তত্ত্ববতী)

হইতে 'ভুয়ঃ শূণ্ণ বদামি তে' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক মন্ত্র ২টী (১১)।

অতএব প্রথম চরিতে সর্বসমেত মন্ত্রসংখ্যা ১০৪।

মধ্যম চরিতের মন্ত্রসংখ্যা সর্বসমেত ১৫৫। তন্মধ্যে উবাচাঙ্কিত ৯, অর্ধশ্লোকাক্ষক ২ ও শ্লোকাক্ষক ১৪৪। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঋষিকবাচ ১, এবং 'দেবানুরমমতুদমুদং' হইতে 'পুষ্পবৃষ্টি মুচো দিবি' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক মন্ত্র ৬৮। তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষিকবাচ, দেবুবাচ ও ঋষিকবাচ ৩ এবং 'নিহন্তমানং তৎসৈন্তং' হইতে 'ননুতুচ্চাপরোগণাঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক মন্ত্র ৪১। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম ঋষিকবাচ ১, 'শক্রাদয়ঃ হুরগণাঃ' হইতে 'তৈরম্যান্ রক্ষ সর্বতঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক মন্ত্র ২৬, ঋষিকবাচ ১, 'এবং স্ততা সুরৈর্দিব্যৈঃ' হইতে 'সমস্তান্ প্রগতান্ সুরান্' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ২, দেবুবাচ ১, 'ত্রিরতাং জিদশাঃ সর্কে' অর্ধশ্লোকাক্ষক, ১ দেবুউচুঃ ১, 'ভগবত্যা কৃতং সর্বং' হইতে 'ধনদারাদিসম্পদাঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৩, 'বৃক্রেহস্বং প্রসন্নো হুং' অর্ধশ্লোকাক্ষক ১, ঋষিকবাচ ১ এবং 'ইতি প্রসাদিতা দেবৈঃ' হইতে 'যথাবৎ কথরামিতে' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক মন্ত্র ৪টী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্ত্রসংখ্যা ৬৯, তৃতীয়ে ৪৪ ও চতুর্থ অধ্যায়ে ৪২, অতএব মধ্যম চরিতের মন্ত্রসংখ্যা ১৫৫ (১২)।

তৃতীয় চরিত বা উত্তর চরিতে মন্ত্রসংখ্যা সর্বসমেত ৪৪১। তন্মধ্যে শ্লোকাক্ষক ৩২৭, অর্ধ শ্লোকাক্ষক ১২, জিপিং ৬৬, উবাচাঙ্কিত ৩৪ এবং পুনরুক্ত ২। পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষিকবাচ ১, 'পুরা শুভনিগুণ্ডাত্যাং' হইতে 'বিষ্ণুমার্যঃ প্রোতুহুঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৬, দেবুউচুঃ ১, 'নমোদেব্যা' হইতে 'দেব্যা কৃত্যৈ নমোনমঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাক্ষক ৫, 'যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমার্যেতি শক্তি' হইতে 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংহিতা। নমন্ততৈ নমন্ততৈ নমন্ততৈ নমোনমঃ।' পর্য্যন্ত ২১টী শ্লোকের প্রত্যেকটীতে

(১১) "প্রথমস্য চরিতস্য সর্কে মন্ত্রান্তঃপতম্।

ভেবুবাচাঙ্কিতা মন্ত্রাযোকবোকজিগকতিঃ।

বৃকতুপুত্রজগৎ বৈশ্বতক্রমূর্ণধিতিঃ।

চতুর্দশ হাঃ শ্লোকান্চাতুর্বিংশতিরীতিঃ।

অবপিষ্টান্ত বটবটঃ শ্লোকমত্যা ইতি বিতিঃ।" (তত্ত্ববতী)

(১২) "মধ্যমস্য চরিতস্য পঞ্চপঞ্চাশত্তরঃ।

শতং মন্ত্রান্তেবু দেব্যা বচসী বে কথন্ত বট্।

দেবানামেকমর্থে বে অস্তে শ্লোকা ইতি বিতিঃ।

এবং দ্বিতীয়কে হধ্যায়ে মত্যা একোদশপুতিঃ।

পঞ্চ শ্লোকা ইতি চতুশ্চব্বারিংশং তৃতীয়কে।

কথেন্টঃ চতুঃশ্লোকীত্যধ্যায়েচ চতুর্ধকে।

মত্যা দ্বিচব্বারিংশং হাঃ।" (তত্ত্ববতী)

তিনটী করিয়া মন্ত্র ধরিলে হইল ৬৩, ইহাদের প্রথমার্ধ ৩৩ 'নমস্তুভৈ' পর্য্যন্ত ১, 'নমস্তুভৈ' ও ২, 'নমস্তুভৈ নমোনমঃ' ৩য়। এইরূপ তিনভাগে বিভক্ত করিতে হয়? (১৩) ইহা-
দিগকেই জিপিং মন্ত্র বলে। 'ইজ্রিগামধিষ্ঠাত্রী' শ্লোক-
স্বক ১, 'চিভিরূপেণ বা কৃৎস্ব' ইত্যাদি শ্লোকটিকে তিনভাগে
বিভক্ত করিলে জিপিং মন্ত্র ৩, 'স্ততাঃ স্তুতৈঃ পূর্ব' হইতে 'ভক্তি-
বিনম্রমূর্ত্তিভিঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ২, ঋষিরূবাচ ১ 'এবং
স্তবাদিয়ুক্তানাং' হইতে 'স্বরা কস্মিন্ন গৃহ্যতে' পর্য্যন্ত শ্লোক-
স্বক ১৭, ঋষিরূবাচ ১, 'নিশম্যোতি বচঃ শুভঃ' হইতে
'স্কন্ধং মধুরয়া পিরা' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৩, দূত উবাচ ১,
'দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুভঃ' হইতে 'মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ' পর্য্যন্ত
শ্লোকস্বক ৯, ঋষিরূবাচ ১, 'ইতুক্তা সা তদা দেবী' শ্লোক-
স্বক ১, দেবুবাচ ১, 'সত্যযুক্তং স্বয়ন্যত্র' হইতে 'পাণিঃ
গৃহ্যতু মে লঘু' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৪, দূত উবাচ ১ 'অবলি-
ষ্টাসি মৈবঃ স্বঃ' হইতে 'মা গমিষ্যসি' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৪,
দেবুবাচ ১, এবং 'এবমেতৎবলী শুভঃ' হইতে 'সচ যুক্তং
করোতু যৎ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক মন্ত্র ২।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঋষিরূবাচ ১ 'ইত্যাকর্ণা যচোদেব্যাঃ'
হইতে 'যক্ষো গন্ধর্ব এব বা' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৪, ঋষিরূবাচ
১, 'তেনাজপ্তস্ততঃ শীঘ্রং' হইতে 'কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্'
শ্লোকস্বক ৩, দেবুবাচ ১, 'দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতঃ' শ্লোকস্বক
১, ঋষিরূবাচ ১, এবং 'ইতুক্তঃ সোভাধাবৎ তাতঃ' হইতে
'গৃহীত্বা তামথ্যাবিকাম্' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক মন্ত্র ১২টী।

সপ্তম অধ্যায়ে ঋষিরূবাচ ১, 'আজপ্তাস্ত ততো দৈত্যাঃ'
হইতে 'নিগুন্তক হনিষ্যসি' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ২৩, ঋষিরূবাচ
১ এবং 'তাবানীভৌ স্ততো দৃষ্টৌ' হইতে 'খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি'
পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক মন্ত্র ২টী।

অষ্টম অধ্যায়ে—ঋষিরূবাচ ১, 'চণ্ডচ নিহতে দৈত্যে'
হইতে 'শূলেনাভি জঘান তৎ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৫৫, 'মুখেন
কালী জগৃহে' অর্দ্ধশ্লোকস্বক ১, এবং 'ততোহসাবা জঘান'
হইতে 'ননর্ভাস্ত্ৰভৃন্দোদ্ধতঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক মন্ত্র ৬টী।

নবম অধ্যায়ে—রাজোবাচ ১, 'বিচিদ্ৰমিদমাখ্যাতং' হইতে
'নিগুন্তশ্চাতিকোপনঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ২, ঋষিরূবাচ ১,

এবং 'চকার কোপমতুলং' হইতে 'শিবদ্বীপী যুগাধিপৈঃ'
পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক মন্ত্র ৩৭।

দশম অধ্যায়ে—ঋষিরূবাচ ১, 'নিগুন্তং নিহতং দৃষ্টৌ' ও
'যলাপলেশচুঠে স্বঃ' শ্লোকস্বক ২, দেবুবাচ ১, 'একৈবাহং
জগত্তাত্র' হইতে 'একৈবানীৎ তদামিষকা' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক
২, 'অহং বিতৃত্য' শ্লোকস্বক ১, ঋষিরূবাচ ১, 'ততঃ প্রব-
বৃত্তে যুতং' হইতে 'দেবীং গগনমাধিতঃ' পর্য্যন্ত ১৩, 'তজ্জাপি
সা নিরাধারা' অর্দ্ধশ্লোকস্বক ১ এবং 'নিযুতং খে তদা-
দৈত্যাঃ' হইতে 'শান্তদিগ্জনিভবনাঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক
৯টী মন্ত্র।

একাদশ অধ্যায়ে—ঋষিরূবাচ ১, 'দেব্যাংহতে তত্র মহা-
সুরেন্দ্রে' হইতে 'লোকানাং বরদা ভব' পর্য্যন্ত ৩৪, দেবুবাচ
১, 'বরদাহং সুরগণা' শ্লোকস্বক ১, দেবা উচুঃ ১, 'সর্গা-
বাধা প্রশমনং' শ্লোকস্বক ১, দেবুবাচ ১, 'বৈবস্বতেহস্মরে
প্রাপ্তে' হইতে 'আবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৮,
'শাকন্তরীতি বিখ্যাতিং' অর্দ্ধশ্লোকস্বক ১, এবং 'তত্রৈবচ
বধিষ্যামি' হইতে 'করিষ্যাম্যারিসংক্ষয়ম্' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক
মন্ত্র ৬টী।

দ্বাদশ অধ্যায়ে—দেবুবাচ ১, 'অভিস্তবৈশ্চ মাং নিত্যং'
হইতে 'পঠনাদেব নাশনং' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ১৮, 'সর্গঃ
মমৈতন্মাহাশ্বা' অর্দ্ধশ্লোকস্বক ১, 'পশুপুণ্ড্রাধুপৈশ্চ'
হইতে 'সুরতশ্চরিতং মম' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ১০, ঋষিরূবাচ
১, 'ইতুক্তা সা ভগবতী' হইতে 'মহোগ্রোহতুলবিক্রমে'
পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৩, 'নিগুন্তেচ মহাবীৰ্য্যে' অর্দ্ধশ্লোকস্বক
১, 'এবং ভগবতী দেবী' হইতে 'মতিং ধর্ম্মে তথাশুভাম্'
পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক মন্ত্র ৬টী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—ঋষিরূবাচ ১, 'এতৎ তে কথিতং-
ভূপ!' অর্দ্ধশ্লোকস্বক ১, 'এবং প্রভাবা সা দেবী' হইতে
'ভোগবর্গাপবর্গনা' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৩, মার্কণ্ডেয় উবাচ
১, 'ইতি তস্ত বচঃ শ্রদ্ধা' হইতে 'প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা'
পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ৬, দেবুবাচ ১, 'যৎ প্রার্থতে স্বরা ভূপ'
শ্লোকস্বক ১, মার্কণ্ডেয় উবাচ ১, 'ততো যত্র' হইতে
'সদ্বিচূতিকারকং' পর্য্যন্ত শ্লোকস্বক ২, দেবুবাচ ১
'স্মৈ রহোতি নৃপতে' হইতে 'তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি' পর্য্যন্ত
অর্দ্ধশ্লোকস্বক ৬, মার্কণ্ডেয় উবাচ ১ এবং ইহার পরবর্তী
'ইতি দক্ষা তরোদেবী' হইতে 'সাবর্ণি ভবিষা মনুঃ' পর্য্যন্ত
শ্লোক দুইটিকে দুইবার আবৃত্তি করিতে হয়। অতএব
শ্লোকস্বক ৪টী মন্ত্র হয়, তন্মধ্যে দুইটিকে পুনরুক্ত মন্ত্র বলে।

চণ্ডীর শ্লোকসংখ্যা সর্বসমেত ৫৭৮টী। তন্মধ্যে

(১৩) "ততঃ শ্লোককবিংশত্যা প্রতিশ্লোকঃ ত্রিশত্রিশঃ।

বিভাগানুসরীত্যঃ ত্রিষষ্ট্যাহতরো বধা।

মহাকাল্যাদ্যর্ধভেদারমত্তত ইতি ত্রয়ং।

মন্ত্রাঃ পুরোক্তরো দেবৌ বা দেবার্দ্ধং নমোনমঃ।

ভেদামান্যস্তরোর্থোক্তৌ প্রতিমন্ত্রকদেণ ভৌ।

ভেদ পর্য্যবসানং ভাদৈকমন্ত্র ইদৃশঃ।" (ভগবতী)

শ্রোতাক্রম মন্ত্র ৫৩৭ টী, অবশিষ্ট ৪১৫টি শ্রোতকের অংশ ও
অধিকবাচ প্রভৃতি লইয়া চণ্ডীতে সাত শত মন্ত্র পূরণ করা
হয়। এই সকল বিবরণ সহজে জানিবার উপায়—

ক্রমিক	অধ্যায়	শ্রোতাক্রম মন্ত্র	অর্ধ শ্রোতাক্রম মন্ত্র	বিশিষ্ট বা শ্রোতাক্রম মন্ত্র	উপাচারিত মন্ত্র	সর্বমন্ত্র সংখ্যা	শ্রোত সংখ্যা
১	১	৬৬	২৪	০	১৪	১০৪	৭৮
২	২	৬৮	০	০	১	৬৯	৬৮
২	৩	৪১	০	০	৩	৪৪	৪১
২	৪	৩৫	২	০	৫	৪২	৩৬
৩	৫	৫৪	০	৬৬	৯	১২৯	৭৬
৩	৬	২০	০	০	৪	২৪	২০
৩	৭	২৫	০	০	২	২৭	২৫
৩	৮	৬১	১	০	১	৬৩	৬১
৩	৯	৩৯	০	০	২	৪১	৩৯
৩	১০	২৭	১	০	৪	৩২	২৭
৩	১১	৫০	১	০	৪	৫৫	৫০
৩	১২	৩৭	৩২	০	২	৪১	৩৮
৩	১৩	১৪	৭	০	৬ পুনরু ২	২৯	১৭
সমষ্টি	১৩	৫৩৭	৩৮	৬৬ ৫৭ ও পুনরু ২	৭০	৭০০	৫৭৮

[চণ্ডীর অপর বিবরণ জানিতে হইলে কাব্যায়নীভূত,
বারাহীভূত, রুদ্রবামল, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, চণ্ডীরহস্ত, মন্ত্র-
মহোদধি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শতাবৃত্তচণ্ডীপাঠের বিধান
তৎশেলে দ্রষ্টব্য।] (১৪) চণ্ডীর নবাক্ষর মন্ত্রের অবি ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও শিব, ছন্দ গায়ত্রী, উকিক্ ও ত্রিষ্টুপ্। দেবতা মহা-
কালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। শক্তি নন্দা, শাকম্বরী ও
ভীমা। বীজ রক্তদন্তিকা, হুর্গা ও ভীমা। সর্কাতীষ্ট দিক্দির
নিমিত্ত বিনিরোগ। শিরে, মুখে ও হৃদয়ে যথাক্রমে অধিচ্ছন্দ

(১৪). "অখোমবাক্ষর মন্ত্রং বক্ষ্যে চণ্ডীপ্রসঙ্গতঃ।

বাঙ্করো বদনো দীর্ঘলক্ষ্মীভূতঃ প্রতীক্ষ্যক্।

ভাটের সদৃক্ জলং কুর্ষয়ং কিশীপসংযুতম্।"

(মন্ত্রমহোদধি ১৪ ভূতঃ)

ও দেবতা, তদন্বয়ে শক্তি ও বীজ পুনর্বার হৃদয়ে তদ্ব্যক্ত
করিয়া উক্ত মন্ত্রে সমস্ত ও ব্যতক্ৰমে অঙ্গভাস করিবে।
ইহার পরে একাদশটি ভাস করিলে অতীষ্ট দিক্ হইয়া
থাকে। ১ মাতৃকা, ২ সারস্বত, ৩ মাতৃগণ, ৪ নন্দজাদিভাস,
৫ ব্রহ্মাদ্য, ৬ মহালক্ষ্ম্যাং, ৭ মূলান্ধরভাস, ৮ বিপরীতভাবে
মূলান্ধর ভাস, ৯ মন্ত্র ব্যাপ্ত, ১০ বড়ল এবং ১১ ঋজ্বাণী শূলি-
ভাদিভাস। [মাতৃকাভাস হইতে বড়ল ভাস পর্যন্ত দশটির
বিবরণ ভাস ও মাতৃকাভাস প্রভৃতি শেলে দ্রষ্টব্য।] ঋজ্বাণী
শূলিভাদি ভাস এইরূপ করিতে হয়—ঋজ্বাণী শূলী প্রভৃতি
পাঁচটি শ্রোত অর্থাৎ ১ অধ্যায়ের ৬১—৬৫ শ্রোত পাঠ ও
মন্ত্রের প্রথমবর্ণ ঐটিকে বোর কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করিয়া সর্কাদে
ভাস করিবে। এইরূপ "শূলেন পাহি নো দেবী" ইত্যাদি ৪
অধ্যায়ের ২৩ হইতে ২৬ পর্যন্ত পাঁচটি শ্রোত পাঠ ও দ্বিতীয়
বীজ 'হ্রী'কে সূর্যাসদৃশ চিত্রা করিয়া সর্কশরীরে 'সর্কশরূপে
সর্কশে' ইত্যাদি ১১ অধ্যায়ের ২৩ হইতে ২৭ শ্রোত পর্যন্ত ৫
পাঁচটি শ্রোত পাঠ ও তৃতীয় ক্রীংকে ক্ষটিকের সদৃশ ভাস
করুণ ভাবিয়া তদন্বয়ে ভাস করিবে। ইহার পরে বড়ল ভাস
করিতে হয়। চণ্ডীর ধ্যান যথা—

"ঋজ্বাং চক্রগদেযু চাপপরিবান্ শূলং কুণ্ডলীং শিরঃ

শঙ্খং সন্দধতীং কঠৈর্জিনরনাং সর্কাদভূতভূতম্।

নীলাতছ্যতিমাত্রপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামভ্যোং শরিতে হরৌ কমলজো হস্তঃ মধুটেকটভৌ।

অক্ষত্রক্ পরশু গদেযু কুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাম্

দণ্ডং শক্তিমসিক চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাতাজনম্।

শূলং পাশসুদর্শনেচ দধতীং হস্তেঃ প্রবালপ্রভাম্

সেবে সৈরিতমর্কিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজহিতাম্।

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃসায়কম্

হস্তাটকর্দধতীং বনানুবিলাসজীতাং কুণ্ডলাপ্রভাম্।

গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা

পূর্কামত্র সরস্বতীমহুতজে শুভাদিদৈত্যাকিনীং।"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া পূর্কলিখিত নবাক্ষর মন্ত্র ৪

লক্ষ রূপ করিবে। অপের দশাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ হোম

করিবে। পারশারে হোম করা বিধেয়। ইহার পরে অবাদি

শক্তিযুক্ত হেমপীঠে দেবীর অর্চনা করিবে। ঘটকোণ

অষ্টদলযুক্ত, জ্যাম ও পঞ্চবিংশতি পত্রযুক্ত যন্ত্রের ত্রিকোণ

মধ্যে মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিতে হয়। পূর্কে শক্তির

সহিত ব্রহ্মা, নৈঋতে লক্ষ্মী ও বিষ্ণু, বায়ুকোণে উমা ও

শিব, উত্তর এবং দক্ষিণে সিংহ ও মহিষ, ঘটকোণের

মধ্যে পূর্কাদি ক্রমে নন্দজা, রক্ত-দন্তিকা, শাকম্বরী, হুর্গা,

জীমা ও জামরীর পূজা করিবে। অষ্টমলে বখাক্রমে প্রজাপী, নাহেখরী, কোমারী, বৈকরী, বারাহী, নারসিংহী, ঈশী ও চান্দুগা এবং পঞ্চবিংশতি পক্ষে বখাক্রমে বিজুয়ারা, চেতনা, বুদ্ধি, নিজা, জুখা, ছারা, শক্তি, তুকা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, প্রজা, কান্তি, লক্ষী, বৃতি, পরা, বৃতি, শ্রুতি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, মোহ ও ভ্রান্তি, ইহাদিগকে পূজা করিবে। বাহিরে গৃহকোণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, বোম্বিনীগণ এবং ইন্দ্রাদি দিকপালগণের পূজাও করিতে হয়। এই প্রকারে চণ্ডী পূজা করিয়া জপ করিলে মঙ্গলসিদ্ধি হয়। (মন্ত্রমহোদধি ১৩ তরঙ্গ)

চণ্ডীকৃত্তম (পুং) চণ্ডীপ্রিয়ঃ কৃত্তমঃ বহু বহুতী। রক্তকরবীর বৃক্ষ। (রাবণি)

চণ্ডীগড়, লাক্ষ্মানদীতীরস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম, দুর্গাপুর হইতে ৩ ক্রোশদূরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন দুর্গের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। (দেশাবলী)

চণ্ডীটীকা, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের টীকা। পূর্বে দেবীমাহাত্ম্যের অনেক টীকা ছিল, তন্মধ্যে এখন এই কয় ব্যক্তির টীকা পাওয়া যায়। যথা—আত্মারাম বাস, আনন্দ পণ্ডিত, একনাথভট্ট, কামদেব, কাশীনাথ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ, গোবিন্দরাম, গোড়পদ, গৌরীধর চক্রবর্তী, জগদ্ধর, জয়নারায়ণ, জয়রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ চক্রবর্তী, পীতাম্বর মিশ্র, ভগীরথ, ভাস্কররায়, ভীমসেন, রঘুনাথ, মঙ্গরী, রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রামানন্দতীর্থ, ব্যাসাশ্রম, বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবনগুরু, বিরূপাক্ষ, শঙ্করশর্মা, শম্ভু, শিবাচার্য্য।

চণ্ডীদত্ত, অযোধ্যার রাজা মানসিংহের সভায় একজন কবি। [মানসিংহ দেখ।]

চণ্ডীদাস, বঙ্গের একজন প্রাচীন কবি, কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। ব্রাহ্মণকুলে চণ্ডীদাসের জন্ম ও নারায়ণগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বীরভূম জেলার সাকুরীপুর থানার ঠিক পূর্বাংশে নারায়ণগ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে এখনও শিলাম্বরী বিখ্যাতীকী বা বাণ্ডলীদেবী বিরাজ করিতেছেন। প্রবাদ আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে তাঁহারাই উপাসনা করিতেন, পরে তাঁহারই উপদেশে কৃষ্ণভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলা-যুতি পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন যে তিনি বাণ্ডলীর বয়েই পদাবলী রচনা করেন।

“কহে বড় চণ্ডীদাস বাণ্ডলীর বয়ে।” পদাবলী ১২৯।

পদকরভর পাঠে জানা যায়—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গুণ গুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, ঘটনা-

ক্রমে ভাগীরথী তীরে পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে উভয়ের কবিতা ও রসিকতার মিষ্ট হইয়া মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন (১)।

বিদ্যাপতির যেমন লহিমা-আলক্তির প্রসঙ্গ আছে, চণ্ডীদাসেরও সেইরূপ রাবী নারী রজককতার সহিত সংঘটনের কথা শুনা যায়। চণ্ডীদাস পদাবলীতেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

“নিত্যের আদেশে, বাণ্ডলী চলিল, সহজ জানাবার তরে।

প্রমিতে প্রমিতে, নারায়ণ গ্রামেতে, প্রবেশ ঘাইয়া করে ॥

বাণ্ডলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কর।

সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥

ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।

যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি, শুনহ চৌবট্ট সনে ॥

বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্র, ভজহ তাহারে নিতি।

বাণের সহিতে, সলাই যজিতে, সহজের এই রীতি ॥

দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিত্তে, বাইলে প্রমাদ হবে।

এই কথা মনে, তাব রাজিদিনে, আনন্দে থাকিবে তবে ॥

রতি পরক্ষীয়া যাহারে কহিয়া সেই সে আরোপসার।

ভজন ভোমারি রজক বিয়ারি রাগিনী নাম যাহার ॥

বাণ্ডলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, শুনহ শিখের স্তত।

এ কথা লবে না, না জানে যে জনা, সেই সে কলির ভূত ॥”

(পদাবলী—রাগাঙ্ক পদ)

চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবেরও পূর্ববর্তী, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, চণ্ডীদাসের সময়ে বালালা রচনার আদিকাল বলা-ঘাইতে পারে, তিনি বঙ্গের আদি কবি না হইলেও বঙ্গভাষার সেই প্রথম অবস্থার কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনে যেরূপ কল্পনাশক্তি, রচনা পারিপাট্য, রসনাধুষ্য ও সুললিত ছন্দোবদ্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি একজন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। চণ্ডীদাসের কবিতায় আদিরসের ছড়াছড়ি বলিয়া মব্যাক্তির বিরুদ্ধ বটে এবং ভাবগাভীরো ও বাক্যবিন্যাসে নব্যদিগের নিকট বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় চণ্ডীদাস

(১) “চণ্ডীদাসে গুণি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে তেল অধুরাগ।”

দৈবহি হুঁই দেখা করল পাতল লবই না পারই কোই।

হুঁই বোহা নাম প্রবে তহি জামল রূপনারায়ণ পোই।

সময় বসন্ত বায়দিন মাঝি বটভবে হুরধনী তীর।

চণ্ডীদাস কবিরসনে মিলল পুলকে কলধর গীর।

ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ভবি রূপনারায়ণ সঙ্গে।

হুঁই আলিঙ্গন করল ভবন ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥” (পদকরভর)

বিদ্যাপতি অপেক্ষা কম ব্যক্তি ছিলেন না। বিদ্যাপতি চণ্ডী-দাস অপেক্ষা নানাবিধে পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সরল সরল কথার চণ্ডীদাস বেক্স মনের ভাব, হৃদয়ের বেমন নিখুঁত ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তেমন খাঁটি ভাব অতি অল্পই লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক আর বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্র-কর। একজন ভাবুক, অপর দার্শনিক। একজন সোজা কথার সরলভাবার সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তি রচনাচাতুর্য্যে প্রাকৃতির সৌন্দর্য্যে ও শব্দবিদ্যার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের অধ্যাতিভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিলী কবি, আর চণ্ডীদাস আমাদের স্বদেশীক একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। [বিদ্যাপতি দেখ।]

২ একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক, নারায়ণের পৌত্র, ইহার বহু লক্ষণতটের আদেশে ইনি সংস্কৃতভাবার ধ্বনিসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ কাব্যপ্রদীপে চণ্ডীদাসের মত উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিষ্ণুনাথ সাহিত্যদর্পণে সগোত্র বলিয়া ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

৩ ভাবচক্রিকা নামে সংস্কৃত তত্ত্বগ্রন্থরচয়িতা।

চণ্ডীদেবশর্মান, সংস্কৃতভাষার প্রাকৃতদীপিকাকার, ইনি “শোভাকরকুলোদ্ভূত” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

চণ্ডীপাঠ (পুং) চণ্ডী দেবীমাহাত্ম্যাক্ষরগ্রন্থত পাঠ: ৬৩৭। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর আবৃত্তি, যথানিয়মে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ। [চণ্ডী দেখ।]

চণ্ডীপুর, রাজমহলহ একটি প্রাচীন গ্রাম। (দেশাবলী) বৃহন্নীলতরুর মতে চণ্ডীপুর একটি পীঠস্থান, এখানে প্রচণ্ডাদেবী বিরাজ করেন।

“চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডী চণ্ডবতী শিবা।” বৃহন্নীলতরু ৫ পৃ।

চণ্ডীমন্ড, পঞ্চাননদীর পশ্চিমতীরস্থ একটি প্রাচীন গ্রাম। গিরি-একের নিকটবর্তী ইঙ্গলৈল হইতে ১ ক্রোশ উত্তরে ও নালন্দ হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখান হইতে কতকগুলি বুদ্ধমূর্তি ও রাজা রামগণদেবের ১২শ বর্ষাকিত একধণ্ড শিলালিপি দৃষ্ট হয়। (Cunningham, Arch. Sur. Rep. VIII. p. 8 and XI. p. 169)

চণ্ডীমণ্ডপ (পুং) চণ্ডী মণ্ডপ: ৬৩৭। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র আটচালা বা ইষ্টকনির্মিত দালান।

চণ্ডীশ (পুং) ১ ক্রতুর গণভেদ। স্থানবিশেষে চণ্ডেশ্বর নামেও ইহার উল্লেখ আছে। (ভাগবত ৪।৫।১৬) চণ্ডী ক্রীশ: ৬৩৭। ২ শিব। চণ্ডীশ্বর প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত।

চণ্ডীশ্বর, মাধব সরস্বতীর শিষ্য, ইনি ন্যায়চূড়ামণিপ্রভা রচনা করেন।

চণ্ড (পুং) চড়ি উৎ। ১ উন্নয়, সুবিক। (শব্দচ) (দেশজ) ২ মাদক দ্রব্যবিশেষ। অহিকেননির্ঘ্যাস হইতে এই দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে আকিমের গোলাকে বিধৃত করিয়া কাটিলে, তাহার মধ্যস্থলে যে তরল পদার্থ দেখা যায়, তাহা তুলিয়া অপর একটি মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঐ সময়ে যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাকে কোন জল-পাত্রে ক্রমাগত হাত ধুইতে হয়। ঐ আকিম মিশ্রিত জলে গোলার আবরণকণ্ড ভিজাইয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া, পরে কাপড় ও চীনা কাগজে দুইবার উত্তমরূপে হাঁকিয়া লইবে। শেষে ঐ পরিষ্কৃত জলের সহিত লৌহপাত্রে তরল আকিম মিশাইয়া অগ্নির তাপ দিবে। যতক্ষণ না ঐ জল মাৎস্তের মত চট্‌চটে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফুটাইতে থাকিবে।

পরে ঐ গুড়ের মত আটাবুক্ত আকিম একপাত্রে করলার আঁচে তাপ দিবে এবং তাড়ু বা হাতা দ্বারা উন্টাইবে যে, উহার মধ্যে আর কোনরূপ জল না থাকে এবং অতি সাবধানে দেখিবে যেন উহার তলা না ধরিয়া যায়। যখন বুঝিবে যে মাল উপযোগী অবস্থায় আসিয়াছে, তখন নামাইয়া সমস্ত লৌহপাত্রে অর্ধ ইঞ্চি পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় ঐ পাত্রে এক এক অংশ ক্রমা-গত অগ্নিতে তাড়াইবে। পরে পাত্রে দুই পুটেই তিনবার অগ্নির উত্তাপ দিবে। মালে আবদ্ধকীর উত্তাপ পাইয়াছে কিনা, তাহা কেবলমাত্র দ্রব্যের গন্ধ ও রসের পরিবর্তন দেখিয়া কারিকর জানিতে পারে। ইহার অধিক উত্তাপ লাগিয়া যদি আকিম ধরিয়া উঠে, তাহা হইলে সমস্ত আকিম একবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পরিশেষে এই বহু কষ্টে তত্ত্ব আকিম তাম্রপাত্রে প্রচুর জলে গুলিয়া উলানে চাপাইবে। যখন দেখিবে যে ফুটিয়া ফুটিয়া ঐ পদার্থ গাঢ় আঠাবুক্ত হইয়াছে, তখন নামাইবে। ইহাই বাজারে “চণ্ড” নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

তরল আকিম হইতে শতকরা ৭৫ অংশ এবং ডেলা আকিম হইতে শতকরা ৫০ হইতে ৫৫ অংশ চণ্ড পাওয়া যায়।

চীনভাষায় চণ্ডুর নাম চেন্-চৌ বা হু-য়েন। চীনেরা এই চণ্ড তামাকুর ভার সাজিয়া সেবন করিয়া থাকে। ইহাতে উৎকট নেশা হয়। চণ্ড প্রস্তুতকালে যে চীনা কাগজে আকিম হেঁকা হয়, মলের প্রকোপ বা তলপেটে অপর কোন রূপ বেদনা হইলে সেই কাগজ পেটে লাগাইলে বেদনা আরোগ্য হয়।

চণ্ডপণ্ডিত, খোলকানিবাৰী সংকল্পজ্ঞ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, আলিগড়ের পুত্র, ভালুপের জাতি, বৈদ্যনাথ ও নরসিংহের শিষ্য। ইনি খোলকারাজ সাক্ষের আদেশে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নৈমধীরদীপিকা ও ঋষিদের একখানি ভাষা প্রণয়ন করেন। চণ্ডেশ্বর (পুং) চণ্ডচাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি কর্ণধাং। ১ রক্তবর্ণ পরীরধারী শিবমূর্তি বিশেষ। “চণ্ডেশ্বরং রক্তভঙ্গুং জিনেজম্।” (তন্ত্রসাং)

২ রক্তগণ বিশেষ। [চণ্ডীশ দেখ।]

চণ্ডেশ্বর, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত। মিথিলারাজমন্ত্রী বীরেশ্বর ঠাকুরের পুত্র। নিজের ভবেশপুত্র মিথিলাদীপ হরসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি স্মৃতিরত্নাকর নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। এই গ্রন্থ সপ্ত রত্নাকরে বিতক্ত। যথা—কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর, ব্যবহাররত্নাকর, শুকিরত্নাকর, পুজারত্নাকর, বিবাহরত্নাকর ও গৃহস্থরত্নাকর।

চণ্ডেশ্বর নিজগ্রন্থে করজম, পারিজাত, প্রকাশ ও হলা-দুধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রঘুনাথ, কমলাকর, অনন্তদেব, কেশব, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির স্মৃতিসংগ্রহে চণ্ডেশ্বরের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি সংস্কৃতভাষার জ্ঞানপ্রদীপ, প্রসঙ্গচণ্ডেশ্বর, প্রসঙ্গবিদ্যা ও স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তভাষা রচনা করেন।

৩ কটক হইতে গঙ্গা যাইবার পথে এবং খুরদা হইতে ১৩ কোশদূরে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে চণ্ডেশ্বরদেবের এক অতি প্রাচীন লিঙ্গমন্দির আছে, মন্দিরটী প্রস্তরে নির্মিত ও ইহার চারিদিকে যথেষ্ট শিরনৈপুণ্য আছে। এই বৃহৎ মন্দিরটী অসুমান খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এখন কেবল গর্ভগৃহ ও অন্তরাল-মণ্ডপ বিদ্যমান। ইহার চারিপাশে কুণ্ড ও অতি প্রাচীন মন্দিরাদির চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। (Cunningham's Arch. Sur. Rep. XIII. p. 101.)

এখানে কতকগুলি খোদিত শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে মন্দিরটী গঙ্গাবংশীয় কোন রাজা কর্তৃক নির্মিত বলিয়া বোধ হয়।

চণ্ডেশ্বরবর্ষম্, অপরোকারুত্বতির অমৃতবদীপিকা নামী টীকাকার।

চণ্ডোত্রাশূলপাণি (পুং) শিবমূর্তিবিশেষ।

“চণ্ডোত্রাশূলপাণেচ মন্ত্রঃ সর্কার্থসাধকঃ।” (তন্ত্রসার)

চণ্ডোত্রা (স্ত্রী) নারিকা বিশেষ। [নারিকা দেখ।]

চতসর [চত্বর দেখ।]

চত্বারি, বুলকনহরের খুজাতহসীলের অন্তর্গত একটা গওগ্রাম, আলিগড় যাইবার রাস্তার অবস্থিত। এখানে অনেক বহুকু লোকের বাস, ডাকঘর ও ইংরাজী স্কুল আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে গোমেবাদির হাট বসে।

চতিন্ (জি) চত-গিন্। বিনাশক।

“তং ব ইজ্ঞং চতিনমত শাঠিকঃ।” (শুক ৬।১৯।৪) ‘চতিনঃ শত্রুণাং চাতকং নাশকমিত্যর্থঃ।’ (সারণ।)

চতুঃকুটা (স্ত্রী) শ্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ।

“চতুঃকুটা মহাবিদ্যা শব্দরেন প্রপূজিতা।” (তন্ত্রসার)

চতুঃপঞ্চ (জি) চত্বারঃ পঞ্চ বা বার্ষেড। চার কি পাঁচ।

চতুঃসংখ্যক বা পঞ্চসংখ্যক।

“চতুঃপঞ্চানি বর্ষাণি তিষ্ঠন্ নৃপগৃহে শিশুঃ।” (রাজতরং ৬।৩২৬)

চতুঃপঞ্চাশ (জি) চতুঃ পঞ্চাশতঃ পূরণম্ চতুঃপঞ্চাশৎ-ডট।

যাহা দ্বারা চতুঃপঞ্চাশসংখ্যা পূরণ হয়, চতুঃপঞ্চাশত্তম।

চতুঃপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) চতুরধিকা পঞ্চাশৎ মধ্যপদলো। ১ চতুঃ

রধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, চুয়ার। (জি) ২ চতুরধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যায়ুক্ত।

“পদপুৰোডাশো হবিত্তচতুঃপঞ্চাশৎ।” (শতং ত্রা ৬।২।২০৭)

চতুঃপঞ্চাশত্তম (জি) যাহা দ্বারা চতুঃপঞ্চাশৎ সংখ্যা পূরণ হয়।

চতুঃপত্রা (স্ত্রী) চত্বারি পত্রাণ্যভাঃ বহুব্রী ত্রিমাং ভীপ্।

১ ক্ষুদ্র পাবাগভেদী। (রাজনিং) বিক্রেত্রে রেকের হানে বধ হয়। চতুঃপত্রী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃপর্ণী (স্ত্রী) চত্বারি পর্ণান্ত্র বহুব্রী ত্রিমাং ভীপ্।

ক্ষুদ্রাঙ্গিকা, আমরুল। (রাজনিং) বিক্রেত্রে রেকের হানে বধ হয়। চতুঃপর্ণী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃপার্শ্ব, চতুর্গাং পার্শ্বানাং সমাহারঃ দ্বিগু, পাত্রাদি গণান্তর্গত

বলিয়া ভীপ্ হইল না। চারিদিক্। বিক্রেত্রে রেকের হানে বধ হয়। চতুঃপার্শ্ব শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃপুণ্ড্র (পুং) চত্বারি পুণ্ড্রাণীবাত বহুব্রী। তিষ্ঠীতকবৃক্ষ।

(রাজনিং) বিক্রেত্রে রেকের হানে বধ হয়। চতুঃপুণ্ড্র শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃফলা (স্ত্রী) চত্বারি ফলানি যগ্যাঃ বহুব্রী। নাগফলা।

(রাজনিং) কোন কোন গ্রন্থে ‘চতুঃফলা’ হানে চতুঃফলা পাঠ দৃষ্ট হয়। বিক্রেত্রে রেকের হানে বধ হয়। চতুঃফলা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃশত (স্ত্রী) চারিশত।

চতুঃশতী (স্ত্রী) চতুর্গাং শতানাং সমাহারঃ দ্বিগুঃ। চতুঃশত

বা ভীপ্। চারিশত।

চতুঃশাল (ক্ৰী) চতুঃশাং শালানাং সমাহারঃ ষষ্টি। পরম্প-
রাতিমুখ চারি গৃহ, চকমিলানবাড়ী।

“একজ্ঞানমে চতুঃশালে হৃদিকে রাষ্ট্রবিপ্লবে।

যাযিনি নীরমানারাঃ পুরঃ শুকো ন চুযাতিঃ” (নিবন্ধকর্ম প্রা°)

চতুঃশালা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃশালক (ক্ৰী) চতুঃশাল-বার্ণে কন্। [চতুঃশাল দেখ।]

কোন কোন আভিধানিকের মতে বিকল্পে ঙীৎ হইয়া

চতুঃশালী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চতুঃষষ্টি (ত্রি) চতুঃষষ্টিঃ পূরণঃ চতুঃষষ্টি-ডট। যাহা হারা

চতুঃষষ্টি সংখ্যার পূরণ হয়, চতুঃষষ্টিভম।

চতুঃষষ্টি (ক্ৰী) চতুরধিকা ষষ্টিঃ মধ্যলো°। ১ চতুরধিক
ষষ্টি সংখ্যা, চৌষষ্টি। ২ চতুরধিক ষষ্টিসংখ্যাবৃক।

চতুঃষষ্টি কলা (ক্ৰী) চতুঃষষ্টি মিতা কলা। কলা নামী উপ-
বিদ্যা। চতুঃষষ্টিকলার নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্নরূপ দৃষ্ট
হয়। [শিবতন্ত্রে চতুঃষষ্টিকলার যে সকল নাম আছে,
তাহা কলা শব্দে লিখিত হইয়াছে।] শুক্রনীতি শাস্ত্রে
চতুঃষষ্টিকলার যে সকল নাম আছে, তাহা এই স্থানে
লিখিত হইল।

চতুঃষষ্টিকলার নাম—১ হাবতাবাদিযুক্ত নর্তন, ২ বাদ্য-
বাদন, ৩ বস্ত্রাভার সন্ধান, ৪ অনেকরূপ প্রস্তুত করণ,
৫ শয্যা ও আস্তরণসংযোগে পুষ্পাদি গ্রন্থন, ৬ দ্রুত প্রভৃতি
অনেক ক্রীড়ার অভিরঞ্জন, ৭ নানা রকম আসনে রতিজ্ঞান,
এই সাতটা কলাকে গান্ধর্ব বলে। ৮ মকরন্দ ও আসব
প্রভৃতি মন্য প্রস্তুতকরণ, ৯ সিরাত্রণবাধ, ১০ নানাবিধ
রসের মিশ্রণে অন্ন প্রভৃতি পাককরণ, ১১ বৃক্ষ প্রভৃতির
রোপণ ও পালনাদিজন, ১২ পামাণ ও ধাতু প্রভৃতির দ্রব-
করণ ও কঠিন করণ, ১৩ শুষ্ক প্রভৃতি ইক্ষুবিকার প্রস্তুত
করণ, ১৪ ধাতু ও ওষধিসংযুক্ত করিবার নিয়মজ্ঞান, ১৫
মিশ্রিত ধাতুদ্রব্যের পৃথক্ করণ, ১৬ ধাতু প্রভৃতির
সংযোগ-জ্ঞান, ১৭ হারনিকাসনজ্ঞান, ১৮ শস্ত্রসন্ধানবিক্ষেপ,
১৯ মন্ত্রযুক্ত, ২০ যজ্ঞাদি অস্ত্রনিপাতন, ২১ বায়ুসংকেতা-
সারে বাহরচনাদি, ২২ হস্তী, ঘোটক ও রথের সংরক্ষণ
করিয়া যুদ্ধসংযোজন, এই পাঁচটা কলা যুদ্ধশাস্ত্রসম্বন্ধ।
২৩ বিবিধ আসন ও মুদ্রা হারা দেবতার আরাধন; ২৪
সারণ্য বা গজ ও অশ্ব প্রভৃতির গতিশিক্ষা, ২৫ মূর্ত্তিকা,
২৬ কাঠ, ২৭, ২৮ পামাণ ও ধাতুময় দ্রব্যাদি নির্মাণজ্ঞান;
২৯ ধনিবিজ্ঞান, ৩০ তড়াগ, বাপী, প্রাসাদ ও সমভূমি প্রস্তুত
করিবার উপায়, ৩১ বটী প্রভৃতি যন্ত্র ও বধনির্মাণ,
৩২ বর্ণের পরস্পর সংযোগে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রস্তুত করণ, ৩৩

অল, বায়ু ও অগ্নিসংযোগে নিয়োগাদি ক্রিয়া, ৩৪ নৌকা ও
রথাদি-যাননির্মাণ, ৩৫ জ্ঞানি বাসী রক্ষণপ্রস্তুত করণ,
৩৬ বস্ত্রনির্মাণ, ৩৭ রত্নবিজ্ঞান, ৩৮ বর্ণাদি ধাতুবিজ্ঞান,
৩৯ কৃত্রিম ধাতুজ্ঞান, ৪০ অলকার নির্মাণ, ৪১ লেপাদি জ্ঞান,
৪২ পত্র ধর্মোক্তনির্মাণ জ্ঞান, ৪৩ ব্রহ্মদোহমাদি জ্ঞান, ৪৪
সীবন বিদ্যা, ৪৫ সস্ত্রয়ণবিদ্যা, ৪৬ গৃহতাণ্ড প্রভৃতি মার্জন-
বিদ্যা, ৪৭ বস্ত্রসম্পর্জক, ৪৮ ক্ষুরকর্ম, ৪৯ মাদিবাদি ক্রিয়া-
জ্ঞান, ৪৯ তিল মাংস প্রভৃতির মেহ নিকাসনবিদ্যা, ৫০
সীরাদ্যাকর্ষণজ্ঞান, ৫১ বৃক্ষরোহণ প্রভৃতি, ৫২ মনোরম্য
পদার্থ সেবন, ৫৩ বাণ ও তুণ প্রভৃতির পাত্রনির্মাণ, ৫৪
কাচপাত্রাদিনির্মাণ, ৫৫ অলসংসেচন, ৫৬ অলসংহরণ,
৫৭ লোহাভিসার শস্ত্র ও অস্ত্রে নির্মাণ, ৫৮ হস্তী, অশ্ব, বৃষ
ও উষ্ট্রের পল্যানাদিজ্ঞান, ৫৯ শিশু প্রতিপালনাভিজ্ঞতা,
৬০ ধারণ, ৬১ ক্রীড়ন, ৬২ নানাদেশীর অক্ষর অতি সুন্দরভাবে
লেখন, ৬৩ অপরাধীর দণ্ডজ্ঞান এবং ৬৪ তাড়ন রক্ষাদির
বিজ্ঞান। ইহাদের নামানুসারেই লক্ষণ বুঝিয়া লইতে হয়।
তাহা ছাড়া অপর কোন লক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্রে লক্ষিত হয় না।

(খিল শুক্রনীতি ২ অঃ।)

চতুঃষষ্টিতম (ত্রি) চতুঃষষ্টি-তমপ্। যাহা হারা চতুঃষষ্টি
সংখ্যা পূর্ণ হয়।

চতুঃসপ্তত (ত্রি) চতুঃসপ্ততি পূরণার্থে ডট। যাহা হারা
চতুঃসপ্ততি সংখ্যা পূরণ হয়। জ্ঞানিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে।

চতুঃসপ্ততি (ক্ৰী) চতুরধিকা সপ্ততিঃ মধ্যলো°। ১ চতুরধিক
সপ্ততি সংখ্যা, চুয়াত্তর। ২ চতুরধিক সপ্ততি সংখ্যাবিশিষ্ট।

চতুঃসপ্ততিতম (ত্রি) চতুঃসপ্ততিপূরণার্থে তম। যাহা
হারা চতুঃসপ্ততি সংখ্যা পূরণ হয়।

চতুঃসম (ক্ৰী) চত্বারি সমানি যত্র বহুব্রী। ১ মিশ্রিত লবঙ্গ,
জীরক, বমালী ও হরীতকী। (শকার্ণচি°) ইহার গুণ—আম-
শূল ও বিবক্ক নাশক, পাচন, ভেদক ও শোষণাশক। ২ চুই-
ভাগ কস্তুরী, চার ভাগ চন্দন, তিন ভাগ কুঙ্কুম ও তিনভাগ
কর্ণূর এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুঃসম
বলে। চতুঃসম শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃসম্প্রদায়, চারিজন প্রধান আচার্য্য প্রবর্ত্তিত চারি প্রকার
সম্প্রদায়। ১ শ্রীসম্প্রদায়, ২ মাধ্ব বা চতুমূখ সম্প্রদায়, ৩
কচ্ছ সম্প্রদায় ও ৪ সনক সম্প্রদায়। ইহাদিগকে চতুঃসম্প্রদায়
বলে। [বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

চতুঃসীমন্ (ক্ৰী) চতুর্দিকের সীমা, চারিসীমা।

চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন (ত্রি) চারিসীমাবিশিষ্ট, যাহার চারিদিকে
চারিটা সীমা আছে।

চতুর্ (ত্রি) [বহ] চত-উরন্ । ১ চতুঃসংখ্যা, চার । ২ চতুঃ-
সংখ্যায়ুক্ত । (বেদীসং)

[অব্যং] চতুর্-বারার্ধে-সুচ পত্ লোপশ্চ । ৩ চতুর্বার, চার বার ।

“চতুর্নমো অষ্টকৃষো ভবার ।” (অধর্ম ১১২।২) ৪ চতুর্ভুজ ।

“গুটমৈবুধধর্মক কালে কালে চ সংগ্রহম্ ।

অপ্রমাদমনালভং চতুঃ শিক্তেত বারসাং ।” (চাণক্য ।)

চতুর (ত্রি) চত্যাতে যাচ্যাতে চত-উরচ্ (মন্দিবাশিমথিচতি-
চত্বাঙ্কিত্য উরচ্ । উৎ ১।৩২) ১ বক্রগামী, যে বক্রভাবে গমন
করে । ২ আলতহীন । ৩ কার্যাদক্ষ । পর্যায়—দক্ষ, পেশল,
পটু, উষ্ণ, পেশল, নিপুণ ।

“চতুরোদৈব যুহেত মুখঃ সর্কজ যুহতি ।” (দেবীভাগ ১।১৭।৪৪)

(পুং) ৪ হস্তিশালা, আলান । ৫ নারকবিশেষ । রস-
মঞ্জরীর মতে এই নারক দুই প্রকার—বচনব্যঙ্গ্যসমাগম ও
চেষ্টাব্যঙ্গ্যসমাগম । যে নারকের বাক্যে অতিশয় ব্যঙ্গ্যার্থ-
যুক্ত অর্থাৎ যাহার বাক্যে গূঢ়ভাবে নারিকার সমাগম কাল
ও স্থানের নির্দেশ থাকে ও তদনুসারে নারিকার সহিত
মিলন হয়, তাহাকে বচনব্যঙ্গ্যসমাগম বলে । যথা—

“তমো জটালে হরিনন্দরালে কালে নিশায়ান্তব নির্গতায়ঃ ।

তটে নদীনাং নিকটে বনানাং ঘটেত শাতোদরিকঃ সহায়ঃ ।”

এইস্থলে দিক্‌সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে নিশাভাগে
নদীর তটে বনের নিকটে নারিকার সমাগমব্যঙ্গ্য । অত-
এব এই নারকে বচনব্যঙ্গ্যসমাগম বলা যায় ।

যে নারকের চেষ্টা হইতে নারিকার সমাগমস্বত্ব ব্যক্ত
হয়, তাহাকে চেষ্টাব্যঙ্গ্যসমাগম বলে । যথা—

“কাস্তে কনকজরীর করে কমপি কুর্তি ।

অগারলিখিতে ভানৌ বিন্দুমিন্দুযুধী নদৌ ॥”

(ত্রি) চতুর্ অর্শাদিস্বাং অচ্ । ৬ চতুঃসংখ্যা বিশিষ্ট ।

৭ উপভোগক্ষম । ৮ নেত্রগোচর ।

চতুরংশ (পুং) চতুরোংশা যত্ বহুব্রী । যাহার চারিটি
অংশ আছে ।

চতুরংশ (স্ত্রী) বর্ণবৃত্তবিশেষ । “দ্বিজবরকর্ণা বিহরসবর্ণা
ভবতি যদা সা কিল চতুরংশা ।” (ছন্দোগ্রন্থ)

চতুরক (ত্রি) চতুর-স্বার্থে কন্ । [চতুর দেখ ।]

চতুরকি (চতুরকি), দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত
একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রাম । সিন্ধুগি হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে
অবস্থিত । এই স্থান দত্তাজেয়-মন্দিরের জন্ম বিখ্যাত । এই
মন্দিরের শিরোনৈপুণ্য প্রাশংসনীয় । মন্দিরের প্রত্যেক দ্বারে
নরসিংহমূর্তি ও মধো অনেক দেবদেবী ও জীবজন্তুর মূর্তি আছে ।
এখানে একখানি প্রাচীন অম্পষ্ট খোদিত শিলাকলক দৃষ্ট হয় ।

চতুরক্রম (পুং) রূপকবিশেষ । দুই গুরু, দুইটি ম্লুত ও
তৎপরবর্তী গুরু হইলে চতুরক্রম বলে । ইহা বত্রিশ অক্ষরে
ও শৃঙ্গাররসে প্রাপ্ত ।

“ক্রতব্ধং ম্লুতব্ধং তথা প্রাস্তে গুরুভবেৎ ।

ষাতিংশদক্ষরৈরযুক্তঃ শৃঙ্গারে চতুরক্রমঃ ॥” (সঙ্গীতদা°)

চতুরক্ষ (ত্রি) চত্বারি অক্ষাণি যত্ বহুব্রী সমাসান্তষ্টচ্ । যাহার
চারিটি চক্ষু আছে ।

“চতুরক্ষো পথিরক্ষো নৃচক্ষসৌ ।” (শক ১০।১৪।১১) ‘চতুরক্ষা-
বক্ষি-চতুর্ভুজো’ (সায়ণ ।)

চতুরক্ষর (স্ত্রী) চত্বারি অক্ষরাণি যত্ বহুব্রী । ১ চারিটি
অক্ষরযুক্ত নারায়ণের নাম ।

“যদা নারায়ণায়তি জগাদ চতুরক্ষরম্ ।” (ভাগবত ৬।২।৮)

২ অক্ষরচতুর্ভুজ্যক ছন্দঃ প্রভৃতি । “সোমশ্চতুরক্ষরেণ”
(গুরুবঙ্ক ২।৩১) ‘সোমঃ অক্ষরচতুর্ভুজ্যকেন ছন্দসা’ (মহীধর ।)

(ত্রি) চারি অক্ষরযুক্ত ।

চতুরঙ্গ (স্ত্রী) চত্বারি অঙ্গানি যত্ বহুব্রী । ১ হস্তী, ঘোড়া, রথ
ও পদাতি এই অঙ্গ চতুর্ভুজ্যক সৈন্য ।

“প্রয়াতে হস্মিন্ নরব্যাস্র বলেন মহতাবৃতঃ ।

কুণ্ডেন চতুরঙ্গে যন্তেন জিতকাশিনা ॥” (ভারত ৩।২০ অঃ)

(ত্রি) ২ যাহার চারিটি অঙ্গ আছে ।

“নরশংসশ্চতুরঙ্গো যমোহদিতিঃ ।” (শক ১০।১২।১১)

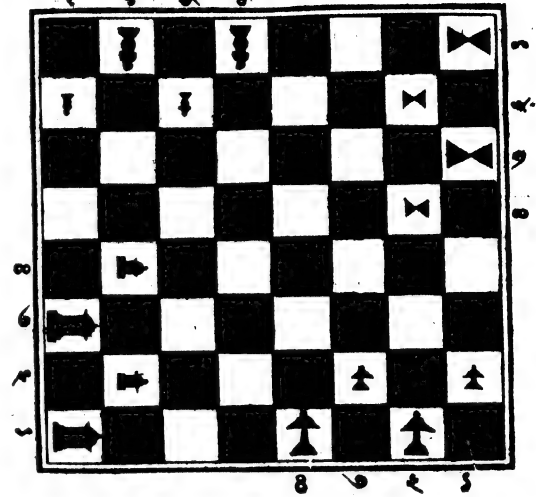
‘চতুরঙ্গশ্চতুর্ভিরমিভিযুক্তঃ’ (সায়ণ ।) (স্ত্রী) ৩ গীতের
জাতিবিশেষ । ইহাতে চারিটি তুক থাকে । প্রথম তুকের
বর্ণনাতে চতুরঙ্গ শব্দটির উল্লেখ থাকিবে । দ্বিতীয় তুকে
স্বরগ্রাম, তৃতীয়তুকে আলাপের বোল এবং চতুর্থ তুকে
বাদ্যের নকল থাকে ।

৪ ক্রীড়াবিশেষ । ইহাকে সতরঞ্চ, দাবাখেলা বা চৌড়ং
খেলাও বলে । বর্তমান কালে প্রচলিত সতরঞ্চ খেলার
কিন্তু, মাত, পিলুড়ী ইত্যাদি নাম পারস্য বা আরবী এবং
সতরঞ্চ নামটিও সেইরূপ । এই কারণে অনেকেই এই
খেলাকে বাদশাহী অর্থাৎ পারস্ত বা আরব দেশে ইহার
প্রথম উৎপত্তি বলিয়া থাকেন । আবার কোন কোন প্রত্ন-
তত্ত্ববিৎ ইহাকে চীনদেশীয়, কেহ গ্রীসে এবং কেহ বা
মিশরে ইহার প্রথম উৎপত্তি স্বীকার করেন । বর্তমান
সময়ে প্রায় সমস্ত ভূমণ্ডলের সভ্য জাতির মধ্যেই এই
খেলা প্রচলিত । এ দেশের প্রবাদ যে, “রাক্ষসরাজ
রাবণ সর্বদাই যুদ্ধাভিলাষী ছিলেন, তাহার যুদ্ধাভিলাষ
কিছুতেই পূর্ণ হইত না । পরিশেষে মন্দোদরী স্বামীর
যুদ্ধাভিলাষ পূরণ করিবার জন্য এই অদ্ভুত যুদ্ধক্রীড়াবিশেষ

উদ্ভাবন করেন।" এই দাবা খেলাই পূর্বকালে চতুরঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইত। হস্তী, অশ্ব, নৌকা ও বটিকা এই চারিটি অঙ্গ লইয়া এই ক্রীড়া করা হয়, এই জন্য প্রাচীন আর্যেরা ইহার নাম 'চতুরঙ্গ' রাখিয়াছেন। পারস্যেরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত হইতে এই ক্রীড়া স্বদেশে লইয়া যান। পারস্য ভাষায় এই ক্রীড়ার নাম চতুরঙ্গ। অনেকে বলেন যে ইহার পরে পারস্য হইতে আরব দেশে এই ক্রীড়ার প্রচার হয়। আরব ভাষায় চ এবং গ নাই বলিয়া "চতুরঙ্গ" স্থানে সত্তরঞ্জ হইয়াছে। প্রাচীন চতুরঙ্গ ক্রীড়ার নাম পরিবর্তনের সহিত পূর্বপ্রচলিত ক্রীড়ানীতি ও সংস্থানরীতিরও পরিবর্তন ঘটয়াছে। এই পরিবর্তন যে কোন্ দেশে হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যাইতে পারে না। আরব হইতে ক্রমে যুরোপবর্তে ইহার প্রচার হয়। সম্ভবতঃ এসিয়ার অন্তরস্থ স্থানেও এই সময়েই এই খেলার প্রচার হইয়া থাকিবে। কোন পুরাবিদেয় মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইংলেণ্ডে ইহার প্রথম প্রচার হয়। যুরোপে প্রথমে এই ক্রীড়াকে "শ্যাক্‌হী" বলিত। তাহা হইতে 'এচেক্স' এবং এচেক্স হইতে চেস (Chess) হইয়াছে।

এই খেলা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে চতুরঙ্গকরলী, চতুরঙ্গক্রীড়ন চতুরঙ্গপ্রকাশ এবং বৈদ্যনাথপারস্যগুপ্তে বিরচিত চতুরঙ্গবিমোদ এই চারিখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে ত্রিভঙ্গাচার্য্যাপান্ডী নামে একজন চতুরঙ্গক্রীড়ার আচার্য্য ছিলেন, তিনি এসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। বর্তমান সময়েও যুরোপের কোন কোন অংশে তাঁহার মতেই ক্রীড়া হইয়া থাকে। যুরোপে দাবা খেলা সম্বন্ধে অনেকই অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে মহর্ষি কৃষ্ণবৈদ্যপায়ন সম্রাট বুদ্ধিধিরকে চতুরঙ্গ ক্রীড়া শিখাইবার সম্বন্ধে কতকগুলি পদ্য রচনা করেন। ইহাই সর্বপ্রথম। পূর্বকালে এই নিয়মে চতুরঙ্গ ক্রীড়া করা হইত।—

এই ক্রীড়া চারিজন করিতে হয়, তাসের গ্রাণ্ডর খেলা স্থায় হইতেও এক এক দলে দুই দুইজন খেলোয়াড়। পূর্বপশ্চিমের খেলোয়াড়দ্বয় একদল কৃষ্ণ ও উত্তরদক্ষিণের দুইজন খেলোয়াড় অপর দল। উহারিগের প্রত্যেকের একটা রাজা, একটা হস্তী, একটা অশ্ব, একখানি নৌকা এবং চারিটি করিয়া বটিকা বা পদাতি থাকে। পূর্বধারের বলের রং লাল, পশ্চিমের হরিদ্রাভ, দক্ষিণে সবুজ ও উত্তরে কাল। প্রাচীনকালে যেকোন চিত্রে ক্রীড়া করা হইত, তাহার



একটি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহার বর্তমান নাম ছক। ছকের চারিপাশে যে চারি চারিটি ঘূঁটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহাই রাজা, হস্তী, অশ্ব ও নৌকা নামে প্রসিদ্ধ। ১ রাজা, তাহার বামভাগে ২ হস্তী, ৩ অশ্ব, ৪ নৌকা। ছকের কোণে নৌকা থাকে, তাহা হইতে গণনায় চতুর্থ ঘরে রাজা বসিবে। এই চারিটি প্রধান বলের সম্মুখে চারিটি ঘূঁটির নাম বটিকা বা পদাতি। প্রাচীন চতুরঙ্গ ক্রীড়ার মন্ত্রী বা দাবা নাই (১)।

গমনাগমন বা ঘূঁটি চালনা করিবার নিয়ম।—রাজা সকল দিকেই একঘর যাইতে পারে। বটিকা বা পদাতি কেবলমাত্র অগ্রে একপদ যাইতে পারে। কিন্তু অপর বল মারিবার সময়ে অগ্রকোণে যাইয়া থাকে। হস্তী চারিদিকেই ইচ্ছামত চালিত হইতে পারে অর্থাৎ বর্তমান দাবাখেলার দাবা বা মন্ত্রীর ভায় সেকালের হস্তীর চাল ছিল। অশ্ব তিন ঘর বক্রগমন করে। বর্তমান ক্রীড়ায়ও অশ্বের চাল

(১) যুদ্ধির উবাচ।

"অষ্টকোষ্ঠাক বা ক্রীড়া তাং মে ক্রহি তপোধন।

একধৈন্যব মে নাথ চতুরাঙ্গী যতো ভবেৎ।

ব্যাস উবাচ।

অষ্টৌ কোষ্ঠান্ সমালিখ্যাদক্ষিণক্রমেণ তু।

অরুণঃ পূর্বাঃ কৃষ্ণা দক্ষিণে হরিতঃ বলম্।

পার্শ্বঃ পশ্চিমতঃ পীতমুত্তরে শ্রামলঃ বলম্।

রাজো বামে গজঃ কৃষ্ণাং তস্মাদশ্বঃ তত্তত্তরিত্।

কৃষ্ণাং কোত্তরঃ। পুরতো যুক্তে পত্তিচতুঃসম্।

কোণে নৌকা। দ্বিতীয়েত্বতৃতীয়ে চ পক্ষো বসেৎ।

কুরীয়ে চ বসেত্ৰাজা বটিকাঃ পুরতো দ্বিতোঃ।" (তিথিকথ)

সেই রকমই আছে। নোকা কোণাকূর্ণি ছই পদ বা ছই বর লজ্জন করিয়া গমন করে অর্থাৎ ছইপদের বেগী বাইতে পারিবে না (২)।

রাজার লক্ষ্য বা গন্তব্য স্বীয় স্থান হইতে পাঁচ পদ। রাজা শূন্য বর পাইলে, আপনার নির্দিষ্ট স্থান হইতে পাঁচ বরের বেগী বাইতে পারে না। বটিকা আত্মপদ পরিত্যাগ করিয়া পাঁচবর মাত্র বাইতে পারে। তাহার পরে আর তাহার বটিকা থাকে না, উত্তম বলরূপে পরিণত হয়। যে বটিকা যে বলের সম্মুখে অবস্থিত, সেই বটিকা সেই বলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বটিকা কোন বলনাশ করিয়া যদি অপর কোঠে যায়, তবে সেই কোঠা অতীত হইয়া তাহার পরিণতি হয়। কাহারও মতে এই স্থানেই বটিকা চালনা শেষ হয়।

গজের গন্তব্য পথ ৪টা।—বাম, সম্মুখ ও সম্মুখের ছই কোণ। অথ নির্দিষ্ট স্থান হইতে ত্রিগুণভাবে তিনটামাত্র পদ বাইতে পারে এবং নোকা নির্দিষ্ট স্থান হইতে ছই পদের বেগী বাইতে পারে না (৩)।

সিংহাসন, চতুরাজী, নৃপাকৃষ্ট, বটপদ, কাককাঠ, বৃহন্নোকা ও নোকা কৃষ্ট এই সাতপ্রকার জয় পরাজয়সূচক পরিণাম। কেবল হস্তীর বলেই রাজার জয় বা পরাজয় হইয়া থাকে, অতএব সকল বল দিয়া হস্তীটিকে রক্ষা করা উচিত। ইহার পরে পরকীর বল মারিতে চেষ্টা করিবে। সৈন্য সমুদায় এবং হস্তীর সাহায্যে রাজাকে রক্ষা করিবে। রাজা বিনষ্ট না হয় এবং অপর রাজা আসিয়া রাজার নির্দিষ্টপদ বা সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে, এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা উচিত। কোন রাজা শত্রুপক্ষীয় রাজার স্থান আক্রমণ করিলে আক্রমণকারীর সিংহাসন হইয়া থাকে, যদি রাজা আসিয়া সিংহাসন হরণ করে, তবে বাহার রাজসিংহাসন চ্যুত হইল, তাহার পরাজয় হয় (৪)।

পূর্বকালে এই খেলাতেও পণ রাখিতে হইত। বাহার

জয় হইত, তিনি পণ্য অর্থ পাইতেন। রাজাকে মারিয়া সিংহাসন অধিকার করিলে দ্বিগুণ পণ্য দিতে হয়। কোন রাজা নিজের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে তাহার সিংহাসন বল কর্তৃক অপহৃত হয়। ইহাকেও সিংহাসন বলা হইয়া থাকে। কোন রাজা সিংহাসন করিবার জন্য স্বীয় গন্তব্য স্থান অতিক্রম করিয়া বটপদে উপস্থিত হইলে বল দ্বারা সুরক্ষিত থাকিলেও তাহাকে হনন করা বাইতে পারে। নিজের রাজা জীবিত থাকিতে যদি অপর রাজ্যেরকে পাওরা যায় অর্থাৎ শত্রুপক্ষীয় রাজদ্বয় বিনষ্ট হয়, তবে তাহাকে চতুরাজী বলে। একপ পরাজয়ে যে পণ রাখা হইয়াছিল, তাহা দিতে হয়। কিন্তু রাজ কর্তৃক রাজা হত হইলে পণ্যের দ্বিগুণ পাইয়া থাকে এবং রাজা স্বপদস্থিত অপর রাজাকে মারিলে যে চতুরাজী হয়, তাহাতে চতুর্গুণ পণ্য দিতে হয়। যদি সিংহাসনের সময়ে চতুরাজী হয়, তবে তাহাকে চতুরাজীই বলে, সিংহাসন বলে না। কোন রাজা অপর নৃপ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গমন করিলে তাহাকে হনন করিবে, ইহাকে নৃপাকৃষ্ট বলে। কোন রাজা স্বস্থান অতিক্রম করিয়া বটিকার অন্তর্ভাগে উপস্থিত ও বটী কর্তৃক নীত হইলে তাহাকে বটপদ বলে। চতুরাজী ও বটপদ এক সময়ে হইলে তাহাকে চতুরাজী বলে, বটপদ বলে না। পদাতির বটপদ রাজা বা হস্তী কর্তৃক বিদ্ধ হইলে তথায় বটপদ হয় না। বটিকা সপ্তম কোঠে থাকিলে হুর্দল বলকে হনন করিবে। বাহার তিনটা বটিকা থাকে, তাহার বটপদ হয় না। কোন রাজার কেবল একখানি নোকা ও একটা বটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাকে পাড়া বটী বলে। তাহার কোণ, পদ বা রাজপদ দূষিত হয় না। একেবারে বলহীন হইলে তাহাকে কাককাঠ বলে। নোকা চতুর্গুণ হইলে তাহাকে বৃহন্নোকা বলে। গজের অভিযুগে গজ দিতে নাই। [বর্তমান দাবাখেলার নিয়ম দাবা শব্দে ও চতুরঙ্গের অপর বিবরণ দ্যুতশব্দে দ্রষ্টব্য।]

চতুরঙ্গ (জী) চ্চারি-অঙ্গানি বস্তাঃ বহব্রী। ষোটিকাবৃক।
চতুরঙ্গিন্ (জি) চ্চারি অঙ্গানি কুমা সন্ত্যত চতুরঙ্গ-ইনি।
হস্তাশ্ব প্রভৃতি সেনানি চতুর্গুণ্যক।

(২) “কোঠমেকং বিলজ্যাধ সর্কভো বাতি ভূপতিঃ।

অত্রএব বটী বাতি বলং হস্তাগ্রকোণম্।

বধেষ্টং বৃহন্নোকাতি চতুরঙ্গিন্ মহীপতেঃ।

ত্রিগুণ্য তুরঙ্গমো বাতি লজ্জরিখা ত্রিকোঠকম্।

কোণকোঠবরং লজ্যা ব্রজেন্নোকা বৃথিষ্ঠিঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

(৩) “পক্ষেন বটী রাজা চতুর্গুণ্য বৃহন্নোকাঃ।

ত্রিকোণৈব চলত্যত্র পার্শ্ব নোকাবরেন্দ্র কু।”

(৪) “সিংহাসনং চতুরাজী নৃপাকৃষ্টং বটপদম্।

কাককাঠং বৃহন্নোকা নোকা কৃষ্টপ্রকারকম্।

বাতাবাতে বটী নোকা বলং হস্তি বৃথিষ্ঠিঃ।

রাজা লজ্জোরুপাতি ভাস্তা বাতং নিহতি চ।

অস্তাশ্বঃ স্ববলং রক্ষেন্দ্র বরাজবলসুত্তমম্।

অনন্ত রক্ষা পার্শ্ব। হস্তাশ্বঃ বলসুত্তমম্।” (তিথিতত্ত্ব)

“চালয়ন্ বহুশং চেমাং বলেন চতুরঙ্গিণা।” (ভারত ১১৪ অঃ)

চতুরঙ্গিণী (স্ত্রী) চত্বারি অঙ্গানি হস্তাশ্বরণপদাতয়ঃ সন্ত্যক্তাঃ
চতুরঙ্গ ইনি-স্ত্রিয়াং ভীপ্। চতুরঙ্গযুক্ত সেনা।

“প্রেষয়িষ্যে তবার্থার বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্।” (ভারত ১৭৩২-৩)

চতুরঙ্গুল (পুং) চত্বশ্চোহঙ্গুলয়ঃ পরিমাণমন্ত বহুব্রী, সমা°
অচ্। ১ আরগ্বেষ, সোন্দাল। (অমর) (ত্রি) ২ চতুরঙ্গুল
পরিমিত, বাহার পরিমাণ চার আঙ্গুল।

“স চতুরঙ্গুল মে বোভয়তোহস্ততউপগৃহতি।”

(শতব্রাহ্ম ১০।২.২।১)

চতুরঙ্গুলী (স্ত্রী) শীতলী, শিউলী।

চতুরঙ্গ (স্ত্রী) চতুর্গাময়ানাং সমাহারঃ বিশ্ণুঃ। চারি প্রকার
অঙ্গদ্রব্য। ভাবপ্রকাশের মতে অঙ্গবেতস্, বৃক্ষাস, বৃহৎ-
জম্বীর ও কাগজী নেবু এই চারি দ্রব্যকে চতুরঙ্গ বলে।

চতুরতা (স্ত্রী) চতুরস্ত ভাবঃ চতুর-তন্-টাপ্। চাতুর্য, দক্ষতা।

চতুরধার্যিক। (স্ত্রী) চতুর্গামধার্যানাং সমাহারঃ বিশ্ণুকর্ম্ম°।
স্ত্রিয়াং ভীপ্ ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ক্বেষশ্চ। যাহার চারি
অধার আছে।

চতুরনীক (ত্রি) [বৈ] চতুরানন, চারি মুখবিশিষ্ট।

চতুরমুগান (স্ত্রী) সামভেদ।

চতুরস্ত (ত্রি) চারিদিকে অস্ত বা সীমাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্।
পৃথিবী।

চতুরমহল, অযোধ্যার নবাব উজীরের একজন রূপসী
বেগম। অযোধ্যারাজের অধঃপতন হইলে চতুরমহল কুর্বাণ
আলী নামক একজন সামান্য ব্যক্তির প্রেমে মুগ্ধ হন এবং
তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু বেগমের মাতা তাহাতে
বিলম্ব আপত্তি করেন, এবং যাহাতে কুর্বাণের ছাত্র সামান্য
ব্যক্তিকে কস্তা বিবাহ করিতে না পারে, তজ্জন্ত বিশেষ
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুর্বাণ আলী বুঢ়ী গবর্মেন্টের
একজন সেরিকাদার ছিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি মত চতুর-
মহল চিফ কমিসনরের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে “তিনি
মক্কাযাত্রা করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহার এই ধর্ম্ম-
কার্য্যে কেহ বাধা দিতে না পারে; তজ্জন্ত কমিশনর সাহেব
যেন একটু দৃষ্টি রাখেন।” এইরূপে চিফ কমিসনরের
অহুমতি লইয়া চতুরমহল লক্ষ্মী নগরে আসিয়া কুর্বাণ
আলীর সহিত মিলিত হইলেন। পরে উভয়ে বুলেদখণ্ডের
অন্তর্গত বিজ্ঞানীর নামক স্থানে পতিপত্নীরূপে বাস করিতে
লাগিলেন। চতুরমহলের গুণ দৃষ্টিতে কুর্বাণ তখন একজন
মহা ধনবান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন।

চতুরবত্ত (ত্রি) চারি অংশে বিভক্ত।

চতুরবত্তিন্ (ত্রি) যে চারি অংশে হবিঃ বিভাগ করিয়া দেয়।

“যদ্যপি চতুরবত্তী যজমানঃ ত্রাৎ।” (ঐতঃ ব্রা° ২।১৪)

চতুরবিহারী, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি চতুরকবি
নামেও অভিহিত। শিবসিংহ ও কৃষ্ণানন্দবাসুদেব ইহার
প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রায় ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যা-
মান ছিলেন।

চতুরসিংহ, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর একজন হিন্দী কবি।
রাণা চতুরসিংহ নামেও খ্যাত। ইনি অতি সরল ও-মিষ্ট
কথার কবিতা লিখিয়াছেন।

চতুরশীত (ত্রি) চতুরশীতি পূরণার্থে ভট্। বাহা দ্বারা চতুর-
শীতি সংখ্যার পূরণ হয়, চতুরশীতিতম।

চতুরশীতি (স্ত্রী) চতুরধিকা অশীতিঃ মধ্যলো°। ১ চৌরশী।
চতুরধিকাসীতি সংখ্যা। ২ চতুরশীতি সংখ্যায়ুক্ত।

চতুরশ্র (ত্রি) চত্বশ্চোহশ্রয়ঃ কোণোবন্ত বহুব্রী নিপাতনাদচ্
(সুপ্রাতঃস্বপ্নাদিবাশারিকুক্ষচতুরশ্রৈশীপদাজপদপ্রোষ্ঠপদাঃ।
পা ৫ ৪।১২০) ১ চতুর্কোণযুক্ত, বাহার চারিটা কোণ আছে।

“চতুরশ্রঃ ত্রিকোণং বা বর্ত্মূলং চার্কচক্রকম্।

কর্তব্যমাহুপূর্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলম্।” (বোধায়ন)

কোন কোন আভিধানিকের মতে ‘চতুরশ্র’ স্থানের
চতুরশ্র পাঠ দৃষ্ট হয়। সচরাচর লিখিতে ‘চতুরশ্র’ এইরূপ
বর্ণ বিন্যাস করা হইয়া থাকে।

(পুং) ২ ব্রহ্মসত্ত্বান, কেতু বিশেষ।

“চতুরশ্রা ব্রহ্মসত্ত্বানাঃ।” (বৃহৎ সং ১১ অঃ) (ত্রি) ৩
অনুমানতিরিক্ত। “বভূব তত্শাশ্চতুরশ্রশোভি।” (কুমার ১।৩২)
‘চত্বশ্চোহশ্রয়োযন্ত তৎচতুরশ্রঃ অনুমানতিরিক্তং।’ মল্লিনাথ।
৪ জ্যোতিশাস্ত্রমতে ৪র্থ বা ৮ম রাশি।

চতুরশ্রি [অশ্রি দেখ।]

চতুরশ্ব (পুং) নৃপভেদ।

চতুরস্বামিন্, একজন কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব। ইনি গুরু
আদেশে সর্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনবাসী হন। (ভক্তমাল)

চতুরহ (স্ত্রী) চত্বারি অহানি সমা° অচ্। ১ চারিদিন।
(পুং) ২ চারিদিন সাধা যাগ।

চতুরাঙ্গন (পুং) চতুরঃ কাণ্ডানিপুণঃ আত্মা মনোযন্ত বহুব্রী।
চত্বারোবুদ্ধাদর আত্মানো যন্ত ইতি বা। পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

“চতুরাঙ্গা চতুর্বাহঃ।” (ভারত ১৩।১৪১।২৫)

চতুরানন (পুং) চত্বারি আননাশ্রয় বহুব্রী। চতুর্মুখ ব্রহ্ম।

“ইতরতাপশতানি যথেষ্টয়া বিতর তানি লহে চতুরানন।”

(উভট)

চতুরানর্ভন (স্ত্রী) চারিভাগে নৃত্য।

চতুরালি (নেশজ) চতুরতা, চালাকী।

চতুরাশ্রম (ক্ৰী) চতুর্গামাশ্রমাণাং সমাহারঃ। চার-আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি।

চতুরূষণ (ক্ৰী) চতুর্গামূষণানাং সমাহারঃ। পিঙ্গলীমূলযুক্ত ত্রিকটু।

“জ্যৈষণং সকাশমূলং কথিতং চতুরূষণং।

বোষভেষ্ব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে ॥” (ভাবপ্রকাশ)

চতুরিডম্পদস্তোভ (ক্ৰী) সামভেদ।

চতুরন্তর (ত্রি) চারিক্রমে বৃদ্ধি।

চতুর্গতি (ক্ৰী) চতুর্গাং বর্ণাশ্রমাণাং কথোক্তকারিণাং গতিঃ
৬তং। ১ পরমেশ্বর।

“চতুমুস্তিস্তুর্য্যাহ্ চতুর্বাহ্ চতুর্গতিঃ।” (ভারত ১৩।১৪৯।৯৫)

(পুং ক্ৰী) ২ কল্প। (হেমং)

চতুর্গব (ক্ৰী) চারিটা গোক। (কাত্য° শ্রোত ২২।১১২)

চতুর্গুণ (ত্রি) চারগুণ।

চতুর্গৃহীত (ত্রি) চতুর্ভিগৃহীতঃ ৩তং। ১ যাহা চারিজন
দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্গ্রাম (ক্ৰী) গ্রামভেদ।

চতুর্জাতক (ক্ৰী) চতুর্গাং জাতকানাং জন্মরাণাং সুরভীণাং
সমাহারঃ। দারচিনি, এলাচি, তেজপাতা ও নাগকেশর
এই চারিটা দ্রব্যকে চতুর্জাতক বলে। ইহার গুণ—রুচিকর,
রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখের দুর্গন্ধনাশক, লঘু, গিত্ত ও অগ্নিবৃদ্ধি-
কর এবং কক ও বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চতুর্গবত (ত্রি) চতুর্গবতি পুরণার্থে উট। চতুর্গবতিতম,
যাহা দ্বারা চতুর্গবতি সংখ্যা পূরণ হয়। চতুর্গবতি শব্দের
নকার বিকরে গৎ হয়। চতুর্গবত শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুর্গবতি (ক্ৰী) চতুর্গবিকা নবতিঃ মধ্যলো°। ১ পূর্বপদাদ
বাৎসৱঃ। ২ চতুর্গবিকা নবতি সংখ্যা, চুরানববই। ২ চতুর্গবতি
সংখ্যায়ুক্ত। “চতুর্গবত্যধিকানি ত্রীণি শতানি।” (কাত্য°
শ্রো° ১৬।৮।২০) চতুর্গবতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুর্থ (ত্রি) চতুর্গাং পূরণঃ চতুর্-উট (তত পূরণে উট। পা
৫।২।৪৮) ততঃ থুক্। (পা ৫।২।৫১।) ১ চারসংখ্যার পূরক।
ক্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

চতুর্থক (পুং) চতুর্থে হকি ভকোরোগঃ চতুর্থ-কন্। রোগ-
বিশেষ, বিষমজ্বর, তিনদিন পর পর যে জ্বর হয়, তাহার
নাম চতুর্থক।

“দিনত্রয়মতিক্রম্য যঃ শ্রীং সহি চতুর্থকঃ।” (বৈদ্যক)

চতুর্থকাল (পুং) চতুর্থঃ কালো কর্মধা°। শাস্ত্রানুসারে
যে সময়ে ভোজনের বিধান আছে, ভোজনকাল।

[ভোজন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ প্রদেয়।]

চতুর্থভক্ত (ক্ৰী) চতুর্থে চতুর্থকালে ভক্তঃ যত্র বছরী।
ভোজনকাল, সার্কদিন।

“চতুর্থভক্তপণং বৈশ্বে শূদ্রে বিধীয়তে।” (ভারত ১৩।১০৬ অঃ)

চতুর্থভাজ্ (পুং) চতুর্থঃ অংশঃ খাদ্যাদেঃ ভজতে কররূপেণ
ভজ-রি। যিনি প্রজার নিকট হইতে খাদ্য প্রভৃতির ১ অংশ
গ্রহণ করেন। মজুর মতে রাজা বিপৎকালে প্রজার নিকট
হইতে খাদ্যাদির ১ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই
সমস্ত অর্থে যদি প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণ করা হয়, তবে
আর কোনরূপ পাপ হয় না।

“চতুর্থভাজ্ মহারাজ! ভোজ ইন্দ্রসখো ববী।” (ভারত ১।২।১৬)

চতুর্থব্রহ্ম (ক্ৰী) চতুর্থঃ ব্রহ্মো যত্র বহতী। সামবিশেষ।

চতুর্থাংশ (পুং) চতুর্থখণ্ডাসৌ অংশশ্চেতি কর্মধা°। ১ চার
ভাগের এক ভাগ।

“চতুর্থাংশোহথ ধর্ম্মস্ত রক্ষিতা ভভতে বলঃ।”

(হরিবংশ : ৭০ অঃ)

(ত্রি) চতুর্থোংশো হস্ত বছতী। ২ চতুর্থাংশের অধিপতি।

“সর্গেষামধিনো মুখ্যাস্তদধিনো নার্কিনোহিণেরে।

তৃতীয়িনন্তৃতীয়াংশচতুর্থাংশান্ত পাদিনঃ ॥” (মহুঃ ৮।২।১০)

চতুর্থিকা (ক্ৰী) পরিমাণবিশেষ, এক পল। (বৈদ্যকপরি°)

চতুর্থিকর্ম্ম (ক্ৰী) চতুর্থ্যামনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম। বিবাহের পর চতুর্থীর
দিন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। (গোবিল)

চতুর্থী (ক্ৰী) চতুর্গাং পূরনী চতুর্-উট (তত পূরণে উট। পা
৫।২।৪৮) ততঃ থুক্ (যটকতিপয়চতুরাং থুক্। পা ৫।২।৫১)
টিষাৎ স্থিরাং ভীপ্। ১ ব্যাকরণ পরিভাষিত বিভক্তিবিশেষ,
ঙে, ভ্যাম্ ও ভাস্ এই তিনটি রূপকে চতুর্থী বলে।
সম্প্রদানকারক, ক্রিয়াযোগ ও ভাদর্য্য প্রভৃতি অর্থে চতুর্থী
বিভক্তি হয়। [বিভক্তি দেখ।]

২ তিথিবিশেষ, চন্দ্রের চতুর্থকলা। চতুর্থী দুইপ্রকার
শুক্লপক্ষীয়া ও কৃষ্ণপক্ষীয়া। অমাবাস্তার দিনে চন্দ্রের সম্পূর্ণ
অক্ষর্যন হয়, তৎপরে যে দিনে অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী চতুর্থদিনে
চন্দ্রের চারিকলা উদিত হয়, তাহার নাম শুক্লপক্ষীর চতুর্থী
এবং পূর্ণিমার পরবর্ত্তী চতুর্থদিনে চন্দ্রের চারিকলা ক্ষয় হয়,
তাহাকে কৃষ্ণপক্ষীর চতুর্থী আনিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থী তিথিতে
যে সকল কার্য্য বিহিত আছে, সেই সকল কার্য্য চতুর্থী-
কার্য্য নামে উল্লিখিত হয়। উভয়দিনে চতুর্থী তিথি
ঘটিলে কোনদিনে চতুর্থী কার্য্য করিবে, ইহার মীমাংসা
সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক মতামত লক্ষিত হয়। শ্রুতিসংগ্রহ-
কারগণও এ বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। রঘু-
নন্দনের মতে বিশেষ বিধান না থাকিলে যেদিনে চতুর্থীর

সহিত পঞ্চমীর যোগ থাকিবে, সেই দিনেই চতুর্থীকার্য করিতে হয়।

“একাদশীমী যদী অমাবাসী চতুর্থিকা।

উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তাঃ পরাঃ পূর্ণেন সংযুতা।”

অগ্নিপূরণের এই বচনে পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থী তিথির উল্লেখ থাকায় বিশেষ স্থল ভিন্ন সর্বত্রই পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীতে কার্য করা উচিত। কেহ কেহ বলেন যে ব্রহ্মবৈবর্তপূরণের—

“চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়াচ চতুর্থিকা।

তৃতীয়ায়া যুতা নৈব পঞ্চম্যা কারণে কচিৎ ॥”

এই বচন অনুসারে তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীতেই কার্য্য করিবে, পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীতে কার্য্য করিতে নাই। এই মতটী ঠিক নহে, কারণ ব্রহ্মবৈবর্তের ঐ বচনটী বিনায়কব্রতপ্রকরণে বলা হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মবৈবর্তবিহিত বিনায়কব্রতেই তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীর বিধান, সাধারণ চতুর্থী কার্য্যে ঐ বচনের সংশয় নাই। (তিথিতত্ত্ব) কালমাধবীয় চতুর্থী প্রকরণেও এইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। [ইহার অপর বিবরণ তিথি ও বিনায়কব্রত প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চতুর্থীর প্রদোষকে গাণপত বলে। ইহাতে অধায়ন করিতে নাই।

“ত্রয়োদশাশ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশীতিথিঃ।

প্রদোষে হধ্যায়নং দীমান্ ন কুর্বাতি যথাক্রমম্।

সারস্বতো গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণব স্তথা।”

হেমাদ্রির মতে প্রদোষ শব্দের অর্থ রাত্রির প্রথম প্রহর। নির্ণয়ামৃতপ্রণেতা ভোজদেবের মতে প্রদোষ শব্দের অর্থ রাত্রি।

ভাদ্রমাসের চতুর্থীতিথিতে চন্দ্র দেখিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। সেইদিন চন্দ্র দেখিবে না। [নষ্টচন্দ্র দেখ।]

চতুর্থী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি পুত্রবধু ও মিত্রদ্বীর প্রতি অমুরাগী, স্নাত ভোজনান্তিলাষী, দয়ালু, বিবাদ শীল, ক্ষয়ী ও কঠোর প্রকৃতি হয়।

“স্বপুত্রমিত্রপ্রমদা প্রমোদী স্নাত্তিলাষী কুপয়া সমেতঃ।

বিবাদশীলো বিজয়ী বিবাদে ভবেচ্চতুর্থীপ্রভবঃ কঠোরঃ ॥”

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

চতুর্দশী (জি) চতশ্রো দংষ্ট্রা যন্ত বছরী। ১ যাহার চারিটা দংষ্ট্রা আছে। (পুং) ২ কাত্তিকের সৈন্ত। ৩ দানব বিশেষ, বলির সৈন্ত। (ভারত।) ৪ পরমেশ্বর।

চতুর্দশী (পুং) চত্বারো দন্তা যন্ত বছরী। ১ ঐরাবত, ইন্দ্রবাহন-হস্তী। (জি) ২ যাহার চারিটা দন্ত আছে।

চতুর্দশ (জি) চতুর্দশানাং পূরণঃ চতুর্দশন্-ডট। চৌদসংখ্যার পূরণ; যাহাযারা চতুর্দশ সংখ্যার পূরণ হয়।

চতুর্দশা (অব্য) চতুর্দশ প্রকারার্থে ধা। চতুর্দশ প্রকার, চৌদ রকম। “এতাবানৈবাণ্ডকোষো বশ্চতুর্দশা পূরণেযু বিকল্পিতউদগীয়তে।” (ভাগবত ৫:২৬:৩৮)

চতুর্দশান্ (জি) [বহ] চতুরধিকাদশ মথালো। ১ চতুরধিক দশসংখ্যা, চৌদ। ২ চতুর্দশ সংখ্যায়ুক্ত।

“চতুর্দশাং কৃতবান্ কৃতঃস্বয়ং নবেদ্বি বিদ্যাসু চতুর্দশস্বয়ম্।”

(নৈষধঃ ১:১৪)

কবিকল্পলতার মতে বিদ্যা, যম, মমু, ইন্দ্র, ভুবন ও অবতারক এই ছয়টা চতুর্দশ সংখ্যার বাচক।

চতুর্দশগ্রন্থিস্তু ও, যাহাদের গুণে চৌদটা গ্রন্থ থাকে, যথা কেয়ো।

চতুর্দশবিদ্যা (জী) [বহ] বেদ প্রভৃতি চতুর্দশ বিদ্যা। চার বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও তর্কশাস্ত্র এই চৌদটাকে চতুর্দশ বিদ্যা বলে।

“বিদ্যাশ্চতুর্দশ প্রোক্তাঃ ক্রমেণকু যথা স্থিতি।

ষড়ঙ্গমিশ্রিতা বেদা ধর্মশাস্ত্রং পুরাণকম্।

মীমাংসা তর্কমপিচ এতাবিদ্যাশ্চতুর্দশ।” (নন্দিপূরণ)

চতুর্দশভুবন (জী) চতুর্দশানাং ভুবনানাং সমাহারঃ, বিষ্ণু। চৌদভুবন, সপ্তসর্গ ও সপ্ত পাতাল।

চতুর্দশাঙ্গকাথ (পুং) পাচন বিশেষ। দশ মূলের সহিত চিরাতা, মুখা, গুড়ুচী ও গুট মিশাইয়া পাচন প্রস্তুত করিলে তাহাকে চতুর্দশাঙ্গ কাথ বলে। ইহা সেবনে চিরজ্বর, বাত ও কফোদগ, এবং সন্নিপাত জ্বর ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

চতুর্দশী (জী) চতুর্দশ-তীপ্। তিথি বিশেষ, চন্দ্রের চতুর্দশ কলা ক্রিয়ারূপ, ইহার অপর নাম ভূতা। চতুর্দশী ছইটা কৃষ্ণপক্ষীয়া ও শুক্লপক্ষীয়া। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে চতুর্দশী তিথিতে যে সকল কার্য্য বিহিত হইয়াছে তাহাকে চতুর্দশীকার্য্য বলে। উভয় দিনে চতুর্দশী প্রাপ্তি ও কার্য্যাহুষ্ঠান সম্ভব হইলে যে দিনে পূর্ণিমার যোগ থাকে, সেই দিনে চতুর্দশী বিহিত কার্য্য করা উচিত। কিন্তু কৃষ্ণ পক্ষে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশীতে কার্য্য করিতে হয়। পক্ষভেদে এই ছই রকম ব্যবস্থা হইয়া থাকে। (১) উপবাসাদি কার্য্যে এই নিয়ম জানিবে।

চতুর্দশী তিথি অপরাহ্নব্যাপিনী হইলে শুক্ল চতুর্দশী ও পূর্ণবিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দশী গ্রহণ করা উচিত। রঘুনন্দনের মতে শিববিষয়ক ব্রতাদিতেই এই

(১) “কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী চৈব কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী। পূর্ণবিদ্ধেব কর্তব্য। পরবিদ্ধা ন কুর্জিৎ। শুক্ল চতুর্দশী গ্রাহ্য। পরবিদ্ধা সদাভতে।” (স্মৃতি)

নিয়ম, অপরাপর স্থলে গুরুপক্ষীয় চতুর্দশী পরবিজ্ঞাই গ্রহণ করিবে (২)।

চতুর্দশী তিথিতে বাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি বিরুদ্ধশীল, রোষযুক্ত, চোর, কঠোর স্বভাব, বঞ্চক, পরামর্ভাজী এবং পরদারিত হয় (৩)।

ভিন্ন ভিন্ন মাসের চতুর্দশী তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার বিধান আছে। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর নাম সাবিত্রী চতুর্দশী, এই দিনে সাবিত্রীব্রত ও জীলোকের পক্ষে ভক্তি পূর্ণক স্বামী পূজা করা কর্তব্য। [সাবিত্রীব্রত দেখ।] ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর নাম অঘোরা চতুর্দশী। [অঘোরা দেখ।] ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্দশীকে অনন্তচতুর্দশী বলে। এই দিনে অনন্তব্রত, ডোরক ধারণ এবং চতুর্দশ পিষ্টক ভক্ষণ করা উচিত। [অনন্তব্রত দেখ।] কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীকে ভূতচতুর্দশী বলে, এই দিন চতুর্দশ শাকভক্ষণ, চতুর্দশ দীপদান ও যমতর্পণ করা কর্তব্য। [ভূতচতুর্দশী দেখ।] অগহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দশীতে গৌরীপূজা ও পাষণাকার পিষ্টক ভক্ষণ করা উচিত। কেহ কেহ ইহাকে পাষণচতুর্দশী নামে উল্লেখ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর নাম রটন্তী চতুর্দশী। ইহাতে কাণীপূজা ও অরুণোদয় সময়ে স্নান করা কর্তব্য। [রটন্তী দেখ।]

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর নাম শিবচতুর্দশী, ইহাতে শিবরাত্রিব্রত, উপবাস ও শিবপূজা কর্তব্য। [শিবরাত্রি দেখ।] চৈত্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে মদনবৃক্ষের পল্লবে কামদেবের পূজা করা উচিত। [মদনপূজা দেখ।]

চতুর্দিক্ (চতুর্দিশ্ শব্দজ) চারিদিক্।

চতুর্দিশ্ (ক্ৰী) সংজ্ঞার্থে কর্মধা°। পূর্ণ প্রভৃতি চারিদিক্।

“শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্সমাবৃত্তাম্।” (কালীদাস)

চতুর্দিশ্ (ক্ৰী) চতুঃসংঃ দিশানাং সমাহারঃ দ্বিগু°। চারিদিক্।

“চতুর্ভিন্নামভিশ্চতুর্দিশমভিশ্চতুর্দশী।” (ভাগবত ৫।১৭।৫)

চতুর্দোল (পুং ক্ৰী) চতুর্ভির্বাহকৈর্দোলাতে উৎক্লিপ্যতে উহাতে দোলি ঘণ্। স্নানমথ্যাত যান বিশেষ, চারিজনের বহনীয় শিবিকা, চলিত কথায় চণ্ডোল, চন্দোল বা চৌদোল বলে।

“রাজ্ঞো যদিপদং যানং বিশেষাথামলং বিভূঃ।

চতুর্ভিক্ষহতে যন্তু চতুর্দোলং তত্চাতে ॥” (যুক্তিকল্পতরু)

ভোজরাজের মতে যে যান চারিজন লোকে বহন করে

(২) “চতুর্দশীতু কর্তব্য। ত্রয়োদশাযুতা বিভো।

মমভক্তৈর্মহাবাহো ভবেদ্ বা চাপরাহ্নিকী।” (তিথিতত্ত্ব)

(৩) “বিরুদ্ধশীলঃ পুরুষঃ সরোবন্দোরকঠোরঃ পরবঞ্চকঃ।

পরামর্ভাজ্ঞা পরদারিত্ত্বচতুর্দশী চেৎ জন্মন্ত কালে।” (কোজীশ°)

এবং সাহাতে ৬টি রঙ ও কুম্ভ এবং আটটি স্তম্ভ থাকে, তাহার নাম চতুর্দোল। চতুর্দোল চারিপ্রকার—জয়চতুর্দোল, কল্যাণচতুর্দোল, বীরচতুর্দোল ও সিংহচতুর্দোল। চারিপ্রকার রাজার পক্ষে যথাক্রমে এই চারি রকম চতুর্দোল ব্যবহারের যোগ্য।

যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য তিন হাত, বিস্তার ৩ উচ্চতা দুই হাত তাহার নাম জয়। চারি হাত দীর্ঘ, আড়াই হাত বিস্তৃত ও আড়াই হাত উচ্চ চতুর্দোলকে কল্যাণচতুর্দোল বলে। চতুর্দোল দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত, বিস্তারে তিন হাত ও উচ্চতায় বিস্তারের সমান হইলে তাহার নাম বীরচতুর্দোল। যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার চারি হাত ও উচ্চতা ২ হাত তাহার নাম সিংহচতুর্দোল।

কতকগুলি চতুর্দোলে ছাদ দেওয়া হয়, তাহাদিগকে সচ্ছদি চতুর্দোল বলে। ছাদহীন চতুর্দোলের নাম নিশ্ছদি-চতুর্দোল। সমরস্থল ও বর্ষাকালে সচ্ছদি বা ছাদযুক্ত এবং কেলি ও অপরকালে ছাদহীন বা নিশ্ছদিচতুর্দোল ব্যবহার করা উচিত। চতুর্দোলের বজ্রধারণ (?) দণ্ড সকল রকম কাঠেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু চন্দন দ্বারা সকল দণ্ড পরস্পর মিলিত করা উচিত, মহীপতিগণের চতুর্দোলে বহ্নিনির্মিত লোলজ, কনক, কুম্ভ ও পদ্মকোষ স্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া দর্পণ, অর্দ্ধচন্দ্র, হংস, ময়ূর, শুক প্রভৃতি মনোহর প্রতিমূর্তিও করিতে হয়। চতুর্দোলে মণির নিয়মদণ্ডের স্থায় জানিবে। ইহাতে পতাকা দিতে হয়। রক্ত, গুরু, পীত, কৃষ্ণ, চিত্র, অরুণ, নীল বা কপিল ইহার যে কোন রঙের পতাকা হইতে পারে। পতাকা-যুক্ত চতুর্দোলকে শুভযান বলে। ইহার উপরে চাষপক্ষীর পাখার পুচ্ছ যোজনা করিলে তাহাকে যাত্রাদিকি নামক চতুর্দোল বলে। কোন কোন চতুর্দোলে ধ্বজ দিবারও নিয়ম আছে। তাহাকে সধ্বজ ও ধ্বজহীন চতুর্দোলকে নিধ্বজ চতুর্দোল বলে। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু) [অপর বিবরণ যান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চতুর্দ্বার (ক্ৰী) চত্বারি দ্বারানি যন্ত। ১ চারিমুখ গৃহবিশেষ। সমাহারঃ। ২ চারিদ্বার।

“মণ্ডপং কারয়েত্তত্র চতুর্দ্বারসমবৃত্তম্।” (হেমাদ্রি।)

চতুর্দ্বীপচক্রবর্তিন্, চতুর্দ্বীপের সম্রাট। (সদ্ধর্মপুণ্ডরীক)

চতুর্ধর, গণপতিগীতার একজন ভাষ্যকার।

[নীলকণ্ঠ হরি দেখ।]

চতুর্ধরশিব, শিবমহিমস্তবের একজন টীকাকার।

চতুর্থা (অব্য) চতুঃপ্রকারঃ ধা। (সংখ্যার বিধার্থে) ধা।

পা ৪।৩।৪২।) ১ চারি খণ্ড। “বাক্যগোষ্ঠ চমসং চতুর্ভা” (অঙ্ক ৪।৩৪।৩) ২ চারি প্রকার। ৩ চারিবার।

চতুর্ধাম, মথুরাধ চারিধাম, রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও হারকানাথ। (ভক্তমালা)

চতুর্বাছ (পুং) চক্ষুরো বাহুবো যন্ত। ১ বিষ্ণু।

“পীতাম্বরং চতুর্বাছং শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষসম্।”

দেবীভাগ* ১।৪।৩৪।

২ শিব। (শিবসহস্রনাম)

চতুর্ভুজ (স্ত্রী) চতুর্গাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ভদ্রাণাং সমাহারঃ। ১ ধর্মার্থকামমোক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ ধর্মার্থকামমোক্ষযুক্ত।

“স চেন্নমার সজয়। চতুর্ভুজতরঙ্গরা” (ভারত ভ্রোণ)।

চতুর্ভাগ (পুং) চারিভাগ। এক চতুর্থাংশ, সিকি।

“স রাজা তচ্চতুর্ভাগং দাপাস্তত্চ চ তক্রনম্।” (মহু ৮।১৭৬।)

চতুর্ভুজ (পুং) চক্ষুরো ভূজাঃ ১ চতুর্বাছ বিষ্ণু। ২ বিষ্ণুর অবতার বাহুদেব। “তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।” (গীতা) (স্ত্রী) ৩ চতুর্কোণক্ষেত্র (Square) (ত্রি) ৪ বাহার চারিটা হাত আছে। “মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।” (শ্রীমারং) চতুর্গাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ভূজঃ। ৫ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষভাজন। জিয়ারং টাপ্। ৬ গায়ত্রী-রূপা মহাশক্তি। (দেবী ভাগ* ১২।৬।৪৭)

চতুর্ভুজ, একজন পরম বৈষ্ণব রাজা। ইনি করুরি নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। বৈষ্ণব পাইলেই ইনি পরম সমাদরে তাঁহার সেবা করিতেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার এক বিপক্ষ রাজা একজন ডোমকে বৈষ্ণব সাজাইয়া চতুর্ভুজের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত চতুর্ভুজ কোন সূত্রে তাহা জানিতে পারিয়াও বৈষ্ণববেশী ডোমের যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেন এবং বহুমূল্য জরির কাপড়ে একটা কাণাকড়ি বাধিয়া উক্ত রাজাকে উপহার দিবার জন্য ডোমের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দেন। রাজা ডোমের নিকট হইতে সেই কাণাকড়িটা লইয়া সভ্যদিগকে দেখাইয়া বলেন, যে “আমার পরমশত্রু চতুর্ভুজ এইরূপে কি আমায় পরিহাস করিল?” তখন একজন সভ্য রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “মহারাজ! পরিহাস নয়, আপনার ভ্রমসংশোধনের জন্য তিনি এমন করিয়াছেন। মনে করুন কাণাকড়ি ডোম, আর জরির কাপড় বৈষ্ণববেশ, স্তরায় বৈষ্ণববেশ হইলে ডোমকেও বৈষ্ণবের ভায় ভক্তি-প্রদা করা কর্তব্য।” সভ্যের কথায় রাজার চৈতন্য হইল, তিনি অজ্ঞায় কার্য্য করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি চতুর্ভুজের নিকট গিয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহার

নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে উভয়ে পরমা-নন্দে বৈষ্ণব ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। (ভক্তমালা)

চতুর্ভুজ, ১ একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি অদ্বুতগাপরমার নামে একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করেন।

২ অশৌচসংগ্রহ ও অষ্টাদশসংস্কার নামে ধর্মশাস্ত্রকার, রঘুনন্দন ইহার নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ বিজয়রামাচার্যের গুরু, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রণেতা।

৪ সৃষ্টিকরণটীকা নামে জ্যোতিষশাস্ত্রকার।

৫ কোম্বুদেশের একজন চেররাজ, গোবিন্দের পুত্র।

চতুর্ভুজদাস, গোফুলনিবাসী বিটঠলনাথের একজন শিষ্য, অষ্টছাপের অন্তর্গত, একজন হিন্দী কবি। শিবসিংহ ও কৃষ্ণানন্দ বাসদেব ইহার ব্রজবুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি ব্রজভাষায় ভাগবতের ১০ম স্কন্দ অনুবাদ করেন।

চতুর্ভুজপণ্ডিত, একজন বিখ্যাত নৈরায়িক। ইনি তত্ত্বচিন্তা-মণিদীপ্তিবিম্বার রচনা করেন।

চতুর্ভুজমিশ্র, ১ অমরশতকের ভাবচিন্তামণি নামে একজন টীকাকার।

২ পণ্ডিত শিবদত্তমিশ্রের পিতা এবং গোবিন্দের রচিত রসহৃদয়ের একজন টীকাকার।

চতুর্ভুজমিশ্র উপমন্যব, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ। ইনি সংস্কৃতভাষায় সংক্ষেপ মহাত্ম্যরত্ন, মহাত্ম্যরত্নটীকা ও দেবীমাহাত্ম্যের হর্গাবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন।

চতুর্ভুজরস (পুং) বৈদ্যাকোক্ত ঔষধ বিশেষ। রসসিন্দুর ছই ভাগ, স্বর্ণ, কস্তুরী, হরিভাল, মনঃশিলা প্রত্যেকের এক ভাগ স্নতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরও পাতায় জড়াইয়া ধাতু রাশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে। রোগীর রোগবল বিবেচনা করিয়া ত্রিফলা চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করাইলে বলী পলিত, অপমায় অর, কাশ, শ্বাস, শোথ, মল্লমি, ক্ষয়, হাত-কাঁপা, মাথাকাঁপা, গাঁকাঁপা এবং বাত, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি নিবারিত হয়। (রসেন্সসারসং)

চতুর্ভুজী, এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক একজন সাধু ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে সেই সাধু কোন সময়ে চতুর্ভুজ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্প্রদায়ের নাম চতুর্ভুজী হইয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহারও তিলকধারণ রামানন্দীদিগেরই মত, কেবল ইহার ললাটে শ্রী ধারণ করে না।

চতুর্মহারাজকায়িক, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মহাদীপ্তিশালী দেবতা বিশেষ। (বুৎপত্তি)

চতুর্মুখ (পুং) চক্ষুরি মুখানি অস্ত। ১ ব্রহ্মা। [ব্রহ্মা দেখ।]

২ বিষ্ণু। (রঘু ১০।২২) (ক্ৰী) ৩ চতুর্ভার গৃহ। (ত্রি) ৪ চারি মুখযুক্ত। ত্রিমাং ৩। পূ। (ক্ৰী) ৫ চারখানি মুখ।

“পুরাণত কবেস্তত চতুর্মুখসমীকিতা।” (কুমার ১।১৭)

(পুং) ৬ ঔষধবিশেষ। [চতুর্মুখরস দেখ।]

চতুর্মুখরস (পুং) ১ বৈদ্যকোক্ত ঝাভব্যাদির ঔষধবিশেষ।
বর্ণ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অস্ত্র, প্রত্যেকের এক এক ভাগ,
স্বতকুমারীর রসে মাড়িয়া পরে এরও পত্রে বেটন করিয়া
ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। দুই রতি পরিমাণে ত্রিকলা
কাথের সহিত সেবনে সর্করোগ বিনষ্ট হয়। ইহা পুষ্টিকারক,
বলকর ও একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগনাশক। (রসেন্সসারসং)

২ মুখরোগের ঔষধবিশেষ। রসসিন্দুর এক ভাগ, বর্ণ এক
ভাগ ও মনঃশিলা দুই ভাগ একত্র করিয়া অতসীতলে মাড়িয়া
ও শিঙ করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া অতসীফল গুঁড়া করিয়া
লেপ দিবে, পরে দোলাষত্রে তিন দিন পাক করিবে। ইহা
মুখে রাখিলে জিহ্বা, দন্ত ও মুখরোগ ভাল হয়। (রসেন্সসারসং)

চতুর্মুখস্থান, ব্রহ্মাবনহ একটি ভৌগোলিক। এখানে ব্রহ্মা
তপস্তা করেন। বর্তমান নাম চৌমুহা।

চতুর্মূর্তি (পুং) পরমেশ্বর, যিনি বিরাট, হ্রদ্রাশ্রা, অব্যাকৃত
ও তুরীয় এই চারি মূর্তিতে আছেন।

‘চতশ্রো মূর্তয় বিরাটহ্রদ্রাশ্রাব্যাকৃততুরীয়াশ্রানোহন্ত।’

(বিষ্ণুসহস্রনামতাব্যো শঙ্করাচার্য্য)।

চতুর্যুগ (ক্ৰী) চতুর্গাং যুগানাং সমাহারঃ। সত্য, ত্রেতা,
দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ; দৈবমানে ইহার বর্ষ পরিমাণ
৪৩২০০০০। [যুগ দেখ।]

চতুর্যুজ (ত্রি) চতুর্ যুজ-কিপ্। চারিটি (বৃষ) দ্বারা যুক্ত বা
আকর্ষিত। “চতুর্যুজো যুনক্ত্যপরাংসুক্ষীং বহির্বৈদি বোড়শ।”

(কাত্যায়নশ্রোত ১৪।৩।১১)

‘একৈকস্মিন রথে চতুরশ্চতুরোহস্থান্যুনুক্তি।’ (ভাষ্য)

চতুর্ভক্ত (পুং) চত্বারি বক্তৃগ্যাগত। ১ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ২ দানব-
বিশেষ। (হরিবংশ)।

চতুর্ভয় (ত্রি) চত্বারো বয়া অবয়বা যন্ত। চতুর্ভূহ।

“সম্বন্ধকুতা চতুর্ভয়ং।” (শুক ১।১১০।৩)

‘চতুর্ভয়ং চতুর্ভূহং * * বয়া অবয়বা যন্ত স।’ (সারণ)।

চতুর্ভগ (পুং) চতুর্গাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বর্গঃ সমূহঃ। ধর্ম,
অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

‘ত্রিভগৌ ধর্মকামার্থাশ্চতুর্ভগঃ সমোক্ষকাঃ।’ (হেম ৬।১৮)

চতুর্ভগচিন্তামণি, হেমোজিকৃত এক বৃহৎমূর্তিনিবন্ধ।

[হেমোজি দেখ।]

চতুর্ভগ (পুং) চত্বারো বর্গাঃ সংজ্ঞাষাৎ ৭ সমাহারঃ বিষ্ণু।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্গ। স্বার্থে ভাবে বা
ব্যঞ্জে। চাকুবর্ণ্য।

চতুর্ভগাদি, সিদ্ধান্তকোমুদীযুক্ত একটি গণ।

“চতুর্ভগাদীনাং স্বার্থ উপসংখ্যানম্।” সিং কোং।

চতুর্ভগ, চতুরাশ্রম, সর্কবিদ্যা, ত্রিলোক, ত্রিশ্বর, বড়শুণ,
সেনা, অনন্তর, সমীপ, উপমা, সুখ, তদর্থ, ইতিহ, মণিক এই
কয়টি শব্দ চতুর্ভগাদি গণান্তর্গত।

চতুর্ভগিক (ক্ৰী) চারিবর্ষের গাতি।

‘চতুর্ভগিকীণ্যেচ্ছকায়ণ্যোকাদিবর্ষিকা।’ (হেম ৪।৩৮)

চতুর্ভাহিন (পুং) চতুঃ বহু-গিনি। রথবিশেষ, যে রথ চারিটি
(অশ্বে) বহন করিয়া লইয়া যায়। (পঞ্চবিংশত্যাং ১৬।১৩)

চতুর্বিংশ (ত্রি) চতুর্বিংশতে: পুরণঃ ভূতি। চব্বিশ সংখ্যার
পুরক। (ক্ৰী) ২ একাহ যাগবিশেষ।

“অতিরাজাচতুর্বিংশমহরয়িষ্টোম উক্খ্যো বা।”

(কাত্যায়নশ্রোত ১৩।২।২)

চতুর্বিংশতি (ক্ৰী) চতুরধিকা বিংশতি। ১ চব্বিশ, ২৪।

২ বাহাতে চব্বিশ সংখ্যা আছে। (শুক্ল যজুঃ ১৪।২৫)

চতুর্বিংশতিক (ত্রি) চতুরধিকা বিংশতি যত্র কপ্। ১ চতু-
বিংশসংখ্যায়ুক্ত, বাহাতে ২৪ সংখ্যা আছে। (পুং) সাংখ্যোক্ত
চতুর্বিংশতিতত্ত্ব।

“পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ ব্রহ্মচতুর্ভির্দশতি স্তথা।

এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিহুঃ।”

(ভাগবত ৩।২৬।১) [সাংখ্য দেখ।]

চতুর্বিংশতিতম (ত্রি) চব্বিশ সংখ্যার পূরণ, চতুর্বিংশ।

চতুর্বিংশতিমূর্তি (ক্ৰী) বিষ্ণুর হস্ত ও চক্রাদিবিদ্যাসভেদে
২৪টি মূর্তিভেদ। অগ্নিপুরণে এই চতুর্বিংশতি মূর্তির এইরূপ
বর্ণনা আছে—

মূর্তির নাম	উপরের ডান	নীচের ডান	উপরের বাম	নীচের বাম হাত
১ কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
২ নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৩ মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪ গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৫ বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৬ মধুসূদন	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা
৭ ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
৮ বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
৯ ত্রীধর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১০ দ্বীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
১১ পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১২ দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র

মূর্তির নাম	উপরের ডান	দীর্ঘের ডান	উপরের বাম	দীর্ঘের বাম হাত
১৩ বাহুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৪ লক্ষ্মণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৫ প্রহ্লাদ	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৬ অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৭ পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১৮ অধোক্ষ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৯ নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
২০ অচ্যুত	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
২১ উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
২২ জনার্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২৩ হরি	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
২৪ কৃষ্ণ	শঙ্খ	গদা	শঙ্খ	চক্র

চতুর্বিদ্যা (স্ত্রী) চতুঃ বিদ্যা সংজ্ঞায়াং কর্মধা। ১ অর্ক, যজুঃ, সাম ও অথর্ক এই চারি বিদ্যা। চতুঃ বেদস্বরূপা বিদ্যা অস্ত। ২ চতুর্বেদাভিজ্ঞ। [চতুর্বেদ্য দেখ।]

চতুর্বিধ (ত্রি) চতুস্তো বিধা যন্ত। চারি প্রকার।

“এতচ্চতুর্বিধং গ্রাহঃ সাক্ষাৎকর্তৃত্ব লক্ষণম্।” (মহু ২।১২)

চতুর্বিজ (স্ত্রী) চতুর্গং বীজানাং সমা। মেঘি, চন্দ্রশূর (হালিম্), কালজীরে ও যমানী এই চারি মিলিত দ্রব্য। ভাবপ্রকাশ মতে ইহা নিত্য ভক্ষণ করিলে বায়ু, আমর, অজীর্ণ, শূল, আশ্বান, পার্শ্বশূল ও কটিতে বেদনা দূর হয়।

চতুর্বার (ত্রি) ১ চারিদিন সাধ্য সোমযাগবিশেষ।

“অত্রিচতুর্বারজ্ঞানদগবসিষ্টসংসর্গবিধামিত্রা।”

(কাত্যায়নশ্রৌতসূ. ৩২।২।১৩।)

২ অগ্নিবিশেষ।

“চতুর্বারং নৈখাতেত্যচতুর্ভ্যো।” (অথর্ক ১৯ ৪৫।৫।)

চতুর্ব্ব (ত্রি) চত্বারো বৃষা যস্য বহত্ৰী। যাহার চারিটি বৃষ আছে। “যদি চতুর্ব্বোহসি স্বজারসোহসি।” (অথর্ক ৫।১৬।৪)

চতুর্বেদ (পুং) চত্বারো বেদা অস্য বহত্ৰী, চত্বারো বেদান্ যেতি অধীতে বা বিদ্ অণ-উপপদসং। ১ পরমেশ্বর।

“চতুর্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুরাশ্বা সনাতনঃ।” (হরিবংশ ২৩৮ অঃ)

(ত্রি) ২ চতুর্বেদাভিজ্ঞ। ৩ যিনি চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। (পুং) [বহ] চত্বারশ্চ তে বেদা শ্চেতি কর্মধা। ৪ চারিবেদ।

চতুর্বেদপুর, বারাগণী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য ব্রহ্মণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—“স্বর্গ-ভূমির মধ্যভাগে এবং কাশী হইতে প্রায় বোজন খানেক পথদূরে চতুর্বেদপুর অবস্থিত। পূর্বকালে কাশীরাজ গোমতীগঙ্গাদ্বারা সোমযজ্ঞ করেন, তিনি কাশীকুল হইতে

চতুর্বেদপারগ কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনিয়া সেই যজ্ঞ সমাধা করেন। দক্ষিণাশ্রুতগণ তাঁহাদিগকে একখানি গ্রাম দেওয়া হয়। চতুর্বেদাদিগের বাসহেতু সেই গ্রামের নাম চতুর্বেদপুর হইয়াছে। স্ববনাধিকারকালে এখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বড়ই অভাব হয়, তৎকালে অনেক ব্রাহ্মণ নেপালরাজ্যে পলায়ন করেন। বিক্রমশালকের অন্তে স্ববমেরা এখানে সোমযজ্ঞ করিবে, সেই পাপে এই গ্রাম বিধ্বস্ত ও পাতাল-গামী হইবে।” (ভা.ব্রহ্মণ্ড ৫৬।৪৭-৫৬)

চতুর্বেদবিৎ (পুং) চত্বারোবেদান্ বেত্তি বিদ্-কিপ্। ১ বিজ্ঞ।

“চতুরাশ্বা চতুর্ভাবশ্চতুর্বেদবিদেকপাং।” (বিষ্ণুসহ)

(ত্রি) ২ চতুর্বেদাভিজ্ঞ।

চতুর্বেদিন্ (ত্রি) চত্বারোবেদাঃ সজ্ঞাত চতুর্বেদ-ইনি। যাহার চারিটি বেদ আছে, যিনি চারিবেদ জানেন।

চতুর্ব্বাহ (পুং) চত্বারোব্বাহ যন্ত বহত্ৰী। ১ বিজ্ঞ।

“চতুর্ব্বাহশ্চতুর্গতিঃ।” (বিষ্ণুসহ) ভাষ্যকারের মতে শরীর-পুরুষ, হৃদয়পুরুষ, বেদপুরুষ ও মহাপুরুষ রূপ চারিব্বাহ আছে বলিয়া বিজ্ঞকে চতুর্ব্বাহ বলা হয়। (ভাষ্য)

পুরাণের মতে বিষ্ণু সৃষ্টি প্রকৃতি কার্যের জন্য চারি-ভাগে বিভক্ত হইয়া বাহুদেব, লক্ষ্মণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারিমূর্তিতে অবতীর্ণ হন, অতএব ঐ চারিটি মূর্তিরূপ ব্বাহচতুষ্টয় থাকায় বিষ্ণুর নাম চতুর্ব্বাহ হইয়াছে।

“ব্রাহ্মান্যনং চতুর্ধাতব বাহুদেবাদিমুষ্টিভিঃ।

সৃষ্টাদীন্ প্রকরোত্যোষ বিপ্রতাস্মা জনার্দনঃ।” (বিষ্ণুপুরাণ)

(স্ত্রী) ২ চিকিৎসাশাস্ত্র।

চতুর্হুত্ব (ত্রি) চত্বারোহনবো যন্ত বহত্ৰী। ১ যাহার চারিটি হুত্ব আছে। (পুং) ২ দানববিশেষ।

চতুর্হায়ণ (ত্রি) চত্বারোহায়না যন্ত বহত্ৰী গণ্ডং। যাহার বয়স চারিবৎসর। জৌলিঙ্গে ভীপ্ হয়। হায়ন শব্দে বয়স না বুঝাইলে গণ্ড বা জৌলিঙ্গে ভীপ্ হয় না।

চতুর্হোত্ (পুং) চত্বারশ্চ তে হোতারশ্চেতি কর্মধা। ১ চারি জন হোতা।

“চতুর্হোতার আশ্রমশ্চাতুর্মাস্তানি নীবিদঃ।” (অথর্ক ১১।৭।১৯)

চত্বারোহোতারো যন্ত বহত্ৰী। ২ বিজ্ঞ।

“চাতুরাশ্রম্যবেত্তা চতুর্হোতা মহাকবিঃ।” (হরিবংশ ১৭৯ অঃ)

চতুর্হোত্র (পুং) চত্বারি হোত্রাণি হোমা যন্ত বহত্ৰী। বিজ্ঞ, পরমেশ্বর।

“চতুর্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুরাশ্বা সনাতনঃ।” (হরিবংশ ২৩৮ অঃ)

চতুর্হোত্রক (স্ত্রী) চত্বারো হোতারো যজ্ঞ কর্মণি বহত্ৰী কপ্। নিপাতনে সাধু। যে কর্মে চারিটি হোতা আছে, যজ্ঞ।

“অথবা চতুর্হোজকবিদ্যারিচ।” (ভাগবত ৭।৩।৩০) ‘চত্বারো হোতারো যত্র তৎচতুর্হোজকং কৰ্ম’ (ঐধর।)

চতুল (জি) চত-উল্। স্থাপরিভা, যে স্থাপন করে।

(সংক্ষিপ্তসাং উপাদিঃ)

চতুষ্কর (ক্ৰী) কল্পবামলোক একটা চক্র, ইহা দ্বারা মন্ত্রের শুভাশুভ বিচার করা যাইতে পারে। এই চক্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম—প্রথমে পূর্বপশ্চিমে পাঁচটা রেখা টানিয়া তাহার উপরে উত্তরদক্ষিণে আর পাঁচটা রেখা টানিলে ১৬টা কোঠবৃত্ত একটা চক্র হয়। ঐ চক্রটির প্রথম চারি কোঠ, সিদ্ধ, শীতল, জপ ও সিদ্ধ, তাহার ডানদিকের কোঠ চতুষ্কর আল্লাদ, প্রত্যার, মুখ্য ও শুদ্ধ, ইহার অধোভাগে কোঠচতুষ্কর লৌকিক, সাংখ্যিক, মানসিক ও রাজসিক এবং ইহার বামভাগের কোঠ চতুষ্কর জপ, ক্রিপ্ত, লিপ্ত ও হৃষ্টমন্দ নামে অভিহিত। সিদ্ধ কোঠে আ উ ঙ, শীতল কোঠে আ উ ঙ, জপকোঠে ই ঞ ও এবং সিদ্ধ কোঠে ঙ, ঞ ও এই কটা বর্ণ লিখিবে। এইরূপ আল্লাদে ক খ ঞ, প্রত্যারে গ ঘ চ, মুখ্যে ও ট ঠ, শুদ্ধে ঢ ণ ত, লৌকিকে ধ দ ম, সাংখ্যিকে ধ ন য, মানসিকে প ফ, রাজসিকে ং, জপে ব ভ, ক্রিপ্তে ল ল, লিপ্তে ব ব এবং হৃষ্টমন্দ কোঠে স ও বিন্দু লিখিবে। ইহার নাম চতুষ্কর। ইহার মধ্যে সিদ্ধকোঠে মন্ত্র বর্ণ থাকিলে সাধকের সর্বপ্রকার সুখ-প্রাপ্তি এবং আল্লাদাদি কোঠ চতুষ্করে মন্ত্রবর্ণ স্থিত হইলে শুভাশুভ ফল হয়। জপাদি কোঠ চতুষ্করে স্থিত হইলে সেই মন্ত্রে বিঘ্ন হয়। অর্থাৎ এই চতুষ্কর গৃহে যে করণী বর্ণ আছে, তদ্ব্যতীত অপর মন্ত্র গ্রহণ করিলে ঐহিকে সিদ্ধি ও চরমে মুক্তি হয়। যদি কোন সাধকের হ্রস্বদৃষ্টে জপাদি কোঠ চতুষ্করে মন্ত্রবর্ণ লক্ষিত হয়, তবে ভূতলিপি দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিবে, তাহা হইলে সিদ্ধি হয়। এই চক্র এই প্রকারে অঙ্কিত করিতে হয়।

চতুষ্কর।

সিদ্ধ অ উ ঙ	শীতল আ উ ঙ	আল্লাদ ক খ ঞ	প্রত্যার গ ঘ চ
সিদ্ধ ঙ ঞ ও	জপ ই ঞ ও	শুদ্ধ ঢ ণ ত	মুখ্য ও ট ঠ
জপ ব ভ	ক্রিপ্ত ল ল	লৌকিক ধ দ ম	সাংখ্যিক ধ ন য
হৃষ্টমন্দ স ং	লিপ্ত ব ব	রাজসিক ং	মানসিক প ফ

চতুষ্করারিংশ (জি) চতুষ্করারিংশ—পুরণার্থে-ভট্ট। চূমারিংশ সংখ্যার পুরক, চতুষ্করারিংশতম।

চতুষ্করারিংশ (জী) চতুর্ধিকা চত্বারিংশং মথালো।
১ চতুর্ধিকা চত্বারিংশং সংখ্যা, চূমারিংশ। ২ চতুষ্করারিংশং সংখ্যায়ুক্ত।

চতুষ্করারিংশতম (জি) চতুষ্করারিংশং তমট। চতুষ্করারিংশ।
চতুর্শাল (জি) চতুঃ শালা যত্র বহুত্রী। ১ বাহার চারিটা শালা আছে। (ক্ৰী) চতুঃশালা শালানাং সমাহারঃ বিণ্ড।
২ বিশ্বকর্মে প্রকাশের মতে বাহার অলিন্দে অবচ্ছেদন নাই অর্থাৎ চারিটিকের অলিন্দ পরস্পর মিলিত ও চারিটা দ্বার থাকে, সেই চতুঃশাল বাস্তুকে সর্বতোভদ্র বলে। [চতুঃশাল দেখ।]
“অলিন্দানাং অবচ্ছেদো নাস্তি যত্র সমস্ততঃ।
তদ্বাস্ত সর্বতোভদ্রং চতুর্দ্বারসমবিতম্।” (বিশ্বকর্মে প্রকাশ ২ অঃ)

[গৃহ দেখ।]

চতুর্শৃঙ্গ (জি) চত্বারি শৃঙ্গানি যত্র বহুত্রী। ১ বাহার চারিটা শৃঙ্গ আছে।

“চতুর্শৃঙ্গোহবমীদ পৌর এতৎ।” (শুক ৪।৫।২)
‘চতুর্শৃঙ্গঃ চত্বারি শৃঙ্গানি বেদচতুষ্কররূপাণি যত্র সঃ’ (সারণ।)
(পুং) ২ কুশদীপস্থ একটা বর্ষকর্ত। (ভাগবত ৪।২।১১)

চতুর্শ্রোত্র (জি) চত্বারি শ্রোত্রানি যত্র বহুত্রী। বাহার চারিটা কর্ণ আছে।

“অষ্টাপদী চতুরক্ষী চতুঃশ্রোত্রা শচুর্হুঃ।” (অথর্ব ৫।১৯।৭)
চতুর্ক (জি) চত্বারোহবয়বা যস্য চতুর্কন্। ১ বাহার চারিটা অবয়ব আছে, চতুষ্কর।

“পানতক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব যুগয়াচ যথাক্রমম্।

এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুর্কং কামতো গণে।” (মহু ৭।৫)

২ গৃহবিশেষ। “চতুর্কপুং প্রকরাবকীর্ণয়োঃ

পরোহপি কোনাম তবামুমত্ততে।” (কুমার ৫।৬৮)

৩ ষষ্টিবিশেষ। (শকরস্বাবলী)

(পু) ৪ রাজতরঙ্গিনী-বর্ণিত একজন রাজা। (রাজতরং ৮।২৮৪২)

চতুর্কর (পুং) চত্বারঃ করা যত্র বহুত্রী। ১ যে সকল জন্তর পদের অগ্রভাগ ঠিক হাতের সদৃশ তাহাদিগকে চতুর্কর বলে। (জি) ২ হস্তচতুষ্করযুক্ত, বাহার চারিখানি হাত আছে।

চতুর্করিন্ (পুং) চত্বারঃ করা ভূম্য সন্তাত চতুর্কর-ইনি। যে সকল পণ্ডর পদ চতুষ্করের অগ্রভাগ হস্তরূপে পরিণত।

চতুর্কর্ণ (জি) চত্বারঃ কর্ণা (বিষতরা) বর্তন্তে যত্র বহুত্রী।
১ বাহা কেবল চারি কর্ণে স্ত্রীত হইয়াছে। “ষট্ কর্ণো তিদ্ভাতে মন্ত্রচতুর্কর্ণং স্থিরোভবতি।” (শকতন্ত্র) ২ বাহার চারিটা কর্ণ আছে।

চতুষ্কণী (স্ত্রী) চকার: কণা অত্যং বহুব্রী, ভত: ভীষ। ১
কান্তিকের অমুচরী মাতৃকাবিশেষ। (ভারত ২.৪৭ অঃ)

চতুষ্কল (পুং) চতস্র: কলা মাত্রা যত্র বহুব্রী। ছন্দ:শাস্ত্রশাস্ত্রিক
মাত্রাগণবিশেষ। যে গণে চারিটী মাত্রা থাকে, তাহাকে
চতুষ্কল গণ বলে। এই গণ পাঁচ প্রকার—সর্গশ্লোক, আদিশ্লোক,
মধ্যশ্লোক, অন্তশ্লোক ও সর্গশ্লোক। [মাত্রাবৃত্ত দেখ।]

“জ্ঞেয়া: সর্গাস্তমধ্যাদিশ্লোকবোহত্র চতুষ্কলা:।” (ছন্দোম ১)

চতুষ্কিকা (স্ত্রী) চতু:সংখ্যা। (রাজতরঙ্গিনী)

চতুষ্কিন্ (ত্রি) চতু:কণিনি। চতুষ্কয়ুজ, যাহার চারিধার আছে।

চতুষ্কী (স্ত্রী) চতু:ক জিয়াং ভীপ্। ১ মসহরী, মশারি। ২
পুষ্করিণীভেদ।

‘চতুষ্কী মশকহর্যাং পুষ্করিণ্যন্তরেহপিচ।’ (মেদিনী।)

চতুষ্কোণ (ত্রি) চকার: কোণা যত্র। ১ চতু:স্র, চারি কোণবিশিষ্ট।
(স্ত্রী) চারিকোণবিশিষ্ট ক্ষেত্র। (Square, quadrangle.)

চতুষ্কটয় (ত্রি) চকারোহবয়বা যত্র তয়প্। (সংখ্যায়ং অব-
য়বে তয়প্। পা ৫.২.৪২।) ততো রেকস্য বিসর্গে সঙ্ঘে চ ক্রতে
যত্রং (হ্রস্বাতাদৌ তদ্ধিতে। পা ৮.৩.১০১।) ১ চতু:স্রবয়যুক্ত,
চারি অংশে বিভক্ত।

“চতুষ্কটয়ং যুক্তাতে সংহিতাস্তং” (অপকর্ষবেদ ১০.২৩।)

২ চতু:র্বিধ, চারি প্রকার।

“তদৈব সর্গমপ্যেতৎ প্রযুক্তীত চতুষ্কটয়ম্।” (মহু)

(স্ত্রী) চতু:র্গাবয়ব: তয়প্। ৩ চারি সংখ্যা। ৪ কেষ্ট্র, লম্ব ও
লম্ব অপেক্ষা সপ্তম ও দশম স্থান।

“কেত্রং চতুষ্কটয়ং জ্ঞেয়ং।” (নীলকণ্ঠতাজক)

চতুষ্কটোম (পুং) চতু:কটুর: স্তোমঃ, মধ্যলোমঃ। ১ চতু:কটুর
স্তোমঃ। (শুক্লযজু: ১৪।২৩) চতু:র্দিক্ স্তুয়মানস্তাৎ। ২ বায়ু।

“য এব চতুষ্কটোমস্তোমস্তুং তদুপদধাতি।” (শতপথব্রা
১৮।৪।১১৬) ৩ স্তোমবিশেষ। “সমীচীর্দিশ: স্পৃশ্যন্তচতুষ্কটোমঃ”

(শুক্লযজু: ৩৪।২৫।) ৪ (ত্রি) চারিভাগে বিভক্ত স্তোমসম্বন্ধীয়।

“পশুকামযজ্ঞৌ চতুষ্কটোমৌ” (কাত্য। শ্রৌতস্থ ২২।১০।৮)

চতুষ্কণাশং (স্ত্রী) চতু:রধিকা পঞ্চাশং। ১ চতু:রধিক পঞ্চাশ
সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযোগ্য। ৩ ভত: সংখ্যা পূরণে ডট্ ইতি
চতুষ্কণাশ।

চতুষ্কণ্ডী (স্ত্রী) চকারি পত্রাণ্যসা: আতিবাহং ভীষ। ১ জুনি-
ষষ্টক, জুনিশাক।

“চাঙ্গেরী মদুস: পট্টৈশ্চতুষ্কল ইতি দ্বত:।

শাকৌ জলাহিতে দেশে চতুষ্কণ্ডীতি ভাব্যতে।” (শকার্ধচিঃ)

২ ক্ষুদ্র পাষাণভেদী লতা। (রাজনিঃ)

চতুষ্কপাথ (পুং) চকার: পথানো ব্রহ্মচর্যাদয় আশ্রমায়সা

অঃ (অকপুঃপুঃপথানানকে। পা ৫।৪।৭৪। ইদ্রপথসোতি।
পা ৮।৩।৪১।) ইতি দ্বতম্। ১ ব্রাহ্মণ। (স্ত্রী) ২ একত্র মিলিত
পথ চতুষ্কটয়, চৌমাথা।

“যদদান্ দৈবতঃ বিপ্রং হতং মধু চতুষ্কপথম্।” (মহু ৪।৩২।)

চতুষ্কপথনিকেতা (স্ত্রী) কুমারের অমুচরী মাতৃকাভেদ।

“চতুষ্কপথনিকেতাচ গোবর্ণা মহিষাননা।” (ভারত শল্য ৪৭ অঃ)

চতুষ্কপথরতা (স্ত্রী) কুমারের অমুচরী মাতৃকাভেদ।

(শল্য ৪৭ অঃ)

চতুষ্কপদ (পুং স্ত্রী) চকারি পদানি যসা। পদবাদি জন্তু,
(Quadrupeds) পশু। যাহার চারি পা আছে, প্রধানতঃ
তাহাকেই চতুষ্কপদ বলা যায়, কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এরূপ
সকল জীবকেই চতুষ্কপদ বলিয়া স্বীকার করেন না। যে সকল
জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট, বিশেষতঃ চারি পায়ে যথেষ্ট
চলৎশক্তি আছে, প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এরূপ স্তম্ভপায়ী মাতৃকেই
চতুষ্কপদ জন্তু মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। [স্তম্ভপায়ী দেখ।]

২ তির্ঘ্যগ্রুপ প্রবকরণভেদ। কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে চতু-
ষ্কপদ করণে জন্মগ্রহণ করিলে সদাচারহীন, অতি অন্ন ধন ও
কীর্ণ দেহ হইয়া থাকে। ৩ মকরাদির প্রথমার্ধ, ধনুর শেষার্ধ,
মেঘ, বৃষ ও সিংহ রাশি। (স্ত্রী) চারিচরণবিশিষ্ট পদ্য।
(ত্রি) চারিচরণবিশিষ্ট।

“চতুষ্কপদং ষিপদশ্চাপি সর্গমেবং” (ভারত ১।২০।১১)

৬ রোগ নিবারণের চারিটা উপায়। সূত্রত লিখিয়াছেন—বৈদ্য,
রোগী, ঔষধ ও পরিচারক এই চারি পাদ চিকিৎসা কার্যের
উপযোগী। বৈদ্য গুণবান্ ও অপর তিনটা উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট
হইলে মহৎ রোগও শীঘ্র ভাল হয়। যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থপর-
দর্শী, দৃষ্টকর্ম্মী, কার্যক্ষম, লঘুহস্ত, শুচি, শূর, ঔষধ ও অস্ত্র-
চিকিৎসার সকল উপকরণে পটু, প্রত্যাংগদ্রুতি, বুদ্ধিমান,
ব্যবসারী, ধর্ম ও সত্যপরায়ণ, তিনিই চিকিৎসা কার্যে
প্রথম পদ বলিয়া গণ্য। যে রোগী বুদ্ধিমান, আন্ত্রিক,
বৈদ্যের মতামতগামী, সাধ্য ও আয়ুমান্, তাহাকে চিকিৎসা
কার্যে দ্বিতীয় পাদ বলা যায়। যে ঔষধ প্রশস্ত দেশে
উৎপন্ন, ভাল দিনে উৎকৃষ্ট মনের শ্রুতিকর, গন্ধবর্ণ রসবিশিষ্ট,
দোষঘ্ন, মানিহীন, বিপর্যয়ে ও যাহার বিকার জন্মে না এবং
উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত হয়, সেই ঔষধই
চিকিৎসার চতুর্থ পদ বলিয়া পরিগণিত। যে পরিচারক
ঠাণ্ডা, বলবান্, রোগীর প্রতি যত্নশীল, পরনিন্দা করে না,
পরিশ্রমে কাতর নহে এবং বৈদ্যের কথা মত চলে, সেই
পরিচারককেই চিকিৎসার চতুর্থ পাদ বলা যায়।

চতুষ্কপদবৈকৃত (স্ত্রী) চতুষ্কপদ জন্তুপ্রসবানিরূপ উৎপাত

বিশেষ। বরাহমিহির এই উৎপাত বা বিকার সম্বন্ধে এই-
রূপ লিখিয়াছেন—

ভির্ধ্যাক্ বোনির পরবোমিতে অস্তিগমম অমকলজনক।
ধেহুগণ বা বৃষষর যদি পরম্পর স্তম্ভপান করে অথবা কুকুর
যদি বাছুরের সহিত এইরূপ পান করে, তাহাও ভাল নহে।
তাহাতে তিন মাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে পরাগমন হইয়া
থাকে। গর্গ ইহার শাস্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ঐরূপ
চতুষ্পদ জন্তু তাগ, নির্কাসন বা ব্রাহ্মণকে দান করিলে শীঘ্র
শুভ হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া জপ ও হোম
করাইবে। পুরোহিত প্রাণাপত্য মন্ত্রে স্থালীপাক ও পশু-
ঘারা ধাতাকে যজন করিবেন এবং বহু দক্ষিণা দিবেন।

(বৃহৎসংহিতা ৪৬।৫৮-৫৯)

চতুষ্পদী (স্ত্রী) চত্বরঃ পাদা যস্যঃ (সংখ্যাপূর্ণস্য। পা
৪।৪।১৪০) ইতি অন্ত্যলোপে, ততঃ ভীপ্ (পাদোহন্যাতর-
স্যাম্। পা ৪।১।৮।*। পাদঃ পং। পা ৪।৪।১২০। ইতি পদা-
দেশঃ) ১ চারি চরণযুক্ত পদ্য, চৌপদী, হিন্দীতে চৌপই বলে।
“পদ্যং চতুষ্পদীতচ্চ বৃত্তং আতিরিত্তি বিধা।” (ছন্দোম্।)

চতুষ্পর্গী (স্ত্রী) চত্বরী পর্গাভ্যম্ ভীপ্। সুস্মিনশাক। (রাজনি)
চতুষ্পাটী (স্ত্রী) চত্বশ্চো দিশঃ পাটয়তি পাটি-অণ্ উপং স।
নদী। (শব্দমালা)

চতুষ্পাঠী (স্ত্রী) চতুর্গাং বেদানাং পাঠো যত্র গৌরাদি ভীষ্।
ছাত্রাধ্যয়নস্থান, চৌপাঠী, টোল। [টোল দেখ।]

চতুষ্পানি (পুং) চত্বরঃ পানয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। (হারাবলী)
২ চারিহস্তবিশিষ্ট।

চতুষ্পাদ্ (ত্রি) চত্বরঃ পাদা অস্য অন্ত্যলোপঃ সমা°। চারি
চরণযুক্ত গোমহিষাদি। ২ চারিভাগ (ধন)।

“চতুষ্পাদেতি বিপদামভিষরে।” (অঙ্ক ১০।১১৭।৮।)

‘চতুষ্পাচ্চতুর্ভাগধনঃ’। (সারণ)

চতুষ্পাদ (ত্রি) চারি খণ্ডে বিভক্ত।

“চতুষ্পাদং পুরাণস্ত ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা।” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
২ চতুষ্পদ পশু কর্তৃক কৃত।

“চতুষ্পাদকতো দোষো নাপ্রবীতি প্রজন্মতঃ।” (যজ্ঞঃ ২।৩০।১)
(পুং) ১ চারিপোয়া, চারিভাগ।

চতুষ্পদ (স্ত্রী) চত্বরঃ স্তন্য যত্র বাহুলকাৎ ন ভীপ্। চারিপ্তন-
যুক্ত (সুরভি) গো। “স চতুষ্পদা ভবতি চতুষ্পদা হি গোঃ।”
(শতপথব্রাঃ ৬।৪।২।১৮।)

চতুর্বিংশ (ত্রি) চতুর্বিংশং সংখ্যাপুরণে ভট্ট। চৌত্রিশ।

চতুর্বিংশৎ (স্ত্রী) চতুরধিকা ত্রিংশৎ। চৌত্রিশ, ৩৪ সংখ্যা।

চতুর্বিংশছাত্তক (পুং) বুদ্ধভেদ।

‘চতুর্বিংশছাত্তকজ্ঞো দশপারমিতাধরঃ।’ (হেম ১।১৪৭)

চতুস্‌সন (পুং) চত্বরঃ সনেতি শব্দা। নানি যেষাং সন-অচ্।
ত্রয়গুণ সনক, সনৎকুমার, সনক্কন ও সনাতন এই চারি
ঋষি। (পুং) ২ চতুর্গাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সনঃ দাতা
অচ্। ২ বিষ্ণু।

“আদৌ সনাৎ স্ততপসঃ স চতুঃসনোহতুং।” (ভাগবত ২।৭।৫।)

চতুস্‌সম (স্ত্রী) চন্দন, অশুন্ধ, কস্তুরী ও কুসুম এই চারি
গন্ধদ্রব্য। ‘চন্দনাশুন্ধকস্তুরীকুসুমৈস্ত চতুঃসমম্।’ (হেম ৩।৩০৩)

চতুঃসাহ, কর্ম্মনাশা নদীতটে অবস্থিত এক অতি প্রাচীন
গ্রাম। পূর্বে এখানে সন্দেশ নামক লিঙ্গের এক বৃহৎ
মন্দির ছিল। সিদ্ধাশ্রম হইতে চারিজন বণিক আসিয়া
চতুঃসাহ গ্রাম স্থাপন ও ভগ্নাবশেষের উপর এক মন্দির
নির্ম্মাণ করাইয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মৃত্তিকা-
নির্ম্মিত চূর্ণের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মনাশার জলে এই
গ্রাম ধ্বংস হইবে। (ভং ব্রহ্মধণ্ড ৫৮।৪৪-৪৮)

চতুস্‌স্রুতি (ত্রি) ‘চতুঃস্রুতঃ কোণাদিগুণা যস্য স।’
(মহীধর।) চতুর্দিগবচ্ছিন্ন।

“চতুঃস্রুতিনাভির্জাতস্য।” (শুক্র যজুঃ ৩৮।২০)

চতুরাজী (স্ত্রী) চতুরাজ ক্রীড়ায় রাজা স্বপদস্থিত অপর
রাজাকে মারিলে চতুরাজী হয়। [চতুরাজ দেখ।]

চতুরাত্র (স্ত্রী) চতুস্ততিঃ সাত্তিভিনিবৃত্তঃ অণ্ তত্ লুক বা
অচ্ সমাসঃ। ১ চারি রাত্রি। ২ চারিরাত্রি সাধ্য যজ্ঞভেদ।
কাত্যায়নশ্রোতসূত্রের মতে ‘চতুরাত্রঃ।’ (১৯।১।১৪) অর্থাৎ
চারিরাত্রিতে এই যজ্ঞ করিবে। ভাব্যকার ককীচাৰ্য্যের
মতে “পৌর্ণমাস্যঃ সর্ব্বেষ্টয়োমাত্ত্ববস্নিতি” অর্থাৎ পূর্ণিমার
রাত্রিতে এই সকল যজ্ঞ করিতে নাই। এই যজ্ঞে সহস্র
দক্ষিণা দিতে হয়।

“চতুরাত্রঃ পঞ্চরাত্রঃ ষড়্ভূত্রেচাভয়ঃ সহ।” (অথর্ক ১১।৭।১১)

চত্বর (স্ত্রী) চত্যাতে স্বীক্রিয়াতে চত-ঘরচ্। (কৃষ্ণলুপ্
চতিভ্যঃ ঘরচ্। উণ্ ২।১২৩।) ১ স্থগিল, হোমের জন্তু সংস্কৃত
ভূভাগ। ২ গৃহের বহিরঙ্গন, উঠান। ৩ চাতাল।

“গৃহস্তাং গৃহবাস্তুনি কার্য্যস্তাং ত্রিকচত্বরঃ।” (হরিব° ১১৩ অঃ)
৪ চারিরথার মিলনস্থান, চৌমাথা পথ।

“অমুরথ্যাহ সর্কীন্ চত্বরেষু চ কোরব।” (ভারত ৩।১৫।২০)

৫ নানাদেশীর আগন্তুক জনগণের বাসস্থান, মঠ।

“অতিষ্ঠং চত্বরে গজা ছারামাং নগরাবহিঃ।”

(কথাসরিৎ ৬।৪১)

চত্বরবাসিনী (স্ত্রী) চত্বরে বস্তুং শীলমত্যাঃ বস-গিনি-ভীপ্।
কার্ত্তিকের অম্বুরী মাতৃকাবিশেষ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

চত্বারিংশ (জি) চত্বারিংশ পুরণার্থে উট। চন্সিৎ সংখ্যার পুরক, চত্বারিংশতম।

চত্বারিংশ (জী) চত্বারিংশতঃ পরিমাণমতঃ বহুব্রী নিপাতনে সাধু। (পংক্তিবিংশতিত্রিংশচত্বারিংশৎ পঞ্চা-
শংবৃষ্টিসপ্তত্যাশীতিনবতিশতম্। পা ৫।১।৫৯) ১ সংখ্যা বিশেষ,
চন্সিৎ। ২ চত্বারিংশৎ সংখ্যায়ুক্ত।

“তেভোহায়ঃ সমভবন্ চত্বারিংশক পঞ্চ চ।” (ভাগবত ৪।১।৬০)

চত্বারিংশতম (জি) চত্বারিংশৎ পুরণার্থে তমট। (বিংশ-
তাদিশান্তমভুক্ততরতঃ। পা ৫।২।৫৬) চন্সিৎ সংখ্যার পুরক,
চত্বারিংশ।

চত্বাল (পুং) চত্যাতে প্রার্থ্যতে হোমার্থে চত-বালঞ ন বৃদ্ধিঃ।
১ হোমকৃত্ত্ব। ২ দর্ভ, কুশ। (মেদিনী) ৩ গর্ভ। ৪ চাতাল।
চদির (পুং জী) চন্সতি দীপ্যাতে শরীর প্রভাবেণ চদি বাহ-
লক্যাং কিরচ্ নিপাতনে সাধু। ১ হস্তী। ২ সর্প। জীলিঙ্গে
ডীহ্ হয়। ৩ চন্স। ৪ কর্পূর। (সংক্ষিপ্তসাং)

চন (অব্যং) চন-শকে অচ্। ১ অসাকল্য।

“অসাকল্যোচ্ চিৎচন।” (অমর) ২ মুক্তবোধ ব্যাকরণের
একটি প্রত্যয়, বিভক্ত্যন্ত কিম্ব শব্দের উত্তর উৎপন্ন হয়।

“কিম্ব জ্ঞান্যচ্চিচ্চনৌ।” (মুক্তবোধঃ)

কোন কোন আভিধানিকের মতে সমুচ্চরার্থক চ ও ন
শব্দের সমান হইয়া চন হইয়া থাকে।

৩ নিষেধ ও সমুচ্চর।

“বিশ্বস্তাঃ মববান। যুবোদিদাপশ্চন প্র মিনস্তি ব্রতং বাঃ।”
(ঋক্ ২।২৪।১২) ‘চনেত্যেতৎপদদ্বয়সমুদারঃ ঐকপদাং
ত্বদ্যাপকসাম্প্রদায়িকম্।’ (সারণ।) ৪ নিষেধ।

“পূর্বীশ্চন প্রসিতরন্তরতি।” (ঋক্ ৭।৩২।১৩) ‘চনেতি
সমুদারোনেত্যার্থে বর্ততে।’ (সারণ।)

৫ সমুচ্চর।

“মহির এবাং পিতরশ্চনে শিরে।” (ঋক্ ১০।৫৬।৪)

‘পিতরশ্চন অন্স পিতরোহপি।’ (সারণ।)

চনকপাল, পালবংশীর একজন রাজা। ভোটদেশীর তারা-
নাথের মতে ইনি শ্রেষ্ঠপালের পুত্র। কিন্তু পালবংশীর রাজ-
গণের সময়ে খোদিত কোন শিলালিপিকে চনকপালের নাম
দৃষ্ট হয় না। [পালবংশ দেখ।]

চনস্ (কী) চার-অনু-তল্য ছুট্ বাতোহু বহুং চ। (চারতে
রনে হ্রস্বচ। উণ্ ৪।১।২৯) অর। “ননো দধীত নাদ্যো-
গিরোমে।” (ঋক্ ২।৩৫।১) ‘চনোহরং।’ (সারণ।)

চনসিত (কী) চন-শকে অচ্ চনঃ সিত অরসানং বহু বহুব্রী।
প্রাকগণিতের অপ্রত্যক নাম, শুণ্ড নাম।

“নপ্রত্যকনামা চকীত চনসিতেত্যাহতা সহ।

সম্ভাবমাপো জরাবিচক্ষণেতীতরৈরিতি ॥” (কর্কভূত মনু)

“বিচক্ষণ চনসিতবতীং বাচং।” (কাত্যায়নশ্রোত ৭।২।৭)

‘বিচক্ষণশব্দবতীং চনসিতশব্দবতীং চ বাচং ব্রাহ্মণাধিনামধেয়-
ভূতাং বাণীং বদেৎ।’ (কর্ক)

চনা (দেশজ) ১ গোমুত্র। ২ ছোলা।

চন্সার (ইংরাজেরা চন্সার বলে) — উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্ত-
র্গত মির্জাপুর জেলার অন্তর্গতী এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণ-
তীরে বিদ্যাপুরির উপকণ্ঠ অধিকার অবস্থিত একটি
তহসীল। ইহার পরিমাণকল ৫৫৮ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে
২৪৪ বর্গমাইল পরিমিত ভূতাপে কৃষিকার্য্য হয়। অবশিষ্ট
পর্বতময় অসুর্ক্ষর। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইহাতে একটি
কোজদারী আদালত ও ৭টি থানা ছিল। অক্ষা° ২৫°
৭’ ৩০” উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫৫’ ১” পূঃ মধ্যে চন্সার
সহর অবস্থিত।

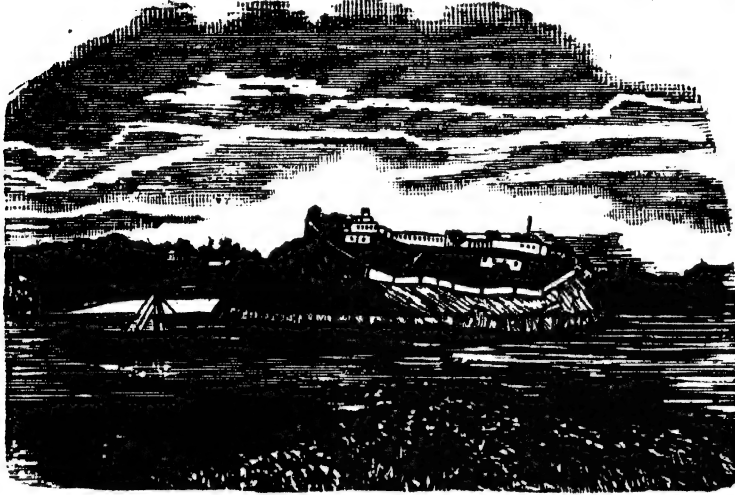
চন্সার সহর ও ইহার মধ্যবর্তী চন্সার চূর্ণ অতি প্রাচীন।
ইহা মির্জাপুরের ২০ মাইল পূর্বে, কান্দীর ২৬ মাইল নৈঋত-
কোণে গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীর
সংখ্যা (১৮২১ খৃঃ অব্দের গণনার) ১১৪২০ জন। তন্মধ্যে
হিন্দু ৮৪৫৩, মুসলমান ১২৫৭৭।

চন্সার চূর্ণের প্রকৃত নাম চরণাঙ্গিগড়। এই চূর্ণ বিদ্যা-
পর্বতমালার একটি শাখা পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।
গঙ্গাস্রোত ঐ পাহাড়ের পাদমূল খোঁত করিয়া উত্তরাভিমুখে
বারাণসী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাহাড় প্রায় উত্তরদিকিণে ৮০০
গজ দীর্ঘ, ১১২ হইতে ৩০০ গজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চতুঃপার্শ্ব
সমতল ভূমি হইতে ৮০ হইতে ১৭৫ ফিট উচ্চ। গড়ের চতু-
র্দিকেই প্রাচীরের পরিমাণ প্রায় ২৪০০ গজ। বর্তমান চূর্ণের
অধিকাংশই আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে
নির্মিত বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে অতি
প্রাচীন বহুসংখ্যক হিন্দুদেবদেবীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি
আছে। ভর্তৃহরির সমাধিমন্দির ইহার মধ্যে অবস্থিত।
এই সকল দর্শন করিবার জন্য বিস্তর হিন্দুতীর্থযাত্রী এখানে
আসিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে একখণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণ-
বর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর আছে। প্রবাদ আছে যে ঐ প্রস্তরের
উপবেশন করিয়া ভর্তৃহরি যোগসাধনা করিয়াছিলেন।
১৮৮৮ অব্দে সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ এই চূর্ণের
দক্ষিণপশ্চিমভাগে এক গুহা আবিষ্কার করেন, ঐ গুহাতে
শিব, পার্শ্বতী এবং তৈরবের মূর্ত্তির প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি
পাওয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ইংরেজ গবর্নমেন্টের

রাজকীর বন্ধি-নিবাস হইরাছে। ইহা অন্যাপি ভারতের একটা দুর্গ বলিয়া পরিচিত।

এই দুর্গের আকার একটা প্রকাণ্ড পদচিহ্নের ভাৱ। ইহার অভুলি হইতে পনের অর্ধাংশ নদীর দিকে বিস্তৃত,

গুলফতাপ তীরে অবস্থিত। এই সাদৃশ্য হেতুই ইহার নাম চরণাঙ্গিগড় হইরাছে। প্রবাদ আছে যে যাপর যুগে কোন দেব হিমালয় হইতে কুমারিকার গমনকালে মধ্যে একবার ঐ স্থানে পদবিক্ষেপ করেন এবং ঐ পদচিহ্ন রাখিয়া বান।



চনার-গড়।

চনার দুর্গের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। কথিত আছে যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি যোগমার্গাবলম্বী হইয়া ঐ স্থানে সাধন আরম্ভ করেন। বিক্রমাদিত্য ইহা অবগত হইয়া ঐ স্থান দর্শন করেন, এবং ভ্রাতার বাসের নিমিত্ত বর্তমান ভর্তৃ-হরির মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অপর প্রবাদের মতে পৃথীরাঙ্গও ঐ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐখরদীন্ সলতগীন ঐ দুর্গ অধিকার করেন। ১৩৯০ সংবতে (১৩৩৩ খৃঃ অব্দে) খোদিত একখণ্ড তাম্র প্রস্তরকলক দৃষ্টে জানা যায় যে স্বামীরাজ পুনরায় মুসলমানদিগের নিকট হইতে এই দুর্গ উদ্ধার করেন এবং ঐ ঘটনার স্মরণার্থে পূর্বোক্ত প্রস্তর কলক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অবশেষে মহম্মদশাহের সেনাপতি মালিক সাহেবউদ্দীনের বুদ্ধিকৌশলে এই দুর্গ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়।

হুমায়ূনের প্রতিদ্বন্দ্বী হুচতুর সেরখাশুর বিবাহসূত্রে ষণ্ডের নিকট হইতে ঐ দুর্গ লাভ করেন। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে হুমায়ূন ঐ দুর্গ আক্রমণ এবং ৬ মাস অবরোধের পর উহা অধিকার করেন। তৎপরে হুমায়ূন বালালা জয়ে অগ্রসর হইলে সেরখা পুনরায় চনার অধিকার করিয়া যসিলেন এবং হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অকবরের সৈন্য কর্তৃক চনার পুনরায় মোগলাধিকৃত হয়। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর চনার অবোধার নবাব উলীর হস্তগত হইরাছিল। পরে অনেক সর্দারের অধিকারে আসিয়া অবশেষে প্রায় ১৭৫০ অব্দে কাশীরাজ বলবন্তসিংহের করতলগত হয়।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সেনাপতি মেজর মনরো কর্তৃক পরিচালিত ইংরেজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করে কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। বাহা হউক, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে চনারদুর্গ বখারীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্পিত হয়। ১৭৮১ সালে চৈতসিংহের বিদ্রোহের সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এই দুর্গে অবস্থান করিয়া বিদ্রোহদমন করেন। এই দুর্গ এবং এখানকার জলবায়ু হেষ্টিংসের অতিশয় মনোরম ছিল। তাঁহার আবাসভবন অন্যাপি এই দুর্গের সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠমন্দির, তাহা দুর্গের মধ্যে সর্বোচ্চস্থানে নির্মিত।

চনার দুর্গ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে শাহ কালিম সুলেমানি নামক জনৈক ধার্মিক ফকিরের সমাধিমন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের কারুকার্য ও গঠনকৌশল অতি উৎকৃষ্ট শিরনৈপুণ্যের পরিচায়ক। কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীর এই ফকিরকে বধ করিবার আদেশ করেন, কিন্তু প্রতিবার উপাসনাকালে তাঁহার বন্ধনশৃঙ্খল খসিয়া পড়ে গুলিয়া অবশেষে তাঁহাকে চনার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিবা-

গণ এই বর্তমান সমাধি নির্মাণ করেন। অনেকে অজ্ঞান করেন যে এই মন্দির দেখিয়াই শাহজহানের তাজমহল-নির্মাণের কল্পনা হইয়াছিল।

চনার রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণদিকের প্রায় অর্ধ মাইল দূরে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। এই দুর্গাকুণ্ড হইতে একটা অপ্রশস্ত গভীর নালা বাহির হইয়াছে, উহাকে জীর্ণ নালা কহে। ঐ নালার উত্তরে কামাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার নিকট আরও একটা ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ জীর্ণনালার উপর একটা সেতু আছে। ঐ সেতু পার হইলেই পর্বত গাঙ্গে খোদিত তিনটা দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রাচীরের গাঙ্গে নানাবিধ দেব দেবী ও পশুপক্ষাদির চিত্র অঙ্কিত আছে এবং গুপ্তবংশের রাজকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্যন্ত সকল সময়ের লিপি উহাতে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ‘চন্দ্র’ ও ‘সমুদ্র’ এই দুই নাম পাশাপাশি অনেক স্থলে লেখা আছে। অনেকে অজ্ঞান করেন, ঐ নামদ্বয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্তের নাম হইবে।

জীর্ণনালার আরও কিছুদূরে “দুর্গাখো” নামক গুহা অবস্থিত। এই গুহার নিকটে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের পর একটা মেলা হয়। এই গুহাদৃষ্টে বোধ হয় পূর্বে উহা হইতে প্রস্তর উত্তোলিত হইত, ক্রমে ইহা গুহার আকারে ও শেষে স্তম্ভাদি দ্বারা শোভিত হইয়া দেবমন্দিরে পরিণত হয়। ইহাতেও চন্দ্রগুপ্তের সময়কার প্রাচীন খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। সেখানকার অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে দুর্গাদেবী স্বয়ং পর্বতগাঙ্গে প্রস্তরমুক্তিতে আবিস্কৃত হন। তাঁহাকে দর্শন করিতে বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

চনাশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম।

চনিফি (ত্রি) চনোহরঃ লক্ষণয়া তদ্বান্ চনসাং অন্নবতায়তি শয়েন প্রকৃষ্টঃ চনস্-ইঠন্। অন্নশালীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্নবত্তম। “অন্নে বো অস্ত্র স্তমতিশ্চ নিষ্ঠা।” (ঋক্ ৭।৭৭৪) ‘চনিষ্ঠান্নবত্তমা’ (সায়ণ।)

চনোধা (ত্রি) চনোহরঃ দধতি চনস্-ধা কিপ্। অন্নের অধিপতি, যিনি অন্নপোষণ বা ধারণ করেন।

“সাবিত্রোহসি চনোধাশ্চনোধা অসিচনোমসি ধেহি।”

(ঋক্ ৮।৭) ‘চনোধা অন্নস্ত ধারয়িতা’ (মহীধর।)

চনোহিত (ত্রি) চনসাং অন্নানাং হিতঃ ৬তং। ১ অন্নের হিতকর। ২ নিহিতান্ন। “কবিরত্যা ন বাজসাতার চনোহিতঃ।” (ঋক্ ৩২।৭) ‘চনোহিতঃ নিহিতান্নঃ’ (সায়ণ।)

চন্দ্র (পুং) চন্দি-আহ্লাদনে-গিচ্-অচ্। ১ চন্দ্র। ২ কপূর।

(শকার্থঃ)

চন্দ্রক (পুং) চন্দ্রয়তি আহ্লাদয়তি লোকান্ চন্দি-গিচ্-পুল। মৎসাবিশেষ, চাঁদা মাছ। ইহার গুণ—বলকারী ও অন্তিবাঙ্গী। (রাজবল্লভ) কোন কোন পুস্তকে ‘চন্দ্রক’ স্থলে চন্দ্রক পাঠও লক্ষিত হয়। [চন্দ্রক দেখ।]

চন্দ্রকপুষ্প (স্ত্রী) [চন্দ্রনপুষ্প দেখ।]

চন্দ্রন (পুং স্ত্রী) চন্দ্রয়তি চন্দি-আহ্লাদে গিচ্-লু। ১ স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। পর্যায়—গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রপ্রী, শ্রীখণ্ড, মহার্হ, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মাধল্য, মলয়োত্তব, গন্ধরাজ, স্নগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢা, ভোগিবল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, ইন্দ্রচ্যুতি, ভদ্রপ্রিয়, হিত, হিম, পটী, বর্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেবা, রৌহিণ, বামা, পীতসার।

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে, যে চন্দ্রনের আশ্রাদ তিক্ত, রস পীতবর্ণ, ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটরযুক্ত, সেই চন্দ্রন উৎকৃষ্ট। ইহার গুণ—শীতবীৰ্য, ক্লক, তিক্তরস, আহ্লাদজনক, লঘু এবং শ্রান্তি, শোষ, বিষ, প্লেমা, তৃকা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহবিনাশক।

রক্তচন্দ্রনের গুণ—শীতবীৰ্য, শুষ্ক, তিক্ত, মধুর রস, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বমি, তৃকা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ত্রণ ও বিষনাশক। পীতচন্দ্রনের গুণ রক্তচন্দ্রনের সমান, বায়ু ও মুখরোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্বঃ ১ ভাগ)

চন্দ্রনকে পারস্যে সন্দল *, আরবে সন্দল আবিয়াজ, তিব্বতে চন্দন, তৈলঙ্গে চন্দনপু, কর্ণাটে শ্রীগু, সিংহলে সন্দন, ব্রহ্মে কর-মাই বা সন্দকু, চীনে পে-চেন্-তন বা তন-মুহ, কোচীন চীনে কয়ুনদন, জাপানে সন্দন, ইতালী স্পেন ও পর্তুগালে সন্দলো (Sandal), জার্মানিতে Sandelholz, ফ্রান্সে Sandale, Santal, হলণ্ডে Sandel hout, ডেন-মার্কের Sandeltree, রুসে Sandaloe dereos, সুইডেনে Sandel trad, ইংরাজীতে Sandal-wood.

ভারতবর্ষে ও সিংহলে ছোট ছোট চন্দ্রনগাছ আছে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Santalum album, এই নাম হইতে পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্রনবৃক্ষকে Santalaceae শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

আর এক জাতীয় গাছ (Myoporum tenuifolium), তাহা এক একটা উচ্চে ১০ হাত হইতে ১৫ হাত পর্যন্ত বড় হয়, ইহাকে কৃত্রিম চন্দ্রন (Spurious sandal-wood) বলে, ইহা যত বড় হইতে থাকে, ইহার স্নগন্ধিকাঠ ততই পীত হইতে রক্তবর্ণে পরিণত হয়। পার্সি, আপুঠার্ট, পাম প্রভৃতি

* সংস্কৃত চন্দ্রন শব্দ হইতে পারসী সন্দল ও সন্দল হইতে রুরোগীর স্যাণ্ডাল (Sandal) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধীপেও একপ্রকার (*Exocarpus latifolia*) কৃত্রিম চন্দন গাছ দেখা যায়। ভারতে গোবরচাঁপা জাতীয় (*Plumeria alba*) একপ্রকার গাছের কাঠও আসল চন্দনকাঠের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাজারে চন্দন বলিয়া বিক্রীত হয়।

ভারতের খাঁটা চন্দনের স্থান সাণ্ডউইচ ধীপেও ছই জাতীয় চন্দনগাছ (*Santalum Freycinetianum* and *S. paniculatum*) দেখা যায়। পূর্বে দক্ষিণসাগরীয় ধীপ-পুঞ্জের মধ্যে (*S. Freycinetianum*) চন্দনগাছ জন্মিত, কিন্তু অধিবাসীদের উৎপাতে সেখানকার চন্দনবৃক্ষগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বোম্বাই, কোইম্বাটুর, কোড়গ, গঞ্জাম, পশ্চিম ঘাট, কাম্বীর, কোল্লমলর, কটকের নলতিগিরি, মাস্তাজ, মেলগিরি, মের্কারা, মহিসুর, নীলগিরি, পচমলয়, পল্লনী পাহাড়, সালেম, সাতারা, সিন্ধপুর, বাবাব্দন প্রভৃতি স্থানে চন্দন গাছ জন্মে।

জাঞ্জির হইতে বোম্বাইয়ে “লবা” নামে একপ্রকার শ্বেতচন্দন আসে, তাহা মহিসুরের চন্দনের স্থান ব্যবহৃত হয়।

মহিসুরের রাজার যত্নে তথাকার চন্দনগাছ রক্ষিত হয় ও তথায় ৭টা চন্দনের আবাদ আছে। এখানকার চন্দন অতি উৎকৃষ্ট। চন্দন হইতেই মহিসুররাজের গ্রাম তিন লক্ষ টাকা আয়। সেখানে উৎকৃষ্ট চন্দন ২০ হইতে ২৫ টাকায় মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। চন্দন গাছের গুঁড়ি যখন ৯১০ ইঞ্চি মোটা হয়, সেই সময় গাছ হইতে কাঠ সংগ্রহ করে। তৎপরে ইহার ছাল ছাড়াইয়া দেড়মাস বা ছইমাস মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখে। এই সময়ে ঘুণ লাগিয়া উপরের সমস্ত কাঠ কুরিয়া ফেলে, তখন কেবল মধ্যের সারযুক্ত কাঠ অবশিষ্ট থাকে।

বাজারে সরাসর ছইপ্রকার চন্দন দেখা যায়, একপ্রকার শ্বেত চন্দন ও অপর পীতাক রক্তচন্দন। কিন্তু উভয় চন্দনই এক গাছ হইতে পাওয়া যায়, সারকাঠের বহিঃভাগে শ্বেত ও অন্তর্ভাগে রক্তচন্দন থাকে।

চন্দনকাঠের সুগন্ধ গোলাবের স্থান, তীব্র হইলেও ঝাণ-যোগ্য, ইহার আশ্রয় কিছু কটু। ইহার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ আছে, তাহাতেই মিষ্ট গন্ধ থাকে। ঐ তৈল জল অপেক্ষা ভারি ও সহজেই গাঢ় করা যায়। অন্তঃসারের মধ্যে ইহার বর্ণ যতই গাঢ় রক্তাক্ত দেখায়, ততই তাহাতে ভাল গন্ধ থাকে।

যুরোপ ও ভারতে চন্দনের সুগন্ধিত্বের যথেষ্ট আদর। আতর ও গোলাব প্রস্তুতকারীগণ যথেষ্ট চন্দনতৈল ব্যবহার করে। [গোলাব দেখ।] এদেশে চন্দনতৈল গোলাবী

আতরের প্রধান উপকরণ। ইহার সুগন্ধ আছে বলিয়া চীনেরা বাইতে বড় ভালবাসে। চীনে ফিজি ও তিমরধীপ হইতে প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক টাকার চন্দন আমদানী হয়।

চন্দনকাঠে পোকা ধরে না, তজ্জন্ত ইহাতে সকল প্রকার আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্বকালে হিন্দুরাজগণ চন্দন কাঠে সিংহাসন, নানাবিধ অলঙ্কার, চতুর্দোল, দেবদেবীমূর্তি, বিলাসভবনের ও দেবমন্দিরের ঘরাদি প্রস্তুত করাইতেন। এখনও ভারতে আক্ষদাবাদের চন্দনকাঠের উপর খোদাই কার্য অগতে বিখ্যাত। ভারতে সর্বত্রই পূর্ববৎ চন্দনের আদর আছে। মৈনপুরীর তারকানী নামক চন্দনের অলঙ্কারও প্রশংসার জিনিস। ভারতে ও চীনদেশে দেবমন্দিরে যথেষ্ট চন্দনের ব্যবহার আছে। হিন্দুগণ চন্দনকাঠে শবদাহ করিয়া থাকেন। ইহার ছালে বেশ লাল রঙ হয়, কিন্তু তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

ভারত হইতে প্রতিবর্ষে ৫৬ লক্ষ টাকার চন্দন বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

(ক্লী) ২ রক্তচন্দন। (মেদিনী) (পুং) ৩ বানরবিশেষ। (হেম*) (ক্লী) চন্দাতে আক্লাদাতেহনেন চদি-গিচ্-লুট। ৪ তজ্জকালী। (মেদিনী)

চন্দন, তগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা নদী। ইহা দেব-গড়ের সমিহিত পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুসংখ্যক উপনদীর সহিত মিলিতে মিলিতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অবশেষে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ভগলপুরের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। তথায় ইহার সর্বা-পেক্ষা প্রশস্ত শাখার বিস্তার ১৫০০ ফিটের অধিক নহে। বর্ষাকাল ব্যতীত অল্প সময়ে উহা জনশূন্য ও বালুকাময় থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে সহসা ভীষণবেগে প্রবল বহায়ে প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ জনপদের সমূহ ক্ষতি করে। এই অত্যধিক অনিষ্ট নিবারণার্থ উভয়তীরে বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে।

চন্দনক (পুং) চন্দন সংজ্ঞার্থে কন্। ১ মৃচ্ছকটিক বর্ণিত এক জন রাজভৃত্য। [চারুদত্ত দেখ।] স্বার্থে কন্। ২ চন্দন।

চন্দনকারী, পঞ্চকূটের অন্তর্গত ও টাকা গ্রামের ছই ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। (দেশাবলী)

চন্দনগিরি (পুং) চন্দনস্য গিরিঃ ৬তৎ। মলয়াচল, এই পর্বতে অধিক চন্দন গাছ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। [মলয় দেখ।] পূর্বকালে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে মলয়াচল ভিন্ন অপর কোথাও চন্দন জন্মে না, এই কারণেই পঞ্চতন্ত্র প্রণেতা বিষ্ণুশর্মা লিখিয়াছেন যে—

“বিনামলয়মত্ৰ চন্দনং নপ্রয়োহতি।” (পঞ্চতন্ত্র ১।৪৭)

চন্দনগোপী (জী) চন্দনমপি গোপারতি শুপ্-অণ্ উপপদস্
ততঃ স্ত্রিয়াং ভীপ্। শরিবা বিশেষ। (রাজনি)

চন্দনদাস (পুং) একজন শ্রেষ্ঠী, কুম্ভপুর সহরে ইহার বাস ছিল। নন্দমন্ত্রী রাক্ষস নগর পরিত্যাগ করিবার সময়ে ইহার গৃহে স্বীয় পরিবারবর্গ রাখিয়া যান। চাণক্য জানিতে পারিয়া রাক্ষসের পরিবারবর্গকে বাহির করিয়া দিতে অসম্মত করেন। চন্দনদাস তাহাতে সন্মত হইলেন না। পরিশেষে চন্দনদাসকে শূলে দিবার আদেশ হইল, চন্দনদাস তাহাতেও রাক্ষস-পরিবার বাহির করিয়া দিলেন না, নির্ভীকচিত্তে বধ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। পরে রাক্ষস আসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। (মৃত্যুরাক্ষস)

চন্দনধেহু (স্ত্রী) চন্দনেনাক্তিতা ধেহুঃ মধ্যলোঃ। পতি-পুত্রবতী নারীর মৃত্যু হইলে তাহার উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না করিয়া বৎসের সহিত চন্দনাক্তিতা ধেহু দান করা পুত্রের পক্ষে কর্তব্য, এই চন্দনাক্তিতা ধেহুকে চন্দনধেহু বলে (১)।

বশিষ্ঠের মতে পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র বৃষোৎসর্গ করিতে পারে না, অতএব পিতা বর্তমানে জননীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্বর্গকামনায় আচার্য্য ব্রাহ্মণকে চন্দনধেহু দান করিবে। ইহাতেও যজ্ঞবল্ক্যের কাঠে চারি হাত একটি যুগ করিতে হয়। যুগটি বর্তুলাকার দেখিতে স্তন্য ও হুল করিবে এবং যুগের উপরে একটি ধেহুর মূর্তি প্রস্তুত করা উচিত। কলিকালে বিষ্ণু ও বকুল যুগ প্রস্তুত, ইহার অভাবে বরুণবৃক্ষেও যুগ করিতে পারা যায়। তরুণবয়স্কা, রূপবতী, স্থলীলা ও পরশ্বিনী ধেহু দান করা উচিত। অস্ত্রায়-রূপে যে ধেহুটির সংগ্রহ করা হয়, তাহা দান করা উচিত নহে, ভ্রাতৃত্বজিত অথবা গৃহজাত ধেহু দান করা কর্তব্য। নদীতীর, বন, গোষ্ঠ, দেবারতন, ত্রীহিক্ষেত্র, কুশক্ষেত্র, রাজ-দ্বার বা চতুষ্পথ ধেহুদানে প্রস্তুত (২)। চন্দনধেহুদানের কল

(১) “ঐষদভুক্তু বা নারী পুত্রিণাশ্রিত্যে বহি।

সবৎসামক্তিভাং ধেহুমাচার্য্যায় একক্লয়েৎ।” (দেবজ)

“পতিপুত্রবতী নারী শ্রিত্যে ভর্তৃ-রত্নতঃ।

চন্দনেনাক্তিতাং ধেহুঃ ততঃ স্বর্গায় কল্পয়েৎ।” (ব্রাহ্মণসংকলন)

(২) “ন যুক্তস্ত বৃষোৎসর্গো বাবংপিতৃণি জীবতি।

চন্দনেনাক্তিতাং ধেহুমাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ।

চতুর্হস্তো ভবেদযুগো বজ্রবৃক্ষসমুদভঃ।

বর্তুলাং শোভনং যুগং কর্তব্যো ধেহুমৌলিকঃ।

বিষম্ব বকুলভেব কলৌ যুগঃ প্রস্তুতঃ।

অভাবে বরুণেনাপি যুগং কুর্ধ্যাদিধানতঃ।

তরুণী রূপসম্পন্ন্য স্থলীলাচ পরশ্বিনী।”

বৃষোৎসর্গের সমান। [বৃষোৎসর্গ দেখ।] ইহাতেও মৃত ব্যক্তির প্রেতদ্ব পরিহার ও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

চন্দনধেহু দানের ব্যবস্থা লব্ধক্রে সংগ্রহকারগণের মতামত লক্ষিত হয়। চন্দ্রশেখর বাচস্পতিয়র মতে যে নারীর মৃত্যুকালে স্বামী ও পুত্র জীবিত থাকে, তাহার উদ্দেশেই চন্দন-ধেহু দান করিবে। কিন্তু মৃত্যুকালে পতি বা পুত্রের অভাব থাকিলে তাহার উদ্দেশে চন্দনধেহু দান করিবে না, বৃষোৎসর্গই করিবে (৩)। কোন স্মৃতিসংগ্রহকারের মতে মূলবচনে “পতিপুত্রবতী নারী শ্রিত্যে ভর্তৃ-রত্নতঃ।” এইরূপ নির্দেশ থাকায় এবং “অপুন্পিভা মৃত্যু কাচিৎ তস্যা ধেহু বিগর্হিতা।” এই কপিল বচনে অপুন্পিভা মৃতনারীর উদ্দেশে চন্দনধেহু দানের নিষেধ আছে বলিয়া গর্ভজাতপুত্র না থাকিলে সপত্নী পুত্রের পক্ষে পিতার বর্তমানাবস্থার মৃত বিমাতার উদ্দেশে চন্দনধেহু দান করা উচিত। চন্দ্রশেখর অনেক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে গর্ভজাত পুত্রই চন্দনধেহু দান করিবার অধিকারী। ছই বা ততোধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই চন্দনধেহু দান করিবে। কনিষ্ঠের পক্ষে বৃষোৎসর্গ করা কর্তব্য। এই প্রকরণে ছই পুত্রের মধ্যে প্রথমকে, তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম ছই জনকে, চার পুত্র থাকিলে প্রথম তিন জনকে এবং পাঁচ পুত্র হলেও প্রথম তিন পুত্রকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। জ্যেষ্ঠের পক্ষেই চন্দনধেহু দানের বিধান আছে (৪)।

স্ববর্ণশূল, রোপ্যাক্ষর, কাংস্তোদর, তাম্রপৃষ্ঠ, ঘণ্টা ও চামর দ্বারা পরিশোভিতা, স্থলীলা ধেহুকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া

(৩) “নচ অপুন্পিভা মৃত্যু কাচিৎ তস্যা ধেহু বিগর্হিতা। ইতি কপিল-বচনে অপুন্পিভায়াঃ পুত্রকর্তৃকধেহুৎসর্গনিষেধশাস্ত্রসমুত্তরা সপত্নীপুত্র-কর্তৃকধেহুৎসর্গনিষেধশাস্ত্রো তদ্বৃষ্টা। পতিপুত্রবতীত্যস্য সপত্নীপুত্রবতী-পরমমম্যাং বাচ্যং তদেকব্যাক্যতরা পুত্রিণীতাদাবপি তথাহমিতি বাচ্যং। অপুন্পিভেতি কপিলার্হস্য এসক্তিপূর্বকতার্থঃ। পতিপুত্রবত্নিবৃত্তরজ্ঞান্যায় ধেহুৎসর্গনিষেধার্থস্যং পত্যাং সত্যাং লক্ষণায় বীজাত্যাবাং। প্রতিবোগি-বদ্ব্যংসপ্রাগভাবয়োরপি অভ্যাত্যাবিরোধিত্বমতে তু অজাতপুন্পি-ত্রীপরম্ব বা ভবতু। তথাযেহপি তস্যা ধেহু বিগর্হিতেতি অপ্রসক্তাধাপি অপুন্পিভা ধেহুদাননিম্পাপতিপুত্রব্যত্যচন্দনধেহুদানম্ভতিপর।।”

(চন্দনধেহুদানবিধি)

(৪) “বহ্য্যং ধেহুঃসুতোজ্যোষ্ঠঃ কনিষ্ঠোবৃষহুৎসর্গজেনঃ।

যরোঃ সোদররোরোকো ভবেজ্যোষ্ঠঃ প্রধানতঃ।

ত্রয়াণাং দ্বৌ সুতো জ্যোষ্ঠো চতুর্থাঃ চ ত্রয়ঃ স্তুতাঃ।

পকানাং সোদরাণ্যক ত্রয়োজ্যোষ্ঠাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

জ্যোষ্ঠেইবহু কর্তব্যং ধেহুদানং বিধানতঃ।” (চন্দনধেহুদানবিধি)

ভাহার কর্ণে প্রবালের মালা দিবে। খেছটাকে চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করিয়া ব্রহ্মোৎসর্গের নিয়মে আচার্য্য ত্রাঙ্গণকে দান করিবে। ইহার নাম চন্দনখেছ। “মানস্তোক” ইত্যাদি ও “ব্রহ্মোক্তা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া খেছর সন্ধিদেশে ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন অঙ্কিত করিবে। পরে খেছটাকে উত্তরমুখী করিয়া দাঁড় করাইবে এবং যজমান পূর্বমুখ হইয়া বসিয়া খেছর মন্ত্রক প্রভৃতি অঙ্গে পূজা করিবে। পূজা করিবার মন্ত্র বথা—মন্ত্রকে “ও” ব্রহ্মণে নমঃ।” ললাটে “ও” ব্রহ্মধরজায় নমঃ।” উত্তর কর্ণে “ও” অশ্বিনীকুমারভ্যাং নমঃ।” উত্তর নেত্রে “ও” শশিতাক্ষরভ্যাং নমঃ।” জিহ্বায় “ও” সরস্বতী নমঃ।” দন্তে “ও” বসুভ্যো নমঃ। ওষ্ঠে “ও” সন্ধ্যারৈঃ নমঃ।” গ্রীবায় “ও” নীলকণ্ঠায় নমঃ।” হৃদয়ে “ও” স্কন্দায় নমঃ।” রোমকূপে “ও” ঋষিভ্যো নমঃ।” দক্ষিণপার্শ্বে “ও” কুবেরায় নমঃ।” বামপার্শ্বে “ও” বরুণায় নমঃ।” রোমাগ্রে “ও” রশ্মিভ্যো নমঃ।” উরুতে “ও” ধর্ম্মায় নমঃ।” জন্বায় “ও” অধর্ম্মায় নমঃ।” শ্রোণিতটে “ও” পিতৃভ্যো নমঃ।” খুর-মধ্যে “ও” গন্ধর্ব্বভ্যো নমঃ।” খুরাগ্রে “ও” অশ্বরেভ্যো নমঃ।” লাহুলে “ও” দাদশানিত্যেভ্যো নমঃ।” গোময়ে “ও” মহালক্ষ্ম্যে নমঃ।” গোমুত্রে “ও” গন্ধারৈঃ নমঃ।” শুনে “ও” চতুঃসাগরায় নমঃ।” এইরূপে খেছর সকল অঙ্গে পূজা করিয়া এই কয়টি মন্ত্রপাঠ করিবে।

“ও” ইচ্ছন্ত চ ভমিজ্ঞানী বিফোলক্ষ্মীশ্চ যাম্বতা।

ঋদ্রন্ত গৌরী যা দেবী সা দেবী বরদান্ত মে।

ওঁ যালক্ষ্মীলোকপালানাং যা চ দেবেষবহিতা।

খেছরূপেণ সা দেবী তত্যাঃ পাংং ব্যাপোহতু।

ওঁ দেহহাযাচ ঋদ্রাণী শঙ্করন্ত সদাগ্রিয়া।

খেছরূপেণ সা দেবী তত্যাঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু।”

“ওঁ সর্বদেবময়ী দোদ্রী সর্বলোকময়ী তথা।

খেছরূপেণ সা দেবী তত্যাঃ স্বর্গং প্রযচ্ছতু।”

ইহার পরে অর্ঘ্য ও পান্য গ্রহণ করিয়া গুণশালী আচার্য্য ত্রাঙ্গণকে খেছদান করিবে। যথানিয়মে খেছ দান করা হইলে পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি তর্পণ করিবে। ইহার দক্ষিণাশ্রুণ আচার্য্যকে একটি ব্রহ্ম দিতে হয়। ইহার পরে ত্রাঙ্গণদিগকে পূজা করিতে হয়। সমাগত দীন দরিদ্রদিগকে অন্নদান প্রভৃতিও ইহার অঙ্গ। (চন্দনখেছদানবিধি)

[ব্রহ্মোৎসর্গ ও খেছদান দেখ।]

চন্দননগর, হুগলী জেলার মধ্যবর্তী করাসী অধিকৃত একটি ক্ষুদ্র নগর। চুঁচড়ার নিকটে গজার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫০' ৪০" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২৪' ৫০" পূঃ।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে করাসীরা চন্দননগর অধিকার করে ও ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে পূর্ণ দখল প্রাপ্ত হয়। (১৭৩১—৪১ খৃঃ অঃ) করাসী গবর্নর ডুপ্লের শাসনাধীনে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এই সময় প্রায় ২০০০ ইষ্টকের বাড়ী নির্মিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন সাহেব এই নগর আক্রমণ করিয়া গোলাবর্ষণে এখানকার দুর্গ ও গৃহাদি ধ্বংস করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে করাসী ও ইংরাজে পুনরায় সখ্যতা স্থাপিত হইলে করাসীরা উক্ত নগর পুনরায় প্রাপ্ত হন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর জাতিতে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে করাসীরা পুনরায় দখল পান। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনঃ অধিকার করেন। পরিশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বরে করাসীরা ইংরাজরাজের নিকট হইতে উক্ত নগর ফিরাইয়া পান।

চন্দননগরের সেই প্রাচীন ধোরব আর নাই। এখন ইহা একটি সামান্ত নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানে একজন করাসী গবর্নর ও কতকগুলি মাত্র সৈন্ত আছে। পাছে চন্দননগরবাসীরা আফিমের চাষ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে, এই ভয়ে ইংরাজরাজ প্রতি বৎসরে চন্দননগরে ৩০০ বাক্স আফিম পাঠাইয়া থাকেন। কলিকাতার নিকটবর্তী হাবড়া হইতে চন্দননগর ২২ মাইল পথ হইবে।

চন্দনপুষ্প (ক্লী) চন্দনমিষ স্তম্ভজি পুষ্পমন্ত বহত্বী। লবঙ্গ।

চন্দনময় (ত্রি) চন্দন-ময়ট। চন্দনবৃক্ষ নির্মিত।

“চন্দনময়ো রিপুয়ো ধর্ম্মযশোদীর্ঘজীবিতকৃত্২।” (বৃহৎসং ৭৯ অঃ)

চন্দনরায়, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। শাহজহানপুরের মাহিল পুর্বা নামক স্থানে প্রায় ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গোড়রাজ কেশরীসিংহের সত্যায় থাকিতেন ও রাজার নামে কেশরীপ্রকাশ, এতদ্ভিন্ন শৃঙ্গারসার, কমলোত্তরঙ্গী, কাব্যভরণ, চন্দনশতক ও পথিকবোধ প্রভৃতি হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন।

চন্দনবতুয়া (দেশজ) এক প্রকার শাক।

চন্দনশারিবা (ক্লী) চন্দন ইব স্তম্ভজিঃ শারিবা। শারিবা বিশেষ।

চন্দনসার (পুং) চন্দনস্তেব সারো যস্য বহত্বী। ১ বজ্রকার।

(রাজনিং) চন্দনস্য সারঃ ৬তং। ২ স্তম্ভ চন্দনের সার্যাংশ।

চন্দনহিরাণ (দেশজ) লতা বিশেষ।

চন্দনা (ক্লী) চন্দন-টাপ। ১ শারিবা বিশেষ। (রাজনিং)

২ মধুখালী নগরীর নিকটে প্রবাহিত নদী বিশেষ।

(দেশজ) ৩ শুকপক্ষী বিশেষ।

চন্দ্রনাচল (পুং) চন্দ্রনস্যাংকরোহচলঃ। মলয়াচল। (রাজনিং)
চন্দ্রনাটা (দেশজ) চন্দ্রন ঘনবিলার শীল, বাহাতে চন্দ্রন
ঘন হয়।

চন্দ্রনাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত একটা গণ। চন্দ্রন, উল্লীর,
কপূর, লতাকন্তুরী, এলাচী, শঠী ও পোশীর্ষ এই সাতটা গন্ধ-
দ্রব্যকে চন্দ্রনাদিগণ বলে। (বৈদ্যক)

চন্দ্রনাদ্রি (পুং) চন্দ্রনস্যাংকরোহদ্রিঃ। মলয়াচল। (ত্রিকাণ্ডং)

চন্দ্রনাদ্য (স্ত্রী) চক্রদন্তোক্ত ঔষধতৈল বিশেষ। নখী,
কুড়, যষ্টিমধু, শৈলেশ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরল, দেবদারু,
শঠী, এলাচি, গন্ধখড়, কুঙ্কুম, মুরা, জটামাংসী, কঙ্কোল,
প্রিয়ঙ্গু, মুগা, হরিদ্রা (২), শারিবা (২), কটুকী, দারচিনি,
ক্ষেপাপড়া, নলী ও কটুর সহিত তৈল ও তাহার চতুর্ভাগ
দধির মাত্ পাক করিবে। পাককালে দেখিতে যখন
লাক্ষারসের সমান হইবে, তখন নামাইবে। ইহার নাম
চন্দ্রনাদ্য তৈল। ইহার গুণ—বলকারী, বর্ণপরিষ্কারক, অপ-
স্মার, জ্বর, উন্মাদ, কৃত্যা ও অলসীনাশক, আয়ুষ্কর, পুষ্টি-
কারক এবং বলীকরণে প্রশস্ত। (চক্রদন্ত)। পাকের অপর
সাধারণ নিয়ম তৈলপাকের সমান। [তৈলপাক দেখ।]

চন্দ্রনাবতী (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

চন্দ্রনিন্ (ত্রি) চন্দ্রনগন্তস্য চন্দ্রন-ইনি। বাহার চন্দ্রন আছে,
চন্দ্রনযুক্ত।

চন্দ্রনী (স্ত্রী) চন্দ্রয়তি আক্সাদয়তি চন্দি-লুট্-স্ত্রী। নদী-
বিশেষ। “কচিতরাং কুটিলাক্ষেব চন্দ্রনীং চাপগাং তথা।”

(রামাং ৪৪০।২০)

চন্দ্রনীক (স্ত্রী) চন্দ্রেতেনরা চন্দি-অনিয়ন্ত্-টাপ্। গোরোচনা।
(রাজনিং)

চন্দ্রনোদকচন্দ্রুতি (পুং) চন্দ্রনোদকেন সিক্তো চন্দ্রুতির্ভয়া
বহতী। একজন যাদববীর। ইহার অপর নাম ভব, ইহার
সহিত তুঙ্গু গন্ধর্বের বন্ধুতা ছিল। (বিষ্ণুপুরাণ)

চন্দ্রলা (স্ত্রী) কর্ণাটাদিগণিত পরমাড়ি-রাজের পত্নী। ইনি
অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৭।১১২২)

চন্দ্রির (পুং স্ত্রী) চন্দ্রতি হব্যতি লোকা যেন চন্দি-কিরচ্
(ইষিদ্‌মিদ্‌মি-শুভিভ্যঃ কিরচ্। উণ্ ১।৫২) ১ হস্তী। স্ত্রীলিঙ্গে
স্ত্রী হয়। (পুং) ২ চন্দ্র। (মেদিনী)

চন্দ্রেরি, ১ গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা জেলা। এই
জেলার মধ্যে সর্বসমেত ৩৮০ খানি গ্রাম আছে। ১৮৮০
খৃষ্টাব্দের সন্ধির পর এই জেলা ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে আইসে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সিদ্ধিয়া রাজ্যের রাজ-
ধানী। গোয়ালিয়ার হইতে ১০৫ মাইল এবং আট্রা হইতে

১৭০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪২' উঃ ও দ্রাঘি°
৭৮° ১১' পূঃ। পূর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও
চুর্গাদিতে বেষ্টিত ছিল। বর্তমান সময়ে আর সেক্ষপ নাই,
পূর্বে গৌরব ও ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আইন ই-অকবরী যে সময়ে লিখিত হয় তৎকালে এই
স্থানে ১৪০০০ পাথরের বাড়ী, ৩৮৪ বাজার, পথিকদিগের
পথক্লেণনিবারণের জন্য ৩৬০ টা সরাই ও ১২০০০ মসজিদ
ছিল। এখানকার কেল্লা পাছাড়ের উপরে স্থাপিত, চারিদিকে
বালুপাথরের আল আছে। সে সময়ে এই চুর্গ তুর্ভেদ্য ছিল।
এক সময়ে ইহার উপর ৮ মাস কাল অবরোধ চলিয়াছিল।
বর্তমান সময়ে বৃহৎ বৃহৎ ভয়ঙ্কর দেখিরা জানা যায় যে
প্রাচীন চন্দ্রেরি নগরের পূর্বে গৌরব এখনও হ্রাস হয় নাই।
পূর্বগৌরবের মধ্যে প্রায় ১০০ ফিট উচ্চে পাছাড়কাটা
একটা পথ দেখা যায়। ঐ পর্বতের উপরে গোমতী ও কয়লা
বারের সম্মুখে একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে যে, দিল্লী-
সম্রাট গিয়াস্ উদ্দীন এই স্থান নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন।
চন্দ্রেল বা চন্দ্রেল্ল, বুলন্দশহরের প্রাচীন রাজবংশ। [চন্দ্রা-
ত্রের শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্র (পুং) চন্দ্রয়তি আক্সাদয়তি চন্দ্রতি নীপাতে বা চন্দ্র-নিচ-
রয়, চন্দ্র-রক্ বা (ক্ষয়িতকিঞ্চিকি—শুভিভ্যো রক্। উণ্ ২।১৩।)
১ চাঁদ। ইহার পর্যায়—হিমাংশু, চন্দ্রমা, ইন্দু, কুমুদবাহুব,
বিধু, সুধাংশু, শুভ্রাংশু, ওষধীশ, নিশাপতি, অজ, জৈবাতক,
সোম, মৌ, মুগাক, কলানিধি, বিজরাজ, শশধর, নক্ষত্রেশ,
ক্ষপাকর, দোষাকর, নিশীথিনীনাথ, শর্করীশ, এগাক, ক্ষীতরশ্মি,
সমুদ্রনবনীত, সারস, শ্বেতবাহম, নক্ষত্রেনমি, উড়ুপ,
সুধাপ্রতি, তিথিপ্রদী, অমতি, চন্দ্রির, চিত্রাটীর, পক্ষধর,
নভশ্চমস, রাজা, রোহিণীশ, অত্রিনেত্রজ, পত্রজ, সিদ্ধজন্মা,
দশাত্ত, হরচূড়ামণি, মা, তারাপীড়, নিশামণি, মুগ-
লাহন, দর্শবিপৎ, ছায়ামুগধর, গ্রহনেনমি, দাক্ষারণীপতি,
লক্ষীসহজ, সুধাকর, সুধাধার, শীতভাসু, তমোহর, তুবার-
কিরণ, হরি, হিমভ্রাতী, বিজপতি, বিখম্পা, অমৃতদীপিতা,
হরিগন্ধ, রোহিণীপতি, সিদ্ধনন্দন, তমোভূৎ, এণতিগন্ধ,
কুমুদেশ, ক্ষীরোদনন্দন, কান্ত, কলাবানু, যামিনীপতি, সিপ্র,
মুগপিপ্লু, সুধানিধি, তুলী, পক্ষজন্মা, অক্লিনবনীতক, পীযুষহা,
শীতমরীচি, ক্ষীতলবলী, ত্রিনেত্র, চূড়ামণি, অত্রিনেত্রভূ,
সুধাক, পরিজ্ঞা, বলকণ্ঠ, তুলীপতি, যজ্ঞনাংপতি, পর্বদি,
ক্লেহ, জয়ন্ত, তপস, ধ্যমস, বিকস, দশবাজী, শ্বেতবাজী,
অমৃতহ, কোমুদীপতি, কুমুদীনীপতি, ভগতি, দক্ষজাপতি,
ওষধিপতি, কলাভূৎ, শশভূৎ, এগভূৎ, ছায়াভূৎ, অত্রিগুজ,

নিশারঙ্গ, নিশাকর, রজনীকর, কপাকর, অমৃত, খেতছাতি, লক্ষী, লক্ষ্মীহন, মৃগলাহন।

রাত্রিকালে আমাদের মাথার উপরে নক্ষত্রমালার মধ্যে মণির ভায়, উজ্জল, আলোকময় যে একটি জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন আৰ্য্যগণ তাহাকে চন্দ্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্য্য প্রভৃতি অপর অপর গ্রহের ভায় ইহার নিয়মিত গতি আছে বলিয়া ইহাও একটি গ্রহ। কিন্তু অপর গ্রহের ভায় এই গ্রহটিকে সর্বদা সর্বাংশে আলোকময় দেখায় না এবং মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ছায়াযুক্তের ভায় বোধ হয়। চন্দ্রটি কি? উহার মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় কেন? এবং প্রতিদিন সমানভাবে সকল অংশে আলোক না থাকার কারণ কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর বা সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতেই মতামত চলিতেছে।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর পরামর্শে দেব-তারার অন্তরগণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্ধান করেন। সেই সমুদ্র হইতে শীতরশ্মি উজ্জলপ্রভ, জগৎপ্রকাশকারী চন্দ্রের উৎপত্তি হয় (১)। ইনি একজন দেবতার মধ্যে গণ্য। অমৃত খাইবার সময়ে দেবতাদের পংক্তিতে বসিয়া একটা অমৃত অমৃত খাইয়াছিল। ইনি বিষ্ণুকে সেই কথা বলিয়া দেন। সেই রাগেই অমৃত রাহুরূপে ইহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। চন্দ্র লক্ষ্মীর সহোদর। (ভারত ১:১২ অঃ)

কালীখণ্ডের মতে—ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি মুনি তিন হাজার দিব্য বৎসর তপস্তা করেন। সেই সময়ে তাঁহার রেতঃ সোমরূপে পরিণত ও উর্দ্ধগামী হয় এবং দশদিক্ উজ্জল করিয়া নেত্র হইতে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। পরে বিধাতার আদেশে ক্রমে দশটা দেবী সেই রেতঃ ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা সেই গর্ভধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। সোম পৃথিবীতে পতিত হইল। পিতামহ তাহা লইয়া রথে স্থাপন করেন। চন্দ্র সেই রথে চড়িয়া একবিশতিবার পৃথিবী ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে ইহার অনেক তেজঃ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া যায়, তাহাই ওষধিরূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎ পোষণ করিতেছে। চন্দ্র ব্রহ্মার তেজে পুনর্বার বর্জিত হইয়া কালীতে চন্দ্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন ও শতগুণসংখ্যক বর্ষ তপস্তা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ইহার একটি কলা লইয়া আপনার ললাট ভূষণ করিলেন। চন্দ্র মহাদেবের রূপায় একটি রাজত্ব লাভ করেন। তাহারই নাম চন্দ্রলোক। ইহার

পরে চন্দ্র একটি রাজসূর্য যজ্ঞেরও অমুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। দক্ষের শাপে প্রতিদিন ইহার এক কলা করিয়া ক্ষয় হয়। এইরূপে পনের কলা ক্ষয় হইলে পুনর্বার শিব-ললাটের সেই কলাটা দ্বারা বর্জিত হইয়া পনের দিনে পূর্ণ হয়। (কালীখণ্ড ১৪ অঃ।) [চন্দ্রেশ্বর দেখ।] কালিকা-পুরাণের মতে ব্রহ্মার নিয়মে শাপদাতা দক্ষই ১৫ কলা ক্ষয়ের পর পুনর্বার ক্রমে বৃদ্ধি হইবার নিয়ম করিয়াছেন। [কৃত্তিকা দেখ।] এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস যে, দক্ষযজ্ঞের শাপে চন্দ্রের রাজত্ব ক্ষয় হয়, তাহার প্রতিকারের জন্ত তাহার কোড়ে একটি মৃগ আছে। প্রসিদ্ধ মাঘ কবিও শিশুপালবধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (২)। আবার কোন কোন প্রাচীন মতে চন্দ্র গুরুপত্নী তারার সহিত কুবাবহার করেন, সেই শাপে চন্দ্রের শরীরে কাল দাগ বা কলঙ্ক হইয়াছে। [তারার দেখ।] ইহা ছাড়া সেকালে বৃদ্ধমহিলাদের বিশ্বাস যে, চন্দ্রের মধ্যে একটি বৃহৎ বটগাছ আছে, পতিপুত্রবিহীন একটি বৃদ্ধী গাছের তলে বসিয়া হতা কাটে। আমরা সেই বটগাছটিকেই চন্দ্রের কলঙ্করূপে দেখিয়া থাকি।

উপরে যে কয়টা মত লিখিত হইল, বৈজ্ঞানিক আৰ্য্য-জ্যোতির্বিদগণ উহার একটিও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের মতে চন্দ্র একটি গ্রহ, উহার নিজের আলোক নাই, সূর্য্যের আলোকে প্রতিকলিত হইয়াই রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করে। ভাস্করাচার্য্যের মতে চন্দ্র জলময়, উহার নিজের কোন তেজ নাই। চন্দ্রের যে যে অংশ সূর্য্যভিমুখে অবস্থিত করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যকিরণ প্রতিকলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ছাড়া অপরংশ সূর্য্যকিরণে প্রতিকলিত না হওয়ার শ্রামল বর্ণ থাকে। যেকোন যোজ্ঞে একটি ঘট রাখিলে তাহার একাংশই প্রকাশিত হয়, অপর ভাগ তাহার নিজের ছায়ারই অপ্রকাশিত থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। যেদিন সূর্য্যের অধঃস্থিত চন্দ্রের অধোভাগে অর্থাৎ যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয় না, সেই দিন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। ইহারই নাম অমাবাস্য। চন্দ্র ও সূর্য্য এক রাশিহ অর্থাৎ সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইলে এইরূপ ঘটয়া থাকে। অমাবাস্যার দিনে চন্দ্র সূর্য্য এক রাশিহ হয় (৩)। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের

(২) "জগদ্বিখ্যাপিতমৃগলক্ষ্মী মৃগলাহনঃ।

কেশরী মিঠুরক্ষিগুণমুখো মৃগাধিগঃ।" (মাঘ ২য় সর্গ)

(৩) "তরশি-কিরণমদাদেব সীমূষিগো

দিনকরশি চন্দ্রলক্ষ্মীকান্তিকান্তি।

তদিতরশি বাল্য কুন্তলভামলি

ধট ইব নিজমুখি ছায়রৈব তপসঃ। ১১।

(১) "ততঃ শতসংখ্যাত্তম্যমাস্তু সপরাং।

এসরাস্তা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতঃ শুক্লজলঃ।" (ভারত ১:১২ অঃ)

গতি বেশী, চন্দ্র অতি গীত্বই স্ব্যাসমত্বপাত অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে সরিয়া পড়ে। চন্দ্র স্ব্যাহইতে দূরে বাইলে ক্রমে স্ব্যাকিরণ চন্দ্রের কিয়দংশ প্রতিফলিত হয় এবং আমরা সেই অংশ উজ্জল প্রতীক্ষালী ও যে অংশে স্ব্যাকিরণ পতিত হয় না, সেই অংশ আলোকহীন তাত্রবর্ণ দেখিতে পাই। দিন দিন চন্দ্র যত দূরবর্তী হয়, ততই তাহাতে স্ব্যাকিরণ অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইতে থাকে। অমাবাস্তার পর শুরু বিত্তীয়াতে চন্দ্র পশ্চিম দিকে উদয় হয়। ঐ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশে স্ব্যাকিরণ পতিত হইয়া চন্দ্রের এক কলা পরিমিত ভাগ উজ্জল হয়। ক্রমে দিন দিন এক এক কলা বৃদ্ধি পাইয়াই পূর্ণিমার দিনে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন এক এক কলা হ্রাস হইয়া অমাবাস্তার দিনে সংপূর্ণ অবদর্শন হয়। শুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত স্ব্যাকিরণ পশ্চিমে চন্দ্র অবস্থিত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষেও বৃত্তের ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই সময়ে চন্দ্র স্ব্যাকিরণ পূর্বদিকে থাকে।

স্ব্যাসিদ্ধান্তের মতে—চন্দ্র ও স্ব্যাকিরণ অন্তর অল্পসারে শুরুতা বা চন্দ্রের উজ্জলংশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অমাবাস্তা তিথিতে চন্দ্র ও স্ব্যাকিরণ সমত্বপাতে অবস্থিত বলিয়া অন্তর থাকে না। এই সময়ে স্ব্যাকিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় না, অতএব চন্দ্রের শুরুতার অভাব হয়। অমাবাস্তার পরে চন্দ্রের গতি অল্পসারে স্ব্যাহইতে যত অন্তর হয়, তত পরিমাণে চন্দ্রের পশ্চিম ভাগ আলোকিত হয়। চন্দ্র স্ব্যাহইতে ৬ রাশি অন্তরে স্থিত হইলে চন্দ্রের অর্ধাংশ (আমাদের দৃষ্টভাগ) সংপূর্ণ আলোকিত হয়। পূর্ণিমার পরে চন্দ্র যত গমন করে, ততই স্ব্যাহ ও চন্দ্রের অন্তর কমিয়া যায় এবং তদনুসারে শুরুতারও হ্রাস হইতে থাকে। অল্পপাত অল্পসারে অপর অপর দিনের শুরুতার পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয় (৪)। [ইহার অপর বিবরণ শৃঙ্খলান্তি শব্দে

স্ব্যাদধঃস্থত বিধেরধঃস্থতঃ বৃহৎ সকলাসিতঃ তাৎ।

দর্পেৎষ ভাষ্করিতঃ শুরুঃ তৎপৌর্ণমাস্তাঃ পরিবর্তনেন। ২।

উপচিতিমুগ্ধাতি শৌর্যমিন্দোদ্যুক্ত ইনঃ ব্রজতন্ম যেচকঃ।

জলময়জলন্ত গোলকবাৎ প্রভবতি তীক্ষ্ণবিবরণপাতঃ। ৪।

(গোলাধার শৃঙ্খলান্তিবাঃ)

(৪) “দর্শিতে স্ব্যচন্দ্ররোরুতাতাৎ অল্পদূত্বার্কে চন্দ্রপোলে স্ব্যাকিরণপ্রতিফলনাতাৎ পৌক্ষাতাৎ। ততো যথা যথাকীচন্দ্রঃ পূর্বতো হস্তরিতত্ত্বা তথা চন্দ্রপোলাসদৃশ্যার্কে চন্দ্র পশ্চিমভাগক্রমেণ শৌর্যবৃদ্ধিঃ। এবং ষট্রাশত্রে পৌর্ণমাস্তে চন্দ্রপোলাসদৃশ্যার্কে সংপূর্ণ যেতঃ ভবতি।” (স্ব্যাসিঃ ১০।৯ ব্রজতন্ম)

প্রভবা।] প্রাচীন জ্যোতির্বিদ বরাহ, শ্রীপতি ও জানরাজ প্রভৃতির মতেও চন্দ্র জলময়, তাহাতে স্ব্যাকিরণ প্রতিফলিত হইয়াই উজ্জল ও প্রতীক্ষালী হইয়া থাকে।

“বহুলচন্দ্র ইত্যেব জ্ঞানেনে ধাতুরূঢ়াৎ।

শুরুষে চামৃতষে চ গীতষে চ বিত্তাবাতে।

ঘনভোরান্নকং তজ মণ্ডলং শশিনঃ স্তম্।” লিঙ্গপুঃ ৬।১৫-৭।

চন্দ্রের মধ্যে যে কৃষ্ণাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চন্দ্রের কলক নামে প্রসিদ্ধ। স্ব্যাসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতিতে উহার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। হরিবংশে লিখিত আছে যে যেরূপ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ চন্দ্রে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়। তাহাই চন্দ্রকলক নামে প্রসিদ্ধ (৫)। ইহাতে বোধ হয় যে সাধারণের যেরূপ বিশ্বাসই থাকুক না কেন প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রকলককে পৃথিবীর ছায়া বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে পার্থিব জল স্ব্যাকিরণে আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে বাইয়া অবস্থিত হয় এবং পুনর্বার বৃষ্টি প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্রমণ্ডলকেই জলাধার বলা যায়, গঙ্গা প্রভৃতি নদীও চন্দ্রমণ্ডল হইতেই প্রবাহিত (৬)।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের মতে—চন্দ্র একটা গ্রহ অপর গ্রহের ন্যায় চন্দ্রও পৃথিবীকে সমান্তরালে রাখিয়া অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। অপর গ্রহের ন্যায় ইহারও একটা কক্ষ আছে। চান্দ্রী কক্ষও অপরপর চন্দ্রের ন্যায় ৩৬০ অংশে বিভক্ত। চন্দ্র পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্তী বলিয়া ইহার গতি অপেক্ষাকৃত বেশী। ইহা পৃথিবী হইতে ৫৭৪৫ যোজন উচ্চে অবস্থিত। চন্দ্র যে কক্ষায় পৃথিবী

(৫) “লোকজ্ঞানায়নঃলক্ষ্য তথাকে লক্ষ্যংস্থিতম্।

ন বিদুঃ সোমদেবাণি যেচ নক্ষত্রযোগিনঃ।” (হরিবংশ)

“যথা দর্পণে প্রাপ্য পরাবৃত্তা নয়নশ্রয়ো প্রীতাহমেব মুখং দর্পণপতিমিব পশ্যন্তি এবং চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য পরাবৃত্তান্তে দূরত্বদোষাৎ পৃথিবীমব্যক্ত-রূপামিব চন্দ্রমণ্ডলগতাং পশ্যন্তি স এব চন্দ্রে কলক ইত্যুপচর্যতে।” (চীক।)

(৬) “স্ব্যাকিরণজালেম বায়বুজেন সর্বশঃ।

জগতো জলমাদন্তে কুংসন্য বিজসন্তমঃ। ১৩

আদিতো গীতঃ * * * সোমঃ সংক্রমতে জলম্।

নাড়ীতির্ধার যুক্তান্তিলোকীধামঃ প্রবর্ততে। ১৪

সোমধারা নদী গঙ্গা পবিত্রা বিমলোদকা।

সোমপুত্রপুরোপাত মহানদ্যো বিজোন্তমাঃ।” ১৫।

(ব্রহ্মাণ্ডপুঃ অস্থবল ৫৫ অঃ)

পরিভ্রমণ করে, তাহার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন। চন্দ্র-কক্ষার ব্যাস ১০৩০৯১ যোজন। চন্দ্র দৈনিক গতিতে স্বীয় চক্রের ৭২০ কলা ৩৪ বিকলা ও ৫২ অক্ষকলা ভাগ অতিক্রম করে। ইহার বার্ষিকগতি (রাশিাদি) ৪।১২।৪৬।৪০।৪৮ ; একবৃৎ ৫৭৭৫৩৩৬৬টি ভাগ ও এককরে ৫৭৭৫৩৩৬০০০টি ভাগ হইয়া থাকে। [খগোল, গ্রহ ও গ্রহণ দেখ।]

চন্দ্রেরও একটি পাত আছে, তাহা অদৃশ্য এবং পশ্চিম-গতিতে ছাদশরাশি ভ্রমণ করে। [পাত দেখ।]

স্বর্ঘ্যের ন্যায় চন্দ্রেরও দিন মাস প্রভৃতি গণনা করা হয়। চান্দ্রদিনই তিথি নামে প্রসিদ্ধ। কালমাধবীর ও বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতির মতে চন্দ্র যত সময়ে রাশিচক্রের ১২ অংশ অতিক্রম করে তাহাকে একটি চান্দ্রদিন বলে। অমাবাস্যায় স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র সমস্বরে থাকে, সেই সময় হইতে চান্দ্র প্রথমদিন আরম্ভ হয়। ইহার প্রথমদিনের নাম শুরু প্রতিপদ। (৭) [তিথি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত থাকে, রাশিচক্রের গতিতে সেই রাশিটি বখন উদয়চলে অর্থাৎ পূর্বক্ষতিজবৃত্তে সংলগ্ন হয়, তখন চন্দ্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাকেই চন্দ্রের দৈনিক উদয় বলে। আবার বখন পশ্চিম ক্ষতিজবৃত্তের অন্তরালে সরিয়া পড়ে আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাকে অন্ত বলে। স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের মতে স্বর্ঘ্যগতি হইতে চন্দ্রের গতি অধিক বলিয়া স্বর্ঘ্যের পূর্বদিকে অন্ত ও পশ্চিমদিকে উদয় হইয়া থাকে (৮)। স্বর্ঘ্য হইতে ১২ অংশদূরে পশ্চিমে চন্দ্রের উদয় ও ১২ অংশ পূর্বে অন্ত হয়। [চন্দ্রের দৈনিক উদয়ান্ত সাধনপ্রণালী চন্দ্রান্তোদয় শব্দে দ্রষ্টব্য।] পূর্বে যে চান্দ্রদিনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ত্রিশদিন বা তিথিতে একটি চান্দ্রমাস হয়। কোন মতে শুরু প্রতিপদ হইতে ও কোন মতে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে চান্দ্রমাসের গণনা আরম্ভ হয়।

পুরাণের অনেক স্থলের বর্ণনা অনুসারে আপাততঃ বোধ হয় যে চন্দ্রমণ্ডল স্বর্ঘ্যমণ্ডলের উপরে অবস্থিত।

(৭) "চন্দ্রার্কগতাঃ কালস্য পরিচ্ছেদো যস্য ভবেৎ।

তস্য তয়োঃ প্রথম্যামি পতিমাত্রিত্য নির্ণয়ঃ।

ভগণেন সমগ্রেন জেদ্য ছাদশ রাশয়ঃ।

ত্রিংশাংশান্ত তথা রাশেভাগ ইত্যভিধীয়তে।

আদিত্য্যাদিগ্রহৃষ্টভাগ ভাগ ছাদশকং বদ্য।

চন্দ্রম্যঃ স্যান্তত্বা রাস তিথিরিত্যভিধীয়তে।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

(৮) "উনাবিববতঃ প্রাচ্যামন্তঃ চন্দ্রজ ভার্গবাঃ।

ব্রহ্মত্যাখিকাঃ পশ্চাৎ উদয়ঃ শীত্বারিনঃ।" (সূর্যাসি ৯।৩)

"এবং চন্দ্রম্য অর্কগতন্তিত্য উপরিষ্টাৎ লক্ষ্যবোজনত উপলভ্য-মানঃ।" (ভাগবত ৫।২২।৮) ইহার অর্থ এইরূপ বৃত্তিতে পারা যায় যে স্বর্ঘ্যগতি অর্থাৎ স্বর্ঘ্যমণ্ডল হইতে লক্ষ্য বোজন উপরে চন্দ্র অবস্থিতি করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এই স্থানে 'স্বর্ঘ্যগতন্তিত্যঃ' এই পঞ্চমী বিতক্তি হেতুর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহার অর্থ অপাদান নহে। অতএব ভাগবতের ঐ বাক্যের অর্থ এই প্রকার করিতে হয়। পৃথিবী হইতে লক্ষ্য বোজন উপরে চন্দ্রমণ্ডল স্বর্ঘ্যকিরণ হেতুক অর্থাৎ স্বর্ঘ্যকিরণে উজ্জ্বল হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে জ্যোতিঃশাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক মতের সহিত পুরাণের বিরোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে অথবা পরিমাণের পারিভাষিক শব্দ-গুলির ভেদে পরিমাণাদি সর্বদা মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। পুরাণের আপাততঃ অর্থ গ্রহণ করিয়া অনেকেই কিন্তু পৌরাণিক মতে স্বর্ঘ্যের উপরে চন্দ্র বলিয়া ভ্রান্ত হন।

পৌরাণিক মতে সমস্ত গ্রহমণ্ডলেরই অধিষ্ঠাতা এক একজন দেবতা। পুরাণে চন্দ্রমণ্ডল ও তাহার অধিষ্ঠাতা দেব এই উভয়েরই বর্ণনা আছে। পুরাণে চন্দ্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা চন্দ্রমণ্ডলের নহে, তদধিষ্ঠাতা দেবই সেই সেই স্থলে চন্দ্র শব্দের অর্থ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে চন্দ্রদেবের কথা প্রায়ই নাই, চন্দ্রমণ্ডলের বিবরণ নিক্রপণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

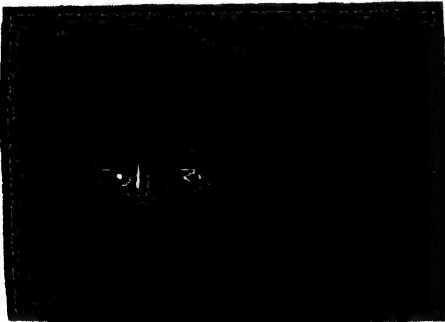
ফলিত জ্যোতিষের মতে চন্দ্র বায়ুকোণের অধিপতি, জীগ্রহ, সুষুম্না, লবণের অধীশ্বর, বৈশ্বজাতি, যজুর্বোদাধিষ্ঠাতা এবং স্বর্ঘ্য ও বুধের সহিত ইহার মিত্রতাব আছে। কর্কটরাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র। অপর গ্রহের হ্রাস ইহার দশা ও দৃষ্টি অনুসারে জাতকের ফলাফল ফলিত জ্যোতিষে নির্ণিত আছে। [চন্দ্রচার, চন্দ্রক্ষুট, রিষ্ট, চন্দ্রগোচর, চন্দ্রলোক প্রভৃতি শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

যুরোপীয় জ্যোতির্বিদগণের মতে চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক (Satellite)। পৃথিব্যাতির হ্রাস ইহাও এক প্রকার জড়পিণ্ড; পৃথিবী হইতে ইহার গড় দূরত্ব হই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। এই দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বোধ হইলেও অভ্যন্ত জ্যোতিষের দূরত্বের সহিত তুলনার মিতান্ত্র অকিঞ্চিৎকর প্রতীত হয়। বাস্তবিক চন্দ্রই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ জ্যোতিষ। দূর-বীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পণ্ডিতেরা চন্দ্রপৃষ্ঠের অনেক তথ্য অবগত হইয়াছেন। এই সকল তথ্য এরূপ নিশ্চয় ও অপ্রাসক্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে গুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস প্রায় ২১৫০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। সুতরাং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় $\frac{1}{49}$ অংশ। অর্থাৎ প্রায় উনপঞ্চাশটি চন্দ্র একত্র করিলে একটি পৃথিবীর সমান হইবে। ইহার যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহার পরিমাণ প্রায় যুরোপ খণ্ডের দ্বিগুণ, ভারতবর্ষের পাঁচগুণ। চন্দ্রের আপেক্ষিক ঘনত্ব পৃথিবীর আপেক্ষিক ঘনত্বের অর্ধেক অপেক্ষা অত্যন্ত মাত্র অধিক। ইহার ভার পৃথিবীর ভারের প্রায় নব্বই ভাগের একভাগ মাত্র। চন্দ্রপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের $\frac{1}{6}$ এক ষষ্ঠাংশের অধিক নহে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্য ৬ সের ভারী বোধ হয়, তাহা চন্দ্রপৃষ্ঠে এক সের মাত্র বোধ হইবে।

চন্দ্রের আলোক সূর্যালোকের ছয় লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পূর্বচন্দ্রের আলোক ১২৬ ইঞ্চি দূরবাপী একটি বাতির আলোকের সমান। সূর্যালোক ১ ফুট দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বাতির আলোর সমান। চন্দ্রের আলোক উহার নিজস্ব নহে। পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির দ্বারা উহাও নিঃসৃত। সূর্য্যাক্রিয়ণ চন্দ্রে প্রতিভাত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং আমরা রজনীযোগে চন্দ্ররশ্মিরূপে যে কোমল মুহূ আলোক প্রাপ্ত হই, তাহা সূর্য্যরশ্মিরই রূপান্তর মাত্র।

চন্দ্রের আকার অস্বাভাবিক প্রকারে প্রায় বর্তুল। ইহার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। এই কারণে চন্দ্রের কেন্দ্র ও ভারকেন্দ্র ঠিক এক নহে। প্রত্যুত ঐ দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩০২ মাইল। চন্দ্রের ভারকেন্দ্র অপেক্ষা প্রকৃত কেন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্তী। সকল পদার্থই ভারকেন্দ্রের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়। যদি চন্দ্রে সমুদ্র বা বায়ুরাশি থাকা সম্ভব হয়, তবে জলরাশি স্বল্প রেখাঙ্কিত বৃত্তের দ্বারা ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে অবস্থিত হইবে এবং বায়ুরাশি বিন্দুময় বৃত্তের আকারে থাকিবে। মূল কক্ষরেখাঙ্কিত বৃত্ত চন্দ্রের কঠিন অবয়ব। এবং ক তাহার কেন্দ্র; ভা ভারকেন্দ্র। এখন



দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রের যে অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে,

তাহাতে বায়ু বা জল থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নানা রূপে পৃথিবীপৃষ্ঠ পরীক্ষা দ্বারাও অদ্যাপি চন্দ্রের দৃষ্ট অংশে জল বা বায়ুর অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে উহাতে কুয়াটিকা, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদির কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে চন্দ্রের অপর অর্ধেক জল বায়ুযুক্ত হইলেও আমাদের দৃষ্ট অংশ মকমর জনপ্রাণী-ভক্ষ-শৃঙ্গ-লতা বিব-জিত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে কোথাও একগাছি তৃণমাত্র নাই। অপর প্রান্তরময় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। ইহার তুলনার সাহায্যে কোথায় লাগে। এই ভীষণ স্থান করনা করিতেও প্রাণ আতঙ্ক শিহরিয়া উঠে। এই চন্দ্রলোক! !

আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে প্রায় সমান আকারের দেখি। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ছয় কোটি গুণ বড়। সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা অনেক দূরবর্তী। জ্যোতিষগণের মধ্যে চন্দ্রই সর্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্তী। চন্দ্র যখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে আইসে; তখন চন্দ্র বৃহত্তম দেখায় ও তাহার ব্যাস আমাদের দৃষ্টিতে $৩৩^{\circ} ৩১' ১''$ কোণ উৎপন্ন করে, এবং যখন সর্বাপেক্ষা দূরে যায়, তখন চন্দ্রের আকার ক্ষুদ্রতম হয়, এবং ব্যাস $২৯^{\circ} ২১' ৯''$ কোণ উৎপন্ন করে। প্রায় এইরূপ কোণেই (Angle of vision) আমরা সূর্য্যকে দর্শন করি। সুতরাং উহাদের দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ আকার সমান দেখায়।

চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। আমরা চন্দ্রের কেবল এক দিকই দেখিতে পাই। কারণ যে সময়ের মধ্যে চন্দ্র একবার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই তাহার পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার ভ্রমণ হয়। ইহার ভ্রমণ-পথ প্রায় বৃত্তাভাস এবং পৃথিবী ঐ বৃত্তাভাসের অন্ততম কেন্দ্রে (focus) অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব সকল সময় সমান থাকে না। এই চন্দ্রকক্ষস্থ দূরতম ও সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুদ্বয় (Apsides) স্থির নহে। কিন্তু উভয়েই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় ৯ বৎসর পরে পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য প্রভৃতির দ্বারা চন্দ্রও রাশিচক্রের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে গমন করে। এইরূপ রাশি-চক্রের এক স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া পুনরায় পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রায় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট ১১ সেকেন্ড লাগে। কিন্তু ইত্যবসরে সূর্য্যও রাশিপথে কিছু দূর অগ্রসর হয়। সুতরাং সূর্য্যের সহিত পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত

হইতে চন্দ্রকে আরও কিছুদূর বাইতে হয়। এইরূপে এক অমাবাস্তা হইতে অস্ত্র অমাবাস্তা পর্যন্ত প্রায় ২৯ দিঃ ১৩ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৩ সেকঃ সময় হয়। ইহাই চান্দ্রমাস। চন্দ্র প্রতিদিন রাশিচক্রে ১৩ অংশ গমন করে।

চন্দ্রের কক্ষ স্বর্যাকক্ষার সহিত এক সমতলস্থ নহে। তাহা হইলে প্রতি অমাবাস্তা ও পূর্ণিমাত্তেই গ্রহণ হইত। [গ্রহণ দেখ।] এই কক্ষরেখা স্বর্যাকক্ষার (Ecliptic) সহিত $5^\circ 8'$ কোণ উৎপন্ন করে। সুতরাং চন্দ্রের কক্ষ ও স্বর্যাকক্ষা দুইটা মাত্র বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে। এই বিন্দুদ্বয়কে (Nodes) পাত্ৰ কহে। পাত্ৰদ্বয় আবার স্থির নহে, ইহার। ক্রমে চন্দ্রের গতির দিকে স্বর্যাকক্ষার ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় ১৯ বৎসর পরে আবার পূর্বাৱস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চন্দ্র একবার যে পথে ভ্রমণ করে, পুনঃক্রম সেই পথে আসিতে প্রায় ১৯ বৎসর সময় লাগে। এইরূপে চন্দ্র ১৯ বৎসরের মধ্যে স্বর্যাকক্ষার উত্তর দিকস্থ $11^\circ 6'$ পরিমিত আকাশে সর্বত্র ভ্রমণ করে।

পূর্বে বলিয়াছি চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিঃহীন, স্বর্য্য রশ্মি দ্বারা আলোকিত হইয়া উজ্জ্বল দেখায়। ইহাই কলাভেদের প্রধান কারণ। গোলাকার বস্তু একবারে অর্দ্ধাংশের অধিক অংশ সারিত হইতে পারে না। [অমাবাস্তা শব্দে চিত্র দেখ।]

চন্দ্র যখন স্বর্য্যর সহিত আকাশের এক অংশে থাকে, তখন চন্দ্রের আলোকিত অংশ আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। কেবল অন্ধকারময় অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে, সুতরাং আমরা ঐ দিবস চন্দ্র দেখিতে পাই না। কিন্তু চন্দ্রের আন্বিক গতি অনুসারে উহা রাশিচক্রে 13° অংশ এবং স্বর্য্যও ঐ সময়ে 1° অংশ মাত্র অগ্রসর হয়। সুতরাং চন্দ্র স্বর্য্য হইতে 12° অংশ দূরে যায়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইলে আমরা চন্দ্র-রেখাক্রমে আলোকিত অংশের ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাই। এই চন্দ্ররেখার প্রান্তদ্বয় পূর্বদিকে বিস্তৃত থাকে*। ক্রমে যখন প্রায় ৭ দিন পরে স্বর্য্য ও চন্দ্রের দূরত্ব 90° অংশ হয়, তখন চন্দ্র ঠিক অর্দ্ধবৃত্তাকার ধারণ করে।

এইরূপে ক্রমে যখন 180° অংশ দূরে অর্থাৎ স্বর্য্যর ঠিক বিপরীতদিকে চন্দ্রের উদয় হয়, তখন তাহার সম্পূর্ণ আলোকিত ভাগই আমরা দেখিতে পাই। ঐ দিন পূর্ণিমা।

* গুরুপক্ষে ২রা, ৩রা এবং কৃকপক্ষে ১২রা, ১৩রা প্রভৃতিতে যখন চন্দ্রের কক্ষ কলামাত্র দৃষ্ট হয়, তখন চন্দ্রের কক্ষাংশ ও ইহা আভ্যন্তরীণ প্রভাবমান হয়। পতিভেদে অনুমান করেন পৃথিবীপৃষ্ঠে অতিক্রান্ত স্বর্য্যর কক্ষ আলোকিত হইয়া চন্দ্রের ঐ অংশ আভ্যন্তরীণ বোধ হয়।

ক্রমে আবার যত স্বর্য্যর নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই চন্দ্র হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং যে ভাগ প্রথমে দৃষ্ট হইয়া ছিল, সেই ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে, এইরূপে পূর্ণচন্দ্র আবার রেখাকারে পরিণত হইতে থাকে। স্বর্য্যর নিকট আসিয়া অদৃশ্য হয়। কৃকপক্ষে চন্দ্রকণার স্বল্প-প্রান্তদ্বয় পশ্চিমদিকে থাকে। এইরূপ পূর্ণচন্দ্র কালকে চান্দ্রমাস বলে। প্রথম পঞ্চদশদিবস বৎকালে চন্দ্র ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তাহা গুরুপক্ষ ও পর পঞ্চদশদিবস বৎকালে চন্দ্র হ্রাস হয়, তাহা কৃকপক্ষ নামে অভিহিত। চন্দ্রের উদয়কাল ঠিক এক সময় নহে। আজি যে সময় উদয় হইল কালি তাহা অপেক্ষা ৫০ মিনিট পরে উদয় হইবে এবং পরন্তু তাহা হইতে আরও ৫০ মিনিট পরে উদয় হইবে। অমাবাস্তার দিন চন্দ্র স্বর্য্যর সহিত উদয় হয় ও অস্ত যায়। শুক্লাষ্টমীতে দিবা দ্বিপ্রহরে উদয় ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে অস্ত। কৃক্লাষ্টমীতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উদয় ও দিবা দ্বিপ্রহরে অস্ত হয়।

যদিও চন্দ্রের একপৃষ্ঠ সততই পৃথিবীর দিকে থাকে, তথাপি চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে বলিয়া উহার সকলদিকই এক একবার স্বর্যালোক প্রাপ্ত হয়। আমরা কলাভেদের বিবরণে দেখাইয়াছি কিরূপে চন্দ্রের আলোকিত অংশ চন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরিয়া আইসে। আমাদের পৃথিবী যেমন একদিনে একবার নিজ মেরুদণ্ডে আবর্তন করে, চন্দ্রও সেইরূপ নিজের একদিনে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করে। কিন্তু চন্দ্রের একদিবস আমাদের এক চান্দ্রমাসের সমান অর্থাৎ ২৯ দিন, ১২ ঘঃ, ৪৪ মিঃ, ৩ সেকঃ। চন্দ্র হইতে দৃষ্টি করিলে পৃথিবীকে আকাশের একস্থলে স্থির উজ্জ্বল পদার্থ বলিয়া দৃষ্ট হইবে। অমাবাস্তার দিন পৃথিবী স্বর্য্য অপেক্ষা 15° ও বড় উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের জায় দৃষ্ট হইবে। পূর্ণিমার দিবস পৃথিবী চন্দ্র হইতে দৃষ্ট হইবে না।

একপক্ষে চন্দ্রমণ্ডলের দৃষ্ট অংশের ভূতত্ত্ববিবরণ আলোচনা করা বাউক। আমরা চন্দ্রকে চন্দ্রকে যেরূপ মন্থণ ও উজ্জ্বল দেখি, বাস্তবিক উহা সেরূপ নহে। দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে যুরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ পর্বত ও গভীর গহ্বরাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। যে সকল ভাগ চন্দ্রের কক্ষ বলিয়া পরিচিত, উহা চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ নিম্ন প্রান্তর মাত্র। চন্দ্রের যে সকল অংশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর বলিয়া দৃষ্ট হয়, উহা উচ্চ পর্বত এবং মধুচক্রের জায় রক্তবিশিষ্ট শৈলসমাচ্ছাদিত উচ্চ ভূমি।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে অনায়াসেই এই সকল পর্বতাদির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। শুক্রপক্ষে ২৪১, ৩৪১ প্রভৃতির সমস্ত চন্দ্রকলা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে চন্দ্রের আলোকিত ও অন্ধকারময় অংশের ব্যবচ্ছেদযেখা ঠিক রেখাকার নহে। এই ব্যবচ্ছেদ অতি অল্পই ও কুটিল এবং অন্ধকারময় অংশে অনেক দূর পর্যন্ত স্থানে আলোক দৃষ্ট হয়। এই সকল আলোকময় স্থান পর্বত-শৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাদের চতুর্পার্শ্ব নিম্ন-প্রদেশ সকল বহন অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, তখনও উহার সূর্যালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায়। এই সকল পর্বত সন্নিহিত প্রান্তরের উপর বহুব্রহ্মাণীনি ছায়া বিস্তার করে। দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে এই সকল ছায়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং তদ্বারাই এই সকল পর্বতের উচ্চায় নিরূপিত হয়। এই সকলের কোন কোনটার উচ্চায় প্রায় ৫৬ মাইল, অর্থাৎ আবাদিগের হিমালয়াদির সমান। সুতরাং পৃথিবীর তুলনায় হিমালয়াদি বেক্ষণ, চন্দ্রের তুলনায় এই সকল পর্বত অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ বলিতে হইবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে এরূপ গভীর গহ্বর সকল আবিস্কৃত হইয়াছে যে উহাদের গভীরতা পৃথিবীর একটা প্রকাণ্ড পর্বতের উচ্চায়ের সমান। ম্যাডলার, ডার্পাট প্রভৃতি চন্দ্রতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ চন্দ্রের অতি ক্ষুদ্র ও বিশদ মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ণিমায় দিবস দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল বেক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহার একটা চিত্র



চন্দ্রমণ্ডল।

দেওয়া যেন। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রমণ্ডল প্রধানতঃ ছই ভাগে বিভক্ত। প্রায় ৬ ভাগ অধিক উচ্চল, অবশিষ্ট ৬ ভাগ নিম্ন ক্ষুদ্র, উহাই চন্দ্রের কক্ষ।

এই ৬ ভাগ স্থান চন্দ্রের নিম্নভূমি, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প অবস্থার আছে। ইহার চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বতশ্রেণী বিরাজমান। মধ্যভাগেও স্থানে স্থানে ছই একটা ক্ষুদ্র পাহাড় ও গহ্বরাদি দৃষ্ট হয়। পূর্বে এই অংশকে চন্দ্রের সাগর বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে তাহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল নিম্নভূমি এক্ষণে একবারে জলশূন্য। হইতে পারে চন্দ্রে এক সময় ভরানক প্রাকৃতিক বিপ্লব উপস্থিত হওয়ারে সমুদ্র এই সকল স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রের প্রাকৃতিক তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

চন্দ্রের পর্বত সকলকে পণ্ডিতেরা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। ১ম—সমতল-মধ্যে সিরিড্রোণী হইতে বিচ্ছিন্ন এক একটা পর্বত। সমতল হইতে একবারে উর্দ্ধে উঠিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছে। প্লেটো গহ্বর উত্তরবর্তী পিকো (Pico) গিরি এরূপ। গুহাগুলির মধ্যে মধ্যে এরূপ অনেক গিরি দৃষ্ট হয়। ২য়—পর্বতশ্রেণী। হিমালয়, আন্দিস্ প্রভৃতি পর্বতশ্রেণীর ভার চন্দ্রেও সূর্য্য ও অত্যাচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে। এই সকল পর্বতশ্রেণী একটা বিস্তীর্ণ নিম্ন প্রান্তরের চতুর্দিকে অত্যাচ্চ প্রাচীরের ভার অবস্থিত। প্রান্তরের অপর দিকে পর্বত সকল ক্রমান্বয়ে হইয়া সমতলে মিশিয়াছে। পৃথিবীর পর্বতশ্রেণীর পর্বতের সহিত উহাদের সাদৃশ্য আছে। এই সকল পর্বতের উৎপত্তির কারণ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। অনেকের মত যে উহার চন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ আত্মের শক্তি দ্বারা কখন উৎপন্ন হয় নাই। অল্প কোন অভ্যন্তর শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ৩য়—চন্দ্রের গুহা সকল। উহার অতীব অকৃত ও বিস্ময়জনক। চন্দ্রের প্রায় ২ অংশ এই সকল গভীর গহ্বর অথবা চক্রাকৃতি গুহা দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহা-সিগের দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল মধুচন্দ্রের ভার দৃষ্ট হয়। এই সকল গহ্বর অতি প্রকাণ্ড, কোন কোনটার ব্যাস প্রায় ৫০। ৬০ মাইল। ক্ষুদ্রতম গুলির ব্যাস ৫০০ ফিটের নূন নহে। এই সকল গুহার মুখ চতুর্পার্শ্ব হইতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ এবং শিখরের নিকট গভীর কূপাকৃতি গহ্বরযুক্ত, এই সকল গহ্বরের অভ্যন্তরে চক্রাকৃতি সোপানমার্গ স্তরে স্তরে বিদ্যমান আছে। চন্দ্রের অনেক অংশ এই সকল গহ্বর দ্বারা এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, এই অংশ অবিকল মধুচন্দ্রের প্রাচীরমান হয়। এইরূপ গুহা সকলের মধ্যে টাইকো (Tycho) একটা প্রধান। চিত্রে চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগে যে উচ্চল স্থান হইতে

আলোকময়ী রেখা সকল বহির্গত হইয়া চতুর্দিকে গিয়াছে, উহাই টাইকো গুহা। টাইকোর দৃশ্য অতি বিস্ময়কর। ইহার চতুর্দিকে প্রায় ৫৩ মাইল পরিমিত স্থানের চৌদিকে উচ্চ পর্বত-প্রাচীর। কটাঁহাকার মধ্যভাগ স্বর্ষ্যকিরণে অভ্যাশ্চর্য্য-রূপে উদ্ভাসিত। কেন্দ্রাতিমুখে ভূমি পুরমার উচ্চ হইয়া পর্বতাকার ধারণ করিয়াছে। এই পর্বতের শৃঙ্গ সাধারণ পর্বতের স্তার নহে। ইহা এক প্রকাণ্ড স্তরের স্তার। এই শৃঙ্গে উপনীত হইলেই অদ্বুত লোকসম্প্রদায়ী দৃশ্য উপস্থিত হয়। পর্বতশৃঙ্গ হইতে অপরদিক্ আবার ক্রমশঃ না হইয়া একবারে সমুদ্র সহস্র ফিট গভীর। এই গভীর কূপের বিস্তার প্রায় ৫৫ মাইল, চতুর্দিকে আকাশস্পর্শী অলঙ্ঘ্য প্রাচীর বিরাজমান। বাহির হইবার কোনরূপ পথ মাত্র নাই।

কেবল টাইকো গুহাই যে এইরূপ গভীর তাহা নহে, চন্দ্রের মেঘদেশে এমন অনেক গহ্বর আছে যে তাহাদের অভ্যন্তরে কোন কালেই স্বর্ষ্যালোক প্রবেশ করে নাই। টাইকো হইতে যে আলোকময় রেখা সকল বহির্গত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটা প্রায় ১৭০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরও অনেক গুহা হইতে টাইকোর স্তার আলোক রেখা বাহির হইয়াছে দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, উহার গুহার চতুর্দিকস্থ বিদীর্ণ স্থান। কাহার কাহার মতে সে সমস্তই কঠিনীভূত ধাতুর স্রোত। ঐ সকল ধাতুস্রোত অন্যাপি উজ্জল তাবৈ আছে। কারণ পৃথিবীর পর্বতাদি যেমন সর্বদাই জলবায়ু কর্তৃক পরিবর্তিত হইতেছে, চন্দ্রে জলবায়ু না থাকার একগাছি ভ্রণও জন্মে নাই এবং পর্বতাদির বা ঐ ধাতুস্রোতের কিছুমাত্র মালিন্য সাধিত হয় নাই।

চন্দ্রদ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু ও জলরাশির গতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। চন্দ্রের আকর্ষণেই প্রধানতঃ জোয়ার ভাটা হয়। পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার দিবস বায়ু প্রায় পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। শরৎ ও বসন্তকালে স্বর্ষ্যের জ্যোতিতে অবস্থিতি সময়ে বায়ুর গতি প্রধানতঃ চন্দ্র কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে।

নাটিক ও ভৌগোলিকগণ চন্দ্র দেখিয়া কোন স্থানের লক্ষ্যের নিরূপণ করিতে পারেন।

চন্দ্রের ভূমি অস্থানে অনেক যোণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পূর্বে ইংরাজদিগের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে উন্নততা (Lunaoy)-ব্যাপি চন্দ্রের শক্তিতে উৎপন্ন হয়। আনাদিগের পাশ্চাত্য ভূবিদ্যাশাস্ত্রে খাদ্যবিশেষের তত্ত্ব নির্দিষ্ট আছে। শাক্যকারেরা রাশিচক্র ও অগ্নিরাশির রাশির সহিত

অবস্থানভেদে চন্দ্রের স্থিতি দেখিয়া জ্যোতির্বিদগণ বিস্ময়ের তত্ত্বাত্ত্ব ফল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণ চন্দ্র-পূজা করিত এবং ভূবিদ্যেতে কাঁঠোহীন, শতবর্ণমাদি কার্য্য তত ও অন্তত ফলপ্রসূ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কষ্টলগ্ন, জর্দনি প্রভৃতি দেশেও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল।

এলো সান্সন ও জর্জ তাহার চন্দ্র পুস্তক ও স্বর্ষ্য জী। ইংরাজী, রোমক ও গ্রীকভাষার চন্দ্র জী ও স্বর্ষ্য পুস্তক।

(জি) ২ আল্লাদজনক। (জিকাণ্ড) (পুং) ৩ কর্পূর। ৪ স্বর্ণ। ৫ জল। ৬ কাম্পিল্য। (মেদিনী) ৭ বীণবিশেষ। (শব্দমালা) ৮ নাদবিন্দু। (জি) ৯ কমলী। (পুং) ১০ ময়ূরপুচ্ছ, মেচক। (হেম) ১১ শোণ মুক্তাকল। (বাড়ি) ১২ হীরক। ১৩ মৃগশিরা লক্ষ্য। ১৪ এক সংখ্যা। ১৫ চন্দ্র গুণ্ড। “জ্যুগ্রহঃ স কেতুঃ চন্দ্রঃ সম্পূর্ণ ওলিম্বানীম্।” (মুত্রাঃ ১ অঃ)

১৬ বহাউদের পালবংশীর রাজত্বের আদিপুস্তক।

১৭ নেপালস্থ একটা গিরি।

চন্দ্র, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে—১ বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইনি কাম্বীরবাসী ছিলেন। (Bühler's Kashmir Report, p. 72.) [চন্দ্রগোমিন্ দেখ।]

২ প্রাকৃতভাষাতত্ত্ববিদ্যার-রচয়িতা।

৩ অষ্টাদশশতাব্দির একজন চীকায়ার।

চন্দ্র, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ চন্দ্রভাগা নদীর একটা প্রধান উপনদী।

উহা লাহল প্রদেশে বারালাচা গিরিবন্ধের দক্ষিণপূর্বকোণে এক প্রকাণ্ড ভূবারকেজ হইতে বহির্গত হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থানের এক মাইল মাত্র দূরে ইহার গভীরতা এত অধিক যে হাঁটরা পার হওয়া যায় না। দক্ষিণপূর্বাভিমুখে প্রায় ৫৫ মাইল পরে বক্রিমগমনে মধ্য হিমালয়ের পাদদেশ ধোত করিতে করিতে ১১৫ মাইল গমনের পর দ্রাঘি° ৭৭° ১' পূঃ, অক্ষা° ৩২° ৩০' উঃ, তান্দীর নিকট ভাগানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত নদীর উত্তরতীর পর্বতাকীর্ণ, বহুবোয়র বাসমাত্র বর্জিত, কেবল-মাত্র গ্রীষ্মকালে কয়েকমাস ছাপ মেঘ প্রভৃতির চারণ ভূমি হয়। পালমোগিরিলক্ষ্যের নিকট আসিয়া ঐ নদী প্রায় ৩ মাইল দীর্ঘ এক হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। রোহতক গিরিলক্ষ্যের মূলদেশ হইতে প্রথম মজ্জাবাণ নদী উৎপন্ন হয়। তৎপরে চন্দ্রনদী শতক্ষেত্র ও লোকালয়শোভিত অপেক্ষাকৃত প্রস্তরময় প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বতদেশ লম্বভাবে নদীর উত্তরপার্শ্বে জুলিয়া আছে। কোড়ানার নিকট এইরূপ একখণ্ড প্রস্তর

নদীবন্ধ হইতে লম্বভাবে মাথার উপর ১১০০ ফিট উচ্চ। তাক্কীর নিকট ভাগার সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্র নদী চন্দ্র-ভাগা নাম ধারণ করিয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে তাক্কী পর্যন্ত চন্দ্র নদী প্রতিমাইল প্রায় ৬৫ ফিট করিয়া নিরগামী হইয়াছে।

চন্দ্র, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতারামপুর জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ইহার পশ্চিম সীমা গোমতী নদী, পূর্ব সীমা কঠনা নদী, দক্ষিণসীমা এই উত্তর নদীর সঙ্গম ছধুরামান এবং উত্তরসীমা খেরী জেলা। এই পরগণা যথাক্রমে বৈ, আহীর, সৈয়দ ও গোড়দিগের অধিকারে আইসে। শেষোক্ত অধিকারীগণের আদিপুরুষ কিরিমুল প্রায় ২০০ শতবৎসর পূর্বে এইস্থান অধিকার করেন। এখানকার সর্বসমেত ১৫০ খানি গ্রামের মধ্যে কিরিমুলের বংশধরগণ অন্যাপি ১৩০টির অধিকারী আছেন। ইহার পরিমাণ ১২৯ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২১½ বর্গ মাইলে শস্ত উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ইহার ভূমি অম্লস্বর।

চন্দ্রক (পুং) চন্দ্রইব কারতি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ বহ্নিনেত্র, ময়ূরপুচ্ছের হাঁদ।

“চন্দ্রকচাকময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।” (গীতগো০)

২ নথ। (শব্দচ) ৩ একপ্রকার মৎস্ত, চাঁদামাছ।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—চলংপূর্ণিমা, চন্দ্রচকলা, চন্দ্রিকা।

বৈদ্যক মতে এই মাছের গুণ অন্তিভ্যান্ধি, মধুর ও বলবর্দ্ধক। (রাজনি°)

“যাং চন্দ্রকৈর্মদজলস্ত মহানদীনাং।” (মাঘ ৫।৪০)

স্বার্থে কন্। ৪ চন্দ্র। [চন্দ্র দেখ] ৫ চন্দ্রমণ্ডল।

৬ (স্ত্রী) শিগুবীজ। ৭ খেত মরিচ। (রাজনি°)

চন্দ্রক, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ক্ষেমেন্দ্র উচিত্য-বিচারচর্চায় ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজতর-ঙ্গিনীতে লিখিত আছে, যে ইনি তুঙ্গীনের রাজত্বকালে নাটক রচনা করিতেন। (রাজতরঙ্গিনী ২।৭৬)

২ গোমতীর উত্তরপারে অবস্থিত বর্গভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। তব্বিষা ব্রহ্মধণ্ডের মতে এখানকার লোকেরা স্বর্ঘ্যদেবের কোপে কৃষ্ট ও চক্ষুরোগাক্রান্ত হইবে।

(ভ° ব্রহ্মধণ্ড ৫৬।২০৫-২০৭)

চন্দ্রকলা (স্ত্রী) চন্দ্রস্ত কলা ৬তৎ। ১ চন্দ্রের বোড়শভাগের একভাগ। [কলা দেখ] কামশাস্ত্র মতে এই সকল কলা তিথি-ভেদে ত্রীলোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন শরীরাবরণে অবস্থিতি করে। তাহাদের নাম যথা—

পূষা, বশা, ভূমনসা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋতি, দৌষ্য,

মরীচি, অংগমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি ও অমৃততা চন্দ্রের এই বোলটি কলা। (কামশাস্ত্র)

কল্পযামল মতে—অমৃততা, মানসা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কাতি, জ্যোৎস্না, স্ত্রী, প্রীতি, রজসা, পূর্ণা, অপূর্ণা, অমৃততা ও কামদারিনী চন্দ্রের এই কলাগুলিকে কলাবতী দীক্ষার অগ্রে পূজা করিতে হয়। (কল্পযামল)

চন্দ্রকবৎ (পুং স্ত্রী) চন্দ্রকোহস্তাত্ত মতুপ্ মত বঃ। ময়ূর।

“প্রাচুর্ভবৎ সপদি চন্দ্রকবান্ ক্রমাগ্রাৎ।” (মাঘ) স্ত্রিরাং স্ত্রীপ্।

চন্দ্রকবি, পশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন বিখ্যাত রাজপুত কবি।

ইনি চাঁদবর্মান্নাই নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রণন্তত্তগড়ের চৌহান-

বংশীয় প্রাচীন কবি বিশলদেবের বংশসম্ভূত *। কিন্তু তাঁহার

বংশধর সুরদাস কবির বর্ণনায় জানা যায়, ইনি জগৎবংশীয়

ছিলেন। দিল্লীর পৃথ্বীরাজের দরবারে আসিয়া ইনি

মন্ত্রীপদ এবং “কবীশ্বর” উপাধি পাইয়া রাজকবিরূপে মনো-

নীত হন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত

হইয়াছিল। ইহার বিমুচিত প্রধান কাব্যের নাম “পৃথ্বীরাজ

রায়সা”। এই গ্রন্থে কবি তাঁহার প্রতিপালকের জীবনী ও

তৎসাময়িক ঘটনাবলী নিবন্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে

৬৯ প্রস্তাব ও ১০০০০০ শ্লোক লক্ষিত হয়। মহারাজ পৃথ্বীরাজ

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কাগ্গার নদীর কূলে সাহাবউদ্দীন ঘোরির

সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং মুসলমানেরা তাঁহাকে বন্দী ও অন্ধ

করিয়া গজনীতে লইয়া যান। চাঁদ কবি তথায় পৃথ্বীরাজের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কথিত আছে প্রথমে চাঁদ-

কবি কিছুতেই পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন নাই,

অবশেষে তাঁহার মধুর গানে কারারুদ্ধক মোহিত হইয়া

তাঁহাকে অন্ধ পৃথ্বীরাজের সহিত দেখা করিতে দেন। এখানে

চাঁদ কোন ক্রমে ঘোররাজকে বিনাশ করিয়া নিজ প্রতি-

পালকের সহিত আত্মহত্যা করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর

প্রারম্ভে মিবাররাজ অমরসিংহ চাঁদপ্রণীত কবিতাগুলি

সংগ্রহ করেন।

পৃথ্বীরাজরাসা পূর্বে রাজপুতানার ভাটনিগের মুখে মুখে

ছিল, সেই সময়ে ভাটেরা এই মহাগ্রন্থে অনেক অপ্রাচীন

ও অনৈতিহাসিক কথা ঢুকাইয়াছেন এবং নিজেদের সুবিধার

জন্ত স্থানে স্থানে ভাষারও পরিবর্তন করিয়াছিলেন। অমর-

সিংহ সেই অবস্থায় পৃথ্বীরাজরাসা সংগ্রহ করেন। এই

সকল অনৈতিহাসিক ও অপ্রাচীন কথা দৃষ্টে মেবারের

বর্ত্তমান রাজকবি শ্রীমলদাস পৃথ্বীরাজরাসাকে চাঁদকবি-

রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কোন

একজন সুচতুর কবি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে চাঁদ-কবির নাম দিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। চাঁদকবির নাম শুনিয়া রাজধানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাটগণ তদনুসারে রাজপুত্ররাজবংশাবলী রচনা করেন, তাই রাজপুত্রানার নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও ভাস্কর্য্যাদি-বর্ণিত-বংশাবলী ও রাজ্যকালের সহিত ভাটদিগের গ্রন্থের ঐক্য নাই। সেই জন্য মহাত্মা টডসাহেবের রাজধানের ইতিবৃত্ত ভ্রমশূন্য হয় নাই।[†] ভ্রামলদাসের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কালীহ একজন পণ্ডিত রাজকবির প্রতিবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, যে বিভিন্ন সময়ে রাজধানের ভাটদিগের দ্বারা উক্ত মহাগ্রন্থে অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত হইলেও উক্ত মূলগ্রন্থ প্রকৃত চাঁদবর্দাই রচনা করেন। খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবিদিগের বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।[‡] [সুরদাস ও শারঙ্গদেব দেখ।] উক্ত পৃথীরাজরাসা ব্যতীত চাঁদকবি কনোজরাজ জয়চাঁদের নামে “জয়চন্দ্র প্রকাশ” রচনা করেন। চাঁদবর্দাইএর কবিতা অতি মনোহর ও হৃদয়-উদ্বেজক। এমন বীররসপ্রধান কবিতা ভারতে বোধ হয় আর নাই। যিনি অতি ভীক, তাঁহারও হৃদয় চাঁদের কবিতা শুনিয়া বীরমদে নাচিয়া উঠে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ চাঁদকে রাজপুত্র হোমার বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা টড পৃথীরাজরাসার প্রায় ত্রিশহাজার কবিতা অমূল্য-বাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর কিরদংশমাত্র রবার্ট লেজ কর্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কৃষভাষায় ও তৎপরে এদিসাটিক সোসাইটী কর্তৃক কতক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রাজপুত্রানার প্রচলিত সকল ভাষা, এ ছাড়া অপভ্রংশ শৌরশ্রেণী প্রাকৃত ভাষা জানা না থাকিলে চাঁদকবির সকল কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

২ অপর একজন কবি। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি রাজগড়ের নবাব সুলতান খাঁনানের ভ্রাতা ভূপাল-রাজ বন্দনবাবুর সভায় কবি ছিলেন। ইনি সুলতানের আদেশে বিহারীলাল চৌবে প্রণীত “শতনৈ” গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

চন্দ্রকাটুকি (পুং) প্রবর ঋষিভেদ।

চন্দ্রকান্ত (পুং) চন্দ্রঃ কান্তঃ প্রিয়োহুত। ১ কৈরব। ২ মণি-বিশেষ। ইহার পঞ্চাঙ্গ—চন্দ্রমণি, চাঁদ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দু-

কান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্ৰবোপল, সিতাশ্মা, চন্দ্রদ্রাব, শশিকান্ত। বৈদ্যক মতে ইহার ঔষ—মিথু, শিশির, শিবপ্রীতিকর, বহু, অশ্রু, দাহ ও অলক্ষ্মীনাশক। ইহা হইতে উদ্ভব জলের ঔষ—বিমল, লঘু, কফ, পিত্ত, মুচ্ছা, অশ্রু, দাহ, কাস ও মদাতার-রোগনাশক। (রাস্ত্রনি°)

ভোজরাজের মতে পৃথিমার চন্দ্রের সংস্পর্শে যে ক্ষমত ক্ষরণ হয়, তাহাকেই চন্দ্রকান্ত বলে। ইহা কলিযুগে হ্রাস্ত।

“পুণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতঃ স্রবতি ক্ষণাৎ।

চন্দ্রকান্তঃ তদাখ্যাতঃ হ্রাস্তঃ তৎকলৌ যুগে ॥” (যুক্তিকল্পতরু)

৩ কামরূপের একজন রাজা। [কামরূপ শব্দ ৫৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

(কৌ) ৩ ত্রীখণ্ডচন্দন। ৪ লক্ষ্মণায়জ চন্দ্রকেতুর রাজধানী।

চন্দ্রকান্তা (স্ত্রী) চন্দ্রঃ কান্তঃ প্রিয়ো যথাঃ। ১ রাজি। ২

চন্দ্রপত্নী। ৩ পঞ্চদশাক্ষরগদযুক্ত ছন্দোবিশেষ। ইহার ১১৩৪১ ৭৬৮৯১২১৩৪১৫ বর্ণসঙ্খ্য।

“চন্দ্রকান্তাতিথা রৌ ভৌ বিরামঃ স্বরাষ্টৌ।” (বৃত্তরত্না° ট°)

চন্দ্রকাস্তি (কৌ) চন্দ্রেণ কাস্তি র্থত্ব শুভ্রত্বাৎ। ১ রৌপ্য,

রূপা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধে নেত্রপাত করিলে তাঁহার দক্ষিণ নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তাহাতে তেজোময় কল্পের উৎপত্তি এবং বাম চক্ষু হইতে অশ্রুবিদ্যুৎ পতিত হয়, তাহা হইতে রৌপ্যের উৎপত্তি। [রৌপ্য দেখ।]

২ চন্দ্রের দীপ্তি।

চন্দ্রকাম, কোন রমণী কর্তৃক বশীকরণসাধন ঔষধ বা মন্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা বিমোহিত পুরুষের মানসিক পীড়া।

(ইন্দ্রজাল)। আরবী ভাষায় ইহার নাম সিনা।

চন্দ্রকামাশ্রিত (ত্রি) ইন্দ্রজাল মতে চন্দ্রকামরোগাশ্রিত ব্যক্তি।

চন্দ্রকালানল (কৌ) চক্রবিশেষ। (সময়মৃত)

চন্দ্রকিত (ত্রি) চন্দ্রকো জাতোহুত তারিকাদিভ্য ইতচ্। জাতচন্দ্র।

চন্দ্রকিন্ (পুং) চন্দ্রকোহুত্বাৎ ইনি। ময়ূর। (ত্রিকাণ্ড)

চন্দ্রকীর্তি (পুং) বুদ্ধপালিতমতাবলম্বী একজন বৌদ্ধচাৰ্য্য।

চন্দ্রকীর্তিসূরি, জৈনাচাৰ্য্য হর্ষকীর্তির গুরু। ইনি রত্নশেখরের ছকঃকেশের টীকা ও সারস্বতপ্রক্রিয়ার কীর্তিবুদ্ধিবিলাসিনী নামে টীকা রচনা করেন। হর্ষকীর্তি সলিম শাহের সময়ে (১৫৪৫-৫৩ খৃঃ অঃ) বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রকীর্তি তাঁহার কিছু পূর্বতন।

চন্দ্রকুণ্ড (পুং কৌ) কামরূপস্থ এক পবিত্র কুণ্ড। [চন্দ্রকুট দেখ।]

চন্দ্রকুল (কৌ) নগরবিশেষ। (শুকসপ্ততি ৩৮৯)

† Journal Asiatic Society, Bengal, 1886, pt. I, p. 5 &c.
“On the antiquity, authenticity and genuineness of Chānd Bardai's epic the Prithviraj Rāsa,” by Kuviraj Syāmal Dās.

‡ “The defence of Prithviraj Rāsa of Chānda Bardai”; by Pandit Mohan Lal Visnu Lal Pandia (Banaras Medical Hall Press, 1887.)

চন্দ্রকুলা (জী) কান্ধীয়ে প্রবাহিত একটি নদী।

(রাজতরঙ্গিনী ১৩২৯)

চন্দ্রকূট (পুং) কামরূপস্থ একটি পাহাড়। কালিকাপুরাণের মতে চন্দ্র যখন কামাখ্যায় আসিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার কিরণরাশি হইতে জল বাহির হয়। ইহা সেই জল লইয়া ব্রহ্মশিলার উপর নিজ নামে ও চন্দ্রের নামে একটি কুণ্ড নির্মাণ করেন। চন্দ্রকূটে নান করিয়া ইহার নিকটস্থ চন্দ্রকূটে উঠিয়া চন্দ্রমার পূজা করিলে পত্নীর কখন সন্তানবিচ্ছেদ হয় না। এখানে লোকপাল ইন্দ্রের পূজা করিলে মমুয়া মহাফল প্রাপ্ত হয়। প্রতি অমাবস্তায় চন্দ্র তিন বার চন্দ্রকূট ও নন্দন পর্বত প্রদক্ষিণ করেন। (কালিকাপুং ৭৯ অঃ)

চন্দ্রকূপ (পুং) কান্ধীস্থ চন্দ্রকূত পবিত্র কূপভেদ।

“চন্দ্রকূপজলে দ্বারা জগাহ নিয়মং ব্রতী।” (কান্ধীখং ১০ অঃ)

চন্দ্রকেতু (পুং) ১ লক্ষণের কনিষ্ঠ পুত্র। ভরতের কণারাম ইহাকে উত্তরদিকস্থ চন্দ্রকান্ত দেশ প্রদান করেন।

“চন্দ্রকেতোশ্চ মনস্ত মনভূমাং নিবেশিতা।

চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা॥” (রামাং ৭১০২ সং)

চন্দ্রকোণা, বাঙ্গালা প্রদেশে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি সহর ও থানা। অক্ষা° ২২° ৪৪' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৩৩' ২০" পূঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে এই সহরে কোম্পানির একটি কুঠি ছিল এবং তৎকালে সেখানকার তত্ত্বাবরণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্রবয়ন করিয়া কোম্পানিকে বহু মূল্যে বিক্রয় করিত। কোম্পানি এই সকল মূল্যবান বস্তাদি নানাদেশে চালান দিতেন। কোম্পানির কুঠি উঠিয়া গেলে তত্ত্বাবরণ খরিদার অভাবে বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আজও এই সহরের অনেক তত্ত্বাবরণ অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করে। চন্দ্রকোণার কাপড় আজও সর্বত্র বিখ্যাত। ১৮৯১ সালের লোকসংখ্যায় ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ১১৩০৯, তন্মধ্যে হিন্দু ১০৮৮২, মুসলমান ৪১৭। দেশাবলী নামক সংস্কৃত ভূগোলে লিখিত আছে, এই স্থান ব্রাহ্মণভূমির উত্তর সীমা।

চন্দ্রকয় (পুং) অমাবস্তা। (মেদিনী)

চন্দ্রকেতু, তাম্রীনদীতীরস্থ একটি পবিত্র স্থান।

(তাম্রীনদী ৫৫১ অঃ)

চন্দ্রগর্ভ (পুং) একখনি বৌদ্ধস্থ গ্রন্থ।

চন্দ্রগিরি, মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আর্কট জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত একটি তালুক। এই তালুক কদপা (কড়পা) নগরের সমিহিত। পরিমাণফল ৫৮৪ বর্গমাইল।

ইহাতে দুইটি সহর আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রগিরি একটি। ১৩৫টি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার উত্তরভাগে পূর্বঘাট পর্বত বিস্তৃত, দক্ষিণভাগের অধিকাংশ কর্ণেতনগর-পাহাড় দ্বারা পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ ঐ তালুকের কতক অংশ পর্বত, কতক অংশ প্রান্তরময় ও অবশিষ্ট অংশ গিরিবাহিনী নদী কর্তৃক আনীত পলিবিশিষ্ট উপত্যকা ভূমি। এই তালুক উত্তর আর্কটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উর্বর। জলাশয় সকল অতি উচ্চে অবস্থিত এবং সমিহিত জঙ্গল হইতে যথেষ্ট গলিত পত্রের সার পাওয়া যায়। চন্দ্রগিরির তৈলঙ্গ কৃষকগণ কঠিন পরিশ্রমী এবং কৃষিকাৰ্য্য করিতে ভালবাসে। সম্ভবতঃ ইহারাই জেলার মধ্যে উৎকৃষ্ট কৃষক। প্রায় ৩০০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি অরণ্যময়। সম্ভ্রুতি এই সকল অরণ্য রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

২ পূর্বোক্ত তালুকের একটি নগর। ত্রিপতি টেসনের প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণে তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৩৫' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২১' ৩০" পূঃ। এই নগরে তালুকের সরকারী আফিস, জেল ও ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

ইতিহাসে চন্দ্রগিরি অতি বিখ্যাত। ১৫৬৫ খৃঃ অন্ধে তালিকোটে পরাজিত হইয়া বিজয়নগরের রাজগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই নগরের চূর্ণ প্রায় ১৫১০ খৃঃ অন্ধে নির্মিত হয়। ১৬৬৪ খৃঃ অন্ধে উহা গোলকুণ্ডার সর্দারের করগত হয় এবং প্রায় একশত বৎসর পরে আর্কটের নবাব উহা অধিকার করেন।

১৭৫৮ খৃঃ অন্ধে নবাব আবদুল বাহাব খাঁ ঐ চূর্ণের অধিপতি ছিলেন এবং সেই চূর্ণেই পবিত্র ত্রিপতিনগরের রক্ষাকর্তা বলিয়া আগনার পরিচয় দিতেন। ১৭৮২ খৃঃ অন্ধে হায়দর আলী ঐ চূর্ণ জয় করেন এবং ১৭৯২ খৃঃ অন্ধে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত ইহা মহিমুরের অধীন থাকে। চতুঃপাশ্বে প্রদেশ হইতে প্রায় ৬০০ ফিট উচ্চ একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরের পর্বতের উপর ঐ চূর্ণ নির্মিত। ইহার অবস্থান ও গঠন একরূপ বলিয়াই পূর্বকালে অজ্ঞেয় বলিয়া গণ্য ছিল। এই নগরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ফোর্ট সেন্ট জর্জ অর্থাৎ মাজাজ প্রদান করিবার সর্বপ্রথম সন্ধিপত্র লিখিত হয়। বর্তমান চন্দ্রগিরি নগর চূর্ণের পূর্বে অবস্থিত, প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর এক্ষণে শতক্রেত হইয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চতুর্দিকস্থ ভূমি উর্বর। স্থানে স্থানে মন্দির পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রগিরি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত দক্ষিণ কাণাড়া জেলার একটি নদী। সেখানকার লোকে ইহাকে পুইশিরি নদী বলে। ইহা সম্প্রাঞ্জির নিকট পশ্চিমঘাট পর্বত (অক্ষা° ১২° ২৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪০' পূঃ) হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ৬৫ মাইল গমনের পর কাসরগোড়ের দুই মাইল দক্ষিণে (অক্ষা° ১২° ২৯' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১' ৬" পূঃ) সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বস্ত্রার সময় পশ্চিম ঘাট পর্বত হইতে বৃহৎ বৃহৎ কড়ি কাঠ কাটিয়া নদীশ্রোতে আনীত হয়। কিন্তু অল্প সময়ে নদীমুখ হইতে ১৫ মাইলের অধিক দূরে নৌকাদি বাইতে পারে না। নদীর বাম তীরে একটি দুর্গ স্থাপিত আছে।

চন্দ্রগিরি মলয়ালম্ ও তুলুভ প্রদেশের মধ্যবর্তী এবং তদ্বর্তী জনপ্রবাদ অনুসারে নারার রমণীগণের এই পর্বত লঙ্ঘন করিতে নাই।

চন্দ্রগুণ, চট্টগ্রামের পার্শ্বপ্রদেশে কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত একটি গ্রাম ও থানা। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে জেলার সমস্ত বিচারালয়াদি ছিল, পরে উহা রাজ্যমাটিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই গ্রামে কড়ি কাঠ ও অজ্ঞাত পার্শ্বভাষ্যজাত, তুলু, লবণ, মসলা, গোমেঘাদি ও তামাক প্রভৃতির বাণিজ্য হয়।

চন্দ্রগুপ্তি, মহিষুরের শিমোগ জেলায় স্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতের একটি শৃঙ্গ, ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮৩৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৪° ২৭' ৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৮' ২৫" পূঃ। পূর্বকালে এখানে বংশপরম্পরায় অনেক প্রাদেশিক সর্দারের গড় ছিল। ইহার সর্বোচ্চস্থানে পরশুরামের মাতা রেণুকার একটি মন্দির আছে।

চন্দ্রগুপ্ত, ভারতের একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গ ও ভাগবতপুরাণ মতে নন্দবংশের অবসানে কোটিল্য (চাণক্য) নামক একজন ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এ ছাড়া পুরাণে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই। বিষ্ণুপুরাণের চীকাকার লিখিয়াছেন—

“চন্দ্রগুপ্তং নন্দশৈব পদ্মাস্তরশ্চ মুরাসংজ্ঞস্ত পুত্রং মোর্ধ্যাণাং প্রথমম্।”

চন্দ্রগুপ্ত নন্দের মুরানামক এক পত্নীরই পুত্র, মোর্ধ্যা-রাজগণের মধ্যে ইনিই প্রথম।

কিন্তু মুরারাক্ষসের “মোর্ধ্যোন্দু” ও “মন্ত্রে স্থিরাং মোর্ধ্য-কুলশ লক্ষ্মীঃ” (মু° রা° ২ অঃ) ইত্যাদি বচনে চন্দ্রগুপ্ত মোর্ধ্য ছিলেন এই মাত্র জানা যায়। আবার উক্ত নাটকের ৪র্থ অঙ্কে “মোর্ধ্যোহসৌ স্বামিপুত্রঃ পরিচরণপরোমিজপুত্রস্তবাহং”

মলয়কেতুর এই বচন দ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে নন্দপুত্র বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে।

কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেব (১) দক্ষিণদেশের একজন পণ্ডিতের নিকট হইতে তৈলঙ্গ অক্ষরে লিখিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, তাহাতে লিখিত আছে—

কলিযুগের আরম্ভে নন্দনামে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তন্মধ্যে সর্কার্থসিদ্ধি একজন, তিনি একজন মহাবীর এবং রাক্ষস প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই নন্দরাজের মুরা ও সুনন্দা নামে দুইটা মহিষী ছিল। এক সময়ে রাজা উত্তর রাণীকে সঙ্গে লইয়া এক সিদ্ধপুরুষের আশ্রমে উপস্থিত হন ও ভক্তিতাবে সেই সিদ্ধের পাদ দ্ব্যুত করিয়া সেই জল উত্তর রাণীর মাথায় ছিটাইয়া দেন। সুনন্দার মাথা হইতে ২ ফোঁটা ও মুরার মাথা হইতে ১ ফোঁটা জল পড়ে। ১ ফোঁটা জল পড়িতে না পড়িতে মুরা অতি ভক্তিতাবে তাহা গ্রহণ করেন, তাহাতে সিদ্ধপুরুষ মুরার প্রতি অতিশয় ক্রীত হন। বণাকালে মুরা একটি রূপবান্ সন্তান প্রসব করেন। তাহার নাম হইল মোর্ধ্য। কিন্তু সুনন্দা কোন সন্তান প্রসব না করিয়া একতাল মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। রাজমন্ত্রী রাক্ষস তাহা নয়গণ্ডে ভাগ করিয়া তৈলকুপীর মধ্যে রাখিয়া দেন। রাক্ষসের বন্ধে সেই নয় গণ্ড হইতে ক্রমে ৯টা শিশু সন্তান জন্মে এবং পিতৃপুরুষগণের নামানুসারে তাহারাই নব নন্দ নামে খ্যাত হয়। রাজা সর্কার্থসিদ্ধি বণাকালে নয়-পুত্রকে রাজ্য ও মোর্ধ্যাকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া রাজপদ পরিত্যাগ করেন। মোর্ধ্যের একশত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। মোর্ধ্যাপুত্রগণ শোর্ধ্য বীর্ঘ্য নবনন্দকে অতিক্রম করিলেন, তাহাতে মোর্ধ্যের উপর নন্দগণের বড়ই আক্রোশ হইল। তাঁহার একদিন মোর্ধ্য ও তাঁহার পুত্রগণকে এক গুপ্তগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া সপুত্র শিতাকে বিনাশ করিলেন।

ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সিংহলরাজ একটা মোমের সিংহ পিঞ্জরে করিয়া পাঠান ও এই ভাবে পত্র দেন, “যদি আপনার কোন অমাত্য পিঞ্জর না খুলিয়া সিংহকে ছুটাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিব।” সিংহটা মোমে প্রস্তুত হইলেও জীবন্ত বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং নন্দরাজগণ মহা মুগ্ধিলে পড়িলেন, খাঁচা না খুলিলে কিরূপেই বা সিংহ চলিবে, তাহা তাহাদের সামান্য বুদ্ধিতে

(১) See Wilson's Theatre of the Hindus, Vol. II. p. 114 &c., (Ed. 1835.)

আসিল না। তখনও চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ, বহির্গত হয় নাই, তিনি कहিলেন, “যদি আমার প্রাণরক্ষা হয়, তবে আমি ঐ সিংহকে দৌড় করাইকে পারি।” নবনন্দ চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন চন্দ্রগুপ্ত একটা লোহদণ্ড উত্তপ্ত করিয়া পিঙ্গুরসিংহের গায়ে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে মোম গলিয়া সিংহমূর্তি অতর্কিত হইল। তাহাতে নন্দগণ চন্দ্রগুপ্তকে অঙ্গকার গম্বীর হইতে তুলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা ও যথেষ্ট ধনদান করিলেন। এখন হইতে চন্দ্রগুপ্ত রাজার ভায় বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞাশ্রিত বাহ, সৌম্যমূর্তি, বীরভাব ও উদার প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ক্রমে এই জন্ত চন্দ্রগুপ্তের উপর নন্দরাজগণের দারুণ ঈর্ষা জন্মিল। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ পায়ে একটা কুশ বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ক্রমাগতই কুশগাছ ছিড়িতে ছেন। চন্দ্রগুপ্ত সেই ক্রোধনস্বভাব ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাম রিকুগুপ্ত। নীতিশাস্ত্র-বিদ চণকের পুত্র বলিয়া ঈহাকে লোকে চাণক্য বলিয়াও ডাকিত। ক্রমে চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের বেশ মিত্রতা জন্মিল। চন্দ্রগুপ্ত মিত্রের নিকট নন্দ হইতে তাঁহার দুরবস্থার বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। সেই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, “চন্দ্রগুপ্ত! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে নন্দের সিংহাসন প্রদান করিব।”

এক দিন চাণক্য কুশার্ভ হইয়া নন্দের ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন ও প্রধান আসনে বসিয়া রহিলেন। নবনন্দ চাণক্যকে একজন সামান্ত ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাঁহাকে সেই উচ্চাসন হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাতে অনেক আপত্তি করেন। কিন্তু নন্দরাজগণ তাহা না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চাণক্যকে টানিয়া তুলিয়া দিলেন। চাণক্য তখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শিখা খুলিয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, “বর্তমান না নন্দবংশের উচ্ছেদ হইবে, ততদিন আমি আর এ শিখা বন্ধন করিব না।” এই বলিয়া চাণক্য তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। চন্দ্রগুপ্তও নগর ছাড়িয়া চাণক্যের নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন এবং নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্ত স্বেচ্ছাধিপ পর্তুতেজ্ঞকে আহ্বান করিলেন। কথা হইল, যদি যুদ্ধে জয় হয়, তবে পর্তুতেজ্ঞ অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবেন। তদনুসারে স্বেচ্ছাধীশ সসৈন্য আসিলেন। নন্দের সহিত যুদ্ধ চলিল। চাণক্যের কৌশলে একে একে সকল নন্দই নিহত হইলেন।

রাজমন্ত্রী রাক্ষস তখন আর উপায় না দেখিয়া বৃদ্ধ সর্বার্থ-সিদ্ধিকে নগর হইতে গুপ্তভাবে বাহির করিয়া দিলেন। রাজধানী চন্দ্রগুপ্তের অধিকৃত হইল। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্ত ইচ্ছাশ্রমে এক বিষময়ী কন্যা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। চাণক্য তাহা জানিতে পরিয়া পর্তুতরাজকে ঐ কন্যা অর্পণ করেন, তাহাতেই পর্তুতরাজের মৃত্যু হয়। পরে চাণক্য পর্তুতরাজের পুত্র মলয়কেতুকে পিতৃনির্দিষ্ট অর্দ্ধরাজ্য দিবার জন্ত আহ্বান করেন, কিন্তু মলয়কেতু ভীত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন। তৎপরে চাণক্যের কৌশলে বন-বাসী সর্বার্থসিদ্ধি অচিরে ইলোক পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস তাহা শুনিয়া মলয়কেতুকে আহ্বান করিয়া স্বেচ্ছাসৈন্য সাহায্যে মৌর্যরাজকে আক্রমণ করেন। কিন্তু চাণক্যের কৌশলে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বন্দী হইলেন, শেষে চাণক্য তাঁহাকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্বপদ প্রদান করেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষরচিত বিনয়পিটকের সমস্তপালা-দিকা দ্বারা চীকায় ও মহানামবির কৃত মহাবংশীকায় চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রগুতো) (২) সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

তক্ষশিলাবাসী চাণক্য ধননন্দের নিকট নিতান্ত অপ-মানিত হইয়া রাজকুমার পর্তুতের সাহায্যে গুপ্তভাবে বিদ্যা-রণে পলাইয়া আসেন। এখানে তিনি নিজ ক্ষমতাপ্রভাবে একটা কার্ষাপণকে চটা করিয়া ক্রমে আট কোটা কার্ষাপণ সংগ্রহ করেন। এই বিপুল অর্থবলে তাঁহার অপর এক ব্যক্তিকে রাজা করিবার ইচ্ছা হইল। ঘটনাক্রমে মোরিয় (মৌর্য)-বংশোদ্ভব কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন।

চন্দ্রগুপ্তের মাতা মোরিয়নগরাধিপের (৩) পটুমহিষী ছিলেন। একজন হৃদ্য রাজা মোরিয়নগর অধিকার করিয়া মোরিয় (মৌর্য)-রাজকে বিনাশ করেন। সে সময়ে তাঁহার পটুমহিষী গর্ভবতী ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্যে বহুকষ্টে পলাইয়া পুষ্পপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। যথাকালে সেই রাণীর একটা পুত্র সন্তান জন্মিল। তিনি নবজাত শিশুকে একটা মৃৎপাত্রের শোয়াইয়া দেবগণের উপর নির্ভর করিয়া একটা খোয়াড়ের দরজায় রাখিয়া

(২) বুদ্ধঘোষ ও মহানামের গ্রন্থ পালিভাষায় লিপিত, হুতরাং চন্দ্রগুপ্তের নামও এইরূপ পালিভাষায় আছে; কিন্তু সাধারণের বোধ-গম্যের জন্ত নামগুলি সংস্কৃত আকারে লিখিত হইল।

(৩) বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের মতে মোরিয়নগর হিন্দুকুল ও চিত্রলের মধ্যবর্তী উজ্জিনক দেশের মধ্যে ছিল। [উজ্জিনক শব্দ ও S. Beal's Records of the Western World, Vol. I. p. XVII. দ্রষ্টব্য।]

গেলেন। যৌবনরাজকে যেমন বুঝত রক্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ চন্দ্র নামে একটা বুঝত সেই শিশুর নিকট থাকিত। সেই অবস্থায় একজন রাখাল দেখিতে পায়। শিশুর অমূল্য-মুষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার জনরে বাৎসল্যভাব জন্মে। তখন সে নিজ গৃহে শিশুকে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে থাকে। চন্দ্র নামক বুঝত কর্তৃক গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া শিশুর নাম হইল চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত কিছু বড় হইলে তাঁহার প্রতাপালকের বন্ধ এক ব্যাধ তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া নিজ ঘরে রাখে। এই গ্রামে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিদিন গোমেঘাদি চরাইতেন। একদিন গ্রামস্থ অপর রাখালবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে তাঁহার “রাজা রাজা” খেলা সাধ হইল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইলেন, অপর বালকেরা কেহ সামন্ত কেহ মন্ত্রী কেহ বা চোরডাকাত প্রভৃতি সাজিল। মনে মনে একটা বিচারালয় স্থির হইল। চন্দ্রগুপ্ত বিচার-সনে বসিলেন। অপরাধী জুটিল। বিচারকেরা বিচার করিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিচার শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের হাত পা কাটিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কৰ্ম্মচারীগণ অমনি বলিল, “দেব! কুঠার নাই, কিরূপে কাটিয়া দিব।” চন্দ্রগুপ্ত গভীরস্বরে কহিলেন—“চন্দ্রগুপ্তের আদেশ, তোমরা উহাদের হাত পা কাটিয়া দাও। ছাগের শৃঙ্গই তোমাদের কুঠার।” রাজা আদেশ প্রতীপালিত হইল, শৃঙ্গের আঘাতেই তাহাদের হাত পা দিখত হইয়া পড়িল। আবার হুকুম করিলেন, “হাত পা জুড়িয়া দাও।” তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ হাত পা জোড়া লাগিল।

চাণক্য এই অভূতপূর্ব ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বুঝিলেন চন্দ্রগুপ্ত সামান্য রাখাল বালক নহে। নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্র। তখন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সঙ্গে করিয়া তাহার প্রতাপালকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাধকে সহস্র কার্ষাপণ দিয়া কহিলেন, “আমি তোমার এই ছেলেটিকে সকল বিদ্যা শিখাইব, ইহাকে আমার দাও।” অর্থের মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া ব্যাধ আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে আপন আশ্রমে আনিলেন। এখানে তিনি পশমের উপর স্বর্ণহস্ত গাঁথিয়া চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠে বেঁধেন করিয়া দিলেন। ঐ স্বর্ণহস্তের মূল্য প্রায় লক্ষ মুদ্রা হইবে। চাণক্য কুমার পর্ত্ততকেও ঐরূপ স্বর্ণহস্ত পরাইয়াছিলেন। অতি অল্পদিন পরে তিনি পরিচয় পাইলেন যে চন্দ্রগুপ্ত মোরিয়-(মৌর্য) বংশীয় রাজকুমার।

একদিন ঐ তিন ব্যক্তি পরস্পর আহার করিয়া এক নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন। সকলেই নিদ্রিত। চাণক্যের অগ্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি পর্ত্ততকে তুলিলেন ও তাঁহার হাতে একখানি তীক্ষ্ণধার অসি দিয়া বলিলেন, “যাও চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠ হইতে স্বত্রগাছি লইয়া আইস, ছিড়িয়া বা খুলিয়া আনিতে পারিবে না।” পর্ত্তত অসি হস্তে অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহার কার্য্যসিদ্ধ হইল না। এইরূপ পর দিন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নিদ্রিত পর্ত্ততের কণ্ঠ-দেশ হইতে স্বত্রগাছি আনিতে বলিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আদেশ-পালনে অগ্রসর হইলেন, তিনি ভাবিলেন, ছিড়িবে না অথচ খুলিতে পারিব না, এরূপ হইলে স্বত্র আনিবার উপায় কি? তবে দেখিতেছি পর্ত্ততের মন্তকচ্ছেদ ভিন্ন আর কোন পথ নাই। কি করেন চাণক্যের আদেশ পালন করা চাই। তিনি অসির আঘাতে পর্ত্ততের মূণ্ড কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বত্রগাছি আনিয়া চাণক্যের পদে অর্পণ করিলেন। চাণক্য দেখিয়া শুনিয়া অবাক! যাহা হউক, তিনি চন্দ্রগুপ্তের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল বিদ্যা শিখাইলেন। এইরূপে ছয় সাতবর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্ত একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রগুপ্ত যৌবনরাজ্যে পদার্পণ করিলেন। এতদিন পরে চাণক্য আপনার অতীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ পাইলেন। তিনি আপন সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া সেই অর্থবলে বহু সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। চাণক্যের আদেশে চন্দ্রগুপ্ত সেই বিপুলবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। এবার চাণক্য আপনার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জনাকীর্ণ নগর ও গ্রাম আক্রমণ করিতে লাগিলেন। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া নগরবাসীগণ একত্র হইল এবং তাহাদের সম্মিলিত আক্রমণে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন উভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে পরামর্শ স্থির হইল যে “যখন যুদ্ধে কোন ফলাফল স্থির হইতেছে না, তখন ছদ্মবেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় জানা উচিত।” অনন্তর উভয়ে ছদ্মবেশে নগরে নগরে ঘুরিয়া সাধারণের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

এক দিন উভয়ে একগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানে একজন রমণী তাহার পুত্রকে অপূর্ণ খাওয়াইতে ছিলেন। সেই শিশু চারিধার না পাইয়া কেবল পিঠকের মধ্যস্থল খাইতেছিল, তাহা দেখিয়া রমণী-পুত্রকে বলিল—“তোমার কার্য্য ঠিক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের মত। পিঠার চারিপাশ আগে না

খাইয়া যেমন মাংসখান খাইতেছিল, চন্দ্রগুপ্ত ভেমনি রাজ্য-লোভের উচ্চ আশায় মত্ত হইয়া আগে সীমান্তস্থান জয় না করিয়া একবারে রাজ্যের মধ্যে আসিয়া নগরাদি আক্রমণ করিতেছে। এ তাঁহার মূৰ্খতা বটে!”

এবার চন্দ্রগুপ্ত আপনাদেব দৌষ বুঝিতে পারিলেন। এবার বহুতর সৈন্য সংগৃহীত হইল। এবার চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে প্রথমেই সীমান্ত প্রদেশ সকল আক্রমণ করিতে লাগিলেন (১)। অবশেষে তাঁহারা পাটলীপুত্র আক্রমণ করিয়া ধননন্দকে নিপাতিত করিলেন।

চাণক্য সহসা চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন নাই। অগ্রে একজন দীঘরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া নন্দের গুপ্তকোষাগার অবগত হন। সেই সমস্ত গুপ্তধন সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পুষ্পপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত জতিয়া মনাতর্প (মনিয়তপ্পো) নামক তাঁহার এক পূর্বপরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাঁহাকে রাজ্যের শাস্তিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। রাজ্যদেশে জতিয়া রাজ্যের সূক্ষ্মালা স্থাপন করিলেন।

চাণক্য দেখিলেন যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহারই কোশলে আজ সমুক্ত রাজপদ লাভ করিয়াছেন, হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতে সেই চন্দ্রগুপ্ত কোন চুষ্টব্যক্তির বিষপ্রয়োগে নিহত হইতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তকে অন্ন অন্ন করিয়া, বিষপান অভ্যাস করাইলেন। সুতরাং কেহ যে বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবিনাশ করিবেন, তাহাতেও আর কোন সন্দেহ রহিল না।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকেই পাটরাণী করিলেন। ঐ মাতুলই তাঁহার মাতার সহিত পুষ্পপুরে আসিয়াছিলেন।

যথাকালে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন। একদিন চাণক্য যথারীতি চন্দ্রগুপ্তের খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আদর করিয়া যেমন রাণীর মুখে আহার তুলিয়া দিতে যাইবেন, চাণক্য দ্রুতবেগে আসিয়া রাজাকে নিবারণ করেন, কিন্তু একগ্রাস রাণীর মুখে গিয়াছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং রাণীর উদর বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণকে লইয়া ছাগের গর্ভে শেলাই করিয়া রাখেন। এইরূপে সাত দিন সাতটা ছাগের উদরে রাখিয়া তৎপরে সেই নবজাত শিশুকে খাদ্যের হস্তে অর্পণ করেন। সেই শিশুর গায়ে

ছাগলের একবিদ্যুৎ রক্ত পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বিদ্যুৎসার হইল। (মহাবংশটীকা) (২)।

মহাবংশ-টীকাকার শেষে লিখিয়াছেন যে হিন্দুগ্রন্থে নন্দরাজের পুনর্জীবন লাভের কথা আছে (৩), কিন্তু তাহা ঠিক নহে, চন্দ্রগুপ্তের মৃতদেহে দেবগর্ভ নামক বক্ষ কর্তৃক পুনর্জীবন সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারেন এবং বিদ্যুৎসার নিজ অসির আঘাতে তাহাকে বিনাশ করিয়া মহাসমারোহে পিতার সমাধিক্রিয়া সমাধা করেন।

প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত পদ্মমন্দিরগণি-বিরচিত ঋষিমণ্ডল প্রকরণবৃত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দকে উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপুত্র শাসন করিতেন। তাঁহার প্রাসাদে শত্রুগণের হননার্থ প্রত্যহ বিষ প্রস্তুত হইত। এক দিন চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার গর্ভবতী মহিষী দুর্ধরা ভ্রমক্রমে বিষাক্ত খাদ্য আহার করেন, চাণক্য তাহা দেখিয়া উভয়কেই নিবারণ করেন। কিন্তু তখন দুর্ধরা অনেকটা বিষ খাইয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার আর জীবনের আশা নাই ভাবিয়া চাণক্য অবিলম্বে রাণীর উদর বিদীর্ণ করিয়া শিশুকে বাহির করেন। সে সময়ে শিশুর মাথায় এক বিদ্যুৎ রক্ত পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল বিদ্যুৎসার। (ঋষিমণ্ডলপ্রকরণবৃত্তি)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ (৪) চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে অল্প বিস্তর লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের মতেই চন্দ্রগুপ্ত গান্ধারদেশ (Gandariðæ) ও প্রাসী (Prasii) দেশের রাজা ছিলেন।

জটিনস্ লিখিয়াছেন, এই রাজা অতি নীচ বংশোদ্ভব। দৈববলেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি আলেক্সান্দারের সহিত দেখা করেন। (৫) কিন্তু তাঁহার বক্ষ কথায় আলেক্সান্দার রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ-

(২) টীকাকার লিখিয়াছেন চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে উত্তরবিহারের থেরো রচিত “অথকথা” নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) বৃহৎকথা বা কথাসরিংসাগর গ্রন্থে নন্দের মৃতদেহে পুনর্জীবন সঞ্চারের বিবরণ লিখিত আছে। [নন্দ শব্দে বিদ্যুৎ বিবরণ দেখ।]

(৪) পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ডিওডোরস্ সিকিউলস্ (Xandrames), কুইন্টাস্ কাটিলস্ (Aggramen), জটিনস্ ও সেনেকুটিনস্ (Sandrocottus or Sandrokoptos) এবং দ্রুটার্ক (Andracottus) নামে চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) দ্রুটার্কও লিখিয়াছেন যে, যখন চন্দ্রগুপ্তের সহিত আলেক্সান্দারের দেখা হয়, তখন চন্দ্র বালক মাত্র। তাঁহার নীচবংশে জন্ম বলিয়া আলেক্সান্দার তাঁহাকে স্থগীর চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

(১) মুদ্রারাক্ষসে লিখিত আছে—এই যুদ্ধে পর্ত্তেবর, শক, যবন,

কাবোজ ও পারসিক সৈন্য চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিয়াছিল।

দেৱের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়া রক্ষা পান। নানাহান ঘুরিয়া অভিশ্রম ক্রান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়েন, একটা বৃহৎ সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও পশুরাজ কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। তাহা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে অশ্রুট আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্ত অনেক দস্যুদল সংগ্রহ করিলেন তাহাদের সাহায্যে গ্রীকসৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া সিঙ্কুনদ-প্রবাহিত প্রদেশ অধিকার করিলেন। (Justinus, XV. 4)

ডিওডোরস্ লিখিয়াছেন—আলেক্সান্দার ফিজিয়াসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে সিঙ্কুর পরপারে মরুভূমির মধ্য দিয়া ১২ দিনের পথ গমন করিলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রের (Xandrames) রাজ্য, তাঁহার বিশ-হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতি, দুই হাজার রথ ও চারি হাজার হস্তী আছে। এ কথা আলেক্সান্দারের বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু পুরুকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। পুরুরাজ আরও বলেন যে গান্ধ্যপ্রদেশের সেই রাজা অতি নীচ বংশোদ্ভব নাগিতের পুত্র। নাগিত অতি অশুপুরুষ ছিল, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাণী তাহার সহবাস করে। সেই ছুটা রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে। (Diodorus Siculus)

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ ডিওডোরাসের মত চন্দ্রগুপ্তের বিপুল সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে প্রজাগণ সকলেই এই রাজাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে।

আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো, আপিয়ানস্ প্রভৃতি অনেক গ্রীক গ্রন্থ-কারই চন্দ্রগুপ্তের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

ডিওডোরাসের বর্ণনায় জানা যায়, গ্রীকসেনানায়ক ফিলিপের হত্যাকাণ্ডের পর আলেক্সান্দার ইউডিমস্ ও তক্ষ-শিলকে পঞ্জাব শাসনের ভারার্ণ করেন। কিন্তু ৩২৩ খৃঃ পূর্বাব্দে আলেক্সান্দারের মৃত্যুর পর ইউডিমস্ নিজে রাজা হইবার আশায় তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরু-রাজকে হত্যা করেন। (Diodorus—XIX. 5.)

কাহারও মতে চন্দ্রগুপ্ত পুরুরাজের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্বাব্দে ইউডিমস্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থে ৩০০০ পদাতি, ৫০০০ অশ্বারোহী এবং প্রায় ১২০ টী হস্তী লইয়া গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই অবকাশে চন্দ্রগুপ্ত জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্ত দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। (Justinus—XV. 4.)

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, ইহারই অনতিকাল পরে সেলিউকস্ নিকিটর পুনরায় গ্রীকরাজ্য স্থাপনের জন্ত চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু তাহার সহিত চন্দ্রগুপ্ত মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হন। মেগেস্টিনিস্ লিখিয়াছেন, এই সময়ে সিলি-উকস্ চন্দ্রগুপ্তকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করেন। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত ৫০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়া সিলি-উকসের সম্মান রক্ষা করেন। সিলিউকসের আদেশে গ্রীকদূত মেগেস্টিনিস্ পাটলীপুত্রে (Pelembotthra) নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মেগেস্টিনিস্ চন্দ্রগুপ্ত ও তাহার রাজ্যের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের স্বকাব্যেরও চারিলক্ষ লোক উপস্থিত থাকিত। প্লুটার্ক একস্থানে লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। শ্রাবণবেলগোলা হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম খোদিত শিলাফলকে লিখিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত শতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করেন।

কোন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এ সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। স্বল্পপুরাণে কুমারিকা-খণ্ডে লিখিত আছে—“ততঃস্বিসু সহস্রেশু দশাদিক শতত্ৰয়ে। ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্হনিষ্যতি॥” (৩৯ অঃ)

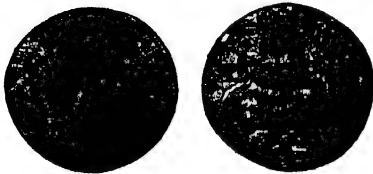
কলির ৩৩১০ বর্ষ হইলে নন্দের রাজ্য হয়, নন্দকে চাণক্য বিনাশ করিবেন। এখন কলির ৪৯৯৫ অব্দ, সুতরাং কুমারিকাখণ্ডের মতে (৪৯৯৫—৩৩১০) ১৬৮৫ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ২০৯ খৃষ্টাব্দে নন্দের বিনাশ ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ হইয়া থাকিবে। পৌরাণিক বচনে হইলেও এ কথার আদৌ নির্ভর করা যাইতে পারে না, কারণ গ্রীক ইতিহাস দ্বারা সর্ববাদীসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হইয়াছে যে ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে অর্থাৎ কুমারিকাখণ্ড বর্ণিত সময়ের প্রায় ৫০২ বর্ষ পূর্বে মহাবীর আলেক্সান্দারের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে আলেক্সান্দারের সময় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার বয়স অল্প। এক্ষণে স্থলে ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দেরও পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম রাজ্যাভিষেক হয়। উইলসন্, কোল-ত্রক, টার্নার, প্রিন্সেপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ চন্দ্র-গুপ্তের প্রকৃত সময় নিরূপণে যথেষ্ট আশ্রয় স্বীকার করিয়া-ছেন, অবশেষে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্‌ডেভিট স্থির করেন যে চন্দ্রগুপ্ত প্রায় ৩২০ খৃঃ পূর্বাব্দে রাজা হন (৬)। আমাদের বিবেচনায় চন্দ্রগুপ্ত ঐ সময়ের পূর্বে রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি রাজচক্রবর্তীরূপে গণ্য হন।

(৬) Numismata Orientalia, (1877) p. 41—“On the Ancient coins and measure of Ceylon.” By T. W. Rhys Davids.

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিম্বসার রাজা হন। রাজা রাজেন্দ্রশালার মতে “নেপালীবৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিলে বিম্বসারকে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বা মোর্ধ্যাবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। চন্দ্রগুপ্ত মোর্ধ্যাবংশের প্রথম ও শেষ রাজা” (৭)। কিন্তু যখন সকল প্রধান পুরাণে, দীপবংশ ও মহাবংশ প্রভৃতি প্রামাণিক বৌদ্ধগ্রন্থে বিম্বসার চন্দ্রগুপ্তের পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। [চাণক্য, বিম্বসার প্রভৃতি শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রগুপ্ত, ১ একজন মহাপ্রতাপশালী গুপ্তসম্রাট ও মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পিতা। ইহার অপর নাম বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য। ইনি লিচ্ছবিরাজহুতা কুমারদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। মেহরৌলীর খোদিত শিলাফলকে চন্দ্র নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়, কেহ কেহ তাঁহাকে মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু ঐ লিপির অক্ষর ও সমুদ্রগুপ্তের সময়কার গুপ্তাক্ষরে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায়, উহা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপরাপর গুপ্তসম্রাটগণের শিলাফলকে “ভাগবত” নামে যেমন তাঁহাদের পরিচয় আছে, মেহরৌলীর লিপিতেও সেইরূপ “ভাগবত” আখ্যা দৃষ্ট হয়। এই ফলকে লিখিত আছে যে চন্দ্র বঙ্গ হইতে সিন্ধু বাহ্লিক পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ইনিই গুপ্তরাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে সমস্ত উত্তর ভারত জয় করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং নূতন (গুপ্ত) সম্বৎ প্রচলন করেন। গুপ্তসম্রাটগণের ইতিহাসে ইনি ১ম চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

২ অপর একজন গুপ্তসম্রাট, ২য় চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত। ইনি মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের “পুত্রিগৃহীত” পুত্র ও দত্তদেবীর গর্ভজাত। ইহার অপর নাম বিক্রম বা বিক্রমাক, ও দেবরাজ। ইনি (নেপালরাজ ধ্রুবদেবের কন্যা) ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। দিগ্বিজয় উপলক্ষে উদয়গিরি প্রভৃতি



চন্দ্রগুপ্ত মুদ্রা।

ভারতের নানান্থান দর্শন, অনেক কীর্ত্তিস্থাপন এবং অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ইহার সময়কার খোদিত

শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ইনি ৮১ হইতে ৯৪ গুপ্তসম্বৎ (৪০০ হইতে ৪১৩ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ভোগ করেন। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

চন্দ্রগুপ্ত, অজমীরের একজন চৌহানরাজ, মাণিক্যরায়ের পৌত্র। প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজ ইহারই বংশধর।

চন্দ্রগুপ্ত, একজন জালন্ধররাজপুত্র। মড়াগ্রামের বিখ্যাত লক্ষ্মণন্দিরে প্রায় ৬০০ খৃঃ অব্দের প্রাচীন হুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের পত্নী জৈম্বরা ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্রগৃহ (ক্লী) চন্দ্রগ্রহ গৃহ ৬তং। কর্কটরাশি। চন্দ্রমন্দির প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রগোচর ফল (ক্লী) রাশিবিশেষে চন্দ্রের অবস্থিতি অনুসারে মানবগণের যে গুণভুক্ত ঘটে, তাহাকেই চন্দ্রগোচর ফল বলা যায়। [গোচর দেখ।]

চন্দ্রগোপালপাল, নবদ্বীপাদিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাস্থ প্রধান বিদুষক। ইনি গোপালভাঁড় বলিয়া খ্যাত। নবদ্বীপ নগরে কুন্ডকার কুলে ইহার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। ইনি অতিশয় সঙ্গীতাত্মক ছিলেন এবং দিল্লী প্রদেশীয় সমাগত কেলোয়াংদিগকে অতিশয় সমাদর করিতেন। রূপদ ও খেয়াল তাঁহার বড়ই প্রীতিকর ছিল এবং তিনি এতদংশীয় সঙ্গীতের রাগ রাগিণী অতি আশ্চর্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ইনি অট্টালিকা নির্মাণের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। রাজবাড়ীর মধ্যে পুজার দালান তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। কাশীধামস্থ পবিত্র জ্ঞানবাণী কূপে অবতরণ করিবার জন্ত যাত্রীদিগের সুবিধাজনক মর্ধ্যর প্রান্তর নির্মিত সোপানশ্রেণীও ইহা দ্বারা নির্মিত হয়। হিন্দু সমাজেও সর্বত্র সম্মান ও সমাদর পাইতেন এবং জাতি সঙ্ঘর্ষী কোন প্রসন্ন উত্থাপিত হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এমন উপস্থিতিবক্তা ও সুরসিক বঙ্গে বোধ হয় আর জন্মে নাই। (Calcutta Review.) এ ছাড়া ইহার সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবাদ আছে। [গোপালভাঁড় দেখ।]

চন্দ্রগোমিন্, অসিদ্ধ চন্দ্রব্যাকরণপ্রণেতা। কীর্ত্তাসমী ইহার রচিত পারায়ণ এবং পুরুষোত্তম ও উজ্জলদত্ত ইহার লিঙ্গানুশাসন বা লিঙ্গকারিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্রগোল (পুং) চন্দ্রএব গোলঃ। গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল। (ত্রিকাণ্ড)

চন্দ্রগোলন্দ (পূঃ) [বহু] চন্দ্রগোলে তিষ্ঠতি স্বাক। চন্দ্র-
গোলস্থিত অধাতোজী পিচ্ছলোক। (ত্রিকাণ্ডঃ)

চন্দ্রগোলিকা (জী) চন্দ্রগোলঃ সাধনমেনান্তান্ত চন্দ্রগোল-
ঠন-টাপ্। জ্যোৎস্না। (হেমঃ)

চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের গ্রহণ। গ্রহণ শব্দের পরিভাষায় লিখিত
হইয়াছে যে চন্দ্র যখন কোন পাতবিন্দুর নিকট থাকে এবং
সূর্য্যও সেই সময় অপর পাতবিন্দুর নিকট থাকে, তখনই
চন্দ্রগ্রহণ হয়। সুতরাং ঐ পাতবিন্দুদ্বয় স্থির হইলে প্রতিবৎসর
ঠিক এক সময়েই গ্রহণ হইত। বৃষ্ণ ও শুক্রের কক্ষার সহিত
সূর্য্যাক্ষার পাতবিন্দু স্থির, সুতরাং ইহাদের গ্রহণ একবার
বৎসরের যে সময়ে হয়, তাহার পরবর্তী গ্রহণও বৎসরের
ঠিক সেই সময়েই হইয়া থাকে এবং চিরকাল হইতে থাকিবে।
যদিও এইরূপ গ্রহণদ্বয়ের মধ্যবর্তীকালের পরিমাণ বহু বৎসর।
বাস্তবিক ঐ পাতদ্বয় সূর্য্যাক্ষার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে
হইতে প্রায় ১৮½ বৎসরে একবার ঘুরিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে
আইসে। অর্থাৎ প্রতিবৎসর প্রায় ১৯° অংশ পিছাইয়া যায়।
সুতরাং একবৎসর যে সময় গ্রহণ হয়, পরবৎসর সেই গ্রহণ
হইলে, তাহা প্রায় ১৯ দিন পূর্ব্ব হইবে।

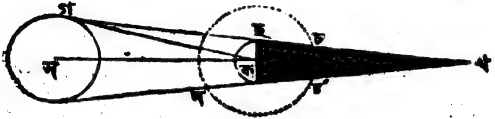
চন্দ্র সূর্য্য ও চন্দ্রপাতের (Node) যেরূপ স্থানে একবার
অবস্থান করে, পুনরায় সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় ২২৩
চান্দ্রমাস লাগে। এক্ষণে যদি পূর্ণিমার দিন একবার চন্দ্র
রাতগ্রস্ত হয়, তবে পুনরায় ২২৩ চান্দ্রমাস পরে চন্দ্র ও সূর্য্যের
অবস্থান পূর্ব্ববৎ হইবে, সুতরাং গ্রহণও সম্ভব। ৫টি লিপইয়ার
(Leap year) থাকিলে ১৮ বৎসর ১০ দি, ৭ ঘ, ৪৩ মি এবং ৪টি
লিপইয়ার থাকিলে ১৮ বৎসর ১১ দি, ৭ ঘ, ৪৩ মি পরে চন্দ্রের
স্থিতি, সূর্য্য চন্দ্রপাত এবং চন্দ্রকক্ষার দূরতম বিন্দুর (apogee)
সহিত তুলনার আবার প্রায় পূর্ব্বরূপ হয়। সুতরাং ঐ কাল
পরে সর্ব্বাংশেই প্রায় পূর্ব্ববারের স্থায় গ্রহণ হয়। কিন্তু এই
কালের মধ্যে চন্দ্রের পাত উনবিংশ বার সূর্য্য সহ পূর্ব্বাবস্থান
প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রায় পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়, কিন্তু ঠিক
সেই স্থানে আসে না। এই হ্রাসবৃদ্ধি হইলে গ্রহণ গণনার
আর কোন গোল থাকিত না, একবার চন্দ্রগ্রহণ হইলে উক্ত
পরিমিত কাল পরে পুনরায় আবার ঠিক সেইরূপ গ্রহণ হইত।
এরূপ গণনা অতি সূক্ষ্ম হইলেও উহাতে অতি সামান্য অসঙ্গতি
আছে এবং তজ্জন্ত একবার গ্রহণের পর ১৮ বৎসর ১১ দিন
পরে ঠিক সেইরূপ গ্রহণ না হইয়া অল্প ইতর বিশেষ হইয়া
থাকে। এমন কি আংশিক গ্রহণ বাহাতে চন্দ্রের অত্যন্ত ভাগ
মাত্র গ্রস্ত হয়, উক্ত পরিমিত কাল পরে পুনরায় না হইতেও
পারে এবং একবার গ্রহণ না হইলেও উহার ১৮ বৎসর ১১ দিন

পরে চন্দ্রের পাদ গ্রহণ হইতে পারে। অজ্ঞাত বিপদ,
ত্রিাদিগ্রাস প্রভৃতি গ্রহণ যথাসময়ে পুনরায় হইবে বটে, কিন্তু
তাহাদের গ্রস্ত অংশের পরিমাণ যে ঠিক পূর্ব্বের স্থায় হইবে,
এমন নহে।

অধুনা জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে নক্ষত্রদিগের
গতিনিরূপণের অতি উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।
তদ্বারা কোন সময়ে কোন নক্ষত্র আকাশের কোন ভাগে
অবস্থান করিবে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য
ও চন্দ্রের আকাশমার্গে অবস্থিতির তালিকা প্রস্তুত হই-
য়াছে উহা দেখিয়া কোন সময় গ্রহণ হইবে কি না হইবে
অনায়াসে বলিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের নাবিক-পঞ্জিকার
(Nautical Almanac) আগামী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত আকাশ-
মণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিদিনের অবস্থানবিবরণ সমস্ত
বিষয়ই লিখিত আছে। উহার সাহায্যে আমরা গ্রহণের
ভোগকাল এবং গ্রস্ত অংশের পরিমাণাদি সমস্ত বিষয়
জানিতে পারি। চন্দ্রগ্রহণের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে হইলে
নিম্নলিখিত বিষয়টা সম্যক উপলব্ধি করা আবশ্যক।

পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রের কেন্দ্র পর্য্যন্ত
ব্যাসার্দ্ধ লইয়া আকাশে একটা মণ্ডলাকার স্থান কল্পনা
কর। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ এই
বর্ত্ত্বলাকার স্থানের অভ্যন্তর দিকে ও অর্দ্ধভাগ বাহিরে
থাকিবে। পৃথিবীর ছায়া-সূচীর দৈর্ঘ্য পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের
২১৩ গুণ হইতে ২২০ গুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের
দৃশ্যমান বিশ্ববাসের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি অল্পসারে উহারও
হ্রাসবৃদ্ধি হয়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রে গড় দূরত্ব পৃথিবীর ৬০
ব্যাসার্দ্ধের সমান। সুতরাং চন্দ্র ঐ ছায়া-সূচীতে প্রবিষ্ট
হইতে পারে। পৃথিবীর ছায়াও পৃথিবী হইতে ক্রমে হ্রাসরতন
হইয়া সূচীর আকারে এই মণ্ডল ভেদ করিয়া যাইবে। এক্ষণে
এই মণ্ডলাকার স্থানের উপরিভাগে দুইটা চিহ্ন হইল, একটা
চন্দ্রমণ্ডল ও অপরটা পৃথিবীর ছায়া। ইহা স্পষ্ট দেখা যাই-
তেছে যে এই ছায়ার কেন্দ্র, পৃথিবীর কেন্দ্র ও সূর্য্যের কেন্দ্র
এক সরলরেখায় অবস্থিত, সুতরাং ছায়াকেন্দ্র সূর্য্যকেন্দ্রের ঠিক
বিশরীড় দিকে সূর্য্যাক্ষার (Ecliptic) অবস্থিত। সুতরাং
ইহার গতিও সূর্য্যাক্ষার উপর এবং সূর্য্যের সমান। চন্দ্রও
এই বর্ত্ত্বলের চারিদিকে নিজ কক্ষার ভ্রমণ করিতেছে এবং
ইহার কেন্দ্র কক্ষার উপর অবস্থিত। যখন এই দুই চিহ্ন
পরস্পর অন্তর থাকে, তখন গ্রহণের সম্ভাবনা নাই, যখন
ইহাদের সংযোগ হয় তখনই গ্রহণ হয় এবং যদি পৃথিবীর
ছায়া চন্দ্র অপেক্ষা বড় হয়, তবে সর্ব্বগ্রাস হইয়া থাকে।

গ্রহাংশের পরিমাণাদি জানিতে হইলে ঐ দুই চিত্রের আপেক্ষিক আয়তন জানা প্রয়োজন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি চন্দ্রের বিষুবাস গড় $৩১' ২৫''.৭$ এবং নিম্নলংখ্য $২৯' ২২''$ হইতে $৩০' ২৮''$ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। নাবিকপঞ্জিকার উহার প্রতিদিনের পরিমাণ লিখিত আছে এবং তাহা হইতে দিবসের যে কোন সময়ে উহার পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। পৃথিবীর ছায়ার পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে বাহির করা যায়। মনে কর ন চ উল্লিখিত আকাশমণ্ডলের উপরিভাগ



এবং ইহা চন্দ্রের কেন্দ্র ভেদ করিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ছায়া ইহার চ চ পরিমিত স্থানে গোলাকার ভাবে পড়িবে। এই বৃত্তের দৃষ্ট বিষুবাস চ ক চ নিরূপণ করাই এক্ষণে প্রয়োজন। যেহেতু $[চ ক খ] = [চ ক চ] + [চ ক খ] = [চ ক চ] - [চ খ ক]$ আবার $[চ খ ক] = [গ ক স] - [হ গ ক]$ সুতরাং $[চ ক খ] = [চ ক চ] - ([গ ক স] + [হ গ ক]) = [চ ক চ] - [গ ক স] + [হ গ ক]$ ইহার মধ্যে $[চ ক চ] =$ চন্দ্রের লম্বন (Parallax) যেহেতু ক চ রেখা পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্বের সমান। $[হ গ ক] =$ সূর্যের লম্বন (Parallax) এবং $[গ ক স] =$ সূর্যের বিষুবাসের অর্ধ পরিমাণ, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্যের লম্বনের যোগফল হইতে সূর্যের বিষুবাসের অর্ধেক বিয়োগ করিলে পৃথিবীর ছায়ার ব্যাসার্ধের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। এইরূপে পৃথিবীর ছায়ার ঐ অংশের বিষুবাসের পরিমাণ $১' ১৫' ৩২''$ হইতে $১' ৩১' ৩৬''$ পর্যন্ত হয়। নাবিকপঞ্জিকার দিবসের যে কোন সময়ে ইহার পরিমাণ লিখিত থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুশাশিবদ্ধন এই ছায়া সচরাচর পঞ্জিকালিখিত পরিমাণ অপেক্ষা জীবৎ বৃহৎ বোধ হয়। এই নিমিত্ত পঞ্জিকা লিখিত ভাবী গ্রহণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টের সহিত মিল রাখিবার নিমিত্ত ঐ পরিমাণকে ৬ দিয়া গুণ করিয়া লওয়া হয়।

মনে কর ক খ সূর্যাকক্ষা এবং গ ঘ চন্দ্রাকক্ষা (Moon's orbit)



তাহা হইলে প একটা পাত-বিন্দু (Node) হইবে। হ পৃথিবীর ছায়া, ক খ দিরা সূর্যের সমান গতিতে যাইতেছে এবং

চন্দ্র গ ঘ দিরা তাহার ১৩ গুণ অধিক বেগে যাইতেছে। এক্ষণে চন্দ্র ও ছায়ার সঙ্গিলন হইতে হইলে চন্দ্র নিকটবর্তী হইবার সময় ঐ ছায়ার কেন্দ্র প বিন্দুর অতি সন্নিহিত থাকা আবশ্যক।

চন্দ্র ও ঐ ছায়ার দৃষ্ট বিষুবাস সকল সময় সমান থাকে না এবং প পাতবিন্দু (Node) হইতে ছায়াকেন্দ্রের দূরত্ব, বিপরীতদিকে অপর পাতবিন্দু হইতে সূর্যাকেন্দ্রের দূরত্বের সমান। তাহা হইলে প্রথমতঃ—চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনাকালে সূর্যাকেন্দ্র যদি সন্নিহিত পাতবিন্দু হইতে $১২' ৩''$ অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হয়, তবে গ্রহণ হইবে না। ২য়তঃ—ঐ সময় যদি সূর্যাকেন্দ্রের দূরত্ব $৯' ৩১''$ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে গ্রহণ নিশ্চয়ই হইবে। ৩য়তঃ—যদি ঐ দূরত্ব ঐ দুই পরিমাণের মধ্যবর্তী হয়, তবে গ্রহণ হইতেও পারে, না হইতেও পারে *। ইহা স্থির করিতে বিশেষ গণনার প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে চন্দ্রগ্রহণের স্পর্শ, স্থিতি, মোক্ষ ও গ্রহাংশের পরিমাণাদি নিরূপণ করা যায়। উদাহরণরূপে প্যারিস নগরীর ১৮৪৫ অব্দে ১৩১৪ই নবেম্বরের চন্দ্রগ্রহণ লও। ফরাসী নাবিকপঞ্জিকার প্যারিস নগরে ১৩ই মধ্যাহ্নকালে চন্দ্র ও সূর্যের প্রবকান্তর $১৮' ২০' ৭''.১$ । পরদিবস ১৪ই নবেম্বর মধ্যাহ্নকালে উহাদের প্রবকান্তর $১৭' ৪' ৪৫''.৬$ মাত্র, সুতরাং এই সময়ের মধ্যে উহা নিশ্চয়ই

* একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নবর্ণিত পূর্বচিত্রের ভাৱ। এক্ষণে প পাতবিন্দু হ পৃথিবীর ছায়াকেন্দ্র। মনে কর প হ পরিমিত সূর্যাকক্ষার পরিমাণ $১২' ৩''$ অপেক্ষা অধিক। সূর্য্য বিপরীতভাবে অবস্থিত। এই সময় চন্দ্র কেন্দ্র যদি চ বিন্দুতে আইসে, তাহা হইলে ঐ দুই বৃত্ত হ ও চ এইরূপে অবস্থিত হইবে।



পূর্বে বলা হইয়াছে চন্দ্রের বৃহত্তম, দৃষ্ট ব্যাসার্ধের পরিমাণ $১৬' ৪৪''$, পৃথিবীর ছায়ার বৃহত্তম দৃষ্ট বিষুবাসের পরিমাণ $৪৫' ৪৮''$ এই দুইয়ের যোগফল হয় $১' ২' ৩২''.১$ কিন্তু প হ

$১২' ৩''$ হইলে হ চ এর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং ঐরূপ অবস্থানকালে চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়ার দৃষ্ট আয়তন বৃহত্তম হইলেও গ্রহণ হয় না। এইরূপে উহাদের অবস্থিতি যদি ক খ বৃত্তের ন্যায় হয় অর্থাৎ যদি প খ $৯' ৩১''$ অপেক্ষা দূর হয়, তাহা হইলে চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া সূত্রতম আকারে দৃষ্ট হইলেও গ্রহণ হইবে, সুতরাং গ্রহণ নিশ্চিত, আর যদি ঐ কেন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থানে ট ঠ বিন্দুর ভাৱ স্থাপিত হয়, তাহা হইলেও পৃথিবীর দৃষ্ট আয়তন যদি ট ঠ বৃত্তের ভাৱ হয় তবে গ্রহণ হইবে না; কিন্তু উহাদের আয়তন বিন্দুর বৃত্তবৎ ভাৱ হইলে গ্রহণ হইবে। সুতরাং ঐরূপ স্থানে গ্রহণ অনিশ্চিত।

এক সময়ে ১৮° হইয়াছিল। ইহা হইতে সহজেই জানা যায় যে ১৩ই রাত্রি ১৮ মিমি ২০.৯৯ এর সময় চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর ছইদিকে ঠিক বিপরীতভাবে ছিল। পঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায় যে ঐ সময়ে সূর্য্য পাতবিন্দু হইতে ৫৫° অংশ দূরত্ব অবস্থিত ছিল। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এ স্থলে গ্রহণ নিশ্চিত। পঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায় যে ঐ সময়ে—

চন্দ্রের লম্বন (Parallax) প্রায় $৫৫^{\circ} ৩২'' .৬$ ।

সূর্য্যের লম্বন (Parallax) প্রায় $৮'' .৭$ ।

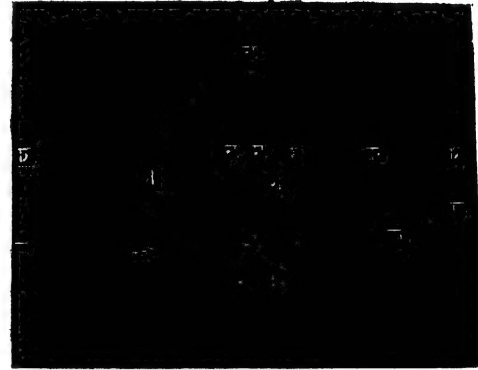
চন্দ্রের দৃষ্ট বিষবাসার্দ্ধ (Apparent Semi-diameter) প্রায় $১৬^{\circ} ১০'' .১$ ।

সূর্য্যের দৃষ্ট বিষবাসার্দ্ধ প্রায় $১৬^{\circ} ১২'' .৮$ ।

ইহা হইতে পূর্ব্বোক্তগণিত গণনা অনুসারে পৃথিবীর ছায়ার দৃষ্ট বিষবাসার্দ্ধ প্রায় $৩৯^{\circ} ৩৬'$ অর্থাৎ $২৩৭৬''$ বিকলা, ইহাকে ৬ দিয়া গুণ করিলে $২৪১৫'' .৬$ বিকলা হয়। পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে—১৩ই রাত্রি ০৮, ৩০ মিমি সময়ে সূর্য্য চন্দ্র হইতে $১৮^{\circ} ১৬' ৩৩'' .৭$ অবধি অবস্থিত ছিল এবং চন্দ্র সূর্য্যপথ হইতে $০^{\circ} ২৫' ৫৭'' .৬$ উত্তর বিক্ষেপে অবস্থিত। ২য়তঃ—ঠিক ঐ দিবস রাত্রি ১৮, ৩০ মিমি, সময় চন্দ্র ও সূর্য্যের অবকান্তর প্রায় $১৭৯^{\circ} ৪৭' ৩৭'' .৭$, এবং চন্দ্রের বিক্ষেপ প্রায় $০^{\circ} ২৮' ৫১'' .৫$ ।

এই সকল জ্ঞাত পরিমাণ দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে গ্রহণ সম্বন্ধীয় অপরাপর সমস্ত বিষয় নির্ণয় করিতে পারি। গ্রহণের সমস্ত স্থিতিকাল ব্যাপিয়া চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া পূর্ব্বোক্ত আকাশমণ্ডলের যে ভাগে অবস্থিত করে, ঐ ভাগকে সমতল করনা কর, এরূপ করনার গণনার বিশেষ তারতম্য হয় না। আরও মনে কর পৃথিবীর ছায়া স্থির এবং ঐ ছায়ার সহিত আপেক্ষিক গতি ভিন্ন চন্দ্রের অত কোন প্রকার গতি নাই। ক খ গ ঘ বৃত্ত পৃথিবীর ছায়া (চিহ্ন দেখ)। ইহার ব্যাসার্দ্ধ ম ক ছায়ার বিষবাসার্দ্ধের ($২৪১৫'' .৬$) অনুপাতিক অর্থাৎ চিত্রস্থ বৃত্ত, রেখা প্রভৃতির অনুপাত ঐ সকলের পঞ্জিকালক পরিমাণের অনুপাতের সমান। বর্ণা—পঞ্জিকার পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস যদি চন্দ্রছায়ার ব্যাসের দ্বিগুণ থাকে, তবে চিত্রেও ক খ গ ঘ বৃত্তের ব্যাস জ বৃত্তের ব্যাসের দ্বিগুণ করিতে হইবে; ইত্যাদি। ম কেন্দ্রের মধ্য দিয়া চর্চ রেখা সূর্য্যাক্ষার (Ecliptic) কিয়দংশ নির্দেশ করিতেছে। রাত্রি ০৮, ৩০ মিনিটের সময় সূর্য্য চন্দ্রের $১৮^{\circ} ১৬' ৩৩'' .৭$ অন্তরত্ব অবধি আছে, সুতরাং ম কেন্দ্রের অবধি চন্দ্র হইতে $১৬' ৩৩'' .৭$ অর্থাৎ $৯৯৩'' .৭$ বিকলা অধিক। এক্ষণে যদি চিত্রে দক্ষিণ হইতে

বামদিকে অবধি গণনা করা যায় এবং চিত্রের মান অনুসারে ম ক রেখাকে $৯৯৩'' .৭$ এর সমান করা যায় তাহা হইলে ক বিন্দু চন্দ্রকেন্দ্রের তাত্‌কালিক অবধির ছেদ বিন্দু হইবে। ক বিন্দু হইতে চর্চ সূর্য্যপথের এক লম্ব উত্তোলন কর এবং এই লম্বরেখার চন্দ্রের বিক্ষেপ $২৫' ৫৭'' .৬$ অর্থাৎ $১৫৫৭'' .৬$ এর সমান করিয়া ক বিন্দু লগ। তাহা হইলে রাত্রি ০৮ ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্রকেন্দ্রের অবস্থিতি ক বিন্দুতে হইবে। এইরূপ ১৮, ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্র



হইতে ছায়া কেন্দ্রের অবধির আধিক্য $১২^{\circ} ২২'' .৩$ অর্থাৎ $৭৪২'' .৩$ এর সমান করিয়া ম ন অংশ লগ। তৎপরে ন বিন্দু হইতে সূর্য্যাক্ষার উপর উত্তোলিত লম্ব, চন্দ্রের সেই সময়ের বিক্ষেপ $২৮' ৫১'' .৫$ অর্থাৎ $১৭২১'' .৫$ এর সমান করিয়া ন ত অংশ লগ। তাহা হইলে ত বিন্দু রাত্রি ১৮, ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্রকেন্দ্রের স্থিতি নির্দেশ করিবে। এক্ষণে আমরা যদি গ্রহণকালে ঐ ছায়ামণ্ডল হইতে চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি সরল রেখাক্রমে ধরি, তাহা হইলে গণনায় বিশেষ কিছুই ভুল হয় না। সুতরাং ত ব বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া ছ হ, রেখা টানিলে উহাই ঐ ক খ গ ঘ ছায়ার ভুলনার চন্দ্রকেন্দ্রের আপেক্ষিক গমনপথ হইবে। ম বিন্দু হইতে উত্তোলিত লম্ব ও ছ হ রেখার ছেদে উৎপন্ন ধ বিন্দুই ১৩ই নবেম্বর রাত্রি ১৮, ৩০ মিমি ২০.৯৯, সময় অর্থাৎ বধন সূর্য্য, চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত হইয়াছিল, তখন চন্দ্রকেন্দ্রের অবস্থিতি স্থান। ম কেন্দ্রের চতুর্দিকে চন্দ্র ও ছায়ার ব্যাসার্দ্ধের যোগফলের অর্থাৎ $৩৩২৫'' .৭$ এর সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটা বৃত্ত অঙ্কিত কর। ঐ বৃত্ত চন্দ্রের আপেক্ষিক ছ হ কক্ষপথকে জ ও জ, বিন্দুতে ছেদ করিবে। এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে জ ও জ বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের সমান $৯১০'' .১$

বাসার্দ্ধ লইয়া দুইটা বৃত্ত অঙ্কিত করিলে উহার কণ্ঠ গ ঘ ছারাবৃত্তের পরিধি স্পর্শ করিবে। এই দুই বৃত্ত গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষের সময় চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। আর যদি ম হইতে ছ ছ উপর ম দ লম্বপাত করা যায়, তাহা হইলে দ বিন্দুই গ্রহণকালের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে চন্দ্র কেন্দ্রের অবস্থিতি নির্দেশ করিবে। চন্দ্রকে ব হইতে ত পর্য্যন্ত যাইতে ১ ঘণ্টা লাগে, ব ত ও দ ধ এর পরিমাণ দেখিয়া চন্দ্র কতক্ষণে দ হইতে ধ পর্য্যন্ত যাইবে নির্ণয় করা যায়। এস্থলে ঐ সময়ের পরিমাণে ৫ মি, ৪০.৮ সেকেন্ড। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যের বিপরীতভাবে অবস্থান সময়ে ৫ মি, ৪০.৮ সে পূর্বে অর্থাৎ ০ ঘ, ৫৮ মি, ৪০.১ সে রাজি সময়ে গ্রহণের মধ্যকাল হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় দ জ কিম্বা দ জ' পরিমিত স্থান যাইতে চন্দ্রকে ১ ঘ, ৩৯ মি, ১৯.৪ সে সময় লাগে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে ১৩ই নবেম্বর রাজি ১১টা ১৯ মি ২০.৭ সেকেন্ডে গ্রহণ স্পর্শ এবং রাজি ২টা ৩৭ মি, ৫৯.৫ সেকেন্ডে সময় মোক্ষ হইয়াছিল। দ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রবাসার্দ্ধের সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটা বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, তৎক্ষণাৎ জানা যাইবে ঐ গ্রহণ পূর্ণগ্রাস হইবে। কি পাদগ্রাস হইবে। বর্তমান স্থলে চন্দ্রগ্রহণ আংশিক, যেহেতু যৎকালে দ চন্দ্রকেন্দ্র ছারাকেন্দ্র মএর সর্বাংশে নিকটবর্তী, তখনও চন্দ্রমণ্ডলের কতক অংশ ছায়ার বাহিরে পড়িয়াছে। এক্ষণে প স যদি চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস হয়, তবে প র রেখা ঐ ব্যাসের যত অংশ হইবে, সেই সংখ্যাই চন্দ্রের অস্তাংশের পরিমাণ প্রকাশ করে। উল্লিখিত গ্রহণের পরিমাণ ০.৯২। লচরাচর চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসকে ১২ ষাটশ সমানভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একটীভাগকে (Digit) একক স্বরূপ ধরিয়া গ্রহণের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। স র পরিমিত ব্যাসখণ্ডকে ঐ এককের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল গ্রহণের পরিমাণ প্রকাশ করিবে। ০.৯২ এই ভগ্নাংশ-২২এর সমান ইহাকে ২২ দিয়া ভাগ করিলে প্রায় ১১ হয়। সুতরাং ১৮৪৫ অব্দের ১৩১৪ই নবেম্বরের চন্দ্রগ্রহণের পরিমাণ ১১। প প ব্যাস যদি সর্বতোভাবে ছায়ার ভিতর পতিত হয় তবে সর্বাংশ হইবে। ঐ সর্বাংশ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়া কোন সময় পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে চন্দ্রমণ্ডল কোন্ কোন্ সময়ে ছায়া পরিধির অভ্যন্তরদিগ্ স্পর্শ মাত্র করিবে ইহা নিরূপণ করিলেই হইল। যেক্ষণে জ জ বিন্দু ছয় লওয়া হইয়াছে ঐ উপায় অবলম্বন করিলেই ঐ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থিতি পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল চিত্রাদি দ্বারাই গ্রহণ স্বক্কে সমস্ত

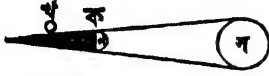
বিষয়ের গণনা করা হইল। অঙ্কাদি দ্বারা গণনা করিলে ইহা অপেক্ষা আরও সুস্বকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক গ্রহণ গণনা ঐরূপেই হইয়া থাকে। ঐ করিত আকাশমণ্ডলে ছেদিত ছায়া-সূচীর বৃত্তাংশের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাস অপেক্ষা আর তিনগুণ বড়। ঐ ছায়ার তুলনায় চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি প্রত্যহ প্রায় ১২° ধরিলে চন্দ্রমণ্ডল ঐ ছায়ার ভিতর প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সুতরাং চন্দ্রকেন্দ্র ঐ ছায়ার ব্যাস দিয়া গমন করিলে সম্পূর্ণ ২ ঘণ্টাকাল চন্দ্রের সর্বাংশ থাকিতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক পৃথিবীর কত অংশে পূর্কোক্ত গ্রহণ দৃশ্য হইতে পারে। দেখান গিয়াছে যে পারিস নগরে ১৩ই নবেম্বর রাজিগড় ০ ঘ, ৫৮ মি, ৪০ সেকেন্ড সময় গ্রহণের ঠিক মধ্যকাল। সময়-সমীকরণ নিয়মামুসারে (Equation of time) পঞ্জিকা লিখিত ঐ দিবসে উহার মান ১৫ মি, ২৭ সেকেন্ড যোগ করিলে ১ ঘ, ১৪ মি, ৭ সেকেন্ড হয়; ইহাই তৎকালে পারিস নগরের প্রকৃত সময়*। এক্ষণে দেখা যাউক এই সময় চন্দ্র পৃথিবীর কোন অংশে ঠিক মন্তকোপরি ছিল। তথায় এই সময় ঠিক মধ্য রাজি এবং পারিস হইতে উহার দ্রাঘিমান্তর ১৮° ৩১' ৪৫"। পশ্চিম। ঐ স্থানের অক্ষান্তর নাড়ীমণ্ডল হইতে চন্দ্রের কোণিক দূরত্বের (Angular distance or declination of the moon) সমান। নাবিকপঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায় উহার পরিমাণ ১৭° ৪২' ১৭"। সুতরাং পৃথিবীপৃষ্ঠে ঐ বিন্দুর অবস্থান স্থির হইবে। এক্ষণে ঐ বিন্দুকে মধ্য বিন্দু ধরিয়া উহা হইতে পৃথিবীর চারিদিকে ৯০° পর্য্যন্ত লইলে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ হইল, ঐ অর্দ্ধভাগ গ্রহণের মধ্যকালে দৃষ্ট হইবে এবং উহার বাহিরে অদৃষ্ট থাকিবে। যেক্ষণে মধ্যগ্রহণ দর্শনের সীমা নিরূপিত হইল, ঠিক ঐ নিয়মে স্পর্শ ও মোক্ষ দৃষ্টির সীমাও নিরূপিত হয় এবং উহা হইতে কোন্ কোন্ স্থানে সমস্ত গ্রহণ ও কোন্ কোন্ স্থানে গ্রহণের কতকংশ মাত্র দৃষ্টি হইবে, অন্যায়সে নির্ণয় করা যায়।

চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্য হইতে হইলে চন্দ্রমণ্ডল ও পৃথিবীর ছায়া উভয়ই দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার (Horizon) উর্কে

* সূর্য্য যৎকালে কোস স্থানের দ্রাঘিমার ঠিক উপর আসিবে, সেই সময় তথায় বেলা ১২টা অর্থাৎ বিপ্রহর হয়। পূর্ব্বদিক সেইস্থানে আসিতে গড় ২৪ঘণ্টা লাগে। কিন্তু রাসিচক্রে সূর্য্যের গতি ১২ অংশ হইতে ১ অংশ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং ঠিক বাড়িতে ১২টা হইলেও সূর্য্য সকল সময় তৎস্থানের দ্রাঘিমায় আসে। এই সকল নিরূপণ করিতে হইলে বিশেষ গণনার প্রয়োজন। [সময়-সমীকরণ দেখ।]

ধাক্কা আঘাতক, সুতরাং সূর্য্য অস্ত না হইলে তাহা অসম্ভব। সেই জন্য চন্দ্রগ্রহণ রাত্রিকালেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সূর্য্যাস্তের কয়েক সেকেন্ড পূর্বে বা সূর্য্যোদয়ের কয়েক সেকেন্ড পরেও চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হয়। মনে কর ক



বিন্দু হইতে স্পর্শকালে গ্রহণ দেখিতেছি, সুতরাং সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলের এবং চন্দ্রমণ্ডলের কতক অংশ দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার নীচে থাকিবে। কিন্তু পৃথিবীস্থ বায়ুরাশির ভিতর দিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রলোক বক্রীভাবে আইসে, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার উপরিভাগে দৃষ্টি হইবে। এইরূপে আমরা কয়েক সেকেন্ডের অল্প সময় সূর্য্য ও রাহগ্রস্ত চন্দ্র একবারেই দেখিতে পাই।

সর্যগ্রাসের সময়ে চন্দ্রমণ্ডল সচরাচর জ্বলন্ত রক্তিমভ পূরবর্ণ প্রতীয়মান হয়। উহার কারণ সূর্য্যরশ্মি ভূবায়ুর মধ্য দিয়া গমনকালে বক্রীভূত (refracted) হইয়া চন্দ্রে পতিত হয়। সূর্য্যালোক বক্রীভূত হইয়া গমন করিলে সাতপ্রকার মৌলিক বর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়। সর্যগ্রাসের সময় কখন কখন ঐ সকল বর্ণ অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কোন কোন গ্রহণের সময় চন্দ্রমণ্ডল আকাশ হইতে একবারে অদৃশ্য হয়।

উপচ্ছায়া (Penumbra)-বশতঃ সর্যগ্রাসের স্পর্শ ও সৌক স্ফূরুপে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সহজেই প্রায় ১ মিনিটের তফাৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং সম্প্রতি চন্দ্রগ্রহণ ধরিয়া আর কোন স্থানের অক্ষাংশ নিরূপিত হয় না। চন্দ্রগ্রহণ পরিদর্শন করিতে হইলে কোন্ কোন্ সময় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন সকল ছায়াপ্রবেশ করে, তাহাই নিরীক্ষণ করিতে হয়।

চন্দ্রবিষয় দ্বারা গ্রহাদি ও তারা সকল আবৃত হইলে তাহাকে তারাগ্রহণ (Occultation) বলে।

চন্দ্রপাতন্বয়ের পরাবৃত্ত গতির (Retrograde motion) পরিমাণ প্রত্যাহ প্রায় ৩° ১০' ৬৪। সেই জন্য ঐ দুইপাতন স্থান ১৮½ বর্ষে আকাশমণ্ডলে একবার আবর্তন করে। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্যাক্ষর উভয়দিকে ৫° ৯' মধ্যস্থ প্রত্যেক গ্রহ ও তারাকে কোন না কোন সময় আচ্ছাদন করিবে। সর্বদাই দেখা যায়, তারাগুলি চন্দ্রের একপার্শ্বে প্রবেশ ও অপরপার্শ্বে প্রকাশ পায়। এই তারাগ্রহণগুলির সময় নাবিকপঞ্জিকায় নির্দিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা নাবিকদিগের ও ভূগোলবেত্তাদিগের অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়।

চন্দ্রগ্রহণসময় (পূঃ) চন্দ্রগ্রহণ সমাগমো মেলনং ৬তং। অপর গ্রহ বা নক্ষত্রের সহিত মেলন, নৈকট্য। [ইহার ফলাফল শীর্ষগ্রহণসময় নক্ষত্র দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রচকল (পূঃ) চন্দ্রইব চকলঃ। মন্তব্যবিশেষ, খলিমা। (জটধর) চন্দ্রচকলা (জী) চন্দ্রচকল-টাপ। চন্দ্রক মন্ত, টাঙ্গা মাছ। চন্দ্রচন্দন, অষ্টাদশদয়ের পদার্থচন্দ্রিকা নামে টীকাকার।

চন্দ্রচার (পূঃ) চন্দ্র চারঃ ৬তং। চন্দ্রমণ্ডলের রাশি বিশেষে গতি, এক রাশি হইতে অল্প রাশিতে গমন। আকাশচারী চন্দ্রমার এই গতি অনুসারে ভুলোকবাসীর শুভাশুভ ফল ঘটয়া থাকে। বৃহৎসংহিতার মতে চন্দ্রচারের ফলাফল এইরূপ লিখিত আছে—জ্যোষ্ঠা, মূল্য, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দক্ষিণ ভাগে চন্দ্র গমন করিলে বীজ, জল ও কাননের হানি হয় এবং বহিঃস্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যখন বিশাখা ও অমুরাধা নক্ষত্রের দক্ষিণে উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে পাপচন্দ্র বলা যায়। কিন্তু বিশাখা, অমুরাধা ও মঘা নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা অবস্থান করিলে শুভফল হইয়া থাকে। রেবতী হইতে যুগশিরা পর্য্যন্ত ৬টা নক্ষত্র অনাগত হইয়া চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়। আর্দ্রা অবধি অমুরাধা পর্য্যন্ত দ্বাদশটা নক্ষত্র মধ্যভাগে চন্দ্রের সহিত মিলিত হয় এবং জ্যোষ্ঠা অবধি উত্তরভাগে পর্য্যন্ত ৯টা তারা অতিক্রান্ত হইয়া চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রের শূদ্র জ্যেষ্ঠ উন্নত হইয়া নৌকার জার আকার ধারণ করিলে নাবিকগণের পীড়া হয়; ইহা ছাড়া অপর লোকের শুভফল হইয়া থাকে। অর্দ্ধোন্নত চন্দ্রশূদ্রকে লাঙ্গলমিতি বলে। ইহার ফল—লাঙ্গলোপজীবীর পীড়া, রাজগণের আত্মদা ও সুভিক্ষ। চন্দ্রের দক্ষিণশূদ্র অর্দ্ধোন্নত হইলে তাহাকে দুষ্টলাঙ্গল বলে। ইহা হইলে পাণ্ডদেশীয় রাজার সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠে ও রাজাকে মারিবার উদ্দেশ্য করে। চন্দ্র যদি সমানভাবে উদ্ভিত হয়, তবে সুভিক্ষ, মঙ্গল ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। চন্দ্র দণ্ডের জায় উদ্ভিত হইলে তাহার ফল গোপীড়া ও রাজগণের অস্বাভাবিক কঠোরদণ্ড করিবার উদ্দেশ্য; চন্দ্রমা ধনুকের আকার হইলে তাহার ফল ভয়ানক যুদ্ধ, কিন্তু ঐ ধনুর জ্যা যে দেশে থাকে, সেই দেশের জয় হয় এবং যদি ঐ শূদ্রটা দক্ষিণোত্তরে আয়ত হয়, তাহাকে স্থান বা যুগ বলে। ইহার ফল ভূমিকম্প। এই যুগ নামক শূদ্র দক্ষিণে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে তাহাকে পার্শ্বশারী শূদ্র বলে। ইহার ফল—নাবিকগণের মৃত্যু ও অনাবৃষ্টি। চন্দ্রের কোন শূদ্র নিম্নমুখ হইলে তাহাকে আবর্জিত বলে। ফল—গোহৃভিক্ষ। চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দিকে অবস্থিত বৃত্ত-

সদৃশ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহাকে কুণ্ড নামক শৃঙ্গ বলে। ইহা হইলে দ্বাদশ মণ্ডলসংক্রান্ত রাজাদিগের স্থানভাগ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে চন্দ্রশৃঙ্গটী উত্তরদিকে উন্নত থাকিলে শতশৃঙ্গ ও স্রৃষ্টি এবং দক্ষিণ ভাগে উন্নত হইলে দ্বিভুজ ঘটিয়া থাকে। একশৃঙ্গ, নিম্নমুখ, শৃঙ্গহীন অথবা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চন্দ্র দর্শন করিলে দর্শকদিগের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। চন্দ্র ক্ষুদ্র হইলে দ্বিভুজ এবং অপেক্ষাকৃত বড় দেখাইলে স্রৃষ্টি হয়। চন্দ্র মধ্যমরূপে উদিত হইলে তাহাকে বজ্র বলে। ইহার ফল—প্রাণীগণের ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং রাজগণের সম্ভ্রম। মৃদঙ্গরূপী চন্দ্রোদয় হইলে মঙ্গল ও স্রৃষ্টি হয়। চন্দ্রমূর্তি অতিশয় বিশাল হইলে রাজলক্ষ্মী বৃদ্ধি, স্থল হইলে স্রৃষ্টি এবং রমণীয় হইলে উত্তম ধাতু হয়। চন্দ্রশৃঙ্গ মঙ্গল গ্রহ দ্বারা কোনরূপ আহত হইলে প্রত্যন্ত দেশীয় কদাচার নৃপতিগণের বিনাশ হয়। এইরূপ চন্দ্রশৃঙ্গ শনি দ্বারা আহত হইলে পশ্চতম ও ক্ষুধাতম হয়। বুধ দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ আহত হইলে অনাবৃষ্টি ও দ্বিভুজ; বৃহস্পতি দ্বারা আহত হইলে প্রধান প্রধান রাজগণের বিনাশ; শুক্র দ্বারা আহত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। শুক্রপক্ষে গ্রহ দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ ভিন্ন হইলেই এই ফল হয়। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রশৃঙ্গ শুক্র দ্বারা সমাহত হইলে মগধ, যবন, পুলিন্দ, নেপাল, ভূঙ্গী, মরুচ্ছ, সুরাষ্ট্র, মদ্র, পাঞ্চাল, কৈকয়, কুলুত, পুরুষাদ ও উশীনর দেশে সাত মাসব্যাপক মড়ক হয়। এইরূপ বৃহস্পতি দ্বারা আহত হইলে—গান্ধার, সৌবীরক, সিদ্ধ, কৌর, দ্রাবিড় ও পার্বত্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ ও তদ্রূপী ধাতু সকল দশ মাস সন্তাপিত হয়; মঙ্গল দ্বারা ভিন্ন হইলে বাহনের সহিত উদ্যুক্ত ত্রিগর্ভ, মালব, কোগিল, গণপতি, শিবি ও অযোধ্যা দেশীয় শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগের এবং কুরু, মন্ত ও গুজি প্রদেশীয় উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া ও বিনাশ; শনি দ্বারা আহত হইলে পূর্বদেশবাসী অজুনবংশীয় ও কুরুবংশীয় রাজা, মন্ত্রী ও যোদ্ধাদিগের দশ মাসব্যাপী পীড়া ও মৃত্যু, বুধ কর্তৃক আহত হইলে মগধ, মথুরা ও বেণা নদীর তীরবর্তী প্রদেশসমূহের পীড়া ও পশ্চিম দেশে সত্য যুগের আবির্ভাব, এবং কেতু দ্বারা আহত হইলে অমঙ্গল, ব্যাধি, দ্বিভুজ, শত্রুজীবীর বিনাশ ও চোরগণের অত্যন্ত পীড়া হয়। রাহু বা কেতু দ্বারা গ্রস্ত চন্দ্রের উপরে উৎপাত হইলে যে রাজার জন্ম নক্ষত্রে গ্রহণ হইতেছে, সেই রাজার মৃত্যু হয়। চন্দ্রমণ্ডল ভাঙতুল্য পুরুষ, অরুণবর্ণ, কিরণহীন, কপিলবর্ণ, ক্ষুণ্ণ অথবা ক্ষুরণশীল হইলে ক্ষুধা, সংগ্রাম, রোগ বা চোরভয় উপস্থিত হয়। চন্দ্র কুন্দ, মৃগাল

বা মৌক্তিক হারের দ্বার গুহ বর্ণ হইয়া তিথি অনুসারে ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অবিকৃত মণ্ডল, অথবা গতি বা কিরণ যুক্ত হয়, তবে মনুষ্যগণের বিজয়লাভ; শুক্রপক্ষে চন্দ্র অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও প্রজাগণের বৃদ্ধি; হীন হইলে এই সকলের হানি ও সমপরিমাণ হইলে সমতা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীত ফল হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৪ অধ্যায়)

চন্দ্রচূড় (পুং) চন্দ্রশৃঙ্গায়াং যন্ত বহুব্রী। ১ চন্দ্রশেখর, শিব। ২ গোমাঞ্চলস্থ একটা তীর্থ স্থান। [গোমাদেশ।]

চন্দ্রচূড়, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, পুরুষোত্তম ভট্টের পুত্র। ইনি অত্যাশ্চর্য্যভরণ, কাক্তবীৰ্য্যোদয়কাব্য, চন্দ্রশেখরবিবাহকাব্য ও প্রত্নাবচিস্তামণি নামে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রচূড়ভট্ট, অপর নাম চন্দ্রশেখর শর্মা—এক বিখ্যাত স্মার্ত ও সংস্কৃত গ্রন্থকার, উমাপতি ভট্টের পুত্র ও ধর্ম্মেশ্বরের পৌত্র। ইনি কালসিদ্ধান্তনির্ণয়, কালদিবাকর, পাকযজ্ঞনির্ণয়, পিণ্ডপিতৃপ্রয়োগ, শ্রাদ্ধনির্ণয় সংস্কারনির্ণয়, সৌত্রামণিপ্রয়োগ, চন্দ্রচূড়ীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রচূড়া (স্ত্রী) চন্দ্রশৃঙ্গায়াং যত্নাঃ বহুব্রী। গায়ত্রী মূর্তি-বিশেষ। (দেবীভাগ ১২।৬।৪৯)

চন্দ্রজ (পুং) চন্দ্রাং জায়তে চন্দ্র-জন-ড। চন্দ্রের পুত্র, বুধ। “রৌদ্রাদীনী মঘাস্ত্রাহ্মণাশিতে চন্দ্রেজে প্রজাপীড়া।” (বৃহৎসং ৭।৩)

(ত্রি) ২ বাহা চন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয়। চন্দ্রজাত প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রজসিংহ, তর্কসংগ্রহের পদকৃত নামে টীকাকার।

চন্দ্রজ্ঞানতন্ত্র, ক্ষেমরাজদ্বারা একখানি প্রাচীন তন্ত্র।

চন্দ্রট, ১ স্রৃষ্টকর্ণামৃতধৃত একজন প্রাচীন কবি।

২ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার, তীসটের পুত্র। ইনি সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রট-সারোদ্ধার, স্রৃষ্টপাঠশুদ্ধি ও যোগরত্নসমুচ্চয় নামে বৈদ্যকগ্রন্থ, তীসটরচিত চিকিৎসাকলিকার টীকা ও বৈদ্যজিংশটীকা রচনা করেন।

চন্দ্রতীর্থ, সহ্যাদ্রিখণ্ড বর্ণিত গোমাঞ্চলের একটা পবিত্র তীর্থ। (২।৩।২১) [গোমাদেশ।]

চন্দ্রদত্ত মৈথিল, এক বিখ্যাত মৈথিল পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় কালীগীতা নামে সংগীতগ্রন্থ, ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য, কৃষ্ণবিক্রদাবলী ও তাহার টীকা রচনা করেন।

চন্দ্রদাস, প্রেমামৃতটীকা রচয়িতা।

চন্দ্রদেব, ১ কনোজের রাঠোর-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা, কনোজ-রাজ মদনপালের পিতা। শিলালিপিপিঠে জানা যায় মদন-

পাল ১১৫৪ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রদেব তাঁহার কিছুকাল পূর্বে কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

২ বোদামমুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম রাজা, ইহার পুত্রের নাম বিগ্রহপাল দেব।

৩ উৎকলের একজন পূর্বতন রাজা, কেশরীবংশের পূর্বে ইহার অভ্যূদয়। উৎকলের ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি ৩২৩ হইতে ৩২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি নাম মাত্র রাজা ছিলেন, ঐ সময়ে যবনেরা উৎকল অধিকার করিয়া ছিল। শেষে যবনেরাই ইহাকে বিনাশ করে। (Hunter's Orissa, Vol. I. p. 199.)

কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা প্রাচীন শিলাফলকে চন্দ্রদেবের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই।

চন্দ্রতাপন (পুং) চন্দ্রঃ তাপয়তি তপ-ণিচ্ ক্তরি ল্য। দানব-বিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

চন্দ্রদক্ষিণ (ত্রি) চন্দ্রঃ সূর্যং দ্বিতীয়ং দক্ষিণা যত্র বহত্ৰী, শাকপাৰ্থিবাদিত্বাৎ দ্বিতীয়পদন্ত লোপঃ। সূর্যং দক্ষিণা, যাহা অপেক্ষা দ্বিতীয়। “ঋতন্ত যথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণাঃ।” (শুক্ল যজুঃ ৭।৪৫) ‘চন্দ্রদক্ষিণাঃ চন্দ্রঃ সূর্যং যজমানহস্তং দ্বিতীয়ং দক্ষিণা ইতি প্রাপ্তে শাকপাৰ্থিবাদিত্বাৎ দ্বিতীয় পদন্ত লোপঃ।’ (মহীধর।)

চন্দ্রদশা (স্ত্রী) চন্দ্রস্ত দশা ৬তং। ফলিত জ্যোতিষ মতে গ্রহগণ নির্দিষ্ট সময়ে মানবগণের শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। চন্দ্র যতকাল পর্য্যন্ত ফল দেন, তাহাকে চন্দ্রের ভোগকাল বা দশা বলা হয়। [দশা দেখ।]

চন্দ্রদার (পুং) [বহ] চন্দ্রস্ত দারাঃ ৬তং। ১ চন্দ্রের স্ত্রী, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি দক্ষকন্যা। ২ অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্র। [নক্ষত্র দেখ।]

চন্দ্রদেব (পুং) ১ পঞ্চাল বংশীয় একজন বীরপুরুষ। ইনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক ছিলেন, যুদ্ধে বিস্তর বিক্রম দেখাইয়া কর্ণের হস্তে নিহত হন। (ভারত ৮.৫০ অঃ)

২ রাজতরঙ্গিনী বর্ণিত একজন তাপস ব্রাহ্মণ। ইহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব নীলপর্শ্বের উৎপাত হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বক্ষুবিল্বও ইহা দ্বারা ই দূর হইয়াছিল। (রাজতরঙ্গিনী ১।১৮২—১৮৪)

চন্দ্রদ্বীপ (পুং স্ত্রী) চন্দ্রেণাধিষ্ঠিতোদ্বীপঃ মধ্যলোঃ। সমুদ্রপারে উত্তরকুরুর উত্তরভাগে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে এই দ্বীপে নাগ ও অসুরগণের বসবাসই বেশী। ইহার পরিধি হাজার বোজন, বিস্তার দশবোজন ও উচ্চতা ১০০ বোজন। এই দ্বীপের মধ্যভাগে চন্দ্রকান্দ, খেত

বৈহর্য্য ও কুমুদ প্রভৃতি পরিশোভিত একটি পর্বত আছে। এই পর্বত হইতে পুণ্যসলিলা চন্দ্রাবর্তী নদী প্রবাহিত। ইহাতে নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রদেবের একটি বাসস্থান আছে। গ্রহনায়ক চন্দ্র প্রায়ই এই স্থানে অবতরণ করেন। চন্দ্রপর্বত স্বর্ণ ও মর্ত্য উভয় স্থানেই প্রসিদ্ধ। চন্দ্রদ্বীপবাসী মনুষ্যাগণের শরীরকান্তি চন্দ্রের জ্বালা উজ্জ্বল ও গৌর, মুখখানি চন্দ্রতুল্য। তাহারা সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তেজস্বী এবং চন্দ্রের উপাসক। ইহারা এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে। (ব্রহ্মাণ্ড-অনুবঙ্গ* ৪৭ অঃ)

চন্দ্রদ্বীপ, বাংলার অন্তর্গত সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ। আবুল ফজলের আইন-ই-অকবরী গ্রন্থে ইহারই অধিকাংশ বঙ্গলা (বাংলা) সরকার নামে বর্ণিত।

চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ১মটি—বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে ভগবতীমত্রে দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি ভগবতী নামী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে তাঁহার আর আশঙ্কার সীমা রহিল না—ভাবিলেন, লোকে কি আমাকে পত্নী উপাসক বলিবে? বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু এমন দুর্কর্ম্ম করিব না। তিনি নৌকায় করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন, তখন বিক্রমপুরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি নৌকা করিয়া সাগরে আসিয়া পৌঁছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে এখানে আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু পরদিন প্রত্যবে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় এক ধীবরকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রশেখর অবাক! তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় স্বয়ং ভগবতী হলনা করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র জলধি মধ্যে আবিস্কৃত হইয়াছেন, তিনি অবিলম্বে সেই কন্যার তরলীতে উঠিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। প্রথমে ভগবতী ধীবরকন্যা বলিয়াই আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন, শেষে যখন দেখিলেন চন্দ্রশেখর ভুলিবার ছেলে নয়, তখন পরিচয় দিলেন, “আমি তোমার ঈষ্ট-দেবতা ভগবতী। আমার বরে এইখানে চড়া পড়িয়া দ্বীপ উৎপন্ন হইবে, তুমি এই স্থান অধিকার করিবে এবং তোমার নামানুসারে ইহা চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইবে।” বর দিয়া ভগবতী অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জল সরিয়া চর দেখা দিল (১)।

২য় প্রবাদ এই—চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে এক সম্রাসী ছিলেন। দমুজমর্দন দে নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিল।

(১) ব্রহ্মহ্মর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১১ পৃঃ।

সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া সর্ষদাই বেড়াইতেন ; একদিন রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন কাষী দেবী দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—“এই জলের মধ্যে কতকগুলি দেবমূর্তি আছে, এই সকল উদ্ধার কর।” পরদিন সন্ন্যাসী শিষ্যকে তিনবার ডুব দিতে বলেন। শিষ্য তিন ডুবে তিনটা দেবমূর্তি তুলিলেন (২), হুর্ভাগ্যক্রমে আর ডুব দিতে হইল না, তাহা হইলে লক্ষ্মীমূর্তি পাইতেন ও রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত। চন্দ্রশেখর এই ভবিষ্যাবাণী বলিলেন যে ঐ স্থান শুক হইয়া চর হইবে ও দহুজ তাহার রাজ্য হইবেন। চন্দ্রশেখরের আদেশে ও নামানুসারে ইহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল।

আবার ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—(৩) এখানকার সমস্ত ভূমি পূর্বে জলময় ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তাহার ললাটের অগ্ন্যস্ত্রাণে সেই জল শুক হয়। চন্দ্রচূড়ের মন্তকর চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল। (বোধ হয় সেই জগৎ ব্রহ্মখণ্ডকার ইহা চন্দ্রদ্বীপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।)

বাস্তবিক চন্দ্রদ্বীপের নাম কেন হইল ? তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই।

প্রাচীন সীমা—দিগ্বিজয়প্রকাশবিস্তৃতি নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে এক স্থানে লিখিত আছে—

“পূর্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী।

বাদাভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে।

সমস্তান্তঃ মাঙ্গমার্গস্ত শাসকোহতম্ মহীপতিঃ ॥” ৬২১।

পূর্বসীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপ।

(২) মধুগণাশার রাজবাটিতে যে সকল দেবমূর্তি আছে, তাহার কতকগুলি জলোদ্ধৃত মূর্তি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। (চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১২ পৃঃ)

(৩) “চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপান্তোরপূর্ণা চ ভূমিকা।

মহাদেবঃ প্রসাদেন শুক্য ভূতাহি মৃতিক।।

ললাটানলদাহেন বিলীনঃ হি জলঃ বহ।

শলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাঃ স্তগকারিকা।

মহাদেবঃ সুড়ানী চ প্রচ্ছ সাধরাষিতা।

পূর্ণচন্দ্রঃ বিহাইরব ধার্যাক্তে শশিনঃ কলা।

কিং নিমিত্তঃ ভয়া ধার্যাক্তঃ কিং সুখং জায়েতে ততঃ ॥

মহাদেব উবাচ। অমাদিপৌর্ণমাসান্তাঃ বা এব শশিনঃ কলাঃ।

তিথয়ন্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে।

অমা ষোড়শ ভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলা।

সংহিতা পরমা মারা দেহিমাঃ দেহধারিণী।

অমা মারী কলামধো বা বা সা জং প্রতিষ্ঠিতা।

অতো হি জং সমাখ্যাতাঃ কলা কালপ্রমাণিনী।

ভক্তা কলারাঃ কিরপৈঃ সিক্তা দ্বীপা চ ভূসুতাঃ।

অতো প্রজাঃ কলাচন্দ্রদ্বীপে ধর্মগরায়ণাঃ ॥”

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ১২-২-৮ শ্লোকঃ।

আবার বাকলা বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে—

“মেঘানদী পূর্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।

ইন্দ্রিলপুরী যক্ষদীমা দক্ষিণে স্তম্ভরং বনং।

ত্রিংশৎ যোজনবিমিতো সোমকান্তোজ্জিবজ্জিতঃ।

সোমকান্তে চ ষৌ দেশো বিখ্যাতো নৃপশেখর।

জম্বুদ্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারো হি তথোত্তরে।

বাকলাখ্যো মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ ॥”

(দিগ্বিজয়প্রকাশবিস্তৃতি)

পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী, উত্তরে ইন্দ্রিলপুর ও দক্ষিণ ভাগে স্তম্ভরবন ইহার মধ্যে গিরিবজ্জিত সোমকান্ত, ইহার পরিমাপ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে আবার দুইটা জনপদ আছে—পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ ও উত্তরভাগে স্ত্রীকার—মধ্যভাগে বাকলা নামক রাজধানী।

যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের বিবরণ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোন সময়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আমরা চন্দ্রদ্বীপের স্থলে বাকলার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাদশাহ অকবরের সময়ে বাকলা একটা স্বতন্ত্র সরকার, ইস্‌মাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদপুর ও আদিলপুর (ইন্দ্রিলপুর) এই চারিটা মহালে বিভক্ত ছিল। এখানে ১৫০০০ পদাতি ও ৩২০ গজ থাকিত। এই সরকার হইতে মোট ৭১৫০০০ দাম (অর্থাৎ ১৭৮৭৯।১৫ টাকা) রাজস্ব আদায় হইত। (আইন-ই-অকবরী)

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ এই কয়টা নগর ও গ্রামের উল্লেখ আছে। যথা—

ব্রহ্মপুর (নগর), বারাগদীপুর, সহশাল, নালিকাসরিৎ পার্শ্বে কুমুদগ্রাম, কোটালি, কাকিনীগ্রাম, কণ্ঠশালী, বেণুবাটী, রণানদীর নিকট ডহুর, চৌদারনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলিগ্রাম, ধুরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন। (ভ* ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

উপরোক্ত মহাল ও নগরাদির অবস্থান অনুসারে বোধ হয়—এক সময়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বর্তমান খুলনা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বাকরগঞ্জ জেলাই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মগদিগের উৎপাতে এই বিস্তৃত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎসন্ন হয়, অধিকাংশ ব্যাভাদি-হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ জঙ্গলময় স্তম্ভরবনরূপে পরিণত হয়*।

* ব্রহ্মখণ্ডেও লিখিত আছে—

“মগজাতিপত্ন্যাতৈ মর্তব্যঃ সকলা প্রজাঃ।

মগাধিকারে ভাবী চ বেদজটো ভবিষ্যতি ॥” (ভ* ব্রহ্মখণ্ড ১৩।১৩)

ইতিহাস—চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-লেখকের মতে বিক্রমপুর হইতে সমাগত দহুজমর্দনদেই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গীর কার্যসমাজের সমাজপতি। ইনিও কতকগুলি কুল-বিধি প্রচলিত করেন। ইতিপূর্বে কুলীন শব্দে (৩২৬ ও ৩৪২ পৃষ্ঠায়) বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইনিই মুসলমান ইতিহাসে দহুজরায় বা নোজা ও প্রাচীনতম কুলাচাৰ্য্যকারি-কার্য দনোজামাধব নামে বিখ্যাত। ইনি গোড়েশ্বর লক্ষণ-সেন দেবের প্রপৌত্র। তারিখ-ই ফিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাসে লিখিত আছে—দহুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যৎকালে সত্ৰাট বলবন্ তুগ্রিল খাঁকে দমন করিতে আসেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃষ্টাব্দে) ইনি জলপথে বলবনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ইনি অবশেষে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্র-দ্বীপে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। [কুলীন শব্দ ৩২৬ ও ৩৪২ পৃষ্ঠায় দনোজামাধব প্রবর্তিত কুলবিধি দেখ।]

দনোজামাধবের বা দহুজ রায়ের পুত্র রমাবল্লভ রায়। ইনিও পিতার প্রদর্শিত কুলবিধি রক্ষার জন্ত আরও কতক-গুলি নিয়ম করিয়াছেন (৪)। ইনি নিজ নামে একটা নগরও স্থাপন করেন (৫)। তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ রায়, তৎপুত্র হরিবল্লভ রায় (৬), তৎপুত্র জয়দেব রায়। দহুজরায় লইয়া এই পাঁচ জন (৭) চন্দ্রদ্বীপে প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করিতেন।

জয়দেব রায়ের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার ভাগিনেয় বলভদ্র বহুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজা পরমানন্দ কার্যভগণের কোলীনা সম্বন্ধে অনেক নিয়ম করেন। পূর্বে বঙ্গীয় কার্যসমাজের ঘোষ, বহুর, গুহ, মিত্র এই ক্রমাহুসারে গণনা হইত। তাঁহার সময়ে বহুর, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রম-াহুসারে গণনা হইতে আরম্ভ হয়। আইন-ই-অকবরীর মতে পরমানন্দের পিতা বাকুলায় রাজত্ব করিতেন। অকবরের ২৯শ বর্ষে ঐ স্থানে বেলা তিনটার সময় এক ভয়ানক জল

প্রাধান হয়, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘর ঘর ভাসিয়া যায়। রাজা সেই সময়ে আমোদে মত্ত ছিলেন, তিনি তাড়াভাড়ি একখানি নৌকার উঠিয়া পড়েন, তাঁহার পুত্র পরমানন্দ রায় ও কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের উচ্চ চূড়ার উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন। চারি ঘণ্টা পর্যন্ত বড় বৃষ্টির সহিত সমুদ্র বৃদ্ধি হইয়াছিল। উক্ত মন্দির ব্যতীত আর সমস্তই সাগরের গর্ভশায়ী এবং প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয় (৮)। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশাবলী ও প্রাচীন কুলাচাৰ্য্যকারিকায় পরমানন্দই চন্দ্রদ্বীপের বহুবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপুত্র রাজা জগদানন্দের সময়েই নদীর স্রোত প্রবলবেগে রাজবাটী পর্যন্ত ধাবিত হয়। রাজা জগদানন্দই নদীগর্ভে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিজ বাকরগঞ্জের নিকট কচুয়া নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। রাজা জগদা-নন্দের কস্তা কমলা এখানে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করেন, এখনও ঐ পুষ্করিণী রহিয়াছে।

রাজা জগদানন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র মহাবল কন্দর্পনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন, রাফ্ ফিচ্ প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারী ইহার গুণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (Hakluyt's Voyages, Vol. II. p. 207) [কন্দর্পনারায়ণ শব্দ দেখ।]

চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটীতে একটা বৃহৎ পিতলের কামান আছে, ঐ কামানের উপর বলাকরে কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩১৮ অব্দ খোদিত (৯)।

মগের দৌরাঙ্গো কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া বরিশালের পূর্বোক্ত কোণে বাসুরিকাটী গ্রামে এক রাজ-ধানী করেন। পরে ঐ স্থান ছাড়িয়া যথাক্রমে পঞ্চকরণের নিকটবর্তী হোসনপুর ও ফুজকাটিতে কিছুকাল বাস করেন। শেষে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান। পূর্বোক্ত স্থান-সমূহে এখনও প্রাচীন মন্দির ও ভগ্ন ইষ্টকালাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে।

মাধবপাশায় একজন মুসলমান গাজী বাস করিতেন, তাহাকে বধ করিয়া কন্দর্পনারায়ণ এই স্থানে রাজধানী নির্মাণ করিলেন। এখনও তাহা বিদ্যমান (১০)।

কন্দর্পনারায়ণের পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রায় রাজা হন। যশোরাদি প্রভাণাদিত্যের কস্তা বিষ্ণুমতীর সহিত রামচন্দ্রের

(৮) Col. H. S. Jarrett's Ain i Akbari, vol. II, p. 123.

(৯) চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটীর নিকট এক পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম কামান-ডাঙা, বহু লোকের বিবাস এখানে অনেক কামান থাকিতে পারে।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্তের মতে মাধবপাশার মাধবদেবের মন্দির এমনি।

(৪) ব্রহ্মবৈবর্ত প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১৮১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) দ্বিবিজয়প্রকাশে এই নগরের উল্লেখ আছে—

“রমাবল্লভনগরে রাজাতুল্যধনাধিতঃ।” (চন্দ্রদ্বীপ বিবরণ ২৪৫ শ্লোক)

(৬) কুলীন শব্দে ৩৪০ পৃষ্ঠায় এই নামটি ভ্রমক্রমে ছাড় হইয়াছে।

(৭) দ্বিবিজয়প্রকাশে বাদবরায় নামে একজন রাজার বিস্তারিত

বিবরণ লিখিত আছে। ইহার সহিত বরনাকোটের রাজকস্তার বিবাহ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত যে বাদবপুরের উল্লেখ আছে, বোধ হয় বাদবরায় সেই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বিবিজয়প্রকাশে চন্দ্রদ্বীপের রাজা অমরাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বিবাহ হইরাছিল। কিন্তু বিবাহরাজে প্রজাপাদিত্য তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়া কারকের সমাজপতিত্ব ও চন্দ্রবীপ রাজ্য অধিকার করিবেন, পর্ত্তর সুখে এই সংবাদ পাইয়া তিনি বসন্তরার ও সর্দার রামমোহন বালের সাহায্যে ৬৪ হাঁড় কোব-নোকার করিয়া চন্দ্রবীপে চলিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে বশোররাজকর্ত্তা কাম্বীজাজাচ্চলে নোকাবনে চন্দ্রবীপে উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার ভাগ্যে স্বাধীনদর্শন লাভ ঘটে নাই। প্রথমে তিনি যে কাঁটে থাকিতেন, সেখানে সস্তাহে হুইবার হাট বসিত। এখন সেখানে হাট নাই, কিন্তু সেই স্থান “বউ ঠাকুরাণীর হাট” নামে প্রসিদ্ধ। রামচন্দ্রমহিষী সারসী গ্রামের নিকটও কিছুদিন ছিলেন; ঐ গ্রামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন।

রাজা রামচন্দ্র ভুল্লয়ার প্রসিদ্ধবীর লক্ষণ মাণিক্যকে বন্দী করিয়া চন্দ্রবীপে আনিরাছিলেন, ইহাতে তাঁহার সাহস ও বীরত্বের বখেট পরিচর পাওয়া যায়। [লক্ষণমাণিক্য দেখ।]

রামচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়। ইনি নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন, মেঘনার উপকূল হইতে কিরল-দিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেন; তাহা ওমিয়া ঢাকার নবাব কীর্ত্তিনারায়ণের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। দৈব-ক্রমে একদিন যুদ্ধযাত্রাকালে ইনি নবাবের ভোজ্য দ্রব্যের ভ্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই লজ্জা তিনি জাতিভ্রষ্ট হন ও কনিষ্ঠ বাহুবদেব নারায়ণের হস্তে চন্দ্রবীপরাজ্য সমর্পণ করেন। বাহুবদেবের পর তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ রাজা হন। প্রেম-নারায়ণের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। বহুবংশীর এই ৮টি রাজা চন্দ্রবীপে রাজত্ব করেন।

[কুলীন শব্দে ৩৪৫ পৃষ্ঠার বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

প্রেমনারায়ণের পর তাঁহার পিতৃদোহিত্র মিজবংশীর উলাইলনিবাসী পৌরীচরণ মিজ মজুমদারের পুত্র উদয়-নারায়ণ চন্দ্রবীপের সিংহাসন অধিকার করেন। উদয়নারায়ণের এক সহোদর ছিলেন, তাহার নাম রাজা রজনারায়ণ রায়। তিনিও মাতামহীর উত্তরাধিকারস্বত্বে “রাজমাতা তালুক” নামে এক বৃহৎ তালুক ও চন্দ্রবীপের অন্তর্গত মহাল হিতাজাত ও মহাল উজ্জ্বাহত এই কয় সম্পত্তি পাইয়া মাধব-পাশার নিকট প্রজাপপুত্র বাস করেন। তথায় এখনও তাঁহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের সে মহাদুলা সম্পত্তি নাই।

উদয়নারায়ণ হইতে মিজবংশীর এই কয় পুরুষ চন্দ্রবীপে রাজত্ব করেন—

১ রাজা উদয়নারায়ণ রায়। ২ রাজা শিবনারায়ণ রায়।

৩ রাজা জয়নারায়ণ রায়। ৪ রাজা সুসিংহনারায়ণ রায়।

৫ রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায় (দত্তক)।

৬ রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (দত্তক)।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্যাভ্যুত্থানের পরই নবাবের জালক খানি মজুমদার তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করেন। পরে নবাবের আদেশে উদয়নারায়ণ এক ব্যাঘ্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রবীপ ব্যতীত জুলতান-প্রতাপ পর-গণার বর্ষভাগের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন দালালকে তাঁহার সমস্ত অংশ সিদ্ধিলা দিয়া উলাইল নিবাসী দেবপ্রসাদ মিজ মজুমদারকে কাঁকি দিতে বান, তাহাতে মোকদ্দমা উপ-স্থিত হয়। বাঙ্গালা ১১৭৯ সালে ২১এ অগ্রহারণ ঐ মোক-দ্দমার রায় প্রকাশ হয়। ইহাতে রাজা শিবনারায়ণের বখেট কলঙ্ক হইয়াছিল। এ ছাড়া তাঁহার চরিত্রদোষের কথাও শুনা যায়।

রাজা জয়নারায়ণ বালাকালেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে তাঁহার কর্মচারী শব্দর বক্সী অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে জয়নারায়ণের মাতা দুর্গারানী কতকাংশ ফিরাইয়া পান। ঐ রানী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহা এখন দুর্গাসাগর নামে খ্যাত। রাজা জয়নারায়ণের সময় দশশালা বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে পরগণা কোটালিপাড়, ইদিলপুর, জুলতানাবাদ, বুলকগ, উমেদপুর প্রভৃতি কয়েক স্থান পৃথক হয়, ভবুও বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক বৃহৎ জমিদারী, তাহারই বন্দোবস্ত হইল।

তখনকার লোকের নির্দিষ্ট দিনে খাজানা লইয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে অভ্যাস ছিল না। অবধারিত দিনে সূর্য্যোস্তের মধ্যে খাজমা জমা না দিলে মিলামে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই আইন জারি হইলে রাজার অর্থলোভী ছুঁশর কর্মচারীদিগের দোষে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সম্পত্তি মিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। রাজার নিজের খানাবাড়ী ও কয়েকখানি সিকমী তালুক মাত্র তাঁহার বর্ত্তমান সম্পত্তি।

মিজবংশীরদের রাজত্বের পূর্বে বে বহুবংশীরেরা চন্দ্রবীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতিবর্ণ এখনও দেহভগাতি প্রায়ে বাস করিতেছেন ও চন্দ্রবীপের রাজসভার তাঁহারা সুবরাজ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রবীপের বর্ত্তমান রাজগণের অবস্থা মন্দ হইলেও বঙ্গ কারত্বসমাজে এখনও তাঁহারা যথেষ্ট সম্মানিত।

চন্দ্রজ্যোতি (পুং) চন্দ্রজ্যোতিরিক জ্যোতির্ভব বহুব্রী। ১ চন্দ্রম।
(ভাবপ্রকাশ) [চন্দ্রম দেখ।] (জী) চন্দ্রমত জ্যোতিঃ
৬৩২। ২ চন্দ্রকিরণ।

চন্দ্রদ্রোণ [বাঁবা বৃন্দ দেখ।]

চন্দ্রধনু, রাজিকালে বৃষ্টির উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া ধনু-
কাকার বে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহাকে চন্দ্রধনু বলে।
ইহার উৎপত্তি ও আকার প্রভৃতি সমস্তই রামধনুর জায়।
তবে ইহার বর্ণ নন্দার দিবাভাগে উৎপন্ন রামধনুর জায়
উজ্জ্বল ও স্পষ্ট নহে। একাঙ অর্ধবৃত্ত অর্থাৎ ধনুর জায়
আকার বলিয়া ইহাকেও ধনু কহে। [রামধনু দেখ।]

চন্দ্রধ্বজকেতু (পুং) সমাধিবিশেষ। (ব্যুৎপত্তি) পত-
দাহত্রিকা প্রজাপারমিতায় ইহা চন্দ্রধ্বজা নামে বর্ণিত।

চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম নগরের ২৪ মাইল উত্তরে শীতাকুণ্ডশৈল-
মালায় দ্ব্যভাগে অবস্থিত একটি পাহাড়। ইহাকে শীতাকুণ্ড-
গিরিও বলিয়া থাকে। ইহার উচ্চতা ১১৫৫ ফিট। ইহাতে
হুই প্রকার প্রস্তর অল্প পরিমাণে দেখা যায়, ১ম লচ্চিত্র
আগ্নেয়, ২য় লৌহসংশ্লিষ্ট নিরেট। প্রসিদ্ধ শীতাকুণ্ড নামে
উক্ত প্রস্তর এই পর্বতে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের
একটি মহাভীর্ষ। কথিত আছে, মহাদেব ও রামচন্দ্র, উভ-
য়েই এই স্থান দর্শন করেন এবং মহাদেব এই পবিত্র ক্ষেত্রে
অদ্যাপি বাস করিতেছেন। বাঙ্গালার সকল স্থান হইতে
বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক হিন্দুবাড়ী এই পুণ্যভূমি দর্শন
করিতে আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে কাঙ্ক্ষন মাসে শিবচতুর্দশী
পূর্ন উপলক্ষে তথায় সর্বাধিক লোকের সমাগম হয়।
এই সকল বাড়ীদিগের বানের নিমিত্ত অধিকারী সামগ্রী
ব্রাহ্মণগণ বাসাঘর নির্মাণ করাইয়া রাখে। বাড়ীরা ঐ সকল
গৃহে বাস করে। অধিকারী তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া
পায়, এতদ্বাতিত দেবতার্থ বস্ত্র তৈজসাদি বাহা কিছু উৎসর্গ
করা হয় তৎসমস্তই অধিকারীর প্রাপ্য। শিবচতুর্দশীর সময়
প্রত্যেক অধিকারী এইরূপে প্রায় ৩৪ হাজার টাকা উপা-
র্জন করে। মন্দিরের মোহনগণ কেবলমাত্র কর পান,
তদ্বারা দেবদেবাসির ব্যয় নির্বাহ হয়। শিবচতুর্দশীর মেলা
প্রায় দশ দিন থাকে। এই সময় ১০ হইতে প্রায় ২০ হাজার
পর্যন্ত বাড়ী আসে। চৈত্র ও কার্তিক মাসে এবং গ্রহণের
সময়েও বিস্তর বাড়ী আসিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস যে
চন্দ্রনাথ পর্বতে আরোহণ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই
শৈলশৃঙ্গে লিঙ্গরূপী মহাদেবের একটি মন্দির আছে, পর্বতের
চতুঃপার্শ্বেও অসংখ্য দেবমন্দির দেখা যায়। চন্দ্রনাথ হইতে প্রায়
তিন মাইল দক্ষিণে বাড়বকুণ্ড ও উত্তরে অবশ্যাক নামক ভীর্ষ-

স্থান অবস্থিত ১০ এ ছাড়া পর্বতের হাদে হাদে আরও অনেক
কুণ্ড বা ভীর্ষ আছে। [চন্দ্রনাথ ও শীতাকুণ্ড দেখ দেখ।]

প্রধান প্রধান মেলার সময়, শীতাকুণ্ডভীর্ষে বাড়ীগণ
সামগ্রিক পীড়িত হয়। রাত্তা বাট প্রভৃতির অপরিচ্ছন্নতা,
কদম্বা পানীয় জল ও অতি জনতাই তাহার কারণ।

প্রবাদ আছে, বুদ্ধদেবের শরীর চন্দ্রনাথ পর্বতের একস্থানে
প্রোথিত হইয়াছিল। এই স্থানে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে
বৌদ্ধদিগের একটি মেলা হয়, এবং অসংখ্য লোকে মৃত
আত্মীর স্বজনের অস্থি আনিয়া তথাকার পবিত্র বুদ্ধকূপে
মিক্ষেপ করে।

২ চট্টগ্রাম জেলার উক্ত পর্বতে অবস্থিত একটি গ্রাম।
ইহা শীতাকুণ্ডভীর্ষবাড়ীদিগের প্রধান আচ্ছা। অক্ষাঃ ২২°
৩৭' ৫৫" উঃ, দ্রাঘিঃ ৯১° ৪৩' ৪০" পূঃ।

চন্দ্রনাভ (পুং) চন্দ্রো নাভৌ বহু চন্দ্রনাভি সংজ্ঞার্থে অচ।
ভারতবর্গিত একটি দানব। (হরিবংশ ৩২৪)

চন্দ্রনার্ম (পুং) চন্দ্রত নামান্যোব নামান্য্য বহুব্রী। কপূর।
চন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, একজন নৈমারিক, ইহার রচিত
জায়গ্রন্থের অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে এই কথখানি পাওয়া
যায়—কুজমাঙ্গলীটীকা, গাদাধরীরাঙ্গম, গদাধরের অজ্ঞান-
ধণ্ডের টীকা, গোতমজয়বৃত্তি, জাগদীশ্বরের ক্রোড়টীকা,
জাগদীশ্বর চতুর্দশলক্ষীপত্রিকা, তর্কচিহ্নামণিটিপনী, তর্কগ্রন্থ-
টীকা ও ন্যায়ক্রোড়পত্র।

চন্দ্রনির্গিজ (জি) চন্দ্রস্য নির্গিগিব নির্গিজ্ রূপং বহুব্রী।
১ চন্দ্রসদৃশ রূপবিশিষ্ট, বাহার রূপ চন্দ্রের ন্যায়। চন্দ্রে আলো-
দকং নির্গিজ্ রূপং বহুব্রী। ২ বাহার রূপ আলোদজনক।
“পতরেব চচরা চন্দ্রনির্গিজ্ মনঃকল।” (শুক ১০।১০।৬৮)
‘নির্গিগিতি রূপনাম চন্দ্রনির্গিজৌ চন্দ্রসদৃশরূপজ্ঞৌ, যথা
চন্দ্রমালাদকং রূপং বহোঃ’ (সায়ণ।)

চন্দ্রপঞ্চাঙ্গ (জী) চন্দ্রমানজ্ঞাপক পঞ্জিকা বিশেষ, এই পঞ্জিকা
দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

চন্দ্রপণী (জী) চন্দ্রবৎ পর্ণং বহুব্রী, ততঃ ভীপ্। প্রদা-
রগী, চলিত কথায় গন্ধভেদালী বলে।

চন্দ্রপাণ্ডুর (জি) চন্দ্রইব পাণ্ডুরঃ। চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

* “বর্ত্ততে জামকীকুণ্ডং লোকানাম্ তারহেতবে।

কালে কালে বিশেষণ মজ্জনং সংতির্য্যতি।

চন্দ্রনাথো বিরূপাকো লোকপায়মহেতবে।

রত্ননন্দনগিরিরংশে লক্ষ্মণেন পুরাকৃতো। * * *

রত্ননন্দনগিরিরংশে বাড়বাকুলসংজ্ঞকম্।

কুণ্ডং কবিন্দ্রমাতুলং কর্ণিগাং পুণ্ড্রং সগাঃ। (জি) ব্রহ্মবৎ ১৮। ১০০১২)

চন্দ্রপাদ (পুং) চন্দ্রস্য পাদঃ ৬তং। চন্দ্রকিরণ। “নিরমিত
পরিধেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।” (কুমার)

চন্দ্রপাল, ১ একজন বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ইহার উপদেশে
নিতান্ত সংসারমায়াবদ্ধ ও ধর্মবিরাগী ব্যক্তিগণও ধর্মশিষ্য
হইত। ইনি অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। চীনপর্ষাটক
হিউএন সিয়ং এর “সি-মু-কি” গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে।

২ গোপাচলের একজন পূর্বতন অধিপতি। ইনি মহারাজ
কোলভের দ্বিতীয় মহিষী সাধ্বীশ্রী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৩ এতাবা অঞ্চলের একজন রাজা, আদ্বাই খেরা নামক
চুর্গের প্রতিষ্ঠাতা।

৪ মিবারের স্বর্ঘ্যবংশীয় একজন রাজা। ইনি এক সময়ে
সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন।

চন্দ্রপুত্র (পুং) চন্দ্রস্য পুত্রঃ ৬তং। বুধ।

“ত্রতচার-রসায়নকুশলবেসরাসচন্দ্রপুত্রস্য।” (বৃহৎসং ১৬২০)

চন্দ্রপুর, মধ্যপ্রদেশে সঙ্গলপুর জেলার অন্তর্গত একটি রাজ্য বা
জমিদারী, পদ্মপুর জমিদারী ইহার অন্তর্গত। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে
দুইটি গবর্মেণ্ট পরগণা লইয়া গঠিত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে
সুরেন্দ্র শাহের বিদ্রোহে যোগদান অপরাধে কতিপয় জমিদারের
বার্ষিক ৩০০০ আয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, এবং ঐ জেলার
তখনকার ডেপুটি কালেক্টর রায় রূপসিংহকে প্রদত্ত হয়।
রাজদ্রোহীগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে পুনর্বার ঐ
সমস্ত প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু রায় রূপসিংহের ক্ষতিপূরণের
নিমিত্ত ডেপুটি কমিশনার মেজর ইস্টেপ এইরূপ বন্দোবস্ত
করেন, যে ৪০ বৎসর চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর জমিদারী হইতে
৭৫৫০ বার্ষিক কর রূপরায় সিংহ পাইবেন এবং তিনি ঐ
জমিদারীর রাজস্ব বার্ষিক ৪১৩০ টাকা গবর্মেণ্টকে দিবেন।
চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর উভয়ই মহানদীতীরে অবস্থিত। সঙ্গলপুর
হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে পদ্মপুর ও তথা হইতে
আরও ২০ মাইল পশ্চিমে চন্দ্রপুর অবস্থিত। মধ্যে রায়গড়
রাজ্যের কতক অংশ। চন্দ্রপুর পরগণা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল
ভাবে অবস্থিত নানা অংশে বিভক্ত। ইহার সকল অংশেই
বেশ জল পাওয়া যায়, কোথাও বন জঙ্গল নাই, কোন স্থানে
বালুকা ও কোন স্থানের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ কর্দমময়। শস্য
চাউল, ইক্ষু, সর্ষপ, তিল, ছোলা, গম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।
এখানকার তসরের বস্ত্র বিখ্যাত।

চন্দ্রপুর, ১ তত্ত্ববর্ণিত একটি পীঠস্থান।

“কৈলাসঃ পীঠকেশরঃ শুভঃ চন্দ্রপুরঃ তথা।”

(বৃহদ্রত্নঃ ৫ পং)

২ দেশাবলীর মতে জিপুরাছ অত্রতোলার ৪ ক্রোশ

দক্ষিণে গোমতীনদীতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম,
এখানে জিপুরাছন্দরী বিরাজ করেন।

চন্দ্রপুরী, নর্মদা নদীতীরবর্তী একটি প্রাচীন নগরী। রেবা-
খণ্ডের মতে এখানে সোমবংশীয় রাজা হিরণ্যতেজা রাজত্ব
করিতেন। (রেবাখং ৩২)

চন্দ্রপুলী (দেশজ) একপ্রকার সুমিষ্ট খাদ্যভক্ষ্য। নারিকেল
ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত হয়।

চন্দ্রপুষ্পা (স্ত্রী) চন্দ্রে ইব পুষ্পং রত্নাঃ বহতী। ১ শ্বেত কণ্ঠ-
কারী, হিন্দীতে শ্বেতরেঙ্গী বলে। (রাজনিঃ) ২ শ্বেত-
প্রভা, বাকুটী, চলিত কথায় সোমরাল বলে। ৩ জ্যোৎস্না।

চন্দ্রপ্রকাশ (পুং) চন্দ্রে প্রকাশঃ ৬তং। চন্দ্রের উদয়।
২ চন্দ্রের আলোক।

চন্দ্রপ্রভ (পুং) চন্দ্রেণ প্রভাষত বহতী। জৈনদিগের অষ্টম
তীর্থঙ্কর। ইহার পিতার নাম মহাসেন রাজা ও মাতার নাম
লক্ষ্মণা। পৌষ বদি ত্রয়োদশ তিথি, অমুদ্রাধানকৃত্ত ও বৃশ্চিক
রাশিতে চন্দ্রপুরী নগরীতে ইক্ষুকুংশে জন্মগ্রহণ করেন।
ইহার চরণ তিথি চৈত্রবদি পক্ষমী ও বিমানের নাম বিজয়ন্ত।
ইহার শরীরটি শ্বেতবর্ণ ও ১৫০ পঞ্চাশ ধনু পরিমিত ছিল। ইনি
রাজা উপাধি ধারণ করিয়া দশ (লাখ) বৎসর ভূতলে বিচরণ
করিয়া ছিলেন। রাজা চন্দ্রপ্রভ ১০০ সাধুর সহিত মিলিত হইয়া
চন্দ্রপুরী নগরীতে পুরাণবৃক্ষের তলে পৌষ ত্রয়োদশী তিথিতে
দীক্ষিত হন। দীক্ষার সময়ে দুইটি উপবাস করিয়া সোম-
দত্তের ঘরে পারণ করেন, দুইদিন কেবল ক্ষীর খাইয়াছিলেন।
পরে তিনমাস মাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জ্ঞানলাভ
করেন। জ্ঞানলাভের পূর্বেই ইনি দুইটি উপবাস করেন।
ফাল্গুন বদি সপ্তমী তিথিতে ইহার জ্ঞানোদয় হয়।
২৩ গগধর, ২৫০০০ সাধু, ৩৮০০০ সাধ্বী, ৭৬০০ বাদী,
৮০০০ অবধিজ্ঞানী, ১০০০০ কেবলী, ৮০০০ মনঃপর্যায়, ১০০০
চতুর্দশপুর্বী, ২৫০০০ শ্রাবক ও ৪৭২০০০ শ্রাবিকা ছিল।
ইহার শাসনযন্ত্রের নাম বিজয় ও যক্ষীণীর নাম ভুকুটী,
প্রথম গগধরের নাম দিম ও প্রথম আখ্যার নাম সুননা।
ভাদ্র বদি ৭ তিথিতে সম্ভেত শিখরে কোষর্গ নামক আসনে
ইহার মোক্ষ হয়। চন্দ্রপ্রভ যুগযোনি ও দেবগণ ছিলেন।
ইনি নয় মাস সাতদিন গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হন। ইহার মোক্ষ
পরিবার ১০০০। ইহার তিনটি মাত্র জন্ম হয়।

চন্দ্রপ্রভ, তত্ত্বশিলা বা তক্ষশিলাবাসী একজন বোধিসত্ত্ব। ইনি
তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। নগরের চারিদিকে তাঁহার
চারিটি দানাগার ছিল। যে বাহা চাহিত তিনি তাহাকে

* কাহারও মতে আবতী বা বর্ধমান শেটমাছটের নাম চন্দ্রকাপুরী।

তাহাই দান করিতেন। সহস্র সহস্র ভিক্ষুক প্রতিদিন মনোমত্ত ধনাদি লইয়া বাইত। অবশেষে ব্রাহ্মণ নামে এক কপট ব্রাহ্মণ রাজার নিকট আসিয়া তাঁহার মন্তক ভিক্ষা করিল। রাজা ব্রাহ্মণকে বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি লইয়া ঐ অসম্মত প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে অস্বরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজার মন্তক ভিন্ন আর কিছুই লইতে স্মীকৃত হইল না। অবশেষে রাজা সত্যভঙ্গের ভয়ে নিজ মন্তক দিতেই প্রস্তুত হইলেন। মন্তক হইতে রাজমুকুট লইয়া ভিক্ষুকে দান করিলেন। তদর্শনে মহাচন্দ্র ও মহীধর নামক প্রধান মন্ত্রীদ্বয় মুচ্ছিত ও গতাস্থ হইলেন। ব্রাহ্মণ এই সকল দেখিয়া উপহিত ক্রুদ্ধলোক হইতে অহিত আশঙ্কা করিয়া রাজাকে কহিল, “কোন নির্জন উদ্যানে গিয়া আমাকে মন্তক অর্পণ করুন।” রাজা তাহাতেই সন্মত হইলেন এবং উদ্যানে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বৌদ্ধমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চম্পকবৃক্ষে আপনাকে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণকে মন্তক লইতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার মন্তক কাটিয়া লইয়া গেল। ভদ্রশিলা নগর তৎপরে তক্ষশিলা নামে অভিহিত হয়। এই চন্দ্রপ্রভা নৃপতিই জন্মান্তরে বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হন। মন্ত্রীদ্বয় শাস্ত্রীপুত্র ও মৌদগলায়ন নামে তাঁহার শিষ্যরূপে এবং ঐ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দেবদত্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন।

(দিব্যাবদানমালা, সমাধিরাজ ও দ্বাবিংশতিঅবদান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রপ্রভার বিবরণ দ্রষ্টব্য ।)

চন্দ্রপ্রভা (জী) চন্দ্রইব প্রভা যত্নাঃ বহত্ৰী । ১ বাকুচী । (রাজনি)

২ ঔষধবিশেষ। সূত্রবোধের মতে—বিড়ঙ্গ, রক্তচিটা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দেবদারু, চই, ভূনিষ, মাগধীমূল, মুখা, শঠী, বচা, স্বর্ণমালিক, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপুল, ও আতাইচ ইহার প্রত্যেকের ছইতোলা, শিলাজতু ৮ তোলা, শৈলজ ২ পল, লৌহ ২ পল, সিতা (চিনি) ৪ পল, বংশলোচন, নিকুন্ত (দণ্ডী), কুন্ত (গুণ্ডশূল) ও স্নগন্ধিত্র এই সকল দ্রব্য মিশাইয়া চূর্ণ করিবে। ইহার নাম চন্দ্রপ্রভা বা চন্দ্রপ্রভাণ্ডিকা। ইহার সেবনে অর্শ, ভগন্দর ও কামলা রোগ ভাল হয় এবং মন্দাশ্মি ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া পৈত্তিক, ক্লেমিক, বায়ুরোগ, মর্দগত, নাড়ীগত, ব্রণ, গ্রন্থীকরুদ, বিদ্রুধি, রাজঘন্টা, মেহ, শুক্রক্ষর, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, শুক্রপ্রবাহ ও উদরান্নর রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল রোগে আহারের পূর্বে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ঘোল, দধির মাং, ছাগীর দুগ্ধ,

জালজ হৃৎ অথবা শীতল জল ইহার অল্পপান। ইহা সেবনে আহারাদি সঘর্ষে কোন নিয়ম নাই, বাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে বা পান করিতে পারা যায় এবং শীত, বায়ু, রৌদ্র ও মৈথুন বিষয়েও কোন নিয়ম নাই। ইহা সেবন করিলে হস্তীর জ্বর বল, বোড়ার ন্যায় গমনশক্তি, গরুড়ের ন্যায় দর্শনশক্তি এবং বরাহের ন্যায় শ্রবণশক্তি জন্মে। বৃদ্ধ ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে বলী ও পলিত দূর হয় এবং যৌবন ফিরিয়া আইসে। শিবের তপতা করিয়া চন্দ্রের প্রসাদে এই মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। (সূত্রবোধ)

৩ চন্দ্রদন্তোক্ত বস্তিবিষেব। ত্রিকলা, কুকুটাত্তর ধোলস, হিরাকস, লৌহচূর্ণ, নীল শাপলা, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্র-ফেন এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের ঘৃতে পিষিয়া সাতরাত্র একটা ভামার পাত্রে রাখিয়া দিবে। সাতরাত্রি পরে পুনর্বার দুগ্ধে পেষণ করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম চন্দ্রপ্রভাবস্তিকা। ইহার সেবনে অন্ধ ব্যক্তিরও পুনর্বার দর্শনশক্তি জন্মে। চন্দ্রদন্তে আরও অনেক প্রকার চন্দ্রপ্রভাবস্তির কথা আছে, তাহা জানিতে হইলে তদগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪ চন্দ্রকিরণ।

চন্দ্রবালা (জী) চন্দ্রত কর্পূরত বালেব তুল্যগন্ধিভাৎ । ১ স্থল এলা, বড় এলাচী । (রাজনি) ২ ঔষধবিশেষ। চন্দ্রত বালা ৬তৎ । ৩ চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না । ৪ চন্দ্রপত্নী ।

চন্দ্রবাহু (পুং) অস্ত্রবিশেষ।

চন্দ্রবুধ (ত্রি) চন্দ্র আক্লাদকো বৃধঃ মূলং যত বহত্ৰী । যাহার মূল আক্লাদজনক।

“চন্দ্রবুধো মদবুদ্ধো মনীষিত্তিঃ ।” (ঋক্ ১০।৫২।৩) ‘চন্দ্রবুধঃ সর্কাসাং প্রজানাং আক্লাদকমূলঃ’ (সাযণ ।)

চন্দ্রভ (পুং) চন্দ্রসোব ভা যস্য বহত্ৰী । চন্দ্রপ্রভা ।

চন্দ্রভস্মন্ (ক্রী) চন্দ্রইব শুভ্রং ভস্ম । কর্পূর । (শকার্ধচিৎ)

চন্দ্রভা (জী) চন্দ্রস্য ভা ইব ভা যত্নাঃ বহত্ৰী । খেতকণ্টকারী ।

চন্দ্রভাঁট, উপাসক সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা একপ্রকার ভিক্ষুক বই আর কিছুই নয়। দশনামী তাঁটের জায় ইহারাও শিবভক্ত; উপহিত মতে শিব ও কালীর পূজা দিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থ। কাশী, পাটনা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর অঞ্চলের নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। শীতকালে পরিবার সঙ্গে করিয়া ও গো, মেঘ, ছাগল, বানর, কুকুর, গর্দভ এবং কেহ কেহ অশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া দেশ দেশান্তরে ভিক্ষায় গমন করে। এইরূপে যাহা কিছু উপার্জন করিতে পারে, তদ্বারা সংসার নির্বাহ করে। অনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষিকার্য্যাদিও করিয়া থাকে।

ইহার প্রবাসে গিয়া যে দিন যে স্থানে অবস্থিত করে, তথায় টোল অর্থাৎ কুদীর প্রভৃত করিবায় মত সামগ্রী সকল সঙ্গে সঙ্গে রাখে। গোপ্তে জবাজাত লইয়া যায়, এবং কুকুরে রাজিকালে চৌকি দেয়। ইহার মখন তিক্কার যায়, লোকের নিকটে বানর ও ছাগল নাটাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে। ইহার অভিশয় নিকট লোক; সচরাচর মদ্যমাংস ব্যবহার করিয়া থাকে।

চন্দ্রভাগ (পুং) চন্দ্রস্য ভাগো বিভাগো যত্র বহতী। ১ পর্ত-বিশেষ। কালিকাপুরাণের মতে হিমালয়ের নিকটবর্তী শত-যোজন বিস্তৃত একটা পর্ত। এই পর্তটী সর্বদা তুষারময় থাকায় কুলকুমুমের ছায় ধবল বর্ণ দেখায়। ইহার উচ্চায় ৩০ যোজন। চন্দ্রভাগা নদী এই পর্ত হইতে প্রবাহিত। পূর্বকালে ব্রহ্মা এই পর্ততে বসিয়া দেবতা ও পিতৃগণের জন্ম চন্দ্রকে ভাগ করিয়াছিলেন, তাই দেবতারা ইহার নাম চন্দ্রভাগ রাখিয়াছেন। (কালিকাপুরাণ ২০ অঃ)

চন্দ্রভাগা (স্ত্রী) চন্দ্রভাগঃ পর্ত্তবিশেষঃ স উৎপত্তিস্থানং-নাস্তাত্তাঃ চন্দ্রভাগ-অচ্-টাপ্। একটা নদী। পর্যায়—চন্দ্রভাগী, চন্দ্রিকা। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তির কথা এইরূপ লিখিত আছে—ব্রহ্মার আদেশে চন্দ্রভাগ পর্ত্তের সান্নিধ্যে শীতা নদীর উৎপত্তি হয়। শীতা নদী চন্দ্রকে প্রাবিত করিয়া প্রবাহিত হইলে তাহার জল অমৃতযুক্ত হইয়া বৃহল্লোহিত সরোবরে পতিত হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই জল হইতে একটা কণা উঠিয়াছিল, তাহার নাম চন্দ্রভাগা। ব্রহ্মার অমৃতমিত্তে সাগর সেই কণাকে বিবাহ করে। চন্দ্র নিজ গদার অগ্রভাগে সেই সেই গিরির পশ্চিম পার্শ্ব ভেদ করিয়া দেন, তাহাতে স্রোতস্বতী চন্দ্রভাগা সেই স্থান হইতে প্রবাহিত হয়। সাগর নিজ ভাৰ্যা চন্দ্রভাগাকে লইয়া গৃহে গমন করেন। চন্দ্রভাগা অবাধ গতিতে সাগরে মিলিত হইল। ইহার গুণ—গন্ধার সমান। (কালিকাপুং ২২ অঃ) রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার জলের গুণ—অভিশয় শীতল, দাহ, পিত্ত ও বাতনাশক।

যে পাঁচটা নদী থাকায় পঞ্চনদ প্রদেশের নাম পঞ্চাব (অর্থাৎ পঞ্চনদ) হইয়াছে, চন্দ্রভাগা উহাদের মধ্যে একটা। ইহা সিন্ধু নদের উপনদী। তাণ্ডী নগরের নিকট চন্দ্র ও ভাগা নদীদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রভাগা নাম ধারণ করিয়াছে। কাশ্মীর প্রদেশের তুষারমণ্ডিত হিমালয়-পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জম্মুসঙ্কটের মধ্য দিয়া কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইতে হইতে শিয়ালকোট জেলার খাইরি-রিহাল গ্রামের নিকট ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

তাবী নামে বৃহৎ নদীর সহিত মিশিয়া প্রায় ১৮ মাইল পর্যন্ত শিয়ালকোট ও গুজরাট জেলাদ্বয়ের মধ্য সীমায় প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে নদীর উত্তর তীরস্থ প্রান্তর পলিময়, এবং নদীর গতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। তৎপরে এই নদী রেচনা ও জেচ্ দোয়াবের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে অনেক বাণিজ্যতরী যাতায়াত করে। নদীতীর হইতে কয়েক মাইল ভূভাগ পলিময় ও কৃষিক্ষেত্রোপযোগী, তাহার পরবর্তী স্থানে নদীর জল যায় না। গুজরানুবালা জেলার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত হইয়া মক্কেয় স্বদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তথায় ইহার উত্তরতীরস্থ প্রান্তরের বিস্তার প্রায় ৩০ মাইল। এই প্রান্তর নূতন পলিময়, এবং নদীপ্রবাহ এখানে সর্বদা পরিবর্তিত ও নানা ভাগে বিভক্ত। এক্ষণে নদীগর্ভ প্রান্তরের মধ্যভাগে অবস্থিত। প্রায় তথা হইতেই সমস্ত তীর-ভূমিতে কৃষিকার্য্য হয়। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে অসংখ্য চড়া আছে, প্রায় প্রত্যেক বছর সমস্ত স্থান-স্তরিত হয়। তিস্ত নগরের নিকট চন্দ্রভাগা বিস্তৃত। নদীর সহিত মিলিয়াছে। ওয়াজিরাবাদের নিকট ইহার উপর একটা রেলওয়ে সেতু আছে, এবং স্বল্প হইতে ডেরা ইস্মাইল খাঁ পর্যন্ত রাস্তা ইহার উপরে নৌসেতু গিয়াছে।

চন্দ্রভাগী (স্ত্রী) চন্দ্রভাগস্য ইয়ং চন্দ্রভাগ-অণ্ (তসোদং। পা ৪।৩।১২০) বহ্বাদিভ্যাম্ ন বৃদ্ধিঃ (বহ্বাদিভ্যাম্। পা ৪।১।৪৫।) ততো ভীষ্। চন্দ্রভাগানদী। (শব্দরত্নাঃ)

চন্দ্রভানু (পুং) কক্ষপ্রিয়া ত্রীমতী চন্দ্রাবলীর পিতা। ইহার পিতার নাম মহীভানু ও মাতার নাম সুখদা। ইহার চারিটা সহোদর ছিল। তাহাদের নাম রত্নভানু, বৃষভানু, সুভানু ও ভানু। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রভানুই সর্ব জ্যেষ্ঠ। ইহার ভগিনীর নাম ভানুসুদা ও পত্নীর নাম বিন্দুমতী। (বৃং লীঃ ১৬।২৩ অঃ)

২ কক্ষের এক পুত্র, সত্যভামার গর্ভজাত। ইহার সহিত চন্দ্রেরাথার প্রেমঘটিত কথা তৈলজ্ঞে প্রসিদ্ধ আছে।

চন্দ্রভাম (পুং) [চন্দ্রহাস দেখ।]

চন্দ্রভূতি (স্ত্রী) চন্দ্রস্যেব ভূতিঃ কান্তিরস্য বহতী। রজত।

চন্দ্রমণি (পুং) চন্দ্রপ্রিয়ো মণিঃ শাকপাণ্ডিবৎ সমাসঃ।

চন্দ্রকান্ত মণি। (হেমং) [চন্দ্রকান্ত দেখ।]

চন্দ্রমণ্ডল (স্ত্রী) চন্দ্রস্য মণ্ডলং ভূতং। চন্দ্রবিষ।

চন্দ্রমল্লিকা (স্ত্রী) চন্দ্রমল্লী স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বত্বশ্চ। চন্দ্রমল্লী।

চন্দ্রমল্লী (স্ত্রী) চন্দ্রইব মল্লো বস্যাঃ বহতী, ততো ভীপ্। লতাবিশেষ, অষ্টাপদী। (শব্দটিং)

চন্দ্রমস্ (পুং) চন্দ্রঃ আক্কারং মিত্রীতে মি-অস্বন্ব মাদেশঃ।

যথা চন্দ্রঃ কর্পূরং মাতি তুলয়তি মা-অম্বনু সচড়িং (চন্দ্রে মোড়িঃ। উণ্ ৪।২২৭) ১ চন্দ্র।

“অম্ববিয়ং করোতোব সূর্য্যাক্ষমসং যথা।” (পঞ্চতন্ত্র ৩।৩৮) ২ কর্পূর।

চন্দ্রমুখ (পুং) চন্দ্রস্যা মুখ ৩তং। চন্দ্রেণমুখ।

চন্দ্রমো (স্ত্রী) চন্দ্রেণ যীরতে মা-ঘঞার্থে ক, ততঃ টাপ্। নদী বিশেষ। “কৌশিকীমিশ্রপ্রাশোণং বাহুদাগথ চন্দ্রনাম্।”

(ভারত ৬।৯ অঃ)

চন্দ্রমুখ (পুং) ১ দেবমুখ নামক দিবিরের ঔরসে অপূর্ণিকা বোজার গর্ভে উৎপন্ন একজন ধনী। বাল্যকালে ইহার কিছুই ধন সম্পত্তি ছিল না, কেবল মহারাজের অনুগ্রহেই পরিশেষে কোটিস্বর হইয়া ছিলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৭।১১১) (ত্রি) চন্দ্রেইব মুখং যস্য বহুত্বী। ২ যাহার মুখখানি অতিশয় সুন্দর। জৌলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

চন্দ্রমুখী (স্ত্রী) চন্দ্রেইব মুখং যস্যো বহুত্বী। ১ যে স্ত্রীর মুখ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর।

চন্দ্রমূল (দেশজ) এক প্রকার গাছ।

চন্দ্রমৌলি (পুং) চন্দ্রামৌল্যবস্যা বহুত্বী। মহাদেব।

“কৌতন্তপোতি রিতিবাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।” (কুমার ৫।৮।৬)

চন্দ্ররথ (ত্রি) চন্দ্রঃ সূর্য্যময়োরথো যস্য বহুত্বী। ১ সূর্য্যময় রথ। “হোতা মন্ত্রঃ সূর্য্যবচন্দ্ররথঃ।” (ঋক্ ১।১৪।১২) ‘চন্দ্ররথঃ সূর্য্যময়রথোপেতঃ’ (সারণ।) (পুং) ২ সূর্য্য-নির্মিত রথ। চন্দ্রস্য রথঃ ৩তং। ৩ চন্দ্রের রথ, চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব যে রথে আরোহণ করেন।

চন্দ্ররসা (স্ত্রী) চন্দ্রেইব রসো যস্যো বহুত্বী, ততঃ টাপ্। ভারত-বর্ষীয় একটা নদী। “চন্দ্ররসা তাম্রপণী” (ভাগবত ৫।১৮।১৮)

চন্দ্ররাত্ন মোড়ে, বিজাপুর রাজ্যের অধীন ও সাতারা নগরের ৩৫ মাইল বায়ুক্রমে স্থিত জাবলির একজন মহারাজা। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্ররাত্ন মোড়ে শিকি প্রদেশ জয় করিবার নিমিত্ত বিজয়পুরের প্রথম অধিপতি যুসুফ আদিল শাহের নিকট হইতে ১২০০০ হিন্দুসৈন্য প্রাপ্ত হন এবং সৈন্য-সাহায্যে ঐ সকল প্রদেশ জয় করেন।

চন্দ্ররাত্ন এবং তাহার পুত্র যশোবন্ত রাত্ন ঝারাই মোড়ে-বংশ বিখ্যাত হয়। যশোবন্ত রাত্ন আকাদনগরের বৃহান্ নিজাম শাহকে পুরস্কারের নিকট পরাজিত করিয়া তাহার হরিষর্গ পতাকা কাড়িয়া লয়েন। এই বীরকার্যের জন্য তিনি পৈতৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন ও ঐ বিজয়পতাকা ব্যবহার করিতে অনুমতি পান। তাহাদের উত্তরাধিকারী ৭ পুরুষ

পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন এবং সকলকেই বংশের স্থাপন কর্তার নামে “চন্দ্ররাত্ন” উপাধি ব্যবহার করিতেন।

এই সমস্ত রাজগণ বিজাপুরের নবাবের অধুগত ছিলেন, নবাব সেই জন্য তাহাদের নিকট অন্নমাত্র কর লইতেন। ১৬৫৫ সালে শিবজী তখনকার রাজাকে বিজাপুরের বিপক্ষে অসি ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। সেই সময়ের রাজা চন্দ্ররাত্ন শিবজীকে বন্দী করণাভিপ্রায়ে সমাগত শামরাজ নামক বিজাপুর-নবাব-প্রেরিত সেনাপতিকে নিজ রাজ্য দিয়া যাইতে দেন। শিবজী এই ছল ধরিয়া তাহার সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চন্দ্ররাত্ন, তাহার পুত্রদ্বয়, ভ্রাতা এবং মন্ত্রী হিম্মতরাত্ন ইহারা, সকলেই বীরপুরুষ ছিলেন, এবং সৈন্যাগণও শিবজীর সৈন্য অপেক্ষা হীনবল ছিল না, সুতরাং সূচতুর শিবজী প্রকাশ্য শত্রুতা না করিয়া কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্থির করিলেন। তিনি রঘুবল্লভ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং শঙ্কাজী কাবজী নামক জনৈক মহারাজাকে চন্দ্ররাত্নের কন্যার সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার ছলে ২৫জন মারাঠী সৈন্যসহ জাবলিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তথায় বাইয়া শিবজীর উপদেশমত রাজা ও তদীয় ভ্রাতাকে প্রতারণাপূর্ব্বক বিনাশ করিল, এবং নিকটস্থ অরণ্যে অবস্থিত সৈন্য শিবজীর সহিত মিলিত হইল। তৎপরে শিবজী ঐ নগর আক্রমণ করিলে হিম্মতরাত্ন প্রভৃতি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। তদবধি ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা শিবজীর বংশধরের ও পেশবার অধীন ছিল।

চন্দ্ররাজ (পুং) রাজতরঙ্গিনী-বর্ণিত একজন বীরপুরুষ। ইনি হর্ষরাজের মন্ত্রী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিনী ৭।১৩৭৬)

চন্দ্রলেখ (পুং) রামায়ণ-বর্ণিত একটা রাক্ষস। (৬।৮৪।১২)

চন্দ্রলেখা (স্ত্রী) চন্দ্রস্ত রেখা ৩তং। ১ জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ চন্দ্রের মণ্ডলস্থচক রেখা। চন্দ্রস্ত রেখা ইব আকৃতির্যথাঃ বহুত্বী। ২ একটা পরমা সুন্দরী অপ্সরা। (কাশীখণ্ড ৮ অঃ) ৩ বাকুচী লতা, চলিত কথায় হাকুচ বা সোমরাল বলে। (রাজনিঃ) ৪ চন্দ্রলেখের সছোদরা ভগিনী। [চন্দ্রলেখর দেখ।] ৫ ছন্দোবিশেষ। যে বৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৩ অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক চরণের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ১১শ অক্ষর গুরু অপর লঘু তাহাকে চন্দ্রলেখা বলে। ইহার ৬ ও ৭ অক্ষরে যতিস্থান। “নন্দরঘুগলৈশ্চন্দ্রলেখর্থু লৌকিকঃ।” (বৃত্তরত্নাং টী) ৬ বাণরাজের কন্ডা উবার নথী। (পুরাণ) কোন কোন স্থানে চন্দ্রলেখা নামেও ইহার উল্লেখ আছে।

চন্দ্ররেখাগড়, মেদিনীপুর জেলার একটি প্রাচীন গড়। নয়াগ্রাম রাজবংশীয় খেলারের ৪র্থ ভূপতি চন্দ্রশেখর সিংহ কর্তৃক খ্রীস্ট ১৬শ শতাব্দীতে এই গড় নির্মিত হয়। প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ পরিধা দ্বারা ইহার চতুর্দিক বেষ্টিত ও পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। এই পরিধা ৮১০ ফিট প্রশস্ত ও ৬ ফিটেরও অধিক গভীর এবং লোহিত বর্ণ কঠিন প্রস্তর কাটিয়া বহুব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বভাগে দ্বারের নিকট একটি গভীর পরিধা ও প্রাচীর আছে। দ্বার হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। উহার রাজার বাসগৃহ হইতে পারে। এই স্থান এখন গভীর জলপূর্ণ। চন্দ্ররেখাগড়ের প্রায় অর্ধেকাংশ পূর্বে দেউল নামে ৭৫ ফিট উচ্চ একটি বৃহৎ শিবমন্দির আছে, মন্দিরটা দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কে এই মন্দির নির্মাণ করিল, এখনও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নয়াগ্রামের রাজার বায়ে ইহার দেবসেবা নির্বাহ হয়।

চন্দ্ররেণু (পুং) চন্দ্রইব আক্লাদকো রেণুর্জ বহত্রী। ১ কাবাচোর। (ত্রিকাণ্ড) (ক্লী) ২ রূপা। (বৈদ্যক)

চন্দ্রলা (স্ত্রী) কর্ণাটদেশ-প্রসিদ্ধ একটি দেবী।

(রাজতরঙ্গিনী ৮৩৪২১)

চন্দ্রলেখা (স্ত্রী) চন্দ্রং তৎকাস্তিঃ লিখতি লিখ-অণ্ উপ-স-ততো বাহুলকাৎ টাপ্। ১ লতাবিশেষ, বাকুটী। চন্দ্রস্ত লেখা ৬তৎ। ২ চন্দ্রলেখা। ৩ ছন্দোবিশেষ। যে সম-বৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৫টা অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক চরণের ৫, ১০ ও ১৩ অক্ষর লঘু ও অপর গুরু, তাহাকে চন্দ্রলেখা বলে। ৭ ও ৮ অক্ষরে ইহার যতিস্থান। “ত্রৌ মো, যৌ চেন্দ্রভবোতাং সপ্তাষ্টকৈচন্দ্রলেখা।” (ছন্দোমণ)

৪ বাণরাজের মন্ত্রী কুম্ভাকের কন্যা, উহার একজন সখী, ইহার উদ্যোগেই রূপসী উষা প্রাণপতি অনিরুদ্ধের সহিত গোপনে মিলিত হন। (পুরাণ) [উষা দেখ।] ৫ অক্ষরা-বিশেষ, স্থানবিশেষে চন্দ্রলেখা নামেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [চন্দ্রলেখা দেখ।]

৬ নাগ জুশ্রবার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম ইরাবতী। (রাজতরঙ্গিনী ১২১৯)

চন্দ্রলোক, চন্দ্রমণ্ডল। পূর্বে চন্দ্রের বিবরণে দেখান গিরাছে চন্দ্রের যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, তাহা কেবল পর্কতময়, শুহাদি দ্বারা বিক্ষোভিত ও জলবায়ুশূন্য। সুতরাং চন্দ্রের সূর্য্য দিব্যভাগে ঐ অংশ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে গ্রীষ্মকালে দিবা কয়েক ঘণ্টা মাত্র দীর্ঘ হয়, তাহা-তেই সূর্য্যের তাপ অসহ্য হইয়া উঠে। তখনও বায়ুশিশি ও

মেঘবৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যতাপ অনেক কম হইয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রে জলও নাই, বায়ুও নাই, মেঘও নাই, সুতরাং ১৫ দিবসব্যাপী দিব্যভাগের প্রথম সূর্য্যকিরণে চন্দ্রস্থ পর্কত ও প্রান্তর সকল কিরূপ ভীষণ উত্তপ্ত হয়, তাহা কল্পনাতীত। সুতরাং পার্থিব প্রকৃতির কোন জীব যে চন্দ্রে থাকিতে পারে না তাহা নিশ্চিত। তথায় জলও নাই মৎস্তও নাই বায়ুও নাই, সুতরাং পক্ষীও উড়িতে পারে না। পার্থিব কোন প্রাণী তথায় বাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পক্ষত পাইবে এইরূপই অনুমান হয়। তবে বিশ্বপতি এই চন্দ্রলোকের উপযোগী কোন প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে? হইতে পারে সেই সমস্ত প্রাণীর প্রকৃতি চন্দ্রের অমুরূপ, তাহার পৃথিবীতে আসিলে হ্রত প্রাণত্যাগ করিবে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে জলবায়ু এবং পার্থিব-প্রকৃতির প্রাণী থাকিতে পারে। হ্রত সেখানেও আমাদেরই জায় মম্বোর বাস আছে এবং সলিল মধ্যে মৎস্ত ও বায়ু-সাগরে পক্ষী বিচরণ করে*। হ্রত সেখানেও পৃথিবীর জায় শ্রোতবতী নদী, শ্রামল বৃক্ষলতা ও নানাবর্ণের পুষ্পাদি আছে এবং সূর্য্যোদয় সমীপে প্রবাহিত হয়। কিন্তু চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত অল্প বলিয়া উহার বায়ু অতিশয় লঘু, সুতরাং তথাকার প্রাণীদিগের সহিত আমাদেরই বিশেষ মিল হইবে না। চন্দ্রের দিবস ১ চান্দ্রমাসের সমান। চন্দ্রের ঋতু পর্য্যায় নাই। প্রত্যেক দিবাই চন্দ্রের গ্রীষ্মকাল ও প্রত্যেক রাত্রিই শীতকাল। পৃথিবী শীতকালে সূর্য্যের অধিক নিকট-বর্তী হয়, তজ্জন্য পোষ ও মাঘ মাসে, চান্দ্রমাসের পরিমাণ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের চান্দ্রমাসের পরিমাণ অপেক্ষা কিছু অধিক হয়। সুতরাং ঐ সময় চন্দ্রের দিবস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, সুতরাং তখন চন্দ্রের গ্রীষ্মকাল অপেক্ষাকৃত অধিকতর উষ্ণ হয়। সেইরূপ আমাদের গ্রীষ্মকালে চন্দ্রের শীত কিছু প্রখর হয়। [চন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপ ও সোমগিরি শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রলোচন (পুং) এক দানব। (হরিবংশ)

চন্দ্রলোক (ক্লী) চন্দ্রইব ওজঃ লোকঃ ধাতুহব্যঃ। রজত, রূপা। (রাজনিঃ)

* আমাদের শাস্ত্রে চন্দ্রলোকে পিতৃপুরুষগণের বাসের কথা লেখা আছে। যথা—

“প্রজাবতাং প্রশংসেব নৃত্য সিদ্ধা ক্রিরাবতান্।

ভেবাং নিবাপবতানঃ তৎকুলীনেত্ব বাক্যৈঃ।

মাংসপ্রাভুত্বং পিতৃপিতৃ লভন্তে সোমলৌকিকাঃ

এতে মনুষ্যাঃ পিতরে মাশি প্রাভুত্বমন্ত তে।”

(ত্রিকাণ্ডপুরাণ - অনুবক ৬০ অঃ)

চন্দ্রবংশ (পূঃ) চন্দ্র বংশঃ ৬৩৭। চন্দ্র হইতে উৎপন্ন
পুরুষপুরুষা, চন্দ্রের সন্তান সন্ততি। মহাতারত, রামায়ণ,

হরিবংশ প্রভৃতিতে চন্দ্রবংশের বিবরণ লিখিত আছে,
তদনুসারে চন্দ্রবংশের তালিকা লিখিত হইল।

চন্দ্রবংশ।

ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র

বৃষ (শুরুপদী তারার গর্তজাত)

পুরুষা (ইনার গর্তজাত)

আরু অমাবসু বিষাণ অত্রায় দৃঢ়ায় বনায় শতায় (ক)

(খ) ভীম নমস্কিং

কাকিনপাত

মুহোজ

জরু (ইহার মাতার নাম কেনিনী, ইনি গঙ্গা পান করেন)

মুনহ

অজক

বলকাম্ব

কুশ

(ভাগবতের মতে)

জরু

পুরু

বলক

অজক

কুশ

কুশায় তনয় বহু কুশনাত

গাধি

বিষামিত্র

সত্যবতী

মধুকন্দ প্রভৃতি ১০০ পুত্র

দেবরাত

(বিষ্ণুপুরাণের মতে)

জরু

মুহু

অজক

বলকাম্ব

কুশ

কুশায় কুশনাত অমৃতার অমাবসু

গাধি

সত্যবতী

বিষামিত্র

মধুকন্দ প্রভৃতি, হারীত অষ্টক

কুশিক কুশনাত কুশান্দ মণ্ডিমান

গাধি

বিষামিত্র

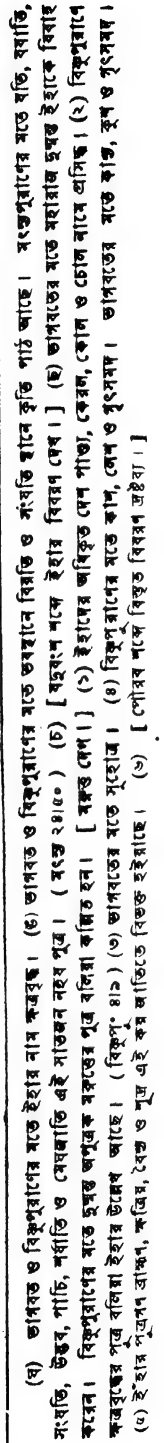
সত্যবতী

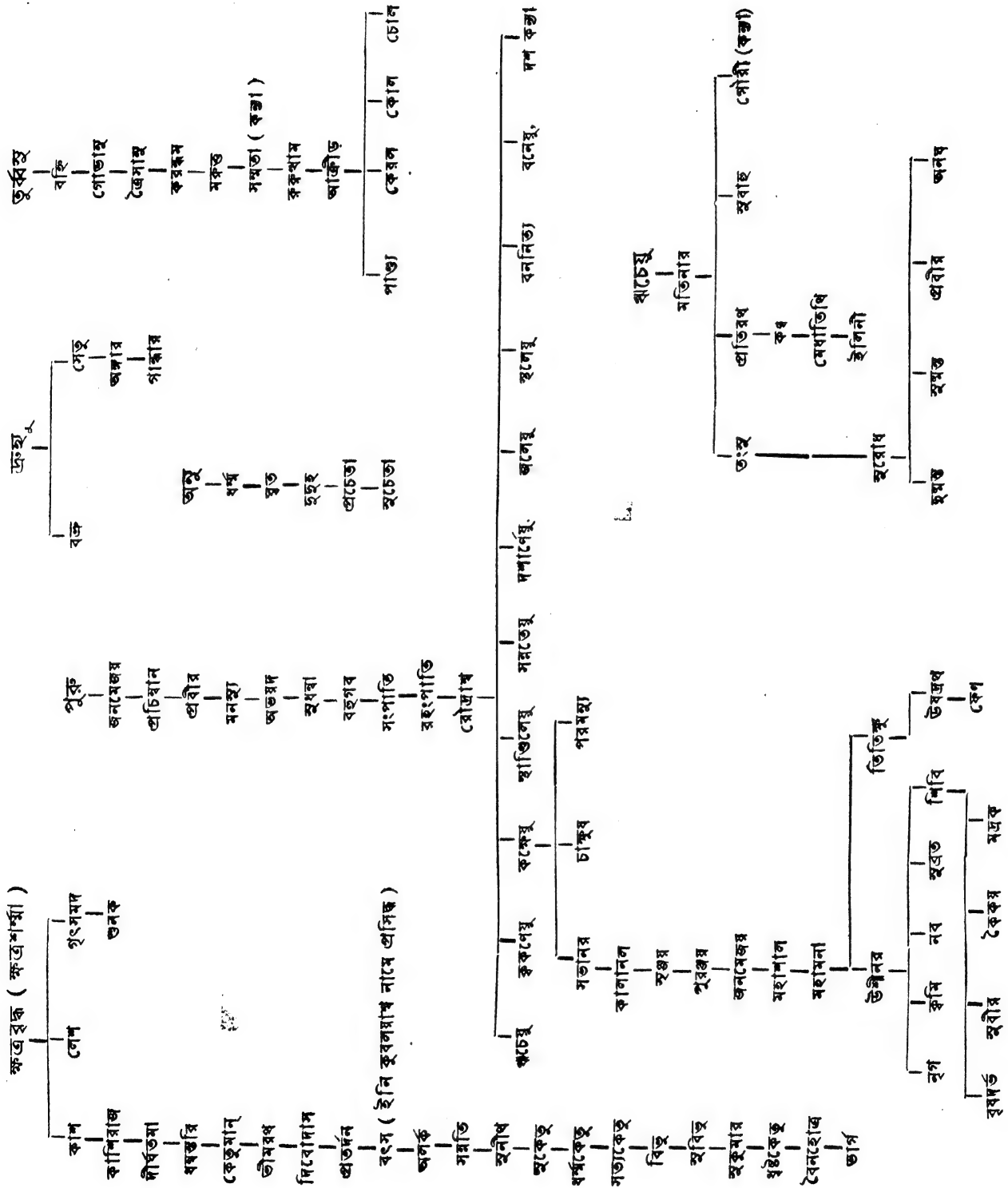
দেবরাত শালকায়ন প্রভৃতি অষ্টক

গোহি

নোহি

(ক) ভাগবতের মতে পুরুষপুরুষ পুত্র ৩ জন, ভাগবতের নাম—আরু, কুশায়, শতায়, বহু, তনয় ও বিষ্ণু। বিষ্ণুপুরাণের মতে আরু, অমাবসু, বিষ্ণু, কুশায় ও অমাবসু। (বিষ্ণু ৪।৭ অঃ) মৎস্যপুরাণের মতে আরু, দৃঢ়ায়, বনায়, শতায়, বহু, তনয়, বিষ্ণু, কুশায় ও অমাবসু। (মৎস্য ২৪।৩৪)।
(খ) ভাগবতের মতে ইনি বিষ্ণুর পুত্র। (প) ইনি বিষ্ণুর পুত্র। ভূতবংশীয় অমৃতার পুত্রের উল্লেখ।





চন্দ্রবজ্র (জী) ইব চন্দ্রবজ্রঃ বভাঃ বহতী। ত্রিমাং টাপ্।
১ নগরীভেদ। ২ চন্দ্রযুধী।

চন্দ্রবৎ (জি) চন্দ্রোবিধাতে ২৩ চন্দ্র-মতুপ্ মত্ বঃ। ১ চন্দ্র
যুক্ত, বাহার চন্দ্র আছে। ২ দীপ্তিযুক্ত। “চন্দ্রবতা রাধালা
পপ্রথশ্চ।” (ঋক্ ৩।৩০।২০) ‘চন্দ্রবতা দীপ্তিযুক্তেন’ (সায়ণ।)

চন্দ্রবদন (জি) চন্দ্রইব বদনং বভাঃ বহতী। বাহার মুখখানি
অতিশয় সুন্দর, চন্দ্রতুল্য মুখবিশিষ্ট।

চন্দ্রবতী (জী) চন্দ্রবৎ জীপ্। ১ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের
কন্যা, ইহার কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম প্রভাবতী। (হরিবংশ ১৫৩ অঃ)
[প্রভাবতী দেখ।]

চন্দ্রবর্ণ (জি) চন্দ্রেভ বর্ণোযন্ত বহতী। ১ বাহার বর্ণ সুবর্ণের
সদৃশ। “সকল্যা মরুতশ্চন্দ্রবর্ণাঃ।” (ঋক্ ১।১৬৫।১২)
‘চন্দ্রমিতি সুবর্ণনাম, সুবর্ণবর্ণাঃ।’ (সায়ণ।)

২ চন্দ্রের স্তার খবল।

চন্দ্রবজ্র (জী) চন্দ্রোবিশেষ। বস্তুরদ্ধাকরের মতে যে সম-
বস্তুর প্রত্যেক চরণ ১২টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও প্রত্যেক
চরণের ১, ৩, ৭ ও ১২শ অক্ষর গুরু ও তদ্ভিন্ন লঘু হয়, তাহার
নাম চন্দ্রবজ্র। “চন্দ্রবজ্র নিগদন্তি রনভসৈঃ।” (বস্তুরদ্ধাঃ)

চন্দ্রবর্ষন, কালজরহর্গনিষ্ঠাতা ও চন্দ্রেন্নরাজবংশের আদি-
পুরুষ। [চন্দ্রোত্তরবংশ দেখ।]

চন্দ্রবল্লরী (জী) চন্দ্রঃ বল্লরী ৬তৎ। সোমলতা। (ভরত)
কেহ কেহ ব্রাহ্মীশাককে চন্দ্রবল্লরী বলেন।

চন্দ্রবল্লী (জী) চন্দ্রঃ বল্লী ৬তৎ। ১ সোমলতা। [সোমলতা
দেখ।] ২ মাধবীলতা। (রাজনিঃ) ৩ প্রসারগী। চন্দ্রবল্লী-স্বার্থে
কন্-টাপ্ পূর্নহ্রস্ব চন্দ্রবল্লিকা শব্দ ও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রবসা (জী) ভারতবর্ষীর একটি নদী। (ভাগবত ৫।১২।১৮)

চন্দ্রবাটী, বর্ধমানের দক্ষিণাংশে দামোদরস্থ একটি প্রাচীন
নগর। এখানে পোণরাজগণ রাজত্ব করিতেন।

(ভং ব্রহ্মণ ৭৪৩)

চন্দ্রবিন্দু (পুং) চন্দ্রযুক্তো বিন্দুঃ মধ্যলোঃ। বর্ণবিশেষ,
চলিত কথার চাঁদ বিন্দু বলে। ইহার অপর নাম নাদবিন্দু।

চন্দ্রবিমল (পুং) সমাধিবিশেষ। (যৌদ্ধশাস্ত্র)

চন্দ্রবিমলসূর্য্যপ্রভাস (জী) (পুং) বুদ্ধভেদ।

চন্দ্রবিহঙ্গম (পুং জী) চন্দ্রইব শুভ্রো বিহঙ্গমঃ। ১ বকপক্ষী।
২ পক্ষিবিশেষ, শম্বী, চলিত কথায় শম্ভাচিল বলে।

চন্দ্রবেগা, একটি পুণ্যতোয়া নদী। বিখ্যানপুরাণ ৬৭ পটলে
ইহার মাছাচ্ছা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

চন্দ্রব্রত (জী) চন্দ্রঃ চন্দ্রলোকপ্রাপ্তয়ে ব্রতম্ ৬তৎ। চান্দ্রা-
ব্রতত। [চান্দ্রারণ দেখ।]

চন্দ্রশাল (জী) চন্দ্রেণ শালিতে শোভতে শাল-অ-ততটাপ্।

১ জ্যোৎস্না। (ত্রিকাণ্ডঃ) চন্দ্রইব শালিতে শাল-অ-টাপ্।

২ রথাদি বা আসাদের উপরিস্থ গৃহ, চিলেঘর। পর্যায়-
শিরোগৃহ, চন্দ্রশালিকা, বড়তী ও কুটাগার।

“বিরদগতং পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ কণং প্রতিশ্রদ্ধধরাঃ কয়োতি।”

(রঘু ১৩।৪০)

চন্দ্রশালিকা (জী) চন্দ্রশালী স্বার্থে কন্-টাপ্ অত-ইষক্।
বড়তী। (ত্রিকাণ্ডঃ)

চন্দ্রশিলা (জী) চন্দ্রপ্রিমা শিলা শাকপার্বতাদিঃ মধ্যলোঃ।
১ প্রেতরবিশেষ, চন্দ্রকান্ত। “প্রোলামিতা চন্দ্রশিলেব তূর্ণম্।”
(ভট্ট ১।১।১৫।) ২ কুমারের অনুচরী মাতৃকাতেরদ।

চন্দ্রশূর (পুং) চন্দ্রে তজ্জৈম্মিকরোগে শূরইব। ১ বৃক্ষবিশেষ,
চাঁদহর। (কী) ২ ফলবিশেষ, চলিত কথায় হালিম্ বলে।
পর্যায়—চন্দ্রিকা, চন্দ্রহস্তী, পণ্ডমেহনকারিকা, নন্দনী, কান্ধরী,
মজা। ইহার গুণ—হিকা, বাত, স্লেমা ও অতীসাররোগ-
নাশক এবং বলপুষ্টিকর। (ভাবপ্রকাশ)

চন্দ্রশেখর (পুং) চন্দ্রযুক্তঃ শেখরঃ নৃপং বভাঃ বহতী। একটি
প্রসিদ্ধ পর্বত, তীর্থস্থান। এই পর্বতটি চট্টল প্রদেশে
(বর্তমান চট্টগ্রামে) অবস্থিত। এখানে চন্দ্রশেখর নামে
শিব আছেন। ২ চন্দ্রশেখর পর্বতে অবস্থিত একটি শিব
মুর্তি। তত্ত্বচূড়ামণির গীঠনির্ণয়ে লিখিত আছে যে—

“চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।

ব্যাক্তরূপা ভগবতী ভবানী ভদ্র দেবতা ॥”

(তত্ত্বচূড়ামণি—গীঠনির্ণয়)

চট্টলদেশে দেবীর দক্ষবাহু পতিত হয়, সেই স্থানে
ভবানী নামে ভগবতী ও চন্দ্রশেখর নামে ভৈরব আছেন।

[চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড দেখ।]

চন্দ্রঃ শেখরে যন্ত বহতী। ৩ মহাদেব।

“ইতি ব্রহ্মোন্নিখিতশ্চ মুদ্রয়া রহস্যপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ।”

(কুমার ৫।৫৮।)

৪ বারাহীতন্ত্রের মতে—দক্ষিণভাগে সাগর হইতে সর্জিতাম
দূরে চন্দ্রশেখর নামে একটি তীর্থস্থান আছে। এখানে
আসিয়া কুণ্ডে স্নান করিলে মহাফল হয়। এই ক্ষেত্রের
মধ্যভাগ অর্জুনোজনকে পরক্ষেত্র বলে। এই স্থানে স্নান, শ্রাদ্ধ,
পিতৃতর্পণ ও যথাবিধি দেবতর্পণ করিলে সকল পাপ হইতে
মুক্তি হয় ও সচ্ছ গোদানের ফল হয়। (বারাহীতন্ত্র ৩১শ পটল)

৫ কালিকাপুরাণ বর্ণিত একজন রাজা। কালিকা-
পুরাণে ইহার উপাখ্যান এইরূপ আছে—পৌষ নামে একজন
অবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার তিনটি বহিবি।

রাজার বৃদ্ধ দশা উপস্থিত হইল, তথাপি পুত্র হইল না। নিঃসন্তান পোষা ভাৰ্য্যাভ্রয়ের সহিত কমলাসন ত্রক্ষর উপা-
সনা করেন। ত্রক্ষা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি ফল দিয়া
বলিলেন, “বৎস পোষা! এই ফলটী সহজে জীর্ণ হইবার
নহে। তুমি তোমার মহিষীগণের সহিত ত্রিলোকপতি
মহাদেবের আরাধনা কর, তিনি সাক্ষাৎ হইলে তোমার
অভিলাষপূর্ণ হইবে।” ত্রক্ষর আদেশে পোষা ভক্তিভরে
কঠোর তপস্তা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট
হইয়া শিব দেখা দিয়া বলিলেন, “বৎস! ত্রক্ষা তোমাকে
যে ফলটী দিয়াছেন, তাহা তিনভাগ করিয়া তোমার মহিষী-
গণকে খাইতে দাও। ইহাতে তোমার সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন
একটি পুত্র হইবে। কিন্তু একজনের গর্ভে মাথা, দ্বিতীয়
মহিষীর গর্ভে মধ্যভাগ ও তৃতীয় মহিষীর গর্ভে নাভি হইতে
অধোভাগ উৎপন্ন হইবে। পরে এই খণ্ডত্রয়ের যোজনা
করিলেই সুলক্ষণ একটি বালক হইবে।” মহারাজ পোষা
শিবের আদেশানুসারে তাহাই করিলেন। তাহাতে চন্দ্র-
শেখর রাজার উৎপত্তি হয়। চন্দ্রশেখর শিবের অবতার।
ইনি ভগবতীর অবতার তারাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার
কপালে চন্দ্রকলার স্থায় জ্যোতিঃ ছিল। চন্দ্রশেখরের রাজ-
ধানীর নাম করবীর। ইনি তিনটী মহিষীর উদরে জন্মগ্রহণ
করেন বলিয়া ইহার নাম ত্রাঘক হইয়াছিল। ইহার ঔরসে
তারাবতীর গর্ভে উপরিচর, দমন ও অলক নামে তিন
পুত্র হয়। চন্দ্রশেখর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপরিচরকে রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া প্রিয় পত্নী তারাবতীর সহিত বনে গমন করেন।
(কালিকাপুঃ ৫০ অঃ।) [তারাবতী দেখ।]

৫ ঋবকতালবিশেষ। [ঋবক দেখ।]

চন্দ্রশেখর, এই নামে একজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম
পাওয়া যায়। যথা—১ ত্র্যাক্ষিরণাবলীশব্দবিবেচন নামে
স্তায়গ্রন্থরচয়িতা। ২ পুরাণচরিত্রাণিকা নামে স্মৃতিসংগ্রহকার।
৩ স্মৃতিপ্রদীপরচয়িতা। ৪ লক্ষ্মীনাথভট্টের পুত্র, ইনি
পিজলভাবোদ্যোত, বৃত্তমৌক্তিক ও গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীর
ছন্দোমঞ্জরীজীবন নামে একখানি টীকা রচনা করেন।

৫ বিষ্ণুপণ্ডিতের পুত্র ও রঙ্গভট্টের পৌত্র। ইনি
অভিজ্ঞানশকুন্তলটীকা, হস্তমল্লটীকা ও শিশুপালবধের
সন্দর্ভচিন্তামণি নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রশেখর গোড়ীয়, স্বর্জনরাজচরিত্র নামক সংস্কৃত
কাব্যকার।

চন্দ্রশেখর রস (পুং) ঔষধবিশেষ। পায়া, গন্ধক, মরিচ ও
সোহাগা ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, মনঃশিলা চারি তোলা

মৎস্তপিত্তে মর্দন করিয়া তিনদিন ভাবনা দিবে। যাক্ষা তিন-
রতি। পথ্য—শরীরের উত্তাপ অধিক হইলে তিজান ভাত ও
তক্র প্রভৃতি সেবন। পিত্তপ্রবল থাকিলে মাথার জল দিতে
হয়। ইহার অমুপান আদার রস। ইহা সন্নিহাস্বরোগে
বিশেষ উপকারী। (রসেন্সসারসংগ্রহ)

চন্দ্রশেখর রায়গুরু, গোপীনাথের পুত্র। ইনি মধুরা-
নিরুদ্ধ নামে একখানি সংস্কৃত রূপক রচনা করেন।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, নবদ্বীপের একজন স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা
পণ্ডিত। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার পিতা
বিদ্যাভূষণ উপাধিদারী ষড়্‌দর্শনবেত্তা একজন প্রসিদ্ধ
দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহারই নিকট চন্দ্রশেখর স্মৃতিশাস্ত্র
অধ্যয়ন করেন এবং নবদ্বীপে একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত
হইয়া উঠেন। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি
প্রণয়ন করেন। যথা—স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ, সংকল্প-
দুর্গভঞ্জন ও ধর্মবিবেক।

চন্দ্রশেখরবিদ্যালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসারের একজন বিখ্যাত
টীকাকার।

চন্দ্রশেখরসিংহ, কটক হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত খণ্ড-
পাড়া নামক গড়জাতনিবাসী একজন রাজপুত্র, খণ্ডপাড়াধি-
পতি ৬ শ্যামসুন্দরসিংহের পুত্র এবং খণ্ডপাড়ার বর্তমান রাজা
নটবরসিংহ মন্দরাজ ভ্রমরবররায় সামন্তের খুল্লতাত-ভ্রাতা।
চন্দ্রশেখরের পূর্ণ নাম চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র
সামন্ত। বঙ্গদেশে জ্যেষ্ঠ দুই একটি পুত্রের মৃত্যু হইলে পিতা-
মাতা যেমন পরবর্তী পুত্রগণের কুড়োরাম প্রভৃতি নাম রাখেন,
চন্দ্রশেখরেরও তেমনি একটি নাম “পঠানী সান্ত্ব।” সম্প্রতি
ইংরাজ গবর্নমেন্ট ইহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত
করিয়াছেন। ১৭৫৭ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে
সংস্কৃত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও ধর্মশাস্ত্র, পরে পিতৃব্যের
নিকট সামান্য জ্যোতিষ শিখিতে আরম্ভ করেন। ২৩২৪ বর্ষে
নিজ প্রতিভাবলে ইনি একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ হইয়া
উঠেন। ইংরাজী অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত না হইয়াও
সুদূর বনরাজ্যে বসিয়া সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রে এতদূর
উন্নতি করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে
হয়। গ্রহোপগ্রহের গতিবিধি পরিদর্শনের জন্ত ইনি
কখন কোন যুরোপীয় যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু
আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় শুধে শলাকানিশ্চিত
যে সকল বেধযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতি
আশ্চর্যজনক। এই সকল যন্ত্র দ্বারা তিনি গ্রহাদির বেধ
স্থির করিয়া যে সকল ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন,

ও সিদ্ধান্ত মতে ধ্রুবক সংস্কার করিয়াছেন, আশ্চর্যের বিষয় এই, তাহার সহিত সুর্য্যোপীর্ণ নাবিকপঞ্জিকার কতক কতক মিল আছে। আপন প্রতিভাবলে ইনি সংস্কৃত ভাষার সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামে একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও এই মহাত্মা উৎকলজনপদবাসীর গৌরবভাস্বর অরূপ বিরাজ করিতেছেন। ইহার সিদ্ধান্তদর্পণানুসারে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া উড়িষ্যার বিশেষতঃ জগন্নাথের সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চন্দ্রশৈল, নেপালস্থ একটা পবিত্র গিরি। (হিমবৎখণ্ড ৮।২০৭)

চন্দ্র স্ত্রী (পুং) অন্ধ ভূতাবংশীর একজন রাজা, ইনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পিতার নাম জয় ও পুত্রের নাম পুলোমাচি। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।১৩) ভাগবত মতে চন্দ্রস্ত্রীর নাম চন্দ্রবিজয়।

চন্দ্রসংজ্ঞ (পুং) চন্দ্র ইতি সংজ্ঞা যন্ত বহুব্রী। কর্পূর। (অমর)

চন্দ্রসভা, মধ্যে মধ্যে দ্বৈবং মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে চন্দ্রের চতুর্দিকে যে আলোকময় মণ্ডল দৃষ্ট হয় উহাকেই লোকে চন্দ্রের শোভা বা সভা कहিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে চন্দ্র আলোকময় দেবগণপরিবৃত হইয়া সভামধ্যে পৃথিবীর শুভাশুভ বিষয়ক গীমাংসা করেন। ঐ বৃত্ত যখন বৃহদাকার দেখায়, তখন শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে মনে করে এবং যখন চন্দ্রের অতি নিকট ও ক্ষুদ্র দেখায়, তখন বৃষ্টি বিলম্বে হইবে এইরূপ ভাবে।

বায়ুরাশির উপরিস্থ স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার উপর চন্দ্র বিব পতিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। ঐ সকল জলবিন্দু অতি ক্ষুদ্র হইলেও চন্দ্রকিরণকে বক্রীভূত করিয়া দেয়। তজ্জন্ত আমরা চন্দ্রের কিছু দূরে আবার আলোকময় বৃত্ত দেখিতে পাই। ঐ স্তর যখন পৃথিবীর নিকটবর্তী থাকে, তখন বৃত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দূরবর্তী থাকিলে বৃহৎ দেখায়। আরও এ কারণে সভার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বৃহৎ জলকণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র জলকণা আলোকে অধিক বক্রীভূত করে। এই কারণে মেঘ-স্থিত জলকণা বৃহৎ হইলে সভাও বৃহৎ দেখায়। এই সকল বৃহৎ জলকণা শীঘ্রই তারবশতঃ বৃত্তিরূপে ভূতলে পড়িবার সম্ভাবনা। অতরাং এদেশে, “দূরে সভা নিকট জল, নিকট সভা দূরে জল” বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। রামধনুর দ্বারা এই সভাতেও নানা বর্ণ দেখা যায়। কখন কখন ঐ সভার কিছু দূরে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আরও একটা সভা দৃষ্ট হয়। শীতপ্রধান দেশে এই সভার দৃষ্ট আরও কৌতুকজনক। তথায় জলকণা শীতবশতঃ জমিয়া কোণবিশিষ্ট ভূবারকণা হইয়া যায়।

উহার মধ্য দিয়া চন্দ্ররশ্মিগমনকালে মানাক্রম দৃষ্ট উৎপাদন করে। তথায় সভা ব্যতীত কখন কখন তন্মধ্যে চেরার + আকারে চন্দ্রশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই সকলকে চন্দ্রাভাস (False moon) কহে। [রামধনু ও সূর্য্য দেখ।]

চন্দ্রসম্ভব (স্ত্রী) চন্দ্র: সম্ভবো যন্ত বহুব্রী। বৃধ।

চন্দ্রসম্ভবা (স্ত্রী) চন্দ্র: সম্ভবো যন্তা: বহুব্রী। ক্ষুদ্র এলা, ছোট এলাচি।

চন্দ্রসরস্ (স্ত্রী) বৃন্দাবনের অন্তর্গত সর্ষপকুণ্ডের নিকটবর্তী একটা জলাশয়। (বৃং লীং ১৩)

চন্দ্রসূত (পুং) চন্দ্রসূত: ৩২৭। বৃধ।

চন্দ্রসুরস (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Vitex Negundo)

চন্দ্রসূর্য্যজিহ্মাকরপ্রভ (পুং) বৃক্ষ।

চন্দ্রসূর্য্যপ্রদীপ (পুং) বৃক্ষ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস (পুং) বৈদ্যাকৌত এক প্রকার ঔষধ।

পারা, গন্ধক, লোহ, অজ ও গোকুর প্রত্যেক ৮ তোলা, কড়ি, শঙ্খ প্রত্যেক ৪ তোলা এবং মোক্ষর বীজ এক তোলা এই সকল দ্রব্য মিশাইয়া ভাবনা দিবে। পরে পটোল, ক্ষেত-পাপড়া, ব্রহ্মবটি, ভূমিকুয়াণ্ড, গুলফা, গুড়ুচী, দস্তী, বাসক, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্গবা, কেশুরে, শালিঞ্চ ও দ্রোণ-পুশী ইহাদের প্রত্যেকের রস চারিতোলা ভাবনা দিয়া বটা করিবে। ছাগদুগ্ধ অল্পপানে চৌদ্দটা বটি সেবন করিলে হলীমক, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজর, বিষমজর, অল্পপিত্ত, অরুচি, শূল, প্লীহা, উদরী, অজীর্ণা, শুষ্ক, বিদ্রবি, উপদংশ, দক্ষ, শোথ, মন্দারি, হিকা, শ্বাস, কাশ, বমি, ভ্রম, ভগন্ধর, কণ্ঠ, ব্রণ, দাহ, তৃক্ষা উরুস্তম্ভ, আমবাত ও কটীগ্রহ প্রভৃতি রোগ বিনাশ হয়। পথা মত্ত, মদ্য ও যুগের যুব। গুড়ুচী, ত্রিফলা ও বাসক প্রভৃতি অল্পপানেও ইহা সেবন করিবার বিধান আছে। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

চন্দ্রসুরি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত। ইনি নিরয়াবলী-প্রত্নতত্ত্বটীকা রচনা করেন। এ ছাড়া মাগধী ভাষার সংগ্রহী নামে একখানি ভূবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রসেন (পুং) চন্দ্রা আত্মাদিকা সেনা ২৩ বহুব্রী। ভারত-প্রসিদ্ধ একজন প্রবল নরপতি। ইহার পিতার নাম সমুদ্র-সেন। ইনি অশ্বখামার হস্তে নিহত হন। (ভারত ৭।১৫৬ অঃ)

চন্দ্রসেন, একজন প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত, হেমসুরির শিষ্য। ইনি উৎপাদসিদ্ধিপ্রকরণটীকা রচনা করেন, এই গ্রন্থ বিক্রমগতে ১২০০ বর্ষে চৈত্রমাসে লিখিত হয় (১)।

(১) “দ্বাদশবর্ষশতেষু জীবিতমতো পতেষু ব্রহ্মভিঃ।

চৈত্রে সম্পন্নমিহ সাহায্য চাত্র মে দেবে।” উৎপাদসিদ্ধিপ্রকরণ টীকা।

চন্দ্রসেন, চম্পাবতী নগরীর একজন রাজা। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, রাজা চন্দ্রসেন কোন সময়ে মৃগয়া করিতে যান। কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়াও একটা শিকার পাইলেন না। সন্ধ্যাকালে বহু দূরে একটা মৃগ দেখিতে পাইলেন ও তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মৃগ বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া ইনি দ্রুতগদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন সেখানে মৃগ নাই, কিন্তু একজন ঋষি যাতনায় ধড়কড় করিতেছে। রাজা আপনায় দুর্ভিক্ষ বৃত্তিতে পারিয়া ঋষির নিকট অমুনর বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ঋষির ক্রোধ শাস্ত হইল না। ঋষির শাপে তাহার শরীর তৎক্ষণাৎ কলসার মত কাল হইয়া গেল। শাপমুক্ত হইবার আশায় চন্দ্রসেন সর্বদাই ধর্মকর্ম করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার শাপমোচন হইল না। অবশেষে পণ্ডিতদিগের পরামর্শে তিনি মাতা ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার আদেশে বসন্তপুরে গিয়া বরাহসাগরে স্নান করিয়া শাপ ও জরামুক্ত হইলেন।

উক্ত চম্পাবতীর বর্তমান নাম চাংসু ও বসন্তপুরের বর্তমান নাম বাঘেরা, দুইটাই রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত। প্রবাদ এইরূপ, এই চন্দ্রসেনই বিক্রমাদিত্যের পর মালবরাজ্যে রাজত্ব করিতেন এবং খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নিজ নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্রাবতী নগরী নির্মাণ করেন।

২ রেণুকামাহাশ্রয়বর্ণিত একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি পরভ্রামের হস্তে নিহত হন, মৃত্যুকালে ইহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি দালভ্য ঋষির আশ্রমে গিয়া গর্ভরক্ষা করেন। তাহার বংশধরগণই চন্দ্রসেনী কার্য নামে বিখ্যাত।

[কায়স্থ ৫৭৫ ও ৫৮৯ পৃঃ দেখ।]

চন্দ্রসেন যাদব, তারাবাইএর একজন প্রধান সেনাপতি, ধনজী যাদবের পুত্র। ইনি একজন মহাবীর ছিলেন। ইহার প্রতিষদ্বী পেশবাবংশ-প্রতিষ্ঠাতা বালাজী বিশ্বনাথের অন্তই ইহার অধঃপতন হয়। [বালাজী বিশ্বনাথ দেখ।]

চন্দ্রক্ষুট [ক্ষুট দেখ।]

চন্দ্রহন (পুং) চন্দ্রে হতবান্ হন-কিপ্। রাহ।

“একাক্ষচন্দ্রহা রাহঃসংহারো মৃগলখনঃ।” (হরিবংশ ৪২ অঃ)

চন্দ্রহনু (পুং) চন্দ্রো হনৌ যন্ত বহতী। রাহ।

“খেতর্দীর্ঘচন্দ্রহনুচন্দ্রহা চন্দ্রতাপনঃ।” (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

চন্দ্রেহন্তু (পুং) চন্দ্রে হন্তি হন-তৃচ্। অম্বরবিশেষ। ভারত-যুদ্ধ সময়ে ইনি শুনক নৃপকূলে অবতীর্ণ হন।

“চন্দ্রেহন্তো যন্তব্যঃ কীর্তিতঃ প্রবরোহম্বরঃ।” (ভারত ১৬৭ অঃ)

চন্দ্রহাস (পুং) চন্দ্রেব হাসঃ প্রতাহন্য বহতী, বহা চন্দ্রে

হসতি হস-অণ্। ১ খড়্গা। ২ রাবণের খড়্গা। (স্ত্রী) ৩ রৌপ্য। (রাজনিঃ) (পুং) ৪ একজন রাজা। ইহার পিতা দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের সম্রাট ছিলেন। চন্দ্রহাসের বাল্যকালেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়, কিছুদিন পরে চন্দ্রহাসজননীও কালগ্রাসে পতিতা হন। একটা ধাত্রী চন্দ্রহাসকে লইয়া বনে পলায়ন করে। দৈবক্রমে ইহার জ্ঞানসঞ্চার না হইতে না হইতেই ধাত্রীরও মৃত্যু হয়। পিতৃমাতৃহীন বালক চন্দ্রহাস এখন নিরাশ্রয়। কেহই ইহাকে রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে না। একদিন ইনি প্রধান মন্ত্রীর আবাস-সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন দৈবজ্ঞ ইহাকে দেখিয়া বলিলেন, “এই বালক কালে সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবে।” মন্ত্রী মহাশয়ের রাজত্ব লালসা বড়ই প্রবল, রাজার অভিপ্রেতে সে রাজ্যে তিনিই সর্বোৎকর্ষ, তাই দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী তাহার হৃদয়ে লাগিল। তিনি চন্দ্রহাসের বিনাশকামনায় ষাতুক নিযুক্ত করিলেন। ষাতুকেরা মন্ত্রীর আদেশে চন্দ্রহাসকে লইয়া বধ্য ভূমিতে চলিল। কিন্তু চন্দ্রহাসের রূপ ও কাতরবাক্যে ষাতুকেরা ইহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে একজন সম্রাট ষাতুক ইহাকে লইয়া বান। তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া চন্দ্রহাস বর্দ্ধিত হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাহস ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন সময়ে মন্ত্রী সেই স্থানে গিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াই চন্দ্রহাসকে চিনিতে পারিলেন এবং তাহার বিনাশ কামনায় একখানি পত্র লিখিয়া নিজ পুত্র মদনের নিকট পাঠাইয়া দেন। চন্দ্রহাস মন্ত্রীর পত্র লইয়া নিঃশব্দচিত্তে মন্ত্রীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। পথে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে মন্ত্রিত্ববনের একটা উদ্যানে নিদ্রাস্থখতোগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মন্ত্রিত্বনয়া বিষয়া উদ্যানে আসিয়া উহার রূপে মুগ্ধ হইলেন ও উহাকে বাঁচাইয়া পতিত্ব বরণ করিবার অভিপ্রায়ে পত্রের পাঠ পরিবর্তন করিয়া দিলেন। চন্দ্রহাস নিদ্রিত, ইহার কিছুই জানিল না। মদন পত্র পাইয়া ও চন্দ্রহাসকে দেখিয়া আর কোন মতামত না করিয়া সেই দিনেই ভগিনী বিষয়াকে অর্পণ করিলেন। মন্ত্রী জানিতে পারিয়া একটা দেবালয়ে ষাতুক নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রহাসকে পূজার ছলে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। ষাতুকের সহিত কথা ছিল যে যুদ্ধ দেবালয়ে আসিবে, তোমরা তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। দৈবক্রমে চন্দ্রহাসকে রাখিয়া মন্ত্রীপুত্র মদন দেবালয়ে যান ও অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়। কালক্রমে চন্দ্রহাস একজন সম্রাট হইয়াছিলেন। (মহাভারত) তত্তমাল একই ইহার উপাখ্যানটা অল্প রূপ লিখিত আছে।

চন্দ্রহাসা (জী) চন্দ্রহাস-টাপ্। ১ গুড়ুচী। (রাজনি°)

চন্দ্র ইবান্দাদকরোহাসো যতঃ। ২ গায়ত্রী।

“চন্দ্রহাসা চাক্ষুযী চকোরী চন্দ্রহাসিনী।”

(দেবীভাগবত ১২।৬।৪৮)

৩ বহতী।

চন্দ্রহাসিনী (স্রী) চন্দ্রং হসতি হস-গিনি-ভীপ্। গায়ত্রী দেবী।

চন্দ্রা (জী) চদি-আল্লাদে রক্ টাপ্। ১ এলা, এলাচি। ২

চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। ৩ গুড়ুচী। (শকার্ধটি°)

চন্দ্রাংশু (পুং) চন্দ্রশ্যঃশুরিবান্দাদকোহংগুরন্ত বহতী। ১

বিষ্ণু, পরমেশ্বর। “ঋকঃ স্পষ্টাকরো মন্ত্রাংগুর্ভাকরহাতিঃ।”

(বিষ্ণুসহস্র°) চন্দ্রাংশুঃ ৬তং। ২ চন্দ্রকিরণ।

চন্দ্রাকর (পুং) এক বীরপুরুষ। (রাজতরং ৭।৫)

চন্দ্রাখ্যরস (পুং) ঔষধবিশেষ। রসশিশুর, অত্র হীরাতম,

তাত্র ও কাংস ইহার প্রত্যেকের সমান ভাগ, এই সকলের সমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ভেলার কাণে এক দিবস মর্দন করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে বন্দুজ ও সর্প প্রকার অর্শরোগ নাশ হয়। (রাসায়নিকসংগ্রহ)

চন্দ্রাগ্র (ত্রি) ১ সূর্য্য প্রভৃতি। ২ সূর্য্য শৃঙ্গ।

“সনো রাসচ্চরুধঃচন্দ্রাগ্রাঃ” (ঋক্ ৬।৫৯।৮) ‘চন্দ্রাগ্রাঃ

চন্দ্রমিতি হিরণ্য নাম হিরণ্যপ্রমুখাঃ যদ্বা স্বর্ণশৃঙ্গাঃ’ (সায়ণ।)

চন্দ্রাতপ (পুং) চন্দ্র ইব আতপতি নীতলীকরোতি ছায়া-

দানেন আতপ-অচ্। ১ বিতান, চাঁদোয়া। পর্যায়—উল্লোচ,

বিতান, চন্দ্রা। চন্দ্রসাতপঃ ৬তং। ২ জ্যোৎস্না।

“চন্দ্রাতপমিব রসতামুপেতম্।” (কাদম্বরী)

চন্দ্রাভ্যেয়বংশ, বৃন্দেলখণ্ড প্রদেশের প্রবল পরাক্রান্ত ও

প্রাচীন রাজপুত্র রাজবংশ। এই বংশীয়েরা একগুণে চন্দেল নামে খ্যাত হইয়া রোহিলখণ্ড, গোরখপুর, আলাহাবাদ, আজিমগঞ্জ, নিজামাবাদ, জৌনপুর, মির্জাপুর, কনৌজ, বৃন্দেলখণ্ড ও কাণপুর জেলার নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। স্বর্দির দক্ষিণে এই বংশীয়দিগের বাসস্থান চন্দেলখণ্ড নামে বিখ্যাত। নিম্ন দোয়াবে ইহারা রাজা, রাও, রাণা ও রাউত উপাধিভূষিত।

এই রাজবংশের ভূরি ভূরি মন্দির, তান্ত্রশাসন, শিলালিপি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রাদি কীৰ্ত্তি অদ্যাপি বর্তমান আছে।

কোন সময়ে এই রাজবংশ প্রাকৃত্ত হইয়া, তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যায় না। তবে খজুরাহ, মহোবা, কালঞ্জর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তান্ত্রশাসনাদি দৃষ্টে এবং চন্দ্রকবির পুথিরাজ-রায়সা ও কেরিষ্ঠাপাঠে জানা যায় যে প্রায় ৮০১ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ-

বংশীয় স্বাধীন নৃপতিগণ মহোবা, খজুরাহ প্রভৃতি স্থানে প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই বংশের উৎপত্তিবিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে।—

কাশীরাজ ইন্দ্রজিতের পুরোহিত হেমরাজের কন্যা হেম-বতী অতি সুরূপা ছিলেন। একদিন তিনি একাকিনী রতিকুণ্ডে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রদেব তাঁহার রূপে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। হেম-বতী চন্দ্রের এই ধৃষ্টতায় অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্র এই বর দেন যে, হেমবতীর পুত্র পৃথীশ্বর হইবে এবং তাঁহা হইতে অনেক রাজবংশ উৎপন্ন হইবে। হেমবতী অনুচাবস্থায় গর্ভধারণের কলঙ্ক অপনোদন জন্ত নিবেদন করিলে চন্দ্র বলিলেন, “তচ্ছত্বে চিন্তা করিও না। কর্ণবতী নদীতীরে তোমার পুত্র প্রসূত হইবে। তৎপরে তুমি তাহাকে খজুরাহ লইয়া গিয়া রাজাকে প্রদান করিবে। মহোবা নগরে তোমার পুত্র রাজত্ব করিবে। আমি তাহাকে স্পর্শমণি দান করিব। সে কাণজরে দুর্গ নির্মাণ করিবে। যখন তোমার পুত্র ১৬শ বর্ষ বয়স্ক হইবে, তখন তুমি নিজ কলঙ্কমোচনের জন্ত ভাগ্যযোগ অনুষ্ঠান করিবে এবং বারাগনী ত্যাগ করিয়া কালঞ্জরে বাস করিতে থাকিবে।” চন্দ্রের কথামত হেমবতী কর্ণবতী-(বর্তমান কেয়ান) নদীতীরে বৈশাখী শুক্লএকাদশীতে সোমবারে দ্বিতীয় চন্দ্রতুলা একপুত্র প্রসব করিলেন। জাত-মাত্র চন্দ্র দেবগণ পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিয়া উৎসব করিলেন। বৃহস্পতি জাতবালকের জন্মপত্রিকা লিখিলেন। ঐ বালকের নাম চন্দ্রবর্মা রাখা হইল। ১৬শ বর্ষ বয়সে চন্দ্রবর্মা এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বধ করেন এবং পিতা চন্দ্রদেবের নিকট হইতে স্পর্শমণি প্রাপ্ত হন ও রাজনীতি শিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি কালঞ্জরদুর্গ নির্মাণ করেন। পরে খজুর-পুরে গমন করিয়া মাতার কলঙ্কমোচনার্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ৮৫টি দেবালয় নির্মাণ করেন। অবশেষে তিনি মহোবা অর্থাৎ মহোৎসব নগরে গমন করিয়া ঐ স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

কোন সময়ে এই ঘটনা হয়, তাহা ঠিক হয় নাই। চন্দ্রকবির মহোবাখণ্ডের মতে ইহা ২২৫ সংবতে ঘটে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম সাহেব ১৮৫২ খৃঃ অব্দে খজুরাহ নগরে অবস্থানকালে চন্দেলরাজবংশীয় বাহাদুর সিংহের নিকট হইতে যে সন্ধান পান, তাঁহার মতে ঐ ঘটনা ২০৪ সংবতে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে অনেক মতামত আছে। খজুরাহ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে

মরীচিনন্দন আদি খবি হইতে চন্দ্রাজ্যের জন্ম গ্রহণ করেন (১)। তাহা হইতেই এই বংশ চন্দ্রাজ্যের বা চন্দেল নামে খ্যাত হইয়াছে।

শিলালিপি প্রভৃতি দৃষ্টে চন্দ্রাজ্যের বংশের আবির্ভাবকাল স্পষ্টরূপে অসুচিত হয়। এই বংশের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধর্ম নৃপতির খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায়, যে তিনি ৯৫৪ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন। রাজত্বকাল ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে প্রায় ৮০০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ঐ বংশের স্থাপন হইয়া থাকিবে, এইরূপ অসুমান করা যাইতে পারে।

চন্দ্রকবি ও অগ্রাচর রাজকবিগণ এই বংশের ষাটবংশি জন রাজার নাম লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ নাম গুলি রাজত্বকাল অসুসারে ক্রমান্বয়ে লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাহার পর কে সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। মহোবাতে চন্দ্রকবির যে পুঁথি আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায়। ১ চন্দ্রবর্মা, ২ রামবর্মা, ৩ রূপবর্মা, ৪ রহিলবর্মা, ৫ বলবর্মা, ৬ রত্নবর্মা, ৭ বিজয়বর্মা, ৮ বেলবর্মা, ৯ গজাবর্মা, ১০ দিলীপবর্মা, ১১ খজুরবর্মা, ১২ নবলবর্মা, ১৩ কেশববর্মা, ১৪ হরবর্মা, ১৫ সুরপবর্মা, ১৬ ধনবর্মা, ১৭ মাধববর্মা, ১৮ কলাগবর্মা, ১৯ মদনবর্মা, ২০ কীর্তিবর্মা, ২১ পদ্মলবর্মা, ২২ ব্রহ্মজিবর্মা। শিলালিপি দৃষ্টে যেরূপ জানা যায়, তাহাতে এই বংশাবলী ঠিক বলিয়া অসুচিত হয় না। কবিদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে (২)।

খজুরাহ, মহোবা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতিতে ১৮ জন রাজার নাম ও রাজ্যকালাদির বিবরণ জানা গিয়াছে, তাহাদের বিষয় নিয়ে লিখিত হইল।

১ম, রাজা নরক। (আসুমানিক রাজত্বকাল ৮৩১—৮৫০ খৃঃ অব্দ।) ধর্মের সময়ে খজুরাহর খোদিত লালাজি ও চতুর্ভুজের শিলালিপি এবং মহোবার ১২৪০ সংবতস্কৃত

(১) "তদ্রাশিষস্বরঃ পুরাণপুরুষাধারায়কবে

বৈভূবদ্বনঃ পবিত্রচরিতাঃ পূর্বে মরীচাদয়ঃ।

তত্রাজিঃ হৃদয়ে নিরন্তরতপত্তীত্রপ্রভাবং হৃতং

চন্দ্রাজ্যেরমহুত্রিসোম্বলতরজানপ্রদীপঃ মুনিঃ।

অত্র স্বত্ববিধায়িনঃ স জগতাং নিঃশেষবিদ্যাবিদ-

স্বত্বাঙ্গোপনতখিলশ্রুতিনিধেধর্মঃ প্রশংসামদং।"

খজুরাহর লক্ষ্মীজীর মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি।

(২) Cunningham's Arch. Sur. Reports, vol. II. p. 449.

অসম্পূর্ণ শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায়, নরক এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার বিষয় আর অধিক কিছু জানা যায় না। অসুমান হয়, ইনি পরিহারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মহোবা অধিকার করেন।

২য় বাকপতি। (আসুমানিক রাজত্বকাল ৮৫০—৮৭০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার রাজত্বকালে কনোজাধিপ ভোজরাজ চন্দ্রের অধিকারী ছিলেন।

৩য় বিজয়। (আসুমানিক রাজত্বকাল ৮৭০—৮৯০ খৃষ্টাব্দ।) লালাজি ও চতুর্ভুজশিলালিপিতে ইহার নামোন্মেষ আছে। যশোবর্মার শিলালিপিতে ইনি বিজয়শক্তি নামে অভিহিত।

৪র্থ রাহিল। (আসুমানিক রাজত্বকাল ৮৯০—৯১০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত শিলালিপিতে, তত্ত্বির অজয়গড়ের একটি মন্দিরের অনেক প্রস্তরে তাহার নাম খোদিত এবং ঐ গড়ের কতক দেবমন্দির ও পুষ্করিণী তাহার নিশ্চিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং অসুচিত হয়, এই সময়ে অজয়গড় চন্দেল রাজ্যভুক্ত ছিল। কালঞ্জরহর্গ প্রথম হইতেই ইহাদের হস্তগত হয়।

ইহাদের তিনটি রাজধানী ছিল। ১ কালঞ্জর—প্রধান সেনা-নিবাস ও দুর্গ। ২ খজুরাহ—অগণ্য দেবমন্দিরযুক্ত ধর্মস্থান। ৩ মহোবা—রাজপ্রাসাদ ও বিচারালয়যুক্ত রাজধানী।

চন্দ্রকবির মতে রাহিল বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী এবং সিংহল পর্য্যন্ত গমন করেন, কিন্তু তাহা অযথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তিনি আরও বলেন, রাহিল কালঞ্জরের ২০ মাইল দূরানেকোণে রসান নগর স্থাপন করেন। রসান যেরূপ প্রাচীন, তাহাতে এই কথা সত্য হইতে পারে।

মহোবা-সম্বন্ধিত রাহিলসাগর এবং তাহার তীরস্থ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরমন্দির নিশ্চয়ই রাহিল কর্তৃক বিনির্মিত। ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, অজয়গড় ও কালঞ্জরের ভায় মহোবাও রাহিলের অধিকারভুক্ত ছিল।

চেন্দিশের কলচুরিবংশীয় রাজা ১ম কল্কোল নন্দাদেবী নাম্নী চন্দেলবংশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই নন্দাদেবী সম্ভবতঃ রাহিলের বা বিজয়ের কন্যা।

৫ম হর্ষ। (আসুমানিক রাজত্বকাল ৯১০—৯৩০ খৃষ্টাব্দ।) লালাজি-শিলালিপিপাঠে জানা যায় তিনি অনেক দেশ জয় করেন ও গঙ্গাবংশীয় রাজকন্যা কঙ্কাকে বিবাহ করেন।

৬ষ্ঠ যশোবর্মা। (আসুমানিক রাজত্বকাল ৯৩০-৯৫০ খৃঃ অব্দ।) পূর্বোক্ত শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি হর্ষবর্মার পুত্র। খজুরাহর শিলালিপি গুলিতে লিখিত আছে—তিনি গোড়, খশ, কোশল, মিথিলা, চেন্দী, কাশ্মীর, মালব প্রভৃতি নানাদেশ জয় করেন এবং একটি

বিজয়মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মহিষী পৃথ্বাদেবী
ধন নামে পুত্র প্রসব করেন।

৭ম ধঙ্গ। রাজত্বকাল ১৫০—১৯৯ খৃঃ অব্দ। ইহার রাজত্ব-
কালে খোদিত তিনখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
একখানি ১০১১ সংবতাব্দিত খজুরাহর চতুর্ভূজশিলালিপি,
অপরখানি ১০৫৫ সংবতাব্দিত হুনোরার শিলালিপি এবং শেষ
খানি ১০৫৬ সংবতাব্দিত খজুরাহর লালাজি-শিলালিপি।
শেষোক্ত লিপিতে ঐ বংশের ধঙ্গের মৃত্যুর কথা লেখা আছে।

মোছত্রপুরের শিলালিপিপাঠে অমুমিত হয় প্রভাস
নামে ধঙ্গের এক মন্ত্রী ছিল, লালাজির শিলালিপিতে তাঁহার
মন্ত্রীর নাম যশোধর লেখা আছে। ১০৫৫ সংবতে ধঙ্গ-
দেবের তাম্রফলকে ও খোদিত দানপত্রে যে যশোধর ভট্টের
কথা আছে, বোধ হয় তিনিই ঐ যশোধর মন্ত্রী হইবেন।

৯৭৮ খৃঃ অব্দে গজনী আক্রমণকালে লাহোররাজ জয়পালের
সাহায্যার্থ দিল্লী, আজমীর কনৌজ প্রভৃতির রাজাদিগের
সহিত যে কালঞ্জররাজ গমন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিই
এই ধঙ্গ। মোছত্রপুরের শিলালিপিতে যে একজন রাজ
কর্তৃক কাশ্মুকুজজয়ের কথা লেখা আছে, ঐ রাজা নিশ্চয়ই
ধঙ্গ কিম্বা তৎপুত্র গণ্ডদেব হইবেন। লালাজি শিলালিপিতে
লিখিত আছে যে ধঙ্গদেব কাশী, অঙ্গ, অঙ্গ ও রাঢ়দেশের
রাজমহিষীগণকে কারাগারে বন্দিনী করিয়াছিলেন এবং
কোশল, কুস্তল, ক্রথ ও সিংহল রাজগণকে সহচারী করিয়া
রাখিয়াছিলেন।

ইনি প্রায় শতবর্ষ বয়সে প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ করেন।

৮ম গণ্ডদেব। (রাজত্বকাল ১৯৯—১০২৫ খৃঃ অব্দ।)
মোছত্রপুরের শিলালিপি ব্যতীত অস্ত্র কোথাও ইহার
নাম পাওয়া যায় না। তাহাতে ইহার মন্ত্রীর নাম প্রভাস
লেখা আছে।

সম্ভবতঃ কালঞ্জররাজ এই গণ্ডদেব লাহোররাজ জয়-
পালের সহিত ১০০৮ খৃঃ অব্দে মাক্সুদ গজনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-
যাত্রা করেন। ফেরিস্তায় লিখিত আছে কালঞ্জররাজ
নন্দরার (গণ্ডদেব) কনৌজ জয় করিয়া তথাকার রাজাকে
বিনষ্ট করেন। ইহার প্রতিশোধ জয় মাক্সুদ কালঞ্জর আক্র-
মণ করিয়া অধিকার করেন। (১০২৩ খৃঃ অব্দ)

খজুরাহতে জটনৈক কক্কোল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যনাথ
মন্দির ও তাহার মধ্যে ১০৫৮ সংবতাব্দিত উৎকীর্ণ শিলা-
লিপি দর্শনে অনেকেই অমুমান করেন যে চেদিরাজ ২য়
কক্কোল গণ্ডদেবের সময় খজুরা অধিকার করিয়াছিলেন।
কিন্তু ঐ কক্কোল খজুরাহ-নিবাসী জটনৈক ঐশ্বর্যশালী

ব্যক্তি মাত্র। চেদিরাজের সহিত ঐ কক্কোলের কোন
সম্পর্কই নাই *।

যাহা হউক চেদি-বিজেতা কীর্তিবর্মার পূর্বে চেদিরাজ
কালঞ্জর অধিকার করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।
কারণ ঐ সময়ে চেদিরাজগণের শিলালিপিতে তাঁহাদিগকে
কালঞ্জররাজ বলা হইয়াছে।

৯ম বিদ্যাদেব। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১০২৫-
১০৩৫ খৃঃ অব্দ) ইনি গণ্ডদেবের পুত্র। মোছত্রপুরের শিলা-
লিপিতে ইহার নামোন্মেষ ব্যতীত আর কোন কীর্তি নাই।
ইহার মন্ত্রী বিখ্যাত দার্শনিক শিবনাগ, এই শিবনাগ
ধঙ্গ ও গণ্ড নৃপতির মন্ত্রী প্রভাসের পুত্র। শিবনাগের পুত্র
মহীপাল, বিজয়পালের এবং মহীপালের পুত্র অনন্তকীর্তি-
বর্মার ও সল্লক্ষণবর্মার মন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবতঃ অনন্তের পুত্র
গদাধর জয়বর্মার প্রতীহার এবং পৃথ্বীবর্মার ও মদনবর্মার
প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

আবুরিহান লিখিয়াছেন,—ইনি জব্বলপুরের সমিহিত
ত্রিপুরীশ্বর চেদিরাজ গাজেরদেবের (১০৩০-৩১ খৃঃ অব্দ)
সমকালবর্তী ছিলেন।

১০ম বিজয়পাল দেব। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১০৩৫-
১০৪৯ খৃঃ অব্দ।) উক্ত শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।
ইহার মহিষীর নাম ভুবনদেবী। নটেশরার ১নং শিলালিপিতে
লিখিত আছে যে, ভুবনদেবীর পুত্র দেববর্মাদেব পিতার পর
রাজ্যাধিকারী হন।

১১শ কীর্তিবর্মাদেব (১ম)। (আনুমানিক রাজত্বকাল
১০৪৯-১১০০ খৃঃ অব্দ।) মোছত্রপুরের শিলালিপি ৭ম শ্লোকে
লিখিত আছে, বিজয়পালের পর তৎপুত্র কীর্তিবর্মার রাজা
হন। অনন্ত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু হুনোরার ১নং শিলা-
লিপিতে লিখিত আছে—বিজয়পালের পর তৎপুত্র শিবভক্ত
কালঞ্জরাধিপ ত্রিদেববর্মাদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবার কালঞ্জরের নীলকণ্ঠ-শিলালিপি ৭ম শ্লোকে
দৃষ্ট হয়, যে বিজয়পালের পুত্র ভূমিপাল শাপিত অসি দ্বারা
বহু শত্রুনাশ করেন।

সুতরাং ইহা অমুমিত হয় যে, ১ম কীর্তিবর্মার, দেববর্মার-
দেব ও ভূমিপাল বিজয়পালের পরবর্তী একই রাজার
নাম হইবে†।

মহোবার একখণ্ড শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়, কীর্তিবর্মার
চেদিরাজ কর্তৃক জয় করেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের

* Epigraphia Indica, vol. I. p. 148.

† J. A. S. B. vol. L. p. 18.

নান্দীভাগে চেদিবিজয়ী যে কীর্তিবর্ম্মার কথা আছে, তিনি এই কীর্তিবর্ম্মা। কিন্তু কালঞ্জরের নীলকণ্ঠ শিলালিপিতে দেখা যায়, ভূমিপালের (কীর্তিবর্ম্মার) পুত্র চেদিরাজ কর্ণকে জয় করেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায় যে কীর্তিবর্ম্মার পুত্র এবং জয়পালের পিতা সল্লক্ষণদেব। সম্ভবতঃ এই সল্লক্ষণদেবই পিতার রাজ্যকালে চেদি জয় করিয়া থাকিবেন।

১১৫৪ সংবত্কিত দেবগড়ের শিলালিপি ও চন্দ্রেরী-দুর্গের সম্মিহিত কিরাতসাগর সম্ভবতঃ এই কীর্তিবর্ম্মারই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দেলথণ্ডে চন্দ্রেরীদুর্গ ও কিরাতসাগর-নির্ম্মাতা যে কিরাতবর্ম্ম-বিষয়ক প্রবাদ আছে, তাহা বোধ হয় এই চেদিবিজয়ী কীর্তিবর্ম্মারই নামান্তর।

ইনি কালঞ্জরদুর্গ সংস্কার করেন ও অজয়গড়ে অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করেন বলিয়া খ্যাতি আছে।

কীর্তিবর্ম্মার নামাঙ্কিত যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা এই কীর্তিবর্ম্মারই হইবে; কেননা ইহার পোত্র ২য় কীর্তিবর্ম্মার মুদ্রাতে জয়বর্ম্মার নাম অঙ্কিত আছে।

ইনি কলচুরিবংশীয় চেদিরাজগণের মুদ্রা অনুকরণে চন্দেল-রাজ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন।

সম্ভবতঃ ইনি দেবগড়ের দুর্গসংস্কার করিয়া নিজ নামা-নুসারে ইহার নাম দেবগড় রাখেন *।

১২শ সল্লক্ষণবর্ম্মদেব। (আহুমানিক রাজ্যকাল ১১০০—১১১০ খৃঃ অঙ্গ।) ১৩১৭ সংবত্কিত অজয়গড়ের বীরবর্ম্ম-প্রদত্ত শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে কীর্তিবর্ম্মার পর তৎপুত্র সল্লক্ষণ রাজা হন†।

সল্লক্ষণের নানাঙ্কিত মুদ্রাপ্রাপ্তে জানা যায় যে সল্লক্ষণ রাজা ছিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিতে লিখিত আছে, কীর্তিবর্ম্মার মন্ত্রী অনন্তের পুত্র বাস্তু, বামন ও প্রত্যাশ তিনজনেই সল্লক্ষণের সভায় থাকিতেন।

১৩শ জয়বর্ম্মদেব। (ওরফে ২য় কীর্তিবর্ম্মা।) (আহুমানিক রাজ্যকাল ১১১০—১১২০ খৃঃ অঙ্গ।) লালাজি-শিলালিপির পরিশিষ্টে ও ১৩১৭ সংবত্কিত বীরবর্ম্মের শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া যায়। লালাজি শিলালিপির পরিশিষ্টে ইহারই সময় খোদিত হয়। উভয় লিপিতেই ইনি সল্লক্ষণের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, জয়বর্ম্মার পর তাঁহার পিতৃব্য পৃথ্বীবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তাঁহার পর পৃথ্বীবর্ম্মার পুত্র মদনবর্ম্মা রাজা হন।

১৪শ পৃথ্বীবর্ম্মদেব। (আহুমানিক রাজ্যকাল ১১২০—১১৩০ খৃঃ অঙ্গ।) মৌছত্রপুরের শিলালিপি ও বীরবর্ম্ম-প্রদত্ত অজয়গড়ের ১৩১৭ সংবতের শিলালিপির মতে মদনবর্ম্মের পিতাও জয়বর্ম্মের পর রাজা হন। তাঁহার সময়ের দুই একটা মুদ্রা পাওয়া যায়।

১৫শ মদনবর্ম্মদেব। (আহুমানিক রাজ্যকাল ১১৩০—১১৬৫ খৃঃ অঙ্গ।) ইহার সময়ের শকাঙ্কিত বিস্তার শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাওয়া যায়। তদ্বারা ইহারই রাজত্বকাল স্পষ্ট-রূপে নির্ণয় করা যায়। মহাবীর মদনসাগর ইহারই নির্ম্মিত।

ইহার সময়ের বিস্তার জৈনমূর্ত্তি দৃষ্টে বোধ হয়, এই সময় জৈনধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চন্দ্রকবির পুস্তক ও প্রাচীন লিপি উভয়েই বর্ণিত আছে, মদনবর্ম্মা মহাবীর ছিলেন এবং বহুদূর রাজ্য বিস্তার করেন।

কালঞ্জরের ২ নং শিলালিপিতে লিখিত আছে, মদনবর্ম্মা গুজরাট জয় করেন। চন্দ্রকবিও তাই বলেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিতে দেখা যায়, মদনবর্ম্মা চেদি জয় করেন। তাহাতে অনুমান হয় কীর্তিবর্ম্মার পর কলচুরি-বংশীয় চেদিরাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া পুনর্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে আবার মদনবর্ম্মা চেদি জয় করেন। *

অনেকে অনুমান করেন, বেলায়ী চন্দেলরাজ্যের অন্ত-ভুক্ত ছিল এবং চন্দেলরাজার অধীন সামন্তরাজ কর্তৃক শাসিত হইত। এই রাজার নাম বলদেব। সম্ভবতঃ ইনি চন্দেলবংশোদ্ভব হইবেন।

১৬শ পরমর্দিদেব (অথবা পর্ম্মদেব) (আহুমানিক রাজ্য কাল ১১৬৫—১১০২ খৃঃ অঙ্গ।) অনেকে ইহাকে চন্দেলবংশের শেষ রাজা মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইনি পৃথ্বীরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন মাত্র এবং তৎপরেও ইহার বংশধরেরা রাজ্য করিয়াছিলেন।

পরমর্দিদেবের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ১২৫২ সংবত্কিত বকে-শ্বরের শিলালিপিতে লিখিত আছে, মদনবর্ম্মার পুত্র যশো-বর্ম্মা এবং যশোবর্ম্মার পুত্র পরমর্দিবর্ম্মা†।

আবার ১৩১৭ সংবত্কিত বীরবর্ম্মার অজয়গড়ের শিলালিপিতে দেখা যায়, মদনবর্ম্মার পর পরমর্দিবর্ম্মা রাজা হন। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে এইরূপ অনুমান হয়, যে মদনবর্ম্মার পর তাঁহার পোত্র পরমর্দিবর্ম্মা রাজা হন। শেষোক্ত শিলালিপিতে তাঁহাকে বালকবীর বলা হইয়াছে‡।

* J. A. S. B. vol. L. p. 13.

† Do. „ p. 15.

‡ Epigraphia Indica, I. 327.

* Epigraphia Indica, I. 209.

† „ „ I. 327.

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ও চন্দ্রকবি এই রাজার বিষয় বিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্ত ইনি সকলেরই নিকট পরিচিত। নতুবা ইহার কীর্তিবরূপ মন্দির, বীর্ষিকানি বা মুদ্রা প্রভৃতি এমন কিছুই নাই, বাহা দ্বারা প্রকৃতরূপে ইহার রাজ্যকাল নির্ণিত হইতে পারে।

১১৮২ খৃঃ অব্দে পরমর্দিন্দেব দিল্লীর পৃথ্বীরাজ কর্তৃক পরাজিত ও মহোবা হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার এই পরাজয় চন্দ্রকবি এরূপ সুললিতভাবে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন যে ঐ প্রদেশের সকল লোকেই চন্দ্রকবির উক্ত বিষয়ক গীত শুনিয়া থাকে এবং অনেকে উহা হইতে নাটক উপভাষাদি রচনা করেন।

চন্দ্রকবির মতে পরমর্দিন্দেব কেবলমাত্র ২০০ সঙ্গীসহ পলাইয়া রক্ষা পান, অপর সকলেই হত হয়। সম্ভবতঃ ইহা অতিরঞ্জিত। যেহেতু তাহার প্রায় বিংশতি বর্ষ পরে, ১২০৩ খৃঃ অব্দে পরমর্দিন্দেব কালঞ্জরে কুতবুদ্দীন্ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে দুর্গরক্ষা করেন। পরে মুসলমান সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণে কৃতসঙ্কল্প হইলে তদীয় মন্ত্রী কর্তৃক নিহত হন। মন্ত্রী আরও কএক দিবস যথেষ্ট সাহসের সহিত দুর্গ রক্ষা করিয়া অবশেষে হত হন। তৎপরে মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করে। যাহা হউক, এই দুর্গ অধিকারিন মুসলমানদিগের হস্তগত থাকে নাই। শীঘ্রই হিন্দুরাজগণ উহা পুনরধিকার করেন।

পরমর্দির সময় হইতেই চন্দেলবংশের যশোভাতি মলিন হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ পৃথ্বীরাজ ও তৎপরে কুতবুদ্দীন্ কর্তৃক পরাজিত হইলে তাঁহাদের অধীন সামন্ত-রাজগণ স্বাধীন হইয়া পড়েন এবং চন্দেলবংশ একটা ক্ষুদ্র রাজবংশে পরিণত হয়।

পরমর্দির পর তৎপুত্র ত্রৈলোক্যবর্মা ও তৎপরে বীরবর্মা রাজত্ব করেন। অজয়গড়ে ত্রৈলোক্যবর্মার ও বীরবর্মার শিলালিপি আছে। বীরবর্মার মহিষী কলাগুদেবী অজয়গড়ে নির্জরাকূপ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার স্মৃতিচিহ্নরূপ একখানি শিলালিপি খোদিত হয়।

বীরবর্মার পর তৎপুত্র ভোজবর্মা রাজা হন, তাঁহার সময়ের পর্কতগাত্রখোদিত এক লিপি আছে। ভোজবর্মার পর আরও কএকজন রাজা হন। অবশেষে ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সেরশাহ কালঞ্জর আক্রমণ করিয়া তথাকার চন্দেলবংশীয় শেষ নৃপতি কিরাতসিংহকে নিহত করিয়া কালঞ্জরদুর্গ অধিকার করেন।

এই চন্দেল বংশ প্রায় ৮০০ হইতে ১৫৪৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত

প্রায় সার্কি সপ্ত শতাব্দী প্রবল পরাক্রমে বিপুল গৌরবের সহিত রাজত্ব করেন।

চন্দ্রাত্মজ (পুং) চন্দ্রস্যাশ্রয়ঃ ৬তং। বৃধ। চন্দ্রতনয় প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রানন (পুং) চন্দ্রইবাননময়া বহুব্রী। ১ কাস্তিকের।

“অমোঘস্তনরোরোজঃ শিবশ্চন্দ্রাননস্তথা।” (ভারত ৩২৩১ অঃ)

(ত্রি) ৩ বাহার মুখখানি চন্দ্রের দ্বারা সুন্দর।

চন্দ্রাননরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, অত্র, চিতা, প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক তিনভাগ, কাঠডুহুরিকার আঠার সহিত মাড়িয়া এক রতি মাত্রায় বটী করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়।

চন্দ্রাপীড় (পুং) চন্দ্র আপীড়ঃ শিরো ভূষণং যস্য বহুব্রী। ১ শিব। ২ কাম্বীরাদিপতি প্রতাপাদিত্য বা দুর্লভকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইহার অপর নাম বজ্রাদিত্য। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর ৬০৪ শকাব্দে ইনি কাম্বীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ইহার অনেক স্তনিয়ম ও অশুভল শাসনশৃঙ্খলে অনেকেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। চন্দ্রাপীড় ত্রিভুবনস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্তি স্থাপনের জন্ত একটা মন্দির নির্মাণ করেন। সেই দেবভবনের চতুঃসীমার মধ্যে একজন চামার বাস করিত। মন্দির প্রস্তুত করা হইল, কিন্তু চামার সেই স্থান পরিত্যাগ করিল না। ক্রমে রাজাকে জানান হইল। রাজা স্বয়ং সেই চর্ম্মকারের গৃহে ঘাইয়া তাহার নিকট হইতে গৃহাদি ক্রয় করিয়া লইলেন। দীন দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি এইরূপ সদ্ব্যবহারে কাম্বীরবাসী সকলেই রাজার প্রতি অমুরক্ত হইল। চন্দ্রাপীড়ের পত্নীর নাম প্রকাশা, গুরুর নাম মিহিরদত্ত। ইহার ভ্রাতা তারাপীড় জনৈক ইন্দ্রজালব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ দ্বারা ইহাকে নিহত করেন। ইহার রাজত্বকাল ৮ বৎসর ৮ মাস। (রাজতরঙ্গিনী)

৩ মহাকবি বাণভট্টবর্ণিত কাদম্বরীকথার নায়ক। ইহার পিতার নাম তারাপীড় ও মাতার নাম বিলাসবতী। ব্রাহ্মণশাপে রোহিণীপতি চন্দ্র চন্দ্রাপীড়রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইনি সর্গশাস্ত্রপারদর্শী, নীতিজ্ঞ ও দেহিতে অতি সুন্দর ছিলেন। হিমালয়ের নিকটে কিম্বদন্তির অমুসন্ধান করিতে করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হন। মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নের সহিত ইহার প্রাণের ভালবাসা ছিল। ক্রমে গন্ধর্ব্বরাজকুমারী কাদম্বরীর সহিত ইহার দেখা হয়। প্রথম দেখা হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অমুরক্ত হন। মহাশ্বেতার শাপবাক্যে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু বৈশম্পায়নের মৃত্যু হয়। চন্দ্রাপীড় বন্ধুবিচ্ছেদানল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন ও শূদ্রক নরপতি রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন।



চন্দ্রাবতী।

দেবাদেশে চন্দ্রাপীড়ের মৃতশরীর রক্ষিত হইয়াছিল।
চন্দ্রাপীড় পুনরুদার উজ্জীবিত হইয়া কাদম্বরীর পাণিগ্রহণ করেন। (কাদম্বরী)

চন্দ্রাভাস (পুং) চন্দ্রইবাভাসতে আ-ভাস-অচ্। যাহা ঠিক
চন্দ্রের ভায় দেখায়, চন্দ্রের প্রতিক্রপ। (False moon)

চন্দ্রামৃতলোহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে,
চৈ, জীরা ও সৈন্ধব লবণ এই সমুদয়ের সমান লোহমিশ্রিত
করিয়া নয় রতি পরিমাণে বটি প্রস্তুত করিবে। প্রাতে পবিত্র
ভাবে জৈশ্বের নাম করিয়া ইহা সেবন করিতে হয়।
রক্তোৎপল ও নীলোৎপলের রস এবং কুলথ কলায়ের রস
বা কাথ সহ সেবনে কাস, বায়ু, পিত্ত, বিষদোষ, খাসযুক্ত জ্বর,
ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা, শূল, অরুচি ও জীর্ণ জ্বর নাশ হয়। ইহা
বৃষা, আশ্বের, বল ও বর্ণকর। চন্দ্রনাথ ইহার আবিষ্কার
করেন, সেই জন্ত তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নাম চন্দ্রা-
মৃতলোহ হইয়াছে। [বৃহৎচন্দ্রামৃতরস দেখ।]

চন্দ্রার্কদীপ (পুং) বৃদ্ধ।

চন্দ্রার্ক (পুং) চন্দ্রার্কিঃ ৬তৎ। চন্দ্রের কলারূপ ভাগ।

চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ তুল্য দুই অংশের একাংশ
ব্যবহীলে অর্দ্ধশব্দের পূর্বনিপাত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র শব্দ হয়।

চন্দ্রার্ক (পুং) কর্পূর। (রাজনিঃ)

চন্দ্রালোক (পুং) চন্দ্রতালোকঃ ৬তৎ। ১ জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ।

২ পীযুষবর্ষকবিকৃত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ। [জয়দেব দেখ।]

চন্দ্রাবৎ, রাজপুত্র জাতির একটি শাখা, ইহারা আপনা-
দিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা সকলেই
পরাক্রমশালী ও মিবারের রাণার অধীন। রামপুর বা
ভানপুরে চন্দ্রাবৎ সর্দার বাস করেন, তাঁহার আর প্রায় ছয়
লক্ষ টাকা। রাণা জগৎসিংহ তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মধুসিংহকে যে
জায়গীর দেন, চন্দ্রাবতেয়া সেই জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

চন্দ্রাবত, আরাবল্লীর পাদদেশে অবস্থিত একটি প্রাচীন
নগর। গুর্জররাজের অধীন প্রধান সামন্ত প্রমাররাজগণের
এখানে প্রাচীন রাজধানী ছিল। বনাস নদীতীরে অর্ধদু-
শিখরের প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে শ্রামল নিকুঞ্জ বন মধ্যে এই
প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। আক্ষদ এই
প্রাচীন নগরের মসলা লইয়া প্রসিদ্ধ আক্ষদাবাদ নগর স্থাপন
করেন। সেই সঙ্গে অধিবাসীগণ শাবরমতী নদীকূলে উঠিয়া
বায়। এখন শুপাকার রাজভবন ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ
অতীত গৌরবের কতক পরিচয় দিতেছে।

চন্দ্রাবতী, রাজপুতানার কালাবার প্রান্তের রাজধানী কালাবা-

চন্দ্রিকামুজ (ক্ৰী) চন্দ্রিকেশব শুভ্রমধুজং। শ্বেত পদ্ম।

চন্দ্রিন্ (ত্রি) চন্দ্রোহন্ত্যত চন্দ্র-ইনি। ১ চন্দ্রযুক্ত, যাহার চন্দ্র আছে। ২ সুবর্ণযুক্ত। “চন্দ্রী যজতি প্রচেতাঃ।” (শুক্লযজুঃ ২০।৫৭।) ‘চন্দ্রী সুবর্ণময়ঃ’ (মহীধর)।

চন্দ্রিমা (ক্ৰী) চন্দ্রিণঃ মিমীতে মা-ক-টাপ্। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না।

চন্দ্রিল (পুং) চন্দ্র বাহুলকাৎ ইলচ্। ১ শিব। ২ নাপিত। ৩ বাস্তুক শাক। (মেদিনী)

চন্দ্রী (ক্ৰী) চন্দি-রক্ গোরাদি-ণীষ্। বাকুচী। (রাজনি’)

চন্দ্রেশ্বর (পুং) চন্দ্রস্ত চৈশ্বরঃ ৬তৎ। কাশীস্থ শিবমূর্তি-বিশেষ। [কাশী ও চন্দ্র দেখ।]

চন্দ্রেষ্ঠা (ক্ৰী) চন্দ্র ইষ্টো যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। উৎপ-লিনী, নালের গাছ। (রাজনি’)

চন্দ্রেহী, বৃন্দলখণ্ডে শোণনদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রাম। শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায়—ইহার প্রাচীন নাম চন্দ্রাবতী, এক্ষণে ইহাতে কএকটি তৃণাচ্ছাদিত গৃহমাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু এক সময়ে চন্দ্রেহী (চন্দ্রাবতী) যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সুরম্যাহর্যাদি শোভিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার নান্যস্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটি দেউল অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণাবস্থায় আছে। এক প্রকাণ্ড উচ্চ চতুরস্র ভিত্তির উপর দেউল স্থাপিত। এই দেউলের কার্যকার্য অতীব বিস্ময়কর ও অতুলনীয়। বাস্তবিক এ প্রকার গঠনের দেউল খুব অল্পই আছে। ইহা কোন সন্ন্যাসী কর্তৃক সম্ভবতঃ [১] ৩২৪ সংবতে নির্মিত হয়। দেউলের সম্মুখে বিস্তীর্ণ দর-দালান আছে। দরদালান স্থলাকার অনতিদীর্ঘ স্তম্ভ দ্বারা পরি-শোভিত। এই দেউলের প্রতিষ্ঠাতাগণ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন। দেউলের নিকট একটি ভগ্ন প্রাসাদও পড়িয়া আছে। ইহার গঠনাদি দৃষ্টে অনুমান হয় যে এখানে পূর্বে সন্ন্যাসীদের আড্ডা ছিল।

চন্দ্রোদয় (পুং) চন্দ্রস্ত উদয়ঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্রের প্রথম প্রকাশ, প্রাথমিক দর্শনযোগ্য স্থানে অবস্থিতি। ক্ষিতিজবৃন্তের অন্তরালে কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আমরা দেখিতে পাই না, রাশিচক্রের গতি অনুসারে যে গ্রহ যখন পূর্ণক্ষতিজ বৃত্ত অতিক্রম করিয়া আমাদের দর্শনযোগ্য স্থানে প্রথম উপস্থিত হয়, তাহাকে সেই গ্রহের উদয় বলে। কোন কোন মতে তিথি অনুসারে চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে। যে দিনে যে তিথি আড়াই প্রহরব্যাপিনী হয়, সেইদিন সেই তিথি অনুসারেই উদয় হইয়া থাকে। [চন্দ্রোদয়াস্তসাধন দেখ।]

২ চন্দ্রাতপ। ৩ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—খণ্ড আট

তোলা, পারদ এক সের ও গন্ধক হইসের, রক্তবর্ণ কাপাস ফুলের রসে ও স্নতকুমারীর রসে ক্রমে মর্দন করিবে। ভালরূপ মাড়া হইলে বোতলে পুরিয়া তাহার মুখটা ভাল করিয়া বদ্ধ করিবে; বোতলে কাপড় ও মাটির লেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। পারা ভস্ম হইয়া যখন নূতন পল্লবের জার রঞ্জিত হইবে, তখন নামাইবে। ইহার সহিত ৮ তোলা কর্পূর, জাতীফল, মরিচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ৩২ তোলা, কস্তুরী আধতোলা মিশাইয়া খল করিবে; ভালরূপ খল করা হইলে দশ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে মদোন্মত্তা শত প্রমদাগণের গর্ষ নিবারণ করি-বার সামর্থ্য হয়। ইহা জরামরণ ও বলিপলিতনাশক, বয়স্থাপক, সর্ষরোগনিবারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মৃত্যুঞ্জয়কারক। ইহার অমুশান—পানের রস, ইন্দ্রযব, লবঙ্গ ও কাপাস ফুলের রস। কেহ কেহ ইহাকেই মকরধ্বজ বলে।

(রসেন্দ্রনা’)

চন্দ্রোদয়া (ক্ৰী) চন্দ্রোদয়ো বস্তুঃ বহুব্রী, টাপ্। নেত্র-রোগের ঔষধ বিশেষ, চক্রদন্তোক্ত একপ্রকার বস্তু। প্রস্তুত প্রণালী—হরীতকী, বচ, কুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার শাঁস, শঙ্খনাস্তি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগছুঁড়ে পেষণ করিবে। অপর নিয়ম বস্তু প্রস্তুত করিবার সমান। ইহা সেবনে তিমির, কণ্ঠ, পটল, অর্কুদ, রাত্র্যাক্ততা প্রভৃতি নেত্ররোগ ভাল হয়। (চক্রদন্ত)

চন্দ্রোদয়াস্তসাধন (ক্ৰী) চন্দ্রোদয়াস্তরোঃ সাধনং ৬তৎ। গণিতানুসারে চন্দ্রের উদয় ও অস্ত নির্ণয়করণ। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে—শুক্লপক্ষের অষ্টীদিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের সূর্য্য ও চন্দ্রের ক্ষুদ্র সাধন এবং চন্দ্রের দৃক্‌কর্ম্ম সময়ের সাধন করিবে। [ক্ষুদ্র ও দৃক্‌কর্ম্ম দেখ।] ইহার পরে সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত ৬ রাশি যোগ করিয়া উভয়ের অন্তর করিবে। যাহা ফল হইবে, তাহাকে অমু (পরিমাণবিশেষ) করিয়া স্থাপন করিবে। কিন্তু যদি ৬ রাশিযুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের একরাশি হয়, তবে উহাদের অন্তরকে কলা করিয়া লইবে। অন্তর কলা বা অমুকে ঘটিকা করিয়া তাহা দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের ভুক্তি গুণ করিবে ও গুণফল ৬০ দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহা যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্য যোগ করিয়া পুনর্বার পূর্ণরীতি অনুসারে তাহাদের অন্তর করিলে যাহা ফল হয়, তাহাকে পুনর্বার ঘটিকা করিয়া পূর্ব্বের জ্ঞায় প্রক্রিয়া করিবে। যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তর সমান না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া করিতে হয়। এই নিয়মে চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তর সমান হইবে। উভয়ের

পমান অন্তরে বসে অল্প হয়, স্বর্ধ্যান্তের পর তত অল্প পরে চন্মের অন্ত হয় (১)।

কৃষ্ণপক্ষে স্বর্ধ্যের ক্ষুদ্র করিয়া তাহার সহিত ৬ রাশি যোগ করিবে ও চন্মের দৃষ্ণকর্ষ সংহার করিবে। পরে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া করিলে চন্ম ও স্বর্ধ্যের সমান অন্তর বসে অল্প হইবে, স্বর্ধ্যান্তের পর তত অল্প পরে চন্মের অন্ত হয় (২)। ইহাকে চন্মের দৈনিক উদয়াস্ত বলে। ইহা ছাড়া অপর গ্রহের জায়গা চন্মের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। স্বর্ধ্য-সিদ্ধান্তের মতে চন্ম স্বর্ধ্য হইতে ১২ অংশ পূর্বে অন্ত ও ১২ অংশ পশ্চিমে উদিত হইয়া থাকে।

চন্মোপল (পুং) চন্মপ্রিয় উপলঃ মধ্যলোঃ। চন্মকাস্তমণি।

চন্মোন্নীলন (স্ত্রী) একখানি সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ।

চন্মোরস (পুং) চন্মস্ত ওরসঃ ৬তং। ১ বৃষ। ২ ছল্লা-বিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৪টি অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও প্রত্যেক চরণের ১, ২, ৩, ৪, ১১, ১২ ও ১৪ অক্ষর শুক, তস্ত্রির অপর অক্ষর লঘু হয়, তাহার নাম চন্মোরস। “ভৌ ভৌ লেগী চেনিহ তবতি চ চন্মোরসঃ।” (বৃত্তরত্নাকরটী)।

চন্মগিরি, ১ মহিষুরের শিমোগা জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। পরিমাণ প্রায় ৪৬৭ বর্গ মাইল। এই তালুকের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে অল্পসত্ত পর্বতমালা বিরাজমান। ঐ সকল পর্বত হইতে বহুসংখ্যক নির্ঝরিনী নির্গত হইয়া বিস্তীর্ণ স্থলিকেরী হ্রদে পতিত হইয়াছে। এই হ্রদের পরিধি প্রায় ৪০ মাইল। ইহা হইতে হরিত্রানদী বহির্গত হইয়া তুলুভ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে। তালুকের অবশিষ্টাংশ সমতল ও বহল চারণভূমিসমাকীর্ণ। উত্তরভাগ সমধিক উর্বর ও উদ্যান, ইক্ষুক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা শোভিত। ইহাতে একটি ফৌজদারী আদালত ও ছয়টি থানা আছে।

২ উক্ত তালুকের সদর, শিমোগা হইতে ২৫ মাইল দূরপথে জৈশানকোণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ১১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৯' পূঃ।

(১) “রবীন্দ্রোঃ বড়ভৃত্যোঃ প্রাপ্ত বরদাস্তরাসবঃ।

একরাশো রবীন্দ্রোঃ কার্ধ্যা বিবরলপ্তিকাঃ।

ভরাডিকা হতে ভূজী রবীন্দ্রোঃ বজীভাজিতে।

তৎকলাধিত্তোভূঃ কর্তব্য বিবরাসবঃ।

এবং বাবং দ্বিরীভূতা রবীন্দ্রোঃ রত্নরাসবঃ।

ভৈঃ প্রাপ্ত রত্নমেতীন্দ্রঃ শুক্রে হর্ষাভ্রময়ং পরং।” (স্বর্ধ্যসি° ১০।২-৪)

‘এবং তদ্যটিকাভিঃ স্বর্ধ্যাকালিকো বড়ভৃত্যাদৃষ্ণকর্ষসংস্কৃতচন্মো প্রচালা তরোর্বিবরাসব ইতি বাবং দ্বিরীভূতা অভিন্নাত্বাবং সাধাঃ।

তৈরভিন্নৈরহুভিঃ স্বর্ধ্যান্তদনন্তরং চন্মোহন্তং প্রাপোতি।’ (রত্ননাথ)

(২) “ভগবার্জঃ রবেদ্বা কার্ধ্যাভিবরাসবঃ।

ভৈঃ প্রাপ্তঃ কৃষ্ণপক্ষে শ্রীতঃ শুক্রে ব্রজং।” (স্বর্ধ্যসি° ১০।৫)

চন্মপাট, মহিষুরের অন্তর্গত বঙ্গলুর জেলার একটি সহর। ইহার প্রকৃত নাম ‘চন্মপত্তনম্’ অর্থাৎ স্তম্ভন নগর। এই সহর বঙ্গলুর হইতে ৩৭ মাইল দূরপথে দক্ষিণপশ্চিমকোণে অবস্থিত। দ্রাঘি° ৭৭° ১৩' পূঃ, অক্ষা° ১২° ৩৮' উঃ। সহরের উত্তরপূর্বাংশ শুক্রবারপেট নামে খ্যাত। এই অংশেই শিল্পকর ও ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থান। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে জগদেব রায়ল চন্মপাটে একটি গড় নির্মাণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা ১৬৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন, তৎপরে মহিষুরের উদেয়ার রাজগণ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হন। শুক্রবারপেট বিবিধ বাণিজ্যব্যাভাত, খেলনা, লৌহতার এবং কাচের চুড়ি ইত্যাদি নির্মাণ জন্ত বিখ্যাত। এখানে দৈন্য প্রেয়ীর বিস্তর মুসলমান বাস করে। ঐ পেটের উত্তরে ছইটি স্তম্ভন কবর আছে। তন্মধ্যে একটি টিপু-স্তম্ভনানের গুরু ও অপরটি টিপু ইরাজবন্দীদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশের জন্ত বঙ্গলুরের জনৈক শাসনকর্তার নামে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সহর চন্মপাট তালুকের সদর ছিল।

চন্মবসবেশ্বর স্বামী, দক্ষিণাত্যের জনৈক গ্রন্থকার। ইনি ‘বীরশৈবোৎকর্ষপ্রদীপ’ নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

চন্মরায়পত্তন, ১ মহিষুরের হাসান জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। পরিমাণ প্রায় ৪৫৪ বর্গমাইল। এই তালুকের জল দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া হেমবতী নদীতে পড়ে। ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ পুকুরিনী আছে এবং ভূমি প্রায় সমতল। পাহাড়ের মধ্যে শ্রাবণবেলগোলার জৈন ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। উত্তরের কঙ্করময় অংশ বাতীত ভূমি সর্বত্র উর্বর। তথায় ধান ও রবিশস্ত উভয়ই উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত তালুক বা তহসীলের সদর। হাসান হইতে ২৪ মাইল পূর্বে একটি গ্রাম। অক্ষা° ১২° ৫৪' ১২" উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৫' ৫৫" পূঃ। প্রথমতঃ এই গ্রামকে কোলা-তুর বলিত। ১৬০০ খৃঃ অব্দে তথাকার একজন সর্দার চন্মদেবস্বামীর (বিষ্ণুর) এক মন্দির স্থাপন করেন এবং পুত্রের নাম চন্মদেবস্বামী রাখেন। তৎপরে ঐ গ্রামেরও নাম পরিবর্তিত হইয়া চন্মরায়পত্তন হইল। ক্রমে এখানে গড় নির্মিত হয়। হায়দরআলী গড়ের পরিখা ও দ্বারগুলি নির্মাণ করেন। এখানে কোন কোন মুসলমান রেসমের কার্য্য করে।

চপট (পুং) চপ-তৎপার্থে ক, চপঃ সাস্ত্রনা চূর্ণীকরণং বা তদর্থং অটীতি অট-অচ শক্কাদিবৎ সাধু। ১ চাপড়, চড়।

চপড় (চপট শব্দজ) চড়, চাপড়।

চপরাঙ্গ (হিন্দী) কর্মচারীর চিহ্নবিশেষ, ইহা পিত্তল প্রভৃতি

ধাতুদ্ব্যে নিশ্চিত, ইহাতে কার্যালয়ের নাম ও কর্মচারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি খোদিত থাকে।

চপলাসী (হিন্দীজ) বাহার চপলাস আছে, পত্রবাহক, কর্মচারী।

চপলা (ক্ৰী) চপ-মন্দারঃ গতো কল। উকারত্ব অকার। (চপে রচোপধায়াঃ। উণ ১।১১০) ১ লীঘ, তাড়াতাড়ী। (পুং) ২ পারদ। (ভাবপ্রা)। ৩ শিলাবিশেষ। ৪ মংস্ত। ৫ গন্ধ-দ্রাব্যবিশেষ, চোরক। ৬ একপ্রকার ইন্দুর। এই ইন্দুরে দংশন করিলে নমন, পিপাসা ও মুচ্ছা হইয়া থাকে। দেবদারু, জটামাংসী ও ত্রিফলার চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে উপশম হয়। (সুশ্রুত কল্প ৬ অঃ) ৭ চাতক। ৮ ক্ষব। (রাজনি)। (ত্রি) ৯ তরল। ১০ চঞ্চল।

“কুলান্তোভিঃ পবনচপলৈঃ।” (শাকুন্তল)

১১ কণিক। ১২ বিকল, যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ কোন দোষ হইবে কি না, ইহা বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে।

চপলক (ত্রি) চপল-স্বার্থে কন্। [চপল দেখ।]

চপলগ্রাম, বিষ্ণুনাথের নিকটবর্তী পূর্ণানন্দীতীরস্থ একটি গ্রাম। (ভূ. ব্রহ্মা ৮।৬৭)

চপলতা (স্ত্রী) চপলত্ব চপলায়া বা ভাবঃ চপল-তল্ টাপ্। ১ চঞ্চলা, অস্থিরতা। ২ হুঁহুতা। ৩ ব্যভিচারী গুণবিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে মাংসখ্য ও ঘেঘাদি বশতঃ চিত্তের যে অস্থিরতা জন্মে, তাহার নাম চপলতা। ইহাতে পরনিন্দা, পারুষ্য ও স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি হইয়া থাকে।

“অতাস্থ তাবদুপভোগসহাস্ত্র ভুঞ্জ ! লোলং বিনোদয় মনঃ স্তম্ভনোলতাস্থ। মুগ্ধামজাতরজসং কলিকামকালে বার্থঃ কদম্বরসি কিং নবমালিকারঃ।” এই স্থলে নায়িকা ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, তুমি অশ্লু পুষ্পিত লতার নিকটে গিয়া চিত্ত বিনোদন কর, বৃথা কেন এই নবমালিকার কলিকাকে কষ্ট দিতেছ, ইহাতেই নায়কের প্রতি কটুক্তি করা হইয়াছে, সুতরাং এই নায়িকাতে চপলতা গুণ প্রকাশ হইল। (সাহিত্যদর্পণ)

চপলা (স্ত্রী) চপল-টাপ্। ১ লক্ষী।

“চপলাজনাং প্রতি নচোদ্যমদঃ।” (মাঘ ২।১৬)

‘চপলা চাপলবতী স্ত্রী কমলাচ।’ (মল্লিনাথ) ২ বিদ্যুৎ।

“অহুতবচপলাবিলাসিতগজ্জিতদেশান্তরভ্রাতীঃ।” (আর্যাসপ্ত)

৩ বেস্তা। ৪ পিঙ্গলী। ৫ জিহ্বা। (শব্দচ) ৬ বিজয়া।

৭ মদিরা। (রাজনি)। ৮ মাত্রাবৃত্তবিশেষ। আর্য্যার পূর্বার্ধ ও পরার্ধের দ্বিতীয় ও চতুর্থগণ জগণ এবং তৃতীয় গণ গুরুধর্ম্মাক হইলে তাহাকে চপলা বলে।

“উত্তমার্ধ্যো র্জকারো দ্বিতীয়ত্বয়ো গমধ্যার্গো বশতঃ।

চপলেতি নাম তত্য়াঃ প্রকীর্ষিতঃ নাগরাজেন॥” (বৃহস্প)

চপলাঙ্গ (ত্রি) চপলঃ অঙ্গং যত্ব বহুত্ৰী। ১ বাহার শরীর চঞ্চল। (পুং) ২ শিশুমার, শুণ্ডক। (হার্য)

চপলাবক্ত (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ। যে অক্ষর দুইভেদে প্রথম ও তৃতীয় চরণের চতুর্থ অক্ষরের পরে একটি নগণ অর্থাৎ তিনটী লঘু অক্ষর থাকে, তাহাকে চপলাবক্ত বলে। “চপলাবক্ত-ম-যুজ্ঞানকার্ষ্যেচৎ পরোরাশেঃ” (বৃহস্প)

চপেট (পুং) চপ-ইট-অচ্। চড়, চাপড়, প্রতল, প্রহস্ত।

চপেটা (স্ত্রী) চপেট-টাপ্। [চপেট দেখ।]

চপেটী (স্ত্রী) ভাঙ্গমাসের গুরুপক্ষীর বতী। কৃত্যচন্দ্রিকার মতে ইহাই চাপড়াবতী। এই তিথিতে অক্ষর ফল কামনা করিয়া মানাদি এবং সম্ভান কামনা করিয়া জলের নিকট “ও বঠৈ নমঃ” এই মন্ত্রে অরণ্যবতীপূজার বিধি অহুসারে বতীদেবীর অর্চনা করিতে হয়।

হৃদপুরাণে লিখিত আছে—সম্ভানের আয়ুর্বিদ্যের জ্ঞান বারমাসের বারটা গুরুপক্ষীর বতীতে বতীদেবীর অর্চনা করিবে। হৃদপুরাণে ঐ সকল বতীর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে। যথা, বৈশাখে—চান্দনী, জ্যৈষ্ঠে—অরণ্য, আষাঢ়ে—কাঞ্চী, শ্রাবণে—লুণী, ভাদ্রে—চপেটী, আশ্বিনে—হুর্গা, কার্তিকে—নাড়ী, অগ্রহায়ণে—মূলক, পৌষে—অন্নপূর্ণা, মাঘে—শীতলা, ফাল্গুনে—গো এবং চৈত্রে—অশোকা। কেহ কেহ চপেটীবতীকে মহানবতী বলিয়া থাকেন।

চপ্য (ত্রি) চপ-য়ৎ। ভোজনীয়। “চপ্যং ন পায়ুর্ভিষগত্ব” (শুক্রসূত্রঃ ১২।৮৮)

চমকসূক্ত (ক্ৰী) বাঙ্গলদেশের ইতিহাসের ১৮ অধ্যায়ের ১ হইতে ২৭ মন্তকে চমকসূক্ত বলে।

চমচক্র (পুং) কুরুক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ।

চমৎকরণ (ক্ৰী) চমৎ-কৃ-ভাবে লুট্। ১ আশ্চর্য্য জ্ঞান করণ। কর্তরি লুট্। (ত্রি) ২ যে চমৎকৃত করে। ৩ যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে।

চমৎকর্তৃ (ত্রি) ১ যে চমৎকৃত করে। ২ যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। চমৎকর প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত।

চমৎকার (পুং) চমৎকরোত্তীতি চমৎ-কৃ-কর্তরি অণ্। ১ অপামার্গ। (শব্দরং) কৃ-ভাবে যঞ, ততঃ ৬তৎ। ২ চিত্তবৃত্তিবিশেষ, অলৌকিক বস্তুর জ্ঞান হইলে অনির্বচনীয় আনন্দের হেতু চিত্তের বিকাশ হয়, তাহার নাম চমৎকার। সাহিত্যদর্পণ মতে—চমৎকার চিত্তের বিস্তার (প্রফুল্লতা) স্বরূপ, ইহার অপর নাম বিস্ময়।

কেহ কেহ বলেন—কোন এক অলৌকিক বিষয় অনুভব করিলে পর 'কি এই' ? এইরূপ জ্ঞানধারা হওয়াতে চিত্ত-মুত্তির যে বিকাশ হয়, তাহার নাম চমৎকার। আবার কোন মতে অলৌকিক বস্তুর অনুভব হইলে 'দুঃখ হেতু হইতে ইহা সম্ভব নহে' এইরূপ ভাবিয়া কারণান্তরের অনুসন্ধান করিতে যে মানসিক ব্যাপার হয়, তাহার নাম চমৎকার। কেহ বলেন—চমৎকার স্থখ বিশেষ, চমৎ-কারক আত্মাদগত জ্ঞাতিবিশেষ। (রসগঙ্গাধর)

৩ উৎসেগ। "সমুত্তমৎকারকুরং সন্মম।" (কাব্যচ°)

চমৎকারক (ত্রি) চমৎ-কৃ-ণুল্ ৩তৎ। বিস্ময়জনক, যে আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মায়।

চমৎকারপুর, নাগরখণ্ড বর্ণিত একটা পুণ্যস্থান।

চমৎকারিত (ত্রি) চমৎকারঃ সঙ্গাতোহস্ত চমৎকার-ইতচ্। বিস্মিত, বাহার চমৎকার জন্মিয়াছে।

চমৎকারিন্ (ত্রি) চমৎকরোত্তীতি চমৎ-কৃ-ণিনি। [চমৎকারক দেখ।]

চমৎকৃত (ত্রি:) চমৎ-কৃ-ক্ত। বিস্ময়াপন্ন।

চমৎকৃতি (ত্রি) চমৎ-কৃ-ক্তিন্। চমৎকার, আশ্চর্য্য।

চমর (পুং ত্রী) চম্-অদনে অরচ্ (অস্তিকমিভ্রমিচমিদেবি-বাসিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩।১৩২) মহিষের চার একপ্রকার পত্, বাহার পৃচ্ছাবারা চামর প্রস্তুত হয়, এই পত্ হিমালয়ের উত্তরস্থিত পর্বতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পর্যায়—বাজনী, বজ্জ, ধেমুগ, বালধিগ্রিয়। [চামর দেখ।]

"চমরাঃ স্মর্য্যশ্চ যে চাঞ্চে বনচারিণঃ"। (রামায়ণ)

২ দৈত্যবিশেষ। চমরশ্চন্দমিত্যাণ্ সংজ্ঞাষাদবৃদ্ধেরনিত্যতা।

(স্ত্রী) ৩ চামর।

চমরপুচ্ছ (পুং ত্রী) চমরস্ত পুচ্ছ ইব পুচ্ছো যস্ত বছত্রী।

১ বিলহারী পশুবিশেষ, কোকড়। (রাজনি°)

(স্ত্রী) ৬তৎ। ২ চামর। ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।

চমরিক (পুং) চমরমিব কেশরোহস্তাশ্চ চমর-ঠন্। কোবি-দার বৃক্ষ। (অমর ২।৪।২২)

চমরী (স্ত্রী) চমরস্ত ত্রীজাতিঃ চমর-ভীষ্। ১ চমর-জাতীয় ত্রী, চমরগৰী। "কুর্কস্তি বালব্যজনৈশ্চমর্যাঃ"। (কুমার ১।১৩) ২ মঞ্জরী। (মেদিনী)

চমস (পুং ত্রী) চমতে ভূজাতে সোমঃ অগ্নিন্, চম-অসচ্ (অত্যবিচনীতাদি। উণ্ ৩।১১৭) ১ যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষ। পলাশ, বট অথবা অশ্ব কোন বৃক্ষের ১২ অঙ্গুলি পরিমিত একখানি কাঠ লইয়া তাহার ৪ অঙ্গুলিতে হাতে ধরিবার জন্য দণ্ড এবং অবশিষ্ট ৮ অঙ্গুলিতে চারি অঙ্গুলি পরিমিত

চতুর্কোণ খাত করিবে। ঐ খাতের উভয়পার্শ্ব ৩ অঙ্গুলি বিস্তৃত হইবে। হোতা ও ব্রহ্মা প্রভৃতির চমসের দণ্ড বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে (১)।

২ সোমপানার্থ পাত্রবিশেষ। কন্দ্রপি অচ্। (পুং) ৩ পর্পট, একপ্রকার পিঠক। ৪ লড্ডুক, লাড়ু। ৫ অষভদেবের জনৈক পুত্রের নাম।

চমসাধ্বর্য্য (পুং) ঋষিকবিশেষ।

"প্রপদ্যন্তে চমসাধ্বর্য্যাব এব তে।" (অথর্ক ৯।৬।৫১)

চমসিন্ (পুং ত্রী) চমসযুক্ত, বাহার চমস আছে।

চমসী (স্ত্রী) চমস-ভীষ্। ১ মুগ অথবা মসুরের চূর্ণ। ২ শুক মাষচূর্ণ। "চূর্ণং যচ্ছুকমাধাণং চমসী সাত্ত্বীয়তে" (ভাবপ্র°) ২ কাঠনির্ম্মিত যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। (ভরত)

চমসোস্তুদ (পুং) প্রভাসের নিকটবর্ত্তী তীর্থবিশেষ।

"ততস্ত চমসোস্তুদেদমচ্যুতস্বগমদ্বলী।" (ভারত শল্য ৩৬ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে—এই স্থানে সরস্বতী অদৃষ্ট হইয়াছিল। এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমযাগের ফল লাভ হয়।

চমসোস্তুদন (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ, চমসোস্তুদ। (ভারত ৩।৮৮ অঃ)

চমাদি, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় জেলার মধ্যে গোহেলবাড়ের মধ্যস্থিত একটা ক্ষুদ্ররাজ্য। এখানকার রাজার প্রায় দশ হাজার টাকা আয়, তন্মধ্যে গাইকবাড়কে ৭৬৫ এবং জুনা-গড়ের নবাবকে ২০৭ টাকা কর দিতে হয়।

চমীকর (পুং) কৃতব্র নামক স্বর্ণের উৎপত্তিস্থান, সোণার খনিবিশেষ। এই জন্তই স্বর্ণের এক নাম চামীকর। (শকার্ণচি°)

চমু (স্ত্রী) চমরতি বিনাশপতি রিপুন্ চম-উ (কৃষিচমিতনীতি। উণ্ ১।৮০) ১ সেনামাত্র।

"গন্তেতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্যমহতীং চমুং।" (গীতা ১।৩)

২ সেনাবিশেষ। অমর ও মেদিনীকোষ অনুসারে ৭২৯ হস্তী, ৭২৯ রথ, ২১৮৭ ঘোটক এবং ৩৬৪৫ পদাতি সর্ব্বসমেত ৭২২০, ইহার নাম চমু।

অধিকরণে উ। (স্ত্রী) ৩ চমস। [বিব] ৪ স্বর্ণ ও পৃথিবী। (নিঘণ্টু)

চমুচর (পুং) চমুচরতীতি চমু-চর ট। ১ দৈনিক পুরুষ। (শকার্ণচি°) ২ সৈন্যধ্যক্ষ।

চমুনাথ (পুং) চমুনাং নাথ ৬তৎ। সৈন্যধ্যক্ষ।

(১) "চমসানন্ত দক্ষামি দণ্ডাঃ স্যাত্তুরঙ্গলাঃ।

আঙ্গুলস্ত ভবেৎ স্কন্ধো বিজ্ঞানস্তুরঙ্গলাঃ।

বিককতময়াঃ স্কন্ধাঃখিলান্চমসাঃ স্তুতাঃ।

অন্তেষ্টোবাণি বা কাষ্যন্তেষাং দণ্ডেব লক্ষণং।"

(কাব্যারনশ্রোতসুতাব্য।)

‘যুবতিচমুনাথভোজ্যবস্ত্রাণাং।’ (বৃহৎসং ১৬ অঃ)

চম্পতি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চমুক (পুং স্ত্রী) চম উর (খজিপিঙ্গাদিত্য উরোলটৌ। উণ্
৪।২০) পুষ্পোদরাদিভ্যাং অকারন্ত উকারঃ। মুগবিশেষ।

‘ইদমুকমুগং ন চমুকদৃশঃ’ (প্রায়শ্চর্য্যব)

চমুষদ্ (ত্রি) চমুষু সীদন্তি চমু-সদ্-কিপ্ সুষমাদেবরাতিগণ-
ভ্যাং যৎ। যাহারা চমস প্রভৃতি বস্ত্রীয়পাত্রে অবস্থান
করে। ‘জম্বা মধ্বশ্চমুষদঃ।’ (ঋক্ ১।১৪।৪)

‘চমুষদশ্চমসাদিপাত্রেষবস্থিতাঃ।’ (সায়ণ।)

চমুহর (পুং) চমুং দানবদৈন্তং হরতি চমু-হ-অচ্। মহাদেব।

‘চমুহরঃ সুরেশশ্চ’ (ভারত আনু ৯।১ অঃ)

চমুকন (চমৎকরণ শব্দ) হঠাৎ কাঁপিয়া উঠা।

চমুকান (দেশজ) চমুকন, হঠাৎ কম্পন।

চমুকানি (চক্‌মানি), আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহার
প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে পারস্ত হইতে আফগানস্থানে আসিয়া
খটুকজাতির মধ্যে বাস করে। মুকিম ও কানিগোরাম
নামক স্থানদ্বয়ে অদ্যাপি তাহা শত চক্‌মানি আছে।

চমুকানিরা ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী পারস্ত দেশীয় একটা
সম্প্রদায়। ইহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী অতি
কুনীতিপূর্ণ থাকায় পারস্যরাজ কর্তৃক বন্দোবস্ত হইতে বিতাড়িত
হয়। এক্ষণে ইহারারা সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ও গোঁড়া মুসলমান
বলিয়া পরিচিত। ইহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাচার ও
তদানুসঙ্গিক কুনীতিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপাদির বিষয়ে অতি বিস্তার-
জনক বিবরণ আছে।

একটা প্রজলিত আলোক ইহাদের ব্রতাস্থানের প্রধান
অঙ্গ। এই ধর্ম্মাস্থানে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই যোগদান
করিত। কতক্ষণ মস্তাঙ্গি পাঠ ও অগ্ন্যস্ত পূর্ব্বকৃত্য সমাপন
হইলে পর যথাকালে মোল্লাজী দীপনির্মাণ করিয়া দিতেন।
তৎপরে বীতংস পৈশাচিক ব্যাপার আরম্ভ হইত। এই
বিসদৃশ রীতির অন্ত পারসিকগণ ইহাদিগকে ‘চিরাগ-কুশ’
অর্থাৎ দীপনির্মাণক, এবং পাঠানগণ ‘অর মুর’ অর্থাৎ অগ্নি-
নির্মাণক বলিত। ইহাদের আদিপুরুষের নাম আমীর
লোবান্। আফগানেরা বলে, এক সময় ৩৪ বর্ষব্যাপ্তি
ছুড়িত হইলে ইহার দেশত্যাগ করিয়া নানা স্থানে চলিয়া
যায়। এইরূপে ইহার পেশবারের নিকট চমুকানিগ্রামে
আসিয়া বাস করে।

এক্ষণে চমুকানিদিগের সংখ্যা প্রায় ৫ সহস্র পরিবার
হইবে। ইহার শাস্ত্রপ্রকৃতি, পরিশ্রমী, কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা
করে না এবং কখনও যুদ্ধ বা দস্যুবৃত্তি করিতেও চাহে না।

চমুচম (দেশজ) মিষ্টখাদ্যবিশেষ।

চমুচ (দেশজ) [চামচ দেখ।]

চম্প (পুং) চপি অচ্। ১ কোবিদার বৃক্ষ। (শকমালা) (স্ত্রী)
২ চম্পক পুষ্প, চাপাফুল। ৩ জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা, হরিবংশ
এবং বিষ্ণুপুরাণে ইনি চক্‌নামে নির্দিষ্ট। ইহার পিতার নাম
হরিত, পিতামহের নাম হরিশ্চন্দ্র ও পুত্রের নাম সুষমদেব।
ইনি চম্পাপুরী স্থাপন করেন। (ভাগবত, পদ্ম)

চম্পক (পুং) চপি বুল্। ১ একপ্রকার ফুল ও তাহার গাছ,
চাপা (Michelia Champac) পর্যায়—চাম্পয়, হেমপুষ্পক,
স্বর্ণপুষ্প, শীতলাচ্ছদ, স্নতগ, ভূদমোহী, শীতল, ভ্রমরাতিথি,
সুরভি, দীপপুষ্প, হিরগন্ধ, অতিগন্ধ, হিরপুষ্প, শীতপুষ্প,
হেমাহব, সূক্ষ্মার, বনদীপ। দক্ষিণ উৎকলে কাঞ্চনমু, তৈলঙ্গ
চম্পকমু, ভামিল শেম্বুবা, কর্ণাটে সম্পদ্বি, সিংহলে নঙ্গু,
মলয়ে জম্পক, ব্রহ্মে সা-গা, চীনে চেন-পু-কিয়া বলে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় এই গাছ আছে, চম্পারাজ্যে এই
গাছ এক একটা ৪০।৫০ হাত উচ্চ হয়। ভারতে ইহার
কাঠে লাল এবং সিংহলে ঢোলের খোল, গাড়ী পাখী
প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। চীনে এই গাছের ছাল দালচিনির
সহিত তৈজাল দেওয়া হয়।

ইহার সুবর্ণবর্ণ কুসুম হিন্দুদিগের অতি প্রিয় ও প্রকার
জিনিস। এই ফুল কৃষ্ণপুঞ্জার প্রশস্ত। এই ফুলেই মদনের
পঞ্চশরের একটা বাণ প্রস্তুত হয়।

কাহারও মতে, ইহার এতই তীব্র গন্ধ যে মোমাছি সাধ
করিয়াও ইহার কাছে যাইতে পারে না। ইহার ছালের গুণ—
রজনিসারক। মাস্তাজে সম্পত্তি নামে যে স্নগন্ধি তৈল
প্রস্তুত হয়, তাহা এই চাপা কাঠ হইতেই তৈয়ারি হয়। ডাক্তার
ওসফনেসির মতে, ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া সবিরাম জরে
১০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ইহার গুণ কটু, তিক্ত এবং শীতল। দাহ, কুষ্ঠত্রণ ও
কণ্ডুনিবারক। ভাবপ্রকাশ মতে—ইহার গুণ কষায় ও মধুর,
বিষ, ক্রিমিরোগ, কফ, বায়ু এবং অগ্নিপিত্তনাশক।
৩ কদলীবৃক্ষবিশেষ, চাপাকলার গাছ। (স্ত্রী) ৪ পুষ্পবিশেষ,
চাপাফুল। ‘ব্যালোকয়চম্পককোরকাবলীঃ।’ (নৈষধং)

৫ পনসফলের একপ্রকার অবয়ব, চাঁপী। ৬ কদলী-
বিশেষ, চাপাকলা। (রাজনিঃ) ভাবপ্রকাশ মতে ইহা শুষ্ক,
পক ও বীৰ্য্যকর এবং বাতপিত্তনাশক, ইহার রস অতি
শীতল। পকাবস্থায় এই ফল অতি মধুর।

৭ সাধ্যাশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধিবিশেষ, চতুর্ধসিদ্ধ, কোন কোন
গ্রন্থে চম্পকহলে রম্যক পাঠ আছে। [রম্যক দেখ।]

চম্পকচতুর্দশী (স্ত্রী) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশী। মৎস্তসূক্তে লিখিত আছে—“জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশীতে অমৃত, সহস্র অর্থবা শত সংখ্যক চম্পক পুষ্পাদি শিষের অর্চনা এবং পায়সবলি প্রদান করিবে, ইহােকই চম্পকচতুর্দশী ব্রত কহে। এই ব্রত রাত্রিতে কর্তব্য। এই ব্রত করিলে ক্ষয় ও জর প্রভৃতি রোগ এবং দশজন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।” (সংবৎসরকৌমুদীধৃত ব্রহ্মপুরাণ এবং উত্তর-কামাখ্যাতন্ত্রের ১১ পটলে এই ব্রত ও ইহার ফল উক্ত আছে।)

চম্পকনাথ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি ভাবার্থচরণটীকা, স্মৃতিচরণটীকা ও শাস্ত্রদীপিকা প্রকাশ রচনা করেন।

চম্পকমালা (স্ত্রী) চম্পকস্ত্র মালা ৬ভং। ১ টাপাকুলের মালা। ২ টাপাকুলের স্তার স্ত্রীদিগের কঠালঙ্কারবিশেষ, টাপকলি। ৩ ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রত্যেক পাদে দশ অক্ষর করিয়া থাকে। প্রত্যেক পাদেই প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম এই করণী অক্ষরমাত্র শুদ্ধ থাকিবে, অবশিষ্ট অক্ষরগুলি লঘু হইবে। “স্তো মগযুক্তো চম্পকমালা।” (বৃহত্তর) কাহারও মতে এই ছন্দের নাম রুজুবতী।

চম্পকরস্তা (স্ত্রী) চম্পক ইতি নাম্না প্রসিদ্ধা রস্তা মধ্যলো। টাপাকলা। [চম্পক দেখ।]

চম্পকানন্দদাকুঞ্জ (পুং স্ত্রী) বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনসমিহিত শ্রাম ও রাধাকুণ্ডের নিকটস্থ চম্পকলতিকার কুঞ্জ।

(বৃন্দাবন ৮ অঃ)

চম্পকাবতী (স্ত্রী) চম্পক-অন্ত্যর্থে মতুপ, মতু বঃ সংজ্ঞায়াঃ দীর্ঘঃ। চম্পাপুরী। [চম্পা দেখ।] চম্পকবতীও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চম্পট (দেশজ) প্রহান, পলায়ন।

চম্পকারণ্য (স্ত্রী) চম্পকবহনমরণ্যং মধ্যলো। তীর্থ-বিশেষ, ভারতে ইহা বর্ণিত আছে। এই তীর্থে একরাত্রি যাপন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। “ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চম্পকারণ্যমুত্তমম্। তজ্জোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ।” (ভারত বন ৮৪ অঃ) বর্তমান নাম চম্পারণ।

চম্পকামু (পুং) চম্পকেন পনসাবরবিশেষেণ অলতি চম্পক-অল-উণ্। পনস, কাঁঠাল। (শকার্ণিচিং)

চম্পকুম্ভ (পুং) চম্পইব কুম্ভে কুদ্বি-অচ্। মৎস্তবিশেষ, চাঁদকুড়া। ইহার গুণ—শুষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর ও বাতপিত্ত-নাশক। (রাজনিং)

চম্পকোষ (পুং) চম্পাচম্পক ইব কোষো যন্ত বহুব্রী। কাঁঠাল। (ত্রিকাণ্ডং)

চম্পাংরায় (চম্পতিরায়), একজন বিখ্যাত বুকেলা সর্দার, ছত্রসালের পিতা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীে ইনি দলবল সঙ্গে মুলমানদিগকে পরাজয় করিয়া বেজবতী নদীতীরভূমি সমুদায় কুড়াগ অধিকার করেন।

লালকবি রচিত্ত ছত্রপ্রকাশ নামক হিন্দীগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। [ছত্রসাল দেখ।]

চম্পা (স্ত্রী) চম্পা নদী অতি অত্যাং চম্পা-অর্শ-আদিহাং অচ্। অথবা চম্পেন রাজ হরিক্ষত্রস্ত্র প্রণোদ্যেণ নির্মিতা বা পুরী। ১ গঙ্গাতীরস্থিত অঙ্গরাজ্যের রাজধানী, মহাভারতে ৩ পুরাণে চম্পা, চম্পাপুরী প্রভৃতি নামে ইহার উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র মালিনী, লোমপানপু ও কর্ণপু চম্পার এই কএকটি পর্যায় লিখিয়াছেন। বর্তমান ভাগলপুরের নিকটেই এই নগর ছিল। বিখ্যাত চীনপর্যটক হিউএনসিয়াং চম্পার এইরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন,—

“চম্পা একটা বিস্তৃত প্রদেশ। উহার রাজধানী চম্পা-নগর উত্তরভাগে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই প্রদেশের ভূমি সমতল ও উর্বরা এবং সুচাক্ষুণ্যে কর্ষিত হইয়া থাকে। বায়ু মুহু ও জঘৃহৃহৃ। অধিবাসীগণ সরল ও সত্যবাদী। এখানে বহুসংখ্যক জীর্ণ সজ্জারাম আছে। ঐ সকল মধ্যে প্রায় ২০০ বৌদ্ধ যতি বাস করে। ইহার হীন-যান-মতাবলম্বী।

“ইহাতে প্রায় বিংশতিটা দেবমন্দির আছে। রাজ-ধানীর চতুর্দিকস্থ প্রাচীর ইষ্টকনির্মিত ও অত্যুচ্চ এবং শত্রুগণের দুরাক্রম্য। কথিত আছে, এই কল্পের আরম্ভে যখন মহুঘা প্রভৃতি প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে এক অঙ্গরা কোন অপরাধে স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্যে আসিয়া বাস করে। পরে কোন দেবের ঔরসে ঐ অঙ্গরার গর্ভে ৪টা পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রগণ জঘৃহৃপকে চারি অংশ করিয়া এক এক জন এক এক অংশে রাজ্যস্থাপন করেন। উহাদেরই একজন চম্পা নগরের স্থাপয়িতা।

এই নগরের পূর্বে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে একটা পাহাড় ও তত্পরি এক দেবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের দেবতা প্রত্যক্ষ ও অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেন। পাহাড়খোদিত করিয়া মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে। ঐ পাহাড় ও তথাকার গুহা প্রভৃতি দেবিতার জন্ত অনেক স্ত্রী লোক আগমন করেন।

এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে অরণ্য মধ্যে হস্তী ও অত্যাং বহু জন্তু পালে পালে চরিয়া বেড়ায়।” (Si-yu-ki)

ভাগবতাদির মতে—হরিতপুত্র চম্প নিজ নামে চম্পা নগরী নির্মাণ করেন। [চম্প দেখ।]

২ পূর্ব উপদ্বীপের এক অতি প্রাচীন রাজ্য। বর্তমান আনাম ও কাছোডিয়া অর্থাৎ ক্বোজের সর্বদক্ষিণাংশে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি ঐ স্থানের কতক অংশকে চম্পা কহে। ঐ স্থানের অধিবাসীগণ চম্ (চম্প) নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে—ক্বোজগণের আগমনের পূর্বে উহার এক সময়ে শ্রাম উপসাগর হইতে সমস্ত উপদ্বীপ ব্যাপিয়া বাস করিত। পূর্বে ইহারা সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল। অমুখান হর, গঙ্গাভীরবর্তী চম্পানগরীর অমুকরণে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পার্থক্য রাখিবার জন্ত উহাকে মহাচম্পা বলা হইত। চীনপৰ্য্যটক হিউএন্ সিয়াং কাছোডিয়ার চম্পাকে মহাচম্পা ও গঙ্গাভীরবর্তী চম্পাকে শুদ্ধ চম্পা (চেন্-পো) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আনামবাসীদিগের আক্রমণের পূর্বে এই রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ কর্তৃক শাসিত হইত। তখন উহার সীমা শ্রাম ও আনামের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৫শ শতাব্দীতে মলয় ও যবদ্বীপের সহিত চম্পার ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে যবদ্বীপের প্রধান রাজা চম্পারাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

আনামীভাষায় চম্পার লোককে লুই বলে। ইহারা বরাবর হিন্দুমতাবলম্বী ছিল। ইহাদের উপাসনা প্রভৃতি কতক বৌদ্ধ বা জৈনদিগের ছায়। এখানেও হর, পার্বতী প্রভৃতির পূজা হয়। কএক বর্ষপূর্বে এখানে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি ও অমুখাসন প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুলির অধিকাংশ সংস্কৃত কিংবা চম্ ভাষায় লিখিত। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, এই স্থানে পূর্বে পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামানুসারে এই প্রদেশে জয়হরিলিঙ্গেশ্বর, ত্রীজয়হরিবর্ষলিঙ্গেশ্বর, ত্রীজয়বর্ষশিবলিঙ্গেশ্বর প্রভৃতি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপিগুলির যে গুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সেগুলি অতি প্রাচীন।

৩ নদীবিশেষ, এখন যাহাকে চাপাই বলে। ৪ পনসের একপ্রকার অবয়ব, চাপি। (শম্ভার্ঘচি°)

৫ কাম্বীরের সীমান্ত প্রদেশ, ইহার রাজধানীকে ব্রহ্মপুর বলে। ১০২৮ হইতে ১০৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাম্বীররাজ অনন্তদেব এই রাজ্য আক্রমণ করেন, শালদেব নামক তথাকার রাজা অনন্তদেবের হস্তে নিহত হন। পরে তাঁহার পুত্র চম্পাবর্তী নামে এক নগর স্থাপন করেন। সেই চম্পা এখন চম্বা নামে প্রসিদ্ধ। রাবী বা ইরাবতী নদীর দ্বারা ঐ নগর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। [চম্বা দেখ।]

চম্পা (চাপা) মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলায় একটা

জমিদারী। পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ৬৫, গৃহসংখ্যা ৬৩৭৭। এখানকার জমিদারকে কুমার কহে। ইহার সদর চম্পা সহরে। এখানে বিস্তর তক্তবার বাস করে। ঐ সকল তক্তবারদিগের বস্ত্রাদি নিকটস্থ বামনিদেহীর বাজারে বিক্রীত হয়।

চম্পাধিপ (পুং) চম্পার অধিপ: ৬তং। কর্ণ। [কর্ণ দেখ।] চম্পানগর, ভাগলপুর সহরের পশ্চিমভাগস্থ একটা গ্রাম। এখানে জৈনিক মুসলমান সন্ন্যাসীর (১৬২২-২৩ অব্দের) কবর আছে। এখানে ভাগলপুরস্থ ওলবাল জৈনদিগের পুরোহিতগণ বাস করেন। জেলার মধ্যে এই গ্রামে তসর পাট প্রভৃতি বস্ত্রের প্রধান আড়ত আছে।

চম্পানের, গুজরাটের অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার একটা গ্রাম ও গিরিজুর্গ। ইহা বোম্বাই হইতে প্রায় ২৫০ মাইল উত্তরে একটা অত্যাচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৬' পূঃ। গড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪২০ গজ, প্রস্থ প্রায় ৬৬০ গজ। গড় দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ অত্যাচ্চ, উহাতে প্রসিদ্ধ কালিকাদেবীর মন্দির আছে। অপারক্কে অপেক্ষাকৃত অবনত হইলেও হ্রাক্রম্য। এখানে অতি প্রাচীনকালের হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরাদি দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই অজের দুর্গে এক রাজপুত সর্দারের রাজধানী ছিল। অবশেষে ১৪৮২ খৃঃ অব্দে আক্ষদাবাদপতি মাক্কুদ চম্পানের সর্দারের কএকটা অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রদেশ আক্রমণ ও চম্পানের দুর্গ অবরোধ করেন। কথিত আছে, ষাটশবর্ষ অবরোধের পর দুর্গ অধিকৃত হয় এবং মাক্কুদ ইহার সুদৃঢ় অবস্থান দর্শনে এরূপ প্রীত হন যে ইহার অদূরে বর্তমান মহম্মদাবাদ-চম্পানের নগর স্থাপন করিয়া উহা বহু মস্-জিদাদি দ্বারা শোভিত করেন। কালে ঐ নগর বিস্তীর্ণ বাণিজ্য স্থান রূপে গণ্য হয়। প্রায় ১৫৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ নগরে গুজরাটের রাজাদিগের রাজধানী ছিল।

১৫৩৫ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন চম্পানের দুর্গ জয় করেন। প্রবাদ আছে, হুমায়ুন কএকজন মাত্র সহচর লঙ্গে প্রাচীরের গারে পেরেক মারিয়া দুর্গে উঠেন, এবং একটা দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সৈন্তগণের প্রবেশের পথ করিয়া দেন। তাহাতেই দুর্গ জয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর চম্পানের মহারাষ্ট্রদিগের অধীনস্থ এবং অবশেষে মধুজী সিদ্ধিয়ার হস্তগত হয়। ইহার উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিদ্ধিয়া ১৮০২ খৃঃ অব্দে বিনাযুদ্ধে কর্ণেল উডিংটনকে এই দুর্গ অর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে সেরজি অক্সনগাঁও সন্ধিবারা ঐ দুর্গ দৌলভরাও সন্ধিরাকে প্রত্যর্পিত হয়। পরিশেষে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ঐ নগর সমগ্র পাঁচমহল জেলার সহিত ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চম্পানের হইতে বহুলোক পলায়ন করে এবং ইহার উপত্যভাগ অরণ্যে পরিণত হয়। এই স্থান সম্প্রতি অভ্যন্ত অস্বাভাবিক ও বাসের অযোগ্য। ইহাতে বসতি স্থাপনের জন্য গবর্মেণ্টের প্রত্নত উদ্যম ও চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহার দুর্গ, পরিখা প্রাচীরাদি এবং মুসলমান রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ ও কোতূহল উদ্দীপন করে।

চম্পারণ, বেহার প্রদেশের বায়ুক্ষেপে অবস্থিত এবং পাটনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালার লেক্টেনেন্ট গবর্নরের শাসনাধীন একটি জেলা। এই জেলা দ্রাঘি° ৮৩° ৫৫' হইতে ৮৫° ২১' পূঃ ও অক্ষা° ২৬° ১৬' হইতে ২৭° ৩০' উঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৩৫১ বর্গমাইল। এই জেলার প্রধান বিচারালয়াদি মতিহারী নামক নগরে স্থাপিত। মতিহারীর অক্ষা° ২৬° ৩২' উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ৫৮' পূঃ।

এই জেলার উত্তরে স্বাধীন নেপালরাজ্য, পূর্বে মজঃকরপুর জেলা, দক্ষিণে মজঃকরপুর ও সারণ এবং পশ্চিমে গোরখপুর জেলা ও রাজবোতওয়াল নামক নেপালের কিয়দংশ। পূর্বে প্রায় ৩৫ মাইল পর্যন্ত বাঘমতী নদী এবং দক্ষিণ পশ্চিমে গণ্ডকনদী ও উত্তরে সোমেশ্বরপর্বত অবস্থিত।

এই জেলা পূর্বে সারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইহা একটি পৃথক জেলা বলিয়া পরিগণিত হয়। অদ্যাপি সারণের জজ মধ্যে মধ্যে মতিহারী গিয়া সেখানকার বিচারকার্য করিয়া থাকেন।

যদিও চম্পারণে কোন বৃহৎ নগরাদি নাই, তথাপি তথাকার জনপ্রবাদ ও প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের কোতূহলোদ্দীপক এবং ইহার পুরাকালীন গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। নানা কারণে জানা যায় যে ইহা মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লৌরিয়া-নবনগড় নামক গ্রামের নিকট তিনটা প্রকাণ্ড স্তূপ প্রস্তরশ্রেণী বিদ্যমান আছে। জেনারেল কনিংহাম অনুমান করেন ঐ সকল প্রস্তরস্তূপ ৬০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্বে রাজাদিগের সমাধিস্থান জন্ত নির্মিত হয়। এখানে আলেকজান্ডারের ভারতে আগমনের পূর্বের একটি রৌপ্যমুদ্রা এবং গুপ্তরাজ্যের সময়ের অক্ষরাক্ত মৃত্তিকানির্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের নিকটেই অশোকপ্রতিষ্ঠিত ৩৩ ফিট উচ্চ একটি অখণ্ড প্রস্তরস্তূপ আছে। এই স্তূপে

বুদ্ধের আদেশাবলী লিখিত। অররাজ নামক গ্রামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি স্তূপ আছে। কেশারিয়া নামক স্থানে ইষ্টকনির্মিত এক প্রকাণ্ড চতুর্কোণ বেদীর উপর ইষ্টকনির্মিত ৬২ ফিট উচ্চ ও ৬৮ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটি স্তূপ আছে। পুরাবিদ কনিংহাম অনুমান করেন, ইহা বুদ্ধদেবের কোন কার্যের স্মৃতিচিহ্নরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। ইহার নিকটেই বুদ্ধদেবের মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, রাজপুতানা হইতে কোন মহাত্মা আসিয়া নেপালের সীমান্ত প্রদেশে সিমরাউনে রাজ্য স্থাপন করেন। তথায় অদ্যাপি জঙ্গল মধ্যে বহু পরিমাণে প্রাচীন পরিখাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদমতে ১০২৭ খৃষ্টাব্দে নানুঅগাদেব সিমরাউন স্থাপন করেন।

মুসলমানদিগের সময়ে চম্পারণ সরকার বর্তমান চম্পারণ জেলা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ছিল। অকবরের রাজস্ব-সচিব তোডরমলের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, ১৫৮২ খৃঃ অব্দে চম্পারণ তিনটা পরগণায় বিভক্ত ছিল, পরিমাণ ৮৫১১১ বিঘা এবং রাজস্ব আদায় প্রায় ১৪০০০০ টাকা। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গালার দেওয়ানি প্রাপ্তির সময়ে, ইহার পরিমাণ ২৫৪৬ বর্গমাইল ও রাজস্ব ৩৪০০০০ টাকা ছিল। বেতিয়ারাজবংশোদ্ভব যুগলকিশোরী সিংহের পুত্রগণকে সমস্ত জেলা বন্ডোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। অদ্যাপি ঐ বংশীয়রাই জেলার অধিকারের অধিকারী। অপরাধের অধিকাংশ নেপালসীমান্তস্থিত রামনগরের রাজা ও বেতিয়ারাজকুলোদ্ভব আবহুলসিংহের বংশধর মধুবনীর বায়ুগ ভোগ দখল করিতেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১২শ সংখ্যক অখারোহী সৈন্যদল এই জেলার সেগোলীতে অবস্থান করিতেছিল। জুলাই মাসে এক দিবস তাহার বিদ্রোহী হয় এবং সেনাপতি মেজর হোলমস্ প্রভৃতিকে হত্যা করে।

এখানে বৃষ্টি ভাল হয় না। স্রবষ্টি না হওয়ার ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে এই জেলায় দুইবার ভীষণ দ্রুতি হয়। এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা অদ্যাপি বিশেষরূপ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। এই জেলা অপেক্ষাকৃত নির্ধন এবং এখানে বাণিজ্যাদির অবস্থা তত ভাল নহে। সম্প্রতি ত্রিহুতেটেট রেলওয়ে হওয়াতে ইহার সহিত বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের দায়। গণ্ডক ও বাঘমতী নদীদ্বয় উহার দুই বাহু এবং নেপালের সীমান্তস্থিত অমুচ্চ শৈলমালা ইহার ভূমি, মধ্যভাগে বুড়িগণ্ডক নদী

স্থিত করিতেছে। জেলার দক্ষিণভাগ সমতল এবং পার্বণ ও মুন্সেরপুর জেলার ভাগ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উর্বর। উত্তরভাগ বহু ও তরঙ্গাক্রান্ত। উত্তরসীমার সোমেশ্বর-গিরি উচ্চায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৭০ ফিট। এই গিরিমালার অনেক স্থানই মনুষ্যের দ্বারোহ। সোমেশ্বরের পূর্ব প্রান্তে প্রসিদ্ধ গিরিবন্য দিয়া বৃটিশ দৈর্ঘ্য ১৮১৪ ১৫ খুঃ অঙ্গে গুর্খাদিগকে দমন করিতে পমন করিয়াছিল। সোমেশ্বর, কাপন, হলো, হড়া প্রভৃতি আরও কএকটি গিরিপথ আছে।

সোমেশ্বরগিরিবন্য জুরিপানিনামক নদীগর্ভ হইতে ক্রমে উচ্চতর হইয়াছে। সর্বোচ্চ স্থানের প্রায় ২০০ ফিট অন্তরে একটা অনতিবিস্তৃত সমতল আছে, ঐ স্থানের বায়ু অতি শীতল ও সুস্বাদু, জল বিশুদ্ধ এবং ঐ স্থান একটা স্বাস্থ্য-নিবাসের উপযুক্ত। সর্বোচ্চ স্থান হইতে দেশালের মোরি প্রান্তর এবং ধবলগিরি, গোসাইখান, অন্নপূর্ণা ও কাঞ্চনজঙ্ঘ, প্রভৃতি হিমালয়ের প্রকাণ্ড শৃঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়। এই প্রদেশে প্রচুর তৃণ জন্মে ও বিস্তর গোমেষাদি চরিয়া থাকে। গওক অর্থাৎ শালগ্রামী নদীতে বারমাসই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী জিবেলীঘাটে চম্পারণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা কোথাও হাটিয়া পার হওয়া যায় না। নদীর গতি অতিশয় কুটিল ও নিত্য পরিবর্তনশীল। অপর নদীগুলির মধ্যে ছোট গওক ও বাঘমতীই প্রধান। এই নদীদ্বয়েও নৌকাদি যাতায়াত করে। জেলার মধ্য দিয়া শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি ঝিল আছে। বোধ হয়, এইখানে কোন বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত। কালে উহার গতি পরিবর্তিত হওয়াতে ঐ সকল ঝিল উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় সকল নদীতেই বর্ষাকালে ভীষণ বড়া আসিয়া বহুদূর পর্যন্ত জলমগ্ন হয়।

এই জেলার রীতিমত বৃষ্টি হয় না, এবং প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। গবর্মেন্ট গওক নদীর তীরে বাধ দিয়া জলপ্রাধান হইতে কতক স্থান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর ভাগের নালগুলি সময়ে সময়ে জল বাহির লা হওয়ায় মধ্যে মধ্যে দেশ জলপ্রাণিত হয়। জেলার উত্তরভাগে স্বর্ণ, তাম্র, কয়লা প্রভৃতি ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। জেলার সমস্ত ভাগেই চুণা পাথর (চুটিং) দৃষ্ট হয়। অজ্ঞাত জব্য জাতের মধ্যে কড়িকাঠ, জালাসিকাঠ, মধু, মোম, লাক্ষা, পিপুল, নানাবিধ গাছ গাছড়া, সবিতা অর্থাৎ রজ্জুতণ ও মাছর বুনিবায় নর্কট অর্থাৎ নাগরমুখা পাওয়া যায়।

আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে থাক ও মেপালীগণ উত্তরভাগে লোরিয়া ও বগহা পরগণায় বাস করে। থাকরা

হিমালয়ের পাদদেশে বাসে স্থানে পার্কিয়া সরিং সকলের জলধারা কথকিৎ ধান্য চাষ করিয়া থাকে। চম্পারণে মবাই ডোম নামে এক দল আছে, ইহারা কোথাও গৃহ-নির্মাণ করিয়া বাস করেনা এবং প্রধানতঃ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সম্প্রতি গবর্মেন্ট ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার অনেকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্মাদি অবলম্বন করিয়াছে এবং একস্থানে বসবাস করিতেছে। গোণ্ড নামে আর এক আদিম জাতি আছে, তাহাদের সংখ্যা ১১,০৫৫। এখানকার ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা ৭৬,২৮৪, রাজপুত ৮০,৭৬৪, যুদ্ধব্যবসারী ব্রাহ্মণ ৪২,২৮০। বেতিয়ারাজ শেখোক্ত শ্রেণীভুক্ত। অবশিষ্ট মান্য গণ্য জাতির মধ্যে কায়স্থগণ প্রধান। অধিকাংশ গবর্মেন্ট কর্মকারীই কায়স্থ বংশোদ্ভব। ইহাদের সংখ্যা ২৮৪১১। তস্ত্রি কুড়ুমি, কোরেরী, বেনিয়া, নাপিত, লোহার, বাকুই, কুস্তকার, শুদ্ধবার, কাহার, খোপা, মাল্লা প্রভৃতি জাতি আছে। ছুনিয়া নামক নীচ জাতি বংশপরম্পরা ক্রমে সোরা প্রান্তর করে। চামার, দোসাধ, বুলাহর, বিন্দু, ধাক্ক প্রভৃতি নীচ জাতিরও বাস আছে। পাটনা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে অনেক মুসলমান আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। বেতিয়া ও চুহারীতে রোমান কথলিক মিশনরীগণ বাস করেন। চম্পারণের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর বেতিয়া। মতিহারীতে দেওয়ানী আদালত আছে। মধুবনী, কেশারিয়া, সেগোলী, সীতাকুণ্ড, অন্নরাজ ও জিবেলীঘাট প্রভৃতি নগর আছে। সেগোলী বিদ্রোহের জন্ম ভূমি। শেখোক্ত তিন স্থানে ও বেতিয়ায় বর্ষে বর্ষে মেলা হয়।

এখানকার সাধারণ লোকের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। প্রায় সকল কৃষকই মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে আবদ্ধ। সুতরাং ভাল ফসল জন্মাইলেও শস্যের অধিকাংশই ঋণশোধ করিতে ব্যয় হয়। আবার তাহাদিগের ঋণ করিতে হয়।

চম্পারণে তাম্র, অগ্রহায়ণ ও ফান্ডন তিনমাসেই শস্ত হয়। যথাক্রমে উহাদিগের নাম ভাদই, অজ্রানি ও রবি শস্ত। আশু অর্থাৎ ভাদই খাদ্য অন্নই হয়, অধিকাংশ খাদ্যই অজ্রানি অর্থাৎ হৈমন্তিক। তস্ত্রি জেলার অনেকস্থলে নীলকরেনা নীল চাষ করেন। বর্ষে বর্ষে দুই তিন লক্ষ টাকার নীল এবং প্রচুর পরিমাণে অহিকেন উৎপন্ন হয়। এখন ইক্ষু চাষ হইতেছে।

চম্পারণের উত্তর অংশে ব্রাহ্মগণ জলসেচনের জন্ত সুদীর্ঘ নাল প্রান্তর করে। দক্ষিণভাগে কুপাদি দ্বারা সেচন কার্য সম্পন্ন হয়। এখানে পুষ্করিণীর সংখ্যা খুব কম।

চম্পারণে নৈবহুর্জিপাক বড় অধিক। কখন তীব্র জলাবৃষ্টি, কখন প্রবল বজা দেশকে প্রস্ফুটিত করে। রেল পথ দ্বারা আমদানির সুবিধা ও বাঁধ প্রস্তুত করিয়া গবর্নেন্ট ঐ দুই বিপদ নিবারণের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন।

এই জেলার বাণিজ্য ব্যবসায়াদি নদীযোগেই অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। সুতরাং স্রোতমুখে নদী দিয়া মাল রপ্তানি করা যত সহজ, আমদানি করা সঙ্কটপূর্ণ নহে। সম্প্রতি রেল হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে। এখানকার উৎপন্নের মধ্যে মোটা সুতার কাপড়, কবল ও মাটির বাসন প্রধান। নীলকরেরা সকলেই যুরোপীয়, সুতরাং নীলে এ জেলার লোকের লাভ অল্পমাত্র। এতদ্ব্যতীত চিনি, সোরা প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাটনা হইতে নেপাল পর্যন্ত পথ এই জেলা দিয়া যাওয়াতে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আছে। ১৮৭৬-৭৭ সালের গবর্নেন্ট রিপোর্টে ইহার আমদানি রপ্তানি এইরূপ হিসাব পাওয়া যায়। মোট রপ্তানি ৫৪০০০০ টাকা, তন্মধ্যে প্রধান নীল ২৪৫০০০ টাকা, তিল সর্ষপাদি ১২০০০০, কড়িকাঠ ৩৮০০০০, চিনি ১৭০০০০ এবং কার্পাসবস্ত্র ৩০০০০০ টাকা। কার্পাসবস্ত্র অধিকাংশই নেপালে প্রেরিত হয়। মোট আমদানি ১৩৯০০০০ টাকা, তন্মধ্যে প্রধান লবণ ৩৯০০০০ টাকা, ছিট বস্ত্রাদি ১০০০০০ ও গোধূম চাউলাদি ২০০০০০ টাকা। শেযোক্ত দ্রব্য নেপাল হইতে আইসে। বেতিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, বগহা, বড়রবা, পাক্রি এবং মানপুর, এই কয়টা নদীতীরস্থ প্রধান বাণিজ্যস্থান।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের পূর্বে পর্যন্ত চম্পারণ সারিণ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বর্ষে উহা একটা পৃথক জেলা বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৭০-৭১ সালে উহার পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা ২৭০৪ জন ছিল; অর্থাৎ প্রতি ৬৩৭ জন লোকের জন্য ১ একজন পুলিশ ছিল। মতিহারী নগরে দেওয়ানি আদালত ও একটা জেলখানা আছে। বেতিয়ায় একটা হাজত আছে। পূর্বে মতিহারী জেল অতিশয় অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। ১৮৮৩-৮৪ অব্দে এক নূতন জেল প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানে শিক্ষাপ্রাণী ভাল ছিল না। ক্যাথল সাহেবের যত্নে গবর্নেন্টের সাহায্যে পাঠশালা প্রভৃতিতে বিদ্যামূলীলন পুনর্জীবিত হয়। সম্প্রতি ইহাতে বহুসংখ্যক ইংরেজী বিদ্যালয় হইয়াছে।

চম্পারণ জেলা ২টা চৌকী, ১০টা থানা ও ৪টা পরগণায় বিভক্ত। ইহার মাঝোরা পরগণা আবার ২৫টা ভাগায় বিভক্ত।

চম্পারণের জল বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন পর্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠের কতকদিন পর্যন্ত ভয়ানক গ্রীষ্ম। এই সময় পশ্চিম হইতে কালবৈশাখী ঝড় বহিয়া থাকে। পৌষ হইতে কানুন পর্যন্ত শীত থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত আয় ৪৭.২২ ইঞ্চ।

এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল। গলগণ্ড ও মেধাতাব রোগীও বিস্তর। ওলাউঠা ও পানিবসন্তও হইয়া থাকে।

চম্পাঙ্গু (পুং) চম্পাচম্পকত্বৎ কোষবর্ণ আলাতি প্রতি-গৃহ্যতি চম্প-আ-লা-ডু। পনস, কাঁঠাল। (শকর)

চম্পাবতী (স্ত্রী) চম্পা নদী অস্তি অত্যাং চম্পা-মতুপ্ মত বঃ। চম্পাপুরী। [চম্পাবতী দেখ।]

চম্পাবতী, রাজপুতানার অন্তর্গত বর্তমান চাংসু নগরের প্রাচীন নাম। এই নগর দেওসা হইতে ৩৫ মাইল নৈঋত কোণে এবং জয়পুর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। ইহাই পুরাণোক্ত চম্পসেন রাজার রাজধানী চম্পাবতী নগর। [চম্পসেন ও চম্পাবতী দেখ।]

চম্পাবতী, ভাগলপুর জেলার একটা নদী। ইহার বর্তমান নাম চন্দন। ভাগলপুরের ২০ মাইল দক্ষিণে এই নদী-তীরে জেথুর নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর একটা মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে ১০৫৩ সংবতাব্দিত এক ছত্র শিলালিপি পাওয়া যায়। [চন্দন নদী দেখ।]

চম্পাষটী, দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত পক্ষিবিশেষ। ইহা মার্গ-শীর্ষমাসের শুক্লষষ্ঠীতে খণ্ডোবার মন্দিরে সম্পাদিত হয়। সেখানকার লোকে ইহাকে 'চম্পাষটী' কহে।

চম্পু (স্ত্রী) চপি-উ। গদ্য পদ্যময় কাব্যবিশেষ, যে কাব্যে গদ্য ও পদ্য উভয়ই থাকে।

"গদ্যপদ্যময়ী বাণী চম্পুরিত্যভিধীয়তে।" (সাহিত্যদ)

চম্পোশ (পুং) চম্পায়া জশঃ ৬তৎ। কর্ণরাজ। (ত্রিকাণ্ড)

চম্পোপলক্ষিত (পুং) চম্পা নদ্যা নগর্যা বা উপলক্ষিতঃ ৩তৎ। ১ অঙ্গদেশ, এই দেশে চম্পা নামে নদী অথবা চম্পা নামে রাজধানী আছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। [বহু] ২ তদেশবাসী।

চম্পোলি (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

চম্বল, মধ্যভারতের একটা নদী ও যমুনার প্রধান উপনদী। ইহার প্রাচীন নাম চম্বতী। ইহা নৌ-সেনানিবাসের চাং

* Statistical Account of Bengal, vol. XIII; The Bengal Census Report for 1881, and the Provincial Administration Report.

মাইল অন্তরীণে মালব প্রদেশেই বিজ্ঞাপিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ অঞ্চলে উহার নাম জনপাড়া। উৎপত্তি স্থানের প্রায় ৪০ মাইল দূরে চম্বল-টেনসে রাজপুতানা-মালব রেলওয়ে গিয়াছে। উত্তরাতিমুখে গমন করিতে করিতে ৮০ মাইলের পর চম্বা নামক আর এক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ভালনগরের নিকট ইহা উত্তরপশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে এবং নগংবারা দুর্গকে বেটন করিয়া শিখা নামে অপর এক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। [চম্বা নদী দেখ।]

চম্বা (স্ত্রী) চম্বু বর্তমানঃ ইষোহ্মানি ৭৩২ চম্বি-বস্ত রেক-
হ্মানসঃ। চমসে অবস্থিত অন্ন, চমসহ ভক্ষ্যব্য।

“এবম্পূর্কী যব তত চম্বিঃ” (ঋক্ ১৫৬।১) ‘চম্বি-চ
চম্বু চমসে অবস্থিতঃ সোমলক্ষণা ইবঃ’ ‘চম্বু..... ততঃ
বর্তমানঃ ইষোহ্মানসঃ বকারন্ত রেকহ্মানসঃ’ (সায়ণ।)

চম্বী (স্ত্রী) চম্বা ইবাতি গচ্ছতি ইব-ক (ইণ্ডোপথজ্যাক্রীকিরকঃ।
পা ৩।১।১৩৫।) পুৰোদারাদিত্যং রেকো দীর্ঘচ। যবা চম-
জ্বন্ রেকঃ পূর্ববৎ। চমসে অবস্থিত, যবা চমসে থাকে।

“চম্বী বো ন শবলা পাঞ্চজন্যঃ” (ঋক্ ১।১০০।১২) ‘চম্বী বো
চম্বা চমসে রসাত্তনাবস্থিতঃ’ (সায়ণ)

চম্বা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন পর্বতময় একটা হিন্দু রাজ্য।
এই রাজ্য কাঙ্গড়া ও গুরুদাসপুর জেলাবস্তুর উত্তরে অব-
স্থিত। দ্রাঘি ৭৫° ৪২’ ০” হইতে ৭৭° ৩৩’ ০” পূঃ এবং অক্ষা°
৩২° ১৫’ ৩০” হইতে ৩৩° ১৩’ ০” উঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার
চতুর্দিকেই উচ্চ পর্বতশ্রেণী। আনুমানিক পরিমাণ ৩১৮০
বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ১১৫৭৭৩।

চিরতুষারমণ্ডিত দুইটা পর্বতশ্রেণী চম্বাকে ভেদ করিয়া
গিয়াছে, একটা ইরাবতী ও চম্বাভাগা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী,
অপরটা লাধক ও বুটল লাহলের সীমায় অবস্থিত। ইরা-
বতী ও চম্বাভাগা নদী দিয়া কড়িকাঠ প্রভৃতি রপ্তানির বিশেষ
সুবিধা আছে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইহার অল্পমহল ইজারা
লইয়াছেন। তাহাতে প্রতিবর্ষে প্রায় দুইলক্ষ টাকার কড়ি-
কাঠ উৎপন্ন হয়। শস্তের মধ্যে গোধূম, যব, ভুট্টা, দেধান,
ধাত প্রভৃতি জন্মে। নানাবিধ গাছ গাছড়া, রং, কাবাবটিনি,
আথেরোট, মধু, উর্ণা, ঘৃত ও পক্ষীর পালক বিদেশে
রপ্তানি হয়।

গ্রীষ্মকালে জম্বু হইতে মুসলমান গুজরগণ এদেশে
গোমহিষাদি চরাইতে আইসে। প্রায় ৫১৬ লক্ষ ছাগ মেঘাদি
এবং ৮।১০ সহস্র গোমহিষাদি গ্রীষ্মকালে চম্বার পর্বতে
চরিত্তা থাকে।

চম্বাপ্রদেশে লৌহপ্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হয়,
ভাঙ্গ ও কিরং পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার সর্বত্র বিশে-
ষতঃ দক্ষিণভাগে ডালহৌসী নামক স্বাভাবিকালের নিকটে
রৌপ্য পাথরের খনি আছে। এখানকার মৃত্তিকা ও জলবায়ু
৮। চাষের উপযুক্ত। জলসে মৃগ, চম্বর, বজ্রবরাহ, নেকড়ে
প্রভৃতি বাস করে। ঐ সকল শিকার করিবার জন্য অনেক
শিকারী আসিয়া থাকে। বর্ষাওয়ের জলসে কতৃৎকামুগ
আছে। চম্বা ও লাহলের মধ্যভাগে শামর হরিণ পাওয়া যায়।

নানা জাতীর ক্ষত্রিয় পক্ষী এখানে বাস করে। উহাদের
বিচিত্র পক্ষবৃত্ত গাজ্জল বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।

চম্বা, পক্ষী ও লাহলের মধ্যে আটটা গিরিবন্দ্য আছে।
চম্বাতে প্রায় ৩০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার
মধ্য দিয়া মধ্যএসিয়ার সহিত কতক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।
কাপড়, ছুরি, কাঁচি, তৈল, চর্ম প্রভৃতি লাধক, ইয়র্কন ও
তুর্কিস্থানে প্রেরিত হয়। চা, চরস ও উর্ণা বস্ত্রাদি আমদানির
মধ্যে প্রধান।

এখানকার রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সংখ্যায় অল্প এবং অনেক-
কেই হিমাচলের দক্ষিণে উপত্যকার বাস করে। বর্ষাওর
এবং কাঙ্গড়া জেলার, হুরপুর ও গুরুদাসপুর জেলার
পাঠানকোট পরগণার সীমান্ত প্রদেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস
করেন। ইহার অতি সরল, সকলই অতি প্রাচীন রীতিনীতি
অনুসারে চলিয়া থাকেন, এবং আধুনিক আচার ব্যবহারাদি
কিছুই অবগত নহেন। এখানে একদল ক্ষত্রিয় আছে ;
প্রবাদ এইরূপ যে তাঁহারা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কন্দোবে
ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। ইহার কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন
এবং ইহাদেরই জাতি হইতে অধিকাংশ রাজকর্মচারী নিযুক্ত
হয়। ইহাদের আকৃতি ও ব্যবহারাদি সমতলবাসী ক্ষত্রিয়
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাঙ্গড়া-সীমায় কুনেত জাতি
কৃষিকর্ম করে, কিন্তু তত্তরগণ তথাকার জমিদার। এই
তত্তরগণ সম্ভবতঃ তুরাণীয় জাতীয়। ইহার অল্পন বাহক,
চৌকিদার ও মজুরের কার্যও করিয়া থাকে। অধিবাসি-
গণের মধ্যে হিন্দু ১০৮৩৭৭, মুসলমান ৬৮৫২, বৌদ্ধ ৩৮৫,
শিখ ৭২ এবং খৃষ্টান ৮০।

চম্বার রাজা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব। ইনি সম্মান অনুসারে
পঞ্জাব ভূপতিগণের ১৫শ এবং সম্মানার্থ ১১টা তোপ প্রাপ্ত
হন। ইনি ১টা কামান ও ১৬০ জন সিপাহী রাখিতে পারেন।

১৮৪৬ অব্দে চম্বা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমে
ইহার কতক অংশ কাশ্মীরাদিপতিকে প্রদত্ত হইয়াছিল,
পরে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে সমগ্র চম্বা সনন্দ দ্বারা উহার রাজা ও

তাহার উত্তরাধিকারীগণকে অর্পিত হয়। প্রাচীন হিন্দু নিরমাহুসারে ইহার অনেক বিচারকার্য হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের জন্য প্রত্যেক গ্রামে এক একজন চর অর্থাৎ গোমস্তা আছে। উহাদের অধীনে একজন সরকার ও এক জন বাটোরাল অর্থাৎ চৌকিদার থাকে। গোমস্তা গ্রামের কর আদায় ও অন্যান্য বিষয় রাজসরকারে জ্ঞাপন করে।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ডালহৌসী স্বাস্থানিবাস ইংরাজ গব-মেন্টকে অর্পিত হয় এবং তৎকাল রাজ্যের কর ২০০০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে চব্বার বকুলো ও বলুন নামক স্থানদ্বয়ে ইংরাজসৈন্তের দুইটা ছাউনি প্রস্তুত হয়। উহার কতিপয়গণস্বরূপ কর আরও ৫০০০ টাকা কমাইয়া দিয়া এক্ষণে বার্ষিক মোট ৫০০০ টাকা মাত্র কর হির হইয়াছে। ইহার রাজধানী চবা। [চম্পা দেখ।]

২ পুরোঁক চবা রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৩২° ২৯' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১০' পূঃ। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫২১৮। চম্বেলি (দেশজ) পুষ্পবিশেষ, চামেলি।

চয় (পুং) চি-কর্ষণি-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৬৬) ১ সমূহ।

“চরষিষামিত্যবধারিতং পুরা।” (মাঘ ১।৩।১)

২ বপ্র। [বপ্র দেখ।] ৩ প্রাকার।

“শৈলাদভ্রাক্ষরবতা চরাটালকশোভিনী।” (ভার০ ৩।১৬।৩৭)

৪ পরিখা হইতে উদ্ধৃত মুক্তিকান্তূপ। ৫ সমাহার। (মেঘিনী)। ৬ পীঠ, বসিবার আসন। (হেম°) ৭ অগ্ন্যাদির চরনরূপ সংস্কারবিশেষ। ৮ বাত, পিত ও কফের অবস্থাবিশেষ।

“চরঃ শাম্যতি গণ্ডত প্রকোপঃ কুটুতি ক্রতম্।” (চক্রপাণি) চয়ক (জি) চরে কুশলঃ চয়-কন্ (আকর্ষাদিত্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪।) চরনকুশল।

চয়ন (ক্লী) চি-ভাবে লুট্। ১ আহরণ। ২ অগ্ন্যাদির সংস্কার-বিশেষ। “স বধা কামরেন তথা কুর্ধ্যাদিতি অচরনত তথা চরনভেতি” (শত° ত্রা° ৯।৫।২।১১) চীরতে হনেন চী-করণে লুট্। ৩ সংস্কারসাধন, বৃণ প্রভৃতি।

“যেন ভাগীরথী গঙ্গা চয়নৈঃ কাকনৈশ্চিতা।” (ভারত ৭।৫। ১) অঃ) চয়নীয় (জি) চি-অনীয়ন্। বাহা চয়ন করা হইবে, চয়নযোগ্য। চর (পুং) চরতি স্ব-পর-রাষ্ট্রগুণভাজনানার ভ্রাম্যতি চর-অচ্।

১ নিজ রাজ্য ও পররাজ্যের গুণভাজন জ্ঞানিবার জন্য নিযুক্ত দূত, চার। পর্যায়—স্বার্থবর্ণ, প্রগিধি, অপসর্গ, চার, স্পর্গ, গুঢ়পুরুষ, অপসর্গক, প্রতিক, প্রতিকল, গুণগতি, মন্ত্রগুঢ়, হিতপ্রীতি ও উদাহিত। মুক্তিকরতরুর মতে চর দুইপ্রকার—বাহার। প্রকৃতভাবে গমনাগমন করে, তাহাদিগকে প্রকাশ এবং বাহারা গুণভাবে স্বরাজ্য বা পররাজ্যের গুণভাজন

অনুসন্ধান করে, তাহাদিগকে অপ্রকাশ বলে। প্রকাশ চরের নাম দূত। [দূত দেখ।] বাহারা তর্ক ও ঈর্জিতজ্ঞ, স্বতিশক্তিযুক্ত, ক্লেণ ও আরাসহনশীল, কার্যক্ষম, ভয়শূন্য, রাজতত্ত্ব এবং সহসাই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে পারে, তাহারাই চর হইবার যোগ্য। [ইহার অপর বিবরণ দূত শব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ কপর্দক, কড়ি। (রাজনি°) ৩ মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশি।

“চরহিরঘ্যাক্ষক নামধেরা মেবাদরোহিনী ক্রমশস্ত্রিধা স্ত্যঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)। ৪ স্বাভী, পুনর্বহু, শ্রবণা, বনিষ্ঠা ও শতভিষা এই কর্ণী নক্ষত্রকে চর বলে।

“বাতাদিত্যাহরিতরং চরগণঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৫ মঙ্গলবার। ৬ অক্ষকীড়াবিশেষ। (জি) ৭ চল, অস্থির।

“তত্ত্ব সর্গাণি ত্তানি স্বাবয়বাণি চরাণি চ।” (মহু ৭।১৫) (পুং জী) ৮ ধরন পাখী। (শব্দমা°)

৮ দেশান্তর। ইহা দুইপ্রকার পূর্বাণর ও দক্ষিণোত্তর (১)। স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তে চরানয়নপ্রণালী লিখিত আছে। দিন ও রাজিমান জানিতে ইহার প্রয়োজন হয়। প্রথমে গণিতা-মুসারে গ্রহের স্পষ্ট ক্রান্তিসাধন করিয়া তাহা হইতে ক্রমজ্যা ও উৎক্রমজ্যা সাধন করিবে। [স্পষ্টক্রান্তি দেখ।] উৎক্রমজ্যা ও ত্রিজ্যা উত্তরের অন্তর করিলে বাহা হইবে, তাহাকে দিন-ব্যাসি-দল, অহোরাত্র বৃত্তের সার্দ্ধ বা জ্যজ্যা বলে। দিন ব্যাসার্দ্ধ দক্ষিণগোল ও উত্তরগোলে হইয়া থাকে, অপরটীর নাম ক্রান্তিজ্যা। বিষুবদিকের মধ্যাক্ষকালে ১২ আঙ্গুল শঙ্কুর ছায়া বত হইবে তাহা দ্বারা ক্রান্তিজ্যা গুণ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা হইবে তাহাকে কুজ্যা বলে। কুজ্যাকে ত্রিজ্যা দ্বারা গুণ করিলে বাহা হইবে, তাহাকে দিন-ব্যাসদল বা জ্যজ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। বাহা ফল হইবে তাহার নাম চরজ্যা। এই চরজ্যার অন্তর্কে চরাস্ত্র বলে। গ্রহের অহোরাত্রাসাধন করিয়া তাহার চতুর্থাংশের সহিত চরাস্ত্র যোগ ও অপর চতুর্থাংশ হইতে চরাস্ত্র বাদ দিলে যে দুইটা রাশি হইবে, তাহাই দিনার্দ্ধ ও রাত্রার্দ্ধ হইয়া থাকে। (২) (স্বর্ঘ্যসি°) [দিনরাজিমানসাধন দেখ।] ৯ নদীগর্ভে যে বালুকাময় স্থান উৎপন্ন হয়।

(১) “যেহনেন লকোদরকালিকান্তে দেশান্তরেন স্বপূরোমবে হ্যঃ।

দেশান্তরঃ প্রাগপরং তথাস্তং বাম্যোত্তরং তচ্চরসংজ্ঞকম্।”

(পৌলগাধ্যায় মধ্যপতিবা°)

(২) “ক্রান্তেঃ ক্রমোৎক্রমজ্যে যে কুর্ধ্যা তজ্যোৎক্রমজ্যা।

হীনা ত্রিজ্যা দিনব্যাসদলং তদক্ষিপোত্তরম্। ৬০।

কারিজ্যা বিষুবদ ভাষী ক্র্তিজ্যা দ্বাদশোক্তা।

চরক (পুং) চর-এব চর স্বার্থে কন্। ১ চর, দ্রুতবিশেষ।
২ বৈদ্যশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ। “দেবাকর্ণয় স্ত্রুতেন
চরকস্তোতেন জানেহি লম্।” (নৈষধচ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যখন নারায়ণ সৎস্রাবতার
হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব অথর্ববেদের
অন্তর্গত আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর অনন্তদেব
ভূতলের অবস্থা দর্শন করিতে চররূপে পৃথিবীতে আসিয়া
দেখিলেন যে, ভূমণ্ডলবাসী অনেককেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায়
কাতর হইয়াছে। দয়ালু অনন্তের হৃদয় গলিয়া গেল।
তিনি মানবের দুঃখ দূর করিতে বড়ঋষেবের্তা মুনি-
পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। ইনি চর রূপে পৃথিবীতে
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কারণ তাঁহার নাম চরক হইয়াছে।
চরকাচার্য্য অল্পদিন মধ্যেই মানবমণ্ডলীর ব্যাধির সূ-চিকিৎসা
করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইলেন। আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবিশ
প্রভৃতি যে সকল বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন,
পণ্ডিতবর চরক সেই সকলের সংস্কার ও সারসংগ্রহ গ্রন্থ
করিয়া নিজ নামে (চরকসংহিতা) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন
করেন। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব° ১ ভাগ)

৩ চরকমুনি প্রণীত একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ। ইহা আট
ভাগে বিভক্ত—সূত্র, নিদান, বিমান, শারীর, ইন্দ্রিয়,
কল ও সিদ্ধিহীন। প্রচলিত বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে চরক
একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ৪ একজন প্রাচীন বৈদ্যকরণ।
ক্ষীরস্বামী ও মোহনদাস ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।
৫ চরকর। ৬ চরুক। (শব্দার্থচি°) ৭ পর্পট। (রাজনি°)
চরকসংহিতা (স্ত্রী) চরকেণ নির্মিতা সংহিতা মধ্যলো°।
বৈদ্যকগ্রন্থবিশেষ। [চরক দেখ।]

চরুকা (চরু শব্দজ) স্ত্রী কাটিবার কলবিশেষ। পূর্বে বঙ্গ-
দেশে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে চরুকা থাকিত। অবকাশ
মত স্ত্রীলোকেরা তাহাতে স্ত্রী কাটিত। এখন তত্ত্বাবধায়েরা
চরুকা ব্যবহার করে। হিন্দুর বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে চরুকার
প্রয়োজন হয়।

চরকাল (পুং) কালবিশেষ, দিনমান স্থির করিতে ইহার
প্রয়োজন হয়। [দিনরাত্রিগান দেখ।]

চরুকি (চরু শব্দজ) ১ চরু, যাহা চতুর্দিকে সমান ভাবে
ঘুরিয়া থাকে। ২ এক প্রকার বাজী, ইহার মুখে আগুণ
দিলে চরুকারে ঘুরিতে থাকে।

ত্রিভাণ্ড গণাহারাত্মক-কর্ণাণ্ড চরুসংঃ। ৬১।

তৎকার্য্যমুচ্চরুকাভ্যো ধর্মহানী পৃথক্ৰিতে।

বাহোরাত্তরুর্ভাগে দিনরাত্রিদলে স্মৃতে। ৬২। (সূর্যাসি°)

চরগৃহ (স্ত্রী) চররূপং গৃহং। মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকর
রাশি। [চর দেখ।] চরণেহ প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত।

চরট (পুং স্ত্রী) চরতি নৃত্যতি চর-বাহুলকাৎ অটহ। খঞ্জন
পাখী। (শব্দমা°) স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ হর।

চরণ (পুং স্ত্রী) চর-করণে লুট্ (অর্দ্ধাচাদি গণাস্তর্গত বলিয়া)
উভয় লিঙ্গ। পা ২।৪।৩।১।) ১ দেহাবয়ববিশেষ, পদ। পর্য্যায়—
পাদ, পৎ, অঙ্গি, বিক্রম, পদ, আক্রম, ক্রমণ, চলন, ক্রম।

“দ্বিতীয়ে হস্তচরণৌ তৃতীয়ে বধ মর্হতি।” (মহু ৯।২৭৭)

২ বেদের একদেশ, শাখা। “গোত্রক চরণৈঃ সহ।” (মহাভাষা)

৩ সূর্য্য প্রভৃতির কিরণ। ৪ স্রোতের চতুর্থ ভাগ,
পাদ। “প্রথমাজিস্রোতঃ স্রোতঃ তৃতীয়েচরণো ভবেৎ।”

(হল্লান্দ°) ৫ চতুর্থভাগ। “পশুস্তি খেটাস্ত্রচরণাতিবৃদ্ধিতঃ।”

(জ্যোতি°) ৬ একদেশ। “জ্যোতিস্ত্রচরণাতিবৃদ্ধিতঃ।”

(শা° সূ°) চর ভাবে লুট্। ৭ অমুর্ভান। “তপসশ্চরণৈ-

শ্চোটৈঃ।” (মহু ৬।৭৫) ৮ গমন।

“যত্রামুকামং চরণং ত্রিণিকে ত্রিণিকে দিবঃ।” (শুক ৯।১১৩ ৯)

১০ ভক্ষণ।

“অকৃত্বা ভৈক্ষচরণ মসমিখাচ পাৰকম্।” (মহু ২।১৮৭)

১১ আচার। (হেম°) চরতি বিচরত্যত্র চর অধিকরণে

লুট্। ১২ চরণস্থান, যেখানে বিচরণ করা হয়। “অঙ্গরসং-

গন্ধর্বাণাং যুগাণাং চরণে চরন্।” (শুক ১০।১৩৬, ৬) ‘চরণে

সফারভূতে দিব্যাস্তরীক্ষে চ তথা যুগাণাং সিংহাদীনাম্ সফার-

স্থলে পৃথিব্যাং।’ (সায়ণ।)

১৩ ভাষ্কর্য্যি গোত্রীয় দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা।

চরণগ্রন্থি (পুং) চরণস্ত গ্রন্থিঃ ৬তৎ। গুল্ক, গোড়ালী।

চরণদাস, জ্ঞানসুরোদয় নামক হিন্দীগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৪৮০

খৃঃ অব্দে ফরজাবাদের পণ্ডিতপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

চরণদাস, চরণদাসী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থাপনকর্তা।

ইনি ১৭৬০ সংবতে ধুসার নামক বশিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন

এবং ১৮৩৯ সংবতে গতাস্থ হন। সম্রাট ২য় আলমগীরের

সময় ইনি প্রাজভূত হন। বাল্যকালে ইনি দিল্লীতে গিয়া

উত্তমরূপে সংগীতশিক্ষা করেন। পরে চরণদাসী নামক

বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। দিল্লীতে ইহার মঠ আছে।

ইনি ভাগবত ও গীতার ভাষা এবং সন্দেহসাগর, ধর্মজাহাজ

প্রভৃতি হিন্দী বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। [চরণদাসী দেখ।]

চরণদাসী (স্ত্রী) ১ নিজ স্ত্রী। ২ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

চরণদাস ইহার প্রবর্তক। চরণদাসীরা কৃষ্ণকেই জগতের

আদিকারণ পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে বটে, তথাপি ইহাদের

মত কতক অংশে বৈদান্তিকদিগের ভ্রাম্য। অন্যান্য বৈষ্ণব-

দিগের ন্যায় ইহারাও দীক্ষাশ্রমকে অগাধ ভক্তি করে ও ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে। ইহারা জাতিভেদ মানে না। প্রথমে ইহারা শালগ্রাম পূজা করিত না, অবশেষে রামানুজ সম্প্রদায়ের সহিত মিল রাখিবার নিমিত্ত শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিয়াছে।

ইহাদের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহারা ভক্তিকে কর্তৃক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিবেচনা করে না। সুতরাং ইহারা সদাচার ও স্ত্রীনীতি ভাল বাসে। মাধব সম্প্রদায় হইতে ইহারা নীতিশিক্ষা অমুকরণ করিয়াছে। [মাধব দেখ।]

ইহাদের অনেকে বিবাহাদি করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করে, আবার অনেকে সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। শেখোক্ত বৈষ্ণবগণ পীতবর্ণ পরিচ্ছদ, ললাটে গোপীচন্দন রেখা, মস্তকে সূত্রগ্র টুপি ও গলায় তুলসীমালা ধারণ করে। ইহাদের বিস্তার শিখা আছে। গোপীকুলস্থ গোপীমৌদিগের প্রতিপত্তি নাশ করিবার জন্যই সম্ভবতঃ এই দলের সৃষ্টি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা ইহাদের ধর্মশাস্ত্র। চরণদাস নিজের ও তদনুযায়ী অনেকে চলিতভাষায় ঐ গ্রন্থদ্বয়ের অমূল্যবাদ করিয়াছেন। চরণদাসের ভগিনী সাহজীবাই ভ্রাতার নিকট সর্বপ্রথম এই ধর্মে দীক্ষিত হন। দিল্লীনগর ইহাদের প্রধান আড্ডা।

চরণশ্রাস (পুং) চরণশ্র শ্রাসঃ ৬তং। পাদন্যাস, পাদক্ষেপ।
চরণপর্জন (ক্লী) চরণশ্র পর্জন ৬তং। গুলফ, পায়ের গোড়ালি।
চরণপাত (পুং) ১ পাদন্যাস। ২ পদস্থলন।

চরণপাহাড়ী, রক্ষাবনের অন্তর্গত কাম্যবনের সীমার মধ্যে লুকালুকুণ্ডের পার্শ্বস্থ একটি পাহাড়। বৈষ্ণবেরা এই পর্বতের চরণপাহাড়ী নামের কারণ এইরূপ নির্দেশ করেন—
“কোন সময়ে গোপমহিলাগণ কৃষ্ণের সহিত লুকালুকুণ্ডে জলক্রীড়া করিতে যাইয়া পরামর্শ করিল যে, কৃষ্ণের সহিত একসঙ্গে ডুব দিব, কিন্তু তাঁহার উঠিবার পূর্বে উঠিব, আর যেমন দেখিব যে তিনি উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি আবার ডুব দিব। তাহা হইলেই তিনি অগ্রে ও আমরা পশ্চাৎ উঠিয়াছি প্রমাণ হইবে। কৃষ্ণ রাধা প্রভৃতির চালাকি বুঝিতে পারিয়া প্রথম ডুবেই বহুদূর সরিয়া গেলেন এবং একটি পর্বতে উঠিয়া গোপীদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। এদিকে গোপীরা বার বার ডুবিতে ও উঠিতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল না, অবশেষে কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া সকলে মিলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণ সময় বুঝিয়া বাণী ধরিলেন। গোপীরা ছুটিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের মধুর বাণীরবে পাষণ্ডময় পাহাড়ও কোমল

হইয়া গেল। তাহাতে কৃষ্ণের চরণচিহ্ন পাহাড়ের চূড়ায় অঙ্কিত হয়। এই কারণে উহাকে চরণপাহাড়ী বলে। (ভক্তমাল)

এই পাহাড়ের প্রস্তর বর্ষণ ও সন্দর্গী নামক পাহাড়-ঘরের অমূল্যরূপ। এক সময়ে এই প্রস্তর কাটিয়া ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হয়, তাহাতে দেশীয় লোক আপত্তি করায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফিট এবং দৈর্ঘ্য এক মাইলের চতুর্থাংশের অধিক নহে। ইহার অধিকারীর নাম রাখিকাদাস।

এই পর্বতে ইন্দ্রযব, গজের ও নির্ঝিলালতা প্রভৃতি জন্মে। পাহাড়ের চতুর্দিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল আছে। এই স্থান দর্শন করিলে ব্রজধামের বহুবিধ ফল পাওয়া যায়।

চরণবৃহ (পুং) চরণ্যমাং শাখানাং বৃহোহিত্র বহুব্রী। বেদের শাখাবিভাগাদির পরিচায়ক একখানি গ্রন্থ। অথর্ববেদের ৪৯ পরিশিষ্ট এবং কাণ্ডায়নের ৫ম পরিশিষ্টকেও চরণবৃহ বলে। বেদব্যাস, শৌনক প্রভৃতি রচিত চরণবৃহও আছে। কৃষ্ণদত্ত, মহীদাস, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি রচিত চরণবৃহের টীকা দৃষ্ট হয়।

চরণশুক্লমা (ক্লী) চরণয়োঃ শুক্লমা ৬তং। পদসেবা।
চরণস (ত্রি) চরণেন নিবৃত্তঃ চরণ-চাতুর্য্যিক স (পা ৪।২।৮০।)
চরণনিবৃত্ত দেশাদি।

চরণসেবক (ত্রি) চরণশ্র সেবকঃ ৬তং। যে চরণ সেবা করে।
চরণসেবা (ক্লী) চরণশ্র সেবা ৬তং। পদসেবা, পা টেপা।
চরণা (ক্লী) যোনিরোগবিশেষ।
চরণাক্ষ (পুং) অক্ষপাদ, গৌতম।
চরণাক্ষুগ (ত্রি) ১ শরণাগত। ২ পশ্চাৎগামী।
চরণাভরণ (ক্লী) চরণশ্রাভরণং ৬তং। চরণের অলঙ্কার, পাদভূষণ।

চরণামৃত (ক্লী) চরণশ্রামৃতং ৬তং। পাদোদক।
চরণায়ুধ (পুং ক্লী) চরণএবায়ুধঃ অন্ত্রবিশেষো যশ্র বহুব্রী। কুকুট।
“আকর্ণ্য সম্প্রতি কৃতং চরণায়ুধানাং।” (সাহিত্যদ্র ৩ পরিঃ)
ক্রীলঙ্গে ভীষ্ হয়। (ত্রি) চরণৌ আয়ুধাবিব যশ্র বহুব্রী। ২ যাহার চরণ আয়ুধের জায়। “তুণ্ডপক্ষপ্রহারেণ জটায়ুশ্চরণায়ুধঃ।” (রামায়ণ ৩।৫৬।৩৫।)

চরণি (পুং) চরণ-অনি। মনুষ্য।
“স্ববিধাসং চক্ৰতাং চরণীনাম্।” (ঋক্ ৮।২৪।২৩)
‘চরণীনাং মনুষ্যাণাং।’ (সারণ।)

চরণিল (ত্রি) চরণ-চাতুর্য্যিক ইল। চরণ দ্বারা নিবৃত্ত।
চরণোপাস্ত (পুং) চরণশ্র উপাস্তঃ ৬তং। চরণ সমীপ, পায়ের নিকট।

চরন্টী (স্ত্রী) চিরন্টী পূবোদয়াদিব্যাং ইকারন্ত অকারঃ ।

চিরন্টী, সুবাসিনী । (হেমং)

চরণা (ত্রি) চরণা-উণ্ । চরণশীল, গমনশীল । “চক্ষুর্ন গ্রহিণী

চরণাঃ ।” (ঋক্ ১০।১৫।৬) ‘চরণা-চরণশীলঃ’ (সায়ণ ।)

চরতা (স্ত্রী) চরত ভাবঃ চর-তল্-টাপ্ । ১ চরের ধর্ম, চরত ।

(দেশজ) ২ বুদ্ধি ।

চরণ (ত্রি) চর-অথ । ১ জন্ম । “হাতুশ্চরণমক্ষুণ্ ব্যার্ণোৎ ।”

(ঋক্ ১।৬৮।১) ‘চরণং জন্মং’ (সায়ণ ।)

২ চরণশীল, গমন করা যাহার স্বভাব ।

“পুরুষা চরণং মধে ।” (ঋক্ ৮।৩৩।৮) ‘চরণং চরণশীলং’ (সায়ণ ।)

(স্ত্রী) ৩ বিচরণ, ভ্রমণ । “কুধী ন উর্দ্ধাঙ্করথায় জীবসে ।”

(ঋক্ ১।৩৬।১৪) ‘চরণায় লোকে চরণায়’ (সায়ণ ।)

চরদেব (পুং) রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত একজন যোদ্ধা । (৭।১৫৫৪)

চরক (পারসী) বাস্তর চরুদিকহ নিমভূমি, চলিত বাঙ্গালায় চরকা বলে ।

চরভ (স্ত্রী) চরয়াশি, চরগৃহ ।

চরভবন (স্ত্রী) [চরগৃহ দেখ ।]

চরম (ত্রি) চরতি চর-অমচ্ (চরেষ্ট । উণ্ ৫।৬৯।১) ১ অন্ত্য ।

২ পশ্চিম । ৩ শেষোৎপন্ন । “অত্রবীং ক্রিয়তামেবাং স্ততানাং চরমা ক্রিয়া ।” (ভারত ৪।২৪ অঃ)

(স্ত্রী) ৪ অন্ত, পশ্চাৎ । “উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমং চাত চরমং চৈব সন্নিশেৎ ।” (মনু ২।১৯৪)

চরমকাল (পুং) চরমশাস্ত্রো কালশ্চেতি কর্মধাৎ । শেষসময়, মৃত্যুকাল ।

চরমক্ষাত্ত্বং (পুং) চরমশাস্ত্রো ক্ষাত্ত্বেন্চেতি কর্মধাৎ । অন্ত্যচল, পশ্চিমাচল । চরমগিরি, চরমাচল প্রভৃতি শব্দ ও এই অর্থে ব্যবহৃত ।

চরমশৈর্ষিক (ত্রি) চরমং পশ্চিমস্থঃ শীর্ষ অন্ত্যস্ত চরমশীর্ষন্থন । পশ্চিমশীর্ষ, যাহার মাথা পশ্চিমদিকে থাকে ।

“অথ দক্ষিণমাবৃত্য বুধীং চরমশৈর্ষিকীম্ ।” (ভারত ১৩।১০।২৯)

চরমাজা (স্ত্রী) অতি ক্ষুদ্র অজা ।

“চরমাজা মপেচিরন্ ।” (অথর্ব ৫।১৮।১১)

চরবী (পারসী) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, বসা । [বসা দেখ ।]

চরবীদার (পারসী) যাহার চরবী আছে ।

চরব্য (ত্রি) চরবে হিতং চর-ব্যৎ (উগবাদিত্যোযৎ । পা ৫।১।২।)

চরুর হিতকর তত্ত্ব প্রভৃতি ।

চরস্, গাঁজা গাছের ও তাহার ফুলের আঠা । গাঁজার মধ্যে বিশেষতঃ ইহার ফুল ও পক বীজের মধ্যে রজনৈর মত একপ্রকার আঠা থাকে, ঐ আঠা গাঁজা হইতে সময়ে সময়ে

পৃথকভাবে বাহির করিয়া লওয়া হয়, সেই আঠাকেই “চরস” বলে । যে স্থানে গাঁজার আবাদ হয়, তাহার সকল জায়গায় চরস পাওয়া যায় না । কারণ বঙ্গদেশে ও অপর অনেক দেশের গাঁজা গাছে আঠা অতি অল্পমাত্র বাহির হয়, স্ততরাং এ সকল প্রদেশে ভালরকম চরসও পাওয়া যায় না । হিমালয়ের নিকটস্থ প্রদেশে বিশেষতঃ গড়বাল ও নেপাল প্রভৃতি স্থানের গাঁজাগাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঐরূপ আঠা থাকে, স্ততরাং ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে চরস উৎপন্ন হয় । সুরোপ অতি নীত প্রধান বলিয়া তথাকার গাঁজা গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আঠা নিঃসৃত হয় না, স্ততরাং তথায় সেরূপ পরিমাণে চরস উৎপন্ন হইবার আশাও নাই । গাঁজা গাছ তফাৎ তফাৎ থাকিলে তাহাতে আঠা বেশী জন্মে ।

ঐয়কালে চরস প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার প্রস্তুত-প্রণালী সাধারণতঃ তিনপ্রকার—টাটকা অথচ স্পৃগ গাঁজা গাছকে অগ্নির মুহ উত্তাপে নরম করিয়া পরে হামানদিস্তায় পেষণ করিলে গাজসংলগ্ন আঠা একত্র হইয়া চরসরূপে পরিণত হয় ।

দ্বিতীয় প্রণালী এই—চরস প্রস্তুতকারীগণ চর্মনির্মিত পায়জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া গাঁজাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনাগমন করে এবং তদ্বারা গাঁজাবৃক্ষের সহিত তাহাদের গাত্রে সংস্পর্শ ও সংঘর্ষণ হওয়ায় গাঁজা বৃক্ষের রজন স্ফূর্ণ আঠা তাহাদের চর্মনির্মিত পরিচ্ছদে লাগিয়া যায় । তাহারা পোষাক হইতে এই আঠা পৃথক করিয়া লয় এবং তাহাতেই চরস উৎপন্ন হইয়া থাকে । চরসপ্রস্তুতকরণের শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী এই—গাঁজা গাছের বন্ধিতাবস্তায় হাত দিয়া উহার মধ্য হইতে নির্গাস বা আঠা বাহির করিয়া লইতে হয় এবং উহাই চরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

পঞ্জাব অঞ্চলে গাঁজার বীজগুলি তুলিয়া হস্তদ্বারা একত্র মর্দন করিলে চরস পাওয়া যায় । ইরক্কন্দ ও কাশ্মীর প্রদেশের চরস অত্যুৎকৃষ্ট । তথায় গর্দী নামক চরসই অধিক ব্যবহৃত হয় । গর্দী তিনপ্রকার স্থর্থা, ভল্লারা ও থাক । কলু, কাজড়া ও কাশ্মীর প্রদেশ দিয়া পঞ্জাব প্রদেশে কাশ্মীর ও ইরক্কন্দ প্রদেশের চরস আনীত হয় ।

ভারতবর্ষে বোখারী, রকান্দী, কাশ্মীরী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীর চরস পাওয়া যায় । সকল প্রকার চরসের মধ্যে মোমের তায় চরসই সর্বোৎকৃষ্ট । নেপাল প্রদেশে বোখারী চরসের আদর বেশী । দিল্লীপ্রদেশস্থ গড়বাহার নামক স্থান চরসের প্রধান আড্ডা ।

চরস গাঁজা ও সিকির ভাৱ মাদক পদাৰ্থ, তবে গাঁজাৱ ভাৱ ইহাতে মাদকভাৱকি বেনী নাই। প্ৰথমে তামাকের মধ্যে চরস পুৱিয়া অগ্নিতে আৱশ্যক মত পুড়াইয়া লয়। পৰে অৱ তামাকের সহিত এই চরস মিলাইয়া কলিকাতে সাজিয়া ধূম পান কৰে। ধূমপান কৰিবামাত্ৰ নেশা হইয়া থাকে, অৰ্থাৎ চরসের নেশা শীঘ্ৰই হয়, আবার এই নেশা শীঘ্ৰই ছুটিয়া যায়। চরস অকস্মাৎ বাৰহাৱ কৰিলে মানসিক বিব্রম ঘটয়া থাকে। চরসের নেশাৱ চক্ষু অধিক ৱক্তবৰ্ণ হয়।

এসিয়া, ও মিশৰদেশে বহুকাল হইতে মাদক দ্ৰব্য স্বৰূপ চরস ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভাৰ্জাৱ ৱইল ও মৱে সাহেব লিখিয়াছেন যে য়ুৰোপেও অতি প্ৰাচীনকাল হইতে ঔষধেৰ মধ্যে চরস ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পূৰ্বে পাঁচ ছয় টাকা কৰিয়া চরসেৰ সেৱ বিক্ৰয় হইত।

চরসী (দেশজ) বাহাৱ চরস খাৱ। চরসখোৱ।

চৰা (চড়া) মানভূম জেলাৱ অন্তৰ্গত একটা গ্ৰাম। অক্ষা° ২৩° ২৩' ০" উঃ, দ্ৰাঘি° ৮৬° ২৭' ৩০" পূঃ, পুৰুলিয়ানগৰেৰ নিকটে অবস্থিত। এখানে অতি প্ৰাচীন পাথৰে নিৰ্মিত ও লোহাৱ বাঁধ দেওয়া দুইটা জৈন-দেৱালয় আছে। পূৰ্বে এইৰূপ ৭টা দেৱালয় ছিল, দুইটা ভিন্ন সকলগুলিই পড়িয়া গিয়াছে। মন্দিৰে তেমন কাৰুকাৰ্য্য নাই, কিন্তু এখানকাৱ তীৰ্থকৰেৰ মূৰ্ত্তিগুলি দেখিবাৱ জিনিস। এখানে শ্ৰাবক-দিগেৰ নিৰ্মিত কৃতকগুলি বড় বড় জলাশয় আছে।

চৰাচৰ (জি) চৰ-অচ্চ নিপাতনে সাধু। ১ জন্ম। ২ ইষ্ট। (হেম°) (পুং) ৩ কপৰ্দক, কড়ি। (ৰাজনি°) চৰেণ সহ অচৰঃ। ৪ স্থাবৰ ও জন্ম।

“চুক্ষোভাভোজ্যমাসাদ্য যস্মিন্জ্যোক্তাশ্চৰাচৰাঃ।” (ভাগ° ৩।৬।৫)

(ক্ৰী) চৰাচৰয়োঃ সমাহাৱঃ। ৫ স্থাবৰ ও জন্ম, জগৎ।

চৰাচৰগুৰু (পুং) চৰাচৰত্ৰ গুৰুঃ ৬তৎ। ১ পৰমেশ্বৰ। ২ স্থাবৰজন্মমাত্ৰক জগতেৰ সৃষ্টিকৰ্ত্তা, ব্ৰহ্ম।

চৰাণ (দেশজ) নানাস্থানে লইয়া বেড়ান।

চৰাণি (চাৱণ শব্দজ) মাঠ, ময়দান, পণ্ডচাৱণস্থান।

চৰি (পুং) চৰ-ইন্ (সৰ্গধাতুত ইন্। উণ্ ৪।১১৭।) পণ্ড।

চৰিত (জি) চৰ-কৰ্মণি-ক্ত। ১ অহুষ্ঠিত, কৃত। (ক্ৰী) চৰ ভাবে ক্ত। ২ চৰিত্ৰ।

“ৰাজ্যং চৌভয়বৎস্থানাং চৰিতং পৰমাত্মতম্।” (ভাগ° ১০।১।১)

উজ্জলনীলমণিৱ মতে চৰিত দুইপ্ৰকাৰ অহুতাব ও লীলা।

“অহুতাবাশ্চ লীলা চেতুচাত্যে চৰিতং দ্বিধা।” (উজ্জলনী°)

[অহুতাব ও লীলা দেখ।] ৩ অহুষ্ঠান। (জি) চৰ-কৰ্মণি-ক্ত। ৪ গত। ৫ প্ৰাপ্ত। ৬ জাত।

চৰিতময় (জি) চৰিত-ময়ট্। চৰিতাম্বক।

চৰিতব্য (জি) চৰ-তব্য। চৰিতেৰ যোগ্য। “উপাংগ বাচা চৰিতব্যঃ।” (ঐতৰেয়ব্ৰা° ১।৪৮)

২ অহুষ্ঠেৰ, কৰ্ত্তব্য।

“নবাধ্যর্থো বিবৃদ্ধিচৰিতব্যঃ কথঞ্চন।”

(ভাৱত ১।১৯৬অঃ)

চৰিতব্ৰত (জি) চৰিতং অহুষ্ঠিতং ব্ৰতং যেন বহত্ৰী। কৃত-ব্ৰত, যে ব্ৰতাচৰণ কৰিয়াছে।

চৰিতাধ্যান (ক্ৰী) চৰিতত্যাধ্যানং ৬তৎ। চৰিতকীৰ্ত্তন, চৰিতবৰ্ণন।

চৰিতাধ্যায়ক (জি) চৰিতত্যাধ্যায়কঃ, ৬তৎ। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিৱ জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কৰে, চৰিত্ৰলেখক।

চৰিতাৰ্থ (জি) চৰিতঃ কৃতোৰ্থঃ প্ৰয়োজনং যেন বহত্ৰী।

১ কৃতার্থ, যাহাৱ কাৰ্য্য বা প্ৰয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। ২ সকল।

“প্ৰৱ্ত্তিৱাসীচ্ছদানাং চৰিতাৰ্থা চতুঃত্ৰী।” (কুমাৱ ২।৭)

চৰিতাৰ্থতা (ক্ৰী) চৰিতাৰ্থত্ৰ ভাবঃ চৰিতাৰ্থ-তন্-টাপ্। চৰিতাৰ্থেৰ ভাব, কৃতার্থতা।

চৰিতাৰ্থত্ৰ (ক্ৰী) চৰিতাৰ্থত্ৰ ভাবঃ চৰিতাৰ্থ-ত্ৰ। কৃতার্থতা।

“অন্তোহা ভাবতো নাশ্চ চৰিতাৰ্থত্ৰমুচ্যতে।” (ভাষাপৰি°)

চৰিতিন্ (জি) [দুশ্চৰিতিন্ দেখ।]

চৰিত্ৰ (ক্ৰী) চৰ-ইজ (অৰ্জি-লু-ধৃ-স্থ-খনসহচৰ ইজঃ। পা ৩।২।১৮৪)

১ স্বভাব। পৰ্যায়—চৰিত, চাৱিত্ৰ, চৰীত। “অচিন্ত্যঃ শীলগুণানাং চৰিত্ৰং কুলযোষিতাং।” (কথাসৰিৎ ৪।৮০।)

২ অহুষ্ঠান। ৩ চেষ্টা। ৪ লীলা প্ৰভৃতি। (শব্দৰত্না°)

চৰিত্ৰপুৰ, উৎকলেৰ একটা প্ৰাচীন নগৰ। চীনপৰিব্ৰাজক

হিউএন্সিয়ং চে-লি-ত লো নামে ইহাৱ উল্লেখ কৰিয়াছেন।

তাঁহাৱ বৰ্ণনাৱ জানা যাৱ যে এই স্থান সমুদ্ৰেৰ নিকটবৰ্ত্তী

হওয়াৱ তৎকালে এখানে নানা দেশেৰ লোক বাণিজ্য

কৰিতে আসিত।

প্ৰকৃততত্ত্ববিদ্ কনিংহামেৰ মতে, এখনকাৱ পুৰীই প্ৰাচীন

চৰিত্ৰপুৰ। কিন্তু আমাৱা তাঁহাৱ মত গ্ৰহণ কৰিতে পাৰিলাম

না। চৰিত্ৰপুৰেৰ বৰ্ত্তমান নাম চোৱপুৰ, ইহা পুৰীজেলাৱ

অন্তৰ্গত ও বাগাৱী নদীৱ উত্তৰকূলে অবস্থিত।

চৰিত্ৰবৎ (জি) চৰিত্ৰ প্ৰশংসাৰ্থে মতুপ্ মত্ৰ বঃ। প্ৰশস্ত

চৰিত্ৰবৃত্ত। “বৈদ্যাং চৰিত্ৰবন্তং ব্ৰাহ্মণম্।” (আশ্বলা° গৃহ° ৪।২)

চৰিত্ৰো (ক্ৰী) চৰিত্ৰ টাপ্। তিস্তিভী বৃক্ষ। (শব্দৰত্নাবলী)

চৰিমু (জি) চৰ-ইচ্চ। (পা ৩।২।১৩৬) ১ জন্ম। চৰণশীল।

“বিৱাট্ৰিৱাট্ৰ স্থাৱু চৰিমু ভূমঃ।” (ভাগবত ২।৬।৪০)

(পুং) ২ কীৰ্ত্তিমান্ৰেৰ পুত্ৰ।

চরিস্থধুম (ত্রি) চরিস্থধুমো যত বহতী। যাহার ধুম চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, চরণশীল ধুমবিশিষ্ট।

“চরিস্থধুমগৃভীত শোচিষম্” (ঋক্ ৮।২৩।১) ‘চরিস্থধুমং সর্গতশ্চরণশীলধুমজালাম্’ (সারণ)

চরু (পুং) চর্যতে ভক্ষ্যতেহ্যাদিভিঃ চর-কর্মণি উঃ, যদা চরতি হোমাদিকমন্মায় চর-অপাদানে উ। (ভৃশ্নীতৃ চরিত্য-সরিতনিধনিমিসৃজিত্য উঃ। উণ্ ১।৭) ১ হব্যাম, হোমের জন্য যে অন্ন পাক করা হয়, যজ্ঞীয় পায়সাম। চরন্ত্যাপোহত্র চর-উ অধিকরণে। ২ মেঘ। (নিঘণ্টু) ৩ চরুপাকপাত্র, যাহাতে চরুপাক করা হয়। (বিষ্ণু।)

কর্ম্মশ্রদীপের মতে অশ্বাথোক্ত বিধি অনুসারে অন্ন স্নসিক্ করিয়া পাক করিলে তাহাকে চরু বলে। চরু অতিশয় কঠিন বা খুব শিথিল করিতে নাই, দক্ষ না হয় অথচ ভাল হয়, এইরূপ ভাবে পাক করিবে (১)।

ভবদেবভট্টের মতে চরুপাক প্রণালী—যথানিয়মে অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চিমদিকে কতকগুলি কুশ পূর্বাগ্র করিয়া রাখিবে। বরুণ কাষ্ঠ দ্বারা একটা উদ্বল, মুসল ও চমস এবং বংশলকা দ্বারা কুলা প্রস্তুত করিতে হয়। [চমস ও কুশটিকা দেখ।] উদ্বল, মুসল, চমস ও কুলা প্রাকালিত করিয়া কুশের উপরে রাখিয়া দিবে। চমসে জল ও কুলায় ত্রীহি বা যব রাখিতে হয়। মন্ত্র পড়িয়া চমসস্থিত জল দ্বারা ত্রীহি বা যব ৮ বার প্রোক্ষিত করিবে। প্রোক্ষণ করিবার মন্ত্র—১ ওঁ বাস্তোম্পত্যে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ২ ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ৩ ওঁ ভূষাজুষ্টং প্রোক্ষামি। ৪ ওঁ ভুব্বাজুষ্টং প্রোক্ষামি। ৫ ওঁ স্বর্ষাজুষ্টং প্রোক্ষামি। ৬ ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। এই ৬টা মন্ত্রদ্বারা ৬বার প্রোক্ষণ করিয়া অমন্ত্রক দুইবার প্রোক্ষণ করিতে হয়। ১টা কাংতপাত্র বা চরুস্থালী দ্বারা ত্রীহি বা যব উঠাইয়া উদ্বলে রাখিবে। ত্রীহি বা যব ৮বার উঠাইতে হয়। উঠাইবার মন্ত্র যথা, ১ ওঁ বাস্তোম্পত্যে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ২ ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৩ ওঁ ভূষাজুষ্টং নির্বপামি। ৪ ওঁ ভুব্বাজুষ্টং নির্বপামি। ৫ ওঁ স্বর্ষাজুষ্টং নির্বপামি। ৬ ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। এই ৬টা মন্ত্রে ৬বার উঠাইয়া দুইবার অমন্ত্রক উঠাইবে। ডান হাতখানি উপরে রাখিয়া মুসল ধরিতে হয়। মুসলের আঘাত করিয়া চাউল প্রস্তুত করিবে এবং কুলায় ঝাড়িয়া তুষ ও কণা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইবে। তিনবার এইরূপ করিতে হয়। ইহার পরে ঐ চাউল তিন-

বার প্রাকালন করিবে। চরুস্থালীর মধ্যে একটা পবিত্র উত্তরাগ্র করিয়া রাখিয়া তাহার উপর প্রাকালিত তণুল তদু-পযুক্ত ছদ্ম ও কিয়ৎ পরিমাণ জল দিয়া পাক করিবে। মেকণটা দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইয়া একপভাবে পাক করিবে, যেন অন্ন স্নসিক্ হয় অথচ গলিয়া বা পুড়িয়া না যায়। পাক হইলে তাহাতে স্নতস্রব দিয়া অগ্নির উত্তরে কুশের উপরে রাখিবে। পাক করিবার সময়ে চরুস্থালীর যে দিক্ যে দিকে ছিল, ঠিক সেই দিক্ সেই দিকে রাখিয়া কুশের উপরে স্থাপন করিতে হয়। এই কারণে নামাইবার পূর্বেই স্থালীটিকে চিহ্নিত করিয়া লইতে হয়। ইহার পরে চরুর মধ্যে আর একবার স্নতস্রব দিবার বিধান আছে। (ভবদেবভট্ট) কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও তাহার ভাষ্যে চরুপাকপ্রণালী এই রূপ লিখিত আছে—অধ্বর্যা প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া অপূর্ণ চরুস্থালী ও স্নাজ বা উপ্ত মুষ্টিতে ত্রীহি গ্রহণ করিবে। অথবা অপূর্ণ স্রক্ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাঘ্রির উত্তরে ও গার্হপত্যের পশ্চিমে দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া ত্রীহিতে আঘাত ও কণ্ডন (অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া) করিবে। চাউল হইলে উদ্বল হইতে কুলায় উঠাইয়া তুষ ও কণা প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিবে। কোন শাখার মতে দক্ষিণাঘ্রির উত্তরে একখানি কৃষ্ণাজিন উত্তরগ্রীব করিয়া পাতিবে। সেই কৃষ্ণাজিনের উপরে উদ্বল রাখিয়া ধাত্রে আঘাত ও কণ্ডন করিবার বিধান আছে। এইরূপে যে তণুল প্রস্তুত হয়, তাহাকে সারতণুল বলে। চরুপাকে তণুল বেশী সিদ্ধ করিতে নাই এবং এইরূপ ভাবে পাক করিবে যেন চরুপাক হইলে স্থালী পূর্ণ না হয় (২)। (অপর বিবরণ কর্ম্মশ্রদীপ ও পত্ৰপতি কৃত পদ্ধতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

চরুকা (স্ত্রী) ত্রীহি বিশেষ। (চরক)

চরুচেলিন্ (পুং) চরুচেলমিবাস্তান্ত চরু-চেল-ইনি। মহাদেব।

“চরুচেলী মিলীমিলী।” (ভারত ১৩।২৮৬ অঃ)

চরুত্রণ (পুং) চরোত্রণ ইব। চিত্রাপূপ, চিতাই পিঠা। (ত্রিকাণ্ড)

চরুস্থালী (স্ত্রী) চরোঃ স্থালী ৬তৎ। যে পাত্রে চরুপাক করা হয়, চরুপাকের পাত্র। কর্ম্মশ্রদীপের মতে মৃগ্নয় বা উডুয়র নির্মিত চরুস্থালীই প্রশস্ত। ইহার মুখ অতিশয় বৃহৎ করিতে নাই। ত্রিঘৃক ও উর্দ্ধভাগে একটা লম্বা পরি-মিত (প্রাদেশ প্রমাণ) ও শক্ত করিতে হয়।

(২) “অপরেণ গার্হপত্যঃ চরুপূর্ণঃ স্রবঃ বা তুষ্ণীঃ পূহীষোত্তরেন দক্ষি-ণায়াবহন্ত তিষ্ঠন।” (কাত্যায়নশ্রৌ ৪।১।৫)

“সকুং ফলা কয়োতি।” (কাত্যায়নশ্রৌ ৪।১।৬)

“সারতণুলমপূর্ণঃ প্রপরিষ্যতিধার্যোষান্তমেকণেন জুহোত্যায়র ইতি সোমোয়েতি চ।” (কাত্যায়নশ্রৌ ৪।২।৭)

(১) “অশ্বাথোক্তঃ প্রযথিপ্রোক্ষণদ্ব্যেকটমঃ শুভঃ।

ন বাতিশিথিলঃ পাচ্যঃ স চরুঃ স্তা ন চারসঃ।” (কর্ম্মশ্রদীপ)

“তিথ্যগুরুসমিখাভ্রা দৃঢ়া নাতি বৃহস্পতি।

মুগ্ধবোধব্রী বাপি চক্ৰবালী প্রসততে।” (কণ্ঠপ্রদীপ)

চক্ৰহোম (পুং) বাহাতে চক্ৰ দিয়া আহুতি দেওয়ার বিধান আছে তাহাকে চক্ৰহোম বলে।

চক্ৰখা (পারসী) স্ত্রী কাটিবার একরকম কল। পূর্বকালে ভারতবাসীরা চক্ৰখা স্ত্রী কাটিত ও পতি পুত্রবিহীন অনেক রমণীর ইহাই জীবিকা ছিল। পাশ্চাত্য স্ত্রী কলের বহুল প্রচারে চক্ৰখা স্ত্রী কাটা উঠিয়া গিয়াছে।

চর্খা, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। আর প্রায় ১২০০ টাকা, তন্মধ্যে গাইকবাদের ৫০০ ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩৮ টাকা কর দিতে হয়।

চর্খারি, মধ্যভারত এজেন্সির অধীন বুলন্দশাহের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ২১' হইতে ২৫° ৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪০' হইতে ৭২° ৫৮' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৭৮৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ।

এখানকার রাজগণ প্রসিদ্ধ বুলন্দা সর্দার ছত্রসালের বংশধর। বর্তমান রাজার নাম মহারাজ ধিরাজ জয়সিংহ দেব, ইনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্বপুরুষ বিজী বাহাদুর প্রথম বুটীশ অধীনতা স্বীকার করেন, তদনুসারে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সনন্দ দ্বারা চর্খারি রাজ্য প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহে চর্খারির রাজা বুটীশগবর্মেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জ্বল তিনি দত্তকগ্রহণের অধিকার, দুই হাজার টাকা আয়ের জায়গীর, এবং সম্মানার্থ ১১টি তোপ প্রাপ্ত হন। চর্খারিরাজের পাঁচ লক্ষ টাকা আয়।

২ উচ্চ চর্খারিরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৫° ২৪' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৭' পূঃ। গোয়ালিয়ার হইতে বান্দা যাইবার পথে উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। নগরের যাইবার একটি মাত্র পথ আছে, সেই পথে কেবল একটি হাতি যাইতে পারে। নগরের নিম্নে সুন্দর সরোবর, মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট পথ আছে।

চর্চক (পুং) চর্চ-কর্ত্তরী ধূলু। যে চর্চা করে, আলোচক।

চর্চন (ক্ৰী) চর্চ-লুট্। ১ আলোচনা।

চর্চর (পুং) চর্চ-বাহুলকাৎ অরন্। গমনশীল।

“পজ্জব চর্চরং আরং মরায়ু।” (ঋক্ ১০।১০৬।৭) ‘চর্চরং চরণ-শীলং’ (সায়ণ।)

চর্চরিকা (ক্ৰী) চর্চরী কন্ টাপ্ পূর্ব হ্রস্বচ। গতিবিশেষ।

“চর্চরিকয়া বিচিন্ত্য।” (বিক্রমোর্কশী ৪ অঙ্ক)

চর্চরী (ক্ৰী) চর্চ বাহুলকাৎ অরন্ গোৱাদি ভীষ্। ১ গান-বিশেষ। ২ কোঁকড়ান বা পশুচুল। ৩ করধনি।

‘চর্চরী গীতিভেদে চ কেশভিৎকরশব্দয়োঃ।’ (কল্প)

৪ হর্ষক্ৰীড়া, উৎসব, টাচর। (সুভূতি) ৫ কার্পটিকগণের আদরযুক্ত বাক্য। ৬ ভৌতিক, নৃত্য, গীত ও বাদ্য। ৭ বসন্ত-কালের ক্ৰীড়াবিশেষ। ৮ হর্ষ ক্ৰীড়ার বাক্যবিশেষ, চর্চটী।

“অরে মধুরমতি হস্তমান মুহুমদানুগতসঙ্গীতমধুরঃ পুরঃ পৌরাণামুচ্চরতি চর্চরী ধনিঃ।” (রত্নাবলী ১ অঙ্ক)

৯ সাটোপ বাক্য। (শকার্ধচি°) ১০ প্রাচীন ভারতের একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র। ১১ বর্ণবৃত্তবিশেষ।

“হারযুক্তস্বর্ণকঙ্কণপাণিশিখাবিরাজিতা

পাদনুপুরসজ্জতা সুপয়োধরদ্বয়ভূষিতা।

শোভিতা বলয়েন পিঙ্গলপন্নগাধিপবর্ণিতা

চর্চরী তরুণীব চেতসি চাকসীতি সুসজ্জতা।” (শকার্ধচি°)

চর্চরীক (পুং) চর্চ-ইকন্ নিপাতনে সাধু (কর্করীকাদয়ঃ)।

উণ্ ৪২০। ১ মহাকাল ভৈরব। ২ কেশ বিভ্রাস। ৩ শাক।

(মেদিনী)

চর্চন্ (পুং) চর্চ অহ্ন। ১ নিধিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°) [নিধি দেখ।]

চর্চা (ক্ৰী) চর্চাতে বিচার্যতে বেদবেদান্তাদিতত্ত্বশার্ভঃ চর্চ নিচ্ অঙ্। ১ দুর্গা। চর্চ-ভাবে অঙ্। ২ চিন্তা, আলোচনা।

৩ চার্চিক্য। (মেদিনী) ৪ লেপন।

“মুগমদকৃতচর্চা পীতকোশেয়বাসাঃ।” (ছন্দোম°)

৫ গায়ত্রী রূপা মহাদেবী।

“জ্ঞানধাতুময়ী চর্চা চচ্চিতা চাকহাসিনী।” (দেবীভাগ ১২।৬।৪৬)

৬ জয়ন্তের অন্তর্গত একটি নদী। (দেশাবলী)

চর্চি (ক্ৰী) চর্চ ভাবে ইন্। বিচারণা।

“যে চর্চাবতির্য্যোতে একয়া গৌরতিরিক্তঃ একয়ায়ুরুনঃ।”

(তৈত্তিরীয়ব্রা° ১২।২।২)

চর্চিক (ত্রি) চর্চাং বেদাদি-বিচারণাং বেত্তি চর্চা-ঠন্। যে বেদাদির বিচার জানে।

চর্চিকা (ক্ৰী) চর্চা স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্ৰঙ্। ১ দুর্গা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ চর্চা। (দ্বিকৃপকো°) ৩ রোগবিশেষ।

চর্চিক্য (ক্ৰী) চার্চিকা পৃষোদরাদিত্ত্বাৎ সাধু। [চার্চিক্য দেখ।]

চর্চিত (ত্রি) চর্চ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ চন্দ্রনাদি দ্বারা লেপিত। ২ আলোচিত। (ক্ৰী) চর্চ ভাবে-ক্ত। ৩ লেপন।

চর্চন (ত্রি) ১ একত্র বন্ধ। (ক্ৰী) ২ গোঁজ, কীলক।

“বিত্তে মুখ্যামি রশনা বি রশ্মীন্ বিযোক্তা যানি পরিচর্চনানি (কৃষ্ণযজুঃ ১।৬।৪।৩)

চর্চব্য (ত্রি) চর্চ-তব্য। [চর্চিতব্য দেখ।]

“ব্রহ্মা ক্রজেণ নিয়মাচ্চর্চব্য ইতি নঃ শ্রুতং।”

(ভারত ১৩।১০৬।২)

চর্চা (জি) চর্চাতে চূত হিংসায়াং গাৎ । (ঋতুপথ্যাক্রমি
চূতঃ । পা ৩।১।১১০ ।) হনুমায়, হিংসিতব্য ।

চর্খাবল, উঃ পঃ প্রদেশের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা
নগর । অক্ষা° ২১° ৩২' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮' ১০" পূঃ ।
মজঃফর নগর হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে ও হিন্দন নদী হইতে
৩ মাইল পূর্বে অবস্থিত । পূর্বে এখানে আমিলের বাস-
ভবন ছিল, এখন অধিকাংশই কৃষকের বাস । লোক সংখ্যা
প্রায় পাঁচ হাজার ।

চর্দা, অযোধ্যার বড়াইচ জেলার একটা পরগণা । উত্তরে
তাপ্তী নদী প্রবাহিত মেপালের সীমা, পূর্বে ভিলা পরগণা,
দক্ষিণ ও পশ্চিমে নানপাড়া । এই স্থান বখাক্রেম ইকোনা ও
সৈয়দবংশীর পার্শ্বভীয়া সামন্ত রাজগণের অধিকারে ছিল, তৎ-
পরে নানপাড়ার রাজার একজন জাতি এই পরগণা প্রাপ্ত
হন । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ জাতিবংশীয়দিগের অধীনে
ছিল, বিদ্রোহী হওয়ার তাহাদের অধিকার বাজেয়াপ্ত হয় ।
যাহারা ব্রীটিশ রাজ্যের আজাদীন ছিল, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকেই
ঐ পরগণা দান করেন ।

চর্দা পরগণা ভক্লা নদী কর্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত । ভক্লা
ও রাপ্তী নদীর মধ্যবর্তী স্থান নাবাল ও অতিশয় উর্বর ।
ভক্লা নদীর পশ্চিম ভাগের জমি অধিত্যকার ক্রিয়দংশ ।
এই পরগণার পরিমাণ ২০৬ বর্গমাইল । গবর্নমেন্ট রাজস্ব
১৩২৫৩০ । লোকসংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার । এই পরগণার
মধ্য দিরা দুইটা পাকা রাস্তা গিয়াছে । এখানে কতকগুলি
হাট বাজার, থানা, ডাকঘর ও ইংরাজী বিদ্যালয় আছে ।

চর্দার, আসামের দরঙ্গজেলার একটা মহাল । পরিমাণ ১১২০
বর্গমাইল । এই মহালে বেলশ্রী ও মানশ্রী নদীর মধ্যে প্রায়
৮০ বর্গমাইল বনবিভাগ আছে । ইহার মধ্যে অতি অল্প
স্থানেই রবার চাষের পরীক্ষা হয় । কিন্তু তেমন লাভকর
হয় নাই ।

চপট (পুং) চূপ-অটন্ । ১ ক্ষার । ২ বিপুল । ৩ চপেট ।
৪ পর্পট । (মেদিনী)

চপটী (জী) চপট-টাণ্ । ভাঙ্গমাসের গুরুষষ্ঠী, চলিত
কথায় চাপড়াষষ্ঠী বলে । [চপেটী দেখ ।]

চপ্‌টী (জী) চপট গৌরাদিহাং ঙীর্ষ । শিষ্টকবিশেষ, পোশী ।
(জিকাণ্ড°)

চর্ভট (পুং) চর-কিপ্, ভট-অচ্ ততঃ কর্মধা° । ইর্বাক্,
কাঁকড় । (হলায়ুধ)

চর্ভটী (জী) চর্ভট ঙীর্ষ । ১ চর্ভটী । ২ হর্ষকীড়া । ৩ সাটোপ
বাঁকা । ৪ চর্ভা । (হেম°)

চর্ম্ম (কৌ) চর্ম্ম সাধনতয়া অন্ত্যত চর্ম্মন্ অচ্, টিলোপশ্চ ।
১ চর্ম্ম নির্ম্মিত কলক, ঢাল । (অমরটী° ভরত) ২ চাম, চামড়া ।

চর্ম্মকরি (জী) ১ মাংসরোহিণীলতা । ২ অগ্নিকি জ্বা ।

চর্ম্মকশা (জী) চর্ম্মকবা পুণ্ডোরাদিহাং সাধু । ১ পশ্চিম
দেশ প্রসিদ্ধ গজদ্রব্যবিশেষ, চলিত কথায় চামরকবা বলে ।
২ সপ্তলালতা । (অমর) ৩ মাংসরোহিণী । (রাজনি°)

চর্ম্মকবা (জী) চর্ম্ম কবতি চর্ম্ম-কব-অচ্-টাণ্ । [চর্ম্মকশা দেখ ।]

চর্ম্মকসা (জী) চর্ম্মকবা পুণ্ডোরাদিহাং সাধু । [চর্ম্মকশা
দেখ ।] (ভরত)

চর্ম্মকার (পুং জী) চর্ম্ম তরিস্মিত পাছকাদিকং কয়োতি চর্ম্ম-ক
অণ্ (কর্ম্মকৃৎ । পা ৩।২।১) সর্কাণ জাতিবিশেষ, চামার, বুতি ।
পরশরের মতে চণ্ডালীর গর্ভে ভীষরের ঔরসে চর্ম্মকারের
জন্ম । (পরশর পদ্ধতি) ময়ুর মতে বৈদেহীর গর্ভে নিবাদের
ঔরসে চর্ম্মকার উৎপন্ন হয়, ইহাদের অপর নাম কারাবর ।
“কারাবরো নিবাদাতু চর্ম্মকারঃ প্রসূরতে ।” (মহু ১০।৩৬)
উশনার মতে বেণুকের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির
উৎপত্তি হয় ।

“স্বতাবিশ্রপ্রসূতারাং সূতো বেণুক উচ্যতে ।

নৃপারামেব তন্ত্ৰৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ ।” (উশনা)

সংগ্রহকারগণ বলেন যে এই তিনটা মতের কোনটিকেই
অগ্রমাণিত বলিতে পারা যায় না । অতএব চর্ম্মকার জাতি
তিনপ্রকার । চর্ম্মের পাছকাদি নির্মাণ ইহাদের বৃত্তি ।

ভারতের সর্বত্রই ঐ জাতি দৃষ্ট হয় । এদেশে চামার,
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চমার এবং বোম্বাই প্রদেশে চাস্তার নামে
খ্যাত । সংস্কৃত পর্য্যায় পাছকৃৎ, চমার, চর্ম্মকৃৎ, পাছকাকার,
চর্ম্মক, কুবট । অপর সকল স্থান অপেক্ষা নাগপুর অঞ্চলে
চামার জাতি দেখিতে অতি সূত্রী, স্থানে স্থানে এই জাতীর
কোন কোন পুরুষ ও রমণী সাধারণ অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
অপেক্ষা দেখিতে সুলভ । সূত্রাং ইহাদের শারীরিক গঠন ও
সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া অনায়াসেই বোধ হয় যে ইহারা
উৎকৃষ্টতর জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । কিন্তু উত্তর-
পশ্চিম প্রদেশস্থ চর্ম্মকারেরা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও অতি কলা-
কার, সেধানকার কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণের স্থায় সূত্রী চর্ম্মকার অতি
বিরল । তথায় সাধারণের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে—

“করিআ ব্রহ্মন গোর চমার,

ইন্ কে সাপ ন উত্তরিয়ে পার ।”

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ও গৌরবর্ণ চামারের সহিত নদী
পার হইবে না । সাধারণের সমক্ষে উভরই অবদল চিহ্ন ।
কোন কোন মতে ডোম, কাজার প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি হইতে

চন্দ্রকার জাতি উপর হইরাছে এবং তজ্জন্মই ইহারা হিন্দু-
লম্বা বহিষ্ঠত। প্রথমাবস্থায় চন্দ্রকারেরা শ্রমজীবী কর্ম
করিত। প্রকৃত ক্ষেত্রকর্ষণ ও পরীক্ষা সামান্য কৃষ্ণে বাস,
শব্দেহ ও তাহার চন্দ্র বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করিত। বলা বাহুল্য
যে এই শ্রেণীক কর্মই আজকাল তাহাদের প্রথম ব্যবসা
হইয়া পড়াইরাছে। কিন্তু নাগপুর প্রদেশস্থ রাইপুর অঞ্চ-
লীয় চন্দ্রকারেরা আপনাদিগকে অন্তঃস্থ প্রদেশের চন্দ্রকার-
দিগের ভার হীনাবস্থ মনে করে না।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রামানন্দের প্রসিদ্ধ শিষ্য রবি-
দাস (কইদাস) আবিষ্ঠত হন, বাঙ্গালা বেহারের চন্দ্রকারেরা
এই রবি বা কইদাসকে আপনাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া
পরিচয় দিয়া থাকে। উক্ত বস্তুকে ইহাদিগের মধ্যে
প্রবাদ আছে—একদা চারিজন ব্রাহ্মণ মহোদয় নদীতে
অবগাহন করিতে গিয়া দেখিলেন একটা অলহারা গাভী
চোরা বালিতে পতিত হইয়া বসিয়া ভোগ করিতেছে। ব্রাহ্মণ-
কুমারেরা গাভীর বিপদ দেখিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে
উদ্ধারকরণার্থ কনিষ্ঠ মহোদয়কে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু
চুঃখের বিষয় এই যে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুমার যাইতে না যাইতে
গাভী মগ্ন হইয়া জীবলীলা লবণ করে। তখন জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-
কুমারেরা কনিষ্ঠকে গাভীটির শব্দেহ স্থানান্তর করিবার
অনুমতি প্রদান করেন। কনিষ্ঠ উক্ত কর্ম সম্পাদন করিলে
জ্যেষ্ঠেরা তাহাকে সমাজচ্যুত করেন। তদবধি কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
চন্দ্রকার নামে অভিহিত হইল। এই ব্রাহ্মণকুমারই চামার
বা চন্দ্রকারদিগের আদিপুরুষ। পশ্চিমাঞ্চলে চন্দ্রকারদিগের
মধ্যে এ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ
ও চন্দ্রকার বন্ধুভাবে একত্র বাস করিত। সত্যযুগে এক-
জন ব্রাহ্মণ ও একজন চামার প্রতিদিন একসঙ্গে গঙ্গানান
করিতে যাইত। একদিন ঘটনাক্রমে চামার ব্রাহ্মণের সহিত
গঙ্গানানে যাইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার উদ্দেশে
গঙ্গানাতাকে প্রণাম করিতে বলিয়া দিয়াছিল। ব্রাহ্মণও
চামার বন্ধুর অনুরোধ মক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।
ব্রাহ্মণ চামার বন্ধুর উদ্দেশে গঙ্গানাতাকে প্রণাম করিলে পর
মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শ্রীর মণিবন্ধ
হইতে কঙ্কণ গ্রহণ করিয়া চামারকে উহা উপহার বরূপ
দিবার জন্য ব্রাহ্মণ হস্তে অর্পণ করেন। কঙ্কণের উপর ব্রাহ্ম-
ণের লোভ পড়িল। উক্ত কঙ্কণ চামারকে না দিয়া তিনি
নিজেই গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাদেবী জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে
এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে ব্রাহ্মণের এই কুকর্মের ফল-
বরূপ ব্রাহ্মণমাজকেই জীবিকানির্ভারের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি

অবলম্বন করিতে হইবে এবং তদবধি ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষুক
শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইরাছে।

কাশী প্রদেশস্থ চামারেরা “নোনা-চামার” নামক এক-
জনকে আপনাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে।
নোনাচামারের গৃহিণী নোনাচামাইন্ হিন্দুপরিবারের নিকট
ভাকিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

বাহা হউক, কোন কোন স্থলের চামারদিগের আকার
প্রকার ও গঠন সৌন্দর্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে, উহারা
আর্যাবংশসমূহ হইয়া কালক্রমে ব্যবসা ও আচার ব্যবহার
দ্বারা নিকট জাতিতে পরিণত হইরাছে এবং ইহাদিগকে
দেখিলে বৈদিক সময়ের অধঃপতিত সমাজচ্যুত চারমার
জাতির কথা মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ
চামারদিগের আকার প্রকার বর্ণ ও গঠনপ্রণালী দ্বারা
তাহাদিগকে চন্দ্রব্যবসারী অনার্যজাতির বংশধর বলিয়া
বোধ হয়। তবে যে সময়ে সময়ে হুন্দর ও হুশ্রী চামার দৃষ্ট
হইয়া থাকে, তাহা কেবল অনার্যের সহিত আর্যের সংমি-
শ্রণে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

চামারদিগের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। বাঙ্গালার
ইহারা জয়দেব শ্রেণী বা বিভাগে বিভক্ত। যথা—চামার
তান্তি, খাড়, ধুসিয়া, দোহর, গোরিয়, জৈসবর, জনকপুরী,
জোনপুরী খাটিমাহারা, কোরার, লাকৌর, মগহিয়া ও পচ্ছি-
রান্। এতদ্ব্যতীত ধুসিয়ার শ্রেণীর মধ্যে আবার পাঁচটা থাক আছে
যথা—হোল, জোরিয়াহা, ঘোষলিয়া, সোনপুরী এবং ঠেঙ্গই।

কাশীপ্রদেশে চামারেরা নয়শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

১। জৈসবর—সাধারণতঃ ভূত্যের কর্ম করিয়া থাকে।

২। ধুসিয়া বা কুসিয়া—বিনামা ও অখের সাজ নির্মাণ
করে।

৩। কোরি—তন্তুবার, অখপ্রতিগালক এবং শ্রমজীবী
কর্ম করিয়া থাকে।

৪। দোলাদ—ঐ

৫। কুরিল—চন্দ্র পরিষ্কার ইহাদিগের ব্যবসা।

৬। রজিয়া—চন্দ্রে রং করাই ইহাদিগের কাজ।

৭। অতুয়া—শ্রমজীবী।

৮। মজতিবা—ভিক্ষুক।

৯। তন্তুয়া—চন্দ্ররজ্জুনির্মাতা।

উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে জৈসবর শ্রেণীর স্বক্কে তার বহন
করা প্রথা নাই; তাহার মস্তকে তার বহন করিয়া থাকে।
তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্বক্কে তার বহন করিলে সে
সমাজচ্যুত হয়।

মজ্জিত্বা শ্রেণীর ভিক্ষাবৃত্তিই অবলম্বন ; কিন্তু তাহার জৈস্বর শ্রেণী ভিন্ন অপর কোনজাতির ভিক্ষা গ্রহণ করে না। ইহাদের বংশধরগণ জৈস্বর শ্রেণীর বংশধরগণের নিকট বৎসরে একবার মাত্র গিয়া একটি পয়সা, একখানি রুটি ও অপর যাহা হয় কিছু ভিক্ষা করিয়া আনে এবং তাহাতেই তাহাদিগের জীবিকানির্ভাহ হয়। বংশপরম্পরাক্রমে ইহারা এইরূপ জৈস্বরজাতির নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ভাহ করিয়া আসিতেছে।

গাজিপুর ও তৎপূর্বাঞ্চলে ধুসিয়া শ্রেণী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আলাহাবাদ প্রদেশে এই শ্রেণীকে খুসিয়া বলে। অনেকের বিশ্বাস আলাহাবাদ নিকট ধুসি বা খুসি নামক গ্রাম হইতে ইহাদিগের ধুসিয়া বা খুসিয়া আখ্যা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ ঐ স্থানে ধুসি বা খুসি নামক কোন জায়গা নাই। গাজিপুর জেলার অন্তর্গত সৈদপুর নামক স্থানের পূর্বাঞ্চলে ঐ শ্রেণীর আদিম নিবাস, ইহা তাহার নিজেই স্বীকার করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন রোহিলখণ্ডে অংলোং ; মধ্যদোয়াবে অহরবর, সক্রবর ও দেহের এবং বেহারে গরৈয়া, মগহিয়া, দক্ষিণীয়া এবং কনৌজিয়া নামক চামার শ্রেণীর বাস আছে।

শাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও গাজিপুর অঞ্চলে দোসাদ শ্রেণীই চামারই অধিক। কালী, আজিমগড়, মির্জাপুর এবং নিম্ন দোয়াব প্রদেশেও উহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। স্থানে স্থানে ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু গাজিপুর অঞ্চলে চৌধুরিত্তিই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসা।

দোসাদেরা সৈনিকের কর্ম্ম করিতেও গুট, গলাসীর বিখ্যাত সমরে ইহারা ক্লাইবের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অতি বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। সময়ে সময়ে ইহারা ঘাতক ও শবদেহাহকের কার্য্য করিয়া থাকে।

বঙ্গ ও বেহার প্রদেশে চামারেরা জ্ঞাতগিত সপ্তম পুরুষ বাদ দিয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে। বাল্যবিবাহ চামারদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলনের অভাবে কল্পা বরস্থা হইলেও সমাজে বিশেষ দোষের কারণ হয় না।

বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুর অঞ্চলে ধোড়কে, কাব্বলে, ভাগমারে প্রভৃতি উপাধিদারী চামার আছে, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে আহাতিদি প্রচলন আছে, কিন্তু এক উপাধি হইলে বিবাহ হয় না। আন্ধ্রদেশের ও তৎসম্বন্ধিত স্থানে চামারদিগের উপাধি নানাপ্রকার--যথা আগাবনে, বনজুরে, ভাগবত, দমারে, দেশমুখ, দেবরে, থোর্গে, হুর্গে, গাইকবাড়, গিরিম্বর, হলম্, কেজুধ, জমথরব, কবাড়ে,

কদম, কালগে, কালে, কাব্বলে, কান্দে, কাবড়ে, কেমার, লাগচব্রে, নটকে, পবার, সালাবে, সাতপুতে, সিলে, সোনা-বনি, এবং বাঘে। এখানেও এক উপাধির মধ্যে পরম্পর বিবাহক্রিয়ার প্রচলন নাই।

বেহারে চামারেরা পত্নীর সহোদরকে বিবাহ করা অতীব গর্হিত কার্য্য বিবেচনা করে। বিবাহকালে কস্তাকর্ত্তা পণস্বরূপ পাত্রের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে স্বজাতীয় বৃদ্ধলোক পৌরহিত্যের কার্য্য করে এবং অজ্ঞাত হিন্দুর ভ্রাতৃ পাত্র পাত্রীর সীমন্তে সিন্দূর দিয়া মাজলিক অমুষ্ঠান শেষ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে এবং পত্নী পতি কর্ত্তক পরিত্যক্ত হইলে পুনরায় অল্প পতিগ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে সমাজে পতিত হয় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় চর্ম্মকারেরা প্রকৃত হিন্দুমতাবলম্বী না হইলেও হিন্দু অমুষ্ঠিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদিগের অনেকে “শ্রীনারায়ণী” মতাবলম্বী। পূর্ববঙ্গে কবীরপন্থী দলভুক্ত চামার দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত চর্ম্মকার বঙ্গদেশে অতি বিরল।

ইহারা শীতলা ও জ্ঞানদেবী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। জ্ঞানদেবী আমাদের রক্ষাকালী স্থানীয়া।

বেহার অঞ্চলে চর্ম্মকারেরা বঙ্গজ চর্ম্মকারদিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক নিষ্ঠাবান তাহার। স্বদেশীয় হিন্দুদিগের অমুষ্ঠিত কোন ক্রিয়াকলাপ বাদ দেয় না। কেহ কেহ হিন্দু দেবদেবীর পূজোপলক্ষে স্বজাতীয় পুরুষকে পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী না করিয়া মৈথিলী ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় পুরোহিতবংশকে পুরী কহিয়া থাকে এবং পুরীরা সমাজচ্যুত কনোজ ব্রাহ্মণ, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস। উক্ত দেশে চামারেরা লোকে-স্বরী, রক্তমালা, কালী প্রভৃতির অর্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ রবিদাসকেই শ্রেষ্ঠত্বদ্বাদ প্রদান করে। বোম্বাই প্রদেশস্থ চর্ম্মকারেরাও হিন্দু দেবদেবীর অর্চনা করিয়া থাকে এবং সমস্ত ভূমিষ্ট হইলে তাহার মঙ্গলকামনার্থ চট্টাই বা ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেয়।

শ্রীপঞ্চমী বঙ্গীয় চর্ম্মকারদিগের প্রধান উৎসব। শারদীয় শুক্লদশমী ও তাহাদিগের কম উৎসবের দিন নহে, ঐ দিনে তাহার দেবীপূজায় উন্মত্ত হয় এবং দেবী সমক্ষে শূকর, ছাগ প্রভৃতি বলি দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। শ্রীরামদশমী তাহাদিগের তৃতীয় উৎসব ; শ্রীরাম চন্দ্রের জন্ম উপলক্ষ করিয়া এই উৎসব সম্পাদিত হয়।

বেহার প্রদেশে চামারেরা শবদাহ করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর দশম কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে প্রাক্ক্রিয়া সম্পন্ন করে। পূর্ববঙ্গে ও বোম্বাই প্রদেশের আন্দমনগর অঞ্চলের চামার মাজাই এবং সোলাপুর অঞ্চলের দরিজ চামারেরা শবদেহ ভূমিতে প্রোথিত করিয়া ফেলে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে।

বাবলা ও আচার ব্যবহারে চামারেরা হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট-তম পর্যায়ে গণ্য; সুতরাং তজ্জন হিন্দুসমাজের নিকট ঘৃণা। হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ আহার সামগ্রী ইহাদের খাদ্য। এমন কি ইহারা মৃত জন্তুর শবদেহ আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কৃত পাকার স্পর্শ করে না, কিন্তু হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন আহার করে।

চর্মপরিষ্কার, বিনামা ও অশ্বের সাজ নির্মাণ এবং অশ্ব প্রতিপালন চামারের আতিগত ব্যবসা। ঢোল, একতারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া উৎসবাদিতে ইহাদিগকে যোগ দিতে দেখা যায়। এই জাতীর কোন কোন শ্রেণী পাকী বহন, কোন কোন শ্রেণী কৃষি, এবং কোন কোন শ্রেণী বস্ত্রবয়ন কর্মও করিয়া থাকে।

চামার রমণীগণ চামাইন্ নামে অভিহিত। চামাইনেরা কপালে টুক্লী পরিতে ও সর্পশরীর উল্কা দ্বারা রঞ্জিত করিতে ভালবাসে। ইহারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই খাজীর কর্ম করিয়া থাকে। হিন্দুমহলে এমনও প্রবাদ আছে যে চামার-রমণী সন্তান ভূমিষ্ঠ সময়ে খাজীর কার্য না করিলে জাতক্রিয়া অন্তঃস্বায় রহিয়া যায়।

স্বজাতীয় পক্ষায়ত হইতে ইহাদের সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভারতের ছাত্র জাপান ও চীনদেশেও চর্মকারেরা অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া গণ্য।

বেয়ার অঞ্চলের চামারেরা বলে যে, তাহারা ১২২ জাতিতে বিভক্ত তন্মধ্যে চোর, বৃন্দেলা, কল্লর, মরাঠা, পরদেশী, মজ, কটাই, ও মুসলমান চামার এই কয়টির সন্ধান পাওয়া যায়। অরঙ্গাবাদের চামারেরা মরিঅম্মা ও শীতলা দেবীর পূজা করে। ভারতবর্ষে প্রায় ২৪ লক্ষ চামারের বাস। চর্মকারক (জি) চর্ম তন্মিষিতং পাছকাদিকং কয়োতি চর্ম কৃ-ণুল। যে চর্মপাছকাদি নির্মাণ করে।

চর্মকারালুক (পুং) বারাহীকন্দ। (ভাবপ্রা°)

চর্মকারী (স্ত্রী) চর্ম ক্রিয়তি কৃ-অণ্-ভীষ্। ১ ওষধিবিশেষ, চর্মকবা। (মেদিনী) চর্মকার জাতৌ ভীষ্। ২ চর্মকার-জাতীয় স্ত্রী।

চর্মকার্য্য (স্ত্রী) চর্মগঃ কার্য্যং ৬৩৭। চর্মের কবচ প্রভৃতি শেলাই ও পাছকাদি নির্মাণ করার নাম চর্মকার্য্য। মম্বর মতে ইহাই চর্মকারগণের জীবিকা।

“ধিপর্ণানং চর্মকার্য্যং বেণানং ভাণ্ডবানং।” (মম্বু ১০।৪৯)

‘চর্মকার্য্যং কবচাদিনী বনং উপনদগ্রন্থনমিত্যেবমাদি।’

(মেধাতিথি)

চর্মকীল (পুং) চর্মশি কীল ইব। গুহজাতরোগ বিশেষ, চলিত কথায় হালীশ ও স্থানবিশেষ হারিস্ বলে। শরীরে কাল বা শাদা মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাকে জ্বচ্ছ বা চর্ম-কীল বলে। ইহাতে সময়ে সময়ে বেদনা থাকে, আবার কখন কখন বেদনা একেবারেই থাকে না। শিরাবেধ, প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল ছুঁড়ের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ, অথবা সিদ্ধিপত্র, বৃদ্ধদারক ও শিওকাঠ চূর্ণ করিয়া তদ্বারা উষ্মর্জন করিলে ইহার প্রতীকার হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা জ্বচ্ছরোগের লক্ষণ। অশ্রুত জ্বচ্ছরোগ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, উৎপত্তি ও কারণ অনুসারে জ্বচ্ছরোগকেই চর্মকীল বলা যায়। (অশ্রুত, নিদান, ১৩ অঃ ৩৭) [ক্ষুরোপ ও জ্বচ্ছ দেখ।]

চর্মকৃৎ (পুং) চর্ম তন্মিষিতপাছকাদিকং কয়োতি চর্ম কৃ-কিপ্ তুগাগম্শচ। চর্মকার। (হলায়ুধ)

“চর্মকৃৎ কোহপি ন প্রাদাৎ কুটীং ক্ষেত্রোপযোগিনীং।”

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৫৫)

চর্মখাণ্ডিক (পুং) তন্মামক জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

চর্মগ্রস্থি (পুং) চর্মণোগ্রস্থিঃ ৬৩৭। চামড়ার গাঁট।

চর্মগ্রীব (পুং) শিবের অমুচরবিশেষ।

চর্মচটকা (স্ত্রী) চর্মণা চটকেব। পক্ষীবিশেষ, চাম্চিকা। পর্যায়—জতুকা, অজিনপত্রিকা, জতুকা, গৃহমাচিকা, জতুনী, অজিনপত্রা, চার্মি, চর্মচটী, চর্মপত্রা, চর্মচটিকা।

চর্মচটিকা (স্ত্রী) চর্মচটী স্বার্থে-কন্ পূর্ব্বহৃৎশচ। পক্ষীবিশেষ, চামচিকা।

চর্মচটী (স্ত্রী) চর্ম চটতি ভিনন্তি চট-অচ্ গোরাदि° ভীষ্। পক্ষীবিশেষ, চামচিকা। (শব্দরত্না°)

চর্মচিত্রক (স্ত্রী) চর্ম-চিত্রয়তি চিত্র-ণুল্। খেতকুষ্ঠ, ধবল-রোগ। (রাজনি°) [কুষ্ঠদেখ।]

চর্মচেল (পুং স্ত্রী) চর্মচ্ছাদিত বস্ত্র।

চর্মজ (স্ত্রী) চর্মশি জায়তে চর্ম-জন-ড। ১ রোম। ২ কধির। (রাজনি°) (জি) চর্মশি চর্মণোবা জায়তে জন-ড। ৩ যাহা চর্মে উৎপন্ন হয়। ৪ যাহা চর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চর্মধারিণী (ত্রি) চর্মঃ চর্মনির্মিতফলকং ধরতি চর্ম-ধ-গিনি ।
যে চর্মনির্মিত ফলক ধারণ করে ।

চর্মণ্য (ত্রি) চর্মণি ভবঃ চর্মণ-যৎ । চর্মণ, বাহা চর্মণে
উৎপন্ন হয় । “স্নেহণা চর্মণ্যং বাত্বা বিলিষ্টং সংশ্লেষয়েৎ ।”
(ঐতরেয় ব্রাঃ ৫।৩২)

চর্মণ্য (ত্রি) চর্মন্ অস্ত্যর্থে মতুপ-মত বঃ । ১ চর্মযুক্ত, যাহার
চর্ম আছে ।

চর্মণ্ডী (স্ত্রী) চর্মণ্ডা স্ত্রী । ১ নদীবিশেষ । অপর নাম
চর্মবালা ও শিবনদ । (A. Res. XIV. 407.)

মহারাজ রত্নদেব প্রত্যহ কয়েক সহস্র যুগ বধ করিয়া
ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে ভোজন করাইতেন । সেই সকল
যুগের চর্মনিঃসৃত রক্ত ও স্নেহে এই নদীর উৎপত্তি হয় ।
(তারত, শাস্তি ।) প্রাচীন দশপুর নগর এই নদীর তীরে
ছিল । বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত বর্তমান চম্বল নামে বিখ্যাত ।
[চম্বল দেখ ।] (বামন ১৩ অঃ, মার্কণ্ডেয় ৫৭।২০, মৎসক ১১৩।২৪, মহাভিঃ ২।৩১।৭)

“চর্মণ্যং পর্কতো জাতে: বিক্কাচলসমঃপুনঃ ।

মেঘাধুপ্রবনাজ্জাতা নদী চর্মণ্ডী শুভা ॥”

(দেবীভাগবত ১।১৮।৫৪)

২ কদলী বৃক্ষ । (মেদিনী)

চর্মতরঙ্গ (পুং) চর্মণি তরঙ্গ-ইব । চর্মের সলোচ, বলি ।

(রাজনিঃ)

চর্মতিল (ত্রি) চর্মণি জাতা তিলা অস্ত বহুব্রী । যাহার চর্ম
তিল জন্মিয়াছে, তিলযুক্ত শরীরাদি ।

চর্মদণ্ড (পুং) চর্মণা কৃতো দণ্ডঃ মধ্যপদলোঃ । চর্মনির্মিত
দণ্ড, কষা । (হেমঃ)

চর্মদল (ত্রি) চর্ম দলয়তি দল-অণ্ । কুষ্ঠবিশেষ ।

[কুস্তকুষ্ঠ দেখ ।]

চর্মদূষিকা (স্ত্রী) চর্ম দূষয়তি ছব-গিচ্ ণ্-টাপ্ অত ইৎ ।
কোটরোগ । (রাজনিঃ)

চর্মদ্রুম (পুং) চর্ম চর্মাকৃতিবকলং তৎ প্রধানোক্রমঃ মধ্য-
পদলোঃ । ভূর্জবৃক্ষ । (রাজনিঃ)

চর্ম (স্ত্রী) চর্ম-মনিন্ (সর্পধাতুভ্যো মনিন্ । উণ্ ৪।৪১৫)
১ বক্, চাম, চামড়া । হিন্দীতে চর্ম্, চামড়া, পারসী চর্ম্,
তামিলে তোল, মলয়ে কুলিং, ফারাসী Cuir, ওলন্দাজ ও
দিনেশার Leder, Leer, কষকোলা, জর্জণ Leer, ইতালি
Cuajo, লাতিন Corium. ২ ইন্দ্রিয়বিশেষ, বৃগিজিহ্বা ।
শারীরবিদ্যায় মতে চর্ম শরীরস্থ শৈবিকযন্ত্রের অংশবিশেষ ।
শৈবিকঝিল্লী (mucous membrane) এবং রসনিঃসরণকারী

গ্রন্থি সমূহ (secreting glands) ইহার অন্তর্ভুক্ত । সরল
বক্-স্বকীয় ঝিল্লী (cutaneous membrane) দ্বারা গঠিত
মূল ঝিল্লী বা ভস্ত (basement tissue) এবং ভস্তের উপরত্বক
(epithelium) এই দুইটি ইহার মূল উপকরণ । মূলঝিল্লীর
(basement membrane) নীচে নাড়ী, দাঁড় ও সংযোগকারী
ভস্তব্যুৎ থাকে । চর্মের শক্ত ও পুরু অংশ বহির্ভূত বা উপত্বক,
(Cuticle or epidermis) তরির অংশ প্রকৃত বক্
(Dermis or cutis vera) নামে অভিহিত । এই প্রকৃতবক্
যন কোষিক ঝিল্লীময় ।

চর্মের উপরিভাগ বিভিন্নপ্রকার বৃহৎ ক্ষুদ্র রেখাবলীতে
পরিবৃত্ত ; উহাদের কতকগুলি শরীরের গ্রন্থির নিকট
থাকে, কতকগুলি মাংসপেশীর সহিত মিলিত হইয়া
থাকে । অপর কতকগুলি প্রাচীন বয়সে কিছু শারীরিক
ব্যাধিবশতঃ চর্মের উপর দেখা যায় । হস্ত ও পদতলে
ক্ষুদ্র রেখাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে,
এতদ্ব্যতীত ইহাতে বর্ষ ও বসী নিঃসরণ জন্ত অসংখ্য
লোমকূপ থাকে ও স্থানে স্থানে কেশ ও নখ হয় ।

চর্মের আত্যন্তরিক অংশ শুষ্ক ও পীতবর্ণের কোষিক-
ঝিল্লীময় পদার্থে পরিপূর্ণ ; তাহার কোন কোন অংশে প্রচুর
পরিমাণে মাংসপেশী রহিয়াছে । শরীরের যে সমস্ত অংশ
হিতাহাপক, সেখানকার চর্মের অভ্যন্তরন্তরে পীতবর্ণের
পদার্থ অধিক এবং পদতলের মত অধিক বাধা বিষমস্বকারী
সরল অংশের চর্মাত্মান্তরন্তরে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক পদার্থের
অস্তিত্ব রহিয়াছে । চর্ম মধ্যস্থ পীত পদার্থ হিতাহাপক
এবং শুষ্ক পদার্থ বলশালী ।

দেহের সমুখভাগের চর্ম অপেক্ষা পশ্চাৎভাগের এবং
বহিঃ অপেক্ষা অন্তরস্থ চর্ম অধিক ঘন । সন্ধিহলে উহা
অত্যন্ত পাতলা । চর্মের পল্লব ও তৎসদৃশ ভ্রারবীর কার্য যে
যে অংশে প্রবল, সেই সকল স্থলের চর্মস্তর অতিশয় পাতলা
ও কোমল । পদতল ও তৎসদৃশ স্থলে ঘনচর্মস্তর অপর
একটি স্তরের দ্বারা তাহার অধঃস্থ হলবেষ্টনীর (fascia)
সহিত দৃঢ়রূপে মিলিত থাকে ।

এই সকল কোমল অথচ বেশী ব্যবহার্য স্থল রক্তার
জন্ত চর্ম ও হলবেষ্টনীর মধ্যে বসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তুলাকারে
অর্থাৎ দলা বাধিয়া থাকে । ইতর জন্তুদিগের মধ্যে এ
প্রকারের উদাহরণ অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

(Todd and Bowman's Physiological Anatomy
and Physiology of Man, vol. I., p. 407. দ্রষ্টব্য)

প্রকৃত চর্মের (Cutis) উপরিভাগ যথার্থ স্পর্শেন্দ্রিয় ।

কলিকার (Kolliker) সাহেব বলেন প্রকৃতচর্ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত, তাহার বানিকটা অংশ জালের ভাৱ, আর বানিকটা অংশ চূচুকাঁড়।

রক্তবহ নাড়ী সকল অধঃস্থ কোষিক স্রোতী হইতে চর্ম মধ্যে প্রবেশ করে এবং বলাবর্তুল, ঘর্মস্রবণগ্রন্থি, বসাগ্রন্থি, কেশ-কোষ, চর্ম-কণ্টক প্রভৃতির দিকে বিতক্ত হইয়া যায়।

উপস্থকের উপরিভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু ভিতর অংশে জায়ুর ভাগ অপেক্ষাকৃত বিরল। চর্মের মধ্যে ঘর্মস্রবণগ্রন্থি, বসাগ্রন্থি ও Ceruminous glands নামক কয়েকটা গ্রন্থি আছে। ঘর্মস্রবণগ্রন্থি মানব-শরীরের প্রায় সর্বাস্থানেই প্রকৃত চর্মের অন্তর্দেশে অবস্থিত। বসাগ্রন্থি করতল ও পদ-তল ভিন্ন শরীরের অপর সর্বাস্থানে বিশেষতঃ মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে চর্ম মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই গ্রন্থি শুষ্কবর্ণ ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

Ceruminous glandsএর বাহ্যিক্রিয়ার ঠিক ঘর্মগ্রন্থির ভাৱ, এই গ্রন্থি প্রবেশজিরের বহির্দেশে অবস্থিত থাকে।

যদি বা চর্মের প্রধান ক্রিয়া বা ধর্ম স্পর্শ। এই ক্রিয়া তিন ইহার আরও অনেক ক্রিয়া আছে, ইহা শরীরের আবরণী স্বরূপ, সূতরাং আবরণী সদৃশ ইহা দৃঢ়তা, কোমলতা, প্রতিবন্ধকতা এবং স্থিতিস্থাপকতা-গুণসম্পন্ন। অধঃস্থ বসান্তর, কেশ, লোম এবং পালক প্রভৃতি সংযুক্ত উপস্থক শারীরিক উষ্ণতা রক্ষা এবং নখাদি শক্ততাচরণ ও শক্ততা নিবারণ করিয়া থাকে। চর্মেই চর্মস্রবণগ্রন্থি ও বসাগ্রন্থির আশ্রয় স্থান, সূতরাং শরীরের ঘর্ম ও সময়ে সময়ে বস নিঃসরণ ইহার একটা ক্রিয়া। শোষণক্রিয়া চর্মের অন্ততম ধর্ম। পারদ-ঘটিত দ্রব্যাদি কিম্বা তরুণ অল্প কোন পদার্থ চর্মের উপর বর্ষণ করিলে আভ্যন্তরিক প্রয়োগের দ্বারা কার্যকারী হয়।

চর্ম নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। ডাক্তার বেরার (liayer) সাহেব তাহার গ্রন্থে প্রায় ৪৬ প্রকার চর্মরোগের তালিকা দিয়াছেন।

চর্ম আমাদের অনেক উপকারে লাগে। গো, মহিষ প্রভৃতির চর্মেই অধিক কার্যকারী। জন্তুদিগের চর্ম শরীর হইতে পৃথক হইলেই কার্যোপযোগী হয় না, কারণ সেরূপ চর্ম অধিকদিন স্থায়ী হয় না; অল্পদিন মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য জন্তুদিগের শরীর হইতে চর্ম পৃথক করিয়া কয়েক প্রকার পদার্থ দ্বারা উহা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই পরিষ্কৃত চর্মেই ইংরাজীতে লেদার (Leather) কহে।

যাহাতে চর্ম নীচ নষ্ট না হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, এ অভিপ্রায়ে চর্ম পরিষ্কার করিবার প্রণালী

অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। এখন কি জগতের ইতিবৃত্ত আরম্ভ হইবার পূর্বেই সভ্যতার আরম্ভেই এ প্রণালীর প্রচলন হইয়াছে। মানবজাতি বস্ত্রবস্ত্র-প্রণালী আবিষ্কারের আগে চর্ম পরিধান করিয়া লক্ষ্য নিবারণ করিত। সূতরাং তৎকালেই যে তাহারা চর্ম পরিষ্কার কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ (ইহার ইংরাজী নাম ট্যানিক্‌ অ্যাসিড Tannic acid) দ্বারা চর্ম পরিষ্কার হয় ও অনেকদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নূতন কৌশল আবিষ্কৃত না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ উদ্ভিজ্জ পদার্থ-ই (Tannic acid) চর্ম পরিষ্কারের এক মাত্র উপকরণ ছিল। এ কৌশল কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে চর্ম-পরিধান, চর্মব্যবসা প্রভৃতি চর্ম সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কাজ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে এ কৌশলটি আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

যে সকল জন্তুর চর্ম পরিষ্কার করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, সেই সকল জন্তুর চর্মে আঠাবৎ একরূপ পদার্থ থাকে; সেই পদার্থের সহিত উদ্ভিদ বহুল-নিঃসৃত পদার্থের (Tannic acid) রাসায়নিক ক্রিয়া অতি প্রবল, সূতরাং উভয়ে একত্র হইলেই রাসায়নিক ক্রিয়ায়দ্বারা চর্ম নীচ পরিষ্কার ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় উপযোগী হয়।

অপরিষ্কৃত, অর্ধপরিষ্কৃত, সুপরিষ্কৃত প্রভৃতি বিবিধপ্রকার অবস্থার চর্ম আছে। তিন তিন অবস্থার চর্ম তিন তিন প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে।

চর্ম আমাদের বহুবিধ প্রয়োজনে আসে। বিনামা, দস্তানা, চর্মের পায়জামা ও অন্যান্য পরিচ্ছদ, অশ্বের সাজ ও বস্ত্রাশ্মি, পুস্তকের পাটি, ব্যাগ প্রভৃতি নানাপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূতরাং চর্মের ব্যবসা একটা প্রধান ব্যবসা মধ্যে গণ্য। অনেকে এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে। হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির চর্ম শুষ্কচর্ম মধ্যে গণ্য। হিন্দুশাস্ত্রে চর্মব্যবসা নিষিদ্ধ। যেজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ইহার ব্যবসা করিয়া আসিতেছে সে জাতি চর্মকার নামে অভিহিত। এই জাতি হিন্দুসমাজ বহির্ভূত ও অতি হেয়। [চর্মকার দেখ]

হিন্দু বাতীত অপর কাহারও চক্ষে চর্ম ব্যবসা ছাড়া নহে। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক হিন্দু সন্তান দেখাদেখি কেহ প্রত্যক্ষ কেহবা অপ্রত্যক্ষভাবে চর্মের ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তরমাণা অস্তরীপ হইতে মেঘচর্ম, আর পৰ্ব্বতের নিকটবর্তী স্থান হইতে হরিণচর্ম, রুসিয়া দেশ হইতে শূকরচর্ম এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অশ্বচর্ম প্রভৃতি পরিমাণে ইংলণ্ড দেশে আমদানী হইয়া থাকে। তথা হইতে আবার ভারতে আসে, তাহা বিলাতী চর্ম নামে খ্যাত, তাহার দাম বেশী। এদেশেও চর্ম প্রস্তুত হয়, তাহা দেশী চর্ম নামে প্রসিদ্ধ।

চর্ম পরিকার করণের নূতন কৌশল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্পিলসবারী (Spilsbury) সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়, এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেডমিনষ্টারবাসী ড্রেক (Drake) সাহেব এই কৌশলের উপর অনেক উন্নতি সাধন করেন। যাহা হউক আজ কাল চর্ম পরিকারের অনেক কৌশল বাহির হইয়াছে।

ভারতবর্ষে—অল্পপসহর, আগ্রা, আন্ধ্রাবাদ, কানপুর, কপদগু, কলানোর, কর্ণাল, কমোর, কুতলা, খবাস (শেওনিয়), খৈরপুর, খাঁপুর, গুজরাট, চকবাল, জবল-পুর, জম্মুপুর, জেরক, ঝগ, তলগাঁ, তন্দো মহম্মদ খাঁ, থর ও পারকর, খতিয়া, দোদেদি, নজীবাবাদ, নারোবাল, নৌসহর, পঞ্জাব, পূর্বা, পিওদাদন খাঁ, বাঙ্গালা, বতলা, বিসম্ভা, বিরিয়া, বোম্বাই, ভূটান, মতিয়ানা, মামন্দ, মীর-পুর, মিঠাতিরাণা, মুন্সের, মুল, মুলতান, মহিসুর, যোধ-পুর, রায়চুড়, রাহতগড়, রামনগর, রাণিয়া, রাবলপিণ্ডী, রেওতী, লার্থানা, বধধান, বাকানের, শাহদরা, শিয়ালকোট, স্মধমান, সিদ্ধপ্রদেশস্থ হায়দরাবাদ, হুসিয়ারপুর ও হুগসুর প্রভৃতি স্থানে চর্মপ্রস্তুত ও তাহা হইতে জুতা প্রভৃতি নানা প্রকার জব্বা তৈয়ারি হইয়া থাকে। [বচ্-দেখ।] ৩ শরী-রাবরক শস্ত, ফলক, ঢাল। [ঢাল ও ফলক-দেখ।]

চর্মনালিকা (স্ত্রী) চর্ম নির্মিতা নালিকেব। কষা, তাড়নী। (শকার্ধচিঃ)

চর্মনাসিকা (স্ত্রী) 'চর্মবন্ধ', চাবুক।

চর্মপট (পুং) চর্মণঃ পটঃ ৬তৎ। চর্মনির্মিত পট, চামাটী।

চর্মপট্টিকা (স্ত্রী) চর্মণঃ পট্টিকা ৬তৎ। [চর্মপট দেখ।]

চর্মপত্রা (স্ত্রী) চর্মণেব পত্রং পক্ষোহস্তাঃ বহুব্রী। চর্মচটা, চামচিকা। (জটাধর)

চর্মপাত্রী (স্ত্রী) চর্মণেব পত্রং পক্ষোহস্তাঃ বহুব্রী ততো বাহ-লকাৎ জীব্। চর্মচটা, চামচিকা।

চর্মপাত্ৰকা (স্ত্রী) চর্মনির্মিতা পাত্ৰকা মধ্যলোঃ। উপানং, জুতা।

"ততো ব্রহ্মচারী অনেন যজ্ঞেন চর্মপাত্ৰকে পাদয়ো-নিদধ্যাৎ।" (ভবদেব)

চর্মপুট (পুং) চর্মনির্মিতঃ পুটঃ পাত্রং মধ্যলোঃ। যথা চর্ম-নির্মিতঃ পুটঃ পাত্রমত্র বহুব্রী। চর্মনির্মিত পাত্রবিশেষ, কুশা।

চর্মপুটক (পুং) চর্মপুট-স্বার্থে কন্। [চর্মপুট দেখ।]

চর্মপ্রভেদিকা (স্ত্রী) চর্ম-প্রভিনতি-প্র-ভিদ-বুল-টাণ্ অত ইৎ। অত্রবিশেষ, ফোড়, চর্মবেধনাজ। (অমর)

চর্মপ্রসেবক (পুং) চর্মণা প্রসীবাতে প্র-সিব-বাহলকাৎ কর্মণি বুল্। ভস্তা, জাঁতা।

চর্মপ্রসেবিকা (স্ত্রী) চর্মপ্রসেবক-টাণ্। অত ইৎ। চর্ম-নির্মিত যন্ত্রবিশেষ, ভস্তা, জাঁতা। (অমর)

চর্মবন্ধ (পুং) চর্মণা বন্ধঃ ৩তৎ। ১ চর্মধারা বন্ধন। ২ চাবুক।

চর্মমণ্ডল (পুং) [বহ] দেশবিশেষ।

"অপরাস্তাঃ পরাস্তাস্ত পহবাস্তচর্মমণ্ডলাঃ।" (ভারঃ ৬।৯ অঃ)

চর্মময় (ত্রি) চর্মণোবিকারঃ চর্ম ময়ট্ চর্মনির্মিত পাত্রাদি।

"বীপি চর্মাবনৈকৈশ্চ ব্যাজচর্মময়ৈরপি।" (ভারঃ ৬।৪৬ অঃ) জীলিঙ্গে ভীহ্ হয়।

চর্মমুণ্ডা (স্ত্রী) চর্মণো জীবরহিতদৈত্যাত্ত মুণ্ডমন্তি হন্তে-হস্তাঃ বহুব্রী, টাণ্। যথা চামুণ্ডা পুষোদরাদিস্থাৎ সাধু। ছর্গা। (হেম)

চর্মমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। বামহস্তটী তির্গাণ্ ভাবে প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলী আকৃষ্ট করিবে ইহাকে চর্মমুদ্রা বলে।

"বামহস্তং তথা তির্গাকৃৎ চৈব প্রসার্যচ।

আকৃষ্টাঙ্গুলীঃ কুর্ধ্যাৎ চর্মমুদ্রেয়মীতি।" (তন্ত্রসার)

চর্মম্মা (ত্রি) চর্মময়ে কবচাদৌ মনতি অভ্যস্ততি চর্ম-ম্মা-বিচ্।

(আতো মনিন্ কনিক্বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪) ১ যে ব্যক্তি

চর্মময় কবচাদি ধারণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে। চর্মণি

চরণ সাধনান্যাদীনি তেষু মনতি অভ্যস্ততি চর্ম-ম্মা-বিচ্।

২ অশ্বাদি আরোহণ করিতে যাহার অভ্যাস আছে।

"কৃষ্ণচর্মম্মা অভিতোজনাঃ।" (খক্-৮।৫।৩৮) 'চর্মম্মা-চর্মময়স্ত কবচাদেধারণে কৃত্যভ্যাসাঃ'। (সাক্ষি)

চর্মযষ্টি (স্ত্রী) চর্মময়ী যষ্টিরিব। চর্মময় যষ্টি, অশ্বতাড়নী।

(শকার্ধচিঃ)

চর্মরঙ্গ (পুং) চর্মণি রঙ্গোহস্ত বহুব্রী। দেশবিশেষ। কুর্-বিভাগে পশ্চিমোত্তরে এই দেশের উল্লেখ আছে।

(বৃহৎসং ১৪ অঃ)

চর্মরঙ্গা (স্ত্রী) চর্মণে রঙ্গোহস্তাঃ বহুব্রী-টাণ্। আবর্তকী-লতা, কোকিলদেশে ভগবতবল্লী বলে। (রাজনিঃ)

চর্মরী (স্ত্রী) চর্ম-রাতি রা-ক-গোরাণি জীব্। হাবর বিধের অন্তর্গত একপ্রকার বিষলতা, ইহার ফলে বিষ আছে।

চর্ম্মক (পুং) চর্ম্মরাজি-রা-বাহুলকাৎ কৃ। চর্ম্মকার। (জিকাণ্ড°)
চর্ম্মবৎ (ত্রি) চর্ম্ম-অত্যর্থে-মতৃপ্ মত্ বঃ অলংকার্যৎ মলোপঃ।
১ চর্ম্মবৃত্ত। জীলিলে জীপ্ হর।

“লোহচর্ম্মবতী চাপি সান্নিঃ সপ্তদৃষ্টিকা।” (ভারত ৩।১৫ অঃ)
(পুং) ২ অম্বলের এক পুত্র। (ভারত ৩।২১ অঃ)

চর্ম্মবসন (পুং) চর্ম্ম গজাস্তরচর্ম্ম বসনং যত্র বহত্বী। মহাদেব।
[কৃতিবাসস্ দেখ।]

চর্ম্মবৃক্ষ (পুং) চর্ম্মপ্রধানচর্ম্মতুল্যবৃক্ষপ্রধানো বৃক্ষঃ মধ্যলো°।
তুর্জবৃক্ষ।

“খর্জুরা মারিকেলান্চ চর্ম্মবৃক্ষো হরীতকী।” (হরিব° ৩১ অঃ)

চর্ম্মসম্ভবা (স্ত্রী) চর্ম্মণি সংভব উৎপত্তিব্যত্যাঃ বহত্বী, টাপ্।
এলা, এলাচী। (হারাবলী)

চর্ম্মসার (পুং) চর্ম্মগঃ সারঃ ৬তৎ। রস। (রাজনি°) তুস্ত
অন্নাদি চর্ম্ম মধ্যে থাকিয়া রসরূপে পরিণত হয় বলিয়া
ইহার নাম চর্ম্মসার হইয়াছে।

চর্ম্মাখ্য (পুং) কুষ্ঠরোগবিশেষ। [কুষ্ঠ দেখ।]

চর্ম্মাক্ষ, প্রাচীন ভোজকটের অন্তর্গত একটা গণগ্রাম। ইহার
বর্তমান নাম চম্বক বা চমাক। ইহা ইলিচপুর হইতে ৪ মাইল
দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°
৩১' পূঃ। এই গ্রাম হইতে বাকটিকমহারাজ ২য় প্রবর-
সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চর্ম্মাস্ত (পুং) সূত্রতোক্ত উপযজ্ঞবিশেষ।

“উপযজ্ঞাণ্যপি রজ্জুবেগিকা পটুচর্ম্মাস্তবকুললতা।”

(সূত্রত সূত্র° ৭ অঃ)

চর্ম্মাস্তস্ (স্ত্রী) চর্ম্মগোহস্তঃ ৬তৎ। চর্ম্মমধ্যস্থিত রস। (রাজনি°)
কোন আভিধানিকের মতে এই শব্দটা পুংলিঙ্গ এবং কোন
কোন আভিধানিক “চর্ম্মাস্তস্” অকারান্ত চর্ম্মাস্ত শব্দ স্বীকার
করেন।

চর্ম্মার (পুং) চর্ম্ম-শিরসাধনতরা ঋচ্ছতি-ঋ-অণ্, উপপদস°।
চর্ম্মকার। (জটধর)

চর্ম্মাবকর্ত্তিন্ (পুং) চর্ম্ম-অবকৃত্ততি অব-কৃত-গিনি। চর্ম্মকার।
“আয়ুঃ স্তবর্ণকারাণাং তথা চর্ম্মাবকর্ত্তিনাং।” (মহু ৪।২১৮)

চর্ম্মাবকর্ত্ব (পুং) চর্ম্মকার।

চর্ম্মি (স্ত্রী) চর্ম্মচটকা, চামটিকা। (শব্দরত্না°)

চর্ম্মিক (ত্রি) চর্ম্মং চর্ম্মময়ং ফলকং অন্ত্যস্ত চর্ম্ম-স্ত্রীহাদি°
ঠন্। যে ব্যক্তি চর্ম্মময় ফলক লইয়া যুদ্ধ করে, ঢালী।

চর্ম্মিন্ (ত্রি) চর্ম্ম শরীরাবরকং ফলকমন্ত্যস্ত চর্ম্ম-ইনি,
টিলাপশ্চ। ১ চর্ম্মযুক্ত, চর্ম্মধারী, চলিত কথায় ঢালী বলে।
পর্যায়—ফলকপাণি।

“শ্রামং বৃহন্তং তরুণং চর্ম্মিণামুভয়ং রণে।” (ভারত ৩।২৭।৩১)
(পুং) চর্ম্মিণি বকলানি সম্ভ্যত চর্ম্ম-ইনি। ২ তুর্জবৃক্ষ।
(অমর।) ৩ তুর্জরীট। ৪ মোচা। (শব্দরত্না°) ৫ মহাদেব।
(ভারত ১৩।১৭।৩১।)

চর্ম্ম্য (ত্রি) চর্ম্ম-কর্ম্মণি যৎ (গদমদচর্ম্মমশ্চাছুপসর্গে। পা ৩।১।১০০)
১ অম্বষ্ঠের, আচরণীয়।

“যট্টিজিংশদাকিকং চর্ম্ম্যং শুভ্রো জৈবেদিকং ব্রতম্।” (মহু ৩।১)
(স্ত্রী) চর্ম্ম-ভাবে যৎ। ২ অবশ্য কর্তব্য, যে অম্বষ্ঠান নিশ্চয়ই
করিতে হইবে।

চর্ম্ম্য (স্ত্রী) চর্ম্ম্য-টাপ্। ১ আচরণ। ২ সেবা।

“বনবাসন্ত শূরন্ত মমচর্ম্ম্যাহি রোচতে।” (রামা° ২।২৯।১৫)
৩ গমন। ৪ ভক্ষণ। (বুদ্ধবোধটী° চূর্ণাদাস।) ৫ ইধ্যাপন-
স্থিতি, পরিব্রাজকগণের ব্রতাম্বষ্ঠানবিষয়ে নিয়মের অপরি-
ত্যাগ। (অমরটী° তরুণত°)

চর্ম্ম্যাবতার (পুং) বৌদ্ধশ্রুতেন্দ।

চর্ম্মণ (স্ত্রী) চর্ম্ম ভাবে লুটি। ১ চিবান, দস্তদ্বারা চূর্ণ করা।
২ রসাস্বাদনব্যাপারবিশেষ। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°) (ত্রি)
চর্ম্ম-কর্ত্তরি লু। ৩ যাহারা চর্ম্মণ করে।

“পুনঃ পুনঃচর্ম্মিতচর্ম্মণানাং।” (ভাগবত ৭।৫।৩০।)

চর্ম্মণা (স্ত্রী) চর্ম্ম-যুচ্-টাপ্। ১ রসাস্বাদন ব্যাপার।

“প্রমাণং চর্ম্মণৈবাত্র শ্রান্তিরে বিদুষাং মতং।” (সাহিত্য ৩ পরি°)
২ চর্ম্মণ, চিবান।

চর্ম্মন্ (পুং) তলগ্রহণ। (হারাবলী)

চর্ম্মা (স্ত্রী) চর্ম্ম-অঙ্। ১ চর্ম্মণ। ২ তলগ্রহণ। (শকার্ণটী°)

চর্ম্মিত (ত্রি) চর্ম্ম-কর্ম্মণি ক্ত। ১ যাহাকে চর্ম্মণ করা হইয়াছে।
২ ভক্ষিত। [চর্ম্মণ দেখ।]

চর্ম্মিতপাত্র (স্ত্রী) চর্ম্মিতস্ত পাত্রং ৬তৎ। পাত্রবিশেষ,
পিকদানী।

চর্ম্মিতপাত্রক (স্ত্রী) চর্ম্মিতপাত্র স্বার্থে কন্। পাত্রবিশেষ,
পিকদানী।

“তাম্বলং চর্ম্মণং পানপাত্রং চর্ম্মিতপাত্রকম্। (পাণ্ডে পাতাল)

চর্ম্ম্য (ত্রি) চর্ম্ম-কর্ম্মণি গ্যৎ। ১ ভক্ষ্যজব্য বিশেষ, যাহা দস্ত
দ্বারা চূর্ণ করিয়া খাইতে হয়।

“যট্টিকোটং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ।

চুষ্যপেয়লেহচর্টেক্যরতি তৃপ্তিং দিনে দিনে ॥” (ব্রহ্মবৈ° পু°)
২ চর্ম্মণীয়।

চর্ম্মণ [রণচর্ম্মণ দেখ।]

চর্ম্মণি (পুং) কর্ম্মণি কৃষ-অনি চ আদেশশ্চ। (কৃষেরাদেশ্চ চঃ।
পা° উণাদি°) ১ মল্লযা। “য একশ্চর্ম্মণীনাং বহুমানিরজ্যতি।”

(ধৃক ১৭১৯) 'চৰ্ঘণীনাং মল্লযাগাং' (সায়ণ।) (জী) ২ পুংস্তলী।

"স চৰ্ঘণীনাং মল্লগচ্ছো যজ্ঞঃ" (ভাগবত ১০।২৯।২।)

চৰ্ঘণীপ্রা (জি) যিনি ধন দিয়া মল্লযাগকে শ্রীতিযুক্ত করেন।

"আ চৰ্ঘণীপ্রা বৃষভোজনাং" (ধৃক ১।২৭৭।১) 'চৰ্ঘণি-

প্রাঃ চৰ্ঘণয়োমল্লযাগাঃ। তেবাং ধনাদিনা শ্রীণয়িতা।' (সায়ণ।)

চৰ্ঘণী (জী) চৰ্ঘণী-জাতি বা জীপ্। ১ মল্লযাগাতি। "ইদমুতা

চৰ্ঘণীধৃতা।" (ধৃক ৮।৯০।৫) 'চৰ্ঘণীধৃতা...মল্লযাগাং ধারকেন।' (সায়ণ।)

চৰ্ঘণীধৃৎ (জি) যে মল্লযাগাভিকে ধারণ বা রক্ষা করে।

[চৰ্ঘণী দেখ।]

চৰ্ঘণীধৃতি (জি) চৰ্ঘণীভি ধৃতঃ পুৰোদরাদিবাং সাধু। প্রজা কর্তৃক ধৃত, প্রজারা যাহাকে ধারণ করিয়াছে।

"সোম নৃমাদনঃ পরম্ব চৰ্ঘণীধৃতিঃ।" (সাম্য ২।৩।২।৩।৫)

'চৰ্ঘণীধৃতিঃ চৰ্ঘণীভির্ধৃগ্ধিগ্ধিঃ প্রজাভিধৃতঃ।' (সায়ণ।)

চৰ্ঘণীসহ (জি) শক্রনাশক, যে শক্রদিগকে অভিভব করিতে পারে। "যুয়ং রাজানঃ কং চিচ্চৰ্ঘণীসহঃ।" (ধৃক ৮।১৯।৩৫।)

'চৰ্ঘণীসহঃ শক্রভূতানামভিত্তবিতারঃ।' (সায়ণ।)

চল (জি) চলতি গচ্ছতি চল-অচ্ (নন্নিগ্রহিণ্যচাদিভ্যো লুগিষ্ঠঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ চঞ্চল, অস্থির।

"তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেষ নিবিড়া বলাকিনী।"

(রঘু ১।১।৫)

২ কম্পযুক্ত। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

"ধৃতানীচলচলঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৯২) ৪ পারদ।

(হেমং ৪।১।১৬) চল কম্পনে স্বার্থে গিচ্ছাবে অপ্। ৫ কম্পন।

(মেদিনী) (স্ত্রী) ৬ ছন্দোবিশেষ, যে সময়বৃত্তের প্রত্যেক

চরণ ১৮টা অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং যাহার প্রত্যেক

চরণের ১, ২, ৩, ৪, ১১, ১৩, ১৬ ও ১৮ অক্ষর গুরু, তাহা

ভিন্ন অপর অক্ষর লঘু হয়, তাহাকে চল বলে।

"স্তোন্মজো জ্যো চেকলমিদমুদিতং যুগৈর্মুনিভিঃ স্বরৈঃ।"

(বৃত্তরত্নাং) (পুং) ৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৬)

চলকর্ণ (পুং) পৃথিবী হইতে গ্রহণের প্রকৃত দূরত্ব।

চলকুড়ি, মাজাজ প্রদেশের কোটান রাজ্যে প্রবাহিত একটি নদী। মুকুন্দপুর হইতে উৎপন্ন হইয়া অক্রবক্রভাবে ৬৮

মাইল পথ গিয়া ক্রান্তনেনের কিছুদূরে অপসৃত হইয়াছে।

চলকৃতি (জি) চলা কৃতিঃ কার্য্যং যন্ত বহতী। যাহার কার্য্য অস্থির।

"অহঞ্চ ন কতচিৎখসিমি চলকৃতিশ্চ।" (পঞ্চতন্ত্র)

চলকেতু (পুং) চলশচ্যো কেতুশ্চেতি কর্ম্মধা°। কেতুবিশেষ।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে ধুমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত

হয় ও দক্ষিণে একাজুল উন্নত একটি শিখা থাকে এবং উদিত

হইয়া উত্তরে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পরে অন্ত যায়, তাহার নাম

চলকেতু। বর্ধিত চলকেতু যদি উত্তর প্রব, লগ্নধিমণ্ডল বা

অভিজিৎ নক্ষত্রকে স্পর্শ করিয়া আকাশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত

চলিয়া যায় ও তথায় অন্তমিত হয়, তবে প্রয়াগের নিকট

হইতে অবন্তী পর্য্যন্ত পুষ্কর এবং উত্তরে দেবিকা নদী পর্য্যন্ত

বৃহৎ মধ্যদেশ বলিষ্ঠ হয়। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে রোগ ও

দুর্ভিক্ষে অপর অপর দেশেরও অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার

কলকাল দশমাস। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আঠার মাসে

ইহার ফল হয়। (বৃহৎসং ১।১।৩৩-৩৬) [কেতু দেখ।]

চলক্সগতিপ্রিয়া (স্ত্রী) দেবীবিশেষ, কুমারী।

"চারুচন্দ্রা চলক্সগতিপ্রিয়া।"

(কৃত্তবাসল, উত্তরতন্ত্র ১০ পং)

চলচক্ষু (পুং স্ত্রী) চলা চক্ষুরন্ত বহতী। চেকোর পক্ষী। (হেম)

চলচিত্ত (স্ত্রী) চলচ্চিত্তং চেতি কর্ম্মধা°। ১ অস্থিরচিত্ত।

"পোংচল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ।" (মহু ৯।১৫)

(জি) চলং অস্থিরং চিত্তং যন্ত বহতী। ২ অস্থির চিত্ত, যাহার

মতের স্থির নাই।

চলচিত্ততা (স্ত্রী) চলচিত্তত্ব ভাবঃ, চলচিত্ত-তল্-টাপ্।

চিত্তের অস্থিরতা।

চলচ্ছক্তি (স্ত্রী) গতিশক্তি, চলিবার সামর্থ্য।

চলৎ (জি) চল-শত্। ১ যে চলিতেছে। ২ কম্পমান, যাহা

কাঁপিতেছে। ৩ চঞ্চল, অস্থির।

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজীবনযৌবনং।" (উদ্ভট)

জীলিঙ্গে ভীষ্ হইয়া 'চলন্তী' শব্দ হয়।

চলতা (স্ত্রী) চলস্য ভাবঃ চল-তল্-টাপ্। অস্থিরতা।

"চলানামচলত্বমচলনাং চলতা।" (সুশ্রুত ১।১৩২ অঃ)

২ দাঁতনড়া। (অশ্ববৈদ্যক)

চলৎপূর্ণিমা (স্ত্রী) চলন্তী পূর্ণিমা তত্পলক্ষিতশ্চন্দ্রইব।

চন্দ্রকমৎসা, চাঁদা। (ত্রিকাণ্ড°)

চলদঙ্গ (পুং স্ত্রী) চলৎ চঞ্চলং অঙ্গং যন্ত বহতী। মৎসাবিশেষ,

চেল মাছ। ইহার গুণ—অনভিস্যন্দী, বাতরোগে হিতকর ও

মুখরোচক। (রাজবল্লভ)

চলদঙ্গক (পুং স্ত্রী) চলদঙ্গং যস্য বহতী বা কপ্। [চলদঙ্গ দেখ।]

চলদল (পুং) চলানি চঞ্চলানি দলান্তস্য বহতী। অশ্বখ বৃক্ষ।

(অমর ২।৩।২০।) [অশ্বখ দেখ।]

চলন (স্ত্রী) চল ভাবে লুট্। ১ কম্পন।

"হস্তমোচনাদেকো দ্বিতীয়ঃ পাদবেগজঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ২।১৭৪)

২ গতি, ভ্রমণ।

“চলনক বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি মে মতিঃ।”

(দেবীভাঃ ১।১৭।১২)

(জি) চল-কর্ত্তরি লু। ৩ কম্পযুক্ত। (মেদিনী)
(পুং জী) ৪ হরিণ। (জটায়র) এই অর্থে জীলিঙ্গে ভীষ
হয়। (পুং) চলভ্যনেল চল-করণে লুট্। ৫ চরণ। (হেম)
চলনক (পুং) চলন-সংজ্ঞার্য্য কন্। চণ্ডাতক। (হেম)
চলনশিলা (জী) বৃন্দাবনের অন্তর্গত একটা স্থান, ইহা
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। (বৃ-লীঃ ২৪ অঃ)
চলনার্হি (জি) চলনমর্হতি চলন-অর্হ-অণ্। বাহা চলিবার যোগ্য।
চলনিকা (জী) চলনী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্কোত্ত্বশ্চ। রেলমী
কালর। [চলনী দেখ।]

চলনী (জী) চলভ্যত্র চল-আধারে লুট্ ভীপ্। পরিধেয় বস্ত্র-
বিশেষ, বাঘরা। ২ পজবন্ধনী, বারী। (হেম)

চলনীয় (জি) চল-অনীয়র্। ১ গমনীয়। ২ ব্যবহারযোগ্য।

চলপত্র (পুং) চলানি চকলানি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। অশ্বখ-
বৃক্ষ। (রাজনিঃ) “অজেন কেনাপি বিজেকুমত্তা গবেষ্যতে
কিং চলপত্রপত্রম্।” (নৈষধঃ)

চলপানি, অপর নাম খলপানি। যুগফজইএর লুন্খোর জেলার
প্রবাহিত একটা নদী। প্রকৃতস্ববিদ্ কনিংহামের মতে
আরিয়ান্ মলমন্তস্ (Malamantos) নামে যে নদীর
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই চলপানি হইতে পারে।
এই নদীতে চোরাবালী অধিক। ইহা কাবুল নদীর সহিত
মিলিত হইয়াছে।

চলস্ (ক্রী) বৃক্ষবিশেষ। (উণাদিকোঃ) (Wood-sorrel)

চলসংক্রান্তি (জী) চল্যচলৌ সংক্রান্তিচেতি কর্ম্মধা°।
অন্ননাশের চলানুসারে রাশিবিশেষের অংশে রবি প্রভৃতি
গ্রহের প্রভাসকার। [সংক্রান্তি দেখ।]

চলা (জী) চল-অচ্-টাপ্। ১ লক্ষী। (মেদিনী) ২ গজদ্বয়
বিশেষ, সিল্ক। (রত্নমা°) ৩ বিদ্যুৎ। ৪ চারি চরণ ও
অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোভেদ।

চলাচল (জি) চলতি চল-অচ্ বিহ্বৎ। অকারস্যাকারা-
দেশশ্চ। ১ চঞ্চল। (অমর)

“জগ্নিনোহস্য হিতিং বিধান্ লক্ষ্মীমিব চলাচলাম্।”

(ক্রিয়াত° ১১.৩০)

(পুং জী) ২ কাক। (রাজনিঃ) ৩ সংসারচক্র।

(দিব্যাবদান) জীলিঙ্গে ভীষ হয়।

চলাচলি (দেশজ) গমনাগমন, যাতায়াত।

চলাতক (পুং) চলস্য চলনস্যাতকো ভয়মন্নাৎ বহুব্রী। বাত-
রোগ বিশেষ। (রাজনিঃ)

চলাবুলা (দেশজ) গমনাগমন, বাওয়া আনা।

চলি (পুং) ১ রাজমাষ, বরবটী। ২ উত্তরীর বস্ত্র।

চলিত (জি) চল-কর্ত্তরি ক্ত। ১ কম্পিত। (অমর)

“তন্নোবিলাসবলিতৈশ্চলিতাপাদবিভ্রমৈঃ।” (রাজতর° ৫।৩৬৫)
২ গত।

“চলিতঃ পুরঃ পতিমুপেতমাত্মজম্।” (মাঘ)

৩ প্রাপ্ত। ৪ জাত। (ক্রী) চল-ভাবে ক্ত। ৫ গমন। ৬ চলন।

(দেশজ) ৭ বাহার চলন বা ব্যবহার প্রচলিত আছে।

চলিতব্য (জি) চল-ভাবে তব্য। গন্তব্য।

চলিফু (জি) চল-ইফুচ্। ১ গমনশীল, বাহা স্থির নহে।

২ যে বাইবার উপক্রম করিতেছে, গমনোদ্যত।

চলু (পুং) চল-উন্। গণ্ডুষ। (হেম° ৩।২৬২)

চলুক (পুং) চলু সংজ্ঞার্য্য কন্। ১ প্রস্থতি, হস্তকোষ।
২ ভাণ্ডবিশেষ, ক্ষুদ্র ভাণ্ড। (মেদিনী)

চলেযু (পুং) চলো লক্ষ্যমপ্রাপ্ত ইষ্যৎ বহুব্রী। মন্দ ধাতুক,
বাহার নিকৃষ্ট বাণ লক্ষ্য প্রাপ্ত হয় না।

চলৌনি, ভাগলপুরের একটা নদী। হরাবৎ পরগণায় বাহির
হইয়া নারীদিগর পরগণা হইয়া পাঁচুরার ধারে লোরণ নদীতে
মিলিত হইয়াছে। নিশাকপুর পরগণায় এই নদী দণ্ডার
নামে খ্যাত।

চলিয়াপত্নী, রাজপুতানার একটা উপাসক সম্প্রদায়। জয়পুর
ও যোধপুর অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোক আছে। ইহাদের
আচার ব্যবহার বামাচারী শাক্তদিগের ন্যায়। প্রত্যেক
গুরু একজন কোতোয়াল, একজন সহকারী কোতোয়াল
আর কতকগুলি শিষ্য থাকে। কোন নির্দিষ্ট রাজিকালে
ইহাদের চক্র হয়। চক্র আরম্ভের পূর্বে এক পার্শ্বে গুরু
আসন ও তাহার ডান দিকে কোতোয়াল ও সহকারী কোতো-
য়ালের আসন থাকে। তাহার সম্মুখে সুরাপূর্ণ একটা বড়
পাত্র এবং এক শূন্যকুম্ভ রাখা হয়। জীলোকেরা স্ব স্ব কাঁচলি
খুলিয়া সেই শূন্য কুম্ভের মধ্যে রাখিয়া একত্র এক স্থানে বসে,
পুরুষেরা আর এক দিকে অবস্থান করে। পরে কোতোয়াল
উঠিয়া পূর্কোক্ত সুরাপাত্র হইতে এক পাত্র সুরা উত্তোলন
করে। তখন গুরু আপন ইচ্ছানুসারে পুরুষদের মধ্য
হইতে এক জনকে আহ্বান করেন। সে ব্যক্তি আসিয়া
গুরু আদেশে বামপার্শ্বে বসে। তখন সহকারী
কোতোয়াল উঠিয়া কুম্ভ হইতে একখানি কাঁচলি তুলিয়া
লয়, বাহার কাঁচলি সেই জীলোক আসিয়া সেই
আহৃত পুরুষের বামভাগে একাসনে উপবেশন করে।
এই রূপে সকল শিষ্য শিষ্যা দুই দুই জনে একাসনে

চক্রাকারে বসিয়া যায়। সাধনার সময়ে সেই ছই জন পতি-পত্নী মধ্যে গণ্য হয়। ঐ সময়ে সম্প্রদায়ের নিয়মাক্রমে উভয়ে একত্র সুরাপান ও অন্যান্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাঁচলি শব্দের বিকারে অথবা কাঁ বাদ দিয়াই হউক, ইহার আশ্রয়ীদের নাম চলিয়াপত্নী রাখিয়াছে।

(ভারতবর্ষীয় উপা° সম্প্র° ২য় ভা°)

চলুকান (দেশজ) উথলে পড়া, উছলে উঠা।

চলুগালি, ছোট নাগপুরের সগুজার অন্তর্গত একটা তাম্রা।

পূর্বে এখানে একজন সামন্তরাজের রাজত্ব ছিল। এখানকার কনহার নদীতীরে পূর্ব কীর্তির বিস্তার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে ৩টা বৃহৎ শিব-ভূগীর মন্দির এবং পাথরের এক অতি বৃহৎ চতুর্ভুজ পুরুষমূর্তি দেখা যায়। উক্ত বিধ্বস্ত মন্দিরের শিল্পকার্য্য প্রশংসনীয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, ঐ চতুর্ভুজ পুরুষই সামন্তরাজের প্রতিমূর্তি।

চলুবলিয়া (দেশজ) চকল।

চলুতি (দেশজ) ব্যবহার।

চল্লিশ (চত্বারিংশৎশব্দজ) সংখ্যা বিশেষ, ৪০।

চল্লিশা (দেশজ) চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে অনেকের চক্ষুতে এক প্রকার রোগ জন্মে, ইহাতে দৃষ্টিশক্তি কিছু হানি হয়, চলিত কথায় তাহাকে চালশে বা চালিশা (Presbyopia) বলে।*

চবর্গ (পুং) চ-বর্গ বহু চতুর্ভুজ বর্গ: ৬৩৭। ২য় বর্গ, চ ছ জ ক ঞ।

চবর্গীয় (ত্রি) চবর্গে ভব: চবর্গ-ছ (বর্গান্তান্ত)। পা ৪.৩।৬৩) চবর্গ সম্বন্ধীয়।

চবল (পুং) চর্ব বাহুলকাৎ-অলচ্ প্ৰবোধদাদিত্বাৎ সাধু। রাজমাষ। (শকার্ধচি°)

চবি (জী) চর্ব-ইন্ প্ৰবোধদাদিত্বাৎ সাধু। চব্য, চই। (শকার্ধচি°)

চবিক (জী) চবি-সংজ্ঞায়াং কন্। চবিকা। (ভরতধৃত ক্রত)

চবিকা (জী) চবি স্বার্থে কন্-টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, চই।

(Piper longum) আরবী দর-কিল্কিল, পারসী মগজ্ পিপল, হিন্দী পিপুলমূল। এশিয়ার দক্ষিণাংশে বিশেষত: ভারতবর্ষে জলের ধারে এই গাছ যথেষ্ট জন্মে। এই গাছ লতানিয়া। উত্তর সরকারে ইহার চাব বেনী। এই গাছ কাটিলে আবার বাড়িয়া উঠে, ইহার মূল বহুবর্ষেও নষ্ট হয় না। কাশ মরিচের মত ইহার ফল হয়, প্রথমে তাহাতে সবুজের আভা থাকে, পাকিলে লাল দেখায়। অপকাবস্থায় শুকাইয়া গইলে কৃষ্ণাভ রঙ হয়। ডাক্তারদিগের মতে, ইহার গুণ অনেকটা মরিচের মত।

সংস্কৃত পর্যায়—চব্য, চব্যা, চবি, চবিক, চবী, রত্নাবলী,

ভেজাবতী, কোলা, নাকুলী, উষণা, চব্যাক, বশির, গন্ধমাকুলী, বরী, কোলবরী, কোল, কুটিলগণ্ডক, তীক্ষ, করিকরণাবরী, কুসর। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, লঘু, রোচন, দীপন, কাশ, শ্বাস ও শূলনাশক। (রাজনি°) ভেদকারী ও ককনাশক। (রাজবলত।)

চবী (জী) চবি-জীন্ (বহ্বাদিত্যশ্চ। পা ৪।১।৪৫) চবিকা, চই।

(শকার্ধচি°) "সর্ববর্ণা চবীহন্ত: প্রতিজ্ঞাং তাং সুহৃদ্রাম্।"

(কথাসরিৎ ৩।১৫১)

চবিশ (চতুর্বিংশ শব্দজ) চতুর্বিংশতি সংখ্যা, ২৪।

চবিশ পরগণা, বঙ্গদেশের একটা জেলা। বালার ছোট-লাট এই জেলায় অবস্থান করেন। অক্ষা° ২১° ৫৫' ২০" হইতে ২২° ৫৭' ৩২" উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৬' ৪৫" হইতে ৮৮° ২০' ৫১" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নদিয়া জেলা, ঈশান কোণে যশোর জেলা, পূর্বে খুলনা জেলা ও সুন্দরবন, দক্ষিণে আসমুদ্র সুন্দরবন এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। ইহার পরিমাণ ২০২৭ বর্গমাইল ও অধিবাসীর সংখ্যা ১৬১৮৪২০। আলিপুর ইহার প্রধান সদর। ইহার অন্তর্গত সুন্দরবনের অনেক স্থান অজলময়, সুতরাং সে অঞ্চলের পরিমাণ কল এখনও স্থির হয় নাই। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরী ইহার অন্তর্গত, তবে কলিকাতার শাসন ও অপরাপর কার্য্য-প্রণালী পৃথক্ রূপে চালিত হয় বলিয়া ঐ নগরী ইহার মধ্যে গণ্য করা যায় না।

চবিশ পরগণা গঙ্গার বদ্বীপের পশ্চিম অংশ। ইহার পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া অনেকগুলি নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং দক্ষিণে সমুদ্র বহিতেছে। বহুসংখ্যক খাল ইহার মধ্যদেশে বর্তমান। ইহার উপরিভাগ সাধারণত: সমতল; উত্তর অঞ্চল উচ্চ এবং দক্ষিণ অঞ্চল কিছু নিম্ন। এই অঞ্চলে নদী বিস্তার এবং ঐ সকল নদী হিংস্র জন্ত-পরিপূর্ণ মজুয়াবাসের অযোগ্য অজল মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই জেলার পূর্বাঞ্চলে অসংখ্য বিল ও পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য খাল বিরাজ করিতেছে। ইহার উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্বরা। উত্তর পূর্বাঞ্চলে নারিকেল গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ অংশ অতিশয় লবণাক্ত, সুতরাং তথাকার ভূমি ভেমন শস্তোৎপাদক নহে। ইহার মধ্য দিয়া হুগলী বা ভাগীরথী, বিন্ধ্যাধরী, পিয়ালী, কালিন্দী, ইছামতী বা যমুনা, খোলপেটুরা, এবং কবোদক (কপোতাক্ষ) নামে কএকটি প্রধান নদী প্রবাহিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবনে মালক, রায়মজল, মাতলা, জামিরা, হুগলী বা বুড়মজের নামক অনেক ক্ষুদ্র নদী

রহিয়াছে। হুগলী বা ভাগীরথীর গতি এই জেলার কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার গতি টলির নালার সহিত মিশিয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে। মেজর টলি ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে এই নালার কাটেন। এই জেলার আদিগঙ্গা কিছুদূর সামান্যভাবে প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখানকার নদীর বালিতে চড়া পড়িয়া অনেক ছোট ছোট দ্বীপ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাগরদ্বীপ বিখ্যাত। ইহার অন্তর্গত পোর্টক্যানিং, হুসেনাবাদ এবং ইছামতী জলযানের পথ।

আজকাল সুন্দরবন প্রধান আবাদ মধ্যে গণ্য, জঙ্গলস্থ গাছপালা পচিয়া ইহার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। এখানকার জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট, নল ও কাটি উৎপন্ন হয়। জঙ্গলে সুন্দরী, পতুর, কির্পা, বাইন, হিহাল, গরান, কেওড়া, গঙ্গো, খালসী, বাবলা প্রভৃতি কাঠ, নানা জাতীয় শস্য, মধু, মোম, গোলপাতা, গাবফল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, নাটা প্রভৃতিও বেশ পাওয়া যায়। এখানে বাঘ, বজ্রমহিষ, নানাজাতীয় হরিণ, খরগোশ, বহুকুকুট, বহুহংস প্রভৃতি জন্তু দৃষ্ট হয়।

আদিগঙ্গার তটে কালীঘাট চব্বিশ-পরগণার প্রধান তীর্থস্থান। সাগরদ্বীপ ইহার অন্তর্গত। এই স্থানে কপিলমুনির আশ্রম এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম। এতদ্ভিন্ন ডায়মণ্ডহারবারে যাত্রা-দেউল, জৈশানপুরে বারদোয়ারী, পরমানন্দকাটার গোবিন্দজীর মন্দির, মতোলীর প্রতাপাদিত্যের মন্দির, জৈশানপুরের বড় ওমরার গোর এবং মুস্তাফাপুরের নবরত্নমন্দির দেখিবার জিনিস।

চব্বিশপরগণা পূর্বে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের অংশ ছিল; ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের সন্ধি অনুসারে বাঙ্গালার নবাব নাজিম মীরজাফর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এই স্থান বিক্রয় করেন। ডায়মণ্ড-হারবার, বারুইপুর, আলিপুর, দমদম, বারাকপুর, রারাসত, বসিরহাট ও সাতক্ষীরা এই কয়টা চব্বিশ পরগণার উপবিভাগ।

চবুতরা (হিন্দী) কোতোয়ালের থানা।

চব্য (ক্ৰী) চর্ব-কর্মণি গ্যৎ পৃষোদরাদিত্যঃ র লোপে সাধু।
চবিকা, চই।

“চব্যোজ্জ্বীজং ত্রিফলা সর্পির্মাংসরসাস্বুতিঃ।” (সুশ্রুত ১.৪৪ অঃ)

চব্যক (ক্ৰী) চব্য-স্বার্থে কন্। চবিকা। (রাজনিং)

চব্যজা (ক্ৰী) চব্যমিব জায়তে জন-ভ টাপ্। গজপিপ্পলী, গজপিপুল। (রাজনিং) [গজপিপ্পলী দেখ।]

চব্যফল (ক্ৰী) চব্যমিব ফলং যন্ত বহুব্রী। গজপিপ্পলী। (রাজনিং)

চব্য। (ক্ৰী) চব্য-টাপ্। ১ চবিকা। (অমরটী ভরত)

“সর্পির্ধৃত্যং ত্রিকটু প্রলিহা

চব্যা বিভ্রোপহিতং ক্রম্যতঃ।” (সুশ্রুত ৪১ অঃ)

২ বচ। (মেদিনী) ৩ কার্পাসী, কাপাসের গাছ। (রাজনিং)

চব্যাদি (ক্ৰী) বৈদ্যাকোক্ত একপ্রকার পাক করা ঘৃত। চক্রদত্তের মতে চই, ত্রিকটু, আকনাদি, ক্ষীর, ধনে, যমানী, পিপ্পলীমূল, বিভ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বিষ (তেলাকুচ), ও হরিতকী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতে সহিত পাক করিবে। ইহার নাম চব্যাদিঘৃত। ইহা সেবনে প্রবাহিকা, শুদ্রাংশ, মূত্রকৃচ্ছ, পরিশ্রব ও শূলরোগ ভাল হয়। (চক্রদত্ত)
চব্যাদিকাত (পুং) বৈদ্যাকোক্ত ঔষধ বিশেষ। চই, সুখা, আতইচ, কচি বেলের শাঁস, শুষ্ঠী, কুড়চির ছাল, ইক্ষব ও হরিতকী একত্র কাথ করিবে; এই কাথ সেবনে বমি ও কফাতিসার নষ্ট হয়।

চশম (পারসী) ১ চক্ষু। ২ কূপ। ৩ উৎস।

চশমুখোর (পারসী) ১ যে কিছুই দেখিতে পায় না। ২ অকৃতজ্ঞ, যে উপকার মনে করেন না।

চশমখোরী (পারসী) ১ কিছু না দেখা। ২ অকৃতজ্ঞতা।

চশমা (পারসী) ১ পরিবীক্ষণ, নয়নাবরণ। [চস্মা দেখ।]
২ উৎস।

চষক (পুং ক্ৰী) চষতি ভক্ষয়তি পিবত্যনেন চষ-কূন্ (কূন্ শিলি-সংজ্ঞায়োরপূর্কৃত্যপি। উণ্ ২।৩২)। মদ্যপানপাত্র। পর্যায়—গব্বক, সরক, অমৃতর্ষণ। যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, রাজাদিগের পানপাত্রের নাম চষক। উহা স্বর্ণ, রক্ত, স্ফটিক বা কাচনির্মিত গোলাকার, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ বা দশকোণ। এই চারি প্রকার চষক চারি প্রকার রাজার পক্ষে প্রাপ্ত। চষকটা যাহার ব্যবহারের জন্য নির্মিত হইবে, তাহার মুষ্টি-পরিমিত করা উচিত এবং চতুর্ভুজ রহে তাহাকে খচিত করিতে হয়। মুস্তিকা বা ফাল-নির্মিত চষক সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। জঙ্গলবাসী রাজার পক্ষে কাঠ, ধাতু বা প্রস্তরের চষক মন্দ নহে। (যুক্তিকল্পতরু)

(ক্ৰী) চষ-কর্মণি কূন্। ২ মধু। ৩ মদ্যবিশেষ। (মেদিনী)

চষতি (পুং) চষ ভাবে অতি। ১ ভক্ষণ। ২ বধ। ৩ ক্ষয়।

চষা (দেশজ) ১ চাস করা, ভূমিকর্ষণ। ২ যাহা চাস করা হইয়াছে।

চষানি (দেশজ) ১ ক্ষেত্রে কৃষিকার্য। ২ কৃষিকার্যের জন্য যে বেতন দেওয়া যায়।

চমাল (পুং ক্ৰী) চষাতে বধ্যতেইয়িন্ চষ-আলচ্ (সানসি-বর্ণসির্গসিতভূলাকুলচষোলেবলপল্ললিফাশল্যাঃ। উণ্ ৪।১০৭) যুগটক, সাঁপি, যুগোপরিহ কাঠ, লৌহনির্মিত বলয়। [যুগ দেখ।] ২ মধুহান। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

চমিত (জি) চন্-ক। ১ ভক্তিত। ২ হত। (দেশজ) ৩ বাহা চাস করা হইরাছে।

চষীপোকা (দেশজ) এক প্রকার পোকা। হাতে, নাভিতে ও লিঙ্গে এই পোকা হয়, তাহাতে কষ্টকর ক্ষোটক জন্মে। হাতে হইলে চন্দন এবং নাভি ও লিঙ্গে হইলে মেটে সিম্পুর দিলে চষীপোকা দূর হয়।

চফটন (পুং) একজন ক্ষত্রপ রাজা।

চন্মা, কাচাদি নির্মিত চক্ষুর আবরণ। প্রধানতঃ একখানি ফ্রেমবিশিষ্ট কাচ কিংবা তজ্রপ স্বচ্ছ কোন পদার্থ নির্মিত দুইখণ্ড পরকলা (Lens) মাত্র। ফ্রেমখানি এক্রপভাবে গঠিত হয় এবং পরকলা দুইখণ্ড এক্রপভাবে তাহার সহিত আঁটা থাকে যে ফ্রেমের মধ্যস্থল নাসিকার উপর স্থাপিত হইলে পরকলা দুইখণ্ড চক্ষুর উপর পতিত হয় ও আবরণীয় জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টিশক্তির খর্বতা নিবারণের জন্যই সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ চন্মা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সখ করিয়া এবং কেহ কেহ চক্ষুর মধ্যে ধূলি, বালি প্রভৃতির পতন-নিবারণমানসেও চন্মা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী চন্মাও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে অর্থাৎ পরকলার আকৃতি ও তৎসঙ্গে উহার গুণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পরকলা ছয় প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট হয়।



১ সমতল ও হ্রাসপৃষ্ঠবিশিষ্ট অর্থাৎ এক পৃষ্ঠ সমতল ও অপর পৃষ্ঠ হ্রাস (Plano-convex)। ২—উভয়পৃষ্ঠ হ্রাস (Double convex)। ইহা দুই প্রকার, উভয় হ্রাসপৃষ্ঠের ব্যাসার্ধ সমান (Equi convex) এবং একের ব্যাসার্ধ অপরের অপেক্ষা ছয় গুণ (Crossed lens)। ৩—একপৃষ্ঠ ফাঁপা অপর পৃষ্ঠ হ্রাস (Meniscus)। ৪—একপৃষ্ঠ সমতল ও অপর ভাগ কূর্ণপৃষ্ঠাকার (Plano concave)। ৫—উভয়দিক কূর্ণপৃষ্ঠাকার বা ফাঁপা (Double concave)। ৬—একপৃষ্ঠ হ্রাস ও অপর ভাগ কূর্ণপৃষ্ঠাকার (Concavo convex)। এই ছয় প্রকার পরকলার মধ্যে উভয় পৃষ্ঠ হ্রাস (Double convex) পরকলা বয়সজনিত খর্বদৃষ্টি ব্যক্তির ও উভয়দিক কূর্ণপৃষ্ঠাকার (Double concave) পরকলা স্বাভাবিক কিংবা ব্যাধিজনিত খর্বদৃষ্টি অল্পবয়স্কের উপযোগী। এই জন্ত কূর্ণপৃষ্ঠাকার ও হ্রাস পরকলাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দৃষ্টিশক্তির কম বেশি খর্বতা অল্পসারে পরকলার কূর্ণপৃষ্ঠ ও হ্রাসপৃষ্ঠের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অল্পসারে বিভিন্ন প্রকার কূর্ণপৃষ্ঠ ও হ্রাস পরকলার প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি লাভ করাই পরকলা বা চন্মার মুখ্য উদ্দেশ্য। উভয়দিক হ্রাস (Double convex) ও কূর্ণপৃষ্ঠ (Double concave) পরকলার উপরই আলোক লম্ব বা সমান্তরাল ভাবে পতিত হয়, কিন্তু হ্রাস পরকলার মধ্য ভেদ করিয়া অপর পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া উহা আর সমান্তরাল থাকে না, পরস্পর বক্রভাবে আসিয়া পরকলার কিছু দূরে একটা বিন্দুতে মিশিয়া যায়;

ঐ বিন্দুটি অধিশ্রয় (Focus) নামে অভিহিত [নিয়ে ছবি দেখ] ঐ অধিশ্রয় বিন্দুতে আলোকসাহায্যে দৃষ্ট পদার্থের একটা প্রতিমূর্তি উন্টাভাবে পতিত হয় কূর্ণপৃষ্ঠ পরকলার (Double concave) উপর আলোক সমান্তরাল ভাবে পতিত হয় ও ভেদ করিয়া অপর পার্শ্ব বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে যাইয়া পরস্পর তফাৎ হইয়া যায়। এই সমস্ত বক্রআলোক রেখাকে বর্জিত করিলে যে বিন্দুতে মিলিত হয়, উহাই কূর্ণপৃষ্ঠ পরকলার উপর পতিত আলোকের অধিশ্রয় (focus)। চালসে (Presbyopia), বৃদ্ধ বয়সে নিকট দৃষ্টি (Myopia senilis), মণিহীনতা (Aphakia), নিকট দৃষ্টি



(Myopia), অস্পষ্টদৃষ্টি (Hypermetropia), ক্ষীণদৃষ্টি (Asthenopia), বিবম বা তির্যাক দৃষ্টি (Astigmatism) প্রভৃতি রোগে চন্মা ব্যবহারের দরকার। চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিগণ চালসে (Presbyopia) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দূরদৃষ্টির কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু নিকট দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ দূরাগত সমান্তর রশ্মির অধিশ্রয় (Focus) চক্ষুর মধ্যস্থ চিত্রপত্রের (Retina) উপর না হইয়া উহার বাহিরে হয় এবং এই জন্তই নিকট দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া যায়। একরূপ স্থলে যাহাতে সমান্তর আলোক রশ্মির অধিশ্রয় চিত্রপত্রের বাহিরে না পড়িয়া ঠিক উহার উপর পতিত হয়, সেই উপায় অবলম্বনীয়, কারণ পাতার উপর অধিশ্রয় হইলেই দৃষ্টি ঠিক থাকে, কোন ব্যত্যয় হয় না। উভয় পৃষ্ঠ হ্রাস (Double convex) চন্মার দ্বারা এই দোষ নিবারিত হয়, সুতরাং এ সময়ে উভয় পৃষ্ঠ হ্রাস চন্মার আবশ্যক। তবে চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোক ব্যক্তির

পক্ষে এক চন্দ্ৰমা কার্যকারী হয় না, কারণ বয়লান্সসারে সমান্তর আলোক রশ্মির অধিশ্রয় ও চিত্রপত্রের বাহিরে বিভিন্ন দৃশ্যের উপর হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিতে হয়। কত বয়স্ক লোকের চক্ষুতে আলোকের রশ্মির অধিশ্রয় কতদূরে পড়ে, ডাক্তার কিচেনার তাঁহার 'ইকোনমী অব দি আইজ' (Dr. Kitchener's Economy of the Eyes) নামক পুস্তকে এক তালিকা দিয়াছেন।

বয়স	অধিশ্রয়ের দূরত্ব ইঞ্চি।	
৪০	...	৩৬
৪৫	...	৩৫
৫০	...	২৪
৫৫	...	২০
৫৮	...	১৮
৬০	...	১৬
৬৫	...	১৪
৭০	...	১২
৭৫	...	১০
৮০	...	৯
৮৫	...	৮
৯০	...	৭
১০০	...	৬

Myopia senilis অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে নিকট দৃষ্টি হইলে হ্রাস চন্দ্ৰমা ত্যাগ ও কূর্ণপৃষ্ঠাকার (concave) চন্দ্ৰমা গ্রহণ করিতে হয়। ছানি তুলিলেও চক্ষুতে মণির অভাব হয়। ইহাতে নিকট ও দূরদর্শনের জন্য দুইখানি হ্রাস চন্দ্ৰমা ব্যবহারের আবশ্যক। নিকটদৃষ্টিরোগ ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের ব্যক্তির ঘটয়া থাকে। ইহাতে অতি নিকটের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দূরস্থ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। উপযুক্ত (মাঝারি) কূর্ণপৃষ্ঠাকার চন্দ্ৰমা এ রোগের উপযোগী ওষধ।

অস্পষ্ট দৃষ্টিরোগে কি নিকটে কি দূরে কোন স্থানেরই পদার্থ স্পষ্ট দেখা যায় না। এই দোষ থাকিলে চক্ষু ছোট হয়, অল্পবয়স্কের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়, ইহা প্রায়ই পৈতৃক। এ রোগে কূর্ণপৃষ্ঠ বা মধ্যনিম্ন চন্দ্ৰমা উপকারী। অধিক লিখন পটন প্রভৃতি চক্ষুর ব্যবহার দ্বারা ক্ষীণ দৃষ্টিরোগ ঘটিয়া থাকে। মধ্যনিম্ন ও কাচকলমের চন্দ্ৰমা ইহার উপযোগী।

চক্ষুর পরকলা (lens) সর্বত্র সমানভাবে হ্রাস না থাকায় বিষম দৃষ্টিরোগ ঘটয়া থাকে, ইহাতে নলাকার (cylindrical) চন্দ্ৰমা ব্যবহারে উপকার হয়।

অল্পবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষীণদৃষ্টিরোগ (short-sight) হইলে সমান্তর আলোকরশ্মি তাহাদের চক্ষুর অন্তরস্থ হইয়া চিত্রপত্র পর্য্যন্ত না গিয়াই কেন্দ্রায়িত হয় অর্থাৎ রশ্মির অধিশ্রয় হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মধ্যনিম্ন বা কূর্ণপৃষ্ঠ

চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিলে আভাবিক স্থলে অধিশ্রয় ঘটে ও দৃষ্টির ধর্মতা মষ্ট হয়।

দ্বিবারাত্রির আলোকের তারতম্য জন্ম চন্দ্ৰমাধারীদিগের বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট চন্দ্ৰমা ব্যবহার করা উচিত।

আজকাল কেহ কেহ সভ্যতার জন্য কেহ বা সখ করিয়া অহ চক্ষে চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ বাহাদুরী লইবার মানসে অথবা লজ্জার অমুরোধে চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ও চালসে রোগগ্রস্ত হইয়াও চন্দ্ৰমা ব্যবহার করেন না। কিন্তু হৃৎকের বিবর উভয় প্রকার ব্যক্তিকেই এ জন্য ভবিষ্যতে অশুভাপ করিতে হয়।

প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ যে চন্দ্ৰমা ব্যবহার করেন, তাহার পরকলা দুইখণ্ড ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের চক্ষুর উপযোগী হ্রাস বা মধ্যনিম্ন না হইয়া সমতল (plane) হইলেও অহ চক্ষুতে চন্দ্ৰমা ব্যবহার করায় তাহাদের চক্ষু একরূপ দূষিত হইয়া উঠে যে উহা প্রকৃত ব্যাধিগ্রস্ত হইলে (চল্লিশের পরই হউক আর অহ কোন সময়েই হউক) আর কোন প্রকার চন্দ্ৰমায় উপকার করে না। তখন তাহাদিগকে চক্ষুরোগের জন্ম বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা বালাবস্থায় অহ চক্ষুতে চন্দ্ৰমা ব্যবহার না করিলে এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না, কারণ তাহা হইলে রোগের উপযোগী চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিলে উপকার হইত।

শেষোক্ত ব্যক্তিগণ চালসে-জনিত দৃষ্টির ধর্মতা নিবা-রণের জন্ম চন্দ্ৰমা ব্যবহার না করায় তাহাদের দৃষ্টিশক্তি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়; তখন চন্দ্ৰমা ব্যবহার করিলেও কোন ফল ফলে না। চন্দ্ৰমা রীতিমত ব্যবহার করিলে চক্ষুর কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

চহ্লা (দেশজ) অন্ন কাদা।

চা (ইচ্ছা শব্দজ) ১ স্পৃহা, বাঞ্ছা। (চীন শব্দ) ২ বৃক্ষবিশেষের পত্র। প্রধানতঃ দুইজাতীয় গুল্ম হইতে চা উৎপন্ন হয়। একজাতি চীনদেশে এবং অপর জাতি ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। দক্ষিণ আমেরিকায় যাহা জন্মে, তাহা * হইতে প্যারাগুয়া-চা (Paraguay tea) উৎপন্ন হয়।

চীনদেশে চার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, "ধর্ম নামক কোন ব্রাহ্মণসন্ন্যাসী চীনদেশে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় পৌছিলে দীর্ঘপথভ্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত

* এই জাতীয় গাছকে ইংরাজিতে Holly এবং ভারতে ও পঞ্জাব অঞ্চলে "দফ" বা "কলুচো" বলে।

হইয়া নিম্নিত হইয়া পড়েন। নভ্রাভঙ্কের পর তিনি দৌর্য্য লা বোধ করিলেন, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাত্ত ক্রিষ্টিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই চুলে শিকড় গজাইল ও ছোট ছোট গাছ জন্মিল। সন্ন্যাসী ঐ গাছের পাতার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং ঐ সকল গাছই চা গাছ নামে অভিহিত হইল।”

চীনদেশে *Thea chinensis* নামক বৃক্ষের চা মিং, কুতু, কু-চা, কিয়া, তু প্রভৃতি নামে প্রচলিত। এই সকল নাম হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই দেশে কোন কোন শাক সবজী হইতে চা উৎপন্ন হইত। মিং কথাটা তাংবংশের রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্তমান চীন সাহিত্যেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, এবং চা বাক্সের উপর প্রায়ই মিং লেখা থাকে।

কু-তু ও কু-চা পাতাও আজকাল চা নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ “কিয়া” শব্দে বিলাতী চিকোরী (*Chicory*) নামক গাছও বুঝাইত। এ ছাড়া আর একপ্রকার গুল্ম (*Sageretia theezans*) আছে। চীন দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চা রপ্তানি হওয়াতে তদ্রূপে চার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেজন্য দরিদ্র লোকেরা ভাল চা ক্রয় করিতে পারে না। তাই তাহারা চার পরিবর্তে উক্ত গুল্মের (*Sageretia theezans* এর) পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার সহিত আবার মল্লিকার (*Camellia*) পাতা মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তাহাতে চার অংশ অতি অল্পই পাওয়া যায়। যে ঘরে চা বস্তায় পুঁজা হয় সেই ঘরে বাহা পরিত্যক্তভাবে থাকে, তাহাও দরিদ্রদের নিকট অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়। “তু” কথাটার প্রচলন এখন পর্য্যন্ত আছে। হানবংশীয় কোন রাজার শাসনকালে “চা” বর্ণের “তু” উচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তদবধি “চা” নামই অধিক প্রচলিত।

যুরোপীয় বণিক মহলে নানাজাতীয় চার নাম শুনা যায়। যথা—কাল চা (*Black tea*), বোহিয়া (*Bohea*), ব্রিক্ চা (*Brick tea*), কঙ্গু (*Congou*) হরিৎ চা (*Green tea*), বারুদ চা (*Gunpowder tea*), রাজবারুদ (*Imperial gunpowder*), হাইসন্ (*Hyson*), পাক্লি হাইসন্ (*Pukli Hyson*), হাইসন্ স্কিন্ (*Hyson Skin*), পিকো (*Pekoe*), পিকো-সুচং (*Pekoe Suchong*), ফুল পিকো (*Flowery Pekoe*), সুবাসিত পিকো (*Scented Pekoe*), পুচং (*Pouchong*) ও সুচং (*Souchong*)। চার ভিন্ন ভিন্ন নাম চীন-বাসীদের দেওয়া। রঙ ও উৎপত্তিস্থানের নামানুসারে এই সকল নাম রাখা হইয়াছে। উই বা বুই পর্বতে জন্মে বলিয়া

বোহিয়া চার নাম হইয়াছে। চীনদেশে কোন বিশেষ চার এই নাম নহে, যদিও কাণ্টন নগরে এক প্রকার ধারাপ কাল চা এই নামে প্রচলিত। কিয়াংসু পর্বতে যে সকল হরিৎ বর্ণের চা জন্মে সে গুলিকে সুংগ্লো (*Sunglo*) বলা হয়।

কাল রঙের চার নিম্ন লিখিত ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—

পিকো বা পিকো (নামের অর্থ সাদাচুল)—ইহার কচি পাতায় একরূপ শাদা রঙের কেশর হয়। লোকে ইহা খুব গছন্দ করে। ইহার স্বাদে একটু বিশেষত্ব আছে। কমলা-পেকো (*Orange pecco*) খুব সুগন্ধি ও পেকো হইতে একটু ভিন্ন হাংমুই (*Hungmuy*) অর্থাৎ লোহিত বদরীফুল—ইহার রঙ একটু লাল। সুচং ও পিকোর আরও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, সেই সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ করিলে রাজকু, মাংসবর্ণ কেশর, পদ্মগীজ, চটকজিহ্বা, দেবদারু, পদ্মাদর্শ প্রভৃতি নাম হইতে পারে।

সুচং বা সিয়ান্চং শব্দের অর্থ ছোট চারা গাছ বা ছোট জাতি। এইরূপ পুচং অর্থে ভাঁজ করা; বস্তা বাধার বিশেষ ধরণ হইতে ইহার এই নাম হইয়াছে।

কম্পোই (*Compoi*) কন্পাই (*Kan-Pei*) শব্দের অপভ্রংশ অর্থ যত্নতপ্ত। চুলান (*Chulan*)—চুলান নামক ফুলের গন্ধে সুগন্ধি করা হয় বলিয়া কয়েক জাতীয় চাকে চুলান চা বলা হয়। হরিৎবর্ণের চার নাম বড় বেশি নাই।

ভারতবর্ষে দেশভেদে চার নামও ভিন্ন ভিন্ন। কাছাড় জেলায় চার নাম “হুলিচাম্”। গাছের বাকলের রঙ হইতে হুলিচাম্ অর্থাৎ শ্বেতকণ্ঠ নাম হইয়াছে। আসামীরা ইহাকে ক্রেপ বা ক্রেপ বলে। মটকে মিসাক্রেপ ও আসামের অন্তর্গত প্রদেশে চা হিলকাটি নামে প্রসিদ্ধ।

চা যে ভারতজাত উদ্ভিদ পূর্বে যুরোপীয়েরা তাহা জানিতেন না। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জানিতে পারেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে স্যার জোন্সেফ্ ব্যাক্সন্ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরামর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট এক দরখাস্ত করেন, তাহাতে চীনদেশ হইতে চার চারা আনা-ইয়া বেহার, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে চার চাষের অধিকার পাইবার কথা থাকে।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে কোন বন্দীয় লেপ্টেনান্ট কর্ণেল ভারতের উঃ পূঃ প্রদেশে চা গাছের কথা প্রকাশ করেন। তখন হইতে অনেকেই ভারতে চার সন্ধান পাইয়াছেন। ডাক্তার বুকানান হামিল্টনের মতে, চা আসাম ও ব্রহ্মদেশজাত। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে মাননীয় গার্ডনার সাহেব নেপালপ্রদেশে, ১৮২১ খৃঃ অব্দে মুরক্রফ্ট সাহেব বুগাইরে, ১৮২৪ খৃঃ অব্দে

বিশপ্ হিব্বার কুমায়ুন প্রদেশে চা দেখিতে পান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসামের কমিশনর ডেভিড্ ফট্ সাহেবই ১৮১৯ খৃঃ অব্দে এদেশে চা আবিষ্কার করেন। তিনি ভারত গবর্নমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী জি, হুইটন সাহেবকে কতকগুলি চার নমুনা মণিপুর হইতে পাঠাইয়া ছিলেন। সেই নমুনা এখনও লণ্ডনের লিনিয়ান্ সভাগৃহে রক্ষিত আছে। মেজর আর ও সি, এ ব্রুস্ নামক দুইতাই প্রথমে তাঁহার নিকট ঐ পাতা আনিয়াছিলেন। ছোট তাই আসামে ইংরেজাধিকারের পূর্বে হইতে বাণিজ্য করিতেন, পরে ১৮২৬ খৃঃ অব্দে কতকগুলি বীজ ও শাক সবজী লইয়া আসেন। সে সময়েই চা বীজ ও চা গাছ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ব্রুস্ সাহেব নাগা পর্বতে চা দেখিতে পান। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় লিখেন যে তিনি পাহাড় ও মরদানে ১২০ টা চা ফ্লাইবার হান দেখিয়াছেন।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিক্ ভারতে চার চাষের আবশ্যকতা সঙ্কে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের সভায় আবেদন করেন। তদনুসারে ১১ জন যুরোপীয় ও ২ জন দেশীয় সভ্য লইয়া এক সভা গঠিত হয়। ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে চার চাষ ভাল হইতে পারে, তদন্ত করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। আসামদেশে চা পাওয়া গিয়াছিল, তাই সভ্যরা সেই দেশে গিয়া ব্রুস্ সাহেবের অধীনে নানা স্থানে বেড়াইয়া তদন্ত করিতে লাগিলেন। চীন দেশ হইতে চার বীজ ও চারা আনান হয়। প্রথমে কার্যের তেমন সুবিধা হয় নাই। নূতন বাগানে যে সকল চা ফলিতে লাগিল, ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে তাহার কতকগুলি নমুনা বিলাতে ডাইরেক্টরদিগের কাছে পাঠান হইল। কিন্তু সেগুলি ব্যবহার্য্য হয় নাই।

যে সকল চা-কর নিযুক্ত হইয়াছিল, চা-প্রস্তুত প্রণালী তাহাদের ভালরূপ জানা ছিল না। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে চীনদেশ হইতে লোক আনান হয়। তাহাদের ভাষাব্যবহারে বেশ সুন্দর চা হইতে লাগিল। ১৮৩৮-৩৯ খৃঃ অব্দে ডাইরেক্টরদিগের নিকট আবার চা পাঠান হয়। এবার চা দেখিয়া তাহারা মোহিত হইলেন। খুব উচ্চ দরে চা বিক্রয় হইতে লাগিল। বণিকেরা আর লোভ সামলাইতে পারিলেন না। চার চাষ সঙ্কে পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। আসামদেশে আসাম-চা-কোম্পানি নামে একদল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ভারতগবর্নমেন্ট সরকারী বাগানাদির ও অংশ ঐ কোম্পানিকে অর্পণ করিলেন ও

একতৃতীয়াংশ খালে রাখিলেন। পরে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে অবশিষ্টাংশ একজন চীনদেশীয় ব্যবসায়ীর নিকট ২০০ টাকা মূল্য লইয়া বিক্রয় করেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা সঙ্কে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কর্তৃক সাহেবকে চীনদেশে প্রেরণ করেন। ভাল ভাল চার বীজ ও নিপুণ চা-কর সেই দেশ হইতে আনার ভার ও তাঁহার উপর ছিল।

এখন ভারতের আফগানিস্তান হইতে ব্রহ্ম-সীমান্ত পর্য্যন্ত (অক্ষা° ২৫° হইতে ৩০° উঃ, দ্রাঘি° ৭০° হইতে ৯৫° পূঃ পর্য্যন্ত) চা জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৬৭ হস্ত উপরে কোন কোন স্থানে, হিমালয়ের পাদদেশে ১৩৬৭ হাত উপরে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, আসাম, ঢাকা, কোচবিহার, চাটগাঁ, ছোটনাগপুর, দার্জিলিং, তরাই, কাঞ্চড়া, গড়বাল, কুমায়ুন, কাছাড়, শ্রীহট্ট, দেৱা, হাজারি-বাগ ও নীলগিরিতে যথেষ্ট চা জন্মে।

জাপানীদের “সুগার চা” *Hydrangea Thunbergii* নামক বৃক্ষেরই পাতা। সান্তাফি দেশে *Astoria theiformis* নামক গাছের পাতা চা রূপে ব্যবহৃত হয়। ধারক গুলবিশিষ্ট *Oeanthus Americanus* গাছের পাতা নব জার্সি চা (*New Jersey tea*) নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Sterculia acuminata নামক গাছের পাতা কোলা চা এবং হাব্সী দেশের কাঠা (*Catha edulia*) নামক গাছের পাতা হাব্সি-চা (*Abyssinian tea*) নামে ব্যবহৃত হয়।

Melaleuca, *Leptospermum*, *Correa alba*, *Acæna sanguisorba*, *Glaphyra nitida* এবং *Athenosperma moschota* গাছের ছাল হইতে তাম্বানীয়া চা এবং মরিচ দ্বীপের *Augricum fragrans* নামক কোন সুগন্ধি লতা হইতে ফহম্ চা (*Faham tea*) প্রস্তুত হয়।

ইতিহাস।—বহুকাল হইতে চীনদেশে চা-পান প্রচলিত। চীনদের নিকট হইতে অপরজাতি চার গুলাগুলের প্রকৃত সন্ধান পাইয়াছে। সুলিমান্ নামক কোন আরববণিক ৮৫০ খৃঃ অব্দে পূর্বদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তে চার উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাক্কার্সন্ তাঁহার “ভারতবর্ষের সহিত যুরোপীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে” এই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে চীনদের সাধারণ পানীয় ত্রব্য চা। খৃঃ বোধশ শতাব্দির মধ্যভাগে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারকগণ চীন ও জাপানদেশে গমন করেন। ইহাদের তত্ত্বদর্শে পরিভ্রমণের পূর্বে “চা পান” প্রথার আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বটেরো (*Botero*) ১৫৯০ খৃঃ অব্দে চার বর্ণনা করিয়াছেন।

ভেজাইরা (Taxeira) নামক একজন পর্তুগীজ ১৬০০ খৃঃ অব্দে মলক্কাবীপে শুক চার পাতা দেখিয়াছিলেন। ওলিয়ারিস্ (Ollarius) ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে পারস্তবাসীদের মধ্যে চার ব্যবহার দেখেন; উজ্জ্বল বণিকেরা চীন দেশ হইতে ঐ চা লইয়া যাইত। যুরোপে ওলন্দাজ বণিকেরাই প্রথমে চার আমদানী করেন। পরে আমষ্টার্ডম্ হইতে চা লণ্ডনে নীত হয়। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেন্টের কোন বিধিতে চা, কফি ও চকোলেট (chocolate) এর উল্লেখ আছে। সেই আইনে চকোলেট, সরবৎ ও চার ব্যবসারে প্রতি গ্যালনে ৮ পেন্স হিসাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। চা তখন লোকের নিকট কেমন একটা নূতন জিনিস ছিল। অনেক দিন পর্যন্ত চা অতি অল্প পরিমাণেই আমদানী হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে রাজোপহারের জন্য ১/১ সের চা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে কোম্পানি প্রায় ৫৮৮৯০ চা ইংলণ্ডে লইয়া বান এবং তখন হইতেই ইহার ব্যবসা লক্ষ্য লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু পরবর্তী ছয় বৎসরে চা ৫/৫ এর অধিক আমদানী হয় নাই। মাইবরনের “প্রাচ্যবাণিজ্য” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে ১৭১১ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৭৭৫ মণ, ১৭১৫ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৫০৭৯০ মণ, ১৭২০ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৩৭৩৮ মণ এবং ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে প্রায় ৯১৪৬৯৪০ চার কাটতি হয়। দেড়শত বৎসরেরও অধিক কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের চা সরবরাহ করিয়াছিলেন। কোম্পানির বৃহৎ ব্যবসা ছিল। তাহাদিগকে চা আমদানীর জন্য জাহাজ দিতে হইত ও এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী চা গুদামে মজুদ রাখিতে হইত।

বর্তমান সময়ে চার অতি বৃহৎ বাণিজ্য চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে চার মূল্য হ্রাস ও মাদক দ্রব্যের পরিবর্তে চার প্রচলন হওয়ায় ইহার প্রয়োজনও অনেক বাড়িয়াছে। এক মাত্র গ্রেট ব্রিটনে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৬৩৮৫০৪৯০ মণ চার আমদানী হয়। ইহার বার আনা অংশ চীনদেশ হইতে আসে এবং দেশের ব্যবহারের জন্য প্রায় সমান পরিমাণ চা রাখা হয়। ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের প্রত্যেক লোক বৎসরে গড়ে ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২১০ সের চা ব্যবহার করে।

চার।—চার বীজ বিলাতী হথর্ন (Hawthorn) বীজের মত। চীন দেশে নানাবিধ চা গাছ জন্মে। পরস্পরের বিভিন্নতা অল্পই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ইহার বীজ সংগৃহীত হয়। একই বীজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে

বপন করিলে কিছু কাল পরে ফসলের মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা হইয়া যায়। স্থানবিশেষে বীজ হইতে ভাল চাও হইতে পারে, আবার স্থান বিশেষে মন্দও হইতে পারে। এ জন্য চার বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে খুব উৎকৃষ্ট চার বীজই সংগ্রহ করা উচিত।

সার জন ডেভিস্, ফরচুন এবং আর্চ-ডিকন্ গ্রে চীন-দেশে যে রূপে চার চাষ হইয়া থাকে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। আর্চ ডিকন্ গ্রে বলেন, যে চীন দেশে আশ্বিন কার্তিক মাসে চার বীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বীজগুলি ভাল করিয়া রোজে শুক করিয়া রাখিতে হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে পুনরায় সেই সকল বীজ ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া কাপড়ের বস্তার পুরিয়া রন্ধনশালা কি অপর কোন উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। কিছু শুক হইলে বীজগুলি আবার ভিজাইতে হয়। এই রূপে বীজগুলি অঙ্কুরিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলে। তৎপরে সাহস কি অন্য কোন জিনিসের উপর পাতলা মাটির স্তর করিয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অঙ্কুরিত বীজগুলি স্থাপন করিতে হয়। প্রথম চারি দিন বীজ গুলিকে সকালে সকালে জলে ভিজাইয়া রোজে খুলিয়া রাখা হয়, আবার রাত্রিতে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পঞ্চম দিবসে অঙ্কুরগুলি ৪ হাত পরিমাণে উচ্চ হইলে ইহাদিগকে ২ ইঞ্চি অন্তর মাটিতে রোপণ করিতে হয়। পার্শ্বভূমিতে জলনিষ্কাশনের সুবিধা হয় বলিয়া মরদান অপেক্ষা পাহাড়ে চার চাষ ভাল হইয়া থাকে।

তৃতীয় বৎসরের শেষ ভাগে চার প্রথম ফসল হয়। তৎপূর্বে কাটিলে চা নষ্ট হইতে পারে অথবা ফসলের খুব অনিষ্ট হইতে পারে। তিন বৎসর পর যদি বৎসর বৎসর চা কাটা না হয় তাহা হইলে প্রত্যেক পরবর্তী বৎসরে অতি অল্প পরিমাণে বা নিতান্ত অকর্মণ্য চা জন্মিবে। বৎসরে তিন বার করিয়া চা তুলিতে হয়।

প্রথম বারে বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে, দ্বিতীয় বারে জ্যৈষ্ঠ মাসে, এবং তৃতীয় বার তাহার একত্রিশ দিন পরে চা তুলিতে হয়। খুব সাবধান হইয়া তুলিবে। পাতা তুলিবার সময় যেন গাছের কোন অনিষ্ট না হয়। ৮-১০ বৎসর পরে গাছ গুলিতে আর ভাল পাতা জন্মে না, কেবল দুই একটা মোটা পাতা বাহির হইয়া থাকে। তখন চাকরেরা গাছ গুলির গোড়া কাটিয়া ফেলে ও তাহাতে পরবর্তী গ্রীষ্মকালে নূতন অঙ্কুর জন্মে।

পাতা তুলিবার পূর্বে শ্রমজীবদিগকে হাত ধুইয়া

আসিতে হয়। তাহার পাতাগুলি ফুড়াইয়া এক প্রকার ফুড়িতে রাখে। দক্ষ শ্রমজীবীদের মধ্যে একজন /৫ হইতে /৬৯ দেয় পাতা ফুড়াইতে পারে। তাহার পাতা তুলিবার সময় বেশ চাতুর্য দেখাইয়া থাকে,—একবারে একটীর বেশি পাতা তুলে না।

কংগু চা প্রস্তুত প্রণালী।—কোন খোলা জায়গায় পাতাগুলি ছড়াইয়া বায়ুতে শুকাইয়া লইতে হয়। তৎপরে শ্রমজীবীরা পাতাগুলি ২৩ ঘণ্টাকাল পা দিয়া মাড়াইয়া লয়। ইহাতে পাতাগুলির দখ রস বাহির হইয়া যায়। তাহার পর পাতাগুলি আবার একত্র জমা করিয়া কাপড় দিয়া এক রাত্রি ঢাকিয়া রাখে। ইহাতে পাতাগুলি হইতে একটা উত্তাপ বাহির হয় ও হরিৎবর্ণ পরিবর্তিত হইয়া কাল কি ধূসরবর্ণ ধারণ করে, একটু সুগন্ধ বাড়ি ও স্বাদে একটু বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। তাহার পর শ্রমজীবীরা পাতাগুলি দুই হাতে বিশেষ রূপে ঘষিয়া লয় ও রোদে শুকাইতে দেয়। বর্ষাকাল হইলে কাঠের কয়লার আগুনে ভাজিয়া লয়। এই অবস্থার কারখানার মালিকদের নিকট চা বিক্রয় করা হয়। তাহার পুনরায় দুই ঘণ্টাকাল আগুনে ভাজিয়া লয় এবং ঝাড়াপ পাতাগুলি ঝাড়িয়া কেলিয়া ভাল চা কাগজে মোড়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখে। বর্ণের বিভিন্নতানুসারে কালপাতা ও লালপাতা কংগু, উনানকংগু, নিংচোকংগু ও হোচোকংগু প্রভৃতি নামে চা অভিহিত। হুপে প্রদেশে নানা প্রকার কংগু জন্মে, ইহাদিগকে উপকংগু বলে। হংকো বন্দর হইতে এই সকল চা রপ্তানি হয়। হোনান দেশে উনানকংগু জন্মে। ইহার পাতাগুলির রঙ কাল, একটু শাদার আভাও আছে এবং কোন কোন স্থলে লাল রঙও দেখা যায়।

কিয়াংসি প্রদেশের উত্তরপশ্চিমভাগে নিংচোকংগু জন্মে। ইহার উৎকৃষ্ট জাতি উনিং প্রদেশে উৎপন্ন হয় এবং কাণ্টন ও হংকো সহরে সাধারণতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার পাতা কালরঙের ও একটু ধূসরবর্ণের আভাযুক্ত। কিয়াংসি প্রদেশের উত্তরপূর্ব বিভাগে ও বোহিয়া পর্বতের উত্তরাংশে ‘হো হাউ’ চা জন্মে। এই চার অধিকাংশই বিক্রয়ের অল্প কিছুকিয়াং নগরে এবং অল্প পরিমাণে কাণ্টন, সেন্সাই ও ফুচু নগরে প্রেরিত হয়। হো-হাউ চা সর্বোৎকৃষ্ট। কালপাতা চার মধ্যে উপক জাতীয় চাই সর্বোৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট। উনান চা নিংচো হইতে ভাল। ফোহিকিএন্ গাছ হইতে ছোট ছোট লাল ও ধূসরবর্ণের চা জন্মে। ইহার সর্বোৎকৃষ্ট জাতিকে “কাইসন্” বলে এবং

সামান্য নগরের নিকটস্থ কোন স্থান হইতে ইহার আমদানী হয়। এই সকল চার প্রধান বিক্রয়স্থান ফুচু নগর। কিন্তু যে গুলি ফোহিকিএন্ প্রদেশের দক্ষিণাংশে জন্মে, সে সমস্ত চা আময় নগরে প্রেরিত হয়। কোয়াংটাং প্রদেশে যে কংগু জন্মে, তাহার নাম তেলান্ কংগু। ইহার পাতাগুলি লম্বা লম্বা ও শক্ত শক্ত, রঙ কাল ও ধূসরবর্ণের আভাযুক্ত। মকাও নগরেই এই চা অধিক বিক্রয় হয়।

করেক বৎসর হইল লালপাতা কংগুর একটা অতি উৎকৃষ্ট নকল বাহির হইয়াছে। ইহার পাতাগুলি ছোট ছোট। কাণ্টন সহর হইতে এই চা ইংলণ্ড আনীত হয় এবং কতক কতক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাঠান হয়। ইহার এক এক বাক্সে ১০ মণ হইতে ৫০ মণ অবধি চা থাকে। তেলান্ কংগু এক এক বাক্সে ১০ দেয় হইতে ১৫ দেয় অবধি ও কালপাতাকংগু ১/২২০ হইতে ১/১৫ চা পূরা থাকে।

লালপাতা কংগুর দ্বারা সুচল চারও রঙ একটু লালচে অথবা পিঙ্গলবর্ণ হয়। সুচল্ চা প্রায় কংগুর মত। ফোহিকিএন্ প্রদেশের উঃ পূঃ বিভাগে ভাল সুচল্ জন্মে। ইহারও প্রস্তুতপ্রণালী কংগু প্রস্তুত প্রণালীর অনুরূপ।

ফুল পিকে—ইহা দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু বেশি হয় না। পাতার কুঁড়ি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। কুঁড়িগুলি তুলিয়া তখনই রোদে শুকাইয়া লইতে হয়। কারখানার লোকেরা শুকনা পাতা কিনিয়া সামান্য আগুনে ভাজিয়া লয় ও পরে বস্তার পুরিয়া রাখে। পাতাগুলি দেখিতে পাখীর কোমল পালথের মত। কতকগুলি হলদে আর কতকগুলি কাল। ফুচু হইতে ইংলণ্ডে ইহা রপ্তানী হয়। কিছু কিছু কাণ্টন হইতেও যায়।

উলং—ফোহিকিএন্ প্রদেশে এই চার উৎপত্তি। ফুচু ও আময়বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে উলং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হয়। ইহার পাতাগুলি তুলিয়া রোদে শুকাইতে হয়। পরে জলে ভিজাইয়া কংগুর মত ভাজিয়া লইতে হয়। চা-করেরা এই অবস্থার ব্যবসাদারের নিকট চা বিক্রয় করে। তাহার বোটা ও ঝাড়াপ পাতাগুলি বাছিয়া কেলিয়া আবার জলে ভিজায় ও পরে ভাজিয়া লয়। তৎপরে কতকগুলি করিয়া পাতা জড় করে ও সেই জড়ান পাতাগুলি একত্র মিলাইয়া পুনরায় ভাজিয়া লয়। পাতাগুলি দেখিতে হলদে, মধ্যে মধ্যে একটু একটু কাল ও মেটে সবুজ রঙেরও আভা দেখা যায়। পাতাগুলির আকার এক রকমের নয়, একটু শক্ত খসখসে রকমের অথচ জড়ান নয়।

সুগন্ধি কমলা পিকো—কোকিএন্ ও কোরাংটং প্রদেশে এই চা প্রস্তুত হয়। যে সকল চা কোরাংটং প্রদেশে প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে কার্টনসুগন্ধি-কমলাপিকো বলে। আর যে সকল কোকিএন্ প্রদেশে প্রস্তুত হয়, সেগুলিকে ফুচুসুগন্ধি-কমলাপিকো বলে। প্রথমে পাতাগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। তাহার পর শ্রমজীবীরা পাতাগুলি দুই হাতে ভাল করিয়া ঘষে। ইহাতে পাতাগুলি একটু জড়ান হয়। এই অবস্থার পাতাগুলি কার্টন ও ফুচুর বাজারে প্রেরিত হয়। সেখানকার লোকেরা অল্প আঙনে পাতাগুলি তাজিয়া মল্লিকানুসার সহিত মিশ্রিত করে। তৎপরে পাতাগুলি সুগন্ধি বোধ হইলে চালুনি দ্বারা ফলগুলি পৃথক করিয়া লইতে হয়। ভালরূপে সুগন্ধি করিতে হইলে দুই-বার এই প্রক্রিয়া করা কর্তব্য। ফুচু প্রদেশের সুগন্ধি কমলা চা ছোট ছোট ও খুব জড়ান জড়ান থাকে। দেখিতে হলুদে রঙের, মধ্যে মধ্যে অল্প পিঙ্গল, তাহাতে কাল আভাও আছে। কার্টন-সুগন্ধি-কমলা চা লম্বা লম্বা, জড়ান জড়ান ও দেখিতে কাল। কখন কখন হলুদে ও সবুজ রঙেরও দেখা যায়। সুগন্ধিকমলাপিকো বাক্সে বন্ধ থাকে এবং ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। কতক পরিমাণে ফুচু হইতে অষ্ট্রেলিয়ায়ও যায়। এখন ভারতেও অল্প আমদানী হইতেছে।

সুগন্ধি কেপার—সুগন্ধিকমলাপিকোর ধরণে ইহাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি বর্জলাকার সুগন্ধি কমলাপিকো হইতে চালুনি সাহায্যে পৃথক করিতে হয়। ফুচুতে যে সব প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় হলুদে পিঙ্গলবর্ণ বা কাল। কার্টন নগরে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা কাল বা পিঙ্গল বর্ণ। তবে কখনও কখনও হলুদে ও সবুজ রঙেরও হইয়া থাকে।

সুগন্ধিকরণ—ফুচু সাহেব চীন দেশে এইরূপে চা সুগন্ধি করিতে দেখিয়াছিলেন। কোন ঘরের এক কোণে শুপাকারে কমলাফুল রাখে। একজন লোক চালুনি দ্বারা সেই ফুলরাশি হইতে ছোট ছোট কেশরগুলি পৃথক করিয়া ফেলে। তাহাতে সেই ফুলরাশির শতকরা ৭০ ভাগ থাকে ও ৩০ অংশ ফেলিয়া দেয়। কমলা ব্যবহার করিতে হইলে খুব ভাল ফুটন্ত ফুল দরকার। কিন্তু মল্লিকা ফুল মুকুলিতাবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে; চার সহিত মিশাইলে পর সেই মুকুল ফুটিতে থাকে ও গন্ধ বাহির হয়। এইরূপে প্রায় ১০ মণ চার সঙ্গে ৪০ মণ ফুল মিশান হয়। তৎপরে শুক চা ও ফুল মিশাইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল এই ভাবেই রাখে। চালুনি সাহায্যে দুই তিন বার ঝাড়িতে

ঝাড়িতে ফুলগুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়ে। এই রূপে চা হইতে ফুলের রস বাহা কিছু লাগিয়া থাকে, তাহা শুকাইবার জন্য কাঠের করলার আঙনে চা তাজিয়া লয়। চার গন্ধ বড় বাহির হয় না, পরে কিছু কাল চাকিয়া রাখিলে ক্রমশঃ গন্ধ বাহির হইতে থাকে। কখন কখন দুই তিন বার এইরূপ করিলে পর চার গন্ধ বাহির হয়। চীনবাসীরা নানাজাতীয় ফুলে চা সুগন্ধি করিয়া থাকে।

চা সুগন্ধি করিতে সকল ফুল সমান পরিমাণে লাগে না। হাইসনপিকো নামক চা খুব মূল্যবান ও সুবাস, এমন কি দুধ চিনি ছাড়াও পান করা যায়। তাহা চীনের কুইল (Olea fragrans) ফুলে সুগন্ধি করা হয়। ফুলের জাতি অনুসারে ইহার সুগন্ধের স্থায়িত্বের তারতম্য ঘটে। ঐ ফুলের গন্ধ প্রায় এক বৎসরকাল স্থায়ী। দুইবৎসর পর আর চার গন্ধ থাকে না, অথবা একরূপ খারাপ তৈলগন্ধ বাহির হয়। কমলাফুল ও চীনের মলি নামক ফুলে যে সব চার সুগন্ধি করা হয়, তাহাদের গন্ধ দুই তিন বৎসরকাল থাকে। এ ছাড়া সিউহিল্ ফুলের গন্ধও তিন চারি বৎসর স্থায়ী হয়। বিদেশীরা সিউহিল্ ফুলের গন্ধই বেশি আদর করে। কিন্তু চীনবাসীরা এই গন্ধ তেমন ভাল বাসে না।

গুণ—চা ধারক ও উত্তেজক। পরিশ্রমের পর পান করিলে খুব আরাম বোধ হয়। চার একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা পান করিলে অধিক রাত্রি জাগরণ করা যায়। এই গুণটি হরিৎবর্ণের চাতেই বিশেষ লক্ষিত হয় ও বাহাদের চা পানের অভ্যাস নাই তাহাদের উপরই বিশেষ কার্যকরী হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা হৃদয় ও রক্তাধারকে খুব স্নিগ্ধ রাখে। ডাক্তার বাইলিং বলেন—চা ও কফি স্নিগ্ধকারক, উত্তেজক, ঔষধের নেশা নিবারক, প্রাণ্তিনাশক ও অজ্ঞান মেদোরোগ-নিবারক। অধিক পরিচালনা দ্বারা মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলে চা পানে অনেকটা প্রতিকৃতি হয়।

সার হান্ফ্রি ডেভির মতে হরিৎবর্ণের চাতে টানিন (Tannin) অর্থাৎ অম্ল ও সঙ্কোচক পদার্থ অধিক এবং কাল চাতে এক প্রকার উষ্ম তৈল অধিক দৃষ্ট হয়। ডাক্তার লিবিগের মতে চা হইতে যকৃতের স্রাবের মত এক প্রকার রস ক্ষরণ হয়।

চাইট (দেশজ) গবাদির পদাৰ্থ।

চাইম, পার্শ্বতীর ত্রিপুরারাজ্যে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। আঠারমুঠা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া উক্ত রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের নিকট গোমতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চাইবালা, বাহালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিংহভূম জেলায়

একটি প্রধান নগর। সমভূল ভূমি হইতে উচ্চতানে অক্ষা° ২২° ৩২' ৫০" পূঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৫০' ৫৭" উঃ মধ্যে অবস্থিত। এখান হইতে রোডো নদীর দক্ষিণতটে দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দিকে পর্বত থাকার স্থানটির দৃষ্ট বড় মনোরম। পরিমাণ-ফল ৬৪০ একর। এখানে সহস্রাধিক বাটী আছে। ভরমধ্যে ডেপুটী কমিসনরের কুঠি, থানা, জেলখানা, ডাকঘর, পবর্মেণ্ট স্কুল ও দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রধান। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বড়দিন উপলক্ষে এখানে বড় মেলা হয়। তাহাতে আর দেড় লক্ষ টাকার জিনিস আমদানী হইয়া থাকে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অসভ্য লোকদিগের সহিত তসর, শুটী ও অন্তান্ত জিনিসের কারবার চালাইবার উদ্দেশ্যেই এই মেলা আরম্ভ হয়। এখানে তসর, রেসমের শুটী, কাপড় ও শস্যের ব্যবসা আছে। মিউনিসিপালিটির বহু নগরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখানে প্রতি অধিবাসীকে গড়ে ১৬০ হিসাবে কর দিতে হয়।

চাউনি (দেশজ) দৃষ্ট, অবলোকন।

চাউল (দেশজ) তুলা। [তুলা দেখ।]

চাওন (দেশজ) ১ যাক্সা, প্রার্থনা করা। ২ দেখা।

চাওপুর, বদায়ুন জেলার রাজপুর পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম। পল্লার বামকূলে এবং বদায়ুন নগর হইতে ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি বর্ষ কার্তিক মাসে এখানে এক মেলা হয়, তাহাতে আর বিশ হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে।

চাওয়া (দেশজ) ১ যাক্সা, প্রার্থনা। ২ অবলোকন।

চাওর্ (আরবী) চিন্তা, ভাবনা।

চাংভকার, ছোটনাগপুরের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা° ২৩° ২২' হইতে ২৩° ৫৫' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩৭' হইতে ৮২° ২০' ৩০" পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ২০৬ বর্গ মাইল।

এই রাজ্য গিরি, দরী ও অধিত্যাকামর, তাহার উপর বিশাল শালজঙ্গল ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার গিরিমালা সর্পাকারে উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে মিশিয়াছে।

ছোটনাগপুর বিভাগের পশ্চিমাংশের শেষভাগে এই রাজ্য, ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমার বাবেলখণ্ড রাজ্য এবং পূর্বে কোরেয়া বা কোড়েরা রাজ্য। এই স্থানও করলাসংযুক্ত প্রান্তরময়। কোড়েরার মত এখানেও ভাল করলা উৎপন্ন হয়।

গিরিদরী দ্বারা ঘূর্ণিত হইলেও পিণ্ডারী ও মরাঠাদিগের উপদ্রবে এই ক্ষুদ্র রাজ্য বখেটে অন্ত্যাতার লঙ্ঘন করিয়াছে।

সেই উপদ্রব নিবারণের জন্যই এখানকার সর্দার রেবার রাজপুত সর্দারদিগকে ৮ খানি সীমান্ত গ্রাম ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানকার সর্দার কোরেয়া-রাজবংশসম্বৃত।

এই রাজ্য মধ্যে বনাস ও নেউর নামে দুইটা মাত্র নদী আছে, তাহাতে নৌকাদি চলে না। দুইটা জঙ্গল ভেদ করিয়া দুইটা গিরিসঙ্কট গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার শালবনে অনেকে গবাদি চরাইতে আনে, তজ্জন্য এখানকার রাজাও রেশ কর আদায় করিয়া থাকেন।

জনকপুরে কতকগুলি মেটে ঘর আছে, তাহাই এখানকার রাজত্ববন। রাজার বার্ষিক আর আর ৩০০০ টাকা। তাহাকে কেবল ৩৮০ টাকা কর দিতে হয়।

এখানকার হরচোকা গ্রামে পাহাড়খোদা গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আছে, বোধ হয় পূর্বে সেগুলিতে মন্দির ও বিহার ছিল। চাংভকারের বর্তমান অধিবাসীদের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় না, যে তাহাদের কোন পুরুষ ঐ সকল অসাধারণ কীর্তি করিয়া থাকিবে। নিশ্চয়ই পূর্বকালে এখানে কোন উন্নত ও পরাক্রান্ত রাজা বা জাতির বাস ছিল, তাহারাই পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির অথবা আশ্রমাদি নির্মাণ করিয়া থাকিবে।

এখানে বহুসংখ্যক হিন্দুর বাস। গৌড়, মুন্সাসি, কুরু প্রভৃতি অসভ্য জাতিও এখানে হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে।

চাঁই (দেশজ) ১ প্রধান, মূলীভূত। যথা—ইনি এ বিষয়ের চাঁই। ২ ডেলা। যথা—“গোপাল একটা চাঁই ভুলিয়াছে।” ৩ মাছ ধরবার বস্ত্রবিশেষ, বংশ শলাকা দ্বারা ইহা নির্মিত হয়। মাছ ইহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। ৪ চোর, ডাকাত প্রভৃতি ছুই লোকদিগের দলপতি।

চাঁই, মধ্যবঙ্গ ও বেহারবাসী এক নীচ জাতি। চাঁই অথবা বড়চাঁই নামেও অভিহিত। চাব ও মাছধরা ইহাদের উপজীবিকা। অযোধ্যা প্রদেশে থাক, নট, ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির সহিতও ইহাদের দেখা যায়। যুরোপীয় মানবতত্ত্ববিদগণের মতে ইহাদের মুখের ভাব অনেকটা মল্লোলীর ছাঁচে ঢালা। ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি গোত্র আছে। যথা—ভারদ্বাজী, চরণবংশী, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ, বালাবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বয়স্ক বিবাহ প্রচলিত আছে। সচরাচর দশনামী গোপালীরাই ইহাদের গুরু। মৈথিল বর্ণব্রাহ্মণগণ এই জাতির গোঁরোহিত্য করে।

অযোধ্যার চাঁইরা মহাবীর, সত্যনারায়ণ ও দেবীপাটনের উপাসক। বেহারের চাঁইগণ পাঁচপীরকে মানিয়া চলে।

আবার বলে এই জাতি কোইলাবাবার পুত্র অসুরক। সকল উৎসবও আমোদ প্রমোদে ইহাদের মদ না হইলে চলে না। ইহারা বরাহমাংস খাইতে বড় ভালবাসে।

ইহাদের মধ্যে কোন রমণী দ্রুত হইলে সে সমাজচ্যুত হয়, কিন্তু স্বভাবি মধ্যে একটা ভোজ দিলে আর তাহার কোন দোষ থাকে না। দ্রুত, রমণীকে তাহার পতি পরিভ্যাগ করিলে সে তাহার প্রণয়ীকে বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা বিন্, ছুনিয়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা সমাজে হীন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি কৃষিকর্ম ও বদির প্রস্তুত করে। পূর্ববঙ্গে ইহারা ডালকলাই বিক্রয় করিয়া থাকে।

ছুনিয়া ও মলাদিগের মধ্যেও টাই নামে এক শাখা আছে।

বাল্যাব্যবহাগে প্রায় লক্ষাধিক টাই বাস করে।

টাইপুর, বঙ্গের শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা: ২৫° ২' ১৫" উঃ, দ্রাঘি: ৮৬° ০২' ৩০" পূঃ। ভুব্রার ৩০ কোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

ঐতিহাসিক হট্টর সাহেব লিখিয়াছেন, "চান্দু নামে এক চেকরাজদ্রাভা এখানে বাস করিতেন, তাহার নাম হইতে ইহার নাম হয় চান্দুপুর। তাহার অপভ্রংশে এখন টাইপুর নাম হইয়াছে।" (Statistical Account of Bengal, vol. XI. p. 212.)

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় চান্দুপুরের অপভ্রংশ না হইয়া চামুণ্ডাপুরের অপভ্রংশে টাইপুর নাম হইয়াছে। এখানে প্রবাদ আছে সত্যযুগে অসুররাজ শুভনিগুপ্তের চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুইজন সেনাপতি ছিল। অসুরনাশিনী পার্শ্বতী উভয়কে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। এখনও এই টাই-পুরের আড়াইকোশ পূর্বে মুণ্ডেশ্বরী নামে ভগবতীর এক মন্দির দৃষ্ট হয়।

আবার কাহারও বিশ্বাস কটুনি নদীতে গোয়ালহাট নামক স্থানে মণ্ড নামে এক চেকরাদারের রাজত্ব ছিল। চণ্ড তাহারই ভ্রাতা। চেকরা গণেশ, হুম্মান, হরমোদী ও নারায়ণ মূর্তির পূজা করিত। এখনও সেই সকল দেবমূর্তির তথা-বশেষ নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

গোয়ালহাটের মধ্যে মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত। যদিও ঐ মন্দিরের এখন মিতান্ত্র ভগ্নাবস্থা, কিন্তু এখনও তাহাতে মহিষমর্দিনী ও শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন বুদ্ধমূর্তির স্তায় ঐ মহিষমর্দিনীর কেশপাশ ও কর্ণধর আছে। এ ছাড়া মন্দিরের গায়ে নর্তক, বাদ্যকর প্রভৃতির নানা মূর্তি দেখা যায়।

টাইপুরের হিন্দুরাজগণ চেকদিগকে তাড়াইয়া দেন।

তাঁহার রাজপুত্রবংশীয় ও বহুকাল এখানে নির্বিবাদে রাজত্ব করেন। তাঁহার এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, তাহার চারিদিকে গড়খাই ও বঙ্গশোভিত। সেই প্রাচীন দুর্গ আজও রহিয়াছে। আর আড়াইশত বর্ষ হইল, পাঠানেরা এখানকার হিন্দুরাজকে তাড়াইয়া দুর্গ ও নগর অধিকার করেন; এখনও পাঠানদেরই অধিকারে আছে। মুসলিম সৈরদার নামের সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এখানকার পাঠানসদস্য ইখতিয়ার খাঁর পুত্র কতেখাঁর সহিত সৈরদারের কন্যার বিবাহ হয়। কতেখাঁর গোত্রনামের উপর একটি হুন্দর মসজিদ নির্মিত হইয়াছে।

টাইপুর নগরটী অতি মনোরম স্থান, এখান হইতে বিশাল ক্ষেত্র ও পাহাড় সরলগোচর হয়।

মুগলসান আক্রমণের পর টাইপুরের হিন্দুরাজ সুরানদীর ভীরে আসিয়া নিজ নামে এক নগর পতন করেন ও তথায় বাস করিতে থাকেন।

টাইপুর, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গ্রাম। অক্ষা: ২৫° ৪২' ২৮" উঃ, দ্রাঘি: ৮৬° ৩৬' ১৬" পূঃ। পূর্বে এখানে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল, তাহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হিন্দুমাঝেই অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিত। এখন আর তেমন পণ্ডিতমণ্ডলী নাই, তবে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে।

টাচ (চকাশক) বলনির্মিত আস্তরণ, দরবা।

টাচড়া, বশোর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম ও টাচড়ারাজ-গণের রাজধানী। অক্ষা: ২৩° ২' ০" উঃ, দ্রাঘি: ৮৯° ১৪' ৪৫" পূঃ, বশোর নগরের প্রায় অর্ধকোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

রাজত্ববনের লজ্জা এই স্থান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। এই রাজত্ববনে টাচড়া বা বশোর-রাজবংশের বসবাস।

ভবেশ্বর রায় হইতে টাচড়ারাজবংশের সোতাগোব্দর। ভবেশ্বর উত্তররাজ্যের কারহ ছিলেন ও বান্-ই-আজমের অধীনে একজন সৈনিকের কর্ম করিতেন। তিনি সৈরদপুর, আন্দামপুর, মুড়াগাছা, মলিকপুর এই চারিটা পরগণা প্রাপ্ত হন। পূর্বে ঐ পরগণা করটা রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বর রায়ের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাবরায়র ১৫৮৮ হইতে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরাধিকার উপভোগ করেন। তাঁহার সময়ে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে তিনি মানসিংহকে বখেট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি উক্ত চারিটা পরগণা স্বারীকপে ভোগদখল করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। মহতাব রায়ের পর তাঁহার বংশধর কন্দর্পরায় ১৬১৯ হইতে

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্পত্তি সংগ্রহ করেন। দাঁড়িয়া, বলিখালি, বাঘমারা, বলিমাঝ ও সাহিমদালপুর পরগণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার মৃত্যু হয়, তৎপুত্র মনোহররায় ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে তিনি রামচন্দ্রপুর, হুসেনপুর, রাজদিয়া, মহিমাবাদ, চিহুটিয়া, মুসকপুর, মলই, সোবনালী, মোঘলা, সাহল, টালা, কলুয়া, শ্রীপদ কবিদাঙ্গ, জাটলা, কলিকাতা প্রভৃতি ছোট বড় অনেকগুলি পরগণার অধিকার লাভ করেন। ইনিই প্রকৃত প্রস্তাবে ট্যাচড়া-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মনোহর রায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কলকাতা ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার সময়ে মহেশ্বরপাণা ও রায়মল্ল ট্যাচড়ারাজ্যের অন্তর্গত হয়। মনোহর মদীয়ারাজের নিকট হইতে বাজিতপুর পরগণাও ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র শুকদেব রায় ঐ বিপুল সম্পত্তি ভোগ দখল করেন। তিনি মাতার আদেশে বিবয়ের ১০ আনা অংশ কনিষ্ঠ শ্রীমন্তনরকে অর্পণ করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র নীলকান্ত পিতার বারআনা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। এখন হইতে বার আনা অংশ মুসকপুর তরফ এবং চারি আনা অংশ সৈয়দপুর বা সোবনালী তরফ নামে খ্যাত হইল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নীলকান্তের পুত্র শ্রীকান্তরায় বারআনার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দশশালার বন্দোবস্ত হয় এবং নির্দিষ্ট দিনে উদয়ান্তের মধ্যে গবর্মেণ্টরাজস্ব জমা দিতে না পারায় একে একে সমস্ত পরগণাই নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহার পরিবারবর্গ শেষে গবর্মেণ্টের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীকান্ত-রায়ের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র বাণীকান্ত মোহনদাস করিয়া সৈয়দপুর পরগণার কিয়দংশ উদ্ধার করেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে বাণীকান্ত কালক্রমে পতিত হন। তাঁহার পুত্র বরদাকান্ত রায়। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দ্বারা বরদাকান্তের সম্পত্তির অনেক আয় বৃদ্ধি হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের অজুগ্ৰহে বরদাকান্ত সাহস পরগণা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি গবর্মেণ্টকে সাহায্য করার রাজ্য বাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন ও সম্মানসূচক খেলাত পাইলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বরদাকান্তের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র জ্ঞানদাকান্ত, মানদাকান্ত ও হেমদাকান্ত রায় বাহাদুর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন।

এখন ট্যাচড়ারাজ অঞ্চলে জড়িত ও নানা দোবে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে।

১৭৫৬—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারআনার অধিকারী

শ্রীমন্তনর ও তাঁহার নাবালক পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রীমন্তনরের মৃত্যুকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বালালায় মদাবের নিকট হইতে কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান প্রাপ্ত হন, তখন সৈয়দ-পুর তরফের কেহ অধিকারী ছিল না। এই সময়ে অনেক জমিদার আগমনের পূর্বস্ব লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এক জন মুসলমান জমিদার নিজ সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া সৈয়দপুর তরফ দখল করিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ-পুর বা সোবনালী তরফ হাজি মহম্মদ মহলীর অধিকারে ছিল, তিনি মৃত্যুকালে হুগলীর ইমামবাড়ীর সাহায্যার্থ ঐ স্থানবাসী সম্পত্তি দান করিয়া বান।

টাচন (দেশজ) ছোলন, স্তম্ভকরণ।

টাচর (দেশজ) ১ কৌকড়া চুল। “টাচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বাক্, বেড়ি নব মালতীর ফুল।” (কবিকল্প)

২ অম্মুৎসব, দোলের পূর্ব দিনে ইহার অম্মুঠান হয়।

টাচরকেশ (দেশজ) কোঁকড়া চুল।

টাচা (দেশজ) পরিষ্কার করা।

টাচি (দেশজ) অবশিষ্ট অংশ।

টাটাটাটি (দেশজ) চড়াচড়ি, মারামারি।

“পাইয়া সময়, নাহি চিনে ঘর পর,
টাটাটাটি পড়িল তলে।” (কবিকল্প)

টাড়ার-মারা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ।

টাড়াল (চঙাল শব্দ) [চঙাল দেখ।]

টাড়ালীরা (দেশজ) টাড়াল সম্বন্ধীয়।

টাঙ্গ (চঙ্গ শব্দ) [চঙ্গ দেখ।]

টান, মুলন্দহর জেলার একজন পূর্বতন রাজা, ইনি আলাহাবাদচন্দ্রোক নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ঐ স্থানে টানরাজ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তথায় টান-রাণী-কা মন্দির নামে একটি মন্দিরও দৃষ্ট হয়।

টানকবি, বিখ্যাত রাজপুত কবি। [চঙ্গকবি দেখ।]

টানকুমারী, পঞ্জাবের একজন অধীশ্বরী, মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্রবধূ ও খজলাসিংহের মহিষী। তৎপুত্র নবনহাল-সিংহের মৃত্যুর পর ইনি শিখরাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। মন্ত্রী ধ্যানসিংহকে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন ধ্যানসিংহই তাঁহার পতিপুত্রের পতনের মূল, আর কিছুদিন তাঁহাকে এই উচ্চপদে রাখিলে বোধ হয় শিখরাজ্য পর্য্যন্ত তিনি হস্তগত করিতেন। এই ভাবিয়া তিনি সিঁছুবালা উত্তমসিংহকে প্রধান মন্ত্রী প্রদান করিলেন। তাহাতে ছুট ধ্যানসিংহ সেই বিচক্ষণা রমণীর সর্জনশ করিবার সুযোগ খুঁজিতে

লাগিলেন। তিনি রণজিতের জারজ পুত্র সেরসিংহকে উত্তরাধিকারী খাড়া করিলেন। শেষে গোলাপসিংহ ও ধ্যানসিংহের বড়বন্ধে চাঁদকুমারী রাজ্য হারাইলেন ও ১ লক্ষ টাকা আরের এক জারগীর পাইলেন। সেরসিংহ পঞ্জাবের রাজা হইলেন ও চাঁদকুমারীকে হস্তগত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চাঁদকুমারী সেরসিংহকে অতি ঘৃণা করিতেন। সেরসিংহ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে তিনি অগ্রাহ্য করেন। তাহাতে চুইমতি সেরসিংহ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া চাঁদকুমারীর সহচরীদিগকে জারগীর দিবার লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে রানীর হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত করিলেন। এক দিন পতিপুত্র-হীনা শোকসন্তপ্তা শিখরাজমহিষী আপন বিশ্রামকক্ষে চুল বাধিতেছেন, এমন সময় তাঁহার চুই সহচরীগণ কেশভুজ ধরিয়া ভূমিতলে তাঁহার মাথা বধড়াইয়া অতি দ্রুতি ভাবে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। [গোলাপসিংহ লক্ষ ৫৭৫ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠার চাঁদকুমারী সম্বন্ধে অনেক কথা উঠেব্য।]

চাঁদকো, সিন্ধুপ্রদেশের এক উর্ধ্বরাজ্য, অক্ষা ২৬° ৪০' ও ২৭° ২০' উঃ এবং দ্রাঘি ৬৭° ২৫' ও ৬৮° পূঃ মধ্যে সিন্ধুনদের দক্ষিণধারে অবস্থিত। এখানে প্রধানতঃ চাঁদিয়া জাতির বাস। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তলপুরের মীর এখানকার চাঁদিয়া সর্দারকে এই ভূখণ্ড জারগীর দেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জারগীরদার বালি মুহম্মদ বিপক্ষ মীরের পক্ষ অবলম্বন করার খয়েরপুরের মীর আলী-মুরাদ চাঁদকো আক্রমণ করেন, পরে সার চার্লস নেপিয়ার অনেক কষ্টে এই স্থান উদ্ধার করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ঘাইবি খাঁ চাঁদকো এই স্থান জারগীর দেওয়া হয়। ইহার প্রধান নগর বাইবি-দেবো।

চাঁদখাঁ, গোরালিয়ার নিবাসী একজন বিখ্যাত গায়ক। (আইন্ ই-অকবরী)

চাঁদখালী, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। অক্ষা ২২° ৩২' উঃ, দ্রাঘি ৮৯° ১৭' ৩০" পূঃ। কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত। এখান হইতে সুলতানবন ৪০ ক্রোশ মাত্র। পূর্বে এ অঞ্চল অবধি সুলতানবন ছিল ও নদীয়ারাজের অধিকারভুক্ত পর্তুগীজ বা বাঙ্গালপাড়াগ্রামের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। ১৭৮২ কি ৮৩ খৃষ্টাব্দে মাজিষ্ট্রেট হেনকেল সাহেব প্রথমে বন কাটাইয়া এখানে গজ স্থাপন করেন, তখন হইতে এই স্থান হেনকেলগজ বা "সাহেবের হাট" নামে খ্যাত হয়। বন কাটা হইলে নদীয়ারাজ এই স্থান দাওয়া করিয়া বসেন, শেষে অনেক মোকদ্দমা সামলার পর ঐ গজের ৫৩১ টাকা কর ধার্য হয়। শেষে নদীয়ারাজ ৮০১১ টাকা মূল্যে এক-

জন জমিদারকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া কেলেদ। ঐ জমিদার গবর্নমেন্টের সহিত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলে ইহার ৮৭২ টাকা কর ধার্য হয়।

প্রতি সোমবারে এখানে এক বৃহৎ হাট বসে। তাহাতে নিকটস্থ গ্রামের বিস্তর লোক উপস্থিত হয়। তৎকালে নদীতে শত শত নৌকা ও কুলে শত শত লোকের সমাগমে এক অপূর্ণ জীধারণ করে। এই হাটে প্রধানতঃ চাউল, হলুদ, তামাক, তৈল ও শাক সব্জি বিক্রীত হয়। সোমবারে এখানে যেমন গোলমাল, আবার অন্য দিনে তেমনি শান্ততাব ধারণ করে। এ সকল দিনে মনে হয় কেবল কতকগুলি কুটীর পড়িয়া আছে, বৃষ্টি লোকের বাস নাই।

চাঁদগড়, (চন্দ্রগড়, চন্দ্রগড়) কর্ণাটক প্রদেশের বেলগাম জেলার অন্তর্গত চাঁদগড় বিভাগের প্রধান সদর। এখানে পুলিশ, ডাকঘর, পাঠশালা ও রাজস্ব-কার্যালয় আছে। এখানকার ছোট গড় ও রবলনাথের মন্দির খ্যাত। লোকের বিশ্বাস এখানকার বরলনাথের পূজা দিলে ওলাউঠা রোগ হয় না। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সাবস্তবাকীর বিখ্যাত কোন্দ সামন্তের পুত্র নাগসামন্ত চাঁদগড় জয় করিয়া এখানে একটা থানা করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কোলহাপুরের সামন্তরাজ পেশবার ভ্রাতৃপুত্র সদাশিব রায় ভাউকে চাঁদগড় দুর্গ, পার্গড় ও কালানন্দগড় এবং পাটহাজারী টাকা মূল্যের সম্পত্তি অর্পণ করেন। এখানকার দুর্গে পূর্বে ৪০টা সামান্য ঘোড়া ও একটা কামান থাকিত। এখন চাঁদগড় নগরে প্রায় আড়াই হাজার লোকের বাস।

চাঁদগাজি, বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঁয়ার মধ্যে একজন, ইনি চাঁদ-প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। [বারভূঁয়া দেখ।]

চাঁদজৌ (দেশজ) লাক্ষাবিশেষ।

চাঁদতারা, রেসমী বস্ত্রবিশেষ, ইহাতে চাঁদ ও তারার মত ফুটকি থাকে। মালদহের চাঁদতারা প্রসিদ্ধ।

চাঁদনী (দেশজ) ১ চাঁদোয়া। ২ বারাণ্ডা।

চাঁদপুর, উঃ পঃ প্রদেশে বিজনোর জেলার একটা নগর। অক্ষা ২২° ৮' ২৫" উঃ, ও দ্রাঘি ৭৮° ১৮' ৫" পূঃ, বিজ-নোর হইতে দক্ষিণে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। পরিমাণ ১৬৫ একর। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সহরের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। সম্প্রতি অনেক পাকাবাড়ী ও পরোপ্রাণী প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়াতে নগরের অবস্থাও অনেকটা ভাল হইয়াছে। এখানে তহসীলের কাছারী, ডাকঘর, থানা, হাসপাতাল, পাঠশালা, বালক বালিকাদের বিদ্যালয়, পাঁচ ছয়টা মন্দির ও মসজিদ প্রভৃতি আছে। সহর হইতে সাতটা

রাস্তা নিকটস্থ গ্রামাতিথ্যে চলিয়া গিয়াছে। বাজারে চিনি ও শক্তের ব্যবসাই অধিক। এখানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসে। স্থানীয় লোকেরা হাঁড়ি, কলিকা, কুঁজো প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কেহ কেহ স্তার কাপড়ও বুনিয়া থাকে।

২ উক্ত বিজ্ঞানীর জেলার একটা তহসীল। চাঁদপুর, বুড়পুর ও বাস্তা এই কয় পরগণা লইয়া এই তহসীল। পরিমাণ ৩০৭ বর্গমাইল।

চাঁদপুর, মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রাম। সমুদ্রতটে ভাগীরথীর মোহানার উপর অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মকালে সর্কদাই সমুদ্রের স্রিষ্ট শীতল বায়ু বহে। এই জন্য অনেক গ্রীষ্মকালে এখানে আসিয়া বাস করেন।

চাঁদপুর, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটা বাণিজ্যপ্রধান নগর, মেঘনানদীর ধারে অবস্থিত।

চাঁদরায়, বহুসম্পত্তিশালী একজন জমিদার, ইহার বাসস্থান রাজমহল। রায় মহাশয় ধনাঢ্য হইয়াও অসচ্চরিত্র ও দম্ভা-দলাধিপতি ছিলেন এবং নিজেও দম্ভাবৃত্তি করিতেন। প্রজাপীড়ন ও পরধনহরণই ইহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। দিন দিন বড়ই গরীত হইয়া উঠিলেন। নবাবের অধীনতা তাঁহার পক্ষে ভাল লাগিল না; তিনি রাজকর বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন তিনি এক প্রকার স্বাধীন। নবাব জানিতে পারিয়া কয় আদায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন। চাঁদরায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইনি অধীনস্থ দম্ভাদল দ্বারা নবাবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিলেন, নবাব বহু-যত্নেও তাহা নিবারণ করিতে কৃতকার্য হইলেন না। চাঁদ-রায়ের ভয়ে ও অভ্যাচারে লোক সকল পথে ঘাটে বাহির হইতেও সাহস পাইত না। সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি সমস্ত অসৎকার্যই ইহার অঙ্গভূষণ ছিল। ইনি শক্তির উপাধিক ছিলেন; প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য দুর্কল নিরীহ প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। পূজার সময়ে দেবীর নিকটে লক্ষ লক্ষ ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হইত। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ আচরণেও ইনি ভীত ছিলেন না।

কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল, দম্ভাপতি চাঁদরায় উন্নত হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস একটা ব্রহ্মদৈত্য চাঁদরায়ের দৌরাঙ্গ্য দেখিয়া ইহার শরীরে আশ্রয় করে। ইহাকে বিনাশ করিয়া প্রজাবর্গের শান্তিস্থাপনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। চাঁদরায়ের কনিষ্ঠের নাম সন্তোষরায়। সন্তোষ অনেক বৈদ্য আনাইয়া ইহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, পাপের ফল দিন দিন

বর্ধিত হইতে থাকিল। সন্তোষরায় গড়েরহাট-নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া ইহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই চাঁদরায় মীরোগ হইলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ধর্মোপদেশে ইহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। ইনি সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্র ও পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন। প্রজাবর্গের শান্তি হইল, নবাবও প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে রাজকর পাইতে লাগিলেন। (ভক্তমাল।)

চাঁদরায়, বিখ্যাত বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ত্রিপুর ইহার রাজধানী ছিল।

প্রবাদ এইরূপ—অকবর বাদশাহের রাজত্বের প্রায় দেড়-শত বর্ষ পূর্বে নিমরায় নামে এক ব্যক্তি কণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আরাকুলবাড়িয়া নামক গ্রামে বাস করেন। এখানকার বঙ্গাধিপের আদেশে তিনিই বংশানুক্রমে সর্বপ্রথম ভূঁয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জাতিতে দে উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। নিমরায়ের পুত্রাদির নাম জানা যায় না। এই বংশে চাঁদরায় ও কেদার-রায় নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, খিজিরপুরের প্রসিদ্ধ ভূঁয়া জৈশাখার সহিত চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সর্কদাই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। জৈশাখা চাঁদরায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহার কত্যা সোণাই বা স্বর্ণময়ীকে লইয়া গিয়া বিবাহ করেন *।

উক্ত প্রবাদ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ইতিপূর্বে কেদাররায় শব্দে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ চাঁদরায় ঐ সময়ের কিছুকাল পূর্বে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জৈশাখার মৃত্যু হয়†। ঐ সময়ে চাঁদরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাৎপক্ষেই সন্দেহ। এরূপ স্থলে জৈশাখা কর্তৃক চাঁদরায়ের কত্যাচরণ একান্ত অসম্ভব।

চাঁদরায় একজন বীরপুরুষ ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে সন্দীপ পর্যন্ত অধিকার করেন। তিনি আপন অধিকার মধ্যে নানাহানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিক্রমপুরে পদ্মা নদীর বামকূলে প্রাচীন ত্রিপুরের নিকট রাজবাড়ীমঠ নামে এক বৃহৎ ও সুন্দর শিবালয় দৃষ্ট হয়, এই প্রসিদ্ধ মন্দিরের ইষ্টকে অতি সুন্দর চিত্র বিচিত্র ফুলকাটা আছে। ইহার

* Journal Asiatic Society of Bengal, vol. XLIII, pt. I, p. 202.
† Blochmann's Ain-i-Akbari, vol. I, p. 340.

প্রাচীর প্রায় ১১ ফিট পুরু। এরূপ ধরণের মন্দির বলে আর এখন দেখা যায় না। এখন ইহার চত্বাবধি নানাহাদে অক্ষত ও বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের পাঁচ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত বাগাঁচড়া গ্রামে কতকটা ঐ ধরণের ভগ্ন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, এই মন্দিরের পূর্বদ্বারোপরি ইষ্টকের উপর ৮ ছত্রে খোদিত এই শ্লোকটি আছে—

“শাকে বারমতজবাগহরিগাঙ্গে নাক্ষিত শঙ্করং .

সংস্থাপ্যন্তুস্থধা স্ত্রধাকরকরস্কীরোদনীরোপমং ।

তটমৈ সৌধমিদমুদাস্তজলদানিীনলোলধ্বজং

তৎপাদেবিত ধীরধীরবিরভং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ ॥”

অর্থাৎ অবিরত-নিশ্চলবুদ্ধি শ্রীচাঁদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ও স্কীরোদজলতুল্য এবং নিবিড় মেঘসংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজযুক্ত এই মন্দির সেই শিবপাদে অর্পণ করিয়াছেন।

বাগাঁচড়ার অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে এই মন্দিরনির্মাতা চাঁদরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যোতি ছিলেন। আবার উক্ত মন্দিরের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণশাসন নামক গ্রামের অধিবাসীরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ চাঁদরায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ নদীয়ারাজ রুদ্ররায়ের দেওয়ান ছিলেন। কোন সময়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন, পথে ব্রাহ্মণশাসন নামক এক গ্রাম দেখিয়া ভাবিলেন, ব্রহ্ম এখানে কেবল ব্রাহ্মণই বাস করেন, কিন্তু গ্রামের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণেরও সন্ধান পাইলেন না, কেবল অনাথ ও অহিন্দুর বাস দেখিলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে একটা প্রকৃত ব্রাহ্মণশাসন স্থাপনের ইচ্ছা হয়। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেওয়ান চাঁদরায়কে মনের কথা বলিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে আদেশ করিলেন। চাঁদরায় বর্তমান ব্রাহ্মণশাসন নামক গ্রাম মনোনীত করিয়া দেড়শত শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করাইলেন। ঐ চাঁদরায় উক্ত শিব-মন্দির নির্মাণ করেন।

উপরোক্ত দুইটা প্রবাদের মধ্যে প্রথমটা নিতান্ত অমূলক। কারণ ১৫৮৭ শকের চাঁদরায় কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর নয়। ২য়টা কতদূর সত্য তৎপক্ষেও সন্দেহ আছে। মন্দিরনির্মাতা চাঁদরায় রুদ্ররায়ের দেওয়ান হইলে তিনি কেবল নিজ নামে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইতেন না, তাহা হইলে রুদ্ররায়ের নামও অবশ্য উৎকীর্ণ থাকিত। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎকীর্ণ সহস্র সহস্র খোদিত-লিপিতে যেখানেই মন্ত্রী বা রাজপুরুষ কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রশস্তি লিখিত, প্রায় সেই সেই স্থানে রাজার নামও

দৃষ্ট হয়। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও তত্পলক্ষে ব্রাহ্মণশাসন স্থাপন দাক্ষিণাত্যের নানাহাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে রুদ্ররায়ের আদেশে ব্রাহ্মণশাসন স্থাপিত হইলে কেন না ঐ লিপিতে রুদ্ররায়ের নাম খোদিত থাকিবে? অতএব ঐ মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা চাঁদরায় সম্ভবতঃ রুদ্ররায়ের দেওয়ান হইতে ভিন্ন। ঐ মন্দিরের কার্যকার্যের সহিত রাজবাড়ীর মঠের কতক সোসাদৃশ্য থাকায় এবং ঐ সময়ে চাঁদরায়ের পরাক্রম বিক্রমপুরে বিস্তৃত হওয়ার, এই যাত্রা অজ্ঞান হয় যে তিনি কোন সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তনকালে উড়িষ্যার অল্পকরণে বাগাঁচড়ার নিকট জল কাটাইয়া বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও তত্পলক্ষে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া যান। পরে ঐ ব্রহ্মোত্তর ব্রাহ্মণশাসন নামে খ্যাত হয়। ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের লোকেরা বলিয়া থাকে, বাগেদবীর শাপে চাঁদরায় নির্বংশ হন। বিক্রমপুরের চাঁদরায়েরও বংশ নাই, তাঁহার কনিষ্ঠ কেদাররায়ের বংশ আছে।

চাঁদবিবি (অপর নাম চাঁদমূলতানা) দাক্ষিণাত্যের এক অতি বিখ্যাতা বীরবালা। আন্ধ্রনগররাজ হুসেন নিজাম-শাহের কন্যা ও মুর্তজা নিজাম শাহের ভগিনী।

যে সকল গুণ থাকিলে মানব চিরস্মরণীয় ও জগতে পূজ্য হন, এই বীরবালার দে সমস্ত গুণের অভাব ছিল না। শৈশব হইতে বিলাসের প্রাসাদে লালিত পালিত হইয়াও যেরূপ মানসিক বীর্যবস্তুর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য-শয় প্রশংসনীয়।

বিজাপুররাজ আলী আদিলশাহ চাঁদবিবির অল্পময় রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, সেই সময়ে রাজবালা শোলাপুররাজ্য ঘোড়কু পাইয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি জাগিয়া উঠে, অশনে শমনে সর্বদাই তিনি পতিকেকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে পতিস্বপ্নসন্তোগ বেশীদিন স্থায়ী হইল না, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর রাজমহিষী বিধবা হইলেন।

তিনি পতিহীনা হইলেন বটে, কিন্তু যাহাতে পতির মানসস্বপ্ন বজায় থাকে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি পতির ভ্রাতৃপুত্র নবমবর্ষীয় ইব্রাহিম আদিলশাহকে বিজাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।

বালক ইব্রাহিমের রাজত্বের প্রথম ৮।১০ বর্ষ কেবল গোলযোগেই কাটিয়া গেল। বিজাপুরের আমীর ওমরাহগণ স্ব স্ব প্রাধিকার লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অব-

লবন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে প্রধান মন্ত্রী কামাল খাঁ সমস্ত রাজশক্তি নিজ আশ্রয় করিবার বড়বন্দু আঁটিতে ছিলেন। টানবিবি জানিতে পারিয়া কামাল খাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। কিশ্বর খাঁ টানবিবির আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ক্রমে কিশ্বর খাঁ প্রধান আর্মীর হইয়া বসিলেন। মুস্তফা খাঁ নামে টানবিবির এক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, কিশ্বর খাঁ গুপ্তভাবে তাঁহারও প্রাণবিনাশ করিলেন। পরে সেই ছুই টানবিবিকে বিজাপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়া সাতারায় ছুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শেষে রেখলাস খাঁ নামক এক হাব্‌সি সর্দারের সাহায্যে টানবিবি মুক্তিলাভ করেন। তখন কিশ্বর বিজাপুর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, পথে গোলকুণ্ডায় মুস্তফার এক আত্মীর হস্তে নিহত হন।

বিজাপুরের এই অন্তর্বিদ্বেহের সময়ে আক্কাদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদয়ের রাজগণ বিজাপুর অবরোধ করিলেন। বিজাপুরের সর্দারেরা বুঝিলেন যে, গৃহবিবাদে ফলে তাঁহাদের এই দারুণ সঙ্কট উপস্থিত। টানবিবি শত্রুমিত্র সকলকে ডাকিয়া তাঁহাদের মানসম্মত ও রাজ্যরক্ষার জন্য উত্তেজিত করিলেন। আবার সকলে একতাহুয়ে বদ্ধ হইলেন। শত্রুগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। বিজাপুরের সহিত আক্কাদনগর ও গোলকুণ্ডারাজ সন্ধি করিলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ বালক ইব্রাহিমের সহিত গোলকুণ্ডারাজতগিনী তাজ-মুলতানার বিবাহ হইয়া গেল। এ সময়ে দিলাবর খাঁ নামে এক ব্যক্তি বিজাপুরে সর্কেসর্কা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আবার স্ত্রীমত প্রচারে অগ্রসর হইলেন।

টানবিবির কর্তৃত্ব আর থাকে না। তিনি দেখিলেন বিজাপুরে এখন বেশ সুখশান্তি বিরাজ করিতেছে, দিন দিন রাজ্যের বেশ উন্নতি হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হঠাৎ জন্মভূমি আক্কাদনগরে আসিলেন। এই সময়ে টানবিবির ভ্রাতৃপুত্র মিরান হুসেনের সহিত এক বিজাপুর রাজকন্ডার বিবাহ হইল। উৎসব আয়োজন শেষ না হইতেই আক্কাদনগররাজ মুর্জা নিজাম শাহের মনে ধারণা হইল যে পুত্র মিরান হলেন তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অমূলক বিশ্বাসে তাঁহার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তিনি পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্য একদিন তাঁহার শয়নকক্ষে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। মিরান কোন রকমে রক্ষা পাইয়া গুপ্তভাবে দৌলতাবাদে পলাইয়া যান। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মির্জাখাঁর সাহায্যে আক্কাদনগর অধিকার করেন এবং পিতাকে এক গুরুদ্বারে পুরিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশপূর্বক

সিংহাসনে অতিবিক্ত হন। মিরানের অত্যাচারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষক্রমে তিনি তাঁহার প্রধান সহায় মির্জাখাঁর প্রাণবিনাশে আদেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মির্জাখাঁ জানিতে পারিয়া সাবধান হইলেন এবং কোশলক্রমে একদিন মিরান হুসেনকে বন্দী করিয়া অপর একজনকে রাজা করিবার জন্য রাজবংশীর ইসমাইল ও ইব্রাহিম নামক দুই ভ্রাতাকে আনাহিলেন। দুই ভাই লোহগড়ে বন্দী ছিলেন। তদাধ্যে কনিষ্ঠ দাদশবর্ষীয় ইসমাইল নিজামই রাজপদে অতিবিক্ত হইলেন। কিন্তু জামালখাঁ নামে একজন সেনাপতি তাহাতে ঘোর প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে মিরান হুসেনই তাঁহাদের প্রকৃত রাজা, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। এ সময়ে অনেকেই জামালখাঁর পক্ষ অবলম্বন করিল। তখন মির্জাখাঁ মিরানের শিরশ্ছেদ করিয়া তোরণদ্বারে ঝুলাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। নগরবাসীগণ সেই বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করিয়া সকলেই উত্তেজিত হইয়া ছুর্গদ্বারে আগুন দিল এবং জামালখাঁর সহিত ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে যাহাকে পাইল বিনাশ করিতে লাগিল। সাতদিন মধ্যে মির্জাখাঁ ধৃত ও নিহত হইলেন।

এখন জামালখাঁই সর্কেসর্কা হইয়া পড়িলেন। তিনি মুর্জা নিজামের ভ্রাতৃপুত্র ও বৃহান্ নিজামের পুত্র ইসমাইল-নিজামকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময়ে অনেক আর্মীর জামালখাঁর বিপক্ষে সলাবৎখাঁর সহিত মিলিত হইলেন। বিজাপুরের প্রধানমন্ত্রী দিলাবরখাঁও দক্ষিণ হইতে আসিয়া যোগ দিলেন। টানবিবি এত দিন নীরবে আক্কাদনগরের কার্যকলাপ দেখিতেছিলেন। কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আক্কাদনগরের সমুদয় ক্ষতি হইবে ভাবিয়া তিনি স্বয়ং বিজাপুরের শিবিরে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি অমুসায়ে নিজামশাহী রাজসরকার হইতে ৮৫ লক্ষ টাকা যুদ্ধ ব্যয় হিসাবে দিতে হইল।

টানবিবির বৃহান্ নিজাম (২য়) নামে আর এক ভ্রাতা ছিলেন। হুসেননিজামের জীবদ্দশায় তিনি একবার পিতৃরাজ্য গ্রহণের চেষ্টা পান, সেইজন্য তিনি পিতার ক্রোধে পড়িয়া দেশত্যাগ করেন ও অকবরবাদশাহের আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। অকবর উত্তরভারতে তাঁহাকে কিছু আয়গীর দিয়াছিলেন, তাহাতেই বৃহানের জীবিকা চলিত। আক্কাদনগরের উপরোক্ত ব্যাপার অকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি বৃহান্ নিজামকে দক্ষিণাথে পাঠাইলেন ও খানেশ প্রভৃতি নানাদিক হইতে সাহায্য পাইয়া

বুর্হাননিজাম আকদনগর অধিকার করেন এবং পুত্রকে বন্দী করিয়া নিজের রাজ্যে হইলেন।

বিজাপুরের রাজমন্ত্রী দিলাবরখাঁ ইতিপূর্বেই বিজাপুর ছাড়িয়া বিদগ্ধ পলাইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনিও বুর্হানের সভায় আসিয়া মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। দিলাবরের উত্তেজনা বুর্হান বিজাপুর জয়ে অগ্রসর হইলেন। যখন বুর্হান সৈন্যে বিজাপুর রাজ্যের বক্ষস্থলে ভীমানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে ইব্রাহিম আদিলশাহ দিলাবরখাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি বিজাপুরের প্রকৃত রক্ষাকর্তা, পুনরায় বিজাপুরে আসিয়া রাজকাৰ্য্য গ্রহণ করুন। দিলাবরখাঁ লোভ সামলাইতে পারিলেন না, তিনি বুর্হানকে পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুরে আসিয়াই নিহত হইলেন। ভীমানদীর জলপ্রাবনে বুর্হাননিজামের বিশেষ ক্ষতি হইল এবং তাঁহার পুত্র রাজ্যগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া কালবিলম্ব না করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে বুর্হান আবার একবার ইব্রাহিম আদিলশাহের বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইলকে সাহায্য করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু এবারও তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। এই বর্ষে ১৫ই মার্চ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র ইব্রাহিমনিজাম রাজ্যগ্রহণপূর্বক তাঁহার শিক্ষক মিক্কা মজুমদারকে প্রধান মন্ত্রী প্রদান করিলেন। এ সময়ে আকদনগরে আবার গোলযোগ আরম্ভ হইল। রেথলাস্‌খাঁ হাব্‌সি ও মুবল্লিড্‌ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মিক্কা মজুমদারকে অন্তর্ধারণ করিলেন। দারুণ গৃহবিবাদের উপক্রম হইল। এই সময়ে চাঁদবিবির আদেশে বিজাপুর-রাজ ইব্রাহিম আদিলশাহ যুদ্ধবোষণা করিলেন এবং আকদনগররাজের সাহায্যার্থ শাহজুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মিক্কা মজুমদার প্রত্যাগ করিলেন, কিন্তু রেথলাস্‌খাঁ তাহাতে সন্মত হইলেন না। নির্দোষ আকদনগররাজ রেথলাস্‌খাঁর মতেই মত দিলেন। সুতরাং বিজাপুরসৈন্য বাহার সাহায্যে আসিয়াছিল, এখন তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম নিজামশাহ নিহত হইলেন।

মিক্কা মজুমদার তাড়াতাড়ি রাজধানীতে আসিয়া রাজকোষ ও দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন এবং কিরূপে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ হইবে, তাহার পরামর্শ করিবার জন্ত রেথলাস্‌খাঁ প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

চাঁদবিবির একান্ত ইচ্ছা ইব্রাহিমনিজামের দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান বাহাদুরই রাজা হয়। প্রধান প্রধান হাব্‌সি সর্দারেরা তাহাতে সন্মত হইয়া মিক্কা মজুমদারকে বলিয়া পাঠাইলেন

যে আকদনগররাজপুত্র বাহাদুর সিংহাসন পাইবেন এবং তাঁহার পিতার পিসী চাঁদবিবি তাঁহার অভিভাবক হইয়া রাজকাৰ্য্য চালাইবেন। নিজের প্রস্তাব কতটা ধর্ম্ম হইবে তাবিয়া মিক্কা মজুমদার তাহাতে সন্মত হইলেন না, তিনি আকদন নামে এক দ্বাদশবর্ষীয় রাজজাতিকে রাজা করিলেন এবং চাঁদবিবির নিকট হইতে বাহাদুরকে সরাইয়া তাঁহাকে সৈন্যে চাবন্দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। হাব্‌সি-সর্দার রেথলাস্‌খাঁ মিক্কা মজুমদার আচরণে বড়ই চটিয়া গেলেন, তিনি শুনিলেন যে আকদন প্রকৃত নিজামশাহী-রাজবংশীয় নহে। হাব্‌সি ও মুবল্লিড্‌ সৈন্যসাহায্যে তিনি মিক্কা মজুমদারকে আক্রমণ করিলেন। জনরব হইল যে সেই যুদ্ধে নবীন রাজা নিহত হইয়াছেন। রেথলাস্‌খাঁ চাবন্দুর্গ হইতে বাহাদুরকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ দুর্গাধিপ মিক্কা মজুমদার বিনা অজুমতিতে বাহাদুরকে ছাড়িয়া দিলেন না। রেথলাস্‌ বাহাদুরের সমবয়স্ক এক বালককে রাজা খাড়া করিয়া দশ বার হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তখন মিক্কা মজুমদার হতাশ হইয়া পড়িলেন; তিনি অকুবরপুত্র কুমার মুরাদকে আকদনগরের রাজ্য দিতে প্রতিক্রমিত হইয়া গুজরাট হইতে তাঁহাকে আসিতে লিখিলেন। মুরাদকে পত্র লিখিবার পরই মিক্কা মজুমদার অদৃষ্ট ফিরিল। হাব্‌সি ও মুবল্লিড্‌ সৈন্যগণ পরাস্ত হইল। একমাস পরেই মুরাদ জিহাদ হাজার অখারোহী, সেনাপতি থান-খানান্ ও খান্‌দেশের রাজার সহিত দুর্গের দুই ক্রোশ দূরে হস্‌-ই-বেহিস্‌ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিক্কা মজুমদার আপনার অদূরদর্শিতার জন্য অমৃত্যুপ করিতে লাগিলেন ও বাতিবাস্ত হইয়া পড়িলেন।

এই বার বিচক্ষণা চাঁদবিবি আকদনগররাজের রক্ষণীয়-রূপে কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আদেশে মিক্কা মজুমদার প্রধান কর্ম্মচারী অনুসন্ধান খাঁ ঘাতক হস্তে নিহত এবং বাহাদুরশাহ রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু তখনও বাহাদুর চাবন্দুর্গে বন্দী। মিক্কা মজুমদার নামমাত্র রাজা আকদনশাহকে লইয়া ইব্রাহিম আদিলশাহের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিজাপুর সীমার উপস্থিত হইলেন। এদিকে দৌলতাবাদের নিকট রেথলাস্‌খাঁ মতি নামে এক শিশুকে রাজ্যেশ্বর খাড়া করিয়াছেন। আবার হাব্‌সি-সেনানায়ক নেহজ্‌খাঁ বিজাপুরে গিয়া (১ম) বুর্হান নিজামের এক সপ্ততিবর্ষীয় পুত্র শাহআলীকে আকদনগরে গিয়া রাজপদগ্রহণের জন্ত উত্তেজিত করিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে রাজ্যরক্ষা করা কতদূর কষ্টসাধ্য ও অতিক্রান্ত সাপেক্ষ তাহা বীরমহিলা চাঁদবিবি বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। এবার সকল প্রধান কার্য্যের ভারই নিজ হস্তে

লইলেন, তিনি শম্শির খাঁ হাবসি ও অকজল খাঁ বোরিবিবে হুর্গরক্ষার নিযুক্ত করিলেন এবং নেহজ্ খাঁ ও শাহআলীকে রাজারক্ষার আহ্বান করিলেন। নেহজ্ খাঁ সাতহাজার সৈন্যসহ রাজিকালে আকদনগর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, পশ্চিমধ্যে মোগল শিবির দেখিতে পাইয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। এ সময়ে খানখানানের অধীনস্থ অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। এইরূপে পথ পরিষ্কার করিয়া নেহজ্ খাঁ সৈন্যে হুর্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন। শাহআলী দৌলত খাঁ লোদী-পরিচালিত মোগলসৈন্যের নিকট কতক পরাজিত হন; মোগলেরা তাঁহার সাতশত সৈন্যকে কাটিয়া ফেলে। বিজাপুররাজ এই সংবাদ পাইয়া খোজা সোহেলখাঁর সহিত পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী শাহজগতিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। বিদেশীর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া মিক্রো-মজ্জ, আকদনশাহ ও রেখলাস্ খাঁ আসিয়া সোহেলখাঁর সহিত যোগ দিলেন। এই সময়ে হায়দরাবাদ হইতে মেহদিবুলী-জুলতানের অধীন হুসহাজার গোলকুণ্ডা অশ্বারোহী শাহ-হুর্গে উপস্থিত হইল। মুরাদ এই অপূর্ণ মিলন সংবাদ শুনিলেন। মোগলসৈন্য মধ্যে যুদ্ধসভা বসিল, স্থির হইল যে শত্রুর হুর্গরক্ষার একটা বন্দোবস্ত করিতে না করিতে হুর্গের এক অংশ ধ্বংস করিতে হইবে। অন্নদিন মধ্যেই হুর্গের একদিকে পাঁচটা স্তূড়ল কাটা হইল, যেদিকে মোগল দলবল থাকিবে সেইদিক্ ছাড়া স্তূড়লের মধ্যে আর সকল দিকেই বারদ পুরিয়া চূণ সুরকি ও পাথর দিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইল। (পরদিন ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ ফেব্রুয়ারী তারিখে) স্তূড়ল কয়টিতে আগুন দিবার কথা ছিল।

রাজিকালে খাজা মুহম্মদ খাঁ সিরাজী ভাবী বিপদের কথা জানাইয়া দিলেন। চাঁদবিবি তৎক্ষণাৎ দলবল লইয়া স্তূড়ল খুঁজিতে লাগিলেন। দিনের বেলায় তিনি দুইটা স্তূড়ল নষ্ট করিলেন, সন্ধ্যা বৃহৎ স্তূড়ল হইতে সৈন্তগণ মাল-মন্ডা বাহির করিয়া ফেলিতেছিল, সেই সময়ে মুরাদ তাহাতে অগ্নিদান করিতে আদেশ করিলেন। অগ্নি দিবা-মাত্র স্তূড়লনষ্টকারীগণ অনেকেই বিনষ্ট হইল এবং প্রাচীরের অনেকটা পড়িয়া গেল। এই সময়ে অনেক প্রধান যোদ্ধা হুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। চাঁদবিবি দেখিলেন আর নিস্তার নাই। তিনি মুখে ঢাকা দিয়া বর্ষা-চর্মে পরিবৃত্ত হইয়া মুক্ত অসিহস্তে সেই ভয় প্রাচীর রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তীক্ষ্ণ যোদ্ধাগণ সেই বীর-মহিলার অসম সাহস অবলোকন করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে তাঁহার অমূল্যত্ব হইলেন। সেই ভয় প্রাচীর হইতে এক

কালে দলবলধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল; অগ্ন্যস্ত্রের ভীষণ গর্জনে দিবাগুল আচ্ছন্ন করিল। শত শত যোগলবীর সেই ভয় প্রাচীরের নিকট প্রাণত্যাগ করিল। রাশি রাশি মৃতদেহে গড়খাই পরিপূর্ণ হইল! তাহার জন্য আজ প্রকৃতই শোণিতস্রোত বহিতে লাগিল। আজ শত্রু মিত্র সকলেই সেই বীরবালার অমূল্যত্ব তেজস্বিতার বধেষ্ট পরিচয় পাইলেন। কি হুর্গমধ্যে কি শত্রু শিবিরে সকলেরই মুখে আজ চাঁদবিবি ও চাঁদজুলতানার স্মৃতি গান। রাজি দুই প্রহরের সময়ে বৃদ্ধ একটু খামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু চাঁদরাজীর বিশ্রাম নাই। তিনি হুর্গসংস্কারে ব্যস্ত! প্রত্যুষ হইতে না হইতে তরফানে ৫৬ হাত প্রাচীর উঠিয়া গেল।

এদিকে হুর্গের রসদ কমিয়া আসিতে ছিল। চাঁদবিবি বিন্দনগরে স্বপক্ষীয় সৈন্যদলকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। ঘটনাক্রমে সেই পত্র শত্রুর হস্তে পড়িল; মুরাদও পত্র পড়িয়া নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন ও মোগলপক্ষীয় একদল সৈন্য আনাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ মাণিকদণ্ড পাহাড় হইয়া আকদনগরে উপস্থিত হইল। মোগলশিবিরেও রসদের অভাব হইয়াছিল, এখন নতুন সৈন্যদলের আগমনে মোগলেরা বড়ই কষ্টে পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মুরাদ চাঁদবিবিকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি সম্বরই আকদনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। চাঁদবিবি প্রথমে ইতস্তত করিলেন; শেষে ভাবিয়া দেখিলেন যে যদি তাঁহার পক্ষীয় সৈন্যগণ মোগলের নিকট পরাজিত হয়, তাঁহার মানসম্মত কোথায় থাকিবে? এই ভাবিয়া তিনি বাহাদুরশাহের নামে সনন্দপত্রে সহি করিলেন। মোগলসৈন্য দৌলতাবাদ দিয়া চলিয়া আসিল। তিন দিন পরে বিদ্ হইতে দলবল আসিয়া পৌঁছিল। মিক্রো মজ্জ ভাবিয়া ছিলেন আকদনশাহকেই রাজসম্মান দেওয়া হইবে, কিন্তু প্রধান প্রধান আমীরগণ মিক্রোর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। নেহজ্ খাঁ বাহাদুর শাহকে আনিবার জন্য চাবন্দহুর্গে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। চাঁদবিবিও ইব্রাহিম আদিলশাহকে আকদনগরের গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। বিজাপুররাজ চাঁদবিবিকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, তিনি অবিলম্বে চারিহাজার সৈন্য পাঠাইলেন এবং মিক্রো মজ্জকে আকদনশাহের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুরে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার আদেশ মত মিক্রো মজ্জ বিজাপুরে উপস্থিত হইলেন, এখানে তিনি

বিজাপুররাজের অহুগ্রহে একজন গণ্য মান্য আবার হইরা বাস করিতে লাগিলেন।

বাহাদুরশাহ আকদনগরে উপস্থিত হইবামাত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং চাঁদবিবির বিশ্বস্ত মুহম্মদখাঁ পেশবা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। এখন আবার মুহম্মদখাঁ সর্বময় কর্তা হইরা উঠিলেন, তাঁহার নিজের লোকেরাই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইল। তিনি অবিলম্বে নেহল্ খাঁ ও হাবসি সর্দার শম্শির খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন, তদুপরে অপরাপর সর্দারেরা ভীত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিল। চাঁদবিবি দেখিলেন হিতে বিপরীত! তাঁহারই অহুগ্রহে যে ব্যক্তি রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইরাছেন, সেই লোকই আজ তাঁহার উপর কর্তৃত্ব চালাইতে অগ্রসর! তিনি বিজাপুররাজকে মুহম্মদের অত্যাচারের কথা জানাইলেন ও সমস্ত মুহম্মদের কর্তৃত্ব হইতে রাজ্যোদ্ধারের জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। অবিলম্বে সোহেল খাঁ (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে) বহুসংখ্যক বিজাপুরসৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। মুহম্মদখাঁ ও তাঁহার গতিরোধ করিলেন। বিজাপুরসৈন্য চারিমান কাল দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। মুহম্মদখাঁ যখন দেখিলেন, চাঁদবিবির কোশলে ক্রমেই শত্রুগণ বলবান্ হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার আর জয়ের আশা নাই। তিনি বেরারে মোগলসেনাপতি খানখানাকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুহম্মদখাঁকে বন্দী করিয়া চাঁদবিবির নিকট হাজির করিল। উন্নতমনা চাঁদবিবি মুহম্মদখাঁর প্রাণরক্ষা করিলেন। আবার চাঁদবিবির উপর রাজ কার্যের ভার পড়িল। তিনি নেহল্ খাঁ হাবসিকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী পদ প্রদান করিলেন। পূর্বতন প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় নেহল্ খাঁও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইরা হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন।

কিছুদিন পরেই নেহল্ খাঁ চাঁদবিবির সর্বনাশের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদবিবি শীঘ্রই জানিতে পারিলেন। তিনি বালক রাজাকে দুর্গমধ্যে আনিয়া দুর্গ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। নেহল্ খাঁ দুর্গে প্রবেশ করিতে গেলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি রাজধানীতে কার্যাদি করিতে পারেন, দুর্গমধ্যে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তখন নেহল্ খাঁ প্রকাশভাবে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। বিজাপুররাজ এই গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার কথার কেহ কর্ণপাত করিলেন না। নেহল্ খাঁ চাঁদবিবির কিছু করিতে

না পারিয়া শেষে মোগলের অধীন বিদ্রোজ্য অধিকার করিয়া বলিলেন।

অকস্মের নিকট এ সংবাদ পৌছিল, তিনি (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) কুমার দামিরাণ ও সেনাপতি খাম্বানাকে বিদেহ শাসনকর্তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। অমরপুর-কোটলি নামক গিরিপথে নেহল্ খাঁ মোগলের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বিপুল মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধে কলোদর হইবে না ভাবিয়া আকদনগরে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই চাঁদবিবির সহিত মিটমাটের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চাঁদবিবি আর নেহল্ খাঁর কথার বিশ্বাস করিলেন না। নেহল্ খাঁ জুনারে পলায়ন করিলেন।

এদিকে মোগলসৈন্য নিষ্ক্রিয়বাদের আকদনগরে আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল ও গুলি ফুড়ক কাটিতে লাগিল। এবারও ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার চাঁদবিবি সেই ভীষণ রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করিলেন! আকদনগরে প্রবাদ আছে—এই যুদ্ধে যখন সকল গোলাগুলি ফুরিয়া গেল, তখন তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা এমন কি রাশি রাশি মণি মুক্তা কামানে ঠালিয়া শত্রু মধ্যে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার ক্রমেই তিনি তথ্যেৎসাহ হইয়া পড়িলেন, দেখিলেন বাহিরে যেমন প্রবল শত্রু, দুর্গে মধ্যে তিনি সেইরূপ শত্রুবেষ্টিত। প্রধান প্রধান বোদ্ধাগণ যুদ্ধে পরাশ্রয়! তিনি খোজা হমিদ খাঁ নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমরা চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত! যে সকল প্রধান বোদ্ধা দুর্গমধ্যে আছেন, তাঁহাদেরও আর বিশ্বাস নাই। একরূপ হলে যদি আকদনগররাজের মান সত্তম ও ধনরত্ন রক্ষা পায়, তবে শত্রুহন্তে দুর্গ অর্পণ করাই উচিত।”

হমিদ খাঁ যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহাতে চাঁদবিবি উত্তর করিলেন, “আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এ যুদ্ধে আমাদেরই পতন অবশ্যজ্ঞাবী। এখন বালক রাজাকে রক্ষা করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।” অল্পবুদ্ধি হমিদ খাঁ চাঁদবিবির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পথে পথে রাষ্ট্র করিলেন যে চাঁদবিবি শত্রুহন্তে দুর্গ অর্পণ করিবেন। কীণচেতা সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া হমিদখাঁর সহিত চাঁদবিবির গৃহে প্রবেশ করিল ও অতর্কিতভাবে তাঁহার প্রাণ-বিনাশ করিল। বীরবালার জীবলীলা এইরূপে শেষ হইল।

চাঁদবিবির হত্যাকাণ্ডে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। মোগলেরা দুর্গ অধিকার করিল এবং বাহাদুরশাহ ও অপরায়ণ রাজপুত্রদ্বিগকে বন্দী করিয়া

অকবরের নিকট পাঠাইয়া দিল। চাঁদবিবির ভবিষ্য বাণী নিম্ন হইল।

বিজাপুররাজ ইব্রাহিম আদিলশাহ তাঁহার বালাজীবনের রক্ষয়িত্রী দেহময়ী চাঁদবিবির মৃত্যুসংবাদে অতিমাত্র শোক-লগ্ন হইলেন, এই শোকের সময়ে তিনি ব্রজ-মরাঠী মিশ্রিত পারসী কবিতায় চাঁদবিবি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"নন্দনকাননে হরবালাগণ করে বধা বাস।

মানবপ্রাণে রমণীয়তন বধার প্রকাশ।

নৌদর্ঘ্যে সন্তানে তাঁর সম কারো নাহিক উপমা।

বিজাপুররাজ সেই প্রিয়তমা চাঁদহুলতামা।

জীবন সময়ে তেজোবীর্ঘ্য তাঁর সদা উদ্ভাসিত।

হৃৎশান্তিকালে সরল বিমল সদা শান্তচিত।

কণি প্রতি মারা, বীন বীন প্রতি অপার করুণা।

ছিল মহারাজি বিজাপুররাজা চাঁদহুলতামা।

বতাবে কোমলা মধুর মাধুরী নাহিক তুলনা।

তাঁহার মহিমা বর্ণিতে না পারে মানবরসনা।

মহুমার কোলে অতি সন্তনে পালিল যে জন।

রাজ্যের বিরবে অনাথ বালকে করিল রক্ষণ।

সেই মাতৃদুতি হৃদয়-মন্দিরে (করিতে পূজন।)

আমি ইব্রাহিম তুচ্ছ কর ছত্র করিম রচন।" ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ প্রকৃতি চাঁদবিবির সাবেক প্রতিকৃতি এখনও বিজাপুরে আছে। তাহাতে সেই স্নন্দর মুখমণ্ডল, নীলনয়ন, তিলমূলবিনিমিত বক্র নাসিকা, স্থির গম্ভীর হাবভাব অতি স্নন্দর চিত্রিত। বিজাপুরের সকলেই আজও চাঁদবিবিকে বিশেষ ভক্তি প্রজ্ঞা করে, আজও সকলে অপর গল্প ফেলিয়া চাঁদবিবির আকন্দনগরের যুদ্ধ কল্পা শুনিতে ভাল বাসে *।

চাঁদবালি, উৎকলপ্রদেশস্থ বালেশ্বরজেলায় অন্তর্গত বৈভ-রগী নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত একটি বন্দর। ইহা অক্ষা-২০° ৪৬' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি-৮৬° ৪৭' ৫৩" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা যদিও সমুদ্রকূল হইতে অনেক দূরে আছে, তথাপি ইহা দামড়া বন্দরের সীমান্তগত। আজ কয়েক বৎসর হইতে এ স্থানটী বিখ্যাত এবং এখন প্রধান বন্দররূপে পরিগণিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এখান পর্য্যন্ত সীমার যাতায়াত করিয়া থাকে। অধিকাংশ সীমারই জগন্নাথ-দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণে পূর্ণ থাকে। ভারতের নানাস্থান হইতে যাত্রীগণ কলিকাতার সমবেত হইয়া সীমারযোগে

চাঁদবালি যার এবং তথা হইতে পুরীধামে গমনপূর্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া আইসে। ইংরাজ গবর্নেন্ট এখানে পুলিশ প্রভৃতি শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বাসযোগ্য স্থানও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য কাণ্টোন ম্যাকনির্ সাহেব সর্বপ্রথম এইস্থানের আবশ্যকতা বোধ করেন এবং তাঁহারই যত্নে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চাঁদবালির দুই মাইল অন্তরে বৈভরগীতীরে মহারী গাঁ নামক একটি স্থান আছে, তথায় সীমার বিশ্রামার্থ অপেক্ষা করিয়া থাকে।

চাঁদবালি পার্শ্বস্থ স্থান সকল অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া এখানে অট্টালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে এবং কালক্রমে ইহা আরও বিখ্যাত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

চাঁদবীণা, চম্বাকার অলঙ্কারবিশেষ, উত্তরপশ্চিমে এই গহনা প্রচলিত।

চাঁদসওদাগর, একজন বিখ্যাত সওদাগর। ইনি মনসার ভাসান ও মনসামঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক সকলের নারক নথিলয়ের পিতা ও বেহলার স্বত্ব। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—চম্পাইনগরে ইহার বাসস্থান ছিল। ইনি গন্ধবণিককুলোদ্ভব ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক তরী সর্বদা বহুদূরদেশে বাণিজ্য করিতে বাহিত। ইনি পরম জ্ঞানী ও মহাদেবের মহাভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা দানপ্রত্যাদি ধর্ম্মাচরণে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেন। পরে দৈববশে সর্বকুলের অধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীর সহিত ইহার বিবাদ হয়। চাঁদ তত্ত্বজ্ঞানী ও পরম শৈব ছিলেন, সুতরাং মনসার পূজা করিতে সম্মত হন নাই, বরং কেহ পূজা করিলে তাহার প্রতিরোধ করিতেন এবং মনসাকে চেন্নমুড়িকানি বলিয়া গালি দিতেন। মনসাদেবী তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিহিংসাবশে সাধুর অনিষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। শিবজ্ঞান থাকায় সাধুর কিছু অনিষ্ট করা অসাধ্য ভাবিয়া, মনসা তাঁহার ছয় পুত্রকে নাশ করেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী চাঁদসওদাগর তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। মনসার জীবনল তাহাতে আরও জলিয়া উঠিল। তিনি সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা কালীদেহে ডুবাইয়া দিলেন। সওদাগর সর্বস্বান্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার জ্ঞান ও মানসিক তেজ অচল রহিল। তিনি কিছুতেই চেন্নমুড়িকানির পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। চাঁদ জানিতেন যে মনসার কোপেই তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে, তিনি ইহাও জানিতেন যে মনসার পূজা করিলেই তাঁহার কষ্টের অবসান হইবে, কিন্তু মহামনসী সাধু সামান্য

* অনেক গ্রন্থেই চাঁদবিবির কথা আছে, তন্মধ্যে এই কয়খনি উল্লেখ্য—
ফেরিষ্টা, আবুলফজলের অকবরনামা, কৈজির অকবরনামা, ম্যাসি-ই-
রহিম, Elphinstone's History of India, Col. Meadows-
Taylor's Architecture of Bijapur and his History of India ;
Bombay Gazetteer, vol. XVII and XXIII.

পার্শ্বিক জ্ঞানের জ্ঞানমার্গ হইতে বিচলিত হইলেন না। সুতরাং মনসা তাঁহাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া, শববস্ত্র পরাইয়া, মনসার আনন্দ হইতে লাগিল। চাঁদ নিরন্তর অবহার ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া ততুল আনিলেন, মনসা ইন্দুর দ্বারা তাহা অপহরণ করিলেন; অগত্যা সাধু অনাহারে রহিলেন, মনসার আনন্দের সীমা নাই। চাঁদ কাঠ কাটিয়া আনিতেছে মনসা হুমান সাহায্যে তাহা কুচাইলেন। চাঁদের সাধ্য কি কাঠ বিক্রয় করে। একপ না করিলে চাঁদের মনসার প্রতি ভক্তি হইবে কেন? সাধুর কষ্টের অবধি রহিল না। বিব-হরির এত দয়া দেখিয়াও, কিন্তু তাঁহার প্রতি চাঁদের ভক্তি হইল না। ক্রমে তাঁহার নখিন্দর নামে একটি সুকুমার পুত্র জন্মিল। চাঁদ অশেষ কষ্টের পর দীনবেশে গৃহে ফিরিবে, দয়াময়ী মনসার কেমন করিয়া তাহা সহ হইবে। তিনি গণকবেশে বেগুনীকে বলিয়া গেলেন, ‘কাকা, আজ রাজে কলাবন দিয়া তোমার বাড়ীতে চোর আসিবে, তাহাকে খুব মারিও।’ চাঁদ গৃহিণীর হাতে মনসার কপাল প্রহার খাইলেন। ইহাতেও মনসাদেবীর উৎকট প্রতি-হিংসা দূর হইল না। তিনি বিবাহরাজিতে লোহার বাসরগৃহে সাধুর একমাত্র তনয় নখিন্দরকে সর্পদ্বারা বিনষ্ট করিলেন। সাধুও নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি দেখিলেন বিব-হরির বিষনয়নে যত অনিষ্ট থাকিতে পারে তাহার শেষ হইল। তাঁহার ধনধান্য পুত্র সকলেই গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষ পুত্রের শোণিতেও বিবহরির মনোমালিন্য দোত হইল না। মনসা মহা ফাঁকরে পড়িলেন। তাঁহার এত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি অস্ত্র উপায় অবলম্বন করিলেন। শঙ্খচিলরূপে সওদাগরের জটাহিত শিবজ্ঞান হরণ করিলেন। চাঁদ এখন বাস্তবিক দরিদ্র হইলেন। এদিকে চাঁদের পুত্রবধু সারবণিকহুঁহিতা বেহলা বহু কষ্টের পর স্ববস্ত্রিত পূজা নৃত্যগীতাদি দ্বারা মনসার সন্তোষ জন্মাইয়া যুতপতি ও ছর ভাস্করের প্রাণদান করিলেন এবং স্বপুত্রের চৌদ্দডালা পুনরুদ্ধার করিয়া সানন্দে স্বত-রালয়ে আগমন করিলেন। মনসার এক কৌশল ব্যর্থ হইল না। চাঁদ মহানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মহার্য হইলেন এবং সামান্য প্রতিদানের পর মনসার পূজা করিতে সম্মত হইলেন। মহাআড়ম্বরে সাধুর বাড়ীতে মনসার পূজা হইয়া গেল। তাঁহার দেখাদেখি সকলেই মনসার পূজা করিতে লাগিল।

মনসার ভাসান প্রভৃতিতে চাঁদসওদাগরের এইরূপ বিবরণ

পাওয়া যায়। এই সকল প্রযোক্ত চাঁদসওদাগর ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট অলৌকিক বিবরণ অধিকাংশই কবি কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক খৃষ্টীয় ১২শ কি ১৩শ শতাব্দীতে চাঁদ নামে যে একজন ধনশালী সওদাগর প্রচলিত হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই এদেশে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া থাকে। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দদাস এই বিবরণ লইয়া সুপ্রাচ্য মনসাতাসান গীতিকাব্য রচনা করেন। বাঁকুড়া জেলার চাকিবোগে প্রাচীন ও ভাঙ্গসংক্রান্তিতে মনসাপ্রতিমার সম্মুখে মনসাতাসান গীত হইয়া থাকে।

বর্তমান জেলার মানকর টেশনের অনতিদূরে চম্পাইনগর অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থানের বর্তমান নাম কসবা। তথায় এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। এই শিবলিঙ্গ ৫৬ হাত লম্বা। অনেকের বিশ্বাস উহা চাঁদসওদাগরের প্রতিষ্ঠিত। তথায় সেতেলশরৎ ও গাঙ্গুড়েনদী আজও বর্তমান আছে। তথায় কোন বণিক বাস করেন। প্রবাদ—তথায় কোন বণিক বাস করিলে সর্পদষ্ট হইবে। জগমোহনরচিত মনসামঙ্গলের বর্ণনা পড়িলেও এই স্থানে চম্পাইনগর ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়*। [মনসা দেখ।]

চাঁদ-সাহেব, দক্ষিণাভ্যে ইনি হুসেন দোস্তখা নামে পরিচিত। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে দোস্তখা আলি আর্কটের নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হন। চাঁদ-সাহেব নবাবের একজন আত্মীয় ছিলেন। নবাব সিংহাসনে আরুঢ় হইলে পর তাঁহার এক কস্তার সহিত চাঁদসাহেবের বিবাহ হয়। আবার আর্কটের দেওয়ান গোলাম হুসেন চাঁদসাহেবের একটি কস্তাকে বিবাহ করেন। সুতরাং চাঁদসাহেব নবাবের জামাতা এবং দেওয়ানের স্বপুত্র হইলেন। এই দুইটি বৈবাহিক সূত্রে চাঁদসাহেব রাজ্যমধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। চাঁদসাহেবের অন্তঃকরণে উচ্চপদ লাভের আশা বলবর্তী ছিল। যাহারা এপ্রকার আশার বশবর্তী, তাঁহাদিগকে কুটিল পথ অবলম্বন করিতে হয়। চাঁদসাহেব তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানী কার্যে স্বপুত্রকে সাহায্য করিতেন। একদা তিনি স্বপুত্রের পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্তও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, কিছুদিন পরে, চাঁদসাহেবের উন্নতির পক্ষে আর একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। মহরার নায়করাজগণের রাজত্বকালে, রাণী মীণাক্ষীদেবী তাঁহার স্বামী বিজয়রাজ-চৌকনাথের পরলোক-

* “কটাকে গাঙ্গুড়েনদী পল্লব করিয়া।

বর্তমানে সওদাগর উত্তরিল গিয়া।” জগমোহনের মনসামঙ্গল।

গম্বজের পর, বঙ্গার তিরুমলের একটা পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু তিরুমলের তাহা মনঃপুত হইল না। তিনি নিজে সিংহাসন পাইবার জন্য রাণীর বিপক্ষে সমরযোষণা করিলেন। এই বিশ্রাবস্থায় রাণী আর্কটের নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সফদরআলি এবং চাঁদসাহেবকে সৈন্তে রাণীর সাহায্যে পাঠাইলেন। তিরুমল সফদরআলিকে হস্তগত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। তাহা দেখিয়া রাণী চাঁদসাহেবের শরণাগতা হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া এই নিষ্পত্তি করিলেন যে, তিনি রাজ্য নিকট করিয়া সৈন্যে আর্কটে প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু চাঁদসাহেবের অন্যপ্রকার অভিসন্ধি ছিল। তিনি ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন এবং মহারাজ্যে মহম্মদীর জয়গতাকা উড়াইলেন।

চাঁদসাহেবের এই কার্য্য সফদরআলির মনে ধরিল না। তিনি চাঁদসাহেবের উচ্চাশা বুঝিতে পারিলেন এবং যাহাতে তিনি অপদস্থ হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। একটা সুযোগও উপস্থিত হইল। এই সময়ে আর্কটের দেওরানের পদ খালি হইল এবং সফদরআলির শিক্ষক মীর আসদ্ সে পদ প্রাপ্ত হইলেন। সফদরআলি এখন বল পাইলেন, তিনি মীর আসদের সহিত একত্র হইয়া, চাঁদসাহেবের বিপক্ষে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি চাঁদসাহেবের বিপক্ষে অনেক কথা দোস্তআলির কর্ণগোচর করিলেন। নবাব চাঁদসাহেবকে ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদের কথা শুনিলেন না।

সফদরআলি এবং মীর আসদ্ তাহাতেও কান্দ হইলেন না। তাঁহার দোস্তআলির অজ্ঞাতসারে যড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহারাষ্ট্রদের সহিত একটা সন্ধি করিলেন, এই সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, মহারাষ্ট্রগণ চৌধ আদায় করিবার ছলনায় নবাবের অধিকার সকল আক্রমণ করিবে। তাহা দেখিয়া চাঁদসাহেব স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ত্রিচিনাপল্লী ছাড়িয়া নবাবের সাহায্যে আসিতে হইবে; এই সুযোগে মহারাষ্ট্রসৈন্য উক্ত নগর আক্রমণ করিবে। দোস্তআলি এই গুপ্ত অভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানিতেন না। মহারাষ্ট্রদের আক্রমণবার্তা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রয়ঃ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য পরাভূত হইল এবং তিনিও শত্রু কর্তৃক নিহত হইলেন।

কথায় বলে, পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। সফদরআলির তাহাই ঘটিল। এখন তাঁহাকে

মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে হইল। তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া মহারাষ্ট্রগণ চলিয়া গেল। তৎপরে সফদরআলি তাঁহার পিতৃপদ গ্রহণ জন্য আর্কটে গমন করিলেন এবং চাঁদসাহেব ত্রিচিনাপল্লীতে কিরিয়া আসিলেন। মহারাজ্য মুসলমানদের শাসনে আসিল দেখিয়া, তিরুমল মহারাষ্ট্রদিগের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। চাঁদসাহেব তাহা জানিতে পারিয়া, ত্রিচিনাপল্লীতে সৈন্যদিগের আহ্ব্যত্রব্যের বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু চাঁদসাহেব দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রসৈন্তগণ কর্ণাট ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে। তিনি সন্ধিত দ্রব্যাদি অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, রঘুনাথজি ভোন্সলে একদল বৃহৎ সৈন্যসহ মহারাজ্য আক্রমণ করিলেন। মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইল। চাঁদসাহেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রঘুনাথজি নগর অধিকার করিলেন এবং চাঁদসাহেবকে কারাবদ্ধ করিয়া সাতারায় লইয়া গেলেন। চাঁদসাহেবের জী এবং তাঁহার অন্যান্য পরিবারবর্গ ফরাসীপূর্ব মুসো ডুপ্লেয়ার তত্ত্বাবধানে পুন্দিচেরিতে রহিলেন। ভারতবর্ষে ফরাসী-আধিপত্য বিস্তৃত হয় ইহাই ডুপ্লেয়ার আন্তরিক অভিপ্রায়। তিনি চাঁদসাহেবকে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক বলিয়া জানিতেন। চাঁদ মুক্তিলাভ করিলে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের অনেক সুবিধা হইবে, ইহা তাঁহার প্রবিশ্বাস ছিল। ডুপ্লেয়ার জী দেশীয় ভাষা জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত চাঁদসাহেবের জীর কথোপকথন হইত। এই আলাপ অবশেষে বন্ধুত্ব পরিণত হইল। চাঁদসাহেবের জী তাঁহার স্বামীর মুক্তিলাভের কথা উত্থাপন করিলেন। ডুপ্লেয়ার জী একথা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন। ডুপ্লেয়ে ইহাতে সন্মত হইলেন। চাঁদসাহেবের জী জানিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র-কর্মচারীদিগকে কিছু টাকা দিলে তাঁহার স্বামীর মুক্তিলাভ হইতে পারিবে। ডুপ্লেয়ে এই টাকা প্রদান করিলেন। তদ্বারা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিলেন।

এই সময়ে চিত্তলহর্য এবং বেদনুরের রাজত্বের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। উভয়েই চাঁদসাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চিত্তলহর্যের রাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। চূর্ভাগের বিষয় যে, এই সময়ে তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। তিনি বন্দী হইয়া বেদনুরে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু অবশেষে মুক্তিলাভ করিলেন।

এই ঘটনায় চাঁদসাহেব হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে যে সমস্ত

বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহা হইতেই তাঁহার অভ্যুদয়ের সূত্রপাত। এই সময়ে আনওয়ারউদ্দীন আর্কটের নবাব ছিলেন। নিজাব তাঁহার প্রতি বিশেষ সদর ছিলেন বলিয়া তিনি এই পদরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নিজামের মৃত্যু হইলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মজঃফরজঙ্গ এই পদ পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই সুযোগে চাঁদসাহেব মজঃফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, এবং ডু'প্লে'র নিকট হইতে ফরাসীসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনওয়ারউদ্দীনের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। অম্বর নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আনওয়ারউদ্দীন পরাজিত এবং শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তৎপরে মজঃফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং চাঁদসাহেব আর্কটের নবাবের পদ পাইলেন।

এই সময়ে আর্কটের ধনাগার অর্থশূন্য হইরাছিল। চাঁদসাহেব অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তজ্জবুর আক্রমণ করিলেন। ভথাকার রাজা ভীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। তাহাতে চাঁদসাহেব ৭০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা লইয়া আর্কট অতিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, সুযোগ বুঝিয়া, নাসিরজঙ্গ তিনলক্ষ সৈন্য লইয়া আর্কট আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। মজঃফরজঙ্গ এবং চাঁদসাহেব এই সৈন্যাদিগকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্যম বিফল হইল। মজঃফরজঙ্গ নাসিরজঙ্গের শরণাপন্ন হইলেন এবং চাঁদসাহেব পলায়ন করিলেন। নাসিরজঙ্গ আর্কট অধিকার করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের সুবেদারপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কিছুকাল পরে, আর্কটে বিপ্লব উপস্থিত হইল। আনওয়ারউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলি ইংরাজদিগের সহায়ে, আর্কটের নবাবের পদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলি ইংরাজসৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইংরাজেরা সাহায্য করিলেন না। এই সংবাদ পাইয়া ডু'প্লে ফরাসীসৈন্য সহ চাঁদসাহেবকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। চাঁদসাহেব মহম্মদ আলিকে পরাভব এবং গিজি নামক কেল্লা অধিকার করিলেন। এই সকল ঘটনায় নাসিরজঙ্গ ভীত হইলেন। তিনি ডু'প্লে'র সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য বহুবান্ হইলেন। ডু'প্লেও তাঁহার অতিপ্রায় নাসিরজঙ্গকে জানাইলেন। নাসিরজঙ্গ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তৎসম্পাদনে কিছু বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ডু'প্লে যুদ্ধার্থ ফরাসীসৈন্য প্রেরণ করিলেন।

যুদ্ধের আরম্ভে ফু'প্লে'র নবাব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নাসিরজঙ্গকে বিমোহিত করিলেন।

তাঁহার পর ডু'প্লে দক্ষিণভারতের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি মজঃফরজঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার এবং চাঁদসাহেবকে আর্কটের নবাবের পদ প্রদান করিলেন।

আর্কটের নবাবের পদ পাইয়া চাঁদসাহেবের আশা মিটিল না। তিনি ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে নিজের এবং ডু'প্লে প্রেরিত সৈন্যদল লইয়া ত্রিচিনাপল্লী আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ক্লাইব ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝিয়া আর্কট আক্রমণ ও পরে অধিকার করিয়া লইলেন। চাঁদসাহেব তাহা অবগত হইয়া, রাজাসাহেবকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ক্লাইব কর্তৃক তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন।

এই সময়ে মেজর লরেন্স ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার অবর্তমানে ক্লাইব মাদ্রাজসৈন্যাদিগের উপর কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। এখন মেজর লরেন্স নিজকার্যের ভার ক্লাইবের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অল্পপরিচিকালে ক্লাইব যে কর্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিবার জন্য বহুপরিশ্রম করিলেন। তিনি প্রচুর সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। মহিম্বর এবং তজ্জোর হইতে মহম্মদ আলি কর্তৃক প্রেরিত মুসলমানসৈন্য এবং মুরারিয়ারের অধীনস্থ মহারাষ্ট্রসৈন্যগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এই সৈন্য লইয়া তিনি ত্রিচিনাপল্লী আক্রমণ করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসী-সেনানায়ক ল এবং চাঁদসাহেব শ্রীরঙ্গমের প্রাচীরবেষ্টিত দেবালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এখন চাঁদসাহেবকে হস্তগত করা লরেন্স সাহেবের উদ্দেশ্য হইল। তিনি তজ্জোরের সেনানায়ক মণিকজীর সহিত এসম্বন্ধে একটা অভিসন্ধি আঁটিলেন। মণিকজী চাঁদসাহেবকে যুক্তিলাভের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। চাঁদসাহেবের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, এদিকে লরেন্সসাহেব ল-সাহেবকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার অতিপ্রায় শীঘ্র প্রকাশ না করিলে তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে নিহত করিবেন। ল সাহেব অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন।

চাঁদসাহেবসম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, ইহা লইয়া ঘোর

আন্দোলন হইল, কিন্তু তৎপক্ষে কিছুই হির হইল না। এমন সময়ে, (১৭৫২ খৃষ্টাব্দে) মণিকজী চাঁদসাহেবকে নিহত করিলেন। সকল গোল মিটিয়া গেল।

চাঁদা (চন্দা) চিক্ কনিলময়ের শাসনকৃত মধ্যপ্রদেশান্তর্গত নাগপুর বিভাগের একটি জেলা। অক্ষা° ১৯° ৩১' হইতে ২০° ৫০' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫২' হইতে ৮০° ৫২' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আকৃতি ত্রিকোণাকার, উত্তরে বর্ধা, নাগপুর ও ভদ্রারা জেলা; পশ্চিমে বর্ধানদী এবং পূর্বদিক্বে বস্তারসী ও রাইপুর জেলা। পরিমাণকল ১০৭৫ বর্গমাইল; অধিবাসী সংখ্যা ৬৪২১৪৬।

চন্দা জেলার বর্ধানদীপ্রবাহিত পশ্চিমাংশ কেবল নিম্নভূমি, এতদ্ব্যতীত ইহার সমুদায় অংশই উত্তরদিক্বে বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণীতে আকীর্ণ। বেণগঙ্গা নদীর পূর্বদিকে পাহাড়শ্রেণীর উচ্চতাবৃদ্ধি হইয়াছে; এখানকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চ। বেণগঙ্গা, বর্ধা ও মহানদী নামক তিনটী প্রধান নদী এবং অন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ইহার মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বেণগঙ্গা ও বর্ধানদী সিওনী নামক স্থানে মিলিত হইয়া প্রাণহিতা নাম ধারণ করিয়াছে। গড়বোয়ী ও ব্রহ্মপুত্রী পরগণার অনেক স্থানে গিরি-নিঃসৃত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সকল পরস্পর মিলিত ও পথকৃত হইয়া ব্রহ্মপুত্রীতে পরিণত হইয়াছে। এ জেলার নদী বেষ্টী থাকার বৃক্ষাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; ইহার পশ্চিম সীমার ব্রহ্মপুত্রী বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ৩৩৬৮ বর্গমাইল জঙ্গল আছে, এতদ্ব্যতীত ১১৪ বর্গমাইল জঙ্গল অরক্ষণীয় ভাবে রহিয়াছে। দৃষ্টপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা মনোরম স্থান। তদুপর, মোম প্রভৃতি এবং প্রচুর লৌহখনির জন্ম এইস্থান বিখ্যাত। স্থানে স্থানে গিরিনির্গত নদীর বালুকরাশির মধ্যে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য পদার্থও পূর্বে পাওয়া যাইত, এখন আর দেখা যায় না।

মহারাত্রাজ্য সংস্থাপনের পূর্বে গোড়বংশীয় রাজগণ চন্দার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার নামমাত্র দিল্লীর সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কলে তাঁহাদিগের রাজত্বকালে চন্দার স্বাধীনতা বিস্তারিত করিতেছিল। তৎকালে তথাকার অধিবাসীগণ অসভ্য ও অশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল; দেশের অনেক জঙ্গল পরিকার করিয়াছিল এবং অনিষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল। গোড়রাজগণ কোন সময়ে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা

নিশ্চয় জানা যায় না; তবে সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে তৎবংশীয় বীরশাহী নামক নরপতির রাজত্বকালে কার্গাপেন নামক গোড়দিগের আরাধ্য প্রধান দেবতার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে চিত্রপ্রচলিত গোবধপ্রথা সমাক্রমে অভ্যহিত হইয়াছিল। [গোড় দেখ।] গোড়রাজবংশের শেষ নরপতির নাম নীলকান্তশাহী। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন; সুতরাং প্রজাপুঞ্জের নিকট তিনি স্বপাম্পদ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোন্সলে মহারাত্রী-সৈন্য লইয়া চন্দা আক্রমণ করিলে রাজপারিষদগণের বিশ্বাসঘাতকার বিনা যুদ্ধে চন্দারাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়; কিন্তু রঘুজী প্রথমতঃ গোড়রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু দুইবৎসর পরে নীলকান্তশাহীকে কারাকৃত করিয়া তিনি উক্ত রাজ্য সমাক্রমে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নীলকান্তশাহী কারাগারেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময় হইতে চন্দার ভোন্সেলবংশীয়গণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মহারাত্রীরাজাদিগের ক্রমাগত গৃহবিচ্ছেদ ও রাজপরিবর্তনে নীলকান্তশাহীর পুত্র সুযোগ পাইয়া গোড়সৈন্য সংগ্রহপূর্বক ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে পৈতৃক সিংহাসন পুনরধিকার করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার চেষ্টা কলবতী হয় নাই; তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও কারাকৃত হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ৬০০ টাকা হিসাবে মহারাত্রীরাজের বৃত্তিভোগী হন। যাহা হউক চন্দারাজ্যের স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবৃদ্ধিরও অবসান হইতে থাকে।

মহারাত্রীদিগের পর পিণ্ডারীগণ চন্দা আক্রমণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীগণ চন্দাজেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অধিকাংশ পল্লী উৎসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাদিগের অত্যাচারে শত শত পল্লী জনশূন্য হইয়াছিল। কথিত আছে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত জেলার অর্ধেক অধিবাসী বিনষ্ট হয়। এমন কি প্রাকারবেষ্টিতা চন্দানগরীর সুরমা হর্দ্যাসমূহের অর্ধেক ভূমিসাৎ হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাত্রীরাজের মৃত্যু হইলে তদীয় একমাত্র পুত্র পর্শোজী চন্দার সিংহাসনে অধিরোধন করেন। তিনি অন্ধ, খঞ্জ, অবশ্যাক ও নিরক্ষাধ ছিলেন; সুতরাং রাজকার্য্য মন্ত্রীদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মন্ত্রীগণের মধ্যেও পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। অবশেষে তিনি আপালাহেব নামক তাঁহার একজন জ্ঞাতী ভ্রাতার গুণ আদেশক্রমে নিদ্রিতাবস্থায় নিহত হন।

আপাসাহেব উত্তরাধিকারস্বত্বে নাগপুরে রাজত্ব ধারণ করেন, এবং ব্রীটিশ রাজকেশরীর সহিত নানা প্রকারে বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা করিয়া পরিশেষে ইংরাজরাজের শরণাপন্ন ও ব্রীটিশের সাহায্যে রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হন। কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ইংরাজসৈন্য পেশবার সহিত যোগদান করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগপুরের ইংরাজরেসিডেন্টের হস্তে বন্দী হন। তাঁহার মিত্র পেশবা বাজীরামও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে চন্দার নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরাজরেসিডেন্ট তাহা অবগত হইয়া সৈন্যপ্রেরণপূর্বক তাঁহার গতিরোধ করেন। ঐ অবস্থার ১৭ই এপ্রেল তারিখে বর্দ্ধানদীর পশ্চিমে পন্দরকাঁড় নামক স্থানে তিনি ইংরাজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং ২২শে মে তারিখে ইংরাজসৈন্য চন্দা অবরোধ করে ও উৎসন্ন করিয়া ফেলে।

আপাসাহেব ইংরাজরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। রঘুজী নামক একটি বালক তৎপরিবর্তে রাজ্যভার গ্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজরেসিডেন্ট তাঁহার নামে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। রেসিডেন্টের শাসনকালে গোঁড়জাতি পূর্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ দস্যুবৃত্তি হ্রাস এবং শিক্ষার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের শাসনভার রাজহস্তে অর্পিত হইলে দেশের নবোদ্বৃত্ত উন্নতির বিষয় হইতে লাগিল এবং দস্যুবৃত্তি পুনরায় দেশ মধ্যে দেখা দিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩য় রঘুজী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে চন্দা ও নাগপুরবিভাগের অপরাপর স্থান ব্রীটিশরাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং ব্রীটিশরাজসরকারের অধীনস্থ একজন কমিসনর দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে।

এখানকার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলময়। হায়দরাবাদ রাজ্যের অতি নিকট থাকায়, এ স্থানটির অধিবাসীগণও বিদ্রোহে যোগদান করিতে পারে এই ভাবিয়া সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে সাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসের পূর্ব পর্য্যন্ত কোনরূপ বিদ্রোহ লক্ষিত হয় নাই। পরে মোনাম্পলী-নিবাসী বাবুরাও নামক একজন সর্দার রাজগড় পরগণা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন এবং আপলী ও ঘট নামক স্থানের জমিদার বাবুটরায়ের সহিত মিলিত হন। উভয়ে বহুসংখ্যক রোহিলা ও গোঁড়সৈন্য সংগ্রহপূর্বক প্রকাণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২২শে এপ্রিল তারিখের যুদ্ধে গাটল্যাও ও হল সাহেব নিহত হন। পিটার

নামে এক কর্মচারী কোনরূপে পলায়ন করিয়া তৎকালীন ডেপুটি কমিসনর কাপ্তেন ক্রিকটন সাহেবের সহিত মিলিত হন এবং এদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে কাপ্তেন ক্রিকটনের একখানি পত্র লইয়া ইংরাজসরকারী লক্ষ্মীবাই নামক সন্ন্যাস হিন্দুমহিলার নিকট উপস্থিত হন। লক্ষ্মীবাই বাবুরাওকে ধরিয়া দেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ২১শে অক্টোবর, বাবুরাও চন্দানগরে নিহত হন। বাবুটরাও বস্তার নামক স্থানে পলায়ন করেন, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে ঐ রাজ্যের রাজা তাঁহাকে ধৃত করিয়া ইংরাজহস্তে অর্পণ করেন। ইংরাজকর্তৃপক্ষগণ তাঁহার অপরাধের জন্য চিরজীবন কারাবাসের আদেশ প্রদান ও তদীয় সম্পত্তি গ্রহণ করেন।

চন্দা জেলায় হিন্দু, কবীরপন্থী, সাতনামী, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও জৈনধর্মাবলম্বী লোকের বাস। এতদ্ভাতিত অনেক অনার্য্য আদিম অধিবাসীও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দা, বরোরা ও অর্মোরি এই তিন সহরে পাঁচ হাজারের অধিক লোকের বাস।

চন্দা জেলায় ভাওক, বিদ্যাবাসিনী, দেবালা, যুগু নামক মন্দিরগুলি বর্দ্ধানদীর গর্ভস্থ বজ্রালপুরের মন্দির, মার্কণ্ডী, নেদী, বতারা, ভাওক, বৈরাগড়, আঘণী, বাগনা এবং কেস্লাবরী নামক স্থানের প্রাচীন মন্দিরগুলি, চন্দার সমীপস্থ একখণ্ড প্রস্তরের স্তম্ভ, বৈরাগড় ও বজ্রালপুরের চূর্ণ, চন্দা নগরীর প্রাচীর, জল নিকাশন প্রণালী এবং গোঁড় রাজ-গণের সমাধিস্থান সকল এখানকার প্রাচীনকালের স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতদ্ভাতিত বর্দ্ধানদীর ভীষণ স্রোত, সিওরী নামক স্থানে বর্দ্ধা ও বেগমদা নদীর সঙ্গম, কেস্লাবরী নামক স্থানের নিকট রামদীঘি খাল, ডোমা নামক স্থানের নিকট পেজ্জাগড়-পাহাড়স্থ গুহা সকল ও মগড়াই প্রস্তর এবং নানাজাতীয় লৌহখনি, কয়লার ও প্রস্তর প্রভৃতির আকর দেখিতে অতি মনোরম ও দর্শনোপযোগী। চন্দা জেলার বাণিজ্য ব্যবসায় মন্দ নয়। বর্দ্ধা, নাগপুর, ভণ্ডারা ও রায়পুর প্রভৃতি জেলা এবং বস্তার, হায়দরাবাদ ও বেরার প্রভৃতি রাজ্যের সহিত এখানকার উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় হইয়া থাকে।

এখানে অনেক মেলা বসিয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রতিবর্ষে বৈশাখমাসে চন্দা নগরীতে এবং মাঘমাসে ভাওক নগরে যে দুইটা মেলা হইয়া থাকে, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল মেলাতে বহুদূর হইতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে এবং এই মেলায় দ্বারাই বাণিজ্য

ব্যবসা প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। মহারাষ্ট্ররাজগণের রাজত্বকালে এখানকার বাণিজ্যের দিন দিন হ্রাস হইতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ব্রীটশসিংহের করগত হওয়ার পর হইতেই বাণিজ্য ব্যবসারের পুনরুদ্ধার হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অল্পদিন মধ্যেই চন্দানগরী দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে এরূপ আশা করা যায়। কার্পাসবস্ত্র এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য, পূর্বে আরবদেশে পর্য্যন্ত ইহার রপ্তানি হইত; বর্তমান সময়েও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইহার প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে উত্তম রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার আবশ্রুত্ব সেরূপ দেখা যায় না। এখানকার তসর কাপড় অতি উত্তম। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার লোহের সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়।

২ উক্ত নামীর জেলার প্রধান নগর; অক্ষা° ১৯° ৫৬' ৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯° ২০' ৩০" পূঃ। এই নগরী সাড়ে পাঁচ মাইল প্রান্তর-পরিধি বিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাতে পাঁচটা প্রবেশদ্বার আছে। প্রাচীরপরিধির ভিতরে পল্লী, শতক্ষেত্র প্রভৃতি এবং বাহিরে উপনগর বিরাজমান। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ। পাণ, ইক্ষু এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কার্পাসবস্ত্র, রেশম, পিত্তলনির্মিত বাসন প্রভৃতিও এখানকার প্রধান শিল্পজাত। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য অতি প্রসিদ্ধ। প্রতি বৈশাখমাসে তিনসপ্তাহকাল মেলা হইয়া থাকে।

চন্দানগরীর দৃশ্য অতি চমৎকার; ইহার উত্তর ও পূর্বদিকে ঘন নিবিড় অরণ্য, দক্ষিণে মাণিক্যক নামক গিরিমালা এবং পশ্চিমে শতক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান সকল শোভা পাইতেছে। গোঁড়রাজাদিগের সমাধিস্থান, অচলেশ্বর, মহাকালী এবং মুরলীধরের মন্দির এখানকার পূর্বকীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, চন্দানগরী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খলফিয়া বজালশাহী নামক এক রাজা কর্তৃক নির্মিত হয়; কিন্তু দেশীয় ইতিহাস মতে ইনি অকুবর বাদশাহের সমসাময়িক বালাজী, বজালশাহী নামক রাজার উর্জ্বতন চতুর্থ পুরুষ। সুতরাং উক্ত ঐতিহাসিক মতামতসমূহের গণনা করিলে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে চন্দানগরী নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। চন্দা-নির্ম্মাণের পূর্বে উহার ৬ মাইল দক্ষিণে বর্দানদীর তীরস্থ বজালপুর নামক স্থান গোঁড়রাজগণের রাজধানী ছিল। চন্দা জেলার যে সকল গোঁড়রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ভীমবজাল

নির্ম্মিত প্রান্তরময় দুর্গ এবং রাজত্ববনের ভয়াবশেষ আজিও বজালপুরে দেখাযায়মান রহিয়াছে। ভীমবজাল চন্দানগরী প্রতিষ্ঠাতার উর্জ্বতন দশমপুরুষ; সুতরাং এতদমুসারে গণনা করিলে খৃঃ ১২০০ অব্দে চন্দার গোঁড়রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মণ্ডলবংশীয় গোঁড়রাজগণ ৪১৫ সন্থৎ অর্থাৎ ৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের অভ্যুদয় হইয়াছে বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজোপাধিধারণের সময় নিরূপণ করিতে গেলে ঠিক ঐ সময়ের সহিত মিল দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ কথিত আছে, তাঁহাদিগের আদিপুরুষ যাদবরাজ চেদিরাজ হৈহয় নামক নরপতির অধীনে কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা কোশলদেশের কলচুরি নামক রাজাদিগের অধীনে সামান্ত সর্দার মাত্র ছিলেন।

ভীমবজালের রাজত্বকালের পূর্বে চন্দার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানা যায় না। কিন্তু এখানকার মন্দিরাদি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে গোঁড়রাজগণের রাজত্বের পূর্বে ইহা একটা প্রধান রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহাই কৈলকিল যবনদিগের রাজধানী প্রাচীন বাকাটক নগর বলিয়া অনুমিত হয় এবং ভাণ্ডকের খোদিত প্রস্তর-পাঠে ইহাও জানা গিয়াছে যে এই নগরী একটা প্রধান রাজবংশের রাজধানী ছিল; এই বংশের চারিজন প্রসিদ্ধ নরপতি সূর্য্যযোষ, কুংস, উদয়ন এবং ভবদেব খৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর রুদ্রদেব ভিন্ন এই বংশীয় অপর কোন রাজার ইতিবৃত্ত জানা যায় না। বরজলে রুদ্রদেবের রাজধানী ছিল। তিনি ১১৬২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। আইন-অকুবরী পাঠে জানা যায় যে বেরাররাজ্যে গোঁড়বংশীয় বাবুজি নামক একজন জমিদার চন্দা নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং কলিঙ্গ-সরকারের ৮টা পরগণা চন্দার অন্তর্ভুক্ত হয়।

চাঁদা (চন্দা) অযোধ্যার অন্তর্গত সুলতানপুর জেলার একটা পরগণা। ইহা দক্ষিণে প্রতাপগড়জেলার অন্তর্গত পট্ট ও উত্তরে আলদিমৌ নামক পরগণাঘরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরিমাণ-কল ১৩০ বর্গমাইল। জোনপুর হইতে লক্ষৌ যাইবার পথ ইহার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহকালে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন তারিখে এই স্থানের নিকট ফ্রান্স সাহেব মহম্মদ হোসেন নাজিমকে পরাস্ত করেন।

চাঁদা (চন্দ্রাশকজ) ১ চন্দ্রাতপ, পাইল। ২ মাথট, মধুকরী বৃত্তি, অনেক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ। ৩ মৎস্ত-বিশেষ, চাঁদাকুড়া।

চাঁদাকুড়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রমৎস্য। চাঁদামাহ।
[চক্রক দেখ।]

চাঁদাফোটা (দেশজ) বাকড়ার ডিবাধার।

চাঁদী (দেশজ) ১ বচ্ছরোপা। ২ মাথার উপরিভাগ।

চাঁদুড়, ১ বেয়ার প্রদেশস্থ ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটি সহর। এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। ঐ হাটের সংলগ্নীত শুক সহরের উন্নতিকল্পেই ব্যয় করা হয়। এ স্থানটি স্ট্রেট-ইন্ডিয়ান পেমিন্‌গুলার রেলওয়ের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে চিকিৎসালয়, ডাকঘর, বিদ্যালয় এবং পুলিশখানার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২ উক্ত প্রদেশস্থ অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ইহাতে ২টি সহর ও ২২৬টি পল্লী আছে। অধিবাসী সংখ্যা ১৭১৬১১। এখানে প্রচুর পরিমাণে শাকক্ষেত্র রহিয়াছে; অধিবাসীগণ ঐ সকল শাকক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকানির্বাহ করে। এতদ্ব্যতীত পতিত জমিও যথেষ্ট। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় এবং পুলিশখানা আছে।

৩ উক্ত জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২০° ৪২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১' পূঃ। রেলওয়ে স্টেশন হইতে ১ মাইল অন্তরে অবস্থিত। স্টেশনের নিকট পাছশালা রহিয়াছে।

চাঁদুড়িয়া, বঙ্গদেশস্থ খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য-প্রধান পল্লী, ইছামতী নামক নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৪' ৪৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৫৬' ৪৫" পূঃ। এখানে একটি মিউনিপালিটি আছে।

চাঁপদানি, বঙ্গপ্রদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা বৈদ্যবাটার নিকটে হুগলীনদীর দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থানে দহাগণ বাস করিত এবং অধিবাসী ও পথিকদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে হত্যা করিত।

চাঁদোয়া (চত্ৰাতপ শব্দজ) চত্ৰাতপ।

চাঁপকলি (চম্পককলিকা শব্দজ) একপ্রকার কর্ণভরণ।

চাঁপা (চম্পক শব্দজ) ১ চম্পকপুষ্প। ২ উঠাইয়া দেওয়া।

চাঁপাকলা (চম্পককদলী শব্দজ) একপ্রকার কদলীফল।

চাঁপাগড়ি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

চাঁপানটিয়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রশাক।

চাক (চক্রশব্দজ) ১ মধুচক্র, ঘোচাক। ২ কুস্তকাবের চক্র।
৩ চক্র।

চাকখড়ি (দেশজ) খড়ির চাপ।

চাকচকা (চাকচিক্য শব্দজ) উজ্জলতা।

চাকচক্য (ক্ৰী) চক্-অচ্ চক্: প্রকারে বিহং চকচকন্ত
ভাবঃ চকচক-বাঞ্ছা। উজ্জলতা, চলিত কথায় চক্চক্।

"কাচাদিমোবদ্বিতলোচনস্ত পুরোবর্তিত্রযাসংযোগাদিনমা-
কারা চাকচক্যাকারা চ কাচিদন্তঃকরণবৃত্তিকদেতি।"

(বেদান্তপরিভাষা)

চাকচিক্য (ক্ৰী) চকচক-ভাবার্থে বাঞ্ছা পূর্বোদয়াদিভাং
সাধুঃ। উজ্জলতা, চাকচক্য। (শকার্ণচিঃ)

চাকচিচ্চা (ক্ৰী) চক্-অচ্ চক্: তং চিনোতি চি-ক্ৰিপ্
তথা সত্যী চীরতে চি-বাহলকাৎ ড। খেতবুলা। (রত্নমালা)

চাকদয়াল (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রশাকী।

চাকদুহ, হুগলী নদীতীরস্থ নদীরাঙ্গলাস্বর্গত একটি নগর। কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল অন্তরে পূর্ববঙ্গরেলওয়ের একটি স্টেশনের ধারে অবস্থিত। অধিবাসী সংখ্যা ৮৯৮৯। এখানে কোল্লি বিক্রয়ের জন্য একটি হাট বসে এবং নদীরাঙ্গলার উপর সমুদায় কোঠাই 'চাকদাপাট' নামে অভিহিত হইয়া ঐ হাট হইতে অন্তরানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে পবিত্রসলিলা ভাগীরথীসলিলে অবগাহন-মানসে পূর্ণাঙ্কল হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী সমাগত হয়। ইহার নিকটে ফুলিয়া নামক স্থানে শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের ও তদীয় সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়ায় মিলন উপলক্ষে উপরোধভঞ্জন নামে একটি বার্ষিক মেলা হয়। এই মেলা তিন দিবস থাকে, ইহাতে লাত আটহাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

চাকন (দেশজ) ১ আবাদন। ২ স্বাদপরীক্ষা।

চাকন, বোম্বাই প্রদেশস্থ একটি সহর। ইহা পুণানাসিক রাস্তার উপর ও পুণা হইতে ১৮ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এখানে একটি বৃক্ষতলে অতি প্রাচীনকালের একথও প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ প্রস্তরফলকের একপার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণদেবের প্রতিমূর্তি ও অপর পার্শ্বে একটি বৃষের আকৃতি খোদিত রহিয়াছে।

এখানে পুরাকালের একটি প্রসিদ্ধ চূর্ণ আছে। এই চূর্ণের চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মালিক্-উল্-তুজার নামক একজন বাক্সীবংশীয় সেনানায়ক ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন কর্তৃক কোঙ্কণচূর্ণ অধিকার করিতে আদিষ্ট হইয়া চাকন সহরে সেনানিবাস ও বাসস্থান নির্দেশ করেন, এবং সেই সময় হইতেই চাকনসহর প্রসিদ্ধি লাভ করে। মালিক্-উল্-তুজারের মৃত্যু হইলে চাকন নগরে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় ও উহা দক্ষিণাত্যবাসী সরদারগণের হস্তগত হয়। পরে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চাকনের সেনানায়ক জৈন্-উদ্দীন বিজোহী হইলে

সিদ্ধান্ত-উল্ল-মূলক নামক বাকী নদী তাঁহার পুত্র মালিক আকন্দকে চাকন অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু জৈনউদ্দীন বিজাপুরমহলের বাহা পাওয়ার আশ্রয় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বাহা হউক সেই বৎসর মালিক আকন্দ বরং বাকীমহলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, চাকন-সৈন্যমাল্যক জৈনউদ্দীন উক্ত রাজার সহায়তা করেন; মালিক আকন্দ এক্ষণে তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন কর্ত্ত বিশেষ চেষ্টা পান, কিন্তু বিকল মনোরথ হইয়া একদিন রজনীতে অকস্মাৎ সৈন্যসামন্তসহ চাকনাতিস্থে গমন করেন এবং ১৭ জন সহরে সঙ্গে প্রাচীর উন্নয়ন করিয়া চাকনসৈন্তের বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া দেন। সেই যুদ্ধে জৈনউদ্দীন প্রাণত্যাগ করেন। সৈন্যধ্যক্ষের মৃত্যুতে সৈন্তেরা হতাশ হইয়া বিপকের শরণাগত হয়। তদবধি চাকন মালিক আকন্দের বংশধর-গণের অধিকারভুক্ত থাকে। পরে ঐ বংশীয় আকন্দনগর-রাজ বাহাদুর ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে পুণাজেলার অপরায়ণ কএকটি স্থানের সহিত চাকনসহর শিবজীর পিতামহ মালোজী তোনুস্লেখে প্রদান করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে শিবজী মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে সৈন্যধ্যক্ষ সারেন্তা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন ও চাকনদুর্গ অবরোধ করেন। তৎকালে চাকন কিরলজী নামক সৈন্যধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছিল। দুর্গরক্ষার্থ কিরলজী যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়া পরিশেষে শত্রুকরে বন্দী হন। চাকনদুর্গ মোগলদিগের করগত হয়। সারেন্তা খাঁ কিরলজীকে অতি লম্বা সময়ের সহিত শিবজীর নিকট প্রেরণ করেন। শিবজী কিরলজীর অতুল সাহস ও বীর্যের পরিচয় পাইয়া পুস্তকায় প্রদান করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সারেন্তা খাঁ কর্ত্তক চাকনদুর্গের জীর্ণ সংস্কার হয়। পরে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সহিত শিবজীর লঙ্ঘন হইলে, মোগলসম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি ও পুণা প্রভৃতি স্থানের সহিত চাকন প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও মহারাত্রদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ডিকন সাহেব চাকনদুর্গ অবরোধ ও এখানকার সৈন্য-দিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে এক বৃহৎ হাট বসে।

চাকনিয়া (দেশজ) যে স্বাদ পরীক্ষা করে।

চাকন্দা (চক্রমর্দ শব্দজ) [চক্রমর্দ দেখ।]

চাকভারুই (দেশজ) একপ্রকার ছাতার পাখী।

চাকভ্রমী (চক্রভ্রমী শব্দজ) ১ চক্রের ভ্রমণ। ২ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ।

চাকর (পারসী) ১ ভৃত্য, কর্মচারী। (চীন 'চা'+সংস্কৃত 'কর') ২ যে চা প্রস্তুত করে।

চাকরা (চাকর শব্দজ) দাঁসঘের পারিভোষিক স্বরূপ যে ভূমি দান করা হয়।

চাকরাণী (পারসীজ) দাসী।

চাকরান্না (দেশজ) ভৃত্যের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত ভূসম্পত্তি।

চাকরী (পারসী) দাসঘ, পরের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া কাজ করা।

চাকলতোড় (চাকুলতোড়), মানভূম জেলার একটা গ্রাম।

এই গ্রাম পুন্ডলিয়ার দক্ষিণ। অক্ষা° ২০° ১৪' উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৬° ২৪' পূঃ। এখানে বৎসর বৎসর ছাতা-পরবের সময় একটা মেলা হয়। এই মেলা প্রায় একমাস থাকে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, শোহাগড়াগা, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক দোকানদার নানাবিধ দ্রব্যজাত লইয়া জন্মবিক্রয়াদির জন্য এখানে আশ্রয়ন করে। পিতলের বাসন ও শজাতরপ বহুপরিমাণে বিক্রয় হয়।

চাকলা (চক্রল শব্দজ) কএকটি পরগণার সমষ্টিকে চাকলা কহে। [চকলা দেখ।]

চাকলাদার (পারসী) চাকলার অধিপতি, যাহার উপরে একটা চাকলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হয়।

চাকশূল (চক্রশূল শব্দজ) একপ্রকার ঔষধের গাছ।

চাকা (চক্র শব্দজ) রথাক, চক্র।

চাকাদানী (পারসী মিশ্র) একপ্রকার ঔষধের গাছ।

চাকাবালিয়া (দেশজ) একপ্রকার বালিয়া মাছ।

চাকী (দেশজ) ১ জাঁতা। ২ গোলাকার ছোট টেকু।

চাকী, পূজাবের গুরুদাসপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটা নদী। ইহা ডালহাউলী স্বাস্থ্যনিবাসের সমীপস্থ গিরিমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া কিয়দূর পর্যন্ত ঐ জেলার পূর্বসীমা স্বরূপ প্রবাহিত হইয়াছে এবং পরে পার্বত্য-প্রদেশস্থ পরোপ্রগালী ও চম্বাগিরিনিঃসৃত উপনদীর সহিত মিলিত ও কিয়দূর প্রবাহিত হইয়া পাঠানকোটের দুই মাইল দক্ষিণে দুইটা শাখার বিভক্ত হইয়াছে। ইহার একটা শাখা দক্ষিণবাহিনী হইয়া মীরথল নামক স্থানের নিকট বিপাশা নদীতে পতিত হইতেছে। অপরটা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া ইরাবতী নদীর সহিত মিলিত হইতেছিল, কিন্তু বারিদোয়াব খাল কর্ত্তক প্রতিহত হইয়া পরিশেষে বিপাশা নদীতে পতিত হইয়াছে।

চাকু (পারসী) ছুরি। [চাকী দেখ।]

চাকুন্দা (দেশজ) ১ একপ্রকার শাক, অনেকে 'চাকুন্দা' হলে চাকুন্দাও ব্যবহার করে। ২ একপ্রকার লাটানাহ।

চাকুলিয়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রগাছ, ইহাকে চাকুল্যা বলে। (Hemionitis carotifolia.)

চাক্চিক্য (চাক্চক্য শব্দজ) উজ্জলতা, দীপ্তি।

চাক্চিক্নী, দীপ্তি, উজ্জল্য।

চাক্চি (চক্ শব্দজ) ১ কোন গোলাকার পদার্থ। ২ গোলাকার ও চেন্টাভাবে প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্য।

চাক্চ (ত্রি) চক্রেণ নিবৃত্তং চক্-অণ্। ১ যাহা চক্চারা উৎপন্ন হইয়াছে।

“চাক্চমৌসলমিত্যেব সংগ্রামং রণবৃত্তঃ।” (হরিবং ১০০ অঃ)

চাক্চবর্ণ্যণ (পুং) চক্চবর্ণ্যণোহপত্যং চক্চবর্ণ্যন্-অণ্ টিলোপঃ।

চক্চবর্ণ্যার পুত্র, ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন।

পানিনি ইহার মত উল্লেখ করিয়াছেন। (ঈতচাক্চবর্ণ্যণশ্চ। পা ৬।১।১৩০।)

চাক্চবাক্যেয় (ত্রি) চক্চবাক্যসখ্যাদি চাতুর্যধিক চক্চ।

চক্চবাক্যের নিকটবর্তী দেশাদি।

চাক্চায়ণ (পুং) চক্চয় গোত্রাপত্যং চক্চ-ফঞ্ (অখানিত্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) চক্চ নামক ঋষির বংশধর। ছান্দোগ্য

উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। (ছান্দোগ্য ১।১০।১)

চাক্চিক (ত্রি) চক্রেণ সমূহেন যন্ত্রবিশেষণ বা চরতি চক্চ-ঠক্

(চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ ঘাটিক, যাহারা অনেকে মিলিত

হইয়া কোন ব্যক্তির স্তুতি পাঠ করে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মতে ইহাদের অন্নভোজন নিষিদ্ধ।

“পিতৃনামৃতিনোষ্টৈব তথা চাক্চিকবন্ধিনাম্।

এষামন্নং ন ভোক্যং সোমবিজ্ঞপ্তত্বা।” (যাজ্ঞ ১।১৬৫)

২ তৈলকার, কলু। (হেম) ৩ শাকটিক, গাড়োয়ান।

“ভিক্ষুকাংশাক্চিকাংশৈব স্ত্রীষোয়তান্ কুশীলবান্।

বাহ্যান্ কুর্য্যায়রশ্রেষ্ঠোমোষায়তেম্ম্যরত্বা।”

(ভারত ১৩।৬৯ অঃ)

৪ চক্চিশ্রী, যে চাক্চবুরার, কুস্তকার। (বৃহৎসংহিতা ১০।১২)

৫ সহচর, অসুচর।

“তদাশ্রজাঃ কপে তস্মিন্গহনদ্রোহচাক্চিকাঃ।” (রাজ-

তরঙ্গিনী ৫।২৫৭।) (ত্রি) ৬ চক্চাকার। ৭ চক্চ সম্বন্ধীয়।

৮ কোন চক্চ বা সম্বন্ধসম্বন্ধীয়।

চাক্চিকা (স্ত্রী) একপ্রকার পুষ্প।

চাক্চিক (পুং) চক্চিকোহপত্যং চক্চিন্ অণ্ টিলোপাভাঃ

(সংযোগাদিচ্। পা ৬।৪।১৩৬) চক্চীর পুত্র। [চক্চিন্ দেখ।]

চাক্চিক্রেয় (ত্রি) চক্চসখ্যাদি চাতুর্যধিক-চক্চ। চক্চের

নিকটবর্তী দেশাদি।

চাক্ষুষ (স্ত্রী) চক্ষুযা নিবৃত্তং চক্ষুন্-অণ্ (তেন নিবৃত্তং। পা

৫।১।৭২) ১ প্রত্যক্ষবিশেষ, দর্শনেজ্জিরদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে।

ভাষ্যপরিচ্ছেদের মতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষু। ভিন্ন

ভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করিতে ইহার ব্যাপারভেদ হইয়া থাকে।

ত্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ব্যাপার সংযোগ, এইরূপ ত্রব্য

সমবেত রূপাদি পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ব্যাপার সংযুক্ত

সমবার এবং ত্রব্যসমবেত পদার্থের (গুণাদি জাতির)

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ব্যাপার সংযুক্ত সমবেত সমবার। (ভাষ্যপরিঃ)

চক্ষুযা গৃহ্যতে চক্ষুন্-অণ্। ২ চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপাদি। (ত্রি)

চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপাদিযুক্ত।

(পুং) ৪ বর্ষ ময়ূ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে ইনি পূর্ণ

জন্মে ত্রক্ষার চক্ষু হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তাই এই জন্মেও

ইহার নাম চাক্ষুষ হইয়াছে।

“অন্ত জন্মনি জাতোহসৌ চক্ষুষঃ পরমেষ্টিনঃ।

চাক্ষুষমতত্তত্ত জন্মজন্মনিপি বিজ।” (মার্কণ্ডেয় ৭।৬।২)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার উপাখ্যানটী এইরূপ লিখিত

আছে যে, রাজর্ষি অনমিত্রের মহিষী ভদ্রার গর্ভে সর্প জন্মলক্ষণ-

সম্পন্ন একটি পুত্র জন্মে। পুত্রের রূপ ও জন্মলক্ষণ দেখিয়া

পিতামাতার আনন্দের অবধি থাকিল না। মহিষী ভদ্রা

বালকটিকে কোলে লইয়া আশ্বাস করিতে লাগিলেন।

সহসা বালক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। জননী বালকের

অকারণ হাসি দেখিয়া সন্নিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“বৎস! তোমার হাসির কারণ কি! আমার কোলে

উঠিতে ভয় হইতেছে অথবা তুমি কোন আশ্চর্য ঘটনা দর্শন

করিতেছ?” বালক ধীরে ধীরে বলিল, “জননি! ঐ

দেখুন, একটি মার্জারী আমাকে খাইবার জন্ত চেষ্টা করি-

তেছে, আবার জাতহারিণীও লুকাইয়া হইয়া আমাকে লইয়া

যাইবার উদ্যোগে আছে। জগতের সকলই স্বার্থপর।

আপনি মনে করিতেছেন যে, কালে দিনে আমি আপনার

উপকার করিব। কিন্তু সে কল্পনা মিথ্যা। আমি ৫;৭ দিনের

বেশী আপনার নিকটে থাকিতে পাইব না। তথাপি না

জানিয়া আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাত

বৎস প্রভৃতি মিথ্যা নামে আমাকে সম্বোধন করিতেছেন

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি হাসিয়াছি।” অস্তিনব

বালকের এই সকল কথা শুনিয়া ভদ্রার প্রাণে আঘাত

লাগিল, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

সেই দিন বিক্রান্ত রাজার মহিষীও একটি পুত্র প্রসব করিয়া-

ছিলেন। জাতহারিণী ঐ বালকটিকে লইয়া তাহার

লগ্নায় রাখিল এবং তাহার পুত্রটিকে অপর একস্থানে

লইয়া গেল। মহিষী নিমিত্তা, তিনি ইহার কিছুই জানিলেন

না। তাহাকেই পুত্রের জায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিক্রান্ত পুত্রের নাম আনন্দ রাখিলেন।

রাজকুমার আনন্দ ক্রমে সর্কশাস্ত্রপারদর্শী হইয়া পিতামাতার ঘরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বধা সময়ে আনন্দের উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর আচার্য্য তাহাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন, “বৎস! প্রথমে জননীর পূজা করিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর।” আনন্দ গুরুর এইরূপ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “গুরো! আমি কাহাকে পূজা করি, যিনি জননী তাঁহার পূজা করিব না, যিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহার পূজা করিতে হইবে?” আচার্য্য বলিলেন, “কেন বৎস! তোমার জননী বিক্রান্তরাজমহিষী হেলিনী, তুমি ইহারই পূজা কর।”

আনন্দ উত্তর করিলেন, “না, ইনি আমার জননী নন, ইহার পুত্রের নাম চৈত্র, সে বিশালগ্রামে বোধবিগ্নের ঘরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার জননীর নাম ভদ্রা।” তৎপরে আনন্দের মুখ হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আনন্দ রাজা ও রাণীকে প্রবোধ বাক্যে সাধনা করিয়া তপস্তায় নিরত হইলেন। আনন্দের তপস্তার সন্ধান হইয়া ত্রুকা তাঁহাকে মনু করিলেন। ইনিই চাক্ষুয মনু নামে বিখ্যাত। রাজা উগ্রের কন্যা বিদর্ভার পাণিগ্রহণ করেন। এই মনুষ্যের সুরগণের নাম আৰ্য্য, তাঁহাদের পাঁচটি গণ ছিল। দেবগণের মধ্যে যিনি শতযজ্ঞের অঙ্কুঠান করিতে পারিতেন, তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করা হইত। চাক্ষুয মনুষ্যের মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। সুরেধা, বিরজা, হবিরান, উরত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। উরু, পুরু ও শতছায় প্রভৃতি মনুর পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৭৬ অঃ) ভাগবতের মতে চাক্ষুয মনু বিশ্বকর্মার পুত্র। (ভাগবত ৯।৩।১৫) ইহার মাতার নাম আকৃতি ও পত্নীর নাম নম্বলা। পুরু, কৃৎস, অমৃত, ছ্যামান, সত্যবান, বৃত, অগ্নিটোম, অতিরাজ, প্রোছায়, শিবি ও উল্লুক ইহারা মনুর পুত্র। এই মনুষ্যের ইন্দ্রের নাম মনুক্রম। (ভাগবত)

মন্তপুত্রাণের মতে নড়ুলার গর্ভে উরু, পুরু, শতছায়, তপস্বী, সত্যভাবী, হবিঃ অগ্নিষ্টুং, অতিরাজ, সুরায়, অপরাজিত ও অতিমহা এই কর্ণটি পুত্র জন্মে।

৪ ঝায়ভুব মনুর পুত্র। ৫ কক্ষুয় একপুত্র ও সত্যানরের ভ্রাতা। (হরিবংশ ৩১ অঃ)

৬ রিপুয় পুত্র, ইহার মাতার নাম বৃহতী। ইহার ঔরসে ও অরণ্য প্রজাপতির কন্যা বীরণীগর্ভে মনুর উৎপত্তি হয়। (হরিবংশ ২ অঃ)

৭ খনিজের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম বিবিশ্বতি।

৮ চতুর্দশ মনুষ্যের একটি দেবগণ।

“চাক্ষুষাশ্চ পবিজ্ঞাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাতৃধা।” (বিক্রপুঃ ৩২ অঃ)

৯ ৬ষ্ঠ মনুষ্যের।

“চাক্ষুষেভ্যস্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গেকালবিক্রতে।” (ভাগঃ ৫।৩০।৪৯)

১০ পিতৃভেদ। “সুর্যমংচাক্ষুষঃ।” (অথর্ববেদ ১৪।৭।৭)

চাক্ষুষভূ (স্রী) চাক্ষুষ ভাবার্থে-য। চাক্ষুষের বর্ধ।

চাক্ষুষ (ত্রি) চন্দ্র-বাহুলকাৎ ম পৃষোদরাদিহাৎ সাধু। ঔষ্টা,

যে দর্শন করে। “চাক্ষুষো যথাচৈত্বে ভরতে মতী।” (শক্ ২।২৪।৯)

‘চাক্ষুষঃ সর্বত্ৰ ঔষ্টা’ (সারণ)।

চাঞ্চী (দেশজ) স্থানবিশেষে কলানবুর নাম।

চাগন (দেশজ) ১ রোগের উদ্রেক। ২ উৎসাহে জাগরণ।

চাগান (দেশজ) ১ উত্তোলন। ২ উত্তেজন।

চাক্স (পুং) চীরতে ড চমকৎ যত বহতী। ১ চাক্সেরী। (রায়বৃক্ট) ২ দস্তগটুতা। (শকাধীচিঃ)

চাক্সা (চক শকজ) নীরোগ, সবল।

চাক্সারী (দেশজ) বংশ শলাকা দ্বারা মিশ্রিত পাত্রবিশেষ।

চাক্সেরী (স্ত্রী) চাক্স ঈয়তি চাক্স-ঈয় অণ্ উপপদসং গৌরাদিহাৎ ঙীষ্। অন্নলোলিকা, আমরুল। (অমর ২।৪।১৫০।)

ইহার গুণ—দীপন, রুচিকর, লঘু, উষ্ণ, কফ ও বাত-নাশক, অন্নরস, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং গ্রহণী, অর্শ ও কৃষ্ঠনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চাক্সেরীমুত (স্রী) চাক্সেরীয়া পকং স্নাতং মধ্যালোঃ। ঔষধঘৃত-বিশেষ। নাগর (ভৃষ্ঠ), পিঙ্গলীমূল, চিত্তে, গজপিপূল, গোক্ষুর, পিপূল, ধনে, বিব, আকনারি ও যমানী এই সকলের কক ও চাক্সেরীরসে স্নতপাক করিবে। ইহা সেকনে অর্শ, গ্রহণী, মুত্রক্কু, প্রবাহিকা ও গুদব্রংশরোগের প্রতীকার হয়। (চক্রদত্ত)

চাচকপুর, জোনপুর জেলার একটি গ্রাম। ঝনঝারি মসজিদের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। ইব্রাহিম শাহ ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন। এখানে হিন্দুরাজ জয়চন্দ্র নির্মিত একটি হিন্দুদেবালয় ছিল।

চাচপুট (পুং) তালবিশেষ। বধাক্রমে গুরু, লঘু ও ম্লুত থাকিলে তাহাকে চাচপুট বলে।

“গুরুলঘুঃ ম্লুতশ্চৈব তবৈচাচপুটাত্তিঃ।” (সঙ্গীতদামোদরঃ)

চাচলি (ত্রি) চল-যজ্জলুগন্ত কি। ১ অতিশয় চঞ্চল। ২ বক্রগামী।

চাচা (হিন্দীজ) পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য, খুড়া।

চাচাত (চাচাশব্দজ) পিতৃব্যসম্বন্ধীয়।

চাচাতবহিন্ (হিন্দী) পিতৃব্যের কন্যা।

চাচাতভাই, পিতৃব্যের পুত্র।

চাচিক্সদেব, গুজরাটের অন্তর্গত পাবকগড়ের একজন রাজা।
প্রসিদ্ধ চৌহানপতি পৃথ্বীরাজের বংশে ইহার জন্ম। ইহার
পিতার নাম ত্রীচাক্সদেব।

চাচী (হিন্দী) চাচার স্ত্রী, পিতৃব্যপত্নী।

চাচুকী (দেশজ) ১ অস্থায়ী। ২ কোন লোকের উপর নির্ভর।

চাচ্চা (চাচা শব্দজ) চাচা, পিতৃব্য।

চাঞ্চল, মালদহের অন্তর্গত একটা বৃহৎ জমিদারী।

চাঞ্চল্য (স্ত্রী) চঞ্চলতা ভাব: চঞ্চল-বাঞ্ছ। চঞ্চলতা, অস্থিরতা।

“চাঞ্চল্যবহিতা লক্ষ্মী: পুত্রপৌত্রাবমিহিহিরা:।” (জগন্মলকবচ)

চাচি (পুং) চাচাতে ভিদ্ভাতে যন্মাং। চট-অপ্। ১ বিশ্বাস-
যাতক চোর, যে ব্যক্তি প্রথমে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে ধনাদি
অপহরণ করে।

“চাটতরুরত্নম্ মহালাহলিকাদিভিঃ।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

‘চাটা: প্রতারকা: বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরতি।’

(মিতাক্ষরা আচার্য্যার)

(দেশজ) ২ মুখরোচক খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

চাটকায়ন (পুং) চটকয়া গোত্রাপত্যং চটক-কক্ (নভাদিত্যঃ
কক্। পা ৪।১।২২) চটকের গোত্রাপত্য, চটকবংশধর।

চাটকৈর (পুং) চটকারঃ পুংপত্যং চটকা-এরক্ (চটকার
এরক্। পা ৪।১।২৮) চটকার পুং অপত্য, চড়াই ছানা।
বার্ত্তিককারের মতে চটক শব্দের উত্তরও এরক্ প্রত্যয়
হইয়া থাকে। (চটকসোতি বাচ্যং। বার্ত্তিক)

চাটগাঁ (চটগ্রাম) বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটা
জেলা। অক্ষাঃ ২০° ৪৫' হইতে ২২° ৫০' উঃ এবং
দ্রাঘিঃ ৯১° ৩০' হইতে ৯২° ২৫' পূঃ। পরিমাণ কল ২৫৬৭
বর্গমাইল। ইহার উত্তরপশ্চিমে ফেণীনদী, দক্ষিণে নাকুনদী,
পূর্বে চটগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশ ও আরাকান এবং পশ্চিমে
বঙ্গোপসাগর।

এই জেলার সমুদ্রতীরভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬৫ মাইল
এবং প্রস্থে প্রায় ১৫ মাইল। কর্ণফুলী ও সঙ্গু ইহার প্রধান
নদী। কর্ণফুলী উত্তরপূর্বস্থ পার্বত্যপ্রদেশ হইতে উদ্ভূত
হইয়া চটগ্রামের মধ্য দিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী
হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। চটগ্রামসহর ও
তন্মাক বন্দর এই নদীতীরে অবস্থিত। হলদা এই নদীর
প্রধান উপনদী। সঙ্গুনদী আরাকানের পার্বত্যপ্রদেশের
দক্ষিণপূর্বদিক হইতে নির্গত ও এই জেলার মধ্য দিয়া
প্রবাহিত হইয়া অবশেষে কর্ণফুলীনদীর দশ মাইল দক্ষিণে
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। দোলাইহার প্রধান উপনদী।

এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল এখানে অনেক
রহিয়াছে। ফেণীনদী যদিও ইহার উত্তরপশ্চিম দিগা
প্রবাহিত হইয়া ইহার সীমানির্ধারণ ও ইহাকে নোয়াখালি
জেলা হইতে পৃথক্ করিতেছে, তথাপি উহা এই জেলার
নদীমধ্যে পরিগণিত নহে। কারণ ইহা কোন স্থানেই
এই জেলার অন্তর্গত ভূমিস্পর্শ করে নাই।

এই জেলার অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ নিম্নভূমি সকল রক্ষার্থ
বড় বড় বাঁধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কুতবদিয়া নামক বীপের
বাঁধগুলি এবং গণ্ডামারা পল্লীরক্ষার জন্য নির্মিত গণ্ডামারা
নামক বাঁধই প্রসিদ্ধ। এখানে সীতাকুণ্ড, গোলিয়াসী, সাত-
কানিয়া, মাসখাল এবং তেকুনাফ নামক পাঁচটা পাহাড়
আছে। সীতাকুণ্ডপাহাড়ের শৃঙ্গের নাম চন্দ্রনাথ বা সীতাকুণ্ড;
ইহা হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান; বহদুর দ্রাঘন্তর হইতে
নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। ইহার
উচ্চতা ১১৫৫ ফিট, এখানে ইহার ন্যায় উচ্চশৃঙ্গ আর দৃষ্ট
হয় না। [সীতাকুণ্ড দেখ।]

চটগ্রামে হ্রদ নাই। গমনাগমনের সুবিধার জন্য
এখানে অনেকগুলি খাল খনন করা হইয়াছে। ঐ সকল
খাল বড় বড় নদীর সহিত সম্মিলিত। অধিবাসীগণ এই সকল
খালের সাহায্যে শস্য, কার্পাস, আলু, ইক্ষু, শুষ্ক মংস্ত
প্রভৃতির বিনিময় করিয়া জীবিকানির্ভর করে। এখান-
কার অনেক লোকই মৎস্যের ব্যবসার জীবন বাপন
করে। খনিজ পদার্থ বড় পাওয়া যায় না। সীতাকুণ্ডের
উচ্চপ্রস্রবণ ব্যতীত উহার ৩ মাইল উত্তরে লবণাক নামক
লবণাশ্রম আর একটা প্রস্রবণ আছে; ইহাও হিন্দুদিগের
পবিত্র তীর্থ এবং বহদুর দেশ হইতে এখানেও অনেক
যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বাঈ, হস্তী, বন্যশূকর, হরিণ প্রভৃতি এখানকার আরণ্য
জন্তু। ব্রহ্ম ও চীনদেশের সহিত এখানকার বাণিজ্য
চলিয়া থাকে।

চটগ্রাম পূর্বে বঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দুরাজের এবং আরাকানের
বৌদ্ধরাজগণের অধীন ছিল। প্রবাদ আছে,—
খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে শেখোক্ত বৌদ্ধরাজ বঙ্গ আক্রমণ
করিয়া বর্ত্তমান চটগ্রামে এক জয়ন্তস্ত স্থাপন করেন। সেই
অবধি ব্রহ্মবাসীরা বিজেতার দৃষ্টান্তে “চিং-ত-গৌং” অর্থাৎ
‘যুদ্ধ করা অনার’ এই নাম প্রদান করেন (১)। সেই “চিং-
ত-গৌং” হইতে দেশীয়েরা চটগ্রাম বা চটল নাম দিয়াছে।

(১) Anderson's Archaeological Catalogue of Indian
Museum, vol. II, p. 162.

দেশাবলী নামক সংকৃত ভূগোলের মতে চন্দ্রনাথ হইতে ভূবণা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিস্তৃত ছিল। মুসলমানদিগের করগত হইবার পূর্বে এখানে পুন্ড্র পুনঃ রাজশরিবর্তন ঘটে এবং ইহা বঙ্গ ও ত্র্যম্বেক মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ার ইহার সীমাসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিপুরারাজ্যের হিন্দুরাজের সহিত আরাকানের বৌদ্ধরাজগণের ক্রমাগত বিবাদ চলিতে থাকে। পরে বঙ্গদেশে আকগান্দিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইলে ইহা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। পর্তুগীজ ইতিহাস লেখক কেব্রিরা ডি-জুয়া লিখিয়াছেন যে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ার তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি বাঙ্গালার আকগানরাজের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন; রাজদূত চট্টগ্রামে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজধানী গৌড়নগরে গমন করেন, কিন্তু গৌড়রাজ পর্তুগীজদিগের উপর দলিহান হইয়া জাহাজের অপরায়ণ লোকের সহিত দৌত্যকার্যে নিযুক্ত তের জন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া গোড়ে রাখেন। পর্তুগীজেরা এই ঘটনার কয়েক মাস পরে চট্টগ্রাম ভ্রমসাৎ করিয়া এই অপরায়ণের প্রতিশোধ লয়। খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল ও আকগান্দিগের মধ্যে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ জুবোণ পাইয়া চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়া লয়ন এবং বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলদিগের অধিকারভুক্ত হইলেও তাহাদিগের লক্ষ্যে পতিত না হওয়ার চট্টগ্রাম আরাকান-রাজেরই রাজ্যভূগত থাকে। পরে অক্‌বর বাদশাহের রাজস্বমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট টোডরমল উহার বার্ষিক ২৮৫৬০৭ টাকা রাজস্ব স্থির করিয়া তাঁহার সেরেস্তার শোভাবর্দ্ধন করেন, ঐ রাজস্বের করদ্রব্যও রাজকোষে জমা হয় নাই; বাস্তবিক আরাকানরাজই উহার প্রকৃত রাজা ছিলেন।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মটুকরার (মুটুকরার) নামক একজন মগ-সরদার আরাকানরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ চট্টগ্রাম শাসন করিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু ঘটনাক্রমে স্বীয় প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া উঠেন এবং পাছে প্রভু কর্তৃক শাস্তি ভোগ করিতে হয় এই ভয়ে বাঙ্গালার মোগলরাজপ্রতিনিধির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে নামস্বাজ উক্ত দেশ-প্রদানপূর্বক তাঁহার প্রজা হইয়া বাস করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাহাতেও আরাকানদিগের দৌরাত্ম্য শান্ত হইল না; বরং এত বুদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহাদিগের অভ্যাচারে কোন কোন স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িল।

১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তৎকালীন মোগল-শাসন-কর্তা স্যারেন্টার্ন চট্টগ্রামে আরাকানরাজের অভ্যাচার নিবা-

রণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া হুসেনবেগ নামক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কতকগুলি সৈন্য জলপথে ও কতক সৈন্য তাঁহার পুত্র উমেদখাঁর অধীনে হুলপথে প্রেরণ করেন। উমেদখাঁ আরাকানসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া চট্টগ্রাম পুনরধিকার করেন, তদবধি চট্টগ্রাম মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত ও চট্টগ্রাম নামের পরিবর্তে “ইসলামাবাদ” নামে অভিহিত হয়।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মনোমালিন্য সংঘটিত হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ নিকলসন সাহেব চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া তথার ইংরাজ-দুর্গসংস্থাপনের জন্য প্রেরিত হন, কিন্তু হুগলীতে ইংরাজ-পক্ষের হ্রস্টনা স্মরণ করিয়া তিনি একাধো প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন নাই। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। পরে আরাকানরাজ ত্রক্ষরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, ত্রক্ষরাজের অত্যাচারে প্রলীড়িত হইয়া বহুসংখ্যক মগ চট্টগ্রামে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই ত্রক্ষরাজের অপ্রত্যক্ষ কারণ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার দেশীয় পদাতিক সৈন্যগণও বিদ্রোহী হয় এবং শান্তিরক্ষক-দিসকে বিনাশ করিয়া ত্রিপুরাভিমুখে গমন করে, কিন্তু ত্রিপুরারাজ ও তথাকার পার্শ্বভাষাভি সকল তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন।

চট্টগ্রাম জেলার নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রসিদ্ধ—চট্টগ্রাম নগর, কক্সবাজার, কটকচরী, কুমিরিয়া, হাটহাজারী, রাঙাবান, পাতিয়া, সাতকানিয়া, চন্দ্রনাথ, মাস্থাল, চকরিয়া এবং রমু। রমুর দক্ষিণদিকে রাজাকুল নামক স্থানে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

চট্টগ্রামে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী লোকের বসবাস আছে।

বাণিজ্য বিষয়ে চট্টগ্রাম একটা প্রসিদ্ধ স্থান। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, দক্ষিণ শাহাবাজপুর এবং হাটীরা শরণীণ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে তুণলের আমদানী হয় এবং “চাটগাঁর চাউল” নামে বিখ্যাত হইয়া বণিকগণ কর্তৃক দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত হয়। চা এখানে উৎপন্ন হয় ও এখান হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়। বোরাডোম, ত্রিপুরাবাজার, কাসলং, পোরাংহাট, মাণিকঘাট প্রভৃতি কার্পাস বিক্রয়ের স্থান। এখানকার কার্পাস চুই প্রকার। ফুলহুতা ও বেগীহুতা; ফুলহুতা খেতবর্ণ ও উৎকৃষ্ট, বেগীহুতা ধূসরবর্ণ। এখানকার পুরুত হইতে সংগৃহীত কাঠ অপরদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

* পাজের শকে মহাসিংহপুরে চাটোবর অবস্থিত বিখিত হইয়াছে,
তাহা ঠিক নহে।

চাটেশ্বরের সেবার্থ অনেক দেবোত্তর ছিল, কিন্তু সেবকেরা তাহা ক্রমে ক্রমে হস্তান্তর করিয়া কেলিয়াছে। এখন সেবা-পূজারও আর পূর্ববৎ আড়ম্বর নাই। এখন সেবার্থ ১০০০ বিঘা ভূমি ও ৩০০ তরণ খাজ বন্দোবস্ত আছে। শিব-রাত্রি ও কাঙ্ক্ষিকমাসের শুরু চতুর্দশীর দিন এখানে বহলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

উক্ত গ্রামে চাটেশ্বরের উত্তরপার্শ্বে কৃষ্ণরাধিকা ও পার্শ্বতীর মন্দির আছে, কিন্তু সেগুলি দেখিলেই নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। চাটেশ্বর তেমন আধুনিক নহে, উড়িষ্যার অপরাপর স্থানে খ্রীষ্টীয় ষাটশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছে, চাটেশ্বর দেখিলেই ঐ সকল মন্দিরের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটী সমস্তই বউলমালা পাথরে নির্মিত; ইহার গাত্রে মল্লশিল্প-নৈপুণ্য নাই, তবে পূর্বে যেরূপ দেখিতে সুন্দর ও শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত বোধ হইত, এখন সে সৌন্দর্য্য ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এই সমুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তর অঙ্ককরময় বোধ হয়। সেবকদিগের অযত্নে এই সুন্দর দেবালয়মধ্যে শত শত বাহুড়ের বাস হইয়াছে। গর্ভগৃহের ভিতর এক খাত কাটা আছে, তন্মধ্যেই লিঙ্গ সর্বদাই জলময় থাকেন, মধ্যে মধ্যে পরোপলক্ষে বাহির হন।

এই চাটেশ্বরের মন্দিরে উৎকলরাজ (২য়) অনলভীমের প্রশস্তি-বর্ণিত একখানি খোদিত শিলাকলক দৃষ্ট হয় (১)।

চাটেশ্বরের উৎপত্তি সন্ধে এইরূপ গ্রন্থাদ আছে—

এখন যে মন্দিরে চাটেশ্বর আছেন, সেখানে একটা সরোবর ছিল। তাহার অনতিদূরে এক গুরুমহাশয় “চাট-শালী” (পাঠশালা) করিয়া ছাত্রবৃন্দকে অধ্যয়ন করাই-তেন। দেব দেব মহাদেবও চাটবেশে * সেই গুরুমহাশয়ের

* উড়িষ্যার চাট শব্দে শিবা বা ছাত্রকে বুঝায়।

(১) চাটেশ্বরের এই প্রশস্তির এতিলিপি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, অথবা ইহার বিষয় কোন রাজকীয় অথবা সাধারণ পত্রিকার বিবৃত না হওয়ার আবশ্যক বোধে ইহার পরিচয় দিতেছি।

গত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই নবেম্বর তারিখে বেলা ৪।০ সময় আমরা চাটেশ্বর দর্শনে গিয়াছিলাম। আমাদের প্রস্তাবমত মন্দিরের সেবকগণ ঐ বৃহৎ শিলাকলক মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মুখশালীর মধ্যে স্থাপন করেন। তখন ক্রমেই সন্ধ্যার অঙ্ককর দেখা দিতে ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি ঐ শিলাকলকের অবিকল প্রতিকৃতি উঠাইয়া লই। শিলা-কলকখানি দৈর্ঘ্যে ৩২ ১/২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২২ ইঞ্চি। ইহার অক্ষরগুলি প্রাচীন বঙ্গীয় নাগরাকারে লিখিত। এই অক্ষরের সহিত ক্রমেণের মন্দিরে উৎকীর্ণ উদ্যোতকেশরীর শিলালিপি সহিত কতকটা সোসাদৃশ্য আছে। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol, VII. Plate XXIV. দেখ)

চাটেশ্বর-প্রস্ততির অক্ষর ৬ ইঞ্চি করিয়া বড়। নিয়ে উক্ত প্রশস্তির সমুদয় এতিলিপি পঞ্জিক্রমে উদ্ধৃত হইল—

- ১ ও নমঃ শিবায়। স যশ্চিদৈবমাতঃ স্রতি জনকজ্যোত্সলিতঃ বনতঃ শ্রীকান্তঃ স্রতি গৃহজামাতৃগবীর্বঃ। হরতাত্তম্যহৃদয়ননমহুত্বব্যবিত বনুধন্যসত্রঃ সৌরঙ্গরতি স্রি-
- ২ তানেকহৃদগঃ। তস্মাদভূষিতমরাদধানঃ কলানিধিক্ষণিগোচমান্যঃ যমগরামাস তপাহুসারগ্রেমমারিষ কুটুপুসারিঃ। তপাস্তপাভূবুর্কিস্তমরসমরোদকশান্ত্যাবীর্ষ্যাজ্যো-
- ৩ তিষ্ঠালাবলীতপ্রতিষ্টকরটিহাননানপ্রবাহঃ। যোবাশীলপ্রবাহঃ প্রতিপদমদরংবৎ নীসঙ্গসৌখ্যপ্রোচ্ছং কলরতিজলবিত্তানিলীলারিতানি। তেবাৎশেপদদযশসা
- ৪ ধোড়গন্ধীকৌল্যরাজবাৎসরহরিতনোজ্যোতিরিবিবুভব। দমোদারবিগমননদীতীর্থনস্তানিনাঃ যরিত্রিশেন প্রতিপুতরঃ আপিতামোক্ষলক্ষীম্। ধর্ম্মঃ করণবে
- কলিতবানুগ্রাগেব বৈ-
- ৫ রিশ্রিয়ঃ স্রোমর্দুতরজিতেনমনসানিত্রিঃশরনীতঃ। চক্রে বৈরিত্বজ্ঞানন্তনতীর্থোমুখ্যুস্তাঃপুরঃপশ্চাদ্ধরগঙ্গাসিদ্ধুরমদপ্রলম্বিগুহলী। বৎকলোতিতমঙলাত্রুটিলিটোপক্ষ-
- ৬ রংসাপদৈর্ঘ্যপ্রকরপ্রহারতরলৈঃশতাবিধিঃ পার্থিবৈঃ। চণ্ডাপোদিবিমণ্ডলাত্রিপলং নির্ভিত্যতম্মহান্য মনো নিবৃতিগবিতৈরমুহুতৈর্নির্বাপীসীমারঃ। আসীং
- সুহরনগভীমুগ-
- ৭ তিঃপুণ্যাতপজাততানম্পৃষ্টকলিকালকশবমসীকলোলালীলারিতৈঃ। কোরমরকলাপদমর্দকরিবুংবিহার্যুনাশ্রদ্ধামেকপদেনুপেকলরতাস্রাজ্যামাসানিতম্। বৈরংক্রতি
- ৮ তরণবীভরুপান্তমানোগোবিন্দইত্যাজনিবংসকুলেধিজেল্লঃ। রাজঃকএবমহিমাবদস্যানেনসাত্রাজ্যভারবহনে বিদধেধরীনঃ। সেবানতপ্রতিমহীপতিকেশপাশলৈবালব্রলিখ-
- ৯ রে নবরাজঃসাঃ। বৎপাদগজগৃহাশ্রয়িঃ পুণ্ডিত রাজেন্দ্রইত্যাজনি তেন ভক্তকিতীঃ। যজ্ঞহংসী তমনদভীমুগভিত্তপ্রতাপানলজালাসঃবলিতৈঃ সুবর্ষশিখরীযাত্রিবতঃ
- ১০ যদি। আদ্যৈরনমহর্নিশং যদি বনামুক্তি ধারোৎকরানাশাঃ পুরিত্ত্বং তথাপি বিজরীয়দনকলিক্রমঃ। তৈলোক্যং বিমলীকরোতিবলিতৎকীর্তীমুখা বর্কনীকঠেচৎবিলুষ্ঠিত
- ১১ তদন্তপিতরোথিঙমৌক্তিকানাঃ প্রজঃ। যৎপাদাজনধন্যভিবাতিকরৈতু বাধিবিধ্বাতুং প্রতীকিতিপালভালকলকে কঃ পটব্রহ্মহঃ। তত্ৰাথ কিতিপালভালবড়তীত্রিভাণু-
- ১২ পাদানুলেখিতুর্কুরিবাগঃ কলিতবানু সারিচবাম্যাহুতম্। খেতচ্ছত্রশতানি যত যশসা নির্ধার্য কিংক্রমে সাত্রাজ্যত্রিকলিলাবনুপতেরকীতপকীকৃতম্। যেযাতাঃ শরণং
- ১৩ রগাপশ্রমসুহৃদগুণত্রাঃ পুরো যৈ বী হৃদমদোবিলাসরসিকৈরংখাতথজোঃস্থিতম্। আশ্রয়্য বদমীষেরেগ ন চিরাদাসাধা বিকোঃ পদঃ শ্রান্তা নির্ভরনিবৃতিপ্রয়িতাঃ প্র-
- ১৪ তার্থিনঃ পার্থিবঃ। বিজ্ঞানেরবিসীমভীমতটিনীকুলে তটেন্তোনিধে বিকৃবিকুরনাবাবিত্তরাজৈতলিখঃ পততঃ। সাত্রাজ্যং সপরিশ্রমেণ ন তথা বৈধাননানামিহঃ বিশ্বঃ
- ১৫ বিশ্বময়ঃ যথাপরিগতঃ তুগাপপুণীপতেঃ। কঠোস্তানিতসারকস্য হুতটানেকাকিনো নিদ্রতঃ ক্রিজো যবনাবনীলুসমরে তন্তুত বীরব্রতম্। যত্নালোকনকৌতুক্যাসনি-
- ১৬ নাং যোমাজনে কাকিনামগদৈরনিসিহুস্তিত্তরজুজৈরৈহাংসবঃ। সাহস্রাঃশরিতঃ ক্ষুরস্ত হরমঃ খেলভিবিদগুপ্তাঃ প্রোচ্ছিতঃ পাথিপুত্রীকপটলৈর্কচক্রমা-
- ১৭ ক্রমাতৈঃ। সযাসঃকটেকু্যোনিবু পদস্তাসঃকুলস্তাত্তাম্বদ্ব্যবজন কাচিহুৎকলপতেঃসাত্রাজ্যলক্ষীকৃতিঃ। আপীষ্টঃকুরকিরথবঃশোভেভৎকিরংবদিকচক্রকির-
- ১৮ দেতদেগকলয় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডকিরং। আশ্রয়তনোতি যত্রচরণংব্রহ্মমাসোদেতযত্রপ্রজাতিযত্রাবিনসতিযচ্ছলমেতদ্বশঃ। তপনতনয়মেভ্যাদন্তেবতঃসমিতুলিবঃ কুবলয়কুল-
- ১৯ কঠোস্তানেন বিজিত হুতবঃ। বিচকিলবনোৎসঙ্গেকু্যো বিদ্যালিনঃ শ্বানঃ জগতিজনিভবেতাবেতদদ্যাবশোভরিঃ। অনেন পুরুষোত্তমুগুণিগীষু বারাগ্রিভেদটীষুভিত্তাস্তলাপু
- ২০ ত্বহেমভূমীভূতঃ। বিলাসবসনীতঃ কলরতাবলারিতনা শ্চীবদনবারিজেরতলিতাম্র লোলঃ দৃশঃ। পছানঃ সরসঃশটৈস্তত্তইতন্তেনাভিত্যবস্ত্রোমরোজ্যাজরগ-
- ২১ ত্ত্বহরশরশ্রবণেশোমঃ। অন্তঃসৌরতসারশীকরময়ৈঃপাখেরজ্যৈরমীমলঃমলমুত্তজন্তপথিকানাভোবিবেলানিলাঃ। আবীকিকীকুটিলৈমকতংকটাকৈরজ্যজীবননতাম-
- ২২ রমঃ চূচুঃ। বৈরঃ বদীয় জগরে বিজহারবার্তাঃ বঃ দণ্ডনীতিরিশির্মিতরমালিলিঙ্গঃ। উদগ্রদোবাদপথপ্রবর্তনখলকাতীনিজ্রতিসুখিবিজ্রৈঃ। চকার তত্র প্রতিপত্তিসম্প-
- ২৩ দাম্পত্যঃ পুণ্যপানি পুনর্বানি যঃ। কনককলসভারঃ ভারামাস ভাষানজরজনিজানিফাটিকঃ পূর্ণকৃতঃ। ধরজপটচট্টলীর্ধ্ব চ যোমগজা বিরচিত্তমুদনঃ ধাম-
- ২৪ কামাতকতঃ। ত্রিভুবনভরশাণ্ডিকৃত্তমেকার্ণবজলজরমিব যাবৎ কুরুতে পর্কতক্রোঃ। সদনমিদমুদকং রেণপুঞ্জপ্রতিষ্ঠামিহ কলরতু তাদ্রদীয়তাক প্রশস্তিঃ। লোক-
- ২৫ চন্দ্রদিশনমতি যশোবদীরঃ বিদ্যাকচুদ্দিন তুপ্যতি যত বুদ্ধিঃ। মন্তরগাণ্যি চতুদ্দিন যত স্তুতিনানিমতি স কবিঃ কিল ভাষ্যোক্তাঃ। . .

নিকট পড়িতে আসিতেন। সকল ছাত্রকেই বেতনের জন্ত শিক্ষককে তাগাদা করিতে হইত, কিন্তু চাটরূপধারী তাগাদা না করিতেই বেতন দিয়া যাইতেন। গুরুমহাশয় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কখনও পরিচয় দিতেন না। গুরুমহাশয়ের মনে ক্রমেই সন্দেহ হইতে লাগিল। একদিন চাট পাঠশালা হইতে বাইবার সময় গুরুমহাশয় তাঁহার অনুশরণ করিলেন। পথে বাইতে বাইতে দেখিলেন—চাট সেই সরোবরে ঝাঁপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেইদিন রাত্রিকালে গুরুমহাশয়কে স্বপ্নাদেশ হইল যে, “আমি নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত চাটবেশে তোমার নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলাম। অতঃপর আমার নাম চাটেশ্বর বলিয়া প্রচার করিও।” সেই ঘটনার পর অনেক লোক আসিয়া এখানে অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমে এই স্থানমাহাত্ম্য উৎকলরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই সরোবর ত্যাগ করিয়া তাহার উপর একটা স্থান মন্দির নির্মাণ করিয়া বর্তমান চাটেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন ও তাঁহার সেবার জন্ত বিস্তর সম্পত্তি দান করিলেন।

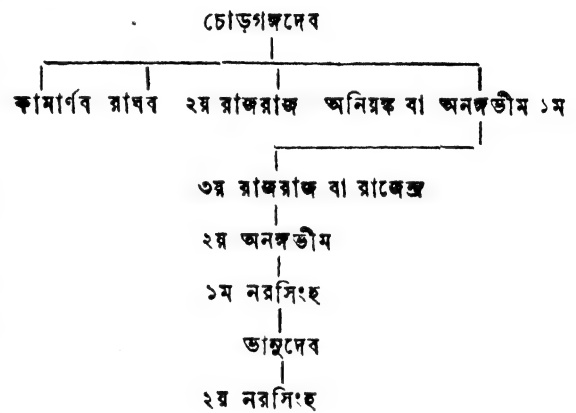
উৎকলরাজ ২য় নরসিংহদেবের প্রদত্ত তাম্রফলকে চোড়গঙ্গ হইতে ২য় অনঙ্গভীম পর্যন্ত যেক্রপ বংশাবলী আছে, চাটেশ্বরের শিলাফলকেও সেইরূপ। গাঙ্গেয় শব্দ উৎকলের গাঙ্গেয়রাজগণের তালিকায় মুদ্রাকরের সাজাইবার দোষে, (২য়) রাজরাজ ও অনিয়কভীম রাবের পুত্ররূপে বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক রাজরাজ ও অনিয়ক বা অনঙ্গভীম চোড়গঙ্গের পুত্র। [গাঙ্গেয় শব্দ ৩১৯ পৃষ্ঠা দেখ।] যখন গাঙ্গেয় শব্দ লেখা হয়, তখন চাটেশ্বরের উক্ত শিলাফলকের সমস্ত পাঠোদ্ধার করিতে সময় হয় নাই, সুতরাং শিলাফলক সম্বন্ধে তখন বাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সব ঠিক নহে। এখন উক্ত শিলালিপির সমস্ত পাঠোদ্ধার হওয়ার অনেক নূতন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

গাঙ্গেয় শব্দে ৩১৮ পৃষ্ঠার অনঙ্গভীম ও অনিয়কভীম দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ২য় নরসিংহদেবের তাম্রফলক অনুসারে অনিয়কভীমের পুত্রের নাম রাজরাজ (৩য়)। এক্ষণে চাটেশ্বরের শিলালিপিপাঠে জানা বাইতেছে যে, চোড়গঙ্গের অনঙ্গভীম নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ অনঙ্গভীমের বংশগোষ্ঠীর গোবিন্দ নামে এক বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং রাজেন্দ্র নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ রাজেন্দ্র হইতে ত্রিকলিঙ্গনাথ (২য়) অনঙ্গভীম জন্ম পরিগ্রহ করেন।

এই (২য়) অনঙ্গভীমের প্রধান মন্ত্রীর নাম বিষ্ণু। এই

বিষ্ণুর প্রবল প্রভাবে বহুতর স্ববনরাজ্য অনঙ্গভীমের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং তুঘাণ (২) নৃপতি তাঁহার ভয়ে সশঙ্কিত হইতেন। [প্রতিলিপি ৪, ৬, ৯, ১২, ১৫ পঙ্ক্তি দেখ।]

উক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ২য় নরসিংহের তাম্রফলক বর্ণিত অনিয়কভীম ও চাটেশ্বর শিলালিপির চোড়গঙ্গপুত্র অনঙ্গভীম উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ ৩য় রাজরাজ ও রাজেন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে চাটেশ্বরলিপি ও ২য় নরসিংহের তাম্রফলক অনুসারে নিঃসন্দেহে উৎকলের গাঙ্গেয়রাজগণের বংশতালিকা এইরূপে অঙ্কিত হইতে পারে—



গাঙ্গেয় শব্দে লিখিত হইয়াছে যে ১ম অনঙ্গভীম অনেক পুরাতন কীর্তি সংকলন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চাটেশ্বর শিলালিপি ২৩শ পঙ্ক্তি পাঠে জানা যাইতেছে যে ১ম অনঙ্গভীম নহে, ২য় অনঙ্গভীমই এই কার্য করিয়াছিলেন এবং তিনিই এই কামার্বকের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, বাহা এক্ষণে চাটেশ্বর নামে বিখ্যাত। [গাঙ্গেয় শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চাড়া (দেশজ) ১ উৎকটেজা, একান্ত অভিশ্রাব। ২ ক্ষিপ্রতা।

৩ প্রয়োজন। ৪ এক পাকে যে খাদ্য রাখা হয়।

চাড়াচট, গুজরাটের পালনপুর এজেন্সীর অন্তর্গত একটা জমিদারী। সচরাচর সন্তানপুরের সহিত সন্তানপুরচাড়াচট নামে আখ্যাত। উভয়ের পরিমাণকল ৪৪০ বর্গমাইল। চাড়াচটে ১১টা গ্রাম আছে। এখানকার রাজগণ ঝরিরাজপুত-

(২) গাঙ্গেয় শব্দে লিখিত হইয়াছে, মহারাজ অনঙ্গভীমের পুত্র (১ম) নরসিংহ রাট ও বরেন্দ্র আক্রমণ করিয়া তুঙ্গল-ই তুগান্ধাকে পরাস্ত করেন। বোধ হয়, এই তুগান্ধাই চাটেশ্বরের শিলাফলকে তুঘাণ নৃপতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই যুদ্ধে বিষ্ণুসাহাই প্রধান সেনাপতিরূপে সৈন্তপরিচালনা করিয়া থাকিবেন।

কুলোত্তর। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ইহার তালুকদার শ্রেণীভুক্ত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২১এ জুলাই ইংরাজ গবর্নমেন্টের সহিত তালুকদারের বন্দোবস্ত হয়।

ইহার ভূমি সমতল ও জলশালি শূন্য। যুক্তিকা কোথাও কর্দমময়, কোথাও বালুকাময়, কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ। ইহার অধিকাংশ জমীই এক কস্‌লা। এখানে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হয়। এখানে নদী প্রভৃতি অধিক নাই, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ অনেক পুকুরি আছে। বৈশাখমাস পর্যন্ত তাহাতে জল থাকে, তৎপরে অধিবাসীদিগকে কৃপ আশ্রয় করিতে হয়। এখানে ৫ হইতে ২০ কিলোমিটার মধ্যে গর্ত করিলেই জল পাওয়া যায়।

চাড়া (দেশজ) ১ যুক্তিকানির্মিত পাত্রাদির তয়াংশ। ২ ক্ষুদ্র গাছ। ৩ উচ্চ। ৪ অবলম্বন বা ঠেস।

চাঁগ (চিল শব্দজ) জল মধ্যে মৎস্যের উল্লাস।

চাঁগক (পুং স্ত্রী) চাঁগক্য ছাত্রঃ চাঁগক্য-অণু যন্ত লোপঃ। ১ চাঁগক্যের ছাত্র। ২ কম্পাস (Compasses)

চাঁগক, ইহার অপর নাম বারাকপুর। এই নগরটি ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা হইতে ৭৪০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৫' ৪০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৩' ৫২" পূঃ। ইহার নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত। এখানে একটি সেনানিবাস আছে, এই জন্য ইংরাজেরা ইহার নাম বারাকপুর রাখিয়াছে। এখানে ই বি টেট রেলওয়ের একটি স্টেশন হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, জবচাঁগক এই স্থান সংস্থাপন করেন। তাহার নামের অপভ্রংশে চাঁগক নাম হইয়াছে। কিন্তু কর্ণেল ইউল (Yule) সাহেব প্রাচীন পত্রাদি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই প্রবাদটির মধ্যে কোন সত্য নাই। চাঁগক সাহেবের জন্মগ্রহণের বহুপূর্বে এই স্থানটি আচাঁগক বা চাঁগক নামে অভিহিত হইত। ইহার লোকসংখ্যা ৩৫৬৪৭, তন্মধ্যে ২৬১৫৭ হিন্দু, ৮৫১২ মুসলমান এবং ২৭৮ অন্যান্য জাতি। সেনানিবাসের দক্ষিণদিকে একটি মনোহর উদ্যান আছে, তাহা বারাকপুরপার্ক নামে অভিহিত। ইহার ভিতরে একটি উৎকৃষ্ট প্রাসাদ আছে। ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল লর্ডমিণ্টো সাহেবের সময়ে তাহা নির্মিত হয় এবং পরে মার-কুইন্স অব হেষ্টিংস ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করেন। অবকাশ পাইলে বড়লাট চিত্তবিনোদনার্থ বারাকপুরে আসিয়া এই গৃহে অবস্থিতি করেন। এই উদ্যানটির মধ্যে লেডি ক্যানিংয়ের কবর আছে। এখানে তিনবার সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছিল। প্রথমবার ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। ব্রজবৃদ্ধের সময়ে ৪৭ সংখ্যক বঙ্গ-পদাতিক বৃদ্ধের জন্য সমুদ্রপথে বাইতে অস্বীকার করে এবং বলে যে বিগুণ ভাতা না পাইলে তাহার

পদব্রজে বাইতে প্রস্তুত নহে। দ্বিতীয়বার, উক্ত বৎসরের শেষভাগে আর একদল সিপাহী বুদ্ধব্রাজ্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহার বুদ্ধাজ্ঞা পরিভ্যাগ করিয়া নদী অভিমুখে গমন করিলে পর ইংরাজসৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কতকগুলিকে গুলিবারা বধ করে। কতকগুলি ফাঁসি কাঠে ঝুলিল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে গিয়া জলমগ্ন হইল। তৃতীয়, বা শেষ বিগ্রহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঘটয়াছিল। এই বৎসরের প্রারম্ভে হিন্দু সিপাহীদিগের মধ্যে একটি কথা উঠিল যে, বন্দুকের টোটার গোবর চর্খি দিয়া ইংরাজগণ তাহাদিগকে খুঁটানু করিবার জন্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন। এ কথা যে অমূলক তাহা বুঝাইবার জন্ত সেনাধ্যক্ষগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে এই বিদ্রোহী সিপাহীগণ গৃহে অগ্নি দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে মঙ্গলপাঁড়ে নামক একটি সিপাহী একজন সেনাধ্যক্ষের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। পরে মঙ্গলপাঁড়ে ও সেই দলের অধ্যক্ষের ফাঁসি হয়। [বারাকপুর দেখ।]

চাঁগকীন (স্ত্রী) চাঁগকানাং ভবনং ক্ষেত্রং চণক-খণ্ড (খাণ্ডানাং ভবনে ক্ষেত্রে। পা ৫।২।১) চণকের উৎপত্তিযোগ্য ক্ষেত্র।

চাঁগক্য (পুং) চণক্য মূনে গোত্রাপত্যং চণক-গর্গাদি-যণ্ড। একজন সুপ্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ মূনি। ইহার বিরচিত নীতিশাস্ত্র অদ্যাপিও ভারতের ঘরে ঘরে জাজ্জল্যমান। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে চাঁগক্য নাম দেখিয়া ইহাকে চণক মূনির পুত্র বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন; কিন্তু পাণিনির ৫।২।১ সূত্রানুসারে চণকের বংশোৎপন্ন যে কোন ব্যক্তিকেই চাঁগক্য বলা বাইতে পারে। মুদ্রারাক্ষস পাঠে জানা যায় যে ইহার আসল নাম বিষ্ণুশূন্য। ত্রিকাংশে কৌটিল্য, ত্রোমিণ ও অংগুল এই দুইটি নাম আছে। এ ছাড়া পক্ষিগণী, মল্লনাগ, বাংস্তায়ন প্রভৃতি নামান্তর দৃষ্ট হয়।

কামন্দকনীতির টীকাকার 'কৌটিল্য' নামের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—'কুটো ঘটন্তুঃ ধাতুপূর্ণং লাভি সংগৃহীতি ইতি কুটলাঃ কুস্তীধাত্তা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেবাং গোত্রাপত্যং কৌটিল্যো বিষ্ণুশূন্যো নাম।' 'কুট' অর্থাৎ ধাতুপূর্ণ কুস্ত বাঁহারা সঞ্চয় করেন, তাহাদিগকে 'কুটল' বলে। 'কুটল' শব্দের অপর পর্যায় 'কুস্তীধাত্ত'। বাঁহারা একবৎসরের জীবিকার উপযোগী ধাতাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাৎশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ 'কুটল' বা 'কুস্তীধাত্ত' বলিয়া অভিহিত। চাঁগক্যের পূর্বপুরুষেরা ঐরূপ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া চাঁগক্যের

নাম ‘কৌটিল্য’ হইয়াছে। অবশ্য কাহারও মতে তিনি কুটিল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া ‘কৌটিল্য’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইজন্য অধ্যাপক উইলসন (Professor Wilson) সাহেব ইহাকে Machiavelli of India বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ “নীতিশাস্ত্র”-প্রণেতা কাম্বলক চাণক্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

চাণক্য কোন সময়ে প্রাজ্ঞত্ব হইয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে সংবদ্ধ বলিয়া ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বেই তাঁহার আবির্ভাবের সময় নিরূপিত হইয়াছে।

ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার বাল্যজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে নানান্যাত্র অধ্যয়ন করিয়া তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর নীর্ব্যতান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৈলঙ্গ অক্ষরে লিখিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—একদিন চাণক্য ক্ষুধার্ত হইয়া নন্দের তোক্তাধারে প্রবেশ করিলেন ও প্রধান আসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। নব নন্দ তাঁহাকে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া সেই সিংহাসন হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাতে অনেক আপত্তি করেন, কিন্তু নন্দরাজগণ উহাতে কর্ণপাত না করিয়া রোমভরে চাণক্যকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন। চাণক্য তখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শিখা ধুলিয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, “যতদিন না নন্দবংশের উচ্ছেদ হইবে, ততদিন আমি আর এ শিখা বন্ধন করিব না।” এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। চন্দ্রগুপ্তও নগর পরিত্যাগ-পূর্বক চাণক্যের নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। এখানে নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্য স্বেচ্ছাধিপ পর্ত্তেজকে আহ্বান করিলেন। কথা হইল, যদি যুদ্ধে জয় হয়, তবে পর্ত্তেজকে অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবেন। তদনুসারে স্বেচ্ছাধিপ সৈন্যে আসিলেন। নন্দের সহিত যুদ্ধ চলিল। চাণক্যের কৌশলে একে একে সকলেই নিহত হইলেন।

মুদ্রারাক্ষস ও মহাবংশটীকা পাঠে জানা যায়—সপুত্র নন্দরাজ নিহত হইলেও, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ সহজে সম্পন্ন হয় নাই। মহামন্ত্রী রাক্ষস সর্বার্থসিদ্ধি নামক রাজভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইয়া, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের প্রাণনাশের জন্য অধিরত

অবস্থা কুটলায় বিস্তার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসের মনোবদ্বা পূর্ণ হইল না। চাণক্য পণ্ডিতের সুদর্শনতুল্য নীতিকৌশলে ঠেকিয়া তাহার সকল অস্ত্রই চূর্ণ হইয়া গেল। চাণক্য বিপক্ষপক্ষ ধ্বংস করিয়া নন্দের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তকে স্থাপিত করিলেন এবং অকুল পৌরবে ও প্রবল পরাক্রমে তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন। চাণক্য অসামান্য শত্রুপক্ষকে সংহার করিলেন বটে, কিন্তু পরাক্রমশালী সশস্ত্র শত্রু রাক্ষসের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেন না। রাক্ষসও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। উত্তরোত্তর প্রবল রাজার আশ্রয়গ্রহণপূর্বক চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের ধ্বংসের চেষ্টা করিতে ছিলেন। রাক্ষস চাণক্যের ঘোর শত্রু ছিলেন বটে, কিন্তু গুণগাহী চাণক্য তাঁহার নিঃসার্থ প্রভুত্ব, কর্তব্যকার্যে অবিলম্বিত অধ্যবসায়, অসামান্য বুদ্ধি ও অলৌকিক মন্ত্রণাকৌশল দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহার অনেক প্রশংসা করিতেন। চাণক্য যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, উহা পবিত্র ব্রাহ্মণ্য আচরণের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং তাঁহাকে যে নীত্বই এই কুটিল পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু রাক্ষস বিপক্ষ থাকিলে এবং তিনি মন্ত্রিত্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য কখন বিপদশ্রুত হইবে না। এই চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে কোনও উপায়ে রাক্ষসকে বহুতাত্পর্যে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদে নিয়োজিত করিতে হইবে। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিলে চন্দ্রগুপ্ত নিঃশঙ্কচিত্তে রাজত্ব করিতে পারিবেন, তাঁহার রাজপদ নিশ্চল হইবে। চাণক্যের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে অবশেষে তাহাই সংঘটিত হইল। চাণক্য আন্তরিক ভক্তি ও যথোচিত সৌজন্য দ্বারা রাক্ষসের প্রীতি সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে শপথ করাইয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বপদে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধবোধ প্রণীত বিনয়পিটকের সমস্তপশা-দিকা নামী টীকার ও মহানাম-ত্ববিষয় রচিত মহাবংশ-টীকার চাণক্য সঙ্ক্ষে কএকটি নূতন পরিচয় অবগত হওয়া যায়—

তক্ষশিলাবাসী চাণক্য ধননন্দের নিকট অপমানিত হইয়া রাজকুমার পর্ত্তেজের সহায়তায় অজ্ঞাতসারে বিদ্যারণ্যে পলায়ন করেন। এখানে আসিয়া তিনি নিজ অসীম ক্ষমতা-প্রভাবে অপরিমিত ধন লাভ করেন এবং সংগৃহীত অর্থবলে অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার রাজ্য করিবার ইচ্ছা হয়।

মোরিয়-বংশোদ্ভূত কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাহার চিত্ত আকর্ষণ করেন। আপন সংগৃহীত অর্থবলে চাণক্যদেব বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সেই বিপুলবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে নানা কৌশলে ও প্রচণ্ড বিক্রমে পাটলীপুত্র আক্রমণ করিয়া ধননন্দকে নিহত করেন। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পূর্বোক্ত “নীতিশাস্ত্র” নামক নীতিশাস্ত্রগ্রন্থে চাণক্যের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“বংশে বিশালবংশানামৃদীণামিব ভূরসাম্।
অপ্রতিগ্রাহকাণাং যোবভূব ভূবি বিপ্রভঃ ॥
জাতবেদাইবাচিহ্নান্ বেদান্ বেদবিদাং বরঃ।
যোহধীতবান্ হুচতুরশ্চতুরোহপ্যেকবেদবৎ ॥
যথাভিচারবজ্রেন বজ্রজলনতেজসঃ।
পগাত স্নাতঃ শ্রীমান্ হুপর্কো নন্দপীকৃতঃ ॥
একাকী বল্লশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্ ॥
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে ॥” ইত্যাদি।

অর্থাৎ চাণক্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন। তিনি জগতে অলৌকিকী প্রতিভাবলে অবলীলাক্রমে চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদজগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাবলে অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসাগর মন্থনপূর্বক নীতিশাস্ত্ররূপ অমূল্যরত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চাণক্য ছয় সহস্র শ্লোক-সম্বলিত একখানি রাজনীতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্নিম্ন বৃহ-চাণক্য, লঘুচাণক্য ও বোধিচাণক্য নামধেয় ক একখানি গ্রন্থ চাণক্যপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বৃহচাণক্যের কোনও পুস্তকে ১৭ অধ্যায় ও ৩৪২ শ্লোক, কোনও পুস্তকে ততোধিক অধ্যায় ও ততোধিক শ্লোক, কোনও পুস্তকে ৮ অধ্যায় ও প্রায় সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয়। লঘুচাণক্যের অধিকাংশ পুস্তকেই অষ্টোত্তর শত শ্লোক দৃষ্ট হয়। বোধ হয় চাণক্যের পরবর্তী কোনও পণ্ডিত চাণক্যের সুবৃহৎ রাজনীতিশাস্ত্র হইতে সাধারণ নীতিবিষয়ক শ্লোকগুলি ইচ্ছামত পৃথক করিয়া বৃহচাণক্য নামে প্রকাশিত করিয়া থাকিবেন এবং তৎপরবর্তী আর কোন পণ্ডিত ঐ বৃহচাণক্য হইতে বেচ্ছাসূত্রে কতকগুলি শ্লোক নির্দ্বিগ্ধ করিয়া তাহা লঘুচাণক্য নামে প্রচারিত করেন।

বোধিচাণক্যেও ৩০০ শ্লোক আছে, নেপালের বৌদ্ধসমাজে এই গ্রন্থ প্রচলিত।

কোনও কোনও ইতিহাসলেখক বলেন, চাণক্য শক-টারের গৃহ হইতে তপোবনে গমন করিয়া তথায় তিন দিবস অতিচার সাধন করেন। অতিচারকার্য সম্পন্ন হইলে, শকটারের নিকট কিঞ্চিৎ নির্দোষ পাঠাইয়া দেন। সেই নির্দোষ স্পর্শ করিয়া রাজা ও রাজপুত্রগণ দিনত্রয় মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, চাণক্য সাংঘাতিক দূত দ্বারা নন্দের প্রাণসংহার করেন।

চাণক্য জগতে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অবতারণা। চাণক্য মুনি শ্রেণীতে গণ্য ছিলেন।

বৈরনির্ঘাতনের জন্ত তিনি যে কালাগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন, কঠোর প্রতিজ্ঞাপালনান্তে সেই তৈরবী তামসী মূর্তি পরিত্যাগপূর্বক তিনি কল্যাণী মেহবতী সার্বিকী মূর্তি প্রকাশ করিলেন। কুটিল রাজ্যতন্ত্রের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পুণা ও বিশ্বহিতভ্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বাল্য বাহ্যিক প্রভৃতি পরম দয়বান্ মহর্ষিগণের পদাশ্রয় হইয়া বিশ্ববাসীগণের মঙ্গলের জন্ত উপদেশ শাস্ত্রের অবতারণা করিলেন।

চাণক্য নীতিশাস্ত্র বাতীত “বিষ্ণুগুপ্তসিদ্ধান্ত” নামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। বরাহমিহির, হেমাজি, ভূধর, লক্ষ্মীদাস, স্মার্ত্তরঘুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাহারও মতে ঐ সিদ্ধান্তের নামই বিশিষ্ট-সিদ্ধান্ত *। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ও ভট্টোৎপলের বচন দ্বারা জানা যায় যে বিষ্ণুচন্দ্র নামধেয় এক ব্যক্তি বিশিষ্টসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন, বিষ্ণুগুপ্ত নয়। কাহারও মতে, ইনি বৈদ্যাকীবন নামে একখানি বৈদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বাৎস্যয়ন নামে পরিচয় দিয়া “কামশাস্ত্র” এবং ভ্রায়হৃত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, উভয় গ্রন্থই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

[কথাসরিৎসাগর, ঋষিমণ্ডলপ্রাকরণবৃত্তি, পালি অথকথা প্রভৃতি গ্রন্থেও চাণক্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহার জীবনের অপরাপর বিবরণ চন্দ্রগুপ্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ক্ৰী) চাণক্যেন প্রোক্তং চাণক্য-অণু তত্ৰ লোপঃ।
২ চাণক্যরচিত নীতিশাস্ত্র। চণক-স্বার্থে ষাঞ। ৩ চণক। [চণক দেখ।]

চাণক্যমূলক (ক্ৰী) চণক এব চাণক্যং তদিব মূলমন্ত বহুব্রী।
একজাতীয় মূল্য, চণকমূলী। পর্যায়—বালেশ, বিষ্ণুগুপ্তক, হুলমূল, মহাকন্দ, কোটিলা, মন্ডসম্ভব, শালাক, কটুক।

* Max Müller's Indin, p. 820.

ইহার গুণ—উষ্ণ, কটু, কটিকর, দীপন, কক, বাত, ক্রিমি ও শুশ্রূণাশক, গ্রাহী ও শুক। (রাজনিঃ)

চাপুর (পুং) কংসের অঙ্গের মলবৃত্তাভিঙ্গ একজন অঙ্গর। ভাগবত ও হরিবংশের মতে মরদানব এই নামে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মযজ্ঞ সময়ে কক্ষের হস্তে ইহার নিধন হয়। (ভাগবত ও বিষ্ণুপুং) কোন কোন গ্রন্থে 'চাপুর' স্থলে 'চাপুর' পাঠ আছে।

চাপুরসূদন (পুং) চাপুরং হৃদয়তি নাশয়তি সুদ-লু। শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকাণ্ড) [চাপুরের নাশবৃত্তান্ত হরিবংশের ৮৬ অঃ দেখ।]

চাপু (পুং স্ত্রী) চণ্ডাপত্যং চণ্ড-অণ্ (শিবানিত্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) ১ চণ্ডের অপত্য (স্ত্রী) চণ্ডস্ত ভাবঃ চণ্ড-অণ্ (পৃথাদিত্য ইমনিজবা। পা ৪।১।১২২) ২ চণ্ডতা।

চাপুল (পুং স্ত্রী) চণ্ডাল এব চণ্ডাল-বার্ধে অণ্ (প্রজ্ঞা-দিত্যশ্চ। পা ৪।৪।৩৮) ১ [চণ্ডাল দেখ।] স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্ম হয়। "চাণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুকুটঃ স্মা তথৈব চ।

রক্তশলা চ বচশ্চ নেকেরনশতোবিজান্ ॥" (মহু ৩২৩৯)

(ত্রি) চণ্ডালশ্চৈব চণ্ডাল-অণ্। ২ চণ্ডাল সম্বন্ধীয়।

চাণ্ডালক (স্ত্রী) চণ্ডালেন কৃতং চণ্ডাল-বৃঞ (কুলাদিত্যো বৃঞ। পা ৪।৩।১১৮) ১ সংজ্ঞাবিশেষ। (ত্রি) ২ চণ্ডালকৃত।

চাণ্ডালিকি (পুং স্ত্রী) চণ্ডালতাপত্যং চণ্ডাল-ইঞ্ অকঙ্ চ। (স্বধাতৃব্যাসবরুড়নিবাসচণ্ডালবিধানামিতি বক্তব্যম্। ৪।১।২৭ মহাভাষ্য।) কোন মতে চণ্ডাল শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া চাণ্ডালিকি শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, তাঁহারা প্রকৃত্যন্তর স্বীকার করেন। চণ্ডালের পুত্র বা কন্যা, চণ্ডালাপত্য।

চাণ্ডালিকা (স্ত্রী) চাণ্ডালক-টাপ্ ইত্য়ক। বীণাবিশেষ, চণ্ডালবীণা। (অমর ২।১০।৩২)

চাণ্ডালিকাশ্রম, একটা এসিদ্ধ তীর্থস্থান।

"কোকামুখে বিগাহাধ গজা চাণ্ডালিকাশ্রমে ॥" (ভাঃ ১৩.২৫ অঃ)

চাণ্ডালী (স্ত্রী) চাণ্ডাল-গৌরাদিং ভীষ্ম। ১ লিঙ্গিনীলতা, হিন্দীতে পঞ্চগিরী বলে। (রাজনিঃ) চাণ্ডাল জাতী ভীষ্ম। ২ চণ্ডালজাতীয় স্ত্রী।

চাতক (পুং স্ত্রী) চততে জলং চত-বুল্। স্বনামখ্যাত পক্ষী। পর্যায়—শ্রোকক, শারঙ্গ, মেঘজীবন, তোকক, শারঙ্গ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে এই পক্ষীর পিণ্ডা হইলে মেঘের নিকটে জল চাহিয়া থাকে। ইহারা বৃষ্টি জল ভিন্ন অপর জল কখন পান করে না। কখন জল হইবে এই প্রত্যাশায় শুককণ্ঠে মেঘের দিক্ চাহিয়া কালবাণন করে। এই কারণেই ইহাদিগকে চাতক বলে।

ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম আইওরা টাইফিয়া

(Iora typhia), ইংরাজীতে The White-winged Green Bulbul বলে।



চাতক ও চাতকীর গঠনপ্রণালী ঠিক একরূপ হইলেও ইহাদের বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চাতকের শরীরের সমুদ্রভাগ নৈকট্য কলের ভ্রায় সবুজ ও পশ্চাদংশ হরিৎ-বর্ণ, ইহার পক্ষবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উভয় পার্শ্বের প্রান্তভাগ জীবৎ হরিত। পক্ষবর্ণের মূলদেশস্থ পালক-গুলি বেতকৃষ্ণকঙ্কিত; অঙ্গদেশস্থ পালকসমূহ আংশিক শুক্ল এবং পুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ। কিন্তু চাতকীর পুচ্ছ ও শরীরবর্ণ প্রায় একপ্রকার, তবে পুচ্ছ শরীরাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার পক্ষবর্ণ চাতকের পক্ষবর্ণের ভ্রায় কৃষ্ণবর্ণ নহে।

উভয় প্রকার চাতকেরই চক্ষু ও পদবর্ণ জীবৎ নীলের আভাবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণ এবং নেত্রযুগল উজ্জল কপিশবর্ণ। ইহার সমগ্র আকৃতির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। পক্ষবর্ণ ২৪, পুচ্ছ ২ ও চক্ষুর অগ্রভাগ ১ ইঞ্চি।

নেপাল, বঙ্গালা, মধ্যভারত, আসাম, আরাকান এবং মলয় উপদ্বীপে চাতকপক্ষী বিচরণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই পক্ষী দক্ষিণবর্ত হইতে ঐ সকল দেশে আসিয়াছে; অপর কেহ বলেন নাগপুর ও সাগর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই পক্ষী অজ্ঞান্য হানে গিয়াছে। কারণ ঐ প্রদেশেই বহুসংখ্যক চাতক নয়নগোচর হইয়া থাকে। তবে প্রভেদ এই যে, শেবোক্ত চাতক জাতীয় পক্ষী-দিগের পৃষ্ঠ ও শিরোদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে, ইহাদের চক্ষু ও অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং শারীরিক বর্ণেরও বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ নিবিড় কৃষ্ণ-বর্ণের পৃষ্ঠ ও শিরোদেশবিশিষ্ট চাতকজাতীয় পক্ষীর উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও ঠিক ঐরূপ পক্ষী দেখা যায় না বটে, কিন্তু জীবৎ কৃষ্ণবর্ণের চাতকজাতীয় পক্ষীর আদর্শ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল পক্ষী দক্ষিণাভ্যাসী চাতক জাতীয়পক্ষী ও এত-দেশীয় চাতকপক্ষীর মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্করজাতি বলিয়া বোধ হয়। কারণ দক্ষিণাভ্যাসী ও সিংহলদেশীয় চাতকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট চাতক আর্ঘ্যাবর্তের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে চাতকীর মধ্যে উভয়দেশে কোনরূপ বিভেদ লক্ষিত হয় না।

পূর্বোক্তাধিত কএকপ্রকার চাতক পক্ষী ভিন্ন আরও অনেক প্রকার চাতক পক্ষী আছে। যব ও অন্যান্য

বীণে। এতদেশীয় চাতকের ন্যায় একপ্রকার চাতক নয়নগোচর হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Iora scapularis*। সরল, পুচ্ছবিশিষ্ট বৃহৎ আকৃতির চাতকও অরুণি হইল আরাকান দেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; এই জাতীয় চাতকের বৈজ্ঞানিক নাম *Iora lafresnayii*, বোর্নিও বীণে *Iora viridis*, এবং সুমাত্রা বীণে *Iora viridissia* এই দুই প্রকার চাতকও দেখা যায়।

ইহার মাংসের গুণ—লঘু, শীতল, রুক্ষ ও রক্তপিণ্ডনাশক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজবলত)। সূক্ষ্মত ইহাদিগকে জাহ্নবের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ইহার সামান্ত গুণ—মধুর, কষার ও দোষনাশক।

চাতকানন্দন (পুং) চাতকমানন্দয়তি আনন্দ-গিচ-লু। ১ বর্ষাকাল। (রাজনিং) ২ মেঘ।

চাতন (ক্লী) চত-গিচ-লুট্। ১ পীড়ন, ক্রেশ দেওয়া। (পুং) ২ একজন বৈদিক ঋষি। (অথর্বব্রহ্ম ১২) (জি) চাতয়তি যাচয়তি চত-গিচ-লু। ৩ যাচনাপ্রযোজক, যে যাচঞা করায়।

চাতর (দেশজ) বিদ্রোহ, ছুটে লোকের জোট বাঁধা।

চাতরদুর্বা (দেশজ) এক প্রকার দুর্ভিক্ষ।

চাতরা, বঙ্গদেশের হাজারিবাগ জেলার একটি সহর। অক্ষা° ২৪° ১২' ২৭" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৫৫' পূঃ। হাজারিবাগ সহর হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর দশ-হরার সময়ে পশুমেলা হয়। চাতরাহাট হাজারিবাগ জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ। লোহারডাঙ্গা, বর্জমান, গয়া, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য এই হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত ও হাজারিবাগে উৎপন্ন দ্রব্য এই হাটে হইতে তত্তৎদেশে প্রেরিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে সিপাহীদিগের সহিত ইংরাজদিগের এখানে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে সিপাহীগণ পরাভূত হইয়াছিল।

চাতা (ছাতা) ১ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ মথুরা জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। ইহা ব্রজমণ্ডলের অংশমাত্র। এখানে কোন নদী নাই, আগ্রাখাল দ্বারা জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। এখানকার ক্ষেত্রফল ২৫১২ বর্গমাইল। ২ মথুরা জেলার একটি সহর এবং উক্ত তহসীলের সদর। অক্ষা° ২৭° ৪৩' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩২' ৫০" পূঃ। মথুরা সহর এখান হইতে ২১ মাইল। এখানে একটি বৃহৎ পাছ-শালা (সরাই) রহিয়াছে, তাহা দেখিতে জর্জের স্তায়, তাহা অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছে; তাহার দৃশ্য অতি চমৎকার, কাহারও মতে সেরশাহের সময়ে ঐ পাছশালা নির্মিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহকালে বিদ্রোহিগণ তাহাতে অবস্থান করিয়া-

ছিল। চাতাসহরে খান্স, ডাকঘর, বিদ্যালয় এবং সেনানিবাস আছে। এখানে প্রতি ত্রুৎবারে হাট বলিয়া থাকে।

চাতাল (চত্বর শব্দজ) অলন, চত্বর।

চাতুর (জি) চতুর্ভিকহতে চতুর-অণ্। ১ যাহা চারিজনে বহন করে। "চাতুরং শকটং" (সিং কোঁ)। চতুর স্বার্থে অণ্। ২ নেত্রগোচর। ৩ নিরস্ত। ৪ চাটুকার। (মেদিনী) ৫ চতুর। (পুং) ৬ চক্রগত, গোল বালিশ। (জিকাণ্ড) (ক্লী) চতুরস্ত ভাবঃ চতুর-অণ্। ৭ চতুরতা।

চাতুরক (জি) চাতুর-স্বার্থে কন্। [চাতুর দেখ।]

চাতুরক (ক্লী) চতুর্ভিকহতেনিষ্পান্যতে চতুরক-অণ্। ১ যে চারিটা ঘুটি লইয়া অক্ষকৌড়া করা হয়। (পুং) ২ উপধান-বিশেষ, গোলবালিশ। (মেদিনী)

চাতুরঙ্গক, পূর্ণারকক্ষেত্রের মধ্যবর্তী একটি গিরি।

"এবং ক্ষেত্রং মহাদেবি ভাগবেন বিনির্মিতম্।

তন্মধ্যেতু কতো বাসঃ পর্ততে চাতুরঙ্গকে।" (সহ্যাদ্রি ২।১।৩০।)

চাতুরর্ধিক (পুং) চতুর্ অর্থেবু বিহিতঃ চতুরর্ধ-ঠক্। পাণিন্যুক্ত কএকটি প্রত্যয়। পাণিনির ৪।২।৬৭, ৬৮, ৬৯ ও ৭০ সূত্রে যে চারিটি অর্থের প্রত্যয়ের বিধান আছে, তদর্ধক প্রত্যয়কে চাতুরর্ধিক কহে।

"জনপদে বাচো চাতুরর্ধিকস্ত লুপ্তাং।" (সিং কোঁ)

চাতুরাশ্রমিক (জি) চতুর্ আশ্রমেবু বিহিতঃ চতুরাশ্রম-ঠক্। যাহা চারিটি আশ্রমে বিহিত আছে, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম। "চাতুর্বিদ্যাং যথা বর্ণং চাতুরাশ্রমিকান্ পরং।

তানহং সংপ্রবক্ষ্যামি শাস্তান্ লোকভাবনান্।"

(ভারত ১।৩৫৩ অঃ)

চাতুরাশ্রমিন্ (জি) চতুরাশ্রমের মধ্যে এক আশ্রমভুক্ত।

চাতুরাশ্রমা (ক্লী) চতুরাশ্রমে তে আশ্রমাশ্চেতি সংজ্ঞাত্বাং কর্ম্মধা চতুরাশ্রম-স্বার্থে-ষাঞ্। (ত্রাক্ষণাদিবু চাতুর্বর্ণ্যাদীনা-মুপসংস্থানং। বার্তিক ৫।১।১২৪। 'প্রত্যারান্তোচ্চারণং ভাব-কর্ম্মসম্বন্ধনিবৃত্ত্যর্থমিতি স্বার্থ-এব যাঞ্ ভবতি।' কৈয়ট)। আশ্রমচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণশ্রম ও ভিক্ষু।

"চাতুর্বিদ্যং চাতুর্হোত্রং চাতুরাশ্রমামেব চ।" (ভারত ১।৩।৪৬ অঃ)

চাতুরিক (পুং) চাতুরীং বেত্তি চাতুরী ঠক্। সারথি। (জটায়ু)

চাতুরী (ক্লী) চতুরস্ত ভাবঃ চতুর-স্বার্থে-ভীষ্ যলোপশ্চ। ১ চতুরতা। "ঘশঃ পটং তদন্তচাতুরীতুরী।" (নৈষধ ১।১০)

২ নিপুণতা। (দেশজ) ৩ প্রবঞ্চনা। ৪ শঠতা।

"মিথ্যাকার্য্যে কর সাধু কপট চাতুরী।" (কবিকল্প)

চাতুর্জাতক (পুং) শুক্ররদেশীয় উচ্চ রাজপারিষদের উপাধি-বিশেষ এবং উক্ত উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সিন্ধা হইতে প্রাপ্ত

দারদ্র্যেবের প্রাপ্তিতে লিখিত আছে—শুক্ররদেশীয় ত্রিপুরা-
জক দ্বাষতীর্থ ভ্রমণ করিয়া সরস্বতী-সাগরসন্মম দেবপতন
(প্রভাস) নামক স্থানে উপস্থিত হন, তথায় তিনি উমাশক্তি-
বৃহস্পতির নিকট বর্ষ মহত্তর-পদে অভিষিক্ত হইয়া চাতুর্জাতক
সমীপে গমন করেন। তিনি তদীয় ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া
অতিশয় সন্তোষলাভ করেন। এই প্রাপ্তির ৬৫, ৬৩, ও
৬০-৬১ শ্লোকে চাতুর্জাতককে অস্থশাসন প্রচার করিতে,
এবং ৬৭ম শ্লোকে শিবরাত্রিপূর্ণোৎসবকে পান সুপারি বিতরণ
করিতে দেখা যায়। চাতুর্জাতক শব্দের মূল অর্থ, যিনি চারি
জাতিকে শাসন করেন, সুতরাং পরিভাষা মতে ইহার অর্থ
প্রকৃত শাসনকর্তা বা নগরশ্রেষ্ঠী *।

(ক্লী) চাতুর্জাতক এব চাতুর্জাতক-অণ্। ২ পক্ষচতুষ্টয়,
শুভঘটক, এলা, ডেলপত্র ও নাগকেশর। ইহার গুণ—
রেচক, রক্ষ, ভীক, উষ্ণ, মুখগন্ধরামাশক, লঘু, পিত্ত ও বিষ-
নাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব ১ম ভাগ)

চাতুর্থক (পুং) ১ পক্ষ প্রকার জরের অন্তর্গত এক প্রকার
জর। দুই দিন অন্তর যে জর হয় অর্থাৎ যে জর একদিন
হইয়া দুইদিন মধ্য থাকে, তাহাকে চাতুর্থক বলে। ইহাতে
বায়ুর আদিক্য থাকে। চাতুর্থক জর দুই প্রকার—মজ্জাগত
ও অঙ্গিগত। এই জর অতি ভয়ানক। দোষ শিরঃস্থিত
হইলে দ্বিতীয় দিবসে কঠ, তৃতীয় দিবসে হৃদয় এবং চাতুর্থ
দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, এই
কারণে এই জর দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে। (সুশ্রুত ৫।৩২ অঃ)

[ইহার অপর বিবরণ জর শব্দে দ্রষ্টব্য।] (ত্রি) ২ বাহা
চতুর্থ দিনে উৎপন্ন হয়।

চাতুর্থকারী (পুং) ঔষধবিশেষ। হরিতাল, মনঃশিলা,
তুঁত, শঙ্খ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যতকুমারীর রসে ভাবনা
দিয়া মর্দন করিবে। উহাকে আবার গুটে রাখিয়া যত-
কুমারীর রসের সহিত গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা
৩ রতি। তক্র পান করিয়া যত ও মরিচ অল্পপানে ইহা
সেবন করিবে। ইহা সেবনে শীতচাতুর্থকজ্বরে জ্বাশ
উপকার হয়। (রসেন্সসারঃ)

চাতুর্থাক্ষিক (ত্রি) চতুর্থমূল্যঃ সমাসান্ত-টচ্ অকাদেশশ্চ চতু-
র্থাক্ষে দিনচতুর্থভাগে ভবঃ চতুর্থাক্ষ-ঠক্। ১ চতুর্থ দিন-
সম্বন্ধীয়। ২ দিনের চতুর্থ ভাগে কর্তব্য কর্ম।

চাতুর্থিক (ত্রি) চতুর্থে ভবঃ চতুর্থ-ঠক্। বাহা চতুর্থে বা
চতুর্থ দিনে উৎপন্ন হয়, চতুর্থ-সম্বন্ধীয়।

“চাতুর্থিকস্ত বাৎসপ্রত্য।” (লাটায়ন ৭।৭।২৮)

* Epigraphia Indica, vol. I. p. 275.

চাতুর্দশ (ক্লী) চতুর্দশাং দৃষ্টতে চতুর্দশ-অণ্। ১ রাশি।
(সিং কোঃ) (ত্রি) চতুর্দশাং ভবঃ চতুর্দশ-অণ্। ২ বাহা
চতুর্দশীতে উৎপন্ন হয়।

চাতুর্দশিক (ত্রি) চতুর্দশামধীতে চতুর্দশী-ঠক্। যে চতুর্দশী
তিথিতে অধ্যয়ন করে। (সিং কোঃ ৫।৪।৭১)

চাতুর্দৈব (ত্রি) চারিদেবের পবিত্র।

চাতুর্ভদ্র (ক্লী) চতুর্ভদ্রমেব চতুর্ভদ্র-স্বার্থে-অণ্। [চতুর্ভদ্র দেখ।]

চাতুর্ভদ্রাবলেহ (পুং) চক্রমন্তোক্ত ঔষধবিশেষ। কটুক, ল,
পুষ্করমূল, ককটশূলী ও কৃষ্ণা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া
মধুর সহিত মিশাইবে। ইহার নাম চাতুর্ভদ্রাবলেহ। ইহা
সেবনে কাশ, শ্বাস, জ্বর ও কফ বিগষ্ট হয়। (চক্রমন্ত)

চাতুর্ভৌতিক (ত্রি) চতুর্ভূতেষু ভবঃ চতুর্ভূত-ঠক্। বাহা
চারিটি ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। (সাম্বাহ্য ৩।১৮)

চাতুর্মহারাজকায়িক [চাতুর্মহারাজিক দেখ।]

চাতুর্মহারাজিক (পুং) চত্বারোমহারাজিকাঃ স্বীকারভেনা-
স্ত্যস্ত চতুর্মহারাজিক-অণ্। ২ পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

“মহারাজিকচাতুর্মহারাজিক” (ভারত ১৩.৩৪. অঃ।)

২ বুদ্ধের নামভেদ।

চাতুর্মাসক (ত্রি) চাতুর্মাসং ব্রতং চরতি চাতুর্মাস-ডব্ণ-
যলোপশ্চ। (চাতুর্মাস্তানাং যলোপশ্চ। পা ৫।১।২৭ বাস্তিক)
যে চাতুর্মাস্তব্রত আচরণ করে।

চাতুর্মাসিক (ত্রি) চতুরোমাসান্ ব্যাপ্য ব্রহ্মচর্যমস্ত চতুর্মাস-
ঠক্। চতুর্মাসব্যাপক ব্রহ্মচর্যযুক্ত (কর্ম)।

চাতুর্মাসিন্ (ত্রি) চাতুর্মাস্তং ব্রতং চরিতং চাতুর্মাস্ত-ভিনি
যলোপশ্চ (চাতুর্মাস্তানাং যলোপশ্চ ডব্ণশ্চ ডিনিস্ত বক্তব্যং।
৫।১।২৪ মহাভাষ্য।) যে চাতুর্মাস্ত ব্রত আচরণ করে।

চাতুর্মাসী (ক্লী) চতুর্ষু মাসেষু ভবতি চতুর্মাস-অণ্ দ্বিরাং ভীপ্
(সংজ্ঞায়ামণ্। পা ৫।১।২৪ বাস্তিক।) পৌর্ণমাসী।

“চতুর্ষু মাসেষু ভবতি চাতুর্মাসী পৌর্ণমাসী” (৫।১।২৪ মহাভাষ্য।)

চাতুর্মাস্ত (ক্লী) চতুর্ষু মাসেষু ভবো যজ্ঞঃ, চতুর্মাস-ণ্য (চতুর্মাস
সান্গো যজ্ঞে তত্র ভবে পা বাস্তিক ৫।৪।১২৪) ১ চতুর্মাস-
সাধা যজ্ঞবিশেষ। (চতুর্ষু মাসেষু ভবস্ত চাতুর্মাস্তানি যজ্ঞাঃ।
৫।১।২৪ ভাষ্য।)

কাত্যায়নশ্রোতস্থত্রেয় ৫ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত
আছে। সূত্রকারের মতে কান্দনী পৌর্ণমাসী তিথিতে এই
যজ্ঞের আরম্ভ করিতে হয়। (চাতুর্মাস্তপ্রয়োগঃ কান্দন্যাং।
কাত্যায়নশ্রো ৫।১।১) ভাব্যকার ও পদ্ধতিকার শাখাস্বত্বের
সহিত একবাক্যতা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে,
কান্দন, চৈত্র বা বৈশাখ মাসের পূর্বমাস ইহার আরম্ভ

হইতে পারে। এই বস্তু চারিটা পক্ষ আছে। যথা ১ বৈশ্ব-
দেব, ২ বৃক্ষবাস, ৩ শাকসেধ ও ৪ জলানীলী। [বৈশ্বদেব
শ্রুতি শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য।]

২ চতুর্মাশাধ্য ব্রতবিশেষ।

বরাহের মতে আষাঢ়মাসের শুক্লাদশী বা পূর্ণিমার
এই ব্রতের আরম্ভ করিয়া বথাবিধি অনুষ্ঠানে কার্তিক মাসের
শুক্লাদশীতে অথবা পূর্ণিমার ইহার উদ্‌যাপন করিবে (১)।

মাংসে লিখিত আছে যে, বৎসরের চারিমাশ দেবগণের
উখান পর্যন্ত শুভত্যাগ করিলে মধুর বর, তৈলত্যাগে
মুখী, কটুতৈলপরিভ্যাগে শক্রনাশ, হালীপক ভক্ষণ না
করিলে সন্ততিবৃদ্ধি ও মদ্য মাংস পরিভ্যাগ করিলে বোগ-
সিকি হইয়া থাকে। এই কয়মাশ একদিন অন্তর আহার
করিলে বিমূলোকপ্রাপ্তি, নখলোম ধারণ করিলে প্রতিদিন
গন্ধানানের ফল, তাবুল পরিভ্যাগে গীতলজ্জি, দ্রুতত্যাগে
শরীরে লাভ্যা ও স্নিগ্ধতা, কলত্যাগে বৃদ্ধি ও অনেক সন্তান
লাভ হয়। তত্ত্বপূর্বক 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রটি জপ
করিলে উপবাসের ফল এবং বিমুবন্দনা করিলে গোদানের
সমান ফল হয়। ব্রত আরম্ভ করিবার মন্ত্র যথা—

“ইদং ব্রতং ময়া দেব! গৃহীতং পুরতত্ত্বব।

নিবিয়াং সিকিমাপ্রোক্তুঃ প্রসন্নো হসি কেশব।

গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যদাপূর্ণে স্বহস্ত্রিয়ে।

স্বস্মে ভবতু সংপূর্ণং স্বংপ্রসাদাদ্ জনার্দন।” (সনৎকুমার)

ব্রতসমাপ্তির পরে এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়।

“ইদং ব্রতং ময়া দেব! কৃতং প্রীতৌ তব প্রভো।

নুনং সংপূর্ণতাং যা তু স্বংপ্রসাদাদ্ জনার্দন।”

কাঠকগৃহের মতে যতির পক্ষে এই চারিমাশ একস্থানে
বাস করা উচিত। (তিথিতত্ত্ব।)

সনৎকুমারের মতে আষাঢ়ী একাদশী, পূর্ণিমা বা কৰ্কট
সংক্রান্তিতে ইহার আরম্ভ করিবার বিধান আছে। আরম্ভ
করিবার মন্ত্র—

“চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবভোজ্যাপনাবধি।

ইমং করিষ্যে নিরমং নির্কিয়ং কুক্ষ মেচ্ছাত।”

ভবিষ্যপুরাণের মতে যিনি চাতুর্মাশ ব্রত না করেন,
তাহার জীবন নিফল হয়। অতএব সকলের পক্ষেই চাতু-
র্মাশ করা উচিত।

(১) “আষাঢ় শুক্লাদশ্যাং পৌর্ণমাসাবধি বা।

চাতুর্মাশব্রতভ্যং কুর্ধ্যাৎ কৰ্কটসংক্রমে।

অভ্যবেতু তুলাটিকংপি মস্ত্রেণ নিরমং ব্রতী।

কার্তিকে শুক্লাদশ্যাং বিধিবৎ তৎ সমাপয়েৎ।” (বরাহ)।

বন্দপুরাণের নাগরথও লিখিত আছে যে, শ্রাবণমাসে
শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে দুগ্ধ ও কার্তিকমাসে
আমিষ পরিভ্যাগ করা উচিত। শিথিকা, রাজমাংস, পুতিকরজ,
পটোল ও বেগুন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সেই কাললজ্জি কচিকর
কলমুলাদি পরিভ্যাগ করিবে। (ভবিষ্যপুরাণ) [ইহার
অপর বিবরণ জানিতে হইলে বিষ্ণুহস্ত, ভবিষ্যোত্তর ও
হরিতত্ত্ববিলাস শ্রুতি গ্রহ্য দ্রষ্টব্য।]

২। বৈদিক চাতুর্মাশ ইষ্টির জ্ঞায় প্রাচীন পারসিক
জাতির মধ্যে “গহনবার” নামক যাগ প্রচলিত আছে।
বৈদিক চাতুর্মাশযাগের জ্ঞায় গহনবারেও পণ্ডব হইয়া
থাকে, প্রভেদ এই যে চাতুর্মাশ যাগ চারি মাসাধ্য, কিন্তু
গহনবার বৎসরের মধ্যে ছয়বার করিতে হয়। বৈদিকগণ
যাগকালে অগ্নিমধ্যে বপা নিক্ষেপ করেন, পারসিকেরা
অগ্নিতে না দিয়া পবিত্র ভাবিয়া সেই পণ্ডর মাংস আহার
করেন। এখন দাক্ষিণাত্যেরও কোন কোন স্থানে যাগ উপ-
লক্ষে মাংস অগ্নিকে উৎসর্গ করিয়া ঋষিকগণ তাহা আহার
করিয়া থাকেন।

চাতুর্মাশদ্বিতীয়া (জী) আষাঢ়, কাশ্বিন, আশ্বিন ও কার্তিক
মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া।

“আষাঢ়ে কাশ্বিনোজ্জেষে যা দ্বিতীয়া বিধুক্ষেয়।

চাতুর্মাশদ্বিতীয়াভ্যাঃ প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ।” (স্মৃতি)

চাতুর্থা (জী) চতুরস্ত ভাবে চতুর-যাঞ। ১ চতুরতা, দক্ষতা।

“চাতুর্ধ্যমুদত্তনোভবয়া রতেষু।” (সাহিত্যদ*) ২ চাতুরী।

চাতুর্বর্ণ্য (জী) চতুরো ব্রাহ্মণাদয়ো বর্ণা চতুর্বর্ণ-স্বার্থে যাঞ
(ব্রাহ্মণাদিষু চাতুর্বর্ণ্যাদীনামুপসংখ্যানং। পা ৫।১।১২৪ বার্তিক)
১ চারিবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।” (গীতা)

চাতুর্বর্ণ ভাবে-যাঞ। ২ বর্ণচতুষ্টির অন্তর্গত ধর্ম্ম।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ শ্রুতি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম
নিরূপণ করিয়াছেন। স্মৃতিগ্রন্থেও শাস্ত্রের মতে, ব্রাহ্মণের
ধর্ম্ম—যজ্ঞ, যাজ্ঞ, দান, অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ।
ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম প্রজাপালন। বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম
কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য। শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণসেবা ও
শিল্পকর্ম্ম। ক্ষমা, সত্য, দম ও শোচ এই কয়টি সকল বর্ণের
সাধারণ ধর্ম্ম। গীতা, বিষ্ণুসংহিতা, মহাভারত স্মৃতি, পুরাণ ও
মহাত্ম্যাদিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। জানিতে
হইলে তৎতৎ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শ্রুতি শব্দ দেখা।]

চাতুর্বিংশিক (জি) চতুর্বিংশতিদিন সম্বন্ধীয়।

চাতুর্বিদ্য (জী) চতুরো বিদ্যাএব চতুর্বিদ্যা স্বার্থে যাঞ।

(ব্রাহ্মণবিদ্যুচাত্ত্বর্ণাঙ্গীনাংসংখ্যানং । পা ৫।১।১২৪ বার্তিক)

১ চারিবেদ । ২ বিদ্যাচতুষ্টয়, আত্মিকী, দণ্ডমোতি, বার্তা ও ত্রয়ী । (জি) চতস্রোবিদ্যা চেতি চতুর্বিদ্যা-অণ্ ।
১ চতুর্বেদাভিজ্ঞ । ২ যে বিদ্যা চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছে ।
চাত্ত্বর্বেদ্য (ক্লী) চতুর্বেদমেব চতুর্বেদ-স্বার্থে-স্বাঞ । ১ চারিবেদ ।
(চতুর্বেদমেবচাত্ত্বর্বেদাং । পা ৫।১।১২৪ কৈরট) (জি)
চতস্রো বিদ্যা অধীতে চতুর্বিদ্যা-ঠক্ ভক্ত লুক্ চতুর্বিদ্যা এব
চতুর্বিদ্যা স্বার্থে স্বাঞ উভয়পদবৃদ্ধিঃ । ২ যে চারিটা বিদ্যা
অধ্যয়ন করে ।

“চতস্রো বিদ্যা অধীতে বিদ্যালকপকল্পস্বত্বাদিকল্পা-
দেহিতি ঠকঃ সর্বসাধেধিগোষ্ঠ লইতি লুক্ । চতুর্বিদ্যা এব
চাত্ত্বর্বেদ্যমত্মশক্তিকাদেবাক্তিগণ্যত্বাহতরপদবৃদ্ধিঃ ।”

(পা ৫।১।১২৪ কৈরট ।)

চাত্ত্বর্হোতৃক (পুং) চত্বর্হোতৃপ্রতিপাদকগ্রন্থস্ত ব্যাখ্যাতে,
চত্বর্হোতৃ-ঠক্ । চত্বর্হোতৃপ্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যানকর্তা ।

চাত্ত্বর্হোত্র (জি) চত্বর্হোতৃভিরনুষ্ঠেয়ং, চত্বর্হোতৃ-অণ্ ।
১ যাহা চারিজন হোতাদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় । চতুর্গাং হোতৃগাং
কর্ম চত্বর্হোতৃ-অণ্ । ২ চারিজন হোতার কর্ম ।

“চাত্ত্বর্হোত্রং কর্মগুহ্যং প্রজ্ঞানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্ ।”

(ভাগবত ১।৪।১৯)

চাত্ত্বর্হোত্রিয় (জি) যে যজ্ঞাদিতে চারিজন হোতা নিযুক্ত হয় ।

চাত্ত্বর্কাক্ষিক (জি) চারিকাত্তে বিভক্ত ।

চাত্ত্বর্ফয় (পুং) চতুষ্টয়ং কলাপস্বত্ববৃত্তিবিশেষং বৈত্তি অধীতে
বা চতুষ্টয়-অণ্ । ১ চতুষ্টয় বৃত্তাভিজ্ঞ, যে চতুষ্টয় বৃত্তি জানে ।
২ যে চতুষ্টয় বৃত্তি অধ্যয়ন করে ।

চাত্ত্বর্শ্রাশ্র (জি) চত্বর্ভিরনুষ্ঠায়াত্রাদিত্বাভিগতিঃ প্রাশ্রং
ওতং, ততঃ স্বার্থে অণ্ । চারিজন ঋষিকের ভোজনোপকূল,
যাহা চারিজন ঋষিকে ভোজন করিতে পারে ।

“চাত্ত্বর্শ্রাশ্রমোদনং পচন্তি ।” (শতং ব্রাঃ ২।১।৪।৪।)

চাত্ত্বর্সাংগরিক (জি) চত্বর্ষুসাংগরেষু ভবঃ চত্বর্সাংগর-ঠক্ ।
চত্বর্সাংগরোৎপন্ন, যাহা চারিটা সাংগরে কৃত হয় । জীলিঙ্গে
ভীষ্ হয় ।

চাত্র (ক্লী) চার করণে-ষ্ট্রন্ । অগ্নিমহনযন্ত্রের অবয়ববিশেষ ।
অগ্নিমহনপ্রণালী কাত্যারনশ্রোতস্বত্রের ভাষ্যে এইরূপ
লিখিত আছে—অখটিকে পূর্বদিকে পশ্চিমমুখী করিয়া
রাখিয়া অগ্নিমহন করিবে । প্রথমে একখানি কাঠ
উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, ইহাকে অধরারণি বলে । অপর
একখানি কাঠের জেশানদিক হইতে ৮ আঙ্গুল দীর্ঘ, ২ আঙ্গুল
মোটা একখানি কাঠ লইয়া প্রনহ বা মহনরত্ন প্রস্তুত

করিবে । চাত্রের মূলে প্রমহতীর মূল বসাইরা দিবে ।
অধরারণির মূল হইতে ৮ ও অগ্র হইতে ১২ আঙ্গুল পরি-
তাগ করিয়া তাহার মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমিত মহনস্থান
প্রস্তুত করিতে হয় । প্রমহের অগ্র সেই স্থানে স্থাপন
করিয়া চাত্রের অগ্রকৌলকের উপরে উত্তরাগ্র করিয়া ঔ-
বীলী রাখিবে । ইহার পরে চাত্রকে নেত্র বা মহনরত্ন
দ্বারা তিনবার বেটন করিয়া এইরূপে মহন করিবে যে
অগ্নি যেন পশ্চিমে পতিত হয় । কোন শাখার মতে যজমান
স্বয়ং যজ্ঞটী ধরিয়া থাকিবে ও তাহার পরী রত্ন ধরিয়া
মহন করিয়া লইবে । শাখান্তরে অপর্য্য পূর্বমুখী হইয়া মহন
করিবে এইরূপ বিধান আছে । বার আঙ্গুল একখানি
ধরিরকাঠকে গোল করিয়া তাহার অগ্র লোহকৌলক মুক্ত
ও মূলে একটা ছিদ্র করিবে এবং লোহপট্টিকাধারা ইহার
মূল ও অগ্র বাধাইতে হয় । ইহাকে চাত্র বলে । বার
আঙ্গুল দীর্ঘ চারি আঙ্গুল মোটা একখানি ধরির কাঠ লইয়া
অখোভাগ সমান ও উপরিভাগ বর্জুল করিবে । ইহাতেও
লোহপট্টিকা দিতে হয় । ইহাকে ঔবীলী বলে (১) ।

(কাত্যারনশ্রোতস্বত্র ৪।৮।২৬ ।)

চাত্রপুত্র, মাজাজ প্রেসিডেন্সির গঙ্গাম জেলার অন্তর্গত একটা
নগর । ইহা বহরমপুর হইতে ১৯ মাইল উত্তরপূর্বে এবং
গঙ্গাম হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত । অক্ষা° ১৯° ২১' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩' পূঃ । জেলার কালেক্টর এবং পুলিশের
বক্তৃতা এখানে অবস্থিত করেন । প্রতি বৃহস্পতিবার
এখানে হাট বসে । বহরমপুর ও গঙ্গাম হইতে দ্রব্যাদি
আমদানী হয় । এখানে একটা ইংরাজী বিদ্যালয় আছে ।

চাৎসু, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর ।
ইহা জয়পুর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণোত্তর । প্রাচীন কালে
ইহার চারিদিক তাত্রের প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল বলিয়া ইহার
নাম চাৎসু হইরাছে । এখানে প্রতিবৎসর আটটা মেলা বসে,
তাহাতে বহু লোকের সমাগম হয় । এখানে মহারাজ কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত একটা চিকিৎসালয় আছে । [চম্পাবতী দেখ ।]

চাত্রাঙ্গিঃ (ক্লী) চাত্রাঙ্গিঃপদার্থাঃ পরিমাণমত চাত্রাঙ্গিঃ-

(১) “চাত্রবৃদ্ধে প্রমহাঃ পাণ্ডু কৃষ্ণা বিচক্ষণঃ ।

কৃষ্ণোত্তরাগ্রাঙ্গিরণিঃ ভবঃ ধূপরিভসেনঃ ।

চাত্রাঙ্গঃ কৌলকাগ্রত্বাংমৌলীমূলাগ্রকান্ ।

বিষ্টভাঙ্গারেন্দ্রযন্ত্রং নিচক্ষং প্রভতঃ শুচিঃ ।

দ্বিধবেষ্টাখ নেত্রং চাত্রং পদ্যোহুভ্যভ্যন্তকাঃ ।

পূর্বে মহত্যাগতে প্রাচ্যঃ ভাব্যবা চ্যুতিঃ ।” (কর্কপ্রবীণ ৪।২২-৪)

ডগ্ (জিংশকবারিংলতোরাজ্যে সংজ্ঞার ডগ্। পা ৪১১৬২)
জাঙ্গণবিশেষ, বাহাতে চান্দনী অধার আছে।

চান্দারিংশক (জি) চান্দারিয়ার জীত।

চান্দাল (পুং) চক্রেতে বাচতে চক-বাগন্ (হাতিমুখে
বাগন্ বাগন্সীদারবঃ। উণ ১১১৫) ১ যজ্ঞকৃত। ২ মর্ড।
৩ উতান। ৪ উৎকট। (বিধ্বং) ৫ উত্তরবেদির অঙ্গ,
মুক্তিকাত্মপ। ৬ গর্ভ। "চান্দালং চান্দালবৎজ।"

(আখ' প্রো' ১১১৬।)

চান্দালবৎ (জি) চান্দালোহত্যত চান্দাল-মতুল মত বঃ।

চান্দালযুক্ত, বাহার চান্দাল আছে।

চান্দর (পারসী) উত্তরীর বহু।

চান্দল, কালজয়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমস্থিত অজয়গড়
নামক স্থানের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি দ্বীপটি বংশে
অগ্রগ্ৰহণ করেন এবং আন্দোলিক যশ ও সম্মানে ভূষিত
ছিলেন। মুস্তিমান বীর্যবরূপ রাজা ত্রিপাল ইহার পুত্র।

চান্দরাটি (কৌ) চনরাটিতেদং চনরাট-অণ্। রাজা চনরাটের সভা।
এই শব্দটি পরে থাকিলে দিক্বাচক শব্দের অন্ত উদ্ভূত হয়।
(দিক্বাচগ্রামজনপদাখ্যানচানরাটেয়। পা ৬২১০৩।)

চান্দসম, গুজরাট প্রদেশস্থ বরদা গাইকবাড় রাজ্যের একটি
সহর। অক্ষা° ২৩° ৪৩' উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ১৪' ৫৫" পূঃ।
এখানে জৈনদিগের উপাশ্রয় দেবতা পার্শ্বনাথদেবের একটি
মন্দির আছে, এ প্রকার সুবৃহৎ জৈনমন্দির গাইকবাড় রাজ্য
মধ্যে আর নাই। অর্ধশতাব্দী পূর্বে ইহার নিষ্প্রাণকার্য
সম্পন্ন হইয়াছে। চান্দসম সহরে বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা
ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে।

চান্দপিল্লী (শান্তপল্লী) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত
বিশাখপত্তন জেলার একটি পল্লী। অক্ষা° ১৮° ২' ৩০" উঃ ও
দ্রাঘি° ৮৩° ৪২' ০" পূঃ, বিনমলীপত্তনবন্দরে প্রবেশা-
ভিমুখী জাহাজ সকল বাহাতে পাহাড়ের উপর পতিত হইয়া
বিপদগ্রস্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে নাবিকদিগকে সাবধান
করিবার জন্ত ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এখানে "শান্তপিল্লী" নামে
একটি আলোকগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে প্রায়
১৪ মাইল দূরে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চান্দনিক (জি) চন্দনের সম্পদ্যতে চন্দন-ঠক্। বাহা চন্দন
বারা সম্পন্ন হয়।

"বপুশ্চান্দনিকং বহু কার্ণবেষ্টনিকং মুখং।" (তট্)

চান্দনী [চান্দনী দেখ।] ১ চন্দ্র বারা আলোকিত।

২ এক প্রকার গুহ। ইহার বৈজ্ঞানিক ইংরাজী নাম

Tabernamontana coronata। ইহা ৪ হইতে ৬ ফিট

পর্যন্ত উচ্চ, ইহার পাতা নব্বণ, উজ্জল ও তীক্ষ্ণ এবং
৫৬ ইঞ্চি লম্বা। ইহার ফুল চুপাকি, বোনের ন্যায় খেতবর্ণ,
বৃহৎ এবং মুহুঃ স্নগন্ধবিশিষ্ট। ইহার গন্ধ দিনের বেলায়
অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল উদ্যানেই এই
গুহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাগানের অলঙ্কারস্বরূপ।

চান্দাভলু (শান্দাভলু) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কুকা
জেলার একটি সহর। অক্ষা° ১৬° ১' উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ৪০' পূঃ।
লোকসংখ্যা ২৮২৫। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে অনেক বর্গইষ্টক
পাওয়া গিয়াছিল।

চান্দালা, মধ্যপ্রদেশের চন্দা জেলার মূল তহসীলের মধ্যস্থ
একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই জমিদারী প্রথম
স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ১৭ বর্গমাইল।

চান্দোড়, বরদার গাইকবাড়ের অধিকারভুক্ত একটি গ্রাম।
বরদা হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্বে এবং নর্মদা নদীর
দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এই স্থানে এবং ইহার নিকটবর্তী
কাণালি গ্রামে অনেক দেবালয় আছে। তদুদ্ব্যর্থার্থ চৈত্র
এবং কার্তিক মাসে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়।

চান্দোড়, বোম্বাইয়ের নাসিক জেলার এবং চান্দোড় তালুকের
অন্তর্গত, অক্ষা° ২০° ২' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১৯'
পূঃ। নাসিক হইতে ৪০ মাইল উত্তরপূর্বে ও মন্বাড় হইতে
১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম। ইহাতে
রেণুকা এবং কালিকাদেবীর মন্দির এবং একটি বাদশাহী
মসজিদ আছে। এখানে জৈনদিগের পরিত্যক্ত মন্দির
ছিল। এখন তাহা হিন্দু-দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে।

রেলপথ খুলিবার পূর্বে, এখানে তাম্র, পিত্তল এবং লৌহের
পাত্রাদি প্রস্তুত হইত। কথিত আছে যে মহারাজ হোলকর
এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নিশ্চিত একটি প্রাসাদ
এখানে আছে। ইহার নিকটে একটি পুরাতন কেল্লা দৃষ্ট হয়।

চান্দোলি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বনারস জেলার অন্তর্গত
তহসীলদারের অধীন একটি উপবিভাগ, ইহা কানৌর
পূর্বদক্ষিণে গঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। এই তহসীলের মধ্য
দিয়া রেলপথ গমন করিয়াছে। এখানে বিচারালয়, থানা
প্রভৃতি আছে।

চান্দ্র (জি) চন্দ্রেতেদং চন্দ্র-অণ্ (তত্তেদং। পা ৪১৩১২০।)

১ চন্দ্র সন্ধ্যাকর, বাহাতে চন্দ্রের সন্ধ্যক আছে, দিন মাস প্রভৃতি।

(কৌ) ২ চান্দ্রারণ ব্রত।

"চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্ককং ব্রহ্মকত্রবিশাংবিধিঃ।" (প্রারম্ভিকতত্ত্ব)

(পুং) ৩ চন্দ্রকান্তমণি। (হেম') (কৌ) ৪ আর্দ্রক।

(রাজনি') ৫ পরিমাণবিশেষ। [চান্দ্রমাণ দেখ।]

৩ যুগশীর্ষ নক্ষত্র। [নক্ষত্র ও যুগশিরস্ শব্দ দেখ।]
৭ একখানি ব্যাকরণ। [চান্দ্রব্যাকরণ দেখ।] ৮ প্রকরণীপত্র
একটি পত্রত। (লিঙ্গপুং ৫৩২।)

চান্দ্রক (ক্ৰী) চান্দ্রঃ আর্জকমিব কারতি কৈ-ক। ওজী। (রাজনিং)
চান্দ্রপুর (পুং) [বহ] ১ একটি জনপদ। বৃহৎসংহিতার
কর্মবিভাগে পূর্বদিকে ইহার উল্লেখ আছে। ২ তদেশস্থ
শিবমূর্তি।

চান্দ্রভাগা (ক্ৰী) চান্দ্রোভাগোহন্ত্যাস্যাং বহতী। চন্রভাগা
নদী। (হিরূপকোষ) [চন্রভাগা দেখ।]

চান্দ্রভাগের (পুং) চন্রভাগারী অপত্যঃ চন্রভাগাটক্
(ক্ৰীভ্যাটক্। পা ৪।১।১২০) চন্রভাগা নদী হইতে উৎপন্ন
একটি নদ।

চান্দ্রমস (জি) চন্রমস ইদং-অণ্। ১ চন্রসম্বন্ধীয়, বাহাতে
চন্রের সম্বন্ধ আছে।

“তিথিচান্দ্রমসং দিনঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

(ক্ৰী) ২ যুগশিরস্ নক্ষত্র।

চান্দ্রমসায়ন (পুং) চান্দ্রমসায়নি পূর্বোদয়াদিষাদিকারস্য-
কারঃ। বুধ। (হলায়ুধ)

চান্দ্রমসায়নি (পুং) চন্রমসো হপত্যঃ চন্রমস-ফিঞ্ (ভিকা-
দিত্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪।) বুধগ্রহ।

চান্দ্রমাণ (ক্ৰী) চান্দ্রক তমানক্চেতি কর্মধাং। কালের পরি-
মাণবিশেষ, চন্রের গতি অনুসারে যে সকল পরিমাণ স্থির
করা হয় তাহাকে চান্দ্রমাণ বলে। এ দেশে কালসম্বন্ধে
সৌর ও চান্দ্রমাণ গণনা করা হয়। সৌরমাণে যেরূপ
মাস ও বৎসর প্রভৃতির গণনা করা যায়, সেইপ্রকার চান্দ্র-
মাণেও দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি হইয়া থাকে। সূর্য্য-
সিদ্ধান্তের মতে চন্র নিজ গতি অনুসারে সূর্য্যের সমস্বত্রে-
পাতে অবস্থিত হইলে ইহাদের কিছুই অন্তর থাকে না,
এই সময়কে অমাবস্তা বলা হইয়া থাকে। তৎপরে দীর্ঘগতি
চন্র সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকে। এই প্রকারে
সূর্য্য হইতে দ্বাদশাংশ অতিক্রম করিতে চন্রের বৎ সময়
লাগে, তাহারই নাম চান্দ্রদিন। ১৫ চান্দ্রদিনে একপক্ষ, ২ পক্ষে
এক মাস ও বারমাসে এক চান্দ্রবৎসর হয়। [ইহার অপর
বিবরণ তিথি ও চন্র শব্দে দ্রষ্টব্য।] সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে
তিথি, করণ, বিবাহ, কৌরকর্ম, অপর ক্রিয়া ও ব্রতোপবাস
ব্রাহ্ম প্রভৃতি চান্দ্রমাণে করিতে হয়।

“তিথিকরণমুদ্বাহঃ কৌরং সর্গক্রিয়াস্তথা।

ব্রতোপবাসযাজ্ঞানাং ক্রিয়া চান্দ্রেণ গৃহ্যতে।” (সূর্য্যসিং)

চান্দ্রমাস (পুং) চান্দ্রমাসৌ মাসশ্চেতি কর্মধাং। চন্রসম্বন্ধীয়

মাস। চন্রমাস দুই প্রকার গোণ ও মুখ্য। কৃক প্রতিপদ
হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই দ্বিশটি তিথিকে গোণ ও শুক্লপ্রতি-
পদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত দ্বিশটি তিথিকে মুখ্যচান্দ্র বলে।

মুখ্যচান্দ্রে বিহিত কর্ম—বাৎসরিকপ্রসাদ, আশ্বিনপ্রসাদ,
মাসিক, সপ্তভীকরণ, চান্দ্রায়ণ ও আশ্বিনপ্রসাদ, দান,
নিত্যমান, গৃহ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ
তিথি বিহিত কর্ম।

গোণচান্দ্রে বিহিত কর্ম—অষ্টকাদি পার্শ্বপ্রসাদ, বারগীর্মান,
জন্মতিথিকৃত্য, জন্মষ্টমী প্রভৃতি উপবাস এবং দুর্গোৎসব
প্রভৃতি নিয়ত কর্ম। (স্মৃতি)

চান্দ্রব্যাকরণ, চন্র বা চন্রপোমিন্ নামধের পণ্ডিত প্রণীত
ব্যাকরণ। অষ্টপ্রধান সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে ইহা একখানি।

“ইচন্রচন্রঃ কাশকৃত্বমাপিশলীশাকটারণঃ।

পাণিন্তমরজৈনেত্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাসিকারঃ।”

আজ কাল এই ব্যাকরণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না; কোন
কোন স্থানে দুই একখানি অমূল্যিপি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু
তাহাও সম্পূর্ণ নহে। অন্ন দিন হইল ইহার এক খানি অস-
ম্পূর্ণ অমূল্যিপি নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে; এই অমূল্যিপি
৪৭৬ নেপাল-অঙ্কে অর্থাৎ ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই ব্যাক-
রণের অনেক সূত্রের ভাষা ও বর্ণবিন্যাস ঠিক পাণিনি ব্যাক-
রণের স্তার, এতদ্বারা অমূল্যিপি হয় যে ইহা পাণিনি অপেক্ষা
কিছু সহজ করিয়া উহার পরে প্রণীত হইয়াছিল। বেণ্ডাল
সাহেব (Mr. Bendal) বলেন যে চান্দ্র ব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে
বিভক্ত এবং এক এক অধ্যায়ও পুনরায় চারি পাদে বিভক্ত,
কিন্তু নেপাল হইতে যে অমূল্যিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বষ্ট
অধ্যায়ে তিনটির অধিক পাদ নাই। চান্দ্র ব্যাকরণ যদিও
পাণিনির অনুকরণে রচিত, তথাপি ইহার মধ্যে পাণিনি-
লিখিত সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই, এতদ্ব্যতীত কতক
শব্দের ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে; যথা উপসর্গের পরিবর্তে
প্রাদি, সর্গনামের পরিবর্তে সর্গাদি, তদ্ধিতের পরিবর্তে অণাদি
ইত্যাদি।

চান্দ্রব্রতিক (পুং) চান্দ্রতুলাং চান্দ্রায়ণং বা ব্রতমন্ত্যত
চান্দ্রব্রত-ঠন্। ১ রাজা, প্রজাবর্গ তাহার দর্শনে চান্দ্রদর্শনের
ভায়ে আত্মাদিত হয়, সেই জন্ত রাজাকে চান্দ্রব্রতিক বলে।

“তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকো নৃপঃ।” (মহু ৯।৩০.২।)

(জি) ২ যে চান্দ্রায়ণব্রত করে।

চান্দ্রাখ্য (ক্ৰী) চান্দ্রমিত্যাখ্য। যস্য বহতী। আর্জক।
(রাজনিং)

চান্দ্রায়ণ (ক্ৰী) চন্রভাগানমিবারন মজ বহতী পূর্বপদাৎ

সংজ্ঞারূপে পঞ্চদশীর্ণচ বরা চাঙ্গারণ বার্থে অণ্। ত্রত্বিশেষ।
পৰ্য্যায় ইন্দ্রজ্ঞ। মিতাক্ষরার মতে চাঙ্গারণাচ্চাঁদকারী
গুরুপ্রতিপদের দিন মনুস্মৃতিপরিমিত একটি পিণ্ড এবং
দ্বিতীয়ার দুইটি পিণ্ড তক্ষণ করিবে। এই প্রকার ক্রমে
এক একটি বুদ্ধি করিয়া পূর্ণিমার দিনে পনেরটি পিণ্ড বা গ্রাস
খাইবে। তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিকর্ষে ১৪টি, দ্বিতীয়ার
১৩টি, এই প্রকারে ক্রমে এক একটি কমাইয়া কৃষ্ণচতুর্দশীতে
একটি পিণ্ড বা গ্রাস তক্ষণ করিবে। অমাবস্যার দিনে কিছুই
খাইতে নাই, উপবাস করিয়া থাকিবে। বখানিষ্মে এইরূপ
আচরণ করায় নামই চাঙ্গারণ। এই ত্রত যবের জার মধ্যস্থল
বলিয়া ইহাকে যবমধ্যচাঙ্গারণ বলে। এই ত্রত কৃষ্ণপক্ষের
প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমার সমাপ্ত করা হইলে তাহাকে
পিপীলিকাতুম্মধ্য বলে। ইহাতে কৃষ্ণপ্রতিপদে ১৪ গ্রাস,
দ্বিতীয়ার ১৩ গ্রাস, এই প্রকার ক্রমে এক একটি গ্রাস
কমাইয়া কৃষ্ণ চতুর্দশীতে একটি মাত্র গ্রাস তক্ষণ করিবে।
অমাবস্যার দিনে উপবাস করিয়া গুরুপ্রতিপদে একটি গ্রাস,
দ্বিতীয়ার দুইটি গ্রাস, এই নিয়মে ক্রমে এক একটি বুদ্ধি
করিয়া পূর্ণিমায় পনের গ্রাস ভোজন করিতে হয়। তিথির
হ্রাসবুদ্ধি অনুসারে এক পক্ষে ১৪ দিন বা ১৬ দিন হইলে
গ্রাসেরও হ্রাসবুদ্ধি করিবে। গৌতমের মতে চাঙ্গারণের
বিধি এইরূপ লিখিত আছে যে—প্রথমে কেশবপন ও কৃষ্ণ
চতুর্দশীর দিনে উপবাস করিবে। “আপ্যায়শ্চ” ইত্যাদি
(ঋক্ ১১১১১৮), “সন্তে পরায়সি” উভয়াদি (ঋক্ ১১১১১৭)
ও “নবোনবঃ” ইত্যাদি (ঋক্ ১০৮৫১২) এই করণী মন্ত্র-
দ্বারা তর্পণ, আত্মাহোম, হবির অনুমন্ত্রণ ও চঞ্জের উপস্থান
করিতে হয়। “য দেবা দেবহেড়নঃ” ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্ঠয়ে
আত্মাহোম এবং “দেবকৃত্যস্য” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা
সমিধ আহুতি প্রদান করিবে। গ্রাসের মন্ত্র “ওঁ ভূত্বঃ স্বঃ
মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীঃ উর্ক্ ইট্ ওজঃ তেজঃ পুরুষঃ
ধর্ম্যঃ শিবঃ।” প্রতি মন্ত্রে “নমঃ স্বাহা” উচ্চারণ করিয়া ভোজন
করিতে হয়। বাজবল্ক্যের মতে শিক্তসংখ্যা সর্বসমেত
২৪০টি। [সোমায়ন দেখ।]

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে চাঙ্গারণ পাঁচ প্রকার—পিপী-
লিকাতুম্মধ্য, যবমধ্য, যতিচাঙ্গারণ, সর্বতোমুখ ও শিশু-
সাহব। কৃষ্ণ প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া একমাস পর্য্যন্ত অমু-
ষ্ঠান করিলে তাহাকে পিপীলিকাতুম্মধ্য বলে। গুরু প্রতি-
পদে যে চাঙ্গারণের আরম্ভ করা হয়, তাহার নাম যবমধ্য।

কৃষ্ণপক্ষে বধাক্রমে প্রতিদিন এক একটি পিণ্ডের হ্রাস ও
গুরুপক্ষে এক একটি পিণ্ডের বৃদ্ধি এবং জিহ্মা মাস

করিয়া যে জন্তের অমুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম
চাঙ্গারণ (১)।

কলতকর মতে প্রতিদিন স্তিম তিনটি গ্রাস তক্ষণ করিয়া
একমাস ত্রতাচুষ্ঠান করিলে তাহাকে যতিচাঙ্গারণ বলে।
পরায়ণের মতে গ্রাস-পরিমাণ, কুছুটাও পরিমাণের সমান
অথবা বহু বড় মুখে খাইতে পারে (২)। সকল রক্ষম
চাঙ্গারণেই চতুর্দশীতে উপবাস ও কেশ, শ্রবণ, মথ এবং
রোম বপন করিয়া তৎপরদিন সংযম করিতে হয় (৩)।

গৌতমের মতে সকল রক্ষম চাঙ্গারণেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি
হয়। এই কারণে “চাঙ্গার্য চন্দ্রসবন্ধিনো লোকস্য অরনঃ
ময়াং” এই বৃৎপতি লইয়া ত্রতটির নাম চাঙ্গারণ হইয়াছে।
ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের অন্তঃ চাঙ্গারণ করিবার বিধান
আছে। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।] চাঙ্গারণত্রয়ের অমুকর
সাক্ষীগণধেয়। ত্রতাত্মানে অপজ্ঞের পক্ষে অমুকর ধেয়দান
করিলেও চাঙ্গারণের সমান ফল হয়। [ইহার অপার বিব-
রণ প্রায়শ্চিত্ত, পিপীলিকাতুম্মধ্য, যবমধ্য, যতিচাঙ্গারণ,
সর্বতোমুখ, শিশুসাহব, প্রায়শ্চিত্ত ও সোমায়ন পক্ষে দ্রষ্টব্য।]
(জি) চাঙ্গারণলোভঃ চাঙ্গারণ-অণ্। ২ চাঙ্গারণ সন্ধী।

কোন কোন আভিধানিক চাঙ্গারণ শব্দটিকে পুংলিঙ্গও
স্বীকার করেন।

চাঙ্গার্যগিক (জি) চাঙ্গারণমাবর্তয়তি চাঙ্গারণ-চঞ। (পারা-
দগুরুায়ণচাঙ্গারণং বর্তয়তি। পা ৪।১।৭২।) চাঙ্গারণকারী।
চান্দ্রী (জী) চেন্দ্র ইদম্ চেন্দ্র-অণ্ (তন্ত্বেদম্। পা ৪।২।১২০।)
জিহ্মং জীপ্। ১ চেন্দ্রপত্নী। ২ জ্যোৎস্বা। ৩ শ্বেতকণ্ঠিকারী।
(জি) ৪ চেন্দ্রসন্ধী। “শুককাব্যায়ুগাং বিভ্রচ্চান্দ্রীমভিনভঃ-
শ্রিগম্।” (মাঘ ২২।)

চান্দ্রবরপথ, মধ্যভারতের অন্তর্গত নুসিংহপুর জেলার একটি
গ্রাম। ইহার বর্তমান অবস্থা অতিহীন। মহারাষ্ট্রবিগের
একটি উৎকৃষ্ট কেল্লার ভগ্নাবশেষ এখানে আছে।

চাপ (পুং) চপস্ত বংশবিশেষস্য বিকারঃ চপ-অণ্ (অথরবেচ
প্রাগোষদি বৃক্ষভ্যঃ। পা ৪।৩।১৩৫।) অথবা চপাতে ক্রিপাতে
অনেন চপ-ঘণ্ (অকর্তৃরিচ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।৩।১২।)
১ ধম্। “সচাপ বৃংহত্য বিবৃদ্ধমংসরঃ।” (রঘু ৩।৩০।)

(১) “একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃকে শুক্রেচ বর্জয়েৎ।

উপশ্ল. শংগ্রিমবণমেতচ্চাঙ্গারণং শ্রুতম্।” (মন্ত্র)

(২) “কুছুটাও যমাগত যাবান্ বা অবিশেষমুখম্।

এতং গ্রাসং বিজানীয়াৎ শুদ্ধার্থং কারণোক্তম্।” (পরায়ণ)

(৩) “শুকাকৈব চতুর্দশীতুগবসেৎ কৃষ্ণাঃ চতুর্দশীঃ বা কেশব্রজ-
মথরোমাদি বাপরিবা।” (বোধায়ন)

২ যুক্তকৈজারী। চাপানয়নের প্রকার স্বর্যসিদ্ধান্তে
লিখিত আছে—

“জ্যাং প্রোজ্ঞাশেবং তদ্ব্যবহিতং তদ্বিবরোকৃতম্।

সংখ্যা তদ্ব্যবহিতং সংখ্যোজা ধনুকচ্যতে ॥” (২।৩৩।)

অর্থাৎ যাহার ধনুসাধন করিতে হইবে, তাহাতে গ্রহাদির
জ্যা সাধন করিবে, সেই জ্যা সাধিত হইলে তদ্ব্যবহিত যত জ্যা
ধনু বিরোগ পড়িবে, সেই লক্ষ সংখ্যা পৃথক রাখিবে, পরে
জ্যাধনু সাধনের অবশিষ্ট যে অঙ্ক থাকিবে, তাহাকে ২২৫
দিয়া গুণন করিবে। পরে যে জ্যাধনু বাদ পড়িয়াছে
সেই ধনু ও তাহার পরধনু যাহা হইবে, উভয়ের অন্তর
যে ধনু তাহার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। তাহাতে যাহা
লক্ষ হইবে, সেই অঙ্কগুলি একস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্বকার
পৃথক রাখা বাদপড়া জ্যাধনুসংখ্যা দ্বারা ২২৫ গুণ করিয়া
পূর্বোক্ত একস্থানে স্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিলেই
চাপ হইবে (১)।

মনে কর—কোন গ্রহাদির জ্যা ২০২৫ পরিমিত, তাহার
চাপ আনয়ন এইরূপে করিতে হয়—

২০২৫ জ্যার মধ্যে জ্যাধনুের নবমধনু ১৯১০ বাদ
দিয়া অবশিষ্ট ১১৫ হইল, ইহাকে ২২৫ দিয়া গুণ করিলে
২৫৮৭৫ হইল। পরে ইহাকে উক্ত নবমধনু ও দশমধনুের
অন্তর ১৮৩ দিয়া ভাগহার করিয়া ১৪১।৭২ হইল, ইহাতে
বাদপড়া নবম অঙ্কদ্বারা ২২৫কে গুণ করিয়াও ২০২৫ হওয়ায়
লক্ষ্য ১৪১।৭২ যোগ করিলে ২১৬৬।৭২ চাপ বা ধনু হইল।

৩ ধনুরাশি। “চাপগণিত গৃহীতঃ” (বৃহৎসং ৪২।১০।)

চাপড় (চপেট শব্দজ) চপেটাবাত, খাবড়া।

চাপদণ্ড, যাহাদ্বারা জলাদি উর্দ্ধ ও অধোগত হয়, যেমন পিচ-
কারীর দণ্ড।

চাপদাসী (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ)

চাপন (দেশজ) ১ ভার দেওন।

চাপপট (পুং) চাপো ধনুঃ তৎসংক্রান্তকারঃ পটঃ পত্রং যস্য
বহতী। পিয়ালবৃক্ষ।

চাপল (স্ত্রী) চপলতা ভাবঃ কন্দর্পা, চপল-অণ্। (হায়নান্ত-
সুবাদিত্যোহণ্। পা ৫।১।১৩০) ১ চপলতা। ২ অনবস্থিতি।

“মাৎসর্য্যাৎসবরাগাদেশচাপলত্ববস্থিতিঃ।” (সাহিত্যদং।)

চাপলায়ন (পুং) চপলতা গোত্রাপত্যং পুমান্, চপল-কণ্।

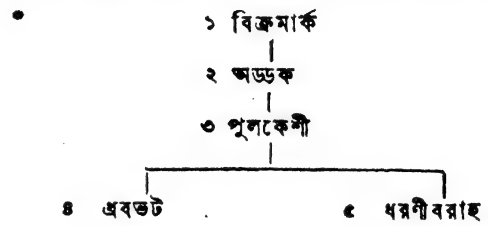
(অশ্বাভিহত্যঃ ফণ্। পা ৪।১।১১০) চপলের গোত্রজ পুরুষ।

চাপল্য (স্ত্রী) চপলতা ভাবঃ কন্দর্পা। (শুণবচনত্রাক্ষণিক্যঃ
কন্দর্পিচ। পা ৫।১।১২৪) ১ চপলতা। ২ চাপল্য। ৩ অট্টবর্ষ্য।

“শুরোঃ স্থানে চাপল্যাক্ষণিক্যবিবর্জয়েৎ।” (চাপল্য ৩০)

চাপবংশ, কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিমসীমান্তগত বর্দ্ধমান নামক
স্থানের একটা রাজবংশ। হুডালা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে
এই বংশের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে এই
বংশের আদিপুরুষ মহাদেবের চাপ অর্থাৎ ধনু হইতে উৎপন্ন
হইয়া “চাপ” নামে অভিহিত হন।

চাপের বংশে বিক্রমার্ক জন্মে, তিনিই সম্ভবতঃ এই
বংশের প্রথম রাজা। নিম্নে চাপবংশাবলী দেওয়া হইল।



হুডালার অনুশাসনপত্রে জানা যায় যে ধরনীবরাহ ৮৩৯
সম্বৎ অর্থাৎ ৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানরাজ্যে রাজত্ব করিতেন।
৩ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে
বিক্রমার্কের আবির্ভাবকাল বোধ হয়।

উক্ত দানপত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধরনীবরাহ
নৃপতি কন্দর্পদেবের দ্বার্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন, অর্জুনের দ্বার্য
বলবীৰ্য্যশালী ও কর্ণের দ্বার্য দানশীল ছিলেন। তিনি
রাজপুত্রবীরদিগের দ্বার্য শত শত গ্রাম ও নগর উৎসন্ন
করিয়া বীরোচিত বশঃলাভ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান নামক
নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

কাঠিয়াবাড় রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলস্থ বর্দ্ধমান বটবান নামক
নগর প্রাচীন বর্দ্ধমান বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কারণ
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর জৈনলেখকগণ বটবান নগরকে
বর্দ্ধমান বা বর্দ্ধমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান
সময়েও সেখানকার ত্রাঙ্গগণ শেখোক্ত নামে অভিহিত
করিয়া থাকেন। পশ্চিমভারতে উক্ত নামাভিহিত দ্বিতীয়
স্থানেরও অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না।

দানপত্রের মজলারচরণে মহাদেব ধক্কেবর নামে জ্ঞত
হইয়াছেন। আক্ষদাবাদ জেলার অন্তর্গত ও বর্দ্ধমানের সমীপস্থ
ধক্ক নামক প্রাচীন নগরে ধক্কেবর মহাদেবের মন্দিরও
আছে। পূর্বে ধক্ক নগর ধরনীবরাহ রাজার পিতামহ
অড্ডকের শাসনাধীন ছিল। ধরনীবরাহ উক্ত প্রদেশে
আধিপত্য করিতেন।

(১) এবিষয়ে সিদ্ধান্তশিরোমণির গণিতাধ্যায়ে লিখিত আছে—

“জ্যাং প্রোজ্ঞা তদ্ব্যবহিতাংশেবং বাটবাজীবা বিবরণে কল্প্যে।

জ্যাং বিলুপ্তা বতমাত্রতদ্ব্যবহিতাংশেবং ধনুঃ সাং।”

দানপত্র দৃষ্টে বুঝা যায় যে চাপবংশ বড়বান স্থানের পরবর্তী ঠাকুর উপাধিধারী রাজাদিগের জায় সমীপবর্তী প্রধান রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। যাহা হউক, ধরণীবরাহ “সমধিপত্যাশেষমহাশয়” এবং “সামন্তাধিপতি” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং স্বীকার করিতেন যে তিনি রাজচক্রবর্তী মহীপালদেবের অগ্রগৃহে ও তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া রাজত্ব করিতেন।

চাপা, মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলা এবং সিওর-নারায়ণ তহসীলভুক্ত একটি গ্রাম।

চাপাল (ক্‌) বৌদ্ধদিগের এক বিখ্যাত চৈত্য।

চাপিন্ (পুং) চাপোহস্ত্যস্ত চাপ-ইনি। ১ ধর্ম্মধারী। “স্বং গদী স্বং শরী চাপীখট্টাকী স্বর্করী তথা।” (ভারত ১২।২৮৬ অঃ) ২ শিব। ৩ ধর্ম্মরাশি। “চাপী নরোৎকলনোমকরো যুগাসাঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

চাপোংকট, গুজরাটের অন্তর্গত পত্তন নামক স্থানের একটি রাজবংশ। এই বংশের আদি রাজার নাম বাণ। তিনি পত্তননগর স্থাপন ও ৮৬২ বিক্রম সংবৎ অর্থাৎ ৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরকাল তথায় রাজত্ব করেন। তাঁহার পর-লোকপ্রাপ্তির পর যোগরাজ ৮৪১ খৃষ্টাব্দ এবং তৎপরে ক্ষেমরাজ ৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ক্ষেমরাজের পর বান্দা ও ভূয়ড় ২৫ বৎসরকাল অর্থাৎ ৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসন ভোগ এবং দ্বারাবর্তী ও পশ্চিমদিকে সমুদ্রতীরবর্তী সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া রাজ্যের পুষ্টিসাধন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বংশীয় বীরসিংহ ২৫ বৎসর এবং রত্নাদিত্য ১৫ বৎসর ক্রমান্বয়ে শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম সামন্তসিংহ; তিনি ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন (৯৩৫—৯৪২)। পরে ৯৪২ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভগিনীপুত্র চৌলুক্যবংশীয় মূলরাজ নরপতি গুজরাট ও পত্তনের অধিপতি হন।

চাপ্‌কান (পারস) পরিচ্ছদবিশেষ।

চাপ্‌ড়া, নদীরাঞ্জেলার অন্তর্গত একটি বাণিজ্য প্রধান গ্রাম, জলঙ্গী নদীর উপর অবস্থিত।

চাপ্‌রাশি (হিন্দীজ) ১ যাহার চাপ্‌রাস আছে। ২ দূত।

চাপ্‌রোলি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ মিরাত জেলার একটি পল্লী।

(অক্ষা° ২৪° ৫০' ১৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩৬' ৩০" পূঃ) কথিত আছে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জাটেরা এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু শিখদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের বংশ লুপ্তপ্রায় হয়। যাহা হউক প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এখানকার আদিম অধিবাসীগণ মীরপুরের

ধ্বংসাবশিষ্ট জাটদিগের সহিত মিলিত হওয়ার এই স্থানটী পুনরায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এখানে বাণিজ্য শিল্পাদির চর্চা নাই; তবে চাষ আবাদ বেশ হয়। এখানে ধান, গাছশালা, বাজার ও ডাকঘর আছে। অধিবাসী সংখ্যা ৬১১৫।

চাফটি (পুং ক্রী) চকট্ট স্থানের পত্যং। চাফট্ট-ইঞ্জ (নতৌ-বলিভাঃ। পা ২।৪।৬১) ইতি লুৎ নিবেধঃ। ১ চকট্ট স্থানের অপত্য।

চাফল, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত উম্মরাজ নামক স্থানের ৬ মাইল পশ্চিমে কৃষ্ণার উপনদী মাড়নদীতীরে ও একটি উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত একটি বৃহৎ পল্লী। ইহার চতুর্দিকে উর্করা ক্ষেত্র ও তৎপার্শ্বে পাহাড়শ্রেণী রহিয়াছে। ইহার নিকট পর্য্যন্ত একটি সড়ক আছে। প্রসিদ্ধ শিবজীর গুরু বিখ্যাত রামদাসস্বামী বংশোৎপন্ন লক্ষ্মণরাম ও রামচন্দ্রস্বামী এখানকার রাজা। এই পল্লী মাড়নদীর উত্তর তীরে বিস্তৃত; উত্তরপার্শ্বে গমনাগমন জন্য নদীর উপরে একটি সঁকো আছে। নদীর দক্ষিণপার্শ্বে স্বামীর বাসতল ও তাহার অনতিদূরে রামদাসস্বামী ও তাঁহার আরাধ্য মাক্তিদেবের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির রহিয়াছে। এই মন্দির ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বালাজী মাণ্ডবগণি নামক একজন ধনবান্‌ ব্রাহ্মণ কর্তৃক সম্পূর্ণ হয়। ইহা একটি তীর্থস্থান। রামদাসস্বামীর সময় এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে, ঐ সময়ে বহুতর যাত্রীর সমাগন হইয়া থাকে।

চাবী (পর্তুগীজ Chave শব্দের অপভ্রংশ) ১ তালার কাটী। ২ ছাড়া।

চাবুক (পারসী) ১ কশা। ২ অশ্বাদির তাড়নদণ্ড।

চাম, চামড়া (হিন্দী) ১ চর্ম্ম। ২ স্বক্‌। [চর্ম্ম দেখ।]

চামচা (পারসী) ১ হাতা। ২ দরবী।

চাম আটালু, উজ্জ্বের মত একপ্রকার পোকা, ইহা চামড়ার আটকাইয়া থাকে।

চামদল (দেশজ) চর্ম্মরোগবিশেষ।

চামনিকী (দেশজ) চর্ম্মজ পোকার ডিম্ব।

চাম্‌চিকা (দেশজ, চর্ম্মচটক শব্দ হইতে উৎপন্ন)। চটক পক্ষীর জায় আকার ও চর্ম্মনির্ম্মিত পক্ষ্যুক্ত বলিয়া ইহা-দিগকে চর্ম্মচটিকা বা চাম্‌চিকা কহে। ইহার স্তম্ভপায়ী, ইহাদের হস্ত হইতে পদ ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত একখণ্ড পাতলা চর্ম্মবৃত্ত। ঐ চর্ম্ম ঈচ্ছামত শুটাইতে, বিস্তার করিতে এবং লকালন করিতে পারে, ঐ চর্ম্ম দ্বারা ইহার আকাশে উড়িতে পারে। হস্তের উপরিভাগে বড়শীর জায় আঁকুশী আছে। বৃক্ষ প্রাচীরাদিতে ঐ আঁকুশী লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের অঙ্গলোমাবৃত এবং আকার বহু প্রকার। ইহার প্রায়ই কীট

পতঙ্গাদি ভোজন করে। বৃক্ষকোঠর, গৃহাদির কোণ, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের চূড়ার এবং অন্তান্ত অক্ষকারময় স্থানে ইহার বাস করে। দিবাভাগে কঠিন বাহির হয়। বৈকালে সূর্যাস্তের সময় গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

চাম্চিকা নানা জাতীয়। বাহুড়, কলাবাহুড় প্রভৃতিও এই জাতীয় জীব। বাহুড় ফলভোজী এবং আকারে অনেক বড়। চাম্চিকার আকার সচরাচর ৪ ইঞ্চি হইতে ৯।১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। বাহুড় ২০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

এদেশের কোন কোন নীচ লোক এবং সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা চাম্চিকা ভক্ষণ করে। এ দেশের চাম্চিকার বর্ণ সচরাচর ধূসরবর্ণ, কিন্তু সিংহলে পীত, লোহিত, পাটল প্রভৃতি বর্ণেরও চাম্চিকা দেখা যায়। [বাহুড় দেখ।]

চামর (পুং-স্ত্রী) চমরী যুগবিশেষতত্ত্ব ইন্দু, চমরী-অণু। চমরীপুচ্ছ বা লোমনির্মিত ব্যজন। চলিত কথায় চোরী বলে। যুক্তিকল্পতকতে লিখিত আছে—অসেক, হিমালয়, বিকা, কৈলাস, মলয়, উদয়চল, অন্তাচল ও গন্ধমাদনপৰ্ব্বতে যে চমরী নামক মৃণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পুচ্ছলোম হইতে প্রস্তুত বলিয়া ইহার চামরসংজ্ঞা হইয়াছে।

ইহার পর্য্যায়—প্রাকৌলিক, চমর, চামরা, চামরী, ঝাল-বাজন, রোমপুচ্ছক। চামরের বায়ুর গুণ—ওজঃকর ও মলিকাদি দূরকর। শুভ্রবর্ণ, দুই হস্ত উন্নত, সুবর্ণলগ্নমুক্ত এবং হীরকধারা অলঙ্কৃত চামরই রাজাদিগের শুভকর ও সম্মানজনক। চামরদণ্ড কিংবা চামরের দৈর্ঘ্য দেখিয়া ইহার বিস্তার ঠিক হয়। দণ্ড সুবর্ণ, রৌপ্য কিংবা সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত হইতে পারে। চামরদণ্ডে হীরক, পদ্মরাগ, বৈদূর্য ও নীলকান্তমণি যোগ করিতে হয়। চামর লোহিত, পীত, গুরু কিংবা নানা বর্ণের হইতে পারে। চামর দুই-প্রকার হলজ ও জলজ। আর্যদেশের রাজা হলজ এবং মঙ্গলদেশের রাজা জলজচামর ব্যবহার করিবে।

চামরের গুণ—দীর্ঘ, স্বচ্ছ, ঘন ও লঘু। দোষ ও চারি-প্রকার—ধূসর, গুরু, বিবর্ণ ও মলিনাঙ্গ। দীর্ঘ চামরে দীর্ঘায়ু, লঘু হইলে ভয়বিশিষ্ট, স্বচ্ছ হইলে ধন ও কীর্তিনাভ এবং ঘন হইলে সম্পদবৃদ্ধি হয়।

হলজ চামরের লক্ষণ—ধূসর হইলে অন্নায়ু, গুরু হইলে অতিশয় ভয়প্রদ, অন্নলোমবৃত্ত হইলে রোগ ও শোকেৎ-পাদক এবং মলিন হইলে মৃত্যুজনক।

জলজ চামরের লক্ষণ—সাতপ্রকার সমুদ্র হইতে উৎপন্ন

চামর ত্রিঃ ত্রিঃ গুণবিশিষ্ট। লবণ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন চামর পীতবর্ণ এবং গুরু ও লঘু উভয়বিধ হয়; ইহার রোম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অন্ন চট চট শব্দ করে। ইন্দ্ৰ সমুদ্রজাত চামর তাম্রবর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও লঘু। ইহা বাজন করিলে মলিকা ও মশক আইসে না। সুরাসমুদ্রজাত চামর নানাবর্ণমুক্ত, মলিন, গুরু ও কর্কশ। ইহার গন্ধে বৃদ্ধ-হস্তীগণও মত্ত হয়। সর্পিঃ সমুদ্রজাত চামর লবং পীতবর্ণ-যুক্ত শ্বেতবর্ণ, মিষ্ট, ঘন ও লঘু। ইহার বাতাসে বায়ুরোদ-মাশ হয়। জলসমুদ্রজাত চামর পাণ্ডুবর্ণ, দীর্ঘ, লঘু ও অত্যন্ত ঘন। ইহার বায়ুতে তৃষ্ণা, মূর্ছা, মদ ও জন্ম দূর হয়; এই চামর বাহার করে থাকে, তাহার গৃহে কোনও রূপ অমঙ্গল বা ভয় থাকে না।

দুহ্মসমুদ্রোদ্ভব চামর শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘ, লঘু ও অত্যন্ত ঘন। ইহার গুণ নানাবিধ। দেবতারিও সহজে ইহা প্রাপ্ত হন না। সমুদ্রের মধ্য হইতে সর্পগণ ইহা হরণ করিয়া আনে।

হলজ চামর অনার্যসে দণ্ড করা যায় এবং দাহকালে মিটমিট করে। জলজ চামর সহজে দণ্ড হয় না এবং দাহ-কালে অত্যন্ত ধূম উৎখিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া যে রাজা চামর ব্যবহার করেন, তিনিই সুখভোগ করিতে পারেন।

যে আর্য্য রাজা জলজচামর ব্যবহার করেন, ঈশ্রুই তাঁহার বংশ, বীৰ্য্য, লক্ষী ও আয়ুঃক্ষয় হয়। যে অনূপ-দেশের রাজা হলজচামর ধারণ করেন, তাঁহারও লক্ষী, আয়ুঃ, যশঃ ও বলক্ষয় হয়। বালুকায়ত্রে মহুর ও জল প্রভৃতি দ্বারা ইহার সংস্কার করিতে হয়। সেই উচ্চ জলের দ্বায়ে ইহার ক্রটিমত্তা নষ্ট হয়। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতক)

চামরগ্রাহ (ত্রি) চামরঃ গৃহ্ণতি চামর-গ্রহ-অণু উপ-সং। চামরেন ব্যজনকর্তরি দ্বিরাং টাপ্। মুক্তবোধমতে বণ্ দ্বিরাং ভীপ্। যে চামরদ্বারা বাতাস করে, চামরব্যজনকারী।

চামরধারিণী (স্ত্রী) চামরং ধরতি ধর-ণিনি দ্বিরাং ভীপ্। চামরগ্রাহিকা।

চামরপুষ্ক (পুং) চামরবৎ পুষ্কম্ভেতি। বাহার পুষ্ক সকল চামরের ভায় স্বরকে ভবকে অন্মে। ১ জ্রুশুক। ২ কাশতৃণ। ৩ কেতকীবৃক্ষ। ৪ আত্ম। (মেঘিনী)

চামরপুষ্কক (পুং) চামরপুষ্ক এব স্বার্থে কন্ চামরমিব পুষ্কম্ভ ইতি কন্ বা। কাশতৃণ। [চামরপুষ্ক দেখ।]

চামরলাকোটা (সামুলকোটা) মাজাজ প্রেসিডেন্সীর গোদা-বরী জেলার অন্তর্গত একটি সহর, কাকনাড়ার সাতমাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৩১' উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ১২'

৫০" পূঃ। এই স্থান হইতে রাজমহেন্দ্রী ও কাকনাড়া পর্য্যন্ত ঝাল কাটা হইয়াছে। পূর্বে এই স্থানে সেনানিবাস ছিল, কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে আর তথায় সেনা রাখা হয় না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এক বারিক এখনও আছে।

চামরহস্তা (জী) চামরং হস্তে বস্তাঃ সা বহত্ৰী। [চামর-ধারিণী দেখ।]

চামরা (জী) চামর অজাদিখাং টাপু। চামর।

চামরাজ, মহিষুরের বাদবংশীয় আদিরাজা বিজয়ের বংশোৎপন্ন একজন রাজার নাম। ১ম চামরাজ ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহিষুরের রাজত্ব করেন। বিজয়নগর ধ্বংসের পর তিনি স্বাধীন হন। ২য় চামরাজ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কথিত আছে ইনি প্রথম চামরাজের পিতৃব্যবংশোৎপন্ন। ৩য় চামরাজ ১ম চামরাজের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৩১ হইতে ১৭৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহিষুরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইনি বিজয়বংশীয় রাজাদিগের শেষ বংশধর। ইহার পর অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং মুসলমানেরা উক্ত রাজ্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নরপতি নির্বাচন করেন। যাহা হউক এই প্রকার বিশৃঙ্খলতার সময়ে মুসলমানগণ কর্তৃক নির্বাচিত ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজগণের মধ্যে চামরাজ নামক ছইজম রাজার নাম দৃষ্ট হয়। একজন ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোধ করিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অপর একজন হাইদরআলি কর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি কারুণহলীবংশীয় আর্কোতারের দেবরাজ অরসুর পুত্র।

চামরাজেন্দ্র উদেয়ার, মহিষুরের একজন রাজা। ইনি মহিষুরের শেষ হিন্দুরাজ কারুণহলীবংশীয় চামরাজের পৌত্র। ত্রিরঙ্গপত্তন ধ্বংস ও টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর ইংরাজরাজ ইহার পিতৃদেবকে মহিষুরের সিংহাসন প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ইমি নাবালকবস্থায় সিংহাসনে অধিরোধ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

চামরাজনগর, মহিষুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা সহর। অক্ষা° ১১°৫৬'১৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। এই সহরের প্রাচীন নাম আর্কোতার। মহিষুরাধিপতি চামরাজ উদেয়ার এইস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, সে জন্য উক্ত মহারাজের পুত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরোধ করিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্মানার্থ তদীয় জন্মস্থানের নাম পরিবর্তন করিয়া চামরাজনগর নাম দেন ও তথায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে একটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ ও মন্দির মধ্যে চাম-

রাজেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উক্ত দেব-সেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিরাজেন। এখানে শেহোজ রাজনির্মিত একটা রাজপ্রাসাদও দৃষ্ট হয়। এই নগর চামরাজনগর নামক তালুকের সদর এবং মহিষুর নগর হইতে ৩৬ মাইল অন্তর। ইহার দুই মাইল পূর্বে মণিপুর নামক প্রাচীন নগরের ভয়াবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

চামরিক (পুং) চামর-ঠন্। যে ব্যক্তি চামর বহন করে।

চামরী (পুং জী) ১ চমরী গো। (Yak)

ভোজরাজরচিত যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃতগ্রন্থে লিখিত আছে—স্বমের পর্ব্বতের চমরীগণ ঈষৎ পীতবর্ণ, হিমালয়ে ও বিষ্ণাপর্ব্বতে শুভ্রবর্ণ, কৈলাসপর্ব্বতে কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ, মলয়পর্ব্বতে শুভ্র ও পিঙ্গলবর্ণ, উদয়চলে ঈষৎ রক্তবর্ণ, অন্তাচলে ঈষৎ নীলাভাযুক্ত শুভ্র, কাহারও মতে কৃষ্ণবর্ণ এবং গন্ধমানে পান্ডুবর্ণ এবং অজান্ত স্থান হইতে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ চমরী উৎপন্ন হয়। এই পর্ব্বতোদ্ভূত যুগল আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারিপ্রকার। তন্মধ্যে দীর্ঘ রোমযুক্ত, অতিশয় ক্ষুদ্র, স্নিগ্ধাল, কোমল, সংখ্যায় অল্প, অল্পগ্রন্থিযুক্ত চমরী ব্রাহ্মণ জাতীয়। ইহাদের রোমসংস্কার বাতিরেকেণ্ড পরিষ্কার থাকে। দীর্ঘলোমযুক্ত, অত্যন্ত গুরু ও বাহা সচরাচর দেখা যায়, তাহার ক্ষত্রিয়জাতীয়। স্থূলসন্ধিযুক্ত চমরীগণ বৈশ্যজাতীয়। অল্পলোমযুক্ত, অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কোমলাঙ্গ, সচরাচর দৃশ্য ও অল্পসন্ধিযুক্ত চমরী শূদ্রজাতীয়, ইহাদের চামর সংস্কার করিলেও মলিন হয়। (যুক্তিকল্প°)

বর্তমান প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে—চমরী গোজাতীয় একপ্রকার বড় জন্তু। তিব্বতের নানাস্থানে ইহারা গৃহপালিত ও ভারবহনাদি কার্যে নিযুক্ত হয়। ইহাদের আকার অনেকাংশে ঘুঘু ও মহিষের মাঝামাঝি। ঐ জাতীয় অপর্যাপ্ত চতুষ্পদদিগের ভায়ে ইহারাও মস্তক মুক্তিকা-সমিহিত করিয়া ভ্রমণ করে। গৃহপালিত চামরী এক একটা প্রকাণ্ড বৃষভের ভায়ে, মস্তক, পদ ও আকৃতিও প্রায় তদনুরূপ। সর্কাল স্তূর্দীর্ঘ লোমাবলীদ্বারা আবৃত, মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ও উজ্জল; শৃঙ্গ নাতি দীর্ঘ, বহুম ও সূচ্যগ্র; ললাট কুঞ্চিত, স্তূর্দীর্ঘ ও রোমগুচ্ছসম্বিত; নাসিকা চৌরস ও ক্ষুদ্র রন্ধযুক্ত; ষাড় ছোট; পশ্চাৎভাগ নিম্ন, পদগুলি দৃঢ় এবং স্বজের উপর লোমময় ককুদ্ বিদ্যমান। ইহাদের পৃষ্ঠদেশের লোমাবলী সোজা হইলেও কর্কশ নহে। পৃষ্ঠ স্তূর্দীর্ঘ লম্বমান, ও বহল লোমরাজি দ্বারা শোভমান। লম্বুখের পদদ্বয়ের মধ্য হইতে একগুচ্ছ দীর্ঘ লোম বাহির হয়। পৃষ্ঠ ও স্বজদেশের লোমাবলী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র,

নিম্ন ভাগের লোম সরল ও স্থলীর্ণ, কখন কখন কুমি স্পর্শ করে।

শাদা, ধূসর প্রভৃতি নানাবর্ণের চামরী আছে। তন্মধ্যে শাদা ও কাল চামরী সচরাচর দেখা যায়। ইহাদের গায়ে প্রচুর লোম থাকতে ইহারা তিব্বতের ছয় মাসীত সহ্য করিতে পারে।

তিব্বতের উচ্চ পার্বত্য প্রদেশেই ইহাদের প্রকৃত জন্মস্থান। তিব্বতের পূর্বভাগে পর্বতের উপরে দলে দলে বস্ত্র চামরী দৃষ্ট হয়। তথায় গৃহপালিত চামরী গাড়ীর প্রয়োজন সাধন করে। তিব্বতীয়গণ ইহার দুগ্ধ পান করে, লোমে বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ইহারা দুর্গম গিরিপথে ভারবহন করিয়া থাকে। তিব্বতের লোকেরা ইহার মাংস আহার করে এবং দুগ্ধ হইতে পনির, ছানা, মাখন প্রভৃতি নানারূপ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। পূর্ব-নেপালে চামরী তথাকার প্রধান সম্পত্তি মধ্যে গণ্য, কৃষিকার্য্যে কিম্বা শকটাদি টানিতে ইহারা পটু নহে, কিন্তু পৃষ্ঠে ভার লইয়া অত্রপ্রাণীর অগম্য গিরিপথে প্রতিদিন প্রায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত বাইতে পারে। লামাগণ চামরীতে চড়িয়া থাকেন। চামর ভিন্ন ইহাদের লোমে রজ্জু ও একরূপ শক্ত কাপড় হয়, এবং সলোম চশ্মে টুপি, পিরাণ, কবল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।



চতুপদ প্রাণীদিগের মধ্যে চামরীই সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রদেশে বাস করে। হিমালয় ও তিব্বতের তুষার-মণ্ডিত পর্বত সকলে ইহারা বিচরণ করে। তথাকার দারুণ শীতে ইহাদের কষ্ট হয় না। ইহারা শীতাতপের সহসা অধিক পরিবর্তন সহ্য করিতে পারেনা। গ্রীষ্মকালে সচরাচর ১৬০০-১৭০০ ফিট

উচ্চে বাস করে। ১২০০ ফিট উচ্চে চামরী দেখা গিয়াছে। এই ভীষণ উচ্চ স্থানের বহুদূর নিয়ে তৃণভাদি কন্ঠিতে পারেনা, চিরতুষার-মণ্ডিত থাকে।

সিঙ্গুনদের উপত্যকা স্থানে বিস্তর চামরী দৃষ্ট হয়, কিন্তু কারাকোরম ও কিউনলু পর্বতের পাদদেশেই ইহাদের বহু সংখ্যক দল দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের প্রাণীদিগের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার। বন্যাবহার ইহারা অতিশয় ভীষণ ও দুর্দান্ত, মহাবেগে শিকারির প্রতি ধাবমান হইয়া শূলধারা তাহাকে বিধীর্ণ করে বা বন্ধধারা মাটিতে শিশিরা কলে। ইহাদের জিহ্বা এমন খলখলে ও ধারাল যে কোন স্থানে লেহন করিলে সেস্থানের হাড় বাহির করিয়া দেয়। শীতকালে ইহারা উচ্চপর্বত হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশে আইসে এবং শীতশেষে আবার চলিয়া যায়। ইহারা একাকী কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া নির্জন উপত্যকার বাস করে। ভল্লুক ও হরিণের ন্যায় মধ্যাহ্নকালে তুষারের উপর গভীর নিদ্রা যায়। শিকারিগণ এই অবস্থার তাহাদিগকে নিহত করে।

বৃহদাকার কুকুর ও বালুক লইয়া চামরী শিকার করা হয়। শিকারীগণ ইহাদের মারিবার স্থান অন্বেষণ করিয়া তাহার ২৪ গজ অন্তর অন্তর প্রস্তরের তৃপ প্রস্তুত করিয়া রাখে। শিকারী উহার একটার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যখন চামরী বেশ নিকটে আইসে, তখন শুলি করে এবং তৎক্ষণাৎ অন্য তৃপ আশ্রয় লয়। চামরী শূল পাইবামাত্র আহতই হউক আর অনাহতই হউক বেগে সেই দিকে ধাবিত হয় ও শূলধারা প্রস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকে। শিকারী এই অবসরে আবার শুলি করে এবং আর এক তৃপে লুকাইয়া যায়। এইরূপে চামরী হত হয়।

বন্যচামরী গৃহপালিত চামরীর প্রায় চতুর্গুণ। পূর্ণবয়স্ক চামরীর শূল প্রায় দুই হাত লম্বা। তিব্বতবাসীগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্যাদি খচিত করিয়া উহার পানপাত্র প্রস্তুত করে। বিবাহ ও উৎসবদিগের সময় উহাধারা স্তম্ভধূর পানীর ভোজ্যবর্ণকে প্রদত্ত হয়।

তিব্বতের নানাস্থানে লামাসর্যাই মধ্যে মহাকাণী মূর্তির সম্মুখে বলিদানার্থ চামরী দৃষ্ট হয়।

চৈত্র ও বৈশাখমাসে চামরী একটা মাত্র সন্তান প্রসব করে। চামরীবৎস দেখিতে অতি স্থলর ও অতিশয় জীড়ায়িত।

রূপসা, বুশার প্রভৃতি স্থানে চামরী গৃহপালিত হইতেছে। বুশার হইতে চামরী বিক্রমার্থ প্রেরিত হয়। শ্রীভিনয়গরে

চমরী বারা হল চালানা হরণ চমরী ও গো সংমিশ্রনে এক-
রূপ প্রাণী জন্মে। ইহারও প্রায় চমরীর ভায়।

চামরবিব কেশরোহিত্য ইনি প্রভায়ঃ। ২ ঘোটকী।
৩ চামর। [চামর দেখ।]

চামরীকৌরেন্না (দেশজ) এক প্রকার গুল্ম।

চামসা (দেশজ) শুষ্ক চর্মের গন্ধের দ্বারা গন্ধযুক্ত।

চামসারিন (পং) চমসিন্-কক্ (নড়ানিভাঃ কক্। পা ৪।১।২২)
চমরীর গোত্রাপত্য।

চামাটি (দেশজ) কুরাদি শান দিবার চামড়া। চলিত কথায়
চামাতি বা চামাটি বলে।

চামাটিপাটি (দেশজ) মাহুর প্রস্তুত করিবার উপযোগী
তৃণবিশেষ। (Cyperus Pangorii)

চামার (চর্মকার শব্দজ) ১ চর্মপ্রস্তুতকারী। ২ পাহুক
নির্মিতা। মুচি। [চর্মকার দেখ।]

চামার-তেজুড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক নামক
স্থান হইতে ৫৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত একটি পর্বত। ইহা
প্রায় ছয়শত ফিট উচ্চ। ইহার ৪৫০ ফিট উপরে জৈন-
মন্দির আছে। এই পর্বতের উপরে উঠিবার জন্য পাহাড়
খোদিত সিঁড়ি এবং উপরে পুষ্করী মন্দির প্রভৃতি আছে।
ইহার মধ্যদেশে ও উপরে জী পুষ্করাদি বহুবিধ প্রতীমুতি
খোদিত রহিয়াছে।

চামারদি, গুজরাট প্রদেশস্থ কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত
গোহেলবারের এক সামান্য রাজ্য। এই রাজ্যে একটি মাত্র
গ্রাম আছে। এখানকার উৎপন্ন রাজস্ব মধ্যে কতক গাইক-
বাড়কে ও কতক জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হইত।

চামারবৈষ্ণব, চামার জাতির মধ্যে বাহারি বিষ্ণুমত্রে দীক্ষিত
হয় ও ভেদ লইয়া ডোরকোপীন ধারণ করে, তাহাদিগের
নাম চামারবৈষ্ণব। ইহারা কেবলমাত্র চামারদিগকে
মন্ত্রোপদেশ দিয়া থাকে। চামারবৈষ্ণবদিগের মহাস্ত আছে।
মহাস্তেরা পৃথক পৃথক মঠে বাস করে। চামারবৈষ্ণবেরা
মহাস্তদিগের নিকট শিবা হয়। উৎকলপ্রদেশে এই প্রকার
বৈষ্ণবশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চামরাগুলি, অযোধ্যা প্রদেশস্থ উনাও জেলার একটি সহর।
উনাও সহর হইতে ৭ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দীক্ষিত উপাধি-
ধারী কজিয়গণ এই নগর স্থাপন ও বহুকাল এখানে কর্তৃত্ব
করেন। এখনও এখানকার একটি পল্লীতে বিস্তর দীক্ষিত
কজিয়ের বসবাস আছে। এখানে একটি গবর্নমেন্টের বিদ্যালয়,
শতের বাজার ও দুইটি প্রাচীন শিবমন্দির রহিয়াছে।

চামারালু (দেশজ) এক প্রকার আলু।

চামারী (দেশজ) এক প্রকার লতা।

চামারীশিম (দেশজ) লালরঙের এক প্রকার শিম।

চামীকর, (স্রী) চমীকরে রত্নাকরবিশেষে তবম্ চমীকর-অণা
১ অর্ণ। ২ ধ্রুবরত্নক। "জগতীরিহ কুদ্রিতচাকচামীকরাঃ।" (আখ)
(ত্রি) ৩ অর্ণমর।

"লশক চামীকরকিকীকঃ" (কুমারসম্ভব)। [অর্ণ দেখ।]

চামুণ্ডরাজ, গুজরাটের চৌলুকবংশীয় দ্বিতীয় রাজা। ইহার
পিতার নাম মুলরাজ; ইনি চাপোৎকটবংশীয় শেব রাজা
সামন্তরাজের ভগিনীপুত্র। বাল্যকাল হইতেই চামুণ্ডরাজ
অতিশয় বুদ্ধিকুশল ও বীৰ্যবান ছিলেন। তাহার পিতার
মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য শৃঙ্খলা-
বদ্ধ ও অনেক বিষয়ে উন্নতি করেন। বলভরাজ, হর্লভ-
রাজ ও নাগরাজ নামে তাহার তিন পুত্র জন্মে। একদা
চামুণ্ডরাজ কোন পাপকার্যে লিপ্ত হন। প্রায়শ্চিত্ত জন্য
কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গমন করেন। পথিমধ্যে
মালবরাজ তাহার রাজহত্যা ও চামর আত্মসাৎ করিয়া
ছিলেন। বাহ্য হউক, চামুণ্ডরাজ তীর্থস্থান হইতে রাজধানী
প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র বলভরাজকে মালবরাজের বিরুদ্ধে
যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বলভরাজ পথিমধ্যে
বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করার যুদ্ধযাত্রার কোন ফল কলে
নাই। পরে হর্লভরাজকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চামুণ্ডরাজ
পুনরায় শুদ্ধতীর্থে গমন এবং তথায় ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মানব-
লীলা সম্বরণ করেন। গুজরাটের অন্তর্গত পতননগরে
ইহার রাজধানী ছিল। ইহার সময়ে গজনীর সুলতান
মাদুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও গুজরাট লুণ্ঠন করেন।

চামুণ্ডরাজ, চাঁদবর্দাই-লিখিত দৌহার মধ্যে প্রবল প্রভা-
পাষিত বীরপুরুষ চামুণ্ডরাজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।
ইনি দেবগিরি জয় করিয়া পৃথীরাজের নিকট উপস্থিত হন
ও তাহাকে রেবাতট জয় করিবার জন্য উৎসাহপূর্ণ কতক-
গুলি কথা বলেন।

চামুণ্ডরায়, দাক্ষিণাত্যের বেলগোলা নামক স্থানে জৈন
মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা রাচ্ছমল্ল নরপতির প্রধান
মন্ত্রী। ইনি "চামুণ্ডরায়পুরাণ" নাম দিয়া কতকগুলি গ্রন্থ
একস্থানে সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থে ৬৩ জন প্রধান প্রধান
জৈন মহাত্মার অর্থাৎ ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন চক্রবর্তী, ৯
জন বাহুদেব, ৯ জন গুরুবল এবং ৯ জন বিশ্ববিষের বিবরণ
আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি চরিত্রসার নামে একখানি আধ্যাত্মিক
জৈনগ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ৯০০ শকে জীবিত ছিলেন।

চামুণ্ডা (স্রী) হর্গা। মাতৃকাবিশেষ। ইহার নামান্তর—

চর্কিকা, চর্মমুণ্ডা, মার্জারকর্ণিকা, কর্ণমোটা, মহাগন্ধা, তৈরবী ও কাশালিনী। ইহার ধ্যান যথা,—

“কালী করালবদনা বিনিক্রান্তাশিখাশিনী।

বিচিহ্নধট্টাধরা নরমালাবিকুণ্ঠা ॥

দীপিচর্মগরীধানা শুকমাংসাতিকৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ॥

নিমগ্নারক্তনয়না নানান্মুরিতদিশুখা ॥”

ইহার চামুণ্ডা নাম হইবার কারণ—

“যন্মাকুণ্ডক মুণ্ডক গৃহীত্বাত্মগুণগতা।

চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি ॥” (চণ্ডী)

চামুণ্ডা নারী শক্তি মহাসংগ্রামে শুভ নিশ্চয়ের চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইজন সৈন্যদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার চামুণ্ডা নাম হইয়াছে।

যিনি চামুণ্ডাদেবীর লগাট হইতে নিজান্ত হইয়াছেন, তাহারই নাম কালী। ইহার আটজন যোগিনী—ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কৰ্ত্তী, হস্তী, বিধাতৃকা, করালী এবং শূলিনী।

চামুণ্ডার বীজমন্ত্র—ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ (ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডারৈ বিষ্ণে)। চামুণ্ডা দেবশক্তিরূপা হইলেও সচ্চিদানন্দাত্মক-হেতু ত্রিকুণা। চিদ্রূপা মহাসরস্বতী, সেইজন্য সরস্বতীবীজ ঐ, সজ্জগা মহালক্ষ্মী তাই বীজ “হ্রীঁ”। আনন্দরূপা মহাকালী তাই কামবীজ ক্লীঁ।

“বিষ্ণে” (বিং, চ, ই) শব্দত্রয়ায়ক চিংসদ আনন্দবাচক। উক্ত সংজ্ঞা বিষ্ণুর প্রমাণও আছে যথা—“মহাসরস্বতি চিতে! মহালক্ষ্মীসদাশ্রিত্যে! মহাকালানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞানপ্রসিক্ষয়ে। অমুসন্দগ্ধে চণ্ডি! বয়ং স্বাং জয়মাশুজে।” (দক্ষিণামূর্তিসং)

যদিও মহালক্ষ্মীর বীজমন্ত্র “ত্রীঁ”, কিন্তু সেটা “হ্রীঁ” হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে, কারণ শকার ও হকার উভয়ে উন্নয়ন ও সজাতীয়, অতএব “ত্রীঁ”তে লক্ষ্মীশ্চ এই শাখান্তরে “ত্রীঁ” স্থানে “হ্রীঁ” পাঠ দেখা যায়। কামবীজ “ক্লীঁ”, এহলে শকার স্থানে রকার যোগ করার কালীবীজ “ক্লীঁ” হয়।

চামুণ্ডীবেড়া, মহিষুর রাজ্যের একটি পর্বত। অক্ষা° ১২° ১৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৪৪' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৮২ ফিট উচ্চ। এই পর্বতের শৃঙ্গদেশে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পর্বতবাহিরে মন্দিরসমূহে গমনপথে শিবকিঙ্কর নদী ও শিববাহন বুকের প্রতিমূর্তি পর্বতের গারে খোদিত ও পুথের দুই তৃতীয়াংশে ব্যাণ্ড রহিয়াছে। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা দোদ-দেব মহিষুরের সিংহাসনে অধিরোধ করিয়া এই প্রতিমূর্তি খোদিত করেন। হারদয়জালির রাজত্বকাল পর্যন্ত এই মন্দির সমুখে নরবলি হইত। এখানে প্রবাদ আছে যে,

ভগবতী-চামুণ্ডা এই দেশেই মহিষুর বধ করেন, সেইজন্য এই রাজ্য ‘মহিষাসুর’ শব্দের অপভ্রংশে মহিষুর নামে আখ্যাত।

চামুসি, মধ্যপ্রদেশস্থ চান্দা (চান্দা) জেলার অন্তর্গত মূল তহসীলের একটি সহর। ইহা বেণগঙ্গার বামপার্শ্বে অবস্থিত। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও আদিম অধিবাসীর বাস। লোক সংখ্যা ৩৪৮০। নিজাম রাজ্যের সহিত তেরাণ্ডা বীজ ও পূর্ব-উপকূল হিত প্রদেশের সহিত যত কার্ণাট প্রকৃতির বাণিজ্য চলিয়া থাকে। এখানে একটি সাপ্তাহিক হাট, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

চায় (জি) চয়সা বিকার, চয়-অণু। (তালারিতোহণ, পৃ ৪৩১৫২) চয়ময়।

চায়ক (জি) চি-খুল। যে চয়ন করে।

চায়নীয় (জি) চায়-কর্মণি অনীয়ন্। পূজনীয়। (নিরুক্ত)।

চায়মান (পুং) চয়মানোহিত রাজোহিপত্যং চয়মান-অণু। ১ চয়মাণ রাজার পুত্র। (অঙ্ ৩২৮৮) (জি) চায় শাসক। ২ পূজা। ৩ দৃষ্ট।

চায়ু (জি) চায়-উণ্। পূজক। “বজ্জমু বউ চায়বঃ।” (অঙ্ ৩২৪৪) ‘চায়বঃ পূজকাঃ।’ (সারণ)

চার (পুং) চর এব চর-স্বার্থে অণু। ১ গৃচপুত্র, চর।

“চারঃ সুবিহিতঃ কার্য আত্মনশ্চ পরন্ত বা।

পাণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রৈব যোজয়েৎ ॥” (ভারত ১।১৪ অঃ)

কৃষি, দুর্গ, বাণিজ্য, খাতাদি মর্দনহানের খাজনা আদায়, সৈন্যদিগের করগ্রহণ, অশ্ব ও হস্তীদিগের বন্ধন, পতিত ক্ষেত্রাদির প্রজাসংগ্রহ, প্রজাদিগের শত্রুরক্ষার্থ বীধ প্রকৃতি নির্মাণ এই অষ্টবিধ বিষয়ে রাজা আটপ্রকার চার নিয়োগ করিবেন। স্বামী, সচিব, রাষ্ট্র, মিত্র, কোশ, বল, দুর্গ, রাজ্যাল, অন্তঃপুর, পুত্রদিগের মনের ভাব, মালাশিষ্টকাদি রক্ষণগৃহ, শত্রু ও শত্রুতা মিত্রতাপ্রভৃ উদাসীন রাজাদিগের বলাবল জানিবার জ্ঞও রাজা চার নিযুক্ত করিবেন। রাজা সজ্জার সময়ে মন্ত্রীর সহিত নির্জনে গিয়া চারকে রহস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন। স্বপুত্র, অন্তঃপুর, রক্ষণগৃহ ও মন্ত্রী ইহাদিগের রহস্ত বৃত্তান্ত জানিবার জ্ঞ যে চার নিযুক্ত হই-রাছে, তাহাকে মধ্যরাজে রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিবেন।

যে নানা বেশ ধরিতে পারে, বাহার ভার্যা পুত্রাদি আছে, যে বহুভাষাভিজ্ঞ, পণের অভিশ্রয় সহজেই বুঝিতে পারে, অতিশয় ভক্ত, সামর্থ্যশালী ও নির্ভর এইরূপ চার উপযুক্ত। রাজা কৃষিবিষয়ে আত্মসদৃশ বাণিজ্য ও দুর্গাদিবিষয়ে বলবান, এবং অন্তঃপুরে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ চার নিযুক্ত করিবেন।

(কালিকাপুং ৮৫ অঃ)

২ (কী) চর-কর্ণশি অণ্। চর্যাতে ভক্যতে কোপবেবাদি-
বশাৎ। কৃত্রিম বিষ, মাহ ধরিবার জন্য বড়লীতে গাঁথা দ্রব্য।
(দেশজ) ৩ চলিত কথার চারি সংখ্যা।

চারআইমাক (আইমাক কাবুল, পারস্ত, মঙ্গোলিয়া,
মাছুরিয়া এবং ফুকদদেশীর শব্দ, ইহার অর্থ জাতি।) অর্থাৎ
চারিজাতি। হিরাত ও কাবুলের উত্তরে পার্শ্বপ্রদেশে
চারিপ্রকার চারআইমাক বাস করে। কথিত আছে
এসিদ্ধ তৈমুর খাঁ ইহাদিগকে ফিরোজ-কোহ নামক স্থানে
পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যস্থ পার্শ্বপ্রদেশে
স্থাপন করেন। তদবধি তাহারা ফিরোজকোহ নামেও
বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। লাম্ব সাহেব বলেন,
চারআইমাক জাতি তাইমনি, হাজারা, জুরি ও তৈমুরী
এই চারি প্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু ভ্যাঙ্ক সাহেব বলেন, উহার
তৈমুরী, তেইমেণী, ফিরোজ-কোহিও-জামসিডি এবং পার-
সিক এই চারি প্রেণীতে বিভক্ত।

চারইয়ারি, ইসলামধর্মাবলম্বী একপ্রকার হুরি সম্প্রদায়।
ইহার আবু বকর, ওমার, ওসমান ও আলী এই চারিজনকেই
প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন।

চারক (ত্রি) চারমতি ত্রিচর-পুল। ১ গো অখাদির পালক,
পশুপালক। ২ সঞ্চারক। "ন চাহমাশাং কুর্ঘ্যাং তে পাপ-
প্রচ্ছরচারকঃ" (রামাং ৩৬৬।১৮) ৩ বন্ধ। ৪ গতি। ৫ পিয়াল
বৃক্ষ। ৬ কারাগার। "নিগড়িতচরণা চারকে নিবোধব্যা।"
(দশকুমার)।

চার-স্বার্থে কন্। ৭ গুপ্তচর। "ত্রিভিভিরবিজ্ঞাতৈর্বৎসি
তীর্থানি চারকৈঃ।" (ভারত ২।৫।৩৮।) ৮ চালক। ৯ সহচর।
১০ অখারোহী। ১১ ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ১২ মধ্যা।

(কী) চরকেণ নির্মিতং চরক-অণ্। ১৩ চরকনির্মিত।

চারকচু (দেশজ) একপ্রকার কচু।

চারকীণ (ত্রি) চারক-থৎ। ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ ছাত্রের উপযুক্ত।

চারখানা (দেশজ) একপ্রকার চেকের কাপড়।

চারচক্ষুঃ (পুং) চারচক্ষুরস্ত বহুব্রী। রাজা।

"যস্মাৎ পশুন্তি দূরতঃ সর্কানর্থান নরাধিপঃ।

চারেণ তস্মাচ্চ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুঃ।" (রামাং ৩।৩৭ স*)

রাজগণ চারবারাই দূরস্থ সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন
বলিয়া তাহাদিগকে চারচক্ষুঃ বলে।

চারচণ (ত্রি) চার-চণ্। বাহির গমন সূক্ষ্ম।

চারচক্ষু (ত্রি) ভ্রমণকালে ঘাটকে ভাল দেখায়। সূক্ষ্মরগতিযুক্ত।

চারটিকা (কী) চর-গিচ্-অটন্ (শব্দাদিত্যোহটন্। উণ্ ৪।৮১)

ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অন্ত ইৎ। নলীনামকগন্ধদ্রব্য।

চারটী (কী) চর-গিচ্-অটন্ ভক্তো গৌরাদিবাং টী। ১ পদ্ম-
চারিণী বৃক্ষ। ২ ভূম্যাবলম্বী।

চারণ (পুং) চারয়তি প্রচারয়তি নৃত্যগীতাদিবিদ্যাং ভঞ্জন্য
কীর্তিং বা। চর-গিচ্-লু। ১ কীর্তিসঞ্চারক মট। ইহার নামান্তর
কুলীলব। (অমর) ২ গন্ধর্ববিশেষ।

"গন্ধর্বগাং ভক্তো লোকঃ পরতঃ শতবোজনাত্।

দেবানাং গায়নাং চ চারণাং জুতিপাঠকাঃ।"

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

৩ দেবযোনিবিশেষ। "গন্ধর্ববিদ্যাধরচারণাঙ্গরঃ" (ভাগবত)

৪ চার পুরুষ। "অন্তর্কর্ষিচ্চ ভূতানাং পশান্ কর্ণাণি
চারণৈঃ। উদাসীন ইবাধ্যাকো ধায়ুয়াত্মৈব দেহিনান্।" (ভাগ০)

৫ ভ্রমণকারী। "ন কুর্ঘ্যান দীর্ঘহৃদৈরলসৈশ্চারণৈশ্চ।"

(ভারত)

৬ বাগীশ্বরী দেবীভক্ত অত্রিগোত্রীর একজন রাজা, ঐশ্বর্যের
পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১।৩২।২৬।)

৭ কোলাহা-দেবীভক্ত প্রিয়র্ষি গোত্রীর একজন রাজা,
শুকের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১।৩৭।৩)

চারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলস্থ একটা জাতি। সহ্যাদ্রিখণ্ডের
মতে—

"বৈশ্রধর্ম্মেণ শূদ্রায়াং জাতো বৈতালিকাতিথঃ।

চারণোহসাবশি ভবেন্নানো বৃষলধর্ম্মতঃ।

রাজাং চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূণ্যবর্ণমন্তং পরঃ।

সংগীতং কামশাস্ত্রঞ্চ জীবিকা তন্ত বৈ শূদ্রা।" (২৬।৪২-৫০)

বৈশ্রধর্ম্মী দ্বারা শূদ্রার গর্ভে বৈতালিক জন্মে, চারণ-
জাতিরও ঐরূপ উৎপত্তি, তবে বৃষলত্ব হেতু ইহার কিছু নূন
হইরাছে। রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের শূণ্যবর্ণনা, সঙ্গীত ও কাম-
শাস্ত্র ইহাদের উপজীবিকা।

আচার ব্যবহার ও কার্যকলাপে এই জাতি ঠিক ভাট
জাতির মত। চারণেরা বলে, মহাদেব পার্শ্বতীকে শ্রীতিদান
করিবার অভিলাষে নিজ ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু হইতে ভাট
জাতির সৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাটেরা পার্শ্বতীর শূণ্যকীর্তন
না করিয়া মহাদেবেরই শূণ্যকীর্তন করিতে আরম্ভ করে;
সুতরাং পার্শ্বতী ভাটদিগের উপর সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত
অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন এবং মর্ত্যভূমে রাজাদিগের ও দেবতা-
দিগের শূণ্যকীর্তন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য
অভিসম্পাত করিয়া তাহাদিগকে মর্ত্যে প্রেরণ করেন। অপর
একটা প্রবাদ আছে যে মহাদেব সিংহ হইতে তাহার বৃষের
রক্ষণার্থ ভাটের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাটের তত্ত্বাবধানে
 থাকিয়াও সিংহ প্রত্যহই বৃষের আশংকার করিয়া উন্নয় পূরণ

করিত এবং মহাদেবকে প্রত্যাহইনুতন বৃষস্টি করিতে হইত। ইহাতে মহাদেব অসন্তুষ্ট হইয়া ভাটি অপেক্ষা বলবান্ ও সাহসী চারণকে স্টি করিয়া সিংহ ও বৃষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করেন। চারণের তত্ত্বাবধানে সিংহ আর বৃষের প্রাণ সংহার করিতে পারিত না। তাহার সন্তানেরা চারণ নামেই অভিহিত হইয়া একটি জাতিমধ্যে গণ্য হয় এবং ইচ্ছাপূর্বক মর্ত্যে আসিয়া বাস করে। চারণেরা সুকলের বংশাবলীর বিবরণ অভ্যাস করিয়া রাখে এবং কবিতায় বংশাবলী কীর্তন দ্বারা সাধারণকে সন্তুষ্ট করে। সিদ্ধ-প্রদেশস্থ মরুজলের চারণগণ ভিক্ষুকবেশী, বিবাহ ও অন্ত্যস্ত পক্ষোপলক্ষে তাহার লোকের বাড়ী গিয়া নানা কৌশলে অর্থ উপার্জন করে। যাহা হউক চারণেরা সাধারণের সম্মানিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মালব ও গুজরাট অঞ্চলে কেহ কোন সময়ে পথভ্রমণে বাহির হইলে সঙ্গে চারণ লইয়া যায়; বিশ্বাস যে, চারণেরা মহাদেব কর্তৃক উৎপাদিত বলিয়া দস্যুগণ তাহাদের সম্মুখে পথিকদিগকে মারিতে সাহসী হয় না। ভ্রমণাবস্থায় কোন সময়ে দস্যু উপস্থিত হইলে সহচর চারণ অগ্রসর হইয়া “আমি শিব-বংশোদ্ভব, আমার সম্মুখে যেন কোনরূপ পাপকর্ম্ম না হয়” এই বলিয়া সহচর পথিককে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। যদি তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারে, তাহা হইলে দস্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া “এই শোণিত তোমাদিগের মস্তকে পতিত হউক” এই বলিয়া স্বীয় বাহুর উপর তরবারী নিক্ষেপ করে এবং যদ্যপি তাহাতেও কোনরূপ সফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে নিজ বক্ষঃস্থলে তরবারী নিক্ষেপ করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করে। চারণগণ মৃত্যুকে ভয় করে না, সকলেই প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। ইহারা কাচিলি ও মরু দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই দুই প্রধান সম্প্রদায় পুনরায় ১২০ পরিবারে বিভক্ত। কাচিলি চারণগণ বাগিজ্য বাবসা ও মরু চারণগণ ভাটের কাজ করিয়া জীবন-বাণন করিয়া থাকে। এই দুই সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহাদি কার্য চলে না। তবে মরু-চারণগণ রাজপুতদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।

মিবার-ইতিবৃত্তে বিখ্যাত রাণা হামীর কচ্ছভুজ নামক স্থানের সমিহিত প্রদেশ হইতে চারণদিগকে আনাইয়া চিতোরের নিকট মাল্গা নামক স্থানে বাস করান এবং তাহা-দিগকে সম্মানসূচক কার্যে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে এখান-কার চারণগণ সাধারণের নিকট সম্মানিত হয় এবং রাজ-পুতনার মধ্যে বিনা শুকে বাগিজ্য করিতে অহুমতি পায়।

চারণগণ লেখাপড়া শিক্ষা করে। কাচিলি-চারণগণ বাবসা বাগিজ্যে বিশেষ নিপুণ। মরুচারণগণ বংশাবলী ও বীরগণের যশোগান অভ্যাস করিয়া রাখে। যুদ্ধপ্রিয় রাজপুত জাতি চারণদিগের মুখনিঃসৃত বীরকাহিনী সাদরে শ্রবণ করেন। বিশেষতঃ রাঠোরেরা চারণগণকে সকল সময়েই অন্তরের সহিত ভালবাসে।



ইহারা কখনই জাতীয়তা ত্যাগ করেনা। রাণা হামীর কর্তৃক গুজরাট হইতে আনীত চারণগণ চিতোরের নিকটে বহুশতাব্দী বাস করিয়াও এ পর্যন্ত জাতীয় পরিচ্ছদেই ভূষিত থাকে, তাহাদিগকে রাজপুতদিগের দ্বায় বেশভূষায় সজ্জিত হইতে দেখা যায় না। ইহারা ঢিলা পোষাক ও উচ্চ উষ্ণীয় পরিধান এবং লম্বা দাড়ি রাখে।

চারণদারা (স্ত্রী) নটী প্রভৃতি।

চারণবিদ্যা

চারণবৈদ্য

চারণাবিদ্যা

(পুং) অর্থক্সবেদের অংশ বিশেষ।

চারপথ (পুং) যে স্থানে দুইটা রাস্তা মিলিত হইয়াছে সেই স্থান, বহুলোকের গমনের নিমিত্ত পথ, রাজপথ।

চারভট (পুং) চারের চরম ভট; যথা চারে বুদ্ধিকোশলাদি প্রচারে ভটঃ। বীর, সাহসী ব্যক্তি।

চারমিক (স্ত্রী) চরমমধ্যেতে বেদ বা চরম-ঠক্ (বসন্তাদিত্যঠক্। পা ৪।২।৬৩।) চরম অধ্যয়নকারী।

চারবায়ু (পুং) চারণ স্বর্ষ্যস্তোত্রপতিভেদেন প্রেরিতো যো বায়ুঃ। গ্রীষ্মকালের বাতাস।

চারসন্দা, পঞ্জাবের অন্তর্গত পেশাবর জেলার একটা নগর। হস্তনগর তহসীলের কার্যালয় এই স্থানে অবস্থিত। ইহা পেশাবর হইতে ১৬ মাইল উত্তরপূর্বে। স্বাং নদী ইহার বামদিক দিয়া প্রবাহিত। অক্ষা° ৩৪° ৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৬' ৩০" পূঃ। ইহার লোকসংখ্যা ১০৬১৯। তন্মধ্যে হিন্দু ৫৩৮, মুসলমান ৯৯৪৩ এবং শিখ ১৩৮। এখানে পেশাবর, মর্দন এবং নওসহরের রাস্তার যোগ আছে। শেখোক্ত স্থানে উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের একটা ষ্টেশন আছে। প্রাক নামক গ্রাম ইহার নিকটে অবস্থিত। জেনারল কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই দুইটা স্থান পুঙ্লাবতী নামে অভিহিত হইত, এবং যে সময়ে সত্ৰাট আলেক্সান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সে সময়ে ইহা একটা প্রসিদ্ধ নগররূপে গণ্য ছিল। ইতিহাসবেত্তা এরি-রান লিখিয়াছেন যে, অসটিস্ নামক একজন সেনাপতি শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহার অন্তর্গত একটা কেল্লা রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হন। এক সময়ে ইহা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের একটা পবিত্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব এখানে তাঁহার চক্ষু দুইটা ভিক্ষা-স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থ এখানে একটা মন্দির নির্মিত হয়। তদর্শনার্থ এখানে যাত্রীগণের সমাগম হইত। ইহার চারিদিকে এখন প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

চারসম্প্রদায়, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ভাটদিগের একটা বিভাগ। ইহার রামাভূজ প্রভৃতি প্রধান চারিসম্প্রদায়ের শিষ্যপ্রাণী প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মত তাহা কীর্তন করিয়া থাকে। এই ভাটেরা আপনাদিগকে “চার-সম্প্রদায় কা ভাট” বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার বিষ্ণুপাসক। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিকট গমন করিয়া স্তুতিপাঠ, যশোবর্ণন ও শিষ্যপরম্পরার আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের কীর্তন বিষয়ে কবির বলে।

চার (দেশজ) ১ একপ্রকার পক্ষী। ২ ছোটগাছ। ৩ উপায়াস্তর। চারান্তরিত (পুং) গুপ্তচর।

চারায়ণ (পুং জী) চরত গোত্রাপত্য চর-ক্ষু। (পা ৪১১৯৯) ১ চরের গোত্রাপত্য। ২ সাধারণাধিকরণ নামে এক কামশাস্ত্রকার, বাৎস্তারণ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চারায়ণক (ত্রি) চারায়ণেভ্য আগতঃ। চারায়ণ-বৃক্ষ। (পা ৪১৩৮০)। চারায়ণীয় ছাত্র।

চারায়ণীয় (পুং) ১ চারায়ণের ছাত্র। ২ কথল।

চারিকর, আফগানস্থানের অন্তর্গত একটা স্থান। ইহা

ওপিয়ান্ নামক স্থানের নিকট। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে কাবুল-যুদ্ধ হয় সেই সময় হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে প্রধান সেনাপতি ম্যাক্ কাস্কিল দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করেন।

চারিকচারিকা (জী) ১ সহচরী। ২ আরওলা, তেলাপোকা।

চারিকাগিশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম। (Psophocarpus tetragonolobus.)

চারিণী (জী) চারয়তি স্বগুণমিতি চর-গিচিনি জীপ্ চ। করুণীবৃক্ষ।

চারিতার্থ (জী) চরিতার্থত্ব ভাবঃ। চরিতার্থতা, উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

চারিত্র (জী) চরৈবৃত্তে চর-গিত্রন্। চরিত্রমেব চারিত্রম্ স্বার্থে-অণ্। ১ চরিত্র, স্বভাব। “কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্।” (রামা° ৩ ৫৯৯।) ২ কুলক্রমাগত আচার। “চারিত্রং যেন নো লোকে দৃষিতং দৃষিতাম্মনা।” (হরিবংশ ১৭০ অঃ) (পুং) ৩ মরুৎগণের অস্তিত্ব।

(হরিবংশ ২০৪ অঃ।)

চারিত্রকবচ (ত্রি) সংস্বতাবরূপ বর্মে আবৃত।

চারিত্রবতী (জী) একপ্রকার সমাধি।

চারিত্রবর্দ্ধন, একজন বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার, অপর নাম সরস্বতীবাচনাচার্য্য। খরতরগচ্ছীয় ত্রীজিনপ্রভাচার্য্যের পুত্র। সাধু অরডকমলের আদেশে ইনি শিত্তহিতৈষী নামে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের টীকা, এতত্ত্ব নৈষধ, শিশু-পালবধ, রাঘবপাণ্ডবীর প্রভৃতি কাব্যের টীকাও রচনা করেন। অফ্রোজ্ সাহেব ইহাকে রামচন্দ্রভিষজের পুত্র ও ইহার অপর নাম সাহিত্যবিদ্যাধর লিখিয়াছেন *। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, রামচন্দ্রের পুত্র বিদ্যাধর ও চারিত্রবর্দ্ধন উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

চারিত্রসিংহগনি, জিনভদ্রহরির উত্তরাধিকারী ভাবধর্মগণির প্রাশিষ্য ও মতিভদ্রের শিষ্য। ইনি ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে কাতন্ত্র-বিভ্রমহ্মত্ৰ ও অবচুরি, এ ছাড়া ষড়্দর্শনবৃত্তি রচনা করেন।

চারিত্রা (জী) চারিত্রমন্ত্রস্তাবো বিদ্যাতে অত্যাঃ। চারিত্র-অচ্ছিয়াং টাপ্। তিস্তিভীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ।

চারিত্র্য (জী) চরিত্রমেব চারিত্র্যঃ চরিত্র-স্বার্থে ষাঞ্। স্বভাব। [চরিত্র দেখ।]

চারিদরজা (পারস্ত) খোলা জায়গা।

চারিন্ (ত্রি) চর-গিনি। ১ সঞ্চারকারী, গমনকারক।

.(পুং) ২ পদাতিসৈন্য। জী চারিণী। ৩ করুণীবৃক্ষ।

চারিবাচ্ (জী) একপ্রকার বৃক্ষের নাম, কর্কটশৃঙ্গী।

চারী (জী) চার: পদনিক্ষেপনক: গতিভেদো বা অন্ত্যাত্মা (অর্শ আদিভোহ্। পা ৫।২।১২৭।) ততঃ ভীপ্। নৃত্যাক বিশেষ। “মাধুর্য্যোবর্তনা নৃত্যে চারী চারুগতির্মতা।” চারী ব্যতিরেকে নৃত্য হয় না। শূদ্ধারাদিরসের ভাবোদীপক এবং মধুরতাজনক সুন্দর গতিকে চারী বলে। মতান্তরে এক বা দুই পদধারা নৃত্যকেও চারী বলে।

ভূচারী ছাবিশপ্রকার—যথা সমনধা, নুপুরবিদ্ধা, তিষ্ঠাঙ্ক মুখী, সরলা, কাতরা, কুবীরা, বিলিষ্টা, রথচক্রিকা, পাঞ্চি-রেচিতকা, তলদর্শিনী, গজহস্তিকা, পরাবৃত্ততলা, চারুতাড়িতা, অর্দ্ধমণ্ডলা, শুভ্রকীড়নকা, হরিণজালিকা, চারুরেচিকা, তলোদ্বত্কা, সঞ্চারিতা, ক্ষুরিকা, লজ্জিতজন্বা, সজ্জাতিতা, মদালসা, উৎকৃষিতা, অতিতিথ্যক-কৃষিতা ও অপকৃষিতা। কাহারও মতে ভূমি-চারী বোলপ্রকার—সমপাদস্থিতা, বিদ্ধা, শকটাক্ষিকা, বিব্যাধা, তাড়িতা, আবদ্ধা, এড়কা, ক্রীড়িতা, উরুবৃত্তা, ছন্দিতা, জনিতা, স্পন্দিতা, স্পন্দিতাবতী, সমতরী সমোৎসারিতঘট্টিতা, উচ্ছন্দিতা।

আকাশচারীও বোলপ্রকার—বিক্ষেপা, অধরী, অজ্জি-তাড়িতা, ভ্রমরী, পুরুক্ষেপা, স্থচিকা, অপক্ষেপা, জন্বাবর্তা, বিদ্ধা, হরিণপ্রুতা, উরুজন্বান্দোলিতা, জন্বা, জন্বনিকা, বিচুৎক্রান্তা, ভ্রমরিকা, দণ্ডপাখী। মতান্তরে—বিজ্ঞাতা, অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তিকা, উর্দ্ধজাহু, দোলোদ্বত্কা, পাদোদ্বত্কা, নুপুরপাদিকা, ভূজজ্ঞাতালিকা, ক্ষিপ্তা, আবদ্ধা, তালা, স্থচিকা, বিছাৎক্রান্তা, ভ্রমরিকা, দণ্ডপাদা। যিতা-হারী ও প্রমসহিষ্ণু হইয়া তৈল মাখিয়া এই সকল চারী প্রথমতঃ শুভ্র বা স্ফিভিদেখে অভ্যাস করিবে; রূপাহারী বা টক্ খাইয়া কখনও অভ্যাস করিবে না। (সঙ্গীতদামোঁ)

চারু (ত্রি) চরতি চিত্তে ইতি চর-উণ্। ১ মনোজ্ঞ, সুন্দর। “কোশতং চারু চমুকচর্মণা” (মাঘ ১) চরতি দেবেষু শুক-ধ্বন (পুং) ২ ব্রহ্মপতি। (ক্লী) ৩ কুসুম। (পুং) ৪ রঞ্জিণীর গর্ভমজ্জত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিং ১১৭।৩৯।)

চারুক (পুং) চারু-সংজ্ঞার্থে কন্। ক্ষুদ্রধাম্যবিশেষ। ইহার গুণ—মধুর, রূক্ষ, রক্ত, পিষ্ট ও কফনাশক, ঠাণ্ডা, লঘু, কষায়, বীৰ্য্যকর ও বাতবর্জক।

চারুকেশরী (জী) চারুদি কেশরাণি অস্তা। ১ নাগরমুখা, নাগরমুতা। ২ তরুণীপুপ, সেইতীকুল।

চারুগর্ভ (পুং) চারু: মনোজ্ঞ: গর্ভ: অন্তঃকরণং যন্ত। অথবা উৎপত্তিহানং যস্য। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিং ১৬০।৬।)

চারুগীতি (জী) ছন্দোভেদ, গীতির প্রকার ভেদ।

চারুগুপ্ত (পুং) চারু যথা তাত্ তথা গুপ্ত: রক্ষিত:। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিং ১৬০।৬।)

চারুচিত্র (পুং) দ্বুতরাঙ্কোর এক পুত্র।

চারুতা (জী) চারু ভাবে তল্। (ভক্ত ভাবহৃত্তলোঁ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। সৌন্দর্য্য, রমণীয়তা।

চারুদত্ত (পুং) মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক। বৈষ্ণবকল্পা বসন্তসেনার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার যথাসম্ভব ব্যয় করেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। মৃচ্ছকটিক ব্যতীত জিনসেন আচার্য্য-কৃত অরিন্ট-নেমিপুরাণে ও জৈম পদ্মপুরাণে চারুদত্তের প্রসঙ্গ আছে।

চারুদেব (পুং) শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। নিকুন্ত প্রভৃতি অসুর-দিগের সহিত কৃষ্ণসেনার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, চারুদেব সেই যুদ্ধে মৈন্যবাহের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। (হরিং ১৪৩ অঃ)

চারুধারা (জী) চারুং চারুতং ধারয়তি ধারি-অণ্ অথবা চার্বী ধারা ব্যবহার: অস্তাঃ। ইত্ৰপত্নী শচী।

চারুধিষ (পুং) একাদশ মন্বন্তরের সপ্তদ্বিধ মধ্যে একজন।

চারুনালক (ক্লী) চারু নালং যস্য কপ্। কোকনদ, রক্তপদ্ম।

চারুনেত্র (ত্রি) চারু মনোহরং নেত্রং যস্য। ১ সুন্দর নয়ন-বিশিষ্ট। ২ (পুং) হরিণ। ৩ অঙ্গরাবিশেষ। (কাশীখং ১০ অঃ)

চারুপদ (পুং) পুরুবংশীয় রাজা মধুসূর এক পুত্র। (ভাগ০ ৯।২০।২।)

চারুপর্ণী (জী) চারুণি পর্ণাণি অস্তাঃ। প্রসারণী, গন্ধতাদাল।

চারুপুট (পুং) চারুপুটময়। সঙ্গীতের তালবিশেষ।

চারুপ্রতীক (ত্রি) সুন্দর উপক্রমযুক্ত। “চারুপ্রতীক আহতঃ” (অক্ ২।৮।২) ‘চারুপ্রতীক: শোভনোপক্রমঃ’ (সারণ)

চারুফলা (জী) চারু মনোহরং ফলং অস্তাঃ। জাফলাতা, আঙ্গুরগাছ।

চারুবাছ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিং ১৬০।৬।)

চারুভদ্র (পুং) শ্রীকৃষ্ণের একপুত্র। (হরিং ১৬০।৬।)

চারুমৎ (পুং) একজন বৌদ্ধ চক্রবর্তী। (বুৎপতি)

চারুমতী (জী) রঞ্জিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের এক কন্যা। (হরিং ১৬০ অঃ)

চারুমশ্ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের একপুত্র। (ভারত অঙ্ক ১৪ অঃ)

চারুরাবা (জী) ইত্ৰপত্নী শচীর নামান্তর। (হেমং)

চারুলোচন (ত্রি) চারু লোচনং যস্য বহুব্রী। ১ সুন্দর নেত্রযুক্ত। “তস্যাং প্রণম্য যাতায়াং কামস্তাং চারুলোচনাং” (হরিং ১৫৩ অঃ)

(পুং) ২ হরিণ। (ত্রিকাণ্ড) জিহ্মং টাপ্।

চারুবক্ত (ত্রি) চারুবক্তং মুখং যন্ত। ১ সুন্দর মুখযুক্ত। (পুং) ২ কাণ্ডিকের এক অহুচর। (ভারত পণ্ড্য ৪৬ অঃ)

চাৰুবৰ্জন (জি) চাক: চাকতাং বৰ্জয়তি বৃথ-শিচ-স্মৃট্।
সৌন্দৰ্য্যবৰ্জক।

চাৰুবৰ্জনা (জী) চাকবৰ্জন-জিরাং টাপ্। রমণী। (রাজনিং)

চাৰুবিন্দ (পুং) চাক চাকতাং বিন্ধতি বিন্ধ- (গবাদিযু
বিন্ধে: সংজ্ঞায়াং। বার্তিক ৩১।১৩৮।) ঐক্ৰফের একপুত্র।
(হরিবংশ ১৬০।৬)

চাৰুবেশ (জি) চাক: বেশ: যন্ত বহত্ৰী। ১ অন্নর বেশবৃত্ত।
(পুং) ২ কল্পিতগৰ্ভজাত ঐক্ৰফের একপুত্র। (ভাং অহু ১৪অঃ)

চাৰুব্রত (জি) চাক ব্রতং যন্ত বহত্ৰী। অন্নর ব্রতবিশিষ্ট।

চাৰুব্রতা (জী) চাকব্রত-জিরাং টাপ্। একমাস উপবাসী
স্ত্রীলোক। (জিকাত)

চাৰুশিলা (জী) চাকী শিলা কর্ণধা। ১ অন্নরশিলা। “কুতু-
হলাচ্চাকশিলোপবেশং” (ভট্ট)। ২ মণিরত্ন।

চাৰুশীৰ্ষ (জি) চাক শীৰ্ষং মন্তকং যস্য বহত্ৰী। ১ অন্নর
মন্তকবিশিষ্ট। ইন্ডের সখা আলম্ব অবির পুত্রহেতু ইহার
আর একটা নাম আলম্বায়ন। (ভারত অহু ১৮ অঃ।)

চাৰুশ্রবস্ (জি) চাকনী শ্রবসী কর্ণো যন্ত বহত্ৰী। ১ অন্নর
কর্ণযুক্ত। (পুং) ২ ঐক্ৰফের কল্পিতগৰ্ভজাত এক পুত্র।
(ভারত অহু ১৪ অঃ)

চাৰুহাসিন্ (জি) চাক যথা ভথা হসতি হস-গিনি। যে
অন্নর হাস করে।

চাৰুহাসিনী (জী) চাকহাসিন্ জিরাং ভীপ্। ১ অন্নর হাস-
কারিণী স্ত্রী। ২ বৈতালীর ছন্দোবিশেষ। “অযুগ্ভবা চাক-
হাসিনী” (বৃত্তরং)

বৈতালীরেয় অন্তর্গত প্রবৃত্তকের বিবম অর্থাৎ প্রথম ও
তৃতীয় পাদেয় লক্ষণক্রান্ত যে ছন্দ: তাহাকে চাকহাসিনী বলে।

চাৰেক্ষণ (পুং) চার: ক্ষণং যন্ত বহত্ৰী। যিনি চার দ্বারা
দেখেন, নৃপতি। [চারক্ষণ: দেখ।]

চাৰ্ (দেশজ) বড়লীতে মংতাদি ধরিবার পূর্বে তাহাদিগকে
যে ভক্ষ্যক্রবা দেওয়া যায়।

চাৰ্চিক (পুং) চৰ্চাং বেত্তি তৎপরং গ্রহ্যং অধীতে বা, চৰ্চা-
উদ্ধাদিহাং ঠক্। (কৃতকৃদ্ধাদিস্থজাত্যঠক্। পা ৪।২।৬০।)
বিচারমন্ত বা চৰ্চাপরগ্রহঅধ্যয়নশীল। (জিকাত)

চাৰ্চিক্য (স্ত্রী) চৰ্চিকা এব স্বার্থে ব্যঞ্। কুছুমাদি দ্বারা
গজলেপন।

চাৰ্ণক (Job Charnock) একজন ইংরাজ। ইহার পূর্ণ
নাম যব চাৰ্ণক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট হইয়া
বাংলায় আগমন করেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি মুর্শিদাবাদের
নিকটস্থ কাসিমবাজারের জুগীৰ অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশহরের প্রতিনিধি ইংরাজদিগের সহিত
গোলযোগ করিয়া হুগলীর কুঠী আক্রমণ করিলে, চাৰ্ণক
সাহেব মোগলসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সুবিধা
করিয়া লয়েন। তাহার কিছুকাল পরে সম্রাট অরঙ্গজেবের
যাত্রীপূর্ণ কএকখানি জাহাজ ইংরাজ কর্তৃক ধৃত হইলে,
তিনি ক্রোধাক্ত হইয়া ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে
বিদূরিত ও হুগলী মুঠন করিতে আদেশ করেন। তাঁহার
আদেশক্রমে হুগলী কুঠীর উপর অত্যাচার আরম্ভ হইলে
চাৰ্ণক সাহেব বাধ্য হইয়া লোকজন সহ হুগলীনদীর মোহা-
নাম্ হিজলীদীপে পলায়ন করেন। যাহা হউক, ইহার
অল্পদিন পরেই বাংলার মোগলপ্রতিনিধি সন্ধির প্রস্তাব
করিয়া সৈন্যাদি সহ সূতাহুটি নামক স্থানে আশিবার জজ
চাৰ্ণক সাহেবকে লিখিয়া পাঠান, কিন্তু কাপ্তেন হিথ তৎকালে
সন্ধি বন্ধ রাখিয়া যুদ্ধ চালাইবার আদেশ লইয়া ইংলণ্ড হইতে
এ দেশে আসিয়া পৌছিলে, চাৰ্ণক সাহেব সমুদায় সৈন্য-
সহ বালেশ্বর ধ্বংস ও চট্টগ্রাম পুনর্গ্ৰহণপূর্বক মাদ্রাজে
উপস্থিত হইলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের সহিত
ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলে তিনি বাংলাদেশে আগমন
করেন এবং হুগলীনদীর তীরস্থ সূতাহুটি ও তরিকটবর্তী স্থান
সকল ক্রয় করিয়া তথায় এক কুঠী স্থাপন করিলেন।
অনেকের বিশ্বাস যে চাৰ্ণক সাহেবই কলিকাতা নগরীর
প্রতিষ্ঠাতা। [কলিকাতা দেখ।]

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চাৰ্ণক সাহেব চাণকে (বারাকপুরে)
একটা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান করেন,
উক্ত সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের চাণক নাম
হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। [চাণক দেখ।]

চাৰ্ণক একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়া দেখেন,
যে কতকগুলি লোক এক নবযৌবনা অন্নরী ব্রাহ্মণকন্তাকে
তাঁহার মৃত পতির সহিত দাহ করিবার উদ্যোগ করিতেছে,
কিন্তু রমণী প্রাণভয়ে আতঁনাদ করিতেছে। চাৰ্ণক সাহেব
দলবল লইয়া উপস্থিত লোকদিগের নিকট হইতে সেই
রমণীকে কাড়িয়া আনিলেন, পরে তাহার প্রাণয়ে আসক্ত
হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে
সেই রমণীর মৃত্যু হইল। চাৰ্ণক তাহার শোকে অধীর হইয়া
পড়িলেন। প্রতিবর্ষে সেই রমণীর মৃত্যুদিন উপলক্ষে তিনি
তাঁহার সমাধিস্থানে (সেন্টজন চার্চে) গিয়া একটা মুরগি
উৎসর্গ করিতেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে চাৰ্ণকের মৃত্যু হয়।

চাৰ্ণাবল, উং পং প্রদেশের অন্তর্গত মুজফরনগর জেলার
একটা নগর। অক্ষাং ২২° ৩২' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮' ১০" পূঃ।

মুজঃকরনগর হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ।

চার্লস্‌ (জি) চর্মণা আচ্ছাদিতঃ চর্মণ-অণ্ । ১ চর্মীচ্ছাদিত ।
(পুং) ২ চর্মীচ্ছাদিত রথ । (ভারত)

চার্লস্‌গ (ক্লী) চর্মণাঃ সমূহঃ চর্মণ-অণ্ । (ত্তিকাভিত্যোহণ্ ।
পা ৪।২।৩৮ ।) চর্মসমূহ ।

চার্লস্কিক (জি) চর্মণা নিবৃত্তঃ চর্মণ-ঠক্ । চর্মনির্মিত ।
“চর্মচার্লস্কিকভাণ্ডেয়ু ।” (মমু)

চার্লস্কিকায়ণি (পুং ক্লী) চর্মণোহপতাঃ চর্মণ্ অগভ্যার্থে
কিঞ্ কুকাগমশ্চ । (বাকিনাদীনাঃ কুচ্চ । পা ৪।১।১৫৮ ।)
চর্মীর অপত্য, ঢালীর সন্তান ।

চার্লস্কিক্য (ক্লী) চার্লস্কিক ভাবঃ চার্লস্কিক-ভাবে বক্ (পতাস্ত-
পুরোহিতাদিত্যোবক্ । পা ৪।১।১২৮) চার্লস্কিকের ভাব ।

চার্লস্কিণ (ক্লী) চর্মণাঃ সমূহঃ চর্মণ-অণ্ । চর্মি-সমূহ, ঢালীসমূহ ।

চার্লস্কীয় (জি) চর্মণঃ অয়ং চর্মণ-ছঃ (উৎকরাদিত্যস্বঃ ।
পা ৪।২।১২ ।) চর্মসম্বন্ধীয় ।

চার্য্য (পুং) ব্রাত্যবৈশ্ব হইতে সর্বগী জীতে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর
জাতিবিশেষ ।

“বৈশ্বাত্তু জায়তে ব্রাত্যাঃ সূধ্যচার্য্যএব ।” (মমু ১০।২৩)

চার্লস্‌উইলকিন্স্, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত । ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে
ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বিংশতিবর্ষ
বয়সে ভারতীয় সিভিলসার্ভিস্ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া
রাজকর্মগ্রহণপূর্বক বঙ্গদেশে আইসেন । এখানে কএক
বৎসর অবস্থানের পর তাঁহার বন্ধু হালহেড্ সাহেবকে
সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারও
সংস্কৃত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় । সৌভাগ্যক্রমে তিনি
অন্নারাসেই কোতূহল চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত একজন
পণ্ডিত পাইলেন, কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রম-
ণিকা-স্বরূপ কোন পুস্তকের অস্তিত্ব না থাকায়, তিনি প্রথমে
তাঁহার শিক্ষকের সাহায্যে অধীত ব্যাকরণের সার সঙ্কলন
করিয়া ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করিতে বাধ্য হইলেন ।

অল্পসময় মধ্যে তিনি সংস্কৃতবিদ্যার পারদর্শিতালাভ
করিলেন । অমৃতভূতিস্বরূপাচার্য্য প্রণীত সারস্বতপ্রক্রিয়া,
বোপদেব প্রণীত মুক্তবোধ ও পুরুষোত্তম প্রণীত রত্নমালা
এই তিনখানি প্রধান সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলম্বনপূর্বক
ইহাদের মধ্য হইতে আবশ্যক অংশ সকল উদ্ধৃত ও
ইংরাজীতে তাহার অমুবাদ করিয়া একখানি ব্যাকরণ
প্রণয়ন করিলেন । তৎপরে তিনি ভগবদগীতা ইংরাজী
ভাষায় অমুবাদ করেন । ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাইরেক্টরসভা তাঁহার
শেখোক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ করিয়া প্রচার করেন ।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া অদেশ
যাত্রা করেন । তথায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে Trial of Sakuntala
অর্থাৎ “শকুন্তলা-পরীক্ষা” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ
করেন । উক্ত বৎসরে তিনি বচোটার লৌহকলক খুদিয়া
দেবনাগরী অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করেন ।

ইতিপূর্বে এতদেখে হস্তলিখন ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে
গ্রন্থাদি প্রচারের সুবিধা ছিল না । চার্লস্‌উইলকিন্স্
প্রথম এই অভাব যোচন করিতে হিরসংকল্প হইলেন ।
ইংলণ্ডে বসিয়া তিনি দেবনাগরী অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করি-
লেন । মুদ্রাযন্ত্রের অন্যান্য উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া
নিজ গৃহে বসিয়া মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু
দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে না
হইতেই ঐ বৎসর ২২ মে দিবসে বাতীতে অগ্নি লাগিয়া
মুদ্রাযন্ত্রের উপকরণসামগ্রী নষ্ট হইয়া যায় ; তবে সূত্রে
বিষয় এই যে তিনি তাঁহার মুদ্রাক্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ
এবং অক্ষরের ছাঁচগুলি অগ্নিদেবের কবল হইতে রক্ষা
করিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু অক্ষর ও অন্যান্য উপকরণ
সকল কতক তস্মীভূত ও কতক অব্যাবহার্য্য হইয়া যায় ।

মুম্বোর দুর্ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হইলে একটা ঘটনাই
শেষ হয় না ; একটা দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি
ঘটনাই থাকে । চার্লস্‌উইলকিন্স্ মহোদয়ের পক্ষেও তাহাই
হইয়াছিল, স্মরণ্যঃ তাঁহার উপকরণাদি নষ্ট হইয়া গেলে
তাঁহার উৎসাহও হ্রাস হয় । যাহা হউক, ইহার কিছু দিন
পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডায়রেক্টরগণ ইংলণ্ডের হার্ট-
ফোর্ড সহরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কলেজ নামক একটা বিশ্ববিদ্যালয়
স্থাপন করেন । যাহারা ভারতবর্ষে কর্মগ্রহণ করিয়া আসিতে
অভিলাষী, তাঁহাদিগকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে
হইত । প্রাচ্যভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃতশিক্ষাই এই কলেজের
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । কিন্তু সহজে জ্ঞানলাভ করিবার উপযুক্ত
উক্ত ভাষার কোন ব্যাকরণ না থাকায় চার্লস্‌ উইলকিন্স্
ডায়রেক্টরগণ কর্তৃক আহৃত ও এ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার
ভার প্রাপ্ত হন । তিনি তাঁহার পূর্বে ছাঁচ দ্বারা নূতন অক্ষর
সকল প্রস্তুত করিলেন, তদ্বারা মুদ্রাঙ্কণ করিয়া নিজের
বহুদিনের উদ্দেশ্য সাধন করিলেন ।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-হাউসের পুস্তকালয়ের
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন । ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যগ্রন্থাদির অমুবাদ
লইয়া ইংলণ্ডে আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে
অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন । সেই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ
উইলিয়ম তাঁহাকে “নাইট” উপাধিতে ভূষিত করেন ।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে বোকার
স্ট্রীটে উইলকিন্স পরলোক গমন করেন।

উইলকিন্স প্রথমে বালা ও পারসী অক্ষরের ছাঁচ
করেন। তিনি সংস্কৃত হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ
করিয়া তাহাও প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি
রাজপুরুষদিগের বাহাতে শ্রদ্ধা ও শ্রীতি অন্বে, তদ্বিবরে তাঁহার
বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং মহা উচ্চতম, জ্ঞান ও নীতিগ্রন্থ
ভগবদ্গীতা যে জাতির ধন তাঁহার কত শ্রদ্ধেয়, ইহা প্রমাণ
উদ্দেশ্যেই তিনি গীতার ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং তখনকার
বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসকে তাহা বুঝাইয়া দেন। হেষ্টিংস
ডায়রেক্টরদিগকে গীতার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য এক
সুখবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

চার্কা (পুং) চারু আপাতমনোরমঃ লোকমনোরমকো
বাকো বাক্যং বহু, প্ৰবোধদারাদিভ্যং সাধুঃ। তাত্ত্বিকবিশেষ।
ইহার নামান্তর বার্ষ্পত্য, নাস্তিক, লোকায়তিক।

ইনি নাস্তিক মতপ্রবর্তক বৃহস্পতির শিষ্য। মহাত্মার
ছাত্র্যধনেয় সখা চার্কা রাক্ষসের প্রসঙ্গ আছে। তিনি
পরিব্রাজকরূপে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতি ও
শ্রদ্ধাকরকারী বলিয়া যুধিষ্ঠিরের যথেষ্ট নিন্দা করেন ও
তাঁহাকে জীবনভ্যাগ করিতে বলেন। তাহাতে সভাস্থ শুদ্ধা-
চারী ব্রাহ্মগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং চার্কাকে ভৎসনা
করিয়া হত্যা করিয়া দিলেন। সেই হত্যার দণ্ড হইয়া চার্কাক
ভূতলশায়ী হইল। (শান্তিপর্ক) অনেকে অনুমান করেন
যে ঐ চার্কাই নাস্তিকমত-প্রবর্তক।

সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্কাদর্শনের যে সকল কথা আছে,
তাহাতে জানা যায় যে বৃহস্পতিই প্রথমে নাস্তিকশাস্ত্র প্রণয়ন
করেন, পরে চার্কা ও তাঁহার শিষ্যগণ সেই বৃহস্পতির
সত প্রচার করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক বৃহস্পতিস্বত্ব
নামে একখানি নাস্তিক-মত-প্রতিপাদ্য গ্রন্থও দৃষ্ট হয়।
কিন্তু এই বৃহস্পতি কে ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।
পদ্মপুরাণে লিখিত আছে দেবগুরু বৃহস্পতি বলদগুপ্ত অশ্ব-
দিগকে ছলনা করিবার জন্য বেদের বিপরীত মত প্রচার
করিয়াছিলেন।

আবার বিষ্ণুপুরাণে ঠিক চার্কাকের মত-পরিপোষক
কথা প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে—হাদপ্রমুখ ধর্মবলে
বলীয়া দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ত্রিলোক ও
বজ্রভার হরণ করে। তাহাতে দেবগণ নিতান্ত কাতর হইয়া
বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে
মারামোহের সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে বলেন যে “এই মারামোহ

মোহ সমুদয় দৈত্যকে মোহিত করিবে। পরে তাহার
বেদমার্গবিহীন হইলে তোমরা অনারাসে তাহাদিগকে
বিনাশ করিতে পারিবে।” মহাসুরগণ তখন নর্ষদাতীয়ে
ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দিগম্বররূপে মারামোহ তাহাদের
নিকট আসিয়া নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাহাদিগকে
বেদমার্গ প্রদর্শন করিলেন। মারামোহের কথাই কেহ দেবগণের,
কেহ ব্রহ্মাদি ত্রিগুণাত্মক, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে
লাগিল। মারামোহের কথা এই—“যদি যজ্ঞে নিহত
পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডে নিজের পিতাকে কেন
না মারিয়া ফেলে (১) ? যদি অস্ত্রের ভুক্ত অঙ্গে পুরুষত্বপ্রাপ্তি
লাভ করে, তবে প্রবাসীদিগের উদ্দেশ্যে প্রাণ দান, আর
তাহাদিগের অন্ন বহন করিতে হইবে না (২)। ইহা যদি
অনেক যজ্ঞ করিয়া দেবস্ব প্রাপ্ত হইয়াও শমীকাঠাদি ভক্ষণ
করে, তবে পদ্মভোজী পশুও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৩)। আমার
ও তোমাদের মত লোকের কাছে যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রাহ্য (৪)।”

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মহর্ষি জাবালি যখন রামচন্দ্রকে
বনবাস হইতে ফিরিয়া বাইতে উপদেশ দিতেছেন, সেই
জাবালির বাক্যেও চার্কাকমতের আভাস লক্ষিত হয়,
ইহাতে অনুমিত হয়, চার্কাক মত অতি প্রাচীন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একস্থানে লিখিত আছে—বৃহস্পতি
গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে তাঁহার
মাথা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু গায়ত্রী অমরী। তাঁহার
মস্তকের প্রত্যেক বিন্দুতে বর্ষটাকার উৎপত্তি হইল।

উক্ত উপাখ্যানপাঠে বোধ হয় যে বৃহস্পতি কোন সময়ে
বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের চোঁটা করিয়াছিলেন।

উপনিষদ্ ও দর্শনসমূহে কর্মকাণ্ডের অবজ্ঞা আছে। কর্ম-
কাণ্ডের বাড়াবাড়ির সময়ই উপনিষদাদির সৃষ্টি। বোধ হয়
সেই সময়েই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ বৃহ-
স্পতির তর্কসম্বৃত বর্তমান চার্কাক মত প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

যুরোপে আরিষ্টটল, এপিফুরস, বেকন, কোম্‌ত, মিল
প্রভৃতি সকলেই যেমন ইহলোক ও সুখজীবন লইয়াই
ব্যস্ত, চার্কাকও সেইরূপ আপাতঃ সুখপ্রচারে বিশেষ

(১) “নিহতস্ত পশোযজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তিবদীযতে।

অপিভা ব্রহ্মমাসেন কিম্ব তদ্রাম হস্ততে।”

(২) “ভৃগুয়ে জারতে পুংসো ভুক্তমস্তেন চেৎ ততঃ।

দধ্যাজ্জ্বাহং অক্ষয়ামঃ ন বহেরুঃ প্রবাসিনঃ।”

(৩) “যজ্ঞেরনেকৈর্দেবভয়মাপ্যোজ্ঞেণ ভূতাতে।

শস্তাদি যদি চেৎকাঠঃ ভয়ং পত্রভূক্ত পশুঃ।”

(৪) “যুক্তিমতঃ প্রাহুঃ মরাতৈস্ত ভবেদ্বিধৈঃ।”

(বিষ্ণুপুরাণ ৩ অঃ ১৮ অঃ।)

উদ্যোগী। যদিও চার্কাকের সহিত তাঁহাদের অনেক মত-ভেদ আছে, কিন্তু মূল কথা এক।

ভারতের সকল দর্শনকারই পরলোক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চার্কাক পরলোক মানেন না, এইজন্য চার্কাকদর্শনের অপর নাম লোকারত। [লোকারত দেখ।]

চার্কাকদর্শনের মতে—সুখই ইহজীবনের প্রধান লক্ষ্য, দুঃখ আছে বলিয়া যে সুখ ভোগ করিতে চাহে না, সেত পশুবৎ মূর্থ। মাছে আঁধ আর কাঁটা আছে বলিয়া কি মাছ খাওয়া ছাড়িব? ধাত্তের কুটা বাছিতে হইবে বলিয়া কি ভাত খাইব না? পশুগণ শত্রু নষ্ট করিবে ভাবিয়া কি কেহ ধাত্তবীজ বপন করিবে না? তিক্ষুক আসিয়া বিরক্ত করিবে বলিয়া কি অন্নপাক পরিভাগ করিতে হইবে?

চার্কাকের মতে ইহকালের সুখই সুখ, পরকাল অসম্ভব। যেমন সুরার উপযোগী দ্রব্যগুলি অর্থাৎ গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে যেমন মাদকতাবলি জন্মে, সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিভূত অচেতন হইলেও, তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চেতন্যের উৎপত্তি হয় (৫)। আমি ফুল, আমি কুশ, আমি গোর, আমি ভ্রামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিকব্যবহারেও আত্মাই ফুল, কুশ ইত্যাদিরূপে মনে হয়। ফুলফাদি ধর্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই ভৌতিক দেহই আত্মা, এ ছাড়া আর আত্মা নাই। উক্ত চারিভূতের অভাব হইলেই আমি অর্থাৎ চেতন্যোও বিনাশ হয়, তখন তাহার অবস্থিতি অসম্ভব। এই চেতন্যাবিশিষ্ট দেহ তন্নীত হইলে আর তাহার পুনরাগমন হয় না (৬)।

(৫) "সুখমেষ পুরুষার্থঃ। ন চান্ত দুঃখসংভিন্নতরা পুরুষার্থমেষ বাতী-
তি সমুদয়ং অবর্জ্যনীয়তরা প্রাপ্তস্ত দুঃখাস্য পরিহারেণ সুখমাত্মন্যেব
ভোক্তব্যম্। তদ্যথা মৎস্যার্থী সপক্ষান্ সন্কটকান্ মৎস্যানুশাস্তে সা
বাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ততে। বথা বা ধাত্তার্থী সপলানানি ধাত্তান্য-
হরতি ন বাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ততে। তন্মাদুঃখতরানামুকুলবদ-
নী যঃ সুখং ত্যক্ত্ব মুচিচ্ছ... যদি কলিদ্ ভীকৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স
পশুসদৃশো ভবেৎ।" (সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্কাকদর্শনঃ।)

(৬) "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবাধ্যানামিমাঃ।

চতুর্ভাঃ ধূলু কুতেভ্যাকৈতন্তসুপকারতে।

কিণ্ডাদিত্যঃ সমেতেভ্যো ত্রয়েভ্যো মদশক্তিবৎ।

তেষু বিনষ্টেষু সংস্খরং বিনষ্টতি।"

"অহং ফুলঃ কৃশোদীতি সামান্ত্যধিকরণতঃ।

বহঃ ফোলাদিত্যেণোক্ত স এবাদ্ভা ন চাপর।

মম দেহোহস্মিন্ভূতিঃ সমুদয়োপচারিকা।"

সকল শাস্ত্রেই জীবনের অতিথি প্রতিপাদনের জন্য অহুমানই অবলম্বন। কিন্তু পরম নাস্তিক চার্কাক এককালেই অহুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে অহুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিবিষ্ট হইলে তবে তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, এরূপ প্রত্যক্ষ বর্তমান কালে সম্ভব হইলেও ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এককালেই অসম্ভব।

বহিঃস্থের চিরসঙ্গী, কেবল এখন নহে, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের সহগামী। যখন আমরা অগ্নি নাই, তখনও বহিঃস্থের সহচর ছিল, যখন আমাদের মৃত্যু হইবে, তখনও অগ্নি ধূমের সঙ্গে থাকিবে। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান ত্রিকাল-ব্যাপক; এরূপ জ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষ দ্বারাই হইতে পারে। কিন্তু তাহাও প্রামাণ্য নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি অসুখত্বের জন্য মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ। সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইবারও সেই আপত্তি। যদি বল অহুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা হইলেও ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে। কারণ যে ব্যাপ্তি লইয়া অহুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিই অহুমান সাপেক্ষ।

কাণাদ মতে শব্দ অহুমানের অন্তর্ভুক্ত। অহুমান দ্বারাই আমরা কোন শব্দ বিবেচনা করিয়া থাকি। মনে কর, কেহ কলস আনিতে বলিল। যাহাকে বলা হইল, সে বস্ত্রবিশেষ আনিয়া উপস্থিত করিল; আমরাও ঠিক করিয়া লইলাম, ঐ বস্তুই কলসী। এইরূপ বৃদ্ধ ব্যবহার দৃষ্টে শব্দার্থের অহুমান হয়, সুতরাং অহুমানকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ, শব্দকে অহুমানের কারণ বলিলেও সেই দোষ ঘটে (৭)। স্বার্থাহুমান শব্দপ্রয়োগ নাই, সুতরাং কিরূপে শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিবে? ধূম যেমন অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে, এরূপ হলে ধূমে যেমন অন্যান্যনিপেক্ষতার জ্ঞান সম্ভব, তেমন ভূতভবিষ্যতের দূরদেশবর্তী জ্ঞান সকল স্থলে সম্ভব নহে, সুতরাং সর্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়ভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না (৮)।

(৭) "কাণাদ-মতানুসারেনাহুমান এবাভ্যর্থক্যং... অসম্ভবং বা
বৃদ্ধব্যবহাররূপলিঙ্গাবগতিসাপেক্ষতরা প্রাপ্তস্তদুৎপত্ত্যজন্যজ্ঞানস্বয়ং।"

(৮) "উপাধাত্যবোধপি দূরবগমঃ উপাধীনাঃ প্রত্যক্ষবিশ্রমাস-
বেদ প্রত্যক্ষাণ্যমভাবসা প্রত্যক্ষবোধপি অপ্রত্যক্ষাণ্যমভাবসা...
তদা অহুমানান্যাপেক্ষামতঃ সুখানতিবৃত্তে।"

যদি বেদ দ্বারা ঈশ্বর ও পরলোক সংস্থাপন করিতে চাও, চার্কাক বলেন যে, বেদ এক কালে প্রামাণিক নহে, কারণ উহা প্রত্যক্ষবিলোপী যুক্তিবিহীন ও ধূর্ত লোকসম্মত। চার্কাক বলিয়া গিয়াছেন—অনেক প্রধান অসাধারণ ধীশক্তিশালী পণ্ডিত বুধা বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া বেদোক্ত কর্মসম্পাদন করিতেছেন, ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে অবশুই পরলোক আছে; কিন্তু বাস্তবিক পরলোক নাই। ঐ সকল নিষ্ফল কর্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, কতকগুলি ধূর্ত প্রভাবক বেদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ, নরকাদি নানা প্রকার অলৌকিক পদার্থ বর্ণনা করিয়া সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাহারা নিজে ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেছে। সেই ধূর্তগণ রাজগণকে নানারূপ যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ লইয়াছে ও তাহা হইতেই নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের অভীষ্ট বৃদ্ধিতে না পারাতেই অনেকেই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং বহুকাল হইতে ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডগ্রহণ ও ভ্রম-লেপন এ সমস্তই নির্দোষ ও কাপুরুষদিগের উপজীবিকা। বেদে আছে যে পুস্তোষ্টিয়াগ করিলে পুত্র জন্মে, কারিরীয়াগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্বেনবাগ করিলে শত্রুনাশ হয়, তাই অনেকে ঐ সকল কর্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু কৈ তাহাতে কোন ফল ত দেখা যায় না। বেদে এক স্থানে আছে যে, হর্যোদয়ে অগ্নিহোত্র করিবে, আবার অপরস্থানে আছে যে হর্যোদয়ে হোম করিবেনা, করিলে প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসেরা ভোগ করে। এইরূপ বেদে অনেক বিষয়েরই পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, আবার উন্নত প্রাণের মত বারবার এক কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল দোষ দেখিয়া কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা এই সমস্তই মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণকত্রিয়ারদির চারি আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সকলই বুধা। ধূর্তেরা বলিয়া থাকে, যজ্ঞে যে পশুবধ হয় সেই পশু স্বর্গে যায়। যদি ধূর্তদিগের এমনই বিশ্বাস, তবে কেন তাহার যজ্ঞে আপনাপন বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিনাশ করে না? তাহা হইলে পিতা মাতার স্বর্গ লাভ হইত, আর তাহাদিগের উদ্দেশে বুধা শ্রদ্ধ করিয়া কষ্টভোগ করিতে হইত না। যদি শ্রদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তি পরিতোষ লাভ করে, তবে কোন লোক বিদেশে গেলে তাহাকে পাথের দিবার প্রয়োজন কি? গৃহে তাহার উদ্দেশে কোন এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি

হইতে পারে। যদি শ্রদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে উঠানে শ্রদ্ধ করিলে গৃহের উপরিস্থ ব্যক্তির পরিতোষ হয় না কেন? মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে প্রেতকৃত্য করা হয়, তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকামাত্র, তাহাতে কোন ফল নাই। এদেহ ভ্রম হইলে আর তাহার পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে আত্মার পরলোকগমনের পর দেহান্তরে প্রবেশের ক্ষমতা থাকে, তবে বহুবাকবের স্নেহে পূর্বদেহে পুনরায় কেন না আসে? যত দিন বাঁচিয়া থাক, সুখে কাল অতিবাহিত কর, স্বপ্ন করিয়াও মৃত থাকিবে। ভগু, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন বেদের কর্তা। অক্ষরী তুক্ষরী ইত্যাদি পণ্ডিতদিগের নাম সকলেরই জানা আছে। ভগুরা লিখিয়াছে যে অশ্বমেধ-যজ্ঞে রাজপত্নী অশ্বশিল্প ধরিবেন। ভগুগণ এই রূপ কত কি ধরিবার কথাই লিখিয়াছে। সেই রূপ নিশাচররাই (যজ্ঞে) মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে।” *

চার্কাক-দর্শন হইতে এই কয়টা মূল কথা আমরা জানিতে পারি—১ম ইহলোক ছাড়া অন্য নয়, সুখ পরিত্যাগ করিবেনা। ২য় শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তিই প্রবল। ৩য় প্রত্যক্ষ-প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। [চার্কাক মত বিস্তৃত রূপে জানিতে হইলে বৃহস্পতিসূত্র, সর্বদর্শনসংগ্রহ, সর্বদর্শনশিরোমণি ও নৈষধ-চরিতের ১৭শ স্বর্গ দ্রষ্টব্য।]

* “ন স্বর্গো নাপনর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।

নৈব বর্ণপ্রাণীনাং ক্রিয়ান্দ কলদারিকঃ।

অগ্নিহোত্রঃ ত্রয়োবেদাঙ্গিভঃ ভ্রমশ্চৈব ন।

বৃষ্টিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ভাতৃনির্ধিতা।

পশুশ্চেন্নিহন্তঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।

স্বপিতা যজ্ঞবানেন তত্র কস্মিন্ন হিংস্রতঃ।

মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেতুস্তিকারণম্।

গচ্ছতামিহ জন্তুনাং কাৰ্ধাং পাথেরকল্পনম্।

স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিঃ পচ্ছেন্ন স্তত্র দানতঃ।

প্রাসাদস্যোপরিহানানত্র কস্মিন্ন দীযতে।

বাবজীবেৎ সুখং জীবেন্দুণং কৃতা মৃতং পিবেৎ।

ভ্রমীকৃতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনঃ কৃতঃ।

যদি পচ্ছেৎ পরং লোকঃ দেহাদেব বিনির্গতঃ।

কস্মাত্তু যো ন চার্যতি বহুত্রেহসমাকুলঃ।

ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্তিহ।

মৃতানাং শ্বেতকাৰ্ধ্যানি নত্বন্যাদিন্যতে কচিৎ।

ত্রয়োবেদস্ত কর্তারো ভগুধূর্তনিশাচরাস্তে।

অক্ষরী তুক্ষরীভ্যাং পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।

অথস্যাত্ৰ হি শিরস্ত পত্নীগ্রাহং প্রকীৰ্ত্তিতম্।

ভট্টশ্রবণং পরশৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীৰ্ত্তিতম্।

মাংসানাং খাদনং তদ্বিশিষ্টাচরসমীকৃতম্।”

চার্কাবধপর্ক (কী) মহাভারতের অন্তর্গত অবাস্তব পর্ক-বিশেষ। কুরুবংশ স্বংস হওয়ার পর ছুর্যোধনের সখা চার্কাক নামক রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় যাইয়া জ্ঞাতিবিনাশ করিয়া রাজ্যলাভহেতু তাঁহাকে ভিন্ন-কার করিতে থাকে। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহার ভিন্নকারে ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার সভাস্থিত ব্রাহ্মণগণ ছদ্মবেশধারী রাক্ষস জানিয়া হত্যার ছাড়িয়া চার্কাককে নিহত করিলেন। চার্কাকবধপর্ক জীপর্কের অন্তর্গত বলিয়া আদিপর্কের উপক্রমণিকাতে লিখিত, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে ঐ পর্ক শান্তিপর্কের মধ্যে দেখা যায়।

চার্কাঘাট (পুং) চারু আহুতি চারু-আ-হন-অণ্ অন্তত চ টঃ। (দারাবাহনোহণস্ত্যন্ত চ টঃ সংজ্ঞায়াং চারৌ বা। বার্তিক। পা ৩।২।৪২।) খজ্ঞবিশেষ।

চার্কাবাদি (পুং) অন্তোদাত্তস্বরপ্রক্রিয়ার স্বত্রোক্ত শব্দগণ। (কৃত্যো কেচ্ছুচ্চার্কাবাদয়শ্চঃ। পা ৩।২।১৬০।)

চার্বী (জী) চারু-ত্রিয়াং ভীপ্। ১ স্তম্বরী জী। ২ জ্যোৎস্না। ৩ বুদ্ধি। ৪ কুবেরের জী। ৫ দীপ্তি।

চাল (পুং) চল-ণ অথবা গিচ্ অচ্। ১ ঘরের চাল। পর্যায় পিঠ-পটল, ছদিস, ফটল, ছাদ। ২ স্বর্ণচূড়পক্ষী। ভাবে ষঞ্। ৩ চলন।

চালক (ত্রি) চল-ধূল্। ১ চালক, যে চালায়। ২ ছর্দম হস্তী।

চালকুমড়া (দেশজ) কুমড়াও বিশেষ। সচরাচর গৃহের চালে হয় বলিয়া ইহাকে চালকুমড়া বলে। ইহার অপর নাম মাচিকুমড়া। (Benincasa cerifera)। এই কুমড়া “কুমড়াওখণ্ড” ইত্যাদি ঔষধে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই ফলের আকার অণ্ডের স্থায় ও ওজনে সচরাচর ৮।১০ সের হইয়া থাকে। অপকাবস্থায় ইহার সুমিষ্ট তরকারী হয়। পাকিলে এই ফলের গাত্রে ষ্বেতবর্ণ গুঁড়ার স্থায় একরূপ আবরণ জন্মে। দেবোদ্দেশে কুমড়াবলি প্রভৃতি কার্যে এই কুমড়া ব্যবহৃত হয়। বর্ষার প্রারম্ভে ইহার বীজ পোতা হয়, শরৎকাল হইতে ইহাতে ফল হয়। পল্লীগ্রামে তৃণাচ্ছাদিত গৃহের চালে ষ্বেতপুষ্প-ভূষিত ও ফলযুক্ত কুমড়াগাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই সকল ফল নিত্যন্ত অরুচিবাহ্য পথের ধারে থাকিলেও পরিষ্কৃত ফলবোধে কেহ চুরি করে না। [কুমড়াও দেখ।]

চালুতা, একপ্রকার গাছ ও তাহার ফল। (Dillenia Speciosa) এই বৃক্ষ সুদীর্ঘ-ঘন-পত্রযুক্ত বৃহদাকার ও দেখিতে অতি সুন্দর এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহাতে বৃহৎ শুভ্রবর্ণ ফল হয়, ঐ ফলের দলগুলি খসিয়া গেলে আবরক-দলগুলি গুটাইয়া বৃহৎ ফলরূপে পরিণত হয়। হেমন্ত ও শীতকালে ঐ ফল পাকিয়া থাকে।

চালুতার সুমিষ্ট অন্ন প্রস্তুত হয়। পাকা চালুতা চিংড়ি মাছের সহিত রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় তরকারী হয়। বীজকোষাদি পরিভ্যাগ করিয়া উপরের কঠিন খোসাই খান্যের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চালুতা মুখরোচক ও পিত্তহর।

চালুতা গাছের ঘন শুষ্ক-বৃদ্ধ পত্র মধ্যে শুভ্র পুষ্প ও বৃহদাকার হরিৎবর্ণ ফল দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া অনেকে দেবালয়ের নিকটে ও উদ্যানে চালুতাগাছ রোপণ করেন। চালুতাগাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহার কাঠ পরিপক হইলে অতিশয় দৃঢ় হয় এবং সচরাচর নৌকানির্মাণাদি কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলে এই কাঠ পচিয়া যায় না।

চালন (কী) চল-গিচ্ করণে লুট্। ১ চালুনী। ভাবে লুট্। ২ বায়ুর ক্রিয়াবিশেষ। (ভাগবত ২২।৩।৩৬) ৩ চলন।

চালনী (জী) চালন-ত্রিয়াং ভীপ্। চালুনী।

চালমুগুনা, একজাতীয় বৃক্ষ (Genocordia Odorata)। হিন্দু-স্থানীয়া ইহাকে চালমুগুনা, ছালমুগুনা, চাউলমুগুনা, বাঙ্গালা দেশে চাউলমুগুনা, চালমুগুনা, নেপালী কছ, লেপ্চা তুফুং, বোম্বাই অঞ্চলে চাউলমুগুনা, মগেরা ঠং পং, শ্রীপুরবাসীরা তালিনোই, পারসীতে ত্রিমোয়া এবং চীনে তকাংচি কহিয়া থাকে।

চালমুগুনা মধ্যায়তন ও চিরহরিৎবৃক্ষ। ইহা সিকিম, থসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন এবং তেনসেরিম প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। এই বৃক্ষের গুঁড়িতে ও বৃহৎ বৃহৎ শাখায় দৃঢ় এবং বর্ন্তুলাকার এক প্রকার ফল জন্মিয়া থাকে, এই সকল ফল পেষণ করিলে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়, সেই তৈল বিখ্যাত ‘চালমুগুনা তৈল’ নামে অভিহিত। চালমুগুনা তৈল আমাদের অতি উপকারী বলিয়া ঐ গাছ সর্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে।

চালমুগুনার ফল দেখিতে অনেকটা বাদামের মত ও আখিনমাসের মধ্য সময়ে পাকিয়া থাকে। ইহার বীজ এত কোমল যে অল্পায়াসেই এমন কি হস্তের পেষণে ইহা হইতে তৈল বাহির হয়। এই ফলের গন্ধ ও আশ্বাদন মন্দ নহে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পশুপক্ষ্যাদি জন্তু সকল এই ফলের অনিষ্ট করে না। ঝড় বাতাসে ফল বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া থাকে, কখন বা গাছ হইতে পড়িয়া আনিতে হয়।

চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে চালমুগুনা ফল কলিকাতা অঞ্চলে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই সকল ফল পক ও অপক ভেদে দুই প্রকার। পক ফলগুলির শক্ত পিঙ্গলবর্ণ ও উহা তৈলে

পরিপূর্ণ, কিন্তু অপরূপের শীশ কৃষ্ণবর্ণ ও উহা হইতে বেশী তৈল বাহির হয় না ; যে টুকু তৈল পাওয়া যায়, তাহাও অতি অপরিষ্কার।

কল হইতে তৈল বাহির করিবার উদ্দেশে কলগুলিকে তালিয়া উহার শীশ গ্রহণপূর্বক খোসার ভাগ পরি-ভাগ করিতে হয় ; পরে উক্ত শীশকে আতপতাপে শুক করিয়া পশ্চিমদেশবাসীগণ যেভাবে উছখলের সাহায্যে তণ্ডুল প্রস্তুত করে, সেইরূপে উছখল দ্বারা অর্ধ ভগ্ন করিতে হয়। তারপর অর্ধভগ্ন শীশ নরম কাথিসের ভিতরে রাখিয়া “ক্যাষ্টর অইল” প্রস্তুত-প্রণালীতে কলের সাহায্যে তৈল বাহির করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পরিষ্কার তৈল পাওয়া যায় না। কারণ অগ্নির উত্তাপে তণ্ডুল না হইলে এই তৈল পরিষ্কৃত হয় না।

চালমুগুরার তৈল সাধারণতঃ দুই প্রকার—এক প্রকার ময়লাবিহীন, উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান। দেখিতে ঠিক ‘সেরি’ মদের ছায়। অপর অতি সূক্ষ্ম শক্তকণাবিশিষ্ট, সূতরাং অসুস্থ।

জে মস্ মহোদয় রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করেন, ইহার ৮০ ভাগ অম্লমিশ্রিত (শতকরা ১১.৭ অংশ Gynocardic acid, ৬৩ অংশ Palmitic acid, ৪ অংশ Hypogæic acid এবং ২.৩ অংশ Cocinic acid রহিয়াছে।) এই সকল অম্ল Glycerol-এর সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কোন অম্লের কিছু কিছু অংশ অসংশ্লিষ্ট অবস্থাতেও থাকে। এই তৈল ৪২ ডিগ্রী উষ্ণতায় দ্রব হয়।

চালমুগুরা-তৈল চর্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এমন কি এই তৈল রীতিমত ব্যবহার করিলে কুষ্ঠব্যাধিও আরাম হইয়া থাকে। ইহার বাহ ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার প্রয়োগই ফলদায়ক। এ দেশে এখন চালমুগুরা-বীজ ও উহার তৈলের বহুল প্রচার দৃষ্ট হইতেছে এবং অনেকে ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বলকারক এবং বাহ্যপ্রয়োগ উদ্ভেজক। পাঁচড়া হইতে কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত সকল প্রকার চর্মরোগেই ইহা ব্যবহৃত এবং সমভাবে উপকারী।

চালমুগুরা যে উপদংশ রোগের মহোষধ, তাহা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতপ্রবাসী ষ্টেথপুস্করণ আনিতে পারেন এবং তাহার কিছুদিন পরে ডাক্তার আর জোন্স প্রকাশ করেন যে, উহা ক্ষয়কাশ ও গণ্ডমালা রোগে বিশেষ উপকারী। পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা মহোপকারী ঔষধের উপকরণ বলিয়া ভারতীয় সরকারী ঔষধ-তালিকাভুক্ত হয়।

সেই সময়ে লিখিত হয় যে উহা কুষ্ঠব্যাধি, গণ্ডমালা,

অস্ত্রান্ত চর্মরোগ এবং বাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য। সেই সময়ে উহার প্রয়োগ পরিমাণও স্থিরীকৃত হয়। ছয় গ্রেন বীজচূর্ণ দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসে তিনবার কিম্বা দিবস মধ্যে পাঁচ ছয় কোঁটা তৈল ব্যবহার করিবে। বর্তমান সময়ে সমগ্র যুরোপধণ্ডে উহা পরিব্যক্ত হইয়াছে ও উহার বশঃগৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আজকাল ইহা হইতে (Gynocardic acid, gynocardata of magnesia প্রভৃতি) নানাপ্রকার মলম প্রস্তুত হইতেছে।

এই তৈল অত্যন্ত উপকারী হইলেও সকল রুগ্ন ব্যক্তির ব্যবহার্য্য নহে। রুগ্ন ও অরুজীর্ণ লোকের পক্ষে ইহা সেরূপ নহে, কারণ ঐ প্রকার লোকের পক্ষে ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই তৈল আহারের পরে ব্যবহার করিতে হয়। ৪ হইতে ৩০।৪০ গ্রেন পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। Vaseline-এর সহিত একত্র করিয়া ইহার উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত করিতে হয়।

চালমুগুরা তৈল, বীজচূর্ণ ও ইহার মলম ব্যবহার করিয়া অনেক কুষ্ঠরোগী যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিলে রোগ প্রবল হইতে পারে না এবং দিন দিন আরাম হইতে থাকে।

কলিকাতায় চালমুগুরা বীজের মণ ৫. ৭. ৭ টাকায় বিক্রীত হয়। কিন্তু আমদানী অল্প হইলে সময়ে ১২. ১৩. ১৪ করিয়াও বিক্রয় হইতে দেখা যায়। বর্ষার শেষে ইহার আমদানি হয়। ইহার তৈল প্রতি মণ ৬০. ৭০ টাকা। কলিকাতা হইতে বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া থাকে, সূতরাং তথায় অপেক্ষাকৃত মূল্য অধিক।

চালায়ুদী, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর জেলার একটা নদী। হরাবত পরগণার বাহির হইয়া পরগণা নারদিগরের অন্তর্গত খাল্লাগড়ী নামক গ্রাম দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে গেঁড়ো নদীতে গিয়া পতিত হইয়াছে। এই নদীর কিনারায় অনেক স্থানে চাউল জন্মিয়া থাকে।

চালিকর, মহারাষ্ট্র-আধিপত্যকালে ধারবারের খাজনা আদায়-কারী একপ্রকার কর্মচারী। ইহারা অপেক্ষাকৃত অল্প করে জমি দখল করিত এবং তাহার পরিবর্তে প্রজা-দিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া দিত। কোন প্রজা খাজনা দিতে না পারিলে চালিকরকে ঐ খাজনা পূরণ করিয়া দিতে হইত। তন্নিম্ন তাহাদিগের অস্ত্রান্ত দায়িত্ব ছিল। সচরাচর নির্ধারিত খাজনা ব্যতীত আরও নানারূপ কর চালিকরদিগের নিকট আদায় হইত। চালিকরদিগের

ক্ষমতাও ছিল। তাহারা জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিত। অজন্মা বা ভাল শস্ত না হইলে প্রজারা খাজনা দিতে পারিবে না তাহাকেই দিতে হইবে, সেই জন্ত চালিকর অক্ষম প্রজাদিগকে বীজ, লাঙ্গল, বৃষ ও শস্ত প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিত। কোথাও কোথাও চালিকরগণ নিষ্কর জমি ভোগ করিত। কৃষ্ণানদীর দুইপার্শ্বে চালিকরদিগের ক্ষমতা ভিন্ন রূপ ছিল। তৎকালে এই পদ বড়ই আদরের ছিল। চালিকরেরা গ্রামের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জমি দখল করিত, সর্বাপেক্ষা স্কন্দর গৃহে বাস করিত, পতিত ভূমি হাসিল করিতে পাইত এবং তাহারাই বেসরকারী জমি অন্ন করে বা নিষ্কর দখল করিত। তাহাদের হাতে প্রজাদিগের হিতাহিত মানসম্বন্ধ সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, এজন্ত কোন চালিকর নিজ কর্তব্য অবহেলা করিলে তাহার ক্ষমতা ও জমি প্রভৃতি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত।

চালিয়া, মলবার উপকূলের একটি পুরাতন বন্দর। ইহার অপর নাম চাল্যাম্, ইহা বেপূর নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই স্থানে মাস্তাজ রেলওয়ে শেষ হইয়াছে।

চালিশগাঁ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেদ জেলার একটি উপবিভাগ। ইহার ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৩২টা গ্রাম আছে। এই বিভাগটা জেলার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। সাতমালা পর্বতশ্রেণী খান্দেদ এবং দাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমির মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। ইহার উত্তরস্থিত গ্রামের ভিতর দিয়া গিরনা, মত্ভাড় এবং তিতুর নামক কএকটা নদী প্রবাহিত। ইহাতে ৪০২৭৯৫ বিঘা আবাদী জমি আছে। তাহার অধিকাংশেই শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২ উক্ত খান্দেদ জেলার একটি নগর। চালিশগাঁ উপবিভাগের কার্যালয় সকল ও জি আই পি রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। ইহা ধুলিয়া নগর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

চালুক্য, দক্ষিণপথের প্রবল পরাক্রান্ত এক প্রাচীন রাজবংশ। দাক্ষিণাত্যের শত শত তাম্রশাসন ও শিলাফলকে এই পরাক্রান্ত রাজগণের রাজ্যকাল ও কীর্তিকলাপ কীর্তিত হইয়াছে।

প্রাচীনতম শিলালিপিতে এই বংশ চক্য, চলিক্য ও চলুক্য ইত্যাদি নামে অভিহিত।

বিহ্লগের বিক্রমাক্ষরিতে লিখিত আছে কোন সময়ে ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিতে ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, পৃথিবীতে ঘোর দুর্দৈব উপস্থিত! আপনি একজন বীরপুরুষের সৃষ্টি করিয়া অত্যাচার হইতে ধরাকে রক্ষা করুন। তাহা শুনিয়া প্রজাপতি আপনার “চলুক” অর্থাৎ জলশায়ের দিকে

দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই চলুক হইতে এক স্কন্দর বীর ত্রিভুবনরক্ষার্থ উদ্ভূত হইলেন। সেই চলুক পুরুষ হইতেই মহাবীর চালুক্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। হারীতই তাঁহাদিগের আদিপুরুষ। এই বংশে শত্রুদমনকারী মানব্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের আদিবাস অযোধ্যা, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিঘিজরোপলকে দক্ষিণদেশ আক্রমণ করেন (১)।

বিহ্লগের উক্ত বর্ণাঙ্কসারে জানা যায় যে চলুক হইতে চালুক্য নাম হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতম শিলালিপি-বর্ণিত চক্য, চলিক্য ইত্যাদি পাঠ করিলে বিহ্লগের বর্ণনা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনতম কোন চালুক্য-শাসনেই ব্রহ্মার চলুক হইতে চালুক্যের উৎপত্তির কথা বর্ণিত নাই। কোন কোন চালুক্য-অংশাসন পত্রে চালুক্যবংশের পূর্বপুরুষগণের বর্ণনা-উপলক্ষে কল্পিত পুরাণাখ্যান দৃষ্ট হয়। প্রাচ্যচালুক্যদিগের বহুতর তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, চালুক্যরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ও তাঁহাদের ৬০ পুরুষ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজগণের মধ্যে শেষ রাজার নাম বিজয়াদিত্য। তিনি দিঘিজর উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, কিন্তু এখানে দুর্দৈবক্রমে ত্রিলোচন-পদ্মবের হস্তে নিহত হন। তাঁহার মহিষী তখন গর্ভবতী ছিলেন, তিনি কুলপুরোহিত বিষ্ণুভট্ট সোমযাজী ও সখীগণের সহিত মুড়িবেমু নামক অগ্র হারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে যথাকালে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে মাতার

(১) “সন্ধাঃসমাপ্যো ভগবান্ স্থিতোঃ পশ্চেন বহ্মাঃপ্রমাঃ প্রণম।

বিজয়াদিত্যঃ শেখরগিরিজাতীরিকনাদিগুণৈর্গোড়ঃ। ৩৯।

নিবেদিতচন্দ্রজনে নাপ তথা ক্ষিতৌ সংপ্রতি বিদ্রবো মে।

মজ্জ যথা যজ্ঞবিভাগভোগঃ স্তম্ভাতামেঘ্যতি নির্জগাম্। ৪৪।

ধর্ম্মপ্রহামত্র নিবারণায় কার্যাবুদ্য। কশ্চিদব্যাধীবিধাঃ।

রবেরিবাংগুপ্রসরণে যন্ত বংশেন হুঃ। ককুভঃ ক্রিয়ন্তে। ৫৫।

পুরন্দরেণ প্রতিপাদ্যমানমেঘঃ সমাকর্ণ্য যচো বিরিকিঃ।

সন্ধ্যাপূর্ণে চলুকে মুমোচ খানানুবিদ্যানি বিলোচনানি। ৬৩।

হিমাচলস্তব কৃতঃ শিলাভিক্রদারজাধ্বনদচাক্ষুঃ।

অখাধিরাণীং স্তম্ভটিলোকত্রাগপ্রবীণশূলকাধিষাভুঃ। ৫৫।

ক্রমেণ তস্মাদ্ভুদ্রায় বংশঃ শৌরেঃ পরালাজ্জইব এবাহঃ। ৫৭।

বিশক্করীরাভুতকীর্তিহারা হারীত ইত্যাদিপুমান্ স যজ।

মানব্যানামা চ বহুব মারী মানব্যঃ যঃ কৃতবানরীণাম্। ৫৮।

এসাধ্য তং রাবণমধুধাস বাঃ নৈধিলীঃ কুলরাজধানীম্।

তে ক্ষত্রিয়স্তামবদ্যতকীর্তিঃ পুরীমবোধ্যাং বিদধূর্নিবাসম্। ৬০।

জিগীষবঃ কেপি বিজিত্য বিঘঃ বিলাসনীকারসিকাঃ ক্রমেণ।

চক্রঃ পদঃ নাগরথচুখি পুংক্রমায়াং দিলি দক্ষিণতাম্। ৬৪।

তদুদ্ভবৈভূপতিভিঃ সলীলং চোলীরঘঃসাক্ষিণি দক্ষিণাভঃ।”

(বিক্রমাক্ষরিত ১৯ সর্গ।)

মুখে পিতৃশ্রদ্ধাঙ্গণের ইতিহাস জানিতে পারিলেন। তখন তিনি চালুক্য নামক শৈলে নন্দা গৌরী, কুয়ার, নারায়ণ ও মাতৃকা-দিগকে পরিতুষ্ট করিয়া রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন। তাঁহার নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন। তিনি গঙ্গ ও কাদম্বরাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বেতচ্ছত্র, শম্ব, পঞ্চমহাশব্দ, পালিকেশন, প্রতিকা, বরাহলাঞ্জন, মনুরাসন, মকরতোরণ ও গজায়মুনাদি চিহ্নে বিভূষিত হইয়া অল্প প্রভাবে দক্ষিণাংশ শাসন করিতে থাকেন (২)।

প্রত্নতত্ত্ববিদ স্মিট সাহেব উক্ত প্রবাদকে কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। তাঁহার মতে, পুলিকেশিবল্লভ হইতেই চালুক্যবংশ দক্ষিণাংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপূর্বে চালুক্যরাজগণ উত্তরাংশে রাজত্ব করিতেন এবং সম্ভবতঃ গুজররাজগণের অধীন ছিলেন।

তার ওরালটর ইলিগট সাহেব লিখিয়াছেন—

“চালুক্যরাজগণের দক্ষিণাংশে আগমনের পূর্বে পল্লব-রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনপল্লবের রাজ্যকালে জয়সিংহ অপর নাম বিজয়াদিত্য নন্দা-অতিক্রম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মহিষী বিষ্ণু সোমযাজীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় রাজসিংহ নামে এক পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার অপর নাম রণরাগ বা বিষ্ণুবর্দ্ধন। তিনিও পিতৃপদবীর অনুশরণ করিয়া পল্লবগণের সহিত বিবাদ বাঁধাইলেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন এবং পল্লবরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রের নাম পুলিকেশী (১ম)।” (৩)

১ম পুলিকেশীর রাজ্যকালে উৎকীর্ণ লিপিদৃষ্টে জানা যায় যে পূর্বে চালুক্যরাজগণের ইন্দুকান্তি নগরীতে রাজধানী ছিল, তৎপরে পুলিকেশী (১ম) বাতাপি নগরী জয় করিয়া এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। বাতাপিনগরের বর্তমান নাম বাদামি। [বাদামি দেখ।] সম্ভবতঃ এই স্থান পল্লবরাজগণের অধিকারে ছিল, পুলিকেশী পল্লবরাজকে তাড়াইয়া বাদামি অধিকার করেন। বীরবর পুলিকেশিবল্লভ ৪১১ শকে (৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৪)।

যেব্বের সোমেশ্বর-মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলকে লিখিত

আছে যে, তিনি দুই সহস্র গ্রাম দান ও অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন (৫)।

পুলিকেশীর পুত্র কীর্ত্তিবর্ধা, ইনি মল, মৌর্য ও প্রসিদ্ধ কাদম্বরাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিবর্ধার পর তাঁহার কনিষ্ঠ মঙ্গলীশ ৪৮৮ শকে অভিষিক্ত হন। বাদামির শুভামন্দির-মধ্যস্থ বরাহমূর্ত্তির পার্শ্বে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বর্ণিত আছে যে, ইনি রাজপের, অমিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করেন এবং তাঁহার রাজত্বের ১২শ বর্ষে ৫০০ শকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (৬)। এতদ্বিধি ইনি রেবাতট, মাতঙ্গ, কলচুরি, কোঙ্কণের কিয়দংশ এবং শঙ্করগণের পুত্র বৃদ্ধকে পরাজয় করেন।

কীর্ত্তিবর্ধার পুত্রগণ সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার মঙ্গলীশ রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রেবতীদ্বীপ আক্রমণ ও কলচুরিদিগকে পরাস্ত করেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্র সত্যশ্রয় বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকেই রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন (৭)।

সত্যশ্রয়ের অপর নাম পুলিকেশী (২য়)। ইহার ছায় পরাক্রমশালী নরপতি চালুক্যবংশে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি ৫৩১ শকে রাজ্যারোহণ করেন। ঐহোলের মেণ্ডটি-মন্দিরে উৎকীর্ণ ৫৩৪ শকের শিলালিপিতে লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ সত্যশ্রয় কোশল, মালব, গুজর, মহারাষ্ট্র, লাট, কোঙ্কণ ও কাঞ্চী জয় করেন, তিনি মৌর্য, পল্লব, চোল, কেরল প্রভৃতি নৃপতিবর্গকে পরাজয় করিয়াছিলেন। যে রাজাধিরাজ হর্ষের পাদপদ্মে শত শত নৃপতিবর্গ অবনত মস্তকে থাকিতেন, সেই মহা পরাক্রান্ত হর্ষরাজও সত্যশ্রয়ের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। সত্যশ্রয় পণ্ডিতমণ্ডলীকেও বিশেষ সমাদর করিতেন। “কালিদাস ও ভারবি সদৃশ কীর্ত্তিমান্ (জৈনপণ্ডিত) রবিকীর্ত্তি” তাঁহার যথেষ্ট অমুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন (৮)। এ ছাড়া তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দকে পরাজয় করিয়াও মহাশৈলাভ করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ইহার রাজ্যসমৃদ্ধির ও তথাকার রীতিনীতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পারশুরাজ ২য় খোশ্রর সহিত ইহার উপঢৌকন আদান-

(৫) “স হি ভূয়গজেন্দ্রোগ্রামসং

সহস্রবরণমিতমুখিস্ফলককারিষমেধে।”

Indian Antiquary, VIII. p. 13.

(৬) Indian Antiquary, vol. VI. p. 364.

(৭) “ ” ” vol. VII. p. 13-14.

(৮) “ ” ” vol. V. p. 70-71.

(২) Indian Antiquary, vol. XIV. p. 51.

(৩) Madras Journal, 1858; Journal Royal Asiatic Society, (N.S.) vol I. p. 251.

(৪) Indian Antiquary, vol. VII. p. 209.

প্রদান ও পত্রবিনিময় হইয়াছিল (৯)। ৫৫৬ শকাব্দ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সত্যশ্রয়ের মৃত্যুর পর কাঞ্চীর পল্লবরাজ চোল, পাণ্ড্য ও কেরলরাজের সহিত মিলিত হইয়া চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। এ সময়ে সত্যশ্রয়ের পুত্র সম্ভবতঃ চন্দ্রাদিত্য অথবা আদিত্যবর্মা কোঙ্কণ ব্যতীত আর সমস্ত জনপদই হারাইয়া ছিলেন। অমুজ বিক্রমাদিত্য বীর্যপ্রভাবে পল্লবরাজস্বর্গকে পরাস্ত করিয়া কতক পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই পল্লবগণের হস্তে চালুক্যরাজ নিগৃহীত হন, কিছুদিন পরে বিক্রমাদিত্য যথেষ্ট দলবল সংগ্রহ করিয়া পল্লবরাজধানী কাঞ্চীপুর আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। দেবশক্তি প্রভৃতি পরাক্রান্ত সেন্সকরাজগণ তাঁহার মহাসামন্ত ছিলেন। য়েবুরের শিলাফলক অমুসারে ২য় পুলিকেশী বা সত্যশ্রয়ের পুত্রের নাম নড়মরি, বোধ হয় তাঁহারই অপরাধ নাম চন্দ্রাদিত্য। এই শিলাফলক মতে নড়মরির পুত্রের নাম আদিত্যবর্মা। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্মিটসাহেব নড়মরি ও আদিত্যবর্মা এই দুই নামই কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহার মতে পূর্বতন শিলালিপিতে ঐ দুই নাম দৃষ্ট হয় না। বিক্রমাদিত্যের খোদিত লিপি পাঠে বোধ হয় যে, তিনিই পুলিকেশী সত্যশ্রয়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে তৎপূর্ববর্তী*অন্ত কোন চালুক্যরাজের নাম থাকিত। কিন্তু মহায়া স্মিটের এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়-মহাদেবীর তাম্রশাসনে পুলিকেশী সত্যশ্রয়ের পুত্র বিজয়মহাদেবীর স্বামী চন্দ্রাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন (১০)। ঐ তাম্রশাসনে বিক্রমাদিত্যের নামও আছে। ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, চন্দ্রাদিত্যের অল্পকাল রাজ্যভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে অমুজ আদিত্যবর্মা অল্প বয়সেই রাজ্যলাভ করিয়া ছিলেন, তৎকালে মহিষী বিজয়-মহাদেবী তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে ছিলেন, কিছুকাল পরে আদিত্যবর্মার মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাদিত্য পল্লবদিগের হস্তে উত্যক্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের শাসনাদিতে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না।

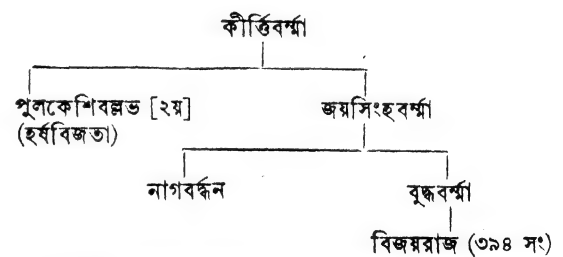
বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালীন শকচিহ্নিত কোন লিপিরূপে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হুই একখানি যাহাও পাওয়া

গিয়াছে, তাহাও কৃত্রিম (১১)। তবে তৎপুত্র বিনয়াদিত্যের সময়কার শকচিহ্নিত খোদিতলিপি পাঠে জানা যায় যে তিনি ৬০১ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১২)।

য়েবুরের শিলাফলক-মতে—বিক্রমাদিত্যের পুত্রের নাম যুদ্ধমল। ইহার নামান্তর বিনয়াদিত্য। ইহার ৬১১ গভ-শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, পল্লবপতি হইতে চালুক্যবংশ নিগৃহীত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলে সেই পল্লবপতিকে বিনয়াদিত্য পিতার আদেশে বন্দী করিয়াছিলেন। এই বিনয়াদিত্যের অপরাপর তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, যে তিনি এক সময়ে প্রবল পরাক্রমে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খেড়া হইতে আবিষ্কৃত ৩৯৪ সন্বদঙ্কিত বিজয়রাজের তাম্রশাসন, নৌসারি হইতে ৪২১ ও সুরটের ৪৪৩ সন্বদঙ্কিত শিলাদিত্য শ্রীশ্রয়ের তাম্রশাসন, বলসার হইতে সংগৃহীত ৬৫৩ শকাব্দিত মঙ্গলরাজের তাম্রশাসন এবং নৌসারির ৪৯০ সন্বদঙ্কিত পুলিকেশি-বল্লভ-জনাশ্রয়ের তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে হর্ষবিজ্ঞতা পুলিকেশি-সত্যশ্রয়ের সময় হইতে এই চালুক্যবংশীয় জন কএক রাজা গুজরাট অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের সহিত বিখ্যাত পুলিকেশি-সত্যশ্রয় প্রভৃতিরও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

নাসিক জেলার নির্পল্ গ্রাম হইতে প্রাপ্ত নাগবর্দ্ধনের তাম্রশাসন ও বিজয়রাজের তাম্রশাসন একত্র করিলে এইরূপ বংশাবলী দৃষ্ট হয়—(১৩)



আবার পূর্বোক্ত নৌসারি ও বলসারের তাম্রশাসন কয়খানি একত্র করিলে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায় (১৪)।

(৯) Journal Royal Asiatic Society, vol. XI. p. 165.

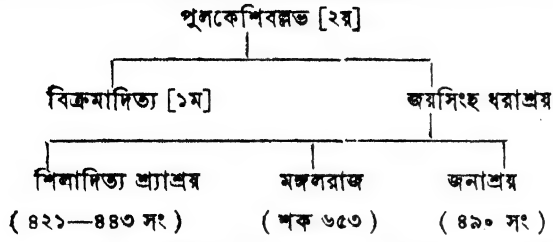
(১০) Ind. Ant. vol. VIII. p. 45

(১১) Ind. Ant. vol. VII. p. 218.

(১২) Indian Ant. vol. VI. 85, VII. 186.

(১৩) Bombay Branch Royal Asiatic Society, vol. II. p. 4; and Ind. Ant. vol. VII. p. 252.

(১৪) Verhandlungen des siebenten Int. Orientalisten Congresses in Wien, Arische Section, p. 210/ and Jour. Bom. Br. R. As. Soc. vol. XVI. p. 2.



প্রথম বংশাবলীপাঠে বোধ হয় ২য় পুলকেশিবল্লভের সময়ে জয়সিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যেই অথবা যে কোন প্রকারে হউক গুর্জররাজের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র বিজয়রাজ পর্যন্ত ঐ স্থানে রাজত্ব করেন। তৎপরে এই বংশের লোপ হয় অথবা বাতাপি বা গুর্জররাজগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন।

বোধ হয়, সেই সময়েই কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজ চোল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজের সহিত মিলিত হইয়া বাতাপিপুরীর চালুক্যরাজবংশ ধ্বংসের জন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

যুবরাজ শিলাদিত্যশ্রাশ্রয়ের অনুশাসন-পত্রে লিখিত আছে যে, ২য় পুলকেশির পুত্র বিক্রমাদিত্যই তাঁহার পিতা জয়সিংহধরাশ্রয়কে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যসত্যশ্রয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া আপন কনিষ্ঠ সহোদর জয়সিংহধরাশ্রয়কে গুর্জরের দক্ষিণাংশ অর্পণ করিয়াছিলেন। পিতার বর্ন্তমানেই বোধ হয় শিলাদিত্য কালক্রমে পতিত হন, সেই জন্ত তিনি আর রাজপদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পরে অনুজ বিনয়াদিত্যমঙ্গলরাজ রাজা হন। তাঁহার ৬৫৩ শকাব্দিত তাম্রশাসন দৃষ্ট হয়। তৎপরে পুলকেশিবল্লভ-জনাশ্রয় ভ্রাতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার ৪২০ (চোদি) স্বয়ংদ্রুত তাম্রশাসন দৃষ্ট হয়। তৎপরে কে রাজা হন, তাহা এখনও কোন খোদিতলিপিস্বারা জানা যায় নাই। যে সময়ে উক্ত পিতা ও পুত্রগণ দক্ষিণগুর্জরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্যযুদ্ধমল্লকে বাতাপির সিংহাসনে দেখিতে পাই।

নানা স্থান হইতে এই বিনয়াদিত্যের তাম্রশাসনাদি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ইনি ৬০২ শকে রাজপদ লাভ করেন। ইনি পিতার আদেশে ত্রৈরাজ্যের পল্লবসেনাদিগকে পরাজয় করিয়া পল্লব-রাজধানী কাঞ্চী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কলত্র, কেরল, হৈহয়, বিল, মালব, চোল ও পাণ্ড্যরাজ প্রভৃতিও তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি সমস্ত দাক্ষিণাত্যের রাজ-চক্রবর্তী হইয়াছিলেন।

তাঁহার অভাব হইলে তৎপুত্র বিজয়াদিত্য ৬১৮ শক হইতে ৬৫৫ শক পর্যন্ত নিরাপদে রাজ্যসম্ভোগ করেন। ইহার প্রদত্ত তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় ইনিও অনেক স্থান জয় ও অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১৫)। পালিধ্বজ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং বৎসরাজ প্রভৃতি ইহলোক হইতে অবসর লইয়াছিলেন (১৬)। তৎপুত্র মহারাজ বিক্রমাদিত্য (২য়), ইনি ৬৫৫ হইতে ৬৬৯ শক পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। বোন্ধলে গ্রাম হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—ইনি তিনবার পল্লবরাজধানী আক্রমণ ও নন্দিপোতবর্মাকে বিনাশ করেন। পল্লবরাজ নরসিংহ-পোতবর্মার কাঞ্চীপুরে যে রাজসিংহেশ্বর ও অপরাপর যে সমস্ত দেবতার প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য (২য়) সেই দেবমণ্ডলীকে সোণা দিয়া মুড়িয়াছিলেন। তৎপুত্র কীর্তিবর্মার (২য়) ৬৬৯ শকে রাজ্যারোহণ করেন, তিনিও একবার চালুক্যবংশের চিরশত্রু পল্লবরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সার্কভোম উপাধি গ্রহণ করেন (১৭)।

মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত কোথেম হইতে সংগৃহীত ৫ম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, (২য়) কীর্তিবর্মার সময়ে চালুক্যরাজ্যত্রির দারুণ বিঘ্ন ঘটয়াছিল (১৮)।

তাম্রশাসন দ্বারা ৬৭৯ শক পর্যন্ত ২য় কীর্তিবর্মার অধিকারকাল দেখিতে পাই। বোধ হয় উহারই অনতিপরে রাষ্ট্রকূটাধিপতি ২য় দস্তিধ্বজ কীর্তিবর্মাকে পরাস্ত করিয়া বিস্তীর্ণ চালুক্যরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রাচ্য চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে প্রবলপ্রতাপে আধিপত্য করিতে থাকিলেও বাতাপির প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্যবংশ যে নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ববর্ণিত ৫ম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশের পুনরায় অভ্যুদয় হইলেও আর ২য় কীর্তিবর্মার পুত্র বা উত্তরাধিকারী রাজ্যাধিকার পান নাই। তাঁহার পিতৃব্যবংশীয়গণই প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার, পিতৃব্যের নাম ভীম। তৎপুত্র কীর্তিবর্মার (৩য়), তাঁহার পুত্রের নাম তৈলভূপ। তৈলের পুত্রের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের পুত্র ভীমরাজ, তৎপুত্র অয্যগাধ্য, ইনি (রাষ্ট্রকূটাধিপ) কৃষ্ণের কন্ঠার

(১৫) Ind. Ant. vol. VI. p. 85, VII. p. 186, VII. p. 14.

(১৬) Ind. Ant. vol. VIII. pp. 28.

(১৭) " " " " " "

(১৮) "ভদ্রবো বিক্রমাদিত্য: কীর্তিবর্মার ভদ্রবর্মণঃ।

যেন চালুক্যরাজ্যত্রিরস্তরানিগাভূতঃ।"

পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্র বিক্রমাদিত্য (৪র্থ)। ভীম হইতে বিক্রমাদিত্যের পূর্ববর্তী রাজগণ বোধ হয় অতি সামান্ত জনপদে রাজত্ব করিতেন অথবা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটরাজের মহাসামন্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

অবশ্যের পুত্র ৪র্থ বিক্রমাদিত্য হইতেই এই বংশের পুনরুত্থান।

ফ্রিট সাহেবের মতে—৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৈল (২য়) হইতেই চালুক্যরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। কিন্তু ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসন ও য়েবুর-শিলাফলকে লিখিত আছে যে (৪র্থ) বিক্রমাদিত্য বিজয়বিভাগী ও বিরোধি-বিক্ষংসী ছিলেন, চেদিরাজলক্ষ্মণহুহিতা বোছাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন, তাহার অপরাধ নাম বিজিতাদিত্য (১৯)। ইহাতে বোধ হয় যে, ইনি চেদিরাজের সাহায্যে প্রথম নষ্ট গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ডাক্তার বার্গেলের মতে, ইনি ৮৯৫ শক হইতে ৯১৯ শক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্তী জয়সিংহদেবের সমকালীন শিলালিপিতে লিখিত আছে, যে সত্যশ্রয় কুলোত্তব নৃমুড়ি তৈল (সম্ভবতঃ তৈল ২য়) রট্ট বা রাষ্ট্রকূটরাজগণকে বিদলিত ও তাঁহাদের হাত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া চালুক্যকুলচূড়ামণি হইয়াছিলেন (২০)।

অনুমান হয় যে পিতার সময়েই বীরবর তৈল (২য়) রাজ্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৪র্থ বিক্রমাদিত্য অথবা ২য় তৈলরাজ বাতাপিনগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন নিদর্শন নাই।

৯৭৫ শকাব্দি ১ম সোমেশ্বরদেবের সাময়িক শিলাফলকে তিনি কল্যাণাবীশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার পূর্বপুরুষ ৪র্থ বিক্রমাদিত্য বা ২য় তৈল চালুক্যরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া কল্যাণে রাজধানী স্থাপন করেন। [কল্যাণ দেখে।]

৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৈল (২য়) এক মহাপরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। য়েবুরের শিলাফলকে লিখিত আছে যে তৈল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্ণরের দুইটা রণসুত্রে বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি কুটিল রাষ্ট্রকূটদিগের হস্ত হইতে চালুক্যবলভরাজলক্ষী উদ্ধার করেন। চৈদ্য ও উৎকলরাজকে সমরে পরাভব এবং রাষ্ট্রকূটরাজ (ভস্মহের) কন্যা জাকব্বার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে জাকব্বার গর্ভে (২য়) সত্যশ্রয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও নীনাস্থান জয় করিয়া রাজ্যের পুষ্টি-

সাধন করিয়াছিলেন। সত্যশ্রয়ের পর তাহার অমুজ দশবর্ষী বা যশোবর্ষী সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মহিষী ভাগ্যবতীর গর্ভে (৫ম) বিক্রমাদিত্য ত্রৈলোক্যমল্ল বলভেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার তাম্রশাসন দৃষ্টে জানা যায় যে ইনি ৯৩০ শকে রাজপদ-প্রাপ্ত হন। ইনি মহান্নাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ-জয়দেবকমল রাজসিংহাসন লাভ করেন। তজ্ঞারের শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে ইনি মালবদিগকে বিধ্বস্ত এবং চের ও চোলরাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সমস্ত কুন্তলদেশ ইহার অধিকৃত হইয়াছিল। ৯৬৪ শক পর্যন্ত ইহার রাজ্যকাল। ইহার ভগিনী অজ্ঞাদেবী।

তৎপরে তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর আহবমল্ল প্রবলপ্রভাপে রাজত্ব আরম্ভ করেন। বিক্রমাদিত্যচরিতে লিখিত আছে যে ইনি দুইবার চোলরাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার ১ম কুলোত্তবের অচ্যুতশাসনাদি পাঠে বোধ হয় যে ইনিও তাঁহার নিকট একবার পরাজিত হইয়াছিলেন। এই ১ম সোমেশ্বরের সময়ে বনবাসী কাদম্বরাজগণ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন। সোমেশ্বরের তিন পত্নী বচলাদেবী, চন্দ্রিকাদেবী ও মৈললাদেবী। ইহার ভগিনী অবল্লদেবী, যাদবরাজ আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (২১)।

সোমেশ্বরের পুত্রের নাম ভুবনৈকমল বা ২য় সোমেশ্বর। ইনি ৯৯০ হইতে ৯৯৭ শক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি কাদম্বরাজগণকে শাসন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ ত্রৈলোক্যমল্লকে বনবাসীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। জয়সিংহ তথায় ১০০১ হইতে ১০০৩ শক পর্যন্ত শাসনকার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।

তৎপরে সোমেশ্বরের মধ্যম ভ্রাতা ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য জিভুবনমল্লের অনুদায়। মহাকবি রিঙ্কণ ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া “বিক্রমাদিত্যচরিত” নামক কাব্য রচনা করেন। চোলরাজকন্য়ার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি তুঙ্গভদ্রানদীতীরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ঋতুরের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি অবিলম্বে সৈন্যে কাঞ্চীপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে দাক্ষিণ বিজ্জোহীদিগকে দমন করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে কাঞ্চীপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, তৎপরে তিনি গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুর আক্রমণ করেন। অনতিকাল পরেই তিনি শুনিলেন যে, যে তাঁহার শালক বিজ্জোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং বেঙ্গিরাজ রাজিগ

(১৯) “অভবন্তয়েত্তনুজো বিজয়বিভাগী বিরোধিবিক্ষংসী তেজো বিজিতাদিত্যসত্যধনো বিক্রমাদিত্যঃ।”

(২০) Ind. Ant. vol. V. p. 17.

(২১) Ind. Ant. vol. XII. p. 122.

(রাজেন্দ্র কুলাভূজ চোড়দেব ১ম) কাকীপুরী অধিকার করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে রাজিগের বিরুদ্ধে সৈন্তচালনা করিলেন। রাজিগ (রাজেন্দ্রচোড়) বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা চালুক্যরাজ ২য় সোমেশ্বরকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। বিক্রমাদিত্য সোমেশ্বর ও রাজিগ উভয়কেই পরাস্ত করিলেন। রাজিগ পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, কিন্তু সোমেশ্বর বন্দী হইলেন। এইবার বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সার্বভৌম নৃপতি বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিলেন। (বিক্রমাকচরিত)

ঐহার রাজ্যারোহণ হইতেই তিনি “চালুক্যবিক্রমবর্ষ” নামে এক নব অঙ্গ প্রচলন করিলেন। ৯৯৭ শকে কান্তন-মাসের শুক্লপঞ্চমী হইতে এই অঙ্গের আরম্ভ। [চালুক্য-বিক্রমবর্ষ দেখ।] শত শত তাম্রশাসনে এই মহাবীরের প্রতাপ ও মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। কাদম্বরাজগণ ঐহার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রীত হইয়া কাদম্বরাজকে আপন কন্যা সম্ভ্রাদান করেন। বিক্রমাদিত্য ১০৪৮ শক অবধি রাজত্ব করেন।

তৎপরে ঐহার পুত্র সোমেশ্বর ৩য় বা ভুলোকমল্ল সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই চালুক্যগৌরবরবি হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। চেদি ও গণপতিরাজগণ চালুক্যরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিস্তীর্ণ চালুক্য-রাজ্য এক এক করিয়া বিপক্ষের করকবলিত হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে ভুলোকমল্ল ১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যলক্ষ্মী রক্ষা করেন। তৎপরে ঐহার ভ্রাতা জগদেকমল্ল [২য়] অপর নাম জয়কর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐহার সেনাপতির নাম কালিদাস (২২)। রাজা জয়কর্ণ বড় ধার্মিক ছিলেন, নানাস্থানে ইনি দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন (২৩)।

তৎপরে ভুলোকমল্লের পুত্র তৈল বা ত্রৈলোকমল্ল (৩য়) ১০৭২ শকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তৎপুত্র বীরসোমেশ্বর ৪র্থ আবার চালুক্যরাজ্যপ্রী কিছুদিনের জন্ত গৌরবাধিত করিয়াছিলেন। ঐহার রাজত্ব কালে অর্থাৎ ১১১১ শক পর্য্যন্ত চালুক্যগৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তৎপরে মহিশূরের হয়সাল বজ্রালবংশের অভ্যুদয়ে চালুক্যরাজ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

সিউএল সাহেব লিখিয়াছেন, ১১৮৯ খৃঃ অব্দের পর আর প্রতীচ্য চালুক্যের নামগন্ধ শুনা যায় না (২৪)। কিন্তু

বোধ হয় যে তখনও প্রতীচ্য চালুক্যবংশ এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। ৩৬৬ শকাব্দিত একখানি তাম্রশাসনে কল্যাণপুরাধীশ্বর বীর নোণেশ্বর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ৩৬৬ শকে কল্যাণপুরে কোন চালুক্যের রাজধানী ছিল না, বিশেষতঃ ঐ শাসনপত্রের লিপি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয় (২৫)। এরূপ স্থলে উক্ত শকাব্দ সম্ভবতঃ চালুক্যবিক্রম-বর্ষেরই হইবে। যদি এ অমুমান প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ১৩৬৩ শকেও কল্যাণপুরে বীর নোণেশ্বর রাজত্ব করিতেছিলেন।

পূর্বকথিত চালুক্যবংশ হইতেই প্রাচ্য চালুক্যবংশের উৎপত্তি। যে সময়ে বাদামি ও কল্যাণের চালুক্যরাজগণ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বেঙ্গীরাজ্যে প্রাচ্য চালুক্যগণ আধিপত্য করিতে ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব অংশে ইহারাজ্য করিতেন বলিয়া প্রাচ্যচালুক্য নামে অভিহিত করিলাম। হর্ববিজ্ঞেতা পুলিকেশি সত্যাপ্রয়ের অমুজ কুজবিষ্ণুবর্দনই প্রাচ্য চালুক্য-বংশের আদিপুরুষ।

পুলিকেশি সত্যাপ্রয়ের আধিপত্যকালে বিষ্ণুবর্দন যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং চালুক্য-সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ জ্যেষ্ঠের অধীনে শাসন করিতেন। অবশেষে তিনি বেঙ্গীরাজ্য অধিকারপূর্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ঐহার ও তৎসংশ্লীষ নরপতিগণের শত শত অমুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাদামি ও কল্যাণের চালুক্য রাজগণের প্রকৃত রাজ্যকালনির্ণয়ে যেরূপ অমুবিধা, এই প্রাচ্য চালুক্যের তাম্রশাসনাদিতে প্রত্যেকরাজের রাজ্যকাল বিবৃত থাকায় ইহাদের প্রকৃত সাময়িক ইতিহাস উদ্ধারে সেরূপ গোলযোগ নাই।

কুজবিষ্ণুবর্দন স্বদত্ত অমুশাসনাদিতে কোথাও কুজবিষ্ণু, কোথাও বিষ্ণুবর্দন, কোথাও বিটুরস, কোথাও ত্রীপুথিবী-বল্লভ, কোথাও বা বিষমসিদ্ধি বিরুদ্ধে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পুলিকেশি সত্যাপ্রয়ের ৮ম বর্ষে লিখিত তাম্রশাসনে (৫৩৮ শকে অর্থাৎ ৬১৬ খৃষ্টাব্দে) ইনি যুবরাজ আখ্যায় ভূষিত ছিলেন (২৬)। আবার বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত চিপুরুপল্লি হইতে সংগৃহীত বিষ্ণুবর্দনের ১৮ সম্বদকিত তাম্রশাসনে ঐহার সর্বপ্রথম “মহারাজ” উপাধি দেখিতে পাই। এই তাম্রশাসন সাহায্যেই জানা যায় যে বিষ্ণুবর্দন বাদামি রাজ্য হইতে অনেক দূর পূর্বে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

(২২) Indian Antiquary, vol. VI. p. 140.

(২৩) Jour. Bom. Br. Roy. As. Soc. vol. X. p. 287.

(২৪) R. Sewell's Dynasties of Southern India, p. 11.

(২৫) Ind. Ant. VIII. p. 94, plate I and II

(২৬) Indian Antiquary, vol. XIX. p. 303.

প্রাচ্য চালুক্যগণের তাম্রশাসন-মতে বিষ্ণুবর্দ্ধন ১৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ রাজ্যকাল তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইতে গণিত হইয়াছে।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম জয়সিংহ ৫৫৬ শকে রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং ৫৮৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রভট্টারক সাতদিন মাত্র রাজত্ব করেন। মহারাজ প্রভাকরের পুত্র পৃথিবীমূলের প্রদত্ত গোদাবরীর তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তিনি (গঙ্গরাজ) ইন্দ্রবর্ষা প্রভৃতি রাজত্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রভট্টারকের উচ্ছেদের জন্ত যোরতর সংগ্রাম বাধাইয়া ছিলেন (২৭)। ইন্দ্রভট্টারকের পর তৎপুত্র (২য়) বিষ্ণুবর্দ্ধন ৫৮৫ হইতে ৫৯৪ শক পর্য্যন্ত ৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। কোন কোন তাম্রশাসনে তাঁহার নাম বিষ্ণুরাজ, সর্বলোকাশ্রয় উপাধি এবং বিষমসিদ্ধি বিরুদ্ধ লিখিত আছে।

তৎপরে ২য় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র মঞ্জি-যুবরাজ ৫৯৪ হইতে ৬১৯ শক পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার উপাধি সর্বলোকাশ্রয় ও বিরুদ্ধ বিজয়সিদ্ধি, ইনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে ইনি অনেককেই পরাজয় করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী সকল চালুক্যরাজের শাসনাদিতে লিখিত আছে যে স্বামী মহাসনের অমুগ্রাহে চালুক্যবংশ রাজ্যাত্মী অর্জন করেন, কিন্তু এই মঞ্জিরাজের একখানি শাসনে লিখিত আছে যে কৌশিকীর বরপ্রসাদেই তাঁহার রাজ্যালাভ হইয়াছিল (২৮)।

তৎপরে মঞ্জিযুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ২য় জয়সিংহ ৬১৯ হইতে ৬৩২ শক পর্য্যন্ত ১৩ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। তৎপরে ২য় জয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কোঙ্কিলি ৬ মাস মাত্র রাজত্ব করেন।

কোঙ্কিলির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৩য় বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ৬৩২ হইতে ৬৬৯ শক পর্য্যন্ত ৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন।

তৎপরে ৩য় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র বিজয়াদিত্য ভট্টারক ৬৬৯ হইতে ৬৮৭ শক পর্য্যন্ত ১৮ বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্যভোগ করেন, ইহার বিক্রমরাম ও বিজয়সিদ্ধি এই দুই বিরুদ্ধ ছিল।

বিজয়াদিত্যের পুত্রের নাম বিষ্ণুরাজ বা ৪র্থ বিষ্ণুবর্দ্ধন। ইনি ৬৮৭ শক হইতে ৭২২ শক পর্য্যন্ত ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার বীরপুত্র বিজয়াদিত্য নরেন্দ্রমুগরাজ ৭২২ হইতে ৭৬৬ শক পর্য্যন্ত ৪৪ বর্ষ রাজ্যাত্মী ভোগ করেন।

(২৭) Journal Bombay Branch Royal Asiatic Society vol. XVI, p. 19.

(২৮) Hultzsch's South Indian Inscription, vol. I. p. 35.

ইহার প্রথাবাহ্যর তাম্রশাসনাদি উৎকীর্ণ হইবার সময়ে ইনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে ইনি ৪ বর্ষ যৌবরাজ্য ও ৪০ বর্ষ রাজপদ ভোগ করেন। ইনি চালুক্য-অর্জুন ও সমস্তভুবনাশ্রয় নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নানা স্থান হইতে ইহার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা যায়—ইনি গঙ্গবংশ-ধ্বংসের অনলস্বরূপ ও নাগাধিপবিজেতা। ইনি ষাটশবর্ষব্যাপী দিবারাত্র সংগ্রামে গঙ্গ ও রট্টসৈন্যের সহিত শতাব্ধিবার যুদ্ধ করিয়া শতাব্ধি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র মহারাজ কলি-বিষ্ণুবর্দ্ধন বা ৫ম বিষ্ণুবর্দ্ধন। ইনি ১৮ মাস রাজত্ব করেন।

কলিবিষ্ণুর জ্যেষ্ঠপুত্র গুণক বিজয়াদিত্য বা ৩য় বিজয়াদিত্য। কোন কোন তাম্রশাসনে গুণগ বা গুণগাঙ্গবিজয়াদিত্য নাম ও সমস্তভুবনাশ্রয় উপাধি দৃষ্ট হয়। ইনি একজন অকৃশাঙ্গ-বিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রট্টরাজ কর্তৃক আহৃত হইয়া অসমযোদ্ধীগকে আক্রমণ করেন, যুদ্ধে মঞ্জিরাজের মন্তক ছেদন এবং (রাষ্ট্রকূটরাজ ২য়) কৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইনি ৭৬৭ হইতে ৮১১ শক পর্য্যন্ত ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে ৩য় বিজয়াদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়, ইনি রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই (১)। তৎপরে বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১ম যুদ্ধমল্লের নাম পাওয়া যায়। ইনি মহারাজ চালুক্যভীমের পিতৃব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনিও বোধ হয় রাজপদলাভ করিতে পারেন নাই।

যুবরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম চালুক্যভীম ৮১১ শক হইতে ৮৪১ শক পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন। কৃষ্ণাঙ্গোদয় ইদর হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—৩য় বিজয়াদিত্যের পর বেঙ্গীদেশ রট্টগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। চালুক্যভীম কৃষ্ণবল্লভকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইহার সেনাপতির নাম মহাকাল।

চালুক্যভীমের জ্যেষ্ঠপুত্র ৪র্থ বিজয়াদিত্য ৮৪১ শকে ৬ মাস মাত্র রাজ্যভোগ করেন। নানা স্থানের তাম্রশাসনে ইনি কোল্লবিগণ্ড বিজয়াদিত্য, কোল্লভিগণ্ড বিজয়াদিত্য, কোল্লবিগণ্ড, কোল্লবিগণ্ডভাস্কর, কলিযর্ভাক্ষ, কলিযর্ভিগণ্ড ইত্যাদি নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার পত্নীর নাম মেলাদা। ইনি সমস্ত বেঙ্গীমণ্ডল ও ত্রিকলিঙ্গ শাসন করিতেন। পট্টবর্দ্ধিনীবংশীয় পৃথিবীরাজের পুত্র ভগুনাদিত্য অপর নাম কুন্ডাদিত্য ইহার প্রধান অমুচর ছিলেন।

(১) Ind. Ant. vol. VI. p. 70 and vol. XI. p. 161a.

বাদামি, কল্যাণ ও গুজরাটের চালুক্যরাজবংশ।

[২৬৭]

জয়সিংহ ১ম

রণরাগ

১ পুলিকেশী:বল্লভ [১ম] (শক ৪১১)

২ কীর্তিবর্মা [১ম] পৃথিবীবল্লভ (শক ৪৮৯)

৩ মঙ্গলীশ বা মঙ্গলরাজ (শক ৪৮৯-৫৩১)

৪ সত্যাশ্রয় ইন্দ্রবর্মা (শক ৫৩১)

৫ পুলিকেশী [২য়] সত্যাশ্রয় (শক ৫৩১-৫৫৬)

বিষ্ণুবর্দ্ধন (১ম আচা চালুক্যরাজ)

জয়সিংহ ধরাশ্রয় (গুজরাটের ১ম চালুক্যরাজ)

নাগবর্দ্ধন

বুদ্ধবর্মা

বিজয়রাজ (৩৯৪ চৈদিসং)

৬ নড়মরি (চন্দ্রাদিত্য) (শক ৫৫৭-৫৯০)

৭ আদিত্যবর্মা (শক ৫৯০-৬২৭)

৮ বিক্রমাদিত্য [১ম] (শক ৫৯২-৬০১)

অধেরা (কন্বা)

জয়সিংহ ধরাশ্রয় (গুজরাটধিপ)

[মহিষী বিজয়মহাদেবী]

৯ বিনয়াদিত্য যুদ্ধমল্ল (শক ৬০২-৬১৮)

শিলাদিত্য শ্রীশ্রয় (যুবরাজ) (৪২৬-৪৪৩ চৈদিসং)

বিনয়াদিত্য যুদ্ধমল্ল মঙ্গলরাজ (৬৫৩ শক)

পুলিকেশিবল্লভ জনাশ্রয় (৪৯০ চৈদিসং)

১০ বিজয়াদিত্য (শক ৬১৮-৬৫৫)

১১ বিক্রমাদিত্য [২য়] (শক ৬৫৫-৬৬৯)

১২ কীর্তিবর্মা [২য়] (শক ৬৬৯-৬৭৯)

১ ভীম [১ম]

কীর্তিবর্মা [৩য়]

তৈল [১ম]

বিক্রমাদিত্য [৩য়]

ভীম [২য়]

অযাগ [১ম]

১৩ বিক্রমাদিত্য [১ম] বা সত্যাশ্রয় বিক্রমাদিত্য, (শক ৮৯৫-৯১৫)

১৪ তৈল [২য়] বা আহবমল্ল [১ম]

১৫ সত্যাশ্রয় [২য়], (শক ৯১৯-৯৩০)

দশবর্মা বা যশোবর্মা

১৬ বিক্রমাদিত্য [৫ম] বা ত্রৈলোক্যমল্ল [১ম] (শক ৯৩০-৯৪০)

অকাদেবী (শক ৯৪৪-৯৬৯)

১৭ জয়সিংহ [৩য়] বা জগদেকমল্ল [১ম] (শক ৯৪০-৯৬৪)

(কল্যাণপুরে)

১৮ সোমেশ্বর [১ম] বা আহবমল্ল [২য়] ত্রৈলোক্যমল্ল (শক ৯৬৪-৯৯০)

১৯ ভুবনৈকমল্ল বা সোমেশ্বর [২য়] (শক ৯৯০-৯৯৭)

২০ বিক্রমাদিত্য [৬ষ্ঠ] বা ত্রিভুবনমল্ল [২য়] (শক ৯৯৭-১০৪৮)

জয়সিংহ [৪র্থ] বা ত্রৈলোক্যমল্ল (বনবাসীর শাসনকর্তা), (শক ১০০১-১০০৩)

২২ জয়কর্ণ বা জগদেকমল্ল [২য়] (শক ১০৬০-৭২)

২১ সোমেশ্বর [৩য়] বা ভুলোকমল্ল (শক ১০৪৮-১০৬০)

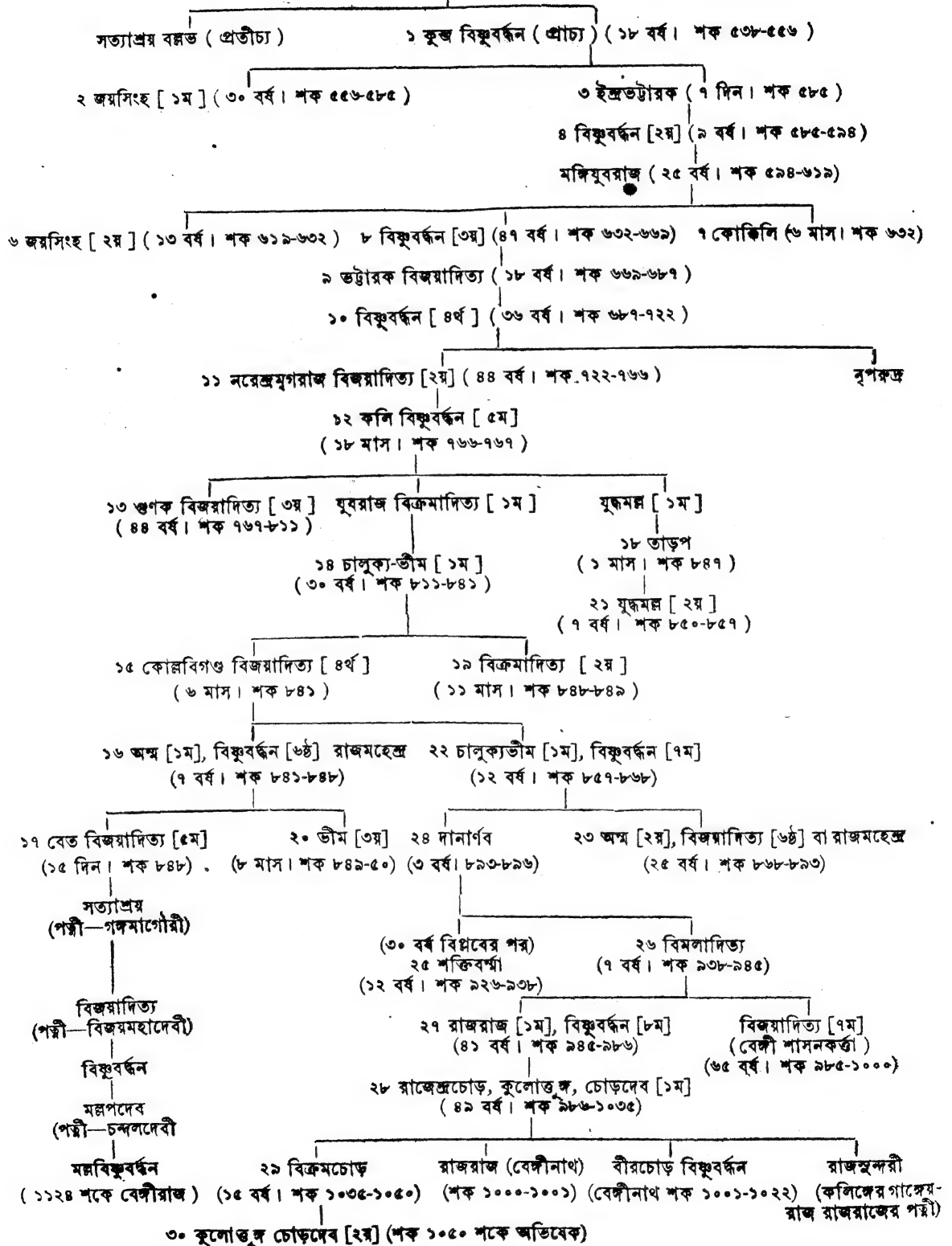
মৈললাদেবী (কাদম্বরাজ ২য় জয়কেশীর পত্নী)

২৩ তৈল [৩য়] বা ত্রৈলোক্যমল্ল [৩য়] (শক ১০৭২-১০৮৪)

২৪ সোমেশ্বর [৪র্থ] বা ত্রিভুবনমল্ল [৩য়] (শক ১০৮৪-১১১১)

প্রাচ্য চালুক্যবংশাবলী ।

कीर्तिबन्ध्या



উক্ত বিজয়াদিত্যের পুত্র অম্ব ১ম বা রাজমহেন্দ্র বিজুবর্ধন (৬৬) ৮৪১ হইতে ৮৪৮ শক পর্যন্ত ৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইহার জাতি সামন্তগণ ইহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত যোগ দান করেন। ইনি উত্তর শতাব্দী নিপাত করিয়াছিলেন। ইহারই সময়ে রাজমহেন্দ্রপুর (বর্তমান রাজমহেন্দ্রী) চালুক্যরাজ্যভুক্ত এবং পুনরায় রাজমহেন্দ্র নামে অভিহিত হইতে থাকে।

তৎপরে অম্বের জ্যেষ্ঠপুত্র (৫ম) বিজয়াদিত্য অপর নাম বেত একপক্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। ২য় অম্বের তান্ত্রশাসনে লিখিত আছে যে, বেত বিজয়াদিত্য যুদ্ধমল্লের পুত্র তাড়প কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইয়াছিলেন (২)।

পিটপুত্রের শিলাফলকে ও গোদাবরী হইতে আবিষ্কৃত তান্ত্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে, তাড়প বেত বিজয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলে বেতের পুত্রগণ বেদী অঙ্কলে পলায়ন করেন। বোধ হয় তৎকালে রাজমহেন্দ্রীতেই রাজধানী ছিল। বেদীতে গিয়া বেতের পুত্রগণ প্রথমে সামান্তভাবে থাকিয়া অবশেষে তথাকার শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কারণ, ১১২৪ শকে ঐ বংশীয় মল্লবিজুবর্ধন “বেদীদেশবহুদরেশ” নামে অভিহিত হইরাছেন। [২৬৮ পৃষ্ঠার প্রাচ্যচালুক্যবংশাবলীতে মল্লবিজুবর্ধনের পূর্বপুরুষের বংশাবলী উক্তব্য।]

যুদ্ধমল্লপুত্র তাড়পের ভাগ্যেও বেদীদিন রাজপদ ভোগ করিতে হয় নাই, তিনি ১ মাস রাজত্ব করিতে না করিতে চালুক্যভীমের পুত্র (২য়) বিজয়াদিত্য তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজপদ গ্রহণ করেন, তিনিও ১১ মাস ত্রিকলিঙ্গ ও বেদীমণ্ডল শাসন করেন। তৎপরে ১ম অম্বের আর এক পুত্র ভীম (৩য়) যুদ্ধে বিজয়াদিত্যকে পরাস্ত করিয়া ৮ মাস মাত্র রাজ্যলক্ষী উপভোগ করেন। তাড়পের পুত্র ২য় যুদ্ধমল্ল ভীমকে মারিয়া ৮৫০ শক হইতে ৮৫৭ শক পর্যন্ত ৭ বর্ষ রাজ্যসম্পাদন করেন।

তৎপরে ৪র্থ বিজয়াদিত্যের পুত্র ও ১ম অম্বের বৈমাত্রেয় (২য়) চালুক্যভীম বা (৭ম) বিজুবর্ধন ৮৫৭ শক হইতে ৮৬৮ শক পর্যন্ত ১২ বর্ষকাল রাজ্য অধিকার করেন। ২য় অম্ব বা ৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্যের একধামনি অপ্রকাশিত তান্ত্রশাসনে লিখিত আছে—যে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চালুক্যভীম ত্রিরাজমহা, মহাবীর ধলগ বা বলগ, দুর্দর্ভ ভাতবিকি বা ভাতবিকান, রণদুর্দর্ভ বিজ্ঞ, দুর্দান্ত অধ্যাপক, চোলরাজ লোববিকি, যুদ্ধরত্ন

এবং গোবিন্দ-প্রেরিত বিশূল সৈন্তবর্গকে বিনাশ করেন। তিনি সর্বলোকপ্রসন্ন, পশুমহেন্দ্র, রাজমার্ত্তণ্ড, কররিকদাত ও বেকীনাথ প্রভৃতি নামে পরিচর দিয়া গিরাছেন।

প্রাচ্য চালুক্যরাজগণের মধ্যে ইনি একজন মহা পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ইহার শাসনপক্ষে ইনি “মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক” এই উচ্চ উপাধি ও ইহার বরাহলাহিত মোহরে দ্বিত্ববনাত্মক নাম খোদিত আছে।



চালুক্যরাজের তান্ত্রশাসনে সংলগ্ন মোহর।

ইহার পত্নীর নাম লোকমহাদেবী। তৎপরে ২য় চালুক্যভীমের পুত্র অম্ব ২য় বা ৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইহার প্রদত্ত অনেক তান্ত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইনি সমন্তভুবনাশ্রয় ও রাজমহেন্দ্র নামে এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি ৮৬৮ হইতে ৮৯৪ শক পর্যন্ত ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দানার্ণব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ৩ বর্ষ রাজ্যভোগ হইতে না হইতে চালুক্যরাজ্য অরাজক, বিশৃঙ্খল ও বিপ্লবপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজজ্ঞাতিবর্গ ও প্রতিপক্ষ চোলরাজগণ চালুক্য সিংহাসন গ্রহণ করিবার জন্য সকলেই উদ্যত হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ অসুমান করেন যে, চোলরাজ গঙ্কৈকোণ্ড-কো-রাজরাজ রাজকেশরিবর্মাণ্ডর অব্যবহিত পূর্বপুরুষ সমস্ত বেদীরাজ্য কিছুদিনের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন। গোদাবরী জেলাস্থ চোন্নুরী নামক স্থান হইতে সংগৃহীত তান্ত্রশাসনে (৩) লিখিত আছে—“প্রায় ২৭ বর্ষ ধরিয়া বেদীমণ্ডল অরাজক ছিল।”

† প্রত্নতত্ত্ববিৎ ক্রিষ্টসাহেব ই’হাকে রাষ্ট্রকূটরাজ ৫ম গোবিন্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(৩) Dr. Hultzsch's South Indian Inscriptions, vol. I. p. 94

(২) Ind. Ant. XIII. p. 248

* প্রতীচ্যগজবংশীয় বেগুনের শিলালিপিগণিত অধ্যাপকের।

Epigraphia Indica, vol. I. p. 847f.

† ইনি সম্ভবতঃ ২য় চালুক্যভীমের পূর্ববর্তী ২য় যুদ্ধমল্ল।

তৎপরে দানার্ণবের জ্যেষ্ঠপুত্র চালুক্যচন্দ্র শক্তিবর্ম্মা বেকীর সিংহালন অধিকার করেন। আরাকান ও শ্রামদেশ হইতে এই শক্তিবর্ম্মার নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইনি ২২৬ শক হইতে ২৩৮ শক পর্য্যন্ত ১২ বর্ষকাল রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে শক্তিবর্ম্মার কনিষ্ঠ বিমলাদিত্য রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি সূর্য্যবংশীয় চোলরাজ রাজরাজের কন্যা ও রাজেন্দ্রচোলের কনিষ্ঠ ভগিনী কুণ্ডবামহাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার রাজ্যকাল ২৩৮ হইতে ২৪৪ শক।

মহারাজ বিমলাদিত্যের গর্ভে রাজরাজ জন্মগ্রহণ করেন। কোকুমেল্লি হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—রাজ-রাজ ২৪৪ শকে সিংহরাশিতে সৌরভাজপদ কুজ্বিতীয়া তিথি শুক্লাবारे সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন (৪)। ইনি নিজ মাতুল রাজেন্দ্রচোলের কন্যা অনঙ্গদেবীকে বিবাহ করেন। ২৮৬ শক পর্য্যন্ত ৪১ বর্ষ ইহার রাজত্বকাল। আরাকান ও শ্রাম হইতে ইহারও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে (৫)।

তৎপরে তাঁহার বীরপুত্র কুলোত্তম-চোড়দেব বেকীরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনিও চোলরাজ রাজেন্দ্রদেবের কন্যা মধু-রাস্তকীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিন পুরুষ ধরিয়া মাতুল-বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চালুক্য রাজগণ এই সময়ে প্রকৃত “চোল” হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই জন্তই প্রত্যেককেই মাতামহের উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য্যভিষিক্ত হইতে দেখা যায়। [চোলরাজবংশ দেখ।]

মহারীর কুলোত্তম চোড়দেব নানাহান জয় করিয়া গঙ্গা-পুুরী বা গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম্ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিখ্যাত কাকীপুরে ইহার রাজসভা বসিত। বোধ হয়, যে সময়ে উত্তরাধিকার লইয়া চোলরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, ইনি সেই সময়ে চোলরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় কিছুদিনের জন্ত রাজপাঠ স্থাপন করেন।

গাঙ্গেররাজ চোড়গঙ্গের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তাঁহার পিতা রাজরাজ রাজেন্দ্রচোড়ের কন্যা রাজসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন এবং ত্রমিল যুদ্ধে জয়শ্রী অর্জন করিয়া বেকীরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে বিজয়াদিত্যকে বেকীরাজ্যের ভার্য্যপণ করিয়া কলিঙ্গে চলিয়া আইসেন।

- (৪) “বো রক্তিত্ত্বং বহুবতীং শকবৎসরেষু
বেদাধুরানিবিধির্ভবু সিংহগেহকে।
কুজ্বিতীয়াবাসোত্তরভক্তিকারাম্
বারে ভুরোর্ব্বিজি লয়বরেভিষিক্তঃ।”

কোকুমেল্লির তাম্রশাসন ৩২১৪ বর্ষ পঞ্জি।

(৫) Ind. Ant. XIX. p. 79.

[গাঙ্গের দেখ।] সম্ভবতঃ চালুক্যরাজ কুলোত্তম-চোড়দেব চোলরাজ্য আক্রমণের সময়ে আবিড়ত্ববে জামাতা রাজরাজের সাহায্য পাইয়াছিলেন, এবং বোধ হয় সেই জন্তই তাঁহাকে কিছুদিনের জন্ত বেকীর শাসনভার প্রদান করেন। গাঙ্গের-রাজ রাজরাজের পর কুলোত্তমের পিতৃব্য ও রাজরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়াদিত্য ২৮৬ শক হইতে ২২২ শক পর্য্যন্ত বেকীরাজ্য শাসন করেন।

বিজয়পের বিক্রমাদিত্যের সময়ে মহারাজাধিরাজ কুলো-ত্তম-রাজেন্দ্র-চোড়দেব কেবল রাজগি নামে অভিহিত হইয়া-ছেন। ইনি প্রথমে চোলরাজ্য অধিকার করিলে চোলরাজ-জামাতা (কল্যাণপুরের) চালুক্যবংশীয় বট বিক্রমাদিত্য সৈন্নে আসিয়া গঙ্গাপুরী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও কাকী উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কল্যাণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজহত্যা গ্রহণের পরই বোধ হয় কুলোত্তম আবার চোলরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। তিনি ২৮৬ শক হইতে ১০৩৫ শক পর্য্যন্ত ৪২ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রমচোড় ১০৩৫ হইতে ১০৫০ শক পর্য্যন্ত ১৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইনি প্রথমে কিছু দিন বেকীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ইনি রাজ্য হইলে ইহার কনিষ্ঠ ২য় রাজরাজ ১০০০ শকে অন্নদিনের জন্ত বেকীতে রাজপ্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তৎপরে কুলোত্তমের তৃতীয় পুত্র বীরচোড়দেব বা ২য় বিজুবর্দ্ধন ১০০০ হইতে ১০২২ শক পর্য্যন্ত প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন।

বিক্রমচোড়ের পর তাঁহার পুত্র ২য় কুলোত্তম-চোড়দেব ১০৪২ শকে চালুক্যসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন। চিত্তুর হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে ১০৫৬ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপরে আর কতদিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার পর কে চালুক্যসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় ১৭শ নৃপতি বেতবিজয়াদিত্যবংশীয় মন্ন-বিজুবর্দ্ধনকে ১১২৪ শকেও বেকীসিংহাসনে অভিষিক্ত দেখি।

[২৬৮ পৃষ্ঠায় প্রাচ্য চালুক্যবংশাবলী দেখ।]

চাল্য (ত্রি) চল কৰ্ম্মণি-ণ্যৎ। চালনীয়, যাহাকে চালান যায়। “অভূতিন চাল্যঃ” (ভাগবত ২।৭।১৭)

চাবড়, গুজরাটের একটা প্রাচীন ও বিখ্যাত রাজপুত-রাজবংশ। চাবড়বংশীয় নানা শাখার রাজপুতগণ ভিন্ন ভিন্ন আদিপুরুষের নামোল্লেখ করেন, সুতরাং যদিও ইহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর রাজপুত মধ্যে গণ্য এবং যদিও অণহল্লাবড়ের চাবড়-নৃপতিগণ ইতিহাসে স্পষ্ট, তথাপি তাঁহাদিগের বংশোৎপত্তি-বিবরণ

আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই জাতি বিদেশ হইতে আসিয়া সৌরাষ্ট্ররাজ্য অধিকার করেন। ক্রমে উত্তরদিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া, অবশেষে এই বংশীয় বনরাজ পট্টনরাজ্য স্থাপন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, চাবড়গণ বহুবিকৃত ও বিখ্যাত প্রমার-বংশোদ্ভব। এই প্রমারবংশ হইতেই বর্তমান বহুবংশ্যক রাজপুত্রবংশ উদ্ভূত হইয়াছে। এমন কি প্রাচীনকালে এক সময়ে ইহাদের রাজ্য এরূপ বহু বিস্তৃত হইয়াছিল যে, ‘পর্শার-কা-মুলুক’ বলিয়া প্রবাদ চলিত ছিল। গুজরাটের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বিখ্যাত নগরে প্রমারগণ কোন না কোন সময়ে রাজত্ব করেন। পট্টননগরেও প্রথমে প্রমারদিগের রাজধানী ছিল। চাবড়গণ এখানে আসিয়া অণ-হলু নামক এক পশুপালকের সাহায্যে পট্টনের ভ্রমাবশেষের মধ্যে প্রমাররাজ্যগণের সঞ্চিত বহুঅর্থ লাভ করেন। বনরাজ সেই অর্থ সাহায্যে পূর্বরাজধানীর ধ্বংসাবশেষের উপর ৮০২ সংবতে এক নূতন নগর স্থাপন করিলেন, এবং অণহলের নামানুসারে উহার নাম অণহলুবাড় রাখিলেন। প্রাচীন বর্ধমানপুরও বহুপূর্বে প্রমারদিগের শাসনাধীন ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। সম্ভ্রতি ঐ প্রদেশের দক্ষিণাংশে এক শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে প্রমারবংশীয় এক নৃপতি বালাকেন্দ্র (বর্তমান বালাক)-নগরে রাজত্ব করিতেন।

সম্ভবতঃ উক্ত চাবড়রাজগণ হইতেই পালানপুরের চাডচট অর্থাৎ চাবড়চটের নামকরণ হইয়া থাকিবে। তথাকার প্রবাদেও এরূপ অনুমিত হয় যে, ঐ চাবড়গণ প্রমারবংশের এক শাখা মাত্র। বনরাজ বহুরাজের পৌত্র ও দীর্ঘজীবিপতি বেণিরাজের পুত্র। পরম্পরাগত প্রবাদ যে, বহুরাজ আরবনাগরের উপকূলে রাজ্য করিতেন। তথায় তিনি ও পরে তাঁহার পুত্র বেণীরাজ রাজত্ব করেন। বেণীরাজ জনৈক সপ্তদাগরের বহুমূল্য রত্নাদি রাখিয়া প্রভারণা করার সমুদ্র জুঝ হইয়া বেণীরাজ সহ সমগ্র দ্বীপ জলসাৎ করিয়া ফেলে। তৎকালে গর্ভবতী রাজরাণী স্বপ্ন-যোগে এই বিপদ জানিতে পারিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি প্রথমে পঞ্চাসরে এবং ঐ নগর ধ্বংসের পর অরণ্যে গমন করেন। চন্দুর নামক স্থানে তিনি বনরাজ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বনরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হৃদ্যন্ত দম্পত্যি হইলেন। চতুর্পার্শ্ব হইতে বহুসংখ্যক দম্পত্যি আসিয়া তাঁহার দল গুঠ করিতে লাগিল। এক সময়ে তিনি কনোজের রাজত্ব বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন। এই অর্থে তিনি দল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে অণহলু নামে জনৈক রাখাল প্রাচীন পট্টননগরীর সঞ্চিত বহু গুপ্তঅর্থ বনরাজকে দেখাইয়া দিল। বনরাজ ঐ অর্থ দ্বারা বিখ্যাত অণহলুবাড়পত্তন নামক নগর

স্থাপন করিলেন। ঐ প্রদেশে চারণ ও ভাটগণ চাবড়-রাজ-গণের ঐতিহাসিক অনেক ঘটনা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল কবিতায় দীর্ঘবংশ-ধ্বংসের বিবরণ এবং বনরাজ যে প্রমারবংশীয় তাহার উল্লেখ আছে। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ বার্গেস বলেন যে, তিনি একটা বংশাবলীতে বনরাজ, বেণীরাজ ও বহুরাজ ইহারা বিক্রমাদিত্য নামক প্রমার-বংশীয় রাজার বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ দেখিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, কনকসেন নামে বনরাজের কোন পূর্ব-পুরুষ কনকবতী (বর্তমান কাটপুর) নামক স্থানে বাস করেন, অবশেষে সমুদ্রতীর দিয়া দীর্ঘবংশে গমন করেন। তৎপরে বহুরাজের সময় দীর্ঘবংশ চাবড়দিগের অধিকৃত হয়। উল্লিখিত কনকবতী বা কাটপুর বর্তমান বালাকের অন্তর্গত। সম্ভ্রতি এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্বৃষ্টে জানা যায় এই বালাকে একজন প্রমার বংশীয় রাজা ছিলেন।

ঐ প্রদেশের কবিগণ যেসকল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, * তাহাতে দেখা যায় যে ৯৯৭ সংবতে চাবড়গণ অণহলুবাড় হইতে বিভাজিত হন এবং ১২৯৭ সংবতে আলাউদ্দীন অণহলু-বাড় অধিকার করেন। ৯৯৭ সংবতে মুলরাজ ঐ নগর আক্রমণ করিয়া রাজ্য হন ও সকলকে বিনাশ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি এই সময় বিজয়সোলাঙ্কীর প্ররোচনার নিজ মাতার মস্তক ছেদন করেন। ছিন্ন রক্তাক্ত মস্তক যখন সিঁড়িতে গড়াইয়া গড়াইয়া সপ্তমসোপানে উপস্থিত হইল, তখন মুলরাজ উহা ধরিয়া রাখিলেন। বিজয় সোলাঙ্কী তাহা শুনিয়া বলিলেন, ‘যদি তুমি সিঁড়ির নীচ পর্য্যন্ত মাথা গড়াইতে দিতে, তাহা হইলে তোমার বংশ চিরকাল পট্টনে রাজত্ব করিত। সম্ভ্রতি সাত-পুরুষ পর্য্যন্ত তোমরা পট্টনে রাজত্ব করিতে পারিবে।’ যাহা হউক, চাবড়গণ প্রকৃত কোন বংশোদ্ভব তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপিত হয় নাই।

এক সময়ে গুজরাটের সমস্ত উপকূল চাবড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাল্লদুগজনির আক্রমণ সময়ে সোমনাথ-পাট্টনাধিপতি চাবড়বংশীয়ের অধিকারে ছিল।

* একটা কবিতায় বনরাজ কর্তৃক অণহলুর স্থাপনের বর্ণনা করিয়া তাঁহার বিধিজয়ের বর্ণনা এইরূপ আছে—

“প্রথম চাড-চাডেল, লক গগসেন হুগারো।

অরবুদ দীর্ঘী আং, হেম ওত্তর দীপ আরো।

পরবরীয়ো পরমার, বাসজীমাল বসারো।

নবকোটা করমেত্র, খেজ পাঞ্জলী খসারো।

ভোগং যেভোগ লকুতশাং, রণায়ত ভংগ বাখারো রজ।

বণরাজ কুবের বাণীয়ো, বশমো অণহলপুর চুরংগ।”

অগ্নহর্যবাপ্তনের প্রাচীন গৌরব চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। ইহার ভগ্নাবশেষে অদ্যাপি বহুসংখ্যক মন্দিরপ্রস্তর-নির্মিত ভগ্নমূর্তি পাওয়া যায়। তথাকার লোকে ঐ সকল পোড়াইয়া চূর্ণ করিত। বর্তমান ডাকঘরের নিকট একটা মন্দিরে শিবপার্বতীর মূর্তি ও ৮০২ সংবতে খোদিত একটা শিলালিপি আছে।

চাবুণ্ড (চামুণ্ড) পুণাজেলার অন্তর্গত একটা পর্বত। ইহাতে একটা বহু প্রাচীন দুর্গ আছে। এই পর্বত জুনানগরের ১০ মাইল বায়ুক্রমে এবং নানাঘাটের ১০ মাইল অধিক্রমে অবস্থিত। চাবুণ্ড, সিন্ধা, হড়ঙ্গর ও শিবনয় এই চারিটা দুর্গ নানা-গিরিপথ রক্ষা করিতেছে। চাবুণ্ডদুর্গ স্বভাবতঃ অতি দুর্ব্বারোহ। ইহার কৃত্রিম প্রাচীরাদি ভূত হ্রদ্বত ছিল না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে দুর্গে উঠিবার স্থান গোলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে পার্বত্য লোক বাতীত কেহ উহাতে উঠিতে পারে না। ইহার শিখর-দেশে চাবুণ্ডবাই (চামুণ্ডা) দেবীর মন্দির আছে। এখানে জল বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্রান্ত রসদ ভাল মিলে না। আন্ধারনগরের নিজামশাহীবংশের স্থাপিতা মালিকআব্দ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চাবুণ্ড অধিকার করেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিজামবুর্হানের শিশুপুত্র বাহাদুর প্রায় একবর্ষ কাল চাবুণ্ডদুর্গে বন্দী থাকিয়া পরবর্ষে আন্ধারনগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শাহজী চাবুণ্ড অর্থাৎ জন্দদুর্গে মোগলদিগকে দান করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সময়ের সময়ে মেজর এক্সট্রিজ-চালিত একদল সৈন্য চাবুণ্ডদুর্গ অধিকারে প্রেরিত হয়। ১লা মে তারিখে রাত্রিকালে ইংরাজসৈন্য দুর্গে শতাধিক গোলাবর্ষণ করিলে প্রাতঃকালে দুর্গস্থ ১৫০ জন মহারাষ্ট্রসৈন্য পরাজয় স্বীকার করে।

চাবুণ্ড, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সিন্ধবংশের রাজ্য। এই নামে সিন্ধরাজবংশে দুইজন নৃপতি ছিলেন। প্রথম চাবুণ্ডের নামোল্লেখ ছাড়া আর কোন কীর্তি শুনা যায় না। চাবুণ্ডের খোদিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান বিজাপুরের দক্ষিণভাগ ও ধারবারের উত্তরপূর্বভাগ লইয়া প্রাচীন সিন্ধরাজ্য গঠিত ছিল। ২য় চাবুণ্ড আনুমানিক ১০৮৪ শকে (১১৬১ খৃঃ অব্দে) প্রাহুভূত হন। ইনি দ্বিতীয় আবুগির পুত্র ও ১ম পশ্মাড়ির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি প্রতীচ্য চালুক্যরাজ ৩য় তৈলের সামন্তরাজ ছিলেন। দেমল-দেবীর গর্ভে চাবুণ্ডের আবুগির ও পশ্মাড়ি নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহার সময়ের একখানি শিলালিপি অরশিবিদি

ও অপরাধানি পদ্মদকল নামক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। শেখোক্ত অনুশাসন ১০৮৪ শকে খোদিত। এই সময়ে চাবুণ্ড ত্রিশভ কলাবাড়ী, সপ্ততি কিত্তকাড় ও সপ্ততি বাগদগ প্রভৃতির অধীশ্বর ছিলেন। দেবলাদেবী ও রাজপুত্র আবুগির প্রতিনিধি স্বরূপ পদ্মদকলে রাজত্ব করিতেছিলেন। কল-চুরি নৃপতি বিজ্জলের ভগিনী চাবুণ্ডের ২য় মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে চাবুণ্ডের বিজ্জল ও বিক্রম নামে আর দুই পুত্র জন্মে। এই সময় ইহার কলচুরিরাজদিশের অধীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। চাবুণ্ড কলচুরি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া কতক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। ১১৮০-১ খৃঃ অব্দে বিক্রমরাজ কলচুরিবংশীর সন্তানরাজের সামন্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর সিন্ধবংশের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চাশ, রাবলপিণ্ডীর ৩০ মাইল পশ্চিমে ও সাহধেরি নামক স্থানের ২৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা বৃহৎ নগর। ইহার বর্তমান নাম কতেজক; পূর্বে চাশ নামেই বিখ্যাত ছিল। খুলালগড় ও কালাবাগ নগরদ্বয় যে দুইটা প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত, সেই দুইটা রাস্তার সঙ্গমস্থলে এই নগর স্থাপিত এবং ইহাই এই সহরের উন্নতির অন্ততম কারণ। এই সহরের একমাইল অন্তরে একটা বৃহৎ পোস্তা আছে; এই পোস্তা ২২৫ ফিট দীর্ঘ, ১৬০ ফিট প্রশস্ত ও ২৬ ফিট ৩ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার চতুর্দিকে আরও অনেক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষসহ পোস্তাকে এ অঞ্চলের লোকে চাশধেরী বা চাশপোস্তা কহিয়া থাকে।

উক্ত পোস্তার পূর্বদিকে ও উহার অতি নিকট আর একটা ক্ষুদ্র পোস্তা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট মাত্র।

এ প্রদেশস্থ লোকের বিশ্বাস যে চাশপোস্তার প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পত্তি প্রোথিত আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অর্থ ব্যয় করিয়া পোস্তা খুঁড়িয়া ধনসম্পত্তি বাহির করিতে কেহই সাহসী হয় নাই।

চাশ, বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম জেলার একটা গ্রাম। এখানে একটা পুলিশ থানা আছে।

চাষ (পুং) চাষয়তি ভক্ষয়তি কর্ণাদিকং চাষি-অচ্। ১ স্বর্ণ-চাতক, সোণাচড়া। ২ নীলকণ্ঠ (Coracias Indica) ইহার পর্যায়—কিকীদবি, নীলাক্ষ, পুণ্যদর্শন, হেমভূণ্ড, মণিঙ্গীব, স্বস্তিক, অপরাভিত, অশোক, বিশোক, নন্দন, পুষ্টিবর্দ্ধন। স্বস্তির মতে—এই পাখী দেখিয়া উক্ত করটা নাম পাঠ করিলে কার্যসিদ্ধি হয়। ইহাকে বধ করিলে কৃত্রিম, বৈশ্ব ও শূদ্র বধের জায় উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

“হুয়া চাং মত্থুকেবচ।...পুত্রহত্যারিতং চরেৎ।” (মত্থু ১১:১৩২)
“পুত্রহত্যাকৃতং পুত্রবিটকজিরবধইতাপাতকপ্রারচিত্তং”

(কুরূক।)

ইহাদের মতক ও কঠদেশ মেটে হরিতাভ নীলবর্ণ, কপাল ভেৎ রক্তবর্ণ, গ্রীবা স্বল্প ও উদর পাংশুবর্ণ, পুচ্ছমূল ও পুচ্ছ পীতাত গাঢ় নীলবর্ণ, পক্ষবর্ণ ও তাহার দীর্ঘপালক সমুদায় কিকে নীলবর্ণ, পুচ্ছ গোড়ার পক্ষ ও শেষ দিকে বিহৃত, পদবর্ণ লোহিতাভ পীতবর্ণ, চক্ষু ধূসরবর্ণ, চক্ষের পাতা পীতবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ ইঞ্চি।

এই পক্ষী ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুরোপে ও এশিয়ার অজাঙ্ঘ্রস্থানে নীলকণ্ঠজাতীয় নানারূপ পক্ষী বিচরণ করে।

ভারতবর্ষীয় নীলকণ্ঠপক্ষী গভীর অরণ্যে থাকে না। ইহারা জঙ্গলের প্রান্তভাগে, শুষ্কবনে, উদ্যানে, শতক্ষেত্রে, নির্ঝরাদির মিকটে এবং গ্রামের চতুর্দিকে দৃষ্ট হয়। ইহারা সচরাচর উচ্চ বৃক্ষের চূড়ার শ্রাবলিক কর কর শব্দ এবং মৃত্যু করিতে করিতে চারিদিকে কীটপতঙ্গাদি খুঁজিতে থাকে। ভূমিতে কোন সজীব কীটপতঙ্গাদি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে, পুনরায় পূর্বস্থানে বসিয়া নূতন কীটাদি অন্বেষণ করে। দেশীয় লোক চোঘরা ফাঁদে জীবন্ত ঘুরঘুরে বাঁধিয়া ইহাদের বসিবার স্থানের নিকট রাখিয়া দেয়। চাষপক্ষী সেই স্থানে একবার বসিলে নিঃসন্দেহ ঘুরঘুরে দেখিতে পায় এবং ফাঁদে পড়ে।

বর্ষার প্রারম্ভে বৃক্ষের কোটরে, ভগ্ন প্রাচীরের ফাটলে অথবা প্রাচীন দেবমন্দিরাদির গাত্রে বাসা করিয়া একবারে ৩৪টা শুভ্রবর্ণ ডিম্ব প্রসব করে। এই সময় ইহারা অতিশয় কলহপ্রিয় ও ক্রুদ্ধস্বভাব হইয়া পড়ে।

তৈলঙ্গভাষায় এই পক্ষীকে পালুপিত্ত অর্থাৎ ছুপাখী বলে। তৈলঙ্গীদের বিশ্বাস স্বল্পপরা গাভীকে ঘাসের সহিত চাষপক্ষী অর্থাৎ পালুপিত্তপাখীর পালক খাওয়াইলে গাভীর অধিক দুগ্ধ হয়।

বরাহমিহিরের মতে—যাত্রাকালে চাষপক্ষী উত্তরদিকে থাকিলে কার্যাসিকি, অপরাহ্নে ঐ পক্ষী নকুলের সহিত বামদিকে থাকিলে শুভ, দৃষ্টির অগ্রভাগে পাপপ্রদ এবং পূর্বাহ্নে যাত্রাতুলা গ্রাঙ্ঘ হইবে। (বৃহৎসং ৮৬২৩-৪৩) আবার চাষপক্ষী রথের ধ্বজে বসিলে যুবরাজের অমঙ্গল হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৪৮।৬২)

চাঁস (পুং) চাষ পুসোদরাদিহাং সতং। ১ চাষপক্ষী। ২ ইক্ষু-বিশেষ। (দেশজ) ৩ কৃষিকর্ম, ভূমিকর্ষণ।

চাঁসকমান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণাজেলাস্থ একটা গ্রাম। ইহা ভীমানদীর উপর অবস্থিত এবং ধেম নামক স্থানে হইতে ৬ মাইল উত্তরপশ্চিম। ইহার লোকসংখ্যা ২২০০। শেনবাদিগের সময়ে এইস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। বালাজি বাজিরাওর কন্যা কল্লিগীর্বাই এখানে কএকটা অট্টালিকা ও উৎকৃষ্ট ঘাট এবং মহাদেবের এক স্থলর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত। মন্দিরটা নানা প্রকার কারুকার্যে খচিত এবং ইহার আনু-লম্বিক অস্ত্রাভ মণ্ডপ ও অন্তরনির্মিত দীপমালা ইহার শোভা আরো বৃদ্ধি করিতেছে।

চাঁসমুখোর (পারসী) চক্ষুলজ্জাহীন।

“কুচক্রী চাঁসমুখোর চোকলখোর হয়” (শ্রীধর্মরঙ্গল। ১১।)

চাঁসা, উড়িষ্যার এক স্ববিজীবী জাতি। অনেকে অসুমান করেন এই জাতীয়েরা অনার্য্য, ক্রমে হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ওড়চাষা বা মুণ্ডিচাল, বেনাতিয়া, চুখুলিয়া ও স্কুলিয়া। প্রত্যেক শাখার মধ্যে আবার কাশ্রপ ও শালখবি গোত্র প্রচলিত। চুখুলিয়া শ্রেণীর চাঁসাগণ সংখ্যার অল্প এবং সমুদ্রকূলে লবণ প্রস্তুত করে। ইহাদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ হয় না।

অপর শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। উড়িষ্যার সমাজবন্ধন বান্ধালা অপেক্ষা শিথিল ছিল বলিয়া অমেক অনার্য্য জাতি এই চাঁসাদিগের দলভুক্ত হইয়া যায়। এদিকে ধনশালী চাঁসাগণ স্বয়ং লাঙ্গল ও কৃষিকার্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মহাস্তি উপাধিগ্রহণপূর্বক নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টার আছে।

ইহাদের মধ্যে বালাবিবাহ ও বরহের-বিবাহ উভয়ই প্রচলিত। বালাবিবাহই অধিক গৌরবাহ। আট বা নয় বর্ষে কন্যার বিবাহ দিয়া যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাহাকে স্বামীর কাছে যাইতে দেয় না। বহুবিবাহের বিশেষ বাধা নাই। তবে জী বক্যা না হইলে দরিদ্রতানিবন্ধন অনেকেই দ্বিতীয় বিবাহ করে না। চাঁসাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা সচরাচর দেবরকে বিবাহ করে, দেবর না থাকিলে ইচ্ছামত অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। বিধবার বিবাহে আচারাদি নাই। দক্ষিণহস্তের পরিবর্তে বামহস্ত দ্বারা পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হয়। স্বামী অসতী জীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। একরূপ স্থলে পক্ষ্যাত ও জ্ঞাতিদিগের নিকট তাহার বিচার হয়। বিচারে জী অসতী স্থির হইলে স্বামী এক বৎসরের ধোয়াকী দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে। পরিভ্রাতা জী বিধবাবিবাহের নিয়মে আবার বিবাহ করিতে পারে।

চাসারা অনেকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের পুরোহিতগণ বর্ণব্রাহ্মণ। ইহারা মৃতদেহের অগ্নিসংকার করে, কখন কখন সমাধিও করিয়া থাকে। সমাধি দিবার সময় শবের সহিত অন্ন ও ফলাদি পুতিয়া ফেলে। অগ্নিসংকার করিলে কখন ঐ ভস্ম পুতিয়া ফেলে, কখন বা গঙ্গাজলে দিবার জন্ত কলসে রাখিয়া দেয়। শ্রাদ্ধাদি হিন্দুনিয়মে সম্পন্ন হয়।

চাসারা অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং ইহাই তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসা। তবে অতি অল্প লোকই বাণিজ্য ও চাকরি করে। চাকরগণ অনেকে চাকরাণ্‌ জমি ভোগ করে, অপরে বেতনভোগী ভূত্য। সমাজে ইহারা মালিদিগের নিম্ন ও জলাচরণীয়। ইহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও গৃহে ভাত খায় না। বস্ত্র বরাহের মাংস এবং শালমাছ ব্যতীত অপর সকল মাছই ইহাদের আহাৰ্য্য।

চাসাধোবা, বাঙ্গালার কৃষি ও বাণিজ্যোপজীবী জাতিবিশেষ। কেহ কেহ শিল্প ও গৃহনিৰ্ম্মাণাদিও করিয়া থাকে। চাসাধোবারা বলিয়া থাকে যে, তাহারা বৈষ্ণব ঔরসে ও বৈদেহ-কন্ডার গর্ভে উৎপন্ন। আরও বলে যে—সচরাচর চাসাধোবার কৃষিকার্য্যাবলম্বী ধোবা অর্থাৎ রজক বলিয়া বৈষ্ণব অর্থ করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, প্রকৃত অর্থ চাস অর্থাৎ কৃষি, তাহার ধব অর্থাৎ স্বামী, অর্থাৎ চাসজমির অধিকারী। ইহাদের উৎপত্তিবিষয়ক আরও একটা গল্প আছে। তাহা এই—“একদিন ব্রাহ্মণ ধোপানী মলিনবসনাদি লইবার জন্ত পুত্রসহ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল। পিতামহ তৎকালে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পুত্রকে অপেক্ষা করিতে রাখিয়া ধোপানীকে যাইতে বলিলেন। বালক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মা মলিন বস্ত্র সমুদয় লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ধোপানীর পুত্রকে না দেখিয়া ভাবিলেন, হয়ত কোন অমর তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হউক, ধোপানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তিনি তাহার পুত্রের অমররূপ একটা বালক সৃষ্টি করিলেন। এমন সময়ে ধোপানী যথাপূৰ্ণ নিজ পুত্র সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিল। ব্রাহ্মা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মহাবিব্রত হইলেন, অবশেষে তাহার সৃষ্ট পুত্রটী ধোপানীকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে পালন করিবে আর এই পুত্র দেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং বস্ত্রাদি ধোতকরণ প্রভৃতি নীচ কার্য্য করিবে না, কৃষিকার্য্যই ইহার উপজীবিকা হইবে।” যাহা হউক এইরূপ গৌরবজনক কিম্বদন্তী থাকিলেও চাসাধোবাদিগের কতিপয় লোকের সামাজিক

অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশোদ্ভব বলিয়া অনুমান করেন। সম্ভবতঃ ইহারা ধোবারই এক শাখা, কৃষিকার্য্যাদি উচ্চ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একপে আর ধোবা অর্থাৎ রজক বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না।

চাসাধোবাদিগের তিন শ্রেণী আছে। যথা—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র। ব্রাহ্মণ, কার্ম্ম প্রভৃতি উচ্চজাতির শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ঐ বিভাগ আদি বাসস্থানপরিচায়ক। চাসাধোবাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আহারাদি হয়, কিন্তু কস্তা আদান প্রদান চলে না। ইহাদের মধ্যে অলিমান, আতুলখম্বি, বাঘখম্বি, বৃহৎবট, ধবলখম্বি, কান্তপ ও শাওল্য এই কয়টা গোত্র আছে। কোন গোত্রের লোক নিজ গোত্রে বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু মাতার গোত্রে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে আরও দুই বিভাগ আছে—যথা কুলীন ও মৌলিক। কুলীনগণ কুলীন কিম্বা মৌলিক উভয় শ্রেণীতেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু মৌলিকগণ নিজ শ্রেণী ভিন্ন কুলীন শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। এই জন্ত মৌলিকগণের বিবাহ অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়, কারণ সকলেই কুলীনদিগকে কস্তা দান করিতে উৎসুক। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা বা তাহার অসাধ্য রোগ থাকিলে স্বামী পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে।

স্ত্রী অসতী হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণভোজন, কুটুম্বভোজন ও সত্যনারায়ণের পূজাদি করিয়া পাপমুক্ত হয়।

চাসাধোবাদের অধিকাংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত, অতি অন্নসংখ্যক লোকই শাক্ত। ইহাদের মধ্যে একজনও শৈব নাই। বৈষ্ণবমতাবলম্বীগণ মাংস ভোজন করে না, কিন্তু মৎস্য খাইয়া থাকে। কৃষিব্যবসায়ীগণ লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে, আবার শিল্পব্যবসায়ী চাসাধোবারা বিষ্ণুকন্নার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতগণ বর্ণব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য।

বঙ্গসমাজে চাসাধোবাদিগের স্থান ধোবা হইতে উচ্চ নহে, সকলে ইহাদিগকে ধোবাদিগের সমানই বিবেচনা করে। ইহাতেও ইহাদের অপেক্ষাকৃত অন্নসংখ্যা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্নদীনই এই জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কেননা এই জাতি প্রাচীন হইলে সম্ভবতঃ বস্ত্রধোতকরণরূপ নিষ্কণ্টক বৃত্তি পরিত্যাগ ও কৃষিরূপ উচ্চতর উপজীবিকাঅবলম্বন জন্ত ইহারা এতদিন সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিত। ইহারা শূঁড়ী, ধীবর ও কৈবর্তদিগের দ্বারা অন্ত্যজশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহারা জলাচরণীয় নহে। ইহাদের অনেকে ভূমিসম্পত্তি করিয়া

কৃষিকার্য্য করিতেছে ও অনেকে শতবিক্রয়াদি বা ভেজারতি করিয়া অনেক অর্থসঞ্চয় করিয়াছে। অনেকে আবার স্ত্রোদ্ধার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিরও কর্তব্য করিয়া থাকে।

চাহড়দেব, নলপুর বা নরবাররাজ্যের একজন হিন্দু রাজা। তাঁহার সময়ে প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে তিনি ১৩০৩ হইতে ১৩১১ সংবৎ (খৃঃ ১২৪৬—১২৪৮) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পরিহারবংশের উচ্ছেদক বলরবর্ষদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নরবার রাজ্যের রাজা হন ও তথায় এক নব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া পরিশেষে দিল্লীরাজ সামসুদ্দীন আলতামাসের অধীনে করদরাজ মধ্যে গণ্য হন। চাহড়দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৩১১ হইতে ১৩৩৬ সংবৎ (খৃঃ ১২৪৮—১২৭১) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

চাহড়দেব, দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দিল্লী ও আজমীর উভয় রাজ্যই পৃথ্বীরাজের ছিল; স্ত্রতরাং পৃথ্বীরাজের অধীনে ইনি কিছুকাল দিল্লীতে করদরাজ্য হইয়া রাজত্ব করেন, রাজস্থানের ইতিবৃত্তপাঠে এইরূপ অসুমান হয়। বাহা হউক চাহড়দেব পৃথ্বীরাজ অপেক্ষা অনেক অংশে স্থান হইলেও একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তৎপ্রচলিত মুদ্রাদৃষ্টে জানা যায়।

চাহমান, রাজপুতদিগের এক বিখ্যাত শাখা। চৌহান নামে খ্যাত। দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজ বিখ্যাত বীর পৃথ্বীরাজ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মালব ও রাজপুতানার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়।

চাহমানদিগের উদ্ভব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কাহারও মতে ইহার অগ্নিকুলসম্বৃত ও আবু পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গস্থিত অনলকুণ্ড হইতে এই জাতির উদ্ভব। কিন্তু বাৎস্ত চাহমানদিগের সাধারণ গোত্র, সেইজন্য অনেকে ইহাদিগের জন্ম সম্বন্ধে প্রথমোক্ত মত পরিহার করিয়া ইহার ভৃগুকুলোদ্ভব জামদগ্ন্য বাৎস্তের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অসুমান করিয়া থাকেন। পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে চাহমানেরা আপনাদিগকে বাৎস্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত। বাহা হউক, খিচি চাহমানদিগের কুলকবি মুকজি চাহমানদিগকে কেবল “অনলোদ্ভব” বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং চাহমান শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থেও অনলোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে প্রকৃত নাম চতুরমান; চতুর অর্থে চারি অর্থাৎ অনলোদ্ভব পরিহার, প্রেমার, শোলাকী ও চাহারমান এই চারি জাতির মধ্যে ইহা একটী। চৌ-শব্দ হিন্দীভাষায় চতুর্ শব্দের অপভ্রংশ; স্ত্রতরাং চাহারমান শব্দের

অপর নাম চৌহান চতুরমান শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে— ইহা অনেকের বিশ্বাস।

মাণিকরায় এই বংশের স্থাপনকর্তা বলিয়া অসুমানিত হয়। তিনি ৮০০ খৃঃ অব্দে আজমীরে রাজত্ব করিতেন ও শব্দে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আপনায় রাজ্য বিস্তার করেন। চাহমানরাজগণ ১১২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আজমীর সিংহাসন অলঙ্ঘিত করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ তদীয় মাতামহ কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং দিল্লী ও আজমীর উভয় স্থানের রাজা হইয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ বংশের মহম্মদবোরা এদেশে আসিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আজমীর গ্রহণ করিয়া চাহমানবংশীয় রাজাদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন।

এখন সাহারণপুরের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে, জাহাজিরা-বাদের সমীপস্থ প্রদেশে, আলিগড় জেলায়, রোহিলখণ্ড প্রদেশে এবং বিজনোর জেলার পশ্চিম পরগণায় বহুসংখ্যক চাহমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত গোরক্ষপুর, আজিমগড়, দিল্লী ও মিরটে ইহাদিগের অনেকে বাস করিয়া থাকে। চাহমানদিগের মধ্যে রাজকুমার, হর, খিচি, ভদৌরিয়া, রাজোর, প্রতাপরুর, চক্রনগর এবং মোচনা নামক কয়টী শ্রেণী বিশেষ বিখ্যাত।

ইহার আপনাদিগকে পৃথ্বীরাজের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেইজন্য দুই এক ঘর ভিন্ন অপরের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করে না। ইহার রাজা উপাধিতে ভূষিত। মোচনা-শ্রেণীভুক্ত চাহমানগণ সাধারণতঃ মৈনপুরীর রাজা বলিয়া বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীভুক্ত চাহমানদিগের মধ্যে রাণা, রাও, দেওয়ান প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মণ্ডাবারের রাওবংশ এবং নিমরাণার রাজবংশ পৃথ্বীরাজের সহোদর চাহড়দেবের পৌত্র সঙ্গরাজের বংশ। সঙ্গরাজ বার্কক্যাবস্থায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া তৌহারবংশীয় একটা রূপলাবণ্যবতী কামিনীর কর-পার্থী হন এবং উক্ত রমণীর গর্ভজাত পুত্রই কেবল তাঁহার রাজ্যাধিকারের উত্তরাধিকারী হইবে, অপর মহিষীর সন্তানেরা রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এই প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মণ্ডাবারের রাওবংশের আদিপুরুষ লাহ এবং নিমরাণার রাজবংশের আদিপুরুষ লোরি এই রণীর গর্ভসম্বৃত। সঙ্গরাজের বংশীয় চাহমানদিগের মধ্যে মণ্ডাবাররাওবংশ বংশমর্যাদায় ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান পাইয়া থাকেন। রাওবংশের প্রাধান্য সম্বন্ধে পরবর্ণিত শ্লোকটী স্মরণে পাওয়া যায়—

“লাহি মংডাবর বৈঠিয়ে আঠোং মঙ্গলবার।

জো জো বৈরী সংচরে সো সো গিরে মার ॥”

প্রিয়তমা কনিষ্ঠ পরীসম্ভূত উক্ত দুইটা পুত্র ব্যতীত সঙ্গৎ রাজের অপর মহিষীর গর্ভজাত আরও উনবিংশতিটা পুত্র ছিল, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনপূর্বক আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। জম্মু প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ সর্দারগণ তাহাদিগের অশ্রুতমের বংশ। উপরিলিখিত চাহমানবংশীয়েরা মুসলমানদিগের আধিপত্যবিস্তারে পুনঃ পুনঃ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ মুসলমানরাষ্ট্রাদিগের রাজত্ব সময়ে কিয়ৎকাল স্বরাজ্যে স্বাধীন জয়-পতাকা উড্ডীরমান করিয়াছিলেন।

রেবা রাজ্যের পূর্বে এবং কৈমুর পাহাড়ের দক্ষিণে সারগুজা ও সোহাগপুরের মধ্যে চোহানখণ্ড নামক একটি বিস্তৃত স্থান আছে; এখানে অনেক চাহমানবংশীয় লোক বাস করিয়া থাকে এবং তাহারা মৈনপুরী চাহমানদিগের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। চাহমানদিগের বাস জন্তু বেধি হর উক্ত স্থানের নাম চোহানখণ্ড হইয়াছে। চাহমানদিগের বিখ্যাত নায়ক চন্দ্রসেনের নামানুসারে চোহানখণ্ডের চন্দ্রকোণা নাম হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশীয় চাহমানগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন চন্দ্রকোণা রেবারাজ্যের সন্নিকট নহে। উহা কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল অন্তরে মেদিনীপুরের নিকট অবস্থিত। অপর কেহ কেহ বলেন বর্তমানের নিকট চন্দ্রকোণা নামক যে স্থান আছে, উহাই সেই চন্দ্রকোণা। ফলে রেবারাজ্যের নিকটস্থ অনার্যজাতির বাসভূমি পার্শ্বত্যাগপ্রদেশে চাহমানগণ না গিয়া বর্তমান বঙ্গপ্রদেশের মধ্যে যে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কেহ কেহ বলেন, গোরক্ষপুরের চাহমানগণ চিতোররাজ রত্নসেনের পুত্র রাজসেনের বংশ। এই বংশের একটা শাখা বিহারপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোম কোন স্থানের চাহমানগণ এত নিকটবংশসম্ভূত যে তাহারা রাজপুতদিগের মধ্যে গণনীয় নহে। উত্তররাহিলখণ্ড প্রদেশের চাহমানগণ ঠিক ঐরূপ।

চাহনি (দেশজ) দৃষ্টপাত।

“তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও।”

(ভারতচন্দ্র বিদ্যা)

চিক (দেশজ) ১ কণ্ঠভরণ ভেদ। ২ বংশধর/নির্দিষ্ট এক-প্রকার পক্ষী।

চিকন (দেশজ, সংস্কৃত চিকণ শব্দজ) ১ স্ত্রী, চক্চকে।

২ হৃচিকার্য্য দ্বারা কার্পাস, উর্ণা বা রেসমী বস্ত্রের উপর

নানাবর্ণের সূত্রাদি যোগে পুশ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করাকে হিলি ও বাঙ্গালীভাষায় চিকণ, চিকণকারি ও চিকণদাজি বলে। কাপড়ের উপর ফুলতোলা ও বুটা-তোলার নামও চিকণ।

ভারতবর্ষ বহুপ্রাচীনকাল হইতে এই কার্য্যের জন্ত বিখ্যাত। সর্হিফুতা ও হুন্দকার্য্যে নৈপুণ্য থাকায় এদেশীয় লোকে অতি অল্পারসেই চিকণ শিক্ষা করিতে ও উহাতে নৈপুণ্যপ্রদর্শন করিতে পারে।

সত্য অসত্য পৃথিবীর সকল দেশেই চিকণ প্রচলন আছে। সকল হুন্দ্যাদেশেই একটা উৎকৃষ্ট শিল্পের অঙ্গবোধে চিকণ-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রাসাদস্থিতা রাজকল্যা হইতে কুটীরবাসিনী দরিদ্রবালিকা পর্য্যন্ত এই কার্য্য শিক্ষা করে। যাহা হউক যদিও এক্ষণে মানারূপ যন্ত্রাদি সাহায্যে যুরোপে অতি অল্পসময়ে ও অল্পব্যয়ে বহুবিধ চিকণের কাজ করা ব্রহ্মাদি প্রান্তর হইতেছে, তথাপি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত ঢাকার জামদানি, কারচব্ প্রভৃতি প্রাধান্ত ও গৌরবরক্ষা করিতেছে। চীন, পারস্য, তুর্কিস্থান ও ভারতবর্ষের চিকণ কাজ আজও যুরোপ প্রভৃতি সভ্যদেশে সাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে।

সচরাচর কার্পাসসূত্র, রেসম, উর্ণা অথবা স্বর্ণরৌপ্যাদির তার প্রভৃতিই এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূত্রাদি যথাসাধ্য সুরঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। কখন কখন তৎসহ পক্ষীপতঙ্গাদির পালক, পরকলা খণ্ড, চুম্বিক, প্রাণীদিগের নবকেশাদি কিবা মুদ্রাদিও সংযোজিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জমির উপর ভিন্ন ভিন্ন সূত্রাদি দ্বারা কাজ করাতে উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা—কারচব্, জামদানি, কাপ্পন, চারখানা, মুগা, কসিদা ইত্যাদি। কার্পাসবস্ত্রের উপর সূত্র, রেসম, উর্ণা অথবা স্বর্ণরৌপ্যাদির অরিধারা ফুল তোলা হয়। রেসমী ও পসমী কাপড়ে কার্পাসসূত্র ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য বিরাও হৃচিকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্বর্ণরৌপ্যাদির তার ও রেসমসূত্র জড়াইয়া একরূপ সূত্র হয়, উহাকে চলিত ভাষায় “কালাবতুন” বলে। হৃচিকার্য্যে ইহারই বেশী ব্যবহার। এইরূপে ধূতি, উড়ানি, পিরানি, জ্যাকেট, টুপি, কোট, চোগা, শাল, চাদর, গদি ও বালিশ প্রভৃতির আবরণ অতি সুন্দররূপে ও আশ্চর্য্য নৈপুণ্য সহকারে নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পজীবাদির প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হয়। রাজা ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ ঐ সকল বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন ও মহা আড়ম্বরগুরু আসবাবের জন্ত রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বহু সহস্র টাকা

ব্যয় করিয়া চক্রাতপ এবং হস্তাখাদির গাত্রাবরণও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি দ্বারা খচিত করেন। সৰ্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য সোণার কাজকে কার্চব্ কহে। প্রথমে রেসমী বা পশমী জমির উপর কোনপ্রকার স্বর্ণদ্বারা পুষ্পাদির চিত্র অঙ্কিত করে, পরে কালাবতুন দিয়া সূচিসাহায্যে তুলিয়া লয়। অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে স্বর্ণরৌপ্যের কাজ থাকিলে তাহাকে কারচিকণ বলে। সূতার কাপড়ের উপর সোণারূপার কাজের নাম জামদানি।

ঢাকার জামদানি কাপড় বিখ্যাত। উহার ফুল সকল তাঁতেই তোলা যায়। সূনিপুণ তন্তুবায়গণ বস্ত্র বুনিতে বুনিতে যথাস্থানে বংশনির্মিত সূচিসাহায্যে প্রতানসূত্রের সহিত ফুলের সূত্র বসাইয়া দেয়। সোজা বাঁকা সকলদিকেই ইহার ফুলের সারি রাখিয়া যায়। বাঁকা সারি হইলে তাহাকে তেড়চা কহে।

ইতস্ততঃ বিক্ৰিষ্ট ও পৃথক পৃথকরূপে ফুল কাটা হইলে তাহাকে বুটদার বলে। আরও নানারূপ জামদানি কাপড় আছে। যথা—ঝালঝাল, পান্নাহাজার, ডুরিয়া, করেলা, গৈদা, শবুরগা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন ফুল ও বিস্তারের প্রভেদানুসারে ইহাদের নাম হইয়া থাকে। পূর্বে জামদানি কাপড়ের বিস্তার কাট্টি ছিল, সম্প্রতি অনেক হ্রাস হইতেছে।

আসাম হইতে বহু পরিমাণে মুগা ঢাকায় আসে। মুগায় কাজ করা কাপড়কে কসিদা বলে। ঝাপন, ঝকা, ডুরিয়া, চারখানা প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার রেসম ও সূত্রের সূচিকার্য্যযুক্ত কাপড় ঢাকায় প্রস্তুত হয়। মুগা-চারখানা-কসিদা, কাটারুমি-কসিদা, নীলা-চারখানা-কসিদা প্রভৃতি বস্ত্র আরব, পারস্ত, তুর্কিস্থান প্রভৃতিদেশে বহু পরিমাণে বিক্রীত হয়। বদন-খাস-হাঁসিয়া, সমুদ্রলহর প্রভৃতি বহুমূল্য সূচিকার্য্যও তথায় সমাদরলাভ করে। ৪৬ গজ দীর্ঘ ৩৬ ইঞ্চি বিস্তৃত ঢাকার একখানি ঝাপনের মূল্য ১৫ হইতে ৬০ টাকা, ৫৬ গজ দীর্ঘ ৩৯ ইঞ্চি বিস্তৃত কসিদার মূল্য ১২ হইতে ৩০ টাকা।

কলিকাতার নানাস্থান হইতে অনীত বহুপ্রকার সুলভ বুটদার শাড়ী বিক্রয় হয়। বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রথমে ঢাকাতেই প্রস্তুত হইত, এক্ষণে নানাস্থানে উহার অমুকরণ হইতেছে। যুরোপীয়গণ পর্দা প্রভৃতির জন্ত বহু পরিমাণে চিকণ কাজ করা কার্পাসবস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকেন। বিবিদিগের পরিচ্ছদ, শিশুদিগের পোষাক, রুমাল ইত্যাদির সুলভ চিকণকাজ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ নানা স্থানে হইয়া থাকে। লক্ষ্মোনগরে দ্বাদশ শতাব্দিক দরিদ্র সম্রাজ মুসলমান-মহিলা ও বালক বালিকা উৎকৃষ্ট চিকণকার্য্য করিতেছে।

সোজনী নামে আর একরূপ বস্ত্র লেগের জন্ত প্রস্তুত হয়। বাক্সালার মালদা, রাজসাহী, নদিয়া, উড়িষ্যার পুরী প্রভৃতি জেলায়, বোম্বাই, শিকারপুর (সিন্ধুপ্রদেশ) ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার সোজনী প্রস্তুত হয়।

বোখারা হইতে অনীত সোজনী বড়ই জঁকাল, তাহাতে অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত রেসমের কাজ থাকে।

পাটনা ও মুর্শিদাবাদ নগরে কালাবতুনযোগে বহুমূল্য চিকণের হস্তাখাদির সজ্জা, ঝালরযুক্ত চক্রাতপ, পাকীর আবরণ, অজরাখা, টুপি, কার্পেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীতে মুর্শিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ী কার্চব্ কাজ করা একটা চক্রাতপ ও একটা পাকীর আবরণ প্রেরণ করেন, উহাদের মূল্য যথাক্রমে ১৫১৮ ও ২০০০ টাকা। শারণ হইতে ঐরূপ কাজযুক্ত বালিশের খোলার একটা আদর্শ প্রেরিত হয়।

নাটক, যাত্রাদির অভিনেতাঙ্গিণের পরিচ্ছদ, তাজ প্রভৃতিতে অনেক সময় বহুমূল্য কারচবের কাজ হয়। কলিকাতার ঐ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে লক্ষৌ, কাশী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে অতি সুলভ সূচিকার্য্যসম্পন্ন জামদানি, জর্দোজি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মথমলের উপর সোণা ও রূপার কাজকে জর্দোজি বলে। লক্ষৌএর শাড়ী, দোপাট্টা, কোট, শাল প্রভৃতির হাঁসিয়া, জিনের আচ্ছাদন, ব্যাগ, ঝালর, পাছকা ইত্যাদি ভারতের সর্বত্র বিক্রীত হয়। এখানকার স্বর্ণ রৌপ্যের তার, কালাবতুন প্রভৃতি সূচিকার্য্যের উপকরণ সম্প্রতি যুরোপে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। বারাণসীর শাড়ী সর্বত্র বিখ্যাত। আগ্রায় ছকার নল, টুপি, কোমর-বন্দ ইত্যাদি বিচিত্র সূচিকার্য্য শোভিত হয়।

পঞ্জাবের অমৃতসর, লুধিয়ানা, দিল্লী, প্রভৃতি নানা স্থানে উৎকৃষ্ট সূচির কাজ সম্পন্ন হয়। এই সকল স্থানের সূচির কাজ করা মলিদা প্রভৃতি শীতবস্ত্র, টেবিল, চেয়ার, বিছানা ইত্যাদির চাদর, পর্দা, রুমাল ইত্যাদি সাহেবেরাই বেশী ব্যবহার করেন। লুধিয়ানা, হুয়পুর, গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থানে কাশ্মীরীশাল প্রস্তুত হয়।

পূর্বে কাশ্মীরেই উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হইত, তদনুসারে উৎকৃষ্ট শালের নাম কাশ্মীরীশাল হইয়াছে। কাশ্মীরীশাল দুই প্রকার। ১ম প্রকারের শাল তাঁতে বুনিলে সময় বহুসংখ্যক মাকুদারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সূতা দিয়া একবারেই চিত্রাদি করা হয়। এই প্রকার শালই উৎকৃষ্ট। ২য় প্রকার শালে সূচিসাহায্যে ফুলাদি তোলা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত

অপকৃষ্ট। প্রথমপ্রকার শাল তিলিবালা, তিলিকার, কানিকার, বিনোদ এবং দ্বিতীয়প্রকার অমলিকার নামে খ্যাত। সম্ভ্রুতি কাঞ্চীয়ে কাঞ্চীরীশালের অতি হীনাবস্থা ঘটনাছে।

অমৃতসর, শিয়ালকোট, মন্টগমেরী, রাবলপিণ্ডি, কিরোজপুর, হাজারা, বরু, হিলার, লাহোর, কর্ণাল, কোহাং প্রভৃতি পঞ্জাবের অনেকস্থানে ফুলকারী নামে আর এক বৃক্ষ চিকণের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। হুজার কাপড়ের উপর মেসমের হুতা দিয়া ফুল বুনিলে তাহাকে ফুলকারী কহে। পঞ্জাব অঞ্চলে স্বয়ংকপড়ীগণ এই ফুলকারী তৈয়ার করে। তথায় জীলোকেরা ইহার ওড়মাও আড় রাখা করিয়া থাকে। সাহেবেরা ফুলকারী বড় ভালবাসেন, ভক্তি নানাবিধ চিকণকার্যযুক্ত আলোমান, রামপুরী-চাদর প্রভৃতি পঞ্জাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে শিকারপুর, রোহরি, করাচি, হারজাবাদ, হুরাট, সাবস্তবাড়ী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে চিকণ কার্য হইয়া থাকে।

শিকারপুর, রোহরি, হুরাট প্রভৃতি স্থানে হুচিকরদিগকে চিকণদাজ বা কুন্দিদাজ বলে। ইহারা মুসলমান। ইহারা হাতজারি, কারচোবি, বদলানি এবং রেসমী-ভরাত-কাম এই চারি প্রকার হুচিকার্যে পটু। হাতে বোনা স্বর্ণ-রৌপ্যের জরি হুচিকার্যকে হাতজারি এবং পাতলা সোণা রূপার তারকসির কাজকে বদলানি কহে। রেসমী-ভরাত-কাম কার্যে প্রথমে রেসমের উপর স্বত্বদ্বারা চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থান স্বর্ণ-রৌপ্যের জরি দিয়া পূরণ করে। কারচোবি কাজ আবার ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা ১ কসব্‌টিকি, ২ ঝিক্‌চলক্, ৩ ভরাতকরাচি, ঝিক্‌টিকি ও ৫ চলক্‌টিকি। টিকির অর্থ চুম্বিকি, ঝিক্‌ একরূপ সোণার স্বত্ব এবং চলক্‌ অর্থে আঁকাবাঁকা। কসব্‌টিকির অর্থ সোণারূপার চুম্বিকির কাজ, ঝিক্‌ স্বত্বের আঁকাবাঁকা কাজকে ঝিক্‌চলক্, ঝিকের মধ্যে মধ্যে চুম্বিকি বসাইলে ঝিক্‌টিকি এবং আঁকাবাঁকা ও চুম্বিকিযুক্ত হইলে চলক্‌টিকি হয়। করাচির অহুকরণে বস্ত্রের উপর ফুল তোলা থাকিলে তাহাকে ভরাতকরাচি বলে।

আসামে সুন্দর ফুল-কাটা রেসম ও কাপাঁসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহাদের অধিকাংশই তাঁতে বোনা হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীর জীলোকই ঐ কাজ করে। নূতন নূতন ধরণের পুন্দাদি বুনিতে পারিলে তাহারা গৌরব মনে করে। তথায় চাদর, খনিয়াকাপড়, চেলেঙ্গ, পরিদিয়া-কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। রেসমের রিহা অর্থাৎ জীলোকের চাকর এবং এড়া-বর-কাপড়, ইত্যাদি সোণারূপার জরি দিয়া প্রস্তুত হয়। এখানকার মুগারেসমের বস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে হুচিকার্যযুক্ত

হইয়া থাকে। এই সকল কাপড়ের আঁচলা অভিজ্ঞদের ও দন ফুলকাটা হয়।

সম্ভ্রুতি এদেশে ধনী দরিদ্র সকলেই চিকণকাজ ব্যবহার করিতেছেন। বড় লোকের মহিলাগণ বিভিন্ন স্বর্ণরৌপ্য-খচিত ছকুল পরিধান করেন, দরিদ্ররমণী কাপাঁসস্বত্বের অল্পমূল্য গুলুবারশাঙ্কী পরিয়া সখ মিটান। ধনবান্ কারচোবের কোট, টুপি, পায়জামা ও কাঞ্চীরীশাল গারে দিয়া আয়াস করেন, নির্ধন চাদর ও বুটদার কামিজ পরিয়া কথঞ্চিৎ খেদ মিটান। যাহার সোণার জরি কিনিবার সামর্থ্য নাই অথচ সখ আছে, তিনি তারকসির কাজেই বিলাস-পিপাসার শাস্তি করেন।

যুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আসিরীয়দেশ চিকণকার্যের আদি-উৎপত্তি স্থান, তথা হইতে নানাদিকে ইহা বিস্তৃত হইয়াছে। প্রিনি বঁলেন, ফ্রিজিয়গণ ইহার উদ্ভাবয়িতা এবং ভজ্জতাই রোমের হুচিকরগণকে ফ্রিজিয়ান্ বলিত। বাহা হউক ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। (ঋগ্বেদ ২।৩৬, ২।৩৮।৪।) মোজেসের সময় হিব্রুগণ মধ্যে ইহার চর্চা ছিল। মিসর, আরব ও পারসিকগণ প্রাচীনকালে সুন্দর হুচিকার্য করিত। ট্রম-যুদ্ধের পূর্বে সিডনের রমণীগণ হুচিকার্যে নিপুণ ছিল, তৎপরে গ্রীকরমণীগণ উহাতে নৈপুণ্যলাভ করে।

চিকণ কেবল সৌখিন কার্য নহে। ইহা অর্থগণেরও একটা উপায়। যুরোপে নানারূপ কল সাহায্যে হুচিকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মান-হান্মেন-নিবানী মিঃ হিলম্যান (M. Heilman) এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তদ্বারা একবারে ৮০ হইতে ১৪০টা পর্যন্ত হুচী ঢালাইতে পারা যায়। সুতরাং হস্ত দ্বারা যে সময়ে ১টা মাত্র ফুল তোলা হয়, তদপেক্ষা অল্পসময়ে ঐ যন্ত্র সাহায্যে ৮০ হইতে ১৪০টা ফুল তোলা হইতে পারে। হুচিকার্য সহজ কল্পিব্যবস্থা তথায় নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পুন্দাদির ছাড়া ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-বৃত্ত আদর্শ পাওয়া যায়। উহা কাপড়ের নীচে রাখিয়া আগে পেন্সিল দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রংএর দাগ দিয়া লইতে হয়। তৎপরে হুচি দিয়া বথোপযুক্ত বর্ণের হুতাধারা ঐ সকল স্থান পূরণ করিয়া দেয়। বার্লিনে প্রথম উদ্ভব হয় বলিয়া এইরূপ কাজকে বার্লিনওয়ার্ক (Berlin-work) কহে। ইহাতে হুচি-ঢালনে নৈপুণ্য ভিন্ন অল্প কোন প্রকার বাহ্যিক নাই।

[হুচি দেখ।]

চিকবল্লপুৰ, ১ মহিম্বর রাজ্যের কোলায় জেলার একটা তালুক। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৭২ বর্গমাইল; এখানে নক্ষিত্র

ও কলবারহুর্গ নামক দুইটা প্রাচীন দুর্গ এবং বিচারালয়, থানা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। ২ উক্ত নামধের তালুকের সদর। ইহা কোলার অবস্থিত হইতে ৩৬ মাইল অন্তরে, অক্ষা° ১৩° ২৬' ১০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪৬' ২১" পূঃ। এখানে একটি দুর্গ আছে। উক্ত দুর্গ পলিগারদিগের আদিপুরুষ মোরহু বোলবংশীর মল্লবৈরিগণ কর্তৃক ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং কালক্রমে মল্লবৈরিগণের বংশধরেরা মহি-
নুরের হিন্দুরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও তাঁহার অধীনতা অস্বীকারপূর্বক চিক্‌বলপুরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ হারদরখালি মহিনুর-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে চিক্‌বলপুর ও নন্দীদুর্গ অধিকার করিলে এখানকার গণ্ডবংশীয় শেব ভূপতি কোবতুরের কারাগারে প্রেরিত হন। এখানকার বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা ১০৬২০।

চিকলদহ, ১ বেরার প্রদেশের অন্তর্গত ইলিচপুর জেলার অবস্থিত একটি পাহাড়। ইহা গাবিলগড়দুর্গ হইতে প্রায় দেড় মাইল ও ইলিচপুর হইতে প্রায় ১৫ মাইল অন্তর। ইহার উচ্চতা ৩৭৭৭ ফিট। অক্ষা° ২১° ২৪' ও দ্রাঘি° ৭৭° ২২' পূঃ। ২ উক্ত পাহাড়ের অধিত্যকার অবস্থিত একটি পল্লী। এই পল্লীটা মেলঘাটতালুকের অন্তর্গত। এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস আছে; এহানটা অধিত্যকার স্থাপিত হইলেও এখানে আরোহণ করা কষ্টসাধ্য নহে, এমন কি অস্বাভাবিক এখানে উঠিতে পারা যায়। গো, শকট কিম্বা উষ্ট্র দ্বারা এখানে দ্রব্যসামগ্রী আনীত হয়। এ স্থানটা নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে তাপমান-
বস্তু ৫০° ও গ্রীষ্মকালে ৮০° উষ্ণতা অনুভূত হয়। এখানকার সাধারণ উষ্ণতা ৭১° ফারেনহিট। এখানে আলু, চা, কাকি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি ফুল এখানকার অধিবাসীদিগকে মোহিত করিয়া রাখে।

চিকাকোল (শ্রীকাকুলম্) মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর গঙ্গাম-
জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ক্ষেত্রফল ৪০২ বর্গ-
মাইল। এখানে পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধরাজ্যদিগের অধিকার-
ভুক্ত কলিঙ্গরাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং মোগলরাজ্যদিগের অধীনস্থ সরকার প্রদেশের রাজধানী ছিল। এই স্থানটা ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎকলের গঙ্গপতিরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। পরে বঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্তা অধিকার করিয়া কুতবশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এখানকার শাসনভার হিন্দু-
রাজ হতেই ন্যস্ত থাকে। অবশেষে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে আসফজা নিজাম-উল-মুলক দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ও হায়দরাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া চিকাকোলরাজ্যের

সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। সুতরাং এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে এখানকার হিন্দুরাজগণের উচ্ছেদ সাধিত হয়। মুসলমানদিগের শাসনসময়ে এই তালুকটা ইছাপুর, কাশিমকোটা ও চিকাকোল এই তিনটা বিভাগে বিভক্ত হয়। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর ইহার কতক অংশ উক্তর সরকার প্রদেশের সহিত করাসীদিগকে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে, পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে প্রদান করেন। কাশিমকোটা ও চিকাকোল বিভাগদ্বয় ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ার পর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গামজেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই তালুকের মধ্যে ৩টা সহর আছে।

২ (শ্রীকাকুলম্) উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটি সহর। অক্ষা° ১৮° ১৭' ২৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ৫৩' ২৫" পূঃ। সমুদ্র-
তীর হইতে ৪ মাইল ও মাদ্রাজ হইতে ৫৬৭ মাইল অন্তরে নাগবলীনদী এবং প্রাণ্টট্রকরোডের উপর অবস্থিত। অনেক দিন পর্যন্ত এই স্থানে সেনানিবাস ছিল। এই সহরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য জেলার শাসনকর্তার ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য জেলার জজসাহেবের বিচারালয় স্থাপিত হয়। এখনও এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয়, চিকিৎসা-
সালয়, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি রহিয়াছে। এখানকার রাজসংক্রান্ত অটালিকা সকল প্রাচীন দুর্গের চতুঃপার্শ্ব পরিধার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপার্শ্বে এখানকার অধিবাসীগণ বাস করিয়া থাকে। এই স্থানে গোলকুণ্ডার কুতবশাহীবংশের শাসনকর্তা সেরমহম্মদখান প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মসজিদ অতাবাধি মুসলমান শাসনকর্তাদিগের আধিপত্যের ও এই প্রাচীন সহরের গুণকর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সহরের স্থানীয় হিন্দু নাম শ্রীকাকুলম্ ও স্থানীয় মুসলমান নাম মহফুজ বা মনুজর বন্দর। লাসেনের মতে প্রাচীন মগিপুত্রের অপভ্রংশ মনুজর হইয়াছে। কেহ বলেন, চিকাকোলের প্রসিদ্ধ মুসলমানশাসনকর্তা অনুবর্উদ্দীনখান পুত্র মুফজ্জার নামানুসারে এই সহরটির শেষোক্ত নামকরণ হইয়াছে। ইহার স্থানীয় নাম গুলচানাবাদ অর্থাৎ মনোহর গোলাপবাগান।

এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা বিংশতিজন ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ও শতকরা আটজন শিল্পকার্য করিয়া জীবন যাপন করেন। এখানকার শিল্পকার্য অতি পরিপাটি, ঢাকা অপেক্ষা হীন নহে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে চিকাকোলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় এ স্থান একরূপ জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেও একবার দুর্ভিক্ষ হয়, কিন্তু তাহা প্রথমবারের ছায় অনিষ্টকর হয় নাই।

চিকরিষু (ত্রি) করিতুং ক্বেপুং ইচ্ছুঃ কৃ-সন্-উঃ। ক্বেপণ করিতে অভিলাষী।

চিকর্তিষু (ত্রি) কৃৎ-সন্-উ। করিতে অভিলাষী।

চিকাগো, আমেরিকার এক বিখ্যাত নগর। [আমেরিকা দেখ।] সার্বজাতিক ও সার্বধর্মিক প্রদর্শনীর জন্য এই স্থান বিখ্যাত। [প্রদর্শনী দেখ।]

চিকাতি, মাস্রাক্সপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজাম্বেলার মধ্যস্থ একটি রাজ্য। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ১১৯১৩, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ৮৮১ খৃষ্টাব্দে একজন সামন্ত এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করার উৎকলের তখনকার রাজার নিকট হইতে এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। বলিন্দা নদী ইহার মধ্যে প্রবাহিত হওয়ায় রাজ্য মধ্যে গমনাগমনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। এখানকার প্রধান সহর চিকাতি।

চিকারী (দেশজ) সেতारे আবদ্ধ যে পাঁচটা তারের অতিরিক্ত আরও তিন চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার আবদ্ধ থাকে, তাহা-দিগের নাম চিকারী।

চিকিত (ত্রি) কিং-জ্ঞান বঙ-লুক পচাওহ। চি জ্ঞানে কৰ্ম্মণিক্ত নিষ্ঠায়াঃ সার্বধাতুকসংজ্ঞায়াং (ছন্দশুভ্রথ্য। পা ৩৪।১১৭।) শপজুহোতাদিস্বাং তন্ত ঋঃদ্বিহ্ম। ১ অতিশয় জ্ঞানবিশিষ্ট। ২ জ্ঞাত। “স্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা” (ঋক্ ১।১১।১।) ‘প্রচিকিতঃ প্রকর্ষণে জাতঃ’ (সায়ণ) (পুং) ৩ ঋষিবিশেষ।

চিকিতান (ত্রি) কিং-জ্ঞানে কানচ্। ১ অভিজ্ঞ। “চিকিতানো অচিন্তান্” (ঋক্ ৩।১৮২) ‘চিকিতানঃ কৰ্ম্মাভিজ্ঞা’ (সায়ণ) ২ (পুং) ঋষিবিশেষ।

চিকিতান্ন (পুং) চিকিতের গোত্রাপত্য।

চিকিতি (ত্রি) জ্ঞাত। পরিচিত।

চিকিতু (ত্রি) কিং-উপ বেদে দ্বিহ্ম। অভিজ্ঞ। “অচেতায়িচ্চিকিতুর্হব্যবাহি” (ঋক্ ৮।৫৬।৫।)

চিকিত্বন্ (ত্রি) কিং-জ্ঞানে কনিপ্ বেদে দ্বিহ্ম। জ্ঞানবিশিষ্ট। “তুভ্যং চিকিত্বন।” (ঋক্ ৮।৬০।১৮।)

চিকিত্বিৎ (ত্রি) যিনি জানেন বা জানান। “বা চিকিত্বিৎ স্নতাবরি” (ঋক্ ৪।৫২।৪) ‘চিকিত্বিৎ জ্ঞানপতীং’ সায়ণ।

চিকিত্বিগ্নানস্ (ত্রি) সর্বজ্ঞাস্তঃকরণবিশিষ্ট। “চিকিত্বিগ্নানসঃ স্বা” (ঋক্ ৫।২২।৩) ‘চিকিত্বিগ্নানগ্নানো যন্ত অসৌ।’ (সায়ণ)

চিকিৎসক (পুং) চিকিৎসতি রোগং অপনয়তি কিং-স্বার্থে সন্ (গুপ্তিজ্জিক্ধ্যাঃ সন্ বহলং। পা ৩।১।৫।) ধূলু। যিনি রোগ আরাম করেন, বৈদ্য। “চিকিৎসকানাং সর্বেষাং মিথ্যা প্রচরতাং দমঃ।” (যশু ৯।২৮৪) পর্যায়—রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্।

চিকিৎসক রোগ পরীক্ষা করিয়া বিচারপূর্বক ঔষধ দান করিবেন; না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। দোষ বিনা ব্যাধি হইতে পারে না। সেই সকল দোষের আত্মমানিক লক্ষণদ্বারা রোগনির্ণয় করিবেন; বিকার শাস্তি করিতে না পারিলেও তিনি লজ্জিত হইবেন না। বৈজ্ঞানিক, কৃতী, ক্ষিপ্রহস্ত, শুদ্ধাচারী, সদ্যয়োগ প্রতীকারে সমর্থ, প্রিয়বাদী, অধ্যবসায়ী, ধার্মিক ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট চিকিৎসকই প্রশংসনীয়। মলিনবস্ত্র, অপ্রিয়বাদী, অভিমানী, ঔষধ প্রয়োগে অনভিজ্ঞ ও স্বয়ং গৃহে আগত এইরূপ চিকিৎসক ধম্বতরীর সমান হইলেও জনসমাজে কখন আদরীয় হয় না।

চিকিৎসক ধর্ম্মজ্ঞানে চিকিৎসা করিবেন। জীবিকা-নির্বাহের জন্য কেবল ধনীদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। যিনি ক্লেশসহিষ্ণু, আন্তরিক ও চিকিৎসকের বাক্য প্রতিপালন করেন এবং যাহার আত্মীয়স্বজন আছে, পথ্যাদির যোগাড় হইতে পারে এইরূপ রোগীই চিকিৎস্য। যিনি ভীক, কৃতর, প্রজ্ঞাহীন, ধূর্ত, শকাযুক্ত, ক্রোধাশীল, তিনি চিকিৎসকের বৈরী অর্থাৎ তাহাকে কখনও চিকিৎসা করিবেন না। (ভাবপ্রকাশ)

চিকিৎসন (ক্লী) আরোগ্যকরণ, চিকিৎসা।

চিকিৎসা (ক্লী) কিং-সন্ ভাবে অঃ। রোগ-প্রতীকার। পর্যায়—কৃৎপ্রতিক্রিয়া, উপচার, উপচর্যা, নিগ্রহ, বেদনা-নিষ্ঠা, ক্রিয়া, উপক্রম, শম, চিকিৎসিত, প্রতীকার, ভিষগ-জিত, রোগপ্রতীকার। চিকিৎসা তিন প্রকার,—দৈবী, আত্মরী, মাহুর্ষী। পারদপ্রধান চিকিৎসা দৈবী, অদ্বাঘাতাদি আত্মরী, ছয় রসদ্বারা যে চিকিৎসা তাহাকে মাহুর্ষী কহে। মাহুর্ষীই কলিযুগে আদরীয়। যে ক্রিয়ায় শরীরস্থ ধাতু সকল সমতা প্রাপ্ত হয়, অথ ব্যাধি জন্মে না, তাহাকে চিকিৎসা কহে। চিকিৎসার ফল—অর্থ, মিত্রতা, ধর্ম্ম, যশঃ ও কার্য্য-ভ্যাস। চিকিৎসার অঙ্গ—রোগী, দূত, বৈদ্য, দীর্ঘ আয়ুঃ। পথ্য—দ্রব্য, শুশ্রূষাকারী। পটু, নির্মলবেশ ও রোগীর সজাতি দূত অথ বা বৃষে আরোহণ করিয়া শুশ্রূষা ও ফলহস্তে বৈদ্যকে আনিতে যাইবে। (ভাবপ্রাঃ) [আয়ুর্বেদ দেখ।]

চিকিৎসিত (ক্লী) কিং-সন্ ভাবে ক্ত। ১ চিকিৎসা। ২ ভেষজ। কৰ্ম্মণিক্ত বা চিকিৎসা-ইতচ্ (ত্রি) ৩ কৃতরোগ-প্রতীকার, চিকিৎসা দ্বারা যাহার রোগ শাস্তি হইয়াছে। (পুং) ৪ ঋষিভেদ।

চিকিৎস্ (ত্রি) চিকিৎ-সন্-উ। যিনি চিকিৎসা করেন। চিকিৎস্ (ত্রি) কিং-স্বার্থে সন্ কৰ্ম্মণি বৎ। প্রতিকার্য্য, চিকিৎসা-সাধ্য। “ভেষজৈঃ স চিকিৎস্ভ্যঃ স্বাৎ” (ভারত শাস্তি ১৪ অঃ।) চিকিন (ত্রি) নি নতা নাসিকা অন্ত ইনচ্ প্রকৃত্তে-

শিকারেশ:। (ইনচ্ পিট্ চিকচি চ। পা ৫।২।৩৩।) নত,
নাসিকায়ুক্ত, খাঁদ।

চিকিল (পুং) চি বাহলকাং ইলচ্ কুচ্চ। পক, পাক।

চিকীর্ষক (ত্রি) কৰ্ত্তুম্ভুজঃ ক-ইচ্ছার্থে-সন্ (ধাতো কৰ্মণঃ
সমানকৰ্ত্ত্বকাদিচ্ছায়াং বা। পা ৩।১।৭) ততো ধূলু। করিতে
অভিলাষী।

চিকীর্ষা (স্ত্রী) কৰ্ত্তুম্ভিচ্ছা ক-সন্ ততঃ অঃ প্রত্যয়ঃ (পা
৩।১।১০২।) করিবার অভিলাষ।

“নাশকৰ্ম চিকীর্ষয়া।” (ভারত ২।১০।২৪।)

চিকীৰ্ষু (ত্রি) কৰ্ত্তুম্ভিচ্ছুঃ ক-সন্ উ (সম্মাশংসভিক্ উঃ। পা
৩।২।১৬৮।) করিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট।

চিকীৰ্ষিত (ত্রি) কৰ্ত্তুম্ভিচ্ছৈ ক-সন্-কৰ্মণি ক্ত। অভীপ্সিত,
অভিলষিত।

চিকীৰ্ষা (ত্রি) কৰ্ত্তুম্ভেব্যঃ ক-সন্ কৰ্মণি ষৎ। করিতে
অভিলষনীয়।

চিকুর (পুং) চি ইত্যব্যক্তশব্দং কুরতি চি-কুর-কঃ। ১ কেশ।

“চিকুরপ্রকার জরস্তি ভে” (নৈষধ)। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ পর্বত।

৪ সরীসৃপ। ৫ সর্পবিশেষ, আৰ্য্যকের পোজ বামনের দোহিহ
ও স্রুমুখের পিতা। (ভারত উল্লেখ্য ১০৩।২) (ত্রি) ৬ চঞ্চল।

চিকুরকলাপ (পুং) চিকুরাণাং কলাপঃ ৬তৎ। কেশসমূহ।
(হেম ৩।২৩২) [চুল দেখ।]

চিকুর (পুং) নিপাতনাদীর্ঘঃ। কেশ, চুল।

চিকোড়ি, ১ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বেলগাঁও জেলার
মধ্যস্থ কতকগুলি গ্রামসমষ্টি; উক্ত জেলার উত্তরপশ্চিমে অব-
স্থিত। ইহার উত্তরে কোলাপুর ও আথনি, দক্ষিণে গোকাক
ও শাহপুর, পূর্বে গোকাক এবং পশ্চিমে কোলাপুর-
রাজ্য। ইহাতে মোট ২১৫টি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ১৫৮টি
গ্রাম গবর্নমেন্টের ও ৫৭টি অপর লোকের কর্ত্ত্বাধীনে রহি-
য়াছে। ইহার ক্ষেত্রফল ৮৪০ বর্গমাইল, অধিবাসী সংখ্যা
২৪৫৬১৪। ১৮৪২-৫০ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেন্ট
চিকোড়ির জরিপ করেন।

ইহার মধ্যস্থ ৩০০।৪০০ ফিট উচ্চ মালভূমির দ্বারা ইহা
সভাবতঃ উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণা ও
তাহার উপনদী হুধগঙ্গা উত্তর চিকোড়ির মধ্য দিয়া এবং
ঘাটপ্রভা ও তাহার উপনদী হরণকাশী দক্ষিণ চিকোড়ির
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার উর্বরতা বৃদ্ধি করি-
তেছে। ইহা সছাদ্রিপর্বতের অনতিদূরে অবস্থিত বলিয়া
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। পূর্বাঞ্চলে
বৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু অভ্যন্তর প্রদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে

অপর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। আবার মধ্যস্থ মালভূমির উপরে অল্পবৃষ্টি
হইয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য দ্বারাই এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীদিগের
জীবিকানির্ভাহ হইয়া থাকে। অল্প লোকেই বজ্রবয়ন,
কদলাদি প্রস্তুত ও রন্ধের কর্ম করিয়া জীবন ধাপন করে।
এখানকার অনেক গ্রামে সাপ্তাহিক হাট বসিয়া থাকে।
নিপানি, শকেশ্বর ও চিকোড়ি নামক সহরত্রয় বাণিজ্য জন্ত
বিশেষ বিখ্যাত; এই তিনটি স্থান প্রধান প্রধান রাস্তার
উপর অবস্থিত এবং সেইজন্ত অল্প স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য এই
এই স্থানে আনীত ও এখানকার উৎপন্ন সামগ্রী অপর স্থানে
রপ্তানি হইয়া থাকে। এ প্রদেশের জমিদারগণ সঙ্গতিশালী।
এখানকার প্রধান উৎপন্ন শস্ত জোয়ারি। গোধূম ও অম্মাত্ত
শতাদিও এখানে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তত বেশী উৎপন্ন হয় না।

চিকোড়ি, ১ বেলগাঁও জেলার একটা উপবিভাগ। উপরি লিখিত
চিকোড়ির গ্রামসমষ্টি লইয়া এই উপবিভাগ সংগঠিত। ইহা
একটা কৃষিকার্য্যকুশল উপত্যকাভূমি; ইহাতে বহুসংখ্যক
বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। ইহার দুই তিন মাইল দক্ষিণে অম্বর্কর
পাহাড় পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত, ইহার উত্তরাঞ্চল অতিশয়
উর্বরা। এই উপবিভাগ ইক্ষু, উপাদেয় ফল ও ভাল ভাল
বাগানের জন্ত বিখ্যাত।

এই উপবিভাগের উত্তরপ্রদেশের জলবায়ু মনোরম ও
স্বাস্থ্যকর; মধ্যঅঞ্চলের জলবায়ু না ভাল না মন্দ, কিন্তু
দক্ষিণঅঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। ইহার দক্ষিণে
অতিশয় বৃষ্টির প্রাচুর্য্য, কিন্তু পূর্বদিকে স্রুষ্টি হয় না।

চিকোড়ি উপবিভাগের উত্তরদিকে কৃষ্ণা, উত্তরপশ্চিমে
এবং দক্ষিণপশ্চিমে হুধগঙ্গা ও বেদগঙ্গা এবং দক্ষিণে হরণ-
কাশী ও ঘাটপ্রভা নদী প্রবাহিত হওয়ার এখানে জলকষ্ট
নাই; এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী, খাল ও পুষ্করিণী বহু-
তর রহিয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত চিকোড়ি উপবিভাগের একটা
সহর। অক্ষা° ১৬° ২৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮' পূঃ। এই
সহরের চতুর্দিকে পাহাড়। কৃষ্ণানদী এখান হইতে ১০
মাইল অন্তর। লোকসংখ্যা ৫৬২২। ইহা একটা বাণিজ্য-
প্রধান স্থান। রত্নগিরিউপকূলস্থ রাজপুর নামক স্থান ও
নিকটবর্তী অপরাপর স্থানের সহিত এখানকার বাণিজ্য
চলিয়া থাকে। ব্যবসানিপুণ মুসলমান বণিকগণ কোলাপুর
রাজ্যের মধ্যস্থ অজরে নামক স্থান হইতে তথুল, দক্ষিণ
বিজাপুরের বাঘলকোট নামক স্থান হইতে গোধূম,
রত্নগিরির মধ্যস্থ রাজাপুর হইতে নারিকেল, তরকারী,

খেজুর, লবণ, মসলা প্রভৃতি এবং বোম্বাই হইতে বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া থাকেন। এ স্থান হইতে রাজাপুরে কাপাস, গজিকা, তামাকু প্রভৃতি, পুণা জেলার চিনি, বেলগাঁও অঞ্চলে পাণ ও তামাকু প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে সাধারণ জীলোকদিগের অতি উত্তম পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার স্বর্ণকারেরা অলঙ্কার মধ্যে উৎকৃষ্টরূপে হীরকখণ্ড স্থাপন করিতে নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক হাট বসে। হুর্গ ও সহরের মধ্যে দুই ফিট গভীর ও দুই ফিট প্রশস্ত একটি ক্ষুদ্র তটিনী প্রবাহিত হইতেছে; ইহার জলে জর আরাম হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখানে ছোটআদালত, বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিক্ (পুং) চিক্ ইত্যাক্ষরদ্বয়ে কায়তে শব্দায়তে চিক্-কৈ-ক। ছুছন্দরী, ছুঁচ। নি নতা নাসিকা অন্ত নি-ক চিকা-দেশঃ। (ইন্ চ পিট্। পা ৫২।৩৩) ‘কপ্রত্যয় চিকাদেশো-বক্তব্যো’ (বার্তিক)। (ত্রি) নতনাসিকায়ুক্ত, ঝাঁ।

চিকণ (ত্রি) চিত্যতে জায়তে চিত্-কণ-কন্। ১ নিধ্, চিকণ, চক্চকে। “কঠিনচিকণঃ স্নগ্ধ” (ভারত ১২।১৮৪।৩৪) (পুং) ২ শুবাকবৃক্ষ। (স্ত্রী) ৩ শুবাকফল। ৪ হরীতকীফল। (পুং) ৫ শুবধপাকের অবস্থাবিশেষ। পাক তিন প্রকার—মন্দ, চিকণ, খর চিকণ। (বাতট)।

চিকণা (স্ত্রী) চিকণ স্ত্রিয়াং-টাপ্। ১ উত্তম গাভী। পর্যায়—নৈচিকী। (শব্দচন্দ্রিকা)। ২ পুগফল, সুপারি।

চিকণী (স্ত্রী) চিকণ গৌরাদিহ্মাং ঙীষ্। ১ শুবাকবৃক্ষ। ২ শুবাকফল। ৩ হরীতকী।

চিকণকণ্ঠ (স্ত্রী) নগরবিশেষ।

চিকণশল্লী (পুং) চিকণ আম্রবিশিষ্ট মৎস্ত।

চিক্‌দেব, মহিষরাজ্যের যাদববংশীয় একজন রাজা। তিনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তঞ্জোরের একোজির নিকট হইতে বঙ্গলুর জয় ও অস্তায়পূর্বক কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যের পুষ্টিসাধন করেন। রাজ্যসংক্রান্ত নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া তিনি প্রজাগণের অতি প্রিয় হইয়া উঠেন। মহারাষ্ট্রগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

চিকনর্তি, বোম্বাই প্রদেশস্থ ছবলী নামক স্থান হইতে প্রায় ১১ মাইল পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৪০১ জন মাত্র। এই গ্রামে কমলেশ্বর নামক

একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে উৎকর্ণ প্রাচীনকালের একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

চিক্‌রায় তিস্মায়া, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পুন্‌নুর নামক স্থানের একজন নরপতি। তাঁহার পিতার নাম ইন্‌দ্রি তিস্মায়া। তিনিই বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবরায়ের সহায়তায় আদিলশাহীবংশীয় মুসলমানদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনটি নতুন হুর্গ নির্মাণ করেন। চিক্‌রায় তিস্মায়া তদানীন্তন রাজকর্তৃক বিশেষ সম্মানিত হন এবং নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। ইনিই পুন্‌নুর নগর নির্মাণ করেন।

চিক্‌রায়বাসব, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পুন্‌নুরের অধিপতি চিক্‌রায়তিস্মায়ের পুত্র। অতি শৈশবাবস্থায় তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কিয়দংশ আত্মসাৎ ও অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বীরচিক্‌রায়। তিনি মুসলমানদিগের প্রিয় হইরাছিলেন।

চিক্‌স (পুং) চিক্‌য়তি পীড়য়তি চূর্ণকারিণমিতি শেবঃ চিক্‌-অসচ্। স্বচূর্ণ, যবের ছাত্ত।

চিক্‌া (স্ত্রী) চিক্‌য়তি পীড়য়তি ভোক্তারং চিক্‌-অচ্‌ স্ত্রিয়াং টাপ্‌। শুবাকফল, সুপারী।

চিক্‌ির (পুং) চিক্‌-ইরচ্‌। মুখিকভেদ, ইহার দংশনে শিরশীড়া, শোথ, হিক্কা ও বমির উৎপত্তি হয়। কষায়াদি প্রয়োগ করাইলে শাস্তি হয়।

চিক্কুর (দেশজ) বিছাৎ।

চিক্কুর বিনবর, কণাটকবাসী আতিবিশেষ। ইহাদের মাতৃভাষা কণাড়ী; ইহাদিগের পুরুষমাত্রেরই নিজ নামের সহিত ‘আপা’ অর্থাৎ পিতা এবং রমণীমাত্রেরই ‘আবা’ অর্থাৎ মাতা শব্দ সংযোগ করিয়া থাকে এবং নামের শেষে অল্প কোন প্রকার উপাধি উল্লেখ না করিয়া তাহাদিগের আতিগত নাম অর্থাৎ চিক্কুরবিনবর এই শব্দ প্রয়োগ করে। যাহার নাম “আব” সে আয়াপা-চিক্কুর-বিনবর বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের ৬৪টি শাখা আছে, তন্মধ্যে আরে, বিলে মেনন্‌ এবং মিনে প্রধান। পাত্র পিতৃগোত্র ও মাতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর গোত্রের কন্তাকে বিবাহ করি পাবে। ইহারা কৃষ্যবর্ণ ও দূতকার। সামান্য একতল গৃহ বাস করিয়া থাকে এবং সামান্য কবল, লেপ ও কতকগুলি মৃৎপাত্র ভিন্ন অপর কোন মূল্যবান গৃহসামগ্রী ইহাদিগে আবাসগৃহে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাদিগের মধ্যে চাকরাখা প্রথা প্রচলিত নাই। ইহারা পক্ষী ও ছাগাদি পণ্ড

প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু যদি কেহ কুকুর প্রতিপালন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

কুঠী, দাইল ও নানাবিধ উত্তীর্ণ ইহাদিগের দৈনন্দিন খাদ্য। ছাগ, সেব, খরগোস, হরিণ ও পক্ষীমাংস এবং প্রাম্যমদিয়া ব্যবহারের প্রথা প্রচলন আছে। লিঙ্গদেব ও বল্লভাদেবের অর্চনোপলক্ষে ইহারা ছাগ বলি দেয়। বীরভদ্র ইহাদিগের কুলদেবতা ও পুরোহিতেরা জঙ্গম। বিবাহাদি ব্যাপারে জঙ্গমের আবশ্যক।

এই জাতীয় পুরুষ কি স্ত্রী কেহই প্রত্যহ স্নান করে না। পর্কোপলক্ষে উপবাস করিতে হইলে কিম্বা কোন স্থানে ভোজনাদির নিষেধ হইলে পুরুষগণ এবং সন্তাহ মধ্যে একদিন মাত্র রমণীগণ স্নান করে। পুষ্পগণ শুষ্ক ও মস্তকে শিখা রাখে এবং জামা প্রভৃতি পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক শরীর আচ্ছাদন করে; রমণীগণ মহারাষ্ট্রকামিনীদিগের ন্যায় পোষাক পরে। সজ্জাত পুরুষ এবং রমণীগণ স্বর্ণরৌপ্যানির্ধিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা কষ্টসহ, মিতব্যয়ী, কিন্তু অতিশয় অপরিষ্কার। ব্যবসা বাণিজ্য ইহাদের পৈতৃক বৃত্তি, কিন্তু চুঃখের বিষয় বর্তমান সময়ে তাহারা বাণিজ্য ব্যবসারে সেরূপ মনোনিবেশ করে না। কার্পাসবস্ত্রবস্ত্রন ও কৃষিকর্ম করিয়াই জীবিকানির্ভর করে। বালক বালিকা ও রমণীগণ পুরুষদিগের কার্যে সাহায্য করিয়া থাকে। লিঙ্গায়ত এবং সাপিগণ এই জাতি অপেক্ষা মর্যাদায় কিছু উচ্চ, কিন্তু শিল্পি এবং কুরুর জাতি কিছু নীচ। ইহারা অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কয়েক মাস অবিক পরিশ্রম করে।

বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা এ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। পতির পরলোক হইলে, পত্নীর পিতামাতা কিম্বা অন্য কোন গুরুজন তাহাকে একটা নব-পরিচ্ছদ প্রদান করে এবং সে প্রদীপহস্তে পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু পত্নী পতির অগ্রে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলে পতির শিরোদেশ পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া দেয়।

চিক্কুরুবিনবরণ সামাজিক কলহে বড়ই নিপুণ; কিন্তু তাহাদিগের সামাজিক কলহ জাতীয় পঞ্চায়ত দ্বারা মীমাংসিত হয়। বালকগণ দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত পাঠশালার অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

চিক্কেরুর, ষোড়শই প্রদেশের অন্তর্গত কোড় নামক স্থানের দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি সহর। প্রতি বৃষবারে এখানে হাট বসে। তত্ত্বল এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। এখানে হিরিকেরে নামক একটা বৃহৎ সরোবর আছে। উক্ত সরোবর-তীরে ১০২৩ ও ১০২৫ শকে খোদিত দুইখানি শিলাফলক

আছে। এখানে বাণেশ্বরী, হনুমান ও সোমেশ্বর দেবের মন্দির এবং উক্ত মন্দিরত্রয়েও বর্ষাক্রমে ৯৭৫, ১০২৩ ও ১০২৩ শকে খোদিত ৩টা শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ৯৯৯ ও ১১৪৪ শকে খোদিত প্রস্তরফলক-সংযুক্ত দুইটা বীরগণপাথর এবং ১০৪৭ ও ১০৫১ শকে খোদিত দুইখানি বৃহৎ শিলাফলক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিক্কায়ায়কনহল্লি, ১ মহিন্দের অন্তর্গত তুমকুর জেলার একটা তালুক। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৫৫ বর্গমাইল। এই তালুকের উত্তরদিকে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটা পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের পূর্বদিক জঙ্গলময়, কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমি উর্বরা ও কৃষিকুশল। এখানে খানা, বিচারালয় প্রভৃতি আছে। নারিকেল প্রভৃতি পণ্য সামগ্রী এখান হইতে অন্ত স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

২ উক্ত তালুকের সদর, তুমকুর সহর হইতে ৪০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। অক্ষা ১৩° ২৫' ১০" উঃ ও দ্রাঘি ৭৬° ৩৯' ৪০" পূঃ। হাগালবাংলীর চিক্কায়ায়ক নামক সামন্ত কর্তৃক এই সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস ত্রীক্ষপত্তনে গমন করিলে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি পরশুরামভাও তাঁহার সহিত মিলনাতিলাবে ত্রীক্ষপত্তনাভিমুখে আইসেন ও পথিমধ্যে এই সহর লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বহুল অর্থ সংগ্রহ করেন। বর্তমান সময়ে এ স্থান বিলকণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। মোটা কার্পাসবস্ত্র এখানকার প্রধান পণ্য। এখানে ৭টা প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

চিক্কায়ায়কনহল্লি, (অর্থাৎ কনিষ্ঠকজ্জার নগরী) ১ মহিন্দের রাজ্যের অন্তর্গত কদুর জেলার ও চিক্কায়ায়ক তালুকের প্রধান সহর। বজলুর হইতে ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা ১৩° ১৮' ১৫" উঃ, দ্রাঘি ৭৫° ৪৯' ২০" পূঃ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হইতে এই স্থানটা কদুর জেলার সদর হইয়াছে; ইহার নিকট কাকির চাষ হয় বলিয়া এখানে অনেক মুসলমান বণিক বাস করিয়া থাকেন। প্রবল পূর্ববায়ু সময়ে সময়ে এই সহরের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থ সহরের চতুর্দিকে তরুরাজি রোপিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিকের ভূমি অতিশয় উর্বরা, তাহাতে কার্পাস উৎপন্ন হয়। এখানে বিস্তৃত বাজার আছে এবং সাপ্তাহিক হাটও বসিয়া থাকে।

২ মহিন্দের রাজ্যের অন্তর্গত কদুর জেলার একটা তালুক। এখানকার ভূমি উর্বরা। কাকি ও কার্পাস প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এখানে বিচারালয়, খানা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

চিক্রেংস (স্ত্রী) ক্রমিতুমিচ্ছা ক্রম ইচ্ছার্থে সন্-অ-টাণ্। ১
আক্রমণের অভিলাষ। ২ গমনের ইচ্ছা।

চিক্রাশী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ। (Swietenia Chickraasy.)

চিকুরি বেংকর, কর্ণাটকবাসী একজাতি। অপর নাম অড়-
বিচিকুর ও কানসেপার্কি। ইহারা সংখ্যার অত্যন্ত হইলেও বিজা-
পুর জেলায় প্রায় সকল স্থানে কিছু কিছু দেখা যায়। ইহারা
বর্ণসঙ্কর। ধাকড়, কাব্লিজার ও রাজপুতজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন।

ইহাদের মাতৃভাষা গুজরাটী, কিন্তু ইহারা কণাড়ী ও হিন্দু-
স্থানী ভাষার বেশ কথাবার্তা কহিতে পারে। ইহাদিগের
শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ নহে, কিন্তু ইহারা এত অপরিষ্কার ও
ময়লা থাকে যে, দেখিলে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ ও
মলিন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কেশপাশ বন্ধন করে এবং ছিন্ন ধূলিধূসরিত
বস্ত্র বন্ধ ও কটিদেশে জড়াইয়া রাখে। রমণীগণ অপরিষ্কৃত
জামা ও পিতলাদি নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করে।

ইহারা সাধারণতঃ ভ্রমণশীল, সুতরাং গৃহাদি নির্মাণ
না করিয়া ময়দান মধ্যে অনাবৃত স্থানেই বাস করে
এবং শতের সময়ে দলে দলে ভ্রমণে বাহির হয়। সামান্য
কুটি ইহাদের প্রধান আহার, কিন্তু মাংস পাইলে আর
আচ্ছাদ ধরে না। তবে শূকর ও গোমাংস ভক্ষণ করে
না। ইহারা সর্কদাই সুরাপানে উন্মত্ত থাকে। কৃষক-
দিগের শস্যাদি অপহরণ ও মৃগয়া করিয়া ইহারা জীবিকা-
নির্বাহ করে। অল্প কোন কার্য করিতে চাহে না।
ঘলমা, তুলজাতবানী এবং বাঙ্কটেশ প্রভৃতি ইহাদিগের
কুলদেবতা। এই সকল দেবতার প্রতিমূর্তি ইহারা বস্ত্রে
বাঁধিয়া রাখে এবং আশ্বিনমাসে পূজা করিয়া থাকে। ইহারা
কোন পরকোপলক্ষে উপবাসাদি, আমোদপ্রমোদ কিম্বা
তীর্থযাত্রা করে না। ভবিষ্যদ্বাণী ও যাত্ৰাবিদ্যায় ইহারা সম্পূর্ণ
বিশ্বাস রাখে। ইহাদের রমণীগণ তপ্ততৈলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ
করিয়া সতীত্বের পরিচয় দেয়। যদি অঙ্গুলি দগ্ধ হয়, তাহা
হইলে সে অসতী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বাল্যবিবাহ ও বিধবা-
বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা শবদেহ সময়ে
সময়ে অগ্নিসংস্কার ও সময়ে সময়ে মৃতিকায় প্রোথিত করে।
পঞ্চায়তগণ ইহাদের সামাজিক বিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকে।

চিক্রিদ (ত্রি) ক্রিদ যঙ্ লুক্ অচ্। অতিশয় ক্রৈদযুক্ত, অতিবিশ্রান্ত।

চিক্রোড়া (স্ত্রী) ক্রীড়িতুমিচ্ছা ক্রীড় ইচ্ছার্থে সন্-অ-টাণ্।
ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা।

চিখলবহল, বোম্বাইপ্রদেশের নাসিকজেলার অন্তর্গত মালি-
গার ১০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। এখানে একটি
বড় গৌরীমন্দির আছে।

চিখাদিমু (ত্রি) খাদিতুমিচ্ছা খাদ-ইচ্ছার্থে সন্-উঃ। খাইতে
অভিলাষী।

চিখলি, বাংলাদেশ জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র তীলস্রাজ্য। সাত-
পুরা পাহাড় ও তাড়িনদীর মধ্যে অবস্থিত। অধিবাসীদের
ভাষা গুজরাটী, মরাঠী ও হিন্দুস্থানী এই তিন ভাষার মিশ্রণে
উৎপন্ন। এরাছোর অধিকাংশ জঙ্গলময়, এই জঙ্গ অতিশয়
অস্বাস্যকার; কেবল তাড়ীনদীর সমীপস্থ অরণ্যজ অগ্নি-
উর্ধ্বর। মেবাসীবংশীর জনৈক সর্দার এখানকার শাসনকর্তা।

চিখলি, বেরার প্রদেশের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটি
তালুক। ইহার মধ্যে একটি সহর ও ২৭২টি গ্রাম আছে।
ইহার ক্ষেত্রফল ৪৬৫১২৪ একরের অধিক, কিন্তু অতি অল্প
স্থানই কৃষিকার্য্যোপযোগী। অধিবাসীসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ।
চিখলি এই তালুকের প্রধান নগর। তথায় বিচারালয়, থানা
প্রভৃতি আছে।

চিখলি, সুরাট জেলার একটি উপবিভাগ ইহার ক্ষেত্রফল
১৬৭ বর্গমাইল এবং ইহাতে ৬২টি গ্রাম আছে। এখানকার
অধিবাসীসংখ্যা ৬০১৪৭। উচ্চ ও নিম্নভূমিতে এই
উপবিভাগটি দুইভাগে বিভক্ত। উচ্চ অংশটি গিরিনিঃসৃত
নদী কর্তৃক প্রাবৃত হইলেও ভূমি তেমন উর্বরা নহে,
কিন্তু নিম্নাংশ অতিশয় উর্বরা; তথায় অধিকা, কাবেরী,
থেরা ও অরঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং নানাবিধ শস্য,
ইক্ষু ও নানা জাতীয় ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

২ উচ্চ উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২০° ৪৬' উঃ ও
দ্রাঘি° ৭৩° ৯' পূঃ। এখানে বিচারালয়, থানা, ডাকঘর ও
চিকিৎসালয় আছে।

চিখাদিমু (ত্রি) খাদিতুমিচ্ছা খাদ-ইচ্ছার্থে সন্-উঃ। খাইতে
অভিলাষী।

চিক্‌ট (পুং) চিক্‌ ইত্যব্যক্তশব্দেন অটতি চিক্‌-অট্-অচ্ শক-
কাদিবাৎ অলোপঃ। মৎস্তভেদ, চিক্‌ড়ীমাছ। পর্য্যায়—মহাশব্দ।
(হারাবলী)। এই মৎস্ত গুরুপাক, বলবীৰ্য্যকর, পিত্তাদিনাশক,
মূত্ররোচক এবং কফ ও বাতবর্জক। (রাজবল্লভ) উপাধানে
এই মাছ পরিত্যাগ করিবে। (বৈদ্যক) [চিক্‌ড়ি দেখ]

চিক্‌টী (স্ত্রী) চিক্‌ট অল্পার্থে ত্রীপ্। সুবাচিক্‌ড়ী।

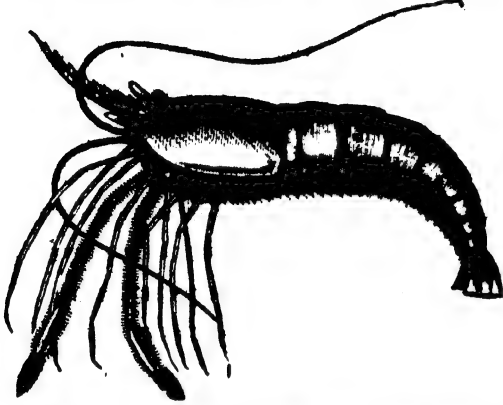
চিক্‌ড় (পুং) চিক্‌ট প্ৰযোদরাদিবাৎ সাধু। চিক্‌ড়ী মাছ।

চিক্‌ড়ি (দেশজ) শব্দরহিত কঠিন খোসা আচ্ছাদিত স্তন্যমথ্যাত
মৎস্ত। প্রোণিতস্ববিৎ পণ্ডিতগণ চিক্‌ড়িমাছকে কক্‌টাদির
সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ—উত্তর পার্শ্বে দীর্ঘ দীর্ঘ গ্রন্থিযুক্ত পৃষ্ঠ
ও তন্মধ্যে সমুখের দুইটি দাড়। বৃহদাকার ও আশ্চর্য্যকর অঙ্গ

বঙ্গপ ধারাল কাঁটির জার অধিককাল শরীরের আবরণরূপে পরিণত। পাঁজর কঠিন ও গ্রহিযুক্ত।

এই মাছ আকার, বর্ণ ও গঠনভেদে বহুজাতিতে বিভক্ত। সচরাচর গল্লাচিংড়ি, মোচাচিংড়ি, বুসোচিংড়ি, বুদেচিংড়ি, কানাচিংড়ি, বাগুচিংড়ি, কালচিংড়ি প্রভৃতি নানারূপ চিংড়িমাছ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মৎস্ত অতি ক্ষুদ্র কাঁচাচিংড়ি হইতে ১১ সের ১১ সের ওজননের গল্লাচিংড়ি পর্যন্ত দেখা যায়। আকারগত পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের গঠনাদি এক রূপ। মস্তকের নিকট



সর্বাংশে ছাল ও ক্রমে পুচ্ছের দিকে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। ইহারা শরীর শুটাইয়া পুচ্ছ ও মস্তক একত্র করিতে পারে। মস্তকের খোসা অতি দৃঢ় এবং সম্মুখে করাতের জ্ঞার ধারাল খড়্গ ও স্থতীক দাঁড়া দুইটির সাহায্যে ইহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রাণীর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। ইহাদের চক্ষুর গঠন অজ্ঞান্য প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাঁকড়ার জ্ঞার ইহাদের দুইচক্ষু দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁড়ার অগ্রভাগে অবস্থিত, ইচ্ছামত তাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে পারে।

ইহারা মধ্যে মধ্যে শরীরের খোসা পরিবর্তন করে। খোসা ছাড়িলে ইহাদের শরীর কিছুদিন অতিশয় কোমল থাকে, পরে অবিলম্বেই সেই খোসা নুগুচ্ছ হইয়া যায়। বালুনা, উড়িয়া ও ভারতের অজ্ঞান্য স্থানের সকল প্রধান প্রধান নদীতে ও পুকুরিগীতে ছোট বড় নানারূপ চিক্‌লিমাছ পাওয়া যায়। বড় গল্লাচিংড়ি পুকুরিগীতে অধিক অয়ে না, কিন্তু ক্ষুদ্র চিক্‌লি বিস্তার হইয়া থাকে। ইহারা অণু সমুদ্রার পরিপকাবে পৰ্যন্ত উদরের উপর ধারণ করিয়া থাকে।

চিক্‌লপৎ (চেলপৎ) মাস্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটা জেলা। অক্ষা° ১২° ১০' হইতে ১৩° ৫৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৫' হইতে ৮০° ২৩' পূঃ। বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ১১৫ মাইল এবং প্রস্থ ৪২ মাইল। পরিমাণকল ২৮৪২ বর্গমাইল। ইহার পূর্বে

বকোপিনাগর, উত্তরে নেরুজেল্লা, দক্ষিণে দক্ষিণআর্কট এবং পশ্চিমে উত্তরআর্কট জেলা অবস্থিত। এই জেলার ৬টা নগর ও ১২৭টা গ্রাম আছে।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই সমতল ও মৃৎবর। সর্বত্রই কোথাও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, বরং উপকূলের নিকট কোন কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্ন। এই সকল স্থান এ পর্যন্ত বালুকাসূর্ণ ছিল, সম্ভ্রুতি স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ করার উপকূলের দৃষ্ট মূতন প্রকার হইয়াছে। মধ্যভাগে কোথাও বিস্তীর্ণ বাস্তক্ষেত্র ও তাহার মধ্যে মধ্যে নারিকেল, তিলিঙ্গী প্রভৃতি বৃক্ষসমাকীর্ণ গ্রামাবলী, কোথাও আবার বালুকাকঙ্করময় ক্ষুদ্রাবরবর্ধিত বৃক্ষসমবিত অস্থরর প্রদেশ। আবার স্থানে স্থানে পুকুরিগীতে শ্রেণীবদ্ধ তালবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমভাগে নাগলপুরম্ ও কাষাকম্ পাহাড় বিস্তৃত। এই পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে কাষাকম্ চূর্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫৪৮ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত।

ইহাতে পালার, কোর্ভেলিয়ার, মারারণবরম্ বা অরানিয়ার নদী, চেয়ার, অদরার এবং কুবম্ প্রভৃতি নদী আছে। কোন নদীতেই নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে না। উপকূলের নিকট পুলিকছ, এম্ প্রভৃতি হ্রদ হইতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত খাল কাটা হইয়াছে। ঐ সকল খাল দিয়াই নৌকাদি গমনাগমন করে। পুলিকছ হ্রদের দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল, প্রস্থ ৩ হইতে ১১ মাইল পর্যন্ত এবং গভীরতা ১৪ হইতে ১৬ ফিটের অধিক নহে। এই জেলার ১১৫ মাইল বিস্তৃত উপকূলে বিখ্যাত “মাস্রাজী চেট” নামক উচ্চ উচ্চ ভীষণ তরঙ্গ সর্ঙ্গদা প্রতিহতক্ষর। নৌকাদি এখানে থাকিলে ভাঙ্গিয়া যায়। পুলিকছ ও কোবিলদে সামান্য পোতাশ্রয় আছে। এই জেলার আকরিক পদার্থ অধিক পাওয়া যায় না।

কাষাকম্ ও নাগলপুরম্ পাহাড়ে বন আছে, কিন্তু তাহাতে অধিক কাঠ উৎপন্ন হয় না। সম্ভ্রুতি বালুকাময় উপকূলভাগে একপ্রকার কাউগাছ রোপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ঐ সকল বৃক্ষ অনেক দূর ব্যাপিয়া গিয়াছে। অজ্ঞান্য বৃক্ষের মধ্যে তাল, তেঁতুল, নারিকেল, আম, অম্ব, বট, শিমশপা প্রভৃতি প্রধান। মাস্রাজনগর এই জেলার অন্তর্গত হওয়ার ইহাতে বহুসংখ্যক খাল, রাজপথ ও রেলওয়ে আছে। অরণ্যে অতি অল্পসংখ্যক বস্ত্র জন্তু দেখা যায়। করুল্লি সরোবরে বিস্তার কুস্তীর দেখিতে পাওয়া যায়।

চিক্‌লপৎ প্রাচীন বিজয়পুররাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও ইহার স্থানে স্থানে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তার

নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তালিকোটে বিজয়রাজ-বংশের রাজ্যাবলান হইলে, সম্ভবতঃ ঐ বংশীর রাজরাজগণ এই জেলায় রাজত্ব করেন। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে শ্রীমঙ্গরায়ের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাজাজনগর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভের জন্য ইংরাজ করানীতে ভীষণ বিবাদের সময় চিক্লপতে অনেক লংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে আর্কটের নবাব মুহম্মদআলি প্রত্যাগমনেরূপ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এই জেলা আরগীর দেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট শাহআলম্ ঐ দান মঞ্জুর করেন। ১৭৬৩ হইতে ১৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই জেলা নবাবের ইজারাদুত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে হায়দরআলি দুইবার এই জেলা আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ করেন। তৎপরেই আবার ভীষণ হুর্ভিক্ষে ঐ জনপদে প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলে। তাহার পর এখানে নূতন বন্দোবস্ত হয়।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে সমস্ত জেলা ১৪ ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার চারি বৎসর পরেই উহা আবার ভিন্ন ভিন্ন কালেক্টরিতে বিভক্ত হয়। এই সমস্ত কালেক্টরি লইয়া আবার ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে একটি জেলা হয়। ১৮০১ খৃঃ অব্দে সত্তিয়াবাদ বিভাগ ও পুলিশপ্রদেশ চিক্লপতের অন্তর্গত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মাজাজনগর এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুনর্বার স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হয়।

হায়দরআলির আক্রমণ ও হুর্ভিক্ষাদির পর এই জেলার লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এখন ক্রমে ইহার লোক বৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৩৩৩৩১৪, মুসলমান ২৫০৩৪, এবং অবশিষ্ট ১৬৭৭৪ জন খুঁটান। জেলার মধ্যে প্রধান নগরগুলির নাম—কাকীপুর, সেন্টেটমাসেন্ড মাউন্ট (একটি সেনানিবাস), সৈদাপেট, তিরবেতিরর, চেল্লপৎ, পানামলি (সেনানিবাস), তিরুবল্লুর ও পল্লবরম্। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ক্ষুদ্র সহর আছে।

মাজাজের অস্ত্রাস্ত্র জেলার জায় এখানকার ভূমি উর্বরা নহে, সুতরাং অস্ত্রাস্ত্র জেলা অপেক্ষা ইহা দরিদ্র; যেখানে সর্বদা জল পাওয়া যায় এইরূপ স্থানেই শস্তাদি উৎপন্ন হয়। কাষ্ঠ অতিশয় দুস্প্রাপ্য বলিয়া লোকে গোময়াদি জ্বালিয়া কেলে, সুতরাং রীতিমত সার পাওয়া যায় না।

অনেক জমীদার মাজাজেই বাস করেন, সুতরাং নিজ জমি পরিদর্শন ও তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করায় প্রজাগণ কৃষিকার্যে তেমন যত্ন করে না। প্রজাগণ অধিকাংশই দরিদ্র প্রায়ই সমস্ত খাজানা দিয়া উঠিতে পারে না। জমিদারগণ খাজনার কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়া আদায় করেন।

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি নিবন্ধন ইহাতে অনেকবার ভরানক হুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জল সেচনের সুব্যবস্থা না হওয়ার, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে মহিম্মরসৈন্ত-গণের আক্রমণে, ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টিতে, ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে অতিবৃষ্টি ও তৎকাল ভীষণ বজ্রাশ খালবিলাদি ভয় হওয়ার, এবং ১৮০৬-৭ খৃঃ অব্দে সমস্ত মাজাজপ্রেসিডেন্সীতে অজন্মা হওয়ার ভীষণ হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে শত অত্যন্ত মহার্ঘ হয়, ১৮৭৬ সনেও খাদ্য টাকার ৮ সের মাত্র বিক্রয় হয়। এই জেলার আর একটি প্রাকৃতিক বিড়ম্বনা আছে। বৈশাখ ও কাশিকমাসে এখানে ভীষণ ঝড় হইয়া প্রায়ই নানারূপে অনিষ্ট উৎপাদন করে। ১৭৪৬ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এইরূপ ১৫টি ঝড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আর একবার ভীষণ ঝড় হয়। এইরূপ ঝড় প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হইয়া মাজাজ নগরের উত্তরপার্শ্বে দুই শতাধিক মাইল ব্যাপিয়া ভীষণবেগে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়। গৃহ, বৃক্ষ, সহস্র সহস্র নোকা, জাহাজাদি চূর্ণীকৃত হইয়া যায় ও বহুসংখ্যক মৃত্যু, গোমেবাদি প্রাণভ্যাগ করে।

উপকূলস্থ মাজাজনগর ব্যতীত আর কোথাও বহির্বাণিজ্য হয় না। মধ্যভাগে অন্তর্বাণিজ্য অল্পাধিক হইয়া থাকে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুলিশহুতে শুষ্ক আদারের গৃহ ছিল এবং বেশ বাণিজ্যও হইত, কিন্তু ঐ বৎসর শুষ্কগৃহ স্থানান্তরিত হওয়ার উপকূলভাগ একরূপ বন্দরশূন্য হইয়াছে। এখানে গবর্নমেন্টের লবণ-পোস্তান আছে। তথায় বহুসংখ্যক লোক কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জন করে। মিরানীদারগণই বংশপরম্পরাক্রমে লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বস্ত্রবরনাদি একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়, কেবল এখানকার আশিনগরে দুই এক শত তন্তুবায় আজও হস্ত কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। তাহারও আর তেমন খ্যাতি নাই। সামান্য পরিমাণে বাসনাদি প্রস্তুত হয় এবং নীলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায় ও তাহা হইতেই কিছু আর হইয়া থাকে। সরিহিত সমুদ্রেও মৎস্য, শুকি ও কচ্ছপাদি ধৃত হইয়া মাজাজ নগরে আনীত হয়। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই জেলার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা চিক্লপৎ, কাকীপুর, মধুরাস্তকম্, পোনেরি, সৈদাপেট ও তিরুবল্লুর এই ছয়টি তালুকে বিভক্ত। রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সৈদাপেটে বাস করেন। চিক্লপতে ক্রেসনে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। মাজাজনগর এই জেলার অন্তর্গত হইলেও ইহার বিচারকার্য্যাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে

মাস্ত্রাজনগরেই হইয়া থাকে। এই জেলার ১৩টা জেল আছে। সম্প্রতি এখানে বিদ্যালয় উন্নতি হইতেছে। মাস্ত্রাজনগরের সম্বন্ধিত বলিয়া ইহার অনেক বিদ্যালয়ে ইংরাজী প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। কেবল সৈদাপেটে গবর্ণমেন্ট স্থাপিত একটি বিদ্যালয় আছে।

এই জেলা উচ্চকর্তৃবলের অন্তর্গত হইলেও সমুদ্রকূলবর্তী বলিয়া নাভিশীতোষ্ণ। ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের দ্বারা ইহাতে কখন দারুণ গ্রীষ্ম কখন ভীষণ শীত হয় না। ইহার উত্তাপ কারেনহিটের ৬৩° হইতে ১০৭° অংশ পর্যন্ত হইয়া থাকে। অল্প সময় বড় একটা জর হয় না, কিন্তু শীতকালে কালাজর অনেককে আক্রমণ করে, এবং অনেকেরই বসন্ত ও চক্ষুউঠা রোগ হয়।

২ চিক্লপংজেলার একটা তালুক। পরিমাণ ৪৩৬ বর্গ-মাইল। এই তালুকের ভূমি মধ্যভাগে লোহিতপলিযুক্ত ও পশ্চিমভাগে বালুকাময়। সাধারণতঃ ইহা পাহাড় জঙ্গলানির্ভর ও অসুস্থ, তথাপি জেলার অগ্রাংশ তালুক অপেক্ষা নানারূপ দৃশ্যপূর্ণ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৩টা ফৌজদারী ও ২টা দেওয়ানি আদালত ছিল।

৩ উচ্চ জেলা ও তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১২° ৪২' ১" উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ১' ১৩" পূঃ। এই নগর মাস্ত্রাজের ৩৬ মাইল দক্ষিণে, চিক্লপং-আর্কোনিউন লাইন ও দক্ষিণভারতীয় রেলপথের সন্ধানে অবস্থিত। ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সজজ, সব-কালেক্টর ও সিভিলসার্জন এই নগরে বাস করেন, তন্নিহি এখানে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, জেল, হাসপাতাল, ডাকঘর প্রভৃতিও আছে। দেশীয় পথিকদিগের বিশ্রামার্থ স্থানীয় লোকের সাহায্যে এখানে একটি ছত্র আছে। যুরোপীয়দিগের জন্য একটা বাজালা নির্মিত হইয়াছে।

চিক্লপং-দুর্গের উপর দিয়া সম্প্রতি রেলপথ গিয়াছে। এখন ঐ দুর্গ কোন ব্যবহারেই আসে না। কিন্তু পূর্বে অতিশয় বিখ্যাত ছিল। বিজয়নগরের রাজগণ হীনভেজা হইলে পর তাঁহারা চিক্লপং ও চন্দ্রগিরি এই দুই স্থানে যথাক্রমে রাজত্ব করিতেন। এই সময় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে চিক্লপংদুর্গ নির্মিত হয়। এই দুর্গের গঠন-প্রণালী অপর দুর্গের দ্বারা।

ইহার দুর্গম অবস্থিতি দেখিলে বোধ হয় এই দুর্গ অজয়, ইহার তিনদিকে জলাভূমি, অপর দিক্ সুদৃঢ় পরিধা ও প্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্বে এই দুর্গ মাস্ত্রাজনগরের একটা দ্বার বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু চতুর্দিক্ হইতেই গড়ের উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারা যায়। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ

গোলকুণ্ডার সর্দারদিগের হস্তগত হয়। তাঁহারা আর্কটের নবাবকে ঐ দুর্গ অর্পণ করেন। নবাব আবার ১৭৫১ খৃঃ অব্দে করাসীদিগের সাহায্যে কর্ণাট-আক্রমণকালে চাঁদনাবেবকে প্রদান করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব এই দুর্গ আক্রমণ ও দুর্গস্থ করাসীসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। তৎপরে ঐ সকল দুর্গ কখন করাসী বন্দীদিগকে রাখিবার স্থান, রসদ রাখিবার ভাণ্ডার, কখন চতুঃপার্শ্ব পলিগার-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনানিবাস ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়। পরে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মাস্ত্রাজরক্ষার নিমিত্ত চারিদিকের দুর্গ হইতে সৈন্যাদি মাস্ত্রাজে আনিত হইল। এই সময়ে চিক্লপংদুর্গ একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই আবার করাসীদিগকে দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ঐ দুর্গে মাস্ত্রাজের একজন ইংরাজসৈন্য রাখা হয়। করাসীসেনাপতি লালি আসিয়া দেখিলেন দুর্গ ইংরাজ-হস্তগত ও দুর্জয়, সুতরাং তিনি মাস্ত্রাজাভিমুখে গমন করিলেন। এই যুদ্ধে দুর্গস্থ সৈন্যগণ প্রকৃগণকে পক্ষাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল বেলির স্তম্ভ ভঙ্গ করিয়া ইংরাজ-সৈন্য এই দুর্গে আশ্রয় লয়। মহিষরযুদ্ধের সময় এই দুর্গ একবার মহিষরের হস্তগত হয়, পরে আবার ইংরাজেরা জয় করেন। চিক্লপং ও চন্দ্রগিরির পলিগার বা নায়কদিগের নিকট হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মাস্ত্রাজনগর নির্মাণ করিতে আদেশ পান।

চিচাঙ্গিল, পঞ্জাবের বম্বুজেলার অন্তর্গত একটা গিরিমালা। অক্ষা° ৩২° ৫১' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১০' ৪৫" পূঃ। ইহার অপর নাম শিঙ্গড় বা ময়দানি। এই গিরিশ্রেণীর উচ্চত্বের নাম সুখাজারং, উহা কালাবাগ নামক স্থান হইতে ১৬ মাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭৪৫ ফিট উচ্চ। ইহার পূর্বদিকে বম্বু উপত্যকা। সিয়ানবালি হইতে যে পথ বম্বু উপত্যকাভিমুখে আসিয়াছে, তাহা চিচালির দক্ষিণপ্রান্তস্থিত ট্যাংদারা নামক গিরিপথ দিয়া গিয়াছে।

চিচিঙ্গা, এক প্রকার লতানিয়া গাছ (Trichosanthes anguina.) ইহার ফল প্রায় ৩৪ হাত লম্বা ও সর্পাকৃতি হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ হলুতাত শুভ্র। শীতকালে এই ফল জন্মে এবং বিদ্যে, শিম প্রভৃতির দ্বারা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর পুষ্করিণীর তীরে ইহার বীজ রোপণ করে, এবং লতা আশ্রয় পাইবার জন্য কাঁটাগাছ পুতিয়া দেয়। চিচিঙ্গা ফল অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। ইহার সংস্কৃত নাম চিচিণ্ড।

[চিচিণ্ড দেখ।]

চিচিও (পুং) কলবিশেষ, চিচি। পথ্য—খেতরাজি, স্থলীর্থ, গৃহকলক, বইকল। ইহার গুণ—বাতপিত্তনাশক, বল ও কটিকারক, পথ্য, প্রায় পটোলের মত উপকারক। (হারীত)

চিহ্নগড়, মধ্যপ্রদেশের ভাওয়ালজেলার দক্ষিণপূর্বাংশস্থিত একটা বিস্তৃত রাজ্য বা অধিবাসী। এই রাজ্যটি সুবিভূত হইলেও নানাকারণে ইহার অবস্থা ভাল নহে। ইহার ক্ষেত্রফল ২৩৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে কেবল ১২ বর্গমাইল মাত্র স্থানে কৃষিকর্ম হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হলুবা, গোঁড় ও গোয়ালারাই প্রধান। চিহ্নগড়ের বনে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। চিহ্নগড় ও পালনুর ইহার প্রধান সহর। চিহ্নগড়নগরে এখানকার অধিপতি একটা কুশ খনন ও একটা সন্ন্যাসী নির্মাণ করিয়াছেন।

চিক্কেড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পটোরা তালুকের একটা বিখ্যাত স্থান। অশুর নাম যাই-জি। প্রতিবৎসর ১৫ই পৌষ হইতে এখানে একটী মেলা বসে। প্রবাদ আছে যে কোন রমণী এখানে সমাধি হন, তৎপলক্ষে বর্ষে বর্ষে মেলা হইয়া থাকে। ঐ রমণী জম্মেরজেলার হিবরি গ্রামের ফিরোজী কুণবির কন্যা, যত্ন শাওড়ী কর্তৃক লাহিত ও বিতাড়িত হইয়া মালপাহাড়ে আসিয়া গোরকনাথের নিকট যোগশিক্ষা করেন। অবশেষে তিনি চিক্কেড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রতিবৎসর অধিবাসীরা তাঁহার অস্ত্র একটা কুটার নির্মাণ করিয়া দিত, তিনি প্রতিবৎসরই উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। ষাটশব্দ অস্ত্রে তিনি স্বয়ং ভূগর্ভে সমাধিগত হন। অধিবাসীগণ ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

চিক্‌নি, ঠানজেলার একটা নগর। এই নগর চিক্‌নি তালুক পুর থাণ্ডীর উত্তরকূলে এবং বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বজারন স্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

চিকবড়, হাওলীর একটা নগর। পুণার ১০ মাইল উত্তরপশ্চিমে পাবনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরে রম্যঅট্টালিকা, মন্দিরাদি পূর্ব ও নদীতীরে সুন্দর সোপান-শ্রেণীবিরাজিত বাট ছিল। সম্প্রতি একটা রেলওয়ে স্টেশন হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে গণপতি এখানে মরাকারে বাস করেন। এ সম্বন্ধে একটা উপাখ্যানও শুনা যায়—

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে পুণানগরে এক ধর্মশীল দরিদ্র দম্পতি বাস করিতেন। তাঁহারা গণেশের উপাসনা করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্রের নাম মরবা। পুত্রের জন্মের পরই তাহারা চিকবড়ের চারি মাইল দক্ষিণে পিঙ্গলীতে আসিয়া বাস করেন। পিতা মাতার স্মৃতির পর আশ্রয় ধর্মশীল মরবা চিকবড়ের ছই মাইল পশ্চিমে

ভাতবড়ে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই ভাতবড় হইতে তিনি প্রতিমাসে ২৫ কোশ দূরবর্তী মরগাঁয়ে গণেশের মন্দিরে পূজা দিতে বাইতেন। মরগাঁয়ের প্রধান মণ্ডল মরবার বর্ষাঋতুদর্শনে শ্রীত হইয়া প্রতিবারই তাঁহাকে এক বাটী করিয়া হুঙ্কার করিত। একদিন ঐ ব্যক্তি এক অন্ধবালিকাকে গৃহে রাখিয়া ক্ষেত্রে গিয়াছিল, এমন সময় মরবা উপস্থিত হইয়া যথাপূর্ব হুঙ্কার চাহিলেন। অন্ধবালিকা তৎক্ষণাৎ চক্ষু পাইল এবং হুঙ্কার আসিয়া মরবাকে প্রদান করিল। এই আশ্চর্য ঘটনা চারিদিকে জানিতে পারিল। অনতিকাল পরেই মরবা মহারাষ্ট্রবীর শিবজীর চক্ষুরোগ আরোগ্য করিলেন। মরবার বংশোদ্ভূত চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নানাহান হইতে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে মরবার উপাসনাদির ব্যাঘাত হওয়ার জিনি চিকবড় অরণ্য মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। মরবা বৃদ্ধ হইলে তাঁহার পক্ষে প্রতিমাসে ২৫ কোশ হাঁটিয়া মরগাঁও যাওয়া হুঙ্কার হইয়া উঠিল। একদিন তিনি পূজা শেষ হইবার পর তথায় উপনীত হইলেন এবং মন্দিরস্থার বদ্ধ দেখিয়া বাহিরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পঞ্চম্রমে ক্রান্ত থাকার শীত্রেই তাঁহার নিজাকর্ষণ হইল। যথেষ্ট গণেশদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, “তুমি আমার পূজা কম এবং ভবিষ্যতে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিও না, আমি তোমার এবং তোমার পুত্রপৌত্রাদির দেহে বাস করিব।” মরবার নিজা ভাবিলে দেখিলেন, মন্দির স্থায়ী উন্মুক্ত হইয়াছে। অনন্তর তিনি গণপতির পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রত্যেকে পুরোহিতগণ আসিয়া গণপতির গলায় এক নূতন পুষ্পহার প্রদত্ত ও রত্নহার অপহৃত দেখিয়া আশ্চর্যবোধিত হইল। সামান্য অসুস্থতানেই মরবার গলায় সেই হার দৃষ্ট হইল, এবং দলপতিগণ তৎক্ষণাৎ মরবাকে বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন। গণেশের কৃপায় মরবা মুক্তিলাভ করিয়া চিকবড়ে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া গণেশের মূর্তি উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি এই মূর্তি পূজা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মূর্তির নিম্নে আপনি সমাধি হইলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র চিত্তামণ ২য় গণেশাবতার বলিয়া গণ্য হইলেন। কথিত আছে, বিখ্যাত কবি ভুসারামের সঙ্কেতমোচনার্থ একদিন চিত্তামণ গণেশমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। চিত্তামণ বৃদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করিলেন। নারায়ণ তৃতীয় দেব হইলেন। তৎপুত্র সন্ন্যাসী অরজ্জব উপহাস করিয়া তাঁহার ষাটের নিমিত্ত গোমাস প্রেরণ

করেন, কিন্তু তাঁহার স্পর্শমাত্র একগুচ্ছ যুথিপুন্শে পরিণত হয়। সম্রাট তাঁহার এই আশ্চর্য কার্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে চিরস্থায়ীরূপে আটখানি গ্রাম প্রদান করেন। ৪র্থ অবতার ২য় চিন্তামণ, ৫ম নারায়ণের পুত্র ধর্মধর, ৬ষ্ঠ ৩য় চিন্তামণ এবং ৭ম দেব ২য় নারায়ণ। শেবোক্ত ব্যক্তি কোতুলপদবশ হইয়া মরবার সমাধি খনন করেন। সমাধিই মরবা ধ্যানভঙ্গে অভিলাষ করিলেন যে, ২য় নারায়ণের পুত্রের পর আর দেববংশ থাকিবে না। তাহাই হইল। ২য় নারায়ণের পুত্র ধর্মধর ১৮১০ খৃঃ অব্দে অপুত্রক লীলা সংবরণ করিল। অনন্তর তাঁহার দূরসম্পর্কীয় শখরী নামে জনৈক বালককে দেবপদে অভিষিক্ত করিয়া মন্দিরের বহুমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করা হইল। ঐ দেবতার সম্বন্ধে এখনও অনেকের বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় বতই লোক হউক না কেন, অতি অল্পমাত্র মিষ্টান্নাদি থাকিলেও দেব তাহাতেই সকলকে পর্যাপ্তরূপে ভোজন করাইতে পারেন।

দেববাণীমেরা নদীতীরে এক সুন্দর প্রাসাদে বাস করেন। এই প্রাসাদের কতক অংশ নানাকড়ুনবিশু (১৭৬৪-১৮০০ খৃঃ অঃ) ও কতকাংশ মহারাষ্ট্রসেনাপতি হরিপদ্রক্ষড়কে (১৭৮০—১৮০০ খৃঃ অঃ) নির্মাণ করিয়া দেন। প্রাসাদের নিকটেই পরলোকগত দেবদিগের এক এক মন্দির নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মরবার মন্দিরই প্রধান। ইহাতে মরগাঠী ভাষায় উৎকীর্ণ এক লিপি আছে। তদ্বারা জানা যায় এই মন্দির ১৫৮০ শকে আরম্ভ হয়। শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ ৩য় গণেশাবতারের মন্দিরে আর এক লিপি আছে। ঐ মন্দির ১৬৪১ শকে নির্মিত হয়।

এই সকল মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১৩৮০০ টাকা। পূর্বোক্ত অরঙ্গজেব প্রদত্ত আটটা গ্রামের খাজনা হইতেই ঐ টাকা আদায় হইয়া থাকে। গণেশের সম্মানার্থ প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে চিক্‌বড়ে এক মেলা হইয়া থাকে।

মরবার বিবরণ সম্বন্ধে মতান্তর লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মরবা বিদর-নিবাসী ও ধর্মশীল ছিলেন। যৌবনের পূর্বেই অকর্মণ্য বোধে পিতা কর্তৃক ভাড়িত হইয়া তিনি চিক্‌বড়ে আগমন করেন। পশ্চিমধ্যে মোরেশ্বর বা মরগাঁও নামক স্থানের গণেশের উপাসনা করিতে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা হয়। সুতরাং তিনি চিক্‌বড় হইতে প্রতিদিন তথায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদিন ভাত্রমাসে গণেশচতুর্থী যোগে মন্দির লোকে লোকারণ্য থাকার মরবা বৃক্ষতলে নিজ নৈবেদ্য গণেশের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দৈববলে ঐ নৈবেদ্য তৎক্ষণাৎ মন্দিরাত্যন্তরে ও মন্দিরের নৈবেদ্য বৃক্ষতলে জ্বলিত

হইল। পুরোহিতগণ বালককে জ্বলন্ত অগ্নিস্থান করিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিল। পরে অগ্ন্যবশেষে গণপতি পুরোহিতকে আদেশ করিলেন যে, “তুমি দীপ্ত মরবাকে লইয়া আইস, সে আমার পূজা করিবে।” পুরোহিতগণ অনেক অগ্ন্যবশেষ করিলেও মরবা আসিলেন না। স্বপ্নে গণেশ মরবাকে কহিলেন, “আমি তোমার সহিত চিক্‌বড়ে অবস্থান করিব।” পরদিন মরবা গ্নান করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার আরাধ্য মরগাঁওয়ের গণেশমূর্তি ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা গৃহে লইয়া গেলেন এবং একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাখিলেন। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল যে, মরবা গণেশদেব হইয়াছে। পরে মরবা বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার পর তৎপুত্র চিন্তামণ গণেশাবতার বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী লর্ড ভালেমিয়া বংকালে এই মন্দির দর্শন করেন, তখন ক্রমিত গণেশাবতার চক্ষুরোগে ভুগিতেছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ প্রেহাম্ এই মন্দির দর্শন করেন। তিনি বলেন, ঐ সময়ের দেব একটা বালক মাত্র। তিনি প্রতিদিন অতিবাত্র অহিফেণ সেবন করিয়া চক্ষু লাল করিয়া থাকিতেন।

চিচ্চিকুটী (জী) পক্ষীয় চিংকার।

চিচ্চিটিঙ্গ (পুং) চীরতে চি কক্ষণি ক্রিপ্-চিং অগ্নিঃ তত্র চিটিং প্রেষণং পচ্ছতি চিটি-গম্-ড পৃষোদরাদিভ্যাম্ যুম্। কীটভেদ, উচ্চিঙ্ডা।

চিচ্ছদৈবজ্ঞ, প্রশসার নামে সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রহকার।

চিচ্ছক্তি (জী) চিদেব শক্তিঃ কক্ষণাৎ। চৈতন্যশক্তি। “মায়াম্ ব্যান্ডচিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি” (ভাগবত ১।৭।২৪।)

চিচ্ছায়াপতি (জী) চিত্তি বুদ্ধাদেঃ বুদ্ধাদৌ বা চিতেঃ ছায়া প্রতিবিম্বঃ তত্ত্বা আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ। চিচ্ছক্তিতে বুদ্ধিসম্বাদির প্রতিবিম্ব বা বুদ্ধিসম্বাদিতে চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব। পর্যায়—চিং-প্রতিবিম্ব, চৈতন্যধ্যাস, চিদাবেশ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকারে বৃত্তি হইয়া থাকে। বিষয়াকারবুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। চেতনের ছায়া পাইয়া অচেতন বুদ্ধিও চেতন হইয়া উঠেন। বিষয়াকার পরিণাম হইলে বুদ্ধিও চেতনশ্চে প্রতিবিম্বিত হন। তখন পরিণামীর প্রতিবিম্ব পাইয়া অপরিণামী নির্লেপ পুরুষও আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান করেন। (সাংখ্যভাষ্য)

চিচ্ছিৎসু (জি) ছেতু মিচ্ছুঃ হিদ্-ইচ্ছার্থে সন্-উ। ছেদন করিতে অভিলাষী।

চিচ্ছিল (পুং) ১ দেশভেদ। ২ ভেদশব্দ। “মেলকৈলৈপুয়ো-শৈব বিচ্ছিলৈশ্চ সমধিতঃ।” (ভারত তীয় ৮৮ অঃ।)

চিচ্চুক (চিৎসুখ) ভাগবতের একজন টীকাকার।
 চিঞ্চা (স্ত্রী) ১ তিস্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুল গাছ। ইহার পাতার রস
 গুণ্যরোগের উপকারক। তন্তা ফল ইত্যাদি হরীতক্যাদিষা-
 মূপ (হরীতক্যাদিষাভ্যাস। পা ৪।৩।১৬৭) চিঞ্চাকল, তেঁতুল।
 চিঞ্চাটক (পুং) তৃণবিশেষ।
 চিঞ্চাম্ব (স্ত্রী) চিঞ্চোবাম্ব। অম্লশাক, আমরুল।
 চিঞ্চাসার (পুং) চিঞ্চায়া ইব সারোহন্ত। অম্লশাক, আমরুল।
 চিঞ্চিড়ী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ।
 চিঞ্চিনী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ, গঙ্গাধারের দক্ষিণভাগে অবস্থিত।
 চিঞ্চী (স্ত্রী) চিঞ্চ গোরাতিষাৎ ভীপু। গুজা।
 চিঞ্চোটক (পুং) চিঞ্চো অটতি চিঞ্চা-অট-খুল পৃষোদরাদিষাৎ
 সাধু। তৃণবিশেষ, চৈচক।
 চিটা (দেশজ) চটচটে।
 চিটাগুড় (দেশজ) তরল চটচটে খারাপ গুড়।
 চিটিঙ্গ (পুং) কীটভেদ, উচ্চিঙড়া।
 চিটী (স্ত্রী) চৈততি প্রেরয়তি চিট-ক গোরাতিষাৎ ভীপু। ১ চণ্ডাল-
 বেশধারিণী যোগিনী, বশীকরণের জন্ত তাহার উপাসনা
 করিবে। মন্ত্র—“ও চিটি! চিটি! মহাচাণ্ডালি অমুকং মে
 বশমানয় স্বাহা।” স্বাহাকে বশ করিবার ইচ্ছা তাহার নাম
 তালপত্রে লিখিয়া ক্ষীরমিশ্রিত জলে রাত্রিতে সিদ্ধ করিবে,
 তাহা হইলে অবশ্যই সে বশ হইবে, এই বিধিবারা রাজা ৭ দিনে
 বশীভূত হয়। (তন্ত্রসার) (দেশজ) ২ পত্র।
 চিঠা (দেশজ) ১ জমীর পরিমাণ যাহাতে লিখিত হয়। ২ পত্র।
 চিড়া (দেশজ) চিপটক, চিড়ে।
 চিড়িক (দেশজ) ১ বিহ্যৎ চমুকান। ২ বেদনাদিতে দপদপানি।
 চিড়িয়াখানা (হিন্দী চিড়ীয়া অর্থাৎ পক্ষী, পারশ্ব থানা অর্থাৎ
 আবাস) পক্ষী রাখিবার স্থান।
 চিড়িয়াঘাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।
 চিড়িমার (পারসীজ) তাস খেলার একটি রঙ।
 চিড়বিড় (দেশজ) চঞ্চল।
 চিৎ (স্ত্রী) চিৎসংজ্ঞানে সম্পাদাদিষাৎ ভাবে কিপু। ১ জ্ঞান,
 চৈতন্য। “ভগবতশ্চিন্মাত্রাভিকারিণঃ” (ভাগবত ৩।৭।২)
 ২ চিত্তবৃত্তি। “চিদসি মনাসি ধীরসি” (গুরুযজুঃ ৪।১৯)
 ‘অচেতনদেহাদি সজ্বাতস্ত চৈতনস্বং সম্পাদয়ন্তী বাহুববন্তু
 নির্লিপকরূপং সাম্যজ্ঞানং জনয়ন্তী বৃত্তিশ্চিৎতং দেবাত্র
 চিদিত্যুচ্যতে।’ (মহীধর) ৩ নির্বিকল্পকপ্রত্যক আত্মস্বরূপ
 সাক্ষর সত্ত্ব অবভাসক জ্ঞান। “চিদিহাস্মীতি চিন্মাত্রমিদং
 চিন্মাত্রমবচ। চিৎসং চিদহসেতেচ লোকশ্চিদিতি ভাবয়েৎ।”
 (ব্রহ্মসংহতা) চিনোতি চি-কর্তৃণি কিপু। (পুং) ৪ চয়ন-

কর্তা। কর্তৃণি কিপু। (পুং) ৫ অগ্নি। (অব্য) ৬ অসাকল্য।
 ৭ বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর প্রত্যয়বিশেষ “কশিৎ কিঞ্চিৎ”
 ইত্যাদি।

চিত (ত্রি) চি-কর্তৃণি ক্র। ১ ছয়। ২ কৃতচয়ন।

চিতং, পঞ্জাবের অন্তর্গত অম্বালা ও কর্ণাল জেলার একটি নদী।
 ইহা সরস্বতী নদীর কএক মাইল দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া সর-
 স্বতীর সহিত সমান্তরভাবে কিছু দূর গিয়াছে। বালচকর
 নগরের নিকট উভয় নদীর বালুকাময় গর্ভ প্রায় মিলিত হই-
 য়াছে, কিন্তু কিছুদূর গমনের পরই আবার পৃথক হইয়াছে।
 চিতনদী যমুনার সহিত সমান্তরভাবে হালি ও হিসার
 অভিমুখে গমন করিয়াছে। নদীর এই অংশ পশ্চিম যমুনা-
 খালের এক অংশ। ইহাতে কৃষিকার্যের বেশ সুবিধা
 হইয়াছে। পূর্বে এই নদী ভাটিনেরনগরের কএক মাইল
 নিম্নে ঘর্খরানদীর সহিত মিলিত হইত; আজও বালুকাময়
 সেই প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। পরে স্রোত পরিবর্তিত হইলে
 বর্তমান খালে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ অসুমান করেন
 চিতং একটি মহাব্যাকৃত খালমাত্র, কৃষিকার্যের সুবিধা জন্ত
 খনন করা হইয়া থাকিবে।

চিতরতলা, উড়িষ্যার কটকজেলার অন্তর্গত মহানদীর একটি
 শাখা। এই নদী বিরূপার উৎপত্তি-স্থান হইতে ১০ মাইল
 নিম্নে মহানদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিছুদূরে আসিয়াই
 চিতরতলা ও মুন এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রায়
 ২০ মাইল গমনের পর এই দুই নদী পুনরায় মিলিত হইয়া
 মুন নাম ধারণ করিয়াছে ও পরে উপকূলের কিছুদূরে মহা-
 নদীর মোহানায় পতিত হইয়াছে। কেন্দ্রপাড়া খাল প্রথমে
 এই চিতরতলানদীর উত্তর দিয়া আসিয়াছে, পরে মুননদীর
 উত্তর দিয়া কটক হইতে ৪২ মাইল দূরে মার্শাঘাই নামক
 স্থানে নদীতে মিশিয়াছে।

চিতলছুর্গ, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত নগর বিভাগের একটি
 ছুর্গ। ছুর্গের নামানুসারে ঐ জেলা ও উহার প্রধান নগরের
 নামও চিতলছুর্গ হইয়াছে। ছাতার ঞ্জার আকার বলিয়া এই
 ছুর্গকে ‘ছন্তথলছুর্গ’ বলে, তাহা হইতে চিতলছুর্গ নাম হইয়াছে।
 জেলার পরিমাণফল ৪৪৭১ বর্গমাইল। ইহার উত্তর ও
 উত্তরপূর্বসীমায় মাল্লাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলারী জেলা,
 দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্বসীমায় মহিসুরের তুমকুর জেলা এবং
 পশ্চিমে কদুর ও মহিসুরের শিমোগা জেলা অবস্থিত। উত্তর-
 পশ্চিমে তুঙ্গভদ্রানদী ইহাকে ধারবার হইতে পৃথক্ করি-
 তেছে। ইহার প্রধান নগর চিতলছুর্গ বঙ্গলুর হইতে প্রায়
 ১২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাঃ ১৪° ১৪’ উঃ,

জাতি ৭৬-২৬ পূঃ। এই নগরেই বিচারালয় ও পুলিশ-স্টেশন আছে।

মহিষের মধ্যে এই জেলা সর্বাপেক্ষা অধুর্করা ও প্রস্তর-টিমর। এখানে বার্ষিক বৃশাত অত্যন্ত অল্প। বেদবতী নামে তুঙ্গতদ্রার একটা উপনদী জেলার নৈঋতকোণ হইতে ঈশানকোণাভিমুখে বহিতেছে। অমুচ্চ গিরিমালা স্থানে স্থানে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত। তন্নিম্ন অংশ স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গড় ২০০০ ফিট উচ্চ। গ্রীষ্মকালে বেদবতীতে বালির চড়া পড়ে, প্রায় জল থাকে না। বালি খুঁড়িলে তবে কিছু জল পাওয়া যায়। এই জেলার কোনখানেই তেমন গাছপালা হয় না। অনেকে বলেন যে, বড় বড় বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলাতেই বৃষ্টির অভাব ও তজ্জন্তু ক্রমেই জমি অধুর্করা হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনাদির ব্যবস্থা করিলে উত্তম শস্তাদি জন্মে। পশু-চারণের উপযোগী তৃণসমৃদ্ধ ক্ষেত্রও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভাগে লবণাক্ত মাটিতে নারিকেল প্রভৃতি গাছ জন্মে। মধ্যভাগের পাহাড়ে খনিজ লৌহ, চূষক, স্ট্রে-পাথর ও অজ্ঞাত পাথর পাওয়া যায়। পাহাড়ে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হীপি, তরকু ও বন্যবরাহ বাস করে।

পলিগার সর্দারগণ বহুকাল চিতলহুর্গে রাজত্ব করিতেন। এই জেলার অন্তর্গত নিম্ভুঙা নামক অতি প্রাচীন গ্রামে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর এক শিলালিপি পাওয়া যায়। তৎপাঠে জানা যায় যে, ঐ স্থান গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের অধীন কোন জৈন রাজার রাজধানী ছিল। চালুক্য ও বল্লালবংশীয় রাজ-গণের প্রাধান্যকালে গঙ্গবংশীয় কোন রাজাই সম্ভবতঃ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। মুসলমানগণ বল্লালবংশ জয় করিলে বিজয়পুরের হিন্দুরাজগণ দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হন। এই সময়েই রাজধানী বিজয়পুর হইতে বহু দূরবাসী সামন্ত-রাজগণ একরূপ স্বাধীনতা লাভ করেন। তন্মধ্যে চিতলহুর্গ, নিম্ভুগল ও নায়কনহট্টের পলিগারেরাই প্রধান। এই পলিগারগণ বেদর বা বোয়াজাতি, প্রাচীন কিরাত জাতির স্তায়। এই রাজবংশের স্থাপয়িতা ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের সমকালে চিতলহুর্গ অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যে মোগল, পাঠান ও মহারাষ্ট্রদিগের যৌর যুদ্ধকালে পলিগারগণ কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিতেন। জনৈক সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে চিতলহুর্গ হায়দরআলির অধিকৃত হয়। হায়দর-আলি রাজাকে বন্দী ও বেদর বালকগণকে নিজ কর্ণে নিযুক্ত করেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু মৃত্যুর পর চিতলহুর্গ মহিষরাজ্যভুক্ত হয়।

১৮৩০-৩১ খৃঃ অব্দে সমস্ত মহিষের সহিত চিতলহুর্গ ইংরাজগবর্নমেন্টের অধীন হয়। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহি-ষের শাসনভার পূর্বরাজবংশীয় রাজার হস্তে অর্পিত হই-য়াছে। সাম্প্রতি ব্রিটিশ নিয়মেই ইহার শাসনকার্য্য চলিতেছে। দবনগিরি, হরিহর, চিতলহুর্গ ও তুর্কমুর এই করটা প্রধান নগর। চিতলহুর্গের দক্ষিণে যোগীমঠ নামক পর্বতের উপর একটা স্বাস্থ্যনিবাস আছে।

শস্ত্রের মধ্যে ধাতু, ভূট্টা, বাজরা, সরিষা, তিল প্রভৃতি ও কোন কোন স্থানে কার্পাস জন্মে, দক্ষিণভাগে নারিকেলও উৎপন্ন হয়। এখানে শস্ত অতিশয় দুর্লভ। বহুকাল হইতে বেদবতীনদীর উপর ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বাধ করিবার কল্পনা হইতেছে। তাহা সম্পন্ন হইলে জেলার অনেক অংশ বিশেষ উর্বরা হইবে। ইতিমধ্যে বহুব্যয়ে জলাগমের অনেক উপায় করা হইয়াছে।

দেশীয় লোকে কার্পাস, উর্ণা ও শেঁহ প্রভৃতির নানাবিধ দ্রব্য নির্মাণ করে। কোন কোন স্থানে কার্পাসের অতি-হস্ত ও সুন্দর বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হয়। জেলার সর্বত্র উৎকৃষ্ট কষল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন কষল ২০০ হইতে ৩০০ শত টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। জেলার মধ্যভাগে পর্বতে লৌহ পাওয়া যায়, তাহাতে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি ও ছুরী, কাটারি ইত্যাদি নিষ্প্রিত হয়। মালিবেহর ও হরিহরের কাচের চুড়ি মন্দ নয়। মোটা কাগজও স্থানে স্থানে প্রস্তুত হয়। সাম্প্রতি কাচের কাজ একপ্রকার উঠিয়া বাইতেছে।

দবনগিরি প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানকার বস্ত্রশ্রাবক, মরিচ ও কষলাদির সহিত মাস্ত্রাজ হইতে আনীত ছিটবস্ত্র, বাসন ও লবণাদির বিনিময় হয়। নায়কনহট্ট নগরে বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে।

২ উক্ত চিতলহুর্গ জেলার একটা তালুক। একটা পাহাড়-দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণে এই তালুক দুই ভাগে বিভক্ত। এই তালুকের পশ্চিমভাগে ভীমসমুদ্র নামে সার্ক তিনমাইল দীর্ঘ ও দুইমাইল বিস্তৃত একটা প্রকাণ্ড জলাশয় আছে।

চিতলমারি, বাঙ্গালার অন্তর্গত খুলনাজেলার একটা গ্রাম। এই গ্রাম মধুমতীনদীতীরে অবস্থিত। এখানে চৈত্রমাসে ৬ দিন ধরিয়া একটা মেলা হয় এবং তাহাতে প্রায় প্রতিদিন ৪০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

চিতলমাছ, (Notopterus Chitala) মৎস্যবিশেষ। এই জাতীয় মৎস্য অনেকাংশে ফলুইমাছের মত। পৃষ্ঠদেশ অতিশয় কুজাকার, নাসিকা উন্নত এবং পৃষ্ঠের পাখনা মস্তক অপেক্ষা পুচ্ছের অধিক নিকটবর্তী। ইহাদের শব্দ অতি

কুত্র এবং রোপ্যবর্ণ। ইহাদের বিস্তার কাঁটা আছে। গলদেশে হইতে উদয়ের নিম্ন পর্যন্ত প্রায় ১১ সারি কাঁটা থাকে। বর্ণ পৃষ্ঠদেশে ধূসর ও ভায়াভ, কিন্তু পার্শ্বদেশে রোপ্যের দ্বারা। এক একটা চিতলমাছ ৩৪ হাত বড় ও ওজনে দেড় মণ হই মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগর, উড়িষ্যা, আসাম, সিঙ্ক-প্রদেশ, জাম, কলর প্রভৃতি স্থানের নদী ও পুষ্করিণীতে এই মাছ বাস করে। নিম্নবঙ্গেই এই মাছ বেশী বড় হয়।

ইহারা ছোট ছোট মাছ ধরিয়া খায় বলিয়া যে পুষ্করিণীতে চিতল মাছ থাকে, সেখানে অত্যন্ত মাছ অধিক জন্মিতে পারে না। ইহাদের আবার বিভিন্নরূপ জাতিও দেখা যায়।

চাটকা চিতলমাছ ঝাইতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অধিকতর তৈলাক্ত বলিয়া অনেক সময় কেবল তৈলসংগ্রহ জন্তই ইহাদিগকে ধরা হয়। তৈল সংগ্রহ করিতে হইলে মাছ ধরিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল রাখিয়া জলে সিদ্ধ করিবে, পরে ভাজিয়া জাঁতা দিয়া চাপিলে তৈল বাহির হইবে। ঐ তৈল পরিষ্কার করিয়া আলাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট অংশে উত্তম সার হয়।

চিতা (জী) চীয়েতে অশানাদিরস্তাং চি অধিকরণে ত্ত জিয়াং চাপ্। শব্দাহাধার, চুলী। পর্যায়—চিত্যা, চিতি, কাষ্ঠমঠা, চৈত্যা, চিতাচূড়ক, চিত্যা। চিতার শব্দাহার প্রথা অতি পূর্বকাল হইতে প্রচলিত। শতপথব্রাহ্মণ, কাঠ্যায়নশ্রৌতসূত্র, লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে চিতার কথা আছে। কাঠ্যায়নশ্রৌতসূত্রের মতে যে কোন সমস্থানে বহুল তৃণ কাষ্ঠাদির নিম্নভাগে অগ্নি রাখিয়া চিতা রচনা করিতে পারা যায় (১)। কাষ্ঠাদির স্থানে কীরয়ুক্ত অর্কবৃক্ষ, ত্রুক্ষী, শর, মুঞ্জ, পুশ্পিপী, মাষপর্ণী, অধ্যাণ্ডা অথবা চণটগিকাকাষ্ঠে চিতা সাজাইবে (২)।

তুচ্ছিতবে লিখিত আছে—সগোত্রজ, সগিণ্ড অথবা বন্ধুবর্গ শব্দকে লইয়া চিতার স্থাপন করিতে পারে। পুরুষ হইলে দক্ষিণদিকে পা রাখিয়া উবুড় করিয়া শোয়াইবে, কিন্তু স্ত্রী হইলে চিং করিয়া শোয়াইতে হয়। [দাহ দেখ।]

তন্ত্রে মন্ত্রসাধনায় চিতার কথা লিখিত আছে। বীর-তন্ত্রের মতে—যে কোন পক্ষে অষ্টবী বা চতুর্দশীতে চিতাসাধন হইতে পারে, তবে কৃষ্ণপক্ষই প্রশস্ত। দেড়প্রহর রাত্র অতীত হইলে শব লইয়া চিতার গিরা আপনার হিতের জন্ত

সাধন করিবে। ভয় করিবে না, হাসিবে না, চারিদিকে চাহিবে না। আপনার মনেই মন্ত্রপাঠ করিবে। সাধনের সময় আশিষযুক্ত অন্ন, শুড়, ছাগ, সুরা, পায়স, পিষ্টক ও ইচ্ছামত নানাকল দিয়া নৈবেদ্য করিয়া শতপাণি সূক্তের সহিত বীরসাধন করিবে।”

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—

“অসংস্কৃত চিতা গ্রাহা ন তু সংস্কারসংস্কৃতা।

চাণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলঃ শীত্ৰসিদ্ধিমা ॥”

অর্থাৎ অসংস্কৃত চিতাই বীরাচারে প্রশস্ত, যে চিতার সংস্কার করা হইয়াছে তাহা উপযোগী নহে। বিশেষতঃ চাণ্ডাল প্রভৃতিকে যে চিতার দাহ করা হইয়াছে, সেই চিতার শীত্ৰ অতীষ্ট সিদ্ধি হয়। ২ সমুহ। (মেদিনী)

চিতাকড়ি (দেশজ) একপ্রকার কড়ি।

চিতাচ্ছাদন (স্লী) চিতায়াঃ আচ্ছাদনং ৬তৎ। চিতার আচ্ছাদন-বস্ত্র।

চিতাপড়ন (দেশজ) চিং হইয়া পড়া।

চিতাবাঘ (চিত্রব্যাজ, চিত্রক) শাদুল জাতীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাবয়ব মাংসাসী হিংস্রজন্তু। যুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদগণ ইহাদিগকে বিড়ালজাতির মধ্যে গণ্য করেন। সচরাচর নানাবর্ণে চিত্রিত বলিয়াই ইহাদিগকে চিত্রব্যাজ বা চিতাবাঘ বলে। ইহাদের সমস্ত অবয়ব সূক্ষ্ম ও সবল, গঠন অনতি স্থূল, মস্তক গোলাকার, দংষ্ট্রা অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং পায়ের খাণ্ডা সূতীক্স নখর-বিশিষ্ট। ইহাদের পুচ্ছ সূদীর্ঘ এবং সর্কাজ ঘন কর্কশ লোমাবৃত। গাত্রে গোল বক্র রেখা প্রভৃতি নানা আকারের ক্লকবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহাদের বর্ণ প্রায়ই ক্লকান্ত পীত। ভারতবর্ষ, পূর্বউপদ্বীপ, আফগানস্থান, সিংহল প্রভৃতি এশিয়ার নানাস্থানে ও আফ্রিকার চিতাবাঘ দেখা যায়। নানাস্থানে ইহাদের নানাক্রম জাতি আছে। অনেকে কালবাঘকেও এই শ্রেণীভুক্ত করেন। এই চিতাবাঘেরই ক্ষুদ্রাকার এক জাতিকে বিবিবাঘ বলে।

চিতাবাঘ নিবিড় অরণ্যে বাস করে না, ঈষৎ জঙ্গলপূর্ণ গিরিপার্শ্বে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা ভয়ানক হিংস্র। যতক্ষণে কিছুমাত্র ভয় করেনা এবং কোন কোন সময়ে শিকারীকে পর্যন্ত মারিয়া ফেলে। ইহারা যুগশাবক প্রভৃতি বড় জন্তু ধরিয়া খায়, সুবিধা পাইলে গোমহিষাদিও নষ্ট করে। কখন কখন গ্রামে প্রবেশ করিয়া গোমেষাদি এমন কি বালকবালিকা পর্যন্ত ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাদের লম্ব ও গম্বনাড়ি প্রায় ব্যাঘ্রের দ্বারা। অনারাসেই ৬৬ হাত উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাইতে পারে। অনেক সময় নিকটে

(১) “বিতানং সাধরিয়া সসে বহলতৃণেহস্তরায়ৌ চিতিং চিনোতি।”

(কাঠ্যায়নশ্রৌতসূত্র ২৫।১।১৫)

(২) ‘ন চিতিবৎ বৃত্তত দাহাৰ্ণং বনুশৈঃ কাষ্টৈশ্চিতিং চিতিং জানুনে দেশে।’ (বর্কচাৰ্য্য)

পাইলে যথেষ্ট পোক, ছাগল প্রভৃতি মারিয়া ফেলে। কুখা না থাকিলেও ইহারা প্রাণীহিংসার নিবৃত্ত হয় না। ইহারা প্রায়ই মৃতজন্তু খায় না, তবে বেশী কুখা পাইলে মৃত জীবও উদরসাৎ করে। ইহারা শুশ্রূষনে লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সম্মুখে কোন প্রাণী আসিলে অমনি তাহার উপর লাকাইয়া পড়ে। কখন কখন সম্মুখ বৃদ্ধ করিয়াও নীকার করে।

ইহারা সহজে পোষ মানেনা। কিন্তু শৈশবাবস্থায় ধরিয়া ইহাদিগকে পোষ মানাইতে ও কুকুরের ভায় প্রভুর আচ্ছাদন করিতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পোষা চিত্তাবাধ সঙ্গে লইয়া অনেকে তামাসা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। আবার অনেকে চিত্তাবাধ গুলিয়া তদ্বারা যুগাদি শিকার করে।



শিকারীচিত্তা (Felis jubata) মধ্যভারতে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে, রাজপুতানা ও সিন্ধুপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি এশিয়ার দক্ষিণপশ্চিমভাগে এবং আফ্রিকার সর্বত্র ইহারা অল্পাধিক বাস করে। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও শ্বেত এবং গায়ে ঘন ঘন গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নযুক্ত। প্রত্যেক চক্ষুর প্রান্ত হইতে একটা কৃষ্ণবর্ণ রেখা টানা, পুচ্ছে ডোরা ও অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ, উদরের লোমাবলী দীর্ঘ ও স্বচ্ছ অল্প কেশর থাকে। ইহাদের চক্ষু গোলাকার, কাটদেশ সরু, পদ দীর্ঘ। এই জন্তু লইয়া কৃষ্ণসার ও অস্ত্রাশ্রয় শিকার করা যায়, তাই ইহাদিগকে শিকারী চিত্তা বলে। কিছু বড় হইলে ধরিয়া আনিয়া পোষ মানায়, পরে শিকার করিতে শিখায়। পোষ মানাইবার সময় ইহাদিগকে অবধা উত্তেজিত করিলে বা সর্বদা বন্দী করিয়া রাখিলে কিছুই ফল হয় না। সাবধানে যথোপযুক্ত স্বাধীনতা এবং আদর দেওয়া চাই। শিকারে যাইবার সময় শিকারীগণ চিত্তাকে একটা শকটের ভিতর রাখিয়া চক্ষে ঠুলি দিয়া লইয়া যায়। পরে সম্মুখে কৃষ্ণসারযুগের পাল দৃষ্ট হইলে যথাসাধ্য নিকটে গমন করিয়া শকট হইতে চিত্তাকে বাহির করে এবং তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দেয়। চিত্তা শিকার দেখিবামাত্র নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, পরে যখন নিকটে গমন করে বা শিকার যদি জানিতে পারে, অমনি ক্রতবেগে লম্বা কক্ষে শিকারের উপর গিয়া পড়ে। যদি প্রথম

উদ্যমেই ধরিতে না পারে, তবে ক্রোধে ও হতাশে অধীর হইয়া বিকট মুখভঙ্গিপূর্বক বসিয়া থাকে। চিত্তা দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার কৃষ্ণসারকেই আক্রমণ করে এবং গলায় কামড়াইয়া ও মস্তকের উপর একথাবা দিয়া একপভাবে তাহাকে আয়ত্ত করে যে কৃষ্ণসার শৃঙ্গদ্বারা চিত্তার কিছুই করিতে পারে না। শিকারের পর যুগের একটা পা কাটিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ চিত্তাকে দেওয়া হয়। যে কৃষ্ণসারের ক্রতগতির নিকট কি বিলাতী কি দেশীয় কোন ডালকুড়া সমকক্ষ নয়, সেও চিত্তার নিকট সহজেই পরাস্ত হয়। কিন্তু চিত্তা অধিকক্ষণ দৌড়িতে পারে না। শিকারীগণ চিত্তাকে শিশুকাল হইতে পালন করিলে ভাল শিকার করিতে পারে না, কিছু বড় হইয়া মাতার নিকট পশু ধরিবার কৌশল শিক্ষা করিবার পর উহাদিগকে ধরিয়া পোষ মানাইলে তবে উৎকৃষ্ট শিকারী হয়।

চিত্তামণপুর, বেহারের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটা নগর।

চিত্তালিয়া, বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁওতালপরণগার একটা জমিদারী, ইহা গবর্মেণ্টের সম্পত্তি।

চিত্তারেবা, মধ্যপ্রদেশের একটা নদী। ইহা ছিলবারাজেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া ৫০ মাইল আসিয়া নরসিংপুর জেলার অন্তর্গত পাটলোন্ নামক স্থানের নিকট স্করনদীতে পতিত হইয়াছে। নর্মদা-মাইনিং কোম্পানির কয়লা এই নদীর সাহায্যে অস্ত্র প্রেরিত হয়।

চিতাভক্ষ (ক্লী) চিতারা: ভক্ষ ৩৩৭। চিতার ভক্ষ।

চিতাকৃমি (ক্লী) চিতারা: কৃমি ৩৩৭। আশাম।

চিতারুঢ় (ত্রি) চিতাং আরুঢ়: ২৩৭। চিতাতে যে আরোহণ করিয়াছে।

চিতাশায়িন্ (ত্রি) চিতারাং শেতে চিতা-শী-গিনি উপস।
চিতাতে যে শয়ন করিয়াছে।

চিতাসাধন (ক্লী) চিতারাং সাধনং ৭৩৭। চিতার উপরি সাধন। উত্তরপক্ষের চতুর্দশী বা অষ্টমীর দিনে রাত্রি সেড়-প্রহরের সময়ে চিতার উপরে বসিয়া নির্ভিকচিহ্নে ইষ্টমন্ত্র অর্পণ করিবে। সামিষ অন্ন, শুদ্ধ, ছাগ, মদ্য, পায়স, পিষ্টক এবং নানাবিধ ফলদ্বারা নৈবেদ্য করিয়া পূজা করিবে। (ভক্তসার)

চিতাহরিণ (দেশজ) চিত্রমৃগ।

চিতি (ক্লী) চীয়েতে অন্ত্যং চি আধারে জিন্। ১ চিতা।

[চিতা দেখ।]

“চিতিং দাক্ষময়ীং চিত্বা।” (ভাগবত ৪।২৮।৫) ক্লীর আটায়ুক্ত আকন্দ প্রভৃতি বৃক্ষের কাঠ, দুর্কা, মুক্ত, মাষপর্ণী, চণচণিকা (ধঞ্চ), অশ্বগন্ধা ইত্যাদি দ্বারা অনেক তৃণযুক্ত স্থানে চিতি নির্মাণ করিবে, চিতির কাঠাঙ্গসারে মাটির গুণ হইয়া থাকে।

(কাত্যায়ন।)

ভাবে জি। ২ সমুহ। ৩ চরন। ৪ অগ্নির সংস্কারবিশেষ।

“গার্হপত্যং চেবান্ পলাশশাখাব্যুদ্বহতি অবস্ততি হৈতৎ গার্হপত্যং চিনোতি” (শতপথব্রাহ্মণ ৭।১।১।১।)

৫ ইষ্টকাদির সংস্কার। “প্রাণভূত উপদধাতি। প্রাণা বৈ প্রাণভূতঃ প্রাণানৈবৈ তদুপদধাতি। তাঃ প্রথমার্য্যং চিতা উপদধাতি” (শতব্রাহ্মণ ৭।১।১।১।) ৬ তিতিস্থ ইষ্টকসমুহ।

[চিতিব্যবহার দেখ।] ৭ দুর্গা। “চিতিশ্চৈতন্তভাবান্ বা চেতনা বা চিতিঃ স্তুতা” (দেবীপুং ৪৫ অঃ) কপু হইলে দীর্ঘ হয় (চিভে: কপি। পা ৬।৩।১২৭।) যথা একাচিভীক ইত্যাদি। চার দীপ্তৌ-জিন্। ৮ চৈতন্ত।

চিতিকা (ক্লী) চিতিরিব কায়তি চিতি-কৈ-ক টাপ্। ১ কটিশূল, মেখলা। চিতি-স্বার্থে কন্ টাপ্। ২ চিতিশব্দের যে যে অর্থ।

[চিতি শব্দ দেখ।] চিতা-স্বার্থে কন্ টাপ্। ৩ চিতা।

চিতিমৎ (ত্রি) চিতিরত্ম্যস্মিন্ চিতি-অন্ত্যার্থে মতুপ্। যে দেশে বা স্থানে-চিতা আছে।

চিতিব্যবহার, যেক্ষণে ইষ্টক ও প্রস্তরাদির পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়, তাহার প্রকরণকে চিতি কহে।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—

“উচ্চ-য়েণ গুণিতং চিভে: কিল ক্ষেত্রসম্ভবকলং ঘনং ভবেৎ।

ইষ্টিকা ঘনকৃতে ঘনেচিতেরিষ্টিকাপরিমিতস্ত লভ্যতে।

ইষ্টিকোচ্চ-রত্নহুত্ব-তিষ্ঠিতো: স্ত্য:স্তরাস্ত দ্বন্দ্বাং চিভেরপি।”

(নীলাবতী ২৬:)।

প্রথমে খাতব্যবহার অনুসারে ইষ্টক প্রভৃতি চিতির ক্ষেত্রকল সাধন করিলে উচ্চতা (উচ্চুর) দ্বারা গুণ করিলে তাহাই চিতির ঘন হইবে। পরে ইষ্টিকাদিরও ঘনকল আনয়ন করিয়া উপরোক্ত চিতির ঘনকে ভাগ করিলে ইষ্টিকাদির পরিমাণ হইবে।

পূর্বোক্ত মতে চিতির উচ্চ-তিকে ইষ্টিকাদির উচ্চ-তি দ্বারা ভাগ করিলে স্তরকল সিদ্ধ হয়।

উদাহরণ—ইষ্টকাদির দৈর্ঘ্য ১৮ অঙ্গুল, প্রস্থ ১২ অঙ্গুল, ও উচ্চতা ৩ অঙ্গুল। যাহার দৈর্ঘ্য ৮ হাত, প্রস্থ ৫ হাত ও উচ্চতা ৩ হাত, এমন চিতির (পাঁজার) মধ্যে কত ইট ও তাহার মধ্যে কত স্তর সংখ্যা থাকে তাহার নিরূপণ কর।

অঙ্গুলিপরিমাণে চিতির ইষ্টকাদির ঘনকল ৬৪৮ হয়। আর অঙ্গুলপরিমাণে চিতিতে ১৬৫৮৮৮০ ঘনকল হয়। অতএব চিতির ঘনকল ১৬৫৮৮৮০কে ইষ্টকায় ঘনকল ৬৪৮ দিয়া ভাগ করিলে ২৫৬০ চিতির ইষ্টকের সংখ্যা হইল। এইরূপ আবার চিতির উচ্চ-তি ৩ হাত অর্থাৎ ৭২ অঙ্গুলিকে ইষ্টকের উচ্চতা ৩ অঙ্গুলিদ্বারা ভাগ করিলে ২৪ চিতির স্তরের পরিমাণ হইল।

চিতিসাপ (দেশজ) একজাতীয় সর্প, চিতুইসাপ। ইহার। চালে বাস করে। [সর্প দেখ।]

চিতোর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরের একটা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ও পূর্বতন রাণাগগের রাজধানী। অক্ষা° ২৪° ৫২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪১' পূঃ। নীমচ হইতে রাজবন্দর এই নগর দিয়া নসিরাবাদ গিয়াছে। ইহা হোলকর-সিদ্ধি-টেট রেলওয়ের একটা স্টেশন।

চিতোরের কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে নেত্রপাত করিলে এক অপূর্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। প্রথমেই সমতল হইতে ক্রমোচ্চ প্রবণভূমি পর্তুতাকারে উত্থিত, তাহার শীর্ষস্থানে প্রাচীরবেষ্টিত গড় শোভিত, ইহার কোন স্থানে হিন্দুগৌরবের উচ্চল দৃষ্টান্তস্বরূপ অত্যুচ্চ জয়স্তম্ভ অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান, কোনস্থানে অত্যাবশ্য্য ভাস্কর্য্যকার্য্যসম্বিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধমালা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্তমান থাকিয়া তাৎ-কালিক অদ্বুত বুদ্ধিকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; কোথাও বিস্তীর্ণ জলাশয় ও তাহাদের তীরস্থ প্রাসাদ সকল মহাপরাক্রান্ত রাণাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিতেছে ও তাহাদের অদ্বুত বীরকার্য্য সকল স্মৃতি-পথে উপস্থিত করিতেছে। স্বর্গ্যকুলতিলক মহাবীর রামচন্দ্রের বংশধর বল্লভাও

যে নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, যে ষাটশবর্ষীয় রাজপুত বালকের শৌর্য্যে পশ্চিমীকরণমোহিত হুর্জর আলাউদ্দীনের অগণ্য সৈন্য সনসদনে গমন করে সেই মহাবীর বাদলের জন্মভূমি, মহারাজ জীমসিংহ ও মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী কুন্তরাণার রাজধানী স্নসমৃদ্ধ ভারতবিখ্যাত চিতোরনগর এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াও বাঁহারী সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না একশত শত বোদ্ধার প্রসবিনী বীরমাতা চিতোরনগরী এক্ষণে কিরূপ হৃদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা দেখিলে কাহার মনে সন্তাপের উদয় না হয়? যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই ভূরি ভূরি ভয়াবশেষ ইহার প্রাচীন গৌরব ও স্বতন্ত্রত্বের পরিচয় দিতেছে। কোথাও অত্যাচর স্তম্ভ, কোথাও ভগ্নপ্রাসাদ, কোথাও প্রকাণ্ড তোরণদ্বার, কোথাও দেবালয়, এমন কি একখণ্ড সামান্য প্রস্তর পর্যন্ত কোন না কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশ করিতেছে। বাস্তবিক হিন্দুকুলগৌরব রাজপুত-রাজধানী চিতোরে গমন করিলে বর্তমান অধঃপতিত হিন্দুর দ্বন্দ্বের যে কি এক অপূর্ণ ভাবের উদয় হয়, তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে।

শৈলের পশ্চিম পাদদেশে চিতোর নগর অবস্থিত। নগরের আকার একটা বিশাল আয়তক্ষেত্রের জায়। ইহার চতুর্দিক হুর্জরসংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত। পশ্চিমভাগে অদূরে গমেরীনদী বহিতেছে, তাহার উপর পাথরের সেতু কালের প্রতি উপেক্ষা করিয়াই যেন বর্তমান রহিয়াছে। চিতোরের সমৃদ্ধিকালে শৈলশৃঙ্গ হুর্জর ভিতর রাজপ্রাসাদ, কীর্তিস্তম্ভ ও অজ্ঞাত মন্দিরাদি নির্মিত হইত, কাজেই নিম্নস্থ নগরে স্নন্দর অট্টালিকা দি নির্মিত হয় নাই। নিম্নস্থনগরকে তলহাটা কহে। প্রাচীন শিলাফলকে উক্ত নগর চিত্রকূট ও পাহাড়ই চিত্রকূটচল নামে বর্ণিত হইয়াছে। নগরের পূর্বে ৩৪ মাইল দীর্ঘ শৈল-শিখরে ভুবনবিখ্যাত চিতোরগড় অবস্থিত। এই গড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭৩৫ গজ ও বিস্তার ৮৩৬ গজ। শিখরদেশ অতিশয় হুর্জম, কিছুদূর নিম্ন হইতে প্রবণভূমি ক্রমনিম্ন হইয়া সমতলে মিশিয়া আসিয়াছে। হুর্জের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেক জলাশয় আছে। সর্ব উত্তরভাগে হুর্জ প্রাচীর ১৭৬১ ফিট ও সর্ব দক্ষিণভাগে ১৮১৯ ফিট উচ্চ। হুর্জে প্রবেশ জন্ত তিন দিকে তিনটা তোরণদ্বার। ঐ সকল দ্বার পর্যন্ত উঠিবার তিনটা ক্রমোচ্চ পথ আছে। পশ্চিমদিকের রাজপথই তন্মধ্যে প্রধান। এই পথ প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। নগরের অধিকাংশ হইতে ছইটা তোরণ দিয়া প্রথমে উত্তরমুখে ১০৮০ গজ পর্যন্ত গিয়াছে, পরে বাঁকিয়া গিয়া আরও ৩৪টা তোরণ পার হইতে হইতে ৫০০ গজ অতিক্রমণের পর রামপোল নামক হুর্জদ্বারে মিশিয়াছে। সমস্ত পথ সমভাবে ১৫ ইঞ্চিতে ১ ইঞ্চি

ক্রমোচ্চ ও স্থানে স্থানে প্রস্তর-নির্মিত। ২২ দ্বার উত্তরভাগে অবস্থিত, ইহাতে উঠিবার পথ অতি হুর্জম, স্তম্ভরং প্রায় অব্যবহার্য। হুর্জপোল নামে ৩৭ দ্বার পূর্বভাগে অবস্থিত। এই দ্বারে উঠিবার পথ প্রায় ৭৫০ গজ, ইহার উপরের অর্দ্ধাংশ প্রস্তরনির্মিত। হুর্জে প্রায় ৩২টা সরোবর থাকার প্রচুর জল পাওয়া যায়। পর্বতমিয়ে মগরের উপরিভাগে একটা নির্ঝরিনী আছে, তথায় সকল সময়েই সুবাহু ও সুবাহুর জল পাওয়া যায়। মধ্যভাগে অত্যন্ত স্থানে গোধূম চাস হয়, কিন্তু চারণযোগ্য তৃণাদি পাওয়া যায় না।

চিতোরগড়ের অবস্থান অতি উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ়। ইহা চতুর্দিকের সমতল হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চ। পর্বতগাত্র গভীর, হুর্জম ও নিবিড় ধাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বর্তমান সর্বোৎকৃষ্ট কামানদ্বারাও ইহার উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারা যায় না। বাস্তবিক চিতোরের সোভাগ্যের সময় সমগ্র ভারতবর্ষে একরূপ গড় একটাও ছিল কি না সন্দেহ।

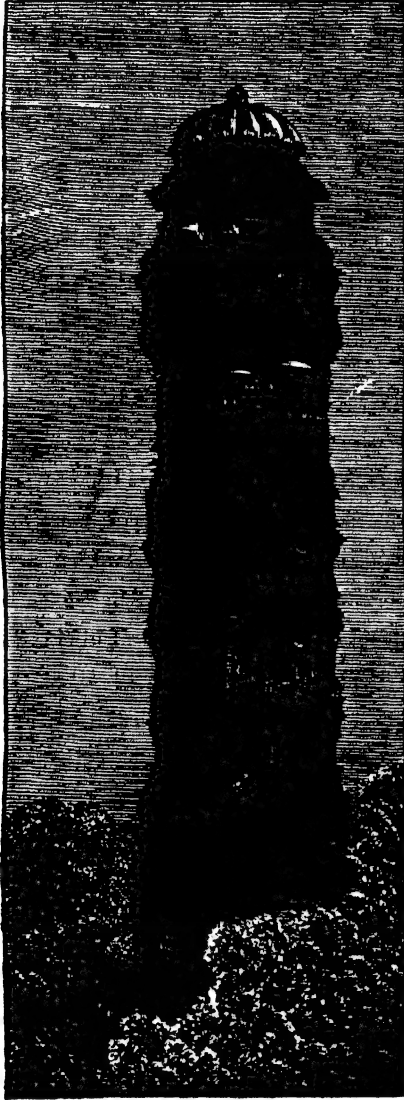
রাজপুতেরা বলিয়া থাকে হুর্জবংশাবতংস নৃপকুল-ধুরন্ধর মহাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ তনয় লবের পবিত্র বংশে বঙ্গরাও জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ৭২৮ খৃষ্টাব্দে চিতোরগড় নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার বংশীয়েরা তথায় রাজত্ব করিতেন, পরে ঐ অঙ্গে সম্রাট অকবর চিতোরগড় অধিকার করিলে তখনকার রাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

চিতোরের প্রাচীন মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভাদির মধ্যে কুন্তরাণার কীর্তিস্তম্ভ, ধোবাসিনস্তম্ভ, মোকলজির মন্দির, শিল্লারচৌরী প্রভৃতিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন হুর্জের সর্বত্রই বহুল ভয়াবশেষ পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে জৈনদিগের খোদিত অনেক শিলালিপিও পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বোপেক্ষা প্রাচীন লিপিস্থান ৭৫৫ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ।

মালব ও গুজরুর সুলতানকে পরাজয় করিয়া সেই জয়-ঘোষণার্থ কুন্তরাণা-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরের কীর্তিস্তম্ভই চিতোরের হিন্দুগৌরবের প্রধান পরিচায়ক। ইহার উচ্চতা ১২২ ফিট এবং প্রস্থ নিম্নদেশে ৩৫ ফিট ও উর্দ্ধভাগে ১৭ ফিট মাত্র। ইহা ৯টা তলে বিভক্ত। প্রত্যেক তল সুস্পষ্ট ও চতুর্দিকে বাতায়নসম্বিত। স্তম্ভের পাদদেশ হইতে চূড়া পর্যন্ত স্নন্দর রাজভাস্কর কার্য-সম্বিত। উহাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক জনগণের মূর্তি প্রভৃতি খোদিত এবং কুন্তরাণার কীর্তি ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের কীর্তিকলাপ-বিবোধক শিলালিপি আছে। রাজপুত ঐতিহাসিক টড সাহেব উক্ত কীর্তিস্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপি সাহায্যে লিখিয়াছেন, ১৫১৫

সংবতে অর্থাৎ ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হয় (১)।

"In Samvat 1515, the temple of Brimba was founded and this year, Vrishpatwar (Thursday), the 10th.....on the immoveable Chutterkote, this Kheerut Stambha was finished".



চিত্তোরের জরতস্তম্ভ।

অন্নতরবিদ কনিংহামের অনুবর্তী গ্যারিকও টডের মত স্বীকার করিয়াছেন। (২)

বিখ্যাত শিল্পশাস্ত্রবিৎ ফাঙ্গার্সন সাহেবের মতে ১৪৩৯

খৃষ্টাব্দে ঐ জরতস্তম্ভ নির্মিত হয় (৩)। আবার বিখ্যাত হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন—"The chief object of interest is the Khirat Khumb, the pillar erected in 1450 by Rana Khumbhu, to commemorate his defeat of the combined armies of Malwa and Gujarat in 1439." (৪)

কিন্তু উপরোক্ত একটা মতও ঠিক নহে, ১৫১৫ সন্থতে কি ১৪৩৯ খৃঃ অথবা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দেও নির্মিত হয় নাই, বাস্তবিক ১৫০৫ সংবতে অর্থাৎ ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কীর্তিস্তম্ভ সম্পূর্ণ হয়। উক্ত কীর্তিস্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৮৪-১৮৭ শ্লোকে এইরূপ পরিচয় আছে—

"বর্ষে পঞ্চদশে শতে ব্যাপগতে সপ্তাদিকে কার্তিক-

স্তম্ভানুজতিথৌ নবীনবিশিবাং * ত্রিচিক্রকূটে ব্যাধাং।

উত্তরোত্তরগণচারহীরকপ্রভাতানুর-

প্রোদকংকপিশীর্ষকাক্ষিতশিরোরম্যাং মহীবল্লভঃ ॥ ১৮৪

ত্রিবিক্রমাং পঞ্চদশাদিকেহস্মিন্ বর্ষে শতে পঞ্চদশে ব্যতীতে।

চৈত্রাসিতেহনজতিথৌ ব্যাধারি ত্রিকুম্ভমেকর্ষস্থধাধিপেন ॥ ১৮৫

পূণ্যে পঞ্চদশে শতে ব্যাপগতে পঞ্চাদিকে বৎসরে

মাঘে মাসি বল্লপঞ্চদশমী দেবেজ্য পুষ্যাগমে।

কীর্তিস্তম্ভমকারয়ন্নরপতিঃ ত্রিচিক্রকূটচলৈ

র্মানা নির্মিতনিজ্জরাবতরণৈর্মেরো হসন্তঃ শ্রিয়ং ॥ ১৮৬

সংপ্রাকারপ্রকারং প্রচুরস্বরগৃহাডম্বরং মঞ্জুগুঞ্জ-

ভৃঙ্গশ্রেণীবরেণ্যোপবনপরিসরং সর্বসংসারসারং।

নন্দবোমেষুশীতস্থ্যাতিমিতিকরিতরে বৎসরে মাঘমাসে

পূর্ণয়াং পূর্ণরূপং ব্যরচয়দচলং হর্গমুকীমহেন্দ্রঃ ॥ ১৮৭

অর্থাৎ সপ্তাদিক পঞ্চদশ শতবর্ষ (১৫০৭) অতীত হইলে নরপতি কুম্ভকর্ণ কার্তিকমাসের প্রথম ত্রয়োদশীতে চিক্রকূটে উত্তরোত্তরগণচিতহীরকপ্রভাতানুরা দীপ্যমান এবং যাহার শিরোদেশ কপিশীর্ষ দ্বারা শোভমান এমন নূতন আত্মরাগার নির্মাণ করেন। [১৮৪] বিক্রম হইতে পঞ্চদশাদিক পঞ্চদশশতবর্ষ (১৫১৫) অতীত হইলে মহারাজ চৈত্রমাসের কৃষ্ণত্রয়োদশীতে কুম্ভমেক নির্মাণ করেন। [১৮৫] পঞ্চাদিক পঞ্চদশশতবর্ষ (১৫০৫) অতীত হইলে নরপতি মাঘমাসের পুষ্যাগমে বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্রে চিক্রকূটে অচলস্বরূপ খোদিত নানা দেবতার মূর্তি দ্বারা স্তম্ভের শোভাজয়কারী কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। [১৮৬] নবাদিক পঞ্চদশশতবর্ষ (১৫০৯) মাঘমাসের পূর্ণিমাতিথিতে পৃথিবীপতি স্তম্ভের আচার্যবৃত্ত অনেক

(১) Tod's Rajasthan, vol. II. p. 657.

(২) Sir A. Cunningham's Archaeological Survey Reports, vol. XXIII. p. 111a.

(৩) Fergusson's History of Indian Architecture

(৪) Dr. Hunter's Imperial Gazetteer, (2nd ed) vol. III p. 431.

* শুদ্ধ পাঠ "বিশিবাং"।

দেবমন্দিরশোভিত মধুর গুহনশীল ভ্রমরকুলপূর্ণ-উপবন-বিরা-
জিত সকল সংসারসার অচল দুর্গ নির্মাণ করেন। [১৮৭]

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে ১৫০৫ বিক্রম-
সংবতে মাঘমাসে উক্ত কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত হয়। টঙ্কাহেব
যে ১৫১৫ সম্বতে “বৃষ” নামক দেবমন্দির নির্মাণের কথা
লিখিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, বাস্তবিক কীর্তিস্তম্ভে
উৎকীর্ণ ১৮৫ শ্লোকে উক্ত বর্ষে কুন্তমেক নির্মাণের কথাই
লিখিত আছে *।

বিখ্যাত টঙ্কাহেবের মতে এই ভ্রমস্তম্ভ দিল্লীর কুতব-
মিনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু কনিংহাম সাহেবের মতে এই
স্তম্ভ কুতব-মিনারের সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি বলেন,
ইহার আপাদমস্তক হ্রস্ব ভাস্কর্য্যার্থে পরিপূর্ণ থাকায় ইহার
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসই হইয়াছে। এরূপ না হইয়া
যদি মধ্যে মধ্যে শাদা জায়গা থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য
আরও বৃদ্ধি হইত। ইহাতে উঠিবার সোপানশ্রেণী অতি
অপ্রশস্ত ও দ্বারগুলি অতি ক্ষুদ্র।

অপর একটা স্তম্ভের নাম কীর্তম্ অর্থাৎ ছোটকীর্তম্।
ইহা সম্ভবতঃ দেবোদ্দেশে নির্মিত হয়। এই স্তম্ভ সম্প্রতি
পতনোন্মুখ হইয়া আছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে ফাটিয়া
গিয়াছে, এবং চূড়ার কতক অংশ খসিয়া পড়িয়াছে।

চিতোরের মন্দিরগুলির মধ্যে মোকলজী-কা-মন্দির ও
শিকারচৌরী নামক মন্দিরদ্বয়ই প্রধান। প্রবাদ আছে—
রাণা কুন্তকর্ণ পিতা মোকলজীর স্থতিচিহ্নরূপ উল্লিখিত
মোকলজী-কা-মন্দির নির্মাণ করেন, আবার কাহারও মতে
মোকলজী স্বয়ং ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পূর্বপশ্চিমে
৭২ ফিট দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে ৬০ ফিট বিস্তৃত। ইহার
মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ, উহার উপরের ছাদ খিলান করা
এবং ক্রমে গোলাকার সূচীর আকার ধারণ করিয়া চূড়ার
পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই প্রধান প্রকোষ্ঠের পশ্চাতে

* কীর্তিস্তম্ভের শিলালিপির প্রকৃত পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়াই
টঙ্কা প্রভৃতি পূর্বতন ঐতিহাসিকগণ সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। এইরূপ
অপরপর শিলালিপির প্রকৃত পাঠোদ্ধারের অভাবে মহাত্মা টঙ্কা রচিত
রাজহানের ইতিবৃত্ত অধিকাংশই ভ্রমাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। হস্তরাক্ষ
অত্যেক শিলালিপির সীতিসম পাঠোদ্ধার হওয়া আবশ্যক।

উক্ত কীর্তিস্তম্ভের শিলালিপিতে রাণা কুন্তকর্ণের পূর্বপুরুষগণের
কীর্তিকলাপাদি বর্ণিত আছে। এই শিলালিপিখানি অতি আবগন্ধ হইলেও
কেহই এপর্য্যন্ত ইহার প্রকৃত পাঠোদ্ধার করেন নাই। বাহ্যিকভাবে কেবল
নির্দিষ্ট স্থান নাজ উদ্ধৃত করিলাম।

মন্দিরের পূর্বাংশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটা গর্ভগৃহ আছে,
তাহা অতিশয় অন্ধকারময়। মন্দিরের কোথাও আলোক
হাইবার বন্দোবস্ত নাই। উজ্জ্বল দিবাভাগেও দীপসাহায্য
ব্যতীত কিছুই নেত্রাগোচর হয় না। মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ
ও পশ্চিমদিকে তিনটা দরদালান ও প্রবেশদ্বার আছে,
তন্মধ্যে পশ্চিমদিকের দ্বারই প্রধান। পূর্বদিকের প্রকোষ্ঠে
একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তি স্তম্ভাকারে দণ্ডায়মান আছে।
প্রস্তরের তিনদিকেই মূর্তি খোদিত ও অত্যুৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য-
শোভিত। এই মন্দিরের সর্বত্রই প্রস্তরখোদিত বহুসংখ্যক
মূর্তি পরিপূর্ণ। ইহার কোথাও বাদ্যকরগণ, কেহ ঢোল, কেহ
করতাল, কেহ বাঁশী, কেহ নাগড়া ইত্যাদি লইয়া বাদ্য করি-
তেছে; কোথাও বিচারকগণ বিচার করিতেছেন, সম্মুখে
প্রহরী কর্তৃক ধৃত অপরাধী ভীতি বিহ্বলচিত্তে দণ্ডায়মান,
কোথাও কোন মহিলা জলকুন্ত মস্তকে লইয়া আসিতেছে,
সম্মুখে করজোড়ে জনৈক পুরুষ দণ্ডায়মান; কোথাও কোন
বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সশস্ত্র প্রত্যাগত, সম্মুখে শিশুকোড়ে
করিয়া তাহার শ্রিতমা আশ্রমে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে,
কোথাও যোদ্ধাগণ অসি চর্চ লইয়া যুদ্ধ করিতেছে, ইত্যাকার
নানা ভাবের সুন্দর সুন্দর খোদিত মূর্তি শত শত বর্তমান।

শিকারচৌরী নামক মন্দিরের গঠন চোরার মত। ইহার
প্রধান গর্ভগৃহ মধ্যভাগে নির্মিত। তাহার চতুর্দিকে চারিটা
দরদালান, তন্মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণদিকে দ্বার নাই, উত্তর ও
পশ্চিমদিক দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। হিন্দুদেবমন্দিরাদি
প্রায়ই পূর্বদ্বারী হইয়া থাকে, কিন্তু চিতোরের মন্দিরাদি
প্রায় সবই পশ্চিমদ্বারী। প্রবাদ যে এই শিকারচৌরী রাণা
কুন্তকের জৈনধর্ম্মাবলম্বী কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক নির্মিত।

শিকারচৌরীর মধ্য দিয়া মিবার-রাজ্যাপহারী বনবীর
আশ্বরক্ষার্থ এক প্রাচীর নির্মাণ করেন। ঐ প্রাচীর দ্বারা
গড় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

চৌধানের অদূরবর্তী সরোবর মধ্যে ভীমসিংহ ও রাণী
পদ্মিনীর প্রাসাদ। সম্প্রতি এই প্রাসাদের সংস্কার হইয়াছে।

একটা উচ্চভূমির উপর মিবারের অধিষ্ঠাত্রী কালিকাদেবীর
মন্দির স্থাপিত। অনেকে অজ্ঞান করেন এই মন্দিরের নিম্ন-
ভাগ এমন কি স্তম্ভাদি পর্য্যন্ত রাণাদিগেরও পূর্বে নির্মিত;
রাণাগণ ইহার সংস্কার করিয়াছেন মাত্র।

এতদ্বিধ কুরুক্ষেত্রমন্দির, অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির, রত্নেশ্বর-
সিংহের প্রাসাদ, নবলক্ষভাণ্ডার প্রভৃতি আরও অনেক
অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরাদি এবং সূর্য্যকুণ্ড, মাতাজি কুণ্ড প্রভৃতি
চিতোরের শোভাসম্বন্ধন করিতেছে।

চিৎকণ (ত্রি) চিদিত্যব্যাক্তশব্দং করোতি চিৎ-কণ-অচ্। যে চিৎ এই শব্দ করে।

চিৎকণকল্প (ক্লী) চিৎকণস্ত কল্পা ৬তৎ। কল্পাশব্দস্ত ক্লীবত্বং (সংজ্ঞায়াং কছোশীনরেষু। পা ২।৪।২০) কল্পার সংজ্ঞাতোদ। পূর্ন-পদের আদিবরের উদাত্ততা। (আদিশিহণাদীনান্। পা ৬।২।১২৫)

চিৎকার (পুং) চিৎ-কৃ-ভাবে ষঞ্। চীৎকার, ভয়াদি জন্ত উচ্চ-শব্দ। “স বিষীদতি চিৎকারাং তাড়িতো গর্দভো যথা” (হিতোপং)

চিৎকারবৎ (ত্রি) চিৎকার-অন্ত্যর্থো মতুপ্ মন্ত বহ্বং (মাহুপ-ধায়াশ্চ মতোর্বোহযবাদিত্যঃ। পা ৮।২।১০) চিৎকারকারী। “বৈনায়ক্যচিৎকারং বো বদনবিধুতয়ঃ পাস্ত চিৎকারবত্যাঃ।” (মালতীমাধব।) চিৎকারবৎ-স্ত্রিয়াং ভীপ্।

চিত্ত (ক্লী) চিত্তী জ্ঞানে করণে ক্ত। ১ অন্তঃকরণভেদ। “মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং কারণমাস্তরং” (বেদান্ত।) ২ মন। “তব চিত্তং বাত ইব প্রজীমান্” (ঋগ্বেদ ১।১৬৩।১১) ‘তব চিত্তং মনঃ’ (সায়ণ)।

সাধ্যমতে চিত্ত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির কার্য্য। ইহার অধিষ্ঠাতা অচ্যুত। চিত্ত বাহু ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তুর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বেদান্তসারে লিখিত আছে—নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি এবং সংকল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকেই মন বলে। চিত্ত ও অহঙ্কার এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত ছই বৃত্তি মাত্র। অহুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চিত্ত এবং অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার বলা যায়।

আবার চার্লসকের মতে মনই আত্মা। মন বিশুদ্ধ হইলে প্রাণাদির অভাব হয় (১)।

পঞ্চদশীর মতে—চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ প্রভৃতি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের নিরস্তা মন হুৎপদ্মগোলকে অবস্থিত, তাহাকেই অন্তঃকরণ বলা যায়। আন্তরিক কার্য্যে মন স্বাধীন, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয় পরাধীন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ মনের এই তিনটি গুণ আছে, এই সকল গুণ দ্বারা মন বিকৃত হয়। বৈরাগ্য, ক্রমা, ঔদার্য্য ইত্যাদি সত্ত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বৈষয়িক ব্যাপার সমুদয় রজঃগুণের বিকার। আলস্য, দ্রাস্তি ও তন্দ্রা ইত্যাদি মনের তমোগুণের বিকার। (২।৭-৯)। পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণসমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিতেই ছইপ্রকার মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক ভাবকে মন এবং নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। (১।১৮)

বেদান্তদর্শনের মতে প্রাণই মনের কারণ। “তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাং।” মরণকালে মনই প্রাণে লয় হয়। শারীরিক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

“মন প্রাণে লয় হয়। এখানে মনোবিবক্ষিত বৃত্তি লয় হয় কি মনেরই লয় হয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। বৃত্তি সহিত মন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয় বলিলে অর্থ সঙ্গতি হয় বটে। মন যে প্রাণমূলক প্রকৃতিতেই তাহার প্রমাণ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, মন অন্নমূলক, প্রাণ জলমূলক। অন্নময় মনের লয় স্থান প্রাণ, দেখাও যায় অন্নের লয়স্থান জল। অভেদভাবে গ্রহণ করিলে অবশ্যই বলা যায়, অন্নই মন আর জলই প্রাণ। অন্ন ও মন একই এই দৃষ্টিতে অবশ্যই প্রাণকে মনের প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। আবার সুষুপ্ত ও স্মিয়মাণ অবস্থায় প্রাণের কার্য্য অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, কিন্তু মনোবৃত্তি থাকে না, এরূপও দৃষ্ট হয়। এরূপ হইলে মন যে প্রকৃতপক্ষে প্রাণমূলক নহে, এজন্য প্রাণে মনের স্বরূপ বিলয় অসম্ভব। মনের প্রাণ-মূলকতা আছে সে কথা আবার সে প্রাণালীর প্রকৃতিতে কার্য্য বিলয় মানিতে গেলে অন্নেও মনের বিলয় মানিতে হয়, এরূপ মন অন্নে, অন্ন জলে এবং প্রাণেও জলে লয় প্রাপ্ত হয় বলিতে হইবে। কিন্তু প্রাণরূপে পরিণত জল হইতে যে মনের জন্ম, তাহার প্রমাণ নাই। সেই জন্তই বলিতেছি প্রাণে মনের বৃত্তি বিলয় হয়, কিন্তু স্বরূপ বিলয় হয় না।” (৪।২।৩ হৃদভাষ্য।) যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের মতে—

“অসম্যক্ দর্শন হইতে অনাত্মশরীরাদিতে যে আত্মদর্শন হয় এবং অবস্থিতে যে বস্তুজ্ঞান জন্মে, তাহাই চিত্ত (২)। ভাবাভাব অবস্থার ও দুঃখসমূহের আধার এবং আশার বশবর্তী এই শরীরের বীজই চিত্ত। এই চিত্ত বৃক্ষের ছইটা বীজ এক প্রাণ-স্পন্দন, দ্বিতীয় কঠিন ভাবনা। প্রাণস্পন্দন দ্বারা চৈতন্য রুদ্ধ হয়, তাহাতে দুঃখ জন্মে। ভাবনাদ্বারা ভব্যবস্তু উৎপন্ন হয়, পুরুষ কাসনাবিহীন হইয়া সেই বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং বাসনাবশে জীবস্বরূপ ভুলিয়া যায়। এই জন্তই যোগীগণ প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা প্রাণস্পন্দন বোধ করেন। প্রাণস্পন্দন বোধ হইলে চিত্তের বিমল শান্তি হয়। এইরূপে যে ব্যক্তি চিত্ত হইতে সাংসারিক ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া মায়াজীত পরম বস্তুর ভাবনা করে, তাহারই নাম অচিন্ত্য বা চিন্তশূন্যতা। বাসনা ও প্রাণস্পন্দন উভয়ের মধ্যে একের ক্ষয় হইলে ছই নষ্ট হয়। কারণ বাসনা দ্বারা প্রাণস্পন্দন আবার

(১) “ইতরস্ত চার্লসঃ অতোস্তরআত্মা, মনসি স্থপ্তে প্রাণাধেরভাবাৎ।”

(বেদান্তসার)

(২) “অসম্যদর্শনং বস্তুজ্ঞানাত্মজ্ঞানভাবনং।

যদবস্থানি বস্তুবৎ তচ্চিত্তং বিদ্ধি রাঘব।” (যোগবাশিষ্ঠ ২৩।৪৭)

প্রাণস্পন্দ হইতে বাসনা উৎপন্ন হয়। জ্ঞেয় বস্তুর পরিভাগ্য করিতে পারিলেই প্রাণস্পন্দ ও বাসনা উভয়ই নষ্ট হয়।”

ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেরা বলেন যেমন অগ্নি নিজকে প্রকাশিত করিয়া অপর বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ চিত্ত স্বপ্রকাশ ও বিষয়প্রকাশক, চিত্ত অতিরিক্ত পৃথক্ আত্মা নাই।

পতঞ্জলি বলেন চিত্ত স্বপ্রকাশ হইতে পারে না (যোগসূ* ৪।১৮)। কারণ চিত্ত দৃশ্য, যে বস্তু দৃশ্য তাহা স্বপ্রকাশ নহে, যেমন ইন্দ্রিয় বা শব্দাদি, তাহার একজন প্রকাশক আছে, তিনিই আত্মা। অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। কারণ অগ্নি কিছু অপ্রকাশ নিজরূপকে প্রকাশ করে না। প্রকাশ ও প্রকাশকের সংযোগ হইলে বস্তুর প্রকাশ হয়, কিন্তু আপনার সহিত আপনারও সংযোগ হইতে পারে না। চিত্ত এক সময়ে স্ব ও পর উভয়কে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ ক্ষণিকবাদীর মতে সব বস্তুই ক্ষণিক উৎপত্তি ভিন্ন বস্তুর অন্ত কোন ব্যাপার নাই। চিত্ত উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইল, কিরূপে অপর বস্তু প্রকাশ করিবে? যদি বল পর চিত্ত দ্বারা পূর্বে চিত্তের গ্রহণ হইবে, পূর্ববুদ্ধি ও পরবুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইবে, পরবুদ্ধির গ্রহণ কিরূপে হইবে? তৎপর বুদ্ধি দ্বারা তাহার গ্রহণ। এখানেও অনবস্থাদোষ হইল। যতগুলি অমুভব হইল, ততগুলি স্মৃতিও হইবে, অমুভবের দ্বারা স্মৃতি ও পর পর স্মৃতি দ্বারা গ্রাহ্য পৃথক্রূপে কোন স্মৃতির অবধারণ হইতে পারিল না। অতএব স্মৃতিসাক্ষ্য দোষ হইল।

যোগসূত্রকার পতঞ্জলির মতে—চিত্ত ঘটাদির দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্যপদার্থ, (৩) আত্মার সহায় ব্যক্তিরেকে চিত্ত কিছুই করিতে পারেনা (৪)। চিত্ত এক না বহু এ সম্বন্ধেও যোগসূত্রের বৈমাসিকভাষ্য ও রাজমার্গও নামক রুতিতে ভ্রমবিস্তার অনেক কথাই লিখিত আছে, শেষে স্থিরীকৃত হইয়াছে মন এক, বহু নহে। কারণ যোগীগণের এক চিত্তই সকল চিত্তের অধিষ্ঠাতা, অতএব যোগীর এক চিত্ত নানাপ্রকার কার্যে বহুচিত্তকে প্রেরণ করিতে পারে। যোগসূত্রকারের মতে, চিত্তবৃত্তি পঞ্চবিধ—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অমুমান ও আশ্রয়বাক্য ইহাদিগকে প্রমাণ, এক বস্তুকে অগ্রবস্ত বলিয়া ভ্রমজ্ঞান তাহারই নাম বিপর্যয়, বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দরূপ জ্ঞানানুসারে যে এক প্রকার বোধ হয় তাহাকে বিকল্প, যে অবস্থায় চিত্তে সর্ব বিষয়ের অভাব বোধ হয়, তাহাকে নিদ্রা এবং পূর্বে প্রমাণ দ্বারা যে যে বিষয় অমুভূত

হইয়াছে, কালান্তরে সংসার দ্বারা বুদ্ধিও সেই বিষয়ের আরোপ করাকে স্মৃতিবৃত্তি বলা যায়। যোগ অভ্যাস করিতে হইলে চিত্তের ঐ পঞ্চবৃত্তির নিরোধ করা চাই। (১।৬-১২) [যোগ দেখ]

বৈমাসিক ভাষ্যকারের মতে মন ও প্রাণ ইহারাই পরস্পরের সাহায্যে যোগ সাধন করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু সংযত হইলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তিও সংযত হয়, তাহা হইলে চিত্তের নিরোধ বা একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে। রেচক, পূরক ও কুস্তক এই ত্রিবিধ উপায়েও চিত্তের একাগ্রতাসাধন হয়। যোগসূত্রকার বলেন, সমস্ত বিষয়ানুরাগ পরিভাগ্য করিতে পারিলেও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তাহাকেই চিত্তশৃঙ্খতা বা বীতরাগ বলে। রাজমার্গওকারের মতে ঐরূপ অবস্থাকেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধির বিষয় বলা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে আর চিত্তের অনুরাগ জন্মিতে পারে না, চিত্তে সমাধি উপস্থিত হয়। এ সময়ে একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত অমুরক্ত থাকে, তখন বিষয়ান্তরে চিত্তের আসক্তিমাত্র থাকেনা। (৩।১২)

ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

যেমন বায়ুশূন্য স্থানে প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ নির্বিকল্প সমাধিতে চিত্ত একাগ্র হইয়া নিশ্চল হয়। তখন যোগী আত্মাকে জানিতে পারিয়া নিজ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। (৬।১৯-২০)

পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন—

যে সময় চিত্ত আপনার ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করে, তখন কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মা চিত্তে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। চিত্তের কর্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম নিবৃত্তি হইয়া যায়। (যোগসূত্র ৪।২৪-২৫)

যোগসূত্রকার আরও লিখিয়াছেন—

চিত্তসংযম-সিদ্ধি-বিষয়ে ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে—নিরোধ-পরিণাম, সমাধি-পরিণাম ও একাগ্রতা-পরিণাম। এই ত্রিবিধ পরিণাম দ্বারা ত্রিবিধ ভূত ও ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়েরও ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে। চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণাম অতীত হইয়া সমাধি সম্পন্ন হইলে অতীত-অনাগত-জ্ঞান, শব্দাদি প্রত্যেকের প্রতি সংযমহেতু সর্ব ভূতাদি সমস্ত পদার্থের জ্ঞান ও পূর্বজন্মান্তরীয় জাত্যাদি জ্ঞান এবং লোকের মুখ দেখিয়া তাহার মনোভাব জানিবার ক্ষমতা জন্মে। (যোগসূত্র ৩।৯, ১৬-১৯)

কর্মণি স্তু। ৩ জ্ঞাত। কর্তরি স্তু। ৪ জ্ঞাত, যিনি জানেন।

চিত্তগর্ভ (ত্রি) চিত্তং গর্ভয়তি গৃহীতীতি যাবৎ চিত্ত-গর্ভ-অচ্। চিত্তগ্রাহী, মনোহর। “বয়াকিনং চিত্তগর্ভাস্থ স্বরূকঃ।” (শুক ৫।৪৪।৫) ‘চিত্তগর্ভাস্থ চিত্তগ্রাহিণীষু স্মৃতিবু’ (সারণ।)

(৩) “ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ।” যোগ* সূ* ৪।১৮।

(৪) “ন হু চিত্তঃসেব যদি সংযোগকর্তব্যং প্রকাশকং তদা স্বপরপ্রকাশরূপ-স্বাভাসানমর্থক প্রকাশপরতীতি।” (রাজমার্গও)

চিত্তচাক্ষুঃ (ক্ৰী) চিত্তস্ত চাক্ষুঃ ৩তং। মনের অস্থিরতা।

চিত্তচারিণ্ (ত্রি) চিত্তে চরতি চিত্ত-চর-ণিনি। যাহাকে সৰ্বদা মনে ভাবা যায়। “পতীনাং চিত্তচারিণী।” (ভারত বন।)

চিত্তচালন (ক্ৰী) চিত্তস্ত চালনং ৩তং। মনোরত্তির চালনা।

চিত্তজ (পুং) চিত্তে জায়তে চিত্ত-জন্-ড। কল্প, কাম।

চিত্তজন্মান্ (পুং) চিত্তাৎ জন্ম যন্ত বহুব্রী। কাম।

চিত্তজ্ঞ (ত্রি) চিত্তং জ্ঞানতি চিত্ত-জ্ঞা-ক। যিনি চিত্ত বা আশয় বৃত্তিতে পারেন।

চিত্তদোষ (পুং) চিত্তস্ত দোষঃ ৩তং। চিত্তের দোষ, বিষয়াদি গ্রহণে অসামর্থ্য।

চিত্তনদী (ক্ৰী) চিত্তমেব নদী অবধারণে কৰ্ম্মধা*। চিত্ত-বৃত্তিরূপ নদী। এই নদী পাপ ও পুণ্যবাহিনী। অবিবেক অবস্থায় পাপবাহিনী, তখন কেবল সংসারের দিকে ধাবমান হয়, বিবেকবাহিনী পুণ্যবাহিনী, তখন কেবল কৈবল্যই ইহার অভিলষণীয়।

চিত্তনাশ (পুং) চিত্তস্ত নাশঃ ৩তং। চিত্তবৃত্তির নাশ।

চিত্তনিবৃত্তি (ক্ৰী) চিত্তস্ত নিবৃত্তিঃ ৩তং। মনের শান্তি।

চিত্তপরিকৰ্ম্মন্ (ক্ৰী) চিত্তস্ত পরিকৰ্ম্ম ৩তং। মৈত্ৰ্যা-দিভাবনারূপ চিত্তের সংস্কার। [চিত্তপ্রসাদন দেখ।]

চিত্তপ্রমাথিন্ (ত্রি) চিত্তং প্রমথ্যতি চিত্ত-প্রমথ-ণিনি। যে চিত্তকে ব্যাকুল করে।

চিত্তপ্রসন্নতা (ক্ৰী) চিত্তস্ত প্রসন্নতা, ৩তং। মনের তৃপ্তি, প্রীতি।

চিত্তপ্রসাদ (পুং) ৩তং। মনের সম্ভোষ।

চিত্তপ্রসাদন (ক্ৰী) চিত্তস্ত প্রসাদনং ৩তং। মৈত্ৰ্যাাদি ভাবনা দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল করা। মৈত্ৰী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। সুখীর প্রতি মিত্র ভাব হৃদীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি হর্ষ এবং পাপীর প্রতি উপেক্ষা দেখাইবে, এইরূপ ভাবনার চিত্তের রাজস ও তামস ধর্ম নিবৃত্ত হইলে কেবল সাত্বিক স্কন্ধ উদিত হয়। “মৈত্ৰীকরুণামুদিতো-পেক্ষাণাং সুখহৃৎপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত্চিত্তপ্রসাদনং॥”

(যোগসূ* ১।৩০।)

চিত্তভূ (পুং) চিত্তে ভবতি চিত্ত-ভূ-ক্ৰিপ্। কল্প, কাম।

চিত্তভূমি (ক্ৰী) চিত্তস্ত ভূমিঃ অবস্থা ৩তং। চিত্তের অবস্থা। পাতঞ্জলোক্ত চিত্তের অবস্থাত্তে যথা—ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত—রজোগুণ দ্বারা চলিত বিষয়ে সৰ্বদা অস্থির। মুঢ়—তমোগুণের উদ্রেকহেতু নিদ্রাবৃত্তিযুক্ত। বিক্ষিপ্ত—ক্ষিপ্ত হইতে কিছু বিশেষ এই যে কখনও স্থির হয়। একাগ্র—একবিষয়ে মন থাকা। নিরুদ্ধ—বৃত্তিসকলের নিরোধ হওয়ায় কেবল সংস্কাররূপে অবস্থিত। ক্ষিপ্ত, মুঢ়

ও বিক্ষিপ্তচিত্ত সমাধির উপযোগী নয়। একাগ্র অবস্থার সংপ্রজ্ঞাতসমাধি হয়, রাজস তামসবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র সাত্বিকবৃত্তি থাকে। অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিতে তাহারও নিরোধ হয়। মধুমতী, মধুপ্রতীকা, বিশোকা ও ঋতত্তরা এই চারি ভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই ভূমির অন্তর্গত।

(যোগসূ* ১ ব্যাস।)

চিত্তমোহ (পুং) ৩তং। মনের মোহ।

চিত্তযোনি (পুং) চিত্তং যোনিরূপস্তিহানং যন্ত বহুব্রী। কল্প।

চিত্তরাগ (পুং) ৩তং। মনের অহুরাগ।

চিত্তলনার, মধ্যভারতের অন্তর্গত চাঁদা জেলার নিকটস্থ একটি জমিদারী। ইহার জমিদার জিগারগুণ্ডা নামক হানে অবস্থিত করেন। এখানকার জঙ্গলে উত্তম সেতুগকাঠ পাওয়া যায়।

চিত্তবৎ (ত্রি) প্রশস্তঃ চিত্তং বিদ্যতে অত চিত্তপ্রশংসায়াম্ মতুপ্ মন্ত ব। উদারচেতা, উন্নতমনাঃ।

চিত্তবলাস, মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটি নদী। ইহার অপর নাম বিমলীপত্তন। ইহা গোলকুণ্ডা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে গোপালপল্লি, জমি ইত্যাদি নগর দিয়া ৫৮ মাইল গমনের পর বিমলীপত্তনের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। চিত্তবলাস নগরের নিকট ইহার উপর এক সেতু নির্মিত হইয়াছে।

চিত্তবাদ (পুং) চিত্তরূপঃ বাদ মধ্যলো* কৰ্ম্মধা। মন খুলে বলা বা মনের মত বলা।

চিত্তবিকার (পুং) ৩তং। মনের বিকার।

চিত্তবিক্ষেপ (পুং) চিত্তস্ত বিক্ষেপঃ ৩তং। মনের চঞ্চল অবস্থা, এই অবস্থা যোগের ব্যাঘাতকারী। পাতঞ্জলে চিত্ত-বিক্ষেপ নয় প্রকার উক্ত হইয়াছে যথা—ব্যাধি, ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্ত, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলঙ্কৃত্যমিকত্ব, অন-বস্থিতত্ব। ব্যাধি অর্থাৎ ধাতুরসাদির বৈষম্য। ত্যান—চিত্তের অকৰ্ম্মণ্যতা। সংশয়—উভয়কোটিক জ্ঞান অর্থাৎ ইহা হইতেও পারে না হইতেও পারে। প্রমাদ—সমাধিসাধনে যত্ন না করা। আলস্ত—শরীরের ককাদি জন্ত স্কন্ধ ও চিত্তের তমোজন্ত স্কন্ধ হেতু অগ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয় বাসনার অনিবৃত্তি। ভ্রান্তিদর্শন—মিথ্যাজ্ঞান। অলঙ্কৃত্যমিকত্ব—সমাধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ লজ্জভূমিতে চিত্তের অনবস্থিতি। (যোগসূ* ১।৩০। ব্যাস।)

চিত্তবিদ্ (ত্রি) চিত্তং বেতি চিত্ত-বিদ্-ক্ৰিপ্। ১ চিত্তজ, যিনি মনের ভাব বৃত্তিতে পারেন। (পুং) ২ বৌদ্ধভেদ।

চিত্তবিনাশন (ত্রি) চিত্তং বিনাশয়তি চিত্ত-বিনাশি-নন্দ্যাদিহা-দ্য। ১ চিত্তবিনাশক। ভাবে-ল্যুট (ক্ৰী) ২ চিত্তের বিনাশ।

চিত্তবিপ্লব (পুং) চিত্তত বিপ্লবো-বস্মাৎ বহব্রী। ১ উদ্ভাদ-
রোগ। ৬তৎ। ২ চিত্তের অসবস্থিতি।

চিত্তবিক্রম (পুং) চিত্তত বিশেষণে ব্রহ্মণমবস্থানং বস্মাৎ
বহব্রী। ১ উদ্ভাদরোগ। ২ বুদ্ধিক্রম। “অহো চিত্তবিকারো
হয়ং তথা মে চিত্তবিক্রমঃ।” (ভারত ১৮।২ অঃ)

চিত্তবিলেপ (পুং) ৬তৎ। মনোভঙ্গ।

চিত্তবৃত্তি (স্ত্রী) চিত্তত বৃত্তিঃ ৬তৎ। চিত্তের অবস্থা,
চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম। পাচজলে পাচপ্রকার বৃত্তি
উক্ত হইরাছে, যথা—প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিজা, স্থিতি।
ইহারাও ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে বিবিধ। অবিন্যাদি ক্লেশ-
হেতুক বৃত্তি ক্লিষ্ট, যথা উক্ত ক্লেশ-হেতুক নহে তাহা অক্লিষ্ট।
চিত্তল (পুং স্ত্রী) চিত্তং লাতি চিত্ত-লা-ক। ভৃগুভেদ। বৈদ্যক-
শাস্ত্র মতে—কৃষ্ণতিলের তৈল দ্বারা পক, লবণযুক্ত চিত্তলমাংস
কটিকর ও রক্তপিত্তনাশক। (শকাধিচি)

চিত্তসমুন্নতি (স্ত্রী) চিত্তত সমুন্নতিঃ ৬তৎ। ১ মনের উন্নতি।
২ গর্ভ।

চিত্তস্থিত (ত্রি) ৭তৎ। যাহা মনে রাখা যায়।

চিত্তহারিন্ (ত্রি) চিত্তং হরতি চিত্ত-হ-ণিনি। মনোহারী, হৃদয়।
চিত্তানুবর্তিন্ (ত্রি) চিত্ত-অনুবর্ত-ণিনি। যে মন যোগাইয়া চলে।
চিত্তান্তর (স্ত্রী) অন্তর্চিত্তং স্থপস্থপেতিস্ বা চিত্তত অন্তরঃ
৬তৎ। ১ অন্ত চিত্ত। ২ মনের ভিতর।

চিত্তাপহারক (ত্রি) চিত্ততাপহারকঃ ৬তৎ। চিত্তকে যে হরণ
করে, মনোহারী, হৃদয়।

চিত্তাপাহাড়, পঞ্জাবের রবলপিণ্ড জেলার একটি গিরিমালা।
ইহা ত্রিভুজাকৃতি, তাহার ভূমি নারানগরের নিকট সিদ্ধনদীর
পূর্বকূলে এবং শীর্ষবিন্দু প্রায় ৫০ মাইল পূর্বে মর্গলা
গিরিসঙ্কটের নিকট অবস্থিত। ইহার সর্বাপেক্ষা বিস্তার ১২
মাইল। স্তরীভূত চূণাপাথরে ইহা শাদা দেখায় বলিয়া ইহার
নাম চিত্তাপাহাড় হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে
জলপাই গাছ জন্মে এবং ইহার পাথর হইতে যথেষ্ট চূণ পাওয়া
যায়। ইহার পশ্চিমভাগ অতিশয় বন্ধুর ও দুয়ারোহ। পূর্বভাগে
স্থানে স্থানে উচ্চশৃঙ্গ ও স্থানে স্থানে গভীর ধাল দৃষ্ট হয়।

চিত্তাপর্ণী, পঞ্জাবের অন্তর্গত হাশিয়ারপুর জেলায় গিরিমালা।
ইহার অপর নাম সোলাসিংহী। ইহা জামবান্‌হনের পূর্ব
সীমা। এই গিরিমালার উপর একটি স্থান আছে, ইহাকেও
চিত্তাপর্ণী বলে। এখানে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।
প্রতি বৎসরে অনেক যাত্রী তাহা দেখিতে আসে।

চিত্তাভোগ (পুং) চিত্তত আভোগঃ একবিষয়তা ৬তৎ।
একবিষয়ে চিত্তের প্রবৃত্তি, মনের দৃষ্টব্য। পর্যায়—মনস্কার।

চিত্তাধাদিগি, মাদ্রাজের অন্তর্গত বেণারী জেলার একটি
সহর। অক্ষা ১৫° ১৭' উঃ, দ্রাঘি ৭৩° ৪৭' পূঃ। অধিবাসীর
সংখ্যা ৩৭৫২৭। এই সহর ভূক্তভাদ্রানদী ও হম্পেটনগর হইতে
২ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটি প্রধান হাট বসে।
এই হাটে নিজামরাজ্যের পণ্য দ্রব্য সকল আমদানি হইয়া
থাকে। ইহাতে ৩৪৮টা মাত্র উদ্ভম রাস্তা আছে। হম্পেটনের
অনেক সমৃদ্ধ বণিক এখানে বাস করেন। বেলা নামক ধাল
এই নগরের ভিতর দিয়া গিয়াছে।

চিতি (স্ত্রী) চিত-ভাবে ক্তিন্। ১ বুদ্ধিবৃত্তি। “উহু স্বা বিবে
দেবা অয়ে! ভবন্ত চিতিভিঃ।” (শুক্লযজুঃ ১২।৩১) ২ অগ্নিতত্ত্ব-
পরিজ্ঞানার্থ চিত্তা। “চিতিং জুহোমি মনসা যুতেন।” (শুক্লযজুঃ
১৭।৭৮) ‘চিতিং অগ্নিতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থ চিত্তনং’ (মেনদীপ)।
৩ কর্ম। “সাচিতিভি নিহি চক্ষর” (ঋক ১।১০।২২) ‘চিতিভিঃ
কর্মভিঃ’ (নিরুক্ত)। ৪ ধ্যানি। “চিতিং দক্ষত স্তত্ত্বং তমস্বে”
(ঋক ২।২১।৬) ‘চিতিং খ্যাতিং’ (সায়ণ) ৫ অর্থকর্মবির পত্নী।
“চিতিত্বধর্মণঃ পত্নী সেতে পুত্রং যুতত্ত্বং” (ভাগবত ৪।১।৩৮)।
কর্তরি ক্তিন্। ৬ জাপক বা প্রাপক। “চিতিয়ণাং মধে বিখ্যায়ুঃ”
(ঋক ১।৬।৭।৫) ‘চিতিশ্চেত্তরিতা প্রাণয়িতা বা’ (সায়ণ)।

চিতিত (ত্রি) চিত্তং অন্ত সজ্জাতঃ চিত্ত-তারকাদিধাদিতচ্।
চিত্তযুক্ত।

চিতিন্ (ত্রি) চিত্তং অন্ত অন্তি-চিত্ত-ইনি। প্রশস্ত চিত্তযুক্ত।
“জ্যারত্বশ্চিতিনো মা বি য়োষ্টে।” (অথর্ব ৩৩।৫)।

চিতিবলাস, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন
জেলার একটি নগর। অক্ষা ১৭° ৫৬' ২০" উঃ, দ্রাঘি
৮৩° ২২' ৩০" পূঃ। বিশাখপত্তন হইতে বিজয়নগর পর্য্যন্ত
রাজবন্দ্য এই নগরের মধ্য এবং সম্মিহিত চিত্তবলাস
ও গোস্থানী নদীরয়ের উপরস্থ সেতু দিয়া গিয়াছে। ইহাতে
একটি বৃহৎ পাটের কারখানা আছে।

চিতিকৃত (ত্রি) অচিত্তং চিত্তং কতরদভূততদভাবে চি।
চিত্তের সহিত প্রাপ্ত, যাহাকে একাগ্রচিত্তে চিত্তা
করা গিয়াছে। “একোময়েহভবান্ দ্বিবিধপ্রধানৈশ্চিতিকৃতঃ
প্রজ্ঞনায়।” (ভাগবত ৪।১।২৬)

চিত্তুর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কট জেলার
একটি ভালুক বাসভিভিজন। পরিমাণফল ৬৭১ বর্গমাইল।
এই ভালুক উত্তরআর্কটের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহাতে অনেক
উচ্চ-উচ্চ পাহাড় এবং চিত্তুর, বেঙ্কটগিরি, অরুণ্ডা ও
ক্রোলা নামক পোইনদীর চারিটা শাখা আছে। বর্ষাকাল
ব্যতীত এই সকল নদীতে জল থাকে না। এখানকার ভূমি
লাল ও বালুকাময়, পর্বত হইতে আনীত পলি পড়ায় বেশ

উর্করা। পূর্বে এখানে লোহ তোলা হইত, কিন্তু এখন ঐ ব্যবসার লোপ পাইয়াছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান সদর। অক্ষা° ১৩° ১৩' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৮' ১০" পূঃ। এই নগর বেঙ্গুর ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল উত্তর ও মাদ্রাজের ১০০ মাইল দূরবর্তী। এই নগরে রাজকীয় বিচারালয়, পুলিশ ষ্টেশন, জেলখানা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত চিত্রুরে ইংরাজদিগের সেনানিবাস ছিল। প্রথমে আর্কটরাজবংশীয়দিগের সম্পত্তি ছিল, অবশেষে ১৭৮১ সালে সর আইয়ার-কুট্ট অধিকার করিয়া ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করেন।

চিত্তোন্নতি (স্ত্রী) ৬তং। ১ মনের উন্নতি। ২ গর্ভ।

চিত্তোদ্বেষ (পুং) ৬তং। মনের উদ্বেষ।

চিংপতি (পুং) চিত্তঃ জ্ঞানস্ত পতিঃ ৬তং। পূর্বপদস্ত ন প্রকৃতিস্বরূপ (ন ভূবাক্চিদ্ধিষু। পা ৬।২।১৯) ১ মনোভি-মানী জীব। "চিংপতির্মী পুনাতু" (যজুঃ ৪।৪।) ২ হৃদয়েশ্বর।

চিংপাত (পুং) চিং হইয়া পতন।

চিংপাবন, কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের প্রকৃত নাম। সহ্যাদ্রিখণ্ডে ইহার চিত্তপুত্ৰা নামে বর্ণিত হইয়াছেন। [কোঙ্কণস্থব্রাহ্মণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চিংপুর, কলিকাতার উত্তরপশ্চিমপ্রান্তবর্তী একটি প্রাচীন স্থান। চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

চিংপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) ৬তং। চৈতন্তের প্রবৃত্তি।

চিংকিরোজপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বালিয়ারাজ্যের একটি সহর। ইহার অপর নাম বড়গাঁও। অক্ষা° ২৫° ৪৫' ৪" উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২' ৩৯" পূঃ। এই সহর বালিয়া হইতে ১০ মাইল অন্তরে উক্ত নগর হইতে গাজিপুর যাইবার পথের উপরে এবং সরযুদীর্ঘ তীরে অবস্থিত। ইহা কৃষিকর্মের জন্ত বিখ্যাত।

চিংবাইল, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কদাপা (কড়াপা) জেলার মধ্যস্থ পালামপেট নামক তালুকের একটি প্রধান সহর। অক্ষা° ১৪° ১০' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৪' ২৯" পূঃ। পূর্বে এই নগরে একটি সামান্য রাজ্যের রাজধানী ছিল ও ইহার শাসনকর্তা ঘটপর্কতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিজয়নগররাজ-গণের অধীনস্থ অত্যন্ত প্রধান সামন্ত বা মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার অধিপতি ইংরাজরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বৃত্তিভোগী হন।

চিত্য (পুং) চীয়েতে চি-য নিপাতনে। (চিত্যামিচিত্যে চ। পা ৩।১।১০২।) ১ অমি। (ত্রি) ২ চয়নীয়। চীয়েতে অমিন্ অমিরিতি শেষঃ। (স্ত্রী) ৩ শব্দাহ করিবার চুম্বী। চিতায়াং

ভবঃ চিতা-যং। (ত্রি) ৪ চিতা হইতে জাত। "চিত্যামালা-রাগশ্চ আয়সাতরগোহভবং।" (রামায়ণ ১।৫৮।১১।)

চিত্যা (স্ত্রী) চীয়েতেহমিরিত্যং প্রেতস্ত চি-য নিপাতনে, ত্রিয়াং টাপ্। ১ চিতা। ভাবে ক্যপ্। ২ চয়ন।

চিত্র (স্ত্রী) চিত্রাতে চি-ক্তৃ (অমিচিমিচিসিভ্যঃ ক্তৃঃ। উণ্ ৪।১৬৩।) ১ তিলক। ২ আলোচ্য। "উত্তমাদমভাবেন বর্ত্তস্তে পটচিত্রবৎ।" (পঞ্চদশী ৬।৫) [চিত্রবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ৩ অদ্রুত, আশ্চর্য্য। "চিত্রং সংকীর্ণমানাত্যঃ ক্রীড়নৈবিবিধৈস্তথা।" (রামায়ণ ১।১০।৪) ৪ শব্দালঙ্কারভেদ, পদ্যাকার বা খণ্ডগাদির আকারে বর্ণবিজ্ঞাসের নাম চিত্রালঙ্কার। (সাহিত্যদং ১০।৬৪৫।)

৫ কাব্যভেদ। যদি শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য থাকে এবং ব্যঙ্গার্থ অক্ষুটভাবে থাকে, তাহাকে তৃতীয় অবম কাব্য বলে। (কাব্যপ্রকাশ ১ উঃ।) ৬ ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ সমানিকালছন্দের পাদধয়ের সমান, তাহার প্রত্যেক পাদে ষোল অক্ষর অযুগ্ম, অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি গুরু এবং যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিতীয়া চতুর্থ ও ষষ্ঠ ইত্যাদি বর্ণ লঘু হইবে। (ছন্দোমঞ্জরী)। ৭ আকাশ। ৮ কৃষ্টিবিশেষ। ৯ (স্ত্রী পুং) কবুর বর্ণ, বিচিত্রবর্ণ। চিত্রয়তি পাপপুণ্যে বিচার্য্য লিখ্যতে চিত্র-ণিচ্ অচ্। (পুং) ৯ যমভেদ। "ব্রহ্মোদয় চিত্রায়" (তিথ্যা-দিতব্য)। ১০ চিত্রগুপ্ত। ১১ এরণ্ডবৃক্ষ। ১২ অশোকবৃক্ষ। ১৩ চিত্রকবৃক্ষ। (ত্রি) ১৪ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। "নিসর্গচিত্রোজ্জল-স্থম্পপল্লবা।" (মাঘ) ১৫ আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়কর। "চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবস্ত্তপশিনুঃ" (ভারত ১।১৩।৩১।)

চিত্রক (স্ত্রী) চিত্র-স্বার্থে কন্। ১ তিলক। চিত্রেণ চিত্র ইব বা কায়তি চিত্র-কৈ-ক। (পুং) ২ ব্যাঘ্রবিশেষ, চিতাবাঘ। ৩ শূর, বলবান্। ৪ এরণ্ডবৃক্ষ। ৫ চিতা। ৬ ওষধি ভেদ, চিরাতা। ইহার গুণ—গ্রাহণী, কৃষ্ণ, শোধ, অর্শ, ক্রমি, কাস, বাতশ্লেষ, বাতঅর্শ, শ্লেষ ও পিত্ত-বিনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কটু।

চিত্রকশাক কাসমর্দনের সহিত মর্দন করিয়া হিঙ্গের সহিত তৈলে পাক করিয়া আহার করিবে। (শকার্থচি°) চিত্রয়তি চিত্র-স্বার্থে কন্। ৬ (ত্রি) চিত্রকার। (পুং) ৭ মুচুকুন্দ। ইহার গুণ শিরঃপীড়াদিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চিত্রকণ্ঠ (পুং) চিত্রঃ কণ্ঠোযন্ত বহুব্রী। ১ কপোত, পায়রা। ২ বনকপোত, ঘুঘু।

চিত্রকণ্ঠটিকা (স্ত্রী) গুটিকাবিশেষ। চিত্রক, পিপুলের মূল, ক্ষার, লবণ, ত্রিকটু হিঙ্গু ও যমানী একত্র চূর্ণ করিয়া দাড়িম বা নেবুর রস দ্বারা গুটি পাকাইবে, পরে সৌবর্জল, সৈন্ধব,

বিট, উদ্ভিদ, সামুদ্র এই পঞ্চলবণের সহিত এক প্রহর পর্য্যন্ত অনলে পাক করিবে। (চক্রদত্ত)

চিত্রকগুড়িকা, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাতিকার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিঙ্গু (হিং), বনযমানী, চই, এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া টাবানেবু বা দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আমপাচক ও অম্বিদীপ্তিকারক। (ভৈষজ্যরত্ন)

চিত্রকঘৃত, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ চিতামূল ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির মাং ১৬ সের। ককার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মরিচ, সমুদ্রায়ে ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরায়ান, পাণ্ডু, অরুচি, জ্বর, অর্শঃ, শূল প্রভৃতি নানারোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

মতান্তরে ঘৃত চিত্রকের কাথ ও ককদ্বারা পাক করিবে। ইহা—গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, প্লীহা, শূল ও অর্শ নাশক এবং অম্বিবর্দ্ধক। (চক্রদত্ত)

চিত্রকতৈল, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কক চিতামূল, চই, যমানী, কটকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দপত্র মিলিত ১ সের। ইহার নস্ত্রে নাসার্শ ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

প্রকারান্তরে চিত্রক, চই, জোয়ান, এলাচ, করমচার বীজ। আকন্দ ও লবণ তৈলের সহ একত্র করিয়া গোমূত্রে পাক করিবে। ঐ তৈলের গুণ অর্শনাশক। (ভৈষজ্যরত্ন)

চিত্রকম্বল (পুং) কম্বলভেদ, গালিচা।

চিত্রকর (ত্রি) চিত্রং করোতি চিত্র-কৃত। ১ যে চিত্র করে, চিত্রশিল্পকর। ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, পটুয়া, শূদ্রার গর্ভে ও বিষ্ণুকর্ম্মার গুণসে এই জাতি উৎপত্তি হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ) রামায়ণ মহাভারতেও চিত্রকরের উল্লেখ আছে।

[চিত্রবিদ্যা দেখ।]

চিত্রকর্ণিন্ (ত্রি) চিত্রং কর্ণ যন্ত বহুব্রী। ১ চিত্রকর। ২ আশ্চর্য্যকর। (পুং) ৩ তি নিশবৃক্ষ। ৬ষ্ঠি তৎ (স্ত্রী) ৪ চিত্রকার্য্য, শিল্প।

চিত্রক-পিপ্ললীঘৃত, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ছুহু ১৬ সের, ককার্থ পিপুল ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পাক করিলে যকৃৎ ও প্লীহা নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

চিত্রকহরীতকী (স্ত্রী) চিত্রকের সহিত পাককরা হরীতকী। আয়ুর্ষেদোক্ত ঔষধভেদ। চিত্রক, আমলকী, গুড়ুচী, ও দশমূল্যের রস দ্বারা হরীতকী চূর্ণ গুড়ে পাক করিবে, পরদিন ত্রিকটু ও তেজপত্রের ক্ষারদ্বারা মধুতে পাক করিবে। ইহা সেবনে অম্বিযুক্তি এবং ক্ষয় কাস, নাসিকারোগ, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত, অর্শ ও শ্বাস আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে, ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পুরাতন গুড় ১০০ পল। কাথার্থ চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৥০ সের; আমলকীর রস (অভাবে কাথ) ১২৥০ সের; গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৥০ সের। দশমূল্য প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৥০ সের। এই সমুদায় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকীচূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, শুঁট, পিপুল, মরিচ, গুড়ুচক, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরদিনে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। অম্বির বল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা মাত্রা হ্রাস করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্বির দীপ্তি এবং ক্ষয়, কাস, প্লীনস, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত, অর্শ ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

চিত্রকাথি, বোম্বাইপ্রদেশবাসী একপ্রকার জাতি। ইন্দাপুর, পুরন্দর ও পুণা এই তিনটি স্থান ভিন্ন পুণাজেলার অপর সকল স্থানেই ইহাদিগের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্র ও কথা এই দুইটি শব্দ দ্বারা ইহাদিগের জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ ইহারা লোকের নিকট দেবদেবীর ও বীর পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ চিত্রপ্রদর্শন এবং পৌরাণিক কথা শুনাইয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, শোলা-পুর জেলার অন্তর্গত সিন্ধানাপুর ইহাদিগের পূর্ব্ব বাস ছিল; সাহু রাজার রাজত্ব কালে (খৃঃ ১৭০৮-১৭৪৯ খৃঃ অব্দে) ইহারা পুণা জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই। যাদব, মোরে প্রভৃতি ইহাদিগের উপাধি। সমান উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আহারাদির প্রচলন আছে, কিন্তু বিবাহ প্রচলন নাই। ইহাদিগের পুরুষগণের নামের অন্তে “পেটেল” ও রমণীদিগের নামের শেষে “বাই” থাকে।

ইহাদিগের মাতৃভাষা মরাঠী। ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি মরাঠী কুণ্ঠি জাতির মত। ইহারা শিখা ও গোঁফ রাখে। ইহারা ছাগ, মেঘ প্রভৃতির মাংসভক্ষণ এবং নেসা করিতে ভালবাসে। প্রায় চিত্রকাথি জাতি অপরিষ্কার, কিন্তু মিতব্যয়ী ও অতিথিসেবক। ইহারা সময়ে সময়ে কাঠপুস্তলিকার

মৃত্যু ও তাহাদিগের যুদ্ধ দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে।
ষাটশব্দ বয়সক্রমকালে ইহারা চিত্রপ্রদর্শন-ব্যবসা আরম্ভ
করে। হিন্দুধর্মে ইহারা অতিশয় অমরকণ্ড। তুলুজাপুরের
ভবানী দেবী ও জেজুরীর খাণ্ডোবা ইহাদিগের কুলদেবতা।
ইহারা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেও ভবানীই ইহাদিগের
প্রধান আরাধ্য দেবী। মহারাষ্ট্রদেশের কৃষকগণ যে সকল
পক্ষাদি পালন করিয়া থাকে, ইহারাও সেই সমস্ত পালন
করে। আলাড়ী, জেজুরী প্রভৃতি ইহাদিগের তীর্থস্থান।
সন্তান কুমিষ্ট হইবার অল্পকণ পরেই ইহারা প্রসূতি ও জাত
সন্তানকে স্নান করাইয়া দেয়।

বিবাহাদি কার্যোপলক্ষে বয়সকর্তাকে কস্তাকর্তার নিকট
গিয়া প্রস্তাব উপাধন করিতে হয়। ৩ বৎসর হইতে ২৫৩০
বৎসর পর্যন্ত পুরুষের ও ৩ বৎসর হইতে ২৩ বৎসর পর্যন্ত
রমণীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হটুক
না কেন ইহাদিগের পোষহিত্য করিতে পারে। ইহারা
শবদেহ গোর দেয় এবং তের দিন মৃতদেহে গ্রহণ করে,
শেষ দিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বজাতির ভোজ দেয়। এই
উপলক্ষে সময়ে সময়ে ছাগ বলি দিয়া তাহার মাংস আহার
করে। প্রতি ভাদ্রমাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসব
করিয়া থাকে। ইহাদের পঞ্চায়ত সামাজিক বিবাদের মীমাংসা
করে। সামাজিক অপরাধে অপরাধী পাঁচ জনকে ভোজ
দিলেই আবার সমাজে গৃহীত হয়।

চিত্রকাদিলোহ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—
চিতামূল, শুঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, ডাল-
জটাম্ব, আপান্ধমূলভস্ম, পুরাতন মাগ প্রত্যেক ৬ তোলা;
লোহ, অত্র, পিপ্পল, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবর্ণ, প্রত্যেকে ২
তোলা, গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। সীতল
হইলে অধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদি
লোহ সেবন করিলে প্রীহা, গুল্ম, উদরাময়, যক্ষ্ম, গ্রহণী,
শোথ, অধিমান্য, জ্বর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শুদ্রভংশ ও
প্রবাহিকা আরোগ্য হয়। (ভৈবজ্যর*)

চিত্রকায় (ত্রি) চিত্রঃ কায়ঃ শরীরং যন্ত বহুব্রী। চিত্রক-
ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ। (রাজনি*)

চিত্রকায় (ত্রি) চিত্রং কয়োতি চিত্র-কৃ-অণ্। ১ চিত্রকণ্।
(পুং) ২ সঙ্করজাতিভেদ। গান্ধিকীর গর্ভে স্থপতির ঔরসে
ঐ জাতির উৎপত্তি। (পরাসরপদ্ধতি)।

চিত্রকারিন্ (ত্রি) চিত্রং কয়োতি চিত্র-কৃ-ণিনি। চিত্রকর।
চিত্রকুণ্ডল (পুং) চিত্রে কুণ্ডলে ২স্ত বহুব্রী। ধৃতরাষ্ট্রের যুধ-
ভেদ। (ভারত আদি ১১৭১৩)

চিত্রকূট (পুং) চিত্রাণি কূটানি অস্ত বহুব্রী। পর্বতবিশেষ।

“দর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহস্রবর্ণং।” (ভারত বন ২৭৬ অঃ)

রামায়ণ মতে ঐ পর্বত প্রয়াগক্ষেত্রের নিকটবর্তী
ভরখাজাত্রনের সাড়ে তিন যোজন দক্ষিণে অবস্থিত; ইহার
উত্তরপার্শ্বে পুণ্যতোরা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত বহিতেছে।
(রামায়ণ অবোধ্যা, ৯২ অঃ)। ঐ স্থানে ভগবতী সীতারূপে
বিদ্যাজমার। “চিত্রকূটে তথা সীতা বিদ্যা বিদ্যাধিবাসিনী”
(দেবীভাগবত)

আদিরামায়ণীয় চিত্রকূটমাছাছ্যে ও ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্ম-
খণ্ডে লিখিত আছে, রাম জানকী এই স্থানে অবস্থান
করেন বলিয়াই ইহা পুণ্যভূমি। অধুনা ঐ পর্বত আমতা
নামে অভিহিত। এখনও কিন্তু দেশীয় লোকে ইহাকে
চিত্রকোট বলিয়া থাকে। এখন এই পাহাড় বান্দাজেলার
মধ্যে অবস্থিত। ইহার পাদদেশে পয়োকী নদী প্রবাহিত।
পুণ্যক্ষেত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণা দেওয়া আছে, তীর্থযাত্রীগণ
তাহারই চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পদোদ্ধীনদীর
তীরে অথবা শৈলদেশে ৩৩৩৪টা ক্ষুদ্র ও সুরম্য মন্দির
আছে, ঐ সকল মন্দিরের দেবদেবায় অস্ত্র বৃটীশাধীন
৩৯ খানি গ্রাম ও দেশীয় রাজ্যভুক্ত কয়খানি গ্রামের
জায় নিদ্বিষ্ট আছে। রামনবমী ও দেওয়ালী উপলক্ষে
পূর্বে এখানে চল্লিশ পঞ্চাশহাজার তীর্থযাত্রী আসিত,
এখন বিশহাজার লোকও হয় না। পূর্বে ঐ সময়ে অনেক
দেশীয় রাজা ও পেশবার পরিবারবর্গ আগমন করিতেন।
এখনও পাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে ৩০টা ঘাট আছে, স্নান
করিবার কালে ঐ সকল পাণ্ডাকে কিছু কিছু দিতে হয়।

চিত্রকূটে রামায়ণোক্ত মন্দাকিনী ও মালিনী নামে দুইটা
ক্ষুদ্র নদীও প্রবাহিত হইতেছে।

২ চিতোর নগরের শিলালিপি-বর্ণিত প্রাচীন সংস্কৃত নাম।
[চিতোর দেখ।] ৩ হিমালয়ের একটা পবিত্র স্থান।

(হিমবদ্ধ্যন্ত ৮।১০৬)

৪ সীতানদীর পূর্বতটে অবস্থিত একটা পর্বত।

“নীলাজ্রে দক্ষিণশাখাং যোজনৈকসহস্রকে।

সীতা পূর্বতটে চিত্রং বিচিত্রং কুটমপ্যভঃ॥” জৈঃ হরিবংশ ৫।১৯১।

চিত্রকুণ্ড (ত্রি) চিত্রং কয়োতি চিত্র-কৃ-কিপ্। ১ চিত্রকর।

২ আশ্চর্য্যকর। (পুং) ৩ সঙ্করজাতিভেদ। ৪ তিনিশব্দক।

চিত্রকেতু (পুং) ১ গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত ৫।৯৯ অঃ) ২

লক্ষণের এক পুত্র। (ভাগঃ ৯।১১।৭) ৩ উজ্জয় গর্ভজাত বশিষ্ঠের

পুত্র। (ভাগঃ ৪।১১।৩৪) ৪ কংসার গর্ভজ যজ্ঞবল্লীর দেবভাগের

পুত্র। (ভাগঃ ১১।২৪।৩) ৫ শুরসেন দেশের এক রাজা। তিনি

পুত্রশোক সন্তপ্ত হইলে দেবর্ষি নারদ আসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞতা তাকে বাস্তবদেবমন্ত্রাদি উপদেশ দিয়াছিলেন। (ভাগৱত ৭ঃ১৫৬)
(জি) ৩ চিত্রপতাকাযুক্ত।

চিত্রকোণ (পুং) চিত্রঃ কোণোহস্ত বহুব্রী। অঙ্গনিকা, অঙ্গনী।

চিত্রাক্রিয়া (স্ত্রী) কৰ্মধা। চিত্রাকাৰ্য্য।

চিত্রকল্প (জি) বিচিত্র বলবিশিষ্ট। “চিত্রকল্প চিত্রতমং বয়োধাং।” (শ্লোক ৬৯৭)। “হে চিত্রকল্প বিচিত্রবল।” (নারায়ণ)।

চিত্রগ (জি) চিত্র-গঙ্-ড। চিত্রাঙ্গিত, চিত্রাঙ্গিত।

চিত্রগত (জি) চিত্র-গম্-কর্তৃরি ক্ত। চিত্রাঙ্গিত।

“সুভাভাতে রণেহতীব পটে চিত্রগতে ইব।” (ভারতভীষ্ম ৪৪ অঃ)

চিত্রগন্ধ (স্ত্রী) চিত্রঃ গন্ধোহস্ত বহুব্রী। ১ হরিতাল।

(জি) ২ আশ্চর্য্য গন্ধযুক্ত।

চিত্রগুপ্ত (পুং) চিত্রাণাং পাপপুণ্যাদিবিচিত্রাণাং গুপ্তং রক্ষণং যন্ত্যং বহুব্রী। ১ যমভেদ। “চিত্রগুপ্তাং বৈ জমঃ।” (যমতর্পণ)
লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ধানে নিমগ্ন হইলে তাঁহার কায় হইতে বিচিত্রবর্ণ এক পুরুষ মস্তাধারলেখনীহস্তে নিঃসৃত হইল। পিতামহের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি সমুদ্বিষ্ট সেই বিচিত্র গঠন পুরুষকে নিরীক্ষণ করিলে, সে বলিল “হে তাত! আমার নাম কি? আমাকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন।” ব্রহ্মা স্বকায়সম্মত পুরুষের মধুর বাক্য শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, “আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইরাছ, এজন্ত তুমি কারহ নামে খ্যাত হইলে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। লোকদিগের পাপপুণ্যবিচারার্থ তুমি যম-রাজের পুরে গিয়া বাস কর” এই বলিয়া ব্রহ্মা অস্তবিত্ত হইলেন। ভট্ট, নাগর, সেনক, গোড়, জীবাস্তব্য, বাপু, অর্হিষ্টাণ, শৈকসেন এবং অষ্ট ইহারা চিত্রগুপ্তের পুত্র। চিত্রগুপ্ত ইহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। (ভবিষ্যপুরাণ)

তিনি মাল্লবের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখেন।

(পদ্মপুরাণ, পাতালধঃ ১০২ অঃ)

তিনি যমরাজ কর্তৃক নিযুক্ত হইরা পাপীদিগকে যাতনা প্রদান করেন। (“তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদিকিরোধঃ।” শাং হুং)
গরুড়পুরাণের প্রেক্ষকল্পে লিখিত আছে, যমলোকের নিকট চিত্রগুপ্তপুর নামে একটা স্বতন্ত্র লোক আছে, তথায় চিত্র-গুপ্তের অধীনে কায়হরণ পাপীগণের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন।

কার্তিকমাসের শুক্লবিত্তীরাতে কারহেরা ভক্তিপূর্বক চিত্রগুপ্তকে পূজা করিবে। গরুড়পু, হুপদীপ, নৈবেদ্য,

পটিবস্ত্র, শর্করা, পূর্ণপাত্র ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা বিবিধ বাদ্য-বাদনপূর্বক মহাসমারোহের সহিত ভাহার পূজা সমাপন করিয়া ত্রাঙ্গণ ও কারহদিগকে আহ্বান করাইবে।

চিত্রগুপ্তের নমস্কার-মন্ত্র বধা—

“সমীভাজনসংযুক্তঃ সদাচরসি কৃতলে।

লেখনীক্ষেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত! নমোহস্ত তে ॥

চিত্রগুপ্ত নমস্তত্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।

তেষাং স্বং পালকেনিত্যং নমঃ শান্তিঃ প্রবজ্জ হে ॥”

হুয়ান্চার সোদাস নামক রাজা কার্তিক মাসে শুক্লবিত্তীরা ভিক্ষিতে চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া অনন্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন। ঐ ভিক্ষিতে মহাবাহু ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের উপাসনা করার চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, হে মহাবাহো! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইরাছি, তোমার মৃত্যু হইবে না। যখন তুমি ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তের প্রসাদেই ভীষ্মের ইচ্ছাসূচ্য হইরাছিল।

কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের বিত্তীয়ার নাম যমবিত্তীরা। ঐ ভিক্ষিতে যম, যমকৃত ও চিত্রগুপ্তকে পূজা করিবে। ভগিনী হস্তপ্রস্তুত অন্নাদি ও পণ্ডুর পান ভোজন করিলে বুদ্ধি, বলঃ, আয়ুর্হি এবং সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবে। প্রার্থনা মন্ত্র—

“উৎপলো ঐলয়েচৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃত।

লেখকল্পং সদাশ্রীনাং চিত্রগুপ্ত নমোহস্ত তে ॥

স্ত্রিরা সহ সবুংপন্ন সমুদ্রমখনোত্তব।

চিত্রগুপ্ত! মহাবাহো মমার্যবরদোত্তব ॥”

(ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চিত্রগুপ্তব্রতকথা।)

“স্ত্রিরা সহসবুংপন্ন সমুদ্র মখনোত্তব” ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে চিত্রগুপ্ত লক্ষ্মীর সহোদর সমুদ্রমখনকালে সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইরাছিলেন।

গোমস্তের (বর্তমান গোয়ার) মালীশের শম্বাবলীনদীর নিকট প্রাচীন চিত্রগুপ্তমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

“সুগুণং চৈব মর্ত্যানাং চিত্রগুপ্তস্ত মনিরে।”

(সহ্যাদ্রি মালীশমাং ২১১।)

২ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। অলোৎসর্গ ও মঠপ্রতিষ্ঠাদিতে রত্নলব্ধ চিত্রগুপ্তমূর্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চিত্রগৃহ (পুং স্ত্রী) ৬তম। চিত্রশালা। চিত্রযুক্ত বা চিত্র করিবার গৃহ। [চিত্রবিদ্যা দেখ।]

চিত্রগ্রীব (জি) চিত্রা গ্রীবা যন্ত বহুব্রী। বিচিত্র গ্রীবাবিশিষ্ট।

চিত্রঘণ্টা (স্ত্রী) চিত্রা ঘণ্টা যন্তাঃ বহুব্রী। কান্ধিহ দেবীভেদ।

“বিষে! বিষে! বিষভুজে! নমোহস্ত্রে তে
ঐচিত্রঘণ্টে! বিকটে স্তম্ভশিকে!” (কাশীখণ্ড ৫ অঃ)

চিত্রঘণ্টেশী (স্ত্রী) কাশীস্থ দেবীবিশেষ। “ইয়ং চিত্রঘণ্টেশী
ঘণ্টাকর্ণধ্বং হৃদঃ।” (কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ)

চিত্রচাপ (পুং) যুদ্ধরাত্রেয় পুস্ত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

চিত্রজ্ঞ (পুং) চিত্রো মনোহরোজয়ঃ কর্ণধা। বাক্যভেদ,
প্রিয়ব্যক্তি প্রিয়ব্যক্তির নিকট রোষের সহিত অনেক
ভাবময় উৎকণ্ঠাবুক্ত যে বাক্য বলে। ইহার দশটি অঙ্গ যথা—
প্রজ্ঞ, পরিজ্ঞমিত, বিজ্ঞ, উজ্ঞ, সংজ্ঞ, অবজ্ঞ, অভি-
জ্ঞমিত, আজ্ঞ, প্রতিজ্ঞ ও সূজ্ঞ। প্রজ্ঞ অবস্থায় প্রেরণী
অনুয়া, ঈর্ষা ও গর্ভযুক্ত হইয়া অবজ্ঞার সহিত কৌশল করে।
পরিজ্ঞমিত অবস্থায় স্বামীর নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও চপলতা ইত্যাদি
দেখাইয়া ভাব ভঙ্গিতে নিজের সরলতা প্রকাশ করে। বিজ্ঞ
অবস্থায় অভিমান চাপিয়া রাখিয়া অনুয়া প্রকাশপূর্বক প্রিয়-
তমের প্রতি কটাক্ষে কথা বলে। উজ্ঞ অবস্থায় গর্ভ চাপিয়া
ঈর্ষার সঙ্গে কুহকাখ্যান ও অনুয়ার সহিত আক্ষেপ। সংজ্ঞ
অর্থাৎ উপহাস ও আক্ষেপ করিয়া প্রিয়তমকে অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি
বলা। অবজ্ঞ অর্থাৎ ঈর্ষাপূর্বক যেন ভয়ে প্রিয়জনকে নিষ্ঠুর,
কামুক, ঘৃষ্ট ইত্যাদি বলা। অভিজ্ঞমিত অর্থাৎ প্রিয়কে ত্যাগ
করাই উচিত, ভঙ্গিতে ও অল্পভাপের সহিত এক্রপ ভাব প্রকাশ
করা। আজ্ঞ অর্থাৎ মনের খেদে প্রিয়কে কুটিল ও হৃৎখদায়ক
বলা। তিনি যে অস্ত্রের স্তম্ভদাতা তাহাও ভঙ্গিতে প্রকাশ
করা। প্রতিজ্ঞ অর্থাৎ প্রিয়তম প্রেরিত দূতকে সম্মান
করিয়া বেশ স্থির ভাবে কথা বলা যে “তিনি অস্ত্রের
প্রতি আসক্ত, তাহার হৃৎজনে সর্বদাই একত্র থাকেন।
এ অবস্থায় আমার যাওয়া উচিত নয়।” সূজ্ঞ অর্থাৎ সরলতা,
গাভীযাতা, চপলতা ও উৎকণ্ঠার সহিত প্রিয়তমকে জিজ্ঞাসা
করা। (উজ্জলনীলমণি)

চিত্রতণ্ডুল (স্ত্রী) চিত্র তণ্ডুলো যন্ত বহব্রী। বিড়ঙ্গ।

চিত্রতণ্ডুলা (স্ত্রী) বিড়ঙ্গ।

চিত্রতৈল (স্ত্রী) এরণ্ডতৈল, ভেরাণ্ডার তৈল।

চিত্রতৃচ্ (পুং) চিত্রাযুক্ যন্ত বহব্রী। ভূজপত্র।

চিত্রদণ্ডক (পুং) চিত্রো দণ্ডো যন্ত বহব্রী-কপ্। শূরণ, ওলগাছ।

চিত্রদীপ (পুং) পঞ্চদশীপ্রকরণের অন্তর্গত দীপভেদ। চিত্র
যেমন পটে অঙ্কিত থাকে সেইরূপ স্বচৈতন্ত্রে অগচ্ছিত্রও
অঙ্কিত। তাহাকে নারায়ণ ও মিথ্যাজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া
চৈতন্তই এক ও বহুরূপ অবধারণ করিবে। এই চিত্রদীপের
বিষয় তাহার নিকট অঙ্গসম্বন্ধান করে, তাহার অগচ্ছিত্র অব-
লোকন করিলে তাহার পুং শব্দ যথার্থ হয়। (পঞ্চদশী।)

চিত্রদৃশীক (ত্রি) বিচিত্রদর্শন। “চিত্রদৃশীকমণঃ” (ঋক্
৬।৭।৫।) ‘চিত্রদৃশীকং বিচিত্রদর্শনং’ (সায়ণ)

চিত্রদেব (পুং) কান্তিকের এক অমুচর। (ভারত শলা, ৪৬ অঃ)

চিত্রদেবী (স্ত্রী) ১ মহেশ্বরবাহুণী, বড়মাকাল লতা। ২
শক্তিবিশেষ। কলিকাতার উত্তরপ্রান্তস্থ চিৎপুরের উত্তরে
চিত্রদেবী নামে এক শক্তিমূর্তি আছে। বোধ হয় তাহারই
নামানুসারে চিত্রপুর এবং তাহা হইতে বর্তমান চিৎপুর
নামকরণ হইয়াছে। [চিৎপুর ও চিত্রেশ্বরী দেখ।]

চিত্রধর্ম্ম (পুং) দৈতানুপতিভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

চিত্রধরশর্মা, একজন বিখ্যাত নৈরায়িক। ইনি ঈশ্বরবাদ
ও সংস্কারসিদ্ধিদীপিকা নামে সংস্কৃত ভাষার নব্য ভাষ্যগ্রন্থ
প্রণয়ন করেন।

চিত্রধা (অব্য) চিত্র-বিধার্থে ধা। অনেকধা, অনেকবিধ।
“তর্করামাস চিত্রধা” (ভাগ ৩।১৩।২০)

চিত্রধাম (স্ত্রী) কর্ণধা। চিত্রনির্মিত পুজার মণ্ডল, সর্বতো-
ভদ্রমণ্ডল।

চিত্রধ্বজতি (ত্রি) বিচিত্র গতিবিশিষ্ট। “চিত্রধ্বজতি-
রতিযো” (ঋক্ ৬।৩।৫।) ‘চিত্রধ্বজতিবিচিত্রগতিঃ’ (সায়ণ)

চিত্রধ্বজ, একজন পাণ্ডুরাজ। [পাণ্ডু দেখ।]

চিত্রনেত্রা (স্ত্রী) চিত্রঃ নেত্রঃ যন্তাঃ, বহব্রী। ১ সারিকা,
শালিক। ২ মদনপক্ষী, ময়না।

চিত্রশূন্ত (ত্রি) চিত্রে শূন্তঃ ৭তৎ। চিত্রার্ণিত, চিত্রিত।

চিত্রপক্ষ (পুং) চিত্রো পক্ষো যন্ত বহব্রী। তিত্তিরীপক্ষী।
ইহার মাংস বাত, কফ ও গ্রহণীনাশক। (রাজনিং)

চিত্রপট (পুং) ১ চিত্রিত বস্ত্র, ছিট। ২ চিত্রাধার, পট।
“নিঃশেষং বৃক্ষিসৈন্তং তু স্থিতং চিত্রপটে যথা” (হরিব ৩।১ অঃ)

চিত্রপট্ট (পুং) চিত্রিত পট। “চিত্রপট্টং ময়াদন্তং স্বচ্ছিত্বং
বীক্ষ্য জীবতি” (হরিব ১।৭ অঃ)

চিত্রপট্ট (ত্রি) চিত্রে পট্টঃ ৭তৎ। চিত্রকার্যে কুশল।

চিত্রপতি, সিদ্ধান্তপীযুষ নামে স্বতন্ত্রগ্রন্থকার।

চিত্রপত্র (ত্রি) চিত্রে পত্রে পক্ষো যন্ত বহব্রী। ১ বিচিত্র
পক্ষযুক্ত, সুন্দর ডানাবিশিষ্ট। “চিত্রপত্রশকুনিদ্যোতিতে-
ত্যাতি।” (কাদম্বরী।)

চিত্রপত্রিকা (স্ত্রী) চিত্রাণি পত্রাণি পর্ণানি যন্তাঃ বহব্রী,
কপ্। অতইয়ং। ১ কপিখপর্ণী বৃক্ষ। ২ দ্রোণপুশী।

চিত্রপত্রী (স্ত্রী) জলপিপ্লী, জলপিপুল।

চিত্রপথা (স্ত্রী) প্রভাসতীর্থে ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপস্থ একটা ক্ষুদ্র
নদী। যখন যমদূতেরা যমরাজের আদেশে চিত্রকে সশরীরে
বাঁধিয়া লইয়া যত্ন, তখন চিত্রা নামে তাহার এক ভগিনী নিত্যন্ত

ছাথিতচিত্তে বেন তাহার ভ্রাতাকে অধেষণ করিবার জন্তই নদী হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত এই নদীর নাম চিত্রপথা হইয়াছে। কলিতে ঐ নদী অন্তর্হিত হইয়াছে। কখন কখন বর্ষাকালে দর্শন দিয়া থাকে। ঐ নদীতে স্নান করিয়া চিত্রানিত্যকে দর্শন করিলে পরকালে তাহার স্বর্গ্যলোক লাভ হয়। (প্রভাসখং)

চিত্রপদ (ত্রি) চিত্রাণি পদানি স্থপ্তিগুণরূপাণি যত্র বহতী।
জ্ঞানর পদবিশিষ্ট। “ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হর্যেবশো”

(ভাগ ১।৫।১০)

চিত্রপদা (স্ত্রী) ১ গোখালতা, গোয়ালে লতা। ২ ছন্দোভেদ, ইহার প্রতি চরণে আটটি করিয়া অক্ষর। প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, ও অষ্টম গুরু ও অবশিষ্ট লঘু হইবে।

চিত্রপর্ণিকা (স্ত্রী) চিত্রাণি পর্ণানি অস্তাঃ বহতী টাপ্ অত-
ইহং। চিত্রপর্ণীভেদ। ছোট চাকুলে। পর্যায়—দীর্ঘা, শৃগাল-
বিম্বা, ত্রিপণী, সিংহপুচ্ছকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘৃষ্টিলা। (রত্নমাং)

চিত্রপর্ণী (স্ত্রী) বহতী, গোয়াদিস্থাৎ ভীষ্। ১ পূর্ণীপর্ণী,
চাকুলিয়া। ২ কর্ণফোটলতা, কাণফাটা। ৩ জলপিপ্ললী।
৪ দ্রোণপুশী। ৫ মঞ্জিষ্ঠা।

চিত্রপাদা (স্ত্রী) চিত্রৌ পাদৌ যস্তাঃ বহতী। শারিকা।

চিত্রপিচ্ছক (পুং) চিত্রং পিচ্ছং যস্ত বহতী কপ্। ময়ূর।

চিত্রপুশ্য (পুং) চিত্র পুশ্যো যস্ত বহতী। শর, বাণ।

চিত্রপুশ্পী (স্ত্রী) চিত্রাণি পুশ্পাণি যস্তা বহতী ত্রিয়াং ভীষ্।
অবষ্ঠা, আমড়াগাছ।

চিত্রপৃষ্ঠ (পুং) চিত্রং পৃষ্ঠং যস্ত বহতী। ১ কলবিকপক্ষী, চড়াই।
২ ক্ষুদ্রকমল, শুভী।

চিত্রপ্রতিকৃতি (স্ত্রী) চিত্রা চিত্রিতা প্রতিকৃতিঃ প্রতিমূর্তিঃ
কর্মধা। চিত্রে অঙ্কিত প্রতিমূর্তি। “চিত্রপ্রতিকৃতিশ্চৈব কাঠস্ত
প্রতিমাং তথা।” (হরিবংশ ১৩৮ অঃ)

চিত্রফল (পুং) চিত্রং ফলং ফলকং তদ্বদাকৃতিবিদ্যাতে যস্ত
চিত্রফল-অচ। ১ চিত্রলম্বস্ত চিত্রলমাছ। ইহা গুরুপাক, স্বাদ
ও বলবীৰ্য্যকারক। (রাজবল্লভ)। ২ চেলান, চেলনাফল।

চিত্রফলক (পুং) চিত্রফল-স্বার্থে কন্। ১ চিত্রলমাছ। ২ ছবি।

চিত্রফলা (স্ত্রী) চিত্রাণি ফলানি যস্তাঃ বহতী টাপ্। ১ চির্ভটী,
কাঁকড়। ২ যুগেরাঁক। ৩ লিঙ্গিনীলতা। ৪ মহেঞ্জবাক্ষী,
বড়নাকাল। ৫ বাস্তীকু, বেগুন। ৬ কণ্টকারী। ৭ ফলকী-
মংস্ত, ফলুইমাছ। পর্যায়—রাজগ্রীব, মহোম্মদ।

চিত্রবর্হ (পুং) চিত্রোবর্হো যস্ত বহতী। ১ ময়ূর।

“কাকেনমাংশ্চিত্রবর্হান্ শাদ্ধলান্ ক্রোষ্টুকেনচ।

ক্রীড়িষ্য পাণ্ডবান্ রাজান্!” (ভারত ২।৬০ অঃ)

২ গরুড়ের এক পুত্র। (ভারত ৫।১০০ অঃ)

চিত্রবর্হিন্ (ত্রি) চিত্রোবর্হো যস্তাঃ চিত্রবর্হ অন্ত্যার্থে ইনি।
বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্ট। “বম্বুর চিত্রবর্হিণম্।”

(ভারত অম্ব ৮৬ অঃ)

চিত্রবর্হিস্ (ত্রি) চিত্রং বর্হিঃ কুশমস্ত বহতী বিচিত্র কুশমর বা
কুশযুক্ত। “আপুষ্কিত্রবর্হিবাম্বুণে” (ঋক ১।২৩।১৩)

‘চিত্রবর্হিঃ বিচিত্রৈর্দৈর্ঘ্যকং’। (সায়ণ)

চিত্রবাহু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

চিত্রভানু (ত্রি) চিত্রাভানবোরশ্ময়ো যস্ত বহতী। ১ বিচিত্র
দীপ্তিবিশিষ্ট। “শ্রুয়া অগ্নিঃ চিত্রভানুঃ” (ঋক ২।১০।২।)

‘চিত্রভানুঃ বিচিত্র-দীপ্তিঃ’ (সায়ণ)। (পুং) ২ অগ্নি। “পুচ্ছৈঃ
শিরোভিচ্ছ ভৃশং চিত্রভানুং প্রপেদিরে” (ভারত ১৫২ অঃ)

৩ স্বর্ঘ্য। ৪ চিত্রকবুক্ষ, চিতাপাছ। ৫ অর্কবুক্ষ, আকলগাছ।

৬ ভৈরব। (শঙ্করভা)। ৭ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। “প্রপূর্ণগা-
পূর্ণজৌ চিত্রভানু” (ভারত ১।২২২৬ অঃ)

৭ প্রভবাদি
যষ্টি-সংবৎসরে যে বারটা যুগ হয়, তাহাদের মধ্যে চতুর্থ
যুগের প্রথম বৎসর। এই যুগের অধিপতি অগ্নি;

ইহার অন্তর্গত পঞ্চবৎসরের নাম ১ চিত্রভানু, ২ সূত্ৰভানু, ৩
ভারণ, ৪ পার্থিব, ৫ ব্যয়। ইহাদের মধ্যে চিত্রভানুই অধিক
কলপ্রদ। “শ্রেষ্ঠং চতুর্থস্ত যুগস্ত পূর্বং যচ্চিত্রভানুঃ কথয়ন্তি
বর্ষম্।” (বৃহৎসং ৮।৩৫।)

৮ মণিপুরের রাজা অর্জুনপত্নী চিত্রাঙ্গদার জনক।

চিত্রভূত (ত্রি) অচিত্রশ্চিত্রোভূতঃ কর্মধা। আশ্চর্য্যভূত।

“সহস্রশ্চিত্রভূতাঃ সমুদ্ভাঃ।” (ভারত, আশ্রম ১০ অঃ)।

চিত্রভেষজা (স্ত্রী) চিত্রং ভেষজং যস্তাঃ বহতী। কাকোড়-
ধরিকা, কাঠডুমুর।

চিত্রমণ্ডল (পুং) চিত্রং মণ্ডলং যস্ত বহতী। মণ্ডলজাতীর
সর্বভেদ।

চিত্রমহস্ (ত্রি) চিত্রং মহন্তেজোযস্ত বহতী। বিচিত্র বা চায়-
নীয় তেজোবিশিষ্ট। “বম্বুর ন চিত্রমহসং গৃণীষে।” (ঋক ১০।
১২২।১।) ‘চিত্রমহসং চায়নীরতেজস্ব’ (সায়ণ)

চিত্রমৃগ (পুং) চিত্রবর্ণ হরিণ, পৃথতজাতীর মৃগবিশেষ। “বগ্নমা
সাম্ভাগমাংসেন পার্ষতেন চ সপ্তৈব।” (মহু ৩।২৬৯।) ‘পৃথত-
শ্চিত্রমৃগ’ (কুল্লুক) [মৃগ দেখ।]

চিত্রমেখল (পুং) চিত্রা মেখলাযস্ত বহতী। ময়ূর। (ত্রিকাণ্ড)

চিত্রযাম (ত্রি) নানাগমনযুক্ত। “তং চিত্রযামং হরিকেশ-
মীমহে” (ঋক ৩।২।১৩।) ‘চিত্রযামং নানাবিধগমনং’ (সায়ণ)

চিত্রযোধিন্ (ত্রি) চিত্রং যুধাতি চিত্র-যুধ্ শিনি। ১ আশ্চর্য্য
যুদ্ধকারী। “বদাদ্রোণো বিবিধানত্মমার্গান্ নিদর্শয়ন্ সমরে

চিত্রবোধী।" (ভারত ১১৫ অঃ) (পুং) ২ অক্ষর, পার্থ।
৩ অক্ষরবাক্য, অজানগাছ।

চিত্ররথ (পুং) চিত্রোরথো যন্ত বহতী। ১ রথ। ২ অক্ষরলোক-
বাসী এক গন্ধর্ব্ব। কল্পপের ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে
ইহার জন্ম। (ভারত ১১২৩। ৫৩।) ইনি কুবেরের সখা,
ইহার নামান্তর গন্ধর্ব্বরাজ, অজারপর্ণ, কুবেরসখ, দক্ষরথ।
(ভারত ১১৭১। ৩৭-২।) "গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ।" (শ্রীভা।)
৩ ত্রিকঙ্কর পোত্র ও গদের পুত্র। (হরিবং ১৬২ অঃ) ৪ এক-
জন বিতাদ্বর। (হেম) ৫ অঙ্গদেশের একজন রাজা। (ভারত
১৩৪২ অঃ) ৬ অঙ্গবংশীয় মহারাজ ধর্ম্মরথের পুত্র।
(হরিবংশ ৩১ অঃ) ৭ নৃপতি ঋষদংশুর পুত্র। (ভারত,
১৩১৪৭ অঃ) ৮ যদুবংশীয় এক নৃপতি, বিশদংশুর পুত্র।
(ভাগং ৯২৩৩০) বিষ্ণুপুরাণে বিশদংশুর স্থানে ক্রমজ পাঠ
আছে। (বিষ্ণুপুঃ ৪১২১। ১) ৯ যদুবংশীয় নৃপতি বৃক্ষির পুত্র।
(ভাগং ৯২৪১৪।) ১০ সুপার্বকের একপুত্র। (ভাগং ৯১৩৩২৩)
১১ গায়ত্রীর গর্ভসমুৎপন্ন গয়ের এক পুত্র। (ভাগং ৫১৩৩১৪)
১২ নৃপতি উজ্জৈর এক পুত্র। (ভাগং ৯২২১৪০।) ১৩ মৃত্তিকা-
বতীর একজন রাজা। (ভারত বন) ১৪ একজন স্ত্রী।

(রামাং ২১৩২। ১৭)

(ত্রি) ১৫ নানাবর্ণ রথযুক্ত। "হোতারং চিত্ররথমধ্বরথ।"

(শুক ১০। ১১৫।) 'চিত্ররথং নানারূপরথং।' (সায়ণ) "ইতি
ক্রবংশচিত্ররথঃ স্বসারথিং।" (ভাগবত ৪। ১০। ২২)

চিত্ররথ (স্ত্রী) ননীভেদ। (ভারত ভীষ্ম)

চিত্ররশ্মি (ত্রি) চিত্রারশ্ময়ো যন্ত বহতী। ১ নানাবর্ণ রশ্মি-
বিশিষ্ট। ২ (পুং) মরুভেদ। (হরিবং ২০৪ অঃ)

চিত্ররাত্রি (ত্রি) চিত্রা রাত্রি দীনং যন্ত বহতী। যিনি নানা-
বর্ণ রাত্রি করেন। "হরো বর্ষং গুণতে চিত্ররাত্রী।" (শুক
৬। ৬২। ১১।) 'চিত্ররাত্রী বিচিত্রাদানো' (সায়ণ।)

চিত্ররাধসু (ত্রি) বিচিত্র বা চারুগীষ ধনযুক্ত। "অগ্নিং হবামহে
বাজেযু চিত্ররাধসং।" (শুক ৮। ১১। ৯।) 'চিত্ররাধসং চারুগীষধনং'
(সায়ণ।)

চিত্ররেক্ষ (পুং) ১ শাকদ্বীপাধিপতি ত্রিপুরতপোত্র ও মেধা-
তিথির এক পুত্র। মেধাতিথি বার্ষিক্যে তপোবনে বাইবার সময়ে
পুরোজব, মনোজব, বেগমান, ধুম্রানীক, চিত্ররেক্ষ, বহুব্রপ,
বিষাধার এই সাতপুত্রকে সাতটিবর্ষ বিভাগ করিয়া দিবা-
হিলেন। যিনি যে বর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন সেই বর্ষ
তারার নামে অভিহিত হইত। (ভাগং ৫। ২০। ২৫) ২ বর্ষভেদ।
চিত্রল (পুং) চিত্রং আশ্চর্য্যং লাতি লাক। ১ কবুর্বর্ণ। (ত্রি)
২ নানাবিধ বর্ণযুক্ত।

চিত্রলতা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা।

চিত্রলা (স্ত্রী) চিত্রল-টাপু। (অভ্যাস্যতটাপু। পা ৪। ১। ৪)
গোরকীষক। (রাজনিং)

চিত্রলিখন (স্ত্রী) ১ চিত্র করা। ২ সূক্ষ্মর লেখা।

'চিত্রলিখনাঙ্গীনি সর্ষতঃ প্রতিগ্রহীতব্যানি।' (মহু ২। ২৪ কুল্লুক)
চিত্রলিখিত (ত্রি) চিত্রং যথাক্রমে তথা লিখিতং। (সহ
সুপা। পা ২। ১। ৪) বিচিত্রলিখিত, সূক্ষ্মরলিখিত।

চিত্রলেখক (পুং) চিত্রস্ত লেখকঃ ভক্তঃ। ১ চিত্রকার।
২ যে সূক্ষ্মর লেখে।

চিত্রলেখনিকা (স্ত্রী) চিত্রলেখনী-বার্ধে-টাপু। ইকারন্ত হ্রস্বঃ
(কে ২ঃ। পা ৭। ৪। ১৩) তুলি।

চিত্রলেখনী (স্ত্রী) চিত্রং লিখ্যতে অনরা করণে লুট্‌ দ্বিগাং-
টীপু। কুটী, চিত্র করিবার তুলি।

চিত্রলেখা (স্ত্রী) চিত্রলেখো লেখনশক্তিযন্তাঃ বহতী। ১
অঙ্গরাবিশেষ। ২ বাণাসুরহৃতি উবার সখী, কুম্ভাওর
কন্যা। ইনি চিত্র অঙ্কণে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। "বাণস্ত
মত্নী কুম্ভাওশ্চিত্রলেখাতু তৎসুতা" (ভাগং ১০। ৬২। ১২)
[চিত্রবিদ্যা দেখ।] ৩ ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ—প্রত্যেক
পাদে ১৮ অক্ষর। ৪র্থ হইতে ৯ম পর্যন্ত ও ১২শ ও ১৫শ লঘু,
অবশিষ্ট গুরু। ১১শ ও ১২শ অক্ষরে যতি হইবে। "রুদ্রাঐর্ধনন
ততমৈক কীর্তিতা চিত্রলেখায়ম্।" (বৃহস্পতীকা) অঙ্কপ্রকার
যথা। "মন্দাক্রান্তা নগর লঘুভূতা কীর্তিতা চিত্রলেখা" (ছন্দো-
মঞ্জরী।) চিত্রলেখা মন্দাক্রান্তারই লক্ষণাক্রান্ত, কেবলমাত্র
একটি লঘুবর্ণ অধিক যোগ করিতে হইবে। ইহার ৪র্থ ১১শ
ও ১৮শ অক্ষর যতি। ৪ সপ্তদশাক্ষরপাদযুক্ত ছন্দোভেদ। লক্ষণ
যথা—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১৪শ, ১৬শ ও ১৭শ গুরু, অব-
শিষ্ট লঘু। ১০ম ও ১৭ম অক্ষরে যতি হইবে। "সসজ্জা ভজগা
ও দিক্‌স্বরৈর্ভবতি চিত্রলেখা।" (বৃহস্পতীকা) ৫ ত্রাক্ষর-
ভেদ। "প্রীত্য তন্ত্রাং নরনয়গবতুচ্চিত্রলেখাতুতারঃ।"
(উজ্জলনীল) ৬ চিত্রবর্ণ রেখা। ৭ চিত্রলেখনী।

চিত্রলোচনা (স্ত্রী) চিত্রং লোচনং যন্তাঃ বহতী। ১ শারিকা,
শালিকপাখী। ২ মননপক্ষী, ময়না।

চিত্রবৎ (ত্রি) চিত্রং বিদ্যাতে অস্ত চিত্র-মতুপ্‌ মস্তবাসেশঃ (মাহুপ-
ধারাক্ষ মতোর্বোহিববাদিভ্যাঃ। পা ৮। ২। ৯) চিত্রযুক্ত, আলেশা-
শোভিত। "আসেহযোঃ সপ্তম চিত্রবৎসু।" (বহু ১৪। ২৫।)

চিত্রবদল (পুং) চিত্রবৎ আ সমস্তাং অঙ্গাতি পর্যাপ্রোতি
চিত্রবৎ আ-অল্‌-অচ, অথবা চিত্রোবদালঃ কর্ণধা। পাঠীনমস্ত্র,
বোয়ালমাছ।

চিত্রবন (স্ত্রী) গণ্ডকীর নিকটবর্ত্তী পুরাণখ্যাত একটী বন।

চিত্রবর্ষান্ (পুং) ১ স্বতরাষ্ট্রের এক পুত্র। “চিত্রবাহুশ্চিত্রবর্ষা।” (ভারত ১।১১৭।৬)। ২ কুলুতদেশের এক রাজা। “কৌলুতশ্চিত্রবর্ষা মলয়নরপতিঃ সিংহনাদোহুসিংহঃ।” (মুদ্রারং ১ অঙ্ক)।
 চিত্রবর্ষিন্ (ত্রি) চিত্রং যথাক্রমে তথা বর্ষতি চিত্র-বর্ষ-গিনি। অদ্বুত বর্ষণকারী। “চিত্রবর্ষী চ পর্জন্তো যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি।” (হরিবংশ ১৯৩ অঃ)

চিত্রবল্লিক (পুং) চিত্রবল্লিরিব কায়তি চিত্রবল্লি-কৈ-ক। চিত্রবদাল, বোয়াল।

চিত্রবল্লী (স্ত্রী) চিত্রা বল্লী কর্মধা। ১ বিচিত্রলতা। ২ মৃগ-বাক, শাবা রাখালশাবা। ৩ মহেন্দ্রবাকুলী, বড়মাকাল।

চিত্রবহা (স্ত্রী) চিত্রং বহতি চিত্র-বহ-অচ্ টাপ্। নদীভেদ। “করীষিণীং চিত্রবহাং চিত্রসেনাং চ নিয়গাং।” (ভারত ৬।৯ অঃ)

চিত্রবাজ্জ (ত্রি) চিত্রোবাজ্জঃ পক্ষোযন্ত বহত্ৰী। বিচিত্র পক্ষ-যুক্ত। “চিত্রবাজ্জৈঃ শরৈরপি।” (ভাগ ৪।১০।১১।)

চিত্রবাণ (পুং) ১ স্বতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৬) (বহত্ৰী) (ত্রি) ২ বিচিত্রবাণযুক্ত।

চিত্রবাহন (পুং) মণিপুরেশ্বর এক নাগ। “মণিপুরেশ্বরঃ রাজন্ ধর্মজ্ঞঃ চিত্রবাহনঃ।” (ভারত ১।২।১৫ অঃ)

চিত্রবিদ্যা, কলাবিশেষ। সমতল কোন বস্তুর উপর স্বভাবতঃ বৃক্ষলতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কিম্বা প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া মানবদ্বয়ে কোন ভাবোৎপন্ন করাই চিত্রবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহপ্রাচীর, দেবমন্দির, যানবাহনাদি নানা-বর্ণে রঞ্জিত ও দেবদেবী বৃক্ষলতাদির প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিবার প্রথা বহুকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত ও অমূল্যলিত হইয়া আসিতেছে। কোন সময়ে চিত্রতত্ত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বহু শতাব্দী পূর্বে যখন সমগ্র যুরোপ আমমাংসভোজী গুহাবাসী বর্বর জাতির বাসস্থান ছিল, তখন ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতাদিতে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালে চিত্রে মনুষ্যাদির অসংখ্য প্রতিকৃতি হাব ভাব চেষ্টা প্রভৃতি অদ্বুত নৈপুণ্যসহকারে চিত্রিত হইত। এমন কি ভয়-বিশ্ময়াদিতে স্তম্ভিত হইলে তাহাকে চিত্রাঙ্গিত বলা হইত।

“অদ্বুতমুহূর্তং স্তিমিতং সর্বং তদ্রাজমণ্ডলম্।

তুক্ষীভূতে ততস্তন্নি পটে চিত্রমিবাঙ্গিতম্॥”

(ভারত, অঙ্ক ১৬৬।৪)

রামায়ণের সময়েও রাজগণের চিত্রগৃহ ছিল, চিত্রশালায় গিয়া রাজগণ আমোদ প্রমোদ করিতেন। যথা—

“আপানশালা বিবিধা ভূয়ঃ পুষ্পগৃহাণি চ।

চিত্রশালাষ্ট বিবিধা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ॥” (রামা ৫।১৫।৮)

পূর্বে এই ভারতবর্ষে রাজগণ ও রাজপুত্রগণ সকলেই চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতেন, চিত্রবিদ্যা না শিখিলে তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। এমন কি তৎকালে কুটীরবাসিনী বনচারিণী কুমারীগণও আলেখ্যরচনার পটু ছিল, কালিদাসের শকুন্তলা তাহার উজ্জল দৃষ্টান্তহল। “অহো রূপমালেখ্যন্ত।” (শকুন্তলা।)

শকুন্তলা অপেক্ষা উষার সখী চিত্রলেখার নামবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বকালে কুলকামিনীগণ কিরূপ চিত্রবিদ্যায় অনিপুণ ছিলেন, তাহা চিত্রলেখার বিবরণে অতি সুন্দর বিবৃত হইয়াছে। হরিবংশে ও ভাগবতে লিখিত আছে, বাণহুহিতা উষা অনিরুদ্ধের জন্ত অধীর হইলে চিত্রলেখা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলেন, ‘সখি! তোমার মনচোরের কুল, শীল, বর্ণ ও নিবাস আমি কিছুই জানিনা, তবে আমি বুঝিবলে এই করিতে পারি যে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস-গণের মধ্যে যাহারা প্রভাবে, কুলে, শীলে, রূপে ও গুণে প্রধান, মনুষ্যলোকেও যাহারা লোকবিখ্যাত, তাঁহাদের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মধ্যে তোমার নিকট উপস্থিত করিব। তুমি সেই আলেখ্যগত মহাত্মাদিগকে দেখিলেই তোমার কান্ডকে চিনিতে পারিবে। তখন আর তিনি আমাদের হাত এড়াইতে পারিবেন না।’ সাত দিন মধ্যেই চিত্রলেখা সমস্ত আলেখ্য যথামত প্রস্তুত করিয়া আনিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সমুদয় স্বহস্তলিখিত চিত্রপট বিস্তার করিয়া সখীগণের সমক্ষে উষাকে দেখাইতে লাগিলেন। শেষে চিত্রলেখা কহিলেন, ‘আমি সকলকেই অবিকল চিত্রিত করিয়াছি, তুমি স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়াছ, যদি তিনি ইহার মধ্যে থাকেন ত বাছিয়া লও।’ উষা একে একে ছবি দেখিতে দেখিতে শেষে কৃষ্ণের পোত্র ও প্রহ্মায়পুত্র অনিরুদ্ধের ছবি চিনিতে পারিয়া চিত্রলেখাকে দেখাইয়া দিলেন। শেষে ঐ চিত্রলেখাই দ্বারকায় গিয়া অনিরুদ্ধকে আনিয়া উষার বিরহবেদনা বিদূরিত করেন। (হরি ১৭৫ অঃ)

রামায়ণ মহাভারত পাঠে জানা যায় সেই প্রাচীনকালেও চিত্র-উপজীবী স্বতন্ত্র চিত্রকর ছিল। যথা—

“মূলবাণাঃ কাংশ্চকারা শিত্রকারাশ্চ শোভনাঃ।”

(রামায়ণ ২।৮০।১৮)

বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রের মতে—স্থপতি, স্থাপক, শিল্পী, বর্দ্ধকী ও তক্ষক ইহাদের মধ্যে শিল্পীই চিত্র অঙ্কন করিবে।

“শিল্পী চিত্রবিনির্মাণঃ বর্দ্ধকিস্ত শিলাক্ৰিয়াঃ।...

অলঙ্কারক্ৰিয়াক্তং সর্বচিত্রাদিশাস্ত্রতম্॥” (বিশ্বকর্ম্মীয় ১।১৯)

হর্ষশীর্ষণধরাত্ম ও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে পূর্বকালে দেবতার চিত্র অঙ্কিত ও পূজিত হইত। এখনকার

মত পূর্বকালেও চিত্রপটের ও চিত্রফলকের আদর ছিল। (হরিবংশ ১৭৭।৪৫, বিক্রমোর্কশী ২ অঙ্ক।) তৎকালে চিত্র-প্রতিকৃতির* (Portrait painting) বিশেষ আদর ছিল, তাহা হেমচন্দ্ররচিত হবিরাবলীচরিতের পরিশিষ্টপর্কে প্রথম সর্গে বিবৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী পূর্বকালে এক-রূপ মোটামুটি ছবি আঁকিতে পারিলেও তাঁহারা চিত্রের সাম-জ্ঞাত রাধিতে আনিডেন না, তাঁহাদের চিত্রবিদ্যার রীতিমত পদ্ধতি বা কোন প্রণালীও এই ছিল না, বিশেষতঃ দৃশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য আদৌ চিত্র করিতে পারিডেন না।

কিন্তু ভারতবাসী যে বহুপূর্বকাল হইতেই চিত্রবিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। এ ছাড়া ভারতবাসীর চিত্রবিদ্যার স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। প্রায় এগারশত বর্ষ পূর্বে কাশ্মীরাদিধিপতি জয়সিংহের সভায় কবি দামোদরশঙ্কর তথ্যচিত্র কুটনীমত গ্রন্থে “চিত্রশাস্ত্র” + নামক চিত্রাঙ্কনবিবরণ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে দামোদর শঙ্করেরও বহু পূর্বে যে চিত্রশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য-অঙ্কনেও যে আর্ঘ্যচিত্রণ লৈপুণ্যলাভ করিয়া-ছিলেন, ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথমঙ্কের বর্ণনা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। লক্ষণ সীতার বিনোদনার্থ একখানি চিত্র আনয়ন করেন, তাহাতে রামের বনবাস হইতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত সমুদয় ঘটনামূলক প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রিত ছিল। সীতা সেই ছবি দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্চর্যবিস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন “অজ্ঞ উত্ত! এদেশ চিত্রদঃসংগেন পক্ষুঃপ্লবঃসংগে অথি মে বিগ্ধঃ।” (উত্তররামচরিত ১ অঃ) আর্ঘ্যপুস্ত! এই ছবি দেখিয়া আবার আমার সেই অভিলাষ মনে জাগিতেছে।

সেই প্রাচীন আর্ঘ্যচিত্রের নিদর্শন এখন অতি বিরল। যেমন ভারতের প্রাচীনতম সহস্র সহস্র কীর্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয়ও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল উৎকলের কটকজেলার কপিলেশ্বর-মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত মণ্ডোদক চিত্র (Fresco-painting) অতি সামান্য ভাবে প্রাচীন হিন্দুচিত্রের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। ময়-

শিৱ ও মানসার নামক বাহুশাস্ত্রে ঐরূপ চিত্র “চিত্রভোরণ” নামে বর্ণিত হইয়াছে। (ময়শিৱ ২০ অঃ, মানসার ৪৩।২৩।)

ভারতীয় বৌদ্ধদিগের সময়ে যে সকল মন্দির নির্মিত হয়, তন্মধ্যে দুই একটার গায়ে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে অজন্তাশাস্ত্রিত মন্দিরের গাত্রে এইরূপ চিত্র অদ্যাপিও বর্তমান আছে। এই গুহা গুপ্তের দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে সহস্র বৎসর ধরিয়া খোদিত হয়। চিত্র সকলও সেই সময়ের। অজন্তার চিত্র দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনকালেও যে ভারতে চিত্রনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ চিত্রবিদ প্রিক্সিসাহেব অজন্তাগুহার গাত্রে অঙ্কিত চিত্র সন্দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—“The artists who painted them were giants in execution. Even on the vertical sides of the walls some of the lines which were drawn with one sweep of the brush struck me as being very wonderful; but when I saw long delicate curves drawn without faltering with equal precision upon the horizontal surface of a ceiling, where the difficulty of execution is increased a thousand-fold—it appeared to me nothing less than miraculous..... For the purpose of art education no better examples could be placed before an Indian art-student than those to be found in the caves of Ajantā, full of expression—limbs drawn with grace and action, flowers which bloom, birds which soar, and beasts that spring, or fight, or patiently carry burdens: all are taken from Nature’s book—growing after her pattern and in this respect differing entirely from Muhammadan art, which is unreal, unnatural, and therefore incapable of development.” (Indian Antiquary, vol. III. p. 26-28.)

অতি প্রাচীনকাল হইতে মিসরেও চিত্রবিদ্যায় প্রচলন হইয়াছিল। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মিসরের উন্নতির সময় তথায় এই বিদ্যার চর্চা ছিল। তথায় চিত্রদ্বারাই লিপিকাৰ্য্যসম্পন্ন হইত। ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রকাশ করিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিত্র অঙ্কিত হইত। বিলাতে বৃটিশ মিউজিয়মে প্রায় ৩ সহস্র বৎসরের পুরাতন একটা মিসরীয় ছবি আছে। প্রকৃত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অমুমান করেন, খৃষ্টের প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্বে খিব নগরের প্রাচীর চিত্রিত ছিল। সহজেই অমুমান করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞাত সমস্ত বিদ্যার জ্ঞান মিসর হইতেই গ্রীকগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে। খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে গ্রীসে চিত্রবিদ্যা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

* মনুস্মৃতির অধিকল চিত্রকে চিত্রপ্রতিকৃতি বলা হইত—

“চিত্রপ্রতিকৃতিঃ কথং প্রতিকৃতিঃ।

দিল্যপ্রতিকৃতিঃ ময়োং পরমত্বা।” (হরিবংশ ১৩৯।২৭-২৮)

† “ভারতবিশাখিলদত্তিলব্ধকায়ুর্কেনচিত্রজ্ঞেয়ু।” (কুটনীমত ১২৩)

৪৬৩ খৃঃ পূঃ খৃষ্টাব্দে আসিস্ নগরে পলিগনোটাস্ নামে এক চিত্রকর প্রাহত্ব হন। আদ্রিষ্টল তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলেন, “তাঁহার অঙ্কিত মনুষ্যের চিত্র প্রকৃত মনুষ্য অপেক্ষাও সুন্দর।” সিকিরণ, করিষ্, আথেন্স ও রোডস্ এই কয় স্থানে গ্রীসের প্রধান প্রধান চিত্রশালা ছিল। অপরূপ গ্রীক চিত্রকরদিগের মধ্যে এপিনিষ্ ও রোডস্ নিবাসী প্রটোজিসন্ এক সময়ে প্রাহত্ব হন। গ্রীসে তাত্ত্বিকবিদ্যার সহিত চিত্র-বিদ্যাও উন্নতি হয়। স্থানিগুণ ভাস্কর্যগণের মত চিত্রকর-গণেরও অভাব ছিলনা।

রোমে চিত্রের সম্যক প্রচলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশই গ্রীকচিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত। গ্রীসের অবনতির ও রোমনগরের সমৃদ্ধির আরম্ভ হইলে, গ্রীকচিত্রকরগণ কার্যে অধেষণে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোমকগণ তাহাদের সঙ্গুণের পুরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রীসের সকল প্রধান চিত্রকর রোমে আসিয়া বাস আরম্ভ করিলেন। সুতরাং তৎকালে রোমের সমস্ত চিত্রকার্যই গ্রীকচিত্রকর দ্বারা সম্পন্ন হইত। অবশেষে খৃষ্টীয় ৭৫ অব্দে রোমে চিত্রের সম্পূর্ণ হীনাবস্থা ঘটে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুনরায় যুরোপে চিত্রবিদ্যার অল্পশীলন আরম্ভ হয়। ১২০৪ খৃঃ অব্দে লাটিনজাতি কন্সটান্টিনোপল্ অধিকার করিলে গ্রীকচিত্রকরগণ কর্তৃক ইতালীর চিত্র-বিদ্যা পুনর্জীবিত হইল। সেনানিবাসী গিদো ইতালীর আদি-চিত্রকর। ১২২১ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত তাঁহার একখানি চিত্র আজও রক্ষিত আছে। ইনি তৎকাল চিত্রবিদ্যার দোষ সকল অধিকাংশ বিদূরিত করিয়া পূর্বাপেক্ষা বিপুল ও নূতন প্রণালীতে চিত্রাদি অঙ্কন করেন। ইহার অনেক শিষ্য ছিল, তাহাদের অনেকের চিত্রাদি আজও দেখা যায়। ইহার পর ইতালীতে অনেক বিখ্যাত চিত্রকর জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে লিওনার্ডো-ডা-ভিন্সি (১৪৫২-১৫১৯), মাইকেল-এঞ্জেলোবোনাভি (১৪৭৪-১৫৬৩) এবং রাফেল (১৪৮৩-১৫২০) এই তিন ব্যক্তিই প্রধান। টিসিয়ান্ ও করেজিও ইহারও বিখ্যাত চিত্রকর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভিন্সি ভিন্ন ইতালীর সর্বত্র চিত্রবিদ্যার অবনতি আরম্ভ হইল। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে পুনর্বার ইতালীতে চিত্রবিদ্যার সংশোধন ও উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। একদল পূর্বপ্রসিদ্ধ চিত্রকর-গণের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রণালীগুলি গ্রহণ করিয়া এক নূতন প্রণালী সৃষ্টি করিল। অপর দল কোন প্রকার প্রাচীন রীতির বশবর্তী না হইয়া একেবারে প্রকৃতিকে আদর্শ ধরিয়া তদনুরূপ চিত্র করিতে অগ্রসর হইল।

বলোগনা নগরে প্রথম এবং নেপলস্ নগরে দ্বিতীয় প্রকারের চিত্রালয় ছিল।

শার্লিম্যানের (Charlemagne) সময় হইতে জর্মনিতেও চিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি চিত্রবিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন এবং এক্সলা-চাপেলের গির্জায় চতুর্বিংশতি উপাসক সমেত খুঁটের চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ওমোর (৯৭৪-৯৮৩) সহিত গ্রীকরাজকন্যা থিওফানির বিবাহ হইলে, জর্মনচিত্রকরগণ গ্রীকদিগের নিকট চিত্রশিল্পের সুবিধা পায়। এই সময় হইতেই বোহিমিয়া, হলও প্রভৃতি নামান্বানে চিত্রবিদ্যার অল্পশীলন আরম্ভ হয়। ১৩৮০ খৃঃ অব্দে মিষ্টার উইলহেলম্ নামে জনৈক বিখ্যাত জর্মন চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার ও তৎপরবর্তী অনেকের চিত্র আজও কলোন, বালিন প্রভৃতি নগরের যাহুঘরে রক্ষিত আছে।

শার্লিম্যানের সময় ও তৎপরবর্তী কাল হইতে ফ্রান্সদেশে চিত্রবিদ্যার আভাস পাওয়া যায়। ফরাসী চিত্রকরগণ ইতালীয়দিগের নিকট হইতেই শিক্ষা করিত, পরে সিমন্ ভেঁট (Simon route) (১৫৮২-১৬৪১ খৃঃ) স্বাধীন প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেন।

বহুকাল হইতে ইংলণ্ডে চিত্র অঙ্কনের কথাঙ্কিৎ আভাস পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেখানে হস্তলিখিত পুস্তকাদি সুন্দর চিত্রাদির দ্বারা সূশোভিত করা হইত। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ডারহাম বুক (Durham Book) ইহার প্রমাণ স্থল। কিন্তু ক্রমে পরবর্তী কালে ইহার ব্যবহার কমিয়া যায়। ৭ম ও ৮ম হেনরির সময় বিদেশীয় চিত্রকরগণ রাজপ্রাসাদের চিত্রাদি কর্ষে নিযুক্ত ছিল। পরে এলিজাবেথের রাজত্বকালে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরাজ চিত্রকরগণ প্রাহত্ব হন। বাস্তবিক এই সময় হইতেই ইংরাজ চিত্র-বিদ্যার উৎপত্তিকাল ধরা যাইতে পারে। এই সময় নিকলস্ হিলিয়ার্ড ও তাঁহার শিষ্য আইজাক্ অলিভার প্রধান।

প্রথম চার্লস্ নামান্বান হইতে উৎকৃষ্ট চিত্রসকল সংগ্রহ করিতেন। সকল বস্তুলোকেই তাঁহার অঙ্করণ আরম্ভ করেন। ইহাতে ইংরাজ চিত্রকরগণ উৎসাহ পাইতে লাগিল। এ সময়ে যদিও অনেক বিদেশীয় চিত্রকর ইংলণ্ডে বাস করিত এবং অল্প অনেক বিষয়ে তাহারা ইংরাজ চিত্রকরদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তথাপি প্রতিমূর্তি চিত্রে ইংরাজ চিত্রকরগণই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। যাহা হউক, তৎপরেও অনেক চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে বিখ্যাত ইংরাজ চিত্রকর উইলিয়ম্ হগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪ খৃঃ) চিত্রবিদ্যার নূতন পথ আবিষ্কার করেন। সর জশুয়া রেণল্ড (Sir Joshua Reynold) প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ

ইংরাজ চিত্রকর। প্রতিমূর্তি চিত্রে ও যথাযথ বর্ণবিজ্ঞানে তাঁহার ভায় অদ্ভুত শক্তি অল্প লোকেরই ছিল। ইনি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর অনেক বিখ্যাত চিত্রকর প্রাদুর্ভূত হন। পল সাণ্ডবি (Paul Sandby ১৭২৫-১৮০৯ খৃঃ) ইংলণ্ডে প্রথম জলীয় রঙে কাগজের উপর ছবি আঁকিবার প্রথা উদ্ভাবন করেন। ক্রমে তাহারই উন্নতি হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

মুসলমানদিগের মতে জীবন্তপ্রাণীর মূর্তি অঙ্কিত করা পাপ, সেই জন্য অনেক বাদসাহ চিত্রবিদ্যার উন্নতিকল্পে উদ্যোগী ছিলেন। ভারতের বিখ্যাত মোগলসম্রাট অকবর ঐ কুসংস্কার অপনোদন করিয়া অনেক বিখ্যাত চিত্রকর দিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি রাজমুনামা নামে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পারসী অলুবাদ করান। জয়পুর-রাজপুতকাগারে হস্তলিখিত ও সচিত্র ঐ মহাগ্রন্থের এক খণ্ড আছে। ঐ গ্রন্থের ছবি প্রায় চারিলক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বোৎকৃষ্ট পারসিক চিত্রকরগণ কর্তৃক চিত্রিত হয়। তখনকার বাদশাহ ও নবাবদিগের বহুসংখ্যক চিত্র আজও বর্তমান আছে। মুসলমানদিগের নিকট হইতে এদেশীয় চিত্রকরগণ কিছু কিছু শিক্ষালাভও করেন।

অজস্রাণ্ডহা নির্মাণের পর এদেশে চিত্রবিদ্যার বিশেষ হৃদঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। বর্তমান দেশীয় চিত্রকরগণ যেরূপ চিত্র প্রস্তুত করেন, তাহা অতি কদর্য। তাহাদের চিত্রে আকারের সামঞ্জস্য, কিম্বা চিত্র ও চিত্রিত বস্তুর সৌম্যদৃশ কিছুই নাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য অঙ্ককরণে পুনর্বার ইহার উন্নতি হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান নগরে গবর্ণমেন্টের সাহায্যে চিত্রশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়াই স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ভার করিতেছে। বলা বাহুল্য ঐ সকল চিত্রের অধিকাংশই পাশ্চাত্য রুচি অনুযায়ী, কিন্তু ইহাই এক্ষণে ভারতীয় চিত্রবিদ্যাকে পুনর্জীবন দান করিতেছে।

কেবল চক্ষুর প্রীতি সম্পাদন করাই চিত্রবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। চিত্রবিদগণ ইহার অল্পলীলনে বিমল আনন্দ অলুভব করিয়া থাকেন। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত যেমন গ্রহগণের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া আনন্দিত হন, সেইরূপ চিত্রকর সুন্দর বর্ণবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক দৃশ্যদর্শনে কিম্বা নানারূপ চিত্রাদি কল্পনা করিতে করিতে অপার আনন্দনীরে ভাসিতে থাকেন। ইহার অল্পলীলন এক

বিভিন্ন আমোদের আকর। চিত্রবিদ্যাশুশীলনে যুবকগণের রুচি ও প্রবৃত্তি সকল মার্জিত ও উন্নত হয়। ইহা দ্বারা উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনের চক্ষু ফুটে এবং মানব-মনে ভাবের লহরী প্রবাহিত হয়। পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়িয়াও কোন স্থানের দৃশ্য বা কাহারও অজ্ঞতদ্বী হাবভাবাদির বর্ণনায় মনে যে ভাবের উদয় না হয়, হয়ত সূচিত্রকরের শুদ্ধ একটা মাত্র চিত্রদ্বারাই তাহা অনায়াসে হইতে পারে। সুতরাং সূচিত্রকর সূকবি হইতে ন্যূন নহেন। বরং অনেক অংশে উৎকৃষ্ট, কেননা কবির বর্ণনা যতই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হউক না কেন, তাহা চিত্রের দ্বারা সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে উদ্ভেদ করিতে পারে না। আবার কবির মনোভাব সেই ভাষাভিঞ্জ লোকেরই বোধগম্য, কিন্তু চিত্রকরের মনোভাব সকল লোক সকলকালেই বৃদ্ধিতে পারে। এতদ্ব্যতীত চিত্রদ্বারা অস্ত্রাশ্র শিল্পাদি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ও তজ্জন্ত দেশের ধনাগম হইয়া থাকে এবং চিত্রবিদ্যায় প্রাচীন পরিচ্ছদাদি ও বিখ্যাত জনগণের মূর্তি প্রভৃতি চিরজীবিত করে, সুতরাং ইতিহাসের সম্যক উন্নতি সাধিত হয়।

বর্তমান চিত্রকার্য্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, রেখাদি দ্বারা অঙ্কিত করা ও পরে বর্ণাদি দ্বারা রঞ্জিত করা। প্রস্তর, প্রাচীর, কাষ্ঠ, বস্ত্র বা কাগজের উপর চাখড়ি, উড্‌পেন্সিল বা কালির দ্বারা প্রধানতঃ অঙ্কনকার্য্য সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থী প্রথমে সরল, বক্র প্রভৃতি নানারূপ রেখা টানিতে অভ্যাস করে, তাহাতে দক্ষতা জন্মিলে বৃত্ত ত্রিভুজাদি জ্যামিতিক ক্ষেত্র অঙ্কন করিতে শিখে। ইহা সম্পূর্ণ আরম্ভ হইলে পর নানাবিধ বস্তুর ও মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদির প্রতিকৃতি আঁকিতে অগ্রসর হয়। প্রথম প্রথম বস্তু সকলের কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাত্র প্রদর্শন করিতে শিখে। পরে সমতলের উপর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ তিনদিকই আঁকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ চিত্রকে (Perspective drawing) বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কিছু অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। ক্রমে চিত্রকর অনেক বস্তু একত্র যথাযথ আকারে অঙ্কন করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকার চিত্রে বস্তু সকলের আকার সমাধিপাতিক হইবে এবং আলোকময় ও অন্ধকারময় ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত অঙ্কন করা আবশ্যক। সুদক্ষ চিত্রকর এমন সুন্দরভাবে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন যে, তাহা দেখিলে প্রকৃত বস্তু বলিয়া ভ্রম জন্মে। আলোক ও অন্ধকার-চিত্রে প্রদর্শন করিতে দৃষ্টির প্রখরতা ও বিশেষ অল্পলীলন প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য যথা, নগরমধ্যস্থ রাজপথ, নদীতীর, বন,

বা উপবসাদি অঙ্কন করাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। এই প্রকার চিত্রে পদার্থ সকল যেরূপ তাহে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আকারেই তাহাদিগকে অঙ্কিত করিতে হয়। আমরা নিকটস্থ পদার্থ সুস্পষ্ট, বৃহৎ ও উজ্জ্বল দেখি; চিত্রেও তাহাদিগকে বৃহদাকার ও সুস্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিতে হয়। ক্রমে যতই দূরে যায়, ততই আকার ও স্পষ্টতার হ্রাস হয়। এইরূপ চিত্রের আকাশভাগে ঈষৎ মেঘমালা এবং চন্দ্রাদি অঙ্কন করিলে চিত্র অতি মনোহর দেখায়। শিক্ষার্থী প্রথমাৱস্থায় অল্প চিত্র অথবা ফটোগ্রাফ দেখিয়া তাহার নকল করে, পরে তাহাতে বিশেষ পারদর্শী হইলে প্রাকৃতিক বস্তু দেখিয়া তাহাই অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করে। কিরূপ স্থানে কোন দিক্ হইতে দেখিয়া অঙ্কন করিলে চিত্র সুন্দর হইবে, তাহা জানিতে হইলে অভিজ্ঞতা চাই।

শিক্ষার্থী প্রথমে একখণ্ড পুরুকাগজ, তাহা বসাইবার একটা সমতল তক্তা, কএকটা উড়পেন্সিল ও একটুকরা রবার লইয়া চিত্র অভ্যাস করিতে পারে। চিত্রের নানাস্থান নানাপ্রকার পেন্সিলে অঙ্কিত হয়। কোথাও ঘোর কৃষ্ণ, কোথাও অল্প কৃষ্ণ, কোথাও নীতাস্ত ফিকে। নিকটস্থ পদার্থ ও তাহাদের ছায়া ঘোর করিতে হয়। দূরস্থ বস্তু অপেক্ষাকৃত ফিকে কাল করা উচিত। রবারের পরিবর্তে চিত্রকরেরা পাউরুটির খণ্ড ব্যবহার করে। চিত্রের পরিচ্ছন্নতার বিষয় দৃষ্টি থাকি আবশ্যিক, নতুবা সামান্য কারণেই চিত্র নষ্ট হইয়া যায়।

মহুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা চিত্রবিদ্যার একটা প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ নাসিকা, কর্ণ, হস্তপদাদি এক একটা অঙ্গের উৎকৃষ্ট চিত্র লইয়া তাহার নকল করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত নকল আদর্শের সমান না হয়, ততক্ষণ যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট নকল অঙ্কিত করিতে হয়। এইরূপে ছোট বড় সকল আকারে ও ভঙ্গীতে হস্ত, পদ, বক্ষ, কটী, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি অঙ্কিত করিতে বিশেষ পারদর্শী হইলে পর শিক্ষার্থী ঐ সকলের একত্র সমাবেশ করিয়া মহুষ্য দেহ অঙ্কিত করিবে। মহুষ্য শরীরের সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রকর চিত্রের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিবেক। মহুষ্য দেহ অঙ্কিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

১। কাগজের যে পরিমাণ স্থানে চিত্র অঙ্কিত হইবে দাগ দিয়া লও।

২। ঐ পরিমাণ স্থানের অনুযায়ী করিয়া মস্তক অঙ্কিত কর।

৩। স্বক, বাহ ও বক্ষ অঙ্কিত কর।

৪। অবশেষে অগ্রে যে পদের উপর ছবি দাঁড়াইবে তাহা ও তৎপরে অঙ্গ পদ অঙ্কিত কর।

নগদেহ অঙ্কিত করিতে হইলে যথাস্থানে শিরা প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে হয়। হস্তপদাদি দ্বারা কোন কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইলে তত্তৎস্থানের শিরাদি অধিক সুস্পষ্ট করিতে হয়। কিশোর দেহে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা শিরাদি প্রদর্শন করা অত্যাশঙ্কনীয়। স্থূলকায় ব্যক্তি, সুন্দর যুবা ও বালকদিগের শরীরে বড় একটা শিরা অঙ্কিত করিবে না। সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি আঁকিতে হইলে শিরা একবারেই পরিত্যাগ করিবে।

মহুষ্যের মুখ, চোখ প্রভৃতি দেখিয়া তাহার মানসিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়, সুতরাং চিত্রেও উহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। মুখই মানবদেহের দর্পণস্বরূপ, সুতরাং মানসিক অবস্থা চিত্রনে মুখের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বিষাদ প্রকাশ কালে মস্তক অনাহত রাখিতে হয়, ঔজ্জ্বল্য, নির্ভীকতা বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ কালে মস্তক সোজা ও উত্তোলিত রাখিবে। অবসন্নভাবে দেখাইতে মস্তক একপার্শ্বে হেলিয়া রাখিবে। এইরূপ মস্তকের নানারূপ বিস্থাপনে চিন্তা, বিলাপ, অহঙ্কার, ভীতি প্রদর্শন, প্রেম, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। মস্তকের মধ্যে আবার চক্ষু ও মুখদ্বারাই ভয়বিষমাদি জানা যায়।

চিত্র অঙ্কিত হইলে পর তাহাতে রঙ দিবে। বস্তু সকলের স্বাভাবিক বর্ণ যে প্রকার, চিত্রেও সেই সেই প্রকার বর্ণাদি প্রয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে চিত্র আরও সুসদৃশ ও সুন্দর হয়। বর্ণয়োজনা নানা প্রকার হইয়া থাকে। জল, কাঁই-মণ্ড, গঁদ, তৈল প্রভৃতির সহিত, মিশ্রিত করিয়া চিত্রে রঙ ফলাইতে হয়, যে সকল রঙ জলে দ্রবণীয় তাহাদিগকে জলের রঙ (water colour) ও যাহা তৈলে দ্রবণীয়, তাহাদিগকে তৈলবর্ণ কহে। রঙ জলে দ্রব করিয়া চিত্র অঙ্কন করাকে painting in water-colour বা water-painting এবং তৈলে দ্রব করিয়া অঙ্কন করাকে Oil painting বলে। এই দুইটা পরস্পর বিভিন্ন বিদ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরগণ কর্তৃক অনুশীলন হইয়া থাকে।

সকল রঙ প্রধানতঃ তিন প্রকার। ১ আকরিক, ২ ধাতব ও ৩ উদ্ভিজ্জ। হিন্দুল, হরিতাল, মনঃশিলা প্রভৃতি আকরিক; সিন্দূর, জাঙ্গাল প্রভৃতি ধাতব এবং নীল, লাকারসাদিবর্ণ উদ্ভিজ্জ। জলে গুলিয়া রঙ করিতে হইলে প্রায়ই শেবোক্ত প্রকার রঙই ব্যবহৃত হয়। আজকাল মেজেক্টর সাহেব ও অত্যাশ্চর্য্য অনেক কোম্পানির প্রস্তুত বহুপ্রকার জলের রঙ পাওয়া যায়। রঙ দিয়া কাগড় কিম্বা কাগজের উপর ছবি আঁকা যায়, কিন্তু এই প্রকার ছবি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহাদের রঙ শীঘ্রই ফিকে হইয়া পড়ে। অধিক কাল

স্থায়ী করিবার জন্য বার্ণিস মাখান হইয়া থাকে। বার্ণিস করিলে চিত্র উজ্জ্বল হয় এবং ধূলি লাগিয়া সেই চিত্র নষ্ট হয় না।

তৈলচিত্র (oil painting) অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহা সচরাচর বস্তুর উপর অঙ্কিত হয়। একথানা মোটা কাপড় ফ্রেমে টান করিয়া লাগাইয়া তাহাতে একরূপ প্রলেপ মাখান হয়। ঐ প্রলেপযুক্ত বস্তুর ছিদ্র থাকে না ও রঙ দিলে আর চুপসিয়া যায়না। তিসি, গর্জন প্রভৃতি তৈলে রঙ গুলিয়া ছবি আঁকিতে হয়। হিন্দুল, হরিভাল, সফেদা, ভূষা প্রভৃতি এই কার্যে ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার তৈল এখন তৈয়ারি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল রঙের কতক একটি ক্ষুদ্রপাত্রে রাখিয়া আবশ্যক মত তুলি দিয়া চিত্রে লাগান হয়। চিত্র আঁকা হইলে পর তাহা বার্ণিস করিতে হয়।

এদেশে পূর্বকালে কিরূপ তৈলচিত্র ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে মুসলমানদিগের সময় যে ভারতে তৈলচিত্রের প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল তৈলচিত্রে তেমন উন্নতি লক্ষিত হয় না।

তৈল চিত্র প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে অধিক উন্নতি লাভ করে নাই। নানাস্থানে মোটামুটি রকমের তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের চিত্রই প্রধান। তথায় পুরাতন বস্ত্র কর্দ্ম লেপন করিয়া পরে গাল। সংযোগে তাহাকে শক্ত ও চিকণ করা হয়, তৎপরে উহাতে চিত্রাদি অঙ্কিত করে। জগন্নাথের পর্কাদির চিত্র সম্বলিত এইরূপ একটি সুদীর্ঘ চিত্রপটের তাড়া ৪০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রীত হয়।

সম্প্রতি যুরোপীয় শিক্ষকের নিকট অনেক ছাত্র এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। এখন অনেক ভারতবাসী উত্তম চিত্রকর হইয়াছেন। ইহারা বড় বড় লোকের, হিন্দুদেব-দেবী এবং সমাজের নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া বখেট অর্থ উপার্জন করিতেছেন।

অট্টালিকার প্রাচীর-গাত্রে ও মন্দির, পুণ্ড, পক্ষ্যাদির চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রথা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত আছে। দেওয়ালের চূণ (কাঁচা) আর্দ্র থাকিতে থাকিতে উহাতে রঙ মাখাইয়া ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়। রঙ চূণের সহিত মিশিয়া কঠিন হইয়া যায় ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কৃষ্ণনগরে এইরূপে চিত্রিত একটি প্রকাণ্ড দালান আছে।

মুসলমানরাজ্যের শেষভাগে (১৫০০ হইতে ১৮০০ খৃঃ অঃ) প্রস্তুত কাগজের উপর অঙ্কিত বাদসাহ প্রভৃতির বহুসংখ্যক প্রতিমূর্তি আজও পাওয়া যায়। কলিকাতা-প্রদর্শনীতে

ঢাকা ও সাহারাণপুর হইতে এইরূপ অনেকগুলি চিত্র সং-গৃহীত হয়। তন্মধ্যে হুজুরান বেগম, শাবস্ত খাঁ, রাজা ঘশোবস্তসিংহ, সম্রাট সাহআলম ও আলমগীর প্রভৃতির চিত্র আছে। জয়পুর রাজপুতকাগারহ 'রাজম্' নামার ছয়টি চিত্র বৃহদাকারে অঙ্কিত করিয়া ভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে একটি যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন, আর একটি রাজসুয়বস্ত্রের চিত্র। বলা বাহুল্য ঐ সকল চিত্র অতি উৎকৃষ্ট। জয়পুরে অন্যান্য পুরুকাগজে উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হয়। ঐরূপ একথানা মহাকালীর চিত্রের মূল্য ২১ টাকা, জয়পুরের রাজার চিত্র ৮ টাকা, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ৪ টাকা।

বিকানীরেও জয়পুরের স্থায় উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হয়। লাহোরের তোতারাম নামে জনৈক চিত্রকরের অঙ্কিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র ভারতীয় যাত্রাবরে রক্ষিত হইয়াছে। লাহোরের চিত্রকরগণের দ্বারা অঙ্কিত কুরুক্ষেত্র, কোরবরাজসভা, কংসবধ, কালিয়দমন, বরাহ অবতার প্রভৃতি চিত্রের মূল্য ৭০, ৮০ টাকা পর্যন্ত।

মাদ্রাজের নানাস্থানে কাগজের উপর উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়। কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মাদ্রাজ হইতে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরভাণ্ডহস্তে ও তাঁহার ছইপার্শ্বে ছই গোপাঙ্গনা, এইরূপ একটি চিত্র প্রেরিত হয়। উহার মূল্য ১৩২ টাকা।

কিছুকাল পূর্বে বাক্সালার পটুয়াগঞ্জ উৎকৃষ্ট হিন্দু-দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করিত। লিথোগ্রাফের প্রতিবন্ধিতায় তাহাদের অতি ছুরবস্থা হইয়াছে। পূর্বধরনের একথানা ছবির মূল্য প্রায় ১০ টাকা। মহিমুরে চিত্রকরগণ যবে রঙ কাগজের উপর চিত্রাদি আঁকে। একখানার মূল্য ৫ হইতে ১৫ টাকা।

পূর্বে বাক্সালার নানাস্থানে কাচের উপর দেবদেবী প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইত। সম্প্রতি উহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের চঙ্গগিরি এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এখনও কাচের উপর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হয়।

দিল্লীতে হস্তীদন্তের উপর অতি সুন্দর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হয়। পারসী হস্তলিপিতে ঐরূপ চিত্র প্রস্তুত হইত। মুসলমান বাদসাহ, বেগম প্রভৃতির প্রতিমূর্তি এবং তাজমহল জুমা মসজিদ প্রভৃতি মন্দিরের চিত্র হস্তীদন্তের উপর জলের রঙে অঙ্কিত হয়। চিত্রকরেরা ফটোগ্রাফ দেখিয়া ও বর্ণ দ্বারা তদনুরূপ চিত্র আঁকিয়া থাকে। এই সকল চিত্রিত হস্তীদন্তের বাস, সম্ভ্রাম কিম্বা মণিযোগে-অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর অনেক মুসলমান হস্তীদন্ত-চিত্রকর সম্প্রতি কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। এক-

ধানা এইরূপ ছবির মূল্য ১০০ হইতে ১০০০ টাকা।
বারাণসী ও চিত্রপল্লীতে এইরূপ চিত্র হইয়া থাকে। জয়-
পুরে অনেকে হস্তীদন্তের উপর চিত্র আঁকিতে পারে।

বারাণসী, ত্রিচনাপল্লী প্রভৃতি স্থানে অস্ত্রের উপর ভিন্ন ভিন্ন
জাতি ও উপজীবীগণের চিত্র এবং পর্ক বাত্রাদির চিত্র
অঙ্কিত হইয়া থাকে।

ভারতের সর্বত্র কাঠের উপর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হয়।
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাকরপুর, দিল্লী, লাহোর, জালন্ধর,
সিমলা, বারাণসী, বরেলি ও পাটনা প্রভৃতি স্থানের চিত্রিত
কাঠের বাজ ও খেলানা বিখ্যাত। কপাট, সিঁদুক, কোটা
প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া পরে বার্ণিস করা হয়।

হস্তলিখিত পুথিতে সুরঞ্জিত চিত্রাঙ্কন-প্রথা বহুকাল হইতে
ভারত, ভোট ও চীনদেশে প্রচলিত ছিল। ভোটদেশের
(তিব্বতের) অনেক প্রাচীন পুস্তকে সিন্ধুপুরুষ ও দেবদেবী-
গণের চিত্র অঙ্কিত আছে। ভারতের অনেক প্রাচীন জৈন
হস্তলিপিতেও এইরূপ তীর্থঙ্কর ও মহাপুরুষগণের চিত্র অঙ্কিত
দেখা যায়। বহুদিন হইতে এদেশে তান্ত্রিক যন্ত্রাদি পুথির
মধ্যেই নানাবর্ণে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে, এরূপ চিত্রিত
চারিশত বর্ষের হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।

হস্তলিখিত পুস্তক চিত্রিত করিতে মোগলসম্রাটগণ
বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। অক্টবর ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজম্
নামা সচিত্র করেন। অলবারের মহারাজ বানীসিংহ পারশু-
কবি সেখ সাদির গুলিস্তান নামক পুস্তকের সচিত্র হস্তলিখিত
নকল করান। উহার কেবল চিত্রগুলিতে ৫০ হাজার টাকা ও
সর্বশুদ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে। এই পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা
নূতন রকম চিত্রদ্বারা শোভিত। জয়পুর প্রদর্শনীতে এই
পুস্তক রাজম্‌নামার সহিত প্রদর্শিত হয়। ১৮৮৩ সালে কলি-
কাতা প্রদর্শনীতে অনেকগুলি সচিত্র হস্তলিখিত পুস্তক
সংগৃহীত হয়। এগুলি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুসলমান রাজগণ
প্রেরণ করেন। উড়িষ্যায় তালপত্রের পুস্তকেও চিত্রাদি অঙ্কিত
দেখা যায়।

সম্প্রতি মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর, কাঠফলকে খোদিত
(Wood cut), লিথোগ্রাফচিত্র (Lithograph), ফটো
লিথোগ্রাফ (Photograph), তাম্রফলক (Copper-plate) চিত্র
প্রভৃতি দ্বারা পুস্তকাদি সচিত্র করা হইতেছে।

পূর্বে কেবল হস্তদ্বারা চিত্রাদি অঙ্কিত ও তাহাতে বর্ণ
যোজিত হইত বলিয়া চিত্র অতিশয় দুর্লভ ছিল। সম্প্রতি
লিথোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতির উদ্ভাবন হওয়াতে চিত্রকার্য
অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে কোন চিত্র-

কর একটা চিত্র অঙ্কিত করিলে লিথোগ্রাফ সাহায্যে তদমুদ্রণ
সহস্র সহস্র ছবি অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। [উহাদের
বিষয় বিবরণ লিথোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চিত্রবিভাগ করস্, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী
পায়দ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র ঘৃতকুমারীর
রসে তিনদিন মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে শোধিত
তাম্রপত্র ৩ তোলা ঐ কজ্জলী দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটা স্থালী-
মধ্যে ঘুটের ছাই রাখিয়া তাহার উপরিভাগে কজ্জলী লিপ্ত
ঐ তাম্রপত্র স্থাপন ও খোল দিয়া ঢাকিয়া পুনর্বার তাহার
উপর ঘুটির ছাই দিয়া স্থালী পূর্ণ করিবে। পরে স্থালীর
মুখে সরা ঢাকিয়া তীব্র অগ্নিতে ২ প্রহর পাক করিবে।
পরদিনে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ ও জামীরের রসে পিষ্ট
করিয়া মৃষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া ৭বার গজপুটে পাক করিবে।
মাত্রা ১ রতি, অমুপান ঘৃত ও মধু। সেবনান্তে কাঁজিতে ঘষা
তালমূলী ও রসুন ভোজন করা কর্তব্য। ইহা ব্যবহারে
ভগন্দররোগ নষ্ট হয়। মিষ্টদ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, মৈথুন
ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন নিষেধ। (ভৈষজ্যরঃ)

চিত্রবীৰ্য্য (পুং) চিত্রং আশ্চর্য্যং বীৰ্য্যং যন্ত বহুব্রী। ১ রক্ত
এরও। (ত্রি) ২ আশ্চর্য্য বলযুক্ত।

চিত্রবৃত্তি (স্ত্রী) কর্মধা°। অদ্রুত ব্যাপার।

চিত্রবেগিক (পুং) চিত্রবেগোন্ত্যস্ত চিত্রবেগ-ঠন্। নাগভেদ।
(ভারত ৫৭ অঃ)

চিত্রবেশ (পুং) কর্মধা°। বিচিত্রবেশ।

চিত্রব্যাত্র (পুং) চিত্রাব্যাহ। [চিত্রাব্যাহ দেখ।]

চিত্রশাল (স্ত্রী) চিত্রার্থা শাল মধ্য কর্মধা°। চিত্র করিবার
জগ্ন নিশ্চিত ঘর, চিত্রগৃহ।

চিত্রশিখণ্ডিজ (পুং) চিত্রশিখণ্ডিনোহিরিমুম্নর্জায়তে চিত্র-
শিখণ্ডিন্-জন্-ড। বৃহস্পতি।

চিত্রশিখণ্ডি-প্রসূত (পুং) চিত্রশিখণ্ডিনঃ প্রসূতঃ সন্ততিঃ
৬-তৎ। বৃহস্পতি।

চিত্রশিখণ্ডিন্ (পুং) চিত্রঃ শিখণ্ডঃ শিখা অন্ত্যস্ত চিত্র-শিখণ্ড-
ইনিঃ (অত ইনি ঠনো। পা ৫।২।১।৫।) মরীচি, অঙ্গিরা,
অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সাত ঋষির নাম। (অমর)

চিত্রশিরস্ (পুং) চিত্রং শিরোহস্ত বহুব্রী। ১ গন্ধর্বভেদ।
(হরিবং ২৬১ অঃ)। ২ মৃত পুরীষোৎপন্ন বিষভেদ। (সুশ্রুত)।

চিত্রশীর্ষক (পুং) চিত্রঃ শীর্ষঃ শিরোহস্ত বহুব্রী, কপ্। কীট-
ভেদ। (সুশ্রুত)

চিত্রশোচিস্ (ত্রি) চিত্রং শোচিঃ তেজো যন্ত বহুব্রী। বিচিত্র-
যুক্ত। “অং নাকং মিত্র-শোচিৎ ময়ং” (ঋক ৫।১৭।২।)

‘চিত্রশোচিবং চিত্রভেজসঃ’ (সারণ) ২ বিচিত্র কীৰ্ত্তিযুক্ত।
 “চিত্রশোচিব্রজসঃ” (ঋক্ ৩।১০।৩।) “চিত্রশোচিব্রচিত্র কীৰ্ত্তিঃ”
 (সারণ)।

চিত্রশ্রবস্ (ত্রি) ১ বিবিধ কীৰ্ত্তিযুক্ত। “অঘিহোতা হবিক্রতুঃ
 সত্য চিত্রশ্রবন্তমঃ” (ঋক্ ১।১।৫।) “চিত্রশ্রবন্তমঃ অয়তে ইতি
 শ্রবঃকীৰ্ত্তিঃ অতিশয়েন বিবিধকীৰ্ত্তিযুক্তঃ। কবিক্রতুশ্চিত্র-
 শ্রবন্তমইত্যত্রোক্তয়ত্র বহুব্রীহিষাং পূৰ্ণগদপ্রকৃতিস্বরস্ব।’
 (সারণ) ২ বিবিধ অন্নযুক্ত। “স্বাং চিত্রশ্রবন্তম হবন্তে” (ঋক্
 ১।৪৫।৩।) ‘হেচিত্রশ্রবন্তম অতিশয়েন বিবিধ হবীরূপায়ুক্ত।
 ...শ্রব ইত্যন্ননাম চিত্রশ্রবো যন্তাসৌ অতিশয়েন চিত্রশ্রবাঃ
 চিত্রশ্রবন্তমঃ। আমন্ত্রিতাহুদাত্তং’। (সারণ)।

চিত্রসংস্থ (ত্রি) চিত্রে সংতিষ্ঠতি চিত্র-সং-স্থ-ক। চিত্রস্থিত,
 চিত্রগত।

চিত্রসঙ্গ (পুং স্ত্রী) চারিচরণ ও ষোল অক্ষরযুক্ত ছন্দোভেদ।

চিত্রসর্প (পুং) কৰ্ম্মবাং। মাদুধান সর্প। (শব্দরং)

চিত্রসেন (ত্রি) চিত্রা সেনায়ন্ত বহুব্রী। নানা সৈন্তবিশিষ্ট।
 “চিত্রসেনা ইয়ুবলা অমৃধাঃ” (ঋক্ ৬।৭৫।২।) ‘চিত্রসেনাঃ
 দর্শনীয়সেনাঃ।’ (সারণ) (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।
 (ভারত ১।১৫ অঃ)। ৩ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ২।১০ অঃ)
 ৪ পুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের অত্যন্তম পুত্র। (ভারত ১।১৫।৫২)
 ৫ শম্বরাস্ত্রের পুত্র। (হরিবং ১৬।১৪৩।) ৬ নরপতি
 নরিষ্যস্তের পুত্র। (ভাগ০ ৯।২।১২)।

চিত্রস্থ (ত্রি) চিত্রে তিষ্ঠতি চিত্র-স্থ-কঃ। চিত্রাপিত, চিত্রগত।

চিত্রহস্ত (পুং) চিত্রোহস্তঃ হস্তক্রিয়া যত্র বহুব্রী। যুদ্ধাঙ্গ হস্ত-
 ক্রিয়াভেদ। (ভারত ২।২ অঃ)

চিত্রা (স্ত্রী) চিত্র অচ-টাপ্। ১ ত্রীকৃষ্ণের সখী, ব্রজাঙ্গনাভেদ।
 (উজ্জল নীলমণি) ইহার বয়স তেরবৎসর আটমাস, বর্ণ গৌর,
 বসন জাতীপুষ্প সদৃশ, কৰ্ম্ম চিত্রকরা। ইহার কুঞ্জ ত্রীকৃষ্ণের
 আনন্দ-সুখদ। (গোব্বাসি-গ্রন্থ)। ২ মুবিকপর্ণী। ৩ গোড়ুয়া,
 রাজগোমুক। ৪ স্তম্ভজা। ৫ দস্তিকা, দস্তীবৃক্ষ। ৬ মায়া।
 ৭ সর্পভেদ। ৮ নদীবিশেষ। ৯ চিত্রের ভগিনী, ইনি
 নদী হইয়া চিত্রপথা নামে আখ্যাত। (প্রভাস) ১০ অঙ্গরা-
 বিশেষ। ১১ মুগেবারু। ১২ গণ্ডদূর্কা, গণ্টেদূর্কাবাস। ১৩
 মঞ্জিষ্ঠা। ১৪ বিড়ঙ্গ। ১৫ আখুর্কণী, ইছরকাণী। ১৬ যবনিকা।

১৭ নক্ষত্রবিশেষ, (Spica virginis) প্রথম শ্রেণীর উজ্জল-
 নক্ষত্র। অশ্বিনাদি নক্ষত্রের মধ্যে চতুর্দশ তারা, ইহা মুক্তার
 মত উজ্জল প্রভায়ুক্ত, ইহার তারা সংখ্যা এক, কিন্তু ইহার
 যোগতারাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা উত্তর দিকে চিত্রাক্ষ,
 অপাংবৎস নামে বিখ্যাত। ইহার কলার পরিমাণ ৪০।

ইহার বিক্ষেপ দুই কলা। ইহার কলাংশ ১৩ অর্ধাৎ
 সূর্য্যাক্ষর ত্রয়োদশ অংশ মধ্যে অন্ত এবং ত্রয়োদশ
 অংশের পরে উদিত হয়। গণিতস্থলে সামান্ত অন্তর ঘটে।
 ইহা পূর্ব্বদিকে উদয় হয় ও পশ্চিমদিকে অন্ত যায়।
 (সু* সি* রজনাত।) ইহার দেবতা বিশ্বকর্মা।

এই নক্ষত্র জন্ম হইলে তাহার ফল এইরূপ ঘটয়া
 থাকে। প্রতাপে প্রতিপক্ষ পক্ষপরিভাগিত, নীতিশাস্ত্রে
 নিপুণ, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধানকারী ও নানা শাস্ত্রে
 পারদর্শী। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)।

চিত্রানক্ষত্র যখন আকাশমণ্ডলে মহায্যের মন্তকের ঠিক
 উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তখন মকরলগ্নের প্রথমকলা
 উদিত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হয়। (কালিদাসকৃত রাতি-
 লমনিরূপণ)। এই চিত্রানক্ষত্রে বা স্বাতীনক্ষত্রে বৃহস্পতি
 গ্রহের উদয় বা অন্ত ঘটে, তখন বার্ষিক্যচৈত্র নামে
 সংবৎসর হইয়া থাকে। কথ্যরাশির ২৩ অংশ ২০ কলা
 গত হইলে তুলারাশির ৬ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত চিত্রানক্ষত্রের
 ভোগকাল অর্থাৎ সেই সময়ে ক্ষুণ্ণাংশ অল্পসারে সূর্য্য
 প্রভৃতি গ্রহগণ চিত্রানক্ষত্রে থাকেন। ইহা পার্শ্বমুখ নক্ষত্র।
 ইহাতে যন্ত্র, রথ, জলযান, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ এবং গো,
 গজ, বাজি প্রভৃতির কার্য্য শুভদায়ক। (জ্যোতিষতত্ত্ব)
 চিত্রবিচিত্র মনোহর রূপলাবণ্যই ইহার চিত্রা নামের কারণ।
 (শতপথব্রা ২।১।২।১৭) পুরাণে দক্ষপ্রজাপতির চতুর্দশ
 কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইনি ও চন্দ্রের পত্নী বলিয়া
 গণ্য। চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র প্রায় এই নক্ষত্র
 ভোগ করেন, গগন্যার গোলযোগে বা অস্ত্র কোন কারণে
 কখন কখন দুই এক নক্ষত্র অন্তরে পড়ে। ইহার স্থিতি
 ৩০ মুহূর্ত্ত।

এই নক্ষত্রে মেঘে সূর্য্যগ্রহের সঞ্চারণ হইলে তীরে গোটকা-
 পাত হইয়া থাকে, তাহার ফল সর্ব্বদেশে স্তম্ভের বৃষ্টি তন্দ্বারা
 সকলপ্রকার শস্তের উন্নতি ও সর্ব্বজনের আনন্দ হয়।

রাত্রিমানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক
 মুহূর্ত্ত হয়, তাহার চতুর্দশ ভাগকে চিত্রার মুহূর্ত্ত বলা যায়,
 যদি সে নিবস রাত্রিকালে অন্ত কোন নক্ষত্র থাকে, তথাপি
 চিত্রানক্ষত্রে যে যে কার্য্য করিবার বিধি আছে, তাহা
 ঐ মুহূর্ত্তে করিতে পারা যায় (১) এই নক্ষত্রে যাহার জন্ম
 তাহার রাক্ষসগণ হয়। রাক্ষসগণ ও নরগণের বিবাহে মেল
 হয় না। কেহ বলেন রাক্ষসগণ পুরুষ ও নরগণ কন্যা হইলে

(১) “নক্ষত্রে বহিঃস্থিতঃ তৎকার্য্যং ওমুহূর্ত্তেপি।” শুদ্ধীপিকা

বিবাহে মেল হয় (১)। সোমবার চিত্রানক্ষত্রে যোগ পাইলে পাণযোগ ও করকচা নামে যোগ হয়, তাহাতে যাত্রা নিবেশ। রবিবার বা মঙ্গলবারে চিত্রানক্ষত্র যোগ পাইলে যদি উত্তরপক্ষের প্রতিপদ বা বজ্র কি একাদশী তিথি মিলে, তবে অমৃতযোগ হয়। অমৃতযোগে সর্বকর্ম্য সিদ্ধিকর। শুক চিত্রানক্ষত্র যাত্রার মধ্যফলন বলিয়া উক্ত আছে। শনিবারে চিত্রানক্ষত্রে যোগ পাইলে কালযোগ হইয়া থাকে। ইহার যেমন নাম, তেমনি অন্তত জানিবে। যুদ্ধ নক্ষত্রবর্গের মধ্যে চিত্রা নক্ষত্র আছে, ইহাতে মিত্রতা, মৈথুনাদিবিধি, বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গলগীত এই সকল কার্যে শুভ হয়। চিত্রা নক্ষত্রে জরোৎপত্তি হইলে অর্ক্যাস ভোগ করিতে হয়। কৌশিকের মতে চিত্রোদন ও যুত হোম করিলে পীড়া নিবৃত্তি হয়। ভীষ্মপরাক্রমে লিখিত আছে, বে চিত্রাতে পিষ্টক ও তণ্ডুলপুষ্প দিবে। (জ্যোতিষ)

১৭ চন্দ্রের পত্নী নক্ষত্রভা ভেদ। ১৮ গায়িত্রীস্বরূপা মহাশক্তি। (দেবীপুঃ ৬।৫২)। ১৯ চিত্রায়াং জাতা অণু তন্ত লুক (চিত্রায়োহিণীভাঃ জিয়ার্মপসম্মানং। পা ৪।৩।৩৪ বার্তিক) চিত্রানক্ষত্রে জাতা জ্ঞী। জ্ঞী না বুঝাইলে অণের লুক হইবে না। যথা চৈত্র।

২০ মুখিককর্ণী, ইন্দুরকানী। ২১ ছন্দোবিশেষ, ইহার পাদে পঞ্চদশটী অক্ষর, তাহার ১০ম ১৩শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট সকল গুরু হইবে। “চিত্রা নাম ছন্দো যস্মিন্ জ্যোত্সোমাস্ততোযো” (বৃত্তরং টীকা)

চিত্রা, বাঙ্গালার যশোর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। এই নদী যশোরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালীগঞ্জ, খজুরা, ঘোড়াখালি, নড়াইল ও গোবড়া নামক স্থান সকল অতিক্রম করিয়া পুনরায় উক্ত জেলার অভ্যন্তর দেশস্থ জলাপ্রদেশ মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছে। আষাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণ-মাস পর্যন্ত এই নদীতে বড় বড় নৌকা সকল গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু অপর সময়ে সামান্য ডিল্লী ভিন্ন অল্প কোন নৌকা যাইতে পারে না। গত শতাব্দীর মানচিত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, এই নদীটী প্রথমে নবগঙ্গার শাখানদী ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে নবগঙ্গার চড়া পড়ায় ও নীলকর কুটিয়ালগণ বাঁধ প্রস্তুত করায় ইহার উৎপত্তিস্থান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

চিত্রাঙ্ক (ত্রি) চিত্রে অক্ষিণী যন্ত বহুব্রী, যচ্। (বহুব্রীহৌ

সকথ্যক্কাঃ স্বাক্ষাৎ যচ্। পা ৪।৪।১১৩) ১ বিচিত্রনেত্রযুক্ত। ২ যুতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৫)

চিত্রাক্ষী (জ্ঞী) চিত্রাঙ্ক-জিয়ার্ণ ভীষ্ম। শারিকা, শালিকপাখী। চিত্রাক্ষুপ (পুং) নিত্যসং। জ্যোত্সুপী।

চিত্রোজ (পুং) ১ যুতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৬) ২ রক্তচিত্রক, রাংচিতা। ৩ সর্পভেদ। ৪ চিত্রক, চিতা। ইহা বাতশালক, বল ও মেদবর্জক। (হারীত ১১ অঃ)। (ক্লী) চিত্রং অঙ্গং যন্তাৎ বহুব্রী। ৫ হিঙ্গুল। ৬ হরিতাল। চিত্রং অঙ্গং যন্ত। (ত্রি) ৭ বিচিত্র অঙ্গযুক্ত।

চিত্রোজদ (পুং) ১ সত্যবতীর গর্ভজাত শাস্ত্রহর পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিচিত্রবীর্ষ্য। চিত্রোজদ গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের সংগ্রামে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ২ গন্ধর্ববিশেষ। (সেবীভাগঃ ১।২০।২২) ৩ দশার্ণ দেশের একজন রাজা। (ভারত অঙ্কঃ ১৫) ৪ বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎ ২২।১৩৬) চিত্রোজদসু (জ্ঞী) চিত্রোজদ-সু-কিপু। শাস্ত্রহর জ্ঞী সত্যবতী। (ভারত ১।১০১ অঃ)।

চিত্রোজদা (জ্ঞী) ১ একটা অক্ষর। (ভারত ১৩।১২০ অঃ) ২ অর্জুনের জ্ঞী। ইনি মণিপুরপতি চিত্রবাহনের কন্যা। (ভারত ১।১২৫ অঃ)। ৩ রাবণের জ্ঞী, বীরবাহর জননী। চিত্রোজ্ঞী (জ্ঞী) চিত্রং অঙ্গং যন্তাৎ বহুব্রী, জিয়ার্ণ ভীষ্ম। ১ মজ্জিষ্ঠা। ২ কর্ণ জলোকা, কেয়ুই।

চিত্রাটীর (পুং) চিত্রাং নক্ষত্রবিশেষং অটতি চিত্রা-অট্ট-জির্। ১ চন্দ্র। (চিত্রং তিলকং অটতি প্রাপ্নোতি বলিচ্ছাগ্রাবিন্দু-ভিরিতার্থঃ) ২ উৎকৃষ্ট রক্তদ্বারা অঙ্কিত ঘণ্টাকর্ণের কপাল দেশ। ৩ শিবের অমুচরবিশেষ, ঘণ্টাকর্ণ।

চিত্রাদিত্য (পুং) চিত্রাশ্চ চিত্রগুপ্তশ্চ আদিত্যঃ। ৬তং। প্রভাসতীর্থে চিত্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত সূর্য্যমূর্ত্তিভেদ। ঐ মূর্ত্তি চিত্রপথা নদীর নিকটে অবস্থিত। যিনি চিত্রপথায় স্নান করিয়া চিত্রাদিত্যকে দর্শন করেন, তাহার সূর্য্যালোকে গমন হয়। (স্কান্দে প্রভাসথঃ)

চিত্রোদ্র (ক্লী) কর্ম্মধাং। অঙ্গবিশেষ। (যাজ্ঞবল্ক্য)। যব ও তিল-তণ্ডুল ছাগীর ছুঁড়ের সহিত পাক করিয়া পরে ছাগীর কর্ণের রক্ত দিয়া রঞ্জিত করিলে তাহাকে চিত্রোদ্র বলে।

চিত্রোপূপ (পুং) কর্ম্মধাং। পিষ্টকবিশেষ, চিতুইপিঠা। (ত্রিকাণ্ডঃ) চিত্রোমঘ (ত্রি) বিচিত্র ধনযুক্ত। জিয়ার্ণ টাপু। “ঋষি চিত্রোমঘে! হবৎ।” (ঋক্ ১।৪৮।১০।) “হে চিত্রোমঘে! বিচিত্র ধনযুক্তে! মঘমিতি ধন-নাম। চিত্রং মঘং যন্তাঃ সা চিত্রোমঘা। অজ্ঞেযা-মপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়াং পূর্ব্বপদস্ত দীর্ঘক্” (সায়ণ।)

চিত্রোমঘা (জ্ঞী) চিত্রোমঘ-টাপু। উবা। (নিঘণ্টু)।

(১) “মাহুবীচ বর্ষা কন্যা রাক্ষসন্ত বর্ষা যঃ।

তদোর্ব্বিহাঃ শুভদো গর্গঃ লংপ্রজপৌ মৃদিঃ।” (গর্গসংহিতা)

চিত্রায়স (ক্লী) চিত্রঃ অয়ঃ কৰ্মধা ট্‌ সমা° (অনোন্মায়ঃসরসায়ঃ
জাতি সংস্করণঃ। পা ৫।৪।২৪) তীক্ষ্ণলোহ, ইন্দ্রপাত।

চিত্রায়ুধ (ত্রি) চিত্রাণি আয়ুধানি যন্ত বহুব্রী। ১ আশ্চর্য্য
আয়ুধযুক্ত। (পুং) ২ যুগ্মরাত্রেয় একপুত্র। (ভারত ১।১১৭অঃ)
কৰ্মধা°। (ক্লী) ৩ আশ্চর্য্য আয়ুধ। “চিত্রায়ুধ-সুরক্ষিতং।”
(ভারত ২।১৬ অঃ)।

চিত্রায়ুস্ (ত্রি) চিত্রমায়ুধস্ত বহুব্রী। চিত্র গমন বা অন্ন যুক্ত।
“পাবীরবী কস্তা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী।” (ঋক্ ৬।৪৯।৭) ‘চিত্রায়ুঃ
চিত্রগমনা চিত্রান্না বা’ (সারণ)।

চিত্রারম্ভ (ত্রি) ১ চিত্র অঙ্কনের প্রথমে রেখাদি টানা।

আ-রম্ভ-কৰ্মণি ষণ্। (পুং) ২ চিত্রলিখিত পুস্তকাদি।

চিত্রাপিত্ত (ত্রি) চিত্রে অর্পিতঃ ৭তৎ। চিত্রশস্ত্র, চিত্রিত।

চিত্রাপিত্তারম্ভ (ত্রি) চিত্রে অর্পিত আরম্ভো যন্ত বহুব্রী।

চিত্রলিখিত। “চিত্রাপিত্তারম্ভমিবাবতহে” (কুমার ৩।৪২)

চিত্রাল, কাশ্মীর দেশান্তর্গত কুনর বা কাস্কার উপত্যকাস্থিত
চিত্রাল নামক রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৩৫° ৫৫’ উঃ, দ্রাঘি°
৭১° ৫৬’ পূঃ। এই নগর কাস্কারনদী তীরবর্তী মুস্তাজ হইতে
৪৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২০০
ফিট উচ্চ। এখানকার মৃত্তিকা অতিশয় উর্বরা। এখানে
নানাবিধ শস্ত ও প্রচুর পরিমাণে ফল মূল জন্মিয়া থাকে;
বিশেষতঃ এখানকার আঙ্গুরফল অতি প্রসিদ্ধ। পণ্য বিনিময়
দ্বারা এখানকার বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

কিঞ্চদন্তী আছে যে, এই স্থান অফ্রাশিয়াবের সুরাভাণ্ডার
ছিল। এই উপত্যকাভূমির নৈসর্গিক গঠনপ্রণালী ও জল-
বায়ুর শৈত্য কাফ্রিস্থানের সদৃশ। এখানকার পুরুষগণ
সুদীর্ঘ ও দৃঢ়কায় এবং রমণীগণ বিখ্যাত সুন্দরী। ইহাদের
গঠন ও বর্ণ ঠিক চম্বা ও কান্দহার পার্শ্বত্যা অধিবাসীদিগের
জায়। দাসপ্রথা এখানে সাধারণ ভাবে চলিয়া থাকে
এবং এখানকার শাসনকর্তাগণ এ ব্যবস্থা হইতে বিলক্ষণ
উপার্জন করিয়া থাকেন।

চিত্রাবতী, মাজার প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কদাপা জেলার প্রবা-
হিত একটি নদী। ইহা মহিসুর রাজ্যান্তর্গত নন্দীদুর্গ হইতে
নিঃসৃত ও বেলারি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জমলমছগু
তালুকের মধ্যস্থ পেরাননদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চিত্রাবাণ্ড, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাথিয়াবার প্রদেশস্থ
গোহেলবার জেলার একটি সামান্য রাজ্য। এই রাজ্যে এক-
খানি বই আর গ্রাম নাই। এখানকার রাজা বরদারাজকে
কর দিয়া থাকেন।

চিত্রাবন্থ (ক্লী) বিবিধ নক্ষত্রাদি মণ্ডিত রাত্রি।

“চিত্রাবনো স্বস্তি তে পারমণীয়।” (শুক্লযজুঃ ৩।১৮)

‘চিত্রাণি বিবিধানি চন্দ্রনক্ষত্রাঙ্ককাররূপাণি বসন্তি যন্তঃ রাজ্যে
সা চিত্রাবন্থঃ। হে চিত্রাবনো রাজ্যে’ (মহীধর)।

চিত্রারহর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

চিত্রাশ্ব (পুং) সভ্যবানের নামান্তর। তিনি অশ্বের ছবি ভাল-
বাসিতেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

চিত্রিক (পুং) চৈত্র-স্বার্থে-ক-পৃষো°। চৈত্রমাস (শব্দর°)

চিত্রিকা (ক্লী) চিত্রা-স্বার্থে-কন্-কাপি ইষৎ। [চিত্রা দেখ°]

চিত্রিণী (ক্লী) পদ্মিনী প্রভৃতি চতুর্বিধ নারিকার অন্তর্গত মীন-
গন্ধা নারিকা। তাহার লক্ষণ যথা—শরীর অতিদীর্ঘ বা অতি
ধর্ম হইবে না, নাসিকা তিলমূল সম, নেত্রদুটো পদ্মপত্রবৎ
সুন্দর, মুখখানি সর্বদা তিলকাদি দ্বারা চিত্রিত। এই
রূপ সকল গুণগুচ্ছিতা স্তনভারে অবনতা রতিনিপুণা
সুচরিত্রা নারিকাকে চিত্রিণী বলে। একরূপ ক্লী যুগজাতীর
পুরুষের প্রতি অহরন্তু হইয়া থাকে। (রতিমঞ্জরী)।

চিত্রিত (ত্রি) চিত্র-কৰ্মণি-ক্ত। চিত্রপটে লিখিত, চিত্রার্পিত।

চিত্রিন্ (ত্রি) চিত্র-ণিনি। ১ আশ্চর্য্যকারক। অন্ত্যার্থে ইনি।
২ চিত্রকর্মযুক্ত। দ্বিগাং ভীপ্। “ভ্রমিশ্চিন্দ্রাসি তুতুজিরা
চিত্রিনীষাং” (ঋক্ ৪।৩২।২) ‘চিত্রিনীষু চিত্রকর্ম-
যুক্তাসু’ (সারণ)।

চিত্রিয়, একপ্রকার অশ্বখের নাম।

চিত্রীকরণ (ক্লী) আশ্চর্য্যকরণ। চিত্রীকরণ অর্থে ধাতুর উত্তর
সর্বলকারাপবাদক লিঙ্ হয়। (পা ৩।৩।৫০)

চিত্রীয়মাণ (ত্রি) চিত্রঙ্-ক্যচ্ (নমোবরিবচিৎ ৩ঃ কাচ্।
পা ৩।১।১২) শানচ্। যে আশ্চর্য্যায়িত করে। (ভট্ট ৫।৪৮।)

চিত্রেশ (পুং) ৬তৎ। ১ চিত্রানক্ষত্রপতি, চন্দ্র। (ক্লী) ২
চিত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ।

চিত্রেশ্বর (ক্লী) প্রভাসক্ষেত্রস্থ চিত্রগুপ্ত স্থাপিত শিবলিঙ্গ।
(প্রভাসথ°)

চিত্রেশ্বরী, কলিকাতার উত্তর প্রান্তস্থিত চিংপুরে অবস্থিত
একটি দেবীমূর্তি ও তাহার প্রাচীন দেবমন্দির। পূর্বে
এই মন্দির দর্শনে বিস্তর ধাত্রী আসিত, এখন আর তেমন
সমৃদ্ধি নাই।

চিত্রোক্তি (ক্লী) চিত্রা আশ্চর্য্যকারিণী উক্তিঃ কৰ্মধা°।
১ চিত্র কথন। ২ আকাশবাণী। (ত্রিকাণ্ড°)।

চিত্রোড়, বোম্বাইপ্রদেশস্থ কঠকোটের ১৩ মাইল দূরে অব-
স্থিত একটি গ্রাম। ইহার ১ মাইল উত্তরে মিবালা নগরে
প্রতিষ্ঠিত চারিটি প্রাচীন জীর্ণমন্দির পুরাকালের ভাস্কর
বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিবালায় একমাইল

পূর্বপার্শ্বেস্থিত বিত্তিবতীর ভগ্নাবশেষের নিকট একটি মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে, উক্ত মন্দিরে ১৫৫৯ সন্থতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

চিত্রোতি (ত্রি) নানাবিধ তৃপ্তিযুক্ত। “ভূরিবর্ষসশ্চিত্রোত্তরো-
বামজাভাঃ” (ঋক্ ১০।১৪০।৩।) ‘চিত্রোত্তরঃ চিত্রা বিচিত্রা
উত্তিষ্ঠতির্ধায়া তান্ত্রথোক্তাঃ’ (সায়ণ)।

চিত্রোৎপলা, ১ উৎকলের একটি বিখ্যাত নদী। (উৎকলখ-
১১ অঃ) ইহার বর্তমান নাম চিতরতলা। [চিতরতলা দেখ।]
২ পুরাণোক্ত আর একটি নদী। মার্ত্তণ্ডেয় ও মৎস্যপুরাণের
মতে, ইহা ঋক্ষপাদনিঃসৃত। (মার্ত্তণ্ডেয় পুং ৫৭।২২, মৎস্য
১১।৩২৫, বামন ১৩ অঃ)।

চিত্রোপলা (স্ত্রী) চিত্রউপলা যথাঃ বহুব্রী, ত্রিমাং টাপ্।
নদীভেদ। “চিত্রোপলাং চিত্রপথাং।” (ভারত স্ত্রীপ ৯ অঃ)।

চিত্রোদন (স্ত্রী) কেতুপুজার দেয় বিচিত্র অন্নবিশেষ।
“চিত্রোদনঞ্চ কেতুভ্যাঃ সর্বভক্ষ্যৈঃ সমর্চয়েৎ।” (গ্রহযোগতত্ত্ব)
[চিত্রাং দেখ।]

চিত্র্য (ত্রি) চিত্র কর্ণশি যপ্। ১ পুজ্য। “সূর্য্যোমা ধথো দিবি
চিত্র্যং রথং।” (ঋক্ ৫।৬৩।৭।) ‘চিত্র্যং পুজ্যং’ (সায়ণ)।
২ চায়নীয়। “চিত্র চিত্র্যং ভরা রয়িং নঃ।” (ঋক্ ৭।২০।৭।)
‘চিত্র্যং চায়নীয়ং’ (সায়ণ)।

চিদ্ (অব্য) চিং-পুৰোঃ। (সায়ণ) ১ অপ্যর্থ। “শিরিণায়াং
চিদন্তুনা” (ঋক্ ২।১০।৩) ‘শীর্ষ্যন্তেহন্তাং ভূতানীতি শিরিণা
রাত্রিঃ অস্ত্রামপি।’ (সায়ণ) ২ এব। “অমর্ত্যং চিদাসং মজ্জমানম্”
(ঋক্ ২।১১।২) ‘অমর্ত্যং চিং মরণধর্ম্মরহিতমেব’ (সায়ণ)। ৩
চকারার্থ ‘জরাং চিন্মে নিঋতির্জগ্রসীত’ (ঋক্ ৫।৪১।১৭) ‘জরাং
চিঞ্জরাং চ’ (সায়ণ)। ৪ পুজ্য। “ভূরিচিদধ্যাঃ সূদান্তরয়েবা”
(ঋক্ ১।১৮।৫।৯) ‘ভূরি চিং চিং পুজ্যায়াং।’ (সায়ণ)।
৫ কুৎসা। “আরাত্রিচ্ছবসো অন্তমাপুঃ” (ঋক্ ১।১৬।৭।৯)
‘চিদিতি কুৎসায়াং’। (সায়ণ)। ৬ পাদপূরণে। “স্বং চিন্মন্তসে
রয়িং” (ঋক্ ৫।২০।১।) ‘চিদিতি পাদপূরণঃ।’ (সায়ণ)
৭ অসাকল্য। ৮ উপমা। “অথ নিপাতা উচ্চাবচেষথেষু
নিপতন্ত্যপমার্থে হপি।” ৯ কুৎসিত। (নিরুক্ত ১।৪) কিং
শব্দের পরস্থিত চিং শব্দ পূর্বে থাকিলে তিঙস্ত পদ উদাত্ত
হয় না। (পা ৮।১।৪৮) চিংশব্দ পরে থাকিলে তিঙস্তপদও
উদাত্ত হয় না। (পা ৮।১।৫৭) চিংশব্দ উপমার্থে প্রযুক্ত হইলে
বাক্যের অন্ত্যস্বর হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত অল্পদাত্ত স্বর প্রসূত
হইবে। (চিদিতি চোপমার্থে প্রযুক্ত্যামানে। পা ৮।২।১০।১)
চিংসভেশানন্দতীর্থ, সচ্চিদানন্দতীর্থের শিষ্য, ইনি আকা-
শোপস্তাস নামক সংস্কৃত বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চিংসুখ, একজন বিখ্যাত টীকাকার ও নৈসারিক। ইনি
গোড়েশ্বরচাৰ্য্যের শিষ্য ও স্মৃতিপ্রকাশ স্মৃতির গুরু। ইনি
বড়দর্শনসংগ্রহবৃত্তি, আনন্দবোধের জ্ঞানমকরনের টীকা,
প্রত্যকৃত্ত্বদীপিকা বা চিংসুখী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।
ইহার চিংসুখী গ্রন্থে উদয়ন, উদ্যোতকর, কুমারিল,
পদ্মপাদ, বলভ, বাচস্পতি, সুরেশ্বর প্রভৃতির নাম উদ্ধৃত হই-
য়াছে। কানীশওটীকাকার রামানন্দ চিংসুখরচিত ব্রহ্মসুত্রে
ও শ্রীধরস্বামী ইহার রূপে বিষ্ণুপুরাণটীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

চিদম্বর, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। অনন্তনারায়ণের
পুত্র ও কৌশিক সূর্য্যনারায়ণ দীক্ষিতের পৌত্র। ইহার
পুত্রের নামও অনন্তনারায়ণ। ইনি ভাগবতচম্পু, শঙ্কর-
চিন্তামণি ও তাহার টীকা এবং কথাত্রয়ীবাখ্যান বা রাঘববাদব-
পাণ্ডবীয় রচনা করেন। কথাত্রয়ীবাখ্যানের কতকাংশ তাহার
পুত্র অনন্তনারায়ণেরও রচিত।

চিদম্বরম্, ১ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণআর্কট জেলার অন্ত-
র্গত একটি তালুক। পরিমাণ ৩৯৩ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায়
২৭০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে কৃষিকার্য্য হয়। অধিবাসীগণের
প্রায় ৬ অংশ মুসলমান, অবশিষ্ট হিন্দু। ইহার প্রধান নগর
চিদম্বরম্ ও পোট্টোনভো।

২ পূর্বোক্ত চিদম্বর তালুকের প্রধান নগরও একটি প্রাচীন
তীর্থ, ইংরাজেরা চিদম্বরম্ বলিয়া থাকেন। এই নগর কন্দা-
লুরের ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রকূল হইতে ৭ মাইল দূরে অব-
স্থিত। অক্ষা° ১১° ২৪’ ২” উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪’ ৭” পূঃ।
তালুকের সদর বলিয়া এখানে জেলার অধীনস্থ কালেক্টরী,
দেওয়ানি ও পুলিশ আদালত, ডাকঘর ও সাহেবদিগের বাঙ্গলা
ইত্যাদি আছে। অধিবাসীগণের একচতুর্থাংশ রেসম ও
কাপাসবস্ত্র বপন করিয়া থাকে। এখানে চিদম্বরের দেবের
উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর পৌষমাসের শুক্লপঞ্চমী হইতে
পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলায় চতুর্দিক্
হইতে প্রায় ৫০।৬০ হাজার লোক দেবদর্শন ও ব্যবসাদি উপ-
লক্ষে আসিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ-ফরাসী বিপ্লবের সময় চিদম্বরম্ একটি
সেনানিবাস মধ্যে পরিগণিত হয়। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন
কোপ্ দেবীকোটের আক্রমণে বিকল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া
আসিবার সময় সসৈন্তে এখানে উপস্থিত হন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে
ফরাসীরা ইংরাজ সৈন্তদিগকে এই স্থান হইতে তাড়াইয়া দেয়।
১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ইহা দখল করিতে চেষ্টা করেন,
কিন্তু সিজকাম হন নাই। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ফরাসীগণ হয়দার-
আলীকে চিদম্বরম্ অর্পণ করিলে তিনি পরিখা প্রাচীরাদি দ্বারা

সুদৃঢ় করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে সরস্বতীর কূট চিদম্বরম আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও শেষে বিতাড়িত হন।

চিদম্বরম দেবালয়গুলি অতি বিখ্যাত। তন্মধ্যে শিবমূর্ত্তির কনকসভা সর্ব প্রধান। স্থলপুরাণের মতে পঞ্চম মহুর্ তনয় শ্বেতবর্ণ (নামাস্তর হিরণ্যবর্ণ) এই মন্দির নির্মাণ করেন। শ্বেতবর্ণের শ্বেতকূট হইয়াছিল, এই নিমিত্ত পিতৃদত্ত গোড়মাজ্য ভোগে বীতশূঁহ হইয়া তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুর নগরে উপস্থিত হন। তথায় জনৈক ব্যাধ মুখে সংবাদ পাইলেন যে চিদম্বর নগরে ব্যাঘ্রপদ নামে কোন ঋষি বাস করিতেছেন। কোতূহল পরবশ হইয়া তিনি চিদম্বরে আগমন করেন। ঋষির অরণ্য মধ্যে আকাশরূপী শঙ্কর-দেবের এক মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। শ্বেতবর্ণ তথায় আসিলে তিনি ধ্যানযোগে সৰ্বল জ্ঞানিতে পারিয়া শঙ্করের আজ্ঞাক্রমে রাজাকে হেমতীর্থে দান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সেই তীর্থে দান করিবামাত্র রাজার রোগ দূর

হইল তিনি দিব্য কাঞ্চন-কান্তি লাভ করিলেন। তদবধি তিনি শ্বেতবর্ণের পরিবর্তে হিরণ্যবর্ণ নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্করের কৃপায় সেই উৎকট রোগমুক্ত হইয়া তিনি কনক-সভা নামে শিবের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক-মূর্ত্তির অত্যন্ত আকাশমূর্ত্তির পূজা হয়। দেবালয়ের সম্মুখে একটা পর্দা আছে। কোন ব্যক্তি দেব দর্শনে আসিলে পুরো-হিতগণ পর্দা তুলিয়া দেন, তখন দেবালয়ের দেওয়াল ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা দেবতা আকাশরূপী, স্তুত্যাং মানব চক্ষুর অগোচর। এই লিঙ্গ চিদম্বর-রহস্য নামে কথিত এবং ইহা হইতেই নগরের নাম চিদম্বর হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিতগণ দীক্ষিত নামে বিখ্যাত। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে ইহার পদ্মযোনির আদেশে তেজাই হইতে বারাণসী গিয়া বাস করেন। হিরণ্যবর্ণ ইহাদের তিন সহস্র ব্যক্তিকে চিদম্বরে আহ্বান করেন। তদবধি ইহার এখানে বাস করিতেছেন।

এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করিতে গেলে চিদম্বরম মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। কাশ্মীর-রাজবংশের ইতিবৃত্তে হিরণ্যবর্ণ রাজা ও তাঁহার সিংহলজয়ের উল্লেখ আছে। ইনিই যদি চিদম্বরম কনকসভা নির্মাতা হন, তবে ঐ মন্দির খৃষ্টীয় পঞ্চম-শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার কোঙ্গুদেশরাজকাল নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, “বীরচোলরায় এক দিন চিদম্বরেশ্বর (শিব) ও পার্শ্বতীকে সমুদ্রতীরে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদের জন্ত কনকসভা নির্মাণ করেন” এই বীর-চোলরায় ৯২৭ খৃঃ অব্দে হইতে ৯৭৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তদনুসারে এই মন্দির খৃষ্টীয় দশম-শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উক্ত গ্রন্থে অপর একস্থানে উল্লিখিত আছে— “অরিরৈরিদেব নামে বীরচোল-রাজের পৌত্র চিদম্বরেশ্বরের উদ্দেশে গোপুর, মণ্ডপ, সভাগৃহ ও প্রাকারাদি নির্মাণ করেন।” এই অরিরৈরিদেব ১০০৪ খৃঃ অব্দের সমকালে প্রাচুর্ভূত হন। এই প্রাচীর সম্ভবতঃ দেবালয়ের ভিতরের প্রাচীরই হইবে। বাহিরের প্রাচীরও সম্ভবতঃ ষোড়শশতাব্দীর প্রথমভাগে আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই।

মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যভাগে একটা গুরুরিগী



চিদম্বরমের একটি বাটমন্দির।

আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০ ফিট ও প্রস্থ ১০০ ফিট এবং চতুর্দিকে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে এই তীর্থ প্রাচীন হেমতীর্থের উপর নির্মিত হইয়াছে। বহুতর লোক এই সরোবরে অতি তক্তিতাবে স্নান করে। তজ্জন্তু এবং জলাদি যাতায়াতের কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকায় উহার জল সবুজ হইয়া পড়িয়াছে। পানীয় জলের জন্ত মন্দিরে ৪টা কূপ আছে। ঐ সকল কূপের জলও স্বাস্থ্যকর নহে।

এই সরোবরের উত্তরভাগে পার্শ্বতীর মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখের নাট্যমণ্ডপ অতিসুন্দর ও নানাবিধ ভাস্কর-কার্য্য সমন্বিত।

পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে বিখ্যাত সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ। এই মণ্ডপ অনেকাংশে ত্রীরঙ্গমের মন্দিরের ছায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এই মণ্ডপে অত্যুৎকৃষ্ট ভাস্করকার্য্যযুক্ত এক সহস্র স্তম্ভ আছে।

অপর একটা মণ্ডপে নটেশ্বর মহাদেবের মূর্তি আছে। প্রবাদ এক সময়ে মহাদেব একপদে নৃত্য করিয়া ভগবতীকে পরাস্ত করেন। তদবধি ঐ স্থানে নটবেশে একপদে অবস্থান করিতেছেন। স্থল পুরাণাদির মতে ঐ মূর্তি ত্রীরামচন্দ্রেরও পূর্ববর্তী। কিন্তু ঐ সকল পুরাণাদিতে বিস্তর অলীক উপাখ্যান থাকায় বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অপর একটা মন্দিরে অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি ও শিবলিঙ্গের নামক আর একটীতে বিষ্ণেশ্বরের মূর্তি আছে। সমস্ত দেবালয়ের পরিমাণ ফল প্রায় ১২০ বিঘা।

দীক্ষিত উপাধিদারী পুরোহিতগণ মন্দিরের দেবসেবাদি করিয়া থাকেন। সকল দীক্ষিত এক সভায় সমাগত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করেন। একজন সভ্য কোন বিষয়ে আপত্তি করিলে তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারেনা। সর্ববাদী সন্মত না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। যাহার উপনয়ন হইয়াছে, এরূপ দীক্ষিত হইতে সকলেরই সভায় সমান ক্ষমতা। এই জন্ত বালকগণের অতি অল্পবয়সেই উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কুড়ি জন করিয়া দীক্ষিত একবারে পূজায় নিযুক্ত থাকে। ইহাদের এক একজন প্রতিদিন এক এক মন্দিরে পূজা করে, এইরূপে ২০ দিনে প্রত্যেকেরই সকল মন্দিরে একবার করিয়া পূজা করিতে হয়। তখন নূতন ২০ জন আসিয়া উহাদের স্থান অধিকার করে। পূজার নৈবেদ্যাদি পূজক দীক্ষিতই গ্রহণ করেন, কিন্তু উৎসবদির সময়ে বা অল্প কারণে বহুপরিমাণে মোদক ও দক্ষিণাদি সংগ্রহ হইলে তাহা সকল দীক্ষিতেই ভাগ করিয়া লয়। ইহারা পালাক্রমে এক এক দল করিয়া দেবতাদিগের পূজা আদায় করিবার

নিমিত্ত মাস্ত্রাজ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এইরূপ ভিক্ষার যাহা উপার্জিত হয়, তাহার ষৎকিঞ্চিৎ দেবসেবায় অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট তাহারা স্বয়ং গ্রহণ করে। কোন দীক্ষিত একবাড়ী হইতে একবার ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আর কোন দীক্ষিত সে বাড়ী যায় না।

চিদম্বরতন্ত্র, ক্ষুদ্রপুরাণীয় চিদম্বরমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে চিদম্বরের দেবমাহাত্ম্যাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

চিদাকাশ (পুং ক্লীং) চিং আকাশমিব নির্লেপত্বাৎ সর্বাধার-
হ্মজ। আকাশবৎ নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম। যেমন আকাশ কোন পদার্থের সহিত লিপ্ত না হইয়া সর্বাধাররূপে অবস্থিত আছে সেইরূপ চিদম্বর পরব্রহ্ম সর্ববস্তুতে নির্লিপ্ত হইয়া ও সকলের আধাররূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

চিদাত্মন (পুং) চিং চৈতন্তমাত্মা স্বরূপমন্ত। চৈতন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম।
“এতদ্রূপং ভগবতোহরূপস্ত চিদাত্মনঃ।” (ভাগঃ ১।৩।৩০)

চিদানন্দযোগী, একজন দার্শনিক, তোটকব্যাত্ম্য-রচয়িতা।
চিদানন্দসরস্বতী, আত্মপ্রকাশ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের এক-
জন ব্যাখ্যাকার।

চিদাভাস (পুং) চিত আভাসঃ প্রতিবিম্বঃ ৬তৎ। ১ বুদ্ধি বা
মহত্ত্বশ্চে চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্ব। ২ জীবাত্মা। (বেদান্তসাং)

চিদ্রূপ (ত্রি) চিদেব রূপমন্ত বহুব্রী। ১ ক্ষুণ্ণবৃক্ষ। ২ হৃদ-
য়ালু, প্রশস্তচেতা। ৩ জ্ঞানময়। (পুং) ৪ আত্মা। (ক্লী)
৫ চিত্তরূপং চৈতন্ত্যস্বরূপ। [চিত্রদীপ শব্দ দেখ।]

চিদুল্লাস (ত্রি) চিদিব উল্লাস উজ্জ্বলঃ কর্মধাৎ। (উপমানানি
সামান্যবচনৈঃ। পা ২।১।৫৫) ২ চৈতন্ত্যের ছায় উজ্জ্বল। “মুক্তা-
ফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ।” (ভাগঃ ৯।১।১৩৩)। “চিং চৈতন্ত্যং তদ্বদুল্লাসৈ-
রুজ্জ্বলৈঃ” (শ্রীধর) উৎ-লস-ভাবে ঘঞ্। ৬তৎ। (পুং)
৩ চৈতন্ত্যের ক্ষুরণ।

চিদ্রূপাশ্রম, একজন বিখ্যাত ব্যাকরণবিৎ। ইনি পরিভাষে-
ন্দুশেখরের বিবমী নামে টীকা ও দীপব্যাকরণ রচনা করেন।

চিহ্নিলাস, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য। দাক্ষিণাত্যে অনেকের বিশ্বাস যে, ইনিও শঙ্করবিজয় নামে সংস্কৃত ভাষায় এক-
খানি শঙ্করাচার্য্যের চরিত্র রচনা করেন। এই গ্রন্থে চিহ্নি-
লাস বক্তা এবং বিজ্ঞানকন্দ শ্রোতা।

চিনকুলি খাঁ, নিজাম উল্গলুক আসফ জা দাক্ষিণাত্যে
দিল্লীর মোগলসম্রাটের একজন প্রতিনিধি, তিনি প্রথমে
মালবপ্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রী
শত্ৰুজী ও সাহর মধ্যে গৃহবিচ্ছেদানল প্রবল হইলে তিনি
শত্ৰুজীর পক্ষাবলম্বন করেন। চন্দ্রসেন নামক মহারাষ্ট্রী

সেনাপতি সাহুর বিরাগভাজন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ইনি হাইদ্রাবাদের নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(১৭১৪-১৭২০) খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের উপর সৈয়দ-ঘরের একাধিপত্যে বিরক্ত হইয়া তিনি মালবদেশের শাসন-কর্তৃপদ পরিভ্রাণপূর্বক সমুদায় দক্ষিণাঞ্চলের অধীশ্বর হইবার চেষ্টা করেন। তিনি খানেশ লুঠন ও তৎবিরুদ্ধে প্রেরিত মোগলসৈন্যদিগকে বুরহানপুর নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। মোগল সেনাপতি দিল্লীবার আলি খাঁ এই যুদ্ধে নিহত হন। পরে মহারাষ্ট্রসৈন্য-সেনাপতি আলম-আলি খাঁর অধীনে নিজাম-উলমুল্কের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বালাপুর নামক স্থানে সেনাপতি শমন সন্ধান গমন করেন। যাহা হউক অল্পদিন মধ্যেই দিল্লীতে সৈয়দদিগের আধিপত্য ধ্বংস হয় এবং সম্রাট মুহম্মদ শাহ তাঁহাদিগের করকবল হইতে মুক্তাভ করেন। চিনকিলিচ খাঁও তৎকালে দাক্ষিণাত্যের স্থায়ী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু সম্রাটের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য রহিয়াই গেল।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে নিজামউলমুল্ক মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার হইতে দেখিয়া বড় শঙ্কিত হইলেন। তিনি নানা কৌশলে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া হায়দ্রাবাদ নগরে রাজধানী স্থির করিলেন।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পেশবার বাজীরাওর সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শম্ভুজী এই সকল যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু বাজীরাওর যুদ্ধনৈপুণ্যে নিজাম-উলমুল্ক সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। বাজীরাও সন্ধির প্রস্তাব অগ্রমোদন করেন। সন্ধির শর্ত এই—শম্ভুজীকে তাৎক্ষণিক পাঠাইতে হইবে। ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রদিগের অংশ মত রাজত্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না হয়, এই জন্য কতিপয় সুদৃঢ় দুর্গ প্রতিভূষণরূপ রাখিতে হইবে এবং বাকী রাজত্ব আদায় করিয়া দিতে হইবে। নিজাম-উলমুল্ক প্রথমটী ভিন্ন অপর দুটীতে সন্মত হন; পরে বাজীরাও শম্ভুজীকে তাঁহার তাহু হইতে নিরাপদে নিজাম-উলমুল্ক সমীপে প্রেরণ করিতে সন্মত হওয়ার, তিনিও তৎপ্রস্তাব অগ্রমোদন করেন। তদনন্তর তিনি কখন মহারাষ্ট্রগণের সহিত সন্ধাব কখন বা অসন্ধাবে কাটাইয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কার্ঘ্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাত্রা করিতে হয়, কিন্তু তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁহার পুত্র নাসির-

জঙ্গের বিজ্ঞোহবার্তা শুনিয়া সমুদ্রে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৪৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

চিনমল্লেকমু, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর কতাপাঞ্জেলার রায়চাটী তালুকের অন্তর্গত একটা সহর। অক্ষা° ১৩° ৫৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪৪' পূঃ।

চিনা (দেশজ) ১ নিদর্শন। ২ পরিচিত।

চিনি, মধুর আশ্বাদবিশিষ্ট পদার্থবিশেষ। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চিনি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণ মহাকাব্যাদি গ্রন্থে তাহার বিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (রামায়ণ ২।১০০।৬৭, ভারত ১২।২৮৫।৪৪, জুহুত ১।৪৫ অঃ।) সংস্কৃত শর্করা, খণ্ড, গুড়, প্রভৃতি শব্দ হইতেই যে আরবী কণ্ড, মলয় গুল, পারসী শর্কর প্রভৃতি শর্করা-বাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এছাড়া গুড়, শর্করা, গুড়োড়বা, দিতা, মিষ্ট, ইক্ষুসার, বালুকা-ম্মিকা ইত্যাদি গুড়ের সংস্কৃত পর্যায় দৃষ্ট হয়। লাতিন শর্করম্, ফরাসী সুকার ও ইংরাজী সুগার শব্দের সহিত সংস্কৃত শর্করা শব্দের সমান সৌসাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত গ্রন্থে খণ্ডমোদক, খণ্ড, মাক্ষিক শর্করা, উপলা, শুক্রোপলা, শর্করা, দিতাখণ্ড, দৃঢ়গামিকা ইত্যাদি চিনির সংস্কৃত নাম দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা অনুমান হয়, ভারতবর্ষ হইতেই চিনির ব্যবহার চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথমে ভারতীয় নামেই শর্করা অভিহিত হইত, কিন্তু ক্রমে ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানারূপে অপভ্রংশ হইয়া যায়। চরক, জুহুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে নানা স্থানে খণ্ড, গুড় প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদপেক্ষা প্রাচীন মনু স্মৃতি সংহিতাতেও শর্করার উল্লেখ আছে। পথশ্রান্ত সম্বলবিহীন দ্বিজ পথিক পথপার্শ্ববর্তী ইক্ষুক্ষেত্র হইতে ছইগাছি ইক্ষু লইলে দণ্ডনীয় হইবে না, মনু এরূপও নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ গুড় চুরি করিলে পরজন্মে বাহুড় হইবে এইরূপ বিধিও দৃষ্ট হয়। মনু-সংহিতার দশম অধ্যায়ে শর্করা ও মিষ্টার উল্লেখ আছে। জুহুত নামক মনুর সময় হইতে শর্করা, গুড় প্রভৃতির ব্যবহার ও ইক্ষুর যে চাষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীনকালে যুরোপে চিনির ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হেরোডোটস্, থিওফ্রাস্টস্, সেবেকা, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পলস্ ইজিনেটা অতি প্রাচীন কালের প্রস্তুতকার আর্কিজিনিসের অনুবর্তী হইয়া “দেখিতে সাধারণ লবণের মত কিন্তু মধুর ভার স্মিষ্ট, ভারতীয় লবণ” নামে যে বস্তুর উল্লেখ করেন, তাহা চিনিরই

বর্ণনা। ইহাতে বোধ হয় ভারত হইতেই চিনির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে এরূপ অনেক গ্রাম আছে বাহা-দিগের নামের সহিত শর্করা, গুড়, খণ্ড, বর্জুর ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বোধ হয় ঐ সকল স্থান গুড় শর্করা প্রভৃতি উৎপন্ন জব্যের নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে। ফ্লুকিগার (Fluckiger) ও হান্‌বারি (Hanbury) সাহেব অনুমান করেন, বাঙ্গালার গোড় আখ্যা এইরূপেই হইয়াছিল। বাস্তবিক পূর্বে বাঙ্গালার যে বহু পরিমাণে ইক্ষু চাষ হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও অনেকে অনুমান করেন, ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে বঙ্গ দেশেই ইক্ষুর চাষ আরম্ভ হয়। তৎপরে এই স্থান হইতে ক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্তোপসাগরের কূলে ইক্ষুর চাষ হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম-যোদ্ধাগণ (Crusaders) সিরীয় প্রদেশে ইক্ষু দেখিয়াছিলেন। ঐ সময়ের একজন ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন, “ধর্ম যোদ্ধাগণ ত্রিগলীদেশের ক্ষেত্র সকলে সুক্রা (Sukra) নামে বহু পরিমাণে মধুযুক্ত তৃণ দেখিয়াছিল।” এই সকল মধুময় তৃণ যে ইক্ষু তাহাতে আর কি সন্দেহ? সারাসিংগ প্রথমে যুরোপে ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে যুরোপে চিনির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে ও এক আউল থাটা রূপায় এক পাউণ্ড সুপ-রিক্ত চিনি পাওয়া যাইত। চিনি যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়, এ বিষয় বহুকাল পর্যন্ত গ্রীক ও রোমকগণ জানিতেন না। ভারতবর্ষ হইতে আরব, গ্রীস প্রভৃতি স্থানে চিনির আমদানির কথা আরব দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১৩০৬ খৃষ্টাব্দে সুলতানের অধিকৃত রাজ্য মধ্যে ও সাইপ্রস, রোডস, সিসিলি প্রভৃতি খৃষ্টধর্মাবলম্বী রাজার অধীনস্থ দেশ-সমূহে প্রথমে চিনি প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত হয়। ইতালি, স্পেন ও ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপবাসীগণ আরবদিগের নিকট হইতে ইক্ষুর চাষ, উহা হইতে রসনিঃসরণ ও চিনি প্রস্তুত প্রকরণ শিক্ষা করে। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা সিসিলি দ্বীপ হইতে মেরিয়ার ইক্ষুর আমদানি করে। বাহা হউক স্পেনীয় ও পর্তুগীজ হইতে সর্বপ্রথমে ভারত ও চীনদেশীয় চিনি প্রস্তুত-কৌশল যুরোপখণ্ডে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বার্বাডোজে ইংরাজদিগের চিনির কারখানা প্রথম স্থাপিত হয় এবং ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে উহা চরম-সীমায় পদার্পণ করে। ইংরাজদিগের কারখানা স্থাপনের অল্প

দিন পরেই পর্তুগীজগণ যুরোপ খণ্ডে ব্রেজিলদেশীয় চিনির বহুল প্রচার করে।

কেবল ইক্ষু ও খেজুর গাছ হইতেই যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা নহে, বহুসংখ্যক তরু ওষাদি হইতে অস্বাভাবিক পরিমাণে চিনি বাহির হইয়া থাকে, নিম্নে চিনিউৎপাদক উদ্ভিদ সকলের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইক্ষু, খজুর, তাল, নারিকেল, সাণ্ড, বিটপালগু, মাপল (Sugar Maple) ও নিম্ব। এতদ্ভিন্ন ভুট্টা, দেধান, কাশীরুল ইত্যাদির রস হইতেও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। নলী প্রস্তুতকালে যখন নীল পচিতে দেয়, তখন নীলে সারের সহিত নীলের চিনিও জলের সহিত দ্রব হইয়া যায়। চিনি থাকার দ্বারা এই নিম্নপ্রক্রিয়া অন্তর্যৎসেক (Fermentation) হইতে থাকে এবং তৎপ্রভাবে নীলবর্ণ নীলসার স্বৈতবর্ণ নীলে পরিণত হয়। এই স্বৈতনীল পুনরুদার নীলবর্ণ করিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সাধ্য, কিন্তু এই নীলজাত চিনি সকলেই অকর্ষণ্য বোধে ফেলিয়া দেয়। কাফি-উৎপাদকগণ কেবলমাত্র কাফির বীজগুলি গ্রহণ করে, কিন্তু ফলের সারভাগের সহিত বিস্তর চিনি প্রতি বর্ষে অযথা পরিত্যক্ত হয়। পাট হইতে এক প্রকার চিনি ও তাহা হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হইতে পারে।

মধুকপুষ্প অর্থাৎ মৌল ফুলে প্রচুর পরিমাণে চিনি আছে। তজ্জন্ম যে যে স্থানে মৌল উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে উহা হইতে বিখ্যাত মৌলের মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন রাসায়নিকই মৌল হইতে দানাকারে চিনি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

নানাজাতীয় ফল ফুল হইতে চিনি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা বাহা কিছু মিষ্ট জব্য ভোজন করি, তন্মধ্যে সকলেই কোন না কোন আকারে চিনি বিদ্যমান আছে। যে মধু পান করি, তাহাও চিনির অবস্থা ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে, পুষ্পাদির মিষ্ট রস লইয়া মধুমক্ষিকাগণ তাহাই মধুরূপে পরিণত করে। সুতরাং মধু পরোক্ষভাবে বৃক্ষজ চিনির ভেদমাত্র। আন্ডুর, আতা, পেয়ারা, জাম, আনারস, জামরুল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলে চিনি থাকাতে ঐ সকল হইতে অতিশয় মনোহর সুগন্ধযুক্ত আসব প্রস্তুত হয়। আর্থাৎ খণ্ডবিগণের সোমসুরা বোধ হয় এইরূপ কোন বস্তুর দ্বারা সুবাসিত হইত।

কুঁচ বা গুজার মূলে এবং যষ্টি মধুর মূলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শর্করা আছে, তজ্জন্ম উহা মিষ্ট বোধ হয়। দারুচিনিতেও চিনি আছে, কিন্তু উহাদের পরিমাণ অল্প এবং ঐ সকল বস্তুও অধিক মিলে না। সুতরাং ঐ চিনি বিশেষ কোন কার্যে আসে না।

সকরকল আলু, গোল আলু প্রভৃতির পালো হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি কার্পাসের বীজ হইতে ইক্ষুজ চিনি হইতেও উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

কাঠচূর্ণ ও ছিন্নবস্ত্র হইতেও নেপোলিয়ানের উদ্যমে চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার প্রক্রিয়া অতিশয় কষ্ট সাধ্য।

এই সকল হইতে যে চিনি হয়, রাসায়নিকেরা তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—ইক্ষুজ শর্করা, মধুজ শর্করা, ফলজ শর্করা এবং দুগ্ধজ শর্করা। এই চারি প্রকার চিনির মধ্যে আশ্বাদের বৈলক্ষণ্য আছে। ইক্ষুজ শর্করা অপেক্ষাকৃত রসনাগ্রিহ, অম্লমাসলভ্য, স্নাতরাং বহু প্রচলিত। ইক্ষু, পালাং মূল, খেজুর, সাগলগম্ প্রভৃতির রস হইতে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা ইক্ষুজ শর্করা, মধু ও টাটকা ফল হইতে উৎপন্ন চিনি মধুজ শর্করা, ফলের মণ্ড, আঙ্গুর ও অন্যান্য শুষ্ক পদার্থ হইতে উৎপন্ন চিনি ফলজ শর্করা এবং জন্তুগণের দুগ্ধোৎপন্ন চিনি দুগ্ধজ শর্করা নামে অভিহিত। কেহ কেহ ঐ চারি প্রকারে বিভক্ত না করিয়া ইক্ষুজ ও ফলজ এই দুই প্রকার বিভাগ করিয়া থাকেন। কুরাপীয় রাসায়নিক মতে—ইক্ষুজ চিনিতে অঙ্গুর ১২, উদজন ১১ ও অম্লজন ১১ ভাগ; মধুজ চিনিতে অঙ্গুর ১২, উদ* ১২ ও অম্ল* ১২ ভাগ, ফলজ চিনিতে অঙ্গুর ১২, উদ* ১২, অম্ল* ১২ ও জল ২ ভাগ এবং দুগ্ধজ চিনিতে অঙ্গুর ২৪, উদ* ২৪, ও অম্ল* ২৪ ভাগ থাকে। যে চিনি ইক্ষুজ নামে খ্যাত, তাহা বর্ণবিহীন, গন্ধশূন্য, স্নিগ্ধ আশ্বাদযুক্ত, অল্প দৃঢ়, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর। সাধারণ পরিশুদ্ধ চিনির হ্রায় শীঘ্র শীঘ্র দানা প্রস্তুত করিতে গেলে, দানাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, কিন্তু অধিক উত্তাপে দ্রব করিয়া ধীরে ধীরে শীতল করিলে দানাগুলি মিছরির হ্রায় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৬। অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে ইহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, উত্তপ্ত হইলে ইহার জলীয় অংশ নষ্ট হইয়া যায় মাত্র। এক তৃতীয়াংশ পরিমিত শীতল ও যে পরিমাণেরই হউক না কেন উত্তপ্ত জলে ইহা দ্রব হয়। সুরাসারেও ইহা দ্রব হইয়া থাকে, কিন্তু জলের মত নহে। ফারেনহাইটের তাপমান যন্ত্রের ৩২.০ ডিগ্রী উষ্ণ হইলে চিনি অতি মসৃণ, বর্ণহীন, তরল পদার্থের মত হইয়া পড়ে এবং ঐ তরল পদার্থ অকস্মাৎ শীতল হইলে অতিশয় স্বচ্ছ গোটা বাধিয়া থাকে, কিন্তু কিছু সময় রাখিয়া শীতল করিলে অস্বচ্ছ হইয়া যায়। বেশী উষ্ণ হইলে ইহার অঙ্গুর ভিন্ন অপর অংশ সকল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। দুইখণ্ড গোটা বাষ্প চিনি (মিছরী) অল্পকালে পরস্পর সংঘর্ষিত হইলে আলোক উৎপন্ন হয়। ইক্ষুজ চিনি গুটিকর, ইহাতে খাদ্য দ্রব্যাদিও

বেগুন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, অপর কোন প্রকার চিনিতে সেরূপ হয় না।

প্রত্যাবের দোষ নিবারণ করিবার বতগুণি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, ফলজ চিনি তাহার অল্পতম উপায়। বহুমাত্র ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রত্যাবের সহিত উক্ত প্রকার চিনি বাহির হয়। স্নাতরাং ঐ সময়ে ফলজ চিনি ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে। ফারহাইটের ১৪.০ ডিগ্রী উষ্ণ করিলে ইহা নরম হইয়া যায় এবং ২১.২ ডিগ্রী উষ্ণতায় দ্রব হয়, কিন্তু তদপেক্ষা উষ্ণতর হইলে ইহা ক্যারে (Caramel) পরিণত হয়। ইক্ষুজ চিনি জলে যত শীঘ্র দ্রব হয়, ঐ প্রকার চিনি তত শীঘ্র দ্রব হয়না এবং দ্রব হইলে উহা দ্রবাবদ্ধায় ইক্ষু চিনির হ্রায় নির্মল ও স্নিগ্ধ থাকেনা। উত্তপ্ত সুরাসারে ইহা দ্রব হয়। কিন্তু অল্পমাত্র শীতল হইলেই পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বাধিয়া যায়। মধুজ চিনি তীক্ষ্ণ সুরাসারে তরল হয়।

দুগ্ধজ শর্করা সচরাচর বর্ণহীন। ইহা প্রায় ছয় গুণ শীতল অথবা আড়াই গুণ উষ্ণজলে দ্রব হয়। ইহার আশ্বাদ তেমন স্নিগ্ধ নহে, ইহা বায়ুতে অনাবৃত থাকিলে পরিবর্তিত কিম্বা সুরাসারে দ্রবীভূত হয়না। অম্লের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে তাহা ধীরে ধীরে ফলজ চিনিতে পরিণত হয়। জন্তুগণের দুগ্ধ ছিঁড়িয়া গেলে তাহার জল ফুটাইয়া তাহা দানা-কারে পরিণত হইলে যে চিনি হয়, তাহাকে দুগ্ধজ চিনি বলে। উপরি লিখিত চারি প্রকার চিনি ভিন্ন আরও কয় প্রকার চিনি নবাবিকৃত হইয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত চিনিই ইক্ষুজ চিনির হ্রায়। অতি অল্প দিন হইল কয়লা-মধ্যে চিনির অতিদ্রব উদ্ভাবন হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক বলিতেছেন তাহা অপেক্ষা বেশী মিষ্টতা আর কোন দ্রব্যে নাই।

খেজুর গাছের নির্ধাস হইতে প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে শুভ্র, চিনি ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাদ্দালার সকল স্থানেই খেজুর রস সংগৃহীত ও তাহা হইতে শুভ্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলাতেই সর্বাধিক। খেজুর গাছ ৫৭ বৎসরের হইলে পর তাহার শিরোভাগে শাখার নিম্নে একদিক্ চাঁচিয়া কেলে। স্বচ্ছ ছোলা হইলে পর ঐ সমস্ত স্থানের রস একস্থানে গড়াইয়া পড়িতে পারে, একরূপ করিয়া আলি কাটিয়া দেয়। দুইদিক্ হইতে দুইটা আলি গিয়া মধ্যস্থলে মিলিত হয়। পরে ঐস্থানে একখণ্ড বাঁশের পাতি কিম্বা টিনের ফলক রাখে। ঐ পাতির নিম্নে রস সংগ্রহ করিবার জন্য একটা হাঁড়ি বাঁধিয়া দেয়। বৈকালে এইরূপ করিয়া রাখিলে সমস্ত রাত্রি ঐ স্থান হইতে রস নির্গত হইয়া ভাঙে সঞ্চিত হয়। প্রত্যুষে অধিকারী আসিয়া রসপূর্ণ ভাঙ

লইয়া যায়। এইরূপ ক্রমাগত ৩ দিন রস সংগ্রহ হইলে বৃক্ষকে ৩ দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। সচরাচর অগ্রহায়ণমাস হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্তই রস সংগৃহীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পৌষমাসে অর্থাৎ অত্যন্ত শীতের সময়ই অধিক পরিমাণে রস নির্গত হয়। একটা পূর্ণ-বয়স্ক অর্থাৎ ১৬/১৭ বৎসরের বৃক্ষ হইতে গড়ে প্রতি দিন ৮ সের রস নির্গত হইতে পারে। প্রথম কয়েক বৎসর অল্প পরিমাণে এবং মধ্যে ৫/৭ বৎসর খুব অধিক পরিমাণে রস হয়, তৎপরে আবার রসের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে। রস লইলে খেজুর গাছের পরমায়ু অনেক হ্রাস হইয়া যায়। আবার অনিয়মিতরূপে রস সংগ্রহ করিলে আরও অন্নায়ু হয়। কেহ কেহ ৩/৪ বর্ষের গাছ হইতেই রস লইতে আরম্ভ করে। ইহাতে গাছ শীঘ্র শীঘ্রই রুগ্ন হইয়া যায় এবং বহু কষ্টে বড় হইলেও তাহাতে বেশী রস হয় না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। বাদলা কিয়া কুয়াসা হইলে সেদিন রস সংগ্রহ করিবে না, তাহা হইলে রসও ভাল হয় না, আর গাছ পচিয়া যায়। এ বৎসর গাছের যে দিক চাচিয়া রস লইবে, পর বৎসর তাহার ঠিক বিপরীত-দিকে কাটিবে। এইরূপে প্রতি বৎসর খেজুর গাছে একটা করিয়া খাঁজ পড়ে। ঐ সকল খাঁজের সংখ্যা গণনা করিয়া তাহার বয়স অনুমান করা যায়, রস হইতে এইরূপে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। সমস্ত বৃক্ষ হইতে রস একত্র করা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী কারখানায় লইয়া গিয়া কড়ায় চড়াইয়া জাল দিতে থাকে। রস অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে উহাতে অন্তরুৎসেক (Fermentation) হইয়া সুরার পরিণত হয়। তখন তাহাতে গুড় হয় না। সেইজন্য কাল বিলম্ব না করিয়া রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। রস খুব টাটকা ও উৎকৃষ্ট হইলে ৬ সেরে ১ সের গুড় হয়, অন্যথা ৭/৮ সেরে ১ সের গুড় হইতে পারে। সিউলি নামে এক জাতি বাদ্দালার নানাস্থানে খেজুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করে। ঐ গুড় হইতে ইক্ষুগুড়ের প্রণালী অনুসারে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। একশত খেজুর গাছ হইতে প্রতি বৎসর ১২০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতে পারে।

খেজুরের জায় তালগাছ হইতেও গুড় ও চিনি হইতে পারে। মলবার উপকূল তালের কাঁদি স্থানে স্থানে কাটিয়া দিয়া রস সংগ্রহ করে। ঐ রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। বাদ্দালা দেশে তালের রস (তাড়ি) হইতেও গুড় প্রস্তুত অতি অল্প হয়। ব্রহ্মদেশে বহু পরিমাণে তালের গুড় উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়।

মাদ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত হয়। দাক্ষিণাত্যে নারিকেল গাছ বাদ্দালার খেজুরগাছের কাজ করে।

সিংহলের দক্ষিণাংশে সাগুবৃক্ষ হইতে চিনি উৎপন্ন হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে করালীয়াষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফ্রান্সে চিনির আমদানি বন্ধ হইয়া যায়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আদেশ করেন, যে কেহ যুরোপজাত কোন বস্তু হইতে অল্পব্যয়ে অনেক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার পাইবে। এই সময় অনেকেই অনেক পদার্থ হইতে চিনি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে বিটের চিনিই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুলভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য উদ্ভাবিতা প্রতিক্রম লক্ষমুদ্রা প্রাপ্ত হন। পরে ইক্ষু প্রতিক্রমীভাব ইহার লোপ পাইবার উপক্রম হয়। কিন্তু বিদেশীয় চিনির উপর অতিশয় কর বৃদ্ধি হওয়ার বিটের চিনি টিকিয়া যায়। এখনও যুরোপে বিট মূল হইতে প্রভূত পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তেমন উৎকৃষ্ট বিটও হয় না, সুরাতায় বিট হইতে তেমন ভাল চিনিও পাওয়া যায় না। একরূপ বিটপালঙ্ক এদেশে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উহা শাকাদিবৎ ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র।

ইক্ষু, ইহার গুড় ও চিনি।

ইক্ষু হইতেই (বিশেষতঃ ইক্ষুর পরিপক্বাবস্থায়ই) অধিক পরিমাণে চিনি পাওয়া যায়। তরুণাবস্থায় ইক্ষুতে অধিক চিনি থাকে না, উহাতে খেতসারও চিনির পূর্করূপ সোট (Glucose) বিদ্যমান থাকে। তাহাই ক্রমে চিনিতে পরিণত হয়। আবার ইক্ষুর মূলভাগে অধিক চিনি ও খেতসার প্রভৃতি অল্প পরিমাণে এবং অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প চিনি ও অধিক মাত্রায় সোট খেতসারাদি বিদ্যমান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে ১০০ ভাগ ইক্ষুরস বিস্ফিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়—

	১ম পরীক্ষা ৩১ আগষ্ট	২য় পরীক্ষা ২৯ সেপ্টেম্বর	৩য় পরীক্ষা ১০ ডিসেম্বর
ইক্ষুর দৈর্ঘ্য	৪৫ ফিট	৫৫ ফিট	৫৫ ফিট
সপত্র " "	৯ "	১০ ১/২ "	১০ ১/২ "
রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব	১.০৩৭	১.০০৪	১.০৭১
শর্করা	৪.২৫	৮.০০	১৬.০০
সোট	১.২৭	২.০০	৩.১
ভস্ম	.৭৩	.৭৮	.৭৩
খেতসার	১.৫১	.৮৯	৩.২৫
অম্ল	.১৬
জল	৯২.০৮	৮৮.৩৩	৭৯.৭১
	১০০	১০০	১০০

তালিকায় দেখা যাইতেছে যে সেপ্টেম্বর মাসে চিনির ভাগ আগষ্টের প্রায় দ্বিগুণ, এবং ডিসেম্বরে সেপ্টেম্বরের

বিশ্বণ, আবার দেখা যাইতেছে যে সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মুকুৎ অর্থাৎ মোটের জগৎ কমিয়াছে এবং খেতসার বাড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া অনুমান হয়, সেটিভাগই কোন রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রভাবে চিনিরূপে পরিণত হয়। সুকীর কিরণ ব্যতীত বৃক্ষলতাদি বর্জিত হইতে পারেনা এবং বৃক্ষপত্র সকল বায়ুস্থিত ব্যারদারক বাষ্প শোষণ করিতে পারে না, প্রথমে রৌদ্র হইলে রাসায়নিক ক্রিয়া অবশেষে চলিতে থাকে, সুতরাং বৃক্ষাদিও সুন্দর বর্জিত হয়। এই কারণে রৌদ্র ইন্ধুর পক্ষে বিশেষ হিতকারী। যে বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্পবৃষ্টি হয় এবং আকাশমণ্ডল অনেক সময় পরিষ্কার থাকে, সে বৎসর ইন্ধু অতি উৎকৃষ্ট ও সুশিষ্ট হয়। কিন্তু বর্ষা অধিক হইলে অথবা গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ইন্ধুর বৃদ্ধি ও মিষ্টত্বের ব্যাঘাত হয়।

ককরশূভ্র উৎকৃষ্ট শুনা জমিতেই ইন্ধুর চাষ হইয়া থাকে। ইন্ধু প্রায় ৮৯ মাস কাল ধরিয়া বাড়ে, এইজন্য ক্ষেত্রে সীতিমত সার দিতে ও জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। বাক্সালায় কৃষকগণ ৫৬ বার চাষ দেয় এবং গোময়, তন্ন, বালুকা, পুরাতন প্রাচীরাদির মৃত্তিকা প্রভৃতির সার দিয়া জমি তৈয়ার করে। ইন্ধুর পাতা, খোয়া ইত্যাদিই ইন্ধুক্ষেত্রের সর্বোৎকৃষ্ট সার। পরে লাঙ্গল দিয়া উহাতে দেড় হাত অন্তর অন্তর একটা নালা প্রস্তুত করে। নালা প্রস্তুত হইলে উহাতে এক বা দেড় হাত অন্তর এক একখানি ডগা অর্থাৎ ইন্ধুর অগ্রভাগ সোজাশুজি ভাবে ফেলিয়া যায়। অনন্তর ৪৫ ইঞ্চি মাটি দিয়া ঐ ডগা সকল ঢাকিয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে জল সেচন করিতে থাকে। ১০১৫ দিন পরে এক একটা ডগা হইতে ৮১০টা পর্যন্ত অঙ্কুর দেখা দেয়, তখন অতি সাবধানে ইন্ধু ক্ষেত্র একবার অল্প করিয়া খুঁড়িয়া উহাতে জলসেচন করা হয়। চৈত্রমাসই ইন্ধু রোপণের প্রশস্ত সময়। কথায় বলে—

“আখ, আদা, পুই, তিন চৈত্রে রুই।”

আখ এক হাত দেড় হাত বড় হইলে পর পুনরায় একবার জমি খুঁড়িয়া প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় মাটি দেওয়া চাই। ইহার ক্ষেত্র যতবার নিড়ান হয়, ততবারই জল সেচন করিতে হয়। ভাদ্রমাসে আখের গোড়ায় পাতা দিয়া ডগা হইতে উৎপন্ন সমস্ত আখগুলিকে এক একটা ঝাড় করিয়া বাঁধে। প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় আবার মাটি দিয়া থাকে। আখনি, কার্তিকমাসে ইন্ধু অনেকটা মিষ্ট হয়। শৃগালগণ একবার এই কোমল ইন্ধুর রসবাণ করিলে আর ভুলিতে পারেনা। কৃষক এই সময় একজন রক্ষক নিযুক্ত করে। সে আখবাড়ীর মধ্যে তিন হাত উচ্চ করিয়া মাচা বাঁধে এবং মাচার উপর একটা ছত্র

বুঁড়ে করিয়া রাত্রিকালে সেই স্থানে থাকিয়া শৃগালাদির উপদ্রব হইতে ইন্ধু রক্ষা করে। মাচা হইতে ৫৬ গাছি বিচালির দড়ি ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বেড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। রক্ষক বসিয়া ঐ দড়ির গোড়া টানিলেই সমস্ত আখবাড়ী নড়িতে থাকে, সুতরাং শৃগালদিগ পলায়ন করে। অনেক রাখা বা রক্ষক সুখে রাত্রি কাটাইবার নিমিত্ত মাচার নীচে আশুণ আলিয়া নাগড়া বাজাইতে বাজাইতে গান করে ও শৃগাল তাড়ায়। কখন কখন রক্ষকপত্নী মামস শিষ্টকানি উপায়ের খাদ্য লইয়া আখ ক্ষেত্রে দ্বারীর নিকট যায়। উক্তর মহানন্দে রাত্রি কাপন করিয়া আখবাড়ীর মধ্যেও স্বর্গসুখ অনুভব করে।

মাঘ, কাশ্যনমাসে ইন্ধু পরিপক হয়। তখন কোদালি দিয়া সমস্ত ইন্ধু কাটিয়া একত্র করে এবং পাতা ছাড়াইয়া ইন্ধুদণ্ড ও ডগাগুলি অর্থাৎ ইন্ধুর অগ্রভাগ পৃথক করিয়া দেয়। আলোক ও উত্তাপ পাইবার জন্য কৃষকগণ আখের শুক পাতা দ্বারা আশুণ আলিয়া থাকে। ইহাকে গাখ্যাল সেওয়া বলে। সমস্ত আখ ছাড়ান ও ডগা গুলি ভাগ করা হইলে আখগুলি এক পণ অর্থাৎ ৮০ গাছি করিয়া তাড়া বাঁধা হয়। তাহার পর সমস্ত আখ গাড়ী করিয়া আখশালে লইয়া গিয়া মাড়াই করে। এক বৎসর যেখানে ইন্ধু চাষ হয়, পর বর্ষে সেখানে ইন্ধু চাষ না দিয়া অল্প কিছু চাষ হয়। পূর্বে কাঠের চটিকলে আখ মাড়াই হইত। তেঁতুল কাঠের ৩ বা ৩½ ইঞ্চি লম্বা ও ৫৬ ইঞ্চি ব্যাসের দুইটা গুঁড়ি উপরূপরি দৃঢ় ভাবে দুইদিকে দুইটা পায়ার মধ্যে বন্ধ রাখিয়া দুইজন লোকে দুইদিক হইতে গুঁড়িগুলি ঘুরাইতে থাকে। একজন আখ লইয়া গুঁড়ির মুখে ধরিয়া দেয়। এইরূপে আখ গুঁড়ির ভিতর দিয়া পার হইলে কতক রস নির্গত হইয়া যায়, তখন আর একজন ঐ অর্ধক নিম্পেষিত ইন্ধু লইয়া প্রথম ব্যক্তিকে প্রদান করে। এইরূপে ৫৬ বা ততোধিক বারে আখ হইতে বথাকার্য্য রস বাহির করিয়া চপা বা খোয়া কেলিয়া দেয়। এইরূপ আখ মাড়ার অধিক পরিশ্রম ও অসুবিধা বলিয়া সম্প্রতি সর্বত্র লোহার শাল ব্যবহৃত হইতেছে। লোহার শাল নানাপ্রকার, কোন শালে দুইটা কোনটার তিনটা গুঁড়ি থাকে। আবার কোন শালের গুঁড়িগুলি সোজা দাঁড় করান, কোনটার গুঁড়ি-গুলি উপরি উপরি স্থাপিত। এই সমস্ত কল বাষ্পদ্বারা কিম্বা পেঁ, মহিষাদি কর্তৃক চালিত হয়। মাষাদি গোছ একটা আখমাড়া কল গোরু দ্বারা টানা হইলে প্রতিদিন ৪০৫০ মণ রস ও তাহাতে ৭৮ মণ শুদ্ধ হয়। এই সকল কলের মূল্য শুণামুসারে ৮০ হইতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত। সম্প্রতি বাঙ্গালার সর্বত্রই এইরূপ লোহার কলের ব্যবহার

হইতেছে। বাহারা কয় কিনিতে না পারে, তাহারা প্রায়ই অপরের নিকট হইতে ভাড়া করিয়া আনে। মচরাচর ইহার জন্ম প্রভিধি ২ টাকা।

আখমাতা হইকে ঐ রস অতি দীর্ঘ জাল দিয়া শুড়ে পরিণত করা হয়। পূর্বে ২১৩ হাত গভীর লম্বা খাল কাটিয়া উহাতে ১৮১৯৮১ মাটার বাণ (কুড়ি) বসান হইত। ইহাকে জোল বলেঃ এই জোলের মুখে শুক পাভা খড় কাঁচ ইত্যাদি দিয়া জাল দিলে অমিশ্রিত সমস্ত কুড়ির নির দিয়া অপর মুখে বাহির হইয়া বহিত। মুখ হইতে ৫১৬টা কুড়ি অপেক্ষাকৃত নীচে ও অবশিষ্টগুলি প্রায় এক হাত উচ্চ থাকিত। সমস্ত কুড়িতে রস দিয়া অল্প অল্প জাল দিলে ক্রমে রস যত শুকাইয়া আসিত ততই শেবদিকের কুড়ি হইতে রস মুখের অধিক উত্তম কুড়িতে নীত ও ঐ শূন্য কুড়ি নূতন রস দিয়া পূর্ণ করা হইত। মুখের কুড়ি ৫টা হইতেই শুড় প্রস্তুত হইত, শেষের গুলিতে রস গাঢ় করা হইত মাত্র। রসে প্রথম হইতেই অধিক জাল দিলে ভাল দানাদার শুড় হয় না। প্রথমে মুহূর্ত্তাণে ঘন করিতে হয়। আজকাল সর্বত্র লোহার ডেকে রস হইতে শুড় প্রস্তুত হইতেছে। রস হইতে গাদ প্রভৃতি তোলা হইলে যখন বড় বড় বুধুদ সহ কুটিতে থাকে, তখন হাতা দিয়া মাড়িতে হয়। পরে শুড় হইয়া আসিলে প্রথমে কতকটা লইয়া জোলের সমুখস্থ ইক্ষু অধিষ্ঠা ও রক্ষক দেবতা পোড়াতাড়ার (১) উপর ও অগ্নিতে ঢালিয়া দেয় এবং দেবার্জনা, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতির জন্য রাখিয়া দিয়া পরে সমস্ত শুড় মাটির কলসীতে ঢালিয়া রাখে। এই সমস্ত কলসীকে শুড়ের পায়া বলে। একটা পায়াতে ৬ হইতে ৩০ সের পর্যন্ত শুড় ধরে। ক্রমক এই সমস্ত শুড় বাড়ী লইয়া যায় এবং সংবৎসরের নিজের ব্যবহারের উপযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করে।

ভারতবর্ষে ক্রমকগণ শুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করে না। মোদকগণ ক্রমকের নিকট হইতে শুড় কিনিয়া লয় এবং চিনি প্রস্তুত করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানারূপ উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকলেরই প্রণালী প্রায়ই এক প্রকার। নিম্নে দেশীয় উপায়ে চিনি করিবার প্রণালী লিখিত হইল—

(১) পোড়াতাড়ি একটা গ্রাম্য দেবতা। অজ ক্রমকগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে পোড়াতাড়ি ঠাকুরই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আখ রক্ষা করে। হুতরাং সম্বৎসর মধ্যে পোড়াতাড়ির বিজ্ঞান নাই। প্রথমে ডগা-গরলে পোড়াতাড়িকে চৌকি দিতে হয়। তাহার পরই আখবাড়ীতে প্রায় দশমাস কাল আখ রক্ষার কাটিয়া যায়। ঐ কাৰ্য শেষ হইতে না হইতেই আবার আখনাশে পোড়াতাড়িকে শুড় দেখিতে হয়। এইরূপ সর্বদা কোন না কোন কাৰ্য্য ব্যস্ত থাকায়, অবকাশীন কোন লোককেও ক্রমকগণ পোড়াতাড়ি করিয়া থাকে।

শুড়ের পায়া বা ১১ মাস রাখিলে শুড়ের অধিকাংশ দানা ধাক্কিয়া যায়। তখন পায়ায় মুখ ভাকিয়া শৈবাল দিয়া ঢাকিয়া তলায় ছিঁড় করিয়া দিলে ছিঁড় দিয়া সমস্ত চিটা বাহির হইয়া যায়। শৈবালের শুণে উপরের কতকটা দানাদার শুড় শাদা হইয়া যায়। তখন ঐ শাদা অংশ চাচিয়া লইয়া পুনর্বার নূতন শৈবাল ঢাকা দিতে হয়। তৎপর দিবস আবার শাদা অংশ লইয়া অপর নূতন শৈবাল দিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চিটা বাহির হইয়া যায় এবং শুড় অনেকটা কাঁচ হইয়া পড়ে। তখন ঐ দ্রব্য রোড়ে শুকাইয়া বস্তা করিয়া রাখে। ইহাকে দোলা, দোলাশুড় বা দোলো চিনি কহে। এই দোলাই অনেক স্থলে চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। দোলা হইতে পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে মোদক লোহ বা পিতলের একটা বৃহৎ কড়া চুলায় চড়াইয়া উহাতে দোলা ও জল ঢালিয়া দেয়। যখন কুটিতে থাকে, তখন উহাতে অল্প অল্প তৈল, ছুখজল, চুণজল, কারজল ইত্যাদি ঢালিতে থাকে। তখন উহার উপরে গাদ উঠিতে থাকে, মোদক বাঁধিয়া দিয়া তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়। এইরূপে যখন আর গাদ উঠে না, তখন জাল দিয়া ঘন করিয়া চুলা হইতে কড়া নামাইয়া রাখে। শীতল হইলে তাহাতে দানা বাঁধিতে আরম্ভ হয়। ঐ সমস্ত দানাই শর্করা। রস হইতে ঐ শর্করা ছাঁকিয়া রাখিলে আবার নূতন দানা বাঁধিতে থাকে। এইরূপে সমস্ত দানা সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্টাংশে জাল-দিয়া অল্প কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ঐ রস চুলাতেই জলশূন্য করা হয়। তখন সমস্ত চিনি দানা বাঁধিতে পায় না। একবারেই কাদার ভায় হইয়া যায়। ঐ দ্রব্যকে পাটয়া ফেলিয়া জীবৎ কোমল থাকিতে থাকিতে কাঠের তাড়ু বা পেৰণী দ্বারা পিষিতে থাকে। ক্রমে উহা শুক শাদা ধূলায় আকার ধারণ করে, ইহাকে মাড়াচিনি বা ধুলুয়া চিনি কহে। মিথ্রী বা মিছরি চিনিরই ভেদ মাত্র। জর্জ ওয়াট সাহেব অসুমান করেন, পূর্বে এদেশে অধিক পরিমাণে সুপরিষ্কৃত চিনি হইত না। চীন ও মিসর হইতে ঐ সুপরিষ্কৃত চিনি এদেশে রপ্তানি হইত। এইরূপে চীনজাত শর্করা চিনি ও মিসরজাত শর্করা মিথ্রী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।* কিন্তু তাহার এই কল্পনা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, বহু পূর্বকাল হইতেই যে ভারতে শর্করা নামক নানাবিধ চিনি প্রস্তুত হইত, তাহা সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্কেন্দ্রে উক্ত হইয়াছে। [শর্করা শব্দ দেখ।]

* Dr. Watt's Dictionary of the Economic products of India.

শুড় হইতে চিটা বাহির করিয়া সারভাগ শুক করিলে তাহাকে ভুরা বা ভুরাশুড় কহে। ভারতচন্দ্র ও ভুরা এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

“আট পণে আনিরাছি আধসের চিনি।

অন্য লোকে ভুরা মের ভাগ্যে আমি চিনি।”

এতদ্বারা ভুরা চিনি অপেক্ষা নিকট বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ভুরা শব্দে উৎকৃষ্ট চিনি অর্থাৎ মিছরি বুঝায়।

কানীর দোবরা চিনি অতি উৎকৃষ্ট। ছইবার পরিকৃত করা হয় বলিয়া ইহার বোধ হয় দোবরা নাম হইয়াছে।

ওলা ও ইংরাজী লোফ-সুগার (Loaf-sugar) একই পদার্থ।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে নানারূপ ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। বাদ্রালায় কাজলী, কাতরি, খাগড়া, ছাঁচি, ছুধে, পুঁড়ি, বোম্বাই প্রভৃতি তত্ত্বিন্ন মরিচসহর, ওটাহিটা, বার্বৈ, শিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি হইতে আখের বীজ আনিয়াও চাস হইতেছে। কাজলী আখের রং লাল অথবা বেগুণে। তত্ত্বিন্ন সকলেরই রং ক্রিমী পীত। ছুধে আখের রং শাদা। চিত্র বিচিত্র আখও পাওয়া যায়। শিঙ্গাপুরের একরূপ স্বচ্ছ আখ অতিশয় কোমল ও মিষ্ট, কিন্তু অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া ঝড় বা বেশী বাতাসে সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। বোম্বাই ও ওটাহিটার আখ সর্কাপেক্ষা অধিক বড় হইয়া থাকে। কেবল চিবাইয়া রস পাইবার জন্য বহুপরিমাণে ইক্ষু ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত ইক্ষু অপেক্ষাকৃত অনেক কোমল। পাইতে খুব ভাল হইলেই সে আখে উৎকৃষ্ট চিনি হয় না। কোমল ও ভঙ্গপ্রবণ আখ চাস করিলে ক্ষতির ভয় অধিক। খুব সতর্ক হইয়া রক্ষা না করিলে শৃগাল ও মানুষেই অনেক খাইয়া ফেলে। মনুষ্য শৃগালদির উপদ্রব হইতে এড়াইবার জন্য অনেকে কাতরি, খাগড়া, চীনে প্রভৃতি কঠিন আখের চাস করিয়া থাকে। এই সকল আখে শুড় প্রায় সমান হয়, তা ছাড়া মানুষের কথা দূরে থাকুক, শৃগাল, কুই ইত্যাদিও একখানি নষ্ট করিতে পারে না। সেই জন্য এই সকল আখ না বাঁধিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ঝড়ে পড়িয়া গেলেও ইহাদিগকে নির্জিন্দে তুলিয়া দেওয়া যায়।

শৃগাল ও চোরের উপদ্রব ব্যতীত আখের আরও অনেক বিঘ্ন আছে। ১ম আখচাস বহু ব্যয়সাধ্য, সুতরাং দরিদ্র কৃষক ঋণ না করিয়া আখচাস করিতে পারে না। কিন্তু দেশীয় মহাজনদিগের কবলে একবার পড়িলে কেহই সহজে ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ইক্ষুচাষ এইরূপ বিপদ দেখিয়া সহজেই বিশেষ সঙ্গতি না থাকিলে, কেহ অগ্রসর হইতে চায় না।

তাহার পর দেবতার অমুগ্রহ হইলে যদি কেহ চাস

করিল, তখন আবার কুই, ইক্ষুর, শৃগাল ভদ্রুকাদির উপদ্রব আছে। সময়ে সময়ে ইহাদের একরূপ উপদ্রব হয় যে সমস্ত ইক্ষুক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তা ছাড়া মড়ক লাগা, ধনা ধরা ও অন্যান্য কীটাদির উপদ্রব আছে। একরূপ কীট আখের গায়ে ছিঁড় করিয়া বাস করে এবং রস পান করিতে থাকে। ইহারা একস্থানে ছিঁড় করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

একবার ছই একটা আখে কুই লাগিলে সমস্ত ঝাড়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, যে সুন্দররূপ আখ জন্মিয়াছে, বাহিরে কোন বৈলক্ষণ্য নাই, কিন্তু একগাছি ভাঙ্গিয়া দেখ, কোন পাব (পর্ক) শুক, কোথাও বা লাল ও বিষাদ হইয়া গিয়াছে অথবা সমস্তটাই একরূপ অস্বাদ্যবস্তু হইয়াছে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেক কৃষিতত্ত্বাভ্যাসকিৎসু মহোদয় এই বিষয় পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে বহুবর্ষ ধরিয়া এক জমিতে একরূপ ইক্ষু আবাদ করিলে পূর্কোক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। তাঁহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বাদ্রালায় যেসকল জমিতে বোম্বাই আখের চাস ১৯২০ বৎসর ধরিয়া হইতেছে তথায় এই সকল রোগ অত্যন্ত অধিক, আবার যেখানে ১৯১২ বৎসর মাত্র চাস হইতেছে, তথায় আদৌ ঐরূপ কোন রোগ নাই।

অনেক সময় ইক্ষুক্ষেত্রে বহু পরিমাণে আগাছা ও পরগাছা জন্মিয়া বিস্তর ক্ষতি করে। এই সমস্ত পরগাছার দৌরাছো অনেক সময় কৃষককে ইক্ষুচাস বন্ধ করিতে হয়। পরগাছা আখের গোড়ার উৎপন্ন হয় এবং উহার গায় শিকড় কুটাইতে থাকে। ইহাদের শিকড় ইক্ষুর বৃদ্ধি ভেদ করিলে ইক্ষু আর বর্ধিত হয় না, শুষ্ক ও মৃতবৎ হইয়া যায়। প্রথমে জমিতে শণ, নীল প্রভৃতি আবাদ করিয়া পরে ভালরূপ সার দিলে ইহাদের হাত এড়াইতে পারা যায়।

এই সকল বিষয় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ইক্ষু জন্মিলেও রক্ষা নাই। দেশীয় প্রথা অমুসারে কোন দিগ ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট ইক্ষু ভাঙ্গিয়া লইয়া গেলেও তাহাকে কিছু বলিবার যো নাই; কেন না মনুষ্য নিয়মামুসারে দ্বিজের ইক্ষুগ্রহণে অধিকার আছে। তা ছাড়া পথিক, গাড়োয়ান, রাখাল প্রভৃতি গোপন ভাবে অনেক অপহরণ করে। গ্যাডাল দিব্যর (অর্থাৎ ইক্ষু কর্তনের) দিন আখ-বাড়ীতে একরূপ লুট পড়িয়া যায়। লোক আসিয়া যথেষ্ট ভক্ষণ করে ও হুচার গাছি না লইয়া ফিরে না। চক্ষের উপর এইরূপ ডাকাতি দেখিলেও দেশাচারের খাতিরে কৃষক কিছু বলিতে পারে না। আখশালেও ব্রাহ্মণাদি বা অপহরণ

লোক আসিলে তাহাকে শুড়, রস বা আখ দিতে হইবে, কাহাকেও নিরাশ করিয়া রিক্তহস্তে কিরাইলে অশ্রম হয়। তাহার পর বখন শুড় হইবে, তখন শুক, পুরোহিত, নাগিত, ধোণা, লকলকে শুড় দিতে হয়। এইরূপ অবিস্রাত ব্যয়ের পর অন্নায় শ্রম কৃষকের ভাণ্ডারে যায়, ইহাতে অনেক সময় কৃষকের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, চাসের খরচই উঠে না। এই কারণে অনেকে আখের চাস করিতে চার না। তাহার উপর কৃষক অশিক্ষিত। পিতৃপিতামহাদি প্রদর্শিত প্রাচীন প্রণালীর অভিক্রম করিয়া নতুন প্রণালী অবলম্বন করিতে জানে না বা চাহে না। সুতরাং এদেশে শুড় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবসায়ও যে অধঃপতন হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের লাভও আছে, তাহাতে দেশের উপকারও আছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনবাসিগণকর্তৃক কানেরি-দ্বীপ-পুঞ্জে ইক্ষু চাস আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে ১৪২০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ-গণ সিসিলী দ্বীপ হইতে মেদিরা ও সেন্ট টমাস দ্বীপে ইহার চাস করে। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে কানেরি দ্বীপ হইতে ইহা সানডোমিঙ্গো দ্বীপে প্রচলিত হয়। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ ব্রাজিলে সর্বপ্রথম ইক্ষুর চাস ও চিনির কারখানা স্থাপন করেন, কিন্তু শীঘ্র তথা হইতে পর্তুগীজদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কারখানা করেন। ইংরাজগণ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বার্বাডোজ দ্বীপে এবং ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে জামেকা দ্বীপে চিনির কারখানা করিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই চিনির ব্যবসা লইয়া ইংরাজ, ফরাসী ও পর্তুগীজদিগের মধ্যে ভরানক আড়াআড়ি চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা নানা উপায়ে খরচ কমাইয়া সর্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ সানডোমিঙ্গোর কারখানার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ইংরাজদিগের সহিত টক্কর দিয়া যুরোপে বিস্তর চিনি চালান দিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে ইক্ষুর চাস যুরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে রাজনৈতিক বিপ্লবে সানডোমিঙ্গোর ফরাসী-চিনির কারখানা উঠিয়া যায়। সুতরাং ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের চিনির কাটি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। এ সময় চিনি অতি-শর মহার্ঘ্য হয়, এমন কি এই সময় ইংলণ্ডে অতি কমর্য্য চিনিরও দাম প্রায় ৮০ আনার বিক্রয় হইত। তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে চিনি রপ্তানী করিবার জন্য সকলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে

অনুরোধ করেন। তখন ভারতীয় চিনি এত অধিক পরিমাণে বিলাতে রপ্তানী হইতে লাগিল যে আমেরিকার চিনি ব্যবসায়ী ইংরাজগণ দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইল। কর্তৃপক্ষ আমেরিকার কারখানা সকলের এইরূপ দুর্বস্থা দেখিয়া তাহাদের সুখ চাহিয়া শুকের হার কমাইয়া দিলেন, কিন্তু ভারতীয় চিনির শুক অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তৎকালে দাস-প্রথার প্রতি সাধারণের ভরানক বিষেব থাকার, ক্রীত দাস দ্বারা প্রস্তুত আমেরিকার উৎকৃষ্ট চিনিও পরিত্যাগ করিয়া লোকে ভারতের চিনি ব্যবহার করিত। এই সমস্ত চিনি বাজালা হইতে রপ্তানি হইত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দেও বাজালা হইতে ৫০০০০ মণ চিনি বিলাতে প্রেরিত হয়। এক্ষণে বাজালা হইতে চিনি রপ্তানির কথা দূরে থাকুক, খরচের উপযুক্ত পরিমাণ চিনিও এখানে উৎপন্ন হয় না। নানাহান হইতে চিনি, শুড় প্রভৃতি বাজালায় আমদানি হইয়া থাকে।

আজকাল আমেরিকার নানাহানে, মরিসসু, ওটাহিটী, শিকাপুর প্রভৃতি দ্বীপে প্রভূত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে। বলা বাহুল্য এই সকল কারখানার অধিকারীগণ সকলেই যুরোপীয়। ইক্ষুর হইতে চিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই বৃহৎ বৃহৎ কল দ্বারা সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে জমিতে চাস ও সার দেওয়া এবং উপ-যুক্ত ইক্ষু রোপিত হয়। আমাদের দেশীয় কলে ইক্ষু হইতে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক রস বাহির হইতে পারে না, কিন্তু যুরোপীয়গণের উৎকৃষ্ট কল সাহায্যে শতকরা ৭৫ ভাগ রস বাহির হয়।

ভারতবর্ষে যুরোপীয় প্রণালীতে ইক্ষু চাস ও চিনি প্রস্তুত করণের চেষ্টা অনেকবার করা হইয়াছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বণিকদল প্রথম এই উদ্যম করেন। গবর্নর জেনারেল ঐ কোম্পানিকে সাহায্য করিতে সন্মত হন। তাঁহারা প্রথমে কতক ভূমিতে ইক্ষু রোপণ করেন, কিন্তু ক্রমাগত রুই কীটে এরূপ অনিষ্ট করে যে কোম্পানিকে ঐ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহারা তৎপরে দেশীয় কৃষকগণের নিকট হইতে ইক্ষু লইয়া কিছুদিন চিনি করেন, পরে বিশেষ লাভ না থাকায় ঐ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পর এ বিষয়ে প্রথম উদ্যমকারীগণকে বিশেষ সতর্কতা ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। বণিকসমিতির দশা দেখিয়া কাহারও হতাশ হইবার বিশেষ কারণ নাই, বরং তাঁহাদের কিরূপ সাবধান হইতে হইবে তাহাই বুঝা যায়।

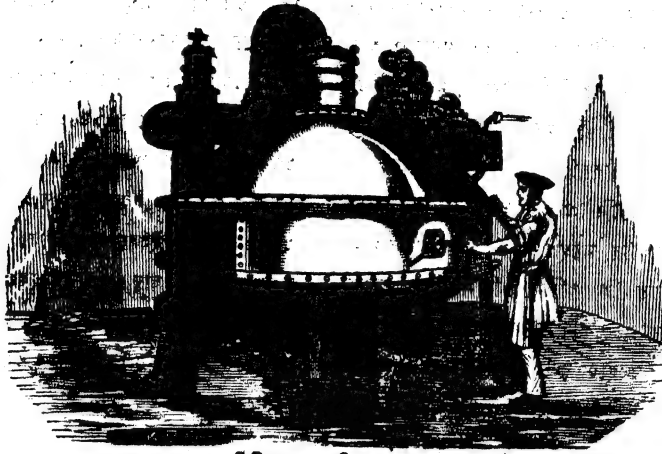
চিনি প্রস্তুত করিবার কৌশল নানা প্রকার প্রচলিত আছে। বিদেশীয় কলে প্রস্তুত চিনিতে হিন্দুধর্মবিপরিত্ত কোন কোন

পদার্থ দেওয়া হয় বলিয়া উহা হিন্দুর পক্ষে অভোজ্য, সুতরাং এদেশে কলে চিনি প্রস্তুত হইত না। বৃহৎ কড়া, ডেক কিবা ইাড়ির মধ্যে ইন্ধুরস রাখিয়া উহার নীচে জাল দিতে ও মুখ খুলিয়া রাখিতে হয়। অগ্নির উত্তাপে ঐ রসের উপরিভাগে একপ্রকার মলিন পদার্থ জমিয়া যায়, উহা জমিয়া মাত্র তুলিয়া কেলিতে হয়, ইহাকে গাদতোলা কহে। এইরূপে কতক সময় জাল দেওয়া ও গাদ তোলায় পর জলীয় অংশ বাষ্প হইয়া গেলে এবং উহা ঘনীভূত হইয়া গুড়রূপে পরিণত হইলে শীতল করিবার জন্ত মৃৎপাত্রে চালিয়া রাখিতে হয়। রীতিমত দানা বাঁধিলে উহার মধ্য হইতে তরল অংশ ভাগ করিয়া কেবলমাত্র সারাংশ রাখিবার উদ্দেশে ঐ গুড় মোটা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া তাহার উপর চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তরল অংশ সূচ্যরূপে নিঃসৃত হইয়া গেলে সারাংশে জল মিশ্রিত করিয়া পুনরায় জালের উপর চাপাইতে হয়; এবারে ইহার সহিত সামান্য চূণ ও দুগ্ধ মিশাইতে হয়, কারণ চূণ ও দুগ্ধে ময়লা কাটে। জালের উপর থাকিয়া উত্তপ্ত হইলে উহার উপর পুনরায় ময়লা (গাদ) জমিতে থাকে ও উহা তুলিয়া কেলিতে হয়। ক্রমাগত এইরূপ প্রক্রিয়ার পর যখন আর ইহার উপর মলিনাংশ (গাদ) দৃষ্ট হয় না, অথচ জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পৃথক্ হইয়া যায়, তৎকালে ইহা নামাইয়া শীতল করিবার জন্ত মৃৎপাত্রে রাখিতে হয়। মৃৎপাত্র মধ্যে দানা বাঁধিলে তরলাংশ পৃথক্ করিবার জন্ত তলদেশে ছিদ্র ও চিনির বর্ণ উজ্জল ও পরিষ্কার করিবার জন্ত পাত্রের উপরিভাগ শৈবাল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। শৈবাল নিঃসৃত রস পাত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চিনির মলিনাংশের সহিত ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। শৈবালের গুণে চিনির দানা শুভ্র হইয়া পড়ে। পরে হাঁড়ি হইতে চিনি বাহির করিয়া লইতে হয়। এই চিনি পুনর্বার জালে চড়াইয়া পূর্বের জায় আবার দানা বাঁধিতে দেয়। চিনির মধ্য হইতে পাত্রের ছিদ্র দিয়া যে রস বাহির হইয়া যায়, তাহা অপর পাত্রে ধরিয়া অল্প প্রয়োজনে লাগান হইয়া থাকে। চীনদেশেও এই প্রক্রিয়ায় চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমেরিকা মহাদেশে অতি সহজ উপায়ে ইন্ধুরস হইতে চিনি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। তথায় আধ-মাড়া কল হইতে নিঃসৃত রস প্রাণালীর মধ্য দিয়া পাত্রে পতিত হয়। ঐ পাত্রগুলি অধিকুণ্ডের উপর স্থাপিত। অধিকুণ্ড সকল সময়ে প্রজ্জ্বলিত থাকে না; পাত্র রসপূর্ণ হইলে অধিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ও সেই সময়ে রসের সহিত অতি অল্প পরিমাণে চূণ মিশ্রিত করা হয়। পাত্রস্থ রস উত্তপ্ত

হইলে উহার ঘন অংশ উপরে ভালিয়া উঠে। রস পরিষ্কৃত করিবার জন্ত ঐ মলিন ঘন অংশকে তুলিয়া কেলিয়া দিতে হয়, উহাকেই এদেশে গাদতোলা বলে। কিছুকণ এইরূপে তাপে পরিষ্কৃত হওয়ার পর যখন দেবিতে পাওয়া যায় যে রসের উপরিভাগ গুরুবর্ণ কোয়ার উত্থলাইরা উঠিতেছে সেই লম্বেরে অধিকুণ্ড অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিতে হয় এবং এক ঘটাকাল ঐ রস সেই অবস্থায় রাখিয়া পরে অপর পাত্রে চালিয়া দেয়। এই সময়ে রস দেবিতে ঠিক শিথলবর্ণ সুরার জার উজ্জল ও পরিষ্কৃত যোধ্য হয়। সমুদায় পাত্রান্তরিত হইলে উহার জলীয় অংশের কমকিঞ্চ বাষ্পাকারে পরিণত করিবার জন্ত পুনরায় রসপূর্ণ পাত্রের তলদেশে অগ্নির উত্তাপ দেয়। অগ্নির উত্তাপে রসের উপরিভাগে গাদ একত্র হইলে উহা অতি সতর্কভাবে তুলিয়া কেলি; অবশেষে রস জমাট বাধিবার উপযোগী হইলে, হাতা কিবা ঐরূপ কোন উপকরণ দিয়া প্রথমে শীতলকরণার্থ কাঠনির্মিত বাস্ক কিবা নলের জায় আকৃতিবিশিষ্ট কোন পাত্র মধ্যে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িতে হয়, পরে ঘন করিবার জন্ত তাহা হইতে অপর পাত্রে চালিয়া থাকে। এই পাত্র মধ্যে রসের কিয়দংশ কোমল দানাবিশিষ্ট হয় ও কিয়দংশ ঘন আটাল দানাবিহীন তরল অবস্থায় থাকে। দানাদার অংশ, দানা বিহীন তরল রস হইতে পৃথক্ হইলেই চিনি হয়। সুতরাং উভয় প্রকার পদার্থ পৃথক্ করাই দরকার। তরল অংশ হইতে দানাদার অংশ পৃথক্ করিবার জন্ত শেখোক্ত পাত্র হইতে দানায়ুক্ত অংশ বাহির করিয়া একটা বৃহৎ গৃহ মধ্যে লইয়া যায়। উক্ত গৃহের মেজের মধ্যে গর্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে তরল পদার্থ-ধারণের উপযুক্ত চৌবাচ্চা প্রস্তুত ও তাহার উপরিভাগে ক্রেমের উপর কতকগুলি খালি পিপা স্থাপিত। ঐ সকল শূন্য পিপার তলদেশ কলার ডেগো ঢাকা ও তাহাতে আট দশটা করিয়া ছিদ্র থাকে। পূর্বলিখিত দানাদার অথচ সামান্য তরল রসমিশ্রিত চিনি এই সকল পিপার মধ্যে রাখিলে উহার তরল অংশ ক্রমে সহিদ্র কলার ডেগোর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নীচে ভূমি গর্তস্থ চৌবাচ্চা মধ্যে পতিত হয় এবং শুষ্ক চিনি পিপার মধ্যে রহিয়া যায়।

চিনি প্রস্তুতের জন্ত অনেক স্থলে অনেক প্রকার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে ডব্লিউ এণ্ড এ মইন (W. and A. Monie) সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত কলই যুরোপখণ্ডে সর্বত্র প্রচলিত ও বিশেষ আদৃত। [চিত্র দেখ।] এই কলে তাত্ত্বনির্মিত শূন্য কটাহ সংলগ্ন থাকে, ইহার ব্যাস ৯ ফিট ও নিয়ান্ত দীর্ঘতম। উভয় তলের মধ্যস্থলে ২ ইঞ্চি কিবা এক



চিনি প্রস্তুত করিবার কল।

ইক্ষু পরিমিত স্থান ধুম চলাচলের জন্ত শুল্ক থাকে। ইক্ষুরস পূর্কবর্ণিত প্রণালীমত উত্তপ্ত ও উহার মলিনাংশ পৃথক্ হইয়া তরল হইলে এবং উত্তপ্তাবস্থাতেই তৈলের স্রাব ঘন হইলে উহাকে এই কলের শুল্ক কটাতে চালিয়া দিতে হয়। কল-সংলগ্ন শুল্ক কটাতে নিষ্কিপ্ত রস শীতল হইতে আরম্ভ হইলে উহাতে দানা বাঁধিতে থাকে। দানা বাঁধিবার সময়ে বাহাতে দানাগুলি ঠিক একরূপ হয়, তৎপক্ষে চিনি প্রস্তুতকারীগণকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়। তাহার শুল্ক কটাহের সমুদায় অংশ রসপূর্ণ না করিয়া উহার তৃতীয় কি চতুর্থ অংশ রস পূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিতে থাকে এবং দানাগুলি আয়তনে বৃহৎ হইয়া আসিলে উহার মধ্যে ক্রমশঃ মলিন রস দিয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে থাকে। এইরূপে কটাহের রস দানায়ুক্ত মণ্ডাকার হইলে উহা অপর পাত্রে চালিয়া এই পাত্র মধ্যে রাখিয়া শীতল করিলেই চিনি হয়, কিন্তু প্রস্তুতকারীগণ উহা তখন শীতল না করিয়া অন্তান্ত দেশে রপ্তানির জন্ত তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র মধ্যে চালিয়া শীতল করে। চিনির ভাল দানা বাঁধিলে এবং উহা শীতল হইলে পর পাত্রতলস্থ ছিদ্রগুলির দ্বিপি খুলিয়া দেয়। দ্বিপি খোলা হইলে পাত্রমধ্যস্থ বে রস জমিয়া দানাকারে পরিণত হয় নাই, তাহা বহির্গত ও প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ পাত মধ্যে গিয়া জমে। পরে পুনরায় ঐ রস কলের শুল্ক কটাতে স্থাপন করিয়া উহা অপেক্ষা কিছু অল্প গুণবিশিষ্ট চিনি প্রস্তুত করে, ইহাই মাঝারি চিনি। এই চিনির অবশিষ্ট রসংশ লইয়া তদপেক্ষা খারাপ চিনি প্রস্তুত করা হয়।

ইংলণ্ড ও অন্তান্ত দেশে চিনি পরিষ্কার করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা হইয়া থাকে। চিনি পরিষ্কার করিবার স্থান আট নয় তল উচ্চ। অপরিষ্কৃত চিনি উহার উচ্চতম স্থানে লইয়া গিয়া চিনি-পরিষ্কারকরণ সম্ভবমত উহার সহিত উষ্ণ জল ও সামান্য গোরক্স মিশাইয়া তলদেশে অগ্নির উত্তাপ দেয়, তাপ বেশী হইলে গোরক্সের সারভাগ ঘন হইয়া উষ্ণ তরল পদার্থ মধ্যস্থ সমুদায় অপরিষ্কৃত অংশ সহ পাতলা গাদের স্রাব উপরে আসিয়া উঠে। সেই তরল চিনি মোটা ঘন বুনানি কার্পাসবস্ত্র নিষ্প্রিত থলিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই থলি ব্যাগফিন্টার নামে অভিহিত। শীঘ্র শীঘ্র থলির মধ্য হইতে রস নিঃসরণের জন্য উহা লোহদণ্ডে বুলাইয়া রাখে এবং পাছে শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে উহার চারিপার্শ্বে উত্তাপ প্রয়োগ করে। বস্ত্রনিষ্প্রিত থলি দিয়া সকল প্রকার ময়লা নষ্ট হয় বটে কিন্তু উহার কৃষ্ণবর্ণস্থ যায় না, সেই জন্য থলি হইতে বহির্গত হইলে পুনরায় লোহনিষ্প্রিত অক্ষারাক্তি-পরিপূর্ণ পাত্র মধ্যে রাখিয়া দেয়। ঐ পাত্রের উচ্চতা সচরাচর ২০১০ ফিট এবং ব্যাস প্রায় ৫১৬ ফিট। পাত্রস্থ অক্ষার চূর্ণ করিয়া দেয়। অক্ষার চূর্ণের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর ইহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়। এই সময় অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পরিণত করিলে শুভ্র, উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত হয়।

চিনি অধিকতর পরিষ্কৃত ও দানাগুলি গোটা রাখিয়া বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে মিছরী বলে। চিনির রস স্ফুটাক্রমে পরিষ্কৃত হইলে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সাধারণ কটাহ অপেক্ষা বৃহৎ কটাহে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ ও

মধ্যে মধ্যে নতুন রস ঢালিয়া দিতে হয়, উহার মধ্যে বড় বড় দানা দৃষ্ট হইলে উহা কেন্দ্রবিমুখ (Centrifugal Machine) কলের মধ্যে পাড়ান্তর করা হয়। উক্ত কলে ঢালিবামাত্র দানা-বিশিষ্ট অংশগুলি অবশিষ্ট রস হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে ও শুক হইয়া যায়। এই বড় বড় দানাদার চিনিই মিছরী নামে অভি-হিত। এই প্রকার চিনির দানাগুলি সহজে দ্রব করা যায় না।

চিনির ব্যবসা।

জগতে কি পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঈলি সাহেব কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ চিনি ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার কৃত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে—

ভারতবর্ষ ও ব্রিটান আমেরিকায়	২৬৬৬২৫০ মণ,
ফরাসী উপনিবেশ সকলে	১৭৭৩৭৫০ মণ,
হলণ্ডের উপনিবেশ সকলে	১৭৮৭৫০০ মণ,
স্পেনের উপনিবেশে	২১৪৩৭৫০ মণ,
ডেনমার্কের উপনিবেশ সকলে	২০৬২৫০ মণ,
ব্রজিল দেশে	৫৫০০০০০ মণ,
আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে	৩৭৫৩৭৫০ মণ,

মোট ৩১৮৩১২৫০ মণ,

ইক্ষু-চিনি অল্প দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। তিনি আরও স্থির করেন যে, যে পরিমাণ চিনি এক এক দেশ হইতে ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, উক্ত পরিমাণ চিনি সেই সেই দেশের প্রয়োজন জন্তও ব্যয়িত হয়। তিনি যে কেবলমাত্র ইক্ষুরসোৎপন্ন চিনির বিষয় স্থির করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি তাহার তালিকা মধ্যে ৪৫৩৭৫০০ মণ বিট-মুলের চিনি, ২৭৫০০০০ মণ খেজুরে চিনি এবং ৫৫০০০০ মণ মাপল্ চিনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক যদি তাহার তালিকা বিস্তৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা ৬৮৭৫০০০০ মণের অনেক অধিক চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মাকুলক সাহেবের মতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রার পৃথিবীতে ২৫০০০০০০ হেণ্ড্রেট ওয়েট চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল।

অপরূপ দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে চিনি অধিক প্রয়ো-জনে লাগিয়া থাকে। চিনি ভিন্ন কোন প্রকার মিষ্টান্ন কি ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে না। মিষ্টান্ন, প্কার প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ব্যক্তিরেকেও বহু বিষয়ে চিনির আবশ্যক হইয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কাশী, গাজিপুর প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয় এবং উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। মিঠাবান্ হিন্দু সন্তান দেশীয় ব্যক্তীত বিশেষীয় পরিত্রুত চিনি ব্যবহার করেন না।

(১৮৩৬-৩৭ খৃঃ অব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ৫১৩৮৪৩০৭ ১৮৪০-৪১ খৃঃ অব্দে ১৬৪৬৮৮২৮ এবং ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৬৬২৮৫২৪ টাকার চিনি বিদেশে রপ্তানি হয়। এই সমস্ত চিনি অধিকাংশই বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাঙ্গালা দেশজাত চিনির উপর শুদ্ধ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ঐ বর্ষ হইতেই ভারতীয় চিনির ব্যবসা কমিতে থাকে। ১৮২০-২১ সালে ভারতবর্ষে হইতে মোট ৩৮৩৭৫৪ টাকার চিনি ও ৩৭২১৮৭১ মণ শুদ্ধ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়।

ঐ বৎসর মরিশসহর, চীন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও উপ-নিবেশ সমূহ হইতে মোট ৩,৩২,৬৮৪৬২৬ টাকার চিনি ও ৭৩০৩৬৩ টাকার শুদ্ধ প্রভৃতি ভারতবর্ষে আমদানি হয়।

১৮৮২-২০ সালে বাঙ্গালা হইতে ৫৮৬২৬ মণ চিনি ও ৩২৪৩৩৭ মণ শুদ্ধ, দোলা ইত্যাদি ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি হয়। ঐ বর্ষে ভারতের নানাস্থান হইতে আমদানি পরি-মাণ ১০১১৩ মণ চিনি ও ৭৬৩৮২ মণ শুদ্ধ ইত্যাদি।

গত ১৮২০-২১ খৃষ্টাব্দে আমদানির পরিমাণ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ঐ বৎসর বাঙ্গালা হইতে ২৪২০৬ টাকার চিনি ও ৩১০০ টাকার শুদ্ধ, মোট ২৭৩০৬ টাকার মাত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। সুতরাং ঐ বর্ষে প্রায় ৬৯ লক্ষ টাকা কেবল চিনি, শুদ্ধ ইত্যাদি ক্রয় জন্তই বাঙ্গালাকে দিতে হইয়াছে।

রেজিস্ট্রার প্রস্তুত চিনির প্রতি পূর্বে লোকের যে দৃণা ছিল তাহার শৈথিল্যই বিদেশীয় চিনির কাটুতির কারণ।

কেবল কলিকাতা নগরেই প্রতিবর্ষে প্রায় ৩ ভিন লক্ষ মণ চিনি খরচ হয়। ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ১৩ সের ১০ হটাক চিনি ভক্ষণ করিয়াছিল।

চিনিওৎ, পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝল্ জেলার একটা নগর। ইহা চম্ভাভাগানদীর দুই মাইল দক্ষিণে এবং ঝল্ হইতে উজ্জিরা-বাদে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪৩'৩২" উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫২" পূঃ। এখান সমৃদ্ধিশালী। এখানে একটা উৎকৃষ্ট মসজিদ এবং একজন মুসলমান সাধুর নামে প্রতিষ্ঠিত একটা মন্দির আছে। কাঠ এবং অন্তরে খোদিত কারুকর্মের জন্ত এ স্থান বিখ্যাত। যে সময়ে, আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল নির্মিত হয় সে সময়ে

একজনকার স্থপতিগণ তথায় গমন করিয়াছিল। তিনিও তহশীলের কার্যালয় সকল এই নগরে অবস্থিত।

চিনিাকানরাজা (দেশজ) একপ্রকার গাছ। ইহার ফল কামরাকার ছায়। আকারে তাহার অর্ধেক। পরিপক্যবস্থায় ইহার বর্ণ ঘোর সবুজ, কিন্তু কামরাকার ছায় সূক্ষ্ম নহে। ইহা কামরাকার নত অল্প নর, এবং ইহার আশ্বাদও তেমন উত্তম নহে।

চিনিবাদাম (দেশজ) দক্ষিণআমেরিকাজাত ফল। কিন্তু এখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই ইহা উৎপন্ন হয়। এই বাদাম মামির ভিতর জন্মে এবং সেই খানেই ইহা পরিপক্য হয়। এই নিমিত্ত ইহাকে ভূঁইমুগ বলে। ইহার আশ্বাদন বাদামের ছায়।

চিনিতোপ (পুং) তোপচিনি।

চিন্‌চিন্ (দেশজ) অন্ন অন্ন আলা করা।

চিস্তক (ত্রি) চিস্তয়তি চিস্তি-ধূল (ধূলত্বটৌ। পা অ১।১৩৩) যে চিন্তা করে, চিস্তয়িতা।

চিস্তন (ক্ৰী) চিত্তি-গিচ্ ভাবে-নুট। অধ্যয়ন, চিন্তা।

চিস্তনীয় (ত্রি) চিত্তি-গিচ্ কৰ্ম্মণি অনীয়। অধ্যয়ন, ভাবনীয়।
“অতোহত্চিস্তনীয়স্ত” (ভাগ ৮।১১।৩৮)

চিস্তয়িতব্য (ত্রি) চিত্তি-গিচ্ কৰ্ম্মণি তব্য। চিস্তনীয়, ধ্যেয়।

চিস্তা (ক্ৰী) চিত্তি-গিচ্-দ্বিয়ামণ্ড (চিত্তিপূজিকথিকৃষ্ণিচর্চক। পা অ৩।১০৫) ততোহ দন্তত্বাং টাপ্ (অজাদ্যন্তটাপ্।) ১ আধান, ভাবনা। “চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তঃ” (ভাগ ৭।৫।৪৪।) ২ কল্পনাপতি উদয়ের পত্নী। (রাজত ৮।৩৪৫৩) ৩ নাট্যকৌতু ব্যভিচারি গুণবিশেষ। লক্ষণ,—প্রিয় বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু তদ্বিষয়ক ধ্যান; ইহা দৃষ্টির শূন্যতা, শারীরিক তাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা অহুমিত হয়। চিন্তা করণ রসে ব্যভিচারী। (সাহিত্যদর্পণ) ৪ দর্শনসম্প্রদায়বিষয়ক ভাবনাতোদ। (রসমঞ্জরী) পর্যায়—আধা, ধ্যান, চিন্তিত।

চিন্তাকৰ্ম্ম (ক্ৰী) চিন্তেব কৰ্ম্ম কৰ্ম্মধা। চিন্তারূপ কার্য।

চিন্তাকারিন্ (ত্রি) চিন্তাং কৰোতি চিন্তা-কৃ-গিনি। যে চিন্তা করে।

চিন্তাপর (ত্রি) চিন্তা পরা প্রধান যন্ত বহুব্রী। চিন্তাসক, চিন্তাষিত।

চিন্তামণি (পুং) চিন্তায়াং সৰ্বকামদো মণিরিব। শাক-পাৰ্থিব-বৎ সমাসঃ অথবা চিন্তায়াং ধ্যান-ধারপাদিনা মন্ততে আহরতে চিন্তা মন-ইণ্। ১ ব্রজা। ২ বৃক্ষবিশেষ। ৩ কামপ্রদ মণিভেদ। “চিন্তামণীহুদ্যাম্ভাচ চিত্তিতে সৰ্বকামদান” (হরি ১৫২ অঃ)

৪ সৰ্বকামদণ্ডরমেশ্বর। ৫ মন্তবিশেষ। ৬ যাত্রিক যোগভেদ। সঙ্গল সহজ স্থানে ও বৃহৎপতি ডাটগাহানে থাকিলে

তাহাকে চিন্তামণি যোগ বলে, ইহাতে বাজা করিলে মঙ্গলকর মিল হয়। (জ্যোতিষ) ৭ স্পর্শমণি। “যথা চিন্তামণিঃ স্পৃষ্টঃ লৌহঃ কাঞ্চনতাম্রং ব্রজেৎ।” (পদ্ম-উত্তরখণ্ড) ৮ গণেশ ভেদ। ইনি কপিলের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবাহু গঙ্গা নদীক তৈল্য কপিলের চিন্তামণি হরণ করিলে ইনি তাহাকে বিনাশ করিয়া সেই মণি উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই অবধি ইনি চিন্তামণি নামে অভিহিত হন। কপিলের গৃহে উৎপত্তি হেতু ইহার আর একটা নাম কপিল। (স্কন্দপুঃ গণপতিকল্প।) ৯ অশ্ববিশেষ। লক্ষণ—কণ্ঠদেশে একটা মাত্র বৃহৎ লোমাবর্ত থাকিবে। এই অশ্ব চিত্তিত অর্থ-বুদ্ধিকারী। (নকুলকৃতান্ত চিকিৎসা)

চিন্তামণি, ১ কৃষ্ণকীর্ত্তিপ্রবন্ধ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, বৃহত্তচিন্তামণি-রচয়িতা রামের শিষ্যমহ। সংস্কৃত ভাষার ইহার রচিত এই কথ্যানি জ্যোতির্গ্রন্থ পাওয়া যায়—পণ্ডিতত্ব চিন্তামণি, গ্রহগণিতচিন্তামণি, জ্যোতিঃশাস্ত্র, রমণশাস্ত্র, রমণচিন্তামণি, রমণোৎকর্ষ।

৩ বৃহত্তমালী নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৪ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, হরিহরের পুত্র ও সিদ্ধেশ্বর পোত্র। ইনি অক্ষাবলী, অভিধানসমুচ্চয়, কংসবধ, কাদম্বরীরস, কৃতাপ্পূজাঙ্গি, ত্রিশিরোবধ, বাহুবলবন্তব, শম্বরারিচরিত এবং ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বাহুবলবন্তব নামে ছন্দো-গ্রন্থ রচনা করেন।

৫ শেষ নৃসিংহের পুত্র শেষ চিন্তামণি নামে খ্যাত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় ছন্দঃপ্রকাশ, মেঘদূত টীকা, রসমঞ্জরীর ভাষা, কল্পিণীহরণ নাটক এবং বৃন্তরত্নাকরের স্থধা নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

৬ শিবপুরবাসী গোবিন্দ জ্যোতির্বিদের পুত্র, দৈবজ্ঞ চিন্তামণি নামে বিখ্যাত। ইনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তারচিন্তামণি নামে এক ছন্দোগ্রন্থ ও তাহার টীকা রচনা করেন।

৭ জ্ঞানাপিরাভ কৃত সিদ্ধান্তসূত্রীর একজন টীকাকার। এই নামে সংস্কৃত ভাষার ছায় ও যশশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিস্তার গ্রন্থ আছে।

চিন্তামণি স্নায়বাণীশ ভট্টাচার্য্য, গোড়বাসী একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। ইনি স্মৃতিব্যবস্থা রচনা করেন। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে উদাহ, তিথি, দায়, প্রায়শ্চিত্ত, শুদ্ধি ও শ্রাদ্ধব্যবস্থা বর্ণিত আছে।

চিন্তামণিচতুষ্টয়, ষট্‌বধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসমিন্দুর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অঙ্গ ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র স্নাতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরূপপক্ষে

বেঠেন করিয়া ধাতুরালির মধ্যে স্থাপন করিবে। তিন দিবস পরে বাহির করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অস্থাপন মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্ন*)

চিন্তামণিপেট, মহিষুর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার জেলার একটি নগর। ইহা কোলার হইতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ২১' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫' ৪৫" পূঃ।

চিন্তামণিরাও নামক একজন মহারাজা এই নগরটিকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হইতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি ব্যবসাদার লোক বাস করে। সোণা, রূপা, জহরৎ এবং নানা প্রকার শস্তের বাণিজ্য হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরস, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অত্র ১ তোলা, বিষ ১০ তোলা, জয়পাল ১১০ তোলা, এই সকল দ্রব্য গোড়ানিবুর রসে মর্দিত ও গোলাকার করিয়া তিনটা পাণ দিয়া বেঠেন এবং মৃত্তিকার কোটার স্থাপন পূর্বক কুট্টিত বস্ত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া লঘুপটে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া ঐ পাণ তিনটির সহিত সমুদায় চূর্ণ করিয়া পুনর্বার জয়পাল অর্দ্ধ তোলা ও বিষ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিকটুচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ ও চিতাপাতার রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে সর্বপ্রকার জ্বর, শূল প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

২য় প্রকার—পারদ, গন্ধক, অত্র, লোহ, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা ও রৌপ্য ১০ তোলা সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রস, তুঙ্গরাজ রস এবং অর্জুন ছালের কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এক একটি বটিকা গোখুমের কাথের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ, কুস্কুলরোগ এবং প্রমেহ, শ্বাস, কাথ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি এবং বলবীর্ঘ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্ন*)

চিন্তামণিবিনায়ক (পুং) গণপতির মূর্তিভেদ। কালীতে যে ৮টা বিনায়ক আছেন, ইনিও তাহাদের অন্তর্গত। ইনি হেরদ্বের অমিকোণে অবস্থান করিতেছেন। (কালীধ° ৫০ অঃ)

চিন্তাময় (ত্রি) চিন্তা-ময়ট্ (ময়ট্ চ। পা ৪।৩।৮২) চিন্তাধারা উপস্থিত, চিন্তাহেতু উৎপন্ন। “ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীধরম্” (ভাগ° ২।২।১২) ‘চিন্তাময়ং চিন্তয়া আবির্ভবন্তঃ’ (শ্রীধর)।

চিন্তাবৎ (ত্রি) চিন্তা অস্ত্যস্ত চিন্তা-মতৃপ্ মস্ত বচ (মাতৃপ-ধারাস্ত মতোর্বোহ্যবাদিত্যঃ। পা।৮।২।৯) চিন্তাযুক্ত, চিন্তিত।

চিন্তাবেশ্মন (স্ত্রী) চিন্তায়া ময়ণাদেবেশ্ম গৃহং ৩৩৭। ময়ণা-গৃহ। তৎপরিচয়—দার্কটি (হারাবলী)।

চিন্তি (পুং) ১ বেশবিশেষ। ২ ভূদেশবাসী আভিভেদ। হুয়াইপদের সহিত বন্দ সমাস করিলে পূর্বপদের অর্থভি-বন্দ হয়। (“চিন্তি হুয়াইপাঃ।” পা ৬।২।৩৭)

চিন্তিড়ী (স্ত্রী) তিড়িড়ী পৃথিবীরাদিশাস্ত্র চং। তিড়িড়ী, তেঁতুলগাছ।

চিন্তিত (ত্রি) চিত্তি-কর্মণি ক্ত। ১ অস্থ্যাত, ভাবিত, আলোচিত। “যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি” (উত্তট) কর্তরি ক্ত। ২ যে চিন্তা করে, চিন্তাযুক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩ চিন্তা।

চিন্তিতা (স্ত্রী) ১ চিন্তিতা নারী স্ত্রী। তস্তা অপত্যং চৈত্তিতঃ (অবুদ্ধাভ্যো নদীমাহুদীভ্যস্তম্যামিকাভ্যঃ। পা ৪।১।১১৩।) ২ চিন্তাযুক্তা, ভাবযুক্তা।

চিন্তিত্তি (স্ত্রী) চিত্তি ভাবে ক্তিচ্ ইট্চ। চিন্তা।

চিন্তিয়া (স্ত্রী) চিন্তা। (ত্রিকাণ্ড°)

চিন্ত্যোক্তি (স্ত্রী) চিন্তয়া উক্তিঃ কথনং ৩৩৭। চিন্তা পূর্বক বাহা বলা যায়।

চিন্ত্য (ত্রি) চিন্ত-কর্মণি যৎ। চিন্তনীয়, ভাবনীয়।

“কেবু কেবু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ মম।” (গীতা ১০।১৭)

চিন্ত্যদ্যোত (পুং) চিন্ত্যঃ সন্ দ্যোততে দ্যাত-অচ্। দেব-ভেদ, চিন্তা দ্বারা বাহ্যর পবিত্র জ্যোতি অল্পভব করা যায়।

“চিন্ত্যদ্যোতা যে চ মহুযোষু মুখ্যঃ।” (ভারত অহু° ১৮ অঃ)

চিন্ন (পুং) (Panicum miliaceum) শস্তবিশেষ, চিনে ধান।

চিন্নকিমেন্দি, মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গজাম জেলার পশ্চিমে অবস্থিত এক বিস্তৃত জমিদারীর তিনভাগের এক ভাগ। [কিমেন্দি দেখ।] কঙ্কজাতি ইহার অধিবাসী, কিছুকাল পূর্বে ইহার দেবতার সমক্ষে নরবলি দিত। যাহারা বলিরূপে মনোনীত হইত তাহাদিগকে মেরিয়া বলিত। কথিত আছে যে, কঙ্কগণ সুরাপানে মত্ত হইয়া মেরিয়াকে টানিতে টানিতে লইয়া যাইত এবং যতক্ষণ তাহার মৃত্যু না হইত ততক্ষণ অস্ত্র দ্বারা তাহার দেহ হইতে টুকরা টুকরা করিয়া মাংস কাটিয়া লইত। পরে মৃত দেহ দগ্ধ করিয়া তাহার তস্ম নূতন শস্তের সহিত মিশ্রিত করিত। কীট হইতে শস্ত রক্ষা করিবার ইহা একটি উপায়।

চিন্নমলপুর, মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গজাম জেলাস্থিত পাহাড়ের একটি চূড়া। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬১৫ ফিট উচ্চ।

চিন্নমুভট্ট, বিষ্ণুদেবারাধ্যের পুত্র ও সর্বজ্ঞের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। খ্রীষ্ট ১৪শ শতাব্দীতে ইনি রাজা হরিহরের আদেশে তর্ক-

ভাষাপ্রকাশিকা, নিম্নলিখিতবিবরণ ও চিহ্নসমূহের নামে দ্বার প্রবেশ প্রণয়ন করেন।

চিহ্নবোদ্ধপুলাল, দক্ষিণপথের নলবোদ্ধপুলালের পুত্র, ইনি সংস্কৃতভাষার সঙ্গীতরাস্য রচনা করেন।

চিহ্নয় (ত্রি) চিৎ ময়ট। জ্ঞানময়।

চিহ্নলগুন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার একটি স্থান। ইহা কোড় নামক নগর হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানটির উত্তরপূর্বমুখে কালপাথরে নির্মিত চিকেশ্বরের মন্দির আছে। ইহা নানা প্রকার কারুকার্যে খচিত এবং ইহার ছাদ ১১টা স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই স্থানটির উত্তরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। ইহার ভিতরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহার কিছু দূরে একটি গুহা আছে। প্রবাদ এই যে গুহাটী অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এখানে মুচুকুন্দারের একটি আশ্রম ছিল এবং তাহা হইতে ইহার নাম মুলগুন্দ হইয়াছে। ইহার নিকটবর্তী পাহাড়ে সোণার গুঁড়া পাওয়া যায় বলিয়া ইহা চিহ্নলগুন্দ নামে অভিহিত।

এই স্থানটিতে দুটা উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে, একটি চিকেশ্বরের মন্দিরে অপরটা সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে।

চিপিট (পুং) চিনোতি চি-বাহুলকাৎ পিট্ সচ কিং। ভক্ষ্য-দ্রব্যবিশেষ, চিড়া। ইহা গুরুপাক, বলকারক ও কফবর্ধক। হৃদ্য মাষিয়া ভক্ষণ করিলে বায়ুনাশক ও রেচক। (রাজবল্লভ)

ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—উৎকৃষ্ট নূতন ধাতু কিছুকণ জলে সিদ্ধ করিয়া একরাতি শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিবস ঐ ধান ছাঁকিয়া কাটখোলায় কতককণ পর্য্যন্ত নাড়া চাড়া করিয়া ভাজিতে হয়। যখন হুই একটা ধান ফুটিতে থাকে, তখন সমস্তগুলি ঢেঁকির গড়ে ফেলিয়া কুটিতে হয়। চিড়া কুটিবার ঢেঁকী ঠিক ধান ভাগিবার ঢেঁকির মত, তবে উহার মুখটির অগ্রভাগে লোহার শামা (belt) থাকে না। কুটিতে কুটিতে ধানের তুষ চূর্ণ এবং তড়ুলভাগ চেপ্টা হইয়া যায়। তখন গড় হইতে বাহির করিয়া কুলাদ্বারা চিড়া ভূষ শূন্য করা হয়।

পুরাতন ধাত্রে ভাল চিড়া হয় না। নূতন শালিধাত্র, নীবারধাত্র হইতেই উৎকৃষ্ট চিড়া হয়। চিড়া যত পাতলা ও শাদা হইবে ততই উৎকৃষ্ট।

এদেশে সর্বত্রই চিড়া প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাথের জন্ত ব্যবসায়ীগণ চিড়া ও গুড় লইয়া যায়। চিড়ার সহিত সচরাচর মুড়কি ব্যবহৃত হয়। অসমর্থ পক্ষে লুচি কচুরির পরিবর্তে অনেক সময় চিড়া, মুড়কি, দধি, গুড় ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সম্পন্ন হয়।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিবস চিড়া ও নারিকেলের জল ভক্ষণ করা শাস্ত্রবিহিত।

সংস্কৃত পর্য্যায়—পৃথুক, চিপিটক, চিপুট, ধাত্রচয়স, চিপীটক। বৈদ্যক রতে ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। (ভাবপ্রকাশ)

চিপিট যতী বিধবা ব্রহ্মচারীদিগের অভক্ষ্য, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেও ভক্ষণে ইহা নিতান্ত প্রশস্ত নহে। দেশাচার ভেদে ইহা কোন কোন দেশে শুদ্ধ, কিন্তু দেবতার প্রতি উৎসর্গে ইহা প্রশস্ত নহে। (ব্রহ্মবৈবর্ত ব্রহ্মধং) ২ নি-নতা নাসিকা বিদ্যাভেদে নি-নাসিকা পিট্ প্রকৃতেশ্চিৎ। (ইনচুপিট্ চিকচি চ। (পা ৫২।৩৩ বার্ষিক) (ত্রি) ২ নতনাসিক, খেদ। চিপিট অধম, ইহার দর্শনে অনর্থোৎপত্তি হয়। (বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ১৩।৫) ৩ চিপিটাকার। (পুং) ৪ অঙ্গুল্যাদি নিপীড়ন দ্বারা নেত্রের আকুলতা। “ব্রাহ্মো দুগন্তচিপিটাকরণাদিরাদিঃ” ‘দুগন্তচিপিটাকরণং নেত্রান্তারুলীকরণং’ (নৈবধে মল্লি)।

চিপিটক (পুং) চিপিট-স্বার্থে কন্। চিপিট, চিড়ে।

চিপিটজয়াপীড়, কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

চিপিটনাসিক (পুং) চিপিটা নাসিকা যত্র বহত্রী। ১ দেশ-ভেদ। ঐ দেশ কৈলাস পর্বতের উত্তরে অবস্থিত। (বৃহৎ সংহিতা) সোহভিজানোহত ইত্যং তন্তলুক। ২ তদেশবাসী লোক। ৩ সেই দেশের রাজা। ৪ মধ্যদেশের উত্তরাংশবাসী লোক। (ত্রি) চিপিটানাসিকা যত্র বহত্রী। ৫ চিপিটাকার নাসিকায়ুক্ত।

চিপিটা (ত্রী) ১ গুণাসিনী তৃণ, হরিৎবর্ণ নিশ্যাবী। চিপিট-টা। ২ চিপিট মূর্তি। “চিপিটাভিবেন্দানী।” (কাশীধং ৩৭।১৬)

চিপিটিকাবৎ (ত্রি) চিপিটকের দ্বার আকারযুক্ত।

চিপীটক (পুং) চিপিট, চিড়া।

চিপুট (পুং) চিপিট-পুৰোধাদিধাতু সাধু। চিপিটক, চিড়া।

চিঙ্গ (পুং) চিক্রতি পীড়য়তি অঙ্গুলিং চিক্র-অচ্ ক-স্থানে প্লাগমঃ। নখরোগবিশেষ, আঙ্গুলহাড়া। লক্ষণ—বাত ও পিতে নখ-মাংসে যদি জ্বালা ও যন্ত্রণা দেয় তাহাকে চিঙ্গরোগ কহে। চিকিৎসা—প্রথম রক্তস্রাব বা শোধন দ্বারা ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। যদি ইহার উৎকতা না থাকে, তবে গরমজল দ্বারা সেক দিবে। পরিপক হইলে কাটিয়া ব্রণো-চিত বিধান দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। লোহপাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী বসিয়া তাহার সার দিয়া ইহাকে পুনঃ লেপন করিবে। গাঙ্গারী বৃক্ষের কোমল সাতটা পত্র দ্বারা ইহাকে বেঁধন করিয়া রাশিলে শীঘ্রই ইহার উপশম হয়।

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখণ্ড ৪র্থ ভাগ)।

মতান্তরে—চিঙ্গরোগে নখমাংসের ভিতরে দণ্ দণ্ করে

আলা, যন্ত্রণা ও অর হয়। ইহা ক্ষতরোগ নহে। ইহাকে উপ-
নখও বলা যায়। (বাভট উত্ত° ৩১ অঃ)। পাকিলে ইহাকে
অস্ত্রদ্বারা কাটিবে। (বাভট উ° ২২ অঃ)

চিল্লিকা (স্ত্রী) রাজিচর, অন্তভেদ। ইহা ককাল অভিক্রম
করিয়া বিচরণ করিলে দেশ বা রাজ্যের বিনাশের কারণ হয়।
(বৃহৎসং ৮৮২ ।)

চিপ্য (পুং) কুমিভেদ।

চিপ্লুন, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত রত্নগিরি জেলার চিপ্লুন
উপবিভাগের প্রধান নগর। ইহা সমুদ্র হইতে ২৫ মাইল
দূরে এবং বাসিন্দীনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহার অক্ষা°
১৭° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৬' পূঃ। ইহা কোঙ্কণ বা
চিংপাবন ব্রাহ্মণগণের আদিম বাসস্থান। ইহার অপর নাম
চিত্তপোলন। এই নগরের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল দূরে
কতকগুলি প্রস্তর খোদিত মন্দির আছে। ইহার মধ্যে বড়টা
লম্বায় ২২ ফিট, চৌড়ায় ১৫ ফিট এবং উচ্চে ১০ ফিট। ইহার
একদিকে বৌদ্ধদের দেহগোপাকৃতি একটি মন্দির আছে।
এতদ্ভিন্ন এখানে পরশুরামের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।
কোঙ্কণ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পরশুরাম-
শৈল এই স্থানের নিকটবর্তী।

চিবুক (স্ত্রী) অধরাধোভাগ, দাড়ী, পুতনী।

চিম (পুং) ককথট পত্র, পাট।

চিমটন (দেশজ) নথদ্বারা পীড়ন, খামচান।

চিমটা (দেশজ) ১ আঙুন তুলিবার জন্ত লৌহনির্মিত যন্ত্র।
২ মোচনা, সোমো।

চিম্নগোড়, গোড়জাতির একটি বিভাগ, অপর নাম চামাঙ্ক-
গোড়। অপর দুইটা ভাগের নাম তাটগোড় এবং বামনগোড়।
দিল্লীর অন্তর্গত মধ্যদেশ্যে এই জাতীয় বড় বড় লোক
অবস্থিত করে। চামারগোড়েরা কয়েকটা বিভাগের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ। গোড়বংশীয়েরা বিপদাপন্ন হইলে পর তাহাদের একটি
স্রীলোক পূর্ণ গর্ভাবস্থায় একজন চামারের গৃহে গিয়া আশ্রয়
লইয়াছিলেন। আশ্রয়দাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তিনি অঙ্গীকার
করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সে চামার নামে
অভিহিত হইবে। কিন্তু এই জাতীয় কতকগুলি লোকে বলিয়া
থাকে যে, তাহাদের প্রকৃত নাম চৌহারগোড়, এই নামে অভি-
হিত কোন রাজা হইতে তাহারা এই নাম পাইয়াছে। আবার
কেহ কেহ বলে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে চিমলগোড় বলা
উচিত। যেহেতু তাহারা চিমল মুনি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

চিমি (পুং) চিনোতি সন্ধিনোতি মনুষ্যজাতিবদ্ভাক্যানি চি-
বাহলকাং মিক্। ১ শুকপক্ষী। ২ পট্টকবৃক্ষ, পট্টশাক।

চিমিক (পুং) চিমি-স্বার্থকন্। ১ শুকপক্ষী। ২ পট্টকবৃক্ষ।

চিমিচিমা (স্ত্রী) চেনলবিশেষ, চিন্ চিন্ করা।

চিমুয়, মধ্যপ্রদেশের চম্পা জেলার অন্তর্গত চিমু পরগণার
একটা নগর। ইহার অক্ষা° ২০° ৩১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°
২৫' ৩০" পূঃ। ইহা বরদা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে
উৎকৃষ্ট তুলার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং প্রতিবৎসরে একটি মেলা
বসিয়া থাকে।

চিম্নাজিআপা, মহারাত্রীর রাজ্যের প্রধান পেশোবা বালাজি
বিশ্বনাথের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে বালাজি ইহলোক
পরিভ্রাণ করিলে পর তাঁহার প্রথম পুত্র বাজিরাও পেশোবার
পদ প্রাপ্ত হন। চিম্নাজি তাঁহার অধীনে সৈন্যধ্যক্ষ রূপে
নিযুক্ত হন এক স্রুপা নামক একটি জেলা তাঁহাকে জায়গীর
স্বরূপ প্রদান করা হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরকোঙ্কণের
মধ্যে যে সকল স্থান পর্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল,
চিম্নাজি তাঁহার অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া তাহাদিগকে
স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। বাজিরাওয়ের মৃত্যুর পর
তাঁহার পুত্র বালাজিরাওয়ের তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবার
পক্ষে বিম্ব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাতে
চিম্নাজির সাহায্যে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র
ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তার পক্ষে চিম্নাজি তাঁহার ব্রাতৃপুত্র
বালাজিরাওকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে
জাহঙ্গীরী মাসের শেষে চিম্নাজি পরলোক গমন করেন।
ইহার মৃত্যুতে বালাজিরাও বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

চিম্নাজিমাধবরাও, মহারাত্রীর রাজ্যের অষ্টম পেশোবা।
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষে মাধবরাওয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময়ে
তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার অস্বীয় বাজীরাও,
যিনি শাস্ত্রবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন,
তিনি তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। নানা কাড়নবিস্ এই সময়ে
পেশোবার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিলনা যে, বাজি-
রাও পেশোবার পদ প্রাপ্ত হন এবং এই জন্য তিনি মাধব-
রাওয়ের মৃত্যুকালের কথা গোপন করিয়া প্রস্তাব করেন যে,
মাধবরাওয়ের বিধবা স্ত্রী কেশোবা বাই একটা দত্তক গ্রহণ করেন,
এক সে বৎসর পর্যন্ত সাবালক না হয়, ততকাল পর্যন্ত নানা
তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ পেশোবার কার্য নির্বাহ করিবেন।
এই প্রস্তাবে হোলকার এবং সে সমরকার বড় বড় লোক
ও ইংরাজগণ সম্মত হন। বাজিরাও এই সমস্ত জানিতে পারি-
লেন, এবং তিনি তাঁহার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হই-
লেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। মাধবরাওয়ের বিধবা
স্ত্রী বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা চিম্নাজিকে দত্তক গ্রহণ

করিলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে ইনি পেশোবার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরশুরাম ভাউ প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি স্বয়ং সৈন্যবিভাগের কার্য ভার গ্রহণ এবং নানা অস্ত্রাস্ত্র বিভাগের কার্য পরিদর্শন করেন। এই প্রস্তাবে নানা সম্মতি প্রদান করিলেন এবং এতৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির করিবার জন্ত পরশুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপদকে তাঁহার নিকটে ওয়াই নামক স্থানে পাঠাইয়া দিবার জন্ত অহরোধ করিলেন। কিন্তু পরশুরাম ভাউয়ের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। হরিপদ ওয়াই নামক স্থানে যাইবার জন্ত যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু দূত স্বরূপ না গিয়া সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন। নানা পরশুরামের ছুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া রায়গড় কেল্লার সন্ধিহিত মাহাড় নামক স্থানে গমন করিলেন।

এই সময়ে নানা আপনাকে বিপদাপন্ন জান করিলেন। কিন্তু এই বিপদে তাঁহার বুদ্ধি ক্ষুণ্ণি পাইল। তিনি কোশল-জাল বিস্তার করিয়া অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ করিলেন। চিম্নাজির ভ্রাতা বাজিরাওয়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। স্থির হইল যে, বাজিরাও পেশোবা হইবেন এবং তিনি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর কার্য করিবেন। নানা কএক বৎসর ধরিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি ক্ষমতাপন্ন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে হস্তগত করিলেন। যথেষ্ট সৈন্য তাঁহার অধীন হইল, বাজিরাও পেশোবার পদ পাইবেন, নিজাম এবং সিন্ধিয়া মহারাজা কোন কোন জমিদারী ও স্থান প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। স্ত্রতঃ তাঁহারা বাজিরাও এবং নানার সহায় হইলেন। ২৭শে অক্টোবরে মহারাজ সিন্ধিয়া তাঁহার মন্ত্রী বালবাকে বন্দী এবং পরশুরামকে ধরিবার জন্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্য নিজাম প্রদত্ত আর একদল সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। পরশুরাম ইহা অবগত হইয়া চিম্নাজিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু উল্লিখিত সৈন্যগণ কর্তৃক তাঁহারা ধৃত হন। এইরূপে নানার কূট নীতি সফল হইল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নবেম্বরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরের ৪ঠা ডিসেম্বরে বাজিরাও পেশোবার পদে অভিষিক্ত হন। চিম্নাজিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন। যাহা হউক তিনি গুজরাটের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাজিরাওয়ের পেশোবার পদ প্রাপ্তি বিষয়ে নাগপুরের রঘুজি ভোঙ্গে এবং ইংরাজগণ সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।

চিম্নাজি যাদব, একজন মহারাষ্ট্র বিদ্রোহী। ইনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন। ভাউখড়ে এবং নানা দরবাড়ে নামক দুজন

সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া সম্রাট পার্শ্ববাসী কোলিদিগকে উত্তেজিত করেন, তৎপরে তাহাদিগকে লইয়া একটা দল সংগঠিত করিয়া অনেক পল্লীগ্রাম লুট করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোলিদিগের উপদ্রব আরম্ভ হয়। ইহাদিগের নেতাগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পেশোবার পরিবর্তে রাজ্য শাসন করিবেন এবং প্রকৃতরূপে শাসন ভার গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট রুড একদল অঝারোহী সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই দণ্ড দিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহারা সম্পূর্ণরূপে শাসিত হয়।

চিম্নাপাটেল, মধ্য প্রদেশস্থ নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত কাশ্মা এবং বরুদ তালুকব্বয়ের জমিদার। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কাপ্তেন গর্ডন সাহেব তাঁহাকে শাসন করেন।

চির (ত্রি) চি-বাহুলকাং রক্। ১ দীর্ঘ, দীর্ঘকালবর্তী। “বিল্লাপ চিরং কালং” (হরিবংশ ১৭৬) (“ক্লী”) ২ দীর্ঘকাল। তপসঃ কিং চিরেণ তে” মার্কণ্ডেয়পুং ১৬।৮০) তৎপুরুষ সমাসে চিরশব্দ পরে থাকিলে প্রতিবন্ধবাচী পূর্বপদের প্রকৃতি স্বরদ্ধ হয়। “গমন চিরং” (প্রতিবন্ধি চিরকৃচ্ছ যোঃ। পা ৬।২।৬।) ৩ ছন্দঃ শাস্ত্রোক্তগণবিশেষ। যে গণে তিনটা মাত্রা থাকে তাহাকে চির বলে, কিন্তু ইহাতে প্রথম বর্ণ লঘু হওয়া আবশ্যিক। (অব্যং) ৪ দীর্ঘকাল। পর্যায়—চিরায়, চির-রাত্রি, চিরস্ব, চিরেণ, চিরাং, চিরে, চিরত। “মাচিরং তত্থা অপঃ” (ঋক্ ৫।৭২।২।)

চিরকশ্মন্ (ত্রি) বহুব্রী। চিরক্রিয়, দীর্ঘস্থত্র।

চিরকার (ত্রি) চিরং করোতি চির-ক-অণ্ (কর্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) দীর্ঘস্থত্র।

“চিরকারৈস্ত যৎপূর্বং বৃত্তং” (ভারত শাস্তি ২৬৭ অঃ)

চিরকারি (ত্রি) দীর্ঘস্থত্র “চিরকারিং দদর্শাশি পুত্রং।”

(ভারত শাস্তি ২৬৭ অঃ)

চিরকারিক (ত্রি) চিরকারিন্-স্বার্থকন্। দীর্ঘস্থত্র “চির-কারিক ভদ্রং তে ভদ্রং তে চিরকারিক” (ভারত শাস্তি। ২৬৭ অঃ)

চিরকারিন্ (ত্রি) চিরেণ করোতি চির-ক-ণিনিঃ। ১ দীর্ঘস্থত্র, চিরক্রিয় “চিরকারীচ মেধাবী” (ভারত, শাস্তি ২৬৭ অঃ) ২ (পুং) গৌতমের পুত্র ভেদ “চিরকারী মহা প্রাজ্ঞো গৌত-মস্তাভবৎ স্তুতঃ” (ভারত শাস্তি ২৬৭ অঃ)

চিরকাল (পুং) কর্মধা। দীর্ঘকাল।

চিরক্রিয় (ত্রি) চিরা ক্রিয়া যন্ত বহুব্রী। দীর্ঘস্থত্র।

চিরকল, ১ মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মলবার জেলার

একটা তালুক। পরিমাণ ফল ৬৪৮ বর্গমাইল। ইহাতে একটা নগর ও ৪৪টা অংশ আছে। ইহার প্রধান নগর কনানুর। এই তালুকে ২টা কোজদারী আদালত আছে। দেওয়ানী বিচার তেলিচেরীর মুন্সেফী আদালতে নিষ্পন্ন হয়।

২ পূর্বোক্ত চিরকল তালুকের একটা সহর। এই সহর কনানুর হইতে ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ৫৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৯' পূঃ। এই সহর পূর্বে চিরকল তালুকের সদর ছিল। আজিও মলবার জেলার সেন্ট্রাল জেল এই সহরে অবস্থিত। এই স্থানের চিরকলরাজ বা কোলভিরিরাজ হইতেই ইংরাজগণ সর্বপ্রথম তেলিচেরিতে কুঠি স্থাপনের অমুমতি পান। এই রাজার বংশধরগণ নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেছেন। চিরক্রিয়তা (স্ত্রী) চিরক্রিয়-ভাবে তল্ (তন্ত্র ভাবস্বত্ব)। পা ৫১১১১১ তত ঠাপ্। দীর্ঘস্থতা।

চিরক্রীত (ত্রি) চিরং ক্রীতঃ সুপসুপেতি সমাসঃ। দীর্ঘকাল যাহা ক্রয় করা হইয়াছে।

চিরখড়ি বা চারখড়ি, বৃন্দলখণ্ড প্রদেশস্থ একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ২১' ও ২৫° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪০' ও ৭৯° ৫৮' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ৭৮৭ বর্গমাইল। এই রাজ্যের বর্তমান রাজা ছত্রশালের বংশসম্ভূত। এখানকার বিজয় বাহাদুর নামে একজন নরপতি প্রথমে বৃটশসিংহের অধীনতা স্বীকার করেন। এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বৃটশরাজ তাঁহাকে উক্ত রাজ্যের অধিপতি বলিয়া সনন্দ প্রদান করেন। তাঁহারই একজন বংশধর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ একটা জায়গীর, সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও ১১ তোপ প্রাপ্ত হন ও এই রাজ্যের বার্ষিক উপস্বৰ প্রায় পঞ্চলক্ষ টাকা।

চিরঙ্গদ্বার, আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার কতক অংশ। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ভোটানীদিগকে পরাজিত করিয়া এই ভূভাগ ও অস্ত্রাস্ত্র দ্বার অধিকার করেন। পরিমাণ ফল ৪৯৫ বর্গমাইল। ইহার সর্বত্র ভীষণ অরণ্য। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৩ জন মাত্র লোক বাস করে, ২২৫½ বর্গমাইল স্থানে অর্থাৎ ইহার প্রায় অর্ধেক অংশে গবর্ণমেন্টের রক্ষিত অরণ্য আছে। সমস্ত অরণ্য ১৩ ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগ হইতেই প্রতিবৎসর বহুমূল্যের শালকাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪০০০ বিঘার শস্তাদি উৎপন্ন হইতেছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ২৪' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৭' পূঃ। বন্দা হইতে ৪১ মাইল দূরে, গোয়ালপুর হইতে বান্দা নগর যাইবার পথের ধারে পর্বতের

পাদদেশে অবস্থিত। নিকটে একটা স্থানর হর্গ আছে। নগরের কিছু নিম্নদেশে একটা বৃহৎ হ্রদ থাকার নগরের শোভা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই নগরের চতুর্পার্শ্বে সুগম্য পথ ও স্থানে স্থানে নিকুঞ্জ বনে শোভিত বলিয়া পথিকগণকে পথপ্রাপ্তি অসুভব করিতে হয় না। প্রান্তর মধ্যে সুবিচ্ছৃত সরোবর থাকার শতক্ষেত্রের উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে।

চিরজাত (ত্রি) চিরং দীর্ঘকালঃ জাতঃ সুপসুপেতি সমাসঃ। দীর্ঘকাল জাত। “স্বত্চিরজাতঃ” মত্চিরজাতঃ”।

(ভারত, বন ১৯৮ অঃ)

চিরজীবক (পুং) চিরং জীবতি চির-জীব-ধূল্। ১ জীবক বৃক্ষ। (ত্রি) ২ চিরজীবী।

চিরজীবিকা (স্ত্রী) কন্দমা°। দীর্ঘকালবৃদ্ধি, দীর্ঘকাল বাচা “বৃগীষ বিস্তং চিরজীবিকাঞ্চ” (কঠ-উপ°)

চিরজীবিন্ (ত্রি) চিরং-জীবতি চির-জীব-গিনি। ১ দীর্ঘকাল-জীবী, বহুকালজীবী “অথরাজোবতুবৈবং বৃদ্ধস্ত চির-জীবিনঃ।” (রামা° অযোধ্যা ১।৩৬ অঃ) (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ কাক (মেদি°) ৪ জীবকবৃক্ষ। ৫ শামলিবৃক্ষ (রাজনি°) ৬ মার্কণ্ডেয়। “চিরজীবী যথা স্বঃ ভোঃ” তিথিতত্ত্ব। ৭ অশ্বখামা প্রভৃতি সপ্তজন। যথা—অশ্বখামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, রূপ ও পরশুরাম। (তিথিতত্ত্ব)।

চিরঞ্জীব, বিদ্যোদ-তরঙ্গিনী রচয়িতা। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার জাতীয় উপাধি ভট্টাচার্য।

চিরঞ্জীবিন্ (পুং) চিরং জীবতি চিরম্-জীব-গিনি। ১ বিষ্ণু। ২ কাক। ৩ জীবকবৃক্ষ। ৪ শামলিবৃক্ষ (রাজনি°) (ত্রি) ৩ চিরজীবী।

চিরন্টী (স্ত্রী) চিরেণ অটতি পিতৃগৃহাদিতি চির-অট-অচ্ বয়সি প্রথমে। পা ৪।১।২০) ততো ভীপ্ পৃথোদরাদিস্থাং সাধু। ১ উচা বা অনুচা পিতৃগৃহস্থিত বয়স্কা কন্ডা। ২ যুবতী।

চিরতিক্ত (পুং) চিরস্তিক্তো রসো যত্র। বহুব্রী। ভূনিষ, চিরতা। পর্যায়—চিরাতিক্ত, তিক্তক, অনার্যাতিক্তক, কিরাততিক্ত, ভূনিষ, কিরাতক, স্তুতিক্তক।

চিরতা (স্ত্রী) চির-ভাবে তল্ ততঃপা। ১ দীর্ঘস্থতা। (চির-তিক্ত শব্দজ) ২ ভূনিষ, চিরতা। [চিরতা দেখ।]

চিরত্ন (ত্রি) চির-ভবার্থে-ত্ন। (চিরপঞ্চং-গরারিভ্যন্তো-বক্তব্যঃ (পা ৪।৪।২৩ বার্তিক) পুরাতন, চিরকালোৎপন্ন।

চিরস্তন (ত্রি) চিরং ভবঃ চিরং ভবার্থে ষ্টল্ তুট্চ। (সায়ং চিরং প্রোক্তে প্রাগব্যয়েভ্যষ্টু ষ্টলৌ তুট্চ। পা ৪।৩।২৩) ১ পুরাতন, পুরাণ। “স্বহস্ত-দন্তে মুনিমাসনে মুনিচিরস্তনস্তাবদভিত্ত

বীৰিশং" (মাঘ ১ সর্গ)। (পুং) ২ সুনিন্ভেদ। "ব্রাহ্মণেষ্ণু
পুরাণেন চিরন্তনেন সুনিনা প্রাক্তাঃ" (পা ৪।৩।১০৫ বার্তিক)
চিরনীহারবাহু, চিরনীহার সীমার নিম্নভাগে যে বরফরাশি
জমাট হইয়া থাকে কখন দ্রবীভূত হয় না।
চিরনীহারসীমা, পর্বতের যে ভাগ নিম্নত তুষার মণ্ডিত,
তাহার নিম্নরেখা।
চিরপত্রিকা (স্ত্রী) কপিপর্ণীকৃষ্ণ, কপিমানী।
চিরপাকিন্ (পুং) চিরেণ পাকো হস্ত্যস্ত চিরপাক অন্ত্যর্থে
ইনি। কপিখবৃক্ষ, কদবেল গাছ।
চিরপুষ্প (পুং) চিরানি পুষ্পানি যন্ত বহুত্রী। বকুলগাছ।
(রাজনিং)
চিরপ্রবাসিন্ (ত্রি) চিরং প্রবসতি চির প্র-বস্ গিনি। যে
চিরকাল বিদেশে বাস করে, চিরবিদেশী।
চিরপ্রাপ্ত (ত্রি) চিরেণ প্রাপ্তঃ ৩তং। অনেকদিনের পর
যাহা পাওয়া গিয়াছে।
চিরপ্রার্থিত (ত্রি) চিরেণ প্রার্থিতঃ ৩তং। চিরান্তিলম্বিত,
বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত।
চিরপ্রোষিত (ত্রি) চিরং প্রোষিতঃ স্পৃহপেতি সমাসঃ। যে
বহুকাল বিদেশে বাস করে।
চিরম্ (অব্য) চি রমৃক্। দীর্ঘকাল। "বিপক্ষ ভাবে চির-
মন্ত তন্তু যঃ" (রঘু ৩ সর্গ)
চিরমুকোড়, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নীলগিরি
নগরের একটা বিভাগ। পরিমাণ ফল ৪১ বর্গমাইল। একটা
মাত্র সহরের চতুর্দিকস্থ কিছুদূর পর্যন্ত লইয়া এই বিভাগ
হইয়াছে।
চিরমেহিন্ (পুং) চিরেণ মেহতি চির-মিহ-গিনি। অনেক-
ক্ষণ ধরিয়া প্রস্রাব করে এরূপ গর্দভ, গাধা।
চিরমেহিনী (স্ত্রী) চির মেহিন্ স্ত্রিয়াং ভীপ্। গর্দভী।
চিরমোচন (ক্লীং) তীর্থবিশেষ "চির (চীর) মোচন তীর্থান্ত-
র্গণরাত্র্য তপস্তত।" (রাজতরঙ্গিনী ১।১।৪৯)।
চিরস্ত (পুং) চিল, চিল।
চিরস্তণ (পুং) চিরং ভগতি চিরম্-ভণ-কর্তরি অহ্। চিল
পক্ষী, চিল। (ত্রিকাণ্ডং)
চিররাত্র (স্ত্রী) চিররাত্রি রিতিযোগবিভাগাৎ অহ্ সমাসস্তঃ।
দীর্ঘকাল "চিররাত্রোষিতা স্নেহ ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে" (ভারত,
আদিং ১৬৮ অঃ।)
চিররাত্র্য (অব্য) চিররাত্র্য অয়তে চিরংরাত্র অয়ঃ অণ্
(কর্মণ্যণ্) পা ৩।২।১) দীর্ঘকাল "হবিষ্য চিররাত্র্য স চানন্ত্যায়
কল্পতে" (মহু ৩।২৬৬) "চিররাত্র্যপদমব্যয়ং চিরকাল-বাচী

অতএব চিরায় চিররাত্র্য চিররাত্র্য চিররাত্রিকা ইত্যন্তি-
ধানিকাঃ।" কুঙ্ক।
চিরলোক (পুং) চিরঃ চিরস্থায়ী লোকো যেবাং বহুত্রী। পর-
লোক গত পিতৃপুরুষ। "স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানা-
মানন্দঃ" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ) "চিরকালস্থায়ী লোকো যেবাং
পিতৃণাং চিরলোকাঃ পিতরঃ।" ভাষ্য।
চিরবিল্ (পুং) চিরং বিলতি আচ্ছাদয়তি পত্রকণ্টকাদিভি-
রিতি চির-বিল-বঃ। করঞ্জবৃক্ষ, করম্চা। "চিরবিষোমিকো-
দন্তী (সুশ্রুত ৩৬ অঃ)।
চিরবিল্বক (পুং) চিরবিষ স্বার্থে-কন্। করঞ্জ, করম্চা।
চিরবীর্ঘ্য (পুং) রক্তএরওবৃক্ষ, লালভেরাণ্ডা।
চিরবৃষ্টিমণ্ডল (পুং) যে দেশে সর্বদা বৃষ্টি পতিত হয়।
চিরসূতা (স্ত্রী) চিরং সূতা। চিরপ্রসূতা গাভী, যে গোরু
বৎসর বৎসর প্রসব করে, ফলনগাই। পর্যায়—বহুয়নী।
চিরস্থ (স্ত্রী) চিরংতিষ্ঠতি চির-স্থা-ক। ১ চিরকালস্থায়ী। (পুং)
২ নায়ক।
চিরস্থায়িতা (স্ত্রী) চিরস্থায়িন্-ভাবে তল্ তত্ঠাপ্। দীর্ঘ-
কালস্থায়িতা।
চিরস্থায়িন্ (ত্রি) চিরংতিষ্ঠতি চির-স্থা-গিনি। চিরকালস্থায়ী,
দীর্ঘকালস্থায়ী।
চিরস্ত্র (অব্য) চিরং অন্ততে চির-অস্-যৎ শব্দাদিস্থাৎ সাধু।
দীর্ঘকাল ("চিরস্ত্র দৃষ্টেব মৃতোথিতোব।" কুমার।)
চিরাতা (যাবনিক) শিরোভূষণ যথা "বিলাতি খেলাত পরে
জরকেশী চিরাতা"।
চিরাগত (ত্রি) চিরেণ আগতঃ স্পৃহপেতি সমাসঃ। ১ বহুদিন
হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে। ২ অনেকদিন পরে আগত।
চিরাতিকা (স্ত্রী) চিরং অটতি চির-অট্-খুল্ কাপি অত ইহং
১ শ্বেতপুনর্বা। ২ বটিকা লতা পাতাডী "গোমুত্রশুদ্ধস্ত
পুরাতনস্ত যদায়সন্তানি চিরাতিকায়ঃ।" বৈদ্যকং। ৩ কিরাতক
চিরতা।
চিরাতা বা চিরতা, তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট গুণাবিশেষ। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—ভূনিধ, অনার্যাতিক্ত, কৈরাত, কাণ্ডতিক্তক,
কিরাতক, কিরাততিক্ত, চিরতিক্ত, তিক্তক, স্ত্রতিক্তক,
কটুতিক্ত ও রামসেনক। অনার্যাতিক্ত, কৈরাত ইত্যাদি
নাম দ্বারা বোধ হয় আর্যগণ কিরাত নামক অনার্যজাতির
নিকট হইতে ইহার গুণাগুণ অবগত হন। [বৈদ্যকোক্ত
গুণাগুণ সম্বন্ধে কিরাততিক্ত শব্দ দেখ।] ভারতবর্ষে
প্রায় ৩৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন চিরতা দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে
প্রায় ১৮০ প্রকার চিরতা জাতীয় গুণ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সমস্ত গুল্ম Gentianaceae শ্রেণীভুক্ত। ভারত-বর্ষের চিরতা জেন্সিয়ানার (Gentiana) সমধর্মী। এই সকল চিরতার কাণ্ড ও মূল বহুল পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের গুণ—অগ্নি, ক্ষুধাবর্ধক ও বলকারী বিশেষতঃ অত্যন্ত সমগুণ সম্পন্ন ঔষধের হ্রাস ইহা ক্ষম ও উগ্র নহে। সর্বপ্রকার আত্যন্তরিক প্রদাহেই নিরূপদে চিরতা প্রয়োগ করা বাইতে পারে। জ্বর ঘটিত আময় সকলেও ইহা ব্যবহারে ফল দর্শে।

চিরতার তিক্তাস্বাদ চিরতাবীৰ্য্য (Chiratin Gentianaceae) রোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অঙ্গার ২০, উদ্ভজন ৩০ ও অম্লজন ১২ ভাগ। Gentianin (অঙ্গ ১৪, উদ্ভ ১০ ও অম্ল ৫২) নামক আর একটা স্বাদ বিহীন, পীতবর্ণ দানাদার পদার্থ চিরতার বিস্তারিত থাকে। তন্ত্রি ইহাতে শতকরা ০.১২ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত তরল শর্করা বর্তমান থাকায় বাবেরিয়া ও সুইজলও বাসীগণ চিরতার মূল হইতে একরূপ সুরা প্রস্তুত করে। সুরাং চিরতার বীৰ্য্যে উল্লিখিত তিনটা দ্রব্য বিদ্যমান আছে। বাজারে নিম্নলিখিত প্রকার চিরতার সমধর্মী গুল্ম পাওয়া যায়। ১ ছোট চিরতা (Adenema hyssopifolia) দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে ইহা পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় তিক্ত, মৃদু, বিরোচক এবং অগ্নি উদ্দীপক। ২ চিরতা (Gentian Chirata, Ophelia Chirata) ইহা ভারতবর্ষের উত্তরভাগে ও মোরুঙ্গ (Morung) পর্বতে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্পাদি সমস্তই অতিশয় তিক্ত। ইহার গুণ সর্বাংশে জেন্সিয়ানার তুল্য। ভারতের সর্বত্রই এই দ্রব্য বলকর ও জ্বর, ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ের নিম্নভূমি সকলে এই চিরতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহাই বাজারে চিরতা নামে সচরাচর বিক্রীত হয়। ৩ কালমেঘ (Justicia paniculata) হিন্দী ভাষায় ইহাকে কলাপুনাথ বা মহাতিতা কহে। ইহাই আদি ও প্রকৃত চিরতা। ৪ গীমা বা গীর্ষী (Chironia centauroides)। এই তিক্ত শাক জলাশয়াদির নিকট ভারতের সর্বত্র জন্মিয়া থাকে। ৫ Exacum hyssopifolia, পূর্ব উপদ্বীপে জন্মে। ইহা অতিশয় তিক্ত। ইহা বলকর ও অগ্নি উদ্দীপক। অধিবাসীগণ ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করে। ৬ Exacum bicolor, নীলগিরী সন্নিহিত স্থানে উৎপন্ন হয়। শরৎকালে এই বৃক্ষে ফুল ফুটে। ইহাতে জেন্সিয়ানা লুটিয়ার (G. lutea) সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। তজ্জন্ম অনেকে অনুমান করেন জেন্সিয়ানা লুটিয়ার পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ৭ কুণ্ডী (Exacum tetragona) ইহাকে

বেগুণী চিরতা কহে। ৮ (Ophelia angustifolia) ইহাকে পাহাড়ী চিরতা কহে। প্রকৃত চিরতার পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হয়। ৯ শিলারস অর্থাৎ শিলাজতু (Ophelia elegans) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। ভাদ্র-মাসে ইহাতে অতি সুন্দর ফুল হয়। দাক্ষিণাত্যের কবিরাজ ও হকিমগণ হিমালয়ের চিরতা অপেক্ষা ইহাকে অধিক আদর করেন। বিশাখপত্তনে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ২৫০০ টাকার শিলারস ঐ স্থান হইতে রপ্তানী হয়। বাজারে শুষ্ক ও ভাড়াবাঁকা শিলারস পাওয়া যায়, ইহার অরিষ্ট সেবন করিলে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি এবং শরীরে বল ও কাস্তিময় হয়।

সাধারণ চিরতা বা কিরাতাতিক্ত (Ophelia Chirata or Gentiana Chirata) হিমালয় পর্বতে ৪০০০ হইতে ১০০০০ ফিট উচ্চে জন্মে। খসিয়া পর্বতে ৪।৫ সহস্র ফিট উচ্চেও চিরতা জন্মিয়া থাকে। এই সকল স্থানেই চিরতা অপেক্ষাপূর্ণ পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সকল বৃক্ষ প্রতিবৎসর জন্মিয়া থাকে। এবং সচরাচর ২ হইতে ৫ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়। ইহাদের কাণ্ড সকল গোলা ও শাখা শূন্য। শরৎকালে ইহাদের ফুল হয়, এই সময় গুল্মগুলি শিকড় সহিত উপড়াইয়া শুষ্ক করিয়া লয়। পরে ৩ ফিট লম্বা চেপ্টা তাক বাধিয়া নানা স্থানে প্রেরিত হয়। বাজারে এই অবস্থাতেই চিরতা পাওয়া যায়। চিরতার উগ্রবীৰ্য্য জলে ও সুরায় দ্রব হইয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ ও অগ্নিমান্দ্য হইলে অনেকে সন্ধ্যায় চিরতা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে চিনির সহিত উহা পান করে। চিরতার শিকড়ই অধিক তিক্ত। তিক্তরসের জন্তই চিরতা আদরীয়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে চিরতার গুণ ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৩৯ অব্দে চিরতা এডিনবর্গ ফার্মাকোপিয়াতে গৃহীত হয়। কিন্তু যুরোপ ও আমেরিকায় ইহা এক্ষণে অধিক ব্যবহৃত হয় না। যাহা হউক ভারতবর্ষে যুরোপীয় ডাক্তারগণ ইহার প্রচুর প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক উপায়ে চিরতার বীৰ্য্য বাহির করিয়া উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ প্রস্তুত হয়। গাত্রকণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ইত্যাদি রোগে উহা অতি আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। চিরতা ও গুল্মের সমাংশ কাথ কবিরাজগণ পরিবর্তক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। দেশীয় সালসায় চিরতার কাথ থাকে। অশ্বদিগকে মোটা করিবার জন্ত ইংলণ্ডে একরূপ চিরতা উহাদিগকে খাইতে দেয়।

অধিকমাত্রায় চিরতা খাইলে গাত্রদাহ, বমনোচ্ছা এমন কি বমি ও অতিসার হইতে পারে।

চিরতার মূল হইতে প্রস্তুত চারিপ্রকার ঔষধ ভারতবর্ষীয় কার্মাকোশিরাতে দৃষ্ট হয়।

অধিকাংশ চিরতা নেপাল হইতে কলিকাতা এবং তথা হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

চিরাতিস্ত (পুং) চিরং আতিস্তঃ। চিরতিস্ত, চিরতা।

চিরাং (অব্য) চিরং অততি চির-অত-কিপ্। ১ চিরকাল, দীর্ঘকাল। “চিরাদ্যৈঃ সমাগতং” (সাময়ণ ৪।২৭।১৭) (পুং) ২ চিরতিস্ত।

চিরাদ্ (পুং) চিরেণ অতি চির-অদ্-কিপ্। গরুড়। (ত্রিকাণ্ড)

চিরাস্তক (পুং) পক্ষ্ণের পুত্র “পুৰ্য্যনেত্রিচিরাস্তকঃ।

(ভারত, উদ্ভোগ ১০১ অঃ)

চিরায় (অব্য) চিরং অরতে চির-অয়-অপ্। দীর্ঘকাল “চিরায় নারঃ প্রথমাতিথেরতাং” (মাব ১ সর্গ)

চিরালী, মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কুকায়েলার বাপংলা তালুকের একটা সহর। অক্ষা° ১৬° ৫৮' ২০" উঃ দ্রাঘিঃ ৮০° ৪' ১০" পূঃ। এই সহর পূর্বে নেমুর জেলার অন্তর্গত ছিল। এই স্থান কার্ণাসবন্ধুর জন্ম বিখ্যাত। ইহাতে একটা ঔষখালয় আছে।

চিরায়ুস্ (ত্রি) চিরং আয়ুর্ধ্বস্ত বহুতী। ১ দীর্ঘকালজীবী। “শক্বেদোহঁদা চ বীৰ্য্যবস্তং চিরায়ুসং পুত্রং জনয়তি” (সুক্রত) (পুং) ২ দেবতা।

চিরাবা, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত শেখাবতী বিভাগের একটা নগর।

চিরি (পুং) চিনোতি মনুষ্যবদ্ বাক্যাদিকং চি-রিক্। শুকপক্ষী, চিরেপাখী। পর্যায়—করী, চিমি।

চিরিণ্টিকা (স্ত্রী) চিরিণ্টী-স্বার্থে কন্-টাণ্-ইকারহ্রস্বচ (কেহণঃ। পা ৭।৪।১৩)। চিরণ্টী, বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থার যে মেয়ে বাপের বাড়ী থাকে।

চিরিণ্টী (স্ত্রী) চিরণ্টী-পুৰোদরাদিহাং সাধু। পিতৃ গৃহস্থিত কন্তা। বিবাহিত বা আইবড় অবস্থায় যে মেয়ে বাপের বাড়ী থাকে। পর্যায়—স্বাসিনী, চিরণ্টী, সুবাসিনী (ভারত) ২ যুবতী।

চিরিবিজ্জ (পুং) চিরবিজ্জ-পুৰোদর সাধু। করজবৃক্ষ, করম্ভাগাছ।

চিরু (স্ত্রী) চি-বাহুলকাৎ কৃক্। বাহুসন্ধি, কন্ধ ও বাহুর সন্ধিস্থল।

চিরিমির, গাছড়া ভেদ।

চিরুণ (দেশজ) কঙ্কতিকা, কাঁকুই।

চিরুণদাঁতী (দেশজ, স্ত্রী) যাহার দন্তশক্তি চিরুণের স্থায়।

চিরুণী (দেশজ) চিরুণ।

চিরে (অব্য) চিরমেতি চির-ই-বিচ্। দীর্ঘকাল “চিরতাভা

শিরার্থকাঃ” (অমর) ‘আতশকেন চিরে চিরেণ চিরাং ইতি গৃহ্যন্তে।’ (ভারুজ দীক্ষিত)

চিরেণ (অব্য) চির-বাহুল্যাৎ এনপ্। দীর্ঘকাল। “নিদ্রা চিরেণ নয়নাতিমুখী বভূব”। (মধু)

চিরুণা (স্ত্রী) পুংকল, সুপারী।

চির্ভট (স্ত্রী) রাজসুযবী।

চির্ভটী (স্ত্রী) চিরেণ তটতি চির-ভট-অচ্ পুৰোদরাদিহাং সাধু ‘গৌরাদিহাং ভীব্’। ককটী, কাঁকুড়।

চির্ভিট (পুং) চির্ভটী-পুৰোদরাদিহাং সাধু। ১ কাঁকুড়গাছ, গোরক্ষ ককটী, শুকগাছ। (স্ত্রী) ২ গোমুকল।

চির্ভিটী (স্ত্রী) ককটী ভেদ, কাঁকুড়বিশেষ। পর্যায়—সুচিরা, চির্ভল্লা, ক্ষেত্রচির্ভিটী, পাণ্ডুল্লা, পথ্যা, রোচন-কলা, চির্ভিটিকা ও কক্চির্ভিটী। ইহা মধুর, রস, শুকপাক এবং পিত্ত ও কফনাশক। পাকা হইলে উষ্ণ, পিত্তকারক (ভাবপ্রকাশ)। কাঁকুড় কচি অবস্থায় তিক্ত এবং কিঞ্চিং অন্নরসযুক্ত। শুক চির্ভটী বাত, রেগ্না, অরুচি, শরীরের জড়তা দূর ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত করে। (রাজনি*)

চির্ভিটিকা (স্ত্রী) ককটী, কাঁকুড়।

চির্ভিটী (স্ত্রী) ককটী, কাঁকুড়।

চিল, (Milvine) পক্ষীবিশেষ। ঈগল, শাকুনিক, শ্বেন প্রভৃতি ঋগদ পক্ষীর সহিত ইহাদের অনেক সোসাদৃশ্য আছে। ইহাদের চঞ্চু গোলাকার, দৃঢ় ও অগ্রভাগে বক্র। পায়ের অঙ্গুলি বক্র ও ধারাল নখর যুক্ত। পক্ষবয় দীর্ঘ, পৃচ্ছ হ্রস্ব, অধঃ ও অধ্বা দীর্ঘ ও ছই শাখায় বিভক্ত। ইহারা কপোত অপেক্ষা ৫৬ গুণ বড়। পক্ষবয় বিস্তার করিলে প্রায় ২৬।২৭ ইঞ্চ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচপ্রকার চিল বাস করে। তন্মধ্যে শঙ্খচিল (বা শঙ্কর চিল) ডোমরা চিল ও ধোবা চিলই সচরাচর বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। তন্মিহ আফ্রিকা ও আমেরিকায় আরও নানা প্রকার চিল আছে। ইহারা কীট, পতঙ্গ, ইন্দুর, কুকলাস, ছোট পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া ভক্ষণ করে। মৃত শবদাদির মাংসও খাইয়া থাকে। কোন স্থানে মৃত সর্প, মৃত ইন্দুর বা অন্য কোন পুতিগন্ধকর আবর্জনা পড়িয়া থাকিলে, ইহারা দেখিবামাত্র উঠাইয়া শইয়া যায়। পল্লীগ্রামে যেখানে রাস্তা ঘাটাদি পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত নাই তথায় ইহারা ই রাস্তা পরিষ্কারকের কার্য্য করে। ইহারা অতি স্থির ভাবে, পক্ষ সঞ্চালন না করিয়াও আকাশে উড়িতে পারে, এবং চক্রাকারে ঘূর্ণিত্রমণ করিতে করিতে ভীরবেগে হেঁ মারিয়া শিকারের উপর গিয়া পতিত হয় ও তৎক্ষণাৎ সেইরূপ বেগেই উড়িয়া যায়।

শিকার পাইলে উড়িতে উড়িতেই তাহা ভক্ষণ করিয়া কেলে ও পুনর্বার উড়িতে থাকে। হেঁ মারিবার সময় ইহার লম্ব ভাবে ভূতলে আইসে না, বৃত্তপথে অবতরণ করিয়া ভূভাগ স্পর্শ করে ও সেই বেগেই চলিয়া যায়। কোন কোন চিল জলে হেঁ মারিয়া মৎস্য ধরে, অনেক সময় মৎস্য ধরিতে গিয়া জলে ডুবিয়া যায়, পরে অনেক কষ্টে উপরে আসিয়া উড়িয়া যায়। মৎস্য ধরিবার স্থানে, কসাইখানার উপরে এবং বাজার প্রভৃতির নিকট যথায় পরিত্যক্ত খাদ্য ও জঞ্জালাদি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইখানে বহুসংখ্যক চিল উড়িতে দেখা যায়। জাহাজাদির উপরও বহু-সংখ্যক চিল উড়িয়া থাকে, সেই জন্য কোন বৈদেশিক নূতন ভারতবর্ষে আসিলে প্রথমেই দেখিতে পান বহুসংখ্যক চিল তাঁহার মস্তকের উপর উড়িতেছে ও মধ্যে মধ্যে জাহাজের পাটাতনে প্রক্ষিপ্ত, অন্নাদি আবর্জনা বেগে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে।

শম্ভুচিলের বর্ণ তাম্রাভ লোহিত। ইহাদের গলদেশ শুভ্রবর্ণ। ডোমচিলের বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর ও দেখিতে অতি কদর্য। পুরাণের মতে—ভগবতী এক সময় শম্ভুচিলের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই হউক, অথবা ইহার সুন্দর আকার দেখিয়াই হউক এদেশীয় অনেক লোক শম্ভুচিলকে বিশেষ সমাদর করে। রবিবারে এইরূপ অনেক লোক মৎস্য ও অন্নাদি খাদ্য লইয়া ছড়াইতে থাকে ও ঝাঁকে ঝাঁকে শম্ভুচিল আসিয়া উহা ভোজন করে। কোন কার্যোপলক্ষে যাত্রাকালে শম্ভুচিল দেখিলে উহার বিশেষ শুভলক্ষণ মনে করে, এবং কার্যে সফলতা নিশ্চিত বলিয়া স্থির করে। বালকবালিকাগণও শৈশাবধি এইরূপ দেখিয়া শম্ভুচিলকে আদর করিতে শিক্ষা করে। শম্ভুচিল দেখিতে পাইলে দল শুদ্ধ বালকবালিকারা এই বলিয়া চীৎকার করে “শম্ভুচিলের ঘটা বাটা।

ডোম চিলকে কুড়ুলে কাটি ॥”

দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিল এদেশীয় কেহ মারে না এই জন্য ইহার অতিশয় নির্ভীক। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের ভিতর ইহাদের উপদ্রবে খাদ্যদ্রব্য, মৎস্য, মাংসাদি অতি সাবধানে লইয়া যাইতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই চিল বেগে এক-ঝাপ্টা দিয়া যথা সাধ্য লইয়া যায়। ইহার অনেক সময় বালক বালিকার হস্ত হইতে মিষ্টান্ন কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করে। অনেকের বিশ্বাস শম্ভু চিল বিষ্ণুর বাহন ও গুরুড়েরই রূপান্তর, ইংরাজগণ ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-চিল (Brahmany kite) নামে উল্লেখ করেন। খেত-এ কৃষ্ণবর্ণের আরও অনেক রকম চিল দেখিতে পাওয়া যায়।

শৌৰ, মাঘ মাসে ইহার ডিম পাড়ে। উচ্চ বৃক্ষের শাখার, মন্দির অট্টালিকাদির চূড়ার বা পাহাড়াদির উপরে ইহার বাসা নির্মাণ করে, একবারে দুই তিনটির অধিক ডিম পাড়ে না। ছানা হইবার সময় বিশেষ সতর্কতা বাসা রক্ষা করে। ইহার অপরাপর পক্ষীর বাসা হইতে ছানা লইয়া নিজের শাবকগণকে ভক্ষণ করাইয়া থাকে। হংস ও কুহুটাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবক প্রায়ই ইহাদিগের প্রাসে পতিত হয়। উড়িতে উড়িতে কিম্বা অল্প প্রতিবন্দীর সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহার একরূপ চিঁ চিঁ শব্দ করে। ঐ শব্দ প্রায় হেঁষা রবের সদৃশ। ইহাদের শব্দ হইতেই সম্ভবতঃ ইহাদিগের নাম চিল হইয়া থাকিবে। চিল অপেক্ষাকৃত উচ্চ-ভাগে উড়িতে পারে, ইহাদের দৃষ্টিও অতিশয় তীক্ষ্ণ।

চিল (চিলশব্দ) চিলপক্ষী, চিল।

চিলানদেব, নেপালের অন্তর্গত পাটন ও কীর্ত্তিপুয়ের একটা মন্দির। প্রত্যেক স্থানে পাঁচটা করিয়া মন্দির আছে। মধ্যস্থলের মন্দিরটা সর্বোচ্চ। মন্দিরগুলির গঠন প্রাণালীর অতিশয় পরিপাটি আছে। ইহা মধ্যে স্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলিও অতি সুন্দর।

পাটনের মন্দির একটা পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কিম্বদন্তী আছে যে, সম্রাট অশোক যখন এই মন্দিরটা নির্মাণ করেন, সরোবরটাও সেই সময়ে খনন করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটার পূর্বদিকে একখানি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে যে, মধ্যস্থিত চৈত্যাটা এবং ইহার চারি কোণে অবস্থিত অপর চারিটা শৈলি স্থা নিবার মেগাপাল (Megapal) ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে উত্তমরূপে সংস্কার করেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, ৮১০ জন বান্হা (Banhras) একত্র হইয়া এই মন্দিরের অন্তর্গত একটা ধরম-ধাতুমণ্ডল নির্মাণ করে। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, কীর্ত্তিপুয়ের মন্দির সর্বদে কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। একখানি প্রস্তরফলক পাঠে জানা যায় যে, উক্ত অঙ্গে এই মন্দিরটার সংস্কার করা হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটা অন্তর্গত একটা ধরম-ধাতুমণ্ডল এবং ইহার চারিদিকে “অষ্ট মন্ডল” শব্দেই খোদিত আছে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে, বান্হা জাতীয় দুই ভ্রাতা ইহা নির্মাণ করিয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণে একটা ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। ইহার ভিতরে বুদ্ধদেবের ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ত্রিনিবাস মল্লের (Mall) রাজত্বকালে, বান্হা কর্তৃক এই দেবালয়টা নির্মিত হয়।

চিলপুত, বৃক্ষভেদ।

চিলমুরী, বৃক্ষভেদ।

চিলমিলিকা (জী) চিরং মীলতি চিকমীল—খুল—ততটাপ
অত ইং। ১ কষ্টভেদ, কঠমালি। ২ খদ্যোত, জোনাকী-
শোকা। ৩ বিদ্যুৎ।

চিলম (দেশজ) ছিলিম, হকা।

চিলমুচি (দেশজ) মুখ হাত খুইবার পাত্রবিশেষ।

চিলসু, কাশ্মীর-মহারাজের অধীনস্থ একটি করদ রাজ্য। ইহার
উত্তর সীমা সিদ্ধনদী এবং ইহার দক্ষিণে ও পূর্বে একটি
হ্রদ। বৎসরের অনেক সময় ইহা তুষারে আবৃত থাকে।
শিনিজাতিরাই এখানে প্রধান। ইহারা আরববংশীয় বলিয়া
আপনাদের পরিচয় দেয়। মুসলমানদের সহিত তুলনা করিতে
গেলে, ইহাদের জীলোকেরা অধিক স্বাধীনতা পাইয়াছে
এবং তাহাদের ক্ষমতাও অধিক। ইহারা সতীত্বের বড়ই
পক্ষপাতী। এখানকার অসতী জীলোকদিগের দণ্ড মৃত্যু।
কি পুস্ত, কি ফারসি, কি হিন্দি, কোনটাই সহিত ইহাদের
ভাষার মিল নাই। ইহাদের প্রতিবাদী সৈয়দজাতি ও ঘিল-
ঘিটের পশ্চিমস্থিত ছররাইল এবং তান্‌কীরগণও ইহাদের
ভাষা বুঝিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ চলিয়া
আসিতেছে যে, মুসলমানেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে, চিলস্বাসী-
দিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত
করিয়াছিল। ইহারা প্রতিবৎসরে কাশ্মীরের মহারাজকে
তিন তোলা সোণার গুঁড়া এবং একশত ছাগ কর স্বরূপ
প্রদান করে।

চিলা (দেশজ) ছাদের উপরের ঘর, চিলে-ঘর।

চিলাসি, মধ্যএসিয়ার অন্তর্গত হিন্দুকুশপর্বতবাসী জাতি-
বিশেষ। ইহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ইহাদের কাছে
এই ধর্মটি ভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে,
চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে এই ধর্মটি ইহাদের মধ্যে চলিত
হইয়াছিল। পর্বতস্থিত প্রত্যেক গ্রামে প্রাচীন পৌত্তলিক
ধর্মের চিহ্ন দেখা যায়। প্রস্তর নির্মিত অবয়ব প্রায় সর্ব-
ত্রই প্রোথিত আছে। এই সকল মূর্তির সমক্ষে সপথ
করিলে তাহা অলঙ্ঘনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।
স্বাত এবং বোনার হইতে মোল্লাগণ আসিয়া ইহাদের এবং
পর্বতস্থিত অন্যান্য জাতিদের মধ্যে ধর্ম-প্রচার করিয়া থাকেন।
প্রত্যেক জাতিই স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা-
দের মধ্যে জীর বহুশামী গ্রহণ রীতি প্রচলিত আছে। ইহাদের
বৈবাহিক বন্ধন শিথিল করা হইতে পারে। ইহারা আমোদ-
প্রিয়; নৃত্য, গীত এবং অন্যান্য আমোদে ইহাদের বিশেষ
উৎসাহ আছে।

চিলিয়াটঙ্গী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

চিলিকা (জী) [চিরিকা দেখ।]

চিলি (পুং) মৎস্তবিশেষ।

চিলিচিম (পুং) চিলিং হিংসাং চিনোতি চিলি-চিম্
রত্ন লভ্যং। মৎস্তবিশেষ, বেলে গড়গড়ে মাছ। পর্যায়—নল-
মীন, তলমীন, চিলীচিমি, চিলিচীম, চিলীচিম, চেলিচীম,
চিলীম, চিলিমীনক, চিলিচীমি, কবল, বিলোটক। এই
মৎস্ত—লঘু, রুক্ষ, বায়ুকারী ও কফনাশক। (রাজবল্লভ)

চিলিয়ান্বালা, পঞ্জাব প্রদেশে গুজরাট জেলার অন্তর্গত
ফেলিয়ান্ তহসিলের একটি গ্রাম। ঝিলামনদীর পূর্বকূল
হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩৯' ৪৬" উঃ
এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮' ৫২" পূঃ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারীতে এই স্থানে শিখদিগের
সহিত ইংরাজগণের একটি ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে
ইংরাজেরা পরাভূত হইয়াছিলেন। তাহাদের অনেক প্রধান
রাজপুরুষ এবং সেনা সেই যুদ্ধে নিহত হন। ইহাদের স্মরণার্থে
এই যুদ্ধক্ষেত্রে একটি চিহ্ন সংস্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী
লোক সকল এই স্থানকে “কোতলগড়” বলে। জেনারেল
কানিংহাম বলেন যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্বে আলেকজান্ডারের
সহিত পুরুষাজের যুদ্ধ হইয়াছিল।

চিলিবা, মৎস্তবিশেষ। এই মৎস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রচুর
পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু
দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার বর্ণ নূতন বোউলের স্যায়।
ইহার আসে খুঁটা মতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আশ্বাদনও
অতি উত্তম।

চিক্কাহুদ, উৎকল প্রদেশের একটি বিখ্যাত হ্রদ। পুরী
জেলার দক্ষিণপূর্ব কোণ হইতে আরম্ভ হইয়া মাস্‌জা প্রদেশে
গঞ্জাম জেলার গিয়া শেষ হইয়াছে। ইহা বঙ্গোপসাগরের
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্র ও হ্রদের মধ্যে একটি বালির
ঢিবি আছে। এই ঢিবিটিতে একটি ছিদ্র থাকাতে হ্রদটির
সমুদ্রের সহিত সংযোগ হইয়াছে। ইহা ৪৪ মাইল লম্বা।
ইহার উত্তরার্দ্ধ প্রায় ২০ মাইল চওড়া। ইহার দক্ষিণার্দ্ধ ক্রমে
সরু হইয়া গিয়াছে। ইহা চওড়ায় ৫ মাইলের অধিক নহে।
ইহার গভীরতা কোনখানেই ৬ ফিটের অধিক নাই। ডিসেম্বর
হইতে জুনমাস পর্যন্ত ইহার জল লবণাক্ত থাকে। বর্ষা
আরম্ভ হইলে লবণাক্ত জল ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায়, এবং
হ্রদটি মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ হয়। ইহার জল অতিশয় পরিবর্তন-
শীল, কখন বিস্তীর্ণ কখন বা সংকীর্ণ হইয়া থাকে। এখন
ইহা সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এই হ্রদের স্থানে স্থানে অতি মনোহর দৃশ্য আছে। ইহার

দক্ষিণ ও পশ্চিম কূলে পূর্বভূপ্রাচীর শোভা পাইতেছে। এই অংশটুকুর মধ্যে মধ্যে প্রত্যয়ে গঠিত কএকটা দ্বীপ ও ইহার উত্তর অংশেও একটা দ্বীপ আছে, কিন্তু তাহা প্রত্যয়ে গঠিত নহে। এই দ্বীপটীতে লোকের বসতি নাই, কিন্তু ইহাতে শরবন থাকিতে লোকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া শর কাটিয়া লইয়া যায়। হ্রদটির পূর্বদিকে পারিফ্রন নামক দ্বীপপুঞ্জ আছে। ইহা নানাপ্রকার সুন্দর পাদপশ্রেণীতে শোভিত। এই দ্বীপগুলিকে প্রকৃতির প্রমোদকানন বলিলে বলা যাইতে পারে। মনোহর বৃক্ষগুলির শাখায় অবস্থিত নানাবর্ণে রঞ্জিত সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গমকুলের মধুর ধ্বনিতে দ্বীপপুঞ্জ সর্বদাই সুখময় ও ভাবুকগণের অতিশয় ঐতিহাসিক হইয়া থাকে। এক সময়ে মহাশয় চৈতন্যদেব এই হ্রদের শোভা সন্দর্শনে জ্ঞানশূন্য হইয়া জল মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

চিল্ল (জি) ক্লিরে চক্ষুধী ক্লির-চিল্ল, লচ্চ (ক্লিরত চিল্ল লচ্চাত চক্ষুধী। পা ৫২১৩৩ বার্তিক।) ১ ক্লিরচক্ষু। চিল্লতি হাব ভাবেন উজ্জীয়েতে চিল্ল-অচ্চ। ২ পক্ষীবিশেষ, চিল্ল। পর্যায়—আতায়ী, শকুনি, আতাপী, খজ্রাস্তি, কণ্ঠনীড়ক, চিরন্তণ।

চিল্লিকা (জী) চিল্লইব কারতি চিল্ল-কৈ-ক। ঝিল্লিকা, ঝিল্লিপোকা।

চিল্লভক্ষ্যা (জী) চিল্লভ ভক্ষ্যা ভক্ষণীয়া ৬তৎ। হট্টবিলাসিনী নামক গন্ধ দ্রব্য।

চিল্লা, যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে এবং বারদেওয়াল হইতে ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত একটা গ্রাম। ইহা প্রাগ (এলাহাবাদ) হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামটী বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে প্রস্তর নির্মিত একটা বৃহৎ অট্টালিকা আছে, এই জন্তই গ্রামটী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, এই অট্টালিকাতে আলহা এবং উদল নামক দুইজন বিখ্যাত বানানকার বীর-পুরুষ বাস করিতেন। ইহার চারিদিক এরূপ উচ্চ এবং দৃঢ় প্রাকারে বেষ্টিত ছিল যে, ইহা কিছুকালের জন্য শত্রু সৈন্তের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত।

এই অট্টালিকাটী হিন্দুদিগের আদিম কীর্তি। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, ইহা খৃষ্টীয় ৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল।

চিল্লাভ (পুং) চিল্লইব প্রসঙ্গ হারিহরাদাত্তাতি চিল্ল-আ-ভা-ক। ১ চৌরবিশেষ, গাঁটকাটা, হাত হট্টা। (পুং) চিতোলাভ: ৬তৎ। ২ চৈতন্যলাভ।

চিল্লি (পুং) চিল্ল-ইন্। ১ জুহুয়ের মধ্য। ২ চিল্ল পক্ষী।
চিল্লিকা (জী) চিল্লি-স্বার্থে কন্ ততটাপ্। জ। *শ্লিচর-

কেতন-শরাসনভাং চিল্লিকালভাং (কানবরী)। চিল্লি-স্বার্থে কন্ ইকার হ্রস্বচ। ২ চিল্লি শাক।

চিল্লী (জী) চিল্ল-ইন্-ততো জী। ১ লোহ বৃক্ষ। ২ ঝিল্লিকা, ঝিল্লিপোকা। ৩ ক্ষুদ্র বাস্তক শাক। পর্যায়—চিল্লিকা, তুলী, অগ্রলোহিতা, বৃহপত্রী, কারবলা, কারপত্রা, বাস্তকী, মহদগা ও গোড়বাস্তক। ইহার সাধারণ গুণ—বাস্তকের সমান। বিশেষ গুণ—রোম, পিত্ত, স্নেহকৃষ্ণ ও শ্রমেহ নাশক, পথ্য ও রুচিকর। (রাশনি*)

চিল্লীকা (জী) ঝিল্লী, ঝিল্লিপোকা। (শকর*)

চিল্লুপার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলার একটা পরগণা। ইহার উত্তরপূর্ব সীমায় রাষ্ট্রীনদী, পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম সীমায় ভাওরাপার এবং ধুরিয়াপাড় নামক দুইটা পরগণা এবং দক্ষিণ সীমায় বর্ষান নদী। এই পরগণাতে নানা জাতীর লোক বাস করে। একটা উপবিভাগে কেবল ব্রাহ্মণ-দিগের বসতি। ইহার নাম কাণ্ডুজিয়া, প্রায় ৮ সহস্র ব্রাহ্মণ এখানে বাস করে। এখানে অনেক জলাশয় আছে। জলাশয়-গুলি দ্বারা শস্ত ক্ষেত্রের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। গোরক্ষপুর জেলার মধ্যে এই পরগণাটী সর্বাপেক্ষা অধিক উর্বরা। তড়াগগুলি যতই শুকাইতে থাকে অমনি সেই শুষ্ক জমীতে ধানের আবাদ হয়। ধাতু এবং নীল এই সময়কার উৎপন্ন দ্রব্য। বসন্তকালে গম, অড়হর, ছোলা এবং অম্মাভ শস্ত উৎপন্ন হয়। এই পরগণাটী প্রথমে ভারদিগের অধিকারে ছিল। কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ধুরিয়াপাড়ের প্রথম রাজা ধুরিচাঁদকোশিক ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষে অথবা ১৭শ শতাব্দীর প্রথমে সেমরা বাসী বীরনাথসিংহ বিশেষ ইহা অধিকার করেন। ইহার বংশধর-গণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরে রাজা বিজোহী হওয়ারতে, এই বংশ হইতে রাজ উপাধী লোপ পায়, এই রাজাদের নরহরপুরের রাজধানী ছিল এবং এই নিমিত্ত ইহার নরহরপুরের রাজা বলিয়া অভিহিত হন।

চিবি (জী) চীব-ইন্ পৃষোদরাদিভাং সাধু। চিবুক। (জটায়র)

চিবিট (পুং) চিপিট, চিড়ে। (অমরটী*)

চিবিপ্লিকা (জী) ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্যায়—রক্তদলা, ক্ষুদ্রখোলা ও মধুমাল পত্রিকা। ইহার গুণ—কটু, কষায়, রসায়ন ও জীর্ণজরে বিশেষ উপকারী। (রাশনি*)

চিবু (পুং) চীব-উ পৃষোদরাদিভাং হ্রস্বঃ। ওষ্ঠের অধোভাগ, চিবুক। (ভরত)

চিবুক (জী) চিবু-স্বার্থে কন্ অভিধানাং ক্রীবৎ। ১ ওষ্ঠের অধোভাগ, চলিত কথায় খুঁতি বা দাড়ি বলে।

“উত্তম্য চিবুকং বক্ষস্থাপ্য পবনং শনৈঃ।” (হঠ-
যোগ দীপিকা ১।৪৬) (পুং) চিবু সংজ্ঞার কন্ (২) মুচুক্স
বৃক্ষ। (রাজনিং)
চিচ্চা (অব্য) [বৈ] তুগীর হইতে বাণ উঠাইবার সময় যে
শব্দ হয় তাহাকে চিচ্চা বলে। “চিচ্চা ক্লণোতি সমনাব-
গত্যা।” (শব্দ ৬।৭৫।৫) চিচ্চা ক্লণোতি। চিচ্চেতি শব্দান্ত
কৃতিঃ। ইষুধ্বিক্রিয়মানেষুধ্বিশিচ্চাশব্দং করোতি। সায়ণ।
চিটু (পুং) [অচিটু দেখ।]
চিহণ (ত্রি) চিহ্ন প্ৰবোধদাদিহ্মাং নিপাতনে সাধু। চিহ্নণ,
চিকণ। (পা ৬।২।১২৫)
চিহণকল্প (ত্রি) চিহণ কহা যন্ত বহতী। যাহার চিহ্ন কহা
আছে। (পা ৬।২।১২৫)
চিহণাদি (পুং) চিহণ আদিবস্ত বহতী। পাণিনীয় একটা
গণ। চিহণ, ময়ূর, ময়ূরময়, বৈতুল, পটংক, বৈড়ালিকর্ণক,
বৈড়ালিকর্ণি, কুকুট, চিহ্ন ও চিকণ এই কয়টা শব্দকে
চিহণাদি বলে। কহা শব্দ পরে থাকিলে চিহণাদির আদি
উদাত্ত হয়। (সি° কো°)
চিহার (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ।
চিহারী (পারসী) মূর্তি, আকৃতি।
চিহ্নর (পুং) চিহ্ন প্ৰবোধদাদিহ্মাং সাধু। কেশ, মাথার
চুল। (শব্দার্থ চি°)
চিহ্ন (স্ত্রী) চিহ্ন-অচ্। ১ লক্ষণ, চলিত কথায় চিনা বা
দাগ বলে। পর্যায় কলঙ্ক, অঙ্ক, লক্ষ, লক্ষণ, লিঙ্গ, লক্ষণ ও
অভিজ্ঞান।
“চিহ্নীভূতঃ স্তম্ভিষ্ঠানঃ স্তম্ভে কৰ্ত্তৃমহসি।” (রামায়ণ
৪।১২।৪৪) ২ মাত্রা, গণবিশেষ। যে গণ আদিলঘু অথচ
তিনটা মাত্রা যুক্ত তাহাকে চিহ্ন বলে। (শব্দার্থ চি°)
৩ পতাকা। (মেদিনী)
চিহ্নক (ত্রি) চিহ্নয়তি চিহ্ন-ধূল। ১ যে চিহ্নিত করে। (পুং)
২ বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় চিহ্না বলে।
চিহ্নকারিন্ (ত্রি) চিহ্নং করোতি চিহ্ন-কৃ-ণিনি। ১ চিহ্নকারক,
যে দাগ দেয়। ২ ঘোর দর্শন। (বিষ্ণু°) স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়।
চিহ্নধারিন্ (ত্রি) চিহ্নং ধরতি চিহ্ন-ধৃ-ণিনি, চিহ্ন যুক্ত।
চিহ্নধারিণী (স্ত্রী) চিহ্নধারিন্-ভীষ। স্ত্রীমালতা। (শব্দচঞ্জিকা)
চিহ্নিত (ত্রি) চিহ্ন কৰ্ম্মণি ক্ত। ১ অঙ্কিত। ২ লক্ষিত,
যাহাতে চিনা দেওয়া হইয়াছে।
“দিবা চরয়ুঃ কার্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।” (মহু ১০।৫৫)
চিহ্নিতনামা (দেশজ) জমী জমা সম্বন্ধে রাজা বা ভূস্বামী
প্রদত্ত সীমা নিরূপণ পত্র।

চিহ্নীকৃত (ত্রি) চিহ্ন চি ক্ত। চিহ্নিত। “লিঙ্গেনাপিহরন্ত
সৰ্গপুরুষাঃ প্রত্যক্ষচিহ্নীকৃতা।” (ভারত, অমুশাসন°)
চীচীকুটি (অব্য) শারিকা প্রভৃতির শব্দের অমুকরণ।
“চীচীকুটি বাসন্তে শারিকা বৃক্ষিবেন্দ্র।” (ভারত ১৬।২)
“চীচীকুটী” এবং “চীচীকুটী” শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
চীচীরিয়া (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র গুল্ম।
চীজ্ (পারসী) জব্য, জিনিষ।
চীড়া (স্ত্রী) চিড় টাপ্ প্ৰবোধদাদিহ্মাং দীর্ঘত্বং। গন্ধদ্রব্য-
বিশেষ; চলিত কথায় চীড়া-গন্ধ বলে। পর্যায়—দারুগন্ধা,
গন্ধবধু, গন্ধমাদনী, তরুণী, তায়ী, তৃতমারী, মঙ্গল্যা, কপটিনী,
গ্রহভীতিজিৎ। ইহার গুণ কটু, কফ ও কাশ নাশক, দীপন,
এবং ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তমোহ ও ভ্রান্তি
বিনাশ হয়। (রাজনিং)
চীণ (পুং) [বহ] চীন প্ৰবোধদাদিহ্মাং সাধু। চীনদেশ-
বাসী। (বৃহৎস° ১৬।১)
চীণক (পুং) [চীনক দেখ।]
চীতি (স্ত্রী) চি-জিন্ প্ৰবোধদাদিহ্মাং সাধু। চয়ন।
“দেবান্তে চীতি মবিদন্ ব্রহ্মাণউতবীৰুধঃ।” (অথর্ব ২।৯।৪)
চীতু, একজন বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দার। ইনি জাঠবংশে জন্ম
গ্রহণ করেন, কিন্তু শৈশবাবস্থায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে
পিতামাতা কর্তৃক জনৈক পিণ্ডারীর নিকট বিক্রীত হন।
পিণ্ডারী চীতুকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন ও নিজ ব্যব-
সায় শিক্ষিত করিতে লাগিল। চীতু শীঘ্রই স্বীয় অসাধারণ
প্রতিভাবলে পিণ্ডারীদলে একপ্রাপ্তিপন্ন হইয়া উঠিলেন যে,
হীক ও বুয়ান নামক প্রধান সর্দারদ্বয়ের মৃত্যুর পর দৌলত-
রাও সিক্খিয়া চীতুকে নবাব উপাধি দিয়া একটা জায়গীর প্রদান
করেন। দুই বৎসর পরে সিক্খিয়ার কোপে পতিত হইয়া
চীতু বন্দী হইলেন, এবং চারিবৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া
অনশেষে প্রচুর অর্থ বিনিময়ে মুক্ত হন। ইহার পর তিনি
সিক্খিয়ারাজের নিকট হইতে ভূপালের পূর্ববর্তী এটা জেলা
পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নর্মদা-তীরে নিমার নামক স্থানে তাঁহার
সেনানিবাস ছিল।
চীতুর সমকালে ওয়াসিল মহম্মদ, দোস্ত মহম্মদ ও করিম
খাঁ নামক আরও তিন জন প্রধান পিণ্ডারী সর্দার ছিল।
১৮১৪ খৃঃ অব্দে চীতুর অধীনে প্রায় ১৫০০০ অশ্বরোহী
ছিল। চীতুর সেনাপতিগণ বহুদেশ লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর অর্থ
আনয়ন করে। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে চীতুর অধীনে প্রায় ২৫০০০
সহস্র অশ্বরোহী পিণ্ডারী সৈন্য নিজামরাজ্য আক্রমণ করিয়া
বহুতর অর্থ আনয়ন করিয়াছিল।

চীতু রঘুজী ভৌসলার নিকট হইতে কতিপয় জারগীর প্রাপ্ত হন, স্ততরাং একসময়ে করিম খাঁ নামক পিণ্ডারীসদার রঘুজী ভৌসলার রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলে চীতু সাহায্য করিতে অসম্মত হইলেন। এই বিষয় লইয়া করিমের সহিত তাঁহার ঘোরতর মনোবাদ হইল। পরস্পর এইরূপ বিবাদে উভাদের বলহীন হইলে শীঘ্রই সিদ্ধিয়া প্রেরিত সৈন্য কর্তৃক করিম পরাজিত হইল ও চীতু পূর্বাংগে অধিক বলবান হইয়া পড়িলেন। তিনি ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইংরেজাধিকৃত উত্তর সরকার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগের দুর্দশার একশেষ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সরজনু মাল-কোলম্ নামক ইংরাজ সেনাপতি চীতুর দমনার্থ প্রেরিত হন। চীতু অস্ত্রাশ্রয় পিণ্ডারী সদারের সহিত উত্তরদিকে পলায়ন করিয়া জবাদের যশোবস্তরাও'ভাওএর আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য ঐদিকে অগ্রসর হওয়ায় পিণ্ডারীগণকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। অতঃপর উহারা চিতোরে উপনীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল।

চীতু প্রথমে গুজরাটভিত্তিতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার প্রবেশ দুর্ভেদ্য দেখিয়া পুনরায় স্বস্থানে, ফিরিতে মানস করিলেন। বহুস্থান ঘুরিয়া ইংরাজ সৈন্য অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে চীতু হিন্দিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় মেজর হিথ চীতুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া উহার দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলেন। চীতু পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত হঠাৎ একদিন ভূপালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে বলিলেন। চীতুর ইচ্ছা ছিল ইংরাজ-রাজ তাঁহার পূর্বকৃত অপরাধ মার্জনা করিয়া চীতু ও তাঁহার কতিপয় অনুচরকে একটা জারগীর দিলে তাঁহার ইংরাজের অধীনে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু ইংরেজগণ ঐ প্রার্থনায় সম্মত না হওয়ায় চীতু পলায়ন করিলেন এবং বিদ্যা ও সাতপুর পর্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ব্যাঘ্র কর্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধ-ভক্ষিত দেহ জনৈক মেঘপালক দেখিয়া চিনিতে পারে।

চিংকার (পং) চীং-কু-ঘাং। চিংকার, উচ্ছ্বাস, চৈতন। [চিংকার দেখ।]

চীন (পং) চীংয়ে সন্ধীয়তে দোষ বিশেষো যত্র চি-বাহুলকাৎ নন্দীর্ষশ্চ। ১ দেশবিশেষ। শক্তিসম্পন্ন তত্ত্বের মতে কাম্যীর হইতে আরম্ভ করিয়া কামরূপের পশ্চিমে ও মানসেশের দক্ষিণভাগে দেশ; মানসেশের দক্ষিণ পূর্বে চীন দেশ।

বৃহৎসংহিতায় কুর্শ বিভাগে জ্ঞানকোণে এই দেশের উল্লেখ আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪ অঃ)

বর্তমান পূর্ব এসিয়ার মধ্যবর্তী সুবিধাত দেশ। এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের পূর্বসীমা চীনসাগর ও পীতসাগর, দক্ষিণ সীমা পূর্ব উপদ্বীপ, পশ্চিম সীমা তিব্বত ও পূর্বতুর্কিস্থান এবং উত্তর সীমা চীনের বৃহৎ প্রাচীর ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮৬০ মাইল এবং পূর্বপশ্চিমে প্রায় ১৫২০ মাইল। পরিমাণ ফল প্রায় ১৫,৩৪,৯৫০ বর্গমাইল। হেনান দ্বীপ সহিত এই রাজ্য ১৮° উঃ হইতে ৪০° উঃ অক্ষরেখা পর্য্যন্ত এবং ৯৮° পূঃ হইতে ১২৪° পূঃ দ্রাঘিমাঙ্কের পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপরে যে সকল পরিমাণ বলা হইল উহা কেবল চীনদেশের। তন্নিম্ন চীন সম্রাটের অধীনে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীনভাতার প্রভৃতি দেশ আছে। সকলের মোট পরিমাণ ফল প্রায় ৪৪,৬৮,৭৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০,৩২,৪১,। রাজস্ব আদায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

এই বহু জনাকীর্ণ প্রকাণ্ডরাজ্য এক ভাষা ভাষী, এক আচার ব্যবহার সম্পন্ন, এক জাতীয় লোকের বাসস্থান এবং বহু প্রাচীনকাল হইতেই একই রাজাদ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসীগণ এই রাজ্যকে চীনরাজ্য ও অধিবাসীদিগকে চীনবাসী বা চীনা কহিয়া থাকে।

যুরোপে ইহার নাম চায়না (China), পশ্চিম মঙ্গোলীয়গণ ইহাকে 'কাথে' এবং মাঞ্চুরীয় তাতারগণ 'নিকণ কোণ', জাপান বাসীগণ 'থ' ও আনামবাসীগণ 'ছীন' কহে। চীনারা আপনাদের দেশকে 'চং কুয়ো' অর্থাৎ মধ্যরাজ্য বলে। তাহার ইহাকে 'চং হো' অর্থাৎ 'মধ্য প্রস্থ'ও কহিয়া থাকে। বর্তমান রাজবংশ ইহাকে 'টাট্-সিং-কুয়ো' অর্থাৎ 'পবিত্র সাম্রাজ্য' এই আখ্যা দিয়াছেন। তন্নিম্ন 'চং থ্যাং' 'টিয়াং চেয়ো' অর্থাৎ স্বর্গীয়রাজ্য প্রভৃতি আরও অনেক রূপক নাম আছে।

চীনদেশের ভূমি প্রায় সর্বত্রই উর্বরা। তিব্বতের পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো নদীদ্বয় ইহার বহুবিস্তীর্ণ প্রদেশে জল দান করিতে করিতে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীদ্বয়ের উপর দিয়া একটা সুদীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে তদ্বারা কৃষিকার্যের বিস্তর সুবিধা হয়। হোয়াং হো বা পীতনদীর গতি অতি পরিবর্তনশীল। সম্ভ্রান্তি ইহার গতি পরিবর্তিত হইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। এই সকল কারণে পীতনদীকে "চীনের শোক" (Chines Sorrow) কহে। অপর নদী সকলের মধ্যে দক্ষিণভাগে কাণ্টন নদী ও উত্তরভাগে পিহো নদী প্রধান।

চীনের ভূমিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১মত, পশ্চিমভাগে উন্নত মালাভূমি; ২য়ত, মধ্য ও দক্ষিণাংশে পার্বত্যভূমি এবং ৩য়ত, পূর্বভাগে প্রকাণ্ড সমতল ক্ষেত্র। পে-লিং ও ইয়ন-লিং এই দুইটা পার্বত্যশ্রেণী উত্তরদক্ষিণে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিতেছে। নন লিং পার্বত্য দক্ষিণভাগে অবস্থিত।

চীনের রাজধানী পিকিন্ নগর। পিকিন্ শব্দের অর্থ উত্তর রাজসভা, ইহা রাজ্যের উত্তরভাগে বৃহৎ প্রাচীর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে পিহোনদীর তীরে অবস্থিত। একটা অত্যুচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর নগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। অপরাপর নগরের মধ্যে নান্‌কিন্, কাণ্টন, সাংজ্যে, আময়, ফুচু ও নিংপো প্রধান। নান্‌কিন্ নগর পূর্বে রাজধানী ছিল।

বিদেশীয় অধিকারের মধ্যে হংকং দ্বীপ ইংরাজদের অধিকৃত।

জলবায়ু।—চীনের অধিকাংশ প্রদেশেই শীত গ্রীষ্মের অতিশয় বৈষম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পিকিন্ নগরের নিকট শীতকালে একরূপ শীত হয় যে, নদী প্রভৃতি পৌষমাস হইতে প্রায় ৩৪ মাস বরফাবৃত থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে অসহ্য গ্রীষ্ম হয়। কিন্তু পিকিনের গড় তাপাংশ ইহার সম অক্ষান্তর্কর্ষী যুরোপের নগর সকলের গড় তাপাংশ অপেক্ষা অনেক কম। পিকিন্ ৩৯° ৫৪' উঃ অক্ষাংশস্থিত হইলেও ইহার গড় তাপাংশ ফারনহীটের ৫৪° অংশের অধিক নহে। কিন্তু নেপলস নগর ইহার প্রায় ১° উত্তরে অর্থাৎ ৪০° ৫০' উঃ অক্ষাংশস্থিত হইলেও ইহার গড় তাপাংশ ৬০°। ইহার কারণ চীন রাজধানীতে শীতকালে দ্রুত শীত হয় এবং তাপমানের তাপাংশ অনেক অল্প থাকে। কাণ্টন নগর কলিকাতার সম অক্ষান্তর্কর্ষী হইলেও উভয়ের জলবায়ু শীতোষ্ণতা বিষয়ে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। বৃষ্টি-পরিমাণ সকল বর্ষে সমান নহে। সচরাচর বার্ষিক ৭০ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টি পতিত হয়, 'কোন কোন বৎসর ৯০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণের মধ্য হইতে ফাল্গুনের কতকদিন পর্য্যন্ত উত্তর পূর্বদিক হইতে অতি শীতল বায়ু বহিতে থাকে। উদ্ভিদাদি এই কালে বর্ধিত হয় না।

বৈশাখ মাসে দক্ষিণ বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়। এই বায়ু দক্ষিণে উষ্ণ সাগর সকলে প্রচুর বাষ্পযুক্ত হইয়া উত্তর বায়ু দ্বারা শীতল চীনদেশে আসিবামাত্র, সেই বাষ্পরাশি কুণ্ডলিকারূপে পরিণত হয়। এই সময় বৃষ্টিও হইয়া থাকে। অবশেষে আষাঢ়, শ্রাবণমাসে ভয়ানক গ্রীষ্ম উপস্থিত হয়। কাণ্টন নগরের নিকট এই সময় বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া

এত পাতলা হইয়া যায় যে ভীষণ ঝটিকাদি উৎপন্ন হয়। চীনারা এইরূপ টাইফুন (Typhoon) অর্থাৎ ঝটিকাকে অতিশয় ভয় করে। কাণ্টনের নিকটস্থ প্রদেশে বিশেষতঃ হেনান্ দ্বীপের উপকূলে এই ঝটিকার উপদ্রব অধিক। চীনের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অধিবাসীগণ দীর্ঘজীবী।

জীবজন্তু।—চীনের পার্বত্য ও অরণ্য প্রদেশে হস্তী, গণ্ডার ভল্লুক, কেন্দুয়া, উল্কাযুখী, মহিষ, ঘোটক, উষ্ট্র, বন্যগর্দভ, বরাহ প্রভৃতি বন্য জন্তু বাস করে। উত্তর প্রদেশে বীবর সেবল, আর্মেন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোমোৎপাদক পশুসমূহ দেখা যায়। এই দেশ সমগ্রলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এখানে অপেক্ষাকৃত শীতের আধিক্য বলিয়া সমগ্রলের অনেক প্রাণী বাস করিতে পারে না। ব্যাঘ্র, তরঙ্গ প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু জনাকীর্ণ প্রদেশে অতি বিরল। শিলোথাবাব দক্ষিণ অংশে ছুই একটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলিকাতার সহিত প্রায় এক অক্ষরেখা হইলেও কাণ্টনে একটাও শিলোথাবাব দেখা যায় না। সিংহ একবারে নাই। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ, ছাগ, মেঘ, অশ্ব, শূকরাদিই বেশী। চীনেরা গৃহপালিত পশুর প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করে না। গো, মেঘ, অশ্বাদি মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দেয়। পশুদিগের জন্ত যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহাদিগকে যে আহাশ দিতে হয়, সে জ্ঞান ইহাদিগের আদৌ নাই। কাজেই এখানের সমস্ত পশুই অতি ক্ষুদ্রাকার ও হীনবল। অশ্ব সকলও ক্ষুদ্রাবয়ব ও ভীক, এমন কি তাতারদিগের যুদ্ধাশ্বের দ্বৈয়া-রব শ্রবণমাত্র পলায়ন করে। যাহাউক এদেশের ছাগ ছোট হইলেও যুরোপীয়দিগের নিকট অতি উপাদেয় খাদ্য। এতদ্ভিন্ন অল্পতর এজাত এমন আরও নানাপ্রকার পশুমাংস চীনারা ভক্ষণ করে। চীনারা ছাগ কিম্বা পনির খায় না। বলদ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু ভারবহন করে, কিন্তু মজুর অতিশয় সুলভ বলিয়া অল্পসময়ই বলদ প্রভৃতি ভার বহনে নিযুক্ত হয়। এখানে আসামদেশীয় বানরই বিখ্যাত। দক্ষিণভাগে কস্তুরিকা-যুগ আছে। তাতারদেশীয় অরণ্যে একজাতি পক্ষবিশিষ্ট উল্কাযুখী ও ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণ, কুম্ভসার, বন্যবরাহ, শশক, কাঠবিড়াল প্রভৃতি শিকারও দ্রুত নহে।

চীনে নানাপ্রকার অদ্ভুত পক্ষী দৃষ্ট হয়। এখানকার স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণের কুণ্ডলজাতীয় পক্ষী অতি প্রসিদ্ধ, উহাদের এক শ্রেণীর পুচ্ছ ৬ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। চীনের অরণ্যে ডাক, তিতর, বটের, বাগাঁস প্রভৃতি বিস্তর পক্ষী বাস করে। হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীও বিস্তর। এখানে একরূপ ধূসরবর্ণ হংসাকৃতি পক্ষী আছে,

তাহারা মংসু ধরিতে অতি পটু। চীনেরা ঐ পক্ষী পুষিয়া হুদ হইতে উহাদিগের দ্বারা মাছ ধরাইয়া লয়। অস্ত্রাত্মক বহুজাতীয় পক্ষীর মধ্যে সামরিক ভারুইপক্ষী, একপ্রকার ঘুঘু ও শুভ্রকণ্ঠ কাক বিখ্যাত।

বহুসংখ্যক লোকের বাস ও নদী সকল সর্বদা অগণ্য নৌকাদি দ্বারা উদ্বেলিত হওয়ায় কাণ্টন নগরের উত্তরে হাঙ্গর কুত্তীরাদি ভীষণ জলজন্তু প্রায় নাই। গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্যক রুকলাস, টিক্‌টিক, শরট প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বিধাত্ত সর্প অধিক নাই। একরূপ শাখমালা চিতিই তথায় সর্বাপেক্ষা বিধাত্ত ও ভয়ঙ্কর সর্প। ইহার ২।৩ ফিট লম্বা হয়।

চীনের নদী, হুদ ও সরোবরে অতি সুস্বাদু নানারূপ মংসু পাওয়া যায়। তথাকার অতি সুন্দর স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণ মংসু অতি বিখ্যাত। ইহাদের আকার সামান্য পুঁটিমাছের জায়। কাচের বোতলে করিয়া এই সকল মংসু নানাদেশে রপ্তানী হয়। কি সমুদ্র, কি নদী, সর্বত্রই বহুল পরিমাণে মংসু দ্রুত হইয়া থাকে। সার, জে এফ ডেভিস (Sir J. F. Davis) অনুমান করেন যে, চীনের জায় পৃথিবীর কোন স্থানেই জল হইতে এত অধিক শাস্ত সংগৃহীত হয় না।

কীট পতঙ্গাদির মধ্যে পক্ষপাল চীনের কয়েকটা জেলার বিস্তর অনিষ্ট করে। কাণ্টন নগরের নিকট কাঁকড়া-বিছা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বৃক্ষে একপ্রকার মাকড়সা বাস করে, উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীও জালে ধরিয়া খাইতে পারে। কাণ্টনের পূর্বদিকে লো-ফো-শান্ পর্তুতে একজাতি বৃহদাকার অতি সুন্দর প্রজাপতি বাস করে, ইহাদের বহু সংখ্যক প্রতিবৎসর পিকিনে প্রেরিত হয়। রেসমোংপাদক গুটীপোকা বহু প্রাচীনকাল হইতেই চীনে জন্মিতেছে। চীনের উৎকৃষ্ট রেসম নানা দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

আকরিক।—চীনের আকরিক সম্পত্তির বিষয় অতি অল্প মাত্রই জানা যায়। পর্তুগীজ প্রদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, রক্ত, দস্তা, সীসা প্রভৃতি সকল প্রকার ধাতুই উৎপন্ন হয়। কিন্তু কৃষিকার্যের অজুত বিস্তৃতি জন্তু খনি সকল রীতিমত খোদিত হয় না। এখানে স্বর্ণ মুদ্রা হয় না, এবং সম্রাট ব্যতীত অতি অল্প লোকেই স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে। ব্রহ্মদেশের সীমান্তস্থিত ইউনান্ প্রদেশে নদী সকলে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। উহাতে রৌপ্যেরও খনি আছে, এবং বিখ্যাত পি-টাং অর্থাৎ সিত-তাম্র ধাতুও এই প্রদেশেই উৎপন্ন হয়। পি-টাং ধাতু প্রায় রৌপ্যের জায় উজ্জল। জাপান হইতে স্বর্ণ-বর্ণ তাম্র আনীত হয় তাহা অতি সুন্দর। সাধারণ তাম্র ইউনান্ ও কিউ-রো প্রদেশে পাওয়া যায়।

হ-কুয়াং হুদের নিকট হরিৎবর্ণ আকরিক তাম্র দৃষ্ট হয়। হিন্দুল, হরিভাল, কোরাষ্ট 'ও সৈন্ধব লবাণাদিও পাওয়া যায়। সমুদ্রজলে লবণ প্রাপ্ত হয়।

গৃহ নির্মাণোপযোগী প্রস্তর ও গ্রেট-প্রস্তর দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার মর্ম্মরপ্রস্তর উৎকৃষ্ট নহে। তড়িৎ স্থানে স্থানে চুনী, মরকত, পামা প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরও পাওয়া যায়।

চীনের কেওলিন্ নামক কৰ্দম অতিশয় বিখ্যাত। চীনা-বাসন সকল ইহাতেই প্রস্তুত হয়। চীনারা একপ্রকার খড়িমাটির সহিত কেওলিন্ মিশ্রিত করিয়া বাসন প্রস্তুত করে। তড়িৎ অস্ত্রাত্মক সকল প্রকার কলুসাদি নির্মাণোপযোগী মৃত্তিকাই চীনে প্রচুর পরিমাণে ও পাথরিয়া করিয়া চীনদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। চীনারা বহুপ্রাচীনকাল হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

ইতিহাস।—পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন চীনা-গণ কাম্পীয়ন্ হুদের দক্ষিণ হইতে আগমন করিয়া চীনে বাস করে। ইহাদিগের চিত্রময় বর্ণমালার সহিত প্রাচীন মিসরের বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন ইহারা মিসরীয় বংশোদ্ভূত হইবে। সূর্য্যদেবের ষাণ্মাষিক অন্ননাস্ত-কালীন অর্ঘ্যদান ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদির বিধি আমাদিগের তুল্য। আরও ভারতবর্ষীয়দিগের জায় ইহারা দশভাগে দ্বিখিভাগ ও দ্বাদশভাগে রাশিচক্র বিভাগ করে। ঐ সকল সাদৃশ্য স্বত্বেও ইহারা হিন্দু বা মিসরীয় বংশোদ্ভূত নহে। চীনাদিগের বদনাবয়ব আর্ঘ্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। এই জাতি কর্কট ক্রান্তি হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত এসিয়ার সমস্ত ভাগে বাস করে।

চীনাদিগের আদি রাজবংশের নাম ও বিবরণ প্রভৃতি আলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। উহারা কহে 'পুয়ং কু' চীন-রাজ্যের প্রথমাদীশ্বর ছিলেন। তৎপর সীনহোয়াং রাজ্য প্রাপ্ত হন। পুয়ং কু শব্দে অতি প্রাচীনকাল ও সীনহোয়াং শব্দে স্বর্গাদীশ্বর বুঝায়। সুতরাং ঐ সকল নাম রূপক ও প্রাচীন ইতিহাস অনিশ্চিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক চীনরাজ্য যে অতি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। সকলেই অনুমান করেন ফোহিই চীনের প্রাকৃত প্রথমাদীশ্বর। ফোহি খৃষ্টের ২৯৫০ বৎসর পূর্বে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তাহার জন্ম বিষয়ে এক উপাখ্যান আছে। তাঁহার জননী একদা আবাস সম্বিহিত কোন হুদের কূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময়ে বালুকার উপর অপূর্ণ জ্যোতির্বিশিষ্ট রামধনুর

বংশোদ্ভিত একটা পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার গৰ্ভ সঞ্চার হইল। পুত্র প্রসূত হইলে তাহার নাম ফোহি রাখিলেন। ফোহি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরাক্রম ও শক্তিসম্পন্ন এবং বহুবিধ রাজগুণশালী দেখিয়া চীনবাসীগণ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ফোহি চীন ভাষার সৃষ্টি করেন এক রাজ্য মধ্যে বিবাহ প্রথা, সঙ্গীত শাস্ত্র, বেশভূষাদির নিয়ম প্রচলিত করিয়া সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান। প্রবাদ আছে যে, তিনিই প্রথম অক্ষর সৃষ্টি করেন। কুসংস্কারবিশিষ্ট লোকের অমুরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি প্রচার করেন যে, তিনি ঐ সকল অক্ষর একদিন কোন হুহু হইতে উদ্ভূত শব্দ ও পক্ষযুক্ত স্বর্ণায় এক অশ্ব পৃষ্ঠে দর্শন করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে-ছেন। অত্যাশি চীন সম্রাটের পতাকা সমূহে ঐ অশ্বমূর্তি অঙ্কিত থাকে। ফোহি বহুকাল রাজত্ব করিয়া গতাহ হইলে তাঁহার পর সিংহ, হোয়াংটাং, সাওহাও, চিউনহিউ, টিকো, চী, ইয়াও এবং সান্ এই সপ্তজন সম্রাট রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্বকালের বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় নাই। ইয়াও সম্রাটের রাজ্যকাল হইতেই চীনের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। ইনি ও ইহার জামাতা সান্ সম্রাট চীনে অনেক সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া যান। সানের মৃত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী ইউ থুটের ২২০৭ বৎসর পূর্বে 'হায়া' নামক প্রথম চীন রাজবংশ স্থাপন করিয়া সম্রাট-পদাভিষিক্ত হইলেন। নিয়ে 'হায়া' বংশের সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রত্যেক রাজ বংশের নাম সম্রাট সংখ্যা ও তাহাদের রাজ্যারম্ভের কাল লিখিত হইল।

বংশের নাম	সম্রাট সংখ্যা	রাজ্যারম্ভ কাল
১। হায়া বা কায়া	১৭ ...	২২০৭ খৃঃ পূঃ
২। সাং বা ইং,	২৮ ...	১৭৬৬ ” ”
৩। চিউ,	৩৫ ...	১১২২ ” ”
৪। ছিন্,	৫ ...	২৫৫ ” ”
৫। হান্,	২৯ ...	২০৬ ” ”
৬। হুহান্,	২ ...	২২০ খৃঃ অঙ্গ
৭। ছিন্,	১৫ ...	২৬৫ ” ”
৮। সাং,	৮ ...	৪২০ ” ”
৯। ছি,	৫ ...	৪৭৯ ” ”
১০। লিয়াং	৪ ...	৫০২ ” ”
১১। চিন্	৪ ...	৫৭৭ ” ”
১২। সুই	৩ ...	৫৮১ ” ”
১৩। টোয়াং	২০ ...	৬১৮ ” ”
১৪। হুলিয়াং,	২ ...	৯০৭ ” ”

১৫। হুটাং,	...	৪ ...	৯২৩ ” ”
১৬। হুহিন্,	...	২ ...	৯৩৬ ” ”
১৭। হুহান্,	...	২ ...	৯৪৭ ” ”
১৮। হুচু,	...	৩ ...	৯৫১ ” ”
১৯। সাং,	...	১৮ ...	৯৬০ ” ”
২০। ইয়েন্,	...	৯ ...	১২৮০ ” ”
২১। মিং,	...	১৬ ...	১৩৬৮ ” ”
২২। ছিং	১৬৪৫ ” ”

শেষোক্ত বংশের ৯ম ভূপতি এক্ষণে রাজত্ব করিতেছেন।
নিম্নে শেষোক্ত ছই রাজবংশের প্রত্যেক সম্রাটের নাম, সিংহাসনারোহণকাল ও রাজত্বকাল লিখিত হইল।

মিং বংশ।

সম্রাটগণের নাম	সিংহাসনারোহণ কাল	রাজত্বকাল
হাং হো,	...	১৩৬৮ ... ৩০ বৎসর
কিয়েং বাং	...	১৩৯৮ ... ৫ ”
ইয়াং লু,	...	১৪০৩ ... ২২ ”
হাং হু,	...	১৪২৫ ... ১ ”
সিনেং টি,	...	১৪২৬ ... ১০ ”
চিং টাং,	...	১৪৩৬ ... ২১ ”
কিং টাই,	...	১৪৫৭ ... ৮ ”
চিং হোয়া,	...	১৪৬৫ ... ২৩ ”
হাং চি,	...	১৪৮৮ ... ১৮ ”
চিং টি,	...	১৫০৬ ... ১৬ ”
কিয়াং ছিং,	...	১৫২২ ... ৪৫ ”
লুং কিং	...	১৫৬৭ ... ৬ ”
জং লি,	...	১৫৭৩ ... ৪৭ ”
তৈ চাং,	...	১৬২০ ... ১ ”
টিয়েং কি,	...	১৬২১ ... ৭ ”
ছাং চিং	...	১৬২৮ ... ১৬ ”

ছিং বংশ।

সাং চি,	...	১৬৪৪ ... ১৭ ”
কাং হি,	...	১৬৬১ ... ৬১ ”
ইয়াং চিং,	...	১৭২২ ... ১৪ ”
কিয়েং লুং	...	১৭৩৬ ... ৬০ ”
কিয়াং কিং	...	১৭৯৬ ... ২৫ ”
টাও কোয়াং	...	১৮২১ ... ২৯ ”
হিয়েং ফুং,	...	১৮৫১ ... ১০ ”
টুং চি,	...	১৮৬২ ... ১৩ ”
কোয়াং সু,	...	১৮৭৬ ”

প্রথম হুই বংশের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। দ্বিতীয়বংশীয় টেজু সম্রাটের রাজত্বকালে রাজত্বকালে অকস্মাৎ এক প্রকাণ্ড তুতবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। সম্রাট ধর্মপথাবলম্বী হইলে ঐ বৃক্ষ শুকাইয়া যায়।

চিউ বংশীয় ত্রয়োবিংশ সম্রাট লেং বং নৃপতির রাজত্বকালে ৫৫০ খৃঃ খৃষ্টাব্দে শাংটং প্রদেশের কারাকু নগরে মহাদার্শনিক, বিশ্ববিখ্যাত কনফুচি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাৎকালিক ব্রহ্ম-সঙ্ঘল চীনের ধর্মমত সকল ধ্বংস করিয়া নিজ বিশুদ্ধ ধর্মমত ও রাজনীতি সকল প্রবর্তিত করিলেন। কনফুচি, পূর্বতম চীন মনীষী ফোহি, ভেং ভাং প্রভৃতি প্রাণীত ধর্মগ্রন্থ সকলের বিশুদ্ধ টীকাসহ সংকলন এবং অনেক নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। ঠিক এই সময়েই প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস পশ্চিম দেশে যশোলাভ করিতেছিলেন। [কনফুচি দেখ।]

এই বংশীয় পরবর্তী সম্রাটগণের রাজত্বকালে চীন বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সকল রাজ্যের নৃপতিগণ পরস্পর বুদ্ধ বিগ্রহাদিতে সর্বদা ব্যাপৃত থাকায় রাজ্য অতিশয় হীনবল হইয়াছিল। এই বংশের ষাট্রিশ সম্রাট হীনভ্যাং যখন চীনে রাজত্ব করেন, তখন ৩২৭ খৃঃ অব্দে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। হিন্দু নামক চতুর্থবংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে সিহোয়াংটি বা চিং নামক চতুর্থ সম্রাটই সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। ২১৩ খৃঃ অব্দে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া সমস্ত চীনদেশের একাধিপতি হন। উত্তরভাগে তাভারদিগের দৌরাষ্ট্র্য নিবারণার্থ ইনিই বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেন।



(এই প্রাচীর পৃথিবীর সাতটি আন্তর্ভেদ্য মধ্যে একটি।)

পরিশেষে দিখিজয়ে মহা গর্জিত হইয়া তিনিই চীনের প্রথম-দীপ্তর, পরবর্তী লোকদিগের এই বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত

তিনি কবি ও শিল্পবিষয়ক ব্যতীত অসংখ্য সমস্ত গ্রন্থাদি তত্ত্ব-ভূত করিবার অল্পমতি যেন, এবং তাৎকালিক অনেক পণ্ডিতের প্রাণবধ করেন। এই জন্মই চীনের প্রাচীন ইতিহাস সমস্ত জানা যায় নাই।

হান নামক পঞ্চমবংশীয় অষ্টাদশ সম্রাট চাংটির নিকট ৮৮ খৃঃ অব্দে পার্শ্বীয়গণ কোন কার্যোপলক্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। এই বংশীয় বড়-বিংশ সম্রাট হোপ্টীর রাজত্ব-কালে তাঁহার নিকট বাণিজ্যকরণার্থ ১৬৬ খৃঃ অব্দে রোম রাজ্যের ৬ষ্ঠ সম্রাট মার্কাস অবিনিয়ন্ কতিপয় রোমীয় সম্রাৎ পুরুষকে প্রেরণ করেন। সেই অবধি চীনের সহিত রোমের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। বর্ত, সপ্তম ও অষ্টমবংশীয় সম্রাটগণের রাজ্যকালে সমস্ত চীনদেশ যুদ্ধ বিগ্রহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। ৪১৬ খৃঃ অব্দে চীনরাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। হোনান নগর উত্তরভাগের এবং নাকিন্ নগর দক্ষিণভাগের রাজধানী হইয়াছিল।

৪৮২ খৃঃ অব্দে নবমবংশীয় ২য় সম্রাট তুটির রাজত্বকালে ফান্সিন্ নামক একজন নাস্তিক দার্শনিক চীনে জন্মগ্রহণ করেন। দশমবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালে সংগ্রামাদি দ্বারা চীনেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। একাদশবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালে চীনদেশে অশান্তির উদয় হয়। ইহারা সাতিশর বিতোৎসাহী ও প্রজারঞ্জন ছিলেন। এই বংশোদ্ভব ২য় সম্রাট ভিটি নিরম করেন যে, রাজনীযোগে কোন ব্যক্তি অকারণ রাজপথে ভ্রমণ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত অসংখ্য প্রহরী এক ঘটিকা রাতি হইলে তেরী বাজাইয়া লোক সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেয়। এই নিরম অভ্যাসিও চলিয়া আসিতেছে। ত্রয়োদশবংশীয় ২য় সম্রাট টেহং চীন দেশে বিস্তার সমধিক উন্নতি করেন। তিনি রাজত্ববনেই এক উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান্য স্থাপন করিয়া প্রায় আটহাজার ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান করেন। ইহার মহিষীও বিদ্বম্বী ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী জীলোকদিগের কর্তব্য বিষয়ে একখানি জ্ঞান্য পুস্তক রচনা করিয়া যান। এই টেহং সম্রাটের রাজত্বকালেই নোষ্ঠোরিয়ান্ জীষ্টানগণ চীনে আগমন করেন। সম্রাট তাহাদিগকে ধর্মপ্রচার করিবার অল্পমতি ও গির্জা নির্মাণ জম্ম ভূমি দান করেন।

ইহার পর চীনরাজ্য বার বার তাভারদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং নানা বংশের হস্তগত হইলে অবশেষে ১১১৭ খৃঃ অব্দে কিন্তাতারগণ চীনের উত্তরভাগে রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের রাজত্বকালে ১২১২ খৃঃ অব্দে হুদাত মোগল সেনাপতি জঙ্গিস্ খাঁ চীন আক্রমণ করেন।

জকিস্ বা চীনের বহু নগর জয় করিয়া গতাহ হইলে তৎপর-বর্তী মোগল সেনাপতিগণ অনেক যুদ্ধের পর কিন্দিগকে বিতারিত করিয়া উত্তরভাগ অধিকার করিলেন। চীন সম্রাট দক্ষিণভাগে নাঙ্কিন্ নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে মোগলদিগের সহিত চীনসম্রাটের বিরোধ উপস্থিত হইলে চীনে পুনরায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। উত্তর পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল, অবশেষে পিয়েন্ নামক জনৈক মোগলবীর চীনদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলে, চীন সম্রাটের শেষ উত্তরাধিকারী নবম-বর্ষীয় যুবরাজ, অমাত্য, মান্দারিন্ ও অন্যান্য লক্ষ্যবিক্রমিত ব্যক্তি সহিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে ১২৮০ খৃঃ অব্দে চীনরাজবংশ শেষ হইলে হপিলো ইয়েন্ নামক মোগলরাজবংশ স্থাপন করেন। হপিলো তখন পর্যন্ত চীনদিগের অজ্ঞাত হোয়াংহো নদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিয়া ঐ প্রদেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করান। তন্নিমিত্ত তিনি গণিত, সাহিত্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের বিস্তর উন্নতি করেন। বাণিজ্য কার্যের সুবিধার জন্ত ইনি এক সুবৃহৎ খাল খনন করান। ঐ খাল অজ্ঞাপি বর্তমান আছে। এই বংশীয় শেষ নৃপতি সাণ্টিকেচু নামক জনৈক চীন-বীরপুরুষ পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া হং তু উপাধি গ্রহণপূর্বক মিং নামক একবিংশবংশ স্থাপন করিলেন। এই বংশীয় নবম সম্রাট হাংচির রাজত্বকালে ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে নাবিকাগ্রগণ্য ভাঙ্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেঠন পূর্বক ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হন। এই সময় হইতেই যুরোপীয় জাহাজ সকল চীনে বাতায়াত আরম্ভ করে। দশম সম্রাট চিংটির রাজত্বকালে গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা লপেজ-ডি সল্লা ১৫১৭ খৃঃ অব্দে টমাস্ পেরেরাকে দূত স্বরূপ চীনে প্রেরণ করেন। টমাস্ পেরেরা কারাবদ্ধ হইয়া পিকিনে প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে লপেজ নানা কৌশলে চীনের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চীনদিগকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করাতে তাহার পর্তুগীজদিগকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিল। অবশেষে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে ১১শ সম্রাট কিয়াছিঙ্গের রাজত্বকালে পর্তুগীজগণ চাংটিদৌ নামক জলদস্যুকে বিনষ্ট করিয়া চীনের নিকট মেকেরো দ্বীপ প্রাপ্ত হইল। অজ্ঞাপি উহা পর্তুগীজদিগের অধিকারে আছে। এই বংশীয় ত্রয়োদশ সম্রাট তং-লির রাজত্বকালে ওলন্দাজগণ প্রথম মেকেরাতে পদার্পণ করে। ষোড়শ সম্রাট ছিং চিং এই বংশের শেষ নৃপতি। ইহার রাজত্বকালেই কাপ্তেন ওরেডেল্ নামক জনৈক ব্রিটিশ পোতাধ্যক্ষ চীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজদিগের সহিত চীনের বাণিজ্যের

সুত্রপাত করেন। অবশেষে বিদ্রোহী সেনাপতিগণ লি ও চাং অতিশয় পরাজিত হইয়া উঠিলেন, সম্রাট উপায়াত্তর না দেখিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইবার আশঙ্কার রাজ্ঞী ও ছহিতার সহিত আত্মহত্যা করিলেন। প্রধান বিদ্রোহী লি সম্রাটের ছই পুত্র ও অমাত্যবর্গের মস্তকচ্ছেদন করিয়া রাজ্যাধিকার করিলেন। উক্তাজে নামক চীনরাজবংশীয় এক সাহসী সেনাপতি লির অধীনতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন, এবং মাঝুতাতারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাতাররাজ ছংটি তৎক্ষণাৎ অষ্ট সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। লি ইহা শুনিয়া পিকিন্ লুঠন করত প্রচুর ঐশ্বর্য্য অপহরণ পূর্বক পলায়ন করিলেন। তাতার-রাজ কালগ্রস্ত হইলে তাঁহার পুত্র সাংচি সাধারণ সম্মতিক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ছিন্ নামক ষাৰ্ব্বিশতিতম বংশ স্থাপন করিলেন। অজ্ঞাপি এই বংশ রাজত্ব করিতেছে। সাং চি উক্তাজেকে সেলি প্রদেশের অধীশ্বর করিলেন, কিন্তু তাহাতে উক্তাজের তাতারদিগকে আস্থান জন্ত অহুতাপ দূর হইল না। তিনি সৰ্ব্বদাই বলিতেন “শুগালদিগকে দূরীকরণার্থ সিংহসমূহ আহ্বান করিয়া কি কুকর্ম্মই করিলাম!” তিনি ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে একবার মাঝুদিগের বিপক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু প্রতারণিত হইয়া অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র হং হোয়া তাতারদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া একরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আত্মহত্যা দ্বারা লীলা সংবরণ করিলেন, ক্রমে তাহারে অজ্ঞাত বিদ্রোহ দমন করিয়া চীনে সুদৃঢ় হইল। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে চীনের ১৮ প্রদেশেই সম্পূর্ণরূপে তাতারদিগের বশীভূত হইয়া নিরুপদ্রব হইল। সাকির উত্তরাধিকারী কাজি অত্যন্ত বিদ্রোহসাহী ছিলেন। তিনি প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের অত্যন্ত আত্মকুল্য করেন, কিন্তু শেষে উহার যথেষ্ট বিরোধী হন। তাঁহার পুত্র যকিং জেসুটদিগকে কান্টনে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এবং তথা হইতে তাহাদিগকে ১৭৩২ খৃঃ অব্দে মেকেরোদ্বীপে তাড়িত করেন।

১৭২৮ খৃঃ অব্দে ফরাসি পোতাধ্যক্ষ ভেলেয়ার প্রথম কান্টনে উত্তীর্ণ হন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে চীনের উত্তর প্রদেশে এক ভীষণ ভূমিকম্প ঘটয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ করে।

যজিঙ্গের পুত্র কিয়েন্লিং সম্রাটের রাজত্বকালে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডবিশ্বর চীনসম্রাটের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া চীনের সহিত বাণিজ্য প্রচলন করিবার নিমিত্ত লর্ড মেকার্টনিকে বহুলোক সমভিব্যাহারে দূত স্বরূপ প্রেরণ

করেন। তিনি তথ্য উপস্থিত হইয়া বিশেষ কিছু অবিধা করিতে পারেন নাই। কিয়ন্ লিং সম্রাট অতীব বিদ্বান জ্ঞানী, নিম্নলিখিত স্বভাব ও পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮০০ খৃঃ অব্দে তাহারেরা চীন আক্রমণ করে কিন্তু তাঁহার পুত্র সম্রাট কার্যকিং কর্তৃক পরাজিত ও ত্রাণিত হয়। ইনি মিশনারিদিগকে রাজধানীর ত্রিশ ক্রোশ দূরে বাস করিতে আদেশ করেন। কথিত আছে এই সময়ে কয়েক সহস্র বালক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। ১৮০৫ অব্দে সেচুয়েন্ প্রদেশে অনূন ৬৪টা মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পুনরায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই সময়ে সর্জর্জ ষ্টাটন, কার্টনস্থ ইংরেজদিগের কুঠির চিকিৎসক পিয়ার্সন সাহেবের সাহায্যে চীনে গো বীজের টাকা দিবার প্রথা প্রচলিত করেন।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের জনৈক নাবিক লণ্ডনস্থিত দ্বারা একজন চীনার প্রাণবধ করেন। ইহা লইয়া কার্টনস্থ ইংরেজদিগের সহিত চীনের বিবাদ হয়। কালক্রমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু ইংরাজের উপর চীনাগিরের বিষয় বন্ধনুল হইল। কার্যকিং স্বদেশের প্রচলিত আচার ব্যবহারাদি অনেক সংশোধন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র টৌকুয়াং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যুরোপীয় যন্ত্র ও শিল্পকর্মাদি চীনে প্রচার করিলেন। এ পর্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি চীনের সহিত সমস্ত বাণিজ্যের একাধিপত্য করিতেছিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট হইতে এক রাজাজ্ঞা উপস্থিত হইল যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিবেন না; কেবল চীন-নিবাসী ইংরাজদিগের দ্বারাই উহা নিষ্পন্ন হইবে।

টৌকুয়াং সম্রাট অহিফেণ সেবনে প্রজাদিগের বুদ্ধি ও ধনক্ষয় দেখিয়া আদেশ দেন যে, চীনে আর অহিফেণ আনীত হইবে না। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লিন্ নামে সম্রাটের জনৈক কমিশনার কার্টনে উপস্থিত হইয়া যেখানে যত অহিফেণ ছিল সমস্ত বিনষ্ট করিলেন, এবং পর বৎসর সম্রাটের আদেশে ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংলও হইতে বহুসংখ্যক রণতরী চীনে প্রেরিত হইল। চীন রাজমন্ত্রী ভীত হইয়া কার্টনে ইংরাজদিগের সহিত এই নিয়মানুসারে সন্ধি করিলেন যে, হংকং দ্বীপ ও যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৬০ লক্ষ ডালর তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে, বাণিজ্য অবোধে চলিতে থাকিবে। সম্রাট এই সংবাদ পাইলে মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিলেন। সন্ধিও অগ্রাহ হইল। ইংরাজেরা ইহা শুনিয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল,

অবশেষে চীনাগণ ৬০ লক্ষ ডালর প্রদানে সম্মত হইল ও বাণিজ্য চলিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজ রণতরী আমর, কুজান দ্বীপ, শিংপো, চাপু প্রভৃতি অধিকার করাতে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইংরেজেরা ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতে প্রবেশ করিয়া বহুলোক নিহত ও উমাং, সাংসে, মিন্-কিয়াং অধিকার করিল। এপ্রিল মাসের অষ্টম দিবসে তাহারা নাঙ্কিন্ নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করাতে সম্রাট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ঐ মাসের ২৯শে তারিখে এই নিয়মে এক সন্ধি হইল যে ইংরাজদের সহিত আর বিবাদ নাই হইয়া বন্ধন স্থাপিত হইবে, সম্রাট আগামী চারি বৎসরের মধ্যে একবিংশতি লক্ষ ডালর প্রদান করিবেন, কার্টন, আমর, ফুচু, শিংপো ও সাংসে বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারিবে, এবং হংকং দ্বীপ ইংলও দ্বীপ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদত্ত হইবে। তদন্তর ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে জুন মাসে ইংরাজেরা হংকং দ্বীপ অধিকার করিল।

নাঙ্কিনের এই সন্ধির সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমেরিকা ও যুরোপের বণিকমণ্ডলীর দৃষ্টি চীনের উপর পড়িল। ইউ-নাইটেড্ স্টেটস্, ফ্রান্স, হলণ্ড, প্রুসিয়া, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি রাজ্য হইতে দূতগণ চীনে প্রেরিত হইয়া বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া গেল। সেই অবধি চীনের সমস্ত বন্দরে, বিশেষতঃ কার্টন ও সাংসে নগরদ্বয়ে নিষিদ্ধ বাণিজ্য চলিতেছে।

টৌকুয়াং সম্রাট ১৮৫০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র হীং ফু সম্রাট হইলেন। ইনি অবিবেচক, হীনবুদ্ধি ও নীচপ্রকৃতি ছিলেন। ইনি পিতৃ-নিযুক্ত জ্ঞানী, উন্নত কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীন মতাবলম্বী মান্দারিন্ নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যে কোন প্রকার নূতন প্রথা প্রচলন নিষিদ্ধ হইল, মান্দারিনগণ বিদেশীয়দিগের বিশেষতঃ ইংরাজদিগের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিতে যত্নশীল হইলেন।

চীনগণ মাফু-তাতারদিগের শাসনে থাকিতে পূর্ব হইতেই অসন্তুষ্ট ছিল, এক্ষণে সম্রাটের এই সকল ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজ্যের নানাহানে বিদ্রোহ চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিদ্রোহীগণ ক্রমেই বলশালী হইয়া অনেকা-নেক নগর অধিকার করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। ইংরাজেরা কার্টন অধিকার করিয়া পিকিন্ আক্রমণের ভয় দেখাইলে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ২৬শে জুলাই মাসে টাংহিনে এক সন্ধি স্থির হইল। সন্ধির প্রধান শর্তগুলি এইরূপ—১ম, বাণিজ্যের নিমিত্ত নূতন বন্দর সকল উন্মুক্ত থাকিবে; ২য়, খ্রীষ্টধর্ম নিষিদ্ধ উপাসিত ও চীনা-খ্রীষ্টানগণ সুরক্ষিত হইবে; ৩য়, একজন

বৃটিস কর্তারী রাজ-প্রতিনিধি রূপে শিকিনে বাস করিবেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে চীনগণ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ইংরাজগণ ফরাসিদিগের সহিত মিলিত হইয়া চীনের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে শিকিনে সন্ধি হইল যে, বিদেশীয় বণিকগণ যথেষ্টাঙ্গমে চীনের নগর সকলে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন, এবং চীনগণও যথেষ্টা বিদেশে গমনাগমন করিতে পারিবে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ হাং ফু' গতাত্ম হইলে তাঁহার পুত্র টুং-ছি রাজপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু যুবরাজ বালক থাকায় তাঁহার খুন্সিতাত কং রাজকাৰ্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে বিদ্রোহীগণ নাকিন্ নগরে একত্র হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। সম্রাটের সেনাপতি ছেং কোচান্ নাকিন্ অবরোধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিলেন। সেই অবধি বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে কোরাং সু নামক মাফু-ভাতারবংশীয় নবম ভূপতি চীনে রাজত্ব করিতেছেন। ইনি ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ১৫ আগষ্ট জন্মগ্রহণ ও ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১২ জানুয়ারি সিংহাসনারোহণ করেন।

উৎপন্ন দ্রব্য।—চীনের অতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল এবং কৃষিকার্য্যে অতিশয় যত্নবান। প্রজাবর্গকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য চীনসম্রাট্ স্বয়ং এক নির্দিষ্ট শুভদিনে স্বহস্তে লাঙ্গল চালনাঘারা সর্ব্বাঙ্গে ভূমি কর্ষণ করেন। ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত শস্যই চীনে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণভাগে অধিক পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, ইহাই চীনবাসীর প্রধান খাদ্য। এসিয়া ও যুরোপের প্রায় সমস্ত ফলই চীনে উৎপন্ন হয়। আম, আতা, পিরারা, দাড়িম, জলপাই, পিচ, তুঁত, কমলালেবু, আধরোট, ডুম্বর ও পিষ্টককল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পৰ্ব্বতীজগণ চীন হইতেই যুরোপে প্রথম কমলালেবু লইয়া যায়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লেবু পাওয়া যায়। এক প্রকার ক্ষুদ্র লেবুগাছ অতি সুন্দর, চীনেরা উহা টবে করিয়া ঘর সাজায়। চীনে হলুদে রঙের এক প্রকার কাঁড় জন্মে; চীনেরা উহার ধোঁসা সমেত ভক্ষণ করে। মিচু প্রভৃতি কএকটা চীনা-কল ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইতেছে। চীনে ত্রাণাকলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এসিয়া ও যুরোপের দাবতীয় শাকসব্বী কতীত চীনে আরও নানাবিধ নুতন নুতন শাক মূলদি পাওয়া যায়। কপি, বীটপালঙ, চীনা-পিটসে, হরিজা, বিবিধপ্রকার আলু, পলাতু, রজন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথাকার মানকচু ৩৫ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।

বৃক্ষ সকলের মধ্যে চুকে ডুম্বরবৃক্ষ সঙ্গত। ইহার বসন্তে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হয়। এখানকার বাণিসম্বন্ধের নিবাসে বাকিল প্রস্তুত হয়। চীনেরা ইহাকে 'সিচু' বৃক্ষ কহে। এখানকার এক প্রকার কাঠ নৌহ সঙ্গত কঠিন ও পুরু। 'নানসু' নামক কাঠ অতি দীর্ঘকালস্থায়ী, রাজতবসের কড়ি, বরগা, ছায়াদি এই কাঠে নিৰ্ম্মিত হয়, গোলাপী সুগন্ধবিশিষ্ট একরূপ সুন্দর কাঠে শৌখীন গৃহসামগ্রী প্রস্তুত হয়। চীনদেশের কর্পূরবৃক্ষ সুবিখ্যাত। ইহার উচ্চতা শত হস্তেরও অধিক এবং শুড়ির পরিধি এত বড় হয় যে ২০ জন ব্যক্তিও ইহার মূলদেশ বেঠন করিতে পারেনা। চীনেরা এই বৃক্ষ হইতে কর্পূর প্রস্তুত করে। [কর্পূর দেখ।] এখানকার বাঁশ নারিকেল গাছের মত মোটা হয়। চীনেরা পাণ খায়, পাণ সেখানেই জন্মে। তামাকও বিস্তর উৎপন্ন হয়। এখানে নানাবিধ সুগন্ধি ও সুন্দর পুষ্প পাওয়া যায় তন্মধ্যে "উটফু" নামক পুষ্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উলান্, লামু, চাহো, মোলীন, হেটাং ও মুটান্ প্রভৃতি আরও অনেক পুষ্পবৃক্ষ আছে। এখানে নানারূপ পদ্মফুল হয়। চীনেরা অতিশয় ফুল ভালবাসে। চা-বৃক্ষ চীনের প্রধান উদ্ভিদ। চীনে কি সমস্তল কি পার্শ্বভূমি সর্ব্বত্রই চা জন্মে। চা এদেশের প্রধান পণ্য দ্রব্য। [চা-র বিস্তৃত বিবরণ চা শব্দে দেখ।]

চীনে বহুবিধ ওষধি জন্মে। রেউচিনি, চীনাটিহোপং, গিলোং, কাসিয়া নামে দারুচিনি, সন্টসি, কোলিন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। চীনের পুদিনা অতি উৎকৃষ্ট। চীনে কার্পাস বৃক্ষ সুন্দর জন্মে। ইকুও বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার শুড়, চিনি ইত্যাদি ভারতবর্ষ ও যুরোপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

শণ, পাট প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে একপ্রকার বৃহৎ শণ গাছ জন্মে, উহা প্রায় ১০।১৫ ফিট লম্বা হইয়া থাকে।

কাটন নগরের নিকট একরূপ শণ হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ বস্ত্র যুরোপে বিস্তর রপ্তানী হয়। যুরোপে ইহাকে চীনাঘাসের কাগড় (China-grass-cloth) কহে। জলাভূমিতে নাগরমুখার চাস হইয়া থাকে। জুলাই মাসে তাহা কাটিয়া মাছর প্রস্তুত করে।

অধিবাসী।—চীনদেশবাসীগণ শারীরিক বলে ও সৌন্দর্য্যে এসিয়ার অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কাটন নগরের কুলিগণ অতিশয় সুগঠিত ও বলবান। মঙ্গোলীয় শাখা-ভুক্ত হইলেও চীনদিগের মুখাবয়ব মঙ্গোলীয়দিগের স্তায় কদাকার নহে, বরং অনেকটা চৌরঙ্গ হইয়া পিরাছে। চীন

পশের ক্ষীত ওষ্ঠ ও বিস্তৃত নাসারন্ধ্র, অনেকটা কাকিদিগের মত। আমেরিকার আদিমবাসীদিগের স্তায় ইহাদের কেশ বিরল, কৃষ্ণ ও উজ্জল। চীনদিগের গায়ে লোম নাই বলিলেই হয়। হস্ত, পদ, ও অঙ্গি সকল ক্ষুদ্রাতন। উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণাংশের চীনদিগের মুখশ্রী অপেক্ষাকৃত চৌরস অর্থাৎ অল্প চতুর্কোণ। ইহাদিগের বর্ণ শুভ্র। প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়স পর্যন্ত চীনদিগকে অতি সুন্দর দেখায়, পরে ক্রমে ক্রমে গওদেশে উচ্চ অস্থির বাহির হইয়া মুখকে চতুর্কোণ করিতে থাকে। চীনের বুড়া, বুড়ী সকলেই প্রায় দেখিতে ভীষণ কদাকার।

চীনগণ অধিকাংশই পরিশ্রমী, শাস্ত্রপ্রকৃতি ও সন্তুষ্ট-চিত্ত। চীনের সম্রাট যথেষ্টাচারী হইলেও তিনি প্রজাবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তিনি স্তায় ও দয়ার সহিতই তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন। ইহারা বাহিরে বিনয় ও শিষ্টাচার দ্বারা বশুতা দেখাইতে বড় মজবুত, কিন্তু অনেকেরই ঘোর মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। কাজেই ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সন্তাব থাকেনা। ইহারা শিষ্টাচার দেখাইয়া এরূপ মনের ভাব গোপন করিতে পারে যে, অনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখন কোন চীন তোমার মাথা কাটিতে পাইলে আর কিছু চায়না, তখনও সে তোমার সহিত এরূপ বন্ধুভাবে আলাপ করিবে যে, তুমি তাহার মনের ভাব বিদ্বুৎসির্গও জানিতে পারিবেনা। ইহাদের কথোপকথনে অধিক মাত্রায় বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়। আদব কারদার এমনই আড়ম্বর যে অতি উচ্চতর স্বভাব গর্জিত ব্যক্তিও কথাবার্তায় আপনাকে ‘হীন আমি’ ‘মৃঢ় আমি’ ‘ইতর আমি’ ‘ক্ষুদ্রমতি আমি’ ইত্যাদি ভাবে সম্বোধন করে। পথের ভিখারীকেও ‘মহাশয়ের দর্শনে আমি ধন্য ও ভাগ্যবান হইলাম’ এই বলিয়া আপ্যায়িত করে।

ইহারা কোন কার্যোপলক্ষে আগমন করিলে প্রথমেই নানারূপ বাজে কথার অবতারণা করিয়া অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দেয়, শেষে যাবার কিছু পূর্বে ‘মহোদয়কে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বড় বিরক্ত করিলাম’ এইরূপ বহুভাষণপূর্ণ ভূমিকার পর যে জন্ত আসিয়াছিল ২৪টা মাত্র কথার তাহা শেষ করিয়া চলিয়া যায়। লৌকিকাচার এইরূপ হইলেও ইহাদের নীতিজ্ঞান বড়ই অল্প। অনেকেই ঘোর মিথ্যাবাদী। চীনেরা অতিশয় অহিকেন সেবন করে। মিঃ নোন্টন (Mr. Knowlton) অনুমান করেন চীনে সর্বশুদ্ধ ২৩,৫১,১১৫ জন গুলিখোর (opium-smoker) আছে অর্থাৎ প্রতি ২৭০ জনে ১ জন গুলিখোর।

শান্তির সময়ে সাধারণতঃ ইহারা আপনা হইতেই রাজ্যে হস্তক্ষেপ রক্ষা করে। কিন্তু বুদ্ধিগ্ৰাহাদির সময়ে কিম্বা অত্যাচার প্রতীড়িত হইলে ইহারা উন্নতবৎ হইয়া উঠে, তখন নরহত্যা, শোণিতপাত, লুণ্ঠন প্রকৃতি কোন প্রকার ভীষণ ও নির্দয় কার্যেই ইহারা পশ্চাৎ পদ হয় না। যখন যে বিয়র লইয়া থাকে, তদনুসারে ইহারা কখন দয়ালু, কখন নিষ্ঠুর, কখন নিরীহ, কখন বা ভীষণ প্রকৃতি হয়। কিন্তু যখন চীনবাসী নিজ শাস্তিময় গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে নিজ কার্য করে, তখন ইহাদিগের স্তায় নিরীহ ও হস্তক্ষেপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

ইহারা কৃষি, মিস্ত্রী, মজুরি ও মাঝিগিরিতে বিলক্ষণ পটু। যে পরিমাণ বুদ্ধি, যত্ন ও সহিষ্ণুতা থাকিলে উৎকৃষ্ট কারিগর হওয়া যায় ইহাদের তাহা আছে। কলিকাতার চীন-মিস্ত্রী ও চীনমুচি বিখ্যাত। সম্রাটের ইহারা দেশীয় কারিগরগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, এবং গবর্নেন্ট কর্তৃক অধিক আদৃত। ইহারা নব্র, ধীর, মিতাচারী, পরিশ্রমী, নিঃস্বার্থপর, কষ্ট-সহিষ্ণু এবং কতক পরিমাণে শাস্তি-প্রিয়। ইহারা কি নীত কি গ্রীষ্মপ্রধান সকল দেশেই বাইরা বাস করে। রীতিমত শিক্ষা, অর্থ-সাহায্য ও উৎসাহ পাইলে চীনেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কারিগর হইয়া দাঁড়ায়।

কষ্টে পড়িলে ইহারা অনায়াসে অপত্যান্নেহষকন ছিন্ন করিয়া ফেলে। এরূপ সময় নিরাশ্রয় বালিকারাই হত কিম্বা পরিত্যক্ত হয়। চীনদেশে বুদ্ধ, ধর্ম, অন্ধ, কুষ্ঠব্যাদি-গ্রস্ত প্রভৃতির নিমিত্ত দাতব্যাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হয়।

চীনদিগের আমোদ প্রমোদের জন্ত রজ্যলয়ে নাট্যাভিনয়, বাজিপোড়ান, পুতুলনাচ, ভেক্তিবাজী, কুস্তিবাজী, বাচখেলা, পক্ষী-লড়াই, কড়িঙ-লড়াই প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহারা সুন্দর পক্ষী অতিশয় ভালবাসে। কিন্তু স্বভাবতঃ ইহারা গম্ভীর প্রকৃতি, আমোদ প্রমোদে অধিক কাল কাটাইতে ভালবাসেনা।

বেশভূবা।—চীনে সকল শ্রেণীর লোকেই প্রায় একরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। সম্রাটগণ সম্মানসূচক চিহ্নরূপ কতকগুলি অলঙ্কার ধারণ করেন, অপরে উহা ব্যবহার করিলে দণ্ডিত হয়। ইহাদের অলঙ্কারা অতিশয় লম্বা ও আলংগা এবং ৪৫টা বোতাম দ্বারা বদ্ধ থাকে। ইহারা কোমরে একটি দীর্ঘ কটিবন্ধ পরিধান করে। ঐ কটিবন্ধে একটি ছুরি ও দুইটা কাটা কুলান থাকে, তদ্বারা উহারা আহার করে। ইহারা সাধারণতঃ নীল পরিচ্ছদ পরিধান

করে। পক্ষৌৎসবাদিতে কৃষ্ণ, ধূসর, হরিত, পীত, লোহিত ইত্যাদি বর্ণের বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। সম্রাট স্বয়ং পীত-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন।

রাজপরিবারগণ পীতবর্ণ কটিক ধারণ করেন। শোকা-দির সময় শুভ্রবেশ ধারণ করাই চীনের প্রথা। চীনগণ টুপি ব্যবহার করে। ইহারা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যভাগে একটা দীর্ঘ বেণী রাখে। এই বেণী ইহাদের অতিশয় আদর-গীয়। ইহা কৰ্ত্তন করিলে চীনগণ সাতিশয় অপমান বোধ করে। চীনদেশে বিংশবর্ষ অতিক্রম না করিলে কেহ রেসমের বস্ত্র ও টুপি পরিতে অমুমতি পায় না। চীনরমণীগণ অবশুষ্ঠন ব্যবহার করে না। ইহারা মস্তকে বেণী বন্ধন করে এবং তাহাতে স্বর্ণরৌপ্যনির্মিত নানাবিধ ফুল পরিয়া থাকে।



মানারিন পুরুষ।



মানারিন স্ত্রীলোক।

চীনেরা দীর্ঘ নখ রাখাকে সম্রাটবংশের চিহ্ন জ্ঞান করে, কেননা হীনবংশীয়দিগকে কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং নখ ভাঙ্গিয়া যায়। বাহার যেরূপ সজ্জন, তাহার নখও সেইরূপ দীর্ঘ। সম্রাটের নখই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক রীতি।—চীনে বহুবিবাহ প্রচ-লিত আছে। বিবাহিতা রমণীগণ এমন কি প্রথমপত্নীও

স্বামীর সংসারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না; তবে পুত্রবতীদিগের বিশেষ ক্রমজ্ঞা আছে। পুত্র যত বড়ই হউক না তাহার উপর সাতার ক্রমজ্ঞা অসীম। এই কারণেই চীন-রমণীগণ কথঞ্চিৎ সপত্নী-নিগ্রহ সহ করিতে পারে। রাজাজ্ঞার ধনী লোক ও বণিকদিগকে নিজ নিজ দাস দাসীর বিবাহ দিতে হয়। জরী গর্ভাবস্থায় ও শিশুর স্তন্য পান কালে ক্রীসঙ্কম একান্ত নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকে দারাস্তর পরিগ্রহ করে। ধনীগণ বিশেষরূপে ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রধানা সম্রাজ্ঞী ব্যতীত আরও অনেক রাজমহিষী আছেন। প্রত্যেক মহিষীরই ভিন্ন ভিন্ন গৃহ, দাস, দাসী ও অস্ত্রান্ত আবশ্যকীয় আসবাব আছে। এই সকল রাজমহিষীদিগের জন্ত ১৮৭৭ সালের কিন্-ভি-চিনের রাজকীয় বাসনের কারখানা হইতে প্রায় ১১,৮৩৮টা চীনা-বাসনের মৎস্তাধার, ফুলদানি, এবং বহুচিত্র বিচিত্র উৎকৃষ্ট পাত্র প্রেরিত হয়। বাহা হউক সপত্নী-বস্ত্রগা-ভরে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া উহার হাত এড়াইয়া থাকে।

চীনে জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে সন্তানগণের বিবাহ দিয়া থাকে। অভিভাবক কিম্বা আত্মীয় স্বজনেরাই কন্যা নির্বাচন করে। বিবাহের পূর্বে বর কন্যাকে দেখিতে পায় না। বিবাহের দিন দিবাভাগেও মশাল জালিয়া বাস্তভাওসহ মহা আড়-ম্বরে কন্যাকে পাকী করিয়া বরের বাড়ী পাঠান হয়। তৎ-পরে তথায় যথারীতি বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। কন্যা স্বস্তর শাওড়ীকে অভিবাধন করে এবং নবদম্পতি ঈশ্বরোপাসনা করিলে রমণীগণ কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। দাম্পত্য-প্রণয়ের আদর্শ স্বরূপ বিবাহে চক্রবাকমিথুন আনীত হয়। বিবাহের পর অন্তঃপুরে রমণীগণ ও বাহিরে পুরুষগণ আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে, পরে খুব ধুমধামের সহিত আহাঙ্গাদি সম্পন্ন হয়।

বিবাহের প্রণালী রাজনিয়মের অন্তর্গত। কন্যা ১৪ বর্ষ বয়স্ক না হইলে বিবাহ করিতে পারে না। স্বগোত্রে কিম্বা নিত্যন্ত অন্তরঙ্গ মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। নট, কোটাল, নাবিক, দাস প্রভৃতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করে। চীনে বিধবা বিবাহ সম্মানকর নহে। কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। বিবাহকালে অনেক স্থলে কন্যার পিতা বরের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করে। পূর্বে বলিয়াছি বর বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখিতে পায় না, সুতরাং অনেক সময় এমন ঘটে যে, কন্যা বরের আলয়ে আসিলে তাহার পছন্দ হয় না। তখন কন্যা বিমুখী হইয়া কিরিয়া যায়। কিন্তু এরূপস্থলে বরকে বৃথা অনেক ব্যয় ভার বহন করিতে হয়।

চীনের অবরোধ প্রথা এদেশের অপেক্ষাও অধিক। সেখানে রমণীরা অন্তঃপুরের বাহির হইতে পার না। আত্মীয় গুরুজনেরও হঠাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই।

পদবর অতিশয় ক্ষুদ্র হওয়াই চীন-রমণীর প্রধান সৌন্দর্য-লক্ষণ। এই ক্ষুদ্র বাহুল্যকাল হইতেই পদবর ছোট করিতে তাহাদের বিশেষ চেষ্টা থাকে। পদবর রড় হওয়া তাহাদের মতে নীচবংশের চিহ্ন। চীন-রমণীগণের পদ স্বভাবতঃই অতি ক্ষুদ্র, তাহার উপর ৭৮ বৎসর বয়স হইতে নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে উহাদিগকে ক্ষুদ্রতর করা হয়। ঐ সময়ে মোটা বস্ত্রের কিতা দিয়া পারের আবুল, পাতা, গোড়ালি এরূপ আটরা বাঁধিয়া দেয় যে আর কোন মতেই বর্ধিত হইতে পার না। তাহার উপর আবার লোহ-পাত্ৰকা পরিধান করা হয়। সুতরাং পা ক্ষুদ্রই থাকিয়া যায়। এইরূপ পদ আমাদিগের দেশে অতি কদাকার বোধ হইতে পারে, কিন্তু চীনে বহুকাল হইতে ইহার গৌরব হইয়া আসিতেছে। পারের অতি ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরের স্তায় যেন পারের পাতা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষুদ্রপদেও চীন-রমণী অতি দ্রুত বাইতে পারে, পাছে পড়িয়া যায় এই ভয়ে তাহারা ময়াল গমনে হেলিতে ছলিতে যায়। চীন-দিগের অবরোধ প্রথা ও চীন-রমণীদিগের পদে পৌহপাত্ৰকা দেখিয়া কোন কবি বলেন যে, উহা লোহপাত্ৰকা নহে রমণী-দিগকে অন্তঃপুর-কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার শৃঙ্খল। যাহা হউক সম্রাতি লোকের ক্ষুদ্রপদের উপর দৃষ্টি কমিতেছে, অনেকে ইতিমধ্যেই আর পদ ক্ষুদ্র করিবার জন্ত অথবা যন্ত্রণা ভোগ করে না।

চীনে বহুসংখ্যক শিশুহত্যা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য হত শিশুদিগের অধিকাংশই নবজাতা বালিকা। চীনদেশে পিতাই সম্ভানদিগের হত্যাকর্তা, সুতরাং এইরূপ নৃশংস ব্যবহারের জন্ত রাজবাংসে দণ্ডিত হইতে হয় না। অতিশয় দারিদ্র্য জন্ত মহাকষ্টে পতিত হইলে যখন উহারা দেখে যে, বাঁচিয়া থাকিলে শিশুর জীবন কেবল কষ্টপূর্ণ হইবে মাত্র, তখন শীঘ্রই কষ্টের অবসান করিয়া দেন। যাহা হউক সমৃদ্ধ জনপদ সকলে এই প্রথা দৃষ্ট হয় না। ফুচু নগরের নিকটে একটা নদীর তীরে একখণ্ড প্রান্তরে লেখা আছে যে, ‘এখানে বালিকা ডুবাইরা মারিওনা।’ ইহাতে বোধ হয় চীনে বালিকা-বধ নিবারণিত হইতে এখনও দেরি আছে।

খাদ্য।—ভাত চীনদিগের প্রধান খাদ্য, গোলমালু, কপি, শিম, মূলা, বেগুন প্রভৃতির উৎকর্ষিত ব্যবহৃত হয়। ইহারা সচরাচর শূকর, ছাগ ও মেঘমাংস খায়, তজ্জির আখ,

হুহুর, বানর, বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতির মাংসও অখাদ্য নহে। তবে শূকরমাংসই অধিক প্রচলিত। চীনদিগের এই মাংস এতদূর প্রিয় যে, উহারা কথায় বলে ‘বিদ্যার্থী কখন বহি ছাড়ে না, এবং পরিব কখন শূকর ছাড়ে না।’

খাদ্যের বিষয়ে ইহাদের নিয়ম এই যে যাহা কিছু শরীর পোষণ করিতে পারে তাহাই ভক্ষ্য। বনীগণ একরূপ পক্ষি-নীড়*, সমুদ্র-শযুক, হাড়রের পাখনা, মাছের পেটা, গোন্ধের শিরা, মহিবচর্ম প্রভৃতি দুলভ উপাদানের খাদ্য সকল ভোজন করে। আর একরূপ উপাদানের খাদ্য কীটবিশেষের অণ্ডোদ্রুত শাবক দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহারা সকল প্রকার মাছ, কীকড়া ও কচ্ছপাদি ভক্ষণ করে। গোবধ সম্পূর্ণরূপে আইন বিরুদ্ধ। কেহ গাভী কিম্বা বলদ বধ করিলে প্রথমবার তাহার এক শত বেত্রাঘাত দণ্ড হয়। ২য় বার ঐ অপরাধে ১০০ বেত্রাঘাত ও ব্যবজীবন নির্কাসিত হয়। চীনেরা তণ্ডুলের মদ্যপান করে, তবে মাতাল নহে। আকিংএর চণ্ডু ইহাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রচলিত। ইহারা যুরোপীয়দিগের স্তায় চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কাঠের হাতা ও দুইটা কাটি দ্বারা আহার করে। চা-পান ব্যতীত অন্য সময়ে চামচ ব্যবহার করেনা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।—চীনেরা মৃত্যুকে অতিশয় ভয় করে। তাহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর মনুষ্য ক্ষুধার্ত ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া হাঙ্গা করিয়া বেড়ায়। এই মৃত্যুভয় নিবারণার্থ চীন-শাস্ত্রকারগণ মৃতব্যক্তিকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করিতে ও মৃত-দেহের মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে বিবিধ ক্রিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মৃত্যুর পর হঠাৎ কোথায় যাইব কি করিব ইত্যাদি চিন্তায় তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। পরকালে অনন্ত সুখের আশাও উহাদিগকে আশস্ত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে চীনে দাহপ্রথা চলিত থাকা সম্ভাবিত নহে। চীনে গোর দেওয়া প্রচলিত।

কোন চীন মরিলে তাহার জীবিতকালের সহস্রগুণ সম্ভান দেখান হয়। তাহাকে সর্বোৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সাধারণ্যায়ী মূল্যবান সুন্দর শব-সিন্দুক স্থাপন করে। ঐ সকল শব-সিন্দুক নানারূপ কারুকার্যবিশিষ্ট, উজ্জল রক্ত, পীত, নীলাদি বর্ণে চিত্রিত এবং বহুবল্য হইলে স্বর্ণ রৌপ্যাদি মণ্ডিত হইয়া থাকে। এক একজনের মূল্য দুই-হইতে তিন শত টাকা হইয়া থাকে। অনেকে জীবিতাবস্থাতেই

* এক জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী যুগ্মসংস্কৃত লাল দ্বারা প্রভবের উপর ক্ষুদ্র লাল নির্মাণ করে। ঐ পক্ষীর মাংস রন্ধন করিলে কোমল, পুষ্টিকর উপাদানের খাদ্য প্রস্তুত হয়।

নিজের অস্ত্র সিন্দুক ক্রয় করিয়া রাখে। যাহা হউক উহার মধ্যে তুলা, চুণ ও সমরে সমরে চা-পাতা দিয়া শবদেহ স্থাপিত হইলে ৩ হইতে ৭ দিবস পর্যন্ত গৃহে রাখা হয়। ইত্যবসরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কুটুম্বাদি সকলে খেতবর্ণ শোকসজ্জার সজ্জিত হইয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আইসে। গৃহাদিও ঐ সময় খেত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, খেতভূষাই উহাদিগের শোকচিহ্ন। আগন্ত কুটুম্বাদি কয়েক দিবস মৃতের বাটীতেই অবস্থান করে। সমাধির দিন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই শবের সঙ্গে গমন করে। সন্নিহিত পর্বতের উপত্যকাই সমাধিস্থানরূপে নির্ধারিত হয়। শব-সিন্দুক তথায় প্রোথিত কিম্বা মন্দিরাভ্যন্তরে নিহিত হয়। নগরাদির কিছু দূরে সমাধিস্থান উচ্চ বৃক্ষাদি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। শব সমাহিত হইলে চীনগণ প্রতিবর্ষে ঐ স্থানে আগমন করিয়া মৃতের উদ্দেশে প্রার্থাদি করিয়া থাকে। পরকালে মৃত ব্যক্তি গৃহ ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় চীনেরা কাগজ নির্মিত গৃহানাদি দাহ করে। তাহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ ভস্মীভূত গৃহানাদি পরকালে প্রকৃত হইয়া যায়। এইরূপে নগর টাকা হইবে ভাবিয়া সোণালি কাগজও পোড়াইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির মর্যাদামুসারে শোককাল সুদীর্ঘ হইতে থাকে। সম্রাট মৃত পিতামাতার জন্ত পূর্ণ তিন বৎসর শোক-চিহ্ন ধারণ করেন, সম্রাট চীনগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। মদ্যমাংসাদি বর্জন, খেতবস্ত্র পরিধান, উৎসবাদি ত্যাগ ইত্যাদি শোকচিহ্ন। রাজকর্মচারীগণ ঐ সময় রাজকার্যে বিরত হন, বিদ্যার্থীগণ পাঠাদি ত্যাগ করেন, সাধারণ লোকে কোন কর্ম করে না। পাছে যথোচিতরূপে মৃতের অস্ত্যষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, এই জন্ত প্রত্যেক নগরে সভা স্থাপিত আছে। কাহাকে কতক্ষণ কিরূপে কত মাত্রায় শোক প্রকাশ করিতে হইবে, সে সমস্তও ঐ সভায় নির্দিষ্ট হয়। বিদেশে কোন চীন মরিলে তাহার সম্মানগণ দেশে আনিয়া তাহাকে সমাহিত করে। অজ্ঞাথার ঘোর দুর্গম হয়। যাহা হউক, অনেক সময় শব সকল ফেলিয়া দেওয়া হয় মাত্র। নাকিং মগরের নিকট এইরূপ বিস্তর শব প্রক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। খ্রীষ্ট ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে পর্যন্ত চীনের সতীরমণী মৃতপতির অনুসরণ করিত। এ দেশের জ্ঞান তাহার অলস্ত চিত্তার ঝাঁপ দিত না; অনাহারে বা অহিফেন সেবন দ্বারা জীবন বিসর্জন করিত। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট ইয়ুন চাং এই প্রথা রহিত করিয়া দেন। কিন্তু এখনও বিধবা-রমণী পতির সমাধিস্থানে গিয়া তাঁহার কবরের উপর পাখার বাতাস দিয়া হৃদয়ের শোকবেগ প্রকাশ করে।



পতির সহগামিনী চীন-বিধবা।

ভাষা, সাহিত্য।—চীন ভাষার জ্ঞান প্রাচীন ভাষা জগতে দুর্লভ। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে চীনে যে ভাষায় কথোপকথন হইত, এখনও প্রায় সেই ভাষাতেই হইয়া থাকে। চীনদিগের বর্ণমালা চিত্রময়, ইহাদের ভাষা একমাত্রাবিশিষ্ট অর্থাৎ একটা শব্দে একটা বস্তু ও একটা ব্যঞ্জন মোট দুইটির অধিক বর্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং বর্ণমালা দ্বারা অতি অল্পসংখ্যক শব্দ হইতে পারে। সমগ্র চীন ভাষার মোট ৪৫০টা মাত্র শব্দ আছে। কিন্তু প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণভেদে নানারূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপে প্রায় ৪৩,৪৯৬ বিভিন্নার্থবোধক শব্দ হইয়াছে। এই সংখ্যার কতক শিখিলেই অধিকাংশ মনোভাব প্রকাশ করা যায়। খৃষ্টান মিসনরীদিগের চীন ভাষার বইবেলে মোট ৫০০০ শব্দ আছে মাত্র। ক্রমাগত পাঁচ বর্ষকাল অভ্যাস করিলে বিদেশী ব্যক্তি মোটামুটি চীন ভাষা শিখিতে পারে।

চীনের ভাষা ৪ প্রকার। ১ম কোরেন্ অর্থাৎ রাজভাষা। এই ভাষা এক্ষণে চলিত নাই, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি ইহাতেই লিখিত হইত। এই ভাষা অতি মধুর এবং ইহা দ্বারা সংক্ষেপে গুরুতর বিষয়ও বর্ণনা করা যায়। ২য় ওয়েচ্চাং—এই ভাষার বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রাদি লিখিত হয়। ৩য় হোয়ান্‌হোয়া—এই ভাষা বিচারালয়ে এবং শিক্ষিতমণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি এই ভাষা ১৮শ বিভাগেই প্রচলিত। তন্মধ্যে পিকিনের নিকট ইহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ। ৪র্থ হারাং টান্—ইহা পল্লীগামের ও নীচ লোকের ভাষা।

চীনদিগের বর্ণমালা ৬ প্রকার। ১ম কিয়াই-সু—ইহাই সর্বাধিক প্রচলিত। ২য় চুয়েন্‌ সু—ইহা চিত্রময় বর্ণমালায়ই অব্যবহিত পরবর্তী। ৩য় লে-সু রাজকার্যে ব্যবহৃত। ৪র্থ হিং-সু হাতের লেখায় ব্যবহৃত; তাড়াতাড়ি লিখিতে ইহাই

প্রশস্ত। এম চৌ-জি সংক্ষিপ্ত ও গীত্র লিখিত এবং কারবারে ব্যবহৃত হয়। ৬৪ শাং-টি—পুস্তক মুদ্রাক্ষেপে প্রচলিত। রাজকর্ম-প্রার্থী পরীক্ষাবিধিগের রচনা স্বকর কিয়াই-জু বর্ণমালা দ্বারা পরিপাট্যরূপে লিখিত হওয়া আবশ্যিক।

চীনেরা লেখা কাগজকে দেবতার স্মারক মাত্র করে। পাছে কেহ ছাপা বা লেখা কাগজের উপর পা দেয়, এই আশঙ্কায় বিহংসমাজ ঐসকল কাগজ সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করেন। সংগ্রহকারী ভায়ে জুইটা বাশের চুপড়ি লইয়া দ্বারে দ্বারে ‘সৌ-জুই-চু’ অর্থাৎ চোড়া কাগজ দাও বলিয়া বেড়ায়। উহা শুনিবামাত্র সকলে নিজ নিজ গৃহে চুপড়িতে সজ্জিত বাজে কাগজ আনিয়া ভানবাহকের চুপড়িতে ঢালিয়া দেয়। তৎপরে ঐ সমস্ত কাগজ দেবালয়ে পোড়াইয়া ভস্মশূলি কলসীতে করিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।



চীনের কাগজসংগ্রহকারী।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে বিস্তার সমধিক আদর হইয়া আসিতেছে। চীনসম্রাট দেশের সমস্ত বিদ্বান্গণের মধ্য হইতে পরীক্ষা করিয়া নিজ কর্মচারী সকল নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার রাজকীয় সাহিত্যসমিতি আছে।

পুস্তকাদির মধ্যে কনফুচি প্রণীত ৫ খানি গ্রন্থই অতি প্রাচীন ও সর্বত্র আদরপ্রিয়। কনফুচির পূর্বেও অনেক চীন-গ্রন্থকার পুস্তকাদি লিখিয়া যান। কনফুচি উহাদিগের পুস্তক সকল হইতে সকল ও উহাদিগের সমস্তার্থ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, ইত্যাদি সকল প্রকার পুস্তকই লিখিয়া যান। ধর্মের ক্ষুদ্র তব ব্যাখ্যাত্তই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। কনফুচির শিষ্যগণ তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন সমস্ত ‘শু’ নামে তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২১৩ খৃঃ পূঃ অব্দে সম্রাট চি-ওয়াং-টি ক্রি, স্থপতি ও আয়ুর্বেদ-বিষয়ক তিন দেশের অপর বাবতীর পুস্তকই পোড়া-

ইয়া কেনেন। তাঁহার পরে ৬৪ সম্রাট কিং টিও তৎপরে সম্রাট ‘ও-টি’ পুস্তক সমগ্রোহে ও রক্ষণে যত্নবান হন। শেষোক্ত সম্রাট ১২০ অধ্যায়ে ৪ ভাগে বিভক্ত এক প্রকাণ্ড ২০২৭ পৃঃ ধূঃ হইতে ১২২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত চীনের ইতিহাস প্রস্তুত করান।

১১০০ খৃঃ পূঃ অব্দে চৌকি নামে এক ব্যক্তি সর্ব প্রথম লু-লু নামক একখানি চীন ভাষার অভিধান প্রণয়ন করেন। অন্যাপি উহা চলিয়া আসিতেছে। সম্রাট কান্সি তাঁহার রাজত্বের প্রধান পণ্ডিতগণ দ্বারা সংকৃত ব্যাকরণের অল্পকরণে বিটিন নামক ৩২ খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান প্রস্তুত করেন।

চীনে কবিতার বিশেষ আদর আছে। পণ্ডিতগণ সর্ব-সাধারণের সুবিধার্থ সকল প্রকার নীতিই সরল কবিতায় রচনা করেন। ইহাদের মাটিকে বিশেষ একটা ঘটনা বা বিশেষ কোন রসের প্রাধান্য থাকে না। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অঙ্গিগে নিজ পরিচয় দিয়া অভিনয় আরম্ভ করে। একজনই ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করে।

চীন-ভাষার উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ একখানিও নাই। খুটান মিসনরীগণ ঐ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া কতক কৃতকার্য হইয়াছেন।

প্রাচীন চীনভাষায় ছন্দ চিহ্ন ব্যবহার ছিল না। এক্ষণে রাজকীয় পরীক্ষা প্রকৃতিতে লেখার সহিত ছন্দ ব্যবহার হয় না। তবে বোধসৌকর্যার্থ মিসনরীদিগের ও অন্তান্ত পুস্তকে ছন্দ ব্যবহার হইতেছে।

ধর্মপ্রণালী।—মৃত পিতৃপুরুষদিগের প্রতি বোধোচিত সম্মান-প্রদর্শন ও তাহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্চনা করাই চীনদিগের প্রধান ধর্ম। শিক্ষিত সম্রাটের কনফুচির মত অবলম্বন করিয়া থাকে। অমেকেই আবার বৌদ্ধ নাস্তিক। তৌইচি নামক আর এক সম্প্রদায় আছে, প্রথমে উহাদের মত উৎকৃষ্টই ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহার যাজকগণ ঐ ধর্মকে নানারূপে বিকৃত করিয়া জঘন্য পৌত্তলিকতার পরিণত করিয়াছে। অতঃ লোকে অনেকেই নানাবিধ দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্মও প্রচলিত আছে। চীনগণ বুদ্ধদেবকে ‘কো’ ও বৌদ্ধযাজকগণকে হোচাং বলিয়া থাকে। এই হোচাং অর্থাৎ লামাগণ সর্বত্র পীতবসন পরিধান করে এবং দ্বারপরিগ্রহ না করিয়া ধর্মমন্দিরে বাস করে। চীনের বৌদ্ধগণ নিজে কোন প্রাণীহত্যা করে না, কিন্তু অপর কর্তৃক হত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে। বহুকাল হইতে খুটান ধর্ম চীনে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ হাক্স অস্বীকার করেন যে, বর্তমান সমস্ত চীন-রাজ্যে খুটানের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। প্রবাদ আছে, মহানদের

মাতৃস্ব উল্লেখ্য চীনে মুসলমান ধর্ম প্রচার করেন। এক্ষণে চীনে অনেক মুসলমান বাস করিতেছে। এই সকল নামাযার্থ প্রচলিত মাঝিগেও কনুচি প্রণীত ধর্মই রাজার অঙ্গমোহিত।



চীনের বোধ-বালক।

শাসনপ্রণালী।—চীনসাম্রাজ্যে বোধোচ্চারপ্রণালী প্রচলিত। সম্রাটই রাজ্যের সর্বস্বত্ব। পরিবার শাসনের অঙ্গরূপে তিনি রাজ্য প্রজাদিগকে সম্বানবৎ পালন ও শাসন করেন। পিতৃভক্তির আদর্শেই রাজতত্ত্ব সংগঠিত হয়। সুতরাং কেহ পিতামাতার অবাধ্য হইলে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। সমস্ত প্রজা সম্রাটকে দেবতার স্থায় ভক্তি করে। তিনি এবং মান্দারিনগণ প্রজাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন এবং অগত্যনির্কীর্ণে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। সম্রাটই রাজকীয় কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যকে চীনেরা পৃথিমাতার অংশ বলিয়া মান্য করে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য চীনদেশ অষ্টাদশ বিভাগে বিভক্ত। যথা—উত্তরভাগে শাং টুং, পেচিলি; শান্সি, শেন্সী, দক্ষিণভাগে কোয়াং টুং ও কেরাংসি; পূর্বভাগে চেকিয়াং, কোকিয়েং ও কিয়াংসু; পশ্চিমভাগে কাংসু, ছেচুয়েন্ ও ইয়ুনাং; এবং মধ্য প্রদেশে নাংঘুই, কিয়াংসি, হুনান, হুকে, হোনান ও ফুইচু। প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্তা আছেন। তিনি ঐ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার উপর প্রভুত্ব করেন।

রাজকার্য পর্যালোচনার জন্য রাজার ছইটী মন্ত্রীগণ আছে। ঐ ছই সভা আইন প্রণয়ন ও নিয়মাদি পরিবর্তন-

বিষয়ে সম্রাটকে উপদেশ প্রদান করেন। চীনের সৈন্তসংখ্যা সর্বমুদ্র প্রায় ১২ লক্ষ। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীনে মোট ১৬০ খানি যুদ্ধ তরী ছিল। সম্রাতি যুরোপ হইতে অনেক যুদ্ধের আস্রাব ক্রয় করা হইতেছে।

প্রধান শাসনকর্তা ও সেনাপতিদিগকে মান্দারিন বলে। যে সকল মান্দারিন শাসনকার্যে কিংবা যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তাহাদিগকে কোয়াং, হিও, পায়েক, ছি ও নান ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হয়। অভ্যন্তর প্রধান লোকেও এই সকল উপাধি পাইতে পারে। তাহা যথাক্রমে বিলাতের ডিউক, মার্কুইস, আর্চবিশপ, বারন ও বারনেট উপাধির মত। এই সকল উপাধি বংশাধিকারিক নহে। রাজবংশীয় ও মহামতি কনুচির বংশীয়রাই পুরুষাধিক্রমে উপাধি প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ উহারা আমাদের দেশের গবর্নেন্ট প্রদত্ত রাজা, মহারাজ, বার বাহাদুর ইত্যাদির স্থায়। রাজবংশীয়গণ রাজোপাধি এবং লোহিত ও পীতবর্ণের কটিবন্ধ ধারণ করিতে পান মাত্র। রাজসরকারে পদপ্রার্থী হইলে তাহাদিগকেও জন সাধারণের স্থায় রীতিমত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হয়।

চীনদেশের রাজদণ্ড অতি কঠোর ও সময়ে সময়ে অতি নৃশংস বলিয়া বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধে পদতলে বস্তুপ্রহার ও গলার হাড়কাঠ পরাইয়া দেওয়া হয়। নরহত্যা, রাজদ্রোহ ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে দোষীকে নির্দাসিত, অথবা প্রস্তরনিষ্কেপ, শাসরোধ প্রভৃতি নৃশংস উপায়ে বধ করা হয়। অপরাধীকে ৮, ২৪, ৩৬, ৭২ বা ১২০ খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিবার প্রথা চীন ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও চলিত নাই। চীনের কারাগার সকল সাক্ষাৎ মরক সদৃশ।

মুক্তা।—চীনে স্বর্ণমুক্তা প্রচলিত নাই। একরূপ রৌপ্যনির্মিত মুক্তা চলিত আছে, উহা হারাই কর্মচারীদিগের বেতনাদি প্রদত্ত হয়। রাজস্ব ও সাধারণ বণিকদিগের কারবারেও এই মুক্তা ব্যবহৃত হয়। সাধারণ লোকে সর্বদা পৈন্তল মুক্তা ব্যবহার করে। এই সকল মুক্তা মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত পাতলা পিতলের ঢাকা মাত্র। ইহারের মূল্য অতিশয় কম। ৩০০।৭০০ এইরূপ পিতলের মুক্তার মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। বণিকদিগের কারবারে সুবিধার্থ একরূপ ছিদ্র ব্যবহৃত হয়।

ওজন প্রণালী।—চীনের ওজন-প্রণালী সন্নিহিত অনেক দেশে প্রচলিত। সর্বাপেক্ষা অধিক ওজন-পরিমাণ 'পিঙ্গুল' প্রায় ৬৬ সেরের সমান। ৩ কাটি প্রায় ২ সের।

১০ কাংশ = ১ কাকারিন।	১৬ টাইল = ১ কাটি।
১০ কাকারিন = ১ মেস।	১০০ কাটি = ১ পিঙ্গুল।
১০ মেস = ১ টাইল।	

কালগণনা।—চীনগণ উত্তরপূর্ব এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত জাতির জায় ৬০ বৎসরের কালাবর্ত দ্বারা সময় গণনা করে, এই ৬০ বর্ষ পরিমিত কালের প্রত্যেক বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। চীন ভাষায় এই কালাবর্তকে হুয়া-কি-চি বলে।

ফাস্তনের শুরু প্রতিপদ হইতে চীনেরা বর্ষ গণনা করে। ২৯ বা ৩০ দিনে এক চান্সমাস, এইরূপ ১২ চান্সমাসে এক বৎসর; সৌরবর্ষের সহিত সমান রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ইহারও একটা মলমাস ধরিয়া থাকে। রাত্রি ১১টা হইতে ইহার দিবস গণনা করে। দিবারাত্রি ২ ঘণ্টা করিয়া দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের পৃথক নাম যথা—

চি ১১ টা হইতে ১টা পূর্বাঙ্ক	যু ১১ হইতে ১ অপরাহ্ন
চৌ ১ " " ৩ "	উই ১ " " ৩ "
মিউ ৩ " " ৫ "	শিন ৩ " " ৫ "
মৌউ ৫ " " ৭ "	ইউ ৫ " " ৭ "
শিন ৭ " " ৯ "	সিও ৭ " " ৯ "
জি ৯ " " ১১ "	হাই ৯ " " ১১ "

প্রত্যেক ভাগের প্রথম ঘণ্টা জ্ঞাপন করিতে হইলে ঐ ভাগের নামের পূর্বে কেও এবং শেষ ঘণ্টা বুঝাইতে চিং শব্দ যুক্ত হয়। যথা—কেও-চি বলিলে রাত্রি ১১টা এবং চিং-চি বলিলে রাত্রি ১২টা বুঝায়। কেও-চৌ বলিলে রাত্রি ১টা এবং চিং-চৌ বলিলে রাত্রি ২টা বুঝায় ইত্যাদি। ক'হি শব্দে এক চতুর্থাংশ এবং চিহ, আচ, সেও শব্দে যথাক্রমে ১, ২, ৩ বুঝায়। ঘণ্টার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ বুঝাইতে ক'হি শব্দের পূর্বে য়িহ, আচ এবং সেও শব্দ প্রযুক্ত হয়, যথা—চিং-মাউ-দিদ-কহি অর্থাৎ ৬০টা কেও-যু-আচ ক'হি ১১০টা ইত্যাদি। চীনরাজসরকারে সচরাচর এইরূপ বিভাগই প্রচলিত। যাহা হউক সম্প্রতি চীনে বহু পরিমাণে যুরোপীয় ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে ও তজ্জন্য ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদিও চলিত হইতেছে।

শিল্পাদি।—চীনগণ সুবুদ্ধি, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও কষ্ট-সহিষ্ণু। কি উপারে নির্মাণের উপকরণ সকল বাজে নষ্ট হয় না, তাহা ইহার বেশ জানে। উদ্ভাবনীশক্তিও ইহাদের বিলক্ষণ আছে। বিদেশীয়গণ চীন হইতে অনেক বিষয় শিখিয়াছে। আমাদের দেশের চীনাংশুক বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। রেসম, স্যাটিন, চা প্রভৃতি চীন হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়; সিল্ক (Silk), স্যাটিন (Satin), টি (Tea) প্রভৃতির সহিত উহাদের চীনা নাম জি, জেটান, টি শব্দের সৌসাদৃশ্যই তাহার প্রমাণ।

একণে সকলেই স্বীকার করেন যে, কাগজ, মুদ্রাবস্ত্র, বাক্স প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবিষ্কার প্রথম চীনদেশেই হয়। খৃষ্টের ১০৫ বৎসর পূর্বে ছোট্ট সন্ডাটের

রাজত্বকালে চীনে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। ইতিপূর্বে কার্পাস ও রেশম নির্মিত বস্ত্র খাত্তকলকে এবং কৃষ্ণপত্রাবিশিষ্টে লিপিকার্য সম্পন্ন হইত। ঐ বৎসর একজন মাফারিন্ বহুল, শণ ও পুরাতন বস্ত্রাদি দ্বিক্রয় করিয়া তাহার মণ্ড হইতে একরূপ কাগজ প্রস্তুত করেন। বলা বাহুল্য ঐ প্রথম আবিষ্কৃত কাগজ অতি কমব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে চীনগণ নানারূপ বুদ্ধিকৌশলে উহার প্রস্তুত উন্নতি করিয়া কাগজকে চিত্রণ, শুভ্রবর্ণ ও পরিকার করিতে শিক্ষা করে। এখনও উহার যে সকল সহজ উপারে কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা যুরোপীয় শিল্পকারগণও জানেন না। প্রত্যেক প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কোকিন প্রদেশে কচি বাঁশ হইতে, চেকিয়াং প্রদেশে ধানের খড় হইতে এবং কিয়াং-নান্ প্রদেশে অকর্ণ্যা রেসম হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরম্ভে চীনদেশে প্রথম মুদ্রাবস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ঐ শতাব্দীতে ৯৩২ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাট বহু সংখ্যায় পুস্তক মুদ্রিত করিতে অমুমতি দেন এবং সমস্ত ধর্ম-গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া রাজভবনে রক্ষিত করেন। ইহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে যুরোপে মুদ্রাবস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া বর্তমান উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলো চীনরাজ্যে মুদ্রিত কাগজের টাকা অর্থাৎ নোটের প্রচলনের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি চীনদেশে ছাপা পুস্তকও দেখিয়া থাকিবেন।

চীনদেশে অতি পূর্বে কাষ্ঠকলকে অক্ষর খোদিত করিয়া তাহাতেই পুস্তক মুদ্রিত হইত, এক্ষণেও চীনেরা লি-মো নামক বৃক্ষের কঠিন কাষ্ঠে পুস্তকের পৃষ্ঠা খোদিত করিয়া মুদ্রিত করে। কিন্তু যদিও চীনে বহুকাল মুদ্রাবস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইহার সমধিক উন্নতি হয় নাই। বর্তমান উৎকৃষ্ট যুরোপীয় মুদ্রাবস্ত্রের তুলনায় চীনের মুদ্রাবস্ত্র অতি অপকৃষ্ট।

স্বজন ভেভিন্ সাহেব অমুমান করেন যে—বাক্স, চুষকহুটী (দিগদর্শন যন্ত্র) এবং মুদ্রাবস্ত্র এই তিন মহোপকারী অত্যা-বিস্ময়কর পদার্থ চীনেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

চীনের কালি সর্বত্র বিখ্যাত। চিত্রাদি-অঙ্কনে যুরোপ ও অন্যান্য দেশে উহা আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীপ-শিখা-জাত তুলা, শিরীষ ও অন্যান্য পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত পদার্থ একত্র জমাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কণ্ডিত হয়, পরে মোহরযুক্ত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। কিয়াং-নান্ প্রদেশের হৈচিউ নগরের কালিই সর্বোৎকৃষ্ট।

তথাকার সঙ্গী-শ্রমতকারিগণ বিদেশীয়দের কথা দূরে থাকুক, স্বদেশীয়দিগকেও ইহার কৌশল জানিতে দেয় না। এই চীনাশি ইণ্ডিয়ান-ইঙ্ক (Indian ink) নামে খ্যাত।

চীন দেশেই সর্বপ্রথমে মাটি হইতে দৃঢ় উজ্জল বাসন প্রস্তুত হয়, এক্ষণে ঐ বাসন পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার বাসন মাত্রকেই চীনদেশের নামানুসারে চীনা-বাসন কহে। অদ্যাপি চীনদেশের কেওলিন্ মৃত্তিকা হইতে যুরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদিগের কার্পাসের বীজ ছাড়াইয়া তুলা বাহির করিবার খাউই যুরোপীয় কল অপেক্ষাও কম্পোপযোগী। তন্নিম্ন ইহাদিগের লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, দস্তা ও নিকেল নির্মিত নানাবিধ ধাতুদ্রব্য এবং পিকিন্ নগরের ১৩১৪ ফিট হুহং বন্দা অতি বিখ্যাত। চীনের সিম্বর প্রভৃতি ধাতব বর্ণ, চীনের বার্গিস, চীনের খোদকারীযুক্ত মণি, হস্তীদন্ত ও কাষ্ঠাদি নির্মিত বহুবিধ দ্রব্য, স্বর্ণরৌপ্যাদির নানারূপ অলঙ্কারাদি স্ত্রী-বিশ্বয়জনক। নানাবিধ জরির কাজ করা চীনের পটুবস্ত্র বহুকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে যুরোপে গুটিপোকা ছিল না। প্রবাদ চীনদেশ হইতেই জনৈক রোমান্কাথলিক ধর্মযাজক শূন্য-গর্ত যন্ত্রির ভিতর গুটিপোকাকার অণু লুকাইয়া যুরোপে লইয়া যান এবং তথায় রেসমের চাস প্রবর্তিত করেন। বহু পূর্বে কনফুচির সময় হইতে চীনেরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। হানবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্ব-কালে চীনেরাই সর্বপ্রথম ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থ নোট প্রচলন করে। ওটা নামক সম্রাটের রাজত্বকালে স্রজিত ১২৫ টাকা মূল্যের 'ফাইপাই' নামক নোট চলিত ছিল। অন্ত্য চীনের নোটের নাম ফেতিসিয়ন, ফাইটিসৌ, পিয়ান্ টিসিয়ান্, টিচিটিসি, কৈওটিন্ ইত্যাদি ছিল। বস্তুতঃ আমাদের দেশের নোটে লিখিত থাকে, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে ব্যক্তি এই নোট আনিবে তাহাকে চাহিবামাত্র লিখিত টাকা দিবে।" কিন্তু চীনের নোটে লেখা থাকিত, "কোবাধ্যক্ষদিগের প্রার্থনায় আদেশ হইল যে মিজ-রাজ-বংশীয় মুদ্রাক্রিত এই কাগজের টাকা সম্পূর্ণরূপে তাম্র মুদ্রার পরিবর্তে প্রচলিত হইবে, যে ব্যক্তি ইহা অমাত্র্য করিবে, তাহার মস্তকচ্ছেদ হইবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের নোট গবর্ণমেন্টের একরূপ ধত, আর চীনের নোট একরূপ কাগজের টাকা। সাহা হউক ঐরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা স্বত্ত্বেও চীনের নোট অর্ধেক বাটার কমে বিক্রয় হইত না।

রেলপথ ও তাড়িতবার্তা।—যুরোপীয়গণ বহুকাল হইতেই চীনে রেলপথ ও তাড়িতবার্তার তার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। একবার যুরোপীয়গণ চীনসম্রাটের অনুমতি লইয়া নিজ ব্যয়ে সাত্‌ঝাই হইতে উসিং পর্য্যন্ত ৩৪ ক্রোশমাত্র রেলপথ করেন। কিন্তু ইহা চীনকর্মচারীদিগের এরূপ চক্ষুশূল হইল যে, উহার সমস্ত ক্রয় করিয়া লইল এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সাহা হউক সম্প্রতি কৈপিং হইতে পীহোনদী পর্য্যন্ত কেবল করিয়া আনিবার জন্য একটা রেলপথ ও ১৮৯১ খৃঃ অব্দে টিয়েং হইতে টংশাং পর্য্যন্ত ৮১ মাইল যাতায়াতের জন্য একটা রেলপথ হইয়াছে। ফর্মোজা দ্বীপে প্রায় ৬১ মাইল রেলপথ হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ সকলের সরঞ্জাম সমস্তই যুরোপীয়। সম্প্রতি সীমারও নানা স্থানে রেলপথ খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইতিমধ্যে চীনে ৩০০০ মাইল তাড়িতবার্তার তার বিস্তারিত হইয়াছে।

সম্প্রতি চীনে যুরোপীয় বাণ্যীয় বস্ত্র দ্বারা তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত, বস্ত্রবয়ন এবং নোকা, যুক্তরী প্রভৃতি পরিচালিত হইতেছে।

বাণিজ্য।—ভারতবর্ষের সহিত চীনের বাণিজ্য ঠিক ইংল-ণ্ডের নীচে ধরা যাইতে পারে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে বিদেশ হইতে চীনে মোট আমদানির পরিমাণ ২৬ কোটি টাকা। ঐ অব্দে মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৩ কোটি। ১৮৯০ অব্দে বিলাত হইতে প্রায় ৭ কোটি টাকার মাল চীনে আমদানি হয় এবং প্রায় ৫ কোটি টাকার মাল চীন হইতে বিলাতে প্রেরিত হয়। চীনে আমদানির মধ্যে আফিং, তুলা, উর্গাজাত, কেরোসিন ও তেল এবং রপ্তানীর মধ্যে চা, চিনি, রেসম, পটুবস্ত্র ও কপূরই প্রধান।

অধিকার।—চীনসম্রাটের অধীনে চীন ব্যতীত চীনতান্তর, মঙ্গোলিয়া, মাকুরিয়া, কোরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ আছে। চীনের দ্বার বহুজনাকীর্ণ দেশ ভূমণ্ডলে আর নাই। চীন-সম্রাটই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রজার অধীশ্বর। কোরিয়া প্রদেশ একজন চীনের করদ নৃপতি কর্তৃক শাসিত হয়। সম্প্রতি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার প্রাধান্য লইয়া চীন ও জাপানে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। যুরো-পীয় রাজগণ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

ভারতের সহিত চীনের সন্ধি।—পূর্বে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে (২৫০ খৃঃ পূঃ) হিন্ (জিন্) বংশ অথবা (৩০০ খৃঃ অব্দে) গিন্ বা চিন্ বংশ হইতে "চীন" শব্দের উৎপত্তি হই-য়াছে, এতদনুসারে মঙ্গোলিয়া ও মহাভারতে চীন শব্দের

এরোগ দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের হিন্ বা সিন্ বংশের সময়ে বা পরবর্তীকালে রচিত হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বর্তমান চীন-পুরাবিহীন হির করিয়াছেন, চীন নব্ব বহু প্রাচীন, এই নাম ভারতবাসীর প্রেরিত, হিন্ বংশেরও পূর্বে বাইবেলের প্রাচীনতম অংশে চীনদেশ "সিনিম্" (Sinim) নামে বর্ণিত হইয়াছে (১), হিন্দুগ্রন্থ "চীন" নামই টলেমি সিনাই (Sinai) নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্ম্যেতে লিখিত আছে যে, মহারাজ ভগবত চীন ও কিরাত সৈন্তসহ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন (২) [কামরূপ দেখ।] ইহাতে যোধ হয় যে ভারত যুদ্ধকালেও চীনের সহিত ভারতের সংগ্রহ ছিল। অতিপূর্বকাল হইতেই সিদ্ধবাসী বণিকগণ চীনসম্রাজ্যের মধ্য দিয়া কাশ্মির সাগরের তীরে দাহিতানে পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করিত, ১২২ খৃঃ পূঃ অব্দে হানবংশীয় চীনসম্রাট্ বৃ-তি উক্ত বণিকগণের প্রথম সংবাদ পান এবং তাহা হইতেই ভারতের দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়ে (৩)। বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সহিত ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। তুঙ্গ-কিএন্-কং-মু-নামক প্রাচীন চীনগ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ অশোক যে আশী হাজার স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ৪৫ ভাগ চীনদেশে নির্মিত হয়, তন্মধ্যে মিং-চেট (বর্তমান নিম্পো) নগরের স্তূপই প্রধান। অপর পুস্তকে লিখিত আছে যে ২১৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতবাসী সেন্-সি প্রদেশস্থ চীন-রাজধানীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিল।

৬১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট্ নিকট স্বপ্নে বিদেশীয় দেবমূর্তি দর্শন করিয়া ১৮ জন ব্যক্তিকে ভারত হইতে বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম পুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। সেই দূতগণ ভারতবাসীর যেত অখারোহী দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, তাঁহাদের সহিত দেবমূর্তি, প্রতিমা ও অনেক ধর্মগ্রন্থ ছিল। ৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চীনসম্রাটের সমীপে উপনীত হইলেন; তাঁহাদের সহিত ভারতবাসী কল্পমতজ নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই সর্ব প্রথমে চীনভাষায় "বিচছা-রিংগ হুয়" অনুবাদ করেন, চীনের লোয়জ নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহারই পর হইতে চীনবাসী বৌদ্ধধর্মে আস্থা প্রদর্শন করিতে থাকে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দে

ভারতবাসী চীনদেশে গিয়া নানাবিধ বৌদ্ধ-দেবতার স্থাপন করিতে থাকেন। এই সময় ধর্মকাকল নামে এক ভারতসন্তান "বিনয়পিটক" অনুবাদ করেন। ২১৫ খৃষ্টাব্দে চু-সি-হিং নামে একজন চীন, তৎপরে চু-ক-ক-লিং বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের জন্ত উত্তর ভারতে আসিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষ নামে একজন বৌদ্ধাচার্য্য ভারত হইতে একখানি সংস্কৃত "নিরুপহুয়" লইয়া গিয়া চীনদেশে প্রচার করেন। তৎপরে বুদ্ধবশা নামে এক ভারতসন্তান "মহাগম হুয়" প্রভৃতি চীনভাষায় প্রকাশ করেন। একত্রিংশ ধর্মনিদ্রি, ধর্মাপম্, সলদেব প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়া অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বশোহিত ও বুদ্ধনন্দি সিংহল হইতে চীনদেশে গিয়া অনেক ধর্মগ্রন্থ প্রচার করেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর আরম্ভে বুদ্ধজল নামে এক ভারতবাসী চীনদেশে গমন করেন, চীনের চৌ-রাজকুমার তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন এবং আপনার প্রজাবর্গকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধজলও ধর্মপুস্তক সঙ্কলনে চীনবাসীকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসন্তান কুমারজীব চীনসম্রাটের নিকট উচ্চ পদলাভ করেন, তিনি সম্রাটের আদেশে ভারতীয় ধর্মপুস্তক অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। আরআটশত বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার মহাকাব্যে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বয়ং চীনসম্রাট্ও বহুত্রে প্রাচীন হস্তলিপি ধরিয়া পাঠ সংশোধন করিতেন। কুমারজীবের অধ্যবসায় শুণে ৩০০ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছিল। আজও চীনের বর্তমান বৌদ্ধগ্রন্থে কুমারজীবের নাম প্রথম উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৎকালে কুমারজীবের প্রিয় শিষ্য কা-হিয়ান্ নামে এক চীনপরিব্রাজক ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মপুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্ত আগমন করেন। তিনি ৪১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমে ফিরিয়া পলংসজ নামে এক ভারতবাসীর সহিত তাঁহার সংগৃহীত ধর্মপুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে কা-হিয়ান্ গুরু কুমারজীবের আদেশে আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি ভজ নামক এক ভারতীয়ের সাহায্যে "অসংখ্যের বিনয়" হুয়ের অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগ্রন্থ চীনদেশে বতই প্রচার হইতে লাগিল, চীনের রাজা প্রজা সকলেরই বৌদ্ধধর্মের উপর ততই অনুপ্রাণ বাড়িতে লাগিল। সম্রাট্ সুংবেতির রাজত্বকালে (৪৩০-৪৫৩ খৃঃ অব্দে) বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধিদর্শনে নান্দহান হইতে চীনসম্রাটের উপর সাহুবাদ আসিতে লাগিল, তন্মধ্যে আরট্রাজ পিববর্মী ও বেববদ নামে ভারতবর্ষীয় আর এক রাজার নাম চীন ইতিহাসে রক্ষিত আছে।

(১) Edkins' Chinese Buddhism, p. 93n ;

Indian Antiquary, vol XIII. p. 317n.

(২) "সিদ্ধারিত চীনদেশে বৃত্তঃ প্রাপ্তোক্তিঃ বৌদ্ধধর্মঃ" (ভারত ২২৩০)

(৩) Edkins' Chinese Buddhism, p. 83.

খৃষ্টীয় ৪ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে বৌদ্ধধর্মের উপর নির্ভরন আরম্ভ হইলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অনেক ভারতসন্তান হিন্দুধর্মের ধর্মের তেজ করিয়া চীনসম্রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমে চীনদেশে প্রায় তিনহাজার ভারতসন্তানের বাস হইয়াছিল। তাঁহাদের তরুণাবস্থা ও যুগ যুগের জন্ম বেই-রাজকুমার চীনের নানাহানে মনোহর সম্ভারায় নিৰ্মাণ করিয়া দেন। ৫১৮ খৃষ্টাব্দে বেই-রাজ যুজ-য়ুনকে বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক সংগ্রহের জন্ম ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার সঙ্গে হেই-সেং নামে এক বৌদ্ধবাজকও আসিয়াছিলেন।

৫২৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যবাসী বুদ্ধ বোধিধর্ম বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ সমুদ্রপথে কাণ্টন নগরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি চীনসম্রাট গিরাংবুতি কর্তৃক আহৃত হইয়া নান্‌কিং নগরে রাজসভার উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি সম্রাটের উপর বিরক্ত হইয়া লোকে আসিয়া ৯ বর্ষকাল ধ্যাননিমগ্ন থাকেন। ক্রমে তাঁহার শুশ্রূষার কথা চীনসম্রাট বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও আর বোধিধর্মকে আপন সভায় আনিতে পারিলেন না। হো-নান্ ও শেন্সির মধ্যবর্তী হিউজর পর্বতে তিনি সমাধিলাভ করেন। পরিত্রাজক যুজ-য়ুন ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বোধিধর্মের পুত্রেই কোন মন্দিরে রক্ষা করিবার জন্ম শবাধারে লইয়া আসেন, কিন্তু পরে শবাধার খুলিলে বোধিধর্মের একপাটা পাদুকা ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না, সেই পাদুকা একটা বিহারে রক্ষিত হয়, কিন্তু টোয়াংবংশের রাজত্বকালে সেই পাদুকাও যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

৬২৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ং সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের জন্ম ভারতে আগমন করেন। তদ্রূচিত সি-মুকি নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের নানা স্থানের আচার ব্যবহার, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনেক অত্যাবশ্যকীয় কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপাঠে প্রাচীন ভারতের অনেক কথা আমরা জানিতে পারি। উক্ত চীনপরিব্রাজক সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের জন্ম বেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাহা শুনিলেও আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয়। স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে তিনি ২২টা ঘোটকে ৬৫৭ খানি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তজ্জন্ম চীনসম্রাট তাঁহার সন্মুখিত অন্ত্যর্ধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যুত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করেন। হিউএন্-সিয়ং সর্বমুদ্র ৭৪০ খানি সংস্কৃত

বৌদ্ধগ্রন্থ ১৩৩৫ খণ্ডে বিভক্ত চীনভাষায় অনুবাদ করেন। [হিউএন্-সিয়ং দেখ।]

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রাকালে কনফুচির মতাবলম্বী চীনবাসীরা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে চীনদেশবাসী হিন্দুগণ তথাকার পঞ্জিকা সংশোধন করিতে নিযুক্ত হন। কিছুকাল গৌতম-সিদ্ধান্ত অনুসারে পঞ্জিকা চলিয়া ছিল। কোচুদের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে টোয়াংবংশের রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে) ভারতীয় বৌদ্ধগণ ঐশ্বররাজ্যে হিন্দুপঞ্জিকা প্রচার করেন। এতদ্বির তংয়ুন, যু-শিয়ান্ প্রভৃতি প্রাচীন চীনমহাকাব্যে যে সকল বৌদ্ধশাস্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভারতবাসীর সাহায্যে লিখিত হয়।

একটা বুদ্ধমূর্তির পশ্চাভাগ হইতে গৌতমসিদ্ধান্তের চীনা-নুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ অনুবাদের নাম কই-য়ুএন্-চন-কিং। ঐ গ্রন্থে ভারতীয় অক্ষপ্রণালীরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। গৌতমসিদ্ধান্ত ব্যতীত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে মলয়বাসী দলুচি কর্তৃক ২০ অধ্যায়ে ব্রহ্মসিদ্ধান্তের (শো-সেন-তিএন্ বেন্), চীনা-নুবাদ তৎপরে গর্গসংহিতার ও ভারতীয় অক্ষপ্রণালীর চীনা-নুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সকল অনুবাদ দ্বারা অনুমিত হয় যে সেই প্রাচীনকালেও ভারতসন্তান দূরদেশে ভারতীয় বিজ্ঞা ও সভ্যতা বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংয়ুজ্ চীনসম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, এবং সংস্কৃত অক্ষরে লিখিতেন। ঐ সময়ে বোধিধর্মচি নামে একজন বৌদ্ধাচার্য্য আসিয়া কএকখানি বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন। টোয়াংবংশের রাজত্বকালে অমোঘ (চীনভাষায় পু-কুং) সিংহল হইতে চীনদেশে আইসেন। অসঙ্গ মহাবান, ব্রহ্ম, শৈব ও ধ্যানী বুদ্ধ-মতানুসারী যে যোগাচার মত প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অমোঘ চীনদেশেও সেই যোগাচার মত প্রচার করেন।

৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভারত হইতে সামন্ত নামে একজন সন্ন্যাসী ১৬ পরিবারসহ চীনরাজসভায় গমন করেন। ইহারই কিছুকাল পরে তৌ-মুএন্ নামে এক চীনবাজক ভারত-বর্ষ হইতে তালপত্রে লিখিত ৪০ খানি সংস্কৃত পুঁথি লইয়া যান। তাহার পরবর্ষে (৯৬৬ খৃষ্টাব্দে) সম্রাটের আদেশ লইয়া ১৫৭ জন চীনবাজক বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের জন্ম ভারতে আগমন করেন। ৯৮২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম চীনবাসী একজন রাজক ভারতদর্শন করিয়া ভারতীয় এক রাজার পত্র লইয়া চীনসম্রাটের নিকট উপস্থিত হন। ঐ পত্রে ভারতের

পারদা: পহুবা-চীমা: কিল্লাতানরদা: থানা: ১" ৪৫। (বহু ১০ অধ্যায়)

কবে কে নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন ও হৃদয় হইয়া উঠে, সহজে কেহ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।

চীনদেশকে প্রেমিত ঐক্যজনকবীর বস। তাহার একমাত্র কাশক কোমর অড়াইয়া রাখে, কিন্তু যদি তাহার জাতীয় গোবাক ছাড়িয়া কোন ক্রমের মত গোবাক পরে, তাহা হইলে আর তাহাকে চীন বলিয়া চেনা যায় না। কেবল গায়ের উজীর দ্বায়েই করা পড়ে।

কেহ কেহ অল্প ব্রহ্মভাবার কথা কহিতে পারে; তাহাদের ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে তাহার একমাত্র ভগবান গোতমের উপাসক। তাহার জগতের ঐক্য ও বিধাতা একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে, কিন্তু কখন তাহার পূজা করে না। ইহার ষাণ্ড নামক ছুরা দিয়া “নট” নামক উপদেবগণের পূজা করে। তাহার কল যে নাটেরাই সকল প্রকার অনিষ্টের মূল, ষাণ্ড পাইলে তাহার ভূত হয়।

চীনমাত্রেই ষাণ্ড খাইতে বড় ভালবাসে, সকল উৎসবে ষাণ্ড না হইলে চলে না। কিন্তু বেশী ষাণ্ড খাইলে কড়ই মাতাল হইয়া পড়ে।

ইহাদের কুমারীগণের উপর ভ্রাতারই কর্তৃত্ব চলে। ভ্রাতার ইচ্ছায় চীনকুমারীর বিবাহ হয়। পিতা মাতার তাহাতে কোন কথা কহিবার জোনাই। কতক আশ্বিনায়েই তাহার এক ভ্রাতা তাহার স্বকক স্থির হয়। ভ্রাতা না থাকিলে তাহার পিসতুতা বা খুড়তুতা ভাই ঐ ভাব পায়। বিবাহের সময় বরকে ঐ ভ্রাতার মত লইতে হয়, বিবাহের পরও বর ভ্রাতাককে সম-ধিক সম্মান দেখাইতে বাধ্য। যদি কোন সময় কেহ শত্রুরায়ে ভ্রাতাকের সহিত দেখা করিতে যায়, তবে ভ্রাতাককে দিবার জন্ত তাহাকে ষাণ্ড সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

কাহারও মৃত্যু হইলে মহা ধুমধাম পড়িয়া যায়। গৃহদেহের অবস্থানসারে আত্মীয় কুটুম্বগণের ভোজের জন্ত মরিচ, রুখ, শূকর ও নানা প্রকার পাখী মারা হয়। শবের সহিত একটা মুরগী দেয়, শবের সঙ্গে সেই মুরগীর একটা পা বাঁধা থাকে। পরে বোলা করিয়া শব জইয়া গিয়া দাফ করে। দাফান্তে মৃতের অস্থিগুলি লইয়া ষাণ্ডহুরার খুঁইয়া হলুদ মাখাইয়া এক বৎসরকাল এক পায়ে রাখিয়া দেয়, তৎপরে সাধারণ সমাধিস্থানে আনিয়া সেই অস্থিগুলি প্রোথিত করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরেই চীনসমাজে কালদেখানকারে উজী কাটিলে মুখ ঢাকিয়া কেবল, তাহাতে তাহাদিগকে এক কিছুত ক্রিয়াকার দেখায়। কেন যে তাহারা এতদূর উজী কাটে, কেহ ঠিক কহিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলে যে মুখে একপে উজী কাটা থাকিলে লগন জাতীয় কোন পুঙ্খ তাহাকে ভাল-

বানিত্য চাক না। আবার কেহ বলে যে এরূপ চিহ্নিত থাকিলে অপর জাতি লইয়া মেয়ে লইয়াই করা পড়ে। চীনজাতির মধ্যে সর্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত আছে; তবে বৃটানিয়ার যক্ষগণ্যভার বাতানে উজীর ব্যবহার কিছু কমিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ ও আরকানে লগন লক চীনের বাস আছে।

চীনক (পু) চীন বার্থকন্। ১ বাস্তবিশেষ। চলিত কথায় চীরা বলে। পর্যায় কাককন্।

“প্রিয়বোধনান্নাচ্চ কোরুণ্ডাচ চীনকন্।” (বিকৃণ্ডা ৩৬২)

ইহার ভগ—শেখর, বায়ুদ্বিকর, পিত্তস্নেহমানক ও কক। (সামব্রত) ২ কজুনি। [কজুনি দেখ।] ৩ চীন কর্পূর। (রাবনি) [বহ] ৪ চীনদেশবাসী।

“সুমানদাশ্চ বাদান্তে নিষবান পুণ্ড চীনকন্।” (ভা ৪৮৮১০)

চীনকর্পূর (পু) চীনদেশক: কর্পূর: মধ্যমো:। কর্পূরবিশেষ। পর্যায়—চীনক, কজিন, ধবল, পটু, মেঘসার, জুবান, বীপ-কর্পূরক। ইহার ভগ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দ্রব্য শীতল, কক, কষ্টদৌক ও ক্রমিলশক, মেঘা এবং পবিজ। (রাবনি)

চীনজ (স্ত্রী) চীনে জায়তে চীন-জন-ভ। ১ ভীক্ষুসোহ, ইম্পাং। (রাবনি) (জি) ২ চীনজাত, যাহা চীনদেশে উৎপন্ন হয়।

চীনজাতার, চীনসম্রাটের শাসনাধীন ভূকিস্থানের পূর্বভাগ। ইহার ভিন্নদিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী অবস্থিত, কেবল পূর্বদিকে সমতল ক্ষেত্র গোবি নামক মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। উত্তরভাগে থিরানলান্ পর্বত এই দেশকে জর্জেরিয়া হইতে, এবং দক্ষিণে কারাকোরন্ ও কিয়ুনলন্ পর্বত ইহাকে ভারত-বর্ষ হইতে পৃথক্ করিতেছে। পর্বতের উপত্যকা সকলের ভূমি কদমময়, কিন্তু মধ্যভাগ বালুকাপূর্ণ। এখানে বৃষ্টি অতি বিরল, তন্মত বায়ু অতি ঐশ্বর্য। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্য-কর ও নাতিশীতোষ্ণ। ধনি সকলে স্বর্ণ, তাম্র, লবণ, পঙ্কক ও ককবর্ণ মণি পাওয়া যায়। এখানে ইরকন্, কাসের, খোতন, আকু, ইরাকিসর এবং উলটাতান এই ছয়টা নগর আছে। খোতন নগরে পূর্বে ভারতবর্ষের সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, এখনও তথা হইতে উর্ণা, বনাত, চর্ম ও চিনি আমদানি হয়। অধিবাসিগণ অনেকেরই মুসলমান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কহিয়া ইহার ইলি প্রদেশ ও কুনজা সহর জয় করিয়া লইয়াছে।

অধোনাক জুর্ক বা ভ্রাতার জাতি, আবাসস্থান বলিয়া এসেণের নাম জুর্কিস্তান বা ভ্রাতার হইয়াছে। পশ্চিমের উচ্চ ভূমিতে বাহারা বাস করে, তাহার বিরুদ্ধ-ভ্রাতার নামে অভিহিত। ইহার এক স্থানে হুজী নহে। ইহার বর্ষাকৃত, কিন্তু পশ্চিমাংশে বিভিন্ন হইলেও, আভ্যন্তরীণের

মধ্যে তুর্কভাষা প্রচলিত এবং প্রায় সকলেই মুসলমান বর্ণাবলম্বী। [তাতার দেখ।]

চীনপট্ট (পুং) চীনদেশে উৎপন্ন পট্ট বস্ত্র।

চীনপতি (পুং) ১ চীনদেশের রাজ্য। ২ জনপদবিশেষ।

চীনপত্তন, মাত্রাজের আর একটা নাম। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্ক মাসের প্রথম দিনে, ইংরাজগণ এখানে একটি কেল্লা নির্মাণ করিবার জন্য বিজয়নগরের রাজবংশীরের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই আদেশপত্রে দেখা ছিল, যে নগর ও কেল্লা নির্মিত হইবে তাহা খ্রীস্টরাজ-পত্তন নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্তা দমিরলা বেকটাদ্রি নারক ত্রাঙ্গিস্কে সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহার পিতা চীন-আম্রার নামে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিবে, এই জন্য মাত্রাজ প্রদেশবাসীগণ ইহাকে চীনপত্তন বলিয়া থাকে। [মাত্রাজ জটব্য।]

চীনপিষ্ট (স্ত্রী) চীনজ সীসকস্ত পিষ্ট ৬তং। ১ সিন্দুর-বিশেষ, চলিত কথায় চীনের সিন্দুর বলে। চীনং পিষ্টমিবা। ২ সীসক। (রাজনি)

চীনরাজপুত্র (পুং) ১ রাজপুত্র। ২ নাসপাতি গাছ।

চীনবঙ্গ (স্ত্রী) চীনভবং বঙ্গ মধ্যলোম। সীসক।

চীনা (চীন শব্দজ) ১ চীন দেশীয়। ২ ধাতুবিশেষ।

চীনাংশুক (স্ত্রী) চীনাংশুপদমন্তকং কর্মধা। পট্টবস্ত্রবিশেষ।

“চীনাংশুকমিবকেতো: প্রতিবাতং নীরমানজ।” (শাকুন্তল ১ অঙ্ক)

চীনাংক (পুং) চীনং চীনাংকারমকতি অক-অণ্। কর্পূরবিশেষ।

“চীনাংকসংজ্ঞা: কর্পূর: কক্করকর: স্তূত:।” (ভাবপ্রকাশ)

ইহার গুণ—কক্ক, কুষ্ঠ, ক্রমি ও বিষনাশক এবং তিক্তরসযুক্ত।

চীনাংককটী (স্ত্রী) চীনমিব বাহু: ককটী কর্মধা পুষ্পোদরাদিবাৎ দীর্ঘ:। চিত্রকূটপ্রদেশপ্রসিদ্ধ ককটীবিশেষ, রাজককটী। হিন্দীতে চীনা ও রাজদেশে বাথারী বলে। পর্যায়—রাজককটী, সুদীর্ঘা, রাজকলা, বালা, কুলককটী। ইহার গুণ—কটিকর, শীতল, পিত্ত, বাহ ও শোথনাশক, মধুর ও তৃপ্তিকর। (রাজনি)

চীনাচন্দন, একপ্রকার তরত পক্ষী। ইহার চূড়া ক্ষুদ্র। ইহার উপর অংশ চূড়াসহ ঈষৎ কপিল পীতবর্ণ। কিন্তু ইহাতে লম্বালম্বী কাল কাল ডোরা আছে। ইহার পুচ্ছদেশ অধিকাংশ লালচে রং, বাকুলে কএকটা কালডোরা এবং ঠোট কটা। ইহার চূড়াতে অজ্ঞাতহান অপেক্ষা লম্বা লম্বা পালক আছে।

এই পক্ষী দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়, তবে কর্ণাটক দেশে অতি বিরল, সেখানকার লোকের ইহাকে পিঙ্গর-বন্ধ

করিয়া রাখে। এই পাখী মধুরস্বরে গান গায় এবং নানাপ্রকার কৌতুক করিয়া লোককে হাসায়।

চীনামাটি, চীনদেশজাত মৃত্তিকা। চীন ভাষায় ইহাকে কেও-লিন্ কহে। এই মৃত্তিকার শতকরা দশিকেট অর্থাৎ ৪৩.৪ ভাগ, আলুমিনাম অর্থাৎ ৩২.৬৬ ভাগ ও জল ১৩.৯২ ভাগ থাকে। চীনের কিং-ডি-চীন পর্বতে এই মৃত্তিকা বিস্তৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তদনুসারে ইহাকে কেওলিং অর্থাৎ উচ্চ পাহাড় কহে। নানান্নপ উদ্ভিদ ও আকরিক ধাতুর মিশ্রণে ইহার গুণের তারতম্য ঘটে। বাসন প্রস্তুত করিতে বিস্তৃত চীনমৃত্তিকাই উৎকৃষ্ট। হিন্দুগণ একবার ব্যবহৃত মৃৎপাত্র পুনরায় ব্যবহার করে না বলিয়া ভারতবর্ষের কুস্তকারগণ চিকণ ও মৃদু মটির বাসন প্রস্তুত করিত না। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও বাঁকড়া জেলায় চীনা মটির সদৃশ একরূপ শাণা মাটি বাহির হইয়াছে, রাণীগঞ্জের বারন্ এণ্ড কোং উহা দ্বারা বহুতর সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন।

চীনা-বাসন, চীনমাটি নির্মিত চিকণ ও মৃদু বাসন। ইহাকে সচরাচর এদেশে কাচের বাসন কহে। চীনদেশে ইহা সর্ব প্রথম প্রস্তুত ও তথা হইতে অপরাপর দেশে নীত হয় বলিয়া ইহাকে চীনাবাসন কহে।

চীনানারঙ্গী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Triphasia aurantiola) ইহার ফল অতি সদৃশযুক্ত।

চীনাচিন্দুর (দেশজ) একপ্রকার সিন্দুর। এই সিন্দুর প্রথমে চীনদেশ হইতে আনীত হয়।

চীনি, পঞ্জাবের বশহর জমিদারীর অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা: ৩১° ৩১' উঃ, দ্রাঘি: ৭৮° ১২' পূঃ। একটা অত্যুচ্চ পর্বতের দক্ষিণদিকের উপত্যকার শতদ্রু নদী হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। নদীগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০ ফিট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ২০৮৫ ফিট। পর্বতনিহিত বহুসংখ্যক নিষ্করিণী চীনবাসীদিগকে জলদান করে। ইহার চতুর্দিকে ত্রাঙ্কাকানন। ত্রাঙ্কাই অধিবাসীদিগের প্রধান ধাত। অধিবাসীগণ বৃহৎ বৃহৎ কুঁড়ুর দ্বারা তদ্রূপ তাড়াইয়া ত্রাঙ্কা রন্ধা করে। এইখানে লর্ড ডালহৌসীর অতি প্রিয় শৈল-নিবাস ছিল।

চীনী (চীন শব্দজ) কদমীবিশেষ, ইহার ফল বাইতে মিষ্ট।

চীনীগোড়ানেবু (দেশজ) একপ্রকার সুবিশিষ্ট গোড়ানেবু।

চীপুরপল্লি, মাত্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলায় একটা জমিদারী। ইহার মধ্যে একটা পল্লিগ্রাম আছে। পূর্বে ইহা পাঁচদারদা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল।

চুক্তা (দেশজ) ১. একপ্রকার সূত্রগাছ। ২. ইক্ষুর। ৩. জুয়াড়ি
দ্রব্য ভেদ। ৪. ঔষধ লতাবিশেষ।

চুক্তান (দেশজ) করণ, গমন, নিঃসরণ।

চুক্তান (দেশজ) হাত বা পা চোঁচা।

চুক্তি (চুক্তনকর) [চুক্তি দেখ।]

চুক্তি, হুগলী জেলার একটি সহর। এই সহর হুগলী নদের
কিছু দক্ষিণে জাগীতবীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা ২২°
৩০' ১" উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৮° ২৬' ৪০" পূঃ। এক্ষণে চুক্তি হুগলী
মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত হইয়াছে। খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে
ওলন্দাজগণ এই নগরে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ১৮৫২
খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এই নগর উদাদিগেরই অধিকারে থাকে,
পরে ঐ বংশের ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়। পূর্বে এই স্থানে
আতুর বেনারসি বাস ও ইংলওযাত্রী কিম্বা ইংলও হইতে
আগত সেনাদিগের থাকিবার আড্ডা ছিল।

চুক (দেশজ) ১. শক্ত খোড়। (হিন্দী) ২. ভুল। (চুক্তনকর)
৩ টক, অল্পরস।

চুকন (দেশজ) ১. ভুলন, ভ্রমে পড়ন। ২. পরিশোধ। ৩. নিষ্পা-
দন। ৪. নির্ধারণ।

চুকালি (দেশজ) নিষ্পা, অপবাদ, কোন ব্যক্তির অপকার
উদ্দেশ্যে গোপনে গোপনে তাহার নিন্দা করা।

চুকপালঙ্গ (দেশজ) অল্পরসবিশিষ্ট এক রকম শাক, ইহার
অপর নাম টক পালঙ্গ, ভারতবাসী অনেকেরই ইহা খাইতে
ভালবাসে।

চুকানিয়া (দেশজ) যে কার্যের পারিশ্রমিক পূর্বেই নির্ধারণ
করিয়া দেওয়া হয়।

চুকে (ক্রি-বি) ভুলক্রমে।

চুককার (পু) চুক্ তাৎ অচ্ চুক্ পীড়নং আয়াতি
সম্যক্ সদাতি চুক্ আয়া-ক। সিংহনাদ। (জিকাণ্)

চুকচুক (দেশজ) ১. অরে অরে হুহুদি পান করিবার শব্দ।
২. বালকের তন্তু পান করিবার শব্দ।

চুক্তি (দেশজ) ১. নিয়ম, সমাধান। ২. কার্যের পারিশ্রমিক
সম্বন্ধে পূর্বেই যে নির্ধারণ করা হয় তাহাকে চুক্তি বলে।

চুক্তি আইন, চুক্তিব্যবহা আইন। ইহা ১৮৭২ সালের
২ আইন বলিয়া পরিচিত। ঐ সালের ২৫এ, এড্রিল অরিয়ে
এই আইন গবর্ণর জেনারেলের অস্থায়ীকৃত হয় এবং ১৮৭২
সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কার্যতঃ ইংরেজীকৃত
প্রদেশসমূহে প্রচলিত হইয়াছে। কোন প্রকৃতির ব্যক্তির
অন্ত এক প্রকৃতির ব্যক্তির কোন কার্য করিতে বা স্র
করিতে আইন-সম্মত যে অঙ্গীকার, তাহাকে চুক্তি কহে।

চুক্তি ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্যতিক্রম কিম্বা লিখিত উভয়ই হইতে
পারে। বেআইনি বিষয়ে অঙ্গীকারপূর্বক, অব্যবহিত ক্ষেত্রে,
প্রত্যেকপ্রকার কিম্বা বিকৃতমতি ব্যক্তির যে চুক্তি তাহা
আদালতে অগ্রাহ্য। চুক্তির একটি বর্গ বেআইনি হইলে
সমস্ত বর্গ বাতিল হইয়া যায়। কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
ঘটনামূলক চুক্তিকে অনিশ্চিত (Contingent) চুক্তি কহে।
এইরূপ চুক্তির উল্লিখিত ভবিষ্যৎ ঘটনা না ঘটিলে কিম্বা উহার
ঘটনা অসম্ভব না হইলে কার্যকারী বা বাতিল হয় না। ঐ
ঘটনা যদি একবারেই অসম্ভব হয়, তবে উভয় পক্ষ জাহুক
আরে না জাহুক চুক্তি বাতিল হইবে। পরস্পর কোন
কার্য করিতে উভয় পক্ষ চুক্তি করিলে প্রত্যেক পক্ষকে
চুক্তির লিখিত অঙ্গীকৃত কার্য করিতে বা করিবার ক্ষমতা
প্রদত্ত করিতে হইবে। স্পষ্ট চুক্তিভঙ্গ প্রতিপন্ন না
হইলে কোন ব্যক্তির মুক্ত হইলেও তাহার উত্তরাধিকারীকে
চুক্তির বর্ত পালন করিতে হইবে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি
কাহারও নিকট মিলিত চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইলে প্রত্যেকে
অপর সকলকেও চুক্তির লিখিত বর্ত পালন করিতে বাধ্য
করিতে পারে। যখন চুক্তির এক পক্ষ নিজ বর্ত পালন করিতে
সম্মত না হয়, তখন অপরপক্ষকে নির্দিষ্ট বর্ত পালন করিতে
হয় না। উভয়ের সম্মতিক্রমে কোন চুক্তি পরবর্তী চুক্তি
দ্বারা রহিত বা পরিবর্তিত হইলে পূর্ববর্তী চুক্তির নিয়ম পালন
করিতে হয় না। উন্নত বা আতুর ব্যক্তিদ্বিগের প্রতি-
পালনাদি বিষয়ে প্রকৃত চুক্তি না থাকিলেও চুক্তি উহা
থাকে এবং আইন মতে বাধ্য না হইলেও অন্য কেহ ঐরূপ
ব্যক্তিকে প্রতিপালনাদি করিলে উহাদের সম্পত্তি হইতে
খরচ পাইতে পারে।

চুক্তির উল্লিখিত বর্ত অঙ্গ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপর
পক্ষের নামে আদালতে ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে পারে,
কিন্তু ঐ ক্ষতি পূর্যক বা অন্য কারণ সম্মত হইলে হইবে না।

কেহ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু অপর ব্যক্তিকে বিক্রয়
করিতে স্বীকার করিলে তাহার আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ লইলে
চুক্তির নিয়মভঙ্গারে সে ঐ বস্তু আর অপরকে বিক্রয়
করিতে পারে না। চুক্তিতে বিক্রয়ত্বকে বিক্রয় বস্তু
বিক্রয়োপযোগী করিয়া দিবার কথা থাকিলে, কতদিন উহা
সম্পন্ন না হয়, কেতা ঐ বস্তু লইতে বাধ্য নহে। চুক্তি দ্বারা
হইলে কেতা ক্রীত বস্তুর মালিকানাধীন মালিক হয়।
বিক্রয় বস্তু বিক্রয়ত্বের অধিকারে না থাকিলেও উহা
বিক্রয়ের চুক্তি হইতে পারে। বিক্রয়ত্ব নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে
ঐ বস্তু সংগ্রহ করিয়া কেতাকে দিতে বাধ্য। চুক্তিতে

বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকিলে বিক্রয় বস্ত্র বিক্রয় কালে যথার থাকে, সেইস্থানেই ক্রেতাকে লইতে হয়। যদি বিক্রয় কালে ঐ বস্ত্র প্রস্তুত না থাকে, তবে যেখানে প্রস্তুত হয় ক্রেতাকে তথায় লইতে হয়। চুক্তিতে বিশেষ নির্দিষ্ট না থাকিলে বিক্রয় সমস্ত মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত আটক রাখিতে পারে।

কেহ কোন বস্ত্র অস্ত্রের নিকট গচ্ছিত রাখিলে রক্ষক ঐ বস্ত্র যথোচিত রক্ষা লইতে বাধ্য। যথোচিত রক্ষা স্বত্বেও ঐ বস্ত্র ক্ষতি হইলে যদি চুক্তিতে অন্যথা কিছু উল্লেখ না থাকে, তবে রক্ষক দায়ী হইবে না। যে বস্ত্র যে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হয়, উহা তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবহারে লাগাইলে উহার ক্ষতি অন্য রক্ষিতা দায়ী। গচ্ছিত বস্ত্র যদি কোন দোষ থাকে, তাহা রক্ষককে বলিয়া দিতে গচ্ছিতকারী বাধ্য, অন্যথা রক্ষকের কোন ক্ষতি হইলে গচ্ছিতকারী তজ্জন্ত দায়ী।

কোন ব্যক্তির ক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধি কর্মচারীর সহিত চুক্তি করিলে প্রথম ব্যক্তির সহিত চুক্তি সিদ্ধ হয়। প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রকাশ দেওয়া না থাকিলে স্থল অনুসারে উহা থাকে। বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিনিধি মালিকের জ্ঞায় কার্য্য করিতে পারে। প্রতিনিধি ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কার্য্য করিলে মালিক তাহা অগ্রাহ বা গ্রাহ করিতে পারেন। তজ্জন্ত কোন ক্ষতি হইলে প্রতিনিধি দায়ী।

এইরূপ কার্য্যের কোন অংশ গ্রাহ করিলে সমস্তই গ্রাহ করা হয়। প্রতিনিধি মালিকের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, প্রকাশ আদেশ না থাকিলে ব্যবহারানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য। মালিক প্রতিনিধির আইন সমস্ত সমস্ত কার্য্যের জন্য দায়ী থাকেন। বেআইনী কার্য্যের জন্য মালিক দায়ী নহে।

চূড় (স্ত্রী) চকতে তৃপ্যাত্যনে চক-রক্ উৎক (চকিরমো-রুচোপধারাঃ। উণ্ ২।১৪।) ১ অন্নরস। ২ অন্নদ্রব্যবিশেষ। চলিত কথায় মহাদা বলে। পর্য্যায়—তিস্তিভীক, বৃক্ষান, চূড়ক, মহান্ন, অন্নবৃক্ষক। ৩ পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চূক বলে। পর্য্যায়—চূড়বাস্তুক, লিচুচ, অন্নবাস্তক, দলাস, অন্নশাক্য, অন্নাদি, হিলমোচিকা। ইহার গুণ—অন্নরস, লঘু, উষ্ণ, বাতশূন্যনাশক, ক্ষতিকর, অগ্নিবর্জক, পিত্তবৃদ্ধিকর, পথ্য। ৪ শুক্লবিশেষ। ৫ কাজিকবিশেষ, চলিত কথায় কাঁজি বলে। পর্য্যায়—সহস্রবেধ, রসান্ন, চূড়বেধক, শাকান্ন, ভেদন, চন্দ্র, অন্নসার, চূড়িকা। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, তিক্ত, অন্ন এবং কক, পিত্ত, নাসিকারোগ, হৃগ্ন ও শিরঃপীড়া-

নাশক। (রাজনি) ৬ রসান্ন। ৭ সন্ধানবিশেষ। বৈদ্যক পরিভাষায় মতে মছাদি, শুড়, মধু ও কাজিক একটা পরি-কার পাড়ে রাখিয়া তিন রাজি পর্য্যন্ত বানের মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে চূড় বলে (১)। (পুং) ৮ অন্নবেতস।

চূড় স্বল্প, পরিষ্কৃত ভাঙে শুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ধাত্তরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। ঐ বিকৃত বস্ত্র নাম শুক বা চূড়। বৃহৎ চূড়ের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ইহাকে স্বল্প চূড় বলা হয়।

চূড় বৃহৎ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—একটা কলসে শুণ্ডলোদক ৪ সের, কাঁজি ১২ সের, দধি ২ সের, কাঁজির অধঃস্থ সিটি ১ সের, শুড় ২ সের একত্র কেলিয়া তাহাতে স্বকরহিত খণ্ড খণ্ড আদা ২ সের, সৈন্ধবলবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ পল। এই সকল প্রদান করিয়া সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিয়া ধাত্ত রাশির অভ্যন্তরে রাখিবে।

গ্রীষ্মকালে ৩ দিন, শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধাত্তাদির মধ্যে রাখিতে হয়। অনন্তর ধাত্তরাশির অভ্যন্তরে হইতে ভাঙ উদ্ধার করিয়া শুড়স্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎ শুক বা বৃহৎ চূড়। ইহাতে মন্সামি, শূল, শুন্ম প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর)

চূড়ক (স্ত্রী) চূড়-সংজ্ঞার্থে কন্। ১ শাকবিশেষ, চূকাপালঙ্গ। ইহার গুণ—ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং শুক, ইহা বিলম্বে জীর্ণ হয়। (রাজবল্লভ) চূড়-স্বার্থে কন্। ২ [চূড়দেখ।] চূড়ফল (স্ত্রী) চূড়ং ফলং যন্ত বহুব্রী, যস্মা চূড়ং ফলতি কল-অচ। বৃক্ষান্ন। (রাজনি) [বৃক্ষান্ন শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।] চূড়বাস্তুক (স্ত্রী) চূড়ং বাস্তুকমিব। শাকবিশেষ, চূকা-পালঙ্গ। (রাজনি)

চূড়বেধক (স্ত্রী) চূড়মিব বিধতি বিধ-ধূল। কাজিকবিশেষ। চূড়। (স্ত্রী) চূড়-টাপ্। ১ চান্দ্রেরী, আমরুল। ২ তিস্তিভী। চূড়ান্ন (স্ত্রী) চূড়মিবান্নং। ১ বৃক্ষান্ন। ২ শাকবিশেষ, চূকা-পালঙ্গ।

চূড়ান্না (স্ত্রী) চূড়মিব অন্নং অন্নং যন্ত বহুব্রী, টাপ্। অন্ন-লোপিকা, আমরুল।

(১) “যদ্বাদি শুড়ো ভাঙে শুড়স্বকোজকাজিকং।

ধাত্তরানো দ্বিরাভবৎ শুকং চূড়ং তদ্ব্যতীতং।” (বৈদ্যকপরি)

চুক্রিকা (স্ত্রী) চুক্রো বিস্ততে ইত্যঃ চুক্র-ঠন্ টাপ্ অন্ত ইৎ।

১ অম্ললোণিকা, আমরুল। পর্যায়—চাকেরী, দন্তপাঠা, অঘটা, অম্ললোণিকা। ২ কুচালেরী, চুকাপালক। ৩ তিস্তিকী।

(ভাবপ্রকাশ।)

চুক্রী (স্ত্রী) চুক্র গোলাদিবাৎ ভী। চাকেরী, আমরুল।

ইহার গুণ—অতিশয় অম্লরস, স্বাদু, বাতনাশক, কফ ও শিত্ত-বর্জক, লঘু এবং রুচিকর। বেগুণের সহিত পাক করিলে ইহা অতিশয় রুচিকর হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ।)

চুক্রিমন্ (পুং) চুক্র-ভাবে ইমণি। অম্লস্ব, চুক্রের ভাব।

চুকা (স্ত্রী) চব-বধে বাহুলকাৎ স পূর্বোদরাদিবাৎ সাধু। হিংসা। [চৌক দেখ।]

চুগলখোর (পারসী) নিম্বাকারী।

চুগলখোরী (পারসী) অপবাদের কার্য।

চুঙ্গী (দেশজ) কুজনল।

চুচু (পুং) [চুচ দেখ]।

চুচুক (পুং স্ত্রী) চুচ ইত্যবার শব্দঃ কায়তি কৈ-ক। ১ কুচের অগ্র, স্তনের বোঁটা। পর্যায়—চুচক, চুচক, কুচানন, স্তন-বৃত্ত। ২ দক্ষিণ দেশবিশেষ। (পুং) ৩ তদ্দেশবাসী।

“গুহাঃ পুন্নিলাঃ শবরাশ্চ চুকা মজ্জকৈঃ সহ।”

(ভারত ১২০৭।৪২)

চুচপ (পুং) ১ দেশবিশেষ। [বহু] ২ তদ্দেশবাসী।

“অন্ধ জালচরাশ্চৈব চুচপারগুপান্তথা।” (ভারত ৫।১০৯ অঃ)

চুচু (পুং) চুচ বাহুলকাৎ উ নিপাতনে সাধু। স্থনিবরণাক, চলিত কথায় জুয়ুগী বলে। (ত্রিকাণ্ড)

চুচুক (পুং) চুচুক-পূর্বোদরাদিবাৎ সাধু। স্তনাগ্র, স্তনের বোঁটা।

চুচু (পুং) শাকবিশেষ। বাগ্ভটের মতে ইহার গুণ—পালক্য-শাকের সমান। [পালক্য দেখ।] ইহার বিশেষ গুণ—সংগ্রাহী। সুক্রতের মতে ইহার গুণ—কষায়, স্বাদু, তিক্ত, রক্তপিত্তনাশক, ককর, বায়ুরুদ্ধিকর, পাকে লঘু। কোন কোন আভিধানিকের মতে এই অর্থে “চুচু” শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়।

চুচু (পুং) ১ চুচুলারী, চুঁচ। (হারাবলী) ২ সত্তর জাতি-বিশেষ। বোধায়নের মতে বৈদেহ জাতীয় জীর গর্ভে ব্রাহ্মণের গুণসে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

“চুচুর্মদগুশ্চ বৈদেহবংশিক্রিয়ো ব্রাহ্মণেন জাতৌ” (বোধায়ন) মমুর মতে বভগপ্ত হিংসাই ইহাদের প্রধাম জীবিকা।

“মেদাক্ চুচুমদ গুনামারগ্যপগুহিংসনঃ।” (মহু ১০।৪৮)

৩ ত্রিশত্ব বংশীয় হরিতের পুত্র। (বিষ্ণুপুং ৪।৩।১৫) কোন কোন পুস্তকে চুচু স্থলে চুচু এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

চুচুমারন (স্ত্রী) বাস্তবের জন্ত রূপের অবস্থাবিশেষ।

“কচুক্ষুণ চুচুমারনপ্রায়ঃ পানু বনরজ্জাবী চেতি বাত-
সেনশোণিতেভ্যঃ।” (সুক্রত চিকিৎসিত ১ অঃ) কোন
কোন পুস্তকে চুচুমারন স্থলে চুমচুমারন পাঠ দেখিতে যে
পাওয়া যায়।

চুচুরী (স্ত্রী) চুচুরিব রাসি রা-ক জিরাৎ ভীপ্। তেঁতুলের
বীজ দ্বারা যে দ্যুতক্রীড়া করা হয়, তাহাকে চুচুরী বলে,
তিস্তিকীদ্যুত, কাইবীচির খেলা। (ত্রিকাণ্ড) চুচুলী শব্দও
এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (হারাবলী।)

চুচুল (পুং) গীতপ্রথা প্রবর্তক বিধামিজ মূনির একজন পুত্র।
(হরিবংশ ২৭ অঃ)

চুচুলি [চুচুরী দেখ।]

চুচুলী (স্ত্রী) চুচুরী বিকরে ক্রেকজ লকারঃ। [চুচুরী দেখ।]

চুণ্ডা (স্ত্রী) চুড়ি অচ্ জিরাৎ টাপ্। কুপ। (ত্রিকাণ্ড) কোন
কোন পুস্তকে চুণ্ডা স্থলে চুণ্ডা পাঠ আছে।

চুণ্ডী (স্ত্রী) চুণ্ড গোলাদিবাৎ ভীপ্। উপকুপ, কুপের নিকট-
বর্তী জলাধার। (হেমচন্দ্র)

চুটকিয়া (দেশজ) ছোট।

চুটকি (দেশজ) ১ ঘাছা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। ২ পদা-
বৃত্তের অলঙ্কারবিশেষ।

চুটকিয়া ইন্দুর, একজাতীয় ছোটরকমের ইঁদুর, স্থানবিশেষে
নেওটেকেই চুটকিয়া বলে।

চুটকী, যে গল্প বা উপাখ্যানে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই
অথচ বিলক্ষণ রসিকতাপূর্ণ, তাহাকে চুটকী বলে।

চুড়চি (দেশজ) একপ্রকার মংস্ত।

চুড়ী (দেশজ) অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম স্বর্ণরৌপ্যাদির তারনির্মিত
জীলোকদিগের করাস্তরণ। সোজা ও বাকা দুই প্রকার
চুড়ী হয়। দুই প্রকারেই সূক্ষ্ম ধোদকার্য থাকে। এই
অলঙ্কার অতিশয় লঘু বলিয়া অনেক মহিলা অতি আদরে
পরিধান করেন।

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত পিতল প্রভৃতির গিল্টি করা চুড়ীও
বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কাচ, গালা, শঙ্খ, হস্তীদন্ত
ইত্যাদিরও চুড়ী প্রস্তুত হয়। আজকাল নানারূপ কাচের
চুড়ী এদেশের সকল শ্রেণীর জীলোকই পরিধান করিতেছে।
এই সকল চুড়ী কাল, লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি সকল
রঙেই হইয়া থাকে। কখন কখন এই সকল চুড়ী স্বর্ণ-
রৌপ্যাদির জার সংযুক্ত করা হয়। উৎকৃষ্ট কাচের চুড়ীতে
নানারূপ ফুলকাটা থাকে। বাজারে বহুপ্রকার চুড়ী দেখিতে
পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট চুড়ী ১৪ টাকা ২ টাকা জোড়া বিক্রয়

হয়। ভারতবর্ষে, গাজিপুর, কান্দি, লক্ষৌ, দিল্লী, হাজিপুর, পাটনা, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও পুণার নিকটস্থ শিবপুরে কাচের চুড়ী প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য উৎকৃষ্ট কাচের চুড়ী বিলাত, চীন প্রভৃতি স্থান হইতে আইসে। গালাচ চুড়ী প্রায় পৈশের সর্বত্রই প্রস্তুত হইতেছে। গালা ও মাটি মিশাইয়া প্রথমতঃ চুড়ী প্রস্তুত হয়, পরে উহার উপরে লাল, নীল, সবুজ, হলুদে প্রভৃতি রঙের গালা দিয়া রং করা হয়। রং করা হইলে অনেক সময় উহার উপরে কাচের মালা, স্নাতা, চুম্বকি, ক্ষুদ্র রত্নিন কাচ ইত্যাদি বসাইয়া সজ্জা করা হয়। গালাচ সহিত ধাতুর গুঁড়া মিশাইয়া উহা চুড়ীর উপর মাখাইলে চুড়ী ধাতুর স্ফার আভাযুক্ত হয়।

আসামের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ গালাচ চুড়ী তৈয়ারের প্রধান স্থান। দিল্লী, রেবা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট গালাচ চুড়ী প্রস্তুত হয়।

পূর্বে সখা জীলোকমায়েই শঙ্খ পরিধান করিতেন। এখনও অনেকে শাঁখের বালা ও শাঁখের চুড়ী পরিতেছেন। ঢাকা নগরেই এক্ষণে সর্বোৎকৃষ্ট শাঁখের চুড়ী নির্মাণ হয়। এই সকল চুড়ী গালা দ্বারা রঞ্জিত ও চুম্বকী ইত্যাদি দ্বারা সজ্জাভিত হইয়া থাকে। ঢাকার জলতরঙ্গ, ডায়মণ্ডকাটা, কার্ণিশদার প্রভৃতি নানা প্রকার শাঁখের চুড়ী প্রস্তুত হয়।

পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, রাজপুতনার পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ও মধ্যপ্রদেশের অনেক স্থানে ও বাল্কালায় কোন কোন স্থানে হস্তীদন্তের চুড়ী ব্যবহার হয়। পঞ্জাবে বিবাহের সময় কস্তার মাতুল তাহাকে এক জোড়া রং করা ও চুম্বকি বসান হাতীর দাঁতের চুড়ী প্রদান করে। উচ্চশ্রেণীর জীলোকেরা বিবাহের পর এক বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ চুড়ী পরিধান করিয়া থাকে, অনন্তর স্বর্ণরৌপ্যাদির আভরণ পরে। রাজপুতানা রেলওয়ের বোধপুর শাখায় অবস্থিত পালিনগর হাতীর দাঁতের চুড়ী ব্যবসার প্রধান স্থান।

মহিবর্ষ হইতেও চুড়ী প্রস্তুত হইতেছে। এই চুড়ীর উপর স্বর্ণরৌপ্যাদির নানারূপ লতা পাতা কাটা থাকিলেও অতি সূক্ষ্ম ও মূল্যবান হয়।

চুণী (হিন্দী) রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র রত্নবিশেষ, স্থানবিশেষে চুণীমুক্তাও বলিয়া থাকে। [চুণী দেখ।]

চুত (পুং) চোততি ক্রতি শোণিতাদিকমন্বাৎ চুত বাহুলকাৎ যঞর্থেকঃ। ১ মলবার। ২ ঘোনি। (শব্দরত্না)

চুতি (স্ত্রী) চোততি ক্রতি মলশোণিতাদি বস্তাঃ চুত-ইন্ (সর্গধাতুভ্যাইন্। উণ ৪।১১৭) মলবার (শব্দরত্নাবলী)

চুনন, (দেশজ) ১ বাছন। ২ নির্কীচন।

চুন্যরগড় [চুন্যর দেখ।]

চুনী, চুণী, রত্নবিশেষ। সংস্কৃত পৰ্য্যায়—মাণিক্য, শোণরত্ন, রত্নরাজ, রত্নমত্ন, শৃঙ্গারী, রত্নমাণিক্য, তরুণ, রাগবৃক্ষ, পদ্ম-রাগ, রত্ন, শোণোপল, সৌগন্ধিক, লোহিতক, কুরুবিজ।

আধুনিক জহরীগণ রক্তবর্ণ বহুমূল্য অনেক প্রকার প্রস্তরকে চুণী আখ্যা প্রদান করেন। রত্নশাস্ত্রে মাণিক্যরত্নের বৈকল্প লক্ষণাদি নির্ণীত আছে, তৎপাঠে অনুমিত হয় যে, আধুনিক চুণী নামক প্রস্তরকেই পূর্বে মাণিক্য বলিত। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য ইত্যাদি ভেদে জহরীগণ চুণীকে চারি ভাতিতে বিভক্ত করেন, যথা চুণী নরম, চুণী স্তাময়েৎ, চুণী কড়া ও চুণী মাণিক্য। শেখোক্ত চুণী মাণিক্যই প্রাচীন পদ্মরাগমণি। ইহার ইংরাজী নাম Oriental ruby, অস্তান্ত চুণী Spinel ruby, Brass ruby, Almandine ruby ইত্যাদি নামে খ্যাত।

চুণী মাণিক্য, পদ্মা, মরকত ইত্যাদি কয়েকটা রত্নের রাসায়নিক উপাদান একরূপ। ইহারা সকলেই আলুমিনিয়াম (Aluminium) ও অক্সিজেন (Oxygen) এই দুই মূল পদার্থ-যোগে উৎপন্ন (Al: 2, O3)। কুরুন্দ প্রস্তর (Corundum) ঠিক ঐ সকল পদার্থযোগে উৎপন্ন। সুতরাং অঙ্গারের সহিত হীরকের বৈকল্প সম্বন্ধ, কুরুন্দ প্রস্তরের সহিত চুণী ইত্যাদিরও সেইরূপ সম্বন্ধ। চুণী ইত্যাদি প্রস্তর অতি কঠিন ও স্বচ্ছ। চুণীর বর্ণ সচরাচর গাঢ় লোহিত, লোহিত, গোলাপী লোহিত, পীতাত লোহিত, ঈষন্মোহিত ও নীলাভ লোহিত হইয়া থাকে। হীরক ব্যতীত পার্থিব যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা চুণী কঠিন, হীরকের কাঠিন্য ১০ হইলে চুণীর কাঠিন্য ৯ ও নরম চুণীর কাঠিন্য ৮ হইবে। সুতরাং হীরক ভিন্ন অপর কোন পদার্থ চুণীর মত কঠিন হইবার নহে। এই বিশেষ গুণ থাকাতে নকল চুণী হইতে প্রকৃত চুণী অনায়াসে পৃথক করা যাইতে পারে। দুইখানি চুণী লইয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে যেটিতে দাগ পড়িবে তাহা অপকৃষ্ট ও যেটিতে দাগ পড়িবে না সেইটাই উৎকৃষ্ট ধরিতে হইবে। সচরাচর চুণী নরম (Spinel) হইতে চুণী মাণিক্য (Ruby) এইরূপেই চেনা যায়। এই (Spinel) প্রস্তরের রাসায়নিক উপকরণ ম্যাগ্নিসিয়াম (Magnesium), আলুমিনিয়াম (Aluminium) এবং অক্সিজেন (Oxygen), (Md. O. Al 2, O3)। খাঁটি চুণী ও Spinel দেখিতে প্রায়ই একরূপ, কিন্তু খাঁটি চুণীর গুরুত্ব, ঔজ্জ্বল্য ও আলোকবিকীর্ণ-শক্তি অধিক। উহাদের রাসায়নিক উপাদানের উল্লিখিত রূপভেদ আছে। আরও Spinel প্রস্তরের দ্বান চুণীর

দানা হইতে বিভিন্ন এবং ইহা অন্ত্যস্ত যাবতীয় পদার্থ হইতে কঠিন হইলেও হীরক ও চুণী অপেক্ষা কোমল, সুতরাং চুণী দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে। উত্তর প্রকার প্রস্তরই স্বচ্ছ, অতি অল্প পরিমাণে লোহ ও ক্রোমিয়াম্ ধাতুমিশ্রিত থাকিতে উহাদের লোহিতবর্ণ উৎপন্ন হয়। চুণী কোন প্রকার দ্রাবকেই দ্রব হয় না। সহজ উত্তাপে চুণীর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সোহাগা যোগে অতিশয় উত্তপ্ত করিলে চুণী গলিয়া বর্ণহীন কাচে পরিণত হয়।

যেমন চুণী গলাইয়া কাচে পরিণত করিতে পারা যায়, সেইরূপ উহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিলে কাচ হইতে চুণীও প্রস্তুত হইতে পারে। বাস্তবিক ক্রোমিয়াম্ ধাতুযুক্ত কাচ হইতে অতি কঠিন নকল চুণী প্রস্তুত হয়। এই সকল নকল চুণী হইতে প্রস্তুত চুণী বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন।

চুণী মণিক্ অর্থাৎ মণিকোর দোষ গুণ, জাতিবিভাগ, এবং ধারণ ফল ইত্যাদির শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও প্রাচীন নিয়মে পরীক্ষা প্রভৃতির শাস্ত্রীয় মত মণিক্য ও পদ্মরাগ শব্দের পরিভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইবে। এস্থলে আমরা চুণীর বর্তমান ব্যবহার, পরীক্ষা, উৎপত্তিস্থান, মূল্য ইত্যাদির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট চুণী পাওয়া যায়। তন্মিহ বোহিমিয়া, জাম, স্মাভা, বোর্নিও এবং পেশু প্রদেশে নানাপ্রকার হীন জাতি চুণী ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে বিরলী-মোদো ও বোলশীগমনী নামক দুই স্থানে সচরাচর কুরুন্দ প্রস্তর (Curundum) ও নিস্ (Gneiss) প্রস্তরের সহিত চুণী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিচিনগড় তালুক ও মল্লপোল্লাই নামক স্থানেও অল্প পরিমাণে চুণী পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের চুণীক্ষেত্র সকল সূক্ষ্মীট হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৭০ সালে মিঃ ব্রেডমিয়ার (Mr. Bred Meyer) যে চুণীক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারক ছিলেন, উহা মান্দালা হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী। পিয়ার ডি আমেটো (Pere de Amato) যে রত্নক্ষেত্র দর্শন করেন, উহা আবা নগরের ৬০৭০ মাইল দৈর্ঘ্যকোণে অবস্থিত।

এই রত্নক্ষেত্রের পরিমাণ ফল প্রায় ৬৬ বর্গমাইল। ২১৩ ফিট বা ততোধিক নিম্নে একটী স্তরে রত্ন পাওয়া যায়। এই রত্নস্তরের বেধ কোথাও ২ ইঞ্চি মাত্র, কোথাও বা ২১৩ ফিট। রত্নসংগ্রহকারিগণ গর্ত কাটিয়া রত্নস্তরের স্তুতিক্য খোঁত করিতে থাকে। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুণী বাহির হইয়া পড়ে। এই সকল চুণী অধিকাংশই $\frac{1}{4}$ এক চতুর্থাংশ রতি অপেক্ষাও

কম। কচিং বৃহদাকার চুণী পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের আকার গোল ও গাঢ় অনেকটা মক্ষণ। ইহা একটা বড় চুণী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার নির্যোব ও অক্ষুর নহে, মিঃ পিয়ার্স বলেন, তিনি আবা ভোলা অপেক্ষা অধিক ওজনের অক্ষুর চুণী একটাও দেখেন নাই। এই চুণীক্ষেত্র পূর্বে ব্রহ্মরাজ্যের খাস ছিল। ইহা হইতে তাহার প্রতি বৎসর লক্ষাধিক বৃত্তা আর হইত। ইহা ছাড়া এক নির্দিষ্ট পরিমাণ (১০০ তিকল) অপেক্ষা বড় চুণী পাইলে তাহা রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইত। কেহ এই চুণী পাইয়া নিজের কাছে রাখিলে গুরুতর দণ্ডনীয় হইত। কিন্তু এইরূপ গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক বড় চুণী রাজকোষগত হইত না। জহরী-গণ এইরূপ মণি পাইলে, হয় ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া ফেলিত, না হয় গোপনে চীন, ভারতবর্ষ, পারস্ত ইত্যাদির সওদাগর-গণকে বিক্রয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইত। ইংরাজরাজ ব্রহ্মদেশ জয় করিলে ব্রহ্মের রাজভাণ্ডারে যে সকল মণি পাওয়া যায়, তাহা সাউথ কেন্সিংটন মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটা ব্যতীত অপর সকলগুলিই কোন না কোন দোষবৃত্ত। ইহাতে বোধ হয় উৎকৃষ্ট বহুমূল্য চুণী অতিশয় বিরল ছিল। কেননা এইরূপ চুণী অধিক উৎপন্ন হইলে রাজভাণ্ডারে নিশ্চয়ই দু দশটা সঞ্চিত থাকিত।

এই রত্নখনি ব্যতীত মান্দালার ১৬ মাইল দূরে সেগিয়ান নামক মন্ডরপ্রস্তরের পর্বতে অপেক্ষাকৃত হীন জাতি প্রস্তর পাওয়া যায়। মান্দালার ১৫ মাইল উত্তরে চুণীক্ষেত্রের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ শুনা যাইতেছে, কিন্তু ঠিক জানা যায় নাই।

উল্লিখিত উপায়ে গর্ত দ্বারা মণিসংগ্রহ ব্যতীত আরও তিন প্রকার উপায়ে ব্রহ্মদেশে রত্নাদি সংগৃহীত হয়। পর্বতের গায়ে নালা কাটিয়া উহাতে বেগে জল ছাড়িয়া দেয়। জলে কর্দম ধুইয়া যায় ও প্রস্তরাদি নিম্নে পড়িয়া থাকে। পরে তাহা হইতে মণি বাছিয়া লয়।

আর একরূপে অতি উৎকৃষ্ট চুণী পাওয়া যায়। পর্বতের ত্তরবিশেষ জলের স্রোতে ধুইয়া যায় এবং উহার রত্নাদি স্থানে স্থানে শুহাতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। রত্নাহুসন্ধিৎসুগণ পর্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সকল শুহা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। কোথাও ঐ রূপ শুহা দৃষ্ট হইলে তাহার নিম্ন হইতে খুঁড়ি করিয়া প্রস্তরাদি তুলিয়া আনে এবং চুণী, পান্না ইত্যাদি বাছিয়া লয়। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চুণীসকল এইরূপেই পাওয়া গিয়াছে।

এক প্রকার কঠিন প্রস্তরের ভিতর হইতেও চুঙ্গী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির করিবার সময় অনেক চুঙ্গী কাটিয়া যায়। যদি হইতে যে চুঙ্গী পাওয়া যায়, তাহাকে কাটিয়া মাঝিয়া লইতে হয়। সচরাচর হীন জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুঙ্গী ওড়াইয়া ভাঙ্গিয়া এই কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরে উহাকে শিল্প বা তামা দ্বারা পালিশ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

চুঙ্গী ব্যতীত আরও নানা রূপ মূল্যবান প্রস্তর ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮৯ সালে ৩৩,৮৪৮ টাকা মূল্যের ৬৫৬২৮৫ ক্যারাট (প্রায় ১৩১২৭ রতি) চুঙ্গী ও ২৫৯ টাকা মূল্যের ৪৪২৬ ক্যারাট (প্রায় ৮৯৯২ রতি) স্পিনেল (Spinel) অর্থাৎ নরম চুঙ্গী ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়।

সম্রাতি শ্রামদেশে বাঙ্ক নগর হইতে চারি দিবসের পথে চুঙ্গী ও পাথর খনি বাহির হইয়াছে। এখানকার মণি ব্রহ্মদেশের মণির দ্বার উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ঘোর গোলাপী। খুঁত জহরীগণ এই প্রস্তরকে সিংহলের মণি বলিয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে বহু মূল্যে বিক্রয় করে।

তুর্কিস্থানের অন্তর্গত বদকশ নামক স্থানে অল্প পরিমাণে উৎকৃষ্ট চুঙ্গী পাওয়া গিয়াছে। অক্সস নদীর তীরবর্তী স্থান ও চরণ নামক স্থানেও অল্প চুঙ্গী পাওয়া যায়। তথাকার লোকের বিশ্বাস যে চুঙ্গী সর্বদা জোড়া জোড়া থাকে। সুতরাং একটি পাইলে আর একটি চুঙ্গী যতদিন না পায়, প্রথমটিকেই ভাঙ্গিয়া দুইটি করিয়া ফেলে।

অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি হইতে অনেক চুঙ্গী পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই অপকৃষ্ট প্রস্তর মাত্র।

সিংহল, আবা, মহিষ, বেলুচিস্থান এবং যুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক নদীগর্ভে কঙ্করাদির সহিত নরম চুঙ্গী (Spinel) পাওয়া যায়। স্পাইডেন ও সিংহলে নীলবর্ণ নরম চুঙ্গী দৃষ্ট হয়। সবুজ কাল ইত্যাদি নরম চুঙ্গীও পাওয়া গিয়া থাকে। ফল কথা ঐ সমস্ত প্রস্তরের উপাদান ও গঠন একরূপ, কেবল বর্ণ দ্রব্যের সামান্য ইतरবিশেষ হওয়ার লোহিত, নীল, হরিত প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে। ত্রৈলিঙে বর্ণ-হীন চুঙ্গীও পাওয়া গিয়াছে।

নির্দোষ বৃহদাকার চুঙ্গী অতি দুর্লভ বলিয়া সময়ে সময়ে ইহার মূল্য হীরক অপেক্ষাও অধিক হয়। বর্তমান সময়ে অক্সরতি ওজনের নির্দোষ চুঙ্গী ১০ হইতে ১০০ টাকার বিক্রয় হইতে পারে।

২ রতি ওজন চুঙ্গীর মূল্য	১৪০০	হইতে	২০০০
৩ " " " " "	২৫০০	"	৩৫০০
৪ " " " " "	৭০০০	"	৮০০০
৬ " " " " "	২০০০	"	২৫০০
৮ " " " " "	৪০০০	"	৪৫০০

৮ রতি অপেক্ষা অধিক ওজনের চুঙ্গী অতি বিরল, সুতরাং তাহাদের মূল্য নির্দিষ্ট হইতে পারেনা।

চিকুয়ুজ অহুজ্জল, অত্যন্ত ঘোর কিম্বা ফিকে লোহিত বর্ণ চুঙ্গীর মূল্য সচরাচর অনেক কম হইয়া থাকে। এইরূপ ৪ রতি ওজনের একটি চুঙ্গী ১২০ টাকা অপেক্ষাও অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। জহরীর দোকানে অনেক রকম চুঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ব্রহ্ম ও শ্রামদেশের চুঙ্গীই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক মূল্যবান।

নরম চুঙ্গীর দর অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ক্ষুদ্র নরম চুঙ্গী প্রতি রতি ২৫ হইতে ৫০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। মাঝারি ও বড় আকারের হইলে প্রতি রতি ১০০ হইতে ৫০০ টাকাতেও বিক্রয় হয়। ফল কথা, ইহাদের মূল্য ক্রেতার সখ ও খেয়ালের উপর নির্ভর করে।

নানারূপ প্রস্তর প্রকৃত চুঙ্গী বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কুরুন্দ প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে ইহাদের কোমলতা ও ওজন করিলে লঘুতা বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে তাহাদের জাতি স্থির করা যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুঙ্গী টেক ঘড়িতে বসান হইয়া থাকে। ঘড়ির চাকার স্থান পিভট (Pivot) চুঙ্গীর ছিদ্রে বসান থাকিলে চাকা অতি সহজে ঘুরিতে পারে। এই সকল চুঙ্গী ব্যবহার্য হইলেও বিস্তর পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের মূল্য অতি অল্প।

পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে চুঙ্গী অর্থাৎ মাসিক অঙ্গ-কারে রাখিলে আলোক প্রদান করে। উহা নিতান্ত অমূলক নহে। চুঙ্গীর আলোক শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। দিবাভাগে রোদ্রে রাখিলে রাত্রিতে উহা হইতে প্রভা নির্গত হয়। আরও অনেক প্রস্তরের এইরূপ গুণ আছে।

প্রায় সকলদেশেই পূর্বকালের লোকেরা বিশ্বাস করিত যে চুঙ্গী ধারণ করিলে অনেক বিপদ ও রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়। আবার অনেকের বিশ্বাস, যে পশুরাগ মণি বিবর্ণ ও হীনপ্রভ হইলে শীঘ্রই ধারকের কোন দুর্ঘটনা ঘটে।

টাতারিয়ার লিথিয়া গিয়াছেন—পারস্তরাজের কপোত-অঙ্কুরিত একটি চুঙ্গী ছিল। এই চুঙ্গীর মধ্যে ছিদ্র ছিল এবং ইহার লাভ্য অতি চমৎকার। রুশিয়ার সম্রাটী ক্যাথারাইনের মুকুটে একটি কপোত অঙ্কুরিত চুঙ্গী ছিল।

সুইডেনের তৃতীয় গুস্তাভাস (Gustavus III) ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ আগমন উপলক্ষে ক্যাথারাইনকে উহা উপঢৌকন প্রদান করেন। ইংলণ্ডের রাজমুকুটের সমুখভাগে একটা বৃহৎ চুণী আছে। ১৩৬৭ খৃঃ অব্দে ডনপেড্রো এই চুণী এডওয়ার্ড দি ব্ল্যাকপ্রিন্সকে (Edward the Black Prince) প্রদান করেন। সর্কাপেকা বৃহত্তম চুণীমাণিক সম্প্রতি রুবিয়ার রাজমুকুটে শোভা পাইতেছে। সাইবিরিয়ার শাসনকর্তা প্রিন্স গার্গেরিন চীন হইতে এই চুণী প্রাপ্ত হন।

প্রবাদ আছে, মহারাজ রণজিৎসিংহের ১৪ তোলা ওজনের একটা চুণীমাণিক ছিল। এই চুণীর গায়ে অরজজের, আফদশাহ প্রভৃতি বাদশাহদিগের নাম খোদা ছিল।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজভাণ্ডারেই এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগের গৃহে নানা আকারের চুণী আছে।

কঠোর, পদক, অজুরীক, ঘড়ির লকেট ইত্যাদিতে চুণী বসাইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়।

চুন্দ (পুং) বুদ্ধদেবের এক শিষ্য।

চুন্দী (স্ত্রী) চোদতি প্রেরণতি নারকাদীন চুদ বা নিপাতনে সাধু। কুটনী, কুটনী। (হেম ৩।১২৭)

চুপ্ (দেশজ) নীরব, মৌন।

চুপ্‌চাপ (দেশজ) বাক্যরোধ, কথা না বলা।

চুপড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্র করড়িকা, টুকরী।

“চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।

মাগোর বসন পরি ভূমে লগা কোঁচা।” (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

চুপড়িয়া (চুপড়ি শব্দজ)

চুপড়ী [চুপড়ি দেখ।]

চুপড়ী আলু (দেশজ) এক প্রকার আলু। ইহা ধামআলু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই আলু শাদা, ইহার ফুল অতি সুগন্ধ।

চুপিচুপি (দেশজ) আঁতু আঁতু, অপ্রকাশ্য ভাবে।

চুপুণীকা (স্ত্রী) চুপ-বাহলকাৎ উনঙ্ ততঃ স্বার্থে-ঈ-কক্। ইষ্টকাবিশেষ, যজ্ঞের আশ্বিন রাখিবার নিমিত্ত যে ইট লওয়া হয়।

“ইষ্টকা চুপুণীকা নামাসি।” (কৃষ্ণযজুঃ ৪।৪।৫।১) কোন কোন আভিধানিক ‘চুপুণীকা’ স্থলে ‘চুপুণীকা’ পাঠ করেন।

চুপ্য (ত্রি) চুপ্-ক্যাপ্। ১ যে স্ব্যক্তি ধীরে ধীরে গমন করেন। ২ গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবিশেষ। কোন বৈয়াকরণিকের মতে এই শব্দটা অশ্বাদিগণ্যকর্ত্ত।

চুবান (দেশজ) ডুবান, নিমগ্ন করা।

চুবুক (স্ত্রী) চিবুক-প্ৰবোধাদিবাং সাধু। [চিবুক দেখ।]

“চুবুক দয়বো।” (আপভ্রংশ)

চুত্র (স্ত্রী) চুষ্যতে অনেক চুবি-র নকার লোপশ্চ। (উৎ ২।২৮) মুখ। (উপাধিকোব)

চুম (চুষন শব্দজ) চুষন। “এক-বলি মড়া মুখে মাতা বেন চুম। বিরলে শোয়ারে বলে বাছা বাও মুম।” (শ্রীধর ৪ সর্গ)

চুমা (চুষন শব্দজ) চুষন।

চুমাচুমি (চুমাশব্দজ) পরস্পর পরস্পরকে চুষন।

চুমুক (দেশজ) পানীয় দ্রব্য খাইবার জন্য তাহার আধারে ওঠ সংযোগ।

চুমুরি (পুং) ঋষেদপ্রসিদ্ধ একটা অশুর। ইজের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। “ধুনী চুমুরী বাহসিষপু।” (ঋক্ ৬২।১৩) ‘ধুনিস্ চুমুরিস্তেত্যেতন্নামকাবহুরৌ।’ (সারণ)

চুমুরী, নারিকেল, খেজুর বা তাল পাঁচের অবয়ববিশেষ। এই সকল গাছের অগ্রভাগে থাকে। প্রথমে অপর একটা কোষের মধ্যে থাকিয়া কিছুদিন পরে কোষ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেই ফল ও ফুল হইয়া থাকে।

চুমুকী (চুমুক শব্দজ) ১ জলপাত্রবিশেষ, ক্ষুদ্র ঘটা। ইহাতে প্রায়ই চুমুক দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে চুমুকী বলে।

২ পরিচ্ছাদির শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্মিত উজ্জল চাক্‌চিক্যশালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা ধাতুখণ্ড। ইহাদিগকে তারা বা সিতারাও কহে। পট্ট ও উর্গা বস্ত্রনির্মিত টুপি, অঙ্গরেখা, চোগা, উড়ানী ইত্যাদি বহুমূল্য কারচবের চিকণ চুমুক দ্বারা সজ্জাভিত হইয়া থাকে। চিকণ কাজের প্রচুর পরিমাণে চুমুক ব্যবহৃত হয়। তত্ত্বিন্ন বাত্মানটকাদির ও প্রতিমার ডাকসজ্জাও তারকসির সহিত বিস্তর চুমুক থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের তার পিটয়া খুব পাতলা করিয়া তাহা হইতে চুমুক প্রস্তুত হয়। পূর্বকার মুসলমান নবাবগণের প্রায় সকল রাজধানীতেই স্বর্ণরৌপ্যাদির সন্মুখ তার ও চুমুক প্রস্তুত হইত। তামা, পিত্তল ও রায় ইত্যাদি গিল্টিকরা চুমুক স্ফলভ কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চুষ (পুং) চুবি ভাবে ষঞ। চুষন, মুখে মুখ স্পর্শ।

চুষক (পুং) চুষতি আর্কষতি লৌহং চুবি-ধূল্। লৌহকর্ষক মণি, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদি করেকটা গুণসম্পন্ন বস্ত্র-বিশেষ। সংস্কৃত পর্যায়—কান্তপাষণ, অরহাস্ত, লৌহকর্ষক।

চুষক হইপ্রকার, স্বভাবজ ও কৃত্রিম। ভারতবর্ষ, সুইডেন প্রভৃতি স্থানে খনি হইতে যে চুষক প্রস্তুত পাওয়া যায় তাহাই স্বভাবজ চুষক। এই প্রস্তুত লৌহ ও অরহাস্ত যোগে উৎপন্ন একরূপ লৌহপ্রস্তুত মাত্র। কিন্তু অতিশয় বিরল। আর ইম্পাত হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে

চুম্বক প্রভূত হয়, তাহাই কৃত্রিম চুম্বক। শেরেস্তা প্রকার চুম্বকই সুলভ ও সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুম্বকের প্রধান ধর্ম এই যে, ইহা লৌহ আকর্ষণ করে এবং একটি চুম্বকশলাকা অবাধে চারিদিকে ঘুরিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ঐ শলাকার একপ্রান্ত নিয়তই একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করে।

চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণশক্তি ইহার দুই প্রান্তেই সর্বাধিক। একটি কৃত্রিম চুম্বকশলাকা লৌহচূর্ণের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে অধিকাংশ লৌহচূর্ণ দুইপ্রান্তেই সংলগ্ন হয়, মধ্যস্থান প্রায় চূর্ণশূন্য থাকে। এই মধ্য স্থানকে সমমণ্ডল কহে। দুই প্রান্তের মধ্যে অবাধে ঘুরিতে পারিলে যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে, তাহাকে উত্তরমেরু বা সূর্যমেরু এবং যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে, তাহাকে দক্ষিণমেরু বা কুমেরু কহে।*

একটি চুম্বকশলাকার উপর একটুকরা পুরু কাগজ রাখিয়া উহার উপর লৌহচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে, ঐ সকল চূর্ণ এক প্রকার রেখাকারে সজ্জিত হয়। ঐ সকল রেখাচারী চুম্বকাকর্ষণের দিক ও পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত চুম্বক-শলাকার নাম চুম্বক-স্থচী। সচরাচর চুম্বক-স্থচী পাতলা ইস্পাতের পাতদ্বারা নির্মিত হয়। ইহার মধ্যভাগ ঈষৎ আরত এবং দুই প্রান্ত ক্রমে স্থূল। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র গর্ত থাকে। একটি স্থচীর স্থূল অগ্রভাগে ঐ চুম্বক-স্থচী বসাইয়া দিলে উহা এক নির্দিষ্টভাবে অবস্থিত হয়। বিচলিত হইলে পুনর্বার পূর্বাৱস্থা পাইতে চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা বা চুম্বক-স্থচী প্রায় উত্তর দক্ষিণে দাঁড়ায়। কিন্তু এই উত্তর দক্ষিণ ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রকৃত উত্তর দক্ষিণের সহিত এক নহে। অনেক স্থলে চুম্বকের কাঁটা প্রকৃত উত্তরের অনেক অংশ পূর্বে বা পশ্চিমে দাঁড়ায়; ইহাকে চুম্বকোপস্থিতি (Magnetic declination) বলা যায়। এই চুম্বকোপস্থিতি একস্থানে ও সকল সময় সমান থাকে না। ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর নানাস্থানের চুম্বকোপস্থিতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল নিরমায়ুসারেই নাবিকদিগের দিগদর্শনযন্ত্র (Compass) নির্মিত হয়। নাবিকগণ ঐ যন্ত্র ও চুম্বকোপস্থিতির একটি তালিকা সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র অকুল সমুদ্র মধ্যেও দিগনির্ণয় করিতে পারে। চুম্বক-স্থচী যে রেখার দাঁড়ায় উহাকে ঐ স্থানের চৌম্বকীয় জাখিমা কহে।

* ক্রমসীমণ চুম্বকশলাকার যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে, তাহাকে সূর্যমেরু ও যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে, তাহাকে কুমেরু কহিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাই সঙ্গত।

[পৃথিবীর নানাস্থানের চৌম্বকীয় জাখিমার চিত্র ও অস্ত্রান্ত বিবরণ দিগদর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

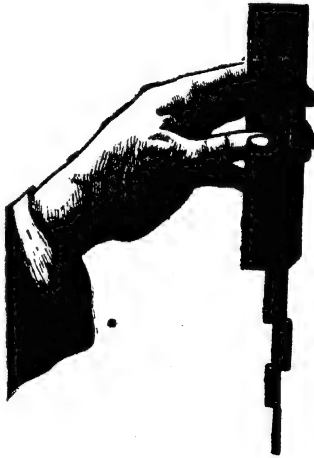
একটি চুম্বক-স্থচী চৌম্বকীয় জাখিমার অবস্থিত একটি দণ্ডারবান সমভালে অবাধে ঘুরিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিলে, স্থচী ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তর থাকে না, একপ্রান্ত নামিয়া যায়, উহাকে চুম্বকোবনতি (Magnetic dip) বলা যায়।

একটি চুম্বকের উত্তরমেরু অপর চুম্বকের দক্ষিণমেরুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উত্তরমেরুকে আকর্ষণ করে না। এই গুণ থাকাতে একটি দ্রব্য চিরস্থায়ী চুম্বকধর্মসম্পন্ন কিংবা কেবলমাত্র চুম্বকদ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে বুঝিতে পারা যায়। যদি কোন বস্তু চুম্বকের উভয় মেরু দ্বারাই সমান আকৃষ্ট হয়, তবে তাহা চুম্বকধর্মসম্পন্ন নহে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি চুম্বকের এক মেরুদ্বারা আকৃষ্ট ও অপর মেরুদ্বারা বিপ্রকৃষ্ট হয়, তবে উহা চুম্বকধর্মাক্রান্ত বুঝিতে হইবে।

একটি চিরস্থায়ী চুম্বকের নিকট লৌহাদি আনিলে উহাও তৎকালে চুম্বকধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং চিরস্থায়ী চুম্বকের স্থায়ী লৌহাদি আকর্ষণ করিতে পারে। এইরূপ চুম্বককে অস্থায়ী চুম্বক কহে। স্থায়ী চুম্বকের যে মেরুর নিকট অস্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন হয়, সেই মেরুর বিপরীত মেরু নিকটবর্তী ও সমমেরু দূরবর্তী হইবে। অর্থাৎ স্থায়ী চুম্বকের উত্তরমেরু একথণ্ড লৌহের নিকট ধরিলে লৌহের দক্ষিণমেরু স্থায়ী চুম্বকের নিকটবর্তী ও উত্তরমেরু দূরবর্তী অর্থাৎ অপর দিকে হইবে। লৌহ যতদূর চুম্বকের সন্নিহিত থাকে, ততদূরই চুম্বকধর্ম-বিশিষ্ট হয়, উহা অপর একথণ্ড লৌহকে এবং ঐ খণ্ড আবার এক তৃতীয় খণ্ড, আবার চতুর্থ খণ্ডকে এইরূপে বহুসংখ্যা পর্য্যন্ত

আকর্ষণ করিতে পারে।

কিন্তু দূরে লইবামাত্র পুনরায় উহাদের চুম্বকধর্ম প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। ইস্পাতকে চুম্বকের নিকট ধরিলে উহাতে লৌহের স্থায়ী প্রবল চুম্বকধর্ম লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু উহা একবার চুম্বকধর্ম প্রাপ্ত হইলে সহজে ত্যাগ করেনা। এই গুণ থাকাতে ইস্পাতকে চিরস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করিতে পারা যায়। যে



সকল চিরস্থায়ী চুম্বক দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি সমস্তই

ইস্পাত নির্মিত। আকার অল্পসারে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে—যথা দণ্ডাকৃতিচুম্বক, অববুদ্রাকৃতি চুম্বক ইত্যাদি। একটা দণ্ডাকৃতি চুম্বককে দুই বা ততোধিক খণ্ডে ভাঙিলে উহা হইতে দুই বা ততোধিক খণ্ডে পৃথক্ চুম্বক উৎপন্ন হইবে। এই সকল খণ্ড চুম্বকের স্বতন্ত্র দুইটা করিয়া মেরুও থাকিবে এবং সমমেরুগুলি সকলেই এক দিকে ও বিষমমেরুগুলি অপর দিকে হইবে। ক ও খ চুম্বককে চারিখণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সকল খণ্ডের ক ক ক ক মেরু একরূপ এবং খ খ খ খ মেরু বিপরীত নামধারী। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ

ক [] খ []

ক [] খ [] ক [] খ []

অসুমান করেন দুই প্রকার পরস্পর বিপরীত চুম্বক শক্তি আছে। উহাদের একটিকে সম ও অপরটিকে বিষম চুম্বকশক্তি বলা যাইতে পারে। এই দুই শক্তির সংমিশ্রণে সাম্য ভাবের উৎপত্তি হয়। নানা উপায়ে এই দুই শক্তিকে পৃথক্ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক চুম্বকেই এই দুই শক্তি সমান পরিমাণে বিद्यমান থাকে, তবে পৃথক্ হইয়া থাকে মাত্র। এই দুই বিভিন্ন প্রকার শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সমজাতীয় শক্তি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

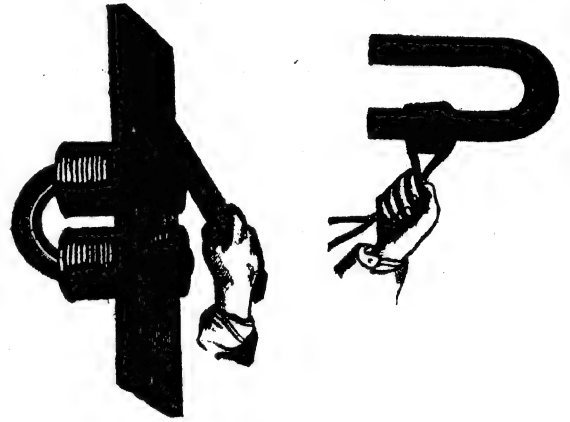
পৃথিবীপৃষ্ঠে নানাহানে চুম্বকের আকর্ষণ ও চুম্বক-স্থচীর অবস্থান দেখিয়া অনেকে অসুমান করেন যে, পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সহিত প্রায় ২০° অংশ কোণ করিয়া আড়ভাবে অবস্থিত একটা বৃহৎ চুম্বকের অস্তিত্ব করন্য করিলে পার্থিব চুম্বকশক্তির মোটামুটি নির্দেশ করা হয়। এই কাল্পনিক চুম্বক উভয় পার্শ্বে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বর্ধিত করিলে যে দুই স্থানে মিলিবে, ঐ দুই স্থানই পৃথিবীর চৌম্বকীয় মেরুদণ্ড। এই দুইস্থানে চুম্বকের কাঁটা সমতল ভাবে থাকিলে যে কোনদিকে থাকিতে পারে। কোন নির্দিষ্ট দিকে অবস্থিত হইতে চেষ্টা করিবে না। এই দুই বিন্দুর চুম্বকাবনতি ৯০°। ঐ দুই চৌম্বকীয় মেরুর সমদূরে একটা বৃত্ত করন্য করিলে ঐ বৃত্তই চৌম্বকীয় নিরক্ষবৃত্ত। এই বৃত্তের সর্বত্র চুম্বকাবনতি ০° শূন্য। এই কাল্পনিক চুম্বকের উভয়দিকে সুষুম্ন-আকর্ষক অর্থাৎ কুমেরু-চুম্বকশক্তি আছে এবং দক্ষিণদিকে সুষুম্ন-চুম্বকশক্তি আছে।

একদণ্ডে কিরূপে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। সাধারণতঃ একটা স্থায়ী চুম্বকে একখণ্ড পাণি দেওয়া ইস্পাত বর্ণন করিয়া চুম্বক প্রস্তুত হয়। একটা বা দুইটা চুম্বক দ্বারা একবারে বর্ণন হইতে পারে। একটা চুম্বকদ্বারা চুম্বক করিতে হইলে ইহার একটা মেরু ইস্পাতের

একদিক্ হইতে অপরদিকে বহিরা হইয়া যাইতে হয়। শেষ হইলে আবার ভূমিগা পূর্বস্থান হইতে আবার বসিতে হয়। দুইটা চুম্বক থাকিলে উহাদের বিভিন্ন মেরুদণ্ড ইস্পাত-শলাকার মধ্যস্থলে রাখিয়া দুইদিকে টানিতে হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ অনেক-বার করিতে করিতে ইস্পাতে চুম্বকশক্তি স্থায়ী হইয়া যায়।

তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা অতি প্রবল চুম্বক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। একটা গৌহমণ্ডের উপর স্তম্ভাকৃতি তামার তার জড়াইয়া ঐ তারে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চারিত করিলে গৌহমণ্ড প্রবল চুম্বকধর্ম সম্পন্ন হয়। এই প্রকার চুম্বককে তাড়িত-চুম্বক (Electro magnet) কহে। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারা দুই উপায়ে চুম্বক প্রস্তুত হইয়া থাকে—

১। একটা দৃঢ়বদ্ধ তাড়িত-চুম্বকের (১ম চিত্র) দুইটা



মেরুর উপর ইস্পাত দণ্ড পরস্পর উল্টা দিকে টানিতে হয়। প্রত্যেক টানের শেষে ইস্পাত-শলাকার অগ্রভাগে সংলগ্ন মেরুর বিপরীত চুম্বকধর্ম উদ্ভূত হয়, সুতরাং দুইপ্রকার টানেই চুম্বক উৎপাদনে একরূপ সাহায্য করে।

২। অতি প্রবল চুম্বক করিতে হইলে তাড়িত-চুম্বক অতিশয় তেজবিশিষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু তাহা হইলে ইস্পাত শলাকা এরূপ দৃঢ়ভাবে তাড়িত-চুম্বকের মেরুতে লাগিয়া যায় যে টানিতে অভ্যস্ত জোর লাগে। এরূপ স্থলে তাড়িত প্রোতবান্ তারের কুণ্ডলী দণ্ডের উপর (২য় চিত্র) একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত নাড়া চাড়া করিতে হয়। আরাগো (Arago) এবং আম্পিয়ার (Ampere) সর্বপ্রথম এই প্রণালী অসুসারে চুম্বক প্রস্তুত করেন। ইস্পাতকে চুম্বক করিতে করিতে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন আরও অধিক চুম্বকশক্তি উহাতে উৎপন্ন করিলে তাহা স্থায়ী হয় না। এই সময় ঐ ইস্পাতকে চরম চুম্বকশক্তিসম্পন্ন (Magnetized to saturation) বলা যাইতে পারে।

কখন কখন ইচ্ছাভে সর্বত্র সমান পাণি দেওয়া না হইলেও অত্যন্ত কারণে চুম্বকের দুইটির অধিক বেশ হইরা যায়। অতঃপর সে হচ্ছে একটি সমকণ্ডল না হইরা অনেকগুলি সমকণ্ডল হয়।

চুম্বকের ভারধারণশক্তি আর আকারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কুজ চুম্বক নিজের বস্তুগণ তার ধারণ করিতে পারে, বৃহৎ চুম্বক নিজের তত গুণ পারে না। সেই অর্থাৎ একটা বৃহৎ চুম্বক অপেক্ষা সমান ওজনের অনেকগুলি কুজ চুম্বক একত্র করিলে অধিক তার ধারণ করিতে পারে। আবার কোন চুম্বকে একবারে বহু তার জুলাইয়া দিলে রাখিতে পারে না, বহুদিকের ধরিতা অল্প অল্প তার জুলাইতে হয় ও ভদ্রপেক্ষাও অধিক তার ধারণ করিতে পারে।

চুম্বক যে কেবল লৌহকেই আকর্ষণ করে তাহা নহে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, চুম্বক লৌহ স্যাতীক মিকেল, কোবার্ট, ম্যাঙ্গানিস, ফ্রোমিয়ান, স্ট্রাটোম ইত্যাদি ধাতুকেও আকর্ষণ করে।

আবার কতকগুলি একগুণ বস্তু আছে, যাহাদিগকে চুম্বকের নিকট লইয়া গেলে বিপ্রকৃষ্ট হয়। জল, জ্বরাসান, কোচ-পাথর, কাচ, প্রাক্করক, পদ্মক, ধূলা, মোম, চিনি, বেতলাস, কাঠ, হস্তীদন্ত, রক্ত ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যেমন তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা চুম্বক উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চুম্বক দ্বারাও তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফারাডে (Faraday) প্রথম আবিষ্কার করেন যে, কোন তারকুণ্ডলীর নিকট চুম্বক লইবামাত্র কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। আবার চুম্বক অপসারিত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলীতে বিপরীতদিকে তাড়িতপ্রবাহ ঘটে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে পিক্সিয়াই (Pixii) সাহেব একটা চৌম্বকীয় তাড়িতকোষ প্রস্তুত করেন। দুইটা তারকুণ্ডলীর অগ্রভাগে একটা স্থায়ী চুম্বক ঘুরিতে পারে, একগুণ বন্দোবস্ত করিয়া ঐ যন্ত্র নির্মিত হয়। চুম্বক ঘুরাইলেই তাহা তাড়িত উৎপন্ন হয়। বাত ও পক্ষাবাত, রোগে যে তাড়িতকোষ দ্বারা রোগীর শরীরে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়, তাহা এই যন্ত্রেরই প্রকার ভেদেই।

রহস্যময় চুম্বক লাগাইলে ও বাতীয় যন্ত্র দ্বারা তার-কুণ্ডলী অতি বেগে ঘুরাইলে একগুণ প্রবল তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হয় যে উহা দ্বারা জল প্রভৃতি জল উপাদানে বিশিষ্ট, অভিলম্ব তাপ উৎপন্ন, এমন কি উজ্জ্বল আলোক পর্যন্তও বহির্গত হইতে পারে। তাড়িতালোক সঞ্চারের এইরূপ যন্ত্র দ্বারা ইংল্যান্ডে হইয়া থাকে। [তড়িতিক দেখ।]

বৈদ্যাক মতে চুম্বকের গুণ—লোমহ, গুণযুক্ত, শীতল, মেঘ ও রিমলাসক। (জ্যোতিষ)। ১. মস্তের উপরিস্থিত অবলম্বন। (মেদিনী)। ২. বিকৃত রহঃ গ্রহের পারলংগ্রহ। (জি)। ৩. যে চুম্বক করে। ৪. কামুক। ৫. কুর্ভা। ৬. গ্রহের একদেশের। (মেদিনী)।

চুম্বকপাথর (চুম্বকাত্মক শব্দ) লৌহাকর্ষক মণি।

[চুম্বক দেখ।]

চুম্বন (ক্রী) চুবি-ভাবে খাট। মুখসংযোগবিশেষ, চলিত কথায় চুমা বলে। কামনাতে চুম্বন করিবার এই কয়টা স্থান নির্দিষ্ট আছে—

“মুখে তনে ললাটে চ কণ্ঠে চ নেত্রো মণি।

গণ্ডে চ কণ্ঠোচ্চৈব কক্ষোক্তভগমুর্দ্ধহ ॥

চুম্বনস্থানমিত্যুক্তং বিজেষ্য কামুকৈরিহ।”

মুখ, ঘন, ললাট, কণ্ঠ, মেত্রের, গণ্ডুল, কণ্ঠের, কক্ষ, উরু, জগ ও সফল এই কয়টা চুম্বনের স্থান, কামুকগণের ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

চুম্বনা (ক্রী) চুবি-ভাবে খাট। চুম্বন।

চুম্বনীয় (ক্রী) চুবি-কর্মণি অনীয়হ। যাহাকে চুম্বন করা উচিত, চুম্বনযোগ্য।

চুম্বা (ক্রী) চুবি-ভাবে অ-টাণ। চুম্ব।

“বেদোহন্ত চুম্বা প্রথমভিযোগঃ।” (বৃহৎসং ৭৮ অঃ ২)

চুম্বিত (ক্রী) চুবি-কর্মণি-ক্ত। যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে।

চুম্বিন (ক্রী) চুবি-গিনি। ১. যে চুম্বন করে। ২. সংযুক্ত।

“গীতোক্তস্তনয়ুগোপরিচাকুর্চি মুক্তাবলী।” (চৌরপং ১৭)

চুম্বাল (দেশজ) ১. করণশীল। ২. পাহাড়ীরা লোক।

চুম্ব (ক্রী) চুর-বাহলকাং ক। যে চুরি করে, চোর।

চুম্বট (দেশজ) ভাসাকনির্মিত নল।

চুরা (ক্রী) চুর-বাহলকাং ভাবে অ-টাণ। চৌর্য, পরজবোর অপহরণ।

চুরাদি (পুং) চুর আদির্যন্ত রহতী। চুর প্রকৃতি কতকগুলি ধাতু। ইহাদের উত্তর স্বার্থে গিচ্ হইয়া থাকে।

চুরি (চুরা শব্দ) চৌর্য, পরজবোরহরণ।

চুরী (ক্রী) চুর-বাহলকাং কি-ভীণ। উপকূপ, কূপের নিকট-বর্তী ক্ষুদ্র জলাশয়। (হেম)

চুরচুর (ক্রী) চুর-কু চুর-ক ততঃ কর্মধা। চর্চন।

চুল (ক্রী) চুর-ক রক্ত ল। ১. চোর। এই শব্দটা বলাদি গণ্যভব্যত। ২. চুলের শিরোদেশ-পোতন ও পূর্ণভাবে আচ্ছাদনকারী বক্সলয় স্পন্দনক যন্ত্রবিশেষ। সংস্কৃত ভাষায় চুলকে কেশ, ওজমাটি ও হিন্দী ভাষায় বাল, লাটিল ভাষায় কাপিলি

পেলোম, ইটালি ভাষার পেলো, মলর ভাষার কব, কুল; কব ভাষার ভোলস, তুরক ভাষার সাহ, ফরাসী ভাষার চিভিউ, জর্জ ও ইংরাজী ভাষার হেরার (hair) কহিয়া থাকে। ইহা উপত্যকের অবস্থান্তরমাত্র এবং চর্যভ্যন্তরস্থ কল্যপ্রবেশ হইতে উৎপন্ন। ঐ কল্য মধ্যে ইহার পুষ্টিবর্ধক মজা নিহিত থাকে।

শুকের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহিত চুলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য সাদৃশ্য আছে। ইহা অতীব দৃঢ় ও স্থিতি-স্থাপক এবং শুষ্ক ও উত্তপ্ত হইলে বৈজ্ঞানিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। জলীয় বায়ুবিভান হইতে জলকণা আকর্ষণ এবং বায়ুবিভান শুষ্ক হইলে উক্ত জলকণা বাষ্পাকারে নিঃসরণ করিবার গুণ ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ণ ও গুণানুসারে ইহা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১। পিকলবর্ণবিশিষ্ট, সময়ে সময়ে ইহার একপৃষ্ঠ লোহিত ও অপর পৃষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই চুল সূর্য্য, কোমল ও অপরিপুষ্ট জন্মিয়া থাকে। যুরোপস্থ নাভিশীতোষ্ণ প্রদেশের অধিবাসীদিগের গাত্রে এইরূপ চুল দৃষ্ট হয়।

২। কৃষ্ণবর্ণ, পর্যাপ্ত, দৃঢ় ও সরল। মঙ্গোলিয়া ও আমেরিকাবাসীদিগের এইরূপ চুল হয়।

৩। কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কোমল, ঘন, অপরিপুষ্ট এবং কুঞ্চিতাকার। দক্ষিণসমুদ্রস্থিত দ্বীপবাসীদিগের শরীরে এইরূপ চুল জন্মিয়া থাকে।

৪। কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতাকার সাধারণতঃ দেখিতে পশু-মের জ্ঞার। আফ্রিকাখণ্ডের অধিবাসীগণের মধ্যে অনেকের চুল এই প্রকার।

এখন দেখা যাইতেছে যে জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার-গুণ ও বর্ণবিশিষ্ট চুল জন্মিয়া থাকে। একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহাও জানা যাইবে যে শরীরের বর্ণের বিভিন্নতাবাদে চুলের বর্ণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শরীরের বর্ণ গৌর এবং শুষ্ক কোমল হইলে চুল পিকল অথবা লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট এবং কোমল হইয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে অর্থাৎ শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ এবং শুষ্ক পুরু হইলে চুলও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিত জীব-শরীরের এই পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে জাতিবিভাগ করিয়া থাকেন।

কালচুল শাদা চুল অপেক্ষা দৃঢ় ও কঠিন। চীনবাসীগণের চুল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোজাতি, আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ এবং নবজিলগুরানীদিগের চুল যুরোপখণ্ডের কৃষ্ণকার অধিবাসীগণের অপেক্ষা অধিকতর

দৃঢ়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণের চুল ঠিক তাহা-নিগের স্বকের বর্ণানুযায়ী, এতদ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে পাক-বর্ণের সহিত কেশের বর্ণেরও সাদৃশ্য রহিয়াছে। নবগিনির অধিবাসী পেপুয়া নামক জাতির কেশ পশম সদৃশ এবং কুঞ্চিত। নবজিলগু এবং আরও কতিপয় স্থানের অধিবাসীগণের কেশ পশম সদৃশ কুঞ্চিত অথচ অপরিপুষ্ট।

যাহা হউক উপরি লিখিত নিয়মানুসারে চর্ম ও চুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও সময়ে সময়ে কাল চর্মের উপর লোহিত চুলের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত, জাতিগত নহে।

জগতের বাবতীয় মানবজাতির মস্তকে সমপরিমাণে কেশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। যেতাক পুরুষগণের শিরোনদেশে বেশী কেশরাজি উৎপন্ন হয়, কিন্তু মঙ্গোলিয়া, আমেরিকা এবং আফ্রিকাবাসী কৃষ্ণকার পুরুষদিগের মস্তকে অত্যন্ত পরিমাণে চুল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকাবাসী কতকগুলি জাতি ভিন্ন সাধারণতঃ আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণের মস্তকে অল্প চুল হইয়া থাকে। [জাতি দেখ।]

কোন কোন স্থানে সর্সাক চুল-বেষ্টিত লোকের অস্তিত্ব দেখা যায়। মান্দালা প্রদেশে এইপ্রকারের একটা জ্রীলোক একবার দেখা গিয়াছিল। অল্পসন্ধানে জানা যায় যে ঐ জ্রীলোকটার বাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহার সর্সাক ঐরূপ চুলে বেষ্টিত নয় এবং তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে একটা পিতার জ্ঞার অপর দুইটা মাতার জ্ঞার হইয়াছিল। যাহা হউক আরও অনেক স্থলে ঐরূপ অস্বাভাবিক মনুষ্য মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়া থাকে, শরীরের লোম বড় ও ঘন কৃষ্ণ হইলে তাহাকেও চুল কহিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক চুল শব্দ মস্তকের কেশকেই বুঝাইয়া থাকে। চুলের নাম কেশ ও গাত্রের অপর স্থানে উৎপন্ন চুল লোম প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়।

চুল মানবজাতির ভূষণ মধ্যে গণ্য। রমণীগণের নিকট কেশ বেক্ষণ আদরের দ্রব্য সেক্ষণ অপরের নিকট নহে। কেশহীন রমণী কুৎসিতা মধ্যে গণ্য। রমণীগণ স্বকীয় কেশের পরিবর্তে বথাসকল্য দান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

গজনি-পতি মাজুর্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে লাহোরাধিপতি অনঙ্গপাল তাহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহার সৈন্যদিগের ধনুর ছিলার আভাব হওয়ার তাহাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, সেই সময়ে এতদৈন্দীয় রমণীগণ অসহ-তুষ্টিরকার্য মতকশোভন কেশ কর্ষণ করিয়া অনঙ্গপালের নিকট পাঠাইয়া দেশের উপকার করেন। ইহা

ভিন্ন রমণীগণের শিরোদেশ হইতে কেশ বিচ্ছিন্ন করিবার অল্প কোন উদাহরণ শুনা যায় না। অক্ষয়বালিনী বিষয়গণ বস্ত্র মুগুন করিয়া থাকেন। তবে ভারতবর্ষে কেশের যতদূর আদর, অল্প দেশে সে পরিমাণে আদর না হইলেও গৌরব ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত তথ্যের সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেরলবাসিনীগণের কেশের জায় হৃদয়ের কেশ ভারতে আর নাই, সেই অল্প প্রসিদ্ধ লেখক মীনকল্প মিত্র লিখিয়াছেন—

“সজল জলদ কটি কেরলের চুল।

কর্ণাটকামিনী কটা ভুবনে অতুল।” [চের শব্দ দেখ।]

চুলের পুষ্টিবর্দ্ধক পদার্থের অভাব হইলে ইহা ধূসর বর্ণে পরিণত হয়। বার্কাক্যবহার সাধারণতঃ এইরূপ ঘটনা থাকে।

কোনরূপ আকস্মিক ভয় হুঃখ কিম্বা মানসিক চাক্ষু্য উপস্থিত হইলেও চুল ধূসর বর্ণ হইয়া যায়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। ফরাসী রাজ্যের প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশীয় তদানীন্তন নৃপতি ১৪শ লুই ও তদীয় মহিষী আণ্টোইনিকে কারাবদ্ধ করিলে মহিষী নিশি মধ্যে এত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ঐ রাত্রিতেই তাহার কেশরাশি ধূসর বর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অতিশয় ভয়, হুঃখ ও মানসিক চাক্ষু্য দ্বারা চুলের মূলদেশস্থ স্বন্ধে এক প্রকার অল্প পদার্থ উৎপন্ন হইয়া উহাকে বিবর্ণ করিয়া দেয়।

হিন্দু মতে শিরোমুগুন সর্বতোভাবে নিবিদ্ধ, সেই অল্প হিন্দুপুরুষগণ শিরোদেশে শিখা রাখিয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা মস্তকে বেগী রাখে। আফগানস্থান ও বেলুচিস্থানবাসীগণ মস্তকের সমুখভাগ কামাইয়া পশ্চাদ্ভাগে চুল রাখিয়া থাকে। হিন্দুগণ তাহাদিগের জাতির পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কিছুদিন তাহার স্মরণার্থ কৌরকার্য সম্পাদন করেন না। কোন কোন স্থানের জীলোকেরা আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে মস্তক মুগুন করিয়া থাকে। হিন্দুগণ কোন দেবতার উদ্দেশে মানস করিয়া চুল রাখিয়া থাকে এবং সময়ান্তে মস্তক মুগুন করিয়া উক্ত দেব সমীপে উহা দিয়া থাকেন। কোন কোন তীর্থস্থলে গিয়াও হিন্দুরা মুগুন করিয়া থাকে।

কেশ বর্ণান্তর করিবার বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে চীনবাসীগণ বৈরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে, সেরূপ আর কোন জাতিই দেখাইতে পারে না। তাহারা তাহাদের আবিষ্কৃত কেশবর্ণান্তর করিবার ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ-

পূর্বক গিলল ও লোহিত বর্ণের কেশকে ঘন রূপ করিতে পারে। এম্ ঔষধ সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, হুইজন ধর্ম্মবাজক ধৈর্য্যকার পুরুষ সীম হইতে তাহাদিগের কেশ রূপ করিয়া আনিরাছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তিন প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহা হউক এই প্রকার ঔষধের গুণ স্থায়ী এবং অনিষ্টকর নহে। কিন্তু এতদেশে ও অন্তর্ভুক্ত স্থানে চুল পক হইলে অনেকে একপ্রকার কৃত্রিম ঔষধ, চুলে ব্যবহার করিয়া ইহা কাল কবিবার চেষ্টা করেন। তাহাকে কলপ কহে। এ প্রকার ঔষধের গুণ স্থায়ী নহে, কিন্তু বিলক্ষণ অনিষ্টকর, সুতরাং এই ঔষধ ব্যবহার করিলে কেশের শুভ্রতা নষ্ট করিতে গিয়া অপর প্রকার অনিষ্ট আনয়ন করে।

মুসলমানগণ কুসুমফুল ও মেহেনীপাতার দ্বারা কেশ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

রমণীগণ নানা প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া চুল বন্ধন করিয়া থাকে। [বেগী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

রীতিমত যত্ন করিলে চুলের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার পুষ্টিবর্দ্ধক ও সৌন্দর্য্যোৎপাদক বহুতর দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বভাবতঃই সময়ে সময়ে মস্তকে জটা বান্ধিয়া যায়, তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইতে পারে না। তাই সময় মত কিরং পরিমাণে যত্নেরও আবশ্যক।

চুল একটা প্রধান পণ্য মধ্যে গণ্য। ইহা নানাকার্য্যে লাগিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ইহার এত অধিক প্রয়োজন যে সুবিধা মত যোগাড় করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ইহার প্রতি অর্দ্ধসের ১৬ শিলিং করিয়া ইংলণ্ডে বিক্রয় হইয়া থাকে। তথাকার রমণীগণ কেশদ্বারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম করিয়া থাকেন। পরচুলা প্রস্তুত জল্প লগুনে বৎসরে প্রায় ১০০ হেণ্ড্রেডওয়েট কেশের আমদানি হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কেশের ব্যবসা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডদেশের দরিদ্র রমণীগণ মস্তকের চুল বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জনপূর্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের রমণীগণ অজ্ঞাতাবে প্রাণভ্যাগ করিলেও ঐরূপ কর্ম করে না।

বসন্তের প্রারম্ভে কেশব্যবসারীগণ বিলাতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে কেশ আহরণার্থে লোক প্রেরণ করিয়া থাকে। পরচুলা ভিন্ন অপর প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন জল্পও কেশের আবশ্যক হইয়া থাকে। কেশে বড়ীর চেন প্রভৃতি নির্মিত হইয়া থাকে।

চুল পরম্পর অতি হইয়া কার্য্যের অল্পপন্থক হইবার

আশঙ্কর ব্যবহারীগণ তাহাকে প্রথমে লোডা ও গরম জলে পরিষ্কার করিয়া কোমল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শুক করে, পরে ক্রম দিয়া আচড়াইয়া তিন প্রকার দৈর্ঘ্য ও গুণবিশিষ্ট করিয়া বর।

কোন স্থানে ব্রীলোকেরা চুলের দ্বারা স্তম্ভর স্তম্ভর বাটী, রেকাবী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নৈশুণ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

চুলকানি (দেশজ) কড়ুয়া, গাজকণ্ড।

চুলা (চুলী শব্দ) উদান, আখা।

চুলিয়া, মলবার ও সিংহলের এক শ্রেণীর মূলমনি। কিন্তু মলবারবাসীগণ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী মাত্রকেই চুলিয়া বলে। তথাকার ব্যবহারীগণ সকলেই চুলিয়া ও ক্রিং এই দুই জাতি-ভুক্ত। ক্রিং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দ হইতে ও চুলিয়া চোল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় চুলিয়াগণ চোলরাজ্য হইতেই তথায় গমন করিয়াছিল।

চুলুক (পুং) চুল বাহুলকাৎ উক্ক। ১ প্রসূতি, হস্তকোষ। ২ ঘন পক্ষ বা ঘন কর্দর। ৩ ক্ষুদ্রভাণ্ডবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড) (স্ত্রী) ৪ মাঘ মজ্জনোপযুক্ত জল, বতটুকু জলে কেবল একটা মাঘ ভূষিতে পারে তাহাকে চুলুক বলে।

“মাঘমজ্জনমলমাসাচমং তচ্চুলুকং।” (মহোপনিঃ)

৫ গোত্র প্রবর্তক ঋষিবিশেষ। [পর্গাদি দেখ।]

চুলুকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

“কাবেরীঃ চুলুকাপিনী বেয়াং শতবলমপি।” (ভারত ৬।৯অঃ)

চুলুকিন্ (পুং) চুলুক উর্দ্ধোন্নতিবিজ্ঞতে ২স্ত চুলুক-ইনি।

১ মৎস্তবিশেষ, ইহার আকৃতি শিশুমারের তুল্য। (শব্দরত্নাবলী)

(স্ত্রী) ২ চুলুকযুক্ত।

চুলুপ (পুং) চুলুপ-ভাবে বঞ। বালকের লালন, অতিশয় যত্নের সহিত বালকের অতিপালন। (জটধর)

চুলুপ্পা (স্ত্রী) চুলুপ-টাপ। ছাপী। (ত্রিকাণ্ড)

চুলুপ্পিন্ (পুং) চুলুপ-গিনি। মৎস্তবিশেষ, ইহার আকৃতি শিশুমারের তুল্য। (শব্দরত্নাবলী)

চুল্ল (স্ত্রী) ক্রিম-স্বার্থে লছ চুল্লাদেশচ (ক্রিমস্ত চিল্ পিল্লাস্ত চক্ষুী। পা ৫।২।৩০ বার্তিক) “চুলচবক্তব্যঃ।” (মহাভারত)

“ক্রিম শকাচ্চক্ষুধিশেখাতিধারিণঃ স্বার্থে-লোবিধেয়ঃ।” ১ ক্রিম-নেত্র, রুদ্রযুক্ত চক্ষু। (স্ত্রী) চুল্ল-অর্শ-আদিদ্বাং অছ। ২

রুদ্রযুক্ত চক্ষুবিশিষ্ট, কাহার চক্ষু ক্রিম হইয়াছে।

চুল্লক [চুলুক দেখ।]

চুল্লকী (স্ত্রী) চুল্লতি অক্ষতলেন ক্রীড়তি-চুল্ল-কুল-গৌরানিবাং কী। ১ শিশুমার, শুভক। ২ কণ্ঠীবিশেষ, একপ্রকার ছালী। ৩ কুলবিশেষ। (মেদিনী)

চুল্লি (স্ত্রী) চুল্লতে বাহুনামনেকার্থক্যং স্বাণ্ডতচ্চ অধিবিদ্য চুল্ল-

ইন্ (সর্বব্যাপ্তিহীন। (ইন্-৪।৩।১২) ১ পাকের নিমিত্ত অগ্নি রাখিবার স্থান, উদান, আখা। পর্যায়—অবস্ত, উদান, অবিপ্ররশী, অতিক্রা, অবস্ত, উদান, উদার, চুলী, আনিকা, উদ্যান।

চুল্লী (স্ত্রী) চুলি বা কীর্ (কনিকারাদিক্ মঃ। পা ৪।৩।৪৫ বার্তিক) ১ চিতা। ২ উদান, চুলা।

“পকমুনা গৃহস্থ চুল্লী পেষণ্যপকমঃ।” (মহা ৩৬৬)

চুল্লুয়া (স্ত্রী) চুল্ল নন্ নিগাতনে লধু। ভাল করিয়া চোবা।

“অতক্ষরন্ত চুল্লুয়াকারং ধানঃ সংলভ্য।” (মানব)

চুল্ল (স্ত্রী, পুং) চুল্লতে আশ্রিতে চুল্ল-ক-নিপাতনে লধু। ১ বৃত্ত, মাংসপিণ্ডবিশেষ। ২ স্থালীভূত মাংস, যে মাংস স্থালীতে ভাজা হইয়াছে, চলিত কথায় ঝাড়াকাব বলে। ৩ পনস প্রভৃতি ফলের অসার ভাগ, চলিত কথায় ভোতা বলে। (ভরত)

চুল্লুক (স্ত্রী) চুল্লতে পীরতে চুল্ল-পানে বাহুলকাৎ উক্কঃ বকারন্ত চকারন্ত। ১ চুল্লক, কুচাগ্র। (ভরত) (স্ত্রী) ২ চুল্লশক্তিহীন, বাহার জিন্সা দ্বারা রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা নাই।

“পাপবোনিং সমাপন্নাস্তাওলায়ুকচুল্লুকা। (ভারত ১৫।৩৬ অঃ)

চুড় (দেশজ) হস্তের আভরণ।

চুড়ক (পুং) চুড়াক্ত্যত্ চুড়া বাহুলকাৎ-কন্। কুপ। (ত্রিকাণ্ড)

চুড়জিপাদোপমণ, বুদ্ধদেবের ধর্মব্যাখ্যান। মহেন্দ্র নামে একস্থবির ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে আসিয়া তথাকার রাজা দেবানন্দ-প্রিয়শিষ্যকে উক্ত ধর্মব্যাখ্যান বুঝাইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অধীনস্থ চল্লিশহাজার লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

চুড়া (স্ত্রী) চোলরতি উন্নতো ভবতি চুল অঙ্ক তন্ত উকারঃ দীর্ঘশ্চ নিপাতনাৎ। ১ ময়ূরশিখা। ২ শিখা, টিকি। পর্যায়—শিখা, কেশপালী, কুটিকা, কুটিকা। ৩ বড়ভী, তৃণাদিনির্মিত গৃহের পাইর। ৪ বাছুর অবস্থার (মেদিনী)। ৫ অগ্রভাগ।

“অস্তাচলচুড়াবলম্বিনি ভগবতি চল্পমসি।” (হিতোপঃ)

৬ কুপ। ৭ শুভা। ৮ খেতশুভা। (বৈজয়) ৯ মন্তক। ১০

প্রধান। ১১ দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত একপ্রকার সংস্কার।

[চুড়াকরণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

“চুড়াকার্যা বধা কুলং।” (মলমালতঃ)

চুড়াকরণ (স্ত্রী) চুড়াস্তাঃ করণং ৬তৎ। ১ দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত একটা সংস্কার। যজ্ঞাধান প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা এই সংস্কারটিও হিজগুণের বিশেষ আদরণীয় ও অবস্ত কর্তব্য। যজ্ঞতন্ত্রিকামণির মতে—যজ্ঞাধান বা জন্মান হইতে তৃতীয় ৫ম বা দশমবর্ষে চুড়াকরণ করিবে। কিন্তু ময়ূর মতে প্রথম বর্ষেও চুড়ার বিধান আছে। পীঠমথারার মতে পঞ্চমবর্ষে

বাহার বে বিধান আছে, তাহার তদনুসারেই চূড়াকরণ করা উচিত। অনেক স্থানে উপনয়নের সহিতই এই সংস্কারটি হয়, আবার কোন স্থানে পৃথকরূপে চূড়াকরণের প্রথাও প্রচলিত আছে। কুলাচার অনুসারে উপনয়ন সংস্কারের সহিত বাহাদের চূড়া হয়, তাহাদের পক্ষে আর চূড়ার অন্ত পৃথক শুভদিন দেখিতে হয় না, যে শুভদিনে উপনয়নের বিধান আছে সেই দিনেই চূড়াও হইতে পারে। কিন্তু চূড়াকরণ সংস্কার বাহাদের পৃথক হয়, তাহাদের পক্ষে ইহারও শুভদিন দেখিতে হয়। মুহূর্ত্ত-চিন্তামণির মতে যথাকালে উত্তরায়ণ অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা ও দ্বাদশী রিক্তা ও প্রতিপৎ ভিন্ন অপর তিথি, সৌম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এবং এই সকল গ্রহের লগ্ন ও নবাংশে চূড়াকরণ করা উচিত। কিন্তু চৈত্র বা পৌষ মাসে চূড়া করিতে নাই। অষ্টম স্থানে শুক্র ভিন্ন অপর গ্রহ থাকিলে তাহাতেও চূড়াকরণ বিধেয় নহে। অনুসারাবজিত মুহূ চর ও লঘুগণ এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র চূড়ায় প্রশস্ত। যে লগ্নের তৃতীয় বর্ষ বা একাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, সেই লগ্নে চূড়া করা উচিত। স্কীণ চন্দ্র লগ্নের কেন্দ্র গত হইলে মৃত্যু হয়, এইরূপ কেন্দ্রস্থানে মঙ্গল থাকিলে শত্রুভয়, শনি থাকিলে পঙ্গুতা এবং সূর্য থাকিলে জ্বর হইয়া থাকে। অতএব লগ্নের কেন্দ্রস্থানে ঐ সকল গ্রহ না থাকে একরূপ দেখিয়াই চূড়াকরণ করা উচিত। কিন্তু বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র কেন্দ্রগত হইলে শুভ ফল হয়। ইহাতে তারাগুহিও দেখিবার আবশ্যক। (১) মাতা গর্ভিনী হইলে শিশুর চূড়াকরণ করিতে নাই। কিন্তু গর্ভের প্রথম পাঁচ মাস মধ্যে বা শিশুর বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক হইলে কোন দোষ হয় না। উপনয়ন ও চূড়া একসঙ্গে হইলে গর্ভের প্রথম মাস মধ্যেও করা যাইতে পারে। (২) বিবাহাদির ঋণ চূড়াকরণও বেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ভবদেবভট্টরূপ দশকর্মপদ্ধতিতে সামবেদীর চূড়াকরণ এই প্রকার লিখিত আছে। যে দিন চূড়াকরণ হইবে সেই দিন প্রাতে বালকের পিতা যথানিয়মে প্রাতঃস্নান ও ব্রতী শ্রাদ্ধ করিবে। তৎপরে কুশাঙ্কিত নিয়মানুসারে

- (১) 'চূড়াবধাৎ তৃতীয়াং প্রভবতি বিশ্বমেহষ্টাকুরিতাদা বতী।
পর্বোনাহে বিচৈত্রোদগরনসময়ে জেন্দুগুজ্ঞানানাম্।
বারে লগ্নাং পর্বোক্তা বতনিননননো নৈধনে শুদ্ধিযুক্ত।
শাক্রোপেতৈবিসিদ্ধৈঃ শুভর লম্বুভারায় বটুজিহ্মপাণৈঃ।
কোনচন্দ্রকুসৌরিতাং বটুভা শত্রুভূতি পঙ্গুতা জরঃ।
জ্যঃ ক্রমেণ বৃদ্ধীভাগ্যবৈঃ কেন্দ্রগৈশ্চ শুভমিষ্টভারায়।' (মুহূর্ত্তচিঃ)
- (২) পক্ষমাসাধিক্যে মাতৃগর্ভে চৌলঃ শিশোঃ সৎ।
পক্ষমাসাধিক্যে মাতৃগর্ভে চৌলঃ শিশোঃ সৎ।

পক্ষমাসাধিক্যে মাতৃগর্ভে চৌলঃ শিশোঃ সৎ।

বিক্রপাক জপান্ত কুশাঙ্কিত করিবে। ইহাতে সত্য নামক অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। [কুশাঙ্কিত দেখ।] তৎপরে একবিংশতি দর্ভ পিঞ্জলি অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগে সাতটি অপর একটি কুশপত্র বেটন করিবে। উক্ত জলপরিপূর্ণ কাংশপাত্র, তামার কুর, তাহার অভাবে দর্পণ আনিয়া রাখিতে হয় এবং নাপিতকে লৌহকুর হাতে করিয়া বসিতে হইবে। অগ্নির উত্তরদিকে বৃষ-গোময়, তিল, তণ্ডুল ও মাষ, যোগে পক্ক কুশর (খেচুড়ী), অগ্নির পূর্বদিকে ধান, যব, তিল ও মাষ এই সকল দ্রব্য পরিপূর্ণ তিনটি পাত্র রাখিবে। ইহার পরে বালকের গর্ভধারিণী একখানি পরিষ্কার বস্ত্রে আচ্ছাদিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির পশ্চিমে স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশার উপরে পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। ইহার পরে বালকের পিতা প্রাদেশ পরিমিত একটি সমিধ যুত মাথাইয়া অমন্তক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কুশাঙ্কিত নিয়মানুসারে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাক্তি হোম করিতে হয়। বালকের পিতা উঠিয়া পূর্বমুখী হইয়া পশ্চিম দিকে অবস্থিত নাপিতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক তাহাকে হৃদয়ের জায় ভাবিয়া "প্রজাপতিঋষি সবিতাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওম্ আয়মগাং সবিতাকুরেণ।" এই মন্ত্রটি ও উক্ত জলপূর্ণ কাংশপাত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ এবং মনে মনে বায়ুকে চিন্তা করিয়া "প্রজাপতিঋষি সবিতাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ও উয়েণ বায় উদকেনৈধি।" এই মন্ত্রটি জপ করিবে। ইহার পরে পূর্বস্থাপিত কাংশপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ উক্তজল ডান হাতে লইয়া বালকের ডানদিকের কপুক্ষিকা ভিজাইয়া দিবে। (শিখাস্থানের নীচে ও কর্ণের নিকটবর্তী উচ্চ স্থানকে কপুক্ষিকা বলে।) মন্ত্র যথা—"প্রজাপতিঋষিরাপো-দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ও আপ উদন্ত জীবসে।" অনন্তর তান্ত্রিকুর বা দর্পণ অবলোকন করিয়া "প্রজাপতিঋষি বিশ্বদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ও বিষ্ণোদংষ্ট্রোহসি।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ইহার পরে কুশবেষ্টিত সেই দর্ভ-পিঞ্জলীটি লইয়া "প্রজাপতিঋষি বিশ্বদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওম্ ওষধে জায়স্বেনং।" এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক দর্ভপিঞ্জলীর মূল উপরের দিকে রাখিয়া পূর্ব সিন্ধু কপুক্ষিকা দেশে সংযোজিত করিবে এবং তান্ত্রিকুর বা দর্পণ ডান হাতে লইয়া "প্রজাপতিঋষি বিশ্বদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ও স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" এই মন্ত্র উচ্চারণে তথায় সংযোজিত করিতে হয়। ইহার পরে সেইস্থানে তান্ত্রিকুর বা দর্পণ "প্রজাপতিঋষি পুষাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ

* কুশান্ত্রবেষ্টিত প্রাদেশপরিমিত অমন্তক কুশপত্রকে পিঞ্জলী কহে।

ও যেন পুণ্য বৃক্ষপতের্ব্যোবিজ্ঞান চাবপত্তম তে বশ্যাক্ষিকরণা
জীবাতেব জীবনায় দীর্ঘায়ুঃ যি বলার বর্চসে” এই মন্ত্র পড়িয়া
এরূপ ভাবে চালনা করিবে যেন একটা কেশও ছিন্ন না হয়।
ইহা ছাড়া বিনামন্ত্রেও ছইবার চালনা করিতে হয়। ইহার
পরে লোহকুর দ্বারা সেই কপুক্ষিকা দেশের কেশ ছেদন
করিয়া বালকের কোন মিত্র ব্যক্তির হস্তস্থিত সেই বৃষগোময়-
পূর্ণপাত্রের উপরে দর্ভপিঞ্জলীর সহিত কেশগুলি রাখিয়া দিবে।
তৎপরে কপুক্ষল দেশের কেশ ছেদন করিতে হয়। (মাথার
পিছন শিখাস্থানের নীচ ও নাপিতের ক্রোড়াভিমুখ উচ্ছ্বান
কপুক্ষল শব্দে বুঝিতে হইবে।) ইহার নিয়ম—প্রথমে
“আপ-উন্দ” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণে উচ্ছ্বলে ভিজাইয়া “ও
বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোহসি।” এই মন্ত্রে তান্ত্রিকুর বা দর্পণ ও “ওম্
ওষধয়ে ত্রায়ধেনং” এই মন্ত্রে দর্ভপিঞ্জলী সংযোজিত করিবে।
তৎপরে “ও স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ” এই মন্ত্রে তান্ত্রিকুর বা
দর্পণের চালনাপূর্বক লোহকুরে কেশছেদন করিয়া পূর্বের
জ্ঞান স্থাপন করিতে হয়। বামকপুক্ষিকা হইতেও এই
প্রকারে কেশ ছেদন করিতে হয়। এইরূপে কেশছেদন
হইয়া গেলে বালকের মস্তক ছই হাতে ঢাকিয়া “প্রজাপতি
ঋষিরুক্ষিকৃচ্ছনো জমদগ্নিকশপাগস্ত্যাদনো দেবতান্ চূড়াকরণে
বিনিয়োগঃ। ও ত্রায়ুধং জমদগ্নেঃ কশপস্ত ত্রায়ুধং
অগস্ত্যস্ত ত্রায়ুধং যজ্ঞবান্ ত্রায়ুধং তত্তেহস্ত ত্রায়ুধং॥”
এই মন্ত্রটী জপ করিবে। ইহার পরে পুষ্পাদি দ্বারা নাপিতকে
অলঙ্কৃত করিতে হয়। নাপিত অগ্নির উত্তরদিকে বসিয়া
বালকের মস্তক মুণ্ডন করিবে। সমস্ত কেশগুলি বৃষগোম-
য়ের উপরে রাখিয়া বনের মধ্যে বাঁশের ঝাড়ে স্থাপন করিবে।
ইহার পরে পূর্ববৎ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাক্তি হোম ও
একটা সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কর্ম
সমাপন করিবে এবং তৎপরে কুশণ্ডিকার নিয়মে শাট্টায়ন-
হোম প্রভৃতি বামদেব্যাগাস্ত্র কর্ম সমান করিয়া কর্মকারক
ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা এবং ধাতাদিপূর্ণ পূর্বস্থাপিত পাত্রগুলি
নাপিতকে অর্পণ করিবে। (ভবদেবভট্টকৃত দশকর্ম)

ঋগ্বেদীয় চূড়াকরণ—নিজ কুলাচার অনুসারে তৃতীয় বা প্রথম
বর্ষে কিম্বা উপনয়নের সময় চূড়াকরণ বিধেয়। স্বয়ং অশক্ত
হইলে অপর ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে পারে। যে দিন চূড়া-
করণ হইবে সেই দিন প্রাতঃস্নান প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সমাপন
করিয়া তিল, জল ও কুশপত্র লইয়া “ও অগ্নেভ্যাদি কর্তব্য
কুমারসংস্কারকচৌলকর্মান্দীর্ঘপ্রাক্কমহং করিষ্যে” এইরূপ
সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে যথোক্ত বিধানানুসারে আত্ম-
দায়িক শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকার নিয়মে অগ্নি

স্থাপন পর্যন্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে অগ্নির নাম
সত্য স্মরণিত হইবে। ইহার পরে প্রাণারাম করিয়া “ও অগ্নে-
ভ্যাদি কুমারসংস্কারার্থ চৌল্যাকর্ম তদক্ষমধানং দেবতা
পরিগ্রহার্থক করিষ্যে।” এইরূপ সংকল্প করিয়া “ও ভূত্বাঃ
স্বাহা। ইদং প্রজাপত্যে নমঃ।” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
ছইটা সমিধ্ দ্রুত মাখাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে
“ও অগ্নেভ্যাদি অগ্নিরুক্ষিহিতে অগ্নৌ অগ্নি জাতকেন্দ্রসমিধান
প্রজাপতিং চাবারদেবক আভ্যোনাগ্নি পবমানং প্রজাপতিক
প্রধানদেবতা আভ্যশেষেণে ষিষ্টকৃতমিধ্ সন্ম হণেন ক্রতং
বিধান্ দেবান্ সংপ্রাবেণ সর্বপ্রাশ্চিত্তদেবতা অগ্নিঃ দেবান্
বিজুং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিক জাতা জাতদোষনির্হরণার্থ
মনাজাতমিতি তিস্রঃ আভ্যাদ্রব্যেণমাদেন কর্মণামন্তোহহং
বক্যে।” এইরূপ সংকল্প করিয়া আভ্যাহোমের আবশ্যকীয়
সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। [কুশণ্ডিকা দেখ।] অগ্নির
উত্তরদিকে ধান, মাষ, যব ও তিলপূর্ণ চারিটা শরা, তান্ত্রিকুর,
লোহকুর, শীতলোক্ষোদক, নবনীত, দধি ও পূর্ণপাত্র স্থাপন
করিবে। বালকের জননী বালকটাকে কোলে লইয়া অগ্নির
পশ্চিমে উপবেশন করিবে। সমীপতপূর্ণ বৃষগোময়যুক্ত
ছইটা নূতন শরা বালকের নিকটে রাখিবে। বালকের পিতা
একবিশতি দর্ভপিঞ্জলী হাতে লইয়া দক্ষিণে উপবেশন-
পূর্বক কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে ইচ্ছাধান হইতে আধার
পর্যন্ত কার্য করিবে। তৎপরে চারিটা দ্রুতাহতি দিতে হয়।
মন্ত্র যথা “অথ আয়ুঃসীতি তিস্রাং শতং বৈধানস ঋষরোহমিঃ
পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আভ্যাহোমে বিনিয়োগঃ। ১
ও অথ আয়ুঃসি পবস আনুবো জমিৎ চনঃ। আরে বাধস্ব
হচ্ছনা স্বাহা”(ঋক্ ৯৬৬।১৯।) ২ “অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্তঃ
পুরোহিতঃ। তদীমহে মহাগয়ং। স্বাহা”(ঋক্ ৯৬৬।২০।)
৩ “অগ্নে পবস্ব স্বপা অগ্নে বর্চঃ সুর্য্যায় দধদ্রিময়ি পোষম্।
স্বাহা”(ঋক্ ৯৬৬।২১) এই তিনটা মন্ত্রের শেষে “ইদমগ্নয়ে
পবমানায় নমঃ” এইরূপ যোগ করিয়া তিনটা আহুতি ও
“প্রজাপতে নমঃ দেতাভ্যস্তো বিধা”(ঋক্ ১০।১২১।১০) ইত্যাদি
মন্ত্রের শেষে “স্বাহা ইদং প্রজাপত্যে নমঃ” এইরূপ যোগ
করিয়া একটা একটা আহুতি দিবে। এইরূপে চারিটা
আহুতি দেওয়া হইলে বালকের ডানদিকে একটা শরা রাখিয়া
পূর্ব স্থাপিত শীতলোক্ষ জল ছইহাতে লইয়া “ও উক্ষেণ বায়
উদকেনৈহি।” এই মন্ত্রে মিশাইবে। একটা শরাতে সেই
মিশ্রিত জল হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া নবনী তাহার অভাবে
ছথের শর দিয়া বালকের ডান কাণের উপরের চুলগুলি “ও
অদিতিঃ কেশান্ বপতু আপত্রদন্তচর্চসে দীর্ঘায়ুঃ যি বলার

বর্তসে।" এই বস্তু পড়িয়া আছে আছে ভিজাইয়া দিবে। এই প্রকারে মাধার সকল চুলই ভিজাইতে হয়। মাধার কেশগুলিকে ডান ও বাম ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার ডান ভাগকে চারি ভাগে ও বাম ভাগকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে, ইহার পরে হোমকর্তা বালকের ডানদিকের কেশ-ভাগের এক চতুর্থাংশে "ওঁ ওষধে জারবৈনং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনটি কুশপিঞ্জলী অর্পণ করিবে এবং সেই কুশপিঞ্জলীর সহিত সেই কেশগুলি বাহুহস্তে গ্রহণ করিয়া ডান হাতে ভাস্কর লইয়া "ওঁ অমিতে মৈনংহিসীঃ।" এই মন্ত্রে চালনা করিবে ও লৌহকুরের দ্বারা "ওঁ বেনা পবং সবিত্তা কুরেণ সোমন্ত রাজো বরুণন্ত বিধান্। তেন তে ব্রহ্মণো বপভেদ-মতাবুদ্যান্ অরদদীর্বধাসং।" এই মন্ত্রটি উচ্চারণে ছেদন করিয়া শমীপত্রের সহিত মিশাইয়া বালক জননীর হস্তাঞ্জলিতে অর্পণ করিবে। এই সময়ে ছিন্ন কেশগুলির অগ্রভাগ পূর্বদিকে রাখিতে হয়। বালকের জননী সেই কেশগুলি বৃষগোময়ের উপরে রাখিয়া দিবে। এইরূপে ডানদিকের চারিভাগ কেশ ছেদন করিবে। ছেদনের মন্ত্র ব্যতীত অপর সকল নিয়মই পূর্বের সমান। ২য় বার ছেদন মন্ত্র "ওঁ বেন ধাতা বৃহস্পতে রম্মেরিত্ত চায়ুবে বপং। তেন তে আয়ুবে বপানি স্প্রোক্যার স্বস্তয়ে।" তৃতীয়বার ছেদনের মন্ত্র "ওঁ বেন ভূরশ্চ রাজ্যং জ্যোক্ত চপশ্চতি সূর্য্য। তেন তে আয়ুবে পামি স্প্রোক্যার স্বস্তয়ে॥" এবং এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ ভাগ ছেদন করিতে হয়। ইহার পরে হোমকর্তা বালকের উত্তরে গিয়া বসিবেন এবং বালকের পিতা বাম কর্ণের উপস্থিত কেশে পূর্বের জ্ঞায় দর্ভপিঞ্জলী অর্পণ পর্য্যন্ত কার্য শেষ করিয়া পূর্বোক্ত তিনটি মন্ত্রে তিনবার ছেদন করিবেন। তৎপরে পূর্বের জ্ঞায় সেই কেশগুলিকে বালকের জননী বৃষগোময়ের উপরে রাখিয়া দিবে। ইহার পর হোমকর্তা অদ্বষ্ট ও উপকনিষ্ঠা অভুলীদ্বারা "ওঁ যং কুরেণ মার্জয়তা স্প্রেশমা বপসি কেশান্ ছিন্তি মাতায়ুঃ প্রমোষীঃ।" এই মন্ত্রোচ্চারণে কুরের মার্জন করিবেন। অনন্তর বালকের মাতা নাপিতের হস্তে কুর অর্পণ করিয়া "শীতোষ্ণাভিরত্তিরক্ষুধমুংকুশলী কুর।" এইরূপ আদেশ করিবেন। নাপিতকে "করোমি" বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহার পরে নাপিত সেই শীতলোক্ষ জলে সকল কেশ ভিজাইয়া মুগুন করিবে। এই সময়েই কর্ণবেধ করিতে হয়। অনন্তর হোমকর্তা প্রারম্ভিত ও বিষ্টকুং হোম সমাপন করিবেন। ইহার পরে দক্ষিণাদান দ্বাদ্বাদিপুর শরাগুলি নাপিতকে দিতে হয়। কুমারীর চূড়ায়ও এই সকল কার্য করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে কোন মন্ত্র

পড়িতে হয় না, বিনা মন্ত্রেই এই সকল কার্যের অচুচান করিবে। (বাহুব্বেবভট্ট বিরচিত আশ্বলায়নপদ্ধতি।)

বহুব্বেদীর চূড়াকরণ নিবন্ধে বৈষ্ণব বিধান আছে তদমু-
লারে চূড়া কাল জানিবে। চূড়াকরণের দিনে বালকের
পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শুভলগ্নে গোষ্ঠ্যাদি মাতৃকা
পূজা, বসুধায়া ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। তৎপরে "ওম্
অভেতাদি মংপুত্রামুকত চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্তব্যো যথাসম্ভব-
গোত্রশাখনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকরিতং তৃপ্ত্যে-
পরিকমরমহমুংহতো।" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া
তিনটি ভোজ্য উৎসর্গ করিবে, তৎপরে তিনজন ব্রাহ্মণ ভোজন
করাইয়া সাধ্যাসুসারে তাহুলাদি ও দক্ষিণা প্রদান করিবে।
ইহার পরে প্রাস্নে ছায়ামণ্ডপের মধ্যে পূর্বমুখে উপবেশন
করিয়া অগ্নি স্থাপন করিবে। উষ্ণজল, শীতলজল, নবনীত
শিঙ, ষেতশরকীর তিনটি কাঁটা, কুশনির্ম্মিত নয়টি ত্রিপাত্র,
ভাস্কর, ও নূতন শরতে বৃষগোমর এই সকল দ্রব্যের
সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার পরে পবিত্রছেদন, প্রোক্ষণীর
উপরে স্থাপন, প্রণীতা পাত্রের জলে প্রোক্ষণী পূরণ, বা মহ-
ত্তের উপরে প্রোক্ষণীটিকে উঠাইয়া লওয়া, ডান হাতের অভুলী
গুলি চিৎ করিয়া প্রোক্ষণী হইতে জল উঠান, ঐ জলে সমস্ত
দ্রব্যের প্রোক্ষণ, আত্মাহুতীতে দ্বত চালিয়া দেওয়া, জলন্ত
অনলে বেষ্টন, পর্য্যায়ীকরণ, শ্রবটিকে উত্তপ্ত করা, সম্ভার্জন,
কুশপত্র দ্বারা শ্রবটির মূল মধ্যে ও অগ্রভাগ মার্জন, প্রণীতা
জলদ্বারা অভ্যক্ষণ, পুনর্বার উত্তপ্ত করণ, ও ভূমিতে স্থাপন,
আজ্যোৎপবন, আজ্যাবেক্ষণ, উপবমন, কুশপত্র ও প্রোক্ষণী
জল বাহুহস্তে গ্রহণ, উঠিয়া অগ্নিতে সমিধনিক্ষেপ, অগ্নি
পশুক্ষণ, প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপন এবং অগ্নির উত্তরদিকে
প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন এই সকল কার্যগুলি যথাক্রমে বধানিয়মে
সমাপন করিবে। বালকের জননী বালককে দান ও নূতন
বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইবেন ও কোলে লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে
উপবেশন করিবেন। ব্রাহ্মণ "ওঁ অগ্নেৎসং সত্য নামাসি" এই
বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও অঘোরস্তপূর্বক "ওঁ প্রজাপতরে
স্বাহা। ইদং প্রজাপতরে।" এই মন্ত্রে অগ্নির বায়ুকোণ হইতে
আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত দ্বতধারা দান ও "ওঁ ইন্দ্রায়
স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়" এই মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ
করিয়া জৈশানকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন দ্বতধারা প্রদান করিবে,
ইহাকে আধার বলে। তৎপরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে"
এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে এবং "ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং
সোমায়" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে দ্বতাহতি দিবে। এই
দ্বইটিকে আজ্যভাগ বলে। ইহার পরে প্রারম্ভিত হোম ও

খিটকংহোম করিবে। তৎপরে “ও উকেন রায়ে উককে নেহদিতে কেশান্ বণ।” এই মন্ত্রে শীতলজলের সহিত উকজল মিশ্রিত করিবে। সেই জলের মধ্যে নবনীত পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহা দ্বারা বালকের মাথার দক্ষিণ ভাগের কেশগুলি “ও সবিত্তা প্রহুতা দেব্য আপ উকছু তে তছুং। দীর্ঘায়ুস্তায় বলার বরুলে।” এই মন্ত্রে ভিজাইয়া দিবে। শরকী কণ্টকগ্রহ দ্বারা চুলের জলা ভাঙ্গিয়া “ও ওষধে আরম্ভ। স্বথিতে মৈনং হিংসীঃ।” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাহাতে কুশ পত্রের সংযোজিত করিবে।

কুশযুক্ত কেশে “ও নিবর্ত্তনাম্যাবে হরাভার প্রজলনার, রাগপোয়ার হুপ্রজন্তার সুবীর্ঘ্যার” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাত্রকুরটী চালনা করিবে। তৎপরে “ও বেনাবণং সবিত্তা কুরেণ সোমন্ত রাক্ষোবক্ষণন্ত বিধান্। তেন বপামি ব্রহ্মণো বপতেদমভায়ুং জরদীর্ঘ্যাসং।” এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নৌহকুরদ্বারা কুশযুক্ত কেশ ছেদন করিয়া বালকের উত্তর-দিকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত পূর্নস্থাপিত গোমরপিণ্ডের উপরে নিক্ষেপ করিবে। দক্ষিণপার্শ্বেও এই প্রকার সমস্ত কার্য্য অমম্বক করিতে হয়। ইহার পরে মন্তকের পশ্চিমপার্শ্বেও দক্ষিণপার্শ্বে জার সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। প্রথমবার কেশছেদনের মন্ত্র—“ও কস্তপন্ত ত্র্যায়ুং। ও যমদমে ত্র্যায়ুং। ও যদেবানং ত্র্যায়ুং তন্তে হন্ত ত্র্যায়ুং।” এই প্রকার মন্তকের উত্তরভাগে ও দক্ষিণপার্শ্বে জার সমস্ত অস্থ-ষ্ঠান করিবে। প্রথমবার ছেদনমন্ত্র “ও বেন তুরিচরা দিবং যে কেচ পশ্চাদবি স্বর্যং। তেনতে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুপ্রোকায্য স্বন্তয়ে।” ইহার পরে সেই জলে সমস্ত কেশ ভিজাইয়া “ও অকুং পরিবণং।” এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক নাপিতের হস্তে কুরগাছি অর্পণ করিবে। নাপিত সমস্ত মন্তক মুণ্ডন করিয়া চুলগুলি সেই গোবর পিণ্ডের উপরে নিক্ষেপ করিবে, কুলাচার অঙ্গুসারে পাঁচটা বা একটা শিখা রাখিয়া মুণ্ডন করিতে হয়। মুণ্ডন হইয়া গেলে সেই চুল-গুলি কোন পোটে, সরোবরে বা পুকুরীতে কেলিয়া দিবে। ইহার পরে বালককে জান করাইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে রাখিয়া শাস্তিকর্ষ ও অশ্লীলকর্ষ করিবে। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে সাধারণ কার্য্যসমাপ্তির জার অঙ্কিত্রাবধারণ করিতে হয়। (পশুপতিভুক্ত দশকর্ণপদ্ধতি)

চুড়াকর্ণান্ (ক্লী) চুড়ারঃ কৰ্ণ ৩৩৭। চুড়াকর্ণ, বিধি অস্থ-সারে প্রথম কেশছেদন। “চুড়াকর্ণ বিজাতীনাং সর্কেবা-মেব ধর্মতঃ।” (মহু ২।৩৫) [চুড়াকর্ণ দেখ।] মেধান্তিধি চুড়াকর্ণ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করেন। ‘চুড়া শিখা উল্লংঘ্য

কর্ণ চুড়াকর্ণ কেবুতিনুর্ভূদেপেহু কেশানাং স্থাপনং রচনা বিশেষতঃ চুড়াকর্ণোচ্যতে’ (মহু ২।৩৫ ভাষ্যে মেধান্তিধিঃ)

চুড়ামাগ, সিংহল দ্বীপস্থিত একটি পর্বত। সিংহল দ্বীপের রাজা মহাদার্বিক মহানাগ এই পর্বতের উপর একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

চুড়াস্ত (পুং) চুড়ারঃ স্তম্ভঃ ৩৩৭। ১ চুড়ার শেখরভাগ। ২ সিদ্ধান্ত, নিম্পত্তি। (শেখর) ৩ শেখ সীমা, পরাকাষ্ঠা, উর্দ্ধসংখ্যার যতদূর সম্ভব হইতে পারে।

চুড়াপ্রতিগ্রহ (পুং) চুড়ারঃ প্রতিগ্রহঃ স্বীকারো ব্রজ বহত্ৰী। বৌদ্ধগণের একটি তীর্থস্থান। বুদ্ধদেব সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণের পর নিজ অসিতে মন্তকের সম্ভার কেশকর্ত্তন করিয়া যে স্থানে চুড়া অর্থাৎ শিখাধারণ করেন সেই স্থানকে ‘চুড়াপ্রতিগ্রহ’ বলে। ইহার অপভ্রংশ চুড়াগহ, চলিত কথায় চুড়িয়া বলে।

চুড়াভয়, সিংহল দ্বীপের একজন রাজা। প্রায় ৩৮ খৃষ্টাব্দে ইনি চুড়গুল নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন। এই বিহারটি গোনক নদীর তীরে এবং রাজধানীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।

চুড়ামণি (পুং) চুড়াস্থিতোমণিঃ মধ্যলোঃ। ১ শিরঃস্থিত মণি, শিরোরত্ন, যে মণিদ্বারা শিরোভূষণ করা হয়।

“ভূষণানাং হি সর্কেবাং স্বথা চুড়ামণিবরঃ।” (মার্কণ্ডেয় ১।৪)

চুড়ারঃ মণিরিবাস্ত বহত্ৰী। ২ কাকমাচিকা। (মেদিনী) ৩ যোগবিশেষ।

“স্বর্য্যগ্রহঃ স্বর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা।

চুড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তঃ ফলং স্মৃতম্।

অন্তর্বাদ্ গ্রহণাৎ কোটী গুণমাত্রফলং লভেৎ ॥” (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

রবিবারে স্বর্য্যগ্রহণ কিম্বা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে তাহার নাম চুড়ামণিযোগ। ইহাতে যে কোন পুণ্যকার্য্যের অঙ্কুষ্ঠান করা হয়, তাহার অনন্তফল হইয়া থাকে। অন্ত গ্রহণ অপেক্ষা ইহাতে কোটী গুণ ফল লাভ হয়।

৪ শুভাশুভ গণনাবিশেষ। শুভাশুভ জানিবার জন্তই এই গণনার অবতারণা করা হইয়াছে। গণক প্রথমে স্বর্য্য, দেবী, গণ ও চন্দ্রকে চিন্তা করিবে। গো-মূত্রিকার জার তিনটা রেখা টানিয়া ধ্বজাদি গণনা করিবে। প্রাশ্নব্যাক্যাসূত্রে ধ্বজাদি গণিতে হয়। নামমন্ত্রাসূত্রে ইহাদের জ্ঞাস করিতে হয় (১)। ১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ স্বা, ৫ বৃষ, ৬ ধর,

(১) ‘অপি চুড়ামণিঃ বক্ষ্যে শুভাশুভবিষয়ম্।

স্বর্য্যং দেবীং গণং সোমং স্মৃত্বাহু বিলিখেরঃ ১।৪

৭ নতী ও ৮ ধাজক এই আটটাকে ধাজাদি জানিবে।
[ইহার অপর বিবরণ গুরুড়পুরাণের ২০৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

৫ বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রব্যবসারী পণ্ডিতগণের উপাধি বিশেষ।

৬ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। “অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্ত নাম ধরি,
বন্দন সন্ন্যাসীচুড়ামণি।” (কবিকঙ্কণ)

৭ শব্দচুড়ের মন্তকস্থিত-মণি। বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে গোবর্দ্ধনপর্বতের ঈশাণকোণে রত্ন-সিংহাসন নামে একটি স্থান আছে। রাধিকার ক্রকের সহিত তথায় হোলীখেলা করিতেছেন, এমন সময়ে কংসপ্রেরিত শব্দচুড় রাধিকাকে হরণ করিবার উদ্দেশে উপস্থিত হয়। ক্রক তাহাকে সংহার করিয়া তাহার মন্তকমণিটা সংগ্রহ করেন, তাহাকেই চুড়ামণি বলে। এই মণিটার প্রতি বলরামেরও লোভ ছিল, কিন্তু রাধিকাই পরিশেষে ইহার স্বত্বাধিকারিণী হন। (বৃন্দা-লী ১০ অঃ) ভক্তমাল গ্রন্থের মতে এই চুড়ামণির অপর নাম শ্রমন্তক।

চুড়ামণি, ১ একজন ধর্মশাস্ত্রকার। রঘুনন্দন ও কমলাকর ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার, বসন্তরাজ ও রাজমার্গেও ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

চুড়ামণিদীক্ষিত, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি, ইনি আনন্দরাঘবকাব্য, কমলিনীকালহংসনাটক ও কল্পিণীকল্যাণ রচনা করেন।

২ বস্তুরত্নাকরের একজন টীকাকার।

চুড়ামণিদাস, একজন বৈষ্ণব গ্রন্থকার, ইনি বাঙ্গলা পণ্ডে চৈতন্যচরিত রচনা করেন।

চুড়ামণি রস, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য চিতার রসে ও স্নাতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগচূর্ণে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক ১০ তোলা পরিমাণে মিলাইয়া মাড়িয়া চক্রাকার করিবে। পরে ঐ চক্র সকল বন্ধন্থায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অমুপান—মধু ও ছাগ স্নাত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ শান্তি হয়।

চুড়াম্ন (স্ত্রী) চুড়ারামগ্রভাগে হস্তঃ যন্ত বহুব্রী। বৃদ্ধাম্ন। (রাজনি*)

ত্রিরখাগোমুক্তিকাত্যায় অথবা প্রমথাকাত্যঃ।

দিগদ্বাদশমুখোবা ধ্রুজাদীন গণেরং ক্রমাৎ। ২।

ধ্রুজো ধ্রুজোঃ সিংহন্ত বাবুঃ ধরদন্তিনঃ।

ধ্রুজোঃ অষ্টমোজেরো নাম মন্ত্রোক্ত তাম্রাসং ১। ৩।

(গুরুড়পুঃ ২০৫ অঃ)

চুড়ার (ত্রি) চুড়ামুক্তি চুড়া-ঋ-অণ্। চুড়াপত, চুড়ার অব-
স্থিত। এই শব্দটা পাণিনিয় প্রাগভ্যাদি গণাস্তর্গত। (পা ৪।২।৮০)

চুড়ারক (ত্রি) চুড়ামুক্তি ঋ-ধূল, বদ্বা-চুড়া-বাহল আরক্।

১ চুড়ায়ুক্ত। (পুং) ২ ঋবিবিশেষ। ইহার উত্তর গোত্রা-
পত্যে ইঞ হইয়া চৌড়ারকি শব্দ নির্মল হয়। (পুং স্ত্রী)

[বহ] চৌড়ারকি-ইঞোলুক্। ৩ চুড়ারক মূনির গোত্রাপত্য।

চুড়ারত্ন (স্ত্রী) চুড়ার রত্নঃ ৬তৎ। চুড়ামণি। (হেম*)

চুড়াল (ত্রি) চুড়া অন্ত্যস্ত চুড়া-লচ্। (প্রাণিহাদাতো লজন্ত-
তরস্তাৎ। পা ৫।২।৯৬) ১ চুড়ায়ুক্ত প্রাণী, যে সকল প্রাণীর
চুড়া আছে।

“চুড়ালঃ কণিকারাস্ত প্রকৃষ্টাঃ পিঠোরোদরাঃ।”

(ভারত ১০।৭।৩৭।) (স্ত্রী) ২ মন্তক। (শব্দরত্না*)

চুড়াল (স্ত্রী) চুড়াল-টাপ্। ১ উচ্চটা তৃণ, চলিত কথায়
নিবিবী বাস বলে। (অমর) ২ খেতগুজা। ৩ নাগরমুখা,
নাগরমুখ। (রাজনি*)

চুড়াবন (স্ত্রী) লাহোড়ের নিকটবর্তী একটি গিরি।

“সম্ভ্রাজ্য লোহরুড়ঃ প্রায়াদ্ গিরিং চুড়াবনাভিধং।”

(রাজতর* ৮।৫২৭।)

চুড়াবৎ (ত্রি) চুড়ান্ত্যস্ত চুড়া-মতৃপ্ মস্ত বঃ। চুড়াবিশিষ্ট,
যাহার চুড়া আছে। (পা ৫।২।৯৬)

চুড়িক (ত্রি) চুড়া-ঠন্। চুড়ায়ুক্ত। এই শব্দ পাণিনিয়
পুরোহিতাদি গণাস্তর্গত। (পা ৫।১।১২৮)

চুড়িকা (স্ত্রী) চুলিকা লস্ত ডকারঃ। [চুলিকা দেখ।]

চুড়িন্ (ত্রি) চুড়া-অন্ত্যস্ত চুড়া-বলাদিষাৎ ইন্। চুড়ায়ুক্ত,
যাহার চুড়া আছে।

চুড়িমাছ (দেশজ) একপ্রকার মৎস্ত। ইহার বর্ণ শাদা এবং
ইহার ডানান্তলির বর্ণ হরিদ্রাত শাদা।

এই মৎস্ত ভারতবর্ষের সমুদ্রে অথবা খালের মোহানায়,
মলয়দ্বীপপুঞ্জে এবং চীনদেশে পাওয়া যায়।

ইহা লম্বায় অনুন ১৬ ইঞ্চি। ইহার নীচের চুয়াল উপর-
কার চুয়াল অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। ইহার উপরকার
চুয়ালের একধারে ৮টা ধারাল ও চাপা দাঁত অবস্থিত। ইহার
সম্মুখে ২ কিষা ৩ জোড়া বাঁকা এবং বৃহৎ ধারাল বিষ দাঁত।
নীচের চুয়ালের উপর আরও দুজোড়া দাঁত আছে। মুখ বন্ধ
হইলে এই কএকটা দাঁত ইহার নাকের সম্মুখে থাকে।
পাশে ও উপরকার চুয়ালের দাঁতের ছায়া প্রায় পাঁচটা
দাঁত আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহার পৃষ্ঠদেশে
এবং বক্ষস্থলে রীতিমত ডানা আছে। ইহার শুষ্কদেশে বা
তাহার নিকটে ডানা নাই বটে, কিন্তু তথায় ৭৬ হইতে ৮২টা

হাড় থাকে। এই কএকটা কাঁটা চর্মের মধ্যে ঢাকা থাকে ও উপর হইতে দেখা যায়।

চুড়িলা (দেশজ) [চুড়া প্রতিগ্রহ দেখ।]

চুড়ী (চুড়াশব্দজ) হস্তালকারবিশেষ। [চুড়ী দেখ।]

চূণ (দেশজ) কার-শরী পদার্থবিশেষ। সংস্কৃত পর্যায়—জ্বা-চূর্ণ, শব্দভঙ্গ, কপর্দকভঙ্গ, শুক্লভঙ্গ, শব্দকভঙ্গ।

চূণ দুই প্রকার। ১ম বাথারি চূণ বা গোড়া চূণ (Ca. O) ২য়, কলিচূণ (Ca. H₂. O₂)। ঘুটিং, শব্দ, শব্দু কাদি ভঙ্গ করিলে যে খেতবর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই বাথারি চূণ (Quick-lime), ইহা অতিশয় উত্তাপেও জ্বব হয় না, কিন্তু যে বস্তু পোড়াইয়া বাথারি চূণ প্রস্তুত হয় উহার আকার অবিকৃত সেইরূপ থাকে। অতিশয় উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে উজ্জ্বল খেতবর্ণ আলোক নির্গত হয়। অম্লজান ও উদজান প্রজ্জলিত করিয়া এই ধীপ-শিখায় এই বস্তু স্থাপন করিলে যে প্রথর আলোক পাওয়া যায়, উহাকেই চূণের আলোক (Lime-light) কহে। বাথারি চূণ বায়ুতে থাকিলে জল ও ঘাস্কারকবায়ু শোষণ করে।

জল দিলে বাথারি চূণ প্রথমে স্পঞ্জের ভায় জলশোষণ করিতে থাকে, পরে অতিশয় তাপ উৎপাদন করিয়া ফুলিয়া উঠে এবং শুষ্ক খেতবর্ণ গুঁড়ায় পরিণত হয়। ইহাকে চূণ ভড়কান কহে। এই নূতন বস্তুর নাম Slacked lime; (Ca. H₂. O₂)। এই চূণ অতি অল্প পরিমাণে জলে জ্বব হয়। জলে গুলিলে কতক অংশ জলে মিশিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই নীচে পড়িয়া থাকে। উপরের স্বচ্ছ জলই চূণ-জল। এই চূণজল ক্ষারধর্মসম্পন্ন। ইহাতে লাল জবাফুল ডুবাইলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। চূণজল ঘাস্কারক বাষ্পশোষণ করিয়া ঘোলা হইয়া যায়। তখন নীচে যে গুড়ি পড়ে, তাহা চা-খড়ি মাত্র।

এই চূণ জলে গুলিয়া কাদার মত করিলে কলিচূণ প্রস্তুত হয়। চূর্ণক (Calcium) ও অম্লজান (Oxygen)-যোগে চূণ উৎপন্ন হয়। অম্লজান, সৈকত প্রভৃতির ভায় এই (Calcium) ধাতু প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সহিত আবার অনেক স্থলে জলের সহিত চূণ মিশ্রিত থাকে। তিন প্রকার জ্বব হইতে চূণ উৎপন্ন হয়—১ম মর্ম্মর পাথর, চূণাপাথর, চাখড়ি ইত্যাদি খনিজ পদার্থ হইতে, ২য় গোলা-কার ঘুটিং হইতে এবং ৩য় শব্দ, শুক্তি, শব্দু, কপর্দক প্রভৃতি প্রাণীদিগের গাত্যকরণ হইতে।

ভারতবর্ষে কড়পা, বিজাপুর, আরাবল্লী, বিজয়গিরি, গোণ্ডবন প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার মর্ম্মর প্রস্তর পাওয়া যায়। এই সকলের যে গুলিতে বেশ পালিশ চলে, তাহা অস্ত্রাস্ত্র কার্যে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্ট পোড়াইয়া চূণ করা হয়। মাদ্রাজ

প্রেসিডেন্সির ত্রিচীনপল্লী, কোইম্বাটোর, কড়পা, কাপ্পল এবং গদ্বরে চূণাপাথরের খনি আছে।

বাঙ্গালার মানডুম, সিংহভূম, হাজারিবাগ, মোহার্জাণা প্রভৃতি স্থানেও চূণাপাথরের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এত-তিন আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, কচ্ছ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই চূণাপাথরের খনি আছে। কিন্তু তথাপি ভারতের অনেক স্থানেই চূণ অতি মূল্যবান। তাহার কারণ এই—যেখানে চূণের কাইতি অধিক, সেখানে হইতে খনি দূরবর্তী। কলিকাতার সমস্ত চূণ নৌকা, রেল প্রভৃতি দ্বারা বহুদূর হইতে আনীত হয়। সুতরাং যে সকল খনি নদী বা রেল-ওয়ের নিকটবর্তী ঐ সকল হইতেই চূণ আনিবার সুবিধা অধিক। সম্ভ্রুতি নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতেই অধিক পরিমাণে চূণ নানাদিকে প্রেরিত হয়—

১। জবলপুর জেলার কাটুনি নামক স্থানে অতি উৎকৃষ্ট চূণ প্রস্তুত হয়। এই চূণ বহু পরিমাণে ৭৩৭ মাইল দূরবর্তী কলিকাতা পর্যন্ত রপ্তানি হইয়া থাকে।

২। শ্রীহট্ট পর্কতের দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ চূণাপাথরের খনি আছে। পূর্বে এই স্থান হইতেই কলিকাতায় অধিকাংশ চূণ আসিত, এখনও বহু পরিমাণে আসিয়া থাকে।

৩। রোহতক দুর্গের নিকট বিজয়গিরিতে চূণাপাথরের খনি হইতে অনেক চূণ হয়।

৪। হিমালয়ের স্থানে স্থানে অনেক চূণ আছে। পঞ্জাবের অধিকাংশ চূণ পাহাড় হইতে উৎপন্ন হয়।

৫। আন্দামান দ্বীপ হইতে অতি উৎকৃষ্ট চূণ আমদানি হয়। আন্দামান প্রায় কাটুনির সমরেখাবর্তী এবং ইহার চূণও কাটুনির চূণের ভায় উৎকৃষ্ট।

এতদ্ভিন্ন অস্ত্রাস্ত্র স্থানে যে চূণ হয়, তাহা স্থানীয় ব্যবহারে লাগে মাত্র। ঘুটিং প্রায় ভারতের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ঘুটিং মৃত্তিকার সহিত নানা আকারে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ও উত্তর প্রদেশে অট্টালিকা-নির্মাণাদি কার্যে এই চূণই অধিক ব্যবহৃত হয়। ঘুটিংএর উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, জলের সহিত প্রস্তরাদির চূর্ণ খুইয়া আইসে এবং পুনরায় জমাট বাঁধিয়া ঘুটিংএর আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য এইরূপে বহুকাল ধরিয়া বৃদ্ধি হইলে পর এতাদৃশ বৃহদাকার ধারণ করে। এই সকল ঘুটিং বিস্তৃত চূণাপাথর নহে। উহাদের সহিত আরও নানাবিধ পদার্থ থাকে।

বাঙ্গালার সমুদ্র, নদী, বিল, পুকুরী ইত্যাদিতে প্রীতি বৎসর বহুপরিমাণে গুলি, শব্দ, শুক্তি ও শব্দু কাদি দ্রুত হয়।

ঐ সকল পোড়াইয়া ছই-প্রকার চূণ হয়। শুষ্ক ও শব্দ প্রভৃতি এই উভয় প্রকার চূণই অষ্টালিকা নির্মাণের উপযোগী।

চূণ বেধানো প্রস্তুত হয়, তাহাকে চূণের ভাটা কহে। এদেশে করলা বা কাঠবারা চূণ পোড়ান হইয়া থাকে। ভাটাগুলি সচরাচর ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হয়। চতুর্দিকে তিন বা চারিহাত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা একটা স্থান বেলা করিয়া প্রাচীরের গোড়ার চারিটা বা ততোধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি রাখিয়া দেয়। ঐ গলিগুলির সোজাশুজি ভাটার মেঝেতে নালা কাটা থাকে, ঐ সকল নালার উপর ছই আঙ্গুল অন্তর ইট বসাইয়া তাহার উপর প্রথম একস্তর করলা বা কাঠ রাখে। পরে একস্তর ঘুটিং দেয়। এইরূপ স্তরে স্তরে ভাটা সাজাইয়া নিম্নস্তরে অগ্নি জালিয়া দেয়। ক্রমে সমস্ত ভাটিতে আগুন লাগিয়া ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে। এইরূপ ২৩ দিন পুড়িলে আগুন নিবিয়া যায়। তখন শীতল হইলে ভাটা হইতে পোড়া চূণ বাহির করিয়া তাহাতে জল ছড়াইয়া দিলে পাথর গলিয়া শুঁড়া শুঁড়া শ্বেতবর্ণ বাথারি চূণ হয়। তারপর এই চূণ বস্তা করিয়া নানা স্থানে লইয়া যায়।

ঘুটিং প্রভৃতি যত আন্তে আন্তে পোড়ে, ততই অধিক পরিমাণে চূণ হয়। এই অল্প চূণারীগণ ভাটির গোড়ার ছিদ্র বেশী বড় করে না, তাহাতে অধিক বাতাস ঢুকিয়া করলা শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায় না। স্তরায় ঘুটিং প্রভৃতির অন্তরস্থ কতকভাগ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ঘুটিং ও করলার উৎকর্ষাপকর্ষ অল্পসারে উভয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। সচরাচর ১০০ মণ ঘুটিং পোড়াইতে ৪০ হইতে ৬০ মণ পর্যন্ত পাথুরিয়া করলা লাগে। অনেক স্থানে করলা ও ঘুটিং স্তরে স্তরে না সাজাইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া দেয়। ১০০ মণ ঘুটিং হইতে ৪০ হইতে ৬০ মণ চূণ হইতে পারে। এইরূপে চাখড়ি ও অজ্ঞাত চূণাপাথর হইতেও চূণ হয়। শব্দ, শুষ্কি, শব্দকাদির আবরণও এইরূপে পোড়াইয়া চূণ পাওয়া যায়। শব্দ প্রভৃতি পোড়াইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ করলা বা কাঠ লাগে। উপাদানের বিশুদ্ধতা অল্পসারে চূণ উৎকৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট চূণ শ্বেতবর্ণ ও কঙ্কর রহিত।

তৈয়ার করিবার খরচ, কাটিতি ও দূরস্থ অল্পসারে চূণের মূল্য স্থির হয়। কলিকাতায় সচরাচর ১৬/০, ৮০ আনা করিয়া মণ বিক্রয় হয়।

যে সকল পদার্থ হইতে চূণ উৎপন্ন হয়, তাহাদের অধিকাংশই চূণ ও দ্ব্যক্সকারক যোগে উৎপন্ন। (Ca. CO₃) পোড়াইলে উহা হইতে দ্ব্যক্সকারকবাস্প বাহির হইয়া যায়, কেবল চূণ অবশিষ্ট থাকে। চাখড়ি, মর্দর প্রভৃতিতে উক্ত ছই দ্রব্য

ভিন্ন ভিন্ন অল্প পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। কিন্তু অনেক চূণ পাথর ও ঘুটিং প্রভৃতিতে লৌহ ও অজ্ঞাত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। চাখড়ি বা চূণাপাথর বায়ুতে দগ্ধ করিলে সাধারণ চূণে পরিণত হয়। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে অভ্যন্ত উত্তপ্ত করিলে উহা গলিয়া একপ্রকার স্বচ্ছমর্দরপ্রস্তরে পরিবর্তিত হইয়া যায়। চূণ হইতে রাসায়নিক উপায়ে অল্পজান পৃথক করিলে চূর্ণক (Calcium) অবশিষ্ট থাকে। চূর্ণক একটা ধাতু, ইহার বর্ণ রৌপ্যমিশ্রিত স্বর্ণের স্তায়। ইহা সীসক অপেক্ষা কঠিন, কিন্তু অতিশয় লঘু। ইহাকে পিটিয়া পাত করা যায়। বায়ুতে থাকিলে শীঘ্রই মরিচা ধরে। উত্তপ্ত করিলে ইহা বায়ুতে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়া পুড়িতে থাকে। পুড়িলে যে দ্রব্য হয়, তাহা চূণ মাত্র।

কোন পদার্থ হইতে অধিক চূণ হইবে কিনা তাহা গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। গন্ধকদ্রাবকে একটু চূণাপাথর ফেলিয়া দিলে যদি তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প উঠিতে থাকে, তবে তাহাতে অধিক চূণ আছে বুঝিতে হইবে। অল্প বাষ্প উঠিলে অল্প চূণ থাকিবে।

চূণ আমাদিগের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহুতর কার্যেই ইহার প্রয়োজন।

কাপড়ে নীল রঙের ছিট করিতে হইলে নীলবড়ির সহিত চূণ ও সৈঁধো যোগে রঙ প্রস্তুত হয়। নীলকে শাদা করিতে হইলে চূণ ও চিনির সহিত নীলবড়ি ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে শীঘ্র অস্তরূপে আরম্ভ হইয়া নীল শাদা হইয়া যায়।

চাখড়ি প্রভৃতি অনেক সময় রঙ রূপে ব্যবহৃত হয়। লোমস প্রাণিদিগের কাঁচা চামড়া চূণে ডুবাইয়া রাখিলে লোম সকল উঠিয়া যায় এবং চামড়া জঁবং ফুলিয়া উঠে। পরে চামড়া কসা হয়।

সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিতেও চূণের ব্যবহার লাগে। [সাবান ও বাতি দেখ।]

কাপড় শাদা করিতে, কোন স্থানে চূর্ণক ঘুচাইতে ও অজ্ঞাত নানা কার্যে যে ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) ব্যবহৃত হয়, তাহা চূণ হইতেই প্রস্তুত। চূণের ভিতর দিয়া হরিতক বাষ্প (Chlorine) চালাইলে চূণ ব্লিচিং পাউডারে পরিণত হয়। ইহার বর্ণনাশক গুণ আছে।

চিকিৎসা—কি বৈদ্যক কি ভাস্করী কি হাকিমী সকল চিকিৎসাতেই চূণ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তত্ত্ব বহুতর মুষ্টিযোগে চূণ লাগে। কোন কোন স্থানে আঘাত লাগিলে চূণ ও হলুদ মিশাইয়া ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা সারিয়া যায়। আগুনে পুড়িলে চূণজল ও নারিকেল তৈল কেনাইয়া ঐ ফেন

সকল মেহড়া বা তুলা দ্বারা দধি স্থানে লাগাইলে বা সারিরা যায়। পাণিবসন্ত স্থানে ঐ প্রলেপ দিলে বসন্তের দাগ হয় না।

অল্প জন্ম অজীর্ণ হইলে প্রতিদিন ২ বার তিন চারি তোলা করিয়া চূর্ণজল খাইলে শীঘ্র অজীর্ণ আরাম হয়। শিশুদিগের পেটের পীড়ায় ছেঁদের সহিত চূর্ণজল দেওয়া যাইতে পারে। কোন খনিজ দ্রব্যক দ্বারা বিবাক্ত হইলে চূর্ণ জল খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে। সৈঁধো বিষ খাইলেও চূর্ণজলে অনেক ফল হয়।

কটু করিলে মূত্রনালীতে জ্বালা ও ঘন ঘন কষ্টদায়ক প্রস্রাবপীড়ার নাতিমণ্ডলে ও উপস্থে চূর্ণ লেপিলে তৎক্ষণাৎ অশ্রুধা ফললাভ হয়। একভাগ চূর্ণজল ও ২।৩ ভাগ জল মিশাইয়া পিচকারী দিলে অনেক সময় খেতপ্রদরাদি যোনিব্যাদি সকল একবারে আরাম হয়।

যে সকল বেদনা হইতে অধিক পুষ নির্গত হয়, চূর্ণজল দ্বারা সর্বদা ধৌত করিলে তাহা শুকাইয়া যায়।

উপদংশসংক্রান্ত ঘায়ে জল প্রায় দেড়পোয়া ও ৩০ গ্রেণ কালোমেল (Calomel) মিশাইয়া সর্বদা লাগাইলে বিস্তর উপকার হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত দ্রব্যই ব্লাক ওয়াশ (Black Wash) নামে খ্যাত।

খাদ্য—আমরা প্রতিদিন পাণের সহিত চূর্ণ ভক্ষণ করি; তন্নিম্ন অনেক শাক ও ফলাদির সহিত চূর্ণ সংযুক্ত হয়। চূর্ণ একটা অস্থিনির্মাণকারী বস্তু। চূর্ণের একটা গুণ মাংসপাককারী। এই জন্ম পাণে অধিক চূর্ণ হইলে মুখ পুড়িয়া যায়।

পূর্বে ভারতবর্ষের সৌখিন নবাবগণ মুক্তান্ত্র দিয়া পান খাইতেন। মুক্তাচূর্ণও অল্পজানযোগে উৎপন্ন পদার্থ এবং ইহার রাসায়নিক উপাদান শুদ্ধি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। স্তত্রাং মুক্তা পোড়াইলে ঝিঝকের মতই চূর্ণ হয়। কিন্তু ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক, গুণও বেশী।

কৃষিকার্যে সাররূপে চূর্ণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে ভূমিতে অত্যন্ত গাছ পালা হয়, তথায় চূর্ণ দিলে ঐ সকল গাছ পালা পচিয়া স্নানর সার হইয়া যায়।

গৃহনির্মাণকার্যে চূর্ণ সর্বাঙ্গপেক্ষা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইট গাঁথিবার মসলা সচরাচর ১ ভাগ চূর্ণ ও ২।৩ ভাগ হুর্কি দিয়া প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানে হুর্কির পরিবর্তে চূর্ণের সহিত বালুকা মিশাইয়া মসলা প্রস্তুত করে। চূর্ণ টাটকা এবং মসলা সূক্ষ্ম ও উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলেই গাঁথনি দৃঢ় হয়। কেবল চূর্ণের মসলা অপেক্ষা চূর্ণ ও হুর্কি-মিশ্রিত মসলা অধিক উৎকৃষ্ট।

চূর্ণকাম (চূর্ণকর্ম্মকাজ) চূর্ণ দিয়া ইটকাদি নির্মিত গৃহলোপন। চূর্ণখড়্গী (দেশজ) একরকম বাস।

চূর্ণতী (চূর্ণবতীশকজ) চূর্ণ রাখিবার ক্ষুদ্র ডাঙবিশেষ।

চূর্ণবালা (দেশজ) চূর্ণ ও বালা।

চূর্ণা (চূর্ণশকজ) চূর্ণ। দালান রঙ করিতে যে সকল চূর্ণ ব্যবহৃত হয়, চলিত কথায় তাহাকে চূর্ণা বলে। কোন কোন দেশে পাণের সহিত যে চূর্ণ ব্যবহার করে, তাহাকেও চূর্ণা বলিয়া থাকে। হিন্দীতে সকল চূর্ণকেই চূর্ণা বলে।

চূর্ণারী (চূর্ণকারীশকজ) ১) যে চূর্ণ প্রস্তুত করে। ২) চূর্ণপ্রস্তুতকারী, বর্ণশকজাতাবিশেষ। রামায়ণে ইহার চূর্ণোপজীবী নামে বর্ণিত। ৩) জীলোকের পরিধেয় এক প্রকার বস্ত্র।

চূত (পুং) চূষ্যতে আশ্রয়তে চূষ কর্ম্মণি-কৃত পূর্বোদরাদিহাৎ যকারলোপে সাধু, যবা চোততি রসং চূত-অচ। ১) আশ্রয়ক।

“পরিশ্চূষতি সংবিশ্ত্র ভ্রমরশ্চূতমঞ্জরী।” (রামায়ণ ৩।৭২।১৭)

(স্ত্রী) চূত-অণু তন্ত্র লুক। ২) আশ্রয়ক, আম। চোততি

করতি শোণিতাদিকং চূত-অচ। ৩) মলদ্বার। (শব্দরত্নাবলী) কোন কোন পুস্তকে ৩ অর্থে “চূত” স্থলে ‘চ্যুত’ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চূতক (পুং) চূত-কন্। ১) আশ্রয়ক, আম গাছ। ২) গুণ বৃক্ষ, যাহাতে গুণ বাঁধা হয়।

চূতি (স্ত্রী) যোনি।

চূয়া, বৃক্ষবিশেষ। বান্দাগায় এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পার্শ্ব-তীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। ঔষধ এবং খাদ্য জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ইহার গুণ উত্তেজক, গণ্ডরোগনাশক এবং উদরাময়ে সন্ধোচক। ইহার পত্রগুলি লোকে রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে, এবং কোন কোন স্থানে ইহার বীজ অত্যাশ্রয় শস্তের জায় ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড় হইতে লাল রঙ নির্গত হয়। এই রঙে কাপড় রংকরা হইয়া থাকে। সেই কাপড় ছিট রূপে ব্যবহৃত হয়।

চূরু (চূর্ণশকজ) চূর্ণ করা, গুঁড়ন।

“দক্ষের নিজ পুত্র, ভাঙ্গিয়া করে চূরু” (কবিকঙ্কণ)

চূরী (স্ত্রী) ক্ষুদ্র কুপ।

চূরু (পুং) চূর-উণ্। কৃমিবিশেষ।

“চূরবোধিস্থাশ্চৈব সপ্তৈবৈতে পুরীষজাঃ।” (সুশ্রুতঃ ৫।৫৪ অঃ)

[ইহার বিশেষ বিবরণ কৃমি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চূরুচূরু (দেশজ) ভরপুর, পূর্ণরূপে যে পান করিয়াছে।

চূর্ণ (স্ত্রী) চূর্ণ্যতে শিষ্যতে বৎ-চূর্ণ-কর্ম্মণি অণু। পেষণ দ্বারা কঠিন দ্রব্যের শুষ্কভাবে পরিণাম, গুঁড়া। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের মতে অত্যন্ত শুষ্ক দ্রব্য পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া

নাইলে তাহারকে চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা এক কব্জি বা আশী রতি। কোন চূর্ণ ঋকৃ সিতে হইলে সমান এবং চিনি সিতে হইলে বিংশ ষেওয়া উচিত। কোন কারণে চূর্ণে কিছু মিশাইতে হইলে উহা অজিরা লইতে হয়। চূর্ণ লেহন করিবার ব্যবস্থা হইলে দ্রব প্রকৃতি কোন তরল দ্রব্য বিংশ পরিমাণে ইহার অল্পান এবং পান করিতে হইলে চতুর্ভাগ তরল দ্রব্যে শুদ্ধিগুলি আলোড়িত করিয়া সেবন করা উচিত। কিন্তু পিত্ত, বায়ু ও ককজাত রোগে যথাক্রমে ৩ পল ২ পল ও এক পল অল্পান ব্যবহার করা উচিত। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব ২ ভাগ)

২ সদগন্ধযুক্ত ধূলি, আবীর।

“অনেকেষু চয়ুরেণ চূর্ণপ্রতিনিধী কৃতঃ।” (রঘুবংশ)

৩ ধূলি। ৪ তাম্বুলোপকরণবিশেষ, চূর্ণ। (মেদিনী) [চূর্ণ দেখ।]

“চূর্ণমানীরতাং তুর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।” (উদ্ভট)

(পুং) চূর্ণ ভাবে অপ। পেষণ, শুড়ন। চূর্ণ-কর্মণি অপ।

৬ ধূলি। ৭ চূর্ণ। ৮ কপর্দক। (মেদিনী) (ত্রি) চূর্ণ

কর্মণি অসংজ্ঞার্থে অপ। ৯ বাহা শুড় হইয়াছে। (দেশজ)

১০ বাহা নষ্ট হইয়াছে, বাহা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

চূর্ণক (স্ত্রী) চূর্ণ সংজ্ঞার্থে কন্। ১ গদ্যবিশেষ। কঠোর অক্ষরহীন, প্রতিকটু, দোষশূদ্ধ, অল্পসমাসযুক্ত, অর্থাৎ বাহাতে দীর্ঘ সমাস নাই এইরূপ গদ্যকে চূর্ণক বলে। ইহা বৈদম্বরীতিতে রচিত হইলে অতিশয় মনোহর হইয়া থাকে।

“অকঠোরাক্ষরং স্বল্পসমাসং চূর্ণকং বিদ্যঃ।

তত্বে বৈদম্বরীতিস্থং গদ্যং স্বল্পতরং ভবেৎ।” (সাহিত্যদঃ)

উদাহরণ যথা—

“সহি ত্রয়াণামেব জগতাং গতিঃ পরম পুরুষঃ

পুরুষোত্তমঃ দৃশ্যদানবভরেণ ভদ্রাদীমবনি-

মবলোক্যাকরুণার্জ জঘন্যস্তভাতারমবতারয়িতুং

রামকৃষ্ণপেণাংশতো যজ্বংশে অবততার।” (ছন্দোমঞ্জরী)

(পুং) ২ যষ্টিক, শালিধাতুবিশেষ।

“চূর্ণককুরবককেদারকপ্রভৃতয়ঃ যষ্টিকাঃ।” (স্বশ্রুত ১।২৪অঃ)

৩ সজু, ছাতু। চূর্ণ স্বার্থে কন্। ৪ [চূর্ণ দেখ।]

৫ ধাতুবিশেষ। (Calcium) [চূর্ণ দেখ।]

চূর্ণকার (পুং স্ত্রী) চূর্ণং করোতি চূর্ণ-ক-অণ্ উপসং। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত কথায় চুগারী বলে। পরাশরপদ্ধতির মতে নটজাতীয় জীর গর্ভে পুণ্ড্রকের ঔরলে এই জাতির উৎপত্তি হয়। [চুগারী দেখ।] জীমিকে জীপ্ হয়। (ত্রি) ২ চূর্ণকারক, যে চূর্ণ করে।

চূর্ণকুণ্ডল (পুং) চূর্ণচালৌ কুণ্ডলশ্চেতি কর্মধা। অলক, আপট, ঘুরী।

চূর্ণকুণ্ড (স্ত্রী) চূর্ণার খণ্ডঃ ৪৩৭। ককর, চলিত কথায় কাকর বা মুটি বলে। (বাক্যরং)

চূর্ণভা (স্ত্রী) চূর্ণভ ভাষা চূর্ণ-ভল-টাপ্। চূর্ণের ভাব, চূর্ণ।

“নীচা স্রবণাদিচূর্ণভাঃ।” (সাক্ষতরং ৪।১৬)

চূর্ণন (স্ত্রী) চূর্ণভাকে ঘ্রাই। শুড়ন, চূর্ণ করা।

চূর্ণপদ (স্ত্রী) গতিবিশেষ, নানাতরঙ্গে অগ্রপট্টাৎ স্রবণ।

চূর্ণপারদ (পুং) চূর্ণঃ পারদস্ত একবেদিশি সমাসঃ। কিছুল।

(রাজনি) ইহা হইতে পারদ লয়ে বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে।

চূর্ণযোগ (পুং) চূর্ণস্ত যোগঃ ৬৩৭। নানাবিধ স্রবণক্রিয়ার মিশ্রণ।

চূর্ণশস্ (অব্য) চূর্ণ-শস্। চূর্ণ-বিচূর্ণ, অতিশয় চূর্ণ।

“ততত্বতীরং হৃদা তং দধ্বা কৃদ্বা চ চূর্ণশঃ।” (ভারত আদি)

চূর্ণশাকাক্ত (পুং) চূর্ণ-ইব তত্রঃ শাকঃ চূর্ণশাকঃ তম্বতে সৃঙ্গী করোতি চূর্ণশাক-অকি-অণ্ উপসং। চিত্রকূট গিরি-প্রসিদ্ধ একরকম শাক, ইহার অপপর নাম গৌরস্রবণ। (রাজনি)

চূর্ণাদি (পুং) চূর্ণ-আদির্য়ত্র বহুব্রী। পাণিনির একটা গণ।

তৎপুরুষ সমাসে এই গণান্তর্গত শব্দ প্রাপ্তিবাচক। শব্দের উত্তরবর্তী হইলে তাহার আদি উদাত্ত হয়। চূর্ণ, করীষ, করিব, শাকিম, শাটক, দ্রাক্ষা, তুস্ত, কুম্ভম, দলম, দলপ, চমনী, চন্দন ও চোল ইহাদিগকে চূর্ণাদিগণ বলে। (পা ৬।২।১৩৪)

চূর্ণি (স্ত্রী) চূর্ণয়তি খণ্ডয়তি শতসহস্রপণ্ডিতানাং তর্কঃ চূর্ণ-ইন্ (সর্গধাতুতাইন্। উণ্ ৪।১১৭।) ১ পতঞ্জলিকৃত পাণিনি

ব্যাকরণের ভাষা। “চূর্ণিভাশুস্রিভাটঃ।” (ব্যাং কাং)

২ শতসংখ্য কপর্দক, একশত কড়ি। (সি কো উপাদিবৃত্তি)

৩ কার্ষাপণ, পুরাণপরিমিত কপর্দক। চূর্ণ-ভাবে ইন্।

৪ চূর্ণন, শুড়ন।

চূর্ণিকা (স্ত্রী) চূর্ণোহন্ত্যস্ত চূর্ণ-ঈন্-টাপ্। সজু, ছাতু।

(ভূরিপ্রয়োগ)

চূর্ণিকৃৎ (পুং) চূর্ণিং মহাভাষ্যং করোতি ক-কিপ্। মহাভাষ্য-কারক, পতঞ্জলি মুনি।

চূর্ণিত (ত্রি) চূর্ণ-কর্মণি-ক্। যাহাকে চূর্ণ করা হইয়াছে।

চূর্ণিদাসী (স্ত্রী) চূর্ণো চূর্ণনে নিযুক্তা দাসী, মধ্যলোৎ। যে দাসীকে পেষণকর্মে নিযুক্ত করা হয়। (শব্দার্থ-চিৎ)

চূর্ণিন্ (ত্রি) চূর্ণৈঃ সংসৃষ্টঃ চূর্ণ-ইনি। (চুগাদিবিঃ। পা ৪।৪।২৩)

চূর্ণনির্মিত, যাহা চূর্ণ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

“চূর্ণিনোহপুণাঃ।” (সি কোং)

চূর্ণী (স্ত্রী) চূর্ণি-জীপ্। ১ কার্ষাপণ, পুরাণ (কাহণ) পরিমিত কপর্দক। “অশীত্বাতরপরিমিতথেষুশতং দেয়ং তদ্বশতো

চষারিংশংপুরাণোত্তরচূর্ণীশতপঞ্চকঃ।” (প্রারম্ভিক্তবিং)

২ পতঞ্জলিপ্রণীত পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য। ৩ নদীবিশেষ।

চূর্ণীকৃত (ত্রি) অচূর্ণঃ চূর্ণঃ সম্প্রচমানঃ কৃতঃ চূর্ণ-কৃ-কৃত।
যাহা চূর্ণ করা হইয়াছে, চূর্ণিত।

“সর্বশূর্ণীকৃতস্তত্র সমাংসান্ধিশিরাপ্তহুঃ।” (রামাং ৫১৩৯১৩১)

চূর্ণিত (ক্রী) চর-ভাবে ক্রিন্ অত উৎস। চরণ।

চুল (পুং) চোলরতি পুনঃ পুনচ্ছেদনে হপি উন্নতো ভবতি চুল
উন্নতো-ক পৃথোদরাদিবাদীর্ঘঃ। যথা চুর-কঃ রেকস্ত লকারঃ।
কেশ, চুল। (অমর) “গৃহীতচুলকো বিপ্রো স্নেচ্ছেন
রজকাদিনা।” (মৎস্তসূক্ত ৩৮পং)

চুলা (ক্রী) চুড়া ডস্ত লঃ। ১ গৃহের উপরিস্থিত গৃহ, চিলেঘর।
(শকার্ধচিৎ) ২ চুড়া।

চুলিক (ক্রী) চোলরতি ভর্জনসময়ে সমুন্নতো ভবতি চুল-খুল
নিপাতনে সাধু। স্তম্ভপক গোধুমপিষ্টক, লুচি। (শকার্ধচিৎ)

চুলিকা (ক্রী) চুলিক্-টাপ্। ১ হস্তীর কর্ণমূল। ২ নাটকের
অঙ্গবিশেষ। নাটকের লক্ষণানুসারে অঙ্গে অদর্শনীয় কতক-
গুলি বিষয়, অর্ধোপক্ষেপক দ্বারা প্রকাশিত হয়। যে স্থলে
যবনিকার মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন বিষয়ের সূচনা
করা হয়, সেই অর্ধোপক্ষেপকের নাম চুলিকা।

“অস্তর্জবনিকাসংস্কারঃ সূচনার্থস্ত চুলিকা।”

উদাহরণ যথা—বীরচরিতে চতুর্থাঙ্কস্থানো “ভো ভো
বৈমানিকাঃ প্রবর্তস্তাং রজমঙ্গলানীত্যাদি” রামেগজিতঃ
পঞ্চশ্রুতঃ।” ইতি নেপথ্যে পাট্রৈঃ সূচিতং।

সংস্কৃত নাটকের লক্ষণানুসারে যুদ্ধাদি ঘটনা অঙ্গে অভি-
নয় করিতে নাই। এই কারণে বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্কের
প্রথমে পরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধ অভিনয় না করিয়া
নেপথ্যস্থিত অভিনেতাগণের বাক্যেই প্রকাশিত করা হই-
য়াছে। অতএব এই অর্ধোপক্ষেপকটিকে চুলিকা বলা যাইতে
পারে। [নাটক দেখ।] ৬ মোরগের মাথার খুঁটি। ৪
জৈনদিগের দৃষ্টিবাদের এক অংশ।

চুলিকাণ্টী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক,
বিষ, হরিভাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ,
সমষ্টির চতুর্গুণ জলপাল। ভীমরাজ বা কেশরিরার রসে এবং
মধুর সহিত মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা
সেবন করিলে শোথ, উদরী, কামলা, পাণ্ডুরোগ, আমবাত,
হলীমক, ভগল্লর, কুষ্ঠ, স্নীহা, শুষ্ক প্রভৃতি রোগ শান্তি হয়।

চুলিকোপনিষদ্ (ক্রী) অথর্কবেদীর একখানি উপনিষদ্।

চুলিন্ (ত্রি) চুড়া অন্ত্যস্ত চুড়া ইনি ডস্ত লঃ। ১ চুড়ায়ুক্ত,
যাহার চুড়া আছে।

“মৌলৌ চঞ্চলচুলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী।”

(গোপীনাথপুরের শিলাপ্রশস্তি)

(পুং) ২ এক ঋষি। রূপবতী গন্ধর্বকুমারী সোমদার
পরিচর্যার সঙ্কট হইয়া ঋষিঠাকুর তাহার প্রতি সদয় হইয়া-
ছিলেন। তাহাতেই গন্ধর্বকুমারী একটি পুত্ররত্ন লাভ
করেন। তাহার নাম ব্রহ্মদত্ত। (রামাং বালকাং ৩৩ অঃ)
[সোমদা ও ব্রহ্মদত্ত দেখ।]

চুষণীয় (ত্রি) চুষ-কর্ম্মণি-অনীদন্। আবাদনীয়, যাহা আবাদন
করা হইবে বা আবাদনের যোগ্য।

চুষা (ক্রী) চুষাতে পীরতে পৃষ্ঠমধ্যসেন দর্শনাবিসরতাং নীরতে
চুষ-মধ্যার্থে-ক-টাপ্। হস্তীর মধ্য বন্ধনরজ্জ্ব, যাহা দ্বারা
হাতীর মধ্যভাগ বন্ধন করা হয়, ইহার অপর নাম কক্ষা,
চলিত কথায় কাছদড়ি বলে। (অমর) চুষ-ভাবে অঙ্
টাপ্। চুষণ।

চুষিত (ত্রি) চুষ-কর্ম্মণি-কৃত। ১ আবাদিত, যাহা চুষণ করা
হইয়াছে। (ক্রী) চুষ-ভাবে-কৃত। ২ চুষণ, আবাদন।

চুষী (দেশজ) শিশুদের একপ্রকার খেলানা, বালকেরা ইহা
মুখে পুরিয়া চুষিয়া থাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

চুষ্য (ত্রি) চুষ-কর্ম্মণি-গ্যৎ। পেয়বিশেষ, জিহ্বা ও গুঠ লাগাইয়া
যাহা পান করিতে হয় তাহাকে চুষ্য বলে, চোষণীয়, যাহা
চুষিয়া খাইতে হয়। “প্রাপ্তির্ভক্ষ্যতোজ্যালেহপেয়চুষ্যাভ্যব-
হার্যাণাং।” (ভারত শল্য ১৯১ অঃ)

চুষ্ত (দেশজ) ফলাদির অসার ভাগ, যেমন কাঁটালের ভূতি।

চৈঁউড় (দেশজ) জন্তুবিশেষের চরণ, যাহাতে ক্ষুর থাকে।

চৈঁচাচৈঁচি (চীৎকার শব্দজ) একাধিক লোকের চীৎকার,
উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান।

চৈঁচান (দেশজ) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা।

চৈঁচানি [চৈঁচান দেখ।]

চৈঁচুয়া (দেশজ) এক জাতীয় ঘাস।

চৈঁচুক (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।

চৈঁট (দেশজ) লিঙ্গ।

চৈঁড় (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

চেকিত (ত্রি) কিং যঙ লুক্-অহ্। ১ অতিশয় বাসনা ও জ্ঞান-
যুক্ত। (পুং) ২ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটি পাণিনির গর্গাদি
গণাস্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর যঙ্ হইয়া থাকে।

চেকিতান (ত্রি) কিত যঙলুক্ তাক্ষিল্যে চানশ্। ১ অত্যন্ত
জ্ঞানযুক্ত। (পুং) ২ মহাদেব।

“রুদ্রমীশানমুবভং জিহ্বাং শঙ্কুং কপর্দিনম্।

চেকিতানং পরং যোনিং তিষ্ঠতোগচ্ছতচ্ছহ॥” (ভারত ৭।২০১ অঃ)

৩ স্বপ্নবৃক্ষের একজন কত্রি রাজা, ভারতবর্ষে পাণ্ডবের পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন।

“ধৃষ্টদ্যুম্নচেতিক্তানাঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্।” (গীতা ১ অঃ)

চেঙ্গোনাই, বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলার একটি নদী। যে সকল স্থান দিয়া ইহা প্রবাহিত তদ্ব্যতীত আটটি স্থানে গব-মেন্ট কর্তৃক মৎস্য ধরবার ব্যবস্থা চলিতেছে।

চেক্রিয় (ত্রি) পরিশ্রমী, কার্যকুশল।

চেঙ্গোপাখী, পক্ষীবিশেষ। ইহার মাথার উপরিভাগে কৃষ্ণ বর্ণ, কিন্তু লম্বালম্বী একটি হরিদ্রাভ শাদা ডেঙ্গাকাটা, চক্ষের উপর দুইটা রেখা, একটি কৃষ্ণাভ কটা অপরটা হরিদ্রাভ, পৃষ্ঠ এবং কণ্ঠদেশে মধ্যমলের রঙ, পাঁশুটে ও গিরিমাটির মত অঙ্কিত; পাখার নিম্নভাগ কৃষ্ণাভ কটা, কিনারায় লালচে শাদা ডোরা। ইহার কৃষ্ণবর্ণ শক্ত পালক লেখনীরূপে ব্যবহৃত হয়। দাড়ি এবং গলা শাদা; গাল, ষাড় এবং বুকের উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত; পাজরার উপর শাদা এবং কালা ডোরা; বক্ষের নিম্নভাগ এবং তলপেট শাদা; পুচ্ছ কাল, কিন্তু ইহার কোন কোন অংশে শাদা দাগ থাকে, ঠোঁট লালচে কটা; কটা পা ধূসরাত সবুজ। এই পাখী এক একটা ১১ হইতে ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। ভারতবর্ষে এই পক্ষী শীতকালে দেখা যায়। জলাভূমিতে, প্রাবৃত ধানক্ষেত্রে, ঝিল, পুকুরিগী এবং নদীতে অবস্থিত করে। কুমি এবং জলীর কীট ইহাদের খাদ্য। ইহার বংশীর শ্রায় ধ্বনি করিয়া বায়ুর বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়।

চেঙ্গো, মলবারবাসী একপ্রকার নীচ জাতি। ইহারা খেজুর নারিকেল প্রভৃতি গাছ হইতে তাড়ি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এইরূপ প্রবাদ যে চেঙ্গোগণ সিংহল হইতে আসিয়াছে। ইহারা বলে যে চেকুম্ পেরুমল রাজার রাজত্ব কালে তাঁহার রাজ্যে এক ধোপানী বাস করিত। একদা সে কাপড় কাচিতে কাচিতে কাপড়ের অশ্রু দিক্ ধরিবার জন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রতিবেশী আজারি অর্থাৎ সূত্রধরের কন্যাকে ডাকিল। বালিকা সমাজের নিয়ম জানিত না, সূত্ররং ধোপানীকে সাহায্য করিল। ইহার অনতিকাল পরেই একদিন ধোপানী ঐ প্রতিবেশী আজারির গৃহে প্রবেশ করিল। আজারী ইহাতে মহাক্রোধাক্ত হইলে ধোপানী বলিল, তোমার জাতি গিয়াছে, এখন তুমি আমাদের সম-জাতীয়; তোমার কন্যা আমার সঙ্গে কাপড় কাচিয়াছে। আজারী ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ধোপানীকে মারিয়া ফেলিল। এই ঘটনা চেকুম্ পেরুমলের কণ্ঠগোচর হইলে রাজদণ্ডভয়ে সমস্ত আজারীগণ পলাইয়া কাণ্ডির রাজ্যে আশ্রয় লইল। চেকুম্ পেরুমল তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া

কিরিরা আসিবার জন্য কাণ্ডিরাজের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু আজারীগণ, ভিরিরা আসিলে কি জানি রাজা কি করেন এই ভয়ে কাণ্ডিরাজের নিকট দুইজন চেঙ্গো অর্থাৎ সৈনিক প্রার্থনা করিল। রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন তোমাদের রক্ষার মূল্য স্বরূপ তোমরা চেঙ্গো ও উহাদের বংশ-ধরদিগকে বিবাহপ্রস্তাভাদি উপলক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল দিবে। তদনুসারে দুইজন চেঙ্গো সজ্জীক মলবারে আসিয়া বাস করে। বর্তমান চেঙ্গোগণ উহাদেরই বংশধর। অন্য্যপি আজারীগণ প্রাচীন প্রথামত বিবাহানিতে চেঙ্গোদিগকে তণ্ডুল দিয়া থাকে। কোন আজারী নিতান্ত অসমর্থ হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল চেঙ্গোকে দিয়া তাহার অহুমতি লইয়া কিরিরা আনে, তথাপি নিয়ম ভঙ্গ করে না। যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময় ইহারা রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ করে। তাড়ি প্রস্তুতই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত চেঙ্গো ও তোয়েন্ চেঙ্গো। উইলসন সাহেব যে চেঙ্গোবান্ বা চেঙ্গাবান্ নামক নীচ জাতির বিষয় লিখিয়াছেন তাহারা বোধ হয় এই চেঙ্গো জাতিই হইবে।

চেঙ্গ (দেশজ) এক জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য। ইহারা লম্বায় এক একটা একহাত দেড়হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের নিম্নের চুম্বালের দস্তশ্রেণী সূচাল। মাথার উপরকার আঁইষ বড় বড়, কিন্তু বাঁকাচোরা। আঁইষগুলি সারি সারি স্থাপিত আছে। নাসিকা হইতে পৃষ্ঠদেশের ডানা পর্য্যন্ত ১৮ হইতে ২০ সারি দাঁত আছে। চক্ষু হইতে কাণুকা পর্য্যন্ত ৯টা সারি। অস্ত্রান্ত স্থানের আঁইষ বিভিন্ন প্রকারে স্থাপিত। ইহার উপরকার বর্ণ কৃষ্ণাভ ফঁকাকোশে, নিম্নের বর্ণ শাদাটে বা হরিদ্রাভ। গাল এবং মুখের নিম্নের দিকে ধূসর ডোরা অঙ্কিত। অস্ত্রান্ত স্থানে নানাবর্ণের ডোরা এবং দাগ আছে।

এই মৎস্য ভারতবর্ষের জলাশয় সকলে পাওয়া যায়। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও দৃষ্ট হয়। ইহারা জলা এবং ঘাসপূর্ণ পুকুরিগীতে থাকিতে ভালবাসে।

চেঙ্গড়া (দেশজ) ১ অপরিণত বুদ্ধি, অপ্রবীণ, অক্ষাচীন।
২ বংশরচিতপাত্রবিশেষ।

চেঙ্গড়ামি (দেশজ) অপরিণত বুদ্ধির কার্য।

চেঙ্গমা, মাজাজ প্রেসিডেন্সির সালেম ও দক্ষিণ অর্কাডু জেলা মধ্যবর্তী একটি গিরিবন্ধ। ইহার প্রকৃত নাম তিকরীকোট বা সিকরীকোট। অক্ষা° ১২° ২১' হইতে ১২° ২৩' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫০' হইতে ৭৮° ৫২' ৫৫" পূঃ। কর্ণাট প্রদেশ হইতে বারমহলে বাইবার পথে অবস্থিত বলিয়া এখানে অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খৃঃ

অধে মক্কেমজালি এই পথ দিয়া কর্ণাটে প্রবেশ করিল। ১৭৩৭ খৃঃ অধে হারদর আলী ব্রীটিশ সৈন্তের অহুশরণ করিতে গিয়া এইখানে পরাজিত হন। ইহার দুই বৎসর পরে বহিবুহের সৈন্ত চেন্নমা দিয়া কিরিয়া আসে, এবং ১৭৪০ খৃঃ অধে এই পথ দিয়া জেনারেল খেলিকে পরাজয় করিতে গমন করে। ১৭৯১ খৃঃ অধে টিপু এই পথ দিয়া ইংরাজাবিরুদ্ধ কর্ণাট আক্রমণ করেন। তাহার পর আর কেহ কর্ণাট আক্রমণ করে নাই।

চেঙ্গারি (দেশজ) বংশশলাকা নির্মিত পাথর।

চেঙ্গুয়া (দেশজ) একরকম মৎস্ত। (Gobius Boddarti)

চেঙ্গু, একটা প্রাচীন জরপদ। গাজিপুর নগরের নিকটস্থ গজানদীর তীর পর্যবেক্ষণ করিয়া কানিংহাম সাহেব অনেক ইটের ঢেলা এবং পুরাতন মাটির পাথর পাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই যে, এখানে চেঙ্গু রাজধানী ছিল। কিন্তু, কারমেল সাহেব বলেন যে, জমানিয়া তহসিলের অন্তর্গত উদারগপুর গ্রামই প্রাচীনকালে চেঙ্গু রাজত্বের রাজধানী ছিল। তিনি এখানে প্রাচীন অট্টালিকার বিস্তর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উদারগপুর সংস্কৃত যুদ্ধরণপুরের অপভ্রংশ মাত্র। চেঙ্গুর অর্থ—যুদ্ধ বিজয়ীর রাজধানী এবং যুদ্ধারণপুরেরও এই তাৎপর্য। চীনদেশের বিখ্যাত পর্যটক হিউএনসিয়াং এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।

চেট (পুং) চেটতি প্রেরয়তি চিট-অহ্। ১ দাস, ভৃত্য।

“শূদ্রারস্ত সহায়্য বিটচেটে বিহুবকান্য্যঃ স্ত্যঃ।” সাহিত্যব*। ২ পতি। ৩ তাঁড়, উপনারকবিশেষ। (দেশজ) ৪ পুরুষের উপহেজ্রি। ৫ সিংহলের রাজা বাসবের প্রধান মহিষী। ইনি পূর্বে বাসবের মাতুলানী ছিলেন। বাসবের মাতুল সিংহল-রাজ শুভের একজন সৈন্যধ্যক্ষ ছিলেন। বাসব আবার মাতুলের অধীনে কার্য্য করিতেন। রাজা যশজ্ঞান এই ভবিষ্য-বাণী করেন যে বাসব নামক এক ব্যক্তি সিংহলের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। রাজা শুভ তাহাতে সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্যকার অস্ত্র কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সিংহলদ্বীপের মধ্যে বাসব নামে যত লোক ছিল, সকলকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় যে উল্লিখিত সৈন্যধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন যে তাহার ভাগিনের বাসবকে রাজার হস্তে সমর্পণ করা উচিত। জীব সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া তিনি বাসবকে লইয়া রাজবাটিতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার জীব বাসবের হস্তে কএকটা পাণ দিলেন, কিন্তু ইহাতে চুপ দিলেন না। যখন তাঁহার রাজবাটির ক্ষুণ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন, উক্ত সৈন্যধ্যক্ষ বাসবের নিকট হইতে পান্স লইলেন।

কিন্তু তাহাকে চুপ না থাকার বালককে চুপের অস্ত্র তাঁহার জীব কাছে পাঠাইলেন। বাসবের জীবনরক্ষার জন্যই চেট এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে দেখিয়া আমন-প্রকাশ করিলেন। পরে শুধু অভিসন্ধি বাক্য করিয়া তাহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন এবং তাঁহার খরচের অল্প তাঁহাকে কিছু টাকা দিলেন।

বাসব মহাবিহারে গিয়া তথাকার কএক দল বৌদ্ধ পুরো-হিতের আশ্রয় লইলেন। এখানে তাঁহার মনে রাজসিংহাসন পাইবার ক্রাশা বলবতী হইল। তিনি যুদ্ধ অভিপ্রায়ে লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে নিকটস্থ কএকটা গ্রাম হস্তগত করিলেন। পরে অগ্রসর হইয়া একটীর পর আর একটা স্থান জয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজধানী আক্রমণ করিয়া রাজাকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার মাতুলও হত হইলেন। বাসব তাঁহার মাতুলানীর উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রধানা রাজমহিষীরূপে বরণ করিলেন।

চেটরাণী একটা উৎকৃষ্ট তুপু নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে একটা ছাদ ও গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা চেট-বিহার নামে অভিহিত হইয়াছিল।

৬ উপপতি, সন্ধানদক্ষনায়ক। (রসময়)

চেটক (পুং) চিট-ধূলু। দাস, ভৃত্য।

চেটা (দেশজ) খর্জুর বা তালপত্র নির্মিত আসন, চেটাই।

চেটাই (দেশজ) খর্জুর বা তালপত্রনির্মিত আসন, চেটা।

চেটাল (দেশজ) বিহৃত, চণ্ডা।

চেটিকা (স্ত্রী) চেটক-টাপু অত ইহং। ১ দাসী। ২ উপনায়িকা-বিশেষ। “অদীকুর্লন্থ য তন্মূঢ়শ্চেটিকাভিঃ প্রবেশিতঃ।”

(কথাসরিৎ ৪।৫১)

চেটী (স্ত্রী) চেট-ভীপু। দাসী। (হেম)

“প্রোছ্যশ্চেট্যাশ্চ বধ্বশ্চ বলহাশ্চাপি শলশঃ।” (রাম্য ২।২১।৬৪)

চেড় (পুং) চেটতি পরপ্রোছ্যতঃ কৰোতি চিট-অহ্ ট্রা ডহং।

দাস, ভৃত্য। (অমরটীকা ব্রহ্মাণ্ড)

চেড়ক (পুং) চেটতি পরপ্রোছ্যতঃ কৰোতি চিট-ধূলু ট্রা ডহং। দাস, ভৃত্য। (অমরটীকা)

চেড়। (দেশজ) ১ ছই খণ্ড করা। ২ বিখণ্ডিত, যাহা ছইখণ্ড করা হইয়াছে।

চেড়ারুড়েড়ি (দেশজ) বার বার চেড়া।

চেড়ান (দেশজ) ছইখণ্ড করান।

চেড়িকা (স্ত্রী) চেড়ক-টাপু, অত ইহং। দাসী। (বিক্রপকো)

চেড়ী (স্ত্রী) চেড়-ভীপু। দাসী। (অমরটীকা)

চেং (অব্য) চিং-কি ত্ত লোণঃ। ১ যদি।

“অন্তঃস্বায়ংকং সখ্যমিতি চেংস্বায়ংকং।

কুটুম্বস্বায়ংকং কুটুম্বস্বায়ংকং তদ্ভবেৎ।” (পঞ্চদশী ৬।৪২)

২ পক্ষান্তর। (অমর) ৩ যে স্থলে সন্দেহ নাই, সেই স্থলেও সন্দেহ কথন।-

“সত্যক্ষেপকৃৎকাক্যমেব সিতরো দেবান্ চেংসোগিনী।

স্রীতা চেংগরদেবতা চ যদিচেং বেদাঃ প্রমাণং হি চেং॥

শাস্ত্রীয়ঃ যদি দর্শনং ভবতি চেংজ্ঞাপ্যমোঘান্তিচেং।

বাতত্যা অপি কোলিকাচ যদি চেংজ্ঞান্মে জয়ঃ সর্বদা॥”

(শকার্ণচিন্তামণিখত তত্ৰ) [চেং দেখ।]

চেংবাই, রাজ্য প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মলবার জেলার একটা গ্রাম। এই গ্রাম বাদানপল্লী নগরের একটা অংশ। খাড়ীর শেষে অবস্থিত বলিয়া পূর্বে এই স্থান বাণিজ্য জন্ত বিখ্যাত ছিল। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ সামরীকাজের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লয় ও এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়া পাণিনিপত্ত প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করে। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে হায়দর আলী সমস্ত জেলা আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ অধিকার করে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইলে উহা কোচিন-রাজকে প্রদত্ত হয়, অবশেষে ১৮০৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানি এই স্থান খাস করিয়া লয়।

চেংসিংহ, কালীর একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি সাহসী ও তেজস্বী ছিলেন এবং রাজনীতিতে ইহার অভিজ্ঞতা ছিল। যে সময়ে মোগলরাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, সেই সময়ে বারাগলী প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের অধীনে আইসে। তখন বলবন্ত-সিংহ এই প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। দিল্লীর পাদশাহ মহম্মদ-শাহ তাঁহার পিতা মনসারামকে যে রাজ-উপাধি প্রদান করেন, তিনি সেই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত অযোধ্যার নবাবের যুদ্ধের সময়ে, বলবন্তসিংহ অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বিগ্রহ শেষ হইলে নবাবের সহিত কোম্পানির যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তন্মধ্যে এই কথাটা লেখা ছিল যে, তিনি পুনরায় অযোধ্যার নবাবের অধীনে থাকিবেন, কিন্তু পূর্বে অধিকৃত অমিদারী তিনি অবিবাদে ভোগ করিবেন এবং যে পরিমাণে রাজস্ব দিয়া আসিয়াছেন সেই পরিমাণেই রাজস্ব দিবেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বলবন্তসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে, অযোধ্যার নবাব তাঁহার পুত্র চেংসিংহকে তাঁহার পিতৃপদে অভিষিক্ত হইবার সনদ দিতে সম্মত হইলেন না। চেংসিংহ ইহা অবগত হইয়া ক্রোধে অগ্নিয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মীয়গণের পরামর্শে

শান্ত্যাবধারণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপদ পাইবার দৃঢ় নবাবকে বিনীতভাবে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলেন, এবং নবাবের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণকে, তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্ত, বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমগ্র চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে, তিনি ইংরাজ-দিগের শরণাগত হইলেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংস সাহেবের অনুরোধে, নবাব সূজাউদৌল্লা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে চেংসিংহকে কালীর রাজস্ব প্রদান করেন, তবে কিয়ৎপরিমাণে রাজস্ব বাড়াইয়া দেন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব সূজাউদৌল্লার মৃত্যু হইল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইলেন। তাঁহার সূজাউদৌল্লার পুত্র আসফউদৌল্লার সহিত একটা নতুন সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধির একটা ধারা অনুসারে চেংসিংহ কোম্পানির অধীনে আসিলেন। চেংসিংহ রাজনীতিকুশল ছিলেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংস সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে তিনি তাঁহার প্রভু বাড়াইতে পারিবেন, তাঁহার ইহা খুব বিশ্বাস ছিল এবং এই জন্ত তিনি সাধ্যমতে হেস্টিংস সাহেবের আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। হেস্টিংস সাহেবও তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। চেংসিংহ সুর্যোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে কোম্পানির নিকট হইতে এক একটা ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নিজের নামে সিকা চালাইতে লাগিলেন এবং কালীপ্রদেশ মধ্যে শাস্তি-রক্ষা, বিচার এবং জমিদারী সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিবার ভার তাঁহার হস্তগত হইল। কেবল নির্দ্ধারিত কর ২২,৬৬,১৮০ সিকা টাকা তাঁহাকে প্রতিবৎসর কোম্পানিকে দিতে হইত।

কিন্তু এ সম্ভাব আর অধিক কাল রহিল না। চেংসিংহ প্রভূত ক্ষমতা লাভ করায় অহঙ্কারে ক্ষীণ হইয়া ইংরাজগণের প্রতি তাজ্জিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে রাজস্ব প্রদান না করাতে, কোম্পানির বিবাদভাজন হইলেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন—চেংসিংহ নিয়মমতই রাজস্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ একদিকে মরাঠাদের সহিত এবং অপর দিকে ফরাসি-দের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার তাঁহাদের অর্থ এবং সৈন্তের প্রয়োজন হইল। তাঁহার চেংসিংহের নিকট হইতে পাঁচলক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। চেংসিংহ যদিও মদোদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজদিগকে ভয় করিতেন। তিনি বিনীতভাবে হেস্টিংস সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়া, তাঁহার স্বার্থভাবে জানাইলেন, কিন্তু হেস্টিংস সাহেব তাহাতে কর্ণপাত না করায়, চেংসিংহ টাকা দিতে সম্মত হইলেন, পর বৎসরে তাঁহার কাছে

পুনরায় পাঁচলক টাকা চাহরা হর। এবারও তিনি টাকা দিতে সম্মত হন নাই এবং নানাপ্রকার আপত্তি করেন। হেষ্টিংস সাহেব একদল সৈন্ত পাঠাইয়া চেংসিংহকে এই টাকা দিতে বাধ্য করেন।

চেংসিংহ বলে মনে বুঝিলেন যে, ইংরাজগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য তিনি নানা সদানন্দকে হেষ্টিংস সাহেবের কাছে পাঠাইলেন এবং তাঁহার দ্বারা করা প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব বলিলেন যে, যদি তিনি বিনা আপত্তিতে আরো পাঁচলক টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে চেংসিংহের পূর্বকার ক্রটি ক্ষমা করা হইবে। সদানন্দ চেংসিংহকে এই আদেশ জানাইলে, তিনি সে সময়ে এই টাকা দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহার পরে অস্বীকারপূর্ণ করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। চেংসিংহের কার্য দেখিয়া হেষ্টিংস সাহেব বিরক্ত হইলেন এবং টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার কাছে একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন।

টাকা আদায় হইল বটে, কিন্তু বহুকাল অপেক্ষা করায় সৈন্তদিগকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে চুইহাজার অখারোহী সৈন্ত পাঠাইবার জন্য চেংসিংহ আদেশ প্রাপ্ত হন। এই আদেশ পাইয়া চেংসিংহ তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া হেষ্টিংস সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তিনি এই পত্রে বুঝাইয়া দেন যে, সর্বশুদ্ধ তাঁহার ১৩০০ মাত্র অখারোহী আছে এবং শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের আবশ্যক। হেষ্টিংস সাহেব সম্ভবতঃ চেংসিংহের কথার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ তিনি প্রথমে ১৫০০ এবং তাহার পর ১০০০ মাত্র সৈন্ত চাহিয়াছিলেন। চেংসিংহ এই সৈন্ত পাঠাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার ১৩০০ মাত্র অখারোহী ছিল, সুতরাং ইহা হইতে ১০০০ সৈন্ত পাঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। অবশেষে তিনি ৫০০ অখারোহী এবং ৫০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া হেষ্টিংস সাহেবকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে অযোধ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হেষ্টিংস সাহেব উত্তরপ্রদেশ যাত্রা করেন। ইতিপূর্বে, চেংসিংহের অধিকারভুক্ত স্থান সকল ক্রম করিবার জন্য নবাবের সহিত হেষ্টিংস সাহেবের পত্র লেখালেখি হইতেছিল। চেংসিংহ এই অভিনবির আভাস পাইয়া, নবাবের নিকট গবর্ণর জেনারেল সাহেবকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু নবাবও ৫০ লক্ষ

টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন বলিয়া চেংসিংহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছিল। চেংসিংহ ইহাতে অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে যে একজন বিপদ উপস্থিত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন। হেষ্টিংস সাহেবের পরামর্শ হওয়া জারী বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই নিশ্চিত তিনি বন্ধুরে গিরা গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার অধিকারভুক্ত সমুদায়ই তিনি তাঁহার অর্থাৎ হেষ্টিংসের কার্যে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহার মাথার পাগড়ী হেষ্টিংস সাহেবের পদে নিক্ষেপ করিলেন। এত করিয়াও চেংসিংহ গবর্ণর জেনারেলের কৃপালাভ করিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে কোন আশাস দিলেন না। অগত্যা চেংসিংহকে বিদায় লইয়া যাইতে হইল। যখন হেষ্টিংস সাহেব ইংলণ্ডীয় মহাসভার, তাঁহার চেংসিংহ-সম্বন্ধীয় কার্য সমর্থন করেন, সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চেংসিংহের টাকা দিবার প্রস্তাব অতি বিলম্বে পাওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহার পর চেংসিংহের ঘোর বিদ্বেষনা উপস্থিত হইল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্টে হেষ্টিংস সাহেব কামীতে উপস্থিত হইলেন। চেংসিংহ তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। পরদিন প্রাতে তথাকার রেসিডেন্ট মারথাম সাহেব চেংসিংহের নিকট প্রেরিত হন। ইনি চেংসিংহের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ এবং তাঁহার নিকট হইতে পাওনার বিহীন সম্বলিত একখানি কাগজ সঙ্গে লইলেন। এই কাগজখানি চেংসিংহের হস্তে প্রদত্ত হইলে, তিনি সেই দিনেই প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু ইহা হেষ্টিংসের মনোমত হইল না। কেনই বা হইবে? তাঁহার কার্য দ্বারা কি অন্তর্য হইয়াছে, হেষ্টিংস সাহেবেরও আর সে কিচর করিবার আরোজন ছিল না। চেংসিংহই বা কত টাকা দিতে পারেন? তিনি পূর্বে ২০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহার উপর আরও ২ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু ইহাতেও হেষ্টিংস সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে, হেষ্টিংস সাহেব রেসিডেন্ট সাহেবকে আদেশ করিলেন যে, তিনি শিবালয়বাটের দুর্গে গমন করিয়া চেংসিংহকে বন্দী করিয়া চুইশত সৈন্ত দুর্গ মধ্যে আঁহরী বরণ রক্ষা করেন। মারথাম সাহেব সেই রাত্ৰ কার্য করিলেন। এইরূপে চেংসিংহ আপনাদি প্রাণাদি সমস্ত বন্দী ভাবে রাখিলেন।

চৈতন্যই প্রচারক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং ভীরু সত্তা বিজয়প্রাণীতে সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। বিশেষতঃ একে হিন্দুর চক্ষে রাজা সেবতাক্ষর, তাহার উপর আমায় চৈতন্যই নির্দোষ, সুতরাং এমন রাজার অপমান কে সহ্য করিতে পারে? কালীধামে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। কেহ আর স্থির থাকিতে পারিল না। লোকে দলে দলে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে লাগিল। কালী-রাজ্যের সৈনিক পুরুষগণ কেহ আক্রমণ করিল। দুর্গটি হুত্ব হইল। দুইশত সেনা অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল শত্রুর আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইংরাজবল্লভ সেনা কর্তৃক কোম কাজই হইল না। তাহাদের সহিত বারুদ ছিল না। সুতরাং তাহার আক্রমণকারীগণকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তাহারা একে একে শত্রুহস্তে নিহত হইল। এই সময়ে আর একদল ইংরাজসৈন্য বারুদ লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন আক্রমণকারীরা দুর্গ অধিকার করিয়াছে। তাহারা অয়োদ্ধায়ে উত্তেজিত হইয়া নবাগত সৈন্যগণকেও নিহত করিল। সর্বশুদ্ধ ২০৫ জন সেনা জীবন হারাইল। এই গোলমালের সময় চৈতন্যই পলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তৎপক্ষে সুযোগও হইল। তখন বর্ষাকাল; সুতরাং গজার জল অধিক উচ্চে ছিল। তিনি তাঁহার পাগড়ির কাপড় কটিদেশে বাঁধিয়া একটা গবাক্ষার হইতে সুনিয়া পড়িয়া, একখানি নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেই নৌকাযোগে অপর পারে গমন করিলেন।

এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেব মধুদাসের বাগানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সোভাগ্যের বিষয় এই যে, চৈতন্যের অয়োদ্ধায়ে লোকগণ হেষ্টিংস সাহেবকে আক্রমণ না করিয়া রাজার সঙ্গে গমন করিল। রাজার লোক বিজোহী হইয়া উঠিল, তাহাদের শীঘ্র দমন করা আবশ্যিক। তখন মেজর পোকার সাহেবের অধীনে কতকগুলি সৈন্য ছিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কালীতে এবং অল্পাংশ মুজাপুরে ছিল। এতদ্বির রেসিডেন্ট সাহেবের বাটীতেও কএকজন সৈন্য প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল, হেষ্টিংস সাহেব স্থির করিলেন যে, কালীস্থিত সৈন্যের সহিত মুজাপুরের সৈন্য একত্র হইলে, পোকার সাহেব অন্যদিকে বিজোহীদিগকে দমন করিতে পারিবেন। মুজাপুরস্থিত সেনাও অধিক তখনই পত্র লেখা হইল যে, তিনি তথাকার সৈন্যগণকে লইয়া রামনগরে আসিয়া অধেশ করিবেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষ এই আদেশ অনুসারে আগমন করিলেন। কিন্তু বুধবার ভ্রমেই হটুক, কিম্বা নিজে গৌরব পাইবার আশাতেই হটুক, তিনি, অস্ত্র সেনার অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার অধীনস্থ সেনা-

গণকে কইরা বিজোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই বৃহৎ তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। বিজোহীদিগ অয়োদ্ধায়ে উত্তেজিত হইল। তাহারা নানাভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। এমন কি, পূর্ণর জেনারেলের বাসগৃহ আক্রমণ করিলে, একজন জনরবও চারিদিকে প্রচারিত হইল। তাহা হেষ্টিংস সাহেবও জানিতে পারিলেন। তিনি আপনাকে আর নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। অবশেষে চনারে প্রস্থান করিলেন।

বড়লাট ভয়ে কালী ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার হওয়াতে, ভরানক বিপ্লব উপস্থিত হইল। কেবল কালীধামের লোক নহে, অযোধ্যা এবং বিহারের কোন কোন স্থানের লোকও চৈতন্যের সপক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

এই বিপ্লবের সময়ে, চৈতন্যই স্বয়ং ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। প্রত্যুত তাহাদের সহিত সন্ধিচাপন করিবার অভিপ্রায়ে, চৈতন্যই হেষ্টিংস সাহেবকে কএকখানি পত্র লেখেন এবং তিনি যে নির্দোষ তাহা বুঝাইয়া দেন, কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব এই সকল পত্রের কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

হেষ্টিংস সাহেব চনার হইতে সমুদ্রের আরোহণ করিলেন। পোকার সাহেব অনেক সৈন্য লইয়া কালী আক্রমণ করিলেন। চৈতন্যই সৈন্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, অল্প ইংরাজ সেনাগণকে পরাস্ত করা তাঁহার সাধ্যাতীত, তখন তিনি পলায়ন করিয়া প্রথমে লতিফপুরে এবং পরে তাহার রাজধানী হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে বিজয়গড় নামক দুর্গে আসিলেন। এই দুর্গে তিনি তাঁহার প্রায় সমস্ত ধন রাখিয়া দিয়াছিলেন। পোকার সাহেব তাঁহার পক্ষান্তর্ভী হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত-বাহায়ে যতদূর সম্ভব ধন লইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে চৈতন্যই মহারাজ সিক্রির আশ্রয় লইয়া পোরা-লিয়ায়ে অবস্থিতি করিলেন।

চৈতন্যই পলায়ন করিলে পর তাঁহার মাতাভ্রাতৃরাণী কেহাতে ছিলেন। কেহা রক্ষা করিবার জন্য রাজসেনাগণ চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। যখন ইংরাজসেনাগণ বলিল যে, কেহা তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে, তখন রাজ-রাণী কেহা না ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। তবে ইংরাজদের সহিত এইরূপ কথা রহিল যে, রাজপরিজনগণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা হইবে না এবং যুঁহে কোল প্রকার খানাতল্লাসী করা হইবে না।

ইহার পর হেষ্টিংস সাহেব চৈতন্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া

তাহার ভগ্নীপুত্র মহীপনারায়ণকে তাহার পরে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তখন মহীপনারায়ণের বয়স অষ্টাদশ মাত্র।

চেৎসিংহ অনেক বৎসর গোরালিয়ারে বাস করিয়াছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাহার সেই স্থানে ভবলীলা শেষ হয়।

চেৎসিংহের কোন কোন বিষয়ে ক্রটি থাকিলেও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, হেষ্টিংস সাহেব তাহার প্রতি অজ্ঞার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহাতে খন জন দিয়া কোম্পানির সাহায্য করিবার কোন কথা ছিল না, অথচ জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে উভয়ই লওয়া হইয়াছিল। হেষ্টিংসের আদেশ পালন করিতে বিলম্ব হওয়ার অথবা তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি বন্দী হইলেন এবং অবশেষে রাজ্য হারাইলেন। চেৎসিংহ যেমন সদাচরণ দ্বারা প্রজাগণকে সুখে রাখিয়াছিলেন, নগরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সেইরূপ ব্যবধান ছিলেন। শিবালয়ঘাটের নিকটস্থ দুর্গ এবং রামনগরের দুর্গের পূর্বদিক ও মুরচা কএকটা তাহার আজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। কালীতে প্রতিবৎসর যে বুড়ামঙ্গল-মেলা হইয়া থাকে, প্রজাগণের মনোরঞ্জনের জন্য তিনিই তাহা আরম্ভ করেন।

চেতকী (স্ত্রী) চেতয়তি উম্মীলয়তি বুদ্ধিবলেস্ত্রিয়াণি চিত-গিচ্-ধূল-গোরাদিহাং ভীষ্। ১ হরীতকী। (অমর) ২ সপ্ত প্রকার হরীতকীর মধ্যে একপ্রকার হিমাচলোৎপন্ন তিনটা শিরায়ুক্ত হরীতকী। ভাবপ্রকাশের মতে চেতকী দুই প্রকার শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। শুক্লবর্ণ চেতকী আরতনে প্রায় ৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ চেতকী আরতনে ১ অঙ্গুলির অধিক হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়াতে গমনাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ভেদ হইতে থাকে। চেতকী হাতে ধারণ করিলে প্রবলবেগে ভেদ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই। তৃষ্ণার্ত, ভুক্ষুভার, ক্লেশ বা ঔষধবিষেবী রোগীর পক্ষে চেতকী প্রশস্ত স্নেহ-বিষয়ন। (ভাবপ্রকাশ পূর্বপর্বে ৩ ১ম ভাগ)

[ইহার অপর বিবরণ হরীতকী শব্দে দ্রষ্টব্য।] ৩ জাতিভুল।

(রাজনি)

চেতন (পুং) চেততি জ্ঞানতি চিত্ত-কর্তরি দ্যু। ১ আত্মা, জীব। ২ পরমেশ্বর। (হেম)

“চেতনা চেতনাত্মা কুটস্থান্ধকতা নহি।

কিন্তু বুদ্ধি কৃতান্তাস কুটম্বেত্যব সম্যতাম্।” (পঞ্চদশী ৩৪৫)

[ইহার বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।] ৩ মনুষ্য। (রাজনি)

৪ প্রাণী, বাহ্যিক জীবন জাতি। (অমর) (ত্রি) চেতন্তং চৈতন্তং বিভক্তেহত চেতন-অচ্ (অপ্ আদিভ্যোহ্। পা ৪।১।২৭।)

৫ প্রাণবৃত্ত, চেতনাবিশিষ্ট।

“কামার্জ্য হি একভিত্তিকপণাচেতনচেতনেন্।” (মেঘদূত পূর্ব ৫)

চেতনকী (স্ত্রী) চেতনং কয়োতি চেতন-কৃ-ড-গোরাদিহাং ভীষ্। হরীতকী। (রাজনি)

চেতনতা (স্ত্রী) চেতনত্বাভাবঃ চেতন-তল-টাপ্। চৈতন্ত, চেতনের ধর্ম। “দেহচেতনতামিহাং।” (বালক ৭)

চেতনত্ব (স্ত্রী) চেতনত্বাভাবঃ চেতন-ত্ব। চেতনতা, চৈতন্ত।

চেতনা (স্ত্রী) চিত্ত-বৃহ-টাপ্। ১ বুদ্ধি। (অমর) “প্রধান-কালশরধর্মসংগ্রহে শরীর এবং প্রতিপত্তচেতনাম্।” (ভাগবত ৪।২।৩৪।) ২ মনের বৃত্তিবিশেষ, জ্ঞান।

“ইচ্ছাষেধঃ স্নেহঃ হৃৎসং সন্ধ্যাতচেতনা বৃত্তিঃ।” (গীতা ১৩।৬)

‘জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ’ (শ্রীধর) ৩ চৈতন্ত। ৪ চিত্তবৃত্তিবিশেষ, স্বরূপ জ্ঞানব্যঞ্জক, প্রমাণের অসাধারণ কারণ। (শব্দার্থচি)

চেতনাবৎ (ত্রি) চেতনা বিভক্তেহস্য চেতনা মতুপ্ মন্ত বঃ। চেতনায়ুক্ত, বাহার চেতনা আছে।

“চেতনাবৎস্ত চৈতন্ত্যং সর্বভূতেষু পশুতি।” (ভায়ত ১৪ প)

চেতিয়া, বনারস বিভাগের অন্তর্গত গাজিপুর জেলার নারায়ণপুর নামে একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামের ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে, গঙ্গার উত্তরতীরে দুইটা দ্বীপ আছে। ইহা চেতিয়া এবং অধিকোট বা অধিরিখ নামক দুইটার সম্মিশ্রণ। অধিকোটের দ্বীপ একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কথিত আছে যে, অধিরিখি এই দুর্গটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বে এস্থান চেলু রাজার অধীনে ছিল।

চেতনীয় (ত্রি) চিত্ত-অনীয়। জ্ঞেয়।

চেতনীয়া (স্ত্রী) চেতনায়ৈ হিতা চেতনা-হ। ঋদ্ধি নামক ঔষধ। (রাজনি)

চেতয় (ত্রি) চেতয়তি চিত্ত নিচ্-শ (অচুপসর্গাঙ্গিসিবিদ্ভাধি-পারিবেছ্যদেজিচেতিসাত্মিহাভিচ্চ। পা ৩।১।১৩৬) চেতনায়ুক্ত।

চেতয়িতব্য (ত্রি) যাহা চেতনায়ুক্ত করা হইবে, চেতনীয়।

“চিত্তং চেতয়িতব্যং।” (প্রবোধিনী ৪।৮)

চেতয়িতৃ (ত্রি) চিত্ত-পিচ্-তৃচ্। চেতনায়ুক্ত।

চেত্ (ত্রি) চি-তৃচ্ যধা চিত্ত-তৃচ্ নিপাতনে সাধু। ১ চেতনায়ুক্ত।

“সাকী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ।” (খেতাবা উপ ৩।১)

[বৈ] ২ হিংসক, যে হিংসা করে।

“ইহে চেতারো অন্তস্ত তুরে মিচ্ছোহ্যমা বন্ধপোহি সতি।” (ঋক ৭।৬০।৫) “চেতারো হস্তারঃ” সায়ণ।

চেতব্য (ত্রি) চিত্ত-ব্য। চরনীয়, যাহা সংগ্রহ করা উচিত।

চেতন্ (স্রী) চিত্যতে জ্ঞায়তে অনেন চিত-অনু। ১ চিত্ত। (অমর)

“চেতোনলং কামরতে মদীয়ং।” (নৈবধচরিত) ২ মন।

নৈরারিক মতে অণু পরিমাণ মনকেই চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা অখ, হঃখ, ইচ্ছা, যেষ প্রভৃতিকৃতকগুলি আত্মধর্মের প্রত্যক্ষ হয়। [মনস্ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ বুদ্ধিত্ব। সাংখ্যমতে বুদ্ধিত্বেই জ্ঞানাদি স্বীকার করা হয় ও তাহাকেই স্থলবিশেষে চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অস্তঃকরণের অন্তরিক্ত চিত্ত নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। [বুদ্ধি ও মহত্ত্ব দেখ।] ৪ বৃত্ত-বিশেষ। (নিষট্টু) (ত্রি) চিত্ত কর্তৃরি অনুন্। সর্ক-ধাতু-ভ্যোহনুন্। ৫ জ্ঞাতা, যে জানে। (স্রী) চিত্ত-ভাবে অনুন্। ৬ চৈতন্ত। ৭ প্রজ্ঞা। (বোপদেব ৬৬২)

চেতসক (পুং) [বহ] একটী জনপদ।

চেতসিংহ [চেৎসিংহ দেখ।]

চেতান (চেতন শব্দ) চৈতন্ত্যুক্ত, জ্ঞানবিশিষ্ট।

চেতানি (দেশজ) উত্তেজনা।

চেতিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন চেতারিতা চেতারিষ্ঠ-ইঠন্। অতি-শয় চৈতন্ত্যুক্ত, চেতারিষ্ঠপ্রধান।

“চেতিষ্ঠৌবিশামুভূৎ।” (ঋক্ ১৬৬।১০)

‘চেতিষ্ঠৌ অতিশয়েন চেতারিতা।’ (সারণ)

চেতিত (ত্রি) চিৎ-গিচ্-ক্ত। জাপিত, যাহা জানান হইয়াছে।

চেতোঃশু (ঋং) চেতসশ্চৈতন্ত্যাত্ম্যগুরিব। জীব। বেদান্ত মতে জলগত বা জলপ্রতিরিত সূর্য্যের জ্বার পুরুষের প্রতিবিম্ব বা আভাসকে জীব বলা হয়; অতএব বৈদান্তিকেরা জীবকে চেতোঃশু নামে উল্লেখ করেন। [জীব দেখ।]

চেতোজন্মন্ (পুং) চেতসি জন্ম বন্ত বহুব্রী। ১ কামদেব, কল্কপ।

“চেতোজন্মশরপ্রস্থনমধুতি ব্র্যামিপ্রতামাশ্রয়ং।” (নৈবধ)

(ত্রি) ২ যাহা মনে উৎপন্ন হয়। মনোজাত। চেতোতব, চেতোত্ব প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চেতোমৎ (ত্রি) প্রশস্তং চেতো বিস্ততে বন্ত চেতস-মত্প।

১ প্রশস্ত চিত্তযুক্ত, মনস্বী। ২ চৈতন্ত্যুক্ত, যাহার চেতনা আছে।

“চেতোমস্তি চ নামানি ধর্ম্মকেন্দ্র ভারতঃ।” (ভারত নব)

চেতোমুখ (পুং) চেতো মুখং দ্বারং বন্ত বহুব্রী। বেদান্ত প্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ।

“আনন্দভূকচেতো মুখঃ প্রাজ্ঞঃ।” (ঋতি)

চেতোবিকার (পুং) চেতনো বিকারঃ ৬৩৭। চিত্তের বিকৃতি, ক্রোধ। ‘ক্রোধঃ চেতো বিকারঃ’ (কুল্লুক মল্ল ১২৫)

চেত্ (ত্রি) চিত্ত-অন্তর্ভূত নিজর্থে আচ্ছাদ্যে তৃণ্ নিপাতনা-দিক্ভাবঃ। ১ জ্ঞাপরিতা, বিনি জানান।

“হিরণ্যপাদি-মুত্রে সবিভার মুশহরে। সচেতন্তা দেবতা পদং।” (ঋক্ ১৭২।৫) ‘চেতা জ্ঞাপরিতা চিত্তী সংজ্ঞানে অস্মাদন্তর্ভাবিক্তার্থাং তান্চ্ছাদ্যে তৃণ্ অনিত্যভাগমশাসন-মিতীভাবঃ।’ (সারণ)

চেত্য (ত্রি) চিত্ত কর্তৃগি প্যৎ। ১ জ্ঞেয়, জ্ঞাতব্য। ২ স্তুত, যাহাকে স্তুত করা উচিত।

“স্বং জ্ঞাতা তরণে চেত্যোতুং পিতামাতা।” (ঋক্ ৬।১।৫)

‘চেত্যো জ্ঞাতব্যঃ স্তুতঃ।’ (সারণ)

চেত্যা (স্রী) চেত্যা-টাপ্। ক্লেপণীয়, যাহা ক্লেপণ করা উচিত।

“কর্হি স্রিংসা ত ইচ্ছ চেত্যা সমবন্ত।” (ঋক্ ১০।৮৯।১৪)

‘চেত্যা চেতয়িতব্যঃ...ক্লেপণীয়া।’ (সারণ)

চেদ্ [অব্য] ১ যদি। ২ পক্ষান্তর। ৩ সন্দেহ না থাকিলেও সন্দেহস্থচনা। [চেৎ শব্দক]

চেদয়ী (দেশজ) একরকম মন্ত্র।

চেদার (পুং) [বেদার দেখ।]

চেদি (পুং) ১ দেশবিশেষ। ভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসেই এই দেশের অল্পবিস্তর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নামান্তর ত্রৈপুর, ডাহল ও চৈন্ত। এই দেশটী অধিকোণে শুক্রিমতী নদীর তীরে বিক্ষিপ্তে অবস্থিত।

“বিক্ষিপ্তে হতিচন্দ্ৰেন চেদিরাষ্ট্রমিষ্ঠিতম্।” জৈনহরিবংশ।

বর্তমান বাবেলখণ্ড ও তেবার বা তেওয়ার চেদিরাজ্যের মধ্যে ছিল। [তেবার দেখ।] [বহ] সৌভিজ্ঞনোহন্ত চেদি অণু তন্ত লুক্। ২ চেদিদেশের রাজা। ৩ তদেশবাসী। (হেম) (পুং) ৪ কৈশিকের পুত্র।

চেদিক (পুং) [বহ] চেদিদেশ।

“শৌলিকবিদর্ভবৎসাক্ষ চেদিকাশ্চৌর্যকর্তাশ্চ।” (বৃহৎসং ১৪।৮)

চেদিপতি (পুং) চেদীনা পতিঃ ৬৩৭। উপরিচর নামক বন্ত।

“ইচ্ছ প্রীত্যে চেদিপতিশ্চকারেজ মহাক্ সঃ।

পুত্রাশ্চাত্ত মহাবীর্যাঃ পঞ্চাশরমিতৌজসঃ।” (ভারত)

[ইহার অপর বিবরণ উপরিচর ও চেদিরাজ শব্দে দেখ।]

২ দমযোবের পুত্র, শিশুপাল। (ভার ২।৪০।১৫)

৩ চেদিদেশের অধিপতি। চেদিপ প্রভৃতি শব্দ ও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চেদিরাজ (পুং) চেদীনাং রাজা-ট্। ১ শিশুপাল।

(ভারত ২।৪০।১২)

২ উপরিচর বন্ত, ইনি চন্দ্রবংশীয় কৃতি রাজার পুত্র, অতিশয় বৈষ্ণব ছিলেন। স্বর্গরাজ ইন্দের সহিত ইহার বন্ধুতা হয়। ইন্দ্র ইহাকে একখানি আকাশগামী রথ প্রদান করেন। ইনি তাহাতে চড়িয়া প্রায় সর্বদাই উপরিদেশে

(আকাশে) ভ্রমণ করিতেন, এই কারণে ইহার নাম উপরিচর হইয়াছিল। সত্যযুগের কোন সময়ে যাজ্ঞক ঋষি ও দেব-গণের ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের মূল এই—ঋষিগণ পশুহিংসা পাপ মনে করিয়া কেবল খাড়াই বীজ-সমূহ দ্বারাই যাগ করিতেন। দেবতারা ইহাদের এই ব্যব-হারে সন্তুষ্ট না হইয়া একদিন ঋষিগণের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, যাজ্ঞক মহাশয়গণ! আপনারা একি করিতেছেন, “অজেন যষ্টব্যং” এই শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুদ্বারা যাগ করাই উচিত। মুনিগণ বলিলেন, “তা নহে, পশুহিংসা করিলেই পাপ হয়। ‘বীজৈর্যজ্ঞেয় যষ্টব্যং’ এই বৈদিকী প্রীতি অনুসারে বীজ দ্বারাই যাগ করা উচিত। আপনারা যে শাস্ত্র বলিলেন, তাহাতেও অজ্ঞ শব্দে বীজেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা পশুবাচক নহে।” কিন্তু দেবতারা ইহা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বহুতর যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইয়া নিজের মত প্রবল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঋষিরাও বড় কম নহেন। তাঁহারাও অনেক যুক্তি ও প্রমাণ বলে দেবতাদিগের মত খণ্ডন ও স্বীয় মত প্রতিপালনে যত্নবান হইলেন। অনেক দিন বিচার চলিল, বাক্যযুদ্ধ অনেক হইল, কিন্তু কোন মতটা ভাল তাহার কোন নির্ণয় হইল না। এই সময়ে উপরিচর নৃপতি যাইতেছিলেন; উভয়পক্ষই তাঁহাকে ছই মতের কোনটা ভাল তাহা নির্ণয় করিবার ভার অর্পণ করেন। রাজা দেবগণের পক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের মতই অহুমোদন করেন। ঋষিগণ কুপিত হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। সেই শাপেই মহারাজ সেই বিমানের সহিত অধোবিচারে (ভূগর্ভে) গমন করিয়াছেন। ইহাতে দেবগণের বড়ই লজ্জাবোধ হইল। তাঁহারা রাজাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন ও শুভকর্মে বসোঁধারা দিতে হইবে, এরূপ বিধান করেন। ইহাতেই ভূগর্ভস্থিত বহুর প্রীতি হইয়া থাকে। আজও বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে বসোঁধারা দিবার নীতি চলিত আছে। কালক্রমে বিষ্ণু সন্তোষ হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন। (ভারত শাস্তি ৩৩ অঃ)

চেদিরাজবংশ, এক বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ, খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বংশীয় রাজগণ ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ত্রৈপুর ও তুঙ্গানের রাজগণই প্রধান। এই বংশ কলচুরি ও হৈহয় নামেও কথিত। [কলচুরি ও হৈহয়রাজবংশ শব্দে বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চেদিদাস, অপর নাম কলচুরি দাস। ত্রৈপুরের চেদিরাজ কর্তৃক খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীে ঐ দাস প্রচলিত হয় বলিয়া ইহার

নাম চেদিদাস হইয়াছে। [হৈহয়রাজবংশ ও কলচুরি শব্দে বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চেতুবা, অন্ধ্রদেশের অন্তর্গত আরাধানের একটা দ্বীপ। ইহা শাভারৈব নদীর অপর পারে অবস্থিত। ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহা সমুদ্রশালী ছিল। তখন একজন রাজা এই দ্বীপটা শাসন করিতেন। তাঁহার অধীনে সৈন্য থাকিত এবং শত্রুসহ যুদ্ধ করার বৃত্তান্ত ইতিহাসে দেখা যায়। ইহার অক্ষা° ১৮° ৪০' হইতে ১৮° ৫৬' উঃ এবং ইহার উত্তরচত্বরদ্রাঘি° ৯৩° ৩১' পূঃ। ইহার পরিমাণকল ১২০ বর্গমাইল। দ্বীপের উত্তরপশ্চিম কোণ ১৭৬০ ফিট উচ্চ।

এই দ্বীপের অনেক স্থানে মেটেটেল পাওয়া যায়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যে মাসে ইহা বৃত্তীয় রাজ্যধীন হয়।

চেন্দবাড়, বঙ্গদেশের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটা পাহাড়। হাজারিবাগ ষ্টেশনের নিকটে যে চারিটা পাহাড় আছে, তন্মধ্যে চেন্দবাড় প্রধান। ইহা মালভূমি হইতে ৮০০ ফিট এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮১৬ ফিট উচ্চ।

চেন্নগিরি (চন্নগিরি) মহিসুররাজ্যের অন্তর্গত শিমাগা জেলার একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৪৬৭ বর্গমাইল। ইহার দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকে গিরিমালা বিস্তৃত। এই সকল পর্বত হইতে নিঃসৃত জল-ধারা একত্র হইয়া একটা বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার নাম শুলিকেরি, পরিধি প্রায় ৪০ মাইল। এই জলাশয় উত্তরদিকে গিয়া হরিদ্রা নামে ভূঙ্গভদ্রা নদীর সহিত মিলিয়াছে। এই তালুকের অপরাপর অংশ উর্ধ্বর। ইহার উত্তর অংশ নানা প্রকার উদ্ভানে শোভিত এবং ইহাতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটা ফোঁজনারী আদালত এবং ৬টা থানা আছে।

চেন্নকরীর, কোবজুরের সম্মিলিত পার্শ্বতা প্রদেশের এক বাণবর জাতি। ইহারা গৃহ নির্মাণ বা কৃষিকার্য্য করে না, নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহারা ফাঁদ ও ধনুতীর দ্বারা পক্ষী শিকার করে এবং তাহার বিনিময়ে চাউল প্রভৃতি ক্রয় করে। ইহারা উইপোকা খায়। শিক্ত মহিষ বা গোব্রুর আড়ালে থাকিয়া পক্ষী প্রভৃতি শিকার করে। ইহাদের ভাষা তামিল ও কণাড়ী মিশ্রিত। যাহারা নগরের নিকট বাস করে, তাহারা তৈলঙ্গ ভাষা শিখিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যাই নগরের বাহিরে কুটীরে বাস করে, কিন্তু অনেকেরই অরণ্য, গুহা, বৃক্ষকোটর বা পর্ণকুটীরে বাস।

চেন্নয়ার, দাক্ষিণাত্যের পূর্ববাটনিবাসী এক অসভ্যজাতি। পার্শ্ববর্তী অধিবাসীগণ ইহাদিগকে চেঙ্কুলাম্, চেঙ্কবড় ও চেন্নয়ার বলে। উইলসন সাহেব যে চেঙ্কবড় জাতির

বিষয় লিখিরাছেন তাহা বোধ হয় এই চেনুয়ার বা চেকবড় জাতিই হইবে। ইহার ক্রমশঃ পশ্চিম উপত্যকা সৰ্ব্বত্র এবং নৈমিত্ত জেলার পশ্চিম উপত্যকা পৰ্বতে বাস করে। নক্ষিকোণ্ডা গিরি-বয়েসের নিকটে বহুসংখ্যক চেনুয়ার আছে, তথায় ইহারা ই প্রহরী ও পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে কুটার নির্মাণ করিয়া বাস করে এবং মুগরা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। মাংস, বাঁশের কোঁড়, বস্ত্রমূল ও বাজরা ইত্যাদি ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা জঙ্গল হইতে মোম, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং বাঁশী ও বাঁশের কোঁড় বিক্রয় জন্ত কখন কখন নৈমিত্তে আসিয়া থাকে।

পুরুষগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে, স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ তথাকার ডোমিনীদিগের ত্যায়। ইহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা চিরকাল পশুপালন করিয়া জঙ্গলেই বাস করে, কখনও লোকালয়ে যায় না, অথবা কখন কৃষিকার্য্য করে না, কচিং কেহ ছাগ মেবাদি পালন করিয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ ধূসর হইতে কৃষ্ণ, আকৃতি দীর্ঘ ও ধর্ম, গাণ্ডাহি উচ্চ, কেশ কুঞ্চিত। স্ত্রীপুরুষ সকলেই দীর্ঘচুল রাখে ও বেণীবন্ধন করে। শিকারের সময় ইহারা বর্ষা, বন্দুক, কুঠার, তীরধনু ইত্যাদি ব্যবহারে।

ইহারা মৃতদেহ প্রোথিত করে। কখন কখন দহও করিয়া থাকে। কেহ কেহ পুলিশে চাকরি করে। ইহাদের ভাষা তৈলঙ্গী, কিন্তু উচ্চারণ কর্কশ।

চেপাঙ্গ, মধ্য নেপালের অন্তর্গত জঙ্গলনিবাসী একটি জাতি। ইহার অপর নাম চিব্গ। নেপাল রাজধানীর ভূতপূর্ব বুটিং রেসিডেন্ট বি, এইচ হজ্জন্ সাহেব লিখিয়াছিলেন, মধ্য-নেপালের নিবিড় বনের মধ্যে দুইটি জাতি বাস করে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। ইহারা অসভ্য অবস্থার আছে। একটি জাতির নাম চেপাঙ্গ, অপরটির নাম কসন্কা। ইহারা সভ্য জাতিদের সহিত কোন সংস্রব রাখে না বা ক্ষেত্রাকর্ষণ করে না। কোন রাজাকে কর দেয় না, কাহারও বস্ত্রতাস্বীকারও করে না। পশুপালন এবং বস্ত্র বৃক্ষের ফল ইহাদের খাদ্য। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—‘রাজা আবাদী ভূমির অধিপতি এবং আমরা পতিত জমির স্বামী।’ অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে ইহাদের তীর ধনুক আছে। জীবহিংসাই ইহাদের উপজীবিকা। বৃক্ষশাখার ইহারা গৃহ নির্মাণ করে এবং তাহাদের ইচ্ছা-সারে এই ঘর উঠাইয়া লয়। যদিও ইহারা সভ্য জাতি-দের সংস্রবে থাকে না, তথাপি ইহাদিগকে কাহারও বিরুদ্ধা-চরণ করিতে দেখা যায় না। ইহারা কাহারও অপকারী

নহে, কিন্তু আপনায় সঙ্কায়হীন। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া সভ্যজাতির লোকের মনে বড় কষ্ট হয়। চেপাঙ্গজাতি লোক আজকাল সভ্যজাতির সহিত কোন কোন বিষয়ে সংস্রব রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। ইহাদের বর্ণ কাল, উদর বড় ও ইহারা অতিশয় কৃষ্ণ। ইহাদের ভাষার সহিত তুটানের লাহোপাদের ভাষার মৌসাদৃশ্য আছে। আর্জুন্মি এবং নদীর কূলে ইহারা বাস করে।

চেপ্টা (চিপটি শব্দ) চওড়া, প্রশস্ত, চোঁটাল।

চেপ্টাভোলা (দেশজ) এক রকম মৎস্য।

চেনুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

চৈত্র (ত্রি) চি-বৎ। ১ চরনীর, বাহার চরন বা সংগ্রহ করা উচিত। ২ যথাবিধানে সংস্কৃত অগ্নি।

“অগ্নিশ্চৈত্রো বহুভিষ্ঠাপি যজ্ঞঃ।” (ভারত ১৩।১২৩ অঃ)

চৈত্রক, ১ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কড়াপা জেলার একটি নদী। ইহা পান্নার নদীর একটি উপনদী এবং পার্শ্বতাপথে প্রবাহিত। নন্দালুরের নিকট রেলপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে।

২ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর অর্কাডু জেলার একটি নদী। ইহার অপর নাম বাহনদী, জাবড়ী পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া বহুসংখ্যক প্রণালী ও শস্তক্ষেত্রে জলদান করিতে করিতে ত্রিবাটুর নগরের নিকট দিয়া ৯০ মাইল গমনের পর চেনকলপট্ট জেলার পালার নদীর সহিত মিশিয়াছে।

চৈত্র, দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন জনপদ, ইহারই কিয়দংশ কেরল ও পরবর্তীকালে কোম্বু রাজ্য নামে খ্যাত হয়। ঠিক চৈত্ররাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বর্তমান কণাড়া, মলবার, কোটীন, ত্রিবাটুর, সালেম প্রভৃতি জনপদ প্রাচীন চৈত্ররাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পূর্বকালে চৈত্র, চোল ও পাণ্ডা এই তিনটি রাজ্যই বিখ্যাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে এই তিনটির মধ্যে কোনটি প্রাধান্য লাভ করিয়া অপরকে বশে আনিত। চৈত্র জনপদে চৈত্রবংশ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সময়ে এই বংশ আবির্ভূত হন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। টলেমি সেরেই (Carei) ও সেরেবেথ্রি (Cerebothri) নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অনেক পুরাবিদের মতে চৈত্র ও চৈত্র-পতি শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে বোধ হয় যে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্বে চৈত্রবংশের অস্তিত্ব ছিল। উইলসন সাহেবের মতে কোম্বুর অপর নাম চৈত্র। (Wilson's Mackenzie Collections, p. 35) কোম্বুদেশরাজকুল নামক প্রাচীন

এহে এই চের রাজবংশের পরিচয় আছে, তৎপুত্রের ডাক্তার বার্মেন ও ডোসন সাহেব এইরূপ চেররাজ বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন—

১ম বীররাজ চক্রবর্তী কলকুপের নগরের অধিপতি ছিলেন, কাহারও মতে ইনি চক্রবর্তীর আবার কাহারও মতে ইনি চক্রবংশীয়। তৎপুত্র গোবিন্দরাজ, তৎপুত্র ককরাজ, তৎপুত্র দিগ্বিজয়ী কালবল্লভরাজ, তৎপুত্র গোবিন্দরাজ। নগনন্দী নামে একজন জৈন কালবল্লভ ও গোবিন্দের মন্ত্রী ছিলেন। গোবিন্দের পর চতুর্ভুজ কনরদেব চক্রবর্তী রাজা হন। তৎপুত্র তিরু বিক্রমদেব কলকুপে অভিষিক্ত হন, তিনি কর্ণাট ও কোন্ডু দেশ শাসন করিতেন। ইহার ১০০ শকাব্দিত খোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে ইনি পাণ্ড্য, চোল, মলয় প্রভৃতি জনপদ জয় করেন এবং শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার খোদিত লিপিতে শঙ্করাচার্য্যের নাম দেখিয়া অনেকে ঐ লিপিবানি জাল বলিয়া স্থির করেন। অনন্তর গঙ্গবংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে গঙ্গ বা কোন্ডু বংশীয়গণ আসিয়া চেররাজ্য জয় করেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের নানাহান হইতে কোন্ডুবংশীয় রাজগণের যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রায়তস্ত-বিৎ ক্রিষ্ট সাহেব তাহার অধিকাংশই আধুনিক ও জাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখনও কোন্ডুবংশের প্রকৃত রাজ্যকাল স্থির হয় নাই। তবে যখন হরসালবল্লালবংশ ১০৮০ খৃষ্টাব্দে চোলরাজের হস্ত হইতে চেররাজ্য অধিকার করেন, তখন বোধ হয় কোন্ডুরাজগণ চোলরাজবংশের হস্তে রাজ্য হারাইয়াছিলেন।

দলবনপুর বা তালকড়ি নামক স্থানে বল্লালবংশের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে হরসালবল্লালবংশ রাজ্য হারাইলে চেররাজ্য মুসলমান রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। অতি অল্পকাল পরেই বিজয়নগরের রাজগণের যুদ্ধে অনেক হিন্দুরাজ একত্র হইয়া চেররাজ্য উদ্ধার করেন। তৎপরে চের রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ হইয়া উঠে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বিজয়নগর রাজ্য অধিকার করিলেও মদুরার নায়কগণ প্রবলপ্রভাবে চেররাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের আদিলশাহীরাজ চেররাজ্য আক্রমণ করেন, ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে মহিমুররাজ বহু প্রয়াসে এই স্থান অধিকার করেন। [চোল শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভারতে বহুকাল হইতে চের বা কেরলমণীর কেশের আদর চলিয়া আসিতেছে। এখনও অনেক কবি কেরলের চুলের উপমা দিয়া থাকেন।



চের বা কেরলমণী।

চেরমহামেন্দ, একজাতীয় ফুল।

চেরমেন্দ, একজাতীয় ফুল।

চেরা (দেশজ) ছই খণ্ড করা, ছেদন।

চেরা, আসানের অন্তর্গত খালিপর্কতস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। সামন্তের উপাধি সায়াম্। কমলানেবু, সুপারি, মধু, বাঁশ, চূণ ও পাথরিয়া করিয়া প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানকার বাঁশের খুড়ি ও মাছুর উৎকৃষ্ট। খালি ভাষায় এই জমিদারী ও ইহার প্রধান নগরের নাম শোহরা, এক প্রকার খাদ্য উদ্ভিদ হইতে ঐ নাম হইয়াছে। ইহার প্রধান নগর চেরাপুজি। [চেরাপুজি দেখ।]

চেরাণ (দেশজ) ছইখণ্ড করান।

চেরাৎ, পঞ্জাবপ্রদেশে পেশবার জেলার নওসরা তহসীলের একটা পার্কতাসেনাগার ও স্বাস্থ্যনিবাস। অক্ষা° ৩০° ৫০' উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১' পূঃ। পেশবার ও কোহাত জেলার মধ্যবর্তী খটক পর্কতের পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহা পেশবারের ৩৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ও নওসরা হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস করিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে সেনানিবাস হইলে সেনাদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। প্রায় ৩ মাইল দূরে একটা পার্কতীয় নির্ঝরী থাকার জলাভাব হয় না। এখানকার বায়ু অতি শুষ্ক। প্রায় ঐশ্বর্য্যকালেও বায়ু ৮০ অংশ কারেনহিটের অধিক উত্তপ্ত হয় না। জুন মাসের শেষে উত্তাপবৃদ্ধি হইলেও শীত এক গম্ভীরা বৃষ্টি হইবামাত্র বায়ু আবার শীতল হয়। পর্কত প্রান্তরময় হইলেও নানারূপ তরুণদ্বয়ে শোভিত,

হনুতগমে নামাধি স্থল হুটিয়া থাকে। এই স্থান শাহকোট, পেশাবান ও তজিপুর এই তিন গ্রামের উদ্ভিদা-খেল-খটক-নিগের অধিকাংশই। ঐতকালে সৈন্তগণ স্থানান্তরে গমন করিলে গ্রামবাসিগণ নবমের্টের ত্রায়াসি রক্ষার নিশ্চিত মাসে ২০০ করিয়া আশু হয়। এই স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে এক দিকে সমস্ত পেশবার উপত্যকা ও অন্য দিকে রাবলশিঙি ও খওরা উপত্যকার অধিকাংশ দৃষ্টগোচর হয়। এখানে একটি রোমান কাথলিক গির্জা আছে।

চেরান, সারথ জেলার অন্তর্গত পজার তীরবর্তী একটি প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে এখানে একটি সমৃদ্ধিশালী গড় ছিল। সম্রাতি এখানে পুরাতন গৃহের বিস্তার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ইহা ছাপুড়া হইতে সাত মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। একটি বড় তুল্পের উপরে একটি মসজিদ এবং তাহার প্রবেশদ্বারের উপর একটি খোদিত লিপি আছে। কতকগুলি হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে এই মসজিদ নির্মিত হয়। প্রাচীরের ভিতর আটটি স্তম্ভ আছে। তাহাতে “আলা উল্ হুনিরাবান্ দিন আবুয়া আল্ জাকর যে হসেন্ সা উল্ হুগতান ইবন্ সৈয়েদ আসরক” নামে এক বঙ্গীয় রাজার নাম খোদিত আছে। এই রাজা অহুমান খৃষ্টাব্দ ১৪৯৮ হইতে ১৫২০ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বোধ হয় উক্ত মুসলমানরাজই প্রাচীন হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার মসলা হইতে উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে চেরা জাতি হইতে চেরান নাম হইয়াছে। [চেরা দেখ।]

চেরাপুঞ্জি, আসামের খাসিপর্কতস্থিত চেরা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। খাসিজাতি কর্তৃক ইহা শোহরাপুঞ্জি নামে অভিহিত। ইহা শিলং হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ। সবুজগুঠ হইতে ৪৫৮ ফিট উচ্চ। ইহার অক্ষা° ২৫° ১৬' ৫৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪৬' ৪২" পূঃ। খাসিপর্কতের মধ্যে এইখানে প্রথমে ইংরাজ রাজপুত্রবদিগের আশাস ছিল। কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জেলার প্রধান প্রধান কার্যালয় শিলঙে উঠিয়া যাওয়ার এই স্থান পরিত্যক্ত হয়। এই গ্রামের দক্ষিণে একটি স্থান আছে, সেখানে চেরা রাজ্যের অধিপতি অবস্থিতি করেন। চেরাপুঞ্জির দৃষ্ট্য এক্ষম শোচনীয়। বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। একটি ডাক বাঙ্গালা, ডাকঘর এবং থানা হাজা এখানে আছে।

খৃষ্টকর্ষপ্রচারকগণ খাসি জাতির মধ্যে খৃষ্টধর্মপ্রচারার্থ এখানে সদা সর্বদা আসিয়া থাকেন। সম্রাতি ব্রাহ্মগণও চেষ্টা করিতেছেন। শোহরাগিন্ চেরারাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহা চেরাপুঞ্জি হইতে ৭ মাইল উত্তরে। সে

স্থানে একটি পাছমিবাল (করাই) আছে। আসাম জিহই ঘাইবার রাস্তার উপরে অবস্থিত। এখানে একটি সাপ্তাহিক হাট বসিয়া থাকে।

চেরাপুঞ্জিতে করলা পাওয়া যায়। দেশীয় রাজার নিকট হইতে বৃষ্টিগ গবর্ণমেন্ট করলার অমি পতন লইয়াছেন। পূর্বে এই অমি হইতে করলা বাহির হইত। কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পড়িয়া রহিয়াছে।

এখানে বহু পরিমাণে আলুর চাষ হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জির বিশেষত্ব এই যে এখানে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে পৃথিবীর কোন স্থানে সেরূপ হয় না।

চেরা (ত্রি) চি-বাহলকাং ক। চয়দলীল, চয়ন করা বাহার স্বভাব। “স্বং হেহিচেরবে বিভাভগং বস্তুতয়ে।” (শুক্ ৮।৬।১৭)

চেরা, ভারতের প্রাচীন জাতি। হয় সাত শত বৎসর পূর্বে ইহারা একটি প্রবল পরিক্রমী ও উদ্যমশীল স্বাধীন জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। প্রবাস এই যে, ইহারা নাগজাতির অন্তর্গত। এই বঙ্গীয় লোক এবং ইহাদের প্রাচীন কীর্তি সকলের চিহ্ন এখনও ভারতমর্বে অনেক স্থানে দেখা যায়। কথিত আছে যে সাসেরাম, রামগড় এবং বৃহগরার অনেক অট্টালিকা তাহারাই নির্মাণ করিয়াছিল। সে সকলের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। শাহাবাদ জেলার যে সকল প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ আছে, তাহার অধিকাংশই চেরাজাতি কর্তৃক স্থাপিত। শেরিং সাহেব বলেন যে, আসাম পাহাড়ের নাগাজাতি, নাগপুরের আদিম জাতি, নাগবংশীয় রাজপুত্র এবং নাগা ককীরদের সহিত চেরা জাতির সংশ্লব আছে। ইহা কতদূর প্রকৃত, তাহা স্থির করা যায় না।

ইহাদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে প্রত্যেক ৫৬৮টি পরিবারের মধ্যে এক জনকে রাজ্যরূপে বরণ করা হয় এবং রাজপুত্রদের রীতি অনুসারে এই রাজার কপালে ঢাকা দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্বে ইহারা গঙ্গা নদীর নিকটবর্তী অনেক জনপদের উপর প্রভুত্ব করিত এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারাই বিশেষ কমতাশালী ছিল। অনেকেই বলেন যে, চেরারাজগণ শুনকবংশীয় এবং গৌতমের সময়ে ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। চেরাদের আধিপত্য সময়ে এই জাতি অতিশয় বলশালী ছিল। উত্তরে বেহার হইতে গৌরকপুর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মুজাপুর জেলার অন্তর্গত শোণনদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল, গাজিপুত্রের পূর্বদিকের সকল স্থান চেরা জাতির অধীনে ছিল, সরবু নদীর তীরে কোপাচিভের অন্তর্গত পাভাকোট নামক স্থানে ৬০ হইতে ২০ বিঘা জমী ব্যাপিয়া প্রাচীন অট্টালিকার

ধ্বংসাবশিষ্ট ইহু এবং অজ্ঞাত জঘা অনেক পড়িয়া আছে। বলিয়া পরগণার অন্তর্গত বাইনা নামক স্থানে যুক্তি-নিশ্চিত বড় বড় বাঁধের ভগ্নাবশেষ নরনগোচর হয়। এই সকল স্থানের লোকেরা বলে যে, গঙ্গা নদীর তীরে বীরপুরের অন্তর্গত কোট নামক স্থান হইতে তিকমদেব নামক একজন চেরুবাংলীয় রাজা মহম্মদাবাদ নামক একটা পরগণা শাসন করিতেন। মহীপ চেরু নামক আর একজন রাজার সুরাহা হ্রদের উত্তর দিকে দেউরি গ্রামে একটা দুর্গ ছিল। যখন আর্ধ্যগণ এখানে আসে, তখন গঙ্গানদীর মধ্য-বর্তী সকল স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এই স্থানে একটা প্রবাদ আছে যে, এখানকার একটা জলাশয় রাজা সুরথের সময়ে চেরু জাতি খনন করে। গাজিপুর জেলার এই জাতির চিরুমাঞ্জও নাই, তবে শাহাবাদ জেলার নিকটবর্তী বাহিয়া পরগণার ইহাদের দেখা যায়। কিছুকাল পূর্বে এই জেলা এবং বেহারের অজ্ঞাত জেলা এই জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। হলদী নামক স্থানের হরবাংলীয় রাজপুতদের কতকগুলি পারিবারিক ইতিহাসে লিখিত আছে যে বাহিয়া নামক স্থানে অবস্থিতির সময়ে তাহারা চেরুদের সহিত বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শেষে তাহারা জয়ী হইয়াছিল। শেরশাহের সময়ে চেরুজাতি তাহার ভীষণ শত্রুরূপে গণ্য ছিল।

মিজাপুর জেলার দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে, তাহা এক সময়ে চেরু এবং খরবার প্রভৃতি কএকটা জাতির সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল। পরে বহুকালব্যাপী সময়ের পর চম্বেল রাজপুতগণ অধিকার করে। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, শাহাবাদের দেও-মার্কও নামক স্থানে যে সকল প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা চেরু রাজগণ কর্তৃক সম্ভবতঃ ৬৭ শত বৎসর পূর্বে নিশ্চিত হইয়াছিল।

কএক বৎসর ধরিয়া নোয়া এবং কোরা নামক দুইজন চেরুজাতীয় দস্যু শোণনদতীরস্থিত মন্ডেসর পাহাড়ে ভীষণ ডাকাতি এবং নরহত্যা করিত। দস্যুবৃত্তি করিয়া তাহারা পাহাড়ের উপরে পলায়ন করিত এবং পাহাড়ীরা তাহাদিগকে আশ্রয় দিত। অবশেষে স্থানীয় মেজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় গ্রামবাসীগণ তাহাদের ধরিয়া দেয়। বর্তমান সময়ে চেরু জাতীয় লোক বেহার এবং ছোটনাগপুরে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন বাপন করে। শাহাবাদ, কাশী এবং মুজাপুরেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পালামোর রাজা রাজপুতবাংলীয় বলিয়া পরিচয় দিলেও অনেকে বলেন যে তিনি চেরুজাতীয়। পালামো নামক স্থানে চেরুদের অধিকারে কিছু কিছু জমি আছে। তাহারা তাহা আবাদ করিয়া সংসারবাজী নির্বাহ

করে। ইহারা রাজপুতবাংলীর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। সকলেই রাজপুত গোত্র অনুগমন করিয়াছে। ইহারা উপবীত ধারণ করে। তথাপি ইহারা প্রকৃত রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

পালামোর চেরুগণ বলিয়া থাকে যে, তাহারা চেনু সুনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তিনি কুনাথুনে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একটা রাজকন্ডার পাপিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্রই চেরু জাতির আদিপুরুষ। আর একটা প্রবাদ এই যে চেরু জাতি উক্ত সুনির আগন হইতে প্রোতুত হইয়াছিল।

অজ্ঞাত স্থানের অধিকার বহু পূর্বে তিরোহিত হইলেও চেরুগণ পালামোরে অনেক দিন প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। বৃটিশ গবর্নমেন্টের শাসনে আসিবার সময় পর্য্যন্ত ইহারা স্বাধীন ভাবে ছিল। এমন কি, চেরু রাজ বৃটিশ গবর্নমেন্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা সকল হয় নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজব দিতে অক্ষম হওয়ার বৃটিশ গবর্নমেন্ট রাজার বিষয় সকল ক্রয় করিয়া লয়েন। তথাপি রাজার জাতিবর্গের জমি তাহাদের অধিকারে থাকে এবং এখনও তাহারা তাহা ভোগ করিতেছে।

স্থানীয় চেরুগণ বলে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ রোহ-তাস্ হইতে আসিয়া এই স্থান অধিকার করে। তখন এখানে কএকটা জাতির বাস ছিল। ইহাদের মধ্যে খরবার জাতিই প্রসিদ্ধ। চেরুগণ ইহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া ইহাদিগকে সরগুজা নামক স্থানের নিকটবর্তী পার্কত্যদেশে বাস করিতে দেয়।

যখন পালামোরে চেরু রাজ্য স্থাপিত হয়, তখন চেরুজাতি ১২০০০ ও খরবার জাতি ১৮০০০ ঘর ছিল। উত্তর জাতিই বলে যে তাহারা রাজপুতবাংলীয়। এই জন্ত ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়।

চেরুজাতি এক সময়ে প্রবল ছিল বলিয়াই বিপুল হিন্দু পরিবারের সহিত বিবাহসূত্র স্থাপনে সমর্থ হয়। এই জন্ত ইহাদের অবরবে পরিবর্তন দেখা যায়। তথাপি কোন কোন লক্ষণে ইহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া স্থির করা বাইতে পারে। ইহাদের বর্ণ বিভিন্ন, তবে সাধারণতঃ কটা। ইহাদের গালের হাড় উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র ও বক্রভাবে স্থাপিত। নাসিকা নত এবং চওড়া। মুখ বড় এবং চোঁট উন্নত।

চেরুজাতির কন্ডাদের বিবাহের বয়স স্থানভেদে ভিন্ন। কোন কোন স্থানে বালাবিবাহ প্রচলিত। কোথাও বা কন্ডা

বরহা হইলে তাহার বিবাহ দেয়। ইহাদের বিবাহপ্রণালী সাধারণতঃ হিন্দুদের মত। তবে কোন কোন বিধে পার্থক্য দেখা যায়।

‘ভানবার’ নামে ইহাদের বিবাহপ্রণালীর একটি অতুষ্ঠান আছে। বৃক্ষের শাখার ইহার একটি চাঁদেরা প্রস্তুত করে। ইহার ভিতরে বিবাহ সমাধা হয়। এখানে একটি বৃত্তিকানিশিঁত পাত্র আছে। বর ও কস্তুরী এই দুইর পাত্রটির চারিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই সময়ে বর মাথা হেঁট করিয়া কস্তুর পাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলে যে, সে যাবজ্জীবন তাহার প্রতি ব্যভিচার করিবে না। সিন্দূরদান শেষ হইলে পাত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাত্রে পদ ধুইয়া মুগল হস্তে ঘোড়ক প্রদান করে। ইহার পর, বরের টোপার হইতে পাতমোড়ী লইয়া কস্তুর মাথার স্থাপন করা হয়। আর একটি অতুষ্ঠানের নাম ‘আমুলে’। বিবাহ করিবার অন্ত কস্তুর বাটীতে বাইবার পূর্বে বরের মা মুখে একটি আম পাতা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। এই সময়ে তাঁহার মাতুল ঐ পাতাটির উপর জল ঢালিতে থাকেন। আবার পাত্র কস্তুর বাটীতে উপস্থিত হইলে, কস্তুর মাতাও ঐরূপ করিয়া থাকে এবং কস্তুর মাতুলও জল ঢালিয়া দেন।

চেলদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। তবে ইহা বিরল। চেলজাতীয় সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। তবে নিম্নশ্রেণীর রমণীদের পুনরায় বিবাহ করিবার পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই। এ প্রকার বিবাহে ইহাদিগকে কোন কোন নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। পারিবারিক সুবিধার জন্ত, ইহারা স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর কিম্বা অন্ত ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে পূর্নকার বিবাহে যে সকল প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। যে রমণী ব্যভিচার করে, তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং সে কোন প্রকারেই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

ইহাদের ধর্মপ্রণালী নান্য আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারা হিন্দুদের দেবতা সকলকে পূজা করে, আবার কোন কোন আদিম অসভ্য জাতির দেবতার সমক্ষেও বলি দেয়। হিন্দু দেবতার পূজার সময়ে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে, আবার বহু জাতির দেবতার নিকট বলিদান কার্য্য সেই জাতীয় বৈগা দ্বারা সম্পন্ন করে। খরিয়া এবং মুণ্ডা জাতির দেবগণের সমক্ষে ইহারা ছাগ, পাখী, মদ এবং মিষ্টান্ন উৎসর্গ করে। অগ্রহারণ মাসে দেবতার রূপার উত্তম

শতলাভ উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। কোল জাতির জ্ঞান ইহারা তিন বৎসর অন্তর বলি দিয়া থাকে এবং মহিষ ও অন্তান্ত গ্রাম্য পশু উৎসর্গ করে।

চেলগণ জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে বহুপরিকর। তাহারা তাহাদের পুরুষদের কীর্তি সকল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্ত মনে করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জমিদার আছে। অনেকেই বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিতেছে। বাহারা অতিশয় দীন, তাহারা কেবল স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে অথবা মজুরের কার্য্য করে।

চেলরূপ পেরুমল, প্রাচীন চেলরাজ্যের শেষ রাজা। চন্দ্রগিরি নদী হইতে কস্তাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে-পাহাড় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত চেলরাজ্যের সীমা ছিল। কথিত আছে যে, চেলরূপ পেরুমল আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্য তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া মকার গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া তিনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন।

আরব সাগরের ধারে সাকহাই নামক স্থানে তাঁহার কবর আছে, তাহাতে খোদিত আছে যে, তিনি ২১২ হিজিরায় (৮২৭ খৃঃ অব্দে) তথায় গমন করেন এবং ২১৬ হিজিরায় (৮৩১ খৃঃ অব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চেলরূপ পেরুমল যে কএক জনকে তাঁহার রাজত্ব বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহারা বহুকাল ধরিয়া নিজ নিজ অধীনস্থ স্থান সকল শাসন করেন। কিন্তু তাঁহারা অন্তান্ত রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়েন। কেবলমাত্র ত্রিবাঙ্গুরের রাজা এখনও ইংরাজরাজের অঙ্গগ্রহে প্রতাপশালী আছে।

চেলেরিটি (চিরতিলক শব্দ) [চিরতিলক দেখ।]

চেলুলচল্লি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার জেলার পতাধী টেসনের ১০ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অক্ষা° ১০° ৫৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২২' ২০" পূঃ। ১৭৯২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত এখানে বোম্বারের “সাদারণ স্পারিটেণ্ডেণ্ট” সাহেবের আফিস ছিল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে, এখানে নেহনগগাড় তালুকের সদর হয়। এখানে ডাকঘর, বাঙ্গালা, বিচারালয় প্রভৃতি আছে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা মহিন্দরের অন্তর্ভুক্ত হয়। *এই স্থানেই সামরীরাজের পরিবারবর্গ ১৭৯০ খৃঃ অব্দে বড়ই হৃদশা প্রাপ্ত হয়।

চেল (স্ট্রী) চিল্যতে আচ্ছাদিতে পরিধীয়তে চিল-কর্শ্মি শব্দ। ১ বস্ত্র, কাপড়।

“চেল কর্ম্মামিবাণাঞ্চ জিরাভঃ সাদভোজনম্।” (মহু ১১/১১৬)

(জি) ২ অর্থঃ। (অমর ভাঃ ২০৩)

“না ক্রান্তিচেলঃ কুবি কল্পচিহ্নম্।” (ভট্ট)

জীলিঙ্গে ভীপ্ হয়। “ব্রাহ্মণি চেলি।” (সি কো)

চেলক (পুং) একজন স্থিতি।

“চেলক উহ সাহ শান্তিস্যায়নঃ।” (শতশতাব্দী ১০।৪।৫৬)

চেলগঙ্গা (স্ত্রী) চেলসি বঙ্গ। ধোকপের নিকটবর্তী একটা নদী। ভারতে ইহার উল্লেখ আছে।

“গোকর্ণস্তোপরিষ্ঠাভু ভ্রংশিতঃ ন মহাহরঃ।

পপাত চেলগঙ্গারঃ পুলিনে লহ কল্পরা।” (হরিবংশ ১৪২ অঃ)

চেল (দেশজ) ১ সন্ন্যাসীগণের শিষ্য, যাহারা সন্ন্যাসী প্রতিপালন করিতে যত্নবান্। ২ কাঠখণ্ড, স্থান বিশেষে চলা কলিয়া থাকে। ৩ একজাতীয় ক্ষুদ্রাকার সাহ।

চেলান (পুং) চেল-বাহলকাৎ আনচ্। লতাবিশেষ, চেলনা ও স্থানবিশেষে তরমুজ বলে। পর্যায়—অন্নপ্রমাণক, চিত্রফল, সুশাশ, রাজতিনিশ, লতাপনস, নাট্য, মেট। ইহার গুণ গুরু, বিষ্টভ, কফ ও শ্বায়ুবর্জক। (রাজনি)

[অপর বিবরণ শীর্ষস্থ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চেলাপিপল (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ।

চেলাল (পুং) চেলমিবালতি অল-অচ্। লতাপনস। (ত্রিকাণ্ড)

চেলশাক (পুং) চেলঃ তত্র স্থিতযুকামশ্রুতি চেল-অশ-ধূল্।

প্রত্যবিশেষ। [চেলশাক দেখ।]

চেলি (দেশজ) পট্টবস্ত্র বিশেষ, রেসমী কাপড়।

চেলিকা (স্ত্রী) চেল-কন্ টাপ্ অতইহৎ। পট্টবস্ত্র, চেলির কাপড়।

“সেয়ং কৃষ্ণস্ত বনিতা পীতশাটীপরিচ্ছদা।

রক্তচেলিকরাচ্ছরা শাতকুন্তলনস্তনী।” (পদ্মপুং পাতালখং)

চেলিচিম, চেলিচীম (পুং) একজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

চেলিনী (দেশজ) চাউল ধোয়াজল, স্থানবিশেষে চেলুনী বলে।

চেলী (স্ত্রী) চেল-ভীপ্। পট্টবস্ত্র, চেলির কাপড়।

চেলৌরি (দেশজ) ক্ষুদ্র মৎস্তবিশেষ।

চেলুক (পুং) চেল-উক। বৌদ্ধভিক্ষুক বিশেষ। (ত্রিকাণ্ড)

পর্যায়—শ্রামণের, প্রত্নজিত, মহাপাসক, গোমী।

চেলুনটিয়া (দেশজ) একরকম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

চেলী (স্ত্রী) স্নানগীরবিশেষ। (হল্লীখং)

চেল্টক (জি) চেল্টে চেল্ট-ধূল্। ১ যে চেল্ট করে, চেল্টযুক্ত।

(পুং) ২ রক্তবর্ণবিশেষ।

“পাদমেকং হৃদিভুক্ত ইতরেনৈব চেল্টয়েৎ।

কান্তকোড়ে স্থিতানারী বকোহং চেল্টকোমতঃ।” (ছন্দদীপিকা)

চেল্টন (স্ত্রী) চেল্ট-লুট্। চেল্ট।

“খংসরিবিশেষঃ ধেমু চেল্টনম্পর্শনে ইন্দ্রিয়ম্।” (মহু ২২।১২০)

চেল্টরিফ্ (জি) চেল্ট-পিচ্-চুদ্। বিশি চেল্ট করান।

চেল্টা (স্ত্রী) চেল্ট-অ-টাপ্। ১ কারিকব্যাপার বিশেষ, নৈসর্গিক মতে আহার বহু বা কৃতি লজ্জ ক্রিয়াসম্বন্ধ কারিক ব্যাপারের নাম চেল্টা।

“আশ্রয়তা অবসিদ্ধা ইচ্ছাকতা কৃতিভবেৎ।

কৃতিজ্ঞতা ভবেচ্চেল্টা চেল্টাকতা ক্রিয়া ভবেৎ।” (নৈরাং প্রসি)

২ ব্যাপার। ৩ কৰ্ম, কার্য, পতি।

চেল্টানাপ (পুং) চেল্টার বিখরচনাব্যাপারত নাশো বহু বছরী। প্রায়। (রাজনি)

চেল্টাবল (স্ত্রী) জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ গ্রহগণের বলবিশেষ, গতি অনুসারে গ্রহগণ বলবান্ হইয়া থাকে, এইরূপ বলকেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে ‘চেল্টাবল’ নামে উল্লেখ করা হয়। বৃহ-জ্ঞাতকের মতে উত্তরারণে রবি, চন্দ্র এবং বক্রগামীমঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি চেল্টাবলযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত গ্রহকেও চেল্টাবলযুক্ত বলা হয়। বুদ্ধা-নিসময়ে অরযুক্ত গ্রহগণেরও চেল্টাবল হইয়া থাকে (১)।

চেল্টাবৎ (জি) চেল্টা বিভক্তেহত্ চেল্টা মতুপ-মত বঃ। চেল্টা-যুক্ত, যাহার চেল্টা আছে।

“চেল্টাবদন্ত্যাবরবিমাত্রবৃত্তিঃ”। (মুক্তাবলী)

চেল্টার্হ (জি) চেল্টাৰহতি অর্হ-অণ্। যাহার চেল্টা করা উচিত।

চেল্টিত (জি) চেল্ট কর্তৃক-জ। ১ চেল্টযুক্ত, যে চেল্ট করে।

(স্ত্রী) চেল্ট ভাবে ক্ত। ২ পতি। ৩ চেল্টা, কারিক ব্যাপার।

“অলুকেব মদানারী রুধিরং পিবতীতিব।

মুখস্ত ন বিজানাতি মহিতো ভাবচেল্টিতৈঃ।”

(দেবীভাগ ১।১৫।১৮)

চেল্ (চেল্ট শব্দজ) চেল্টা।

চৈ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজীকর। ভোজবাজীতে ইহার অচত্বর। অবাধ্য, গোয়ালপুর এবং অন্তান্ত স্থানে ইহার বাস করে। কিন্তু ইহাদিগকে কোন স্থানেই স্থির থাকিতে দেখা যায় না। যেখানে মেলা বসে বা কোন প্রকার উৎসব হয় ইহার সেস্থানে গমন করে এবং তাহাদের কিপ্র-হস্ততা দেখাইয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করে।

চৈ (চব্য শব্দজ) চবিকা, কটুরসযুক্ত দ্রব্যবিশেষ। [চবিকা দেখ।]

চৈকিত (পুং) গোত্রপ্রবর্তক একজন কবি। এই শব্দটি পর্গাদি গণাঙ্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর বঞ্ হয়। (শা ৪।১।১০৮)

চৈকিত্যত্ চৈকিত্যত্ অবে গোত্রাপত্যত্ হ্যাত্ চৈকি-

(১) “উৎপন্নেন রত্নীভবমুখৌ বক্রসমাপনঃ পরিদেখাঃ।

বিপুলকরাযুধি চোত্তরংহ্যন্তেতিবীর্ষমুখাঃ পরিক্রান্তাঃ।” (বৃহৎসংহিতা)

ত্যাগাদি অণু (কথাদিত্যো গোত্রো। পা ৪।২।১১১) চৈকি-
ত্যের হাজ।

চৈকিত্য (পুং স্ত্রী) চৈকিত্য গোত্রাপত্যং চৈকিত্য-বঞ্ (গর্গা-
দিত্যো বঞ্। পা ৪।১।১০৫) চৈকিত্য মূনির গোত্রাপত্য।

চৈকিতান (পুং) চিকিতানন্ত গোত্রাপত্যং চিকিতান-অণু।
উপনিষৎ প্রসিদ্ধ একজন পুরুষ। [চৈকিতানের দেখ।]

চৈকিতানেয় (পুং) উপনিষৎপ্রসিদ্ধ একজন জ্ঞানী পুরুষ।

“তদ্বাপি ব্রহ্মদত্ত শৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্ উবাচ।”
(বৃহদার উপ ১।৩।২৪) কেহ কেহ ইহার অপর নাম
চৈকিতান বলিয়া স্বীকার করেন।

চৈকিতায়ন (পুং) চিকিতায়নস্তাপত্যং চিকিতায়ন-অণু।
চিকিতায়ন ঋষির পুত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার উল্লেখ
আছে। (ছান্দোগ্য উপ ১।৮।১) ‘চিকিতায়নস্তাপত্যং
চৈকিতায়নঃ’ (ভাষ্য।)

চৈকিৎসিত (ত্রি) চৈকিৎসিত্যন্ত ছাত্রঃ চৈকিৎসিত্য-অণু
(কথাদিত্যো গোত্রো। পা ৪।২।১১১) চৈকিৎসিত্য মূনির ছাত্র।

চৈকিৎসিত্য (পুং স্ত্রী) চিকিৎসিত্যন্ত ঋবেগোত্রাপত্যং চিকিৎ-
সিত্য-বঞ্ (গর্গাদিত্যো বঞ্। পা ৪।১।১০৫) চিকিৎসিত
ঋষির গোত্রাপত্য, তদ্বংশোৎপন্ন।

চৈকীর্ষত (ত্রি) চিকীর্ষত্বে চিকীর্ষৎ-অণু (প্রজ্ঞাদিত্যো। পা
৫।৪।৩৮) যাহার চিকীর্ষা আছে, যিনি করিতে ইচ্ছা করেন।
জীলিঙ্গে ভীপু হয়।

চৈটয়ত (ত্রি) চৈটইব যততে যত অচ্ অতঃ স্বার্থে অণু।
ভূত্যের হ্রাস বন্ধশীল, যে ব্যক্তি ভূত্য না হইয়াও ভূত্যের হ্রাস
ব্যবহার করে। (পা ৪।১।৮০)

চৈটয়তায়নি (পুং স্ত্রী) চৈটয়তস্তাপত্যং চৈটয়তং ফিঞ্ (তিকা-
দিত্যো ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) চৈটয়তের অপত্য স্ত্রীলিঙ্গে ষ্ণৎ
প্রত্যয় হইয়া ‘চৈটয়ত্যা’ হইয়া থাকে। (পা ৪।১।৮০) কোন
কোন গণপাঠে ‘চৈটয়ত’ স্থলে ‘চৌটয়ত’ পাঠ আছে।

চৈতন্য (স্ত্রী) চেতন এব চেতন স্বার্থে ষ্ণৎ। ১ চিৎস্বরূপ,
আত্মা। সাধ্যমতে চৈতন্য আত্মার ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা
হয় না। তাঁহাদের মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ দ্রব্য পদার্থ-
বিশেষ। ইহা অপরিণামী অথচ ব্যাপক। পৃথিবী, জল
প্রভৃতি দ্রব্যের হ্রাস ইহাতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণ
নাই, কিন্তু সংযোগ, বিভাগ ও পরিমাণ প্রভৃতি গুণ আছে
বলিয়া দার্শনিকগণ ইহাকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই
মতে জ্ঞান ও চৈতন্য এক নহে। জ্ঞান বুদ্ধি বা মহত্ত্বের
ধর্ম; আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞানকেই চৈতন্য বলিয়া
থাকি। (“নিশ্চয়ং হ্রাস চিত্তম্।” সাংখ্য হু*।) ২ পরমায়া।

বৈদান্তিকগণ পরমায়াকে চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ স্বীকার
করেন। [জীবাত্মা ও পরমায়া দেখ।] ৩ আত্মধর্ম, জ্ঞান।
নৈসর্গিক মতে জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; ইহা আত্মার
ধর্ম, তদ্ব্যতীত কোন পদার্থে ইহার অস্তিত্ব নাই।

“শরীরন্ত ন চৈতন্যং মৃত্যু যুক্তিচারতঃ।” (ভাষ্যপরি*)

৪ চেতনা। ৫ প্রকৃতি। (মেদিনী)। ৬ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব
ধর্মপ্রচারক। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

চৈতন্যচন্দ্র (পুং) স্প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক, চৈতন্য-সম্প্রদায়-প্রব-
র্তক, ইহার পূর্ণ নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, তাহার একদেশ
“চৈতন্য” লইয়াই ইহাকে চৈতন্য নামে অভিহিত করা হয়।

সময়ে সময়ে ধর্মের অবনতি হইলে কোন না কোন
মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া সত্বপদেশ ও নানা প্রকার উপায়ে
ধর্মের সংস্থাপন করেন। এই চৈতন্যদেবও একজন সেইরূপ
অধিতীয় ধর্মপ্রচারক, ইহার স্মৃদধুর ধর্মবিষয়িণী বস্ত্রতা
শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মুগ্ধপ্রকৃতি পাণ্ডিত্যময় ব্যক্তির হৃদয়ও
ধর্মভাবে গলিয়া যাইত, কেহই আর ইহার মতের পক্ষপাতী
না হইয়া থাকিতে পারিত না। যখন বৌদ্ধগণের প্রবল
প্রভাপে ভারতে বিস্তৃত হিন্দুধর্ম নির্বাণ হইয়া আসিতেছিল,
অনেকেই হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন।
তাহার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিকমতের সূত্রপাত
হয়। তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বীগণ দিন দিন তত্ত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য
ভুলিয়া যাইয়া পশুহিংসা ও সুরাপান প্রভৃতি কুকার্যে
রত হন। ইহাদের দলবৃদ্ধি ও প্রবল পরাক্রান্ত যবন-
রাজগণের অত্যাচারে ভারতের ধর্মভাব ভরস্বর হইয়া
উঠিল। ধর্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহ্য হৃদয়-বিদা-
রক ভীষণ মনস্তাপ হইতে লাগিল। তাঁহারা নীরস ভক্তি-
হীন ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রেম, ভক্তি
ও জীবে দয়া করাই প্রধান সাধন স্থির করিয়া বৈষ্ণবধর্মের
পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি
মহাত্ম্যগণ ঐ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার পরে
শ্রীহট্টে চন্দ্রশেখর প্রভৃতি, চট্টগ্রামে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি,
রাজশেখর নিত্যানন্দ, বৃন্দে হরিদাস ও শান্তিপুত্র অদ্বৈতাচার্য্য
প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সাহায্যে
বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিল না, কেবল
সূত্রপাত হইয়া থাকিল। তাঁহারা পাণ্ডিত্যের ভীষণ অত্যা-
চারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য ঈশ্বরকে
মনপ্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। তাহার অনতিকাল পরেই
চৈতন্যচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত সকল জাতির মধ্যে সমানভাবে বিস্তৃত বৈষ্ণবধর্ম প্রচার

করিয়া চিরদিনের জন্ত ভারতবাসীর আশ্রয় ও সুরক্ষার হইয়াছেন। কল্যাণপ্রিয় ভারতে জীবনচরিত অতি হৃদয়-বস্ত, কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সেই অভাব নাই, বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যচন্দ্রের প্রায় সমস্ত জীবনীই লিখিত করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যচন্দ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বৃন্দাবনদাসকৃত সংস্কৃত চৈতন্যমঙ্গল ও ভাষা চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত, চূড়ামণিদাসের চৈতন্য-চরিত, কবিকর্ণপুরকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়, প্রেমদাসকৃত তাহার পদ্যাহুবার, প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃত, প্রহ্লাদমিশ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, জগজ্জীবন কৃত মনঃ-সন্তোষিণী, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরসাকর, গৌরানন্দ-স্বরকমলতরু, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও গৌবিন্দ প্রভৃতি রচিত প্রাচীন কড়চা গ্রন্থই প্রধান। ইহা ছাড়া কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহার বিষয়ে অনেক লিখিত আছে। বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অলৌকিক বিশ্বাস ও ঐকান্তিক-ভক্তি ছিল, তাঁহার সমস্ত চরিত্রই অলৌকিক বলিয়া ইহাদের মনে ধারণা ছিল, তাই তাঁহারা কল্পনাবলে তিলকে তাল করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, এই সকল কারণেই চৈতন্য-চন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে এমন ভাবের অনেক গল্প চৈতন্যজীবনচরিতে সংযোজিত আছে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য বা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যদিও চৈতন্যচন্দ্রের অন্তর্ধানকাল এখনও চারিশত বৎসর অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণও তাঁহার জীবনী লিখিতে ক্রটি করেন নাই, তথাপি সেই সকল অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে প্রকৃতভাব গ্রহণ করা বড়ই সুকঠিন। বাহা হউক তাঁহার জীবনচরিতের অতিরঞ্জিত অংশ পরিত্যাগ করিয়া দেখিতে গেলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, কলিযুগে যে সকল ধর্মপ্রচারক বা আদর্শ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, মহাত্মা চৈতন্যচন্দ্র তাহাদের শীর্ষস্থানীয়, স্বাপনের শেষ আদর্শ পুরুষ বা অবতার কৃষ্ণচন্দ্রের পর আর এতাদৃশ পুরুষ ভারতে বা পৃথিবীর কোন স্থানে উদ্ভূত হন নাই।

মহাত্মা চৈতন্যচন্দ্র উদ্ভূত হইলে সাধু বৈষ্ণবমণ্ডলীর আর আনন্দের পরিমীমা রহিল না। তাঁহাদের ঐকান্তিক-ভক্তি ও বিশ্বাস চৈতন্যচন্দ্রকে তাহাদের নিকটে স্বয়ং পরমেশ্বর বা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া আদর্শ করিল এবং তাঁহারাও তদনুসারে কার্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চৈতন্যচন্দ্র ঈশ্বরস্বাপনের জন্ত বৈষ্ণবেরা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইরাছেন। অপর দিকে তত্ত্বমতাবলম্বী বা শাক্তগণ তাঁহার অসা-

ধারণ প্রেমভক্তি, ঈশ্বর-বিশ্বাস, বৈষ্ণব ও মেল-হিতৈষিতা প্রভৃতি লক্ষণাবলী একেবারে বিশ্বত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার ও অবজ্ঞা করিতে ক্রটি করেন নাই। [বৈষ্ণব ধর্ম দেখ।] বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার ও পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু শাক্ত বা মেল সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে সাধু ভক্ত, ও ধর্মপ্রচারক ভিন্ন ঈশ্বরবন্তার বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহুদিন হইতে ঘোর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। চারিশত বৎসর চলিয়া গেল, চিরস্বরণীয় চৈতন্যচন্দ্র কেবলমাত্র হৃদয়াকাশ আলো করিয়া উদ্ভূত থাকিলেন, তথাপি এ বিবাদের সুচাক্র মীমাংসা হইল না। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে ঈশ্বর করিবার জন্ত এই যুক্তি বলেন যে ঈশ্বর স্বভাব, তিনি ইচ্ছা করিলে মনুষ্য হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! এবং তাঁহাদের মতের পরিপোষক শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইয়া থাকেন—

“ধর্মসংস্থাপনার্থ্য বিহরিষ্যামি তৈরহম্।

কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যগোরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।

প্রভুগৌরহরি গোঁরো নামানি ভক্তিদানিমে।” (অনন্তসংহিতা)

ধর্মসংস্থাপনের জন্ত আমি ঈশ্বর তাহাদের সহিত (ধরাতলে) বিচরণ করিব। আমি কালবশে বিনাশপ্রাপ্ত ভক্তিপথ পুনর্বার স্থাপন করিব। কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরান্দ, গৌরচন্দ্র, শচীসুত, প্রভু, গৌরহরি ও গৌর আমার এই কয়টা নাম অতিশয় ভক্তিপ্রদ।

ইহা ছাড়া মহাভারতের একটি শ্লোকও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

“সুবর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাদ্ভুতচন্দ্রানন্দদী।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরাধরঃ ॥”

বিষ্ণুসহস্রনামের মধ্যে তাহাকে সুবর্ণবর্ণ বা গৌরান্দ, চন্দ্র-তিলকধারী, সংজ্ঞাসকারী ও নিষ্ঠাশাস্তিপরাধর বলিয়া উক্ত শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে (১)। বিষ্ণু আর কোন

(১) চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস এইটিকে ভারতের দামধর্মের ২১০ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩ পরিচ্ছেদ দেখ।] কিন্তু মহাভারতে এরকম একটা শ্লোক নাই। অনুশাসন পর্যাধ্যায়ের ১০২ অধ্যায়ের দামধর্মের ২২ শ্লোকের প্রথম অর্ধেক ও ১০ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ লইয়া উহা সংগঠিত হইয়াছে। সেই দুইটি শ্লোক দেখা—

“সুবর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাদ্ভুতচন্দ্রানন্দদী।

ধীরহা বিবরঃ পুংসো বৃহদানীক চন্দ্রমঙ্গলঃ ॥” ২২

“জিলাদা সামগঃ সাম দিকৃপাং ভেদজঃ ভিবন্।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরাধরঃ ॥” ১৫

অবতারেই উক্ত লক্ষণ বা চিহ্নাদি ধারণ করেন নাই। অতএব মহাভারতের ঐ মোক্ষাবতারে চৈতন্যকেই বিষ্ণু অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের পূর্বাভার, সেই বিষ্ণুই কখন চৈতন্য সৃষ্টি ধারণ করিলেন, তখন আর তাহার পূর্ণ কোথা যার? তাহারা আরও বলেন যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আরম্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ ত্রিশলখা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে—

“পরিভ্রাণাং শাধুনাং বিনাশাং চ দ্রুততাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থাং সন্তানি যুগে যুগে ॥”

শাধুগণের পরিভ্রাণ, দুর্য্যোগণের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব। অতএব কলিযুগে কৃষ্ণের অবতার না হইবে কেন?

শাক্তগণ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নিরাকরণের জন্য তত্ত্বরস্বাকরের কতকগুলি বচন বলিয়া থাকেন। তাহার মর্ম এই যে—ত্রিপুরাসুর মহাদেব কর্তৃক নিহত হইয়া শিবধর্ম বিনাশ করিবার জন্য তিন পুরের স্থানে গৌরাদ্ধ, নিত্যানন্দ ও অম্বৈত এই তিনরূপে অবতীর্ণ হন। পরে নারীভাবে ভক্তনার উপদেশ দিয়া ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্কর দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাদেবের ক্রোধ আবার উদ্দীপ্ত হইল।

* বিষ্ণুর প্রকৃতি অনেক বৈকল্যেরও চৈতন্যের ঈশ্বরের এসক আছে। ইদানসংহিতার লিখিত আছে—

“পার্বতী উবাচ।

ভগবন্ সর্গধর্মজ গুণবক্তৃণ তে পুরা।

কথিতো গৌরচন্দ্রো বক্তব্য মে সংশয়ো মহান্।

কৃষ্ণভক্তো গৌরচন্দ্রো মানবেতি শ্রুতং ময়া।

চতুর্ভূজপ্রদো দেবদুর্গাসৌ পরিকীর্তিতঃ।

যদীযরো হি গৌরাদ্ধচতুর্ভূজপ্রদারকঃ।

তদা কথং স কৃতবান্ সন্ন্যাসাদিকধারণম্।

মহেশ্বর উবাচ।

শুণু চার্বাকি হুতমে বংশস্তঃ গোপিতং বচঃ।

এক এব হি গৌরাদ্ধঃ কলৌ পূর্ণকলপ্রসঃ।

যো বৈ কৃষ্ণঃ স গৌরাদ্ধস্তরো র্ত্তোহ্য ন পিণ্ডিতে।

শিখার্বঃ সাধকাস্যৈকং সাধকসঙ্গমক্।

শিখাভূজঃ শরীপুত্রঃ পূর্ণভ্রম ন সংশয়ঃ।”

ব্রহ্মজ্ঞানলীল চৈতন্যকর নামক বৈষ্ণবগ্রন্থেও লিখিত আছে—

“গৌড়ুলে বলরামদ্বঃ বঃ প্রাপ্তঃ শূণু পার্বতি।

নিত্যানন্দঃ সোহভবতি লোকানাং হিতকাম্যম্।

শরী তে দেবকী দেবী বহুদেবঃ পুরন্দরঃ।

ভরোঃ প্রীত্যেভ্য ভগবান্ চৈতন্যকরং বঃ পতঃ।

কলৌ ভয় সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজতি মে।

ভেবাক নিভৃতি নীতি কলকোটিশৈতন্যি।” [চৈতন্যচন্দ্র ২ অঃ।]

ত্রিপুরের নবী অধ্বরণে বহুস্তের বেশ ধারণ করিয়া ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিতে লাগিল। ইহারা ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে বলরাম ও তৃতীয় অংশকে মহাশয়ের বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল (১)।

ইহার কোনটাকেই বা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়? বৈষ্ণবেরা যে সকল গ্রন্থ হইতে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরের পূর্বাভারত্ব স্থাপন করিবার জন্য প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, তাহার অধিকাংশেরই প্রাচীনত্ব বিষয়ে বোর সন্দেহ। শাক্তগণের উল্লেখিত তত্ত্বরস্বাকরের বচনগুলিকেও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা হইতে পারে যে, চৈতন্যের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত দেখিলে তাহাকে অবতার বলিতে কোন বাধা নাই। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার অনেক সাদৃশ্য চৈতন্যচন্দ্রে দেখিতে পাই। ইনিও একটা ধর্ম সংস্থাপন করিয়া জগতের অনেক পাপীদিগকে ত্রাণ করিয়াছেন।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। পরিশেষে ইহার মীমাংসার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় করলিপি প্রস্তুত হইল। তাহাতে এইরূপ উত্তর পাওয়া যায়—

“চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণেন চাংশকঃ।”

অর্থাৎ চৈতন্য ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণ বা অংশাবতার নহে। শাস্তিপুরনিবাসী অম্বৈত বংশোদ্ভব শাস্ত্রবিহারদ অনেক গৌড়ামী কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত করলিপির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা ও চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করেন। তৎকৃত ব্যাখ্যা—

“চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো ন, অংশকো ন, কিন্তু পূর্ণএব।”

(২) “পদপতিক্রমণ। সএব ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাশিনা।

কবচা পররাবিষ্ট আত্মানন্দকরোত্রিধা।

শিবধর্মবিদ্যাশাল লোকাধিপাঃ যোহ-হেতবে।

হিংসার্বঃ বিবর্ত্তানাম উপপন্নমহাভয়কুনঃ।

অংশেদ্যোহন্যো গৌরাধ্যাঃ শরীপুত্রঃ কনুন সঃ।

নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাজ্ঞরাসীসহাযলঃ।

অম্বৈতাদ্যাত্ম জীয়েন ভাগ্যেব মহুজাধিপঃ।

প্রাপ্তে কলিযুগে বোরে বিজহার মহীতলে।

ভতো দুর্য্যাকো ত্রিপুরঃ শরীপুত্রিত্রিপুরাহরৈঃ।

উপগম্য লোকানাং শরীভাবমুপাশিণঃ।

বৃথলৈ বৃথলীভিত্ত সঙ্কটৈঃ পাপবোধিতঃ।

পুরিষা মহীঃ কুংরাঃ কলকোপমদীপরং।

প্রথমঃ বর্ণরামাসঃ সাক্ষাৎবিহুসদানন্দম্।

দ্বিতীয়মুজলঃ শেষঃ তৃতীয়ঃ মহেশ্বরম্।” (হরদ্বাকর)

অর্থাৎ চৈতন্য একজন ভগবতের বা ভগবানের আশাবতার নহেন। তিনি পূর্ণ। ইহাতেও বিবাদের মীমাংসা হইল না। আজ পর্যন্তও এই বিবাদের সূচক মীমাংসা হয় নাই।

চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনকৃত্যের বৈশিষ্ট্য লিখিত আছে, তাহাই এই স্থানে লিখিত হইবে।

বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যচন্দ্রের জীবনলীলাকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহা আদি-লীলা ও সন্ন্যাস-ধর্মাবলম্বনের পরবর্তী ঘটনাগুলি অন্তলীলা নামে বর্ণিত। অন্তলীলা আবার মধ্য ও শেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

পাশ্চাত্যবৈদিককুলমঞ্জরীর মতে যশোধরের সহিত সমাগত ভরদ্বাজগোত্র জিতমিত্রের বংশে জগন্নাথমিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রথীতরগোত্র নীলাধর চক্রবর্তীর কন্যা বিষ্ণুদাসের ভগিনী শচীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জগন্নাথের ঔরসে শচীর গর্ভে বিষ্ণুর ও বিষ্ণুর নামে দুইটা পুত্র হয়। কনিষ্ঠ বিষ্ণুরই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া চৈতন্য নামে বিখ্যাত হন। ইহাদের বংশ না থাকাতাই পাশ্চাত্য বৈদিককূলে সামবেদী ভরদ্বাজগোত্রের লোপ হইয়াছে (১)। অনেকেই বলেন যে পাশ্চাত্যবৈদিকেরা কোন সময়েও ত্রিহট্টে বাস করিতেন না, তাহা হইলে বৈদিক-সমাজের মধ্যে ত্রিহট্টের উল্লেখ থাকিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের পূর্বপুরুষগণকে যে ত্রিহট্টবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে অশ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।

চৈতন্যের পূর্বপুরুষেরা চক্রবর্তী বা অন্ত কোন বৈদিক সমাজে বাস করিতেন। জগন্নাথ ও তা হইতে গঙ্গাবাস নিমিত্ত নদীয়া আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ সেই স্থানকে ত্রিহট্টের অন্তর্গত মনে করিয়া চৈতন্যের পিতামহের বাসস্থান ত্রিহট্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২), কিন্তু ত্রিহট্ট-নিবাসী প্রহ্লাদমিশ্র রচিত ত্রিহট্টচৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থে ও

তাহার অনুবাদ মনঃসঙ্কোচিনী গ্রন্থে (৩) লিখিত আছে যে, ভগবান্নিত্য জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রকর নামক একজন পাশ্চাত্য-বৈদিক ত্রিহট্টে আগমন করেন। ইনি যেরূপ কিরং পরিমাণ ভূমি লাভ করেন। সেই স্থান বরগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সহধর্মিণী চারিটা পুত্র ও একটা সর্প (৪) প্রসব করেন। তাহার জন্মের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্রমিশ্র কৈলাসপর্বতের নিকটে ইন্দ্রকরীর পশ্চিম পারে অমৃত নামক গুপ্তকুণ্ডের সন্নিধানে বাস করেন। তাঁহার কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্কেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন ও ত্রিলোক নামক সাতটা পুত্র হয়। তাহার মধ্যে জগন্নাথ মিশ্র দেশে ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপন করিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার বিজ্ঞাবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বৈদিককুলসম্বৃত নীলাধর চক্রবর্তী তাঁহার কন্যা শচীর সহিত ইহার বিবাহ দেন। শচীর গর্ভে জগন্নাথের ঔরসে বিষ্ণুর জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুর বাল্য-কালে সংসারের অসারতা জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। জগন্নাথের মনে হইল যে তিনি অনেকদিন পিতামাতার চরণ দর্শন করেন নাই, তাই তাঁহার পুত্রটীর এইরূপ ঘটিয়াছে।

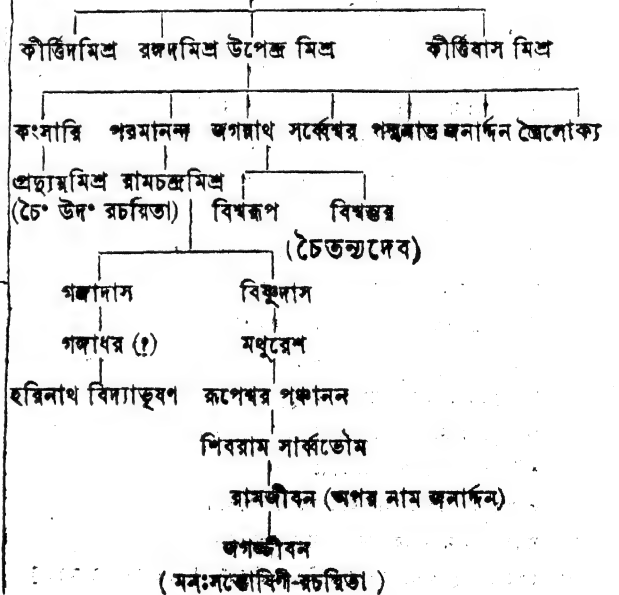
(৩) প্রহ্লাদমিশ্রের বৃন্দভাষ্যের জগজ্জীবন মিশ্র বাহালা পদ্যে চৈতন্যোদয়াবলীর অনুবাদ করেন। তাহারই নাম "মনঃসঙ্কোচিনী।" প্রহ্লাদমিশ্র চৈতন্যচন্দ্রের আদেশেই কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থরচনা করেন—

"তৈত্তরব্রাহ্মণতঃ কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলিঃ।"

প্রহ্লাদাখ্যে মিশ্রেণ কৃতে রত্নদয়াবলী।" (৩ সং ৪৯ পোঃ)

নিম্নে তাঁহাদের বংশাবলী দেওয়া হইল—

মধুকর মিশ্র (ত্রিহট্টে প্রথম)



(১) "চৈতন্যচন্দ্রগ্রন্থাৎ সামবেদীভরদ্বাজো ব্যাতি।"

(পাশ্চাত্য বৈদিক কুলমঞ্জরী)

(২) "ত্রিহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।"

বৈষ্ণব পণ্ডিত বলী সঙ্করণ প্রধাম।

সপ্তমিহ বার পুত্র সপ্ত ভবীশ্বর।

কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্কেশ্বর।

জনার্দন জগন্নাথ ত্রৈলোক্যদাম।

নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈলাস জগন্নাথ।

(চৈতন্যচন্দ্রমিত্রিত আদিলী ৪৩ পরি)

তিনি এইরূপ ভাবিয়া শতীর সহিত দেশে আগমন করেন। পরমানন্দের জী হুশীলার সহিত শতীর বিশেষ সত্য হইল। দেশে থাকিতে থাকিতেই শতীর গর্ভ হইরাছিল। শেষে জননীঃ বাক্যে জগন্নাথ শতীকে লইয়া নবদ্বীপ কিরিয়া আসেন (৬)। ইহাতে বলা বাইতে পারে যে, শ্রীহট্ট বৈদিকের সমাজ নয় বটে, কিন্তু চৈতন্যের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র কোন কারণে আসিয়া শ্রীহট্টে বাস করেন এবং তথার বৈদিকের সংখ্যা তত অধিক না থাকায় ও অন্নদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে সমাজ বলিয়া গণনা করা হয় নাই। কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলজীগ্রহে নাই বলিয়াই চৈতন্যের সমকালবর্তী গ্রন্থকারগণের কথা উড়াইয়া দিয়া চন্দ্রদ্বীপ বা অন্ত কোন স্থানে চৈতন্যের পূর্বপুরুষগণের বাসস্থান অনুমান করা বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না।

বৈষ্ণবগণের মতে সিদ্ধপদ্মের কর্ণিকারূপ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে মারীপুরে জগন্নাথবিশেষের আবাস স্থান ছিল। [নবদ্বীপ দেখ।] জগন্নাথ ও শতীর প্রথমে লন্তানভাগ্য ভাগ ছিল না। একটা করিয়া আটটা কচ্ছা জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়া গেল। দম্পতীর দুঃখের সীমা রহিল না, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ বিষ্ণুরূপ জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার পরে অনেকদিন শতী জগন্নাথের আর কোন সন্তান হয় নাই। বিষ্ণুরূপ প্রায় বোবন সীমার পদাৰ্পণ করিলে চৈতন্যের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহলদ্বীপে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের জন্মসময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। তখন নবদ্বীপবাসী বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎসাহিত। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, ঈশ্বর নামকীর্তন প্রভৃতি ধর্মকাণ্ডের অমুষ্ঠান দ্বারা নবদ্বীপ অমরাবতী হইতে সুখ ও শান্তিময় বোধ হইয়াছিল। এ সকল কার্য অন্ত কারণে হইলেও অনেকের বিশ্বাস

হইল যে একরূপ ভক্ত সময়ে বাহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন না কোন মহাপুরুষ হইবেন, কারণে এই সকল বিশ্বাসই

জাতোত্তরভাষাঃ লোকৈক্যং কবাচিৎপিত্ত্বভূতে।

তত্র যিহা স বিপ্রবিশ্বপুত্রেণ নিরাকুলঃ। ১

শোভরা ভাধারা বৃত্তোপ্যাক্ষর্যগুণবৃত্তরা।

বহুবুঃ সপ্তপুত্রাক্ত উক্ত বিপ্রত বীমতঃ। ১০

ব্রহ্মপাত্তপসপরা নারায়ণপারায়ণাঃ।

কংসদুঃ পরমানন্দো জগন্নাথততঃপেরঃ।

সর্কেবরঃ পদ্মমাতো জনার্দনব্রজলোকপঃ। ১১ (প্রথম সর্গ)

বীমতঃ বহুতঃ বীক্যা জগন্নাথঃ সপার্বদুঃ।

কাত্ত্রাদীনী শান্তাপি পাঠ্যমাস সন্ধিঃ। ১

আবেশঃ ততঃ তত্রৈব দৃষ্টঃ মিশ্রঃ প্রতাপবান্।

প্রতাপরামাস চ তং নবদ্বীপে মমোরমে। ২

মিশ্রাঃ গুণরূপানি ঈশবৈদিকসত্তমঃ।

নীলাধরো বিজয়রো প্রহুঃ তং প্রবোধো দুঃ। ৬

দৃষ্টঃ তং মরশাদ্দুলং চক্রবর্তী বধর্মরাট্।

অমৈকন্যাঃ প্রদাত্তারি হুশীলার মহাক্সনে। ৭

ইতি নিশ্চিতা মমসা গুহা স নিজ কেতনন্।

ভাধারৈঃ কথরামাস মমসা বৎকৃত্ত তং। ৮

প্রাজাপত্যবিধানেন জগন্নাথার বীমতে।

ভুক্তে দিনে প্রদত্তঃ শতীঃ স্বীয়সূতাং ধরান্। ১০

কুহা পাপিগ্রহঃ শতী নবদ্বীপে বিজোক্তমঃ।

জগন্নাথোহবসৎ প্রীতাঃ কাত্তরা শৌধার্যবৃত্তঃ। ১১

সদা তো ধর্মসম্পন্নো গোবিন্দধ্যানতৎপরো।

তপো নারায়ণকেত্রে তেপতুবাহিতম্বে। ১২

বিষ্ণুরূপঃ প্রথমজঃ শচীঃ পুত্রঃ গুণাকরঃ।

বজ্রাদুঃ সমাঙ্গাধ্য জ্ঞানঃ বৈরাগ্যমাবধৌ। ১৩

ভাসিন্ পুত্রে গতে তত্র জগন্নাথঃ গুণভিতঃ।

চিন্তামাপেতি মহতীঃ বর্তেতে শিতরৌ মম। ১৪

ভাভ্যাং বন্তেন শাপেন মাদৃশামীদৃশী পতিঃ।

অতো বাস্তামি তো প্রহুঃ ভাধারা সহিতধ্বরঃ। ১৫

এতন্মিন্নেব সময়ে ঈশ্বরপুত্রোবিস্রাট্।

পত্রঃ প্রতাপরামাস পুত্রাগমনকারণাৎ। ১৬

পত্রঃ প্রাণা জগন্নাথঃ ভাধারা সহিতোলদুঃ।

বদেনমগনমিধান্ পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্জয়ন্। ১৭

অখাপতা জগন্নাথঃ পিত্তসেবাপারায়ণঃ।

তসা পত্নী শতীসাপি বজ্রসেবগতৎপর। ১৮

আসীৎ বজ্রসমীপে চ ধম্যা মায়া চ বোহিতাং।

পরমানন্দপত্নীচ হুশীলাখ্যাতি হরিভা।

ঈশচীঃ মাতরং নিভাঃ পুত্রিকাবদপালয়ৎ। ২০

গতে কিরতি কালোচ ঈশচী সর্কেদেবজঃ।

বহুরাতা বভূবাজ হুশীলী পূর্কতোহবিধাঃ। ২১

ভদ্রিনীধৌ ভপবান্ বাচমাহাশরীরিণীঃ।

(৩) "আসীৎ ঈহটমবাহো মিশ্রোমধুকর্যভিধঃ।

পান্ভাত্যবৈদিকশৈব ভপবী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩

ধরেনাষ্টেব তেনেহ কিরতুঃ মিঃ করোৎকরা।

বরগজেন্দিবো দেশঃ হুজলৈঃ পরিত্যজতে। ৪

চব্বারভক্ত পুত্রোক্ত সর্পৈকণ্ড পকটৈব।

বহুবুঃ গুণসঃ বৃত্তাঃ হুজাঙ্গাঃ প্রতাপিনঃ। ৫

উক্ত মধ্যাহ্নকপুত্রো হিহা দেশত পৈতৃকং।

ঈশ্বরপুত্রোবিস্রাথাঃ প্রধানঃ হামদাদবৎ। ৬

কৈলাসসরিধানেন্তু গুণবৃদ্ধাধনঃ বহৎ।

ইহু নারী তত পূর্কো কালিন্দী সত্বী বদী। ৭

বৃদ্ধগোপেবরভক্ত দক্ষিণতাং দিশি দিতঃ।

কৈলাসভোজরে বৃত্তং গুণং পরমশোভনন্। ৮

চৈতন্যের জন্মের প্রতিপাদনের অন্ততম কারণ হইয়া দাঁড়াইল। চৈতন্যদেব ১৩ মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলে (৪) শচী ও জগন্নাথের আনন্দের সীমা থাকিল না। সকলেই নব বালকটাকে দেখিতে আসিলেন এবং বালকের রূপ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহার রূপ ও জন্ম সময় ভাবিয়া আন্তিক বৈষ্ণবগণ তাহাকে জৈশ্বর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং দিন দিনই তাঁহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধিমূল হইতে লাগিল। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে ডাকিনী ও শাকিনীরা বালকের অনিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু নিমাই নাম রাখিলে আর তাহারা অনিষ্ট করিতে পারে না। তাই বিজ্ঞভক্ত অষ্টমতের সহধর্মিণী “নিমাই” নাম রাখিয়াছিলেন (৫)। কিন্তু চূড়ামণিদাসের মতে শচী ১৩ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে নাই। দশমাস পূর্ণ হইলেই চৈতন্যের জন্ম হয়। জ্যোতিষাচার্য বিশ্বরূপই নবশিশুর নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন (৬)। নীলাদ্রের চক্রবর্তী দৌহিত্রের কোষ্ঠী

শুশু শোভে সুধারাজ্যে প্রারুণ্যমি চারবে।
অন্তঃ পুংঃ সুবাক্যে নবদীপে মনোহরে। ২৩
শীতঃ প্রহ্লাদপদ্মস্বঃ তবাপ্রমো ভবিষ্যতি।
অন্যথা চরণান্তরে ভবিষ্যতি বিপত্তয়ঃ। ২৪
ইতি শ্রুত্ব তু না ভীতা প্রাতঃগতা নিজঃ পতিং।
ব্রহ্মান্তঃ বেদমাস রজনীজঃ মহাকৃতঃ। ২৫
পিতৃভ্যস্ত সমাদিতৌ জগন্নাথায় তুসুরঃ।
প্রয়াগঃ কর্তৃমুখুজে ভাষ্যায় সান্ন্যাস্তরা। ২৬”

(চৈতন্যোদয়বলী দ্বিতীয় সর্গ।)

(৪) “চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাস আসে।
জগন্নাথ শচীর দেখে ক্রকের প্রবেশে।
চৌদ্দশত সাত শকে মাস কাণ্ডল।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভলগ্ন।
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উজ্জ গ্রহণ।
বড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব শুভলগ্ন।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলক চাঁদে আর কিবা প্রয়োজন।
এত জামি চন্দ্রে রাহ করিয়া গ্রহণ।
কুক কুক হরিনামে ভাসে জিজ্ঞাসন।”

(কুকদাস চৈতন্যচরিত্র আদি ১৪ পঃ)

(৫) “ডাকিনী শাকিনী হ’তে, শকা উপলিল চিতে,
করে নাম থুইল নিমাই।”

(কুকদাস চৈতন্য চরিত্র আদি ১৪ পঃ)

(৬) “ভাবিতে চিত্তিতে তার পৌষ মাস গেল।

দশমাস পূর্ণ গর্ভ শচীত বরিল।”

“কতকনে সন্নিতে সে ভাতুয়ুগ বাই।

শুন মাতা পিতা ইহার নাম নিমাই।” (চূড়ামণিদাস)

গণনা করেন, তাহাতেও শারীরিক লক্ষণে ইহাকে মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করা হইরাছিল। কুকদাস কবিরাজ চৈতন্যের জন্মকাল বৈষ্ণব লিখিয়াছেন তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইরাছে। চূড়ামণিদাস নিজস্ব চৈতন্যচরিত্রে একখানি অদ্ভুত কোষ্ঠীর অবতারণা করেন। রাহারা একটুও গণিতশাস্ত্র দেখিয়াছেন তাহারাই সেই কোষ্ঠীর উপাদেশতা গ্রহণ করিতে পারিবেন (৭)। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বৈষ্ণব কবির বিশ্বাস যে চৈতন্যে কিছুই অসম্ভব হইবার নহে। তাই এইরূপ কোষ্ঠীর অবতারণা করিতে সীহসী হইরাছেন। বালকের জন্মগ্রহণের পর জগন্নাথের ঘরে মহোৎসব আরম্ভ হইল। বহু বাক্যব আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা উপহার লইয়া বালকটাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। মিশ্র পুরন্দরও যথাসাধ্য দান ধ্যান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। জনক জননীর হৃদয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি অতিশয় গৌর হইরাছিল বলিয়া মহিলাগণ শিশুটিকে গৌরাজ ও কখন গৌরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কালে এই গুলিও চৈতন্যের নামান্তর মধ্যে গণ্য হইল।

চৈতন্যের বাল্যকালে যে কোন মহৎসূচক বা জৈশ্বর্য-স্বাক্ষর কোন ঘটনা ঘটয়াছিল তাহা বোধ হয় না, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বালক কালেই চৈতন্যকে জৈশ্বর জ্ঞানে নানা-বিধ অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একদিন গৃহলেপনের পর শচী ও জগন্নাথ গৃহ মধ্যে ছোট ছোট পদ চিহ্ন দেখিতে পান এবং তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ,

(৭) “অতিশুভ বৃহস্পতি ত্রিবি পৌর্ণমাসী।

বিংশতি দিবসে মহাবোধ ভেল আসি।

চতুঃসাগর কোষ্ঠী উভচরি যোগ।

নিম্ন নিম্ন গৃহে সর্ব গ্রহ করে ভোগ।

মেঘে ভাহু গ্রহরাজ লগ্ন অংশে বসে।

অন্তর্ভূত পুণ্যনিধি জ্ঞান অংশে বুধে।

সকলোত্ত ভূমিস্ত অষ্ট অংশে বসে।

কর্তৃটেত দেব শুক বশে পক অংশে।

করায়িত বুধ বসে পঞ্চম অংশে।

তুলাচত লমি বসে একবিংশতি অংশে।

সিংহেত সুতুঙ্গ রাহ নব অংশে বসে।

কুন্ডে কেতু কুক হেতু বসে পক অংশে।

এ সব সুতুঙ্গে বসি নব গ্রহগণে।

বিষাতি বিপক সব রাশে রাতি দিমে।

এত দেখি সবলোক বলে হরি হরি।

আবদ আল্লাদে গৌরচন্দ্র অবতরী।” (চূড়ামণি)

চক্র ও মীন চিহ্ন দেখিয়া বিশ্বরসাগরে নিমগ্ন হন। মিশ্র একজন বিখ্যাতী ভক্ত ছিলেন। তিনি অল্পমান করিলেন যে, মরে বালগোপাল সেববিগ্রহ রহিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার পদচিহ্ন। এই সময়ে শচীদেবী বালককে তনপান করাইতে ছিলেন, তিনি পুত্রের পদতলে হঠাৎ ঐ সকল চিহ্ন দেখিতে পাইয়া অবাক হইলেন এবং জগন্নাথকে ডাকিয়া দেখাইলেন। ইহা ছাড়া বংশীবাদন ও মাতাপিতাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিপ্রদর্শন প্রভৃতি আরও কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা আছে।*

শুভদিন দেখিয়া বালকের নাম বিশ্বম্ভর রাখা হইল। চূড়ামণিদাস বলেন যে, চৈতন্তের জন্মনক্ষত্র রোহিণী ও জন্মরাশি বুধ এই কারণে গণক রাশি অল্পসারে ইহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিল (১)। কিন্তু একথা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক, চৈতন্ত রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে সেইদিন কখনই চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারিত না।

বালকের জন্ম হইতেই জগন্নাথের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। তিনি ১৪০৮ শকে শ্রাবণমাসে হস্তানক্ষত্রে ও বৃহস্পতি বারে বেশ ধুম ধাম করিয়া চৈতন্তের অন্নপ্রাশন করাইলেন। ইহাতে নবদ্বীপবাসী সকলেই উৎসাহিত হইল (২)।

নিমাই বালককালে অপেক্ষাকৃত চালাক ও ক্রোধপরতন্ত্র ছিলেন, যখন যাহা বলিতেন তাহা করিতে না পারিলে আর রক্ষা ছিলনা, কাঁদিয়া আকুল হইতেন; বাড়ীর সকলকেই উৎপাত করিয়া তুলিতেন, কিন্তু ইহাতেও তাহার একটুকু অলোকিততা ছিল যে, যদি কেহ মধুরস্বরে হরিনাম করিত, তবে আর কাঁদিতেন পারিতেন না। হরিনাম শুনিবামাত্র কচি কচি হাত পা গুলি সঞ্চালন করিয়া যেন হৃদয়ের উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে দিন গত হইতে লাগিল, চন্দ্র-কলার স্তায় গৌরচন্দ্রও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া পিতামাতা ও ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ১৪০৯ শকের ৫ই বৈশাখ নিমাইয়ের চূড়াকরণ হইল (৩)। নিমাই বালককালে বড়ই চপল ছিলেন। একদিন শচীদেবী তাঁহাকে খই ও

সন্দেশ খাইতে দিয়া গৃহকাণ্ডে গেলেন। কিন্তু বালক খাঁড় দ্রব্য ফেলিয়া মাটি খাইতে লাগিল। শচী তাহা দেখিতে পাইয়া মাটি কাড়িয়া লইলেন ও মাটি খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক নিমাই তাহার উত্তরে দার্শনিক কথা বলিয়া মাতাকে অবাক করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর কহিলেন, ‘মা বিবেচনা করিয়া দেখ সকলেই মাটির বিকার। খই, সন্দেশ প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য সকলেই মাটি হইতে উৎপন্ন। তবে মাটি খাইতেছি বলিয়া দুঃখিত হইতেছ কেন?’ শচী ঠাকুরাণীও বড় কম ছিলেন না। তিনিও তর্কে বালককে পরাজয় করিলেন। আর একদিন একজন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনি বালগোপাল মন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেন; পাক সমাপ্ত করিয়া বাই নিজ ঈষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন, অমনি হৃদ্যন্ত নিমাই কোথা হইতে আসিয়া স্তূপীকৃত অন্নের একগ্রাস খাইয়া ফেলিল। জগন্নাথ ও শচী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হায় হায় করিয়া দোড়িয়া আসিলেন এবং অনেক অন্নর বিনয়ের পর ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার পাক করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে নিমাইকে বাড়ী হইতে বিদায় দেওয়া হইল। সেবারেও নাকি অন্ন প্রস্তুত হইলে নিমাই আসিয়া একগ্রাস অগ্রভাগ লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনবারের বার গৌরান্ন প্রভু যোগনিদ্রায় পিতামাতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপালবেশে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া উদ্ধার করেন।

কোন দিন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বালক বিশ্বম্ভর গঙ্গাतीরে বেড়াইতে যান। ছইজন প্রসিদ্ধ চোর অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে মিঠাই ও সন্দেশ এবং বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যায়। পরে উভয়ে বিষ্ণু-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য স্থানের পথ ভুলিয়া যায়, শেষে ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নিমাইয়ের কোন অনিষ্ট ঘটিল না, সকলে জানিয়া শুনিয়া অবাক হইল। গোড়া ভক্তগণ কংসপ্রেরিত অশুরের স্তায় ঐ ছইজন চোরকে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

জগদীশ ভাগবত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সহিত মিশ্র জগন্নাথের বেশ সদ্ভাব ছিল। উভয়ে একাদশীর দিনে নানা প্রকার উপদেশ সামগ্রী আনিয়া কৃষ্ণপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। নিমাইয়ের খাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি ব্যাধির ছলনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিয়া বসিলেন যে, ঐ সব নৈবেদ্য খাইতে না দিলে তাহার পীড়া ভাল হইবে না। নিমাইয়ের রোদনে বাটার সকলে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে ঐ কথা প্রতিবেশী-

- (১) “গণকে কহিল রাশি ষোণিনীতে বুধ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার পরম সদৃশ।” (চূড়ামণি—চৈতন্যচরিত)
- (২) “এত শুনি মিশ্রবর আনন্দে পূরিত।
গণক আনিয়া দিল করিরে বরিত।
সিত পক্বী হস্তা নক্ষত্র গুরুবায়ে।
অন্নপ্রাশন করাইবেত পুত্রেরে।” (চূড়ামণিদাস চৈতন্যচরিত)
- (৩) “বৈশাখের পাঁচ দিবে এ চূড়াকরণ।
কালুণের সাথো জন্মতিথির পূজন।” (চূড়ামণি চৈতন্যচরিত)

হরকে জানাইতে হইল। সরল মতি বৈষ্ণবের অগত্যা দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবেদ্য দিয়া শান্ত করিলেন।

ক্রমেই বালক নিমাই অতি ছুট স্বভাব ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন; পাড়ার বালকগণের অগ্রণী হইয়া একটা দল বাবিলেন এবং নামাবিধ কোশলে দৌরাঙ্গ্য করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবনে যে শক্তি তাঁহার প্রধান মহায় হইয়াছিল, সেই মোহিনী শক্তি চৈতন্তের বাল্যকালেই বিকশিত হইল। দলের সকল বালকই তদগত প্রাণ হইয়া ছিল, কিছুকালের জন্ত চৈতন্তের বিচ্ছেদে তাহাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিত। নিমাই ঐ দল লইয়া পাড়াপড়শীর ঘরে চুরী করিতেন, দলের কোন বালক তাহার মতে অবাধ্য হইলে তাহাকে শাস্তি দিতেও ক্রটি করিতেন না। কখন কখন ভাগীরথীতীরস্থ বালুকাময় স্থানে প্রচণ্ড রোজতাপে দাঁড়াইয়া মার্ভওখেলা খেলিতেন এবং কখনও কখন দলে দলে জলে পড়িয়া স্নাতার কাটিতেন। ইহাদের জলক্রীড়ায় অপর লোকের নান আশ্রিকে বিশেষ বাধা পড়িত। শচী-জগন্নাথ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনিতে পাইতেন।

একদিন শচীমাতা পুত্রকে ডাকিয়া তাড়না ও তিরস্কার করেন। নিমাইয়ের রাগ হইল, তিনি ঘরে যাইয়া হাঁড়ি কুড়ি যাহা কিছুই পাইলেন, সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন, কোম একদিন নিমাই শচীমাতাকে প্রহার করেন। শচী ছল করিয়া মুচ্ছিত হইলে অপর মহিলাগণ নিমাইকে বলিল তুমি যদি দুইটা নারিকেল আনিয়া দিতে পার, তবে তোমার মাতা সুস্থ হইবেন। নিমাই আর ওজর করিলেন না। তথা হইতে বাহির হইয়াই দুইটা নারিকেল আনিয়া দিলেন। দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের সাজী ও নৈবেদ্য লইয়া গঙ্গার ঘাটে পূজায় বসিত, দুর্দান্ত নিমাই সময় সুকিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতেন, “ওহে তোমরা আমার পূজা কর, আমি তোমাদের উত্তম বর দিব, তোমরা জাননা যে গঙ্গা দুর্গা ও মহাদেব সকলেই আমার আজ্ঞাকারী।” এইরূপ বলিয়া চন্দন, ফুলের মালা ও চাল কলা কাড়িয়া লইতেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ কিছু বলিলে বিধ্বস্তর মধুর হাসি হাসিয়া বলিতেন, “আমি তোমাদিগকে বর দিতেছি যে তোমাদের পরম সুন্দর, যুবা, রসিক ও ধন-বান্ধবী হইবে।” চাল কলা লইতে কোন বালিকা বাধা জন্মাইলে বিধ্বস্তের ক্রোধের সীমা থাকিত না, তিনি রাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন যে, “তোমার বুড়ার হাতে পড়িতে হইবে, তাহার উপর আবার সাতটা সতীন্দ্র হইবে।” নিমাইয়ের

কথাবার্তার সকল বালিকাই চমৎকৃত হইত। “নিমাই কাহা বলে তাহা সত্য, এ বোধ হয় ঈশ্বরের অবতার না হইলে এরূপ কথা বলিতে সাহস পাইত না।” এই ভাবিয়া কতাপন বিধ্বস্তরকে সন্তর্ভব করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠান করিত না। নিমাই এইরূপ সুযোগে চাল কলা খাইয়া আমোদ করিতেন। এই সময়ে একদিন নবদ্বীপের বলভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবপুত্রের জন্ত চন্দন মালা ও নৈবেদ্য লইয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিলেন। বিধ্বস্তর তাঁহাকে দেখিয়া তাহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, “দেখ সুন্দরি! তুমি আমাকে পূজা কর, আমি তোমাকে অতীষ্ট বর দিব।” চৈতন্তের মূর্তি ও মধুমাখা কথার লক্ষ্মী আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না; তিনি মালা ও চন্দন দিয়া গৌরাদেবের অর্চনা করিলেন। এই সময়ে উভয়ের মনে সাহসিক প্রীতির উদয় হয়।

বিধ্বস্তরের অশেষ দৌরাঙ্গ্যের কথা শুনিতে শুনিতে পিতা মাতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন শচীদেবী নিমাইকে ধরিবেন বলিয়া যাইতেছিলেন, নিমাই লাফাইয়া একটা উচ্ছিন্ন হাঁড়ির উপরে বসিলেন। শচী বলিলেন যে নিমাই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, গঙ্গান্নান না করিলে গৃহে যাইতে পাইবে না। নিমাই কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “কেন মা, ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানই অশুভ হইতে পারে না। ব্রহ্মের বর্তমানতায় সকল স্থানই মহাতীর্থময়।” পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিতে পাইয়া সকলেই আশ্চর্য্য-ঘিত হইলেন এবং বহু যত্নে শান্ত করিয়া তাহাকে গৃহে আনিলেন।

কিছুদিন পরে জগন্নাথমিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দেন, বিধ্বস্তর নিজ প্রতিভাবলে অল্পদিন মধ্যেই পাঠশালার লেখা পড়া শেষ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপমণ্ডলীর বালকদের মধ্যে নিমাইয়ের তুল্য আর কেহই থাকিল না। এরূপ হইলেও তাহার দৌরাঙ্গ্যের কিছুই উপশম হইল না। বৈষ্ণব কবিগণ ইহার সহিত আর দুই একটা অলৌকিক গল্প যোগ করিয়া ত্রিচৈতন্তের বাল্যলীলা সমাপন করিয়াছেন।

গৌরাদেব বড় ভাই বিধ্বস্তর চকুস্পীঠিতে সংকৃত পড়িয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়রাজ্যে বৈষ্ণোগ্যের বিলাসভবন হইয়াছিল, তিনি সংসারের দিকে বড় একটা মনোযোগ করিতেন না, প্রায় সকল সময়ই সাধুগণের সহিত ধর্ম্মালাপে ব্যাপ্ত থাকিতেন। তাঁহার

এইরূপ বৈরাগ্যে জনকজননীর মনে বড়ই আঘাত লাগিত। তাই তাঁহারা নিমাইয়ের বিদ্वाশিকার বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। জগন্নাথের বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্वा শিখিলে প্রাণাধিক নিমাইও বিশ্বরূপের অঙ্কুরণ করিবে। এদিকে গোরাঙ্গের বালা-চাকলা ও দৌরাখ্য হাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধবরসের সন্তান বলিয়া পিতামাতা বড় একটা শাসন করিতেন না। নিমাইও তাঁহাদিগকে বিশেষ ভয় করিতেন না। কিন্তু অগ্রজ বিশ্বরূপকে বড় ভয় করিতেন, তাঁহাকে দেখিলেই শাস্ত হইয়া বসিতেন—

“পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।

বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখিলে নম্র হয় ॥” (চৈ° ভা° ১।৬ অঃ) গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া নিমাই বড়ই দৌরাখ্য করিতেন। তাঁহার দৌরাখ্যে প্রতিবেশীগণ বিরক্ত হইয়া শচী বা জগন্নাথের নিকটে জানাইত, তাঁহারা মিষ্টবাক্যে সাহসনা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিতেন, কিন্তু পুনঃপুনঃ নিমাইকে বেষী শাসন করিতে পারিতেন না। ইহার কিছুদিন পরে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন।

চুড়ামণিদাস চৈতন্যের বিদ্वाভ্যাসের পূর্বে একটা নূতন ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি সত্য হইলে এই হইতেই চৈতন্যের ভাবি-জীবনের স্বত্রপাত ও বিকাশ স্বীকার করিতে হইবে। ঘটনাটি এই—

পুত্র নিমাইয়ের দৌরাখ্যের কথা প্রতিবেশীর মুখে শুনিতে শুনিতে শচীর মনে অতিশয় খেদ হইল। তিনি জগন্নাথের নিকটে যাইয়া নিমাইকে অধ্যয়ন করাইবার জন্ত অঙ্কুরোধ করেন। মিশ্র মহাশয় শচীর কথা কাটিয়া বলেন যে, নিমাইয়ের লেখা পড়ার দরকার নাই, আমার যে ধন আছে, তাহাতেই একরূপ খাইয়া পরিয়া কাটাতে পারিবে। বিশ্বস্তর পিতার কথা শুনিয়া বড়ই হুঃখিত হইলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে লেখাপড়া শিখিয়া জগন্নাথের কোন না কোন উপকার করিতে পারিবেন। যখন দেখিলেন যে তাঁহার সে আশা ফুরায়, পিতা তাহাকে বিদ্वाভ্যাস করিতে দিবে না, তখন তাঁহার আর হুঃখের সীমা থাকিল না। তিনি অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ‘ধর্মশাস্ত্রের মতে বাহার অস্থি গঙ্গায় পড়ে, তাহারই মুক্তি হইয়া থাকে, অতএব আমি যতদূর পারি মৃত প্রাণীর অস্থি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিব। অতএব ইহাতেও জগন্নাথের অনেকটা উপকার সাধন হইতে পারিবে।’ বিশ্বস্তর বালাকাল হইতেই মৃৎপ্রতিজ্ঞা ছিলেন, যখন বাহ্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা সাধনের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ক্রটি

করিতেন না। তিনি বালাকালকে লইয়া গঙ্গার তীরবর্তী বিশাল ময়দান হইতে বোকা বোকা হাড় আনিয়া জলে ফেলিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল অস্থিময় হইয়া উঠিল, অনেকেরই মানাফিকে বাধা পড়িল। সকলে নিমাইকে বারণ করিলেন, কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিজ্ঞা অটল, তিনি কিছুতেই বিমত হইলেন না। পরে এই সংবাদ মিশ্রের নিকটে পৌছিল। মিশ্র ক্রোধভরে গঙ্গাতীরে আসিয়া নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইলেন। পরিশেষে অনেক ভৎসনা ও ভয় দেখাইলে বিশ্বস্তর কাদিতে কাদিতে সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করেন। বালাক নিমাইয়ের এতদূর গুরুতর উদ্বেগ শুনিতে পাইয়া সকলেই যারপর নাই সুখী হইলেন। মিশ্র মহাশয়ও পূর্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া নিমাইকে টোলে পাঠাইলেন।

(চুড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত নবদ্বীপের প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন। তাহার চতুর্পাঠ্যে দেশীয় অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র অধ্যয়ন করিত। নিমাই অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রতিভা দেখিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আনন্দের সীমা রহিল না। নিমাই কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। টাকা, পঞ্জী প্রভৃতিও বিশেষ আদর করিয়া অভ্যাস করিতেন (১)। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও শ্রমশক্তি এত সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, যাহা একবার পড়িতেন বা যাহার ব্যাখ্যা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিতেন না। তাঁহার গুণ ও অসাধারণ শক্তির কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইল, তাঁহার মাতাপিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিছুদিন এই ভাবে চলিল, ক্রমে চৈতন্যের উপনয়নের বয়স দেখিয়া মিশ্র মহাশয় মহাধুমধামে বিশ্বস্তরের উপনয়ন দিলেন। বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন নিমাইয়ের উপনয়ন হইয়াছিল। পণ্ডিত গঙ্গাদাস নিমাইয়ের সাবিত্রীদীক্ষার আচার্য্য (২)।

কিছুদিন সুখে কাটিয়া গেল। এই সময়ে মিশ্র মহাশয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বালাকাল হইতেই বিশ্বরূপের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল,

(১) “গঙ্গাদাস পণ্ডিত হুগলে পড়েন ব্যাকরণ।

প্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল বৃত্তিহুগরণ।

অন্যকালে হৈলা পঞ্জী টীকাতে প্রবণ।

চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।”

(বৃক্কবাস চৈতন্য আবির্ভাব ১৫ অঃ)

(২) “পিতার বলিয়া মিশ্র পঙ্গাদাসে কর।

দিন করি বিশ্বস্তরে দেহ উপনয়ন।

ভাল যে বৃত্তি দিল করে গঙ্গাদাস।

অক্ষয়তৃতীয়া তিথি বৈশাখ মাস।” (চুড়ামণিদাস)

বৌদনপ্রারম্ভে তাহার পূর্ণবিকাশ হইল। তিনি বিদ্যাহের প্রস্তাব শুনিয়া পিতামাতাকে জন্মের মত শোকসাগরে ডাসাইরা সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। এই নিদারুণ ঘটনার পিতামাতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বস্তরও আত্মবিরহে অনেক ক্রন্দন করেন। অবশেষে তিনি জনকজননীকে নামাবিধ উপদেশ দিয়া শাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে চৈতন্য পিতামাতাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে তিনিও যে বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। নিমাই উপদেশচ্ছলে বলিয়া ছিলেন যে—

“ভাল হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।

পিতৃকুল মাতৃকুল ছই উদ্ধারিল।

আমিত করিব তোমা ছহার সেচন ॥”

(চৈতন্য চরিত্র আদি ১৫ পরি)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী-রচয়িতা প্রহ্লাদমিশ্রের মতে নিমাইয়ের জন্মের পূর্বেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎপরে মিশ্রপুরন্দর পিতামাতার চরণ দেখিতে শ্রীহট্টে যান, তৎপরে নিমাইয়ের জন্ম (৩)। কিন্তু বৈষ্ণবকবি বৃন্দাবন প্রভৃতি সকলেই চৈতন্যের বাল্যজীবনের পর বিশ্বরূপের সন্ন্যাস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) “অম্বারুণি সমাসাধ্য জ্ঞানং বৈরাগ্যমাবধৌ। ১৩

তস্মিন পুণ্ড্রে গতে তত্র জগন্নাথঃ স্থপতিতঃ।

চিন্তামাপেতি মহতীং বর্জতে পিতরৌ মম। ১৪

ভাভ্যাহন্তেন শাপেন মাদৃশাসীদুদ্বীগতিঃ।

অতো বাস্তমি ভৌ ক্রষ্টুং ভাধ্যায়া সহিত স্বরাং। ১৫

অশেষমগমমিচ্ছাম্ পিত্রোঃ প্রীতিবিসর্জনম্। ১৬

“পিতরাবভিষল্যাত্ত্ব জ্যেষ্ঠঃ জ্যেষ্ঠপ্রিয়ং ভবা।

লোকিকং কারয়ামাস বিহিতং বস্ত্রং বংহিতম্। ২৭

প্রয়াগসমুদ্রে শোভা শচীং সম্বোধ্য সাত্রবীং।

অন্দরীং সদগুণভূতাং অশ্রুদ্রাজ্যামুকারণীম্। ২৮

শুণু চাক্ষুর্দ্বিতে গর্ভে পুরুষো যো ভবিষ্যতি।

এতৎপরেষ্ট.....ভঃ দিব্যকামরি বর্জতে। ২৯

ইতি স্বীকৃত্য শচ্যা সহিতোবিজসন্তমঃ।

মিলনবরো জগন্নাথো লবণীপদগাং পুংসঃ। ৩০

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়ঃ দ্বিতীয় সর্গঃ)

পূর্ণ গর্ভে কু সন্ততে শ্রীচৈতন্যো হরিঃ স্বরং।

ভারগীরাত্ম জগতঃ করুণাসাগরঃ কলৌ। ১

শৈলখোদবিভূষানে শাকে ত্রৈলোক্যকেতনঃ।

কলগুণাঃ পৌর্ণমাস্যন্ত দিলীপে দ্বৈতভাবিতঃ। ২

ঐশচায়া দেবরূপিণ্যামাবিরাসীং ভূমজলে।

অগ্রে সংকীর্ণনবুতে লোকে হর্ষসমাকুলে ॥” ৩ (তৃতীয় সর্গ)

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে বিশ্বরূপের বালচাপলা একে-বারেই তিরোহিত হইল। নিমাই প্রাণপণে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অগরাধমিশ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, অধ্যয়নই সর্বনাশের মূল, অধ্যয়ন করিয়া বিভ্রান্ত না করিলে বিশ্বরূপ কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। তিনি শচীকে ডাকিয়া বলিলেন—

“এও যদি সর্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্।

ছাড়িয়া সংসার স্থখ করিবে পরান ॥

অতএব ইহার পড়ার কার্য্য নাই।

মুখ হয়ে ঘরে মোর রহক নিমাই ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ৬ অঃ)

শচীদেবী জগন্নাথ অপেক্ষা অনেক স্থিরপ্রকৃতি ও বিভ্রান্ত্যাসের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া উত্তর করিলেন—

“শচী বলে মুখ হয়ে জীবক কেমনে।

মুখেরে কষ্ট নাহি দিবে কোন জনে ॥” (চৈঃ ভাঃ ১৬ অঃ)

অবশেষে অগরাধের মতই প্রবল হইল। সেই দিন হইতেই নিমাইকে পাঠবদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। গৌরচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছার পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পাঠবদ্ধ করায় হিতে বিপরীত হইল। নিকৃষ্টা হইয়া বসিয়া থাকার নিমাইয়ের স্বক্ষে ছুট সরস্বতী চাপিল। তাঁহার দৌরাণ্ডো প্রতিবেশী সকলেই জগন্নাথকে গাল দিতে লাগিল এবং গৌরচন্দ্রকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য অনেক অমুরোধ করিল। অবশেষে জগন্নাথ নিমাইকে অধ্যয়ন করিতে অহুমতি করেন। এবারে বিশ্বস্তরের অধ্যয়ন আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বালকেরা কেহই তাঁহার সহিত ফাঁকিতে আটরা উঠিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্র “সর্দার প’ড়ো” হইয়া উঠিলেন, এই টোলে তাঁহার ভাবী ধর্ম-বন্ধুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ সঙ্গর প্রভৃতির সহিত নিমাইয়ের সৌহৃদ্য হয়। গঙ্গার ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরচন্দ্রের সহিত কেহই বিচারে আটরা উঠিত না। তিনি একটা ফাঁকির বিবিধরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রতিবাদীদিগকে পরাজয় করিতেন। তখনও গৌর তত গভীর-ভাব অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তিনি বিচারে পরাজিত বালকগণের সহিত নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কলহ করিতেন। সময়ে সময়ে তাহাদের গায়ে বালি জল ও কাঁদা দিয়া নির্ধাতন করিতেও ছাড়িতেন না। কিন্তু এ সময়ে গৌরচাঁদ দিবরাত্রি পড়িতেন। স্নানান্তে গৃহে আসিয়া বিষ্ণুপূজা ও আহারাদি করিতেন। পরে নির্জনে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন

এবং অবকাশ যত হইতে পুস্তক লিখিতেন। পুস্তকের উপরে টিগনী দেওয়াও তাঁহার অভ্যাস ছিল। জগন্নাথ পুস্তকের বিস্তো-পার্জনে গাঢ় নিপুণতা দেখিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর হইতেই বিশ্বস্তর সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তে একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। একদিন তিনি স্বপ্নে নিমাইয়ের অদ্বুত সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রসিদ্ধ নৈরায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সহিত নিমাইয়ের একটা বিচার হয়, এই বিচারে রঘুনাথকেও নিমাইয়ের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই হইতে নবদ্বীপে নিমাইয়ের নাম পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে স্ত্রীধামিনী ভোর হইল। জগন্নাথ পুত্র নিমাই ও পত্নীকে অকুল শোকসাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নিমাইয়ের বিবাহ দিয়া পুত্র-বধু ঘরে আনা আর জগন্নাথের অদৃষ্টে ঘটনা উঠিল না। এই সময়ে পিতৃবিয়োগে বিশ্বস্তরের হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগিল। প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব আসিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন। বিশ্বস্তর শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনর্বার গৃহস্থালী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন বেশ চলিয়া গেল। দিন দিন বিশ্বস্তর ও শচীর অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্রের স্থায়ী ভূসম্পত্তি কিছুই ছিলনা, একমাত্র স্বাক্ষরাদি ক্রিয়া দ্বারাই বাহা কিছু উপার্জন করিতেন। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরিবারবর্গের যে অর্থ কষ্ট হইবে তাহা অসম্ভব নহে। নিমাই কিন্তু ইহা বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। যখন বাহা আবশ্যক, তখন তাহা না পাইলে রক্ষা থাকিত না।

একদিন বিশ্বস্তর গঙ্গান্নানে যাইবেন বলিয়া মাতার নিকটে মালা ও চন্দনাদি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শচী তদুত্তরে তাহা দিতে পারিলেন না, বলিলেন যে কিছুকাল অপেক্ষা কর, আনিয়া দিতেছি। ইহা শুনিয়া বিশ্বস্তর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। শচীকে তিরস্কার করিতে করিতে একটা লম্ভদ্রুহস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং গঙ্গাজল রাখার ঘর্ড কলনী ছিল তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেন। তাহা ছাড়া চাউল, ডাল প্রভৃতি গৃহের প্রায় সকল সামগ্রীই নষ্ট করিলেন। শচী ভাব গতিক দেখিয়া মালা আনিয়া দেন, তবে নিমাইয়ের শাস্তি হয়। নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলে শচী মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

“এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা ॥

ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।

অপচয় তোমার লে কি দায় আমার ॥

পড়িবারে তুমি এবে এখনি বাইবা।

ঘরেতে সখল নাই কালি কি খাইবা ॥”

জননীর মিষ্ট ভৎসনা শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ লজ্জিত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সংসারে অর্থ কষ্ট উপস্থিত। অন্নদিন হইল পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাতে আবার অর্থের অভাব; ইহাতেও নিমাইকে বিচলিত করিতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দৈর্ঘ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি জননীকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে টাকা কড়ির জন্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না। যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, যাহার রূপায় সকলে জীবন ধারণ করিতেছে, সেই ভগবান্ কোন মতে চালাইয়া দিবেন। জননীকে যাহাই বলুন না কেন, এই সময়ে গৌরাঙ্গ-চন্দ্রকে আর্থিক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রস্তাবে নিমাইয়ের অলৌকিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, নিমাই গঙ্গাতীরে যাইয়া অলৌকিক শক্তিবলে কতকগুলি সুবর্ণ আনিয়া জননীর হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গৌরচন্দ্র শাস্ত্রীর চর্চ্চায় বড়ই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, দিন রাত্রি প্রায় সকল সময়ই শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। ঘাটে, পথে, প্রান্তরে যেখানে বাহার সহিত দেখা হইত, সকলের সহিতই শাস্ত্রালাপ করিতেন। নিমাই বিদ্বান্ হইয়াও দম্ভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, শাস্ত্রালাপে হীনগন্ধের প্রতি বিশেষ অভ্যাস করিতেন। বৈষ্ণবগণের প্রতিই তাঁহার অধিক আকোশ ছিল। বৈষ্ণব পাইলে (তাঁহার পিতার বয়সের লোক হইলেও) ছাড়িয়া দিতেন না। মুরারিগুপ্তের সহিত প্রায়ই কলহ হইত।

অল্প বয়সেই নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণের পাঠসমাপ্তি হইলে গৌরাঙ্গ ত্রায়শাস্ত্র পড়িবার মানসে নবদ্বীপের প্রধান নৈরায়িক বাসুদেব সার্কভোমের টোলে প্রবেশ করেন। একে নিমাই বালক, তাতে আবার অন্নদিন ছিলেন বলিয়া বাসুদেব নিমাইকে তত লক্ষ্য করেন নাই। এই সময়ে প্রসিদ্ধ দীধিতিকার রঘুনাথ-শিরোমণিও বাসুদেবের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সকলের প্রধান হইবেন। নিমাইকে দেখিয়া তাহার সে আশা শুকাইতে লাগিল। এই সময়ে রঘুনাথ “দীধিতি” লিখিতে আরম্ভ করেন, নিমাইও একখানি জ্ঞানের পুঁথি লিখিতেছিলেন। রঘুনাথের সহিত নিমাইয়ের সদ্ভাব ছিল। একদিন উভয়ে নৌকারোহণে গঙ্গাপার হইবার সময়ে নিমাই নিজের গ্রন্থ রঘুনাথকে শুনাইতে ছিলেন। রঘুনাথ শুনিয়া একেবারে হতাশ হইলেন, তিনি দেখিলেন যে নিমাইয়ের গ্রন্থ চম্ব হইলে আর কেহই তাঁহার দীধিতির আদর

করিবে না। তাঁহার প্রাধান্যের আশা একেবারেই হুমাইয়া আসিল, রঘুনাথ আর সহ করিতে পারিলেন না, ছই হাতে চক্ৰ চাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রথন নিমাই বৃত্তিতে পারিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থই রঘুনাথের মৌদনের কারণ, তখন “ভাই! রঘুনাথ তুমি কাঁদিওনা, তোমার চিন্তা নাই, তোমার গ্রন্থই আদরণীয় হইবে” এই বলিয়া নিজকৃত গ্রন্থখণ্ড টানিয়া গঙ্গার ফেলিয়া দিলেন। নিমাইয়ের স্তায়-পড়া সেইখানেই শেষ হইল। তিনি স্বয়ং একটা চতুষ্পাঠী করিলেন। তাঁহার নিজের বাড়ীতে স্থান ছিল না, তাই মুকুন্দসঙ্করের বড় চণ্ডীমণ্ডপে টোল করেন। এই সময়ে নিমাইয়েব বয়স ষোল বৎসর। তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রদক্ষতার কথা কাহারও অগোচর ছিল না, দিন দিনই চতুষ্পাঠীর শ্রীযুক্তি হইতে লাগিল। নিমাই একজন দিগ্গজ পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। এখন আর শচীর ঘরে অর্থকষ্ট নাই। বড় বড় বিখ্যাতগণ নিমাইকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং সাহায্যের জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেও ক্রটি করিত না। কিন্তু নিমাই অমিতব্যয় ছিলেন বলিয়া কিছুই সঞ্চয় হইত না। অতিথির প্রতি নিমাইয়ের বিশেষ যত্ন ছিল। ইহার কিছু দিন পরে গৌরচন্দ্র বঙ্গভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বৈক্যব কবিগণের মতে এ বিবাহে শচীর মত ছিল না, কিন্তু নিমাই ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করেন।

অল্পদিন মধ্যেই নিমাইয়ের যশে চতুর্দিক্ পূর্ণ হইল, দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিমাই প্রায় সকল সময়েই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, মুহূর্ত্ত মাত্রও অবকাশ পাইতেন না। নিমাই পণ্ডিত এ সময়েও অতি চঞ্চল স্বভাব, কিন্তু দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, জন্মাবধি শরীরে কখনও কোনও রোগ হয় নাই বলিয়া বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। প্রত্যহ দুইবেলা গঙ্গার সঁতার কাটিয়া এপার ওপার হইতেন এবং প্রতিদিন শিষ্যগণ লইয়া নগরভ্রমণে বাহির হইতেন, যেখানে যাহাকে দেখিতে পাইতেন, অমনি শাস্ত্রালাপ করিতেন।

মুকুন্দদত্ত নামক একজন চট্টগ্রামবাসী বৈষ্ণবকুমার নব-দীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি পরম বৈক্যব ও সুগায়ক ছিলেন, অবৈতের বাটীতে তিনি কীর্ত্তন ও গান করিতেন। ইহাকে পাইলে নিমাই সহজে ছাড়িতে চাহিতেন না। একদিন গৌরচন্দ্র আপনাদি শিষ্যগণ লইয়া রাজপথে যাইতেছিলেন, মুকুন্দ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অন্তর্পথে চলিয়া গেল, এই সময়ে নিমাই পণ্ডিত জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার দ্বন্দ্বের বিন্দুমাত্রও ভুক্তিভাব দেখা যাইত না, ভক্ত

মুকুন্দ তাঁহার নিকটে বড় খেলিতেন না। অনেককই অনেক রকম মীমাংসা করিলেন, কিন্তু নিমাই উপহাস করিয়া বলিলেন যে ‘বেটা বৈক্যব আমাকে জ্ঞানের পক্ষপাতী জানিয়া ধারে খেলে না, আচ্ছা আমিও একদিন এইরূপ ভক্ত হইব যে সকল বৈক্যবই আমার পদতলে লুপ্ত হইবে।’

আর একদিন মুকুন্দের দেখা পাইয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ‘তুমি আমাকে দেখিয়া পাঙ্গাও কেন, আজ বিচার না করিলে ছাড়িব না।’ মুকুন্দ নিমাইকে সাধারণ পণ্ডিত জানিয়া ঠকাইবার মানসে অলঙ্কারের কঠিন প্রদ্ব জিজ্ঞাসা করেন। নিমাই পণ্ডিত সহস্র বদনে তৎক্ষণাৎ তাহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। মুকুন্দ শুনিয়া অবাক হইলেন এবং ইনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি তাহাও বুঝিয়া লইলেন। প্রকৃত পক্ষে নিমাই ব্যাকরণের পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু কি দর্শন, কি অলঙ্কার, যে কোন শাস্ত্রের বিচার উপস্থিত হইত, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত ও বিচারে তিনি জয়লাভ করিতেন। একদিন পণ্ডিত গদাধরের সহিত মুক্তি সম্বন্ধে বিচার হয়। গৌরচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তে শত শত দোষ দিয়া মুক্তিপদের অশুদ্ধরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ক্রমেই তাঁহার যশঃ ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল।

প্রত্যহ অপরাহ্নে নগরভ্রমণ করা বিশ্বস্তরের অভ্যাস ছিল। পাড়া প্রতিবেশী সকলের সহিতই তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল, সকলেই তাঁহাকে প্রাণের মত ভালবাসিত। এই সময়ে বিজ্ঞান গরিমা ভিন্ন নিমাইয়ের হৃদয় দীর্ঘা, অভিমান প্রভৃতি আর কোন দোষই কলঙ্কিত ছিল না।

একদিন পথে ঐক্যপুত্রীর সহিত নিমাইয়ের দেখা হয়। আপনাদি ভাবী অভীষ্ট দেবকে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্ভিত মস্তক আপনা হইতেই যেন অবমত হইল, এই হইতেই তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ভক্তিরসের অম্লর জন্মিল। পুত্রীর সহিত নিমাইয়ের পরিচয় হইল, তিনি পুত্রীকে নিজের গৃহে আনিলেন। ঐক্যপুত্রী অবৈতের আবাসে অবস্থিত করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপনা সমাপন করিয়া বিশ্বস্তর তাঁহাকে প্রণাম করিতেন ও তাঁহার সহিত অন্তঃস্থতর ধর্ম্মপ্রভাবও হইত। একদিন ঐক্যপুত্রী অরচিত ঐক্যকলীলামৃত নামক কাব্য দেখাইয়া নিমাই পণ্ডিতকে তাহার দোষগুণ অহুস্কান করিতে অহুরোধ করেন। নিমাই অস্বীকার করিয়া বলিলেন—

“প্রভু বলে ভক্ত বাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন।

ইহাতে যে দেখে দোষ পাণী সেই জন ॥

ভক্তের কবির যে ভক্তের কোন নহে।

কিধর সর্বদা ঐত ভাহাতে নিচরে।

অতএব তোমার সে ভক্তের বর্ণন।

ইহাতে দেখিবে কোন সাহসিক জন।^(১)

যদি ভক্তির দান তবিলেও লবজা করিডেম, জানেন প্রাখ্যাত
হাপনাই বাহার প্রাধান উদ্ভেদ ছিল, সেই বিশ্বস্তরের স্বকরের
ববনিকা একেবারে পরিমার্জিত হইল, তাঁহার স্বপনমাজা
ভক্তিরসে আশ্রুত হইল। এই ফলেই চৈতন্যের ভাবী ধর্ম-
জীবনের সূত্রপাত। বাহ্য হউক পুরীর লহরীতে নিমাই তাঁহার
এহে একটি ব্যাকরণ দেব বাহির করিয়া দিলেন। অসাধারণ
প্রতিভাশালী পুরীও প্রাক্যাতনের তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।
তাহার কিছুদিন পরে নিমাই বাহুরোগে কাতর হন ও অনেক
চিকিৎসার পর আরোগ্যলাভ করেন। কোন কোন বৈকব
কবির মতে, এই অবস্থার উপহার সুখ হইতে ছই একটি মহা-
ভাবের কথা অর্থীং “জাবি কেধর তোমরা আমাকে চিন না”
ইত্যাদি শুধা গিয়াছিল। ইহার আর দিন পরেই গৌরচন্দ্র
সম্মুখীন গমন করেন। এই সময়ে হঠাৎ পূর্ববঙ্গে বাইবার
কারণ কি? ইহার সমস্তার বৈকব কবিগণ হস্তক্ষেপ করে
নাই। কিন্তু প্রোক্ষামিশ্রিত ঐক্যচৈতন্যদাবনী গ্রহণার্থে
জানি যায় যে, যে সময়ে সিংহাসনকার শতীকে লাইরা স্বরূপস্বরূপ
চরণ বর্ণন করিতে লজ্জা হইল অহটে গিয়াছিলেন, তখন
লজ্জাশোধের জন্যই একটি স্মরণ দেখেন যে, কে যেন বলিছেন—
“শচীর গর্ভে একটি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। এখানে
বাঞ্ছিত বিপদ হইবে, অতএব আর বিলম্ব করিওনা, এখনই
বকসীপে পাঠাইয়া দেও।” লজ্জাশোধ-জননী প্রোক্ষামিশ্রিত
নবদীপ পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, “শচি। ভক্তমার
এই গর্ভে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার সহিত
আমার লক্ষ্য করাইয়া দিবে।” শচী স্বপ্রোক্ষামিশ্রিত কথার
প্রতিক্রিয়া হইয়াছিলেন। রোগ হয় শচী সেই প্রতিজ্ঞা প্রতি-
পালনের জন্য নিমাইকে পূর্ববঙ্গে বাইবার অহমতি করেন।
কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রস্বরূপীতে চৈতন্যের সত্যসিদ্ধির পরও
আর একবার ঐহটগমনের কথা আছে (২)। নিমাই

(১) “ভক্তদাস ভাবতঃ প্রাপ্য সত্যানবকরোঃ এতুঃ।

ভক্ত্যঃ পুত্রিত্বপুত্রোক্তে কবিরে ন বহুঃকৃতুঃ। ১০

স্বামীশ্বরী ঐহটগমনে নিমাইস্বরূপে নিম্নলিঃ।

শচী ভক্তির সত্যঃ ভক্তের সত্যঃ ইতি। ১১

শিখারূপা নরুতঃ তে ভক্তসত্যসন তে পুতু।

জব গর্ভে মহাভাগে পুত্রবো বো ভবিষ্যতি। ১২

এখাপরে ভক্তির দিব্যস্বরূপে বর্ততে।

বীক্যোতি সত্যাতা নবদীপে পুমানব। ১৩

পণ্ডিত পূর্বদেশের কোন কোন প্রাণে গমন করিয়াছিলেন ও কোন
কেন কোন পর্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ
পাওয়া যায় না। তবে এই বাহ্য পাণ্ডিত্য দ্বারা যে, তিনি শিষ্টি-
গণ পরিবৃত্ত হইয়া পদানবীর তীরে আসিয়াছিলেন। ইহার
পূর্বকই নিমাই পণ্ডিতের মন-সৌরভ পূর্ববঙ্গে বিকীর্ণ হইয়া

ভক্তোহবতঃ পালনীঃ স্বধাকার ভবভাবিনঃ।

ইতি বাত বচঃ প্রভা ঐহটন্যো বহাশ্রুতুঃ। ২০

ভক্তরা লীলা নরুপকরমধাকরোঃ।

এত্যাখ্যো বরপদার্থো অশিতানবদীপতিঃ। ২১

হলপ্রবাহবাহ্যো হরিণজঃ ভক্তার লঃ।

বধ্যাক্ষে ভক্ত্যাক্ষ-হা স্বধাক্ষে হরিণজঃ। ২২

হলপ্রবাহ তদুৎ। প্রাথমিকপ্রবাহঃ।

স্বধাক্ষ্যঃ ভক্তঃ প্রোক্ষ্য প্রাথমিকপ্রবাহঃ। ২৩

সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ ভক্তঃ।

দ্বিমেষকঃ দ্বিমেষকঃ পুত্রগণ্যাতটে ভক্তঃ। ২৪

ব্যক্তরা জাগরিষ্য চাতাগমন কারণঃ।

পিতৃস্বরূপে প্রাপ্য ভক্তস্বরূপান্তরে। ২৫

উপেক্ষাবিলম্বী চ বুদ্ধা বর্ণনয়া লভা।

কলা কল্যাসি নগরমিতি চিত্তপন্যাতকঃ। ২৬

কর ঐক্যচৈতন্যঃ সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ।

বেদস্বরূপে প্রাপ্য সত্যাতাঃ ভক্তঃ। ২৭

ভক্তিং ভক্তঃ সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ।

পীত্ব মাগজ্জ বাতবঃ পত্ব ভিক্ষুরোক্তবঃ। ২৮

অভ্যাস বরসঃ পৌরস্বয়ঃ সত্যাতাঃ।

ইতি প্রভাতু বুদ্ধা সা পুত্রগণ্যাতা সত্যাতাঃ। ২৯

সুতু। ঐক্যচৈতন্যঃ সত্যাতাঃ বরুণকঃ।

ইহরোক্তঃ সত্যাতাঃ ইতি বুদ্ধা বরুণকঃ। ৩০

ভক্তঃ সত্যাতাঃ ভক্তঃ ভক্তাঃ বর্ণনয়া বর্ণনয়া।

সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ। ৩১

সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ সত্যাতাঃ।

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩২

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৩

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৪

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৫

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৬

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৭

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৮

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৩৯

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৪০

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৪১

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৪২

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৪৩

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৪৪

ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ ভক্তঃ। ৪৫

ছিল। তাঁহাকে দেশে পাইয়া সকলেই পরম প্ৰসাদে
কপিতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার কৃত চিহ্নস্বরূপ সাহায্যে
অধ্যয়ন করিতেছিল এবং অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার
নিকটে অধ্যয়ন করিবার মানসে নবদ্বীপে বাইবার প্রয়োজন
করিতেছিল। এই সময়ে নিমাইটাদিকে যত্নের সহায়ত
পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনিও
টোল করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে
অবস্থিতিকালে তপনমিত্র নামে একজন নিরীহ সারগ্রাহী
ব্রাহ্মণের সহিত নিমাইয়ের পরিচয় হয়। গোরাচাঁদ তাঁহাকে
অনেক উপদেশ দিয়া কাশী পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়া-
ছিলেন যে ভবিষ্যতে ঐ স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
হইবে। চৈতন্যচন্দ্র প্রসংগে বলেন যে, সেই সময়ে তিনি
হরিনামের নৌকা সাজাইয়া সজ্জন, হুজ্জন, আচারী, বিচারী,
পতিত ও অধম সকলকেই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের
কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন এতাব কিছুই ছিল
না, আবার যখন নদীয়ার ফিরিয়া আসিলেন, তখনও এই ভাব
কিছু রহিল না, অথচ বঙ্গদেশে বাইয়া আপনার ভাবী
জীবনের সেই অমোঘ শক্তি বিস্তার করিয়া সকলকেই হরিনামে
মাতাইলেন এবং নিজেরও ভক্তিরসে মাতিয়া উঠিলেন।
গৌরচন্দ্র পরম সুখে অভিযোজিত করিতেছেন, এই সময়ে
নবদ্বীপে তাঁহার ঘরে বিপদ উপস্থিত। তাঁহার গৃহ-
ভ্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাঁহার
প্রিয়পত্নী লক্ষ্মীঠাকুরাণীর প্রাণবিয়োগ হইল। শচীর স্নেহের
গৃহ বিমাদের অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। কিছুদিন পরে
গৌরচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ
তাঁহাকে নানাপ্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দেন। নিমাই
পণ্ডিত কয়েকমাস পরে বহুশিষ্য ও ধন সম্পত্তি সঙ্গে
লইয়া নবদ্বীপাভিমুখে আসিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় ধানি
উৎসাহপূর্ণ এবং অনেক দিন পরে জননী ও ভাৰ্য্যার সহিত
মিলিত হইবেন, এই আশার প্রাণ আশ্বাসিত ছিল। কিন্তু
হার! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার আশা
ভীষণ নিরাশায় পরিণত হইবে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিয়া

সর্বপ্রথমে জননীর চরণ স্পর্শ করিলেন, শচী ঠাকুরাণী
হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে লবণ জলিয়া নিমাইকে আলি-
ঙ্গিত করিলেন। জনৈক প্রভিষেকী নিমাইকে পত্নীবিয়োগের
সংবাদ বলিয়া দেন। এই নিদাক্ষণ সংবাদে কিছুকালের
জন্ত গোরাচাঁদের মস্তক অবনত হইল ও অজ্ঞানতা গণ্ডস্থল
বহিয়া প্রবাহিত হইল। অবশেষে জননীকে অত্যন্ত কষ্টের
জানিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন—

“একু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।

ভবিষ্যৎ যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন।

এই মত কালগত কেহ কারও নয়।

অতএব সংসার অনিত্য বেদে কর।

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।

সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর।

অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছার।

সেই সে হইল কি কার্য্য দুঃখ তার।”

নিমাই পণ্ডিত এইরূপ উপদেশ আর কখনও দেন নাই।

বোধ হয় পত্নীবিয়োগ হইতেই প্রথম তাহার হৃদয়ে সংসার
অসার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দিন দিন শোক কমিয়া আসিল,
গোরাচাঁদ নিজের চতুষ্পাঠীতে জাঁক জমকের সহিত আবার
পড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি নিজের পড়ুরাদের
মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের
কর্তব্য কর্মের অহুষ্ঠান না দেখিলে শাসন করিতেন, কিন্তু এ
বয়সেও তাঁহার চাপল্যস্বভাব সম্পূর্ণ যায় নাই।

সনাতন নামে একজন সৎসংজ্ঞাত ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে বাস
করিতেন। বংশপরম্পরাক্রমেই তাঁহার রাজপণ্ডিত ছিলেন,
তাঁহাদের সম্পত্তিও বড় কম মনে। তাঁহার কন্যা বিষ্ণু-
প্রিয়তার সহিত নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব চলিল। সনাতন
নিমাইকে দেখিয়া ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্থির করিয়া-
ছিলেন। এই প্রস্তাবে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না।
কিন্তু নিমাই বিবাহে অমত করেন, পুত্র জননীর আগ্রহে
বিবাহ করিতে সম্মত হন। নিমাইয়ের নিজের অবস্থা ভাল
না হইলেও এই বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়াছিল। নবদ্বীপের
প্রধান ধনী বুদ্ধিমান ধনী, মুকুন্দ, নরায়ণ ও প্রধান প্রধান ছাত্র-
গণ এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রাজপুত্রের
বিবাহের স্থায় নিমাইয়ের দ্বিতীয় পরিণয় হইয়াছিল।

এই সময়ে কেশব ভারতী নামে জনৈক কাশ্মীরী দ্বিধি-
জয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তিনি
একরূপ সকলকেই শাস্ত্রে পরাজয় করেন, কিন্তু নিমাই
তৎকৃত একটা শ্লোকে রক্তকণ্ডলি আলঙ্কারিক ঘোষ দেখাইয়া

কৈলাসক ভক্তোৎসাহী কুণ্ডে সংপ্যাসকুণ্ড।

বৃক্ষগোপেশ্বরঃ বৃষ্টীঃ পিতামহপুত্রগণঃ। ৪২

পরমানন্দপত্নী কুসুমলা ভক্তিসংযুতা।

বিহারারম্যঃ প্রভঃ ভক্তিরাসাৎ মাতৃবৎ। ৪৩

প্রভক্তাঃ ব্যাধমালয়াঃ সন্তোষাচ্চ পিতামহীঃ।

বয়ঃ বিদ্বাজ চৈতন্যো বজ্রাঙ্গ দ্বিতীয়ঃ ৪৪

(চৈতন্যোদয়াবলী ৩ সর্গ)

ইহার সঙ্গী গঙ্গা তীহাকে অনেক প্রকারে সাধনা করিয়া দেশে বাইতে অল্পরোধ করিলে, তিনি কানিতে কাহিতে বলিতে লাগিলেন, “বন্ধুগণ তোমরা দেখে কিরিয়া যাও, আমি আর দেশে বাইব না, যেখানে বাইলে আমার প্রাণনাশের সহিত দেখা হইবে, আমি তথায় চলিয়া বাইব।” ইহার পরে এক

কিছুদিন পরে কেশব চাঁচলিও প্রবাহসারে গৌরচন্দ্র গঙ্গা ত্যাগ করেন। ইহার মেন্দ্র চন্দ্রশেখর ও অনেক পড়ুয়া গৌরের সহিত গঙ্গাধারে গমন করেন। গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া আসিয়া মান্দারণে নিমাইয়ের জয় হইল। সঙ্গীরা সকলেই বিবম চিন্তার পড়িলেন। পরিশেষে নিমাই সেখানকার ভ্রাক্ষণের পানোদক পান করিয়া প্রাণনাশক ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করেন।

গৌরাক্ষ গঙ্গায় বাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলেন এবং পিতৃ-কার্য্যও সমাধান করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীগণের সহিত বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখিতে যার। গঙ্গালী পাণ্ডাগণ পাদ-চিহ্নের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। গৌরের তাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবোচ্ছ্বাস উৎপলিয়া উঠিল। ইহার হৃদয়ের আভাবিক অবস্থাই ভাবময়, এতদিন পাণ্ডিত্যের বৃণাডবরে তাহা ঢাকিয়াছিল। শুভক্ৰমে আবরণ উন্মুক্ত হইল। নিমাই একদৃষ্টে সেই পদচিহ্ন পানে চাহিয়া রহিলেন, ইহার মুখে বাক্য নাই, শরীরে রোমাঞ্চ ও শ্বেদ প্রভৃতি সকল ভাবই প্রকাশ পাইল। গৌরাক্ষের এইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অনেকেই দেখিতে আসিলেন; লোকে লোকারণ্য হইল। সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। নিমাইয়ের সেই অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী ইহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহুজ্ঞান হইল। ইহার পরে ঈশ্বরপুরীর নিকটে নিমাই দশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে নিমাই অভীষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন—

“তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীয়ে।

প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে ॥

হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।

বেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে ॥”

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরপুরী অন্তহিত হন। এখন হইতে দিন দিন গৌরের ধর্ম্মপ্রাণের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল, নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্তিত হইতেছে, নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সঙ্গীগণের সহিত ছুই একটা কথা কহিতেন, তাহা ছাড়া প্রায়ই নিমৃতে বসিয়া শুক্লদণ্ড মন্ত্র জপ করিতেন। একদিন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে হঠাৎ উন্মত্তের ছায় বসিয়া উঠিলেন—

“করয়ে। বাপরে। প্রাণ জীৱন শ্রীহরি।

কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।

পাইছ ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা ॥”

ইহার সঙ্গীগণ তীহাকে অনেক প্রকারে সাধনা করিয়া দেশে বাইতে অল্পরোধ করিলে, তিনি কানিতে কাহিতে বলিতে লাগিলেন, “বন্ধুগণ তোমরা দেখে কিরিয়া যাও, আমি আর দেশে বাইব না, যেখানে বাইলে আমার প্রাণনাশের সহিত দেখা হইবে, আমি তথায় চলিয়া বাইব।” ইহার পরে এক দিন গভীর রজনীযোগে সমভিব্যাহারী লোকদিগকে না বলিয়া তিনি মথুরায় বাইবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। পথে দৈববাণী শুনিয়া কিরিয়া আসেন। চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন, পরে নিমাইকে নানামত প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনেন। সকলে পৌষমাসের শেষে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

গৌরচন্দ্র গয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাটীতে আসিলেন, সে মাছুষ নাই, সে ভাব নাই, সে চেহারা নাই, স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পড়িয়া সকলেই নূতন হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডিত্য, পূর্ণ ও চাকল্যের স্থানে ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার করিয়াছে। নিমাইচাঁদ ভাবে বিভোর হইয়া যখন নদীরার রাজপথ দিয়া গৃহাভিমুখে বাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই অবাক হইয়া গেল।

বিশ্বস্তর জননীর চরণবন্দন ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহিত দুই একটা মিষ্টালাপ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যান। তিনি পুনর্বার অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে উপদেশ দেন। বিশ্বস্তর শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারিগুপ্তের নিকটে গঙ্গার যে অপূর্ণ ভগবানের লীলা দেখিয়াছেন তাহা বলিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে ইহার নয়নবৃন্দ দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, শেষে “হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই তিন ব্যক্তি পূর্ব হইতেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, নিমাইয়ের ভাব দর্শনে ইহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না।

পরদিন শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ীতে সমাগত বৈষ্ণব-দলের মধ্যে নিমাই পণ্ডিতের নবজীবনের কথা প্রকাশ করিলেন, বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে হরিশ্রবণ করিয়া উঠিলেন। পূর্বদিনের কথাছসারে শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত ও মুরারিগুপ্ত শুক্লাধর ব্রহ্মচারীর কুটীরে বধা সময়ে মিলিত হন। গঙ্গাধর পণ্ডিতকে আসিতে না বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোহরণের কাহিনী শুনিবার জন্য শুক্লাধরের গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। শুক্লাধর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব, নানাভীর্ষ পর্যটন করিয়া নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে একটা কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। ইনি অতিশয় সংপ্রকৃতি ও বিশ্বস্তরের পূর্ণপরিত্রিত। তাই

শ্রীমাদ্-পণ্ডিত প্রভুতিকে সেইখানে বাইরে নিমাই অসহ্যে
 করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে শচীনন্দন ভক্তিরসের উকী-
 লক মোক আনুভূতি করিতে করিতে বাকজানপুত হইয়া তথায়
 উপস্থিত হইলেন। তথায় বাইরা “হা নাথ! কোন্‌ বাণ! ওঃ
 পাইয়া হারাইলাম” এইরূপ পীড়নের ভাব কতই বলিতে লাগি-
 লেন এবং মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার এই মহাভাব
 দেখিয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয় প্রেমোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল,
 সকলেই তাহা বিস্তারিত হইয়া নাচিতে, হাসিতে ও নমস্কে
 লয়ে কীর্তিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নিমাইয়ের চেতনা
 হইল, তিনি মহাভাবে উত্তর হইয়া অসহ্যে করিতে লাগিলেন।
 গুরুরের কুটীর প্রেমের হইয়া গেল। অপরাহ্ন উপস্থিত।
 কিন্তু কাহারও সে জ্ঞান নাই, নিমাই পণ্ডিত যে উদ্দেশ্যে ভূমি-
 য়াছেন তাঁহার সকলেই তাহাতে মগ্ন। তাঁহার এইরূপ
 ভাব দেখিয়া গদাধর ঈশ্বর বৈষ্ণব গঠিতে পারিলেন না, গৃহ মধ্য
 হইতে কামিয়া উঠিলেন। নিমাই তাঁহার কারণজিজ্ঞাসা করার
 সকলেই গদাধরের অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বাহিরে
 আনিলেন, গদাধরও তাঁহার সহিত নাচিতে আরম্ভ করি-
 লেন। সন্ধ্যার সময় নিমাই পণ্ডিত তাহা চুলিতে চুলিতে গৃহে
 চলিলেন। সমস্ত দিন আনাহা হইয়া নাই। শচী অনেক বস্ত্র
 করিয়া আনাহার করাইলেন। সন্ন্যাসিনী শচীদেবী গৌরাঙ্গের
 এইরূপ ভাব দেখিয়া কত কি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।
 নবম বিষ্ণুপ্রিয়াও এই ভাবে বড়ই ভয় পাইয়াছিলেন।
 পরদিন প্রত্যুষে নিমাই গদাধর করিয়া টোলে পড়াইতে
 চলিলেন, পড়াইতেও বলিলেন, কিন্তু বে যে প্রশ্ন করে ও
 বাহার যে পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতেই হরিনামের মহিমা
 ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বলিতে বলিতে বাকজান
 পুত হইয়া বস্তুতে ভগবানের মহিমা গান করিতে আরম্ভ
 করিলেন। শিষ্যগণ বৈষ্ণবিক বস্ত্রা পুথি ধারণ। এইরূপে
 একদিন অতীত হইল। নিমাই অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিলেন।
 শিষ্যগণের মধ্যে বাহার প্রশংসিত ছিল, তাহার নিমাইয়ের
 অনুসরণ করিল, অপর ছাত্রগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

তখন গৌরাঙ্গচন্দ্র ভক্ত পড়াপড়কে লইয়া একটা
 মন্দিরেন্দ্র হন করিলেন। তিনি হাতে কামি দিয়া ভাল
 দেখাইয়া শিষ্যগণকে গান শিরাইতে লাগিলেন। যে কীর্তনের
 মধুর লহরী বক্তৃতাটিকে প্রাণিত করিয়াছিল, বাহার তরল-
 ভাবে কত শ্রাবণ হৃদয় গলিত হইয়া সবজীবন লাভ
 করিয়াছিল, এই লক্ষ্যের তাহার দৃষ্টিপাত। এই কীর্তনে
 “হরি হররে নমঃ। গৌরাঙ্গ ধোবিল রান শ্রীমদ্ভক্তের।”
 এই গণ্ডী করা হইল।

শচী প্রভুর একজন মনুষ্য দেখিয়া নিজের ভীত হইলেন।
 নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ই উত্তর পাইতেন না,
 বাহাও হই একটা উত্তর পাইতেন তাহাও অপ্রকৃত, কেবল
 ভগবানের সার-মহিমা বাক্য। শচী আর হির থাকিতে পারি-
 লেন না, তাহার পরম আশ্রয় ভক্ত শ্রীবাল পণ্ডিতের কাছে
 মোক পাঠাইয়া লংঘন জানাইলেন। শ্রীবাল দেখিতে আসি-
 লেন, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের ককভক্তি একেবারে উৎখলিয়া
 উঠিল, শ্রীবালকে প্রণাম করিতে গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন,
 কিংবদন্ত পরেই চেতন হইলে শ্রীবালের সহিত অনেক
 কথা হইল। শ্রীবাল শচীকে অনেক প্রবেশ দিয়া চলিয়া
 গেলেন। ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের কথা মইরা নানাভাবে তর্ক
 বিতর্ক হইতে লাগিল। কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কেহ বা নিমাই-
 কে পাগল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যিনিই বাহা
 বলুন না কেন, নিমাইকে দেখিলে আর সে ভাব থাকিত না,
 সকলেই প্রেমভক্তিতে ভুলিয়া বাইতেন। বাহার বৈষ্ণব-
 ভক্ত তাঁহার প্রতিশ্রুতির আনন্দিত হইলেন, বিশ্বস্ত অসিতীয়
 পণ্ডিত, তিনি ভক্তিপথ অবলম্বন করিলে তাহার উন্নতি
 অবশ্যই হইবে, ইহাই তাহার আনন্দের প্রধান কারণ।
 এই সময়ে বিশ্বস্ত সাধুসেবা ক্রিতে বস্ত্রবান হইলেন।
 শ্রীবাল প্রভুতিকে ভক্তগণকে দেখিতে পাইলে তাহারিগকে
 সম্ভার ও বিশেষ মন করিলেন। ১৪৩০ শকে “হরি হররে
 নমঃ” ইত্যাদি কীর্তন প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টোতাচার্য নামে একজন পরম বৈষ্ণব মনুষীকে বাস
 করিতেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে নিমাইটাদের বড় ভাই বিশ্ব-
 রূপ ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিপ্রমুখ অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে
 বালক বিশ্বস্তরও মধ্যে মধ্যে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে বাইতেন।
 অষ্টোতাচার্য বিশ্বস্তরকে দেখিয়া কোম মনোহর অবতার
 বলিয়া হির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক দিন চলিয়া
 গেল, তথাপি তাঁহার কখনা কার্যে পরিণত হয় নাই। এক
 দিন তিনি একটা বছর বৃষ্টি বিশ্বস্তরের নবজীবনের কথা
 শুনিলেন এবং তাহার পূর্বদিন তিনি ভাগবতের একটা
 স্লোকের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া
 ছিলেন। রাতিকালে স্বপ্নে দেখেন যে “অচ্যুত! জ্ঞান
 চিত্তা নাই। বাহা বৃত্তিতে পায় নাই, তাহার জ্ঞান এই।
 জ্ঞানার অনেক সিজ হইয়াছে, বিশ্বস্তর লবণীয় হইয়াছেন।”
 অচ্যুত এখন বছর বৃষ্টি গৌরবের কথা শুনিয়া বলিলেন যে,
 “যদি বিশ্বস্তর রাত্নিকই বিশ্বস্তর হন, তবে অবশ্যই আমার সহিত
 দেখা করিতে আসিবেন।” তাহার পরেই একদিন নিমাই
 গদাধরের সহিত অষ্টোতাচার্যের বাড়ী গাইয়া উপস্থিত

হন। সেই সময়ে আচার্য্য ভক্তিরসে উগমগ হইয়া তুলসীর সেবা করিতেছিলেন। বিষ্ণুভরের আর সহিল না, হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ও মহাভাবে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অষ্টমত সময় বুরিয়া গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দন দিয়া নিমাইয়ের পূজা করিয়া “নমো ব্রহ্মণ্যদেবার” বলিয়া নমস্কার করিলেন। ইহাতে নিমাইয়ের অকল্যাণ মনে করিয়া সঙ্গী গদাধর ভীত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে নিমাইয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি ভক্তিতে আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আচার্য্য আমাকে রূপা করুন। আপনার রূপা ব্যতীত আমার কৃষ্ণলাভের আশা নাই, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।” * অষ্টমতচার্য্যও অন্নবিস্তর বিষ্ণুভরের প্রশংসা করিতে ক্রটি করিলেন না। ইহার কিছুদিন পরে অষ্টমতচার্য্য নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্ত নবদ্বীপ ছাড়িয়া শাক্তিপুর নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান।

যে দিন অষ্টমতচার্য্য নিমাইকে পূজা করেন, সেই দিন হইতেই বৈষ্ণবগণ তাহাকে অষ্ট চক্রে দেখিতে শিখিলেন। সকলেই নিমাইকে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের অবতার জানে মন-প্রাণে ভক্তি করিতে লাগিলেন। গোবর্ধন ভক্তদল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে ভক্তগণ মিলিত হইয়া গোবর্ধন বহির্বাটাতে সংকীৰ্ত্তন করিতেন। একদিন আবিষ্ট অবস্থায় গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া বলিলেন যে, “যখন আমি গয়া হইতে আসি, তখন কানাই-নাটশালা গ্রামে প্রাতে একটা ভুবনমোহন পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু নাচিতে নাচিতে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, আমার মন প্রাণ পবিত্র হইল, কিন্তু আর দেখিতে পাইলাম না।” ইহা ছাড়া প্রতিদিনই প্রায় আবেশের সময় বলিতেন, “ভাই! কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। ভাই! কৃষ্ণ ভজনা কর, এমন দয়ালু ঠাকুর নাই।” ইহার পরে শ্রীবাসের যন্ত্রে তাঁহার গৃহে কীৰ্ত্তন করা হইত। এই সময়ে এক অপূর্ণ কীৰ্ত্তনীয়া মুকুন্দদত্ত মিলিত হন।

নিমাইয়ের ভাবেরও বিয়াম নাই, নয়নধারারও বিশ্রাম নাই। তবে অপর লোক দেখিলে অতিক্রমে গোপন করিয়া থাকিতেন। একদিন গঙ্গাভীরে কতগুলি গাভী দেখিয়া ও তাহাদের রব শুনিয়া মহাভাবে উদয় হইয়াছিল।

দিন দিন ভক্তদল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কীৰ্ত্তনও পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকিল। মাঘমাসে প্রথমে কীৰ্ত্তন আরম্ভ হয়,

কানুনমাসে প্রকৃত প্রভাবে কীৰ্ত্তন চলিতেছিল। চৈত্রমাসের শেষে এই কীৰ্ত্তন লইয়া সকলেই আন্দোলন করিতে লাগিল। এই সময়ে অপর লোকের প্রবেশ-ভরে ঘর রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাসের মন্দিরে কীৰ্ত্তন হইত। গঙ্গাদাস নামক একজন ভক্ত ঘররক্ষা করিতেন। শ্রীবাসতবনে গীত, বাত প্রভৃতি কলরব শুনিয়া সকলে দেখিতে আসিত, কিন্তু ঘর রুদ্ধ, প্রবেশ করিবার উপায় নাই। ইহাতে অনেকেই কলনা করিয়া বলিল যে ইহারা সকলে মত্তপারী ও জীলোক লইয়া আমোদপ্রমোদ করে, তাই অপরকে যাইতে দেয় না। পাণ্ডুলেলের হৃদয় অলিয়া উঠিল। তাহার শ্রীবাসকে জ্ঞপ্ত করিবার জন্ত একটা মিথ্যাকথা প্রচার করিল যে, “শ্রীবাসকে সপরিবারে ধরিয়া লইবার জন্ত বাদশাহ লোকজন পাঠাইয়াছেন।” এই সংবাদে শ্রীবাসের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু গভীর প্রকৃতি বিষ্ণুর একটুও ভীত হইলেন না; তিনি বলিলেন যে, ‘যদি একান্তই রাজা তোমাকে ধরিতে পাঠায়, তবে আমি এই ভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া হরিগুণ কীৰ্ত্তন করিব, দেখিবে আমার সহিত রাজা এবং সভাসদগণ সকলেই কাঁদিয়া উঠিবে, এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া সম্মান করিবে।’ নিমাইচাঁদের মুখে এই সব কথা শুনিয়াও শ্রীবাসের সন্দেহ একবারে দূর হইল না, নিমাই বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, ‘তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, দেখ এই চারি বৎসরের বালিকাটাকে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদাইতে পারি কি না?’ এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃপুত্রী চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন-দাসের জননী চারি বৎসরের মেয়ে নারায়ণীকে বলিলেন, “নারায়ণী মা একবার কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদ দেখি।” নারায়ণী অমনি ‘হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!’ বলিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীবাসের সন্দেহ মিটিল।

বৈশাখের শেষ কি জ্যৈষ্ঠের প্রথম এক দিন শ্রীবাসের গৃহে বেলা দুইপ্রহরের সময় নিমাইর নৃসিংহভাবের আবির্ভাব হয়। তাহাতে তিনি বিকুণ্ঠায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অভিষেক করিবার নিমিত্ত শ্রীবাসকে অহুমতি করেন। শ্রীবাস ও ভক্তবৃন্দ ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকে জ্যোতির্ময় দেখিয়াছিল। গঙ্গাজল প্রভৃতি নৈবোপচারে তাঁহার অভিষেক হয়। তখন হইতেই মধ্যে মধ্যে নিমাইয়ের দেবভাব প্রকাশ পাইত, আবিষ্টাবস্থায় গৌরাক্ষ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন এবং ভক্তগণও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ করিতে বিমুগ্ধ হইতেন না। আবেশ চলিয়া গেলে নিমাই-চাঁদ পূর্বের স্থায় মাহু হইয়া দাতাভাবে উপাসনা করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে বরাহাবতারের মোকাবেলা ব্যাখ্যা

* কাহারও মতে ঐ সময়ে গৌরচন্দ্র “অষ্টমতাক” পাঠ করেন।

চৈতন্যচন্দ্র ঐ ৮ম লোক এবং একত্র পাঠ্য হার।

করিতে শুনিয়া বরাহাবেশ হইয়াছিল। গৌরাক্ষ বরহাবেশে মুষ্টিগুপ্তের ঘরে যাইয়া তাঁহার সকল সন্দেশ ভঞ্জন করিয়া দেন। আবেশের শেষ অবস্থায় নিমাইচাঁদ “আমি যাই” বলিয়া মুচ্ছিত হইতেন, চেতন হইলে আর পূর্বভাবের কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। এইরূপে ভক্তদল তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে গৌরাক্ষের ঈশ্বরত্ব দৃঢ় হইয়া উঠিল। যে সকল ভক্তের মনে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা দিন দিন তিরোহিত হইল, ভক্তদল এক বাক্যে তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া কুলিলেন। এই জ্যৈষ্ঠমাসেই নিত্যানন্দ আসিয়া মিলিত হন। [ইহার বিবরণ নিত্যানন্দ শব্দে দ্রষ্টব্য।] অবধূত ভক্তপ্রধান নিত্যানন্দের সহিত মিলন হইতে গৌরাক্ষের ভাবময় হৃদয়ে আরও লহরী উঠিতে থাকিল। নিতাইও ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। ভক্তগণ নিতাইকে বলরাম বলিয়া ধারণা করিলেন, নিমাইও তাঁহাকে বড়ভাইয়ের মত ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

এই সময়ে নিমাইচাঁদের মুহুমুহু ভাবাবেশ হইত। একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শাস্তিপুরে যাইয়া অধৈর্যতাচার্যকে লইয়া আসিতে অনুরোধ করেন। শ্রীবাস শাস্তিপুরে যাইয়া অধৈর্যকে আসিবার জন্ত অনুরোধ করেন এবং নিমাইকে ঈশ্বরাবতার বলিয়াও প্রতিপাদন করেন। পণ্ডিত অধৈর্যতাচার্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাবে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত নবদ্বীপে আসিয়া লুকাইয়া থাকেন। গৌরাক্ষ ভাবাবেশে অধৈর্যের চালাকী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনেন। সেই সময়ে নিমাইয়ের নৃসিংহত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া অধৈর্যের মন ভিজিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে অধৈর্যতাচার্য নিজের ইষ্টমূর্তিরূপে গৌরাক্ষকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেন, তাহা শুনিতে পাইলে নিমাই যোরতর প্রতিবাদ করিয়া আপনাকে সামান্য মানব বলিয়া প্রতিপাদন করিতেন। কিন্তু আবিষ্টাবস্থায় নিজস্বার্থেই আপনাকে ঈশ্বর বলিতেন।

একদিন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া বিশ্বস্তর “বাপরে পুণ্ডরীক! তোমায় কবে দেখিব” বলিয়া রোদন করেন। তখন কেহই ইহার বিশেষ মর্ম্ম পাইল না। কিছুদিন পরে চট্টগ্রামনিরাসী পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি আসিয়া নিমাইয়ের সহিত মিলিত হন। ইনি একজন পরমভক্ত। নিমাইচাঁদ ইহাকে বড় মাত্ত করিতেন।

দুই এক মাসের মধ্যেই অনেক প্রাধান্য লোক গৌরাক্ষের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। ভক্তদের মধ্যে নিতাই, অধৈর্য,

পদাধর, শ্রীবাস, দুর্গাদি, মুকুন্দ, নরহরি, পলাদাস, চন্দ্রশেখর, পুরুষোত্তম (স্বরূপ দামোদর), বজ্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাহু ঘোষ, সারঙ্গ ও হরিন্দাস ইহারা প্রধান। [ইহাদের বিবরণ তৎ তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সময়ে গৌরাক্ষ অনেক ভক্তের মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস আরও বাড়িতে লাগিল। একদিন নিমাইয়ের জননী স্বপ্নে নিমাইয়ের কৃষ্ণমূর্তি ও নিতাইয়ের বলরামমূর্তি অবলোকন করেন। এই সময়ে ভক্ত শ্রীবাসাদির পরামর্শে বৃন্দাশ্রী নিজপুত্র নিমাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে অর্জনা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাত্রিতে কীর্ত্তন হইত। এই সময় হইতে কীর্ত্তনের প্রকৃতিও কিছু কিছু পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এতদিন সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। গৌরাক্ষের বহির্বাচী, চন্দ্রশেখর ও শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তন হইত। এখন আর সে নিয়ম থাকিল না, পৃথক পৃথক সম্মুখ হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রতি একাদশীর রজনীতে মহাধুমধামের সহিত কীর্ত্তন হইত। একদিন আবেশ অবস্থায় নিমাই “শ্রীধরকে নিয়া এসো” বলিয়া চীৎকার করেন। কিন্তু শ্রীধরকে কেহই চিনিতে পারিল না। পরে নিমাই বলিয়া দিলেন, “দরিত্র খোলাবেচা শ্রীধর।” ভক্তদল যাইয়া তাহাকে লইয়া আসিল। শ্রীধর এক পরমভক্ত।

একদিন রাত্রিতে শ্রীবাসের ভবনে কীর্ত্তন হইতেছিল। হঠাৎ ভাবাবেশে গৌরাক্ষ মুচ্ছিত হন। এই ভাবাবেশ প্রায় তৃতীয় প্রহরকাল ছিল, শরীরে স্পন্দ বা শ্বাস প্রশ্বাস কিছুই ছিল না। ভক্তদল নিমাইয়ের এই অবস্থায় বড়ই ভীত হইয়াছিলেন, শেষে কীর্ত্তনের রবে বিশ্বস্তরের চেতনা হয়। বৈষ্ণবগণ ইহাকে মহাভাব-প্রকাশ বলিয়া থাকেন।

মুকুন্দদত্ত নিমাইয়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল, ইহার স্তম্ভুর গানে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত। বিশ্বস্তরের এক দিন মহাভাবের প্রকাশ হয়। সেইদিন সকল ভক্তকে তিনি অতীষ্টের প্রদান করিয়াছিলেন।

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণপ্রোমানন্দে বিভোর। ইহাতে শরী বড় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শরীর ইচ্ছা নিমাই সংসারী হইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সহিত আমোদ প্রমোদ করেন। বিশ্বস্তর মায়ের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার সন্তোষের জন্ত শ্রীমতীকে লইয়া রজনীতে কখন কখন দিবাভাগেও আমোদ করিতেন। একদিন নিমাইচাঁদ বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া বলিয়া আছেন, এমন সময়ে নিতাই উলঙ্গ হইয়া তথায় উপস্থিত হন; ইহাতেও বিশ্বস্তরের

বিহার উপস্থিত হয় নাই। এই ঘটনাটা চৈতন্যভাবতে অতি বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

এই সময়ে অমেকেই নিমাইয়ের নিকটে উপদেশ লইতে যাইতেন। বিশ্বম্ভর সকলকেই বৃহন্নারদীরে—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নান্ত্যেব নান্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্তথা ॥”

এই শ্লোকটা উপদেশ দিতেন। ইহাছাড়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের স্তম্ভরূপ আর একটা শ্লোকও বলিতেন—

“ভৃগাধিপি সুনীচেন তরোরিব সহীকৃত।

অমানিনা মানদেন কীর্তিনীয়ঃ সদা হরিঃ।” (পদ্মাবলী ২০ অ°)

এই শ্লোকটা নিমাইয়ের নিজকৃত বলিয়া প্রকাশ আছে।

এই সময়ে শ্রীবাসের ঘরে দ্বাররোধ করিয়া কীর্তন হইত।

এই রকম এক বৎসর চলিয়া গেল। পাণ্ডুল তথ্যর যাইতে না পারিয়া ইহাদের অনিষ্ট সাধনের অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। গোপাল চাপাল নামক জনৈক পাণ্ডা এক দিন রাত্রিকালে হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন ও মত্ত প্রভৃতি শ্রীবাসের গৃহদ্বারে রাখিয়াছিল, তাহার মনের ভাব প্রাতে সকলে তাহা দেখিয়া ইহাদিগকে কপটচারী মনে করিবে। তাহার কিছুদিন পরে নাকি গোপালের ভ্রাতৃনক কুঠরোগ হইয়াছিল। আর একদিন একজন সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রেমে মত্ত হইয়া কীর্তন শুনিতে আসিয়াছিল, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাঁহার অদৃষ্টে কীর্তন দেখা ঘটিল না। তৎপরে কোন দিন নিমাই সদলে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, সে সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকট আসিয়া বলিল, “তুমি আমার মনোহুঃখ দিয়াছ। অতএব তোমার সংসার সুখ বিনষ্ট হউক।” বিশ্বম্ভর এই শাপ শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে ধন্যবাদ দিয়া গঙ্গায় চলিয়া গেলেন। ইহার পরে নিমাইয়ের আত্মলীলা। বৈষ্ণবকবিগণ বলেন যে বিশ্বম্ভর ভক্তগণের মনস্তত্ত্বের জন্ত একদিন একটা আমের আঁটা রোশণ করিয়াছিলেন, দেখিতে না দেখিতে বেশ লম্বা চওড়া একটা গাছ হইল, আর হইল, পাকিল এবং ভক্তগণ জ্বাক্ লাক্ ডালে চড়িয়া আম ছিড়িয়া খাইতে বসিল, সকলেরই ভরপুর পেট হইল, আমটা কিন্তু ঠিক সেইরূপই থাকিয়া গেল! প্রত্যেক বৎসরের শেষে এইরূপ আত্মলীলা করা হইত।

প্রত্যদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবর্ধন ধর্মসাধন হইতেছিল, বাহিরের লোকে ভিতরের ভক্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। একদিন ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ও হরিন্দাসকে

ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা দুইজনে আজ হইতে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ কর। যাহাকে দেখিবে, তাহাকে মিনতি করিয়া হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল বা জমীপুরুষ বলিয়া কোন ভেদ করিবে না, সকলেই সমান অধিকারী। দিনান্তে প্রচারবৃত্তান্ত আমার নিকটে আসিয়া বলিয়া যাইও।” প্রচারের আদেশ শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী মহা আনন্দলাভ করিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিন্দাস প্রচারক হইয়া ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারা লোক দেখিলে—

“বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।

কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন,

হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন।”

এই বলিয়া উপদেশ দিতেন। যে হরিনাম প্রচারক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্যাপিয়াছিল, তাহার স্তম্ভপাত এইরূপে হইল। জগাই মাধাই নামক দুইজন পাণ্ডাচারী ইহাদের উপদেশেই পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল। জগাই মাধাই পরিত্রাণে বিশ্বম্ভরের কোন মাছাত্ম্য প্রকাশ নাই, কেবল নিতাইয়ের শক্তিতেই তাহাদের পরিত্রাণ হয়। ইহারা প্রথমে নিতাইকে প্রহার করিয়াছিল শুনিয়া বিশ্বম্ভর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দিতে উদ্ভত হন, পরে নিত্যানন্দের অহুমনে ক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহারা বিনীতভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলে গৌরচন্দ্র ইহাদের প্রতি অতিশয় সন্মানবাহার করিয়াছিলেন। ইহার পরে কিছু দিন পর্যন্ত আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। একদিন অধৈর্যের সহিত কৌদল করিয়া নিমাই জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই সময়ে নিমাইয়ের জলে ঝাঁপ দেওয়া একটা রোগ হইয়াছিল। এক দিন গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ণনাস্তে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন মাছা ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়া “তুমি আমাকে উদ্ধার কর” বলিয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করিল। ইহা দেখিয়া গৌরচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ প্রদান করিলেন। পরিশেষে নিতাই তাঁহাকে তীরে উঠাইয়াছিলেন। চেতন হইলে নিমাই আপনায় লম্বুতা ও ‘স্কন্ধ ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণের নিকট অপরাধী করিয়াছে’ ইত্যাদি বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শুক্লাধর নামক জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মচারী নবদ্বীপে বাস করিতেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, শুক্লাধরও মনে প্রাণে গৌরচন্দ্রের ভক্তি করিত। এক দিন গৌরচন্দ্র নিতাই প্রভৃতির সহিত শুক্লাধরের

আশ্রমে বাইরা খোড় ভাতে ভাত খাইরাছিলেন। গুরুর প্রথমে ভীত হইরাছিলেন। কারণ সামাজিক নিয়মামুসারে তাহার অন্ন নিমাই খাইতে পারেন না। তিনিও অস্বীকার করিয়াছিলেন। অবশেষে গৌরাক্ষের কথা ঠেলিতে না পারিয়া তাহাকে খোড় ও ভাত খাওয়াইতে বাধ্য হন।

এক দিন গৌরাক্ষ শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে বৈষ্ণবমণ্ডলী মিলিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। বিশ্বস্তর রাধিকা সাজিয়াছিলেন। তাহার মনোহর অভিনয়ে ভক্তদলে কৃষ্ণপ্রেম সহস্র গুণ বর্ধিত হইরাছিল। এই অভিনয়কাণ্ডে বিশ্বস্তর নাকি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই অভিনয়-সমাপ্তির পরেও সপ্তাহ পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখরের গৃহ জ্যোতির্ময় ছিল।

ইহার কিছুদিন পূর্বে অষ্টৈতাচার্য্য হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। গৌরাক্ষের অদর্শনে তাহার মন আবার ফিরিয়া গেল, তিনি আবার ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই গৌরাক্ষ নিতাইকে লইয়া শান্তিপুরে গমন করেন। বাইবার সময় গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রামে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রমে অতিথি হন। কিন্তু বীরাচারী সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। ইহার তখন মনে ভাবিলেন যে তীরপথে বাইলে আবার হয় ত, এইরূপ কপটাচারীর হাতে পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়া গঙ্গার জলে সাঁতার কাটিয়া শান্তিপুরে পৌঁছিলেন। নিমাই অষ্টৈতের বাড়ী বাইরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “হাঁরে নাড়া, ভক্তিকে নাকি আবার অবহেলা করিতেছিস্।” অষ্টৈত বলিলেন, “চির কালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তির কোন ক্ষমতা নাই।” নিমাই এ কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না। বৃদ্ধ আচার্য্যকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন এবং কিলাইতে লাগিলেন। অষ্টৈত মার খাইয়া বাঁধনপাতি করিলেন না এবং তাহার মন ফিরিয়া গেল, তিনি উঠিয়া নিমাইয়ের চরণতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও শতমুখে ভক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নিমাই আচার্য্যকে ধরিয়া বলিলেন, “আপনি করেন কি, আমাকে ক্ষমা করুন” ইহা বলিয়া তাহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। কিছুকাল পরে নিদ্রোথিতের ভ্রাতা বলিলেন, “গৌসাই আমিত কিছু চপলতা করি নাই।” সকলে নিমাইয়ের এই সকল ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ইহার পরে গঙ্গারান করিয়া নিতাই, অষ্টৈত ও নিমাই ভোজন করিলেন। এখানে

আসিয়া প্রথমে বে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

শালিগ্রামবাসী গৌরীদাস পণ্ডিত গৃহত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের ওপারে অধিকা-কালুনার বাস করিতেন। ইনি একজন পরম ভক্ত। একদিন নিমাই নাকি একখানি বৈঠা ঝাড়ে করিয়া একাকী বাইরা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং বৈঠাখানি ঘায়া তাপিত জীবনকে ভবনদী পার করিতে উপদেশ দেন। গৌরীদাসের মৃত্যুর পর এই বৈঠাখানি নাকি তাহার প্রিয় শিষ্য হৃদয়চৈতন্য পাইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত গল্পটা ভক্তিরসাকরী লিখিত আছে। গৌরাক্ষ কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার কিছুদিন পরে গৌরাক্ষচন্দ্র তত্ত্বগণ লইয়া বিষ্ণুগৃহ-মার্জন ও নৌকার উঠিয়া নানাবিধ কৃষ্ণলীলা করিতে লাগিলেন।

প্রবাদ আছে যে নদীরার একপার্শ্বে জাহানগরে সারঙ্গদেব নামক একজন পরম সাধু বাস করিত। সারঙ্গদেব গৌরাক্ষের ভক্ত হইয়া উঠিলে গৌরাক্ষ তাহাকে একটা শিষ্য রাখিতে উপদেশ দেন। কিন্তু সারঙ্গদেব উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে প্রথমে কাহাকেও শিষ্য করিতে সম্মত হন নাই। শেষে গৌরাক্ষের কথামুসারে স্থির হইল যে প্রাতে যাহার মুখ দেখিবেন সারঙ্গদেব তাহাকেই শিষ্য করিবেন। পরদিন প্রত্যুষে সারঙ্গদেব গঙ্গাতীরে নয়ন মুদ্রিয়া জপ করিতে বসিলেন, কিছুকাল পরে একটা মৃত বালকের দেহ ভাসিয়া আসিয়া তাহার গায় লাগিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া ভাবিলেন যে, ‘কি আশ্চর্য্য! যাহাকে দেখিব, তাহাকেই মন্ত্র দিব, এ যে মৃত-দেহ দেখিলাম, এখন কি করি’ অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ‘গৌরাক্ষের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, দেখি কি হয়, ইহাকেই মন্ত্র দিব।’ সারঙ্গদেব মৃতবালকের কর্ণে মন্ত্র দিলেন, দেখিতে দেখিতে বালক চেতন হইল। কিছুকাল পরে নিমাই আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ইহাদের প্রেম উৎফলিয়া উঠিল, সকলে প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার আনিয়া শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল এবং নিমাইকে লেখ্য ভাবিত্ত আর কোন বাধা থাকিল না। পরে জানা গেল যে এই বালকের নাম মুরারি উপাধি গোষ্ঠাসমী, সরগ্রামে বাড়ী। ইহাকে স্নানান্তে সর্পে দংশন করে, সকলে মৃত ভাবিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়, তিনি ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছিলেন।

ক্রমে শ্রীমতাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যত উৎসব আছে, গৌরচন্দ্র তত্ত্বগণকে লইয়া সেই সমুদায়েরই অনুষ্ঠান করিতে

লাগিলেন। নিমাই বধন বে উৎসব করেন, তখন ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতে বোগ দিত। এই সময়ে নবদ্বীপে বাস্তবিকই সুখশ্রোত বহিতে লাগিল, সর্বদা হরিনাম-কীৰ্ত্তন ও ধর্মকথার সকলেই ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু একদল পাষণ্ড হিন্দু ও চুই মুসলমানের পক্ষে ইহা নিতান্তই অসহ্য হইল। গোঁড়রাজের দৌহিত্র চাঁদকাজী নামে জনৈক মুসলমান নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট কতকগুলি পার্ঠানসৈন্য থাকিত। রাজার আদেশে তিনিই এই স্থানের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাষণ্ড হিন্দু ও মুসলমানগণ কাজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কীৰ্ত্তন বন্ধ করিবার জন্ত প্রার্থনা করে, কিন্তু চাঁদকাজী প্রথমে কীৰ্ত্তনে বাধা দিতে সম্মত হন নাই। শেষে তাঁহার কর্মচারী ও হিন্দুগণের উৎপীড়নে থাকিতে না পারিয়া কীৰ্ত্তনে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে আজ হইতে নবদ্বীপে কেহ কীৰ্ত্তন করিতে পারিবে না, করিলে অর্থদণ্ড ও আবশ্যক হইলে জাতিনাশ ও প্রাণদণ্ডও হইতে পারিবে, নবদ্বীপবাসীরা তখন প্রেমে মত্ত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই কাজীর গুরুতর আদেশে কর্ণপাত করিল না, শেষে এক দিন কাজী স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া কোন একটা কীৰ্ত্তনস্থানে উপস্থিত হইয়া মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেন এবং নিজ মুখে সকলকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কীৰ্ত্তন ভঙ্গ করিতে অহুমতি করেন। এই বার সকলেরই ভয় হইল, কীৰ্ত্তন বন্ধ করিয়া বিশ্বস্তরের নিকটে সংবাদ দিতে চলিল।

নিমাই শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, “তোমাদের কোন চিন্তা নাই আমি আজই চুরাচার চাঁদকাজীকে জঙ্গ করিব।” নিমাই প্রচার করিয়া দিলেন যে সন্ধ্যার সময় সকলেই কীৰ্ত্তনের সাজ ও হস্তে একটা দীপ লইয়া যেন নিমাইর সহিত কীৰ্ত্তন করিতে যাব। সকলে তাহাই করিল। সন্ধ্যার সময়ে নিমাইচাঁদ দল বল লইয়া কীৰ্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। বৈষ্ণবগ্রেছে এই নগর-কীৰ্ত্তনের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

সৌরাস্র সদল বলে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তাঁহার লোকেরা কাজীর প্রতি কিছু দোষাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নিমাই সকলকে নিবারণ করেন। চাঁদ এই সকল লোকসমারোহ দেখিয়া প্রথমে পলায়ন করেন, শেষে নিমাই তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। নিমাইকে দেখিয়া কাজীর মন ফিরিয়া গেল, তিনিও একজন কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বস্তরের সহিত গোবধ করা হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়েরই অকর্তব্য এই সম্বন্ধে অনেক

বিচার হয়। তাহাতে কাজী পরাস্ত হইয়াছিলেন। কাজীদমন বিবরণটা চৈতন্যভাগবতে অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। এই কাজীর বংশধরগণও বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। এইরূপে নবদ্বীপ নিকটক হইল। বিশ্বস্তর কাজী-ভবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে শ্রীধরের জীর্ণ জলপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন।

নগর কীৰ্ত্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কঁচাট দিলেন। বাহিরের লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার একেবারেই কমিয়া গেল, দিবানিশি অবিরল ধারে নিমাইয়ের নয়নে অঙ্গধারা বহিতে লাগিল। দিন দিন কীৰ্ত্তন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ভক্তমণ্ডলী অধৈত্যাচার্য্যকে নায়ক করিয়া কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিমাইও মধ্যে মধ্যে কীৰ্ত্তনে যোগ দিতেন। এই সময়ে নিমাই মধ্যে মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িতেন এবং প্রায় সকল সময়ই ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন বিশ্বস্তর বিষ্ণুপূজা করিবেন বলিয়া স্বান করিয়া আসিলেন, পূজার আসনে বসিলেন, অমনি চক্ষুর জলে পরিধেয় কাপড়খানি ভিজিয়া গেল, কাপড় পরিত্যাগ করিয়া আবার বসিলেন, আবারও তাহাই হইল। এইরূপ চার পাঁচবার দেখিয়া নিমাই ভাবিলেন যে আমার দ্বারা আর বিষ্ণুপূজা হইবে না। তখন তিনি গদাধরকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “গদাধর! আমার অদৃষ্টে পূজা নাই, আজ হইতে তুমি বিষ্ণুপূজা কর।” এই দিন হইতেই নিমাইয়ের বিষ্ণুপূজা বন্ধ হইল, তিনি দিবানিশি নাম করিতে থাকিলেন।

বৈষ্ণবকবিগণ বলেন যে, তখন অধৈত গৌরচাঁদকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন নাই, তাই একদিন কীৰ্ত্তন সময়ে আচার্য্যের মনে বড়ই দৈন্ত উপস্থিত হয়। তিনি মনোহুঃখে শ্রীবাসের ভবনে কাতর হইয়া আর্তনাদ করিতেছিলেন। নিমাই জানিতে পারিয়া তথায় যাইয়া এবং আচার্য্যকে বিষ্ণুরূপ দর্শন কুরাইয়া তাঁহার ভ্রান্তি দূর করেন। ইহার পরে একদিন ভাগীরথী পুলিনের মনোহর বনরাজি-দর্শনে চৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মনে পড়িয়াছিল। তাহার পরে তিনি ভক্তগণ লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন।

এ সময়েও শ্রীবাস-ভবনে কীৰ্ত্তন হইত; সময়ে সময়ে বিশ্বস্তরও তাহাতে যোগ দিতেন। একদিন গৌরচাঁদ ভক্তগণের সহিত কীৰ্ত্তন করিতে করিতে বাহজ্ঞান হারাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণও প্রভুর সহিত কীৰ্ত্তনে নিমগ্ন। ওদিকে বাড়ীর মধ্যে শ্রীবাসের বালক পুত্রের মৃত্যু হইল, শ্রীবাসের নিকট খবর আসিল, তিনি জ্ঞপ্তপও করিলেন না পূর্বের ছায় প্রফুল্ল বদনে মৃত্যু কব্বিতে থাকিলেন। কিন্তু অপর ভক্তগণ এই সংবাদে হুঃখিত

হন। কিছুকাল পরে নিমাইয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি মৃত শিশুটিকে বাহিরে আনাইয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন মরা ছেলেটা নাকি এই ভাবে উত্তর দিল যে, “আমার এ অঙ্গতের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি ভাল স্থানে বাই-তেছি। প্রভো! তুমি কৃপা কর, তোমার চরণে যেন মতি থাকে।” নিমাই হাত উঠাইলেন, বালকও আবার মড়া হইল। এই ঘটনার জ্ঞানস্বরূপ পরিবারবর্গের হৃৎকের অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল, নিমাই সদলে সেই মৃত বালকের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন। এই সময়ে পুরাণাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণবিবরণে গোপীগণের বৈষ্ণব অবস্থার বর্ণনা আছে, নিমাইচাঁদেরও সেই সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণবকবিগণ ইহাকে কৃষ্ণবিবরণাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

এই সময়ে বিশ্বস্তর নিজ ভবনে থাকিয়া প্রায়ই নাম কীর্তন করিতেন। একদিন একজন চতুষ্পাঠীর ছাত্র নিমাইকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন নিমাই গোপীভাবে বসিয়া গোপীর নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। ছাত্র বলিল, “মহাশয়! আপনি পণ্ডিত, বলুন দেখি, কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করিয়া গোপ-বালার নাম জপ করেন কেন?” ইহাতে নিমাইয়ের রাগ হইল। তিনি দীর্ঘ লম্বুড় লইয়া তাহাকে মারিতে যান। এই ঘটনার পর হইতে নবদ্বীপের সমস্ত ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে। অধ্যাপকমণ্ডলী পূর্বে হইতে বিরুদ্ধ ছিলেন। বৈষ্ণব-কবিগণ বলেন যে, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার জন্তই নাকি প্রভু নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের ভাব যে, “সন্ন্যাসী হইলে ইহারাও আমার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করিবে এবং আমার ভক্ত হইবে।”

(চৈতন্যচরিত্র আদিলীলা।)

চৈতন্যমঙ্গলের মতে এই সময়ে নিমাই একটা স্বপ্ন দেখিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। স্বপ্নের মর্ম এই—কোন একজন মহাপুরুষ উপস্থিত হইয়া যেন নিমাইকে বলিতেছেন যে, “নিমাই কৈশর তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ, শীঘ্র সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন কর।” ইহা শুনিয়া নিমাই শিহরিয়া উঠিলেন, প্রথমে ভক্তগণ ও বালিকা জ্বর মায়ার ও জননীর স্নেহে সন্ন্যাস করিতে সম্মত হইলেন না। মহাপুরুষ তথাপিও সন্ন্যাস লইতে বার বার উপদেশ দেন। গৌর-চন্দ্র এই স্বপ্নবৃত্তান্ত অথবা পূর্বোক্ত মনোগত ভাব নিত্যানন্দ প্রভৃতি কএকটি প্রধান ভক্তের নিকটে প্রকাশ করেন। ক্রমে নবদ্বীপে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের জনরব রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার কিছুদিন পরে নবদ্বীপনগরে কোষধারতী আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি ভারতী সম্প্রদায়ের একজন উন্নত

সন্ন্যাসী, ভাষ্করদ্বীপ তীরস্থ কণ্টকনগরীতে (বর্তমান নাম কাঁটোরা) ইহার আশ্রয়। গৌরচন্দ্র নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া পথিমধ্যে ভারতীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, ‘মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে ইনিই কি তিনি? সে দিন স্বপ্নে কি এই মহাপুরুষকেই দেখিয়াছি।’ নিমাইয়ের মনে এই সকল আন্দোলন হইতে লাগিল। যত্ন করিয়া সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। রাজিতে সন্ন্যাসীর নিকটে বাইরা স্বপ্নবৃত্তান্ত ও মনোগত ভাব প্রকাশ করেন। ভারতীও তাহাতে সম্মত হইলেন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে দীকার দিন স্থির হইল।

ইহার পরে বিশ্বস্তর নিজেই ভক্তগণের নিকটে সংসার পরিত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিকটে ইহার কোন কথাই তিনি বলেন নাই।

১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির পূর্বদিনে বিশ্বস্তর প্রত্যুষ হইতে জীবাসভবনে উন্নতভাবে কীর্তন করিয়াছিলেন। রাজিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে রাজিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। শচী পূর্বে হইতেই গৃহপরিত্যাগের দিন জানিতেন, তাই তাঁহারও নিদ্রা হয় নাই। সে দিন গদাধর ও হরিদাস নিমাইয়ের বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছিলেন। রাজি চারিদিক থাকিতে গৌরচাঁদ ইষ্টদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং ভগবানের হস্তে মাতা ও পত্নীকে সমর্পণ করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে নাকি প্রিয়তমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া গৌরের হৃদয়ে বিকারের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে প্রিয়তমার মুখখানি চির দিনের মত আর একবার দেখিয়া লইলেন। গৌরচাঁদ কিছুকাল তত্ত্বিত থাকিয়া আপ-নার দুর্দশলতাকে শত শত ধিকার দিতে লাগিলেন এবং জোরে ঘাস খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়া গদাধর ও হরিদাস নিকটে আসিয়া সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করেন। গৌর তাহাদিগকে বারণ করিলেন। শচী-মাতা পুত্রের গমনোদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার জ্ঞান বাহির হারে আসিয়া বসিয়া আছেন। গৌরচন্দ্র জননীকে তদবস্থ দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন এবং জননীকে কত রকম উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু শচী তাঁহার কোনটার উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল নয়নজলে বুক ভাসাইয়া পুত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। বিশ্বস্তর শোকাভিভূতা পতিতা জননীকে প্রোক্ষণ করিয়া পথখুলি লইলেন এবং আর কিছু না বলিয়া দুয়ার খুলিয়া একেবারে বাটী হইতে

নিহা হইয়া চলিয়া গেলেন। নবদীপ অধার হইল। শচী দেবী স্মৃতিতে হইয়া জড়ের দ্বারা ধারণা পাইয়া থাকিলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া কালনিদ্রা তখনও ভাঙে নাই। গদাধর ও হরিন্দাস মাথার হাত দিয়া বিষ্ণুমণ্ডলের দ্বারে বসিয়া কাদিতে লাগিলেন। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই গৌরের হৃদয়ে যত প্রেম, যত ভাব, যত আনন্দ ভবিষ্যৎ জীবনের জ্যোতির্ময় আভাস একেবারে আগিয়া উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘর বাড়ী, মাতা, ভাৰ্য্যা ও বন্ধুগণ এ সকলের চিত্তা ভুলিয়া গিয়া আনন্দমাগরে মগ্ন হইলেন। গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, পড়িতে পড়িতে, ঢুলিতে ঢুলিতে কাঁটোয়ার পথে মন্থর গতিতে যাইতে লাগিলেন। দিন হইল, ক্রমে গৌরের গৃহত্যাগের সংবাদ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে রাষ্ট্র হইল, 'সকলেই প্রভুর বিচ্ছেদযন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আগিয়া পতিকে শয্যার না দেখিয়া ছুটিয়া শচীর নিকটে আসিলেন এবং শোকে অধীর হইয়া কাদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য এবং ব্রহ্মানন্দ এই পাঁচজন গৌরের নিবেদন না মানিয়া ক্রমশঃ তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার সহিত পথে মিলিত হন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে বন্ধুগণের সহিত কেশব-ভারতীর কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন।

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের মত লইয়া উপরোক্ত ঘটনা লিখিত হইল, কিন্তু কবিকর্ণপুর স্বরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থে সন্ন্যাসযাত্রার বৃত্তান্তটা অন্তরূপ লিখিয়াছেন। তাহার মতে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসগ্রহণের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কেবল শচীকে ঈর্ষিতে বলিয়াছিলেন যে কোন প্রয়োজনে গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্ত তীর্থ গমন করিবেন, শচী যেন তাহাতে উদ্বিগ্ন না হন। যে রাত্রিতে গৌরাক চলিয়া যান, তাহার পরে শচী গৌরাকে ঘরে না দেখিয়া মনে করিলেন যে বিশ্বস্তর শ্রীবাসগৃহে কীৰ্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মনে করিলেন যে প্রভু নিজ ভবনে গমন করিয়াছেন। রাত্রিক রাত্রির কীৰ্ত্তন সমাধা করিয়া ভক্তগণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলে গৌর গৃহে যাইবার ব্যপদেশে বাহির হন। তাহার সঙ্গে কেবল আচার্য্যরত্ন ছিলেন। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। ইহারা তিন জনে গঙ্গাপার হইয়া কাঁটোয়াভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দূর অবস্থানে ভারতীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হন। প্রভুকে

গৌর নবদীপে নাই জনরব হইল, শচী ও ভক্তগণ কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে আচার্য্যরত্ন কাঁটোয়া হইতে কিরিয়া আসিলে রহস্ত প্রকাশিত হইল।

যখন শ্রীগৌরাক কেশবভারতীর কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রদোষ সময়। সন্ধ্যার ক্ষীণলোকে গৌরচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যেন স্বপ্নের সেই ছবি সেইস্থানে বেড়াইতেছে, তাহার হৃদয় অমনি প্রেমে পুলকিত হইল। ভারতী গোঁসাই মনুষ্যের পদ শব্দ পাইয়া বাহিরে আসিয়া সঙ্গীগণ সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া প্রেম পুলকিত অন্তরে আলিঙ্গন করিলেন। গৌরাক যথারীতি ভারতীর পদবন্দনা করিয়া গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং পর দিন তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা করিতে হইবে তাহাও জানাইলেন। কেশব-ভারতী প্রথমে তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। একে তাঁহার নবীন বয়স, তাহাতে আবার গৃহে বালিকা পত্নী ও বৃদ্ধা জননী ইত্যাদি ভাবিয়া সন্ন্যাসী কেশবের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'নিমাই! সত্য সত্যই তোমাকে সন্ন্যাসী করিতে আমার হৃদয় কাঁপি-তেছে।' গৌরাকও প্রেমে বিহ্বল হইয়া করজোড়ে সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্ত অরুরোধ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে আবেগে হরি বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সময় বুঝিয়া মুকুন্দ স্তম্ভুর স্বরে সংকীৰ্ত্তন জুড়িয়া দিলেন, গৌরের নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল, তিনি মহাভাবে বিতোরা হইয়া উঠিলেন। কীৰ্ত্তনের কোলাহলে চারিদিক হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল। মনোহর গৌরমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। কেশবভারতী গৌরের এইরূপ অবস্থা কখন দেখেন নাই, তাই তিনি বালকের বৈরাগ্য অসম্ভব ভাবিয়া অস্বীকার করেন। এখন গৌরের মহাভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'নিমাই তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। আমি তোমার কথার অমত প্রকাশ করিয়া অপরাধী হইয়াছি, তুমি যাহা বল আমি তাহাই করিব।' গৌরচন্দ্র এই আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'গুরুদেব! আমি স্বপ্নে যে মন্ত্রটা পাইয়াছি দেখুন, দেখি সে মন্ত্রটা সিন্ধু কি না।' এই বলিয়া ভারতীর কাণে সেই মন্ত্রটা বলিলেন। ভারতী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইল না। প্রভাতে নিমাইয়ের কথাষাসারে আচার্য্যরত্ন দীক্ষার উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিলেন। গৌরচন্দ্রও প্রাণ ভরিয়া কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্বেই গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাই পল্লীর সন্ন্যাস-মতি নর নারীগণ দধি, দুগ্ধ, যত, চিনি, তাম্বুল ও বস্ত্র প্রভৃতি

ভারতী ঠাকুরের কুটীরঘারে আনিয়া সজ্জিত করিল, দেখিতে দেখিতে সম্যাসদীকার উপবোধী সমস্তই আসিল। এদিকে গৌরচন্দ্র কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিলেন। সংকীৰ্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিক্ হইতে নর নারী, বালক বালিকা ছুটিয়া আসিয়া ভারতীর কুটীরঘার ঘেরিয়া দাঁড়াইল। গৌরের মোহনমূর্তি ও তৎকালের ভাব দেখিয়া সকলেই কাঁঠপুতলিকার জায় দাঁড়াইয়া থাকিল, গৌরচন্দ্রের সম্যাস, তাঁহার ও পত্নীর অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া সকলেরই নয়ন বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৈষ্ণব কবিগণ নাগরিক-গণের এই সময়ের অবস্থা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে নিতান্ত প্ৰমাণ হৃদয়ও পলিয়া যায়।

ক্রমে বেলা অবসান হইতে চলিল, তখনও গৌরচন্দ্রের প্রেমাবেগের সঞ্চার হইল না। অবশেষে নিতাইয়ের ঈর্ষিতে গৌরচন্দ্র একটু স্থির হইয়া বসিলেন। তখন গৌরের মুণ্ডন করিবার জন্ত একজন নাপিত ডাকা হয়। নাপিত আসিয়া গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বসিল। প্রভুর সুন্দর কেশরাজি চিরদিনের তরে অস্তিত্ব হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাহা দেখিয়া শুনিয়া দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় গলিয়া গেল, তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল। নাপিত ক্ষুর তুলিবে কি, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌরচন্দ্রও প্রেমাবেগে নানাবিধ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজেই কৌরকর্ষে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। চৈতন্যমঙ্গলের মতে নাপিত মুণ্ডন করিতে অস্বীকার করায় গৌরচন্দ্র তাহাকে কাতরন্বরে অনেক বলিয়াছিলেন। শেষে নাপিতও হরিনামে মত্ত হইয়া গৌরের হাত ধরিয়া নৃত্য করিয়াছিল।

এই সময়ে চাকন্দীগ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য গৌরচন্দ্রের মুণ্ডন দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বেলা অবসান হইয়া আসিল, নাপিত কোন মতে নরনজলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৌরকার্য্য সমাধা করিল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে ছড়াছড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। গৌরভক্তমণ্ডলী ঐ কেশগুলিকে গঙ্গাতীরে মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখিয়া রাখিয়াছেন ও তাহার উপরে একটী মন্দির উঠান হইয়াছে। কাঁটোরার অজ্ঞাপি সেই স্থান প্রভুর কেশসমাধি নামে বিখ্যাত, ভক্ত বৈষ্ণবগণ তথায় যাইয়া প্রেমানন্দে গড়াগড়ি করিয়া প্রাণ লীভল করেন।

নাপিতের কার্য্য শেষ হইলে প্রভু দ্বান করিতে গেলেন,

দর্শকমণ্ডলীও হাহাকার করিয়া দৌড়াইয়া চলিল। নাপিত অজ্ঞপ্তি মাথার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গার বাইরা অজ্ঞপ্তি ঘুরে নিক্ষেপ করিল। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, নাপিত যে হাতে প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে, সে হাতে আর কাহারও কৌরকার্য্য করিবে না, জন্মের মত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে স্থির করিয়াই অজ্ঞপ্তি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রভু দ্বান করিয়া আদ্রবসনে ভারতীর নিকটে আসিলেন, অপর সকলেও প্রভুর জায় ভিজা কাপড়ে হরিনাম করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতী তিন খণ্ড বস্ত্র হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার একখানি কোপীন আর দুইখানি বহির্বাশ। গৌরাজ আসিলে ভারতী সেই তিনখানি বস্ত্রখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ বসন মস্তকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন, “ভাই বন্ধু! বাবা! মা! তোমরা অমুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হইব। তোমরা আমার আশীর্বাদ কর, যেন আমি কৃষ্ণ পাই।” এই কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডলীর চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ভারতী কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচন্দ্রের কর্ণে সম্যাসমন্ত্র দিলেন। কেশবভারতী মন্ত্র দিয়া নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন ভাবিতে লাগিলেন। অনেককণ ভাবিয়া নিমাইয়ের বৃকে হাত দিয়া বলিলেন, “বাপ নিমাই! তুমি জীবমাত্রকে ত্রীকৃষ্ণ চৈতন্য করাইলে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম হইল ত্রীত্রীকৃষ্ণচৈতন্য।” এইরূপে মহাপ্রভুর নামকরণ হইলে সেই নামটী মুখে মুখে সকলে শুনিতে পাইলেন, তখন কেহ কৃষ্ণ কেহ বা চৈতন্য বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পূর্ব কথিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য গৌরের ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়া “চৈতন্য চৈতন্য” করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দৌড়িয়া চলিল। তদবধি তাহার মুখে “চৈতন্য” ভিন্ন আর অল্প কথা উচ্চারিত হইল না। গ্রামবাসীগণ তাহাকে কেপা মনে করিয়া চৈতন্যদাস নামে ডাকিতে লাগিল। গৌরচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর ইনি বৈষ্ণবধর্মকে রক্ষা করেন।

কিয়ৎকালের মধ্যেই সেই জননব খামিয়া গেল। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কাঁঠপুতলিকার জায় দাঁড়াইয়া থাকিল। এই সময়ে নাকি দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সম্যাসী হইয়াছিলেন। গৌরাজ করযোড়ে “আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও” এই কথা

বলিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। গদাধর সঙ্গী হইবার প্রার্থনা করার তাহাকে নিবেদন করেন। ভারতী তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়াছিলেন। গৌরাক্ষ সেই নবীন বয়সে, কাঁজালবেশে দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে দাঁড়াইয়া সকলের নিকটে কৃষ্ণ নাম তিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। আহা! তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে গৌরের বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া আসিল, মনে ভাবিতে লাগিলেন এক নিম্নাসে বৃন্দাবনে যাইবেন। তাই তিনি পশ্চিমদিকে দৌড়াইয়া চলিলেন। ইহা দেখিয়া নরহরি, দামোদর ও বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিলেন এবং সেইখানে উপস্থিত সহস্রাধিক দর্শকবৃন্দও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে হড়াহড়ি করিয়া দৌড়িতে লাগিল।

গৌরাক্ষ প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, শেষে দেখিলেন যে লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই, তখন অতি মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি প্রাণনাথের উদ্দেশে যাইতেছি, আমাকে বাধা দিওনা।’ এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর ও ভারতী প্রভৃতি আসিয়া গৌরাক্ষকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতী সঙ্গে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করার গৌরাক্ষ স্বীকার করিলেন।

এই সময়ে চন্দ্রশেখর প্রভুর নয়নগোচর হন। নিমাই এ পর্যন্ত রাধাভাবে আপনাকে হারাইয়া প্রাণেশ্বরের নিকটে যাইবার জন্ত উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহার আর কিছুই মনে ছিল না। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, নবদ্বীপ মনে পড়িল, জন্মভূমি, ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধা জননী, প্রাণাধিক ভক্তগণ ও প্রিয়তমা নবীনভার্যা এই সকলই ধীরে ধীরে তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে গৌরের নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি বসিয়া চন্দ্রশেখরের গলা ধরিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘বাপ! তুমি বাড়ী যাও। আমার জননীকে তুমি যাইয়া সান্তনা করিও। দেখিও তিনি যেন আমার বিচ্ছেদে প্রাণে না মরেন। আর যাহারা আমার নিমিত্ত হুঃখ পাইতেছে, তাহাদিগকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে তাহাদের নিমাই এ জন্মে কেবল আত্মীয় স্বজনকে হুঃখ দিতে জন্মিয়া ছিল। তাহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। ঘরে তাহাদের বলিও যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছে, সেই অবধি তাহার প্রাণ তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে।’ বলিতে বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল;

আবার প্রেমে বিহ্বল হইয়া ‘প্রাণব্রত! আমি এই আই-লাম’ বলিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। সমুদায় লোক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইল। কাঁটোয়ার পশ্চিমে তখন বন ছিল, দেখিতে দেখিতে প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন। সকল লোকও তাঁহার অনুসরণ করিয়া বনে প্রবেশ করিল। নিমাই দৌড়াইয়া যাইতেছেন, লোক সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না, কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রভু সকলকে পাছে রাখিয়া নিবিড় বনে অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রাণপণে তাঁহার সহিত দৌড়াইতে লাগিলেন। প্রভু কমণ্ডলুটি কটির ডোরে বাঁধিয়া হাতে নূতন বংশদণ্ডটি লইয়া বিছাতের ছায়া দৌড়াইতেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়াইতে না পারিয়া পশ্চাৎ হইতে ‘প্রভো! একটু অপেক্ষা কর, আমরা আর পারি না।’ ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতেছেন, প্রভু তাহাতে ‘হাঁ’ কি ‘না’ কিছুই বলিতেছেন না। ভক্তগণের মধ্যে কেবল নিতাই প্রভুর পশ্চাতে অল্পদূরে, তাহা ছাড়া আর সকলেই অনেকদূরে পড়িয়াছেন। এখন আর প্রভুর দিগ্বিদিক জ্ঞান বড় একটা নাই। পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর পরমভক্ত। প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া নির্মমের ছায়া চলিয়া গেলেন এই কারণে জাহার মনে বড়ই দৈদ্য উপস্থিত হইল। পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিকে ঘৃণা করে, সেই বারানসীধামে যাইয়া গৌরাক্ষের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর।

দৌড়িতে দৌড়িতে বিশ্বস্তর মুচ্ছিত হন, কিছুকাল পরে মুচ্ছা ভঙ্গ হইলে আবার দৌড় মারিলেন, তাঁহার নিকটস্থিত ভক্তগণের প্রতি একবার লক্ষ্যও করিলেন না। সন্ধ্যার পূর্বে নিমাই অতিশয় ক্রতবেগে ধাবিত হইলেন, এবারে নিত্যানন্দও তাঁহার পশ্চাৎগামী হইতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, ভক্তগণ বিষন্ন মনে অধোবদনে দাঁড়াইলেন। ‘নিমাই কোথায়!’ সমুদয়ের প্রাণে প্রবেশ করিয়া বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ কোন খবর বলিতে পারিল না। সকলে বসিয়া রহিল। কাহারও আহার নিদ্রা নাই, কষ্টে রাত্রি শেষ হইল। এমন সময়ে তাহারা কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ভক্তগণ সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মাঠের মধ্যে যাইয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের কৃষ্ণচৈতন্য একটা অশ্বখবৃক্ষের তলে বসিয়া শূন্যগাত্রে একখানি কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, ‘প্রাণনাথ! কৃষ্ণ! আমি কি দর্শন পাইব না, আর যে সহিতে পারি না, এখন দেখা দেও।’

ইত্যাদি কবিতাসমূহক বাক্য উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে-
ছেন। একটু পরে প্রভু আবার উত্তিষেন, উত্তীর্ণা পশ্চিম
মুখে চলিলেন। ভক্তগণ তাঁহার নিকটে, ভক্তা লক্ষ্য করিতে
পারিলেন না। নিমাইয়ের এই সময়ের গমন বিবরণ এইরূপ
বর্ণিত আছে—

“অগ্রে পশ্চাতে কিছু না কর বিচার।

সকল ইন্দ্ৰিয়বৃত্তি হীন কলেবর।

কোথা যান ইতি উত্তি নাহিক ঠাওর।

পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।

পথপানে নাহি চান ঘূর্ণিত নরান।

কখন উন্নত প্রায় উঠেন উন্নতানে।

কখন বা গর্ভে পড়ে তাহা নাহি জানে।

চলি চলি কখন পড়েন ঘাই জলে।

কখনও প্রবেশে বনে চকু নাহি মিলে ॥”

(প্রেরদাস কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকানুবাদ)

নিমাই বাইতে বাইতে হঠাৎ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের—

“এতাং সমাহার পরান্ননিষ্ঠা

মধ্যাসিতাং পূর্বতনৈর্মহতিঃ।

অহস্তরিক্ষামি হুরন্তপারং

তমো মুক্ত্যামি নিষেবয়ৈব ॥”

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সাধু! সাধু!
হে ব্রাহ্মণ তুমিই সাধু। আমিও বৃন্দাবন বাইরা তোমার মত
ঐমুকুন্দের সেবা করিব।” বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে এই
সময়ে নবদ্বীপে ভক্তগণ ও নিমাইয়ের আত্মীয় স্বজন তাঁহার
বিচ্ছেদে কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল, নিমাইয়ের
অস্তর মধ্যে মধ্যে তাহাতে আকৃষ্ট হইত, কেবল তিনি স্বকীয়
বিবেক বলে সেই সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন।

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাঢ়দেশে ঘুরিতেছেন, বৃন্দা-
বনের নিকট এক পাও বাইতে পারিতেছেন না। প্রভু প্রথম
দিনে যেখানে, তিনদিনের দিনও প্রায় সেখানে, অথচ তিন
দিবস অবিশ্রান্ত হাঁটিতেছেন। এইরূপে তিন দিন তিন
রাত্রি চলিয়া গেল, প্রভু জলম্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণও করেন
নাই। প্রভু বধন অচেতন হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন
যে, তাঁহাকে কোন গতিকে শান্তিপুরে অধৈতের বাড়ীতে
নইয়া বাইবেন। প্রভু ঈশটোরা হইতে গমন করিয়া অনেক
দূরে গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপূর্ণ পথে
ছই চারি কোশ দূরে। ভক্তগণ নানা কৌশলে তাঁহাকে এত
নিকটে আনিয়াছেন। নিমাই নরন অর্ধমুদ্রিত করিয়া চলিয়া-
ছেন, দিগ্বিদিক বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। এইরূপ

দেখিয়া প্রভুকে কিরাইতে পারিলেন বলিয়া ভক্তগণের মনে
আশার লক্ষণ হইয়াছে। সেখানে মাঠে রাখাল বালকেরা
গোক চরাইতেছিল। প্রভুকে দেখিয়া তাহারা হরিবোল দিয়া
উল্লসিত, পেরে আনন্দে সকলেই হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে
লাগিল। বালকজনমুখ নিমাই হরিনাম শুনিয়া দাঁড়াইলেন,
জান হইল, চকু খেলিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাগ রাখাল-
গণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাও, বাগ! আমি বহু
দিন হরিনাম শুনি নাই। তাই একরূপ মরিয়া আছি, তোমরা
আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।” রাখালগণ আবার
হরিনাম বলিয়া আচিতে লাগিল। নিমাই আত্মদিকগে বৃন্দা-
বনে বাইবার পথ জিজ্ঞাসা করেন। নিত্যানন্দের সঙ্কেত
অনুসারে তাঁহার শান্তিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু সেই
পথ ধরিলেন।

সেই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে শান্তিপু্রে বাইরা
অধৈতাচার্য্যকে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন
যে, অধৈতকে সংবাদ বলিয়া বাড়ী বাইরা প্রভুর সন্ন্যাসের
কথা প্রকাশ করেন। এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপবাসীরা নিমাইয়ের
সন্ন্যাসসংবাদ জানিতে পারে নাই।

প্রভু শান্তিপুরের প্রশস্ত পথ ধরিলেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ,
তাঁহার পিছনে একটু দূরে গোবিন্দ ও মুকুন্দ। এই সময়ে
নিমাইয়ের কিছু জ্ঞান হইয়াছে। তিনবার “এতাং সমাহার”
ইত্যাদি শ্লোকটি পড়িয়া বলিলেন, “সাধু! সাধু! ব্রাহ্মণ!
তোমার সঙ্কর জীবমাজেরই অনুকরণ করা উচিত।” এই
রূপ বলিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় বুঝিলেন যেন কেহ
তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে। বুঝিয়াও পূর্বের জ্ঞান নির্নিমেধ
নয়নে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃন্দাবন আর কত-
দূর।” নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন “বৃন্দাবন আর অধিক দূরে
নাই।” নিত্যানন্দ পরিচয় দিবার জন্য পথ আগুগিয়া দাঁড়া-
ইয়া বলিলেন, “আমি নিত্যানন্দ।” এই কথা শুনিয়া প্রভু মুখ
উঠাইয়া নিতাইয়ের পানে চাহিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন
না, তাঁহাকে চিনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন
সময় নিতাই প্রভুর ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “প্রভো! চিনিতে
পারিতেছ না? আমি তোমার নিত্যানন্দ।” অনেক পরে
নিমাই নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, “শ্রীপাদ!
তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? আমি বৃন্দাবনে বাইতেছি,
তুমি কি এখানে আমাকে ধরিলে?” নিতাই বেশী কথা
না কহিয়া চলিতে লাগিলেন, প্রভুও চলিলেন। নিমাই “কৃষ্ণ
আমার দর্শন দিবেন ত? আমি বৃন্দাবনে বাইরা কি করিব?”
ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, নিতাইও সংক্ষেপে উত্তর

দিতে লাগিলেন। কিছুদূর বাইরা প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “শ্রীপাদ! বৃন্দাবন আর কতদূর আছে।” নিতাই বলিলেন “বৃন্দাবন অতি নিকট।” কিছুদূর বাইরা নিমাইয়ের ব্যগ্রতা নিবারণের জন্য গঙ্গার তীরবর্তী একটি বটবৃক্ষকে বৃন্দাবনের বংশীবট ও গঙ্গাকে বমুলা বলিয়া বুঝাইয়া দেন। দেখিতে দেখিতে প্রভু গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইয়া বমুলা তাবিয়া স্বপ্ন প্রদান করিলেন। স্বাপ্ন দিবস সময়ে এই স্রোকটা পাঠ করিয়াছিলেন।, বুঝা—

“চিদানন্দভানোঃ মদানন্দমুদোঃ

পরশ্রমপাত্রী জবতঙ্গগাত্রী।

অদ্বানন্দ লবিত্রী অগংগেমধাত্রী

পবিত্রী জিরাঙ্গো বপু ক্ষিত্রপুত্রী ॥” (চৈতন্যচন্দ্রোদয়)

নিতাইয়ের সংবাদ শুনারে অষ্টৈতাচার্য্য ও নৌকা লইয়া তথার উপস্থিত ছিলেন। নিমাই স্নান করিয়া উঠিলে অষ্টৈত তাঁহার নিকটে গেলেন, নিমাই অষ্টৈতকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন এবং নিতাই তাহাকে তুলাইয়া আনিয়াছেন, তিনি বমুনাম্রমে গঙ্গার স্নান করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। আচার্য্য অনেক প্রবোধ দিয়া নিমাইকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। আচার্য্যের যত্নে নিমাই তিনদিন তিন রাত্রি উপবাসের পর অষ্টৈতের গৃহে ভিক্ষা (ভোজন) করিলেন। ভোজন সময়ে মুকুন্দ ও হরিদাসকে তাঁহার নিকটে বসিয়া খাইতে বলেন, তাহারা হীনজাতি বলিয়া খাইতে অস্বীকার করার বাহিরে বসিয়া খাইতে বাধ্য হয়। নিমাইয়ের আগমন বার্তা শুনিয়া অষ্টৈতভবনে লোকারণ্য হইল। সন্ধ্যাকালে আচার্য্য প্রভুকে লইয়া কীর্ত্তন করেন। এদিনেও নৃত্য করিতে করিতে প্রভু উন্মত্ত হন, শেষে নিত্যানন্দ অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। প্রভুর অমুমতি মত নিতাই নবদ্বীপে বাইরা তাহাদিগকে নিমাই দর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরে আসিতে বলেন, বিবাদপূর্ণ নবদ্বীপ এ সংবাদে একেবারে আলোকিত হইল, সকলেই উৎসাহে মাতিয়া শান্তিপুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়াও স্বামী-দর্শন-লালসার সাজসজ্জা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বহুদিনের আশা মিটিল না। নিতাই বলিলেন, যে প্রভু নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই যাইতে অহুমতি করিয়াছেন, কিন্তু পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার বাইবার অহুমতি নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়-কাটিয়া কালা আসিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বৈষ্ণব আসিয়াছিলেন সেই রূপেই চলিয়া গিয়া চিরবিরহশরনে পড়িয়া থাকিলেন। তাঁহার অলৌকিক মুখশ্রী ও তৎকালের ভাব দেখিয়া সকলেই মোহিত ও অকুল

বিবাদসাগরে নিমগ্ন হইরাছিলেন। ইতিপূর্বে নবদ্বীপে কতকগুলি লোক নিমাইয়ের বিরোধী ছিল, তাহারা যখন শুনিল যে সেই কমলীরমুর্তি বৃক নিমাই রাজভোগ ছাড়িয়া কালালের বেধে সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, আর গৃহে আসিবেন না, আর পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াকেও নয়নে দেখিবেন না। তখন তাহাদের অজ্ঞান-বননিকা বসিয়া পড়িল। সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হৃদয় গলিয়া গেল, নিমাইকে দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইলেন। শতী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন। নবদ্বীপ প্রায় লোকশূন্য হইয়া উঠিল। কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া একটা সখীর সহিত অঝোর নয়নে কাঁদিতে থাকিলেন।

এদিকে শান্তিপুরে অষ্টৈতের বাড়ীতে সহস্র সহস্র লোক আসিতে লাগিল, লোকসমষ্টি বেশী হইলে অষ্টৈত বলবান লোক দ্বারে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকেই প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনোহঃখে দ্বারে থাকিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। অষ্টৈত তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে নিমাইকে লইয়া ছাদের উপরে উঠিলেন। ভক্তের বাসনাপূর্ণ হইল; তাহারা নরন ভরিয়া প্রাণকান্ত গৌরানকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ইহাদের নরন ও মনের পরিতৃপ্তি নাই। যে একবার দেখিল, তাহার গৃহে যাইবার ইচ্ছা রহিল না।

এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে লোকবৃন্দ আসিয়া অষ্টৈতভবনে উপস্থিত হইল। গৌরান্দ্র দেখিলেন যে শতীমাতা দোলায় চড়িয়া আসিয়াছেন। অমনি ছাদ হইতে নামিয়া শতীর চরণে পড়িয়া গেলেন। শতী প্রাণধন নিমাইটাদকে কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, “বাপ! নিমাই! বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া আর আমাকে দেখা দেয় নাই। স্বপ্নে তুমিও যদি নিষ্ঠুর হও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব।” নিমাই জননীক চরণে বার বার নমস্কার করিয়া বলিলেন, “মা! এ শরীর তোমার, চিরজীবনেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। যদিও না জানিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, তথাপি তোমাকে কখনও তুলিতে পারিব না। তুমি যাহা বলবে আমি তাহাই করিব।” আচার্য্যর শতী ও নিমাইকে অভ্যস্তরে লইয়া গেলেন। যে যে ভক্ত প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল নিমাইটাদ মধুরবাক্যে সকলকেই সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন আচার্য্যগৃহে থাকিয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন, যে, ‘সন্ন্যাসীর একস্থানে অনেকদিন বাস

করা উচিত নহে, আমি হানাত্তরে যাইব।' এ কথায় সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। শচীমাতাও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, নিমাই নীলাচলে থাকিবেন। কারণ সেখানে এদেশীয় লোক মধ্যে মধ্যে বাইরা থাকে, তথায় থাকিলে শচী প্রায়ই নিমাইয়ের সংবাদ পাইবেন। নিমাইও জননীর কথায় সন্মত হইলেন এবং ভক্তগণকে বলিলেন, “বাপ ধন! তোমরা সকলেই আমার প্রাণতুল্য। প্রাণ থাকিতে তোমাদিগকে ভুলিতে পারিব না। তোমরা সকলেই ঘরে বাইরা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণ-আরাধনা করিয়া দিনাতিপাত কর। আমি নীলাচলে চলিলাম, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমাদের সহিত দেখা করিব এবং তোমরাও সময় মত আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।” প্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু নিমাইয়ের কথার পর কথা বলিতে কেহই সাহস করিল না। তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুকে নমস্কার করিয়া গৃহে বাইরা তাঁহার অহুমতি প্রতিপালন করিতে লাগিল। আচার্য্যরত্নের অহুরোধে গৌরাঙ্গচন্দ্র আরও কএকদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। পরে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ এই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর আঁধার করিয়া ছত্রভোগপথ দিয়া নীলাদি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় জননীর প্রতিপালনের ভার অষ্টৈতাচার্য্যকে অর্পণ করিলেন।

(চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস গৌরচন্দ্রের সম্মান গ্রহণ পর্যন্ত আদিলীলা এবং তাঁহার উদ্ভাদ অবস্থায় তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ অবধি মধ্যলীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।)

এই সময়ে গমনাগমনের বড়ই অসুবিধা ছিল, নৌকাপথে জলদস্যু ও তীরপথে ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর ভয়ে গমনাগমন সকলের সাহসে কুলাইত না। ইহা ছাড়া পথরক্ষক রাজপুরুষগণের উৎপীড়নে অনেক পথিকই প্রাণ হারাইতেন। কিন্তু চৈতন্যের হৃদয় ভয়শূন্য, তিনি নির্ভীক চিত্তে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইলে নিকটস্থ গ্রামে বাইরা ভিক্ষা করিতেন। তিনি যে গ্রামে যাইতেন, যে গ্রামবাসীরা একবার তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিত, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিত। চৈতন্য এক গ্রামে একদিনের বেশী ভিক্ষা করেন নাই। একদিন পথে বিপদ ঘটিল, উপযুক্ত অর্থ না দিলে কেহই পার করিতে চায় না। সম্মানী চৈতন্যচন্দ্র নিঃসম্বল, কমণ্ডলু, বহির্বাস ও বংশ দণ্ডটী ভিন্ন আর কিছুই সম্বল নাই, অথচ দানীরাও অর্থ না পাইলে ছাড়িবে

না; প্রভু তাহাদিগকে বলিলেন, “বাপ সকল! আমরা সম্মানী, টাকা কড়ি কোথা পাইব, আমাদের পায় করিলে তোমাদের পুণ্য হইবে।” তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্য বাদরার উদ্রেক নাই, তাহারা সে কথা শুনিয়া না, শেষে চৈতন্যচন্দ্র শক্তি বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, দেখিয়া শুনিয়া দানী পুরুষগণের হৃদয় তিজিয়া গেল, তাহারাও “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি হরি!” বলিয়া নাচিতে কাঁদিতে হাসিতে লাগিল। চৈতন্যের পায় পড়িয়া পরম সমাদরে পার করিয়া দিল। পথে আর কোন বিষ হইল না, চৈতন্যচন্দ্র সঙ্গীগণের সহিত রেমুণার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে গোপীনাথ নামক একটা দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমাবেগে অনেক নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবির মতে শ্রীচৈতন্য এখানে উপস্থিত হইবামাত্র গোপীনাথদেবের চূড়ার পুষ্প তাঁহার উপহারের জন্ত খসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে চৈতন্য অতিশয় আনন্দিত হন। গোপীনাথের সেবকগণ প্রভুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া সে রাত্রি সেইস্থানে রাখিয়াছিলেন। গোপীনাথের প্রসাদী ক্ষীর খাইয়া তিনি অতিশয় শ্রীতিলাভ করেন। পূর্বে ঈশ্বরপুরীর মুখে এই গোপীনাথের ক্ষীর চুরি করার বিষয় যে অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছিলেন, প্রভু সেই গল্পটী ভক্তগণকে শুনাইয়া বড়ই হর্ষপ্রকাশ করিলেন। [কস্তাভজা ২২১ পৃ দেখ।] গৌরচন্দ্র পুরীর প্রশংসা করিতে করিতে পুরীকৃত—

“অস্বিনীদীন দয়ার্জন্য হে মধুরানাথ কদারলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দরিত। ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥”

এই শ্লোকটী পড়িয়া মুগ্ধিত হন। পরদিন সেই স্থান হইতে চলিলেন। কিছুদিন পরে যাজপুরে উপস্থিত হন। যাজপুরে বরাহ মূর্ত্তি দর্শন ও প্রেমাবেগে নৃত্যগীত করিয়া কটক বাইরা গোপাল দর্শন করেন। গোপাল দর্শনে প্রভুর ভাবাবেশ উপস্থিত হয়, আবেশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গোপালের স্তব করেন। নিতাই লাক্ষীগোপালের অলৌকিক প্রস্তাব বলিলে চৈতন্য আরও হর্ষযুক্ত হন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে, চৈতন্য গোপালের নিকটে লাড়াইলে ভক্তগণ উভয়কেই একরূপ দেখিত। এক রাত্রি এই স্থানে থাকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করেন। চৈতন্য যে গ্রাম দিয়া গমন করেন বা যে স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করেন, সেই স্থানবাসীরাই তদনুগতপ্রাণ ও বৈষ্ণব হইয়া প্রেমে মাতিয়া উঠিতে লাগিল। চৈতন্যচন্দ্র স্বীয় অমোঘ শক্তি সন্মার করিয়া সমস্ত পথ কৃষ্ণপ্রেমে মাতাইয়া ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন। তৎপরে কমলপুর, ভার্গবী নদীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিতে যান। যাইবার সময় নিতাইয়ের হস্তে দণ্ডটী অর্পণ করিয়া—

ছিলেন। নিত্যানন্দ দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া ভাসাইয়া দেন। নিতাইয়ের এইরূপে দণ্ড ভাঙ্গিবার কারণ কি! কেমনই বা চৈতন্য তাঁহাকে দণ্ড অর্পণ করেন? বৈষ্ণব কবিগণ ইহার কোন বীরাঙ্গো করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

“বুঝিতে না পারে কেহ ছই প্রভুর মতি ॥

ইহা কেমন দণ্ড ভাজে তিহৌ কেন ভাঙ্গার।

ভাঙ্গাইয়া ক্রোধ তিহৌ এছোত তরায় ॥

দণ্ডভঙ্গলীলা এই পয়স গভীর।

সেই বৃক্ষে দুহার পদে বার ভক্তি ধীর ॥”

(চৈ' চরি' মধ্য' ৫ পরি')

চৈতন্য কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া হর্ষগদগদ চিত্তে রাজ-পথে চলিতে লাগিলেন। অগরাথ নিকটবর্তী, অনতিবিলম্বেই দর্শন পাইবেন, এই ভাবিয়া চৈতন্যের হৃদয়াবেগ উখলিয়া উঠিল। স্বেদ, কম্প, অঙ্গ প্রভৃতি সান্বিত ভাব এক একটা করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখন অগরাথ-মন্দির তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত, চৈতন্য এই স্থান হইতে মন্দিরের দেউল দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। দণ্ডবৎ হইয়া মন্দির উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে হাসিতে হাসিতে, গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে, ও কাঁদিতে কাঁদিতে গোর সমলে আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া গোরাক্ষের বাহুজ্ঞান হইল। তিনি নিতাইয়ের নিকট দণ্ড চাহিলে নিতাই প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিয়া বলিলেন, “তুমি প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া দণ্ডের উপরে পড়িয়াছিলে তাহাতে দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া কোথায় গিয়াছে জানিনা।” চৈতন্য ইহাতে দ্রব ও কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, “আমি তোমা-দিগকে সঙ্গী করিয়াই ঠকিয়াছি, আমি বৃন্দাবন চলি-লাম, তোমরা ভুলাইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত করিলে, এখন আবার একমাত্র সঞ্চল দণ্ডটীও ভাঙ্গিয়া দিলে। তোমরা আগে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে জেঁথর দেখিতে যাইব না।” ইহা শুনিয়া ভক্তগণ পশ্চাতে যাইবার মত প্রকাশ করিলে চৈতন্য প্রেমে আত্মহারা হইয়া সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অগরাথ দেখিতে একাকী দৌড়াইয়া চলিলেন। ক্রমে গোরের ক্ষম্যে আবেশের স্ফোর হইল, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অগরাথ দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়াই উন্মত্তের ছায় ঠাকুর আলিঙ্গন করিতে ধাক্কা দিয়াছিলেন। কিছুদূর যাইয়া অচে-তন হইয়া পড়েন। অগরাথের সেককণ্ঠ পরিছা (পরীক্ষার অল্প বয়োব্রাত) করিতে আসিল। কিন্তু সেসময়ে বাস্তবদেব সার্কভোম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর মুষ্টি

দেখিয়া মোহিত হন, এবং সেককণ্ঠকে নিবারণ করিয়া আগ-ত্বকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই চেতনা হইল না, ওদিকে অগরাথের ভোগের সময় উপস্থিত, কাজেই সার্কভোম অচেতন সন্ন্যাসী চৈতন্যচন্দ্রকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে উপ-স্থিত হইয়া শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসী অগরাথ দর্শন করিয়া মুচ্ছিত হইয়াছিলেন, সার্কভোম তাঁহাকে লইয়া নিজ ভবনে রাখিয়াছেন। সঙ্গীগণ কিংকর্তব্যবিমূৰ্হ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এই সময়ে মদীয়াবাসী বিশারদের আমাতা গোপীনাথ আচার্য্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। নবদ্বীপ অবস্থানকালে ইনিও চৈতন্যের প্রতি অহরন্তর ছিলেন, বুকুনের সহিত ইহার পূৰ্ব্ব পরিচয় ছিল, ইহাকে পাইয়া তাঁহার আশঙ্ক হন এবং ইহার সহিত যাইয়া সার্কভোমের ঘরে প্রকৃষ্ণে মুচ্ছিত অবস্থায় দেখিতে পান। উপরোক্ত চৈতন্যের উৎকল-গমন-বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতের মতামুসারে লিখিত হইল। অপরায় বৈষ্ণবগ্রন্থের সহিত ইহার অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। চৈতন্য-ভাগবতের মতে শান্তিপুর পরিত্যাগের পর চৈতন্যচন্দ্র সঙ্গী-দিগকে বৈরাগ্যধর্ম উপদেশ দিতে দিতে সন্ধ্যার সময়ে আঠি-সারা গ্রামে অনন্তপণ্ডিত নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং সঙ্গীগণের সহিত তথায় আতিথা-গ্রহণ করিয়া সমস্ত রজনী হরিনাম সংকীৰ্ত্তন ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করেন। প্রভাতে তথা হইতে ভাগীরথীর ধারে ধারে গমন করিয়া হুতভোগে উপস্থিত হন। কোন কোন কবির মতে সে সময়ে এই স্থানের অনতিদূরেই গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগরে মিলিত ছিলেন এবং এই স্থানে অম্বুলিঙ্গ নামে একটি জলময় শিবলিঙ্গ ছিল। শিবের নামামুসারে অম্বুলিঙ্গ নামে একটি প্রসিদ্ধ ষাটও ছিল, চৈতন্যচন্দ্র তথায় স্নান ও সেখানকার লোকের মুখে অম্বুলিঙ্গ শিবের উপাখ্যান শুনিয়া এবং শতমুখী গঙ্গার নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিয়া আত্মাদিত হইয়াছিলেন। তিনি অম্বুলিঙ্গ ষাটে স্নান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে মেথিবার জন্ত লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে যবন-নরপতির স্থাপিত দক্ষিণরাজ্যের অধিকারী রামচন্দ্র খান আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। গোর তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উৎকল বাইবার সুবিধা করিয়া দিতে বলেন। তত্ক্ষণে রামচন্দ্র খান বলেন যে, “এখন উৎকল ও বঙ্গরাজ্যে ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে। সে দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ পাইতেছে না, এ সময়ে উৎকল গমন ভয়ানক কষ্টকর। আপনার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকিলে আমি প্রাণপণে চেষ্টা

করিয়া গোপনে আপনাদিগকে পাঠাইয়া দিব।” এই বলিয়া চৈতন্য ও তৎসঙ্গদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া সেবার আয়োজন করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র নীলাচল দেবিরার ভক্ত, মহা উৎকণ্ঠিত, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। ভোজনাতে কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে রামচন্দ্র খানের প্রবৃত্ত নৌকার আরোহণ করেন। চৈতন্য নৌকার আসিবার সময় সমস্ত পথে সঙ্গীগণের সহিত কীৰ্ত্তন করিয়া ছিলেন। কথা সময়ে নৌকা আসিয়া উৎকলরাজ্যের প্রয়াগ-ঘাটে উপস্থিত হইল। গৌর সদলে সেইখানে নৌকা হইতে অবতরণ করেন। তিনি উৎকল দেশের উদ্দেশ্যে সমস্তার করিয়া সেইখানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে স্থান করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠির-স্থাপিত শিব মূৰ্ত্তি করিয়া তীর্থলগ্নে চলিতে লাগিলেন। যথাক্রমে উপস্থিত হইলে সঙ্গীদিগকে বলিলেন তোমরা এইখানে উপবেশন কর, আমি ভিক্ষার চলিলাম। ইহা বলিয়া সেই নবীন মোহন মূর্ত্তি গোঁরাঙ্গদেব গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের ঘারে ঘারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে অপরিমিত ভিক্ষা দিতে লাগিল, তিনি সঙ্গীগণের আহ্বারের উপযুক্ত সংগ্রহ হইলেই চলিয়া আসিলেন। জগদানন্দ এক বৃক্ষমূলে পাক করিলেন। গৌরচন্দ্র মহানন্দে ভোজন করিয়া হরিনামানন্দে সেই রাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিয়া প্রভাতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে এক ঘাটে, দান না পাইলে দানী নদী পার করিতে চাহিল না। এইখানে চৈতন্যভক্তপণ একটু চিন্তিত হইল, কারণ তাহাদের সহিত এক কপর্দকও নাই। শেষে দানী সন্ন্যাসী চৈতন্যের সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তি ও অবিশ্রান্ত অশ্রু-ধারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সঙ্গে কয়জন লোক।” চৈতন্য তখন মহাভাবে নিমগ্ন, সেই ভাবে উত্তর করিলেন—

“... .. জগতে আমার কেহ নর।

আমিই কাহার নহি কহিল নিশ্চয়॥

এক আমি ছই নহি সকল আমার।”

বলিতে বলিতে গোঁরের নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দানী বলিল, “গোঁসাই আপনি নৌকার উঠুন, এ সকল লোকের কড়ি না পাইলে পার করিব না।” গোঁরাঙ্গ আর বিরক্ত করিলেন না, নৌকার উঠিয়া পরপারে যাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দানীর হৃদয় ফিরিয়া গেল। নিত্যানন্দ প্রভৃতির মুখে প্রভুর পরিচয় জানিয়া সকলকেই পার করিল এবং গোঁরের চরণে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া চলিতে লাগিলেন। ইহার পরে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া অতি ক্রতবেগে বাইতে

লাগিলেন। সঙ্গীরা পাছে পড়িয়া রহিল। কতদূর যাইয়া তাহাদের অপেক্ষার একটা মুহুর্ত্ত তলে উপবেশন করিলেন। এককাল চৈতন্যের দণ্ডটী জগদানন্দের হাতে থাকিল। এই দিন জগদানন্দ ভিক্ষার বাইবার সময়ে নিতাইয়ের হাতে সমর্পণ করেন। নিতাই দণ্ডটী ভাঙিয়া কেছেন। জগদানন্দ আসিয়া দণ্ড ভাঙা দেখিয়া নিতাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার কোন সহস্তর দিলেন না। জগদানন্দ সেই ভাঙা দণ্ড ফুড়াইয়া লইয়া গৌরচন্দ্রের নিকটে গেল। দণ্ডভাঙার অপর বিবরণ চরিতামৃতের বর্ণনার সমান। চৈতন্য সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে গমন করেন এবং জলেশ্বর নামক গ্রামে যাইয়া জলেশ্বর-শিব-পূজা দেখিয়া প্রেমের উত্তেজিত হইয়া সঙ্গীগণ এই স্থানে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যথার্থ্যে বাদ-শাহ গ্রামে একজন মতপাত্রী শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত চৈতন্যের দেখা হয়, প্রভুর কৃপার শাক্ত সন্ন্যাসী নাকি সেই দিন হইতেই বৈষ্ণব হইরাছিল। ইহার পরে রেযুণার আসিয়া কীরটোরা গোপীনাথ মূৰ্ত্তি দর্শন করেন। এক রাত্রি তথায় কীৰ্ত্তনানন্দে অভি-বাহিত করিয়া আবার চলিতে থাকেন। যথাসময়ে চৈতন্য সদলে বাজপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত ও অসংখ্য দেবালয় সুশোভিত। গোঁরাঙ্গ সঙ্গীদিগকে লইয়া দশাধমেধ ঘাটে স্থান করিয়া বরাহমন্দিরে যাইয়া কীৰ্ত্তন করেন। বাজপুরের দৃশ্যে গোঁরের মনে ক্রমেই ভাবলহরী উঠিতে লাগিল, তিনি সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া একাকী বাজপুরের ত্রৈলোক্যলি অবলোকন করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পরে সকলে আনন্দে হরিশ্রবণ করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং যথাসময়ে কটক নগরে পুণ্যমলিলা মহানদীতে স্থান করিয়া পথ পর্য্যটন করিতে করিতে শাক্তীপোপাল মন্দিরে উপস্থিত হন। এখান হইতে যাত্রীদল ভুবনেশ্বর মন্দিরে গমন করেন। ঐচৈতন্যচন্দ্র ভুবনেশ্বর দর্শনে মহা সুখী হইলেন এবং শিশুসরোবরে অবগাহন করিয়া নৃত্য কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে কপিলেশ্বর শিব মূর্ত্তি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। যাত্রীদল যথা সময়ে তথা হইতে কমলপুরে আসিয়া ভার্গবী নদীতে স্থান করেন। এই স্থান হইতে জগদানন্দের দেউলধ্বজা অবলোকন করিয়া চৈতন্যচন্দ্র প্রেমে অস্থির ও বিহ্বল হইয়া—

“প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরন্দরবক্তারবিন্দো

মামালোক্যসম্মিতবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥”

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে পাগলের ভাৱ চলিতে লাগিলেন। ঐ শ্লোকটির তাৎপর্য্যে, ভগদানু বাল-

গোপাল মূর্তিতে আসানের অঙ্গভাগে থাকিয়া আমার দেখিয়া হাসিতেছেন।

এইরূপে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া আছাড় খাইতে খাইতে তিন চারিদিকের পথ তিন প্রহরে অতিবাহিত করিয়া আঠার-মালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। ঐচৈতন্য আঠারমালায় আসিয়া বহুদিগকে বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। সঙ্গীশ্বর বারদেশে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। বধন মুচ্ছিত চৈতন্য সার্কভোমের আঁজার সেবকেরা বহিয়া লইয়া খাইতে ছিল, তখন সঙ্গীশ্বর তাঁহার অহুগমন করেন। (চৈতন্য শেখণ্ড ২ অঃ।)

সঙ্গীশ্বর সার্কভোমতবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া হুঃখিত হইলেন। সার্কভোম আগন্তুকদিগকে বখা-যোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় পুত্র চন্দ্রনন্দকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে কিরিয়া আসিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে স্তব্ধে হরিসংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহরকাল পরে গৌরচন্দ্র হরিনাম শ্রবণে হৃৎকর করিয়া উঠিলেন। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মহানন্দে সমুদ্রে স্নান করিয়া সার্কভোমের যত্নে পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন। এই সময়ে সঙ্গীশ্বরের সহিত গৌরের অনেক আলাপ হয়। তাঁহারা ও সার্কভোম গৌরাদকে একাকী জগন্নাথ দর্শনে খাইতে বারণ করেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া গৌরাদ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জগন্নাথ দর্শন করিতে তিনি আর কখনও মন্দির মধ্যে খাইবেন না, বাহিরে গুরুভৃত্তের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিবেন। স্বাক্ষরিত ভোজনান্তে বথান্নানে উপবিষ্ট হইলে সার্কভোম গোপীনাথের মুখে গৌরাদের পরিচয় শুনিয়া গৌরের নিকটে খাইয়া বলিলেন, “নীলাধর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী, জগন্নাথকেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, অতএব আপনি আমার গৌরবের পাত্র, বিশেষতঃ বধন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয় সন্দেহ নাই।” ঐচৈতন্য কিছু শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আপনি আমাকে এক্ষণ বলিবেন না, আপনি জগতের গুরু, বোদ্ধা-ধাপক মহাপূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী সদস্য-জ্ঞানহীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকটে আমার অনেক শিখিবার আছে। আজ হইতে আমি আপনাকে গুরুস্বরে বরণ করিলাম, আমাকে শিষ্ট জ্ঞানে সহপদদেশ দিবেন।”

চৈতন্যের বিনয়বাক্য শুনিয়া সার্কভোম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমার বতদূর সাধ্য তোমাকে উপদেশ করিব,

কিন্তু বাগুহে একটা কথা বলি যাহা করিব না, এই কাঁচা বরনে সন্ন্যাসগ্রহণটা বড় ভাল কাজ হয় নাই, ইচ্ছিত-কর্ম করা চাই, লোভ মোহ পরিভাগ করা চাই, কখন যে সন্ন্যাসী হইতে পারে। বিশেষ সন্ন্যাসগ্রহণে কেবল কলহের বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই কল নাই।” গৌরচন্দ্র পণ্ডিতবর সার্কভোমের বিজ্ঞপোক্তি শুনিয়া ধীর গভীর ভাবে বলিলেন, “মহাশয়! আমি ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই, ক্রকের অস্ত্র মতিছুর হইয়া উঠিল, তাই সন্ন্যাসী হইয়াছি, ইহাতে আমার বিশেষ অপরাধ নাই।” কিছুকাল এইরূপ আলাপের পর সার্কভোম তাঁহার মালীর গৃহে চৈতন্য ও তাঁহার সঙ্গীদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। প্রভু নিজ কল্লের সহিত তথায় বাইরা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ইহাদের সঙ্গে বাইরা সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন। কিছুকাল পরে গোপীনাথচার্য্য মুকুন্দকে লইয়া সার্কভোমের নিকটে আসিলে সার্কভোম তাঁহাদের মুখে চৈতন্য কেন্দ্র ভারতীর নিকটে সীকিত হইয়াছেন শুনিয়া হুঃখিত হন এবং পুনঃসংবাদ করিয়া চৈতন্যকে উত্তম সন্মানসম্পন্ন করিলে বড়ই ভাল হয় এইরূপ অনেক কথা বলেন। এই সময়ে চৈতন্য জিজ্ঞাস্য কি না! ইহা লইয়া গোপীনাথের সহিত ঘোর-তর বিচার হইয়াছিল। প্রথমে সার্কভোমের সহিতই বিচার হইতেছিল, শেষে তাঁহার ছাত্রগণও চীৎকার করিয়া অনেক গুণগোল করিয়াছিল। গোপীনাথ অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা চৈতন্যকে জেঁদারাবতার বলিয়া হ্রি করিলেন। [চৈতন্যচরিত মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখ।] বৈষ্ণব-গণের মতে এই বিচারে সার্কভোম ও তাঁহার ছাত্রগণ পরাজিত হন, কিন্তু তাত্ত্বিকগণের সহজ লভ্য কূটতর্কে তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করেন নাই। পরিশেষে সার্কভোম গোপীনাথকে বলিলেন যে, “এখন খাইয়া তোমাদের জেঁদরকে মহা প্রসাদ খাইতে দাও। তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে আমার নামে নিরস্ত্রণ করিবে।” গোপীনাথ প্রভুর নিকটে আসিয়া প্রথমেই পণ্ডিতধুরন্ধর সার্কভোম তাঁহাদের সহিত যে অভ্যাস বিচার করিয়াছেন, তাহা জানাইয়া সার্কভোমের নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহাপ্রভু বিচারের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “সার্কভোম বড় পণ্ডিত, তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তাই ওরূপ বিচার করিয়াছেন।” কিন্তু ইহাতে গোপীনাথ ও মুকুন্দের হৃদয় আরও জলিয়া উঠিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিল যে, প্রভুকে বলিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ সাজ সজ্জা করিয়া সার্কভোমের সহিত তুমুল বিচার করিতে খাইবেন, সার্কভোম বিচারে পরাজিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই ভক্ত

হইলেন ও চন্দ্রর অঙ্গে বুক ভাঙ্গাইয়া চৈতন্তের পাছটা বলিয়া কাদিতে বসিলেন।

পরে তাঁহার সার্কভোমকে সহপদেল দিয়া ভক্ত কবিবার ভক্ত প্রার্থনা করিলে প্রভু উত্তর করিলেন যে, “জগৎমানের ইচ্ছা থাকিলে সার্কভোমের শ্রীত্বই ভক্ত হইবে।” রাজনী প্রজ্ঞাত হইলে রুকচৈতন্ত গোপীনাথের সহিত জগন্নাথের শর্যোথান দর্শন করিয়া স্বাসনময়ে সার্কভোমের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ভট্টাচার্য্য প্রভুর অমুপস্থিতি সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসীণী তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সহপদেল দিয়া তাঁহার মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈদ্যাস্তিক মতে তাঁহাকে দীক্ষিত করিবেন। নবীন সন্ন্যাসীর বাহাতে ভাল হয়, তাহা কহাই ভট্টাচার্য্যের একান্ত অভিপ্রায়, ইহা ছাড়া তাঁহার হৃদয়ে বিস্তর গর্ক এবং অহঙ্কার হইয়াছিল। চৈতন্ত আসিলে সার্কভোম যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে দাস্তিক সার্কভোমের হৃদয় ভাঙ করিয়া আসিল। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, “তুমি হরত সব বিষয়েই অবগত আছ, কিন্তু আমার উচিত, তাই বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, আমাদের এখানে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে, বেদান্ত প্রবণ সন্ন্যাসীর নিত্য কৰ্তব্য।” চৈতন্তও অতিশয় নম্রভাবে তাঁহাকে আপনার গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং বাহাতে তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্য বজায় থাকে, এইরূপ আরও উপদেশ দিতে প্রার্থনা করেন।

পরদিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্কভোম মিলিত হন। সেখান হইতে চৈতন্ত সার্কভোমের সহিত তাঁহার ভবনে আগমন করেন। সার্কভোম বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, চৈতন্তচন্দ্র মনোনিবেশপূর্বক শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রতিদিন আসিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র বেদান্ত শুনিতেন, কিন্তু হাঁকি না কোন উত্তর করিতেন না। সাতদিন অতীত হইল, চৈতন্ত এক ভাবেই শুদ্ধিতে লাগিলেন। ইহাতে সার্কভোম মনে করিলেন যে, চৈতন্ত বেদান্তের কঠিন সমস্তার উপনীত হইতে পারিতেছেন না, সেই কারণেই চূপ করিয়া থাকেন। পরদিন গৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে সার্কভোম বলিলেন যে “তুমি সাত দিন পর্যন্ত শুনিতো, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই উত্তর কর না, তুমি বুঝিতে পার কি না তাহাও আমি স্থির করিতে পারিলাম না।” সার্কভোমের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন যে, “আমি মূর্খ তাই হইতে আমার বালক, বেদান্তের কঠিন শিক্ষান্ত উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে। বিশেষ মূলত্বের অর্থ বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু

আমনি যে ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” ইহার পরে সার্কভোমের সহিত চৈতন্তচন্দ্রের বেদান্ত সম্বন্ধ বিচার হয়, প্রভু মার্য্যবাদে শত শত দোষ দিয়া সার্কভোমের মত খণ্ডন এবং সকল কোণে ও পুণ্যপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বেদান্তচন্দ্রের ব্যাখ্যা করেন, ইহাতে সার্কভোম ও ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। সার্কভোম কিছুতেই নিজ মত রক্ষণ করিতে পারিলেন না। চৈতন্ত নিজমত স্থাপন করিবার ভক্ত ভাগবতের—

“আত্মারামাচ্চ মুনয়ো নির্ভাষা অপ্যুরকম্।

কুর্তব্যাহৈতুকীং তত্তিমিখং তুতগোহরিঃ॥” (ভা' ২.৭।১০)

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন। সার্কভোম এই শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া অভিমান প্রকাশ করিলে চৈতন্তচন্দ্র তাঁহার ব্যাখ্যার কোনটী অবলম্বন না করিয়া নূতন অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। [সার্কভোমের সহিত প্রভুর বিচার চরিতামৃতের অধ্যায় ৩৬২ পরিচ্ছেদে ও শ্লোকের ১৮শ প্রকার ব্যাখ্যা বৈষ্ণবগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

প্রভুর শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্কভোমের মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বেদান্তচন্দ্রের ব্যাখ্যা শুনিয়াই চৈতন্তকে অসাধারণ লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এখন শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া ভাবিলেন যে গোপীনাথ বাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। ইনি স্বরং ঈশ্বর। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অমুতাপ উপস্থিত হইল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, গলায় বসন দিয়া “প্রভো! আমি অপরাধী, দয়াময়! আমার ক্ষমা কর” বলিয়া চৈতন্তের চরণে পড়িতে গেলেন। চৈতন্ত প্রথমে ইহাতে বাধা দেন, কিন্তু শেষে তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া আর বাধা দিতে পারিলেন না, তাঁহাকে লইয়া প্রেমাবেগে কীর্তন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব কথিগণ বলেন যে, এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ভট্টাচার্য্যের প্রতি রূপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভূজ নারায়ণ রূপ ও পরে ষিদ্ধজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া তাঁহাকে রুতার্ধ কুস্মিা ছিলেন। চৈতন্তের রূপায় ভট্টাচার্য্যের সকল ভাব উপস্থিত হইল, তিনি প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্তুব করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে সার্কভোম পরমতরু হইয়া উঠিলেন। চৈতন্ত কিছুকাল এইরূপে কীর্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া সার্কভোমের শিষ্যপঞ্চও ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। গোপীনাথ এবং মুকুন্দের তাপিত প্রাণও শীতল হইল। সার্কভোমের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও চৈতন্তের সঙ্গে দূর হইল না। পরদিন অরুণোদয়কালে চৈতন্ত জগন্নাথ দর্শন

করিয়া ও পূজারী প্রভৃতি মালা ও মহাপ্রসাদ হইয়া সার্ক-
ভোমের ভবনে আসিলেন। ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর আগমন
বার্তা পাইয়া শ্রদ্ধাভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার
পদস্বল্লা করিয়া বসাইলেন গৌরচন্দ্র সার্কভোমের হস্তে
মহাপ্রসাদাদি অর্পণ করিলেন। তখন ভট্টাচার্যের জ্ঞান,
সন্ধ্যা, নৃত্যবান প্রভৃতি কোন কার্যই হয় নাই। তথাপিও
তিনি বিকল্পিত করিলেন না, প্রসাদ খাইয়া প্রেমাধোগে
বিতোর হইয়া দুইটা পৌরানিক বচন আবৃত্তি করিলেন—

“তত্ত্ব পৰ্য্যন্ত বাসি নীতাং বা নুরদেহতঃ।

প্রাণিমাশ্রয় ভূতাতব্য নাজ্ঞ কালবিচারণা।

নরেন নিরমজ্ঞ ন কাল বিবরতব্য।

প্রান্তরঃ ক্রমঃ শিষ্টৈর্ভোক্তব্যঃ হরিরব্রহ্মণঃ।” (পদ্মপুরাণ)

সার্কভোম এইরূপে প্রসাদ খাইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন,
দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বিম্বিত হইলেন। চৈতন্য চিরন্তন-
বিষেবী সার্কভোমের এরূপ ব্যবহার ও ভক্তি দেখিয়া আমনে
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাধিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—

“আজি মুই অনারাসে জিনিহু ত্রিভুবন।

আজি মুই করিহু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।

আজি মোর পূর্ণ হল সৰ্ক অভিশাব।

সার্কভোমের হল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।”

এই ভাবে প্রেমাধিষ্ট হইয়া কতকগুলি নৃত্যগীত ও কীর্তনের পর
চৈতন্য নিজ বাসস্থানে আসিলেন। সার্কভোম সেই দিন
হইতেই ভক্তিলাভ তিন অপর শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা অহুশীলন
একেশ্বরে ছাড়িয়া দিলেন। পরদিন ভট্টাচার্য অগরাধ দর্শন
না করিয়া প্রথমেই চৈতন্য দর্শনে গমন করেন। প্রভুর চরণ-
তলে সাতাঁকে নমস্কার করিয়া অনেক অহুতাপ করিলে, প্রভু
তাঁহাকে কহিলেন, “কলিকালে হরিনাম তিন আর গতি নাই,
অন্তএব সৰ্গলা কীর্তন কর।” ভট্টাচার্য প্রভুর কথার দিম রাতি
সামকীর্তন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি একজন
প্রধান ভক্ত হইয়া উঠিলেন, চিরাত্যন্ত সিক্ষাশ্রুতির প্রতি
যে অহুয়াগ ছিল তাহা লোপ পাইল। সার্কভোম এখন ভক্তি-
প্রার্থী, তাই তিনি একদিন শ্রীচৈতন্যের সমুখে ভাগবতের
দশম স্কন্ধের চতুর্দশাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটির চতুর্থ চরণের
“বুদ্ধিগদে” এই পাঠ পরিবর্তন করিয়া “ভক্তিগদে” এই পাঠ
করেন। মহাপ্রভু পাঠ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
সার্কভোম বলেন যে, বুদ্ধির নাম ভক্তিও তাঁহার ভগ্ন হয়,
তাই তিনি ‘বুদ্ধি’ স্থলে ‘ভক্তি’ পাঠ করেন।

ইহার পরে একদিন সার্কভোম ভট্টাচার্য জগদানন্দ ও
দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর অজ্ঞ

উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ ও বরচিত দুইটা শ্লোক একখানি
তালপত্রে লিখিয়া শ্রীচৈতন্যকে পাঠাইয়া দেন। এই শ্লোক
দুইটা অবশ্যে দুহুনের হস্তগত হয়, তিনি পাঠ করিয়া বাহির
ভিত্তের দ্বার লিখিয়া রাখেন। চৈতন্যের শিকটে এই তালপত্র
শৌছিলে তিনি উহাতে নিজের প্রাণেরা দেখিয়া বিস্মিত লহ-
কারে হইকিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তত্ত্ব বৈকুণ্ঠ ভিত্তির
লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কঠর করেন। বৈকুণ্ঠ সেই
শ্লোক দুইটাকে “ভক্তকর্মমণিহার” বলিয়া উল্লেখ করেন।
শ্লোকটি এই—

“বৈরাগ্যবিজ্ঞানিভ ভক্তিযোগ শিখার্বেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যশরীরধারী কৃপাশ্রুদিব্রহ্মহং প্রপত্তে ॥ ১ ॥

কাদারষ্টং ভক্তিযোগঃ নিজঃ যঃ প্রাচ্যকর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যমাম।

আবিত্তভক্ত্য পাদারবিধে সাটংগাচ নীরতাং চিত্তভঃ ॥ ২ ॥”

(চৈ’ চরিত্র’ মধ্য’ ৬ পরি’)

কগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মাগধারী সার্কভোম ভট্টাচার্য
চৈতন্যের কৃপায় ভক্ত হইয়াছেন। কঠোর জ্ঞানী সার্কভোমের
ভক্তি দেখিয়া সকলেই শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস
করিতে লাগিলেন। সেই হইতেই উৎকলরাজের ইষ্টদেব
কালীমিশ্র ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক চৈতন্যের
পরগণ্য হইল। তাঁহার যশে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল।

(চৈ’ চরিত্র’ মধ্য’ ৬ পরি’।)

মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কান্তন
মাসে নীলাচলে আগমন করেন। কান্তনের শেষে দোলযাত্রা
দর্শনের পর সার্কভোমকে কৃপা করেন। ইহার মধ্যেই নীলা-
চলবাসীরা প্রায় সকলেই চৈতন্যের ভক্ত হইয়া উঠিল। বৈশাখ
মাসের প্রথমে গৌরচন্দ্রের দক্ষিণদেশ পর্যটনের ইচ্ছা হইল।
একদিন তিনি ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া
বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমায় প্রাণাধিক বন্ধু,
প্রাণ ছাড়া আর, তবু তোমাদিগকে ছাড়িতে পারিব না।
তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া অঙ্গদাধ দর্শন করাইয়া
সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য করিয়াছ। এখন তোমাদিগের নিকট
একটা ভিক্ষা চাহিতেছি, তোমরা অহুমতি কর, আমি বিশ্ব-
রূপের উদ্দেশে দক্ষিণপথে গমন করিব। কিন্তু এবারে
আমি একাকী যাইব। সেতুবন্ধ হইতে আমি খাবৎ ফিরিয়া
না আসি, তোমরা সে পর্যন্ত এখানেই থাকিও।” চৈতন্যের
কথার ভক্তগণ নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই এ
কথার অমেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্র কিছুতেই
তাঁহাকে সঙ্গী করিতে স্বীকার করিলেন না। শেষে
কৌশীল, বহিবাস ও জলপাই বহন করিবার অস্ত্র সজলমতি

কৃষ্ণদাস নামক একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে নীকার করেন। সার্কডোম এই সংবাদ অবশ্যে নিতান্ত কাতর হইয়া আরও কএকদিন তথায় থাকিতে অহরোধ করিলে চৈতন্য তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। পরে নির্দিষ্ট দিনে চৈতন্যচন্দ্র জগন্নাথদর্শন ও বহুগণের সহিত সাদরসম্ভাষণ করিয়া দক্ষিণ যাত্রা করেন। নিত্যানন্দ প্রকৃতি চারিজন ভক্ত, গোপীনাথার্চ্য ও সার্কডোম আলালনাথ পর্যন্ত চৈতন্যের অহুগমন করেন। এই স্থান পুরী হইতে চারিকোশ দক্ষিণে। চৈতন্যচন্দ্র এই স্থানে আসিয়া আলালনাথ-দেবমন্দিরের পুরোভাগে সদলে হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। অধিবাসীগণ সন্ন্যাসীর অপরূপ ভাব ও পুলকান্ত প্রকৃতি সাত্বিক লক্ষণ দেখিয়া এক প্রাণে শুনিতে ও দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে আসিয়া ভক্তিরসে ভাসিতে লাগিল, সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হাহাকার করিয়া চকুর জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি ভিড় কমিল না। শেষে নিতাইয়ের ঘরে গৌরচন্দ্র স্থান করিলেন। মন্দিরের ঘর বন্ধ করিয়া চৈতন্য ও তৎসঙ্গীগণ ভোজন করেন। ইহার পরে আবার কীর্তন আরম্ভ হয়। এবারে জনতা আরও বাড়িয়া গেল। সমস্ত লোক সারাদিন অন্নান ও অনাহারে প্রেমপিপাসায় সেইস্থানে থাকিয়া সন্ধ্যার পর কীর্তন সমাপ্ত হইলে হরিনাম গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া গেল। চৈতন্য সেরাত্রি তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ে সার্কডোম গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে উৎকলরাজের প্রতি-নিধি পরম বৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের গুণ কীর্তন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্ত চৈতন্যকে অহরোধ করেন। রজনী প্রভাত হইলে গৌরচন্দ্র স্থানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন। ভক্তগণ তাঁহার বিচ্ছেদে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কৃষ্ণদাস পাছে পাছে জলপাত্র বহিয়া গমন করিলেন। চৈতন্যচন্দ্র

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং ॥”

এই সকল নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তিনি যে পথে যাইতে লাগিলেন, সেই পথেই তাঁহাকে দেখিবার জন্ত লোকের ভিড় হইতে লাগিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে

প্রায়ে উন্নত হইয়া কেহ কেহ “হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ” বলিয়া কাদিয়া উঠিত। স্তাহারও প্রভুকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না, কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিতেন। তাহার অনেক কষ্টে গৃহে ফিরিয়া বাইত এবং তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া অপর গ্রামবাসীরাও সেইরূপ কৃষ্ণনামে পাগল হইত। এইরূপে প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাহিতে বিলাহিতে পটীনন্দন সেতুবন্ধন পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কুর্শক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কুর্শদেবের বন্দনান্তে নামসংকীর্তনের স্রোতে সমাগত লোকদিগকে ভাসাইয়া কুর্শ নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হন। কুর্শ তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন। পরদিন প্রাতে চৈতন্যের গ্রহান করিবার সময়ে কুর্শ তাঁহার অহুগমন করিতে যান। চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দেন যে “গৃহাশ্রমই পবিত্র সাধনক্ষেত্র, গৃহে বসিয়া নাম সাধন কর। ফিরিয়া আসিবার সময় আবার আমার দেখা পাইবে।” কুর্শকে রাখিয়া চৈতন্য পূর্বভাবে নামকীর্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।

সেতুবন্ধ পর্যন্ত যেখানে যাহার গৃহে গৌরাদ্র অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সেই গৃহস্থানীই কুর্শের জায় তদুগতচিত হইয়া তাঁহার অহুগমন করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু চৈতন্য তাহাকে ঐ উপদেশ দিয়া গৃহে রাখিয়া বাইতেন। পরিণামে এই সকল গৃহস্থানীই দেশে চৈতন্যমত প্রকাশ করিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইতেন। কুর্শগ্রামে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বাসুদেব নামে একজন ভক্ত বাস করিত। চৈতন্য চলিয়া গেলে সে কুর্শের ভবনে আসিয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া কাদিতে লাগিল। চৈতন্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ও গৃহে বসিয়া কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দেন। বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে চৈতন্যের আলিঙ্গনে বাসুদেবের কুষ্ঠরোগ সারিয়া যায়; তিনি পূর্বের জ্ঞান স্মরণ ও স্মৃতি হইয়া প্রেমভক্তি প্রচার করেন। বাসুদেবের এইরূপ কুষ্ঠ বিমোচন করায় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের নাম “বাসুদেবামৃত” রাখিয়া ছিলেন। (চৈ' চরিঃ মধ্যঃ ৭ পরিঃ)

ইহার কতকদিন পরে চৈতন্য জিহড়নুসিংহক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নুসিংহের স্তব ও বন্দনা করেন। কিন্তু পথে কোথায় কোথায় গমন করেন, বা ভোজন করেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে অনেকে অহুমান করেন যে, সে সময়ে এই পথ অতিশয় অজলময় ছিল, পথে জনমানবের বসতি ছিল না, থাকিলেও তাহা অসভ্যজাতিপূর্ণ, পথিমধ্যে প্রায়ই ভোজন দ্রব্য মিলিত না, চৈতন্য উপবাসী থাকিয়া কেবল

কৃষ্ণানামৃত পান করিতে করিতে গমন করিতেন। বনে হিঙ্গ্র জঙ্গল তাঁহার মুখ দেখিয়া সরিয়া বাইত।

নৃসিংহকেন্দ্র ছাড়িয়া কতকদিন পরে গৌর গোদাবরীতীরে উপনীত হন। গোদাবরী দেখিয়া বসুনা ও ভীরহ বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ার তিনি অনেকক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন। তারপর গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রীনগরে গমন করেন। মহাপ্রভু ষাটে দান করিয়া একধারে বসিয়া জপ করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ রায় গোদাবরী-দ্বানের জন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি শ্রাবক ও অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ছুটিয়া আসিয়া নমস্কার করিলেন। গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়?” আগন্তক উত্তর করিলেন, “হাঁ আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধম।” তাহার পর সার্কভোমের কথায় গৌর রামানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া রামানন্দের হৃদয়ে বিগুণ প্রেমোচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। গৌর-চন্দ্র ও অনার্যাসে রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ও প্রেমে মাতিয়া উঠিল, প্রথমে উভয়েই বাহ তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। কম্প, শ্বেদ, অশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবে বিহ্বল হইয়া উভয়েই ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কিছুকাল পরে উঠিয়া বসিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই রামানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এ সন্ন্যাসী মানুষ নহে, ইনি স্বয়ং ঈশ্বর, এই সময়ে রামানন্দ রায়ের ইচ্ছিতে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে বাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় বাইয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে চলিলেন। রামানন্দও সন্ধ্যার পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীচৈতন্য সারাহ্ন দানসমাপনান্তে নিভৃত্তে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ একমাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক শিষ্টাঙ্গের পরে প্রভু তাঁহাকে সাধ্যনির্ণয় করিতে বলেন। পরম বৈষ্ণব রামানন্দ ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবধর্মের প্রধান সাধ্য বাৎসল্যপ্রেম ও কান্ত্যাব-প্রেম, তাহার মধ্যে আবার রাধিকার প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট এইরূপ সাধ্য নির্দেশ করেন। শ্রীচৈতন্যও

তাঁহা স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, চৈতন্য রামানন্দ রায়ের শরীরে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহার মুখে নিজ প্রবর্তিত ধর্মের গুঢ়তম প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে রামানন্দ এই ধর্মের উপাত্ত কৃষ্ণ ও তৎশক্তি রাধিকার স্বরূপ নির্দেশ করেন। (চৈঃচরিত্রঃ মধ্যঃ ৮ পরিঃ) রাজমহেন্দ্রীনগরে তির তির ধর্মাবলম্বী অনেক লোক বাস করিত। গৌরচন্দ্রের উপদেশ শুনিয়া এবং তাঁহার ভার অবলোকন করিয়া তাহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিল। চৈতন্য এই স্থানে দশদিন অবস্থিতি করেন। রামানন্দ রায়ের ব্যবহারে গৌরচন্দ্রের সন্তুষ্ট হইয়া রসরাজ মহাত্মা হইরূপে বিবর্তিত অপূর্ণ রূপ দেখাইয়াছিলেন।

দশমরাত্রির শেষে গৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে বাইবার উদ্দেশ্য কর, এদিকে আমিও তীর্থভ্রমণ করিয়া অচিরে তথায় প্রত্যাবর্তন করিতেছি। রজনী প্রভাত হইলে গৌরচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য শেষে রাজমহেন্দ্রী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

ইহার পরে গৌরচন্দ্র যে সকল তীর্থ স্থানে গমন করেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই, কেবল প্রধান প্রধান তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময়ে দক্ষিণদেশে স্তানী, কন্নী ও পাণ্ডুর সংখ্যাই অধিক, বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম ছিল, আবার বৈষ্ণবের মধ্যেও রামোপাসক ও তত্ত্ববাদীই বেশী। শ্রীচৈতন্যের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া সকলেই কৃষ্ণনাম লইতে লইতে কৃষ্ণোপাসক হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্য এইরূপে দক্ষিণদেশ উজ্জল করিয়া গৌতমীগঙ্গায় দান করিয়া মল্লিকার্জুনতীর্থে মহেশ মূর্তি দর্শন করিলেন। ইহার পরে অহোবিলম্ নগরে বাইয়া রামানন্দ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহবিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থান দর্শন করেন। সিদ্ধবটে একজন রামোপাসক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হন। এখান হইতে গৌরচন্দ্র স্বল্পকেন্দ্রে স্বল্পমূর্তি দর্শন করিয়া ত্রিমঠে বাইয়া বামনমূর্তি দর্শন করেন। ত্রিমঠ হইতে ফিরিয়া পুনরুদার সিদ্ধবটে সেই রামোপাসক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতেছে। আহা! সন্তোষে চৈতন্যদেব তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করার সে উত্তর করিল যে, “তোমাকে দর্শন করিয়া আমার চিরদিনের অন্ত্যাস ঘুটিয়াছে। সেই হইতে রামনামের পরিবর্তে আমার জিহবা হইতে কেবল কৃষ্ণনামই স্ফূর্তিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া বৃদ্ধকালী (বৃদ্ধকালীঃ) বাইয়া শিব দর্শন করেন এবং তথা হইতে নিকটবর্তী একগ্রামে

বহিরাঙ্গ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই প্রাণে ভক্তবলেন
জ্ঞানপন্থা লক্ষণ বহুবিধ লোকের বাস ছিল। ভাস্করিক,
সীমান্তক, দার্শনিক, বাহ্যবাদী, জ্ঞান ও পৌরাণিক প্রভৃতি
জানা পণ্ডিত এখানে বিভাজিত করিলেন। ইহা ভিন্ন
এখানে যৌদ্ধধর্মেরও একটা আশ্রয় ছিল। এই সকল
পণ্ডিতগণের সহিত চৈতন্যের জুড়ুল মিচায় হর এক তিনি
বীর অসাধারণ ক্ষমতাস্বারা সকলকে অস্বস্তে আসন্ন
করেন। যৌদ্ধধর্ম জাহাঙ্গীর বংশের বাহা সবম নামে
প্রসিদ্ধ, তাহা নইয়া কিয়ত করিতে উপস্থিত হইলে, পৌরাণিক
বীর অসাধারণ ভক্তপন্থাভাব সেই সকল জটিল প্রশ্নের
উত্তর দিয়া বোধমতকে ধ্বংস করিলেন। দেবীরা
ভূমিরা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অস্বস্ত হইয়া পেলেন এবং
বৌদ্ধাচার্য লক্ষ্যের আধোদমন হইয়া থাকিলেন।

কতকগুলি স্তম্ভ বোধ কর্তৃক হারিয়া গিয়া তাঁহাকে ক্লম
করিবার মানসে স্থিত করিয়া একটা খালিতে অশ্রুধারা
ক্ষুণ্ণ করিয়া তাঁহাকে ধাইতে দিবার অস্ত আসিতেছিল, কঠাৎ
বৃহৎকার একটা পক্ষী আসিয়া টোটে করিয়া সেই খালিটা
লইয়া উড়ে উড়িতে গেলে বৌদ্ধাচার্যের মাথার পড়িয়া গেল।
খালিখানি পড়ার আচার্যের মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে
থাকে; আচার্য্য ধরার পড়িয়া স্তম্ভিত হন। বৌদ্ধগণ
হাহাকার করিয়া কানিতে লাগিল এবং চৈতন্যের কোপে
ঐরূপ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া মিনতি
করিয়া তাহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিল। গৌরচন্দ্র তাঁহা-
দিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে স্নানকৃত ও হরিনাম উচ্চারণ
করিতে বলিলেন তাহারাও ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য
চেতন পাইয়া ক্লম বলিয়া কতই অন্নর বিনয় করিতে
লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেবীরা বিস্মিত হইল।

মহাপ্রভু এই স্থান হইতে জিপদীমন্ডে বাইরা চক্ৰবর্তী
বিষ্ণুমূর্তি মর্শনপূর্বক বেড়টিগিরি হইয়া জিপদীনগরে ক্রম-
সীতা মর্শন করেন। ইহার পর পৌরচন্দ্র পানাননসিংহ
মর্শন করিয়া শিবকাকী ও বিষ্ণুকাকীতে আসিয়া পার্বতী
ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পান। তৎপরে জিম্মা ও জিকাল
হতী এই দুইটা তীর্থস্থান ও পক্ষতীর্থে বৃহৎকার, যেত
বরাহমূর্তি মর্শনপূর্বক সীতার শিবহান অতিক্রম করিয়া
শিলালীলগরে শিলালীলৈরবীমূর্তি অবলোকন করেন। অন-
ন্ত তিনি কাবেরী নদীর তীরে গোবিন্দজ (৭) শিব, বেবা-
বনে মহাদেব মূর্তি ও অর্জুনের মর্শন করে। এই সকল
দিবসের উপাসক পাণ্ডা শৈবগণ পৌরকে দেখিয়া বৈক্য
হইরাছিল। ইহার পরে দেবহালে বাইরা বিষ্ণুমর্শন ও বৈক্য-

পনের বহিঃ পক্ষালাপ করেন। পৌরচন্দ্র এইরূপে ক্রমে
ক্রমে, কৃষ্ণকর্ণ-কর্ণাচলার মন্দির, শিবমন্দির ও দানবান-
লীল মর্শন করিয়া ত্রিপুরকোণ্ডে আসিয়া কাবেরীতীরে ও রত-
নাম মর্শন করেন। রতনামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কীর্তন ও
নৃত্য করিয়া পৌরাণ প্রাণে বিহ্বল হন। ভক্তবলেন বেড়ট-
টটনানে ক্রমে বৈক্য প্রাঙ্গণ পদম সম্মুখে প্রভুকে নিমন্ত্রণ
করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে চাকুরীত উপস্থিত,
পঞ্চপাটিনও বিশেষ কষ্টকর জানিয়া বেড়ট টট্ট সেই চারি
মাস তাঁহার গৃহে থাকিতে অহরোধ করেন। প্রভুও ভক্ত
বেড়টটটের অহরোধে চারিমাংস তথায় অবস্থিতি করেন।
এখানে থাকিয়া প্রাতে কাবেরী তীর করিয়া রতনাম মর্শন,
দুই সন্ধ্যা মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্য ও সঙ্গীত এবং অবশিষ্ট
পদম বেড়ট প্রভৃতি বৈক্যগণের সহিত পক্ষালাপ করিয়া
কালান্তিমাত করেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার বখোরাশি
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল, সকলেই তাঁহাকে দেখিতে আসিল ও
তাঁহার ত্রিভুজমর্শনে পদতলে পড়িয়া পক্ষালাপ হইল। তিনিও
কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে বৈক্য ধর্মের সীমিত করিলেন।
চারিমাংস মধ্যে অনেক লোকই বৈক্য হইল। এই সময়ে
বেড়টের বালকপুত্র গোপালভট্ট চৈতন্যের সঙ্গে থাকিয়া বৈক্য
হন। ত্রিপুরকোণ্ডের ব্রাহ্মগণ এক একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ
করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

রতনামের মন্দিরে বসিয়া একজন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে
গীতা পাঠ করিতেন, ব্রাহ্মণ অতি নিরোক্ত, ব্যাকরণ জ্ঞান
আদৌ নাই, বাহা উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত।
তাহা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ
কাহারও কথার কপ না দিয়া আবিষ্টিতে অষ্টাদশাধ্যায় গীতা
পাঠ করিত; অধ্যায় সময়ে চকুর কলে বুক ভাসিয়া বাইত,
তাহার শরীরে রোমাঞ্চ, ঘেদ ও বৈক্য দেখা দিত। ত্রি-
চৈতন্য দেবালয়ে বাইরা প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত
হইতেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“মহাপ্রভু! আপনার উচ্চারণ শুনিয়া মনে হয় যে আপনি
গীতার এক অক্ষরও বুঝিতে পারেন না, অথচ চকুর কলে বুক
ভাসিয়া বায়, ইহার কারণ কি? আমার খুঁজিয়া বলিতে
হইবে।” ব্রাহ্মণ বিস্মিতভাবে উত্তর করিলেন, “প্রভো!
আমি গীতার এক অক্ষর বুঝি না, কিন্তু যতক্ষণ গীতা পড়িতে
থাকি, ততক্ষণ দেখিতে পাই বেন অর্জুনের রূপ উপস্থিত
শ্রীকৃষ্ণ অধরজু ধরিয়া অর্জুনের হিতোপদেশ দিতেছেন।
তাঁহাকে দেখিয়া আমার আনন্দবেগ হয়, এই কারণে পৌরকে
উপহাসে কপ না দিয়া আমি গীতা পাঠ করি।” ব্রাহ্মণের

যাচ্য নষ্ট হইয়া ঐচৈতন্য "সীতাপাঠ ভোমরাই সার্বক, ইহাতে তুমিই বাস্তবিক অধিকারী" এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বিন করিলেন। ব্রাহ্মণ সেইদিন হইতেই তাঁহার পরম্পর হইল। এসময়ে ঐচৈতন্যের সহিত পরিহাসকালে গৌরান অনেক বর্ষরম্য প্রকাশ করেন। [চৈতন্যমধ্যঃ ৯ পরঃ দেখ।]

এইরূপে চাকুরীতে পূর্ণ হইলে ঐগৌরান তথা হইতে পবিত্র-পর্বতে বাইরা নারায়ণ-দর্শন করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর প্রধান শিবা ও চৈতন্যের গুরু ঐবরপূরীর অধ্যাপকজ্ঞাতা পরমহংস-পূরী তথায় চাকুরীতে করিতেছিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা-শ্রবণে তিন দিন পরম সুখে অতিবাহিত করেন, ইহার পরে পূরী-মহাশয় গুরুবোস্তম দর্শন করিয়া বরদেবে গঙ্গানদীতে বাইবার মত প্রকাশ করিলে গৌর তাঁহাকে পুনরায় গুরুবোস্তমে আসিতে অহুরোধ করেন। পূরী চলিয়া গেলে গৌরচন্দ্র ঐশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কান-কোষ্ঠি নগরে গমন করেন। তথা হইতে দক্ষিণ মথুরায় (মহুরায়) উপস্থিত হন। এইখানে একজন রামোপাসক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়া দেখেন যে, ব্রাহ্মণ জগৎলক্ষী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য উপবাস করিতেছে। চৈতন্য তাঁহাকে সাধনা করিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক সীতা চিদ্রমুর্তি, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার শক্তি তুই থাকুক, সাধারণ লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেও পারেন। রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে সীতা অন্তর্দীন হন, রাবণ মায়ায়ী সীতাকৃতি লইয়া যায়।" ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে চৈতন্য তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্বেলন নগরীতে রঘুনাথ ও মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়া সেতুবন্ধে বাইরা ধনুতীর্থে রান ও রামেশ্বর দর্শন করেন। এইখানে ব্রাহ্মণলতার কুর্ষপুত্র পাঠ হইতেছিল, তাহাতে মারাসীতা রাবণ কর্তৃক হত হইয়া, এইরূপ উপাখ্যান শুনিয়া বীর ব্যাখ্যার পোষকতার জন্য পুরাতন পুথির পাতা লইয়া দক্ষিণ মহুরায় প্রত্যাবর্তন করেন ও ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। সেই দিন দক্ষিণ মহুরায় সেই রামদাস বিদ্রোহ ঘরে থাকিয়া তাত্রপর্শী নদীর তীরে পাণ্ডুরাজ্যে ভ্রমণ করেন। তৎপরে যথাক্রমে নর-জিপিদি, চিরভালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পারাগড়ি, চামতাপুর, ঐবৈকুণ্ঠ, বলরপর্বতে অক্ষত্যাশ্রম, কলকুমারী ও আমলীতলা এই সকল স্থান পর্য্যটন করেন। তৎপরে গৌরচন্দ্র ময়ূর বা ময়বীর উপকূলে আগমন করেন। এইখানে ভদ্রলক্ষ্মীকর্তৃক ও বতাপাণ্ডিতে রঘুনাথ মুর্তি দর্শন করিয়া একরাত্রি অবস্থান করেন। তৎকালে সে দেশে

ভট্টমারীগণ চৈতন্যের সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মদেবে কুন্দরী গ্রী ও বনের সোত দেখাইয়া তুলাইয়া দাখেন। চৈতন্য আসিতে পারিয়া ভট্টমারীগণের আভ্যাস বাইরা বলিলেন, "ভোমরাও সন্ন্যাসী আখিও সন্ন্যাসী, আরাম সঙ্গীকে আটক করিয়া রাখা ভাল হয় নাই।" বহুপ্রকৃতি ভট্টমারীগণ এই কথা শুনিয়া অশ্রুশ্রু লইয়া চৈতন্যকে মারিতে উঠিল, কিছুকাল মধ্যেই ভট্টমারীগণের হতহিত অশ্রুশ্রু তাহাদের নিজের গায়ে পড়িতে লাগিল, এই ঘটনার সকলই নিদারুণরূপে আইত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের গ্রী পুত্র কাদিয়া ব্যাকুল হইল, মহা হলহুল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয়া তাহার চুল ধরিয়া বলপূর্বক টানিয়া লইয়া দোড়িতে লাগিল এবং সেই দিনেই পরশ্বিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে বাইরা আশ্রয় লইলেন। এখানে আদিকেশবের মন্দিরে নৃত্য ও কীর্তন করার তাঁহার ভক্তি দেখিয়া বহুলোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি ব্রহ্মলংহিতা নামক ভক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি বয়সের সহিত লেখাইয়া লইলেন। গৌরচন্দ্র এইস্থান হইতে মধবাচার্যের দীক্ষাস্থান অনন্ত-পদ্মনাভ বাইরা অনন্তেশ্বর শিব দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে ঐজনাদিন দেখিয়া দুই দিন তথায় কীর্তন করিয়া পরোক্ষী বাইরা শঙ্কর-নারায়ণ দর্শন করেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র শূকপুরে শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত সিংহারিমঠ ও মংগুতীর্থে দেখিয়া মাধবাচার্যের প্রধান স্থান উদিশীনগরে উড়ুপক্ক দর্শন করিয়া অধী হইলেন। মাধবাচার্যের অধুবর্তী তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে কড় একটা গ্রাহ করেন নাই। পরে তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহার সম্মান করেন, শেষে বিচারে পরাস্ত হইয়া সকলে গৌরের শরণাপন্ন হন।

ইহার পরে গৌরচন্দ্র কলকুপ, বিশালা, পঞ্চাঙ্গরা, গোবর্ধন শিব, বৈষ্ণবাগি, সুপাদক, কোবাগুরে লক্ষী, ক্ষীরভগবতী, লিঙ্গগণেশ ও চোর পার্শ্বতী এই কয়টা দেব-মন্দির দর্শন করিয়া পাণ্ডুরে গমন করেন। তথায় বিয়ল ঠাকুর অবলোকনে প্রোমাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্য ও কীর্তন করিয়া একজন ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন। এই সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্ততম শিবা ঐরঙ্গপুত্রীর সহিত গৌরের সাক্ষাৎ হয়। ঐরঙ্গপুত্রীর সহিত কৃষ্ণকথা ও নৃত্য কীর্তনে পাঁচ লাভ দিন অতিত হইলে তাঁহার মুখে শুনিতে পাইলেন যে, নবদীপধাসী জগদ্বাণিমিশ্রের পুত্র শঙ্করায়ণ (বিব্রকগের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম) এই তীর্থে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে গৌর ঐরঙ্গপুত্রী ও বারকাতীর্থে দর্শনে বাহির হইলেন।

কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অহরোধে আরও চারিদিক তথ্য অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণবেশী নদীর তীরে নানা তীর্থ দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণমণ্ডলী-পরিবৃত কোন গ্রামে গমন করিয়া বৈষ্ণবসমাজে “কৃষ্ণ-কর্ণামৃত” নামক কৃষ্ণলীলাবিবরক মধুর গ্রন্থ পাঠ হইতেছে শুনিয়া পরম সমাদরে তাহা শিখিয়া লইলেন। সিদ্ধান্তবিব-রক ব্রহ্মসংহিতা ও লীলাবিবরক কৃষ্ণকর্ণামৃত এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র মহা আনন্দিত হইলেন এবং তত্ক্ষণিক উপহার দিবেন বলিয়া অতি স্বল্পের সহিত রাখিয়া দিলেন। ইহার পরে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণার তীর হইতে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ ও তাপীনদীতে স্নান করিয়া মাঘেরতীপূরে উপস্থিত হন, কৃষ্ণা হইতে তাপীনদী অনেক দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণা হইতে আসিতে পথে চৈতন্য কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমণ করেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার পরে নানাদেশ পর্যটন করিয়া গৌরচন্দ্রের নন্দনাতীরে আগমন করেন ও ধনুতীর্থ এবং ঋষ্যশৃংগপর্বত দেখিয়া দণ্ডকারণ্য হইয়া সপ্ততাল গমন করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকর্তাদের মতে সেই রামের সময়কার সপ্ততালবৃক্ষ এ পর্যন্ত বর্তমান ছিল, গৌরচন্দ্রের দর্শনের পর অন্তর্হিত হইল। এখান হইতে গৌরচন্দ্র চম্পা সরো-বরে স্নান করিয়া পঞ্চবটীবনে গমন করেন এবং তথা হইতে নাসিক ও ত্র্যম্বক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থান কুশাবর্তে গমন করিলেন। সপ্তগোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে চৈতন্য-প্রভু পুনরায় বিদ্যানগরে আসিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, “তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্বে আমার শুনাই-য়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহারই প্রমাণ স্বরূপ।” রামানন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া স্তুতী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া মূলগ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্য কিছু-দিন তথায় থাকিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। রায় রামানন্দও তথায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য পূর্ব-পরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে যথা সময়ে আলালনাথে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণদ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকটে আগে সংবাদ পাঠাইয়া নিজে পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন।

তত্ক্ষণ মৃত শরীরে প্রাণ পাইল, তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সার্কভোম ভট্টাচার্য্য, অঙ্গরাজের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকলরাজের ইষ্টদেব কানীমিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্রতীরে আসিয়া গৌরের সহিত

মিলিত হইলেন। সকলে একত্র অঙ্গরাজ দর্শন করিয়া সার্কভোমের আশ্রয়ে যাইয়া অবস্থান করিলেন। গৌরচন্দ্র বহুগুণের নিকট তীর্থযাত্রা বর্ণনা করিতে করিতে সে রাত্রি আগরণে অভিগাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরত্ন সার্কভোমের মুখে গৌরের প্রভাব ও ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অহরহ হন এবং সার্কভোমকে বলেন, “সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্র এখানে আসিলেন, আপনাদিগকে কৃপা করিলেন, আপনি আমার সহিত তাঁহার দেখা করাইলেন না কেন? এবং কেনইবা তাঁহাকে এত অল্পকাল মধ্যে যাইতে দিলেন।” ইহার উত্তরে সার্কভোম বলেন যে, “তিনি সন্ন্যাসী, স্বপ্নেও বিষরীর সহিত দেখা করেন না, সেই কারণে ইচ্ছা থাকিতেও আপনার সহিত দেখা করাইতে পারি নাই, তিনি স্বয়ং জগৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, আমি অনেক চেষ্টারও তাঁহাকে রাখিতে পারি নাই। তবে তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগত হইবেন।” মহারাজ সার্কভোমের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব কানীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভুর বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। গৌরদেব উপস্থিত হইলে ভট্টা-চার্য্য কানীমিশ্রের ভবনে বাসা দিলেন। কানীমিশ্র পরমভক্ত, তাঁহার সেবার সঙ্কট হইয়া শ্রীচৈতন্য তাহাকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখাইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের দক্ষিণ গমন বৃত্তান্ত যাহা পাওয়া যায় উপরে তাহাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গোবি-ন্দ্রের কড়চা ও অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সহিত চরিতামৃতের বিবরণের কোন মিল নাই। উক্ত গ্রন্থগুলির মতে দুই বৎসর যাবৎ প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করেন। পুরুষোত্তম হইতে বিদ্যানগর পর্যন্ত গমন বৃত্তান্ত প্রায় চরিতামৃতের সমান।

তৎপরে বিদ্যানগর হইতে ত্রিমদনগরে যাইয়া বৌদ্ধ-পণ্ডিত রামগিরির সহিত বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। তৎপরে দুগিরামতীর্থে দুগিরামের সহিত প্রভুর বিচার হয়। সেই পণ্ডিত তাঁহার কৃপার বৈষ্ণব হইয়া হরি-দাস নামে বিখ্যাত হন। তাহার পর শ্রীচৈতন্য অক্ষয়বটে উপস্থিত হন। এইখানে তীর্থরাম নামক একজন ধনী বণিক সত্যবাহু ও লক্ষ্মীবাহু নামক দুটা বেটী লইয়া প্রভুকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিল, শেষে তাঁহার ভক্তি দেখিয়া ইহার তিনজনেই তাঁহার চরণে পড়িয়া বৈষ্ণব হন। তীর্থ-রামের পত্নী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইয়াছিলেন। অক্ষয়বটে সাতদিন থাকিয়া বিশাল জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলটা দশকোশব্যাপী। ইহার মধ্যে কোন স্থানে

কি বিশেষ ঘটনা হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরে সুরানন্দর হইয়া বেকটনগরে গিয়া ধরে ধরে হরিনাম বিতরণ করেন। পরে তিনি বঙ্গলা নামক প্রসিদ্ধ বনে বাইরা পহুতীল নামক দস্যকে উদ্ধার করেন। চতুর্ভুজ পহুতীল ঐচৈতন্যের দুইচারিটা কথা শুনিয়াই অস্ত্র, শস্ত্র ও চির সজ্জিত হিংসা প্রভৃতি একেবারে বিসর্জন দিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। পহুতীলের উদ্ধারের পর গোরাঙ্গ তিনদিন অনাহারে কেবল কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে ভ্রমণ করেন। চতুর্ধ দিবসে দুধ ও আটা আহার করেন।

অনন্তর তিনি গিরীধর লিঙ্গদর্শন করিয়া বহুতে বিম্বপত্রাদি উপহার লইয়া শিবের পূজা করেন। এইখানে একজন মৌনসন্ন্যাসী প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া মৌনভঙ্গ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন। এখান হইতে ত্রিপতী-নগরে উপস্থিত হন। সেখানে সর্বপ্রধান তার্কিক মধুরা নামক একজন রামায়ণ-পণ্ডিতকে তিনি বিচারে পরাজিত করেন। তৎপরে পান্না নরসিংহ, বিষ্ণুকাঞ্চীনগরে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ত্রিকালেশ্বর শিবদর্শন করিয়া ভদ্রানন্দীর তীরে পক্ষগিরিতীর্থে উপস্থিত হন। তৎপরে কালতীর্থে বরাহমূর্তি দেখিয়া সঙ্কীর্ণতীর্থে অষ্টৈতাবাদী সদানন্দপুরীকে বৈষ্ণব করিয়া চাইপলী তীর্থ ও নাগর নগর অতিক্রম করিয়া তঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাড়ী উপস্থিত হন। তৎপরে সন্ন্যাসীর প্রধান আড্ডা চণ্ডালু পর্বতে বাইরা তথাকার ভট্টনামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব করিয়া পদ্মকোটতীর্থে গমন করেন। এখানে অষ্টভুজাদেবীর নিকটে কীর্তন করিবার সময়ে প্রভুর উপরে হঠাৎ পুষ্প বৃষ্টি হয়। একজন চিরাক্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ গোঁরের কৃপায় চন্দ্রদান পাইয়া প্রভুর রূপ দর্শনমাত্রে প্রাণত্যাগ করে এবং প্রভুও মহাসমারোহে তাহাকে সমাধিস্থ করেন। পদ্মকোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে বাইরা চণ্ডেশ্বর শিব দর্শন ও তথাকার প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভগ্নদেবকে কৃপা করেন। এখানে সাতদিন ছিলেন।

তৎপরে গৌরচন্দ্র আবার গভীর বনে প্রবেশ করেন। এক পক্ষ পরে জঙ্গল পার হইয়া রক্তধামে বাইরা উপস্থিত হন। তথা হইতে স্বভাবপর্বতে বাইরা পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; তৎপরে রামনাদ নগর হইয়া রামেশ্বরতীর্থে উপস্থিত হন। এ স্থান হইতে তিন দিন পরে সাধীবন নামক স্থানে মৌনভ্রতধারী একজন মহাতাপসকে বৈষ্ণব করেন। সাধীপূর্ণিবার দিনে তাত্রপল্লী নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্রপথে কঙ্কাকুমারীতে উপস্থিত হন। তথায় সমুদ্রে স্নান

করিয়া কিরিয়া আসেন। আসিবার সময়ে সীতান পর্বত দিয়া জিবাঙ্গুরে উপস্থিত হন। প্রভুকে দেখিয়া জিবাঙ্গুরের রাজা রুদ্রপতি তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।

জিবাঙ্গুরের নিকটবর্তী রাধাগিরি নামক পর্বতে অষ্টৈতাবাদী শঙ্করাচার্যের শিষ্যদিগকে বৈষ্ণব করিয়া মৎস্ততীর্থ, নাগপঞ্চপলী, চিতোল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া তুল-ভদ্রানন্দীতে স্নান করেন। সেখান হইতে চণ্ডীপুরে বাইরা ঈশ্বরভারতী নামক কোন জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব করিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিয়াছিলেন।

চণ্ডীপুরের পর প্রভু একটা ভয়ানক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহার মুখ দেখিয়া বনবাসী হিংস্র জন্তুরাও হিংসা ছাড়িয়া শান্তিরসে ভাসিয়াছিল। এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া পর্বতবেষ্টিত কোন একটা ক্ষুদ্র গ্রামে বাইরা কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখা দেন। ক্রমে নীলগিরির নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে বাইরা কতকগুলি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তৎপরে অপরাপর স্থান ভ্রমণ করিয়া শুজুরী নগরে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করেন। তথা হইতে বিজ্ঞানুল পর্বত দিয়া সহ্যপর্বত ও মহেন্দ্রমল্ল দর্শন করিয়া পুণা নগরে উপস্থিত হন। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তাদের মতে এখানে প্রভু ঠিক নবদ্বীপের মত ধর্মপ্রকাশ করিয়া চতুর্দশাষ্টর পণ্ডিত ও ছাত্রগণকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। পরে তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া কৃষ্ণবিরহে অনেক সময় রোদন করেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া যথাক্রমে ভোলে-শ্বর ও দেবলেশ্বর দর্শন করিয়া খাণ্ডবার খাণ্ডোবাদেবকে দর্শন করেন। প্রবাদ এইরূপ যে নারীর বিবাহ না হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে খাণ্ডোবাদেবের সেবার নিযুক্ত করিতেন, এইরূপে তথায় অনেক দেবদাসী হইয়াছিল ও দিন দিন তাহারা ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া উঠে। ঐচৈতন্য কৃপা করিয়া সেই সকল ভ্রষ্টাচারিণী দেবদাসীগণকে সংপথে আনয়ন করেন। তাহারা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। তৎপরে গোরাঙ্গচন্দ্র চোরানন্দী বনে প্রবেশ করিয়া প্রসিদ্ধ ডাকাইত নারোজিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া সুলানন্দীর তীরস্থ খণ্ডলাতীর্থ, নাসিক নগর ও পঞ্চবটী বন অতিক্রম করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে উত্তরদিগ্ধরিয়া ১৫ দিন পরে সুরট নগরে গমন করেন। এখানে তিন দিন থাকিয়া তথাকার অষ্টভুজা ভগবতীর নিকটে পণ্ড বসিধানপ্রথা নিবারণ করিয়া তাত্রী নদীতে বাইরা স্নান করেন। তৎপরে নন্দদায় স্নান ও বলাব নগরে বজ্রকুণ্ড দর্শন

করিয়া বরদার উপস্থিত হইলেন। এইখানে নারোক্তি ভাষা-
ইক প্রকাশ্য করেন। হৃদয় সময়ে প্রভু স্বয়ং হাহার
কর্মে কৃষ্ণনাম গান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বরদার হস্তা
প্রভুর শরণাগত হন।

মহানদী পার হইয়া অক্ষয়সাবিত্রি দিয়া শুভানবীর তীরে
উপনীত হইলে কুলীরগোমের রামানন্দবল্ল ও গোবিন্দচরণের
সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে যোগানন্দ স্থানে আসিয়া
বারমুখী নামী বৈষ্ণবেক কৃপা করিয়া সোমনাথ দর্শন করিবার
জন্ত স্যাকুল হইয়া পড়েন এবং জাম্ববতী দিয়া ছয়দিনে সোম-
নাথে উপস্থিত হইলেন। বরবেরা সোমনাথের চরণার একত্ব
করিয়াছে দেখিয়া প্রভু হাহাকার করিয়া আত্মনন্দ করিতে
লাগিলেন এবং কাড়রস্বরে সোমনাথের নিকট অনেক প্রার্থনা
করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। ক্রমে জুনাগড় অতিক্রম
করিয়া গির্গার পাহাড়ে, শ্রীকৃষ্ণচরণ চিত্র দর্শন করিয়া প্রেমে
বিহ্বল হন। এই স্থানে ভগদেব নামক একজন সন্ন্যাসীকে
গীড়া হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রেমদান করেন।

প্রভুর বিশ্রাম নাই। বোলদান ভক্ত সবে নিবিড় জঙ্গল
পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া সাত দিন পরে অন্নরাবতী ও
গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহারই নাম
প্রভাসতীর্থ। এখানে বাইরা গৌর জ্ঞানশুভ হইয়া পড়েন ও
চেতনা হইলে অনেক যোজন করেন।

১লা আশ্বিন প্রভাস ছাড়িয়া হারকার চলিলেন, সাগরের
তীরে চারিদিন চলিয়া দড়ার উপর দিয়া সাগরের খাড়ি পার
হইয়া হারকার উপস্থিত হইলেন; এখানেও প্রভাসের জায়
প্রেমে বিহ্বল হন। একপক্ষ কাল তথায় থাকিয়া নীলাচল
অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (এই স্থান হইতে অপর
স্বকীয়গকে বিদায় করেন।) আশ্বিনমাসের শেষে পুনরায়
বরদানগরে আসিলেন। তার বোলদিন পরে নন্দদানদীতে
আসিয়া দান করিলেন। এখানে ভগদেবের সহিত
প্রভুর বিচ্ছেদ হইল। নন্দদার ধারে ধারে চলিতে
আরম্ভ করিয়া দোহদনগর ও কুক্ষি নগরে অনেক
বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিজ্ঞাচলে মন্দির নগরে
উপস্থিত হন। তথা হইতে তিন দিনে দেওমুখে আসিয়া
আদিনারায়ণ নামক এক কুঠরোগীকে আরোগ্য করেন।
তথা হইতে দুই দিনে শিরানীনগরে আসিয়া তাহার পূর্ব-
তাপস মহাপর্যন্ত দিয়া চতীনগরে বাইরা চতীদেবীকে
দর্শন করেন। তথা হইতে হারগুর দিয়া অরশেবে বিজ্ঞানগরে
রামানন্দস্বরের সহিত মিলিত হন। এইস্থান হইতে পুরীচত
যাত্রার বিবরণ চরিতাবৃত্তের সমান।

বহাং প্রভু দক্ষিণ হইতে কিরীয়া আসিয়াছেন ভবিয়া নীলা-
চলবাসী প্রেমান প্রেমান লোক তাঁহার নিকটে পরিত্রিত হইবার
জন্ত উপস্থিত হইলেন। সকলে উপস্থিত হইলে সার্কভোম একে
একে তাঁহাদের পবিত্রত্ব বিস্তারিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগ-
নাথের দেবক, নন্দদান, স্বর্ণ বৈষ্ণবদী, লিপ্যসিকারী বিধি
মাহিত্তি, বৈষ্ণব প্রভুরবিষ্ণু, জগনাথের মহাশোভার দান
নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিত্তির ভাতা-মুদ্রাক্ষি মাহিত্তি, চন্দনেশ্বর,
মিথহেখর, মুদ্রাক্ষি, বিজ্ঞান, প্রহরাজ মহাপাত্র, এবং পরমানন্দ
মহাপাত্র এই সকল লোক এই দিন হইতে শ্রীচৈতন্যের
একান্ত অঙ্গুগত হইলেন। এই সকল রামানন্দ স্বরের পিতা
ভবানন্দ রায় চারি পুত্র সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন, তত্ত্বাচর্য্য
তাঁহার পরিচয় দিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ও রামানন্দস্বারকে
অনেক প্রশংসা করেন। তিনিও চারি পুত্রের সহিত আশ্র-
মদর্শন করিলেন এবং পুত্র বাগীনাথকে চৈতন্যের সেবার
জন্ত তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন, চৈতন্য ভবানন্দের মুখে
দিন পাঁচের মধ্যে রামানন্দ রায় আসিবেন ভবিয়া অতিশয়
আশ্বাসিত হইলেন। ভবানন্দ বিদায় হইয়া চলিলেন, বাগীনাথ
তাঁহার সেবার নিযুক্ত রহিলেন।

সার্কভোম তত্ত্বাচর্য্য ব্যতীত আর সকল লোক বিদায়
হইয়া গেল। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া
লইলেন ও ভট্টমারীগণের প্রলোভনে তাঁহার যে অবস্থা
হইয়াছিল তাহা আত্মোপাস্ত বর্ণনা করিয়া সার্কভোমকে
বলিলেন, “এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিলাম ও বিদায়
দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার
নিকটে আর থাকিতে পাইবে না।” এই কথা শুনিয়া
কৃষ্ণদাস হৌ হৌ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সত্য তত্ত্ব
হইল। শ্রীচৈতন্য উঠিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন শ্রবণে
নিত্যানন্দ হুঃখিত হইয়া চৈতন্যচন্দ্রের অহুমতি মতে
মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন
সংবাদ দিবার জন্ত নন্দরীশে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস
নবরীশে আসিয়া শচীমাতা ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে এবং
শান্তিপুত্র গিয়া অদৈতচর্য্যকে সংবাদ দেন। এই শুভ-
সংবাদে ভক্তগণের আনন্দের সীমা থাকিল না। ভক্তগণ
মিলিত হইয়া এই উপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিয়া
নীলাচলে বাইবার হুষ্টি করিয়া শচীমাতার ভবনে বাইরা
তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কৃষ্ণদাসের মুখে সংবাদ পাইয়া
নবরীশবাসী বাহুবদেবক, মুদ্রাক্ষি, শিবানন্দ, চন্দ্র-
শেখর, আচার্য্য, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্যনিধি, দামোদর
পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, বিজয়দাস, মোদাভেচা, শ্রীধর,

রাঘব পণ্ডিত ও হরিনাম ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে গমনোদ্দেশ্য করেন। কুলীনগ্রামবাসী সভ্যরাজবা ও রামানন্দ এবং শ্রীধনুনিবাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন ইহারাও আসিয়া যোগ দেন।

এই সময়ে পরমানন্দপুরী দাক্ষিণাল্য হইতে আসিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়া গৌরদেব জনৈক ভক্ত কমলাকান্তকে লইয়া ভক্তগণের গমনোদ্দেশ্য না হইতে হইতেই নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। শ্রীচৈতন্য তাহাকে পাইয়া প্রণাম করিয়া মহানন্দে বলিলেন,—“আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, এখন নীলাচ্রে আশ্রয় করুন।” পুরী হইতে বিশেষ অমত করিলেন না। গৌরচন্দ্র পুরীর জন্ত কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জন একখানি ঘর ও সেবার জন্ত একটা কিছর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পুরীর মুখেই গৌরচন্দ্র ভক্তগণ লইয়া আসিবে এই খবর পাইরাছিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন প্রাতে সার্কভৌম ও পরমানন্দ পুরীকে লইয়া শ্রীচৈতন্য ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কঁদিতে লাগিলেন। ইহার নিবাস নবদ্বীপ ও পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। গৌরাজ সন্ন্যাসী হইলে ইনিও বারাণসী বাইয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। ইনি চৈতন্যের একান্ত অমুরাগী, ইহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বরূপ। ভক্তিরস ও বাক্যশাস্ত্রে ইনি অধিতীর্থ, বেদান্তাদি শাস্ত্রেও ইহার জ্ঞান পণ্ডিত আর দেখা যাইত না। ইহার কঠোর অতিশয় মধুর। শ্রীগৌরের নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়া গুরু অমুখিত হইয়া চৈতন্যের নিকটে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তুমি যে আসিবে, তাহা আজ অগ্রে দেখিয়াছি। ভালই হইয়াছে, আমি অন্ধ ছিলাম, আজ তোমাকে পাইয়া চক্ষুরন্ধ লাভ করিলাম।” স্বরূপ অনেক কঁদিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। গৌরচন্দ্র স্বয়ংই সমস্ত ভক্তগণের সহিত স্বরূপের পরিচয় করিয়া দিলেন এবং স্বরূপের জন্ত কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখানি ঘর নির্দিষ্ট করিয়া পরিচর্য্যার্থ একটা ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোবামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌরদেবের নিকট দেখাইতে আনিলে ভক্ত-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দিলে প্রভুর নিকটে তাহা বাইতে পাইত। স্বরূপ নিভৃত

বসিয়া উপাসনা করিতেন এবং বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের সুললিত পদ ও রারের নাটক প্রভৃকে শুনাইয়া তাহার চিত্তবিনোদন করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে গোবিন্দ চৈতন্যের নিকটে আসিয়া বলেন যে, ঈশ্বর-পুরীর সিদ্ধি হইয়াছে, সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে তিনি গোবিন্দকে চৈতন্যের সেবার নিযুক্ত থাকিতে অমুখিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার অপর ভৃত্য কাশীধরও তীর্থ দর্শন করিয়া এইস্থানে আসিতেছেন। চৈতন্যের অমত থাকিলেও গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গোবিন্দকে আপনার সেবকরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে রানাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি এবং কীর্তনীয়া ছোট ও বড় হরিনাম এই চারিজনও প্রভুর সেবার নিযুক্ত হইলেন।

অনতিকাল পরে ব্রহ্মানন্দ ভারতী উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দের মুখে ব্রহ্মানন্দের আগমনবার্তা শুনিয়া প্রভু স্বয়ং উঠিয়া তাহার নিকটে বান। ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরিধান করিয়া হারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৌর মুকুন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গীপে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াও যেন দেখিলেন না। মুকুন্দকে কহিলেন, “তিনি কোথায়?” মুকুন্দ বলিলেন, “এই যে তিনি আপনার সমুখে দাঁড়াইয়া আছেন।” গৌর জেব হস্ত করিয়া বলিলেন, “মুকুন্দ তোমার কি বুদ্ধি জন্ম হইয়াছে যে, এক জনকে আর এক ব্যক্তি বলিতেছ, ভারতী গোসাই চন্দ্রাধর পরিচয় কেন?” গৌরের এই পরিহাসবাক্যক বাক্যে ভারতীর মনে আঘাত লাগিল, মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, শেষে দাস্তিকতার পরিচায়ক মৃগচর্ম পরিত্যাগ করিয়া বহির্বাস পরিধান করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাহার পদবন্দনা করিলে তিনি গৌরাজকে আলিঙ্গন দেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে উভয়েই উভয়কে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করেন। এই সময়ে ভগবান আচার্য্য ও রামভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তি গৌরের আশ্রয় লইলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বরপুরীর অপর লিখ্য কাশীধর আসিয়া পৌছিল, সে অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল। তাহার উপরে লোকের ভিড় তৈলিয়া গৌরাজকে জগন্নাথ দর্শন করাইবার ভার অর্পিত হয়।

(চৈ' চরি' মধ্য' ১০ পরি।)

কিছুদিন এইরূপে চলিতে লাগিল, ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়া শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সহিত পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন যে রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার দেখিবার জন্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সার্কভৌমের কথা শুনিয়া বিস্ময় করিয়া কাণে হাত দিয়া বলিলেন—

“নিষ্কিনন্ত ভগবদভ্যাসানুখ্যত
পারং পরং জিগমিষোর্বসাগরত ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ বোধিতাক্ষ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যাসাধু ।”

(ঐচৈতন্যচন্দ্রোদয়না ৮৩৪)

অর্থাৎ যিনি ভবলাগরের পর পারে বাইবার মানসে
সকল ছাড়িয়া ভগবানের ভজন করিতে উদ্যত, তাহার
পক্ষে বিষয়ী ও জীলোকের সন্দর্শন করা অপেক্ষা বিষভক্ষণ
করাও ভাল। তোমার কথায় আমি চুঃখিত। সার্কভোম
আবার বলিলেন, “প্রভো! আমাদের রাজা জগন্নাথসেবক
ও পরমভক্ত।” ঐচৈতন্য ধীর গভীরস্বরে বলিলেন—

“আকারাদপি ভেতব্যং জীণং বিষয়িণামপি ।

যথাহের্মনসঃ কোভন্তথা ভক্তাকৃতেরপি॥”

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮২৫)

অর্থাৎ রাজা ও জী কালদর্পের ভ্রায় পরিত্যজ্য, বেক্ষপ
কাঠময় রমণীমূর্ত্তি দেখিলে মনের বিকার হইবার সম্ভাবনা,
তেমনি রাজদর্শনেও ধনতৃষ্ণা প্রবল হইতে পারে। অতএব
এরূপ কথা আর মুখে আনিবে না, পুনরায় বলিলে আমাকে
আর এখানে দেখিতে পাইবে না।

সার্কভোম আর বিরুক্তি করিলেন না।

কথিত আছে, রাজা প্রতাপরুদ্র ঐচৈতন্যের দর্শন জন্ত
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সার্কভোমকে একপত্র লিখিলেন যে,
তিনি যেন গৌরভক্তদিগের কাছে তাঁহার অতুরোধ করাইয়া
প্রভুকে সম্মত করিতে চেষ্টা করেন। সার্কভোম ঐ পত্রখানি
নিত্যানন্দ প্রভুজিকে দেখাইলে তাঁহারাই সেই কথা চৈতন্যকে
জানাইলেন, গৌর তাহাতেও সম্মতি প্রদান করিলেন না।
পরিশেষে ভক্তদল পরামর্শ করিয়া প্রভুর একখানি বহির্বাস
রাজার নিকটে পাঠাইয়া দেন, রাজা সেই খানি মাধ্যম
রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া
উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দরায়ও আসিয়া-
ছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্বপ্রথমে গৌরচন্দ্র
চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌর মহা
আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার মিলন
করাইয়া দিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র সার্কভোমের মুখে
ভুলিলেন যে, গৌরচন্দ্র কিছুতেই তাঁহাকে দর্শন দিবেন না।
রাজা এই সকল কথা শুনিয়া প্রতীক্ষা করিলেন যে যদি
গোয়াজের দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই আশ্রয়প্রার্থ্য করিব।

শেষে সার্কভোমের পরামর্শে মিতান্ত দীনবেশে উভানে
থাকিয়া রথযাত্রার দিনে প্রভুকে দর্শন করেন।

মানবাত্মা দেখিয়া ঐচৈতন্য গোপীভাবে মিতান্ত ব্যাকুল
হন ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া আলাননাথে গমন
করেন। সার্কভোম অনেক অহুসন করিয়া প্রভুকে কিরাইয়া
আনিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে গৌরভক্তগণ
তথায় বাইয়া উপস্থিত হন। ভক্তদল প্রথমে উন্নত হইয়া
কীর্তন করিতে করিতে কানীমিশ্রের ভবনাভিমুখে বাইতে
লাগিল। সে হরিনন্দনি, হুজার, গর্জন ও উৎসাহ দেখিলে
মৃত প্রাণেও উৎসাহ সকার হয়। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টা-
লিকার ছাদে দাঁড়াইয়া গৌরের ভক্তদিগকে অবলোকন
করেন। গোপীনাথ আচার্য্য বধাক্রমে ভক্তগণের নাম
উল্লেখ করিয়া রাজার নিকটে পরিচয় দিয়াছিলেন। ভক্ত-
গণ জগন্নাথ দর্শন না করিয়া সর্বপ্রথমে চৈতন্য দর্শন করিতে
গমন করেন। গৌরচন্দ্র ভক্তগণের আগমনবার্তা পাইয়া
প্রথমে মালা ও চন্দন পাঠাইয়া দেন। ক্রমে তাহার নিকট-
বর্তী হইলে স্বয়ং গমন করিয়া পথিমধ্যে তাহাদের সহিত
মিলিত হন। তখন একটা আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল। কিছু-
কালে সেই আনন্দে মগ্ন থাকিয়া চৈতন্য অবৈত প্রভৃতি ভক্ত-
দিগকে একে একে আলিঙ্গন ও কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা
করিলেন। তৎপরে মুকুন্দদত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কানীদত্তকে
বলিলেন, “তোমার জন্ত ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত নামে দুই-
খানি পুঁথি আনিয়াছি, স্বরূপের নিকটে আছে, চাহিয়া লইয়া
পাঠ করিও।” সকলের সঙ্গে মিলনের পর চৈতন্য জিজ্ঞাসা
করিলেন, “হরিন্দাস কোথায়?” ভক্তগণ বলিলেন যে, হরি-
দাস আপনাকে নীচজাতি জ্ঞানে মন্দিরের নিকটে বাইতে অনধি-
কারী মনে করিয়া রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। সার্ক-
ভোমের পরামর্শ মতে রাজা প্রতাপরুদ্র গৌড়বাগী ভক্তগণের
উপযুক্ত বাসস্থান পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। কানী-
মিশ্র ও পড়িছা আসিয়া জানাইলেন। ঐচৈতন্য ভক্তগণকে
বাসায় বাইতে ও সমুদ্রস্থান করিয়া পুনর্বাস সকলে মিলিত
হইয়া গৌরের বাসায় আসিয়া মহাপ্রসাদ লইতে বলিলেন।

ভক্তদল বিদায় হইলে গৌরাজ্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া
রাজপথে যেখানে হরিন্দাস পড়িয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত
হইয়া হরিন্দাসকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিন্দাস
কাঁতরস্বরে আপনাব নীচজাতিত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্পর্শ
করিতে বারণ করিলে প্রভু উত্তর করিলেন—

“প্রভু কহে তোমা স্পর্শ পবিত্র হইতে।

তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥

কণে কণে কর তুমি সর্বতীর্থ দান।

বিজ্ঞানী হতে তুমি পরমপাবন ॥ (চৈঃ চরিত্রঃ মধ্যঃ ১১ পং)

শ্রীচৈতন্য এই কথা বলিয়া পুষ্পোত্তানের মধ্যে একটা নির্জন ঘর হরিদাসের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তৎপরে গৌরচন্দ্র সমুদ্র স্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণব-মিথের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ও কালীমিশ্র আদেশ পাইয়া বৈষ্ণবদিগের উপযুক্ত মহা-প্রসাদ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বধাসময়ে অবৈত প্রভৃতি ভক্তগণ ভোজনের জন্য চৈতন্যের আবাসে উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে বধাক্রমে বসাইয়া অহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তগণ প্রভুর অপেক্ষার হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিলেন। পরিশেষে গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভোজন করিতে বসিলেন। স্বরূপ দামোদর ও জগদানন্দ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিশ্রবণি দিয়া মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে মালাচন্দন দিয়া বিশ্রামার্থ বাসায় পাঠাইয়া আপনিও বিশ্রাম করিলেন।

সায়াকে ভক্তসঙলী গৌরাজ-সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র একে একে সমস্ত ভক্তগণের সহিত রামানন্দের পরিচয় করিয়া দেন। সকলেই হরিকথায় মত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সকল ভক্ত সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া সন্ধ্যারতির অন্তে কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই দিনে গোরের মনে বড়ই উৎসাহ হইয়াছিল। নবদ্বীপ ছাড়িয়া এমন কীর্তন আর হয় নাই। গৌর আনন্দ-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া কীর্তনের চারিটা সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিশ জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্তনস্বরে আকাশ ভেদ করিয়া গ্রামবাসী সকলকেই উন্মত্ত করিয়া তুলিল। নীলাচলবাসী নরনারীগণ ঘর ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিল। ভক্তগণের শব্দ, অশ্রু প্রভৃতি ভাব দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। প্রতাপরুদ্র অমাত্যবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র কীর্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে জগন্নাথ মন্দির বেঁটন করিয়া নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে সে দিনকার সংকীর্তন শেষ হইল। বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে বেড়া-কীর্তন নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তৎপরে চৈতন্যচন্দ্র ভক্তগণকে লইয়া বাসায় আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। নীলাচলের

পবিত্র ক্ষেত্রে গৌরচন্দ্রের প্রেমের হাট বসিল, দিন দিন ভারতের নানাহান হইতে ভক্তগণ আসিয়া ইহাতে যোগ দিতে লাগিলেন।

তৎপরে রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের নিকটে রাজ্য প্রতাপ-রূপকে কৃপা করিতে অহরোধ করেন। কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বলিলেন যে, “রাজ্য বৈষ্ণব হইলেও আমি তাহার সহিত মিলন করিলে লোক-নিন্দা হইবে, তোমরা এ বিষয় আমাকে অহরোধ করিবেনা।” চৈতন্যচরিতামৃতের মতে এই সময়ে প্রভুর একখানি বহি-বাস রাজাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পরে প্রভুর অহুমতিক্রমে প্রতাপরুদ্রের পুত্র আসিয়া মিলিত হন। শ্রীচৈতন্য তাহার ভক্তি দেখিয়া প্রেমাবেশে তাহাকে আলি-জন করেন। রাজকুমারও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যসঙ্গী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এইরূপ নানারূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল, জগন্নাথের রথযাত্রা নিকটবর্তী।

চৈতন্যচন্দ্র গুণ্ডিচা-মন্দির বড়ই অপরিষ্কার দেখিয়া সকলকে বলিয়া তাহার মার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর আদেশে একশত সম্মার্জনী ও একশত কলসী আনা হইল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীহস্তে একখানি মার্জনী লইয়া মার্জন করিতে লাগিলেন। প্রথমে মন্দিরের উপর মার্জন করিয়া ছোট বড় সকল মন্দিরই ধোত করা হইল। গৌর-চন্দ্র কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে মত্ত হইয়া মার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও সেই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মার্জন করিতে লাগিলেন। মার্জন-কালে তৃণ ধূলি সকল বহির্বাসে করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার হইল। এই সময়ে প্রভুর একজন ভক্ত তাহার পায়ের উপরে এক কলসী জল ঢালিয়া তাহা পান করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রভু অনেক রাগ করিয়াছিলেন। গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য সমস্ত ভক্তকে লইয়া সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করেন। স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল ভক্তের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে আচার্য্য গোস্বামীর পুত্র গোপাল নাচিতে নাচিতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টায়ও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সকলেই বিষম চিন্তিত হইলেন। শেষে শ্রীচৈতন্য তাহার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, “বাপ গোপাল, উঠিয়া একবার কৃষ্ণ-নাম কর।” গোপাল অমনি উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাদিতে লাগিল। পরে গৌরাজন্মের ভক্তগণকে

লইয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের এই হৃদান্তটীকে “ধোরা পাখলা লীলা” নামে উল্লেখ করেন। ইহার পরে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নামে আর একটি লীলা আছে। গোরাঙ্ক দলের অগ্রবর্তী হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে বাইরা বেদুতাকীর্জন করিতেন, তাহাই নেত্রোৎসব নামে বিখ্যাত।

রথযাত্রার দিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া পাণ্ডু-বিজয় দর্শন করিতে যান। এই সময়ে লোকের অতিশয় ভিড়, প্রায় অনেকের অর্ধটাই জগন্নাথ দর্শন ঘটিয়া উঠে না। গোরাঙ্ক ও তাহার ভক্তগণের দর্শনে ব্যাকান্ত না হয় এইজন্য বরং প্রতাপকৃত্ত পাণ্ডগণ লইয়া বন্ধোবস্ত করেন। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, সেবকগণ রাজার জার তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, সকল লোক রথ ধরিয়া টানিল, রথ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীচৈতন্য তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি চারিটা সম্প্রদায় বাঁধিয়া কীর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু স্বয়ংই ভক্ত-গণের গলায় মালা ও চন্দন দিয়া সাজাইয়া দিলেন। চারি সম্প্রদায়ে সর্ব সময়ে চক্ষিণজ্ঞান গায়ক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে হুইটা করিয়া মৃদঙ্গ। অবশিষ্ট বৈষ্ণবগণ ছুটিয়া আরও তিনটা সম্প্রদায় বাঁধিয়া কীর্জন করিতে লাগিলেন। কীর্জন দেখিয়া সকলেরই প্রাণ উন্মত্ত হইল। বৈষ্ণবগণ বলেন, এই কীর্জন শুনিতে নাকি জগন্নাথ রথ রাখিয়াছিলেন।

প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল সম্প্রদায়েই বোগ দিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে চৈতন্য দণ্ডবৎ করিয়া উর্দ্ধমুখে জগন্নাথের তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তব করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেগ আরও উৎকলিত হইল, তিনি ধরাতেলে পড়িয়া গড়া-গড়ি দিতে লাগিলেন। চৈতন্যের সাহসিক ভাব সকল প্রকাশ পাইয়া অতি বনোহর করিয়া তুলিল। কিছুকাল নৃত্য করিয়া গোরাঙ্ক অরুণকে আজ্ঞা করিলে অরুণ হৃদয় বুঝিয়া “সেইত পরাণনাথ পাইছ। যাহা লাগি মদন দহনে পুড়ি গেছ।” এই পদটি গান করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য পদটি শুনিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শরীর রোমাঞ্চিত, অবিভ্রান্ত অশ্রুধারার বুক ভাসিয়া গিয়াছে, কখন ধূলার স্পৃষ্ট হইয়া রোদন করিতেছেন, কখনও বা ধীর গর্জন করিয়া ছাড়ার দিতেছেন। গোরাঙ্কের অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত দ্বারীমণ্ডলীর মন বিচলিত হইল, তাঁহারও নাচিয়া, কাঁদিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাগলের জায় ছুটছুটি করিতে লাগিল। গোরাঙ্ক, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকল ভক্তই অজান হইয়াছেন। চৈতন্য প্রেমাবেগে পড়িয়া

বাইতেছিলেন, রাজা প্রতাপকৃত্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। প্রতাপকৃত্তের পশ্চ মাঝেই চৈতন্যের জ্ঞান হইল, তিনি বিষয়ী পশ্চ হইয়াছে বলিয়া আপনাকে বিচার দিতে লাগিলেন। তৎপরে পৌর আপন ভক্তগণ লইয়া জগন্নাথের রথের অগ্রে কীর্জন করিতে আরম্ভ করেন। প্রভু প্রেমাবেগে অচেতন হইয়া কীর্জন করিতেছেন। সেই সময়ে লার্কভোমের পরামর্শ মতে রাজা প্রতাপকৃত্ত রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে বাইরা চৈতন্যের পদ দর্শন করিতে করিতে ভাগবতের “অরতি তেহধিকং” অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যের জ্ঞান হইল, “আবার বল, বড় ময়ূর ভসিতেছি, তাই আবার বল।” এই বলিতে বলিতে উঠিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। রাজা ও চৈতন্য কিছুকাল প্রেমাবেগে নৃত্য করেন। তৎপরে প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে বীর ঐবর্ষ দেখাইয়াছিলেন। কীর্জন তদ হইল, শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ করিয়া ভক্তগণ লইয়া মহানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। এদিকে জগন্নাথের রথ চালনের সময় উপস্থিত হইল, সকলে মিলিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু রথ স্তম্ভে হইতে তারি হইল, এক পাও চলিল না। এই সংবাদ রাজার নিকটে পৌছিল, তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া প্রধান প্রধান মন্ত্র ও কতকগুলি মন্ত হস্তীঘারা টানাইতে লাগিলেন, কিন্তু রথ একটুও নড়িল না। রথ চলেনা দেখিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, এই সংবাদ পাইয়া চৈতন্য স্বয়ং ভক্তগণ লইয়া রথ টানিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গোরাঙ্ক রথের পিছনে মাথা দিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিলে রথ হড়্ হড়্ করিয়া চলিয়া-ছিল। এইরূপে রথযাত্রা শেষ হইয়া গেলে প্রভু ভক্তগণ লইয়া কীর্জনানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ইন্দ্রদ্বার সন্মোহনে যাইয়াও ক্রীড়া করা হইত। ইহার পরে হোরা-পঞ্চমী দিনের লক্ষ্মীর বিজয়রঙ্গ দর্শন করেন। জগন্নাথের ভিতর বিজয় এবং কৃষ্ণজন্মোৎসব দিনেও পূর্বের জায় ভক্তগণের সহিত নৃত্যকীর্জন করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারিমােস টলিয়া গেল। শ্রীচৈতন্য বিজয়ার দিনে রামলীলা অভিনয় করিলেন। উত্থান-একাদশীর পর দিনেও নৃত্য কীর্জন করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে প্রেমে মাতাইয়া ছিলেন। ইহার পরে একদিন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে লইয়া নিম্নতে বলিয়া পরামর্শ করেন। উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া-ছিলেন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। পরদিন শ্রীচৈতন্য গোড়বাসী ভক্তগণকে ডাকিয়া মিঠাবাক্যে বলিলেন, “তোমরা এখান-সেখান বাইরা আচণ্ডাল প্রভৃতি সকলকেই কৃষ্ণ-ভক্তি দান করিতে প্রেরণ কর। প্রতি বৎসরে রথযাত্রার পূর্বে

এখানে আসিয়া আমার সহিত শুভিচা দর্শন করিবে।” ইহার পরে নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বসিলেন, “শ্রীপাদ! তুমিও গোড় দেশে যাইয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার কর! গদাধর প্রভৃতি কএকজন প্রধান ভক্ত তোমার সহায়তা করিবেন।” অপর অপর সকল ভক্তকেই খিটবাক্যে সান্না করিয়া দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ চৈতন্যের বিচ্ছেদে কাতর হইয়াও প্রভুর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া মন প্রাণ তাহার চরণে অর্পণ করিয়া কাদিতে কাদিতে গোড়দেশে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ভক্তগণের বিচ্ছেদে বিষম হইয়া ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত, পুরী গোসাঁই, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীধর এই স্বরূপ ভক্ত প্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪৫ মাস গোবরের সহিত একত্র থাকিয়া কার্তিকমাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতেন। বতদিন গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন পর্যন্তই এই নিয়ম চলিয়াছিল। ইহার পরে গোড়বাসী ভক্তগণের ক্রীপাত্ত ও আসিতে লাগিল।

ভক্তগণ চলিয়া গেলে ভট্টাচার্যের অহুরোধে মধ্যে মধ্যে তাঁহারও ঘরে শ্রীচৈতন্য ভোজন করিতে লাগিলেন। সার্কভোমের পত্নী বাঠীর মাতাও প্রভুর প্রতি বিশেষ অহুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, পরম ভক্ত ভট্টাচার্যের অহুরোধে প্রভু অধিক ভোজন করিতেন, দশ বারজনের উপযুক্ত অন্নবাজন অনারাসে খাইয়া ফেলিতেন। একদিন বাঠীর ভর্তা ভট্টাচার্যের জামাতা অমোঘ প্রভুর ভোজন দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

“এই অরে তুণ হর দশ বার জন।

একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥”

(‘চৈ’ মধ্য ১৫ পরি’)

প্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভট্টাচার্য লণ্ড লইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, অমোঘ পলাইয়া গেল। তৎপরে ভট্টাচার্য ও বাঠীর মাতা অমোঘের চৌদপুরুষ উচ্ছন্ন দিয়া বার বার বাঠীর বৈধব্য প্রার্থনা করিলেন। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া গৌরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “অমোঘ সরলমতি তাই ওরূপ বলিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই।” ভোজনের পর প্রভু আপনার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। সার্কভোম চৈতন্যনিম্নক জামাতার মুখ দর্শন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং কত্যা বাঠীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা! চৈতন্য-নিম্না করিয়া অমোঘ পণ্ডিত হইয়াছে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর, শাস্ত্রে পণ্ডিত ভক্তকে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে।” ইহাতে সার্কভোমের মন পরিষ্কার হইল না, চৈতন্য-নিম্নাশ্রমে গাণ

হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তির লক্ষ্য তিনি ও বাঠীর মাতা উপবাসী থাকিলেন।

কথিত আছে যে সেই সার্কভোমই অমোঘের বিহুচিকা হয়, তাহার বাচিবার আশা রহিল না। অমোঘ ক্রমে অচেতন হইল, সকলেই ঠিক করিল যে অমোঘ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যনিম্নার অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। সার্কভোম ও বাঠীর মাতা এই সংবাদ পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। প্রাতে গোপীনাথ আচার্য যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিলেন যে, সার্কভোমের জামাতা অমোঘ বিহুচিকারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য এই সংবাদ শুনিয়া আন্তে ব্যস্তে অমোঘের মৃত শরীরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও অমোঘের বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাণ অমোঘ! তোমার হৃদয় সরল, ইহা কৃষ্ণের বসিবার যোগ্য, ইহাতে মাংসখ্যা-চণ্ডালকে কেন স্থান দিয়াছিল? বাণ, সার্কভোমের সম্পর্কে তোমার সমস্ত লাগ লাগ পাইয়াছে, উঠ, একবার তুমি কৃষ্ণনাম লও, ভগবান তোমাকে ক্রপা করিবেন।” চৈতন্যের কথা শুনিয়া অমোঘের জ্ঞান হইল, উঠিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল ও কাদিতে কাদিতে শ্রীচৈতন্যের চরণে পড়িয়া কমা চাহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী অবাক হইয়া গেল, সার্কভোম প্রভৃতি ভক্তগণ এই সংবাদে তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌরচন্দ্র সার্কভোমকে অনেক প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেলেন। (‘চৈ’ চরি’ মধ্য ১৫ পরি’)

সন্ন্যাসের পর চারি বৎসর গত হইয়াছে, গৌরচন্দ্র নীলাদ্রির পুণ্যভূমিতে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় বর্ষে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহার বৃন্দাবন যাইবার অভিলাষ। রামানন্দ ও সার্কভোম আজকাল করিয়া দুইবৎসর কাটাইয়া দিলেন। পঞ্চম বৎসরে বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্বে আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে ফিরিয়া গেলেন। অষ্টম বৎসরের স্থায় সেবারে চারি মাস নীলাচলে থাকিলেন না। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্দ্র রামানন্দ ও সার্কভোমের নিকট বঙ্গদেশে জননীর চরণ ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বর্ষাকালে রাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া উভয়ের পরামর্শ মতে বিজয়াদশমীর দিনে যাত্রা করিবেন স্থির হইল।

বিজয়ার দিনে জগন্নাথের প্রসাদ ও মালাচন্দন সংগ্রহ করিয়া গৌরচন্দ্র প্রাতে যাত্রা করিলেন। পুরী গোসাঁই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীধর, হরিন্দাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, দামোদর

পণ্ডিত এবং রামাই নন্দাই প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গগমন করিতে লাগিলেন। যাত্রীদল ভবানীপুরে উপস্থিত হইলে রামানন্দ রায় ও সার্কভোম ভট্টাচার্য্য আসিয়া মিলিত হন। কালীনাথ বাহকের দ্বারা এখানে মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। সকলে মহানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য সাকীগোপাল দর্শনান্তে স্বপ্নেশ্বর নামক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া বহুলতলার বিশ্রাম করিতেছেন। রামানন্দের মুখে শুনিয়া রাজা প্রতাপ-রুদ্র তথায় আসিয়া গোবরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে রাজার সহিত গোবরাজের অনেক কথা হয়। অনেক কথাবার্তার পরে গৌরচন্দ্র গমনোত্তোগ করিলেন। প্রতাপ-রুদ্র মহাপ্রভুর গমনের সুবিধার জন্ত রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক সচিবদ্বয় এবং রামানন্দ রায় প্রভুর সঙ্গে সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত যাইতে আদিষ্ট হইলেন। অপর অপর বেত্রধারী সৈন্তগণও প্রভুর সঙ্গে যাইবার আদেশ পাইল। এদিকে চিত্রোৎপলা নদীর পর পারে যাইবার জন্ত উৎকৃষ্ট তরলী রাখা হইল, নগরের পথে ও ঘাটে রমণীয় স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হইল। রাজা রাজমহিষী ও পরিজনবর্গ লইয়া যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সন্ধ্যাকালে তথা হইতে যাত্রা করিয়া নদীঘাটে আসিয়া অবগাহন করেন। এই সময়ে রাজা মহিষীদিগকে লইয়া চৈতন্যের পাদ বন্দনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি অনেক প্রবেশ দিয়া গদাধরকে বিদায় করেন। সন্ধ্যার পরে নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়া চতুর্দার (চৌদার) নামক স্থানে আসিয়া রজনী বাপন করিলেন। প্রাতে রাজাজ্ঞার নীলাচল হইতে অনেক মহাপ্রসাদ আসিল, গৌর প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে স্বদলে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করেন। যাজপুরে আসিয়া অমাত্যদ্বয়কে বিদায় দিলেন। রেমুণায় আসিয়া রামানন্দ রায়কে বিদায় করেন। গৌরচন্দ্র যেখানে যান, সেইখানেই রাজাজ্ঞার মহাসম্মান পাইলেন। উৎকলরাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হইলে রাজ-কর্মচারী মহাপাত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই চারিদিন বিশ্রামের পর মহাপাত্র গোবরের নিকটে বলিলেন—

“মত্তপ যবন রাজার আগে অধিকার।

তার ভয়ে পথে কেহ নায়ে চলিবার॥

পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।

তার ভয়ে নদী কেহ হতে নায়ে পার॥

দিন কত যহ সন্ধি করি তার সনে।

তবে সুখে নৌকাতে করাইল গমনে॥”

এই সময়ে যবনরাজের এক গুপ্তচর ছদ্মবেশে উড়িয়া কটকে আসিয়া চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি ও আচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং স্বীয় প্রীতির নিকটে যাইয়া আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পাগলের দ্বার হাসিতে কানিতে ও ক্রক বলিয়া নাচিতে লাগিল। এই ব্যাপারে যবনাধিপতির মন কিরিয়া গেল। তখন তিনি নিজের বিশ্বাসকে উৎকলরাজ-কর্মচারীর সমীপে পাঠাইয়া গোবর দর্শনের ব্যাকুলতা ও তাঁহার প্রতি বহুত ভাব জানাইলেন। মহাপাত্র তাঁহাকে নিরস্ত্র হইয়া কেবল চারি পাঁচটা কৃত্য সঙ্গে আসিতে বলেন। এই সংবাদে রেজাধিপ হিন্দুর বেশধারণ করিয়া উড়িয়া শিবিরে উপনীত হইয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রেম-বিহ্বল চিত্তে সাতাঁক প্রণিপাত করিয়া কানিতে লাগিলেন ও কতই অহুতাপ করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া যবনরাজকে হরিনামে দীক্ষিত করেন। উৎকলরাজ-প্রতিনিধি যবনরাজের সহিত মিজতা স্থাপন করিলেন। উভয়রাজ্যে সন্ধি হইয়া গেল। মুকুল দত্ত সময় বুঝিয়া যবনরাজকে প্রভুর বঙ্গদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। যবন-রাজ আপনাকে কৃতার্থমন্ত ভাবিয়া নৌকা সাজাইয়া প্রভুকে নিজ শিবিরে আনয়ন করিলেন। উৎকলরাজের মহাপাত্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মুসলমান-রাজ এক সূবহং নৌকায় সদলে প্রভুকে উঠাইয়া দিয়া জলদস্যুর ভয়ে আর দশখানি নৌকায় সৈন্ত লইয়া স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন। শ্রীচৈতন্য উৎকল-রাজপ্রতিনিধিকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন। যবনাধিপতি মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদী পার করাইয়া দিয়া পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন এবং নিরাপদ স্থানে পৌছিয়াছেন জানিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া শাশ্রলোচনে বিদায় লইলেন।

মহাপ্রভু সেই নৌকায় পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পুরস্কার দিয়া নাবিকদিগকে বিদায় করিলেন।

পানিহাটীগ্রামে রাখব পণ্ডিতের বাসস্থান। তিনি প্রভুকে মহাসমাদরে নিজ গৃহে আনিয়া সেবা করাইলেন। গৌর আসিয়াছেন শুনিয়া রাখবের গৃহে মহাজনতা হইল। এইখানে এঁড়িরাবহ-নিবাসী গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও মকরন্দজ করকে মহাপ্রভু কৃপা করেন। নিত্যানন্দ এই স্থানে আসিয়া গোবরের সহিত মিলিত হন। রাখবগৃহে একদিন অবস্থান করিয়া গৌরচন্দ্র কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালি-সহর গ্রামে শ্রীবাসের ভবনে আগমন করেন। [শ্রীবাস দেখ।] শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া মহানন্দে

অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই প্রামত্সী বাহুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের গৃহে বাইরাঐ পৌরহুদয়ের অনেক লীলা কোতুক করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছুদিন শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিয়া ও শ্রীরাম পণ্ডিতকে শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্ত বিশেষ উপদেশ দিয়া শিষ্যগণের সহিত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ বিজ্ঞাচাম্পতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। ছই একদিন পরেই গৌরেশ্বর আগমন-বার্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদার দিতে লাগিলেন, কিন্তু লোকের তিড় কমিল না। গৌর শোকের তিড়ে উত্থাক্ত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি কএকজন বিশ্বাসী বন্ধু সঙ্গে লইয়া কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের ঘরে পলাইয়া গেলেন। এদিকে আগন্তুক ব্যক্তিবর্গ গৌরকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বাচম্পতিকে তিরস্কার ও নিষেধন করিতে লাগিল। বাচম্পতি অনেক অল্পসঙ্কানে চৈতন্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে তথায় লইয়া বাইরা নিষ্কৃতি লাভ করেন।

কুলিয়াতে জন-কোলাহল আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া গ্রাম, প্রান্তর, বন জঙ্গল ছাইয়া ফেলিল। গ্রামে দোকানী পশারী জমিয়া এক মহামেলা হইয়া গেল। গোপাল চাপাল অপরাধী হইয়া কুঠরোগে কষ্ট পাইতেছিল। চৈতন্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া অহুতাপ ও আর্তনাদ করায় তাহার অহুমতি মতে শ্রীবাসের প্রসন্নতা লাভ করিয়া রোগ হইতে মুক্তি পাইল। সার্কভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশ্বারদের প্রতিবাসী দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতের অপকার করিয়া অপরাধী ছিল, বক্রেশ্বরের কুপায় তাহার জ্ঞান লাভ হয়। বক্রেশ্বর একদিন জিজ্ঞাসা করেন, সাধুনিষ্ঠা ও পরনিষ্ঠাজনিত পাপ কিসে ক্ষয় হয়? চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, “নিম্নিত ব্যক্তির নিকট নিজ পাপ স্বীকার, তাঁহার স্তুতি, পুনরায় আর নিষ্ঠা না করা এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণই ইহার প্রায়শ্চিত্ত।” দেবানন্দ ভাগবত পড়াইতেন, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। কথিত আছে যে, তিনি শ্রীচৈতন্যের নিকটে ভাগবতের অর্থ শুনিতে চাহিলে চৈতন্য ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে ভাগবতের আশ্রয়ে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সাতদিন কুলিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিয়া বহুবিধ লোককে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্য সমলে শান্তিপুরে অবৈতভবনে গমন করেন। আচার্য্য-ভবনে একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া কেশব-ভারতী চৈতন্যের কে?

এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে অবৈত উত্তর করিলেন, “চৈতন্যের গুরু।” এই কথা শুনিয়া অবৈতের পঞ্চবর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ রাগ করিয়া বলিলেন, “আপনি বলেন কি? চৈতন্যই জগদগুরু, তার আবার গুরু কে?” আচার্য্য পুত্রের-মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাকে কোলে লইয়া প্রেমানন্দে নাচিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য হরিবোল দিয়া তথায় উপস্থিত হন। আচার্য্যের প্রেমসিদ্ধি উথলিয়া উঠিল, হরিনামের ঘোর ষটা পড়িয়া গেল। অবৈত দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীদেবীকে আনাইলেন। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রাণের নিমাইকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এ সময়ে নবদ্বীপের ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য দিন কতক তথায় থাকিয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্বার আসিবে, বলিয়া ভক্তগণের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একজন উড়িয়া ভক্ত নাকি জানিতে পারিয়াছিল যে এবার চৈতন্যের বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না, কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিতে হইবে। গৌরাঙ্গ ভক্তদল ও পথে উপস্থিত লোকসমূহ লইয়া অল্পদিন মধ্যে বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গোড়নগরের নিকট রাম-কেলী গ্রামে উপস্থিত হন। নগরকোতোয়াল গোড়েশ্বরকে জানাইল যে, এক সন্ন্যাসী বহুসংখ্যক লোক লইয়া অনবরত ভূতের সঙ্কীর্তন করিতেছে। সৈয়দ হুসেন বা দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন তখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি হিন্দু সভা-সন্মিলনকে জিজ্ঞাসা করায় কেশবছত্রী, রূপ ও সাকর মল্লিক বা দবীরথাস তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সব মিথ্যাকথা, এক জন ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনে যাইতেছেন, তাহার সঙ্গে ছই চারিজন ভিক্ষুক চলিয়াছে। এদিকে তাঁহারা গোপনে অস্ত্র যাইতে চৈতন্যকে অস্ত্ররোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের মনে আশঙ্কা যে যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোন অনিষ্ট করেন। কিন্তু সৈয়দ হুসেন চৈতন্যের থাকিবার ও সঙ্কীর্তন প্রচারের সুবিধার জন্ত এবং কাজীগণ তাঁহার প্রতি অস্ত্রায় আচরণ করিতে না পারে তজ্জন্ত রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। উক্ত রূপ ও সাকরমল্লিকই পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন নামে বিখ্যাত। [রূপ ও সনাতন গোস্বামী শব্দে বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রূপ ও সাকরমল্লিক রাজদরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া চৈতন্যের দর্শন-মানসে রাতি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেশ পরিবর্তন করিয়া যাত্রা করিলেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর লোকপরম্পরায় তাঁহার ওপের কথা শুনিয়া ইহার একান্ত

অল্পস্বল্প হইয়াছিলেন এবং মধ্যে দুই একবার আপনাদের কর্তব্য কি, এই বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। ঐচৈতন্য তত্ত্বতরে একটীমাত্র সংকৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কবিতাটা এই—

“পরব্যাসিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ণপি।

তমেবানন্দমস্ত্যন্তনবসঙ্গরসায়নম্॥”

অর্থাৎ পরপুরুষাসক্তা কুলকামিনী গৃহকর্ণে ব্যস্ত থাকিয়াও মনে মনে যেমন সর্বদাই তাহার সন্তোগস্থ থাকিবার আশা করেন, সেইরূপ বিষয়কর্ণে লিপ্ত থাকিয়াও ভগবানের রসে মন মগ্ন রাখিবেন।

ইহারও সেই উপদেশ অনুসারে চলিয়া আসিতেছিলেন। যথা সময়ে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া কামিতে লাগিলেন। চৈতন্য বলিলেন, “তোমাদিগকে বড় ভালবাসী, সেই কারণেই এখানে আসি-আছি, এখন যেরে যাও, ঐক্লব অবজ্ঞাই তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।” পরে উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, “সকলে রূপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর। আজ হইতে ইহাদের নাম হইল রূপ ও সনাতন।” ভক্তগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, রূপ সনাতনের হৃদয়ে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল, তাঁহারা নবজীবন পাইয়া আনন্দে হরিবোল দিয়া নাচিতে লাগিলেন। বিদায় হইয়া যাইবার সময় সনাতন ঐচৈতন্যকে সে স্থান হইতে শীঘ্র যাইতে বলেন ও ভঙ্গীক্রমে বুঝাইয়া দেন যে, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত নহে, একাকী অথবা দুই একজন সঙ্গী লইয়া গেলেই ভাল হয়। গৌরাক্ষ সনাতনের উপদেশের সারবত্তা গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রত্যুষেই যাত্রা করিয়া কানাইয়ের নাটশালা প্রাণে চলিয়া আসিলেন। সেই দিন তথায় থাকিয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এবার বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। শান্তিপুরে শচীমাতাকে আনাইয়া দশ দিন পর্যন্ত মহোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে আশ্বিনের শুক্ল মাধবের পূর্ণিমা তথায় উপস্থিত হন। রামভক্ত মুন্নারিগুপ্ত রামাষ্টক রচনা করায় চৈতন্য তাহার কপালে রামদাস নাম লিখিয়া দেন।* রঘুনাথ দাসও এই সময়ে চৈতন্যের রূপালাভ করিলেন।

ঐচৈতন্য মাতা ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া ও সে বৎসরে ভক্তবৃন্দকে নীলাচলে যাইতে নিবেদন করিয়া কেবল

* ইনি-ই সর্বপ্রথমে চৈতন্যের আদিলীলা-বট (সংকৃত) চৈতন্য-চরিত রচনা করেন। লোচনদাস তাহাই অবলম্বন করিয়া স্থলভিত বাঙ্গালা পদে চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করেন।

বলভদ্র আচার্য ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া পুষ্কো-ভমে বাজা করেন। পথে বরাহনগরে এক ব্রাহ্মণের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে ভাগ-বত্ভাষ্য উপাধি প্রদান করেন। [ভাগবতভাষ্য দেখ।]

পূর্বকার পথে নীলাচলে গমন করিলেন। প্রতাপরুদ্র জামিতে পাইয়া পথে পরিচর্য্যার জন্য পূর্বের ভাণ্ড লোক রাখিয়াছিলেন। গৌর বরাহনগরে পুষ্কোভমে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের নিকটে রূপ সনাতনের মিলন ও বৃন্দাবনে না যাইয়া প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণনা করিলেন।

চৈতন্য নীলাচলে আসিয়াই বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধে বর্ষার কন্যাস তথায় থাকিয়া বরুণ গোবিন্দীর প্রস্তাব মতে বলভদ্রাচার্য ও তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ ভৃত্য এই দুই জনকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও না বলিয়া রজনীযোগে নীলাচল হইতেই যাত্রা করিলেন। লোকসমা-গমের ভয়ে প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কটক নগরকে ভাহিনে রাখিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই পথ ব্যরিখও বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বনের শোভা দর্শনে ও কলনাদী বিহঙ্গগণের গান শ্রবণে গৌরের বৃন্দাবন-ভাব উথলিয়া উঠিল। তিনি অনবরত নাচিতে, গাইতে ও মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অনেক দিন উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্তন করেন নাই। এখন নির্জন বন পাইয়া মনের স্রুখে কীর্তন করিতে লাগিলেন। বন-পথে দলে দলে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি বিচরণ করিতেছে। গৌরচন্দ্র নির্ভয়চিত্তে তাহার মধ্য দিয়া নাচিয়া গাইয়া যাইতে লাগিলেন। গৌর-চন্দ্রের প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া হিংস্রজন্তুরাও পথ ছাড়িয়া যাইত। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তাদের মতে একদিন একটা বাঘ ও আর এক দিন এক দল হাতী চৈতন্যের কথা অনুসারে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল !!

গৌর নিবিড় বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সাঁওতাল ও ভীলদিগের জনপদে উপনীত হন এবং হরিনাম বিতরণ করিয়া সকল স্থান পবিত্র করেন। বনপথে সবদিন আহারীয় সামগ্রী মিলিত না। স্বযোগমতে বলভদ্র দুই চারি দিনের তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া লইতেন। বনমধ্যে শাক ও কলমুল তুলিয়া পাক হইত, গৌরচন্দ্র তাহাই পরম স্রুখে ভোজন করিতেন। পূর্বের দক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যেমন হরিনাম বিলাইয়া তদেশ-বাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্যরিখণ্ডের অসত্য লোকদিগকেও তেমন বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ঘাত্রীগণ মধ্যাহ্ন সময়ে কাশীধামে যাইয়া উপনীত

হইলেন এবং নথিকর্ণিকার ঘাটে দানাবগাহন জন্ত গমন করিলেন। এখানে তপনমিশ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তপন প্রথমে সন্ন্যাসী গোরকে চিনিতে পারেন নাই। পরিচয় পাইয়া গোরচন্দ্র ও সন্ন্যাসকে অন্নপূর্ণা, বিশেষর ও বিষ্ণুদ্বন্দ্ব দেখাইয়া গৃহে লইয়া যান। মিশ্র পরমানন্দে চৈতন্যদেবকে আহ্বান করাইলেন। বলভদ্র আচার্য্য পৃথক্ পাক করিলেন। চৈতন্য শয়ন করিলে মিশ্রের বালকপুত্র রঘুনাথ তাঁহার পাশে সন্ধান করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে এই রঘুনাথই ছর গোষ্ঠামীর অন্ততম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর নামে তপনের একজন বন্ধু কাশীতে বাস করিতেন, ইনি জাতিতে বৈষ্ণব, ব্যবসা গ্রহণেখা। সংবাদ পাইয়া ইনি আসিয়া চৈতন্যের চরণদলনা করেন এবং কাশীতে ভক্তির কথা নাই, কেবল বেদান্তচর্চা শুনিয়া বড়ই হুঃখিত হইয়াছেন এইরূপ বলিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের শিষ্য একজন মহারাজীর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী ও প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া প্রকাশানন্দের নিকট বলিলে তিনি অনেক উপহাস করিয়া চৈতন্যকে একজন ঐন্দ্রজালিক বলিয়া নির্দেশ করিলেন এবং শিষ্য মহারাজীরকে তথায় যাইতে বারণ করিয়া বলিলেন যে, “ইহার নাম কাশী, তোমরা চূপ করিয়া থাক, কাশীপুরে আর তাহাকে ভাব কদলী বেচিতে হইবে না।” ব্রাহ্মণ এই কথায় অতিশয় হুঃখিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট মনোহুঃখ নিবেদন করিয়া বলিল, “প্রভো! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, আমাদের অধ্যাপক তিনবার চেষ্টা করিয়াও ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কেবল ‘চৈতন্য’ ‘চৈতন্য’ বলিলেন, ইহার কারণ কি?” গৌরাক্ষ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণাপরাধী, কাজেই তাঁহার জিহ্বার নামঃস্মৃতি হয় নাই। আর আমিত কাশীর হাটে ভাবকদলী বেচিতেই আসিয়াছি। গ্রাহক না পাইলে, মাল বিকাবে না, কিন্তু বোঝাই বা টেনে বেড়াব কত? দাম না পাইলে অন্ন স্বল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব।” এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন এবং মহারাজীরকে কৃপাশীর্ষাদ করিয়া বিদায় করিলেন। মিশ্রের অহুরোধে দশদিন কাশীতে অবস্থিতি করিলেন। প্রত্যাগমনকালে পুনর্বার আসিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। যথাসময়ে প্ররাগে আসিয়া, ত্রিবেণীতে স্নান ও মাধব দর্শন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথ দর্শনে বৃন্দাবনলীলা শ্রবণ হওয়ার দিশাহারা হইয়া রঘুনাথ ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন, ভট্টাচার্য্য আস্তে আস্তে ধরিয়া রাখিলেন।

তিনদিন প্ররাগে থাকিয়া স্বাভাবিক মথুরা উদ্দেশে যাত্রা

করিলেন। পূর্বে যেমন দাক্ষিণাত্যের পথে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নাম প্রচার করিয়াছিলেন, পশ্চিমের পথেও চৈতন্যদেব তাহাই করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মথুরায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলেন এবং কেশব-দর্শনে কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেগে হাসিতে কাঁদিতে ও নাচিতে নাচিতে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংবাদ রাষ্ট্র হইলে ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। আগন্তকের মধ্যে এক ব্রাহ্মণও প্রেমাবেগে নাচিতে লাগিল। চৈতন্য তাঁহার গলা ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন, দৃত্যাবসানে কেশবপূজারি প্রভুকে সেবা করাইলেন। গৌরাক্ষ আগন্তক ব্রাহ্মণকে নিদ্রিতে ডাকিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, “শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুত্রী কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষিত করিয়াছেন, আমি সনাতীয়া ব্রাহ্মণ। সনাতীয়ার হাতে সন্ন্যাসীরা আহ্বান করেন না, কিন্তু মাধবেন্দ্র সে বিচার না করিয়া আমার হাতে দীক্ষা করিয়াছিলেন।” পরিচয় পাইয়া চৈতন্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন ও আশ্বপরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণ পরিচয় জানিয়া মহানন্দে চৈতন্যকে লইয়া গৃহে গেলেন, শ্রীচৈতন্য সনাতীয়া ব্রাহ্মণের হাতে দীক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পরে রঘুনাথ চক্রিশ ঘাটে স্নান করিয়া স্বয়ম্ভু, বিশ্রামতীর্থ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর ও গোকাণ্ঠী তীর্থে দর্শন করিলেন। অনন্তর সনাতীয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চৌরাসী যোজন বিস্তীর্ণ বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন অবলোকন করেন। এই সময়ে তিনি অষ্টপ্রহরই মহাভাবে বিভোর থাকিতেন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে, পুরুষোত্তমে গৌরের যে প্রেম ছিল, ঝারিখণ্ড পথে তাহার শতগুণ, মথুরা-দর্শনে সহস্রগুণ এবং বৃন্দাবন-বনলীলায় লক্ষগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ কর্ত্তারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, লতাপাতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই নাকি তাঁহার প্রতি অহুরাগ দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের পূর্ণপরিচিত কৃষ্ণ মনে করিয়াছিল। তাই একদিন গৌরাক্ষ বিশ্রামের জন্ত একটা তমাল তরুতলে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ এক জোড়া শুকশারী আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িয়া লম্বা চণ্ডা কএকটা সংকৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়া রাখা ও কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিল।

(চৈঃ চরিত্ঃ মধ্যঃ ১৭ পরিঃ।)

এই সময়ে প্রত্যেক বস্তুতে গৌরের কৃষ্ণতাব ক্ষুধা পাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তিনি মুগ্ধিত হইয়া পড়িতেন। কিছু দিন পরে আসিষ্ট গ্রামে আসিয়া অনেক অহুসন্ধানের পর রাখাকুণ্ড নির্গম করিয়া তথায় স্নান ও কৃষ্ণের স্তব করি-

লেন। কুকুলীনার তীর্থ সকল পূর্ণ হইতেই বিমুক্ত হইয়া ছিল, ঐচৈতন্য বহু অমূল্যমানে অনেক তীর্থের উদ্ধার করেন। তথা হইতে ভ্রমণ সন্মোহন করিয়া গোবর্দ্ধন-পর্বতের নিকটে গোবর্দ্ধন গ্রামে বাইরা হরিদেব-বিগ্রহ দর্শন করেন। সে রাজি হরিদেবের সন্ধিরে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। গোবর্দ্ধন পর্বতের উপরে অরকুটপারীতে মাঘবেত্র-পুরী-প্রতিষ্ঠিত গোপালমূর্তি আছে, চৈতন্য সেই মূর্তি দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসাহী হইলেন, কিন্তু পবিত্র লীলাস্থান বলিয়া গোবর্দ্ধন পর্বতের উপরে উঠিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কাজেই কি একারে গোপালমূর্তি দর্শন হইবে তাহা বিবাহ হইলেন, দৈবাৎ সেই রাজ্যে অরকুট গ্রামে গুহব উঠিল যে “গ্রাম মূর্তিতে কুককসোরার আসিতেছে, তোমরা পালাও।” এই অমরবে সকল লোক চারিদিক পলাইয়া পেল, পূজারিগণ গোপাল নইয়া গাঁচুলী গ্রামে লুকাইয়া রাখিল। চৈতন্য প্রাতে এই সংবাদে প্রেমে গদগদ হইয়া গাঁচুলী বাইরা দেবমূর্তি দর্শন করেন। তিনদিন পর্যন্ত গোপালদর্শন করিয়া কাম্যলীলা স্থান দর্শন ও নন্দীধরশৈলে পাবনকুণ্ডে দান করিয়া পর্বতের উপরে বাইরা ব্রহ্মেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বরী ও কুকমূর্তি অবলোকন করেন। তথা হইতে খদিরবনে শেখারী ও খেলাতীর্থ দেখিয়া তাঁহার স্তম্ভন উপনীত হন। এখানে যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন, জীবন, লোহবন ও মহাবন হইয়া পোকুলে বাইরা ভদ্রমূল যমলাজুন দেখিয়া প্রেমামনে নাচিতে লাগিলেন।

বন পর্যটন শেষ করিয়া মথুরার আসিয়া সেই ব্রাহ্মণের ঘরে অবস্থিতি করেন। বন-পর্যটন কালে প্রায়ই কলমূল আহাৰ করিয়া দিনান্তিপাত করিতেন।

চৈতন্যের সাধুতা ও প্রেমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, প্রতিদিন অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল, প্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কৃপা করিতে লাগিলেন। শেবে লোকের ভিড়ে তাক্ত হইয়া যমুনার নিকটে অক্রুর তীর্থে আসিয়া নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন। অক্রুরতীর্থের নিকটে কুকলীলা-সময়ের একটা বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল, তাহার মূলদেশ পিড়ির আকারে বাঁধান। চৈতন্য তথায় আপনায় আসন নির্দিষ্ট করিয়া যমুনা দর্শন ও নন্দীর্জন করিতে লাগিলেন। এখানেও বহুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রত্যাঘে বনের মধ্যে পলাইয়া বাইরা সাধন ভজন করিতেন। মধ্যাহ্নে তেঁতুল তলার আসিয়া দানাবগাহনাতে অক্রুরে বাইরা ভোজন করিতেন। যমুনাপারবাসী কুকদাল নামক জনৈক রজন্য পল্লবরাশি ছাড়িয়া এই সময়ে চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে যে সকল সাধুলোক চৈতন্যকে দেখিতে আসিতেন, তাহারা তাঁহার কৃপালাবণা ও প্রেমবিক্রমতা দেখিয়া এবং ধর্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে মহাব্যাজান করিতে পারিতেন না। তাই বেশমর রথ উঠিল যে, কুক পুনর্বীর উদিত হইরাছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় বহুতর লোক কোলাহল করিয়া বৃন্দাবন বাইতেছে দেখিয়া চৈতন্য তাহাদিগকে সমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল যে “কালিদহের জলে কুক উদিত হইরাছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে কালিদহ-নাগের সাধার পাঁড়াইয়া দৃত্য করেন, আমরা তাহাই দেখিতে বাইতেছি।” গৌরচন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিলেন। তাঁহার সঙ্গী সরলমতি বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কুক-দর্শনের জন্য কালিদহে বাইতে চাহিলে চৈতন্য উত্তর করিলেন—

“মূর্খবাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥

কুক কেন দর্শন দিবেন কলিকালে।

নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥

বাড়ল না হইও ঘরে রহত বলিয়া।

কুক দর্শন করিহ কালি রাজ্যে গিয়া ॥”

পরদিন প্রাতে পরিচিত কএকটা তদ্রলোক চৈতন্যের নিকটে আসিলে চৈতন্য কালিদহের কুকের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিল, “কালিদহের জলে রাজিকালে কৈবর্ত মসাল আসিয়া মৎস্ত ধরিতেছিল, মূর্খলোক না বুঝিয়া নোকায়ে সর্প, মসালকে মাণিক ও ধৌবরকে কুক বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে।” এই কথায় পরে আগন্তক ভক্তেরা চৈতন্যকেই কুক বলিয়া নির্দেশ করিল। গৌরচন্দ্র কাণে হাস্ত দিয়া সেই তদ্রলোককে উপদেশ করিলেন—

“বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিবা।

জীবাধমে কুক জ্ঞান কছু না করিবা ॥

সন্ন্যাসী চিকণ জীব কিরণ কনক সম।

বড়ৈষ্য পূর্ণ কুক হয় সুর্য্যোপম ॥

জীবের জীবর তথ্য কছু নহে সম।

অলমদি রাশি বৈছে কুলিজের কণ ॥

বেই মূঢ় কহে জীব জীবর হয় সম।

সেইত পাবতী হয় নও তায়ে যম ॥” (চৈ-চরিত্র মধ্য ১৮পরিঃ)

ইহার পরে মথুরায় ঘরে ঘরে প্রভুর নিবরণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন কুড়ি পঁচিশটি করিয়া নিবরণ উপহিত হইত। গৌরচন্দ্র একটীর বেশী গ্রহণ করিতেন না, কাজেই অনেকের মনে দৈন্ত থাকিয়া গেল। একদিন তেঁতুল-তলার বলিয়া ঐচৈতন্য তাহাতে ভাবিতে অজ্ঞান হইয়া যমুনার

জলে বাঁপ দিয়া ভুবিয়া বান। কুকদাস রজপুত এই ঘটনা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, তটীচাৰ্য্য সেই শব্দে পৌড়িয়া আসিয়া জলে পড়িয়া অনেক ঘরে প্রকুকে উঠাইলেন এবং অনেক ভাষণ করিয়া হুহু করিলেন।

তটীচাৰ্য্য ও মথুরানিবাসী ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া গঙ্গা-তীরের প্রকাটপথে সোরোকের দিরা ঐচৈতন্যকে লইয়া প্রয়াগ গমন করেন। রজপুত কুকদাস ও পঞ্চাভিজ আর হুইজন লোক সঙ্গে চলিলেন। শ্রান্তিনিবারণের জন্য পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে বসিয়া ঐচৈতন্য একমল গাভী চরিতেছে দেখিলেন। হুন্সাবন ছাড়িয়া বাইতেছেন তাহিয়া তাঁহার মনে কতই আনন্দজন হইতে লাগিল। এমন সময়ে একজন গোপ বাঁপী বাজাইতে আরম্ভ করিল। বাঁপীর রবে গৌরচন্দ্র কৃকাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া পেলেন। মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, গৌ গৌ শব্দ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দিল্লী হইতে দশজন পাঠান সৈনিক অসামান্যে সেই পথে বাইতে ছিল, তাহারা এই ঘটনা দেখিয়া মনে করিল যে, সন্দের পাঁচজন লোক বতির সর্বস্ব হরণ করিবে বলিয়া খুতরা খাওয়ারিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়াছে। সৈনিকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া সঙ্গী পাঁচজনকে বাঁধিয়া কেলিল ও অসি নিকাসিত করিয়া কাটিতে উদ্ভত হইল। কুকদাস সাহস করিয়া তাহাদের সহিত অনেক বাক্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রজপুত কুকদাসের গুরু পণ্ডীর ধমকানি খাইয়া সৈনিকগণ একটু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিল। এদিকে চৈতন্যেরও জ্ঞান হইল। স্নেহগণ তাঁহার নিকটে বাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, “ইহারা সকলেই আমার সঙ্গী, আমার অপকারের চেষ্টা করেন নাই। আমার ভগ্নী রোগ আছে, তাই মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়ি।” সৈনিকগণের মধ্যে বিজুলীখাঁ নামে একজন রাজকুমার ও কোরাণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী একজন মোলবী ছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যের প্রকৃতি, আকৃতি ও সম্ভাবণাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত চৈতন্যের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। পাঠানগণ কোরাণ-প্রতিপাদিত ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু প্রকৃত নিকটে তাহাদের প্রমাণ ও যুক্তি স্থান পাইল না। তিনি তর্কে তাহাদের ধর্মমত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন এবং সর্বাঙ্গীন ও প্রেমমতকেই যুক্তির প্রধান উপায় ইহা বুঝাইয়া দিলেন। বিচার শেষ হইলে মোলবী কাঁদিয়া কুক কুক বলিতে বলিতে চৈতন্যের পা ধরিয়া আশ্রয়

লইলেন। চৈতন্য তাহাকে লীকিত করিয়া তাহার “রামদাস” নাম রাখিলেন। রাজকুমার বিজুলীখাঁও ঐচৈতন্যের রূপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। পরিণামে ইহারা পাঠান-বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন।

ঐচৈতন্য সোরোকের দিরা প্রয়াগ অভিবৃক্ষে চলিলেন। পঞ্চাভিজ হুই ব্যক্তি এইস্থান হইতে বিদায় পাইলেন। রজপুত কুকদাস, মথুরানিবাসী ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ও তাহার সেবক গৌরের সঙ্গে চলিল। বাজীদল বখাসমরে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণীতে মকরদান করিয়া পূর্ব-পরিচিত একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণীঘাটের উপর একখানি পরিচারক ঘর চৈতন্যের বাসার জন্য নির্দিষ্ট হইল, তাহার সম্মুখে একটা মনোহর গুপ্তোদ্যান। চৈতন্য এই স্থানে থাকিয়া প্রাতে গঙ্গাভ্রমণ, বিন্দুমাধব দর্শন, নৃত্য কীর্তন এবং ধর্ম প্রসঙ্গ করিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুণের কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে লাগিল ও চৈতন্যের প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে আরম্ভ করিল। একদিন বিন্দুমাধবের প্রাক্ষেপে গৌরচন্দ্র প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে, দর্শকমণ্ডলী গৌরের ভাবাবেশ দেখিয়া চিত্তপুন্তলীর ভাষা অবাক হইয়া পাড়াইয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে ঐরূপ ও তাহার কনিষ্ঠ অমুগম মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হন। [বিবরণ রূপগোষ্ঠায়ী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রয়াগের অনতিদূরে যমুনা পারে আশলীগ্রামে বলভদ্রট্ট নামে একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত বাস করিতেন, ইনি ভাষ্যবতে অধিষ্ঠীত ছিলেন। তিনি লোকমুখে ঐচৈতন্যের কথা শুনিয়া অমূল্য হইয়া প্রয়াগে আসিয়া মিলিত হন এবং চৈতন্যের প্রেমভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বান। রূপ ও অমুগম উপস্থিত হইল, চৈতন্য তাঁহাদিগকে রূপালিন্দন করিয়া বলভদ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। এই সময়ে বলভদ্র পণ্ডিত ও প্রভু উভয়েই বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাহার মুখে কুকদাস উচ্চারিত হই অর্থাৎ যিনি বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার জন্ম হীনজাতি বা নীচ কুলে হইলেও তিনি ব্রাহ্মণাদির সমান। এই কারণেই তাঁহাদের সহিত রূপ ও অমুগমের সান্না হইয়া গেল। ইহার পরে বলভদ্রট্ট তৎসহ চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া বান। নৌকার বাইবার সময় গৌরচন্দ্র ভাবাবেশে বাঁপ দিয়া যমুনার পড়িয়াছিলেন। অনেক ঘরে তাঁহাকে উঠান হয়। বখা সময়ে আশলীগ্রামে বলভদ্রের বাড়ীতে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ত্রিহত-বাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় চৈতন্যের সহিত

মিলিত হন। তাঁহার সহিত চৈতন্যের অনেক বর্ষকথা হইয়াছিল। (চৈচর মধ্য ১৯ পরিঃ দেখ।)

এখানেও ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া পুনর্বার ত্রিবেণীঘাটে চলিয়া আসিলেন। ত্রিবেণীঘাটের বাসার দিন দিন লোকের ভিড় দেখিয়া চৈতন্যদেব দশাশ্বমেধে বাইরা বাস করেন। এইখানে দশ দিন থাকিয়া রূপগোস্বামীকে তত্ত্ব উপদেশ এবং হুজুরকে ভক্তিরসের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া দিলেন। (চৈচ মধ্য ১৯ পঃ) দশ দিন এইরূপে রূপগোস্বামীকে উপদেশ করিয়া শ্রীরূপ ও অরূপমকে মধুরার ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রজপুত্রের সহিত মধুরার বাইতে অহুমতি করিয়া নোকারোহণে প্রয়াগ হইতে কাশী গমন করেন।

গৌরচন্দ্র যথাসময়ে কাশী উপস্থিত হইলেন। এখানে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাসা লইলেন এবং তপনমিশ্রের ঘরে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সনাতন আসিয়া মিলিত হন। সনাতন দরবেশ সাজিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্যের দর্শনকামনায় চন্দ্রশেখরের বহির্বাটীতে উপবেশন করেন। গৌরচন্দ্র অভ্যন্তরে থাকিয়া মনে মনে তাহা জানিতে পারিলেন এবং চন্দ্রশেখরকে বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ক্রপা করিলেন। ক্রপের মিলনের সময় যে সকল সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, এবারেও সেই সকল সিদ্ধান্তস্বারে ইহাকে গ্রহণ করা হইল। [সনাতন গোস্বামী দেখ।] প্রায় দুইমাস পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া সনাতনকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। সনাতনের প্রস্তুতস্বারে শ্রীচৈতন্য যে সকল ধর্ম মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবসমাজে সনাতনশিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। তাহার বিবরণ জানিতে হইলে ঘটনাকর্ত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসী-সঙ্গ পরিহার করিতেন। তাহাতে পরমহংসগণ অপমান জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সব নিন্দাবাদ শুনিয়া চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও মহারাত্রীর ব্রাহ্মণ মন্যাস্তিক পীড়িত হইয়া ইহার কোন একটা বিহিত করিতে প্রভুকে অহুরোধ করিলেন। এক দিন কাশীনিবাসী কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সন্ন্যাসী ও পরমহংসগণের নিমন্ত্রণ হইল। চৈতন্য এতদিন একজন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সেদিন নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসীদিগের সত্তার মধ্যাহ্নে বসিয়া প্রকাশানন্দ স্বামী মহাশয় জীকজমকের সহিত বেদান্ত আলোচনা করিতেছেন। গৌরচন্দ্র তথায় উপস্থিত

হইয়া সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া নিরানন্দে উপবেশন করিলেন। প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী তাঁহাকে সত্তার মধ্যে বসিতে বলিলে গৌর ভক্তি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “আমি ভক্তি হীন-সম্প্রদায়, আপনাদের সঙ্গে বসিবার উপযুক্ত নই।” প্রকাশানন্দ গৌরের মিনহবাক্যে ব্যয় পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহার হাত ধরিয়া সত্তার মধ্যস্থানে বসাইলেন। কথায় কথায় সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর বিচার আরম্ভ হইল। চৈতন্য একে একে তাঁহাদের মত ধ্বংস করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব ও একমাত্র উপাত্ত এবং জীব তাহা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি তাৎপর্য্যে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নিজ মত স্থাপন করিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রবণে সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইয়া পেলেন। এখন সন্ন্যাসী-সত্তার গৌরের নিন্দার পরিবর্তে প্রশংসা হইতে লাগিল।

তাঁহার পরে একদিন গৌরচন্দ্র বিন্দুমধবের প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন, প্রকাশানন্দ তাহা দেখিয়া সশিষ্যে আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। গৌরচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ নৃত্য ছাড়িয়া প্রকাশানন্দের চরণ ধরিলেন। উত্তরে উত্তরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ মার্যবাদের নিন্দা করিয়া অহুতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রকাশানন্দের অহুরোধে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দেন। প্রকাশানন্দ মার্যবাদ ছাড়িয়া ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কাশীর মার্যবাদী সন্ন্যাসীগণ ও শত শত ব্যক্তি সংকীর্ণন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইতে লাগিল। পরে এক দিন প্রাতে উঠিয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে বাইতে বিদায় দিয়া বলতজ আচার্যের সঙ্গে চৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন, তপনমিশ্র রঘুনাথ ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহা-দিগকে বলিলেন, ইচ্ছা হইলে পরে আসিও, এখন আমি একা যাইব। গৌরচন্দ্র আরিখণ্ডের পথে গমন করিয়া যথা সময়ে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

হুবুজি রায় নামক জনৈক হিন্দু গোড়নগরের বিপুল ভূম্য-ধিকারী, তিনি চাকর সৈয়দ হসেনখাঁকে কোন অপরাধে চাবুক মারেন। কালে ঐ সৈয়দ হসেনখাঁ গোড়েন্দু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কারোয়ার জল খাওরাইয়া হুবুজি রায়ের হিন্দুত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন। হুবুজি রায় বিবর, বিভব, জী, পুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাইরা পণ্ডিতগণের নিকটে প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহার্য্য বলিলেন, “উত্তম বৃত্তপানে প্রাণত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রারম্ভিত।” এই ব্যবস্থা রায় মহাশয়ের অভিমত হইল না, তিনি পাগলের ছায় কাশীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য

উপস্থিত হইলে শ্রুতি রায় তাঁহার নিকটে বাইরা জানাইলে তিনি বলিলেন—

“ইহা হৈতে বাহ বৃন্দাবন।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্গীতন ॥

এক নাম ভাসে তোমার পাশ দোষ থাকে।

আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণ-হানে স্থিতি।

মহাপাতকের হর এই প্রারক্তি ॥”

রায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তিনি চৈতন্যচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় বাইরা কঠোর তপস্বী আরম্ভ করিলেন, অচিরে শ্রুতি রায় পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার-গণ এই পর্যন্ত মধ্যলীলা বলিয়া বর্ণনা করেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র নীলাচলে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ দল বাঁধিয়া নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। শিবানন্দ সেন ইহাদের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে নাকি একটা কুকুরও গিয়াছিল, এবং নীলাচলের নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে-বাইরা প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়। রূপ ও অনুপম চৈতন্য-দর্শনার্থ বৃন্দাবন ছাড়িয়া কালী আসিলেন, তথায় প্রভুর নীলাচল গমনবার্তা শুনিয়া গোড়দেশ দিয়া উৎকলে গমন করেন। গোড়দেশে অনুপমের মৃত্যু হয়, রূপ একাকী চৈতন্যের নিকটে উপস্থিত হন। রূপ এখানে আসিলে চৈতন্য ভক্তগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। ক্রমে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নিকটবর্তী হইল। পূর্বের জ্ঞান গুণিচা-মার্জন, বন-ভোজন, রথোপে নৃত্য কীর্তন সকলই হইল। রথের সময়ে চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হইয়া সামান্য একটা আদিসের প্লোক পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। এই প্লোকে সঙ্গে প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা স্বরূপ ব্যতীত আর কেহই জানিত না। সকলেই শুনিয়া অবাক হইলেন। কথিত আছে যে, রূপ ঐ প্লোকে সহিত প্রভুর মনের ভাব লইয়া আর একটা প্লোক রচনা করেন। গৌর ভাষা শুনিয়া আভিশর আনন্দিত হইয়াছিলেন।

চারিমাস পরে গোড়দেশের ভক্তমণ্ডলী চলিয়া গেল, রূপগোবামী দোলযাত্রা পর্যন্ত নীলাচলে অবস্থিতি করেন। দোলযাত্রা দর্শনের পরে চৈতন্য রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “এখন বৃন্দাবনে যাও; ছুই জাই মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণ সেবা করিও। আমার একবার তথায় বাইবার ইচ্ছা আছে। সনাতনকে

একবার এখানে পাঠাইয়া দিবে।” রূপ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

শতানন্দ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান্ আচার্য্য বিষয়মুখ পরি-
ত্যাগ করিয়া নীলাচলে বাইরা চৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণ
করেন। তিনি অরসিন মধ্যেই সকল ভক্তের প্রিয়পাত্র
হইয়া উঠিলেন। একদিন ভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসের
দ্বারা শিখি মাইতির ভগিনী মাধবীর নিকট হইতে এক মণ
আতপ চাউল ভিক্ষা করাইয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য
খাইতে বসিয়া এই সকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন, ভোজনান্তে
বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, “আজ হইতে ছোট
হরিদাসকে এখানে আসিতে দিওনা।” ছোট হরিদাস
শ্রীচৈতন্যের একজন কীর্তনীর, প্রভুর বাসায়ই থাকিত।
গোবিন্দ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ছোট হরিদাসের
গৌরান্দ-দর্শন বন্ধ হইল। হরিদাস তিনদিন অনাহারে রহিল।
তাঁহার হুখে হুঃখিত হইয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের নিকটে ছোট
হরিদাসের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর
করিলেন—

“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥

হর্বাস ইঞ্জির করে বিষয় গ্রহণ।

দারুপ্রকৃতি হরে মনেরপি মন ॥

ক্ষুদ্র জীব সব কপট বৈরাগ্য করিয়া।

ইঞ্জির চরাঞা বলে প্রকৃতি সম্ভাষণ ॥”

(চৈ* চরি* অন্ত্য* ২ পরি*)

ইহার পরে সমস্ত ভক্ত মিলিত হইয়া হরিদাসের জন্ত
প্রভুকে অহরোধ করিলেন। তৎপরে ভক্তগণের অহরোধে
পরমানন্দপুণীও ছোট হরিদাসের জন্ত অহরোধ করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন হই-
লেন না। এইরূপে একবৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু চৈতন্য
কিছুতেই ছোট হরিদাসের অপরাধ ক্ষমা করিলেন না।
তৎপরে একদিন রাত্রিশেষে হরিদাস নীলাচল ছাড়িয়া
প্রয়াগে বাইরা দ্বিবেগীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।
হরিদাসের কঠোর দণ্ড দেখিয়া অপর বৈষ্ণবগণ স্প্রেণ্ড জী-
সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ-কর্তারা বলেন যে,
হরিদাস নরদেহ ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ দিব্যমূর্তি লাভ করিয়া
প্রভুর নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি
রাত্রিতে শ্রুতধুর গান করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতেন। এক
দিন সমুদ্রতীরে বাইরা নাকি জগদানন্দ প্রভৃতিও হরিদাসের
গান শুনিতে পাইয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে একজন বৈষ্ণব

আনিয়া নববীশে শ্রীবালাদির নিকটে হরিদাসের প্রাণত্যাগের কথা বলিরাছিল। পর বৎসরে শ্রীবালা প্রকৃতি তত্ত্বগণ নীলাচলে আসিয়া গৌরান্দের নিকটে ছোট হরিনামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, “স্বকর্ণকলকু পুমান্।” ইহার পরে শ্রীবালা হরিনামের বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া করিলেন। শ্রীচৈতন্য ইহা হস্ত করিয়া এমন চিত্তে উত্তর করিলেন “প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।”

পুরুষোত্তমনিবাসী একদী পিতৃহীন ব্রাহ্মণ বালক প্রতি-দিন চৈতন্যের নিকট আসিত। বালকটী দেখিতে অতি সুন্দর এবং কথাগুলিও বেশ মধুর; চৈতন্য তাহাকে বড়ই প্রভা করিতেন। বালকের দাতারও ঘোবন অতিক্রম করে নাই, দেখিতেও পরমসুন্দরী, কিন্তু তিনি সত্যী লাক্ষ্মী, কিংবা হইয়া সর্বদাই তপস্যার নিরত ছিলেন। ব্রাহ্মণকুমারের সহিত চৈতন্যচন্দ্রের অত আলাপ পাকির দামোদর পণ্ডিতের মনে ভাল লাগিল না। একদিন বালক উঠিয়া গেলে দামোদর বলিতে লাগিলেন—

“অন্তোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাক্ষির ঠাকুর।

গোসাক্ষি এবে জানিব গোসাক্ষি ॥

এবে গোসাক্ষির শুণ সব লোকে গাইবে।

গোসাক্ষির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে ॥”

(চৈ চরি* অধ্য ৩ পরি*)

দামোদরের বিজ্ঞপোক্তি শুনিয়া গৌরাক তাহাকে খুলিয়া বলিতে বলিলে দামোদর বিনীতভাবে বলিলেন—

“—তুমি স্বতন্ত্র ইন্দ্র।

স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।

মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥

পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।

রাণ্ডীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥

বতপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।

তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥

তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।

লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর ॥”

(চৈ চরি* অধ্য ৩ পরি*)

গৌরাক নিজ তত্ত্বের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অতি-শয় সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, আমার তত্ত্বগণের মধ্যে দামোদরই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। পরদিন দামোদরকে সিন্ধুতে ডাকিয়া শচীদেবীর রক্ষণের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নববীশ যাইয়া বাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। আর বলিলেন, “দামোদর, তোমার মত নিরপেক্ষ আমার দলের মধ্যে আর

কেহই নাই, নিরপেক্ষ না হইলে বর্ষরক্ষা হইতে পারে না। আমা হইতে বাহা হয় না, তাহাও ভোমসার হইতেহে, তুমি যখন আমাকেই রক্ত-কবিত্তে পরিয়াছ, তখন অপরকেও পারিবে। তুমি নববীশে যাইয়া জননীর নিকটে অবস্থান কর।” দামোদর চৈতন্যের আজ্ঞার নববীশে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সনাতন আসিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। সনাতন ঝারিখণ্ডের পথে আসিয়াছিলেন, দুর্গম পথের কটে তাহার সমস্ত নবীয়ে কছু অধিরাছিল। দিন দিন কছু হইতে পুৰ রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার জাতীয় লম্বুতা ও শরীরের অপবিত্রতা বনে তারিয়া চৈতন্য-দর্শনে নিরাশ হইয়া অগরাধের রথের চাকার তলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। তিনি পুরুষোত্তমে আসিয়া বড় হরিনামের বাসার রহিলেন। অগরাধের উপলভোগ দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব হরিনামের বাসার উপস্থিত হইলে সনাতন তাহার সহিত মিলিত হন। চৈতন্য পরম আক্সাদে দুর্গমময় পুৰ-রক্তমাখা সনাতনকে কোলে করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনেক আলাপের পর সনাতন আপনার সঙ্গ জানাইলে শ্রীচৈতন্য তাহাকে সেই দাক্ষ অধ্যবসার হইতে বিরত করিয়া শ্রবণ ও কীর্তন করিতে উপদেশ দিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া বৈকবহৃত্য, বৈকব আচার, কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তি-সেবা এবং লুপ্তভীরের উদ্ধার করিতে বলিলেন।

যথাসময়ে গোড়বাসী তত্ত্বগণ উপস্থিত হইলেন। রথযাত্রায় পূর্বকার স্তায় সমস্ত কার্যের অর্চনা করা হইল। সনাতনের ব্যবহারে গোড়বাসী তত্ত্বগণ তাহাকে বিশেষ প্রভা করিতে লাগিলেন। চারিমাস পরে গোড়বাসীগণ বিদায় হইলেন। সনাতন দোলযাত্রা পর্যন্ত পুরুষোত্তমে থাকিয়া গৌরান্দের আদেশ অনুসারে গৌরাক যে পথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, সেই পথে বৃন্দাবন গমন করেন। কিছুদিন পরে প্রহ্লাদমিশ্র নামে জনৈক সন্ন্যাস প্রকৃতি সাধু ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের নিকটে ধর্মো-পদেশ লইতে আসিলে তিনি তাহাকে রামানন্দ রায়ের নিকটে পাঠাইয়া দেন। প্রহ্লাদ রায় রামানন্দের নিকটে যাইয়া জ্ঞানিলেন যে, তিনি অঙ্গরার ন্যায় সুন্দরী যুবতী রমণী লইয়া নির্জন উজানে ক্রীড়া করিতেছেন। রামানন্দের কৃত্যের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং রায়ের সহিত বৌদ্ধিক মিথ্যাপাণ করিয়া গৌরাকচন্দ্রের নিকট আসিয়া জানাইলেন। যুবতী সুন্দরী স্ত্রী লইয়া নিভুতে ক্রীড়া করিয়াও রামানন্দের বিকার হয় না বলিয়া শ্রীচৈতন্য তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন এবং প্রহ্লাদকে বৃন্দাইয়া দিলেন যে, “রায় রামানন্দ আমা হইতেও অধিক জ্ঞান। অত-

এবং দুই ভাষার শিকটে বাইরা উপদেশ লভ।” এহার তাহাই করিলেন। এই সময়ে বনদেশবাসী কোন একজন পণ্ডিত গৌরচন্দ্রের অবসরবে একখানি নৃত্য নাটক লিখিয়া প্রভুকে উপহার দিবার জন্য তৎপর উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্র তাহা লক্ষ্যই করেন নাই।

এইরূপে নীলাচলে থাকিয়া গৌরচন্দ্র সান্নিধ্য লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যুগে তত্ত্বগণের সহিত ধর্মালোচনা ও নৃত্য কীর্তন করিয়া আসন্ন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর দিন দিনই তত্ত্ব-বিবাহানে লক্ষ্য হইতে লাগিল। রজনী-বোধে তত্ত্ববিষয় অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিত, আর সকল রাজিই কাঁদিয়া কাটাইতেন, এই কারণে দিন দিন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কমিয়া আসিতে লাগিল, মুখা ও ভাবাবেশ আরই হইত। প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রামানন্দ রায় ও বরুণ সর্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। এই সময়ে রঘুনাথদাস আসিয়া মিলিত হইলেন। বৎসকালে গোড়বাসী ভক্তগণ আসিয়া পূর্বের জ্ঞান চারিভাগে থাকিয়া রথযাত্রার পরে দেশে চলিয়া গেলেন। এবারেও শুভিচার্জ্যের প্রভৃতি সমস্তই হইল। ব্রহ্মাবনবাসী শঙ্করানন্দ সরস্বতী প্রভুকে শিলামালা অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরজ তিন বৎসর যাবৎ সেই শিলামালা ধারণ করেন, শেষে রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই মালা অর্পণ করেন।

[রঘুনাথ দাস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বর্ষান্তরে গোড়ের ভক্তগণ উপস্থিত হইলে গৌরচন্দ্র তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ ও নৃত্যকীর্তন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বনভট্ট তথায় উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য পরম সমাদরে ভট্টকে গ্রহণ করিলেন। কথায় কথায় চৈতন্যের যুগে ধর্মমীমাংসা শুনিয়া ভট্টের অভিমান কমিয়া আসিল। একদিন বনভট্ট শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যায় দোষ দিয়া ভাগবতের একটা নূতন ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। প্রভু প্রথমে তাহা দেখিতে সম্মত হন নাই। শেষে ভট্টাচার্যের অনুরোধে একবার মাত্র শুনিয়া শত শত দোষ দিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। বনভট্ট বালগোপালের উপাসক ছিলেন, কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের দেখাদেখি কিশোর-গোপালের উপাসনা করিতে অভিলাষী হইয়া চৈতন্যের আদেশমতে গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপালমতে দীক্ষিত হইলেন।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিলেন, গৌরচন্দ্র তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বখেই তত্ত্ব দেখাইলেন। রামচন্দ্র পরিশ্রদ্ধা করিতে বৃহস্পতি তুল্য। নীলাচলে আসিয়া তত্ত্ব

গণের অনুরোধে শ্রীচৈতন্যের আহারের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে সময়ে তথায় চারিপাণ কড়িতে যে প্রসাদ পাওয়া যাইত, প্রভু তাহা খাইতে পারিতেন, কোন কোন দিন কান্দীও গোবিন্দ ভাগ পাইতেন। রামচন্দ্র-পুরী-তথায় উপস্থিত হইলে জগদানন্দের পূর্বে নিমন্ত্রণ হয়, রামচন্দ্র সৌর্যের আহার দেখিয়া অনেক নিন্দা করিয়া বলেন যে, “সন্ন্যাসীর কি এত খাওয়া ভাল? হর্যুত ইন্দ্রিয়-দমন করিতে হইলে আহার কমাইতে হয়, কেবল জীবন ধারণের জন্য দুইটা খাওয়া উচিত। বাস্তবিক বৈরাগ্য হইলে লোক এত খাইতে পারে না, ইহার বৈরাগ্যের ছলনা করিয়াছে।” রামচন্দ্র এই রকম ছিত্র অঙ্গসন্ধান করিয়া গৌরচন্দ্রের কুংসা রটাইতে লাগিলেন, কিন্তু গৌর তাহাতে একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, তিনি রামচন্দ্রকে দেখিলেই ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিতেন। রামচন্দ্র প্রাতে গৌরচন্দ্রের বাসভবনে আসিয়া কতকগুলি শিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া চৈতন্যকে মিষ্টভোজী মনে করিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অনেক নিন্দা করেন। চৈতন্য তাহার পরদিন হইতে পূর্বে যে আহার করিতেন, তাহার চারিভাগের এক ভাগ খাইতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাহাতে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া পূর্বের জ্ঞান আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, “রামচন্দ্র পুরী বাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক, সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিক ভোজন উচিত নহে।” শেষে সকলের যত্নে অর্ধেক ভোজন করিতেন।

ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথের নিকট কন্যাবাদ প্রতাপ-রুদ্রের ছইলক্ষ কাহন পাওনা হইয়াছিল, গোপীনাথ দিতে অসম্মত হইলে রাজা কোন রাজপুত্রের পরামর্শে তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইয়া খড়্গের উপরে ফেলিয়া প্রাণ লইতে অমুমতি করেন। জন্মাদেয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইতে লইয়া গেল, তাহার সেবকগণ বিপদে পড়িয়া প্রভুকে জানাইলে তিনি স্রবৎ কোপ করিয়া বলিলেন, “আমি দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী, ইহার উপায় কি করিব, রাজার টাকা না দিলে এই দশাই ঘটয়া থাকে।” তৎপরে আরও তিনবার চৈতন্যের নিকটে সংবাদ আসিল, তিনি প্রতিবারই এইরূপ উত্তর করেন। ভবানন্দের পরিবারবর্গ চৈতন্যের আশ্রিত মনে করিয়া ভক্তগণও প্রভুকে ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। শেষে গৌরজ গোপীনাথের প্রাণ রক্ষার জন্য জগদানন্দের নিকটে প্রার্থনা করিতে অমুমতি করেন। ভক্তগণ তাহাই করিলেন। এদিকে হরিচন্দনপাত্রের পরামর্শে রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে আবদ্ধ রাখিতে অমুমতি করেন। ইহার পরে

কাশীনাথ মিত্র চৈতন্তের নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে এই সকল কথা বলিয়া বলেন যে “আমি এখানে ছাড়িয়া আলাননাথ বাইব।” কাশীনাথ রাজা প্রতাপরুদ্রকে এই কথা জানাইলে তিনি গোপীনাথের নিকটে প্রাণ্য টাকা ছাড়িয়া দিয়া সম্মানের সহিত তাহাকে পূর্বদিকে নিযুক্ত করেন।

পর বৎসরে বখাসময়ে গোড়ের ভক্তগণ উপস্থিত হইল। এ বৎসরে জগন্নাথের জলকলির দিনে খুব সমারোহে নৃত্য-কীর্তন হয়। প্রায় সব সময়েই গোরাক ভাবাবেশে উদ্ভূত ছিলেন। চারিমাশ পরে বড় হরিদাস চৈতন্তের চরণ ধ্যান করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে চৈতন্ত স্বয়ং তাহার কাণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে মহাসমারোহে নৃত্যকীর্তন করিয়া সমুদ্রতীরে বালুকার গর্ভে হরিদাসের সমাধি হয়।

চৈতন্তের কৃষ্ণবিরহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তর সর্বদাই বিষাদপূর্ণ, রাত্রিদিন কোন সময়েই তাহার শান্তি ছিল না। “হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! প্রাণনাথ কোথায় গেলে তোমাকে দেখিতে পাইব।” দিবানিশি এই বলিয়া রোদন করিতেন। রাত্রিদিনই তিনি বিরহে কাতর থাকিতেন, কখনও শান্তি পাইতেন না। প্রভুর এইরূপ অবস্থা শুনিয়া গোড়বাসী ভক্তগণ প্রভুকে দেখিতে আসিলেন। এইবারে ভক্তগণের সঙ্গে তাহাদের জীপুত্রও আসিয়াছিল। জগদানন্দ এই সময়ে প্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। একদিন চৈতন্ত স্বয়ং টোটা বাইতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি দেবদাসী গান করিতেছিল, গান শুনিয়া চৈতন্তের ভাবাবেশ হইল। তিনি জীপুত্র লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন করিতে চলিলেন। গোবিন্দ দোড়িয়া বাইয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, “ওরা জীলোক।” জীলোকে নাম শুনিয়া প্রভুর ভাবাবেশ কমিয়া গেল। তিনি গোবিন্দকে সাধুবাদ দিলেন। কিছুদিন পরে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হন। রঘুনাথ আটমাশ প্রভুর নিকটে অবস্থান করিলে প্রভু তাহাকে বাড়ী বাইয়া পিতামাতার সেবা করিতে উপদেশ দেন এবং বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। রঘুনাথ তদনুসারে চলিয়া যান। উদ্ধবদর্শনে রাধা বৈরাগ্য বিলাপ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণচৈতন্তও কৃষ্ণের বিরহে দিবানিশি সেইরূপ করিতে লাগিলেন; বিরহের সমস্ত লক্ষ্যই তাহার ক্ষুণ্ণি পাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে কৃষ্ণের রাসলীলা অবলোকন করিয়া আরও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। অনিচ্ছায় নৃত্যকীর্তন

সমাপন করিয়া গড়ের পাশে পাড়িয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, একটি উড়িয়া জীলোক ত্রিভুজ দর্শন করিতে না পারিয়া চৈতন্তের ঘরে পা দিয়া কৃষ্ণের উপরে উঠিয়া জগন্নাথ দর্শন করিল। গোবিন্দ নিকটে ছিলেন, তিনি দেখিয়া “সর্বনাশ! সর্বনাশ!” বলিয়া জীলোকটিকে বারণ করিতে উদ্ভূত হইলে, চৈতন্ত তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “ইহার ভায় জাগ্যবতী আর কেহই নাই, জগন্নাথ ইহাকে রূপা করিয়াছেন, তাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দেখিতেছে।” জীলোকটা তথা হইতে নামিলে চৈতন্ত তাহার পদবন্দনা করেন।

কৃষ্ণের বিরোগে গোপীগণের যে সকল লক্ষ্য হইয়া ছিল, কৃষ্ণচৈতন্তোও সেই সকল লক্ষ্য অর্থাৎ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্লেশতা, অঙ্গের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উদ্ভক্ততা, মোহ ও মৃত্যু এই দশটী অবস্থা ক্ষুণ্ণি পাইতে লাগিল, রাত্রিদিন সর্বদাই গোরাক অন্তর থাকিতেন, কখন কোন লক্ষ্য উঠিবে তাহার স্থির ছিল না, এই জন্য স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ সর্বদাই তাহার নিকটে থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার পরে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতিকে লইয়া গোরচন্দ্র ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার বাক্যরুদ্ধ হইল, ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রামানন্দ ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, স্বরূপ কৃষ্ণলীলা গান করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাতে অনেক পরে গোরাকের কিছু জ্ঞান হইল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি কিছু সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না, দেখিয়া ভক্তগণ প্রভুকে লইয়া ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইলেন, গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া গোবিন্দ ও স্বরূপ দ্বারে শয়ন করিলেন। চৈতন্তচন্দ্র রাত্রিতে প্রায়ই জাগরণ করিতেন, এ দিনও শয্যা শয়ন করিয়া উজ্জৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ প্রভৃতি কিছুকাল নিদ্রার অভিভূত ছিলেন, জাগিয়া প্রভুর সাড়া শব্দ না পাইয়া কপাট খুলিয়া দেখিলেন প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। তখন ভক্তগণ ব্যাকুল মনে প্রভুর অহু-সন্ধানে বাহির হইলেন, অনেক অহুসন্ধানের পর সিংহদ্বারের উত্তরপাশে বিকৃত অবস্থার প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। গোরাকের সেই অবস্থাটী কৃষ্ণদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

“প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।

অচেতন দেহ নাসার খাল নাহি বয় ॥

এক এক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।

অস্থি এস্থি ভিন্ন চন্দ্র আছে মাত্র ধাত ॥

হস্তপাদ গ্রীবা কটি অস্থি যত।

একেক বিকৃতি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥

চন্দ্র মাজি উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা ।
হুধিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিরা ॥
হুধে লালা কেন প্রভুর উত্তান শয়ন ।
দেখিরা সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥

(চৈঃ চরিঃ অঙ্কঃ ১৪ পং)

স্বরূপ গোসাঁই ভক্তগণকে লইয়া প্রভুর কাণে উচ্চৈঃ-
স্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্য
হরিবোল শ্রী গর্জম করিয়া উঠিলেন, দেখিতে দেখিতে
সেই সকল বিকৃত অবস্থা লোপ পাইল, তিনি আবার পূর্বের
মত হইয়া উঠিলেন। গৌরাঙ্গের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে তিনি
সিংহাসনে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ তাঁহাকে
যথাস্থানে লইয়া যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া
গৌরচন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “কি বল,
আমিত ইহার কিছুই জানি না। কিন্তু আমি সর্বদাই দেখিতে
পাই যেন কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিয়া বিদ্যাতের স্থায় চলিয়া
যান।” ইহার পরে মহাপ্রভু দ্বান করিতে গেলেন। প্রভুর
এই অদ্ভুত বিকার রঘুনাথদাস নিজকৃত চৈতন্যভবকল্পতরু
গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর একদিন, সমুদ্র গমনকালে চটক পর্ত্ত তাঁহার
নয়নগোচর হয়, পর্ত্ত দর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া
ভাগবতের

“হস্তায়মঙ্গিরবলাহরিদাসবর্ষো-

যজ্ঞামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।

মানং ভনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্থং

পানীর শৃষবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥” (১০।২১।১৮)

এই শ্লোকটা পড়িতে পড়িতে দিখিদিগ্জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে
লাগিলেন, গোবিন্দ ও তাঁহার পিছনে ছুটিলেন, কিন্তু প্রভু এত
বেগে দৌড়িতেছিলেন যে, গোবিন্দ প্রাণপণে ছুটিয়াও
তাঁহার নাগাল পাইলেন না। তখন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একটা
হলহুল পড়িয়া গেল, সকলেই সমুদ্রতীরে আসিলেন। কিছু
দূর অভিক্রম করিয়া প্রভুর গমনবেগ ধামিয়া আসিল, শরীর
বিকৃত হইল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া
গেলেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গের শরীরের অবস্থা কৃষ্ণদাস
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

“প্রথমে চলিলা প্রভু বেন বায়ুগতি ।

স্তম্ভভাব পথে হইল চলিতে নাহি শক্তি ॥

প্রতি রোমকূপে মাংস ভ্রণের আকার ।

ভার উপর রোমোকাণ্ড কদম্ব প্রকার ॥

প্রতি রোমে প্রবেশ পড়ে কথিরের ধার ।

কণ্ঠে বর্ষর নাহি বর্ণের উচ্চারণ ॥”

“হইনেত্র বহি অঙ্গ পড়রে অপার ॥”

বৈবর্ণ্য শব্দ প্রায় খেত হইল অঙ্গ ।

তবে কল্প উঠে বেন সমুদ্র তরঙ্গ ॥

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥”

স্বরূপ অনেক শুশ্রূষা করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগি-
লেন, অনেক পরে কিছু জ্ঞান হইলে তিনি বলিলেন যে “কৃষ্ণ
গোবর্দ্ধন পর্ত্তে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, তাহা শুনিতে
তিনি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন হইতে তাঁহাকে
আনিয়া ভক্তগণ ভাল কাজ করেন নাই।” সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে
স্বরূপ বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে সমুদ্র দ্বান করিয়া কিরিয়া
আসিয়া গৌর মহানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করেন। পরে
সর্বদাই তাঁহাতে কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন প্রভৃতি ক্ষুণ্ণিত হইত,
তিনি সর্বদাই ভাবে বিভোর হইয়া ছুটাছুটি করিতেন,
দোদন, বিলাপ ও মুচ্ছা তাঁহার দৈনিক কার্যের মধ্যে পরি-
গণিত হইয়াছিল।

এইরূপে সে বর্ষ শেষ হইল। বর্ষান্তরে গোড়বাসী
ভক্তগণ আসিলেন। এ বৎসরে কালিদাস নামক একজন
বৈষ্ণব ও শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপুর আসিয়া প্রভুর রূপা
পাইয়াছিলেন।

একদিন রাজি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেণুর শব্দ শুনিয়া
শ্রীচৈতন্য সিংহাসনের পাশে গাভীগণের মধ্যে যাইয়া অচেতন
হইয়া পড়েন, এই দিন হস্ত পদ প্রভৃতি অবয়ব তাঁহার
পেটে প্রবেশ করায় তিনি দেখিতে একটা কুম্ভাঙ্কের স্থায়
হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহাকে কুম্ভাকৃতি ভাব বলিয়া
বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন শারদীয় রাজিতে প্রভু ভক্তগণ লইয়া উত্তান-
ভ্রমণ করিতে বাহির হন, ক্রমে ভক্তগণের সহিত রাসের কথা
ও নানাবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে আইটোটা আসিয়া
উপস্থিত হন। হঠাৎ সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যমুনা
ভাবিয়া সঙ্গীগণের অলক্ষিত ভাবে সমুদ্রে খাঁপ দিয়া পড়িয়া
যান। তৎপরে ভক্তগণ চৈতন্যকে না দেখিয়া অবাক হইয়া অস্থ-
সন্ধান করিতে লাগিলেন। জগদ্বাথ মন্দির, শুভিচা-প্রাঙ্গণ,
চটকপর্ত্ত ও সমুদ্রের তীর অস্থসন্ধান করিয়া কোথাও
প্রভুকে না পাইয়া ভক্তগণ প্রভুর অন্তর্ধান হির করিলেন।
প্রভুর বিচ্ছেদে সকলেই শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন।
রাজি শেষ হইল, তথাপি গৌরাঙ্গের কোন সংবাদ নাই।
শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া কএকজন বিববু পর্ত্তের দিকে
গমন করিলেন এবং স্বরূপ কএকজনকে লইয়া সমুদ্রের তীরে

পূর্বদিকে অব্যবহৃত করিতে বাহির হইলেন। কতদূর বাইরা দেখিলেন যে এক ধীর হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ও কানিতে কানিতে উন্নতের ছায় বাইতেছে। তাহার শরীরেরও নাকি অষ্টবিধ সাহসিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, “আমার জালে একটা মৃত শরীর উঠিল, আমি প্রথমে মৃত শরীর বলিয়া জানিতে পারি নাই, মংস্ত ভাবিয়া পরম সমাদরে উঠাইয়া দেখি একটা মড়া। দেখিয়াই আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, জাল হইতে ধসাইয়া ফেলিবার জন্য সেই মড়া স্পর্শ করিয়াই আমার এই দশা হইয়াছে।” স্বরূপ সকলই বৃষ্টিতে পারিলেন, জালিকের ভয় নিবারণের জন্য কপট রোমা সজিয়া তাহার পৃষ্ঠে তিন চাপড় মারিয়া তাহাকে শাস্ত করিলেন এবং তাহাকে সমস্ত গুলিয়া বলিয়া তাহার সহিত প্রভুর নিকটে যাইয়া কৃষ্ণনাম কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। পূর্ব প্রদর্শিত অমৃত বিকারের ছায় এই দিনেও গৌরের সমস্ত শরীর বিকৃত হইয়াছিল। অনেকক্ষণ কীৰ্ত্তন করায় প্রভুর শরীরে ঠিক পূর্বের ছায় অর্ধেক জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাঁহাকে তথা হইতে আনা হইল। তিনি উঠিয়া বলিলেন যে তিনি বৃন্দাবনে যমুনার নামিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন।

সমালোচকগণ বলেন যে, এই সমুদ্র-পতনের দিনই ভারতের এক প্রধান আদর্শ পুরুষ ও ধর্ম প্রচারক গৌরচন্দ্র ভারত-ভূমি অন্ধকার করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে অন্তর্মিত হন। বৈষ্ণবগণ জালিয়ার জালে তাঁহার জীবনহীন শরীরটি পাইয়াছিলেন।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহার পরেও চৈতন্য কএকমাস জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মতে এই ঘটনার পরে চৈতন্যচন্দ্র জগদানন্দ পণ্ডিতকে মাতার নিকটে অমুন করিয়া পাঠাইয়া দেন। জগদানন্দ এই সংবাদ লইয়া নদীয়ার গেলেন। শচীমাতা ও ভক্তগণকে চৈতন্যের নিবেদন ও উপদেশ জানাইয়া কিরিয় আসিবার কালে আচার্য্য গোঁসাই চৈতন্যের নিকট একটা প্রহেলিকা বলিয়া পাঠান। যথা—

“বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।

বাউল কহিও হাটে না বিকায় চাঁউল ॥

বাউলকে কহিও কারে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥” (চৈ. চরিত্র ৩।১৯)

জগদানন্দ যথাসময়ে নীলাচলে আসিয়া আচার্য্যের প্রহেলিকাটি প্রভুকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া সকল ভক্তগণই অবাক হইলেন, কেহই কোন অর্থ বুঝিলেন না। চৈতন্যচন্দ্রকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন “পাগল সন্ন্যাসীর কথা আমিও বুঝিতে পারি নাই।” কিন্তু প্রথমে জগদানন্দের

মুখে শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে বিরহদশা বিগুণ হইতে লাগিল। তখন হইতেই প্রলাপ বাকিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ রাত্রির পরে স্বরূপ গোঁসাই তাঁহাকে গভীরাতে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। এই দিন প্রেমাবেশে দেহাঙ্গে বর্ষণ করায় চৈতন্যের সর্বশরীর কত বিকৃত হইয়া যায়। এইরূপে কতকদিন চলিয়া গেল। বৈশাখের পূর্ণিমার রাত্রিতে জগদানন্দবরুণ নামক উদ্ভানে খাইয়া চৈতন্য অচেতন হইলেন। পরে ভক্তগণের চেষ্টায় তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। ইহার পরে একদিন রাত্রিতে পরমানন্দ রায় প্রভৃতিকে ধর্ম ও কর্তব্যোপদেশ দেন। এই সময়ে শিক্ষাটক নামে যে আটটি শ্লোক শ্রীচৈতন্যকৃত বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহা প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণদাস বিদ্বত চৈতন্যমৃতগ্রন্থ এই স্থানেই সমাপ্ত করিয়াছেন, প্রভুর অন্তর্দানের বিষয় কিছুই লেখেন নাই। অপর বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণও এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস সূত্রাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, ১৪০৭ শকের ফাল্গুনে চৈতন্যের জন্ম, চক্ষিণবৎসর গৃহবাস, তৎপরে সন্ন্যাস লইয়া ছয় বৎসর গমনাগমনে অতিবাহিত করেন, এবং তৎপরে ১৮ বৎসর নীলাচলে থাকিয়া নানা উপায়ে লোক-শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার করিয়া ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু অন্তর্হিত হন। (১)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবে বঙ্গদেশে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেরূপ ধর্ম প্রচার ও সাহিত্যযুগ বঙ্গে কখন হয় নাই। চৈতন্যের প্রধান প্রধান ভক্তগণ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা এই সময় শত শত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছেন ও গোড়দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। কবি যদুনাথ দাস কর্ণানন্দ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

(১) “ঈশ্বরচৈতন্য মনসীপে অবতরি।

অষ্টচল্লিশ বৎসর একট বিহারী।

চৌদশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।

চৌদশত পঞ্চাশে হইল। অন্তর্দান।

চক্ষিণ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।

নিরন্তর কৈল ভাবে কীৰ্ত্তন বিলাস।

চক্ষিণ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।

আর চক্ষিণ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।

কতু দক্ষিণ কতু গোড় কতু বৃন্দাবন।

অষ্টাশ বৎসর রহিল। নীলাচলে।

কৃষ্ণপ্রেমলীলায়ুতে ভাসালে সকলে ॥” (চৈ. চরিত্র ১.১৩ পরি.)

“তনু-ভঙ্গ ভক্তগণ করি এক মন।

হুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন ॥

এই প্রকটনা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।

আনন্দ হইল চিত্তে শক্তি প্রকাশিয়া ॥

শ্রীনিবাসরূপে কল্পবৃক্ষের সাজন।

গৌড়দেশে লক্ষ এই কৈলা প্রকটন ॥” (১ম নিঃ)

চৈতন্য-ভক্তগণের সেই ভক্তিগাথা এখনও ভাবুক ও প্রাকৃত ভক্তের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতেছে, সেই কবিতা-কাননের কলকণ্ঠ নিনাদ স্পষ্টবদে এখনও প্রেমাস্বত বর্ণন করিতেছে। সে একদিন গিয়াছে, সেদিন আর বঙ্গে আসিবে কি না সন্দেহ! চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্গভাষার কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। শুকালে যে বাঙ্গালা গ্রন্থ সকল পড়েই লিখিত হইত, এমন নহে, সে সময়কার রচিত অনেক গল্পগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তখন যে শিষ্ট বাঙ্গালা গণের আদর ছিল, তখন যে লোকে স্থললিত গল্প লিখিতে পারিতেন, তাহা নরোত্তমদাসের দেহকড়চ, কবিরাজ গোস্বামীর জিজ্ঞাসাতত্ত্বসার, মুরারিগুপ্তের কড়চা প্রভৃতি পাঠ করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

[বঙ্গভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চৈতন্যের ধর্ম্মমত।—চৈতন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সময় বিশেষে উপদেশ-চ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানা যাইতে পারে। বাল্যকালে অপরাপরের জায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদেবদেবীতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি ছিল, তিনি বাল্যকাল হইতেই বিশ্বসংসারকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া জানিতেন। প্রথম জীবনে বৈষ্ণবধর্মে তাঁহার বিশেষ অমুরাগ ছিল না, গয়ায় যাইয়া বিষ্ণুপদ দর্শনের পর হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধান স্থির করিয়া তাহার পক্ষপাতী হন। চৈতন্য নিজে কোন দর্শন বা দার্শনিক মতের উদ্ভাবন করেন নাই, প্রাচীন হিন্দুধর্মে যে সকল গ্রন্থ বা মত সপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, চৈতন্য-চন্দ্রও সেই মত ও গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে পূর্বতন মত হইতে ইহার মতে অনেক নুতন হইয়াছে। ইনি ধর্ম্মমত সপ্রমাণ করিবার জন্য বিষ্ণু-পুরাণ, গীতা, ভাগবত, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড, বৃহদারণ্যক, পঞ্চ-রাত্র ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন, এ ছাড়া উপনিষদ, শ্রুতি ও বেদান্তসূত্রেরও যথেষ্ট আদর করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত সার্কভোমের সহিত বিচার, রামানন্দের ধর্ম্মমীমাংসা, রূপের প্রতি উপদেশ,

সনাতন-শিক্ষা ও বসন্তভট্টের সহিত বিচার প্রভৃতি পাঠ করিলে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম্মমত জানা যাইতে পারে।

তাঁহার মতে উপনিষদ, শ্রুতি ও আর্ষ্য ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মুখ্যার্থ অবলম্বনে যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করা উচিত, গোণার্থ অবলম্বন করিয়া ভ্রম নিরূপণ করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, অতএব লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনে শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা যথার্থ হইতে পারে না (১)।

চৈতন্যের মতে ঈশ্বর সর্বব্যাপক, সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সাকার। যে সকল শ্রুতিতে ঈশ্বরকে নির্কিংশেব বলিয়া উল্লেখ আছে, প্রাকৃতত্ব নিষেধ করাই তাহার তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও তাহাতেই পুনর্বার লয় হয়। ভগবান্ ঈশ্বর এই জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণ রূপে অবস্থিত। ঈশ্বরের নেত্র, মনঃ প্রভৃতি সকলই নিত্য, যখন প্রাকৃত অগং কিছুই ছিল না, তখনও বর্তমান ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার শক্তি হইতে প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতিতে যে সকল ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ঈশ্বর (২)। স্বাপনের শেষে নন্দ গোপের গৃহে অবস্থিত কৃষ্ণের সহিত ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোক ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য্য, সর্বশক্তি ও সর্বরসপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং তাঁহার

(১) “প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ।

যতঃ প্রমাণ বেদ সত্য সেই কর।

লক্ষণা করিলে যতঃ প্রমাণা হানি হয়।” (১৫ চরিঃ সধ্যঃ ৬ পদঃ)

(২) “বেদপুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।

সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বাক্ত ঈশ্বর লক্ষণ।

সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ঃ ভগবান্।

তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান।

নির্কিংশেব তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।

প্রকৃতি-নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিধ ব্রহ্মেই জীবয়।

সেই ব্রহ্মে পুনরূপ হয় তাহা লয়।

অপাদান করণাধিকরণ কাক তিন।

ভগবানের x x x বিশেষ এই তিন চিহ্ন।

সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত বসন নয়ন।

অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের মাত্র মন।

ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ঃ ভগবান্।

স্বয়ঃ ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের সম্বাদ।” (১৫ চরিঃ সধ্যঃ ৬ পদঃ)

শরীর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ (৩)। তাহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটিকে প্রধান বলা যায়, যথা—চিহ্নক্তি, মারামক্তি ও জীব-শক্তি। এই তিনটি শক্তিকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা নামে উল্লেখ করা হইতে পারে। তাহার মধ্যে চিহ্নক্তিই প্রধান, ইহার অপর নাম স্বরূপশক্তি (৪)। স্বরূপশক্তি আবার তিন প্রকার—আনন্দাংশে স্লামিনী, সদংশে সজ্জিনী এবং চিদংশে সখিঃ নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ বা ঈশ্বর স্বয়ং সুখময় হইয়াও ভক্তগণকে সুখী করিবার জন্য স্লামিনী শক্তি দ্বারা সুখাধান করেন। স্লামিনীর সন্না-শকে প্রেম এবং প্রেমের পরমসার অংশকে মহাভাব বলে। স্ব্লামবনের রাধা ঠাকুরাণী এই মহাভাবস্বরূপা। তাহার শরীর প্রেমস্বরূপ, ললিতাদি সখী তাহার কার্যবাহ, তিনি কৃষ্ণ প্রেমসী রূপে প্রসিদ্ধ (৫)। রাধা ও কৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়ের নাম তত্ত্বনির্ণয়। ঈশ্বর হইতে জীব সম্পূর্ণ পৃথক। এই মতে হই প্রকার সমগতি স্বীকার করা হয়। ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যশাভ-পূর্বক চিরন্তন স্বর্গভোগ ও আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে ত্রিকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস। কৃষ্ণভক্তগণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সালোক্য, সারীপা, সাষ্ট্রি ও সাক্ষ্য এই চতুর্বিধ মুক্তিলাভ পূর্বক পরম সুখ সম্ভোগ করেন। জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, দান্তপ্রেম, সখ্যাপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম ও কান্ত্যাব প্রেম

(৩) “অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার।

সচ্চিদানন্দ তহু ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন।

সর্বৈবর্ষ্য সর্বশক্তি সর্বরস পূর্ণ।” (চৈঃ চরিঃ সধ্যঃ ৮ পং.)

“স্বয়ং পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাগিণোবিলঃ সর্বকারণকারণম্।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫১)

(৪) “কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।

চিহ্নক্তি মারামক্তি জীবশক্তিমান্।

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।” (চৈঃ চরিঃ সধ্যঃ ৮ পরিঃ)

(৫) “সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ।

আনন্দাংশে স্লামিনী সদংশে সজ্জিনী।

চিদংশে সখিত যারে জ্ঞান করি মারি।

কৃষ্ণকে আত্মাণে তাতে নাম আত্মাদিনী।

সেই শক্তি যারে রূপ আত্মাণে আপনি।

স্বরূপ কৃষ্ণ করে রূপ আত্মান।

ভক্তগণে রূপ দিতে স্লামিনী কারণ।

স্লামিনীর সার অংশ তার প্রেমসার।

আনন্দ বিষয়রূপ রসের আধার।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জামি।

সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।” (চৈঃ চরিঃ সধ্যঃ ৮ পরিঃ)

এই কয়টাই প্রধান সাধ্য, ইহাতে আবার রাধিকার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ। দান্ত ও বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে শ্রেষ্ঠ সাধ্য প্রাপ্তি হয় না। সখীভাবই তৎপ্রাপ্তিপক্ষে প্রধান উপায়। চৈতন্য ইহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কলিকালে হরিনাম কীর্তনই প্রধান, ইহা ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। যিনি তৃণ হইতে লঘু বৃদ্ধি, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারেন, এবং স্বয়ং অহঙ্কারশূন্য হইয়া অপরকে সমাদর করেন, তিনিই নামকীর্তনে অধিকারী। সকল আতিরহি ইহাতে অধিকার আছে। কৃষ্ণভক্ত নীচজাতিও ব্রাহ্মণাদি হইতে লঘু নহে। পরহিংসা, পরদ্বेष ও পরদ্বীসম্ভাষণ প্রভৃতি একান্ত পরিত্যজ্য। [চৈতন্যসম্প্রদায় শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।] রামানন্দ রায় যে প্রণালী ক্রমে অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই চৈতন্যের মতসিদ্ধ। ইনি ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত এই দুই খানিগ্রন্থ প্রতিপাদিত ধর্মকে নিজ মতসিদ্ধ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শিব প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের অভেদ স্বীকার করিতেন। [অপর বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত গ্রন্থস্বরূপ দ্রষ্টব্য *।]

চৈতন্যচন্দ্রামৃত, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থ বিশেষ, পরমহংস প্রবোধানন্দ সরস্বতী ইহার প্রণেতা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১ মহাখ্যা চৈতন্যচন্দ্রের চরিত্রবিবরণ এক খানি সংস্কৃত নাটক। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ইহার প্রণেতা। ১৫০১ শকে লিখিত হইয়াছে। ২ প্রেমদাস রচিত চৈতন্যচন্দ্রের চরিত্রবিবরণ উক্ত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

চৈতন্যচরিতামৃত, ১ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার প্রণেতা। ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে অতি বিশদরূপে চৈতন্যের জন্মাবধি অন্তর্ধান পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ আদি, মধ্যম ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্তবিবরণ যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে

* চৈতন্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই সকল গ্রন্থটি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

মুদ্রারিভূষণ রচিত (সংস্কৃত) চৈতন্যচরিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত স্বরূপ-নির্ণয় ও চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকর্ণপুরকৃত (সংস্কৃত) চৈতন্য-চরিতামৃতকাব্য, ভাষানন্দপুরীকৃত অবৈতন্যকড়চা, ইশানপুরীকৃত অবৈত-মঙ্গল, এছান্দমিষকৃত (সংস্কৃত) চৈতন্যোদয়বলী, জগদীশ্বর মিশ্রকৃত চৈতন্যবিন্যাস, প্রবোধানন্দসরস্বতীকৃত (সংস্কৃত) চৈতন্যচন্দ্রামৃত, বৃন্দাবন বাস কৃত চৈতন্যভাববত, প্রেমদাসকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়, লোচনদাস কৃত চৈতন্যবঙ্গল, চূড়ামণিহাসের চৈতন্যচরিত, বনভাসকৃত ভক্তিরত্নাকর, তরীরথকৃত চৈতন্যসঙ্গীত, (উৎকল ভাষায়) জগদীশচরিতামৃত, পোদ্দিনী জীব-প্রভৃতির কড়চা ইত্যাদি।

এইখানি বিশেষ আদরীয়। চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব গণের ধর্মমীমাংসার ইহার কথা প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়। ইহাতে বৈষ্ণবধর্মের অনেক বিষয়ের মীমাংসা আছে।

- [কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখ।]

চৈতন্যভাগবত, ইহার অপর নাম চৈতন্যমঙ্গল। পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস ইহার প্রণেতা। ইহা আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্য-লীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়াগমন; মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের ভাবান্তর, কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত মিলন, সঙ্কীর্ণন, পাতকী-দিগের উদ্ধার প্রভৃতি; অন্ত্যখণ্ডে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচলে গমন, গোড়ে আগমন, ধর্মপ্রচার ও পুনর্বার নীলাচলে গমন বর্ণিত আছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও রচয়িতার যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে।

চৈতন্যভৈরবী (শ্রী) চৈতন্য শিবস্তুত্বুক্তা ভৈরবী মধ্যলো। তদ্বসারোক্ত ভৈরবী বিশেষ।

চৈতন্যমঙ্গল, ১ চৈতন্যভাগবতের অপর নাম। [চৈতন্য-ভাগবত দেখ।] ২ লোচনদাস প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহা আদি, মধ্যম ও অন্ত্য এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত চৈতন্যলীলাই বর্ণিত আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পাঁচালীরূপে ইহার গান হইয়া থাকে। মুরারি-গুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিত অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত।

চৈতন্যসম্প্রদায়, ভারতবর্ষীয় আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহকারী। চৈতন্যের প্রাচুর্য্যবের কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইহার হ্রস্বপাত হয়। পরে চৈতন্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি দ্বারা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কালে তাঁহাদিগের শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের যত্নে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বদেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

চৈতন্য এ সম্প্রদায়ের কেবল প্রবর্তক নহে, উপাত্ত ও বটে। এ সম্প্রদায়ের মতানুসারে চৈতন্য জৈষ্মের পূর্ণাবতার; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ অংশাবতার। তাঁহারা দুইজনে চৈতন্যের দুই অঙ্গ স্বরূপ। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম, তিনিই চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দ। অদ্বৈত সাংক্য সঙ্গীশিব।

শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ভূক্ত বৈষ্ণবদিগের উপাত্ত দেবতা। ইহাদের মতে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ সর্বকারণের কারণ পরমেশ্বর এবং তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদায় বস্তু। তাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং পৃথিবীর ভারমোচন, প্রজাপালন ও ধর্ম সংস্থাপন জন্ত সময়ে সময়ে পূর্ণাবতার ও অংশাবতার প্রভৃতি অনন্ত-রূপ গ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন। সেই বৃন্দাবনবাসী নন্দহলালই নবদ্বীপে শচীর পুত্র গৌরান্নরূপে অবতীর্ণ হন। স্মরণ্য চৈতন্যদেব ও স্বয়ং জৈষ্ম এবং উপাত্ত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জৈষ্মের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। দ্বিজ মুরলীধর পীতাম্বর কৃষ্ণই ভগবানের কৃটস্থ রূপ। পূর্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাবিকা উভয়ে লীলাচ্ছলে অল্পপম স্তব্ধসন্তোষ করিতেন, কিন্তু কৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য-রসাত্ত্ব করিয়া রাবিকা যেরূপ আনন্দলাভ করিতেন, কৃষ্ণ সে রসাত্ত্বাদে বঞ্চিত থাকিয়া হুঃখিত ছিলেন। এই হেতু আপনার মাধুর্য্য-রস অল্পভব করিবার জন্ত পূর্ণশক্তিস্বরূপা রাবিকা ও পূর্ণশক্তিমান কৃষ্ণ উভয়ে এক দেহে মিলিত হইয়া গৌরান্নরূপে অবতীর্ণ হন। ইহা ছাড়া প্রেমভক্তিপ্রকাশ এবং হরিনাম প্রচার প্রভৃতিও অত্যন্ত উদ্দেশ্য।

এই সাম্প্রদায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, পূর্বে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপাল বালক ও সখীগণ লইয়া লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কলিযুগে গৌরান্নলীলায় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার পার্শ্বদগণও বৈষ্ণব-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চৈতন্যের সমসাময়িক প্রধান বৈষ্ণবগণ ও চৈতন্যের অতিশয় অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কএকজন এই সিদ্ধান্তের উদ্ভাবন করেন। দিন দিন ভক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিল, এবং ভক্তগণের পূর্ববিবরণ সম্বন্ধে গতানত হইতে লাগিল, সেই সময়ে পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর) মথুরা ও গোড়বাসী ভক্ত-গণের মৌখিক সিদ্ধান্ত এবং তৎপূর্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যসম্প্রদায়ের পূর্ক বিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সম্প্রদায়ে চৈতন্য মহাপ্রভু, অদ্বৈত ও নিত্যা-নন্দ এই দুই প্রভু এবং চার গৌস্বামী এই কয়জন আদিগুরু ও ইহাদের পার্শ্বদগণকে মহান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। নিত্যানন্দ-সঙ্গীগণ গোপাল এবং তাঁহাদের সম্পর্কে যাহারা এই সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপগোপাল বলে (১)। স্থান

(১) "ত্রয়োহত্র বিগ্রহাঃ জেরাঃ প্রভুসংগত ত্রয়ঃ ১০

একো মহাপ্রভুজেরাঃ দ্বৌ প্রভু সম্বতৌ সত্যং।

গোবিন্দমুক্ত চত্বারো বাচ্যাঃ প্রথমপূজনং ২১

এষাঃ পার্শ্বদগাঃ বে মহান্তঃ পরিকীর্তিতাঃ।

নিত্যানন্দগণাঃ সর্বে গোপালাঃ গোপবেশিনাঃ ২২

এষাঃ সম্বন্ধসম্পর্কাজুপগোপালসত্ত্বাঃ ২৩

(পৌরগণোদ্দেশবীপিকা)

ভেদে এই সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে ছয় গোষ্ঠী ও চৌবটি জন মহান্ত এইরূপ চ্যুতাদিক করনা করা হইয়া থাকে। কর্ণপূরের মতে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মহন্তম, নীলাচল-বাসীরা মহন্তর এবং দক্ষিণদেশে বাহারা চৈতন্তের কৃপাপাত্র হইয়াছেন, তাহাঙ্কিকে মহান্ত বলে (২)। গৌরান্ন মাধ্বী-সম্প্রদায়ী ঈশ্বরপুরীর দিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতএব এ সম্প্রদায়ের চৈতন্তের পূর্ববর্তী গুরুপ্রণালী মাধ্বী-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। [মাধ্বী-সম্প্রদায় দেখ।]

গৌরগণোদ্দেশনীপিকার এই সাম্প্রদায়িকগণের পূর্বজন্মের বিবরণ বৈষ্ণব বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

(কৃষ্ণলীলার নাম)	(গৌরান্নলীলার নাম)
পর্যন্তগোপাল (৩)	উপেন্দ্র মিশ্র।
বরীন্দ্র (৪)	কমলাবতী। (৫)
নন্দগোপ	জগন্নাথ পুরন্দর।
বশোদা	শচীমাতা।
বহুদেব	মুকুন্দ।
রোহিণী	পদ্মাবতী।
পৌর্ণমাসী	শ্রীগোবিন্দাচার্য।
অধিকা (৬)	মালিনী (শ্রীবাসপত্নী)
কিলিধিকা (৭)	নারায়ণী।
ভীষক	বল্লভাচার্য।
রুক্মিণী	লক্ষ্মী (গৌরের ১ম পত্নী)
সত্রাজিৎ	সনাতন মিশ্র।
সত্যভামা	বিষ্ণুপ্রিয়া।
সান্দীপনি	কেশবভারতী।
বৃষভাসু	পুণ্ডরীকাক বিজ্ঞানিধি।
শ্রীকৃষ্ণ	গৌরান্ন (মহাপ্রভু)।
বলদেব	নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ। (৭)

(২) “তত্র শ্রীমদ্রবীণে বিবর্তনসমীপতঃ।

বিলম্বতি স তে জেয়া বৈষ্ণবাঃ মহন্তাঃ।

নীলাচলে হি বেখাতা তেহি জেয়া মহন্তাঃ।

দক্ষিণভাগে পদ্মপ্রানীদ বৈ বৈঃ সজেয়া মহাপ্রভোঃ।

তে তে মহান্তো মহন্তাঃ সর্বে জেয়াঃ বৈষ্ণবাঃ।”

(গৌরগণোদ্দেশনী)

(৩) কৃষ্ণের পিতামহ। (৪) পর্যায়ের স্ত্রী। (৫) উপেন্দ্রমিশ্রের স্ত্রী।

(৬) কৃষ্ণের ধাত্রী জননী। (৭) কৃষ্ণলীলার বল্লভাই একাংশ-বিশেষে বিবরণ ও নিত্যানন্দ এই উভয় রূপে অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণবগণ অনেক বলে একের দুই অবতার ও দুয়ের একরূপে অবতার স্বীকার করেন।

প্রহ্লাদ	রঘুনন্দন।
ব্রহ্মা	গোপীনাথাচার্য।
সদাশিব	অম্বৈতাচার্য।
যোগেশ্বর	সীতা (অম্বৈতপত্নী)।
অচ্যুতা গোপী	অচ্যুতানন্দ।
নারদ	শ্রীবাস পণ্ডিত।
পরীত (নারদবন্ধু)	শ্রীরাম পণ্ডিত।
হুম্যান্	মুরারিগুণ্ড।
অঙ্গদ	শ্রীপুরন্দর।
সুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ।
ঋষিক মুনির পুত্র, } ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ }	হরিদাস।
অগ্নিমাধ্যষ্টপতি	{ অনন্ত, সুধানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর ও রাঘব যথাক্রমে অগ্নিমাধ্যষ্টপতির অবতার।
গর্গ	নীলাধর চক্রবর্তী।
ভাণ্ডারি (৮)	দেবানন্দ পণ্ডিত।
সনক	কাশীনাথ।
সনাতন	লোকনাথ।
সনন্দ	শ্রীনাথ।
সনৎকুমার	রামনাথ।
বেদব্যাস	বৃন্দাবন।
শুক	অম্বৈত।
হুর্বাসা	জগন্নাথাচার্য।
চন্দ্র	চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও উদ্ধবদাস।
দিবাকর	বিশ্বেশ্বর আচার্য্য।
বিশ্বকর্মা	ভাস্কর ঠাকুর।
সুদাম	বনমালী ভিক্ষুক।
অক্রুর	গোপীনাথ। (৯)
উদ্ধব	পরমানন্দপুরী।
ইন্দ্রহ্যম	প্রতাপকৃষ্ণ।
বৃহস্পতি	সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য।
অজুন ও মধ্যম পাণ্ডব	রামানন্দ রায়। (১০)
শ্রীদাম	অতিরাম।

(৮) বল্লভের সভাপণ্ডিত।

(৯) কোন মতে কেশব ভারতী অকুরাবতার।

(১০) কেহ কেহ রামানন্দকে ললিতায় অবতার বলিয়া হিঁস করেন।

সুদাম	ঠাকুর সুল্লর।
বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত।
সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত।
মহাবল	কমলাকর শিল্পলাই।
সুবাহ	উদ্ধারণ দত্ত।
মহাবাহ	মহেশ পণ্ডিত।
পুরুষোত্তম	পুরুষোত্তম।
অকুন	পরমেশ্বর দাস।
লবঙ্গ	কাল কৃষ্ণদাস।
কুসুমাকর	খোলাবেচা শ্রীধর।
প্রবল গোপবালক	হলায়ুধ ঠাকুর।
বরুণপ	কৃত্ত পণ্ডিত।
গান্ধার্ক	কুমুদানন্দ পণ্ডিত।
ভূজার	কাশীধর।
ভক্তুর	গোবিন্দ। (১১)
রক্তক	বড় হরিদাস।
পত্রক	ছোট হরিদাস।
মধুকর্ষ	মুকুন্দ দত্ত।
মধুভূত	বাসুদেব দত্ত।
চন্দ্রমুখ	শঙ্কর, মকরধ্বজ।
সুধাকর	শঙ্করবোষ।
চন্দ্রহাস (নর্তক)	অগদীশ পণ্ডিত।
মালাধর (বেণুধারক)	বনমালী পণ্ডিত।
বৃন্দাবনের শুকধর	চৈতন্য ও রামদাস।
রাধা	গদাধর পণ্ডিত।
চন্দ্রকান্তি	গদাধর দাস।
চন্দ্রাবলী	সদাশিব কবিরাজ।
ভদ্রা	শঙ্কর পণ্ডিত।
তারকা	গোপাল।
পালী	অগরাথ।
চণ্ডী	দামোদর পণ্ডিত।
বিশাখা	স্বরূপ গোস্বামী।
চন্দ্রকলতা	রাঘব গোস্বামী।
ভূজবিদ্যা	প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
ইন্দুরেখা	কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
রঙ্গদেবী	গদাধর ভট্ট।

সুদেবী	অনন্তাচার্য গোস্বামী।
শশিরেখা	কাশীধর গোস্বামী।
ধনিষ্ঠা	রাঘব পণ্ডিত।
দময়ন্তী	শুণ্ডরাজ।
রত্নলেখা	কৃষ্ণদাস।
কলাবতী	কৃষ্ণানন্দ।
নারায়ণী	বাচস্পতি।
কাবেরী	পীতাম্বর।
সুকেলী	মকরধ্বজ।
মাধবী	মাধবাচার্য।
ইন্দ্রিরা	জীব পণ্ডিত।
সুমধুরা (ভূজবিভা)	বিভা বাচস্পতি।
মধুরেক্ষণা	বলভদ্র ভট্টাচার্য।
চিত্রাদ্রী	শ্রীমাধমিশ্র।
মনোহরা	কবিকল্প।
নান্দীমুখী	সারঙ্গ ঠাকুর।
কলকল্পী	রামানন্দ বসু।
সুকেলী	সত্যরাজ খাঁ।
কাত্যায়নী	শ্রীকান্ত সেন।
বৃন্দাদেবী	মুকুন্দ দাস।
বীরা	শিবানন্দ সেন।
বিন্দুমতী	কবিকর্ণপুরের জননী।
মধুমতী	মরহরি সরকার।
রত্নবতী	গোপীনাথচার্য।
বংশী	বংশীদাস ঠাকুর।
রূপমঞ্জরী	রূপগোস্বামী।
রতিমঞ্জরী	সনাতন গোস্বামী।
লবঙ্গমঞ্জরী	শিবানন্দ চন্দ্রবর্তী।
অনঙ্গমঞ্জরী	গোপালভট্ট।
রাগমঞ্জরী	রঘুনাথ ভট্ট।
রসমঞ্জরী	রঘুনাথ দাস।
প্রেমমঞ্জরী	ভৃগুর্ভ ঠাকুর।
লীলামঞ্জরী	লোকনাথ গোস্বামী।
কমলাবতী	গোবিন্দ।
রসোন্মাসা	মাধবানন্দ।
শুণ্ডভূজা	বাসুদেব।
রাগলেখা	শিখিমহাস্তি।
কলাকেলী	মাধবী (শিখিমহাস্তির ভগিনী)
যজ্ঞপত্রিকা	ভক্তাধর ব্রহ্মচারী।

(১১) ভূজার ও ভক্তুর ককের চাকর। কাশীধর ও গোবিন্দ দীপা-
চলে চৈতন্যের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিল।

সৈয়দী	কালীমিশ্র।
মালতী	ততানন্দ।
চন্দ্রতিলক।	শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
মঞ্জুসেধা	পরমানন্দ গুপ্ত।
বরাসন্দা	রঘুনাথ বিজ্ঞ।
রত্নাবলী	কংসারিসেন।
কমলা	জগন্নাথসেন।
গুণচূড়া	সুবুদ্ধিমিশ্র।
সুকেশিনী	শ্রীহর্ব।
কপূরমঞ্জরী	রঘু মিশ্র।
শ্রীমমঞ্জরী	শ্রীভাগবতাচার্য।
ধেতমঞ্জরী	সুশীল পতিত।
বিলাসমঞ্জরী	জীব।
কামসেধা	বাণীনাথ।
মৌনমঞ্জরী	ঈশানাচার্য।
গন্ধোন্মদা	কমল।
রসোন্মদা	লক্ষীনাথ পণ্ডিত।
গোপালহরিণী	জগন্নাথ বিজ্ঞ।
কানী	অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ।
কাকাকী	হতীগোপাল।
নিভানমঞ্জরী	হরি আচার্য।
কর্ণকল্পী	ত্রীনরন মিশ্র।
কুরঙ্গাকী	রামদাস।
চন্দ্রিকা	চিরঞ্জীব।
চন্দ্রশেখরা	সুগোচন।

প্রেমভক্তিই এ সম্প্রদায়ের সর্ব সম্পত্তি, তাহার অমূল্যানে সকল ধর্ম ও কর্তব্য কর্ত্তের অন্তর্ধান হয়। সর্বজাতীয় লোকই ঐ প্রেমভক্তির অন্তর্ধানে অধিকারী। অতএব মুসলমান ও অপরাপর রোহজাতি সকলেই এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। মহাপ্রভু ও তাঁহার সহযোগী ভক্তেরা মুসলমানদিগকেও উপদেশ দিয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন।

[চৈতন্যচন্দ্র শব্দে বৃত্তান্ত দেখ।]

এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। যথা শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। সনক সনাতন প্রভৃতি যোগীগণ যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন তাহার নাম শান্তভাব। সাধারণ ভক্তেরা যে ভাবে উপাসনা করেন, তাহাকে দাস্তভাব বলে। ভীমার্জুন যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই সখ্য। বাৎসল্য পিতামাতার স্নেহ স্বরূপ। নন্দ ও যশোদা এই ভাবে উদ্ধার হইয়াছিলেন।

মাধুর্য্য সকল ভাবের প্রধান। রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ এই ভাবে কৃষ্ণ সেবা করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুও শেবোক্ত ভাবের ভাবী হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মভাচারী বৈষ্ণবেরা যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাহার সহিত ইহাদের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের গৃহস্থ লোকে ব্রহ্মভাচারীগণের মত প্রতিদিন অষ্টবার কৃষ্ণসেবা করেন। বাঙ্গালার অনেক স্থলেই কেবল পূর্বাঙ্কে ও সাংকালে তাঁহার পূজা হয়। তবে কখনও কখনও উল্লিখিত অষ্টবিধ সেবাও অচ্যুত হইয়া থাকে। নাম-সঙ্কীর্তন এই সম্প্রদায়ের প্রধান সাধন। ইহাদের মতে হরিনামকীর্তন ভিন্ন কলিযুগে আর কোন উপায় নাই। ইহা ছাড়া কৃষ্ণপ্রীতিকামনায় উপবাস, নৃত্য ও রিপুসংযমাদি চৌষটি প্রকার সাধনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গুরুপাদপ্রিয় সর্কাপেক্ষা আবশ্যক। অত্র উপাসকের জ্ঞায় ইহাদেরও দেব, গুরু ও মন্ত্রের অভেদজ্ঞান এবং গুরুকে আত্মসমর্পণ ও সর্কস্ব দান করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস আছে। ইহাদের মতে গুরুকে সর্কাপেক্ষা পূজ্য বলিয়া মানিতে হয় (১২)। যত্নই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ, যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং হরি (১৩)। অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া তৎপরে অতীষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। গুরু তুষ্ট হইলে অতীষ্ট দেব তুষ্ট হন, অতথা কোটিকল্পেও তাঁহার তুষ্টি হয় না। হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরুর কোপে কেহই রক্ষা করিতে পারে না (১৪)। গোস্বামীরা এ সম্প্রদায়ের গুরুরূপদের অবিকারী। গোস্বামীরা গৃহস্থদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উপাসনার প্রকরণ উপদেশ দেন। বাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্মাবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে ভেক লইতে হয়। গোস্বামীরা প্রায় ক্ষৌদ্রদার ও ছড়িদার দ্বারাই সেই কাজ সমাধা করিয়া থাকেন (১৫)। তাহারা উপস্থিত শিষ্যের মস্তকমুণ্ডনপূর্ক্ক স্নান করাইয়া ডোর, কোপীন, বহির্বাঁস, তিলক, মুদ্রা, করক বা ঘটা এবং জপমালা ও ত্রিকল্পী গলমালা প্রদান করিয়া মন্ত্রাদেশ করেন এবং তাহার স্থানে নুনসংখ্যা পাঁচলিকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া

(১২) "বৈষ্ণবঃ সহরিঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ সহরিঃস্বরূপঃ।" (ভক্তনামৃত)

(১৩) "অধমস্ত গুরুঃ পূজ্যতত্ত্বৈক্য সমার্কনম্।" (ভক্তনামৃত)

(১৪) "গুরো তুষ্টে হরিতুষ্টোনামাধা কল্পকোটিভিঃ।

হরো রুষ্টে গুরুত্রাতা হরো রুষ্টেনকল্পম্।" (ভক্তনামৃত)

(১৫) ক্ষৌদ্রদার ও ছড়িদার-শিষ্য-সংসদার্থ বিবৃদ্ধ গোস্বামীবিগণের কর্তব্যের বিবরণ।

চৈতন্য, অধৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগ দিতে এবং বৈষ্ণব-নিগূঢ়কে মহোৎসব করিয়া ভোজন করাইতে হয়। অনেকে বলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু এই তেঁকাশ্রমের সৃষ্টি করেন।

ইহাদের বিবাহও ঐ তিন প্রভুর ভোগ দিবার নিয়ম আছে এবং গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে মালা ও বাতাস দিয়া স্বয়ং করিতে হয়। পাণিগ্রহণের সময় ছড়িদার-বর-কল্পা উভয়ের গলায় মালা দান করে, তৎপরে পরস্পরের মালা-পরিবর্তন হয়। এই উপলক্ষে গোস্বামীরা নুনসংখ্যা পাঁচসিকা দক্ষিণা পাইয়া থাকেন, তন্নিম্ন ছড়িদারেরাও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়। এ সম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, বিধবার পুনর্বিবাহ হইলে তাহার কপালে বা সীমন্তে সিল্প দেওয়ার নিয়ম নাই। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই।

সংস্কৃত ও বাক্যভাষার এ সম্প্রদায়ের মত-প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থ বিস্তারিত আছে। তন্মধ্যে রূপগোস্বামী কৃত বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব, উজ্জলনীলমণি, দানকেলি-কৌমুদী, বহুস্তবাবলী, অষ্টাদশলীলাকান্ত, গোবিন্দবিরূদাবলী, মধুরামাহাশ্রয়, নাটকলক্ষণ, লঘুভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রজবিলাস ও কড়চা এবং সনাতনগোস্বামী কৃত গীতাবলী, বৈষ্ণবভোজবলী, গোপালভট্টের হরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত ও সিদ্ধান্তসার এই কয়খানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বিশেষ আদরীয়। ইহা ছাড়া অপরাপর সংস্কৃত ও বাক্যভাষা গ্রন্থ এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়। যথা—আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, কোন্ডভালকার, আচার্যশতক, ভক্তনামৃত, শ্রীশ্রয়গদর্পণ, গোপীপ্রেমামৃত, কৃষ্ণ-কীর্তন, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি।

এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্যন্ত গোপীচন্দ্রনের উর্দ্ধপুণ্ড করিয়া নাসাগ্রের সহিত তাহার যোগ করিয়া দেন। বাহু, বক্ষস্থল ও ললাটপার্শ্বে ছাপা দিয়া রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কন, কণ্ঠদেশে তুলসী কাষ্ঠের ত্রিকণ্ঠী-মালাধারণ ও সহস্র সংখ্যক তুলসীমণি-গ্রথিত জপমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করা ইহাদের নিত্য কৰ্ত্তব্য। এ সম্প্রদায়-ভূক্ত ভেকধারী বৈরাগীরা কটিদেশে ভোর বন্ধন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ছই মত প্রচলিত আছে, এক মতাবলম্বীরা বামপার্শ্বে ও অপরেরা দক্ষিণ পার্শ্বে ভোরের গ্রহি দিয়া থাকে। যাহারা বামদিকে গ্রহি দেয়, অপরেরা তাহাদিগকে বৈরো বহিরা উপহাস করে।

মহাপ্রভু চৈতন্য যে সময়ে এই ধর্মপ্রচার করেন, তখন তিনি কৃষ্ণকেই উপাস্ত বলিয়া উপদেশ দিতেন। কিন্তু

তাহার অলৌকিক প্রেমভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকেই ঈশ্বর অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করেন ও তাহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। দিন দিন চৈতন্যপূজার নিয়ম ও কৰ্ত্তব্য-প্রতিপাদক গ্রন্থও আবিষ্কার হইয়াছে,—

এ সম্প্রদায়ী কতকগুলি লোকেরা নবদ্বীপের নিমাইটাদকে ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকে। অপরাপর দেবতাদের স্থায় গৌরান্দের ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপ্রণালী ও স্তব প্রভৃতি আছে। চৈতন্য-উপাসকেরা তদ্বারা তাহার উপাসনা করিয়া থাকে।

ঈশানসংহিতার মতে গৌরের এই কয়টি মন্ত্র আছে। যথা—

(১৬) ওঁ গৌরায় নমঃ । (১৭) হ্রীঁ ওঁ গৌরায় নমঃ হ্রীঁ ।

(১৮) হ্রীঁ গৌরচন্দ্রায় হ্রীঁ । হ্রীঁ শ্রীঃ গৌরচন্দ্রায় নমঃ ।

গৌরান্দের ধ্যানঃ যথা—

“স্বিত্বজং সুললং স্বচ্ছং বরাভয়করং বিভূম্ ।

সুহাস্তং পুণ্ডরীকাকং মধনং সিতবাসিনী ॥

কৃষ্ণকৃষ্ণেতি ভাবন্তং স্মরং স্মনোহরম্ ।

যতিবেশধরং সৌম্যং বনমালাবিভূষিতম্ ॥

তারসন্তং জনান্ সর্কান্ ভবান্তোদেহরানিধিম্ ॥” (ঈশানসং)

ব্রহ্মজ্ঞানের মতে চৈতন্যের মন্ত্র “ওঁ চং চৈতন্যায় নমঃ ॥” (১৯)

চৈতন্যের যন্ত্র—প্রথমে একটা ঘটকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে কর্ণিকা ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে অপরাপর যন্ত্রের স্থায় চতুস্তম্ভ চতুর্দ্বার ও ভূপূর অঙ্কিত করিতে হয় (২০)।

চৈতন্যের স্তব—

“শ্রীশিব উবাচ । নমস্তামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্বাক্তম্ ।

কলিপাপবিনাশার্থং হরিনামপ্রদায়কম্ ॥

(১৬) “এণং পূর্নমুচ্চ্য ভক্তং পৌরং সমুচ্চরেৎ ।

হৃদন্তো মনুর্ব্যোহরং পৌরানুভবডঙ্করম্ ॥”

(১৭) “মাস্তাদিকন্তনন্ত্যেং মন্ত্রোহরং হরপাবণঃ ॥”

(১৮) “আদৌ মন্ত্রঃ সমুচ্চাৰ্য্য পৌরচন্দ্রং ভক্তো বদেৎ ।

ভেষুতং চৈব দেবেশি ততো মাস্তাঃ সমুচ্চরেৎ ॥

এব সপ্তাক্ষরোমন্ত্রঃ সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ।

মাস্তাদ্রিযো পৌরচন্দ্রং ভেষুতমুচ্চাৰ্য্যভংগম্ ॥

হৃদন্তং দেবদেবেশি । মন্ত্রস্তম্ভ নবাক্ষরঃ ॥”

(১৯) “চংবীজং পূর্নমুচ্চাৰ্য্য চৈতন্যায় নমঃ পদম্ ।

মন্ত্রস্ত পূর্বে এণং অষ্টাধর্মমন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥”

(২০) “মন্ত্রক কর্ণিকারম্ভে ঘটকোণস্ত লিখেৎ যথাঃ ।

দলটিকং লিখেদেশি চতুস্তম্ভং লিখেত্ততঃ ।

চতুর্দ্বারসমায়ুক্তং ভূপূরং ততো লিখেৎ ॥” (ব্রহ্মবাক্যে চৈঃ)

কৃত্যঃ কামদগুণ্যাকং মদবীণমিবানিসম্ ॥
 শব্দৌ বিজ্ঞেয়াদানৌ সর্বজ্ঞ সর্বকর্মস্ব ॥
 নমস্তে গোপালেশ্বর নমস্তে কামদগুণ্য ॥
 গোপীনাং কামদগুণ্যভিধানে কৃত্যঃ সর্বো নমঃ ॥
 রাধিকাবরভং দেবঃ নমস্তস্মৈ কৃত্যঃ সর্বো ॥
 নন্দগোপালভক্ত্যঃ নমস্তস্মৈ কৃত্যঃ সর্বো ॥
 গোপিকাবরভং বজ্র পুতনাবধকারকস্ম ॥
 বকাস্তদ্বিহরে চ কৃত্যঃ সর্বো নমস্তস্মৈ ॥
 নমো মধুরাগ্রিয়ার নমস্তে কামদগুণ্য ॥
 নমস্তাদ্রুতাতার নমস্তে বিজ্ঞানবন ॥
 নমস্তে পুণ্ডরীকাক নমস্তে নরকাতক ॥
 নমস্তে সৎকরণার নমস্তে কৃত্যঃ সর্বো ॥
 নমো বরাহরূপায় নৃসিংহার নমো নমঃ ॥
 নমো বামনরূপায় বিনিগ্ৰহকারিণে ॥
 নমঃ পরশুরামায় কজিরাক্তকরায় চ ॥
 নমো রামায় হলিনে প্রলম্বনিধনায় চ ॥
 নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণাক্তকরায় চ ॥
 নমঃ কৃষ্ণায়-হরয়ে রাধয়া স্নেহিতায় চ ॥
 নমো বৃদ্ধায় শুদ্ধায় হিংসরা রহিতায় চ ॥
 নমস্তেহং কবীকেশ কবিরূপিণ নমোহংস্তে ॥
 নমস্তেহং কবীরূপায় পুরন্দররূপায় চ ॥
 বৈষ্ণবপ্রাণদাতা চ গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ ॥
 ভক্তিপ্রিয়ায় গুরবে হরিনাম (?) কলৌ যুগে ॥
 নমস্তে ভক্তরূপায় কালিন্দ্যা সেবিতায় চ ॥
 ইতি তে কথিতং দেবি স্বরূপোক্তং পুরাশ্রিতৈ ॥
 চৈতন্তস্ত স্তবং দেবি তব ভক্ত্যা প্রকাশিতম্ ॥
 ন দেবঃ যত্র কতাপি চৈতন্তোহপি মহাপ্রভো ॥
 বৈষ্ণবায় বিদুদ্বায় ভক্তায় সত্যবাদিনে ॥
 দেবতাতেন-হীনায় ভক্ত্যা পূজাপন্নয়নঃ ॥
 দাতব্যং হি সদা ভক্ত্যা ইতি তে কথিতং ময়া ॥
 প্রভাতে জনকালে চ সন্ধ্যাকালে বাপি বৈষ্ণবঃ ॥
 যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স্তবং যত্র শতীকৃতং ॥
 ইতি শ্রীভক্তবামনে চৈতন্তকরে চৈতন্ততোত্রম্ ॥

এতদ্ব্যতীত জ্ঞানসংহিতায় চৈতন্তের শতনাম ও ভক্তবাম-
 লোক্ত চৈতন্তকবচ ও পূজার অপরোপরি নিয়ম লিখিত আছে,
 জানিতে হইলে তত্তৎপ্রহর দ্রষ্টব্য । [বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখ ।]
 চৈতন্যসমুদ্র স্বল্প, বৈষ্ণবোক্ত ঐক্যবিশেষ । প্রভুত প্রণালী—
 যত ৪ সের । কাখার পাণ্ডারীবর্জিত কদম্বুল, রান্না, এরও
 মূল, তেউড়িমূল, বেড়োলা, সূর্যমূল, শতমূলী, ইহাদের

প্রত্যেকের ২ পল, পাখার জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ।
 কদম্ব রাখালপদমূল, জিকলা, রেপুক, দেবরান্না, এলবালুক,
 শালপানি, ভগ্নপদমূল, হরিজা, হারহরিজা, ভাষালতা,
 জনকমূল, জিরক, নীলোৎপল (নীলহুঁদি), এলাইচ, মজিঠা,
 কদম্বুল, দাড়িমবীজ, নাথেরন, জালীপত্র, সুহতী, মাল-
 তীর নবপুল, বিড়ম্ব, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাঠ
 এই ২৮টা দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা । জল ১৬ সের ।
 ইহা সেবনে চিত্তবিকার ভাল হয় ।

চৈতন্যসমুদ্র বৃহৎ, বৈষ্ণবোক্ত ঐক্যবিশেষ । কাখার শগবীজ,
 তেউড়িমূল, এরওমূল, কদম্বুল, শতমূলী, রান্না, পিপুল,
 সজিসামূল, প্রত্যেক ২ পল, পাখার জল ৬৪ সের, শেষ ১৬
 সের । কদম্বা যথা—সূর্যমূল, বটীমূল, মেদ, মহামেদ,
 কাকালী, কীরকাকালী, চিনি, খেজুরমাতী (বা পিওখর্জুর),
 জালা, শতমূলী, তালের মাতি, গোছুর এবং স্বল্প চৈতন্য-
 যুক্তোক্ত কদম্ব মিলিত ১ সের । ইহাতে সকল প্রকার
 অগ্নি, উন্মাদ ও অন্তঃ অনেক রোগ ভাল হইয়া থাকে ।

চৈত (বি) চিত্তভেদম্ চিত্ত-অণু । ১ চিত্তসম্বন্ধী অরূপাণি ।

(পুং) ২ চিত্তাতিমানী ক্ষেত্রজ । “চৈতন্যে হৃদয়ং চৈতঃ
 ক্ষেত্রজঃ প্রাণিশ্চ যদা ।” (ভাগঃ ৩২৬।১৫) (স্ত্রী) ৩ বৌদ্ধ
 মতে বিজ্ঞানবুদ্ধাতিরিক্ত স্বরূপাত্মক । বৌদ্ধেরা চিত্ত ও চৈত
 নামক কেবল দুইপ্রকার পদার্থ স্বীকার করেন । তাহাদের
 মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ মাত্রই চৈত ।

চৈতন্য (বি) চৈত-বার্ধক্য-কন্ । চিত্তসম্বন্ধী । [চৈত দেখ ।]

চৈত্যা (স্ত্রী পুং) চিত্তভেদম্ চিত্তা-অণু (তত্ত্বেদম্ । পা ৪।৩।১২০)
 ১ আয়তনম্ । ২ ব্যায়তন । ৩ দেবারতন । ৪ বেবকুল,
 দেউল ।

“বহু বৃক্ষা মণিমর্য্যচৈত্যান্যাপি হিরণ্যম্ ।” (ভারত মতঃ ৩।১২)

৫ চিত্তা । চৈত্যানেশ্বরতনাদিহানে ভিত্তি চৈত্যা-অণু । (পুং)

৬ চৈত্যান দেবভেদ । ৭ বুদ্ধদেব । ৮ বিষ্ণু । ৯ বুদ্ধের প্রতিমূর্তি ।

১০ উদ্দেশবুদ্ধ । পর্য্যায়—দেবভক্ত, দেবাবাস, করিজ, কুঞ্জর ।

“বুদ্ধা পতন্তি চৈত্যান্ত প্রাণেষু নগরেবু চ ।” (ভারত ৬।৩।৪০)

১১ জিনতর । ১২ প্রাণাদি-প্রসিদ্ধ মহাবুদ্ধ ।

“সেতুবন্ধীকনিরাহিচৈত্যান্তৈরুপলভিতা ।

চৈত্যান্ধাননীমাহ সুপাশ্বাসে স্ত্রমালয়ে ।” (বাজবল্য)

বৃহৎ নিকটে চৈত্যান্তক থাকিলে প্রভুত হয় ।

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।১০)

(স্ত্রী) ১৩ বিহার, বৌদ্ধমঠ । (পুং) ১৪ বুদ্ধবিশিষ্ট ।

(বি) ১৫ বুদ্ধদেব । ১৬ চিত্তাভবন্ধী । (পুং) ১৭
 বিশ্ববুদ্ধ ।

চৈতন্য, বৌদ্ধধর্মের-কর্ত্তে যে সকল সন্নিহিত আদিবুদ্ধ বা ধ্যানী-বুদ্ধধর্মের সময়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই চৈতন্য বলে, কিন্তু সাহাবী-বুদ্ধগণের উদ্দেশ্যে যে সকল সন্নিহিত নির্মিত হয়, তাহাকে কুটাগার বলে। সফর্মপুণ্ডরীক নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে চৈতন্য বা বুদ্ধমণ্ডলের নির্মাণপ্রণালী বর্ণিত আছে। চৈতন্য নামক বুদ্ধমণ্ডলের গর্ভ ও তাহার উর্দ্ধে লিঙ্গাকৃতি চূড়ামণি থাকে, এই অংশের নাম অকনিষ্ঠভূবন। তাহার উপর পাঁচ পাকি ছাতা থাকে, এই পাঁচটা পঞ্চায়াতী বুদ্ধের ভবন বলিয়া খ্যাত। পূর্বে অকোভা, দক্ষিণে রত্নসমুদ্র, পশ্চিমে অমিতাভ, উত্তরে অমোঘসিদ্ধ ও কখন কখন বৈরোচন মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, কিন্তু বঙ্গসম্বন্ধে মূর্ত্তি কখন চৈতন্যে অঙ্কিত হয় না। ভারতবর্ষের মানাস্থানেই বৌদ্ধচৈতন্য দেখা যায়, সেই সকল প্রাচীন চৈত্যাগৃহের শিরনৈশূণ্য ও নির্মাণকোশল পর্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। নেপালী চৈত্যানুগ্নব নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে চৈত্যানুগ্নাবিধি বর্ণিত আছে।

চৈত্যক (পুং) চৈতাইব কারতি চৈত্যা কৈ-কন্। ১ অর্থবৃক্ষ। ২ গিরিভ্রমণপূর্ববৈক পঞ্চগিরির অন্তর্গত পর্বতভেদ।

(ভারত ২০।২ অঃ)

বর্ত্তমান নাম সোণার। রাজগৃহের সীমা পঞ্চ পর্বতের মধ্যে পঞ্চম। ইহা গয়া হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পর্বত এখন অঙ্গুলে পরিপূর্ণ। এখানকার চরণচিহ্ন-দর্শনার্থ অনেক জৈনবাজীর সমাগম হয়।

চৈত্যাগৃহ (স্ত্রী) চৈত্যান্ত সন্নিহিতং গৃহং শাকপার্বিবাতিদ্বাং সমা। চৈত্যান্ত সন্নিহিত গৃহ।

চৈত্যান্তরু (পুং) কর্ণধা*। ১ গ্রামাদিতে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ২ অর্থখ-বৃক্ষ। “চৈত্যান্তরৌ সা পতিতা সংকুতপীড়ান্ করোত্মাকা।” (বৃহৎসংহিতা ৩৩।২১)

উকা চৈত্যান্তরুতে পতিত হইলে সাধুগণের পীড়া হয়।

চৈত্যান্তরু (পুং) কর্ণধা*। অর্থখ বৃক্ষ। [চৈত্যান্তরু দেখ।]

চৈত্যান্তরু (পুং) কর্ণধা*। ১ অর্থখবৃক্ষ। ২ অশোক বৃক্ষ। ৩ জিনস্তরু। [চৈত্যান্তরু দেখ।]

চৈত্যান্তপাল (পুং) চৈত্যান্ত পালয়তি চৈত্যা-পালি-অচ্। চৈত্যান্তরু।

চৈত্যান্তমুখ (পুং) চৈত্যান্ত দেবকুলস্তেব মুখমন্ত বহরী। কমণ্ডলু। (ত্রিকাণ্ড*)

চৈত্যান্তমুখ (পুং) আখ্যানানুগ্ৰহোক্ত বস্তুভেদঃ। “চৈত্যান্তমুখ আখ্যানানুগ্ৰহোক্ত বস্তুভেদঃ।” (হু*)

শব্দর, পদপতি, আখ্যা, জোড়া ইত্যাদি দেকভাসিগের নিকটে প্রতিষ্ঠা করিবে, “যদি আখ্যার অভিপ্রেত বস্তু লাভ

হয় তাহা হইলে আখ্যা-আখ্যানী-পাক রা-পত্ভার আপনার ভাগ করিব।” পরে অভিপ্রেত বস্তু লাভ হইলে আখ্যা-আখ্যানী-পাক রা-পত্ভার আপনার ভাগ করিবে। ইহাকেই চৈত্যান্তমুখ বলে। এই বস্তু চৈত্যান্তমুখ উপলব্ধি করিতে হয়, যিষ্টকর্ত্তের বলির পূর্বেই চৈত্যান্তকে বলি (পূজা) দিতে হয়। “যজ্ঞ বৈ বিদেশস্থং পলাশবৃন্তেন যজ বেচ্ছা বসন্ততে ইত্যোত্তমর্কা বৌ পিণ্ডো কৃষা বীবধেঃস্তাধার দূতায় প্রবচ্ছদিসমন্তৈঃ বলিং হরেতি চৈনং ক্রয়াদয়ঃ কুত্যানিতি বো দূতায়।” (আখ* গৃ* হু*)

বিদেশস্থ চৈত্যান্তরু ভাগ করিতে হইলে পলাশকাঠ দ্বারা দূত ও বীবধ (ভারবহণের বাঁক) নির্মাণ করিবে। পরে “যজ্ঞবেচ্ছা” এই মন্ত্রদ্বারা দুইটা পিণ্ড পাকাইয়া বীবধে স্থাপন করিয়া দূতকে বলিবে “একটা তাহার (বিদেশস্থ) চৈত্যান্তরু উদ্দেশ্যে লইয়া যাও এবং অপরটা তুমি নিজে গ্রহণ কর।”

“প্রতিভয়ং চেদন্তরা শত্রুমপি কিঞ্চিং।” (হু*) “নাব্যা চেৎ নন্তরা প্রবরুণমপি কিঞ্চিদনেন স্তরিতব্যম্।” (হু*)

বাগকর্ত্তা ও বিদেশস্থ চৈত্যান্তরু উত্তরের মধ্যস্থিত পথে কোন রূপ তরু থাকিলে পলাশকর্ত্তিত দূতকে একখানি শত্রু প্রদান করিবে, নৌকাধারা তরণীর নদী মধ্যে থাকিলে তরণের অস্ত্র ভেলার ভায় কিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করিবে। “ধনস্তরি-যজ্ঞে ব্রাহ্মণমগ্নিঃ চান্তরা পুরোহিতাগ্রে বলিং হরেৎ।” (হু*) যদি ধনস্তরি চৈত্যান্ত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সমীপে পুরোহিতকে অগ্রে বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র “পুরোহিতায় নমঃ” পরে “ধনস্তরয়ে নমঃ”। ধনস্তরি বিদেশস্থ হইলে ধন-স্তরি ও পুরোহিতকে একটা পিণ্ড দিবে এবং আর একটা দূতকে দিবে।

চৈত্যান্তরু (পুং) কর্ণধা*। অর্থখ বৃক্ষ। “চতুশ্চাষ্টৈত্যা-বৃক্ষাঃ সমাজাঃ প্রেক্ষণানি চ” (মহু ৯।২৬৪) [চৈত্যান্তরু দেখ।]

চৈত্যান্তবিহার (পুং) চৈত্যান্তেব বিহারোহত্র বহরী। জিন-গৃহ, জৈন বা বৌদ্ধমঠ।

চৈত্যান্তশৈল (পুং) চৈত্যান্তপর্বত।

চৈত্যান্তস্থান (স্ত্রী) ৩৩৭। ১ যে স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ২ পবিত্র স্থান। “চৈত্যান্তস্থানে স্থিতং বুদ্ধং ফলবন্তমিব দিভাঃ।” (ভারত অশ্বশালন ১৬৬ অঃ)

চৈত্যান্ত (স্ত্রী) চি-ইন্ চিঃ ততঃ আর্ধে-অণ্। ১ দেবকুল, সেউল। ২ মৃত। (ত্রিকাণ্ড*) (পুং) ৩ বুদ্ধ ভিক্ষুক। ৪ বর্ষপর্বত-ভেদঃ। “হিমবান্ হেমকূটচ্চ নিযধো মেরুরেব চ। চৈত্রঃ কর্ণাচ শৃঙ্গীচ সৈশ্বতে বর্ষপর্বতঃ।” (হারাবলী) (পুং)

চৈত্রা ভবার্ধে অণ্। ৫ চৈত্রাশ্রমসম্বৃত্ত বৃদ্ধের পুত্র। ইনি সপ্তবীপের অধিপতি ও সুরথ রাজার প্রপিতৃকর।

(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ্ড)। ৩ মানভেন। ইহা সৌর ও চাত্রভেদে বিবিধ। সূর্যের মীনরানিতে সংক্রমণ অবধি সেই রাশি ভোগ পর্যন্ত সৌরচৈত্র। চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণ-মাসী যত্র চিত্রা-অণু (বিভাবাকান্তনব্রহ্মকাক্ষিকীচৈত্রিত্যঃ। পা ৪।২।২৩) যে চাত্রমাসে চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা হয়, তাহা চাত্রচৈত্র। চাত্রচৈত্র কৃক্ অতিপনাবধি পূর্ণিমা পর্যন্ত পৌর্ণ ও শুক্ল অতিপন্ অবধি অমাবস্তা পর্যন্ত স্থা।

পর্যায়—চৈত্রিক, মধু, চৈত্রী, কালাদিক, চৈত্রক, চিত্রিক।

চৈত্রমাসে জন্ম গ্রহণ করিলে লংকর্কশালী, বিনয়ী, সুন্দর-কৃতি, সুখী, সংলব্ধ, বিজ্ঞ ও দেবভক্ত হয়। চৈত্র-মাসের কৃত্য বাকুলী, অশোকঠিহী, শ্রীরামনবমী, মদনজয়ো-দশী, মননচতুর্দশী, সন্ন্যাস প্রভৃতি। [ইহাদিগের প্রকরণ তত্ত্বংশকে দ্রষ্টব্য।] ৭ বার্ষপত্যবর্ষভেদ। ৮ বার্ষপত্য অর্ধমাস। (ক্লী) ৯ চৈত্র্য। (ত্রি) ১০ চিত্রানক্ষত্রজাত।

চৈত্রক (পুং) চৈত্র-স্বার্থে-কন্। চৈত্রমাস।

চৈত্রমথ (পুং) চৈত্রস্ত মথঃ ৬তৎ। চৈত্রমাসীর মদনজয়োদশী প্রভৃতি উৎসব।

চৈত্ররথ (ক্লী) চিত্ররথেন গন্ধর্বেণ নিবৃত্তং চিত্ররথ-অণু (ভেন নিবৃত্তম্। পা ৪।২।৬৮) ১ কুবেরের উপবন, ইলাবৃত্তের পূর্কদিকে অবস্থিত, চিত্ররথ এই বন নির্মাণ করেন।

“বভৌ বহুজনাধীর্ণং বনং চৈত্ররথং যথা।” (হরিং ৩২৪ অং) লিঙ্গপুরাণের মতে ইহা মেরুর পূর্বে অবস্থিত। দেবীভাগবতের মতে চৈত্ররথ একটি পীঠস্থান, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মদোৎকটা। “মদোৎকটা চৈত্ররথে জরজী হস্তিনাপুরে।”

(দেবীভাগ ৭।২০।৮৮)

(পুং) ২ মুনিবিশেষ।

“অবিক্রিতমতিশ্রুতং তথা চৈত্ররথং মুনিম্॥” (ভারত ১।২৪।৪২)

(ক্লী) চিত্ররথং গন্ধর্কমধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ চিত্ররথ-অণু।

৩ মহাভারতের আদিপর্কান্তর্গত একটি পর্কখ্যান।

“তথা চৈত্ররথং দেব্যঃ পাঞ্চাল্যাশ্চ স্বয়ম্বরম্॥” (ভারত ১।১০।৫৫)

চৈত্ররথি (পুং) চিত্ররথস্ত অপত্যং চিত্ররথ-ইঞ (অত-ইঞ।

পা ৪।১।২৫।) শশবিলু নৃপতি।

“আসীং চৈত্ররথির্বিদ্যো যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ।

শশবিলুঃ পরং বৃত্তং রাজর্ষীণাং সমব্রিতঃ॥” (হরিবংশ ৩৭ অং)

চৈত্ররথী (ক্লী) চৈত্ররথেরপত্যং ক্লী চৈত্ররথি অণু-ততো ঙীপ্।

শশবিলু রাজার কস্তা, সুবনাথের পুত্র ইহার পানিগ্রহণ করেন। (হরিবং ১২ অং)

চৈত্ররথ্য (ক্লী) চৈত্ররথমেব স্বার্থে ঞ্। কুবেরের উপবন, চৈত্ররথ।

“মানসে চৈত্ররথো চ ন রেমে রামরা রতঃ।” (ভাগ ৩।২০।৩৯)

চৈত্ররাজ (পুং) চন্দ্রাবতীমহাবীতস্ত গোপকবিভুলজ্ঞ ঞ্চর রাজা। (সহ্যত্রিংশ ১।৩০৩২)

চৈত্রবতী (ক্লী) নদীবিশেষ। (হরিবং)

চৈত্রবাহনী (ক্লী) চিত্রবাহনভাপত্যং ক্লী চিত্রবাহন-অণু জিহাং ঙীপ্। চিত্রবাহনের-কস্তা, অর্কনের পরী, বক্রবাহনের মাতা চিত্রাক্ষা।

চৈত্রায়ন (পুং) চিত্রস্ত গোত্রাপত্যং চৈত্র নড়াদিহাং কৃক্ (নড়াদিত্যঃ কৃক্। পা ৪।১।২৯) ১ চিত্রের গোত্রজ। চিত্রের নিবৃত্তঃ চিত্রপক্ষাদিহাং কৃক্। (বৃহৎসনকঠজিলেত্যাदि। পা ৪।২।৮০) ২ চিত্রনিবৃত্ত।

চৈত্রাবলী (ক্লী) চৈত্রঃ চৈত্রমাসং আসম্যাক্রপেণ বররত্যা-ভিলবতি চৈত্র আবর-গিচ্-অহ্ জিহাং ঙীপ্, রত লভঃ। ২ চৈত্রী পূর্ণিমা। পর্যায়—মধুৎসব, সুবসন্ত, কামমহ, বাসন্তী, কর্দ্দমী। (ত্রিকা) “চৈত্রাবল্যঃ পরেহপি বা।” (তিথিতত্ত্ব) ২ মদনজয়োদশী।

চৈত্রি (পুং) চৈত্রী বিস্ততে অগ্নিন্ চৈত্রী ইঞ। চৈত্রী-গত পূর্ণিমায়ুক্ত চৈত্রমাস।

চৈত্রিক (পুং) চিত্রানক্ষত্রযুক্তপূর্ণিমা বিদ্যাতে অগ্নিন্ চৈত্র-পক্ষে ঠক্। (বিভাবা ফান্তনেত্যাदि। পা ৪।২।২৩) চৈত্রমাস।

চৈত্রিন্ (পুং) চিত্রানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা বিদ্যাতেহগ্নিন্ ত্রীহা-দিহাং ইনি। চৈত্রমাস।

চৈত্রী (ক্লী) চিত্রা-অন্ ততো ঙীপ্। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চৈত্রপূর্ণিমা। “চৈত্র্যাংহি পৌর্ণমাস্তাঃ তব দীক্ষা ভবিষ্যতি”

(ভারত ১।৪।৭২ অং)

চৈত্রিক (ত্রি) চেদ্রিদেশে ভবঃ চেদ্রি কাশ্চাদিহাং ঠঞ ঞ্। চেদ্রিদেশজ।

চৈদ্য (পুং) চেদীনাম্ জনপদানাম্ রাজা চেদ্রি-ঞ্। ১ চেদ্রি-দেশের রাজা, শিশুপাল। “স্বরা বিপ্রকৃতশৈচয়ঃ” (মাঘ ২ নং)

২ (ত্রি) চেদ্রিদেশজ “নকুলস্ত চৈত্য়াকরেণুমতীং” (ভারত আদি ২৫ অং) (পুং) [বহু] ৩ ত্রিপুরদেশ, বর্তমান নাম তেওয়ার। (হেমং ৪।২২) ৪ ভদ্রেশবাসী। ৫ চেদ্রিরাজ বহুর বংশোৎপন্ন। (ত্রিকাং)

চৈত্রিত্ত (পুং, ক্লী) চিত্তিত্তারাত্তরামিকারঃ জিহা অপত্যঃ চিত্তিত্তা অণু (অব্রুজাত্যো নদীমাহবীভ্যন্তরামিকাত্যঃ। পা ৪।১।১১৩) ১ চিত্তিত্তানামিকা জীর গর্তজাত পুত্র বা কস্তা। জীলিজে ঙীপ্ হয়।

চৈত্রিত্তেয় (পুং) চিত্তিত্তারাত্তিত্তাবৃত্তারঃ জিহা অপত্যঃ চক্। চিত্তাবৃত্ত জীর অপত্য।

চেল (ত্রি) চেলভেদং চেল-অণ্ + ১ বজ্জসম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) ২ বজ্জ।
“প্রাণীপশুনিব চেলান্তঃ কন্তঃ দেশং নৃ সম্ভাজেৎ।” (ভা° ১৩২৮৯ অঃ)

চেলক (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। শূদ্রের ঔরসে রাজকুল-
কন্তার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

“জাতঃ শূদ্রেণ রাজক্কা বৈদেহাখ্যং পুঙ্কসঃ।

অভ্যামেন চৌৰ্যেণ চৈলকাখ্যোভিজায়তে ॥” (আখ্যায়িনবৃত্তি)

চেলকি (পুং) চেলকন্ত অবেরপত্যং চেলক-ইঞ। (অত
ইঞ। পা ৪।১।১৫) চেলক নামক ঋষির পুত্র, ইহার অপরা
নাম জীবল।

“তহ হোবাচ জীবলশ্চেলকিঃ।” (শত্ৰু ব্রা° ২।৩।১৩৪)

চেলধাব (পুং) চেলঃ বস্ত্রং ধাবতি পরিক্রান্তে চেল-ধাব-অণ্
উপ° স°। ১ রজক, ধোপা।

“চেলধাব-সুরাস্রীবি-সহোপপতিবেশনাম্ ॥” (যাজ্ঞ° ১।১৬৪)

চেলাশক (পুং) চেলঃ বস্ত্রকীটং অশ্রুতি অশ্-ধূল্। ১ ক্ষুদ্র
প্রাণীবিশেষ। ইহার বস্ত্রকীট ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ
করে। মমুর মতে শূদ্র স্বীয় কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করিলে
জন্মান্তরে চেলাশকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

“চেলাশকশ্চ তবতি শূদ্রো ধর্ম্যাৎ স্বকাক্যতুতঃ।” (মমু ১২।৭২)

(ত্রি) ২ যে বস্ত্র সঞ্চরীয় কীট ভক্ষণ করে। (মহুটীকাগোবিন্দরাজ)

চৈলিক (পুং) বস্ত্রখণ্ড। “স্বৈদমুকাশ্চ চৈলিকঃ।” (সুশ্রুত°
উত্তর° ১৮ অঃ।)

চো (পারসী) গর্ভ, কূপ।

চোআলি (দেশজ) দস্তপাটির সন্ধিস্থল।

চোআ (চুর্ণ শব্দজ) পুড়িয়া যাওয়া, ধরা।

চোআন (দেশজ) গলন, ক্ষরিত হওয়া।

চোই (দেশজ) চই গাছ।

চোওন (দেশজ) অন্ন পুড়িয়া যাওয়া।

চোকা (দেশজ) তীক্ষ্ণ।

চোকান (দেশজ) ১ ছুরি ধার করা। ২ তীক্ষ্ণ।

চোচ (দেশজ) ১ আঁশ, ছালের অভ্যন্তরস্থ ভাগ। ২ অসার অংশ।

চোচড়া (দেশজ) এক রকম ঘাস।

চোচা (দেশজ) ১ মন্ড। ২ ক্রতগতি।

চোচাল (দেশজ) চোচযুক্ত।

চোতা (দেশজ) সামান্ততঃ লেখা।

টোয়ান (দেশজ) পরিষ্রবণ। কোন তরল দ্রব্যকে বাষ্পীভূত
করিয়া অল্পপাত্রে লইয়া তথার পুনর্বার তরল করাকে টোয়ান
বলে। যে বস্ত্র দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হয়, উহাকে বকবস্ত্র কহে।
[বকবস্ত্র দেখ।] প্রকৃত টোয়ান কার্যে কোন রাসায়নিক
ক্রিয়া হয় না, কিন্তু জাতব ও উত্তীর্ণ পদার্থ বন্ধপাত্রে প্রথর

উত্তাপে টোয়াইলে সেই সব ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে বিস্মিত হইয়া
যায়। ইহাকে বিশ্লেষক টোয়ান বল-বাইতে পারে।

সকল বস্তু সমান তাপে বাষ্পীভূত হয় না। অতি অল্প
বস্তুই একতাপে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং মিশ্রদ্রব্যকে
এক নির্দিষ্ট তাপে উত্তপ্ত করিলে, যে দ্রব্যটি সর্বাপেক্ষা অল্প
তাপে বাষ্পীভূত হয়, তাহাই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় ও অজ্ঞাত
পদার্থ পড়িয়া থাকে। পদার্থের এই গুণ থাকতেই টোয়ান
সহজ। জল ফারেনহাইটের ২১২° অংশতাপে বাষ্প হইয়া যায়,
এইরূপ সুরাসার ১৭৩°, সলফিউরিক ইথর ৯৪.৮°, তর্পিন
তৈল ৩১৮° ও পারদ ৬৬২° অংশ তাপে বাষ্পীভূত হয়।
সুতরাং ঐ সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপে বাষ্প হয়,
এরূপ পদার্থের সহিত মিলিত থাকিলে ঐ মিশ্র দ্রব্যকে উক্ত
পরিমাণ পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই জল, সুরাসার প্রভৃতি পৃথক্
হইয়া পড়িবে। যাহা হউক কার্যতঃ টোয়াইলে একবারে
বিশুদ্ধ কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। কোন না কোন অল্প
পদার্থও থাকিয়া যায়। একবারে বিশুদ্ধ দ্রব্য করিতে ভিন্ন
রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রয়োজন।

সুরা প্রস্তুতই টোয়ানকার্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানাবিধ
ফল, ফুল ও শস্তাদি জল যোগে কিছুদিন পচাইয়া রাখিলে
উহাদের মধ্যে অন্তরুৎসেক আরম্ভ হইতে থাকে। এইরূপে ঐ
ফলাদির কতক অংশ সুরাসারে পরিণত হয়। তখন মৃদুতাপে
বকবস্ত্রে টোয়াইয়া লইলেই মৃদু প্রস্তুত হইল। এই মতের
সহিত কিয়ৎ পরিমাণে জল থাকিয়া যায়। মৃদু নির্জল
করিতে হইলে তাহাকে পুনরায় টোয়ান উচিত। সম্পূর্ণ
নির্জল করিতে অনেকবার এই প্রক্রিয়া আবশ্যক। আমা-
দের দেশে শৌণ্ডিকগণ সচরাচর মউল, চাউল প্রভৃতি হইতেই
মৃদু প্রস্তুত করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, চিনি ও
শ্বেতসারই বিকৃত হইয়া সুরাসারূপে পরিণত হয়। সুতরাং
যে সকল দ্রব্যে চিনি ও শ্বেতসার বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত
হইতেই মৃদু প্রস্তুত হইতে পারে। আলু, যব, গুড়, চিনি, দ্রাক্ষা
ও নানাবিধ ফল হইতে মৃদু প্রস্তুত হইতেছে। [মৃদু দেখ।]

ফল টোয়াইয়া উহার সার বাহির করিয়া লইলে ফলের
আরক প্রস্তুত হয়। লেবুর আরক, আমের আরক, এলাই-
চের আরক প্রভৃতি এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

গোলাপফুল ও অজ্ঞাত সুগন্ধি দ্রব্য নির্দিষ্টকাল জলে ভিজাইয়া
রাখিয়া টোয়াইলে উহাদের সুগন্ধ জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায়
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলাতি রোজ-ওয়াটার (Rose-water)
অর্থাৎ গোলাপজল ও লাভেডার, অডিকলন প্রভৃতি এই-
রূপেই প্রস্তুত হয়।

সদী, ইন্দ, লম্বু, সরোবরাদির সঙ্গে প্রায়ই চুল্লিখাদি নানারকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বর্ষভেদে চৌরাইয়া হইলে ঐ সকল খনিজ পদার্থ পড়িয়া থাকে, কিন্তু জল অল্প পাত্রে সঞ্চিত হয়। এই জলকে চৌরান জল বলে। ইহা বৃষ্টি জল অপেক্ষাও বিশুদ্ধ। চৌরান জলের কোন বর্ণ বা গন্ধ নাই, ইহা বিস্ময়। কোন পাত্রে উত্তপ্ত করিলে সমস্তই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, নীচে কিছু পড়িয়া থাকে না।

জাতব ও উত্তীর্ণ পদার্থ আবদ্ধ পাত্রে প্রথমে উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। করলার গ্যাস ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাথরিতা করনা এই প্রকারে চৌরাইলে উহা হইতে করলার গ্যাস, আকাতরা, জাপুখা, আমোনিয়া প্রভৃতি বাষ্পরূপে বাহির হয়, এবং কোক পড়িয়া থাকে। কাঠকে এইরূপে চৌরাইলে কাঠের শিকি, কাঠের স্পিরিট, আকাতরা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এইরূপে হাড় চৌরাইলে পাত্রে জাতব অঙ্গার পড়িয়া থাকে এবং একরূপ তৈল বাহির হয়; এই তৈলকে ডিলেন্স অ্যানিম্যাল অয়েল কহে।

চৌয়ানি [চৌয়ান দেখ।]

চোক (স্ত্রী) ১ কটুপানীমূল। (ভাবপ্র) [চক্ষু শব্দজ] ২ চক্ষু।

চোক, বোম্বাই প্রদেশের কাধিবাড় রাজ্যের উন্মসকীর নামক স্থানের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে দুই গ্রাম আছে, দুই জন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে ইহার রাজস্ব দিয়া থাকেন। তাহার অধিকাংশই ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এবং অল্পাংশ জুনাগড়ের নবাব পাইয়া থাকেন।

চোকপুটি (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য।

চোকহাটু, বাকলা প্রদেশের লোহারভাগা জেলাভুক্ত ডামর পরগণার একটি গ্রাম। এখানে সুওদিগের একটি বৃহৎ গোরস্থান আছে, তাহাতে সাত হাজারের অধিক কবর দৃষ্ট হয়। এই কবর হইতেই গ্রামের নাম চোকহাটু হইয়াছে।

চোকা (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণ। ২ বন্দোবস্ত। ৩ নিষ্পত্তি।

চোকান (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণকরণ। ২ নিষ্পত্তি।

চোকাল (দেশজ) তীক্ষ্ণ, ধারাল।

চোকুটি (পুং) প্রবরবিশেষ। (প্রবরাধার)

চোকণ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত কবি, তঞ্জোররাজ শরভোজীর জন্ত ইনি কুমারসম্ভবচম্পূ রচনা করেন।

চোকনাথ, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, তিপ্পের পুত্র। ইনি শমুকোয়লী ও ধাতুরসাবলী নামে ব্যাকরণ এবং শাহজিরাজের জন্ত কাস্তিমতী-পরিণয়নাটক রচনা করেন।

চোক (পুং) ধারতে প্রাশস্ততে চক্ষ-বজ্জ পূর্বোদয়াদিবাং সাধুঃ। ১ স্বাভাবিক শুচি প্রদেশ।

“অমকানেন্ চোকেন্ নদীতীরে চৈবহি।” (কঙ্ক ৩৫০৭) (ত্রি) ২ গীত, প্রশংসিত। ৩ শুচি, পবিত্র। ৪ দক্ষ।

“প্রকাবজোদয়াবজ্জোকাকোজনপ্রিয়াঃ।” (ভারত ১৭২৪৪ অঃ) ৫ তীক্ষ্ণ। ৬ বন্দোবস্ত। (মেদিনী)

চোখা (দেশজ) তীক্ষ্ণ।

চোখান (দেশজ) লেহন, শব্দপূর্বক জিহবা নাড়িয়া আশ্বাসন।

চোগা (হিন্দী) টিলা অঙ্গরাখা, গলা হইতে পা পর্যন্ত।

প্রধানতঃ কাবুলীয়া ব্যবহার করে। তবে আজ কাল ভারত-বাসীরা ব্যবহার করিতেছে। প্রায় নরম পশম দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার কিনারাগুলি কারুকার্যের দ্বারা খচিত থাকে।

চোজা (দেশজ) নল, নদী, হিত্রযুক্ত বন্যখণ্ড।

চোচ (স্ত্রী) কোচতি অবরুদ্ধি আবেগতি কুচ-অচ্ পূর্বোদয়া-দিবাং ককারত চকারঃ। ১ বহুল। ২ চর্ম। (বরুণি) প্রশস্তং চোচং স্বপ্ন বিভ্রতেহন্ত চোচ-অচ্ (অর্শ আদিভ্যোহচ্। পা ৫।২।১২৭) ৩ গুড়যক্ষ, দারুচিনি। (অমর)

“স্পৃকচোরকচোচপত্রতগরহোণেয়জাতীরসাঃ।” (বাভট ১।১৫।৪৫)

৪ তেজপত্র। ৫ ভালকল। ৬ উপভুক্ত ফলের অবশিষ্টাংশ, চলিত কথায় চোচা বলে। (ভরত) ৭ কদলীকল। (সারস্বত) ৮ নারিকেল। (স্বামী)

চোচক (স্ত্রী) চোচ-স্বার্থে-কন্। -[চোচ দেখ।]

“দম্বাচ্চাত্র পিঙ্গলীমূলতপুণ্ডরীকবরাজচোচকঃ।” (সুশ্রুত ৭ অঃ)

চোচকপুর, স্বর্ণভূমির অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর।

(ভা ব্রহ্মণ ৫৬ অঃ)

চোট (দেশজ) আঘাত।

চোটখেকুয়া (দেশজ) আহত, যে আঘাত পাইয়াছে।

চোট (দেশজ) অতিরিক্ত সুদ।

চোটান (দেশজ) চৌকরান, আঘাত করণ।

চোটীলা, সুরাষ্ট্রের থানের নিকটবর্তী এক প্রাচীন গ্রাম, অপর নাম চোটগড়। পূর্বে প্রমাররাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন, সামন্তগণ আবার তাহাদের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লয়েন।

চোটী (স্ত্রী) চুট-অণু-তীপ্। শাড়ী। (হেম)

চোড় (পুং) চোড়তি সংযোগতি শরীরং চূড়-অচ্। ১ প্রাবরণ, উত্তরীয় বস্ত্র, চাদর। [বহ] ২ দেশবিশেষ। (মেদিনী)

[চোল দেখ।]

চোড়ক (পুং) একপ্রকার জামা (Jacket)। (দ্বিব্যাবধান)

চোড়গঙ্গ, একজন বিখ্যাত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি এবং উৎকলের গঙ্গবংশীয় রাজগণের প্রথম। ইহার প্রকৃত নাম অনন্তবর্মী। ইহার মাতামহের নাম মহারাজ রাজেন্দ্রচোড় ও শিকার

নাম রাজরাজ্য বোধ হয় রাতামহ ও শিতামহ উভয়ের উপাধি একত্র করিয়া ইনি চোড়গঙ্গ নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহার প্রমত্ত ভাস্করশালিনপাঠে জানা যায় যে ইনি ১১১৯ শকে কলিকরাজ্যে অভিষিক্ত হন। কলিকরাজ্য হইতে ইহার প্রমত্ত অনেকগুলি ভাস্করশালিন পাওয়া গিয়াছে।* উৎকলের ঐতিহাসিকগণ মাদলাপত্রীর দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন যে, ইনি ১০৩৪ শকাব্দে উড়িষ্যা জয় করেন, কিন্তু ভাষা প্রকৃত নহে। যদিও ঠিক কোন সময়ে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু পুরীজেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী কেশারেশ্বর মন্দির হইতে আবিষ্কৃত খোদিত শিলালিপিপাঠে + জানা যায় যে, তিনি ১০০৪ শকে উৎকলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রকাশিত উড়িষ্যার ইতিহাসের মতে, ইনি ১১৩২ হইতে ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন, আবার গঙ্গবংশচন্দ্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে উৎকলরাজ চুড়ঙ্গদেব ৭৪ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু নরসিংহদেবের ৩ খানি ভাস্করশালিনেই লিখিত আছে যে চোড়গঙ্গ প্রায় ৭০ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাহার প্রিয় পুত্র কামার্ব ১০৬৪ শকে উৎকলের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও উড়িষ্যার ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, মহারাজ অনঙ্গভীম দেব ১১১৯ শকে ‡ জগন্নাথের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন, কিন্তু নরসিংহের বৃহৎ ভাস্করফলকে লিখিত আছে, গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ

* Indian Antiquary, Vol. XVII; Epigraphia Indica, Vol. III. p. 17.

+ ঐ শিলালিপিখানি অতি প্রয়োজনীয় হইলেও এ পর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধারে চেষ্টা করেন নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল অশ্বট বলিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। (Antiquities of Orissa, Vol. II. p. 93.) উক্ত শিলালিপির আংশিক প্রারম্ভ অংশের পাঠোদ্ধার পঙ্কজকরে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“নকত্র দশবর্ষাণাং দশাভ্যাং নভাভ্যাং চতুর্দশবৃত্তা-

মধুনা ককটকমাস্ত ককচতুর্দশ্যাঃ ঐশ্বর্যমন্ত-

বর্ষণো চোড়গঙ্গাধিপত্যাগুজো ভগবৎ ঐকেশ্বরেবরৈ-

কপঃ রাজা ঐশ্বরি্যাদিনামা তু(হি)ভুবনহিতরে ঐকেশ্বরেবরোদে-
নতঃ দীপঃ প্রাশাদ” ইত্যাদি।

‡ রাজা রাজেন্দ্রলাল অমৃতপ্রতিপাদনার্থ এই রোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“শকাব্দে রত্ন তুজাংগুপনকত্রমারকে।

প্রাসাদঃ কারয়ামাসানকক ভীষেন ধীমতাঃ” (Ant. Ori. II. 11a.)

তাঁহার মতে, এইটি খোদিত শিলালিপির রোক, কিন্তু পুরুষোত্তমের মহাবিষ্ণুর কোন স্থানে ঐ লিপির সম্মান পাওয়া যায় নাই। রোকটি অবশ্যই বলিয়া বোধ হয়।

উৎকলরাজকে পরাজয় করিয়া কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য পুরুষোত্তমের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। [জগন্নাথ শকে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মহারীর চোড়গঙ্গ নানাহান জয় করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু জাজঙ্গদেবের ১১৯ চৈত্রিসংক্রান্ত অক্ষিত শিলাফলকে লিখিত আছে, চন্দ্রবংশীর চোড়গঙ্গ চৈত্রিরাজ রত্নদেব কর্তৃক পরাস্ত হন §।

চোড়া (ঐ) মহাপ্রাবলিকা, বড় ধূলুড়ী।

চোড়ী (ঐ) চোড়-গৌরাদিখাং ডী। শাড়ী। (হেম°)

চোণা (দেশজ) ১ গোমুত্র।

চোতক (ঐ) ১ বকল। (শব্দরত্ন°) ২ শুভঙ্ক, দারুচিনি।

চোদ (পুং) চোদয়তি প্রেরয়তি অথবা চুদ-অচ। ১ অথতড়নী, কশা। ২ অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ নোহশলাকাযুক্ত কাঠবিশেষ।

“জঘনে চোদএবাং বি সন্ধখানি নরো বয়ঃ।” (ঋক্ ৫।৬।১০)

‘চোদঃ প্রেরিকা কশা অরাগ্রকাঠবিশেষো বা।’ (সারণ।)

(ত্রি) ৩ প্রেরক, যে প্রেরণ করে।

“চোদঃ কুবিন্দুতুজ্যাং সাতরে ধিয়ঃ।” (ঋক্ ১।১৪৩।৬)

‘চোদঃ অস্বাকং কর্ণহু প্রেরকঃ।’ (সারণ।)

চোদক (ত্রি) চুদ-ধূল। ১ যে প্রেরণ করে, প্রেরক। “অক-
রোদ বস্তুরং কর্ণ তমোহজুনক চোদকং।” (ভারত শাস্তি°)

(পুং) ২ প্রবৃত্তিরজনক বিধিবাক্য।

“বর্তমানোপদেশাচ্চোদনাশব্দাৎ প্রত্যর্থাত্বাভাবত্বৈ চেতি
বচনান্নির্দেশাৎ কর্ণচোদকঃ।” (কাত্য° শ্রৌ° ১।১০।১)

চোদন (ঐ) চুদ-ভাবে লুট। ১ প্রবর্তন, চোদনা।

“প্রথমেহৈ তৃতীয়ে বা কর্তব্যং প্রতিচোদনাং।” (মহু ২।৩৫)

২ প্রেরণ। “কার্য্যাকারণসন্দেহে ভবত্যাক্তোচ্চোদনাং।”

(ভারত ১৩।৪১ অঃ) (ত্রি) চুদ-কর্তরি লু। ৩ যে প্রেরণ করে।

(ঐ) ৪ কর্ণ।

“অপি প্রায়ং চোদনা বাং মিয়ানা।” (শুক্রবহুঃ ২৯।৭)

‘চোদনা চোদনানি কর্ণাণি।’ (মহীধর।)

চোদনা (ঐ) চোদতে প্রবর্তাতেহনয়া চুদ-ণিচ যুচ্-টাপ।

১ ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য, বিধিবাক্য।

“চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিষ্টকার্থবাচিনঃ।” (অৰ্জুহরি°)

“চোদনালক্ষণোহর্থোদধঃ।” (মীমাংসা ১।১২।২)

‘চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্তকঃ বচনমাছঃ।’ (শব্দরত্নামী°)

২ প্রেরণ। ৩ প্রবর্তনা। ৪ প্রবৃত্তির কারণ।

“জানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ণচোদনঃ।” (গীতা ১।৮।১৮)

‘কর্কচোদনা। কর্কচোভতে প্রবর্ত্যতে২নরা চোদনা জানাদি২য়ঃ
প্রবৃত্তিহেতুঃ।’ (ভীষয়।) ৫ অজাত পদার্থের জ্ঞাপক শব্দ।

“যাহি চোদনা ধর্মত লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিমুজ্ঞানৈব পুরুষ-
মবোধয়তি ত্রক্ষচোদনাতু পুরুষমেব বোধয়ত্যেব কেবলং ॥”
(শাং হং শাকরভাষ্য।) ‘অজাতজ্ঞাপকঃ শব্দচোদনা।’
(রত্নপ্রভা।) ৬ যাগাদিবিষয়ক প্রবর্ত। “একং বা সংযোগরূপ-
চোদনাখ্যাবিশেষাৎ।” (জৈমিনিহৃং ২।৪।৯) ‘তত্র চোদনা
প্রবর্তকঃ শব্দচোদিতঃ প্রয়োজ্যবা।’ (রত্নপ্রভা।)

চোদনাশুভ (পুং) চোদনরা প্রেরণরা আশুভাতে উৎকীর্ণ্যতে
আশুভ-ক। কল্লুক। (ত্রিকাণ্ডং ২।৬।৪৩)

চোদপ্রবুদ্ধ (ত্রি) চোদঃ জ্ঞোজ্ঞং তেন প্রবুদ্ধঃ। স্তুতি দ্বারা
যাহাকে বর্জিত করা হয়।

“অথনু বা ইত্র যিত্তেরকোদপ্রবুদ্ধঃ।” (ঋক্ ১।১৭৪।৩)

‘চোদপ্রবুদ্ধচোদনৈঃ জ্ঞোত্রৈঃ প্রবুদ্ধঃ।’ (সায়ণ।)

চোদয়স্মতি (ত্রি) চোদয়ন্তী প্রেরয়ন্তী মতির্ভক্ত বহুত্বী। প্রেরণ
করিবার মতি যাহার আছে।

“চক্ষুর্দৃশ্যৈ চোদয়স্মতি।” (ঋক্ ৫।৮।৩) ‘চোদয়ন্তী
মতির্ভক্ত তচোদয়স্মতি।’ (সায়ণ)

চোদয়িত্ব (ত্রি) চুদ-গিচ্-তৃহ। যে প্রেরণ করে, প্রেরয়িত্ব।
ক্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয়। “চোদয়ন্তী সুনৃতানাম্।’ (ঋক্ ১।৩।১১)
‘চোদয়ন্তী প্রেরয়ন্তী’ (সায়ণ।)

চোদিত (ত্রি) চুদ-তৃহ। প্রেরিত।

চোদিত্ত (ত্রি) চোদিত্ত্ব ইষ্ট, ততো লোপঃ। প্রেরক প্রেষ্ঠ।

চোদ্য (ক্রী) চুদ-গ্যৎ। ১ প্রপ্ন। ২ পূর্কপক্ষ। (অমর)

“সত্যং ধ্যানং সমাধানং চোদ্য বৈরাগ্যম্বেবচ।” (ভারত৫।৪৩।৩৪)
(পুং) ৩ চোদনার্থ, প্রেরণযোগ্য।

“নীবারমুলেন্দ্রশাকবৃত্তিঃ

সংযতাসিকার্যোষু চোদ্যঃ ॥” (ভারত ৫।৩৮।৮)

৪ আক্ষেপ্য, যাহার জন্ত শোক প্রকাশ করা হয়।

“চপলাজ্ঞনং প্রতি ন চোদ্যমদঃ।” (মাঘ)

চোনা (দেশজ) গোমুত্র, গোব্রজ প্রভাব।

চোনাট (দেশজ) আকুঞ্চিত করণ, কেশ ও বস্ত্রাদির সৌন্দর্য
সাধন করা।

চোপ (দেশজ) নির্বাক।

চোপ, বঙ্গদেশের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটি গ্রাম।
ইহা হাজারিবাগ নগর হইতে ৮ মাইল দূরে এবং মোহানি
নদীর নিকটে অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০০০
ফিট উচ্চ। ইহার নিকটে একটি কয়লার খনি আছে।
ইহাতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা ভাল নহে।

চোপুয়া (দেশজ) লেখা বিকৃত হইয়া বাওয়া।

চোপুয়ান (দেশজ) চুয়িয়া টানিয়া লওয়া।

চোপদার (পারসিক) ভৃত্যবিশেষ, যাহারা আশাপোষ্টা
বহন করে ও তাঁহাদের প্রশংসাসূচকবাণ্য ঘোষণা করে।

চোপন (ত্রি) চূপ কর্তরি লু। ১ মন্দগামী। ২ মৌনী।
(ক্রী) চূপ-লুট। ৩ মন্দগমন। ৪ মৌনতাব।

চোপুরা, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেচ জেলার অন্তর্গত চোপুরা
উপবিভাগের প্রধান নগর। তাপ্তী নদী হইতে ৪ ক্রোশ
দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৫’ ১৫” উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২০’ ২৫”
পূঃ। নগরটি অতি প্রাচীন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দেও হিন্দুরাজ-
গণের আমলে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। এখানকার
রামেশ্বরমন্দিরদর্শনার্থ বহু দূরদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া
থাকে। এখানে ডাকঘর, পাঠশালা প্রভৃতি আছে, তিসি ও
কার্পাসের ব্যবসায় প্রধান। লোকসংখ্যা ১৫৬৫৫।

চোপুচিনি (ক্রী) [তোপচিচি দেখ।]

চোপুকা, এক প্রকার পক্ষী। ইহার পক্ষ নানাবর্ণে রঞ্জিত।
সাদা, কটা, ফেঁকাসে, কাল, খাকী ইত্যাদি। আবার এক
প্রকার বর্ণের উপর অল্প প্রকার বর্ণের দাগও লক্ষিত হয়।
এতদ্ভিন্ন শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে ইহার বর্ণভেদ ঘটে। এক
একটা প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। শীতকালে সমগ্র ভারতবর্ষে
পাওয়া যায়। ইহার সর্বোত্তম তৃণপূর্ণ পাড়ের নিকটে,
খান্দেরে অথবা ভিজ ময়দানে বাস করে।

চোবচিনী (পারসী) বৃক্ষমূলবিশেষ, তোপচিনি (Smilax china.)

চোবদার (পারসী) [চোপদার দেখ।]

চোবা (দেশজ) নারিকেল প্রভৃতি ফলের বাকল।

চোবারি, বোম্বাই বিভাগের উত্তর কাথিয়াওয়ারের অন্তর্গত
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে জুইলনের অধিকারে তিনটা
গ্রাম আছে।

চোবুতরা (হিন্দী) ১ উচ্চাসন, বিচারাসন। ২ বধ্যভূমি।

চোবাহ (দেশজ) জলচর পক্ষীবিশেষ।

চোয়া (দেশজ) পরিষ্কার, শৈবালাদি শূভ্র জল এবং গুদ্র, তৃণ
প্রভৃতি আবর্জনাশূভ্র হল।

চোয়ালি (দেশজ) কদু, হুয়।

চোর (পুং) চোরয়তি চুর-গিচ্-অচ্। ১ যে পরদ্রব্য অপহরণ করে,
তত্বর। পর্যায়—চোর, দস্যু, তত্বর, প্রতিরোধী, মলিনচূচ,
ভেন, ঐকাগারিক, তৈজ, প্রচ্ছন্নজন, মোবক, পাটকর, পরা
স্বামী, কুস্তিল, খনক, শক্তিভবণ, খানিক, প্রচুরপুরুষ, তৃণ,
ডকা, রিভা, রিপু, রিকা, বিহারন, তাম্ব, বনশ, হরদিং,
স্বীবান, অভিশং, বৃক।

২ গজ্জবাবিশেষ, চোরক। (হেম) ৩ কৃষ্ণশক্তি।
(হজ্জতল) ৪ ভারতবর্ষীয় একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।
[চোরকবি দেখ।]

চোরক (পুং) ১ পৃষ্ঠাশাক, চলিত কথায় পিড়িক শাক।
২ স্নগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, নেপালে 'ভেটউর' বলে। পর্যায়—
শক্তি, খজা, ছপা, ক্ষেমক, রিপু, চপল, কিতব, ধূর্ত, পটু,
নীচ, নিশাচর, গণহাস, কোপনক, চোর, ফলচোরক,
গ্রহিণ, গ্রহিদল, গ্রহিপত্র। ইহার গুণ—তীব্র গন্ধ, উষ্ণ,
তিক্ত, বাত, কফ, নাসিকারোগ, মুখরোগ, অজীর্ণ ও কুমিদোষ-
নাশক। (রাজনি) চোর-স্বার্থে কন্। ৩ তদ্বর।

চোরকটক (পুং) চোরক নামক গজ্জবাব। ভাঁটুই ও
স্থানবিশেষে চোরকাটকী বলে।

চোরকবি, ভারতবর্ষীয় একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। কিংব-
দন্তী আছে যে, এই কবি মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক
ছিলেন, ইহার সহিত কালিদাসের সত্তাব ছিল না, পরস্পর
পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন। এক দিন এক লোক কালি-
দাসকে কবির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাকবি চিরবিষেবী
চোরকবির প্রশংসানা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি
“কবিরমরুঃ কবিরমরঃ কবী চোরময়ূরকৌ।

অন্তে কবয়ঃ কপয়ঃ কপিজাতিত্বাচ্চকলমতয়ঃ॥”

এই কবিতাটা রচনা করিলেন। এই কিংবদন্তী ভ্রান্তি-
শূন্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। কারণ চোর
কবির অনেক পূর্বে মহাকবি কালিদাসের উদয় হইয়া-
ছিল। অনেকের মতে এই কবিই প্রসিদ্ধ চোরপঞ্চালিকার
প্রণেতা।

কবি বিষ্ণুগের নামান্তর। [বিষ্ণু দেখ।]

চোরকাঁট (চোরকটক শব্দজ) [চোরকটক দেখ।]

চোরগণেশ (পুং) চোরশাস্ত্রো গণেশচৈতি কৰ্মধা°। গণেশ-
বিশেষ, কর ছিন্ন করিয়া অঙ্গ করিলে ইনি তাহার কল হরণ
করেন। (তত্ত্ব)

চোরছিত্র (স্ত্রী) চোরেণ কৃতং ছিত্রং মধ্যলো°। সন্ধি, সিধ।

চোরপুন্ড (পুং) চোরো লুপ্তারিতঃ অপ্রশস্তঃ পুন্ডঃ পশাদ-
ভাগো যন্ত বহতী। গর্দভ। (শব্দরত্ন°)

চোরপুন্ডিকা (স্ত্রী) চোরপুন্ডী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্বভবশ্চ।
চোরপুন্ডী। (শব্দরত্ন°)

চোরপুন্ডী (স্ত্রী) চোর ইব পুন্ডমত্যাঃ বহতী। পুন্ডবিশেষ,
শম্বিনী। চলিত বাক্য—চোরহলী বা হোটাহলী, হিন্দী শম্বা-
হলী বা বোলা। এই ফুলের আকার অনেকটা শম্বার জায়,
ইহা অধোমুখে বৃত্ত কুলিয়া থাকে। পর্যায়—শম্বিনী, কেশিনী,

চোরপুন্ডিকা, অধঃপুন্ডী, নকল্যা, অমরপুন্ডী, রাজী, ছোটনী।
[শম্বপুন্ডী শব্দে বিবৃত্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চোরশ্রায়ু (পুং) চোরস্ত গজ্জবাবিশেষস্ত্রায়ুরিব। কাক-
নাসিকা। (শব্দার্থচি°)

চোরা (স্ত্রী) চোরভূত্যাং রাত্রি-বিকাসিতরা পুন্ডমত্যাঃ চোর-
অচ্-টাপ্। চোরপুন্ডী। (শব্দার্থচি°)

চোরা, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় রাজ্যভুক্ত,
ঝালাবার জেলার একটা নগর।

চোরাজল, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য
ইহার পরিমাণ ১৬ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৭টা গ্রাম আছে।
ইহার শাসনকর্তা একজন রাঠোর রাজপুত। ইনি বরদা-
রাজকে রাজ্য দিয়া থাকেন। এখানকার অধিকাংশ নিবাসী
কোলি জাতীয়।

চোরাপথ (দেশজ) অপ্রশস্ত পথ, যে পথে গোপনে গমনা-
গমন করা যাইতে পারে।

চোরাসি, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সুরট জেলার একটা
বিভাগ। ইহার পরিমাণ ১১০ বর্গমাইল। ইহাতে দুটা
নগর এবং ৬৫টা গ্রাম আছে। সমগ্র বিভাগটা উর্দুরা, এবং
কৃষিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, তাহী নদী ইহার উত্তরাংশে প্রায় ১৮
মাইল ব্যাপিয়া আছে। তত্তির ইহার অপরাংশে সামান্ত
নদী বহে। তাহাতে জলর অভাব পূর্ণ হয় না। এখানকার
কৃষের জল লবণাক্ত। জেলার প্রধান নগর সুরট এই বিভা-
গের মধ্যে অবস্থিত।

চোরিকা (স্ত্রী) চোরস্ত ভাবঃ চোর-ঠন্-টাপ্। চোরের
ভাব, তদ্বরতা। (অমরটী° রায়সূক্ট°)

চোরিত (ত্রি) চুর-গিচ্ কৰ্ম্মণি-ক্ত। ২ অগত, বাহা চুরি
করিয়াছে। (স্ত্রী) ২ চুরি করা।

চোরিতক (স্ত্রী) চোরিত-স্বার্থে-কন্। পর দ্রব্যের অপহরণ।

চোল (পুং) চুল সমুচ্চায়ে কৰ্ম্মণি-ক্ত। ১ কক্কসিকা, কাঁচুলি।
“নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্।” (আনন্দল° ৬৬)

পর্যায়—কুপাসক, কঙ্ক, কুকুলী, কুকলিকা। ২ জীমিগের
কক্কবিশেষ, নিচোল। (রমানাথ°) ৩ পুরুষের বস্ত্রবিশেষ,
চলিত কথায় চোলা বলে। (পুং) [বহ] ৪ দেশবিশেষ।

এই রাজ্য অতি প্রাচীন, রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

“দ্রবিড় তৈলঙ্গরোর্মধ্যে চোলদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।

লব্ধকর্ণাচ্চ তে প্রোক্তান্তডোলা বাস্তরে ভবেৎ॥”

দ্রবিড় ও তৈলঙ্গের মধ্যে চোলদেশ। সংক্ষেপশব্দর-
ত্নের মতে—এই চোলদেশ দিয়া কাবেরী নদী প্রবাহিত।

“রাজাপগাবহতি তত্র কবেরকজা।” অশোকের খোদিত লিপিতে এই স্থান “চোর”-টলেমি কর্তৃক “চোরাই” (Chorai) ও প্লিনি কর্তৃক “সোর” নামে বর্ণিত হইয়াছে।

আর্কট, কালীপুর ত্রিচীনপল্লীর নিকটবর্তী, বরিশত, কুড়কোণ, গড়কোণসোমপুর ও শেষে তঞ্জোরে চোল-রাজ্যের রাজধানী ছিল।

অতি পূর্বকাল হইতেই চোলরাজগণ প্রবল হইয়া ছিলেন। মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে—বুদ্ধ-নির্করণের ২৯৬ বর্ষ পরে (২৪৭ খৃঃ পূঃ অব্দে) চোলবীর সিংহল অধিকার করেন। ১৫ শতাব্দীতে তামিলভাষী সমস্ত জনপদের উপর চোলরাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পল্লববংশের অধঃপতনকালে চোলরাজগণ কালীপুরে অধিষ্ঠিত হন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং চোল-রাজ্যে আগমন করেন। তৎকাল এই স্থান প্রায় দুই শত ক্রোশ (২৫০০ লি) বিস্তৃত ছিল। তখন ইহার রাজধানী ধ্বংস প্রায়। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে চোলরাজগণ আবার প্রবল হইয়া পাণ্ডা ও কোজুরাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে রাজেন্দ্র কুলোত্তম চোড়গেব বঙ্গবেহার পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে চোলরাজ্যলক্ষ্মী চোলরাজদৌহিত্র চালুক্য-রাজগণের করশাসিনী হয়। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, বর্তমান করমণ্ডল উপকূলই চোলমণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ।

চালুক্যবংশের ধ্বংস প্রকৃত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, চোলরাজগণের সম্বন্ধে সন্দের পাওয়া যায় না। চোলচরিত্র, চোলমাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে চোল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক বলিয়া বোধ হয় না। চোলরাজগণের সময়কার অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কালনির্দেশ না থাকায় প্রকৃত ধারাবাহিক রাজগণের নাম স্থির করাও কিছু কঠিন।

পরবর্তীকালে চোলরাজগণ তঞ্জোরে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাকুরের আক্রমণে ও পরে বিজয়নগররাজের আত্মদয়ে চোলরাজ্য বিধ্বস্ত হয়।

তত্ত্ব রাজা সেহতিজেনোহন্ত ইতি বা চোল-অণু বহুদে তত্ত্ব নৃক। ৫ চোলদেশের রাজা। ৬ তদ্রাজধানী। এই দেশের ক্ষত্রিয় রাজগণ সগররাজ কর্তৃক হিন্দুধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া স্নেহপ্রাপ্ত হইয়াছিল। [কাঞ্চোজ দেখ।]

(পুং) ৭ চীনদেশস্থ একটা প্রসিদ্ধ হ্রদ। (শকার্ধচিঃ)

চোলক (পুং) চোলইব কার্যতি কৈ-ক। ১ বর্ষ, সৌজ্যো। (হার্য ১২৭) ২ দেশবিশেষ, চোল।

“চোলকেশ্বরকীর্তিষ্ঠ কালুয়াং যতুঃ সম্।”(কথাসরিৎ ১২।২৫) ৩ বঙ্গ। (শকার্ধচিঃ)

চোলকিন্ (পুং) চোলক-অন্ত্যর্থ-ইনি। ১ করীর, বাশের কোড়া। ২ নাগরজ। ৩ কিছুপর্ক, নল, খাগড়া। (হার্য)

চোলগুক (পুং) চোলস্ত অগুক ইব শকচ্ছাদি অকারলোপঃ। শিরোবেষ্ট, পাকড়ী। (ত্রিকাণ্ড)

চোলন (স্ত্রী) চোলইব আচরতি চোল-কিপ্ কর্তরি ল্য। ১ নাগ-রজ। ২ করীর, কোড়া। ৩ কিছুপর্ক, নল, খাগড়া। (শকার্ধচিঃ)

চোলী (স্ত্রী) চুল-ঘঞ্ গোরাদি ভীষ্। ১ স্ত্রীলোকের বস্ত্র-বিশেষ, ঘাঘরা। ২ পুরুষের বস্ত্রবিশেষ, চোলা।

চোলোগুক (পুং) চোল উতুকইব। উকীর, পাকড়ী।

চোষ (পুং) চীয়েতে চি-ড চশ্যাদৌ উষশ্চতি কর্শধা। ১ পার্শ্ব জ্ঞানবিশেষ, ভিষক শাস্ত্রমতে পার্শ্বস্থিত অগ্নির সন্ধ্যাপের স্থায় পার্শ্ব জ্ঞান হইলে, তাহাকে চোষ বলে।

“হচ্ছলপীড়নমৃতং পবনেন পিত্তা-

তুড়দাহচোষ বহলং সক্ষপ্ৰসেকম্॥”

‘চোষঃ পার্শ্বস্থিতায়িনেব সন্ধ্যাপঃ।’ (ভাবপ্রকাশ)

চোষক (ত্রি) যে চোষণ করে।

চোষা (দেশজ) চোষণ করা।

চোষণ (দেশজ) চুষিবার জন্য নিযুক্ত করা।

চোষ্য (স্ত্রী) চুষ-ণ্যৎ আর্ধষাৎ ণ্ণঃ। চুষ্য, যাহা চুষিয়া খাইতে হয়।

“ভোজনীয়ানি পৈয়ানি ভক্ষ্যাপি বিবিধানি চ।

লোহাস্তমৃতকলানি চোষ্যাণি চ তথার্জুন ॥”(ভারত ১।১৭৫ অঃ)

[চুষ্য দেখ।]

চোস্ক (পুং) ১ উৎকৃষ্টঘোটক। ২ সিদ্ধবার, সোদাল। (ত্রিকাণ্ড)

চোহান (চাহমান শব্দজ) রাজপুত্রদিগের এক শ্রেণী।

[চাহমান দেখ।]

চৌ (চতুর্ শব্দজ) চারসংখ্যাবিশিষ্ট। এই শব্দটা প্রায়শ অস্ত্রশব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা চৌরস্তা, চৌদিক্।

চৌক (চক্ শব্দজ) ১ চক্। ২ চারিপা বা একের চতুর্থাংশ-বোধক চিহ্ন। ৩ খাতের পরিমাণবিশেষ।

চৌক, অযোধ্যা প্রদেশের একটা নদী। উৎপত্তি স্থানে ইহার নাম শারদা; খেরী ও লীতাপুর জেলায় ইহা চৌক নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার পর দহোর নামে কুটাইঘাটের নিকট কোরিরানী নদীর সহিত মিলিত হইয়া বর্ধরা নাম হইয়াছে।

চৌকিডাঙ্গা, বর্তমান জেলার রাণীগঞ্জের নিকট একটা কয়লার খনি। এই খনিতে মোট ১৪ ফিট ৬ ইঞ্চ পুরু কয়লার স্তর আছে। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম খোঁজা হয়। ১৮৬১

খু: অর্থে অগ্নি লাগিয়া ইহার বিস্তার ক্ষতি করে। ১৮৭৮
খু: অর্থে ইহার কার্য বন্ধ হয়।

চৌকস (দেশজ) সভর, কার্যদক্ষ, মনোযোগী।

চৌকা (চতুর্কোণ শব্দজ) ১ চারিকোণবিশিষ্ট স্থান। ২ পাকস্থান।

চৌকাঠ (দেশজ) চারিখণ্ড কাঠ নির্মিত ঘরের অবয়ব।
উপরের কাঠকে কপালী, দুই পাশের কাঠকে পানাবাজু ও
নীচের কাঠকে গোবরাট, উজ্জটা প্রভৃতি কহে।

চৌকি (দেশজ) ১ আসনবিশেষ, থুরসী। ২ পাহারা,
রক্ষা। ৩ পুলিশে থাকিবার স্থান কিছা কর আদায়ের স্থান।

চৌকিঘর (দেশজ) রক্ষাগৃহ।

চৌকিদার (পারসী মিশ্র) যে ব্যক্তি চৌকি অর্থাৎ পাহারা
দেয়, প্রহরী। এক্ষণে চৌকিদার বলিলে পল্লীগ্রামস্থ নীচ-
জাতীয় প্রহরীদিগকেই বুঝায়। পূর্বে চোর ডাকাতিদিগের
সর্দারদিগকেই চৌকিদার করা হইত। সর্দার নিজে চৌকি-
দার হইলে চুরি ডাকাতি অধিক হইত না। এখন
চৌকিদার যে বেতন পায়, তাহা গ্রামবাসিগণের নিকট
আদায় হয়। গ্রামবাসীরা চৌকিদারের বেতন স্বরূপ যাহা
দেয়, উহাকে চৌকিদারি কর বলে। কর গ্রামস্থ পঞ্চায়েতগণ
আদায় করিয়া থাকেন। চৌকিদারদিগের বেতন অল্প হইলেও
তাহাদের দারিদ্র অনেক। তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট
খানার গিয়া হাজরি দিতে হয়, গ্রামের জন্ম ও মৃত্যুর সংবাদ
দিতে হয়। তাহার সীমানার মধ্যে কোথাও কোন দাঙ্গা
হাজিরা হইলে তাহাকে খানায় জানাইতে হয়। বস্ততে
পল্লীগ্রামের পুলিশের ঘাণতীর কার্যই তাহাকে করিতে হয়।

চৌকিদারী (পারসী মিশ্র) ১ চৌকিদারের কাজ। ২ চৌকি-
দার সম্বন্ধীয়।

চৌকিয়া (দেশজ) ১ যে চৌকি দেয়, চৌকিদার।

চৌকী [চৌকি দেখ।]

চৌকোণ (চতুর্কোণ শব্দজ) যাহার চারিটি কোণ আছে।

চৌক্রা (ক্ৰী) চুক্র ভাব: চুক্র-দ্রুতাদি° যঞ্। (বর্ণদ্রুচা-
দিত্য: যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) চুক্রের ভাব, চুক্রতা।

চৌক্র (ক্রি) চুক্রা হিংসা শীলমত চুক্রা-ছত্রাদি° ৭ (ছত্রাদি-
ভ্যো ৭:। পা ৪।৪।৬২) ১ হিংস্রক, হিংসা করা যাহার
শত্ৰু। ২ মনোজ্ঞ।

“চৌক্র: চৌক্রজনাকীর্ণঃ সুসুখঃ সুখদর্শনম্।”

(ভারত ১২।১১৮ অঃ)

কোন কোন আভিধানিক ‘চৌক্র’ স্থলে চৌগু পাঠ করেন।

চৌগঞ্জ, রাজসাহী জেলার একটি সহর। নাটোরের ১৬ মাইল
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৩৩' উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ১২' পূঃ।

চৌগাম্ (পারসী) এক প্রকার খেলা। [চৌধান দেখ।]

চৌগাছা, বশোহর জেলার একটি গ্রাম। চিনির কারখানার
জন্ম বিখ্যাত।

চৌগাল, কাম্বীর রাজ্যের একটি সহর। ইহা শ্রীনগরের
৩৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে ও ঝিলমের ১১১ মাইল উত্তরপূর্বে
অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ২৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১০' পূঃ।

চৌঘাট, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার জেলার পনানি তালু-
কের একটি সহর। পূর্বে এই সহর চৌঘাট তালুকের সদর
ছিল, এখনও ইহাতে বিদ্যালয় ও নিম্ন বিচারালয়াদি আছে।
চৌঘাট তালুক পনানি তালুকের অন্তর্ভুক্ত হইরাছে।

চৌঘরা, চৌঘড়া, ১ ধীরদিগের জালবিশেষ। দুইটি ধনুর
স্তায় লম্বা বাঁশের মধ্যস্থানে বাঁধিয়া অগ্রভাগে একখানি
চতুর্কোণ জাল ঝাটাইয়া দেয়। বাঁশ দুইটির মধ্যস্থান
অগর একটি দণ্ডে বাঁধা থাকে। ধীর ঐ দণ্ডদ্বারা
চৌঘরা জাল জলাশয়ে ফেলিয়া রাখে এবং মাছ আসিলেই
ছাঁকিয়া তুলে।

২ আঠা দিয়া পক্ষী ধরিবার একপ্রকার ফাঁদ। চারিদিকে
বাঁশের কাঠি দ্বারা একটি ঘর করিয়া তাহার উপর দুই চারিটি
আঠা মাখান কোমল কাঠি থাকে। আঠা-কাঠির নীচে
একটি জীবন্ত ঘুরঘুরে অথবা অল্প কোন কীটপতঙ্গাদি
বাঁধিয়া দেয়। কেরকেটে, চাষ ইত্যাদি পক্ষী যেমন ঐ কীট
খাইতে যায়, অমনি আঠার পড়ে।

চৌঘরা (হিন্দী) মসলাদি রাখিবার জন্ত চারিটি খোপবিশিষ্ট
কুন্ড বাস।

চৌধানবাজি, কাম্বীরের উত্তরবর্তী লদাক ও তিব্বতে
প্রচলিত ক্রীড়াবিশেষ। এই খেলার একজন অধি-
আরোহণ করিয়া একটি তাঁটাকে দণ্ডদ্বারা আঘাত করিতে
করিতে অতি বেগে লইয়া যায়। ইহা ইংরাজদিগের হকি
(Hockey) খেলার স্তায়। আন্তর ও ঝিলঘিটের লোকেরা
এই খেলায় এত উদ্বল হয় যে, খেলার সময় তাহাদের
দিখিদিখি জ্ঞান থাকে না। অধি হইতে পড়িয়া গিয়া অনেক
সময় ছুঁটনা ঘটে। আন্তর নগরে এই খেলাকে তোপো
এবং বে প্রান্তরে এই খেলা হয়, উহাকে শাজারান্ কহে।
ঝিলঘিটে ইহার নাম বুলা। তিব্বতীয় ভাষায় এই খেলাকে
পোলো (Polo) বলে।

চৌচাপট (দেশজ) ১ যাহার চারিদিক সমান। ২ চকুর,
চালাক।

চৌচালা (চতুঃশাল শব্দজ) চারি চালযুক্ত গৃহ।

চৌট (চতুঃশাল শব্দজ) চার।

“মীরে যেহে পনে চৌটে।

আধ ছর আধ ছর কৃষ্ণকৃত চৌটে।” (খনা)

চৌটা (চতুর্থ শব্দজ) চারিভাগের এক ভাগ। এক চতুর্থাংশ।

চৌঠা (চতুর্থ শব্দজ) মাসের চতুর্থ দিন।

চোড় (স্রী) চুড়া প্রয়োজনবশত চুড়া-অণ্। চুড়াকরণ।

“গাউঁ হোঁমৈ জাতকর্ণচোড়মৌলীনিবন্ধনম্।” (মহু ২।২৭)

‘চোড়ঃ চুড়াকরণকর্ম’ (কুল্লুক)। চুড়া স্বার্থে-অণ্। ২ চুড়া।

“লেনিহাটনৈর্জান্নাগৈঃ কৃতচোড়মসিকব্ধম্।” (ভারত ৩।১৭ অঃ)

চোড়া (দেশজ) প্রস্থ পরিমাণ, পরিমল।

চোড়ার্য (ত্রি) চুড়ার প্রগল্ভাদি চাতুর্যধিক এত্। (পা ৪।২।৮০) চুড়াহিত পদার্থের নিকটবর্তী।

চোড়ি (পুং স্রী) চুড়ার অপত্য্য চুড়া-ইঞ্। চুড়া নামক স্রী অপত্য্য। স্রীলিঙ্গে বিকল্পে স্রী হ্রস্ব।

চৌরিক্য (স্রী) চুড়িকন্ত ভাবঃ কৰ্ম বা চুড়িক-ক্ (পত্যন্তপুৰো-হিতাদিভ্যো যচ্। পা ৪।১।১২৮) চুড়াবিশিষ্টের ধর্ম। ২ তৎকর্ম।

চৌঠ্য (স্রী) চুঠে ভবঃ চুঠ-ঞঞ্। চুঠ-জলাশয়ের জল। [চুঠ দেখ।] ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অমিদীপ্তি-কারক, কক্ষ, কক্ষনাশক, লঘু, মধুর রস, পিত্তর, কটিকর,

পাচক ও স্বচ্ছ। (ভাবপ্রঃ পূর্বঃ ২ ভাগ) কোন কোন আভিধানিকের মতে ‘চৌঠ্য’ স্থলে ‘চৌণ্ড্য’ পাঠ দৃষ্ট হয়। সূত্রত ইহাকে চৌক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (সূত্রত নিদানঃ ১২ অঃ) কেহ কেহ লিপিকর প্রমাণে ‘চৌণ্ড্য’ স্থানে চৌক পাঠ হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করেন।

চৌতান, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুরের একটা সহর।

ইহা যোধপুর হইতে ১৪১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

অক্ষাঃ ২৪° ৬১’ উঃ, দ্রাঘিঃ ৭১° ৩’ পূঃ।

চৌতার (চতুস্তরী শব্দজ) ভারতবর্ষীয় একটা তত যন্ত্র। ইহা জনপুরা জাতীয়, চারিটা তারবৃদ্ধ করিতে হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ও দক্ষিণাত্যের গ্রাম্য ভিকাজীবীরা ইহা ব্যবহার করে। এদেশীয় একতারার স্থায় ইহার দণ্ডটা বাঁশের হইয়া থাকে।

চৌতাল (চতুস্তাল শব্দজ) তালবিশেষ, ইহাতে ছয়টা পদ থাকে। তন্মধ্যে ১।৩।৫।৬ এই চারিটা পদে আঘাত এবং ২।৪ পদে কঁক। ইহার পদ দুই মাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে চারিটা আঘাত আছে বলিয়া ইহার নাম চৌতাল হইয়াছে। যথা—

১। ১। ১০। ১১। ১। ১০। ১। ১১।
(১) ধা ধা, দিন্ তা, কৎ তেটে, তেটে তা, তেটে

কতা, গেদি দিনা : :—। (স-রত্না)

১। ১। ১০। ১১। ১। ১০। ১। ১১।
(২) ধা গে, দিন্ তা, কৎ তাগে, দিন্ তা,

১১। ১। ১১।
তেটে কতা, গেদি দিনি : :—।

চৌত্রিশ (চতুত্রিশ শব্দজ) চতুত্রিশ সংখ্যা, ৩৪।

চৌত্রিশগড়, ছত্রিশগড়ের নামান্তর। [ছত্রিশগড় দেখ।]

চৌথ, রাজস্বের এক চতুর্থাংশ। মহারাষ্ট্রের সর্দারগণ প্রবল হইয়া নানাদেশ লুণ্ঠন করিয়া তত্তৎস্থানে অধিপতিদিগকে চৌথ প্রদানে বাধ্য করিত। যতদিন রাজগণ চৌথ দিত, ততদিন লুণ্ঠন হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, কিন্তু চৌথ বন্ধ করিলেই অধারোহী মহারাষ্ট্রসৈন্য দেশ লুণ্ঠন করিত। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শিবজী সর্ক প্রথমে থাকেশ হইতে চৌথ আদায় করেন। ক্রমে হায়দরাবাদ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অসংখ্য দেশ এবং বাঙ্গালা হইতেও মরাঠাগণ চৌথ আদায় করে। ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট চৌথ দিয়া মরাঠাদিগের নিকট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

প্রজারা আপনাদিগের বৃদ্ধাদি কর্তন করিলে তাহার চতুর্থাংশ বা তদুল্য জমিদারকে প্রদান করে, তাহার নামও চৌথ।

চৌত্রিশ (চতুত্রিশ শব্দজ) চতুত্রিশতম।

চৌদায়নি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিবিশেষ।

চৌদিগ্ (চতুর্দিগ্ শব্দজ) চারিদিক, চতুর্দিশ।

চৌহুলী, দাক্ষিণাত্যে গালেম জেলার অন্তর্গত একটা নগর। ত্রিপুরপতন হইতে ৪৮ মাইল অমিকোণে অবস্থিত। অক্ষাঃ ১২° ৩’ উঃ, দ্রাঘিঃ ৭৭° ২৭’ পূঃ।

চৌদ (চতুর্দশ শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, চতুর্দশ, ১৪।

চৌদই (দেশজ) মাসের চতুর্দশ দিন।

চৌদ্বার, উড়িষ্যার অন্তর্গত মহানদীর উত্তর তীরবর্তী একটা প্রাচীন নগর। উড়িষ্যাগণ বলে এই নগর উড়িষ্যার ৭ কটকের মধ্যে একটা কটক। অসংখ্য কটক যথা—১ যাজপুর, ২ পুরী, ৩ ভুবনেশ্বর, ৪ বড়া, ৫ সারণগড়, ৬ ছাতিয়া। প্রবাদ রাজা অনঙ্গভীম একদা মহানদীতে ভ্রমণ করিতে করিতে চৌদ্বারগ্রামে হত শ্রেনগকীর উপর উপবিষ্ট এক বক দৃষ্ট করেন। এই ব্যাপার শুভলক্ষণ মনে করিয়া তিনি চৌদ্বারে রাজধানী স্থাপন করেন। এখনও এইস্থানে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। কাহারও মতে কপ্ত-রাজগণের সময়েও এখানে সহর ছিল।

চৌধুরী, চৌধুরী (চতুধুরী শব্দের অপভ্রংশ) ১ বাঙ্গালার চৌধুরী শব্দে গ্রামের কোড়াল বা কোন ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তিকে বুঝায়। যে ব্যক্তি রসক পত্রাদি ওজন করে ও পুলিসে উহার সংবাদ দেয় তাহাকেও চৌধুরী কহে। কোন

সম্রাটবিশেষের প্রধানকেও চৌধুরী কহে। বাংলাদেশে
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ প্রভৃতি অনেকেরই এই উপাধি দেখা যায়।

২ পরিদর্শক। ৩ রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী। ৪ দক্ষিণ-
গাত্যে অনেক দেবমন্দিরের বেদির কোণে দুই দুইটা মূর্তি
থাকে, ঐ মূর্তি সকলকেও চৌধুরী বলে।

চৌপয়ত (পুং) চুপ-অচ্ চোপ: সন্ যততে যত-অচ্ তত:
স্বার্থে অণ্। ১ ঋষিবেশ্য। পাণিনীয় ক্রোড্যাতি, তিকাদি
ও ভৌবিক্যাদিগণে এই শব্দের পাঠ আছে।

চৌপয়ত-বধ (ক্ৰী) চৌপয়তস্ত বিষয়: চৌপয়ত-বিধল্ (ভৌ-
রিক্যাত্তেযু কার্যাদিত্যো বিধল্ভক্তলো। পা ৪।২।৫৪) চৌপয়ত
ঋষির দেশ।

চৌপয়তায়নি (পুং, ক্ৰী) চৌপয়তস্ত ঋষেরপত্যং চৌপয়ত-
তিকাদি* ফিঞ (তিকাদিত্য: ফিঞ। পা ৪।১।১৫৪) চৌপয়ত
নামক ঋষির অপত্য।

চৌপয়ত্যা (ক্ৰী) চৌপয়তস্তাপত্যং ক্ৰী চৌপয়ত-স্তাঙ্ (ক্রোড্যা-
দিভ্যন্ত। পা ৪।১।৮০) চৌপয়ত ঋষির কস্তা। কোন কোন
পুস্তকে ক্রোড্যাদিগণে 'চৌপয়ত' শব্দের পাঠ নাই।

চৌপল (চতুস্পল শব্দজ) চারি কোণ শির-যুক্ত।

চৌপায়ন (পুং, ক্ৰী) চুপস্তাপত্যং চুপ-অখাদি ফঞ (অখাদিত্য:
ফঞ। পা ৪।১।১১০) চুপ নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

চৌপাটী (চতুস্পাটী শব্দজ) ১ সংস্কৃত বিদ্যালয়, বাহাতে
চারি বেদ অধ্যয়ন হয়। ২ ক্ষুদ্র বিদ্যালয়, টোল।

চৌপাড়ি (চতুস্পাটী শব্দজ) চারিবেদ অধ্যয়ন করিবার স্থান,
টোল।

চৌপাড়িখেলা (দেশজ) একপ্রকার দেশীয় খেলা।

চৌপায়া (চতুস্পাদ শব্দজ) ১ যাহার চারিটা মাত্র অবয়ব
আছে। ২ চতুস্পদবিশিষ্ট জন্তু।

চৌপালা (দেশজ) পাকী।

চৌপিঠা (দেশজ) চতুর্দিকে যাহার দৃষ্টি আছে, চতুর, চালাক।

চৌষক (ত্রি) ১ আকর্ষক। ২ চুষকসংক্রান্ত।

চৌয়াত্তর (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৭৪, চতু:সপ্ততি।

চৌয়ান্ন (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৫৪।

চৌয়াল্লিশ (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৪৪, চতু:চষাংশং।

চৌর (পুং) চুরা চৌর্যংলীলমন্ত চুরা-ছত্রাদি* ৭ (ছত্রাদিত্যো
ণ:। পা ৪।৪।৬২) ১ চোর, চুরি করা যাহার স্বভাব।

“চৌরৈরুপপুতে গ্রামে সংগ্রমে চামিকারিতে।” (মহু ৪।১।৮)

(ক্ৰী) ২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ চোরপুন্দ্রী, ভাঁটুই।

চৌর, পঞ্জাবের অন্তর্গত শিম্ভুর রাজ্যের একটি পর্বত। সমুদ্র-
পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১১৮৮২ ফিট। এই পর্বত চতু:-

পার্শ্ববর্তী যাবতীর পর্বত হইতে উচ্চ। অক্ষা° ৩০° ৩২' উঃ,
দ্রাঘি° ৭৭° ৩২' পূঃ। সরহিন্দের প্রান্তর হইতে এই পর্বতের
দৃশ্য অতি চমৎকার। পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলে দক্ষিণ-
দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও উত্তরে সোপানশ্রেণীবৎ ভূবারমণ্ডিত
পর্বতশ্রেণী দৃষ্টগোচর হয়। চিরতুষার রেখার নিম্নে হইলেও
পর্বতের ছায়াময় ওয়ার গ্রীষ্মকালেও তুষাররাশি সজ্জিত থাকে।
পর্বতের উত্তর ও পূর্বপার্শ্বে স্থানে স্থানে গভীর দেবদারু-বন
এবং দক্ষিণপার্শ্বে স্থানে স্থানে চিরতা প্রভৃতি নানাজাতীয়
ফলপুষ্পশোভিত গুহা জন্মে।

চৌরকর্ম্ম (ক্ৰী) চুরি, পরদ্রব্যের অপহরণ।

চৌরঙ্গী, ১ একজন বিখ্যাত হঠযোগী। কাহারও মতে, তাঁহার
নাম হইতে কলিকাতার দক্ষিণভাগে অবস্থিত রাস্তা ও পল্লীর
নাম চৌরঙ্গী হইয়াছে। [কলিকাতা দেখ।]

২ বাতরোগবিশেষ।

চৌরপঞ্চাশিকা (ক্ৰী) ১ চৌরকবি প্রণীত পঞ্চাশংলোক।

[চৌরকবি দেখ।]

চৌরপুষ্পৌষধি (পুং) চৌরপুষ্পিকা।

চৌরপূর্ব (ত্রি) যে পূর্বে চৌর্যবৃত্তি করিয়াছিল।

চৌরসু (হিন্দী) ২ অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলার একটি গহর।
অক্ষা° ২৫° ৫৬' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪৭' পূঃ।

চৌরাই (দেশজ) একপ্রকার পক্ষী।

চৌরাগড়, মধ্যপ্রদেশের নরসিংপুর্ জেলায় একটি ভয়
গিরিভূগ। সাতপুরশ্রেণীর উপকণ্ঠ মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ
চূড়ায় ইহা অবস্থিত। এই পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪২০০
ফিট ও নন্দদানদীগর্ভ হইতে ৮০০ ফিট উচ্চ, নরসিংপুর্
হইতে ২২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

ইহার অক্ষা° ২২° ৪৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫২' পূঃ। মধ্যস্থলে
প্রায় ১০০ ফিট গভীর দুইপার্শ্বে দুইটা ছুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে
এই গড় নির্মিত হইয়াছিল। একটি শৃঙ্গে প্রাচীন গোড়
মূর্তির রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও অপরটানে নাগপুর
গবর্নমেন্টের সৈন্তাগার আছে। এখানে বহুসংখ্যক সরোবরে
প্রচুর জল পাওয়া যায়। ঐ দুর্গে উঠিবার তিনটা পথ
আছে।

চৌরাদার, মধ্যপ্রদেশে মণ্ডলা জেলার পূর্ববর্তী একটি মাল
ভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০০ ফিট উচ্চ। এখানে শীতকালে
দারুণ শীত হয়, গ্রীষ্মকালেও বায়ু শীতল থাকে; জলও ভাল।
ছুরারোহ না হইলে এখানে জলের একটি বাহ্যনিবাস হইত।

চৌরানকই (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ২৪, চলিত কথায়
চুরানকই বলে।

চৌর্যশি: (চতুর্নকীতি শব্দ.) ১ সংখ্যাবিশেষ, ৮৪। ২ বধ্য-
বাদ্যকারী কুস্তকারদিগের প্রেরণবিশেষ।

৩ চুরাশিটি গ্রাম লইয়া একটা বিভাগ। পূর্বে রাজস্ব
আদায়ের সুবিধার জন্য ঐরূপ বিভাগ প্রচলিত ছিল। তাহা
এখানকার পরগণা প্রভৃতির স্তায়। রাজপুতানার উত্তরপশ্চিম
প্রদেশে এইরূপ বহুসংখ্যক চৌর্যশি দৃষ্ট হয়।

চৌর্যশি, ১ মানভূমের অন্তর্গত একটা পরগণা। পরিমাণকল
১৬৩৭৫ বর্গমাইল। ইহা পঞ্চকোট রাজ্যভূক্ত।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সুরাট জেলার একটা উপবিভাগ।
পরিমাণকল ১১০ বর্গমাইল। ভূমি উর্বরা ও জলময়।
উত্তরদিকে তাপ্তী নদী ভিন্ন অন্য বৃহৎ নদী নাই। জেলার
প্রধান নগর সুরাট এই উপবিভাগে অবস্থিত।

চৌরিকা (জী) চোরস্ত কার্য্য ভাবো বা চোর-বুঞ (বন্দ
মনোজ্ঞাদিত্য)। পা ৫।১।১৩৩) ১ চোরের ধর্ম, তত্ত্ববৃত্ত।
২ চৌর্য, চুরি।

“চৌরিকানুভমার্য্যভিধর্ম্মচাটৈপতি পাদশঃ।” (মহু ১।৮২)

চৌরিকাক (পুং) একরকম কাক। মহাভারতের মতে
লবণ-চোর পরজন্মে চৌরিকাকবানি প্রাপ্ত হয়।

“লবণ-চৌরিকা তু চৌরিকাকঃ প্রজারতে।” (ভারত ১৩।১১১ অঃ)

চৌরী (জী) চোর-ডী। ১ চুরি, চৌর্য। (শব্দরং)

২ গায়ত্রীর নামান্তর। “চন্দ্রিকাচন্দ্রধাত্রী চ চৌরী চৌরচ চণ্ডিকা।”
(দেবীতা ১২।৬।৪২)

চৌরীভূত (জি) অচৌরশৌরোভূতঃ চোর-চি-ভূ-ক। যে
সংপ্রতি চোর হইরাছে।

“চৌরীভূতেহং লোকেহং বজ্রার্থেহংসমোষধীঃ।”

(ভাগ ৪।১৮।৭)

চৌর্ণস্তর (পুং) খড়্গীয়ারা নির্মিত স্তর।

চৌর্য (জী) চোরস্ত কর্ম, ভাবো বা। চোর-বুঞ (পুং-
বচনাদ্ব্যকরণাদিত্যঃ কর্মণি চ। পা ৫।১।১২৪।) চোরের
ধর্ম, চুরি। পর্যায়—তৈস্ত, ত্তের, চৌরিকা, চৌরী, চৌরিকা।

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে যে জব্যো নিজের স্বত্ব নাই,
তাহার অপহরণ বা গ্রহণের নাম চৌর্য। কিন্তু সাধারণ
ধনাদি অর্থাৎ বাহাতে নিজের ও পরের স্বত্ব আছে, তাহা
গ্রহণ করিলে চুরি করা হয় না। মহুর মতে স্বামী বা রক্ষকের
অস্বাক্ষাতে বন্ধনা করিয়া পরধন অপহরণ করাকে চুরি বলে।
স্বামী বা রক্ষকদিগের সমক্ষেও অপহরণ করিয়া তবে
গোপন করিলে তাহাকেও চুরি বলা যায়।

প্রাচীনকালে এই নিয়মে চুরির বিচার হইত। ধন অপহৃত
হইলে ধনস্বামী রাজপুরুষদিগের নিকটে ধর্মের অবস্থা ও

চুরির বিবরণ বিশেষরূপে জানাইত। বিচারকগণ ধনস্বামীর
নিকট হইতে ঐ সকল কথাগুলি শ্রবণরূপে শুনিয়া লইয়া
গ্রাহক বা অতুলস্বানকারী রাজপুরুষ দ্বারা চোরের অতুলস্বান
করিতেন। অতুলস্বানকারী রাজপুরুষগণ বাহাদুর নিকট
অপহৃত জব্য বা চৌর্য্যমাল পাওয়া যায়, গৃহস্বামী যে সকল পদ-
চিহ্নকে চোরের পদচিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহার লহিত
বাহাদুরের পারের মিল হয়, পূর্বে বাহারা চৌর্য্যাপরাধে দণ্ড
পাইরাছে, (দাগী) এবং বাহাদের বাসস্থান অজ্ঞাত, প্রথমে তাহা-
দিগকেই চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিত। এতদ্বিন্ন বৃত্তিমতে,
দ্যুতাসক্ত, বেতাসক্ত, মদ্যপারী এবং রাজপুরুষগণের প্রম
বাক্যে বাহাদের মুখ শুক ও বরভীতিশূচক হইয়া উঠে,
বাহারা অকারণে পর গৃহজব্যের খবর করে, বাহাদের আর অন্য
কিছু ব্যয় বেশী, অথবা বাহারা অপহৃত জব্য বিক্রয় করে,
তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরা যাইতে পারে (১)। এই
রূপ চোর গ্রেপ্তার করিয়াই তাহাদিগকে দণ্ড করা যাইতে
পারে না। বধ্যসাধ্য প্রমাণাদি লইয়া বিচারে চোর বলিয়া
সাব্যস্ত হইলে তবে উপযুক্ত দণ্ড করিতে হয় (২)।

চৌর্য্যাপরাধের দণ্ডবিধি জানিতে হইলে চৌর্য ও চোরের
ভেদ জানিতে হয়। আর্য্যপ্রাড্বিকাগণের মতে চুরি তিন
প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম জব্য চুরির নাম উত্তম,
মধ্যম জব্যের চুরির নাম মধ্যম এবং ক্ষুদ্র জব্যের চুরিকে
অধম চৌর্য বলে। চৌর্যের নানাধিক্যে দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি
করিতে হয়।

মৃদভাণ্ড, আসন, খট্টা, অস্থি, কাঠ, চর্ম, তুণ, শমী ধাতু
ও পক্কর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জব্য, কোষের বস্ত্র ভিন্ন অপর বস্ত্র,
গো ভিন্ন পশু, সুবর্ণ ভিন্ন ধাতুজব্য ও ধাতু, যব প্রভৃতি
মধ্যম এবং সুবর্ণ, রত্ন, কোষের বস্ত্র, জী, পুরুষ, গোব্রু, হাতী,
বোড়া এবং বাহাতে দেবতা, ব্রাহ্মণ বা রাজার স্বত্ব আছে,
এই সকলকে উত্তম জব্য বলে (৩)।

(১) “গ্রাহকৈক্যহতে চৌরো দোপ্তেণাথ পথেন বা।

পূর্বকর্ণাপরাধীচ তথ্যহুত্তব্যাসকঃ।

অভেহপি নকরা গ্রাহ্যো জাতিনাথাদিনিকটৈঃ।

হুতব্রীপানসত্যাক শুভভিন্নস্বধর্যঃ।

পরজব্যগৃহাণাক পুঙ্ককা গৃচচারিণঃ।

মিহায়া। যারবস্ত্রক বিনষ্টজব্যমিহায়াঃ।” (বীরশিবোদয়ভূত বৃত্তি)

(২) “অসত্যঃ সত্যাসত্যঃ সত্যাকাসত্যাসিহাঃ।

দুভূতে বিবিধা ভাবান্তরাহুতঃ পরীক্ষণঃ।” (সারব)

(৩) “মৃদভাণ্ডাসমখট্টাস্থিধাতুচর্ম্মপাদিষৎ।

শমীধাতুঃ কৃত্যাক ক্ষুদ্র জব্যমুদ্যাতব্য।

যাসঃ কোষেরবর্জক গোবর্জক পশুবৃত্তবা।

হিরণ্যবর্জক লোহক মধ্যঃ ব্রীহিব্যাদি চ।

হিরণ্যবৃত্তকোষের ব্রীণুগোবর্জকাদিঃ।

যেব্রাহ্মণরাজাক বিজেরং ত্র্যধুদ্যতমঃ।” (সারব)

কার্যভেদে চোরদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রকাশ ও অপ্রকাশ। নৈগম, বৈম্ব, কিতব, উৎকোচগ্রাহী বা বঞ্চক, সভ্য, দৈবোৎপাদবিদ, ভদ্র, শিরস্ত, প্রতিরূপ, অক্রিয়াকারী, মধ্যাহ্ন ও কুটসাকী ইহাদিগকে প্রকাশ এবং উৎকোচক, সন্ধিতেনক, পাছাপহারী, গ্রহিতেনক, জীহর্তা, পুরুষাপহারক, গোচোর, পণ্ডহর্তা ও বন্দীগ্রহ ইহাদিগকে অপ্রকাশ চোর বলে (৪)।

দণ্ডবিধি—নারদের মতে নৈগম প্রভৃতি চোরগণের দোষানুসারে দণ্ড করিবে, কিন্তু ধনের ন্যূনাধিক্য দণ্ডের হ্রাস বৃদ্ধি করিবে না। বৃহস্পতির মতে বাণিজ্যব্যবসারী বিক্রয় দ্রব্যের দোষ গোপন করিয়া অপর ভাল জিনিষের সহিত মিশাইয়া বা কোন রকম সংস্কার করিয়া বিক্রয় করিলে তাহাকে নৈগম তরুর বলে। ইহার দণ্ড ক্রেতাকে দ্বিগুণ পণ্যদান ও তৎসমান রাজদণ্ড। ঔষধ, মদ্র বা রোগনির্গর করিতে না জানিয়া যে বৈম্ব রোগীকে অথবা ঔষধ দিয়া অর্থ গ্রহণ করে, তাহাকে বৈম্বতরুর বলে। ইহার দণ্ড সাধারণ চোরের সমান। কুটসাকীকারী বা জুয়া-খেলয়ার, রাজ প্রাপ্য ধনের অপহারক ও বঞ্চনাকারী ইহাদিগকে কিতবচোর বলে। সভ্য হইয়া অন্ত্রাঘ্য কথা বলিলে তাহাকে সভ্যতরুর, উৎকোচগ্রাহীকে (সুবধোর) উৎকোচক এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির বঞ্চনাকারীকে বঞ্চক বলে। ইহাদের দণ্ড চিরনির্বাসন। যাহাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিভ্রা বা উৎপাত স্থির করিবার শক্তি নাই, অথচ ছল করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগের নাম দৈবোৎপাদবিচোর। দণ্ড সাধারণ চোরের সমান। বিচারক বিশেষ সতর্ক হইয়া ইহাদের দণ্ডাজ্ঞা করিবেন। যাহারা দণ্ডচর্য প্রভৃতি সন্ন্যাসীর বেশধারণ করিয়া গোপনে গোপনে মনুষ্যের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদিগকে ভদ্রচোর বলে, দণ্ড প্রাণাত্য। যাহারা অন্ন মূল্য জিনিষ সংস্কার বা গিল্পী করিয়া জী বা শিশুদিগকে ঠকাইয়া বহু অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে শিল্পীতরুর বলে। অর্থানুসারে ইহাদের দণ্ড করিতে হয়। যাহারা কৃত্রিম স্রবণ রত্ন বা প্রবালাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে প্রতিরূপক বলে। ইহাদের দণ্ড ক্রেতাকে গৃহীত মূল্য প্রত্যর্পণ ও মূল্যের

দ্বিগুণ রাজদণ্ড। যে মধ্যাহ্ন হইয়া বেহ বা দোভবশত একজনকে বঞ্চনা করে, তাহাকে মধ্যাহ্ন তরুর বলে। ইহার দণ্ড দ্বিগুণ। সাকী মধ্যাহ্ন গোপন করিয়া অথবা বলিলে, তাহাকে সাকীতরুর বলা যায়। তাহার দণ্ড সাধারণ চোরের দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ। (বৃহস্পতি)।

বিজ্ঞপ্তিতে দ্রুতবেলার কুটসাকীকারীর করছেদ করিবার বিধান আছে। মনু কুটসাকীকারীকে ক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে বিধান দিয়াছেন।

অপ্রকাশ চোরের দণ্ড—যাহারা ধনস্বামীর অনবধানতা লক্ষ্য করিয়া ধনির সাক্ষাতেই ধন সরাইয়া অপহরণ করে, তাহাদিগের নাম উৎকোচক। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইহাদের দণ্ড প্রথম অপরাধে করছেদ, দ্বিতীয়বারে একহস্ত ও একপদ ছেদন করিবে। যাহারা গৃহের সন্ধিস্থানে থাকিয়া ভিত্তি কাটিয়া গৃহে প্রবেশপূর্বক চুরি করে, তাহাদিগের নাম সন্ধিতেনক বা সিন্ধেলচোর। দণ্ড—হস্তদ্বয় ছেদন ও শূলারোপণ। বৃহস্পতি সন্ধিতেনক চোরের হাত কাটার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল শূল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা ভীষণ কাত্তার প্রভৃতি স্থানে পথিকদিগের ধন লুটপাট করে, তাহাদের নাম পাছমুট। দণ্ড—গলে বৃক্ষ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা। যাহারা পরিধের বস্ত্রাদিতে গ্রথিত ধনগ্রহি কাটিয়া অপহরণ করে, তাহাদের নাম গ্রহিতেনক, চলিত কথায় গাঁটকাটা বলে। দণ্ড—বৃহস্পতির মতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ছেদন। মনুর মতে প্রথমবারে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী ছেদন, দ্বিতীয়বারে হস্তপদ ছেদন ও তৃতীয়বারে প্রাণদণ্ড করা কর্তব্য।

জীহর্তা চোরকে লোহময় স্থানে (৭) কটামি দ্বারা দন্ড করা বিধেয়। পুরুষহর্তা চোরের হাত পা কাটিয়া চোরান্তার রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য। বৃহস্পতির মতে, গোচোরের নাসিকা ছেদনপূর্বক হাত পা বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দেওয়া উচিত।

নারদের মতে, কণ্ঠাপহারকের প্রাণদণ্ড করা উচিত এবং নারী বা হস্তী, ঘোটক প্রভৃতির অপহারকের যথাসর্বস্ব দণ্ড করা বিধেয়। পণ্ডচোরের দণ্ড তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধ পদছেদন। নারদের মতে, মহাপণ্ড চুরি করিলে উত্তম সাহস, মধ্যম পণ্ড চুরিতে মধ্য সাহস এবং ক্ষুদ্র পণ্ড চুরি করিলে ক্ষুদ্র সাহস দণ্ড করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বন্দীগ্রহ প্রভৃতিকে শূল দিব। স্মৃতির মতে, বিচারক চোরের নিকট হইতে আদার করিয়া অপহৃত দ্রব্য বা তাহার মূল্য ধনস্বামীকে অর্পণ করিয়া যথাবিধি চোরের দণ্ড করিবে।

ইহা ছাড়া অপহৃত দ্রব্যানুসারে চোরের তির তির দণ্ড করিবার বিধান আছে।

(৪) "নৈগম্য বৈম্বকিতবাঃ সত্যোৎকোচকবঞ্চকাঃ।

বৈবোৎপাদবিদো ভদ্রাঃ শিরস্তাঃ প্রতিরূপকাঃ।

অক্রিয়াকারিণৈব মধ্যাহ্নাঃ কুটসাকিণাঃ।

প্রকাশতরুরা হেতে তথা বৃহতজীহবিনাঃ।

উৎকোচকঃ সন্ধিতেনা পাছপহারীঃ প্রতিরূপকঃ।

জীপুঃশোলপণ্ডহরী চৌরো মবিধিঃ স্মৃতঃ।"

যম্বর যতে দশকুন্ডের অধিক ধাতু অপহরণে প্রাণান্ত, দশকুন্ডের অনধিক ধাতু চুরি করিলে অপহৃত দ্রব্য মূল্যের ১১শ গুণ, মুখ্যরত্ন অপহরণে প্রাণান্ত, পঞ্চাশের অধিক স্বর্ণ, রত্নত প্রভৃতি ধাতু বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র চুরি করিলে হস্ত-ক্ষেদন, পঞ্চাশের অনধিক হইলে হস্ত দ্রব্যের ১১শ গুণ, কাঠ, ভাণ্ড, তৃণাদি, মুগ্ধরপাত্র, বেণু ও বৈণবভাণ্ড, নায়ু, অস্থি, চর্ম, শাক, আর্দ্রমূল, ফলমূল, ছদ্ম, শুড় প্রভৃতি, লবণ, তৈল, পক্ষ্ম, মৎস্য, ঔষধ প্রভৃতি অল্প মূল্য জিনিস হরণ করিলে হস্তদ্রব্যের পঞ্চগুণ দণ্ড করা উচিত। কার্পাস, কিধ (সুরার উৎপাদক দ্রব্যবিশেষ), গোময়, শুড়, দধি, ক্ষীর, বোল, পানীয়, তৃণ, বেণু, বেণুনির্মিত ভাণ্ড, লবণ, মুগ্ধর প্রভৃতি পাত্র, ভস্ম, ছাগ, পক্ষী, লবণ, ঘৃত, মাংস, মধু, মত্ত, ভাত, পক্ষ্ম প্রভৃতি অপহরণে হস্তদ্রব্যের দ্বিগুণ দণ্ড করিতে হয়।

যে চুরিতে যে রকম দণ্ড বিধান উক্ত হইয়াছে, শূদ্র চোর হইলে তাহার অষ্ট গুণ, বৈশ্য হইলে ১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়পক্ষে ৩২ গুণ এবং ব্রাহ্মণ চোর হইলে ৬৪ বা ১২৮ গুণ দণ্ড করিবে।

লঘুবৃত্তি পথিক ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার জন্য ক্ষেত্র হইতে দ্রুগাছা আক ও দুইটা মূলা লইতে পারে, ইহাতে কোন দণ্ড হইতে পারে না, এইরূপ ক্ষুধাতুর পথিক চণক, ব্রীহি, গোধূম, যব ও মুগের একমুষ্টি মাত্র অপহরণ করিলে কোন দণ্ড হয় না। কর্মশূন্য কোন ব্যক্তির আহার না জুটিলে তিনি একদিনের উপযুক্ত চুরি করিতে পারেন, ইহাতেও রাজদণ্ড নাই।

ধর্মশাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি চোরকে অন্ন, নিবাস, স্থান, আশ্রয়, জল, মন্ত্রণা, চৌর্য্যসাধন কোন দ্রব্য কিংবা চুরি করিবার ভ্রাতৃ দূরদেশাদি বাইবার পাথেয় দিয়া সহায়তা করে, তাহার পক্ষেও উত্তম সাহস দণ্ড হওয়া উচিত। (বীরমিত্রোদয়)

[চুরির প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত শব্দে এবং কোন দ্রব্য চুরি করিলে কি ফল হয়, তাহা কর্মবিপাক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চৌর্য্যগণনা (দ্বী) জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে অপহৃত দ্রব্যের অবস্থা, চোরের নাম প্রভৃতি এবং অপহৃত জিনিস কোথায় আছে, পাওয়া যাইবে কিনা ইত্যাদি বিষয় যে প্রক্রিয়ায় নিরূপিত হয়, তাহার নাম চৌর্য্যগণনা। এদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই গণনা করিবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম লিখিত আছে। তন্মধ্যে লাম্বিক, পঞ্চপক্ষী ও প্রম্মদক্ষরানুসারী এই তিনটা প্রক্রিয়াই প্রমত্ত। প্রম্মদীপিকা, চণ্ডেশ্বর, হোরাবট-পঞ্চাশিকা ও প্রম্মকৌমুদী প্রভৃতির মত লইয়া এইরূপ চৌর্য্যগণনা করিতে হয়। গণনা আরম্ভের পূর্বে জ্যোতি-

বিন্দু মনস্থির করিয়া একটা খড়ি লইয়া নির্জনস্থানে উপবেশন করিবেন। প্রম্মদীপিকা পবিত্রভাবে ফল ও চূর্ণা লইয়া গণকের নিকটে প্রম্ম করিবেন। জ্যোতিঃবিদ প্রম্মলম্ব স্থির করিয়া গণনা করিবেন। এই গণনার প্রম্মলম্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, লম্ব স্থির করিতে একটু এদিক ওদিক হইলে গণনার ফলাফল ঠিক হয় না। ইহার নাম লাম্বিক চৌর্য্যগণনা।

প্রম্মদীপিকার মতে, প্রম্মলম্ব রবি, মঙ্গল, শনি প্রভৃতি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা অধিষ্ঠিত হইলে কিংবা ঐ লম্ব যদি পাপগ্রহের নবাংশ হয়, তাহা হইলে উদ্ভিষ্ট দ্রব্য চোর কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে (১)।

লাম্বিক গণনার প্রম্মলম্বানুসারে চোরের অবস্থা, প্রম্মলম্ব অপেক্ষা দ্বিতীয় লম্ব বা গৃহে অপহৃত বস্তুর অবস্থা এবং চতুর্থ গৃহ অনুসারে অহৃত বস্তু কোথায় আছে, তাহার নিরূপণ করা যাইতে পারে। এতদ্বিন্ন সপ্তম গৃহের অধিপতি চৌর্য্যের অধিনায়ক হইবেন অর্থাৎ সপ্তম গৃহানুসারে কে চুরি করিয়াছে, তাহা নির্ণয় হইতে পারে এবং লম্বাধিপতি অনুসারে ধনস্বামীও সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা ধন কাহার নিকট আছে, তাহা জানা যাইতে পারে।

হোরাবটপঞ্চাশিকার মতে নবাংশদ্বারা অপহৃত দ্রব্য, দ্রেকাগ দ্বারা চোর, রাশি দ্বারা দিক, দেশ ও কাল এবং লম্বাধিপতি দ্বারা চোরের জাতি ও বয়ঃক্রম জানা যাইতে পারে।

নবাংশদ্বারা দ্রব্যনিরূপণ—মেঘের প্রথমভাগে প্রম্ম হইলে তামা, রাণ্ড, অথবা চতুর্দোশ বা ত্রিকোণ দক্ষমুক্তিকা নির্মিত পাত্র এবং মেঘের দ্বিতীয়াংশে প্রম্ম হইলে মূল, জলজদ্রব্য, স্নিগ্ধ, ক্ষার অথবা অম্লরসযুক্ত কোন পত্রাদি অপহৃত হইয়াছে। এইরূপ অপরাপর অংশেও স্থির করিতে হয়। [ইহার অপর বিবরণ প্রম্মগণনা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্রেকাগদ্বারা চোর-নির্ণয়—মেঘের প্রথম দ্রেকাগে প্রম্ম হইলে চোর পুরুষ এবং ঐ চোরের পরিধান বস্ত্র গুরুবর্ণ স্থির করিবে ইত্যাদি।

রাশি অনুসারে দিক, দেশ ও কালনির্ণয়—মেঘ, সিংহ বা ধনু প্রম্মলম্ব হইলে অপহৃত বস্তু পূর্বদিকে, বৃষ, কন্যা ও মকর লম্ব হইলে দক্ষিণদিকে, মিথুন, তুলা বা কুম্ভলগ্নে প্রম্ম হইলে পশ্চিমদিকে এবং কর্কট, বৃশ্চিক বা মীনলগ্নে প্রম্ম হইলে হস্ত বস্তু উত্তরদিকে আছে জানিতে হইবে। দেশ গণনার নিয়ম সাধারণ প্রম্মগণনার সমান। মেঘ, বৃষ প্রভৃতি

(১) “পাগলিকিতে পাপযুক্ত পাপাংশগতেহগিবা।

তন্মধ্যে লম্বঃ দ্রব্যঃ বস্তুব্যক্ত বিচক্ষণঃ।” (প্রম্মদীপিকা)

ছয় লগ্নে প্রসন্ন হইলে রাশি এবং সিংহ, কস্তুর প্রভৃতি ছয়টি লগ্নে প্রসন্ন হইলে চুরির সময় দিবস স্থির করিতে হয়। সাধারণ প্রসন্নগণনার নিয়মে চোরের আকৃতি স্থির করিবে। প্রসন্নকৌমুদীর মতে প্রসন্ন লগ্ন স্থির রাশি হইলে কোন বন্ধুলোক, চর হইলে অপর এবং দ্ব্যাত্মক হইলে পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তি চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে।

হোরাষ্টপঞ্চাশিকার মতে বুধ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ লগ্নে কিংবা এই সকল রাশির নবাংশে অথবা প্রসন্নলগ্নের নবাংশে প্রসন্ন হইলে দ্রব্য কোন আত্মীয় কর্তৃক হৃত হইয়াছে এবং সেই বস্তু সেই স্থানেই আছে। ইহার বিপরীত হইলে দ্রব্য অপর কর্তৃক হৃত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্গোত্তম ভিন্ন দ্ব্যাত্মক লগ্নে প্রসন্ন হইলে পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বস্তু অপহরণ করিয়াছে এবং তাহার নিকটেই আছে।

প্রসন্নকৌমুদীর মতে লম্বাধিপতির দৃষ্টি লগ্নে থাকিলে আপনাদিগের কোন ব্যক্তি চোর হইবে এবং লম্বাধিপতির স্বীয় মিত্র গ্রহের গৃহে দৃষ্টি করিলে আপনাদিগের মিত্র চোর ও প্রসন্নকালে লগ্নের ষড়্‌বর্গাধিপতি যে কোন গ্রহ লম্বাধিপতির শত্রু হইবে, সে যদি ঐ লগ্নকে দর্শন করে, তবে অপর ব্যক্তি চোর এইরূপ নির্দেশ করিতে হইবে। যদি প্রসন্নলগ্ন রবি ও চন্দ্র এই উভয় গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে চোর গৃহবাসী এবং একের দৃষ্টি থাকিলে প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি চোর হইবে। যদি ঐ উভয় গ্রহ লম্বা বা লম্বাধিপতির প্রতি দৃষ্টি করে, তাহা হইলে গৃহবাসী চোর। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য স্বীয় গৃহে থাকিয়া লম্বা দর্শন করিলে গণক পরিজনের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে চোর বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন। প্রসন্নকালে চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিত হইয়া কোন দ্ব্যাত্মক রাশিতে অবস্থিতি করিলে নির্ণয় করিতে হইবে যে, চোর গৃহবাসী ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত-সারে আসিয়া চুরি করিয়াছে। প্রসন্নকালে সপ্তম গৃহের অধিপতি দ্বিতীয় বা দশম স্থানে অবস্থিত করিলে কিঙ্কর বা কিঙ্করী চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে। সপ্তম গৃহের অধিপতি পুরুষ হইলে কিঙ্কর ও স্ত্রী হইলে কিঙ্করীকে চোর স্থির করিতে হয়। সপ্তম গৃহের অধিপতি পাপরাশির সহিত মিলিত হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করিলে বিখ্যাত আত্মীয় ব্যক্তি এবং সপ্তম গৃহের অধিপতি শুভগ্রহের সহিত কেন্দ্রে অবস্থান করিলে অনাত্মীয় কোন ব্যক্তিকে চোর স্থির করিতে হয়। যদি সপ্তমগৃহের অধিপতি অষ্টমগৃহে অবস্থিতি করেন, তবে চোর বিনষ্ট বা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে। চন্দ্র সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে মাতা, সূর্য্য সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে পিতা, শুক্র সপ্তমগৃহের অধি-

পতি হইলে পত্নী, শনি সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে ভ্রাতা, বৃহস্পতি সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে গৃহবাসী এবং মঙ্গল হইলে ভ্রাতা, পুত্র, মিত্র বা আত্মীয় স্বজন চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে। প্রথম দ্রেকাণে প্রসন্ন হইলে অপহৃত বস্তু গৃহের দ্বারদেশে, দ্বিতীয় দ্রেকাণে প্রসন্ন হইলে নষ্ট বস্তু গৃহের মধ্যে এবং তৃতীয় দ্রেকাণে প্রসন্ন হইলে নষ্টবস্তু গৃহের বাহিরে আছে নিশ্চয় করিবে। সিংহ লগ্নে প্রসন্ন হইলে হৃত দ্রব্য ভূমধ্যে প্রোথিত, ধনু বা তুলায় প্রসন্ন হইলে জল মধ্যে নিমজ্জিত, কস্তুরাশিতে প্রসন্ন হইলে অশ্বশালায়, মেঘ হইলে গৃহে, মকর হইলে অগ্নির নিকটে বা দৃঢ় ভূমিতে, কুম্ভ হইলে মহিষীস্থান, গোস্থান বা অজ্ঞস্থানে, মিথুন হইলে ক্ষেত্রের ধানের নিকটে এবং কর্কট, মীন বা মেঘ প্রসন্ন লগ্ন হইলে হৃত বস্তু গৃহে অথবা ভূমিগত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিবে। (ইহার অপর বিবরণ জানিতে হইলে হোরাষ্টপঞ্চাশিকা, প্রসন্নকৌমুদী ও প্রসন্নদীপিকা প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থ জটব্য।)

চৌর্য্যবৃত্তি (স্ত্রী) চৌর্য্যরূপা বৃত্তিঃ। চোরের কাজ, চুরি।

চৌল (স্ত্রী) চূড়া প্রয়োজনমন্ত চূড়া চূড়া-অণু ভক্ত লঃ।

[চোড় দেখ।]

চৌলি (পুং) চৌলতাপত্যং চৌল-ইঞ্। প্রবর ঋষিবেশবঃ।

চৌলুক (ত্রি) চৌলুক্যন্ত ছাত্রঃ চৌলুক্য কথাদিঃ অণু যলোপঃ।

চৌলুক্যের ছাত্র।

চৌলুক্য (পুং স্ত্রী) চুলুকন্ত গোত্রাপত্যং চুলুক গর্গাদি*।

১ চুলুক নামক ঋষির গোত্রাপত্য। ২ গুজরাটের অনহিল-পত্তনের এক পরাক্রান্ত রাজবংশ। এখন ঐ বংশীয় লোকেরাই শোলাকি নামে অভিহিত। চাহমান, প্রমার প্রভৃতি অম্বিকুলোৎপন্ন চারি শ্রেণীর মধ্যে চৌলুক্য একটী। রাজপুতানার ভট্ট কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, কনোজে রাঠোর রাজগণের অভ্যাদয়ের পূর্বে শোলাকিগণ গঙ্গাপ্রবাহিত সুর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। তৎপরে ইহারাই গুজরাটে অতিশয় প্রবল হন।

হেমচন্দ্র ও লেশাজায় তিলকগনি-বিরচিত দ্ব্যশ্রয়, ধর্ম-সাগর প্রণীত প্রবচনপরীক্ষা, বিচারশ্রেণী, রাসমালা, সোমেশ্বর-কৃত কীর্তিকৌমুদী ও স্বরথোৎসব, কুমারপালচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনহিলপুত্রের বিখ্যাত চৌলুক্যরাজগণের বিবরণ বর্ণিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বড় একটা মিল নাই, যতটুকু সামঞ্জস্য আছে, তাহারই সারাংশ প্রদত্ত হইল।

অনহলবাড়-পাটনের চৌলুক্যরাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মূলরাজের নাম পাওয়া যায়। মূলরাজ কল্যাণাধিপতি ভুবনা-দিভ্যের পৌত্র ও চাপোৎকটরাজ সামন্তসিংহের ভগিনী

বীলদেবীর পুত্র। ঐ সামন্তসিংহের মৃত্যুর পর মূলরাজ উত্তরাধিকার-স্বত্রে ৯৯৮ বিক্রমাব্দে (৯৪২ খৃঃ অব্দ) মাতুলের সিংহাসন লাভ করেন (১)। তিনি গ্রাহরিপু প্রভৃতি রাজ-গণকে পরাজয় করিয়া ৫৫ বর্ষ অতুল প্রভাশে রাজ্যাভোগ করিয়াছিলেন।

তৎপরে তাঁহার প্রিয় পুত্র চামুণ্ডরাজ ১৩৫৩ সন্থতে রাজ্যারোহণপূর্বক ১০৬৬ সন্থৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (২)। চামুণ্ডরাজের তিন পুত্র বলভরাজ, হর্ষভরাজ ও নাগরাজ।

চ্যাপ্রের নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, চামুণ্ডরাজ কোন সময়ে কামোদিত হইয়া ভগিনী কাচিনীদেবীর সহবাস করেন, সেই মহাপাপের প্রারম্ভিত জন্ত তিনি কুমার বলভদেবকে রাজ্যভার দিয়া কানীয়াসী হন। কানী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলভদেবকে বলেন, “যদি তুমি আমার পুত্র হও, তবে সত্বর গিয়া মালবরাজের দণ্ডবিধান কর।” বলভ সসৈন্তে মালব যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে শীতলা (বসন্ত) রোগে তাঁহার জীবনীলা শেষ হয়। (চ্যাপ্র ৭স*) কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতে, বলভ ৬ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন (৩)।

চামুণ্ডরাজ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া হর্ষভকে সিংহাসনে বসাইয়া (ভরুকজের নিকটবর্তী) গুরুতীর্থে গমন করেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

হর্ষভরাজ জৈনধর্মের স্মরিত নিকট জৈনধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। তাঁহার ভগিনীর সহিত মারবাড়রাজ মহেন্দ্রের বিবাহ হয়, এবং তিনিও স্বরম্বরাজ মহেন্দ্ররাজ-সহোদরকে পরীক্ষা লাভ করেন। স্বরম্বরাজ মারবাড়-রাজকন্তাকে লইয়া বাইবার সময় তাঁহার করপ্রার্থী মালব, হুণ, মাধুর, কানী, অন্ধ্র, প্রভৃতি রাজগণের সহিত হর্ষভরাজের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই মহাযুদ্ধে তিনিই জয়লাভ করেন।

হর্ষভরাজের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি নাগরাজের পুত্র ভীমকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রবন্ধচিন্তা-মণিতে লিখিত আছে, হর্ষভ ভীমদেবকে রাজ্য প্রদান করিয়া বারাগদী যাত্রা করেন, পথে মালবের মল্লরাজ তাঁহার

রাজচিহ্ন কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। শেষে কানীধামে গিয়া হর্ষভের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা ভীমদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্ত মল্লরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

হর্ষভ ১০৭৮ সন্থৎ পর্য্যন্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন (৪)। ভীমদেব একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তিনি সিদ্ধরাজ হম্বুক ও চেন্নিরাজকে পরাজয় করেন। তাঁহার ক্ষেমরাজ ও কর্ণ নামে দুই পুত্র জন্মে।

জ্যেষ্ঠ ক্ষেমরাজ পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্রের নাম দেবপ্রসাদ। দেবপ্রসাদের ত্রিভুবনপাল নামে এক পুত্র জন্মে।

কর্ণদেব পিতৃসিংহাসনে অতিবিক্ত হন। তিনি কদম্বরাজ জয়কেশির কন্তা ময়াগলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারগর্ভে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম। জয়সিংহ উজ্জয়িনীরাজ যশোবর্ষা ও বর্ষরকে পরাজয় করেন। অবন্তিরাজকে জয় করিয়া আসিয়া সিদ্ধপুরে সরস্বতীনদীতীরে রুদ্রমাল নামে বৃহৎ শিবালয় ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী মন্দির প্রভৃতি বহুতর কীর্তি স্থাপন করেন। ইনি ১১৯৯ (২) বিক্রম সন্থৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া কুমারপালকে রাজ্য দিয়া যান।

চ্যাপ্রের মতে, কুমারপাল উক্ত ত্রিভুবনপালের পুত্র *। ইনি ১১৯৯ বিক্রমাব্দে সিংহাসনে অতিবিক্ত হন, ইহার যত্নে জৈনধর্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

১২৩০ সন্থতে কুমারপালের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতৃপুত্র অজয়পাল সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে বালমূল ২ বর্ষ, ভীম ৬৩ বর্ষ, ত্রিভুবনপাল বা ত্রিভুবনপাল (২য়) ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহাদের সময় বিশেষ ঘটনা হয় নাই।

১৩০২ সন্থতে চৌলুক্যরাজ্য বাঘেলা-রাজগণের অধিকারী হয়। [বাঘেলা দেখ।]

কোন কোন পুস্তকে চৌলুক্যস্থানে চালুক্য পাঠ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে চৌলুক্য ও চালুক্য এই দুইটা স্বতন্ত্র বংশ। কিন্তু চালুক্যরাজগণ বহুদিন কলাশে রাজ্য করিয়াছিলেন, যদি তথা হইতেই মূলরাজ অনহিরপুত্র আসিয়া থাকেন, তাহা

(১) “বিক্রমাবর্তো বাবৎ বহনবা ভববর্ষো।

মূলরাজা ভদ্রাধিপ্য সামন্তো ভগিনীভূতঃ।

বর্ষা পকপকাশং রাজ্যং কৃৎস্না স্থখানি চ।”

(২) “ভদ্রোপরি সরমাধঃ চামুণ্ডিত মহাবলী।

বর্জরোদনশৈব রাজ্যং কৃৎস্না স্থখানি চ।

বিক্রমাবর্তো বাবৎ রসরাজদশমভূতঃ।”

(৩) “বনরাজো মহাবীর যুদ্ধে চ সিংহবিক্রমঃ।

রসমাসং চ রাজ্যানি কর্তব্যং হু নবোহরম্।”

(৪) “তদোপরি চ রাজ্যানি বর্ষ একাদশ তথা।

মাসং বড়ধিকং চৈব রাজ্যং কৃৎস্না স্থখানি চ।

বিক্রমাবর্তো বাবৎ বসুমুনিষমভূতঃ।”

* আবার কোন জৈন পুথিতে লিখিত আছে, কুমারপাল সিদ্ধরাজের ভগিনী রত্নসেনার পুত্র। (Dr. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mes, 1883-84. p. 11.) এইরূপ আরও মতভেদ আছে।

[কুমারপাল দেখ।]

হইলে চৌলুকাদিগকে চালুক্যবংশেরই + একটি শাখা বলিয়া বোধ হয়।

চৌবাচ্ছা, ১ প্রাচীন রীতাহুসারে দিল্লী প্রদেশে পাগ, টাঙ্গু কড়ি, পংছি, এই চারি বস্ত্র উপর কর। পাগ শব্দে পাগড়ী অর্থাৎ পুরুষ; টাঙ্গু শব্দে ক্ষুদ্রবস্ত্র অর্থাৎ বালক কড়ি বা চুলী, পংছি গোমহিষাদি জন্ত। এইরূপ ঘাস, ছোলা খুরপী, দরঙ্গী অর্থাৎ কাস্তিয়া প্রভৃতির উপরও কর ছিল।

২ ইষ্টকাদি নির্মিত চতুষ্কোণ জলাধার।

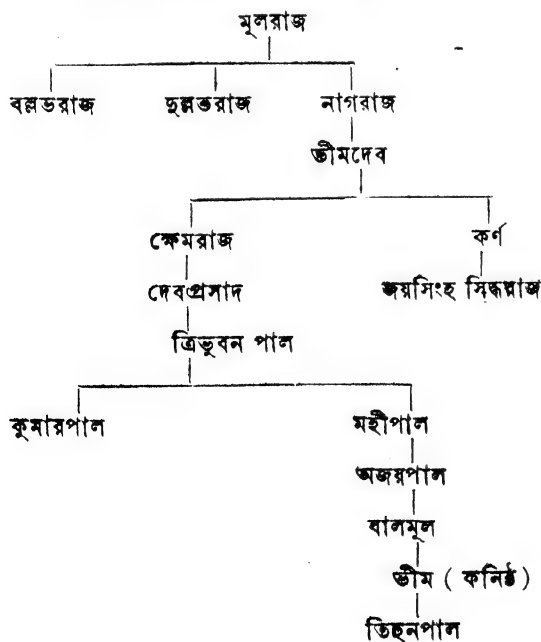
চৌবাড়ী, ১ আলাহাবাদ জেলার একটি গ্রাম। আলাহাবাদ হইতে কুংরা গিরিসঙ্কট দিয়া রেবা ঘাইবার পথে প্রথমোক্ত নগরের ৩৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২' উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ১৪' পূঃ।

২ চতুশাঠী টোল।

চৌবিক্ষুদ, পুরীর পশ্চিমস্থ একটি পরগণা।

চৌবে (চতুর্বেদী শব্দের অপভ্রংশ) কনৌজব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিশেষ। ইহারা চৌ অর্থাৎ চারি বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া চৌবে আখ্যা প্রাপ্ত হন। এইরূপ ছই বা তিন বেদ পাঠ হেতু দোবে, ত্রিবেদী প্রভৃতি আখ্যা হইয়াছে। এক্ষণে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের চৌবেগণ অনেকেই মজ্জগিরি করে। কতিং কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন করে। মথুরার চৌবেগণ তথাকার প্রায় সমুদায় দেবমন্দিরে পূজা করে। ইহারা দীর্ঘকায় ও সবল।

+ নিম্নে চৌলুকারাজবংশাবলী দেওয়া গেল—



চৌবাড়ী (চতুঃষষ্টি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৬৪।

চৌসা, বেহারের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটি থানা, ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের একটি স্টেশন। এই সহর কর্ণশাশীতীরে বসার হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানেই বিখ্যাত সেরশা ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মোগলসম্রাট হুমায়ুনকে পরাজয় করেন। হুমায়ুন কএকজন অশুচর লইয়া শকা সীতরাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া রক্ষা পান। কিন্তু প্রায় ৮০০ মোগলসৈন্য ঐ উত্তরে বিনষ্ট হয়।

চৌসা, শাহাবাদ জেলার একটি থাল এবং শোণ নদীর পয়ঃ-প্রণালী গুলির একটি শাখা। এই থাল দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

চৌহাতিয়া, গুজরাটের অন্তর্গত মুচাকাহানিবাদী মিয়ান বা মাল্লিরা জাতির সমাজপতি। এই মিয়ানগণ অধিকাংশই মুচুনদীর তীরে বাস করে। ইহাদের অনেকেই মৎস্যজীবী।

চৌহান, রাজপুত জাতিবিশেষ। [চাহমান দেখ।]

চ্যবন (ত্রি) চ্যবতে পততি নশ্রতি চ্য-লু। ১ নখর, অচিরস্থায়ী। “যেনে মা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি।” (শ্লোক ২।১২।৪) ‘চ্যবনা নশ্রানি’ (সায়ণ।) ২ ক্ষরণকারী। “বিকৃতহ্মস্যচ্যবনঃ পুরুষ্টভূতঃ।” (শ্লোক ৮।৩৩।৬) ‘চ্যবনঃ সোমানাং চ্যাবয়িতা’ (সায়ণ।) (পুং) চ্যবতে মাতৃকদরাং চ্য-কর্তৃরি লু। ৩ ঋষি-বিশেষ, ইহার পিতা মহর্ষি ভৃগু ও মাতা পুলোমা। মহাভারতে লিখিত আছে যে, পুলোমার গর্ভসঞ্চার হইলে কোন দিন মহর্ষি ভৃগু অভিষেকার্থ গমন করেন। সেই সময়ে একটা রাক্ষস মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পুলোমার রূপ-লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। গর্ভস্থ পুত্র মাতাকে বিপদগ্রস্তা দেখিয়া গর্ভ হইতে বাহির হইল, তাহার ভ্রূজে রাক্ষস ভয়ীভূত হইয়া গেল। ইনি স্বয়ং মাতৃগর্ভ হইতে চ্যূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম চ্যবন হইল। (অমৃত ১।৬ অঃ)

ইনি কোন সময়ে অরণ্যমধ্যে একটা সরোবরের তীরে তপস্তা করিতেছিলেন, দিন দিন ইহার সমস্ত শরীর বক্সীকে ঢাকিয়া গেল, কেবল উজ্জল চক্ষু দুইটা বাহিরে ছিল। এক দিন রাজা শর্যাপতির কন্যা অুকস্তা চক্ষু দুইটা দেখিতে পাঠিয়া উজ্জল কোন অপূর্ণ পদার্থ জ্ঞানে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেন। তাহাতে মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইয়া যোগপ্রভাবে রাজা শর্যাপতির সৈন্য সামন্তগণের মলমূত্র বদ্ধ করিয়া দিলে রাজা অনেক অমুসন্ধানে জানিতে পারিয়া চ্যবনের নিকট ক্ষমা চাহিলে তিনি রাজকন্যা অুকস্তার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জানাইলেন। রাজা বিপদে পড়িয়া এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন, অুকস্তাও

বৃদ্ধ, জরাতুর মহর্ষি চ্যবনকে পতিষে বরণ করিতে আপত্তি করিলেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে পরমশ্রমের অধিনী-
কুমারদ্বয় চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পরমা স্ত্রীরূপ-
লাবণ্যবতী নরযোবনা রাজবালা সুকৃত্যাকে বৃদ্ধ জরাতুর
পতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিতে অহরোধ
করেন। চ্যবনপত্নী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহার ব্যব-
হারে অধিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া চ্যবন ঋষিকে স্ত্রীর যুবক
করিয়া দিলেন। ইহার প্রত্যাশাকারে মহর্ষি চ্যবন শর্যাপতির
যজ্ঞে ব্রতী হইয়া অধিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস দান করেন।
তাহাতে স্বর্গরাজ ইন্দ্র প্রথমে আপত্তি করেন, কিন্তু মহর্ষি
তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। ইন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া ইহার
উপর বজ্রনিষ্ক্ষেপ করিতে উদ্ভূত হইলে ইনি মন্ত্রবলে তাঁহার
বাহু স্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার জন্ত তপোবলে
একটা বিকটাকার অস্ত্র সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র ভয়ে চ্যবনের
শরণাগত হইলে মহর্ষি অধিনীকুমারদ্বয়কে সোমভাজন করিয়া
ইন্দ্রকে মুক্তি দান করিলেন এবং সেই অস্ত্রটাকে স্ত্রীজাতি,
মন্ত্রপান, অক্ষকীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন।
(ভারত ৩।১২১-২২-২৩ অঃ) (ক্লী) চ্য-ভাবে লুট্। ৪ ক্ষরণ।

চ্যবনপ্রাশ, বৈষ্ণবকোষ্ঠ ঔষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—বেলছাল,
গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, বেড়োলা
ছাল, শালপানি, চাকুলে, মৃগানি, মাষানি, পিগূল, গোক্ষুর,
বৃহতী, কণ্টকারী, কঁকড়াশুঙ্গী, জুই আমলা, ডাঙ্গা জীবন্তী,
কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী,
মুতা, পুনর্গবা, মেদ, ছোট এলাচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন,
ভূমিকুন্ডা, বাসকমূল, কাকোলী, কাকজজ্বা, ইহাদের
প্রত্যেকের ১ পল, শ্লথ পুটলী বদ্ধ আমলা ৫০০ টা (অথবা
১৭৬/০ ছটাক) এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ
করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে
এবং পুটলীবদ্ধ আমলাসকল খুলিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া
৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তিল তৈলে (একত্র) ভাজিয়া
শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিস্রি ৫০ পল, কাথ
জল ও উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নিরবীজ আমলাসকল একত্র পাক
করিবে। লেহন হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিগূল ২ পল,
গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা,
নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন
করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু
৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাগে রাখিয়া দিবে। ইহার
মাত্রা ২ তোলা, অম্লপান ছাগধূম। ইহা সেবন করিলে
ব্রতভঙ্গ, যক্ষ্মারোগ ও গুরুগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া

থাকে এবং মেধা, স্মৃতি, কান্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বল ও অগ্নি
বৃদ্ধি, বায়ুর অহুলোমতা, আত্মবুদ্ধি এবং জরাজীর্ণ স্ত্রীরও
যৌবনভাব উপস্থিত হয়। ইহা দুর্জল ও ক্রীণ ধাতুর পক্ষে
অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চ্যবান (পুং) চ্যবন-পুৰোদরাদি দীর্ঘ। চ্যবন ঋষি।

“প্রামুখ্যন্তঃ প্রাপিমিব চ্যবানাং।” (ঋক্ ১।১১৬।১০)

‘চ্যবানাং চ্যবনাখ্যাদৃষে:।’ (সারণ।)

চ্যাঃ (দেশজ) একরকম মাছ।

চ্যাট (দেশজ) [চোট দেখ।]

চ্যাবন (ত্রি) চ্য-গিচ্-লু। ১ চ্যাতিকারক।

“হুচ্যাব চ্যাবনোজ্ঞেতা হস্তাত্রাক্ষিষাং হয়ঃ।” (ভারত ৮।২৪অঃ)

(ক্লী) চ্য-ভাবে লুট্। ২ ক্ষরণ।

“যইদং চ্যবনং স্থানাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ শতক্রতোঃ।” (হরিবংশ ২৮অঃ)

(পুং) চ্যবন-পুৰোদরাদি দ্বাং সাধুঃ। ৩ চ্যবন ঋষি।

(ক্লী) ৪ সামবিশেষ।

চ্যাবয়িতৃ (ত্রি) চ্য-গিচ্-তৃচ্। চ্যাতিকারক।

চ্যৎ (ত্রি) চ্য-ক্ণিপ্ তৃগাগমচ্। চ্যাতিকারক।

চ্যুত (ত্রি) চ্য-ক্ত চ্যুত-ক ইতি বা। ১ ভ্রষ্ট। ২ পতিত।
৩ ক্ষরিত।

চ্যুতপথক (পুং) শাক্যমুনির নামান্তর।

চ্যুতসংস্কারতা (ক্লী) কাব্যদোষবিশেষ। সাহিত্যদর্পণের
মতে কাব্যে ব্যাকরণ বিরুদ্ধ পদবিজ্ঞাস করিলে তথায় চ্যুত-
সংস্কারতা দোষ ঘটিয়া থাকে। এই দোষটী কেবল পদগত
হয়। উদাহরণ—

“গাণ্ডীবী কনকশিলানিভং ভূজাত্যামজয়ে

বিষমবিলোচনস্ত বক্ষঃ।”

এই স্থলে আণ্ড পূর্বক হন ধাতুর আয়নেপদপ্রয়োগ
ব্যাকরণ বিরুদ্ধ, ব্যাকরণবিরুদ্ধপদ বিজ্ঞাস আছে বলিয়া
উক্ত পত্রার্কে চ্যুতসংস্কারতা দোষ ঘটিয়াছে। কাব্যদোষের
মধ্যে এই দোষটীই সর্বপ্রধান, ইহার সদ্ভাবে কবিত্বের
সম্পূর্ণ হানি হয়। (সাহিত্য ৭ পরিঃ)

চ্যুতসংস্কৃতি (ক্লী) কাব্যদোষবিশেষ। [চ্যুতসংস্কারতা দেখ।]

চ্যুতি (ক্লী) চ্য-ক্তিন্। ১ গতি। ২ পতন, ঋলন।

“সত্যচ্চ্যুতিঃ ক্ষত্রিয়স্তান ধর্মেষু প্রশস্ততে।” (ভাঃ ১।১০৩ অঃ)

৩ ক্ষরণ। ৪ অভাব।

“প্রলাপঃ স্রোতসাং পাকঃ কুলনং চেতনাচ্যুতিঃ।” (সুশ্রুত)

অপাদানে কি। ৫ গুদঘার। (শকার্ণচিৎ) ৬ ভগ। (হেমং)

চ্যপ (পুং) চ্যবন্তে ভাষন্তেহনেন চ্য-প-কিচ্ (চ্যবঃ কিচ্।
উণ্ ৩।১৪।) যুথ। ‘চ্যপো বক্তৃৎ’ (উজ্জলদত্ত)

চ্যুত (পুং) চ্যুত পুৰোদরাদিবাছকারত দীৰ্ঘত্ব। ১ আত্মবৃক্ষ।
(স্ত্রী) ২ আত্মকল, আম।

চ্যোত (স্ত্রী) চ্যুত পুৰোদরাদিবাৎ সাধুঃ। যুতাদি করণ।
[শ্চোত দেখ।] (অমরটীকা)

চ্যোত্ৰ (স্ত্রী) চ্যবতে-চ্য-করণে বহুণ্ (অনিদাচ্যাস্বমনিশমি-
নমিতঞত্য়া ইষন্ স্বন্ স্বন্ ক্লিন্শক্ঠটটচঃ। উণ্ ৪।১০৪।)

১ বল। (নিষট্ ২।৯) (ত্রি) চ্য-কর্তৃরি ব্রণ্। ২ দৃঢ়।

“চ্যোতানি দেব যতো ভরস্তু।” (ঋক্ ১।১৭৩)

‘চ্যোতানি চ্যাবয়িত্রীণি দৃঢ়ানি।’ (সারণ)

৩ গমনকর্তা। ৪ অণ্ডজ। ৫ ক্ষীণপুণ্য। (সিং কোঃ)

ছ

ছ, সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ বা চবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ
স্থান তালু (ইচ্চশানাং তালু। পা ১।১৮) উচ্চারণার্থ বাহু
প্রযত্ন, বিকৃত কণ্ঠে শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণতা। “তত্র বর্ণাণাং
প্রথমদ্বিতীয়া বিকৃতকণ্ঠাঃ শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ। একেহম-
প্রাণা ইতরে মহাপ্রাণাঃ” (মহাভাষ্য ১।১৯।) ইহা পঞ্চ
দেবময়, পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিধ ও ঈশ্বরসংযুক্ত এবং পীতবর্ণ,
বিদ্যুতের আকার পরমাশ্রুত্যা কুণ্ডলী। (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকাভ্যাসের সময়ে বাম কক্ষোনিতে ইহার জ্ঞাস করিতে হয়।

ইহার ধ্যান “ধ্যানমন্তাঃ প্রবক্ষ্যামি বিভুজাং তু ত্রিলোচনাং।

পীতাস্বরধরাং নিত্যং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।

এবং ধ্যান ছকারং তু তন্নম্রং দশধা অপেৎ ॥” (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

তন্ত্র মতে, ইহার বাচক শব্দ—ছন্দন, সুষমা, পশু, পশুপতি,
মৃতি, নির্মল, তরল, বহি, ভূতমাত্রা, বিলাসিনী, একনেত্রী,
দ্বিশিরাঃ, বামকুর্পর, গোকর্ণ, লাজলী, রাম, কামমত্ত, সদাশিব,
মাতা, নিশাচর, পায়ু, বিকৃত, স্থিতিশব্দক। বঙ্গাক্ষরে ইহার
লেখন প্রকার—একটা রেখা উর্দ্ধ হইতে নীচের দিকে টানিয়া
কৃষ্ণিতাকারে কুণ্ডলী করিয়া পুনর্বার নীচের দিকে টানিবে।
(বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)। কাব্যের আদিতে ছকার বিস্থাপন করিলে
মঙ্গল হয়। (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ছ (পুং) ১ ছ বর্ণ। ছো ভাবে ডঃ ষঞর্থো বা ক। ২ ছেন্দন।

(স্ত্রী) ৩ গৃহ। (ত্রি) ছো-কর্মণি ষঞর্থো-ক। ৪ নির্মল।

৫ তরল। (একাক্ষরকোষ) ছদ্-ভাবে ড (স্ত্রী) ৬ আচ্ছাদন।

ছই (ছদি শব্দজ) শব্দট নৌকাদির ছাদ বা আবরণ।

ছকুর (হিন্দী) অঘোধ্যা প্রদেশে জমিদারের প্রাপ্য উৎপন্ন
শক্তের বর্ধাংশ।

ছগ (পুং) ছং রোমভিঃছাদনং বজ্রানৌ ছেদনং বা গচ্ছতি ছ-
গম্-ড। ছাগল।

ছগণ (স্ত্রী, পুং) ছাগ বহুঃছাদনার গণ্যতে ছ-গণ-কর্মণ্যণ্।
করীষ, শুক গোমর, ঘুটে।

ছগল (স্ত্রী) ছাতি, ছিনতি, ছায়তে বা ছো-কল, গুগামঃ,
ব্রহ্মচ। (ছোগুগব্রহ্মচ। উণ্ ১।১১২) ১ নীলবর্ণ বজ্র।

(পুং) ২ ছাগল। ৩ বৃদ্ধদারক বৃক্ষ। ৪ ঋষিভেদ, অত্রি।
৫ ছাগল প্রধান দেশ।

ছগলক (পুং) ছগল-স্বার্থে কন্। ছাগল, ছাগ।

ছগলগু (পুং) দক্ষিণদেশে সমুদ্রের নিকট প্রচণ্ডদেবীর
পীঠস্থান। (দেবীতাৎ ৭।৩০।৭৩)

ছগলা (স্ত্রী) ১ বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিতারক গাছ। ২ ছাগী। ৩
মুনিপত্নীভেদ। তত্য়া অপত্যে অণ্ বাহাদিবাৎ অত ইত্বে
ছাগলিঃ। (বাহাদিভাষ্য। পা ৪।১।৯৬)

ছগলাডুত্ৰী (স্ত্রী) ছগলবদজ্জিমূলমন্তাঃ বহত্ৰী ততো ডীপ্।
বৃদ্ধদারক ঔষধ। (রমানাথ)

ছগলাণ্ডী (স্ত্রী) ছগলবদগুং অস্ত্রং যন্তাঃ বহত্ৰী ততো ডীপ্।
বৃদ্ধদারক বৃক্ষ।

ছগলাস্ত্রিকা (স্ত্রী) ছগলাস্ত্রী-স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্বস্বরহঃ।
১ ছগলাস্ত্রী, বৃদ্ধদারক, বিতারক গাছ। ২ নীলবুলা, নীল-
বোনা। ৩ বৃক, নেকড়ে বাঘ।

ছগলাস্ত্রী (স্ত্রী) ছগলবদজ্জঃ যন্তাঃ বহত্ৰী ততো হদন্তবাৎ ডীপ্।
১ বৃদ্ধদারক। ২ বৃক, নেকড়ে বাঘ। ৩ নীলবুলা, নীলবোনা।

ছগলিন্ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি কলাপীর শিষ্য। “হরিক্রঃছগলী-
তুষ্ণুরুলপশ্চদ্বারঃ কলাপ্যন্তেবাসিনঃ” (মনোঃ) কলাপিনো
হন্তেবাসী” এই অর্থে (কলাপিবৈশম্পায়নাস্তেবাসিভাষ্যঃ। পা
৪।৩।১০৪।) গিনিপ্রাপ্তি সঙ্ঘেও বিশেষ সূত্র বলে ছগলিন্
শব্দের উত্তর চিহ্নক্ হইবে। ছগলিনা প্রোক্তং অধীয়াতে
ছগলিন্-চিহ্নক্ (ছগলিনোচিহ্নক্। পা ৪।৩।১০৯) ছাগলয়ী।

ছগলী (স্ত্রী) ছগল জ্যতিভাৎ ডীপ্। ১ ছাগী। ২ বৃদ্ধদারকবৃক্ষ।

ছচ্ছিকা (স্ত্রী) সায়হীন তক্র, মাখনতোলা ঘোল। ইহা শীতল,
লঘুপাক, পিত্ত, বাত ও কফনাশক। ইহা থাইলে শ্রম ও তৃষ্ণা
দূর হয়, লবণ দিয়া থাইলে জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়। (ভাবপ্রকাশ)

ছটা (স্ত্রী) ছো-অটন্ কিচ্চ। ১ দীপ্তি। “প্রতাপাংগুচ্ছটাকুটেঃ”
(রাজতরং ৪।১২৮)। ২ সমূহ, পরম্পরা। “সটাকটাত্তিরঘনেন
বিভ্রতা।” (মাঘ ১।৪৭)

ছটাক (দেশজ) সেরের বোড়শাংশ, পাঁচতোলা।

ছটাকল (পুং) ছটাইব পরম্পর-সংস্থটানি কলানি যন্ত বহত্ৰী।
গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকাঃ)

হুটাতা (স্রী) হুটাতা লীলা তাতি ডাকি পু অথবা কঃ উত্তাপ।
বিহ্যৎ।

হুটকট (দেশজ) বেদনার অহির ইওরা, এশাশ ওশাশ করা।

হুটফাট (দেশজ) অহির, চঞ্চল।

হুড় (দেশজ) ১ দারান প্রভৃতির সমুদয় গুরু ধাম। ২ আঁচড়, দাগ।
হুড়রা, ১ মানকুম জেলার একটি পরগণা। ইহা পঞ্চকোট-
রাজের জমিদারীভুক্ত।

২ উক্ত পরগণার (পুলিয়ার নিকটস্থ) একটি গ্রাম। এখানে
হুইটী প্রাচীন দেউল আছে। প্রবাদ আছে যে, সাতটা দেউল
এবং একটি পুরুষিণী এখানকার সন্ন্যাস বা শ্রাবকগণ প্রতিষ্ঠা
করেন। তাহার পাঁচটা দেউল প্রক্টিয়া গিয়াছে, কেবল
প্রস্তরনির্মিত হুইটী দেউল বর্তমান, ইহাদের গাত্রে চূণকাম
বা বিশেষ কোন কারুকার্য নাই। এই দেউল হুইটীতে
এখন কোন প্রকার লিপি বা দেবমূর্তি নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ
বিক্টিপ্ত অনেক ভয়প্রস্তরে তীর্থঙ্করদিগের নমঃ-মূর্তির আভাস
পাওয়া যায়। দামোদরতীরে তেলকুপী নামক স্থানেও এইরূপ
৮৯টা জৈনমন্দির আছে। উহাদের একটিতে বিরূপ নামে এক
মূর্তি আছে। সন্নিহিত লোকেরা উহার পূজা করে। এই বিরূপ
মূর্তি সম্ভবতঃ ২৪শ তীর্থঙ্কর বীর বা মহাবীরের মূর্তি হইবে।

হুড়া (দেশজ) ১ এক বৃত্তে অঙ্কিত কৃতকগুলি ফলসমষ্টি, কলা
প্রভৃতির কান্দির অংশ। ২ বিদ্যুত পত্নবিশেষ। কবি বা
তরজার দলের অধিকারী প্রতিপক্ষের প্রতি হুড়া কাটাইয়া
থাকেন। হুড়া প্রায় গ্রাম্য ভাষায় রচিত হয়। ৩ ঝাঁটি
দিবার পূর্বে জলাদি কেপণ।

হুড়ান (দেশজ) বিদ্যুত করণ, বীজাদি কেপণ।

হুড়াছড়ি (দেশজ) চারিদিকে বিদ্যুত।

হুড়াঝাঁটি (দেশজ) জল ছিটাইয়া পুহাদি ঝাঁট দেওয়া।

হুড়িদার, চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগুরুদিগের প্রতিমিধি-
কর্মচারী। ইহার স্থানে স্থানে বুরিরা শিষ্যগণের নিকট হইতে
গুরুর বার্ষিক আদার করে এবং অভ্যস্ত লোককে বৈষ্ণব
ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পায়। কেহ কেহ ইহাদিগকে
কোজদারও বলেন।

হুড়ী (দেশজ) ক্ষুদ্র ঝাঁট, সজ লটি।

হুতিয়া, কটকের ২৬ মাইল উত্তরস্থিত একটি গ্রাম। এখানে
প্রস্তরনির্মিত একটি দেবমন্দির ও তাহার অভ্যন্তরে সিন্দুর
ও হরিদ্রা-লিপ্তি অনেক ভয় দেবদেবীর মূর্তি আছে।

হুতুর, কপাট প্রদেশের মহারা জেলার অন্তর্গত একটি নগর।
কুমারী অন্তরীপ হইতে ১১২ মাইল দূরত্বানকোণে অবস্থিত।
অক্ষা° ২° ৪১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১' পূঃ।

হুতুর (স্রী) ছানরভানেনলাতপাদিকং হু-শি-কু-উপধায় হু-শ-
(ইন্দ্রজিৎ কিয়ুহ। পা ৬।৪।১৭) হুতা। "শশিপ্রভং হুতঃ
শুভে চ চানবরে" (যু ৩৯) "হুত্বেপানাহ"। (পা ৪।৪।১৩৬)।
পর্যায়—আতপত্র, ছায়াশিখা, পটোটা, আতপহারণ
পুরাণের মতে, একদা জৈষ্ঠমাসে মহর্ষি জমদগ্নি বাণজীড়া
করিতেছেন, তৎপত্নী রেণুকা সেই সকল নিকৃষ্ট বাণ
কুড়াইয়া আনিতেছেন। রেণুকা প্রথম তপন তাপে
তাপিত হইয়া বৃক্ষের ছায়ার কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া
আগমন করিলে মহর্ষি জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিলম্বে
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রেণুকা কহিলেন,
"প্রভো! অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আমি তরুর ছায়ার বিশ্রাম
করিতে ছিলাম।" তাহা শুনিয়া মহর্ষি সূর্য্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া
ধম্মকে জ্যারোপণপূর্ব্বক বাণ সন্ধান করিলে সূর্য্যদেব ভীত
হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং
অনেক স্তব ভক্তি করিয়াও তাঁহার ক্রোধ একবারে অপনোদন
করিতে পারিলেন না। তবীন সূর্য্যদেব শিরস্ত্রাণ ছত্র নির্দ্বাণ
করিয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন যে, "আজ
হইতে লোকে ছত্র দ্বারা আশ্রয় রোদ্রতাপ হইতে পরিত্রাণ
পাইবে। ত্রতাদি নিয়মে ইহার দান অতি পুণ্যজনক হইবে।"
এই কথা বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। দান ফল—
যিনি ব্রাহ্মণকে শুভ্রবর্ণ ও শত শলাকাযুক্ত ছত্র দান
করেন, তিনি পরকালে সুখলাভ এবং ব্রাহ্মণ, অঙ্গরা ও
দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া দেবলোকে বাস করেন। (ভারত
দানধর্ম) ছত্র সূত্র, আতপ, বায়ু ও হিম প্রভৃতির নিবারক,
চকুর উপকারক। ইহা ধারণে মঙ্গল হয়। (রাখবরত)

ছত্র বিবিধ—বিশেষ ও সামান্ত। রাজাদিগের ছত্রই
বিশেষ। বিশেষও বিবিধ—সদগু ও নির্গু। সদগু ছত্র
সংকোচ ও বিকাশ করা যায়। দণ্ড, কল, শলা, রজু, বস্ত্র
কীলক এই ছয়টা দ্বারা ছত্র নির্মিত হয়। চারি যুগে এই
ছত্রের বধাক্রমে চারি প্রকার পরিমাণ—দণ্ড দশ, আট,
ছয় ও চারিহস্ত পরিমিত। কল ছয়, পাঁচ, চারি ও তিন
কিডতি পরিমিত। শলাকা ছয়, পাঁচ, চারি ও তিন হস্ত
পরিমিত। ইহাদিগের সংখ্যাও চারিযুগে ক্রমে একশত,
আশী, বাটু ও চারিশ হইয়াছে। নরতী তত্ত্ব পাকাইয়া একটি
ক্ষুদ্র করিবে, এইরূপ পরতী ক্ষুদ্রদ্বারা একটি গুণ, নরতী গুণ
দ্বারা একটি পাদ, নরতী পাদদ্বারা একটি রশ্মি (হৃদি)
করিবে। যুগক্রমে মন, আট, সাত ও ছয়টা রশ্মিদ্বারা এক
একটি রজু নির্মিত হয়। বস্ত্র শলাকার বিত্তণ দীর্ঘ হইবে।
কীলকও বধাক্রমে—এগার, দশ, নয় ও আট অঙ্গুলি পরিমিত।

এইরূপ পরিমিত ছত্রই রাজাদিগের মঙ্গলকর। সুব্রাহ্মণ্যের ছত্রের পরিমাণ রাজহুয় অপেক্ষা একপাদ (সিকি) কম হইবে। বিষ্ণুকাঠের দণ্ড ও কন্দ, বিষ্ণুকাঠের শলাকা, রজ্জু ও বস্ত্র রক্তবর্ণ এইরূপ ছত্রই রাজাদিগের প্রাপ্ত। সুব্রাহ্মণ্যের স্বর্ণছত্রের নাম প্রতাপ, তাহার দণ্ড ও বস্ত্র নীলবর্ণ, মস্তকে স্বর্ণবর্ণ কুন্ত। রজ্জু ও বস্ত্র গুরুবর্ণ, শিরোদেশে স্বর্ণ কুন্ত এরূপ ছত্রের নাম কনকদণ্ড। ইহা সর্ষ বিঘ্নে সিদ্ধিদায়ক। দণ্ড, কন্দ, শলাকা ও কীলক বিষ্ণুকাঠের সুবর্ণ নির্মিত; রজ্জু ও বস্ত্র রক্তবর্ণ। শিরোদেশে কুন্ত, হংস ও চামর স্বাক্ষরে বিভাজ্য করিবে। বস্ত্রশটী মুক্তা নির্মিত বস্ত্র ছত্র। মালা তাহাতে ঝুলাইয়া দিবে। বিষ্ণুকাঠের হীরক সকলের উপরে নিহিত, দণ্ডের প্রান্তদেশে কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগ বিভাজ্য,—রাজাদিগের এইরূপ ছত্রের নাম নবদণ্ড এবং ইহা সকল ছত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অভিষেক ও বিবাহকালে ইহাতে গ্রাহাদির বৈশিষ্ট্য দূর হয়। এই নবদণ্ড ছত্রের অগ্রভাগে আট অঙ্গুলী পরিমিত পতাকা নিহিত করিলে, তাহাকে রাজাদিগের “দিগ্বিজয়ী” নামক ছত্র বলে। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

(পুং) ২ ভূতৃণ, গন্ধধড়। ৩ বুদ্ধবিশেষ। তাহার মূল ও পত্র দেখিতে বচর জায়। ৪ ছাত্তরিয়াবিষ, ছাত্তনাবিষ, ধরবিষ। পর্যায়—অভিজ্ঞাত, কুট।

ছত্রক (পুং) ছত্রমিব কার্যতি ছত্র-কৈ-ক। ১ মৎস্তরূপকী, মাহারাজাপাখী। ২ রক্তবর্ণ কোকিলাক বৃক্ষ, রাজাকুলকাটা। ৩ জৈব-গৃহবিশেষ। ছত্র স্বার্থে-কন্। (স্ত্রী) ৪ ছত্র, ছাতা।

(পুং) ৫ ছাত্ত, বেঙের ছাতা, কৌড়ক (Agaricus Campestris)। ছত্রের সহিত আকারগত সাদৃশ্যহেতু ইহাদের নাম ছত্রক, অভিচ্ছাত্রা ও চলিত ভাষায় ছাত্ত হইয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ছাত্তকে উদ্ভিদ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তাহার কচেন, কাঠ ও প্রাচীরাদির গায়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাত্তা পড়ে, ঐ সকল হইতে বৃহদাকার ছাত্ত পর্য্যন্ত সমস্তই একজাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সকলেই কোমল, অতিবর্জনশীল ও অধিকাংশই শুভ্র। সমগ্র পৃথিবীতে যে কত প্রকার ছাত্ত আছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ন্যূনতম ৪০০০ প্রকার ছাত্তজাতীয় উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক অণুবীক্ষণবস্ত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। সে সমুদয় অর্ধবৃত্ত ও শক্তাদির উপরে জন্মে এবং শুষ্ক হইলে ধূলিকণাবৎ সূঁচ হয়। অনেক ছাত্ত তরু, শুষ্ক, গলিত কাঠ ও পত্রাদির উপর জন্মে, অবশিষ্ট ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের আকার কোনটী ক্ষুদ্রবৎ, কোনটী ক্ষুদ্র সরিষার মত, কোনটী

বা দণ্ডাকার ও অগ্রভাগে বর্ত্তমানবৃত্ত, কোনটী বা ধূতরা ফুলের মত, কোনটী বা পত্রাকৃতি, কোনটী ছত্রের ভাষ, কোনটী আবার মূল ও দণ্ডরহিত অণুত্বকৃতি। এদেশে নানাপ্রকার ছাত্ত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক ছাত্ত অতিশয় বিষাক্ত, অন্যরাং ছাত্ত তোজনে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

সচরাচর বর্ষা ও শরৎকালই ছাত্ত জন্মবার সময়। শুখন উদ্যান, জঙ্গল, নদীতীর, প্রান্তর, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালা, পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি সকল স্থানেই আহাৰ্য্য ছাত্ত জন্মে, তন্মধ্যে সিকিম প্রদেশে বেরূপ উৎকৃষ্ট ও অপরিখ্যাত ছাত্ত হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় না। ছাত্ত অতি শীঘ্র বাড়ে, কোন কোন ছাত্ত আবার এত শীঘ্র জন্মে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই দেখিতেছি শূন্যস্থান, কোথাও কিছু নাই, আবার ক্ষণমধ্যেই হয়ত সেখানে দেখিতে পাই, দুই তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃহদাকার ছাত্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ২৩ ঘণ্টার মধ্যেই উহার পূর্ণাকৃতি হইয়া উঠে, আবার তখনই শুকাইতে আরম্ভ করে।

বাঙ্গালার খাদ্য ছাত্তর মধ্যে উই ছাত্ত অতি উৎকৃষ্ট। লোকে কথায় বলে—

“মাছের মধ্যে কুই।

ছাত্তর মধ্যে উই॥”

ইহার অতি ক্ষুদ্র এবং উই চিহ্নিত জন্মে। উই ছাত্ত অপেক্ষা বড় এক রকম ছাত্তর নাম কুড়কি। ইহার প্রান্তরে বেড়ার নিকট ও গোচারণভূমিতে এক একস্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। ঐ সকল স্থানকে ছাত্তর আড়া কহে। কুড়কি ছাত্তর আকার ১১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। কুড়কি ছাত্ত অতিশয় কোমল, ইহাদের মস্তকের ছাত্তা ছিন্ন ভিন্ন, প্রায় গোটা থাকে না, মূল ও মাদির অধিক নীচে থাকে না। এই জাতীয় খুব বড় ছাত্তর নাম বড় কুড়কি। আর এক প্রকার শুভ্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, যেসময় নালায়ুত ছাত্ত বর্ষা ও শরৎকালে জন্মে। সেই সময়ের নামাভুসারে উহা দিগন্ধে কাড়ান, পার্শ্ব ইত্যাদি বলা হয়। ইহাদের মূল মাটিতে অনেকদূর পর্য্যন্ত যায়। এই সকল ছাত্তরই মাধার ছাত্তা যখন জীবৎ ফুটে, তখনই তাহাতে উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়, সমস্ত ফুটিলে অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়া যায়। গলিত খড়, কাঠ, পাতা ও গোমরাদিতে বিস্তর ছাত্ত জন্মে, উহাদের অনেকগুলি অতি সুন্দর ও নিরাপদে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাত্তর গন্ধই আদরগীর। যে সকল ছাত্ত শুভ্রবর্ণ ও সদাশুভ্র, বাহাদের ছত্র পুরু ও নীচের পর্দাগুলি জীবৎ

লোহিতভাঙ, দণ্ড সহজেই ডালিয়া যায় এবং উত্তম স্থানে জন্মে, ভোজনে সেই সকল ছাতুই প্রযুক্ত। অজ্ঞাত ও কুস্থানে উৎপন্ন ছাতু, কিম্বা বাহার ছত্র পাতলা, বাহাতে স্নগন্ধ নাই, কিম্বা বাহা নিংড়াইলে ছদ্মবৎ রস নির্গত হয়, বাহাতে অঙ্গের ভায় তীর গন্ধ বা অস্ত্র কোন প্রকার স্বর্গন্ধ অহুত হয়, বাহার বর্ণ কৃষ্ণাভ বা পীত, এরূপ ছাতু কখন ভোজন করিবে না। অনেক ছাতু এরূপ বিবাক্ত যে খাইলে প্রাণনাশ পর্যন্ত হইতে পারে। রুবিয়ার আর প্রথম আলেক্সিসের পরী বিবাক্ত ছাতু খাইয়া মারা পড়েন।

রোমনগরে ছাতু পরিদর্শন জন্য একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত আছেন, তিনি বাজারে আনীত সমস্ত ছাতু পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

ছাতু শুক ও টাটকা উভয় প্রকারই স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। শুকাইলেও ছাতুর স্নগন্ধ নষ্ট হয় না। টাটকা ছাতু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া উহার মূল ও উপরের পাতলা ছাল ছাড়াইয়া ফেলা উচিত, পরে কিছু কাল সীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া লবণ ও মসৃলাযোগে পাক করিলে উপাদেয় তরকারী প্রস্তুত হইতে পারে। ডিউপেটিট প্রভৃতি কোন কোন রাসায়নিকের মতে অধিকাংশ ছাতুই বিবাক্ত, কিন্তু ঐ বিষয় শতাংশিক তাপমানের ১০০ অংশ উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ছাতু খুব অধিক উত্তাপে পাক করিয়া খাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু অথবা বোধে ছাতু খান না। একটা কথা আছে—“ভাঙ্ক, ডুমুর, ছাতু, তিন খায়না সরা ক্রান্তি” অর্থাৎ সরা (শ্রাবক ?)-গণ ডাকপক্ষী, ডুমুর ও ছাতু খায় না।

একরূপ উৎকৃষ্ট ছাতু মাটির নীচে জন্মে। ইহাদের আকার গোল, আবরণ কঠিন এবং মূল বা কাণ্ড কিছুই নাই। উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে অতি কোমল শুভ্রবর্ণ স্নগন্ধি শাঁস বাহির হয়। অজ্ঞাত ছাতুর ভায় ইহারও উত্তম তরকারী হইতে পারে। এই ছাতু জললে শালগাছের গোড়ায় প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, মান্ডুমা প্রভৃতি জেলায় এই ছাতুকে কুড়-কুড়ে ছাতু কহে *। অনেক অনেক

ডাক্তার বলেন যে, ইহা বিলাতী ট্রাফল (Truffle) অপেক্ষা কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে।

আর একরূপ বড় বড় গোল ছাতু মাটির উপরে জন্মে। ইহাদের উপরে কঠিন খোসা থাকে না। ইহা খাইতে ভাল নহে।

পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে শুক ছাতু বহু পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহুবিধ বিবাক্ত ছাতু ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। একপ্রকার ছাতু আছে, উহা খাইলে সিঁড়ির ভায় নেশা হয়। ডাক্তার গ্রেনভিল সাহেব লিখিয়াছেন যে, কামবটুক প্রদেশে এইরূপ একজাতীয় ছাতু আছে। তথাকার অধিবাসীগণ ইহার বড় একটা বা ছোট ছোট জল দিয়া গিলিয়া কেলে। ২১০ ঘণ্টা পরেই ছাতুর মাদকতাপ্রকৃতি প্রকাশ পায় এবং সেবনকারী মাতালের ভায় হস্ত, প্রাণাদি করিতে থাকে। সাহেব বলেন যে, এইরূপ একবার সেবন করিলে পুরা এক দিন নেশা থাকে। তিনি আরও বলেন, এই ছাতুর একটা আশ্চর্য্য গুণ যে, মত্ত ব্যক্তি রাত্রিতে ঘুমাইলে পরদিন প্রকৃতিস্থ হয় বটে, কিন্তু উহার মূত্র অসাধারণ মাদকতাপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ছাতুর অভাবে পাকা মাতালগণ সেই চুল্লভ বস্তু বৃথা নষ্ট না করিয়া উপাদেয় বোধে পান করে। ইহাতে তাহার ছাতু-পানের সমানই নেশা হয় ও তৎপর দিবস তাহার মূত্রেও পূর্ণরূপ মাদকতাপ্রকৃতি জন্মে। পাকা মাতাল এইরূপে একবার ছাতু সেবন দ্বারা ক্রমাগত ৭৮ দিন মাতলামি রাখিতে পারে। একজনের মূত্র অল্প জন এবং তাহার মূত্র আর একজন এইরূপে বহুলোকেও এক ছাতুতে নেশা করিতে পারে। ছাতুর নেশা ছাড়াইবার ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

যুরোপ ও আমেরিকার অজ্ঞাত ফলমূলদির ভায় ছাতুর চাস হয়। ইহার চাস তত কষ্টসাধ্য নহে, অথচ অল্প ব্যয়ে নির্দোষ ছাতু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেশে ছাতুর চাস নাই। ইহার একটা বিপুল প্রকারের রীতিমত চাস করিলে বোধ হয় ছাতুরও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং লোকেও নিঃসন্দেহচিত্তে ছাতু ভক্ষণ করিতে পারে। জললে যে সকল ছাতু উৎপন্ন হয়, তাহার কোনটী বিবাক্ত কোনটী নির্দোষ হিঁস করা অতিশয় কঠিন, এই জন্ত ছাতু খাইয়া বিবাক্ত হইবার কথা প্রায়ই শুনা যায়। ছাতুর বীজ অতিশয় সঙ্করশীল, এমন কি কেবল বায়ুদ্বারাও ইহা সহস্র সহস্র মাইল দূরে নীত হইতে পারে। ছাতু বীজ সর্বত্রই আছে, কোথাও অবিধাজনক স্থান পাইলেই সেখানে জন্মে। যুরোপে ও আমেরিকায় নানা উপায়ে ছাতু উৎপন্ন হয়। একটা কঠোর

* কুড়-কুড়ে ছাতুর উৎপত্তিবিষয়ে এদেশের ক্রীতদাসগণের মধ্যে একটা বড় ভ্রান্তজনক প্রবাদ আছে। একদা ব্রজগোপীগণ গের্দে গের্দে গিয়া করিয়া ঈশ্বকে ভোজন করাইবার মানসে কুণ্ডলে গমন করিল, কিন্তু তথায় ঈশ্বকে দেখিতে না পাইয়া খালতললে পিষ্টক প্রোথিত করিয়া রাখিয়া আসিল। ঐ পিষ্টকই পরে কুড়-কুড়ে ছাতু হইয়া গেল।

গাম্ভীর্য এক তর গলিত বড় তার পর টাটকা অর্ধগলিত অবস্থিতি এক থাক ও তৎপরে সমাচ্ছ মৃত্তিকা এইরূপে দুই ডিন তর করিয়া ছারার রাধিয়া দিলে প্রায় তাহা হইতে ছাতু উৎপন্ন হয়। আবার ঐ মাটি যদি ছাতুর আড়ার মাটি হয়, তাহা হইলে ছাতু জন্মিবার কোন সম্ভব থাকে না। তথায় স্পান (Spawn) নামে ছাতুর বীজ বিক্রয় হয়। উহা একরূপ মাটি ও ছাতু একত্র চটকাইয়া প্রস্তুত হয়। ঐ মাটি ভাঙ্গিয়া সারের সহিত ছারার আর্দ্রস্থানে রোপণ করিলেই ছাতু হয়।

ছাতুজাতীয় নানাপ্রকার উদ্ভিদ গলিত কাঠ, বৃক্ষ, ফল ও শস্তাদিতে জন্মে। উহাদের কোন কোন জাতি চর্ম্মের স্থায় এবং আকারে কিঞ্চিৎ বড় হইয়া থাকে। অনেকগুলি আবার হস্ত লোমের স্থায় ফলাদির গাত্রে জন্মে। তাহাতে শস্তাদি একবারে নষ্ট হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে একরূপ ছাতু গোল আলুর বিস্তার অনিষ্ট করে। সিংহলের কাকিগাছেও বেড়ের ছাতা দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়; তন্নিম্ন গোধূম, যব, ধাতু, চা প্রভৃতি ইহাদের দৌরাভ্যে ভাল বাড়িতে পায় না। ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে বড় বড় বৃক্ষও শীঘ্র শুকাইতে আরম্ভ করে ও পড়িয়া যায়।

ছত্রকদেহিন্ (পুং) যাহাদের দেহ ছত্রকের (বেড়ের ছাতার) সদৃশ, যথা সেডুসী নামক সমুদ্রজ জীব, ইহার দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার ইংরাজী নাম Discophorn.

ছত্রগড়, আগরা জেলায় চর্ম্মধতী নদীর দক্ষিণতীরবর্তী একটা নগর। এই নগর গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বকোণে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১০' উঃ, দ্রাঘি° ৫৮° ২৫' পূঃ।

ছত্রগুচ্ছ (পুং) ছত্রমিব গুচ্ছোহস্ত বহব্রী। শুও তৃণ।

ছত্রচক্র (ক্ৰী) ছত্রাকৃতিচক্রং কৰ্ম্মধা°। চক্রবিশেষ। অশ্বিনী হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত ৯টা, মঘা হইতে জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত ৯টা ও মূলা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ৯টা নক্ষত্রকে যথাক্রমে তিনটা চক্র বা পঙ্ক্তি করিয়া নামনক্ষত্রানুসারে শুভাশুভ গণনা করা যাইতে পারে। ইহারই নাম ছত্রচক্র। পশ্চিমদিকের মধ্যরেখা হইতে হরাধিপের দ্রিশানকোণ পর্য্যন্ত, নরাধিপের অধিকোণ পর্য্যন্ত, গজাধিপের নৈঋতকোণ অবধি ইহাদিগের ছত্রবিভাগানুসারে শুভাশুভ জানা যায়। রাজার নামনক্ষত্র ছত্রস্থ হইলে তাহার চামর, কলস, বীণা, ছত্র, দণ্ড, পতংগ্রহ (শিকদারী), আসন, কীলক ও রজ্জু ইহাদিগের মধ্যে শনি ছত্রস্থ হইলে ছত্রভঙ্গ হয়। চামরে বায়ু প্রচণ্ড হইলে অনাবৃষ্টি, ঘোর দুর্ভিক্ষ ও প্রজা সকল ব্যাধিগ্রস্ত হয়। শনি কলসস্থ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ, বীণাস্থ হইলে পটুমহিষীর বিনাশ ও রাজা চঞ্চলচিত্ত এবং পৃথিবী ভয়বিহ্বলা হয়। শনি, নক্ষত্রদ্বয় অর্থাৎ

ছত্র, দণ্ড ও পতংগ্রহস্থ হইলে ছত্রভঙ্গ হয়। আসনস্থ হইলে আসন বিনাশ, কীলকস্থ হইলে বুবারাজের মৃত্যু, রজ্জুস্থ হইলে রাজার বন্ধন হয়। কিন্তু অতিচারস্থ শনি যদি বৃক্ষযুক্ত হন, তাহা হইলে উক্ত মন্দফল হয় না। কারণ ক্রুরগ্রহ যদি ক্রুরগ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সে মন্দ ফল দেয়। শনি রাহ মঙ্গল রবি ইহার বৃহস্পতি ও চন্দ্রযুক্ত হইলে উত্তরদিকস্থ রাজার ছত্রভঙ্গ হয়।

ক্রুরগ্রহ চতুষ্টয় বৃষ ও চন্দ্রযুক্ত হইলে পূর্বদিকস্থ রাজার ছত্রভঙ্গ এবং শুক্র ও চন্দ্র সংযুক্ত হইলে দক্ষিণদিকের শস্ত বিনাশ হয়। শনি যেমন মন্দফলদায়ক, বৃষ ঠিক সেইরূপ শুভ-কারক। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহ ও রবি-চন্দ্র ইহার তুল্য-বল। রাজার নাম রাহ বা কেতু নক্ষত্রস্থ হইলে ছত্রভঙ্গ হয়। ক্রুরগ্রহ ছত্রস্থ হইলে রাজা মৃগয়া, বিজয়যাত্রা, দুষ্ট হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহন ও বিগ্রহ ত্যাগ করিবে। (সমরামৃত)

ছত্রচণ্ডেশ্বর, শিবের নামভেদ। নেপালে শৈবদিগের প্রতিষ্ঠিত ছত্র-চণ্ডেশ্বরের বিস্তার মন্দির আছে। এই সকল মন্দিরের দক্ষিণে বা অধিকোণে এক একটা চণ্ডেশ্বর মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিগুলি দেখিতে ঠিক শিবলিঙ্গের স্থায়। শিবপূজার অবশিষ্ট পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি উহাদের উদ্দেশে অর্পিত হয়। সাধারণ লোকে উক্ত লিঙ্গ মূর্তিকে কামদেবের মূর্তি বলিয়া থাকে।

ছত্রদণ্ড (পুং ক্ৰী) ১ রাজছত্র। ২ ছত্র ও দণ্ড।

ছত্রধর (পুং) ছত্রং ধরতি ছত্র-ধ-অহ্। ছত্রধারী। ছাত্রাকর।

ছত্রধার (পুং) ছত্রং ধরতি ছত্র-ধ-অণ্। ছত্রধারী। পূর্বপদের আদিষ্মর উদাত্ত। (অণি নিযুক্তে। পা ৬।২।৭৫।)

ছত্রধারণ (ক্ৰী) ছত্রস্ত ধারণং ভতৎ। ছাত্রি ধরা। “উপান-ছত্রধারণম্” (মহু ২।১৭৮)

ছত্রধারিন্ (পুং) ছত্রং ধরতি ছত্র-ধ-গিনি। যে ছত্রধারণ করে, ছত্রধর।

ছত্রপতি (পুং) রাজোপাধিবিশেষ, সম্রাট।

ছত্রপত্র (ক্ৰী) ছত্রমিব পত্রমস্ত বহব্রী। ১ স্থলপত্র। (পুং) ২ ভূর্জ-পত্র বৃক্ষ। ৩ মাগক, মাগকচু। ৪ সপ্তপত্রবৃক্ষ, ছাত্রিন গাছ।

ছত্রপুর, বৃন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত মধ্যভারত এজেন্সীর শাসনাধীন একটা রাজ্য। এই রাজ্য হামিরপুর জেলার দক্ষিণে দশার্ণ ও কেন এই দুই নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরিমাণ ফল ১১৬৯ বর্গমাইল। বর্তমান রাজবংশের স্থাপনিতা মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় ছত্রশাল-বংশীয় নৃপতিকে পরাজয় করিয়া ছত্রপুর অধিকার করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য ইংরাজ-ধিকৃত হইলে তিনি সনন্দ দ্বারা ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাহার বংশধরগণ গবর্নেন্ট হইতে “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। রাজা ৩২ জন অবারোহী, ১১৭৮ জন পদাতিক, ৩৮ জন গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান রাখিতে পারেন। ইহার সম্মানার্থ ১১টী ভোপ বন্দোবস্ত আছে।

২ পূর্বোক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৪° ৫৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৩৮' পূঃ। ইহা বাক্সা হইতে সাগরের পথে প্রায় ৭০ মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১) মোট ১২২৫৭। তন্মধ্যে হিন্দু ১০৩৪৮, মুসলমান ২০৯৫, জৈন ২৮৬। বুন্দেশখণ্ডের রাজা ছত্রশাল এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী কাগজের কল আছে ও সরিহিত পর্বতের ধনিজ লৌহ হইতে নানাবিধ অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই নগরের নিকটই ইহার স্থাপিতা বুন্দেশা নৃপতি ছত্রশালের জন্মের রাজভবন অব্যাপি বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদের নিকট একটী বৃহৎ পঞ্চচূড় বসজ্জি দৃষ্ট হয়। এখানকার রাস্তা ঘাট অপ্রশস্ত এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর লোকের গৃহ নিম্ন ও সংকীর্ণ।

ছত্রপুস্প (পুং) ছত্রমিব পুস্পমত বহত্ৰী। তিলকপুস্পবৃক্ষ, তিলকুল গাছ।

ছত্রপুস্পক (পুং) ছত্রপুস্প স্বার্থে কন্। তিলকপুস্পবৃক্ষ।

ছত্রপ্রকাশ, শালকবি প্রণীত একখানি হিন্দী গ্রন্থ। ইহাতে বুন্দেশখণ্ডাধিপতি মহারাজ ছত্রশালের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তি, তাঁহার বহু রাজ্য জয় এবং অরজজেব ও বাহাদুর শাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধাদির বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ হইতে ঐ সময়ের অনেক প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়।

ছত্রভঙ্গ (পুং) ৩২৭। ১ রাজ্যের বিনাশ। ২ বৈধব্য। ৩ স্বাতন্ত্র্য।

ছত্রভোগ (পুং) ভয়মণ্ডহারবারের এলাকাধীন ভাগ্নিরথী তীরস্থ একটী গ্রাম। চৈতন্তদেব নীলাচলে ব্যাক্রার সময়ে আঠি-সারা গ্রাম হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়া এক রাত্রি এই গ্রামে অবস্থান করেন। এই গ্রামের জমীদার রামচন্দ্র খাঁ সে রাত্রি সশিষ্য তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন। এই গ্রামে গঙ্গাভীয়ে অমূল্য নামে এক ঘাট ও শিবলিঙ্গ আছে। চৈতন্তদেব তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। (চৈঃভাগঃ)। ছত্রেশ্বরীর মন্দিরের জন্তও পূর্বে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল।

ছত্রমহারাজ, বৌদ্ধদিগের মতে আকাশমণ্ডলস্থ দিকপাল চতুঃষ্টয়। ১ম বীণারাজ—ইনি পূর্বদিকের অধিপতি এবং হস্তে বীণা ধারণ করেন। ২য় ধ্বজরাজ—ইনি পশ্চিমদিকের অধিপতি এবং হস্তে অসি ধারণ করেন। ৩য় ধ্বজরাজ—ইনি উত্তরদিকের অধিপতি এবং হস্তে ধ্বজ ধারণ করেন। ৪র্থ চৈত্যরাজ—ইনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি এবং হস্তে এক চৈত্য ধারণ করিয়াছেন। এই চারিজন দিকপালকেই ছত্রমহারাজ কহে। অনেক বৌদ্ধমন্দিরে ইহাদের প্রতিমূর্তি আছে।

ছত্রমহঃ (ত্রি) ছত্রং বিদ্যাতেহত ছত্র-মতৃপু মত বহক। ছত্র-বিশিষ্ট, প্রোক্ত ছত্রমুক্ত।

ছত্রমহতী, প্রাচীন পাকালরাজ্যের উত্তরবর্তী একটী রাজ্য অপর নাম অহিছত্র, অহিকত্র ও অহিকত্র। রাজধানী অহিছত্র নগরী। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণাদিতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

ছত্রবস্ত্র, বৌদ্ধদিগের মহাবোধদান নামক গ্রন্থের একটী অংশ।

ইহাতে বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী বর্ণিত আছে—
হিমালয়ের অধিত্যকাপ্রদেশে কন্দলা নারী মহেশ পুত্রবতী এক বক্ষিণী বাস করিত। তাহার পুত্রগণ একদা বৈশালী নগরে আসিয়া তথাকার অধিবাসীগণের তেজ হরণ করে। অধিবাসীগণ ইহাতে হীনভেজ হইয়া নানারোগভোগ করিতে লাগিল এবং বংশোৎপাদনে বিবৃত হইল। বৈশালীর লিচ্ছবিগতি ভোসল প্রজাগণের এই হৃদশা দূর করিবার জন্ত রাজগৃহ হইতে বুদ্ধদেবকে আনয়নার্থ গমন করিলেন। ভোসলের অহুরোধে বুদ্ধদেব বৈশালী আসিতে স্বীকার করেন। পথিমধ্যে গঙ্গাভীয়ে কপোতমূর্ত্তি গোশূক রাজদূতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কপোত বুদ্ধদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক মহাব্যবাক্যে তাঁহাকে গোশূকে গমনের জন্ত অহুরোধ করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে সকলে অতিশয় বিস্মিত হইলেন, বুদ্ধদেব কহিলেন, “ইহা আশ্চর্য্য নহে। কালীরাজ ব্রহ্মদত্তেরও তিন পুত্র পেচক, শালিক ও কপোত পক্ষী ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অধিদিকের প্রসাদে ঐ তিন পুত্রপ্রাপ্ত হন। তিনটাই অতিশয় রাজনীতিজ্ঞ; রাজ্যের প্রসন্ন জ্ঞানীর জ্ঞান উত্তর প্রদান করিত। পেচক বলিত, ‘উদ্ধাঙ্গ মনোবৃত্তি রাজ্যের অযোগ্য, উহাদের সংযমনেই অর্থ বৃদ্ধি, ধর্ম্ম ও বুদ্ধির বিকাশ হয়।’ শালিক বলিত, ‘অর্থনীতির মূলমন্ত্র তিনটী যথা—অর্থোপার্জন, অর্থসঞ্চয় ও অর্থের সম্যবহার।’ কপোত বলিত, ‘রাজশক্তি পাঁচ প্রকার—প্রাধান্ত, সম্মতি, আত্মীয়বর্গ, চতুরঙ্গসৈন্য ও পরিণামদর্শিতা। তন্মধ্যে পরিণামদর্শিতাই প্রধান।’

বুদ্ধদেব বৈশালী আগমন করিবামাত্র অধিবাসীগণের সর্বপ্রকার আশঙ্কা দূরীভূত হইল এবং তাহার পূর্ব্বভেজ ও বীশক্তি প্রাপ্ত হইল। ইহাতে সকলে আশ্চর্য্যবিত্ত হইলে বুদ্ধদেব বলিলেন, “তোমরা বিস্মিত হইও না, আমি পূর্বে পাকালস্থ কাপ্পিল্যপতির পুরোহিত ব্রহ্মদত্তের পুত্র ছিলাম। আমার নাম রক্ষিত। সেই রক্ষিত তপোবলে অলৌকিক শক্তিমান হইয়াছিল। একদা কাপ্পিল্যদেশে ছত্রিবার্য্য মারীভর হইলে, রক্ষিত আসিবামাত্র উহা নিবারিত হয়।

“এই রূপে আমি যখন কালীরাজের মহেশ নামক হস্তীরূপে

অঙ্গরোধন করি, তখনও মিথিয়ার বাইরা তথাকার অধিবাসী-গণকে এক অসৌক্যিক ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম।

“এইরূপে অঙ্গরোধনবাসী প্রবৃত্ত বৃক্সপে আমি রাজগৃহ অগ্নয়ের লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।”

এই কথা বলিয়া বুদ্ধদেব ভোজনান্তে মরকত ব্রহ্মাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ছত্র (ক্ষেত্র) নেপালের একটি তীর্থ। পূর্ণিমা হইতে এই স্থান উত্তর-পশ্চিমকোণে ৮২ মাইল দূরবর্তী। অক্ষা° ২৬° ৩০' উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৪' পূঃ। ইহার নিকটে বরাহক্ষেত্র নামক তীর্থে বিষ্ণুর বরাহমূর্তি বিদ্যমান আছে। বরাহক্ষেত্রে অনেক বিখ্যাতী হিন্দু-সন্ন্যাসী সজীবাবস্থায় আপনাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে। লোকের বিশ্বাস যে, এই সময় তাহারা ভবিষ্যৎকাল হয়।

ছত্রবৃক্ষ (পুং) মৃচুকুল ফুলের গাছ।

ছত্রশাল, ১ চৌহান-কুলোডব হরবংশীয় বুল্লীর একজন বিখ্যাত রাজপুত্ররাজ। উচ্চ সাহেবের রাজস্থানে ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে। ইনি রাও রতনের পৌত্র ও গোপীনাথের পুত্র। পিতামহের মৃত্যুর পর শাহজহান বাদশা কর্তৃক বুল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট তাঁহার সম্মান বুদ্ধিজন্তুত্বাহাকে দিল্লীর শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেন। ছত্রশাল আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাহজহান নিজ সাম্রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া চারি পুত্রকে রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিলে ছত্রশালও অরঙ্গজেবের অধীনে একদল সৈন্তের সেনাপতি হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তথায় তিনি দৌলতাবাদ, বিদর, কুলবর্গা, দামনী প্রভৃতির যুদ্ধে নিজ অসামান্য শৌর্যবীর্য প্রকাশ করেন।

এই সময়ে সম্রাট শাহজহানের অলীক মৃত্যুসংবাদ চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। রাজকুমারগণ সকলেই সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সূজা বাঙ্গালা হইতে দিল্লীমুখে অগ্রসর হইলেন; অরঙ্গজেব মুরাদকে লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে রাজধানী অভিমুখে যাত্রার উত্তোধন করিতে লাগিলেন। শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাই কেবল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। এ দিকে সম্রাট শাহজহান অরঙ্গজেবের অসদভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার সহচরী ছত্রশালকে স্বরাজ্যরাজধানীতে প্রত্যাপিত হইবার আদেশ করেন। ছত্রশাল আদেশপ্রাপ্তিমাত্র, রাজ্যাকাশ পালনকরা কর্তব্যবোধে দিল্লীযাত্রার আয়োজন করিলেন এবং অরঙ্গজেবকেও সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিলে তিনি সম্মতিপ্রদানে অস্বীকার করিলেন। ছত্রশাল শাহজহানের আদেশপ্রাপ্ত দেখাইলেও অরঙ্গজেব নিজ সৈন্তগণকে

ছত্রশালের অমুচরাদিকে আটক করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ছত্রশাল বানবহনাদি পুর্বেই পাঠাইয়া ছিলেন। এখন তিনি বীর অমুচরবর্গ লইয়া সর্বপে অরঙ্গজেবের সৈন্তদলকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। এই সময়ে নন্দদানবী বস্ত্রার প্রাবিত, ছত্রশাল শোলাকী রাজগণের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপথে বুল্লীরাজ্যে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েকদিন থাকিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, যে এই সময় মোগল-সম্রাট কোন মুসলমান সেনাপতিকেই বিশ্বাস করিতেন না; রাজপুত্রগণই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। রাজপুত্র সেনাপতিগণ প্রাণপণে প্রভুর উপকার সাধনে কুন্তিত হইতেন না।

এদিকে অরঙ্গজেব, চোলপুরের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই যুদ্ধে ছত্রশাল ও হরবংশীয় বীরগণ কুছুমচলনলিপ্ত রথসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় দারার যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিলে সৈন্তগণ পলায়ন করিতে লাগিল। ছত্রশাল সশস্ত্রে সৈন্তগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া বাহুরচনাপূর্বক হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এই সময় বিপক্ষ পক্ষের একটি গোলা আসিয়া তাঁহার কুঞ্জরকে আহত করিল, হস্তী রণক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। ছত্রশাল হস্তীপৃষ্ঠ হইতে লক্ষ্য দিয়া পড়িলেন, বলিলেন, “যদিও আমার হস্তী পলাইতেছে, তাই বলিয়া আমি রণক্ষেত্রে হইতে পলাইব না।” এই বলিয়া তিনি অশ্বরোহণে ক্রতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় তিনি মুরাদকে বধ করিবার জন্য যেমন বর্ষা লক্ষ্য করিতে ছিলেন, অমনি শত্রুপক্ষীয় গোলা আসিয়া তাঁহার ললাট বিদীর্ণ করিল। ছত্রশাল বীরপুরুষের জ্ঞান রণশায়ী হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তরতসিংহও মহাক্রোধে যুদ্ধ করিতে করিতে অগণ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন। আরও অনেক রাজবংশীয় বীরগণ এই যুদ্ধে সম্রাজ্ঞে প্রাণ বিসর্জন করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিলেন।

বুল্লীর রাজবংশের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত আছে, ছত্রশাল তাঁহার জীবনে বাহাদুরী যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার চিরস্থায়ী বশ উপার্জন করেন। তিনি ছত্রমহল নামে বুল্লীরাজপ্রাসাদের কতক অংশ নূতন নির্মাণ করেন এবং পাটন নামক স্থানে কেশবরায় নামক বিগ্রহের এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৭১৫ সংবতে অর্থাৎ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গত হন। তাঁহার চারি পুত্র। রাও ডাওসিংহ, ভীমসিংহ, ভগবন্ত সিংহ ও তরতসিংহ। জ্যেষ্ঠ রাও ডাওসিংহ ছত্রশালের পর বুল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২ বুদ্ধেলখণ্ডের বিখ্যাত বুদ্ধেলাবংশীয় একজন পরাক্রান্ত রাজা। ইনি চন্দ্রসিংহের পুত্র। লালকবি প্রণীত ছত্রপ্রকাশ নামক গ্রন্থে ইহার বহুসংখ্যক যুদ্ধজয়ের বিবরণ সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

পিতার মৃত্যুর পর ছত্রশাল রাজ্যাসন লাভ করেন। এই সময়ে মোগল সম্রাটগণ হীনবল ও মহারাষ্ট্রগণ প্রবল হইতেছিল। ছত্রশাল প্রথম হইতেই মুসলমান সম্রাটদিগের শাসন অবহেলা করিয়া প্রথমে কাঁসি অধিকার করিয়া, রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৬৭১ খৃঃ অঙ্গে জলায়ন হইতে তিনি প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৬৮০ খৃঃ অঙ্গে হামিরপুর অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। পাটনগরে ছত্রশালের রাজধানী ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দামনী নগর সম্রাট প্রেরিত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইতেছিল, ঐ অঙ্গে ছত্রশাল উহার শেষ শাসনকর্তা নবাব মৈরতখাঁকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অঙ্গে সম্রাট বাহাদুর-শাহ ছত্রশালকে কাঁসি প্রদেশ দান করিলেন, কিন্তু ইহাতেও মুসলমানগণ বুদ্ধেলা রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৩৩ খৃঃ অঙ্গে ফরুকাবাদের পাঠানশাসনকর্তা আকবর-খাঁ বঙ্গ ছত্রশালের রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি মহারাষ্ট্রদিগের সাহায্য চাহিলেন। পেশবা বাজীরাও সাহায্যদানে সম্মত হইলেন। ছত্রশাল বাজীরাওর সাহায্যে সমস্ত বুদ্ধেলখণ্ড অধিকার করিয়া প্রতাপকার স্বরূপ পেশবাকে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দান করিলেন। এই সময়ে সন্ধি হইল যে, পেশবা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ছত্রশাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে সাহায্য করিবে। ১৭৩৪ খৃঃ অঙ্গে ছত্রশালের মৃত্যু হয়।

এই ছত্রশাল বুদ্ধেলা রাজপুত্রবংশীয়। ইনি বিদ্যাচর্চার অতিশয় আদর করিতেন। ইনিই বিখ্যাত লালকবিকে নিজের সভায় রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ছত্রপ্রকাশ নামে তাঁহার কীর্তিকলাপবিষয়ক পুস্তক লিখিতে আদেশ করেন। এই সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহারই জীবনীমূলক সংস্কৃত ভাষায় “শত্রুশল্যকাব্য” প্রণয়ন করেন। ছত্রশালই বহুতর যুদ্ধাদির পর বুদ্ধেলখণ্ডের স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া যান, ছত্রপুত্রের আজিও তাঁহার নির্মিত এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাঁহার সময়ে বুদ্ধেলখণ্ডে অভিনব সাহিত্য-যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, শত শত ব্যক্তি দেশীয় হিন্দীভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

ছত্রসিংহ, ১ খণ্ডের: জায়গীরদার মোকামসিংহের পুত্র। ইনি গৃহ-বিবাদে বিরক্ত হইয়া দিল্লীতে গিয়া বাস করেন এবং নিজ গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সম্রাট ছত্রসিংহকে

কাবুল জর করিতে পাঠাইলে তিনি পঞ্জাবীনগরে ক্ষত্রগণকে পরাজয় করেন। সম্রাট এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ৬০টা গ্রাম প্রদান করেন।

ছত্রসিংহ আন্তরীবালা, সর্দার—ইংরাজরাজনিবৃত্ত কান্দীরের হাজারা জেলার এক শাসনকর্তা। ইনি আকগান-স্থানের আর্মীর দোস্ত মহম্মদের সহিত বড়বন্দ করিয়া পঞ্জাব-জয়ের চেষ্টা করেন। ঐ অভিপ্রায়ে তিনি কান্দীরের রাজা গোলাবসিংহের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। গোলাবসিংহ সাহায্যদানে অসম্মত হওয়ার তিনি দোস্ত মহম্মদের সহিত ঝগড়া দিয়া বিদ্রোহী হন (১৮৪৮ খৃঃ অঙ্গে)। শুজরাটের যুদ্ধে সর্দার ছত্রসিংহের পরিচালিত শিখগণ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেও ইংরাজসৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইল। পরাজিত হইয়া ছত্রসিংহ, অজুচর সহিত অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ছত্রসিংহ ও তাঁহার পুত্র সেরসিংহের বিদ্রোহই পঞ্জাবের শেষ বিদ্রোহ।

ছত্রা (স্ত্রী) ছদ-ঈন্ (সর্কধাতুভ্য: ঈন্। উণ ৪।১৫৮) ১ মধুরিকা, মোরী। ২ শলুকা, শলুকা। ৩ ধত্বাক, ধনে। ৪ মজ্জিতা। ৫ শিলীক, কোড়কছাতা। ৬ ধাত্রী। ৭ কান্দীরদেশজাত ধনের জ্বর গাছ। ৮ রমায়ন ওষধিভেদ। (সুশ্রুত চিকিৎসা ৩০ অ°)

ছত্রাক (স্ত্রী) ছত্রাইব কারতি ছত্রাকৈক-ক। ১ কবক। ইহা ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। “ছত্রাকং বিড়্‌বরাহঞ্চ লগুনং গ্রাম্যকুটুং। পলাতুং গুজনং চৈব মত্যা জম্বা পতেদ্‌ দ্বিজঃ।” (মহা ৫।১০২) ‘ছত্রাকং কবকানি’ (মেধাতিথি।) (পুং) ২ জালবর্করূক বৃক্ষ।

ছত্রাকী (স্ত্রী) ছত্রাক-গোরাতিদ্বাং ভীপ্। ১ রাজা। ২ সর্পাকী। ছত্রাক (স্ত্রী) গোদন্ত, হরিভাল।

ছত্রাতিচ্ছত্র (পুং) ছত্রমতিক্রম্য ছত্রমাবরণমস্ত্যস্ত অশা-দিদ্বাদচ্। ছত্রাকার জলজাত স্তগন্ধি তৃণভেদ। পর্যায়—পালয়া, অতিপুত্রা, স্তগন্ধা, ছত্রক, কটুক, কটু। চলিত কথায় ছাতু বলে। [ছত্রক দেখ।]

ছত্রাদি (পুং) ছত্রং আদি বস্তু বহুব্রী। পাণিনি উক্ত গণভেদ। ইহার উত্তর শীলার্থে প্রত্যয় হয়। (ছত্রাদিভ্যো গ:। পা ৪।৪।৬২) ছত্রাদিগণ যথা—ছত্র, শিক্ষা, প্রয়োহ, স্থা, বৃত্তিকা, চুরা, তিভিক্ষা, উপস্থান, কৃষি, কর্মন, বিশ্বধা, তপস, সভ্য, অনৃত, বিশিখা, বিশিকা, ভক্ষা, উদস্থান, পুরোভাশ, বিক্ষা, চক্ষা, ময়।

ছত্রাধাতু (স্ত্রী) ছত্রাধাতুমিব কর্মধা। ধত্বাক, ধনে।

ছত্রি, ছত্রী (কত্রি শব্দের অপভ্রংশ) অনেক রাজপুত্র আপনাদিগকে ছত্রি বলিয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চৌহান, তমোরিয়া, শিকরবাদ, মোড়ি, পরীহার, পরমার, বাদব, বরোগিরি, ভোমর, কঙ্ক

বহু, তরুন, বরগুজর, মাঠের, ঢকরা, ইন্দোলিয়া বচাল, গহলোং, বশতটি, বৈ ও চন্দ্রের প্রভৃতি আশানাগিকে ছত্রিশ বসিয়া পরিচর দের।

কত্রি, কাছি ও জাঠগণও ছত্রিশগের সহিত পূর্বে মিলিত ছিল।

ছত্রিকা (জী) ছত্রী এব ছত্রী-স্বার্থে কন্ অত ইত্থং অথবা ছত্রং তদাকারপুং বা অন্ত্যন্ত ছত্র-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১৫।) শিলীক, পাতালকোড়। পর্যায়—গোময়ছত্রিকা, দিলীর, শিলীক, বসারোহ, গোলাস, উরুজ, ছত্রাক, উচ্ছিলীক। উৎপত্তিস্থানভেদে ইহার গুণ—গোময়ে, বাশের গায়, ইক্ষুপ-লাল বা মাটিতে জাত ছত্রিকা শীতল, কষা, স্বাদু, পিচ্ছিল গুরুপাক এবং ছদ্মি, অতিসার, অর ও শ্লেষ্মাকারক। পলালজ ছত্রিকা স্নগ্ধ, রুক্ষ ও দোষকর। অণুচি স্থানে কাঠ বা বাশের গাঁইট হইতে উৎপন্ন যেতছত্রিকা অত্যন্ত দোষকর। (রাজনির্ঘণ্ট) [ছত্রক দেখ।]

ছত্রক (পুং) ছত্রং অন্ত্যন্ত ছত্র-ঠন্। ছত্রবিশিষ্ট। ছত্রিকের-ভাবকার্য্য ছাত্রিকা ছত্রিক-পুরোহিতাদিহাদ্যক্। (পা ৫।১।১২৮) ছত্রিন্ (ত্রি) ছত্রং বিস্ততেহন্ত ছত্র-ইনি। ১ ছত্রযুক্ত। “গচ্ছেন্দ বষাৎপে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষুচ” (স্বতি) ২ (পুং) নাপিত। ছত্রিশগড় (ছত্রিশগড়) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি বিভাগ। অক্ষা° ২০° ১’ হইতে, ২২° ৩৩’ ৩০” উঃ ও দ্রাঘিঃ ৮০° ২৮’ হইতে ৮৪° ২৪’ পূঃ। এই বিভাগ রায়পুর, বিলাসপুর ও সঘলপুর এই তিনটি জেলায় গঠিত। পূর্বে এই স্থান কারখণ্ড নামে বিখ্যাত ছিল। রায়পুর জেলায় ছুইকাদান, কান্কেড়, রায়গড়, নন্দগাঁও এই চারটি ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত। এইরূপ বিলাসপুর জেলায় কোরাড়খা ও শক্তি নামে দুইটি এবং সঘলপুর জেলায় কালাহাণ্ডী, রায়গড়, সারগগড়, পাটন, শোণপুর, রাইরাধোল ও বামড়া নামে সাতটি রাজ্য আছে।

এই বিভাগের মোট পরিমাণফল ৩৯৭৬১ বর্গমাইল। কেবল ইংরাজশাসনভুক্ত প্রদেশের পরিমাণফল ২৪,২০৪ বর্গ মাইল। এই বিভাগের ভূমি উর্বরা ও অধিকাংশই সমতল। এখানে ধাতু, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে হইতে বহুলোক আসিয়া এই বিভাগে বাস করিতেছে। এতদিন ইহা বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্যস্থান হইতে বহুদূরবর্তী ছিল, সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইহার মধ্য দিয়া যাওয়াতে অবাধে বাণিজ্য চলিতেছে।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে রঘুজী ভোনসু এই দেশ জয় করিয়া মহারাষ্ট্রদিগের অধীন করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নাগপুরের

সহিত এই প্রদেশও ইংরাজের অধিকৃত হয়। এ প্রদেশে অনেক গাভী ও টাটু জন্মে।

ছত্রুর (পুং) ছদতে অপারায়ণি বর্ষোক্ষাদিক্রমিত ছত্র-বরচ্ (ছিত্রহরহরতি। উণ ৩।১) গৃহ। ২ কুজ।

ছদ (ত্রি) ছাদয়তি-ছাদি-কিপ্ হ্রস্ব। (ইয়ন্ত্রন্ কিম্। পা ৬।৪।১৭) আচ্ছাদক।

ছদ (পুং) ছদ-অচ্। ১ পক্ষ, পাখনা। ২ গ্রহিণী বৃক্ষ, গাঠেলা। ৩ তমালপত্র (পুং স্ত্রী) ৪ পত্র, পাতা। (স্ত্রী) ৫ তেজপত্র।

ছদন (স্ত্রী) ছদ-লুট্। ১ পত্র, পাতা। ২ পক্ষ, পাখনা। ৩ তমালপত্র। ৪ তেজপাতা। ভাবে-লুট্। ৫ পিধান, আচ্ছাদন।

ছদপত্র (পুং) ছদার্থঃ পত্রমন্ত বহব্রী। তুর্দপত্র।

ছদ্বি (স্ত্রী) ছদ-কি। ছাদ, চাল।

ছদিস্ (স্ত্রী) ছাদয়তি ছাদন্তে অনেন বা ছাদি-ইসি (অর্চি-শুচিহস্যপিছাদিছদ্বিভ্য ইসিঃ। উণ ২।১০২) হ্রস্ব। (ইয়ন্ত্রন্ কিম্। পা ৬।৪।১৭) ছাদ। “ক তদীয়রতিভার্য্য কায়-মাত্মা নভঃছদিঃ।” (ভাগবত ৭।১৪।১৩)

“ইন্দ্রজিহ্বারসি বিধ্বজনন্ত ছাদা।” (বাস্কসেনয়ঃ ৫।২৮)

‘সদোনামকং মণ্ডপং নির্মায় তস্তোপরি প্রাবরণায় মধ্যং কটমারোপয়েদিতি হ্রদার্থঃ। ছদিঃ শব্দেন তৃণনির্মিতঃ কট উচ্যতে। হে তৃণময়কট! ঐমিত্তন্ত ছদিরসি ইন্দ্রসম্বন্ধ-কটোত্তবসি’ (মহীধর)

ছদ্যতাপস (পুং) ছদ্যোপলক্ষিততাপসঃ শাকপার্শ্বাদিহাদ্যং সমালঃ। হলতাপস, কপট ব্রহ্মচারী। পর্যায়—সর্ষাস্তিসহী, বৈড়ালব্রতিক, বেশধারী।

ছদ্যাট্ (অব্য) বিনাশ। “এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকছদ্যাট্করী প্রভো।” (ভাগবত ৩।১৮।২৪)

ছদ্যান্ (স্ত্রী) ছদ্যতে স্বরূপমেনে ছদ-মনিন্ (সর্ষ-ধাতুভ্যো মনিন্। উণ ৪।১৪৪) হ্রস্ব। (ইয়ন্ত্রন্ কিম্। পা ৬।৪।১৭) কপটছল। “ছদ্যনাচরিতং চ যৎ” (মুহু ৪।১২৯)

ছদ্যবেশ (পুং) ছদ্যোপলক্ষিতাবেশঃ, মধ্যলোং। কপটবেশ।

ছদ্যবেশিন্ (ত্রি) ছদ্যবেশ-অন্ত্যর্থ ইনি। ছদ্যবেশধারী, কপট বেশধারী।

ছদ্যিকা (স্ত্রী) ছদ্য অন্ত্যন্তাঃ ব্রীহাদিহাদিনি সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্। শুড়ুটী, গুলঞ্চ।

ছদ্বিন্ (ত্রি) ছদ্য অন্ত্যন্ত ছদ্য-ইনি। ছদ্যবেশধারী। “সোহং দশা মঘবতে তিক্ণমেতামহুতমাং। ব্রাহ্মণচ্ছদ্বিনে” (ভারত ৩।২২।৩২)

ছদ্বিন্ (দেশজ) অতি বেগ।

ছদ্ব (ত্রি) ছদ্বি-কর্মণি দ্বন্। ১ উপচ্ছকনীর, উপাসনীর।

“অগ্নিহোমেন পূর্যাহনো” (শ্লোক ১০।১।৩৩)। “ছন্দউপহাসবীরঃ” (সারণ) ভাবে ঘঞ। (পুং) ২ অতিপ্রায়। “পরহাসমবি-
হুবা” (ভাগবত ৭।৩।২৫)

৩ বিধ। (ত্রি) ৪ রহঃ, নির্জন। (অমরটীকা)

ছন্দক (ত্রি) ছন্দরতি ছবি-ধূলী। ১ রক্ষক। (পুং) ২ বাহুদেব।
“বাহুদেব। সর্বছন্দক। হরিহর। মহাবল।”

(ভারত ১২।৩৪ অং)

ছন্দকপাতন (পুং) ছন্দকেন ছন্দেন পাতয়তি লোকানিতি
ছন্দক পাতি-লু। ছন্দতাপন, ভণ্ড তপস্বী।

ছন্দজ (পুং) বস্তু প্রভৃতি দেবগণ।

ছন্দঃপূর্ণ (পুং) ছন্দাংসি বেদবিহিতকর্ণাণি পর্ণানীব যন্ত
বহতী। মারামর সংসার। যেমন পত্র বৃক্ষে আচ্ছাদন ও
রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মও সংসারকে
রক্ষা করে অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্মহীন হইলে আর তাহার সংসারে
প্রবেশ করিতে হয় না। “ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তঃ বেদ
স বেদবিৎ” (গীতা)।

ছন্দশিতি (ত্রি) ৬তং। ১ ছন্দঃসমূহ। ২ ছন্দের ভেদ ও
গুরুলঘুজ্ঞানার্থ প্রস্তার। একটা ছন্দের যতগুলি অক্ষরে
একটা পাদ হয়, সেই সন্ধ্যা হইতে ক্রমে এক পর্য্যন্ত
সন্ধ্যা বিস্তৃত করিবে। উক্ত বিস্তৃত সন্ধ্যার পূর্ব
সন্ধ্যাটি (অর্থাৎ যতগুলি অক্ষরে একপাদ হইরাছে)
এক সন্ধ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হয়। ভাগের দ্বারা ফল হয়,
তৎসন্ধ্যাকই উক্ত ছন্দে এক গুরু অক্ষরযুক্ত পাদভেদ।
আবার ঐ ভাগকলকে পরস্থিত সংখ্যা (অর্থাৎ যে সন্ধ্যাকে
ভাগ করা হইল উক্ত পরস্থিত) দ্বারা গুণ করিবে। ঐ
গুণিত সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করিবে। ঐ ভাগকল পরি-
মিতই উক্ত ছন্দের দুই গুরু অক্ষরযুক্ত পাদ আনিবে।

উক্ত ভাগকলকে আবার পরপরস্থিত সন্ধ্যা দ্বারা গুণ
করিয়া তিন প্রভৃতি সন্ধ্যা (যতগুলি অক্ষরে একপাদ হইরাছে
সেই সংখ্যা পর্য্যন্ত) দ্বারা ভাগ করিলে যে যে ভাগকল
হয়, তৎ তৎ সন্ধ্যাই উক্ত ছন্দের তিন প্রভৃতি গুরু অক্ষর-
যুক্ত পাদ হইবে। উদাহরণ-গারিজীর পাদ হয় অক্ষরে—

৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৬ ১৫ ২০ ১৫ ৬ ১

একাক্ষর ৬। দুই অক্ষর গুরু ১৫। তিন অক্ষর গুরু ২০।
চারি অক্ষর গুরু ১৫। পাচ অক্ষর ৬। ছয় অক্ষর গুরু ১।
সর্ব লঘু ১। সমষ্টি ৬৪। (লীলাবতী)

পিঙ্গলাচার্যের মতে প্রস্তার বধা—গ (গুরু এক অক্ষর) ও

তাহার নিম্নে ল (লঘু এক অক্ষর) লিখিবে। রেখা
টানিয়া আবার গ ও ল লিখিবে। রেখার উপরস্থিত গ ও
লর পার্শ্বে গ নিরস্থিত গ ও লর পার্শ্বে ল যোগ করিবে।
পরে রেখাটি পুঁছিবে, লএর নিম্নে রেখা টানিয়া উপরিকার
জ্ঞায় চারিটা রেখা লিখিবে, পরে উপরিকার রেখার গ ও
নিম্নকার রেখা ল যোগ করিবে। পূর্বকার জ্ঞায় আবার
যোগ করিয়া নিম্নে রেখা টানিয়া নিম্নে উপরিউক্ত আট
ছত্র লিখিবে। পরে রেখার উপরে গ ও নিম্নে ল যোগ
করিবে। এক এক অক্ষর বাড়াইতে হইলে ঐরূপে গ ও ল
যোগ করিবে। এই উপায়ে ছন্দের ভেদ এবং গুরু ও লঘু
জানা যায়। প্রস্তার—

গ	ল
গ গ	গ গ
ল গ	ল গ
গ ল	গ ল
ল ল	ল ল
গ গ গ	গ গ গ
ল গ গ	ল গ গ
গ ল গ	গ ল গ
ল ল গ	ল ল গ
গ গ ল	গ গ ল
ল গ ল	ল গ ল
গ ল ল	গ ল ল
ল ল ল	ল ল ল

এইরূপ ক্রমে ক্রমে গ ও ল যোগ করিলে ছন্দের ভেদও
গুরু লঘু জ্ঞাত হওয়া যায়। ভেদ বধা—একাক্ষরপাদক—
২ প্রকার। দ্ব্যাক্ষরপাদক—৪ প্রকার। ত্র্যাক্ষরপাদক—
৮ প্রকার। চতুরক্ষর—১৬ প্রকার। পঞ্চাক্ষরপাদক ৩২।
ষড়াক্ষরপাদক—৬৪ প্রকার ইত্যাদি।

ছন্দসূ (স্রী) ছন্দরতি আত্মাদরতি চদি-অনু-চত্ৰ ছন্দ। (চন্দ্রে
রাদেচ ছঃ। উণ ৪।২।১৮) ১ ইচ্ছা, অভিলাষ।

“কামাশ্বকান্দনসি কন্দবোগাং” (ভারত ১২।২০।১২২)
“ইচ্ছাপর্যায় শ্লোকঃ শব্দঃ” (পা ৪।৪।২৩)

২ বেদ। “প্রগবৎছন্দসামিব” (রঘু ১ সর্গ)

৪ নির্যত অক্ষর বর্ণ বা মাত্রা নিবদ্ধ চতুশ্রপাদি পদ্য। ইহা
বেদের অঙ্গ। উপনিষৎ প্রভৃতিতে এই শব্দটির নানাবিধ
ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আরণ্যকাণ্ডের মতে পাপ
স্বৰ্গদ্বার করিবার জন্ত যে পুরুষকে আচ্ছাদন করে,

তাহাকে ছন্দঃ বলে (১)। তৈত্তিরীয়সংহিতার মতে বাহা
 বার্য্য সতীরমান অগ্নির উদ্ভাপ আচ্ছাদিত হয়, তাহার
 নাম ছন্দঃ (২)। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে অপমৃত্যু বারণ
 করিবার জন্য যে আচ্ছাদন করে তাহাকে ছন্দঃ বলা যায় (৩)।
 এই কয়টি মতেই নিজস্ব ছন্দ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে
 অমৃত্যু প্রত্যয় বার্য্য নিপাতনে 'ছন্দসূ' এই শব্দটি সিদ্ধ হই-
 রাচ্ছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পাণিনি চদি ধাতুর
 উত্তর অমৃত্যু প্রত্যয় করিয়া 'ছন্দসূ' এই শব্দটি সিদ্ধ করিয়া-
 ছেন। (চন্দ্রোদ্যোতঃ ৮। উপঃ ৪। ২১৮) ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তি
 অমৃত্যুর বাহাতে আচ্ছাদন জন্মায় বা আচ্ছাদিত করে
 তাহারই নাম ছন্দঃ এইরূপ যৌগিকার্থ হইতে পারে। মেদিনী-
 কার প্রকৃতি অভিধানিকগণ পশ্চের নামান্তর ছন্দঃ বলিয়া
 উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার "ছন্দোবন্ধপদং পঞ্চং"
 অর্থাৎ ছন্দোবিশিষ্ট পদ বা বাক্যকে পঞ্চ বলে, এইরূপ
 পশ্চের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যে পঞ্চ হইতে
 ছন্দঃ পৃথক্। বাস্তবিক পক্ষে লঘু, গুরুস্বর বা মাত্রার নিয়ম-
 বিশিষ্ট বর্ণবোজন্য নামই ছন্দঃ।

ইহার আদি বিবরণ পাইবার উপায় নাই। স্মৃতির কোন
 সময়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রথমে ছন্দ প্রকাশিত হয়, তাহা
 নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,
 ভাষা সৃষ্টির অব্যবহিত পরে কিংবা গ্রন্থরচনা প্রণালী আরম্ভ
 হইবার কিছুদিন পূর্বে ছন্দোনিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে।
 সমস্ত ভাষাকেই প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত বলা যাইতে
 পারে—পশ্চ, গীত ও গজ। ছন্দোবন্ধ বাক্যের নাম পশ্চ, গীত
 পশ্চের রূপান্তর এবং ছন্দোনিয়মশূন্য বাক্যকে গজ বলে। সর্ক-
 প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার আদি গ্রন্থ বেদ, বেদের পূর্ববর্তী কোন
 গ্রন্থ বা ভাষার অস্তিত্বের বিশেষ প্রমাণ নাই। বৈদিক
 ভাষাও তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পশ্চভাগের নাম ঋক্
 বা মন্ত্র, গীতের নাম সাম ও গদ্য ভাগের কতকংশ যজুঃ

এবং কতক অংশকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। ঋক্
 উপনিষৎ ও মনুস্মৃতি প্রকৃতির মতে বেদের ঋক্ অংশই প্রথম
 প্রকাশিত হইয়াছে (১)। ভাষার রচনা প্রণালী দুইটি ও ইহা
 স্বীকার করা যায় না। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে,
 ভারতের সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃত প্রাচীন, তাহাতে বৈদিক
 ভাষাই প্রাথমিক, আবার সেই বৈদিক ভাষার মধ্যেও যখন
 ঋক্ বা পদ্যংশ সর্ক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সপ্রমাণ,
 তখন মৌলিক সংস্কৃত ভাষার প্রথম অংশই যে পদ্য বা ছন্দো
 বন্ধ তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবে যদি
 বৈদিক ভাষার পূর্বে ব্যবহারিক গদ্যময় কোন ভাষা প্রচলিত
 ছিল কল্পনা করা যায়, তথাপিও আদিগ্রন্থ বেদের পূর্বে যে
 ছন্দোনিয়ম আবিষ্কার হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার
 করিতে হইবে। [ভাষা শব্দে ইহার অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই ছন্দঃ প্রধানতঃ বৈদিক ও লৌকিক এই দুইভাগে
 বিভক্ত। বৈদিক কালে যে কয়টি ছন্দের আবিষ্কার ও
 বেদে যে কয়টির ব্যবহার দেখা যায়, তাহাদিগকে বৈদিক
 এবং সেই কয়টিকে মূল করিয়া লৌকিক ভাষায় যে অসংখ্য
 ছন্দোনিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে সেইগুলিকে লৌকিক
 বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

ছন্দের প্রধান প্রয়োজন ভাষার লালিত্য, পদ্য যেমন
 কর্ণ মনকে আশ্রিত করিতে পারে, গদ্য শ্রবণে সেরূপ
 তৃপ্তিলাভ হয় না। পদ্য গভীর ভাব সজ্জপে লিখিত হয়,
 পদ্য সহজে অভ্যস্ত হয় এবং সহসা বিস্মৃত হয় না। গদ্যে
 এই কয়টি গুণ লক্ষিত হয় না। [পদ্য দেখ।] এতদ্বিধ
 বৈদিক ছন্দঃজ্ঞানের অল্প আবশ্যকতা আছে। ছন্দ
 না জানিয়া যজ্ঞ বা বেদের অধ্যাপনা করিলে পাপী হইতে
 হয় (২)। এই কারণে ইহাকে বেদের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা
 করা হয়। ইহা বেদের পাদ স্বরূপ। কাব্যের রস, গুণ ও
 দোষাদি সমস্ত বিষয়েই ছন্দের উপযোগিতা আছে। বৈদিক
 ছন্দ বেদ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদের
 ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ঋগ্ বেদিক ছন্দ বিষয়ে অনেক কথা
 উল্লেখিত আছে। কিন্তু তাহাতে ছন্দের বিশেষ জ্ঞানলাভ

(১) "পুত্রবত পাণসবন্ধঃ বারিহুত্মাচ্ছাদিতবাহুত্ব ইত্যুচ্যতে।
 তজ্জগদ্যাক্তে সমাহারতে। "হাবিরতি হবা এবং ছন্দাংসি পাণাং
 কর্ণণঃ।" (ঋক্ সাংগত্যাভ্যুতিকা)

(২) "প্রজাপতিরমিচ্ছিত সক্ষরপিতৃবা তিষ্ঠৎ। তং দেবা
 বিভ্রাতো নোপারন্ তে ছন্দোভিরাভ্যাসঃ হাবিরনোপারন্ তচ্ছন্দাং
 হনতুং।" (কৃকবজুঃ ৩। ৩। ১)

(৩) "অপমৃত্যুঃ বারিহুত্মাচ্ছাদিতবাহুত্ব ইত্যুচ্যতে।" (ঋক্ সাংগত্যাভ্যু-
 তিকা) "দেবাবি বৃত্তোর্বিত্যত প্রণীঃ বিদ্যাং প্রাচিন্যন্তে ছন্দোভি-
 রাভ্যাসমাচ্ছাদিত্ব দেবিরনোপারন্ তচ্ছন্দাং হনতুং।"

(ছান্দোগ্যোপঃ ১। ৩। ২)

(১) "তস্মাদ্ বজ্রাং সর্কতঃ ঋচঃ সামানি জজিরে। ছন্দাংসি
 জজিরে তস্মাদ্ বজ্রত্মাদকারত।" (ঋক্ ১০। ১০। ১) "তত্রৈতত্ত মহতো
 তুতত্ত নিবসিতবেতদুখোদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ক্যাদিরস" (উপনিঃ)
 "অগ্নিবারু রবিতান্ত ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনম্।

ছন্দোহ বজ্রসিদ্ধার্থস্বয়ং সামলক্ষণম্।" (মহু)

(২) "বোধ বা অবিদিতাধেরন্থো দৈবতব্রাহ্মণে মন্ত্রেণ ব্রাহ-
 মতি বাধ্যাপরতি বা হ্যুংবাচ্ছতি পতং বাপদ্যতি প্রবাসীয়েতে পাণিরাণ্ড
 তবতি" (ঋক্ সাংগত্যাভ্যুতিকাভূত কৃতি)

হয় না। কাভ্যায়ন সৰ্বসামুদ্রমণিকার সাতটি বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—১ গায়ত্রী, ২ উচ্চিক, ৩ অমৃষ্টুভ, ৪ বৃহতী, ৫ পংক্তি, ৬ ত্রিষ্টুপ, ৭ জগতী।

প্রথম ছন্দ গায়ত্রী, ইহাতে সৰ্ব সমেত ২৪টি অক্ষর বা স্বরবর্ণ থাকে। বৈদিক গায়ত্রী ছন্দ তিনটি চরণে বিভক্ত। গায়ত্রী হইতে চারি অক্ষর বেশী অর্থাৎ বাহাতে সৰ্ব সমেত ২৮টি অক্ষর থাকে, তাহার নাম উচ্চিক। এইরূপ অমৃষ্টুভ ৩২ অক্ষর, বৃহতী ৩৬, পংক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ ৪৪ এবং জগতী ছন্দঃ ৪৮ অক্ষরে বিভক্ত। ইহা অপেক্ষা অধিক অক্ষরের ছন্দ বৈদিক কালে আবিষ্কৃত হয় নাই। বেদের বিস্তৃত মন্ত্র-ভাগ মাত্র এই সাতটি ছন্দে প্রকাশিত, তন্মধ্যে প্রথম ছন্দটাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাভ্যায়ন এই সাতটি ছন্দের আবার কতকগুলি ভেদ স্থির করিয়াছেন। তাহা জানিতে হইলে কাভ্যায়নপ্রণীত সৰ্বসামুদ্রমণিকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মৌলিক সাতটি ছন্দকে অবলম্বন করিয়া ব্যবহারিক ভাষায় যে অনন্ত ছন্দোনিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই গুলিকেই লৌকিক ছন্দ বলা হয়। কিন্তু কোন্ দিন কোন্ ব্যক্তি প্রথমে লৌকিক ছন্দের আবিষ্কার করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে লিখিয়াছেন, আদিকবি বাঈকির মুখ হইতে “মা নিবাদ প্রতিষ্ঠাং-মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রোঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্।” এই শ্লোকটি নির্গত হইলে কিছুদিন পরে আত্রেয়ী গল্পচ্ছলে বনদেবতার নিকটে প্রকাশ করেন। তাহা শুনিয়া বনদেবতা বলিলেন, “চিত্রং আশ্বিনাদজ্ঞোহং নূতনছন্দসামবতারঃ।” (উত্তরচঃ ২ অঃ) আশ্চর্য্য! বেদ হইতে নূতন ধরণের ছন্দের অবতারণা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে ভবভূতির মতে বাঈকিই প্রথমে লৌকিক ছন্দের আবিষ্কার করেন এবং সৰ্বপ্রথমে অমৃষ্টুভ ছন্দই লৌকিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বাঈকির রামায়ণপাঠে জানা যায় যে নারদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া মহর্ষি তমসা নদীতে স্নান করিতে যান। তথায় ব্যাধ কর্তৃক বকসিধূনের একটিকে নিহত দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে “মানিবাদ” ইত্যাদি শ্লোকটি নির্গত হয়। অশ্রুতপূৰ্ণ লৌকিক ছন্দের আবির্ভাবে বাঈকি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমি কি বলিতেছি! ইহা গদ্য, না পদ্য (১)।” ইহাতেও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আদি

কবি বাঈকি হইতেই লৌকিক ছন্দের প্রথম অবতারণা। রামায়ণের প্রাচীন টীকাকার তীর্থ প্রভৃতি অনেকেই এই তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক টীকাকার রামানুজ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বাঈকির পূর্বেও লৌকিক ছন্দ চলিত ছিল। [রামায়ণ আদিকাণ্ড ২ সর্গ ১৫ শ্লোকের রামানুজকৃত টীকা দেখ।]

লৌকিক ছন্দের অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে মহর্ষি পিন্ডল কৃত ছন্দগ্রন্থই প্রথম রচিত হয়।

পিন্ডলাচার্য্য ১, ৬৭, ৭৭, ২১৬ প্রকার বর্ণ বৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছন্দোরাশির মধ্যে সংকৃত সাহিত্যে সচরাচর অম্লান ৫০টি মাত্র ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আধুনিক ছন্দঃ—একাক্ষরা বৃত্তির নাম উচ্চা ১ ত্রী। দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি অত্যাচ্চা—১ ত্রী, ২ মধু, ৩ মহী, ৪ সার। ত্র্যক্ষরা বৃত্তি মধ্যা—১ নারী, ২ বৃগী, ৩ শলী, ৪ রমণ, ৫ পঞ্চাল, ৬ মুগেন্দ্র, ৭ মন্দর, ৮ কমল। চতুরক্ষরা বৃত্তি প্রতিষ্ঠা—১ কন্তা, ২ সতী, ৩ দ্রাবি। পঞ্চাক্ষরাবৃত্তি সুপ্রতিষ্ঠা—১ পংক্তি, ২ প্রিয়া, ৩ সম্মোহা, ৪ হাবীনবন্ধ, ৫ বমক। ষড়াক্ষরাবৃত্তি গায়ত্রী—১ তমুমধ্যা, ২ শশিবদনা, ৩ সোমরাজী, ৪ বাণী, ৫ বহুমতী, ৬ তীর্ণা, ৭ বিঘোষা, ৮ মহান, ৯ মালতী, ১০ দমনক। সপ্তাক্ষরা বৃত্তি উচ্চিক—১ মধুমতী, ২ কুমারললিতা, ৩ মদলেখা, ৪ হংসমালা, ৫ সুমালী, ৬ সুবাস, ৭ করহক, ৮ শীর্ষ। অষ্টাক্ষরা বৃত্তি অমৃষ্টুপ—১ চিত্রপদা, ২ মানক, ৩ বিদ্যামালা, ৪ সমা-নিকা, ৫ প্রমাণিকা, ৬ গজপতি, ৭ হংসরক্ত, ৮ বিতান, ৯ নারা-চিকা, ১০ মল্লিকা, ১১ তুল, ১২ কমল। নবাক্ষরাবৃত্তি বৃহতী—১ ভূজগণিভূতা, ২ মণিমধ্যা, ৩ ভূজঙ্গমকতা, ৪ হলমুখী, ৫ ভদ্রিকা, ৬ কমলা, ৭ রূপমালী, ৮ মহালক্ষ্মী, ৯ সারঙ্গিকা, ১০ পবিত্রা, ১১ বিশ্ব, ১২ তোমর। দশাক্ষরাবৃত্তি পংক্তি—১ রত্ন-বতী, ২ মন্তা, ৩ স্বরিতগতি, ৪ মনোরমা, ৫ শুদ্ধবিরাট, ৬ পশব, ৭ ময়ূরসারিণী, ৮ উপস্থিতা, ৯ দীপকমালা, ১০ হংসী, ১১ সংবৃত্ত, ১২ সারবতী, ১৩ সুমহা। একাদশাক্ষরাবৃত্তি ত্রিষ্টুপ—১ ইন্দ্রবজ্রা, ২ উপেন্দ্রবজ্রা, ৩ উপজাতি, ৪ সুমুখী, ৫ শালিনী, ৬ বাতোদ্রি, ৭ ভ্রমরবিলসিত, ৮ অম্বুজা, ৯ রথোদ্ধতা, ১০ স্বাগতা, ১১ দোষক, ১২ মোটমক, ১৩ জেনী, ১৪ বৃত্তা, ১৫ ভদ্রিকা, ১৬ উপস্থিত, ১৭ শিখণ্ডিত, ১৮ উপ-চিত্র, ১৯ কুপুকবজ্রনিতা, ২০ অনবসিক্তা, ২১ বিশ্বকমালা, ২২ সাজপদ, ২৩ ক্রতা, ২৪ ইন্দ্রিয়া, ২৫ দমনক, ২৬ মালতী-মালা। দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি জগতী—১ চন্দ্রবজ্র, বংশবিল, ৩ ইন্দ্রবংশা, ৪ অসোদ্ধতগতি, ৫ ভূজঙ্গপ্রায়ত, ৬ ভোটক, ৭ অধিলী, ৮ বৈমল্যলী, ৯ প্রমিতাক্ষরা, ১০ ক্রতবিলম্বিত, ১১

(১) “ভসোক্তাঃ ক্রবতশ্চিদ্ভা বহুং ছদি বীকতঃ।

শোকাক্রোধান্ত পক্ষুণেঃ কিমিধঃ বাস্তবং মল।”

(বাল্মীকি ১২.১৬)

মঙ্গলিকা, ১২ কুহুমবিচিত্রা, ১৩ ভামরস, ১৪ মালতী, ১৫ মণিমালা, ১৬ জলধরমালা, ১৭ পুষ্ট, ১৮ প্রিয়দর্শনা, ১৯ ললিতা, ২০ উজ্জ্বলা, ২১ নবমালিকা, ২২ ললনা, ২৩ ললিত, ২৪ ক্রতপদ, ২৫ বিদ্যাধার, ২৬ পঞ্চ চামর, ২৭ সারঙ্গ, ২৮ মৌক্তিকদাম, ২৯ মোটক, ৩০ তরলনরল। ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি অতিজগতী—১ প্রহরীণী, ২ কচিরা, ৩ মন্তময়, ৪ চণ্ডী, ৫ মন্তাবিণী, ৬ চন্দ্রিকা, ৭ কলহংস, ৮ প্রবোধিতা, ৯ যুগেন্দ্রমুখ, ১০ চঞ্চলিকাবলী, ১১ চন্দ্রলেখ, ১২ উপস্থিত, ১৩ মন্তাসিনী, ১৪ কুটজগতী, ১৫ কন্দুক, ১৬ প্রভাবতী, ১৭ ভায়কা, ১৮ পঞ্চালী। চতুর্দশাক্ষরা বৃত্তি শর্করী—১ অসংবাধা, ২ বসন্ততিলক, ৩ অপরাঞ্জিতা, ৪ প্রহরণ-কলিকা, ৫ বাসন্তী, ৬ লোলা, ৭ নাসীমুখী, ৮ ইন্দুবদনা, ৯ নদী, ১০ লক্ষী, ১১ সুপবিত্র, ১২ মধ্যক্ষমা, ১৩ কুটিল, ১৪ প্রমদা, ১৫ মঞ্জরী, ১৬ কুমারী, ১৭ অকেশর, ১৮ চন্দ্রোদয়, ১৯ বাসন্তী, ২০ ক্রতপদ, ২১ কুরুরীকতা। পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি অতিশর্করী—১ শশিকলা, ২ অক, ৩ মণিগুণনিকর, ৪ মালিনী, ৫ লীলাখেল, ৬ বিপিনতিলক, ৭ তুংক, ৮ চন্দ্রলেখা, ৯ চিত্রা, ১০ প্রভক্তক, ১১ মেলা, ১২ চন্দ্রকান্তা, ১৩ উপমালিনী, ১৪ স্বভট, ১৫ মানসহংস, ১৬ নলিনী, ১৭ নিশিলালক। ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি অষ্টী—১ চিত্র, ২ স্বভটগজবিলসিত (গজ-তুরগবিলসিত), ৩ চকিতা, ৪ পঞ্চচামর, ৫ মদনললিতা, ৬ বাগিনী, ৭ প্রবরললিত, ৮ অচলধৃতি, ৯ গরুড়রুত, ১০ ধীরললিতা, ১১ অশ্বগতি, ১২ মণিকল্পলতা, ১৩ রূপ, ১৪ বরযুবতী। সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি অত্যষ্টী—১ শিখরীণী, ২ পৃথ্বী, ৩ বংশপত্রপতিত, ৪ মন্ডাকান্তা, ৫ হরিণী, ৬ নন্দটক, ৭ কোকিলক, ৮ হারিণী, ৯ ভারাকান্তা, ১০ হরি, ১১ কান্তা, ১২ রতিশারিনী, ১৩ পঞ্চচামর, ১৪ মালাধর। অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি ধৃতি—১ কুহুমিতলভাবেন্নিতা, ২ নন্দন, ৩ নারচ, ৪ চিত্রলেখা, ৫ শার্দূলললিত, ৬ হরিণপুতা, ৭ অশ্বগতি, ৮ সুধা, ৯ ভ্রমরপদক, ১০ শার্দূল, ১১ কেশর, ১২ চল, ১৩ লালসা, ১৪ গজেন্দ্রলতা, ১৫ সিংহবিন্দুজিত, ১৬ হরনর্তন, ১৭ ক্রীড়াচক্র, ১৮ চন্দ্রলেখা, ১৯ হীরক। ঊনবিংশতাক্ষরা বৃত্তি অতিধৃতি—১ মেঘবিন্দুজিতা, ২ ছায়া, ৩ শার্দূলরিকী-ড়িত, ৪ তুরসা, ৫ কুন্দদাম, ৬ পঞ্চচামর, ৭ বিব, ৮ মকর-চন্দ্রিকা, ৯ মণিমঞ্জরী, ১০ সমুজ্জ্বলা। বিংশতাক্ষরা বৃত্তি ক্রতি—১ সুবদনা, ২ গীতিকার, ৩ বৃত্ত, ৪ শোভা, ৫ সুবংশা, ৬ মন্তেতমিকীড়িত। একবিংশতাক্ষরা বৃত্তি প্রকৃতি—১ প্রহরী, ২ সরসী, ৩ সিংহক। দ্বাবিংশতাক্ষরা বৃত্তি আকৃতি—১ হৃদী, ২ মঙ্গিলা, ৩ ভক্তক, ৪ মালিক্য, ৫ মহাপ্রহরী। ত্রয়ো-

বিংশতাক্ষরা বৃত্তি বিকৃতি—১ অক্লিষ্টমরা, ২ অশ্বললিত, ৩ মন্ডাকীক, ৪ কুন্দরিকা। চতুর্বিংশতাক্ষরা বৃত্তি সংকৃতি—১ তরী, ২ কীরীট, ৩ হুর্দিল। পঞ্চবিংশতাক্ষরা বৃত্তি অতি-কৃতি—১ ক্রৌঞ্চপদ। ষড়বিংশতাক্ষরা বৃত্তি উৎকৃতি—১ কুন্দ-বিন্দুজিত, ২ অগবাহ। সপ্তবিংশতাক্ষরা বৃত্তি দণ্ডক—১ চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত, ২ অর্ণ, ৩ অর্ণব, ৪ ব্যাল, ৫ জীমূত, ৬ লীলাকর, ৭ উদ্দাম, ৮ শঙ্খ, ৯ আরাম, ১০ সংগ্রাম, ১১ সুবাম-বৈকুণ্ঠ, ১২ লার, ১৩ কাসার, ১৪ বিসার, ১৫ সংহার, ১৬ নীহার, ১৭ মন্দার, ১৮ কেদার, ১৯ আসার, ২০ সংকার, ২১ সংকার, ২২ মাকন্দ, ২৩ গোবিন্দ, ২৪ লানন্দ, ২৫ সন্দোহ, ২৬ আনন্দ, ২৭ প্রতিভ, ২৮ কুহুমস্তবক, ২৯ মন্তমাতঙ্গ, লীলাকর, ৩০ অনঙ্গশেখর, ৩১ অশোকপুষ্পমঞ্জরী, ৩২ সিংহ-বিক্রীড়, ৩৩ অশোকমঞ্জরী, ৩৪ সিংহবিক্রান্ত, ৩৫ ভূজদ-বিলাস, ৩৬ কামবাণ।

লৌকিক ছন্দগুলি প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত—বৃত্ত ও মাত্রা-বৃত্ত। যে সকল ছন্দে স্বর সংখ্যা ও লঘু গুরুর নিয়ম আছে, তাহার নাম বৃত্ত এবং যাহাতে স্বর সংখ্যার নিয়ম নাই, কেবল মাত্রার নিয়ম করা যায়, তাহাকে মাত্রা-বৃত্ত বলে। বৃত্ত আবার তিনভাগে বিভক্ত সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিবম বৃত্ত। যাহার চারিটা চরণ সমান তাহার নাম সমবৃত্ত। যে সকল ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণ এক লক্ষণাক্রান্ত এবং অপর দুই চরণ তাহা হইতে তির লক্ষণযুক্ত, তাহার নাম অর্ধসম এবং যে সকল ছন্দের চারিটা চরণই তির লক্ষণে লক্ষিত তাহার নাম বিবম। সমবৃত্তের ভেদ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্ধসমবৃত্ত—১ উপচিহ্ন, ২ বেগবতী, ৩ হরিণ-পুতা, ৪ অপরবজ্র, ৫ পুষ্পিতাগ্রা, ৬ সুন্দরী, ৭ ক্রতমধ্যা, ৮ ভদ্রবিরটি, ৯ কেতুমতী, ১০ আধ্যানকী, ১১ বিপরিত-পূর্বা, ১২ কোমুদী, ১৩ মন্তসোরত, ১৪ মালভারিণী। বিবমবৃত্ত—১ উদাতা, ২ সোরতক, ৩ ললিত, ৪ বজ্র, ৫ প্রচুপিত, ৬ বর্দ্ধমান, ৭ আর্ষভ, ৮ শুদ্ধবিরটি। মাত্রাবৃত্ত আখ্যা—১ লক্ষী, ২ স্বকি, ৩ বুদ্ধি, ৪ লজ্জা, ৫ বিভা, ৬ কমা, ৭ দেবী, ৮ গোরা, ৯ স্নাত্তি, ১০ চূর্ণা, ১১ ছায়া, ১২ কান্তি, ১৩ মহামায়া, ১৪ কীর্ষি, ১৫ সিদ্ধা, ১৬ মনোরমা, ১৭ গাহিনী, ১৮ বিধা, ১৯ বাসিতা, ২০ শোভা, ২১ হরিণী, ২২ চক্রী, ২৩ সারসী, ২৪ কুরুরী, ২৫ সিংহী, ২৬ হংসী, ২৭ গীতি, ২৮ উপ-গীতি, ২৯ উদরীতি, ৩০ বৈতালী, ৩১ ঔপচন্দসিক, ৩২ আপাতলিকা, ৩৩ দক্ষিণান্তিকা, ৩৪ উদীচ্যবৃত্তি, ৩৫ প্রোচ্য-বৃত্তি, ৩৬ প্রবৃত্তক, ৩৭ পরান্তিকা, ৩৮ চারুহাসিনী, ৩৯ অচল-বৃত্তি, ৪০ মাত্রাসমক, ৪১ বিদ্রোহ, ৪২ নবাসিকা, ৪৩ চিত্রা,

৪৪ উপচিহ্না, ৪৫ পাদাকুলক, ৪৬ শিখা, ৪৭ খজা, ৪৮ অনঙ্গ-
ক্রীড়া, ৪৯ রুচিয়া। এতদ্ব্যতীত পদ্মটিকা, গাথা প্রভৃতি
আর কতকগুলি ছন্দ আছে। তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে
হইলে পিকলকৃত ছন্দোগ্রন্থ ও ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

[এখানে ছন্দের নামমাত্র লিখিত হইল তাহার লক্ষণ ও
উদাহরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সংস্কৃত ভাষার ভাষ্য পরবর্তী ভাষারও ছন্দোনিয়ম আছে।
বাক্যলা ভাষার পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, এই
ভাষা সৃষ্টির অনেকদিন পরে যখন ইহার অঙ্গ পূর্ণ হইয়া
আসিতে লাগিল এবং এই ভাষার গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন
উপস্থিত হইল, সেই সময়ে ইহাতে ছন্দোনিয়মের আবিষ্কার
হয়। এই ভাষার সর্ব প্রথমে পরার ছন্দের আবিষ্কার হই-
রাছে। আদিম বঙ্গভাষার গ্রন্থ পরারে লিখিত, দিন দিন
উন্নতি হইয়া পরার ভিন্ন অপরাপর অনেক ছন্দ ইহাতে সন্নি-
বিষ্ট হইয়াছে। বাক্যলার ছন্দ নিয়ম সংস্কৃত ছন্দ নিয়ম
হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্থলবিশেষে স্মরণীয়
ব্যঞ্জনবর্ণও একটি অঙ্গর বলিয়া ধরা হয়। ১ পরার, ২ ত্রিপদী,
৩ লঘু ত্রিপদী, ৪ ভূজ্ঞ প্রয়াত, ৫ তুণক, ৬ অমিতাকর
প্রভৃতি ছন্দ বাক্যলার ব্যবহৃত হইয়াছে। [অপর বিবরণ
বাক্যলা ভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ছন্দস্কৃত (ত্রি) গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত। “বোধো-দিতেন বিধিনা
নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ। ব্রহ্মছন্দস্কৃতং চৈব বিজ্ঞো যুক্তো
হনাপদি।” (মহু ৪।১০০:) “ছন্দাসি গায়ত্র্যাদীভিঃপ্রত্যনি
তৈঃ কৃতং যুক্তং ব্রহ্ম ঋক্‌সাম। অনেকার্থকাং করোতেরমর্থো
ব্যাখ্যারতে। যথা গায়মন্ কুরু ইতি সংহারে, পৃষ্ঠং কুরু
ইত্যাদিনে। এবমত্র বুজে রর্থে বর্ততে” (মেধাতিথি)

ছন্দস্ত্র (ত্রি) ছন্দোভাবঃ ছন্দস্ব-বৎ (ছন্দসৌযদগৌ। পা ৪।৩।৭১)
১ ছন্দোযুক্ত ছন্দঃ হইতে উৎপন্ন। “ছন্দস্ত্রাং বাচং বদন”
(ঋক্ ৯।১১৩।৬) “ছন্দস্ত্রাং সপ্তছন্দোভিঃ কৃতাং তেহু ভবাং”
(সারণ) ছন্দসা ইচ্ছয়া নির্মিতঃ ছন্দস্ব-বৎ “ছন্দস্ত্র নির্মিতে”
‘ছন্দসা নির্মিতঃ ছন্দস্ত্রঃ। ইচ্ছা পর্যায়ঃছন্দঃ শব্দঃ’। (বৃত্তি)
(পা ৪।৪।৯৩) ২ অভিলাষ দ্বারা সম্পাদিত।

ছন্দস্বৎ (ত্রি) ছন্দস্ব-মত্প মন্ত বস্তুক। প্রশস্ত ছন্দোযুক্ত।
“ছন্দস্বতী উবসা পেপিশানে” (ভৈত্তিরীয়সং ৪।৩।১১।১)

ছন্দঃস্বত্ (ত্রি) ছন্দসা ভৌতি ছন্দঃ-স্ব-কিপ্। যিনি ছন্দঃ দ্বারা
স্তব করেন। “ছন্দঃ স্বতঃ পতত্রি রাজত”। (ভাগ ৫।২।৫।৮)

ছন্দঃস্বত্ (ত্রি) ছন্দসা ভৌতভেদে ভূতভেদে বা ছন্দঃ-স্বত্-কর্তৃরি
কর্মণি বা কিপ্। যিনি ছন্দঃ দ্বারা ভূতি করেন বা বাঁহাকে
ছন্দঃ দ্বারা ভূতি করা যায়। “ছন্দঃস্বতঃ কুমদস্তবঃ” (ঋক্

৫।২।১২) ‘ছন্দঃস্বতঃ’ ‘ছন্দোভিঃ’ ভৌতারঃ স্বা-যে
ছন্দঃস্বতঃ ছন্দোভিঃস্বত্যাঃ’ (সারণ) ছন্দসা পক্ষেণ স্বত্যাতি
আচ্ছাদয়তি স্ব্যমিতি শেষঃ কর্তৃরি কিপ্। (পুং) ২ স্ব্য-
সারথি, অরুণ। পিতামহ ব্রহ্মা রবির ত্রিলোকদাহক
ভেজোরশি দেথিয়া কতপদ্মত অরুণকে স্ব্যের সারথি-
পদে নিযুক্ত করেন। মহাকার অরুণ সমুখে থাকার মার্ভেণ্ডের
প্রচণ্ড কিরণরাশি ধর্য হইয়াছে। (ভারত আদি ২৪ অঃ)
ছন্দু (ত্রি) যিনি কোন কার্যে প্রবৃত্তি লওয়ান, উপছন্দয়িতা।
“ব্রাহ্মস্বত্ববতি হর্যাতর” (ঋক্ ১।৫।৫।৪) ‘হর্যাতঃ প্রেমাবতো-
বিযকত-ছন্দুরূপ ছন্দয়িতা ভবতি। বিযক্যঃ পুরুবাণাং বাগে
মতিমুৎপাদয়তি।” (সারণ)

ছন্দুকী, মূলতান প্রদেশস্থ একটা জেলা। বস্তার সময় সিদ্ধ,
লার্ঘ্য ও আকুল নদী ইহার চারিদিকে ঘেরিয়া কেলে। ইহার
ভূমি অতিশয় উর্বরা।

ছন্দোগ (পুং) ছন্দো বেদবিশেষঃ সামেত্যর্থঃ গারভি ছন্দঃ গৈ-
টক্। (গাপোষ্টক্। পা ৩।২।৮) ১ সামগ, সামবেদজ্ঞ।
“বহ্নেন ভোজয়েচ্ছাদ্ধে বহুচং বেদপারগং।

শাখান্তগমধারব্য ছন্দোগন্ত সমাপ্তিকম্।” (মহু ৩।১৪৫)
ছন্দোগপরিশিষ্ট (স্ত্রী) ছন্দোগেন সামগেন কাভ্যারনেন
কৃতং পরিশিষ্টং মধ্যলোং। কাভ্যারনকৃত সামবেদোক্ত
কর্মবোধক গোভিলহত্বের পরিশিষ্ট।

ছন্দোগমাহকি (পুং) একজন বৈদিক আচার্য্য।

ছন্দোদেব (পুং) মতঙ্গ নামক চণ্ডাল, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও
নাপিতের ঔরসে ইহার উৎপত্তি। এই মতঙ্গ জাতি
সাক্ষ্য হেতু ব্রাহ্মণ্যহীন হইয়া তপস্তা করে। দেবরাজ
ইন্দ্র তাহার তপস্তার তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলে
সে ব্রাহ্মণ্যলাভের বর প্রার্থনা করিল। দেবরাজ কহিলেন,
অস্তবর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিল, ‘প্রভো! নিতান্তই
যদি আমাকে ব্রাহ্মণ না করেন, তবে এই বর প্রদান
করুন, বাহাতে আমি যথেষ্টাচারী কামরূপী বিহঙ্গ হই
ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলের কাছে পূজা লাভ করিতে
পারি।’ ইন্দ্র কহিলেন, “তথাস্ত, অস্ত হইতে তুমি ছন্দোদেব
নাম ধারণ করিলে। জ্ঞীলোকেরা তোমার পূজা করিবে।”
এই বর দিয়া ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন। (ভারত ১৩।২৯ অঃ)

ছন্দোনামনু (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ছন্দের নাম। বহুব্রী।
(ত্রি) ২ ছন্দোনামক। ‘ছন্দঃ’ এই নামবিশিষ্ট। “ছন্দোনা-
মানাং সাম্রাজ্যং গচ্ছতি” (বালসেনেনসংহিতা ৪।২৪)

ছন্দোভাষা (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ছন্দের ভাষণ, ছন্দের কথন।
ভতো ভবে তদ্ব্যাখ্যানে গচ্ছে ছন্দোভাষঃ ছন্দোভাষা

অগরনাদিবাণ্। (অগরনাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ২ উলাদ-
নাভ্যভেদ। (দেবীপুরাণ)।

ছন্দোম (পুং) ত্রিভুক্ত্য বা তিনদিনসাধ্য অহীনবাগভেদ।
(‘ত্রাহাঃ ত্রিভুক্ত্যঃ পঞ্চ অহীনাঃ।’ কক্ক) রাজ্য অভিলাষ
করিয়া এই বাগ করিতে হয়।

“বিত্তীয়ে ত্রিভুক্তোহতিরাভ্যঃ সর্কে। রাজ্যকামস্ত” (কাভ্যা°
শ্রৌ° ২।৩২৮)

ছন্দোমদশাহ (পুং) দশদিনসাধ্য বাগভেদ। পঞ্চকামীরা
এই বাগ করিয়া থাকে। “ছন্দোমদশাহঃ পঞ্চকামস্ত।”

(কাভ্যা° শ্রৌ° ২।৩৫১২৮)

ছন্দোময় (ত্রি) ছন্দঃ-ময়ট। ১ গায়ত্র্যাদি ছন্দোময়। ২ বেদ-
ময়। “ছন্দোমরো মধ্যমরোহিষিল দেবতাভ্য” (ভাগ° ২।৭।১১)

ছন্দোমান (ক্লী) ৬তৎ। ছন্দের মান।

ছন্দোমালা (ক্লী) ৬তৎ। ছন্দঃসমূহ।

ছন্দোমুটস্তোম (ক্লী) ছন্দোভেদ।

ছন্দোবিচিতি (ক্লী) ৬তৎ। ১ ছন্দঃসমূহ। ততোভবে
ব্যাখ্যানে বা অগরনাদিবাণ্ ছন্দোবিচিতিঃ। ২ তন্মাক
ছন্দোগ্রহ।

ছন্দোবৃত্ত (ক্লী) অক্ষরসম্ব্যাত ছন্দঃ। “ছন্দোবৃত্তেন্তে বিবিধৈ-
রযিতং বিদ্বাং প্রিয়ম্।” (ভারত ১।২৪।

ছন্দ (ত্রি) ছন্দ-স্ত। ১ আচ্ছাদিত। ২ লুপ্ত। ৩ নির্জন। (ক্লী)
৪ রহঃ। “ছন্দেষপি স্পষ্টতরেব যত্র।” (মাঘ)

ছন্দমতি (ত্রি) ছন্দা লুপ্তমতির্ভক্ত বহুব্রী। নষ্টবুদ্ধি, যাহার
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইরাছে।

ছন্দবেশিন্ (ত্রি) ছন্দবেশ-অন্ত্যার্থে ইনি। ছন্দবেশধারী,
মারাবী।

ছন্দর (দেশজ) নৌকাদির ছাদ।

ছন্দরবল্লী, ধারবাড় জেলায় একটা গ্রাম। এখানে হনুমানের
একটা প্রাচীন মন্দির ও তথায় একখানি শিলালিপি আছে।

ছন্দরবন্দ, পুণা ও হাবেলীবাসী জাতিবিশেষ, ইহার রাজপুত
কুলোদ্ভব। ছন্দর অর্থাৎ খড়ের বর নির্মাণ করে বলিয়া
ছন্দরবন্দ আখ্যা পাইরাছে। ইহার বলে যে প্রায় দেড়শত
বর্ষেরও পূর্বে রাজপুতানা হইতে খ্রীপুত্র সহ একশত রাজপুত
জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পুণার আসিয়া বাস করে। ইহার
ভবানীদেবীর উপাসক। পুরুষগণ দীর্ঘশিখা ও গৌক রাখে,
কিন্তু স্ত্রীরা না এবং মহারাষ্ট্রদিগের জায় পাগড়ী
পরে। জীলোকদিগের পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী রমণীগণের জায়।
ইহার পয়লার হিন্দীভাষার, কিন্তু অপর লোকের সহিত মরাঠী
ভাষার কথাবার্তা কর। ইহার সকলেই প্রায় কুকুর পুবে।

পরদেশী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। পুত্রদের ১২ হইতে ২৫
এবং কস্তাগণের ১০ হইতে ২০ বর্ষ বয়স মধ্যে বিবাহ দেয়।
ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।
সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক খৃঃাব্দে রাখিবার নিষেধ হওয়ার
ইহাদের ব্যবসা উঠিয়া যাইতেছে। ইহার অতিশয় দরিদ্র;
কিন্তু পরিশ্রমী, শান্ত ও কষ্টসহিষ্ণু।

ছন্দচ্ছমিত (ক্লী) শব্দভেদ। “অলন্ মাংসবসামেদচ্ছমচ্ছমিত-
সম্বলন্।” (মার্কণ্ডেয় ৮।১১১)

ছন্দ (পুং) পিতৃহীন বালক, ছেমড়া।

ছন্দট (অব্য) ১ অন্তর ব্যবধান। “যজ্ঞমুখস্ত চ ছন্দটকারার।”
(শতপথ ১৩।৪।১।১৪) ‘অচ্ছন্দটকার অনন্তরার’। (সারণ)

ছন্দ (ষট্ শব্দজ) ছন্দ সংখ্যা।

ছন্দ (ক্লী) ছন্দ-ভাবে যঞ্। বমন, ছন্দি।

ছন্দিন (ক্লী) ছন্দ-ভাবে লুট। ১ বমি, ছন্দি।

“ছন্দিনঃ দধুদমিত্যামথবা তত্বাশ্বনা” (শুশ্রূত ৪।১০)
কর্ত্তরি ল্যা। (পুং) ২ অলম্বয় রাক্ষস। হেতৌ গিচ্-লুট। ৩ অলম্বয়,
তিংলাউ। ৪ নিম্ববৃক্ষ। ৫ মদনবৃক্ষ। (ত্রি) ৬ বমনকারী।

ছন্দাপনিকা (ক্লী) ছন্দ বমন আপন্নতি প্রাপন্নতি ছন্দ-আপ-
ল্যা, ততঃ স্বার্থে কন্-টাপু অত ইচ্-চ। কর্কটী, কাঁকড়া। (রাজনি°)

ছন্দি (ক্লী) ছন্দ-হেতৌ গিচ্-ইন্। বমনরোগ। পর্যায়—প্রচ্ছ-
দিকা, ছন্দ, বমধু, বমন, বমি, ছন্দিকা, ছন্দীকা, বাস্তি,
উৎগার, ছন্দিন, উৎকাসিকা। অতিশয় তরল, তৈলাক্ত, কটু ও
লবণাক্ত এবং বাহার ধাতুতে যাহা সহ হয় না এইরূপ
পদার্থ ভোজন, শ্রম, ভয়, উদবেগ, অজীর্ণতা, ক্রিমিদোষ ও
অসময়ে অতিশয় ভোজন এবং অল্প বীতভ্রম হেতু গতিশীল ও
ক্রতাহারীর ছন্দিরোগ জন্মে। হিকা, উৎগার, রোধ, মুখ
হইতে জলস্রাব ও আহারে অরুচি ইহাই পূর্ণলক্ষণ। বাতজ
ছন্দি হ্রস্ব, পার্শ্ব ও নাভিতে শুলের জ্বাৰ বেদনা ধরে, মুখ শুষ্ক
হয় এবং অতি কষ্টে অল্প অল্প সফেন কষায় ক্লমবর্ণ বমি হয়,
হইবার সময় গলার শব্দ অধিক হয়।

পিত্তজ ছন্দি মুচ্ছ্রী, পিপাসা, মুখশোষ, শির, তালু ও অন্ধি
প্রভৃতির সম্ভাপ এবং বমনকালে গাত্রদাহ হয়। পিত্তজ
ছন্দি পীত ও হরিদ্বর্ণ এবং অতিশয় তিক্ত।

শ্লেষ্মজ ছন্দি শ্লিষ্ণ, বন, স্বাদ ও বিড়ক। ইহাতে মুখের
আব্রাদ থাকে, নাক বা মুখ দিয়া কক উঠে, নিদ্রা হয়।
আহারে রুচি থাকে। বমনকালে অল্প কষ্ট ও লোমহর্ষ হইরা
থাকে।

ত্রিদোষজ ছন্দি লবণ ও অন্নরস এবং অতিশয় উষ্ণ। ইহার
রং নীল বা লোহিত। ইহাতে শূল, অশ্লোক, অরুচি, দাহ,

ছদ্ম, খাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আগন্তক ছদ্ম পাঁচপ্রকার—
বধা বীভৎসজ, দৌষজ, আমজ, অসাত্তজ ও ক্রিমিজ।

ক্রিমিজ ছদ্মিতে ক্রিমিদোষ ও ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা
যায়। ইহাতে শূলব্যথা ও হিঙ্গা হইয়া থাকে। কণি অবহার
ক্রিমিজ ছদ্মি যদি লোপ ও শোণিত পূর্ববৃত্ত হয়, তাহা হইলে
অসাধ্য জানিবে। ছদ্মির উপক্রম—কাস, খাস, হিঙ্গা, কৃষ্ণা,
বৈচিত্র্য ও ক্ষয়রোগ।

ঔষধ—অধগন্ধা ও হরীতকী চূর্ণ জল দিয়া কিংবা হরীতকী
ও কুঠি গুড়া করিয়া ঐ গুড়া ঠাণ্ডা জল দিয়া এক গাল পান
করিবে। গুলক, কুঠি, অরিষ্ট, ধনে ও রক্তচন্দন এ গুলিও
ছদ্মির উপকারক। মধু দিয়া বিষ মূল ও গুলকসিক্ত জল
পান করিলে অথবা চালুনী জলে দুর্কা ঝাটিয়া খাইলে ত্রিবিধ
ছদ্মিনাশ হয়। বাতজ ব্যাধীত আর সকল ছদ্মিতে লজ্জন
দিবে।

ছদ্ম শুদ্ধ করিয়া তাহাতে জল দিয়া পান করিলে অথবা
মুগ ও আমলাযুগ স্বতসৈকবসংযুক্ত করিয়া পান করিলে
বাতজ ছদ্মি ভাল হয়।

শিত্তজ ছদ্মিতে গুলক, ত্রিফলা, নিম্ব ও পটোল সিদ্ধ জল
মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ককজ ছদ্মিতে বিড়ল,
ত্রিফলা ও পেপুলের চূর্ণ অথবা বিড়ল, মব (কেউটে মুখা) ও
গুঠের চূর্ণ মধু দিয়া পান করিবে।

ধাইকল, চিনি ও খই একত্র বাটিবে পরে তাহাতে একপল
মধু ও বজ্রিশ তোলা জল দিবে, কাপড়ে ছাকিয়া পান করিলে
তাহাতে ত্রিদোষজ ছদ্মি নষ্ট হয়। গুলকসিক্ত জল ঠাণ্ডা
করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলেও ত্রিদোষ ছদ্মির পক্ষে
উপকারী। কচিকর ফল খাইলেও বীভৎসজ বমি, বাহিত
ফল ভোজনে দৌষজ, লজ্জন দ্বারা আমজ ও অসহ্য বস্ত
ভোজনাদি অনিত ছদ্মি, ধাতুতে বাহা সহ হয়, একরূপ জিনিস
খাইলে ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

ছদ্মিকা (স্ত্রী) ছদ্মি-স্বার্থে কন্ ত্রিগা টাপ্ যথা ছদ্মিতি ছদ্মি
খুল্ টাপ্ অত ইয়ক। ১ বিকৃজাভা, একপ্রকার বৃক্ষ।
অপরাজিতা গাছ। ২ উৎকাসিকা। ৩ বমন।

ছদ্মিকারিপু (পুং) ৬তম্। কুশ্মেলা, গুজরাটী এলাচ।

ছদ্মিষ (পুং) ছদ্মি-হস্তি ছদ্মি-হনু-টক্। নিম্ববৃক্ষ, নিম্বগাছ।

ছদ্মিষ্প (ত্রি) ছদ্মি-গৃহং পাতি রক্ততি ছদ্মি-পা-ফ। গৃহ
পালক। “যাতং ছদ্মিষ্পা উত্তন পরম্পা” (কৃষ্ণ ৯৯।১১)

‘ছদ্মিষ্পো, ছদ্মিষ্পিতি গৃহ-নাম। তত্তান্দীরতপালকো’ (জয়গ)

ছদ্মিস্ (স্ত্রী) ছদ্মি-ইসি (উৎ ২।১০৯।) ১ বমি, বমনরোগ।

“ছদ্মিষি যানীহ পুরোষিতানি” (চরক ২৩ অঃ) ২ উপদান।

৩ গৃহ। “ছদ্মিষন্ত মনাত্যাং” (কৃষ্ণ ৯৯।১২) ‘ছদ্মিষ্ গৃহং’ (সায়ণ)
৪ ভেদঃ। “বাহুইতিপাঠু মহা স্বত্যা ছদ্মিষা” (বাজলনের
১৪।১২) ‘ছদ্মিষা ভেদো বিশেষণে।’ (মহীধর)

ছদ্মীকা (স্ত্রী) ছদ্মিরোগ।

ছদ্মীপনক (পুং) ছদ্মি-বমিঃ আগরতি আগরতি, আপ-
শিহ-ল্য উতঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইয়ক। ককীতি, কীকুড়।

ছল (স্ত্রী) ছো-পুষ্যদাদিছাৎ কলচ্ বহা ছল-অচ্। ১ বক্রপা-
ছানল, শাঠ্য, কাপট্য, ব্যাজ। “ধর্ষণে ব্যবহারেণ ছলেনা-
চরিতেন চ।” (মহু ৮।৪২।)

২ জায়মতলিহ দোষভেদে। প্রতিবাদী যদি বাদীর অভিমত
অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ করনা করিয়া মুক্তিবিশেষ দ্বারা বাদীর
বাক্য খণ্ডন করেন, তাহাকে ছল বলে। ছল তিন
প্রকার, যথা বাক্ছল, সামান্ত্রছল, উপচারছল। “বিষা-
তোহর্থবিরোধোপপত্ত্যচ্ছলম্” “তৎ ত্রিবিধং বাক্ছলং সামান্ত্র-
চ্ছলমুপচারচ্ছলকেতি” (গৌতমসূত্র)। হুইটী অর্থ হইতে
পারে, একরূপ শব্দ বক্তা প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বক্তার
অভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ করনা করেন,
তাহাকে বাক্ছল বলে; যথা ইনি নেপালদেশ হইতে আগত
কারণ ইনি নবকঞ্চল ধারণ করিয়াছেন। এস্থলে ‘নব’
শব্দের নূতন অর্থই বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু প্রতিবাদী
‘নব’ শব্দের নয় সম্বন্ধা করনা করিয়া বাদীর বাক্য খণ্ডন
করিতেছে। “অবিশেষাভিহিতেহর্থং বক্তুরভিপ্রায়ানর্থান্তর-
করনা বাক্ছলম্।” (গৌতমসূত্র)

সামান্ত্র প্রকারে সম্ভব অর্থকে অতি সামান্ত্র প্রকারে অসম্ভব
করিয়া প্রতিবাদী যদি খণ্ডন করেন, তাহাকে সামান্ত্র ছল
বলা যায়; ইনি বিভাচারগম্পন্ন, কারণ ইনি ব্রাহ্মণ।
এস্থলে বাদী ব্রাহ্মণ্য রূপ সামান্ত্র দ্বারা বিভাচারগম্পন্
সাধন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ্যরূপে বিভাচার-গম্পন্ন হওয়া
সম্ভব। কিন্তু প্রতিবাদী বাণ্যরূপ অতিসামান্ত্রদ্বারা তাহা
খণ্ডন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ্য হেতু দ্বারা বিভাচারগম্পন্ন
সাধিত হইতে পারেনা, কারণ বাণ্যে বিভাচারগম্পন্ন পক্ষে
ব্যক্তিতার রহিয়াছে। কিন্তু তখন ব্রাহ্মণ্যের অভাব নাই।
“সম্ভবতোহর্থতাতিসামান্ত্রবোগাদ্গম্যত্বার্থকরনাসামান্ত্রচ্ছলম্”
(গৌতমসূত্র)। অর্থাৎ বা লক্ষণাদ্বারা বাদী কর্তৃক প্রযুক্ত
অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ করনা করিয়া অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থ ও
লাক্ষণিক হলে শকার্য করনা করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর
বাক্য খণ্ডন করেন, তাহাকে উপচারচ্ছল বলে। যথা
‘অধাঃ প্রোশতি’ ‘মক’ শব্দে অধাঃ মকঃ পুরুষ ইহাই
বাদীর অভিপ্রেত লাক্ষণিক অর্থ। কিন্তু প্রতিবাদী ইহার

বিকল্প অর্থ অর্থঃ মঞ্চস্থলের শব্দার্থ (মঞ্চ বা মাটা) কল্পনা করিয়া বাণীর বাক্যধ্বনি করিতেছেন। “ধর্মবিকল্প-নির্দেশেধর্মসত্তাবপ্রতিবেদউপচারচ্ছলম্।” (গোতমসূত্র ১৫৫)

কেহ বলেন, ছল বিবিধ। বাক্ছল ও উপচারচ্ছল একই, বাস্তবিক তাহা নয়, কারণ উভয়ই প্রমাণ দ্বারা ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। আরও, কিঞ্চিৎ সাধারণ্য থাকিলে যদি উভয়ের একতা হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুই ভেদ হইতে পারে না, কারণ পরস্পরের কিছু না কিছু সাধারণ্য আছেই। “বাক্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবিশেষাৎ।” “ন তদর্থান্তরতাবাৎ।” “অবিশেষে বা কিঞ্চিৎ সাধারণ্যাদেকচ্ছলপ্রসঙ্গঃ।” (গোতমসূত্র)

ও নাটকোক্ত বীথির অর্থভেদ। একটা অর্থ থাকিতে আরও অসংখ্যবাপী অবলম্বন করিবে। সাহিত্যদর্পণের মতে প্রিয় বহুল অপ্রিয় বাক্য দ্বারা লোভিত করিয়া যে ছলনা, তাহাকে ছল বলে। কাহারও কোন কার্য উদ্দেশ্য করিয়া হাত ও রোষজনক শঠতাপূর্ণ কথাকেও কেহ ছল বলে।

(সাহিত্যদর্পণ ৬ অঃ)

ছলক (ত্রি) ছলয়তি ছল-কুল। ১ ছলকারক, মারাবী। “মধুকৈটভৌ ছলকৌ ধর্মশীলনাম্” (হরিশংখ ২০৩ অঃ)

ছল-স্বার্থে কন্। (ক্ৰী) ২ ছল। [ছল দেখ।]

ছলকারক (ত্রি) ছলং করোতি ছল-ক-কর্তরি কুল। ছলকারী, মারাবী, শঠ।

ছলগ্রাহক (ত্রি) ছলেন গ্রহাতি ছল-গ্রহ-কুল। প্রভারক, প্রবঞ্চক। ছলন (ক্ৰী) ছল-গিচ্ ভাবে লুট্। প্রভারণা। “যথাপন্নং যথা-যোগং ন চ স্তাংছলনং পুনঃ।” (ভারত ৬১ অঃ)

ছলনা (ক্ৰী) ছলন-ক্রিয়াং টাপ্। প্রভারণা, বঞ্চনা।

ছলি (ক্ৰী) চর্ম, চামড়া।

ছলিক (ক্ৰী) নাটকভেদ। “দেবি! শর্পিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুর্লপীং ছলিকং হুপ্রয়োজ্যমুদাহরন্তি।” (মালবিকামিহিত্র)

ছলিত (ত্রি) ছল-গিচ্ কর্মণি ক্ত। ১ প্রভারিত, বঞ্চিত। ভাবে ক্ত (ক্ৰী) ২ বঞ্চনা, ছলনা।

ছলিতক (ক্ৰী) ছলিক, নাটকভেদ।

ছলিতরাম (ক্ৰী) ছলিতঃ প্রভারিতো রামো যত্র তৎ বহবী। তরামক নাটকভেদ।

ছলিতস্বামিন্ (পুং) কাম্বীরাজ চম্পাপীড়ের রাজত্বকালে তাহার নগররক্ষক ‘ছলিতক’ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি। (রাজত ৪৮১)

ছলিন্ (ত্রি) ছলমন্ত্যত ছল-ইনি। ছলকারী।

ছল্ছল্ (দেশজ) অপ্রভারাক্রান্ত, নরনরলপূর্ণ।

ছল্ল (ক্ৰী) বঞ্চল, ছাল।

ছল্লি (ক্ৰী) ছলং ছাত্তাতাং লাতি ছল্-লা-কি। বঞ্চল, ছাল।

ছল্লী (ক্ৰী) ছল্লি-কীপ্। ১ বঞ্চল, ছাল। ২ লতা। ৩ সন্ততি। ৪ কুন্তমবিশেষ।

ছবি (ক্ৰী) ছাতি হৃদয়ং করোতি, যথা ছাতি ছিনতি দূরী-করোতি মালিভাদিকুবেশাদিকমিতি ছো-কিন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ (কুবিশিচ্ছবিছবিকীদিবি। উৎ ৪৫৬) শোভা, কান্তি, দীপ্তি। “তত্ত্বঃ কণ্ঠছবিরিতগণৈঃ সাদন্নং বীক্ষ্য-মানঃ” (মেঘদূত ৩৫) (দেশজ) ২ চিত্র, প্রতিকৃতি।

ছবিল্লাকর (পুং) একজন কবি। ইনি কাম্বীরাজ অশোক হইতে তৎপুত্র আর চারিজন রাজার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। (রাজতরঙ্গিণী ১১২৯)

ছবী (ক্ৰী) ছবি-কীপ্। শোভা, কান্তি।

ছবির (দেশজ) বেশবিভাস করা।

ছবটি (বটবটি শব্দ) ছেবটি।

ছা (পুং) ছো-কিপ্। ১ শাবক, বাচ্চ।

“ছায়ে ভাঁড়াইল মায়।” (ধর্মমঙ্গল ১২৫)

২ পারদ। (ত্রি) ৩ ছেদনকর্তা।

ছাই (দেশজ) ভস্ম, পাস।

ছাই, ভাগলপুর জেলার একটা পরগণা। ইহা গলানদীর উত্তর-তীরে অবস্থিত। পরিমাণকল প্রায় ৪৯০ বর্গমাইল। মদহ-পুরের মুন্সী আদালতের এলাকাভুক্ত, অস্তান্ত মোকদ্দমা ভাগলপুরে হয়। ইহার ভূমি স্বভাবতঃ সিক্ত, জমিতে জল-সেচনের আবশ্যকতা হয় না। শিবগঞ্জ, শাহাজাদপুর, শেখপুর, চমন, আলমগর, ফুলাট, জয়পুর, জোহার, ধর্মপুর, রতি, পরমেশ্বরপুর, বুধোনা, শগবর্ষা, তুলসীপুর, জয়সিং ও মুরলী-কৃষ্ণগঞ্জ এই কয়েকটা প্রধান গ্রাম।

খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পরগণা অঙ্গলময় ছিল। ঐ সময়ে ছোটনাগপুরের হীরগড় হইতে লাঠি, ঘনা ও হরিশ নামে তিন ভ্রাতা আসিয়া বাস করে। তাহারা এখানে কিছু করিতে না পারিয়া গঙ্গার পরপারে বর্তমান ছাই পরগণায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং এখানে মহাদেবের এক মূর্তি স্থাপন করিল। মহাদেব স্বপ্নে হরিশকে দেখা দিয়া বলিলেন, ‘তুমি এই পরগণার রাজা হইবে।’ তদনুসারে হরিশ বিন্দ, পাসবান, ধরবার, তীবর, মুশাহর, মার্কণ্ডী, গদোত, কলোয়াস্ত, ভড় প্রভৃতি জাতীয়দিগকে সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং উৎপন্ন জবোয় কিয়দংশ উপহার দিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সম্মান পাইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে পর্যন্ত তন্না দেউরা নামে ঐ জমিদারী হরিশের বংশধরগণের অধিকারে ছিল। ছাইলা, একপ্রকার গাছ। এই গাছ অশ্লবন ও ২৪ পরগণার

বিক্রয় করে, শুড়ির গড় দৈর্ঘ্য ৮ হাত। ইহার কাঠ আঁজান হইয়া থাকে, আর কোন কাজে লাগে না।

ছাঁওনী (দেশজ) সেনানিবেশ, জাঁবু।

ছাঁওয়াল (হিন্দী) বালক, সন্তান।

ছাঁওয়াল (হিন্দী) বায়ক।

ছাঁকন (দেশজ) বজ্রাদি দ্বারা প্রকটিত, নির্মূলকরণ।

ছাঁকনী (দেশজ) যে ছাঁকে অথবা যাহার দ্বারা ছাঁকে।

ছাঁট (দেশজ) প্রতিকৃতি, অবয়ব।

ছাঁটন (দেশজ) কর্তন, ছেদন।

ছাঁটনী (দেশজ) বহনদণ্ড।

ছাঁটি (দেশজ) গৃহের চালের অগ্রভাগ।

ছাঁদ (দেশজ) ১ গঠন। ২ যে রংগু দ্বারা গাভীর পদ বন্ধন করিয়া দ্রুত দৌহন করে। ৩ ছদ্ম।

“নানাবাদে নানাহাঁহে গল্প ফাঁকে কত” (অন্নবাসন ৫৭)

ছাগ (পুং) ছারভে ছিড়তে দেবালয়ে ছো-গম্ (ছাপুখড়িত্যঃ কিং। উণ্ ১।১২০) ১ স্বনামখ্যাত পশুবিশেষ, ছাগল। পর্যায়—বস্ত, হগলক, অজ, ভুভ, হগ, হগল, ছাগল, তত, ভুভ, ভুভ, লঘুকাম, ক্রয়সন, বর্কন, পর্ণভোজন, লক্ষণ, সেনাদ, বুক, অন্নাদ, শিবাগ্রি, অবুক, মেধ্য, পশু, পরশুল।

[অজ দেখ।]

ছাগমাংস দ্বারা পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ করিবে।

“মাংস্তহারিণকোরজশাকুনহাগপার্শ্বতৈঃ।” (যাজ্ঞ ১।২৫৮)

শ্রাদ্ধে ছাগমাংস ভোজন করিয়া পিতৃগণ হৃদয়ান্ত পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন। “বৃহস্পাদ্ ছাগমাংসেন” (মহু ৩।২৬৯) ছাগ যজ্ঞের পশু। বজ্রাদি বিধিতে যদি সামান্য পশুমাংসের আলভন ব্যবহা থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে ছাগই আলভ্য বা বধ্য পশু জানিবে। “বায়ব্যাং যেতমাংসভেত” (ঋতি।) ইত্যাদি স্থলে ছাগই আলভ্য। “অনাদেশে পশু-শ্চাগঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

“হোতা বৃকদধিনৌ ছাগভেতাদিমু।” (বাজসনেয় ২।১৪১)

ছাগবিষয়ক শুভাশুভ লক্ষণ। বরাহমিহির লিখিয়াছেন—অষ্ট, নব ও দশদন্ত ছাগসকল ধন ও গৃহে রক্ষণীয়। কিন্তু যে সকল ছাগ সপ্তদন্ত তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। শুক ছাগের দক্ষিণপার্শ্বে কুকুমণ্ডল শুভকরপ্রদ। ঋতু (যেতপাদবৃগ) সপ্তদন্ত কুকুলোহিত ছাগগণের যেত বংশও শুভ জানিবে। ছাগগণের কণ্ঠে বাহা অনবং লবিত হয় তাহা মণি বলিয়া বিখ্যাত। একমণি ছাগ-শুভকর। বাহাদিগের দ্বি-মণি বা ত্রি-মণি আছে, তাহার আরও ভাল। বাহার মুণ্ড যেতবর্ণ ও সমস্ত দেহ কৃষ্ণবর্ণ জাহাও

শুভ। দেহ অর্ধ কৃষ্ণ ও অর্ধশ্বেত কিবা অর্ধ কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও ভাল। যে মুখের অগ্রে বিচরণ ও ক্রোধে জলে অবগাহন করে, সেই ছাগ যেত যন্তক-বিশিষ্ট বা যন্তকে টিকি থাকিলে শুভ। পৃথক মুখের জায় কণ্ঠ ও যন্তক, তিলপৃষ্ঠ সপ্তদন্ত তাম্রলোচন, যেতবর্ণ কৃষ্ণপদ, অথবা কৃষ্ণহাগের যেতপদ হইলেও প্রশস্ত। যে ছাগের কৃষ্ণবর্ণ অণ্ড যেতবর্ণ হইয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণপট্ট দ্বারা আবৃত দেখায়, কিবা যে ছাগ ডাকিতে ডাকিতে অন্ন অন্ন বেড়ায়, সেই ছাগও প্রশস্ত।

যে ছাগ ঋতুর জায় যন্তক ও পালবিশিষ্ট, বাহার সপ্তদন্ত ভাগ পাণ্ডুর ও অপরাভাগ নীলবর্ণযুক্ত, সেই ছাগ শুভকারী। কুটক, কুটিল, জটিল ও বামন এই চারি প্রকার ছাগ লক্ষীর পুত্র। শ্রীহীন ব্যক্তির গৃহে তাহার কখনও বাস করে না। গর্ভজ সপ্তদন্ত রবকারী, প্রদীপ্তপুচ্ছ, কুংসিত নখ, বিবর্ণ, ছিন্ন-কর্ণ, হস্তীর জায় যন্তকবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ তালু ও জিহ্বা-সম্পন্ন ছাগ মন্দ। যে ছাগের মুণ্ড প্রশস্ত, বর্ণ মণিযুক্ত এবং নমন তাম্রবর্ণ, সেই ছাগ মহুত্বের পুত্র। একপ ছাগ সোধ্য, বশঃ ও শ্রীবুদ্ধিকারক। (বৃহৎসং ৬৫ অঃ)

দেবতারার কৃষ্ণবর্ণ, মানবগণ পীত বা হরিদবর্ণ এবং রাক-সেয়া শুক ও বৃহৎকার ছাগই উৎসর্গ করিবে। (স্মৃতি)

ছাগমাংসের গুণ—লঘুপাক, রুচি, বল ও পুষ্টিকারক, ত্রিদোষ, শুক্রধাতু সাম্যকারী, মুহু ও সিদ্ধ। (রাজবল্লভ)

অপ্রস্থতা ছাগীর মাংস পীনসরোগনাশক, শুককাস, অরুচি ও শোষে উপকারী এবং অঠরায়ি বৃদ্ধিকর। (ভাবপ্রকাশ)

ছাগশিশুর মাংস—লঘুপাক, জরনাশক, বল ও রুচিকারক।

খাসির মাংস—কৃষ্ণকারী, শোথ, বাত ও পিত্তনাশক, বল ও পুষ্টিকারক। বৃদ্ধ বা রোগে যে ছাগ মরিয়াছে, তাহার মাংস বাতজ ও রুক্ষ। ছাগমুণ্ড ত্রিদোষ ও রুচিকারক।

ছাগছদ্ম—ঠাণ্ডা, লঘুপাক, মধুর, রক্তপিত্ত, অতিসার করকাশ ও জরনাশক। ছাগদধি রুচিকর, লঘুপাক, ত্রিদোষ, অঠরায়ির সন্দীপক, বাস, কাশ, অর্শঃ ও ক্রয়কাসে উপকারী। (ভাবপ্রকাশ।) ছাগ অপেক্ষা ছাগের মূত্র অধিক উপকারী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রক্ত, কক, বাস, শুষ্ক, প্রীহা প্রভৃতি রোগনাশক। (রাজনি) [অজ দেখ।]

২ শৃঙ্গহীন অজ। “এব ছাগঃ পুরো অখেন বাজিনা” (শুক ১।১৬২।৩)

‘ছাগঃ শৃঙ্গরহিতোহজ।’ (সারণ)

ছাগণ (পুং) ছগণ-এর স্বার্থে অণু। করীবারি, বুটের আঙন। ছাগভোজিন্ (পুং) ছাগ ভুঞ্জে ছাগ-ভুজ-গিনি। ১ বুক, নেকড়ে বাঘ। (ত্রি) ২ ছাগভক্ষক।

হাগময় (স্বী) কার্তিকের বর্ষ মুখ । (তারত বন ২২৭ অ°)

হাগমাংস (স্বী) ৬৩৭ । হাগলের মাংস ।

হাগমিত্র (পুং) দেশভেদ । (কাণ্ডাদিগণের অন্তর্গত ।)

হাগমিত্রিক (ত্রি) হাগমিত্রে তব্যঃ হাগমিত্র-কাণ্ডাদিহাৎ ঠঞ বা ঞ্জিৎ (কাণ্ডাদিত্যর্থাৎঞঠৌ । পা ৪।২।১১৬) হাগমিত্রদেশকাত ।

হাগমুখ (পুং) হাগমুখমিব মুখ বস্ত্র বহত্রী । ১ কুমারের অচুচরভেদ । ২ কুমার, কার্তিকের বর্ষ মুখ হাগের মত । [হাগময় দেখ ।]

হাগমুত্র (স্বী) হাগপ্রস্রাব, হাগলের মূত্র । [হাগ দেখ ।]

হাগমুখ (পুং) হাগোরথোহস্ত বহত্রী । হাগবাহন, অগ্নি । (হেম)

হাগল (পুং) হগলএব হাগলঃ প্রজ্ঞাদিহাদৃণ্ । ১ হাগ । হগলস্ত গোত্রাপত্যং পুমান্ হগল-অণ্ (বিকর্ণগুহকহগলাদ্য বৎসতরযাজাদিহু । পা ৪।২।১১৭) ২ আত্মের ঋষিভেদ ।

হাগলক (পুং) হাগল-আর্থে কন্ । মৎস্ত বিশেষ । “খেতং সুপাকং সমদীর্ঘবৃত্তং নিঃশব্দলং হাগলকং বদন্তি । গলে দ্বিকণ্ঠঃ কিল তস্ত পৃষ্ঠে কণ্ঠঃ সুপথ্যা কচিরো বলপ্রদঃ ।” (রাজনি°)

হাগলাধু (দেশজ) হগলাজী, বৃদ্ধদায়ক বৃক্ষ, বিতারিয়া গাছ ।

হাগলগোত্রিয়া (দেশজ) হাগলের গোত্রসম্বৃত্ত অর্থাৎ, হাগলের জার কাণ্ডাকাঙ জানরহিত ।

হাগলনাদি (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ । ২ হাগলের বিষ্ঠা ।

হাগলপটুপটী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ।

হাগলপাটী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ।

হাগলা (স্বী) হাগী ।

হাগলাদ (পুং) ১ বৃক্ষভেদ । হাগলাং অতি হাগল-অদ-অণ্ । ২ বৃক্ষ, নেকড়ে বাঘ । (দেশজ) ৩ হাগলাস্ত স্বত ।

হাগলাদ্যস্বত, বৈভকোক্ত ঔষধবিশেষ । প্রস্তুতপ্রণালী— স্বত ৪ সের, হাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পার্কার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, হৃদ্য ৪ সের, শতমূলীর রস ৪ সের । কদ্বার্থ জীবনীরদশক (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, কীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু) মিলিত ১ সের । এই স্বত পান করিলে, অর্দিত, কর্ণপুল, বধিরতা, বাকশক্তিরাহিত্য, মিন্দ্রিনভাষণ, অশ্পষ্ট ভাবা, জড়তা, গভ্রতা, বজ্রতা, গৃহ্রণী, কুলতা, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয় ।

হুতারন্তে মত্ৰ । “ওঁ কালি বজ্রেশ্বরী অমুকস্ত কলসিদ্ধিং দেহি ক্রত্বচনেন স্বাহা । দাপরিষা হাগমাদৌ মধু দধা ললাটকে । উদযুধঃ প্রাচ্যুধো বা তিষগেনমুপালভেৎ ।”

হাগমারগময়ঃ । “ওঁ হা ওঁ গৌ গণপতরে স্বাহা ।”

হাগলাদ্য স্বত বৃহৎ, বৈভকোক্ত ঔষধবিশেষ । প্রস্তুত-প্রণালী—গব্যস্বত ১৬ সের, পার্কার্থ নগুলক হাগমাংস ১০০ পল, পার্কার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের । কদ্বার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, ডাফা, কাকোলী, কীরকাকোলী, নীলোৎপল (অভাবে সুন্ধি-পুষ্পমূল), মুখা, রক্তচন্দন, রান্না, মুগানি, মাষানি, চাকুলে, শালপানি, শ্রামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়দু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ল, জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা । তাত্রপাত্রে মৃদু অমিতাপে পাক করিবে । পাকশেষে শীতল হইলে স্বত ছাঁকিয়া উহার সহিত চিনি ২ সের মিশ্রিত করিয়া মুগুর তাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ২ তোলা । ব্যাধি বিবেচনা করিয়া ছদ্মানি অল্পপান ব্যবস্থা করিবে । এই স্বত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ইহা পান করিলে অগ্নিমার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আত্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপ-তন্ত্রক, ভূতোন্মান, গৃহ্রণী, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ, বাত-রক্ত প্রভৃতি বহুপ্রকার ব্যাধির উপশম হয় । কিছুদিন সেবনে শরীর বিলক্ষণ দৃষ্টপুষ্টি ও ইঞ্জিয়শক্তি প্রবল হইয়া উঠে ।

হাগলাদ্য তৈল, আয়ুর্কোক্ত তৈলভেদ । পাকপ্রণালী—৫০ পল হাগ মাংস, ৫০ পল দশমূল, ৮ সের জলে পাক করিবে । জল কিছু কমিয়া আসিলে ৪ সের তৈল, হৃদ্য, শতাবলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কণ্টিকারী, শৈলজ (সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ), জটামাংসী, নাগকেশর, তালীশপত্র, নালুকা, ধনবালুক এই সকল পৃথক পৃথক গ্রহণ করিয়া এক সঙ্গে তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা, লোধ প্রত্যেক ৩২ তোলা করিয়া তাহাতে স্নিবে, পরে ৮ সের জল দিয়া বিধি পূর্বক পাক করিবে । এই তৈল সকল প্রকার অরনাশক, পান, মর্দন ও ভোজনে অতি প্রশস্ত । (বৈভকস্নেহমালিকা)।

হাগলাস্ত্রিকা (স্বী) হাগলাজী সংজ্ঞায়াং কন্ টাণ্ পূর্বস্বঃ । ১ বৃদ্ধদায়ক বৃক্ষ, বিতারক গাছ । ২ বৃকী, বাঘিনী ।

হাগলাস্ত্রী (স্বী) হাগলাং অন্তর্যতি বাহুলকাৎ রক্ ততো ভীপ্ । ১ বৃদ্ধদায়ক বৃক্ষ, বিতারক গাছ । ২ বৃক্ষ, নেকড়ে বাঘ ।

হাগলি (পুং) হগলস্ত গোত্রাপত্যং পুমান্ হগল-বাহ্বাদিহাদিঞ- (বাহ্বাদিত্যশ্চ । পা ৪।১।১৬) ১ হগল নামক ঋষির গোত্রসম্বৃত্ত । ২ হগলদেশীয় । “হাগলিঃ পুরুষিত্রশ্চ বিরটশ্চ মহীপতিঃ ।” (হরি° ৯৯ অঃ) অত্রির গোত্রসম্বৃত্ত এই অর্থে হাগল হইবে ।

हांगनी (डी) हांगन-जिवाडीपू. १ हांगी. २ एकजन इतिहासी।
हांगनस (पू) हांगना जगताय भूमि हांगनीक। एक-
जन इतिहासी भवि।

ছাংলেয়িন্ (পুং) হুগলিনা প্রোকমখীতে হুগলিন্-ডিহক্ ।
 হুগনী ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র যে অধ্যয়ন করে । হুগনী ঋষি কলা-
 গীর হুজ । (মহু) ।

ছাগবাহন (পুং) ছাগেন আশ্রয়ঃ বাহনতি ছাগ-বাহন-
 অথবা ছাগো বাহনমন্ত বহতী। অগ্নি। (জিকাণ্ড)

ছাগফীর (কী) ৬৩৭। ছাগলের দুধ।

ছান্নিকা (ଜୀ) ଛାଣି-ସାଥେ-ବନ୍ ତତ: ଟାପ୍ ପୁରୁହସ: । ଛାଣି,
ଛାଣେର ଜୀ ।

ছাগী (জী) হাগ-জিয়াং জাতো জীপ্। হাগমাতা, বক্রী।
 পর্যায়—অজা, পরম্বিনী, জীক, মেখ্যা, গলেস্তনী, ছাগিকা,
 মজা, সর্গভক্ষ্যা, গমস্তনী, চুস্পা, গজা, মুখবিলুপ্তিকা। ছাগী-
 দুগ্ধ—জুস্বাহ, ঠাণ্ডা, অঠরায়িসঙ্গীপক, লঘুপাক, রক্তপিত্ত,
 বিকার, ক্ষয়কাশ, অতিসার, জ্বর ইত্যাদি রোগনাশক।
 (রাজনি°) ছাগীজুগ্ধের দধি উত্তম ও জুস্বাহ, লঘুপাক, ত্রিদোষ,
 শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্রর ও দোর্দল্যের উপকারী (ভাবপ্রকাশ)।
 ইহার নবনী—ক্ষয়কাশ, নেত্ররোগ ও কক্ষনাশক, বলকারক
 এবং অগ্নিসঙ্গীপক। তাহার দ্রুত চক্ষুরোগের মহৌষধ, বল-
 কারক, অঠরায়িস সংবর্দ্ধক, শ্বাসকাস ও কক্ষনাশক, বক্ষা-
 রোগের বিশেষ উপকারী। (রাজনি°) [অজ দেখ।]

ছাগীদুগ্ধ (কী) ৬৩৭। ছাগীর দুধ।

ଛାଗିପରମ୍ (କ୍ରୀ) ୬୩୭ । ଛାଗିର ହୁଏ ।

ছাগীপালক (পুং) ছাগীঃ পালয়তি ছাগী পা-নিচ্ছুন্। যে
ছাগী গোষে।

ছাগ্যায়নি (পুং) ছাগস্তাপত্যঃ পুমান্ ছাগ কিঞ্। ছাগের
অপত্য, ছাগলের সন্তান।

ছাঞ্চিয়। মীরগঞ্জ, রসপুর জেলায় একটি গ্রাম, পাট ও চাউল ব্যবসার একটি প্রধান আড্ডা।

ছোট (দেশজ) : ১ ছড়ী, দুই বটি । ২ ছিটা ।

ছাটা (দেশজ) কর্তন, কাটা।

ছাটান (দেশজ) ছাটিয়া ফেলান, কাহারও দ্বারা কর্তন করণ।

ছাউ (দেশজ) : ১ মালপত্রের রসিদ। ২ গুদার হইতে মালপত্র বাহির করিয়া লইবার অস্থায়ীমতিলিপি। ৩ গুদারাদি হইতে মুক্তিপত্র।

छाडा (देशज) १ छाग । २ हीन, मूढ । यथा "नन्नीहाडा" ।

ছাড়াছাড়ি (দেশজ) পরস্পর বিরোধন।

ছাত (ত্রি) ছো-ক বিভায়ায়মিহাভাবঃ (শাঙ্করাভ্যন্তরভাষ্যম্।

नं० १।४।४५) १. हिम। २. कुर्बान, कर्म। “हाकेकराकुर्बान।”
(कावाप्रकाश।)

হাটক, এইই জেলায় নুখী নদীতীরে অবস্থিত একটি নগর।
 এইই হইতে ৩২ মাইল দূরবর্তী। অক্ষা' ২৫° ২' ১০" উঃ;
 দ্রাঘি' ৯১° ৫২' ২০" পূঃ। বৎসরের সকল সময়েই নুখী
 নদী দিয়া হাটক পর্য্যন্ত যাতায়াত চলে। বাসি
 পক্ষান্তে উৎপন্ন গোল আম্র, চূষাপাথর ও নেবুর ব্যবসারে
 হাটক দিন দিন অীবৃদ্ধিশালী হইতেছে, ঐ সকলের বিনিময়ে
 চাউন, ডাল, লবণ, চিনি, নুজবন ইত্যাদি গৃহীত হয়। নদী দিয়া
 বাষ্পীয় বহিকপোত এইষ্ট, কাছাড় ও শিলং পর্য্যন্ত যাতায়াত
 করে। হাটক এইটের একটি থানা।

ছাতিনা, বাঁকুড়া জেলার একটা প্রাচীন সামন্তরাজ্য। কোন সময়ে এই রাজ্য স্থাপিত হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ আছে যে, পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণ রাজগণ রাজত্ব করিতেন। পরে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী বাণেশ্বরী বা বিশালাক্ষী দেবী ব্রাহ্মণ রাজাদিগের প্রতি বিরূপা হন এবং সামন্তগণ রাজ্য হইবে বলিয়া রাজাকে স্বপ্ন দেন। ব্রাহ্মণ রাজা ইহাতে সামন্তগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত সামন্ত কাটিয়া ফেলেন। প্রবাদ এইরূপ যে তাহাতেও রাজ্যের তর্য্য দূর না হওয়ার সামন্ত নামের সাদৃশ্য হেতু বনের ভ্রামলতা পর্য্যন্ত কাটিয়াছিলেন।

এই সামন্তগণ যে কি জাতীয় ও কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি
হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। সমাজে ইহার।
জলাকরণীয় ও নবশাখদিগের সমান ক্ষমতা ভোগ করে।
একই পুরোহিত উভয়েরই যাজকতা করে। কেহ কেহ উপবীত
পর্যন্ত ধারণ করিয়া থাকে। কানিংহাম সাহেব অহুমান
করেন, সামন্ত সম্ভবতঃ সামন্তাল নামেরই রূপান্তরমাত্র। সাম-
তাল অর্থাৎ সাঁওতালগণই ব্রাহ্মণ রাজাকে নিহত করিয়া
সিংহাসন অধিকার করে এবং ক্ষমতাবলে হিন্দুসমাজে চলিত
হয়। ক্রমে লোকে তাহাদের উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে।
বাহা হউক এই অহুমান কতদূর সত্য, তাহা প্রকৃতদ্ব্যমুসন্ধিৎসু
পণ্ডিতদিগের বিবেচ্য বিষয়। ছাত্রনার বর্তমান রাজবংশীয়গণ
আপনাদিগকে ছত্রি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কথিত আছে—ব্রাহ্মণরাজ সামন্তদিগের উচ্ছেদ সাধন করিলে ১২ জন সামন্ত জনৈক কুস্তকারের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পায়। তাহার কুস্তকারদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করার আর ধরা পড়ে নাই। বাহা হউক, পরদিবস তাহারো অরণ্যে আশ্রয় লইল এবং প্রতিশোধ লইবার চিন্তা করিতে লাগিল। জঙ্গলেই তাহারো দল গুঠ করিতে লাগিল এবং একদিন অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া বসিল,

আজি-বে আমাদের সঙ্গে জোঁজন করিবে, সেই আমাদের জাতিভুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য অনেক নীচজাতি ঐ সুযোগে লামন্তদিগের সহিত মিশিয়া যায়। একজন সামন্ত এইরূপ দানাজাতির সহিত একত্র আহার করিতে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত কিছুদূরে এক পাথরে বলিয়া আহার করে। ইহাতে সকলেই তাহাকে সমাজহীন করিল এবং তাহার পাথরকাটা সামন্ত উপাধি দিল। আজও তাহার বংশীরেরা পাথরকাটা সামন্ত বলিয়া পরিচিত। লামন্তসমাজে ইহাদের মর্যাদা অত্যন্ত সামন্ত অপেক্ষা কম। বাহা হউক একদিন সামন্তগণ অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা-সীড়িত হইয়া জঙ্গলে বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে বাণ্ডুলীদেবী বৃদ্ধা ব্রীবেশে কৈদ লইয়া উহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উহার কৈদ চাহিলে তিনি সকলকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার খুড়ি হইতে কৈদ কাড়িয়া লইল। তখন বাণ্ডুলী পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই ১২টা টালি (পরশু) ও খাঁড়া গ্রহণ কর। অমুকদিনে তোমরা ছয়বেশে রাজবাটা প্রবেশ করিবে। ঐ দিবস উৎসবে রাজা বাহিরে আসিবে। যখন ঢাকের বাজনার এই নির্দিষ্ট বোল বাজিতে থাকিবে, তখন তোমরা প্রকাশ্তে রাজাকে আক্রমণ করিবে। যুদ্ধে তোমাদেরই জয় হইবে, কিন্তু তোমরা আমার কৈদ কাড়িয়া লইয়াছ, সুতরাং প্রথম রণে একজন কাটা পড়িবে। উদহুসারে ১২ জন সামন্ত অল্পের সমভিব্যাহারে নির্দিষ্ট উৎসব দেখিবার ছলে রাজবাটা প্রবেশ করিল। রাজা দেবদর্শনে বাহিরে আসিলেন। এদিকে ঢাকে সহসা সঙ্কেত বোল বাজিয়া উঠিল,

“ডেডে ডেডে কামলা।

লারবি পার্বি এই বেলা।”

১২জন সামন্ত তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যস্ত হইতে বাণ্ডুলী-প্রদত্ত তীক্ষ্ণ খার টালি ও খড়গ বাহির করিয়া হুহুকার রবে রাজাকে আক্রমণ করিল। বাণ্ডুলীর কথামত একজন সামন্ত হত হইলে অবশিষ্ট ১১জন রাজাকে কাটিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিল। এইরূপে সামন্তগণ ফুলকরের প্রতিশোধ লইয়া রাজ্যাধিকার করিল। প্রবাদ, এখন যেখানে রাজবাড়ী তাহার জ্ঞানকোণে ছাতনার পশ্চিমে ব্রাহ্মণ রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ ছিল। দুই একখানি ইষ্টক ও তাম্রকর্ষাসম্বিত প্রস্তর আজও তথায় পাওয়া যায়। লোকে বলে তথায় রাজারা যে সকল লোককে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা এখনও মাথাকাটা ভূত (কব্ধ) হইয়া তথায় মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। আরও অশোকবনে ঐ স্থানের নিকট পুরণীকীর ঘাটের অগ্রভাগে তামার এক

প্রকাণ্ড কটাহে পাকতৈল সঞ্চিত ছিল। ঐ কটাহের উপর তামার ঢাকনিতে ব্রাহ্মণ রাজাদিগের বিবরণ লিখিত ছিল। কিন্তু ঐ কটাহ বা উহার ঢাকনি কে রাখিয়াছে জানিবার উপায় নাই।

এগার জনেই রাজ্যাধিকার করিয়াছে, সুতরাং কে রাজা হইবে এই গোলযোগ হইল। প্রতিদিন এক একজন রাজা হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যের বিশেষ অন্তবিধা হইতে লাগিল। পরে সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন পরামর্শস্থির করিল যে, কল্যাণে উঠিয়া যাহাকে দেখিব, তাহাকেই রাজা করিব।

এদিকে বিধাতার ঘটনায় ঠিক ঐ দিন দুইটা রাজপুত-বালক জগন্নাথ দর্শনে যাইতে যাইতে সম্বলহীন হইয়া ছাতনার উপস্থিত হইল এবং রাজাদিগের দানশীলতার পরিচয় পাইয়া অতি প্রত্যাশেই ভিক্ষা করিবার জন্য রাজভবনে প্রবেশ করিল। সেই সময় সামন্তগণ কাহাকে রাজা করিব, এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় দুইটা সর্বস্বলক্ষণ কুসুমকুমার বালককে আসিতে দেখিলেন। বালকদ্বয় আসিয়াই তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহাদের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, “মহারাজ! আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, পথে নিঃস্ব হইয়া আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।” সামন্তগণ বলিলেন, “আমাদের ভিক্ষা দিবার কিছুই নাই, রাজ্য, ধন, জন, যান, বাহনাদি যাহা কিছু সকলই আপনাদের হইয়াছে, আমরা আপনাদের আত্মবাহ দাসমাত্র। এখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদের ও প্রজামণ্ডলীকে পালন করুন।” এই বলিয়া তাঁহারা ঐ বালকদ্বয়কে রাজ্যোচিত অভিবাদন করিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতাদি আনিয়া ঐ স্থানেই জ্যোত্বে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। বালকদ্বয় এই অচিন্ত্য-পূর্ব ঐশ্বর্য্যলাভে তথায় রাজা হইয়া পরাক্রান্ত সামন্তগণের সাহায্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই দুইজনের জ্যোত্বে নাম হামির ও কনিষ্ঠের নাম উত্তররায়। বর্তমান রাজ-বংশীরেরা এই হামির ও উত্তরের বংশধর। উত্তররায় ১৪৭৬ শকে বাণ্ডুলী দেবীর এক মন্দির নির্মাণ করেন, উহার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। ভগ্ন মন্দিরের প্রাচীর ও প্রধান দেবালয় ইষ্টকনির্মিত ছিল। ঐ সকল ইষ্টকের অবিকাংশই লিপিবদ্ধ। আমরা ঐ দেবালয়ে দুই প্রকার (এক প্রকার উচ্চ অক্ষরে ও এক প্রকার গভীরাক্ষরে) ইষ্টক দেখিয়াছি। উচ্চ অক্ষরে লিখিত ইষ্টকে লেখা আছে—

“ব্রীহাতনানগরেশ ব্রীহুত্তররায় শক ১৪৭৬।”

গভীরাকরে লিখিত ইষ্টক আরও প্রাচীন বলিয়া ধোঁষ হয়। গভীরাকরে লেখা-ইষ্টকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে। ইহার লেখা পড়া যায় না। আমরা ইহার একখানিও গোটা পাই নাই। মন্দিরের সদরদরজা ও পশ্চিমের একটা মণ্ডপ প্রস্তরনির্মিত (Laterite red), উহা আজও দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দির বর্তমান রাজপথের ঠিক উত্তরে অবস্থিত, এখন বাঙালীদেবী ঐ মন্দিরে নাই। প্রবাদ আছে, ইংরাজেরা এদেশ জয় করিলে ঐ পথে গোরাপল্টন যাতায়াত করিতে লাগিল। বাঙালীদেবী তাহাতে রাজাকে ভয় দিলেন, “কিরী-কীর পারের ধূলা উড়িয়া আমার গারে লাগে, আমাকে ভূমি স্থানান্তরিত কর।” তদনুসারে বিবেকানন্দ নৃপতি ১৬৫৫ শকে রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রস্তরনির্মিত এক মন্দির নির্মাণ করেন। তাহা ঐ মন্দিরের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে—

“ব্রহ্মাশেষবহুরেশবল্যচরণ শ্রীবাঙ্গলীশ্রীতরে

শরীতশ্রয়শারকর্তৃশশভূং সংঘো শকাব্দে শুভে।

সামন্তাধ্বয়সাগরেন্দ্রনৃত্যবন্দ্যশ্রীজ্যৈষ্ঠকেশরী

ভূতুগ্ধবরো বিবেকনৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্ষদং ॥”

ঐ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে, স্থানে স্থানে কাটরা গিয়াছে এবং দুই একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িতেছে, মন্দিরের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষয় বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

প্রবাদ এইরূপ বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ঐ বাঙালীর উপাসক ছিলেন এবং প্রাচীন মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। তাহার পর ১২৭৯ সালে বর্তমান বাঙালীমন্দির নির্মিত হয়। উহাতেই এখন বাঙালীদেবী আছেন।

বাঙালীদেবী প্রাপ্তির বিষয় এইরূপ প্রবাদ আছে—এক ব্যাপারী ঐ পথ দিয়া বাইতেছিল, এমন সময় রাজার বশ হয়, ‘আমি বাঙালী, অমুক ব্যাপারীর শিলে আমি আছি। ভূমি লীভ আমাকে আনিয়া স্থাপন কর।’ তদনুসারে রাজা ঐ ব্যাপারীর নিকট হইতে শিলাখানি আনিয়া এক স্তম্ভধারকে খোদিত দিলেন। স্তম্ভধর ভাবরকার্য জানিত না, কিন্তু বাটালী লাগাইতে লাগাইতে বাঙালীর রূপায় প্রস্তর খসিয়া মূর্তি আগনিই বাহির হইল। তখন রাজা সমাদরে তাঁহার পূজা করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিলেন। আরও প্রবাদ আছে যে, পুরাণের মন্দিরে অরুণাকালে বাঙালী একদিন এক শঙ্খবণিকের নিকট পুষ্কারির কড়া বলিয়া পরিচয় দিয়া শঙ্খ পরিয়াছিলেন। শেষে শঙ্খবণিক পুষ্কারির কড়া নাই এবং সকলই বাঙালীর কড়া জানিতে পারিয়া হতবিস্ত্র হইল। তদবধি সে প্রজাতি বৎসরে এক এক কোড়া পাঁখা বাঙালী-বান্দে বেশিয়া দিয়া বাহিত। কয়েক বৎসর পূর্ব

পর্যন্ত তাহার বশিরেরা প্রথমতঃ প্রতি বর্ষে শঙ্খ দিয়া আসিতেছিল।

ইহা ভিন্ন হাভনার আরও কয়েকটা প্রতি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে। হাভনার মধ্যস্থানে কামারপাড়ার পূর্বে রাস্তার উত্তরে অনতিদূরে তিনটা প্রস্তর মেটাবুটী খোদিত মূর্তিসহ দণ্ডায়মান আছে। বড় পশিরখানি প্রায় ৫ ফিট উচ্চ ও উহাতে এক মূর্তি বহু ও বড়হাড়ে দণ্ডায়মান। আর একটা পাথরে একটা ধূলখানি মূর্তি ও নিকটে একটা শিশু।

হাভনার একটা থানা আছে। পূর্বে ইহা মানকুম জেলার অন্তর্গত ছিল, তখন এখানে ফুলেক থাকিত। বাকুড়া জেলার অন্তর্গত হইয়া অবধি ইহার ফুলেকী উঠিয়া গিয়াছে।

[সামন্ত রাজাদিগের বিশেষ বিবরণ সন্ধ্যা শকে দেখ।]

ছাতা (ছত্র শব্দ) ১ ছত্র। ২ বন্ধ। ৩ বেড়ের ছাতা।

ছাতা, ১ মধুরাজেলার একটা তহসীল। পরিমাণকল ২৫১২ বর্গ মাইল, ভগ্নাংশ ১৮৭ বর্গমাইলে ঢাল হয়। এই তহসীল প্রাচীন ব্রহ্মমণ্ডলের এক অংশ, আগরা-খাল ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ভূমি সমতল ও উর্বরা। ইহাতে একটা কোজ-দারী আদালত ও তিনটা থানা আছে।

২ উক্ত ছাতা তহসীলের সদর মহর। এই মহর মধুরা হইতে ২১ মাইল দূরে বাহুকোণে অবস্থিত। ইহাতে শেরশাহ প্রতিষ্ঠিত একটা সুলতান সরাই আছে। অনেকেই অনুমান করেন যে এই সরাই আসকর্ণী নামে হুমায়ূনের দেওয়ান নির্মাণ করেন। নিপাহী বিদ্রোহের সময় নিপাহীগণ এই সরায়ে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সরাইয়ের নিকট উহার অত্যুচ্চ কটক অপেক্ষাও উচ্চতর হুতিশ নামে একটা পাহাড় আছে। ছাতা বাইতে হইলে বহুদূর হইতে অগ্রেই ঐ পাহাড় গথিকের নরনপথে পতিত হয়। জমাকার ব্রাহ্মণগণ কলন, ঐক্কক ঐখানে ছত্র-ধারণ লীলা করিয়াছিলেন, তদনুসারে উহার নাম ছাতা হইয়াছে। এখানে প্রতি শুক্রবারে হাট বসে।

ছাতারিয়া (দেশজ) পক্ষী বিশেষ। (Turdus canorous.)

ছাতা (ছত্র শব্দ) ছত্র।

ছাতু (দেশজ, সংস্কৃত শব্দ শব্দের অপভ্রংশ) ১ ভজিত যবাদি বৃক্ষ। রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—যবের ছাতু ক্লম, উত্তেজক, অগ্নিবর্ধক, বাত ও কফনাশক এবং সারক। ধানের ছাতু শুষ্ক, মূত্রের উত্তেজক, শিথীকৃত ছাতু শুষ্কপাক, কৃষিপ্লীত লঘুপাক। সেহন করিয়া বাইলে ছাতু লীভ পরিপাক হয়। ভাবপ্রকাশ মতে—বাত জ্বরীয়া বহু দারু শিথী করিবে ছাতু হয়। যবের ছাতু লীভন, অগ্নিবর্ধক, লঘু, কফ-শিথী-নাশক, ক্লম ও উত্তেজক।

ছোঁচা ছাড়াইরা খোঁচা ছাড়াইরা বরান অংশ যবের সহিত চূর্ণ করিলে বুটের ছাতু প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে যত ও চিনি যোগে এই ছাতু অতি কৃত্রিমক।

শাশিগাছের ছাতু অগ্নিবর্জক, লঘু, পীতল, মধুর, গ্রাহী, কটিকর, পথ্য ও শুক্রবর্জক।

আহার করিয়া, চর্ষণ করিয়া, রাজিতে, অধিক রাজার, শুষ্ক, চুই ছাতু একত্র অথবা কেবল ছাতু তক্ষণ করিলে না। পূর্বক পান, পুনর্ভোজন, সামিষ, দ্রব লহিত, দন্তে চর্ষণ করিয়া ও উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ছাতু পাইবে না।

জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে, জন্মতিথিতে ছাতু তক্ষণ করিলে শত্রুবিনাশ হয়। মেঘ সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে ছাতু দান করিলে সকল পাপ দূর হয়। (তিথিতত্ত্ব)

চাতুর্ভাষ্যত্রে প্রাতঃদানে বী ও ছাতু দক্ষিণা দিবার বিধান আছে। (নারদ)। ২ উত্তিৎ বিশেষ। [ছত্রক দেখ।]

ছাত্র (পুং) ছাত্রঃ শুরোদ্যোবাবরণঃ শীলমন্ত ছত্র-ণ (ছাত্রা-
দিত্যোগঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ শিষ্য, অন্তর্বাসী। “ছাত্রাণা-
সার্বাদেশানাং তেন বিস্তাৰ্থিনাং মতঃ।” (রাজতরং ৬৮৭)
(স্ত্রী) ২ কপিল ও পীতবর্ণ বরটাকৃত ছাত্রাকার চাকসম্ভব মধু।
ইহা শিঙ্গল, ঠাণ্ডা, শুষ্কপাক, ক্রিমি, শিথ্র (ধবলরোগ), রক্ত
পিত্ত ও প্রমেহনাশক এবং সুস্বাদু। ইহার বর্ণ কপিল
শীত। (ভাষপ্রকাশ)

ছাত্রক (স্ত্রী) ছাত্র-বার্ধে কন। ১ পীত ও পিঙ্গলবর্ণ সরষা
(মধুমক্ষিকা)-কৃত বা কপিল ও পীতবর্ণ বরটাকৃত ছাত্রাকার
চাকসম্ভব মধু। (রাজনি) [ইহার শুণ ছাত্র শব্দে দেখ।]
ছাত্রস্ত ভাবঃ কর্ণ ছাত্র-মনোজ্ঞাদিহৃদ্যন্ত্যং বুৎ। (পা ৫।১।১০০)
২ ছাত্রের ভাব বা কর্ণ।

ছাত্রগণ (পুং) ছাত্রো গণ্ডইব উপমানকর্ণধা। পদাতবিন্
ছাত্র, যে ছাত্র গ্লোকের প্রথম চরণ মাত্র জানে অর্থাৎ অর
জানবিশিষ্ট।

ছাত্রদর্শন (স্ত্রী) ছাত্রঃ বরটীচ্ছত্রসম্ভবঃ মধু তদিব দৃষ্টতে
ছাত্র-দৃশ-কর্ণশি-লুট। ১ মধুকুলা স্বাদযুক্ত হৈরদবীন অর্থাৎ
সদ্যোজ্ঞাত যুত। ৬৩৭। ২ ছাত্রদিগের দর্শন।

ছাত্রবৃত্তি (স্ত্রী) ৬৩৭। ছাত্রদিগের উৎসাহবর্জন্য পারি-
তোষিক স্বরূপ মাসিকাদি নিয়মে যে অর্থ দেওয়া হয়।

ছাত্রব্যাসক (পুং) ছাত্রো ব্যাসকঃ মধুরব্যাসকাদিহৃদ্যং সমাঃ।
ধূত ছাত্র।

ছাত্রি (স্ত্রী) ছাত্রি-স্ত্রি। ছাত্রন, আচ্ছাত্রি। শাস্ত্রাশ্রয় পরে
থাকিলে উদাত্ত ব্রহ্ম হইবে। (ছাত্রাদিরঃ শাস্ত্রাশ্রয়ঃ। পা ৬।২।৮৬)

বধা ছাত্রি-শালা। তৎপুরুষ সমাদে শালা বধ স্ত্রী ব হইলেও
ছাত্রি-ব্রহ্ম উদাত্ত হইবে। “বদাপি শালাভ্রমসমালো নপুংসক-
মিচ্ছোভবতি তদাপি তৎপুরুষে শালাব্রহ্ম নপুংসক ইতোতৎ
পুরুষপ্রতিবেদনোদ্যেব ব্রহ্ম ছাত্রিশালম্” (শি কৌ)

ছাত্রিক্য (স্ত্রী) ছত্রিকত ছত্রযুক্ত ভাবঃ কর্ণ বা ছত্রিক-
পুরোহিতাদিহৃদ্যং ব্ধ। (পত্যন্তপুরোহিতাদিত্যো ব্ধ।
পা ৫।১।১২৮) ছত্রযুক্তের কার্য বা ভাব।

ছাত্রাদি (পুং) পাণিনি উক্ত শব্দগণতেন (ছাত্রাদিরঃ
শালায়াং। পা ৬।২।৮৬) ছাত্রি, পেদি, তান্তি, ব্যাক্তি, আধিক্তি,
আটি, গোমি এই কয়টা ছাত্রাদিগণ।

ছাদ (স্ত্রী) ছাত্ততেহনেন ছাদি-করণে-বৎ। ১ ছাত, পটল,
চাল। ২ বস্ত্র, কাপড়।

ছাদক (পুং) ছাদয়তি ছাদি-বুল। ১ আচ্ছাদনকর্তা, যে গৃহের
চাল ছায়। ২ যে বসন পরাইয়া দেয়।

ছাদন (স্ত্রী) ছাদি-করণে-লুট। ১ ছদন, অন্তর্ধান। তাবে-লুট।
২ আচ্ছাদন। “ছাদনার্থপ্রকীর্ত্তে কট্টকৈক্লগসকটৈঃ” (হরিব-
৬৫।২৫) কর্ত্তরি লু। ৩ পত্র, পাতা। (পুং) ৪ নীলাম্বান
যুক্ত, কালাকোরঠা ফুলগাছ। (ত্রি) ৫ ছাদক, আচ্ছাদনকর্ত্তা।
“কণাকৃত্যং ছাদনমেকমোকসঃ।” (মাঘ ১ম)

ছাদিত (ত্রি) ছাদি-ক্ত ইড়াগমাৎ শাধুঃ পক্ষে ছর (বা দাত
শান্তপুণ্ডিত-শান্তিছরভাষ্যঃ। পা ৭।২।২৭) আচ্ছাদিত, ছর।
“যনতরমনবৃন্দৈশ্ছাদিতৌ পুন্দ্রবস্তৌ।” (উত্তট)

ছাদিন্ (ত্রি) ছাদয়তি আচ্ছাদয়তি ছাদি-গিনি। আচ্ছাদন-
কর্ত্তা, ছাদক।

ছাদিমেষু (ত্রি) ছদিবে ইদং ছদিস্-ঢৎ (ছদিকৃপাধিবলে
ঢৎ। পা ৫।১।১০) ছাদিনির্দ্বারার্থ তৃণাদি।

ছাদ্নিক (ত্রি) বাহিরে ধার্মিক অন্তরে ঘোর কপট। “ধর্ম্মধ্বজী
সদালুঙ্ক্ছাদ্নিকো লোকদম্বকঃ” (মহু ৪।১৯৫) ‘ছদ্বনা চরতি
ছাদ্নিকঃ। ছদ্ব ব্যাজঃ। প্রকাশং ধার্মিকঃ রহসি নিক্শিপমপ-
হরতি, অপ্রকাশ্যং প্রকাশয়তি।’ (মেঘাতিথি)

ছাদী (স্ত্রী) চর্ম্ম, চামড়া।

ছাদ্যত (পুং) অধিতেন।

ছানা (দেশজ) ১ শিষ্ট সন্তান। ২ আমিষা। [আমিষা ও
ছদ দেখ।] ৩ ছত্ৰাদি দ্বারা কোন বস্তু মন্বন করা।

ছানি (দেশজ) চক্ষুরোগবিশেষ। এই রোগের প্রথমে রোগী
দ্রব বস্তু অস্পষ্ট দেখে। দিবা ভাগে দৃষ্টি বৈকল্প ঘোলা হয়,
রাত্রিকালে অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সেরূপ হয়না, ক্রিষ্ণ
পরিকার বলিয়া বোধ হয়। এই রোগে চক্ষুর অধিক্রমে
অবচ্ছ হইয়া যেতোজ্বল বর্ণ ধারণ করে। উহা কঠিন, কোমল

ও বিবিধ এই ত্রিবিধ হয়; তন্মধ্যে বার্কাক্য অবস্থান প্রায়ই কঠিন হইয়া থাকে।

কিরূপে এই রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাও অনেক অনেক প্রকার মত দিয়া থাকেন। বাহা হউক, বাহাতে চক্ষুর্মণির পরিপোষণের স্রাব্যত ঘটে, তাহাকেই এই ছানি রোগের কারণ বলা যায়। বার্কাক্য, বহুমুত্র, চক্ষুর্গর্ভের অগত্যাগর অবববের প্রদাহ, আঘাতজনিত 'কিষা' আক্রমণাত হইলে ছানি সেই সেই নামে উক্ত হয়। অন্তরোগ জন্ম দৃষ্টির অস্পষ্টতা জন্মিলে রোগীর আলোকাক্রমারে প্রভেদ জ্ঞান থাকে না এবং তারা স্ফোচন ও প্রসারণে অক্ষম থাকে। একরূপ স্থলে অস্ত্রসাধনেও পুনদৃষ্টি লাভ করা অসম্ভব।

চক্ষুর মণি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, কোমল ও বর্জুলাকৃতি, ছানি পড়িলে উহা পীতাত মলিন শ্বেতবর্ণ হয় ও অপেক্ষাকৃত অধিক চেপ্টা হইয়া যায়। ছানি থাকিলে কেবলমাত্র আলোক ও অন্ধকার জ্ঞান থাকে, কোন বস্তুই আকার দেখিতে পাওয়া যায়না। এই সময় অস্ত্র চিকিৎসা করা কর্তব্য।

অস্ত্রচিকিৎসকগণ অতি সাবধানে এই মলিন মণি চক্ষু হইতে বাহির করিয়া ছানি আরোগ্য করেন। এদেশীয় চক্ষু-চিকিৎসকগণ ঐ মণি বাঁধিয়া দেয় কিম্বা অস্ত্রদ্বারা উহা তেলিয়া চক্ষুতারকার দ্রবগোলকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে কিছু দিনের জন্ত বিলক্ষণ দৃষ্টিশক্তি থাকে বটে, কিন্তু তারকা মধ্যে চক্ষুর্মণির অবস্থান-নিবন্ধন, বেদনা, জলপড়া ইত্যাদি রোগে চক্ষু একবারে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় একবারে ভাল হইতেও দেখা যায়।

আঘাত জন্ম ছানি হইলে অনেক সময় তাহা আপনা হইতেই সারিয়া যায়, সুতরাং হঠাৎ অস্ত্রচিকিৎসা করান ভাল নহে। ক্যানার, কোনারস, ফল্‌প, সাইলেজ, সল্‌কর ইত্যাদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে অস্ত্র বাতীত অনেক ছানি আরোগ্য হইয়াছে। চক্ষু অঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা ধোত করিলেও উপকার হয়।

ছানুয়া, ১ বালেশ্বর জেলার একটা পরগণা। ২ বালেশ্বর জেলার একটা নদী। ৩ বালেশ্বর জেলার পাঁপোড়া নদীর তীরে একটা গ্রাম। চাউলের ব্যবসার জন্ত বিখ্যাত।

ছান্দস (পুং) ছন্দোবেদং অধীতে বেত্তি বা ছন্দস-অণু (তদধীতে তষেদ। পা ৪।২।৫২)। ১ বেদাধোতা শ্রোত্রিয়ঃ। ছন্দসো ব্যাখ্যানগ্রন্থস্তত্র ভবঃ ইত্যণু (ছন্দসো যদণৌ। পা ৪।৩।৭২) ছন্দসোহয়ং। তন্ত্বেদং ইত্যণু বা। (ত্রি) ২ বেদভব বা বেদ-সম্বন্ধীয়। "ছান্দসীতিব্রহ্মসংক্রান্তিঃ ক্রতিভিঃ সমসংক্রান্তঃ" (হরিশব ২২৩ অঃ) ত্রিরাং ত্রীপু।

ছান্দসক- (স্ত্রী) ছান্দসস্ত ভাবঃ কর্ণ বা ছান্দস-মসোজাদিভ্যৎ বুঞ। (ছন্দসনোজাদিভ্যৎ। পা ৪।১।১৩০) ছান্দসের কর্ণ অথবা ভাব, ছান্দসক।

ছান্দসক (স্ত্রী) ছান্দস-ভাবে য (ভক্তভারতদ্রোণী। পা ৪।১।১১২) ছন্দঃসম্বন্ধীয়ত্ব, বেদসম্বন্ধীয়ত্ব। "হুববরাভেশ-ছান্দসস্য তবতি" (পা ৭।১।৩২ বৃতি)

ছান্দসীয়া (ত্রি) ছান্দস-হ। ছান্দস সম্বন্ধী।

ছান্দোগ্য (স্ত্রী) ছন্দোগ্যানাং ধর্ম আদ্যারো বা ছন্দোগ্য-এক (ছন্দোগ্যোপকিকমাজিকবহুচ নটীঞঞঃ। পা ৪।৩।২২২)

১ সামবেদীর একখানি উপনিষৎ। "ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকমেবচ", (মৌক্তিকোপ ১অঃ) ২ ছন্দোগের ধর্ম। ৩ ছন্দোগদিগের সমূহ।

ছান্দোভাষ (ত্রি) ছন্দোভাষা ঋগয়নাদিভ্যাদণু। (অনুগয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ছন্দোভাষাসম্বন্ধীয়।

ছান্দোমান (ত্রি) ছন্দোমান-ঋগয়নাদিভ্যাদণু। ছন্দের পরিমাণ বা সংখ্যাসম্বন্ধীয়।

ছান্দোমিক (ত্রি) ছন্দোমত্তেদম ছন্দোম-ঠকু। ১ ছন্দোম যন্ত সম্বন্ধীয়। "যথো এতচ্ছান্দোমিকং যুক্ত্যনৌষাঠৈবধানং ভবতি" (নিরুক্ত ৭।২৪)

ছান্দোবিচিত্র (ত্রি) ছন্দোবিচিত্রি ঋগয়নাদিভ্যাদণু। ছন্দঃ-সমূহসম্বন্ধীয়, ছন্দোবিত্তারসম্বন্ধীয়।

ছাপ (দেশজ) ১ মুদ্রা। ২ চিত্র। ৩ ছাপা। ৪ আবরণ, লুকান।

ছাপন (দেশজ) ১ বস্ত্রাঙ্কন, মুদ্রাঙ্কন। ২ গোপন।

ছাপর (দেশজ) ১ নৌকার ছাদ। ২ বিছানার আচ্ছাদনী, চাদর।

ছাপরখাট (দেশজ) শরনের খাট।

ছাপা (দেশজ) কোন মোহর কিম্বা ধাতুকান্ড বা প্রস্তরাসিতে উচ্চ বা গভীরাকারে খোদিতলিপি অথবা চিত্রাদির উপর বর্ণ দ্রব্যযোগে কাগজ বস্ত্রাদিতে ছাপ দিয়া প্রতিকৃতি তোলাকে ছাপা কহে। অরারাসে ছাপ দিয়া একটা ছবি বা লিপির বহু-সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করাই ছাপার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নানা উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে, যথা ধাতুময় অক্ষর দ্বারা পুস্তকাদি ছাপান, কাঠের উপর ছবি প্রভৃতি খোদিয়া ছাপান (Wood-cut Printing), তাম্র বা ইস্পাতের পাতে ছবি খোদিয়া ছাপান (Copper or Steel-plate Printing) ও প্রস্তরের উপর ছবি আঁকিয়া ছাপান (Lithography) [কাঠ, তাম্র ও ইস্পাতে খোদিত চিত্রের বিস্তারিত বিবরণ তৎকর্তৃতা শব্দে এবং প্রস্তরের ছবির বিবরণ বিদ্যোদ্রোহ শব্দে লিখিত হইবে।] এখানে কেবল পুস্তক মুদ্রণের বিষয়ই বর্ণনা করিব

এখনে জালপত্র, ভুজপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রকলক প্রভৃতিতে পুস্তকাদি লিখিত হইত। তৎপরে এদেশে কাগজ প্রচলিত হয়। কোন্‌ সময় হইতে যে এদেশে কাগজ প্রচলিত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। [কাগজ দেখ।]

পূর্বে কাগজ প্রস্তুত হইলেও লিপিকার্য হস্ত দ্বারা চলিত। সুতরাং একখানি অভিনব পুস্তকের বহুল প্রচার অতি দীর্ঘকালসাপেক্ষ ছিল। পুস্তকের দুর্লভতা জন্ত অভিনব দুর্লভ্য ছিল। সংবাদপত্রাদি এরূপ স্থলে থাকা সম্ভব নয়। এখন মুদ্রায়ন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্পকালে লক্ষ লক্ষ পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে। সকলেই ইচ্ছা করিলে অল্পব্যয়ে অনেক অক্ষরে ছাপা সকলপ্রকার পুস্তক প্রাপ্ত হইতেছে। আজি একখানি অভিনব গ্রন্থ কেহ প্রণয়ন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে তাহা দেশময় প্রচারিত হয়। মুদ্রায়ন্ত্রসাহায্যে আজিকার ঘটনা সহস্র সহস্র সংবাদপত্রে ছাপা হইয়া ডাকযোগে দেশের নানান্থানে নীত হইতেছে এবং কলাই লক্ষ লক্ষ লোকের নয়ন পথে পতিত হইতেছে। বাহা হউক এই ছাপাখানা দ্বারা পুস্তক সত্তা হওরাতে বিদ্যাশিক্ষা যে কত সুলভ ও জ্ঞানলাভ যে কত সহজ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

বর্তমান প্রাণালীতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণপ্রথা সর্বপ্রথম ১৪২০ হইতে ১৪৩৮ খৃঃ অব্দ মধ্যে হলণ্ড ও জার্মানিতে আবিষ্কৃত হয়। তাহার বহু পূর্বে হইতে কাঠ প্রভৃতির ছাপ দিয়া লিপি তুলিবার প্রথা বহুদেশে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, চীনদেশেই ছাপার আদি স্থটি হয় *। তাহা হইতে বিবিধ উন্নতি ও পরিবর্তন হইয়া বর্তমান মুদ্রায়ন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫০ হইতে ১৩০ খৃঃ অব্দের মধ্যে মং-তীও নামে জনৈক রাজমন্ত্রী সর্বপ্রথম চীনে ছাপা আবিষ্কার করেন। তাহার ছাপিবার প্রাণালী বর্তমান কাঠফলক খোদিত চিত্রের দ্বারা। চীনগণ আজও পুস্তক মুদ্রিত করিতে ধাতুনির্মিত খুচরা অক্ষর ব্যবহার করে না, সেই প্রাচীন প্রথাহুসারেই পুস্তকাদি ছাপিয়া থাকে। তাহার পাঁতলা কাগজের এক পৃষ্ঠা লিখিয়া উহার লেখার দিক একটা পালিস্ করা কাঠের উপর বসাইয়া দেয়, তৎপরে কাঠে ঐ লেখার উন্টা দাগ পড়িলে, লেখা ব্যতীত অপরাংশ খোদিয়া ফেলে। তাহার দ্বারা পুস্তক ছাপে না। ঐ কাঠফলকের উপর কালি মাখাইয়া তাহার উপর কাগজ রাখিয়া একরূপ বৃক্ষ দিয়া অন্ন অন্ন চাপ দেয়, তাহাতে এক পৃষ্ঠার ছাপ উঠে।

* বহুলাট হেট্‌সের সময় কান্টোনে বুদ্ধিকা মধ্য হইতে কাঠনির্মিত কল পাওয়া যায়। অনেকে বলেন পূর্বে এরূপ বস্ত্র দ্বারা ভারতবর্ষে ছাপা হইত, কিন্তু এতদসম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই।

বলা বাহুল্য এরূপ প্রাণালী যে অতি কঠিনাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনিস-অগুসতিনী বণিকগণ সর্বপ্রথমে যুরোপে এইরূপ কাঠফলকের ছাপা প্রচলিত করে। প্রথমে কেবল খেলিবার তাস ঐ প্রাণালীতে ছাপা হইত। ১৪৪০ খৃঃ অব্দে কাঠফলকে একখানি বাইবেল ছাপা হয়।

অবশেষে জন গুটেনবর্গ নামে জনৈক জার্মান এক একটা অক্ষর পৃথক্‌ তৈয়ার করিয়া ছাপার প্রকৃতপথ প্রদর্শন করিলেন। (১৪৫০—১৪৫৫ খৃঃ অব্দ)।

অনেকে বলেন, গুটেনবর্গ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে অক্ষরপ্রস্তুতপ্রাণালী শিক্ষা করেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে স্বয়ং অক্ষরের অনেক উন্নতি করিয়া যান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদিন পর্যন্ত ঐ সকল অক্ষর কাঠ কিম্বা ধাতুর উপর খোদিয়া বাহির করা হইত, অবশেষে কুকার নামে অপর একজন জার্মান হাঁচে ঢালিয়া অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রথা উদ্ভাবন করিলেন। ১৪৫৯ খৃঃ, এইরূপ হাঁচে ঢালা অক্ষরের দ্বারা প্রথম পুস্তক ছাপা হয়। কিন্তু কারিকরগণ নিশ্চীগকৌশল গোপন রাখায় বিদেশে প্রচারিত হইতে পারে নাই। ১৪৬২ খৃঃ অব্দে মেণ্ট্‌জ নগর ধ্বংস হইলে তথাকার ছাপাকরগণ নানান্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং পুস্তক ছাপা প্রচলন করে।

১৪৬৫ খৃঃ অব্দে ইটালীতে, ১৪৬৯ অব্দে ফ্রান্সে, ১৪৭৪ অব্দে ইংলণ্ডে এবং ১৪৭৭ অব্দে স্পেনদেশে ছাপার কৌশল প্রচলিত হয়।

পরে প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত ছাপাকরগণ নিজেই অক্ষর ও ছাপার দ্রব্যাদি সমস্তই তৈয়ার করিয়া লইত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওলন্দাজগণ পৃথক্‌ অক্ষর তৈয়ারের কারখানা খুলে। হলণ্ড হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে অক্ষর রপ্তানি হইত। পরে নানান্থানে অক্ষরের কারখানা স্থাপিত হইল। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম ক্যাশলন ইংলণ্ডে অক্ষরের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিলেন।

হাঁচে ঢালা অক্ষর হস্তনির্মিত অক্ষর অপেক্ষা অনেক লঘু ও সহজ হইত এবং প্রস্তুতপ্রাণালী সময়সাপেক্ষ ছিল বলিয়া প্রতিদিন্দ্ৰ অতি অল্প পরিমাণই অক্ষর তৈয়ার হইত। অবশেষে ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কনিবাসী ডেভিড ক্রস্‌ অক্ষর প্রস্তুত করিবার এক কল প্রস্তুত করিলেন। ঐ কল ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে আরও উৎকৃষ্ট উপায়ে বাপ্পীর কলদ্বারা চালিত হইতে লাগিল। পূর্বে হস্ত দ্বারা হাঁচে কলে প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ চারিশতের অধিক অক্ষর প্রস্তুত হইত না, কিন্তু ডেভিড ক্রসের বাপ্পীর কলে প্রতি মিনিটে

১০০ একশত পর্যন্ত অক্ষর তৈয়ারি হয় অথচ এই সকল অক্ষর দৃঢ় ও শুদ্ধ। অক্ষর ঢালাই হইলে পর সেগুলিকে মসিরা, ছাটরা এবং ব্রাউ কাটিয়া লইতে হয়। পূর্বে এই সকল কার্য পৃথকরূপে হস্তশ্রীয়া করা হইত, পরে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কলে একরায়েই এই সকল কার্য করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখন কল হইতে একরায়েই ছাপার ট্রেপযুক্ত অক্ষর তৈয়ারি হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অক্ষরের মুদ্রা তাম্রা দিয়া মোড়া হয়, তাহাতে অক্ষর আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে।

ছাপার কার্যে নানা প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার অক্ষরেরই দৈর্ঘ্য ঠিক এক ইঞ্চি। যাবতীর কারখানার কারিগরগণ এই পরিমাণ ঠিক রাখিতে চেষ্টা করে, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন কারখানার হরপ একত্র ব্যবহার করিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও এক ছাপাখানায় একই কারখানার তৈয়ারি হরপ ব্যবহার করা উচিত। অক্ষরগুলির বিস্তৃতি সমান, তবে কোন অক্ষর বড়, কোনটা বা ছোট বলিয়া উহাদের বেধের তারতম্য হইয়া থাকে। বিস্তৃতি সমান বলিয়া এক পংক্তির সমস্ত অক্ষরগুলি ঠিক ছইখানি সীসার পাতার ভিতর আড়কাঁবে থাকিতে পারে। কোন কোন অক্ষর ত্রাহার গাছ হইতে বড়; সুতরাং উহাদের অংশ গাছ হইতে বাহির হইয়া থাকে। ঐরূপ অক্ষরকে করণ (Kern) কহে। রাঙ্গালা ছাপার কাজে রেফ (') , রফলা () প্রভৃতি যোগ করিতে অধিক মাত্রায় করণ অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

যুরোপীয় প্রথা অনুসারে বিলাতী যন্ত্রাদি দ্বারা যুরোপীয়েরাই এদেশে ছাপা কার্য আরম্ভ করেন, এখনও বিলাতী যন্ত্রদ্বারাই ছাপা চলিতেছে। যদিও সম্প্রতি এদেশে অক্ষর ঢালাই হইতেছে, উহার কল প্রভৃতি সমস্তই বিলাতী এবং যুরোপীয়দিগের নিকট হইতেই শিক্ষা। সুতরাং এদেশে ছাপাখানাতে ছাপাবিবয়ক সমস্ত ইংরাজী শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অক্ষর ব্যতীত স্পেস (Space) নামে আরও কতকগুলি জিনিস ছাপার শব্দ সকলের মধ্যে ব্যবহৃত রাখিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। সেগুলি অক্ষরের গাছের খুঁয়, কেবল অগ্রভাগে অক্ষর থাকে না অর্থাৎ অক্ষরের মাথাটি কাটিলেই একটা স্পেস হয়। ইহাদের স্থলতা নানা প্রকার। যাহার পরিমাণ ইংরাজি এম্ অক্ষরের মত তাহাকে এক এম্ বলে। তদনুসারে উহার অর্ধেককে আধএম্; ত্রিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদিকে দুএম্, তিনএম্ ইত্যাদি বলে। এম্এর বিস্তৃতি ও বেধ সমান।

অক্ষরের স্থলতার পরিমাণ লইয়া উহাদের নানাকল্প নাম

হয়। ইংরাজী ছাপাখানায় ১২ প্রকার অক্ষর সচরাচর প্রচলিত। যথা, ১ গ্রেট প্রাইমার (Great primer), ২ ইংলিশ্ (English), ৩ পাইকা (Pica), ৪ স্মল পাইকা (Small pica), ৫ লং প্রাইমার (Long primer), ৬ বর্জাইস্ (Bourgeois), ৭ ব্রেভিয়ার (Brevier), ৮ মিনিয়ন (Minion), ৯ ননপেরিল্ (Nonpareil), ১০ রুবি (Ruby), ১১ পার্ল্ (Pearl) ও ১২ ডায়মণ্ড (Diamond)। ইহার মধ্যে গ্রেট প্রাইমার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পুস্তক মুদ্রণে ইহার অপেক্ষা বৃহৎ অক্ষর ব্যবহৃত হয় না; তবে বহির নাম দিতে আরও বৃহৎ অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অপরাপর অক্ষরগুলি ক্রমানুসারী ক্ষুদ্র। ডায়মণ্ড অক্ষরই সর্বাপেক্ষা ছোট। ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইংরাজী ডায়মণ্ড অক্ষর অপেক্ষাও একরূপ ক্ষুদ্র অক্ষর আছে। এ ছাড়া উক্ত অক্ষরগুলির আবার আকারানুসারে নানা প্রকার ভেদ আছে। যাহা হউক সেই সকল অক্ষরের ব্যবহার অতি অর।

পাইকা অক্ষরের পরিমাণ ও আদর্শ লইয়া ছাপার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়, পাইকা নির্দিষ্ট সংখ্যক এমের সমান করিয়া কল, সীসা প্রভৃতি কাটা হয়; সুতরাং এত এম্ কল বলিলে পাইকা এম্ বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার অক্ষর সকল সমান আকারের ইংরাজী অক্ষরের নামানুসারেই উক্ত হইয়া থাকে। তবে এখনও বাঙ্গালা অক্ষর অতি ক্ষুদ্র হয় নাই। বাঙ্গালা ছাপাখানায় সচরাচর গ্রেট প্রাইমার, ইংলিশ, পাইকা, টু-লাইন পাইকা, স্মল পাইকা ও বর্জাইস্ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে স্মল পাইকাই বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিশ্বকোষ কুড়ি পাইকা এম্ স্তম্ভে স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হইতেছে।

গ্রেট প্রাইমার অপেক্ষা বড় অক্ষর সচরাচর যথাক্রমে পারাগন, ডবল পাইকা, টু-লাইন পাইকা, টু-লাইন ইংলিশ, ইত্যাদি। ডবল পাইকা অক্ষর স্মল পাইকার ঠিক দ্বিগুণ। অন্ত্যন্ত বড় অক্ষর পাইকার যত গুণ তদনুসারে কথিত হয়, যেমন ৫ গুণ হইলে পাঁচলাইন পাইকা, ৬ গুণ হইলে ছলাইন পাইকা ইত্যাদি। বৃহৎ বৃহৎ বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইবার জন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষর সকল প্রথমে বালির ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত হইত, এক্ষণে বড় অক্ষর প্রায়ই কোমল কাঠে খোদিত প্রস্তুত হইতেছে। তত্তির অসংখ্য প্রকার চিত্রময় অক্ষর প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

অক্ষর সমস্ত লইয়া যে ব্যক্তি শব্দ ও বাক্যাদি গ্রন্থন করে, তাহাকে ইংরাজিতে কম্পোজিটার কহে। একটা সমতল অগভীর কাঠের ডালাতে ও তাহার তিন দিকে তিনটা

হেলান ডালাতে অক্ষর সাজান থাকে। ঐ ডালাগুলিকে ইংরাজীতে কেস (Case) কহে। কেসগুলি ক্রম ক্রম চতুর্কোণ প্রকোটে বিভক্ত। প্রত্যেক ধোপে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর থাকে। ছাপার সকল অক্ষর সমান ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং যে সকল অক্ষরের অধিক প্রয়োগ, সেগুলি নীচের ডালার বড় বড় ধোপে থাকে। কম্পোজিটর সম্মুখে বসিয়া অভ্যাসবলে অতি দ্রুতই ঐ সকল ঘর হইতে বহাবধ অক্ষর লইয়া একটা পিতলের ফ্রেমে সাজাইতে থাকে। ঐ পিতলের ফ্রেমের নাম কম্পোজিং-ষ্টিক্ (Composing-stick)। বাম হাতে ষ্টিক্ ধরিয়া ডান হাতে অক্ষর লইয়া ষ্টিকের বামদিক হইতে সাজাইয়া যায়। এক একটা অক্ষর যেমন সাজান হয়, অমনি বামহস্তের বুদ্ধাধুতদ্বারা উহা ধরিয়া রাখে। সমস্ত পঙ্ক্তি কম্পোজ হইলে পুনরায় অগ্র পঙ্ক্তি আরম্ভ করে, এইরূপে সমস্ত ষ্টিক্ পূর্ণ হইলে উহা হইতে গ্রথিত অক্ষরগুলি একটা কাঠের ফ্রেমে রাখিয়া দেয়। কাঠের ফ্রেমটিকে গ্যালি (Gally) কহে। প্রত্যেক অক্ষরটী দেখিয়া দেখিয়া সাজাইতে গেলে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়, এইজন্য অক্ষরের গারে একটা খাঁজ কাটা থাকে, কম্পোজিটরগণ ঐ খাঁজটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাজাইয়া যায়। তাহাতেই অক্ষরের মুখ উপরদিকে ও সোজা পড়ে। কম্পোজ ভাল হইল কিনা দেখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা উচিত। প্রথমতঃ সমস্ত অক্ষর ঠিক ঠাস্ বসিয়াছে কি না, দ্বিতীয়তঃ পঙ্ক্তি সকলের গোড়া ও শেষ ঠিক সমান আছে কি না, তৃতীয়তঃ শব্দ সকলের ব্যবচ্ছেদ সর্বত্র সমান হইয়াছে কিনা। ভাল কম্পোজিটর শব্দ সকল কোথাও খেস ও কোথাও ছাড়া ছাড়া করেনা, সর্বত্র সমান করিতে চেষ্টা করে।

এক পৃষ্ঠা কম্পোজ হইলে তাহা দড়ি দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধা হয়, পরে এইরূপে বস্ত পৃষ্ঠা দরকার সমস্ত প্রস্তুত হইলে একটা সমতল তক্তার উপর রাখিয়া লোহার ফ্রেমে দৃঢ়রূপে কাঠ-ফলক দিয়া আঁটা হয়। তৎপরে ঐ ফ্রেমগুচ্ছ অক্ষর সমস্ত ছাপার কলে অর্থাৎ প্রিন্টিং প্রেসে দেওয়া হয়। কলে একজন শিরীষের বেলনা অর্থাৎ রোলার দ্বারা অক্ষরের উপর কালি মাখাইয়া দেয়, অপর ব্যক্তি আধ ভিজা কাগজ ফ্রেমে চড়াইয়া অক্ষরের উপর রাখে এবং একটা হাতা টানিয়া চাপ দেয়। চাপদ্বারা কালি কাগজে লাগিয়া ছাপ পড়ে, তখন একটা হাতল ঘুরাইলে ঐ অক্ষর কাগজ সমেত বাহিরে আইসে, ফ্রেম খুলিলে অপর একব্যক্তি ছাপা কাগজ বাহির করিয়া লয়। তখন আবার কালি মাখান হয়, এইরূপে ছাপা চলিতে থাকে।

কিন্তু এইরূপ কলে দ্রুতীয় সচরাচর ৫০০।৬০০ অপেক্ষা অধিক ছাপা হইতে পারে না। সংবাদপত্রাদির অধিক গ্রাহক থাকিলে এরূপ কলে নিরমিতরূপে কাজ হয় না। ১৭২০ খৃঃ অব্দে ডব্লিউ নিকল্‌সন নামে জনৈক ইংরাজ গোল রোলার দ্বারা চাপ দিয়া ছাপিবার কল প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঐ কল তখন অধিক ব্যবহৃত হয় নাই। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথমে বাষ্পীয় কল দ্বারা চালিত ছাপাখানার বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকা মুদ্রিত হয়। ইহাতে সমতল তক্তাতেই অক্ষর সাজান থাকে এবং বাষ্পীয় কলে যেমন গোল রোলার ঘুরিতে থাকে, তখন ঐ অক্ষর সকল একবার উহার নীচ দিয়া বাতায়াত করে। ফিরিয়া আসিবার সময় উহার উপরিস্থ সর্ব সর্ব রোলার দ্বারা অক্ষরে কালি মাখান হইয়া যায়। কেবল কাগজ দিতে ও তুলিয়া লইবার জন্য ছুইটামাত্র বালকের প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ কলেও সংবাদপত্রের কাটুতি কুলাইয়া উঠিতে পারিল না। ইহা অপেক্ষাও অতি দ্রুত ছাপা হইবার উপায় চিন্তা হইতে লাগিল।

বহুদিন হইতে যুরোপে ও আমেরিকার কলদ্বারা কম্পোজ করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক কলও তৈয়ার হইয়াছে, ঐ সকলের সাহায্যে অতি সহজে কম্পোজ হইয়া থাকে। কিন্তু এখনও ঐ কম্পোজিটর-কল বিশেষরূপে প্রচলিত হয় নাই।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কনিবাসী রিচার্ড এম্‌ হো (Richard M. Hoe) নামে এক সাহেব ঘূর্ণমান চোন্ধে (Cylinder) অক্ষর কম্পোজ করিবার কৌশল বাহির করিলেন। এই কলে অক্ষরসমূহ মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ গোলাকার রোলারের গারে দৃঢ় আঁটা থাকে। বাষ্পীয় কলে ঐ রোলার অক্ষর সহ ঘুরিতে থাকে। বড় রোলারের চারিদিকে অপেক্ষাকৃত সর্ব আরও অনেকগুলি রোলার থাকে। এ গুলি চাপ দিবার জন্য; ইহাদের মধ্যে কাগজ ধরিলে তাহা ছাপা হইয়া অগ্র দিকে বাহির হইয়া যায়। সর্ব সর্ব বহু সংখ্যক রোলার দিয়াও অক্ষরে কালিমাখান হয়। এরূপ প্রণালীতে পূর্বোক্ত কলের জায় অক্ষর যাতায়াত জন্ত সময় নষ্ট হয় না, অক্ষর ও চাপের রোলার উভয়ই ঘুরিতে থাকে, সুতরাং ছাপা অবিভ্রান্ত চলিতে থাকে। ক্রমে এই কলের উন্নতি হওয়াতে একবারে দুই বা ততোধিক সংখ্যক কাগজ একই রোলারে একবারে ছাপা হইতেছে। ঐ সমস্ত কাগজ অক্ষরযুক্ত বড় রোলার ও উহার চারিদিকের সর্ব চাপ দিবার রোলার সকলের মধ্য দিয়া ছাপা হয়। সুতরাং অক্ষরের রোলার যত বড় হইবে, উহার চতুর্দিকের চাপ দিবার রোলার গুলির সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি

করিতে পারা যায়, সুতরাং অক্ষরগুলি একবার ঘুরিলে তত-
গুলি কাগজে একবারে ছাপ পড়ে। একবারে ১০টা কাগজ এক
পৃষ্ঠার ছাপা হইতে পারে, এমন কলও প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ
শেষোক্ত কলে ৪০টার ২০,০০০ পর্যন্ত ছাপ উঠিতে পারে।

ইহার পর ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ফিলাডেল্ফিয়াবাসী উইলিয়াম
এ ব্লক এক কল উদ্ভাবন করেন। ইংলণ্ডে ১৮৬৩ হইতে
১৮৬৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে এক কল উদ্ভাবিত হয়। উহাতে
কাগজ সকল খণ্ড খণ্ড ছাপা হয় না, লম্বালম্বী এক সুদীর্ঘ
কাগজ কোশলক্রমে একবারে দুই পৃষ্ঠার ছাপা হইয়া বাহির
হয়। ২১৩ মাইল লম্বা এক কাগজ একটা দণ্ডের গায়ে
গুটাইয়া গুটাইয়া তলে পাকান থাকে। উহার একপ্রান্ত
খুলিয়া কলে ধরিতা দিলে অবিশ্রান্ত ছাপা চলিতে থাকে।
পূর্বোক্ত কলে প্রত্যেক কাগজ ধরিতে এক একজন লোকের
দরকার, কিন্তু এ কলে আপনি কাগজ বাহির হইতে থাকে
এবং বথেক্কা আকারে কাটা, ছাপা ও কাগজের সংখ্যা
নির্দিষ্ট হয়। ঐ সমস্ত লম্বা কাগজ আবার কলেই সূচাক্রমে
ভাঁজা ও একবারে মোড়াই হইয়া বাহির হয়, তখন উহা এক-
বারেই ডাকে দিতে পারা যায়। বিলাতের টাইমস প্রভৃতি
এবং আমেরিকার অনেক বড় বড় সংবাদপত্র এইরূপে ছাপা
হয়। আজ পর্যন্ত সংবাদপত্র ছাপিবার যত কল হইয়াছে,
তন্মধ্যে ১৮৮৩-৪ খৃঃ অব্দে হো সাহেবের কলই সর্বোৎকৃষ্ট
হইয়াছে। ইহাতে প্রতি মিনিটে ৫০০ শত ও ৪০টার গড়ে
২৫,০০০ হাজার কাগজ দুই পৃষ্ঠার ছাপা, ভাঁজা ও মোড়াই
হইতে পারে।

আজকাল আমেরিকা ও বিলাতে পুস্তকাদিও উল্লিখিত
প্রকার কলে ছাপা হইতেছে। পুস্তকাদি ফর্মার ফর্মার ভাঁজি-
বার, সেলাই করিবার ও ছাঁটিবার কলও প্রস্তুত হইয়াছে।
সুতরাং তথার অল্পকাল মধ্যে এতাদৃশ অধিক সংখ্যক পুস্তক
বাহির হইতে পারে যে গুলিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষে ছাপাখানার ব্যবহার অতি আধুনিক।
কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ বোধ হয় ভালপত্র, ভূজ-
পত্রাদিতেই শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি লিখিয়া যান।
পূর্বে ব্রাহ্মগণ তুলট কাগজেই পুস্তকাদি লিখিতেন। যাহা
হউক, কাগজ প্রচলিত হইলেও তৎকালে কেহই পুস্তক
ছাপিবার কথা আদৌ ভাবে নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয়।
বোধ হয় মুসলমানদিগের অভ্যাচারে তখন দেশীয় সাহিত্য-
চর্চা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণী
বাতীত কচিং বিভাগ শিক্ষা করিত। সুতরাং পুস্তকের তাদৃশ
অভাব উপলব্ধি না হওয়ার বহুসংখ্যক পুস্তক প্রস্তুত করিতে

কেহই ব্যয় করে নাই। শীর্ষারামনাথ্য হস্তলিখিত পুস্তকেই
কথকিং লোকের বিভাজন শিপালা লাভি করিত।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লর্ড গীজগণ ভারতবর্ষের গোয়া
নগরে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাঁহারাই সর্ব-
প্রথম রোমান অক্ষরে কোকলী ভাষার কয়েকখানি পুস্তক
মুদ্রিত করেন। দক্ষিণাত্যে অমলকভূ নামক স্থানে খৃষ্টীয়
১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে অনেক দেশীয় পুস্তক নেটোরীয়
মিশনারীগণ দ্বারা ছাপা হয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কোচিন নগরে
গনসলভেন্স নামে এক জেজুট প্রথম বলবার অক্ষর সৃষ্টি
করেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডাম নগরে দেশীয় উদ্ভিজ্জ
নাম ছাপিবার জন্ত প্রথম তামিল অক্ষর প্রস্তুত হয়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলীতে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা বহি ছাপা
হয়। এই বহিখানি নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড (Nathaniel
Brassey Halhed B. C. S.) প্রণীত একখানি বাঙ্গালা ভাষার
ব্যাকরণ। এই পুস্তক ছাপিবার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি তদানীন্তন
বঙ্গীয় সৈন্যবিভাগের লেপ্টেন্যান্ট সি উইলকিন্স (Lieut. C.
Wilkins) ও সংস্কৃতজ সার চার্লস উইলকিন্স (Sir Charles
Wilkins) কর্তৃক প্রস্তুত হয়। লেপ্টেন্যান্ট উইলকিন্স
সাহেবের উপদেশ ক্রমে পঞ্চানন নামে জনৈক কর্মকার
এদেশে সর্বপ্রথম অক্ষর প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন।
ইনি প্রথমে ত্রীরামপুরের মিশনারীদিগকে প্রত্যেক বাঙ্গালা
অক্ষর ১১০ পাঁচসিকা দরে প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৭৮৫ খৃঃ
অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছাপাখানা হইতে ২য় বাঙ্গালা
ছাপা পুস্তক বাহির হয়। যখন ঐ ছাপাখানা হইতে লর্ড কর্ণ-
ওয়ালিসের ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের রেগুলেশনের বাঙ্গালা অনুবাদ
বাহির হয়, তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অক্ষর
প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ত্রীরামপুরের মিসনারীগণ
দেবনাগর অক্ষর প্রস্তুত করেন। তাহার পর তাঁহারাই
১৮১৮ খৃঃ অব্দে সমাচারদর্পণ নামে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-
পত্র বাহির করেন। এই পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে ত্রীরামপুর
হইতে জনরূক মার্সমান সাহেবের সম্পাদকতার প্রকাশিত
হইত। ইহার পর কলিকাতার নিগদর্শন নামে একখানি
মাসিকপত্রিকা বাহির হয়, তাহার পর তিমিরনাশকপত্রিকা
প্রকাশিত হয়। তিমিরনাশকপত্রিকা শীঘ্রই লোপ হইল।
সমাচারদর্পণ বহুকাল প্রকাশিত হইবার পর অবশেষে ১৮৪২
খৃঃ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

এখন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের দ্বারা দেশে বিত্তা চর্চার সমাক-
উন্নতি হওয়ার ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তকের বহু প্রয়োজন হই-
য়াছে। তদনুসারে বাঙ্গালার অনেক ছাপাখানা হইয়াছে।

রেলপথ বিস্তার ও ডাকের সুব্যবস্থা হওয়ায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ক্রমে দৈনিক সকল প্রকার সংবাদপত্রই ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমে এদেশে কেবল হাতেই ছাপা হইত, এখন বড় বড় সংবাদপত্রাদি বাষ্পীয় কলে ছাপা হইতেছে।

প্রতি বর্ষ শত শত বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক এদেশে ছাপা হইতেছে। ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর প্রভৃতি ব্যব-
তীর বর্ণমালাই দেশীয় অক্ষরের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ছাপার কল সমস্তই যুরোপ বা আমেরিকা হইতে আনীত। বাঙ্গালার ছায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও ছাপাখানা হইয়াছে। এখন প্রায় প্রত্যেক নগরেই ছাপাখানা হইতেছে।

ষ্টেরিওটাইপিং (Stereotyping)।—একবার অক্ষর কম্পোজ করিয়া তাহার ছাঁচ প্রস্তুত ও তাহা হইতে গালা বা নীসা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা অবিকল অক্ষরের প্রতিরূপ করিতে পারা যায়। এইরূপে একটা বা ততোধিক প্রতিক্রম করিয়া অক্ষরগুলি পুনরায় অল্প পুস্তক কম্পোজ কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, অথচ পূর্বস্বত প্রতিক্রম ফলকটা দ্বারা পুনরায় যথেষ্টা সেই খণ্ড ছাপিতে পারা যায়। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম জেড নামে স্কটলণ্ডবাসী জনৈক স্বর্ণকার বাইবেল ও স্তোত্রাদি ছাপিবার জন্য প্রথম ষ্টেরিওটাইপ প্রস্তুত করে। তদবধি ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নানারূপ হইলেও সকলেরই মূল প্রায় এক। সকল প্রণালীতেই কর্দম, সূক্ষ্ম বালুকা, বিলাতি মাটি প্রভৃতি মিলাইয়া উত্তপ্ত ও পেষণ করিতে হয়। এই প্রস্তুত দ্রব্যে অক্ষরের ছাপ দিলে ছাঁচ অতি নীচুই শুধাইয়া দৃঢ় হয়, তখন উহাতে অক্ষরনিষ্কাশনযোগী নীসা, রসাজন প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া ঢালিয়া দিলে অবিকল অক্ষরের প্রতিরূপ প্রস্তুত হয়।

যথোচিত নক্ষতা ও তৎপরতা সহ এইরূপ ফলক ৮।১০ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হইতে পারে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকার জন্য এইরূপ ফলক ৮ মিনিটেই প্রস্তুত হয়। এই সকল ফলক সাহায্যে একবারে একই লেখা দুই তিন স্থানে ছাপা হইতে পারে। এই জন্যই এই সকল সংবাদপত্র অতি অল্পকালের মধ্যে ছাপা হয়।

ইলেক্ট্রোটাইপিং (Electrotyping)।—এই প্রথা ১৮৩৯ হইতে ১৮৪১ খৃঃ অব্দের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরে জোসেফ এ এডামস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। একখণ্ড পীতবর্ণ মোমের উপর অক্ষর বা চিত্রের ছাপ মারিয়া ঐ মোমের উপর উডপলিশ বা অল্প কোন তড়িত-পরিচালক বস্তুর গুড়া মাখাইয়া দিতে

হয়। ইহাতে মোমের ছাপ দেওয়া পৃষ্ঠ তড়িত-পরিচালক হইয়া যায়। তৎপরে ঐ মোম রাসায়নিক উপায়ে তামা দ্বারা গিল্টি করিয়া লইলে তামা যখন খুব পুরু হইয়া পড়ে, তখন উহা হইতে মোম ধুইয়া ফেলে। এই পাতলা তামার ছাঁচের পশ্চাদিকে নীসা গলাইয়া ঢালিয়া লইলেই মুখে তামার পাত-মোড়া সূক্ষ্ম অক্ষরের ফলক প্রস্তুত হয়। ষ্টেরিওটাইপ্ অপেক্ষাও এইরূপ ফলক দীর্ঘকালস্থায়ী। তিন লক্ষ ছাপের পরও এইরূপ অক্ষরের বিশেষ ক্ষয় দৃষ্ট হয় না। কাঠফলকাদি চিত্রের এই উপায়ে বহুসংখ্যক অবিকল অনুরূপ ফলক করিতে পারা যায়, অথচ কাঠফলকখানি যেমন তেমনিই থাকে।

ছাপা, মধ্যপ্রদেশে সিওনী জেলার লক্ষণাবার তহনীলের একটি পুরাতন নগর। সিওনী নগর হইতে ২২ মাইল উত্তরে জব্বল-পুর যাইবার রাস্তায় অবস্থিত। পূর্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু পিণ্ডারীদিগের দোরাণ্যে উৎসন্নপ্রায় হয়।

ছাপা, বেহারপ্রদেশস্থ সারণ জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণফল ৯৯৮ বর্গ মাইল। গ্রামসংখ্যা প্রায় ১৬৪৩। প্রতি বর্গমাইলে গড় অধিবাসীর সংখ্যা ৯৮। ইহার পূর্বদিকে গণ্ডকী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে ঘর্ষা নদী প্রবাহিত। বস্তার সময় ইহার অনেক স্থল জলপ্রাবিত হয়। ইহাতে পাচটা থানা আছে, যথা—ছাপা, দিঘবায়া, পরশা, মাঝি ও বসন্তপুর।

২ উক্ত সারণ জেলার প্রধান নগর। এই নগর ঘর্ষা নদীতীরে গঙ্গার ১ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৬' ৪২" উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ৪৬' ৪৯" পূঃ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইল, প্রস্থ কোথাও ১।০ মাইলের অধিক নহে। এই নগরের অবস্থান অতি নিম্ন। পশ্চিম ও উত্তরদিকে দুইটা বাঁধ। অধিবাসী (১৮৯১ খৃঃ অঃ) ৫৭৩৫২ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৪৩৫৮, মুসলমান ১২৮২৯, খৃষ্টান ৯৩, জৈন ৬৭ ও বৌদ্ধ ৪ জন। অজ্ঞাত জেলার ছায় এখানে বিচারালয়, কারাগার, ডাকঘর, থানা, পাছনিবাস, সরকারী হাসপাতাল, ইংরাজী বিদ্যালয়াদি আছে। পূর্বে গঙ্গানদী এই নগরের অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় ১ মাইল দূরে পড়াতে ইহার কৃষিকার্যের বিস্তার ক্ষতি হইয়াছে। পূর্বে ছাপা সোয়ার ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজগণ ইহাতে কুঠি নির্মাণ করেন। এই ব্যবসা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এখানকার মাটি ও পিতলের বাসন অতি উৎকৃষ্ট। ছাপা হইতে বাহির হইয়া কয়েকটা রাস্তা শোণপুর, মুজাফরপুর, মতিহারী, সেবান ও ঞঠনী গিয়াছে। এই স্থান জর্জ মিশনারীদিগের একটি প্রধান আড্ডা।

ছায় (স্ত্রী) অনাতপ। “সত্তিমার বিত্তিমারছায়ারানাতপায়চ”
(ভারত ২৮৬ অং)

ছায়া (স্ত্রী) ছাতি হিন্তি স্বৰ্ণাধোঃ প্রকাশঃ নানরতি ছো-ব
(মাক্সাসিহত্যোঃ বঃ। উপঃ ৪১১৯) ততঃ টাপ্। ১ অনাতপ,
রোজমুত। পর্যায়—ভাবানুজ্ঞা, ভাষা, অভিজ্ঞা, ভীক, অনা-
তপ, আভিতি, আতপাতাব, ভাবালীনা। “উপছায়ামিব বৃণের-
গয়” (বক্ ৩১৩৭৬) “ছায়ামিব প্রতান্ স্বৰ্ণাঃ” (অথর্ক ১৫৪৮)

বৈতকমতে ছায়ার গুণ—সুগুণ, পীতল, দাহপ্রমহারী, বর্ণ-
নাশী। (রাজনি) বেঘের ছায়া, শ্রম, শ্রম, সূক্ষ্ম ও সূতাপ-
নাশক। (রাজবলত) বিশেষতঃ বটবৃক্ষের ছায়া বল ও বর্ণ-
বর্ধক। (চরক)। প্রাণী, খাট ও শরীরের ছায়া অত্যন্ত
দোষকর। (কর্ণলোচন)

জ্যোৎস্না, আতপ, জল, দর্পণ ও কাহারও অঙ্গে বাহার
ছায়া বিকৃতভাবে পতিত হয়, তাহার মূর্ত্য আসন্ন। ছিন্ন
ভিন্ন, আকুল, হীন বা অধিক বিভক্ত, মস্তক শূন্য বা বিকৃত ও
প্রতিচ্ছায়ারহিত একরূপ ছায়া অতি অপ্রশস্ত ও কোন কারণ
জন্ম নহে, বাহার মূর্ত্য তাহাদেরই একরূপ ছায়া পতিত
হয়। যিনি স্বপ্নকালে নিজের ছায়ার অবয়ব সংগঠন বা
প্রমাণ, বর্ণ ও প্রভা পরিবর্তিত দেখেন, তাহারও মূর্ত্য আসন্ন।

আকাশাদি পঞ্চ মহাত্মতের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণে পাঁচ প্রকার
ছায়া আছে। যথা—আকাশ সম্বন্ধীয় ছায়া নির্মল, নীলবর্ণ,
মেঘ ও প্রভাযুক্ত। বায়বীয় ছায়া রক্ত, কপিশ ও অরুণবর্ণ
এবং নিশ্চত। অগ্নির ছায়া বিকৃত রক্তবর্ণ, উজ্জল ও রমণীয়।
জলীয় ছায়া নির্মল, বৈদূৰ্য্যমণির স্তায় নীলবর্ণ ও সুস্বাদু।
পৃথিবীর ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, শ্রাম ও শ্বেতবর্ণ। ইহার মধ্যে
বায়বীয় ছায়া অপ্রশস্ত ও বিনাশের বা মহাকষ্টের কারণ।

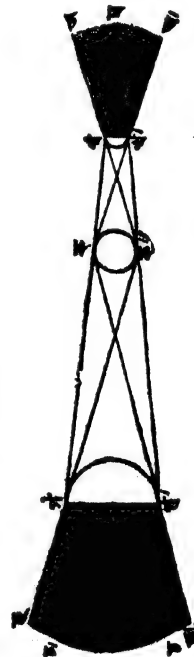
অগ্নির প্রভা সাত প্রকার—রক্ত, পীত, শুভ্র, কপিশ,
হরিত, পাণ্ডুর ও কৃষ্ণ। বিকাশী, স্নিগ্ধ ও বিপুল প্রভাই
শুভ এবং রক্ত, মলিন ও সংকীর্ণ প্রভাই অশুভ। প্রভার
শুভাশুভ অংশসারে তদ্ব্যক্ত ছায়া প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত।

(চরক ইন্দ্রিয়স্থান ৭ অঃ)

বর্তমান বিজ্ঞান মতে কোন অস্বচ্ছ বস্তুর ব্যবচ্ছেদ হেতু
যে স্থান হইতে আলোক অপসারিত হয়, সেই সমস্ত স্থানকে
ছায়া কহে। এই ছায়া ভূমি বা অজ কোন তলক্ষেত্র দ্বারা
বিভক্ত হইলে যে প্রতিবর্তিত উৎপন্ন হয়, তাহাকেও ঐ অস্বচ্ছ
বস্তুর ছায়া কহে। ছায়া সর্বদা বস্তুর সমানাকৃতি হয় না।
আলোকপ্রদ বস্তুর আকার ও দূরত্বভেদে এবং তলের সহিত
অস্বচ্ছ বস্তুর অবস্থানভেদে ছায়ার ভেদ হইয়া থাকে।
আলোক বহুদূরবর্তী এবং তলক্ষেত্রের উপর লম্বভাবে

ধাকিলে ছায়া বস্তুর ব্যবস্থানের প্রায় সমান হয় এবং ছায়ার
প্রান্ত অতি স্পষ্ট হয়। তত্তির ছায়া প্রায়ই ব্যবহৃত বস্তু
হইতে তির্যাকৃতি হইয়া থাকে। আলোকের গতি সরল
সেবাক্ষে হইয়া থাকে। একটীমাত্র বিন্দু হইতে আলোক
নির্গত হইলে সকল বস্তুরই ছায়া একটীমাত্র ও অতি স্পষ্ট
হয়, কিন্তু কার্যতঃ একটা বিন্দু হইতে আলোক উৎপন্ন হওয়া
অসম্ভব; সুতরাং বস্তুর একটীমাত্র ছায়া না হইয়া অনেকগুলি
ছায়া উৎপন্ন হয়। যেখানে সমস্ত ছায়াগুলি উপরি উপরি পতিত
হয়, তথার ছায়া সর্কাপেক্ষা গাঢ় ও ক্রমে চারিদিকে পাতলা
হইয়া যায়। এই পাতলা অংশকে উপছায়া (Penumbra)
কহে। আলোকপ্রদ বস্তু ব্যবহৃত বস্তু অপেক্ষা সুহস্তর
হইলে ছায়াময় স্থান ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে থাকে, কিন্তু ব্যবহৃত
বস্তু সুহস্তর হইলে, ছায়া ক্রমশঃই বৃহৎ হইতে থাকে। ছায়া
ও উপছায়ার চিত্র দেওয়া গেল।

মধ্যস্থ বস্তু লগী আলোকপ্রদ। ক ক' অপেক্ষা খ খ' সুহস্তর
এবং গ গ' সুহস্তর। ক ক' এর দুই প্রান্তস্থ বিপরীত বিন্দু



হইতে আলোকরশ্মি খ খ' এর দুই
প্রান্ত দিক্ খ বিন্দুতে মিশিয়াছে।
সুতরাং খ খ' নামক স্থান সম্পূর্ণ
ছায়া, এবং খ খ' ও খ খ' নামক
স্থান উপছায়া, গ গ' সুহস্তর বলিয়া
ইহার ছায়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে,
সুতরাং গ গ' এর ছায়া ক ক' এর
বিপরীত দিকে মিলিত হইতে পারে
না। জ খ খ' নামক উপছায়া খ খ' খ
নামক ছায়ায় চারিদিকে বেঠন
করিয়া আছে; এই স্থান ক ক' এর
কোন না কোন অংশ হইতে আলো-
কিত হয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর
ছায়া ঠিক এই ভাবেই থাকে। এই
সময়ে চন্দ্র খ খ' জ এই উপছায়ার
মধ্যে আলিলে রক্তবর্ণ দেখায়। অস্বচ্ছ

বস্তুর ছায়া নিকটে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়, ক্রমে ছায়া যত
দূরে বাইতে থাকে ততই উপছায়ার ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্বেই
বলিয়াছি, আলোকের আকার ও বেতলে ছায়া প্রসিক্ত হয়
তাহার অবস্থানভেদে ছায়ার আকার ভেদ হয়।

২ প্রতিবিম্ব। “মরি তেজ ইতিচ্ছায়া স্বাং দৃষ্টাংগতাং
অপেং” (যজ্ঞবল্ক্য ৩২৭৯) ৩ কান্তি, শোভা, দীপ্তি। “সং
ছায়য়া দধিরে সিদ্ধিমাঙ্গা” (বক্ ৫১৪১৬) ‘ছায়য়া দীপ্ত্যা’

(সারণ) ৪ পালিন। ৫ উৎকোচ, যুব। ৬ পংক্তি, শ্রেণী। ৭ কাত্যারনী। (শব্দরসাকর)। ৮ সূর্য্যের এক পত্নী। বিবস্বান্ সূর্য্যের সংজ্ঞা নামে এক পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে বৈবস্বত প্রাদুর্দেব এবং যম ও যমুনার অম্ব। পতির রূপে তাহার চিত্র সঙ্কট ছিলনা। সূর্য্যের তেজ তাহার নিত্য অন্তঃ হওয়ার মায়াধারা নিজের ছায়া হইতে আত্মসদৃশ এক কামিনী করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, “হে ভগ্নে! আমি পিতার ভবনে গমন করিতেছি, তুমি আমার এই বালকযম ও কস্তাটিকে প্রতিপালন কর এবং এই বৃত্তান্ত কাহারও নিকট বেন প্রকাশ করিও না” এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতা বিশ্বকর্মার নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বকর্মাও সমস্ত জানিতে পারিয়া সংজ্ঞাকে তৎসনাপূরক স্বামীর গৃহে গমন করিতে কহিলেন। বারংবার পিতার তাড়নায় সংজ্ঞা নিজরূপ ত্যাগ করিলেন এবং ঘোটকীর আকার ধারণ করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্ সূর্য্যও সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়াকে সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহাতে ছইট পুত্র উৎপাদন করিলেন, প্রথমটির নাম সাবর্ণি, দ্বিতীয় শনৈশ্চর (শনি)। ছায়া তাহাদিগকে সংজ্ঞার পুত্র অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তদর্শনে যম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন। ছায়া চুঃখিত হইয়া “তোমার চরণ খসিয়া পড়ুক” এই শাপ দিলেন। যম শাপগ্রস্ত হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, “পিতঃ! মাতার সকল পুত্রের প্রতি সমভাবে রোহ করা উচিত। কিন্তু তিনি আমাদের অপেক্ষা আমাদের কনিষ্ঠদিগকে অধিক ভালবাসেন। এই জন্যই তাহাকে পদাঘাত করিতে আমি উদ্বৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু গায়ে আঘাত করি নাই। তথাপি তিনি অভিশাপ দিলেন যে পুত্র হইয়া আমাকে চরণাঘাত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তোমার চরণ খসিয়া পড়ুক। সূর্য্য বলিলেন, “তোমার মাতৃবচন আমি অন্তর্গত করিতে পারিব না। ক্রমিগণ তোমার পাদ হইতে মাংস লইয়া ভুতলে গমন করিবে।” অনন্তর সূর্য্য সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়াকে আত্মান করিয়া তাহাকে কনিষ্ঠ সন্তানদিগের উপর অধিক রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ছায়া কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সূর্য্যদেব সমাধিধারা সমস্ত জানিতে পারিয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলে ছায়া ভয়বিহ্বল হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। অনন্তর তগবান্ সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্মার নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বকর্মা কহিলেন, “সংজ্ঞা তোমার তেজ সহ করিতে না পারিয়া ঘোটকীর আকার ধারণ করিয়া তপস্তা করিতেছে।

যাও গিয়া দর্শন কর।” সূর্য্যও বড়বাক্সধারিণী সংজ্ঞার নিকটে গমন করিলেন। পত্নীকে ক্লম্বা মীনা ও ব্রহ্মচারিণী দেখিয়া কহিলেন, “দেবি! আর তপস্তা করিবার প্রয়োজন নাই আমি নিজরূপ পরিবর্তন করিতেছি।” অনন্তর সূর্য্যদেব নিজরূপ পরিবর্তন করিলেন। (হরিবংশ ৯ অঃ) ৯ তমঃ, অন্ধকার। মীমাংসকেরা তমকে পৃথক্ জব্য বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন আলোকের অভাবই তমঃ, ইহা একটি পৃথক্ জব্য নহে। ১০ সাদৃশ্য। “অন্ধাদেহত্যাচং জপ্তা। আত্মায় শিশুমূর্কনি। বস্ত্রাদিতরিতরতা পুত্রচ্ছায়া-বহঃসুখং” “পুত্রচ্ছায়া পুত্রসাদৃশ্যম্।” (দত্তকচক্রিকা) ১১ ছন্দোভেদ। লক্ষণ যথা প্রত্যেক পদে ১৯টি অক্ষর, ২৩৩৪৫৬৭৮৯১০১১ ১২১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু। ৩১২১৩১৪ অক্ষরে যতি। “ভবেৎ সৈবচ্ছায়াতয়ুগযুতা তাদ্ভাদশান্তে যনা” (ছন্দোমঞ্জরী) ১২ রাগিণী বিশেষ। ইহা হারিণি ও শুক্ল নটযোগে উৎপন্ন ও সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। পঞ্চম বাদী, ঋষভ সঙ্গী, অবরোহণে ইহা তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। ইহার ঋ, গ্রহ, অংশ ও তাস (সঙ্গীতসার)। দামোদর মতে ইহা ওড়ব যথা—“নি ধ ম গ সা” (স-রস)। নারায়ণরুত সঙ্গীতসারে ইহা ষড়্জ শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা “ষড়্জগ্রহামরহিতা ছায়া শৃঙ্গারবীরয়োঃ”। ইহার মূর্ত্তি এলোকেশী দিগম্বরী নীলপদ্মের স্তায় স্ত্রীমবর্ণা ও ভয়ঙ্করী। সূর্য্যকাস্তমণি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। (সঙ্গীতসার) ১৩ পরিমাণভেদ। তৎপুরুষ সমাসে ছায়াস্ত শব্দ বাহল্যে ক্রীবলিঙ্গ হয়। (ছায়া বাহল্যে। পা ২৪১২২) ইচ্ছাঙ্করং।

ছায়াক (জি) [বৈ] ছায়াযুক্ত।

ছায়াকর (জি) ছায়া-কৃ-অচ্। ছত্রধারী।

ছায়াগণিত (ক্লী) ছায়াহুগতং গণিতং মধ্যলো। গণিত প্রক্রিয়া বিশেষ। এদেশীয় প্রাচীন আখ্যাজ্যোতির্বিদগণ ছায়া অবলম্বন করিয়া যে প্রক্রিয়ায় গ্রহ গতি ও অন্যান্যশের গমনাগমন প্রভৃতি নিরূপণ করিতেন, তাহাকেই ছায়াগণিত বলা যায়।

দিগদেশ ও কাল নিরূপণ করিতে ছায়া অবলম্বন করিতে হয়। [প্রাচীন আখ্যায়ণ ছায়া অবলম্বন করিয়া যে নিয়মে দিগদেশ নিরূপণ করিতেন, তাহার বিবরণ খগোল শব্দে ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।] সেই প্রক্রিয়া অমুসারে শঙ্কু দ্বারা পূর্ব পশ্চিম রেখা বা বিষুবনুগল স্থির করিয়া ছায়াকর্ণ নিরূপণ করিতে হয়।

ছায়াকর্ণ নিরূপণ করিবার উপায়—শঙ্কুর বর্গ বা ১৪৪ এর সহিত ছায়ায় বর্গ যোগ করিয়া যে ফল হয়, তাহার বর্গমূলকে ছায়াকর্ণ বলে। ছায়াকর্ণ ঠিক হইয়াছে, কি না তাহা জানিতে হইলে ছায়াকর্ণের বর্গ হইতে ১৪৪ অন্তর

করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার বর্গমূল ছায়া হইলে গণিত বিত্ত হইয়াছে জানিবে। [ইহার উপপত্তি সূর্য-সিদ্ধান্তের টীকায় দ্রষ্টব্য।]

অয়ন সংকৃত রবির ক্ষুট যে দিনে শূন্য হইবে, সেইদিনের মধ্যাহ্নকালের শঙ্কুছায়ার নাম বিষুবতী ছায়া। ইহাকে বিষুব প্রভা ও অক্ষতা নামেও উল্লেখ করা হয়। শঙ্কু পরিমাণ কোটা ও বিষুবপ্রভা পরিমাণকে ভূজ করিয়া ক্ষেত্রব্যবহারের কর্ণ আনিবার নিয়মামুসারে প্রক্রিয়া করিলে বাহা ফল হইবে, তাহাকে অক্ষকর্ণ বা অক্ষক্ষেত্র বলে। [কর্ণ স্থির করিবার প্রক্রিয়া ক্ষেত্রব্যবহার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ত্রিভাঙ্গাসাধনপ্রক্রিয়া দ্বারা ত্রিভাঙ্গা স্থির করিয়া তাহাকে গৃথকরূপে শঙ্কু ১২ ও বিষুবপ্রভা দ্বারা গুণ করিলে যে দুইটা রাশি হইবে, তাহা দুই স্থানে রাখিয়া বিষুবপ্রভা দ্বারা ভাগ করিবে। বাহা লব্ধ হইবে তাহাই উত্তরগোলের দক্ষিণদিকস্থিত লম্বাক্ষ।

অক্ষানয়নপ্রক্রিয়া—অভীষ্ট দিনের মাধ্যাহ্নিকী ছায়া দ্বারা ত্রিভাঙ্গাকে গুণ করিয়া মধ্যাহ্ন ছায়ার কর্ণ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লব্ধ হইবে, তাহার চাপসাধন করিবে, লব্ধ চাপকলাকে নতকলা বলা যায়। মধ্যাহ্ন ছায়া পূর্বাংশের সূর্যমধ্য হইতে দক্ষিণস্থ হইলে নত-কলাকে উত্তরনতকলা আর যদি মধ্যাহ্ন ছায়া উত্তরদিকস্থ হয়, তবে ঐ নতকলাকে বাম-নতকলা বলে। নতকলা ও সূর্যক্রান্তি-কলার একদিক হইলে উভয়ের যোগ এবং বিভিন্ন দিক হইলে উভয়ের বিয়োগ করিবে। বাহা ফল হইবে, তাহার নাম অক্ষকলা। স্থল বিশেষে ইহাকে অক্ষ নামে উল্লেখ করা হয়।

অক্ষতা স্থির করিবার প্রক্রিয়া—অক্ষ কলা হইতে প্রথমে অক্ষজ্যা স্থির করিবে। [জ্যা দেখ।] ত্রিভাঙ্গার বর্গ হইতে অক্ষজ্যার বর্গ অন্তর করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলকে লম্বজ্যা বলে। অক্ষজ্যাকে ১২ দিয়া গুণ করিয়া লম্বজ্যা দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লব্ধ হইবে তাহার নাম অক্ষতা। স্থানবিশেষে ইহার পলভা নামেও উল্লেখ আছে।

নতাংশ স্থির করিবার নিয়ম—একদিক হইলে স্বদেশের অক্ষাংশ ও মধ্যাহ্নকালিক সূর্যক্রান্তির যোগ এবং ভিন্নদিক হইলে অক্ষাংশ ও সূর্যক্রান্তির বিয়োগ করিবে। বাহা ফল হইবে তাহার নাম মাধ্যাহ্নিক সূর্য নতাংশ। এই নতাংশকে ভূজ করিয়া প্রক্রিয়া করিলে কোটিভাঙ্গা স্থির করিতে পারা যায়।

ছায়া ও কর্ণ স্থির করিবার উপায়—নতাংশজ্যা শঙ্কু ১২ দ্বারা গুণ করিয়া কোটিভাঙ্গা দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লব্ধ হইবে,

তাহাকে মাধ্যাহ্নিকী ছায়া এবং ত্রিভাঙ্গাকে শঙ্কু ১২ দ্বারা গুণ করিয়া কোটিভাঙ্গা দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে মাধ্যাহ্নিক ছায়াঙ্ক বলে।

অগ্রা ও কর্ণাগ্রা আনয়ন করিবার প্রক্রিয়া—সূর্যক্রান্তি-জ্যাকে অক্ষকর্ণ দ্বারা গুণ করিয়া শঙ্কু ১২ দ্বারা ভাগ দিলে বাহা লব্ধ হয়, তাহার নাম অগ্রা। ইহাকে সূর্যের অগ্রাও বলে। অপর গ্রহ সন্ধিক্ষেত্রে এইরূপ নিয়ম জানিবে। অগ্রাকে অভীষ্টকালের ছায়াঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া ত্রিভাঙ্গা দ্বারা ভাগ করিবে, বাহা লব্ধ হইবে তাহাকে কর্ণাগ্রা বলে।

ভূজানয়নপ্রক্রিয়া—অভীষ্ট সময়ের সূর্য্যাক্ষার সহিত অক্ষতা যোগ করিবে। যোগ ফল দক্ষিণগোলের উত্তর ভূজ এবং পলভা হইতে কর্ণাগ্রা বাদ দিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে উত্তর গোলের উত্তর ভূজ জানিবে। যদি পলভা হইতে কর্ণাগ্রা অধিক হয়, তবে কর্ণাগ্রা হইতে পলভা অন্তর করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে দক্ষিণ ভূজ জানিবে। সূর্য্য বায়োত্তর বৃত্তে অবস্থিত হইলে যে প্রকারে ছায়াঙ্ক স্থির করিতে হয়, তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্য পূর্বাংশের বৃত্তস্থ হইলে ছায়াঙ্ক স্থির করিবার নিয়ম—লম্বজ্যাকে অক্ষতা এবং অক্ষজ্যাকে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া ক্রান্তিভাঙ্গা দ্বারা ভাগ করিলে যে দুইটা রাশি লব্ধ হইবে, তাহাই সমবৃত্তস্থ বা পূর্বাংশের বৃত্তস্থ সূর্যের কর্ণদ্বয়। এইরূপে কোণছায়া ও কর্ণাদিরও সাধন করিতে হয়। তাহার প্রয়োজন ও বিবৃতি বিবরণ ক্ষুটাদি শব্দে দ্রষ্টব্য।

পূর্কোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ছায়াঙ্ক নিয়মিত হইলে সূর্য্য সাধন করা যাইতে পারে। তাহার নিয়ম—অভীষ্টকালের কর্ণাগ্রা দ্বারা লম্বজ্যা গুণ করিয়া তাৎকালিক ছায়াঙ্কের পরিমাণ অঙ্কুলী দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে ক্রান্তিভাঙ্গা বলে। ক্রান্তিভাঙ্গা ত্রিভাঙ্গার দ্বারা গুণ করিয়া পরমক্রান্তিভাঙ্গা দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লব্ধ হইবে, তাহার ধনুর রাশাদিকে ক্ষেত্র বলে। এই ক্ষেত্র হইতে ক্ষুট নিয়মে রবি সাধন করিবে। [রবিক্ষুট দেখ।] প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্বিদেরা ছায়া অবলম্বনে অনেক গণিতকার্য্য নির্বাহ করিতেন, এই স্থলে তাহার একটা প্রক্রিয়া সংক্ষেপরূপে প্রদর্শিত হইল। যে নিয়মে সূর্য্যসাধনপ্রণালী দর্শিত হইল, এইরূপ নিয়মে অনুরূপ গ্রহেরও সাধন হইতে পারে। [ক্ষুট প্রভৃতি শব্দে ইহার অনুরূপ বিবরণ দেখ।]

ছায়াগ্রহ (পুং) দর্শন।

“প্রসন্নলাপসংপ্রাপ্তৌ ছায়াগ্রহ ইবাচলঃ।” (স্বাক্ষর ৩৫৪)

ছায়াঙ্ক (পুং) ছায়া সূর্য্যপ্রতিবিম্বঃ অকোষতঃ বহুব্রী। চক্র।

ছায়াস্তনয় (পুং) ছায়ায়াঃ স্বৰ্ণপদ্মা স্তনয়ঃ ৬৩৭। ছায়াপুত্র, শনি।

ছায়াতরু (পুং) ছায়াপ্রধানতরুঃ শাকপার্শ্বিবৎ মধ্যলোঃ। ছায়া প্রধানতরুঃ। লক্ষণ যথা—পূর্বাঙ্ক বা অপরাঙ্কে যে বৃক্ষের তলে শীতল ছায়া থাকে। ছায়াপ্রধান হেতু সেই বৃক্ষকে ছায়াতরু বলে। ১ ক্ষুরপুস্পাগ, ছবিমান ফুল। “যক্ষচক্র জনকতনয়া দ্বানপুণ্যাদকেষু সিন্ধুছায়াতরু বসতিঃ রামগিৰ্যা-শ্রমেবু” (মেঘদূত)

ছায়াভোড়ী (দেশজ) ভোড়ী ও ছায়াযোগে উৎপন্ন রাগ-বিশেষ। নি ও প বিবাদি। (সঙ্গীতরসাকর)

ছায়াভ্রাজ (পুং) ছায়ায়া আভ্রাজঃ ৬৩৭। শনি।

ছায়াদেবী (স্ত্রী) গায়িত্রী দেবী। (দেবীভাগবত ১২/৬/৫৪)

ছায়াক্রম (পুং) ছায়া প্রধানোক্রমঃ শাকপার্শ্বিবৎ সমাসঃ। ১ ছায়াতরু। ২ নমস্ক বৃক্ষ।

ছায়ানট, রাগবিশেষ। ইহার গ্রহ, অংশ ও ভাস ধৈবত। এই রাগটি সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। (নারায়ণকৃত সঙ্গীতসার।) ইহা ছায়া ও নট যোগে উৎপন্ন। অবরোহণে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। সা বাদী গ সছাদী। ইহা নয় প্রকার নটের মধ্যে একটি। নয়প্রকার নট যথা—বৃহস্পতি, কেদারনট, কল্যাণনট, কামোদনট, মল্লারনট, ছায়ানট, কদম্বনট, হাঙ্গীরনট ও আহীরীনট। (সঙ্গীতরসাকর)

ছায়ানট (পুং) ছায়ানট রাগবিশেষ। ইহার লক্ষণ। “ধৈব-তাংশগ্রহজ্ঞাসম্ভায়ানটঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ। সম্পূর্ণঃ কথিতশাস্তৌ কবিতিস্তব্দশিভিঃ।” (সঙ্গীতসার)। [ছায়ানট দেখ।]

ছায়াপথ (পুং) ছায়াযুক্তঃ পথঃ শাকপার্শ্বিবৎ সমাস। ১ দেবপথ। ২ আকাশ। “ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নঃ।” (রঘু) ৪ জ্যোতিষ্ক মধ্যবর্তী অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি প্রদেশবিশেষ। ৫ জ্যোতিষ্ক মধ্যবর্তী মণ্ডলাকার নক্ষত্র শ্রেণী।

। *। মেঘশূন্য রজনীতে নির্মল আকাশে অসংখ্য তারকা-রাজির সহিত উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে শুভ্রবর্ণ নীহারবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাকে জ্যোতির্বিদেরা ছায়াপথ বা নীহারিকা বলিয়া থাকেন। তত্ত্বিগ্ন কবিগণ ইহাকে দেববর্ষা, দেবমার্গ ইত্যাদি কত নাম দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে উহাকে যমকুলি অর্থাৎ যমের বাড়ী যাইবার রাস্তা কহে। এই অল্পত পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ইহার স্বরূপ তব্ অবগত হইবার জন্ম কাহার চিত্ত ব্যাকুল না হয়? কাহার চিত্ত সংশয়মোলের আন্দোলিত হইয়া দুর্দান্ত কোতূহল বশে এই মনোহর বিমানস্থ পদার্থের প্রতি ধাবিত না হয়?

সহজ দৃষ্টিতে এই পথে কেবল শুভ্রবর্ণ নীহারবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য তারকারাজি দৃষ্ট হয়। এই সকল তারার পশ্চাতে আবার পূর্ববৎ নীহারিকা দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই দ্বিতীয় স্তরকেও কেবল তারাসমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আবার নীহারিকাময় তৃতীয় স্তরক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রসাহায্যে তাহাতেও তারাপুঞ্জ দেখিয়াছেন। কিন্তু যতই তাহারা এক এক স্তর বিশিষ্ট করিয়া যান, ততই পশ্চাতে সেই এক নীহারিকাময় স্তর দেখিতে পান। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই সকল স্তরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাসমষ্টি হইবে। ছায়াপথের এই সকল তারকা এত দূরবর্তী যে আমরা ইহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না, রাশি রাশি একত্র হইয়া পাতলা মেঘবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। ইহাদের দূরত্ব ও আকারের বিষয় পর্যালোচনা করিলে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ছায়াপথের সকল তারকা পৃথিবী হইতে সমান দূরবর্তী নহে। এই সকল তারকা হয়ত স্বর্ঘ্য অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর, উহাদের আলোক প্রতি সেকেন্ডে লক্ষকোশ এই অভাবনীয় দ্রুতগতিতে ধাবমান হইলেও অসুত বর্ষে পৃথিবীতে আসিতে পারে না। এই ছায়াপথে আমাদের তারাজগতের ভায় কত কোটা কোটা জগৎ বিরাজ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ছায়াপথ এক প্রকাণ্ড বলয়ের ভায় পৃথিবীর চারি দিকে আকাশে ব্যাপ্ত আছে। ইহার অর্ধেক অংশ দুই শাখায় বিভক্ত। এই বলয়ের সহিত সমকোণ করিয়া গগন-মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ অংশ তারকার সংখ্যা অতি অল্পই দেখা যায়। ক্রমে যত ছায়াপথের সন্নিকট হওয়া যায়, ততই তারকা সংখ্যার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ছায়াপথের উভয় পার্শ্বে ও ছায়াপথে একবারে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। সমস্ত স্থানেই যেন তারকাময় বোধ হয়। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই অনন্ত শূন্যে এই দৃশ্যমান নক্ষত্র-রাজির সমাবেশ সর্বত্র সমান নহে, প্রত্যুত অধিকাংশ নক্ষত্র একটি অসীমস্তরে অবস্থিত। এই স্তরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের তুলনায় বেধ অত্যল্প। পৃথিবী এই প্রকাণ্ড স্তরের মধ্যদেশে দ্বিষৎ হেলানভাবে এক স্থলে অবস্থিত।

ছায়াপথ রাশিচক্রকে উত্তর ঋগোলার্ধে একবার বৃত্ত ও মিথুন রাশির মধ্যে ও আবার দক্ষিণে ঋগোলার্ধে বৃশ্চিক ও ধনুর্রাশির মধ্যে ছেদ করিয়াছে।

ছায়াপথের সকল স্থান সমান উজ্জ্বল নয়। উজ্জ্বল স্থান সকলের আকার নানারূপ। কোথাও বৃত্তাকার, কোথাও

আবর্তীকৃতি, কোথাও ডমরু সদৃশ। সকলেরই মধ্যস্থান অধিকতর উজ্জল; কোন কোন তারকার চতুর্দিকে নীহারিকা-মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও কোন কোন নীহারিকার তারা দেখা যায় না। ইহাতে কোন কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত অস্বস্তি করেন, এই সকল নীহারিকা ধূমকেতুর পুচ্ছের দ্বারা উজ্জল বাষ্পের পদার্থ হইবে। এই বিশাল বাষ্পরাশি কোটা কোটা বোজন ব্যাপিরা অবস্থান করিতেছে এবং কোন অতিশয় নৈসর্গিক কারণে আবর্তিত হইতেছে। এই বর্ণময় জন্তু উহাদের অণু সকল ক্রমাগত কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহারা ক্রমশঃ হ্রাসমান ও ঘনীভূত হইতেছে। কালে উহারা গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্যে পরিণত হইবে। এই পণ্ডিতেরা অস্বস্তি করেন, সৌরজগৎ সম্ভবতঃ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে।

গ্রীকগণ এই ছায়াপথকে গ্যালাক্সিয়ান্ অর্থাৎ দুগ্ধবস্ম বলিত। প্রাচীন গ্রীকগণের বিশ্বাস ছিল, জুপিটার হারকিউলিসকে জুনোদেবীর কোড়ে স্থাপন করিলে জুনোদেবী তাহাকে মার (Marr)-পুত্র জানিতে পারিয়া ত্যাগ করেন। জুনোদেবীর শুভদৃষ্টি আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতেই এই পথ হইয়াছে। আবার অনেকে বলিত, ছায়াপথের সমস্ত দৃষ্টি নহে; আইসিস্ (Isis) টাইফন হইতে পলায়নকালে পথে পথে শস্তের শীষ ফেলিয়া যায়, তাহাতেই এইরূপ হইয়াছে।

প্লেটো যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে ছায়াপথ দেবতা ও মহাবীরগণের চলিবার প্রশস্ত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রোমকগণও ইহাকে দুগ্ধবস্ম বলিত। পিথাগোরস্-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ইহাকে সূর্য্যের পরিত্যক্ত রথ্যা বলিতেন, আবার কেহ কেহ সূর্য্যরশ্মির প্রতিকলন বলিয়া বিশ্বাস করিত। আরিষ্টটল্ অস্বস্তি করেন, ইহা ধূমকেতু-পুচ্ছবৎ উজ্জল বাষ্পরাশি। আবার কেহ বলিত, ইহা পৃথিবীর ছায়া, কেহ বলিত অগ্নিমণ্ডল, কেহ বলিত উত্তর খগোলার্ধকে বাধিবার দৃঢ় জ্যোতিষ্মান্ বলয়, কেহ আবার বলিত ইহা বিস্তীর্ণ কঠিন গগনতলের কাট দিয়া দৃষ্টমান স্বর্ণের আলোকরাশি। অবশেষে ডিমোক্রিটস্ প্রকৃত তত্ত্বের কতক আভাস দেন, তিনি বলেন ইহা বহু দূরস্থিত তারাপুঞ্জ মাত্র, দূরত্ব নিবন্ধন পৃথক পৃথক দৃষ্ট না হইয়া কেবল শুভ্র দুগ্ধবৎ দেখায়। গ্যালিলিও আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে ছায়াপথে তারকা দেখিয়া বলেন, তিনি সমস্ত ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া কেবল তারাপুঞ্জ দেখিয়াছেন। গ্যালিলিও নির্দিষ্ট দূরবীক্ষণ এখনকার উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ অপেক্ষা নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট ছিল,

যেহেতু তিনি শনিগ্রহের বলয় স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাহা দ্বারা যে সকল ছায়াপথ তারাকামর দৃষ্ট হইবে সম্ভবপর নহে। পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমান অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও সমস্ত ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট হয় না, পশ্চাতে নীহারিকাময় এক স্তর থাকিয়া যায়। ইহাতে বোধহয় গ্যালিলিও অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী স্তর দেখিয়াই এই কথা বলিয়া থাকিবেন।

ইংরাজীতে ছায়াপথকে গ্রীকদিগের অনুকরণে গ্যালাক্সি (Galaxy) বা মিল্কিওয়ে (Milkyway) অর্থাৎ দুগ্ধবস্ম বলিয়া থাকে। ছায়াপথের ঐহং আভাসের স্থান সকলকে নীহারিকা (Nebulae) কহে। [নীহারিকা দেখ।]

ছায়াপথ (পুং) ছায়াপথঃ দৃষ্টঃ পুরুষঃ পুরুষাকৃতিবিশেষঃ শাকপার্শ্বিবৎ সমাসঃ। আকাশে দৃষ্ট নিজ ছায়ারূপ পুরুষ। তস্মৈ লিখিত আছে—এক দিন গৌরী ভগবান্ শূলপাণিকে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রভো! কিরূপেই বা ভবিষ্যৎ বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে।”

ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! শ্রবণ কর, কিরূপে পাপিদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হয় ও ভবিষ্যৎ বিষয় জানা যাইতে পারে। লোকে শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিজের ছায়া আকাশে দেখিতে পায়, তদন্বয়ে-পাপ নষ্ট হয় ও ছয় মাসের মধ্যে যাহা ঘটবে তাহা জানা যায়।” ভগবতী কহিলেন, “লোকে কিরূপে তুলনামূলক নিজের ছায়া আকাশে দেখিতে পায়, কেমনেই বা তাহা দেখিয়া ছয়মাস মধ্যে ভাবী শুভাশুভ জানিতে পারে?” মহাদেব কহিলেন, “আকাশ মেঘশূন্য ও নির্মল হইলে নিশ্চল চিত্তে নিজ ছায়াভিমূখে দণ্ডায়মান হইবে, গুরু উপদেশামুসারে স্বচ্ছায় কণ্ঠ দর্শনপূর্ব্বক নিমেষশূন্যমনে সমুদ্রস্থ গগনতল দর্শন করিবে, তাহাতে দেখিতে পাইবে ক্ষটিকবৎ স্বচ্ছ এক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিতে না পাইলে বারংবার পরীক্ষা করিবে। কাহারও বহু পুণ্যবলে ছায়াপুরুষ দর্শন ঘটে। গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক ছায়াপুরুষের দর্শন করিতে হয়। তদন্বয়ে ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু ছায়াপুরুষকে মস্তকশূন্য দর্শন করিলে ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু অবশ্যস্বার্থী। চরণ দেখিতে না পাইলে ভাব্যায় মরণ ও হস্ত দেখিতে না পাইলে ভ্রাতৃহানি ঘটে। এই সকল জানিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ লোকেই গলাতীরে গিয়া হবিষ্যাসী ও সংযত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম লক্ষ্য করিবে। যদি ছায়াপুরুষের আকৃতি মলিন দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার অন্নপীড়া উপস্থিত হয়। সমাহিত চিত্তে মহাদেবের সেবা করিয়া ইহার শান্তি বিধান করিবে। ছায়াপুরুষের আকৃতি রক্তবর্ণ দর্শন

করিলে ঐশ্বর্য লাভ হয়; মধ্যে ছিদ্র দর্শন করিলে শক্র-
বিনাশ হয়। কলিযুগে ছায়াপুরুষদর্শন পুরুষের লক্ষণ এবং
তদ্বর্ণনে দীর্ঘায়ুলাভ হয়।” (যোগপ্রদীপিকা ৫ পটল)
মন্ত্র—“ওম্ হ্রীং শ্রীং ছায়াপুরুষগ্রহণমন্ত্রস্ত ত্র্যম্বকং বৃহদগারিত্রীজ্ঞানং;
ছায়াদেবী দেবতাঃ হাং বীজং স্বাহা শক্তিঃ পুরুষঃ ইতি কীলকং
সর্বসিদ্ধিসম্পদনসিদ্ধার্থে জপে যিনিয়োগঃ। হামিত্যাদি
ষড়ঙ্গজ্ঞানঃ। দায়রা দায়রা সৌ সৌ হ্রীং মায় শিববিচার্য্যা শ্ববয়ঃ
ও হ্রীং অং গাং সরস্বতি। ও নমোভগবতে ভূতশরীরমাখ্যান-
মাকাদেশে দর্শয়। জাঁ জাঁ জাঁ হ্রীং তৈরবার নমঃ স্বাহা।”
আকাশে দর্শনমন্ত্র—“ও হ্রীং ভূতচরী খেচরী আখ্যানমাকাদেশে
দর্শয় সর্ববৃত্তান্তং কথয় কথয়, হং ফট স্বাহা।” (যোগপ্রঃ ৬ পঃ)

ছায়াভূত (পুং) ছায়াঃ ছায়ারূপং যুগলাঞ্জনং শীতলকান্তিঃ বা
বিভর্তি ছায়া ভূ-কিপ্। চন্দ্র।

ছায়াময় (ত্রি) ছায়া-ময়ট্। অজ্ঞানময়। “যত্রবারং ছায়াময়ঃ
পুরুষঃ সএষবদৈব শাকল্য।” (শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৬।৯।১৬)

ছায়ামান (পুং) ছায়য়া স্ব্যপ্রতিবিম্বেন মীয়তে ছায়া-মা-মূট্।
১ চন্দ্র। (হেম)। ৬তৎ। (ক্লী) ২ ছায়ার মান, প্রমাণ।

ছায়ামিত্র (ক্লী) ছায়ায়ামিত্রমিব অথবা ছায়য়া ছায়াকরণেন
মিত্রমিব। আতপত্র, ছত্র। (শব্দরত্নাকর)

ছায়াযুগধর (পুং) ছায়ারূপং যুগং ধরতি ছায়াযুগ-ধু-অচ্।
ধু-অচ্ ধরঃ, ছায়া যুগস্ত ধরঃ ৬তৎ। চন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড)

ছায়াযন্ত্র (ক্লী) ছায়য়া কালজ্ঞানসাধকং যন্ত্রং। ছায়াধারা কাল-
জ্ঞানসাধক যন্ত্রভেদ।

“শব্দ বস্তুধর্মসূচকৈশ্ছায়াবস্তুরনেকথা। গুরুপদেশাভিজেয়ং
কালজ্ঞানমতন্ত্রিতৈঃ।” (স্বর্ষাসিদ্ধান্ত)

ছায়াবৎ (ক্লী) ছায়া বিত্ততেহন্ত ছায়া-মতুপ্ অবর্ণান্তত্বাৎ মন্ত
বন্তং। ১ ছায়াবিশিষ্ট। ২ কান্তিযুক্ত।

ছায়াবিপ্রতিপত্তি (ক্লী) ছায়ানাং দেহকাস্তীনাং বিপ্রতি-
বিক্রান্তা প্রতিপত্তিজ্ঞানং ৬তৎ। মরণসূচক দেহকাস্ত্যাতির
অন্তথাভাব। যাহার ছায়া কপিশ লোহিত বা নীলবর্ণ কিবা
শীতবর্ণ তাহার মৃত্যু আসন্ন। যাহার লজ্জা ও শ্রী অকস্মাৎ নষ্ট
হয়, তেজঃ, বল, শ্রমশক্তি ও প্রেতা সকলও অকস্মাৎ দূরীভূত
হয়, তাহারও অন্তকাল নিকটবর্তী। যাহার অধরোষ্ঠদ্বয়
পতিত বা উর্দ্ধে ক্লিপ্ত, এক বা দুইটা ওষ্ঠই জামফলের
জায় রক্তবর্ণ এবং যাহার দন্তগুলি ঈষৎ রক্তবর্ণ বা কপিশ-
বর্ণ অথবা খঞ্জন সদৃশ হইয়া পতিত হইতেছে এবং
যাহার জিহ্বা রক্তবর্ণ, নিশ্চল, অবলিপ্ত, ক্ষীত কিবা
কর্কশ এবং যাহার নাসিকা বক্র, ক্ষুণ্ণ, শুষ্ক বা ময় ও
অধিক শব্দযুক্ত যাহার চক্ষুর ছোট, বিবদ, নিম্পদ,

রক্তবর্ণ ও জল বসিতে থাকে, এবং যাহার কেশ সিঁধি-
যুক্ত, ক্রম্বুল ছোট ও ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চকুপাতার লোম
ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন। মুখে অন্ন তুলিয়া
দিলেও যে আহার করিতে পারে না, মাথা সুটাইয়া পড়ি-
তেছে ও দৃষ্টি একাগ্র, সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। হৃর্দল
বা বলবান হউক বারংবার তুলিয়া দিলেও যে মুছিয়া
যায়, যে সর্বদা চিং হইয়া শয়ন করে, শয়নাবস্থায়
ইতস্ততঃ পা কেলে এবং যাহার হস্তপদ শীতল ও শ্বাস নষ্ট-
প্রায় হইয়াছে কিবা কাকের জায় শ্বাস পড়িতেছে, সর্বদা
নিদ্রিত বা আগ্রিত থাকে বা বলিতে বলিতে মোহপ্রাপ্ত
হয়, যে অধরলেহন ও উদগার করে কিবা প্রেতপুরুষের সহিত
আলাপ করে, যাহার রোমকূপ হইতে রক্ত স্রবিত্তে থাকে
এবং যাহার হৃদয়ে উর্দ্ধগত বাতগীলা ও অরুচি রোগ হয়,
সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। আকস্মিক পাদজশোথে পুরুষের,
মুখজ বা গুহজ শোথে স্ত্রীদিগের এবং শ্বাস বা কাসরোগীর
অভিসার, জ্বর, হিকা, ছর্দি বা মেট্রফীত ও অণ্ডের মত হইলে
মৃত্যু নিকটবর্তী জানিবে।

যাহার জিহ্বা কপিশ বর্ণ, বামচক্ষু কোঠরগত, মুখ দুর্গন্ধ-
যুক্ত, তাহার অচিরেই মৃত্যু হয়। যাহার মুখ নয়নজলে
ভাসিতে থাকে, পা দুটা ঘষিতে থাকে, চক্ষুর আকুল, তাহারও
মৃত্যু নিকটবর্তী। যাহার গাত্র অকস্মাৎ অতিশয় লঘু বা গুরু,
যে পক্ষ, মংস্ত্র, বশা, তৈল ও ঘূতের গন্ধই কেবল আশ্রয়
করে; যাহার ললাটে উকুন উঠে, কাক যাহার পূজার দ্রব্য
গ্রহণ করে না এবং অন্তরে সন্তোষ নাই, দৌর্লভ্য অবস্থায়
যাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বেদা অন্নপানাদি দ্বারা শাস্তি হয় না,
যাহার এককালে উদরাময়, শিরঃশূল, কোষ্ঠশূল, পিপাসা ও
দৌর্লভ্য ঘটে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য। এইরূপ মরণোন্মুখ
ব্যক্তির নিকটে ভূতপ্রেত পিশাচাদি নিত্যই আগমন করে।
ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে তাহার কতকটা নিবারণ হয়।

(সুশ্রুত সূত্রঃ ৩১ অঃ)

ছায়াব্যবহার, যে কোন বস্তুর ছায়া দ্বারা তাহার পরিমাণ
স্থির করাকে ছায়াব্যবহার বলা যায়। ভাস্করাচার্য্য লীলা-
বতীতে ইহার প্রক্রিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

ছায়াধ্বয়ের অন্তর ও কর্ণধ্বয়ের অন্তর জানা থাকিলে ছায়া-
ধ্বয় ও কর্ণধ্বয় বাহির করিবার উপায়।—

ছায়াধ্বয়ের অন্তরের বর্গ ও কর্ণধ্বয়ের অন্তরের বর্গ এই
উভয় বর্গের বিরোধফল দ্বারা ৫৭৬ পাঁচশত ছিয়াত্তরকে ভাগ
কর। লব্ধ ভাগফলে ১ যোগ করিয়া ঐ যোগফলের বর্গ
মূলদ্বারা কর্ণধ্বয়ের অন্তরকে গুণ কর। ঐ গুণফলে ছায়াধ্বয়ের

অস্তর একবার যোগ ও একবার বিরোগ করিয়া উত্তর কলের অর্ধেক অর্ধেক লইলে ছইটি ছারার পরিমাণ জানা যাইবে।

উদাহরণ। ছায়াঘরের অস্তর ১৯, কর্ণঘরের অস্তর ১০; ছায়াঘর ও কর্ণঘর কত? ছায়াঘরের অস্তর ১৯, ইহার বর্গ ৩৬১; কর্ণঘরের অস্তর ১০, ইহার বর্গ ১০০; উত্তর বর্গের বিরোগফল ১৯২। ৫৭৬কে ১৯২ দিয়া ভাগ দিলে ৩ হয়। এই ভাগফলকে ১ যোগ করিলে ৪ হয়। উহার বর্গমূল ২ দ্বারা কর্ণঘরের অস্তর ১০কে গুণ করিলে ২০ হয়। ২৬এর সহিত ১৯ যোগ করিলে ৪৫ ও বিরোগ করিলে ৭ হয়। ইহাদের অর্ধেক লইলে ছায়াঘর ২৩ ও ১৭ অঙ্গুলি হইল।

এইরূপে কর্ণাস্তরের পরিবর্তে ছায়াস্তর ১৯কে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে কর্ণাস্তর যোগবিরোগাদি করিলে বর্গ-ঘর ২৭ ও ১৭ বাহির হইবে।

প্রদীপের উচ্চতা ও প্রদীপ তল হইতে শঙ্কুতলের দূরত্ব জানা থাকিলে শঙ্কুর ছায়ার পরিমাণ বাহির করিবার উপায়।

শঙ্কু ও প্রদীপতলের দূরত্বদ্বারা শঙ্কুর পরিমাণকে গুণ কর। ঐ গুণফলকে শঙ্কুমান রহিত দীপশিখার উচ্চতা দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধ ভাগফল ছায়ার পরিমাণ হইবে।

উদাহরণ। শঙ্কু ১ হস্ত প্রদীপ ও শঙ্কুতলের দূরত্ব ৩, প্রদীপের উচ্চতা ৩ হাত, ছায়া কত?

শঙ্কু ও প্রদীপতলের অস্তর ৩কে শঙ্কুর পরিমাণ ২ দিয়া গুণ করিলে ৬ হয়। দীপের উচ্চতা ৩ হইতে শঙ্কুর উচ্চতা ২ বিরোগ করিলে বিরোগফল ৩ থাকে। ৬কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ২ ছায়ার পরিমাণ হইল।

শঙ্কুর উচ্চতা, ছায়ার পরিমাণ ও শঙ্কু হইতে প্রদীপতলের দূরত্ব জানা থাকিলে, প্রদীপের উচ্চতা বাহির করিবার কৌশল।—শঙ্কু ও প্রদীপতলের অস্তর দ্বারা শঙ্কুর পরিমাণকে গুণ কর। ঐ গুণফলকে ছায়ার পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া উহার সহিত শঙ্কুর পরিমাণ যোগ করিলে দীপের উচ্চতা বাহির হইবে।

উদাহরণ। প্রদীপতল ও শঙ্কুর অস্তর ৩ হস্ত, ছায়া ১৬ অঙ্গুলি, শঙ্কু ১২ অঙ্গুলি, প্রদীপের উচ্চতা কত?

শঙ্কু ১ হস্ত, অস্তর ৩ হস্ত, উভয়ের গুণফল ৬কে ছায়া পরিমাণ ১৬ দিয়া ভাগ করিলে ৩ হয়। এই ভাগফলে শঙ্কুর পরিমাণ ১২ যোগ করিলে ১৫ প্রদীপের উচ্চতা হইল।

প্রদীপ ও শঙ্কুর দূরত্ব বাহির করিতে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনীয়। শঙ্কু পরিমাণরহিত প্রদীপের উচ্চতা-পরিমিত অঙ্কদ্বারা ছায়াঙ্গুলিকে গুণ করিয়া গুণফলকে শঙ্কুর পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলে প্রদীপ ও শঙ্কুর অস্তর জানা যাইবে।

উদাহরণ পূর্বের জায়।

দীপোচ্চতা ১, শঙ্কু ১, ছায়া ১। প্রদীপের দূরত্ব ৩ হস্ত।

ছায়া ও প্রদীপের অস্তর এবং প্রদীপের উচ্চতা বাহির করিবার উপায়—

ছায়াগ্রভাগঘরের অস্তরকে ছায়াদ্বারা গুণ করিয়া ছায়া-ঘরের অস্তর দ্বারা ভাগ দিলে ভূমি অর্থাৎ প্রদীপ তল হইতে ছায়াগ্রভাগের দূরত্ব পাওয়া যাইবে। এই ভূমিতে শঙ্কু পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া ছায়াদ্বারা ভাগ করিলে দীপ-শিখার উচ্চতা লব্ধ হইবে।

উদাহরণ। ১২ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কুর ছায়া ৮ অঙ্গুলি শঙ্কুকে ছায়ার দিকে পূর্বস্থান হইতে সোজাঅঙ্গি ২ হস্ত দূরে রাখিলে ছায়া ১২ অঙ্গুলি হয়। ছায়া হইতে প্রদীপের অস্তর ও উচ্চতা বাহির কর।

ছায়াগ্রভাগঘরের অস্তর ৫২ অঙ্গুলি, ছায়াঘর ৮ ও ১২ অঙ্গুলি। ৫২কে প্রথম ছায়া ৮ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ৪১৬ হয়। ইহাকে ছায়াঘরের অস্তর ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল ১০৪ ভূমি অর্থাৎ প্রদীপতল হইতে প্রথম ছায়ার অগ্রভাগের দূরত্ব হইল। এইরূপে দ্বিতীয় ছায়াগ্রভাগের দূরত্ব ১৫৬ অঙ্গুলি। ইহাদের একটিকে শঙ্কুদ্বারা গুণ করিয়া তাহার ছায়া দ্বারা ভাগ করিলেই প্রদীপের উচ্চতা ১ হস্ত বাহির হইবে।

ত্রৈাশিকের নিয়মেও এই অঙ্ক সাধন করা যায়। প্রথম ছায়া ৮ হইতে দ্বিতীয় ছায়া ১২ যত অধিক ৪, ঐ পরিমাণ ছায়াবসব দ্বারা ভূমির পরিমাণ যদি ছায়াগ্রভাগঘরের অস্তরের ৫২ সমান হয়, তবে ছায়াগ্র কত হইবে। এইরূপে ছায়া ও প্রদীপতলের অস্তর নিরূপিত হইবে। ভূমিঘর নিরূপিত হইলে ছায়া পরিমাণ ভূজে যদি শঙ্কু পরিমাণ কোটি হয়, তবে ভূমি-পরিমাণ ভূজে কোটি কত হইবে? এইরূপ ত্রৈাশিক দ্বারা প্রদীপের উচ্চতা নিরূপিত হইবে।

ছায়াঙ্গুত (পুং) ছায়ায়াঃ সূর্য্যপত্ন্যাঃ স্তুতঃ ৬তৎ। শনি।

ছার (কার শব্দজ) ১ কার, ভ্রম। ২ অধম, হেয়।

ছারকচু (দেশজ) একপ্রকার কচু।

ছারকপাল (দেশজ) ছরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য।

ছারকপালে (দেশজ) মন্দ কপালযুক্ত, দুর্ভাগ্য।

ছারধার, ১ ভ্রমসাৎ। ২ সর্কনাশ। ৩ উচ্ছিন্ন, নষ্ট।

ছারপোকা, রক্তপায়ী ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। সংস্কৃত নাম গন্ধকীট, তন্নকীট ও মৎকুণ। (Cimex lectuarius) ছারপোকা জাতীয় অনেক কীট মনুষ্য পতপক্ষ্যাদির রক্তপান করিয়া

জীবনধারণ করে। লেপ, তোষক ও গদিবাগিচাদির কুক্কিত স্থানে, খাট, পালঙ্ক, চৌকি ইত্যাদির ফাটালে কিছা দেওয়ালের গায়ে ইহার দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, এবং সুবিধা পাইলেই হুচ্যাও শুণ্ড মছয়গায়ে বিদ্ধ করিয়া রক্ত পান করে। এই শুণ্ড মছকের নীচে শুটান থাকে, আবশ্যক মত বাহির করিয়া ব্যবহার করে। ইহাদের শরীর নিতান্ত চেন্টা বলিয়া খাট পালঙ্কাদির ফাটালে থাকিতে বিশেষ সুবিধা তিন্ন অসুবিধা হয় না। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই সকল আবাসে ছারপোকা সাদা সাদা ছোট ছোট ডিম পাড়ে। প্রথমে ঐ সকল ডিম আঠাল থাকে, সুতরাং কোন বস্তুতে লগ্ন হইলে সহজে ছাড়ে না। প্রায় তিন সপ্তাহ মধ্যে ডিম ফুটিয়া ছারপোকাকার ছানা বাহির হয়। ছারপোকাকার ছানা খাড়ী ছারপোকা অপেক্ষাও অধিক বিরক্তজনক। প্রায় তিনমাস পরে ছারপোকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রক্তাদির ফাটালে এবং কপোত, চটক, চামচিকা প্রভৃতির বাসাতেও ছারপোকা বাস করে এবং ঐ সকল পক্ষীর রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

ছারপোকা নাড়িলেই একরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়। বিছানা-দিতে ইহার একবার বাস করিলে অতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ইহাদের হস্ত হইতে এড়াইবার বিস্তর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই বিশেষ ফলজনক।

তুঁকি স্থানে একরূপ ছারপোকা আছে, উহা দংশন করিলে শরীর বিষাক্ত হয়। তাহাতে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

ছাল (পুং, স্ত্রী) ছো-অলচ্ অর্ধচাঁদিখাং, পুংলিঙ্গতা স্ত্রীলিঙ্গ-তাচ (অর্ধচাঁদি:পুংসি। পা ২।৪।৩১) বড়ল, বৃক্ষ।

ছালন (পারসীজ) ব্যজন, তরকারি।

ছালনা (দেশজ) বিবাহাদির জন্ত যে চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়া টাঙ্গান হয়।

ছালনা তল (দেশজ) যেস্থলে বর ও কন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা স্ত্রী-আচার করে, বিবাহকালে বিবৃত চন্দ্রাতপের নিম্নতল।

ছালা (দেশজ) খাড়া চাউলাদি বহনের থলি।

ছালাপাক, রঙ্গপুর জেলার একটি নগর, এখানে পাট ও চূণের বাণিজ্য চলে।

ছালিক্য (পুং) ছলিকে রূপকভেদে ভবঃ ছলিক-শ্যঙ্। গান ভেদ, এ গান পূর্বে কেবল দেবলোকেই ছিল, পরে ভগবান বাসুদেবের ইচ্ছায় নরলোকে আনীত হয়। এই গান শ্রবন্ত, পুণ্যকর, ভগবানের শ্রীতিপ্রদ, ইহার কীর্তনে দুঃস্বপ্ন দূর হয়। ভূপতি আশ্বমুহুরতলে স্বর্গে গমন করিয়া ঐ গান শ্রবণ করেন। (হরিবংশ ১৪৮ অঃ)

ছালিয়া (দেশজ) সন্তান, পুত্র।

ছালিয়া পিলিয়া (দেশজ) সন্তান সন্ততি।

ছালিয়ার, গুজরাটের রেবাকাহা বিভাগের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। বহুদিন হইতে এখানে চোহানগণ বাস করিতেছেন।

ছাল্ল, গুজরাটের ঝালাবার রাজ্যের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য।

ছাবী (স্ত্রী) সুরপুরাগবৃক্ষ, ছবিয়ান ফুল।

ছি (দেশজ) তিরস্কার ও অবজ্ঞাসূচক।

ছিকণ (স্ত্রী) ক্ষুৎ, হাঁচ।

ছিকণী (স্ত্রী) ছিক্-ইত্যব্যক্ত্যংশং কনতানয়া ছিং-কন্-করণে অপ্-ততো ঙীপ্। বৃক্ষভেদ, হাঁচুটা, ছিকনি, নাক-ছিকনী। পর্যায়—ক্ষবক্ষুৎ, তিত্তা, ছিক্কা, ব্রাগ্‌হু:খদা, উগ্রা, উগ্রগন্ধা। ইহার গুণ—কটু, কটিকর, অত্যন্ত তীব্র, অগ্নি ও পিত্তকর, বাত, রক্ত, কুষ্ঠ, কৃমি ও বাতকফনাশক। (ভাবপ্রকাশ।)

ছিকর (পুং) ছিক্-ইত্যব্যক্ত্যংশং করোতি, ছিক্-কু-ট। মৃগভেদ। ইহা দক্ষিণে শুভ। (বৃহৎসংহিতা ৮৬ অঃ)

ছিক্কা (স্ত্রী) ছিক্-ইত্যব্যক্ত্যংশেন কায়তি ছিক্-কৈ-ক তত-ষ্টাপ্। ক্ষুৎ, হাঁচ। ইহার ফল—অগ্নিকোণে ও নৈঋতে শোক ও মনস্তাপ, দক্ষিণে হানি, পশ্চিমে মিষ্টান্ন লাভ, বায়ুকোণে অন্ন, উত্তরে কলহ এবং ঈশানকোণে মরণ। (গরুড় জ্যোতিষশাস্ত্র ৬০ অঃ)

ছিক্কার (পুং) ছিক্-কু-অণ্। মৃগভেদ। (বৃহৎসং ৮৬ অঃ)

ছিক্কা (স্ত্রী) ছিক্কা ক্ষুৎ সাধ্যম্বেনাত্মাত্মা: ছিক্কা বাহলকাং ঠঠন। বৃক্ষবিশেষ, হাঁচুটা।

ছিক্কাণী [ছিক্কাণী দেখ।]

ছিচ্কা (শলাকা শব্দজ) শিক, গজ।

ছিট (দেশজ) বিন্দু বিন্দু জলাদি সেক, অঙ্গুলি দ্বারা জলছিটান।

ছিটাগুলি (দেশজ) ক্ষুদ্রগুলি।

ছিঁড়নি (দেশজ) ১ জলনির্গম পথ। ২ স্বভাব।

ছিঁড়া (দেশজ) ছিন্নকরণ, ছেড়া।

ছিচকাচোর (দেশজ) চোরবিশেষ, সামান্য দ্রব্যাদি যে চুরি করিয়া বেড়ায়।

ছিচকাঁদনি (দেশজ) অন্নকারণে ক্রন্দন করা।

ছিচকাঁদনে (দেশজ) একটুতেই যে ক্রন্দন করিতে থাকে।

ছিছি (দেশজ) তিরস্কার বা লজ্জাসূচক অব্যয়পদ।

ছিট (দেশজ) স্বভাব, প্রকৃতি।

ছিট, এক বা ততোধিক পাকা রঙের চিত্রযুক্ত কাপড়।

ছিট কাপড় বলিলে সচরাচর সাদা বা এক রঙী জামির উপর

ছাপ দেওয়া কাপড়কেই বুঝায়। [রঞ্জিত সূত্রাদি দ্বারা ফুল-তোলা অথবা তাঁতে বোনা ছিটের বিষয় চিত্রণ শব্দে দেখ।]

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী ছিট প্রস্তুত জন্ম বিধাত। বাঙ্গালার ঢাকার ছিট বহু সমাদরে যুরোপে বিক্রীত হইত। দাক্ষিণাত্যের কালিকোট বন্দর হইতে বিলাতে ছিট রপ্তানী হইত বলিয়া তথায় ছিট তৈয়ারের নাম কালিকো-প্রিংটিং (Calico-printing) হইয়াছে।

যাহা হউক এক সময়ে ইংলণ্ডে ইহার একরূপ অধিক রপ্তানী হয় যে তথাকার অর্থসচিবগণ ইংলণ্ডীয় রেসম ও উর্ণা-শিল্পের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ভারতীয় ছিট ব্যবহারের নিষেধ ঘোষণা করেন। তাহার পর বিলাতে ছিট প্রস্তুত করিবার নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে উহারই উন্নতি হইয়া এখন চরমাবস্থার উপনীত হইয়াছে। এখন তথায় নানারূপ কলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ছিট প্রস্তুত হইতেছে।

কতকগুলি রঙ জলে সহজেই দ্রব হয়, আবার কতকগুলি স্বভাবতঃ দ্রব হয় না ; কিন্তু কৃত্রিম উপারে উহাদের দ্রব করা যাইতে পারে। দ্রবনীয় অবস্থার রঙ কাপড়ে লাগাইয়া পরে উষ্ণ জল এবং সাবান ও ক্ষার জলে অদ্রবনীয় করিতে পারিলে ঐ সকল রঙ সহজি সূত্রের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে বদ্ধ হইয়া যায়। তখন আর সহজে রঙ নষ্ট হয় না। ছিট প্রস্তুতের ইহাই মূল সূত্র, এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বিলাতে ছিটকরগণ নানা বর্ণের উৎকৃষ্ট ছিট প্রস্তুত করিতেছেন।

আমাদের দেশের ছিট-প্রস্তুতকারীগণ পূর্বে প্রথমত ছিট প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল প্রক্রিয়ার গূঢ় মর্ম্ম তাহারা জানে না, সুতরাং বহু সংস্কারের জ্ঞান প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এদিকে যুরোপ ও আমেরিকার তত্ত্বাবহুসন্ধিসু ব্যক্তিগণ ছিটের বাধার্থ অবগত হইয়া উহার প্রভূত উন্নতি করিতেছেন, তথায় বড় বড় রাসায়নিক পণ্ডিত সাহায্যে ইহার রঙ পাকা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে ও মহা মহা শিল্পিগণ শীঘ্র ও সুন্দর ছিট ছাপাইবার নানারূপ কল প্রস্তুত করিতেছেন। আমাদের দেশে এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যত কাপড়ে ছাপ দিতে পারে, বিলাতে কলে ১ মিনিটে তাহার দশগুণ ছিট ছাপা হইতেছে। সম্প্রতি বিলাতী ছিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশীয় ছিটের বড় হ্রদশা, এখন কলে প্রস্তুত বহু প্রকার সুন্দর সুরঞ্জিত চিত্রণ ছিট অতি জ্বলন্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং দেশীয় ছিটের তত কাঁচিতি নাই। দিন দিন এই ব্যবসায় ভারতে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু

এখনও লক্ষ্যী প্রকৃতি নানা স্থানের প্রস্তুত ছিট বিদেশীয়-মিগের বিমোহোৎপাদন করে।

ভারতবর্ষীয় রঙওয়ালগণ কাপড় রঙ করিতে নিম্নলিখিত উপকরণ সকল ব্যবহার করে। যথা—বাবলাহাল, বাবলা-ফল, খদির, সুপারিয় জল, মাজুকল, গিরিমাটী, হিফমিজ, নীল, কুসুমফুল, জাকরাণ, রক্তচন্দন, অম্বখহাল, হরিতকী, বহেড়া, মঞ্জিঠা, পলাশ, লাক্ষা, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, আঁটচ, দাড়িহাল, হরিতাল, হিরাকস, তুঁতে ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন রঙ করিতে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান চাই। পাকা কাল রঙ নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল যোগে উৎপন্ন হয়। যথা—
১ আঁটচ (আঁচ), হিরাকস, হরিতকী ও ফটকিরি।
২ কুসুমফুল, হিরাকস ও হরিতকী। ৩ গিরিমাটী, হিরাকস ও হরিতকী। ৪ গিরিমাটী, হিরাকস, হরিতকী ও ফটকিরি। ৫ বাবলা, তুঁট ও কালমাটী। ৬ হিরাকস, হরিতকী ও ফটকিরি ইত্যাদি।

এইরূপে ধূসরবর্ণ নীলবড়ি ও মাজুকল যোগে উৎপন্ন হয়।

লাভেওয়ার রঙ—কুসুমফুল, মাজুকল ও ফটকিরি।

মেরুনো রঙ—নীলবড়ি ও কুসুমফুল।

নীল রঙ—নীলবড়ি, তুঁতে ও চূণ।

সবুজ—নীলবড়ি, পলাশফুল, (কিংগুক) ও সেফালিকা, অথবা হিরাকস, হরিদ্রা, দাড়িহাল ও ফটকিরি, কিম্বা হরিদ্রা ও তুঁতে।

পীতবর্ণ—হরিদ্রা, সেফালিকা, পলাশফুল, চূণ ও অম্বজল, কিম্বা হরিদ্রা, দাড়িহাল ও ফটকিরি, অথবা হরিতাল ও হলদে পেউড়িমাটী।

জরদ—হরিদ্রা, কুসুমফুল ও অম্বজল।

পাটল—রসসিন্দুর।

লোহিত—কুসুমফুল, মঞ্জিঠা, হরিতকী ও ফটকিরি, কিম্বা বকম, হরিতকী ও ফটকিরি, অথবা লাক্ষারস ও হিরাকস।

কাপড়ে ছিট করিবার পূর্বে তাহাকে ছাপার উপযোগী করিয়া লইতে হয়। দেশীয় ছিটকরগণ বস্ত্র ধোত করিয়া ও ক্ষারজল, চূণজলাদি দ্বারা উত্তমরূপ শুদ্ধ করিয়া উহাতে হরিতকী, মাজুকল, বাবলা ও গাঁদ মিশ্রিত মণ্ড মাখায়, শুদ্ধ হইলে কাঠের মুগুর দিয়া সমান করিয়া পরে ছাপ দিয়া থাকে।

এদেশে সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন উপারে কাপড় রঞ্জিত হয়।

১, কাপড়ে দ্রবণীয় রঙ মাখাইয়া পরে ঐ রঙ পাকা করা হয়।
২, কাপড়ে ধাতুর মরিচা অথবা অল্প কোন রঙ পাকা করিবার মতলা মাখাইয়া বা ছাপ দিয়া পরে উহাতে রঙ্গ দেওয়া হয়। ৩, ভিজা পাকা রঙ দিয়া একবারেই কাপড়ে ছাপ দেয়া

শেষোক্ত প্রকার ছাপ দেওয়া রঙ শুকাইলে পাকা হইয়া যায়। প্রথম উপায় শালু, খেঁকরা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেই প্রশস্ত। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন মসলা দ্বারা কাপড়ে ছাপ দিয়া একই রঙে ডুবাইলে ছাপ দেওয়া স্থানগুলি ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হয়।

ছাপ সকল সচরাচর মিহি দৃঢ় কাঠেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় ছিট ওয়ালগণ তৈল ও কাঁঠাল প্রভৃতি কাঠ ব্যবহার করে। পূর্কোক্ত উপায়ে কাপড় ধোত ও পরিষ্কার ও চিকণ করা হইলে উহাতে ছাপ দেওয়া হয়। ছাপ দিবার মসলা রঙ অম্লসারে নানা প্রকার। কাল বর্ণের ছিট করিতে লোহ, লালবর্ণের ছিট ফটকিরি বা রাক, নীলবর্ণ করিতে তামা, এইরূপ নানা প্রকার ধাতুর মরিচা ব্যবহৃত হয়। এই সকল মরিচা সিকান বা তরুণ কোন দ্রব্যে দ্রব করিয়া শিরীষ বা গঁদযোগে ঘন করিয়া তৎপরে ছাপ দিলে কাপড়ে লাগিয়া যায়।

এদেশীয় রঙ করেরা বড় বড় জালায় জল ও গুড় একত্র গুলিয়া উহাতে লোহার টুকরা ফেলিয়া রাখে। গুড়-জল ক্রমে সিকান ও এসিটিক এসিডে পরিণত হইয়া লোহাকে দ্রব করিতে থাকে। এইরূপ ২৩ মাস রাখিয়া ঐ জল ছাঁকিয়া উহাতে কিছু তুঁতে মিশাইয়া দেয় এবং ময়দা অথবা গঁদ যোগে ঘন করিয়া ছাপ দেয়।

ছাপার পর দুই তিন দিন রাখিয়া দিলে ধাতুমরিচা কাপড়ে লাগিয়া যায়। তখন ঐ কাপড় পুকুরি, নদী প্রভৃতির জলে ধোত করিয়া বকম, আঁতচ, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতির জলে কিছুক্ষণ ফুটাইলে ছাপ দেওয়া রঙ পাকা হইয়া যায়। তারপর উহা পুনরায় পুকুরি বা নদীর জলে ধোত করিয়া সাবান বা স্কার জলে কাচিয়া লইলে ছাপ ভিন্ন অল্প সমস্ত স্থানের রঙ উঠিয়া যায়। যদি কাপড়ে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মরিচা দ্বারা ছাপ দেওয়া থাকে, তাহা হইলে একরূপ রঙে ছাপাইলেও কাপড়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পাকা ছিট হয়। যদি কাপড়ে লোহ ও ফটকিরি ছাপ থাকে, তবে বকম কাঠের রঙে ডুবাইলে লোহ ছাপযুক্ত স্থান রক্ত ও ফটকিরি ছাপযুক্ত স্থানে লোহিত বর্ণ হইবে। লোহ ও ফটকিরি মিশাইয়া ছাপ দিলে উহা ধূমলবর্ণ হইবে। নামাবলী প্রভৃতি এই নিয়মেই ছাপা হয়।

চুনরী কাপড় নামে আর একরূপ ছিট প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। উহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ। প্রথমে কাপড় তিজাইয়া তাহার স্থানে স্থানে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়। ঐ কাপড় রঙের জলে ডুবাইলে বাঁধা স্থান ব্যতীত অপর সকল স্থানেই রঙ লাগে। তাহার পর নিংড়াইয়া বাঁধন খুলিয়া শুকাইলেই চুনরী হইল। ইহাতে রঙ্গিন কাপড়ে কেবল সাদা চিহ্ন হয়। কাপড় ও ফুল উভয়ই রঙ্গিন করিতে

হইলে প্রথমে সমস্ত কাপড়কে একটি রঙে ডুবাইয়া তারপর বাধিয়া পুনরায় অল্প রঙে ছোপাইলে কাপড় ও ফুল উভয়ই রঙ্গিন হয়। প্রথমে কাপড়কে হলদে রঙে ছোপাইয়া পরে গাঁট বাধিয়া লালরঙে ছোপাইলে লাল কাপড়ে হলদে ফুল হয়। কলিকাতার রঙ্গদারগণ এই উপায়েই চুনরী করিয়া থাকে।

সোণালী ও রূপালী ছিট ও কলিকাতায় প্রস্তুত হইতেছে। কাপড়ে রং করিবার পর উহাতে গঁদ বা অল্প কোনরূপ আঁঠার ছাপ দিয়া ঐ সকল স্থানে নকল সোণা বা রূপার পাতা বসাইয়া দিলেই সোণালী বা রূপালী ছিট প্রস্তুত হয়। সচরাচর গাঢ় বেগুণে জমিতে সোণালী ও রক্তবর্ণ জমিতে রূপালী পাতা বসান হয়। একরূপ ছিট দেখিতে সুন্দর ও জরির কাজ করা বহুমূল্য বস্ত্রের জায়।

এখন বাংলাদেশে অতি অল্প পরিমাণেই ছিট প্রস্তুত হইতেছে। আবার ঐ সকল ছিট প্রস্তুতকারিগণের প্রায় সকলেই বেহার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী। ইহাদের লোক কলিকাতায় বাস করে। কলিকাতা ব্যতীত পাটনা, দ্বারভাঙ্গা ও সারণ জেলায় অল্পবিস্তর ছিট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের ছিটকরণ একবারে পাকা রঙের মসলা দিয়া ছিট ছাপিয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতার ছিটকরণ কাপড় ছাপিয়া পুনরায় উহা কষার জলে সিদ্ধ করে। এজন্ত কলিকাতায় ছাপা কাপড় একটু লালচে দেখায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে প্রায় প্রত্যেক নগরেই অল্প বিস্তর ছিট প্রস্তুত হইতেছে। লক্ষৌ নগরে সচরাচর বিলাতী কাপড়েই ছিট প্রস্তুত হয়। কনৌজ ও ফররুকাবাদে দেশী মোটা কাপড়ে গজি, জোড়া, ধুতি জোড়া প্রভৃতি ছিট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহার ও বস্ত্রাদির প্রকারভেদে তথায় ছিট সকলের নানারূপ নাম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান। ফর্দ ও রেজাই—শীতকালের গাত্রাবরণ শরুপ, লিহাফ, বালাপোষের জামা, তাম্বক পালঙ্কপোষ বা বিছানার চাদর, জাজিম ও ফরাস মেজের উপর বিছাইবার জামা এবং শামিয়ানা ও ছিট-জর্দা তাম্বু প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপীয়গণ এদেশীয় অনেক ছিট মশারী ও পর্দা করিবার জন্য ক্রয় করেন, বিশেষতঃ লক্ষৌ নগরের আঁতচ-রঞ্জিত ছিট তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপ আদৃত। এখন লক্ষৌ ও ফররুকাবাদ হইতেই বহুপরিমাণ ছিট অস্ত্রান্ত স্থানে রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে কালীপুর, আলিগড়, অত্রৌলী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, মৈনপুরী, আলাহাবাদ, ফতেপুর, কল্যাণপুর, জাফরগঞ্জ, ফান-পুর, চাঁদপুর, নাজিরগঞ্জ, শাজাহানপুর, মীর্জাপুর, মুজাফর-নগর, দেওবন্দ, জাহাঙ্গীরাবাদ, বাগপত, এতাবা, বান্দা,

পৈলাসী, কাশী ও চুয়ানপুর প্রভৃতি নগরে উত্তম উত্তম ছিট প্রস্তুত হয়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে থেরুরা ও শালু নামে রক্তবর্ণের কাপড় বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। থেরুরা দেশী মোটা কাপড়ে প্রস্তুত এবং বালিশ ইত্যাদি মোটা কার্যে ব্যবহৃত হয়। শালু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত এবং পাগড়ী, উড়নী, লেপ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্জাব প্রদেশেও উক্ত সকল প্রকার ছিটই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথার এক বর্গ গজ পরিমিত ছিটের গড় মূল্য ৯০০ দশ আনা। পঞ্জাবে আর এক প্রকার ছিটের জায় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কাপড়ে প্রথমে লাল, হলদে ইত্যাদি ঘন রঙে নানারূপ চিত্র আঁকিয়া পরে উহাতে শুড়ান অল্প ছড়াইয়া দেয়।

কাম্বীয়ার ছিট সম্প্রতি গৃহসজ্জার নিমিত্ত বহুপরিমাণে বিলাতে ব্যবহৃত হইতেছে। অত্যধিক কাটুতি দেখিয়া কাম্বীর গবর্মেন্ট ইহার ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন।

রাজপুতানার সান্দানীর, জয়পুর, বেরার প্রভৃতি স্থানে অনেক ছিট প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ভর করে। এই সকল স্থানে অতি উৎকৃষ্ট ছিট পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়ার, রংলাম্, উজ্জয়িনী, মল্লোশ্বর, ইন্দোর প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের অনেক নগরে মোটা ছিট প্রস্তুত হয়। উড়িয়া-বাসিনীদিগের লুগা শাড়ী মঘলপুরে প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে বল্লভা, আর্কট, মেদেরপাক, তিম্পুর, অনন্তপুর, কুন্তকোনম, সালেম, চিক্কলপট্ট, কড়াপা, কাকনাড়া, ত্রিচিনপল্লী ও গোদাবরী ছিট প্রস্তুতের প্রধান আড্ডা। তথাকার প্রস্তুত ছিটের বর্ণবিজ্ঞান ও চিত্রাদি যুরোপীয় ছিটের অনুরূপ না হইলেও দৃষ্ট অতি সুন্দর।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আন্ধ্রাবাদ, খেড়া, বরদা, বরোচ, মালগা, কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে ছিট প্রস্তুত হয়। শাড়ী প্রভৃতি মিহি ছিট বিলাতী কাপড়ে ও জাজিম প্রভৃতি মোটা ছিট দেশী কাপড়ে প্রস্তুত হয়। খেড়া নগরেই প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ও ১৫০ শত মুসলমান পরিবার এই কার্যে দ্বারা জীবিকা নির্ভর করে।

কার্পাসবস্ত্র ভিন্ন ধূপছায়া, ময়ূরকজী, চাঁদভারা, পাঁচপাত, ফুলাল, কিলমিলি, লহরিয়া, পীতাম্বর প্রভৃতি বহুবিধ পট ও উর্ণাজাত বস্ত্র ভারতের নানা স্থানে প্রস্তুত হয়।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ভারতীয় সুরঞ্জিত বস্ত্র যুরোপীয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ছিট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু রেসম ও উর্ণাবস্ত্র-কারীগণ ইহাতে স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখিয়া আগ্রহপণে

উহার প্রতিরোধে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত হইতে বহু পরিমাণে ছিট বিলাতে রপ্তানী করিতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় উর্ণা ও রেসম-ব্যবসারীগণ পুনঃ পুনঃ পার্লামেন্টে আবেদন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের শুদ্ধ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ১৭০০ খৃঃ অঙ্গে ইংলণ্ডীয় পার্লামেন্ট উর্ণা ও রেসম-ব্যবসারীদিগের সুবিধার জ্ঞাত ভারতীয় ছিটের আমদানি একবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃঃ অঙ্গে অবশেষে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার ছিটের ব্যবহারই একবারে বন্ধ হইল। যাহা ইউক ১৭৩০ খৃঃ অঙ্গে পার্লামেন্ট রেসম ও কার্পাস-সূত্র মিলিত বিলাতী ছিট ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অঙ্গে বহু ব্যয়ে পার্লামেন্টে আবেদন করিয়া ছিট প্রস্তুত-কারীগণ কার্পাসবস্ত্রের ছিট প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইলেন। তাহা হইলেও করভারে ছিটের অধিক উন্নতি হইল না। অবশেষে ১৮৩১ খৃঃ অঙ্গে আইন পরিবর্তিত হইলে ছিটের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। তদবধি ছিটের প্রভূত উন্নতি সাধন হইয়াছে ও হইতেছে।

বিলাতে যে উপায়ে ছিট প্রস্তুত হয়, নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া গেল।

যে বস্ত্র হইতে ছিট করিতে হইবে, প্রথমেই তাহার উপরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি দূর করা উচিত। এই কার্য ছই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সূক্ষ্ম লোম হোহার উপর কিম্বা গ্যাসআলোর উপর দিয়া বস্ত্র টানিয়া লইলে সূক্ষ্ম শিথিল আঁশগুলি পুড়িয়া বস্ত্র মসৃণ হয়। তাহার পর কাপড় সাদা করিতে হয়। কাপড় যত সাদা হয়, বর্ণও তত উজ্জ্বল দেখায়। এই কার্যের নিমিত্ত সোডা, চূণজল প্রভৃতি ক্ষার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাপড়ে যুগ্ম ক্ষারজল ও মোটা কাপড়ে উগ্র ক্ষারজল আবশ্যক। সচরাচর বিটিং পাউডার দিয়া কাপড় সাদা করা হইয়া থাকে। প্রথমে কাপড় কিছুকাল ক্ষার জলে ফুটাইয়া পরে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লয়। বিলাতে এই সমস্ত প্রক্রিয়া কলেই হইয়া থাকে। কলে কাপড় ক্রমাগত একবার নিংড়ান ও আবার জলে ডুবান হইতে থাকে। এইরূপে কাপড় হইতে সমস্ত ক্ষার দূর করিবার জ্ঞাত তাহা অতি অল্প পরিমাণ গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid) মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া পরিষ্কার-জলে ধোত করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে কাপড়ের সমস্ত ক্ষার ও লৌহাদি দূর হওয়ার পর তাহার শুভ্রতা নষ্ট করিতে পারে না। কাপড় শুদ্ধ হইলে পর কলে চাপ দিয়া চিকণ ও মসৃণ করিয়া লওয়া হয়। তখন তাহাতে ছিট হইতে পারে।

বিলাতী ছিট ছাপিবার প্রণালী সাধারণতঃ চারি প্রকার। ১, কার্ভিনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপ দিয়া হস্তাধারা ছাপান। ২, কতকগুলি ছাপ একটী ক্রেমে বন্ধ করিয়া কলে ছাপান। ৩, সমতল তামার ছাপ। ৪, তামার দণ্ডাকার ছাপ। প্রথম প্রকার ছাপা এদেশের ছাপার জ্ঞান। এখন বিলাতে উহা অল্পই প্রচলিত। তবে যেখানে অতি ক্ষুদ্র কার্ভের প্রয়োজন, সেই সকল স্থলেই মিহি কাপড়ের উপর হাতে ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় প্রণালী বিস্তৃতভাবে প্রচলিত। তৃতীয় প্রকার এখন আর বড় প্রচলিত নাই। চতুর্থ প্রকারই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং যুরোপ ও আমেরিকার সকল বৃহৎ ছিটের কারখানার প্রচলিত। ইহার মূল প্রণালী এইরূপ—

একটা স্তম্ভাকৃতি ঘূর্ণমান ধূরমুসের (Press-roller) চারিদিকে ছিটের বর্ণ সংখ্যাহুলায়ে দুই চারি বা ততোধিক খোদিত তামার চোলা লাগান থাকে, ধূরমুসে ছাপ থাকে না। ইহা কেবল চাপ দিয়া কাপড়ে ছাপ লাগায়। এই ধূরমুস ও চোলা সকলের দৈর্ঘ্য সচরাচর ৩ ফিট। বাষ্পীয় কুলে ধূরমুস ও তামার চোলা সকল ঘুরিতে থাকে, কাপড় ঐ ধূরমুস ও প্রত্যেক চোলার মধ্য দিয়া আসিবার কালে অতি বিশদরূপে প্রত্যেক চোলা দ্বারা এক এক ধাতু-মরিচা বা বর্ণে যথাস্থানে ছাপা হইয়া বাহির হয়। একবারে ১০।১২টা তামার চোলা লাগাইয়া ১০।১২ প্রকার রঙের ছিট ছাপিবার কলও প্রস্তুত হইয়াছে, তবে সচরাচর ৩।৪টা রঙের ছিটই অধিক ছাপা হয়। এইরূপ একটা কলে অতি অল্পমাত্র পরিপ্রমে ২৮ গজ পর্যন্ত ছিট ৩।৪টা বর্ণে সুন্দররূপে ছাপা হইতে পারে। সুতরাং প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ কাপড় এক বন্টার মধ্যেই ছাপা হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি কল দিয়া ঐ সকল তামার চোলায় কলেই রং বা মরিচা মাখান যায়, সুতরাং ছাপা অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। পৃথক পৃথক থানের মুখে সেলাই করিয়া এক খণ্ড করা হয়। ঐ সুদীর্ঘ কাপড় একটা দণ্ডে শুটান থাকে। ছাপার সময় উহার এক প্রান্ত কলে ধরিয়া দেয়। একটা ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এক বা ২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ইম্পাতের ছাঁচ দিয়া বাষ্পীয় কলের ভীষণ চাপে অপেক্ষাকৃত কোমল তামার চোলায় বথেকা ফুল কাটা হয়।

এ পর্যন্ত আমরা কেবল ছিটের যান্ত্রিক ছাপার বিষয় বর্ণনা করিলাম, অতঃপর রাসায়নিক প্রণালীতে কিরূপে উহার বর্ণ পাকা করা হয়, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। সচরাচর বিলাতে ছিটের বর্ণ পাঁচ প্রকারে পাকা করা হয়।

১। প্রথমে রঙ শোষণকারী ধাতু-মরিচা দ্বারা বস্ত্রে ছাপ দিয়া পরে ঐ কাপড় রঙের জলে ডুবাইয়া লইলে ছাপা পাকা হইয়া যায়।

২। সমস্ত কাপড়ে একরূপ পাকা রং করিয়া পরে রাসায়নিক উপায়ে উহাতে সাদা ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মূল তোলা যায়। ফরাসী শাড়ী প্রভৃতি এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

৩। কাপড়ে বর্ণপ্রতিরোধক কোন দ্রব্যাদি দ্বারা ছাপ দিয়া পরে রঙের জলে ডুবাইলে ছাপ দেওয়া স্থানগুলি সাদা থাকিয়া যায়। নীল রঙের অনেক ছিট এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

৪। রঙ ও মরিচা একত্র বস্ত্রে ছাপ দিয়া বাষ্পের তাপে পাকা করা হয়।

৫। নাইট্রোমিউরিয়েট অব্ টিন নামক রঞ্জকের লবণ-যোগে কাপড়ে রঙ দিলে উহার বর্ণ উজ্জ্বল হয়; কিন্তু এই প্রকার ছিটের রঙ অস্থায়ী।

ফটকিরি, লোহা ও রাজ এই তিনটা দ্রব্যই রঙ পাকা করিবার প্রধান উপায়। ফটকিরি অ্যাসিটেট অব্ আলুমিনা অবস্থায়, লোহা অ্যাসিটেট অব্ আয়রন্ ও রাজ নাইট্রোমিউরিয়েট, অক্সিমিউরিয়েট অথবা পারক্লোরাইড অব্ টিন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এসিটিক এসিডের গুণ এই যে উহা ঐ ধাতু মরিচা সকলকে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করে, কিন্তু বস্ত্রে সংলগ্ন হইলে অতি সহজেই পৃথক হইয়া যায়, তখন মরিচা সকল অদ্রবণীয় অবস্থায় কাপড়ে সংলগ্ন থাকে। অথচ এই অল্প বস্ত্রের কোন অনিষ্ট করে না। অস্তান্ত অল্প মরিচা সকল দ্রব করিতে পারে বটে, কিন্তু উহারা উগ্র ক্রিয়া উৎপাদন করে বলিয়া বস্ত্রের ক্ষত শিথিল হইয়া পড়ে। ফটকিরি হইতে রঙের জল করিতে নানারূপ দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমরা এখানে গোটাকয়েক মাত্র উল্লেখ করিব। বস্তুতঃ উহাদের সকলেরই মূল এক।

ফটকিরি গরম জল—২৫০ সের।

ফটকিরি—৫০ সের।

দানাদার সোডা—২০ সের।

সীসশর্করা (Acetate of lead) ৩৭১ সের।

প্রথমে গরম জলে ফটকিরি দ্রব করিয়া উহাতে ক্রমে ক্রমে সোডা যোগ করিতে হইবে। জল উথলিয়া উঠিয়া স্থির হইলে পর উত্তমরূপে চূর্ণ করা সমস্ত সীসশর্করা একবারে ঢালিয়া দিয়া হাতাধারা ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। কিছু কণ রাখিলে সীস প্রভৃতি অদ্রবণীয় অবস্থায় নীচে পড়িয়া যাইবে। উপরের স্থির জল ফুটাইয়া ও আঁঠাধারা ঘন করিলেই লাল রঙের মসলা প্রস্তুত হয়। এই জলে কিয়ৎ পরিমাণে ফটকিরি অপরিবর্তিতভাবে থাকিয়া যায়, সমস্ত ফটকিরি পরিবর্তিত করিতে হইলে সীসশর্করা ৮২ সের দিতে হয়।

১০০ ভাগ ফটকিরি জলে দ্রব করিয়া উহার সহিত ১৫০

ভাগ পাইরোলিগ্‌নাইট্ অব লাইম্ মিলিত করিয়া জল প্রস্তুত হয়।

কটকিরি ৪ ভাগ, ক্রিম্ অব্ টার্টার ১ ভাগ প্রয়োজন মত জলে দ্রব করিলেও জল প্রস্তুত হয়। ৫ সের পটাশ, ৪ সের গৌড়া চূণ (Quick lime) ২৫ সের জলে একঘণ্টা কাল ফুটাইয়া স্থির হইলে উপরের জল লইতে হইবে। এই জলকে ফুটাইয়া আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০২ হইলে উহার ৭ সেরে ৫ সের কটকিরি যোগ করিতে হয়। তখন সলফেট্ অব্ পটাশ্ দানা বাধিয়া যায়। হাঁকিয়া লইলে কটকিরির জল প্রস্তুত হয়। উপরে যে সকল পরিমাণ লিখিত হইল তাহার সামান্য ইতর বিশেষে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

লোহা হইতে রঙের জল পাইরোলিগ্‌নাইট্ অব্ লাইম্ (Pyrolignite of lime) ও হিরাকস মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সীসর্করাযোগে হিরাকসের গন্ধকদ্রাবক হরণ করিয়া এটি-টেট্ অব্ আয়রন্ অর্থাৎ লৌহের ছাপিবার জল প্রস্তুত হয়। শির্কা বা এসিটিক্ এসিডের মধ্যে ছোট্ ছোট্ লোহার টুকরা দীর্ঘকাল ডুবাইয়া রাখিলেও এসিটেট্ অব্ আয়রন্ প্রস্তুত হয়।

রাজ হইতে ছাপার জল করিতে হইলে রাজকে হাইড্রো-ক্লোরিক্ এসিডে দ্রব করা হয়। এসিডে রাজ দিলে উহা দ্রব হইয়া ফ্লোরাইড্ অব্ টিন্ নামক রাজের লবণ প্রস্তুত হয়। উহার সমস্ত অল্প দূর করিতে হইলে অধিক মাত্রায় রাজ দিয়া ফুটাইতে হয়।

একটা দৃঢ় মাতীর বাসনে ৫ সের জল রাখিয়া উহাতে ৫ সের নোরা ও ৩ সের মিউরিয়াটিক্ এসিড মিশাইতে হয়। উত্তমরূপে মিলিত হইলে ২০ দিন ক্রমে ক্রমে ৫ ভরি রাজ উহাতে গালাইতে হইবে। একবারে সমস্ত রাজ দিলে উগ্র রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া জল নষ্ট হইয়া যায়। বর্ণ ঘোর লাল করিতে হইলে উহাতে আরও রাজ দিতে হয়।

লাক্ষার বর্ণ পাকা করিতে মিউরিয়াটিক্ ১৫ সের, জল ১০ সের ও নাইট্রিক্ এসিড ৫ সের একত্র মিশাইয়া ইহাতে ৩ সের রাজ যোগ করিতে হয়।

ফিকা লাল রঙের ৫ সের মিউরিয়াটিক্ এসিডে ১ সের রাজের দানা দ্রব করিলেই জল প্রস্তুত হয়।

উল্লিখিত ছাপিবার জল সকল ময়দা বা গঁদ দিয়া ঘন করিয়া বস্ত্রে ছাপ দিতে হয়। আঠা না থাকিলে চূপসিদ্ধা গিরা ফুল নষ্ট ও অস্পষ্ট হইয়া যায়। উপকরণের পরিমাণ অহুসারে বর্ণ গাঢ় ও ফিকা হয়। ঘোর বর্ণ করিতে মসলা খুব ঘন করিয়া উহাতে গঁদ দেওয়া উচিত। ছাপার পর শীঘ্র শীঘ্র শুকাইলে ময়দা ভালরূপে কাপড়ে সংযুক্ত হইতে

পার না, এই জন্য ছাপার বর বখাসাখা আঁর্জ রাখা হয়। এই সকল বরের উত্তাপ ৬৫° হইতে ৭৫° (ফা°) পর্যন্ত থাকে। বস্ত্র ছাপা হইলে পর উহা ৭৪ দিনে শুক হয়, তখন জলে ধৌত করিয়া লওয়া যায়। বস্ত্রে ধাতুর মরিচার ছাপ থাকিলেও উহাকে গোবরজলে ধুইয়া লয়। এই কার্য অতি কদম্ব্য বলিয়া গোময়ের পরিবর্তে অনেক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পর কাপড় বকম, মজিষ্ঠা প্রভৃতির জলে - ছোপান হয়।

রঙের জল বথোপযুক্ত গাঢ় রাখা আবশ্যক। রঙ-বরের উত্তাপও ৬৫° হইতে ৭৫° (ফা°) এবং বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিলেই ভাল। কোন কোন রঙের জলে কিয়ৎ পরিমাণে অল্প থাকিয়া যায়। উহা নষ্ট করিবার জন্য রঙের জলে কিঞ্চিৎ চা-খড়ি অথবা কার্বনেট্ অব্ সোডা যোগ করা উচিত, সুন্দর রঙকরণ যথাপরিমাণ ঐ সকল দ্রব্য যোগ করে, অল্পখা পরিমাণ অধিক হইলে বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। রঙের জলে কাপড় প্রায় ১৫ মিনিট মুহূর্ত্তাপে সিদ্ধ হইলে, উহা নিংড়াইয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করা হইয়া থাকে। তাহারপর ক্ষারজলে ধৌত করিলে ছাপা ভিন্ন অল্প স্থানের রঙ উঠিয়া যায়। বলা বাহুল্য বিলাতে এই সকল কার্যই নানারূপ সুকৌশলে কলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অস্তান্ত প্রকার ছিট প্রস্তুতের প্রণালীও প্রায় এইরূপ। তবে উহাদের উপকরণ ভিন্ন প্রকার এবং কোন কোন স্থলে প্রক্রিয়ারও সামান্য ইতর বিশেষ আছে।

রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে বহুতর বর্ণদ্রব্য ও তাহাতে কাপড় পাকা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্বে কেবল উত্তীক্ষ বর্ণদ্রব্যই বস্ত্র রঞ্জিত হইত, লাক্স নামে জাতব বর্ণও ব্যবহৃত হইত। ১৭১০ খৃঃ অব্দে ডিস্‌বক্ নামে বালিন-নগরনিবাসী জনৈক রাসায়নিক প্রসিদ্धान্ ব্লু (Prussian blue) নামে খনিজ বর্ণ আবিষ্কার করিলেন। ইহার পর অস্তান্ত খনিজ বর্ণও বাহির হইয়া পড়িল এবং বস্ত্রাদি রঙ করিতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে জর্জন্ রাসায়নিক অনভার্ডবেরন (Unverderben) অ্যানিলাইন (Aniline) নামক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া ছিটের বহু উন্নতি সাধন করিলেন। তিনি প্রথমে নীলবর্ণি চোয়াইয়া অ্যানিলাইন প্রস্তুত করেন। শীঘ্রই ইহা দ্বারা কাপড়ে পাকা রঙ করিবার উপায় বাহির হইল। অবশেষে গ্যাস প্রস্তুতের কারখানার আলকাতরা হইতে সুন্দর অ্যানিলাইন প্রস্তুত হইল। মজিষ্ঠার মত বর্ণও আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

সম্প্রতি বিলাতের স্নানস্থানে বড় বড় ছিটের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের স্বাধিকারিগণ নানারূপ নূতন নূতন বর্ণের ছিট প্রস্তুত করিতেছেন। বাহা হউক ঐ সকলের ফুল মর্ম্ম প্রায় এক। তথাকার ছিটের কারখানা সকলও এদেশের মত নহে। প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ কারখানাতেই এক একটা রসায়ন বিভাগ আছে। তথায় সর্বপ্রকার রঙ, মসলা, অস্ত্রান্ত উপকরণ এবং পরীক্ষা করিবার নানারূপ যন্ত্রাদি সর্বদা প্রস্তুত থাকে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ ঐ সকল লইয়া নূতন নূতন প্রণালী ও রঙ উদ্ভাবন করিতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ছিট-ওয়ালগণ অস্ত্র কারখানার ব্যবহৃত নমুনার ছিট করে না; স্ত্রতরাং নূতন নূতন চিত্রাদির নমুনা বাহির করিবার অস্ত্র স্রদক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। তাহারা কেবল নানারূপ নূতন ফুল ও চিত্রাদির আদর্শ অঙ্কন করে। আর এক বিভাগে ঐ সকল আদর্শের সর্বোৎকৃষ্টগুলি কাষ্ঠ বা তাম্রফলকাদিতে খোদাই হয়। তাহার পর কাপড় পরীক্ষা, ছাপা, রং করা, শুকান, মণ্ড দেওয়া, মসৃণ করা, গাঁট বাধা ইত্যাদি প্রত্যেক কার্যের জন্ত এক এক পৃথক বিভাগ আছে। ইহা ব্যতীত এতাদৃশ সূর্যহৎ কারখানার সমস্ত কল প্রভৃতি মেরামত জন্ত সকল প্রকার যন্ত্রাদিসম্বলিত এক শিল্প বিভাগ থাকে, এইরূপ বহু কার্য বিভাগ থাকাতোই বিলাতের এক এক ছিটের কারখানার এত অপরিখ্যাপ্ত পরিমাণে ছিট প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষে বিলাতী ছিটের আমদানি কিরূপ বৃদ্ধি হই-তেছে, তাহা নিম্নস্থ তালিকা দৃষ্টে জানা যায়।

বর্ষ	আমদানি ছিটের মূল্য।
১৮৬৬-৬৭	২,৫৭,৬২,৯৪০ টাকা।
১৮৭৫-৭৬	২,৮৩,৭২,৫০৬ „
১৮৮৮-৮৯	৫,৬২,৩১,৮১৭ „

শেষোক্ত বর্ষে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৪৩,১৮,৭৪১ টাকার

ছিট, থেরুয়া প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়।

হিটন (দেশজ) ক্রিপ্তকরণ, ছড়ান।

হিটনি (দেশজ) ১ ইতস্ততঃ ক্রিপ্তকরণ, ছড়ান। ২ বাঁশের শলা। ইহার দ্বারা চিক প্রভৃতি নির্মিত হয়। ৩ যে স্ত্রীলোক হিটনি অর্থাৎ বাঁশের শলাকা দ্বারা চিক ইত্যাদি বুনে।

হিটান (দেশজ) জলাদি সেক, জল ছড়ান।

হিটানি (দেশজ) জলাদি সেক।

হিটাপাড়া (দেশজ) মত্ত পড়িয়া গারে জল নিক্ষেপ করা।

হিটকা (দেশজ) ফাঁদ।

হিট্‌কী (দেশজ) ১ বাঁশের শলা। ২ মৎস্ত ধরিবার জালভেদ।

হিট্‌কনী (দেশজ) ১ বাঁশের বা কাঠের শলাকা। ২ মৎস্ত ধরিবার জালভেদ।

ছিৎ (ত্রি) হিনতি হিৎ-কিপ্। ছেদনকর্তা।

হিত (ত্রি) ছো-ক্ত ইৎক (শাঙ্কোরজতরঙ্গাং। পা ৭।৪।৪১) পক্ষে ছাতঃ। হির।

হিতরাজদেব, কোঙ্কণদেশীয় শিলাহারবংশীয় একজন নৃপতি। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ডাণ্ডুপ নামক স্থানের নিকট ইহার নামে ৯৪৮ শকাব্দিত একটা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

[শিলাহার-রাজবংশ দেখ।]

হিত্তি (স্ত্রী) ছিদ-কিন্। ১ ছেদ, ছেদন। (পুং) ২ করজবন্ধ, উণ ৩১) ডহরকরম্ভা গাছ।

হিত্তর (ত্রি) ছি-ষরপ্ পুৰো' দত্ত তঃ। (হিষরজ্জ্বরেতি। ১ ছেদক। ২ ধূর্ত। ৩ বৈরী।

ছিদক (স্ত্রী) ছিদ-কুন্। বজ্র। (উপাদিকোব)

ছিদা (স্ত্রী) ছিদ-অঙ্ (ঘিদ্ভিদাঙ্। পা ৩।৪।১০৪) ততষ্টাপ্। ছেদন।

ছিদি (স্ত্রী) ছিদ্ভতেহনয়া 'ছিদ্-ইন্-কিচ্চ (কৃ গু পূ কুটি ভিদি ছিদিভ্যশ্চ। উণ ৪।১৪২) ১ কুঠার। ২ বজ্র। কঠরি (ত্রি) ৩ ছেদনকর্তা।

ছিদির (পুং) ছিনন্ত্যনেন ছিদ্-কিরচ্। (ইষিমদিমুদিষিদি-ছিদীতি। উণ ১।৫১) ১ অগ্নি, আগুন।

২ কুটার, কুড়ুল। ৩ করবাল, তন্নবাল। ৪ রজ্জু, দড়ি।

ছিদুর (পুং) ছিনন্তি ছিদ্-কুরচ্। (বিদিত্তিদিছিদে: কুরচ্। পা ৩।২।১৬২) ১ ছেদক, ছেদনকর্তা। ২ বৈরী। ৩ ধূর্ত। ৪ ছেদনদ্রব্য। কঠরি (ত্রি) ৫ স্বয়ং ছিন্ন। “সংলক্ষ্যতে ন ছিচ্ছরোপি হারঃ।” (রঘু ১।৬।৬২)

ছিদ্যমান (ত্রি) ছিদ্-কর্ম্মণি-শানচ্। বাহাকে ছেদন করা হইতেছে।

ছিদ্ৰ (ত্রি) ছিদ্ভতে ভিত্তভেদে ছিদ্-রক্ (ক্ষায়ি তক্ষি বক্ষীতাদি। উণ ২।১৩) ১ ছিদ্ৰযুক্ত। “স্বয়মাতৃগাং পুরুষে শকরাং ছিদ্গাঃ ঋবাসীতি” (কাত্যায়ন শ্রোতযুক্ত ১।৭।৪।১৫) ‘ছিদ্গাঃ স্বাভাবিক ছিদ্ৰ যুক্তাং’ (ভাষ্য) ২ ভেদ, ছেদ। তৎপরিচয়—কুহর, শুবির, বিচর, বিল, নিবাতন, রোক, রক্ত, স্বজ, বপা, শুবি, স্বজ, শুঘী। “ছিদ্ৰক বারয়েৎ সর্বং শশুকরমুখাঙ্গগম্” (মহু ৮।২৩৯) ৩ অবকাশ। ৪ দুষণ, দোষ।

দেহে ছিদ্ৰ সম্বাদ্য। * ১—লোমকূপ চোয়ারকোটা ৫৪০০০০০০, বর্ষনির্গম ছিদ্রের সহিত ইহার সম্বাদ্য ৪৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার, ইহা বায়বীয় পরমাণু দ্বারা সিক্ত হইয়া পৃথকরূপে গণিত হয়। ইহা ক্ষুদ্র ছিদ্ৰ। বৃহৎ ছিদ্ৰ নয়টি মুখ,

নরম, কর্ণ ও নালিকা (ইহার ছিদ্র দুইটা দুইটা) পাখু ও উপস্থ।
৫ জ্যোতিষোক্ত লঘু হইতে অষ্টম স্থান "ছিদ্রাধ্যমষ্টমস্থানঃ"
(জ্যোতিষতত্ত্ব)। ৬ নব সম্বাদ।

কর্ণ শব্দ পত্রে থাকিলে সংহিতা অর্থে লক্ষণাবচক শব্দের
যে দীর্ঘ উক্ত হইয়াছে বধা "বিশ্বগণকর্ণঃ" তাহা ছিদ্র শব্দের
উত্তর হইবে না। (কর্ণে লক্ষণাত্তাবিষ্টপঞ্চমগতিত্বহিন-
ছিদ্রস্ববস্তুকত্ব। পা ৩।৩।১১৫) "ছিদ্রকর্ণঃ"।

ছিদ্রকর্ণ (ত্রি) ছিদ্রযুক্তঃ কর্ণোহস্ত বহুব্রী। ছিদ্রযুক্ত কর্ণ-
বিশিষ্ট। [ছিদ্রকর্ণ শব্দ দেখ।]

ছিদ্রতা (স্ত্রী) ছিদ্র-ভাবে তল ত্রিমাং টাপ্। ছিদ্রযুক্ততা,
ছিদ্রযুক্তের ভাব। "আকাশস্ত গুণঃ শব্দো ব্যাপিষ্ণুঃ ছিদ্র-
যুক্ততা।" (ভারত ১২।২৫৫ অঃ)

ছিদ্রদর্শন (ত্রি) ছিদ্রঃ পশতি ছিদ্র-দৃশ-কর্তরি লুট্। যে
ছিদ্র দর্শন করে, দোষদর্শী।

"ভূমির্ভবতি ভূতানাং সম্যগছিদ্রদর্শনাঃ।" (ভারত ৯ অঃ)

ছিদ্রদর্শিন্ (ত্রি) ছিদ্র-দৃশ-গিনি। ১ দোষদর্শক। ২ ছিদ্রাঘেবী
শব্দ। (পুং) ৩ যোগজ্ঞেয় ব্রাহ্মণভেদ, ইনি বাস্তবের পুত্র।
(হরিবংশ ২৩ অঃ)

ছিদ্রবৈদেহী (স্ত্রী) ছিদ্রপ্রধানা বৈদেহী শাকপাথিববৎ সঃ।
গজপিপ্লী। (রাজনিঃ)

ছিদ্রশ্বাসিন্ (পুং) ছিদ্রেণ শ্বসিতি ছিদ্র-শ্বস্-গিনি। যাহারা
কয়েকটা দেহপার্শ্বস্থিত ছিদ্রদ্বারা শ্বাস ফেলে। ইহাদিগের
চক্ষুঃ ৪টা। যথা—মাঠমাকড়।

ছিদ্রাত্মন (ত্রি) ছিদ্রঃ ছিদ্রযুক্তকুটিল ইতি যাবৎ আত্মা স্বভাবো
যন্ত বহুব্রী। খলস্বভাব, কুটিল। "নির্ণয়কাপি ছিদ্রাত্মা ন তং
বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ।" (ভারত ১২।৩০৭ অঃ)

ছিদ্রাস্তর (পুং) ছিদ্রমন্তর্মধ্যে যন্ত বহুব্রী। নল, খাগড়া।

ছিদ্রানুসন্ধানিন্ (ত্রি) ছিদ্রানুসন্ধানং বিত্ততেহস্ত ইনি।
যে ছিদ্র অন্বেষণ করে, শব্দ। *

ছিদ্রানুসরণ (ত্রি) ছিদ্রানুসরণং যেন। যে_ছিদ্র অন্বেষণ
করে, শব্দ।

ছিদ্রাশ্বেষিন্ (ত্রি) ছিদ্র অশ্ব-ইষ-গিনি। যে ছিদ্র, দোষ বা
অবকাশ অনুসন্ধান করে, শব্দভেদ।

ছিদ্রাফল (স্ত্রী) ছিদ্রঃ ভূষণং আফলতি ছিদ্র-আ-ফল-অচ্।
মায়াকল, মায়ফল।

ছিদ্রিত (ত্রি) ছিদ্র-তারকাদিভাদিতচ্। ১ কৃতবেধ। ২
জাতছিদ্র।

ছিদ্রিন্ (ত্রি) ছিদ্রমন্ত্যস্ত ছিদ্র-ইনি। ছিদ্রযুক্ত, ছেলা।

ছিদ্রোদর (স্ত্রী, পুং) ক্ষতোদর রোগ। এই রোগ প্রায় নাভির

নিম্নেই হয়। ইহাতে উপসর্গ, খালকাল, হিকা, তৃকা, প্রমেহ,
অকচি ও দৌর্বল্য, নির্গত মল লোহিত ও পীতবর্ণ, শিছিল,
অতিশয় হর্গন্ধযুক্ত। (চরক)

ছিদ্রালদেহিন্ (পুং) (Porifera) এই বর্গের প্রত্যেক
জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু ইহারা যে আবাস নির্মাণ করে
তাহা বহু ছিদ্রপূর্ণ সেই জন্য ইহাদিগকে ছিদ্রালদেহী কহা
যায়। উক্ত আবাসের সামান্য নাম স্পঞ্জ।

ছিনন (দেশজ) ছিনিয়া লওন, বলদ্বারা গ্রহণ।

ছিনাল (হিন্দী) ১ ভট্টা, কুলটা। কোন কোন স্থানে ছিনার
কথা ব্যবহৃত হইয়াছে বধা—"ডাকাতি ছিনার চোর হাজার
হাজার" (ল)।

ছিনালপনা (দেশজ) ভট্টা জীর চাতুরী।

ছিনালী (দেশজ) ১ ভট্টা, কুলটা। ২ ছিনালপনা ভট্টার চতুরতা।

ছিদ্রর (ত্রি) ছিদ্ররপ্। বিকরাৎ দন্ত ন তঃ। ১ ঠেরী।
২ ধূর্ত। ৩ ছেদক।

ছিন্দবাড়া, মধ্যপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন নর্মদা-
বিভাগের একটা জেলা। অক্ষা ২১° ২০' ও ২২° ৫২' দ্রাঘি°
৭৮° ১৪' ও ৭৯° ২৩' পূঃ। ইহার উত্তর ও বায়ু কোণে
নরসিংপুর ও হোসেনাবাদ, পশ্চিমে বেতুল, পূর্বে সিউনি,
দক্ষিণে নাগপুর। পরিমাণ ফল (১৮৮৩), ৩৯১৫ বর্গমাইল।
ছিন্দবারা নগর ইহার সদর।

জেলার অধিকাংশ ভূমিই পর্বতময়, ঐ ভাগ বালাঘাট
নামে বিখ্যাত। সাতপুর পর্বতের একশাখা এই জেলার
মধ্য দিয়া জব্বলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ
হইতে রাণাঘাটের গড় উচ্চতা ২০০০ ফিট। দক্ষিণ পশ্চিম
ভাগে তিনটা পরগণা নিম্নভূমিতে অবস্থিত। পার্শ্বত্যা প্রদে-
শের অনেক স্থান বৃক্ষাদিশূন্য, কিন্তু সাতপুর পর্বতের দক্ষিণ
উপত্যকার শাল ও সেগুন গাছের বিস্তীর্ণ অরণ্য দৃষ্ট হয়।
ঐ সকল অরণ্য হইতে বহু পরিমাণে কাষ্ঠাদি নাগপুরে প্রেরিত
হয়। ১৮৮০-৮১ সালে এখানে গবর্নমেন্টের রক্ষিত ৭৩৬ বর্গ
মাইল অরণ্য ছিল। কলহ নদী এই জেলার প্রধান নদী।
মহাদেব পর্বতের পূর্বদিকে মছলখির নিকটস্থ আনোনি
নামক স্থানে একটা উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। যুক্তিকা স্থানে
কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ। কয়েকস্থানে করলার খনি বাহির
হইয়াছে। অরণ্যে শার্দূল, চিত্রব্যাস, তরঙ্গ, তরঙ্গ প্রভৃতি
হিংস্র জন্তু দৃষ্ট হয়। সম্ভ্রান্তি শিকারীদিগের প্রভাবে উহা-
দের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। তত্ত্বিন্ন বহু প্রকার
মৃগ, শৃগাল, শশক, বজ্র কুক্কুর প্রভৃতি চক্ষুশান ও তত্ত্বিন্ন,
ডাক প্রভৃতি বহু পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বে দেবমন্ডের গৌড়-নৃপতির রাজধানী এই জেলায় ছিল। এই নৃপতির তত্ত্ব-বুলন্দ নামে নৃপতি দিল্লী গমন ও তথায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাট অরজজেবের প্রিয়পাত্র হন। তিনি চতুর্দিক হইতে হিন্দুমুসলমান উভয় প্রকার অধিবাসী আহ্বান করিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড় রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। গৌড় রাজগণের অধীনস্থ কুজ কুজ রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়া পড়ে। কুজ নামে গৌড় সর্দারগণ অবশেষে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনতা স্বীকার করে। তাহার ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে আশ্রা সাহেবের সহিত যোগদান করার প্রথমে রাজা হারাইয়া ছিল, কিন্তু পুনর্বার কর দিতে সম্মত হইলে নিজ নিজ অধিকার প্রাপ্ত হয়। ৩য় রঘুজীর মৃত্যুর পর ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে এই জেলা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ইহার অন্তর্গত বরিয়াম-পাগুরা জামগীর ও পাঁচমারি অংশ বোরি ও দেনবা নামক দুইটি উৎকৃষ্ট জঙ্গলসহ হোসঙ্গাবাদ জেলাভুক্ত হইয়াছে।

জেলায় ১৩০৪ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হয়। অবশিষ্ট ভূমির ৯৯৯ বর্গমাইল চাসের উপযুক্ত। ধাতু, গোধূম, সর্ষপ, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, শগ প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। সম্রাতি গোল-আলুর চাস হইতেছে। এখানে ফসল দুই প্রকার, শরিক ও রবি। প্রথম প্রকার আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কাটা হয়; দ্বিতীয় প্রকার ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জন্মে। বৃষ্টির উপরই সমস্ত ফসল নির্ভর করে; কেবল পক্ষুর্ণী পরগণায় ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে পারা যায়। এই জেলার খামারপানি পরগণার অতি উৎকৃষ্ট ছুধদাত্রী গাভী পাওয়া যায়। হিন্দবাড়া, পক্ষুর্ণী, মোহর্গা, লোধিখেরা ও সৌসর প্রধান নগর।

এই জেলায় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র প্রধান। পূর্বে লোধিখেরা প্রভৃতি স্থানে ভাল পিতল ও তামার বাসন প্রস্তুত হইত; এখন আর সেরূপ হয় না। স্থানে স্থানে হাট আছে, তাহাতেই কেনা বেচা নিশ্চয় হয়। হিন্দবাড়া হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, এই পথ দিয়াই অশ্ব স্থানের সহিত আমদানি রপ্তানী হইয়া থাকে। তত্ত্বিন্ন রাস্তা সকল কোথাও কর্মদ ও কোথাও গভীর খাল বিল থাকিতে অতি দুর্গম। হিন্দবাড়া ও রামকোণার ডাকবাঙ্গালা ও সরাই, লোধিখেরা, সৌসর, পক্ষুর্ণী, অমরবারা ও চৌরাই নামক স্থানে কেবল সরাই আছে। বড়গাঁও উমরানালার সরকারী পূর্তবিভাগের আড্ডা আছে।

হিন্দবাড়া মধ্যপ্রদেশের একটি পৃথক্ জেলা বলিয়া পরিগণিত। একজন ডেপুটি কমিশনার, একজন সহকারী

কমিশনার ও দুইজন তহসীলদার এই জেলা শাসন করেন। জেলায় ৬ জন জজ ও ৫ জন মাজিষ্ট্রেট বসেন।

ঘাটপর্কতের উপরিস্থ অংশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও নাতি-শীতোষ্ণ। শীতকালে তুষারপাত বিরল নহে। বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রথর গ্রীষ্ম হয় না। বর্ষাকাল সুশীতল ও মনোরম। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪৩° ২২ ইঞ্চি।

২ উক্ত হিন্দবাড়া জেলার উত্তরভাগস্থ একটি তহসীল। পরিমাণফল ২৮২৭ বর্গমাইল। এই তহসীল বা উপবিভাগে ৪টি দেওয়ানী ও ৪টি ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ হিন্দবাড়া জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২২° ৩' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯' পূঃ। এই নগর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট উচ্চ, অল্পচ পাহাড় বেষ্টিত একটি প্রান্তরে অবস্থিত। নগরের চারিদিকে শস্তক্ষেত্র ও আশ্রকানন আছে। জল প্রচুর হইলেও পানীয় জল নগরের বাহির হইতে আনিতে হয়। এখানে একটি সরকারী বাগান, জেলা আদালত, কমিশনার সাহেবের সরকারি হাউস, জেল, খাজনাখানা, থানা, দাতব্য-চিকিৎসালয়, ফ্রি-চার্জ-মিশনরী, ইংরাজী ও দেশীয় বিদ্যালয় এবং সরাই আছে।

হিন্দিপাড়া, কটক জেলার অঙ্গুল রাজ্যের সর্কপ্রধান সহর। অক্ষা° ২১° ৫' উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ৫৫' পূঃ। এখানে একটি থানা আছে।

হিন্দু, জাতিবিশেষ। বিলাসপুরের নিকট ৯৯২ খৃষ্টাব্দের যে একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে এই জাতির উল্লেখ আছে। এখন হিন্দু নামে কোন জাতির সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। সার হেনরি ইলিয়ট সাহেব অনুমান করেন, এই নাম প্রাচীন চন্দেল বা চম্পারের শব্দের রূপান্তর হইবে।

হিন্দ (ত্রি) হিন্দ-কৃত। ১ কৃতচ্ছদন, খণ্ডিত। পর্য্যায়—ছাত, লুন, কুন্ত, দাত, দিত, ছিত, বৃক, কুষ্ঠ, ছাদিত, ছেদিত, খণ্ডিত। “হিন্দে ধনুর্বি দৈত্যোজ্জ্বলতা শক্তিমধাদদে।” (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৯০।১১) ২ বিভক্ত। “হিন্দাভ্রমিব নশ্বতি” (গীতা) (পুঃ) ৩ মস্তভেদ। যে মস্তের আদি মধ্য ও অন্তে বায়বীজ সংযুক্ত বা বিষয়রূপে উচ্চারণ করিতে হয়, তিন চারি বা পাঁচ প্রকারে পরাক্রান্ত সেই মস্তকে হিন্দ বলে। (বিশ্বসার) ৪ আগন্তুক ঘট প্রকার ব্রণের অন্তর্গত ব্রণভেদ। হিন্দ, ভিন্ন, বিক, ক্ষত, পিচ্ছিল, ঘৃষ্ট এই ছয় প্রকার ব্রণ। বক্র বা সরল আয়ত ব্রণের নাম হিন্দ; ইহাতে গাত্রের মাংস খসিয়া পড়ে।

হিন্দক (ত্রি) হিন্দ-কন্। (অন্যতন্তুগতো ক্রাৎ। পা ৫।৪।৪) ক্রবৎ হিন্দ।

হিন্দকর্ণ (ত্রি) হিন্দঃ কর্ণোহন্ত বহুব্রী হিন্দশব্দন্ত বিষ্টাদিশ্বাৎ

শীর্ষপ্রসিদ্ধেঃ (কর্ণ লক্ষণজাবিহেতি। পা ৬৩১১৫) হির-
কর্ণরূপ চূর্ণলক্ষণকৃৎ। কাণং হেতু।

হিরণ্যপ্রসিদ্ধি (ত্রি) হিরণ্যপ্রসিদ্ধি সংজ্ঞারঃ কন্ হ্রস্বত।
জিগর্ষিকা লজ। (স্বাভাবিক)

হিরণ্যপ্রসিদ্ধি (ত্রি) জিগর্ষিকা লজ।

হিরণ্যবৈধ (ত্রি) হিরণ্য বৈধঃ সংজ্ঞারঃ কন্ হ্রস্বত। নিম্নত-
সংজ্ঞা, কেরাভাসি স্বাক্যঃ প্রথমে বাহার সংজ্ঞা হ্রস্বত।

হিরণ্যতরক (ত্রি) হিরণ্য-তরক (বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীর-
হুনৌ। পা ৫৩১১৭) ততঃ স্বার্থে কন্। 'উত্তরবচনে উত্তরঃ
প্রাপ্যোতি তিরতরকং হিরণ্যতরকং। তদানন্তরো ভবতি পূর্ক-
প্রতিবেদন।' তদন্তরাত স্বার্থে কন্ হ্রস্বত। 'তদন্তরাত স্বার্থে
কন্ হ্রস্বত।' তির তরকমিতি। (মহাভারত, পা ৫৪১৪) 'তদন্তর
প্রকর্ণণ ভাগ্যগতো। যুগপৎ বিবক্ষ্যামঃ পূর্কপ্রতিবেদন। তরপি
কৃত্তে তদন্তরাতঃ কন্ প্রাপ্যোতি ইত্যাহ তদন্তরাতৈতি স্বার্থ পুনর-
সত্যভাগ্যগতিবৃত্ত্যেব নতু শুভঃ।' ভাগ্যপ্রদীপ, অতিশয় হির।

হিরণ্যপক (ত্রি) হিরণ্য লুনৌ পকৌ বত বহতী। হিরণ্যপাখা,
কৃত্তপক, বাহার পাখা ছেদ করা হইরাছে। "অমিত্র কপোতক
হিরণ্যপকং বক্ততে।" (অমরকোষ ২০১৩৫১২)

হিরণ্যনাস (ত্রি) হিরণ্য নাসা নাসিকা অন্ত বহতী। বিধাত্ত
নাসাবুক্ত, হিরণ্যনাসিক।

হিরণ্যপত্রী (ত্রি) হিরণ্য পত্রঃ বতঃ বহতী, ততোড়ীপ্। অবাঠা,
অবাড়া কুপ।

হিরণ্যপুপ (পুং) হিরণ্য পুপঃ বত বহতী ততঃ স্বার্থে কন্।
তিলকপুপকৃৎ।

হিরণ্যভিন্ন (ত্রি) বিশেষণেন সহ বিশেষণত কর্ণধা। ইত্যন্ততঃ
বিক্রিণ্ড, উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট।

হিরণ্যমন্তক (ত্রি) হিরণ্য মন্তকং বত বহতী। মন্তকহীন।

হিরণ্যমন্তা (ত্রি) হিরণ্য মন্তা শিরো বতঃ বহতী। দশমহাবিদ্যার
মধ্যে এক মহাবিদ্যা। (ভট্টসার) [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

ইনিই প্রচণ্ডচণ্ডিকা নামে খ্যাত। ইনি প্রসন্ন হইলে
লোকে শিবস্ব লাতে সমর্থ হয়, অপ্রসন্ন পুত্রবান্, নির্ধন ধনী ও
মুখ বিহীন হয়। ইহার পূজাপ্রয়োণ এইরূপ—সাদক
প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর আচমন করিয়া বসিবে। পরে
লম্বী, মায়া ও কুর্জবীজ দ্বারা তিনবার জলপান করিবে। বাগ্
বীজ দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় সংস্পর্শ করিয়া মায়াবীজ দ্বারা হৃদয়
উদ্বার্তন করিবে। পরে শ্রী, মায়া, কুর্জ, সরস্বতী, কাম, ত্রিশূটা,
ভগবতী ও ভগবীজ এবং কামকলা ও অম্বুশ দ্বারা যথাক্রমে
মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাভি, হৃদয়, মন্তক ও অঙ্গদ্বয়
স্পর্শ করিবে। আচমনান্তর বোড়াস পদে অঙ্গাঙ্গিভাস

করিবে। এই মন্ত্রের তৈরয় অবিহ্ন, লম্বাট হ্রস্ব, হিরন্মতী
বেবতা, হাঁকারদ্বয় বীজ, বাহা শক্তিরম্বতীতীর্থগিরির বিশিষ্টোণ।
যথা—শিরসি তৈরয়বৎসরে নমঃ। সূত্রে লম্বাটহ্রস্বনে নমঃ।
হৃদি হিরন্মতীয়ে বেবতীয়ে নমঃ। ওহে হঁ হঁ বীজার নমঃ।
পাদয়োঃ বাহা শক্তরে নমঃ। কন্নাভাস—কন্নিষ্ঠাভূমে "ও
আং শক্তার জলদার বাহা।" পবিত্রাভূমিরে "ও ইং শক্তার
শিরসে বাহা।" মধ্যমাধরে "ও উং শক্তার শিখায়ে বাহা।"
তর্জনীধরে "ও ঐ পাশা কবচার বাহা।" অর্জুণধরে "ও ঔঃ
অম্বুশ নেত্রদ্বয়ার বাহা।" করতলপৃষ্ঠধরে "ও অঃ শুরকা
শুরকা শুরকাভার কটু।" এই প্রকার জলদানিতেও ভাস
করিবে। জিহ্বাভিত্তে লিখিত আছে—নিজের নাভিতে
অর্জুণবিশিষ্ট গুরুবর্ণ পদ্ম ধ্যান করিবে। তাহার মধ্যে
জবাকুহর লম্বা মন্তকবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল, তন্মধ্যে কোটিহর্যের ভার
উজ্জলবর্ণা মহাদেবী হিরন্মতীকে ভাবনা করিবে। ইনি
বামকরে নিজ মন্তক ধারণ করিয়া লক্ষ লক্ষ জিহ্বা দ্বারা নিজ
কর্ভনিঃসৃত কবিরদ্বারা পান করিতেছেন। বিবিধ কুহুম-
শোভিত কেশপাশ ইত্যন্ততঃ পরিক্রিষ্টা, আনুলায়িতাকেশা,
দিগম্বরী, দক্ষিণ হস্তে কর্তরী। সুওমালাবিকৃতিভা, বোড়শবর্ষী,
পীনোরত পরোদরা, রতি ও কামের উপরি প্রত্যাশীত পদে
দণ্ডায়মান। গলে অস্থিমালা ও সর্পলক্ষণযজ্ঞোপবীত কুচিত।
বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ডাকিনী ও বর্গিনী। ডাকিনী দেহিতে
কন্নাভ হর্যের ভার উজ্জল, বিদ্যুজ্জটা, জিনরনা, দিকটদন্তা,
মুক্তকেশী ও দিগম্বরী। বাম ও দক্ষিণ হস্তে নরকপাল ও
কর্তরী, লক্ষ লক্ষ জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক দেবীর কর্ভনির্গত রক্ত-
দ্বারা পান করিতেছে। দক্ষিণপার্শ্বে বর্গিনী—বেধিতে লোহিত-
বর্ণা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী বাম ও দক্ষিণ হস্তে কপাল ও কর্তরী,
গলে নাপথযজ্ঞোপবীত ও সুওমালা। প্রত্যাশীতপদে অবস্থিত হইরা
দেবীর কর্ভনিঃসৃত কবিরদ্বারা পান করিতেছে। রতি ও কামকে
বিপরীত রতিতে আসক্তরূপে ভাবনা করিতে হয়। যথা—

"লনাতৌ নীরজং ধ্যানেদর্শং বিকসিতং সিতম্।

তৎপদকোষমবোতু মণ্ডলং চণ্ডয়োচিষঃ ॥

জবাকুহরমল্লধাং রক্তবকু কসরিতম্।

রজঃসম্বতমোরোথা যোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিগমপ্রভাম্।

হিরন্মত্যাং করে বামে ধারদন্তাং শরতকম্ ॥

প্রসারিতসূরীং দেবীং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।

শিবস্তীং রৌঘিনীং ধারাং নিজকর্ভবিনির্গতাম্ ॥

বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুপলম্বিতাম্।

দক্ষিণে চ করে কর্ভীং সুওমালাবিকৃতিভাম্ ॥

বিলম্বীঃ মহাধোরাঃ প্রত্যাশীতপদে স্থিতাম্ ।
 অহিমালাধরাঃ ধেবীঃ নগবজোপবীতিনীম্ ॥
 রত্নিকামোপরিষ্ঠাকং মহা ধারন্তি মজ্জিণঃ ।
 সদা যোক্তবর্ষীয়াঃ পীনোরতপয়োজ্ঞানম্ ॥
 বিপরীতরত্নসক্তো ধ্যায়ন্তঃ রত্নবিনোদবো ।
 ডাকিনীঃ বর্ষীয়াঃ স্বামদক্ষিণবোগতঃ ॥
 দেবীঃ গলোচ্ছলজ্ঞানধারাপানং প্রকুর্কতীম্ ।
 বর্ষীয়াঃ লোহিতাঃ সৌম্যঃ মুক্তকেশীঃ দিগম্বরীম্ ॥
 কপালকর্জুকাহস্তাঃ বামদক্ষিণবোগতঃ ।
 নাগবজোপবীতাত্যাং অলন্তেজোমরীমিব ॥
 প্রত্যাশীতপদাং দিব্যাং নানালকারভূষিতাম্ ।
 সদা স্বামদক্ষিণবোগতঃ কপালকর্জুকাহস্তাম্ ॥
 ডাকিনীঃ বামপার্শ্বে তু কল্পদ্বন্দ্বানলোপমাম্ ।
 বিদ্যাক্ষট্যাং জিনরনাং দক্ষপংক্তিবলাকিনীম্ ॥
 দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোরতপয়োজ্ঞানম্ ।
 মহাদেবীঃ মহাধোরাঃ মুক্তকেশীঃ দিগম্বরীম্ ॥
 লেলিহানমহালিঙ্গাঃ সুগুমালাবিভূষিতাম্ ।
 কপালকর্জুকাহস্তাঃ বামদক্ষিণবোগতঃ ।
 দেবী গলোচ্ছলজ্ঞানধারাপানং প্রকুর্কতীম্ ॥
 কল্পদ্বন্দ্বকপালেন ভীষণেনাভিভীষণাম্ ।
 আখ্যাং নিবেদ্যমানাং তাং ধ্যায়ন্তেবীঃ বিচক্ষণঃ ॥

ধ্যান না করিয়া দেবীকে পূজা করিলে তাহার মন্তক
 সদাঃ ছিন্ন হয় ।

ধ্যানান্তর যথা—

‘প্রত্যাশীতপদাং সৈব ন দধতীঃ ছিন্নঃ শিরঃকর্জুকং
 দিগবস্তাঃ স্বকবজশোণিতজুধাধারাং শিবন্তীঃ সুদা ।
 নাগাবজশিরোমণিঃ জিনরনাং হৃদ্যাংপলালিতা
 রত্নাসক্তমনোভবোপরিষ্ঠাং ধ্যায়ন্তবাসরিতাম্ ॥
 দকে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কজীং তথা ধর্মরং
 হস্তাভ্যাং দধতী রজোশুণোভবঃ নারাপি সা বর্ষীনী ॥
 দেব্যাশ্চিরকবজতঃ পতদমৃগধারাং শিবন্তীঃ সুদা
 নাগাবজশিরোমণিঃ বিদা ধোরা সদা সাহুরৈঃ ॥
 বামে কক্কতমুখৈব দধতী ধ্বজাং তথা ধর্মরং
 প্রত্যাশীতপদাং কবজবিগলজ্ঞানং শিবন্তীঃ সুদা ।
 সৈবা য় প্রাণে সমস্তভুবনং ভোক্তাঃ কমা তামসী
 শক্তিঃ নাপি পরাংপরা ভগবতী মাতা পরাডাকিনী ॥’

পূজাযন্ত্র—একটা নন্দনলগ্ন আঁকিবে, ইহার দল পূর্ক-
 দিকে খেত, অধিকোণে রক্ত, দক্ষিণে কৃষ্ণ, বায়ুকোণে
 পীত, পশ্চিমে সূর্য, নৈঋতে রক্ত, উত্তরে সিন্ধু, ঈশানকোণে

কৃষ্ণবর্ণ । কণিকা মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে
 রক্তবর্ণ রজঃ, সূর্যবর্ণ সর্ব ও কৃষ্ণবর্ণ তমো ভূগণের রেখা আঁকিতে
 হয় । পরে বড়করবৃত্ত মারাবীজের আঁকিলা কণিকার চতু-
 দিকে প্রাকার আঁকিবে । পূর্কদিকে রক্তবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ,
 পশ্চিমে সূর্যবর্ণ ও উত্তরে পীতবর্ণ । প্রাকারের চারিদিক দ্বার,
 প্রত্যেক দ্বারেই এক একজন কেত্রপাল থাকিবে । (ভৈরবীর)

প্রকারান্তর যথা—ত্রিকোণাকার রেখা টানিবে, তাহার
 মধ্যে তিনটা মণ্ডল এবং তাহার মধ্যে দ্বারত্রয়বৃত্ত বোনি
 আঁকিবে । বাহিরে অষ্টদলপত্র ও তু-বিষয় এবং তন্মধ্যে
 কুর্ক বীজ আঁকিবে । তিন কোণে কটুযুক্ত করিবে । এইটা
 ধ্যানোক্ত যন্ত্র । উক্ত ধ্যানযন্ত্র যোগিদিগের পক্ষে বিহিত
 হইরাছে । গৃহস্থেরা তাহাকে নিজ নাতিপয় মধ্যস্থিত নির্দেশ,
 নিগুণ, সূক্ষ্ম বালচন্দ্রসদৃশ ছাতি এবং সর্ব রজঃ ও তমো
 গুণদ্বারা বেষ্টিত মনে করিয়া ধ্যান করিবে ।

‘অপরক প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্ ।
 স্বনাভো নীরজঃ ধ্যায়ন্তঃ তাহুঃশুলসরিতম্ ॥
 যোনিচক্রসমায়ুক্তঃ গুণজিতরসংজিতম্ ।
 তত্র মধ্যে মহাদেবীঃ ছিন্নমস্তাঃ সুরেন্দ্রবতিঃ ॥
 প্রদীপকলিকাকারামধিতীয়ব্যবস্থিতাম্ ।
 যোনিমূত্রাসমায়ুক্তাঃ হৃদয়ে স্থিতলোচনাম্ ॥
 শ্যেয়মেতদ্বতীনাং গৃহস্থানাং নিশাময় ।
 অন্তরে স্বশরীরস্ত নাভিনীরজঃসংগতাম্ ॥
 নির্লেপাং নিগুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্রসমপ্রভাম্ ।
 সমাধিমাভ্রগম্যাত গুণজিতর-বেষ্টিতাম্ ॥
 কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাভ্রপ্রদায়িনীম্ ॥’ (ভক্ত)

এইরূপ ধ্যানপূর্কক মানসপূজা করিয়া শূন্যস্থাপন
 করিবে । তার পর পীঠপূজা করিতে হয় । যথা—ওঁ আধার-
 শক্তয়ে নমঃ । ওঁ প্রভুতায় নমঃ । ওঁ কুর্খায় নমঃ । ওঁ
 অনন্তায় নমঃ । ওঁ পৃথিব্যে নমঃ । ওঁ জীরসমুদ্রায় নমঃ ।
 ওঁ রত্নবীপায় নমঃ । ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ । ওঁ তদধঃ স্বর্ণ-
 সিংহাসনায় নমঃ । ওঁ আনন্দকন্দায় নমঃ । ওঁ সখিরালায়
 নমঃ । ওঁ সর্বভোগ্যকপদায় নমঃ । ওঁ সং সঙ্ঘায় নমঃ ।
 ওঁ রং রজসে নমঃ । ওঁ তং তরসে নমঃ । ওঁ জাং আশ্বনে
 নমঃ । ওঁ অং অন্তরাশ্বনে নমঃ । ওঁ পং পরমাশ্বনে নমঃ ।
 ওঁ হ্রীং জ্ঞানাশ্বনে নমঃ । পদ্মমধ্যে ওঁ রত্নিকামাত্যাং নমঃ ।

ভৈরব মতে—আধারশক্তি, কুর্খ, নাগরাজ, পরমালা, পদ্ম,
 চতুর্কোণমণ্ডল, রজঃ, সর্ব, তমঃ, রতি ও কামকে পূজা করিয়া
 শক্তিপূজা করিবে ।

পীঠমন্ত্র যথা—‘রতি কাষোপরি বজ্রৈবৈরোচনীয়ে দেহি

দেহি এহি এহি গুরু গুরু মম সিক্তি দেহি দেহি মম শত্ৰু ন
মারয় মারয় করালিকে হুঁ কটু স্বাহা।" পুনর্বার ধ্যান করিয়া
আবাহন করিবে। "সর্গসিদ্ধিবর্ণনীয়ে সর্গসিদ্ধিডাকিনীয়ে
বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাবহ ইহাবহ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া
"ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সরিথেহি ইহ সংনিরুধ্যব" এই মন্ত্র
দ্বারা আবাহন করিয়া "আং হ্রীং ক্রোং হং সঃ" এই মন্ত্র দ্বারা
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। "ও আং খজ্জার হৃদয়ায় স্বাহা"
ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বড়জ জ্ঞানপূর্বক বখাশক্তি পূজা করিয়া বলি
দিবে। মন্ত্র বখা—"বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি
গুরু গুরু ইমং বলিং মম সিক্তি দেহি দেহি মম শত্ৰু ন মারয়
মারয় করালিকে। হুঁ কটু স্বাহা।" পরে দেবীর দক্ষিণে "ও
বণিতৈ নমঃ", বামে "ও ডাকিতৈ নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা বর্ণিনী
ও ডাকিনীর পূজা করিবে। দেবীর বড়জপূজা করিয়া দক্ষিণে
"ও শ্মশনিন্যে নমঃ" বামে "ও পদ্মনিধয়ে নমঃ" পূর্বদিকে
লক্ষ্মী, দক্ষিণে লজ্জা, পশ্চিমে মায়া, উত্তরে সরস্বতী, অগ্নি-
কোণে ব্রহ্মা, বায়ুকোণে বিষ্ণু, নৈঋতকোণে কৃত্ত, জৈশানকোণে
জৈশ্বর এবং মধ্যে সদাশিবকে আদিত্যে "ও" অস্ত্রে "নমঃ" দিয়া
পূজা করিবে। পরে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিপূর্বক আবরণপূজা করিবে।
অষ্টদিক ও মধ্যে "ও আং খজ্জার হৃদয়ায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র
দ্বারা বড়জপূজা করিয়া পূর্বাদিক্রমে অষ্টদলে পূজা করিবে।
বখা—পূর্ব দলে "ও কাটৈ নমঃ।" অগ্নিকোণ দলে "ও বণিতৈ
নমঃ।" দক্ষিণ দলে "ও ডাকিতৈ নমঃ।" বায়ুকোণ দলে
"ও ভৈরবৈ নমঃ।" পশ্চিম দলে "ও মহাভৈরবৈ নমঃ।"
নৈঋতকোণ দলে "ও ইন্দ্রাট্টৈ নমঃ।" উত্তর দলে ও
পিজ্জলাট্টৈ নমঃ।" জৈশানকোণ দলে "ও সংহারিণ্যৈ নমঃ।"
পদ্ম-মধ্যে "হুং হুং কটু নমঃ স্বাহা নমঃ।" দেবীর দক্ষিণে
"সম্রাট্টৈ ছন্দসে নমঃ" উত্তরে "সর্গবর্ণেভ্যো নমঃ" পুনর্বার
দক্ষিণে "ও বীজশক্তিভ্যাং নমঃ।" পত্রের অগ্রভাগে
পূর্বদিকে "ও ব্রাহ্মৈ নমঃ" অগ্নিকোণে "ও মাহেশ্বর্যৈ
নমঃ" দক্ষিণে "ও কোমার্যৈ নমঃ" বায়ুকোণে "ও
বৈষ্ণবৈ নমঃ", পশ্চিমে "ও বারাহৈ নমঃ", নৈঋতকোণে
"ও ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ" উত্তরে "ও চামুণ্ডারৈ নমঃ" জৈশানকোণে
"ও মহালাক্ষ্যৈ নমঃ।" পূর্বদ্বারে "ও করালার নমঃ" দক্ষিণ
দ্বারে "ও বিকরালার নমঃ" পশ্চিমদ্বারে "ও অতিকরালার
নমঃ" উত্তর দ্বারে "ও মহাকালার নমঃ।"

"পূর্বদ্বারে করালক বিকরালক দক্ষিণে।

পশ্চিমেহতিকরালক মহাকরালমুত্তরে॥" (ভৈরবীর)

"যোনিমুদ্রা সমাক্রুতাং প্রদীপকলিকোজ্জলাম্।

কৃৎপক্ষে বিধুমিব ক্রমেন ক্রীণতাং গতাম্॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রূপভাবনা পূর্বক নাম নাসাপট
দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশিত করিবে।

পুরাচরণ লক্ষণঃ। রাজিতে মন্ত্র মাংস জ্বরাদি দ্বারা
বিভবাহরূপ বলি দিবে। বলি মন্ত্র। "ও সর্গসিদ্ধিপ্রদে বর্ণনীয়ে
সর্গসিদ্ধিপ্রদে ডাকিনীয়ে হিমমত্রে দেবি এহেহি ইমং বলিং
গুরু গুরু মম সিক্তি দেহি দেহি হ্রীং হ্রীং কটু স্বাহা।" (ভৈরবীর)

"দেবি তরে বিশ্বনাথ হইল কল্মষ।

হিমমত্ৰা হইল সতী অতি বিপরীত॥

বিকসিত পুণ্ডরীক কণিকায় মাঞ্চে।

তিন গুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥

বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।

কোকনদ বরণা বিভূজা দিগম্বরী॥

নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাহিমাল্য গলে।

খড়্গা কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥

কণ্ঠ হইতে কণ্ঠির উঠিছে তিনধার।

একধার নিজ মুখে করেন আহার॥

হুই দিকে হুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।

হুই ধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী॥"

চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।

অর্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥" (ভারত অন্নদা)

হিমমন্ত্ৰিকা (ত্ৰী) ১ হিমমন্ত্ৰাদেবী। কাঠমাণ্ডুর দেড়মাইল
পূর্বে ললিতপত্তন নামক স্থানে হিমমন্ত্ৰাদেবীর এক সুন্দর
ও প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের অনতিদূরের ৪৮ সপ্তং
অধিত জিমুগুপ্তের একখানি খোদিত শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

হিমরুহ (পুং) ছিন্নোপি রোহতি রুহক (ইগুপথজ্ঞেতি।
পা ৩।১।১৩৫)। তিলকবৃক্ষ। (রাজনিং)

হিমরুহা (ত্ৰী) হিমরুহ-ত্রিয়াং টাপ্। ১ শুড়ুটী, গুলক।
পৰ্য্যায়—বৎসাদনী, মধুপর্ণী, অমৃত, অমরা, কুণ্ডলী, অমৃতবল্লী,
শুড়ুটী, চক্রলক্ষণা। ২ স্বর্ণকেতকী। ৩ শলকী।

হিমবেশিকা (ত্ৰী) ছিন্নো বিচ্ছিন্নো বেশো যন্তাঃ সংজ্ঞারাঃ
কন্ ভতটাপি অতইৎ। পাঠা, আকনদী।

হিমস্থান (পুং) কৰ্ম্মধা। স্তম্ভতোক্ত স্থানরোগবিশেষ। স্থান-
রোগে কক্ষ ও বাতের আধিক্য হইলে তাহাকে হিমস্থান বলে।
(নিদান) (বহুব্রী) ২ হিমস্থাসম্বৃত।

হিম্মা (ত্ৰী) হিম্মতেহসৌ হিদ্-জ্ঞ ততটাপ্ (অজাততটাপ্।
পা ৪।১।৪)। ১ শুড়ুটী, গুলক। ২ পুংলী। (বিষ)

হিম্মোন্তবা (ত্ৰী) হিম্মাপি উত্তবতি হিম্ম-উৎ-ভূ-অচ্ ততটাপ্।
শুড়ুটী, গুলক।

হিম্প (দেশজ) ১ মন্ত্রধারণ বস। ২ নৌকাবিশেষ।

ছিপি (দেশজ) বোতলের মুখবন্ধ, কাক।

ছিপিগর, ছিটপ্রস্তুতকারী জাতি। এই জাতীর লোক অতি বিরল। খেরা ও কাশীর নিকটবর্তী স্থানে ইহারা বাস করে। বস্ত্রে ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ছিপিগরগণ আপনাদিগকে রাঠোর-রাজপুতবংশ-সম্বৃত বলিয়া পরিচর দেয়। ইহাদিগকে ভাবসারও বলে।

ছিপিয়া, অযোধ্যাপ্রদেশে গোপা জেলার একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে বৈষ্ণবধর্মসংস্কারক সহজানন্দের সম্মানার্থ একটা স্মরণ মন্দির আছে। সহজানন্দ প্রায় শতবৎসর পূর্বে এই ছিপিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে জুনাগড়ের বৈষ্ণব-মঠের প্রধান মহাস্ত হন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া থাকে। তাঁহার উপাধি স্বামীনারায়ণ। তাঁহার বংশধরগণ আজিও তাঁহার প্রবর্তিত মতাবলম্বী বৈষ্ণব-দিগের নেতা বলিয়া পরিগণিত। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে তাঁহার মতাবলম্বী গুজরাটস্থ বৈষ্ণবগণ তাঁহার জন্মস্থানে এক মন্দির নির্মাণার্থ যত্নবান্ হয়। তদনুসারে বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের গঠন স্মরণ, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাত্তাঙ্গে প্রতিবৎসর রামনবমী ও কার্তিক-পূর্ণিমার ছুইটা মেলা হয়। বারমাসই নানাহান হইতে যাত্রীগণ এই স্থান দেখিতে আইসে।

ছিপী (দেশজ) গুঁজি, ছিত্ররোধক কাঠ। [ছিপি দেখ।]

ছিপুলিয়া (পারস্যজ) বালক।

ছিবড়া (দেশজ) রস খাইরা যে অসার ভাগ পরিত্যক্ত হয়, কোন দ্রব্যের নীরস ভাগ।

ছিষলা (পারস্যজ) ছেপলা, বালক।

ছিম (শিবী শব্দজ) শিম।

ছিয়াত্তর (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৭৬, ছেরাত্তর।

ছিয়ানই (যন্ত্রবতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৯৬, ছেরানই।

ছিয়ানবই (যন্ত্রবতি শব্দজ) ৯৬, ছিয়ানই।

ছিয়াশী (যড়শীতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৮৬, ছেরাশী।

ছির্ছিরা, ক্ষুদ্র গায়ক পক্ষীবিশেষ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫।৬ ইঞ্চি। দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে এবং সিংহল ও বাঙ্গালার কোন কোন জায়গায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নির্ভয়ে লোকালয়ে আসে, ফাঁকা স্থানে লাফাইয়া বেড়ায়, অথবা গাছের ডালে বসিয়া গান করে। ইহারা একবার অল্প উপরে উড়িয়া আবার তখনি পাখা মেলিয়া নামিয়া পড়ে এবং এইরূপ করিতে করিতে গান করে।

ছিলা (ছিলা শব্দজ) বকল, ছাল।

ছিলা (দেশজ) ১ ধনুকের গুণ। ২ বস্ত্রাদির প্রান্তভাগস্থ সূত্রাদি।

ছিলাম (পারস্যজ) হঁকা, হকা।

ছিলামিলি (দেশজ) মুসলমান ককিরের গলার মালাবিশেষ।

ছিলাহিণ্ড (পুং) চিলিনা বসনধরুপতর্য হিণ্ডিতে অনাদ্রিরতে চিলি-হিণ্ড-অচ্ পুর্বোদরাদিচ্চাত্ত হঃ। পাতাল-গরুড়বৃক্ষ।

ছীটা (হিন্দি ছীটনা শব্দজ) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে জমিতে ধাত্ত থাকিতে থাকিতে উহাতে মটর ও মসিনা হুড়াইয়া দেয়। ধাত্ত কাটিয়া লইলে পর ঐ সকল শস্ত জন্মে। ঐরূপ জমিকে ছীটা কহে।

গোরক্ষপুর জেলায় ছীটা শব্দে একবার চাষ দিয়া বুনা জমিকে বুঝায়। দখল পাইবার জন্য অনেকে জমি ছীটা করিয়া লয়।

ছুই (হুচী শব্দজ) ছুঁচ।

ছুঁচ (হুচী শব্দজ) ১ হুচী, ছুঁই। ২ সোমাজি।

ছুঁচত্র, কোকিল জাতীয় পক্ষীবিশেষ।

ছুঁচা (দেশজ) গন্ধমুখিক। [ছুন্দরী দেখ।]

ছুঁচাল (দেশজ) তীক্ষ্ণাগ্রযুক্ত।

ছুঁচকি (দেশজ) ওৎ, লীকারাদি করিবার আশায় অতি সন্তর্পণে অবস্থান।

ছুঁচিয়া (দেশজ) তৃণবিশেষ।

ছুঁচিয়াত্রক্ষজাল, সর্পবিশেষ।

ছুঁছা (ছুন্দরী শব্দজ) গন্ধমুখিক, ছুঁচা।

ছুঁড়ী (দেশজ) অন্নবয়স্ক, ছুকুরী।

ছুইকদান (কৌড়কা)।—১ মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ১৭৪ বর্গ মাইল। এই রাজ্য শালিটেকরি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। নিম্ন ভূমিতে উত্তম আবাদ হয়। গোধূম, ছোলা ও কার্পাসই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজ্য কৌড়কা বা ছুইকদান নামক গ্রামে প্রস্তরনির্মিত একটা ক্ষুদ্র দুর্গে বাস করেন। ইনি গৃহস্থ বৈরাগী দলভুক্ত। গবর্মেন্টকে বার্ষিক ১১০০০ টাকা ভাঙ্গনা দিতে হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম ও রাজার বাসস্থান।

ছুকুরী (দেশজ) বালিকা, ছুঁড়ী।

ছুগের, এক পতিত রাজপুত জাতি। ইহারা জাড়েজা রাজপুত বংশীয়। কচ্ছপ্রদেশে বাস করে।

ছুছুকা (গ্রী) ছু ছু ইত্যব্যক্তশব্দ কারতি ছুছ-কো-ক। ছুন্দরী, ছুঁচা।

ছুন্দর (পুং) ছুন্দিত্যব্যক্তশব্দে দীর্ঘ্যতে নিগচ্ছত্যন্তাৎ ছুন্দ-দৃ-অপাদানে অপ্। মুখিকভেদ, ছুঁচা। “ছুন্দরেন বিড়ভলো গ্রীবা স্তম্ভোবিজ্ঞগম্।” (অশ্বত)

ছুন্দর (পুং) ছুন্দ-দৃ-ইন্। মুখিকভেদ।

“ছুল্লমরি: শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাক্ত বহিণঃ ॥” (মহ ২১।৩৫)

মহুর মতে—কতুরী প্রভৃতি সুগন্ধ জব্য হরষ করিলে ছুল্লমরি অন্ন হয়।

ছুল্লমরী (জী) ছুল্লমর-জিন্নার জীপ। গন্ধমুখিক, ছুঁচা। পর্যায়—গন্ধমুখা, চিত্রবেস্ত, নকুল, পুংবুধ, গন্ধমুখিক, গন্ধমুখিকা, রাজ-পুত্ৰী, প্রতিমুখিকা, সুগন্ধিমুখিকা, গন্ধভণ্ডিনী, ভণ্ডিমুখিকা, গন্ধাখু, গন্ধনকুল, চুফু। (Mole)

ইহার কীটপতঙ্গভুক নিশাচর প্রাণী, দিবাভাগে অন্ধকার গর্ভে বাস করে, রাত্রি হইলে কিছু কিছু শব্দে অতি ক্ষতবেগে শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রায়ই উঠানে ইহাদিগকে আরম্ভলা প্রভৃতি ধরিতে দেখা যায়। ভ্রমণকালে ইহাদের শরীর হইতে মৃগনাভির কতক অনুরূপ, কিন্তু অতি অপ্রীতিকর স্তীত্র গন্ধ নির্গত হয়। ঐ গন্ধ একরূপ তেজস্বর যে কোন পদার্থের উপর দিয়া ছুঁচা চলিয়া গেলে দীর্ঘকাল উহাতে ছুঁচার গন্ধ থাকে। খাও বস্ত ছুঁচা-স্পর্শে একবারে নষ্ট হয়। এমন কি আবৃত পাত্র, কিম্বা ছিপি দেওয়া বোতলের নিকট দিয়া গেলেও তদ্ব্যবস্থ বস্ত ছুঁচার গন্ধযুক্ত হইয়া যায়।

ছুঁচার দংশনে অনেক সময় শরীর বিধ্বস্ত হয়। প্রবাদ আছে যে, সাপ ছুঁচার কামড়ে মরিয়া যায়।

জরপুর প্রভৃতি স্থানের অনেকে শুক ছুঁচা সোণা রূপা তামা ইত্যাদির মাদ্রুলীতে পুরিয়া কবচরূপে পরিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে ইহা পরিলে সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পায়, এমন কি অজ্ঞাঘাতে বা গুলিতে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। ছুঁচা জাতীয় অনেক প্রকার জীব ভারতবর্ষে বাস করে।

ছুচু (জী) ছুচুকা, গন্ধমুখিক। বাক্যকালে ছুচা বামদিকে থাকিলে যাত্রা শুভ। (বৃহৎসংহিতা ৮৬ অঃ)

ছুট্ (দেশজ) বাদ।

ছুটকী (দেশজ) ক্ষুদ্র পক্ষী।

ছুটন (দেশজ) পলায়ন, ক্ষত গমন।

ছুটা (দেশজ) অস্থায়ী।

ছুটছুটি (দেশজ) দৌড়াদৌড়ি।

ছুটান (দেশজ) ক্ষত গমন করান।

ছুটা (দেশজ) ১ বিদায়, ছাড়ানি, উদ্ধার। ২ বর্ধমানের দক্ষিণে স্থলোমানাবার পরগণার একটা গ্রাম।

ছুড়ন (দেশজ) প্রক্ষেপ করণ, ছড়ান।

ছুত (ছয় শব্দজ) ছল, চাতুরী, ভান।

ছুতল (দেশজ) ছতঙলা, যে ছুতা বা ছল করে।

ছুতা (দেশজ) ছুত, ছল।

ছুতার (স্বত্বধার শব্দজ) স্বত্বধার। [স্বত্বধার দেখ।]

ছুত্র (জী) ছদ-মক্ পূর্বোদয়াদিষাং সাধুঃ। প্রতীকার, রক্ষি।

ছুনী (দেশজ) ছোট, ক্ষুদ্র।

ছুপ (পুং) ছুপ-বঞার্থে ক। ১ ছুপ, ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত বৃক্ষ। ২ স্পর্শ। ৩ যুদ্ধ। (ত্রি) ৪ চপল।

ছুবুক (জী) চিবুক। “অক্ষাত্যাং তে নালিকাত্যাং কর্ণাত্যাং ছুবুকাদধি”। (অক ১০।১৩৩।) ‘ছুবুকাং চিবুকাং ওষ্ঠত্যাং এদেশাচ্চ।’ (সারণ।)

ছুরণ (পুং) পক্ষী। (শব্দরত্নাঃ)

ছুরা (জী) ছুরতি রজস্বতি নাশরতি দুর্গন্ধাদিকমিতি বা ছুর-ক জিন্নার টাপ। ১ ছুরা, কলিচূর্ণ। ২ চূর্ণ, শুঁড়া।

ছুরিকা (জী) ছুরতি হিন্তি ছুর-কুন। বৃ বা ছুরী-বার্থে কন টাপ পূর্ববৃক্ষচ। অন্ত্রবিশেষ, ছুরী। পর্যায়—শজী, অসি-পুত্ৰী, অসিধেহুকা, ছুরী, খুরী, ছুরী, কপাণিকা, ধেহুপুত্ৰী, ছুরিকা। “তাবৎজিন্নমপত্রভাং হিহা ছুরিকরা ভূশম্। খাদন্তী তত্ৰ মাংসানি পুংসঃ শূল্যগ্রবন্তিনঃ” (কথাসরিৎসাগর ২৫।১৪০)

ছুরিকাপত্নী (জী) ছুরিকেব পত্নমত্যাঃ ততো জীপ। যেত-বৃক্ষ। (রাজনিঃ)

ছুরিত (ত্রি) ছুর-ক্ত। খচিত, রঞ্জিত। “পরম্পরেন ছুরিতা-মলচ্ছরী তদৈকবর্ণাবিব ভৌ বভূবতুঃ” (মাঘ ১ লগ্ন ২২।

ছুরিমার, পঞ্জাব প্রদেশের এক প্রেণীর ককির। ইহার সঙ্গে ছুরি লইয়া বেড়ায় এবং লোকের বাড়ী গিয়া ছুরিকা দ্বারা নিজের শরীরে আঘাত করিতে থাকে। লোকে ভয় পাইয়া ইহাদিগকে ভিক্ষা দেয়। দড়িগুরালা, তস্মীওরালা, দণ্ডীওরালা, ছড়িমার, গুর্জমার নামে আরও কয়েকজের এইরূপ ককির আছে।

ছুরী (জী) ছুরতি হিন্তি ছুর-ক (ইগুপথজ্জৈতি। পা ৩।১।৩৫) ততো জীপ। ছুরিকা, ছুরী। ভারতের নানা স্থানেই ছুরী প্রস্তুত হয়, তদ্ব্যয্যে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চননগরের ছুরীই দেশবিখ্যাত। সেখানকার ছুরী বিলাতী উৎকৃষ্ট ছুরী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

ছুরী, মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুর জেলার ঈশানকোণস্থিত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণকল ৩২০ বর্গ মাইল।

ছুরিপত্রক (জী) বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটা।

ছুরিপত্রিকা (জী) বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটা।

ছুরিপত্নী (জী) বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটা।

ছুলী, চর্মরোগবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্বসার—কিলান, সিখ, বন্ধুপুং। এই রোগ সামান্য কৃষ্টরোগ মধ্যে গণ্য।

সচরাচর উষ্ণ, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানেই উৎপত্তি হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই রোগে বিশেষ কোন উপসর্গ নাই ছুলী দ্বারা আক্রান্ত স্থান ঈষৎ শুষ্ক বা বিবর্ণ এবং কর্কশ বো

হর। ছলী ঘর্ষণ করিলে ধূলির স্তর পদার্থ বাহির হয়। যা হইলে ছলী অতিশয় চুলকাইতে থাকে। অনেক সময় ছলী আপনা হইতেই গায়ে বিলীন হইয়া যায়। আবার অনেক সময় রোগীর সর্কাস ব্যাপিরা বেলে, স্ততরাঃ ছলী দৃষ্ট হয় না। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে এই রোগ সংক্রামিত হয়। [কিলাস দেখ।]

ছুহারা (আফগানী) অর্ধপক্ষ পিণ্ডেজুর গরম জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লইলে ছুহারা প্রস্তুত হয়। [পিণ্ডেজুর দেখ।]

ছুরিকা (স্ত্রী) ছুরী-স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ। ছুরী।

ছুরিকাপত্রী (স্ত্রী) ছুরিকাইব পত্রাণি যন্তাঃ বহত্রী ত্রিমাঃ ভীপ্ হয়। যুটিকাশী লতা, বিছুটা।

ছুরী (স্ত্রী) ছুরী-শব্দোদগাদিহাঃ দীর্ঘঃ। ছুরিকা।

ছে (ছেদ শব্দজ) খণ্ড।

ছেআন (দেশজ) কর্তন, খণ্ডন।

ছেআনি (ছেয়ান হইতে) ছেদকরণ, খণ্ডন।

ছেআশী (যড়নীতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৮৬, ছেয়াশী।

ছেওড় (ছেমও শব্দজ) পিতৃহীন বালক।

ছেঁকচা (দেশজ) তপ্তলোহাদি দ্বারা দগ্ধকরা।

ছেঁকচি (দেশজ) অন্ন তৈলাদিতে ভাজা বা ভর্জিত দ্রব্য।

ছেঁচকা (দেশজ) লোহশলাকা।

ছেঁচকি (দেশজ) অন্ন তৈলাদিতে ভাজা বা ভর্জিত দ্রব্য।

ছেঁচড়া (দেশজ) ১ অসং, অভদ্র। ২ ব্যঞ্জনবিশেষ। মাছের কাঁটা কান্ধুরা প্রভৃতি পরিত্যক্ত অংশ ও শাকাদি দ্বারা এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, ইহা অতি মুখপ্রিয়।

ছেঁচড়ামি (ছেঁচড়া শব্দজ) অভদ্রতা।

ছেঁচড়ী (দেশজ) অভদ্র, অসং।

ছেঁচা (দেশজ) ১ জলাদি সেচন। ২ আঘাত, খেতড়ান। ৩ চেন্টাকরা বংশাদি।

ছেঁচোড় (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রচোর। ২ অভদ্র।

ছেঁড়া (ছেদ শব্দজ) ছেদকরা।

ছেঁদী (ছিন্ন শব্দজ) ১ ছিন্ন। ২ ছিন্নযুক্ত।

ছেঁদে (দেশজ) দৃঢ়বন্ধন।

“আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।”

ছেক (পুং) ছো-বাহুলকাৎ ডেকন্। ১ গৃহাসক্ত যুগপক্ষী আদি। তৎপর্যায়—গৃহক। (ত্রি) ২ নাগর। (পুং) ৩ শব্দালঙ্কারভেদ। বহুব্যঞ্জনের স্বরূপতঃ ও ক্রমতঃ একবার সাম্যকে ছেকাশ্রুতি বলে। (সাহিত্যদর্পণ ১০।৪)

উদাহরণ যথা—“আদার বকুলগন্ধানকীকুর্কন্ পদে পদে জরমান্। অন্নমৈত্রি স্নানমল্ল কাবেরী-বারিপাবনঃ পবনঃ।

অত্র গন্ধানকীতি সংযুক্তরোঃ কাবেরী বা বীতাসংযুক্তরোঃ পাবনঃ পবন ইতি বহুনাং ব্যঞ্জনানাং সন্ধদাহুস্তিছেকোবিদগ্ধ-স্তং প্রয়োজ্যাদেব ছেকাশ্রুতিঃ।” (সাহিত্যদর্পণ ১০।৪) (দেশজ) ৪ বিরাম। ৫ বেদনাদিতে উত্তাপ দেওয়া।

ছেকাপকৃতি (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। [অলঙ্কার দেখ।]

ছেকাল (ত্রি) [ছেক দেখ।]

ছেকিল (ত্রি) [ছেক দেখ।]

ছেকোক্তি (স্ত্রী) ছেকানাং বিদগ্ধানামুক্তিঃ ৬তং। বক্তোক্তি, লোকোক্তি অর্থান্তরযুক্ত হইলে তাহাকে ছেকোক্তি বলে। (কুবলয়ানন্দ)

ছেটন (দেশজ) বংশশলাকা দ্বারা গৃহের চাল প্রভৃতি ছাটন।

ছেটা (দেশজ) শলাদ্বারা ছাটা।

ছেতবা (ত্রি) ছেদনীয়। “ছেতবাং তত্ত্ব দেবাত্ত তন্ময়োরহ-শাসনম্।” (মহু ৪।২৭২)

ছেতু (ত্রি) ছিদ-তৃচ্। ছেদনকর্তা। “ছেতুঃ পার্গতাং ছায়াং নোপসংহরতিক্রমঃ” (হিতোপদেশ)

ছেদ (ত্রি) ছিদ-কর্তরি-অচ্। ১ ছেদনকারী। “স্বাগ্ ছেদস্ত কেন্দারমাছঃ শল্যবতোমৃগম্” (মহু ২।৪৪) কক্ষণি ঘঞ্। ২ ভাজক। “ছেদঃ গুণং গুণং ছেদম্” (লীলাবতী) ৩ খণ্ড। “বলাহকছেদবিভক্তুরাগমকালসন্ধ্যামিব ধাতুমন্তাম্।” (কুমার ১।৪)

তাবে ঘঞ্। (পুং) ৪ ছেদন। “অভিজ্ঞাচ্ছেদপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনক্রমাঃ” (কুমার ২।৪১) ৬ নাশ, অপগতি। “মেদচ্ছেদকুশোদরং।” (শাকুন্তল ২ অঙ্ক) ৭ ষোড়শের জৈন-দিগের ধর্মগ্রন্থ সকলের একটা বিভাগ।

ছেদক (ত্রি) ছিদ-খুল্। ছেদনকর্তা।

ছেদন (স্ত্রী) ছিদ-ভাবে লুট্। ছেদন, মস্তদ্বারা বিধাকরণ। পর্যায়—বর্ধন, কর্তন, কল্পন, ছেদ। “ফলদানান্ত বৃক্ষাণাং ছেদনে অপ্যমৃক্শতম্” (মহু ১।১৪২) ২ নাশ, অপনোদন। “সনৎকুমারং ধর্মজ্ঞং সংশয়চ্ছেদনায় বৈ” (ভারত বন ১৮৫।২৪) (ত্রি) ছিনতি ছিদ-ল্যা। ৩ ছেদক। “প্রসরো বা প্রকাশো বা যোগো যোহরিং প্রবোধতে। তদনৈব শত্রং শত্রুবিদ্যাং ন শত্রং ছেদনং স্মৃতম্।” (ভারত ২।৫৪।৯)

ছেদনী (স্ত্রী) ছিদ-করণে লুট্ ত্রিমাঃ ভীপ্। কর্তরী, কাটারী। ছেদনীয় (ত্রি) ছিদ-কক্ষণি অনীয়ন্। ১ ছেদ, ছেদের উপযুক্ত। ২ কতকবৃক্ষ, মর্ম্মর ফলের গাছ।

ছেদা (হিন্দি ছেঁদ অর্থাৎ ছিন্ন শব্দজ) ঘৃণ। (Calandria graneana) ইহার শব্দের অতিশয় হানিকর। শব্দের ঘৃণ ধরা রোগকেও হিন্দিতে ছেদা কহে।

ছেদ্যাম, ছদ্যাম, (ছ=ছয়, দ্যাম=কোড়ি অর্থাৎ ছয় কোড়ি।)
এক পরসার এক চতুর্থাংশ।

ছেদ্যাদি (পুং) বহুব্রী। নিত্য মর্হতি এই অর্থে ঠাণ্ডা প্রত্যয়
নিমিত্ত শব্দগণ। যথা—ছেদ, ভেদ, জোহ, নর্ভ, কর্ভ, তীর্ভ-
সংযোগ, বিভ্রয়োগ, প্রয়োগ, চিত্তকর্ভ, প্রোবণ, সংপ্রহ, বিপ্রহ,
বিকর্ভ, প্রকর্ভ, বিরাগ, বিরজ। (পাণিনি) ছিদ্-ঠাণ্ড ছৈদিক।

ছেদ্বি (ত্রি) ছিনতি ছিদ্-ইন্। (হপিবিহীত্যানি। উণ ৪।১১৮)
১ ছেদনকর্তা। ২ বজ্র। ৩ বর্জকি। (ধরণি)

ছেদিত (ত্রি) ছেদ-ভারকাদিছাদিতচ্ ক্। ছিদ্-গিহ ক্।
বিধাকৃত, কর্তিত। “ছেদিতাখিলপাপোষা ছন্নয়ী কুলহারিণী”
(কাশীখণ্ড ২৯।৬২)

ছেদিন্ (ত্রি) ছেদ-ইনি উপপদে গিনি। ছেদযুক্ত বা ছেদকর্তা।
“লোষ্ট্রমর্দী তুণ্ণচ্ছনী নখাদী চ যো নয়ঃ” (মহু ৪।৭১)

ছেদ্যার (পুং) শব্দকীজন্ত, সজ্ঞার।

ছেদ্য (ত্রি) ছিদ্-কর্মণি গ্যাৎ। ছেদনীয়, ছেদনের উপযুক্ত।
“শীর্ষচ্ছেদ্য নতোহং হ্যাং” (ভট্ট)। (পুং) ২ কপোতপক্ষী,
পায়রা। ৩ অক্ষিরোগের প্রতিষেধের একটা উপায়।

রোগী অন্ন পথ্য করিয়া স্নানভাবে উপবেশন করিলে
ভিষক্ তাহার চক্ষে লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে
জ্বালা করিবে ও চক্ষু দিয়া জল ঝরিবে। রোগীকে
আড়নয়নে চাহিতে বলিয়া বড়িশ, মুচুটা অথবা মূচীসূত্র
চক্ষুর গলিতে লাগাইবে। চক্ষুর জল পড়িতে দিবে না।
তীক্ষ্মমণ্ডলাগ্রদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া বলি উদ্ধৃত করিবে।
পরে যবনাল, ত্রিকটু ও লবণ চূর্ণ দ্বারা স্নেহ করিয়া চক্ষুধর
বাধিয়া দিবে। ত্রণের জ্বার তৈল দ্বারা তাহার চিকিৎসা
করিবে। তিন দিন পরে হাতের ঘাম দিয়া তাহার শোধন
করিবে। করঞ্জবীজ, আমলকী ও মধুকপকজল মধুসংযুক্ত
করিয়া তাহার দ্বারা দুইদিন প্রক্ষালন করিবে। মধুক, পদ্ম-
কেশর, দুর্লা ও ককদ্বারা মস্তকে শীতল প্রলেপ দিবে। রোগের
কিছু অবশেষ থাকিলে লেখ্যাজন দ্বারা তাহার শোধন
করিবে। বলিরোগ যদি গুরু, নীল, রক্ত বা ধূসরবর্ণ হয়,
তাহা হইলে গুরুরোগের জ্বার ঔষধ দিয়া তাহার প্রতিকার
করিবে। অর্শ্ব (চক্ষুরোগবিশেষ) মাংসবহুল বা কৃষ্ণ
মণ্ডলগত হইলে তাহাকে ছেদন করিবে। শিরার উপর
হইলে ইহা অতি দুঃসাধ্য। মণ্ডলাগ্র দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া
তাহাকে উদ্ধৃত করিবে। শিরার উপরে ফোটক হইলে
অর্শ্বরোগের জ্বার তাহাকে অস্ত্র করিবে। (অর্শ্বরোগবৎ ঔষধ
ব্যবস্থা করিবে।)

পর্বণিকা নামক নেত্ররোগে অস্ত্র করিয়া লৈকব ও মধু

দিয়া প্রতিসারণ করিবে। শব্দ, সমুদ্রকেন, সমুদ্রজ মল্লকী,
ফটিক, কুরুবিন্দ, প্রবাল, অশ্বত্থক, বৈদূর্য্য, মণি, মুক্তা,
লৌহ ও তাম্র সমভাগে পেষণ করিয়া শ্রোতোরণের সহিত
মিশ্রিত করিয়া মেঘশূলনির্মিত পাত্রে রাখিয়া তাহা দ্বারা
অঙ্গন দিবে। অর্শ্ব, পিড়কা, শিরাজাল, অর্শ্ব: প্রভৃতি রোগ
ইহাতে বিনষ্ট হয়। (সুশ্রুত ৫।১৫ অঃ)

ছেদ্যকণ্ঠ (পুং) পারাবত, পায়রা।

ছেনা (দেশজ) আমিকা, ছদ্মবিকারবিশেষ, ছানা।

ছেনি (দেশজ) যন্ত্রবিশেষ, ইহা দ্বারা গর্ত করা হয়।

ছেপ (দেশজ) নিতীবন, ধুধু।

ছেবলা (দেশজ) বালকের জ্বার চপল।

ছেমগু (পুং) ছমু-অদনে বাহুলকাৎ অগুন্ অত এতৎক্।
পিতৃহীন বালক, ছেমড়া।

ছেমড়া (ছেমগু শব্দজ) পিতৃহীন বালক।

ছেয়াস্তর (ষট্‌সপ্ততি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ। ছয় অধিক সত্তর, ৭৬।

ছেয়ানই (ষট্‌সপ্ততি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ছয় অধিক নব্বই, ৯৬।

ছেয়ানী (ষট্‌সপ্ততি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ছয় অধিক আশী, ৮৬।

ছেলক (পুং) ছো-কর্মণি ভেলক্। ছাগ, ছাগল।

ছেলিকা (স্ত্রী) ছাগী।

ছেলিয়া (দেশজ) বালক, শিশু।

ছেলিয়ামি (দেশজ) বালকতা।

ছেলু (পুং) ছো-ভেলু। সোমরাজী গাছ।

ছেলে (দেশজ) ১ পুত্র। ২ বালক।

ছেলেমি (দেশজ) বালকতা।

ছেযটি (ষট্‌ষষ্টি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ছয় অধিক বাট, ৬৬।

ছৈ (দেশজ) নৌকা প্রভৃতির আবরণ।

ছোঁ (দেশজ) অতর্কিত ভাবে গ্রহণ করা বা আসিয়া পড়া।

ছোঁআ (দেশজ) স্পর্শ।

ছোঁআচ (দেশজ) ১ অপবিজ্ঞ। ২ স্পর্শজনিত।

ছোঁআন (ছোঁআ হইতে) স্পর্শ করান।

ছোঁচা (দেশজ) ১ লুক পেটুক। ২ ছুঁচা।

ছোঁচান (দেশজ) শৌচকরণ।

ছোঁচানি (দেশজ) ১ পেটুকতা। ২ অসদ্ব্যবহার।

ছোঁছো (দেশজ) খাত্ত্রব্যের গন্ধ স্কন্ধিয়া বেড়ান, পেটুকতা।

ছোঁড়া (দেশজ) বালক।

ছোকরা (পারস্যজ) বালক।

ছোকরী (দেশজ) বালিকা, ছুকরী।

ছোট (দেশজ) ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ।

ছোটআকন্দ (দেশজ) একপ্রকার আকন্দ গাছ।

ছোটআদালত (দেশজ) বিচারালয়ভেদ; যেখানে ছই
হাজার টাকার অনধিক বিষয়ের বিচার হয়।

ছোটআমতী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

ছোট উদয়পুর, গুজরাটপ্রদেশে রেবাকান্না এজেন্সীর অধীনস্থ
একটা রাজ্য। অক্ষা° ২২° ২' হইতে ২২° ৩২' উঃ,
দ্রাঘি° ৭৩° ৪৭' হইতে ৭৩° ২০' পূঃ। পরিমাণফল প্রায় ৮৭৩
বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল বা
কোলি। অরসিক নদী ইহার মধ্য দিয়া বহিতেছে। দক্ষিণ-
দীর্ঘায় কয়েক মাইল নর্মদা নদী প্রবাহিত। ইহার সর্বত্র
পর্বত ও জলময়। বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই জলবায়ু
অস্বাভাবিক; জরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। উৎপন্ন
দ্রব্যের মধ্যে নানাবিধ শস্ত ও কড়িকাঠই প্রধান। কড়িকাঠ
ও মটল নানাস্থানে রপ্তানি হয়। এখানকার রাজা চোহান
রাজপুতবংশীয়। ১২৪৪ খৃঃ মুসলমানগণ প্রবল হইলে ইহার
পূর্বনিবাস ত্যাগ করিয়া গুজরাটে প্রবেশপূর্বক চম্পানর
অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। ১৪৮৪ খৃঃ অক্কে মহম্মদ
বেগার চম্পানরদ্বর্গ অবরোধ করিলে রাজবংশীয়গণ ছইভাগে
বিভক্ত হইয়া এক শাখা বারিয়া ও অপর শাখা ছোট উদয়পুরে
রাজ্য স্থাপন করেন।

১৮৫৮ খৃঃ অক্কে সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা
তান্ত্রিয়াতোপীর সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন এবং তান্ত্রিয়া
তোপীর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকেন। ছোট
উদয়পুরের নিকটে তান্ত্রিয়া জেনারেল পার্ক কর্তৃক পরাজিত হন।

রাজার উপাধি মহারাওল। ইনি ২৮টা মাঝতোপ প্রাপ্ত
হন। ইহার ৩২০ জন সিপাহী আছে। কেবল প্রাণদণ্ডকালে
রাজা নিজ প্রজার বিচার করিতে পারেন। বরদার গাইক-
বাড়কে বার্ষিক ১০১৪০০ টাকা কর দিতে হয়। এক সময়ে
রাজবংশ মোহন নামক স্মৃঢ় স্থানে বাস স্থাপন করেন,
তদনুসারে এই রাজ্যকে কখন কখন মোহন রাজ্য বলে। ছোট
উদয়পুরের অবস্থান সুরক্ষিত নহে, অনেকে অহুমান করেন
তজ্জন্তই এই রাজবংশ বরদারাজের অধীন হয়। ১৮২২ খৃঃ
অক্কে এই স্থান ব্রীটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। মালব হইতে বরদার
রাজ্য এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। পূর্বে রাজাদিগের
বেবন্দোবস্ত ছিল, তজ্জন্ত ইংরাজ গবর্নেন্ট রাজ্যকে শাসন-
কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্ত একজন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা
নিযুক্ত করিয়াছেন।

২ পূর্বোক্ত ছোট উদয়পুর রাজ্যের প্রধান নগর। এই
নগর বরদা হইতে ৫০ মাইল পূর্বে মাউ নগরের পথে
অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১' পূঃ।

ছোটউলুচা (দেশজ) বাসবিশেষ।

ছোটকর্ষা (দেশজ) লতান বৃক্ষভেদ। (Carpopogon
pruriens)

ছোটকল্প (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Borago Indica)

ছোটকাঞ্চড়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Tradescantia
umbricata)

ছোটকুকুসিমা (দেশজ) এক প্রকার কুকুসিম। [কুকুসিম
দেখ।]

ছোটকেশরাজ (দেশজ) পক্ষীবিশেষ।

ছোটকীরই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Euphorbia chamæsyce)

ছোটখুড়া (দেশজ) কনিষ্ঠ পিতৃব্য।

ছোটখুড়ী (দেশজ) কনিষ্ঠ পিতৃব্যের স্ত্রী।

ছোটগোখুরী (দেশজ) ছোট গোখুর গাছ। (Cyperus
dubius)

ছোটগোটদার (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ছোটগোত্রা, পক্ষীবিশেষ। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ ধূসরবর্ণ,
মস্তক ও কণ্ঠ শুভ্র রেখাঙ্কিত, জ ও গণ্ড শুভ্রবর্ণ বিন্দুময়,
পালক কৃষ্ণধূসর, বক্ষ ও পুচ্ছ শুভ্র, চকু কৃষ্ণাভ হরিদবর্ণ।
এই পক্ষী নবীন ধাত্যক্রেত্র, বিল ও পুকুরিগীর জলের নিকটে
দৃষ্ট হয়। পুরাতন মহাদ্বীপের সকল স্থানে এবং অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে
এই পক্ষী বাস করে।

ছোটচাঁদ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Ophioxylon Serpentinum)

ছোটচাহা (দেশজ) এক প্রকার কাদাখোঁচা পাখী।

ছোটচিরতা (দেশজ) চিরতাভেদ।

ছোটজঙ্গলীমোরগ (হিন্দী) ক্ষুদ্র বস্তুকুট পক্ষী। ইহা-
দের আকার অনেকাংশে গ্রাম্যকুকুটের জায় এবং দৈর্ঘ্যে
১৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মধ্যভারতে, বিষ্ণুগিরির নিকটে
ও দাক্ষিণাত্যের অরণ্য সকলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোটজাগুলিয়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম।
এখানে একটা গবর্নেন্ট বিদ্যালয় ও অপর বিদ্যালয় আছে।

ছোটজাম (দেশজ) একপ্রকার গাছ, ইহা হইতে কড়ি হয়।
(Eugenia Caryophyllata)

ছোটঝঞ্জন (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Crotonaria
prostrata)

ছোটঝাঁজি (দেশজ) সূত্রাকার ঝাঁজি। (Utricularia biflora)

ছোটভূত (দেশজ) ছোট জাতীয় ভূতগাছ। (Morus Javanica)

ছোটভূতী (দেশজ) পক্ষীভেদ। (Loxia rosea)

ছোটচুধলতা (দেশজ) লতাভেদ। (Asclepias geminata.)

ছোটদেউলি, বন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জোকাহি টেপন হইতে

১৬ হাইল পশ্চিমে হিত একটি গ্রাম। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এক বর্ষ হস্ত প্রায় ৭ ফিট ২ ইঞ্চি উচ্চ একটি তত্ত ও তাহাতে বহু প্রাচীন ১১ ছয় স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ সমস্ত গড়া বার না। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন উহা কলচুরি-বংশীয় রাজা শরঙ্গপ কর্তৃক স্থাপিত হইলেও হইতে পারে।

ছোটিন (দেশজ) দৌড়ান, ক্রান্তগমন।

ছোটনাগপুর, বাঙ্গালার একটি বিভাগ। নাগপুরের কমিশনরের শাসনাধীন। অক্ষা ২১° ৫৮' ৩০" হইতে ২৪° ৪৮' উঃ ও দ্রাঘি ৮০° ২২' হইতে ৮৭° ১৫' পূঃ। ইহার উত্তরে মীর্জাপুর, শাহাবাদ ও গঙ্গা জেলা, পূর্বে বুজের, সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহ এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সতলপুর জেলা ও রেবারাজ্য। এই বিভাগে হাজারিবাগ, লোহার্ভাগা, সিংহভূম ও মানসভূম এই চারিটি জেলা ও চাংডুকার, কোরিয়া, সরগুজা, উদয়পুর (ছোট), জশপুর, গাজপুর, বোনাই, খরসাবান ও সরাইকালা এই নয়টি দেশীয় রাজ্য আছে। ছোটনাগপুর বিভাগের সমগ্র পরিমাপকল ৪৩০২০ বর্গমাইল। অধিবাসীগণের অধিকাংশ গোঁড়, খরবার, ভূঁইয়া, ভূমিজ, কোচ, কোল ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসত্য জাতি, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বাগদি, বেনিয়া, গোয়াল, লোহার, কুর্খি ও রাজ্যোয়ার প্রভৃতি হিন্দুজাতি।

দেশীয় রাজ্য নয়টি ছোটনাগপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই সকল রাজ্য পরিমাণে ক্ষুদ্র। ভূমি সর্বত্র পর্বতময়, স্থানে স্থানে নদী ও গভীর গিরিসঙ্কটাদি দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। এই ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্বে এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৬০০ ফিট উচ্চ মালভূমি ছিল, ক্রমে নদী বারু ও বৃষ্টি দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও ইহার অনেক পর্বতের চূড়া বিস্তীর্ণ সমতলের দ্বারা। দেশীয় ভাষায় ঐরূপ স্থানকে পাট বলে।

ঐ সমস্ত রাজ্য ছোটনাগপুরের কমিশনরের তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজগণ কর্তৃক শাসিত হয়। পূর্বে এই সকল রাজ্য সতলপুর ও সরগুজার অন্তর্গত ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে নাগপুরের মরাত্তা রাজা ২য় রম্বাজী ভোঙ্কলে বেঙ্গলীর সন্ধি অনুসারে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ৮টি রাজ্যের সহিত সতলপুরের অন্তর্গত বোনাই ও গাজপুর ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে গাজপুর ব্যতীত ঐ সমস্ত রাজ্যই রাজ্যকে পুনরুপিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মধুজী ভোঙ্কলে (অগ্নী সাহেব)

নাগপুরের রেসিডেন্সি আক্রমণে কার্যমনোরম হইলে মধুজী সহিত বন্দোবস্ত মতে পুনরায় ঐ সমস্ত রাজ্য ইংরাজদের হস্তে আইসে, অবশেষে অগ্নী সাহেবের উত্তরাধিকারী ৩য় রম্বাজী বরঃপ্রাপ্ত হইলে সকল রাজ্য ইংরাজ গবর্নমেন্টের শাসনভুক্ত হয়। সতলপুরের রাজাই এতদিন সকলের উপর প্রাধান্য করিতেছিলেন, এখন গবর্নমেন্ট তাহার সে ক্ষমতা লোপ করিলেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে রাজগণ নূতন সনদ প্রাপ্ত হইলেন। পূর্বপ্রাপ্ত অনেক ক্রম হারে রাজস্ব হ্রাস হইল। ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সতলপুর প্রভৃতি রাজ্য গবর্নর জেনারেলের রাঁচি নগরস্থ দক্ষিণপশ্চিমীমাত-শাসনকারী প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হইত। ঐ বর্ষে বোনাই ও গাজপুর ব্যতীত অপর সমস্ত রাজ্য উড়িষ্যার গড়জাতমহলের হুপারিটেণ্ডেন্ট সাহেবের শাসনভুক্ত এবং কিছুকাল পরেই মধ্যপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন হইল। বোনাই ও গাজপুর মাত্র ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রহিল। উত্তরভাগে সরগুজাপ্রমুখ চাংডুকার, জশপুর, কোরিয়া, উদয়পুর ও সরগুজা এই পাঁচটি রাজ্য ১৮১৮ খৃঃ অব্দে অগ্নীসাহেব ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট প্রথমে রাজাদিগের উপর বিশেষ কড়াকড়ি করিলেন না। রাজগণ প্রকান্তরূপে প্রজাবর্ষ হইতে রাজস্ব ও শুদ্ধ আদায়ের ক্ষমতা পাইলেন এবং কয়েকটি স্থল নিয়মের বশীভূত হইয়া একরূপ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বাণিজ্যের প্রতিক্রোধক কয়েকটি শুক রহিত হইয়া গেল। প্রত্যেক রাজার নিকট হইতে ছিন্নম্নে রাজ্যশাসন করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইল।

পরে ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজাদিগের দণ্ডবিধান ক্ষমতা নির্দিষ্ট হইল। তৎকালসারে তাঁহাদিগের ৫০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা ও দুইবৎসর সপরিশ্রম বা পরিশ্রমহীন কারাবাস দিবার ক্ষমতা রহিল। অপর একটি সর্ব্ব অনুসারে তাঁহাদের ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস ও ২০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড করিবার ক্ষমতা রহিল বটে, কিন্তু ঐরূপস্থলে কমিশনরের সম্মতি প্রয়োজন। তৎপক্ষে অধিক শাস্তি কমিশনের অর্থ বিধান করেন, রাজগণ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কমিশনরের নিকট এইরূপ মোকদমা প্রেরণ করেন। প্রাগলভ্যাজ্ঞা ছোটলাটের সম্মতি ব্যতীত হয় না। সমস্ত রাজ্যের মোট খাজনা আদায় ২,৬৪,০০০ টাকা, তন্মধ্যে ৪৬০০ টাকা বুটীশ গবর্নমেন্ট প্রাপ্ত হন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে সকল রাজাই গবর্নমেন্টের সাহায্য করিতে বাধ্য। শাস্তিরক্ষকগণ সকলেই দেশীয় প্রাধান্যস্বারে বেতন স্বরূপ ভূমি দখল করে। এই সকল রাজ্যে বরহত্যা প্রায়ই ঘটে, কিন্তু সম্পত্তি লইয়া ও দণ্ডের

কোকিলের আতি বিকল : এখানকার লোক ডাইনীতে বিশ্বাস করে। অনেক সময় কীকোকিল তাহাদিগকে ডাইনী বলার জন্য বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত হয়। মধ্যে মধ্যে ডাইনী বিশ্বাসে কোন কোন রুম্বী লিহত বা অপমানিত হয়।

ছোটনোকা (দেশজ) ১ জলজ বৃকভেদ (Pontidra hastata)। ২ ক্ষুদ্র নোকা।

ছোটপত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষীভেদ। (Merops viridis)

ছোটপিউ (দেশজ) কোকিলজাতীয় পক্ষীভেদ। (Cuculus melancholicus)

ছোটপিনেনটা (দেশজ) নটেবিশেষ। (Aira filiformis)

ছোটবউ (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী।

ছোটবন্দা (দেশজ) বৃকভেদ। (Loranthus globosus)

ছোটবয়র (দেশজ) বৃকভেদ। (Zizyphus rotundifolius)

ছোটবিষতাড়ক (দেশজ) বিষতাড়ক বৃকভেদ।

ছোটভুইকামাদী (দেশজ) বৃকভেদ। (Columnnea tomentosa)

ছোটপানলোহা, একপ্রকার পক্ষী। ইহাদের পৃষ্ঠ ও পক্ষ ধূসবর্ণ, মুখপ্রান্ত হইতে চক্ষু পর্যন্ত ধূসরবর্ণ একটা রেখা আছে। পুচ্ছ ধূসর ও অগ্রভাগে শুভ্র; কণ্ঠ, উরু ও উদর শুভ্রবর্ণ, পার্শ্ব পাংশুবর্ণ, চক্ষু ও পদ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চি।

গ্রীষ্মকালে মস্তক, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছমধ্যস্থিত পক্ষ দুইটা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, প্রান্তভাগ লোহিতাভ ধূসরবর্ণ ধারণ করে এবং গণ্ড, গ্রীবার পার্শ্ব ও বক্ষ লোহিতাভ হয়।

শীতকালে এই পক্ষী পালে পালে জলা ভূমিতে, ধাতু ক্ষেত্রে এবং পুষ্করিনী, নদী ইত্যাদির নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মাংস অতিশয় সুস্বাদু।

ছোট ভাগীরথী, মালদহ জেলার গঙ্গার একটা শাখা। পূর্বে ইহাই গঙ্গার প্রধান স্রোত ছিল। এখন বর্ষাকাল বাতীত ইহাতে জল থাকে না। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। গঙ্গার জ্ঞান ইহাও পুণ্যতোয়া বলিয়া খ্যাত। এই নদী প্রথমে পূর্বাভিমুখে ও পরে দক্ষিণমুখে ১৩ মাইল ব্যাপিয়া গোড়নগরের ধ্বংসাবশেষ বেটনের পর পাগুলা বা পাগলী নামক গঙ্গার অপর শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ একটা বীপ বেটন করিয়া পুনরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ছোটমটর (দেশজ) মটরভেদ। (Pisum sativum viride)

ছোটমাছরাঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় মাছরাঙ্গা পক্ষী। (Alcedo Bengalensis)

ছোটমেছোতা (দেশজ) বৃকবিশেষ। (Justicia polysperma)

ছোটমেথী (দেশজ) ক্ষুদ্র মেথী। (Trifolium Indicum)

ছোটলোক (দেশজ) নীচলোক, ইজর।

ছোটলোটরা (দেশজ) পক্ষীভেদ।

ছোটবৈঠান, বৃন্দাবনে বৈঠান ও ছোট বৈঠান নামে দুইটা গ্রাম আছে। জাবট গ্রামের উত্তরে বৈঠান ও বৈঠানের উত্তরে ছোট বৈঠান গ্রাম। বৈঠানের অধিকাংশে কৃষ্ণকুণ্ড ও ছোট বৈঠানের মধ্যে কুন্ডল কুণ্ড নামক দুইটা কুণ্ড আছে। বৈঠান ও ছোট বৈঠান গ্রামে ক্রীতকর্ম সখীদের সহিত রিহা করিয়াছিলেন। (বৃন্দাবনলীলাঃ ২৪ অঃ)

ছোটশালুক (দেশজ) শালুকভেদ। (Nymphæa stettata)

ছোটশিকার (দেশজ) খরগোশ।

ছোটসুঁদি (দেশজ) উৎপলভেদ। (Nymphæa esculenta)

ছোটহরিয়াল, পক্ষীবিশেষ। এই পক্ষী অনেকাংশে হরিताल বা হড়িয়াল পক্ষীর জায়, কেবল আকারে ক্ষুদ্র। পুংজাতির পৃষ্ঠ হরিত, ললাট উজ্জল পীতবর্ণ, গ্রীবা ও পুচ্ছ ধূসল এবং একটা কৃষ্ণরেখাঙ্কিত, উদর হরিত, কণ্ঠ পীতভা, বক্ষদেশ পাটল চিহ্নযুক্ত ও পুচ্ছের অগ্রভাগ শুভ্রচিহ্নিত কৃষ্ণবর্ণ।

স্ত্রীজাতির বর্ণও প্রায় ঐরূপ, তবে উহাদের বক্ষে পাটল-চিহ্ন নাই, সমস্ত উজ্জল হরিতবর্ণ।

ইহাদের চক্ষু হরিতাভ নীলবর্ণ, পদ পাটলাভ রক্তবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ বৃত্তবেষ্টিত। এই পক্ষীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ ইঞ্চি। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাদের বর মিষ্ট, কিন্তু হরিতালের জায় নহে। কলিকাতার এই পক্ষিশাবক অনেক আনীত হয়।

ছোটহলকষা (দেশজ) বৃকভেদ। (Leucus esculenta)

ছোটহাজরী (হিন্দী) প্রাতর্ভোজন, বালভোগ। ভারতবাসী যুরোপীয়গণ প্রাতঃকালে যে চা ও সামান্ত পনিরাদি ভক্ষণ করেন, উহাকেই ছোটহাজরী কহে। এইরূপ সোপচার মধ্যাহ্ন ভোজনকে বড়হাজরী বলে।

ছোট (দেশজ) ১ দোড়ান, ধাবন। ২ কলাগাছ প্রভৃতির গাছ হইতে উদ্ধৃত অংশভেদ। ইহাতে বন্ধনরজুর কার্য্য চলে।

ছোটিকা (স্ত্রী) ছুটিত যজ্ঞবিয়কারিগণ মায়াং ছিন্তি ছুট-খুল টাপি অত ইত্যৎ। তর্জনী ও অনুষ্ট অনুলী দ্বারা যে শব্দ হয়, তুড়ী দেওয়া।

ছোটিন (পুং) ছুটিত নীচজাতিতরা স্বরী ভবতি ছুট-গিনি। কৈবর্ত। (ত্রিকাণ্ড)

ছোটন (দেশজ) নিক্ষেপ করণ।

ছোট (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা। ২ নিক্ষিপ্ত।

ছোটান (দেশজ) চাষী, তাগার কাটা, কৃষিকা।

ছোপ (দেশজ) বস্ত্রাদির রঙ্গকরণ।

ছোপড়া (দেশজ) নারিকেলাদি ফলের বাহিরের তন্তুময়।

ছোপা (দেশজ) রঞ্জিত, বর্ণান্তর প্রাপ্ত।

ছোবড়া (দেশজ) নারিকেলাদির বাহিরের তন্তুময় অংশ।

ছোয়ারা, [ছোহারা দেখ।]

ছোরকবমন, ঔষধবিশেষ।

ছোরণ (ক্ৰী) ছুর ভাবে লুট। পরিত্যাগ।

ছোরা (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ, বৃহদাকার ছুরী।

ছোল (ছুরী শব্দজ) ১ ডক, বাকল। ২ বাকল ফেলা।

ছোলক (পুং) ছুরতি ছুর-বাহুলকাৎ ললচ্ ততোঃত লকং।

মাতুলক, টেবানেবু। (স্বাক্ষরং)

ছোলন (দেশজ) বাকল ছাড়ান।

ছোলা (নৌশব্দ) ১ চণক, কলাইবিশেষ। [চণক দেখ।]

২ স্বকনিমুক্ত।

ছোহারী (স্ত্রী) দীপান্তরস্থ ধর্ম্মরিকা। [ছোহারা দেখ।]

“ধর্ম্মরী গোল্ডনাকারা পরদীপাদিহাগতা।

জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্যতে ॥” (ভাবপ্রং)

ছ্যা (দেশজ) লজ্জা বা নিদ্রাসূচক।

জ

জ, ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টম অক্ষর, চ-বর্ণের তৃতীয়। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু। উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রায় জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা তালু স্পর্শ। বাহ্য প্রবন্ধ—ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অন্নপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত। কলাপ মতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা আছে। মাতৃকাশ্রাসে বামমণিবন্ধে ইহার শ্রাস করিতে হয়। তত্ত্বমতে ইহার পর্যায় বা বাচক শব্দ চতুরানন, শূলী, ভোগী, বিজয়া, স্থিরা, বলদেব, জয়, জেতা, ধাতকী, স্তম্ভী, বিভূ, লঘোদরী, স্তুতি, শাখা, সূপ্রভা, কর্ণকাধরা, দীর্ঘবাহু, রুচি, হংস, নন্দী, তেজাঃ, সুরাধিপ, জবন, বেগিত, বাঘমণিবন্ধ, হুম্বাক্তেশ্বর, বেনী, আমোদী, মদবিহ্বল। (বর্ণোদ্ধারতত্ত্ব)। কামধেনুতত্ত্বের মতে—জকারের স্বরূপ মধ্যকুণ্ডলীযুক্ত, ত্রিগুণাত্মক, শারদীয় চন্দ্রের স্থায় মনোহর কাস্মিয়ুক্ত, পঞ্চদেবস্বরূপ ও পঞ্চপ্রাণময়। ইহাতে ত্রিগুণ, ত্রিশক্তি ও তিনটী বিন্দু আছে। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

“ধানমস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ কমলাননে।

নানালঙ্কারসংযুক্তৈর্জৈহব্দাদিশ্চিহ্নৈঃ ॥

রক্তচন্দনদিকাক্ষীঃ বিচিত্রাবরধারিণীম্।

ত্রিলোচনাং জগদ্ধাত্রীং বরদাং তক্তবৎসলাম্।

এবং ধ্যানো ব্রহ্মরূপাং তন্ময়ং দশধা জপেং ॥” (বর্ণোদ্ধারতত্ত্ব)

কাব্যের সর্বপ্রথমে ইহার বিজ্ঞান করিলে মিত্রলাভ হয়।

“জো মিত্রলাভঃ” (বৃহস্পতিঃ)

২ ছন্দঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ গণবিশেষ। তিনটী অক্ষরে তিনটী স্বরবর্ণকে গণ বলে। যে গণের মধ্যস্বরটী গুরু ও অপর দুটী লঘু তাহার নাম জগণ। যথা রমেশ।

জ (পুং) জয়তি জি-ড, বহা জায়তে জন-ড (অণ্ডেখণি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ১ যত্নাজয়। ২ জয়। ৩ পিতা, জনক। ৪ জনা-র্কম। (মেদিনী) ৫ বিধ। ৬ মুক্তি। ৭ তেজঃ। ৮ পিশাচ। (শব্দরত্না) ৯ বেগ। (একাক্ষরকোষ) (ত্রি) ১০ জাত।

“প্রাবৃট্ শরৎকালদিবাং জে।” (পা অলুক) ১১ বেগিত।

১২ জেতা। (শব্দরত্না)

জক (পুং) একজন ব্রাহ্মণ। ইহার বাসস্থান পতঙ্গগ্রাম, ইনি সল্যব্রাহ্মের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। (রাজতরং ৮।৪৭৪)

জকুট (পুং) জং জাতং কুটতি কুট-ক। ১ মলয়টল। ২ কুজর।

(স্ত্রী) ৩ বার্ষিকপুষ্প। (মেদিনী) [জকুট দেখ।]

জকো, সিমলা জেলাস্থ একটি গিরিশৃঙ্গ, সিমলা-শৈলনিবাস এই

গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫' পূঃ। ইহাতে মানাজাতীয় পার্বত্যীয় বৃক্ষ জন্মে।

জকুতাল, মাজার প্রেসিডেন্সির নীলগিরি জেলার অন্তর্গত একটি গিরি। কনুয়ের প্রায় দেড়মাইল দূরে শোজবেট্টা নামক গিরিমালা হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬১০০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর শৈলনিবাস আছে। ইহারাজেরা তাহাকে ওয়েলিংটন বলে। ইহা মাজাজী সৈন্তগণের প্রধান স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য। বিষুবরেখা হইতে কেবল ১১ অংশ দূরে হইলেও এখানকার জলবায়ু মনোরম, স্বাস্থ্যকর ও জমি বেশ উর্বরা। এখানে ৭৫° (ফা) অধিক উত্তাপ হয় না।

এখানকার সেনানিবাসের চারিদিকে মনোহর উপবন ও নানাবিধ ফলফুলশোভিত বৃক্ষরাজি দৃষ্ট হয়। এখানে নানাবিধ বিলাতী ফলও জন্মিতেছে।

জক্রানি, বলুচজাতির একটি শাখা, ইহারার রণকুশল বলিয়া খ্যাত। [বলুচ দেখ।]

জক্ষ (পুং) [যক্ষ দেখ।]

জক্ষণ (স্ত্রী) জক্ষ-ভাবে লুট্। ভক্ষণ। (হেম)

জক্ষন্ (পুং) [যক্ষন্ দেখ।]

জক্ষাদি (পুং) পাণিনীয় একটি গণ। জক্ষ, জাগু, দরিদ্রা, চকাস, শাস, দীধী, বেবী এই কয়টা ধাতুকে জক্ষাদি বলে। ঐগুলি অভ্যন্তসংজ্ঞা।

জখনাচার্য্য, মহিস্বরের একজন বিখ্যাত শিল্পী ও নৃপতি। মহিস্বরের সকল প্রধান দেবালয় ইহার নির্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে হয়শাল-বল্লাল রাজগণের সময়ে মহিস্বরের কৈড়ল বা ক্রীড়াপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে কএকটা মন্দির নির্মাণ করেন, তন্মধ্যে কৈড়লের ছিন্নকেশব, সোমনাথপুরের প্রসন্ন-চিন্ন-কেশব ও বেলুর গ্রামস্থ কেশব মন্দির প্রধান।

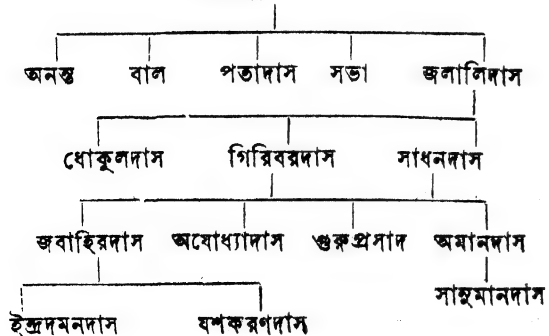
জখাউ, কচ্ছরাজ্যের একটি বন্দর। অক্ষা° ২৩° ১৪' ৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৬৮° ৪৫' পূঃ। ভূজনগর হইতে ৬৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার। এই স্থান অতি-শয় শস্তশালী। এখান হইতে বোম্বাইয়ে নানাবিধ শস্ত, কড়ি, বরগা, চিনি, খেজুর, তৈল প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হয়। সমুদ্র হইতে ৫ মাইল অন্তরে গোদিয়া নামক খাল। এই খাল দিয়াই এখানকার বারমাস বাণিজ্য চলে।

জগচ্ছন্দস্ (পুং) জগতাং চক্ষুরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য। (হেম)

জগচ্ছন্দস্ (ত্রি) জগতী ছন্দোহ্য বহুব্রী নিপাতনাং পুং-বদ্ভাবঃ। জগতী ছন্দদ্বারা যাহার স্তব করা হয়। “স্বরোহসি গয়োহসি জগচ্ছন্দাঃ।” (ভাগ্যত্ৰাণ ১।৫।১৫)

জগজীবনদাস, সংনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক একজন মহাত্মা। চন্দেল-ঠাকুরবংশে ইহার জন্ম। ইহার পিতার নাম গঙ্গারাম। বারবাকি জেলার অন্তর্গত সর্দহাগ্রামে ১৭০৮ সন্থে জগজীবন জন্মগ্রহণ করেন। ছয়মাসের সময় তাঁহার পিতৃ-গুরু বিবেকচরপুত্রী এক দিন তাঁহার মাথায় উত্তরীয় প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রদান করিবামাত্র তাঁহার ব্রহ্মতলে কুঙ্কম-লিপ্ত তিলক দেখা দিয়াছিল, বিবেকচর তদ্রূপে বলিয়াছিলেন, “ভবিষ্যতে এই বালক এক মহাসাধু হইয়া উঠিবে।” গুরুদেবের কথা সত্য হইল। জগজীবনের যতই বয়স হইল, গ্রাম-বাসী ততই তাঁহার প্রতি স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। তিনি রীতিমত শাস্ত্রচর্চা না করিলেও সময়ে সময়ে তাঁহার মুখ হইতে ভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক কথা বাহির হইত, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিত। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিয়া ব্রাহ্মণ হইতে নীচ চামার, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। জগজীবন বেদান্তপ্রতিপাত্ত ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার মত ও বিশ্বাস অনেকটা গুরু নানকের মত। তিনি জাতি ভেদ মানিতেন না। তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার জন্ত স্থললিত হিন্দী কবিতায় অববিনাশ, জ্ঞানপ্রকাশ, মহাপ্রলয় ও প্রথমগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে অববিনাশ নামক গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ১৮১৭ সংবতে রচিত হয়। মৃত্যুর দশবর্ষ পূর্বে তিনি জাতিবর্গ কর্তৃক উত্তারিত হইয়া জন্মান্তর পরিত্যাগ করিয়া ৫ মাইল দূরে কোটবা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে ১৮১৭ সন্থে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সংনামীগণ এখনও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলার রাজত্ব-কালে রায় নিহালচাঁদ মৃত জগজীবনের সম্মানার্থ একটি স্তম্ভের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। এখন প্রতিবর্ষে কার্তিক ও বৈশাখের সংক্রান্তির দিন কোটবা গ্রামে মেলা হয়, তাহাতে অনেক যাত্রী জগজীবনের সম্মানার্থ ও পবিত্রসলিলা অভি-রাগ-তলাও নামক কুণ্ডে স্নান করিবার জন্ত কোটবায় গিয়া থাকে। এখনও কোটবা গ্রামে জগজীবনের বংশধর বাস করিতেছেন, নিম্নে বংশাবলী দেওয়া হইল।

জগজীবন দাস



জগজীবনমিশ্র, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জাতিবংশীয় একজন বৈক্যকবি, ইহার পিতার নাম রামজীবন। [চৈতন্যচন্দ্র শঙ্কে ৪০৮ পৃষ্ঠা দেখ।] ইনি স্বরচিত মনঃসন্তোষিণীর শেষে এই মাত্র পরিচয় দিয়াছেন—

“পূর্বে কুসীরানদী পশ্চিমে কৈলাস।

দক্ষিণেতে বৃদ্ধগোপেশ্বরের নিবাস ॥

উত্তরে কাকিনী নদী এই চতুষ্কোণ।

শ্রীহট্টদেশের মধ্যে গুপ্তবন্দাবন ॥

অত্য়কালে শ্রীঢাকা দক্ষিণ দেশখ্যাতি।

মিশ্রবংশাধিত প্রভু বাহাতে বসতি ॥

যে স্থানেতে জন্ম মোর হৈল পুণ্যফলে।

ভক্তিহীন হৈয়া জন্ম গেলেন বিফলে ॥”

জগজ্জন (পুং) জগতাং জনঃ ৬তং। জগতের লোক।

জগজ্জয়মল্ল, নেপালের একজন রাজা। ৮২২ নেপালী সংবতে ভারতমল্ল অপূরক কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার মহিষী পতির দূরসম্পর্কীয় জগজ্জয়মল্লকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি ৩০ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ৮৫২ নেপালী সং (১৭০২ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাহার মধ্যম পুত্র জয়প্রকাশ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

জগবান্ধ, ভারতবর্ষীয় বাহির্য্যিক যন্ত্র বিশেষ। ইহা পূজা ও বিবাহাদি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ইহা যুদ্ধকালে বাদিত হইত। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্মরজ্জ্বারা সজ্জ থাকে, ধ্বনি-কোষ মৃত্তিকানির্ম্মিত। বাদ্যকর গলার এবং সম্মুখে রাখিয়া বাজাইতে থাকে। ইহা তামা যন্ত্রের সহিত ব্যবহৃত হয়।

জগৎ (পুং) গচ্ছতি গম-ক্টিপ্ নিপাতনাৎ দিহঃ ভুগাগমশ্চ। ১ বায়ু। ২ মহাদেব।

“বিমুক্তো মুক্ততেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্দ্ধনোজগৎ ॥”

(ভারত ১৩।১৭।১৫১) (ত্রি) ৩ জগম। (মেক্সিনী) (ক্লী) ৪ বিশ্ব। পর্য্যায়—জগতী, লোক, পিষ্টপ, ভুবন।

“যদা স দেবো জাগর্জি তদেদং চেষ্টতে জগৎ ॥” (মহু ১।৫২)

জগতী (স্ত্রী) গচ্ছতি গম-অতি নিপাতনে সাধুঃ শত্বদ্ ভাবাৎ ততো ভীপ্। (বর্তমানে পৃথবীহয়জগচ্ছত্বচ্ উণ্ ২।৮৪) ১ ভুবন। “উপরুদ্ধাঙ্ক জগতীং তমসেব সমাবৃত্তাং ॥”

(রামা ২।৬৯।১১)

২ পৃথিবী। আর্য্যভট্টের মতে পৃথিবীর গতি আছে বলিয়া ‘জগতী’ নাম হইয়াছে। যাহারা পৃথিবীকে অচলা বলেন তাহাদের মতে ইহার গতি না থাকিলেও জগৎ অর্থাৎ সমস্ত জগতের আধার বলিয়া ইহাকে ঐ নামে উল্লেখ করা হয়।

“জগত্যাং পাতয়ামাস ভিহ্মা শূলেন বক্ষসি ॥” (মার্কপু ৯।২২)

০ জগৎক্ষেত্র। (হেম) ৪ ছন্দোবিশেষ। বাদশাশ্রব।
বৃত্তি বা যে নমস্তুভ্যং প্রত্যেক চরণে ১২টী অক্ষর বা স্বরবর্ণ
থাকে, তাহার নাম জগতী, ইহা আবার বংশহবিল, তোটক
প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। [উদাহরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জগতীধর (পুং) ১ পৃথিবীধারণকারী। ২ বোধিসত্ত্ব।

জগতীপাল (পুং) জগতীং পালয়তি জগতী-পালি-অণ্ উপসং।

ভূপাল, রাজা। জগতীপতি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

জগতীভর্তৃ (পুং) জগত্যা ভর্তা ভতং। পৃথিবীপতি।

জগতীভূজ (পুং) জগতীং ভূজ্ঞে জগতী ভূজ্-কিপ্। পৃথিবী-
ভোগকারী, রাজা।

জগতীকুহ (পুং) জগত্যাং রোহতি কুহ-ক। মহীকুহ, বৃক্ষ।

জগৎকর্তৃ (পুং) জগতঃ কর্তা ভতং। ১ ঈশ্বর। ২ ব্রহ্মা।

“জগৎকর্তা জগন্নাথো যকারায় নমোনমঃ।” (শিবযড়করস্তোত্র)।

জগৎকুণ্ড, কাথিবাড়ের অন্তর্গত দ্বারকার কিছু দূরে অবস্থিত
একটা অন্তরীপ। এখানে বছরদিন হইতে বধইল নামক
রাঠোর রাজপুতগণ আধিপত্য স্থাপন করেন।

জগত্তুঙ্গ, রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের নামান্তর। [রাষ্ট্রকূট দেখ।]

জগৎনারায়ণ, একজন বিখ্যাত হিন্দুস্থানী কবি। ইনি
লঙ্কোয়ের নবাব আসফউদ্দৌলার উদ্দেশে অনেক কসিদা
লিখিয়া গিয়াছেন।

জগৎপতি (পুং) জগতাং পতিঃ ভতং। ১ জগৎকর্তা, পরমেশ্বর।
২ হরি। ৩ হর। ৪ ব্রহ্মা। ৫ রাজা। (জগদীশ প্রভৃতি
শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।)

জগৎপাণ্ড্য, সিংহলের একজন পাণ্ড্যরাজ, ১০৬৪ খৃঃ অব্দের
পর কিছুদিন ইনি সিংহল শাসন করিয়াছিলেন। [পাণ্ড্য দেখ।]

জগৎপাল (জগপাল) মধ্যপ্রদেশের রাজমালবংশীয় একজন
পরাক্রান্ত রাজা, বর্তমান রাজিম নামক স্থানে ইনি রাজত্ব
করিতেন। রাজিমের রামচন্দ্রমন্দিরের প্রাচীরগাত্রে ৮৯৬
কলচুরি সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই জগৎপালের বীরত্ব-
কাহিনী বর্ণিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়, ইহার মাতার নাম
উদয়া ঠাকুরাণী ও পিতার নাম দেবসিংহ; তিনি কমোমণ্ডল
জয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জগপাল চেদিরাজ জাজম-
দেবের সময়ে মায়ূরিক ও নানাস্থানের সামন্তগণকে জয়
করেন। চেদিরাজ রত্নদেবের সময় তিনি তলহারি রাজ্য লাভ
করিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ পৃথ্বীদেবের সময়ে সরহাণ্ড,
মবকাশিহ, ভ্রমরবদ্র, কান্তার, কুন্ডুম, ভোগ, কান্দাসেহবার ও
কাকয়র নামক স্থান জয় করেন। ইনি নিজ নামে জগপালপুর
নামে একটা নগরও স্থাপন করিয়াছিলেন। [রাজিম দেখ।]

জগৎপ্রকাশমল্ল, নেপালের অন্তর্গত ডাটগাঁও রাজ্যের এক-

জন রাজা, নরেন্দ্রমল্লের পুত্র। ইহার রাজত্বকালে ভীমসেনের
মন্দির নির্মিত হয়, তাহাতে ৭৭৫ নেপালী সম্বতে উৎকীর্ণ
শিলালিপি আছে। বিমলসুচমণ্ডপ ও নারায়ণচোকের
শিলালিপিতে লেখিত আছে যে, ইনি ৭৮২ নেপালী সম্বতে
ভবানীশঙ্করের উদ্দেশে ৫টা স্তোত্র এবং ৭৮৫ নেপালী
সম্বতে গুরুভৃত্তের উপর গুরুড়ের উদ্দেশে একটা প্রশস্তি
খোদিত করেন। ৭৮৭ নেপালী সম্বতে ইনি প্রসিদ্ধ ভবানী-
শঙ্করের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

জগৎপ্রাণ (পুং) জগতাং প্রাণঃ ভতং। বায়ু।

“জগৎপ্রাণ প্রাণানপহরসি কিস্তে ব্যবসিতম্।” (সাহিত্যদং)

জগৎশেষ্ঠ (জগৎশ্রেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ।) মুর্শিদাবাদনিবাসী
ইতিহাস-বিখ্যাত বণিক বংশ। খেতাবের জৈন-সম্প্রদায়ভুক্ত
রাজপুতবংশে ইহাদের জন্ম। রাজপুতানার যোধপুররাজ্যের
অন্তর্গত নাগর নামক নগরে ইহাদের পূর্বপুরুষগণের বাসস্থান
ছিল, প্রায় দুই শত বর্ষ অতীত হইল অপরাপর মারবাড়ী
বণিকদিগের হায়ে ইহারাও গোড়রাজ্যে আগমন করেন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে শেষ্ঠদিগের পূর্বপুরুষ হীরানন্দসাহা প্রথমে
পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে পাটনা নগরে
পঠগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজগণের বড় বড় কুঠি ছিল।
হীরানন্দসাহ সাত পুত্র, এই সাতজনই পিতার হায়ে ভারতের
নানাস্থানে মহাজনী ও ছত্তীর কাজ করিত, তন্মধ্যে
হীরানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন
করেন। এই মাণিকচাঁদ হইতেই শেষ্ঠবংশের নাম সর্বত্র
বিখ্যাত হয়। তখন ঢাকায় বঙ্গের রাজধানী, এখানে থাকিয়াই
মুর্শিদকুলীখাঁ বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। মাণিকচাঁদ তাঁহার
দক্ষিণহস্ত হইলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদে রাজ-
ধানী পরিবর্তন করিলে, মাণিকচাঁদও তাঁহার সহিত নব রাজ-
ধানীতে আসিয়া বাস করেন এবং নবাব-সরকারে একজন প্রধান
ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। এখানে নূতন টাঁকশাল স্থাপিত
হইল, মাণিকচাঁদ তাহার কর্তৃত্ব পাইলেন। এই সময় নিয়ম
হইল, জমিদার বা রাজস্ব আদায়ীকারীদিগকে মাসিক হিসাবে
খাজনা জমা দিতে হইবে। এই সমস্ত টাকা মাণিকচাঁদের হাতে
জমা হইত, তাঁহার হাত দিয়া প্রতিবর্ষে দিল্লীশ্বরের নিকট দেড়
কোটা টাকা পাঠান হইত। দিল্লীতে মাণিকচাঁদের ভ্রাতারও
কুঠি ছিল। মাণিকচাঁদ বঙ্গদেশ হইতে নগদ টাকা না পাঠাইয়া
ছত্তী বা চালান পাঠাইতেন। এইরূপে বঙ্গের সমস্ত নগদ
খাজনা মাণিকচাঁদের নিকট জমা থাকিত। নবাবের টাকার
দরকার হইলে অনেক সময় মাণিকচাঁদের মুখাপেক্ষী থাকিতে
হইত, কাজেই মাণিকচাঁদের ক্ষমতা অধিক বাড়িয়া উঠিয়া-

ছিল। তাঁহার উপর কথা কহিবার আর কেহ ছিল না। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরুখশিয়ার নবাব মুর্শিদকুলীর আবেদন মত মাণিকচাঁদকে “শেঠ” উপাধি প্রদান করেন। শুনা যায়, মাণিকচাঁদও নাকি অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যাহাতে মুর্শিদকুলীর নবাবী বজায় থাকে, তজ্জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখনকার কালে রাজকর্ণচারী মাঝেই অর্থের বশ ছিল। এরূপ স্থলে মহাধনী মাণিকচাঁদ যে মুর্শিদকুলীর দরবারে সর্কেসরকা হইয়া উঠিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। প্রবাদ এইরূপ যে, মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পরও মাণিকচাঁদের নিকট পাঁচকোটি টাকা পাওনা ছিল।

মাণিকচাঁদের পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার ভগিনী ধনবাইএর সহিত ধনলরাজবংশীয় রায় উদয়চাঁদের বিবাহ হয়, এই ধনবাইএর গর্ভে ফতেচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ভাগিনের ফতেচাঁদকে দত্তক লইলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিস্তর অর্থ রাখিয়া মহানন্দ্রানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তৎপরে ফতেচাঁদও একজন ধনকুবের হইয়া পড়িলেন, ভারতের নানা স্থানে হাটীর কারবার চলিতে লাগিল। সে সময়ে তাঁহার মত অর্থনীতিবিৎ আর কেহ ছিল না। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী গিয়া সম্রাট মহম্মদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সম্রাট তাঁহাকে “জগৎশেঠ” উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে দিল্লীদরবারে বঙ্গের নবাব-নাজিম “সাহেবে তহসীল” অর্থাৎ আদায়ের কর্তা, জগৎশেঠ “সাহেবে তহবিল” অর্থাৎ ধনরক্ষক এবং ডাহাপাড়ার বন্ধাধিকারী “সাহেবে তহরীর” অর্থাৎ হিসাব কেতাবের কর্তা এইরূপ উপাধি পাইয়াছিলেন।

শেঠদিগের বংশপত্রিকায় লিখিত আছে যে—কোন কারণে সে সময়ে দিল্লীখর নবাব মুর্শিদকুলীর উপর ক্রুদ্ধ হন এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চহৃদয় ফতেচাঁদ তাঁহাদের পূর্ব-উপকারী মুর্শিদকুলীর যাহাতে কোন অমঙ্গল না ঘটে ও তিনি বঙ্গরাজ্যে বরাবর থাকিতে পান, তজ্জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটি সমুজ্জল মরকতমণি ধোলাং দিয়াছিলেন, সেই মণির উপর “জগৎশেঠ” নাম খোদিত।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীর মৃত্যু হয়, তৎপরে হুজাউদৌলা নবাব হইয়া ১৪ বর্ষ নিরক্ষরে রাজ্যশাসন করেন, এই সুদীর্ঘ কাল ফতেচাঁদ তাঁহার চারিজন প্রধান সচিব মধ্যে গণ্য ছিলেন।

নবাব সকল সময়েই জগৎশেঠের পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন। তখন বঙ্গের রাজকোষ ফতেচাঁদের হস্তে ছিল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন-ফরাজ খাঁ বঙ্গের মসনদে উপবেশন করেন। তিনি কিছু লম্পট ছিলেন। এই লাম্পট্যদোষেই তাঁহার সহিত জগৎশেঠ ফতেচাঁদের বিবাদ হয়। ফতেচাঁদের পুত্র-বধু নাকি বড়ই সুন্দরী ছিলেন, তেমন সুন্দরী বৃদ্ধি আর বন্ধে ছিল না। তাঁহার উপর নবাব সন্নফরাজের লোভ পড়িল। তিনি একবার সেই সুন্দরীকে দেখিতে চাহিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে এক দিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের জন্ত সেই বধুকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সন্নফরাজ সেই সুন্দরীর দেহ কলঙ্কিত করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ধনকুবের ফতেচাঁদ মহা অপমানিত বোধ করিলেন। নবাব জানিতেন যে মাণিকচাঁদের নিকট মুর্শিদকুলী সাতকোটি টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, এখন নবাব সেই টাকা চাহিয়া বসিলেন।

একে ফতেচাঁদ নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন আবার টাকার লোভে সন্নফরাজের শত্রু হইয়া উঠিলেন। তিনি সন্নফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ত আলীবর্দী খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। [মুর্শিদাবাদ ও আলীবর্দী দেখ।] জগৎশেঠের সাহায্যে আলীবর্দী বঙ্গের নবাব হইলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মরাঠা-সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠ করিতে আসেন, সেবার জগৎশেঠের আড়াই ক্রোর টাকা লুট হইয়াছিল।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র শেঠ দয়্যচাঁদ ও শেঠ আনন্দচাঁদ। দয়্যচাঁদের ঔরসে স্বরূপচাঁদ ও আনন্দের ঔরসে মহতাব্রার জন্মগ্রহণ করেন। স্বরূপচাঁদ “মহারাজ” এবং মহতাব্রার “জগৎশেঠ” উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আর্মুগী বণিকদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব আলীবর্দী কাশিমবাজারের কুঠি আক্রমণ করিলে ইংরাজবণিকগণ জগৎশেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা লইয়া নবাবকে দিয়া অব্যাহতিলাভ করেন। সেই সময় হইতে ইংরাজেরা শেঠদিগের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কলিকাতায় টাঙ্কশাল স্থাপনের জন্ত বিশেষ তাগাদা করেন, কিন্তু এখানকার সভাপতি লিথিয়া জানান, “এখানে নবাবকে ঠাণ্ডা করা আমাদের কর্তব্য নয়, আমরা যে হারে টাকা দিতে চাহিব, জগৎশেঠ তদপেক্ষা

বেশী দিগ্ন আমাদের হতাশ করিবে। এদেশে যেমন হইতে কত তাঁদি বা সোণা আসে, সমস্তই জগৎশেষ খরিদ করিয়া লয়, ইহাতেও তাঁহার প্রতিবর্ষে যথেষ্ট লাভ থাকে। তবে যদি আমরা কোনরূপে দিল্লী হইতে সম্রাটের আদেশ লইতে পারি, তবেই আমাদের অস্ত্রপ্রাণ সুস্থিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা চাই। আর এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, যেম জগৎশেষের কোন লোক বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে আমাদের বিপদ নিশ্চয়।”

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের নবাব হইলেন। এই সময় হইতেই জগৎশেষের সহিত ইংরাজগণের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলে ইংরাজ-বণিকগণ জগৎশেষের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। জগৎশেষ নিরপেক্ষভাবে ইংরাজের জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা পাঠাইয়া ছিলেন। অপরাপর লোকের ভ্রায় তিনি নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

শেষেরা যে কেবল ইংরাজদিগের প্রতি অস্বকুল ছিলেন, এরূপ নহে, ফরাসীগণেরও তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। যখন ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখনও ফরাসীগণের নিকট জগৎশেষের ১৫ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল *।

এই সময় দিল্লীখর সিরাজের উপর ফুক হন। পুণিয়ার নবাব বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মীরজাকর তাঁহার বিশপ্কে প্রেরিত হইলেন। সিরাজ জগৎশেষকে ডাকিয়া বলেন, “তিনি দিল্লীখরের নিকট হইতে তাঁহার করমাগ আনান নাই কেন? তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।” তাহাতে জগৎশেষ বলেন, “এখন রাজ্যের চারিদিকেই অজ্ঞান্য, এসময়ে কেইই সুবিধা মত টাকা দিতে পারি-তেছে না। এমন অসময়ে তিনি কিরূপে এত টাকা যোগাড় করিয়া দিবেন।” একথা শুনিয়া উদ্ধত সিরাজ জগৎশেষের গালে একটি চাপড় মারিলেন ও তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

জগৎশেষের অবমাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ। জগৎশেষ বন্দী হইয়াছে শুনিয়া মীরজাকর অবি-লম্বে পুণিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও তাঁহার মুক্তির জন্ত সিরাজকে অনেক বলিলেন। কিন্তু বন্দনতি নবাব কাহারও কথা শুনিলেন না।

২৩ এ নবেম্বর পলতা হইতে ইংরাজ-বণিকসভা জগৎশেষকে এই ভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন—“তাঁহাদের আশা

ভরসা সকলই তিনি, তাঁহারা ইংরাজের এখনও তাঁহারা পথ পানে চাহিয়া আছেন।”

জগৎশেষ মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু নবাবের ভয়ে উভয় দ্বাভাই আর প্রকৃত্তে ইংরাজগণ সমর্থন করিলেন না। তাঁহাদের প্রধান সারের রণজিতরায়কে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত নবাবের কাছে রাখিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কেব্রয়ারী মাসে সিরাজের সহিত ইংরাজ-দিগের যে সন্ধি হয়, তাহা ঐ রণজিতরায়ের কার্য্যককতার সম্পন্ন হইয়াছিল।

ক্লাইব কর্তৃক চন্দননগর দখলের পর সিরাজের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ অবশ্যতাবী হইল। তখন ইংরাজবণিকগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সিরাজের অধঃপতন ও তাঁহারা বঙ্গের সর্ব্বেসর্কা হইবে। জগৎশেষই সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করি-বার জন্ত প্রথম প্রস্তাব করিলেন। মীরজাকর তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইয়ার-লতিফ খাঁ এই গুপ্ত রহস্য কাশিমবাজারে ওয়াটসাহেবকে জানাইলেন। ইয়ার-লতিফ খাঁ নবাবের অধীনে দুইহাজার সৈন্তের নায়ক ছিলেন। নবাবের অধীনস্থ হইলেও তিনি শেষদিগের বেতনভোগী। কথা ছিল যে, সকল বিপদ আপদে এমন কি নবাবও বিপদ হইলে তাঁহাকে শেষদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। বাস্তবিক জগৎশেষের আদেশেই ইয়ারলতিফ নবাবের বিপক্ষে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এই বড়যন্ত্রের ফলে জগৎশেষের সাহায্যেই ভবি-ষ্যতে ইংরাজবণিক বঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

পলাসীযুদ্ধের সাতদিন পরে জগৎশেষের ভবনে মহা ধুমধাম হইয়াছিল। এইখানেই লাল সন্ধিপত্রের রহস্য উল্কা-টিত হয়। সিরাজের অধঃপতনে জগৎশেষ মহানুখী হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লাভ কি লোকসান হইল, তাহা তিনি একবারে ভাবিয়াও দেখেন নাই।

পর বর্ষে কলিকাতার টাকশাল স্থাপিত হইল। জগৎশেষের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ থাকিলেও এই সময় হইতেই তাঁহার ব্যবসার কিছু ভ্রাস হইবার সম্ভাবনা। সুচতুর ইংরাজগণ জগৎশেষকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্ত নানাপ্রকারে তাঁহার সম্ভাব্য বিধান করিতেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মীরজাকরের সহিত জগৎশেষও নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জগৎশেষের অভ্যর্থনার জন্ত এই সময়ে ১৭০৭৪ আর্কট টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেষ মহানুভাব রায়ের যত্নেই মীরজাকর মুর্শিদাবাদের সমনয়ে বসিয়াছিলেন, কিন্তু এই অর্থলোভী নব নবাবের অধঃপতন তাঁহারা

কিছুতেই বিটাইতে পারেন নাই। এই মীরজাকর হইতেই শেঠদিগের ভাগ্য-পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

উত্তর ভ্রাতা নবাবের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তীর্থযাত্রা করেন। পথেও নবাব টাকা চাহিয়া তাঁহাদের কিরীয়া আসিবার জন্ত দুই-হাজার সৈন্ত পাঠাইরাছিলেন, কিন্তু সৈন্তগণ অর্থলোভে শেঠদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজাকর রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার জামাতা মীরকাসিম নবাবী পদ পাইলেন। প্রথমেই তিনি শেঠদিগকে হস্তগত করিলেন, তাঁহার নিকট উত্তর ভ্রাতাই প্রথমে বধেই সম্মান পাইলেন। কিন্তু যখন ইংরাজদিগের সহিত মীরকাসিমের গোলমাল বাঁধিল, যখন তিনি শুনিলেন শেঠেরা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২১এ এপ্রেল) সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী করিবার জন্ত মহম্মদ তকিখাঁকে পাঠাইলেন। জগৎশেঠের পুরমহিলাগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আর তাঁহাদের নিস্তার নাই; শীঘ্রই যবনের হস্তে তাঁহা-দিগকে অপমানিত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহার আশ্রয় হাতে করিয়া বান্ধুদের উপর বসিয়াছিলেন, সেই দারুণ সঙ্কটকালে ক্লাইব গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। কিন্তু মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতাবরায় নবাবের বন্দী হইলেন।

ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ উভয়ের মুক্তির জন্ত অনেক অর্থনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মীরকাসিম তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। উদয়নাথর যুদ্ধে পরাজিত হইলে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া যুদ্ধের আনিলেন। এখানে আসিয়া বুঝিলেন যে, “যখন চারিদিকে বিধ্বাস-বাতক, তখন আর রাজ্যরক্ষা বড়ই কঠিন।” এই সময়ে তিনি ক্রোধে উদ্ভূত হইয়া মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতাবরায়কে বিনাশ করিলেন। তৎপরে উভয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃপদ লাভ করিলেন।

তৎকালে স্বরূপ ও মহাতাবরায়ের কনিষ্ঠ সহোদরগণের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর ভ্রাতার কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্রকেও বন্দীভাবে দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মীরজাকর বজের সিংহাসনে পুনরায় উপবেশন করিলে তিনি উক্ত শেঠদিগের মুক্তির জন্ত অর্থোদ্যায় নবাব উজীরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু উজীর অনেক টাকা চাহিয়া বলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে জগৎশেঠ তাঁহাদের দ্রবস্থায় কথা লর্ড ক্লাইবকে জানাইরাছিলেন। কিন্তু তদন্তের নবেম্বর মাসে ক্লাইব লিখিয়াছিলেন—“আপ-

নার পিতাকে আমি কতই বর ও সাহায্য করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনি অবগত আছেন। কিন্তু মান সন্মান ও সাধারণের উপকারের জন্ত বাধা করা উচিত তাহা করেন নাই। কথা ছিল, কোবাগারে তিনটা করিয়া চাষি দেওয়া হইবে, কিন্তু সে কথা কার্যে পরিণত হইল না। সমস্ত অর্থই আপনাদের গৃহেই রহিল। এদিকে শুনিতেছি, জমিদারদিগের সরকারীর খাজনা ৫ মাস বাকি থাকিলেই আপনি পিতৃপুত্র পরিশোধ করিবার জন্ত তাহাদিগের উপর জোরজুলুম করিতে-ছেন। একাজ আপনার ভাল হয় নাই, এমন কাজ করিতে দেওয়া আমাদের উচিত নহে। আপনারা এখনও মহাধনী বটে, কিন্তু অর্থলোভেই দেখিতেছি আপনাদের মহা অসুবিধা ঘটবে, আপনার উপর পূর্বে বেরূপ ধারণা ছিল, তাহাও দূর হইবে।”

পর বর্ষে জগৎশেঠ ইংরাজদিগের নিকট ৫০।৬০ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বলেন, ইহার মধ্যে মীরজাকর ও ইংরাজ সেনার ব্যয় নির্বাহার্থ জগৎশেঠ ২১ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব সেই ২১ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ করিলেন, আর কিছু দিলেন না। কিন্তু পরবর্ষেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জগৎশেঠের নিকট দেড় লক্ষ টাকা ধার করিলেন।

লর্ড ক্লাইব শাহআলমের নিকট হইতে বাক্সালার দেওয়ানী পাইলে মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় খুশালচাঁদ কোম্পানীর সরকার্ অর্থাৎ তহবিলদার নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে শাহআলম খুশালচাঁদকে “জগৎশেঠ” উপাধি এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তোচচাঁদকে “মহারাজ” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৬৬ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে নবাবের সহিত কোম্পানীর সন্ধিপত্রে জানা যায় যে তখনও জগৎশেঠ রাজ্যের মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রী বলিয়া গণ্য ছিলেন। লর্ড ক্লাইব খুশালচাঁদকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে চান, কিন্তু খুশালচাঁদ তাহা অগ্রাহ করেন। তাঁহার প্রতিমাসে লক্ষ টাকা খরচ হইত। এ সময়ে জগৎশেঠের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিলেও খুশালচাঁদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পার্শ্বনাথশৈলে অনেক জৈনমন্দির নির্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের দেবমূর্তিতে তাঁহার ভ্রাতা জুগোলচাঁদ ও হোসিরাচাঁদের নাম খোদিত আছে। এখন মুর্শিদাবাদের জৈনবণিকসম্প্রদায়ের ব্যয়ে মন্দিরের দেব দেবী নির্মাণ হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন, জগৎশেঠ খুশালচাঁদের সময়েই শেঠবংশ অবসর হইয়া পড়ে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মহা দুর্ভিক্ষে জগৎশেঠের অনেক টাকা মারা যায়। বিশেষতঃ ১৭৭২

মৃত্যুকে ওরারেনে হেষ্টিংস কলিকাতার খালসা কুলিয়া আনিলে জগৎশেঠের সন্ন্যাস পদ যায়। কেহ কেহ বলেন; যে হুজিৎ কিবা পদচ্যুতির জন্য শেঠবংশের অধঃপতন ঘটে নাই। কিন্তু খুশালচাঁদের মৃত্যুই অধঃপাতের কারণ। ৩৯ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সকলেই ধনরাশি পুতিয়া রাখিত, কিন্তু খুশালচাঁদ মৃত্যুকালে সেই প্রভূত গুপ্তধনের কথা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই জন্যই খুশালচাঁদের সহিত জগৎশেঠের লক্ষী ছাড়িয়া গেল। পূর্বে যেমন কেবল একজনেই জগৎশেঠ উপাধি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু খুশালচাঁদের পর আর নিয়ম রহিল না, তাঁহার সহোদর ও তৎপুত্রগণ সকলেই নামমাত্র “জগৎশেঠ” উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

খুশালচাঁদের পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি আপনার ভ্রাতৃপুত্র হরখাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইহাকে দিল্লী হইতে উপাধি আনিতে হয় নাই, ইংরাজরাই তাঁহাকে “জগৎশেঠ” উপাধি প্রদান করেন। হরখাঁদের খুবই টাকার টানাটানি হইয়া ছিল, শেষে গোলাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহার কষ্ট দূর হয়। হরখাঁদ পুত্র লাভের জন্য জৈনশাস্ত্রানুসারে সকল প্রকার ধর্মকর্ম করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার পুত্র হয় নাই, শেষে এক বৈরাগীর কথা অনুসারে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন ও পুত্র সন্তান লাভ করেন। তদবধি এই বংশ বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য। বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয় নাই। এখনও উচ্চ-শ্রেণীর জৈনদিগের সহিতই তাঁহাদের আদান প্রদান প্রচলিত।

হরখাঁদের দুইপুত্র ইজ্ঞচাঁদ ও বিষ্ণুচাঁদ। ইজ্ঞচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি পান। তাঁহার পুত্র গোবিন্দচাঁদ। এই গোবিন্দচাঁদ পরিবার পোষণের জন্য বহুমূল্য হীরামুক্তা বিক্রয় করিয়া শেষে একবারে নিঃশ্ব হইয়া পড়েন। ইংরাজ কোম্পানী দয়া করিয়া তাঁহার ১২০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর বিষ্ণুচাঁদের পুত্র কৃষ্ণচাঁদ শেঠবংশের কর্তা হন। তাঁহার সময়ে গবর্নমেন্ট বৃত্তি কমাইয়া আটহাজার টাকা মাত্র করিলেন। জগৎশেঠ কৃষ্ণচাঁদ পরম ধার্মিক, তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই, তিনি কাশীধামে তাঁহার পরম আত্মীয় রাজা শিবপ্রসাদের * সহিত বাস করেন।

প্রবাদ এইরূপ জগৎশেঠের ঘরে লক্ষী বাঁধা ছিল।

* রাজা শিবপ্রসাদও জগৎশেঠ কটচাঁদের জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় হুজগচাঁদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হুজগচাঁদের পৌত্র দলচাঁদ মহারাজ বরগচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাভাব রায়ের সহিত নবাব সীর কাসিমের বন্ধী হন। দলচাঁদের পুত্র রাজা উত্তরচাঁদ, তৎপুত্র বাবু গোপীচাঁদ, তৎপুত্র রাজা শিবপ্রসাদ।

প্রতি বর্ষে মহাধুম ধামে জগৎশেঠের গৃহে লক্ষীপূজা হইত। সেই লক্ষীদেবীর বেদীর নিম্নে লক্ষ আসিরকী গাড়া ছিল। জগৎসাক্ষিন্ (পূঃ) জগতঃ সাকী ৬তং। ১ ঈশ্বর। ২ সূর্য। জগৎসিংহ, মেবারের একজন রাণা। রাণা কর্ণের পুত্র। কর্ণের মৃত্যুর পর ইনি ১৬৮৪ সন্থতে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময়ে মেবারে তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই, এ জন্য বীররসামোদী ভট্টকবিগণ জগৎসিংহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার শাস্তিময় রাজত্বকালে মেবারে শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। তখন সম্রাটপুত্র খুরম সোরাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছিলেন। জগৎসিংহ তাঁহার নিকট আপন ভ্রাতাকে পাঠাইয়া সেই সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে উদয়পুরে আহ্বান করিলেন। জগৎসিংহের যত্নেই রাজপুতানার সকল নৃপতিই খুরমকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন। এই উপলক্ষে জগৎসিংহ উদয়পুরস্থ বাদলমহল নামক প্রাসাদ স্নসজ্জিত করিয়াছিলেন এবং এই ভবনেই খুরম করদনৃপতিগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম শাহজহান নামে অভিহিত হন। সম্রাট শাহজহান উদয়পুর হইতে বিদায়কালে কৃতজ্ঞতায় উপহারস্বরূপ জগৎসিংহকে একখানি বহুমূল্য মরকতমণি ও মোগলাধিকৃত পাঁচটি প্রদেশ প্রত্যর্পণ করিয়া যান। তিনি যাইবার সময় রাণাকে চিতোরের চূর্ণপ্রাকার-গুলির পূর্ণসংস্কার করিতেও অহুমতি করিয়াছিলেন।

জগৎসিংহের যত্নে মেবারে বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জগনিবাস ও জগমন্দিরই সর্বপ্রধান। জগনিবাস উদয়সাগরের তীরে ও সেই হ্রদের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপোপরি জগমন্দির নির্মিত হয়। কি ভিত্তি, কি স্তম্ভ, কি স্নানাগার, কি তড়াগ, কি কৃত্রিম ঝরণা উক্ত দুই প্রাসাদের সমস্তই মূল্যবান মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্মিত। আবার ষায় ও বাতায়নাদি নানাবর্ণের কাচনির্মিত কবাসমূহে পরিশোভিত, দেখিলেই নয়ন মন বিমুগ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত গহলোৎকুলের অভ্যদয় হইতে একাল পর্য্যন্ত যে সকল প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রাসাদের প্রাকোষ্ঠসমূহে সেই সমস্তই চিত্রিত। দেখিলেই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

এ ছাড়া জগৎসিংহ মালবরাজ, সিংহদ্বার ও ছত্রশাট প্রভৃতি অসংখ্য ভগ্নস্থান গুলির পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন।

১৭১০ সন্থতে তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বীরবর রাজসিংহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

জগৎবিলাস নামক গ্রন্থে জগৎসিংহের সময়কার ইতিহাস কথঞ্চিৎ বর্ণিত আছে।

জগৎসিংহ, জয়পুরের একজন রাজা। মহারাজ প্রতাপ সিংহের পুত্র। সবাই জগৎসিংহ নামে খ্যাত। প্রতাপসিংহের মৃত্যু হইলে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপদ লাভ করেন। এ সময়ে সমস্ত রাজপুতানা মহারাষ্ট্রদিগের প্রবল আক্রমণে নিভাত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। এই সময় মহারাষ্ট্রনেতা হোলকার ও সিন্ধিয়া এবং হুদাদ আমীর খাঁ প্রভৃতি পাঠানদল ভারতের নানাস্থানে অরাজকতা আরম্ভ করিয়াছিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার পূর্ণ প্রভু স্বাপনপূর্বক ভারতের অপরস্থানে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর। বৃটিশ রাজনৈতিকগণ দেখিলেন এ সময়ে রাজপুত রাজগণ নিভাত অবসর হইয়া পড়িতেছেন, এ সময়ে মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার হইতে সেই সমস্ত রাজকুলবর্গকে রক্ষা করিবার আশা দিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এই উদ্দেশ্যে বড়লাট ওয়েলেসলি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর মহারাজ জগৎসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে মহারাজ জগৎসিংহ ইংরাজরাজের মিত্র বলিয়া গণ্য হইলেন এবং আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎপরে কর্ণওয়ালিস বড়লাট হইয়া আসিলে তিনি বুঝিলেন যে দীর্ঘস্থায়ী রাজপুতরাজের সহিত ঐক্য সন্ধিস্থত্রে বদ্ধ থাকায় তাঁহাদের কোন লাভ নাই। একজন মহারাজ জগৎসিংহের কোন প্রকাশ্য দোষ না থাকিলেও তাঁহার উপর বৃথা দোষারোপ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিলেন। সন্ধিভঙ্গের সংবাদ জয়পুরে না বাইতে বাইতে লর্ড লেকের সহিত হোলকারের সম্মানল প্রজলিত হয়। মহারাজ জগৎসিংহ সেই সময়ে লর্ড লেককে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া পূর্বসন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

পরে যখন সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাব হয়, তখন লর্ড লেক বিশেষ প্রতিবাদ করিলেও সার জর্জ বার্লো লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজনীতির অনুসরণ করিয়া সন্ধি বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলেন। মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে বৃটিশজাতির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ইংরাজকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মারবারের প্রধান সামন্ত পোকর্ণের অধিপতি সবাইসিংহের সহিত মারবারপতি মানসিংহের দারুণ মনো-বিবাদ উপস্থিত হয়। চতুর সবাইসিং পূর্বতন মারবারপতি ভীমসিংহের পুত্র রাজকুমার ধনকুলসিংহকেই মারবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অস্বীকৃতি সিদ্ধির পক্ষে সুবিধা না হওয়ার বাহাতে জয়পুররাজের সহিত মানসিংহের বিবাদ বাধে তাহারই পথ পরিষ্কার করিলেন। এ সময়ে মেবাররাজকন্যা কৃষ্ণকুমারী

রূপের কথা রাজপুতানার প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। [কৃষ্ণকুমারী দেখ।] সবাইসিং বহুভাবে জগৎসিংহকে জানাইলেন, “রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী পরমাত্মকরী, আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাণার কাছে প্রস্তাব করুন।”

ইন্দ্রিয়পরায়ণ জগৎসিংহ লোকমুখে কৃষ্ণকুমারীর রূপের কথা শুনিয়া অবিলম্বে বহুদূর উপচৌকনসহ চারিসহস্র সৈন্ত ও বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য একজন দূতকে পাঠাইলেন। পোকর্ণাধিপ যখন শুনিলেন যে, জয়পুর হইতে মেবার অভিমুখে সৈন্ত বাইতেছে, তিনি মারবারপতি মানসিংহকে স্মরণে এই কথা জানাইয়া বলিলেন, “রাণা ভীমসিংহের কন্যার সহিত আমাদের মৃত মহারাজ ভীমসিংহের বিবাহ প্রস্তাব হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি, জয়পুরপতি জগৎসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উপহার দ্রব্য পাঠাইতেছেন। জগৎসিংহ যদি কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করেন, তাহা হইলে মারবাররাজের আর কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।” এ কথায় মারবারপতির মন বিচলিত হইল, তিনিও চাতুরীজালে জড়িত হইলেন। তিনি অবিলম্বে সামন্তগণের সহিত তিনহাজার সৈন্ত লইয়া বহির্গত হইলেন এবং জয়পুরের সৈন্তগণ মেবারে প্রবেশ করিতে না করিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ জগৎসিংহ আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন এবং মানসিংহকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য উত্তেজিত হইলেন। জগৎসিংহ ও মানসিংহে বিবাদ সংবাদ পাইয়া হুদাদ মহারাষ্ট্রনারক সিদ্ধিয়া জগৎসিংহের নিকট প্রচুর অর্থ চাহিয়া বলিলেন এবং অর্থ না দিলে তাহার সহিত কোন ক্রমে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ হইতে দিবেন না, তাহারও ভয় দেখাইলেন। জয়পুরাধিপ সিদ্ধিয়ার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এদিকে সিদ্ধিয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মেবার আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। রাণা ভীমসিংহ সিদ্ধিয়ার আগমনবার্তা পাইয়া জয়পুরপতির নিকট সাহায্য চাহিলেন, তদনুসারে জগৎসিংহ একজন দূতসহ কএক হাজার সৈন্ত মেবারে পাঠাইয়া দিলেন। সিদ্ধিয়া রাণা ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “তিনি কোনক্রমে জগৎসিংহের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না।” রাণা ভীমসিংহও তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়া সিদ্ধিয়ার প্রতিরোধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হুদাদ সিদ্ধিয়ার আক্রমণে রাণা ভীমসিংহের সকল কৌশল ব্যর্থ হইল, তিনি মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার-তরে জয়পুরের সৈন্তবর্গকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে মহারাজ জগৎসিংহ মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চতুর সবাইসিং কুমার ধনকুলসিংহকে লইয়া জগৎসিংহের সহিত বোগদান করেন। জগৎসিংহ ধনকুলকে মারবারের প্রকৃত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মারবার জয়ে অগ্রসর হইলেন। ইতিপূর্বে জয়পুরের কোন রাজাই এত অধিক সৈন্যের একত্র সমাবেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং জগৎসিংহের সেই বিপুলবাহিনীসংগ্রহ যে মহাক্ষমতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

গাজোলী নামক স্থানে জগৎসিংহ মানসিংহকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, এই সময়ে মারবারের প্রধান সামন্তগণ সবাই সিংহের উত্তেজনায় সকলেই জগৎসিংহের পক্ষ হইয়াছিলেন। জগৎসিংহ ও অপরাপর নেতাগণ মানসিংহের শিবির লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন ও যুদ্ধসজ্জাদি লাভ করিয়াছিলেন। পরে সবাইসিংহের পরামর্শ মত জগৎসিংহ যোধপুর রাজধানী অধিকার করেন।

মানসিংহ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। জগৎসিংহ ক্রমাগত ছয় মাসকাল দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু দুর্গস্থিত গোলাবর্ষণে তাঁহার বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল। এই সময়ে জগৎসিংহের অধীনস্থ আমীর খাঁ নামে একজন সেনাপতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মারবারের নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল, তাহাতে জগৎসিংহ আমীরখাঁর উপর আরও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার ইচ্ছা করেন। আমীরখাঁ জয়পুরপতির নুনোভাব জানিতে পারিয়া জয়পুরে পলাইয়া যায় এবং সহসা জয়পুরীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া অরক্ষিত রাজধানী লুণ্ঠন করিতে থাকে। মহারাজ জগৎসিংহ যোধপুর হইতে এই সংবাদ শুনিলেন, এবং আপনার রাজনীতি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনবোধে শিবির পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এই সময় রাঠোর-সৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সর্বস্ব কাড়িয়া লইল। পূর্বেই যোধপুর অবরোধে তাঁহার ধনাগার শূন্য ও বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এখন আরও হীনবল হইয়া পড়িলেন। যে কৃষ্ণকুমারীর জন্ত এত ধনব্যয়, এত সময়, জগৎসিংহের ভাগ্যে সে কৃষ্ণকুমারী-রত্নও লাভ হইল না। এদিকে হোলকরের সৈন্যবর্গ বার বার জয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল, দ্রুত আমীরখাঁও হোলকরের নামে অনেক প্রদেশ জয় করিয়া চৌধুররূপে সেই স্থানের আয় ভোগ করিতে লাগিল। সেই সময়ে জগৎসিংহের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত

হইয়াছিল। রসকপুর নামে এক যবনীকে লইয়া তিনি উন্নত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই বেস্তাকে তিনি অর্ধেক রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি মহারাজ সবাই-জয়সিংহ যে সকল অমূল্য গ্রন্থ সংরক্ষণ করিয়া বান, তাহার অক্কাংশ অবধি সেই বেস্তাকে প্রদান করেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ বিধ্বস্ত হয় এবং বারবিলাসিনীর আত্মীয়গণ ধনসম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয়। এমন কি যে কেহ সেই বেস্তাকে অবজ্ঞা করিত, তাহাকেই জগৎসিংহ বন্দী করিতে লাগিলেন। তাহাতে বীরচেতা রাজপুত-সামন্তগণ জগৎসিংহকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্ত যড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই সময় তাঁহার কয়জন মিত্র রাজসম্মান রক্ষার জন্ত রসকপুরের চরিত্র সর্বদা অতি ঘৃণিত ব্যবহার জগৎসিংহের কর্ণগোচর করেন, জগৎসিংহও সহজেই সেই সকল বিশ্বাস করিলেন। তিনি রসকপুরকে বাহা বাহা দান করিয়াছিলেন সমস্তই কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে সামান্য বন্দীর স্থায় কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এ দিকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টোরেরা জয়পুরের সহিত কোম্পানীর সন্ধিভঙ্গ সন্দেহজনক বলিয়া পুনরায় জয়পুরের সহিত সন্ধিরক্ষা করিবার জন্ত আদেশ করেন। কিন্তু এত বিপদে পড়িয়াও মহারাজ জগৎসিংহ ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপনে সন্মত হন নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন দ্রুত আমীরখাঁ জয়পুর আক্রমণ করিবার জন্ত মধুরাজপুরে আসিয়া গোলা বর্ষণ করিতেছে, এবং ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত, তিনি তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধিপত্রের পূর্বের সকল কথা রহিল, এ ছাড়া স্থির হইল যে, ২য় বর্ষে ৪ লক্ষ, ৩য় বর্ষে ৫ লক্ষ, ৪র্থ বর্ষে ৬ লক্ষ, ৫ম বর্ষে ৭ লক্ষ ও ৬ষ্ঠ বর্ষে ৮ লক্ষ টাকা দিল্লীর কোষাগারে বৃট্টান গবর্নমেন্টকে দিতে হইবে।

তারপর বরাবর তাঁহাকে ৮ লক্ষ টাকাই দিতে হইবে, কিন্তু রাজ্যের আয় ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে ৮ লক্ষ টাকা ব্যতীত বর্ধিত আয়ের বোল ভাগের ৫ ভাগ অতিরিক্ত দিতে হইবে। সন্ধিতে জগৎসিংহ মিত্র রাজা বলিয়া গণ্য হইলেও এইরূপে প্রকারান্তরে তিনি সূচতুর বৃট্টানের করদরাজ হইয়া পড়িলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিলে এই সন্ধি হয়, এই বর্ষে ২১এ ডিসেম্বর তারিখে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জগৎসিংহ, ১ বিসেন-বংশীয় একজন হিন্দী কবি। গোড়া ও ভিন্দার রাজবংশে ইহার জন্ম। ইনি দেউবহা পরগণার তালুকদার ছিলেন ও শিব-অরসেলা নামক কবির নিকট

কাব্য শিক্ষা করেন। পরে হিন্দীভাষায় ছন্দশৃঙ্গার ও সাহিত্য-সুধানিধি নামে একখানি অলঙ্কার রচনা করেন। ইনি প্রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

২ মউরাজোর একজন প্রবল রাজা, ইনি সম্রাট শাহ-জহানের সহিত তরানক বৃদ্ধ করিয়াছিলেন। কবি গভীররায় এই বৃদ্ধকাহিনী উজ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

(J. As. Soc. Beng. XLIV.)

৩ হরবংশীর মুকুন্দসিংহের পুত্র, ইনি একজন মহা যোদ্ধা।

অরুণজীবের সময় জীবিত ছিলেন।

জগৎসিংহ, ইতিহাসে ইনি জগৎরাজ নামে বিখ্যাত। বৃন্দেল-খণ্ডের রাজা ছত্রশালের পুত্র। ইহার চারি সহোদর—হৃদয়-সিংহ, জগৎরাজ, পাণ্ডুসিংহ এবং ভারতীসিংহ। রাজা ছত্রশাল তাঁহার রাজ্য দুইভাগে বিভাগ করিয়া পল্লারাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র হৃদয়সিংহকে এবং জৈতপুর রাজ্য দ্বিতীয় পুত্র জগৎসিংহকে প্রদান করেন। ভগুগড়, বোড়াগড়, বর্ধা, অরুণগড়, রণগড়, জৈতপুর, চর্খারি প্রভৃতি স্থান জৈতপুররাজ্যের অন্তর্গত। জগৎ রাজ জৈতপুররাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে করুণাবাদের নবাব মহ-ম্মদ খাঁ বঙ্গ বৃন্দেলখণ্ড জয় করিবার জন্য দলীল খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন।

জগৎরাজ সৈন্যে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন, নদপুরীয়া নামক স্থানে উভয় সৈন্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। প্রথম বারের যুদ্ধে জগৎসিংহ তরানক আহত হইয়া ভূমিশায়ী হইলে তাঁহার রাণী অমরকুমারী সৈন্যগণকে উৎসাহ দিয়া নিজে যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। জগৎরাজ রক্ষা পাইলেন।

কিছুদিন পরে মোএর যুদ্ধে দলীল খাঁ নিহত হইলে মুসলমানসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জগৎরাজ রাণী অমরকুমারীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তৎপুত্র কীর্তিসিংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এদিকে দলীল খাঁর পরাজয়ের পর নবাব মহম্মদ খাঁ ক্রোধে অধীর হইয়া সৈন্যে আবার বৃন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। জগৎরাজ বহুবার পরাজিত হইয়া পর্তুতে আশ্রয় লইলেন। পরে পেশোবা বাজিবাওর সাহায্যে নবাবকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই রাণী অমরকুমারীর পুত্র কীর্তিসিংহের মৃত্যু হইল। জগৎরাজ কীর্তির পুত্র গুমানসিংহকে “দেওরানু সবারী” উপাধি প্রদান করিলেন। অল্পদিন পরেই মহোবার নিকটবর্তী মোগ্রামে জগৎরাজ উৎকট-রোগে ১৮১৫ সন্থতে (১৭৫৮ খৃঃ অঃ) পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র অন্বে—পাহাড়সিংহ, কেশরীসিংহ, সিনপত-সিংহ, বিহারসিংহ এবং রাণী অমরকুমারীর গর্ভজাত কীর্তিসিংহ।

জগৎসিংহপুর, উড়িষ্যার কটকজেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। অক্ষা° ২০° ১৫' ৫০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ১২' পূঃ, মার্ঘাগ ও খালের ধারে অবস্থিত। এখানে প্রায় দুই হাজার লোকের বসবাস আছে।

জগৎসেতু (পুং) জগতঃ সেতুরিব ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। পক্ষে অলুক স।

জগদ (পুং) রক্ষক, পালক।

“বৎসো জগদৈঃ সহ বনুঃশ্চ রুদ্রানাদিত্যান্।” (পারশ্বরগৃ° ৩।৪)

জগদন্তক (পুং) জগতামন্তকঃ ৬তৎ। জগদ্বিনাশক, মৃত্যু

“উত্তম্য শূলং জগদন্তকাস্তকম্।” (ভাগবত ৪।৫।৬)

জগদম্বা (স্ত্রী) জগতো ম্বা ৬তৎ। দুর্গা।

জগদম্বিক (স্ত্রী) জগদম্বা-স্বার্থে কন্-টাপ ইৎক। দুর্গা।

“সৃষ্টিহিতিবিনাশানাং বিধাত্রী জগদম্বিকা।” (ভগবতীগীতা)

জগদাদি (পুং) জগত আদিঃ কারণম্ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর।

২ ব্রহ্মাদি। “জগদাদিরনাদিস্বং।” (কুমারসং)

জগদাদিজ (পুং) জগতাঃ আদৌ হিরণ্যগর্ভরূপেণ জারতে প্রাহর্ভবতি জন-ড উপসং। পরমেশ্বর।

“ব্রাহ্মিজুর্ভোজনং ভোক্তা সহিযুর্জগদাদিজঃ।” (বিষ্ণুসং)

জগদাধার (পুং) জগত আধারঃ ৬তৎ। ১ বায়ু। (শব্দচঞ্জিকা)

২ জগতের আশ্রয়। “কালোহি জগদাধারঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

জগদানন্দ (পুং) জগত আনন্দঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ কএক-জন সংস্কৃত গ্রন্থকার—একজন কবি, পদ্যাবলীতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। এক ব্যক্তি কৃত্যকৌমুদী নামক নৃত্যসংগ্রহ করিয়াছেন। অপর একজন ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে কোলার্চনদীপিকা রচনা করেন।

জগদায়ু (পুং) জগতামায়ুঃ পুৰোধারাদি° সকারলোপঃ। জগৎপ্রাণ, জগতের জীবন।

“অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা।” (ভার° ৩।১৪৭ অঃ)

জগদায়ুস্ (স্ত্রী) জগত আয়ুঃ ৬তৎ। জগৎপ্রাণ, জগতের জীবন।

“বায়ু বা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠঃ কথিতো জগদায়ুবা।”

(ভারত ১০।৩৪০ অঃ)

জগদীশ (পুং) জগতামীশঃ ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ বিধাতা।

(কুমার ২।১০)

৩ শূলপাণির শ্রদ্ধাবিবেকের ভাবার্থদীপিকা নামে টীকাকার।

৪ ষষ্ঠীর বোড়শ শতাব্দীর একজন হিন্দী কবি।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, হুগ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, দীর্ঘজীবগ্রন্থের অন্ততম টীকাকার। চৈতন্যদেবের স্বল্পর সনাতনমিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। পুরুষ গণনার হিসাবে ইহাকে চৈতন্যের দ্ব্যন্যাদিক শত বৎসর পরবর্তী স্বীকার করা যাইতে পারে।

নববীপে জগদীশের বংশধরেরা আজিও বর্তমান আছেন, পুরুষ গণনার জগদীশ হইতে এখন ১০১১ পুরুষ পাওয়া যায়। ইহাতে তাঁহাকে ৩০০ বৎসরের পূর্ববর্তী বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

জগদীশের পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইহার পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যাদব একজন প্রধান নৈরায়িক ছিলেন, তাঁহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। যখন জগদীশের বয়স ৫৭ বৎসর, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। জগদীশ বালককালে অত্যন্ত দুঃখ ভাব ছিলেন, পিতৃ-বিয়োগে তাঁহার দুঃখতা আরও বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বড়ীদাস তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিতেন, কিন্তু জগদীশ তাহাকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দুঃখতার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা একটা প্রধান রোগ ছিল।

কোন এক দিন জগদীশ পক্ষিশাবক পাড়িবার মানসে এক প্রকাণ্ড তালগাছে আরোহণ করিয়া ছানা বাহির করিবার জন্ত পাখীর বাসায় হাত ঢুকাইয়া দিলে এক প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হইলেন না, আর কোন উপায় না দেখিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সাপও লেজ দিয়া তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু জগদীশ ইহাতেও ভীত হইলেন না। তালবৃক্ষের ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সাপের গলা কাটিয়া মুখটাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অক্ষতশরীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। এক জন সন্ন্যাসী জগদীশের অসাধারণ সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির এইরূপ পরিচয় পাইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। জগদীশও এই বিপদের সময়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে, এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে এমন কার্য আর কখনও করিবেন না, এখন সন্ন্যাসীর কথায় তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

জগদীশ যখন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। এখনও তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই। জগদীশ প্রাগাঢ় পরিশ্রমে দিব্যরাত্রি অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে জগদীশ অকুল হৃৎসাগরে ভাসমান, রাত্রিতে তৈলাভাবে তাহার পাঠ হইত না। তজ্জন্ত তিনি বাঁশের পাতা জালিয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ হৃৎখে পড়িয়াও জগদীশ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই, সর্বদাই অবিচলিত অধ্যবসারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে হুঃপ্রসিক্ত অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠিতে জ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি আপনার প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুষ্পাঠীর মধ্যে সর্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। এই চতুষ্পাঠিতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া জগদীশ সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি নববীপে একটা চতুষ্পাঠী খুলিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থভাবে কিছুদিন তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পরে গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। অল্পদিন মধ্যেই তাহার চতুষ্পাঠী জম্কাইয়া উঠিল, দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। তাঁহার পূর্বে দীধিতিগ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, এই কারণে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইত। জগদীশ সেই অভাব পূরণ করিবার জন্ত দীধিতির টীকা রচনা করেন। তৎকৃত অহুমানদীধিতি টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই—

“প্রাচ্যৈরুচিতবিবিধকোটৈঃ কলুষীকৃতোহধুন।

দীধিতিযুতমণিবেষ ত্রীজগদীশ প্রকাশিতঃ ক্ষুরত্বং॥”

লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই সময়ে জগদীশ অর্থভাবে পূরণ করিবার জন্ত ৩৬০ ঘর শূদ্র শিষ্য করেন।

জগদীশ যথাক্রমে অহুমানদীধিতির তর্ক, সামান্ত্যভাব, ব্যাপ্ত্যমুগম, সিংহব্যাঘ্র, পক্ষতা, উপাধিবাদ, টিপ্পনী এবং ব্যাপ্ত্যমুমানদীধিতির অহুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্রী, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্তলক্ষণ, ব্যাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্নাভাব, অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, অতএব চতুর্ভয়-তর্ক, সামান্ত্যলক্ষণা, সামান্ত্যভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলাঘরী, কেবলব্যতিরেকী, অধরব্যতিরেকী, বাধ, অসিক্তি, সংপ্রতিপক্ষ, ব্যাপ্ত্যমুগম, অহুপসংহারী, অবয়ব, হেতুভাষ, সাধারণ, সবাভিচারী প্রভৃতি, দীধিতিপ্রকাশিকার টিপ্পনী, গল্পেশোপাখ্যায় কৃত অহুমানময়ূখ গ্রন্থের ভাষ্য, প্রশস্তপাদ আচার্যের কৃত বৈশেষিক সূত্রের দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী, শিরোমণি কৃত জ্ঞান-লীলাবতীপ্রকাশ-দীধিতি গ্রন্থের টীকা ও শব্দশক্তিপ্রকাশিকা রচনা করিয়া জ্ঞানজগতে অসাধারণ কীর্তিলাভ করিলেন। ইহা ছাড়া ইহার কৃত তর্কামৃত গ্রন্থ এবং রহস্যপ্রকাশ নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। নববীপের পণ্ডিত हरिनाथ তর্কসিদ্ধান্তের ঘরে হস্তলিখিত একখানি “কাব্যপ্রকাশ রহস্যপ্রকাশ” আছে। পুথির শেষে লেখকের বাক্যমুসারে জানা যায় যে ১৫৭৯ শকে ঐ পুস্তক লিখিত হয় এবং সেই সময় পর্যন্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার জীবিত

ছিলেন (১)। জগদীশের ছই পুত্র রত্ননাথ ও রত্নেশ্বর উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিত, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পরি-
কর। বৈষ্ণবকবি আনন্দচন্দ্র দাস ভাগবতানন্দের আদেশে
“জগদীশচরিত্রবিজয়” রচনা করেন, এই গ্রন্থে জগদীশ পণ্ডি-
তের জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তৎপাঠে জানা
যায়—পূর্বদেশে ভট্টনারায়ণবংশে (গরুড়) কমলাক্ষ বন্য বাস
করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম ভাগ্যবতী। এই ভাগ্যবতীর
গর্ভে বৈষ্ণবপ্রধান জগদীশ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশ
বাল্যকাল হইতে সর্বদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কখন হাসিতেন,
কখন কাঁদিতেন, আবার কখন কৃষ্ণমূর্তি গড়িয়া খেলা করি-
তেন। পাঠে তাঁহার তেমন মনোযোগ ছিল না, কিন্তু গুরু-
মহাশয় যখন যে প্রশ্ন করিতেন, অনায়াসেই তাঁহার উত্তর
দিতেন। আট বর্ষে তিনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করেন, এই সময়
ক্রীমভাগবত পাইয়া তাঁহার মনে কৃষ্ণভক্তি আরও প্রবল হইয়া
উঠে। এই সময়ে তিনি সকলের নিকটেই ভক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য
স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কিছু দিন পরেই
জগদীশ একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়িলেন।
তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র আসিতে লাগিল। তিনি তাঁহাদের
শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের লইয়া নাম-
সংকীৰ্ত্তন করিতেন। তখনও চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন নাই।

জগদীশের এক ভাই ছিল, তাঁহার নাম মহেশ পণ্ডিত।
জগদীশ তপনের কল্পা দুখিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি ছোট ভাই ও ভাৰ্য্যাকে লইয়া
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

তিনি চৈতন্যের পিতা জগন্নাথের গৃহের নিকটেই বাস
করিলেন। এখানে জগন্নাথ মিশ্র ও হিরণ্যভাগবতের সহিত
জগদীশের বেশ আলাপ হইল। হিরণ্যভাগবতের সহিত তিনি
সর্বদাই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতেন।

যথাকালে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশের পত্নী
দুখিনীর সহিত শচীঠাকুরাণীর প্রণয় ছিল, এখন উভয়েই
নিমাইকে লাগল পালন করিতে লাগিলেন।

এক দিন একাদশী। জগদীশ মিত্র হিরণ্যভাগবতের সহিত
একাদশী ব্রত করিলেন। সেইদিন নিমাইচাঁদ কাঁদিয়া আকুল,
বলিলেন “জগদীশ ও হিরণ্য একাদশী ব্রত করিয়াছে,

তাঁহার ছই জন বিষ্ণুপূজা করিবার জন্য নৈবেদ্য সাজাই-
য়াছে, সেই নৈবেদ্য আনিয়া দাও, তবে আমি চূর্ণ করিব।”
শচীমাতা নিমাইএর কথা শুনিয়া খেদ করিতে লাগিলেন,
এদিকে ছই বিপ্র বালকের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নৈবেদ্য
আনিয়া নিমাইকে খাইতে দিলেন।

পর একাদশীর দিন বালক নিমাই আপনি গিয়া জগ-
দীশের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন জগদীশ কৃষ্ণের
উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া এক মনে কৃষ্ণের ধ্যান
করিতেছেন। এই সুযোগে নিমাই নৈবেদ্যের ফল খাইতে
বসিলেন। জগদীশ ধ্যানাক্তে চাহিয়া দেখেন, নিমাইচাঁদ বেশ
আহার করিতেছেন। তখন তিনি নিমাইকে আপন ইষ্টদেব
ভাবিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কত স্তব স্তুতি করিতে
লাগিলেন। নিমাই কহিলেন, “আপনি বৃদ্ধ, মহাপণ্ডিত।
আমি ক্ষুদ্র বালক, আমাকে এক্ষণ স্তব স্তুতি করা আপনার
উচিত নহে।” এই সময়ে জগদীশের পত্নী দুখিনীদেবী সেখানে
আসিয়া দেখিলেন,—

“ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন পদতলে শোছে।

চারিভুজ শশ্য চক্র গদাপন্ন তাহে।

বক্ষস্থলে বনমালা কটিতে ধড়া।

ললাট অলকাবৃত্ত তত্বপরি চূড়া ॥ (জগদীশচ* ৭ অঃ)

দেখিয়াই দুখিনী মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কণপরে জান
হইলে পতীপত্নী উভয়ে মিলিয়া নিমাইএর পূজা করিতে লাগি-
লেন। তখন বালক নিমাই এইরূপে আশ্চর্যচরিত্র দিলেন—

“তুমি দৌছে মোর পারিষদ ছিল। পূর্বে।

ভকত হইয়া জন্ম লভিয়াছ এবে ॥

তোমা সহ মিলিলাম সবার অগ্রেতে।

তবে সর্ব ভক্তসহ মিলিত পশ্চাতে ॥

মিলি সব ভাগবত ধর্ম আচরিব।

হরিনাম সংকীৰ্ত্তন প্রচার করিব ॥

বিষয়েতে মত্ত জীব আছে কলিকালে।

হরিনাম দিয়া আমি তারিব সকলে ॥” (জগদীশচ*)

এইরূপে চৈতন্যের সহিত জগদীশের মিলন হইল। পরে
গৌরাক্ষের নামসংকীৰ্ত্তন কালে জগদীশ তাঁহার সহিত যোগ
দিলেন। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

কিছুদিন পরে তিনি চৈতন্যদেবের অমৃত লইয়া নীলা-
চলে গমন করেন। এখানে তিনি জগন্নাথের প্রেমে বিমুগ্ধ
হইয়া পড়েন। ভগবান্ জ্যোতির্ময় নীলকান্তমণিময়রূপে
তাঁহাকে দেখা দেন। তিনি প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া জগন্নাথ-
দেবকে বলিয়াছিলেন—

(১) “শাকে রত্নাজি বাণকিতপরিগণিতে মাঘমাসে লবমাং

পক্ষে চৈতন্যলকে গ্রহপতিদ্বিবেসে জীবন্ত বৃদ্ধলয়ে।

স্মারালঙ্কারধীরা নিমগ্নরচিতঃ পুণ্ড্রমেতৎ সমস্তং

স্বীয় স্বীকৃত্যনন্তো ব্যালিখদনদলসোহ ধ্যাগনার্থং সুখেন ॥”

“তোমার যে কলেবর, আছরে বৈকুণ্ঠল,
মন্দিরের উত্তরাংশে।
যদি তব আজ্ঞা পাই, সেই মূর্তি লই যাই,
সেবা প্রকাশিব গোড়দেশে ॥”

তখন ভগবান্ ভক্তকে রূপা করিয়া বলিয়াছিলেন—

“অঙ্গিকার করিলুঁ তোমায়।

চলি যাহ একেশ্বর, লই মোর কলেবর,
যেই স্থানে তব ইচ্ছা হয় ॥” (জগদীশচরিত্র ৮ বং)

পরে জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথমূর্তি আনিয়া জসোড়াগ্রামে স্থাপন করিলেন। জসোড়ার রাজা দেবসেবার জন্ত জগদীশকে অনেক ভূমি দান করিলেন, এখানে পণ্ডিত পত্নী ও ভ্রাতাকে আনাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্প দিন পরেই মহেশ পণ্ডিতের বিবাহ হইল, তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিলেন।

যথাকালে জসোড়াগ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের তিন পুত্র জন্মিল। এক দিন চৈতন্তদেব নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দদাস লিখিয়াছেন, এখানে চৈতন্তদেব পরমাত্রা খাইতে ইচ্ছা করেন। জগদীশের গৃহিণী চৈতন্তের আগমনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া রন্ধন করিতেছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু জগদীশকে বলিয়াছিলেন, “আমার বড়ই হাত জালা করিতেছে, তুমি রন্ধনশালায় গিয়া ঔষধ আন।” জগদীশ রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, ছুখিনী দেবী কাঠির পরিবর্তে নিজ হস্ত দ্বারা পরমাত্রা নাড়িতেছেন, তাহাতে তাঁহার ক্রম্পে নাই। জগদীশ বুঝিলেন যে এই জন্তই মহাপ্রভুর হাতে জালা করিতেছে। তিনি পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি হাত দিয়া রাঁধিতেছ, হাত যে পুড়িয়া যাইবে।” এতক্ষণ ছুখিনীর জ্ঞান ছিল না। তিনি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া হাত সরাইয়া লইলেন এবং কহিলেন, “আমার হাতে ত কিছুই লাগে নাই।” জগদীশ কহিলেন, “তোমার লাগে নাই বটে, কিন্তু ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর হাত জালা করিতেছে।”

চৈতন্তদেব মহাপরিতোষে পরমাত্রা ভোজন করিলেন। তখন পৌষ মাস, নিত্যানন্দ সেই অকালে জগদীশের নিকট আশ্রয় পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। এখানে উভয়ে কিছুদিন থাকিলেন। সেই সময়ে জগদীশের বিষ্ণুদেবী তিন পুত্রের মৃত্যু হয়। চৈতন্তদেব ছুখিনীকে সান্বনা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

জগদীশ এক গৌরগোপাল মূর্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই মূর্তির নাম হইল গৌরগোপাল।

কবি আনন্দদাস লিখিয়াছেন, সেই গৌরগোপাল মূর্তি ছুখিনী দেবীকে মা বলিয়া ডাকিতেন ও দেবী তাঁহাকে কোলে লইয়া সন্তপান করাইতেন। চৈতন্তদেব শান্তিপুত্রের অধৈর্যের গৃহে সেই কথা প্রকাশ করেন এবং স্বমূর্তি দেখিবার জন্ত আর একবার জসোড়ার আগমন করিলেন।

চৈতন্তকে দেখিয়া ছুখিনী দেবী গৌরগোপাল মূর্তি লুকাইয়া রাখিলেন। নিত্যানন্দ ও চৈতন্তদেবের আহ্বারের জন্ত দুইখানি আসন পাতা হইলে চৈতন্তদেব বলিলেন, “পণ্ডিত। শুনিলাম এক ভক্তর আসিয়া আমার মূর্তি গড়িয়া গিয়াছে, তুমি তাহাকে আমি ভাবিয়া পূজা কর, সেই মূর্তিও নাকি ছুখিনী দেবীকে মা বলিয়া ডাকে। তাহার জন্ত একখানি আসন পাতিয়া দাও। তাতে আর আমাতে ভেদ নাই। সেই মূর্তি বাহির করিয়া আন, আমরা তিনজনে একস্থানে ভোজন করিব।”

জগদীশ গৌরগোপালমূর্তি বাহির করিলেন। নিত্যানন্দ সেই মূর্তি দেখিয়া অবাক হইলেন। একবার চৈতন্তের দিকে চান, একবার মূর্তি দেখেন। উভয়ে কোন প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। তিনজনের ভোগ হইল, জগদীশ শেষে প্রসাদ পাইলেন। তৎপরে চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ নিদ্রিত হইলেন। নিত্যানন্দ নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, গৌরগোপাল ছুখিনীর কোলে থাকিয়া মাতৃসম্বোধন ও সন্তপান করিতেছে। তদর্শনে নিত্যানন্দ আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

প্রভাত হইল, চৈতন্তদেবও ছুখিনীকে “মা” সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোমার গৃহে দুই গৌর রহিয়াছে, এক গৌরের নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা। একজনকে বিদায় দিন।” গৌরের গমনের কথা শুনিয়া ছুখিনী তৎক্ষণাৎ গৌরগোপালকে কোলে লইলেন। গৌর তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া নিত্যানন্দ সঙ্গে জসোড়া পরিত্যাগ করিলেন। (জগদীশচ ৮ বং)

কিছু দিন পরে চৈতন্তদেব নীলাচলে আসিলেন, এখানে আসিয়া তিনি জগদীশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জগদীশ নীলাচলে গিয়া চৈতন্তের চরণবন্দনা করিয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসেন। নীলাচলে গৌরচন্দ্র ভগবান্ আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্র হইলে তাহার রঘুনাথ নাম রাখিবে এবং তাহার শিক্ষা ও দীক্ষার জন্ত তাহাকে জগদীশ পণ্ডিতের নিকট রাখিয়া দিবে। তদনুসারে বৃদ্ধ জগদীশপণ্ডিত বিখ্যাত রঘুনাথ-চার্য্যের গুরু হইয়া তাঁহাকে রাখাক্ষ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। [রঘুনাথচার্য্য দেখ।]

জগদীশপণ্ডিতের উক্ত তিন পুত্রের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল, সেই পুত্রের নাম রামভদ্র

ও কস্তার নাম রসমঞ্জরী। নিত্যানন্দের দৌহিত্র ও মাধবের পুত্রের সহিত রসমঞ্জরীর বিবাহ হয়।

পৌষমাসে শুক্ল-তৃতীয়ার দিন জগদীশ পণ্ডিত অন্তর্ধান করেন। গোড়ীর বৈষ্ণব মাজেই এখনও জগদীশকে বিশেষ ভক্তিপ্রদা করিয়া থাকেন। উক্ত শুক্ল-তৃতীয়ার দিন এখনও একটি বৈষ্ণবপূর্ণ বলিয়া খ্যাত। জগদীশ-ভক্তগণ ঐ দিন জগদীশ পণ্ডিতের পূজা করিয়া থাকেন।

জগদীশপুর, অযোধ্যার সুলতানপুর জেলার অন্তর্গত (মুসাফর খানা তহসীলের) একটি পরগণা। ইহার পশ্চিমদিকে গোমতী নদী প্রবাহিত। পরিমাণ ১৫৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৯৫০০০। ভর রাজাদিগের আধিপত্যকালে জগদীশপুর সাতন ও কৃষ্ণী নামে দুই পরগণাতে বিভক্ত ছিল। মুসলমানেরা ভরবংশ উচ্ছেদ করিবার পর হইতে দুই পরগণা এক হইয়া জগদীশপুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই পরগণাতে সর্বমুক্ত ১৬৬ খানি গ্রাম আছে।

ইহার প্রধান নগর নিহালগড়। জগদীশপুর হইতে একটি বাঁধা রাস্তা রায়বরেলী এবং ফরজাবাদে গিয়াছে। এখান হইতে উৎপন্ন শস্ত, বস্ত্র এবং অন্ত্র নানাবিধ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ফরজাবাদের রাস্তা এবং গোমতী নদী দ্বারা বাণিজ্যের বেশ সুবিধা হইয়া থাকে।

জগদীশপুর, বিহারের অন্তর্বর্তী শাহাবাদ জেলার একটি নগর। ইহার পরিমাণ ৬৫১৮ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ১২,৪৭৫। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে এই নগর কুমার সিংহ নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে ছিল। জগদীশপুরের উত্তরপূর্বদিকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে নালন্দা বা বড়গাঁ অবস্থিত। নালন্দা পূর্বকালে একটি সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধ নগর ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। জগদীশপুরের অতি নিকটে এইরূপ একটি প্রকাণ্ড স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পরিমাণ প্রায় ২০০ বর্গ ফিট। এই স্তূপটি অধিক উচ্চ নহে, কেবল দক্ষিণপূর্ব-ভাগ ৭০ বর্গ ফিট। এই স্তূপের দক্ষিণদিকে একটি বৃহৎ নিষ বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের নিম্নে অনেকগুলি প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটি মূর্তি বোধগম্যস্থিত বোধিবৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্তির মত। জগদীশপুর হইতে ৮ মাইল দূরে মধুপুর। হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত করহারবাড়ী হইতে পাথুরে করলা আনয়ন জন্য মধুপুর হইতে করহারবাড়ী পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। জগদীশপুর এই লাইনের একটি স্টেশন।

জগদীশপুর নিহালগড়, অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুর

জেলার অন্তর্গত জগদীশপুর পরগণার প্রধান নগর। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০। নগরটীঃক্ষুদ্র। এখানে একটি গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় আছে।

জগদীশ্বর (পুং) জগতামীশ্বরঃ ৬তং। [জগদীশ দেখ।]

জগদীশ্বরী (স্ত্রী) জগদীশ্বর-স্ত্রীপ্। তগবতী, পার্বতী।

জগদেকনাথ (পুং) জগত একোহিতিত্বো নাথঃ। জগতের প্রধান অধীশ্বর, সম্রাট, একচ্ছত্র ধরণীপতি।

জগদেব, ইহার অপর নাম জগদেব ও ত্রিভুবনমল্ল। দাক্ষিণাত্যে মহিষ্মর প্রদেশে শাস্ত্রবংশীয় একজন রাজা। খৃষ্টীয় ষাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার প্রাচুর্য্য। জগদেবের পিতার নাম কাম এবং মাতার নাম বিজ্জলাদেবী। ইহার দুই সহোদর, কনিষ্ঠের নাম সিংহদেব। জগদেবের পুত্রের নাম বস্মরস। শাস্ত্রবংশীয়রাজগণ চালুক্যরাজাদিগের অধীনে করদ ছিলেন। এক দিন জগদেব চালুক্যভূপতি তৈলের আদেশে ওরঙ্গলের নিকটবর্তী অলুমকুও আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান।

জগদেব প্রমার, ভক্তমালগ্রন্থ বর্ণিত একজন ভক্ত বৈষ্ণব। ইনি যে রাজ্যে বাস করিতেন, সেই রাজ্যের রাজকুমারী সাধুতা ও গুণশ্রবণে মোহিত হইয়া ইহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রাজা কস্তার কথা রসমত হইয়া ইহাকে আনাইয়া অনেক যত্ন করেন, কিন্তু বিষয়-নিম্পুহ জগদেব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীও জগদেব ভিন্ন অপর বরে মালাদান করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া জগদেবকে ভুলাইবার জন্য একদিন পরমরূপসী কোন একটি নারিকারারা হরিনাম গান করাইতে লাগিলেন, রাজনিমন্ত্রণে জগদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নর্তকীর মুখে হরিশুগগান শুনিয়া তাহার পুরস্কার-স্বরূপ আপনার মাথা কাটিয়া অর্পণ করেন। তাহাতে রাজকুমারী শোকাভূরা হইয়া জগদেবের কাটামুও স্বর্ণ থালে রাখিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, জগদেবের কাটামুওটাও নাকি আপনার প্রতিজ্ঞা ছাড়িল না, রাজকুমারীর মুখ না দেখিয়া উপড় হইয়া পড়িল। অনেক যত্নেও তাহাকে রাখা গেল না। শেষে জগদীশের দেহে মুণ্ড মিলিত করিলে জগদেব বাঁচিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর প্রার্থনায় ও তাঁহার বৈষ্ণব-ভাব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে কিছু কাল সংসারে থাকিয়া গৃহপরিভ্রমণ করেন। (ভক্তমাল) জগদেবরায়, মহিষ্মর ও সালেমের রাজা। ইনি বিজয়নগরাদি-পতি ত্রিজয়ের জামাতা।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা ত্রিজয়ের রাজধানী পেরনুও

আক্রমণ করিলে জগদেবরায় সৈন্যে অগ্রসর হইয়া মুসলমান দিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। শ্রীরঙ্গ সন্তষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা বেকটপতি চন্দ্র-গিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। জগদেবরায় এ সময়ে চেরপত্তন নামক স্থানের রাজপ্রতিনিধি হইয়াছিলেন।

জগদগুরু (পুং) জগতোগুরুঃ ৬তং। ১ পরমেশ্বর। ২ শিব প্রভৃতি।

০ জগতের উপদেষ্টা নারদ প্রভৃতি। (নৈষধচ-)

৪ বৃন্তকৌমুদী নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

জগদগৌরী (স্ত্রী) জগৎস্থ মধ্যে গৌরী। ১ দুর্গা। ২ মনসা দেবী।

“বিষহরী জগদগৌরী মনসা সিন্ধুযোগিনী।” (মনসাস্তব)

জগদল (পুং) দরদের একজন রাজা।

“সাহার্যকার্থমানিন্যে দরজাজঃ জগদলম্।” (রাজতরং ৮।২।১০)

জগদল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে পূর্বে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এক কাছারী বাটী ও জর্ম্মণদিগের এক কুঠি ছিল। এখনও প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরের পুষ্করিণীটি আছে, লোকে তাহাতে “রাণীপুষ্কর” বলে।

জগদলক, আফগানিস্তানের একটি নদী, একটি উপত্যকা ও একটি গিরিপথের নাম। নদীটি কোটাল নামক গিরিপথের নিকট উদ্ভিত হইয়া কাবুল নদীতে মিশিয়াছে। উপত্যকার জবলখেল ইব্রাহিম ও ছিলজাই জাতি কর্তৃক অধিবেশিত। গিরিপথটি উচ্চ, অপ্রশস্ত, আকাঁকা, ৪০।৫০ গজের অধিক বিস্তার কোথাও নাই, একস্থানে আবার ৬ ফিটমাত্র বিস্তৃতি। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারী তারিখে পলায়নপর ভারতের ইংরাজসৈন্যগণ এই গিরিপথে বিনষ্ট হয়, কএকজন মাত্র গণ্ডামকে পলাইতে পারিয়াছিল।

জগদলপুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্যের প্রধান নগর। এই নগরে বস্তার রাজবাড়ী। অক্ষা° ১৯° ৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪' পূঃ। এই নগর শত গজ বিস্তৃত ইন্দ্ৰাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। নগরের এক দিকে নদী অপর তিনদিকে মৃগয়প্রাচীর ও গভীর খাদ, মধ্যে কেবল কুঠার। মুসলমান বণিকেরাই এখানকার ধনী। যে সকল পথবাহী বণিক উষ্ট্র, টাটুঘোড়া, চোগা, খজুর প্রভৃতি বেচিতে আসে, তাহারা নগর-প্রাচীরের বাহিরে থাকে। নগরের নিকটে একটি বৃহৎ দীঘী আছে। চারি পার্শ্বে বেশ খোলা জমি, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্রগ্রাম ও বাগান। এই নগরের ৪০ মাইল দূরে জয়পুর রাজ্যের জয়পুর নগর। এখানকার লোকসংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ গণনা হিসাবে) মোট ৫০৪৪, তন্মধ্যে

হিন্দু ৪৬৩১, মুসলমান ৩০৯ ও জৈন ২ জন। এখানকার অসভ্য অধিবাসীরা গোহী নামে খ্যাত। [ভদ্রাচলম্ দেখ।]

জগদদীপ (পুং) জগতোদীপইব প্রকাশকঃ। ১ জৈশ্বর। ২ শিব। জগদেব, দুর্লভরাজের পুত্র, স্বপ্নচিন্তামণি-রচয়িতা।

জগদ্ধর, একজন সংস্কৃত কবি, দর্পদলনকাব্য ইহার প্রণীত।

জগদ্ধর, যজুর্বেদের টীকাকার কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত গৌরধরের পৌত্র। ইহার পিতার নাম রত্নধর। ইনি স্ততিকুন্ডমাঞ্জলি, কাতন্ত্রের বালবোধিনীটীকা এবং অপশব্দনিরাকরণ এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জগদ্ধর, মথুরাবাসী একজন সংস্কৃত কবি। ইনি অনেক গ্রন্থের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে দেবীমাহাত্ম্যটীকা, ভগবদ্গীতাপ্রদীপ, মালভীমাধবটীকা, রসদীপিকা নামে মেঘদূত-টীকা, তত্ত্বদীপনী নামে বাসবদত্তাটীকা এবং বেণীসংহারটীকা পাওয়া যায়। তৎস্কৃত তত্ত্বদীপনীতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—চণ্ডেশ্বরের পুত্র বেদেশ্বর (বা বেদধর), বেদেশ্বরের পুত্র রামেশ্বর (বারামধর), রামেশ্বরের পুত্র গদাধর, গদাধরের পুত্র বিজ্ঞাধর, বিজ্ঞাধরের পুত্র রত্নধর। এই রত্নধর জগদ্ধরের পিতা।

জগদ্ধাতৃ (পুং) জগতাং ধাতা ৬তং। ১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব।

জগদ্ধাত্রী (স্ত্রী) জগতাং ধাত্রী ৬তং। ১ দুর্গামূর্ত্তি বিশেষ।

ভারতবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আন্তিকগণের মধ্যে বহুকাল হইতে মূর্ত্তিনির্মাণ করিয়া ইহার পূজা প্রচলিত আছে। কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা কর্তৃক প্রথমে এই পূজা আরম্ভ হয়, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শারদীয় দুর্গাপূজা প্রচলিত হইবার পরে জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত হইয়াছে। বাদশালায় কাহারও বিশ্বাস যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে মৃগয়ী প্রতিমা গড়িয়া জগদ্ধাত্রী পূজা করেন।

যে নিয়মে, যে পদ্ধতিতে এবং যে ফলকামনায় মহা ধুমধামে তিনদিনব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই নিয়ম, সেই পদ্ধতি ও সেই কামনায় এক দিনে তিনবার জগদ্ধাত্রীপূজা করা হয়। ইহাকে একরূপ সংক্ষেপে এক দিন-নিষ্পাণ্ড দুর্গাপূজা বলা যাইতে পারে।

কাভ্যায়নীতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র, কুজিকা-তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণ, স্বতীসংগ্রহ ও দুর্গাকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে অল্পবিস্তর জগদ্ধাত্রীপূজার উল্লেখ আছে।

নিগমকল্পসার জ্ঞানসারস্বত গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীপূজার কাল ও বিধি এইরূপ লিখিত আছে। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের নবমীতিথিকে দুর্গানবমী বলে। সেই দিনে দুর্গাপূজা করিলে চতুর্ভগ্ন লাভ হয়। প্রাতে সাঙ্ঘিকী, মধ্যাহ্নে রাজসিকী এবং

সারংকালে তামসী এই ত্রিকালিকী পূজা করা উচিত। সপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত ত্রিবিধ পূজা করিয়া দশমীতে যে প্রকার বিসর্জনের বিধান আছে, সেইরূপ ইহাতে একদিনে ত্রিবিধ পূজা করিয়া দশমীতে বিসর্জন করিতে হয় (১)। এই নবমী তিথি কোন দিনেও ত্রিসঙ্খ্যাব্যাপিনী না হইলে যেদিন প্রাতঃকালব্যাপিনী নবমী হইবে, সেই দিনে তিনবার পূজা করা উচিত। কিন্তু এইরূপ হলে যদি নবমী প্রাতে মুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী না হয়, তবে পূর্বদিনেই করা উচিত। এক সময়ে তিন পূজা করা অবিধেয়, অতএব তিন বেলা তিন পূজা করিবে (২)। এরূপ হলে দশমীতে বলিদান দেওয়া নিষিদ্ধ নহে (৩)। কাত্যায়নীতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র প্রভৃতিরও এই মত।

এতত্ত্ব কাত্যায়নীতন্ত্রের মতে চন্দ্র কুন্তরানিগত হইলে কার্তিকেয় নবমী তিথিতে উষাকালে সূর্যোদয়ে পুত্র, আরোগ্য ও বলকামনায় এবং শনিবার বা মঙ্গলবারে যোগ থাকিলে চতুর্বর্গকামনায় দুর্গাপূজা করিবে (৪)। কাত্যায়নী-তন্ত্রে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

এক সময়ে কএকজন দেবতা মনে মনে ভাবিলেন যে, আমরাই ঈশ্বর, এতত্ত্ব অপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার দরকার নাই। দেবগণের এতাদৃশ গর্ক জানিয়া জগন্মাতা চৈতন্যরূপিনী ভগবতী দুর্গা দেবগণকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতির্ময়ীরূপে দেবগণের নিকটে আবির্ভূত হইলেন, লোক-ভরসার কোটীসূর্যের স্তায় দীপ্তিযুক্ত সেই তেজোরশি অব-

লোকনে দেবগণ ভীত হইয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া পবনকে ওঠা কি পদার্থ তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন। বায়ু ক্ষতগমনে সেই তেজঃপুঞ্জের নিকট উপস্থিত হইলে তেজোময়ী দেবী বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘যদি তুমি এই তৃণটী লইয়া বাইতে পার, তবে তোমাকে বলবান্ বলি।’ বায়ু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তৃণটীকে নড়াইতে পারিলেন না, অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিলেন। ইহার পরে অগ্নিদেব আসিয়াও সেই তৃণগাছিকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। ইহার পরে সকল দেবতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরী স্বীকার করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে জগদ্ধাত্রী আবির্ভূত হন। কেনোপনিষদে হৈমবতীর আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প লিখিত আছে। ইহাতে অনেকেই উভয়কে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। ইনি যুগেজ্জের উপরে উপবিষ্টা, মুখ হস্তযুক্তা, শরীর সর্কালদ্বারে বিভূষিতা, ইহার চারিখানি হাত, পরিধানে



রক্তবস্ত্র, শরীরের বর্ণ নবোদিত সূর্যের স্তায় ও কোটি চঞ্জের স্তায় আভ্যুক্ত নাগযজ্ঞোপবীত ও তিনটি চক্ষু এবং দেবর্ষি ও মুনিগণ সর্বদাই ইহার সেবার নিযুক্ত আছেন। ইহার ধ্যান—

“সিংহরূপাধিক্রাণ্ডং নামালঙ্কারভূষিতাম্।

চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥

শঙ্খচক্রধরুর্কাণ্ডলোচনত্রিতয়াধিতাম্।

রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীং তমুসম্ ॥

নারদাঠৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবভ্রমরীম্।

ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমুগালিনীম্ ॥

(১) “কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ বা দুর্গানবমী তিথি।

সি প্রপত্তা মহাদেব! মহাদুর্গাপ্রপূজনে।

প্রাতঃ সাত্ত্বিকীপূজা মধ্যাহ্নে রাজসী মতা।

সারংকালে তামসী পূজা ত্রিবিধা পরিকীর্তিতা।

সপ্তম্যাদিনবম্যন্তঃ পূজাকালমিতীরিতম্।

ত্রিদিনে ত্রিবিধা পূজা দশম্যাক বিসর্জয়েৎ ॥

পূজা পরে হুংকি দেবেশ তজাপাত্ত বিসর্জনম্ ॥”

(২) “ত্রিসঙ্খ্যাব্যাপিনী বহিষ্ঠাঙ্গনবমী তিথিঃ।

ত্রিকালে ত্রিবিধা পূজা কথং দেব্যা জগন্ময়ি।

ইতি শ্রুত—

সাপ্রাতঃব্যাপিনী বত্র বাসরে নবমী তিথিঃ।

ত্রিসঙ্খ্যং পুজয়েত্তত্র বাসরে জগদধিকাম্।

মুহূর্ত্তব্যাপিনী চাপি তত্র গ্রাহ্য মনোহর ॥” (দুর্গাকল্প)

(৩) “নবমী তিথিমাশ্রিতা বত্র পূজামির্ভবেৎ।

নিষিদ্ধং বলিদানন্ত দশম্যাং তত্র কুলারি ॥”

“নবমী দিবসমাশ্রিতা পূজাবিধিরিহোদিতঃ।

দশম্যাং বলিদানন্ত মিষিদ্ধং নাত্র পার্জতি ॥”

(৪) “পুত্রারোগ্যবলং লেভে লোকসাক্ষিসম্বেচ।

তাঃ তিথিঃ প্রাপ্যমুহূঃ শনিভোমহিনে বদ ॥” (কাত্যায়নী তন্ত্র ৭৮)

রক্ষীপে মহাবীপে সিংহাসনসমধিতে ।

প্রহরকমলারূপাং ধ্যানেভ্যং ভবগেহিনীম ॥”

(কাত্যায়নীতন্ত্র ৭৭ পটল)

জগদ্ধাত্রীর যজ্ঞ—প্রথমে তিনটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া ত্রিবিধ ও ত্রিরেখাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে যথাবিধানে বজ্র ভূপুর লিখিতে হয়। ইহাকে জগদ্ধাত্রীযজ্ঞ বলে। [ইহার অপর বিবরণ চূর্ণা ও চূর্ণাপূজা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ সরস্বতী। “জগদ্ধাত্রীমহং দেবী মারিরাধয়িষুঃ শুভাম্।

স্তোম্যে প্রণম্য শিরসা ব্রহ্মোনিং সরস্বতীম্ ॥” (মার্ক ২৩৩০)

জগদ্বল (পুং) জগতাং বলমন্মাদং বহতী। বায়ু। উপনিষদের মত পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রাণীগণের বল কার্যের প্রতি বায়ু (ব্যান বায়ু) প্রধান কারণ, এই কারণে বায়ুকে জগদ্বল নামে উল্লেখ করা হয়। [ইহার অপরূপ বিবরণ বায়ু শব্দে দেখ।]

জগদ্যোনি (পুং) জগতাং যোনিরূপস্তিহানং ভূতং। ১ শিব।

“জগদ্যোনিং জগদ্বীজং জয়িনং জগতোগতিম্ ॥” (ভাং ৭২০০।১০)

২ বিষ্ণু। “তং সমেত্য জগদ্যোনিমনাদিনিধনং হরিম্ ॥”

(বিষ্ণু ১।১২।৩২) ৩ ব্রহ্মা। “জগদ্যোনির্যোনিং জগদ্যো-

নিরন্তকঃ ॥” (কুমার ২।৯) ৪ পরমেশ্বর। (দ্বী) ৫ পৃথিবী।

(শব্দচক্রিকা)

জগদ্বন্দ্য (পুং) জগতাং বন্দ্যঃ ভূতং। জগৎপূজ্য, কৃষ্ণ।

“ববন্দে চরণৌ মূর্ধ্না জগদ্বন্দ্যঃ পিতৃষশ্বঃ ॥” (ভার ২।২।৩)

জগদ্বহা (স্ত্রী) জগন্তি বহতি ধারয়তি জগদ্বহ-অচ-টাপ্।

পৃথিবী। (ত্রিকাণ্ড)

জগদ্বক্ষুশার্ম্মা, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনার রাজা শম্ভুচন্দ্র রায়ের অন্তর্গত ইনি আরব্যোপজ্ঞাসের প্রথম ৫০ রাজির গরুড়ি সংস্কৃত ভাষায় গথ পদ্যে অমুবাদ করেন। এই সংস্কৃত আরব্যোপজ্ঞাসের নাম “আরব্যামিনী”।

ইহাতে মোট ১৫৮৪১ শ্লোক আছে।

জগদ্বিনাশ (পুং) জগতাং বিনাশো ধ্বংসো যজ্ঞ বহতী। যুগান্ত, প্রলয়কাল। (হলায়ুধ) প্রলয়কালে সমস্ত জন্তু ভাব-পদার্থের বিনাশ হয় বলিয়া তাহাকে জগদ্বিনাশ বলে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রলয় শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জগনন্দকবি, কালিদাস ত্রিবেদীকৃত “হাজারা” নামক কবিতা-সংগ্রহে ধৃত অনেক কবি। ইনি ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

জগনন্দকবি, একজন হিন্দী কবি, বৃন্দাবনে ইহার বাস ছিল। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইনি অমগ্রহণ করেন। অপরাপর বৃন্দাবনী কবিদিগের জায় ইহার কবিতামালা ও কালিদাস ত্রিবেদীকৃত হিন্দীকবিতা-সংগ্রহ “হাজারা” নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

জগনিক, ইহার অপর নাম জগনায়ক। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি এসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি রাজপুতানায় এসিদ্ধি রাজকবি চাঁদবর্দাইয়ের সম-সাময়িক। ইনি রাজকবি ছিলেন। বুদ্ধেল-খণ্ডে মহোবা নামক স্থানের রাজা পরমর্জীর (পরমজ) সভায় থাকিতেন। ইনি পৃথীরাজের দহিত পরমর্জীর বুদ্ধম্যাপার লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন। চাঁদকবির “পৃথীরাজ-রাস” নামক মহাকাব্যের মহোবা খণ্ডটি অনেকের মতে প্রসিদ্ধ এবং এই জগনিক কবির লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়।

জগনেশকবি, বাঁকিপুরের এসিদ্ধি হিন্দুস্থানী কবি, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের “সুন্দরীতিলক” নামক কবিতাসংগ্রহে এই কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

জগন্নাথ, ভারত মধ্যে এখনকার সর্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র। উৎকলের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে পুরীজেলার মধ্যে (অক্ষা° ১৯° ৪৮' ১৭" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৫১' ৩৯" পূঃ) সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই স্থান নীলাচল, পুরী, পুরুষোত্তম, ত্রীক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র ও কেবল ক্ষেত্র নামেও বিখ্যাত।

দারুভ্রুক ত্রীজগন্নাথের আবির্ভাব হেতু এই স্থান সর্বত্রই জগন্নাথ নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতবাসী উচ্চ নীচ সকল হিন্দুর নিকট জগন্নাথ অপেক্ষা পুণ্য স্থান আর জগতে নাই, এখানে স্বর্গদ্বার, এখানে বৈকুণ্ঠ, এখানে ভুক্তিমুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবান্ দারুভ্রুকরূপে বিরাজ করিতেছেন, এখানে ছোট বড় বিচার নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ সকলেই এখানে সমান, এখানে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই একত্র মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেন, এমন শাস্ত পবিত্রভাব আর হিন্দুজগতে কোথাও নাই, তাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভক্ত হইতে অতি বড় মহারাজাধিরাজ সকলেই এই স্থান প্রকৃত নির্মাণ-মুক্তির স্থান বলিয়া জান করেন, তাই লক্ষ লক্ষ যাত্রী ধনপ্রাণে ক্রক্ষেপ না করিয়া শতসহস্র কষ্ট ভোগ করিয়াও মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া থাকে। এমন মহাপুণ্য স্থানের বিবরণ কোন্ হিন্দুর না জানিতে ইচ্ছা হয়?

ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, বৃন্দপুরাণে উৎকলখণ্ড, কুর্খ, পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণীয় পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, কপিলসংহিতা, নীলাদ্রি-মহোদয়, পুরাণসর্বস্ব, বিষ্ণুরহস্য, মুক্তিচিন্তামণি, রঘুনন্দন-কৃত পুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব, পুরুষোত্তমপুরাণ, আগমকল্পতরু, পুরুষোত্তমপুরীমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে, উৎকল ভাষায় লিখিত মাণ্ডন্যাদাস ও শিগুরামকৃত ক্ষেত্রপুরাণ ও দারুভ্রুক, মহাদেবদাসকৃত নীলাদ্রিমহোদয় এবং বেকটাচার্য্যরচিত তৈলজভাষায় জগন্নাথমাহাত্ম্য, বলকবি মুকুন্দরামকৃত জগন্নাথ-মঙ্গল এবং পুরুষোত্তমচক্রিকা নামক গ্রন্থে জগন্নাথদেব ও

জগন্নাথক্ষেত্রের মাহাশ্মাদি অন্নবিস্তর বর্ণিত আছে, এতদ্বির মন্তপুরাণ, বরাহপুরাণ ও প্রভাসখণ্ডে পুণ্যধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

জগন্নাথের উৎপত্তি।—পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্নবিস্তর মতভেদ আছে, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।

নারদপুরাণে উত্তরভাগে (৫২-৫৬ অঃ) লিখিত আছে—

‘একদিন সুরেন্দ্রপর্ষতে লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন, “নাথ! পৃথিবীতে এমন কি আছে, বাহাতে মানব সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে?”’

ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—“দেবি! পুরুষোত্তম নামে এক মহাতীর্থ আছে, ত্রিলোকের মধ্যে তেমন স্থান আর কোথাও নাই। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে একটা কর্ণস্থায়ী বটবৃক্ষ আছে, এই কর্ণবৃক্ষের উত্তরে গিয়া তাহার কিছু দক্ষিণে কেশবপ্রতিমা আছে, স্বয়ং ভগবান্ কর্ণক সেই মূর্তি নির্মিত হইয়াছে। সেই মূর্তি দর্শন করিলে মানব বৈকুণ্ঠলাভ করেন (১)। একদিন ধর্মরাজ সেই মূর্তি দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আমার নিকটে গিয়া বিস্তর স্তব জ্ঞতি করিয়া বলিয়াছিল, ‘ভগবান্! আপ-নার ইন্দ্রনীলময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া সকলেই মুক্ত হই-তেছে, সুতরাং আমার কার্য্য কিছুই হইতেছে না (২)। অত-এব আমার একান্ত নিবেদন, আপনার ইন্দ্রনীলময়ী মূর্তি গোপন করুন। তখন আমার সেই মূর্তি বল্লমধ্যে গোপন করিলাম।’ (৩) (নারদ উঃ ৫২ অঃ)

‘সত্যযুগে ইন্দ্রহ্যর রাজা জন্মগ্রহণ করেন, একদিন তাঁহার বিষ্ণুপূজা করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি কি প্রকারে কোথায় বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, এই দারুণ চিন্তায় অস্থির হইলেন। মনে মনে সকল তীর্থস্থানই একবার ভাবিয়া লইলেন, কিন্তু তবু তাঁহার মন উঠিল না। তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান এবং পুরুষোত্তমে প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। (নারদ উঃ ৫২) কিন্তু সেই প্রাসাদে তিনি কি

মূর্তি স্থাপন করিবেন, কিরূপে তিনি সর্গহিত্যন্তকারী পুরুষো-ত্তমের দর্শন লাভ করিবেন, তাঁহার এই বড় ভাবনা হইল। আহা! ত্যাগ করিলেন, কেবল বিষ্ণুর স্তব জ্ঞতি করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রহ্যর কুশাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন, এই সময় ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন—‘হে মহীপাল! তোমার যাগ যজ্ঞ ও ভক্তি শ্রদ্ধায় আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার সনাতনী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। আজ যখন নিশা অবসানে নির্মল ভাস্কর উদিত হইবে, তুমি সাগরতীরে জলে স্থলে এক মহা বৃক্ষ দেখিতে পাইবে (৪)। একাকী পরশু হস্তে তথায় যাইবে। সেই বৃক্ষে আমার প্রতিমা নির্মাণ করিবে।’ এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রহ্যর প্রাতে উঠিয়া প্রথমে সাগর-সলিলে স্নান করিলেন, পরে পবিত্রভাবে হৃষ্ট চিত্তে সাগরকূলে সেই মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেদ্রুপ বৃক্ষ তিনি কখনও দেখেন নাই; বুলিলেন ভগবানের রূপা হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই স্বয়ং বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন (৫)। নৃপতি ইন্দ্রহ্যর পরশুদ্বারা সেই বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন, এমন সময় বিষ্ণু সেইখানে আসিয়া কহিলেন, “মহাবাহো! এই নির্জন গহনে সমুদ্রতীরে একাকী কিসের জন্ত বৃক্ষ ছেদন করিতেছ, তোমার কি প্রয়োজন?” রাজা সেই তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—“জগৎপতির পূজার জন্ত তাঁহার প্রতিমা নির্মাণ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, সেই জন্ত এই বৃক্ষছেদন করিতেছি।”

বিষ্ণু রাজার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “রাজন্! তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, আমার সহিত বিশ্বকর্মার সমকক্ষ একজন শিল্পী আসিয়াছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই শিল্পী প্রতিমা নির্মাণ করিতে পারে।”

ইন্দ্রহ্যর তখনই সম্মত হইলেন এবং বিশ্বকর্মার নিকট গিয়া তাঁহাকে এইরূপ প্রতিমা নির্মাণ করিতে কহিলেন,—প্রথমটী পদ্মপত্রায়তনদ্বয়, শঙ্খচক্রগদাধর, শান্ত কৃষ্ণমূর্তি; দ্বিতীয়টী গোন্ধীরসদৃশ গৌরবর্ণ ও লাললাজধারী মহাবল

(১) “প্রতিমাং ভক্ত ভাং দৃষ্টু। স্বয়ং দেবেন নির্মিতং।

অনার্যাসেন বৈ বাস্তি ভবনং মে ভতো নরাঃ।”

(নারদপুঃ উত্তঃ ৫২।১২)

(২) “ইন্দ্রনীলময়ে দৃষ্টু। প্রতিমা সার্বকামিনী।

ভাং দৃষ্টু। পুণ্ডরীকাস্তাব্যবৈকেন শুভয়া।

যেতাথ্যং ভুবনং বাস্তি নিদ্রামাক্তব মানবাঃ।” (৫২।১৫।)

(৩) “ততঃ সা প্রতিমা দেবি যদীতিগোপিতা মম।।

বধা তত্র ন পতন্তি নমুনাঃ বর্ণকাক্ষিণঃ।” (৫২।২৮।)

(৪) “জলং তথৈব বেলারং দৃশ্যতে বজ্র বৈ মহৎ।

লবণভোদধৌরাজঃসুরকৈঃ সমভিগুতঃ।

কুলালবী মহাবৃক্ষঃ স্থিতঃ স্থলজলেষু চ।”

(নারদপুঃ উঃ ৫৪।২২-২৩।)

(৫) “বিশ্বকর্মা চ বিকৃত বিস্ময়পদ্যাবুভৌ।

আজগতু মহাভানৌ তথা ভূলাগ্রজগদনৌ।”

(নারদপুঃ উঃ ৫৪।২৬।)

অনন্তমুর্খি এবং তৃতীয় বাহুদেবের ভগিনী হুতদ্রার কল্পবর্ণ ও স্তোত্রোক্তন মুর্খি হইবে। তদনুসারে বিশ্বকর্মা কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল-বিভূষিত ও হস্তে চক্রলাঙ্গলাদিশোভিত ঐরূপ মুর্খি নির্মাণ করিলেন (৬)। মুর্খি অবলোকন করিয়া ইন্দ্রহ্যম প্রেমে ভাসিতে লাগিলেন। তখন তিনি সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্বক ব্রাহ্মণরূপী দেবদ্বয়কে কহিলেন, “দেব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অথবা স্বয়ং রুবীকেশ, আপনারা কে? আমরা যথার্থ পরিচয় দিন।”

‘বিজরূপী বিষ্ণু পরিচয় দিলেন, “আমি স্বয়ং পুরুষোত্তম। আমিই বিষ্ণু, আমিই ব্রহ্মা, আমিই শিব, আমিই স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। হে রাজন! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি দশহাজার নয় শত বর্ষ রাজত্ব করিবে, তৎপরে পরাংপর নির্লেপ নিঃশূণ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র ও দেবগণ থাকিবে, ততদিন তোমার কীর্তি স্থায়ী হইবে। তোমার যজ্ঞাসমুদ্র ইন্দ্রহ্যমসরোবর মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য হইবে। সেই সরোবরের দক্ষিণে নৈঋতকোণে বটবৃক্ষ আছে, তাহার নিকট কেতকীবন-ভূষিত নানা পাদপরাঞ্জি-বেষ্টিত মণ্ডপ আছে, আষাঢ়মাসের শুক্লপঞ্চমীর

দিন সাতদিন যাবৎ মহোৎসব করিয়া তথায় ইষ্টদেবকে স্থাপন করিবে।”

‘আজ ইন্দ্রহ্যম ধস্ত হইলেন। নৃত্যগীতবাদ্যাদিপূর্বক মহাসমারোহে পুরোহিতাদি-পরিবৃত হইয়া সেই মুর্খিত্রয় রথে করিয়া আনিয়া প্রাসাদে বিধিবৎ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর বহুতর যাগযজ্ঞাদি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিলেন।’ (নারদ পুং ৫৪ অঃ)

ব্রহ্মপুরাণেও জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। নারদপুরাণে ইন্দ্রহ্যম ব্যতীত আর কোন রাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, যে রাজা ইন্দ্রহ্যম প্রথম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কলিঙ্গরাজ, উৎকলরাজ এবং কোশলরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (৭)।

ব্রহ্মপুরাণীয় উৎকলখণ্ডে অন্তপ্রকার উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহা এইরূপ—

‘ব্রহ্মা চরাচর সৃষ্টি করিলেন, যথাস্থানে তীর্থ সকল স্থাপন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে ত্রিতাপে সন্তপ্ত প্রাণীগণ মুক্তিলাভ করিবে, কি উপায়ে আমি এই গুরুভার বহন হইতে নিষ্কৃতি হইব, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার মনের কথা জানিয়া বলিলেন, ‘সাগরের উত্তরকূলে মহানদীর দক্ষিণে এক প্রদেশ আছে, এখানে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থের ফল হয় (৮)। মানব পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্যফলে এখানে আসিয়া বাস করে, অল্পপুণ্য ও ভক্তিহীন মানব এখানে জন্মিতে পারে না। একান্তকানন হইতে দক্ষিণসমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রতিপদে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতম বলিয়া জানিবে। পৃথিবীর মধ্যে তোমারও তুল্য অতিশুণ্ড নীলাচল সমুদ্রতীরে বিরাজ করিতেছে, আমার মায়ায় আচ্ছাদিত বলিয়া দেবদানব কেহই জানিতে পারে নাই। আমি সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সর্ব্বসঙ্গ-পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সশরীরে বাস করিতেছি। এই পুণ্যধাম সৃষ্টি বা

- (৬) “অবৈতথ্যচনং ভক্ত বিশ্বকর্মা যক্ষপুংকং ।
ভংকণাৎ কারমামাস প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ ।
কুণ্ডলাভ্যাং বিচিত্রাভ্যাং কর্ণাভ্যাং সুবিরাজিতাঃ ।
চক্রলাঙ্গলদ্বিন্যাসহস্তাভ্যাং সাধুসমতাঃ ।
প্রথমঃ শুক্লবর্ণাভঃ পারশ্বেকু সমগ্রভম্ ।
সুরকাংক-মহাকাযঃ জটাবিকটমস্তকম্ ।
নীলাম্বরধরঃ চোত্রাং বলং বলসদোদ্ধতম্ ।
কুণ্ডলৈকপদং দ্বিবাং মহাসমূলধারিণম্ ।
বিতীরঃ পুণ্ডরীকাকং নীলজ্যোতঃসম্ভিতম্ ।
অন্তসীপুশ্পসন্ধাংশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
শ্রীবাংসবক্ষসং ব্রাজ্যং গীতবাসসমচূতাম্ ।
চন্দ্রপূর্ণকরং দ্বিবাং সর্ব্বপাপহরং হরিম্ ।
তৃতীয়াং স্বর্ণবর্ণাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্ ।
বিচিত্রবস্ত্রসংছারাং হারকেয়ুরভূষিতাম্ ।
বিচিত্রাভরণোপেতাং রক্তমালাবিলম্বিতাম্ ।
পীনোরতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্মা বিনির্ম্মমে ॥”

(নারদপুং উঃ ৫৪।৫৮-৬৫ সৌক।)

“কৃষ্ণপদরং শান্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
শ্রীবাংসকোমলভরং লম্বচন্দ্রগদাধরম্ ।
সৌরং গোক্ষীরবর্ণাভং বিতীরঃ * * কাঙ্ককম্ ।
লাঙ্গলাগ্রধরং দেবং অনন্তাখ্যং মহাবলম্ ।
ভগিনীং বাহুদেবত কল্পবর্ণাং স্তোত্রবানম্ ।
তৃতীয়াং বৈ হুতদ্রাক সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্ ॥” (নারদপুং ৫৪ অঃ)

(৭) “কলিঙ্গাধিপতিঃ শুরমুৎকলাধিপতিঃ ভবা ।

কোললাধিপতিঐকঃ ॥” ইত্যাদি (ব্রহ্মপুং ৫৫ অঃ)

(৮) “সাগরতোত্তরতীরে মহানদ্যাং দক্ষিণে ।

স প্রদেশঃ পৃথিব্যাংহি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ।

একান্তকাননাং বাবদক্ষিপদোদধিতীরভূঃ ।

পদাং পদাং শ্রেষ্ঠতমা ক্রমেণ পরিকীৰ্ত্তিতা ।

সিদ্ধতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্কভঃ ।

পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি হৃদয়ভম্ ।

করাঙ্করাবতিক্রম্য বর্ন্তেহং পুরুষোত্তম ॥

স্টোত্রলয়েন নাত্রাভং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তম ॥” (উৎকলখং)

এলরকালেও আক্রান্ত হয় না। এখানে চক্রাবর্তিহিত আমার বৈষ্ণব দেখিতেছ, সেখানেও ইহার অমূল্য মূর্তি দেখিতে পাইবে। তথায় কল্পকুণ্ড ও তাহার পশ্চিমে রোহিণকুণ্ড আছে। আমাকে দর্শন করিয়া সেই কুণ্ডের নির্মল বারি পান করিলে মানব আমার সাধুজ্য প্রাপ্ত হয়।”

‘বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ব্রহ্মা নীলাচলে গমন করিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন একটি কাক রোহিণকুণ্ডে ভ্রাম ও জলপান করিয়া ভগবানকে দেখিবারাত্র বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করিয়া নীলমাধবের পার্শ্বে বস করিতে লাগিল। এদিকে ধর্মরাজ সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়া ভগবানের স্তুত করিতে লাগিলেন। নীলমাধব দৃষ্ট হইয়া লক্ষীকে ক্রোড়িত করিলে দেবী বলিলেন,—‘ধর্মরাজ! তুমি ভয় পাইয়াছ, যে যদি সকলেই কাকের মত মুক্ত হয়, তবে আর তোমার আধিপত্য থাকিবে না, এ আশঙ্কা অমূলক। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ব্যতীত আর সকল স্থানেই তোমার অধিকার, কেবল এখানে কেহ প্রাণত্যাগ করিলে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। পরাধিকাল পর্যন্ত আমরা এখানে নীলকান্তমণি-ময়ী মূর্তিতে অবস্থান করিব, পরে অপরাধের প্রারম্ভে খেত বরাহকয়ে স্বায়ত্ত্ব মন্তরে ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ রাজা ইন্দ্র-চ্যামের আসিবার পূর্বেই আমরা অন্তর্হিত হইব। ইন্দ্রচ্যাম শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পর পুনরায় দাক্ষময়ী চারিটা মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া অপরাধকাল পর্যন্ত এখানে অবস্থান করিব।” তখন ব্রহ্মা ও ধর্মরাজ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া আসিলেন।

‘অপরাধের প্রথমে দ্বিতীয় সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রচ্যাম অবন্তিনগরে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পরম ভাগবত হইয়া উঠিলেন। একদিন পূজার সময় বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া কএক জন বেদবিদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি বলিতে পারেন, আমি এই চন্দ্র-চক্রে জগন্নাথের দর্শন পাই, এমন পবিত্রস্থান কোথায় আছে?” তথায় একজন তীর্থ-পর্যটক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজার কথা শুনিয়া কহিলেন, “রাজন! আমি বহু কাল হইতে অনেক তীর্থ পর্যটন করিতেছি ও অনেক ভ্রমণকারীর নিকটও বহু তীর্থের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্র আপেক্ষা পুণ্যস্থান আর কোথাও নাই। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ওড়্রদেশে কাননাবৃত নীলাচল মধ্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র মধ্যে ক্রোশবাপী একটি কল্পবট, তাহার পশ্চিমভাগে রোহিণকুণ্ড, এবং এই কুণ্ডের পূর্বভাগে নীলকান্তমণি-নির্মিত ভগবানের নীলমাধব মূর্তি আছে, আপনি তথায় গিয়া সেই কৈবল্যদায়িনী মূর্তি দর্শন করুন।”

‘তপস্বী ব্রাহ্মণ এই বলিয়া সর্ব সন্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ইন্দ্রচ্যাম সেই ব্রাহ্মণের কথা ঠিক কি না জানিবার জন্ত পুরোহিতের ভ্রাতা বিভাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন।

‘বিভাপতি নানাহান অতিক্রম করিয়া মহানদী পার হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে চারিদিকে নিবিড় বন, বিদ্যাপতি কোথায় বাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কুশাসনে বসিয়া এক মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় বেদধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নীলগিরির পশ্চাতে শবররূপে শবরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় বিশ্বাস্ত্র নামে এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পূজা করিয়া নির্মাণ্য চন্দন ও ভোগাবশেষ লইয়া গৃহে আসিল। সে বিদ্যাপতির নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য শুনিয়া প্রথমে ভগবানকে দেখাইতে অসম্মত হইল। পরে ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিদ্যাপতিকে রোহিণকুণ্ডে লইয়া গেল, বিপ্রবর তথায় ভ্রাম করিয়া নীলমাধবকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া অনেক স্তুত জ্ঞতি করিলেন। পরে শবরের সহিত শবরালয়ে আসিয়া তৎপ্রদত্ত ভোগ্য আহার করিলেন ও পরে বিশ্বাস্ত্রের সহিত বদ্ধতা করিয়া রাজার জন্ত দেবের নির্মাণ্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

‘ইন্দ্রচ্যাম দেবের নির্মাণ্য পাইয়া পুরুষোত্তমে যাইতে কৃত-সংকল্প হইলেন ও বিদ্যাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “আমি এ রাজ্য ছাড়িয়া সেই ক্ষেত্রে গিয়া বহুশত নগর, গ্রাম ও দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিব এবং জগন্নাথের প্রীতির জন্ত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব।” এই সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও রাজার অভিপ্রায় শুনিয়া তিনিও হৃষ্টচিত্তে রাজার সহিত যাইতে সন্মত হইলেন।

‘জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয় পূর্ণিমা-রাত্রিতে শুক্রবারে রাজা ইন্দ্র-চ্যাম সদলে পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উৎকলের সীমায় আসিয়া সুগুণালাবিত্ত্বিত করালবদনা চণ্ডিকাদেবীকে দর্শন ও তাঁহার পূজাদি করিলেন। তৎপরে চিত্রোৎপলা-নদীতীরে ধাতুকন্দর নামক বনে উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্ন-কালে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওড়্ররাজ উপহার লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, “হে অবন্তিরাজ! দক্ষিণ সাগরের কূলে নিবিড় বন মধ্যে নীলাচল অবস্থিত, তাহা অতি দুর্গম, লোকের কথা দূরে থাক, দেবতারও তথায় যাইতে পারেন না। অল্পদিন হইল, শুনিলাম যেদিন বিদ্যাপতি শবরপতির সাহায্যে নীলমাধব সন্দর্শন করিয়া অবন্তিপুণে ফিরিয়া যান, সেইদিন সন্ধ্যাকালে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে থাকে, তাহাতে সাগরের প্রান্তভূমি হইতে প্রবৃত্ত বালুকারণি

উড়িয় নীলাম্বকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই দিন হইতেই আমার রাজ্যে ক্ষীণ মূর্তিক ও অহামারী উপস্থিত হইয়াছে।” রাজা ইন্দ্রহায় একপংখ্য শুনিয়া, ভয়ংকর হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে সাহসনা করিয়া নারদ বলিলেন, “রাজন্! বিস্মৃত হইবেন না, বিষ্ণুভক্তের কোন কার্যই ব্যর্থ হয় না; আপনি তথায় গেলে অবশ্যই নীলমাধব মূর্তি দর্শন পাইবেন। ভগবান্ আপনার প্রতি রূপা করিয়া, চতুর্ধা মূর্তিতে দেখা দিবেন।”

‘পরে সকলে মহানদী পার হইয়া, একান্তকাননে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে নারদের মুখে একান্তর উৎপত্তির কথা শুনিয়া ইন্দ্রহায় ত্রিভুবনেশ্বরের পূজাদি সমাপন করিলেন। ত্রিভুবনেশ্বর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, “রাজন্! তোমার মত বৈষ্ণব আর নাই, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।”

‘এখন ইন্দ্রহায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথে কপোতেশ্বর ও বিবেশ্বর দর্শন করিয়া পুরুষোত্তমের প্রাস্তসীমায় নীলকণ্ঠের নিকট আসিলেন। এখানে ইন্দ্রহায় অনেক কুলকণ দেখিতে লাগিলেন, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন, “মন্দ হইতেই আবার ভাল হয়। স্মরণ্য আপনি বিষয় হইবেন না। আপনার পুরোহিতের কনিষ্ঠ সহোদর বিদ্যাপতি, নীলমাধব দর্শন করিয়া গাইবার পর, নীলাচল বালুকায় ঢাকিয়া গিয়াছে এবং সেই নীলমাধব পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন।” এ নিদারুণ কথা শুনিয়া রাজা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ তাঁহাকে শাস্ত করিবার জন্ত কহিলেন, “রাজন্! আমি বার বার বলিতেছি, শুভকার্য্যে পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে, এজন্ত আপনার চঃখিত হওয়া উচিত নহে। এখন স্থির চিত্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া গদাধরকে সন্তুষ্ট করুন, তাহা হইলে তাঁহার দেখা পাইবেন।”

‘রাজা নারদের কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করিলেন এবং তাহার অনতিদূরে জ্যৈষ্ঠ গুরুষাদশী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রে নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহারই সমুখে তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নীক্ষিত হইলেন।

‘যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে শেষরাত্রে তিনি স্বপ্নে ষেতদ্বীপস্থ ভগবানের অপূর্ণ মূর্তি দেখিতে পাইলেন। নারদ রাজার মুখে তাহা শুনিয়া কহিলেন, “স্বর্ঘ্যোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অতএব দশদিনের মধ্যেই ইহার কল প্রত্যক্ষ হইবে। এই যজ্ঞ শেষ হইলেই বৈকুণ্ঠনাথ দেখা দিবেন।”

‘যজ্ঞাবসানে বাজিকগণ উল্লাসাদিধ্বরে বৈদিক স্তুতিপাঠ করিতেছেন, এমন সময় রাজনিযুক্ত কাককণ্ডলি ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে জানাইলেন, “এই মহাসাগরের তীরে দ্বান করিবার পথে যজ্ঞিষ্ঠার জায় বর্ণ এক বৃক্ষ আলিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে শব্দ ও চক্রের চিহ্ন আছে। একপংখ্য আমরা কখন দেখি নাই, তাহার স্তম্ভ সমুদ্রতীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে (৯)।”

‘তখন নারদ সহস্রমুখে রাজাকে বলিলেন, “নৃপবর! আপনার যজ্ঞের ফল-স্বরূপ এই কাষ্ঠ আসিয়া পড়িয়াছে। আপনি স্বপ্নে ষেতদ্বীপে যে মূর্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারই অঙ্গস্থলিত রোম বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ভগবানের অংশাবতার অপৌরুষেয় যে মূর্তি দেখিয়াছেন, ভগবান্ এই তরুতে সেই মূর্তি ধারণ করিবেন।” নারদের কথা মত ইন্দ্রহায় সমুদ্রে গিয়া অবভূত দ্বান করিলেন এবং স্বপ্নে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, এই বহুশাখ বৃক্ষেও সেইরূপ চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিলেন। মহাসমারোহে নৃত্যগীত ব্যাপ্ত করিয়া সেই মহাতরু লইয়া আসিলেন এবং সেই তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞের মহাবেদীতে স্থাপন করিলেন। পূজাস্তে রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন বিষ্ণুর কিরূপ প্রতিমা নির্মাণ করাইব?” নারদও রাজাকে কহিলেন, “তিনি অচিন্ত্য, জগৎপতি, জগৎস্রষ্টা, তাঁহার রূপ কে স্থির করিতে পারে?”

(৯) ‘লক্ষিণে তটভূদেশে বিবেশ্বরসমীপতঃ।

নিযুক্তা সেবকা-রাজ্যে সসংজ্ঞমুপস্থিতাঃ।

জবেদরঃস্বঃ নৃপতিঃ কৃত্যজলিপুটা দ্বিধাঃ।

দেব দৃষ্টো মহাবৃক্ষস্তটভূমৌ মহোদধেঃ।

প্রবিষ্টাঃ সমুদ্রান্তকলোদগবমূলকঃ।

মাজ্জিতবর্ণঃ সর্বত্র লক্ষ্যচক্রাকৃতঃ শব্দঃ।

দ্বানবেশ্বরসমীপেহসৌ দৃষ্টোহমাতিঃ পরোহভূতঃ।

ন দৃষ্টপূর্বে। বৃক্ষোহমুদ্যানং স্বর্ঘ্যনিভাঃশুনা।

গজেন বাসয়ন্ সর্বাঃ তটভূমিঃ স্তম্ভকিনা।

ক্রমঃ সাধারণো নারঃ লক্ষ্যতে দেবভূকঃ।

কণ্ঠদেবস্তম্ভকযাজ্ঞাদাগতো লক্ষ্যতে প্রথম।

নিযুক্তানাং বচঃ প্রত্যা রাজা নারদমব্রবীৎ।

তৎ কিংনিমিত্তং বদন্তঃ তরুশ্রেষ্ঠং বদন্তি তে।

নারদঃ প্রহসন্ বাক্যমুবাচ নৃপসন্তমঃ।

পূর্ণাহতিসমাপ্তে তু যেন স্ত্রাং সকলঃ ক্রতুঃ।

উপস্থিতঃ তে তদ্বাগ্যং যদে বদন্তীবান্ পুরা।

ষেতদ্বীপে বত মূর্তি দৃষ্টো যো বিষ্ণুরায়ঃ।

তদঙ্গস্থলিতঃ রোম তরুভূমুপগম্যতে।

অংশাবতারঃ স্বামুশ পৃথিবাঃ পরমেশ্বিনঃ।

তরুগীচ তরুগীতি ভগবান্ তত্ত্বংসলঃ।

ক্রমোহসৌ পৌরুষের ভাজনঃ তত্ত্বংসলঃ। (উৎকলখঃ ১৮ অঃ)

এমন সময় আকাশবাণী হইল, “এই অপৌরুষেয় ভগবানকে ১৫ দিন ঢাকা দিয়া রাখ, একজন শত্রুপাণি বর্ষকি আসিয়া প্রবেশ করিলে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবে, যে পর্যন্ত না ভগবানের প্রতিমা নির্মিত হয়, সে পর্যন্ত তোমরা বাহিরে থাকিয়া নানা বাদ্য শ্রমি করিবে। যে প্রতিমা-নির্মাণের শক শুনিবে, তাহার বংশনাশ ও নরকে বাস হইবে। যে বেদী মধ্যে প্রবেশ করিবে ও দর্শন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। সেই মূর্তি মধ্যে ভগবান্ স্বয়ং আবিভূত হইবেন (১০)।”

‘ইজ্জদ্দাম দৈববাণী শুনিয়া তদনুসারে সকল কার্যই করিলেন। বিশ্বকর্মা বৃদ্ধ সূত্রধাররূপে আসিয়া মহাবেদী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ১৫ দিন অতীত হইল। রাজা স্বপ্নে ধেরূপ প্রতিমা দেখিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার দিন দ্বার উন্মোচন করিয়া ঠিক সেইরূপ মূর্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন—

‘ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত দিব্য রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। জগন্নাথের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, মাথায় উজ্জ্বল মুকুট; বলরামের হস্তে গদা, সুবল, চক্র ও পদ্ম (কর্ণে) কুণ্ডল ও মাথার উপর ছত্রাকারে সাতটা কণা; উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মধারিণী চাক্রমুখী সুভদ্রাদেবী বিরাজ করিতেছেন।’

উৎকলখণ্ডের মতে, এই সুভদ্রাই স্বয়ং চৈতন্তরূপিণী লক্ষ্মী, ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণীর গর্ভে বলদেবের রূপ চিত্রা করিয়া বলভদ্রা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি নীলমণির বিচ্ছেদ কখন সহিতে পারেন না। বলদেব ও কৃষ্ণে কিছুই ভেদ নাই। বলদেব ও সুভদ্রা একগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জ্ঞাত লোকিক ব্যবহারে ও পুরাণে সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী বলিয়া বর্ণিত হইরাছে। কিন্তু লক্ষ্মী জীপুরুষ উভয়-রূপেই সর্বদা বিরাজ করেন! তাঁহারই পুং নাম বিষ্ণু ও জী নাম লক্ষ্মী। ব্রহ্মবিদেরা সকলেই জানেন যে লক্ষ্মী-নারা-

(১০) “অপৌরুষেয়ভগবান্বিচারপথে হিতঃ।

সুহৃৎসারঃ মহাবেদ্যাং স্বয়ং সৌভ্য্য বরিষ্যতি।

প্রজ্ঞাত্য তাং দিলান্তেব বাবৎ পঞ্চদশানি বৈ।

উপহিতোরঃ বো বৃদ্ধঃ শত্রুপাণিত বর্ষকী।

একমন্তঃ প্রবিশ্তেব দ্বারং বধন্ত বরতঃ।

বহির্বাধ্যানি সুর্য্যস্তি বাবন্তবটনাং ভবেৎ।

ক্রতো হি ঘটনালকো বাধির্বাধ্যত্বদারকঃ।

নরকে বসতিকৈব সূর্য্যং সম্ভারনামনঃ।

নাভঃ প্রবেশনং সূর্য্যাপগন্তেচ্চ কদাচন।

অষ্টপুত্ৰাপি মহাজীতিরক্তচাচ যুগে যুগে।” (১৮ অঃ)

রূপে কিছুমাত্র ভেদ নাই। চতুর্দশ ভূবন মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ বাতীত কেহই কণাগ্রহণী এই চতুর্দশ ভূবনধারণে সমর্থ নহে। যে অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করেন, তিনিই বলদেব। বলদেব ও কৃষ্ণ অভিন্ন। তাঁহার শক্তিরূপা এই লক্ষ্মীই ভগিনীরূপে কীর্ণিত। শাখাগ্রস্তমধ্যাহ্ন যে সুদর্শনচক্র বিষ্ণুর হস্তে সর্বদাই বিরাজমান, সেই সুদর্শন বিষ্ণুর তুরীয়রূপ চতুর্থ মূর্তি (১১)।

ইজ্জদ্দাম ঐ চারিমূর্তি অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময় আবার আকাশবাণী হইল, “রাজন্! নীলাচলের উপর যে কলরূক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে শতহস্ত দূরে নৃসিংহমূর্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উত্তরে যে বিস্তৃত ভূমি আছে, তাহাতে হাজার হাত উচ্চ এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভগবানের মূর্তি স্থাপন কর। পূর্ব্বে এই নীলাচলে ভগবান্ অবস্থান করিতেন, তখন বিশ্বাবসু নামে এক শবরপতি তাঁহার পূজা করিত। তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। সেই বিশ্বাবসুর বংশধর আছে,

(১১) “নির্ধ্বাং স্বয়ং দেবঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশে দিনে।

চতুর্মূর্তিঃ স ভগবান্ বধাপূর্ব্বং মরোদিতঃ।

তাদ্গাণির্ধ্বকৃৎসো মুখাৎ বর্ণিতঃ পুরা।

দ্বিবাংসিংহাসনাক্রটৌ বলভদ্রাহৃদধীনঃ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মলক্ষ্মবাহর্জনাধীনঃ।

গদামূলচক্রাজং ধারয়ন্ত পদ্মপাকৃতিঃ।

ছত্রাকৃতিকণা সপ্তমুকুটাক্ষলমুকুটঃ।

সুভদ্রা চাক্রবদনা বরাজাতরধারিণী।

লক্ষ্মীঃ প্রার্ব্বকৃৎসবরং সর্বচৈতন্তরূপিণী।

ইদং কৃষ্ণাবতায়ৈহি রোহিণী গর্ভসম্ভবা।

বলভদ্রাকৃতির্ধাতা বলরূপন্ত চিত্তনাৎ।

কণং ন সহতে সা হি সৌক্যুং নীলাবতারিণম্।

ন ভেদম্বাঞ্জিকো বিশ্রাঃ কৃকন্ত চ বলন্ত চ।

একগর্ভপ্রসূতম্বাধ্যাবহারোহথ লোকিকঃ।

ভগিনী বলদেবন্ত চৈবা পৌরাণিকী কথা।

পুংরূপে জীবরূপেণ লক্ষ্মী সর্বত্র তিষ্ঠতি।

পুংনারা ভগবত্বী জীনারা কমলালরা।

দেবততি নমুখ্যাদৌ যিযোত্তনভরোঃ পুনঃ।

কোহন্তঃ পুণ্ডরীকাকান্ত বনানি চতুর্দশ।

ধারয়েন্তু কণাগ্রেণ সৌহিন্ত্যোবলসংজিতঃ।

তন্ত শক্তিবরূপেণ ভগিনী জীঃ প্রকীর্ণিতঃ।

সুদর্শনন্ত বজ্রং সলা বিকোঃ করে হিতম্।

শাখাগ্রস্তমধ্যাহ্ন তত্তপন্ত তুরীয়কম্।

এবন্ত মূর্ত্যন্তেচ চতুশ্রো বৈ একাশিতাঃ।” (উৎকলখণ্ড ১১ অঃ)

তাহাদিগকে আনিয়া জগৎপতির লেপ-সংস্কার ও উৎসবাদি নির্বাহ করিও।”

‘দৈববাণী শুনিয়া ইন্দ্রহ্যম বিশ্বাবস্তুর পুত্রবর্গকে আনিয়া লেপ-সংস্কার ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তাহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে ব্রহ্মার দ্বারা জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাদি করিবার জন্ত নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন।

‘যখন তিনি ব্রহ্মলোক উপস্থিত হন, তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত পূর্ণব্রহ্মের নীলা-গান শুনিতেছিলেন। এজন্ত ইন্দ্র-হ্যম কিছু না বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গান শেষ হইল, ব্রহ্মা তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন, “ইন্দ্রহ্যম! তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে আমি সন্মত, কিন্তু এই যে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে ইহাতে ৭১ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার রাজ্য বা বংশ কিছুই নাই, ইতি মধ্যে কোটি কোটি রাজা রাজত্ব করিয়া কালের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। সেই দেবতা ও দেবপ্রাসাদের সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। এখন স্বারোচিষ মহুর অধিকার চলিতেছে। তুমি কিছুকাল এখানে বিশ্রাম কর, শত্ৰু পরিবর্তন হইলে নরলোকে যাইও। দেবতা ও প্রাসাদ বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রব্য সংগ্রহ করিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।”

‘ইন্দ্রহ্যম বিধাতার আদেশে নারদের সহিত পুনরায় মর্ত্য-লোকে আগমন করিলেন এবং অনেক অহুসন্ধান করিয়া দেবমন্দির বাহির করিলেন।

‘তখন উৎকলে গাল নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি মাধব নামে দেবের এক প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া সেই প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে তিনি আরও পাঁচটি ছোট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তাহাতে মাধব প্রতিমা স্থাপন করেন। এখন ইন্দ্রহ্যম নামে একব্যক্তি আসিয়া সেই প্রাসাদে দেবপ্রতিষ্ঠা করিতেছে শুনিয়া গাল মহাক্রোধে সসৈন্তে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া জ্বলন্ত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার মন একবারে গলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া ইন্দ্রহ্যম ব্রহ্মা ও নারদের সাহায্যে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। গাল নৃপতির সে রাগ কোথায় চলিয়া গেল, তিনি আজ দারুণরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। (২৫ অঃ)। ইন্দ্রহ্যমকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ভাবিয়া তাঁহার যথা-বিধি সংস্কার করিলেন এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া আজ্ঞা-বাহী কৃত্যের জ্ঞায় সকল কর্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া ভরদ্বাজ মুনিকে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিলেন, তদনুসারে বৈশাখমাসে বৃহস্পতিবার পুণ্যানক্ষত্রে

শুক্র অষ্টমী তিথিতে প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা ও এক ধ্বজা স্থাপিত হইল। সে সময়ে ভগবান ইন্দ্রহ্যমকে সন্বেদন করিয়া বলিয়া ছিলেন, “তোমার নিদাম কার্য্যে আমি প্রসন্ন হইরাছি, তুমি কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়া আমার এই আরতন নির্মাণ করিয়াছ, কালে ইহা ভয় হইলেও আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না। আমি অপরাধকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে দারুণ-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিব।” দেবের নিত্যপূজা ও বিবিধ উৎসবাদি চলিতে লাগিল। যথাকালে ইন্দ্রহ্যম এই নম্বর জগৎ পরিত্যাগ করিলেন।” (১৫—২২ অঃ)

উৎকলখণ্ডে যেক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, কপিলসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলাদ্রিমহোদয়েও দেবের উৎপত্তি-বিবরণে অপর সকল বিষয়ে কপিলসংহিতা ও উৎকল-খণ্ডের মত, কেবল জগন্নাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতায় ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের কথা আছে; কিন্তু নীলাদ্রিমহোদয়ের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

‘পঞ্চদশদিন আসিলে, স্বয়ং ভগবান জনার্দন তথায় দিব্য রত্নসিংহাসনে বলদেব, ভদ্রা, সূদর্শন, বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ও মাধবের সহিত আবির্ভূত হইলেন।

‘জগদানন্দকন্দ (জগন্নাথের) নীলমেঘের মত বর্ণ, পদ্মপত্রের মত আয়তলোচন, পদ্মাসনে অবস্থিত থাকায় দুইটি করকমল গুপ্ত ও দুইটি উন্মোচিত। বলভদ্রের সপ্ত ফণাবেষ্টিত বিকট মস্তক, বর্ণ কুন্দেশূল-ধবল, পদ্মলোচন, গুপ্তপাদ, দুই হস্ত গুপ্ত ও দুইটি উন্মোচিত। ভক্তের মুক্তিদায়িনী শুভাননা স্তম্ভদ্বার মূর্ত্তিও ঐরূপ, তাঁহার করপদ্ম অধোলম্বিত ও বর্ণ কুঙ্কুম। সূদর্শন স্তম্ভরূপী ও জিতেন্দ্রিয়। মাধবও ভগবানের স্বরূপ, কিন্তু হৃদয়তন। সূহাস্ত-বদনা লক্ষ্মী চতুর্ভুজা, দুই হাতে বর ও অভয় এবং দুই হাতে দিব্যকমল, তিনি কমলাসনে উপবিষ্টা, চারিটি গজ শুণ্ডদ্বারা সুরবর্গকলস ধরিয়া অমৃতদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিতেছে। দেবী বিশ্বধাত্রীও পদ্মাসনে অবস্থিতা, তিনি দক্ষিণ করে জ্ঞানমুদ্রা ও বাম-করে চারুকমল ধরিয়া আছেন। প্রকাশার মূর্ত্তি ধবল বর্ণা। ১৫ দিন পরে সকলে ভগবানের এইরূপ সাতটি দারুময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইল, কিন্তু সেই স্তম্ভদ্বারকে কেহ আর দেখিতে পাইল না।” (১২)

(১২) “দিনে পঞ্চদশে প্রাপ্তে ভদ্রা বিধাঃ স্বয়ং বিভূঃ।

রত্নসিংহাসনে দিব্যে তাবদাবিবর্ত্তনং হ।

বলেন ভরদ্বাজমুখা সহ সূদর্শনঃ।

বিশ্বধাত্রী চ লক্ষ্মী চ মাধবেন সমং ভদ্রা।

উপরে বাহা লিখিত হইল, তাহা সংকৃত গ্রন্থের কথা, কিন্তু উৎকলের দৈন্য তাহার লিখিত আধুনিক গ্রন্থে ও প্রবাদে জগন্নাথের উপপত্তি সম্বন্ধে একটু তারতম্য আছে।

মাণ্ডিনী দাস ও শিবুরাম দাস লিখিয়াছেন—

‘মালবদেশে ইন্দ্রহ্য রাজত্ব করিতেন। একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহার সভায় আসিয়া কহিলেন, “রাজন! তুমি বিষ্ণুকে লাভ করিবে, তোমার মহিমা জগতে প্রকাশিত হইবে।”

ইন্দ্রহ্য কৃতজ্ঞলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় ভগবান্ আছেন, কোথায় তাঁহাকে পাইব?” নারদ তখন কহিলেন, “নীলাচলে ভগবান্ নীলমাধবরূপে আছেন, একজন শবর অতি গুপ্তভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।” এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রহ্য চারিদিকে দূত পাঠাইয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি নামে একজন ব্রাহ্মণও প্রেরিত হইলেন। তিনি নানাস্থান পর্যটন করিয়া নীলাচলে বসু শবরের গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। বসু শবরের ললিতা নামে এক সুবতী কন্যা ছিল। বিদ্যাপতি এখানে কিছুদিন বাস করিলে বসু শবর তাঁহাকে অমুরোধ

করে, “আমার এই একমাত্র আদরের কন্যা, আমার ইচ্ছা, তোমার সহিত ললিতার বিবাহ দিই।” বিদ্যাপতি শবরের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, তখন শবর বহু তর্কজনক বাক্য করিয়া বলিল, “আমার পিতা একটা বাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। আমি কি তোর মত একটা ব্রাহ্মণকে বধ করিতে পারি না।” তখন বিদ্যাপতি নিতান্ত ক্রোধিত হইয়া কহিলেন, “তোমার বাপ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহার করিয়া ছিল, অগ্রে তাহা বল, তবে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব।”

‘তখন শবর এইরূপ পরিচয় দিল, “ভগবান্ বসুদেবের মায়ার দ্বারকাপুরীতে কুকুরাভর ঘটিল। ভগবান্ যাদবগণকে লইয়া কুকুরা বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। কুকুরা পলাইয়া গেল। তখন দ্বারকানাথ প্রভাসক্ষেত্রে একটা কদম্বতরু লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এই তরুমূলেই কুকুরা লুকাইয়াছে। বলরাম অভিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গাছে মুহলাঘাত করিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই কদম্ব গাছ হইতে হৃদযং নির্ধাস বাহির হইল। যাদবগণ সকলে মিলিয়া সেই কাদম্বরী পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাদম্বরীপানে সকলে মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই বিবাদেই যত্নকুল নির্মূল হইল। বলরাম সাগরসলিলে দেহপাত করিলেন। কৃষ্ণ সিয়ালীপাতায় শুইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার পিতা যুগ অবশেষে সেই বনে বেড়াইতে ছিলেন। তিনি মত্তার ভিতর কৃষ্ণপদ দেখিয়া তাহা যুগকর্ণ ভাবিয়া শর প্রয়োগ করিলেন। সেই বাণে কৃষ্ণ বিদ্ধ হইয়া “অর্জুন আমার রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অর্জুনাদ শুনিয়া আমার পিতা সেই স্থানে গেলেন ও কৃষ্ণের অঙ্গে শরাস্রাঘাত দেখিয়া ভয়ে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, “শবর! আমি নিরপরাধে তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, তাহারই এই প্রায়শ্চিত্ত। পূর্বজন্মে বালী তোমারই পিতা ছিল এবং তুমিই অঙ্গদ। শবর! তুমি হস্তিনার গিয়া পাণ্ডবদিগকে সংবাদ দাও যে আমি যুদ্ধাশ্রয় লয়ন করিয়াছি।” যথাকালে পাণ্ডবগণও সেই সংবাদ পাইলেন এবং অবিলম্বে শবরের সহিত তথায় আসিলেন। কৃষ্ণ তাঁহা দিগকে দেখিয়া নানা আক্ষেপ করিলেন ও অর্জুনের বল হরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের পবিত্র দেহ চিত্তার অর্পণ করিলেন, কিন্তু সাতদিন চেষ্টা করিয়াও সেই পুত্রেহ দধি করিতে পারিলেন না। আকাশবাণী হইল, ‘তোমরা কি পাণ্ডব হইরাছ? এ দেহ কি আমি দধি করিতে পারি?’

সপ্তধাবির্ভবা দেবঃ স্বয়ং তত্র জনাৰ্দ্দিনঃ ।
জগদানন্দকন্দোহভূং সমুত্তোলা ভুজধরঃ ।
পদ্মাসনতয়া বিশ্রা গুপ্তবৎপাণিশম্ভরঃ ।
দাক্ষতক্ষশরীরেণ একাশোহজসি ভূতলে ।
নীলকীম্বুতসঙ্গাঃ পদ্মপদ্মারতকণ্ঠঃ ।
শোণাধরধরঃ শ্রীমান্ ভক্তানামভয়ধরঃ ।
বলম্ভব্রতধামগুণকণাধিকটমন্তকম্ ।
কুলেন্দ্রশুদ্ধধবলঃ একাশোহযুজলোচনঃ ।
গুপ্তপাদকরাভোজসমুত্তোলিতসভুজঃ ।
ভক্তানামবনাতৈরৈব তথা ভদ্রাপি ভদ্রদাঃ ।
অখোলখিতংপদ্ম কুহুমাতা গুপ্তদমনা ।
হৃদশর্নভক্তরূপী বহুব বিজিতেশ্রিয়ঃ ।
এভ্যোঃ স্বরূপমভক্তমাধবো ব্রহ্মরূপকঃ ।
লক্ষ্মীশতভূজা বিশ্রা বরাত্তরধরা মতী ।
ভৈববাজ্জয়ং দিব্যং ধারয়ন্তি দ্বিতাননা ।
চতুর্গজকরোংকিপুহবর্ণকলসানুভৈঃ ।
কৃতান্তিবৈককমলা কমলাসনসংহিতা ।
পদ্মাসনপতা দেবী বিখ্যাতী তথা বিজা ।
জানমুদ্রাং করে দক্ষে বামেচ চাক্রপঞ্চকম্ ।
ধারয়ন্তি ধরাদেবী একাশা ধবলাকৃতিঃ ।
ততঃ পঞ্চদশান্তান্ত দিনসামন্তরে তদা ।
এবং সপ্তবিধা বিকোর্দাক্রমসধরম্য বৈ ।
একালমুত্তরো বেদ্যাং বর্দ্ধকিচ্চ ন দিহাতে ॥

(নীলাদ্রিমহোদয় ৩র্থ অঃ)

সাপরে কেঁদেছিল দাঁত। কলিযুগে নীলাচলে দারুণরূপে ইহা পূজিত হইবে।’ পঞ্চশঙ্কর আকাশবাণী শুনিয়া সাপরে সেই বেহ ভাসাইয়া দিল।

এইরূপ বর্ণনা করিয়া বহু শবর বিদ্যাপতিকে কহিল, “আমি সেই শবরের পুত্র, তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ যাইবে।”

‘বিদ্যাপতি তখন ফাঁপরে পড়িয়া ললিতার পাণিগ্রহণ করিয়া শবরগৃহে উভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ললিতা দেখিল যে তাহার স্বামীর মনে হুখ নাই, সর্বদাই চিন্তায় কাতর। একদিন শবরবালা বিদ্যাপতিকে অতি আশ্রয়ে ডাকিয়া বলিল, “নাথ! তোমার কিসের ভাবনা, সর্বদাই তোমাকে বিষম দেখি কেন? তোমার মলিন মুখ দেখিলে আমার বুক কাটিয়া যায়। পায়ে ধরি, তোমার মনের কথা খুলিয়া বল।” বিদ্যাপতি কহিল, “তুমি সত্য বল যে তোমার পিতা প্রতিদিন শেখরাবত্রে কোথায় যান, আর মধ্যাহ্ন সময়ে কোথা হইতে আসেন। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে কেন চন্দন গন্ধ বাহির হয়?”

শবরকন্যা বলিল, “এই জন্ত তোমার চিন্তা। নীলাচলে নীলমাধব আছেন, একথা কেহ জানেনা, আমার বাবা অতি গোপনে তাঁহাকে পূজা করিয়া আসেন। আজ আসিলে তাঁহাকে বলি। তুমি জগন্নাথের দর্শন পাইবে।”

‘বৃদ্ধ শবর ঘরে আসিলে ললিতা তাঁহাকে গিয়া ধরিল। ললিতার মুখে সকল কথা শুনিয়া শবর বিস্মিত হইল ও কন্যাকে অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া কহিল, “আমি পুণ্যে শুনিয়াছি যে রাজা ইন্দ্রচান্দ্র জগন্নাথের পূজা করিবেন। বোধ হয় এই ব্রাহ্মণ তাঁহারই চর। ইহাকে দেখিতে দিলে নিশ্চয়ই জগন্নাথকে হারাইব।” ললিতা কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যার ক্রন্দনে শবরের মন ফিরিল এবং বিদ্যাপতির চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া গিয়া জগন্নাথকে দেখাইতে সম্মত হইল।

ললিতা বিদ্যাপতিকে পিতার মনোভাব জানাইল। বিদ্যাপতি কহিলেন, “যদি আমার চক্ষুই বাঁধা থাকে, তবে আর আমার দর্শনে কাজ নাই।” ললিতা কহিল, “তার জন্ত ভাবনা কি, আমি পথ চিনিবার উপায় করিয়া দিব। তোমার টেকে তিল বাঁধিয়া লও, যাইবার সময় পথের ছইপাশে সেই তিল ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। গাছ বাহির হইলে তুমি আপনি পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে।”

পরদিন প্রভাতে শবর বিদ্যাপতিকে অন্ধের ত্রায় চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল, বন মধ্যে গিয়া শবর ব্রাহ্মণের চক্ষু খুলিয়া দিল। বিদ্যাপতি বটবৃক্ষ মূলে বহুদিনের শাখ নীলমাধব মূর্তি

দেখিতে পাইলেন। শবর ব্রাহ্মণকে বটবৃক্ষ মূলে বসিতে বলিয়া ফল আনিতে চলিল। এই সময় বিদ্যাপতি দেখিলেন, একটা ভূবত্তী কাক যুগের ঘোরে বৃক্ষ হইতে নিকটস্থ রোহিণিকূলে পড়িয়া গেল, পড়িয়াই চতুর্ভুজ হইয়া চন্দনরূপে গিয়া বসিল। তাহা দেখিয়া বিদ্যাপতিও চতুর্ভুজ লভ ও এই সংসার হইতে মুক্ত হইবার আশায় আপনিও রোহিণিকূলে ঝাঁপ দিতে গেলেন। তখন সেই ভূবত্তী কাক তাঁহাকে বাঁধা দিয়া বলিল—“ব্রাহ্মণ! তুমি যে কাজে আসিয়াছ, আজ কি তাহা তুলিয়া গেলে। তোমা হইতে মর্ত্যলোকে ভগবান্ জগন্নাথ প্রকাশিত হইবেন। তুমি তাহাতেই কৃতার্থ হইবে।”

বিদ্যাপতির আর ঝাঁপ দেওয়া হইল না। এই সময় শবরপতি ফল মূল লইয়া উপস্থিত হইল ও নীলমাধবকে নিবেদন করিয়া কহিল—“মহাপ্রভো! আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।” বৃদ্ধ বার বার মিনতি করিলেও সেদিন আর ভগবান্ শবরের ফলমূল গ্রহণ করিলেন না। শবর নিতান্ত হুঃখিত হইয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমার উপর ক্রোধ হইল কেন?”

তখন দৈববাণী হইল, “শবর! তুমি ব্রাহ্মণকে কেন এখানে আনিগি! এতদিন তোর কাছে কলমূল খাইয়াছি, কিন্তু তাহা আর ভাল লাগে না। রাজা ইন্দ্রচান্দ্র দেখা দিয়াছে। আর তোর কাছে থাকিব না। নীলাচলে দারুণরূপে দেখা দিব। নানা উপচারে ভোগ পাইব। সুরাসুরনর আমার সেই মূর্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধকাল এখানে ছিলাম, অপরাধে দারুণরূপে বিরাজ করিব।”

শবর দৈববাণী শুনিয়া মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। “হায় হার আমার মেয়ে হতেই আমার সর্বনাশ হইল,” এই বলিয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল আক্ষেপ করিয়া আবার ব্রাহ্মণের চক্ষু বাঁধিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

বিদ্যাপতির মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এদিকে তিলবৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ সকল পথ ভাঙ্গ করিয়া চিনিয়া লইলেন। এখন কিরূপে দেশে যাইবেন, সেই ভাবমাই বেনী হইল। একদিন ললিতা স্বামীকে উদ্ভিগ্ন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাপতি হুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন, “অনেকদিন হইল আমি দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমার আত্মীয় স্বজন কে কেমন আছে, জানি না, তাহাদের দেখিবার জন্য আমার মন আকুল হইতেছে।”

তখন ললিতা কাতরভাবে বলিল, “এখন জানিবার, তুমি

রাজা ইন্দ্রহ্যায়ের চর। বাহা হউক, পিতাকে বলিয়া ভোমার দেশে পাঠাইয়া দিব। তুমি আমার প্রাণসর্ব্ব্ব, এ দাসীর নিবেদন, আমাকে যেন পরিত্যাগ করিও না।” বিভাপতিও বলিতার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া কহিলেন, “তুমি আমার কনিষ্ঠা পত্নী, তোমাকে কি আমি পরিত্যাগ করিতে পারি?”

‘শবরপতি কস্তুর অহুরোধে বিভাপতিকে পথ দেখাইয়া দিল। বিজবর আকাশগুণ্ডী নামক স্থানে শবরের নিকট হইতে কন্দমূল লইয়া বিদায় হইলেন। যথাকালে তিনি ইন্দ্রহ্যায়ের প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। দৌবারিক গিয়া রাজাকে বলিল, “ব্রাহ্মণ বিভাপতি আসিয়াছেন। তাঁহার দেহে শঅচক্রেয় চিহ্ন দেখিয়াছি।” ইন্দ্রহ্যায় গোবিন্দ নাম করিয়া ভাবিলেন যে, বিভাপতি নিশ্চয়ই জগৎপতির দর্শন পাইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিভাপতিকে তাঁহার সমক্ষে আনিতে আদেশ করিলেন। বিভাপতি রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! আমি ভগবানকে দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি নীলমাধব মূর্ত্তিতে বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তথায় রোহিণকুণ্ডের জলে পড়িয়া কাকও চতুর্ভুজ হইয়াছে।”

‘তখন রাজা ইন্দ্রহ্যায় বিভাপতির পাদ বন্দনা করিয়া কহিলেন, “আপনার প্রাসাদে আমি উদ্ধার হইব।” পরে মন্ত্রীগণকে আজ্ঞা করিলেন, “আমি নীলাচলে যাত্রা করিব, নীত প্রস্তুত হও।”

‘যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি ও সৈন্তসামন্ত লইয়া অবস্তিরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। বিভাপতি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া চলিলেন। যথাকালে নীলাচলে সেই শ্রোগ্রোথ তরুমূলে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা এখানে নীলমাধব বা রোহিণকুণ্ড কিছুই দেখিতে না পাইয়া বিভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নীলমাধব কোথায়?”

‘নারায়ণের মায়ায় তখন সকলি অস্তহিত হইয়াছিল। কিন্তু বিভাপতি তাহা না জানিয়া রাজাকে কহিলেন, “বোধ হয় বস্ত্র শবর কোথায় লইয়া গিয়াছে।” ইন্দ্রহ্যায় শবরকে ধরিয়া আনিবার জন্য তখনই লোক পাঠাইলেন।

‘রাজপুরুষগণ শবরালয়ে উপস্থিত হইল। বস্ত্র তাহাদিগকে দেখিয়া কাতরভাবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, “জগদ্বন্ধো! আমার কি শেষে এই দশা করিলে। এতকাল তোমার সেবা করিলাম, এখন কি তাহার এই ফল হইল।”

‘ভক্তাধীন ভগবান তখন দৈববাণীরূপে ইন্দ্রহ্যায়কে শুনাইলেন, “এখন আমার দর্শন পাইবে না। আমার মন্দির

নির্মাণ কর, দেবলোক হইতে ব্রহ্মাকে আসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, তবে আমার দেখা পাইবে।”

‘রাশি রাশি বউলমালা পাথর সংগৃহীত হইল (১)। বৈশাখ মাসে পুণ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে শুরু পক্ষমীতিথি মহোৎসবে মন্দির-নির্মাণ আরম্ভ হইল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইন্দ্রহ্যায় মন্দির সম্পূর্ণ করিলেন। এই সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রহ্যায় নারদের সহিত তাঁহার টেকিতে চড়িয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এখানে ব্রহ্মা রাজার মনোগত ভাব জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি অগণকাল অপেক্ষা কর, আমি পূজার্ত্তপণাদি শেষ করিয়া তোমার সহিত জগতে গিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।”

‘সেই সময় মধ্যে শতাব্দী কাটিয়া গেল। সাগরের তরঙ্গে ইন্দ্রহ্যায়ের রচিত প্রাসাদও ক্রমে ক্রমে বালুকামধ্যে ঢাকা পড়িল। রাজা গালে হাত দিয়া ব্রহ্মার দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন (২)। এদিকে শ্রুদেব, বসুদেব, ত্রীপতি প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। মাধব নামে এক ব্যক্তি উড়িষ্যার রাজা হইয়া ১৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করিলেন। মাধব মকর দশমীর দিনে পাত্রমিত্র লইয়া সমুদ্রে স্নান করিতে বাইতেছিলেন, অগ্রে অগ্রে তাঁহার অহুচরগণ পথ পরিষ্কার করিতেছিল। সেই সময় হঠাৎ তাহার মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইল ও রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা সেই স্থান ধনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘকাল ধননের পর সমস্ত মন্দির দেখা গেল। মাধব ভাবিলেন যে, বোধ হয় আমারই কোন পূর্বপুরুষ এই মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আমিও ইহাতে মূর্ত্তি স্থাপন করিব।

‘ব্রহ্মার তর্পণ শেষ হইল। তিনি ইন্দ্রহ্যায় ও নারদের সহিত নীলাচলে আসিলেন। তাঁহারা এখানে দেখিলেন যে মন্দির পূর্ববৎই রহিয়াছে, মন্দিরের দ্বারদেশে কতকগুলি দৌবারিক অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহারা ব্রহ্মা প্রভৃতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু ইন্দ্রহ্যায় তাহাদের কথায় ক্রোধান্বিত না করিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। তখন দৌবারিক গিয়া রাজা মাধবকে জানাইল যে, “একটা চতুর্ভুজ ও ইন্দ্রহ্যায় নামে একটা লোক আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে।”

‘মাধব দৌবারিকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

(১) বাঙালিরা দাস লিখিয়াছেন যে কুর্গণ সেই সকল পাথর পূর্ত্তে বহন করিয়া আনিয়াছিল—“কুর্গবানক পিঠরে। আমনি বহাই পথরে।”

(২) সুন্দরবনের জগন্নাথ মন্দিরে এইরূপ কথা লিখিত আছে।

মন্দিরে গিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্রহ্যমকে বলিলেন, “তোমরা কি অস্ত্র এখানে আসিয়াছ।” ইন্দ্রহ্যম উত্তর করিলেন, “আমি প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছি।” মাধব সর্পে বলিল, “এ মন্দির আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।”

‘এইরূপে মাধব ও ইন্দ্রহ্যমে বোর বিবাদ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, “তোমাদের কাহার কি সাক্ষী আছে?” মাধব কহিলেন, “আমি নিজে মন্দির করিয়াছি, তাহার আবার সাক্ষী কি?” ইন্দ্রহ্যম বলিলেন, “আমার সাক্ষী আছে। আমার প্রথম সাক্ষী ভূধণ্ডী কাক, দ্বিতীয় সাক্ষী ইন্দ্রহ্যমসরোবরবাসী কুর্মগণ।” ব্রহ্মা সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন, তদনুসারে কাক ও কুর্মগণ সকলেই ইন্দ্রহ্যমের হইয়া সাক্ষ্য দিল। ব্রহ্মা রাজা মাধবকে বলিলেন, “তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সেই অস্ত্র কলিযুগে তুমি লিঙ্গ হইবে, কেহই তোমার পূজা করিবে না।”

‘তারপর ব্রহ্মা মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু কিরূপে দারুব্রহ্ম স্থাপন করিবেন, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে ভগবান্ স্বপ্নে দেখা দিয়া ইন্দ্রহ্যমকে বলিলেন, “কাল প্রাতে সাগরতীরে যাইবে, তথায় বাঁকিমোহনায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে।” পরদিন রাজা সসৈন্তে সাগরতীরে আসিয়া বাঁকিমোহনায় দারুব্রহ্মের দর্শন পাইলেন।

‘তখন সকলে মিলিয়া সেই মহাকাষ্ঠকে তীরে তুলিয়া আনিবার অস্ত্র অগ্রসর হইল, কিন্তু হস্তী ও মহুয্য সকলে মিলিয়া কিছুতেই সেই কাষ্ঠখণ্ড সরাইতে পারিল না। অবশিষ্টপতি মহা চিন্তায় পড়িলেন। সেই দিন রাত্রিকালে আবার বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া কহিলেন, “ইন্দ্রহ্যম! তত্ত্ব ভিন্ন কেহ এই কাষ্ঠ নাড়িতে পারিবে না। সেই বহু শবরকে ডাকাইয়া আন। সে ও তুমি স্পর্শ করিলেই উঠিয়া আসিব।” পরদিন প্রাতে রাজা বিভাগপতিকে পাঠাইয়া বহু শবরকে ডাকিয়া আনিলেন। ইন্দ্রহ্যম ও শবরের স্পর্শ মাত্র দারু রথে উঠিল। মন্দিরের সম্মুখে গুরুদণ্ডস্তম্ভের নিকট প্রথমে দারু স্থাপিত হইল।

‘ষাটশ শত স্তম্ভদ্বার জগন্নাথমূর্ত্তি নির্মাণে নিযুক্ত হইল। সাতদিন পরে রাজা কিরূপ মূর্ত্তি হইতেছে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু মূর্ত্তি হওয়া দূরে থাক, দেখিলেন—যেমন কাষ্ঠ ঠিক তেমন আছে। স্তম্ভদ্বারেরা বিনীতভাবে বলিল, “মহারাজ! আমাদের দ্বারা কিছুই হইবে না, দেখুন আমাদের অস্ত্র শস্ত্র ডাকিয়া গিয়াছে।” রাজা তাহাদের উপর চটিয়া বলিলেন—

যদি আগামী কল্য দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।

‘স্তম্ভদ্বারেরা কঠোর রাজাজ্ঞা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া জগন্নাথকে ডাকিতে লাগিল। দৈববাণী হইল— “স্তম্ভদ্বারগণ! তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি কল্য রাজার সহিত দেখা করিয়া তোমাদের রক্ষা করিব।”

‘পরদিন স্বয়ং ভগবান্ (৩) বৃদ্ধস্তম্ভদ্বারের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের গোঁদ, পিঠে কুঁজ, চক্রে পিচুটা, এদিকে আবার কালা। দ্বারবান্ তাঁহাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল না। পরে তিনি রাজার আদেশে সভার আনীত হইলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া সকলেই অবাক হইল। মন্ত্রী বলিলেন—ইহার মরণ নিকটবর্ত্তী, তবু ধনলোভ ছাড়িতে পারে নাই।” রাজা উচ্চঃস্বরে বলিলেন, “তোমার নাম কি?” বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমার নাম বাসুদেব মহারাণা, আমি বিশ্বকর্মার গুরু, আমার অসাধ্য কোন কার্যই নাই। যাহা বলিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া দিব।”

রাজা বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া সেই মহাবৃদ্ধের নিকট আনিলেন। বৃদ্ধ নথ দিয়াই সেই গাছের ছাল তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া সকলেই অবাক। তখন বৃদ্ধ রাজাকে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! আমি মন্দিরের ভিতর থাকিয়া প্রতিমা গড়িব। ২১ দিন দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। এই কয়েকদিন কেহ দ্বার খুলিতে পারিবে না।” রাজাও তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।

বৃদ্ধ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা দ্বাররুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিলেন। শুণ্ডিচা নামে ইন্দ্রহ্যমের পাটরাণী ছিলেন। একদিন তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাথ! তুমি আমায় জগন্নাথ দেখাইবে বলিয়াছিলে? কৈ দেখাইলে না ত?” রাজা বলিলেন, “এক বৃদ্ধ মূর্ত্তি নির্মাণ করিতেছে। আজ ১৫ দিন হইল। আর ছয়দিন পরে দেখিতে পাইবে।” শুণ্ডিচা হাসিয়া কহিলেন, “বারশ ছুতার আসিয়া যখন কিছুই করিতে পারিল না। তখন একটা বৃদ্ধ কি করিবে? বোধ হয়, এতদিন সে অনাহারে মরিয়া গিয়াছে।” রাণীর কথা শুনিয়া রাজারও কিছু চিন্তা হইল। তিনি মন্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে কাণ পাতিয়া কোন শব্দ না পাইয়া ভাবিলেন, বুঝি বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছে।

‘প্রথমে মন্ত্রী দ্বার খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার কথা শুনিলেন না, দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, তখন মধ্যে দেখিলেন, সিংহাসন উপরে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ-

(৩) নীলাজি মহোদয়েরও লিখিত আছে—ভগবান্ স্তম্ভদ্বার রূপে আসিয়া নিম্নমূর্ত্তি প্রকাশ করেন।

“মূর্তি বিদ্যা” করিতেছেন, তাহার হাত অঙ্গুলি কিছুই নাই। বুদ্ধও অস্তিত্ব হইয়াছে। রাজা বুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া প্রথমে অবাক হইলেন, শেষে সত্যলব্ধন করিয়াছেন ভাবিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে কুশল্যা রচনা করিয়া তাহাতে শুইয়া থাকিলেন। ক্রমে অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল, গভীর রজনীকালে জগন্নাথ রাজাকে দেখা দিয়া বলিলেন, ‘তোমার কোন চিন্তা নাই। কলিযুগে আমি হস্তপদহীন বুদ্ধরূপে এখানে থাকিব। তুমি সোণা দিয়া আমার হাত গড়াইয়া দিও (৪)।’

‘তখন রাজা হাতজোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভো! কে আপনার পূজা করিবে?”

‘নারায়ণ বলিলেন, “যে শবর বনে আমার পূজা করিত, তাহার পুত্র পশুপালক দৈতাপতি আমার সেবক হইবে। তাহার সন্তানগণ চিরকাল দৈতাপতি নামে আমার সেবক থাকিবে।” বলজ্জ গোত্রীয় “সুরার”-গণ আমার রক্তমকার্যে নিযুক্ত হইবে।” আমার প্রসাদ সকল জাতিই জাতিভেদ ভুলিয়া একত্র বসিয়া আহার করিতে পারিবে।’

‘তদনুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখনও সেই নিয়মেই পূজা নিরীহ হইতেছে।’

উপরে যে উপাখ্যানটা লিখিত হইল, উড়িষ্যার অধিবাসী-দিগের মধ্যেও ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। বোধ হয় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই শিশুরাম, মুকুন্দরাম, বাণু নিয়া দাস, বেকটাচার্য্য প্রভৃতি জগন্নাথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও পুরাবিদগণ জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ঠালিং, রাজা রাজেন্দ্রলাল, কানিংহাম, ফাউলন, হন্টর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন, বৌদ্ধ-দিগের মাল মসলা লইয়া যে জগন্নাথদেবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বাহাকে আমরা জগন্নাথ, স্তুভঙ্গী ও বলরাম বলি, তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বুদ্ধ, ধর্ম ও মন্ত্বেয় রূপান্তর। তাহার সকলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঐ মূর্তিটির বৌদ্ধত্বেরই রূপ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এইরূপ লিখিয়াছেন—

‘খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ইলুভাখার মলদাবংশ লিখিত হয়, এই

(৪) “মুই বউদ্ধ রূপ হই।

কলিযুগের শিবুরি।

অর্থ হাত খোঁড় করি।

গড়াহি দেব বঙাবারী। (মাতৃবিদ্যাসাধন।)

এই অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে ‘দাখ খাতু বংশ বা দাখবংশ’ রচিত হইয়াছে। এই দাখবংশ পাঠে আসা যায় যে, বুদ্ধের নির্দোষের পর তাঁহার জিহ্বা শিখা কেম কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে বুদ্ধের দত্ত গ্রহণ করেন। ব্রহ্মদত্ত ভক্তিপূর্বক সেই দত্ত দত্তপুর নামক নিজ রাজ-ধানীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রহ্মদত্তের বৃত্ত্যর পর তাঁহার বংশধরেরা বহুদিন উৎকল ও তাহার নিকটবর্তী রাজ্যগুলি শাসন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনকাল হইতেই উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অলুতিগিরি, খণ্ডগিরি, ধোলি প্রভৃতি স্থানে এখনও বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষে রাজা গুহশিব উড়িষ্যার আধিপত্য করিতেন। প্রথমে তিনি হিন্দু ছিলেন। একদিন নাগরিক-গণকে উৎসবে মত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন এক্ষণ উৎসবের কারণ কি? কলিঙ্গবাসী শ্রমগণ তাঁহার কাছে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদত্তের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শেষ জানাইলেন, “আজ সেই বুদ্ধদত্তকে লইয়া দত্তোৎসব হইতেছে।” অনেক তর্ক বিতর্কের পর মহারাজ গুহশিব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মাব-লম্বী সচিবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা অপমানিত হইয়া মগধরাজ পাণ্ডুর নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক অভিযোগ করিলেন। তখন মহারাজ পাণ্ডু চৈতন্ত নামে এক সামন্ত-রাজকে গুহশিবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ধার্মিক গুহশিব যুদ্ধ না করিয়া অতি বিনীতভাবে নানা উপহার লইয়া চৈতন্ত-রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। এখানে চৈতন্ত বলেন, “পাণ্ডু-রাজের আদেশ আপনার উপাত্ত দেবতার সহিত আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।” রাজা গুহশিব পাণ্ডু-রাজের আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইলেন। এখানে চৈতন্ত গুহশিবের মুখে বৌদ্ধধর্মের নির্মূল উপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। উভয়ে বুদ্ধদত্ত লইয়া পাটলীপুত্রনগরে রাজাধিরাজ পাণ্ডুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পাণ্ডু দত্ত নষ্ট করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি ঐ দত্তের জন্ত এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন। এদিকে স্বস্তিপুত্ররাজ দত্ত আনিবার জন্ত পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন। সেই যুদ্ধে রাজাধিরাজ পাণ্ডু নিহত হইলেন। তৎপরে রাজা গুহশিব সেই দত্ত আনিয়া পুনরায় দত্তপুরে স্থাপন করিলেন।

‘মালবদেশের এক রাজপুত্র বুদ্ধদত্ত দর্শন করিবার জন্ত দত্ত-পুরে আগমন করেন। তাঁহার সহিত গুহশিবের কন্যা হেমকামার বিবাহ হয়। মালব-রাজকুমার কন্তের অধ্যাক্ষ হইয়া দত্ত-

কুমার লইবে খাতি হইলেন। বতিপুরের রাজা কীরধারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রগণ আরও চারিজন রাজার সহিত বুদ্ধদত্ত গ্রহণ করিবার জন্য দস্তপুর আক্রমণ করেন। রণক্ষেত্রে রাজা গুহশিবের মৃত্যু হয়। দস্তকুমার গোপনে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া এক বৃহৎ নদী অতিক্রম করিয়া নদীতীরে বালুকার মধ্যে সেই দস্ত প্রোথিত করেন। পরে গুপ্তভাবে হেমমালাকে আনিয়া সেই দস্ত উদ্ধার করিয়া তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন পূরক। এখানে তিনি অর্ণবপোতে বুদ্ধদত্ত লইয়া সজীক সিংহলে উপস্থিত হইলেন।

হন্টর, ফাণ্ডার্ন প্রভৃতি অনেকই লিখিয়াছেন—উক্ত দস্ত এই জগন্নাথক্ষেত্রেই ছিল, এই পুরীধামেরই প্রাচীন নাম দস্তপুর*। এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন, জগন্নাথের দেহ মধ্যে যে বিষ্ণুপঙ্কজ আছে, তাহা ঐরূপ কোনপ্রকার পবিত্র অস্থিই হইবে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতে—পুরীকে দস্তপুর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পুরী দস্তপুর হইলে দস্তকুমার পুরী হইতে সুদূরবর্তী তাম্রলিপ্তনগরে গিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন না। মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানই সম্ভবতঃ দস্তপুর, তথা হইতে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক অধিক দূরবর্তী নহে। তিনি আরও বলেন, পুরী দস্তপুর না হইলেও এখানে বৌদ্ধধর্ম বহুদিন প্রবল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেবের দস্তোৎসবই এখন জগন্নাথের রথযাত্রারূপে পরিণত হইয়াছে। [রথযাত্রা দেখ।]

উক্ত ঐতিহাসিক ও পুরাবিদগণের মত অবলম্বন করিয়া গ্রীষ্মক অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছেন—

“জগন্নাথের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধর্মমূলক বা বৌদ্ধধর্ম মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটা জনশ্রুতি সর্বত্র প্রচলিত আছে। চীনদেশীয় তীর্থ-যাত্রী কাহিয়ন্ ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ-পর্যটনার্থ যাত্রা করিয়া পশ্চিমধ্যে তাতারদেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটা বৌদ্ধমহোৎসব সন্মর্শন করেন। তাহাতে জগন্নাথের রথ-যাত্রার জ্ঞান অবিকল এক রথে তিনটা প্রতিমূর্তি দৃষ্টি করিয়া আইসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধমূর্তি ও তাহার দুইপার্শ্বে দুইটা বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত ছিল।

“খোটানের উৎসব যে সময়ে ও যতদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রথযাত্রাও প্রায় সেই সময়ে ও ততদিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেজর জেনারেল কনিংহেম

বিবেচনা করেন, ঐ তিনটা মূর্তি পুরোক্ত বৌদ্ধমূর্তিদের অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। সেই তিনটা মূর্তি—বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য। বৌদ্ধেরা সচরাচর ঐ ধর্মকে ত্রীরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। তিনি জগন্নাথের মূর্ত্ত্য। ত্রীক্ষেত্রে বর্ণ-বিচারপরিভাগপ্রথা এবং জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণু-পঙ্কজের অবস্থিতিপ্রবাদ, এ দুটা বিষয় হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নয়; প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু এই উভয়ই সাক্ষ্য বৌদ্ধমত বলিলে বলা যায়। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাব-তারস্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। কাশী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতার স্থলে জগন্নাথের রূপ আলে-খিত হইয়া থাকে। এই সকল পর্যালোচনা করিতে করিতে জগন্নাথের ব্যাপারটা বৌদ্ধধর্মমূলক বলিয়া স্বতই বিশ্বাস হইয়া উঠে। জগন্নাথক্ষেত্রেটা পূর্বে একটা বৌদ্ধক্ষেত্রেই ছিল, এই অসুমানটি জগন্নাথবিগ্রহস্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঙ্কজ-বিষয়ক প্রবাদে একরূপ সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া ভারতবর্ষ হইতে অন্ত-হিত হইতে ছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হয়, ইহা পূর্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ঘটনাটিতেও উল্লিখিত অসুমানের সুন্দররূপ গোষকতা করিতেছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ থ্সঙ্গ উৎকলের পূর্বদক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রতটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার যে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটা সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। এই চরিত্রপুরই একগুণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটা অত্যন্ত স্তূপ ছিল। শ্রীমান্ এ কনিংহেম্ অসুমান করেন, তাহারই একটা অধুনা-তন জগন্নাথের মন্দির। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থিকেশাদি সমাহিত থাকে, এই নিমিত্তই জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঙ্কজের অবস্থিতি-বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।”*

পরিশিষ্টে তিনি আবার লিখিয়াছেন—

“জেনারেল কনিংহেম্ ঐ (দারুমূর্তি) তিনটা বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সত্য এই মূর্তিদের বিজ্ঞাপক হওয়ারই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি সাক্ষি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতেও এমন কি শকরাঙ্গাদিগের মূর্ত্তা হইতেও ঐরূপ ধর্মযন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধর্মযন্ত্র বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বীজস্বরূপ য র ল ব ন এই পাঁচটা পালি অক্ষরের সমষ্টি স্বরূপ

* Hunter's Statistical Account of Bengal, vol. XIX. p. 42; Fergusson's Indian Architecture, p. 416.

* উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ উপঃ ২৭২ পৃষ্ঠা।

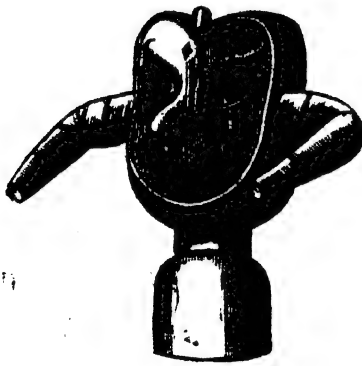
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে*। উল্লিখিত তিনটি ধর্মবস্ত্রের সহিত অগরাধাদি তিনমূর্তির অভেদ বা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। জেনেরেল কনিংহেম ভিল্লা-স্তূপ-বিবরণে বক্রিসংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পার্শ্বপার্শ্ব করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। দেখিলেই ত্রৈলোক্যের বৈকব-ত্রিমূর্তি তিনটি বৌদ্ধধর্মবস্ত্রের অঙ্করণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ তিনটি বস্ত্র সমগ্র বৌদ্ধ ত্রিমূর্তির পরিচায়ক হউক বা না হউক, যখন অগরাধপূরীর তিনমূর্তি কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি, পঞ্চাকৃতি বা প্রকৃত মনুষ্যাকৃতি নয় এবং যখন ঐ তিন ধর্ম-বস্ত্রের সহিত তাহার অভ্যন্তর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন উল্লিখিত অমুমানটী সর্বতোভাবেই সম্ভাবিত ও সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আরম্ভাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত ইলোরার নিকটস্থ একটা বৌদ্ধদেবালয় অদ্যাপি অগরাধের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে হিন্দুদেবতার অগরাধ এই নামটীও বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত এইরূপ অক্লেশেই মনে করা যাইতে পারে।” (২)

রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন—‘মহারাজ যশোভিকেশরী সাধারণের বিশ্বাস অক্ষর রাখিবার জন্যই সেই মূর্তিগ্রন্থ দাক্ষত্বরূপে গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধত্বও হিন্দুদিগের প্রধান আরাধ্য দেবরূপে গণ্য হয়। তিনিই হিন্দু-

ধর্মীজ্ঞানারে পূজা সংকার প্রভৃতি প্রচলন ও বৌদ্ধধর্ম পরিবর্তন করিয়া যান*। বেল্লপে ‘বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ গগরাধার হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, বোধ হয় সেই মত পুরবোত্তম-কেত্রও হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।’

উৎকলের দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবিদগণ এক বাক্যে সকলেই বলেন যে অগরাধকেত্রের মাহাত্ম্যপ্রকাশক পুরাণাদিও ঐ যশোভিকেশরীর পরে রচিত হইয়াছে।

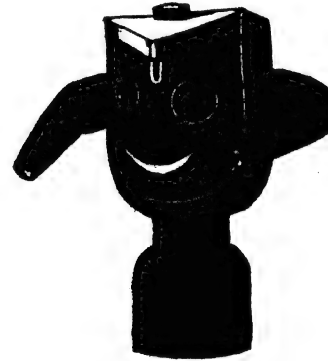
অগরাধের ইতিহাস।—উপরোক্ত পুরাবিদগণের মত গ্রহণ করিলে বলিতে হয়—বৌদ্ধধর্মের অবসান ও রাজা যশোভিকেশরীর অভ্যাস হইতে হিন্দুজগতে অগরাধের আবির্ভাব। বাস্তবিক কি তাই? যে অগরাধকেত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতীয় হিন্দুগণের প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য, প্রাচীন পুরাণাদিতে বাহার মাহাত্ম্য বর্ণিত, সেই পুণ্যস্থান বৌদ্ধধর্মমূলক ও এত আধুনিক! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! সাক্ষি হইতে যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকেই যখন কেবল অমুমান দ্বারা বৌদ্ধধর্মবস্ত্র বলা হইয়াছে, তখন কিরূপে আমরা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত দাক্ষত্বের মূর্তিগ্রন্থ ধর্মবস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? বিশেষতঃ এখন বেল্লপ দাক্ষত্বের মূর্তি আছে, তাহার সহিত বৌদ্ধধর্মবস্ত্রের প্রকৃত সাদৃশ্য নাই। মূর্তিগ্রন্থ ও ধর্মবস্ত্রের চিত্র দেওয়া গেল, এতদ্বারাই সাধারণে বুঝিতে



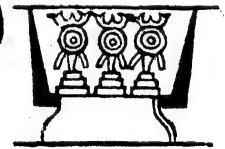
বলরাম



দত্তা



অগরাধ



তিনটি ধর্মবস্ত্র

পারিবেন যে, ধর্মবস্ত্রের সহিত এখনকার দাক্ষত্বমূর্তির কিরূপ সাদৃশ্য। রাজেন্দ্রলাল, কনিংহাম, অক্ষরকুমার প্রভৃতি সকলেই দাক্ষত্বের মূর্তিগ্রন্থে দেব, পুত্র বা মনুষ্যের রূপ না দেখিরাই উহা ধর্মবস্ত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এ মুক্তি সমীচীন নহে, নারদ ও ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে, কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে বেল্লপ মূর্তির পরিচয় আছে, তাহা পূর্বেই

লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে প্রকৃত দেবমূর্তি বলিয়াই বোধ হয়, এখন আমরা যে মূর্তি দেখিতেছি পূর্বকালে এ মূর্তি ছিল না। এ মূর্তি আধুনিক, ইহার বিবরণ পরে লিখিব। ইলোরার বৌদ্ধদেবালয় অগরাধদেবের মন্দির বলিয়া গণ্য হইলেই যে অগরাধকে বুদ্ধ বলিতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই; অথবা হই একখানি আধুনিক পঞ্জিকা অথবা অজ্ঞ চিত্রকর অঙ্কিত আধুনিক হই একখানি ছবিতে দশাবতারের বুদ্ধমূর্তি

* Mitra's Antiquities of Orissa, vol. II. p. 126.

(২) উপাসক সম্ভাষণ ২য় ভাগ ৩২৪-২৫ পৃঃ।

* Dr. Mitra's Antiquities of Orissa, vol. II. p. 1097.

স্থানে জগন্নাথ অঙ্কিত হইলেই জগন্নাথকে বুদ্ধাবতার বলা হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে যেখানে দশাবতারের বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে, তথায় ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি দৃষ্ট হয়; এখনকার মত হস্তপদহীন জগন্নাথমূর্তি দেখা যায় না। যেমন প্রাচীন বোধগয়া হিন্দুর করতলগত হইবার পরেও বায়ুপুরাণের গয়া-মাহাত্ম্যে বোধিতকম্লে বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া পিণ্ডাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে; সেইরূপ যদি জগন্নাথ বৌদ্ধতীর্থ হইত, তাহা হইলে পুরাণাদি কোন না কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নিশ্চয়ই বুদ্ধের কোনরূপ আভাস থাকিত। বরং উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

“অতো দশাবতারানাং দর্শনাদৈতদ্ভ্যং বৎ কলম্।

তৎকলং লভতে মর্ত্যো দৃষ্টী ত্রীপুরুষোত্তমম্॥” (৫১ অঃ)

উক্ত শ্লোকে দশাবতার হইতে জগন্নাথের প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে। মাস্তানিয়া দাসাদির কথা নিতান্ত আধুনিক ও অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য। রাজেন্দ্রলাল যে জগন্নাথের বুদ্ধবেশাদির কথা লিখিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ নাই। নীলাদ্রি-মহোদয়ে জগন্নাথের শৃঙ্গারবেশাদির সমস্তই উল্লেখ আছে, কিন্তু বুদ্ধবেশের কথাই নাই। এ ছাড়া উক্ত পুরাবিদগণ ত্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচারপরিত্যাগপ্রথা উল্লেখ করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে, ত্রীক্ষেত্রে বিলক্ষণ বর্ণবিচার প্রথা প্রচলিত আছে, কেবল এখন মহাপ্রসাদ ভক্ষণ সম্বন্ধে নাই, কিন্তু এ প্রথা আধুনিক, বথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিব। জগন্নাথের রথযাত্রা যে বুদ্ধদেবের রথযাত্রার অঙ্কুরণ, তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ রথযাত্রার প্রথা বহু প্রাচীন, জগন্নাথ ব্যতীত অপরাপর হিন্দু দেবদেবীরও রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বুদ্ধের পূর্ববর্তী এসিক্ক জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রার প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অকুদয়ের পূর্ব হইতেই যে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। [রথযাত্রা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আমরা বৈষ্ণব প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে পুরুষোত্তমকে আৰ্য্যজাতির এক প্রাচীনতম দেবপ্রতিমা বলিয়া মনে করি।

শাখ্যায়নব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“আদৌ বন্ধারু প্রবতে সিদ্ধোঃ পারে অপুরুষম্।

তদা লভত্ব ছদ্মনো তেন বাহি পরং স্থলম্॥”

শাখ্যায়ন-ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—“আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানঃ বন্ধারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্যাদেবভাশরীরঃ প্রবতে জলভোপরি বর্ততে অপুরুষং নির্দ্বাতুরহিতম্ভেন অপুরুষং তৎ আলভত্ব ছদ্মনো হেহোতঃ তেন দারুমরূপে দেবেন উপাত্তমানেন পরং স্থলং বৈকুণ্ঠং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।”

আদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে যে অপৌরুষেয় দারুমূর্তি সমুদ্রতীরে ভাসিয়াছে, তাহার উপাসনা করিলে লোক পরমলোকে গমন করে।

মার্কট রঘুনন্দন ও বাচস্পত্য-রচয়িতা পণ্ডিত ভারানিধিও অধর্কবেদের নাম দিয়া এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“আদৌ বন্ধারু প্রবতে সিদ্ধোর্মধ্যে অপুরুষম্।

তদালভত্ব ছদ্মনো তেন বাহি পরং স্থলম্॥”

কিন্তু উক্ত বচনটী মুদ্রিত অধর্কবেদে পাইলাম না, বোধ হয় ঐ বচনটী শাখ্যাত্তরে অথবা অধর্কবেদীয় অপর কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। অনেকেই এই বচনটী কল্পিত বা প্রকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু ঐ বচনটী প্রকৃষ্ট বা আধুনিক নয়, তাহারও প্রমাণ আছে। আমরা সাত শত বর্ষের হাতের লেখা উৎকলখণ্ডের পুথি পাইয়াছি, তাহাতে উক্ত বচনের অঙ্কুরে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

“ব এষ প্রবতে দারুঃ সিদ্ধপারে হপৌরুষঃ।

তমুপাত্ত ছরারাম্যং মুক্তিং বাস্তি স্থলভ্যম্॥”

(উৎকল খণ্ড ২১৩ শ্লোক)

ঐ শ্লোকের পর লিখিত আছে—

“ব্রহ্মজ্ঞাননিধিঃ সাক্ষারানন্দঃ প্রভূবাচ তৎ।

নহি প্রবৃত্তির্বিজ্ঞোক্ত বিনা বেদং প্রবর্ততে।

পরেবাং বস্ত বা সৃষ্টৌ ক্রতিপ্রামাণ্যবান্ প্রভুঃ।

বিনা ক্রতিং প্রবৃত্তে তৎ কতং প্রামাণ্যমৃচ্ছতি।

তমাং বৃত্তিপ্রসিকোহয়মবতারোহত্র ভূপতে।

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং সীতং তৎ সামসীতিহু।

প্রতিমামেব জানীহি নিঃশ্রেয়সকরীং নৃণাম্।

সন্ত্যেব ক্রতয়ঃ পূর্বমেতদর্জাপ্রকাশিকাঃ।”

উক্ত প্রমাণের দ্বারা অস্বীকৃত হয় যে সময়ে বেদান্তবেদ্য উপনিষদে ব্রহ্মের মহিমা কীর্তিত হইতেছিল, সেই প্রাচীন কালে অথবা তাহার অনতিকাল পরে দারুব্রহ্মের প্রতিমা প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

আমরা অগ্রেই হইতেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শুনিতে পাই। [বিষ্ণু দেখ।] বোধ হয় যখন বিষ্ণুমতাবলম্বী আৰ্য্যগণ প্রথম উৎকলরাজ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময় এখানে অনাৰ্য্যগণের আধিপত্য দেখিতে পান। পৃথিবীর নানা স্থানেই আদিম অসভ্য জাতিগণ এখনও কাষ্ঠপ্রস্তরাদির পূজা করিয়া থাকে। সীওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে তাহার প্রমাণের অসম্ভাব নাই। অগ্রেই ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রপুত্র ছর্ষর্ষ শবরজাতির উল্লেখ আছে। [শবর দেখ।] উৎকল ও দক্ষিণ কোশলে বহু পূর্বকাল হইতে শবরগণ প্রবল ছিল।

বোধ হয়, আৰ্য্যগণ এখানে আসিয়া প্রথমে সেই শবর-
হিগকে সমুদ্রতীরে কাঠ ও প্রস্তরের পূজা করিতে দেখেন।
ক্রমে এখানে কোন পরাক্রান্ত শবর বা অনার্য্য জাতির
সহিত আৰ্য্যগণ মিলিত হইয়া পড়েন এবং এখানকার দাক ও
প্রস্তরমূর্তির পূজা করিতে থাকেন। বোধ হয় উৎকলগত
আৰ্য্যগণ এখানে সেই আরাধ্য দাক বা প্রস্তরকেই অপৌরুষেয়
বিষ্ণু বা ব্রহ্মমূর্তি বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। নারদ ও ব্রহ্ম-
পুরাণ হইতেই আমরা ইহার কতকটা রূপক আভাস প্রাপ্ত হই।

নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে শবরপ্রসঙ্গ, ইন্দ্রহ্য-নির্ধৃত মন্দিরের
বালুকা মধ্যে আচ্ছাদন ও ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মার আগমনের
কথা কিছুই নাই। এতদ্বারা উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতা
প্রভৃতির আখ্যান অপেক্ষা নারদ ও ব্রহ্মপুরাণের বিবরণ
মৌলিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে অনুমান করা যায় যে—
যখন আৰ্য্যগণ লিঙ্গরূপে দাকব্রহ্ম প্রকাশ করেন, তখন শবর বা
অনার্য্যগণের সহিত তাহারা পূর্বসংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন।
ইন্দ্রহ্য এখানে আসিয়া প্রথমে দাকব্রহ্মের দর্শন পান নাই।
নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, তখন পুরুষোত্তম সমুদ্রের
বল্লীমধ্যে গুপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রহ্য আসিয়া কেবল বেদী
দর্শন পান ও তাহাতেই শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যখন পঞ্চ
পাণ্ডব এখানে আগমন করেন, তখনও তাহারা কেবল মহাবেদী
দর্শন করিয়া স্তবপাঠ করিয়াছিলেন। মহাভারতে বনপর্কে
লিখিত আছে—

“ততঃ প্রসঙ্গা পৃথিবী তপসা তত্ত পাণ্ডব।
পুনরুৎপন্ন সলিলাশ্রয়ীকৃপাঙ্ঘ্রিতা বভৌ।
সৈবা প্রকাশতে রাজন্ বেদী সংস্থানলক্ষণা।
আকৃষ্টা মহারাজ বীৰ্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি।
সৈবা সাগরমাসাঙ্গ রাজন্ বেদী সমাপ্রিতা।
এতামাকৃষ্ট ভদ্রস্তে স্বমেকস্তর সাগরন্।
অহঙ্ তে স্বস্ত্যয়নঃ প্রযোজ্যে স্বমেনামধিরোহসেহস্ত।
স্পৃষ্ট্ৱাহি মর্ত্যো ন ততঃ সমুদ্রমেবা বেদী প্রবিণত্যাঙ্গযীচ্।
ও নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সারিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণান্তসি॥
অগ্নিমিজে যোনিরাপোহথ দেবো বিষ্ণুরততমুতত্ত নাতিঃ।
এবং ব্রহ্মন্ পাণ্ডব সত্যাবাক্যঃ ততোহবগাহেত পত্তি নদীনাং॥”

(বনপর্ক ১১৪।২২-২৭)

পৃথিবী তপঃপ্রভাবে প্রসঙ্গ হইয়া সলিল মধ্য হইতে উদ্ভিয়া
বেদীরূপে বিরাজমান হইলেন। মহারাজ ঐ বেদী রেদী
লক্ষিত হইতেছে, ইহাতে আরোহণ করিলে বীৰ্য্যবান্ হইবেন।
বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাতে আরোহণ

করিলে একাকীই (স্ব) সাগর পরে যাইকে পারিবেন।
আমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি, আপনি স্পর্শ করুন। হে দেবেশ!
তুমি বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। তুমি লবণসাগরের
সন্নিহিত হও। তুমি অগ্নি, তুমি মিত্র, তুমি সন্নিহিত আশ্রয়,
তুমি দেবীস্বরূপ ও অমৃতের আকর, এইরূপে স্তব করিয়া
বেদীতে প্রবেশ কর।

এখনও পুরুষোত্তমবালী শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে
জগন্নাথের দাকমূর্তি অপেক্ষা তাঁহার মহাবেদীই প্রকৃত লিঙ্গ-
পীঠ ও মহাপূণ্যপ্রদ। বেদীমন্দিরের কথা নয়, মন্দির অভ্য-
ন্তরে একখানি প্রস্তর থলিয়া পড়ায় দাকমূর্তিগুলি স্থানান্তর
করা হইয়াছিল, সে সময়ে জগন্নাথের প্রসাদ অনেকেই আহাশ
করেন নাই। পণ্ডিতগণ বলেন যে—ভগবান্ মহাবেদীতে না
থাকিলে মহাপ্রসাদ হইতে পারে না। নারদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি
পুরাণেও এই বেদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, জগন্নাথের
সংখ্যাসংখ্য উৎকলখণ্ডে “মহাবেদী-উৎসব” বলিয়া কথিত
হইয়াছে। (উৎকলখণ্ড ৩৩।৩৪ অঃ)

উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা ও নীলাজিমহোদয়ের মতে, এই
বেদীতেই ইন্দ্রহ্য শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই
বেদীতেই দাকব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়। শাস্ত্রানুবর্ণিত অপৌ-
রুষেয় দাকমূর্তিও বোধ হয় এই বেদীতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে—বৌদ্ধধর্মের
অভ্যুদয়ের অনেক পূর্বে হইতেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র হিন্দুর নিকট
মহাতীর্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। মহাভারতে পাণ্ডব কর্তৃক
বেদীর নিকট যে স্তব বর্ণিত আছে, তাহা দাকব্রহ্ম (?)
পুরুষোত্তম-উদ্দেশ্যক স্তব বলিয়াই মনে হয়।

অনন্তর উৎকলরাজ্যে বৌদ্ধদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল।
তাহাতে সুদীর্ঘকাল দাকব্রহ্মের বা মহাবেদীর মাহাত্ম্য হিন্দু-
জগতে অপ্রকাশিত রহিল। বৌদ্ধদের পরাক্রম থর্ব হইলে
অনার্য্য শবরগণ কলিকরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিল ও
ক্রমে তাহারা আৰ্য্য সংস্রবে সত্য হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণজাতির
উপর অনার্য্যজাতির চিরকাল আক্রোশ। [ভোম, সাঁওতাল
প্রভৃতি দেখ।] কিন্তু অচ্যুত শবররাজগণ বৈরিতাব বিসর্জন
দিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইল, বৌদ্ধ-কর্তৃক উৎপীড়িত
ব্রাহ্মণগণও অসত্য শবরের সহিত যোগদান করিতে কুণ্ঠিত
হইলেন না।

রায়পুর, সখলপুর ও কটক জেলা হইতে আবিষ্কৃত তাম্র-
শাসন ও শিলালিপি পাঠে জানা যায়, পূর্বতন শবররাজগণ
সকলেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, মহাকোশলে রাজত্ব করিতেন এবং
আপনাদিগকে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেন।

শ্রীপুর, রাজিম, দুর্গ ও কটক প্রভৃতি স্থানে শবররাজগণের রাজধানী ছিল। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মহানদীকূলস্থ শিরপুর নামক প্রাচীন গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে—(১৫)

‘শবর বংশে উদয়ন * নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ইন্দ্রবল, তৎপুত্র নরদেব, ইনি অনন্তেশ্বর নামক দেবালয় নির্মাণ করেন, তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র হর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র মহাবীর শিবগুপ্ত, ইহার অপর নাম বালার্জুন।’

বিখ্যাত কনিংহাম এই শিবগুপ্তকে ৪৭৫ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্রি টসাহেব তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে উক্ত শিলালিপির অক্ষর কিছুতেই খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এরূপ স্থলে শিবগুপ্তও ঐ সময় বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুতরাং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব হইতে শবরগণ প্রবল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত-পাঠে জানা যায় যে যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ভগিনী রাজ্য-শ্রীকে অম্লসন্ধান করিতে বাহির হন, তখন বিদ্যাপ্রদেশে শবররাজ শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতু রাজত্ব করিতেছিল এবং সেই শবররাজের সাহায্যেই হর্ষরাজ ভগিনীর সন্ধান

(১৫) এই শিলালিপির মূলের পাঠ এ পর্যন্ত কোন পুস্তকে মুদ্রিত না হওয়ার সাধারণের অবগতির জন্য ঐতিহাসিক অংশ উদ্ধৃত হইল—

‘আনীদুর্গরনে নাম ভূপতিঃ শবরাজঃ।

অভূতলভিমা তুল্যস্তম্মাদিত্রবলো বনী।

ততঃ শ্রীনরদেবোহুতুভিমানমহোদরঃ।

পূর্ণানন্তেশ্বরার্থো বচকার দেবালয়ঃ।

চন্দ্রগুপ্তো ভূবো গোপ্তা তস্যাজ্ঞে হতোত্তমঃ।

ততঃ শ্রীহর্ষগুপ্তোহুজ্জয়হর্ষবর্দ্ধনঃ।

ভগ্ন্যজনি শূরণঃ শিবগুপ্তো মহীপতিঃ।

অভূতজয়মুখ্যো যঃ খ্যাতো বালার্জুনাখ্যায়।

যেতানিলিতাঃসংখ্যো কৃষা যঃ করদগ্নিনিম্।

• • • • •

যস্য নির্জিতা নির্জিতা হতুতা ইব সায়কঃ।’ ইত্যাদি।

* পল্লবরাজ নন্দিবর্দা পল্লববর্মের তাম্রশাসনেও এই শবররাজের নামোল্লেখ আছে। নন্দিবর্দা ইহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইহার ময়ূর-পুচ্ছরচিত নর্পণকজ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। (Indian Antiquary, Vol. VII. p. 375.)

† শিরপুরস্থ গজেশ্বর মন্দিরের শিলাকলকেও ইনি কেবল বালার্জুন নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Cunningham's Archaeological Survey Reports, vol. XVII. plate XX.)

পাইয়াছিলেন। বোধ হয় হর্ষরাজ যখন উৎকল জয় করেন, তখনও উড়িষ্যা শবর-রাজগণের অধিকারে ছিল।

উড়িষ্যার পুরাবিদগণ মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন, যে শিবদেব বা শোভনদেবের রাজত্বকালে (২৪৫ শকে বা ৩২৩ খৃষ্টাব্দে) রক্তবাহ নামে যবন অর্ণবপোতে আসিয়া নগর আক্রমণ করেন, রাজা যবনের ভয়ে জগন্নাথ মূর্তি ও সমস্ত তৈজস পত্র লইয়া শোণপুর জঙ্গলে পলাইয়া যান। রক্তবাহ মন্দির লুণ্ঠন করিয়া নগরবাসীর উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা শিবদেব ঐ সংবাদ পাইয়া দারু ব্রহ্মমূর্তি মূর্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন।

রায়পুরের অন্তর্গত দুর্গ নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে শিবদেব ও পুরুষোত্তমের নাম উৎকীর্ণ আছে, ঐ শিলালিপির অক্ষরের সহিত শিরপুর হইতে প্রাপ্ত শিবগুপ্তের চারি খানি শিলালিপির অক্ষরের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কটক জেলার অন্তর্গত মহানদীতীরস্থ কপালেশ্বর নামক প্রাচীন গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে প্রতীয়মান হয় যে মহারাজাধিরাজ শিবগুপ্তের পুত্র ভবগুপ্ত ত্রিকলিঙ্গ ও কোশলরাজ্যে আধিপত্য করিতেন। (Indian Antiquary, vol. V. p. 59.) পূর্বোক্ত দুর্গ, রাজিম শিরপুর, শোণপুর প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাচীন দক্ষিণ কোশলের অন্তর্গত ছিল। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা দুর্গের শিলালিপি-বর্ণিত শিবদেব ও শবররাজ শিবগুপ্ত উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। শবররাজগণ মহানদীতীরস্থ রাজিমনগরে রাজত্ব করিতেন ও এখানে বহুসংখ্যক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, রাজিম-মাহাত্ম্যে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এখন রাজিমনগরে জগন্নাথদেবের এক প্রাচীন মন্দির আছে। এখানকার লোকের বিশ্বাস এবং রাজিমমাহাত্ম্যেও লিখিত আছে, ঐ মন্দিরে যে দারুময়ী জগন্নাথ-মূর্তি বিরাজমান, তাহা প্রথমে শ্রীক্ষেত্রের মহামন্দির হইতে আনীত হয়। দারু-ব্রহ্মের মত রাজিমস্থ দারুমূর্তিরও লেপসংস্কারাদি হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে যবনের ভয়ে মহারাজ শিবগুপ্ত শ্রীক্ষেত্র হইতে পবিত্র মূর্তি আনিয়া নিজ রাজধানীতে স্থাপন করেন। এখানে একটা গোলযোগ উঠিতে পারে, মাদলাপঞ্জীর মতে ২৪৫ শকে শিবদেব কর্তৃক জগন্নাথমূর্তি স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে শিবগুপ্ত খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং উভয়ে এক ব্যক্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমরা গাজের শকে প্রমাণ করিয়াছি যে উৎকলের ঐতিহাসিকগণ মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া যে সকল প্রাচীন কথা লিখিয়াছেন, তাহার

অধিকাংশই স্রমশূলক। এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ ট্রিটনারেবও স্বীকার করিয়াছেন, যে সচরাচর উৎকলরাজ যযাতি কেশরীর বৈষ্ণব সময় নিরূপিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার চারিশত বর্ষের পরে তাঁহার সময় স্থির করিতে হইবে *। ঐতিহাসিক আমরা নানা প্রমাণ পাইয়াছি যে মহারাজ শিবগুপ্ত খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আধিপত্য করিতেন।

উৎকলের ঐতিহাসিকগণ রক্তবাহু যবনকে গ্রীক বলিয়া অহুমান করেন, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গ্রীক কর্তৃক উৎকল-প্রান্ত আক্রমণের কথা অপর কোন ইতিহাসে শুনা যায় না। যবদীপের অধিবাসীগণও যবন্ বা জবন্ নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে যবদীপীয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়া অর্ণব-পোতে গিয়া চীনসমুদ্রবর্তী কছোজ হইতে ভারতের পূর্ব উপকূলবর্তী নানান স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ৭০৯ শকে তাহার কছোজে যে ভীষণ উৎপাত করিয়াছিল, তৎকালকার প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপিতে তাহা অসংখ্য ভাষায় বর্ণিত আছে †।

আমাদের বোধ হয়—কছোজের মত জবনগণ অর্ণবপোতে আসিয়া ত্রিকোণেও লুণ্ঠন করিয়াছিল। পরাক্রান্ত জবন-সৈন্যের ভয়েই রাজা শিবগুপ্ত জগন্নাথ স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শবররাজ শিবগুপ্তের পর তৎপুত্র মহারাজ ভবগুপ্ত ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের নানান স্থান হইতে ভবগুপ্তের সময়কার খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি মহাভবগুপ্ত নামেও আপনায় পরিচয় দিয়াছেন। কটক জেলার কপালেশ্বর গ্রাম হইতে প্রাপ্ত ভবগুপ্তের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ সৰ্ব্বত্র অঙ্ক দুটো বোধ হয়, ইনি বহু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ ভবগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকলের বিখ্যাত রাজা যযাতির পিতা জনমেজয় প্রোত্তুত হন। এখনকার কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, মহারাজ যযাতি-কেশরী মগধ হইতে আসিয়া উড়িষ্যা জয় করেন, কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, ব্রহ্মদেশের শিলালিপিতে লিখিত আছে—যযাতির পিতা চন্দ্রবংশীয় জনমেজয় তিলক হইতে আসিয়া ওড়রাজকে পরাজয় করিয়া উড়িষ্যারাজ্য গ্রহণ করেন (১৩)।

শবরপুর হইতে প্রাপ্ত ও কটকের কালেক্টরী আপিসে রক্ষিত ছইখানি তাম্রশাসনে যযাতির পিতা জনমেজয়ের নাম পাওয়া যায়, তিনি ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজ ভবগুপ্তের অধীনে উৎকল-রাজ্য শাসন করিতেন *।

মহারাজ যযাতির তাম্রশাসন দ্বারাও জানা যায় যে তিনি ভবগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহাশিবগুপ্তের (অধীনে) সময়ে উৎকলরাজ্য শাসন করিতেন †।

উৎকলের ঐতিহাসিকগণ যযাতির পিতার নামোন্মেষণ না করিলেও তাঁহার ১১শ পুরুষ পরে জনমেজয়কেশরী নামে কেশরীবংশীয় এক রাজার নাম লিখিয়াছেন। পুরুষোত্তম-চন্দ্রিকা প্রভৃতির মতে জনমেজয়কেশরী ৬৭৬—৬৮৫ শক অর্থাৎ ৭৫৪—৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ‡।

পূর্বে বৈষ্ণব লেখা হইয়াছে, তাহাতে যযাতির পিতা জনমেজয় ঐ সময়ের লোক হইতেছেন বটে।

তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়—যে শবরাধিপ ভবগুপ্তের সময়ে রাজা জনমেজয়দেব এবং ভবগুপ্তের পুত্র মহাশিবগুপ্তের সময়ে রাজা যযাতি আবির্ভূত হন। উৎকলের ঐতিহাসিকগণের মতে ৩৯৬ শকে রাজা যযাতি রাজত্ব করিতেন। পূর্বেই লিখিয়াছি যে প্রকৃত ঘটনা হইতে যযাতির সময় কমবেশ চারিশত বর্ষ পিছাইয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যযাতির আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়। রাজা যযাতির তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ বর্ণমালা দ্বারাও তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে না।

উৎকলখণ্ড ও তৎপরবর্তী গ্রন্থসমূহে শবর কর্তৃক যে পুরুষোত্তমের পূজাদি লিখিত আছে, তাহা শবর-রাজগণের সময়কার কথা হওয়াই সমধিক সম্ভব। যযাতি শবররাজধানী হইতে দাক্ষিণ্যমুখী আনিয়া নানা যাগ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয় এই উপলক্ষ করিয়াই উৎকলখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মা কর্তৃক দাক্ষিণ্যের প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

নারদ বা ব্রহ্মপুরাণে শবর বা ব্রহ্মার প্রসঙ্গ না থাকায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, যে শবরপ্রসঙ্গশূলক উৎকলখণ্ড ২য় ইজ্ঞাচ্য উপাধিদারী যযাতির সময়ে বা তাঁহার কিছু পরে

* *Fleets' Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III. p. 294.

† *Inscriptions Sanskrites de Campa et du Cambodge* par M. Abel Bergaigne, p. 83. (1894.)

(১৩) “তৎসংশ্ৰুতমি গুজরীর্জিতুলো বিশ্বভারতম্ভো

রাজ্যজয়ময়ঃ স রিপুহা ভূতভিলক্ষাধিপঃ।

বহুভাগিকারিকারিপ্রবিন্দিতরে রিপুণাং যিপে

যঃ কুতঃপ্রবর্তোদ্রুদেশনুপতেলক্ষীং সমাকুটবান্।”

ব্রহ্মবরলিপি ২ নং।

* *Journal Asiatic Society of Bengal*, 1877, pt. I p. 153, 175.

† তাম্রশাসনে উৎকলরাজ জনমেজয় ও তৎপুত্র যযাতি সৌম্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত।—*J. A. S. B. Vol. VII. p. 558.*

‡ *Dr. Hunter's Orissa*, Vol. I. p. 209.

রচিত হইয়াছে*। তিনি ব্রাহ্মণ্যাদি ক্রীমুষ্টি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া যে সকল বন্দোবস্ত করেন, তাহাই উৎকলখণ্ডরচয়িতা নারদ ও ব্রহ্মপুত্র অবলম্বন করিয়া বিস্তৃতভাবে অনেক অপরাপর কথা সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখনও শবররাজ্যের আধিপত্য ছিল বলিয়াই রাজা যযাতি শবরদিগকে জগন্নাথের সেবকরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেইজন্মই পরবর্তী সকল গ্রন্থে জগন্নাথের লেপসংস্কারাদি সকল কার্যে শবরের পূর্ণ অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখনও সেই পূর্বতন জগন্নাথ-সেবক শবরদিগের বংশধরেরা দৈত্যপতি (১৪) নামে খ্যাত ও পূর্ব অধিকার ভোগ করিতেছে, কিন্তু অপরাপর কোন শবরের মন্দির প্রাক্ষণে প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—মহারাজ (সম্ভবতঃ ২য়) ইন্দ্রহ্যুম জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য যখন চিত্রোৎপলা নদীতীরে উপনীত হন, তখন উৎকলরাজ আসিয়া তাহার সহিত দেখা করেন। কপিলসংহিতায় লিখিত আছে—

“উৎপলেশং সমাসান্ত বাবচ্চিত্রা মহেশ্বর।

তাবৎ চিত্রোৎপলা খ্যাতা সর্বপুণ্যপ্রদা নদী ॥”

এই শ্লোক অনুসারে যেখানে উৎপলেশ্বর আছে, সেই স্থানেই চিত্রোৎপলানদী প্রবাহিত। রাজ্জিমমাহাত্ম্যের মতে যেখানে মহানদী ও প্রোত্যোদ্ধারিণী নদী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই উৎপলেশ্বর বিরাজমান।

রাজ্জিম নগরেই মহানদী ও প্রোত্যোদ্ধারিণী বা পাইরি মিলিত হইয়াছে, যযাতির সময়ে ঐ স্থানে শবররাজ্যের রাজধানী ছিল। যদি উৎকলখণ্ডের বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে মহারাজ (২য়) ইন্দ্রহ্যুম এই রাজ্জিম নগরেই উৎকলরাজ্যের নিকট নীলাচলের সংবাদ পান। পূর্বেই লিখিত আছে, জবন-আক্রমণকালে এই রাজ্জিমনগরে জগন্নাথমূর্তি আনীত হইয়াছিল এবং এখনও এখানে দাক্ষময়ী জগন্নাথমূর্তি রহিয়াছে। বোধ হয় যযাতি এখানকার মূর্তি দেখিয়াই নীলাচলে দাক্ষব্রহ্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—ইন্দ্রহ্যুম † স্বর্গ গমন

* কপিলসংহিতা, নীলারাজমহোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে অশোক উৎকলখণ্ড প্রাচীন, তাহা আনুমানিক প্রায় দ্বায়া জানা গিয়াছে।

(১৪) পূর্বকালে আধ্যাপক অসত্য অমার্যাপকে দৈত্য, অহর প্রভৃতি নামে সোধন করিতেম। সেইরূপ শবরপতিসিদ্ধ জগন্নাথের সেবক-দিগকে বোধ হয় উৎকলখণ্ডসীমায় “দৈত্যপতি” অর্থাৎ দৈত্য বা শবরপতি সিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতেম, কালে সেই “দৈত্যপতি” শব্দ অপভ্রংশে দৈত্যপতি নামে খ্যাত হইয়াছে।

† আমাদের বিবেচনায় ইনিই প্রথম ইন্দ্রহ্যুম। মৈত্রেয়-উপনিষদে ইহার নাম দুই হয়।

করিলে বহু ভূগ ধরিয়া মহামন্দির লঙ্ঘনের বাসুকার চাকিরা গিয়াছিল, গাল নামক একজন রাজা সেই মন্দির উদ্ধার (সংস্কার) করেন এবং আরও পাঁচটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্তরময়ী মাধবের প্রতিমা স্থাপন করেন—

“সোহপ্যত্র প্রতিমাং কৃষা মাধবাখ্যাং দৃশময়ীং।

স্থাপরিষ্যত্র প্রোসাদে পূজয়ামাস ঋদ্ধিমান্ ॥

বরীমান্ পঞ্চপ্রাসাদান্ নির্মাণ নৃপসত্তমঃ।

তত্র তাং স্থাপয়ামাস ততো নিষ্কৃত্য সামরম্ ॥” (উৎ. ২৬।৪৬)

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী চরিত্রপুস্ত্রে (বর্তমান পুরী) আসিয়া উক্ত পাঁচটি প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দর্শন করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক উক্ত পঞ্চমন্দিরের গায়ে নানা সিদ্ধধর্ম মূর্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন ‡। বোধ হয়, চীনপরিব্রাজকের সময়ে জগন্নাথের মূলমন্দির বাসুকেশরী অথবা ভগ্ন হইয়াছিল। উৎকলের ইতিহাসে লিখিত আছে, সেই মন্দিরের পুনঃসংস্কার বা পুনরুদ্ধার করিয়াই যযাতি কেশরী বিত্তীয় ইন্দ্রহ্যুম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন §।

মাদলাপঞ্জী ও বংশাবলী অবলম্বন করিয়া উৎকলের ঐতিহাসিকগণ যেরূপ কেশরীবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। যযাতি ও তৎসংশ্লিষ্টগণের সময়ে উৎকীর্ণ যে সমস্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান উৎকলেতিহাস বর্ণিত যযাতি ও জনমেজয়ের নাম ব্যতীত আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না, এতদ্বারা ইতিহাসবর্ণিত কেশরীরাজগণের নামগুলি অধিকাংশই কল্পিত বলিয়া বোধ হয়। [ভুবনেশ্বর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ব্রহ্মেশ্বর-শিলালিপি দ্বারা আমরা ঐ বংশীয় মোট ৮ জন রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখি। যথা—

১ জনমেজয়

২ যযাতি

৩ দীর্ঘবর

৪ অপবার

৫ বিচিত্রবীর

৬ অভিন্নমুখা

৭ চণ্ডীহর

৮ উত্তোতকেশরী

‡ কনিংহাম সাহেব ও তাঁহার অনুযয়ী হইয়া অক্ষরহুমারদত্ত ঐ বৃহৎ পাঁচটি মন্দিরকে ক্রমক্রমে পাঁচটি ভূগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ চীনভাবাবিদ বিল সাহেব ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। (Beal's Si-yu-ki or Records of Western Countries, Vol. II. p. 208.)

§ Sterling's Orissa, (Printed at the De's Utkal Press) p. 114.

ব্রহ্মেশ্বর-লিপিতে লিখিত আছে, রাজা অপবাসের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার মৃত্যুকালে জনমেজয়-তনয় (যুদ্ধ) বিচিত্রবীর দেশান্তরে ছিলেন, পরে উৎকলে আসিয়া রাজত্ব গ্রহণ করেন। শিলালিপিতে উদ্ধৃতকেশরী তিন্ন এই বংশীয় আর কোন রাজার কেশরী উপাধি পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, এই উদ্ধৃতকেশরী হইতেই কেশরী নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। ইনি একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, ইনি গোড় ও চোড় প্রভৃতি রাজগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ছিলেন (১৫)। খণ্ডগিরির অনন্তগুহা ইহারই ১৮শ অঙ্কে নির্মিত হয় (১৬)।

পূর্বে লিখিয়াছি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী মহারাজ যযাতি আবির্ভূত হন, এরূপস্থলে তাঁহার ভ্রাতার চতুর্থ পুরুষ মহারাজ উদ্ধৃতকেশরী (৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা হিসাবে) খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী আবির্ভূত হইরাছিলেন।

এই ১১শ শতাব্দী গাঙ্গেয়রাজ মহাবীর চোড়গঙ্গ উৎকল-রাজ্য অধিকার করেন। চোড়গঙ্গ যখন উৎকল রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন উৎকলে কেশরীবংশীয় কোন রাজা ছিলেন কি না, এখনও শিলালিপি হইতে সে সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উদ্ধৃতকেশরী ও চোড়গঙ্গের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পরস্পর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকার অসম্ভাবন হইবে যে উদ্ধৃতকেশরী অথবা তাঁহার বংশধরের সময়ে মহারাজ চোড়গঙ্গ উৎকল জয় করেন। [চোড়গঙ্গ দেখ।] এই সময়েই বোধ হয় কেশরীবংশীয় রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে পলাইতে বাধ্য হন। পার্শ্বা কিমেদীর রাজগণ উক্ত কেশরী-বংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। [জগন্নাথ গজপতি নারায়ণ দেব শব্দে দেখ।]

গঙ্গবংশীয় ২য় নরসিংহের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—
‘গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ উৎকলরাজসিদ্ধকে মন্থন করিয়া কীৰ্ত্তি-রূপ চন্দ্র, পৃথিবীরূপা রাজ্যলক্ষ্মী, মদমত্ত সহস্র হস্তী, দশহাজার অশ্ব ও অসংখ্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

‘এই বিশাল ভূমণ্ডল যাহার চরণ, অন্তরীক্ষ যাহার নাভি, দশদিক যাহার কর্ণ, সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার নয়নযুগল এবং স্বর্গ লোক যাহার মস্তক, সেই ত্রিলোকব্যাপী পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের বাসযোগ্য মন্দির নির্মাণ করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই ভাবিয়াই যেন পূর্ব্বতন নরপতিগণ পুরুষোত্তমের

(১৫) “বালজীড়ান্তরেব প্রতিষ্ঠতমখিলং সিংহলং চোড়গৌড়ো

যুদ্ধে সন্নদ্ধবোধধিরদলযটাসঙ্গঃ বো বিজিত্য।”

ব্রহ্মেশ্বরলিপি ১০ ব ও ১১শ পংক্তি।

(১৬) উক্ত গুহার এখনও “ঈশ্বরদেবোদ্ধৃতকেশরীদেবত প্রবন্ধ” নামে বিদ্যমান। লম্বা ১৮’ উৎকীর্ণ আছে।

মন্দির নির্মাণে উপেক্ষা করেন, কিন্তু গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ উপেক্ষা না করিয়া এই মহা মন্দির নির্মাণ করাইয়া ছিলেন (১৭)।

তাম্রশাসনের উক্ত বিবরণ দ্বারা বোধ হইতেছে, মহারাজ যযাতি যে মন্দিরের সংস্কার করিয়া ২য় ইন্দ্রদ্রাহ উপাধিলাভ করেন, কালে সেই মন্দির বিধ্বস্ত অথবা ভয় হইয়া ছিল, যযাতিবংশীয় কোন রাজা তাহার সংস্কার অথবা নূতন করিয়া নির্মাণ করাইয়া দেন নাই, তাঁহার শিবমন্দির নির্মাণেই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু মহারাজ চোড়গঙ্গ পুরুষোত্তমের মহা-মন্দির নির্মাণ করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী কেদারেশ্বরদ্বারে উৎকীর্ণ শিলা-লিপি পাঠে জানা যায় যে ১০০৪ শকে চোড়গঙ্গের আধিপত্য-কালে কেদারেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়, বোধ হয় ঐ সময়েই বা কিছু পূর্বে জগন্নাথের মহামন্দির নির্মাণ হইতে থাকে।

উৎকলের সকল ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, মহারাজ অনঙ্গভীমদেব পরমহংস বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধানে ৩০৪০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ১১২৬ খৃষ্টাব্দে ঐ মহামন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য তাহা স্থির করিতে পারি-লাম না। গঙ্গবংশীয় রাজগণের সময়কার পঞ্চাশ ষাটখানি খোদিত শিলাফলক ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন খানিতে অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক মহামন্দির নির্মাণের কথা আদৌ নাই, কিন্তু তৎকর্তৃক অপরাপর শত শত মন্দির-নির্মাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত থাকায় স্বীকার করিতে হইবে, যে অনঙ্গভীমদেব উক্ত মহামন্দির নির্মাণ করেন নাই। চাটেশ্বরের শিলাফলকে তৎকর্তৃক প্রাচীন মন্দির সংস্কারের কথা লিখিত থাকায় অসম্ভাবন হয় যে তাঁহার সময়ে উক্ত মহা মন্দিরের সংস্কার হইলেও হইতে পারে।

জগন্নাথের দেউল-করণেরা বলিয়া থাকেন যে, মহারাজ চোড়গঙ্গই জগন্নাথের প্রাত্যহিক বিবরণমূলক মাদলাপঞ্জী লেখাইবার ব্যবস্থা করেন, তৎপর হইতে বরাবর আজি পর্যন্ত প্রত্যহ তালপত্রে মাদলাপঞ্জী লিখিত হইয়া থাকে। উপর্যুপরি মুসলমান আক্রমণে তৎপূর্ব্ববর্তী প্রাচীন মাদলাপঞ্জীর

(১৭) “নির্ম্মিতোৎকলরাজসিদ্ধমণরং গঙ্গেশ্বরঃ শ্রাপ্তবান্

একঃ কীৰ্ত্তিহথাকরং পুণ্ড্রভং লক্ষ্মীকরণা সমঃ।

মাদ্যদ্বিত্যসংস্রবমিহুতং রত্নাভাসংখানি বা

তৎসিদ্ধোঃ কিমিহং প্রকর্ষমথবা ক্রমস্তদুদ্রাখিনঃ।

পাদেনে বহু ধরাভরীকমখিলং নাভিস্ত সর্বাঃ দ্বিপঃ

শ্রোত্রে নেজহুং রত্নীকুণ্ডলং মূর্ত্তাপি চ যৌরসৌ।

প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্ত নৃপতিঃ কোনামকর্ত্তং কস-

ত্তত্তত্যাধাযুপৈকপৈকস্তমঃ ব্রহ্মেশ্ব গঙ্গেশ্বরঃ।”

(২য় নরসিংহের তাম্রশাসন ২৬-২৭ স্লোক।)

অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই জন্তই মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া উড়িষ্যার পঞ্জীকারগণ যে প্রাচীন বংশাবলী আওড়াইয়া থাকেন, তাহা অধিকাংশই কল্পিত এবং এই জন্তই উৎকলের ঐতিহাসিকগণ মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী যে সকল বংশাবলী ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উৎকলরাজগণের সাময়িক খোদিত লিপি সহিত তাহার অধিকাংশই মিলে না।

গঙ্গবংশীর রাজগণের আধিপত্যকালেই জগন্নাথের সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠে। গঙ্গবংশীর রাজগণ উৎকলের অধিকাংশ আয়ই জগন্নাথের সেবায় ব্যয় করিতেন এবং আপনাদিগকে জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া পরিচয় দিতেন। এখনও যে রথযাত্রার দিন জগন্নাথ রথে উঠিবার সময় সর্কাগ্রে পুরীর রাজা ঝাড়ু দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই প্রথা গঙ্গবংশীর রাজগণের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

গঙ্গবংশীর রাজগণের প্রতাপ থর্ব হইলে সূর্য্যবংশীর কপিলেন্দ্রদেব কর্ণট হইতে আসিয়া উৎকলরাজ্য অধিকার করেন, ইনি ও ইহার মন্ত্রীগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। জগন্নাথের মহামন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব জগন্নাথের সেবার্থ বিস্তর জমি জমা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। [গোপীনাথপুর দেখ।]

কপিলেন্দ্রের পর তৎপুত্র পুরুষোত্তমদেব উৎকলের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার নানাস্থানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নামান্বিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়। রাজা পুরুষোত্তমদেবও জগন্নাথের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। [পুরুষোত্তমদেব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ইনিও দারুভ্রঙ্কের উদ্দেশে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এখন জগন্নাথের মহামন্দিরের চূড়ায় যে নীলচক্র (১৮) বিরাজ করিতেছে, তাহা এই পুরুষোত্তমদেব কর্তৃক প্রদত্ত। ঐ নীলচক্রের মধ্যেও পুরুষোত্তমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়, তাহার উপর পুনঃ পুনঃ বর্ণ-সংস্কার হওয়ায় এখন সেই লিপি অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুরুষোত্তমদেবের পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইহার সময়ে ত্রীক্ষেত্রে নব

যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ত্রীচৈতন্ত্যদেব ইহার সময়েই দীর্ঘকাল ত্রীক্ষেত্রধামে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি কতকগুলি নূতন উৎসব প্রচার করেন এবং এই সময়ে মহাপ্রসাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। (মহাপ্রসাদের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।)

একবার প্রতাপরুদ্র দাক্ষিণাত্য জয়ে বহির্গত হন, এই সুযোগে বঙ্গের মুসলমান সুবাদার সৈয়দ আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। মুসলমানসৈন্য ত্রীক্ষেত্র অবধি লুণ্ঠন করিয়াছিল। এই সময়ে জগন্নাথের সেবকগণ দারুভ্রঙ্কমূর্ত্তি গিরিগল্বরে লুকাইয়া রাখিবার জন্ত গুপ্তভাবে নৌকার করিয়া চিকাহুদে লইয়া আইসে। পরে প্রতাপরুদ্র ফিরিয়া আসিয়া স্নেহদ্বিগকে তাড়াইয়া দারুভ্রঙ্ক মূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বহুসংখ্যক পুত্র ও মন্ত্রী মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ হয়, ক্রমে মন্ত্রী ও সামন্তগণ প্রবল হইয়া ক্রমে ক্রমে সিংহাসন অধিকার করিতে থাকে, এই গোলযোগের সময় জগন্নাথদেবের সেবারও বিশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। রাজ্যবিপ্লব মিটিতে না মিটিতে দেবদেবী কালাপাহাড়ের রণচক্রা উৎকলক্ষেত্রে নিনাদিত হইল। মুকুন্দদেব তখন উৎকলের রাজা, কিন্তু ইতিপূর্বেই অন্তর্বিপ্লবে গঙ্গপতি-রাজগণের প্রতাপ অনেকটা থর্ব হইয়াছিল।

মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় বহুসংখ্যক সৈন্যসহ যাজপুরে উপস্থিত হইল। এখানে উৎকলবাসীগণ প্রাণপণে তাহার গতিরোধ করিল, এই যুদ্ধেই রাজা মুকুন্দদেব নিহত হইলেন। উৎকলরাজের পরাজয়বর্ত্তা জগন্নাথে পৌছিল। এবারও সেবকগণ দারুভ্রঙ্কের মূর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার জন্ত চিকাহুদের নিকটে পারিকুদে আনিয়া একটা গর্ত্তমধ্যে লুকাইয়া রাখিল। দুর্দ্দান্ত কালাপাহাড় শত শত দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ বা অজহীন করিয়া জগন্নাথের মহামন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এখানে বিস্তর লুণ্ঠনাদি ও অপচয় করিয়া দারুভ্রঙ্কমূর্ত্তির সন্ধান করিবার জন্ত চারিদিকে চর পাঠাইয়া দিল।

সেবকেরা বহুযত্ন করিয়াও কালাপাহাড়ের করাল কবল হইতে পবিত্র মূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় পারিকুদ হইতে দারুভ্রঙ্ককে বাহির করিয়া টানিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। এখানে স্তূপাকারে কাঠ সাজাইয়া অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক তন্মধ্যে দারুভ্রঙ্কমূর্ত্তি নিক্ষেপ করিল, পরে সেই দগ্ধমূর্ত্তি অগ্নি হইতে লইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, দারুভ্রঙ্ককে অগ্নিমধ্যে প্রদান করিবারাত্র তাহার সর্কাঙ্গ খসিয়া গেল ও সে মৃত্যু-

(১৮) তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই নীলচক্র ছিল। ব্রহ্ম, নারদ এত্য় প্রাচীন পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে।

“চক্রং দৃষ্ট্বা হরেশ্বরং প্রাসাদোপরি সংস্থিতম্।

সহস্রা মৃত্যুতে পাপায়রো ভক্ত্যা অগ্ন্যা তং।” (নারদপুঃ উত্তর।)

বোধ হয় প্রাচীন চক্র ভগ্ন হওয়ার পুরুষোত্তমদেব একটা নূতন চক্র স্থাপন করেন।

রূপে পতিত হইল। তাহার অহুচরিত্রা যখন সেই পবিত্র
মূর্ত্তি পূজার জন্যে নিক্ষেপ করে, তখন দেবের এক প্রেমান ভক্ত
বেশর মহাভক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অতি গুপ্ত-
ভাবে সেই দণ্ড দেবমূর্ত্তি হইয়া উৎকলের কুজল চূর্ণাধিশিতি
খণ্ডিত গৃহে রক্ষিত করেন। তাহার কুড়িবর্ষ পরে রাজা
রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণ্য কুজল হইতে আনীত হয়।

এ সময়ে উৎকলের অধিকাংশই পাঠানের হস্তগত হইয়া
ছিল। কিন্তু অকস্মৎ বাদশাহের আদেশে মুন্সি খাঁ তৎপর
বাজহান আসিয়া পাঠানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া
১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে উৎকল রাজ্য দিল্লীখয়ের অধিকার ভুক্ত করি-
লেন। উক্ত বুদ্ধ ঘটনার সময়ে জগন্নাথদেবকেও দুই তিনবার
চিঠাহুদে আনিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। মোগল পাঠানের
যুদ্ধকালে উৎকলে যে বোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল, তাহাতে
সন্দেহ নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সামন্তগণ একত্র
হইয়া দনাই বিভাগের পুত্র রণাই রাওজাকে রামচন্দ্রদেব
নাম দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে
অকস্মৎ অস্ত্রতম প্রধান সেনাপতি সবাই জয়সিংহ, বাদ-
শাহের কার্যোদ্ধারের জন্য উৎকলে অবস্থান করিতেছিলেন,
তিনিও রামচন্দ্রদেবের অভিব্যেক কার্যে অহুমোদন করিলেন।
তৎকালে জয়সিংহের আদেশেই রামচন্দ্রদেব বংশপরম্পরায়
উৎকলের অপর সকল সামন্তরাজ হইতে প্রাধান্য লাভ করি-
লেন। রাজা রামচন্দ্র ও তাহার বংশধরই জগন্নাথের প্রধান
সেবকরূপে নিযুক্ত হইলেন। রামচন্দ্র রাজা হইয়াই শাস্ত্রীয়
বিধানে নিম্নকণ্ঠে দাক্ষিণ্যের নবকলেবর স্থাপন করিয়া
মহাসমারোহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। (নবকলেবরের বিবরণ
পরে লিখিত হইবে)। পূর্ববৎ বোড়িশোপচারে দেবের পূজা
চলিতে লাগিল, কিন্তু হুঃখের বিষয় অল্পদিন না হইতে
হইতেই আবার গোলকুণ্ডার আদিলশাহী রাজ উড়িষ্যা আক্রমণ
করিয়া রামচন্দ্রদেবকে পরাজয় করিলেন।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা আসিয়া জগন্নাথ-
ক্ষেত্র দর্শন করেন। তিনি রাজা রামচন্দ্রদেবের ব্যবহারে
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহারাজ উপাধি এবং জগন্নাথ ও তাহার
চারিশার্থী ১২৯ কিল্লার শাসনভার প্রদান করেন। এই সময়
হইতেই খোদারাজ সর্বপ্রকারে প্রাধান্য লাভ * করিলেন।

* এখনও ইহারই বংশধর পুরীরাজার রাজা বলিয়া থাকে। এখন
পুরী রাজা জগন্নাথের মোহাভ ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহার সে
আধিপত্য, সম্পত্তি কিছুই নাই বলিলেই হয়। কিন্তু উড়িষ্যার পল্লিকার
এখনও সেই পুরীরাজের রাজ্য্যক গৃহীত হইয়া থাকে।

তৎপরে কিছু দিন জগন্নাথে আর কোন গোলযোগ হয়
নাই। তৎপরে উল্ নাজিরিন্ নামক পারসী রোজনাংমচার
লিখিত আছে—

‘বাদশাহ অরঙ্গজেব জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য
নবাব ইক্কাবখাকে আদেশ করেন। তখন ঐ মহামন্দির রাজা
জ্যোতিংহদেবের অধীনে ছিল। রাজা শীরমুহম্মদকে নবাবের
নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য অহুরোধ করেন
এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া বিরাটমূর্ত্তি সন্মূলের নিকট পাঠাইয়া দিতে
সম্মত হন। তদনুসারে রাজা সিংহদেবে রক্ষিত একটা
রাক্ষসমূর্ত্তি ও হারের সমুখস্থ দুইটা তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলেন।
এই সময়ে একটা বৃহৎ চন্দনকাঠের মূর্ত্তি ও দেবের নেত্র-
স্থানে রক্ষিত দুইটা প্রেধান হীরক বিজাপুরে অরঙ্গজেবের
নিকট পাঠান হয়।’

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে দেবদেবী অরঙ্গজেবের
ভীষণ দৃষ্টি হইতে জগন্নাথমূর্ত্তিও এড়াইতে পারেন নাই। কেবল
খোদারাজের কোশলেই দাক্ষিণ্যমূর্ত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। উক্ত
জ্যোতিংহদেবের সময় জগন্নাথের পাকশালা নির্মিত হয়।

তাহার কিছু দিন পরে উৎকলে দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রদিগের
আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এ সময় অর্থলোভী মহারাষ্ট্রদিগের
নির্ধাতনে পড়িয়া উৎকলবাসীগণ কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া
ছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু এ হুঃসময়ে জগন্নাথদেবের
সেবার কোনরূপ ক্রটি হয় নাই। মহারাষ্ট্রনায়কগণ জগন্নাথ-
দেবকে অতিশয় ভক্তি প্রদা করিতেন এবং তাহার সেবার
জন্য বিস্তর অর্থাদিও দান করিয়াছিলেন। পূর্বে মহা মন্দিরে
সিংহদেবের সমুখে গুরুভক্ত ছিল, বোধ হয় কালাপাহাড়
প্রভৃতি মুসলমানের আক্রমণে সেই গুরুভক্ত নষ্ট হইয়াছিল,
খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্ট্রগণ কোণার্কের
অরুণভক্ত তুলিয়া মহামন্দিরের সমুখে স্থাপন করেন, এখনও
সেই একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত প্রায় ২৮ হাত উচ্চ সুন্দর
শিল্পকার্য্যযুক্ত অরুণভক্ত মহামন্দিরের সমুখে স্থাপিত রহিয়াছে।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে খোদারাজের অধিকৃত সমস্ত ভূভাগ বৃটীশ
অধিকৃত হইল, এই সময়ে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার কিছু-
দিনের জন্য বৃটীশ গবর্নমেন্টের হস্তে আসিল। ইংরাজরাজ
যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন।

খৃষ্টান গবর্নমেন্ট কর্তৃক হিন্দুমন্দিরের তত্ত্বাবধান খৃষ্টীয়
মিসনরীগণের অসহ বোধ হইল, তাহাদের পুনঃ পুনঃ উত্তে-
জনার গবর্নমেন্ট পুরীর রাজাকে আবার মন্দিরের তত্ত্বাবধারক
নিযুক্ত করিলেন এবং দেবসেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের
সম্পত্তিও ছাড়িয়া দিলেন। এখন পুরীর রাজাই সেই দেবসেবা

নির্বাাহ করিয়া থাকেন। জগন্নাথের সকল কার্যে এখন
উাহারই অধিকার।

ক্ষেত্রের সীমা ও মাহাত্ম্য।—নীলাদ্রিমহোদয়ের মতে—

“ঋষিকুল্যাং সমাসান্ত বাবৎ বৈতরনী নদী।

তাৎ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বর্ততে মুনিপুত্রবাঃ।

সমুদ্রতান্তরং তীরং মহানদ্যন্ত দক্ষিণম্।

ভটমারভ্য তৎ ক্ষেত্রং রাজধানং চ পাবনম্।

বর্ততে তৎ সমারভ্য সমস্তাদশবোজনম্।

পদে পদে শ্রেষ্ঠতমং তৎক্ষেত্রং বর্ততেহনবাঃ।

তরীলাচলপর্যন্তং ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্।”

ঋষিকুল্যা নদী হইতে বৈতরনী নদী পর্যন্ত ক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য আছে, মহানদীর দক্ষিণ ও সাগরের উত্তরকূল নীলাচল
পর্যন্ত দশবোজনের মধ্যে স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র আছে।

“যৎক্ষেত্রস্পর্শতো বিপ্রাঃ সমুদ্রতীর্থরাটু স্মৃতঃ।

ক্রোশজরোরতিবৃত্তে ক্ষেত্রে ত্রীপুরুষোত্তমঃ।

শংখাকারেহপি তদ্ব্যথো রাজতে নীলভূধরঃ।”

যে ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া সমুদ্র তীর্থরাজ বলিয়া গণ্য হই-
রাছে, সেই তিন ক্রোশ বিস্তৃত শংখাকার পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে
নীলাচল অবস্থিত।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে ঋষিকুল্যা হইতে
বৈতরনী-পর্যন্ত সমস্ত স্থান ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইলেও পুরুষোত্তম-
ক্ষেত্র তিন ক্রোশব্যাপী। এই ক্ষেত্র শংখাকার হইলেও
উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

“ইদং ক্ষেত্রং সসর্জাদৌ স্বমূর্ত্তিসদৃশং বিভূঃ।” (৫৫ অঃ)

এই ক্ষেত্র ভগবান্ নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি
করিয়াছেন।

কপিলসংহিতার লিখিত আছে—

“সর্কেবাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা ত্রীপুরুষোত্তমঃ।

সর্কেবাকৈব দেবানাং রাজা ত্রীপুরুষোত্তমঃ।” ৫১৩৯।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই সকল তীর্থের রাজা এবং জগন্নাথদেবও
সকল দেবতার রাজা।

নারদ ও ব্রহ্মপুরাণাদির মত অবলম্বন করিয়া চৈতন্ত-
ভাগবতে বর্ণিত হইরাছে—

“সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম।

ক্ষেত্র ত্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকালে যখন সংহারে।

তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে।

সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।

প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি।

সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।

তাহাতে বসয়ে বসে অস্ত্র কীট কৃষি।

সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।

ময়ন মজল করি কহি যে সে স্থান।

নিজার যে স্থানে সমাধির ফল হয়।

শরনে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়।

প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।

কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন।

হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল।

মংগু থাইলেও পায় হবিষ্যের ফল।

নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।

তাহাতে বতক বৈসে সে আমার সম।

সেখানে নাহিক বন্দও অধিকার।

আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার।” (চৈতন্য অঙ্ক্য ২)

মন্দিরাদি।—জগন্নাথের বর্তমান মহামন্দির অক্ষা° ১৯° ৪৮°

১৭° উঃ এবং ৮৫° ৫১° ৩৯° পূঃ, ২২ ফিট উচ্চ ভূমির উপর

অবস্থিত। পূর্বে এই অঞ্চলই নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে পূর্বপশ্চিমে ৬৬৫ ফিট ও প্রস্থে

উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফিট। ইহার চারিদিকে ২৪ ফিট উচ্চ মুগ্গনি

পাথরে নির্মিত মেঘনাদ নামক প্রাচীর-বেষ্টিত। এই প্রাচীর

রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময় নির্মিত হয়। ইহাতে চারিটা দ্বার

আছে, পূর্বদিকে সিংহদ্বার, পশ্চিমে খাজাঘার, উত্তরে হস্তি-

দ্বার এবং দক্ষিণে অশ্বদ্বার। সিংহদ্বার কালপাথরে নির্মিত,

ইহাতে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে, ইহার দুইপার্শ্বে ২টা সিংহ

মূর্ত্তি। ইহার কপাটশালকাঠে ও ইহার ছাদচূড়াকারে নির্মিত।

এই দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারের

সম্মুখে ৪৪ ফিট উচ্চ প্রসিদ্ধ অরুণস্তম্ভ রহিয়াছে। খাজাঘারে

কোন মূর্ত্তি নাই, অপর দুইদ্বারের নামানুসারে দুইটা করিয়া

অশ্ব ও হস্তীমূর্ত্তি আছে।

পূর্বদ্বারে প্রবেশ করিয়া বামভাগে ত্রীকালী বিঘনাথ ও

রামচন্দ্রমূর্ত্তি দেখা যায়। তারপর বাইস পৈঠা অর্থাৎ ২২টা ধাপ

পার হইলে ভিতর প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণও পূর্বপশ্চিমে ৪০০ ও

উত্তরদক্ষিণে ২৭৮ ফিট। ইহারও চারিদিকে চারিটা প্রবেশ-

দ্বার আছে, এই প্রাঙ্গণের মধ্যে জগন্নাথদেবের বিখ্যাত

মন্দির এবং তাহার চারি পাশে অনেক ছোট বড় দেব

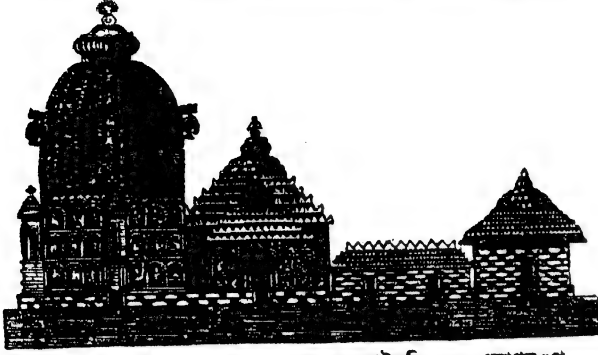
দেবীর মন্দির আছে।

জগন্নাথদেবের মন্দিরও চারিভাগে বিভক্ত—সর্ব পশ্চিমে

জগন্নাথের মূলমন্দির, তাহার সম্মুখে মোহন, মোহনের সম্মুখে

নাটমন্দির ও তৎপূর্বে ভোগমণ্ডপ। ভোগমণ্ডপের দেয়ালে ও

পোতার অতি উৎকৃষ্ট কার্য এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট কুরুচির পরিচরও আছে। ইহা পূর্বপশ্চিমে ৫৮ ফিট ও উত্তরদক্ষিণে ৫৬ ফিট ভূমির উপর গঠিত, ইহার ঘারোপরি অতি সুন্দর নবগ্রহমূর্তি আছে। ইহারও চারিটা প্রবেশদ্বার, এখানে অন্নভোগ হয় বলিয়া ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদ্বার সর্বদাই বন্ধ থাকে।



মূলমন্দির মোহন নাটমন্দির ভোগমণ্ডপ

তৎপরে নাটমন্দির। ইহা লম্বা চওড়ায় প্রায় ৮০ ফিট। ইহারও চারিটা প্রবেশ দ্বার; পূর্বদ্বারে অন্ন বিজয়ের স্কৃৎ মূর্তি আছে। নাটমন্দিরের পশ্চাতে মোহন বা জগমোহন, ইহাও ৮০ ফিট ভূখণ্ডের উপর গঠিত। মোহনের ছাদ ১২০ ফিট উচ্চ দেখিতে পিরামিডের মত। পশ্চাতে মূলমন্দির বা মহামন্দির, এই দেউলই মহারাজ চোড়োগ্র নিৰ্মাণ করেন, অপর অংশ তাহার অনেক পরে নিৰ্মিত হয়। এই মূলস্থানও ৮০ ফিট ভূমির উপর নিৰ্মিত। এই মূলমন্দিরের চূড়া কলিকাতার মন্মন্টে অপেক্ষা উচ্চ, উচ্চতায় ১১২ ফিট; এই জন্ত বহুদূর হইতেই ঐ চূড়া দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে।

মন্দিরের অধিকাংশে বদরীনারায়ণ, তাহার পশ্চিমে ত্রীরাধাকৃষ্ণমূর্তি, উভয়ের মধ্যে পুরাতন পাকশালার দরজা, তাহার পশ্চিমে বটকৃষ্ণ, তাহার পশ্চিমে বটমূলস্থিত অষ্টশক্তির অগ্রতম মঙ্গলাদেবী (১১)। উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা ও নীলাদ্রিমহোদয়ের মতে মঙ্গলার দর্শন ও পূজা করিলে মানবের

(১১) উৎকলখণ্ডে ঐ অষ্টশক্তির নাম এইরূপ লিখিত আছে—

“মঙ্গলা বটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা।
শম্ভুত পৃষ্ঠভাগে তু সংহিতা সর্বমঙ্গলা।
অর্দ্ধাঙ্গনী তথা লম্বা কুবেরদিশি সংহিতা।
কালরাজি দক্ষিণভাগে পূর্বভাগে মরীচিকা।
কালরাজ্যাতথা পশ্চাৎ চতুঃপা বাহুদিশা।
এতান্নকল্পপাতিঃশক্তিভিঃ পরিরক্ষিতম্।”

বটমূলে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শম্ভুর পশ্চাৎভাগে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্দ্ধাঙ্গনী ও লম্বা, দক্ষিণে কালরাজি, কালরাজির পশ্চাৎভাগে চতুঃপা এবং পূর্বদিকে মরীচিকা। এই অষ্টশক্তি কেন্দ্ররক্ষা করিয়া থাকেন।

মোহবন্ধ দূর হয়। তাহার ঈশানকোণে মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও তাঁহার দক্ষিণে বটমূলে বটেশ্বর লিঙ্গ।

নারদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে এই বটই অক্ষয়বট বা কল্পবৃক্ষ নামে বর্ণিত। এখানে আসিয়া কল্পবৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিষ্ণুরূপে তাহার পূজা করিতে হয়। জগন্নাথকেন্দ্র বৌদ্ধমূলক বলিয়া বীহাদের বিশ্বাস, তাহারা বলেন বৌদ্ধেরা বোধগয়াস্থ বোধিভূমির শাখা লইয়া গিয়া নানাস্থানে সযত্নে রোপন করে, এই অক্ষয়বটও সেইরূপে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অল্পমান ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ না থাকায় সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না, বুদ্ধের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী মহাভারতাদি গ্রন্থে অক্ষয়বটের উল্লেখ থাকায় আমরা এই অক্ষয়বটকেও বৌদ্ধস্থাপিত বলিতে পারিলাম না।

মার্কণ্ডেয়েশ্বরের উত্তরে ইজ্রাণী, বটেশ্বরের নৈঋতে সূর্য্য-মূর্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চাতে মুক্তিমণ্ডপ। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্তদেবের অবস্থিতিকালে ৩৮ ফিট ভূমির উপর এই মুক্তিমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে এই মণ্ডপে নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ আগমন করেন ও যাত্রীদিগকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইয়া থাকেন।

মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিমে নরসিংহমূর্তি। তাহার পশ্চিমে মণ্ডপ, এখানে দেবের অমূল্যলপনাদি ঘণ্ডিত হয়। তাহার পশ্চিমে গণেশ ও বায়ুকোণে ভূষণীকাকের মূর্তি। গণেশের পশ্চিমভাগে একটা কুণ্ড। উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই কুণ্ডের স্নানমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

উক্ত কুণ্ডের পশ্চিমভাগে অষ্টশক্তির অগ্রতম বিমলা দেবীর মন্দির, মন্দিরটা দেখিলেই অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। উৎকলস্থ তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন যে বিমলাই ক্ষেত্রের প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী আত্মাশক্তি, জগন্নাথ তাহারই ভৈরব। বাস্তবিক এখনকার অপর সকল শক্তিমূর্তি অপেক্ষা বিমলা প্রধান ও প্রাচীন, তাহা মৎস্তপুরাণ পাঠে জানা যায় (২০)। আশ্বিনমাসের মহাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে জগন্নাথের শয়নের পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হয়, এ ছাড়া ক্ষেত্র মধ্যে আর কোথাও ছাগবলি হইতে পারে না। বলরামের উৎকৃষ্ট ভোগান্তে বিমলার ভোগ হইয়া থাকে। বিমলার উত্তর ও দক্ষিণভাগে রাধাকৃষ্ণমূর্তি। পশ্চিমদ্বারের দক্ষিণভাগে ভাণ্ড-গণেশ, এই দ্বারের উত্তরদ্বারে গোপীনাথমূর্তি, তাহার উত্তরে মাধবচোরার মূর্তি, তাহার উত্তরে সরস্বতী ও নীলমাধব মূর্তি।

নীলমাধবের উত্তরে লক্ষ্মীর মন্দির, ইহার গঠন অতি সুন্দর; জগন্নাথের মত এই মন্দিরও ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির,

(২০) “গয়ায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমঃ” (মৎস্তপুঃ ১০০ বঃ)

মোহন ও মূলমন্দির এই চারি অংশে বিভক্ত। ইহার মূলমন্দির দর্শন করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে মহারাজ চোড়গঙ্গ কর্তৃক লক্ষ্মীদেবীর প্রতিষ্ঠার আভাস আছে। [গাঙ্গেয় শব্দের কোড়পত্র ২৮ শ্লোক দেখ।] বোধ হয়, মহারাজ চোড়গঙ্গ জগন্নাথের মন্দিরের স্থায় এই মন্দিরটীও নির্মাণ করাইয়া ইহাতে লক্ষ্মীদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মীদেবীর স্বতন্ত্র পাকশালা আছে। তাহাতে সাধারণ বিএঁহিদিগের ভোগ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীমন্দিরের পশ্চিমে একটি ছোটমন্দিরে সর্কমঙ্গলা নামে কালীমূর্তি বিদ্যমান। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তরে দুইটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও ঈশানকোণে স্বর্য়ানারায়ণ, তাহার পূর্বে স্বর্য়োর মন্দির, এ মন্দিরের কারুকার্যও অতি সুন্দর, কেহ কেহ বলেন নরসিংহদেবের সময় এই মন্দিরটী নির্মিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্বে জগন্নাথ, তাহার পূর্বে পাতালেশ্বর, তাহার নিকটেই উত্তরদ্বার। ইহার পূর্বভাগে কৃষ্ণ ও তাহার নিকট বাহনদিগের মন্দির। তৎপূর্বে মহামন্দিরের ঈশানকোণে রাধাশ্রাম ও তাহার দক্ষিণে ভোগমণ্ডপের ঈশানকোণে গোরাক্ষদেবের মূর্তি। রাধাশ্রাম ও গোরাক্ষের মধ্যস্থলে একটি দ্বার আছে, এই দ্বার দিয়া স্নানবেদীতে যাইতে হয়। এই বেদীতে জন্মাংশব বা স্নানযাত্রা হইয়া থাকে। স্নানমণ্ডপের অধিকোণে চাহনিমণ্ডপ। এখানে লক্ষ্মী আসিয়া দেবের স্নানোৎসব দেখিয়া থাকেন।

সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে ভেটমণ্ডপ। জগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী এখানে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। বাইশপইঠার উত্তরে পাণ্ডাগৃহে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

হস্তিদ্বারের নিকট প্রদক্ষিণার মধ্যে বৈকুণ্ঠনামে একটি দ্বিতল গৃহ আছে। এখানে কতকগুলি নিম কাঠ থাকে, যে কাঠে গতবারে নবকলেবর হইয়াছে, ইহা তাহারই অবশিষ্ট, প্রতিবর্ষে স্নানযাত্রার পর এখানে দেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের পশ্চিমাংশে এক পাকা চত্বর আছে, সেইখানে কলেবর প্রস্তুত হয়। (নবকলেবর প্রসঙ্গে অপরাপর বিবরণ দেখ।) ঐ চত্বরে দুইটা বেদী আছে, একটাতে পুরাতন মূর্তি রাখা হয় ও অপরটাতে নূতন মূর্তি খোদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমূর্তি ও মহাবেদী।—রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমতত্ত্বত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে,—মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অগ্রে কল্লবট ও গরুড়কে নমস্কার করিয়া পরে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবে, তাহাতে পরমগতি লাভ হয়।

মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া প্রথমে রত্নবেদীকে তিনবার প্রদ-

ক্ষিণ করিতে হয়। অনন্তর প্রথমে বলরাম, তৎপরে স্বাদেশ-কর মন্ড্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে, পরে মূলমন্ড্রে সুভদ্রাদেবীকে পূজা করিবে। (পুরুষোত্তমতত্ত্ব)

সচরাচর যাত্রীগণ সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরে গিয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যে অপরাপর দেবতা দর্শন করিয়া নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। পরে জগমোহনে আসিয়া, গরুড়মূর্তিকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। জগমোহনের মধ্যে একটি বেড়া আছে, এই বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহারা শ্রীমূর্তি সন্দর্শন করে।

শ্রীমন্দিরের ভিতর অন্ধকার, দুইটীমাত্র দীপ জলে, সুতরাং যাত্রীগণ আলো হইতে আসিয়া এখান হইতে প্রথমে মূর্তি দেখিতে পায় না, অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্ট মূর্তি দেখিতে পায়। যাহাদের দর্শন শক্তি কম, হয়ত তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। এই জন্তই সাধারণের বিশ্বাস যে, সকলের ভাগ্যে জগন্নাথ দর্শন ঘটে না। এখানে দেবদর্শন উপলক্ষে যাহা প্রণামী দেওয়া হয়, তাহা পাণ্ডুরাই আত্মসাৎ করে। যাহারা কিছু বেশী খরচ করে, তাহারা দক্ষিণদ্বার দিয়া মূলমন্দিরে যাইতে পায়। এখানে যাহা দক্ষিণা দেওয়া যায়, তাহা মন্দিরের আয় ব্যয় হিসাবে জমা হইয়া থাকে। এখানে রত্নবেদী বা মহাবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শক কর্পুরালোকে দেবদর্শন ও পূজাদি করিয়া থাকেন।

রত্নবেদী প্রস্তরে নির্মিত, দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট ও উর্দ্ধে ৪ ফিট। প্রবাদ এইরূপ—ইহার মধ্যে লক্ষ শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে, এই জন্ত দাক্ষিণ্যমূর্তি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য অধিক, এই জন্ত ইহা মহাবেদী বা সিদ্ধপীঠ বলিয়া গণ্য।

এই রত্নবেদীর উপর প্রথমে দক্ষিণপার্শ্বে বলরাম, তৎপরে সুভদ্রা, তৎপরে জগন্নাথ এবং তৎপরে সুদর্শন মূর্তি অধিষ্ঠিত।

ইহাদের সম্মুখে স্বর্ণনির্মিত লক্ষ্মীমূর্তি, রত্নজের বিখ্যাত শ্রীমূর্তি ও পিতলের মাধবমূর্তি আছে।

প্রধান চতুমূর্তি কেবল স্নানযাত্রা ও রথোৎসব উপলক্ষে বাহিরে আনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দাক্ষিণ্যমূর্তির নানা প্রকার শৃঙ্গার (বেশ) হইয়া থাকে, প্রথমে প্রাতঃকালে মঙ্গল-আরতি-শৃঙ্গার, তৎপরে অবকাশ-শৃঙ্গার, তৎপরে দ্বিপ্রহরের সময় প্রহরশৃঙ্গার, সন্ধ্যার পূর্বে চন্দনশৃঙ্গার এবং সন্ধ্যার পর বড়শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে দামোদর, বামন প্রভৃতি বেশও হয়।

দেবের প্রাত্যহিক বিধি।—প্রথমে জাগরণ, এই সময়ে হনুভি ধ্বনি, মঙ্গল আরতি, পরে যথাক্রমে দস্তকাঠ প্রদান, বস্ত্রপরিধান, বালভোগ ও সকাল ভোগ হয়। বালভোগে

খই, ঘবনী, দধি ও নারিকেল এবং সকাল ভোগে খেচরান ও শিষ্টকাদি দেওয়া হয়। তৎপরে অন্নব্যঞ্জনানি-
যুক্ত বিপ্রহর ভোগ হইয়া যার বন্ধ হয়। পরে ৪ টার
সময় নিভ্রাতঙ্গ ও জিলাপি ভোগ, পরে নানা প্রকার
মিষ্টান্নযুক্ত সন্ধ্যাক্ষেপ, পরে বড়পুন্ডার ভোগ হইয়া
থাকে, এই সময়ে রাজবাজি হইতে “গোপালবল্লভ” নামে
মিষ্টান্ন আসে ও তদ্বারা দেবের ভোগ হয়। সকল ভোগের
পূর্বে পূজা ও পরে আরতি হইয়া থাকে।

মহাপ্রসাদ।—জগন্নাথ উদ্দেশে যাহা ভোগ দেওয়া হয়,
তাহা মহাপ্রসাদ নামে গণ্য। এই মহাপ্রসাদের জন্তই
জগন্নাথ এখন সাধারণের নিকট এত বিখ্যাত।

এই অপূর্ণ মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যের জন্তই আচণ্ডাল
সাধারণে জগন্নাথকে মহাপুণ্য স্থান বলিয়া জ্ঞান করে। যে
হিন্দুসমাজে পরস্পর আহারাদির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই
জাতি-ভেদ-প্রথা রক্ষিত হইয়া থাকে, সেই হিন্দুসমাজে
মহাপ্রসাদের এরূপ আদর, কম আশ্চর্যের কথা নয়।

পুরাবিদগণ সকলে এক বাক্যে লিখিয়াছেন যে, আতি-
ভেদ ভুলিয়া হিন্দু সাধারণে যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া
থাকে, এ প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে।
পূর্বেই লিখিয়াছি, এ প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত
হয় নাই, তাহা হইলে বোধগয়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম
বিশেষ প্রবল ছিল ও যেখানে আজও হিন্দু কর্তৃক বুদ্ধদেব
পূজিত হইয়া থাকে, সেখানে কেন এ প্রথা প্রচলিত নাই?
এইরূপ নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেখানে এখনও বুদ্ধদেব হিন্দু
কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকে, সেখানেও এ প্রথা নাই, সুতরাং
যদি বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে এ প্রথা গৃহীত হইত, তাহা হইলে
যেখানে আজও বুদ্ধদেব হিন্দুর কাছে পূজা পাইয়া থাকেন,
সেখানে নিঃসন্দেহে এই প্রথা প্রচলিত থাকিত, ইত্যাদি
কারণে আমরা ঐ প্রথা বৌদ্ধমূলক বলিতে পারিলাম না।

আমাদের বিশ্বাস যে, যখন জগন্নাথক্ষেত্র শবররাজগণের
অধিকারে ছিল, তখন ইহা সামান্তভাবে প্রকাশ পায়, পরে
চৈতন্যদেবের সময় সর্বসাধারণে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

শবরের হাতে কোন উচ্চ হিন্দুই এখন আহার করেন না,
কিন্তু যখন সমস্ত কলিকরাজ্যে শবররাজগণের আধিপত্য
ছিল, যখন সোমবংশীয় রাজা যযাতি শবররাজের অধীনে
উড়িয়া শাসন করিতেন, যখন শবরসেবকেরা জগন্নাথের
পূজা ও জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত করিত, যখন লুপ্ত লুপ্ত
ব্রাহ্মণ শবরের আশ্রিত হইয়াছিলেন এবং জগন্নাথের প্রসাদ
ভক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন, সেই সময়েই

খৃষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে মহাপ্রসাদের আদরের সূত্রপাত
হয়। অন্যথা বা নীচজাতি কোন সত্য বা আধ্যাত্মিক
উপর আধিপত্য পাইলে সত্যাত্মিকে আপনাদিগের লজ্জা-
ভূত করিয়া নিজেরাও বড় হইবার চেষ্টা করে, ইহা সচরাচর
দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জটুর শবররাজগণ তাঁহাদের
অধীনস্থ সোমবংশীয় রাজগণকে আরত করিয়া, তাঁহাদিগের
জ্ঞান তাঁহারাও আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচর দিতে
কুষ্ঠিত হইলেন না। তাহা শবররাজ শিবগুপ্ত ও তবগুপ্তের
সময়ে উৎকীর্ণ শাসনপত্রপাঠে জানা যায়।

এইরূপে শবরেরা হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুর
আরাধ্য দেবতা জগন্নাথের নিকট নিজ আত্মীয়বর্গকে সেবক
রূপে নিযুক্ত করিলেন, মিত্রতা ও অধীনতাগোশে বন্ধ রাজ্য
যযাতি ও তাঁহার অল্পগত ব্রাহ্মণগণ, প্রবল পরাক্রান্ত শবর-
রাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বরং
দাক্ষিণী পরমব্রহ্মের নিকট জাতিভেদ থাকিতে পারে না,
ছোট বড় সকলেই তাঁহার সেবার সমান অধিকারী এবং
উচ্চ নীচ সকলেই দেবের প্রসাদ একত্র গ্রহণ করিতে পারে,
পুণ্যস্থানে তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না, এইরূপ
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তৎপরবর্তী উৎকলখণ্ড,
কপিলসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাই মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যে
বর্ণিত হইয়াছে। তাই উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—“ভগ-
বানের দেহার্জিবিরিণী অমূল্য বৈষ্ণবী শক্তি (লক্ষ্মীদেবী) স্বয়ং
অমৃত সদৃশ অন্ন পাক করেন, স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভোজন
করেন, তাঁহার ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পবিত্র ও সমস্ত
পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। এমন পবিত্র বস্তু জগতে আর
কিছুই নাই। ত্রৈবর্নিক হউক বা পুত্রই হউক যে কেহই
পাক করুক, স্বয়ং লক্ষ্মী দ্বারাই সে পাককার্য সম্পন্ন হই-
য়াছে জানিবে, সুতরাং অপরাপর লোকের সম্পর্কেও কোন
দোষ হয় না। সকল জাতি, দীক্ষিত, অমিহোদ্রী প্রভৃতি
সকলেই মহাপ্রসাদ ভোজনে পবিত্র হয়, যেমন গঙ্গাজল
চণ্ডাল স্পর্শে অপবিত্র হয় না সেইরূপ এই মহাপ্রসাদও
কিছুতেই অপবিত্র হয় না। ইহার ক্রয় বিক্রয়েও দোষ
নাই। শুক বা দূর হইতে আনিলেও শুদ্ধ, যখন যে অব-
স্থায় পাওয়া যায়, তখনই ভোজন করা উচিত, ইহাতে সকল
পাপ দূর হয় (২১)।

(২১) “চন্দ্রসংহারতথ্যাদি ভোগভোজ্যাদিকাদি যে।

বহুরিভোজ্যভোজ্য পক্ষুঃ ত্রৈবর্নিকানুঃ।

আচাধ্যান্ন বাধ পূজান্ন বা ত্রিবর্ণপরিষেবকানু।

লৌকিকভক্ষণমাহারোহঃ পাত্তি শ্রীঃ স্বয়ং ব্রহ্ম।

এ সময়ে বোধ হয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাপ্রসাদ তক্ষণ অশান্ত্রীক প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু জগন্নাথের সেবকগণ বুঝাইয়া দিলেন—

“সাধারণঃ ধর্মশাস্ত্রং কেত্রেহ্মিন্নি বিচার্যতে ।

অনন্ত পরমো ধর্মো যো দেবেন প্রবর্তিতঃ ॥

আচারপ্রভবো ধর্মো ধর্মন্ত প্রভুরূঢ়াতঃ ।” (উৎকলখণ্ড ৩৮ অঃ)

সাধারণ ধর্মশাস্ত্র এখানে খাটিতে পারে না। এই (মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ-রূপ) ধর্ম স্বয়ং ভগবান্ প্রচার করিয়াছেন। আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি এবং স্বয়ং জগন্নাথই ধর্মের কর্তা।

বাস্তবিক যখন জগন্নাথ শবররাজের পূজা পাইতেন, নীচ শবর আতি কর্তৃকই জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত হইত, তখন ২য় ইজ্রহ্ম উগাবিধারী যযাতি ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেও শবররাজের অধীন ছিলেন বলিয়া জগন্নাথের পূর্বা-

ভূক্তে নারায়ণো নিত্যঃ ভগ্না পঙ্কঃ শরীরগান্ ।

অনন্তঃ তচ্চ নৈবেদ্যং পাপস্য মুক্তিং ধারয়েৎ ॥”

“বৈষ্ণবো লভিতুংলা বিমুদেহাধিপারিণী ।

ভূয়োপমঃ সা পঠতি ভূক্তে নারায়ণপ্রভুঃ ।

মহি ভৎসনশ্চ পুণ্যং বহুত পুণ্যবীতলে ।

প্রাশস্তমশেষাণাং পাপানাং পরিকীর্তিতম্ ।

ভগবৎপাদপদ্যান্ প্রেক্ষণোপাসনাদিভিঃ ।

পাকসংস্কারকর্তৃণাং সম্পর্কোহ্যত্র ন হুযতি ।

লম্বাভাঃ সন্নিধানেন সর্কে চ ভুজঃ স্মৃতাঃ ॥”

“নিমন্তি যে তদমৃতং সূচাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।

লব্ধং বসুধরভুজং সহতে নাপরাদিনঃ ॥

ভেদামত্র ন দৃশ্যেতু বা ভেদাঃ হি দুর্গতিঃ ।

কৃত্যপাকে মহাঘোরে পচ্যতে তে হি দ্বারগে ।

বিক্রমশ্চ ক্রমে বাপি প্রশস্তত্ত ভো বিজাঃ ।

নির্দ্বালাঃ জগদীশন্ত নালিহ্যোয়ামি কিংকন ।

চিরস্থমপি সংভুতঃ নীতঃ বা বুরদেলতঃ ।

মখা তথৈব ভুক্তঃ তৎ সর্বপাপাপনোদনম্ ॥” (উৎকলখণ্ড ৩৮ অঃ)

“জগন্নাথন্ত নৈবেদ্যং স্নানপাতকনাশনম্ ।

ভক্ষণং কলমোহতি কপিলাকোটীধামজং ॥ ৩১ ॥

কিং ভেদ ন কৃতং পাপং কিং তেন চ কৃতং ভগ্নঃ ।

ভক্তিভঃ যেন নারায়ণঃ সাক্ষরভক্ষণপিণ্ডঃ ।

জগন্নাথো যথা সাক্ষাদর্শনাদুত্তরো ব্রহ্ম ॥

তথৈব মুক্তিদায়কঃ জগন্নাথস্ত ভো বিজাঃ ।

মোক্ষভরতং বাপি শুভমাত্রং খাশি বা ॥

ভক্ষণাদর্শনটীক্যং বিজাচীনাক মুক্তিদায়কম্ ।

পুরুষোত্তমাংগরং ক্রেত্রং নাতি নাতি মহীধরঃ ।

বিজাত্য বপচাধরঃ যঃ ভুক্তি পুণকঃ ।

কৃত্যং সর্বদায়কং গম্যবাং পুরুষোত্তমম্ ॥” (কপিলখণ্ড ৪ অঃ)

পর পদ্ধতি এককালে পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা পূজক হইলেন বটে, কিন্তু তখনও শবরেরা ভোগ প্রস্তুত করিত। তাহাদের তাড়াইবার যো ছিল না। যখন জগন্নাথসেবক ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, তীর্থযাত্রীগণ আদিয়া সকলেই পরম পরিতোষে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে, সাধারণ লোকে বড় আর গোলযোগ করিতেছে না, তখন তাহারা শবরসেবকদিগকে যজ্ঞোপবীত দিয়া এক স্বতন্ত্র প্রকার ব্রাহ্মণ করিয়া লইলেন, এখনও জগন্নাথের স্পকারগণ সকলেই বলভদ্রগোত্রী ‘শওর’ বলিয়া পরিচিত। শবর হইতেই “শওর” নাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই শবরেরাই এখন বলভদ্রগোত্রী ব্রাহ্মণ।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে যযাতির পূর্বে মহাপ্রসাদ-ভক্ষণপ্রথা প্রচলিত ছিল না (২২)। নারদ ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে বিস্তৃত ভাবে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও মহাপ্রসাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহা আধুনিক প্রথা বলিয়াই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্তগণ জগন্নাথের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেও মহাপ্রসাদের কথাই তোলেন নাই। বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত জগন্নাথ দর্শনে গিয়া এখনও কেহ কেহ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন না, কেবল দেবদর্শন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জান করেন। পূর্বে পুরুষোত্তম মध्ये কোন কোন প্রধান পণ্ডিত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন না, তাহার কথা শুনা যায়। চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তমে গমন করেন, তখনও রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান পণ্ডিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য মহাপ্রসাদ আহার করিতেন না। চৈতন্যচরিতামৃত লিখিত আছে, সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য চৈতন্যের ভক্ত হইলে একদিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত মহাপ্রভু অকণোদয়কালে মহাপ্রসাদ আনিয়া ভট্টাচার্যকে প্রদান করিলেন। ভট্টাচার্যের স্নানাত্মিক কিছুই হয় নাই। কিন্তু আজ

(২২) এই যযাতির সময়ে শবররাজের অধিকারকালে বোধ হয়, ভূবসেধরেও মহাপ্রসাদ-ভোজনপ্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে—

“প্রকাসবিপিনে বিশ্রা লিঙ্গং সাক্ষাৎ সমাশ্রয়ম্ ।

সৈবৈবাম্রত বাহুস্তি শ্রদ্ধায়াঃ স্রবোৎসবঃ ॥ ৩৩ ॥

অগ্রাহবীশনৈবেদ্যং ন ভোক্তব্যমিতি বিজাঃ ।

যদি ব্যাক্যাসি ভাষ্যে ভাষ্যে কদাচন ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যে কদাচন সেতো তথোক্তোত্তরং বিজাঃ ।

মহাপ্রসাদং সৈবৈবামিতি প্রাহমহর্ষয়ঃ ॥

তদন্যাত্ম্য মরকং বাতি নাত্ম্যং সংসারঃ ॥” (কপিলখণ্ড ১৩ অঃ)

উক্ত গ্রন্থে আরও ভূবসেধরে প্রচলিত আছে।

সার্কভোম চৈতন্তের হাতে মহাপ্রসাদ পাইয়া আনন্দে ভঞ্জন করিলেন। চৈতন্তদেব চিরভক্তিবিষেবী সার্কভোমের ব্যবহার দৃষ্টে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “আজ আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইল। আজ আমি জিভুবন জর করিলাম, আজ আমার বৈকুণ্ঠ লাভ হইল, সার্কভোমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে।” [চৈতন্তচন্দ্র ৪৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

চৈতন্তদেবের কথার ভাবেও জানা যাইতেছে যে, অনেকেই মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারই গুণে মহাপণ্ডিত সার্কভোমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়া ছিল। প্রেমের অবতারণা চৈতন্তদেব জগন্নাথে পা দিয়াই জগৎজুর প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট জগন্নাথদেবের যাহা কিছু সমস্তই অপারিধি ও অলৌকিক, সুতরাং যে মহাপুরুষ হিন্দু যবনকে সমভাবে কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে শবর-পক্ষ মহাপ্রসাদও সাদরে গ্রহণ করিবেন, তাহা কে না বিশ্বাস করিবে? তাঁহার দেখাদেখি শত শত চৈতন্তভক্ত, মহাপ্রসাদকে অমৃত ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতেই মহাপ্রসাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। যে চৈতন্তদেবকে উৎকলবাসীগণ সকলেই ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে গৌরাক্ষের মূর্তি উৎকলের আট শতাধিক মন্দিরে এখনও পূজিত হইয়া থাকে, সেই চৈতন্তদেবের প্রসাদিত মহাপ্রসাদ উৎকলদেশীয় আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি?

“নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারজ।

ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্তের সজ ॥”

চৈতন্তভাগবতের এই কবিতাও আমাদের কথার সমর্থন করিতেছে।

বাস্তবিক আমরা জগন্নাথে গিয়া দেখিয়াছি যে শাক্তগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবেরাই মহাপ্রসাদের বেশী আদর করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা দেশদেশান্তরে লইয়া অতি ভক্তিভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। এখনও অনেক শাক্ত জগন্নাথের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন না, কিন্তু মহাপ্রসাদের মহামান্য শুনিয়া অন্ন ব্যতীত অপরাপর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রত্যহ হাজার হাজার টাকার মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কোন কোন রথ-যাত্রার সময় একদিনে লক্ষ টাকার মহাপ্রসাদবিক্রয়ের কথা শুনা যায়। মহাপ্রসাদবিক্রয়ে পুরীর ঠাকুর রাজা ও পাণ্ডা পড়িহারীদিগের যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

মহোৎসব।—প্রাত্যহিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য ব্যতীত জগন্নাথের অনেকগুলি যাত্রা বা উৎসব হইয়া থাকে—

১ বৈশাখ মাসে অক্ষরতৃতীয়া হইতে ২২ দিনব্যাপী গন্ধলেনন বা চন্দনযাত্রা। এই সময় জগন্নাথের ভোগমূর্তি মদনমোহনকে প্রত্যহ নিকটবর্তী নরেন্দ্রসরোবরে লইয়া গিয়া নৌকার পরিভ্রমণ করান হয়।

২ বৈশাখের শুক্ল অষ্টমীতে প্রীতিষ্ঠোৎসব। এই দিন ইন্দ্রদ্বার কর্তৃক দেবের প্রতিষ্ঠা হয়।

৩ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্ল একাদশীতে কল্মষীহরণ। এইদিন মদনমোহন গুণ্ডিচার গিয়া কল্মষীগকে হরণ করিয়া আনেন। রাত্রিকালে বটমূলে উভয়ের বিবাহ হয়।

৪ জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমার দিন স্নানযাত্রা বা জন্মযাত্রা। এই দিন দারুমূর্তিগুলি স্নানবেদীতে আনিয়া রাখা হয়, এবং অক্ষয়-বটমূলস্থ রোহিণীকুণ্ডের জল লইয়া দেবের স্নানকার্য সম্পন্ন হয়, এসময়ে লক্ষ্মীদেবী চাহনিমগ্নে বসিয়া স্নানোৎসব দর্শন করেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবেশ হয়। এই দিন মহা-ধুমধামে পূজাদি হইয়া থাকে। তৎপরে দারুভক্ষ জগমোহনের পার্শ্বস্থ নিরোধন (আঁতুড়) ঘরে গিয়া ১৫ দিন থাকেন।

এই সময় ১৫ দিন কপাট ও পাকশালা বন্ধ থাকে। এই কয়দিন মহাপ্রসাদ হয় না, অথবা কেহ দেবদর্শন করিতে পায় না। পাণ্ডারা বাহিরের লোকদিগকে বুঝাইয়া দেন, অতিরিক্ত জলসেচন দ্বারা জগন্নাথ মহাপ্রভুর জর হইয়াছে, এই জন্ত তাঁহারা পাচন ভোগ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক পাণ্ডাদিগের এই সকল কথা মিথ্যা, এই ১৫ দিন নিরোধনগৃহে অনেক কার্য হইয়া থাকে। তখনকার গুপ্ত ব্যাপার সাধারণে জানিবার জন্ত বড়ই উৎসুক হইয়া থাকেন। নীলাদ্রিমহোদয়ে ১৫ দিনের কার্যাদি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

‘স্নানোৎসবের পর ১৫ দিন দ্বারবন্ধ বংশাবৃত স্থানে প্রভুকে রাখিয়া ঐ বংশাবরণ চিত্র বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রমণীয় একখানি পর্য্যঙ্ক উহার নিকটে রাখিবে, পরে সার্ক হস্তত্রয়পরিমিত মোটা কাপড়ে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির মূর্তি চিত্রিত করিবে। বলরাম-মূর্তি শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভূজ, শঙ্খ, চক্র, হল ও মুঘলধারী এবং নানা প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। কৃষ্ণমূর্তি মেঘের দ্বারা নীলবর্ণ পদ্মানন্দ, ইহার হস্ত চতুর্ভূজ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকিবে এবং বনমালা ও কোমলাদি নানা আভরণ চিত্রিত হইবে। জুহুদ্রামূর্তি পীতবর্ণ, পদ্মানন্দ, চতুর্ভূজ, হস্ত চতুর্ভূজ পদ্মদ্বয়, বর ও অভয় থাকিবে। এই প্রকারে ৩ খানি পটে উক্ত মূর্তিগুলি চিত্রিত করিয়া পূর্বদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে, প্রদক্ষিণান্তে পূর্বোক্ত বংশাবৃত স্থানে ঐ মূর্তিগুলি স্থাপন করিবে। অনন্তর পূর্বস্থাপিত পর্য্যঙ্কে বলদেবের সম্মুখভাগে

রাম, সুসিংহ ও কৃষ্ণের চিত্রিত মূর্তি, স্তম্ভদ্বার সম্মুখভাগে বিধবাঈ ও লক্ষ্মীর মূর্তি এবং জগন্নাথের সম্মুখভাগে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করিবে, উক্ত কৃষ্ণ (জগন্নাথ) মূর্তির নিকটে স্বদর্শন চক্রঙ্গপী নারায়ণ-চক্র স্থাপন করিবে। এইরূপে মূর্তি সকল স্থাপিত হইলে দর্পণাদির প্রতিবিম্বে পঙ্কামৃত প্রভৃতি দ্বারা মহাদান সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নবিহিত পূজা করিবে। ঐ দিন হইতে ক্রমে পনের দিন যথাসময়ে দান ও পূজা করিতে হয়। দারুভক্ষ মূর্তির মহাদানে শরীর অলস হয় এজন্য প্রধান মন্দিরে পূজা প্রভৃতি যাবদীয় উৎসব ব্যাপার নিষিদ্ধ। ঐ পনের দিন নির্মাণ্য ও উক্ত বংশাবরণের মধ্যেই রাখিয়া দিবে। ঐ সময়ে মিশ্রি ও চিনির জল প্রশস্ত পূজোপকরণ। বিদ্যাপতি ও বিদ্যাবল্লভ-বংশীর ব্যক্তিগণই সমস্ত কার্য্য করিবেন। ক্রমে ৬ দিন পর্যন্ত দারুমূর্তির লেপনাদি কার্য্য হইলে ৭ম দিবসে সুবাসিত তিলতৈলে মর্দন করিবে। ৮ম দিবসে রমণীয় পটুসূত্র দ্বারা দারুমূর্তির সর্কাদ জড়াইয়া শুক সজ্জবন্ধের রস চূর্ণ করিয়া সুবাসিত তিলতৈলে মিশাইয়া সর্কাদে মর্দন করিবে, পরে ৯ম দিবসে চিকুণ আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা পূর্বদন্ত অমুলেপন বার বার পুচিয়া ফেলিবে। ১০ম দিবসে অতি চিকুণ বস্ত্রদ্বারা দারুমূর্তি আচ্ছাদন করিয়া রক্ত চন্দন, সারচন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও কপূর প্রভৃতি সুবাসিত দ্রব্য একত্র করিয়া লেপন করিবে, পরে ১১শ দিবসে সাম্যকালীন পূজাসমাপনান্তে নানাবিধ বাতধ্বনি হইলে পুনর্বার পূর্বোক্ত চন্দনাদি দ্রব্য দ্বারা লেপন করিবে। প্রথম বারের লেপনে দারুমূর্তিতে রক্ত কন্দনা, দ্বিতীয় বারের লেপনে মাংসকন্দনা করিবে। অনন্তর ১২শ দিবসে পুনর্বার বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্বক পূর্বোক্ত লেপন করিয়া চন্দ্রকন্দনা করিবে। ঐ দিন পূজা, দান ও লেপনাদিতে দেড় প্রহর অতীত হইলে নানাবিধ মঙ্গলবাতপূর্বক স্নান ও বস্ত্র ও পূর্বোক্ত লেপন দ্বারা পদদ্বয় নির্মাণ করিবে। ঐ লেপনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে বধির হইয়া থাকে, অতএব বাহাতে শব্দ না হয় এইরূপে লেপনাদি কার্য্য করিবে। রোমকন্দনার্থ কপূরের লেপ দিতে হয়। পক্ষান্তের দিন যখন নেত্র চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে নেত্রোৎসব বলে (২৩)।

(২৩) "রানোৎসবস্ত তত্তান্তে দিগোদগৃহে বিভূঃ।

থাপরেৎ কেবলঃ ব্রহ্মরিতোতৎ কথিতং যম।

দলপকদিনান্তেব বংশাবরণবেষ্টিতং।

কর্তব্যং তত্র কিং কর্তব্যং নোক্তং কমলাসম।

পুণ্যরাজ্য মহাপ্রাজ্ঞ রানোৎসবসমাপনে।

তৎকালোদয়ং তুভে বিচিত্রং বন্দনং বহু।

বজ্রা চাক্রতঃ কৃষা পর্য্যকঃ তৎপুত্রো ভাসেৎ।

সম্প্রতঃসময়ে হস্তদ্বয়মাণেহতিশোভনে।

৫ আবারমাসের শুরু বিত্তীয় রথযাত্রা। এই দিন জগন্নাথের প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। উৎকলখণ্ড, কপিল-সংহিতা, নীলাজিমহোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে রথযাত্রাদর্শন-মাহাত্ম্য বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে, উক্ত কথ্যানি গ্রন্থের মতে রথযাত্রাদর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই রথযাত্রাদর্শন করিবার জন্য লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

সার্বভৌমত্বমুত্তে তত্রৈব প্রতিমাঃ ভাসেৎ।

চিত্রৈর্বিমিশ্রিতং রামঃ ধ্বলক চতুর্ভুজম্।

পঞ্চং চক্রং হলং তাবদ্ব্যবাসঃ সুবলং পরম্।

তত্র সংলিখ্য পরমৈতৎ বৈশিষ্ট্যমতিশোভিতং।

কুর্ধ্যাৎ পটত্রয়ং রম্যমিখ্যং তাবৎ প্রমাণকম্।

সুভদ্রাং পীতবর্ণাভাং পদ্মাসনপতাং শুভাম্।

চতুর্ভুজাং করে বস্ত্রে ধৃতপদ্মদ্বারাঃ পরাম্।

বরাভয়করাকৈব লামাকুৎসিতভূমিতাম্।

পটে চ তাবুশে তত্র বিলিখ্য প্রজ্ঞারাক্ষরেৎ।

নীলজীমূতসজ্জাং পদ্মাসনবিরাজিতাম্।

শঙ্খচক্রগদাগায়ত্রিসংকরণভূজম্।

চতুর্ভুজং চাক্রভূষং পদ্মপত্রায়তেকমম্।

শ্রীবৎসকৌন্তভোদয়ঃ বনমালাবিভূষিতম্।

তাবুশে পটমধ্যেপি চিত্রে সংলিখ্য তৎ হরিশ্চ।...

তৎ পটত্রয়মাদীং পূর্বদ্বারপ্রদেপণতঃ।

প্রাসাদঃ প্রসরিষ্যৎ তৎকালোদয়ং ভাসেৎ।

ততস্তত্রৈব পর্য্যকং তুলিমাশাতরেৎ পরাম্।

রামঃ সুসিংহঃ কৃষ্ণকঃ অতিসাম্প্রদায়িকম্।

থাপরেৎ বলদেবাজে তাবুশে প্রতিমাত্রয়ং।

ভদ্রারাঃ পুরতো ভূগুণ বিধবাঈঃ রম্যঃ ভাসেৎ।

জগদীশত পুরতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্থাপয়েত্তবা।

চক্রায়ে তত্র পর্য্যকং নারায়ণমখো ভাসেৎ।

স্বদর্শনচক্রঙ্গপং জগদীশকরেষ্টিতম্।

পূজয়েত্তঃ তথা ভক্ত্যা পটে মূর্তিঃ ন কল্পয়েৎ।

এবং সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রতিবিম্বে ততঃ পরম্।

পঙ্কামৃতৈর্মহানামঃ কুর্ধ্যাচ্চাচার্য্য এব চ।

ততো মধ্যাকপূজাক পুজতঃ পূর্ববৎশ্রুতিঃ।

কুর্ধ্যাত্তদ্বিনসারভ্য দলপক চ বাসরাম্।...

তথা চতুর্ভুজালাক্কাঃ কাৰ্ঘ্যাদ্ধাচার্য্যবর্ষটিকঃ।

তদ্বির্ভালো জ্বলিষ্যৎ ন কুর্ধ্যাক কদাচন।

কুর্ধ্যাজ্জয়রকে যোরে পচাতে সুচরী নরঃ।

অজালাসে জায়মানে ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপতে।

দেবদেবসি কালেস্মিন্‌নোৎসবসি কারয়েৎ।...

বিদ্যাপতিরবরজে দলপকদিনেষপি।

শিতাপ্রপানকৈর্বিজুং সর্বৈশ্চ তাপুজয়েৎ।

কালবরেংপি দুপতে নির্মাণ্য নো বহিরয়েৎ।

ঐতি বর্ষে তিনখানি নুতন রথ আনত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ হাত উচ্চ ও দৈর্ঘ্যে আছে ৩৫ ফিট তাহাতে ৭ ফিট ব্যাসের ১৬টা লৌহ চক্র আছে, চুড়ার চক্র বা গজপক্ষীর মূর্তি থাকে, সেই জন্ত এই রথকে চক্রধ্বজ বা গজপক্ষী বলে। বলরামের রথ ৪৪ ফিট উচ্চ, দৈর্ঘ্যে আছে ৩৪ ফিট এবং

অষ্টাভয়ভুজোত্তরবংশাবরণবাহতঃ।

শিতাশ্রয়ানকে কিণ্ডু। হস্তসারং মনোহরং।

চিত্তরিখা পুরং ব্রহ্ম তথা ভক্ত সর্পরেণ।

বিধাবসোরবরমা বংশা বিধাপতেতথ।

তদা দারবরপত বিকোরজাং পুনঃ পুনঃ।

হস্তলেননব্যাক বহির্ভুয়াং নটনঃ নটনঃ।

বজ্রাসরমভিঘ্যাণ্য ততস্ত সপ্তমেহহনি।

স্থানিতক ভট্টলং মর্দিয়েনু স্তিলোত্তবঃ।

অষ্টমেহহনি স্ত্রীখানি পট্টত রতিরানি বৈ।

বজ্রা চিত্ততরং বিকোঃ সর্কাজে মাড়িকরনম্।

ভক্তঃ সর্কাজেঃ কীরং শুকং সংচুয়া বহুতঃ।

স্থানিস্তিলোত্তলোক্তৈতিলৈলুজক মর্দিতং।

ভক্ত চূর্ণং হরেপাঁজে লেপয়জ্ঞা একজনে।

নবমেহহনি রাজেন্দ্র স্ত্রীখোঃ শুকপাতনাং।

শোভেস্তাদুশং লেপং দেবাজেবু চ সর্কতঃ।

দশমে দিবসে প্রাপ্তে মেত্রপট্টাং শুকৈঃ পুনঃ।

বিকোঃ সর্কাজমাছোদ্য ততঃ শোণিতকরনাং।

চন্দনানি চ কস্তুরিং সুসুমং হিমবালুকাম্।

তথা চন্দনসারক সর্কাজেবু পেষয়েৎ।

একাদশাং ত্রিখো বিকোঃ সারং পুন্ড্রাবসানতঃ।

ভক্তঃ কাহোলকাঃ স্ত্রীখানিযে জাতে মনোরমে।

ভক্তলম্বাহিকং বিকোঃ সর্কাজেবু বিলেপয়েৎ।

তথিলিখ্য ভতো মাংসকরনা স্ত্রীখোঃ পোত্তম।

ষাষমেহহনি শুক্রানি দুটানি বসনানি চ।

দক্ষা বস্ত্রেন পরমং লেপং বজ্রা পুনরুচম্।

চর্মকরনমাকুর্ধ্যাস্তথা লেপবিলেপনাং।

ভতো ভূপ পুনর্নটনঃ শুকৈর্নু চিত্রাং শুকৈঃ।

ঐহরেঃ পাদরচনাং কুর্ধ্যাং নুচে দুচঃ তথা।

ষাষমেহহনি জাতেহপি সর্দ্ব্যমে নুপোত্তম।

বটান্দলপখানিঃ নিঃশব্দে চ পুনঃ পুনঃ।

তৎপাদরচনাং বিকোঃ ম কেবু অরতে বধা।

ভক্তা ন কর্তব্য কণৌ জারতে বধিরৌ বধা।

অতস্তচ্ছ বণং কার্জ্যে নোভিতং ব্রুপসত্তম।

অত্রৈব তৎপরে রাজন্ তব ঐক্সিমির্দরঃ।

কর্ণপুরুট্টনীলেশং সর্কাজেবু পুনঃকরেৎ।

চিত্রবিজ্ঞ তদা কুর্ধ্যাজেবোঃ শোমপ্রকরসে।

অরোদভাসিতঃ কর্ণং বটৈরৈব বিতকণঃ।

বধারপঃ প্রকুর্ধ্যাজ্ঞ তদালেশং চ দৌলভকম্।

ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের ১৪টা চক্র থাকে। এই রথের মাথার ভাল চিহ্ন থাকে বলিরা ভালকল নাম হইরাছে। জন্তহার রথ ৪৩ ফিট উচ্চ ও দৈর্ঘ্যে ৩ আছে ৩২ ফিট, ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের ১২টা চক্র থাকে। ইহার মাথার পদ্মচিহ্ন থাকে বলিরা ইহার পদ্মকল নাম হইরাছে (২৪)।

দৈতাপতিগণ মূর্তি বহন করিরা রথে আনিরা স্থাপন করে। জগন্নাথ ও বলরামের কোমরে রেশমের দড়ি বাঁধিরা জুলাইরা লইরা যায়। এ সময়ে পাণ্ডারাও ধরিরা থাকে। জন্তরা ও স্তূর্ণনকে মাথার তুলিরা আনা হয়। জগন্নাথের রথেই স্তূর্ণনকে রাখা হয়। এই সময় ঐমূর্তির রাজপুকার বেশ ও অর্ঘ্যের হস্তপন দেওয়া হইরা থাকে।

প্রথাহুসারে পুরীর রাজা রাজবেশে আসিরা রথের সমুখভাগ সুকোষচিত সন্মার্জ্জনী দ্বারা প্রথমে পরিষ্কার করিরা যেন, পরে মূর্তির পূজা করিরা রথের দড়ি ধরিরা টানিতে থাকেন। এ সময় ৪২০০ কালবেড়িরা নামক কুলি রথের রজ্জু ধরিরা রাজার সাহায্য করিরা থাকে। তৎপরে সাধারণ বাজীগণ রথ টানিতে আরম্ভ করে। সেই দিনই শুণ্ডিচাতে

বধাবিধি নৃপজেষ্ঠ চিত্রবিচিত্রকর্মনি।

চতুর্দশীদিনে চাপি তথা পঞ্চদশী দিনে।

দিনষরেহপি তৎকর্ম চিত্রং চাক্রতরং চরেৎ।

নিরোবনপূহান্তমাদ্বেবহিকৃত্য নুপোত্তম।

ষাষভাসেব তদদ্যাপ্য তুভ্যং নির্গাল্যাদরাং।

(নীলাগ্রিমহোত্তর ১৫ অঃ)

(২৪) "আরজেত রথং কুর্ধ্যা বিদ্বরাণে মনোহরসবন্।

যোড়পাঁচের যোড়শভিক্টকর্মেহমরৈনুচৈঃ।

বুজং বিকোরথং কুর্ধ্যাভুজাং নুচকুবরম্।

বিচিত্রবিচিত্রং কাটপুছলীপরিবেষ্টিতম্।

মথো বেচিসমাজ্জাচিতাক্রমপারাজিতম্।

চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্ধারিশোভনম্।

মাসাবিচিত্রবহনং হেমপদ্মবিভূষিতম্।...

রথমেব হরেঃ কুর্ধ্যাং কাসনং সুপদ্বিষ্টম্।

চতুর্দশপাঠকৃত রথং কুর্ধ্যাজ্ঞ সৌরিণঃ।

চতুর্ধারিভক্তিঃ কুর্ধ্যাং জন্তরাদা মথোত্তমম্।

সপ্তচ্ছদসংকুর্ধ্যাং সিরিণো লাকলকরম্।

দেব্যাঃ পদ্মকলং কুর্ধ্যাং পদ্মকর্তবিরিষিতম্।

বিদ্রচবা রথান্ রাজাঃ প্রতিষ্ঠাং পূর্করজরেৎ।"

(পুন্ড্রোত্তরমহোত্তর ৫ম অঃ)

"বাসুদেবরথো বিদ্যো বরুড়েন চ চিত্রিতঃ।

পদ্মকলঃ সূত্রজাঃ তথা সর্পমরো রথঃ।

বলভাপি তথো বিদ্যোত্তমকলসুভিতঃ।"

(নীলাগ্রিমহোত্তর ৫ম অঃ)

বাইবার কথা, কিন্তু সেখানে বাইতে প্রায় চারি দিন লাগে। অবশিষ্ট করদিন ঐমূর্ত্তিগুলি শুভিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন। দশমীর দিন পুনর্বাঁজা হইয়া থাকে, এ সময়ও মহামন্দিরে পৌঁছিতে চারি দিন লাগে।

পূর্বে বিশেষ জনতার কারণ রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া কাহার কাহার মৃত্যু হইত, কেহ বা ছায়াধা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিত। এখন পুলিশের বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বর্ষে এরূপ চর্যটন। ঘটয়া থাকে।

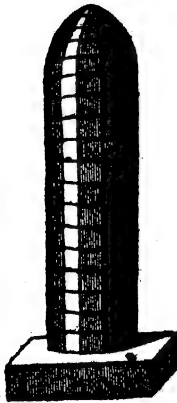
৬ আষাঢ়মাসের শুক্লএকাদশীর নাম শয়নএকাদশী, এই দিন মন্দির মধ্যে এককোণে খাটের উপর বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ মূর্ত্তিকে শোয়াইয়া রাখে।

৭ শ্রাবণমাসে শুক্লএকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত স্থলনযাত্রা। এই করদিন রাত্রিতে অসজ্জিত মুক্তিমণ্ডপের দোলমঞ্চে গিয়া মদনমোহন উপবেশন করেন, এই করদিন এখানে বিবিধ নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

৮ ভাদ্রমাসে জ্যৈষ্ঠমীতে একজন ব্রাহ্মণ ও এক ভিতর-সায়িনী (দেবনর্ত্তকী) বসুদেব ও দেবকী সাজিয়া জ্যৈষ্ঠমীর অভিনয় করে। এই দিন মহাধুম ধামে পূজা হয়।

৯ শ্রাবণমাসে কৃষ্ণএকাদশীর দিন কালীদমন যাত্রা হয়। এই দিন মদনমোহনকে মার্কণ্ডেয় সরোবরে আনিয়া কালীদমনের অভিনয় হইয়া থাকে।

১০ ভাদ্রমাসের শুক্লএকাদশীর দিন দেবের পার্শ্ব-পরিবর্তন; এই দিন ভগবান্ শয়নগৃহে পর্য্যঙ্কে শুইয়া পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া থাকেন, শয়নগৃহেই তাঁহার যথাবিধি পূজা হয়। এই দিন বামন-জন্মোৎসব হইয়া থাকে। দেবের বামনাকৃতি মূর্ত্তি ছত্র কমণ্ডলুহ শিবিকার লইয়া পরিভ্রমণ করান হয়।



১১ আশ্বিনমাসে কৈলাগার পূর্ণিমার দিন অর্ধদর্শনোৎসব

হইয়া থাকে। এই দিন অর্ধদর্শনকে শিবিকার লইয়া নৃত্যগীতাদি সহ নগর পরিভ্রমণ করান হইয়া থাকে। এই দিন মহামন্দিরে শমীর পূজা ও সকলেই রাজিআগরণ করিয়া থাকে।

১২ কাঠিকমাসের শুক্লএকাদশীর দিনে উখানএকাদশী। এই দিন প্রাতঃকালে সন্ধ্যা ও অর্ধরাত্রে পূজা করিয়া দৈবকে শয্যা হইতে উঠান হয়।

১৩ কাঠিকমাসের পূর্ণিমার দিন মহাসমারোহে রাসযাত্রা হইয়া থাকে।

১৪ অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লষষ্ঠীতে দেবের প্রাবরণোৎসব। উড়িয়ারা ইহাকে ঘরনাগি বলে। এই দিন দেবকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

১৫ পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে অভিষেকোৎসব। এই দিন দেবের স্নান পূজারবেশ হইয়া থাকে।

১৬ মকরসংক্রান্তির দিন মকরোৎসব হইয়া থাকে। এই দিন নুতন নুতন দ্রব্য দ্বারা দেবের ভোগ হয়।

১৭ মাঘমাসে শুক্লপক্ষমী বা চৈত্রমাসে শুক্লঅষ্টমীতে শুভিচা উৎসব। এই সময় মদনমোহন শুভিচা মন্দিরে আনীত হয়। উৎকলখণ্ডে রথযাত্রাকালে জগন্নাথের শুভিচা-মন্দিরে আগমনকেও শুভিচোৎসব নামে বর্ণিত হইয়াছে।

১৮ মাঘীপূর্ণিমা, এই দিন ভোগমূর্ত্তি সাগর-সলিলে আনিয়া স্নান করান হয়। এই দিন সকলে সমুদ্রকূলে তর্পণ করেন। উৎকলখণ্ডাদিতে লিখিত আছে, সাগর-সলিলে স্নান করিয়া দেব দর্শন করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়।

১৯ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার দোলযাত্রা। মন্দিরের জলাশয় কোণে যে স্নানমঞ্চ আছে, তাহাতেই দোলযাত্রা হইয়া থাকে। এই সময়ে দেবের গাত্রে সকলে কল নিক্ষেপ করে। পূর্বে এখানে স্থলমূর্ত্তি আনীত হইত, কিন্তু রাজা গোড়ীর গোবিন্দের সময় মঞ্চের কাঠ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব পড়িয়া গিয়া মঞ্চ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার, সেই অবধি জগন্নাথের পরিবর্তে মদনমোহনের দোল হয়।

২০ রামনবমীর দিন জগন্নাথ ও তাঁহার ভোগ মূর্ত্তিকে রামবেশে সাজাইয়া মহাসমারোহে পূজা হইয়া থাকে।

২১ চৈত্রশুক্রজ্যৈষ্ঠাদশীর দিন দমনকপজিকা। জগন্নাথ-বল্লভ নামক বাগানে এই দিন দমনকপজের মালা গাঁথিয়া মদনমোহনের মাথায় সাজাইয়া দেয় এবং বোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

উৎকলখণ্ডাদিতে লিখিত আছে, উপরোক্ত যে কোন উৎসব দর্শন করিলেই মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

নব কলবর।—উপরোক্ত উৎসবাদি ব্যতীত সমস্ত সময়ে

শ্রীমূর্তির জীর্ণ দেহপরিভ্যাগ ও নূতন মূর্তি স্থাপিত হয়, এই নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবই নবকলেবর নামে বিখ্যাত। এই সময় লক্ষ লক্ষ যাত্রী বহু দূর দেশান্তর হইতে শ্রীমূর্তি দর্শনে আসিয়া থাকে, জগন্নাথে যত উৎসব হয়, তন্মধ্যে এই কলেবর উৎসবই সর্বপ্রধান। এ সময়ে বেরূপ মহাসমারোহ হইয়া থাকে, এমন আর কখন হয় না। সাধারণের বিশ্বাস যে এতি যাদশ বৎসরান্তে দেবের নূতন কলেবর হইয়া থাকে। কিন্তু জগন্নাথের পূজাপদ্ধতি মূলক গ্রন্থ সমূহে যাদশ বৎসরান্তে যে নবকলেবর করিতে হইবে, এমন কোন কথা লিখিত নাই। উড়িষ্যার পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে আবার মাসে দুইটা পূর্ণিমা ও মলমাস হইলে, সেই সময় নবকলেবর হইবে, একপস্থলে সাতবর্ষ হইতে ত্রিশ বর্ষ মধ্যে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে নবকলেবর হইয়া থাকে। নীলাজিমহোদয়ে লিখিত আছে—

“বর্ষাণাং শততো বাপি তদর্কং বা নৃপোত্তম।

আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ভবিষ্যতো হরেঃ কলৌ।

বর্ষ-বিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশতিতম বা।

জীর্ঘ্যতাং দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা ভবেৎ।”

শত বর্ষেই হউক আর পঞ্চাশ বর্ষেই হউক কলিকালে হরির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে। কুড়ি বর্ষেই হউক আর ২৫ বর্ষেই হউক জীর্ণ দারুমূর্তির পুনর্নির্মাণ হইয়া থাকে।

নব কলেবর হইবার ব্যবস্থা থাকিলেও অনিষ্ট আশঙ্কার এখন কেবল সংস্কার হইয়া থাকে, আর কলেবর হয় না। সাধারণে বলিয়া থাকে, পূর্বোক্ত নব কলেবরের সময়েই বৃটীশ গবর্নেন্ট কর্তৃক খোঁদারাজ নির্কাসিত হন। আজ তিনবর্ষ হইল, নবকলেবর হইবার কথা হইয়াছিল এবং তাহা দেখিবার জন্য প্রায় দশলক্ষ যাত্রী ত্রীক্ষেত্রে গিয়াছিল, কিন্তু রাজমাতা পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া নব কলেবর হইতে দেন নাই, কেবল দেবের পূর্ণসংস্কার হইয়াছিল মাত্র। নীলাজিমহোদয়ে নবকলেবরের বিধান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“আষাঢ়শ্চ ৫ মাসস্ত যদা বুদ্ধিভবেদুবি।

তদা তদাক্রমূর্তিঃ তাদাক্রমশ্চীনুপাঞ্জরা ॥

বৈশাখে শুক্লপক্ষেহপি শুভে লগ্নে শুভে দিনে।

বিভাপতিকুলোদ্ভূতা বিজাঃ সৰ্ব্ব্তরোহমলাঃ।

বিষাবসোশ্চ কুলজাতথা তে গহনং বনম্।

নৃপাঞ্জরা গমিস্ত্যস্তি দারুশাতনতৎপরাঃ।

পবিত্রং শোভনং তত্ত্ব বনং শোভনমুত্তমম্।

রাজঃ প্রতিনিধিত্বাবদ্গমিস্ত্যস্তি সমং বিজৈঃ।

চতুর্কদবিদো বিপ্রা রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।

শিল্পবিদ্যাসু নিপুণা বর্জকিপ্রবরশ্চ যে।

তে সর্বের চ গমিস্ত্যস্তি তদাক্রমশ্চীনুপাঞ্জরাঃ।

বজ্রসংহারসহিতাঃ প্রবিশ্য তাদৃশং বনম্।

শাতরিখা নিষতরুং মহান্তং ঋক্মুত্তমম্।

মহোরগসমাবাসং সমস্তাং শোভনং নগম্।

চতুঃশাখাবৃতং রম্যং কীটপক্ষ্যাদিবর্জিতম্।

তাদৃশং দারুসংগতং শাতরিখা বৃহদৃহঃ।

তদ্বৃক্ষে সংস্থিতে দিব্যৈর্যাক্ষিতে গোমর্যাবৃত্তিঃ।

চর্চিত্তে চন্দনাভোক্তিরূপচারৈর্মনোহরৈঃ।

ধ্যাত্বা তং গরুড়ারূঢ়ং পূজয়িত্বা জগৎপতিম্।

উপোষ্য তত্র ত্রিদিনং য়েকং বা দৃঢ়ভক্তিতঃ।

তবাহুকুলাং দৃষ্ট্বাধ রাজৌ ভগ্নগতং চ তে।

বেদাধ্যয়নসংস্কৃত্য ব্রাহ্মণাঃ স্থানিরন্তরম্।

তন্নামকীর্তনং তত্র কুবন্ত্যপি সত্ততম্।

ময়রাজং জগন্তশ্চ তত্র কেচন সত্তমাঃ।

এবং ব্রতং কুবতাং তদগতানাং সাধুবন্দ্যনাম্।.....

ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যং কর্ণ সমাপ্য তে।

ব্রতান্তে তস্ত তৎপূজাং কৃৎস্বা সর্বের মানবাঃ।

হবিষ্যক করিষ্যন্তি তন্তুজিন্দুচেতসঃ।

আদৌ গণেশং সংপূজ্য তুর্গাক শঙ্করং রবিম্।

বিষ্ণুঞ্চ ধরণীনাথং স্তোষ্যন্তি নিজ ভক্তিতঃ।

বরুণার্চ্যঃ ততঃ কুর্য্যাৎ সংকল্পং দেশকালবিৎ।

বস্তিবাচনকং কর্ণ বহু কুর্য্যাৎ প্রব্রতঃ।

আচার্য্যব্রহ্মণোর্যেব বরণং তত্র কারয়েৎ।

ময়রাজেন তেনৈব মহুন। মহুজাধিপ।

হোমং কুর্য্যাৎ প্রব্রতেন তস্ত সান্নিধ্যাহেতবে।

পাতালনয়সিংহেন জুহুয়াদ্বিসহস্রকম্।

অযুতং নিযুতং বাপি সমিকোমং চ বৈ চরেৎ।

পূর্ণাহতিং ততঃ কুর্য্যাৎ ভক্তিতাবসমমিতঃ।

বশত্যা দক্ষিণাং দত্তাদাচার্য্যায় বিজয়নে।

আচার্য্যাত্তত্র গম্বাধ ময়রাজং পরং জপন্।

কুঠারং পরিপূজ্যাসৌ চন্দ্রনেন চ পুষ্পতঃ।

চতুর্দিশ্চ চতুর্বেদান্ পঠেৎ ব্রাহ্মণেযু চ।

স্বয়ং হিন্দ্যারিষতরুং মহোৎসবতরা ততঃ।

তে সর্বের বর্জকিগণাঃ পশ্চাত্তং তরুসত্তমম্।

ছেদয়িত্বা যদা বৃক্সাত্তরানপারিকীর্তনাং।

পাত্যমানে তরৌ তত্র তচ্চ কুর্য্যাৎ দ্বিধণ্ডকম্।

প্রথমং জগদীশত বিধণ্ডং কারয়েন্ প।

বলন্ত চ তথা কুর্য্যাৎ দ্ব্যধিকং বিধণ্ডকম্।

একং হুদর্শনত্বার্থে তথৈকং মাধবন্ত চ।

সর্বার্থং বধিকং দিব্যং বিখ্যং কল্পয়েত্ততঃ ।
 ইখং দ্বাদশখণ্ডানি কৃতা তচ্চতুরঙ্গকম্ ।
 শাখাপত্রাণি বন্ধানি তানি সর্বাণি তত্র হি ।
 দীর্ঘধাতু সমারোপ্য প্রোথয়েৎ শকলানি তৎ ।
 চতুশ্চক্রেষু দিব্যেষু স্বনোযস্বেষু ভক্তিততঃ ।
 সমারোপ্য চ তাংস্তেব ছাদয়িত্বা পরং ততঃ ।
 দৃঢ়দিব্যাস্বরৈঃ সূক্ষ্মদৃষ্ট্যংসাহকরৈঃ পটৈঃ ।
 বন্ধাং দৃঢ়তরং তত্র পট্টরজ্জুং সমস্ততঃ ।
 আনয়েয়ুশ্চ তাংস্তেব ছাদ্যামরবীজনৈঃ ।
 সায়ংকালেহপি চ তথা যজ্ঞেভ্যং চোপচারতঃ ।
 শীতদ্রব্যময়ৈর্ভোগৈস্তোষয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
 এবং প্রতিদিনং তত্র পূজয়েজ্জগতীপতিম্ ।
 প্রাসাদোত্তরতো দ্বারে তদাক্রান্তমবেশনম্ ।
 কারয়িত্বা দিব্যাশালাস্তরে তৎ স্থাপয়েন্নৃপ ।
 সূদিনে সূমুহূর্তে চ শুভে লগ্নে নৃপোত্তম ।
 শ্রীমূর্ত্যেঘটনা কার্য্য চতুর্সর্গফলাগ্নয়ে ।
 ঘটনারম্ভকালে চ কুর্য্যাদ্বরণপূজনম্ ।
 বিদ্যাপতেস্তথা বিশ্বাবসোশ্চ কুলসম্ভবান্ ।
 বস্ত্রালঙ্কারগন্ধস্রক্ সংকারৈঃ পরিতোষয়েৎ ।
 শিল্পিকাংশ্চ তথা কুর্য্যান্তে সর্বে তত্র চোদ্যতাঃ ।...
 ঘটতিলৈশ্চ যবঃ প্রোক্তো মুষ্টিঃ শ্রান্তচতুর্থৈঃ ।
 যণ্মুষ্টিভির্ভবেদ্রস্তচতুর্ভিঃ ধেনুকম্ ।
 হিত্বা ভাতো দ্বিভাগৌ চ তচ্চতুর্দশভাগতঃ ।
 যবানাং তচ্চতুরশীতোবমুচুর্বুধা নৃপ ।
 তন্মানেন তদা কুর্য্যাদাশিখং পাদপীঠতঃ ।
 তথৈব ভূজভাগান্তং দৈর্ঘ্যমায়তিকং সমম্ ।
 চক্রাক্রতিতয়া ভালং কুর্য্যাদ্ব্যজ্রিংশভাগতঃ ।
 মস্তকান্মুখপর্য্যন্তং চতুর্দশকভাগকম্ ।
 ত্রিপাদাধিকঘটত্রিংশৎ যবতো মানমুচ্যতে ।
 চতুর্সর্গং প্রাকুর্বাণীত দিনেশর্বমানতঃ ।
 হৃদয়ং শ্রামবযবৈস্তদ্বয়ং বস্ত্রভাগতঃ ।
 সাক্ষিদিগ্যবতো মধ্যং পরিধাপনসংজ্ঞকম্ ।
 এতচ্চতুর্ভাগমিতি কথিতং তৎপুরো ময়া ।
 তৎপাদপদ্যং ষড়্ভাগং পাদহীনকলাযবৈঃ ।
 চতুরশীতিযবকৈরিতং দ্বাদশভাগকম্ ।
 অষ্টাংশিত্রিংশতমানেন ঘটপঞ্চাশদ্যবৈভূজৌ ॥
 করৌ পার্শ্বভূজৌ তাবচ্চতুর্দশপ্রমাণতঃ ।
 চতুশ্চতুর্থৈঃ পার্শ্বভূজয়োরাযতির্ভবেৎ ॥
 শূলাঙ্কং করয়োঃ কুর্য্যৎ চতুর্থবপ্রমাণতঃ ।

তবেদমানং ভূজয়োরাযক্ কল্পয়েদ্বুধঃ ।
 নাসাধোদ্বাদশযবৈস্তদুর্গং মস্তকাবধি ॥
 পাদহীনপঞ্চবিংশপ্রমাণং রচয়েৎ কৃতী ।
 শ্রীমুখায়তিমানন্ত কুর্য্যাজ্রিংশদ্যবৈস্তথা ॥
 যদি ব্রহ্মস্থাপনার্থং চতুর্দশযবৈঃ স্মৃতম্ ।
 কল্পয়েত্তৎ পদং রম্যং ব্রহ্মদারুশ্বরূপিণঃ ॥
 এতাদৃশী জগন্নাথঘটনা জায়তে নৃপ ।
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বলদেবস্ত নিশ্চিতিম্ ॥
 শঙ্খাক্রতিরসৌ ধ্যাতঃ পশুতাং সর্বকামদঃ ।
 দারুদ্ব্যজ্রিংশভাগাশ্চ পঞ্চাশীতি যবৈর্মিতিঃ ॥
 তদ্বজ্রাষুজনির্ম্মাণমেকত্রিংশদ্যবায়িতম্ ।
 তদুর্গং ফণনির্ম্মাণং জ্ঞেয়ং পঞ্চযবৈঃ পরম্ ॥
 চতুর্দশস্থিতিজ্ঞেয়া রুদ্রসংদৈর্ঘ্যবৈনৃপ ।
 কুর্য্যাম্রবযবং ছিত্রং সন্ধানং বেদবন্ধনম্ ॥
 নবানাং যবতঃ কুর্য্যৎ হৃদয়ঞ্চ বিচক্ষণঃ ।
 সাক্ষিদিগ্যবতো নুনং পরিধাপনমুত্তমম্ ॥
 অষ্টাদশযবৈঃ সাতৈর্গঃ ত্রিপাদসরসীরুহম্ ।
 পঞ্চাশীতিযবাঃ প্রোক্তা হেবং হলভূতঃ প্রমা ॥
 ভূজয়বিভাগঞ্চ চতুর্দশবিভাগকম্ ।
 প্রত্যেকঞ্চ বিজানীয়াৎ চতুর্বিংশতিভির্ঘবৈঃ ।
 তত্র ব্রহ্মোপরিভ্রাজৎ ফণায়াশ্চ যুগং যুগম্ ।
 যবেনার্কিয়ুজা জ্ঞেয়ং ঘটতং শ্রাম্পোত্তম ॥
 রুদ্রমর্দকবৎ প্রোক্তং তদাধারতয়া ভবেৎ ।
 চতুর্দশপ্রমাণেন হস্তৌ পার্শ্বভূজৌ তথা ॥
 যবানামেকবিংশত্যা মুখশ্রায়তিরুত্তমা ।
 নাসাধোহষ্টৌযবাঃ প্রোক্তা উর্দ্ধমষ্টাদশা যবাঃ ॥
 ললাটং যবমাত্রং শ্রাৎ ফণাঃ পঞ্চযবাঃ স্মৃতাঃ ।
 ইখং শ্রীবলদেবস্ত নিশ্চিতিনৃপসত্তম ॥
 দ্বিপঞ্চাশদ্যবৈঃ সাতৈর্দ্বিজ্রা পদ্মাক্রতির্ভবেৎ ।
 তদীয়ং শ্রীমুখং নহ্যং ভবেৎ সপ্তদশৈর্ঘবৈঃ ॥
 যবৈঃ পঞ্চদশৈর্ভূপ বিস্তারস্তমুখস্ত চ ।
 ধর্ম্মিল্লঃ সাক্ষিদিগ্যবো হৃদয়ং ত্রিযবং ভবেৎ ॥
 রবিসংখ্যাবৎ মধ্যং পরিধাপনসংজ্ঞকম্ ।
 যবাঃ সপ্তদশ প্রোক্তান্তংপাদযুগপঞ্চজম্ ॥
 যবৈঃ পঞ্চদশৈঃ ধ্যাতৌ ভূজৌ চাধোগতো কটিম্ ।
 তথা পার্শ্বভূজৌ সপ্তদশৈশ্চাধোগতো নৃপ ।
 এবং ভদ্রাক্রতিদিব্যো ভব্যশিল্পিকনির্ম্মিতা ।
 সূদর্শনো গদাকারো ভবেন্নৃপতিসত্তম ।
 চতুরশীতিযবকৈর্দৈর্ঘ্যেণ পরিভাবিতম্ ॥

ভদ্রারতি: পরিখ্যাতা চৈকবিশতির্ভবৈঃ ।

এবং সুদর্শনো জ্ঞেয়ঃ সর্বলিঙ্গাকরো মহান ॥”

(নীলাদ্রিমহোদয় ৩৮ অঃ ।)

যে বৎসর আষাঢ়মাসে মলমাস হইবে, ঐ বৎসর রাজার আদেশে রাজার প্রজিনিধি স্বরূপ কোন ব্যক্তি বৈশাখমাসে শুভদিনে শুভলগ্নে বিভাপ্তিবংশীয় ও বিশ্বাবসুবংশীয় নিষ্ঠাপর ব্যক্তিগণ রাজপুরোহিত, চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শিল্পনিপুণ বর্দ্ধকীগণের সহিত নানারিধ পূজোপকরণ লইয়া পবিত্র অরণ্যে প্রবেশ করিয়া চতুঃশাখাযুক্ত, সরল, কীটপতঙ্গাদির দংশন-বর্জিত, আয়ত নিম্ন বৃক্ষ সংগ্রহ করিবে, তাহার মূলদেশ গোময়জল দ্বারা পবিত্র করিয়া বৃক্ষমূলে চন্দ্রনাদি দ্বারা অমুলেপন করিবে। গুরুভারচূ ভগবানের ধ্যান, নানারিধ উপচারে অর্চনা, বেদপাঠ, মন্ত্ররাজ জপ ও প্রভুর নাম কীর্তনপূর্বক উপবাস করিয়া তিন দিন বা একদিন অতিবাহিত করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সমাপনপূর্বক প্রথমে গণেশ, দুর্গা, শঙ্কর, রবি, বিষ্ণু ও বরুণের পূজা করিয়া স্ততিবাচনপূর্বক সন্মল করিবে। পরে আচার্য্যবরণ ও ব্রহ্মবরণ করিয়া মন্ত্ররাজ দ্বারা হোম করিবে, ঐ হোমের পর “পাতাল নরসিংহেন” ইত্যাদি মন্ত্রে দুই হাজার বার আহুতিপ্রদান, অযুত বা নিযুত সংখ্যক সমিধ হোম, তাহার পর ভক্তিপূর্বক পূর্ণাহুতি দিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে, আচার্য্য ঐ বৃক্ষের মূলদেশে প্রভুর মন্ত্ররাজ জপ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা কুটারের অর্চনা করিবে। বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণ বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে বেদধ্বনি করিতে থাকিবেন, আচার্য্য স্বয়ং ঐ বৃক্ষচ্ছেদন করিলে বর্দ্ধকীগণ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইবে। প্রথমতঃ দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড হইতে জগন্নাথের মূর্তির জন্ত এবং বলদেব ও সূভদ্রা মূর্তির জন্ত দুই খণ্ড করিবে, পরে অপর এক খণ্ড হইতে মাধবমূর্তির জন্ত এক খণ্ড, সুদর্শনচক্রের জন্ত এক খণ্ড এবং সকলের জন্ত অতিরিক্ত দুই খণ্ড সমষ্টিতে দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ঐ খণ্ডগুলিকে প্রথমে চতুরঙ্গ করিয়া লইবে। ঐ বৃক্ষের শাখা পত্র ও বন্ধনাদি সমস্ত একটা গর্ভে পুতিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পরে রমণীয় বস্ত্র ও পট্টম্বাদি দ্বারা ঐ খণ্ডগুলিকে আচ্ছাদন ও বন্ধন করিয়া চারি চাকার গাড়ীতে উঠাইয়া ছত্র ধারণপূর্বক চামরাদির ব্যঞ্জন করিতে করিতে চলিয়া আসিবে, তারপর প্রতিদিন নানারিধ ভোগাদি উপচারে ত্রৈকালিক অর্চনাদি করিবে। মন্দিরের উত্তরাংশে রমণীয় গৃহে ঐ খণ্ড সকল রাখিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে মূর্তি নির্মাণ আরম্ভ করাইবে। আরম্ভের সময় বরুণের পূজা এবং বিশ্বাক্ষর বংশীয় বিজ্ঞাতি ও বিদ্যাপতি বংশীয়-

দিগকে মালা, চন্দ্র, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিবে। ঐ সময়ে শিল্পীগণকেও মালাচন্দ্রনাদি দ্বারা সজ্জিত করিতে হয়।...

ছয়টা তিল পর পর সংলাপ করিয়া সান্নাইলে যতটুকু দৈর্ঘ্য হয়, ঐ পরিমাণের নাম এক যব, ঐরূপ চারি যবে এক মুষ্টি, ছয় মুষ্টিতে এক হাত, চারিহাতে এক ধনু। ইহার ১৬শ ভাগের ২ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ১৪শ ভাগে যে পরিমাণ হয়, ঐ পরিমাণে জগন্নাথদেবের পাদপীঠ হইতে শিখা পর্যন্ত নির্মাণ হইবে। ভূজধ্বজ ঐ পরিমাণে আয়ত। ঐ পরিমিত মুষ্টির ৩২শ অংশের এক অংশে চক্রাকার কপাঘদেশ নির্মাণ করিতে হয়। মস্তক হইতে মুখ পর্যন্ত ১৪শ অংশে বিভক্ত হইবে। পরে বার যবে চতুর্ভুজ, ৯ অষ্টমাংশে ৯ যব পরিমিত হৃদয়স্থান, সার্ক দশ যবে মধ্যস্থান এবং ছয় ভাগে পাদদ্বয় ও সার্ক দশ যবে পরিধানক নির্মিত হইবে। পরে ছাপ্পায় যবে ভূজধ্বজ এবং করপার্শ্ব ও ভূজ চতুর্ভুজ প্রমাণানুসারে করিতে হইবে। হস্তদ্বয়ে চারি যব পরিমিত দুইটা শূল চিহ্ন নির্মিত হইবে। পার্শ্ব ও ভূজের আয়ত চারি যব, নাসিকার অধোভাগ বার যব, ত্রীমুখের আয়তন ত্রিশ যব। ব্রহ্মহৃদপার্শ্ব ১৪শ যব পরিমিত হৃদয়স্থান কর্তব্য। এই প্রকারে জগন্নাথদেবের মূর্তি করিতে হয়। বলদেবের মূর্তি শঙ্খাকৃতি, ৮৫ যবে সম্পূর্ণ হইবে, তন্মধ্যে ৩১ যবে ত্রীমুখ হইবে। মুখের উর্দ্ধে ৫ যব পরিমিত ফণা থাকিবে। একাদশ যবে চতুর্ভুজ, নয় যবে হৃদয় স্থান, সার্ক দশ যবে পরিধানপন এবং সার্ক অষ্টাদশ যবে পদদ্বয় নির্মিত হইবে। ২৪ যবে ভূজধ্বজ বিভাগ এবং চতুর্ভুজ বিভাগ করিতে হয়। স্বক্কের উপরিভাগে অর্দ্ধ যব পরিমাণে দুটি দুটি করিয়া ফণা প্রস্তুত করিবে, পার্শ্ব ও ভূজ মুখের আয়াম এক বিংশতি যব, নাসিকার অধোদেশ অষ্ট যব, ললাট সার্ক অষ্টাদশ যব পরিমিত হইবে, এই প্রকারে বলদেবের মূর্তি নির্মাণ করিতে হয়। সূভদ্রা-মূর্তির পরিমাণ সার্ক দ্বিপঞ্চাশৎ যব, আকৃতি পদ্মের তুল্য। সূভদ্রার মুখ ১৭ যব আয়ত, ১৫ যব বিষ্ণুভূজ, কেশকলাপ সার্ক তিন যব পরিমিত, হৃদয়স্থান ৩ যব, মধ্যস্থান ১২ যব, পদদ্বয় ১৭ যব, পার্শ্ব ও ভূজ সার্ক সপ্তদশ যব পরিমাণে প্রস্তুত হইবে। এই প্রকারে সূভদ্রার মূর্তি রচনার পর স্নান ও গদা এক-বিংশতি যব পরিমিত করিতে হয়। (নী মঃ)

পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে নব কলেবর নির্মিত হইলে প্রধান পাণ্ডা জগন্নাথের পূর্বদেহস্থ বিষ্ণুপঙ্কজ লইয়া নব মূর্তির হৃদয় মধ্যে স্থাপন করেন। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে ঐ বিষ্ণুপঙ্কজের উল্লেখ নাই।

এখন বেকুপ নবকলেবর হইয়া থাকে, তাহাই নীলাদ্রি-

মহোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে। (মূর্তির প্রতিক্রম পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।) কিন্তু পূর্বে দেবের একরূপ কলেবর হইত না। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে এবং উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতায় জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভূজ মূর্তি এবং স্তম্ভদ্বার বিভূজমূর্তির উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থগুলির বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ভুবনেশ্বরস্থ অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও স্তম্ভদ্বার যেরূপ প্রস্তরময়ী মূর্তি আছে, পূর্বে শ্রীক্ষেত্রের দারুময়ী শ্রীমূর্তি গুলিও ঐরূপ নির্মিত হইত। নীলাদ্রিমহোদয়ে চারিমূর্তির স্থানে সপ্তমূর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগন্নাথদর্শনে গমন করেন, তখনও তিনি চারিটী মূর্তিই দেখিয়াছিলেন, সপ্তমূর্তি দেখেন নাই। (চৈতন্যভাগবত ২ অঃ)

চৈতন্যের জীবনচরিতলেখকগণও লিখিয়াছেন যে, তিনি জগন্নাথের চতুর্ভূজ মূর্তিই দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই ক্ষেত্রধামে অতিবাহিত করেন, তিনি শ্রীক্ষেত্রস্থ তীর্থ, উপতীর্থ প্রভৃতি সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন। কপিলসংহিতায় অলাবুকেশ্বর নামে এক প্রসিদ্ধ লিঙ্গের উল্লেখ আছে। চৈতন্য এখানে যে যে তীর্থ দর্শন করেন, তাহার পারিষদবর্গ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার অলাবুকেশ্বরের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, উৎকলখণ্ড, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য এবং ১৩৯৬ শকে রচিত পুরাণসর্বস্ব জগন্নাথস্থ নানাতীর্থ ও লিঙ্গাদির উল্লেখ থাকিলেও অলাবুকেশ্বরের আদৌ উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ১৩৯৬ শক অথবা চৈতন্যদেবের পরে অলাবুকেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১)। স্তুরাং একরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অলাবুকেশ্বর-প্রসঙ্গ-মূলক কপিলসংহিতাও চৈতন্যদেবের পরে রচিত হইয়াছে। রঘুনন্দনকৃত পুরুষোত্তমতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলসংহিতার আদৌ উল্লেখ না থাকায় এই প্রস্তাবের কতকটা সমর্থন করিতেছে। কপিলসংহিতায়ও দেবের চতুর্ভূজ মূর্তির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ইহাতে স্বীকার করা যায় খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে জগন্নাথাদির চতুর্ভূজ মূর্তি ছিল, এখনকার মত অপূর্ণ মূর্তি ছিল না, বোধ হয় সেই জন্তই এখনও ব্রাহ্ম-যাত্রাদির সময়ে জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভূজ মূর্তিই চিত্রিত

হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের দুই আইল পশ্চিমে লোকনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে।

নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে, উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা ও পুরাণসর্বস্ব অথবা চৈতন্যদেবের তীর্থভ্রমণগ্রন্থে এই লোকনাথের উল্লেখ না থাকিলেও নীলাদ্রিমহোদয়ে লোকনাথের বিবরণ বর্ণিত আছে, একরূপ স্থলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও কপিলসংহিতা রচিত হইবার পরে যে লোকনাথ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, একরূপ স্থলে বোধ হয় লোকনাথ-প্রসঙ্গ-মূলক নীলাদ্রিমহোদয়ও খৃষ্টীয় বোদ্ধশ শতাব্দীতে অথবা তাহার অনতি পরে রচিত হইয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িয়া জয় করেন। সকলে জানেন যে হুট কালাপাহাড়ই জগন্নাথমূর্তি আনিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। বেসর মহাশি সেই দক্ষমূর্তি লইয়া গিয়া কুজদেশে গুহাইতের ঘরে রক্ষা করেন। তৎপরে রাজা রামচন্দ্রদেব সেই মূর্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মাদলাপজীতে লিখিত আছে, রামচন্দ্রদেবের সময় দেবের নব কলেবর হইয়াছিল।

বোধ হয়, শ্রীমূর্তিগুলি দক্ষ হইবার পর বে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই মূর্তিই এখন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহারই আদর্শে শ্রীমূর্তির নব কলেবর হইয়া থাকে। এই অভিনব মূর্তির বিবরণই নীলাদ্রিমহোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে স্বেচ্ছ কর্তৃক শত শত অজ্ঞান দেবমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল দেবের মন্দিরাদি বারম্বার পুনঃসংস্কার হইলেও দেবমূর্তির আর পুনঃসংস্কার হয় না, সেই ভয়ঙ্কর পূজা পাইয়া থাকেন। বোধ হয় জগন্নাথের দক্ষ মূর্তিও সেইরূপে পূজা পাইয়াছিল, সেই রূপ পরিবর্তন করিতে কেহ সাহসী হয় নাই।

অষ্টাশ্র তীর্থ ও উপতীর্থ।—মহামন্দিরের অর্ধমাইল উত্তরে মার্কণ্ডেয়হ্রদ। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণ কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে এই মার্কণ্ডেয়হ্রদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। শ্রীক্ষেত্রের পঞ্চ তীর্থের মধ্যে ইহাও একটী। এখানে মার্কণ্ডেয়বট ছিল। কপিলসংহিতার মতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডেয়ের মঙ্গলার্থ মার্কণ্ডেয় বট নির্মাণ করেন। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—মার্কণ্ডেয়হ্রদে ব্রাহ্ম করিয়া মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিব দর্শন করিলে দশ অশ্বমেধের বল, সকল পাপ হইতে মুক্তি ও শিবলোক লাভ হয়।

মার্কণ্ডেয় সরোবরের দক্ষিণ কূলে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির। এই মন্দির নাটমন্দির, মোহন ও মূলস্থান ভেদে তিন অংশে বিভক্ত। ইহার চারিদিকে আশ্রনাথ, হরপার্বতী, কান্তিকেশ, পঞ্চপাণ্ডবলিঙ্গ, বজ্রমাতা প্রভৃতির মূর্তি আছে।

(১) উড়িয়ার ঐতিহাসিকগণের মতে অলাবুকেশ্বরের মন্দির রাজা অলাবুকেশ্বরের সময়ে নির্মিত হয়; কিন্তু অলাবুকেশ্বরী নামে কোন রাজা উৎকলে রাজত্ব করিতেন কিনা খোদিতলিপি বা প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার প্রমাণতাব।

সরোবরের পূর্বাংশের মধ্যভাগে কালির সর্পের কণায় উপর দণ্ডায়মান বংশীধারী কুরুমূর্তি রহিয়াছে। কালির দমনোৎসবের সময় এখানে মদনমোহন আসিয়া লীলা করিয়া থাকেন। উত্তরভাগে একটি মন্দিরে চতুর্ভুজা সপ্ত মাতৃকা, গণেশ, নবগ্রহ ও নারদের প্রস্তরময়ী মূর্তি আছে।

ইন্দ্রহ্যম সরোবর।—মহামন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ দূরে এই সরোবর। ব্রহ্ম ও নারদপুরাণের মতে ইন্দ্রহ্যমের যজ্ঞাজ্ঞা হইতে এই তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। উৎকলখণ্ডের মতে রাজা ইন্দ্রহ্যম যজ্ঞের দক্ষিণাশ্বরূপ যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গাভীর খুরাগ্র হইতে যে গর্ত হইয়াছিল, তাহাই ইন্দ্রহ্যম সরোবর। এখানে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ করিলে সহস্র অশ্বমেধের ফল হয়, এই জন্ত এই তীর্থের অপরা নাম অশ্বমেধাজ। এই সরোবর দৈর্ঘ্যে ৪৮৬ ফিট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফিট, চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান। ইহাতে অনেক বড় বড় কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইন্দ্রহ্যম পাছে বংশ থাকিলে আপনার কীৰ্ত্তিলোপ হয়, এই ভাবিয়া জগন্নাথের নিকট বংশনাশের জন্ত প্রার্থনা করেন। জগন্নাথের বরে ইন্দ্রহ্যমের পুত্রগণ কচ্ছপরূপে পরিণত হইয়াছে। সরোবরের দক্ষিণকূলে নুসিংহ ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠের মন্দির আছে। কপিলসংহিতার মতে ইন্দ্রহ্যম সরোবরে স্নান করিয়া ঐ দুই মূর্তির পূজা করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। উক্ত নীলকণ্ঠ ক্ষেত্রের অষ্টলিঙ্গের মধ্যে একটি (২৫)। উক্ত লিঙ্গ দুইটি অতি প্রাচীন হইলেও উভয়ের মন্দির তেমন পুরাতন নহে।

গুণ্ডিচাগার—ইন্দ্রহ্যম সরোবর হইতে কিরিয় আসিবার পথে শ্রীমন্দির হইতে ২ মাইল দূরে এই বিখ্যাত মন্দির। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে রাজা ইন্দ্রহ্যমের গুণ্ডিচা নামে পাটরাণী ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইন্দ্রহ্যমের স্ত্রীর নামোল্লেখ নাই অথচ নারদ, ব্রহ্ম, সাব প্রভৃতি পুরাণেও গুণ্ডিচাগারের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখনকার গুণ্ডিচা-মন্দির দর্শন করিলে সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমান গুণ্ডিচা-মন্দিরের চারিদিকে ৫ ফিট বিস্তৃত ও ২০ ফিট উচ্চ প্রাচীর আছে, ইহার প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৪৩২ ফিট ও প্রস্থে ৩২১

ফিট। প্রাচীরের পশ্চিমাংশে সিংহদ্বার, উত্তরাংশে বিজয়দ্বার ও মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগার আবার চারিভাগে বিভক্ত—দেউল বা মূলমন্দির দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফিট ও প্রস্থে ৪৬ ফিট; মোহন দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফিট, নাটমন্দির দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফিট ও প্রস্থে ৪৫ ফিট এবং ভোগমণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৫২ ফিট ও প্রস্থে ২৬ ফিট। মূলমন্দির বা দেউল উচ্চে ৭৫ ফিট, ইহার মধ্যে কালপাথরে নির্মিত ১৯ ফিট দীর্ঘ ও ৩ ফিট উচ্চ এক রত্ন-বেদী আছে। রথযাত্রার সময়ে দারুমূর্তি আসিয়া এই রত্ন-বেদীর উপর সাত দিন অবস্থান করেন। রথযাত্রাকালে দারু-ব্রহ্ম সিংহদ্বার দিয়া এখানে প্রবেশ করেন এবং বিজয়দ্বার দিয়া বাহির হন। প্রবাদ আছে, এই স্থানেই বিশ্বকর্মা প্রথমে দারুব্রহ্মের গুঁকার মূর্তি নির্মাণ করেন।

চক্রতীর্থ। বালগণ্ডি-নালার ধারে সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র সরোবর আছে, তাহারই নাম চক্রতীর্থ। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে, এই চক্রতীর্থের ধারে প্রথমে ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়া ছিল। এখানে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া লোকে বালুকার পিণ্ড প্রদান করে। ত্রীক্ষেত্রের মধ্যে এই চক্রতীর্থের জলাই সর্বাপেক্ষা সুমিষ্ট। এই চক্রতীর্থের নিকট উত্তরভাগে চক্রনারায়ণ মূর্তি ও তাহার ঈশানকোণে শৃঙ্গালবদ্ধ হনুমানের মূর্তি আছে।

শ্বেতগঙ্গা।—মহামন্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও নারদপুরাণ, কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অতি পুণ্যতীর্থ ভাবিয়াই প্রায় সকল যাত্রীই এই তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে। ইহার ধারে শ্বেতমাধব ও মংস্তমাধবমূর্তি আছে। কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডের মতে, শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিয়া শ্বেত ও মংস্তমাধব দর্শন করিলে সকল পাপদূর ও শ্বেতদ্বীপ লাভ হয়।

যমেশ্বর। মহামন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে যমেশ্বরের মন্দির। উৎকলখণ্ডের মতে মহাদেব এখানে যমের সংঘম নষ্ট করিয়া যমেশ্বর নামে খ্যাত হন। কপিলসংহিতার মতে যমেশ্বরের পূজা করিলে যমদণ্ড এড়াইয়া শিবস্থ লাভ করে।

অলাবুকেশ্বর। যমেশ্বরের পশ্চিমে অলাবুকেশ্বরের মন্দির। এই লিঙ্গ দেখিতে অনেকটা অলাবুর মত, বোধ হয় সেই জন্ত ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। কপিলসংহিতার মতে এই লিঙ্গ দর্শন করিলে অপুত্র পুত্রবান্ এবং কদাকার ব্যক্তিও সন্তান হইয়া থাকে।

কপালমোচন। অলাবুকেশ্বরের নিকটই কপালমোচন, কালী প্রভৃতি স্থানে কপালমোচনের যেরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এখানকার কপালমোচনের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সেই রূপ কথিত হইয়া থাকে।

(২৫) "কপালমোচনঃ নাম ক্ষেত্রপালঃ যমেশ্বরম্।

মার্কণ্ডেয়ঃ তথোপাশ্রয়ঃ বিশেষঃ নীলকণ্ঠকম্।

বটমূলে বটেলক লিঙ্গানন্তৌ মহেশেভু।" (উৎকলখণ্ডঃ ৪ অঃ)

কপালমোচন, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, ঈশান, বিশেষ্বর, বটেশ্বর ও নীলকণ্ঠ মহেশ্বরের এই অষ্টলিঙ্গমূর্তি ত্রীক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন।

স্বর্গদ্বার। মহামন্দিরের নৈঋতকোণে অর্দ্ধমাইল দূরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে স্বর্গদ্বার। প্রবাদ এইরূপ ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্বারের প্রার্থনার এইখানেই প্রথম অবতরণ করেন। যাত্রীগণ এইখানে আসিয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকে। এখানে যে কোন সময়ে স্নান করিলেই পুণ্যলাভ হয়। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যের মতে স্বর্ষ্যগ্রহণের সময় এখানে স্নান করিলে কোটা জন্মের পাপ দূর হয়। ইহার নিকট স্বর্গদ্বারসাক্ষী ও কাণপাতা হনুমান্ মূর্তি আছে। প্রবাদ এইরূপ সাগরের তরঙ্গশব্দে স্তম্ভভ্রাতা ভীত হইলে তাঁহার হাত উদর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে জগন্নাথ সাগরকে বলিয়া দেন “যেন আমার মন্দির মধ্যে তোমার শব্দ আর না আসে।” সেই জন্ত ভগবানের আজ্ঞায় হনুমান্ কাণপাতিয়া সাগরের শব্দ শুনিতেছে ও সাগরের ঢেউ বাহাতে মন্দিরের নিকট না আসে সেজন্ত চৌকী দিতেছে।

লোকনাথ। শ্রীক্ষেত্রের পশ্চিমসীমায় লোকনাথের মন্দির। সাধারণের বিশ্বাস রামচন্দ্র এই লোকনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি লোকনাথ অধিক প্রাচীন নহে, মন্দিরের গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে মহারাষ্ট্র-দিগের সময়ে এই মন্দির নির্মিত হইয়া থাকিবে। আমাদের এদেশে যেমন তারকেশ্বর, উৎকলে সেইরূপ লোকনাথ। পুরীর লোকেরা জগন্নাথ অপেক্ষা লোকনাথকে অধিক ভয় করিয়া থাকে। লোকনাথ লিঙ্গ সর্বদাই পীঠের মধ্যস্থ একটি কৃত্রিম উৎস মধ্যে ডুবিয়া আছে; নিকটস্থ কোন সরোবরের সহিত ঐ উৎসের যোগ থাকায় মন্দির মধ্যে ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল পীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেবল শিব-চতুর্দশীর দিন লোকনাথলিঙ্গ বাহির হন। এই সময়ে এখানে বিশ ত্রিশ হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে। এখানে অপর সময়েও হরপার্বতীর উদ্দেশে অনেক যাত্রী হইয়া থাকে।

মঠ। জগন্নাথক্ষেত্রে নানা সম্প্রদায়ীর আগমনে এখানে বিস্তর সম্প্রদায়ীর মঠ স্থাপিত হইয়াছে। কেহ কেহ এখন ৭৫২টা মঠ গণনা করেন। উক্ত মঠগুলির মধ্যে নিমাই-চৈতন্তের মঠ, বিদূরপুরী বা মূলকদাসের মঠ, সূদামাপুরী ও পাভালগঙ্গার নিকট নানকসাহী মঠ, অতলম্পর্শী স্বর্গদ্বার-স্তম্ভের নিকট কবীরপন্থীর মঠ ও বালুসাহীর শঙ্করমঠ প্রধান। ঐ সকল মঠে সেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা আশ্রয় ও আহারাদি পাইয়া থাকে। শঙ্করমঠে বিস্তর বৈদান্তিক গ্রন্থ আছে।

আঠারনালা। পুরীর বড় রাস্তা দিয়া গমন করিলে শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময়েই প্রথমে আঠারনালা সমুদ্রে

পড়ে। প্রবাদ এইরূপ রাজা মৎস্যকেশরী মুটিয়ানদী পারাপারের সুবিধার জন্ত আঠারটা কোকরযুক্ত একটি সেতু প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাই আঠারনালা নামে খ্যাত। আবার কেহ বলে, ইন্দ্রদ্বার যাত্রীদের পারাপারের সুবিধার জন্ত নিজের ১৮টা পুত্রের মাথা কাটিয়া ১৮টা নালায় প্রদান করেন, তাহাতে আঠারনালা হইয়াছে। আবার কোন কোন বৈষ্ণব বলেন, চৈতন্তদেব এখানে আসিয়া নদী পার হইতে না পারায় জগন্নাথদেব তাঁহার সুবিধার জন্ত এক রাত্রি মধ্যে ঐ নালা প্রস্তুত করিয়া দেন। বাস্তবিক কখন ঐ আঠারনালা হয়, এখনও তাহা স্থির হয় নাই।

জলবায়ু। জগন্নাথক্ষেত্রের জলবায়ু ভাল নহে। এই জন্ত অধিক যাত্রীর সমাগম হইলেই এখানে নানাপ্রকার পীড়া সংক্রামিত হইয়া পড়ে। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহাতে সাধারণে বিনা অর্থব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

কার্যালয়। সমুদ্রের ধারে আদালত প্রভৃতি আছে। পূর্বে গ্রীষ্মকালে উৎকলস্থ বড় বড় সাহেব কর্মচারীগণ এখানে হাওয়া খাইতে আসিতেন।

নিবেশ। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের প্রদক্ষিণার মধ্যে যবন ব্যতীত বাওরি, শবর, পাণ, হাড়ি, কাওরা, চামার, ডোম, চণ্ডাল, চিড়িয়ামার, সিউলী, ভীষর, ছলিয়া, পাজ, ভঙ্করায়, কাণ্ডার (চৌকিদার), কস্বী, সর্বপ্রকার জঙ্গলিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, কুস্তকার, রজক এই কর জাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন নীলাগ্রিমহোদয়ে লিখিত আছে—

পাককর্ণে অধিকারী ভিন্ন যতি, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থাপ্রমী ও শূদ্র অথবা উহাদের পুত্রগণ দেবের পাকশালায় বাইতে পারিবে না, পাকশালায় প্রবেশ করিলে সমুদ্র ভোজ্য-ভোজ্য দীর্ঘখাতে ফেলিয়া দিবে (২৬)।

জগন্নাথ (পুং) জগতাং নাথঃ ৩তং। ১ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু। জগন্নাথ, ১ কিশুরীবংশীয় একজন রাজা। ইহারই অমৃগ্রহে কবি নরসিংহ ভট্ট অদ্বৈতচন্দ্রিকা এবং তেদাধিকারটীকা প্রণয়ন করেন। [নরসিংহ দেখ।]

(২৬) “পাককর্ণিণি বো মর্ত্যোহধিকারী তঃ জনঃ বিনা।

ন লভ্যয়েৎ কোহপি নিকোঃ পাকমন্দিরদেহলীম্।

যতরো ব্রাহ্মণাশ্চৈব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণঃ।

বাণপ্রস্থাপ্ত শূদ্রাশ্চ যে কেচিচ্চ ভথ্যাজ্ঞাঃ।

ন কেহপি পাকশালাং বৈ গচ্ছেরনু নরেশ্বর।

যদা দৈবায়ং পাকশালাং যতাব্যাস্ত বিশস্তি বৈ।

তদা তদ্ব্যবসিকরঃ দীর্ঘখাতে নিপাতয়েৎ।”

(নীলাগ্রিমহোদয় ৭ অঃ)

২ একজন কাব্যোজ্জ্বল। ইহারই অল্পগ্রন্থে কবি সুর-মিশ্র জগন্নাথপ্রকাশ প্রণয়ন করেন।

৩ নিষাদিত্যের পিতা। [নিষাদিত্য দেখ।]

৪ অন্নভোগ্যকল্পতরু নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৫ স্বপ্নদর্শনক্রমলক্ষণ, স্বপ্নদর্শনসর্গাক্রমগণিকাবিবরণ ও দীক্ষালীপন নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৬ পর্কদত্ত নামক সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ-রচয়িতা।

৭ মানসিংহকীর্তিমুক্তাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি বর্তমান শতাব্দীতেই বিদ্যমান ছিলেন।

৮ বেদান্তচাৰ্য্যাতারাহারাবলী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৯ শঙ্করবিলাসচম্পূরচয়িতা।

১০ শরভরাজবিলাসপ্রণেতা, এই গ্রন্থে তঞ্জোরের শরভোজী রাজের বিবরণ আছে।

১১ সারপ্রদীপক নামক সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা।

১২ সিদ্ধান্ততত্ত্ব নামক দর্শনমূলক একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

১৩ বৈদান্তিসিদ্ধান্তরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

১৪ হোত্রমঞ্জরী নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

১৫ নারায়ণ দৈববিদের পুত্র, ইনি সংস্কৃত ভাবায় জ্ঞানবিলাসকাব্য রচনা করেন।

১৬ একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইহার পিতার নাম পীতা-ব্রহ্ম, পিতামহের নাম রামভদ্র। ইনি কতেশাহের অল্পমতি অল্পসারে অন্তঃস্রষ্ট্রিকা নাটক রচনা করেন।

১৭ যোগসংগ্রহ নামক বৈজ্ঞানিকগ্রন্থপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম লক্ষ্মণ। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে যোগসংগ্রহ রচিত হয়।

১৮ অমিষ্টোৎপত্তিকার, ইহার পিতার নাম বিজ্ঞানকর।

১৯ একজন প্রসিদ্ধ নৈরায়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈরায়িক গোহুলনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বংশধরের মাতুল।

২০ রাজা ভগবানদাসের ভ্রাতা। রাজা প্রতাপের যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনিই জগমলের পুত্র রামদাসকে বধ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথঅবন্তি, অনেক হিন্দী কবি। ইনি প্রথমে অযোধ্যার মহারাজ মানসিংহের সভায় ছিলেন। [মানসিংহ দেখ।] তৎপরে অলবরের মহারাজ শিবদীনসিংহের আশ্রয়ে গমন করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। হিন্দীভাষার ইহার কতকগুলি কবিতা আছে। স্মরণপুরে ইহার বাস ছিল। মিঃ গ্রিয়ারসন্ অল্পমান করেন, কবিতার ইনি জগন্নাথদাস নামে খ্যাত।

জগন্নাথকলাবিৎ, নামান্তত: জগন্নাথ কালোয়াং নামে খ্যাত।

একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীভ্রমবিৎ। মোগলবাদশাহ শাহজহানের দরবারে থাকিতেন। সত্রাট্ট ইহাকে “মহাকবিরাজ” উপাধি প্রদান করেন।

জগন্নাথ গজপতিনারায়ণ দেব, দাক্ষিণাত্যে গজাম জেলায় কিমেদী নামে এক বহুবিধৃত জমিদারী আছে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত; পারলা কিমেদী, পেড্ডা কিমেদী ও চিন্না কিমেদী। এই তিন স্থানের জমিদারেরাই এক বংশোদ্ভূত এবং উভ্যবিধিগণিত কেশরীবংশীয় বলিয়া পরিচর দিয়া থাকেন। পারলা-কিমেদীর জমিদারগণের কাগজপত্র দেখিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে ইহাদের বংশাবলী এইরূপ পাওয়া যায়—

কপিলদেব (১২২৭—১২৪৫)	সুবর্ণকেশরীনারায়ণ দেব (১৫২০—১৬৩০)
নরসিংহদেব (১ম) (১২৪৫—১২৬৫)	মুকুন্দরুদ্রনারায়ণ দেব (১৬৩০—১৬৫৬)
মদনদেব (১২৬৫—১২৯০)	মুকুন্দদেব (১৬৫৬—১৬৭৪)
নারায়ণদেব (১২৯০—১৩০৯)	অনন্ত পদ্মনাভদেব (১৬৭৪—১৬৮৬)
আনন্দদেব (১৩০৯—১৩১৭)	সর্বজ্ঞ জগন্নাথনারায়ণ দেব (১৬৮৬—১৭০২)
অনন্তরুদ্রদেব (১৩১৭—১৩২৫)	নরসিংহদেব (২য়) (১৭০২—১৭২৯)
জয়রুদ্রদেব (১৩২৫—১৩৬৭)	বীর পদ্মনাভনারায়ণ দেব (১৭২৯—১৭৪৮)
লক্ষী নরসিংহ ভাস্করদেব (১৩৬৭—১৩৯২)	বীর প্রতাপরুদ্রনারায়ণ দেব (১৭৪৮—১৭৬৬)
মধুকর্ণ দেব (১৩৯২—১৪২৩)	ইনি অপূত্রক বলিয়া দত্তক লয়ন
মৃত্যুঞ্জয় ভাস্করদেব (১৪২৩—১৪৫৭)	জগন্নাথনারায়ণ দেব (১৭৬৬—১৮০৬)
মধব মদনরুদ্র ভাস্করদেব (১৪৫৭—১৪৯৪)	গৌরচন্দ্র গজপতিনারায়ণ দেব (১৮০৬—১৮৩৯)
চন্দ্রবেতাল ভাস্করদেব (১৪৯৪—১৫২৭)	পুরুষোত্তম গজপতিনারায়ণ দেব (১৮৩৯—১৮৪৩)
সুবর্ণলিঙ্গ ভাস্করদেব (১৫২৭—১৫৬৬)	জগন্নাথ গজপতিনারায়ণ দেব (১৮৪৩—১৮৫০)
শিবলিঙ্গনারায়ণ দেব (১৫৬৬—১৫৯০)	বীর প্রতাপরুদ্র গজপতি নারায়ণ দেব (১৮৫০—)

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বঙ্গদেশের একজন অধিতীর্থপণ্ডিত।
সন ১১০১ অব্দে আশ্বিন মাসের তুর্কপঞ্চমী তিথিতে হুগলি
জেলায় অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার
পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। বৃদ্ধ বয়সে রুদ্রদেবের প্রথমা
স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পুত্রাদি না থাকায় তিনি বন্ধুগণের
অহুরোধে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বামুদেব ব্রহ্মচারীর
কন্যা অধিকার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের করেক বৎসর
পরে জগন্নাথের জন্ম হয়। বৃদ্ধবয়সের পুত্র বলিয়া রুদ্রদেব
জগন্নাথকে বড়ই আদর করিতেন, আদর পাইয়া জগন্নাথ
ক্রমেই চর্চক হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশী সকলের উপর
বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই জন্ত রুদ্রদেব তাঁহাকে
মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন।

সাত বৎসর বয়সে জগন্নাথ পিতার নিকটে ব্যাকরণ পাঠ
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই পুস্তক পাঠ করিতেন
না। একদিন রুদ্রদেব তাঁহার উপর নিত্য বিরক্ত হইয়া
মারিতে গেলে তিনি ব্যাকরণের পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন।
কিন্তু পরীক্ষাতে তিনি সমস্ত প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান
করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির
পরিচয় পাওয়া যায়।

জগন্নাথের ৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু
হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব স্মারালঙ্কার
পড়াইবার জন্ত তাঁহাকে ত্রিবেণীর নিকটবর্তী বংশবাটা গ্রামে
লইয়া গেলেন। জগন্নাথ অন্নদিনের মধ্যেই সাহিত্য ও
অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। একদিন ভবদেব তাঁহার
পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রশেখর বিদ্যা-
বাচস্পতির প্রণীত বৈতনির্গর নামক স্মৃতিসংগ্রহ জনৈক
ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন, তাঁহার এক স্থলে সন্দেহ হওয়াতে
জগন্নাথ তাহা স্মাররূপে বুঝাইয়া দিলেন। ভবদেব যারপর
নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্মৃতি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জগন্নাথের বিবাহ হয়।
তাঁহার পত্নীর নাম দ্রৌপদী। ইহার কিছুদিন পরেই ভব-
দেবের মৃত্যু হইল। ভবদেবের মৃত্যুর পরে জগন্নাথ ত্রিবেণীতে
কামালপুরনিবাসী রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতির টোলে অধ্যয়ন
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন রঘুদেবের সহিত
স্মারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার জগদীশবংশীয় নবদ্বীপনিবাসী
সমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশের ঘোষতর তর্ক উপস্থিত হয়। জগন্নাথ
সেই তর্কের মীমাংসা করিয়া দেন। তিনি অধ্যাপকের নিকট
স্মারশাস্ত্র এবং অবসর মত নিজে অস্ত্রাঙ্গ শাস্ত্র পাঠ করিতেন।
২৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জগন্নাথের পিতা পরলোক গমন

করেন। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার অভিযয় হ্রসব হইল।
পিতার আত্মাদি সমাপনের সহিত তাঁহারও পাঠ শেষ হইল।

জগন্নাথ “তর্কপঞ্চানন” উপাধি লাভ করিয়া নিজ বাটীতে
একটা চতুর্পাঠী খুলিলেন। কিন্তু অন্নদিনের মধ্যেই তাঁহার
যশঃ সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল। দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল। তিনি দেশবিধাত হইয়া উঠিলেন। এক-
দিন বর্ধমানাধিপতি মহারাজ জিলোকচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ
বিদ্যাবস্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পাণ্ডুরা পরগণার অন্তর্গত
হেছাপেত নামক গ্রাম নিকর দান করিলেন। পরে
বর্ধমানরাজ তাঁহাকে আরও অনেক ব্রহ্মোক্তর ভূমি ও একটা
প্রকাণ্ড শুক্লিণী দান করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায়-রাঁয়া নন্দকুমার
তাঁহার স্ত্রী সাতিশয় প্রীত হইয়া নবাবের সহিত তাঁহার
পরিচয় করাইয়া দেন। নবাব তাঁহাকে যথোচিত পারি-
তোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবের অল্পমতিক্রমে
তাঁহার বসতবাটা ইষ্টক নির্মিত হয়।

কোন সময়ে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত জগন্নাথ
তর্কপঞ্চাননের মনান্তর ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে অবমানিত
করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গলার বজ্রের অহুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে
বাদ দিয়া ভারতবর্ষের আর আর সমস্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিত-
গণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ‘পাছে পণ্ডিতগণ মনে করে যে
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু তিনি পরাজয়-
ভয়ে সভায় উপস্থিত হইতেছেন না।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া
তর্কপঞ্চানন বিনা নিমন্ত্রণেই সশিষ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বজ্রসভায়
উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শাস্ত্রমীমাংসায় সকলেই
চমৎকৃত হইল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার আগমনে অত্যন্ত লজ্জিত
হইলেন। তৎপরে জগন্নাথ অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্ত
নন্দকুমারের নিকট গিয়া আত্মোপাস্ত সমস্ত বলিলেন। নন্দ-
কুমার তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে বাকীখাজনার জন্ত ধরিয়া
আনিতে লোক পাঠাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে আনীত
হইলেন। সেখানে জানিতে পারিলেন যে সমস্তই জগন্নাথ
তর্কপঞ্চানন হইতে হইয়াছে। অনেক স্তুতি মিনতির পর
ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র অব্যাহতি পাইলেন।

জগন্নাথের ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়।
তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। এই সময় হইতে তিনি
অধিক সময় পূজা আত্মিক অতিবাহিত করিতেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ
করেন। হিন্দুদিগের বিচারের নিষিদ্ধ তৎকালে তাঁহাদিগের
বোধগম্য গ্রন্থ না থাকায় তাঁহারা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে

ঐরূপ গ্রন্থ সকলনে নিযুক্ত করিলেন। তিনি শ্রুতিসমূহে মনন করিয়া “বিবাদভঙ্গার্থসেতু” নামক শ্রুতিসংগ্রহ রচনা করিলেন।

ইংরাজগণ তাঁহার গুণে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্লাইব, হেষ্টিংস, হার্ডিঞ্জ, কোলব্রুক, জেনার্স প্রভৃতি মহাশয়গণ তাঁহার বাণীতে আসিয়া-মধ্যে মধ্যে চক্রবৎ বিবয়ের মীমাংসা করিয়া লইয়া যাইতেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়। তাহার অল্প একজন প্রধান পণ্ডিতের আবশ্যক হইলে জগন্নাথকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘনশ্যামকে ঐ পদ দেওয়া হইল।

তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে রামচরিতনাটকের কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

বঙ্গীয় ১২১৪ সালে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে গঙ্গাগঙ্গরে ১১৩ বৎসর বয়সে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দশ পৌত্রকে সমান ভাগে ১ লক্ষ টাকা এবং নিজ শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্র প্রভৃতির জন্য ছত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া যান।

আর একজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম পাওয়া যায়, ইনি জগন্নাথীয় নামক স্তায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথদাস, উৎকলের একজন প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ। উৎকল-বাসী বৈষ্ণবদিগের নিকট ইনি গোলোকবাসিনী শ্রীরাধিকার অবতার বলিয়া খ্যাত। জগন্নাথচরিতামৃত নামক প্রাচীন উড়িয়া গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন বৈকুণ্ঠধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া প্রেমাবেশে হস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধার হস্ত হইতে জগন্নাথদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে চৈতন্তদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য জগন্নাথ দাস উৎকলে এবং শ্রীচৈতন্তদেব নবদ্বীপে উভয়ে এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরী জেলার অন্তর্গত কপিলেশ্বরপুর নামক ব্রাহ্মণশাসনে উৎকল ব্রাহ্মণের গৃহে ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমী বুধবারে মাহেন্দ্র ক্ষণে জগন্নাথদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম ভগবান দাস পুরাণ পাণ্ডা ও মাতার নাম পদ্মাবতী।

বাল্যকাল হইতেই জগন্নাথের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম অকুরিত হয়, কালে তাহারই সৌরভ বিস্তৃত হইয়া উৎকলবাসীকে বিমুগ্ধ করে। ইনি অল্পবয়সেই কলাপ, বর্জমান প্রভৃতি ব্যাকরণ, বঙ্গ ও সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বোড়িশি কি

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে চৈতন্তদেব পুরুষোত্তম দর্শনে আসিলেন। একদিন তিনি দাক্ষিণ্য দর্শন করিয়া কিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় বড় গণেশের নিকট জগন্নাথদাসকে দেখিতে পাইলেন। জগন্নাথের মুখনিঃসৃত ব্রহ্মজ্ঞতি শুনিয়া চৈতন্তের মন মুগ্ধ হইল। এই দিন হইতে চৈতন্তদেব প্রত্যহ তাঁহার ভাগবতপাঠ শুনিতে আসিতেন, কিন্তু গোড়ীয় ভক্তগণের তাহা ভাল লাগিত না। একদিন তাঁহারা চৈতন্তকে কহিলেন, “একজন অমুপদিষ্ট উৎকল ব্রাহ্মণের প্রতি এত অমুরাগ ভাল দেখায় না।” চৈতন্ত তাঁহাদের কথা অগ্রাহ করিয়া উত্তর করেন, “উপদিষ্ট কি অমুপদিষ্ট যেই হউক, যাহার মুখে বিস্তৃত ভগবৎ নাম শুনিব, সেই আমার অমুরাগের পাত্র।”

জগন্নাথদাসও এই সংবাদ পাইলেন, তিনি চৈতন্তের মঠে আসিয়া যথাবিধানে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং পরমভক্তিতে চৈতন্তের সেবা করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেম ও ভক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া চৈতন্তদেব তাঁহাকে “অতি বড়” উপাধি প্রদান করিলেন। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে তাহাতে আঘাত লাগিল, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, “আমরা এত করিয়া প্রভুর সেবা করি, তবু আমাদের উপর প্রভু কিছুমাত্র তুষ্ট নন, একটা উড়িয়াকে কিনা তিনি আমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।”

চৈতন্তদেব সর্বদাই জগন্নাথকে “অতিবড়” বলিয়া ডাকিতেন, তাহাতে কোন কোন গোড়ীয় বৈষ্ণব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া পুরুষোত্তম পরিত্যাগপূর্বক যাজপুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। চৈতন্ত ভক্তগণের একপা ব্যবহার শুনিয়া বরং জগন্নাথদাসের উপর বেশী অমুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথচরিতামূলে লিখিত আছে যে জগন্নাথদাস ছয় বৎসর কাল চৈতন্তদেবার অতিবাহিত করেন।

চৈতন্তের প্রেম দেখিয়া জগন্নাথদাসের হৃদয়রাজ্যে সেই রূপ প্রেমতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক সকল কর্ম বিসর্জন দিয়া কেবল পুরুষোত্তমের তত্ত্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভক্তিদর্শনে শ্রীক্ষেত্রের শত শত ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব হইয়া পড়িল। তাঁহার ভক্তির কথা রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ণগোচর হইল। একদিন তিনি জগন্নাথের সেবকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, “জগন্নাথদাসের কি দোষ আছে, তোমরা সত্বর আমাকে জানাইবে।”

এক দিন নিশীথ সময়ে মেধা ও সূমেধা নামে দুইজন দেবদাসীকে জগন্নাথের গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবকেশরী

রাজাকে আসিয়া সংবাদ দিল। প্রতাপরুদ্র ও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন জগন্নাথকে ধরিতে যাইবেন, দেখিলেন সেই দেবদাসীদ্বয় কোথায় অন্তর্হিত হইল। রাজা বিস্মিত হইয়া জগন্নাথের পা জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভাতে পাত্রমিত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের সম্মুখেই জগন্নাথদাস আপনাকে পুরুষোত্তমের দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। জগন্নাথচরিতামৃতরচয়িতা লিখিয়াছেন— এই সময়ে সার্কভোম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথের পুরুষ-অঙ্গে জীচিহ্ন ও তাঁহার কোপীনবাসে রক্ত দেখিয়া রাধিকার অবতার ভাবিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথচরিতামৃতে জগন্নাথদাস সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথার প্রসঙ্গ আছে।

তৎপরে জগন্নাথ ব্রহ্মধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমে ১৬ জন সাধু তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করেন। ক্রমে আরও অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। এই সময় তিনি উৎকল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত, প্রেমসাধন, ব্রহ্মাণ্ডভূগোল, দূতীবোধ প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন।

৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি পুরুষোত্তমের অঙ্গে বলীন হইলেন। (জগন্নাথচরিতামৃত)

এখনও উৎকলের অনেকেই জগন্নাথকে বিশেষ ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

জগন্নাথদীঘী, ত্রিপুরা সদরের অধীন একটা থানা। এই থানায় কতকগুলি আদিম অসভ্য জাতির বাস আছে, তাহারা পাহাড়িয়া নামে খ্যাত। ইহারা বলে যে প্রায় ৩০৪০ বৎসর হইল, তাহারা ইংরাজ রাজত্বে আসিয়া বাস করিতেছে, কারণ ইতিপূর্বে তাহারা জীপুত্রহরণ, গ্রামদাহ ইত্যাদি নানা কারণে উৎপীড়িত হইত।

জগন্নাথদেব, মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার অধিপতি। ১৪২৭ খৃঃ অঙ্গে কোণ্ডবীড়-রাজবংশ মুসলমান-কর্তৃক পরাজিত হইলে ইনি কৃষ্ণাজেলায় আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ (?) খৃষ্টাব্দে ইহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। জগন্নাথ দেব বিজোহাদি নানা উৎপাতে সর্বদাই বিব্রত থাকিতেন। কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত মাচল্লাগ্রামে বিভূতিকুণ্ড নামে একটা তীর্থ আছে। ঐ কুণ্ডসমীপে ১৩৬৬ শকে উৎকীর্ণ শিলাফলকে বর্ণিত আছে যে রুধিরোদগারী নামে জনৈক ব্যক্তি অধিপতি জগন্নাথদেবের সম্মানার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন।

জগন্নাথপঞ্চানন, আনন্দলহরীর একজন টীকাকার।

জগন্নাথপণ্ডিত, ১ তঞ্জোরনিবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি অশ্বাটাকাব্য, রতিমন্মথ নাটক ও বসুমতীপরিণয় নাটক রচনা করেন।

২ “সংবাদবিবেক” নামক ছায়গ্রন্থ রচয়িতা।

৩ তঞ্জোরবাসী শ্রীনিবাসের পুত্র, জনক-বিজয়ভাগ-রচয়িতা।

৪ বিশ্বনাথের পুত্র, ইনি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐষ্টিকৈকাহিক-পদ্ধতি রচনা করেন।

জগন্নাথপণ্ডিতরাজ, একজন বিখ্যাত তৈলঙ্গ পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম পেরম। ইহার শিক্ষাগুরুগণের নাম জ্ঞানেন্দ্র, মহেন্দ্র, খণ্ডদেব, বিজ্ঞাধর, পেরু ভট্ট ও লক্ষ্মীকান্ত। ইনি দিল্লীতে বাস করিতেন ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইহার কাব্যে শব্দলালিত্য ও অলঙ্কারের মাধুর্য্য অতি সুন্দর। মোগলসম্রাট শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার হস্তে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি নিহত হন। ইহার রচিত গ্রন্থ অনেক; তন্মধ্যে অমৃতলহরী (যমুনাতোত্র), আসফবিলাস (নবাব আসফখাঁর গুণকীর্তন), কঙ্কালহরী, গঙ্গালহরী, চিত্রমীমাংসাখণ্ডন, জগদানুরণ, পীযুষলহরী, জ্ঞানানুরণকাব্য, ভামিনীবিলাস, মনোরমাকুচমর্দন, যমুনাবর্ণনচম্পু, রসগঙ্গাধর (অলঙ্কার গ্রন্থ), লক্ষ্মীলহরী ও সুখালহরী (সুখ্যাতোত্র) পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন কোন পুস্তকে কবির যে “ভট্ট” উপাধি ছিল, তাহা জানা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি কেবল অল্পয়দীক্ষিতকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। ইনি বালবিধবার বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। অল্পবয়সে ইহার এক কন্যা বিধবা হইয়াছিল, তাহার পুনর্বিবাহ দিবস জন্মজগন্নাথ অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু অপর পণ্ডিতেরা তাঁহার বিরোধী হইয়াও শাস্ত্রযুক্তিতে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তাঁহার মাতাকে আসিয়া ঐ সম্বাদ দেন। জগন্নাথ নিজ বালবিধবা কন্যার পাত্র স্থির করিয়া মাতার অনুমতি লইতে গেলেন। জগন্নাথের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া কহিলেন, “যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, তখন আমার একটা কথা আছে। তোমার কন্যা প্রেমরসে বঞ্চিতা, কিন্তু আমি যখন উপভুক্ত হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত জানিতেছি, তখন অগ্রে আমার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য।” মাতার কথা শুনিয়া জগন্নাথ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

জগন্নাথপাঠক, দেবনাভের পুত্র, স্বভাবার্থদীপিকা নামে বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার।

জগন্নাথপাণ্ডা, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্যরাজ, চন্দ্রবংশীয় ৬৩শ রাজা। মহারাষ্ট্রাপরিতা কুলশেখরপাণ্ডা হইতে ৬২ পুরুষ অধস্তন। কথিত আছে—কাঞ্চীপুরের চোলরাজ ইহার সময় পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ইনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া জৈনধর্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন ও চোলের জৈনগণকে বানিগাছে নিম্বেষিত করেন। এই ঘটনা কাহারও

মতে ইহার পিতা অরিন্দনের সময়ে খটিয়া ছিল। ইহার পুত্রের নাম বীরবাহ। [পাণ্ড্য দেখ।]

জগন্নাথপুর, > ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি সহরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম, বর্তমান এই গ্রামে পাহাড়ের উপর জগন্নাথদেবের এক বৃহৎ মন্দির আছে। পুরীর মহামন্দিরের অনুকরণে এখানকার এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। কতদিন হইল এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না, তবে অনেক প্রাচীক তাহাতে সন্দেহ নাই। রথ-যাত্রার সময় এখানেও প্রায় ৬৭ হাজার ব্যক্তির সমাগম হয়।

২ কটকজেলার জগৎসিংহপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটি থানা।

জগন্নাথভট্টাচার্য্য, ময়কোব নামে তাত্ত্বিকগ্রন্থ প্রণেতা।

জগন্নাথ মহামহোপাধ্যায়, সিদ্ধান্ততত্ত্ব নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতা।

জগন্নাথমিশ্র, > একজন বৈখিল পণ্ডিত, সংস্কৃতে সাধু কথোপকথন সম্বন্ধে সভান্তরঙ্গ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ইনি সংস্কৃত ভাষার কথাপ্রকাশ রচনা করেন। ৩ চৈতন্যদেবের পিতা। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

জগন্নাথ যতি, একজন বিখ্যাত বৈদ্যাত্তিক, ব্রহ্মসুত্রভাষ্য-দীপিকারচরিতা।

জগন্নাথরায়, স্বারস্বত ব্যাকরণের একজন টীকাকার।

জগন্নাথশাস্ত্রী, > ব্রজেশ্বরী কাব্যপ্রণেতা। ২ জ্ঞানশাস্ত্রীর সামান্য নিকৃষ্টিটীকারচরিতা।

জগন্নাথসম্রাট, একজন বিখ্যাত অক্ষশাস্ত্রবিদ। ইনি সংস্কৃত ভিন্ন আরও অনেক ভাষা জানিতেন। জয়পুররাজ জয়সিংহের আদেশে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত ভাষার রেখাগণিত ও সিদ্ধান্তসারকৌস্তব বা সম্রাটসিদ্ধান্ত রচনা করেন।

রেখাগণিত ইউক্লিডের জ্যামিতি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

জগন্নাথ সরস্বতী, হরিশর সরস্বতীর শিষ্য, অষ্টৈতায়ুত, তত্ত্বদীপন নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথসূরি, একজন বিখ্যাত স্মৃতিবিদ, ধর্মকর্মবিষয়ে 'সমুদায়-প্রকরণ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

জগন্নাথসেন, জনৈক কবি, পদ্যাবলীপ্রণেতা।

জগন্নাথসেন কবিরাজ, গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীর এক টীকাকার। ইহার পিতার নাম অটোদর।

জগন্নাথ (জী) জগন্নাথ-টাপু। দুর্গা। "নমোহস্ত তে জগন্নাথে প্রিয়ে দান্তে মহাব্রতে।" (হরিবংশ ১৭৮ অঃ)

জগন্নাথরায়ণ, ভুবননারায়ণের পুত্র ও দেবীভক্তিরসোন্মাস নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

জগন্নিবাস (পুং) নিবাসভ্যন্ত্র নি-বস-বঞ। নিবাস, আশ্রয়। হানং জগন্নাথ নিবাসঃ ৬৩৭। ১ পরবেশয়। ২ বিকু।

"জগন্নিবাসো বসুদেবসম্মনি।" (মাত ১১) এলকালে সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরে ও পৌরাণিক মতে বিষ্ণু শরীরে লীন হইয়া অবস্থিতি করে, এই কারণে বিষ্ণুর জগন্নিবাস নাম হইয়াছে। [এলক দেখ।]

জগন্না (পুং) জগতা বিশ্বজীবজাতেন নম্যতে জগৎ-নম-ডু। ১ জন্তু। ২ অগ্নি। (বিষ)

জগন্নাঙ্গল (স্ত্রী) জগতাং মঙ্গলং বঙ্গাৎ বহুতী। কালীর কবচবিশেষ।

"শ্রীজগন্নাঙ্গলং নাম কবচং পূর্ণহুতিতম্।" (ভৈরবীখণ্ড)

জগন্মায় (পুং) জগৎস্বরূপ, বিকু।

"ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময়।" (ভাগবত ৮।২২।২১)

জগন্মায়ী (স্ত্রী) জগন্ময়-ভীপ্। যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, শক্তি।

"প্রিয়ভক্তে জগন্মাতঃ শৈলপুঞ্জি বহুধরে।" (হরিবংশ ১৭৮ অঃ)

২ লক্ষী। (মার্কণ্ডেয় পুং ১৮।৩২)

জগন্মাদন (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Justicia gandarussa.)

জগন্মাতৃ (স্ত্রী) জগতাং মাতা ৬৩৭। ১ দুর্গা।

জগন্মোহন বসু, সাধারণের নিকট "দেওয়ানজী" নামেই পরিচিত। ১৮০১ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা মধুসূদন বিনিষ্ট ধনশালী ব্যক্তির সন্তান ছিলেন, কিন্তু শেবাবহায় তিনি সমস্তই নষ্ট করেন। তাহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জগন্মোহন বাল্যকালে পাঠশালায় তৎকাল-প্রচলিত পারস্ত ভাষা শিখিবার জন্য খিদিরপুরে এক প্রতিবেশীর গৃহে উপস্থিত হন। তাহার বাসায় থাকিয়া পাকাদিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পারস্ত ভাষা শিক্ষার চেষ্টার ফিরিতে লাগিলেন। দুই বেলা বহু লোকের পাকাদি-কার্য্যের পরিশ্রমে ও অধিক রাত্রি আগরণপূর্বক অধ্যয়ন করায় বালক জগন্মোহন বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার নির্দয় প্রভু এই সময়ে তাহাকে পাকাদি কার্য্যে অপটু দেখিয়া পাথেরাদি কিছুই না দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, এমন কি তাহার শীতবস্ত্রখানি বাহা তিনি দিয়াছিলেন, তাহাও কাড়িয়া লইয়া বলিয়া দিলেন যে "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, এখানে কাঁদিতে পাইবে না, কাঁদিতে হয় খিদিরপুরের পোলে বসিয়া কাঁদ গিয়া।" জগন্মোহন বাসা হইতে আসিয়া বাস্তবিক খিদিরপুরের পোলে বসিয়া অনাবৃত অঙ্গে পৌষমাসের দক্ষিণ শীতে কাঁপিতে

কাপিতে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার স্বদেশীয় একজন দয়ালু মহাজন তাঁহার এই ছরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে দেশে পৌঁছাইয়া দেন। এত কষ্ট পাইয়াও জগন্মোহন লেখাপড়া ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহার বাটী হইতে আর এক ক্রোশ দূরে এক মুসলমান মোলবী বাস করিতেন, জগন্মোহন তাঁহার নিকট পারস্ত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। জগন্মোহনের বাসস্থানের কিছু দূরেই একটা খাল ছিল, বর্ষাকালে কেহই নৌকা বা ডোঙ্গা ব্যতীত ঐ খাল পারাপার হইতে পারিত না, কিন্তু জগন্মোহন প্রত্যহ পারাপারের পরমা দিতে পারিতেন না, কাজেই তিনি প্রত্যহ গামছা পরিয়া পুস্তক ও পরিধেয় কাপড় মাথায় বাঁধিয়া খাল সাঁতারিয়া পার হইতেন ও মোলবীর নিকট যাইতেন। এই সময়ে তিনি গ্রাসাচ্ছাদননির্কাহের জন্ত প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্বক স্বহস্তে তৎকালের পাঠশালায় ব্যবহার্য্য পুস্তক দাতাকর্ণ, গঙ্গার বন্দনা প্রভৃতি লিখিয়া দিয়া কৃষকদিগের নিকট যে তুলুনা দিইতেন, তাহাতেই সপরিবারে প্রাণ ধারণ করিতেন। এইরূপ অদম্য উৎসাহে ও চেষ্টায় তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুন্সি হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে ফৌজদারী আদালতে মাসিক ৫ টাকা বেতনে কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও বিজ্ঞবৃত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে মীর মুন্সীর পদ প্রদান করেন। ঐ সময়ে তিনি একবার তিন বৎসরের জন্ত মেদিনীপুরের দক্ষিণ মাজনা প্রভৃতি পরগণার তহসীলদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি অভিলষিত কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ লাভ করেন। কএক বৎসর কার্য্য করিয়া জগন্মোহন অনেক অর্থসঞ্চয় করেন, কিন্তু সে কালের আমলাগণের ত্রায় বিশেষ কুটপন্থা অবলম্বন করিতেন না। তিনি অত্যন্ত উন্নত-মনা ও দয়ালুচৈতন্য ছিলেন। দেওয়ান হইলে পর তাঁহার পরিচিত লোকের সম্পত্তি তিনি জানিতে পারিলে বাকী রাজস্বের জন্ত নিলামে বিক্রীত হইতে পারিত না। টাকা দিয়া বিবরণী করিতেন। তিনি নিজ গ্রামে এক অতিথিশালা করেন। প্রতিবৎসর জগন্নাথের শু গঙ্গাসাগরের শত শত সন্ন্যাসী বাজীদিগকে আহাৰ্য্য বস্ত্র ও কিছু কিছু পাথেয় প্রদান করিতেন। মেদিনীপুরের নিজ বাটীতে অনেক দরিদ্র সন্তানকে অন্ন দিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন এবং অনেক গুলি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপককে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। কজাদারগণকে যে কোন লোক তাঁহার নিকট আসিলে তিনি দায়োজ্ঞারের জন্ত যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তাঁহার দেওয়ান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে পিজলা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়, তিনি

প্রত্যেক দরিদ্রের ঘরে ঘরে গিয়া তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। অধিক কি, তাঁহার পূর্বোক্ত নির্দয় প্রভুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রকে লালন পালন করেন ও স্বীয় ভাগিনেয়ীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

সাধারণের জনকষ্ট নিবারণার্থ তিনি কতকগুলি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। সাতপুত্র রাখিয়া ৩ বৎসরকাল পেন্সন্ ভোগ করিয়া জগন্মোহন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

জগন্মোহিনী (স্ত্রী) জগন্মোহন মোহয়তি মুহ-গিচ্-গিনি ৩তং ত্রিয়াং ভীপ্। ১ মহামায়া। ২ চূর্ণা।

জগন্মোহনী সম্প্রদায়, বাঙ্গালাদেশের পূর্ব্বভাগে এই নামে এক শ্রেণীর সম্প্রদায় আছে। বঙ্গের যখন মুসলমান অধিকার, তখন রামকৃষ্ণ গোসাঁই নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। এই সম্প্রদায়ীরা বলে যে রামকৃষ্ণেরও পূর্ব্ব জগন্মোহন গোসাঁই নামে এক ব্যক্তি এই ধর্ম্মোপাসনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই নামে সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। প্রবাদ আছে, জগন্মোহন উৎকলের একজন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভেক ধারণ করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁই, গোবিন্দের শিষ্য শান্ত গোসাঁই, এই শাস্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঁই।

রামকৃষ্ণের সময়ই এই মতের সমধিক প্রচলন হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে যে নৃনাথিক পাঁচহাজার লোক এখন এই সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের অনেক-গুলি আখড়া আছে। আখড়ার প্রধান পুরুষের উপাধি মোহান্ত। শিষ্যদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহারা আখড়ার মানসিক ভোগাদি প্রদান করে, এইরূপে সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা ঐ সকল আখড়ার ব্যয় চলে। ইহারা নিগূণ উপাসক, কোন সাকার দেবতার অর্চনা করে না। গুরুকেই মূর্ত্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহাকেই আনকর্তা বলে।

দীক্ষাকালে ইহারা “গুরু সত্য” এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহার নিকট ব্রহ্মনাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা অবলম্বন করে। ইহাদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, কতকগুলি ধর্ম্মসঙ্গীতই প্রধান অবলম্বন। এই সকল সঙ্গীতের নাম নির্বাণ-সঙ্গীত*।

* এখানে একটী নির্বাণ-সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী সারঙ্গ।

সামুদ্রে ভাই, পূর্ব্বজ্ঞ গুরু কেমন ভাবে পাই।

ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর গদে লও হারা;

অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই।

অশান্ত উপাসক সম্প্রদায়ের ছাত্র ইহারা গৃহী ও উদাসীন এই বিবিধ, তন্মধ্যে গৃহীই অধিক।

জগন্‌বংশী, অযোধ্যার অন্তর্গত কতেপুর জেলার কোরা পর-গণার মধ্যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা আপনাদিগকে জগন্‌বংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের জমিদারী আছে। শাহজহানপুরের গোতম ঠাকুরেরাও এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কোরার মধ্যে অর্ধাল নামক স্থানে এক বংশের লোকেরা আপনাদিগকে গোতম ঠাকুরদিগের আদিবংশ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং গোতম ঠাকুরেরাও তাহা স্বীকার করেন। শাহজহানপুরে ৩৭ খানি গ্রাম গোতম-ঠাকুরদিগের অধীনে আছে।

জগর (পুং) জাগর্তি বৃদ্ধক্রেত্রেহনেন জাগৃ-অচ্, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কবচ। (হেম)

জগল (পুং) জন-ড, জঃ জাতঃ সন্‌ গলতি গল-অচ্। ১ মদ্যকঙ্ক, মেওয়া। (অমর) পর্যায় মেদক। ২ মদনবৃক্ষ। ৩ মদিরাবিশেষ, পিষ্টমদ্য। [মদ্য দেখ।] (ত্রি) ৪ ধূর্ত। (মেদিনী) (ক্লী) ৫ কবচ। ৬ গোময়। (রত্নমালা)

জগহ্ (হিন্দী) জারগা, স্থান।

জগা, কালীর 'ভট্ট' উপাধিদারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে একশাখা জগা নামে খ্যাত। এই ভট্টগণ জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ময়ূর-ভট্টের ঔরসে ও সর্সরিয়া জাতীয়া কোন কামিনীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সঙ্করদোষাধিত কি না জানা যায় না।

জগাই, একজন বিখ্যাত বৈষ্ণবদেবী, নিত্যানন্দের অগ্রগৃহে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। [নিত্যানন্দ দেখ।]

জগাং (আরবী) ১ ভিক্ষা। ২ কোরাণ-নির্দিষ্ট ভিক্ষকের সেবায় দত্ত সম্পত্তি। ৩ শুদ্ধ, কর।

জগাতী (আরবীজ) শুভ, আদায়কারী।

জগাঙ্গি (জগাঙ্গি) পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জেলার উত্তরপূর্ব তহসীল। পরিমাণ ফল ৩৮৭ বর্গমাইল। গম, যব, বাজরা, ছোলা এই তহসীলের প্রধান শস্য। এখানে একজন তহসীলদার একজন ম্যুন্সেফ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট থাকে। ৩টা দেওয়ানী ও ২টা ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার সদরের নাম

অবিনাশ কর মন, বুদ্ধি কর হিত,
হেলার তরিধা ভব, পাইবা সুকতি,
হীম রামদাসে বলে, আসি হেলার বড় হীন।
কৃপা করি রাখ পদে না বাসিও তিন।

আরও কতকগুলি গান দেখা গিয়াছে, সকল গুলিতেই রামদাস ও গোবিন্দদাস ইত্যাকার দাসভক্তি ভণিতা দেখা যায়, বোধ হয় ইহাদেরও উদাসীসেবা দাসভ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

জগাঙ্গি। ইহা ৩০° ১০' অক্ষা° এবং দ্রাঘি ৭৭° ২০' ৪৫"। যমুনা নদী হইতে পশ্চিমে অতি অল্প দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩০২৯, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। শিখ অভ্যাসের পূর্বে এখানে সামান্ত গ্রাম মাত্র ছিল। শিখবিজয়ী বুড়িয়া-নিবাসী রায়সিংহের যত্নে বণিক ও শিল্পকারেরা বাস করে ও তাঁহার সময় হইতেই জগাঙ্গি বিখ্যাত হইয়া উঠে। নাদিরশাহ এই নগর ধ্বংস করেন, কিন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রায়সিংহ ইহা পুনরায় স্থাপন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজাধিকারে আসে। নিকটবর্তী পার্শ্বত্যাগ্রদেশ হইতে এখানে লোহা ও তামা আমদানী হয়। ঐ সকল ধাতুনির্মিত পাত্রের জন্ত এই সহর প্রসিদ্ধ। খোদিত পিত্তলের কারুকার্য এখানে যেমন সুন্দর হয়, এমন কোথাও হয় না। এখানকার পিত্তল ও তামার বাসনাদি উঃ পঃ প্রদেশে ও সমস্ত পঞ্জাবে রপ্তানী হইয়া থাকে। পার্শ্বত্যাগ্রদেশ হইতে লোহাও পরিষ্কারের জব্যাদি আমদানী হয় এবং এখান হইতে বাঙ্গালাদেশে রপ্তানী হয়। এখানে তহসীল-কাছারী, থানা ও সরাই আছে। এখানকার একজন দেশীয় মহাজন পথিক ও নিরুপায়দিগকে অধ্বসের হিসাবে আটা দান করেন।

জগালপুর, মহিষুররাজ্যে চিত্তলহর্গ জেলার একটি গ্রাম। ইহাই আবার কঙ্কুলা তালুকের সদর। ইহা চিত্তলহর্গ সহর হইতে ২২ মাইল পশ্চিমে। এখানকার লোকসংখ্যা ২৫১০, অধিকাংশ লিঙ্গায়ত। এখানকার বাড়ীগুলি স্ট্রুটের মত পাথরে নির্মিত হয়। এখানে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। জগী, ময়ূরশ্রেণীভুক্ত একপ্রকার পক্ষী। ইহাদিগকে সিমলার পাহাড়ে ও তরিকটবর্তী স্থলে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহাদিগকে জেওয়ার, জোওয়ার, জবাহীর বা জৈর বলে। সিমলার পাহাড়ে জহগী ও লুঙ্গি এবং কুমায়ন প্রদেশে শিমোনাল অর্থাৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট মোনাল বলে। সিমলা পাহাড়ে শিকারপ্রিয় সাহেবেরা ইহাদিগকে আর্গাস্‌ কেজাট বলে।

ইহাদের মধ্যে পুরুষগুলির মস্তক কৃষ্ণবর্ণ, চূড়ার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, গলার পার্শ্বস্থ গাঢ় রক্তবর্ণ, পৃষ্ঠদেশ গাঢ় পাটল, এই সকল স্থানে সল্প সল্প অনিয়মিত কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে, ডানার পালক গাঢ় রক্তবর্ণ। পালকের কলমগুলি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘপুচ্ছের পালক কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু প্রত্যেক পালকের গোড়ার দিক্‌ হইতে খেতান পাটল ডোরা টানা। গলা ও ষাড় সিন্দূর বর্ণ। এই সিন্দূর বর্ণের নিম্নেই ধূসল ও পীত-বর্ণের কতকগুলি কাঁটার মত কঠিন পালক আছে, বক্ষস্থল ও নিম্নভাগ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ম্যান রক্তবর্ণের অল্প ছায়া পাওয়া

বার; এই স্থানের প্রত্যেক পালকে একটা করিয়া শালা বিন্দু আছে। টোট কৃষ্ণাত। স্টেটের দুই পার্শ্বে শুলের দ্বার মাংসল কাটা আছে।

ইহা লম্বা প্রায় ২৭২৮ ইঞ্চ। জী জাতীরের মস্তক হইতে সমস্ত দেহের উপরিভাগে গাঢ় ও তরল পাটল বর্ণ এবং কৃষ্ণাভ-বর্ণের মিশ্রবর্ণের পালক এবং পালকের মুখে মুখে পীতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আছে। দেহের নিম্নভাগ পাংশু পাটল কিন্তু সর্বত্র শালা বিন্দু আছে। জীজাতির শূদ্র নাই। ইহারা লম্বা ২৪ ইঞ্চ। পুংসাবক প্রথমে ঠিক জী পক্ষীর মত দেখাইতে থাকে, তৎপরে বখন বয়স দ্বিতীয় বৎসরে পড়ে, তখন হইতে দেহের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তৃতীয় বৎসরে বর্ণান্তিতে ঠিক পুংপক্ষীর পূর্ণদেহ প্রাপ্ত হয়।

এই জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষী পশ্চিম নেপাল হইতে উঃ পঃ হিমালয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অনেকে বলেন সিমলা বা মুসোরীর নিকটে এই পক্ষী অধিক দেখা যায় না। আলমোরাতে ইহাদের সংখ্যা অধিক। চিরতুঘারাবৃত স্থানের অতি নিকটে নিম্নে গভীর জঙ্গলে ইহারা বাস করে। এক স্থানে একটিমাত্র বা দূরে দূরে কতকগুলি থাকে। শীতে ইহারা নামিয়া আরও নিম্নে ওক্, বাদাম ও দেবদারু বনে বাস করে। পাহাড়ে বাঁশের জুগ্ম বোপেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। যেখানে দল বাঁধিয়া থাকে, সেখানে ১২টির বেশী থাকে না। প্রতি বৎসর শীতে এক স্থানে আসিয়া বাসা বাঁধে। বড় ঝড় বা অশ্রু উৎপাতে ইহারা বন হইতে বিতাড়িত হইলে পাহাড়ের ঝোপে গিয়া বাস করে।

ইহারা ভয় না পাইলে কখন শব্দ করে না। ইহারা ভীত হইলে ক্রমাগত ঠিক ভেড়া বা ছাগল ছানার মত চেঁচায়, প্রথমে আলাপ আরম্ভ করিয়া পরে স্বরের মাত্রা চড়াইতে থাকে, শেষে অতি চীৎকার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া পলায়। যেখানে ইহারা উদ্ভাস্ত হয় না, সেখানে ইহারা বড় নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করে, এমন কি অতি নিকটে মানুষ আসিলেও ভয় পায় না। উড়িবার সময় ইহারা ডাকিতে থাকে, কিন্তু একবার উড়িয়া পুনরায় বসিলে আর ডাকে না। একটা ভয় পাইয়া ডাকিয়া উঠিলে একত্র যতগুলো থাকে, সবগুলো একবারে ডাকিয়া উঠে। ইহারা উড়িলে উপরে উঠে না, ক্রমশই নিম্ন পর্বতের ঝোপের দিকে বা বৃক্ষাভিমুখে নামিতে থাকে। ইহারা চিলের মত পাক দিয়া উড়ে। ইহারা বড় চতুর। বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে ইহারা শীতের বাস পরিভ্রমণ করিয়া উপরের দিকে চলিয়া যায় এবং পরস্পর ছড়াইয়া পড়ে। যতদূর পর্য্যন্ত বৃক্ষলতাদি দেখা যায়, ইহারা

এীয়ে তত উচ্চে গিয়াও বাস করে। বৈশাখে ইহারা কোক বাঁধিতে আরম্ভ করে। এই সময় কোন একটা পুংপক্ষী একটা পতিত বৃক্ষের উপর বা শাখার উপর বা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া অতি স্পষ্ট অথচ উচ্চৈঃস্বরে “ওয়া,” “ওয়া” শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দ এক মাইল দূর হইতে শুনা যায়। এইরূপ ডাক হয় ত প্রতি ৫:১০ মিনিট অন্তর বা সমস্ত দিনে ৫৭ বার মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। পুং পক্ষীরা মদন-পীড়ার পীড়িত হইয়া এইরূপ ডাকিতে থাকে এবং রমণাতিলাষী জী-পক্ষীরা এই ডাক শুনিয়া নিকটে উপস্থিত হয়। তৎপরে জীপক্ষী গর্ভধারণ করিয়া এই পুংপক্ষীর সহিত একত্র এক শুশু স্থানে আসিয়া বাসা বাঁধে। এই সময়ে প্রায়ই শীত আরম্ভ হয়।

ইহারা সাধারণতঃ ওক্ ও বন বৃক্ষের পাতা খায়, ক্ষুদ্র জন্তুর মধ্যে বিংগল নামক রুপড়ি কাঁটাগাছের পাতাই ইহাদের প্রিয়। তত্তিন্ন অশ্রুত বৃক্ষের পাতা, কল ও মূল পর্য্যন্ত খায়, কিন্তু পাতাই প্রধান খাদ্য। কয়েকপ্রকার কীটাদিও খায়। গর্ভিণী হইলে জীপক্ষীরা শত ভোজন করে। ইহারা পোষ মানে।

শাকুনশাস্ত্র মতে ইহাদের দুইটা শ্রেণী আছে, সেরিওর্গিস্ মেলানো সিকলা ও সেরিওর্গিস্ টেনিয়ারিতটাই।

জগ্গারী (জি) গৃ-কিন্ বিষ্ণু উৎকল ছান্দসদ্বাং। ১ উদগুর্গ।

“দূরে হৃদ্বা জগ্গারিঃ পরাটৈঃ।” (ঋক্ ১০।১০৮।১)

‘জগ্গারিদগুর্গঃ।’ (সায়ণ।) ২ জজম। (নিরুক্ত ১১।১৫)

জগ্গায়াপেট, মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলায় নন্দীগ্রাম তালুকের একটা সহর। এখানে ১০০৭২ জন অধিবাসী, অধিকাংশ হিন্দু ও বণিক। নিজামরাজ্যের সীমার উপর ১৬° ৫২' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮০° ৯' পূর্ব দ্রাঘিমায়ে অবস্থিত। এখনও এই সহর রোহিলাদিগের উপদ্রবে পীড়িত হইয়া থাকে। বণিকের মধ্যে মাড়বাসীই অধিক। অহিফেন এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। নগরের চতুর্দিকে মুখর ভেড়ী বাঁধা আছে। ইহার প্রাচীন নাম বেত-বোলু।

বসিরুদ্ধী বেক্টাড্রি নাইছ নামক এক ব্যক্তি ইহার চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত করাইয়া স্বীয় পিতার নামে জগ্গায়াপেট নামকরণ করেন। ইহার উত্তরপূর্ব অংশে কড়াপা কণ্ডল পর্বতমালায় পাথুরে কয়লা আছে বলিয়া অল্পমিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে খৃষ্ট পূর্ব ২ শত বৎসরের পুরাতন এক বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে।

জগ্গারী, সামুদ্রিক ক্ষুদ্র মৎস্ত, দাক্ষিণাত্যে নদীতেও অল্প পাওয়া যায়। মলয় উপসাগর হইতে দাক্ষিণাত্যের উপকূলে সমস্ত সাগরেই পাওয়া যায়, গজামবাসীরা ইহাকে জগ্গারী

বলে, ডাঙিল ভাষা উদান ও আরাকাশে “জা বিজ্জা” বলে। নদীর মৎস্তগুলি কিছু কুজাকার লবে ৪১০ ৪১০ ইঞ্চি, কিন্তু সমুদ্রেরগুলি ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। মৎস্তভবিদদের ইহাকে “গেরেস্ ক্যামেটোসাস” নাম দিরাছেন। ইহা দেখিতে বাঁকালায় খলিমা মাছের মত, তবে বর্ণটা রূপার মত বক্ বক্ এবং তাহার উপর পায়রাটাদার গায়ের ফুটকি ফুটকি দাগের মত দাগ আছে।

জগ্গিক (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত একজন বীরপুরুষ, ইহার উপাধি ঠকুর। (রাজতর ৮১২৭৯)

জগ্গ (ত্রি) অদ-কর্মণি ক্ত জগ্গাদেশঃ (অনো জগ্গদিশ্যপ্তিকৃতি। পা ২।৪।৩৬) ১ ভূক্ত, ভক্ষিত।

“বিষ্ণুঃ কলং কুটজবকলমবত জগ্গম্।” (চক্রপাণি)

(স্রী) অদ-ভাবে-ক্ত। ২ ভোজন।

জগ্গি (স্রী) অদ-কিন্ পূর্ববৎ জগ্গাদেশঃ। ১ ভক্ষণ, ভোজন।
“স ভূতানো ন জানাতি ঋগ্ঋজমিমানসঃ।” (মহু ৩।১।১৫)
২ সহভোজন। (অমর ২।১৫৫।)

জগ্ননর, আগরা হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ফতেপুর শিকরি হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে হিত একটি অরম্য নগর।

শ্রতপুর এবং চোলপুর রাজ্যের মধ্যবর্তী ইংরাজ অধিকারের পশ্চিম সীমায় ইহা অবস্থিত। দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রিকোণ দিয়া পূর্বদিক পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গিরিমালা আছে। গিরির শিখরদেশ সমতল। তথায় একটি স্নানরূপ দূর্গ আছে।

তথাকার অধিবাসীগণের মতে মহোবাধিপতি আল্হর মাতুল জগ্ননসিংহের নামানুসারে ইহার নাম জগ্ননর হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বহুবংশীয় কোনও রাজা এই নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় জগ্ন নামে একজাতীয় লোক আছে, বোধ হয়, তাহাদিগের নামানুসারেই এস্থানের নাম হইয়াছে।

মহাশ্মা টুড লিখিয়াছেন ১৬১০ খৃঃ পর্যন্ত জগ্ননর প্রায়-বংশীয় রাজপুতগণের অধিকারে ছিল। তৎপরে ইহা মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। এখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশই ভগ্ন। মন্দিরগুলি সম্রাট অকবরের সময়ের পূর্বে নির্মিত বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরে লংগর বতগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন খানি নাগরীতে লিখিত, এই খানির তারিখ ১৬২৮ সংবৎ।

জগ্গনাথ, সাঁওতালদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বালক বালিকা এবং

স্ত্রীলোকদিগের নীতি শিকার দেয় ও নৈতিক আচারান্বিত হুই রাখে, তাহাকে জগ্গনাথ বলে। বিবাহের সময় ঐ ব্যক্তি উৎসবকর্তা ও কন্ডার হতে আশ্রয়প্রার্থী ভাঙ্গিয়া দেয়।

[সাঁওতাল দেখ।]

জগ্গরা, রণধন্যের চৌকনকুলভিলক হামীরের বৈমাত্রেয় স্রাতা (দাসীগর্ভজাত) ভোজদেব এইস্থান সম্রাট আলাউদ্দীনের নিকট আরম্ভ প্রাপ্ত হন। [হামীর ও ভোজদেব দেখ।]

জগ্গরাওন, পঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা জেলার পশ্চিম তহসীলের নাম জগ্গরাওন। এই তহসীলের পরিমাপকল ৪০৯ বর্গ মাইল। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। এখানে একটা ফৌজদারী ও দুইটা দেওয়ানী আদালত আছে। একজন মুন্সেফ ও তহসীলদার তিনটা আদালতের কার্য করেন। ২টা থানা আছে। সদরের নামও জগ্গরাওন। এই সহর ৩০° ৪৭' ২০" উত্তর অক্ষা° ও ৭৫° ৩০' ৪৫" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জগ্গরাওন সহর লুধিয়ানা সহরের ২৯ মাইল দক্ষিণে ও লুধিয়ানা ফিরোজপুর রাস্তার উপর অবস্থিত। এই সহরের লোকসংখ্যা মোট ১৮১১৬ জন। এই স্থান মোগলসিংহের রাজকোটের রাসদিগের অধীনে ছিল, শেষে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অধীন হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ ইহা ফতেসিংহ আহলুওয়ালিয়াকে অর্পণ করেন। শতের ব্যবসারই এখানে প্রধান, সহরে থানা, স্কুল, ডাক্তার-খানা, সরাই ইত্যাদি আছে।

জগ্গরাসিংহ, মোগল রাজত্বকালে পঞ্জাবের জগ্গদাসপুর জেলার মধ্যে বতাল ও পাঠানকোট নামে দুটি বিখ্যাত স্থান ছিল। বতাল দোয়াবের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল। অকবরের সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় সন্তানের খাঁ এই স্থানে থাকিতেন, তিনি ইহার প্রাচীর বাড়াইয়া দেন ও একটি স্নানরূপ সুরোক্ষর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আজও বর্তমান আছে। তৎপরে যখন শিখরা প্রবল হইয়া সমস্ত পঞ্জাব আপনাদের সর্দারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়, সেই সময় রামঘরীয়া দলের সর্দার জগ্গরাসিংহ বতাল প্রাপ্ত হন। বতাল ভিন্ন দীননগর, কালনোর, জীগোবিন্দপুর ও নিকটবর্তী অজ্ঞাত নগরও তাঁহার অধীনস্থ হয়। অমরসিংহ তগের অধীনে কনহিরীগণ প্রবল হইয়া জগ্গরাসিংহকে একবার বিতাড়িত করে, কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র যোবসিংহ রণজিৎের অধীনে রাজা হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যোবসিংহের মৃত্যু হইলে, রণজিৎ উত্তরাধিকারী-নির্ণয়ে মহা গোলমাল দেখিয়া সমস্ত রাজ্য স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া লয়েন।

জগ্গি (পুং) পম কিঃ বিষ্ণু (ভাবার্যঃ ধাঞ কৃষ্ণগমিজনিন-
নবিত্যঃ। পা ৩২।১৭১ বার্তিক*) ১ বায়ু। (ত্রি) ২ গমন-
কীল, গতা। জীলিঙ্গে বিকল্পে জীপ্ হয়।

জঘন (ক্ৰী) হস্তে ২সৌ হন-কর্ম্মণি অচ্ বিষ্ণু। (হস্তে:
শরীরাবয়বে যে চ। উণ্ ৫।৩২) ১ জীলোকের কটিদেশের
পুরোভাগ।

“জীণাং বৃহজ্জঘনসেতুনিবারিতানি।” (মায় ৫।২৯)

২ কটিদেশ, শ্রোণি।

“ভগবান্ বিজ্ঞং চক্রে জঘনং বিস্মিতো তদা।

দীর্ঘে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাত্মতে।”

(ধেবীভাগবত ১।২।৮১)

জঘনকূপক (পুং) [ধিব°] জঘনন্ত কূপে ইব কারতঃ কৈ-
কঃ। কুক্কন্দর। (হলায়ুধ)

জঘনচপলা (ক্ৰী) ১ মাত্রাবৃত্তবিশেষ। যে মাত্রা বৃত্তের
প্রথমার্ধে আখ্যায় প্রথমার্ধের লক্ষণাক্রান্ত এবং দ্বিতীয়ার্ধে চপলার
দ্বিতীয়ার্ধের লক্ষণে লক্ষিত হয়, তাহার নাম জঘনচপলা।

“প্রাকপ্রতিপাদিতমর্কে প্রথমতঃ তু চপলায়াঃ।

লক্ষ্যপ্রেরিত সোক্তা বিত্ত্বদ্বীতিজঘনচপলা।”

(বৃত্তরসাকর ২ অঃ) উদাহরণ।—

“কৃষ্ণঃ শৃঙ্গারপটুর্দৌবন-মদ-চঞ্চলঃ সুললিতাঙ্গঃ।

আসীদ্রজ্ঞাননানাঃ মনোহরো জঘনচপলানাম্।”

(ছন্দোমঞ্জরী) [আখ্যা ও চপলা দেখ।]

জঘনং চপলং যন্তাঃ বহত্রী। যে সকল জীলোকের জঘন
দেশে অতিশয় চঞ্চল, কাবুকী।

জঘনার্দ্ধ (পুং) জঘনভার্দ্ধঃ ৩তং। পূর্নার্দ্ধ, পূর্বভাগ।

“রাজানমম্বয়ঃ সর্বে পরিচার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।

জঘনার্দ্ধে বিরটিচ্চ বাজসেনিচ্চ সৌমকিঃ।” (ভারত ৫।৫০ অঃ)

জঘনিন্ (ত্রি) জঘনমন্ত্যন্ত জঘন-ইনি। প্রশস্ত জঘনযুক্ত।

“লম্বোদরা জঘনিঃ পিঙ্গাক্ষা বিষ্ণুরূপিণঃ।” (হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

জঘনেফলা (ক্ৰী) জঘনে ইব মধ্যভাগে ফলমন্ত্যঃ অপূক্স*।

কাকোদুষ্করিকা (অমর)

জঘন্ত (ত্রি) জঘনমিব জঘন-যৎ (শাখাদিত্যো যৎ। পা ৫।৩।১০০)

১ চরম। “জঘন্তন্ত পলার্দ্ধেন মেহকথোবধেন চ।”

(চক্রপাণি মেহাধিকার)

২ গর্হিত। “তত্র দ্যুতমতবমো জঘন্তং তস্মিন্ জিতাঃ

প্রব্রজিতাস্ত সর্কে।” (ভারত ২৩।৩৫।১৩) ১ ক্ৰী) জঘণে

কটিদেশে ভবং জঘন্তং দিগাদিভ্যঃ যৎ। ৩ মেহন। (মেদিনী)

(ত্রি ৪ কৃদ্র। (পুং) ৫ শূদ্র। (শকরসাবলী) ৬ হীনজাতি।

“জঘন্তাং সেবমানান্তি সংযতাং বাসরেন্দ্রগৃহে।” (মহু ৮।৩৬৫)

৭ পৃষ্ঠভাগ।

“ততো জঘন্তং সহিতৈঃ স মম্বিতিঃ পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ।”

(রামা* ২।১০৪।২৯)

‘জঘন্তং জঘনভাগং পৃষ্ঠভাগমাপ্রিতঃ সন্’ (রামায়ণ)।

(ত্রি) ৮ নিকৃষ্ট। “জঘন্তেরং প্রবৃত্তিঃ।” (উভট)।

(পুং) ৯ রাজগণের পঞ্চপ্রকার সংকীর্ণ অহুচরের অন্তর্গত
এক প্রকার। বৃহৎসংহিতার ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত
আছে—জঘন্ত পুরুষ প্রায়ই মালব্য পুরুষের সেবা করিয়া থাকে।
ইহাদের কর্ণ অর্ধচন্দ্রের স্তায় অর্ধবৃত্তাকার, সন্ধিহীন অপেক্ষা-
কৃত দৃঢ়, শুক্র সারময়, অঙ্গুলিগুলি স্থূল। ইহার ক্রুর
প্রকৃতি, রুম্মাকৃতি; ইহাদের কবিষ শক্তি থাকে। জঘন্ত
পুরুষ ধনী, স্থূলবুদ্ধি, তাত্রমূর্ত্তি ও পরিহাসশীল। ইহাদের বন্ধ,
হস্ত ও পদে অসি, শক্তি, পাশ ও পক্ষত সদৃশ চিহ্ন থাকে।

(বৃহৎসং ৬২।৩১-৩৪)

জঘন্তচপলা (ক্ৰী) [জঘনচপলা দেখ।]

জঘন্তজ (পুং) জঘন্তে চরমে জায়তে জঘন্ত-জন-ড। (সমুদ্রাঃ
জনেডঃ। পা ৩।২।৯৭।) ১ শূদ্র। (ত্রি) ২ কনিষ্ঠ।

“জঘন্তজন্ত সর্কেষামাদিত্যানাং গুণাদিকঃ।” (ভারত ১।৬৫।১৬)

জঘন্ততর (ত্রি) জঘন্ত-তরপ্। নিকৃষ্টতর।

“জন্ম দ্বিতীয়মিত্যেতজ্জঘন্ততরমুচ্যতে।” (ভা* ১।৪।৪২ অঃ)

জঘন্তভ (ক্ৰী) আজ্ঞা, অগ্নেয়া, স্বাতি, জ্যোষ্ঠা, তরুণী ও শত-
ভিষা এই ছয়টি নক্ষত্রকে জঘন্তভ বা জঘন্ত নক্ষত্র বলে।

জঘন্তশায়িন্ (ত্রি) জঘন্তং চরমং শেতে শী-গিনি। অবশেষে
যে শয়ন করে।

“জঘন্তশায়ী পূর্কঃ স্তাছুখায় গুরুবেশ্মনি।” (ভার* ১২।২৪২ অঃ)

জঘ্নি (পুং) হন-কিন্ বিষ্ণু (আহুগমহনেতি। পা ৩।২।১৭১)
১ বধসাধন অস্ত্রাদি। ২ হস্তা।

“অগ্নিব্রত মমিভ্রিয়ং মরিব্রজং দিবে দিবে।” (ঋক্ ৯।৬।১২০)

‘অগ্নিহস্তাসি।’ (সারণ)।

জঘ্নু (ত্রি) হন-কর্ত্তরি কু বিষ্ণু। (কুভ্রশ্চ। উণ্ ১।২৩)

যাতক। (উণাদিকোষ)

জঘ্ণি (ত্রি) জা-কি-বিষ্ণু। যে গন্ধ গ্রহণ করে, ভ্রাণকারী।

“ভ্রাজন্ত্যভি বিজ্ঞ জঘ্ণিঃ।” (ঋক্ ১।১৬২।১৫)

‘জঘ্ণিজিহ্বতী ভ্রা গন্ধোপাদানে আদৃগমহনেতি কিন্ প্রত্যয়ঃ।’

(সারণ)

জঙ্কি (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জঙ্কিজাম (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ।

জঙ্গপুগ (পুং) নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, পাপকর্ম্ম।

জঙ্গবাহাদুর, নেপালের একজন বীরপুরুষ। ঠান্ডাবংশীয়

বীর কুমার বালনরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। বালনরসিংহ অত্যন্ত রাজভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশাবলী কাজি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বামবাহাদুর সিংহ, বদরী-নরসিংহ প্রভৃতি জঙ্গবাহাদুরের আর চারি ভ্রাতার বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বামবাহাদুর জঙ্গকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। জঙ্গের পুত্র পিতামহ ভীমসেন গোরখাবংশীয় চতুর্থ রাজা রণবাহাদুরের সময়ে ১৮০৪ খৃঃ নেপালের রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বহু দিবস অতৃপ্তকর্মতার সহিত রাজকার্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছিল। ১৮০২ খৃঃ ভীমসেনের প্রধান সহায় মহারাণী জিপুরাজস্বরীর মৃত্যুর পর হইতে ঠানাদিগের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিল। রণবাহাদুরের পৌত্র এবং যোধ-বিক্রমের পুত্র রাজেন্দ্রবিক্রম এই সময়ে নেপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ঠানাদিগের পরম শত্রু পাঁড়েগণ নানা কৌশলে তাঁহাকে স্বদেশে আনিয়া তাহাদিগকে সমুদয় রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত করিল। ভীমসেনের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ আনার নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া তিনি অবশেষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করিলেন। ইতিপূর্বে ভীমসেনের ভ্রাতৃপুত্র মর্ত্তবর সিংকে একরূপ নির্দাসিত করা হইয়াছিল।

রাজেন্দ্র-বিক্রমের ছই রাণী। বড় রাণী পাঁড়েদিগের প্রধান সহায়। তাঁহার সাহায্যেই পাঁড়েগণ ঠানাদিগের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। বড় রাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্র-বিক্রমকে যুবরাজ করা হইল। পাঁড়েগণ ও চৌত্রাগণ এ সময়ে নেপালের প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে বড় রাণীর মৃত্যু হইল। তখন চৌত্রাবংশীয় কতেজঙ্গ চৌত্রা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্যে যারপর নাই বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। রাজা কোনও কার্য্যের ভার আপনাই উপরে লইতে অনিচ্ছুক; তাঁহার ইচ্ছা তিনি রাজা থাকিবেন, যুবরাজ সমস্ত কার্য্য করিবেন অথচ দায়িত্ব কাহাকেও স্পর্শ করিবে না। আবার যুবরাজ নিতান্ত উদ্ভটস্বভাব, সামান্য কারণে নানা ছলে প্রজাগণের উপর অসহ্য উৎপীড়ন করিতেন। কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। একরূপ অবস্থার রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ একত্র হইয়া ১৮৪২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের নিকটে এক আবেদন করিল। তদনুসারে রাজা ছোট রাণীর উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে পাঁড়েগণ নানা কারণে রাজ্যের ক্রোধভাজন হইয়া উঠে, বিশেষতঃ ছোটরাণী তাহাদিগের

উপরে ঝগড়াহুতা ছিলেন। ছোটরাণী যুগ্মরূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসেস্থির করিলেন যে, ঠানাবংশীয় মর্ত্তবর-সিংহকে নির্দাসিত হইতে স্বদেশে আনয়ন করিয়া প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিতে পারিলে তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে। রাজাকে বশিষ্ঠা তিনি মর্ত্তবরসিংহকে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে নেপালে আনাইলেন। রাজা প্রথমে তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু রাণীর অহরোধে পরে সম্মত হইলেন। জঙ্গবাহাদুর এই সময়ে পুরাতন মর্ত্তবরের সহিত নেপালে প্রত্যাগমন করেন। মর্ত্তবর নেপালরাজ্যে আসিয়াই ভীমসেনের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া পাঁড়েদিগের শান্তি বিধান করিলেন। পাঁড়ে এবং চৌত্রা সর্দায়গণ নির্দাসিত হইলেন। মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রমের পক্ষ সমর্থন করায় মর্ত্তবর রাণীর বিষেবভাজন হইলেন, নানা কারণে রাজাও তাঁহার উপর চটিয়া গেলেন। রাজা এবং রাণী উভয়ে পরামর্শ করিয়া মর্ত্তবরকে গোপনে নিহত করেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ১৭ই মে তারিখে মর্ত্তবর নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র জঙ্গবাহাদুরও লিপ্ত ছিলেন। তিনি অনেকদিন পরে প্রকাশ করেন যে রাজা প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একাধারে প্রবৃত্ত করাইয়া ছিলেন। মর্ত্তবরের মৃত্যুর পর পাণ্ডে ও চৌত্রাগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত দূত প্রেরিত হইল, যতদিন তাহারা আসিয়া না পৌছায় ততদিন জঙ্গবাহাদুর প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিবেন এইরূপ স্থির হইল। তাঁহাকে 'জেনরল' উপাধি দিয়া তিনটা রেজিমেন্টের অধিনায়ক করা হইল। কতেজঙ্গ চৌত্রা ফিরিয়া আসিয়া প্রথমত মন্ত্রিপদ গ্রহণে অসম্মত হন। তখন জঙ্গবাহাদুর, গগনসিং, অভিমান রাণা প্রভৃতি অনেকে মন্ত্রিপদের প্রার্থী। প্রথমতঃ স্থির হইল যে সেনাবিভাগের কার্য্য জঙ্গবাহাদুর এবং অস্ত্রাস্ত্র বিভাগের কার্য্য গগনসিং করিবেন। পরে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কতেজঙ্গ প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গগনসিং, অভিমান রাণা, দলভজনপাঁড়ে এবং কতেজঙ্গ এই কয়েক জন লইয়া একটি মন্ত্রি সভা স্থাপিত হইল। কতেজঙ্গ ইহার সভাপতি হইলেন। জঙ্গবাহাদুর যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভার হান দেওয়া হইল না। কিন্তু তাঁহার বলবিক্রম ও বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া প্রকান্তে কেহ তাঁহার শত্রুতা-সাধনে সাহস করিল না। মন্ত্রিসভার মধ্যে গগনসিংহের প্রভুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গগনসিংহ রাণীর অতিশয় প্রিয়পাত্র, সর্ব্বদা রাণীর নিকট তাহার গতিবিধি। রাণীর চরিত্রে সন্দেহ হওয়াতে রাজা

পুত্র এবং মন্ত্রিপণের সহিত যড়যন্ত্র করিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে গগনসিংকে গোপনে বিনাশ করেন। হত্যাকাণ্ডব্যাঘ্রবণে রাণী কোথাক হইয়া তৎক্ষণাৎ কোট (সংগ্রাম-সভাগৃহ) অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সকলকে সমবেত করিবার নিমিত্ত বংশীধ্বনি করা হইল। জঙ্গবাহাদুর সর্বপ্রথমে কোটে সৈন্তে উপস্থিত হইয়া রাণীকে বলিলেন যে তিনি এবং গগনসিং উভয়ে রাণীর প্রধান কর্মচারী, জুতরাং তাঁহার জীবনও নিরাপদ নহে; এজন্য এই হত্যাকাণ্ডের সবিশেষ অহুসন্ধান সর্বতোভাবে কর্তব্য। সকলে সমবেত হইলে রাণী হত্যাকারীর অহুসন্ধানের আদেশ দিলেন। বীরকিশোর পাণ্ডের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শূলভাষ্য করা হইল, সে পুনঃ পুনঃ দোষ অস্বীকার করিতে রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমান রাণার প্রতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। অভিমান রাণা রাজার অহুমতির অপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে রাজা প্রধান মন্ত্রীকে অহুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কোট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রধান মন্ত্রী ফতেজঙ্গ আসিয়া বিচারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করায় রাজ্ঞী ক্রমশঃই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। জঙ্গবাহাদুর রাণীর ইজিত ক্রমে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ফতেজঙ্গ, অভিমান রাণা ও দলভঞ্জন ভূমিশায়ী হইলেন। চতুর্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ-শেষে রাণী সন্তুষ্ট হইয়া জঙ্গবাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই সময়ে জঙ্গ বাহাদুর রাণীর অত্যন্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। যুবরাজকে নিহত করিবার উদ্দেশে রাণী তাঁহাকে সর্বদাই অহুরোধ করিতেন; কিন্তু তিনি নানা কৌশলে তাঁহার অহুরোধ এড়াইয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে বীরধ্বজ বসুনিয়ং রাণীর নিকটে গিয়া যুবরাজের প্রতি জঙ্গের গোপনে অহুরক্তির কথা প্রকাশ করিয়া জঙ্গকে হত্যা করিবার নিমিত্ত যড়যন্ত্র করে। কিন্তু পণ্ডিত বিজয়রাজ নামে জঙ্গের একজন হিতৈষী ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিয়া সমুদয় কথা জঙ্গের নিকটে প্রকাশ করিয়া দিলেন। যড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। বসুনিয়তদিগের অনেকের প্রাণদণ্ড হইল। সন্ধ্যাকালে যুবরাজের অহুমতিক্রমে জঙ্গবাহাদুর রাণীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি যুবরাজের পরমশত্রু, নেপালরাজ্যে তাঁহার স্থান হইতে পারে

না; শীঘ্র নেপাল পরিত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত তাঁহার অন্ত্র চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। রাণীও যড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া ভয়ে কোনও বিরুদ্ধতা করিলেন না। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ২৩এ নবেম্বরে রাজা ও রাণী পুত্রদ্বয়ের সহিত নেপাল পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেলেন। যুবরাজ নেপালে রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকাৰ্য্য চালাইতে লাগিলেন। বসুনিয়ং-যড়যন্ত্র প্রকাশ হইবার পরে রাজা জঙ্গবাহাদুরকে মহাসমারোহে প্রধান মন্ত্রিপদে পুনঃ স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে সম্মানসূচক নানা উপাধি দেওয়া হইল। এই সময় হইতে তাঁহার পারিবারিক উপাধি কুমারের পরিবর্তে রাণাজি হইল। জঙ্গের এখন অসীম ক্ষমতা, সমস্ত নেপাল এখন তাঁহার বশীভূত।

রাণী এবং তাঁহার সঙ্গীগণ বারাণসীতে পৌছিয়া কিরূপে পুনরায় নেপাল হস্তগত করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাও কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তায় পড়িলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে রাজা বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া সিংগোলিতে আসিলেন। গুরুপ্রসাদ চৌদ্ধা নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা নানারূপ যড়যন্ত্রে রাজাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া রাণী পত্র দ্বারা রাজার সহিত যড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এদিকে যুবরাজ এবং জঙ্গবাহাদুর পুনঃ পুনঃ পত্র দ্বারা রাজাকে নেপালে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু তিনি রাণীকে লইয়া নেপালে যাইতে পারিবেন না, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিলেন। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখনও জঙ্গের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করেন, কখনও বা নানা মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন।

অবশেষে ১২ই মে তারিখে গুরুপ্রসাদ চৌদ্ধা এবং কাজি জগৎরাম পাণ্ডে ধৃত হইল। তাহাদের নিকট হইতে একখণ্ড পত্র পাওয়া গেল। তাহাতে রাজার স্বাক্ষর ছিল। পত্রখানি ৮০০০ সৈন্ত এবং ৫৬০০০০০ প্রজাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই মর্মে লিখিত হইয়াছিল—যেন তাহারা যে কোনও প্রকারেই হউক প্রধান মন্ত্রী এবং তাহার আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিনাশ করে। এতদিন পরে রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়া জঙ্গবাহাদুর সমস্ত সৈন্তের সম্মুখে রাজাজ্ঞা পাঠ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, “তাঁহারা আত্মোপাস্ত সমস্ত ঘটনা অবগত আছেন, এখন রাজার এই আদেশ, তিনিই তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং প্রজাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহারা যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিতে পারেন।” সৈন্তগণ রাজাজ্ঞা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিল না। বরং

দুরভ্যাসকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে কুমারজ জরাজীর্ণকৃত্রিম না নেপালের রাজা হইলেন। দুরভ্যাসকে রাজা করিবার কারণ উল্লেখ করিয়া আর ৩০ জন সর্দার, কাজি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ভূতপূর্ব রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রমের নিকটে প্রেরিত হইল। পরে কীম্বদন্তীর হস্তাক্ষর অবধি র্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর আশ্রয় নষ্টের চেষ্টা পর্যন্ত রাজার সমুদয় কার্যের কথা বিবৃত ছিল। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রম নেপালে আসিতে পারিষেন না এমন কোনও কথা ছিল না, বরং তাঁহাকে তথায় রাইতে অহরোধ করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে রঘুনাথ পণ্ডিত অনেক সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া রাজেন্দ্র-বিক্রমের অন্তিমতিক্রমে অঙ্গের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিল। রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রম তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ২৩এ নবেম্বর রঘুনাথের সৈন্তের সহিত তিনি সিংগোলি হইতে আলুতে বাইরা পৌঁছিলেন। সৈন্তসংগ্রহের কথা জানিতে পারিয়া জঙ্গবাহাদুর কাশ্মীর সনকসিংকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সনকসিং ২৮এ মে তারিখে রাজিতে আলুতে পৌঁছিয়াই বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিলেন। সকলে পলায়ন করিল, রাজেন্দ্র-বিক্রম বন্দী হইয়া নেপালে আনীত হইলেন।

১৮৪৯ খৃঃ অঃ হির হইল যে মহারাণী ভারতেশ্বরীকে রাজার অভিমান জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জঙ্গবাহাদুরকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে। ১৮৫০ খৃঃ জাহুরিতে জঙ্গবাহাদুর বিলাত যাত্রা করিলেন। অঙ্গের মধ্যম ভ্রাতা জেনারেল বাম-বাহাদুর তাঁহার অস্থগতি কালে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির কার্য করিতে লাগিলেন।

১৮৫১ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি জঙ্গবাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলে রাজা এবং তাঁহার পিতা ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে ২১টা কামান শঙ্গ করিয়া জঙ্গবাহাদুর পূর্ণ দরবারে ভারতেশ্বরীপ্রেরিত সম্ভাষণপত্র পত্র পাঠ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডে নাইট্ অব্ দি গ্রাণ্ড ক্রস অব্ দি বাথ্ এবং গ্রাণ্ড কম্যান্ডার অব্ দি ষ্টার্ অব্ ইতিহাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি রাজকাৰ্য্যের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অঙ্গের বিরুদ্ধে আর একটা বড়বন্দ্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিলাতগমনহেতু অঙ্গ জাতিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া বড়বন্দ্র হয়, তাঁহার ভ্রাতা কুমার বদরীনরসিং রাণাধি, খুলতাতপুল জঙ্গবাহাদুর রাণাধি এবং রাজ-

সহোদর মহিলা সাহেব এই বড়বন্দ্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা অঙ্গের মধ্যম ভ্রাতা বামবাহাদুরের নিকট সমুদয় কথা প্রকাশ করেন। বামবাহাদুর অঙ্গের নিকটে সমস্ত খুলিয়া বলেন। বড়বন্দ্রকারীগণ স্তব্ধ হইয়া দরবারে নীত হইলে তাহাদের বিচার হইয়া দোষ সপ্রমাণ হইল। রাজা বলিলেন অস্ত্রাঙ্গ অপরাধীগণ যে শাস্তি পাইবে মহিলা সাহেবকেও সেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দরবারের সকলেরই মত হইল যে অপরাধীদের আশ্রয় হওয়া উচিত, কিন্তু কেবলমাত্র জঙ্গবাহাদুর সে মতের সমর্থন করিলেন না। তিনি বলিলেন, অপরাধীগণকে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সাহায্যে ব্রিটিশ অধিকারে কোনও স্থানে কারাবদ্ধ করা উচিত। দরবার প্রথমে সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না, অবশেষে জঙ্গবাহাদুর নানাপ্রকারে দরবারকে সম্মত করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পরে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অপরাধীদেরকে আলাহাবাদে আবদ্ধ রাখিতে সম্মত হইলেন। তাহাঙ্গিরের ভরণপোষণের ভার নেপাল-রাজ্যের উপর পড়িল।



জঙ্গবাহাদুর।

এই সমস্ত গোলমাল শেষ হইলে জঙ্গবাহাদুর নেপালের দণ্ডবিধি আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে লেটেট হইলেন। নরহত্যা ব্যতীত অপর সমস্ত অপরাধে আশ্রয়ও রহিত হইল। বিশেষ গুরুতর অপরাধ না হইলে অঙ্গের শাস্তিও বন্ধ হইল। নেপালে সতীদাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর সর্বিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেক সতীরাঁ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষপাতী। ১৮৫১ খৃঃ অঙ্গ হইতে মহারাণী ভারতেশ্বরীর আদিল উপাধি ২৩এ মে

তারিখে বঙ্গের বঙ্গের ২১টা কামান ধনির প্রথা তিনি নেপাল রাজ্যে প্রচলিত করেন। এই প্রথা সেই হইতে চলিয়া আসিতেছে। ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁহার বন্ধ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদে জঙ্গবাহাদুর ৮৩টা কামান দানিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ মহাসমারোহে জঙ্গবাহাদুরের প্রতিবৃদ্ধি রাজপ্রাসাদের সমুখস্থ খাণ্ডিখেল ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে নেপালে মহাধুম ধাম হইয়াছিল।

পরবৎসর ৮ই মে তারিখে জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত মহারাজের বড় রাণীর জ্যেষ্ঠাকন্তার বিবাহ মহাসমারোহে সমাধা হইয়া গেল। অল্পদিন পরে জঙ্গের সহিত কতেজল চৌব্বের কনিষ্ঠা স্ত্রীর বিবাহ হইল। এই বিবাহে ঠাকুর (বপ) এবং চৌদ্ধাদিগের পুনর্মিলন হয়।

তৎপরে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারিতে জঙ্গের দ্বিতীয় পুত্রের সহিত রাজার দ্বিতীয় কন্তার, এবং ২রা মে তারিখে কতেজল চৌব্বের ভ্রাতৃকন্তার সহিত জঙ্গের বিবাহ হইল। সুতরাং জঙ্গবাহাদুর কতেজঙ্গের ভগিনী এবং ভ্রাতৃপুত্রী উভয়েরই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ জুন, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত জঙ্গের জ্যেষ্ঠ কন্তার বিবাহ হইল। এইরূপে রাজপরিবার এবং চৌদ্ধা-পরিবারের সহিত বিবাহবৃত্তে বন্ধ হওয়াতে ইহাদের বহুকালব্যাপি ঘেবাদেয়ী ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ১লা আগষ্ট জঙ্গবাহাদুর হঠাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া নিজ ভ্রাতা বামবাহাদুরকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এরূপ করার কোনও কারণ জানিতে পারা যায় নাই। তিনি বলিতেন যে নিরন্তর রাজ-কার্যে লিপ্ত থাকার তৎপ্রতি বৈরাগ্যানিবন্ধন তিনি মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা সুরেন্দ্রবিক্রম জঙ্গবাহাদুরকে কাশ্মির এবং লংজ প্রদেশের রাজত্ব প্রদান করিয়া মহারাজ উপাধি দান করিলেন। উক্ত প্রদেশ মধ্যে জঙ্গবাহাদুর দণ্ডযুগের কর্তা হইলেন। স্থির হইল, প্রধান মন্ত্রিপদ তাঁহার বংশে পুরুষাবৃত্ত হইবে। তিনি নেপালের রাজা এবং রাণীর উপরেও প্রভু করিতে পারিবেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া চীনগবর্মেণ্ট কিংবা বৃটিশ গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার কোনও কার্য করিতে পারিবেন না। এই-রূপে জঙ্গবাহাদুর নেপালের সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ মে তারিখে বামবাহাদুরের মৃত্যু হয়। অল্পদিন পরে জঙ্গবাহাদুরের বিরুদ্ধে আর একটা বড়-

যয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, নেপালের স্কটল্যান্ড সেনাবাহিনীর একজন জমাদার বড়বয়ে লিপ্ত ছিল। সৈন্তগণ বড়বয়কারী উক্ত জমাদারকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিহত করিয়া ফেলিল। বামের মৃত্যুতে জঙ্গ অন্ত্যস্ত শোকার্ত হইয়াছিল, শোক কিরূপ-পরিমাণে হ্রাস হইলে তিনি রাজা এবং প্রধান প্রধান লোকদিগের অনুরোধে ২৮এ জুন তারিখে পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। বহুকাল হইতে জঙ্গ-বাহাদুরের ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজে বৃটিশদিগের সাহায্য করেন। এখন সেই সুযোগ দেখিয়া বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃটিশ গবর্মেণ্ট সাদরে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তৎমুসারে জঙ্গ-বাহাদুর সৈন্তে আসিয়া ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করেন। যাত্রার সময়ে তাঁহাকে নিহত করিবার জন্ত আর একটা বড়বয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রধান বড়বয়কারীদিগকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে অযোধ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এখানে কেবলমাত্র সিপাহিগণ নহে অধিবাসীগণ পর্যন্ত বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতি জেনরল ফ্রান্স্ বারাগনীতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে বিশ্বস্ত গোরখা সৈন্ত লইয়া জঙ্গবাহাদুর ইংরাজ-দিগের সাহায্যার্থ আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার সহিত ১০০০ সৈন্য ছিল। জঙ্গবাহাদুরের অসীম বিক্রমে সমস্ত অযোধ্যা বশীভূত হইল। তিনি গোরখপুরের বিদ্রোহী দলাধিপতি মহম্মদ হোসেনকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়া তিনি ও গোরখাগণ বৃটিশ গবর্মেণ্টের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন।

জঙ্গবাহাদুর অন্ত্যস্ত সাহসী এবং শিকারপ্রিয় ছিলেন। যেখানে অন্ত্যস্ত বিপদের সম্ভাবনা, তিনি সেরূপ অরণ্যে নির্ভরে একাকী প্রবেশ করিয়া শিকারাদ্বেষণ করিতেন এবং অতি আশ্চর্য্য কৌশলে স্বকাৰ্য্য সম্পাদন করিতেন।

জঙ্গ বাহাদুর ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। জঙ্গম (ত্রি) পুনঃ পুনর্গচ্ছতি গম-যঙ-অচ্। ১ অহাবর, বাহার গতি আছে। অক্রতের মতে জঙ্গম চারিভাগে বিভক্ত—জরায়ুজ, অণুজ, ব্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মহুয়া পত্র প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণুজ, কুমি কীট প্রভৃতি ব্বেদজ এবং ইন্দ্রগোপ, মধুক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। (সুক্রত হৃদ্য ১ অঃ) ইহার বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

জঙ্গম (অর্থ্যাৎ লিঙ্গধিকারী মানব) দাক্ষিণাত্যবাসী লিঙ্গব্রত

পুরোহিত। অপর নাম অথবা বা বীরশৈব। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রায় লক্ষাধিক জঙ্গমের বাস আছে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার উপাধি নাই, তবে যে যে গ্রাম বা নগরে বাস করে, সেই স্থানের নামানুসারে পরিচর দিয়া থাকে।

জঙ্গমেরা বলিয়া থাকে, যে এই সম্প্রদায় পূর্বে হইতেই ছিল, কিন্তু কালবশে অবনতি হইলে শৈবধর্মপ্রচারার্থ শিব নন্দীকে আদেশ করেন। নন্দী শ্রীশৈলের পশ্চিমস্থ হিন্দুলেশ্বর-পার্বতী নামক অগ্রহারে মাদিগ রায় নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও মহাশা বা মহাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হইল বাসব বা বাসবর। বাসবপুরাণে ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎপাঠে বোধ হয়, এই বাসব হইতেই জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।

জঙ্গমেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, গুরুস্থল বা বিরক্ত এবং গুরুস্থল বা গৃহস্থ। বিরক্ত জঙ্গমেরা বিবাহ করিতে পারেন না, উদাসীন, বৈরাগীদিগের ছায় সংসারে আসক্তি-পরিভ্যাগপূর্বক পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেন। ইহাদের দেখিতে অনেকটা সন্ন্যাসীদিগের ছায়। ইহারা লিঙ্গায়তদিগের উপর গুরুগিরি করিতে পান না অথবা তাঁহাদের উপর কোনরূপ ক্ষমতা চালাইতে পারেন না। শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রোপদেশ প্রদানই ইহাদের কর্তব্য কর্ম।

গুরুস্থলেরা বিবাহ করেন। অপরাপর লিঙ্গায়তদিগের উপর গুরুগিরি করিয়া থাকে বলিয়া গুরুস্থল নাম হইয়াছে। কোন বিরক্তের মৃত্যু হইলে একটি দশম বর্ষীয় বালক তাঁহার পদ অধিকার করে। গুরুস্থল শ্রেণী হইতেই একরূপ বালক গৃহীত হয়। তাহাকে চিরকোমার্য্য অবলম্বন করিতে হয়। নানাস্থানের লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও গুরুস্থলেরা বিধবাবিবাহ করিতে পারেন না, তাঁহারা কুমারীবিবাহ করিয়া থাকেন।

জঙ্গমদিগের এক একটি মঠ বা আখড়া আছে, তথায় এক একজন গুরু থাকেন, তাঁহার নাম পট্টময়। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে পট্টময় ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিরক্ত কি পট্টময়গণ কখন নিজ নিজ মঠ পরিভ্রমণ করেন না, তাঁহাদের কয়েক জন সহকারী থাকে, তাহাদের নাম চরন্তি। এই চরন্তিরাই ধর্মভীরু লিঙ্গায়তদিগের গৃহে গিয়া অর্থাদি আদায় করে ও মঠের অপরাপর সকল কর্ম নিরূহ করিয়া থাকে।

চরন্তি ব্যতীত বিরক্ত ও পট্টময়গণের আরও ১২ জন কর্মচারী থাকে, তাহারা বয়সে বড়ই হউক আর ছোটই হউক, তাহাদের নাম মরি অর্থাৎ ছোড়া। গুরুস্থলদিগের ঘর হইতে অতি শৈশবকালেই চরন্তি বা মরি নির্কীর্ণিত হয়। পট্টময়,

চরন্তি অথবা বে মরি ভবিষ্যতে পট্টময় হইবে, তাহারা বিবাহ করিতে পার না। অপর মরিরা ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে।

কাহাকে জাতিচ্যুত অথবা সমাজভুক্ত করিতে পট্টময়ের সম্পূর্ণ অধিকার। জাতিচ্যুত ব্যক্তি পট্টময়কে অধিক টাকা দিতে না পারিলে সহজে সমাজভুক্ত হইতে পারেন না। এই জন্ত লিঙ্গায়ত জঙ্গমমাত্রেই পট্টময়কে বিশেষ ভর তত্ত্ব করে, এবং ইষ্টদেব ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকে।

বিরক্তেরা আত্মীয় কুটুম্বের সহিত মিশিতে চান না, কিন্তু পট্টময়েরা মঠে জাতি কুটুম্বকে কাছে রাখিতে পারে। শুনা যায়, অনেকেই আবার সেবাদাসী রাখিয়া থাকে। বিরক্ত, পট্টময়, চরন্তি ও মরিরা প্রত্যহ একবার হইতে তিনবার পর্য্যন্ত স্নান করিয়া থাকে। সকল বড় মঠ বা আখড়া এক একজন পট্টময়ের অধীন, কিন্তু অতি অল্প ছোট মঠ চরন্তি ও মরির অধীনে দেখা যায়।

বিরক্ত ও পট্টময়েরা স্ব স্ব মঠে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পুষ্পভূষিত করিয়া লিঙ্গের পূজা করে। শিশুগণ দিনে দুই বার করিয়া তাহাদের পা ধুইয়া দেয়। প্রথম বারের পদ-ধোত জলের নাম ধুল-পাদোদক। লিঙ্গায়তদিগের নিকট এই পাদোদক অতি মহার্য্য সামগ্রী, তাহারা এই জল গঙ্গাজলের ছায় অতি পবিত্র মনে করে, এই জলে স্নান ও জল-স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়। যখন কোন ভক্ত বিরক্ত বা পট্টময়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, সে অগ্রেই তাঁহাদের পাদধোত “করুণবারি” পান করিয়া ধুয়া হয়। দর্শনকালে গুরুগণ লিঙ্গায়তদিগের মাথায় পা দিয়া আলীকাদ করিয়া থাকেন।

জঙ্গমেরা আহারে বড় পটু, কিন্তু পাককার্য্যে তেমন নহে। দুগ্ধ, দ্বত, ঘোল, অন্ন, সব, ইহাদের প্রধান খাদ্য, রসুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি খাইতেও ইহাদের আপত্তি নাই, তবে কেহ মস্ত মাংস আহার করে না। মঠে জঙ্গমদের আহারেরও একটু আদপ কারদা আছে। আহারের পূর্বে একখানি গালিচা অথবা মাদুর পাতিয়া তাহার উপর এক এক খানি “অঙ্গদি” নামে তেপায়া রাখিয়া তাহার উপর সারি সারি পিতল বা কাঁসার থালা সাজাইয়া যায়। পরে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হইলে সকলে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। আহারান্তে সকলে স্ব স্ব উত্তরীয় দিয়া সেই পাতা মুছিয়া ফেলে।

গুরুস্থল অর্থাৎ সাধারণ জঙ্গমেরা কণাভীদিগের বেশ-তুষা করে, গায়ে জামা দেয়, তাঁহাদের পরিবারেরাও জঙ্গরাখা ব্যবহার করে, কিন্তু বিরক্ত, পট্টময়, চরন্তি ও মরিরা উত্তরীয় ও লালপাগড়ী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু গায়ে জামা দেয় না।

জন্ম পুরুষমাত্রই পারে বিবৃতি, কঠে রুদ্রাক ও চোকা রূপার ডিবা এবং লিঙ্গ রাখিবার একটা গুপ্তগুপ্তগী বা গোলাকার রূপার কোটা ধারণ করে। জীলোকেরা সকল প্রকার অলঙ্কার পরে। জন্মেরা সাধারণতঃ নম্র, সংপ্রকৃতি ও আভিষেক। শাস্ত্রিস্বত্বারন, স্নানালিক, লিঙ্গোপাসনা, সাধারণ লিঙ্গারতের নিকট পূজাগ্রহণ, সাধারণকে শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান ইত্যাদি জন্মদিগের বিশেষতঃ বিরক্ত ও পটদয়দিগের উপজীবিকা। হাল-কণাড়া ভাষায় লিখিত বাসবপুরাণ ও চেনবাসবপুরাণই তাঁহাদের প্রধান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, ইহাতে জন্ম গুরু ও সাধুদিগের উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

জন্মেরা হিন্দু হইলেও বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অপরাপর দেবতার উপাসনা করে না অথবা অপর কোন ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না। উল্লী ও শ্রীশৈলই ইহাদের প্রধান পূজ্যকেন্দ্র।

চিন্তনচূর্ণে মার্গস্বামী নামে জন্মদিগের প্রধান আচার্য্য বাস করিয়া থাকেন।

অপরাপর ব্রাহ্মণের ছায় জন্মেরা সকল সংস্কার করে না। সমস্তান প্রস্তুত হইবামাত্র নাড়ীকাটা হয়, একজন জন্ম পুরোহিত আসিয়া আঁতুড়ঘরে গিয়া বসেন। তাঁহার পাদদ্ব্যেত ধূল-পাদোদক সকলের মাথায় ও গৃহচত্বরে ছড়াইয়া সকলে পরিস্কৃত হয়। তৎপরে পুরোহিতের পাদপূজা, লিঙ্গপূজা, করুণবারি পান প্রভৃতি আর্হট্টানিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে পুরোহিত একটা নব পাখাণ-লিঙ্গ লইয়া দুই এক মিনিটের জন্ত নবজাত শিশুর গলায় ঠেকাইয়া প্রস্তুতির গলায় বাঁধিয়া দেন এবং পুরোহিত এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন যেন শিশু বড় হইয়া ঐ লিঙ্গ ধারণে উপযুক্ত হয়। তৎপরে পুরোহিত আপনায় পাওনা লইয়া বিদায় হয়। পঞ্চমদিনে রাত্রিকালে অন্নাদি উৎসর্গ করিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। লিঙ্গায়তেরা বলে এ প্রথা তাহাদের ছিল না। অপর হিন্দুর অসুস্থকরণে এখন প্রচলিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ দিনে পুরোহিত আসিয়া ধূলপাদোদক ও করুণ-বারি প্রদানান্তে সন্তানের নামকরণ করেন। এই দিন সন্ধ্যাকালে পাঁচজন সধবা আসিয়া শিশুকে দোলায় স্থাপন করে। এই দিন অভ্যাগতদিগকে পাণ সূপারি দেওয়া হয়। মাসের দুই এক দিন থাকিতে আত্মীয় রমণীগণ প্রস্তুতিকে নদী বা কোন পুষ্করিণীতীরে লইয়া যায়। এখানে সিন্দূর ও হলুদ দিয়া জলদেবের পূজা করিয়া প্রস্তুতি এক কলসী জল কক্ষে লইয়া ফিরিয়া আসে। এক বর্ষ হইলে বালকের চূড়াকরণ হয়। এ সময়ে পুরোহিত আসিয়া দুইটা পাণ কাঁচির মত ভাঁজ

করিয়া বালকের চুলে ঠেকায়, তৎপরে নাপিত আসিয়া মুড়াইয়া দেয়, ইহাকে জন্মেরা সন্নি-কজ্জি-লোণা বলে। বালকের যে কোন অযুগ্ম বর্ষে চূড়াকরণ হইতে পারে, কিন্তু কছার পাঁচ বর্ষের পর চূড়াকরণ হয় না। কোন কোন জন্ম বলেন যে, পাঁচবর্ষে কছার চুল বড় হইলে কাটরা দিতে হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ঋতুকালে ঐ চুল ঠেকিলে নবজাত শিশুর কোন পীড়া হইতে পারে। দশমবর্ষে জন্মবালকের উপনয়ন হইয়া থাকে।

বর ও কছাপক্ষের এক গোত্র অথবা এক গুরু হইলে বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের সময় আচার্য্য আসিয়া বরকছার কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখে। কোষ্ঠী মিলিলে শুভদিনে পুরোহিত, আত্মীয় কুটুম্ব ও পাঁচজন সধবা জীলোকের সম্মুখে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। পাণ-বিতরণ ও বরণক্ষীরদিগকে ভোজ দেওয়া হয়। বিবাহের পূর্বদিনে কছাকর্তা বরের বাড়ীতে দুই খণ্ড জামার কাপড়, ৫টা পাণ, ৫টা সূপারি, ৫ সের চাউল, ৫টা নেবু, ৫ খানি হলুদ ও ৫টা চাপ গুড় পাঠাইয়া দেন ও তাঁহার গৃহে আসিয়া কছার পাণগ্রহণ করিবার জন্ত লিখিয়া পাঠান।

বিবাহের সময় ইহাদের মধ্যে হলুদের ছড়াছড়ি থুব বেশী। বরের বাড়ী অপর গ্রামে হইলে, বরযাত্রীগণ কছার গ্রামে আসিয়া পৌছিলে কছাপক্ষীয়গণ মহা সমারোহ করিয়া কিছুদূর পথ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসে। বরযাত্র-দিগের থাকিবার জন্ত একটা ডাল ঘর ঠিক করা থাকে। এখানে বর আসিয়া উপস্থিত হইলে কছাপক্ষীয়েরা পাঁচটা মঙ্গলীভাঁড় পূজা করিয়া বর যে বাড়ীতে উপস্থিত হয়, কছাকে তথায় লইয়া আসে। বর কছা উভরে একখানি চৌকির উপর বসিতে পায়, পাঁচজন সধবা উভয়কে উত্তমরূপে তৈলহরিদ্রা লেপন করে। পরে তাহাদের চারিদিকে এলম্বুতা ঘেরিয়া দেয়। তার পর বর ও কছা উভয়ে কছার বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে পুরোহিতের পদদ্ব্যেত করুণ-বারি পান করে। পরদিন বরকছা উভয়ে আবার রীতিমত হলুদ মাখে ও করুণ-বারি পান করে। পরে নব দম্পতি বরের বাড়ীতে আগমন করে। এই সঙ্গে কছাকর্তা পাণ সূপারি ও কাপড়াদি পাঠাইয়া দেন। এ সময়ে বর ও কছার উভয়ের বাড়ীতেই লিঙ্গপূজা ও লিঙ্গায়ত-মন্দিরে মাটির দীপ দিয়া “গুগল” নামক উৎসব করে। পরদিন সধবারা বরকছাকে আবার তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া থাকে। কছাপক্ষীয়গণ বরের বাড়ীতে গিয়া পঞ্চম আহার করে, বরকেও তাহার কিছু কিছু খাইতে

হয়। এই দিন কস্তার পিতা একখানি খালের উপর বরের পা খুইয়া দেন ও পিতামাতা উভয়েই সেই জলে ফল ও সিন্দূর নিক্ষেপ করেন। বর এইবার জন্মের পোষাক পরিয়া কপালে বিভূতি মাখিয়া বৃষতে চড়িয়া মন্দিরে গিয়া পূজা করে, তৎপরে বিবাহ করিবার মন্ত্র ঋতুয়ালয়ে উপস্থিত হয়। ঋতুয়ালয়ে আসিবামাত্র তাহাকে উত্তম বিছানায় বসাইয়া বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করে, তাহার হাতে পায়ে ও গালে হলুদ মাখাইয়া দেয়। পরে অস্তঃপুরে আনা হয়। এখানে গোময়ধোত স্থানে বিচালি বিছাইয়া তাহার উপর গালিচা পাতিয়া রাখে, বর কস্তা তাহাতেই উপবেশন করে। কস্তার সখী স্বরূপ ছইটী কুমারী তাহার পার্শ্বে বসে। তাহাদের সম্মুখে পাঁচটী কলস ও পাঁচ খেই হুতা দিয়া তাহাদের চারিদিকে ঘেরিয়া রাখে ও তাহারই খানিকটা পুরোহিত ও কস্তার হাতে জড়ান থাকে।

পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে, কস্তা বরের ডানহাত ধরিয়া থাকে। মঠপতি খানিক পঞ্চগব্য বরের ডান হাতে ঢালিয়া দেয়, কস্তা তাহা স্পর্শ করে। এই সময় উভয়ে পাঁচবার হাত খুইয়া লয়। পাঁচজন সখবা আলো লইয়া বরণ করে। পুরোহিত ও উপস্থিত সকলে ধান দিয়া বরকস্তাকে আশীর্বাদ করে। তখন পুরোহিত ধান সিন্দূর ও ফুল দিয়া মঙ্গলমন্ত্রের পূজা করিয়া পাঁচজন সখবার হাতে দেন, তাহারা ঐ হুতা কস্তার গলায় বাঁধিয়া দেয়। এই সময় পুরোহিত পুরোহিতের হাতের হুতা খুলিয়া তাহাতে তেল হলুদ মাখাইয়া বরের ডান হাতের কবজীতে বাঁধিয়া দেয়, এই হুতাকে তাহারা গুরুকঙ্কণ বলে। এই সময় পাঁচজন সখবা কস্তার হাতেও ঐরূপ হুতা বাঁধিয়া দেয়, তাহার নাম বধুকঙ্কণ। নবদম্পতি উপস্থিত গুরুজনকে নমস্কার করে, তারপর আত্মীয় কুটুম্ব সকলের ভোজ হয়। বর কস্তা এক পাতেই আহার করে। এই হইলেই বিবাহের কাজ শেষ হয়। পর দিন বরকস্তা ফুলচন্দন দিয়া পুরোহিতের পা পূজা করিয়া তাহার করুণবারি পান করে। মধ্যাহ্নভোজনের পর নরনারী সকলে মহাসমারোহে নাচ গান করিতে করিতে বড় রাস্তা দিয়া লিঙ্গমন্দিরে যায়। বর কস্তা এখানে লিঙ্গের পূজা করিয়া আবার পূর্ববৎ জাঁকজমকে বরের গৃহে আসে। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বরের ভগিনী, ভগিনী যদি না থাকে, তবে অপর কোন বালিকা দ্বার আটকাইয়া পাড়ায়, আর বলে যে “তোমাদের মেয়ে হইলে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে বল, তবে ছাড়িয়া দিব।” বরকস্তা স্বীকার করিলে পথ ছাড়িয়া দেয়। এ দিকে অস্তঃপুরে বরের মাতা বাঁড়ের জিনের উপর কোল পাতিয়া বসিয়া থাকেন, বর মাতার ডান কোলে ও কস্তা বাম কোলে আসিয়া বসে।

বসিরাই আবার উভয়ে কোল পরিবর্তন করে। তখন পাঁচজন সখবা মাঝারি জিজ্ঞাসা করেন, “হুতা ফুলের মধ্যে কোনটী ভারী।” মাঝা উত্তর করেন, আমার হুতা ফুলই সমান, আমি চিরদিন সমান ভাবে হুতাকে বহু করিব।

তৎপরে বরকস্তা কলাতলায় আনীত হয়, এখানে নাপিত উভয়ের হাতে পায়ে হলুদ মাখাইয়া দেয়, পাঁচজন সখবা বরণ করিয়া উভয়কে স্নান করাইয়া দেন। বরকস্তার ভিজা কাপড় নাপিত পায়। তৎপরে আত্মীয় স্বজনদের ভোজ দিয়া বিবাহ উৎসব শেষ হয়।

কস্তা বার তের বৎসর পর্যন্ত শিখালয়ে থাকে, তৎপরে বরের আত্মীয় স্বজন কস্তার বাটীতে আসিয়া খুব ধুমধাম করিয়া কস্তাকে বরের বাড়ীতে লইয়া আসে। এই সময় ভোজ ও বরকস্তাকে বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয়। তৎপরে কস্তা ঋতুমতী না হইলেও উভয়কে এক ঘরে একত্র শয়ন করিতে দেয়। কস্তা ঋতুমতী হইলে এদেশের মত জঙ্গমেরাও তাহাকে তিন দিন তীর-ঘরে রাখে, সে তিন দিন কোন পুরুষ-মুখ দেখিতে পায় না। চতুর্থ দিবসে কেবল তাহাকে স্নান করাইয়া দেয়, আর কোন উৎসব হয় না। অল্প সময়ে ঋতুমতী হইলে জঙ্গমেরা তিন দিন অশুচি মনে করে না বটে, কিন্তু দেবালয় বা রন্ধনশালায় তাহাকে যাইতে দেয় না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মঠপতি বা পুরোহিত আসিয়া ধূলপাদোদক ও করুণবারি পান করিতে দেন, পরে তিনি মুমূর্ষুর সর্কাজে বিভূতি বা গোময় লেপন করিয়া কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দেন। মুমূর্ষু ও পুরোহিতকে পাণ সূপারি, এক তাল বিভূতি ও কিছু অর্থ দিয়া প্রণাম করে। মৃত্যু হইলে আবার পুরোহিত আসিয়া পদধূলি দেন। মৃত ব্যক্তি বিবাহিত বা পুরোহিত হইলে মঠপতি তাহাকে বসাইয়া বিভূতি মাখাইয়া নানা অলঙ্কার পরাইয়া দেয়। তৎপরে বাহির করিয়া আনিয়া রথাক্রতিদোলায় স্থাপন করে, তৎপরে চারিজন লিঙ্গায়ত সেই দোলা কাঁধে করিয়া স্রশানে উপস্থিত হয়। এখানে মৃতের আত্মীয়েরা সেই অলঙ্কার ভাগ করিয়া লয়। জোষ্ঠ পুত্র মাথার পরিচ্ছাদি পায়। পরে মৃত ব্যক্তিকে বসাইয়া একটী থলির মধ্যে পুরিয়া তাহার কণ্ঠস্থ লিঙ্গসহ মাটির মধ্যে পুতিয়া ফেলে। সমাধি-ধনককে পুরোহিত একুণ্ঠী পয়সা প্রদান করেন। সেই পয়সার উপর পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র লিখিয়া দেন। ধনক সেই পয়সা লইয়া কবরের মধ্যে গিয়া মৃত দেহের নানাস্থানে রাখিয়া দেয়। তৎপরে সেই কবরস্থ শবের উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া উপস্থিত সকলে মন্ত্রপাঠপূর্বক

ফুল ও বিষপত্র নিক্ষেপ করে। খনক সেইগুলি ফুড়াইয়া শবের উপর একত্র করে, তখন-মৃতের আত্মীয়েরা এক এক মুঠা মাটি লইয়া শবের উপর ফেলিয়া দেয়। পরে মাটি চাপা দিয়া কবরের মুখ বন্ধ করা হয়। তৎপরে পুরোহিতের পারের নিকট একটি নারিকেল ভাঙা হয় ও সকলে তাঁহার পায়ে ফুল ও সিন্দূর অর্পণ করে। তারপর সকলে ঘরে ফিরিয়া আসে। ঘরে আসিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ধূলপানোদক লইয়া গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। তাহাতেই সব শুদ্ধ হয়। মাসান্তে পুরোহিতদিগকে ভোজ দেওয়া হয়। বালক ও অবিবাহিতকে লম্বালম্বীভাবে শোয়াইয়া পুতিয়া ফেলে।

জঙ্গম ও তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্য লইয়া এক একটা সমাজ আছে, প্রত্যেক সমাজেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার এক এক জন মঠাধিকারী আছে। কেহ কেহ আবার সমাজ-ভুক্ত নয়। ইহাদের মধ্যে তেমন জাতিবিচার নাই। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

জঙ্গমকুটী (জী) জঙ্গমা কুটীব। ছত্র, ছাতি। (ত্রিকাণ্ড) জঙ্গমগুপ্ত (পুং) জঙ্গমশাস্ত্রো গুপ্তাশ্চেতি কর্মধা। পদাতি সৈন্ত। জঙ্গমবিষ (জী) জঙ্গমশ্র বিষং ৬তং। জঙ্গম হইতে প্রাপ্ত বিষ, জঙ্গম সম্বন্ধীয় বিষ। প্রাচীন পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে বিষ তিন ভাগে বিভক্ত—স্বাভাব, জঙ্গম ও কৃত্রিম। [স্বাভাব ও কৃত্রিম বিষের বিবরণ বিষ শব্দে দ্রষ্টব্য।] জঙ্গম বা প্রাণী শরীরে যে বিষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জঙ্গম বিষ। ইহার আধার ষোলটা। ১ দৃষ্টি, ২ নিখাস, ৩ দংষ্ট্রা, ৪ নখ, ৫ মূত্র, ৬ পুরীষ, ৭ শুক্র, ৮ লালা, ৯ আর্ন্তব, ১০ আল, ১১ মুখসন্দংশ, ১২ অস্থি, ১৩ পিত্ত, ১৪ বিশুদ্ধিত (?) ১৫ শূক ও ১৬ মৃত দেহ। দিব্য সর্পের দৃষ্টি ও নিখাসে বিষ, পৃথিবীস্থ সর্পের দংশনে বিষ; মার্জার, কুকুর, বানর, মকর, ভেক, পাকমৎস্ত, গোধা, শঙ্কু, প্রচলাক, গৃহগোদিকা ও অস্থান্য চতুষ্পদী কীটদিগের দংষ্ট্রায় ও নখে বিষ; চিপটি, পিচ্চ-টক, কাষায়বাসিক, সর্বপবাসিক, তোটকবর্ষ, এবং কীট-কোণ্ডিল্যক ইহাদিগের বিষ্ঠায় ও মূত্রে বিষ। মুষিকের শুক্রে বিষ। লুতা বা মাকড়সার লালা, মূত্র, পুরীষ, মুখসন্দংশ, নখ, শুক্র, আর্ন্তব এই সকল বিষাক্ত। বৃশ্চিক, বিখন্ডর, রাজীব মৎস্ত, উচ্চিটিক এবং সমুদ্রবৃশ্চিক ইহাদিগের আল (হলে) বিষ। চিত্রশির, সরাবকুর্দি, শতদাক্ক, অরিমেদক ও শারিকামুখ ইহাদের মূত্র ও পুরীষ বিষাক্ত। বিষহত প্রাণীর অস্থি, সর্পকণ্টক ও বরটামৎস্তের অস্থি এই গুলি অস্থিবিষ।

শকুলীমৎস্ত, রক্তবাজী ও চরকীমৎস্ত ইহাদিগের পিত্তে বিষ; দ্বন্দ্বকুণ্ড, উচ্চিটিক, বরটী, শতপদী, শূক, বলভিক,

শুকী ও ভ্রমর, ইহাদিগের গুর্মাতে ও মুখে বিষ।

(জুক্তত কন্ ৩ অঃ)

জঙ্গমত্ব (জী) জঙ্গমত্ব ভাবঃ জঙ্গম-ত্ব। জঙ্গমের ধর্ম, জঙ্গমের ভাব। “তথা দেবী জঙ্গমত্বাধিষ্ঠা।” (ভারত ১৪।২১ অঃ) জঙ্গল (ত্রি) গল-যঙ-অচ্ নিপাতনে সাধু। ১ জলশূন্য, নির্জল। (হেম ৪।১২) ২ নির্জন। (শকার্থচি) (পুং জী) ৩ মাংস। (মেদিনী) জঙ্গলী (দেশজ) ১ বনবাসী, বস্ত্র। ২ অসভ্য। জঙ্গলীকাপাস (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। (Hibiscus vitifolius)

জঙ্গলীখেজুর (দেশজ) এক প্রকার খেজুর।

জঙ্গলীজয়গড়, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলায় সহ্যাদ্রি-মালা ৬০ মাইল বিস্তৃত, এই ৬০ মাইলের মধ্যে পর্বতের উপর ৫টা পার্শ্বত্যদ্বর্গ আছে। উত্তরদিকে প্রতাপগড়, ইহার ৭ মাইল দক্ষিণে মার্কণ্ডগড়, ইহার ১০ মাইল দক্ষিণে জঙ্গলীজয়গড়। [সাতারা দেখ।]

জঙ্গলীনারঙ্গা (দেশজ) এক রকম বৃক্ষ।

জঙ্গলী বকরী (দেশজ) এক রকম হরিণ।

জঙ্গলরশ্ম (দেশজ) এক রকম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জঙ্গাল (পুং) জঙ্গল-প্ৰবোধদাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাদ, জাফাল। (জটধর) পর্যায়—আলি, পঙ্কর, সেতু, সঙ্কর।

জঙ্গিড় (পুং) মণিবিশেষ, ইহাতে রাক্ষস প্রভৃতির ভয় নিবারণ করে। “দেবৈর্দত্তেন মণিনা জঙ্গিড়েন ময়োভূবা।” (অথর্ব) জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার একটি উপবিভাগ। এখানকার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। এখানে রথুনাত-গঞ্জ, মির্জাপুর, দেওয়ানসরাই, স্মৃতি, শমসেরগঞ্জ এই ৫টা থানা আছে। একটি দেওয়ানী ও একটি কোজদারী আদালত আছে।

এখানকার সদরের নামও জঙ্গীপুর। জঙ্গীপুর ‘জাহাঙ্গীরপুরের’ অপভ্রংশ। প্রবাদ আছে এই সহর মোগলসত্রাটু জাহাঙ্গীরের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহরটা ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে ২৪° ২৮' উত্তর অক্ষা° ও ৮৮° ৬' ৪৫" পূর্বদ্রাঘিমায় অবস্থিত। স্মৃতির ছাপঘাটীর মোহানায় যেখানে গঙ্গা হইতে ভাগীরথী নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহারই ২১ মাইল দক্ষিণে এই সহর অবস্থিত। এই সহরের অপর পারে বাঁশলেই ও পাগলা নদী একত্র আসিয়া ভাগীরথীতে মিলিয়াছে, ইহারই নিকটে গড়ে সহরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী ও সরফরাজ খাঁর যুদ্ধ ঘটে ও ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের সহিত ইংরাজের শেষ যুদ্ধ হয়।

জঙ্গীরা, রাজমহল ও মুন্সেরের মধ্যবর্তী একটি পাহাড়।

বহুকাল হইতে ইহা একটি গঙ্গাভীরব পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য।
এখানে নারায়ণমন্দিরে যাত্রী-সমাগম হয়।

জজুল (ক্ৰী) গম-যজ্ঞ-লুক বাহুলকাৎ জুল। বিব। (ত্রিকাণ্ড)
জজ (পুং) প্রশস্তা জজা বিভক্তেহস্ত জজা-অচ্। রামায়ণ-

প্রসিদ্ধ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৬।৬৯।১২)

জজা (ক্ৰী) জংঘতে কুটিলং গচ্ছতি হন-যজ্ঞ-লুক-অচ্ পুৰো-
দরাদি ততঃপাশ্চ। ১ ওলুফের উর্ধ্ব ও জাহ্নব অধোভাগ,
শূলক অবধি জাহ্নব পর্য্যন্ত ঠাং। পর্য্যায়—টকা, টক, টকিকা।

“শক্রনিমজ্জতা গ্রাহো জজায়াঃ প্রশতিয্যতা।” (ভা° ৫।১৩০।১২)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইহাতে চারিখানি অস্থি আছে। “চত্বার্বা-
রত্নিকাস্থানি জজ্যয়ো স্তাবদেব চ।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

জজাকর (ত্রি) জজাঃ তৎসাধ্যগতিং করোতি জজা-কৃ-ট
(পা ৩।২।২১) যে ব্যক্তি অতিশয় দ্রুতবেগে গমন করে, ধাবক।

জজাকরিক (ত্রি) কৃ-অপ্ করো বিক্ষেপঃ জজায়াঃ করো
হস্তাশ্চ জজাকর-ঠন্ (অত ইনিঠনো)। পা ৫।২।১১৫ জজা
চালনা করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে; ধাবক।
পর্য্যায়—ধাবক, ডাকচক্রী।

জজাত্রাণ (ক্ৰী) ত্রায়তে হনেন ত্রা-ল্যট্ জজাত্রাণং ৩তৎ।
জজাসমাহ, জজার আবরণ, পেটুলন।

জজাপ্রহত (ত্রি) জজা তদ্গতিঃ প্রহতা অশ্ব বহত্ৰী। নিষ্ঠান্ত্বাৎ
পরনিপাতঃ। মন্দগামী। এই শব্দটি অক্ষদ্ব্যতাদি গণাস্তর্গত।

জজাপ্রহত (ত্রি) জজা প্রহতা অশ্ব বহত্ৰী। যাহাকে জজা
দেশে প্রহার করা হইয়াছে। এই শব্দটি পাণিনীয় অক্ষদ্ব্য-
তাদি গণাস্তর্গত।

জজাবক্ষু (পুং) ঋষিবেশব।

“জজাবক্ষুচৈরৈত্যচ্ কোপবেগস্তথাভূগঃ।” (ভারত ২।৪ অঃ)

জজারথ (পুং) জজা রথইব গমনসাধনং যস্ত বহত্ৰী। ১ ঋষি-
বেশব। এই শব্দটি পাণিনীয় যস্মাদিগণাস্তর্গত। (বহ)
জজারথস্ত গোত্রাপত্যানি জজারথ-ইজ্ বহত্বে যস্মাদিভ্যাৎ
তস্ত লুক্। ২ জজারথ নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

জজারি (পুং) বিষ্ণুমিত্রের এক পুত্র।

“মার্মগর্বি হিরণ্যাক্ষো জজারির্বাভ্রবায়ণিঃ।” (ভা° ১৩।৪ অঃ)

জজাল (ত্রি) জজা বেগবতী অন্ত্যস্ত জজা-লচ্ (সিদ্ধাদি-
ভ্যচ্। পা ৫।২।১৭) ১ ধাবক, জজাচালনা দ্বারা যাহার উপ-
জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে। (পুং ক্ৰী) ২ পশুবেশব।
ভাবপ্রকাশের মতে—হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পুংস, কুহু,
শবর, রাজীব ও সুভী প্রভৃতিকে জজাল বলে। তাত্রবর্ণ
যুগ হরিণ, ককবর্ণ এণ, ককসারাকৃতি জেং তাত্রবর্ণ বৃহৎ
যুগ কুরঙ্গ, নীলবর্ণ ঋষ্য, হরিণ অণেকা কিঞ্চিৎ ছোট পরীর

চক্রবিন্দুযুক্ত যুগ পুংস, অধিক শূলযুক্ত যুগ কুহু, বৃহৎকায়
যুগ শবর এবং বে যুগের-সর্বকাল রেখাযুক্ত বেহিত তাহাকে
রাজীব ও যাহার শূল নাই তাহাকে সুভী বলে। এক যুগ
জাতির অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। ইহাদের মাংসের
ভোগ পিত্ত ও কফনাশক, কিঞ্চিৎ পরিমাণে বায়ু প্রকোপকারী,
লঘু ও বলকারক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব ২ ভাগ)

জজাশূল (ক্ৰী) জজায়াঃ শূলমিব। শূলরোগবিশেষ, ইহাতে
জজার ব্যথা হইয়া থাকে।

হরিতকী, আর্দ্রক, দেবদারু, চন্দন এবং অপামার্গের মূল
হাগহুত্রে সিদ্ধ করিয়া বথানিরমে সেবন করিলে, সপ্তরাত্র
মধ্যে জজাশূল ও জজার বেদনা নিবারিত হয়।

“জজাশূলমুদ্রস্তম্ভং সপ্তরাত্রেষু নাশয়েৎ।”

(গরুড়পু ১৮৭ অঃ)

জজিল (ত্রি) প্রশস্তা অতিশয়েন বেগবতী জজাঃস্ত্যস্ত জজা-
ইলচ্। অতিশয় দ্রুতগামী ধাবক।

জজিয়া (দেশজ) জাতিয়া, ছোট ইজার।

জজীর (দেশজ) জলচর পক্ষীবেশব।

জজ্ (ইংরাজী) বিচারক, উচ্চ আদালতের বিচারকর্তা।
এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতেই এখনকার মত
জজ নিয়োগপ্রথা চলিয়া আসিতেছে; ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ২২এ
অক্টোবর সর্বপ্রথমে বড় আদালতে জজ আসিয়া নামেন।
[বিচার ও বিচারক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জজ (পুং) জজতি বৃদ্ধাতে জজ-অচ্। বোকা।

জজহারসিং বুন্দেলা, রাজা নরসিং দেব বুন্দেলার পুত্র।
নরসিং দেব সম্রাট জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন,
তাহার সাহায্যে প্রভূত ধন সম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন।
১৬২৭ খৃঃ অব্দে নরসিং দেবের মৃত্যুর পরে জজহার পিতৃ-
সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে শাহ-
জহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোধন করিলেন, এই সময়ে
জজহারসিং বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট বিদ্রোহ দমন নিমিত্ত
মহাবৎ খাঁ খানুখানান্কে পাঠাইলেন। জজহার উপরাস্ত্র না
দেখিয়া বশতাস্বীকার করিলেন, সম্রাট তাহার অপরাধ
মার্জনা করিয়া তাহাকে মহাবতখাঁ ও খানুখানানের সহিত
দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন।

১৬৩০ খৃঃ জজহারের পুত্র বিক্রমজিৎ খাঁ জাহান নামক
জৈনক রাজবিদ্রোহীকে নিজ অধিকারের মধ্য দিয়া পরাভব
করিতে অসম্মতি দিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট জজহারের প্রতি
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহা শুনিয়া বিক্রমজিৎ খাঁ জাহা-
নের অহসরণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং দিল্লী

খাঁ নামক তাঁহার সেনাপতির মন্তকচ্ছেদনপূর্বক সম্রাট
সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট-সাতিশর সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রম-
জিৎকে ‘জগরাজ’ উপাধি প্রদান করিলেন। ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে
অবকাশ লইয়া জজহার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বাটতে
পৌছিয়াই তিনি পড়ার জমিদার ভীমনারায়ণকে আক্রমণ
করিলেন। ভীমনারায়ণ বাধ্য হইয়া সন্ধি করিল। কিন্তু
সন্ধির নিয়মভঙ্গ হওয়াতে জজহার ভীমনারায়ণ ও তাহার
অনেকগুলি অশুচরের প্রাণ বিনাশ করিলেন। বাদশাহ তাহা
তিনিরা ক্রুদ্ধ হইয়া জজহারকে সমুদয় সম্পত্তি ত্যাগ এবং দশ
লক্ষ টাকা রাজসরকারে প্রেরণ করিতে হুকুম দিয়া তাঁহার
নিকটে একখানি করমাণ পাঠাইয়া দিলেন। জজহার
সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। ২০০০০ সৈন্য লইয়া
অরুণজীব জজহারের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। জজহারও
সৈন্যসংগ্রহ করিয়া উত্তরে দূর্গে আশ্রয় লইলেন। প্রত্যহ
অখারোহীদিগের সহিত কাটাকাটি চলিতে লাগিল।
অবশেষে ভীত হইয়া জজহার প্রথমে ধামুনি, তৎপরে তথা
হইতে সপরিবারে চৌরাগড়ে পলাইয়া গেলেন। অব-
শেষে দাক্ষিণাত্যের পথে সপরিবারে পলাইবার সময় সম্রাট-
সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আপন পুরমহিলা-
গণের সম্মানরক্ষার্থে ব্রহ্মতে সকলকে বিনাশ করিলেন।
বিক্রমজিৎ বিপক্ষেয় সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত
হইয়া পলায়ন করিতে হইল। দুর্গাবাহন, উদাহন, শ্রাম,
দেব প্রভৃতি জজহারের পুত্রগণ এবং বিক্রমজিতের পুত্র
দুর্জনসাল বন্দী হইলেন। পথে জজহার এবং বিক্রমজিৎ অধি-
বাসীগণের হাতে নিহত হইলেন।

জজহার খাঁ হাবসী, গুজরাটের একজন প্রধান আমীর।
ইহার পৈতৃক বাসস্থান আবিসিনিয়াতে ছিল। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে
ইনি গুজরাটের শাসনকর্তা চেঙ্গিজখাঁকে বিনাশ করেন।
তিন বৎসর পরে অকবর বাদশাহ সুরাট জয় করিলে চেঙ্গিজ-
খাঁর মাতা পুত্রের নিধনবার্তা জানাইয়া সম্রাটের নিকটে
বিচারপ্রার্থনা করেন, বিচারে জজহারের অপরাধ সপ্র-
মাণ হইল। সম্রাট হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার
প্রাণকণ্ড করিলেন।

জজহোতি, (জিজহোতি) ১ কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের একটা
শ্রেণী। শব্দটা “জজহোতা” শব্দের অপভ্রংশ। পূর্বে যজু-
র্বেদের বিধান অনুসারে ইহারা হোম করিতেন বলিয়া এই
নাম হইয়াছে। রণরোল্লের চোবে, দৌড়িয়ার দোবে এবং
হামিরপুর ও কড়িয়ার মিশ্রণ জজহোতিবংশসম্বৃত।

২ বুদ্ধলখণ্ডের প্রাচীন নাম।

৩ প্রাচীন চম্বল প্রদেশের একশ্রেণীর বণিক।

জজিয়তী, ১ জজ সম্বন্ধীয়। ২ জজের কর্ম, জজের পদ।
জজু, উত্তর নদীতীরস্থ একটা গ্রাম। খেরাপড় হইতে ৮
মাইল পূর্বে অবস্থিত। গোমাল্লিরের পুরাতন রাজপুত্র ইহার
নিকট দিয়া গিয়াছে। এই গ্রামে একটা সুবৃহৎ সন্ন্যাসী এবং
একটা মসজিদ আছে। মসজিদটা দেখিতে অতি সুন্দর
এবং লালবর্ণ বালুপাথরে নির্মিত, এখানে অনেক তর-
মন্দির ও প্রতিমূর্তি দৃষ্টে বোধ হয় যে পূর্বে এখানে হিন্দু-
দিগের আধিপত্য ছিল।

জজু (পুং) রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত এক ব্যক্তি, মহারাজ জয়সীংয়ের
শ্রালক। জয়সীং যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ
করিলে জজু তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। জয়সীং
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নিজ দেশে প্রত্যাগত হইলে জজু তাঁহার
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। পুরুলেয় গ্রামে উভয়ের
ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। একদিন শ্রীদেব নামে এক গ্রাম-
চণ্ডাল হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জজের প্রাণ সংহার
করে। কান্দীরবাসী প্রজাবৃন্দ জজের রাজ্যশাসনে দুঃখিত
ছিল। (রাজতরঙ্গিণী ৪১১০-৮০)

জজু, মথুরার রাজা বিজয়পালের (কিংবা অজয়পালের) অধীন
একজন ক্ষত্রিয় সামন্তরাজ। ইহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম
সিংহরাজ এবং প্রপিতামহের নাম তেজরাজ। ইনি ঋষিক
রাজ-দ্রুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার চারি পুত্র জন্মে,
সর্ব কনিষ্ঠের নাম আশিক। ১২০৭ সংবৎ-চিহ্নিত কেশব-
শৈলের শিলালিপিতে ইহার কথা আছে। তদ্বারা জানা যায়,
জজু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।
জজু একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং একটা প্রকাণ্ড
বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

জজুক, তোমরবংশীয় একজন রাজা, পৃথ্বীকর্তীরে ত্রিমূর্তি-
লব্ধি বিষ্ণুমন্দিরে একখানি শিলালিপিতে ইহাদের বংশা-
বলীর উল্লেখ আছে। ইনি বজ্রটের পুত্র এবং জোলের পৌত্র,
চন্দ্রা এবং নারিকার নারী ইহার দুই স্ত্রী। চন্দ্রার গর্ভে
গগ্গা এবং নারিকার গর্ভে পূর্ণরাজ ও দেবরাজ এই তিন
পুত্র জন্মে। তাঁহারাই উপরি উক্ত মন্দির নির্মাণ করেন।

জজুবজ্জ (গ্রাম্য) যথেষ্ট, প্রচুর।

জজি (জি) জা কিম্ব দ্বিৎ যবা জন-কিন্ দ্বিৎ। ১ জাত।

২ জাত। “জজিবীজ বর্ষাপর্য্যন্তঃ” (কৃষ্ণবজ্জ: ৭৫২০।১)

জজ্বতী (স্ত্রী) [বৈ] শব্দবিশিষ্ট জল।

“অহেনা অহ বিছাতো মরুতো জজ্বতীরিবা।” (খণ্ড ৫।৫২।৩)

‘জজ্বতীরাপো ভবন্তি শব্দকারিণ্যঃ’ (নিকজ ৬।১৬)

জঙ্গ (ত্রি) জঙ্গি-অহ্। ১ বোকা। জঙ্গি ভাবে ঘঞ্। ২ বৃদ্ধ।

এই শব্দটা পাণিনীর উচ্ছাদি গণান্তর্গত। [উচ্ছাদি দেখ।]

জঙ্গপাতবৎ (ত্রি) জঙ্গপা-তৃ-শত্। বাহ্য অনিভেছে।

“জিহ্বাভিরহ নননদর্চির্বাং জঙ্গপাতবন্।” (শব্দ ৮।৪৩৮)

‘জঙ্গপাতবন্ জলন্। জঙ্গপাতবন্ ময়লাভবরিত্তি জলতি কর্শস্থ পাঠাৎ।’ (সারণ।)

জঙ্গম (ত্রি) জন-ঘণ্ লুক্ অচ্ প্ৰবোধরাদিভ্যাং সাধুঃ। বাহ্য বার বার উৎপন্ন হয়।

জঙ্গপুক (ত্রি) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা অপতি জপ-ঘণ্ উক্।
১ অতিশয় জপশীল। ২ (পুং) তপস্বী।

জঞ্জাল (দেশজ) ১ আবর্জনা, ওচলা। ২ উৎপাত, ঝড়।

জঞ্জালিয়া (দেশজ) ১ আবর্জনাকারী। ২ উৎপাতকারী।

জঞ্জিরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোঙ্কণ অঞ্চলে একটি রাজ্য। দেবিতে একটি দ্বীপাকার। ইহার অক্ষা° ১৮° হইতে ১৮° ৩১' উঃ এবং দ্রাঘি ৭২° ৫৩' হইতে ৭২° ১৭' পূঃ। ইহার উত্তরে কোলাবার অন্তর্গত কুণ্ডলিকা অথবা রোহা নামক খাড়া, পূর্বদিকে রোহা ও লহাড় উপবিভাগ, দক্ষিণে বাণকোট উপসাগর এবং পশ্চিমে আক্কেবসাগর। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শী, বেগী ইত্যাদি এবং অন্যান্য নানাদর্শাবলম্বী লোক বাস করে।

১৪৮৯ খৃঃ অব্দে আক্কেদনগরের নিজামশাহী রাজসরকারের একজন হাবসি সৈনিক পুরুষ, বণিকবেশে জঞ্জিরাতে উপস্থিত হন। তিনি তথাকার অধিপতির অসুস্থতাক্রমে ৩০০টা বাজলইরা নামিলেন, প্রত্যেক বাজের মধ্যে এক এক জন সৈন্য ছিল। রজনীযোগে তাহার বাহির হইয়া জঞ্জিরা দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। সেই হইতে জঞ্জিরা মুসলমান-নিগের অধীন হয়। এখানকার অধিপতিকে নবাব বলে। ইহার সিঁদি অর্থাৎ হাবসি সুলতানের মুসলমান।

এই দ্বীপ অবশেষে বিজাপুররাজের অধিকারভুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রদলপতি শিবজি অনেক বার এই দ্বীপ আক্রমণ করেন, পরে শঙ্কুজিও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত জঞ্জিরাধিপতি স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। কিন্তু তৎপরে রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খল ঘটে, সেই জন্ত ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ইহার শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। এখন কোঙ্কণের পলটিকাল এজেন্ট এখানকার রাজকার্য্য পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এখানকার নবাবের সম্মানার্থ গবর্নেন্ট হইতে ৯টী তোপ হয়।

জঞ্জীর্ (পারসী) জঞ্জির, শৃঙ্খল, বেড়ী।

জঙ্গুহির, আকগান জাতিবিশেষ। মুসলমান ইতিহাসবেত্তা

কিরিতার বতে ইহার পজাব অঞ্চলে সিদ্ধনাগর-নোরাবের অন্তর্গত মথিরালা নামক পর্য্যন্ত প্রদেশে বাস করিত। কোনও এক সময়ে ইহার সেখানকার রাজা কেন্দারনারকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করে। পজাব অঞ্চলে ইহার বিখ্যাত জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিল।

জট (জটাম্বজ) সংহতকেশ, জটা।

জটমল্ল, কোশলবংশসম্বৃত্ত বর্ণপুরীর একজন রাজা। ইনি কালচন্দ্রের পুত্র এবং মল্লদেবাস্বজ চোলের পৌত্র। ঐধরপ্রণীত জটমল্লবিলাস গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

জটলা (দেশজ) ১ বাহার জটা আছে। ২ গোলমাল।

জটা (স্ত্রী) জটতি পরম্পর সংলগ্না ভবতি জট-অচ্-টাপ্। যদা জায়তে জন-টন্-অস্ত্য লোপঃ। (জনেটন্ লোপচ্। উপ ৪।৩০) ১ পরম্পরসংহত কেশ, সংলগ্নক, জট। পর্যায়—শটা, জটি, জটী, জুট, জটক, শট, কোটীর, জুটক, হস্ত।

“নীলাঃ প্রসন্নাস্ত জটাঃ স্তম্বকাঃ।” (ভারত ৩।১১২২)

২ ত্রতীর শিখা। ৩ শটা, কেশর। ৪ মূল।

“যদি ন সমুদ্রস্তি বতরো হৃদি কামজটা।” (ভাগবত)

৫ শাখা। (মেদি)। ৬ কপিকজু। (রাজনি)।

৭ রুদ্রজটা। ৮ জটামাংসী। ৯ শতাবরী। (রত্নমা)।

১০ বেদপাঠবিশেষ। [ইহার বিবরণ ঋগ্বেদ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জটাকর (ত্রি) জটাং করোতি-জটা কৃ-অচ্। বাহাতে জটা হয়, জটা জন্মবার কারণ।

জটাকাঞ্চড়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জটাচীর (পুং) জটাসহিত চীরঃ বসনং বস্ত্র বহত্রী। শিব।

জটাজুট (পুং) জটানাং জুটঃ সমূহঃ ৬তং। জটাসমূহ, জুটি।

“জটাজুটসমাবৃত্তকামকৈশুকভূষণধাম্।” (হর্গাদান)

জটাম্বাল (পুং) জটেব জালাহস্ত বহত্রী। প্রদীপ। (হারাবলী)

জটাতঙ্ক (পুং) জটা টঙ্ক ইবাস্ত বহত্রী। শিব। (ত্রিকাণ্ড)।

জটাতীর (পুং) জটামটতি অট-জৈরন্। শিব। (ত্রিকাণ্ড)।

জটাবর (পুং) জটাং ধরতি জটা-ধৃ-অচ্। ১ শিব। (শব্দরত্না)

২ বৃদ্ধবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড)। ৩ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত

একটা দেশ। (বৃহৎসং ১৪ অঃ।) ৪ অভিধানতত্ত্ব নামক কোষকার। ইনি দ্বিতীয়াধীশ্বরী রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, ইহার পিতার নাম রত্নপতি ও মাতার নাম মন্দোদরী। (ত্রি) ৫ জটাবরী।

জটাবর, একজন গ্রন্থকার, ১৭৬১ সন্থে ইনি কতশাহপ্রকাশ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পিতার নাম বনমালী, পিতামহের নাম হর্গামিত্র। ইহার গর্গগোত্রী।

জটাবর কবিরাজ, পদ্মনাসপ্রণীত হনোমজরীর একজন টীকাকার, জগদাধসেনের পিতা।

এক রাক্ষস ; পাণ্ডবগণ নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া যখন নর-
নারায়ণাশ্রমে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে জটাসুর জ্যো-
তীর রূপদাব্যাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া ভ্রাক্ষণবেশে পাণ্ডবের লহিত

বিবর্তিত হয়। একদিন ভীমসেন বৃন্দার্য নিবিড় অরণ্যে গমন করিলেন সুযোগ পাইয়া পাণ্ডবগণের অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া দ্রোণদী, দ্রুপদী, নকুল ও সহদেবকে আবদ্ধ করিয়া হরণ করিবার উত্তোগ করে। রাজল সকলকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে ছিল, পশ্চিমধ্যে ভীম আসিয়া তাহাকে সংহার করেন। (ভারত ৩।৫৭ অঃ) (বহু) ২ দেশবিশেষ। (বৃহৎসং ১৪ অঃ) জটী (স্ত্রী) জটতি পরম্পর সংলগ্ন তবতি জট-ইন্। (সর্বদাত্তা ইন্। উৎ ৪।১১৭) ১ কটবৃক্ষ। (শকরসং) ২ জটী। ৩ সমূহ। (উ কোঃ) ইহার উত্তর বিকরে ভীপ্ হয়। ৫ জটামাংসী। (অমর)

জটিক [জটিকারন দেখ।]

জটিন্ (পুং) জটী ২স্ত্যত্ জটী-ইনি। ১ প্রকবৃক্ষ, পাকুড়। (ত্রি) ২ জটীবৃক্ষ, বাহার জটী আছে।

“ততো হরো জটী স্বাগুর্নিশাচরণতিঃ শিবঃ।” (ভারত ৭।৪২ অঃ)

(পুং) ৩ কাস্তিকের এক সৈনিক। (ভারত ২।৪৬ অঃ)

জটিল (পুং স্ত্রী) জটীহন্তাত্ত জটী-ইলচ্ (লোমাদি পামাদি পিচ্ছাদিত্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) ১ সিংহ। (শকটঃ) জীলিঙ্গে ভীপ্ হয়। (ত্রি) ২ জটীবৃক্ষ।

“বিশেষ কশ্চিজটিলন্তপোবনে।” (কুমার ৫।৩০)

(পুং) ৩ ব্রহ্মচারী।

“জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্জলং কিতবং তথা।” (মহু ৩।১৫১)

(দেশজ) ৪ যাহাতে অনেক গোল আছে, দুর্জোড়।

৫ দয়ালীন। “বন্ধনে রেখেছে পাক দায়ণ জটিল।

ডাকিয়া সুধান তারে রাজা দয়ালীন ॥” (শ্রীধর্মমঙ্গল ২।১২)

৬ এক বিকৃতত্ব বালক। পৌরাণিকেরা ইহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণনা করেন—জটিল নামে একটা বালক জননীর আত্মার প্রতিদিন পাঠশালায় যাইত, পথে একাকী বলিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। একদিন জননীর নিকটে ভয়ের কথা প্রকাশ করিলে জটিলের মাতা বলিয়া দিলেন, “বৎস! পথে যাইতে যাইতে ভয় পাইলে তোমার সখা গোবিন্দকে ডাকিও, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।” পর দিন বিড়ালগে যাইবার সময় জটিল ভয় পাইয়া, “সখে! গোবিন্দ” বলিয়া কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল। বালকের ডাকে জগৎপতি হরি কৃপাপন্ন হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই অবধি বালক জটিল গোবিন্দের সহিত অনেক-কণ খেলা করিয়া অধিক বেলায় পাঠশালায় যাইত, একদিন গুরুমহাশয় বেলা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জটিল আভোপাক্ত সমস্ত বলিয়া কেলিল। কিন্তু গুরুমহাশয় জটিলের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে বেত্রপ্রহার করিলেন, কিন্তু

ইহাতে জটিলের শরীরে বিকৃত্যক্রম দাঁপ হইল না। ইহার পরে গুরু পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জটিল দ্বিবার তার প্রহণ করে এবং বধ্যাসময়ে কেবল একটা তার দ্বি লইয়া উপস্থিত হয়। সকলে অন্ন দ্বি দেখিয়া জটিলকে তিরস্কার করিতে লাগিল। জটিল বলিল, তাহার সখা গোবিন্দ বলিয়া দিয়াছেন যে নিম্ন-স্থিত সকল লোকে পেট ভরিয়া খাইলেও তারের দ্বি পূর্ণই থাকিবে। প্রথমে বালকের কথায় কেহই বিশ্বাস করিল না, শেষে বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইহার পরে জটিল গুরুকে লইয়া গোবিন্দদর্শন করাইতে বনে গমন করেন, কিন্তু গোবিন্দ বলিয়া দিলেন যে ঐ তিত্তিড়ীবৃক্ষে বস পাতা আছে, ততকাল তপস্তা করিলে তোমার গুরু আমার দর্শন পাইবে। জটিলের মুখে এই কথা শুনিয়া তাহার গুরু সেই তিত্তিড়ীবৃক্ষমূলে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

৭ শিব। যখন উমা শিবকে পাইবার জন্য হিমালয়ে তপস্তা করিতে ছিলেন, তখন তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য মহাদেব জটিলরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। শিবপুরাণান্তর্গত জ্ঞানসংহিতার কথিত আছে যে, পার্শ্বতী মহাদেবকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্তা করেন, তাহাতে ঋষি-গণ ভীত হইয়া মহাদেবের নিকট গিয়া বলিলেন, “পার্শ্বতী দারুণ লোকশোষণকারী তপস্তার অত্যাচার করিতেছেন। আমরা এমন তপস্তা পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন দেখিব না। অতএব হে সদাশিব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহার উপায় বিধান করুন।” দেবতাদিগকে বিদায় দিয়া মহাদেব জটিল মূর্ত্তিধারণ করিয়া পার্শ্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বতী একজন বৃদ্ধ জটাদারী পুরুষকে তপোবনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিতে তাঁহার সংকার করিলেন। এখানে জটিল উপহাস করিয়া শিবের নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বতীর কমনীয় রূপ গুণের সহিত শিবের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া পার্শ্বতীকে ত্রাত্যা-চীন করিতে নিষেধ করিলেন। পার্শ্বতী শিবনিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উত্তত হইলে মহাদেব জটিল মূর্ত্তি ত্যাগ ও বসুধি প্রকাশপূর্বক পার্শ্বতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। (জ্ঞানসংহিতা ১৩ অঃ)

জটিলক (পুং) জটিল-কন্। ১ একজন ঋষি। (পা ২।৪।৬৯)

[বহু] জটিলকন্ত গোত্রাপত্যাদি জটিলক-অণ্ তস্যা লুক্ বহুধে। (উপকাদিত্যোহন্ততত্তমবধে। পা ২।৪।৬৯)

২ জটিলক ঋষির গোত্রাপত্য।

জটিলী (স্ত্রী) জটিল-টীপ্। ১ জটীবৃক্ষ স্ত্রী। ২ জটামাংসী।

(অবসর ২৪।১৩৪) ৩ শিরলী। (মেলি) ৪ বটা। ৫ উচ্চটা।
 (রত্নমা) ৬ মমলকবৃক্ষ। (শ্রাজনি) ৭ রাধিকার বৃক্ষ,
 আম্রের মাতা। (গৌরগণোদেশ) ইনি গোল নামক
 গণেশের পত্নী। ইহার আরাম ও দুঃখ নামে দুই পুত্র ও
 কুটিল নামে একটি কন্যা ছিল। বৃন্দাবনের অন্তর্গত জাবট
 বা জাও গ্রামে ইহার বাস ছিল। রাধিকার কৃষ্ণপ্রেমে ইনি
 অনেক নিলা রটাইয়াছিলেন। (বৃন্দাবন-লীলা ২২ অঃ)

৮ গৌতমবংশসম্বৃত্তা একজন ধর্মপরায়ণা কথিককন্যা, সাতজন
 কথিপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ হয়। যথা—
 “শ্রয়তে হি পুরাণে হপি জটীলা নাম গৌতমী।

অথীন্ অধ্যাসিতবতী সপ্তধর্মভূতাধরা ॥” (ভারত ১।১২৬।১৪)
জটিলীভাব (পুং) জটিল-ট্রি-ভূ-যঞ। সংহতি, জটাকারে
 পরিণতি। গলগিহ্বারলোৎপত্তি: জটিলীভাব: কেশানাম”
 (সুক্রত নিদা ৬ অঃ)

জটী (স্ত্রী) জটিকা ভীষ (কৃমিকারাদিতি)। পা ৪।১।৪৫ বার্তিক।
 ১ পক্কা বৃক্ষ। (শকরত্না) ২ জটামাংসী। (রত্নমা)

জটুল (পুং) জট-উল্। শরীরস্থ চিহ্নবিশেষ, জড়বৃক্ষ। চলিত
 কথায় জড়ুল বলে। পর্যায়—কালক, পিঙ্গু।

জটেশ্বর (পুং) নন্দদানদীতীরবর্তী একটি প্রাচীন তীর্থ, এখানে
 জটেশ্বর লিঙ্গ আছে। (শিবগুং রোবামা)

জটোদা (স্ত্রী) কামরূপস্থ একটি বিখ্যাত নদী।
 [কামরূপ দেখ।]

জঠর (পুং স্ত্রী) জায়েতে গর্ভা মলঃ বা অগ্নি জন-অর ঠাচাত্তা-
 দেশঃ। ১ উদর, কুক্ষি।

“আন্তেহস্তা জঠরে বীর্য্যমবিবহঃ মুরদ্বিঃ।” (ভাগ ৭।৭।৯)
 (ত্রি) ২ বজ্র। ৩ কঠিন।

“ইদানীমস্মাকং জঠরকরঠপৃষ্ঠকঠিনামনোরুদ্রিস্তং কিং
 ব্যসনি বিমুণ্ঠেব কশরসি।” (শান্তিশতক ৪।১৩) (পুং)
 ৪ পর্কতবিশেষ। মেকর পূর্বদিকে অবস্থিত একটি পরিধি-
 পর্কত। এই পর্কত উত্তরদক্ষিণায়ত নীলপর্কত হইতে
 নিম্নবর্ণিত পর্কত বিস্তৃত। ইহার আরাম বা দৈর্ঘ্য ১২
 হাজার যোজন এবং ব্রহ্মত্ব ও উচ্চতা ২ হাজার যোজন। (ভাগ
 ৪।১৬।২৭।) [বহু] ৬ দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কুর্শ-
 বিভাগের অধিকোশে এই দেশের উল্লেখ আছে। (বৃহৎসং ১৪।৮)

মহাভারতে দশর্শ ও কুরুদেশের সন্নিধানে এই দেশের
 উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত ৬।৯।৪২)

৭ উদররোগবিশেষ। সুক্রতের মতে কুপিত বায়ুবেগে
 চালিত হইয়া অন্নসার উপদেহের দ্বারা কোষ্ঠ হইতে নির্গত
 হয়। ক্রমে বহু উদরনপূর্বক কর্তৃত্ব হইতে থাকে। ইহা

হইতেই জঠররোগের উৎপত্তি। বসন্ত ও বর্ণের হীনতা, অরুচি
 ও পেটের উপরে রেখা দর্শন ইহার পূর্বলক্ষণ। (সুক্রত নিদান
 ৭ অঃ) [ইহার অপর বিবরণ উদররোগি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৮ শরীর। “যাতি পক্ষী জঠরজ।” (শব্দ ১।১২।১৭)

‘জঠরজ জঠরোপলক্ষিতশরীরজ।’ (সায়ণ)

জঠরগদ (পুং) জঠরজ গদ: ৬তৎ। উদররোগ। জঠররোগ,
 জঠরায় প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জঠরজালা (স্ত্রী) জঠরজ জালা ৬তৎ। উদরবন্ত্রণা।

জঠরজুৎ (পুং) জঠরঃ জুদতি জুদ-কিপ্ ৬তৎ। আরম্ভ,
 সোদান। ইহাভে উদর ভঙ্গ হয় বলিয়া ‘জঠরজুৎ’ নাম হইয়াছে।

জঠরযন্ত্রণা (স্ত্রী) জঠরজ যন্ত্রণা ৬তৎ। ১ জঠর জালা। ২ কুখ।

জঠররোগ (পুং) উদররোগ।

“কলজ কলহাক্ষিকৃৎ জঠররোগকৃৎসমুদয়ে।” (বৃহৎসং ১০।৪।১৬)

জঠরব্যথা (স্ত্রী) জঠরযন্ত্রণা।

জঠরায়ি (পুং) জঠরস্থিতোহস্তি: মধ্যলো। কুক্ষিগত ভুক্ত
 জ্বের পরিপাককারী অগ্নি। প্রাচীন শরীরতত্ত্ববিৎ আর্ঘ্য-
 গণের মতে প্রাণীমাত্রের উদরেই ইহা সন্নিহিত আছে, ভুক্ত
 জব্য ইহা দ্বারা পরিপাক হয়। ভোজনের অব্যাহিত পরে জাত্য-
 স্তরীয় বায়ু কর্তৃক ভুক্ত জ্বের অসার অংশগুলি পৃথক্ হইয়া
 পড়ে। তৎপরে বায়ু কর্তৃক চালিত জঠরায়ির উপরি-
 ভাগে প্রথমে জল ও তাহার উপরে অন্ন সংস্থাপিত হয়।
 প্রাণ বায়ু তাহার নীচে যাইয়া ধীরে ধীরে অগ্নি উল্লীষ্ট করে
 এবং সেই অগ্নিতে জল উত্তপ্ত হইয়া অন্নপাক করিতে থাকে।
 পাক হইলে তাহার কিছু বা মল পৃথক্ হইয়া যায় এবং অপ-
 রাংশ রস নাড়ীপ্রণালিকা দ্বারা সর্ব শরীরে সঞ্চারিত
 হয়। (যোগার্ণব)। [ইহার অপর বিবরণ শারীর-বিজ্ঞান
 শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জঠরাময় (পুং) জঠরজাময়ো রোগঃ ৬তৎ। ১ জলোদর রোগ।

(রাজনি) ২ অতীসাররোগ। [অতীসার দেখ।]

জঠরিন্ (ত্রি) [উদরিন্ দেখ]

জঠরীকৃত (ত্রি) উদরীকৃত, বাহাকে উদরস্থ করা হইয়াছে।

“জঠরীকৃতলোকযাত্রা।” (ভাগ ৩।৯।১৯)

জটীল (স্ত্রী) জঠরং সাদৃশ্যেনাস্তাত্ অর্শঃ অচ্ রত্ন লজ্জা জল-
 পাত্রবিশেষ, ইহার আকার উদরের সদৃশ।

“চত্ৰোনাটো জটীল জটীলঃ।” (শব্দ ১।১৮।২৩) ‘জঠরজ
 জটীলবহুসংস্কারজ’ (সায়ণ)

জড় (ত্রি) জলতি ধনী ভবতি জল-জট-জড় ৬। ১ মলবৃদ্ধি।

ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত আপনায় ইষ্টানিষ্ট ধারণা করিতে পারে
 না, সর্বদা পনের বশীভূত থাকে, তাহাকে জড় বলে।

“ইষ্টং বানিষ্টং বা ন বেত্তি বো মোহাৎ।

পরবশগঃ স ভবেদিহ জড়সংজ্ঞকপুঙ্খঃ ॥” (নীতিশা*)

২ মূৰ্খ। ৩ বেদগ্রহণাসমর্থ। “বেদগ্রহণাসমর্থঃ জড়ঃ”।

(দায়ভাগ।) ৪ হিমপ্রভ। ৫ শীতল।

“পরামুশন্ হর্বজ্ঞেনপাণিনা তদীয়মজং কুলিশত্রণাক্রিতম্।”

(রঘু ৩।৬৬)

‘হর্বজ্ঞেন হর্বশিশিরেণ’ (মলিনাথ।) ৬ মূক।

“জানয়পি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।” (মহু ২।১১০)

৭ বধির।

“জ্ঞানোজড়ঃ পীঠসূপী সপ্তত্যাহবিরশ্চ যঃ।” (মহু ৮।৩৯৪।)

৮ অপ্রজ্ঞ, অনভিজ্ঞ।

“বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং হু বিষয়ব্যাবৃত্ত” (বিক্রমোর্কশী)

৯ নিশ্চন্দ। (রঘু ২।৪২) ১০ মোহিত, যাহার মোহ হইয়াছে।

“অভিষঙ্গজড়ং বিজজিবান্।” (রঘু ৮।৭৫)

(ক্লী) ১১ জল। (অমরটী* রায়মুকুট।) ১২ সীসক।

(রাজনি*) (ত্রি) ১৩ যাহার চেতনা নাই।

“অবিদ্যাত্মা ঘটানীনং যৎস্বরূপং জড়ং হি তৎ॥” (পঞ্চদশী ৬।২৭)

জড়ক্রিয়া (ত্রি) জড়ত্ব হিমক্লিষ্টেব ক্রিয়া বস্ত্র বহতী। দীর্ঘ-
স্বতী, চিরক্রিয়া। (হলায়ুধ)

জড়তা (ক্লী) জড়ত্ব ভাবঃ জড়-তল্-টাপ্। ১ শীতলত্ব। ২
অপটুতা।

“উদকস্রোমাঞ্চং ব্রজতি জড়তামঙ্গমখিলম্।” (সাহিত্যদ*)

৩ ব্যক্তিতারিতাবিশেষ।

সাহিত্যদর্শনের মতে মঙ্গল বা অমঙ্গলের দর্শন বা প্রবণে
কিছু সময়ের জড় কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া
অচেতন পদার্থের স্থায় অবস্থিতির নাম জড়তা। নির্নিমেঘ
নয়নে অবলোকন ও তুচ্ছীভাব প্রভৃতি ইহার কার্য।

“অপ্রতিপত্তিজড়তাত্ত্বানিষ্টানিষ্টদর্শনশ্রুতিভিঃ।

অনিমেঘনয়ননিরীক্ষণতুচ্ছীভাবায়োহপ্যত্র ॥”

(সাহিত্যদ* ৩ প*)

জড়ত্ব (ক্লী) জড়ত্ব ভাব জড়ত্ব। [জড়তা দেখ।]

জড়ভরত (পুং) জড়োমুক ইব ভরতঃ। আক্লিঙ্গ প্রবর কোন
ব্রাহ্মণের পুত্র একজন যোগী। ইনি পূর্বজন্মে ভরত নৃপতি-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে সংসারে
বীতশুঁহ হইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। দৈব দোষে
একটা হরিণ-শিশুর বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া জন্মান্বয়ে পণ্ডবোনি
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে আক্লিঙ্গ নামক ব্রাহ্মণের গুরসে
অন্নগ্রহণ করিয়া আবার লজ্জদোষে পণ্ডবোনি প্রাপ্ত না হন

এই জড় জ্ঞানী হইয়াও জড়ের স্থায় ব্যবহার করিতেন।

ভাগবতে ইহার উপাখ্যান সংক্ষেপে এইরূপ লিখিত আছে—

আক্লিঙ্গ প্রবর কোন ব্রাহ্মণের প্রথমপত্নীর গর্ভে ভরতের
জন্ম হয়। ভরত জ্ঞানী বলিয়া পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ
ছিল। তিনি লজ্জদোষ সমস্ত অনর্থক মূল নিষ্কর করিয়া
জড়ের স্থায় অন্নগ্রহণ করিতেন। তাহার পিতা কথাসময়ে
তাঁহার উপনয়ন দিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করেন।
দৈবক্রমে তাহার অনতিকাল পরেই পিতার মৃত্যু হইলে
ভরতজননী সপত্নীর হস্তে পুত্র অর্পণ করিয়া পতির অল্পমৃত্যু
হইলেন। ভরতের ভ্রাতারা তাহাকে জড়মতি মনে করিয়া
তাঁহাকে আর পড়িতে দিলেন না। ভরত নিজের ইহা-
দিগের কোন কার্য্যই না করিয়া অপরে বাহা করাইত,
তাহাই করিতেন। ভরতের ভ্রাতাগণ তাঁহাকে ধাত্ত্বক্ষেত্র
রক্ষা করিতে নিযুক্ত করেন। একদিন রাত্রিকালে ভরত
বীরাঙ্গনে বসিয়া ক্ষেত্ররক্ষা করিতেছিলেন। কোন বৃষল
নরপতি পুত্রকামনার ভদ্রকালীকে নরবলি দিবার মানসে
অনুচরগণ দ্বারা ভরতকে লইয়া যান। ভরতের বিরুদ্ধি নাই।
পুত্র বলিদানের যে সময়ত আয়োজন হয়, তাহার কোনটাই
বাকী থাকিল না। ব্রাহ্মণকুমার ভরতকে জ্ঞান করাইয়া
রক্তমালা পরাইয়া দেবীর নিকটে রাখা হইল, রাজা স্বহস্তে
তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদন করিবেন বলিয়া অসিহস্তে দেবীকে নম-
স্কার করিলেন। ভদ্রকালী এই সকল অসহ ব্যাপার দর্শনে
কুপিত হইয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশপূর্বক সেই অসি দ্বারা রাজা ও
তাঁহার অনুচরদিগকে বিনাশ করেন। এইরূপে ভরতের প্রাণ
রক্ষা হইল।

আর একদিন রহগণ নামক রাজার শিবিকাবাহকের
অভাব হওয়ার ভরতকে লইয়া যাইয়া শিবিকা বহনে নিযুক্ত
করা হয়। কিন্তু ভরত অপর বাহকগণের স্থায় শিবিকা
বহনে পটু হইলেন না দেখিয়া রাজা তাহাকে অনেক তির-
স্কার করেন। এইবার ভরতের মুখে কথা ফুটিল, তিনি
রাজাকে সন্মোদন করিয়া জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দিতে লাগিলেন।
রাজা শিবিকাবাহকের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া অবাক
হইলেন এবং শিবিকা হইতে নামিয়া তাহার চরণে পড়িয়া
ক্ষমা চাহিলেন। জড়ভরত এইরূপে কিছুদিন ভূমণ্ডলে বাস
করিয়া প্রারক কয়ের পর মুক্তিলাভ করিলেন।

(ভাগবত ৫।১০-১১ অঃ)

জড়সড় (দেশজ) সঙ্কচিত।

জড়া (ক্লী) জড়ং করোতি জড়-গিচ্-অচ্-টাপ্। ১ শূকশিখী,
আলকুনী। (অমর) ২ ভূম্যামলকী, ভূঁই আমলা। (রত্নমালা)

জড়াও (দেশজ) খচিত, সংলগ্ন।

জড়াজড়ি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন।

জড়ান (দেশজ) বেঁটন, ঘেরন, আবৃত করণ।

জড়ানিরা (দেশজ) ১ যে আবরণ করে। ২ বাহাতে জড়ান হয়।

জড়ানিয়াকল (দেশজ) বায়ুঘারা চালিত কল।

জড়ামড়ি (দেশজ) পরস্পর আলিঙ্গন।

জড়িত (দেশজ) ১ বেঁটিত। ২ খচিত।

জড়িতবাক্য (দেশজ) অস্পষ্ট বাক্য।

জড়িবটী, ঔষধবিশেষ।

জড়ামাংসী (স্ত্রী) জটামাংসী। (শব্দরত্ন°)

জড়িমন্ (পুং) জড়ত্ব ভাবঃ জড়-ইমনিচ্ (বর্ণদ্ব্যাদিত্য মাঞচ।

পা ৪।১।২৩) জড়তা। উজ্জলনীলমণির মতে ইষ্টানিষ্টের অপরিজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রেমের অহুস্তর এবং দর্শন ও প্রবলের অভাবকে জড়িমা বলে।

“ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানঃ যত্র প্রেমেষামহুস্তরম্।

দর্শনপ্রবণতাবো জড়িমা সোহতিদীয়াতে ॥” (উজ্জলনীলমণি)

জড়ীকৃত (ত্রি) ১ ক্ষুণ্ণিহীন। ২ স্পন্দহীন। ৩ বাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে।

জড়ীভাব (পুং) জড়-চি-ভূ-ঘঞ্। জড়তা।

জড়ীভূত (ত্রি) জড়-চি-ভূ-ক্ত। ১ ক্ষুণ্ণিহীন। ২ বাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। ৩ ভয়বিস্ময়াদি কারণে স্পন্দরহিত।

জড়ুর (জড়ুল শব্দজ) শরীরের চর্মের বিকার, দেহস্থ তিলক, জটুল।

জড়ুল (পুং) জটুল প্ৰবোধদাদিভ্যাং সাধুঃ। দেহস্থ তিলক। (হেম)

জড়েসাপটে (দেশজ) সম্পূর্ণ, আমূল।

জড়জড়িয়া (দেশজ) আটল, বাহা জড়িয়া যায়।

জড়িল (ত্রি) জতু-ইল্ (কাশ্যাদিত্যঃ ইল্চ। পা ৪।২।৮০) ১ জতু নির্মিত বস্ত্রদ্রব্য। ২ বহির উদ্দীপক দ্রব্যবিশেষ।

জতিঙ্গা, কাছাড়ের উত্তরদিচ্ দিয়া প্রবাহিত একটা নদী। বরাইল পাহাড় হইতে বাহির হইয়া শিলচরের দক্ষিণে বরাক নদীতে মিলিত হইয়াছে।

জতুরাঙ্গী, দিল্লী এবং রোহিলখণ্ডনিবাসী জাতিদিগের একটা শ্রেণী। [জাতি দেখ।]

জঙ্ক, গোড়নিবাসী একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম অরুণ। সংবৎ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি ভোটারাজ্যধিপতি যশোবর্মার করণিক ছিলেন।

জতু (স্ত্রী) আরতে বৃক্ষাদিত্যঃ জন-উ, তো ২স্থাদেশচ। (কলিপাটিনমিনিজনঃ শুকপাটিনাক্ষিত্যচ। উণ ১।১২) ১ বৃক্ষনির্ধাসবিশেষ, চলিত কথায় ‘জৌ’ ও স্থান বিশেষে

লা বলে। পর্যায়—রাঙ্গা, লাক্কা, বাব, অলঙ্ক, ক্রমান্বয়, রঙ্গা, কীটজা, ক্রিমিজা, জতুকা, জন্তকা, শবাবিকা, জতুক, বাবক, অলঙ্কক, রক্ত, পলকবা, কুমি, বরবর্ণিনী।

“জিয়ন্ বোহতা রমা গন্ধঃ সর্পিজতুবিমিশ্রিতম্।”

(ভারত ১।১৪৭।১৩)

জতুক (স্ত্রী) জতু ইব কারতি কৈ-ক। ১ হিহু। জতুএব জতু-স্বার্থে-কন্। ২ লাক্কা। (মেদিনী)

জতুকা (স্ত্রী) জতুক-টাণ্। ১ জনী নামক গন্ধ দ্রব্য। (অমর-টীকা ভরত) ২ চর্মচটিকা, চামটিকা। (শব্দরত্ন°) ৩ পর্পটী লতাবিশেষ, চলিত হিন্দীভাষায় পপুড়ী বলে। পর্যায়—জতু-কারী, জননী, চক্রবর্তিনী, তিৰ্য্যাক্ফলা, নিশাক্কা, বহুপুত্রী, সুপুত্রিকা, রাজবৃক্ষা, জনেষ্ঠা, কপিকচ্ছু, কলোপমা, রঞ্জনী, হুম্ববম্বী, ভ্রমরী, কুম্ববল্লিকা, বিজুলিকা, কুম্বকুহা, তরুবম্বী, দীর্ঘফলা। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত; রক্তপিত্ত, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও বিষনাশক, কটিকর এবং দীপন। (রাজনি°) কোন কোন গ্রন্থে ‘জতুকা’ স্থলে জন্তকা পাঠ দৃষ্ট হয়। মালবদেশে সচরাচর এই লতাদেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পত্র গ্রহিযুক্ত, ফল আল-কুলী ফলের সদৃশ। কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘ ও চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন। ইহা হইতে লার জায় এক প্রকার কুম্ববর্ণ নির্ধাস বাহির হয়।

জতুকারী (স্ত্রী) জতুকবৎ সংশ্লেষমিচ্ছতি ঋ-অণু উপসংগোরাদিভ্যাং ভীষ্। জতুকা লতা। (রাজনি°)

জতুকুৎ (স্ত্রী) জতুবৎ সংশ্লেষং করোতি কৃ-কিপ্। জতুকালতা। (অমর)

জতুকুক্ষা (স্ত্রী) জস্তিব কুক্ষা। জতুকা লতা। (ভাবপ্র°)

জতুগৃহ (স্ত্রী) জৌ গদ প্রভৃতি দাছ পদার্থনির্মিত গৃহ, পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ রাজা দুর্যোধন বারণাবতে এইরূপ গৃহ নির্মাণ করেন।

জতুনী (স্ত্রী) জতুইব নয়তি জত্বাকারেণ প্রাপরতি সংলিষ্টজব্য-মিতি নী-কিপ্। চর্মচটিকা। (ত্রিকাণ্ড)

জতুপালঙ্গ (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। (Salicornia Indica)

জতুপুত্রক (পুং) জতুনির্মিত পুত্রইব কারতি কৈ-ক। পাশক, শুটিকা, পাশার ঘুঁটি। (ত্রিকাণ্ড)

জতুমণি (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত কথায় জড়ুল বলে। এই রোগ চর্মের উপরে হইয়া থাকে। শত্রু দ্বারা তুলিয়া ক্ষারাদি দ্বারা দগ্ধ করিলে ইহার প্রতীকার হয়।

জতুমুখ (পুং) জতুনেব সংলিষ্টং মুখং যন্ত বহত্ৰী। ব্রীহিবিশেষ। “কুম্বব্রীহিশালামুখজতুমুখনন্দীমুখনারাচকষ রিতকক্কুট্টা-শুকপারাবতকপাটলপ্রভৃতয়ো ব্রীহয়ঃ।” (সুশ্রুত)

জন্তুরাজ (খং) জন্তুনোরমঃ ৩৩২। 'অনুক্রম', 'আবৃত্তা'।
('রাজনি') ['অনুক্রম' দেখ।]

জন্তু (জী) জন্তু নিপাতনাদৃঃ। পক্ষিবিশেষ।

"জন্তুঃ স্ত্রীকীৰ্ত্তা তে জন্তু ইত্যনুক্রমঃ।" ('শ্রুতসংহ' ২৪।৩৬)

'জন্তুঃ স্ত্রীকীৰ্ত্তা এতৌ পক্ষিবিশেষৌ' ('মহীধর')।

জন্তুকর্ণ (পুং) ১ পক্ষিবিশেষ। এই পক্ষী গর্বাধি গণ্যত্ববর্ত, অপত্যার্থে ইহার উত্তর বন্ধ প্রত্যয় হয়।

জন্তুক। (জী) জন্তুক-নিপাতনাদীর্ঘঃ। ১ চন্দ্রচটিক। ('অমর')
২ জমীনাশক পক্ষ্যজব্য। ('শকর')

জন্তু (জী) জন্তু-ভাষ্যদেশঃ। ('অমর')। উপ ৪।১০২
বহুব্রি, ক্রমের উত্তর পার্থক্য অস্থিহর। ('অমর')

"জন্তুদেশে জন্তুং বীয়ো ব্যাবাসীদ্রুখে তথা।" ('ভার' ৩।১৭।২২)

জন্তুক (জী) জন্তু এব জন্তু-স্বার্থে কন্। জন্তু।

জন্তুশ্যক (জী) জন্তুশ্যক-কন্। শিলাজন্তু। ('রাজনি')

জন্তু- (ত্রি) জন্তুতে ইতি জন-অচ্। ১ জাত।

"উবে বাজঃ বি বংশ যশিত্র মাছুবে জনে।" ('খক' ১।৪৮।১১)

'জনে জন্তে বজমানো' ('সারণ')

(পুং) ২ লোক, মহন্ত সাধারণ, মানবজাতি, মানবসমষ্টি।

"অকর্ণগাহি জীবন্তি স্থাবরানন্তরে জনাঃ।" ('ভারত' ৩।৩২।৩)

৩ ভুবন। ৪ অনুবিশেষ। ৫ জন্তুদি সপ্তলোকের অন্তর্গত পঞ্চম লোক, মহলোকের উর্দ্ধ লোক। ['জনলোক' দেখ।]

"স্বাস্থ্যগ্রা মহলোকাঙ্জনঃ জ্ঞাদয়োহুর্জিতাঃ।" ('ভাগ' ৩।১১।২২)

৬ যে শারীরিক পরিশ্রমলব্ধ দৈনিক বেতনে জীবিকা নির্বাহ করে।

"স্বাক্ষরং স্বক্কাং জীবাং প্রোক্ষয়ন্ত চ।" ('মহ' ৭।১১৫)

৭ পামর। ৮ প্রজা। ৯ শকরাক্ষের পুত্রজন্ম।

('হাক্ষপ্য উ' ৫।১১।১)

জনংসহ (ত্রি) বলবান লোকের বিশেষ্য।

"সত্রাসাহো জনতকো জনসংহস্যনো।" ('খক' ২।১১।৩)

'জনংসহো বলিনাং জনানামভিত্তিতা'। ('সারণ')

জনক (পুং) জনরক্তি ইতি-জন-পিচ্ছলু। ১ পিতা, জন্মদাতা।

২ শব্দরাজ্যের চতুর্থ পুত্র। ৩ উপস্থিতিকারক পক্ষিবিদের জ্ঞেয় একজন পক্ষি। ৫ ইক্ষাকুশংখজাত নিমিষজের পুত্র, মিথিয়ার একজন রাজা। শ্রুতসংহর্ষকীয় শতপথব্রাহ্মণ, হাক্ষপ্য উপনিষদ, মহাভারত, হস্তিরংশ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে জনকের উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণের মতে ইনি মিত্রোহর একজন রাজা।

('শতপথব্র' ১।১।৩।১২)। রামায়ণে ছই জন জনকের নাম

পাণ্ডবায়—একজন মিথির পুত্র ও উদ্যোক্তার পিতা, অপর হুমায়োয়ার পুত্র ও সীতার পিতা। ('রামায়ণ' অধি ৭১ম)

ভাগবতে লিখিত আছে—নিমি বশিষ্টকে ভ্যাগ করিয়া ব্রহ্ম আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন। তখন ঋষিগণ গন্ধ, মালা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দেহ পূজা করিয়া মনন করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই মতিতে দেহ হইতে পুত্র জন্মিল। মধ্যাহ্ন দেহ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম মিথি হইল, ইহার অপর নাম জনক। ইহার নাম হইতে এই বংশের রাজাদিগকে জনক বলে। মিথি নাম প্রযুক্ত জনকের স্থাপিত দেশের নাম মিথিলা হইল। ইহার পুত্রের নাম উদ্যোক্ত। ('ভাগবত' ৯।১৩ অঃ)

উপনিষদ ও পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে জনক সংসারে থাকিয়াও যোগী হইয়াছিলেন, শুকদেব প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তিনি রাজর্ষি নামে খ্যাত।

৬ কান্দীরাজ সুবর্ণের পুত্র। ইনি অত্যন্ত প্রজারঞ্জন ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম শচীনর। ইনি বিহার এবং আলোর নির্মাণ করেন। ('রাজত' ১।১৮) ৭ (ত্রি) উৎপাদক। ৮ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "বৃক্ষো জাতু জনকো নন্দীভ্রাতৃকো মতঃ।" ('রত্নমালা')

জনকতা (জী) জনক-তলু টাপু। ('তত্ত্বভাবোদ্ধতলো') ১ কার-গতা, উৎপাদকতা। জনকত্ব দ্বিবিধ স্বরূপযোগ্য এবং ফলোপহিতত্ব। ২ উৎপাদনশক্তি।

জনককুপ (পুং) তীর্থবিশেষ।

জনককণা (জী) জনকত্ব তনয়ের তৎপাল্যার্থে। সীতা, জানকী। ('জনকতনয়া প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।)

জনকজী সিদ্ধিয়া, সিদ্ধিয়াবংশীয় একজন মহারাত্রী বীরপুরুষ। অতি অল্প বয়সেই ইহাকে জীবন যুদ্ধকার্যে ব্যাপ্ত হইতে হইয়াছিল। যে সময় আক্কেদশাহ ছুরাগী ভারতবর্ষে বিজয়ধ্বজা উড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত, সেই সময়ে মরঠাগণের প্রভু ভারতের প্রায় সর্বত্রব্যাপী। আটক নদীতীরে আক্কেদশাহের সহিত মরঠাগণের প্রথম সঙ্গর্ষ হয়। এই যুদ্ধে দত্তপাটেল সিদ্ধিয়া এবং সপ্তদশবর্ষীয় জনকজী মরঠাগণের অধিনায়ক ছিলেন। মরঠাগণ পরাভূ হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে আরও অনেকবার জনকজীকে আক্কেদশাহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ বছর বয়সে পানিপথের তীর্থে যুদ্ধে মরঠাগণের সম্পূর্ণ ভ্রমে ধর্য হইলে জনকজীও বন্দী হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২০ বছর মাত্র। তাঁহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনেকেই

আক্রমণকে অস্বীকার করিয়াছিল। আক্রমণও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আক্রমণের মন্ত্রী বরখাদার দ্বারা ইজিতক্রমে জনকজীকে গোপনে হত্যা করা হয়।

জনকজী, সিদ্ধিয়ার রাজ্যের একজন রাজা। পূর্বরাজা দৌলৎরাও সিদ্ধিয়ার মৃত্যু হইলে বিধবা রাজ্ঞী বৈজবাই জনকজীকে দত্তকগ্রহণ করেন। সিদ্ধিয়া রাজ্যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া মহাগোলবোগ ঘটে। জনকজী সিংহাসনে বসিতে চাহিলে, রাণী তাহাতে বাধা দেন। তখন দুইদল হইয়া যুদ্ধ ঘটবার উপক্রম হয় ও রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলা ঘটে। ব্যাপার এতই গুরুতর হইয়া উঠে যে তাহাতে সমস্ত মধ্যভারতের দেশীয় রাজগণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কেহ এ পক্ষে কেহ ও পক্ষে যোগদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তখন স্যারপার লর্ড উইলিয়ম বেটিক ভারতের বড় লাট। তিনি এই গোলমাল দেখিয়া নিজে গোয়ালিয়রে আসিলেন, কিন্তু রাজার গৃহ বিবাদ বলিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। এ সময় এখানে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট রেসিডেন্ট ছিলেন। ১০ই জুলাই তারিখে উভয়দলে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু রেসিডেন্টের নানা কৌশলে ঘটিতে পারে নাই। তিনিই সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া গভর্ণরজেনরলকে দিয়া জনকজীকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন। রাণী বৈজবাই হতাশ হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

[গোয়ালিয়ার দেখ।]

জনকপুর, ১ মিথিলাধিপতি জনক নৃপতি কর্তৃক স্থাপিত নগর। এই স্থানে জনকের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অস্ব-মান করেন যে মিথারি জেলার মধ্যবর্তী আধুনিক জনকপুরই প্রাচীন মিথিলার রাজধানী। ভবিষ্যে ব্রহ্মখণ্ডে বর্ণিত আছে—মিথিলাদেশে জনকপুর নামে একটি নগর স্থাপিত হইবে। ইহার দুই যোজন পূর্বে মোঘর এবং তরসা নামে দুইটি গ্রাম কালে বনভূমিতে পরিণত হইবে। শেরশাহ আসিয়া জনকপুর আক্রমণ করিলে এখানকার ক্ষত্রিয়গণ জীপুত্রকর্ষ তুমুল যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। শেরশাহ তিনদিনব্যয় ধরিয়া নগর লুণ্ঠনপূর্বক কালঙ্গরে গমন করিলে লেখানে তাহার মৃত্যু হইবে। ইহার পর হইতে জনকপুরের স্থানে স্থানে জলাধীর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু ত্রীরামচন্দ্রের মন্দির এবং অনেকগুলি দীর্ঘিকা বিস্তারিত থাকিবে। জনকপুরে বহুসংখ্যক ক্ষত্রজাতির বসতি হইবে। (৪৫২৫-৩৫)

জনকপুরে সীতামারী এবং সীতাকুণ্ড নামে দুইটি পবিত্র তীর্থস্থান আছে। প্রবাদ এইরূপ যে সীতামারীতে সীতার

জন্ম হইয়াছিল এবং ত্রীরামচন্দ্রের সহিত বিবাহের পূর্বে সীতা সীতাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন।

২ চাঁদখার রাজ্যের রাজধানী।

জনকবংশ (পুং) জনকানাং বংশঃ। ইন্দ্রকুশলের একটি শাখা। এই বংশের সকলেই জনক উপাধিদারী। বিষ্ণুপুরাণ-মতে এই বংশে ৫৬ এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—১ ইন্দ্রকু, ২ নিরি, ৩ জনক, ৪ উদাবনু, ৫ নন্দিবর্দ্ধন, ৬ সুরকু, ৭ দেবরাত, ৮ বৃহদ্রথ, ৯ মহাবীৰ্য্য, ১০ সত্যধতি, ১১ ধৃষ্টকেতু, ১২ হর্যাব, ১৩ যক্ষ, ১৪ প্রতিবন্ধক, (ভাগবত মতে প্রতীপ), ১৫ কুন্তর, ১৬ কুতি, ১৭ বিবুধ, ১৮ মহাধতি, ১৯ কুতিরাত, ২০ বহ-রোমা, ২১ সুরবরোমা, ২২ হুসরোমা, ২৩ সীরধ্বজ (জনকো-পাধিদারী সীরধ্বজ পুত্রার্থ যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে সীতা নামে একটি অযোনিসম্ভবা কন্যা প্রাপ্ত হয়, এই সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয়), ২৪ সীরধ্বজের পুত্র ভাহ্মন, ২৫ শত-হায়, ২৬ শুচি, ২৭ উর্জবহ, ২৮ লতাক্ষজ, ২৯ কুশি (কুণি), ৩০ অজুন, ৩১ ঋতুজিৎ, ৩২ অরিষ্টমৈরি, ৩৩ প্রভাসু, ৩৪ সূর্য্যাব, ৩৫ সজয়, ৩৬ ক্ষেমারি, ৩৭ অনেনাং, ৩৮ মীনরথ, ৩৯ সত্যরথ, ৪০ সত্যমথি, ৪১ উপশু, ৪২ প্রত, ৪৩ শাশ্বত, ৪৪ সুরধা, ৪৫ সুরভাস, ৪৬ সুরকৃত, ৪৭ জয়, ৪৮ বিজয়, ৪৯ শত, ৫০ জুনয়, ৫১ বীতহব্য, ৫২ সজয়, ৫৩ ক্ষেমাব, ৫৪ ধৃতি, ৫৫ বহুলাধ, ৫৬ কুতি। মহাভারতে শান্তিপর্বে করাল ও বহ্মন নামে জনকবংশীয় আরও দুইজন রাজার নাম আছে।

জনকসপ্তরাত্রী (পুং) সপ্ততিঃ রাত্রিতিঃ সাধ্যাঃ অণ, জন-কেন দৃষ্টে: সপ্তরাত্রঃ। জনকদৃষ্ট সপ্তরাত্রিলাভা যজ্ঞবিশেষ। কাশ্যায়ন, শাখ্যায়ন, আশ্বলায়ন ও মার্ককশ্রোতনৃত্রে এই সপ্তরাত্রের বিবরণ বর্ণিত আছে।

জনকারিন্ (পুং) জনৈঃ কীর্য্যন্তে কৃশিণি (কর্ষণি)। অল-কৃত, অল্‌তা।

জনকল্প (ত্রি) জনদূনঃ জন-কল্প। ১ মনুস্মৃতিতে সঙ্গ। ২ অথর্ববেদোক্ত ধর্ম্মাচরণবিধির ২০।১২৮।৬ মন্ত্র। “জনকল্পা সংসতি প্রজাঐব জনকল্পা” (ঐতরেয়ব্রাং ৬।২২।)

জনকীর (ত্রি) জনক-ছ (গহাদিত্যশ্চ। পা. ৩।২।১৩৯) জনকসম্বন্ধীয়।

জনকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) জনকেন স্থাপিত ঈশ্বর: জনকেশ্বরঃ।

তত্ত্ব তীর্থং। নন্দদানদীতীরস্থ একটি তীর্থ। জনকেশ্বরতীর্থে

জনকরাজ কর্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছে। (শিবপুং রোমাং)

জনখোরি, হোসেনখেল, আরমখেল এবং আক্খিদি পর্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত জনকবাড়ের ক্ষুদ্র উপত্যকাবিশাখী পার্ক-

জীর জাতিবিশেষ। ইহারাই এই শ্রেণীতে বিভক্ত—টুটকাই এবং বরকাই। ইহার সাহসী এবং সমরনিপুণ।

জনজন্ম (পুং) জনেন্তো গচ্ছতি বহিঃ-পদ-ঘট্-মুগাৎ। চণ্ডাল। জীলিগে জীপ্-হর।

জনচক্ষুস্ (স্ত্রী) জনন্ত চক্ষুরিব। চক্ষুঃ প্রকাশকঃ। স্বৰ্ঘ্য। জনজন্মাদি (পুং) জনন্ত জনিমন্তো জন্ম আদিঃ। যিনি জন্মের পূর্বে হইতে বিভ্রান্ত আছেন, পরমেশ্বর। “জননো জনজন্মাদিঃ” (বিষ্ণুঃ)

জনং (পুং) জন-ভাবে অতি। ১ ধর্মক্রিয়ানুষ্ঠান সময়ে উচ্চারিত ওষ্যাদি তুলা পাবনশব্দ বিশেষ। ২ জনন।

জনতা (স্ত্রী) জনানাং সমূহঃ। (গ্রামজনবহুভাতল্) জন-তল্-টাপ্। ১ জনসমূহ, ভিড়। জনন্ত ভাব। ২ জনস্ব, সমুদায়। ৩ উৎপাদন।

জনত্রা (স্ত্রী) জনান্ ত্রায়তে জন-ত্রৈ-ক। লোকদিগকে রোজ কিংবা বৃষ্টি হইতে যে ত্রাণ করে, ছত্র, আতপত্র, ছাতি। কাহারও মতে “জনত্রা” না হইয়া জলত্রা শব্দ হইবে।

জনদেব (পুং) জনো দেব ইব উপমি। ১ নরদেব, রাজা, ভূপতি। ২ মিথিলার একজন রাজা। একশত আচার্য্য ইহার আলয়ে থাকিয়া ইহাকে আশ্রমবাসীগণের বিবিধ ধর্ম উপদেশ দান করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের উপদেশে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। অবশেষে কপিলপুত্র মহর্ষি পঞ্চশিখ মিথিলার আসিয়া ইহাকে মোক্ষমার্গ সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিলে ইনি তত্তজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন।

(মহাভারত শান্তি ২১৮ অঃ।)

জনদ্বং (পুং) জনং জননং অতি অস্ত জনং-মতুপ্। জননগুণ-বৃদ্ধ অগ্নি। “অগ্নয়ে তপস্বতে জনস্বতে পাবকবতে স্বাহা।” (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।৮)

জনধা (পুং) জনঃ দধাতি, জন-ধা কিপ্। জনপোষক বহি। অঠরস্থিত অন্নাদির পরিপাক দ্বারা রসবীৰ্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক জীবগণকে পোষণ করে বলিয়া অগ্নির ‘জনধা’ নাম হইয়াছে।

জনন (স্ত্রী) জন-ভাবে লুট্। ১ উত্তব, উৎপত্তি। ২ জন্ম। (স্বাদৃষ্টোপনিষদ শরীরগ্রহণ)। ৩ আবির্ভাব। “যদেব পূর্ব্বং জননে শরীরম্” (কুমারঃ)। ৪ যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত ব্যক্তির সংস্কারবিশেষ; দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষারূপ জন্মগ্রহণ হেতু এই সংস্কারের “জনন” নাম হইয়াছে, আতকর্ষ। “মাতুরগ্রে হবিজননং বিতীরং যোজীবন্ধনে। তৃতীরং যজদীক্ষারং যিজন্ত প্রতিচোদনাং ১” (মহুঃ) অন্ততঃ হস্তিরিতি আধারে লুট্। ৫ বংশ। জন-গিচ্-ভাবে লুট্। ৬ উৎপাদন। “অভোক্তপোভা জননাদ্ বভূব” (কুমারঃ) জায়তি ইতি কর্ত্তরি লু। ৭ (ত্রি)

উৎপাদক। “একত্র চিরবাসো হি ন ত্রীতিজননো জবেৎ।” (ভারত পাত্যজ্ঞঃ)। (পুং)-৮ শিত্। ৯ পরমেশ্বর, বিষ্ণু। “জননো জনজন্মাদিঃ” (বিষ্ণুঃ)।

জননাশৌচ (স্ত্রী) জনন নিষিদ্ধ অশৌচ। [অশৌচ বেধঃ] জননি (স্ত্রী) জায়তে ইতি জন-ভাবে অনি। ১ উৎপত্তি, জন্ম। অন্ততঃ ইতি জন-আধারে অনি। ২ বংশ। জনস্বতি ত্রাণস্থং ইতি জন-গিচ্-কর্ত্তরি অনি। ৩ জনীনাশক গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। (শঙ্করঃ)। ৪ মালবদেশজাত জনী নামক লতা। জননী (স্ত্রী) জনয়তি ইতি জন-গিচ্-অনি; অথবা জায়তে অত্রাঃ ইতি জন-অপাদানে অনি। কৃদিকারাদিতি বিকল্পে জীপ্। ১ মাতা। ২ উৎপাদিকা। “বিশ্বজননী শক্তিঃ।” ৩ দয়া, অহুকাঙ্গা। ৪ জনীনাশক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৫ চর্ম-চটিকা, চর্মচটী, চামটিকা। (শঙ্করঃ) ৬ মুখিকা, যুইফুল। (শঙ্করঃ) ৭ পর্পটী, উত্তরদেশে পপরী বলে। ৮ কটুকা, কটকী। ৯ মঞ্জিষ্ঠা। ১০ অলঙ্কার, আলতা। ১১ অটোমাংসী। (রাজনিঃ)। ১২ উৎপাদক স্ত্রীমাত্র। “বীজপ্রয়োহজননীঃ জলনঃ কয়োতি।” (রঘুঃ)

জননীয় (ত্রি) জন-জনীয়স্ব। উৎপাদনযোগ্য।

জনপদ (পুং) জনাঃ পত্তন্তে গচ্ছন্তি অত্র ইতি জনপদ, আধারে প। অথবা জনানাং পদং আশ্রয়স্থানং যত্র। ১ দেশ, যেখানে বহুলোক বাস করে।

“ত্যাভেদেকং কুলভার্থে গ্রামভার্থে কুলং ত্যাভেৎ।

গ্রামং জনপদভার্থে-আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যাভেৎ ॥” (চাণক্য) ২ লোক।

জনপদাধিপ (পুং) জনপদস্ত অধিপঃ। জনপদের অধিপতি, রাজা।

জনপদিন্ (ত্রি) জনপদাঃ সন্তি অত্র বসেন ইনি। জনপদস্বামী।

জনপদেশ্বর (পুং) জনপদস্ত ঈশ্বরঃ। জনপদের অধীশ্বর। রাজা।

জনপ্রবাদ (পুং) জনেন্ প্রবাদঃ অপবাদঃ ৭তৎ। লোকাপবাদ, লোকনিন্দা। পর্য্যায়—কৌলীন, বিগান, বচনীয়তা। (হেমঃ)

“জনপ্রবাদান্ অবহন্ পুধরপি নরাধিপঃ” (ভাঃ ২।৭২।১৬)

২ জনরব, কিঞ্চদস্তী।

জনপ্রিয় (পুং) জনানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ শোভাজন বৃক্ষ, সজনে গাছ। (পুং স্ত্রী) ২ ধন্যাক, ধনে। (ত্রি) ৩ লোকপ্রিয়, বাহাকে লোকে ভালবাসে। (পুং) ৪ মহাদেব।

জনপ্রিয়া (স্ত্রী) হিলমোচিকাশাক, হেলাকা। কোনও কোনও স্থানে হিফা বলে।

জনবল্লভ (পুং) ১ যেতরোহিত বৃক্ষ, হিন্দীতে যেতরোহিত বলে। ২ লোকপ্রিয়।

জনভক্ষ (পুং) জনানাম ভক্ষঃ। জন-ভজ-বাহুল্য স। ১ কামনা-
পূরণ হেতু বহুমান বাহাকে ভজন করা বা ভাগবাসেন।

“সত্রাসাহো জনভক্ষো জনঃ সহঃ।” (খৃষ্ণ ২।২।১৩)

ভক্ষ-ভাবে বজ্ জনানাম ভক্ষঃ ৬৩৭। ২ মহুয়ের ভক্ষণ।

জনভূয়িষ্ঠ (ত্রি) জনা ভূয়িষ্ঠা বহুলা বজ্। ১ যে স্থানে
অনেক লোকের বাস। ২ বহুজনাগণ।

জনভূঃ (পুং) জনান্ বিভর্তি ধারয়তি পোষয়তি। জন-ভূ-
কিপ্, পিষাৎ ভূগামঃ। মহুয়গণের ভরণকর্তা, যিনি
লোকদিগকে পোষণ করেন।

জনময়ক (পুং) জনানাম ময়কঃ নাননঃ। জন-মৃ-বৃন্।
মহুয়নাশকারী দেশব্যাপী রোগ, মহামারী সমুৎপাদক পীড়া।
(বৃহৎসংহিতা ৭৮।২৪)

জনমর্যাদা (স্ত্রী) জনানাম মর্যাদা। লোকিকরীতি, লোকাচার।

জনমেজয় (পুং) জনান্ শক্রজনান্ এজয়তি প্রতাপৈঃ কম্পয়তি
ইতি। এজ্ কম্পনে গিচ্-শ্চ। ১ বিষ্ণু, জনর্দ্দন। ২ কুরুনৃপতির
পঞ্চমপুত্র। এই কুরু স্বর্ঘ্যতনয়া তপতীর পুত্র। ৩ পুরু-
নৃপতির এক পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অঃ) ৪ অভিমহুয়তনয় রাজা
পরীক্ষিতের পুত্র। [জন্মেজয় দেখ।] জনমেজয় মন্ত্রিদিগের
নিকটে পিতা পরীক্ষিতের বৃত্ত্যবিবরণ শুনিয়া পিতৃহস্তা
তক্ষকের উপরে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। এই সময়ে মহর্ষি
উতক তক্ষক কর্তৃক নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া প্রতিবিধান
মানসে হস্তিনায় আগমন করিলেন, এবং রাজা জনমেজয়কে
বথোচিত আলীক্সা করিয়া তক্ষককে প্রতিকূল দিবার
নিমিত্ত উত্তেজিত করিলেন। তখন জনমেজয় ঋষিকগণকে
সর্বকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত স্তম্ভসত্র আরম্ভ করি-
লেন। বজ্র আরম্ভ হইল। ঋষিকগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক
হোম করিতে লাগিলেন। নামোচ্চারণপূর্বক সর্পগণের
আহুতি আরম্ভ হইলে সর্পগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ঘন ঘন
নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিত্য অনায়ত্ত হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে
পতিত হইতে লাগিল। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন
হইল। অরৎকারপুত্র অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া নিজ ভাগিনের
আত্মীককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে জনমেজয়ের নিকট
প্রেরণ করিলেন। আত্মীকবজ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।
সভাহ সকলেই আত্মীকের গুণে অত্যন্ত প্রীত হইল।
জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋষিকগণকে
বলিলেন, “যদি ইন্দ্র তক্ষককে ছাড়িয়া না দেন, তবে
ইন্দ্রের সহিত একত্র তক্ষককে ভয়সাৎ করুন।” রাজাজ্ঞা
পাইয়া হোতৃগণ তদনুসারে কার্য আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রের
সহিত তক্ষক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে

ভাগ করিলেন, তক্ষক নিভাত কান্ড হইয়া প্রমত্তচিত্তে ঋষি-
শিবার সমীপবর্তী হইতে লাগিল। ঋষিকগণ বলিলেন,
“মহারাজ! আপনার আত্মীক সিদ্ধি বিবরে আর কোনও
প্রতিবন্ধক দেখি না।” তখন জনমেজয় আত্মীককে বলিলেন,
“ব্রাহ্মণকুমার! আপনার আত্মীক কি বলুন, তাহা আপনাকে
প্রদান করিতেছি।” আত্মীক বলিলেন, “মহারাজ সর্পসত্র
নিবৃত্ত হউক এবং আমার মাতুলকুল নিরাকুল চিত্তে বথোজ্ঞা-
ক্রমে অবস্থিতি করুন।” জনমেজয় “তখাত্ত” বলিয়া সর্পসত্র
হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

তৎপরে জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞের অহুতান করেন।
(মহাভারত, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণে পরীক্ষিপুত্র
জনমেজয়ের অশ্বমেধ প্রসঙ্গ আছে।)

৫ পুরঞ্জয়ের এক পুত্র। (হরিবংশ) ৬ সোমদত্তের এক
পুত্র। (বিষ্ণুপুং) ৭ স্তম্ভতির পুত্র। (ভাগ ৯।২৩৬) ৮
বৃত্ত্যজয়ের পুত্র। (ভাগ ৯।২৩২)

৯ একটা প্রসিদ্ধ নাগ। (পঞ্চনিঃশ ব্রাং ২৫।১৫)

১০ উৎকলের একজন সোমবংশীয় রাজা। রাজা যযাতির
পিতা। ইনি পূর্বে তিলকের রাজা ছিলেন, ওড়রাজকে
পরাজয় করিয়া উৎকল অধিকার করেন। ত্রিকলিঙ্গাধিপতি
মহাভবগুপ্তের আধিপত্যকালে ইনি উড়িষ্যা শাসন করিতেন।
[জগন্নাথ শব্দ দেখ।]

জনমোহ (পুং) বৃহ-বজ্, জনানাম মোহঃ ৬৩৭। মহুয়দিগের
মোহ, অচেতত্ত্ব।

জনয়ৎ (ত্রি) জন-গিচ্-শত্। উৎপাদক।

জনয়তি (স্ত্রী) জন-গিচ্-ভাবে অতি। উৎপাদন।

“জনয়তো হ্য সংযোমি” (শুক্রবজ্ঃ ১।২২)

জনয়ন্তী (স্ত্রী) স্তম্ভগমঃ [জনয়ৎ শব্দ দেখ।]

জনয়িতৃ (পুং) জন-গিচ্-তৃচ্। ১ পিতা। ২ জন্মের কারণ।
উৎপাদক।

জনয়িত্রী (স্ত্রী) জনয়িতৃ-স্ত্রিমাৎ স্ত্রী। মাতা।

“জনয়িত্রীমলক্রে যঃ প্রায়শ্চইব প্রিয়ম্।” (রঘুবংশ)

জনয়িকু (ত্রি) জন-গিচ্-ইকুচ্। জননশীল, উৎপাদনশীল,
উৎপাদক।

জনয়োপন (ত্রি) জনাচ্ছাদকর। (বেদ)

জনরঞ্জন (ত্রি) জনানাম রঞ্জনঃ জন-রজ-ল্য। মহুয়গণের
চিত্তাকর্ষণকারী।

জনরব (পুং) জনেনু লোকেষু রবঃ প্রবাদঃ ৭৩৭। ১ নিন্দা,
লোকাপবাদ। লোকে যে কথা রটায়। ২ বহুলোকের
কোলাহল। ৩ জনপ্রতি, কিংবদন্তী।

জনহান (পুং) জনসমূহ রাজ্যে শোভিতে ইতি রাজ্য কিপু। জন-
হান। "জনহানসি রক্ষোহা" (ভৃক্মজঃ ৫।২৪)

জনরাজন (পুং) [২৬] জনাধিপ, রাজা।

জনলোক (পুং) ভূমিদি সন্তলোকান্তর্গত পঞ্চম লোক।

"ভূত্বঃ স্বর্গহৈশ্চ জনচ্ তপএবচ্।

সন্ত্যলোকচ্ লৈহৈতে লোকান্ত পরিকীর্তিতাঃ।"

জনলোকে প্রকার মানসপুত্রগণ এবং উর্দ্ধরেতা বোপীজগণ
সর্বদা স্থখে বাস করেন। স্বল্পপুত্রাঙ্গীর কানীখণ্ড মতে জন-
লোক দুইকোটা যোজনব্যাপী এবং ক্ষিতি হইতে কোটি
যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত।

জনবাদ (পুং) জনানাং বাদঃ কথনং। ১ জনপ্রবাদ। ২
নিদা। ৩ শুভব।

জনবাদিন্ (ত্রি) জনবাদকারী।

জনবার, রাজপুত্রদিগের একটা শ্রেণী। ইহাদের সংখ্যা
অধিক নহে, বুদ্ধেলখণ্ডের সিহোঙা এবং সিঘনী, কানপুরের
বহুলাবাদ, বিঠুর, এবং ফতেপুরের কুটিরাগুণীয়ে ইহাদের
বাস আছে।

জনবিদ্ (পুং) জনান্ বেত্তি জন-বিদ্-ক্টিপ্। বহুজনের
অধিকারী।

জনব্যবহার (পুং) জনানাং ব্যবহারঃ। প্রচলিত রীতি,
লোকাচার।

জনশ্রী (স্ত্রী) ১ যে জন-সমীপে গমন করে। ২ পুয়ার একটা নাম।

জনশ্রুত (ত্রি) জনে শ্রুতঃ বিখ্যাতঃ। ১ লোকবিখ্যাত।

(পুং) ২ একজন রাজার নাম। অপত্যার্থে ইন্ প্রত্যয়
করিয়া "জানশ্রুতি" পদ হয়।

জনশ্রুতি (স্ত্রী) জনেভ্যঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং। ১ লোকপ্রবাদ।

২ একজন রাজা, ইনি অতি দানশীল ছিলেন। ছান্দোগ্য
উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

জনস্ (স্ত্রী) জন-গচ্-অস্ত্। ১ সর্গভূত জনয়িত্রী, ভাবা
পৃথিবী। এই অর্থে দ্বিঘটনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২ জন-

লোক। ("জনন্তপঃ সন্ত্যনিবাসিনো জনাঃ"। ভাগ১ ৩।১৩২৫।)

জনসমূহ (পুং) জনানাং সমূহঃ। লোকের সমষ্টি।

জনসংক্ষয় (পুং) জনানাং সংক্ষয়ঃ নাশঃ। জনসমূহের ক্ষয়,
বিনাশ।

জনসংবাদ (পুং) জনানাং সংবাদো যত্র। জনাকীর্ণ স্থান,
যে স্থানে বহুজনের একত্র সমাবেশ হয়।

জনসংসদ (স্ত্রী) জনানাং সংসৎ। বহুলোকপরিপূর্ণ সভা, সমাজ।

জনস্থ (ত্রি) জনসমীপে অবস্থিত।

জনস্থান (স্ত্রী) জনস্ত স্থানং ভূভাগঃ। ১ লোকবসতি, লোকালয়।

"জনস্থানে ভ্রান্তঃ কনকমৃগকৃষ্ণাঙ্কিতমিরা" (রাহিত্যাদর্শণ)

২ দণ্ডকারণ্য। (জটায়ব)। ৩ দণ্ডকারণ্য সমীপবর্তী

স্থানবিশেষ। রামারণে লিখিত আছে—ইক্ষাকুরাজপুত্র দণ্ড
ভ্রাতাচার্যের কন্যা অরজাকে বলাৎকার করিলে পর ভ্রাতাচার্য
কৃষ্ণ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। শাপ-প্রত্যয়ে
দণ্ডরাজ সপ্তরাত্রি মধ্যে ভ্রমীভূত হইলেন। সেই দণ্ডরাজের
নাম হইতে দণ্ডকারণ্য নাম হইয়াছে এবং ভগবিশ্ব যে
স্থানে অবস্থান করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাকে 'জনস্থান'
বলে। ৪ দণ্ডকারণ্যে রাবণবলনিবেশ স্থান। 'জনস্থানং
নাম দণ্ডকারণ্যে রাবণবলনিবেশস্থান' (রামায়ণটীকার
রামানুজ)। এই স্থানে ধর দুবর্ণ প্রভৃতি সৈন্তগণ
অবস্থান করিত। "থরেনাসীমহদৈবঃ জনস্থাননিবাসিনা"
(ভারত আদি ২৭৬ অঃ)

জনস্থানরুহ (পুং) জনস্থানে রোহতি কহ-ক। জনস্থানে
বাহা উৎপন্ন হয়। সেখানকার বৃক্ষাদি।

জনা (স্ত্রী) জন-অঙ্ টাপ্। ১ উৎপত্তি। (মুদ্রবোধ)।

২ মাহিষতীরাজ নীলধ্বজের পত্নী। ইনি গন্ধাত্ত ছিলেন।

তাহার রূপার এক শিবকিঙ্কর জনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া
প্রবীর নামে খ্যাত হইয়াছিল। জনার চুহিতা বাহার
সহিত অগ্নিদেবের বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের আশ্রমেধিক
অথ মাহিষতীপুরীতে উপস্থিত হইলে প্রবীর সেই অথ
আবদ্ধ করিলেন। নীলধ্বজ অথ কিরাইয়া দিতে অহরোধ
করিলে বীরমাতা জনা তাহার কথায় বাধ্য দিয়া পুত্রকে
যুদ্ধ করিতে অহুমতি দিলেন এবং অথ সৈন্তগণকে সাহস দানে
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অনেক
কষ্টে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিল এবং প্রবীর নিহত হইল।
যুদ্ধের পরে অগ্নিদেবের পরামর্শ মত কুরুভক্ত নীলধ্বজ অর্জু-
নের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলে, পুত্রশোকাক্ত তেজস্বিনী জনা
রাজাকে বহুবিধ ভৎসনা করিয়া মহাতেজে উদ্যাদিনীর ভ্রাতৃ
সমরক্ষেত্রে ছুটিলেন। তাহার তেজে সকলেই ভয়সাৎ হইতে
লাগিল। বহু কষ্টে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবগণ রক্ষা পাইল।
জনা পুত্রশোকে অর্জুরিত হইয়া অবশেষে জালুবীক্রেড়ে ঝাঁপ
দিয়া দাক্ষণ শোকানল নির্ঝাপিত করিলেন। (জৈমিনি ভারত)

জনাই, পুণা জেলায় কুণ্ণবিগণ কর্তৃক উপাসিত সপ্তমাতৃকার
মধ্যে একটা। এই সপ্তমাতৃকা সাধারণের অনিষ্ট করেন ভাবিয়া
কুণ্ণবিগা সর্বদাই ইহাদের পূজা দেয়। সাতটীর নাম—জ্বাই,
জোখাই, জনাই, কোলকাই, মেতিসাই, মুকাই ও নবলাই।

২ হুগলীজেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। এখানকার
রস্করা ও মনোহরা প্রসিদ্ধ।

জনাকীর্ণ (ত্রি) জনৈঃ আকীর্ণঃ আ-কৃ-ক্ত। বহুলোকপরিবৃত।
জনাকার (পুং) জনস্ত আকারঃ ৩তং। লোকাচার, প্রচলিত
 পদ্ধতি, রীতি।

জনাজাত (দেশজ) প্রত্যেক লোককে বিশেষ করিয়া,
 প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া।

জনাতিগ (ত্রি) জনমতীত্য গচ্ছতি অতি-গম্-ড। যে জনকে
 অতিক্রম করে। লোকাভীত, অলৌকিক।

জনাধিনাথ (পুং) ৩তং। ১ জনসমূহের অধিনাথ, প্রভু।
 ২ রাজা। ৩ বিহু।

জনাধিপ (পুং) জনানাং অধিপঃ অধি-পা-ক। রাজা, নরপতি।

জনানা (পারসীজ) ১ জী-সমূহ। ২ জীলোক। ৩ অন্তঃপুর।

জনাস্ত (পুং) জনস্ত অস্তঃ ৩তং। ১ দেশ, সীমাবদ্ধ প্রদেশ,
 জেলা। (ধনঞ্জয়) ২ জনসমীপ। ৩ জনমধ্যাদা। ৪ যম।
 (ত্রি) ৫ মনুষ্যানাশক। ৬ যে স্থানে মনুষ্যের বাস নাই।

জনাস্তিক (স্ত্রী) জনস্ত অস্তিকঃ সমীপঃ। ১ জনসমীপ। ২ অপ্র-
 কাশ ভাবে কথোপকথন। অনেকে একত্র আছে এমন স্থলে
 অল্পে বসিতে বা জানিতে না পারে এরূপ কথোপকথন।
 নাটকে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

“ত্রিপত্যককরণেণাভ্যাসপব্যাস্তুরা কথং।

অন্তোহন্তামন্তং যং স্থাং জনাস্তে তজ্জনাস্তিকঃ।” (সাহিত্যদর্পণ)

জনান (পারসী) ১ হজুর, সম্মানহচক উপাধি। ২ লোকপালন।

জনাবাই, বিথোবার উপাসিকা জনৈক মহারাষ্ট্রমহিলা।
 সোলাপুরের অধীন পুরপুরের বিথাত গোপালকৃষ্ণের
 মন্দিরের নিকটে জনাবাইর কুটার আছে। কুটার মধ্যে দুইটি
 প্রস্তরমূর্তি আছে। একটি বিথোবার, অপরটি জনাবাইর।
 কুটার মধ্যে একখানি অতি পুরাতন কস্থা আছে। প্রবাদ
 এইরূপ যে ঐ কস্থাখানি জনাবাইর। এ অঞ্চলের লোকেরা
 জনাবাইরও পূজা করে।

জন্য (দেশজ) শস্তবিশেষ। বৈজ্ঞানিক নাম Zea Mays;
 ইংরাজীতে মেজ ও ইণ্ডিয়ানকর্ন (Maze, Indian Corn);
 বঙ্গভাষায় জন্য, ভুট্টা এবং জোয়ার (ছোটনাগপুর) এবং
 হিন্দীতে ভুট্টা, মকা, মকাই, জুন্নি, বড় জুয়ার এবং কুকরি
 বলে। সংস্কৃত পর্যায়—যবনাল, যোনাল, জুর্ণালয়, দেবধাণ্ড,
 জোস্তালা এবং বীজপুষ্ণিকা। (হেম) [যবনাল দেখ।]

জন্য বৃক্ষ প্রায় ৬৭ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইয়া থাকে।
 পত্রগুলি দীর্ঘ এবং প্রায় ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত। বৃক্ষদণ্ডটি
 ইক্ষু বৃক্ষের স্থায় প্রস্থিবিশিষ্ট। গাছের মধ্যস্থল হইতে অগ্রভাগ
 পর্যন্ত কয়েকটি গ্রন্থিতে ফল ধরিয়া থাকে। ফলগুলি প্রায়
 অর্ধহস্তপরিমিত দীর্ঘ এবং খেত ও সবুজবর্ণ বিশিষ্ট পাতলা

পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত। কলের মূলদেশ প্রায় ১৫ ইঞ্চি
 স্থল এবং অগ্রভাগ ক্রমে হ্রাস। আবরণ উন্মোচন করিলে খেত-
 বর্ণ কিষা ঈষৎ পীতাক দানা দৃষ্ট হয়। লোকে সেই দানাগুলি
 খাইয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এখন জন্যের চাষ হইয়া থাকে।
 ডি-কণ্ডোল নামে একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন যে,
 আমেরিকা মহাদেশস্থ নিউ গ্রানোডা নামক দেশে প্রথমে
 জন্য জন্মে। কোন্ সময়ে উহা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে
 আনীত হইয়াছিল, তাহার নির্দেশ করা এখন অত্যন্ত কঠিন।
 কোন কোন যুরোপীয়ের মতে বোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ
 লক্ষা, মরিচ, আনারস প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত জন্যও
 লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃ যবনাল নামক শব্দের
 উল্লেখ থাকার ঐরূপ অনুমান সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।
 ভারতবর্ষে বাহ্যরূপে জন্যের চাষ হইয়া আসিতেছে।
 কি শীতপ্রধান, কি গ্রীষ্মপ্রধান সকল প্রকার স্থানেই
 জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঋতু ও স্থানভেদে
 জন্য বৃক্ষের দৈর্ঘ্য এবং পত্রাদির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি
 হয়। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর
 শেষভাগে এবং যুরোপে তাহার কিছু পূর্বে জন্যের চাষ
 আরম্ভ হয়। জন্য প্রধানতঃ দুই প্রকার; এক প্রকার কাঁচা
 খাইতে হয় এবং অল্প প্রকার পাকা খাইতে হয়। ভারত-
 বর্ষের সর্বত্রই জন্য জন্মিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্জাব, অযোধ্যা,
 উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে জন্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন
 হয় এবং সেখানকার অধিবাসীদিগের ইহা প্রধান খাদ্য।

যে সমুদয় জন্য কাঁচা খাইতে হয়, খাইবার পূর্বে সে
 গুলিকে অগ্নির উত্তাপে কিঞ্চিৎ ঝলসাইয়া লইতে হয়। জন্য
 হইতে ছাতু, ময়দা, শুজি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে
 দক্ষিণ আমেরিকায় চিকা নামে এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পিটো
 নামে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। জন্যের কাঁচা গাছ
 কাটিয়া অল্প প্রভৃতির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
 পাকা গাছ শুকাইলে তদ্বারা ঘরের চাল হাওয়া যায়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জন্যতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।
 ঐ তৈলে একপ্রকার সাবান প্রস্তুত হয়।

চিকিৎসাকার্যেও জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমান
 হকিমদিগের মতে ইহা প্রদাহনিবারক, স্ফোচক এবং পুষ্টি-
 কারক। যুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে জন্য হইতে পোলেন্টা
 (Polenta) অর্থাৎ জন্যের শুজি এবং মেজিনা (Maizena)
 অর্থাৎ জন্যের ময়দা প্রস্তুত করিয়া শিশু ও দুর্বলদিগের
 অল্প বলকারক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ডক্টর,

মুদ্রাশয়ের প্রদাহ প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা অনেক উপকার পাওয়া যায়।

পটাল সপ্ট নামে একপ্রকার লবণও জনাব্দীন হইতে প্রস্তুত হয়। জন্মগি প্রভৃতি দেশে জনাব্দীন কলের পাতলা আবরণ হইতে অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হয়।

২ সুখিয়ানা এবং কিয়োকপু হইতে সমদ্রবর্তী একটি প্রাচীন নগর। পূর্বে শতক্র মনী ইহার নিকট দিরা প্রবাহিত হইত। তির তির গ্রন্থে ইহার জজনাব্দীন, জগনব্দ, হজনব্দ, জানিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীগণ ইহাকে জনাব্দীন বনে এবং তাহাদিগের বনে এই নগর জমক রাজ্য কর্তৃক স্থাপিত। এখানে বহুদ্রব্যাদি একটি মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। স্তূপ খনন করিলে অতি প্রাচীন অষ্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্তূপ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে হৃৎকক্ষীভিত্তি একটি স্ত্রীলোক জনাব্দীন নগরে তাহার ভ্রাতার আশ্রয়ে আসিয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতৃবধু অসুস্থাবশে তাহাকে কোনরূপ আহাৰ্য্য দিত না। স্ত্রীলোকটি বাড়ী বাড়ী মরদা পিষিয়া পুত্রবরের নিমিত্ত অতি কষ্টে খাদ্য সংগ্রহ করিত। ভ্রাতৃবধু তাহাও বন্ধ করিয়া দিল। কিছু দিন অতীত হইলে তাহার পুত্রবরকে কষ্টপূৰ্ণ দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, কাপড় কাচিয়া আসিয়া সে কাপড় নিজড়াইয়া পুত্রদিগকে জল পান করায়, তাহা শুনিয়া তাহার ভ্রাতৃবধু তাহাকে কাপড় কাচিতে বারণ করিল, তাহাতে সে নিতান্ত মর্দাহত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল যেন জনাব্দীন নগর তৎক্ষণাৎ উন্টাইয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। সেই হইতে নগর উন্টাইয়া যাওয়াতে এই মৃত্তিকা-স্তূপ হইয়াছে।

জনাব্দীন (পুং) জনাঃ জর্জবাঃ ইব উপনিং। বহুলোকের সমাবেশ, লোকসমুদ্র।

জনাব্দীন (পুং) পারিবারিক উপাধি।

জনাব্দীন (পুং) (১) জনং অসুস্থবিশেষং অর্দ্রিতবান্ ইতি জন-অর্দ্র-গিচ্-কর্ত্তরি ল্য। (২) অথবা জনৈঃ অর্দ্র্যতে বাচ্যতে পুরুষার্থলভ্যায় ইতি জন-অর্দ্র-কর্ম্মণি ল্যুট। অথবা (৩) জনং (জন-ভাবে ঘঞ) জন্ম অর্দ্রয়তি হস্তি তত্ত্বজ্ঞ মৃত্তিকাদানেন ইতি জন-অর্দ্র-ল্য। অথবা (৪) জনান্ লোকান্ অর্দ্রয়তি হররূপেণ সংহারকৃত্বাৎ ইতি। অথবা (৫) জনয়তি উৎ-পাদয়তি ব্রহ্মরূপেণ ইতি জনঃ (জন-গিচ্-পচাভ্) অর্দ্রতি হস্তি লোকান্ হররূপেণ ইতি অর্দ্রনঃ (অর্দ্র-ল্য) জনশাসনৌ অর্দ্রনশ্চেতি (কর্ম্মধা)। অথবা (৬) জনান্ লোকান্ অর্দ্রতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি রক্ষণার্থং পালকত্বাৎ ইতি। (ভরত)

১ বিষ্ণু। ২ গয়্যাতীর্থে-জনাব্দীন নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি। গয়্যাক্ষেত্রে ইহার হস্তে জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড অর্পিত হইয়া থাকে। গয়্যামাহাশ্ব্যে লিখিত আছে যে যাহার উদ্দেশে এইরূপ পিণ্ড অর্পিত হয়, তাহার মৃত্যুর পরে স্বয়ং ভগবান্ জনাব্দীন সেই পিণ্ড তাহার জন্ত গয়্যাম্বিরে অর্পণ করেন।

“বস্ত্র পিণ্ডো যয়া দত্তস্তব হস্তে জনাব্দীন।

যমুদিত্ত স্বয়া দেব! তস্মিন্ পিণ্ডো মৃতে প্রোক্তো ॥

এব পিণ্ডো যয়া দত্তস্তব হস্তে জনাব্দীন।

অন্তকালে গতে মহৎ স্বয়া দেহো গয়্যাম্বিরে ॥”

৩ শালগ্রামশিলা বিশেষ। ইহার লক্ষণ পদ্মপুরাণে পাতালধণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

“সশঙ্খচক্রাজগদং জনাব্দীনমিহো নমঃ।

উপেক্ষ্য গদিনিং সাবিপদশঙ্খ নমোহস্ত তে।”

ইহার উপাসনা করিলে মোক্ষলাভ হয়। (কর্ম্মলোচন)।

৪ (ত্রি) জনপীড়ক, লোকপীড়নকারী।

জনাব্দীন, ১ একজন বৈদ্যাত্তিক, অমৃত্যুভিষকপাচার্য্যের শিষ্য। ইনি তত্ত্বালোক নামে বেদান্ত রচনা করেন।

২ একজন সংস্কৃত কবি।

জনাব্দীন ভট্ট, আনন্দতীর্থপ্রণীত ভগবদ্ভাষ্যপরিণয়ের এবং মেঘদূতের একজন টীকাকার। এ ছাড়া ইনি মন্ত্রচক্রিকাভ্র নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার টীকার স্থিরদেব, বল্লভ এবং আসড়ের নামোল্লেখ আছে।

২ বিবাহপটলনামক সংস্কৃত-জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা।

৩ একজন খ্যাতনামা সংস্কৃত-গ্রন্থকার। ইহার রচিত বৈরাগ্যশতক, এবং শৃঙ্গারশতক এই দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। জনাব্দীন বিবুধ, একজন বিখ্যাত টীকাকার। অনন্তের শিষ্য। ইনি শ্লোকদীপিকা নামে কাব্যপ্রকাশটীকা, রঘুবংশটীকা এবং ভাবার্থদীপিকা নামে বৃত্তরত্নাকরটীকা প্রণয়ন করেন।

জনাব্দীন ব্যাস, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। বাবুজী ব্যাসের পুত্র, বিষ্ণুচরণ ব্যাসের পৌত্র এবং জয়রাম শ্রায়পকাননের শিষ্য। ইনি পদার্থমালা ও গুচ্ছার্থদীপিকা-নামক বৈশেষিকদর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

জনাব্দীন (পুং) জনান্ অস্মাতি ভক্ষয়তি জন-অশ্ ভোজনে ল্য। ১ বৃক, নেকড়িয়া বাঘ। (রাজনিং) ২ (ত্রি) লোকভোজী, মনুষ্যভক্ষক। ৩ (ক্লী) লোকভক্ষণ।

জনাব্দীন (পুং) জনান্যং আশ্রয়ঃ ৬৩৭। ১ মণ্ডপ, কোনও কাণ্ড জন্ত কিছুদিনের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ। ২ গৃহ, ঘর। ৩ লোকালয়। ৪ মনুষ্যদিগের আশ্রয় জন্ত নির্মিত সরাই গৃহ, পাছশালা।

জনাসাহ (পুং) [বৈ] জনান্ সহতে সহ-কিপ্। লোকসহিষ্ণু।
 জনি (স্ত্রী) জন-ইণ্ (জনিসমিত্যমিণ্। উণ্ ৪১২৯।) ১
 উৎপত্তি। ২ নারী। ৩ মাতা। ৪ জুবা, পুত্রবধূ। ৫ জায়া,
 ভাৰ্যা। জায়তে আরোগ্যমময়া। ৬ ঔষধিবিশেষ। ৭ জতুকা।
 (শব্দরত্ন) ৮ জনী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৯ জন্মভূমি,
 জন্মস্থান। [জনী দেখ।] ১০ বেদে সম্ভবতঃ জনি শব্দে
 “অজুলি” বুঝায়। যথা “অনিতিঃ সমিদ্ধ” অর্থাৎ অজুলি দ্বারা
 প্রজলিত।

জনিকা (স্ত্রী) জনি-স্বার্থে কন্ ততঃ দ্বিগাং টাপ্। ১ জনি।
 [জনি দেখ।] জন-গিচ্-খুল্-টাপ্। ২ জমনকত্রী, উৎপাদিকা স্ত্রী।
 জনিকাম (পুং) জনিঃ ভাৰ্যাঃ কামরতে জনি-কম-জ্ঞ।
 ক্রীণাতেজু।

জনিত (ত্রি) জন-গিচ্-ক্ত। ১ উৎপাদিত। জন-ক্ত। ২ উৎপন্ন।
 জনিতব্য (ত্রি) জন-তব্য। জন্মিবার যোগ্য।
 জনিত্ব (পুং) জনরতি ইতি জন-গিচ্-ত্বচ্। নিপাতনাং গিলোপ।
 ১ পিতা। (শব্দরত্ন) জন-ত্বচ্। (ত্রি) ২ যে জন্মিয়া থাকে।
 “জনিতারমপি ত্যক্ত। নিঃস্বঃ গচ্ছতি দূরতঃ।”

জনিত্রী (স্ত্রী) জনিচ্-দ্বিগাং ঙীষ্। মাতা। (শব্দরত্ন)
 জনিত্ব (পুং স্ত্রী) জন-গিচ্-ইত্বন্। ১ পিতা। ২ মাতা। জন-
 ভবিষ্যতি ইত্বন্। ৩ জনিষ্যমাণ, বাহা জন্মিবে। (স্ত্রী)
 ৪ ভাৰ্যাস্ব।

জনিত্বন (স্ত্রী) জন-ভাবে ইত্বন। ১ জনন, জন্ম। ২ ভাৰ্যাস্ব।
 জনিত্বা (স্ত্রী) জন-ইত্বন্-টাপ্। মাতা।
 জনিত্র (স্ত্রী) জন-আধারে ত্র। জন্মস্থান।
 জনিদা ((স্ত্রী) [বৈ] জনি-দা-ক দ্বিগাং টাপ্। যিনি ভাৰ্যা
 প্রদান করেন।

জনিনীলিকা (স্ত্রী) জন্মা উৎপত্তা নীলিকা। মহানীলী বৃক্ষ।
 জনিবৎ, জনিমৎ (পুং) জনি-জন্ম মতৃপ্। জন্মযুক্ত। বেদে
 “জনিবৎ” এইরূপ প্রয়োগ আছে।
 জনিমন্, জনিমা (পুং) জন্মতে ইতি জন-ঔগাদিক ইমনিন্।
 জন্ম।

জনিষ্য (ত্রি) জন বাহুলকাৎ ভবিষ্যতি স্ত্র। জনিষ্যমাণ, বাহা
 জন্মাইবে। “জাতো বা জনিষ্যো বা” (রামায়ণ)

জনী (স্ত্রী) জন-ইন্-দ্বিগাং ঙীষ্। জায়তে সম্ভতিৰ্ভাঃ। ১
 বধূ। ২ জন-ভাবে ইন্। উৎপত্তি। ৩ জনী নামক গন্ধদ্রব্য।
 ৪ ঔষধিবিশেষ। জায়তে আরোগ্যমময়া। পর্যায়—জতুকা,
 রজনী, জতুকা, চক্রবর্তিনী, সংস্পর্শা, জতুকা, জনি, জননী।
 জনীন (ত্রি) জন-খ। ১ জনের হিতকারী। ২ যাহার যেকোন
 প্রয়োজন ভূষণযোগী, যথাপ্রয়োজন।

জনীবোগ তুর্থন্ মির্জা, সিদ্ধপ্রদেশের অন্তর্গত ঠাটের একজন
 শাসনকর্তা। ইহার পিতামহ মির্জা মহম্মদ বাকীর মৃত্যু হইলে
 ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসন লাভ করেন। মহম্মদ বাকী
 জীবিত থাকিতে সম্রাট অকবর শাহ জনীবোগের সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার লাহোরে গিয়াছিলেন। জনী-
 বেগ সাক্ষাৎ না করায় সম্রাট জুঁক হইয়া ১৫৯১ খৃঃ অব্দে
 বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিম খাঁকে তাঁহার বিবাহ
 পাঠাইয়া দিলেন। ওরা নববধর উত্তর দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল,
 তাহাতে জনীবোগ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তৎপরে
 জনীবোগ সম্রাটের বশতঃ স্বীকার করিলে আবদুল রহিম খাঁ
 জনীবোগের কছার সহিত নিজ পুত্র মির্জা জৈরিচের বিবাহ
 দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া (১৫৯২ খৃঃ অব্দে) সম্রাটের নিকট
 আসিলেন। অকবর উচ্চ উপাধি দানে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি
 করিলেন। তখন হইতে সিদ্ধরাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের
 অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে বর্হানপুরে জনীবোগের
 মৃত্যু হয়।

জন্ম (স্ত্রী) জন উ। জন্ম, উৎপত্তি।

জন্মস্ (স্ত্রী) জন্ম-উসি। জন্ম।

জন্ম্ (স্ত্রী) জন্ম দ্বিগাং উঙ্। জন্ম। (শব্দরত্ন)

জন্মেস্ত্র (পুং) জন ইত্ব ইব উপমিৎ। নৃপতি, রাজা।

জন্মেবাদ (পুং) অনুক্ সৎ। জনবাদ, জনশ্রুতি, কিম্বদন্তী।

জন্মেশ, জন্মেশ্বর (পুং) নৃপতি, রাজা।

জন্মেষ্ঠ (পুং) ৬তৎ। ১ মৃদগরপুষ্পবৃক্ষ। ২ (ত্রি) জনাতিমত,
 লোকের বাহিত।

জন্মেষ্ঠা (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ জতুকা। ২ বৃদ্ধিনামক ঔষধবিশেষ।
 ৩ হরিদ্রা। ৪ জাতীপুষ্প।

জন্মেদাহরণ (স্ত্রী) জনৈরদাহ্রিতে কথ্যতে জন উৎ-আ-হ
 কশ্মণি লুট্। যশঃ, সুখ্যাতি।

জন্মে (ত্রি) জনান্ অবতি রক্ষতি জন-অব-কিপ্ (উট্
 বৃদ্ধিচ্।) জনাব্, জনরক্ষক।

জন্মেঘ (পুং) জনানাং ওষঃ সমূহঃ। জনসমূহ, ভিড়।

জন্ম (পুং) জায়তে ইতি জন-ঔগাদিক তূন্। ১ প্রাণী, জন্মলীল
 জীব। ২ মায়ামোহবশতঃ দেহাশ্রয়ভিমাত্রী জীব। “জানমতি
 সমস্তশ্র জন্তোর্বিশয়-গোচরে” (চণ্ডী) ৩ মনুষ্য। (এই অর্থে
 বহুবচনে প্রয়োগ হয়)। ৪ সৌমকরাজপুত্র। সৌমকের
 একশত রাণী ছিল। বৃদ্ধবয়সে সেই ভাৰ্য্যায় জন্ম নামে পুত্র
 জন্মিল। রাজা এক শত পুত্র ইচ্ছা করিয়া সৌমকের দ্বারা
 জন্তর বপা লইয়া হোম করাইলেন। তখন জন্ম হইতে সৌম-
 কের এক শত পুত্র হইল। (ভারত ৩১২৭-১২৮ অঃ)

জন্তুক (পুং) জন্তু-বাহে-কন। ১ জন্তু।

জন্তুকনু (পুং) জন্তুশেতনাবিশিষ্টঃ কনুঃ। কুমিশ্র, জীবিত শব্দ।

জন্তুকা (স্ত্রী) জন্তুভিঃ কারতি প্রকাশতে জন্তু-কৈ-ক টাপ্।

১ লাক্ষা। ২ নাড়ীহিঙ্গু।

জন্তুয় (পুং) জন্তুন্ কুমীন্ হস্তি হন-টক্। ১ বীজপুত্র বৃক্ষ, টাবা-
নেবু। (স্ত্রী) ২ বিড়ঙ্গ। ৩ হিঙ্গু, হিং। (ত্রি) ৪ প্রাণিঘাতক।

জন্তুয়ী (স্ত্রী) জন্তুয়-স্ত্রিয়াং ডীর্ঘ। বিড়ঙ্গ।

জন্তুনাশন (স্ত্রী) জন্তুন্ কীটান্ নাশয়তি নশ্-গিচ্-ল্যু। ১ হিঙ্গু।

(পুং) ২ বিড়ঙ্গ।

জন্তুপাদপ (পুং) জন্তুপ্রধানঃ পাদপঃ। কোষাশ্রয় বৃক্ষ,
কেওড়া। (রাজনি)।

জন্তুকল (পুং) জন্তবঃ কীটাঃ কলে যন্ত। উদ্বহর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর।

জন্তুমে, জন্তুমান্ (ত্রি) জন্তবঃ সন্ত্যস্তাং বাহুল্যেন মতুপ্।

যাহাতে অধিক পরিমাণে (কীটাদি) জন্তু থাকে। জীলিঙ্গে
জন্তুমতী।

জন্তুমারিন্ (পুং) জন্তু-মৃ-গিচ্-ইনি। জীবঘাতী।

জন্তুমারী (স্ত্রী) জন্তুন্ কুমীন্ মারয়তি মৃ-গিচ্-অণ্-ডীর্ঘ।
নিষ্কবৃক্ষ, পাতিনেবু।

জন্তুলা (স্ত্রী) জন্তুন্ কীটান্ লাতি আদদাতি জন্তু-লা-ক টাপ্।

কাশতৃণ, ইহাতে অনেক কীট থাকে বলিয়া এই নাম
হইয়াছে, কেশে।

জন্তুহস্ত্রী (স্ত্রী) জন্তুন্ হস্তি হন-তৃহ্ স্ত্রিয়াং ডীর্ঘ। ১ বিড়ঙ্গ।

(ত্রি) ২ জন্তুঘাতক।

জন্তু (ত্রি) জন্ কৃত্যার্থে-জন্। জনিতব্য, যাহা জন্মিবে।

জন্ম (জন্মন্) (স্ত্রী) জায়তে ইতি জন্-ঔগাদিক মনিন্।

১ উৎপত্তি, উদ্ভব। ২ আত্মক্ষণ সম্বন্ধ। ৩ অপূৰ্ণ দেহগ্রহণ।

(ভার।) পর্যায়—জন্মঃ, জন, জনি, উদ্ভব, জন্ম, জনী, প্রভব,
ভাব, ভব, সংভব, জন্, প্রজনন, জাতি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পাঠে জানা যায় যে প্রাণি মাত্রেয়ই স্ব স্ব
উপার্জিত সং বা অসং কর্ম অনুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্টরূপে
জন্ম হইয়া থাকে।

বৈয়াক্য মতে—ঋতু হওয়ার পরে যোনিক্ষেত্র পদ্মের ভ্রায়
বিস্তারিত হয়, ঐ সময়েই শোণিতবিশিষ্ট গর্ভাশয় বীৰ্য্য
ধারণ করিয়া থাকে। অল্প সময়ে যোনিক্ষেত্র মুকুলিত
থাকে। কিন্তু ঋতু সময়েও উহা বাত, পিত্ত ও স্নেহাতে
আবৃত থাকিলে যদি বিকশিত না হয়, তাহা হইলে গর্ভও
হয় না। ঋতুকাল উপস্থিত হইলে যদি অবিকৃত বীৰ্য্য নিষিক্ত
হয়, তবেই উহা বায়ুগতিতে চালিত হইয়া জী-শোণিতের
নহিত মিলিত হয়। ঐ সময়েই নিষিক্ত বীৰ্য্যে করণ-সংযুক্ত

জীব আসিয়া সম্পৃক্ত হয়। এক দিন পরে উহাতে কলল
জন্মে। পাঁচ রাজিতে সেই কলল বৃদ্ধবান্ধিত ধারণ করে।
ঐ বীৰ্য্য শোণিতময় বৃদ্ধবৃদ্ধে সাত রাজিতে মাংসপেশী ও
হৃদই সপ্তাহ পরে রক্তমাংসে ব্যাপ্ত হইয়া দৃঢ়, পঞ্চবিংশতি
রাজিতে পেশীবীজ অঙ্কুরিত এবং এক মাসের সময় পাঁচভাগে
বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার এক ভাগে কর্ণ, গ্রীবা ও
মস্তক; দ্বিতীয় ভাগে পৃষ্ঠ, বংশ ও উদর, তৃতীয় ভাগে
পাদদ্বয়, চতুর্থভাগে হস্তদ্বয়, পঞ্চমভাগে পার্শ্ব ও কট। পরে
হৃদই মাস হইলে ক্রমে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে থাকে।
তিন মাসে সর্পাঙ্গের সন্ধিস্থান সকল উৎপন্ন হয়। চারিমাসে
অঙ্গুলি এবং অঙ্গের স্থিরতা জন্মে। পাঁচ মাসে রক্ত, মুখ,
নাসিকা ও কর্ণদ্বয়; ষষ্ঠমাসে বর্ণ, বল, রোমাবলী, দন্ত-
পংক্তি, শুষ্ক এবং নখ, ষষ্ঠমাস অতীত হইলে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্র,
পায়ু, উপহৃ, মেট্র, নাভি ও সন্ধি সকল উৎপন্ন হয়। ঐ সময়ে
মন অভিভূত হয়, জীবও চৈতন্যবৃত্ত হইয়া পড়ে। স্নায়ু এবং
শিরা সকলও ঐ সময়ে জন্মে। সপ্তম বা অষ্টম মাসের মধ্যে
মাংস জন্মিয়া উহা চর্মে আবৃত হইয়া পড়ে। ঐ সময়েই
জীবের স্মরণশক্তি জন্মে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরিপূর্ণ ও
সুব্যক্ত হয়। নবম বা দশম মাসে প্রাণী অরাজক হইয়া
প্রবল প্রসববায়ু কর্তৃক চালিত হয় এবং যোনিক্ষেত্র দ্বারা
বাণবেগে নির্গত হইয়া পড়ে।

চঞ্চলচিন্তে গর্ভ উৎপাদন করিলে প্রাণীর আকার বিকৃত,
মাতৃরক্তের আধিক্যে কষ্টা, পিতৃবীৰ্য্যের আধিক্যে পুত্র,
উভয়বীৰ্য্য তুল্য হইলে নপুংসক সন্তান জন্মে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন বিষম তিথিতে গর্ভোৎপাদন
হইলে কষ্টাসন্তান জন্মে আর সম তিথিতে গর্ভোৎপাদন
হইলে পুত্র জন্মে। গর্ভ বামভাগে থাকিলে কষ্টা এবং
দক্ষিণভাগে থাকিলে পুত্র হয়। গর্ভের সময় শোণিতাংশ
অধিক হইলে গর্ভস্থ শিশু মাতার আকৃতি গ্রহণ করে, আর
রক্তের অংশ অধিক হইলে পিতার আকৃতি গ্রহণ করে।
মিশ্রিত শুক্র শোণিতময় গর্ভ বায়ু কর্তৃক বিভক্ত না হইলেই
একটী মাত্র সন্তান প্রসূত হয়। হৃদই ভাগে বিভক্ত হইলে দুইটী
সন্তান জন্মিয়া থাকে। অনেক ভাগে বিভক্ত হইলে বামন,
কুজ প্রভৃতি নানারূপ বিকৃত অথবা সর্প অণু প্রভৃতি জন্মে।

সারকলিকার লিখিত আছে—যোনিস্থের পীড়নদুঃখ
গর্ভযন্ত্রণা হইতেও কোটী গুণ। উদর হইতে নির্গমনের
সময় শিশুর মুচ্ছা হইয়া থাকে। শিশুর মুখ মল, মূত্র, শুক্র ও
শোণিতে আচ্ছাদিত হয়। অস্থিযুক্ত সকল প্রাণীপত্য
বাত্তে আচ্ছাদিত হয়। প্রবল স্রুতিকা বায়ুতে শিশুকে অধোমুখ

করে। শিশুর জন্মবস্তু খুব বেশী। শিশু জন্মিবারাই বৈজ্ঞানিকভাবে মোহিত হইয়া পড়ে। তখন হইতেই পূর্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়। কখন কখন কুখ্য বা তৃষ্ণার কাতর হইয়া কাঁদিয়া উঠে। ঐ সময়ে “কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, কি করিয়াছি, কি করিতেছি, কি ধর্ম, কি অধর্ম” ইত্যাদি কিছুই বুঝিতে পারে না। (অথবোধ)

এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জীব-জগতের অতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণ সবল জীব কর্তৃক ভক্ষিত কিংবা নিহত না হইলে, তাহারা কোনও কালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেন। অর্থাৎ তাহাদের ভাগ্য কেবল অপমৃত্যু ঘটয়া থাকে, স্বাভাবিক মৃত্যু তাহাদের হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, মোনার (Moner), এমিবাস্ (amæbas) প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র কীটগণ সমূহ মাতৃগর্ভে জন্মে না; কিন্তু প্রত্যেকটি আপন আপন শরীর বিভক্ত করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জীবমুষ্টি ধারণ করে এবং ইহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে পরিণত হয়। এইরূপে অসংখ্য জীবের আবির্ভাব হয়। ইহারা প্রত্যেকটি অল্প কোনও প্রকারে নিহত না হইলে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি নিত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রতম কীটগণসকল স্বাভাবিক মৃত্যুর অধীন না হইল, তবে জীব-জগতের ধীর্ঘবর্তী মানব প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবগণের এরূপ মৃত্যু হইবার কারণ কি? বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ অতি ক্ষুদ্র কীটগণের পূর্ণবিকাশ মাত্র। কীটগণের অমরত্ব যদি স্বাভাবিক ধর্ম হইল, তাহা হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবসমূহের নধরত্ব স্বাভাবিক ধর্ম হইল কিরূপে?

ইহার কারণ অমুম্বাণ করিয়া তাহারা স্থির করিয়াছেন যে জন্মই মৃত্যুর কারণ। জন্মিলেই মরিতে হয়। কীটগণের জন্ম হয় না; একটি জীবের শরীর বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এইরূপে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ জীবগণ মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। এই জন্মই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। এখন দেখা আবশ্যক জীবজগতে জন্মের আবির্ভাব কি প্রকারে হইল।

মোনারের (Moner) মাতা শিতা মাই, একটি মোনার বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র জীবরূপে পরিণত হয়।

এমিবাকিরোককাস্ (amæba sphærococcus) নামে আর একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীব আছে, তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্রম মোনার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ জটিল।

এইরূপে এক শরীর বিভক্ত হইয়া যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের

আবির্ভাব হয়, তাহারা একবারেই পূর্ণাবস্থার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে শৈশবাবস্থা-ভোগ করিতে হয় না।

শরীরবিভাগপ্রণালীর পরে মুকুলোৎপাদনপ্রণালী (Gem-mation)। এ প্রণালী আরও জটিল, বৃক্ষ হইতে পুষ্পের উৎপাদন এবং প্রবালাদি কীটের বৃদ্ধি-প্রাপ্তি এই নিম্নমাধ্যমে হইয়া থাকে। ইহার পরে বীজোৎপাদনপ্রণালী। এই প্রণালী অমুম্বাণে মাতৃশরীরে যে লম্বত বীজাঙ্কুর বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই উদ্ভিন্ন হইয়া ভিন্ন শরীর ধারণ করে। এই পর্যন্ত জীবগণ কেবল একটি মাত্র জীবের শরীর হইতে আবির্ভূত।

ইহার পরে উৎকর্ষে জীবজগতে যে সমৃদ্ধ জীবের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রীপুরুষ আবশ্যক। অনেকগুলি প্রাণী এরূপ আছে যে তাহারা উদ্ভিদ শ্রেণী কি জীব শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এরূপ প্রাণী পাওয়া গিয়াছে যে, দুইটি অঙ্কুরের (cells) একত্র সমাবেশে ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই বিভিন্ন অঙ্কুরের অনেক লম্বয়ে সমধর্মী (Homogeneous) হইলেও কখনও বিভিন্ন-প্রকৃতিক হইয়া থাকে, জীবজগতে এইরূপে ক্রমিক বিকাশ হইতে হইতে কালক্রমে দুইটি অঙ্কুর বিভিন্নধর্ম অবলম্বন করে এবং পরস্পরের অভাবপূরক (Sporogony) ভাবধারণ করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জীব মুষ্টিতে পরিণত হয়। ইহাদের পরস্পরের স্বাভাবিক মিলনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। যে সময় হইতে জীবজগতে এইরূপ দুইটি পরস্পর মিলনেচ্ছা বিভিন্নপ্রকৃতিক জীবের আবির্ভাব হয়, সেই সময় হইতে ক্রীপুরুষ ভেদ দৃষ্ট হয়, এবং পরস্পরের সমাগম ব্যতীত নূতন জীবের উদ্ভব রহিত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ক্রমিক বিকাশমার্গে একটি জীব হইতে আর নূতন জীব উদ্ভূত হয় না। এইরূপ পরস্পর সমাগমে যে জীবের আবির্ভাব হয়, তাহাকে কিছুদিন মাতৃগর্ভে থাকিয়া পরে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। জীবজগতে এই প্রকারে জন্ম-প্রকরণের আবির্ভাব হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে মোনার প্রভৃতি কীটগণ প্রথম হইতেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়, কিন্তু জীবজগৎ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া যতই ক্রীপুরুষভেদের লম্বীপবর্তী হয়, ততই জীবকে শৈশবে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইতে হয়। এইরূপে উন্নতিপথের পূর্ণসীমায় পদার্পণ করিলে জীব সম্পূর্ণ নিঃসহায় হয়। সেই জন্ম মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবগণ শৈশবকালে সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। [জীব, পরজন্ম, পুনর্জন্ম, অন্তঃসহা, গর্ভ, মৃত্যু প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

জন্ম (অকারান্ত) (স্ত্রী) জন্-মন্। উৎপত্তি।

জন্মকাল (পুং) জন্মন: কাল: ৬৩৩। জন্মসময়, যে সময়ে জন্ম হয়।

জন্মকাল (পুং) জন্মন: কাল ইব যোধকইব। বিষ্ণু, কারণ বিষ্ণুসেবার পুনর্জন্ম হয় না।

জন্মকৃত (পুং) জন্ম-কৃ-কিপ্ পিঙাৎ কৃগাগম:। পিতা, জন্মানাতা।

জন্মক্ষেত্রে (স্ত্রী) জন্মন: ক্ষেত্রে। জন্মভূমি, জন্মস্থান।

জন্মজ্যোষ্ঠ (ত্রি) জন্মানা জ্যোষ্ঠ:। প্রথমজাত।

জন্মতিথি (পুং স্ত্রী) জন্ম উৎপত্তেতিথি: কালবিশেষ: ৬৩৩।

১ জন্মসময়ে যে তিথি থাকে সেই তিথি। ২ তাহার সজাতীয় তিথি। জ্যৈষ্ঠে বিক্রেতে ভীপ্ হয়। জন্মতিথী।

প্রতিবৎসর জন্মতিথি দিনে জন্মতিথিকৃত্য কর্তব্য। তিথিতত্ত্বে জন্মতিথি কৃত্য ও তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

যে স্থলে পূর্বদিন নক্ষত্রযুক্ত তিথির লাভ হয়, আর পরদিন কেবল তিথি থাকে, সে স্থলে পূর্বদিনে আর যে স্থলে উভয়দিনেই নক্ষত্রযুক্ত তিথির লাভ হয় সে স্থলে পরদিনে জন্মতিথি গণ্য হইয়া থাকে।

যে বৎসর জন্মমাসে জন্মতিথি জন্মনক্ষত্র যুক্ত হয়, সেই বৎসর সন্মান, সুখ ও সুস্থতা লাভ হইয়া থাকে।

শনিবার বা মঙ্গলবার যদি জন্মতিথি পড়ে, অথচ উহাতে যদি জন্মনক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে সেই বৎসর পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ঐরূপ হইলে সর্বোষধিমিশ্রিত জলে স্নান, দেবতা, নবগ্রহ ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চনা করিলে শান্তি হয়। বার দোষের শাস্ত্যর্থ মুক্তা এবং জন্মনক্ষত্রের যোগ না হইলে তাহার শাস্ত্যর্থ কাঞ্চন দান করিতে হয়।

জন্মতিথিকৃত্যে গোপ চাক্সমাসের উল্লেখ হইয়া থাকে। জন্ম মাস কোন বৎসর মলমাস হইলে ঐ মাস ত্যাগ করিয়া চাক্সমাসে জন্মতিথির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

জন্মতিথির দিনে তিলতৈল বা তিলবাটা শরীরে মাখিয়া তিলযুক্ত জল দ্বারা স্নান করিয়া তিলদান, তিলহোম, তিলবপন ও তিল ভক্ষণ করিবে। এইরূপে তিল ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ বিপদ হয় না।

গুগুণ্ডল, নিষপত্র, খেতসর্ষপ, দুর্ধা ও গোরোচনা একত্র লইয়া পুলাই করিয়া,

“ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈ: সার্বং রক্ষাং কুর্ষ্বন্ত তানি মে।”

এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণ ভূজে জন্মগ্রহি ধারণ করিবে, উহাকে কেহ বা জন্মগ্রহি, কেহ বা রক্ষাগ্রহি বলে।

জন্মতিথির দিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর স্বস্তিবাচনাদি-পূর্বক “অন্যোত্যাগি জন্মদিবসনিমিত্তকঙ্কাদিপূজনমহ: করিষ্যে” অথবা “অন্যোত্যাগি শুভবর্ষবৃদ্ধৌ সফলমঙ্গলসম্বলিত দীর্ঘায়ুঃ কামো মার্কণ্ডেয়াদিপূজনমহ: করিষ্যে” ইত্যাদি রূপে

সঙ্কর করিয়া গণেশাদি দেবতা পূজাপূর্বক গুরুদেব, অগ্নি, বিপ্র জন্মনক্ষত্র, পিতা, মাতা ও প্রজাপতির যথাবিধি পূজা করিতে হয়।

“বিভূজং জটিলং সৌম্যং স্তব্ধং চিরজীবিনম্।

দণ্ডাক্ষত্রহতঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিত্ররেৎ” (মার্কণ্ডেয় ধ্যান)

উক্ত প্রকারে মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান করিয়া, “ও মাং মার্কণ্ডেয় নম:” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া

“ও আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সৌম্যবংশসমুত্তব।

মহাতপ মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোহস্ত তে”

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া “চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা যুনে। রূপবান্ বিস্তবাংস্তব প্রিয়া যুক্তশ্চ সর্কদা। মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন। আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধার্থ-মন্মাকং বরদো ভব।” এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর ব্যাস, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, বলি, প্রহ্লাদ, হনুমান ও বিভীষণের পূজা করিয়া “ও বাং বঠো নম:” এই মন্ত্রে দধি ও অক্ষত দ্বারা ষষ্ঠীদেবীর পূজা এবং “মাতৃভূতাসি ভূতানাং ব্রহ্মণা নির্মিতা পুরা, তন্মনা: পুত্রবৎ কৃত্যা পালয়িত্বা নমোস্ত তে” এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ত্রিশরগাদির পূজা করিবে। পরে পূজিত দেবতা সকলের উদ্দেশে তিলহোম করিয়া দক্ষিণাভ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

স্বন্দপুরাণের মতে—জন্মতিথির দিনে নথকেশাদির ছেদন, মৈথুন, দূরগমন, আমিষ ভক্ষণ, কলহ ও হিংসা বর্জনীয়।

জ্যোতিষের মতে—জ্যৈষ্ঠসংসর্গপরিভাগ এবং যথাবিধি স্নান করিলে অভীষ্ট সম্পদ লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রদান করিলে আর জীবিত মন্ত্র জলে ছাড়িয়া দিলে আয়ুর্বর্দ্ধি হয় এবং ঐ দিন যে ছাত্ত ভক্ষণ করে, তাহার শত্রু ক্ষয় হয়। ঐ দিন যে নিরামিষ ভোজন করে, সে জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়।

হিন্দুদিগের জ্ঞান জগতের অপরাপর প্রধান জাতির মধ্যে দেশপ্রচলিত প্রথা অনুসারে জন্মদিনে উৎসব হইয়া থাকে।

জন্মদ (পুং) জন্ম দদাতীতি জন্ম দা-ক। পিতা।

জন্মদিন (স্ত্রী) জন্মনো দিনং দিবসং। জন্মদিবস, যে দিনে জন্ম হয়। [জন্মতিথি দেখ।]

জন্মনক্ষত্র (স্ত্রী) জন্মনো নক্ষত্রং। জন্ম সময়ের নক্ষত্র।

“গোপরেজ্জন্মনক্ষত্রং ধনসারং গৃহে মলাং।” (বিষ্ণুঃ)

জন্মনক্ষত্র সাধারণের নিকট বলিতে নাই। জ্যোতিষ-

মতে—জন্মনক্ষত্রে যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম নিষিদ্ধ। বিষ্ণুধর্মোক্তরে নিষিদ্ধ আছে—প্রতি মাসে জন্মনক্ষত্রের দিনে যথাবিধি দান করিয়া চন্দ্র, জন্মনক্ষত্র, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও ব্রাহ্মণ-গণের অর্চনা করিতে হয়।

জন্মপ (পুং) জন্ম জন্মলগ্ন পাত্তি পা-ক। ১ জন্মলগ্নপতি। ২ জন্মরাশির অধিপতি।

জন্মপতি (পুং) ১ জন্মলগ্নপতি। ২ জন্মরাশিপতি।

জন্মপত্নী (স্ত্রী) ১ জন্মবিবরণ। ২ কোষ্ঠী।

জন্মপত্রিকা (স্ত্রী) জন্মহচকং পত্রং কন্ টাপ্ কোষ্ঠী, ঠিকুজী।

জন্মপাদপ (পুং) জন্মনঃ পাদপঃ। যে বৃক্ষতলে কাহারও জন্ম হয়। পারিবারিক বৃক্ষ।

জন্মপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) জন্মনঃ প্রতিষ্ঠা। ১ জন্মস্থান। ২ মাতা।

জন্মক্ষেত্র (দেশজ) দেহান্তর ধারণ, রূপান্তর।

জন্মবৎ (ত্রি) জন্ম-মতুপ্। প্রাণী, জীব।

জন্মবত্মা (স্ত্রী) জন্মনঃ বত্মা পহাঃ। যোনি।

জন্মবত্মা (স্ত্রী) জন্মস্থান, জন্মভূমি।

জন্মবৈলক্ষণ্য (স্ত্রী) পৈতৃক শক্তির বিপরীতাচরণ।

জন্মভ (স্ত্রী) ১ জন্মনক্ষত্র। ২ জন্মলগ্ন। ৩ জন্মরাশি। ৪ জন্ম নক্ষত্রের সজাতীয় নক্ষত্রাদি।

জন্মভাজ (পুং) জীব, প্রাণী।

জন্মভাষা (স্ত্রী) মাতৃভাষা, স্বদেশের ভাষা।

জন্মভূ (স্ত্রী) জন্মভূমি।

জন্মভূমি (স্ত্রী) ১ জন্মস্থান। ২ স্বদেশ, যে দেশে জন্ম হয়।

“জননী জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” অযোধ্যামাহাত্ম্যে রামচন্দ্রের জন্মস্থান ও জন্মভূমি নামে বর্ণিত হইয়াছে, এই স্থানে আসিয়া দান দান করিলে রাজস্ব ও অশ্বমেধের ফল হয়।

জন্মভূৎ (ত্রি) জন্ম বিভর্ত্তি জন্ম-ভূ-কিপ্। প্রাণী।

জন্মমাস (পুং) ১ যে মাসে জন্ম হয়। ২ জন্মমাসের সজাতীয়

মাস। *। জ্যোতিষ মতে জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম, বিবাহ, কর্ণবেধ ও যাত্রা নিষিদ্ধ। বশিষ্ঠের মতে জন্মমাসে জন্মদিন মাত্র, গর্গের মতে ৮ দিন মাত্র, যবনাচার্য্যের মতে ১০ দিন মাত্র এবং ভাঙ্গুরির মতে সমস্তমাসই উক্ত কার্য্যে বর্জনীয়। (তিথিতত্ত্ব)

জন্মযোগ (পুং) কোষ্ঠী।

জন্মরাশি (পুং) যে রাশিতে জন্ম হয়। জন্মকালিক রাশির সজাতীয় রাশি।

জন্মরোগী (পুং) যে আজন্ম রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে।

জন্মকর্ম (পুং) জন্ম-কর্ম। ১ যে নক্ষত্রে কাহারও জন্ম হয়। ২ প্রথম নক্ষত্রের নাম।

জন্মলগ্ন (স্ত্রী) যে লগ্নে জন্ম হয়। [লগ্ন দেখ।]

জন্মশয্যা (স্ত্রী) জন্মনিমিত্ত শয্যা, প্রসবার্থ শয্যা। যে শয্যাতে জন্ম হয়। “স দদর্শ মহামানঃ শরতলগ্নগতং প্রভো।

জন্মশয্যাগতঃ বীরঃ কাণ্টিকেরমিব প্রভূম্।” (ভারত)

জন্মশোধ (পুং) অঘের মতন।

জন্মসাক্ষ্য (স্ত্রী) জন্মনঃ সাক্ষ্যং। জন্মোদ্দেশ্যের সফলতা।

জন্মস্থান (স্ত্রী) ১ জন্মভূমি। ২ মাতৃগর্ভ।

জন্মরাশি (পুং) ১ শিবের একটা নাম। ২ জন্মরাশিপতি।

৩ জন্মলগ্নপতি। [জন্মপ দেখ।]

জন্মান্তর (স্ত্রী) অন্তঃ জন্ম জন্মান্তরং। ১ অগ্নজন্ম, পূর্বজন্ম, পরজন্ম। ২ জন্মনঃ অন্তরং। লোকান্তর।

জন্মান্তরকৃত (স্ত্রী) (ত্রি) ১ অগ্নজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম।

জন্মান্তরীণ (ত্রি) যাহা জন্মান্তরে ঘটয়াছে বা ঘটবে।

জন্মান্তরীয় (ত্রি) ১ জন্মান্তরসম্বন্ধীয়। ২ যাহা জন্মান্তরে ঘটয়াছে বা ঘটবে।

জন্মান্দ্র (ত্রি) আজন্ম দৃষ্টিহীন। যে অন্ধ হইয়াই জন্মিয়াছে।

জন্মাবচ্ছিন্ন (ত্রি) যাবজ্জীবন, জীবনাবধি।

জন্মাক্ষরী (স্ত্রী) জন্মনঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবন্ত অষ্টমী ৬তং। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি অষ্টমী। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—

“অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কর্ণো যুগে।

অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণো হসৌ দেবকীমুতঃ॥”

অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে দেবকীর গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বিষ্ণু-পুরাণে মহামায়ার প্রতি ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

“প্রারূঢ়কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।

উৎপৎস্তামি নবম্যাক্ষ প্রসূতিং স্বমবাপ্তস্মি॥”

বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে নিশীথ সময়ে আমি আবির্ভূত হইব, ভূমি পরদিন নবমীতে আবির্ভূত হইবে।

উল্লিখিত বচনদ্বয়ে শ্রাবণ ও ভাদ্র উভয় মাসই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং মৃধ্যচান্দ্র ও গোণচান্দ্র ভেদে উহার সমাধান হইবে। যখন মৃধ্যচান্দ্র শ্রাবণের কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমীই গোণচান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী হইয়া থাকে, তখন ভিন্ন ভিন্ন বচনে ভিন্ন ভিন্ন মাসের উল্লেখ সঙ্গতই বৃদ্ধিতে হইবে।

জন্মাক্ষরী তিথি কোন বৎসর সৌর শ্রাবণ মাসে হয়, কোন বৎসর বা সৌর ভাদ্রমাসে হয়। ঐ দিনে উপবাস, বথা নিয়মে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, চন্দ্রকে অর্ঘ্য দান এবং

রাত্রি আগরণ ইত্যাদি নিয়মে জন্মাক্ষরী ব্রত করিতে হয়। জন্মাক্ষরীব্রতের ফল—ভবিষ্যের মতে, ঐ দিনে কেবলমাত্র উপবাসেও সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। মনুস্মরণ প্রভৃতি

পুণ্য দিবসে স্নানপূজাদি করিলে যে ফল জন্মে, জন্মাষ্টমী দিনে তাহার কোটিগুণ ফল জন্মিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্তের মতে ঐ দিনে কেবল তর্পণ করিলেও শতম্বর্ষ-ব্যাপী গয়াশ্রাঙ্কের স্তায় শিঙুলোকেয় তৃপ্তি হয়। কল্কপুরাণের মতে—জন্মাষ্টমী ব্রত স্ত্রীপুরুষ সাধারণেরই প্রতিবৎসর কর্তব্য। এই ব্রত করিলে সন্তান, সৌভাগ্য, আরোগ্য, অতুল আনন্দ এবং ধার্মিকতা প্রভৃতি ইহকালে লাভ করিয়া পরকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কল্কপুরাণে লিখিত আছে, জন্মাষ্টমী ব্রতে চতুর্দশ ফলই হইয়া থাকে (১)।

ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষে যে মহুয়া জন্মাষ্টমী ব্রত না করিবে, সে ক্রুরকর্মী রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং যে স্ত্রী প্রতিবর্ষে জন্মাষ্টমী ব্রত না করিবে, সে অরণ্যের সর্পিণী হইবে (২)। শ্রীকৃষ্ণের ঐতর্য্য ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্বক জয়ন্তীব্রত করিতে হয়, না করিলে চতুর্দশ ইন্দ্ৰের ভোগ্য সময় পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিতে হয়। জন্মাষ্টমী-ব্রত ত্যাগ করিয়া অশ্রু ব্রত প্রতিষ্ঠাপূর্বক সম্পন্ন করিলেও তাহার ফললাভ হয় না। ঐ জন্মাষ্টমী তিথি যদি নিশীথ সময়ের পূর্বদণ্ডে বা পর দণ্ডে কলমাত্র ও রোহিণীনক্ষত্রের সহিত যুক্ত হয় তবে ঐ যুক্ত তিথি জয়ন্তী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ যোগের নামই জয়ন্তীযোগ (৩)। জয়ন্তীযোগ হইলে উপবাস প্রভৃতিতে অধিক ফল হয়। উহাতে আবার সোমবার বা বুধবার পড়িলে আরও প্রশস্ত। কালমাধবীর মতে জন্মাষ্টমী ব্রত ও জয়ন্তীব্রত দুইটা পৃথক্। উপবাস, জাগরণ, অর্চনা, দান ও ব্রাহ্মণভোজন এই সকল কার্যের নাম জয়ন্তী-ব্রত আর কেবল উপবাসের নাম জন্মাষ্টমীব্রত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই জন্মাষ্টমী বা জয়ন্তীব্রতই রোহিণীব্রত নামে কথিত হইয়াছে। শত একাদশী ব্রতের ফলাপেক্ষাও ইহার ফল অধিক।

স্মার্ত ও বৈষ্ণবদিগের মতভেদে জন্মাষ্টমী ব্রতের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্মার্তদিগের মধ্যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের

ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। রঘুনন্দনের মতে বশিষ্ঠ প্রভৃতিস্ব-বচনানুসারে যেদিন জয়ন্তীযোগ হয়, সেই দিনই জন্মাষ্টমী ব্রত করিতে হয়, কিন্তু দিনবারে ঐ যোগ হইলে পরদিনে ব্রত হইয়া থাকে। জয়ন্তীযোগ না হইলে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রতের ব্যবস্থা, দুই দিনেই যদি রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী হয় তাহা হইলে পরদিনে, রোহিণীর যোগ না হইলে যে দিন নিশীথ সময়ে অষ্টমী থাকিবে সেই দিনে জন্মাষ্টমী ব্রত কর্তব্য। উভয় দিনে নিশীথ সময়ে অষ্টমী পাইলে অথবা একদিনেও না পাইলে পরদিন কর্তব্য। বৈষ্ণবদিগের মতে যে দিন পলমাত্র ও সপ্তমী থাকে, সেদিন জন্মাষ্টমী ব্রত হয় না। নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও নবমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য, কিন্তু সপ্তমীবিক্রা অষ্টমী নক্ষত্রযুক্ত হইলেও অগ্রাহ্য (৪)।

ভবিষ্যপুরাণে ও ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে—উপবাসের পূর্বদিনে হবিষ্য করিয়া থাকিবে, উপবাসের দিন প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে উপবাসের সঙ্কল্প করিবে, ঐ দিন প্রাতঃ-কালে সপ্তমীতিথি থাকিলে সঙ্কল্পে “সপ্তম্যাস্তিথাবারতা” এই রূপে তিথির উল্লেখ হইবে। সঙ্কল্পের পর “ধর্ম্মায় নমঃ ধর্ম্মেশ্বরায় নমঃ ধর্ম্মপত্যয়ে নমঃ ধর্ম্মসন্তবায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ” ইত্যাদি উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করিয়া এই মন্ত্রগুলি পড়িবে। “বাসুদেবঃ সমুদ্ভাস্য সর্বপাপপ্রশান্তয়ে। উপবাসঃ করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাং নভস্তহঃ। অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীঃ নভশ্চন্দ্র সরোহিণীম্। অর্চয়িষ্যেবাসেন ভোকেহমপরেহহনি। এনসো মোক্ষকামোহস্মি যদ্ গোবিন্দ ত্রিযোনিজং। তন্মে যুক্তো মাং ত্রাহি পতিতঃ শোকসাগরে। আজন্মমরণং যাবৎ যন্ময়া হৃদ্যতং হৃদ্যতং। তৎ প্রণশয় গোবিন্দ প্রসীদ পুরুষোত্তম।” পরে অর্ধরাত্র সময়ে প্রণবাদি নমঃশাস্ত্রং স্ব স্ব নামরূপ মন্ত্রে বাসুদেব, দেবকী, বসুদেব, যশোদা, নন্দ, রোহিণী, চণ্ডিকা, বামদেব, দক্ষ, গর্গ ও ব্রহ্মার পূজাপূর্বক “শ্রীবৎস-বক্ষঃ পূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্” ইত্যাদি ভবিষ্যোত্তরীয় ধ্যান করিয়া “ও শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়। অর্ঘ্য, স্নান, নৈবেদ্য, ঘৃত-তিল-হোম ও শয়নের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র আছে। শ্রীকৃষ্ণের পূজার পর

(১) “ধর্ম্মমর্ষক কামক মোক্ষক মুনিপুঞ্জবা।

ব্রহ্মাতি বাহুতানর্থানন্ত্যর্থানতিহুলভান্।” (কল্কপুরাণ)

(২) “শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।

ন করোতি নরো বন্ত স ভগ্নে ক্রুররাক্ষসঃ।

বর্ষে বর্ষেভু বা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।

ন করোতি মহাকুরা ব্যালী ভবতি কান্দে।” (ভবিষ্যোত্তর)

(৩) “সিংহাঙ্কে রোহিণীযুক্তা নভঃ কৃষ্ণাষ্টমী বহিঃ।

মাজ্যর্ঘ্যপূর্ণাপরম জয়ন্তী কলরপি চ।” (বরাহসংহিতা)

(৪) “জন্মাষ্টমী পূর্ববিজ্ঞান কর্তব্য কথ্যচন।

পলমধ্যে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যাং চাষ্টমীং তাজেৎ।

সুহৃদা বিন্দুনা স্পৃষ্টং গজাভঃ কলসং বধা।

বিনা একেণ কর্তব্য নবমীসংযুতাষ্টমী।

সকল্যাপি ন কর্তব্য সপ্তমীনংযুতাষ্টমী।

তস্যাং সর্বপ্রবন্ধে ন ত্যাজ্যমেবাভ্যুত্তং যুধৈঃ।

যেথৈ পুণ্যকরং বাস্তি তন্নঃ পূর্বোদয়ে বধাঃ।” (হরিভক্তিবিলাস)

শ্রীপূজা, তারপর দেবকীপূজা কর্তব্য। কৃষ্ণ যশোদা প্রভৃতির স্বর্ণাদি নির্মিত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। পূজাস্তে শুভ ও মৃত্ত দ্বারা বস্ত্রধারা দিতে হয়। অনন্তর নাড়ীছেদন, বস্ত্রপূজা এবং নামকরণাদিসংস্কার কর্তব্য। এই সকল কার্যের পর চন্দ্রোদয়ে চন্দ্র উদ্দেশে হরিশ্চরণপূর্ব্বক শঙ্খপাণ্ডে জল, পুষ্প, চন্দন ও কুশ লইয়া “স্কীরোদাৰ্ণবসম্বৃত্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে অৰ্ঘ্য প্রদান করিয়া “জ্যোৎস্নাঃ পতয়ে ভূভাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রকে প্রণাম করিতে হয়। চন্দ্রপ্রণামের পর “অনং বার্মনং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নামকীৰ্ত্তন এবং “প্রণমামি সদা দেবং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণামপূর্ব্বক “ব্রাহ্মিণং” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া স্তবপাঠ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি বাহা জন্মঠমী কথাতে উল্লিখিত আছে, ঐ সকল শ্রবণ [কৃষ্ণ দেখ।] ও নৃত্যগীতাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দুর্গার মহোৎসব কর্তব্য। পরে ব্রাহ্মণভোজন ও তাহাদিগকে স্তবগাদি দক্ষিণা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া “সর্কার্য সর্কেশ্বরায়” ইত্যাদি মন্ত্রে পারণ ও “ভূতায়” ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসব-সমাপন করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রজাতির পক্ষে পূজাদিতে মন্ত্রপাঠ করিতে হয় না (৫)।

মার্ত্ত রঘুনন্দন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতির বচনানুসারে পারণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। উপবাসের পরদিন তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের অবসান হইলে পারণ করিতে হয়। যে স্থলে মহানিশার পূর্বে তিথি বা নক্ষত্রের মধ্যে একের অবসান হইবে এবং অপরের মহানিশাতে অথবা তৎপরে অবসান হইবে সে স্থানে একের অবসান হইলেই পারণ কর্তব্য। যে স্থলে মহানিশাসময়ে তিথি নক্ষত্র উভয়ই থাকিবে, সে স্থলে উৎসবের পর প্রাতঃকালে পারণ করিবে।

জন্মাস্পাদ (স্ত্রী) জন্মস্থান, জন্মভূমি।

জন্মিন্ (ত্রি) প্রাণী, জীব, কন্তু।

“জন্মিনোহস্ত স্থিতিং বিধান্ লক্ষ্যামিব চলাচলান্।” (ভারবি)

জন্মোজয় (পুং) জনমেজয় রাজা। দেবীভাগবতের ২।১১।৩৬ শ্লোকের টীকায় লিখিত আছে—“জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রু নেজিতবান্ বতঃ। এজ্জ্ কল্পনে ধাতোহি জন্মোজয় ইতি ক্রতঃ।” [জনমেজয় দেখ।]

জন্মেশ (পুং) জন্মরাশির অধিপতি। [জন্মপ দেখ।]

জন্ম (স্ত্রী) জন-ণ্যৎ। ১ হট্ট, হাট, বাজার। ২ পরীবাদ, নিন্দা।

৩ সংগ্রাম, যুদ্ধ।

“তত্র জন্তং রবোর্বোঃ পার্কতীরৈর্গণৈরভূৎ।” (রঘু ৪।৭৭)

(৫) “পুত্রের দুইজাঃ নরকৈ ব্রীশূজাণামমত্ৰক্।” (তিথিত্ত্ব)

(পুং) ৪ জনক, উৎপাদক, পিতা। ৫ মহাদেব। “উগ্রতেজা মহাতেজা জন্তো বিজয়কালবিৎ।” (ভারত ১৩।১৭।৫৬) ৬ দেহ, শরীর। “নিবৃত্তসর্কৈরিত্ত্ববৃত্তিবিভ্রমম্বষ্ঠাব জন্তং বিশ্বজন্ জনাৰ্দ্দনং।” (ভাগ ১।১৩।৩১) ৭ জনজন্ম। [জন্ম দেখ।] ৮ কিংবদন্তী।

(ত্রি) ৯ উৎপাদ। “জন্তানাং জনকঃ কালো জগতাং আশ্রয়ো মতঃ।” (ভাষ্যপরিচ্ছেদ ৪৫) ১০ জনরিতা, উৎপাদক। ১১ নবোদার ভূত। ১২ নবোদার জাতি। ১৩ নবোদার মিত্র। ১৪ নবোদার প্রিয়জন। ১৫ বরের বরত, বরের প্রিয়জন, বরযাত্র। ১৬ জায়মান। ১৭ জনন, জন্ম। ১৮ জনহিত, যদ্বারা লোকের হিত হয়, মহেশ্বরের হিতকর। ১৯ জাতীয়। (পুং) ২০ জাতি। ২১ ইতর লোক।

জন্মতা (স্ত্রী) জন্ত-তল্-টাপ্। উৎপাদতা।

জন্ম্য (স্ত্রী) জন্ত-টাপ্। ১ মাতার সখী। ২ প্রীতি, মেহ।

জন্ম্য (পুং) জন-যুচ্ বাহুলকাৎ ন অনাদেশঃ। ১ অগ্নি। ২ ব্রহ্মা, বিধাতা। ৩ প্রাণী, জন্ত। ৪ জনন, উৎপত্তি, জন্ম।

“অমৃতায়্যং দ্বিতীয়োহয়ং জন্ম্যর্হি মম সর্কথা।” (হরিব ১২৫অঃ)

৫ চতুর্থ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে একজন। (হরিব*)

জপ (ত্রি) জপ-কর্তৃরি অচ্। ১ জপকারক। “কর্ণেজপৈরাহিত-রাজ্যলোভা”। (ভট্টি)। (পুং) ভাবে অপ্। ২ পাঠ, অধ্যয়ন। ৩ মন্ত্রাদির আবৃত্তি, মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। অগ্নিপুরাণ ও তন্ত্রসারে লিখিত আছে—নির্জন্ম স্থলে সমাহিত চিত্তে দেবতাকে চিন্তা করিয়া জপ করিতে হয়। জপকালে বিনম্র ত্যাগ করিলে কিংবা ভয় বিহ্বল হইলে জপ নষ্ট হয়। মলিনবেশে কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত মুখে জপ করিলে দেবতার প্রীতি হয় না। জপকালে আলস্য, জড়তা, নিদ্রা, হাঁচি, নিম্নীবন ত্যাগ, কোপ এবং নীচাক্ষ স্পর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত।

জপ তিন প্রকার—মানস জপ, উপাংশু জপ, এবং বাচিক জপ। মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করা মানস জপ। দেবতাকে চিন্তা করিয়া, জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের যৎসামান্য চালনাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য যে জপ করা যায়, তাহা উপাংশু জপ। বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে জপ করা যায়, তাহা বাচিক জপ। এতদ্বিত্ত আর এক প্রকার জপ আছে তাহাকে জিহ্বা-জপ বলে। কেবল জিহ্বা দ্বারা এ জপ করিতে হয়। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশ গুণ, জিহ্বাজপ শতগুণ এবং মানস জপ সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। জপ করিতে করিতে কত জপ করা হইল তাহার সংখ্যা করা উচিত। এই নির্মিত জপমালার প্রয়োজন। [জপমালা দেখ।] অক্ষত, হস্তপর্ক, ধাত্ত, পুষ্প, চন্দন কিংবা সুতিক

যারা জপ সংখ্যা করা নিষিদ্ধ। লাক্ষা কিংবা শ্রোমর যারা জপসংখ্যার বিধান আছে। (তত্ত্বসার)

ভূগার্ভবতন্ত্রের মতে—উচ্চৈঃস্বরে জপ অথবা, উপাংশুজপ মধ্যম এবং সর্বস্বত্ব স্বর্গে উত্তম বলিয়া কথিত। জপ অতি হ্রস্ব হইলে রোগ এবং অতি দীর্ঘ হইলে তপস্কর হয়। যন্ত্রের অর্ধ, ত্রৈলোক্য ও যোনিবৃত্তা জানা না থাকিলে শত কোটি জপেও কোন ফল হয় না। এ ছাড়া শুণ্ডবীর্ঘ্য অর্থাৎ অচৈতন্যময় জপে কোন ফল হয় না। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্রই সর্বসিদ্ধিকর (১)। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার জপ করিলে যে ফল হয় অচৈতন্য মন্ত্র শত সহস্র অথবা লক্ষ্য জপ করিলেও সে ফল হয় না। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার জপ করিলেই জপকর্তার হৃদয়ে প্রসিদ্ধি, সর্বসিদ্ধি, আনন্দ, অশ্রু, প্লব, দেহাবেশ এবং সহসা গঙ্গাদ্রব্য হইয়া থাকে (২)।

গয়, যতীক বা বীরাঙ্গনাদিতে বসিয়া জপ করিলে, অস্ত্রাণা জপ নিষ্ফল হয় (৩)।

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, শ্রিগির্গুহা, গিরিশূল, তীর্থস্থান, সিদ্ধ-সঙ্গম, বন, উপকূল, বিষ্ণুক্ষেত্রস্থল, গিরিশত, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, অথবা বেখানে চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে, এমন স্থানে জপ করা উচিত। নির্জন গৃহে শত শুণ, গোষ্ঠে লক্ষ শুণ, দেবালয়ে কোটি শুণ এবং শিব সন্নিধানে

(১) "উচ্চৈঃস্বরেণ যোক্ত উপাংশুজপঃ শ্রেষ্ঠঃ।

উত্তমো মাংসো হেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ।

অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো তপঃকরঃ।

অকীরাকরসংযুক্তঃ জপোজ্যোতিকপংজিবৎ।

সমসা যঃ শ্বরেণ তোত্রঃ বচসা বা শব্দঃ জপেৎ।

উত্তরং নিফলং হেবি ভিন্নভাভোদকং বখা।

জাতহৃতকরাদৌ ভাভবন্তে হৃতহৃতকম্।

হৃতকরসংযুক্তো নো মন্ত্রঃ স ন সিদ্ধ্যতি।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিবৃত্তাং ন বেতি যঃ।

শতকোটিজপেনাপি ততঃ সিদ্ধির্ন জারতে।

শুণ্ডবীর্ঘ্যাক যো মন্ত্রা ন দাততি ফলং শ্রীরে।

মন্ত্রাষ্টৈতত্ত্বসিদ্ধিঃ সর্বসিদ্ধিকরঃ শ্রুতাঃ।"

(২) "মন্ত্রোক্ত্যে কৃতে বাসুক্ শরণং প্রথমং ভবেৎ।

শব্দৈঃ সহস্রৈর্লক্ষৈর্বা কোটিজপেন তৎফলম্।

হ্রস্বরে প্রসিদ্ধেব সর্বসিদ্ধিরবদ্যম্।

আনন্দাক্রান্ত পুলাকো হেহাবেশঃ কুলেশ্বরী।

গঙ্গাদোহিতঃ সহসা জারতে কক্ষং মাংসরঃ।

সকলদুঃখভেদংপোষ্য যন্ত্রে চৈতন্যসংগৃহেৎ।"

(৩) "পদ্মযতীকবীরাঙ্গনাদিসংযুক্তঃ প্রসিদ্ধঃ।

জপার্জনাধিকং সূর্যাস্তমধ্যা নিফলং ভবেৎ।"

অনন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে (৪)। শুক্লমন্ত্র হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রের জপই সর্বসিদ্ধিকরক। ইচ্ছাক্রমে শুনিয়া অথবা কৌশল ক্রমে দেখিয়া কিবা পাতায় লিখিত মন্ত্র অভ্যাস করিয়া জপ করিলে কোন অনর্থ ঘটে না, কিন্তু পুস্তকে লিখিত মন্ত্র দেখিয়া বে জপ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হইয়া থাকে (৫)।

জপভূতা (স্ত্রী) জপত জপকারকতা ভাবঃ তল-টোপ। জপ-কারকের কর্ম (ভাব)।

জপন (স্ত্রী) জপ ভাবে লাই। জপ। [জপ দেখ।] "সরসস-এব বেদান্তে বর্ত্ততে জপনং প্রীতি।" (ভারত শাস্তি ১১৬ অঃ)

জপনীয়া (স্ত্রী) জপ-অনীয়া। বাহা জপ করিতে হয়, জপ করিবার যোগ্য।

জপপন্নায়ণ (স্ত্রী) জপ এব পরমরসং আশ্রয়ো বস্ত বহতী। জপাসক্ত, জপলীলা। "শিবরাত্রি ত্রতং হেব পূজাজপপারায়ণঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

জপমালা (স্ত্রী) জপত জপার্থী মালা। জপের নিমিত্ত যে মালা ব্যবহৃত হয়। যে মালা অবলম্বন করিয়া জপ করা হয়। কাম্যাক্ষে জপমালা নানা প্রকার হইতে পারে।

প্রধানতঃ জপমালা তিন প্রকার—করমালা, কর্ণমালা ও অক্ষমালা। (১) তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলী দ্বারা মালার কল্পনা করিতে হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলির তিন পর্ক, অনামিকার তিন পর্ক, মধ্যমার এক পর্ক এবং তর্জনীর তিন পর্ক এই দশ পর্ক লইয়া একগাছি মালা হয়, এই মালার সেক্ষেপে মধ্যমাঙ্গুলীর অপর পর্কদ্বয় কল্পনা করিবে (২)।

(৪) পুণ্যক্ষেত্রঃ নদীতীরঃ শুভাপর্কতমভকম্।

তীর্থপ্রদেশাঃ সিদ্ধনাং সঙ্গমঃ পায়সঃ বনম্।

উদ্যানানি বিবিধানি বিষ্ণুনাং ভটং সিরেঃ।

দেবভারতমং কুলং সমুদ্রতঃ নিমগ্নং গুহম্।

নাথনেমু প্রপত্তানি স্থানান্তেভানি মন্ত্রিণাম্।

অথবা বিমলেন্দ্রঃ যত্র চিত্তং প্রসীদতি।"

(৫) "যত্র শুক্লপাণ্যং প্রাপ্তঃ সর্বকঃ তত্র সর্বসিদ্ধিযম্।

বহুজ্ঞা ক্রতঃ যত্র দৃষ্টোনিপ হলেন চ।

পত্রো দ্বিতং বা চাধ্যাপ্য তদ্ব্যপের জনমকৃতং।

পুস্তকে লিখিতামন্ত্রান্ বিলোক্য একপতি বে।

ব্রহ্মহত্যাসমং ভেবাং পাতকং পরিবীৰ্ত্তিতম্।"

(ভূগার্ভব-১০ উদ্রক-১)

(১) "মালা তু ত্রিবিধা হেবি কর্ণকপর্কভেদকঃ।" (বৎসহৃত)

(২) তর্জনী মধ্যমানাম কনিষ্ঠা চেতি ভাঃ কক্ষং।

তিথোঃ কুল্যদ্বিপর্কো মধ্যমা চৈকপর্কিকা।

পর্কদ্বয়ঃ মধ্যমায়া যেক্ষেপোপকল্পয়েৎ।" (সবংজুয়ার ১০)

ইহারই নাম করমালা। ইহাতে জপ করিবার ক্রম এই-
ক্রম—অনামিকার মধ্যপর্ক হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার
তিন পর্ক লইয়া ক্রমে তর্জনীর মূলপর্ক পর্যন্ত দশ
পর্কে জপ করিতে হয়, ঐরূপ নিয়মে দশবার জপ করিলে
এক দশবার জপ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি, অষ্টো-
ত্তরশত প্রভৃতি অষ্টাদিক অপের হলে অনামিকার মূলপর্ক
হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ক লইয়া ক্রমে
তর্জনীর মধ্যপর্ক পর্যন্ত আট পর্কে আটবার জপ
করিতে হয় (৩)।

শক্তিমন্ত্রের জপে করমালা অন্য প্রকার, তাহাতে অনা-
মিকার তিন পর্ক, কনিষ্ঠার তিন পর্ক, মধ্যমার তিন পর্ক ও
তর্জনীর মূল পর্ক এই দশ পর্ক লইয়া একগাছি মালা হয়।
তর্জনীর মধ্যপর্ক ও অগ্র পর্ক ঐ মালার মেরুরূপে কল্পিত
হয়। মেরুস্থানে জপ নিষিদ্ধ। ইহাতে অনামিকার মধ্য পর্ক
হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তিন পর্ক লইয়া ক্রমে
মধ্যমাঙ্গুলীর তিন পর্ক দিয়া তর্জনীর মূল পর্যন্ত দশ পর্কে
জপ করিতে হয়। ঐরূপ মালার আটবার অপের হলে
অনামিকা অঙ্গুলীর মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার
তিন পর্ক লইয়া ক্রমে মধ্যমার মূলপর্ক পর্যন্ত আটপর্কে
আটবার জপ করিতে হয়।

ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্ররূপে আবার অন্যপ্রকার করমালা।
ইহাতে মধ্যমার মূল ও অগ্র, অনামিকার মূল ও অগ্র, কনিষ্ঠা
ও তর্জনীর মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ক এই দশপর্কে একগাছি মালা
হয়। অনামিকার মধ্যপর্ক এবং মধ্যমার মধ্য পর্ক এই দুইটি ঐ
মালার মেরুরূপে গণ্য।

জপের নিয়ম—মধ্যমার মূল পর্ক হইতে আরম্ভ করিয়া
অনামিকার মূল পর্ক লইয়া কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ক
দিয়া ক্রমে তর্জনীর মূল পর্ক পর্যন্ত। ইহাতেই দশবার জপ
হইয়া থাকে। আটবার অপের হলে কনিষ্ঠার মূল পর্ক হইতে
ক্রমে তর্জনীর মূল পর্ক পর্যন্ত জপ করিতে হয় (৪)।

(৩) “অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।

তর্জনীমূলপর্কান্তঃ দশপর্কং সংজপেৎ।

অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।

তর্জনীমধ্যপর্কান্তঃ দশপর্কং সংজপেৎ।” (সনৎকুমারীর)

(৪) “অনামিকাত্রয়ঃ পর্ক কনিষ্ঠাদি ত্রিপর্কিকা।

মধ্যমারভ্য জিতরঃ তর্জনীমূলপর্কণি।

তর্জন্যগ্র্যে তথা বধো বো জপেৎ স তু পাণকুৎ।” (শ্রীকব)

“পর্কত্রয়ঃ মধ্যমারভ্য তর্জন্যগ্র্যে বো জপেৎ স তু পাণকুৎ।

পর্কত্রয়ঃ মধ্যমারভ্য তর্জন্যগ্র্যে বো জপেৎ স তু পাণকুৎ।

পর্কত্রয়ঃ মধ্যমারভ্য তর্জন্যগ্র্যে বো জপেৎ স তু পাণকুৎ।

সকল প্রকার করমালা জপেই করতল কিংকিৎ আকৃতি
করিয়া অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সংলগ্নভাবে রাখিয়া জপ
করিতে হয়। ইহার অভ্যাস করিলে জপ নির্ভুল হয়।
অঙ্গুলীসকলের অগ্রে অগ্রে এবং পর্কসন্ধিতে জপ করা এবং
মেরুরূপে করা অতি নিষিদ্ধ। গণনার নিয়ম লক্ষন করিয়া
জপ করিলে অপের কল রাঙ্কসেরা গ্রহণ করে। অতএব অঙ্গুলী
দ্বারা পূর্বোক্ত নিয়মে অপরাপর অঙ্গুলীর পর্ক সকল স্পর্শ
করিয়া সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হয় (৫)।

বিংশসারস্ত্রে লিখিত আছে—জপের সংখ্যা ও উপসংখ্যা
উভয়ই রাখিতে হয়।

তন্ত্রমতে হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া অঙ্গুলীগুলি কিংকিৎ বক্র
করিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক জপ করিতে হয়।

ততুল, ধাতু, পুষ্প, চন্দন, বৃত্তিকা ও অঙ্গুলীপর্ক এই
সকল দ্বারা জপের উপসংখ্যা রাখা নিষিদ্ধ। রক্তচন্দন, লাক্ষা,
সিন্দুর, গোবর ও ঘুঁটে একত্র মিশাইয়া গুলি করিয়া মালা
গাঁথিয়া জপসংখ্যা করা প্রশস্ত।

বর্ণমালা।—‘অ’ হইতে ‘ক’ পর্যন্ত বর্ণ সকলে একগাছি
মালা করনা করিবে, ইহাকে বর্ণমালা বলে। তন্ত্রমতে—‘ক’ র
পূর্বেও একটি ‘ল’ র পাঠ করিতে হয়। স্তোত্রায় সমষ্টিতে
৫১টি বর্ণ হয়। ‘ক’ এই বর্ণটি মালার মেরু সাক্ষীরূপে

শক্তিমালা। সমাখ্যাতা সর্বত্র প্রচলিত।

অনামামধ্যমারভ্য গ্রাহকিপ্যক্রমেণ চ।

মধ্যমামূলপর্কান্তঃ দশপর্কং সংজপেৎ।” (হংসপারমেশ্বর)

“অনামামধ্যমারভ্য মূলপর্কঃ দশঃ পর্কঃ।

কনিষ্ঠারভ্য তর্জন্যগ্র্যে পর্কঃ ত্রয়ঃ।

অনামা মধ্যমারভ্য মেরুঃ স্যাৎস্বিতরঃ শুভঃ।

গ্রাহকিপ্যক্রমেণ জপেত্রিপুরসুন্দরীঃ।” (বামল)

“অনামিকাত্রয়ঃ পর্কঃ গ্রাহকিপ্যক্রমেণ চ।

তর্জনীমূলপর্কান্তঃ করমালা একাধিকী।

কনিষ্ঠামূলপর্কান্তঃ গ্রাহকিপ্যক্রমেণ চ।

তর্জনীমূলপর্কান্তঃ দশপর্কং সংজপেৎ।” (মুণ্ডমালাস্ত্র)

(৫) “অঙ্গুলীঃ বিবৃণীত কিংকিৎ আকৃতি তলে।

অঙ্গুলীনাং বিরোধাত হিত্রে চ প্রবর্তে জপঃ।

অঙ্গুল্যাগ্রে তু বজ্রপুং বজ্রপুং মেরুসম্বনে।

পর্কসন্ধিবুং বজ্রপুং তৎসর্কঃ বিরূপঃ ভবেৎ।”

“গণনাবিধিমুজ্ঞা বো জপেত্তজ্ঞাপঃ যতঃ।

গুহুতি রাঙ্কসাভেন গগরেং সর্কবা বুৎ।”

“রাঙ্কসেইতপর্কৈকী ন বাইতর্কচ পুন্সকৈঃ।

ন চন্দনৈবৃত্তিকয়া অপসংখ্যাং ন কারয়েৎ।

লাক্সাঙ্গুলীদ্বিসংখ্যায়ৈব কারয়েৎ।

এতিনির্দাঃ গুলিকিং জপসংখ্যাত কারয়েৎ।” (সনৎকুমার)

কল্পনাপূর্বক একবার মন্ত্র চিন্তা করিয়াই আবার ঐ বর্ণমালার সর্গপ্রথম “অ” বিন্দুবৃত্ত এই বর্ণও চিন্তা করিবে। এই প্রকারে একবার মন্ত্রচিন্তা আর পর পর একটা একটা বিন্দুবৃত্ত বর্ণের চিন্তা করিলেই ‘ল’ পর্যন্ত পঞ্চাশবার চিন্তা করা হয়। এইরূপ একবার অহুলামে চিন্তার পরে আবার একবার বিলোমে অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে ‘ল’ হইতে ‘অ’ পর্যন্ত এক একটা বর্ণের চিন্তা করিলে সমষ্টিতে এক শতবার জপ বা চিন্তা করা হয়। ইহার পর আবার আটবার জপ বা চিন্তা করিতে হইলে অষ্টবর্ণের আট আট আটটা বর্ণ চিন্তা করিতে হয়। তন্মধ্যে মতে অকার হইতে অঃ পর্যন্ত বোড়শবরে এক বর্ণ, আর ম পর্যন্ত ২৫টা বর্ণে পাঁচ বর্ণ, ‘ব র ল ব’ এই চারিটা বর্ণে এক বর্ণ, ‘শ ব স হ ল’ এই পাঁচটা বর্ণে একবর্ণ হয়, সুতরাং অ, ক, চ, ট, ত, প, ব, শ, নামে অষ্টবর্ণ হইয়া থাকে। আটবার চিন্তা বা জপের স্থলে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত। কোন কোন মতে ঐ অষ্টবর্ণের অন্ত্য বর্ণদ্বারাও আটবার জপের বিধান আছে (ক)।

অক্ষমালা।—তন্ত্রদ্বারা লিখিত আছে—রুদ্রাক্ষ, শম্ব, পদ্মাক্ষ, পুন্ড্রজীব, বক, মুক্তা, ক্ষটিক, মণি, স্তবর্ণ, বিক্রম, রোপ্য ও কুশমূল এই নয় প্রকার জব্য দ্বারা গৃহস্থগণের অক্ষমালা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে অমূল্য দ্বারা জপে এক গুণ, পর্ল দ্বারা অষ্ট গুণ, পুন্ড্রজীব নির্মিতমালা দ্বারা দশ গুণ, শম্বমালায় দশ সহস্র গুণ, প্রবাল ও মণির দ্বারা নির্মিত মালার ও ক্ষটিকমালার দশ সহস্র গুণ, মৌক্তিকমালার দশ গুণ, পদ্মবীজমালার দশলক্ষ, স্তবর্ণ মালার কোটি, কুশগ্রন্থির মালার শতকোটি এবং রুদ্রাক্ষ মালার অনন্তগুণ ফল হইয়া থাকে। বাস্তবিক সকল প্রকার মালাই মানবের মুক্তিপ্রদ (৬)।

(ক) “আদি কুচু হু পু হু শবোষ্টৌ বর্ণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।” (সনৎকুমার)

“সবিন্দুঃ বর্ণমূচ্চার্য্য পঞ্চাশত্তঃ জপেদ্বিধঃ।

অকারাদিককারান্তঃ বিন্দুবৃত্তঃ বিভাব্য চ।

বর্ণমালা সমাখ্যাতা অহুলামবিলোমতঃ।” (মারদ)

“অহুলামবিলোমেন বর্ণাষ্টকবিভাগতঃ।

মন্ত্রেণাভ্যস্তিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনাভ্যস্তিতান্ মনু।” (বিষ্ণুদেবভট্ট)

(৬) “পদ্মবীজনির্মিতমালা বহির্বাণে শৃণু বতঃ।

রুদ্রাক্ষপদ্মাক্ষপুন্ড্রজীবকমৌক্তিকৈঃ।

ক্ষটিকমণিরৈকৈস্তবর্ণৈর্বিভক্তমৈতথা।

রাজতৈঃ কুশমূলৈস্ত গৃহস্থভাক্ষমালাক।”

“অকুলীমণ্যাদেকং পর্ণগাষ্টগং তবৈৎ।

পুন্ড্রজীবৈর্দশগুণং শতং শম্বৈঃ সহস্রকং।

প্রবালৈর্মণিরৈকৈস্ত দশসাহস্রকং মতং।

তদেব ক্ষটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্ভক্তকমুচ্যতে।

কালিকাপুরাণের মতে—রুদ্রাক্ষ বা ক্ষটিক মালাদির সহিত পুন্ড্রজীবদি বোণ করিবে না; তাহাতে কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ হয় না (৭)।

রুদ্রাক্ষমালার শক্তনাশ, কুশগ্রন্থিময়ী মালার সকল পাপনাশ, পুন্ড্রজীবকলের মালার পুন্ড্রসম্পদ, রোপ্য ও ও মণির দ্বারা মালার অতীষ্ট-সিদ্ধি এবং প্রবাল-মালার জপ করিলে বিপুল ধনলাভ হয়। বারাহীতন্ত্রের মতে—ভৈরবী-বিভার স্তবর্ণ, মণি, ক্ষটিক, শম্ব ও প্রবালের মালা ব্যবহার করিবে, পুন্ড্রজীব, পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ ও ইন্দ্রাক্ষমালা পরিত্যাগ করিবে (৮)।

তন্ত্ররাজে ও কুমারীকরে লিখিত আছে—ত্রিপুরার জপে রক্তচন্দন ও রুদ্রাক্ষমালা, গণেশের জপে গজদন্ত নির্মিতমালা, বৈষ্ণব জপে তুলসীমালা; কালিকা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরা, তারিণী, ইহাদের জপে রুদ্রাক্ষমালার ব্যবহার করিতে পারে, (কিন্তু পুরন্দর বাতীত দিবসে রুদ্রাক্ষমালা ব্যবহার করিবে না।) নীলসরস্বতী ও তারার জপে মহাশম্বময়ী মালা ব্যবহার করিবে (৯)। কিন্তু উপরোক্ত শক্তি ব্যতীত অপর শক্তি মন্ত্র-জপে রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবে না। কর্ণ ও নেত্রাস্ত্রারালের মধ্যস্থ ললাটাস্থি দ্বারা বে মালা প্রস্তুত হয়, তাহাকেই মহাশম্বময়ী মালা বলে (১০)।

মুণ্ডমালাতন্ত্রের মতে—মহাতান্ত্রিকের পক্ষে ধূমাবতীর

পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষং ত্র্যং সৌবর্ণং কোটিকচ্যতে।

কুশগ্রন্থ্য কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ ত্র্যশসংস্কৃতং।

সর্ষৈর্বিরচিতা মালা নৃণাং মুক্তিকলপ্রদা।”

(৭) “বদ্যতত্ত্ব অমূল্য মালারঃ জপকর্মণি।

তত্ত্ব কামক মোক্ষকং দদ্যতি শ্রিরম্বরী।” (কালিকাপুং)

(৮) “স্তবর্ণমণিভির্মীলা ক্ষটিকীঃ শম্বনির্মিতাঃ।

প্রবালৈরৈব বা কুর্বাৎ পুন্ড্রজীবঃ বিবর্জয়েৎ।

পদ্মাক্ষকৈশ্চ রুদ্রাক্ষমিত্রাক্ষক বিশেষতঃ।”

(৯) “বৈষ্ণবে তুলসীমালা পজয়ৈর্গজাননে।

ত্রিপুরার জপে শত রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ।” (তন্ত্ররাজ)

“কালিকা ছিন্নমস্তা চ ত্রিপুরা তারিণী তথা।

এতাঃ সর্গা ন দ্ব্যভি জপে রুদ্রাক্ষমালাঃ।

দ্বিবা নৈব এজগৎবাঃ রুদ্রাক্ষমালাপি চ।

পুরন্দরাদিতে চাত্র দ্বুগুণত বরাননে।

মহাশম্বময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধে।”

করাক্ষৈঃ শক্তিসম্বন্ধ ময়ী বঃ প্রজপেৎ প্রিয়ে।

স হুগতিমবায়োতি নিকলন্তত তন্ত্রণঃ।” (কুমারীকর)

(১০) “মূলললাটাস্থিগুণ্ডেন রচিতা অপমালা।

মহাশম্বময়ী মালা তারাবিন্দাজপে প্রিয়ে।

কর্ণব্রহ্মাণ্ডমালাহি মহাপ্রাণঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।”

জপ বিষয়ে অশানজাত ধূতুরমালা প্রাপ্ত। নাকী ও রক্তবাস দ্বারা প্রথিত নরাকুলির অস্থিমালাও সর্বকামপ্রদ (১১)।

হরিতকিবিলাসের মতে—গোপালমন্ত্রজপে পদ্মবীজের মালার সিদ্ধি, আমলকীর মালার সকল অতীষ্টপূর্ণ এবং তুলসী-মালার অচিরাত্ম মোক্ষ হয় (১২)।

তত্ত্ব কিরূপ হুতায় জপমালা গাঁথিতে হয়, তাহারও ব্যবস্থা আছে। গৌতমীয়তন্ত্রের মতে—ব্রাহ্মণকন্তার হস্ত-নির্ধৃত কাপাস হুত্রেই ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রদ। শাস্তি, বলীকরণ, অভিচার, মোক্ষ, ঐশ্বর্য ও জয়লাভার্থ শুরু, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পট্টহুত ব্যবহার্য। কিন্তু অপর সকল বর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণের হুতাই প্রশস্ত। তিন খেই হুতা এক করিয়া এক একবার প্রণব জপ করিয়া মণি লইয়া হুতার মধ্যে মধ্যে গাঁথিবে ও ব্রহ্মগ্রহি দিবে। মালা গাঁথা হইলে সংস্কার করিতে হয়। নব অশ্বখপত্র পদ্মাকারে রাখিয়া বীজ উচ্চারণপূর্বক তন্মধ্যে মালা স্থাপন করিবে, পরে পরিস্কার জল ও পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়া লইবে। এ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

“ও সন্তোজাত প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।

ভবেহভবে হনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোভবায় নমঃ॥”

বামদেব মন্ত্রপাঠপূর্বক জপমালা চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দিয়া লেপন করিবে। তৎপরে প্রত্যেক মণি শতবার জপ করিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে জপমালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজা করিবে।

রুদ্রযামলের মতে বিষ্ণুপক্ষে জপমালা করিতে হইলে বাগ্ভব ও লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণপূর্বক “অক্ষাদিমালিকায়ৈ নমঃ” এইরূপে মালার পূজা করিবে।

যোগিনীতন্ত্রের মতে—মালাসংস্কার করিয়া দেবতাভাব-সিদ্ধার্থ ১০৮ বার হোম করিবে, হোম করিতে অপারক হইলে দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রত্যেক মণিতে দুইশত জপ করিবে। জপকালে কম্পন হইলে সিদ্ধি হানি, করভ্রষ্ট হইলে বিনাশ, ও হুতা ছিড়িলে মৃত্যু হয়। অপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশে মালা রাখিবে।

“কং মালে সর্বভূতানাং সর্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।

তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতনমোহস্ত তে॥”

(১১) “অশানধূতুরমালা জেরা ধূম্রবীজিধো।

নরাকুল্যাহিতমালা প্রথিতা সর্বকামদা।

নাক্য সংগ্রহণং কার্ণাং রক্তেন বাসসা প্রিয়ে॥”

(১২) “পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমহাসিদ্ধিহা।

আমলকীভবা মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।

তুলসীভবা বা ভু মোক্ষং দিতমুতেহচিরাৎ॥” (হরিতকিবিলাস)

এই মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া বহুপূর্বক মালা গোপন করিয়া রাখিবে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে, মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই মালার কোন ফল হয় না, এরূপ অপ্রতিষ্ঠিত মালার জপ করিলে দেবতারাও ক্রুদ্ধ হন (১৩)।

এখন অনেক পণ্ডিত নীলতন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন যে—বিষরী গৃহস্থ ভোজনে গমনে, দানে ও গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিলেও সর্বদা সর্বস্থানে মালা জপ করিতে পারে, এরূপ স্থলে ফাটিকী বা অস্থিরী মালা ধারণ করিবে না, রুদ্রাক্ষ, পুণ্ড্রীক, রক্তচন্দন-বীজ, প্রবাল, শঙ্খ ও তুলসীর মালাই প্রশস্ত (১৪)। কিন্তু আমরা এরূপ প্রমাণ নীলতন্ত্র বা বৃহস্পতীতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাইলাম না, বরং গায়ত্রীতন্ত্রে লিখিত আছে, পথে যাইতে যাইতে মালা দ্বারা জপ করিবে না, তাহাতে হানি হয় ও জপকারী সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পথে করমালায় জপ করিতে পারিবে (১৫)। এইরূপ বিরোধ দৃষ্টে বোধ হয় পূর্বে জপকারী গমনকালেও করমালা বা পর্ক সন্ধি দ্বারা জপ করিতে পারিত, কিন্তু পরবর্তী কালে রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নির্ধিত মালাই করমালারূপে করিত হয়, তদবধি সর্বত্র সর্ব-স্থানে সকল সময়ে জপমালার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(নীলতন্ত্র ৭ম পটল, মাতৃকাভেদতন্ত্র ১৪ পটল, বৃহস্পতী-তন্ত্র ৪র্থ পটল, ফেৎকারিণীতন্ত্র সাধারণ পটল ও কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রেও জপমালার বিবরণ বর্ণিত আছে।)

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানগণ জপমালা ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানদিগের জপমালার ১০০ গুটিকা থাকে। জপকালে ইহার আলাহ ১০০ নাম স্মরণ করে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধদিগের জপমালায় গুটিকার সংখ্যা ১০৮। হিন্দুগণ জপকালে কখন কখন গোমুখ (খলিরা বিশেষ) ব্যবহার

(১৩) “অপ্রতিষ্ঠিতমালাভিমন্ত্রং জপতি যো নরঃ।

সর্বং তদ্বিকলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতাঃ” (রুদ্রযামল)

(১৪) “আচাভ্যাপেক্ষিতা নাস্তি শুদ্ধাশুদ্ধবিচারণা।

ভোজনে গমনে দানে গ্রামে গার্হ্যাকর্মণি।

বিষয়াসক্তমনসাঃ কচিদ্ভ্রাতঃ সমাচরেৎ।

সমাদার চরেৎ কর্ণং সদা কালং স্মরেদ্ভুং”

(১৫) “মালায়া ন জপেদমন্ত্রং গচ্ছন্ পথি কদাচন।

জপ্তা মন্ত্রং যথা দৃঢ়ং সর্পবোদৌ চ জায়তে।

করমালায় জপেৎ গচ্ছন্ পথি সুপৌত্তম।

মালায়া পথি জপ্তা যৈ তত্ত হানিঃ প্রজায়তে।

বেদমন্ত্রবিহীনস্ত তথা বাতি পরাতপস্ব।

উপবিত্ত জপেদমন্ত্রঃ মালায়া নৃপনন্দন।” (গায়ত্রীতন্ত্র ৫ পং)

করেন। বিহীনগণ এবং প্রাচীন খুঁটানগণ অপমান্য ব্যবহার করিত কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। খুঁটানগণের মধ্যে কেবল রোমান কাথলিকগণ অপমান্য ব্যবহার করে। ইহাদের মালা ওজ্জ্বলমিষিত। মুকলমানেরা কাচের, তাম্রি (গুটিকা) ব্যবহার করেন, এরূপ উৎকৃষ্ট তাম্রি কান্দাহারে প্রাপ্ত হয়।

জপযজ্ঞ (পুং) জপ-এব যজ্ঞঃ। জপরূপ যজ্ঞ। জপযজ্ঞ তিন প্রকার—বাচিক, উপান্ত এবং মানস। [জপ দেখ।]

জপস্থান (স্ত্রী) জপসাধন স্থান, জপের স্থান। [জপ দেখ।]

জপহোম (পুং) জপযজ্ঞ।

“জপহোমৈরপৈতেনো রাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতম্।” (মহু ১০।১১১)

জপা (স্ত্রী) জপ-অচ্ টাপ্। ১ জবাপুশবৃক্ষ। ২ জবাপুশ, জবাকুল।

“ওড়পুশঃ জবা চাষ জিসক্যা সারগাসিতা।

জপা সংগ্রাহিকী যেন্তা জিসক্যা ককবাতজিং।” [জবা দেখ।]

জপিন্ (ত্রি) জপ গিনি। জপকারী।

জপ্ত (ত্রি) জপ-ক্ত। বাহা জপ করা হইরাছে।

জপ্তব্য (ত্রি) জপ-তব্য। বাহা জপ করা হইবে, জপনীয়।

“ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্।” (ভাগ ৪।২৪।৩১)

জপ্য (ত্রি) জপ-প্যৎ। ১ জপ। “জপ্যেনৈব তু সংনিধ্যৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।” (মহু)। ২ জপনীয়।

জপোপ্তর (স্ত্রী) একটী প্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ।

“জপোপ্তরে মহাস্থানে শঙ্করী চ ত্রিশূলিনী।

ত্রিশূলী শঙ্করস্তত্র সৰ্বপাপবিমোচকঃ।” (বৃহন্নীলস্তত্র)

জব (পুং) জু-ভাবে-অপ্। ১ বেগ। “জবেন কঠং সত্তরাঃ প্রপেদিরে।” (মাষ) (ত্রি) জু-কর্তরি-অচ্। ২ বেগবান্।

জবন (স্ত্রী) জু-ভাবে-লুট্। ১ বেগ। (ত্রি) জু-কর্তরি-লু।

২ বেগবান্, বেগযুক্ত। “আকুহ জবনানখান্ নিবন্তমুপচক্রমে”

(হরিবংশ)। ৩ বেগযুক্ত অর্থ। ৪ দেশবিশেষ, আরবদেশ,

পারস্তদেশ, য়ুনান। ৫ উক্ত দেশবাসী। [যবন দেখ।]

৬ স্নেহজাতিবিশেষ, মুসলমান জাতি। পূর্বে ইহার জবন-

দেশোক্তব কত্মিয় ছিল, পরে সগররাজ ইহাদিগকে মন্তক যুগুন

করিয়া সর্বধর্ম বহিকৃত করিয়া দেন। (হরিবংশ)। ৭ ক্রন্দনের

সৈনিকগণের মধ্যে একজন সৈনিক। (ভারত ৯।৪৫।৭২)

৮ শিকারী যুগ। ৯ ঘোটক। ১০ যবদীপের অধিবাসী।

জবনাল (স্ত্রী) কলৌষধি শস্ত্রবিশেষ। জনার, মজা। ইহার গুণ—বাহু, শীতল, বায়ুজনক এবং ককশিত্তনাশক। (রাজবল্লভ)।

জবনিকা (স্ত্রী) ১ ব্যবহারক বস্ত্রবিশেষ, তির্যকারিণী। কানাৎ, চিক্, পর্দা। “সতাং জবনিকা নিকাম সুখিনাং” (মাষ)।

পর্যায়—প্রাচীনরা, তির্যকারিণী, যবনিকা, যবনিকা,

তির্যকারিণী, অশ্মট, পটী, চিট্রা, কাণ্ডপট। ২ জবনী স্ত্রী।

জবনিমন্ (পুং) জবন-ইমনিহ্। জব, বেগ।

জবনী (স্ত্রী) ১ যবনিকা। ২ ওষধিবিশেষ। ৩ যবনস্ত্রী।

জবৎ (ত্রি) জব-মতুপ্ মত্ ব। বেগবান্, জবযুক্ত।

জবযুক্ত (ত্রি) জবেন যুক্তঃ। ৩-তৎ। বেগবান্, বেগশালী।

জবর (আরবী) কমতা, বল।

জবরদস্তি (আরবী) অত্যাচার।

জবলী (স্ত্রী) কহার কলযুক্ত একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার কলের গুণ—কফ ও শিত্তনাশক, অরুতিক, রুচিপ্রদ, স্খাবহ, স্নগন্ধ-যুক্ত। কোনও কোনও পুস্তকে “লবলী” শব্দ আছে। জবলী বোধ হয় ওষধিজাতীয় হইবে।

জবস্ (পুং) বেগ, জব। “আভ্রমন্ত জবসা” (অক্ ১।১৮।১১)

জবস্ (পুং) দাস, ভূগ। (শঙ্কর)। [যবস্ দেখ।]

জবা (স্ত্রী) জব-টাপ্। ১ বেগবতী। ২ স্বনামখ্যাত পুশ-

বৃক্ষ। জবাকুল গাছ। ইহার পুশ ঘোর রক্তবর্ণ। হিন্দীতে

ইহাকে “ওচুল” ও ইংরাজীতে Chinese rose বলে। পর্যায়—

ওড়পুশ, জপা, ওড়্রা, রক্তপুশী, অর্কপুশী, অর্কপ্রিয়া, রাগ-

পুশী, প্রতিক্রা, হরিবল্লভ।

বৈজ্ঞক রাজনির্ব্বাণ মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, ইজ-

লুপ্তবিনাশক, বিচ্ছর্দি ও জঙ্ঘজনক এবং সূর্য্যারাদনার উপযুক্ত

(রাজনি) রাজবল্লভের মতে—মলমূত্রস্তম্বন রজনকারী।

(রাজব) বৈজ্ঞক চক্রপাণিস্তের মতে—জবাপুশ স্নতে

ভাজিয়া ব্যবহার করিলে স্ত্রী গর্ভমতী হয়।

জবাই (পারসী) হত্যা।

জবাকুশুম (স্ত্রী) জবাকুল।

জবান্দি (স্ত্রী) স্নগন্ধি দ্রব্য ভেদ। “জবান্দিনীরসং দ্বিজমীয়ৎ

শিকস্নগন্ধিনং। আপতে বহুলামোঃ রাজাং যোগ্যক তরাতঃ।”

ইহা একপ্রকার স্নগের বর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইরা থাকে,

ইহার গুণ—স্নগন্ধ, দ্বিধ, উষ্ণ, স্খাবহ, বাতে হিতকর এবং

রাজগণের আল্লাদজনক। (রাজনি) ইহার পর্যায়—গন্ধরাজ

কুজিম, স্নগধর্ম্মজ, স্নগধর্ম্মজ, গন্ধাঢ্য, দ্বিধ, সাত্ত্বিকধর্ম্ম,

স্নগকটেলনির্ব্বাণ, কটুমোদ।

জবামর্দ (পারসী) ১ যুবক, যুবাধর্ম্মজ। ২ যৌবনাবিত।

৩ সাহসী, বলবান্। ৪ দরালু। ৫ উনার চরিত।

জবামর্দী (পারস্ত) ১ যৌবন। ২ কর্ণগুহিত। ৩ সাহস।

৪ ওদার্য।

জবাধিক (ত্রি) ১ অতিশয় বেগযুক্ত। (পুং) ২ অধিক বেগ-

বিশিষ্ট ঘোটক। (অমর)

জবাপুঙ্গ (স্রী) জবাপুঙ্গ।

জবাক (পারসী) ১ জিহ্বা। ২ ভাষা। ৩ বাক্য।

জবান (জোয়ান পারসী) ১ বলবান, কৰ্ম্মকম। ২ যুবক।

জবানিল (পুং) প্রচণ্ড বায়ু।

জবানী (পারসী) ১ জিহ্বা দ্বারা বাহা উচ্চারিত হর, ভাষা।
২ কথিত, উক্ত। ৩ বল, কৰ্ম্ম কমব।

জবানী (স্রী) ১ বাসবিশেষ, ওষধিবিশেষ। [জবানী দেখ।]
২ বৃক্ষভেদ।

জবানুবন্দী (পারসী) সাক্ষীর এজাহার।

জবাব (পারসী) ১ উত্তর। প্রত্যুত্তর। ২ কৰ্ম্মচ্যুতি, ভৃত্যকে
কৰ্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া।

জবাবী (পারসী) প্রত্যুত্তর-দেয় অথবা বন্দারা প্রত্যুত্তর
দেওয়া হর।

জবারু (স্রী) ১ অবমানরোহি। ২ জরমাণরোহি। “সশস্ত্র
চর্ম্মধি চাক্র পুস্ত্রেরগে রূপ আকুপিতং জবারু” (ঋক্ ৪।৫।৭।)
‘অবমানরোহি জরমাণরোহি বা’ (সায়ণ)।

“জবারু অবমানরোহি জরমানবোহি।” (নিরু° ৬।১৭)

জবাল (পুং) [জাবাল দেখ।]

জবাল (স্রী) সত্যকাম ঋষির মাতা। “সত্যকামোহ জাবালো
জবালাং মাতরমামত্ৰরাক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি।” (ছান্দোগ্য°)
সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়া
মাতাকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। জবালা বলিলেন যে,
তিনি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করিয়া সত্যকামকে লাভ
করিয়াছেন, অতএব সত্যকাম কোন গোত্রসংজ্ঞা তিনি ঠিক
জানেন না। এজন্ত তিনি সত্যকামকে বলিলেন যে তাঁহার
নামানুসারে “জাবাল” নাম গ্রহণ করা বিধেয়।

জবজবিয়া (দেশজ) সিন্ধু, ভিজা, সেন্টস্টিয়া।

জব্দ (আরবী) ১ পরাজিত অবমানিত। ২ বাজেয়াপ্ত করা।
৩ শাসন।

জভন (স্রী) জভ-মুঠ। ১ মৈথুন। ২ মৈথুনদ্বারা ধর্ষণ।

জভ্য (পুং) জভ-বৎ। শস্ত্রের অনিষ্টকারী একপ্রকার কীট।
“তর্দ হৈ পতঙ্গ হৈ জভ্য হা উপকস” (অথর্ক। ৬।৫।২)

জম্ (অব্য) পরী।

জম্বক (দেশজ) জাঁকজমক, আড়ধর।

জম্বজ (ত্রি) যমজ হযো। যমজাত। যমজ। (বিরূপকো°)।

জমৎ (ত্রি) উজ্জল, দীপ্তিকর।

জমদগ্নি (পুং) একজন বৈদিক ঋষি। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ক
প্রভৃতি সকল বেদেই এই ঋষির পরিচয় আছে। (ঋক্
২।৬।২৫, গুরুবহুঃ ৩।৬২, অথর্ক ৪।২৯।৩)। সর্কীয়জমদগ্নিকার

মতে ইনি অনেকগুলি ঋক্ প্রকাশ করেন। আখ্যায়ন-
শ্রোতন্থয়ে ইনি ভৃগুবংশীর বলিয়া বর্ণিত। (আখ° শ্রো°
১২।১০) ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রেই বিশ্বামিত্রের সহিত ইনিও
বর্ণিতের বিপক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (ঋক্ ১০।১৬৭।৪,
৭।৯৩।৩) আবার ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।১৬) নরমেধ বজ্রকালে
বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মপদে নিযুক্ত
ছিলেন। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে জম-
দগ্নির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইনি মহর্ষি ঋচীকের পুত্র। [ঋচীক দেখ।] কান্ত-
কুজরাজকন্ডা সত্যবতীর গর্ভসম্মত। সত্যবতী পতিব্রতা
ছিলেন, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি ঋচীক সত্যবতী ও
তাঁহার মাতার জন্ত চুই চক্র প্রস্তুত করিয়া বলেন, “তুমি
ঋতুমান করিয়া উত্ত্বরণবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই চক্র এবং
তোমার মাতা অশ্বথ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া অপর চক্র গ্রহণ
করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা পুত্রবতী হইবে।”
সত্যবতী চক্র লইয়া মাতার নিকট গেলেন ও তাঁহাকে সমস্ত
কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার মাতা উৎকৃষ্ট পুত্র পাইবার
ইচ্ছায় সত্যবতীকে চক্র ও বৃক্ষ পরিবর্তন করিতে অগ্ররোধ
করেন, সত্যবতী মাতার অগ্ররোধ এড়াইতে না পারিয়া
সম্মত হইলেন। যথাকালে উভয়েই গর্ভবতী হইলেন।
ঋচীক পত্নীর গর্ভলক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, আমার বোধ
হইতেছে তোমরা চক্র ও বৃক্ষ পরিবর্তন করিয়াছ। আমি
চক্র প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে বিশ্ববিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ
ব্রাহ্মণ ও তোমার মাতার গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়
জন্মগ্রহণ করিবে ভাবিয়া চক্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এখন
তাহার বিপর্য্যয় হওয়াতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার গর্ভে
উগ্রকর্ম্মী ক্ষত্রিয় ও তোমার মাতার গর্ভে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ
উৎপন্ন হইবে।” তাহা শুনিয়া সত্যবতী বড়ই কাতর হইয়া
পতির পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার প্রতি এসময়
হউন, আমার পুত্র যেন উগ্র ক্ষত্রিয় না হয়, বরং পৌত্র ক্ষত্রিয়
হইলে ক্ষতি নাই।” ঋচীক তাহাই স্বীকার করিলেন। যথা-
কালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে
প্রসব করিলেন। পিতার প্রভাবে বদিও জমদগ্নি ক্ষত্রিয়
হন নাই, কিন্তু সর্কদাই ক্ষত্রিয়োচিত শর-ক্রীড়ায় অহুরক্ত
থাকিতেন। [ছত্র দেখ।] ইনি প্রেনেনজিং রাজকন্ডা রেণু-
কাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে ইহার কুম্ভান, অুবণ, বহু,
বিশ্বাবহু ও পরশুরাম এই পাঁচ পুত্র জন্মে। ঋচীকের কণ্ঠস্থ-
সারেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী হইয়াছিলেন। একদিন মহর্ষি
জমদগ্নি রেণুকাকে ব্যক্তিচারণাবে দ্বিষ্ট ভাবিয়া কুম্ভান

ঐতিহাসিক মাতৃবধ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু পরশুরাম ব্যতীত কেহই মাতৃবধ করিতে সক্ষম না হওয়ার ক্রমবান্ধব প্রভৃতি পিতৃকোপে অতৃপ্ত প্রাপ্ত হয়। পরশুরাম পিতার আদেশ মাত্রই কুঠারাবাতে মাতার প্রাণ বিনাশ করিলেন, তাহাতে জমদগ্নি-রামের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর লইতে বলেন। রাম বর চাহিলেন, “যেন আমার ভাতা পাপমুক্ত ও পুনর্জীবিত হয় এবং আমি সকলের অজ্ঞের হই।” তখন জমদগ্নির কুপার রেণুকা আবার জীবন পাইলেন, ক্রমবান্ধব প্রভৃতিরও অতৃপ্ত দূর হইল।

কোন সময়ে হৈহয়রাজ কার্তবীৰ্য্যার্জুন জমদগ্নির আশ্রমে আগমন করেন, তখন জমদগ্নি ব্যতীত আশ্রমে আর কেহ ছিল না, সেই সুযোগে হৈহয়রাজ ইহার গো হরণ করেন। পরশুরাম পিতার নিকট কার্তবীৰ্য্যের আচরণের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরশু দ্বারা কার্তবীৰ্য্যের সহস্র বাহ কাটরা দেন। কার্তবীৰ্য্যের পুত্রগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পরশুরামের অমুপস্থিতকালে আশ্রমে গিয়া জমদগ্নির প্রাণ বিনাশ করেন। সেই জন্যই পরশুরাম একুশ-বার পৃথিবী নিঃকন্ড্রিয় করিয়াছিলেন।

জমদগ্নিও গোত্রাকারক ঋষির মধ্যে একজন।

“জমদগ্নির্ভরবাকো বিশ্বামিত্রাভিপোতমাঃ।

বশিষ্ঠকান্ডপাগস্ত্যা মুনরো গোত্রাকারিণঃ॥” (মহু)

[রেণুকা ও পরশুরাম দেখ।]

জমদগ্নি, ১ যেমন, ভোজন। ২ খাদ্যজব্য। ৩ (দেশজ) জমিয়া যাওয়া।

জমশেদ, পারশ্বদেশের প্রসিদ্ধ পিশদাদবংশীয় ৪র্থ নরপতি। বেলি প্রভৃতির মতে ইনি খৃষ্ট জন্মের তিনহাজার বর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস যে ইনি খৃষ্টের ৮ শতবর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইনিই বিখ্যাত পার্শ্বপোলিস নগরী স্থাপন করেন, এখনও ঐ স্থান ইন্ডর ও তৎ জমশেদ নামে খ্যাত।

এই জমশেদ হইতেই পারশ্ব সৌর বর্ষ আরম্ভ হয়। সূর্য্য মেঘরাশিতে যে দিন প্রবেশ করে, সেই দিন হইতে এই বর্ষ আরম্ভ। এই নব বর্ষ উপলক্ষে মহা উৎসব হইত।

কর্দোসির শাহনামায় লিখিত আছে—এই জমশেদ হইতেই মানবজাতির মধ্যে সভ্যতা বিস্তৃত হয়। সিরীয়রাজ জুহাক ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু চতুর্ভাষ্যক্রমে জমশেদ রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান, ভারত, চীন প্রভৃতি নানা দেশে পলাইয়া বান। কিন্তু জুহাকের কর্ণচাঙ্গীগণও ইহার

অহরণ করে। অবশেষে ইনি বন্দী হইয়া সিরীয়রাজের নিকট আনীত হন। সিরীয়রাজের আদেশে ইহাকে দুই-খামি নৌকার মধ্যে রাখিয়া করাত দিয়া চিরিয়া ফেলা হয়। বিশ্বস্ত পার্শ্বপোলিস নগরের প্রস্তরের উপর যে রাজসভার চিত্র খোদিত আছে, তাহা অনেকের মতে জমশেদের নৌরোজ উৎসব-আলপক। জমশেদ সম্বন্ধে পারশ্ব নানা অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

২ মুসলমানেরা ডেভিদের পুত্র সলমনকেও জমশেদ বলিয়া থাকেন।

জমশেদ কুতুব শাহ, গোলকুণ্ডাধিপ কুলি-কুতুব শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

জমশেদী, ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে মুর্খাব-নদীতটবাসী পারসিক জাতিবিশেষ। ইহারা পারশ্বরাজ জমশেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ঠিক তুর্ক-জাতির মত। ইহারা এক স্থানে বাস করিতে ভালবাসেন না। আল্লাকুলি খা ইহাদিগকে পারশ্ব হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহারা খিবায় আসিয়া ১২ বর্ষকাল অল্প নদীতীরে বাস করিয়াছিল, তৎপরে তুর্কদিগের অভ্যুদয়কালে ইহারা পৈত্রিক জন্মভূমি মূর্খবে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইহারা তাতারদিগের জায় নলখাগড়ার উপর কঞ্চল ঘেরিয়া কোণাকারে তাঁবু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে। ইহাদের আহার ও পোষকাদি তুর্কদিগের মত। ইহারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ও রণকুশল। মাংস খরা কাজে বিশেষ পটু। এখনও ইহারা প্রাচীন পারসিকদিগের মত অগ্নিপূজা ও পূর্ব্বদারী তাঁবু নির্মাণ করে।

জমা (আরবী) ১ মোট সংখ্যা। ২ আর। ৩ নির্দিষ্ট কর। ৪ সংগৃহীত। ৫ প্রজার দেয় মোট খাজনা।

জমাওয়াশীলবাকী, অযোধ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে দেয় রাজস্বের বিশেষ বিবরণ কোন কোন কিস্তির রাজস্ব পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কত বাকী আছে এরূপ একটা হিসাব সম্বলিত তালিকার নাম জমাওয়াশীলবাকী। বঙ্গদেশে প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনা এবং সেস্ কোন কোন কিস্তির খাজনা পরিশোধ হইয়াছে, এবং হাংল ও বকায়ার কত খাজনা বাকী আছে, প্রজাগণের মধ্যে কে কত ভূমি ভোগ করে ইত্যাদি বিষয়সম্বলিত তালিকার নাম জমাওয়াশীল বাকী।

জমাওয়াশীলবাকী নবীশ, বেকর্চকারী জমাওয়াশীলবাকী বহি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

জমাৎখরচ (আরবী) ১ আর এবং ব্যয়। ২ চলিত হিসাব।
ইহাতে দৈনিক আর এবং খরচের বিষয় লেখা থাকে।

জমাৎজব্বা (আরবী) গত বৎসরের জমা অর্থাৎ অতীত বা গত বৎসরের কাগজে প্রকার নামে (খাজনা প্রভৃতি যাহা প্রকারের দের) যে জমা লেখা যায়।

জমাট্ (আরবী) ১ বহু লোকের সমাগম, জনতা। ২ কোনও বস্তু বাহা জমিয়া গিয়াছে, যেমন জল জমাট হইয়া বরফ হইয়া যায়।

জমাৎ, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী একত্র হইয়া অবস্থিতি কালে কিংবা তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইলে ঐ দলকে জমাৎ বলে। ইহাদিগের কার্যনির্বাহের নিমিত্ত মহাস্ত, পূজারী, কুঠারী, ভাণ্ডারী, কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, পাহারাদার ও তুরীওয়াল প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত থাকে। মহাস্ত সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। পূজারী যথাবিধি দস্তাবেজের চরণপাছকা পূজা করিয়া থাকেন। কুঠারী প্রকৃত ভাণ্ডারী, তাঁহার নিকট সমস্ত আহার দ্রব্যাদি সংরক্ষিত থাকে। পাচককে ভাণ্ডারী বলে, তাঁহার উপর রন্ধন এবং পরিবেশনের ভার। কারবারী কোষাধ্যক্ষ, তিনি জমাতের ধনরক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমতে ব্যয়ার্থ অর্থ দিয়া থাকেন। হিসাবী মুহুরির কার্য অর্থাৎ জমাতের আর ব্যয় লিখিয়া থাকেন। কোতোয়াল মহাস্তের আদেশক্রমে কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং তাহাদের সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পাহারাদারগণ জমাতের তৈজস, নিসান, ডঙ্কা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর রক্ষার্থ চোকী দিয়া থাকে। তুরীওয়ালগণ তুরী বাজাইয়া জমাতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই সমস্ত কার্যে কেবল সন্ন্যাসীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন যোগী পরমহংস প্রভৃতি অস্ত্রাশ্রম শৈবউদাসীনও জমাতে যোগ দিয়া দল পুষ্টি করিয়া থাকেন।

হরিশ্চর, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, গোদাবরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে সময়ে সময়ে অনেক জমাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। বরদা, নাগর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় জমাৎ আছে। তত্তৎস্থানের হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের যথেষ্ট আত্মকূল্য করিয়া থাকেন।

জমাতের কোনও সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে, শবদেহ দখল না করিয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত কিংবা জলে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ইহাকে মৃৎসমাধি বা জলসমাধি বলে। তৎপরে কৃত্তীর দিবসে তাহার উদ্দেশে রোঠভোগ (ছত, আঠা ও চিনি মিশ্রিত একপ্রকার চূর্ণ পদার্থ) দেওয়া হয় এবং ত্রয়োদশ দিবসে পক্ষ ও শম্ভাচাল নামে একটি ক্রিয়া করা হয়। রোঠভোগ ও পক্ষ দিবসভাগে হয়, কিন্তু শম্ভাচাল রাত্রির

কার্য। শব্দ-সাপেক্ষ বলিয়া শম্ভাচাল-ক্রিয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেবল জ্যোৎস্নাঋতুসমী সন্ন্যাসীদেরই শম্ভাচাল হয়, অন্তের হয় না। মৃত ব্যক্তির কোনও শিষ্ট বা অস্থিশিষ্ট কুশপুত্তল নির্মাণ করিয়া শম্ভাচাল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং ক্রিয়াভূমির অস্ত্রাশ্রম সন্ন্যাসীগণ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক সেই পুত্তলের উপর জলসেচন করিয়া থাকেন।

জমাৎখানা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণাহরে আবিং-বাড়-পেঠে ইন্দ্রাএলী-মতাবলী শিরা মুসলমানদিগের একটি সুবৃহৎ উপাসনা গৃহ। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই গৃহটি নির্মিত হয়।

জমাদার, বিহারকলে মুনিয়া জাতির চৌভান বিভাগের একটি শ্রেণী। ২ দেশীয় সেনাবিভাগের কর্মচারী বিশেষ, ইহার পদ সুবাদারের নিম্ন। ৩ পুলিশের একজন কর্মচারী, ইহার পদ দারোগার নিম্ন এবং হেড কনষ্টেবলের উপর। ৪ শুক এবং অস্ত্রাশ্রম বিভাগের কর্মচারী বিশেষ। ৫ কোনও কোনও ধনী গৃহস্থের বাড়ীর কর্মচারী বিশেষ, ইহারা নিম্নতম ভৃত্যদিগের উপরে কর্তৃত্ব কিংবা আত্মবলের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। ৬ কতকগুলি লোকের অধিনায়ক।

জমাদ্দার [জমাদার দেখ।]

জমানি (আরবী) ১ সংগৃহীত। ২ কঠিনতাপন্ন।

জামামস্জিদ্, ১ দিল্লীসহরস্থ মুসলমানদিগের একটি বিখ্যাত উপাসনাগৃহ। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের যতগুলি মস্জিদ্ আছে, জামামস্জিদ্ সর্বাঙ্গেক্ষে বৃহৎ এবং সুন্দর। সম্রাট শাহ-জহান দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রত্যহ বহুসংখ্যক মিস্ত্রী খাটাইয়াও ৬ বৎসরে এই মস্জিদটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, মস্জিদের সম্মুখে এবং উভয়পার্শ্বে তিনটি অতি উচ্চ, প্রশস্ত এবং সুদৃশ্য প্রস্তরনির্মিত সোপানশ্রেণী আছে। এই তিনটি সোপানশ্রেণী দ্বারা মস্জিদের বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিতে হয়। প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটি জলাধার (চোবাচ্চা) আছে। ইহার জলে সকলে হস্তপাদাদি প্রক্ষালন করিয়া মস্জিদে প্রবেশ করে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে উপাসনাগৃহ (মস্জিদ্) এবং অপর তিন দিকে সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠমালায় অলঙ্কৃত। উপাসনাগৃহটি তিনটি প্রকাণ্ড গুণ্ডজ এবং অনেকগুলি সুন্দর প্রকার দ্বারা সুশোভিত। দুইটি প্রকার অতি বৃহৎ এবং মনোহর। এই স্থান হইতে উপাসনার নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। মস্জিদের অভ্যন্তরদেশ অতি প্রকাণ্ড এবং পর্কদিনে কিম্বা কোনও উৎসব উপলক্ষে এখানে অসংখ্য মুসলমান সমবেত হইয়া থাকে।

২ বিজয়পুর-নগরস্থ একটা মসজিদ। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এই মসজিদটা সর্বাধিক বৃহৎ। কথিত আছে যে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে প্রথম আলী আদিলশাহ ইহার নির্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার পরবর্তী রাজগণের বিশেষ চেষ্টাতেও ইহার চূড়া এবং অস্ত্রাঙ্ক অঙ্গ শেষ হয় নাই। মসজিদটা নগরের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে ৩০ ফিট উচ্চ প্রকোষ্ঠশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। প্রধান ভোরণদ্বারটা মসজিদের পূর্বদ্বারে অবস্থিত, কিন্তু উত্তরদ্বারই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট অরঙ্গজেব বিজয়নগর জয় করিয়া ইহার কতক অংশ নির্মাণ করেন। মসজিদের মধ্যস্থিত একখানি শিলালিপিদ্বষ্টে জানা যায় যে ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ আদিলশাহ ইহার কতকংশের নক্সা করাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর চারিহাজার লোক বসিতে পারে।

৩ পুগানগরস্থ একটা বিখ্যাত মসজিদ, আদিংবাড়পেঠে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৫০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইহা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে ইহার অনেকাংশ বন্ধিত করা হইয়াছে। মসজিদ-মধ্যস্থ উপাসনাগৃহটা ৬০ ফিট দীর্ঘ এবং ৩০ ফিট বিস্তৃত। পুগার মুসলমানদিগের ধর্ম এবং সমাজ সংস্কৃতির সমুদয় অবিবেশন এই মসজিদ মধ্যে হইয়া থাকে।

জমালকোটী, জমালগোতা (হিন্দী) বৃক্ষবিশেষ।

[ইহার বিশেষ বিবরণ জয়পাল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জমাল খাঁ, সম্রাট শাহজহানের একজন সৈন্যধ্যক্ষ। দিল্লীতে প্রতি বৎসর খোসরোজ নামে একটা জ্বালোকের মেলা হইত। এই মেলায় বাদশাহ-পরিবার ক্রেতা এবং সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বিক্রেতা। স্বয়ং বাদশাহ মেলায় উপস্থিত হইয়া মহিলাগণের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন।

একবার এই মেলায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজহান মেলায় একটা পরমসুন্দরী মহিলার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাকী আছে কি না, তিনি তাঁহাকে একখণ্ড উজ্জল মিসরি দেখাইয়া বলিলেন, “এই জিনিষ অবশিষ্ট আছে, ইহার মূল্য লক্ষ টাকা।” শাহজহান তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া মিসরিখণ্ড ক্রয় করিলেন, তাঁহার কথোপকথনে অত্যন্ত স্পীত হইয়া তাঁহাকে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। মহিলা যুবরাজের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অহুরোধে পড়িয়া রাজভবনে তাঁহার তিন দিবস বিলম্ব হইল। তৎপরে গৃহে গমন করিলে তাঁহার স্বামী জমালখাঁ তাঁহাকে পরীক্ষণে গ্রহণ করিতে অসম্মত

হইলেন। তাহা শুনিয়া শাহজহান ক্রুদ্ধ হইয়া জমালখাঁকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। জমালখাঁ যত হইয়া স্বীয় প্রত্যাংপরমতিত্বপ্রভাবে শাহজহানের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। শাহজহান সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, ‘যুবরাজ অল্পগ্রহ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক যে নারীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন তিনি কিরূপে তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারেন।’ যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক দশদহস্য অধারোহী সৈন্তের অধিনায়ক করিয়া দিলেন। সেই মহিলার নাম আফস মল বাহু, ইনিই শাহজহানের অকলঙ্কী হইয়া মমতাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। [তাজমহল দেখ।]

জমালি, সেথ জমালি মোলানা। দিল্লী-নিবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি। সারর-উল-আরফিফ্ অর্থৎ ধার্মিক জীবনী নামক গ্রন্থখানি ইহার রচিত। পূর্বে ইহার উপাধি জলালি ছিল, পরে ইনি জমালি উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের শাসন-সময়ে ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। প্রাচীন দিল্লীতে ইহার সমাধিমন্দির আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেথ গদাই কাছো নামক ইহার পুত্র বৈরাগ্যধারী অধীনে বহুকাল যুদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

জমাবন্দী, বঙ্গদেশে প্রজাগণের নাম, যোত, যোতের পরিমাণ ও অস্ত্রাঙ্ক বিবরণ, বিধা প্রতি খাজনার হার এবং কত খাজানা এই সমুদয় বিষয় সম্বলিত তালিকার নাম জমাবন্দী। কোড়গ প্রদেশে জমির খাজনা নির্ধারণ করিয়া যে বার্ষিক বন্দোবস্ত করা যায়, তাহাকে জমাবন্দী বলে। বোম্বাই অঞ্চলে কোনও মহাল, গ্রাম কিংবা জেলার নির্ধারিত রাজস্বের বন্দোবস্ত, কোনও গ্রাম কিংবা কোনও জেলার প্রজাগণের দেয় খাজনা ও তাহাদিগের যোতের বিবরণ সম্বলিত তালিকা অথবা প্রজাগণের সহিত গবর্নমেন্টের প্রাপ্য রাজস্বের বার্ষিক বন্দোবস্ত।

মাজাজ এবং মহিসুর অঞ্চলে প্রজাগণের সহিত রাজস্বের বার্ষিক বন্দোবস্তের নাম জমাবন্দী।

মধ্যপ্রদেশে গবর্নমেন্টের প্রাপ্য রাজস্ব অথবা প্রজাগণের খাজানা এবং যোতের বিবরণতালিকাকেও জমাবন্দী বলে।

জমি, জমিন্ (পারসী) ভূমি, ভূখণ্ড।

জমিদার (আরবী জমিন্=ভূমি, পারসী দার=অধিকারী) ভূম্যধিকারী, ভূদ্বাধিকারী।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমিদার শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। জমিদার শব্দে কোনও স্থানে ভূম্যধিকারী (Land-lord),

কোনও স্থানে সরকারপক্ষীয় রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী বিশেষকেও বুঝায়।

• জমিদার শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভূমি সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। ভূমি কাহার সম্পত্তি, ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে, প্রথমতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

“পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভাব্য্যাং পূর্নবিদো বিদুঃ।” (মনু ৯৪৪)

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে রাজাই ভূমির সন্ধাধিকারী, কারণ তিনি পৃথিবীপতি। মনু আবার বলিয়াছেন,—

“স্বাপুচ্ছেদন্ত কেরারমাহঃ শল্যবতো মৃগম্।” (মনুসং ৯৪৪)

শীকারীর মধ্যে যে প্রথম মৃগকে শরবিদ্ধ করে, সেই যেমন শীকারলব্ধ মৃগপায়, সেইরূপ যে বন কাটিয়া ভূমি উদ্ধার করিয়া কর্ণগাদি করে, ভূমি তাহারই হইয়া থাকে। সুতরাং রাজা এবং কৃষক উভয়েই ভূমির অধিকারী। অধিকন্তু রাজা উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশভাগী, কিন্তু প্রজাগণ অবশিষ্ট সমস্তেরই অংশভাগী। পুরোহিত, গুরুমহাশয়, সূত্রধার, কর্মকার, রজক, নাপিত প্রভৃতি গ্রামসমিতি এই অবশিষ্ট শস্যের যথাযোগ্য অংশপ্রাপ্ত হইত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে রাজা, কৃষকগণ এবং সমিতি ইহাদের সকলেরই ভূমিতে স্থানাদিক অধিকার আছে।

সমীপবর্তী গ্রামসমূহের কর আদায় রাজধানী হইতে সহজে নিষ্পন্ন হইত, কিন্তু দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্ম রাজা গ্রামাধিপতি, দশগ্রামপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন।

“গ্রামস্তাধিপতিং কুৰ্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥” (মনু ৭১১৫)

গ্রামস্থ ভূমি প্রজাগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া গ্রামাধিপতি শাস্ত্রচ্ছেদন সময়ে শস্যের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক রাজার প্রাপ্য অংশ আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন, প্রজাদের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। এই সকল কার্যের জন্ম তিনি রাজার নিকট হইতে শস্যের অংশ প্রাপ্ত হইতেন, কিম্বা অন্ন খাজনার ভূমি ভোগ করিতে পাইতেন।

এইরূপে ভূমি বিভাগ হইলে পর প্রজাগণের স্ব স্ব অংশ কালক্রমে তাহাদের নিজ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। প্রজাগণ তাহার চতুর্দিকে বেড়া দিয়া রাখিতে পারিত এবং পরক্কে হইতে কেহ কোনও বস্তু অপহরণ করিলে তজ্জন্ম সে দণ্ডনীয় হইত।

“গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষ্মা হরন্।

শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ শ্রাদ্ধজ্ঞানাং দ্বিশতো দমঃ॥” (মনু ৮১২৬৪)

সে সময়ে প্রজাগণের যেই ভূমি থাকায় নিজে সমস্ত কর্ণ করিতে পারিত না। নিজের উপযোগী ভূমি রাখিয়া অবশিষ্ট অপরকে বিলি করিয়া দিত। তাহার রাজস্ব এবং ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য অংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইত। এইরূপে রায়তের উৎপত্তি হইল এবং সমিতির প্রজাগণের উপরে ভূমির সন্ধাধিকার জন্মিল।

তৎপরে ভারতবর্ষ মুসলমানগণের হস্তগত হইলে প্রাচীন প্রথা অনেক স্থলে পরিবর্তিত হইয়া গেল। হিন্দুগণ পৈতৃক প্রথা ত্যাগ করিতে অসম্মত; কিন্তু মুসলমানগণ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট।

মুসলমান শাস্ত্রানুসারে শাসনকর্তাই ভূমির একমাত্র সন্ধাধিকারী। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশে ভূমির উপরে শাসনকর্তার সব স্থাপিত হইল। কৃষকগণের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করা হইত, তৎসমস্তই রাজস্ব, সমস্তই রাজকোষে প্রেরিত হইত। রাজা ভিন্ন অপর কেহ তাহার অংশভাগী ছিল না।

রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত বহুবিধ কর্মচারী নিযুক্ত হইল। যথা—আমিল, জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি। দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শাসন জন্ম এক এক জন সুবাদার নিযুক্ত হইল। সুবাদারগণ নিজ নিজ সুবার রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচারপতির কার্য্য নির্বাহ করিতেন। সুবাদারের অধীনস্থ জমিদারগণ রায়তদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া সুবাদারের নিকটে এবং সুবাদার তাহা রাজসমীপে প্রেরণ করিতেন। নিজ নিজ জমিদারীর প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে জমিদারগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহের ভার জমিদারের উপরে হস্ত থাকিত। ভূমিতে তাহাদের কোনও সন্ধাধিকার ছিল না।

এখন প্রশ্ন এই—কাহার উপরে এই সমস্ত কার্য্যের ভার দেওয়া হইত, অর্থাৎ কে জমিদার পদের অধিকারী হইত? বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যায় বহুদিন হইতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং সেই সেই স্থানে প্রাচীন হিন্দুপ্রথা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরাজহস্তে সমর্পিত হইলে তাঁহাদিগকে রাজস্ব সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন রাজ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, ভূমিতে যাহাদিগের

স্ব স্ব স্বার্থ আছে, তাঁহাদের সহিত রাজ্যের বন্দোবস্ত করা কর্তব্য, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা দ্বারাতে বীর সম্পত্তির উন্নতি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ বন্ধন হইবে। সেই সময়ে উক্ত প্রদেশজের জমিদার নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন, তাহাদের উৎপত্তি এবং স্বার্থ সম্বন্ধে অনেক রাসা-হবাদ হইতে লাগিল। তর জর্জ কায়েল তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন—(১)

‘মুসলমানদিগের প্রবল আধিপত্যকালে রাজা এবং প্রজার মধ্যে কোনও প্রকার মধ্যস্বাধিকারী ছিল না। কিন্তু রাজকমতার ক্রমিক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে কমতা-শালী হইয়া উঠে, এইরূপে প্রাচীন হিন্দুপ্রথার জার পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজের উদয় হয়। সেই হইতেই আধুনিক

(১) “In the days when the Mahomedan rule was rigorous, there was little intermediate tenure between the State and the people; but in proportion as the central power declined, smaller authorities rose. In the long period of anarchy there was, under a nominal imperial rule, a partial return in many parts of the country to the Hindu system of petty chieftainship. Out of these the large modern Zemindaries have sprung. I would trace them to the following principal origins :—

“First.—Old tributary *rajās*, who have been gradually reduced to the position of subjects, but have never lost the management of their ancient territories, which they hold rather as native rulers than as proprietors. These are chiefly found in out-lying border districts and jungly semi-civilised countries.

“Second.—Native leaders, sometimes leading men of Hindu clans, sometimes mere adventurers, who have risen to power as Guerilla plunderers, levying black mail, and eventually coming to terms with the Government, have established themselves, under the titles of Zemindars, polygars &c., in the control of tracts of country for which they pay a revenue or tribute, uncertain under a weak power, but which becomes a regular land revenue when a strong power is established.....

“Third.—The officers, whose business it is to collect and account for the revenue, have frequently, in disturbed times, gained such a footing that their rendering of an account becomes almost nominal and practically they pay the sum which the ruling power is willing to accept, and make the most of their charges.

“Fourth.—I have alluded to mercantile countries for the dues payable by the raiyats, held by persons in the position of farmers generally. To a weak Government this system is very tempting, and in the decadence of the Mogul empire, enterprising bankers and other speculators taking contracts of this kind, exercised great authority and handed it down to their successors.”

Cobden, Club, Essay—141, 142.

জমিদারশ্রেণীর অভাব হইয়াছে। তাঁহাদের উৎপত্তির নিয়মিত করেকটা কারণ বিবৃত হইতেছে।

প্রথমতঃ—অতি প্রাচীন কতিপয় কয় রাজা মুসলমান আধিপত্যসময়ে ক্রমশঃ রাজত্বের অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু বীর মহালের শাসনকর্ত্ত্বক হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন নাই। সুতরাং তাঁহারা স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও মহাল শাসন করিতেন। সীমান্ত প্রদেশ এবং অর্ধসভ্য অঞ্চল প্রদেশ-সমূহে এই প্রকারের জমিদার দৃষ্ট হয়।

বিভীয়তঃ—কতকগুলি দেশীয় মলপতি এবং অধিনায়ক লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক কালক্রমে রাজসরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কোনও কোনও প্রদেশে স্থিতিলাভ করিয়া ছিল। সেই সেই স্থানে ইহার জমিদার, পলিগার ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত, পরে ক্রমশঃ রাজকমতা হ্রাস হইলে ইহারাও প্রজাগণের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করে।

তৃতীয়তঃ—কখন কখন আমিল, তহশীলদার প্রভৃতি রাজস্ব আদারকারীগণ উচ্চ কমতা প্রাপ্ত হইলে, স্বীয় কার্যের কোনরূপ হিসাব নিকাশ দিত না এবং কালক্রমে কমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজার সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া জমিদার পদবী লাভ করিয়াছিল।

চতুর্থতঃ—কখন কখন ইজারদারগণ পুরুষাবৃত্তিতে ইজারা মহাল ভোগ করিয়া কালক্রমে জমিদাররূপে পরিণত হয়।

এইরূপে রাজস্ব আদারকারী কর্মচারীগণ, কালক্রমে মুসলমান আধিপত্য হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে জমিদার হইয়া পড়েন এবং হিন্দুগণের প্রায় সমস্ত পদই বংশাভ্যুগত হইত বলিয়া এই জমিদার পদবীও কালক্রমে বংশাভ্যুগত হইয়া উঠিল।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে বর্ধী জমিদারগণের সম্বন্ধে কিন্তু সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—(২)

(২) “The Bengal Zemindars, as we have found them, were the persons who collected the revenue from the cultivators and other subordinate holders, and were responsible for paying it into the Government Treasury. They were, no doubt, *rajās* or chiefs, or persons otherwise possessed of local importance and influence, which the Mahomedan *subahdars* utilized for the collection of the revenue, and which were augmented and extended by being thus called into active exercise, supported by the authority of Government. Where no such persons existed, the want was supplied by appointing some of the numerous candidates who were ready to give a handsome consideration for a position which afforded great opportunities of profit. Once the practice was introduced of making money out of the appointment of Zemindars, it became the most natural thing possible to exact a sum by way of fine

যে সময়ে বাঙ্গালা প্রভৃতির দেওয়ানী ইংরাজদিগের হস্ত-গত হয়, সে সময়ে এখানকার জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করিত এবং তৎকাল তাহাদিগকে দারী থাকিতে হইত। যে যে স্থানে প্রভুত্বশালী গণ্য মাত্র ব্যক্তিগণ বাস করিত, মুসলমান রাজগণ এবং সুবাদারগণ তাহাদিগের উপরে সেই সেই স্থানের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিতেন এবং যে স্থানে তাদৃশ প্রভুত্বশালী ব্যক্তির বাস ছিল না, সে সকল স্থানে বাহারা সম্রাটকে অধিক নজর দিতে পারিত, তাহারা রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইত। কোনও সময়ে এরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল যে, জমিদার পদবীতে অভিষিক্ত হইতে হইলেই সম্রাটকে নজর দিয়া কার্যো প্রবৃত্ত হইতে হইত; এমন কি বাহারা পুরুষাভুক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেন, তাঁহাদিগকেও নজর দিতে হইত। কারণ তাঁহারা দেখিলেন শাসনকর্তার ইচ্ছানুসারে কার্য না করিলে তিনি তাঁহাদিগের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অত্রকে তৎপদে নিযুক্ত করিবেন এবং বাহাদিগের উত্তরাধিকার বংশানুগত নহে, তাঁহারা সম্ভট চিন্তে নজর দিয়া জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন জমিদারীতে তাঁহাদিগের কোনও সত্ত্ব নাই এবং সমস্ত রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ করিলেও জমিদারীতে অনেক প্রকার লাভের আশা ছিল।

বাঙ্গালার তখনকার যুরোপীয় রাজস্ব কর্মচারীগণ উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সকল জমিদারকে এক শ্রেণীভুক্ত করায় জমিদার শব্দের প্রকৃত অর্থ বুদ্ধিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং জমিদারের সত্ত্ব সত্ত্বে নানারূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। বাহারা প্রধানতঃ প্রথম শ্রেণীর জমিদারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহারা ভাবিতেন জমিদারীসত্ত্ব বংশানুগত সত্ত্ব, পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বাহারা অপর শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন, জমিদারী পদ রাজকীয় পদবীমাত্র, বংশানুগত নহে। কোনও

জমিদার পুরুষাভুক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছে দেখিলে, তাঁহারা বলিতেন মুসলমানদিগের সময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত পদই কালক্রমে বংশানুগত হইয়া পড়িত (৩)।

উত্তরপক্ষেই স্বমত প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু কোনও যুক্তিই সম্পূর্ণ ভ্রম-শূন্য নহে।

হারিংটন সাহেব তখনকার জমিদারগণের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (৪)—

জমিদার প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন।

(৩) "Those who looked chiefly at the one class of Zemindars were convinced that a Zemindary was an hereditary proprietary right in the soil..... Those who confined the attention to the other class contended that it was nothing but an office; and when pressed with instance of regular succession, replied that it was the tendency of all offices to become hereditary under the particular system." *Field's Introduction 30.*

(৪) "A landholder of a peculiar description not definable by any single term in our language—a receiver of the territorial revenue of the State from the raiyats and other undertenants of land—allowed to succeed to his Zemindary by inheritance, yet in general required to take out a renewal of his title from the sovereign or his representative on payment of a *peishcush* or fine of investiture to the Emperor and a *nazarana*, or present, to his provincial delegate, the *Nazim*—permitted to transfer his *Zemindari* by sale or gift; yet commonly expected to obtain previous special permission—privileged to be generally the annual contractor for the public revenue receivable from his *zemindari*; yet set aside with a limited provision in land or money, whenever it was the pleasure of Government to collect the rents by separate agency or to assign them temporarily or permanently, by the grant of a *jagir* or *altamgha*—authorised in Bengal since the early part of the eighteenth century to apportion to the *parganas*, villages and lesser divisions of land within his *Zemindari* the *abwab* or cesses imposed by the *subadar* usually in some proportion to the standard assessment of the *Zemindari* established by *Todar Mall* and others; yet subject to the discretionary interference of public authority within to equalise the amount assessed on particular divisions or to abolish what appeared oppressive to the *raiya*—entitled to any contingent emoluments proceeding from his contract during the period of his agreement, yet bound by the terms of his tenure to deliver in a faithful account of his receipts—responsible, by the same terms for keeping the peace within his jurisdiction; but apparently allowed to apprehend only and deliver over, to a *Musalman* magistrate for trial or punishment."

or *nazarana* upon every accession to the position, even in the case of the *Zemindars* of the former class, in whose family their rights had been hereditary before the existence of the Mogul power. Persons who had undoubted rights of succession found it expedient to comply with the demands of those who had it in their power to put these rights set aside; and the heirs of those whose *squads* or *patents* were not a generation old, were too willing to pay for succeeding to a position to which they had not a shadow of a title other than the will of the ruler."

Field's Introduction to the Regulations 29.

জমিদারী সৰ্ব বংশাধুগত ছিল, কিন্তু সম্রাটকে পেশকাস এবং তৎপ্রতিনিধি সুবাদারকে নজর দিয়া জমিদারী পদে অভিষিক্ত হইতে হইত। জমিদার দাবিবিজ্ঞর দ্বারা জমিদারী-সৰ্ব হস্তান্তর করিতে পারিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে তজ্জন্ত অস্বমতি গ্রহণ করিতে হইত। রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত জমিদারের সহিতই হইত; কিন্তু কখন কখন তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে অপরের সহিত বন্দোবস্ত করা হইত, এবং জমিদারকে কিছুকাল কিম্বা চিরকালের জন্ত জারগীর অথবা অল্-তম্বা দেওয়া হইত। নির্দ্ধারিত রাজস্বের হার অনুসারে সুবাদার কোনও কাব কিংবা সেস্ নিরূপণ করিলে জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন পরগণা কিংবা মৌজা প্রভৃতিতে তাহা বিভাগ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা বাঙ্গালার জমিদারবর্গকে (১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে) দেওয়া হইত; কিন্তু সময়ে সময়ে কোন্ পরগণার কিরূপ বিভাগ হইরাছে, সরকার হইতে তাহার তদন্ত হইয়া প্রজাবর্গের উপরে অন্ত্যস্ত অত্যাচার হইলে তাহার নিবারণ করা হইত। রাজস্বের বন্দোবস্ত বতদিনের জন্ত হইত ততদিনের মধ্যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব বাদে বাহা আদায় হইত, তাহা জমিদার পাইতেন, কিন্তু বাহা আদায় হইত, তাহার কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত নিকাশ দিতে হইত। জমিদারীর মধ্যে যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তজ্জন্ত জমিদারকে দায়ী থাকিতে হইত; কিন্তু তিনি অপরাধীকে কেবল ধৃত করিয়া কোনও মুসলমান বিচারকের নিকটে প্রেরণ করিতে পারিতেন।

জমিদার শব্দের অর্থ পঞ্চম রিপোর্টের প্রসারিতে এইরূপ আছে (৫)—

(৫) "Zemindar means Land-holder, land-keeper—an officer who, under the Mahomedan government, was charged with the superintendence of a district, financially considered, the protection of the cultivators, and the realisation of the government's share of its produce either in money or kind; out of which he was allowed a commission of about 10 per cent; and occasionally a special grant of the government's share of the produce of the land of a certain number of villages for his subsistence, called Nauncar. The appointment was occasionally renewed; and as it was generally continued in the same person, so long as he conducted himself to the satisfaction of the ruling power, and even continued to his heirs; so in process of time and through the decay of that power the confusion which ensued, hereditary right was claimed and tacitly acknowledged; till at length the Zemindars of Bengal in particular, from being the mere superintendents of the land have been declared the hereditary proprietors of the soil and.....fluctuating dues of government have, under a permanent settlements, been unalterably fixed in perpetuity."

‘মুসলমানদিগের রাজত্বকালে রাজস্ব ও মহালের তত্ত্বাবধান, প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উৎপন্ন শস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদারের উপরে থাকিত। রাজস্ব হইতে তিনি শতকরা ১০ টাকার কমিয়া কমিশন পাইতেন, কখন কখন ভরণপোষণের জন্ত ননকর স্বরূপ কতকগুলি মৌজার উৎপন্ন শস্ত হইতে সরকারের প্রাপ্য ভাঁহাকে দেওয়া হইত। কখন কখন নূতন ব্যক্তিকে জমিদার পদে নিযুক্ত করা হইত; কিন্তু সরকার বাহাদুরের সন্তুষ্টিসাধনপূর্বক রাজস্ব আদায় কার্যনির্বাহ করিতে পারিলে সচরাচর এক ব্যক্তিই জমিদার পদে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইতেন। কালক্রমে মুসলমান আধিপত্য হ্রাস হইলে জমিদারেরা জমিদারী সৰ্ব বংশাধুগত বলিয়া দাওয়া করিতেন; শাসনকর্ত্তারাও তাহাতে বিকল্প করিতেন না। অবশেষে বাঙ্গালার জমিদারবর্গ মহালের তত্ত্বাবধায়ক পদ হইতে ক্রমে মহালের বংশাধুগত সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেন, এবং এককাল পর্য্যন্ত যে রাজস্ব নির্দ্ধিষ্ট ছিল না, তাহা চিরকালের জন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।’

এইরূপ নানা প্রকার বাঙ্গালীবাদের পর কিছুই সূচ্যরূপে মীমাংসা না হওয়ায় ইংরাজ রাজস্বকর্মচারীগণ এক বাক্যে স্থির করিলেন যে, মুসলমানদিগের সময়ে জমিদারের যে অর্থ-ই থাকুক না কেন, জমিদারদিগকে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারীদিগের মত ভূমির সত্বাধিকারী করা কর্তব্য। এতদনুসারে ১৭৯০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার এবং ১৭৯১ খৃঃ অব্দে বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারগণের সহিত দশবৎসরের জন্ত রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইল। ইহাকে দশশালা বন্দোবস্ত বলে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ ভূসত্বাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হইলেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ২২এ মার্চ এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইল বলিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের অস্বমতি অনুসারে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারল মার্কুইস্ অব্ কর্ণওয়ালিস্ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারের কিরূপ সত্ত্ব ও স্বার্থ জমিদার, হারিংটন সাহেব সে সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন (৬)—

(৬) "A land-holder, possessing Zemindari estate which is hereditary and transferable by sale, gift or request; subject under all circumstances to the public assessment fixed upon it; entitled after the payment of such assessment to appropriate any surplus rents and profits which may be lawfully receivable by him from the under-tenants of land in his Zemindari, or from the cultivation and improvement of untenanted lands; but subject nevertheless

জমিদার জমিদারী মহালের স্বাধিকারী। জমিদারী সব পুরুষাবলীতে উত্তরাধিকারীও পাইবে। জমিদার দান বিক্রম উইল প্রভৃতি দ্বারা বীর জমিদারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন। মহালের উপরে নির্ধারিত রাজস্ব বখানিয়মে সরকার বাহাদুরকে দিতে জমিদার বাধ্য, জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণের নিকট হইতে কিম্বা ভূমির উৎকর্ষসাধন জন্য বাহা কিছু আইন অনুসারে তিনি প্রাপ্ত হইবেন, তাহা হইতে রাজস্ব বাদ দিয়া বাহা উদ্ধৃত থাকিবে, তৎসমস্তই তিনি আয়সাৎ করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে সরকার বাহাদুর রায়ত কিম্বা অন্য প্রজাগণের সব ও স্বার্থের রক্ষা এবং তাহাদিগকে অন্তর আত্মাচার ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষার নিমিত্ত কোনও আইন করিলে জমিদারকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

জমীন্ (পারসী) ভূমি, ভূমিখণ্ড।

জমীন্দার (পারসী) [জমিদার দেখ।]

জমীন্দারী (পারসী) ১ জমিদারের অবস্থা। ২ জমিদারের ভূসম্পত্তি।

জমুকাল (আরবী) ১ সমবেত হওয়া, একত্র হওয়া। ২ সমৃদ্ধি, তাঁক অমক করা।

জম্পতী (পুং) জায়া ৮ পতিষ্ঠ। (রাজদত্তাদিগণে পাঠাৎ জায়া শব্দ জম্পতী নিপাত্যতে। পা ২।২।৩১) ১ দম্পতী, জায়াপতী, স্ত্রীপুরুষ (অমর)। পতি এবং পত্নী শব্দটী দ্বিচনান্ত।

জম্বাদ্যতৈল, বৈদ্যোক্তোক্ত ঔষধ-তৈলবিশেষ। কচি জামপাতা, করেথবেল, কার্পাস ফুল, আদা এই সমুদায়ের সহিত নিম, করঞ্জ ও সর্ষপতৈল সিদ্ধ করিবে, ইহাকে জম্বাদ্য তৈল বলে। ইহা কাণে পুরিয়া দিলে কর্ণশ্রাব নিবারণ হয়।

জম্বাল (পুং) ১ পক্ষ, কর্দম, কাদা। ২ শৈবাল, শেওলা। ৩ কেতকবৃক্ষ, কেওয়া ফুলের গাছ। (শব্দরং)

“জম্ববজ্জলবিষবজ্জলজবজ্জালবজ্জালবৎ।” (উদ্ভট)

জম্বালিনী (স্ত্রী) জম্বাল-অন্ত্যার্থে ইনি। ১ নদী। (হেম) ২ শৈবলিনী। ৩ পদ্মিনী। (শব্দরং)

জম্বির (পুং) জম্বির নিপাতন্যৎ হ্রঃ। জম্বির। [জম্বির দেখ।]

জম্বীর (পুং) জম্বি ভক্কে নিপাতন্যৎ জম্বী বৃদ্ধ। (গভীরাদয়ন্ত) ১ বন্ধকবৃক্ষ, নাগদানা গাছ। ২ অর্জকবৃক্ষ, ক্ষুদ্র তুলসী-

গাছ। ৩ শিতার্জক বৃক্ষ, খেতভুলসী গাছ। (রাজনি)। ৪ (কাহারও কাহারও মতে) শাকভেদ, পুদিনে শাক। ৫ নিষ্ক বৃক্ষ, নেবুগাছ, জামীর। সংস্কৃত পর্য্যায়—দন্তশঠ, জন্ত, জন্তীর, জন্তল, জন্তক, জন্তর, দন্তহর্ষণ, দন্তকর্ষণ, জন্তির, গন্তীর, রেবত, বক্তৃশোধী, দন্তহর্ষক, জন্তী, স্নোচনক, শোধক, জডারি।

হিন্দীতে লিম্বু, বঙ্গে নেবু, মরাঠা লিম্বু, গুজরাটী লিম্বু, সিন্ধু লিম্বু, তামিল এলুমিচ্ চম্পবম্ব, তৈলঙ্গ নিষপতু, মলয় চেকনারঙ্গা, আরবী লিম্বুএ হামিজ, পারসী লিম্বু, দক্ষিণী লিম্বুন, এই লিম্বুহইতে ইংরাজী Lemon হইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Citrus Bergamia (The Bergamot orange). ভারতে এই শ্রেণীর মধ্যে পাতিনেবু, গোড়ানেবু, কাগজীনেবু, চীনা গোড়ানেবু, কামরালীনেবু, রঙ্গপুরী নেবু ও টেবানেবু দেখা যায়।

সমস্ত ভারতবর্ষে, স্রুঙ্গা ও মলক্কী দ্বীপপুঞ্জে ও যুরোপের স্থানে স্থানে জম্বিরনেবু জন্মে। ফ্রান্স, সিসিলী ও কালাব্রিয়ায় ইহার চাষ হয়। এই জাতীয় নেবুর কোনটী গোলাকার, কোনটী ছোট, কোনটী কোমল, কোনটী মন্থণ, কোনটীর ছাল পুরু, কোনটী বা পীতভাষ রসবিশিষ্ট দেখা যায়। এই নেবুর কোন কোনটী পাকিলেও সবুজ থাকে।

এই নেবুর খোসা নিংড়াইয়া রস বাহির করিয়া তাহাতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে Bergamot oil বলে। এই তৈল সুগন্ধি দ্রব্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বাহু প্রয়োগের কোন কোন ঔষধ সুগন্ধি করিবার জন্য এই তৈল দেওয়া যায়। ইহার ফুল হইতেও অল্পপরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। এই নেবুর রস বীজপুস বা বড় নেবুর মত সম গুণবিশিষ্ট। [বীজপুস দেখ।] হাম, বসন্ত ও উত্তাপদায়ক অত্যন্ত করে ইহার রস শাস্তিকর। কঠিনলী, উদর, জরায়ু বৃদ্ধ প্রভৃতি আত্যন্তরিক যন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব হইলে এই নেবু ব্যবহার করা যায়।

ইহার ফলের গুণ—অন্ন মধুর রস, বাতনাশক, পথ্য, পাচন, রুচিকর, পিত্ত, বল ও অধিবৃদ্ধিকারক। (রাজনি) ইহার পক্ষফলের গুণ—মধুর, কফরোগ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক, বর্ণবীৰ্য্য, রুচি, পুষ্টি ও তৃপ্তিকর। (রাজবল্লভ)

“জম্বিরমুখং গুরুব্রং বাতপ্লেয়বিবন্ধহৎ।

শূলকাশকক্লেশচ্ছদ্দিতৃকামদোষজিৎ ॥

আন্তবৈরজ্যং তৎপীড়া বহিমান্যকুমীনু হরেৎ।

ব্রহ্মজম্বিরিকা তৎতৎ তৃক্ষাচ্ছদ্দিনিবারণী ॥” (ভাবপ্রকাশ)

জম্বীরক (পুং) জম্বির স্বার্থে-কন্। জম্বির নেবু, জামির।

জম্বীরিকী (স্ত্রী) জম্বিরভেদ। (ভাবপ্রকাশ)

to such rules and restrictions as are already established, or may be hereafter enacted by the British Government for securing the rights and privileges of raiyats and other under-tenants, of whatever denomination, in their respective tenures and for protecting them against undue exaction or oppression.”

জম্বু (জী) জম্বু ভক্ষণে নিপাতনাং জু। বাহুলকাং হ্রস্বঃ।

১ বৃক্ষভেদ, জামগাছ। [জম্বু দেখ।]

“ভক্তা জম্বোঃ ফলরসো নদীত্বয় প্রবর্ততে”। (বিজয়াদিত্য)

২ স্তম্ভরূপকর্তের নদীবিশেষ, জম্বুনদী। [জম্বুনদী দেখ।]

৩ জম্বুবৃক্ষল, জাম। ফলার্থে জী ও জী হয়। ৪ জম্বু-দ্বীপ। [জম্বুদ্বীপ দেখ।]

জম্বু, কর্ণাটকপ্রদেশবাসী এক নীচ জাতি। ইহারা সচরাচর হোলরা ও মহার নামেও খ্যাত। ধারবার জেলারই এই জাতির বেশী লোক দেখা যায়।

ইহারা বলে যে ইহাদের আদিপুরুষের নাম ছিল জম্বু। তাহার সময়ে এই পৃথিবী জলে ভাসিতে ছিল, নর নারী তেমন স্থবী বা নিরাপদ ছিল না। জম্বু আপন পুত্রকে জীবিতাবস্থায় পৃথিবীগর্ভে পুতিয়া ফেলিয়া পৃথিবীর বনিয়াদ শক্ত করেন। সেই হইতেই পৃথিবীর জম্বুদ্বীপ নাম হইল।

ইহারা বলে যে আমাদের পূর্বপুরুষেরাই প্রথমে এই পৃথিবীতে আধিপত্য করিত, তৎপরে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি আসিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয় ও আধিপত্য কাড়িয়া লয়।

ইহাদের মধ্যে হোলরা ও পোতরাজ এই দুই শ্রেণী আছে। দয়মব, উড়চব ও যেনব এই কয়কটা তাহাদের উপাঙ্গ দেবী।

পোতরাজের অর্থ মহিষের রাজা। পোতরাজেরা বলিয়া থাকে, কোন সময়ে তাহাদের এক পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণের বেশে লক্ষ্মীর অবতার দয়মবকে বিবাহ করে। কিছুকাল উভয়ে পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছিল।

একদিন দয়মবের শাণ্ডিককে দেখিতে ইচ্ছা হইল। হোলরা তাহার মাতাকে আনিল। দয়মব মিষ্টান্ন রন্ধন করিয়া শাণ্ডিককে খাইতে দেন। শাণ্ডি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া পুত্রকে বলেন, “আহা! ইহা খাইতে ঠিক যেন মহিষের দাঁতের মত।” দয়মব অল্পকাল মধ্যেই বৃক্ষিতে পারিলেন যে তিনি জম্বুজ হোলরার হাতে পড়িয়াছেন। অবশেষে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পতিকে বিনাশ করেন। এই উপলক্ষ করিয়া এখনও দয়মবের উৎসবে মহিষবলি হইয়া থাকে। [দয়মব দেখ।] হোলরা হইতে জাত দয়মবের গুজেরা সেই হইতে পোতরাজ নামে খ্যাত হইল।

ইহারা গ্রাম বা নগরের প্রান্তভাগে বাস করে, অপর কোন জাতির সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখে না। অপর জাতিরাও ইহাদিগকে ঘৃণা করে। মৃতজীব জন্তুবহন, চন্দন প্রস্তুত ও ভারবহনই ইহাদের নিত্য উপজীবিকা। ইহারা মৃত গোমেঘাদি আনিয়া তাহার মাংস আহার করে। এই জন্তই

সাধারণে ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে “হোলরা” অর্থাৎ নোংরা বলিয়া ডাকে। ইহারা মাংস ছাড়া মদ খাইতেও বড় ভালবাসে।

ইহারা কঠিন পরিশ্রমী ও বড় আতিথের। বেশ ভূষা নিম্নশ্রেণীর মরাঠাদিগের মত। সকলেই কাণে কুণ্ডল ও হস্তে অঙ্গুরী ব্যবহার করে। ইহারা কর্ণাড়ী ভাষার কথা কয়।

ইহারা কোন ব্রাহ্মণকে ভক্তি প্রদা অথবা ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীর পূজা করে না। হোলী, নাগপঞ্চমী, দশরা ও দেওয়ালী হিন্দুদের এই কয়টা পূর্ণ পালন করে। ইহাদের বলবসাম্প নামে এক স্বজাতির গুরু আছে, বেলাসিতে ঐ গুরুর বাস।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জম্বুমা তাহার নাকী কাটিয়া ঘরের সম্মুখে পুতিয়া ফেলে। তাহার উপর একখানি পাথর রাখিয়া দেয়, সেই পাথরে বসিয়া নবজাত শিশু ও প্রসূতি স্নান করে।

পঞ্চমদিনে আঁতুড় ঘরে একখানি শিলার উপর পাঁচটা পায়ে কাঙ্গনিদানা সিদ্ধ ও চিনি রাখে, পাঁচজন সখা আসিয়া তাহা আহার করে। নবমদিনেও কাঙ্গনিদানা, অড়হর, মুগ, গম ও যব একত্র সিদ্ধ করিয়া ও অন্ন তৈলে ভাজিয়া চিনি দিয়া পাঁচজন সখাকে খাইতে দেয়। তাহার শিশুকে দোলায় তুলিয়া নৃত্য গীত করিতে থাকে। ২১ দিনে শিশুকে উড়চব দেবীর মন্দিরে আনিয়া দেবীর পাদপদ্মে স্থাপন করে। পুজারী একটা পাণ লইয়া কাঁচির মত করিয়া শিশুর চুল কাটিবার উদ্দেশে স্পর্শ করে। পরে পুজারী যেন ধ্যানস্থ হইয়া আপন ইচ্ছামুসারে শিশুর একটা নাম বলিয়া দেয়। তৎপরে সকলে দেবীকে ফুল, হলুদ ও সিন্দূর দিয়া চলিয়া আসে। তারপর যে কোনদিনে শিশুর সমস্ত চুল কাটিয়া দেয়।

বিবাহ স্থির হইলে ইহাদিগকেও প্রায় কুড়ি টাকা কত্মাপণ দিতে হয়। বিবাহের দিনে কত্মাকে লইয়া কত্মা পক্ষীরগণ বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কত্মা বয়স্ক হইলে হাঁটুরা আসে, নহিলে ঘাঁড়ে চড়িয়া আসে।

কত্মাযাত্রীগণ বরের গৃহের নিকট আসিলে বরপক্ষীরগণ একটা পায়ে ধূপ ধূনা ও অপর পায়ে দীপ জালিয়া কত্মা ও কত্মাপক্ষীরগণকে বরণ করে। পরে কত্মাপক্ষীরগণও বরপক্ষকে ঐরূপ ভাবে বরণ করিলে উভয় দল বরগৃহে প্রবেশ করে।

এখানে বরকত্মা ছাঁদলাতলার একখানি কবলের উপর আসিয়া বসে। একজন লিঙ্গারত চেলবাড়ি এই সময় মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। পরে তিনি বরকত্মাকে ধাক্কা দিয়া আঙ্গীর্বাদ করিয়া কত্মার গলায় মঞ্জলহুয়া বাঁধিয়া দেন। তৎপরে আহারাদির পর বিবাহকাণ্ড শেষ হয়।

ইহাদের জীলোকেরা প্রথম ঋতুগতী হইলে তিন দিন এক

স্থানে বসিয়া থাকে, তাহাকে ভাতের সঙ্গে কেবল শুড় ও নারিকেল খাইতে দেওয়া হয়। ৪র্থ দিনে সে বাবুলগাছের তলে আসিয়া ডান হাত দিয়া আলিঙ্গন করে, পরে ঘরে আসিয়া নান করিয়া শুক্ক হয়।

অনেক পুত্রকন্ডা থাকিলে ইহারা কন্ডাগুলির বিবাহ দেয়, কিন্তু পুত্র সন্তান না থাকিলে একটা কন্ডাকে ঘরে রাখে। একজন কন্ডাকে বসবী বলে, সে বিবাহ করিতে পারে না। শুভদিনে সেই কন্ডা পাণ স্পারি ফুল ও নারিকেল লইয়া উচ্চব দেবীর মন্দিরে আসে। এখানে পূজারী দেবীর পূজা করিয়া কন্ডার কণ্ঠে স্বর্ণ বা কাচের মালা ও তাহার কপালে ঘুঁটের ছাই মাখাইয়া দিয়া বলে—“আজ হইতে তুমি বসবী হইলে।” বসবী হইলে সে ইচ্ছামত বেস্তাবৃত্তি করিতে পারে, তাহাতে কাহারও বাধা নাই। কিন্তু সেইদিন হইতে তাহাকে প্রত্যহ দেবীর অঙ্গে যাহাতে একটাও মাছি না বসে, তজ্জন্ম পাখার বাতাস করিতে হয়। পিতামাতার মৃত্যুর পর সেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পায়। তাহার কন্ডা হইলে তাহাকেও ভাল ঘরে বিবাহ দিতে পারে।

ইহাদেরও একটা সমাজ আছে, সামাজিক গোলযোগ চেলবাড়িই মিটাইয়া দেন। কেহ তাহার কথা অমান্য করিলে তৎক্ষণাৎ সে জাতিচ্যুত হয়। জন্ম ও মৃত্যুতে ইহাদের ১১ দিন অশোচ হয়। বিবাহিত জম্বুর মৃত্যু হইলে তাহাকে সমাধিস্থানে আনিয়া চেলবাড়ি তাহার কপালে বিভূতি মাখায় ও শবের মুখে একখণ্ড সোণা পুরিয়া দেয়। পরে তাহাকে মাটি চাপা দিয়া পুতিয়া ফেলে। বসবীদিগেরও এইরূপে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু অবিবাহিত জম্বুর মৃত্যু হইলে তাহাকে আনিয়া কেবল পুতিয়া ফেলে, ভস্মলেপন প্রভৃতি আর কোন কার্য করে না।

জম্বুক, উড়িষ্যানদেশে কটক জেলার একটা ক্ষুদ্র শাখা নদী। কলস্ অন্তরীপের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাতে নৌকাচালনা অনেক সময়ে বিপজ্জনক। সাগরসঙ্গমের নিকটে একটা চড়া পড়ায় ভাটার সময়ে এখন সে স্থানে প্রায় ১ ফুট পরিমাণ জল থাকে। নদীর কোনও কোনও স্থানে ভাটার সময়ে ১৮ ফিট গভীর জল হয়। সমুদ্রতট হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী দেলপাড়া নামক স্থান পর্য্যন্ত এই নদীতে বড় নৌকা বাইতে পারে। এখন ইহা বর্জমান-মহারাজের অধিকারভুক্ত।

জম্বুক (পুং) জম্বু ভক্ষণে কৃ নিপাতনাৎ বৃক্ স্বার্থে-কন্।
১ জম্বুকভেদ, গোলাপজাম। (শব্দর*) ২ ভ্রোনাক বৃক্‌বিশেষ, সোনালু গাছ। (রাজনি*) ৩ কেতকবৃক্, জুবর্ণকেতকী, একপ্রকার কেয়াফুলের গাছ।

“কেতকঃ হৃদিকাশুলো জম্বুকঃ ক্রকচ্ছনঃ।

জুবর্ণকেতকী বৃক্ষা লম্বুপুষ্পা হৃদম্বিনী।” (ভাবপ্রা*)

৪ শৃগাল, শেরাল।

“এবং তেবু প্রয়াতেবু জম্বুকো হইমানসঃ।” (ভারত ১।১৪১।১৪৬)

৫ বরুণ। ৬ বরুণবৃক্। (জব্যার্থচ*)

৭ (ত্রি) নীচ ব্যক্তি। (শব্দর*)। জম্বু স্বার্থে-কন্।

৮ কন্দের অল্পচরভেদ।

জম্বুকতৃণ (স্ত্রী) তৃণ, গন্ধতৃণ। (ভাবপ্রকাশ)

জম্বুকেশ্বর, একটা প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। শিবপুরাণে রেবা-মাছাছা ও ত্রীরঙ্গমাছাছার মতে ইহা নব শৈবতীর্থ মধ্যে একটা। এখানে মহাদেবের জলমূর্ত্তি বিরাজমান। স্থলপুরাণ-মতে এই স্থানে আসিয়া দেবাদিদেবের জলময়ী মূর্ত্তি মর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

ত্রীরঙ্গের মহামন্দিরের অর্ধমাইল দূরে বিখ্যাত জম্বুকেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান। সেই দেউলের বহির্ভাগে একটা ছোট কূপ হইতে সর্বদাই অল্প অল্প জল উঠিতেছে, মন্দিরচত্বর কূপের জল অপেক্ষা এক ফুট নীচে, হুতরাং ভিতরে সর্বদাই প্রায় এক ফুট জল থাকে। এখানে সর্বদাই আপনাআপনি জল উঠিতে দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস যে মহাদেব জলমূর্ত্তিতে এখানে প্রবাহিত। দেউলের পার্শ্বে একটা পুরাতন জম্বুবৃক্ আছে। ত্রীরঙ্গমাছাছা লিখিত আছে, মহাদেব এই জম্বুবৃকের তলায় বহুকাল তপস্বা করিয়াছিলেন।

ফাগুর্সন সাহেবের মতে জম্বুকেশ্বরের বর্তমান মন্দির ১৬০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে নিৰ্ম্মিত হয়। কিন্তু এখানকার উৎকর্ণ শিলালিপিতে ১৪০০ শকে দেবালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমিদানের উল্লেখ থাকায় অল্পমান হয়, এই মন্দির ঐ সময়ে বা তাহারও পূর্বে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু জম্বুকেশ্বর দেব তাহারও অনেক প্রাচীন, তাহা রামাহজের জীবনী ও সহাদ্রি-খণ্ড প্রভৃতি পাঠে জানা যায়।

এই মন্দিরে চারিটা উচ্চ প্রাকার আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রাকারে ৬৫ ফিট উচ্চ একটা গোপুর ও কএকটা মণ্ডপ, তৃতীয় প্রাকারের দুইটা প্রবেশদ্বারে একটা ৭৩ ফিট ও অপরটা ১০০ ফিট উচ্চ এই দুইটা গোপুর এবং ইহার প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী ও নারিকেল বাগান আছে। বৎসরান্তে দেবের ভোগমূর্ত্তি উক্ত পুষ্করিণীতে আনীত হয়। চতুর্থ প্রাকারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪৩৬ ফিট, প্রস্থে ১৪২৩ ও উচ্চে ৩৫ ফিট। ইহার মধ্যে সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ আছে। এখন সহস্রটা স্তম্ভ না থাকিলেও ৯৩৮টা আছে। ঐ সকল স্তম্ভে বিস্তর অক্ষশাসনলিপি খোদিত আছে। পূর্বে এই

মন্দিরের ব্যাবার্য বিস্তর ভূ-সম্পত্তি ছিল, ইটাদি পর্বতসৈ সেই সকল অধিকার করিয়া দেবদেবতার ভক্ত প্রতিদর্শনে ১০৫০ টাকা দিয়া থাকেন। এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে, তাহার বাহা দক্ষিণা দেয়, তাহা পূজকেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে।

জম্বুকোল, সিংহলের মহাবংশবর্ণিত নাগদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। অনেকে বর্তমান আকনা প্রদেশের অন্তর্গত কলম গ্রামকেই জম্বুকোল নামে উল্লেখ করেন।

জম্বুখণ্ড (পুং) জম্বুদ্বীপ।

জম্বুদ্বীপ (পুং) পৃথিবীর সপ্তদ্বীপান্তর্গত একটি দ্বীপ। ইহার চতুর্দিকে লবণসমুদ্র বেঠন করিয়া রহিয়াছে। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং অস্ত্র ছয় দ্বীপ ইহার চতুর্দিকে পদ্মপত্রের ভায় অবস্থিত। ভাগবতের মতে—জম্বুদ্বীপ লক্ষবোজন বিস্তীর্ণ এবং পদ্মমধ্যস্থিত কোষের ভায় অবস্থিত। ইহা পদ্মপত্রের ভায় সম্পূর্ণ গোল এবং লক্ষবোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপ নয়বর্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ষ নয় সহস্র বোজন বিস্তীর্ণ এবং সীমাপর্যন্ত দ্বারা উত্তমরূপে বিভক্ত। এই নয় বর্ষের নাম ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, হরিবর্ষ, কিস্কিন্দ্র্য, ভারত, কেতুমাল এবং ভদ্রাখ। ইলাবৃতবর্ষ জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নীলপর্কত, তদন্তরে রম্যক, তদন্তরে শ্বেতপর্কত, তদন্তরে হিরণ্ময় বর্ষ, তদন্তরে শূলবান্ পর্কত, এবং তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃতের দক্ষিণদিকে নিষধ পর্কত, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হেমকূট পর্কত, তাহার দক্ষিণে কিস্কিন্দ্র্য বর্ষ, তৎপরে হিমালয় পর্কত, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃত বর্ষের পূর্বদিকে গন্ধমাদন পর্কত, তাহার পূর্বদিকে ভদ্রাখবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃতের পশ্চিমদিকে মালাবান্ পর্কত, তৎপশ্চিমে কেতুমালবর্ষ এবং তৎপরে সমুদ্র।

ইলাবৃতের মধ্যস্থানে সুরেক্ষ নামে ৮৪ বোজন উচ্চ একটি কুলপর্কত অবস্থিত। সুরেক্ষের নিম্নদেশে পদ্মকিন্দ্রকের ভায় ২০টা পর্কত আছে, যথা—কুরঙ্গ, কুরর, কুহুভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিবর, শিশির, পতঙ্গ, কচক, নিষেধ, শিতিবাস, কপিল, শম্ব, বৈদুর্ঘ্য, জাক্রবি, হংস, ধবত, নাগ, কালঙ্গর, এবং নীরদ। ইলাবৃতের পূর্বভাগে মন্দরপর্কত, দক্ষিণভাগে মেরুমন্দর পর্কত, পশ্চিমভাগে সুপার্বপর্কত, এবং উত্তরভাগে কুমুদ পর্কত। মন্দরপর্কতোপরি বহুবোজন বিস্তৃত একটি মহান্ চূতবৃক্ষ আছে। নিপতিত আশ্রয়স্থল বিস্তীর্ণ হইয়া অরুণোদা নামে একটি নদী মন্দরপর্কত হইতে প্রবাহিত হইয়া

ইলাবৃতের পূর্বদিকে প্রাবিত করিতেছে। ঐক্লপ বেক মন্দর পর্কতে একটি বহু বোজন বিস্তৃত বিশাল জম্বুবৃক্ষ আছে। এই জম্বুবৃক্ষ হইতে জম্বুদ্বীপ নাম হইয়াছে। তথায় হৃতিপ্রমাণ পতিত জম্বুকল রসে একটি নদী স্রষ্ট হইয়া ইলাবৃতের দক্ষিণ-ভাগ প্রাবিত করিতেছে। এই নদীর নাম জম্বুনদী। ইহার তীরস্থ স্মৃতিকার 'জাম্বুনর' নামক স্তূর্ণ উৎপন্ন হয়। ইলাবৃতের পশ্চিমে সুপার্ব পর্কতের উপরে একটি স্তূবহান্ কদম বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের পাঁচটা কোটির হইতে মধুধারা নির্গত হইয়া সেই স্থান আমোদিত করিতেছে। উত্তরদিকে কুমুদ পর্কতোপরি একটি স্তূবহৃৎ বটবৃক্ষ আছে, এই বটবৃক্ষ কদমক সদৃশ; অনবরত তাহা হইতে দধি, হৃৎ, স্বত, মধু, শুভ্র, অর, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি নির্গত হইয়া সেধানকার অধিবাসিদের অতাবপূরণ করিতেছে। ইলাবৃতবর্ষে হৃৎ, মধু, ইক্কর এবং জলপরিপূর্ণ চারিটি হ্রদ এবং নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্কতোত্তর নামে চারিটি দেবকানন নানা শোভায় সুশোভিত হইয়া অধিবাসিদের নিরন্ত মনোরঞ্জন করিতেছে। সুরেক্ষ পর্কতের পূর্বদিকে অঠর এবং দেবকূট, দক্ষিণদিকে কৈলাস এবং কয়বীর, পশ্চিমে পবন এবং পারি-ষাত্র এবং উত্তরে মকর এবং ত্রিশূল নামে আটটি পর্কতে দেবগণ সর্কনা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। (ভাগ ৫:১৬ অঃ)

ঐক্লপ অস্ত্রাত্ত বর্ষেও নানা নদ, নদী, পর্কত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। [তৎসমুদয়ের বিবরণ তত্তং শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সকল পুরাণেই জম্বুদ্বীপের উক্ত প্রকার বর্ষভেদাদির বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে বর্ষাদির অমরই নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভারত ভীষ্মপর্ক, বিষ্ণুপুং, লিঙ্গপুং ৪৬ অঃ, বামনপুং ১০ অঃ, কুর্খপুং ৪৫ অঃ, বরাহপুং ৭৭ অঃ, অগ্নিপুং ১১২ অঃ, নৃসিংহপুং ৩৫ অঃ, কুমারিকাণ্ড, জৈন হরিবংশ ৪৭ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে জম্বুদ্বীপের বিবরণ বর্ণিত আছে।) আমাদের পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে বোধ হয় যে এখন যাহাকে আমরা এসিয়া মহা-দ্বীপ বলি তাহাই পুরাণে জম্বুদ্বীপ নামে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বকালে ইহার কোন কোন অংশ জলময় ছিল, আবার কোন কোন প্রাচীন স্থান এখন সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। [উত্তরকুরু ও লঙ্কা দেখ।]

বৌদ্ধমতে জম্বুদ্বীপ শব্দে ভারতবর্ষ, এবং কোন কোন জৈনমতে ভারতবর্ষের পঞ্চবিভাগের একটি বিভাগকে বুঝায়। জম্বুদ্বীপ (পুং) ১ জম্বুদ্বীপ, বহুবোজনবিস্তৃত প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ ধ্বজ স্বরূপ বিরাজমান থাকায় জম্বুদ্বীপকে জম্বুদ্বীপ বলে। ২ একজন নাগ।

জম্বুনদী (স্ত্রী) [জম্বুনদী দেখ।]

জম্বুপর্বত (পুং) জম্বুদ্বীপ।

“অষ্টাদশ সহস্রাণি বোজনানাং বিশাম্পতে।

বটপতানি চ পূর্ণানি বিকৃতো জম্বুপর্বতঃ ॥” (ভারত ৩।১১।৫)

জম্বুগ্রন্থ (পুং) একটী নগরের নাম। কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান জম্বুনগর। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃ মাতুলার হইতে অযোধ্যার আসিবার সময় এই নগর দিয়া আসিয়াছিলেন।

“ভোরণং দক্ষিণার্ধেন জম্বুগ্রন্থং সমাগমং ॥” (রামায়ণ ২।৭।১১)

জম্বুবনজ (স্ত্রী) খেতজবাগুশ। “পারিতজ্ঞং পাটলা চ বকুলং শিরিশালিনী। তিলকং জম্বুবনজং পীতকং তগরম্বপি ॥

এতানি হি প্রশস্তানি কুসুমাত্মচ্যুতার্জনে ॥” (বামনপুং)

জম্বুমং (পুং) ১ এক পর্বতের নাম। ২ বানরের নাম।

জম্বুমতী (স্ত্রী) এক অঙ্গরা।

জম্বুমালিন্ (পুং) এক রাক্ষসের নাম।

জম্বুমার্গ (স্ত্রী) পুষ্করস্থ তীর্থভেদ।

“জম্বুমার্গং সমাবিশ্ত দেবহিপিভূসেবিতং।

অধমেধমবাপ্রোতি সর্ষকামসমম্বিতঃ ॥” (ভারত ৩।৮২ অঃ)

জম্বুরুদ্র (পুং) পাতালবাসী এক নাগরাজ। (সহস্রাঙ্গি ১।৪।৫)

জম্বুল (পুং) ১ জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। ২ কেতকপুষ্পবৃক্ষ, কেয়া-ফুল গাছ। ৩ কর্ণপালির রোগবিশেষ, কর্ণের বহির্দেশ সঞ্চরীয় একরূপ পীড়া।

“উৎপাটকশ্চোৎপুটকঃ শ্রাবঃ কণ্ঠযুতো তৃশং।

অবমম্বঃ সকণ্ডকে গ্রহিকো জম্বুলত্বা ॥” (সুশ্রুত ১।১৬)

জম্বুসুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তরুচ জেলার একটী প্রাচীন বিভাগ, উত্তরে মহানদী, পূর্বে বরদারাজ্য, দক্ষিণে বাধর নদী এবং পশ্চিমে কাষে উপসাগর। পরিমাণ প্রায় ৩৭৩ বর্গমাইল। এই বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশ অহরুর, কিন্তু পূর্বাংশ কিয়ৎ পরিমাণে উর্ধ্বর। এখানে অনেক কুপ, সরোবর ও পুষ্করিণী আছে। জোয়ার, বাজরা, গম, নানাপ্রকার ডাইল, তামাক, তুলা এবং নীল জন্মে। লোকসংখ্যা ১২০৭২। এখানকার প্রধান নগরের নাম জম্বুসুর।

জম্বুসুর নগরের অক্ষা° ২২° ৩৩° উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫১° ৩০° পূঃ। পূর্বে দশমাইল দূরে তঙ্কারিয়া নামে একটী বন্দর থাকার, জম্বুসুরে বাণিজ্য ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। সে সময়ে এখানে নীল রপ্তানি হইত। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে রেল হওয়ার তঙ্কারিয়ার সহিত এখানকার সমুদ্রবাণিজ্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। সম্প্রতি রেলপথেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কার্য চলিয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট তুলা জন্মে, তাহা বিদেশে রপ্তানি হয়। ছিট, পরিষ্কৃত চর্ম, হস্তিদন্ত-

নির্মিত প্রব্যাধি এবং নানা প্রকার খেলনা এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দে জম্বুসুর নগর ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে মিষ্টর ক্যালেন্ডার এখানে একটী ক্ষুদ্র হর্ণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে নগরটী পুনরায় মরাত্টিদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পুণার সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নগরটী পুনরায় পাইয়াছেন।

জম্বুসুর নগরের উত্তরদিকে সর্পদেবতা নাগেশ্বরের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে আত্র ও নানাজাতীয় বৃক্ষ পরিশোভিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং তীরে চতুর্দিকে অনেকগুলি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই স্থান একটী প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য।

“জম্বুসুরো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিজি চ।

সূৰ্য্যঃ শিবো গণো দেবী হরির্বিজ চ তিষ্ঠতি ॥” (গকড়পুং ৮।১।১২)

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় বর্টাংশ মুসলমান। ইহার পূর্বে রাজপুত ছিল, পরে মুসলমান হইয়াও প্রাচীন হিন্দু নাম পরিত্যাগ করে নাই। গঙ্গাধর শর্মা নামে একজন বিখ্যাত অক্সফোর্ডবিদ পণ্ডিত এই নগরে বাস করিতেন।

জম্বুস্বামিন্, একজন জৈন স্তবির। রাজা শ্রেণিকের রাজত্বকালে ঋষভদত্ত শ্রেণীর ঔরসে ধারিণীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে একদিন সুধর্মস্বামীর ধর্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহার সন্ন্যাসধর্মগ্রহণে ইচ্ছা হইল। পিতামাতার অসম্মতি চাহিলেন। তাঁহার অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না।

জম্বুর পিতামাতা পূর্বেই আটজন শ্রেণীর কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পুত্রের সহিত তাঁহাদের আটকন্ডার বিবাহ দিবেন। এখন জম্বুর পিতামাতা পুত্রের নিকট সেই কথা জানাইলেন। তখন জম্বু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আটজন শ্রেণিকন্ডার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহ করিয়াও তিনি ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করেন নাই।

সে সময়ে বিদ্যা পর্বতের নিকট জয়পুরনগরে বিদ্যা নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন, প্রবর এবং প্রভু নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। প্রবর (প্রভব) পিতার সহিত বিবাদ করিয়া গৃহ ছাড়িয়া দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি জম্বুর গৃহে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। জম্বুর মনোমুগ্ধকর ধর্মোপদেশে প্রবরের মন পরিবর্তন হইল। প্রবর গৃহে গিয়া পিতার অসম্মতি লইয়া পরদিন জম্বুর নিকটে কিরিয়া আসিলেন। জম্বুও পিতা, শ্বশুরগণ এবং পত্নীগণের সহিত সুধর্মার নিকটে দীক্ষিত হইলেন। প্রবরও সুধর্মার নিকটে দীক্ষিত হইয়া

জম্বুর শিকড় গ্রহণ করিলেন। মহাবীরের নির্ধারণে ৩৪ বৎসর অতীত হইলে জম্বুস্বামী প্রবরকে স্বপ্নে অভিব্যক্ত করিয়া চিরবিপ্রাম লাভ করিলেন। (ঐতিহ্যগতপ্রবণবৃত্তি)

হোমাচার্য্যচিহ্নে স্থিরাবলীচরিতে লিখিত আছে, রাজগৃহ নগরে ক্ষতবস্ত্র বাস করিতেন। যথাকালে তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ার তিনি পত্নী ধারিণীকে সঙ্গে করিয়া বৈভার সিরিতে উপস্থিত হন। এখানে শেব অর্হৎ মহাবীরের শিষ্য জম্বুস্বামীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ধারিণী গণধর জম্বুস্বারের নিকট তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে কি না জানিতে চাহিলে তিনি বলেন—

“তদ্রে ত্র্যাক্ষকো কুক্কো জুতসিংহং ধরিশ্বসি।

“আখ্যাতজম্বুতরুবদগুণরত্নমরশ্চ তে।

জম্বুনা মা সুতো ভাবী দেবতাকৃতসন্নিধিঃ ॥” (২।৫৩)

তদনুসারে যথাকালে ধারিণীর পুত্র জম্বিল, তাহার জম্বু নাম রাখা হইল। হোমাচার্য্যের মতে, বিজ্ঞানস্বামী নামে সুরবর ত্র্যক্ষলোকভ্রষ্ট হইয়া ধারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে আটজন শ্রেষ্ঠকঙ্কাকে জম্বুস্বামী বিবাহ করেন, তাঁহাদের নাম সমুদ্রস্রী, পদ্মস্রী, পদ্মসেনা, কনকসেনা, নভঃসেনা, কনকস্রী, কনকবতী ও জরস্রী। [স্থিরাবলীচরিতে পরিশিষ্টপর্বে ২য় সর্গে ও উত্তরাধ্যায়নবৃত্তিতে জম্বুস্বামীর বিবৃত্ত বিবরণ উঠব্য।]

জম্বু (স্রী) ১ নাগদমনী, নাগদান। (রাজনি) ২ জামগাছ। হিন্দীতে জামন বলে। ইহার ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। পর্যায়—সুরভিপত্রা, নীলকলা, শ্রামলা, মহারক্তা, রাজারী, রাজকলা, শুকপ্রিয়া, মোদমোদিনী, জম্বু, জম্বুল।

বর্তমান উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে—প্রায় জগতে ৭০০ প্রকার জম্বুজাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০ প্রকার। কেহ কেহ বলেন, পূর্বে যতগুলি বৃক্ষ জম্বুজাতীয় বলিয়া গণিত হইত তাহার অনেকই প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন জাতীয়। কোন কোনও মতে লবঙ্গ প্রভৃতিও জম্বুজাতীয়। ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্রহ্ম, মলয়, সিংহল, আমেরিকা মহাদেশস্থ ব্রেজিল এবং ওয়েস্টইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে জম্বু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ইউজিনিয়া (Eugenia)। কথিত আছে সাত্তররাজ ইউজিনিয়ার সম্মানার্থে জম্বুর ঐ নামকরণ হয়।

জম্বুজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে এই বৃক্ষ প্রকার প্রধান—

জাম, কালজাম (Eugenia Jambolana) ইংরাজীতে ব্ল্যাক্ প্লম্ (Black plum), হিন্দীতে জামন, জাম, জামুন, জম্বিন ফল ও পরমান, উড়িয়া ভাষায় জামু ও জামকুলি এবং আসামে জামু বলে।

কালজাম জ্যেষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকে। এই জাতীয় বৃক্ষ মধ্যবিধ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। পঞ্জাব হিমালয় প্রদেশে ৩০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও আপনি জন্মে। আসাম অঞ্চলে ছোটনাগপুরে এবং অন্ধ্র প্রদেশে ইহার বহুলে অপর ত্র্যবা মিশাইয়া (জাল প্রভৃতি) অনেক ত্র্যবা রং করা হয়।

নীল প্রভৃত্ত করিবার সময়ে ইহার বহুলে কাথ ব্যবহৃত হয়। জম্বু অনেক ঔষধে লাগে। ইহার বহুল সঙ্কোচক, অজীর্ণনিবারক, আমাশয়নাশক এবং মুখকণ্ঠ-নিবারক। অপর ফলের রস বায়ুনাশক এবং অজীর্ণকারক। আমাশয় রোগে এবং বৃষ্টিক দংশনে ইহার পাতার রস উপকারী। বীজ চূর্ণ বহুমাত্র নিবারক। পাখুরী, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ইহার পক্ষফল উপকারী।

কালজাম কোনও কোনও স্থানে পারাবতের ডিঘের দ্বার বড় হয় এবং পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। খাইতে কষার এবং জেবৎ অন্ন রসায়ক। লবণ সংযোগে অধিক সুস্বাদু হয়। গোরা অঞ্চলে ইহার ফল হইতে এক প্রকার মত্ত প্রভৃত্ত হয়, তাহা খাইতে অনেকটা পোটের মত। [মন্ত দেখ।] বেশী জাম ভক্ষণ করিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা।

জামকাঠ কিঞ্চিৎ লোহিতাত ধূসরবর্ণ। তেমন শক্তও নহে ও বেশী নরমও নহে। শুঁড়িতে একপ্রকার পোকা গর্ত করিয়া বাস করে। কপাট, চোকাট, লালল প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে জামকাঠ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকমতে ফলের গুণ—কষায়, মধুর, শ্রম পিত্তদাহ, কঠরোগ, শোথ, কৃমিদোষ, শ্বাস কাস ও অতিসার রোগনাশক, বিষ্টভি, কচিকর এবং পরিপাকজনক। (রাজনি) শুষ্ক, স্বাদু, শীতল, অগ্নিসন্ধীপন, কৃষ্ণ এবং বাতকর। (রাজবল্লভ)

বৈদ্যকমতে—বৃহৎ, ক্ষুদ্র এবং আরণ্যভেদে জম্বু ত্রিবিধ। বৃহৎ ফলের পর্যায়—মহাজম্বু, মহাপত্রা, রাজজম্বু, বৃহৎকলা, ফলেন্দ্র, নন্দ, মহাকলা, সুরভিপত্রা। ক্ষুদ্রজম্বুর পর্যায়—হুম্বা, কৃষ্ণকলা, দীর্ঘপত্রা, মধ্যমা। ইহাকে ভাষায় ক্ষুদ্রে জাম বলে। আরণ্য বা বনজম্বুর পর্যায়—ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, নাদেয়ী, শীতপল্লবা, হুম্বপত্রা, জলজম্বুকা, বজ্রভাষাতে বনজাম, ভূঁইজাম, পানশিউলী বলে। ভূঁইজামের গাছ ছোট এবং প্রায়ই নদীতীরে জন্মে। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—বিষ্টভি, শুষ্ক, কচিকর। (ভাবপ্রা) বনজম্বুফলের গুণ—প্রাণী, কৃষ্ণ, কফ, পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক। (ভাবপ্রা) জলে থাকিলে এই কাঠ ভাল থাকে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। একত্র বঙ্গদেশে অনেক স্থলে জামকাঠে দোকা প্রভৃত্ত করে।

ছোটজাম—বৈজ্ঞানিক নাম (Eugenia caryophyllaea)

সীতাল ভাবার বটজনিয়া বলে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। ফল অত্যন্ত সুস্বাদু। পত্র সুস্বাদু এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঠ খেতবর্ণ, অমৃৎ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী।

গোলাপজাম—বৈজ্ঞানিক নাম *Eugenia jambos*, ইংরাজীতে রোজ আপেল (Rose Apple), উৎকলে ও হিন্দিতে গোলাপজাম, সংস্কৃতে জম্বুরাজ এবং আরবী ভাষায় তকা বলে।

গোলাপজামের গাছ ছোট হয়, ফলফুলে ভূষিত হইলে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে। ভারতবর্ষে এবং অস্ট্রাছ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উদ্ভানে এই বৃক্ষ রোপিত হয়। গোলাপজামের গাছ ফুলগাছের মত বড় হয়। ফলগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, কোনটা আপেল ফলের মত বড়। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। পাকা ফলের রং চাপা ফুলের মত, গন্ধ গোলাপ জলের মত, খাইতে অতি সুস্বাদু, কিন্তু তেমন রসাল নহে। ইহার ফল লোহিতাভ এবং সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট। বৎসরের মধ্যে গোলাপজামের তিন চারিবার ফল ধরে।

গোলাপজামের বিশেষ গুণ—প্রত্যেকবার ফলের সময়ে গাছের যে পার্শ্বে ফল ধরে, সে পার্শ্বের পাতা করিয়া যায়, কিন্তু যে পার্শ্বে ফল ধরে না, তাহার পাতাও ঝরে না। ইহার কাঠের বর্ণ লোহিতাভ ধূসর। গোলাপজামের পাতায় চক্ষুরোগের এক প্রকার ঔষধ হয়।

জামরুল—বৈজ্ঞানিক নাম *Eugenia Javanica*। মলাকা, আন্দামান, নিকোবরপ্রভৃতি দ্বীপে জামরুলের আদিম বাসস্থান। এখন ভারতে নানা স্থানে উদ্ভানপ্রভৃতিতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহার ফল পাকে। ফলগুলি খেতবর্ণ, মন্থণ এবং উজ্জল। দ্রিধ এবং রসাল হইলেও খাইতে কোনও আস্থান পাওয়া যায় না। ইহার কাঠ ধূসরবর্ণ ও শক্ত, কিন্তু প্রায় কোনও কার্যে ব্যবহৃত হয় না। আর এক প্রকার জামরুল আছে, তাহাকে ইউজিনিয়া মলাকেসিস্ *Eugenia malaccensis*, ইংরাজীতে মালয় আপেল (Malay apple) ও এ দেশে মলাক-জামরুল বলে।

পূর্বে মলয়দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত হইয়াছিল। এখন বাংলাদেশ এবং ব্রহ্মদেশে উল্য়ানে জন্মিয়া থাকে। ইহার ফল লাল ও ফল সুস্বাদু, আকার পেয়ারার মত। এই গাছ দুই জাতীয় আছে।

বড় জাম—বৈজ্ঞানিক নাম *Eugenia operculata*, হিন্দীতে রায়জাম, পরমান, জামবা বলে। হিমালয়পর্বতের নিম্নদেশে; চট্টগ্রাম, ব্রহ্ম, পশ্চিম বাট প্রদেশ এবং সিংহলের বনভূমিতে জন্মে। বৃক্ষগুলি বেশ বড় হয়। গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগে ইহার ফল পাকে। ইহা খাইতে স্বাদু। বাতরোগে ইহার ফল উপকারী। মূল, পত্র এবং বহুল প্রভৃতিও ঔষধার্থ

ব্যবহৃত হয়। ৩ জম্বুল, জাম। (অমর)। ৪ বনামপ্রসিক নদী, জম্বুনদী।

“মেরো: পার্শ্বাৎ প্রভবতি ব্রহ্মচন্দ্রপ্রভো মহান।

জম্বুশৈব নদী পুণ্যা যতঃ জাম্বুনদং যুতঃ ॥” (মৎস্কপু ১২০।৬৭)
৫ জম্বুদ্বীপ। [জম্বুদ্বীপ দেখ।]

জম্বুক (পুং) শৃগাল, শেরাল (শকর)। [অগরাগর অর্থ জম্বুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জম্বুকা (স্ত্রী) কাকলীজালা। (রাজনি)। কিসমিস্।

জম্বুকী (স্ত্রী) শৃগালী।

জম্বুখণ্ড (পুং) [জম্বুখণ্ড দেখ।]

জম্বুনদপ্রভ (পুং) ভাবিবুদ্ধদেবের নাম।

জম্বুনদী (স্ত্রী) ১ জম্বুদ্বীপস্থ বিশাল জম্বুবৃক্ষ হইতে পতিত জম্বু-ফল রসজাত নদী।

“জম্বুদ্বীপস্ত সা জম্বুনামহেতুর্মহামুনে।

মহাগজপ্রমাণানি জম্বুতন্তাঃ ফলানি বৈ ॥

পতন্তি ভূততঃ পৃষ্ঠে দীর্ঘমাণানি সর্কতঃ।

রসেন তেবাং প্রথ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ॥”

(বিষ্ণুপু ২।২।১৯-২০)

২ ব্রহ্মলোক হইতে প্রবাহিত সপ্তনদীর মধ্যে একটি নদী।

“ব্রহ্মলোকাদপক্রান্তা সপ্তদা প্রতিপদ্যতে।

বহ্নোকসারা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী।

জম্বুনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিদ্ধুচ সপ্তমী ॥” (ভারত ৬।৬ অঃ)

জম্বুবনজ (স্ত্রী) খেতজবাপুস। [জম্বুবনজ দেখ।]

জম্বুবৃক্ষ (পুং) জম্বুনামক বৃক্ষ। জামগাছ। [জম্বুবৃক্ষ দেখ।]

জম্বুমার্গ (পুং) পুষ্করস্থ তীর্থভেদ। এই তীর্থ ভ্রমণে লোকে অশ্বমেধ তুল্য ফললাভ করে এবং তথায় পঞ্চরাত্রি বাস করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুতাত্মা হয়।

(ভারত ৩।৮২ অঃ)

“জম্বুমার্গং গমিষ্যামি জম্বুমার্গং বনাম্যহম্।

এবং সঙ্করানোহপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥” (হরিবংশ ১৪।১ অঃ)

জম্বুর, দাক্ষিণাত্যে কোড়গ প্রদেশের অন্তর্গত মঞ্জরাজপত্তন তালুকের মধ্যস্থিত একটি গ্রাম। অক্ষা° ১২° ৩৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০' পূঃ। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে হাট হয়। এখানে কোড়গাধিপ সিংহরাজের সমাধিস্থির আছে।

জম্বুরাজ (পুং) রাজজম্বু, জামরুল।

জম্বুল (পুং) ১ জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। ২ কেতকবৃক্ষ, কেরাগাছ।

“জম্বুজম্বুলবৃক্ষাভ্যাং কলকন্দলভূষিতং ॥” (হরিবংশ ৯৬।১৬)

৩ (স্ত্রী) বরপক্ষীর দ্বীদিগের পরিহাসবচন, বর কল্পাপেক্ষের পরস্পর হান্ত পরিহাস। (ভারত-চীকার নীলকণ্ঠ)

জন্তু লমালিকা। (জী) ১ বর কড়াপকের পরিহাসবচনসমূহ।

২ কড়া এবং বরের মুখচক্রিকা।

“আশীতিবর্জিত্বা চ দেবর্ষিঃ কৃকমত্ববীং।

অনিরুদ্ধত বীৰ্য্যাথো বিবাহঃ ক্রিয়তাং বিতো ॥

জন্তু লমালিকাং জন্তুং প্রজ্ঞা হি মম জায়তে ॥” (হরিবংশ ১৮৩২২)

৩ জন্তু লগুণের মালা।

জন্তু স্বামিন্ (পুং) জৈনদিগের এক স্ববির। [জন্তু স্বামিন্ দেখ।]

জন্তোষ্ঠ (স্ত্রী) বৈষ্ণবদিগের অস্ত্রচক্রিংসার্থ শলাকাবিশেষ।

[আধবোষ্ঠ দেখ।]

জন্তু (পুং) জন্ততে জন্ততে ইতি জন্ত গাভ্রবিনামে অচ্
(রথিজভোরচি। পা ৭।১।৬১) ইতি হুম্।

১ একজন দৈত্য, মহিষাসুরের পিতা। কোন সময়ে জন্তু ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়। পরে মহাদেবকে তপস্তায় সন্তুষ্ট করে, মহাদেব তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ‘তুমি ত্রিভুবন-বিজয়ী পুত্র লাভ কর’ এই বর প্রদান করেন। দৈত্য বর পাইয়া গৃহে আসিতেছে, এই সময় ইন্দ্র নারদের নিকট সংবাদ পাইয়া পথিমধ্যে যুদ্ধার্থ তাহাকে আহ্বান করেন। জন্তু স্বান করিবার ছল করিয়া সরোবরে গমন করে, তথায় পত্নীকে দেখিতে পায়। পরে তাহার গর্ভোৎপাদন করিয়া ইন্দ্রের নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধেই ইন্দ্রের নিকট জন্তু নিহত হয়। (মার্কণ্ডেয়পুং)

২ প্রহ্লাদের তিনটি পুত্রের মধ্যে একটি। (হরিবংশ ২১৮।৩৫) ৩ হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র, প্রহ্লাদের ভ্রাতা। (হরিবংশ ২৩৯।১৪) ৪ হিরণ্যকশিপুর ঋতুর ও কয়ামুর পিতা। (ভাগবত ৬।১৮।১২) জন্ত্যতে ভক্ষ্যতে অনেনেনতি জন্ত-করণে ঘড়্। ৫ দন্ত, দংষ্ট্রা। “কাক্ষন্ত বায়বন্তান্তে দধামি জন্তয়োঃ।” (ভুল্লয়জুঃ ১১।৭৯) “জন্তয়োঃ প্রদংষ্ট্রয়োঃ” (মহীধর) জন্ত-গিচ্-ধূল্। ৬ জঘীর। জন্ত-ভাবে ঘড়্। ৭ ভক্ষণ। ৮ অংশ। ৯ হুম্। ১০ তূণ। (হেম) ১১ বলির সখা এক দৈত্য, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার হস্তে নিহত হয়। (ভাগবত) ১২ সূক্তের পিতা। (রামায়ণ ২।৭।৭) ১৩ দন্তস্থানীর জালা।

“অগ্নির্জন্তুগিতি” (ঋক্ ১।১৪৩।৫)

‘জন্তৈঃ দন্তৈঃ দন্তস্থানীরাজিলাভিঃ’ (সারণ)

১৪ রস্তা নামে এক অশুর। (কালিকাপুং ৬১ অঃ) এই অশুর যুদ্ধে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়। ১৫ জন্তা।

জন্তুক (পুং) জন্তয়তি জন্ত-গিচ্-ধূল্ স্বার্থে-কন্ (রথিজভোরচি। পা ৭।১।৬১) ১ জঘীর (শব্দচঃ)। (ত্রি) জন্ত-ধূল্। ২ ভক্ষক। (পুং) ৩ স্বনামধাতু নৃপবিশেষ। (পুং স্ত্রী) জন্তভীতি, জন্ত জন্তনে কর্ত্তরি ধূল্। ৪ কামুক। (ত্রি) ৫ হিংসক।

“সাহিত্যো জন্তকং” (ভুল্লয়জুঃ ৩।১৬)

‘জতি মাশনে জন্তরভীতি তং হিংসকং।’ (মহীধর)

৬ শব্দদেবতা। “দদৌ মন্তং জন্তকানাং বশীকরণমুত্তমন্।”
(রামায়ণ ১।৩১।৪)

৭ শিব। (হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

জন্তুকা (স্ত্রী) জন্তা এব-স্বার্থে কন্ টাপ্। জ্তা। (রাজনিং)

জন্তুকুণ্ড (স্ত্রী) বিষ্ণুজ্ঞানেন্দ্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। (কপিলসং)

জন্তুগ (পুং) জন্তায় ভক্ষণায় গচ্ছতি জন্তভীতি, জন্ত-গম-ড।

অতিশয় ভোজনলোলুপ এক রাক্ষস।

“ক্রূরাঃ সর্পাঃ স্তূর্ণগাণ্ড তরবো জন্তগাঃ খগাঃ।”

(আহিকতত্ত্বমুত পদ্মপুং)

জন্তুদ্বিট (পুং) জন্তমহুরং ঘেটি জন্ত-দ্বি-কিপ্ জন্তত্ব দ্বিট ইতি বা। ১ ইন্দ্র। (হেম) ২ বিষ্ণু। (ভারত)

জন্তুন (স্ত্রী) ১ রতি। ২ ভক্ষণ। ৩ জন্তা।

জন্তুভেদিন্ (পুং) জন্তং ভেদন্তুং শীলমন্ত, ভিন্-গিনি (স্থপা জাতোগিনিস্তাচ্ছীলো। পা ৩।২।৭২) ১ ইন্দ্র। (অমর) জন্তরিপু প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জন্তুর (পুং) জন্তং ভক্ষণকৃটিং রাত্তি দদাতি রা-ক্। ১ জঘীর, গৌড়ানবু। (শব্দচঃ)

জন্তুল (পুং) জন্তুর রস্ত লঘং। ১ জঘীর। ২ যুদ্ধবিশেষ। (মেদিনী)

জন্তুলদন্ত, বেতালপঞ্চবিংশতি নামে সংকৃত গ্রন্থকার।

জন্তুলা (স্ত্রী) জন্তং ভক্ষণং লাতি আদদাতীতি লা-ক্। রাক্ষসী-বিশেষ। “সমুদ্রস্তোত্তরে তীরে জন্তুলা নাম রাক্ষসী।

তত্ভাঃ স্রবণমায়েণ বিশল্যা গভিগী ভবেৎ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

সমুদ্রের উত্তর তীরে জন্তুলা নামে রাক্ষসী বাস করিত।

ইহার নাম বটপত্রে লিখিয়া গভিগীর মন্তকে রাখিয়া দিলে গভিগী স্রবণ প্রসব করে। গোদাবরী তীরে ইহার বাস ছিল এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। (পঞ্জিকা)

জন্তুলিকা (স্ত্রী) সঙ্গীতবিশেষ।

জন্তুমুত (ত্রি) দন্তদ্বারা অভিযুত।

“জন্তুমুতং পিব ধানাবস্তং।” (ঋক্ ৮।১১।২)

‘জন্তুমুতং দন্তৈরভিযুতমিমং সোমং।’ (সারণ)

জন্তা (স্ত্রী) জতি জ্তার্যাং জন্ত্যতে ইতি স্বার্থে গিচ্-ভাবে অ।-স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্। জ্তা। (রাজনিং)

জন্তারি (পুং) জন্তত অশুরভেদত অরিঃ ৬ভৎ। ১ ইন্দ্র।

২ অগ্নি। ৩ যজ্ঞ। (বিধ) ৪ বিষ্ণু। (ভারত)

জন্তিন্ (পুং, স্ত্রী) জন্তয়তি জ্ঞানামাদ্যাদিকং নাপরতি, জন্ত-গিচ্-গিনি। ১ জঘীর। (ত্রি) ২ জন্তাযুক্ত।

জম্মীর (পুং) জম্মাতে অগ্নিবুদ্ধার্থে ভক্ত্যতে জম্মজেরন।
পতীরাদয়ন্ত। তত হু। ১ জম্মীর। ২ মরকত। (ভারত)

জম্মা (পুং) জম্মএব বার্থে বৎ জম্মাতে ইতি কশ্মিণিণ্যৎ বা।
দন্ত। “দন্ত্রীভ্যাং মলিন্ গুণ্ডৈস্তকরী।” (শুরবজ্জঃ ১১।৭৮।)
‘জম্মাঃ জম্মাবর্তিমাশ্রিতা’ (মহীধর)

জম্মু, (জম্মু) কাস্মীররাজ্যের একটি প্রদেশ এবং প্রধান নগর।
নগরের অক্ষা° ৩২° ৪৩' ৫২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪' ১৪" পূঃ।
জম্মু প্রদেশ হিমালয়পর্বতশ্রেণী মধ্যে অবস্থিত। সীমা পর্বত-
শুলি প্রায় ১৪০০ ফিট উচ্চ।

তাবি উপনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চম্বলভাগাতে
পতিত হইয়াছে। জম্মুনগরটা তাবির পূর্বদ্বারে অবস্থিত
এবং বহুসংখ্যক সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত।
এখানকার চূর্ণ স্মৃদু এবং পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত
বলিয়া শত্রুগণ কামান প্রভৃতি দ্বারাও ইহাকে সহজে আক্রমণ
করিতে পারে না। প্রাচীনকালে নগরটা মহা সমৃদ্ধিশালী
ছিল, এখন পর্য্যন্ত ইহার চতুঃপ্রান্তে বৃহদাকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট
হইয়া থাকে। অধিবাসিগণ সকলেই হিন্দু। এক সময়ে এখানে
হুগুড়া বংশীয় রাজপুত্রগণ রাজত্ব করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে
মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জম্মু শিখদিগের হস্তগত হয়।
মহারাজ রণজিৎসিং কোনও সময়ে গোলাপসিংহকে জম্মু-
প্রদেশ উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন, তদবধি গোলাপসিংহের
বংশধরগণ জম্মুতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জম্মুনগরে একটি বাৎসরিক মেলা
স্থাপিত হয়। প্রত্যেক বৎসর নানাস্থান হইতে বহুবিধ
শিল্পজাত এবং অজ্ঞাত দ্রব্য মেলায় আমদানি হয়। কাস্মী-
রের মহারাজ শিল্পিদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন।
তিননগর হইতে বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থে জম্মুতে নীত হইয়া থাকে।

শিয়ালকোট হইতে জম্মু পর্য্যন্ত একটি রেলপথে আছে,
তাহাতে জম্মুর বাণিজ্যের অনেকটা সুবিধা হয়।

রামায়ণেও এই নগর জম্মু নামে বর্ণিত আছে।

জয় (পুং) জি জয়ে অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬।) ১ যুদ্ধাদি স্থলে
শত্রুপরাজয়, শত্রুদমন, শত্রুকে হারাইয়া দেওয়া।

২ উৎকর্ষলাভ। ৩ অয়ন। ৪ বশীকরণ। জয়তীতি পচাঙ্ঘল।
৫ বে জয়ী হয়। ৬ যুধিষ্ঠির, তিনি বিরাটগৃহে ছদ্মবেশে
অবস্থিতি কালে এই কৃত্তিম নাম ধারণ করেন।

“জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়সেনো জয়ধ্বজঃ।

ইতি গুহানি নামানি চক্রে তেথাং যুধিষ্ঠিরঃ॥” (ভাগ° ৪।৫।৩২)

৭ ইক্ষ্বাকুবংশীয় একাদশ রাজচক্রবর্তী। (হেম ৩।৩৫৮)

৮ নারায়ণের পার্শ্বচর। জয় ও তাহার ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে

বিষ্ণুর দ্বার রক্ষা করিতেন, কোন সময়ে উভয়ে শনকাদি
ঋষিগণকে হরিদর্শনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, ঋষিগণ
ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে অভিশম্পাত করেন। সেই অভিশাপে
জয় প্রথমে হিরণ্যাক্ষ, পরে রাবণ, তৎপরে শিশুপাল হইয়া
এবং বিজয় প্রথমে হিরণ্যকশিপু, পরে কুন্তকর্ণ ও তৎপরে
দন্তবজ্র হইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিনযুগে জন্মগ্রহণ
করে এবং নারায়ণ-হস্তে হত হইয়া মুক্ত হয়।

সর্বাণি ভূতানি জয়তীতি, জীয়েতে সংসারঃ অনেন বা। ৯ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪৯।৬)

১০ নাগবিশেষ। (ভারত ৫।১০।১৬)

১১ একজন দানবরাজ। (হরিবংশ ২৩৪।৮৩)

১২ দশম মন্বন্তরীয় একজন ঋষি। (ভাগ° ৮।১৩।২১-২২)

১৩ ঋববংশীয় বৎসর নৃপতির পুত্র। (ভাগ° ৪।১৩।১২)

১৪ বিশ্বামিত্র ঋষির এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১৬।৩৬)

১৫ উর্কশীগর্ভজাত পুরুষসূর এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১৫।১)

১৬ একজন রাজর্ষি। (ভাগ° ২।৮।১৪)

১৭ ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্র। (ভারত ১।৬৩।১১৩)

১৮ সঞ্জয়রাজের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।১৬)

১৯ সুযুধান নৃপতির পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।১৪)

২০ ভারতাদি শাস্ত্রবিশেষ।

“অষ্টাদশ পুরাণানি রামশ্চ চরিতং তথা।

বিষ্ণুধর্ম্মাশিষ্টাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ ভারতং॥

কাঞ্চ্যক পঞ্চমো বেদো যদ্বাহাভারতং শ্রুতম্।

শৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র! মানবোক্তা মহীপতে॥

জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনুষিণঃ।” (ভবিষ্যপু°)

২১ দক্ষিণদ্বারিগৃহ। (শব্দার্থচিন্তামণি)

২২ বার্ষিক্যাসংসারের প্রাথমিক নামক ষষ্ঠযুগের
তৃতীয় বৎসর।

এই বর্ষে অত্যন্ত উষ্ম ও বৃষ্টিপাত হয়। (বৃহৎসং ৮।৩৮)

এই বৎসরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, নটনর্তক সকলেই পীড়িত
হইয়া থাকে। (জ্যোতি°)

২২ অমিয়হ বৃক্ষ। (অমর) ২৩ পীতমূল্য। (হেম ৪।১৩৮)

২৪ সূর্য।

“জয়ো বিশালো বরদো সর্বাধাতুনিষেচি।” (ভা° ৩।৩।২৪)

২৫ ইন্দ্র। (হেম) ২৬ দেবভেদ। (বায়ুপু°)

২৭ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। “জয় ইতি চ নৈব্ধতে রুদ্রশ্চানিলে
হত্যন্তরপদেষু।” (বরাহ—বৃহৎসংহিতা ৫২।৪৮)

২৮ বিদেহরাজবংশীয় অশ্বতের পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।৫।১৪)

২৯ অশ্বতের এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।২৫)

৩০ সংকীর্ণিত এক পুত্র। (ভাগ ৯।২৭।১৮)

৩১ মজুর পুত্রভেদ। (ভাগ ৯।২১।১১)

৩২ কব্জের পুত্র অশোক। (বৌদ্ধশাস্ত্র)

জয়ক (জি) জয়-কন্ (আর্কবাদিত্য: কন্। পা ৫।২।৬৪) জয়বৃক্ষ।

জয়কণ্ঠ, স্তম্ভিকর্ণামৃত একজন প্রাচীন কবি।

জয়করণ [জয়রাম ভায়পকানন দেখ।]

জয়কৃষ্ণ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি বদরিকাশ্রমযাত্রা-পদ্ধতি, জুক্তিরত্নাবলী, হরিত্তিকসমাগম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

২ রূপদীপকপিঙ্গল-রচয়িতা।

৩ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি, বালকৃষ্ণের পুত্র। ইনি অজামিলোপাখ্যান, কৃষ্ণভোজ, কৃষ্ণচরিত্র, ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদ-চরিত, বামনচরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ কবিচন্দ্রোদয় খুত একজন কবি।

৫ একজন হিন্দী কবি, ভবানীদাসের পুত্র। হিন্দীতে ছন্দসার প্রণয়ন করেন।

জয়কৃষ্ণ তর্কবাণীশ, একজন স্মার্তপণ্ডিত, ইনি শ্রাদ্ধদর্পণ নামে স্মৃতিসংগ্রহ, দারাদিকারক্রমসংগ্রহ ও জীমুতবাহনরচিত দায়ভাগের দায়ভাগদীপ নামে টীকা রচনা করেন।

জয়কৃষ্ণমোনিন্, একজন বিখ্যাত শাস্ত্রিক। রঘুনাথভট্টের পুত্র ও গোবর্দ্ধনভট্টের পৌত্র। ইনি কারকবাদ, লঘুকৌমুদী-টীকা, বিভক্ত্যর্থনির্ণয়, বৃত্তীপিকা, শব্দার্থতর্কাসমুদ্র, শব্দার্থ-সারমঞ্জরী, তুচ্ছচক্রিকা, ফোটচক্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৈদিকপ্রক্রিয়ার সুবোধিনী নামে টীকা প্রভৃতি রচনা করেন।

জয়কেশরিন্, দুর্গম্লোকার্থ নামে দুর্গমাহাশ্বের টীকাকার।

জয়কেতু, কাঞ্চকৃষ্ণের একজন রাজা। (তাপীখণ্ড)

জয়কেশি, ১ গোয়ার একজন কাদম্ব রাজা। ইনি ১০৫২ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন। ২ উক্ত জয়কেশির পৌত্র। ৩ ঐ বাণীর একজন রাজা, বিজয়াদিত্যের পুত্র। ইনি ১১৭৫ খৃঃ হইতে ১১৮৮ পর্যন্ত রাজত্ব করিতেন।

জয়কোলাহল (পুং) জয়ন্ত কোলাহলো যত্র বহতী, জয়ন্ত কোলাহলঃ, ৬তৎ। ১ কলকলধ্বনি, অরধ্বনি, জয়মুচক শব্দ-বিশেষ। ২ জয়পুত্রক, পাশকভেদ। (শব্দরত্ন)

জয়ক্রেত্র (স্ত্রী) পুণ্যস্থানবিশেষ।

জয়গড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রায়গিরি জেলার অন্তর্গত একটা বন্দর। অক্ষা° ১৭° ১৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৫' পূঃ। বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ৯৯ মাইল দক্ষিণে শাস্ত্রী বা সলমেশ্বর নদী-তীরে অবস্থিত। এখান হইতে গুড় এবং আলানী কাঠ রপ্তানি হয়। বিশেষ হইতে লবণ ও চাউলের আমদানি

হইয়া থাকে। সম্রাতি ইহার সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখানে একটা বৃহৎ দুর্গ আছে। দুর্গটা বিজয়-পুরের রাজার নির্মিত। নারক নামে একজন দস্যু এই দুর্গে আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। ১৫৮৩ এবং ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাহার সহিত পর্তুগীজদিগের এবং বিজয়পুররাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে উভয়েই পরাস্ত হইয়াছিলেন। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে দুর্গটা অঙ্গুর নামক মরাঠা-নৌদস্যুর হস্তগত হয়। তৎপরে ১৮১৮ খৃঃ অব্দ হইতে পেশবাদিগের অধঃপতনের পরে ইংরাজরাজ ইহার অধিকারী হইয়াছেন।

জয়গুপ্ত, শালধরখুত একজন কবি।

জয়গোপাল, সেবাকলবিবরণ-টীকা-প্রণেতা।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। নদীয়ার জেলার (বর্তমান বশোর জেলার) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোর-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবল-রামের ৫ পুত্র—রঘুতম, সদাশিব, বলভদ্র, কালিদাস ও জয়গোপাল। রঘুতম সর্বজ্যোষ্ঠ ও জয়গোপাল সর্বকনিষ্ঠ। ইহাদের কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে করিয়া কালী-বাসী হন। জ্যোষ্ঠপুত্র রঘুতম নাটোরের সভাপণ্ডিতের পদলাভ করিয়া “বাণীকণ্ঠ” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি নাটোর-রাজসভায় স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া এক জমিদারী লাভ করেন। বজরাপুরের ভট্টাচার্য্যবংশ সেই জমিদারী ভোগ করিতেছেন। স্বর্গীয় বিভাগ্যগর মহাশয় এই রঘুতম বাণীকণ্ঠের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখণ্ড হস্তলিখিত “উত্তর-রচিত” নাটক ও কালী হইতে প্রাপ্ত অপর একখণ্ডের সাহায্যে সর্বপ্রথম উত্তরচরিত মুদ্রিত করেন। বিভাগ্যগর মহাশয় উত্তরচরিতের ভূমিকায় এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

জয়গোপাল কালীতে শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে তিনি একজন অধিষ্ঠার শাস্ত্রিক ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জয়গোপালের প্রথম বিবাহ হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা কালী লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। নানাস্থানে অনেক চেষ্টার পর ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহরীপুরের কেরি সাহেবের কর্ম স্বীকার করেন। তিনি ৪৬ বর্ষ বয়সে বিত্তীয়-ব্যয় দায়পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৬ বর্ষ

তিনি কলেজে ছিলেন। বিদ্যারাগর, তারালঙ্কার, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলই তাঁহার ছাত্র। জয়গোপাল তখনকার সুলীমকোটের অজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অন্ততম ছিলেন। সুবিখ্যাত মিসনরী কেরী ও মার্সম্যান তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষা অধ্যয়ন করেন। উপরোক্ত মিসনরীস্বরূপ কর্তৃক শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে কুন্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরামদাসের মহাভারত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির সূত্রপাত মিসনরীদিগের যত্নেই হইয়াছিল। যথিতে গেলে জয়গোপালই এই উন্নতির মূলে সর্বপ্রথম শক্তিসংকার করিয়া মাতৃভাষার নব-জীবন দান করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালী মাঝেই তাঁহার নিকট স্বর্গী। অপর দিকে জয়গোপাল একজন সুকবি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সকলই সুসলিল ও কবিত্বপূর্ণ। অধুনা বঙ্গদেশে যে কুন্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রচলিত আছে, উহার অধিকাংশই জয়গোপালের কবিত্বের সাক্ষ্যস্থল। আসল রামায়ণ মহাভারত এখন মিলে না। [কুন্তিবাস ও কাশিরামদাস দেখ।]

যদিও জয়গোপাল একজন সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন, প্রথমে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালার প্রাচীনতম গ্রন্থ রামায়ণের সংস্কার করিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালাভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া উচিত, কিন্তু জয়গোপাল তাহা না করিয়া রামায়ণ সংশোধন ও নিজ রচনা সংযোজিত করায় মুদ্রিত রামায়ণের অনেক স্থানে রসভঙ্গ এবং প্রাচীনত্বের লোপ হইয়াছে।

শ্রীরামপুর সংস্করণের মহাভারতে বিরাটপর্কের সূচনায়—

“বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্তা-তিলক

মহামুনি পরাশর যাহার জনক”

ইত্যাদি ভারতপ্রণেতা ব্যাসের যে একটি স্তব আছে, উহা জয়গোপালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অথ কৌন সংস্করণের পুস্তকে আমরা ঐ স্তবটি দেখিতে পাই না।

এতদ্ব্যতীত তিনি কবি বিষমঙ্গলকৃত হরিতক্যাদিক সাংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গাভাব, পারশী অভিধান নামাভিধের একখানি অভিধান ও ষড়ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার রচনার নমুনা স্বরূপ বিষমঙ্গলকৃত প্রথম শ্লোকের বঙ্গাভাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“চতুর্কোদে চতুর্শুখ চতুর হইয়া

নিরন্তর নাতিপন্থে নিবাস করিয়া

তথাপি না জানিলেন যে লক্ষ্মীপতিকে

সে লক্ষ্মীপতিকে দেখে গোখুলি-ভূষণ,

তীরে লয়ে ক্রীড়া করে গোপ গোপীগণ।”

জয়গোপালের সময় তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গরাপুরে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চা ছিল। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ছাত্র, জ্যোতিষ ও সাহিত্যশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিষমঙ্গলের বঙ্গাভাবের ভূমিকার তিনি স্বনামের নিম্নলিখিত প্রাথাসূচক পরিচয় দিয়াছেন—

“চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,

ভূমিপতি ভূমিস্বরপতি।

তাঁর রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজ-পুঞ্জিত গ্রাম,

বঙ্গরাপুরেতে নিবসতি ॥

শ্রীজয়গোপাল নাম, হরিতক্যলাভকাম,

উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।

ভক্তবৃন্দ মধ্য রবি, শ্রীবিষমঙ্গল কবি,

কবিতার প্রকাশে পয়ার।”

বিষমঙ্গলের বঙ্গাভাবের শেষ ভাগে তিনি একটা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার পরম সুহৃদ বঙ্গরাপুরনিবাসী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায় যে জয়গোপাল মহেশচন্দ্রের আদেশেই বিষমঙ্গলের অধুবাদ প্রকাশ করেন।

জয়গোপাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশসম্বৃত। ইনি দুই বার দার পরিগ্রহ করিয়াও সন্তান মুখাবলোকে বঞ্চিত ছিলেন। অবশেষে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই পোষ্যপুত্র অস্বাপি জীবিত আছেন। ইহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা।

(১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে) ১৭৬৬ শকে চান্দ্র চৈত্রের দ্বিতীয়া

তিথিতে জয়গোপাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জয়গোপালদাস, ভক্তিভাবপ্রদীপ নামে ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা।

জয়ঘোষণ (ক্রী) জয়শঙ্কোচ্চারণ, উঠে:স্বরে জয়ঘোষণা।

জয়চাঁদ, কনোজের রাঠোরবংশীয় শেষ রাজা। ১২২৫ সন্থতে উৎকীর্ণ লিপিতে ইনি জয়চন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।

[কনোজ ৮১ পৃষ্ঠা দেখ।] ইহার পিতার নাম বিজয়চন্দ্র,

তিনি দিল্লীস্বর অনঙ্গপালের ছহিতার পাণিগ্রহণ করেন।

জয়চাঁদ তাঁহারই গর্ভসম্বৃত। এক সময়ে সার্কভৌমপদের

নিমিত্ত রাঠোররাজের সহিত অনঙ্গপালের তুল্য সংগ্রাম হয়।

এই সংগ্রামে অজমীররাজ চোহানবংশীয় সোমেশ্বর অনঙ্গপালের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, দিল্লীস্বর এই উপকারের

প্রতিদান স্বরূপ তাঁহার সহিত বীর কন্ডার বিবাহ দিয়া-
ছিলেন। এই কন্ডার গর্ভে পৃথীরাজের জন্ম হয়। অনন্যপাল
দৌহিত্রবয়সের মধ্যে পৃথীরাজকেই সমধিক স্নেহ করিতেন।
তাঁহার পুত্রাদি ছিল না। তিনি আপন রাজসিংহাসন পৃথী-
রাজকে প্রদান করিয়া পরলোক গমন করেন। মাতামহের
ঈদৃশ পক্ষপাতিতা দর্শনে কুটিলমতি জয়চাঁদের হৃদয়ে ঈর্ষানল
প্রধূমিত হইতে লাগিল। তিনি তাহার সমুচিত প্রতিকূল
প্রদানে ক্রুদ্ধস্বরূপ হইলেন। রাঠোররাজ মহা পরাক্রান্ত
ছিলেন, তাহার চিরশত্রু চোহান জাতিও তাঁহার প্রশংসাবাদ
করিতেন। তিনি সিদ্ধুর পশ্চিমপ্রান্তবর্তী নৃপতিকে পরাজয়
করিয়া অনহলবাড়ার অধিপতি সিন্ধুরাজকে দুইবার যুদ্ধে পরা-
ভূত করেন। তাঁহার রাজ্য নর্মদানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া-
ছিল। তিনি রাজকুজবর্তী উপাধি লাভের জন্ত গর্জিতচিন্তে
রাজহর-যজ্ঞাসূতানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই যজ্ঞ অতি মহান ব্যাপার। ভোজনপাত্র প্রকালন পর্য্যন্ত
ইহার সমস্ত কার্য রাজগণ কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক।
যজ্ঞসংবাদ শ্রবণে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোলিত হইয়া উঠিল।
যজ্ঞসমাপ্তির পরেই জয়চাঁদের কন্ডা সংযুক্ত (সংযোগিতা)
সমবেত নৃপতিবর্গের সমক্ষে স্বয়ম্বর্য হইবেন, নিমন্ত্রণ পত্রমধ্যে
এ সংবাদও প্রেরিত হইল। যজ্ঞস্থলে সকল নৃপতিই উপস্থিত
হইলেন, কেবল পৃথীরাজ এবং পৃথীরাজের ভগিনীপতি সমর-
সিংহ উপস্থিত হইলেন না। জয়চাঁদ তাঁহাদের অবমাননা
করিবার উদ্দেশে তাঁহাদের স্ববর্ণমুষ্টি নির্মাণপূর্বক দৌবারিক-
বেশ পরিধান করাইয়া যজ্ঞশালার দ্বারে স্থাপিত করিলেন।
যজ্ঞান্তে জয়চাঁদকন্ডা সংযোগিতা অস্ত্রান্ত নৃপতিগণকে
উপেক্ষা করিয়া পৃথীরাজের স্ববর্ণমুষ্টির গলে বরমাল্য প্রদান
করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পৃথীরাজ সর্বৈক যজ্ঞ-
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাহুবলে জয়চাঁদ-হৃদিকাকে হরণ
করিয়া লইয়া যান। কোন্ডে ও লজ্জার জয়চাঁদের পূর্ব হইতেই
প্রধূমিত ঈর্ষাবাহি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি গজনীপতি
সাহেবউদ্দীন ঘোরীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। স্বযোগ
দেখিয়া ঘোরীও তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দৃষতী নদী-
তটে ১১২৩ খৃঃ অব্দে মুসলমান সৈন্যের সহিত পৃথীরাজের শেষ
যুদ্ধ হইল। পৃথীরাজ বন্দী ও নিহত হইলেন। যুদ্ধজয় করিয়া
মুসলমানগণ বিজয়োন্নত হইয়া ভীমদর্পে ভারতবর্ষে বিচরণ
করিতে লাগিল। এদিকে জয়চাঁদ আপন ক্রতকার্যের ফল
অচিরেই প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরেই মুসলমানগণ কনোজ
আক্রমণ করিল, কনোজ শত্রু হস্তগত হইলে, জয়চাঁদ জীবন-
রক্ষার্থ পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন; পলায়নকালে নৌকাযয়

হইয়া তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাণ হইল। ইহারই কুটিলতা,
স্বার্থপরতা এবং বিধানবাতকতা হেতু ভারতগৌরববি চির-
কালের জন্য অন্তর্মিত হইল। রাজপুতানার তাটেরা জয়চাঁদ
সদ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে জয়চাঁদ রণক্ষেত্রেই
বীরের জ্ঞান প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের
তবকাত-ই-নাসিরির মতে—কুতব্ উদ্দীন ৫৯০ হিজিরায়
সিপাসালার ইজ্ উদ্দীনের সহিত বারানসীরাজ জয়চাঁদকে
আক্রমণ করেন। চন্দবাল নামক স্থানে জয়চাঁদ পরাস্ত হন।
কামিল-উৎ-তবারিখ নামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে
যে, সাহেব উদ্দীন ঘোরী যমুনাতীরে জয়চাঁদকে আক্রমণ
করেন। তখন মালব হইতে চীন পর্য্যন্ত জয়চাঁদের অধিকার
বিস্তৃত ছিল। রণক্ষেত্রে জয়চাঁদের সহিত সাত শত নিবাসী ও
প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য উপস্থিত ছিল। সেই যুদ্ধে জয়চাঁদ
নিহত হন।

তাজ্‌উল্ মাসীরের মতে—কুতব্ উদ্দীনের হস্ত-নিকিপ্ত
তীর আসিয়া জয়চাঁদের চক্ষুতে বিদ্ধ হয়, তিনি হাতীর হাওদা
হইতে পড়িয়া যান, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জয়চাঁদ, জয়পুরনিবাসী একজন গ্রন্থকার, ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ইনি
সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় স্বামিকার্ত্তিকেন্দ্রাষ্ট্রপ্রেক্ষ নামক এক-
খানি জৈন ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়চাঁদ, নাগরকোট বা কাজ্‌ড়ার রাজা। সম্রাট অকবরের
সময়ে ইনি প্রাচুর্য্য হইয়াছিলেন।

জয়চক্কা (জী) জয়ার্থী চক্কা, মধ্যলো। বাস্তবিশেষ। জয়ধ্বনি
করিবার জন্ত এই বাদ্য বাদিত হইত।

জয়তীর্থ (রী) ১ তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)।

২ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। পদ্মনাভ ও অকোভ্য-
তীর্থের শিষ্য। ইহার পূর্বনাম চুন্দু রঘুনাথ, সম্রাস-
গ্রহণের পর জয়তীর্থ নামে বিখ্যাত হন। ইনি সংস্কৃত
ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দতীর্থ রচিত প্রায়
সকল গ্রন্থেরই ইনি টীকা লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে এই
ক একখানি টীকা পাওয়া যায়। ব্রহ্মসুত্রভাষ্যের তত্ব-
প্রকাশিকা নামে টীকা, উপাধিখণ্ডনের তত্বপ্রকাশিকা-
বিবরণ নামে টীকা, ব্রহ্মসুত্রব্যাখ্যানের জ্ঞানসুধা নামে টীকা,
অনুব্যাখ্যানাবয়ববিবরণের পঞ্জিকা, প্রমাণলক্ষণের জ্ঞানকর-
লতা নামে টীকা, জ্ঞানোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, ঋগ্বেদভাষ্যের
টীকা, কথালক্ষণের টীকা, কশ্মিনির্ণয়ের টীকা, তত্ববিবেকের
টীকা, তত্বসংখ্যানের টীকা, তত্বোক্তোক্তের টীকা, মায়াবাদ-
খণ্ডনের টীকা, প্রমোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, প্রপঞ্চমিত্যাখ্য-

হুমানব্ধের টীকা, তৎসবদীতাদ্বায়ে প্রমেরদীপিকা নামে টীকা, গীতাভাষণনির্ণয়ের জায়দীপিকা নামে টীকা, বিষ্ণু-তত্ত্বনির্ণয়ের টীকা ও অণুভাষ্যের টীকা। এ ছাড়া জয়তীর্থ বটপঞ্চাশিকা, বেদান্তসংকীর্ণ কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে জয়তীর্থের তিরোভাব হয়। নৃসিংহ স্বতন্ত্রসংগরে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জয়তুঙ্গনাড়, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি প্রাচীন বিভাগ। সূচী-ক্রম মন্দিরে রাজা আদিত্যবর্মার সময়ের যে শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ১৮ নাড়ে (বিভাগে) বিভক্ত ছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে জয়তুঙ্গনাড় ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের রাজধানী ছিল। জয়তুঙ্গনাড়ের অপর নাম জয়সিংহনাড়। কিন্তু বর্তমান সময়ে জয়তুঙ্গনাড়ের সীমা নির্ধারণ অসম্মানসাপেক্ষ, বোধ হয় ষাটপর্ষতের পূর্বদিকে ইহা অবস্থিত ছিল।

জয়তোড়া, মানসু জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। পরিমাণ প্রায় ২২.৫০ বর্গমাইল। ইহা পঞ্চকোটের রাজ্যের জমিদারীর অন্তর্ভূত।

জয়ৎসেন, ১ খ্রিষ্টাব্দে ওত্তরাবান-সময়ে নুল্লের একটি নাম। ২ মগধের এক রাজা।

“মগধেষু জয়ৎসেনস্তেযামাসৌ স পার্শ্ববঃ।

অষ্টানং প্রবরাস্তেবাং কালেনানাং মহাস্থরাঃ।”

(ভারত আদি ৬৭ অঃ)

৩ পুরুবংশীয় সার্কভোম রাজ্যের পুত্র। সার্কভোমের ঔরসে ও কেবয় রাজকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম। (ভারত আদি ৯৫ অঃ) ৪ সোমবংশীয় অহীননুপ পুত্র।

জয়দ (ত্রি) জয়ং দদাতি জয়-দা-কিপ্। জয়দাতা।

জয়দত্ত (পুং) জয়েন বিজয়েন দত্তএব। ১ ইন্দ্রপুত্র। ২ একজন রাজা। ইহার পুত্রের নাম দেবদত্ত।

৩ একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদবিদ। বিজয়দত্তের পুত্র।

ইনি সংস্কৃত ভাষায় অষ্টদৈবদ্যক নামে অশ্চর্যকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জয়চূর্ণী (স্ত্রী) চূর্ণী মূর্তিবিশেষ। তত্ত্বসারে জয়চূর্ণার এইরূপ মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে—

“কালাত্রাজ্যং কটাকৈরিরিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেনুরেখাং

শঙ্খং চক্রং রূপাং ত্রিশিখমপি কটৈরুৎকৃষ্টীং ত্রিনেত্রাম্।

সিংহবক্ষাধিক্রুতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং

ধ্যায়েকচূর্ণাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিভূতাং সেবিতাং সিদ্ধকামৈঃ।”

[চূর্ণী দেখ।]

জয়দেব, এই নামে সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা অনেক করির সন্ধান পাই, তন্মধ্যে গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেবই সর্বপ্রধান ও সর্বত্র বিখ্যাত।

১ গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম রামাদেবী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দু-বিদ্ব (বর্তমান কেন্দুলি) গ্রামে এই সুবিখ্যাত বঙ্গীয় কবি জন্মগ্রহণ করেন। জয়দেবচরিত লেখকের মতে—ইনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জয়দেব তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষণ-সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র ত্রীধরদাসের স্তম্ভিকর্ণায়ুতে জয়দেবের বিমোহিনী কবিতামালা উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন পুথির শেষে লিখিত আছে—

“সমাপ্তক্ষেপং ত্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীনতমং শাস্ত্রং সম্পূর্ণম্। কৃতিঃ ত্রীভোজদেবায়াজ্য ত্রীরামাদেবীপুত্র ত্রীজয়দেব-পণ্ডিতরাজহেতি প্রেরঃ ॥ অথ লক্ষণসেন নাম নৃপতিসময়ে ত্রীজয়দেবস্ত কবিরাজপ্রতিষ্ঠা ॥”

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাকবি জয়দেব কিছু দিন গোড়াধিপ লক্ষণসেনের সভায় ছিলেন। দিল্লী মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ববর্তী রাজা মাণিক্যচন্দ্রে আদেশে রচিত অলঙ্কারশেখরে লিখিত আছে, জয়দে উৎকলরাজ্যের সভাকবি ছিলেন।

ভক্তিমাহাত্ম্য (সংস্কৃত) ও ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে জয়দেবের এইরূপ পরিচয় আছে—

অল্প বয়সেই জয়দেব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করেন। এখানে তিনি সর্বদাই পুরুষোত্তমসেবা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। জগন্নাথ ও তাঁহার ভক্তি-শুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেখানে কএক ব্যক্তি জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উৎকলাধিপতিও তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

একজন ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান না হওয়ার বহুকাল জগন্নাথের আরাধনা করিয়া একটি কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী। নিবাহযোগ্য হইলে ব্রাহ্মণ কন্যাকে জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিবার জন্ত আনিলেন, তদর্শনে পুরুষোত্তম প্রত্যাদেশ করিলেন, “জয়দেব নামে আমার এক সেবক সংসারধর্ম বিসর্জন দিয়া আমার নাম সার করিয়াছে, তুমি তাহাকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর।” তখন ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্ত অনেক অহুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়দেব আর

সংসারী হইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণের কথা অগ্রাহ্য করিলেন। ব্রাহ্মণ কতাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। জয়দেবও তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া কতাকে কহিলেন, “তুমি কোথায় বাইবে বল, সেইখানে তোমাকে রাখিয়া আসি, এখানে থাকা হইবে না।” পদ্মাবতী কাতরস্বরে বলিলেন, “পিতা জগন্নাথের আদেশে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়াছে, তুমি আমার স্বামী, হৃদয়-সর্বস্ব, তুমি যদি আমার ত্যাগ কর, আমি তোমার ছাড়িব না, কামনানোবাক্যে তোমার চরণসেবা করিব।”

পণ্ডিতকবি জয়দেব তখন কি করেন, পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, আবার সংসারী হইলেন। এক নারায়ণবিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবার তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল, সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অপূর্ণ পীুষ্পপূরিত গীতগোবিন্দ প্রচার করিলেন। কথিত আছে—জয়দেব গীতগোবিন্দে সকল রস ও সকল ভাবের অবতারণা করিলেন বটে, কিন্তু খণ্ডিতা মধুর রসের বর্ণনা করিতে পারিলেন না, যাঁহাকে তিনি জগৎপিতা পরমপুরুষ বলিয়া জানেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি রাধিকার পায়ে ধরিবে, এ কথা তিনি লিখিতে সাহসী হন নাই। দৈবক্রমে একদিন তিনি সমুদ্রস্নানে বাহির হইয়াছেন, এই সময়ে স্রগ জগন্নাথ জয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পুণি খুলিয়া “দেহি পদপল্লবমুদারং” কবিতাটি লিখিয়া দিলেন।

পদ্মাবতী এত শীঘ্র জয়দেবকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, “এই মাত্র তুমি স্নান করিতে গেলে, এর মধ্যে কিরিয়া আসিলে কেন?” জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করেন, “যাইতে যাইতে একটা কথা মনে পড়ে গেল, পাছে ভুলিয়া বাই, সেই জন্তই আসিয়া লিখিয়া গেলাম।” জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া যেমন চলিয়া গেলেন, তাহারই অনতিপরে জয়দেব স্নান করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। এবার পদ্মাবতীও অবাক হইয়া বলিলেন, “এই তুমি স্নান করিতে গিয়াছিলে, এসে এই কতক্ষণ লিখিয়া গেলে, আবার এত অল্প সময় মধ্যে কিরূপে আসিলে? এখন আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে, যে লিখিয়া গেল সেই বা কে, আর তুমিই বা কে?” বুদ্ধিমান জয়দেব তখন গিয়া আপনার পুণি খুলিয়া দেবাক্ষর দর্শন করিলেন। পুঙ্কে প্রেমাবেশে তাঁহার হৃদয় বহিয়া অশ্রু-বিগলিত হইতে লাগিল। পদ্মাবতীকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, “তুমিই ধন্ত, তোমারই জন্ম সার্থক, তোমার ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হইল, আমি হতভাগ্য, সেইজন্য তাঁহার দর্শন পাইলাম না।”

জয়দেবের গীতগোবিন্দের মহিমার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। তত্ত্ব ও ভাবুকমাজেই গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন এক মালিনী ক্ষেত্রে বসিয়া গীতগোবিন্দ গান করিতেছিল, জগন্নাথ তাহা শুনিতে বান, তাহাতে তাহার গারে ধূলা ও কাঁটা লাগে। উৎকলরাজ মন্দিরে গিয়া দেবের শ্রীঅঙ্গে ধূলা কাঁটা দেখিয়া ক্রুদ্ধে লাগিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন প্রত্যাদেশ হয় যে, অমুক স্থানে এক মালিনী গীতগোবিন্দ গান করিতেছে, তাহার গান শুনিতে গিয়া শ্রীঅঙ্গে এইরূপ কাঁটা লাগিয়াছে। উৎকলরাজ তখনই শিবিকা পাঠাইয়া সেই মালিনীকে আনাইয়া গীতগোবিন্দ গান করাইলেন। এখনও এই মালিনীর বংশীয় রমণীগণ জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকে।

গীতগোবিন্দের এত আদর দেখিয়া উৎকলরাজও এক-খানি গীতগোবিন্দ লিখিয়া জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। কিন্তু ভগবান পুরুষোত্তম জয়দেবের গীতগোবিন্দ-খানি রাখিয়া রাজার গীতগোবিন্দ ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে উৎকলরাজ অত্যন্ত মর্শ্বপীড়িত হইয়া সাগরে ঝাঁপ দিতে বান। তখন জগন্নাথদেব কৃপা করিয়া কহিলেন, “তুমি মরিও না, জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথমেই তোমার রচিত ১২টী শ্লোক থাকিবে।” রাজা তাহাতেই কৃতকৃতার্থ হইলেন। সেইদিন হইতে এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যহ জগন্নাথদেবের মন্দিরে গীতগোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে। কোনদিন গীতগোবিন্দ পাঠ না হইলে সে দিনের পূজা সিদ্ধ হয় না।

জয়দেবের উপর রাধামাধবের বড়ই যত্ন। তত্ত্বমালে লিখিত আছে, একদিন জয়দেব নিজ কুটীরের ছাঙ্গর ছাইতে ছিলেন, তখন বিষম রোদ্র, হরির তাহা দেখিয়া হুঃখ হইল। তিনি শীঘ্র কার্য শেষ হইবে ভাবিয়া গির ফুড়িয়া দিতে লাগিলেন। জয়দেব ভাবিলেন, বৃদ্ধি পদ্মাবতী গির ফুড়িয়া দিতে-ছেন। কিন্তু নামিয়া আসিয়া দেখেন, কেহ কোথায় নাই, রাধামাধবের হাতে কুল ময়লা লাগিয়াছে। বৃদ্ধিলেন, তত্ত্ববৎসল হরি ভক্তের জন্ত কষ্ট করিয়াছেন। জয়দেবের মনে বড়ই হুঃখ হইল। তিনি হরির শ্রীচরণে পড়িয়া কতই কাকুতি মিনতি করিলেন। এইরূপে শ্রীহরি জয়দেবরূপ ধরিয়া এক দিন পদ্মার হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। রাধামাধবের সেবা ও উৎসবের জন্ত অর্থ-প্রয়োজন হইল। কবিরাজ জয়দেব তজ্জন্ত দেশান্তর বাত্মা করিলেন। পথে ডাকাতেয়া ধরিয়া তাঁহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইল ও তাঁহার হাত পা কাটিয়া একটা কূপ মধ্যে ফেলিয়া গেল। সেই স্থান দিয়া একজন রাজা যুগয়া

করিতে যাইতেছিলেন, তিনি শুনিলেন, কে যেন কূপ মধ্য হইতে “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” করিতেছে। স্বয়ং শুনিয়া কূপের নিকট আসিয়া জয়দেবকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে কূপ হইতে তুলিয়া অতি সমাদরে শিবিকায় করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিলেন। এখানে জয়দেবের কথামত রাজা প্রত্যহ বৈষ্ণব-ভোজন করাইতে লাগিলেন। একদিন সেই ডাকাতেরা বৈষ্ণব সাজিয়া ছদ্মবেশে রাজভবনে উপস্থিত হইল। জয়দেব তাহাদিগকে দেখিয়াই তাহাদের গুপ্তব্যার জ্ঞাত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জয়দেবের আদর অভ্যর্থনায় ডাকাতদিগের আরও ভয় হইল। তাহারা ভাবিল, হয়ত এইরূপ আদর দিয়া শেষে সকলের প্রাণবধ করিবে। তাহারা পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু জয়দেবের অমুমতি ভিন্ন কেহ তাহাদিগকে ছাড়িল না। জয়দেব তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া বহু অর্থ ও সঙ্গে লোকজন দিয়া বিদায় করিলেন। কিছু দূরে গিয়া তাহারা রাজকর্মচারীদিগকে চলিয়া আসিতে বলিল, আরও কহিল—“আমরা এক রাজার বাড়ী চাকর ছিলাম, সেই রাজা ঐ বাবাজীকে মারিতে আদেশ করেন, আমরা বাবাজীর হাত পা কাটিয়া ছাড়িয়া দিই। এখানে আসিয়া ডগ মহাস্ত হইয়াছে, কিন্তু পাছে তাহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই জন্ত সে অর্থ দিয়া আমাদের বিদায় করিল।” এই কথা বলিতে না বলিতে দুবৃত্ত ডাকাতগণ তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। ভূত্যগণ আসিয়া এই অপূর্ব ঘটনা রাজার নিকট জানাইল। তখন জয়দেব ডাকাতদিগের ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিয়া রাজার সন্মুখে ভজ্ঞন করিলেন। শেষে বলিলেন, “পরহিংসা করা কর্তব্য নহে। দুষ্ট লোককেও দয়া করা উচিত। সেই জন্তই দুষ্টদিগের কোন অনিষ্টচরণ না করিয়া অর্থ দিয়া তাহাদিগকে সন্মানিত করিয়াছি।”

এদিকে রাজপক্ষীর সহিত পদ্মাবতীর বেশ প্রণয় জন্মিয়াছিল। এক দিন রাণী তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতৃপক্ষীর সহগমনের কথা শুনিয়া রোদন করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া পদ্মাবতী বলেন যে ‘পতির মৃত্যুতে পতিপ্রাণা রমণীর প্রাণ থাকে না।’ সে কথা রাণীর মনে আগিয়া থাকিল। তিনি একদিন পদ্মাবতীকে পরীক্ষা করিবার জন্ত জয়দেবের মৃত্যুর কথা রটাইলেন। পতিপ্রাণা পদ্মাবতী সে দুঃসহ সংবাদ শুনিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন সাধক জয়দেব আসিয়া তাঁহার কাণে কৃষ্ণনাম দিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। এবার জয়দেবের বৃন্দাবনদর্শনে ইচ্ছা হইল। তিনি নিজ ইষ্টদেব রাধামাধবকে কুলিতে করিয়া লইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া কেশীঘাটে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন,

কোন মহাজন রাধামাধবের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জন্ত এই কেশীঘাটে একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জয়দেবের অগ্রকট হইবার পর জয়পুররাজ সেই মূর্তি লইয়া গিয়া জয়পুরে ঘাটি নামক স্থানে স্থাপন করেন।

জয়দেব জীবনের শেষাবস্থার জন্মভূমি কেন্দুলী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কেন্দুলী হইতে গঙ্গা ১৮ ক্রোশ। প্রবাদ আছে, প্রতিদিন জয়দেব সেই ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গান্নান করিতেন। একদিন ঘটনাক্রমে তিনি গঙ্গান্নানে যাইতে না পারায় তাঁহার মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। কিন্তু গঙ্গাদেবী ভক্তের ক্ষোভ দূর করিবার জন্ত কলনাদে প্রবাহিত হইয়া কেন্দুলীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। এই গ্রামেই জয়দেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখনও তাঁহার স্মরণার্থ এখানে প্রতিবর্ষে মাঘ-সংক্রান্তিতে একটা মেলা হয়, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশহাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভাবুক ভক্তের এক অপার্থিব জিনিষ। হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভারতীয় নানা ভাষায়, এতদ্ভিন্ন অনেক বিদেশীয় ভাষায়ও গীতগোবিন্দের অমুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। [গীতগোবিন্দ দেখ।] উদয়নাচার্য্য, কমলাকর, কৃষ্ণকর্ণ মহেন্দ্র, কৃষ্ণদত্ত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, চৈতন্যদাস, নারায়ণভট্ট, নারায়ণদাস, পীতাম্বর, ভগবদাস, ভাবাচার্য্য, মানাক, রামতারণ, রামদত্ত, রূপদেব পণ্ডিত, লক্ষ্মণভট্ট, লক্ষ্মণসুর, বনমালিভট্ট, বিট্ঠল দীক্ষিত, বিবেকধর ভট্ট, শঙ্করমিশ্র, শ্রীহর্ষ, হৃদয়ভরণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-গীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অনির্দিষ্ট গ্রন্থকার-রচিত বালবোধিনী, বচনমালািকা প্রভৃতি নাম কয়েকখানি টীকা পাওয়া যায়।

২ একজন প্রসিদ্ধ কবি, ইহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম স্নমিত্রা, ইনি প্রসন্নরাঘব ও চন্দ্রালোক রচনা করেন।

৩ একজন কবি, ইনি ত্রিপুরীসুন্দরীস্তোত্র প্রণয়ন করেন।

৪ একজন নৈয়ায়িক, নৃসিংহের পুত্র। ইনি শ্রায়মঞ্জরীসার প্রণয়ন করেন।

৫ একজন শাস্ত্রবিদ বৈষ্ণব। ইনি রসামৃত নামে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

৬ মিথিলাবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক, ইহার উপাধি পঞ্চধর, ইনি হরমিশ্রের শিষ্য ও ভ্রাতৃপুত্র। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক। ইনি তত্ত্বচিন্তা-মণ্যলোক বা চিন্তামণিপ্রকাশ, জ্ঞানপদার্থমালা ও জ্ঞান-লীলাবতীবিবেক নামে বিখ্যাত জ্ঞানগ্রন্থ এবং ভ্রব্যপদার্থ নামে

বৈশেষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই কবরখানি গ্রন্থের মধ্যে ভাষাভাষ্যলোকে নামক গ্রন্থই অতি বৃহৎ এবং নৈসর্গিক মাঝেই অতি সমাদর করিয়া থাকেন। [কুমারখণ্ডিয়ারোমি দেখ।]

৭ একজন ছন্দঃশাস্ত্রকার।

৮ পদাটপদী নামে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের।

৯ ইন্দ্রতরু নামে একখানি ব্যাকরণগ্রন্থের।

১০ অলঙ্কারশতক-রচয়িতা।

১১ একজন মৈথিল কবি, কবি বিভাগতির সমসাময়িক। ইনি মুর্শাওনা-রাজ নিবাসিদের সত্যর অবস্থান করিতেন।

জয়দেব, এই নামে নেপালের ছইজন রাজার নাম পাওয়া যায়। একজন অতি প্রাচীন, তিনি কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ২য় জয়দেবের সময়কার উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে লিখিত আছে—মহারাজ শিবদেব মোঘরিরাজ ভোগবন্দার কজা এবং মগধরাজ আদিভ্যাসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবীর পানিগ্রহণ করেন এই বৎসদেবীর গর্ভে (২য়) জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন, ইহার অপর নাম পরচক্রকার। ইনি গোড়, গুড়, কলিজ ও কোশলাধিপতি জীর্ঘদেবের কজা ও ভগ্নদত্তবংশীয় রাজদৌহিত্রী রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন (১)। এই জয়দেব রাজকুমার হইলেও লুকাই ছিলেন। তিনি উক্ত শিলালিপিতে পাঁচটি শ্লোক নিজে রচনা করেন। এই ২য় জয়দেবের আবির্ভাব-কাল ও বংশনির্ণয় সম্বন্ধে এখানকার প্রধান প্রধান পুরাবিদগণ অভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি কোন হর্ষদেবের আমাত্য তাহা কেহ এখন স্থির করিতে পারেন নাই। বর্তমান প্রধান ঐক্যতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বৃহল (Bühler) লিখিয়াছেন—উক্ত ভগ্নদত্ত ও জীর্ঘদেব সম্ভবতঃ

প্রাগজ্যোতিষ-রাজবংশীয়, যে বংশে হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কুমাররাজও জন্মগ্রহণ করেন (২)।

তৎপরে ঐক্যতত্ত্ববিৎ ফ্রিট্‌ সাহেব অনেক বিচারের পর প্রকাশ করেন যে, ‘জয়দেব (২য়) ঠাকুরীবংশীয় রাজা, ইনি ১৫৩ হর্ষ সম্বতে অর্থাৎ ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন (৩)।’ ডাক্তার হোন্সলি সাহেবও ফ্রিট্‌ের মত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতএব উপরোক্ত ঐক্যতত্ত্ববিৎগণের মত স্বীকার করিলে বলিতে হয়, জয়দেবের পুত্র জীর্ঘদেব সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন হইতে স্বতন্ত্র, ঐ হর্ষদেব ও জয়দেবের দ্বারাকৃত উভয়েই প্রাগজ্যোতিষরাজবংশীয় ছিলেন এবং নেপালরাজ জয়দেব সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের ১৫৩ বর্ষ পরে রাজত্ব করিতেন।

আমরা ইতিপূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি। [গুপ্তরাজবংশ পৃষ্ঠ ৪৩৩ পৃঃ দেখ।] ২য় জয়দেব লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন। লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণের শিলালিপিতে শব্দ সম্বৎ ও গুপ্ত-সম্বতের অঙ্ক আছে। ডাক্তার বৃহলর প্রকৃতির মতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনই নেপাল জয় করিয়া তথায় নিজ সম্বৎ প্রচার করেন। কিন্তু আমরা এমন কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাই না, যদ্বারা ঐ মত অস্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অলুবিহনী ছইটি হর্ষসম্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। একটী ৪৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং অপরটী ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ। তাহার মতে শিলালিপিত হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যে গোলাবোণ খটে, সেই সময়েই কাম্বীরের হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হয় *। কিন্তু চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিংএর জীবনীতে লিখিত আছে যে শিলালিপিত হর্ষবর্দ্ধন ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাহার মৃত্যু হইতে হর্ষসম্বৎ আরম্ভের কথা একান্ত অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ ৪৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে যে হর্ষসম্বতের উল্লেখ আছে, তাহার আর কোন প্রমাণ নাই।

কাম্বীর ব্যতীত আর কোন স্থানে যে কখন হর্ষসম্বৎ প্রচলিত ছিল, এ পর্যন্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা কোন প্রাচীন শিলালিপিতে তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাণতট ও হিউএন্-সিং হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎকর্তৃক সম্বৎ প্রচলনের কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। এক্ষণে

(১) “ভাষ্যঃ জীর্ঘদেব ইত্যভিধ্বজ্যে লোকস্য ভর্তা কুবঃ।

দেবী বাহুবল্যভ্যামৌষিকুল জিবর্ষভূম্যপি-

ব্যতিহ্রুপিভবৈরিকুপতিগণজীভোগবর্ষান্তব্য।

দৌহিত্রী মগধবিগত সম্বতঃ প্র্যাবিত্যাসেনন্ত বা

বৃষ্ণা জীব তেন সা কিত্তিল্লা জীবৎসদেব্যাবরাৎ।

ভৃগ্নাত্মবিভূজোপাভারত জিতারাতেরজবাঃ পটৈ

রাজজীজয়দেব ইত্যবগতঃ জীবৎসদেব্যাবরাজঃ।...

মহাশক্তিহর্ষদত্তবংশলক্ষ্মীরিকুতুম্বজিহো-

গৌড়োত্তরিকলিকোসলপতিজীর্ঘদেববংশজা।

দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতভবৈবৃদ্ধা প্রকৃতভুলৈ

গৌড়োত্তরিকলিকোসলপতিজীর্ঘদেববংশজা।”

গুপ্তপতিবিশিষ্ট উৎকীর্ণ শিলালিপি ১০ ও ১৫ পৃষ্ঠ।

(২) “Bhagadatta and Brharshaddeva probably belong to the dynasty of Prāg-jyotisha, to which Harshavardhana's contemporary Kumararaja also belonged.” Note 57 by Dr. Bühler in Twenty-three Inscriptions from Nepal, p. 53.

(৩) Fleet's Corp. Inscriptionum Indicarum, p. 189.

* Journal Roy. As. Soc. vol. XII, p. 44. (O.S.)

হর্ষবর্দ্ধনের সহিত হর্ষ-সংবতের কোন সংশয় আছে কি না, তাহা এখন সন্দেহহীন। এরূপ হলে জয়দেব প্রকৃতির শিলালিপিতে উৎকীর্ণ সন্তের অঙ্ক নিঃসন্দেহে হর্ষসংবৎ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। [হর্ষ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] নেপালের পার্বত্য-বংশাবলীতে লিখিত আছে, ঠাকুরী-বংশীয় প্রথম রাজা অংশুবর্মার স্বত্বের সময়ে বিক্রমাদিত্য নেপালে আগমন করেন এবং এখানে সৎ প্রচলন করিয়া বান (৪)।

গুপ্তসম্রাটগণের সময়েই নেপালে প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবি-রাজগণ রাজত্ব করিতেন। গুপ্তসংবৎ-প্রবর্তক মহারাজাধিরাজ ১ম চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) লিচ্ছবিরাজকর্তা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। যেমন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ আদিত্য-বর্দ্ধন মহাসেনগুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তার পাণিগ্রহণ করেন (৫)। যেমন মৌর্যরাজ আদিত্যবর্মার হর্ষগুপ্তের ভগিনী হর্ষগুপ্তাকে বিবাহ করেন। সেইরূপ মহারাজা-ধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র বিক্রমাদিত্য-উপাধিধারী ২য় চন্দ্রগুপ্ত নেপালের লিচ্ছবিরাজ ঋষদেবের ভগিনী ঋষদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ঋষদেব ও ঠাকুরী-বংশীয় মহাসামন্ত অংশুবর্মা উভয়েই এক সময়ের লোক। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত ৪৮ সংখ্যাপক শিলালিপিতে মহারাজাধিরাজ ঋষদেবের রাজত্বকালে মহারাজ অংশুবর্মা কর্তৃক 'তিলমক' নির্মাণের প্রসঙ্গ আছে। ডাক্তার বুল্গার প্রকৃতি বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একবাক্যে ঐ ৪৮ অঙ্ক হর্ষসংখ্যাপক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বেই আমরা লিখিয়াছি যে, নেপালে যে কোন কালে হর্ষসং প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। পূর্বেই লিখিয়াছি, পার্বত্য বংশাবলীর মতে রাজা অংশুবর্মার কিছু পূর্বে নেপালে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক গুপ্তসং প্রচলিত হয়। এরূপ হলে নেপালরাজ ঋষদেবের ভগিনী ঋষদেবীর সহিত ২য় চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হইবার পূর্বে এবং সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী গুপ্ত-সং-প্রবর্তক ১ম চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবি-রাজকর্তা কুমারদেবীর বিবাহকালে সমাগত ১ম চন্দ্রগুপ্তকর্তৃক নেপালে গুপ্তসং প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এরূপ হলে অংশুবর্মা ও ঋষদেবের শিলালিপির অঙ্ক যে গুপ্তসং-জাপক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

এরূপ হলে ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ২২২

অঙ্ক গুপ্ত-সং জাপক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। [গুপ্ত রাজবংশ শব্দ দেখ।] তাহা হইলে (২২২ x ৩৩২ =) ৩৮৮১২ খৃষ্টাব্দে লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেবকে আমরা নেপালের সিংহাসনে সমাসীন দেখি। এ সময়ে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাণভট্ট ও চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ংএর বর্ণনায় জানা যায়, সম্রাট হর্ষদেব সমস্ত উত্তর ভারত এবং গৌড়, ওড়্র কলিঙ্গাদি অনেক স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এরূপ হলে ২য় জয়দেবের স্বত্ব গৌড়-ওড়্র-কলিঙ্গ-কোশলাধিপ শ্রীহর্ষদেব ও শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন উভয়ে যে অতিরিক্ত ভাষাতে সন্দেহ নাই।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ ব্রিট সাহেব লিখিয়াছেন, 'হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনোজরাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে মগধরাজ আদিত্যসেন মহারাজাধিরাজ অর্থাৎ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। শাহপুর শিলালিপি মতে তিনি ৬৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে বিত্তমান ছিলেন (৬)।' সুতরাং আদিত্যসেনের দৌহিত্রীয় পুত্র ২য় জয়দেব ৬১৮ খৃষ্টাব্দে বিত্তমান থাকা একান্ত অসম্ভব।

কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করিয়াছি, "শাহপুরের স্মৃতিপ্রতিমায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ৬৬৬ সন্তে রাজা আদিত্যসেনের কথা বিবৃত আছে।" [গুপ্তরাজবংশ ৪৩১ পৃষ্ঠা দেখ।] এরূপ হলে ৬০২ খৃষ্টাব্দে আদিত্যসেনকে মগধের সিংহাসনে দেখিতে পাই। ঐ সময়েও শ্রীহর্ষদেব আধিপত্য করিতেছিলেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত হর্ষদেবের সহচর ছিলেন এবং সম্পর্কেও আদিত্য-সেন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের একপ্রকার ভ্রাতা হইতেছেন। অতএব আদিত্যসেন ও হর্ষদেব উভয়ে যে সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, যখন মাধবগুপ্ত হর্ষের বন্ধু ছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র আদিত্যসেন হর্ষদেব অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন ৬০২ খৃষ্টাব্দে আদিত্যসেন রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও ৬১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দৌহিত্রী-পুত্রের রাজ্যগ্রহণ একান্ত অসম্ভব।

উত্তর। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ংএর জীবনীতে লিখিত আছে—(৬৪০ খৃষ্টাব্দে †) তিনি বঙ্গভারতের সিংহ

(৪) Inscriptions from Nepal, p. 38.

(৫) Epigraphia Indica, vol. I. p. 68.

(৬) Fleet's Inscriptionum Indicarum, vol. III. p. 14.

† Cunningham's Ancient Geography of India, p. 566.

তথাকার রাজা ঞ্বেভট্টকে দেখিয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্জনের পৌত্রীর সহিত এই বলভীরাজ ঞ্বেভট্টের বিবাহ হয়। ইনি (৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) প্রেরাগের ধর্মসভার শ্রীহর্ষদেবের নিকট উপস্থিত ছিলেন (৭)।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে শ্রীহর্ষদেবের বিবাহের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু তৎকর্তৃক দিখিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। একপস্থলে বোধ হয়, তিনি সম্রাট হইবার পর বিবাহ করেন, স্বইচ্ছায় প্রথমে বিবাহ করেন নাই।

সুতরাং তিনি যে বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি রাজপদ পাইলেও ঐ সময়েই বোধ হয় তিনি সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন এবং দারপরিগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বর্ষে তাঁহার কন্যা রাজ্যমতী জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যমতীর ১০ম বর্ষে (সম্ভবতঃ ৬১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সমবয়স্ক লিচ্ছবিরাজ কুমার ২য় জয়দেবের সহিত বিবাহ হয়।

শ্রীহর্ষচরিতে বাণভট্ট ও হর্ষের পরিচয় পাঠ করিলে হর্ষকে অল্প বয়স্ক যুবক বলিয়া বোধ হয় না। বাণভট্ট অনেক দিন হর্ষের সভায় ছিলেন, সম্ভবতঃ বাণভট্টের মৃত্যুর পর প্রৌঢ়বস্থায় হর্ষের বিবাহ হইয়া থাকিবে। একপস্থলে ৪০।৪১ বর্ষ বয়সের সময় (৬০৬।৭ খৃষ্টাব্দে) হর্ষদেব বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে প্রায় ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেব জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, মাধবগুপ্ত হর্ষদেবের সহচর হইলেও তৎপুত্র আদিত্যসেন সম্পর্কে হর্ষদেবের ভ্রাতা, একপস্থলে আদিত্যসেন হর্ষ অপেক্ষা ৭।৮ বর্ষের ছোট ছিলেন, একপস্থলে ধরিয়া লওয়া যায়। একপস্থলে প্রায় ৫৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে আদিত্যসেনের জন্ম হইয়া থাকিবে। বোধ হয় আদিত্যসেনের ও তাহার কন্যাবংশীর অল্পবয়সে পুত্র সন্তান হইয়াছিল।

যেমন শ্রীহর্ষ ৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই অর্থাৎ ২৭।২৮ বর্ষের মধ্যেই পুত্র, পৌত্রী ও নাতি জামাইএর মুখ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ আদিত্যসেনেরও (৫৭০ হইতে ৬১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে) ৪৮।৪৯ বর্ষ মধ্যে কন্যা, দৌহিত্রী ও দৌহিত্রীর পুত্র হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

মহারাজ আদিত্যসেনের শিলালিপিতে মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিয়াই ক্রিষ্টসাহেব তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু কেবল মহারাজাধিরাজ নাম দেখিয়াই এক জনকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রাঢ় ও বরেন্দ্রে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও যেমন বঙ্গাধিপ লক্ষণসেনের পুত্র বিষ্ণুরূপ দেব, ক্ষুদ্ররাজ্যের অধীশ্বর হইলেও

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন (৮), সেইরূপ আদিত্যসেনও কেবল মগধের রাজা ছিলেন, সম্রাট হন নাই। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

বৃহল্লর সাহেব নেপালরাজ ২য় জয়দেবের ঋণুর ও দাদা ঋণুর উভয়কেই প্রাগজ্যোতিষ-বংশীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ঋণুর এবং শাণ্ডীীর পিতা কখন একবংশীয় হইতে পারে না। সম্ভবতঃ মহাবীর হর্ষদেব কামরূপপতি ভগদত্ত-বংশীয় কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মার কন্যা অথবা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই রমণীয় গর্ভেই ২য় জয়দেবের পত্নী রাজ্যমতী জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্মই শিলালিপিতে রাজ্যমতী “ভগদত্তরাজকুলজা” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

২য় জয়দেবের শিলাফলকে লিখিত আছে—তাঁহার মাতা বৎসদেবী মৃতস্বামীর উদ্দেশ্যে পশুপতির উদ্দেশ্যে একটা রক্ততপস্বী উৎসর্গ করেন। বোধ হয় এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইবার অনতিপূর্বে জয়দেবের পিতা শিবদেবের মৃত্যু হয়। বিবাহ হইলেও তখন জয়দেব বালক।

জয়দেবপুর, ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাবালরাজ্যের রাজধানী। [ভাবাল দেখ।]

জয়জ্বল (পুং) বিরাটভবনে ছদ্মবেশী সহদেব।

জয়দ্রথ (পুং) জয়ং রথো যশ্চ বহতী। ১ সিদ্ধসৌবীর দেশের একজন রাজা। বৃদ্ধকজের পুত্র। হর্ষোদধনের ভগিনীপতি ও হুঃশলার স্বামী। ইনি এক সময়ে কাম্যকবনের মধ্য দিয়া শাবদেশে যাইতেছিলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণও ঐ বনে ছিলেন। দ্রৌপদীকে একাকী বন মধ্যে দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্ত জয়দ্রথের ইচ্ছা হইল। তিনি পারিষদ কোটীকাত্তকে দূতরূপে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কোটীকাত্ত দ্রৌপদীকে আদিত্য বলিলেন, ‘আমি সুরথরাজার পুত্র, আমার নাম কোটীকাত্ত। সিদ্ধদেবশাধিপতি রাজা জয়দ্রথ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, আপনি কে? কাহার হুহিতা এবং কাহারই বা ভার্যা, তাহা জানিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।’ দ্রৌপদী আপনার পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভীম ও অর্জুনের হস্তে তিনি বিশেষরূপে অবমানিত হইলেন। উভয় ভ্রাতার জয়দ্রথের মাথা মুড়াইয়া দেন। জয়দ্রথ সেই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে গজাবারে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া শব্বরের তপস্বী করিতে লাগিলেন, “মহাদেব তপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ

(৭) Lu Vie de Hiouen-Tsang par Stanislas Julien, p.264.

(৮) See—The Sena kings of Bengal, by N. Basu.

করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন “ভগবন্। আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করি।” মহাদেব বলিলেন, “না, তুমি অর্জুন ব্যতীত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সর্বদা রক্ষা করেন, এই অস্ত্র অর্জুন দেব-গণেরও অজেয়। অতএব আমি বর প্রদান করিতেছি, একদিন তুমি অর্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডব চতুষ্ঠয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।” তদনুসারে যে দিন দ্রোণাচার্য্য চক্রবাহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেইদিন ব্যূহঘার রক্ষক হইয়া তিনি পাণ্ডব চতুষ্ঠয়কে সমরে জয় করেন। সেই চক্রবাহ মধ্যে অসহায় প্রবিষ্ট অভিমহ্য নিহত হন। এই অস্ত্র অর্জুন জয়দ্রথকে অভিমহ্যর মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। জয়দ্রথের পিতা পুত্রকে বর দিয়াছিলেন যে কেহ ইহার মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিবে, তখনই তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। অর্জুন কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া ইহার মস্তক শরীর হইতে বিমুক্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র-সন্নিহিত সমস্তপঞ্চকস্থ তপপরায়ণ বৃদ্ধকর্ত্তের অঙ্কে স্থাপন করেন। বৃদ্ধকর্ত্ত তপশ্রাস্তে উঠিবামাত্র মস্তক তাহা কর্ত্তক ভূপতিত হয়। সুতরাং তাহারই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। (ভারত বন ও দ্রোণ) ইহার পুত্রের নাম সুরথ।

২ একজন কাশ্মীর দেশীয় বিখ্যাত কবি, ইহার গুরুর নাম সুভটদত্ত, শিব ও সঙ্গধর। ইহার পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপণ্ডিত ও কাশ্মীররাজ যশস্বর, অনন্ত, উচ্ছল প্রভৃতির সচিব ছিলেন। ইহার পিতার নাম শৃঙ্গারথ, তিনিও রাজরাজের সচিব ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জয়রথকৃত তত্ত্বালোক-বিবেকগ্রন্থে ইহাদের পূর্বপুরুষগণের পরিচয় বর্ণিত আছে। জয়দ্রথের মহামাহেশ্বর ও রাজানক উপাধি ছিল। ইনি হরশিবচিন্তামণি, অলঙ্কারবিমর্শিনী ও অলঙ্কারোদাহরণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

৩ বামকেশ্বরতন্ত্রবিবরণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৪ এক থানি যামলের নাম।

জয়ধর্ম্মন (পুং) একজন কুরুসেনাপতি। (ভারত ৭।১৫৬)

জয়ধ্বজ (পুং) কার্ত্তবীর্য্যার্কজনের পুত্র, অবন্তীর এক রাজা।

ইহার পুত্রের নাম তালজয়। (লিঙ্গপু ৬৮।১২)

জয়ন (ক্লী) জীয়েতে হনেন করণে-লুট্। ১ অখাদির সজ্জা।

ভাবে লুট্। ২ জয়।

জয়নগর, ১ মানভূম জেলার একটি পরগণা। পরিমাণ প্রায় ৩০.৩৯ বর্গ মাইল।

২ মগধপতি ইন্দ্রজয়ের দুর্গ। প্রবাদ আছে, তিনি মুসলমানদলপতি মখদুম মোলাগাহুর কর্ত্তক পরাজিত হইয়া

এই দুর্গে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। অল্পমান হর, জয়নগর এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

৩ বঙ্গদেশে ঝারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৬° ৩৪' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ১১' পূঃ। নেপাল-সীমান্তে কয়েক মাইল দক্ষিণে কমলা নদীর কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত। এখানে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ আছে। বাঙ্গালার সুবাদার আলাউদ্দীন ১৫৭৩ খৃঃ অঙ্কে পার্শ্বাভ্যাস-দিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত দুর্গটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নেপালযুদ্ধের সময়ে ইংরাজগণ এই দুর্গের নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে নীল ও চিনির দুইটা কুঠি ছিল; এখন তাহা বন্ধ হইয়া আছে। নরায় হইতে ঝারভাঙ্গা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্বারা জয়নগর হইতে জেলার সর্বত্র যাতায়াতের বিলম্ব নাই হইয়াছে। জয়নগরের নিকটে শিলানথ নামক গ্রামে বৎসর বৎসর একটি মেলা হয়।

৪ বঙ্গদেশে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২২° ১০' ৫৫" উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৭' ৪০" পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি, পুলিশ, থানা এবং একটি ইংরাজীস্কুল আছে। পূর্বে এই স্থানের নিম্ন দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। এখন গঙ্গা অপসৃত হওয়ায় তথায় কতকগুলি ঝিল হইয়াছে। একটি ঝিলের তটে কতিপয় দেবমন্দির আছে। জয়নগরে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তক নির্ম্মিত একটি দেবমন্দির আছে, কিন্তু তাহাতে কোনও বিগ্রহ নাই। এখান হইতে খদিরপুর পর্য্যন্ত একটি খাল আছে, তদ্বারা কলিকাতায় যাতায়াত চলে।

জয়নন্দী, হস্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

জয়নরেন্দ্রসিংহ, পাটয়ালায় একজন মহারাজ। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা করমসিংহের মৃত্যু হইল ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিশু-যুদ্ধকালে ইনি ব্রীটিশগবর্নমেন্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত ব্রীটিশগবর্নমেন্ট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটি জায়গীর প্রদান করেন। তিনি আপনার রাজ্য মধ্যে অপর সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের মাসুল উঠাইয়া দেওয়ায় ব্রীটিশগবর্নমেন্ট পর বর্ষে লাহোররাজের অধীন কতকগুলি সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া রাজা নরেন্দ্রসিংহকে প্রদান করেন। শিপাহীযুদ্ধের সময়ও ইনি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত ইনি দুই লক্ষ টাকা আয়ের স্বত্ব রাজ্য ও পুরুষাচ্যুত্রে মস্তকগ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ইনি G. C. S. I. উপাধি লাভ করেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নবেম্বর বাদশ বর্ষীয় পুত্র মহেন্দ্রসিংহকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জয়নাথ, তমসানবী-প্রবাহিত প্রদেশের একজন মহারাজ। উচ্চকরে ইহাদের রাজধানী ছিল, এই জন্ত ইহারা উচ্চকরের রাজা বলিয়া খ্যাত। ইনি ব্যাভ মহারাজের ঔরসে ও অস্থিত দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৭৪ হইতে ১৭৭ (৩৩) কিস্বা কলচুরি) সম্বতে রাজত্ব করিতেন। ইহার পুত্রের নাম মহারাজ সর্বনাথ।

জয়নারায়ণ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার পিতার নাম রুকচন্দ্র। ইনি শঙ্করসঙ্গীত রচনা করেন।

২ সপ্তশতী চণ্ডীর একজন টীকাকার।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ামিক পণ্ডিত, কলিকাতার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্র বিজ্ঞানাগর একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। জয়নারায়ণ পঞ্চম বৎসর বয়স্ককালে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবৃত্ত হন, অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতৃসম্মিধানে মুদ্রাবোধ ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিয়া অসামান্য বুদ্ধিবলে চতুর্দশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে ভবানীপুরনিবাসী রাম-তোষণ বিজ্ঞানস্বামীর নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র এবং শালিখা-নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট গ্রন্থশাস্ত্র পাঠ করিয়া উভয় শাস্ত্রে অতিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কখনও আলস্তে কাল-যাপন করিতেন না। অধ্যাপকের নিকট হইতে অবসর পাইলেই স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। কখনও কখনও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বাইরা বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে অধ্যাপকের সহিত নানাস্থানে পণ্ডিতসভার নিমন্ত্রণে যাইয়া বিচারে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিতেন, এ জন্ত অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। তাঁহার ছাত্রবর্গ বৎসর বয়স্ককালে তাঁহার অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যু হইল। সকলের অনুরোধে তিনি শালিখার চতুস্পাঠী স্থাপন করিলেন। নানাস্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী সমাগত হইয়া তাঁহার নিকটে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এই সময়ে আর্থিক অনাটন জন্ত ছাত্রদিগের গ্রাসাদানদের নিমিত্ত তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা তাঁহার ছাত্রবর্গের বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন। এইরূপ অধ্যাপনা করিতে করিতে তর্কপঞ্চানন মহাশয় এক সময়ে “ল

কমিটার” পরীক্ষা দিয়া জজ পণ্ডিত হইবার প্রাশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু অধ্যাপনা কার্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি সেই কার্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

একদিন সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অধিতীর পণ্ডিত নিমটান শিরোমণির সহিত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের লিখিত বিচার হয়, বিচারে সাতিশর লড়াই হইয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে স্বীয় স্থান অধিকার করিবার বোধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। নিমটানের মৃত্যুর পরে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হইল। তিনি মাসিক ৮০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি চতুস্পাঠীর অধ্যাপনাকার্য্য ত্যাগ করিলেন না। সিমুলিয়াতে চতুস্পাঠী স্থাপনপূর্বক কলেজের কার্য্য করিয়া অবসর সময়ে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ছাত্রদিগকে বিভ্রাদান করিতেন। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অধিক হওয়াতে তিনি নারিকেলডাঙ্গায় একটা প্রশস্ত বাটী ক্রয় করিয়া, তথায় চতুস্পাঠী খুলিলেন। তাঁহার কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, তারানন্দ তর্করত্ন, দীনবন্ধু গ্রন্থরত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং চতুস্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মহেন্দ্রচন্দ্র গ্রন্থরত্ন, শ্রীমদ্রত্ন তর্কবাগীশ, হরচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ও তারানন্দ তর্করত্ন প্রভৃতি সর্বত্র যশস্বী হইয়াছেন।”

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে তিনি পেনসন লইয়া বারাণসীতে গিয়া বাস করেন। সেখানেও তিনি নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দণ্ডী, পরমহংস, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহামুণ্ডগণও তাঁহার নিকটে বোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিতেন। তাঁহার অধ্যাপনানৈপুণ্যে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১২৮০ সালে কাশীতে পরলোক গমন করেন।

সর্বদাই অধ্যাপনা কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিতেন বলিয়া, তিনি অধিক গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। কণাদমুদ্র-বিবৃত নামক একখানি বৈশেষিক গ্রন্থের টীকা, পদার্থতত্ত্বসার নামক একখানি জ্ঞানগ্রন্থ, তারকেশ্বরশতক ও চারুণ্ডশতক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত পদ্মগ্রন্থ, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বোম্বের আদেশে নীরাঙ্গমগ্রকাশ, এবং বঙ্গভাষায় লিখিত সর্বদর্শনসংগ্রহ নামক পুস্তক রচনা করেন। এই সমুদয় পুস্তকে তাঁহার বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীবাসকালে তিনি একখানি জ্ঞানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কাশীরাজকে উপহার দিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ লীক্ষিত, তর্কমঞ্জরী নামে জ্ঞানগ্রন্থ-রচয়িতা।

জয়ন্তী (জী) জয়ন্তী জীবিতী। ইত্যক্কা।

জয়ন্ত (পুং) জয়ন্তীতি বি-অচ্ (ভূত্বহিবনীতি। উণ্ ৩।১২৮)

১ ইন্দ্রপুত্র, পাকশাসনি, ঐন্দ্রি। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪২।১) অতিশয়েনারীন্ জয়তে জয়হেতুরিতি জয়ন্তঃ। ৩ শিব। (মৎস পুং ৫।৩০) ৪ চন্দ্র। (ত্রিকা) ৫ বিরাটগৃহে ছয়বেশী ভীম। [জয় দেখ।] ৬ মরুভূমী গর্ভজাত ধর্মের এক পুত্র, ইনি উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত। (ভাগবত ৩।৬।৮) ৭ রাজা লশরথের একজন মন্ত্রী। (রামায়ণ ১।৩২-৩) ৮ পর্শুৰাম। (হরিবংশ ১৩০।১৪) ৯ বাত্রিক যোগবিশেষ, বাহার রাশি অপেক্ষা চন্দ্র উচ্চ হইয়া একাদশ স্থানে অবস্থান করেন, তাহার এই জয়ন্ত যোগ হয় *। এই যোগে শত্রু-পক্ষ নাশ করে। ১০ তালবিশেষ, ইহা ঋক জাতীয়।

“আদিতালে জয়ন্তঃ স্থাৎ শ্রাব্যরসসংযুতঃ।

কল্পসংখ্যাক্রমপদ আয়ুর্জ্যিকরঃ পরঃ ॥” (সঙ্গীত নামো)

[জয়ন্তিকা দেখ।]

জয়ন্ত, ১ জয়ন্তী বা-দীপিকা নামে কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার। ইহার পিতার নাম ভারদ্বাজ, তিনি গুজরাটের বাবেলরাজ সারঙ্গদেবের মন্ত্রী-পুরোহিত ছিলেন। সারঙ্গদেবও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিভ্রম করিতেন। ১৩৫০ সন্বতে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণা তৃতীয়ায় কাব্যপ্রকাশদীপিকা রচিত হয়।

২ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, ইনি জ্ঞানকালিকা ও জ্ঞান-মঞ্জরী রচনা করেন। কাশ্মীরে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত।

৩ সারস্বতব্যাকরণের “বাদিঘটমুদগর” নামে টীকা-রচয়িতা।

৪ প্রকাশপুরীর মধুসূদনের পুত্র। ইনি তব্ধচন্দ্র নামে প্রক্রিয়াকৌমুদীর টীকা প্রণয়ন করেন।

৫ পদ্মাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।

৬ জয়ন্তস্বামী নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম কান্ত, পিতামহের নাম কল্যাণস্বামী, এবং পুত্রের নাম অভিনন্দ। ইনি বিমলোদয়মালা নামে আখ্যায়নগৃহসংক্রান্ত, আখ্যায়নকারিকা ও ঋগ্বেদের স্বরনির্ণয় সম্বন্ধে স্বরাকুশ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হরিহর, কমলাকর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি স্মার্তগণ জয়ন্তস্বামীকৃত গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়ন্তপুত্র, নিমিরাজহাপিত একটি নগর, ইহা গৌতম-শ্রমের নিকট ছিল।

জয়ন্তিকা (জী) জয়ন্তী জীবিতীতি কৈ-ক, ভতো হুস্মো নিপাতনাৎ। ১ হরিজ্ঞা। (রাজনি) ২ চূর্ণার মথী। (কাশী-খণ্ড ৪৭।৪৬) ৩ এক প্রাচীন রাষ্ট্র।

* “যত্র বোদ্ধগতস্ত্রয়ো লগ্ন্যদেকাদশে স্থিতঃ।

জয়ন্তো নাম বোগোহয়ং শত্রুপক্ষবিনাশকৃৎ।” (জ্যোতিঃ)

“প্রত্যখ্যাক্রিতটে রম্যে বিখ্যাতোতি জয়ন্তিকা।”

(সহাস্রি ২।১৩।৩৬।)

জয়ন্তিকা, জয়ন্তী, বর্তমান আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটি রাজ্য। পূর্বে এই স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করেন। ব্রহ্মপুত্র, দেশাবলী, দ্বিধিজয়প্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এই রাজ্য জয়ন্ত নামে ও বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেশাবলী মতে এখানে জয়ন্তেশ্বরী দেবী বিরাজ করেন। বৃহন্নীলতন্ত্রেও ইহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—“জয়ন্তং বিজয়ন্তঞ্চ সর্বকল্যাণদং প্রিয়ে।” (৫ম পটল)

এখনও জয়ন্তেশ্বরীদেবীর কালীমূর্তি দেবতার জন্ম অনেক ব্যাক্তি এখানে আগমন করিয়া থাকে। প্রতি বর্ষে এখানে জয়ন্তরাজ নরবলি দিতেন। জয়ন্তের শেষ রাজা রাজেন্দ্রসিংহ এই নরবলির অপরাধেই ইংরাজের কুদৃষ্টিতে পড়েন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে নওগাঁ হইতে কএকজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জয়ন্তেশ্বরীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়। তৎকালেই বড়লাট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত এবং জয়ন্তরাজ্য শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা বার্ষিক ছয়হাজার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। সেই সময় হইতে জয়ন্তরাজ্যের পার্শ্ববর্তী অংশ খাসি ও জয়ন্তী পাহাড়ের অন্তর্গত এবং সমতলভাগ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হয়। এই সমতল অংশের পরিমাণ ৪৬৩ বর্গমাইল হইবে। পূর্বে জয়ন্তরাজ আপন ইচ্ছামত প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্ত বা কর আদায় করিতেন, বৃটিশ অধীন হইবার পর এখানে নিষ্টিষ্ট বন্দোবস্ত হয়। [শ্রীহট্ট ও জয়ন্তিকা পাহাড় দেখ।]

জয়ন্তিকা পাহাড়, আসাম প্রদেশের এক উপবিভাগ, সাধারণে জোবাই বলে। ইহার পরিমাণ-কম ২০০০ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরসীমা নওগাঁ, পূর্বে কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও পশ্চিমে খাসি পাহাড়।

ইহার জোবাই নামক সদরে সহকারী কমিসনরের কাছারী আছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। প্রথমে এখানকার প্রতি গ্রাম হইতে বর্ষে একটি করিয়া ছাগ আদায় হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রতি গৃহে উর্দ্ধ সংখ্যা ১২ টাকা করিয়া কর ধার্য হয়। প্রথমে ঐ কর আদায় সম্বন্ধে গোল বাধিয়া ছিল। পাহাড়ীরা রাজা ভিন্ন আর কাহাকেও কর দিতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে তাহাদের সহিত একটি ছোট খাট যুদ্ধ বাধে। যাহা হউক, তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। তৎপরে এখানে মাছ ধরা ও কাঠ কাটার উপায়ও কর ধার্য হয়। কিন্তু এখানকার পাহাড়ীরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে

আজুয়ারীমাসে পূজা উপলক্ষে সকলে একত্র হইয়া ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। পুলিশ ঘর পুড়াইয়া দিল। বৃটিশের কোন চিহ্ন পাহাড়ে রহিল না। তাহাদের বিরুদ্ধে সিপাহীসৈন্য প্রেরিত হইল। প্রথমে এই সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না, পুনরায় গজারোহী ও দুই দল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে দমন করা হইল। এখন জয়ন্তীরা পাহাড় ২০টা পরগণার বিভক্ত; তন্মধ্যে দুইটীতে কুকী ও দুইটীতে মিকির জাতির বাস। এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা কর আদায় হইয়া থাকে।

এখানে কুম্ নামক কৃষিপ্রথা প্রচলিত। এখানকার নদী-তট হইতে উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া চূণ পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গে শ্রীহট্টের চূণ বলিয়া বিক্রীত হয়।

জয়ন্তী, কদম্ব-রাজগণের রাজধানী বনবাসীর অপর নাম।

[বনবাসী দেখ।]

জয়ন্তীপুর, শ্রীহট্টজেলার উত্তরপূর্বাংশে একটা গ্রাম ও থানা। অক্ষা° ২৫° ৮' ৭" উঃ, দ্রাঘি° ৯২° ১০' ২" পূঃ, हरिनदीর পূর্বা-তন গর্ভে জয়ন্তীরা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখানেই জয়ন্তীরাজের রাজধানী ছিল। এখনও ইহার নানাস্থানে প্রস্তর-নির্মিত সুন্দর শিল্পযুক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, শিবলিঙ্গ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পড়িয়া আছে। এখানে খাসি ও সন্তোং বণিকেরা প্রতি সপ্তাহে একবার হাট করিতে আইসে।

জয়ন্তী (স্ত্রী) জয়ন্তীতি জি-খচ্। (তুতুবহীতি। উণ° ৩। ১২৮) গৌরাদিভাং ভীপ্। হুর্গা।

“জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।

হুর্গা শিবা কমা ধাত্রী স্বাধা স্বধা নমোহস্ত তে।” (কালিকাপু°)

২ ইন্দ্রকজ্জা। ৩ পতাকা। ৪ অগ্নিমহবৃক্ষ, গুণুরীগাছ।

(ভাবপ্র°) ৫ বৃক্ষবিশেষ। পর্যায়—জয়া, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা, বলা, মোটা, হরিভা, বিজয়া, স্কন্দমূলা, বিক্রান্তা, অপরাজিতা। ইহার গুণ—মদগন্ধযুক্ত, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ক্রিমিনাশক, কণ্ঠবিশোধন। জয়ন্তী পত্রের গুণ বিষদোষ-নাশক, চক্ষুর হিতজনক, মধুর, স্নীতল। (রাজবল্লভ) ইহা নবপত্রিকার ব্যবহৃত হয়।

“কদলী দাড়িমী ধাত্তং হরিত্রা মানকং কচু।

বিষোহশোকো জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ” (তিথিতত্ত্ব)

বৈজ্ঞক মতে—রবিবারে ষেতজয়ন্তীর মূল ছুয়ের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে শিথিরোগ আরোগ্য হয়।

“ষেতজয়ন্তী মূলং পিষ্টং পীতকং গব্যাপয়সৈব।

শিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈজ্ঞনাখজ্জা।” (চক্রপাণি)

৬ বৈজ্ঞকোক্ত ঔষধবিশেষ।

বিষ, পাঠা, অখগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, শিপুল, ক্ষিপ্র ও জয়ন্তী প্রত্যেক সমভাগ হাগমুদ্রে পিষিয়া চণকপ্রমাণ কটী প্রস্তুত করিতে হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ) ৭ যোগবিশেষ, যদি প্রাণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রের প্রথম ও শেষ দণ্ডে কলামাত্র রোহিণী নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়, এই যোগ সকল পাপনাশক।

“জয়ং পুণ্যক কুরুতে জয়ন্তীমিতি তাং বিদুঃ।

রোহিণীসহিতা কৃষ্ণা মাসেব প্রাণেহষ্টমী” (তিথিতত্ত্ব)

অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোদ্রং কলয়াপি যদা ভবেৎ।

জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্বপাপপ্রণাশিনী” (তিথিতত্ত্ব)

[জয়াষ্টমী দেখ।] ৮ ষাদশীবিশেষ।

“উদ্যালনী বঙ্গুলীচ ত্রিশূলা পক্ষবর্জিনী।

জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।

ষাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যা সর্বপাপহরা বিজ” (ব্রহ্মবৈবর্তপু°)

জয়ন্তীব্রত, জয়াষ্টমীর অপর নাম। [জয়াষ্টমী দেখ।]

জয়পতাকা (স্ত্রী) জয়সূচকা পতাকা অথবা জয়স্ত্র পতাকা মধ্যলো°। জয়লাভের পর যে পতাকা উড়ান হয়।

জয়পত্র (স্ত্রী) জয়জ্ঞাপকং পত্রং মধ্যলো°। কোনও বিবাদের বিচারের পর যাহাতে রাজকীর মন্তব্য লিখিত হয়।

বীরমিত্রোদয়ে জয়পত্রের লক্ষণ ও ভেদ বর্ণিত আছে। ব্যাসের মতে—কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিবিশয়ক বিবাদে অথবা কোন বিভাগের বিবাদে অথবা কোন বাগ্-বিরোধ প্রভৃতিতে যথাসম্ভব রাজা স্বয়ং দেখিয়া অথবা প্রাড়্-বিবাকদিগের নিকটে শুনিয়া প্রমাণাভুসারে যাহার জয় বিবেচনা করিবেন, তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিবেন (১)। জয়-পত্র রাজা ও সভ্যদিগের স্বাক্ষরিত এবং রাজমুদ্রায় অঙ্কিত হইবে। জয়পত্রে উত্তরপক্ষের মন্তব্য, প্রাপ্ত প্রমাণ, ধর্মশাস্ত্রের মত ও সভ্যদিগের মন্তব্য লিখিত হয়। কোন বিষয়ের জয়পত্র আবার পশ্চাৎকার নামে কথিত হয়।

রাজা প্রকৃত বিষয় নিশ্চয় করিয়া পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ জয়পত্রে লিখিয়া জয়ী ব্যক্তিকে ঐ পত্র প্রদান করেন।

২ অশ্বমেধযজ্ঞীয় অশ্বের কপালে বদ্ধ লিপিবিশেষ।

জয়পাল (পুং) জয়ং পালয়তীতি, পালি-অণ্ (কর্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) ১ বিধি। ২ বিষ্ণু। ৩ ভূপাল। (শব্দরত্না°)

(১) “বায়হরান্ খরং দুই। জয়া বা প্রাড়্-বিবাকতঃ।

জয়পত্রভুক্তো বহ্যায় পরিজানায় পার্ধিবঃ।...

প্রাড়্-বিবাকাদিহত্যাকং মুদ্রিতং রাজমুদ্রা” (বীরমিত্রোদয়)

৪. ক্রকটবিশেষ, (Croton Tiglium) সাধারণ কথায় জামাল-গোটা কহে। পর্যায় জৈপাল, সারক, রেচক, তিত্তিডীকল, দণ্ডীবীজ, মলপ্রাণি, বীজরেচন, কুস্তীবীজ, কুস্তিনীবীজ, দণ্টা-বীজ, দণ্টিনীবীজ, নিকুস্তবীজ, শোধিনীবীজ, চক্রদণ্ডীবীজ। মরাঠী, হিন্দী, নেপালী ও গুজরাটী ভাষায় জামালগোটা বা জামালগোটা, তামিল ও মলয়ে নির্কলম্, তৈলঙ্গে নেপাল-বিভুয়া, ব্রহ্মে কনকো ও আরবে বতু বা হব্বুসলাতীন। ইংরাজীতে Purging Croton.

এই গাছ এক একটা ১৫ হইতে ২০ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। ভারতের প্রায় সকল স্থানে ও মলকা, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশেও জন্মে।

ইহার ফল দেখিতে কমলানুবর মত ও আকার সুপারীর স্তায়। এই ফল হইতে জোলাপের মত কটু কষায় স্বাদ-যুক্ত এক প্রকার তৈল বাহির হয়। ইহার গুণ অতি বিরোচক। কএক ফোঁটা পেটে পড়িলে অল্প সময় মধ্যেই পেট খুইয়া যায়। কঠিন কোষ্ঠবদ্ধ, উদরী, সংশ্রাস, পক্ষাঘাত, এমন কি যখন রোগী এক ফোঁটা ঔষধও গিলিতে পারিতেছে না, এরূপ স্থলে এক ফোঁটা লাগাইয়া দিলে অল্প সময় মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। পূর্বে এখান হইতে জয়পালতৈল বিলাতে প্রেরিত হইত। ইহার আধ সের তৈল করিতে ৫০ আনা মাত্র খরচ হইলেও বিলাতে ৫ টাকার আধ ছটাক মাত্র বিক্রীত হইত। তাহার উপর বেশী ভেজাল চলিত হওয়ায় বিলাতে জয়পাল তৈলের ব্যবহার একবারে উঠিয়া যায়। কাহারও মতে, জয়পালের পাতা ও নূতন কাঠ হইতেও অল্পপরিমাণ তৈল পাওয়া যায়।

জয়পাল বীজ বা তৈল অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, ইহার রস চর্মে লাগিলে তৎক্ষণাৎ ফোকা পড়ে। ঠাণ্ডায় কফ বলিলে বৃকে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টির কার্য করে। বাহ্যপ্রয়োগে ইহার গুণ চর্মপ্রদাহকারী ও অতি উত্তেজক। ইহার তৈলে বিশেষ জলনিঃসারক গুণ আছে। জয়পাল কলের ছাল কাহারও মতে বিষাক্ত। পূর্বকালে হিন্দু চিকিৎসকগণ জয়পালতৈল ব্যবহার করিতেন কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ফল রুক্ষের সহিত লিঙ্গ করিয়া কিম্বা ঘূটের পোড়ে পুড়াইয়া ব্যবহার করা হইত।

অতি সাবধানে জয়পাল ব্যবহার করিতে হয়, অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে অজ্ঞ বেদিয়ার নিকট জয়পাল থাইয়া অনেকে মূর্খ অবস্থার পতিত হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

বৈদ্যক মতে—ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বিরোচন, দীপন, ক্রমি, কফ, আম ও জঠরাময়নাশক। (রাজনি) কোন কোন বর্ষমান চিকিৎসকের মতে—অজ্ঞতকরণে পুরুষাদে জয়পালের প্রলেপ দিলে অনেক সময় জ্বরলপাওয়া যায়। ডরানক হীপানির সময় দীপশিখার জয়পালবীজ কলসাইয়া নাকে ইহার ধূম গ্রহণ করিলে হীপানি কমিয়া আসে। মাথা ধরা বা চক্ষুরোগ প্রবল হইলে ব্রহ্মতলে ইহার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

জয়পাল, লাহোরের একজন বিখ্যাত হিন্দু রাজা। ইহার পিতার নাম হিতপাল। জয়পালের রাজ্য সুরহিন্দু হইতে লম্বন এবং কাশ্মীর হইতে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জয়পালের রাজত্বকালে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করে।

গজনিপতি সবক্তগীন ৯৭৭ খৃঃ অব্দে জয়পালের রাজ্য আক্রমণপূর্বক কয়েকটা দুর্গ হস্তগত করিয়া দেশলুণ্ঠন ও স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জয়পাল ক্রুদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের শাস্তিবিধানার্থ সৈন্তে যাত্রা করিলেন।

সবক্তগীনের সহিত লম্বনে তাহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু যুদ্ধ না হইতেই রাজিতে প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হইয়া জয়পালের সৈন্তগণকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও বিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

সুতরাং তিনি সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

৫০ হস্তী এবং ১০ লক্ষ দিহাম উপঢৌকন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া জয়পাল স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ যখনকে উপঢৌকন দিয়া হিন্দুগোব নষ্ট করিতে বারণ করিলেন।

তদনুসারে উপঢৌকন না দিয়া সবক্তগীনের প্রেরিত দূত-গণকে কারারুদ্ধ করা হইল, এই সংবাদ প্রবণে সবক্তগীন ক্রোধে অধীর হইয়া জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিল। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হইলেন। সবক্তগীন বীজিত উপঢৌকন গ্রহণ এবং পেশবার ও লম্বন অধিকারপূর্বক, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় হইতে পেশবার হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের সীমা হইল, ১০০১ খৃঃ অব্দে ২৭এ নবেম্বর সবক্তগীনের পুত্র মুলতান মাহমুদ ১২০০০ অশ্বাদোহী এবং ৩০০০০ পদাতিক লইয়া জয়পালকে আক্রমণ করেন। জয়পাল পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন; কিন্তু বাৎসরিক কর দানে সম্মত হইলে মামুল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখনকার প্রথা অনুসারে কোনও রাজা দুইবার পরাজিত হইলে, তিনি রাজ্য চালাইতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইতেন এবং রাজত্ব করিতে পাইতেন না। রাজা জয়পাল পুত্র জয়পালকে

সিংহাসনে স্থাপনপূর্বক, প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন।

জয়পাল, লাহোররাজ অলকপালের পুত্র এবং প্রথম জয়পালের পৌত্র। ১০১৩ খৃঃ অব্দে ইনি শিভলিংহাসনে অধিরোধন করেন। ইরানবতী নদীতীরে ১০২২ খৃঃ অব্দে গজনীপতি জুলতান মাঙ্গুদের সহিত জয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়পালের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর হইতে লাহোর মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের এই ভিত্তিভূমি।

জয়পাল, হামির মহাকাব্য মতে চোহানবংশীয় পঞ্চম এবং সপ্তবিংশ রাজা, পঞ্চম রাজা জয়পাল চক্ৰী মহারাজ চন্দ্র-রাজের পুত্র। সপ্তবিংশ রাজা জয়পাল মহারাজ বিশালের পুত্র। [চাহমান দেখ।]

জয়পুত্রক (পুং) অগ্নেন বিজয়েন পুত্র ইব কারতীতি কৈ-ক। পাশকভেন। জতুপুত্রক। [জয়কোলাহল দেখ।]

জয়পুর, রাজপুতানার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরসীমা বিকানের, লোহার, বজ্জর, ও পাটিয়ালা; পূর্বে আলবার, তরতপুর, কেরোলি; দক্ষিণে গোরালির, বুলী, টোক ও মেবাড় বা উদয়পুর এবং পশ্চিমে কুঙ্গগড়, বোধপুর ও বিকানের। ইহার পশ্চিম সীমার ধূক (চুচ) নামে একটি বজ্জীর গিরি আছে, পূর্বে তদনুসারে এই রাজ্যকে ধূকর বলা হইত। ইহার বর্তমান রাজধানী জয়পুরের নামানুসারে এই রাজ্য এখন জয়পুর নামে বিখ্যাত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল ও প্রস্থে ১২০ মাইল। অক্ষা° ২৫° ৪০' হইতে ২৮° ২৭' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫০' হইতে ৭৭° ১৫' পূঃ। শেখাবতী সমেত ইহার ভূপরিমাণ ১৫০৪৯ বর্গমাইল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের লোকসংখ্যানুসারে এখানে ২৮৩২২৭৬ জন লোকের বাস। ইহার রাজস্ব আদায় প্রায় ৪৯৬০০০০ টাকা। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল স্থানে সমান নয়। মধ্য-ভাগে ত্রিকোণাকার সমুদ্র অধিত্যাকৃত্তিমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ বা ১৬০০ ফিট উচ্চ বনাস নদী অতিমুখে দক্ষিণপার্শ্বে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। পূর্ব সীমার গিরিমালা উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে অলবার রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর দরী সকল বিকীর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ সীমা আরাবলীর শাখা হিহ বিচ্ছিন্ন গিরিমালার বেষ্টিত। এখানকার গিরিগুলিও অধিক উচ্চ। উত্তরপশ্চিমে বালুকা-সমাকীর্ণ শেখাবতী ও বিকানের রাজ্য। দক্ষিণ-পূর্বাংশই শস্তভূমি ও সমধিক উর্বরা। বনাস নদীই এখানকার সকল নদী অপেক্ষা বড়। বর্ষাকালে বহু জলপাত

হয়, সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন উপনদী দিয়া এই বনাসনদীতে আসিয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন বাণগঙ্গা, অমানিশা, গভীর, বানী, মোয়েল, যুল, মাজি, খারি, সবি, কাণ্ডালি এই কএকটি নদী ও উপনদী আছে। এইগুলির মধ্যে বাণগঙ্গা পূর্বাংশে, সবি উত্তরাংশে ও কাণ্ডালি উত্তরপশ্চিমাংশে প্রবাহিত। বনাস ও সবি নদী ছাড়া অপর সকলগুলি গভীর হইলেও দীর্ঘ প্রায়কালে শুকাইয়া যায়। জয়পুর নগরের নিকটবর্তী এবং রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাংশের জমি অধিকাংশই বালুকা ও ককর মিশ্রিত। বিশেষতঃ শেখাবতীর সমুদ্র জমিই বালুকা-ময়। বাণগঙ্গার তীরবর্তী সমুদ্র ভূভাগ ও জয়পুর নগরের দক্ষিণাংশ সমধিক উর্বরা ও শস্তশালী।

এখানে তেমন নিবিড় বন নাই, পাহাড়ে সামান্য জল দৃষ্ট হয়। তাহাতে ধাতু-গাছই অধিক জন্মে। রাজ্যের সর্বত্রই নিম্ন ও বাবুলা গাছ দেখা যায়।

ইহার উত্তরাংশে পাহাড়ে দানাদার পাথর, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বালুপাথর, তাহার সহিত খেত ও কাল মর্দর এবং মধ্যে মধ্যে অল্প পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে তাম্রা, মনঃশিলা ও নিকেলের খনি আছে। তাম্রা খনি হইতে তাম্রা উঠান হয়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে মূল্যশিরা হইতে আদত তাম্রা বাহির করিতে পারে না। জয়পুরের মিনার কাজ জগৎ-বিখ্যাত। তাহাতে মনঃশিলা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানকার শান্তরহন হইতে বর্ষে প্রায় দুই লক্ষ মণ শান্তর লবণ উৎপন্ন হয়। রায়বাল নামক স্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া চুন উৎপন্ন হয়। এখানকার রাজমহাল নামক স্থানের নিকট যথেষ্ট লাল চুনি পাওয়া যায়। পূর্বে এখানে অনেক ফিরোজা মণিও পাওয়া বাইত।

এখানকার উর্বরা জমিতে জোয়ার, ধান, কার্পাস, তিল, সরিষা, গম, যব, ছোলা, অহিফেন, তামাক, ইক্ষু ও ডাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু শেখাবতী অঞ্চলে বাজরা, যুগ ও মুখা ভিন্ন আর কিছু উৎপন্ন হয় না। অতি পূর্বকাল হইতে এখানে ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুররাজ জল-সরবরাহের সুবন্দোবস্তের জন্য ২৩৮৬২০ টাকা ব্যয় করেন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান ও অতি অল্প সংখ্যক পারসীর বাস আছে। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রের সংখ্যাই বেশী, জৈনদিগের সংখ্যাও কম নহে। শান্তর-হনের বরাহানা নামক গ্রামে দাহপত্নী সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। জয়পুর-রাজের অধীনে বিস্তর নাগা সৈন্ত আছে।

এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য জৈন বণিকদিগের বড় বড় কুঠী আছে। [জয়পুর নগরের বিবরণ দেখ।] এখানকার অর্থের পাঁচের ভাষর কার্য ও সোণার উপর মিনার কাজ অতি উৎকৃষ্ট, জয়পুরের শিল্পিগণ এই জন্যই সর্বত্র বিখ্যাত। এখানকার পশমী কাপড়ও আদরের জিনিস। রাজধানীর নিকট নজনের নামক স্থানে বহুবিধূত রঙের কারবার আছে। রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজপুতানা মালব-টেট্ট রেলওয়ে মিলাছে, ইহা দ্বারা শাস্ত্রের লবণ নানা স্থানে রপ্তানি হয় ও নানা প্রকার বস্ত্র, লোহার দ্রব্য, মসলা, রোহিলগুড়ের চিনি প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। শেখাবতী হইতে আজমীর ও হিসারের ভবানী নামক স্থানে পশম রপ্তানী ও তথায় তামাক, মসলা, কাপড় ও বাসনাদি আমদানী হয়। শেখাবতী হইতে সকল দ্রব্য উঠে বহিয়া আসে। রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে যত কাপাস, শস্ত, সরিষা, দোলাচিনি ও তামাক উৎপন্ন হয়, তাহা মন্সাবার ও করোলির পথ দিয়া হিন্দোলের হাটে আনীত হয়। সবাই মধুপুর নামক নগরে তামা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হয়, তাহা ইজগড় দিয়া হারাবতী রাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এই রাজ্যের রাজধানী জয়পুর, এ ছাড়া চাকেন, আমের, [অধর দেখ।] লালসোত, দোবা, বাসবা, গিজগড়, হিন্দোল-তোদাভীম, বামনিবাস, গজাপুর, মধুপুর, নীকর, মালপুর, শাস্ত্র, ত্রীমাধবপুর, কতেপুর, রামগড়, নবলগড়, কুঞ্জ, উদয়পুর, লচমনগড়, বিশৌ, চিরাবা, সিংহানা, সূর্যগড়, পাটন, কোট-পুটলি, খন্দেলা, জিলো (পাটন), বৈরাট, মন্দর, তোদা ও খেজি এই কয়েকটা প্রধান নগর।

পূর্বে অধরে টাঁকশাল ছিল, এখন জয়পুরে টাঁকশাল হইয়াছে। এখানে জয়পুর রাজ্যের নামাঙ্কিত মোহর, টাকা ও পয়সা বাহির হয়।

ইতিহাস।—জয়পুর রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশবংশীয় কচ্ছবাহ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। রাজপুত ভাটেরা বলেন—কুশবংশীয় রাজা নল পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়া ৩৫১ সন্থতে নরবর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এখানে তাহার বংশধরেরা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পাল উপাধি ছিল। রাজা নল হইতে ৩৩ পুরুষ পরে রাজা জয়সিংহ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র জুজারাও রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া ১০২৩ সন্থতে এই ধ্বংস রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। [অধর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মহাবীর জুজারাওর ৬ষ্ঠ পুরুষে পুজন জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। যখন পৃথ্বীরাজ কনোজ-রাজনন্দিনী সংযোগিতাকে হরণ করিয়া

আনেন, যে সময়ে পুজন, ভালকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন।

পুজনের ১৩শ পুরুষ পরে বাহারমল (বেহারীমল) রাজা হন। ইনিই প্রথমে মোগলাধিপ বাবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া চিরস্মরণীয় বিত্ত কুলে কালিমা লেপন করেন।

তৎপুত্র ভগবানদাস অকুবর বাদশাহের বন্ধু ছিলেন। তিনি অকুবরপুত্র সেলিমের সহিত নিজ কস্তার বিবাহ দিয়া প্রথিত কচ্ছবাহ বংশ কলঙ্কিত করেন। রাজা ভগবানদাসের পূর্বে আর কোন রাজপুত মুসলমানের হস্তে কস্তা সম্ভ্রাদান করেন নাই। ভগবানদাসের পুত্র মানসিংহ বাদশাহের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বাদশাহের জন্য উড়িষ্যা, বাঙ্গালা ও আসামে যোঁরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যে সময়ে পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের বিবেষবহি দাক্ষিণ প্রজ্জলিত হইতেছিল, সেই বিষম সঙ্কটকালে তিনি কাবুল শাসন করিতেন। দিল্লীর তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্ত্ব প্রদান করেন। মানসিংহের পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র জয়সিংহ বিখ্যাত হন। দিল্লীর তাঁহাকে “মীর্জারাজা” উপাধি প্রদান করেন। ইনি অরঙ্গজেবের পক্ষে মহারাষ্ট্রবীর শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে ধূর্ত অরঙ্গজেব-প্রদত্ত হলাহল পানে তাঁহার জীবন লীলা শেষ হয়। [জয়সিংহ দেখ।] জয়সিংহের ৩য় পুরুষে সুবিখ্যাত সবাই জয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোগল-সম্রাটের নিকট ইনি “সবাই” অর্থাৎ অপর সকল রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই উপাধি লাভ করেন, ইহার বংশধরেরা আজও এই উপাধি ভোগ করিতেছেন। সবাই জয়সিংহ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইহার সময় জয়পুর রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল এবং অধর হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া বর্তমান জয়পুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। [সবাই জয়সিংহ ও জয়পুর নগরের বিবরণ দেখ।]

যে সময়ে দুর্দান্ত মহারাষ্ট্র-দস্যগণ প্রবল হইয়া রাজপুতানা লুট করিতেছিল, সেই সময় কিছুদিনের জন্য জয়পুরের রাজগণ উদয়পুর ও যোধপুরের রাজগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময় জয়পুররাজ আপনাদের চিরকলঙ্ক দূর করিবার জন্য মেবারের রাণার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বিশেষ বস্ত্র করেন। স্থির হইল, মেবার-রাজকস্তার গর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠই হউক আর কনিষ্ঠই হউক, তিনিই জয়পুরের সিংহাসন লাভ করিবেন। চিরন্তনপ্রথা পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া জয়পুর ও যোধপুরের অনেক সামন্ত উদ্বেজিত হইয়া

উঠেন। সবাই জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জৈনসিংহ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু মহাগোলযোগ বাধিল। পূর্বতন রাজার প্রতিজ্ঞানুসারে মেবার-রাজকুমারীর গর্ভজাত মধুসিংহও রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। অনেক সামন্ত কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। অবশেষে মেবারের রাণা হোলকরের সাহায্যে মধুসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। [মধুসিংহ দেখ।]

তৎকালে তরতপুরের জাটেরা উপর্যুপরি জয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতকাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অলবারের সামন্ত পরাজিত হইলে জয়পুর রাজ্যের আরও কতকাংশ করিয়া গেল।

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুর রাজ্যের আরও বিশৃঙ্খল ঘটিল। একদিকে গৃহবিবাদ ও অপর দিকে মহারাষ্ট্র দস্যু কর্তৃক রাজ্যলুণ্ঠন চকিতে লাগিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য জয়পুররাজ জগৎসিংহের সহিত ব্রিটিশগবর্নমেন্টের এক সন্ধি হয়, কিন্তু বড় লাট কর্ণওয়ালিশ অস্ত্রারূপে সেই সন্ধি ভঙ্গ করেন। ইহারই পর মেবার-রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীকে লইয়া জয়পুর ও বোধপুর-রাজ্যের বিষম বিবাদ বাধিল। সুবিধা পাইয়া দুষ্ট আমীর খাঁ পিণ্ডারীদিগের সাহায্যে জয়পুররাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই দুঃসময়ে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহ ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া ব্রিটিশগবর্নমেন্টের সহিত সন্ধি করিলেন। [জগৎসিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জগৎসিংহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া আবার গোলযোগ হইল। রাজপুত প্রথা এই—নিঃসন্তান অবস্থায় রাজার মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে কোন শিশু বা যুবককে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহা দ্বারা মৃত নরপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতে হইবে।

পূর্বের নরবরে কচ্ছবহ রাজগণ রাজত্ব করিতেন। নরবরের শেষ রাজার অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হইলে তৎকালের সামন্তগণ অন্তরাজ্য ১ম পৃথ্বীরাজের নিকট তাহার একটা পুত্র লইয়া তাঁহাকেই নরবর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার ১৪শ পুত্র মনোহরসিংহ। এখন এই মনোহরসিংহের বালক পুত্র মোহনসিংহকে আনিয়া তাঁহাকেই জয়পুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। তাহার কিছু দিন পরেই আবার প্রকাশ পাইল যে মৃত জগৎসিংহের মহিষী ভটিয়ানী গর্ভবতী, শিশুই তাঁহার সন্তান হইবার সম্ভাবনা। সামন্তগণ প্রায়ে কেহ বিশ্বাস করেন নাই, পরে তাঁহাদের পৃথ্বীদিগকে রাজ্যান্তঃপুরে পাঠাইয়া প্রকৃত বিবরণ অবগত

হইলেন। যথাকালে রাণী ভটিয়ানীর গর্ভে ৩য় জয়সিংহ জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন মোহনসিংহ রাজ্যচ্যুত হইলেন। সামন্তগণ ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সম্মতিক্রমে ৩য় জয়সিংহই রাজা হইলেন। এ সময়েও ২য় পৃথ্বীসিংহের পুত্র গোয়াসিংহের সিঁড়িয়ার আশ্রয়ে রাজ্যপাইবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রথমে অনেক সামন্ত তাঁহাকে রাজা করিতেও স্বীকৃত হইরাছিল, কিন্তু তাঁহার মূর্থতা ও অসচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া কেহই তাঁহাকে রাজা হইতে দিলেন না।

৩য় জয়সিংহ রাজা হইলে তাঁহার মাতা রাণী ভটিয়ানীই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজার স্বার্থের জন্য ব্রিটিশগবর্নমেন্ট রাবল বৈরীলালকে জয়পুরের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। জগৎসিংহের শেষাবস্থায় তাঁহার অধীনস্থ সামন্তগণ জয়পুররাজ্যের অধিকৃত অনেক জমি খাস করিয়া লন। কিন্তু ব্রিটিশগবর্নমেন্টের সহিত সন্ধি হইলে জগৎসিংহ সেই সকল জমি আবার উদ্ধার করেন। তাহাতে সামন্তগণ পুনরায় সেই সকল জমি ভোগ করিতে না পারেন, ভটিয়ানী তাঁহাদিগকে ডাকাইরা সকলের স্বাক্ষর করিয়া লয়েন। প্রথমে রাণী ভটিয়ানী রাজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু জটারাম নামে এক ব্যক্তির সহিত ভটিয়ানী গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত হন। তাহাতেই আবার অনর্থের সূত্রপাত হয়। ভটিয়ানী সদাশয় বৈরীলালকে ডাড়াইয়া দুষ্ট জটারামকে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী প্রদান করেন। জটারামই ক্রমে রাজ্যের সর্বো সর্বা হইয়া উঠিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভটিয়ানী রাণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্মানস্বার্থ ব্রিটিশগবর্নমেন্ট এতদিন জয়পুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু এখন প্রাপ্য কর বাকি পড়ায় সূত্র ধরিয়া জয়পুর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে শেখাবতী প্রদেশে শাস্তি-স্থাপন জন্য ব্রিটিশগবর্নমেন্ট একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ের ব্যয়ের জন্য ব্রিটিশরাজ শাস্তরহণ ও তৎসম্বন্ধিত মূল্যবান শেখাবতীর অংশ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সময় জয়পুর রাজধানীতে মহাবিজ্ঞাত উপস্থিত। ৩য় জয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই শাসনভার গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দুষ্ট জটারামের তাহা প্রাণে সহিল না। দুষ্ট জানিত যে, ৩য় জয়সিংহ শাসনভার গ্রহণ করিলে আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। এই ভাবিয়া তিনি ১৭শ বর্ষীয় জয়সিংহকে বিষ খাওয়াইয়া অকালে তাঁহার জীবনকলিকা উৎপাটিত করিলেন। তখন ৩য় জয়সিংহের ২য় রামসিংহ নামে একটা পুত্র হইরাছিল। এখন দুই বর্ষীয় রামসিংহই রাজা হইলেন।

তাহার রাজ্যারোহণকালে জটীরামের বড়বন্ধে রাজধানীতে জয়নাক গোলমাল বাধিল। সেইদিন বড় লাটের এজেন্ট কর্ণেল অল্ডেন সাহেব আহত ও তাহার সহকারী মাটিন্ ব্রেক সাহেব নিহত হন। রাজ্যে অশুশ্রল স্থাপনের নিমিত্ত ব্রিটিশ-গবর্নেন্ট স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ জটীরাম তাড়িত হইলেন। আবার রাবল বৈরিলাল মন্ত্রী পাইলেন। ব্রিটিশগবর্নেন্ট ইংরাজ পলটিকে এজেন্টকে বালক রামসিংহের অভিভাবক পদে নিযুক্ত করিলেন।

২য় রামসিংহের রাজত্বকালে জয়পুরের অনেক উন্নতি হয়। পূর্বাশ্রম আয়ও বাড়িয়া যায়। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশগবর্নেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জ্ব তিনি ব্রিটিশগবর্নেন্ট হইতে কোট-কাসিম পরগণার চিরসত্ত্ব এবং গোয়ালপুর গ্রহণ করিবার সন্মত লাভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ত্রিভিক্ককালে তিনি দরিদ্রগণের প্রতি যেরূপ উদারতা ও বদাঙ্কতা দেখাইয়াছিলেন, তজ্জ্ব ব্রিটিশগবর্নেন্ট তাহার সন্মানার্থ ২টি অধিক তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরে তাহার সন্মানার্থ সর্বশুদ্ধ ২১টি তোপ হইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মহারাজ জগৎসিংহের দ্বিতীয় পুত্রবংশীয় কায়মসিংহকে মৃত্যুকালে দত্তক গ্রহণ করেন।

কায়মসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সবাই মাধোসিংহ (মাধবসিংহ) নামে খ্যাত হন। তাহার নাবালক অবস্থায় সচিবমণ্ডলী ও রেসিডেন্ট কর্তৃক জয়পুর রাজ্য শাসিত হইত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সবাই মাধোসিংহ রাজ্যশাসনের পূর্ণক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এখনও ইনি জীবিত আছেন *।

জয়পুর-রাজগণের মধ্যে কাহার পুত্র সন্তান না হইলে রাজাবংশস্থল হইতে কোন বালককে লইয়া তাহাকেই সিংহাসনে বসান হয়। ১ম পৃথীরাজের দ্বাদশপুত্র হইতে এই রাজাবংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ দ্বাদশপুত্রের নাম যথাক্রমে—১ চতুর্ভুজ, ২ কল্যাণ, ৩ নাথু, ৪ বলভদ্র, ৫ জগমল ইহার পুত্র খাদ্যার, ৬ সুলতান, ৭ পচায়েন, ৮ গুগা, ৯ কায়ম, ১০ কুস্ত, ১১ সুরজ ও ১২ বনবীর। এই দ্বাদশজন হইতে যথাক্রমে ১ চতুর্ভুজোৎ, ২ কল্যাণোৎ, ৩ নাথাবৎ, ৪ বলভদ্রোৎ, ৫ খাদ্যারোৎ, ৬ সুলতানোৎ, ৭ পচায়েনোৎ, ৮ গুগাবৎ, ৯ কুস্তানী, ১০ কুস্তাবৎ, ১১ সুরজপোতা ও ১২ বনবীরপোতা। এই বার বরকে রাজপুতেরা “বার কুঠরী” বলে। ইহারাই জয়পুরের প্রধান দ্বাদশ সামন্ত বলিয়া খ্যাত। এখন এই দ্বাদশ ঘর হইতে প্রায় একশত ঘর উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের আর পূর্ববৎ বিষয় সম্পত্তি নাই, কিন্তু এখনও যথেষ্ট সম্মান আছে।

এ ছাড়া কিছু দিন পূর্বে রাজাবৎ, নারুক, ভাহুকবৎ, পূর্ণমলোৎ প্রভৃতি কচ্ছবহ জাতীয় কএক ঘর সামন্ত ছিলেন, এখনও ছই এক ঘর পূর্ব সম্মান বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে। এতদ্বিন্ন জয়পুররাজের অধীনে ভট্ট, চোহান, বীরগুজার, চন্দ্রাবৎ, শিকারবার, গুজার, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় ৪০৮৫ ঘর সামন্ত আছেন। উপরোক্ত সামন্তগণের মধ্যে গুগাবৎ সামন্তগণই প্রধান, তাহাদের আর চারি লক্ষ টাকার অধিক। কএকজন ব্রাহ্মণ সামন্তও আছেন, তাহাদের আয়ও কম নয়।

জয়পুর-রাজগণ বহুদিন হইতেই অনেক জায়গীর ও

* নিয়ে জয়পুর-রাজগণের নাম প্রদত্ত হইল।—

- ১। চন্দ্রারোৎ* ১০২০ সনতে অভিষেক।
- ২। ককাল (ধূসররাজ্য উদ্ধারকর্তা)
- ৩। মাদল রাও*
- ৪। হনুদেব।
- ৫। কুণ্ডল।
- ৬। পুজন*
- ৭। মলসিংহ* (মালসিং)
- ৮। বিজলী।
- ৯। রাজদেব।
- ১০। কল্যাণ।
- ১১। কুস্তল।
- ১২। জোরানসিংহ।
- ১৩। উদয়করণ।
- ১৪। মলসিংহ।
- ১৫। বনবীর।
- ১৬। উজ্জয়ণ।
- ১৭। চন্দ্রসেন।
- ১৮। পৃথীরাজ* [১ম] (ইহার ১২ পুত্র হইতে ১২ ঘর রাজাবংশসামন্ত উৎপন্ন।)
- ১৯। জীম (পিতৃঘাতী)।

- ২০। অহীশকর্ণ (পিতৃহস্তা)।
- ২১। বাহারমল* (১ম পৃথীরাজের পুত্র)।
- ২২। ভগবানদাস*
- ২৩। মানসিংহ*
- ২৪। ভবসিংহ (ভাগসিংহ)* ১৬৭২ সনতে অভিষেক।
- ২৫। মহাসিংহ ১৬৭৭ সনতে অভিষেক।
- ২৬। জয়সিংহ* মৌর্যরাজ্য, (মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র)।
- ২৭। রামসিংহ*
- ২৮। বিজুসিংহ*
- ২৯। সবাই জয়সিংহ* ১৭৫৫ সনতে অভিষেক।
- ৩০। ঈশ্বরীসিংহ, ১৮০০ সনতে অভিষেক।
- ৩১। মধুসিংহ* (ঈশ্বরীসিংহের দ্বৈতাজের জ্যেষ্ঠপুত্র) ১৮১৭ সনতে অভিষেক।
- ৩২। পৃথুসিংহ [২য়] ১৮৩০ সনতে অভিষেক।
- ৩৩। প্রতাপসিংহ (মধুসিংহের ২য় পুত্র) ঐ
- ৩৪। জগৎসিংহ [২য়] ১৮৬০ সনতে অভিষেক।
- ৩৫। মোহনসিংহ* (মোহনসিংহের পুত্র) ১৮৭৫ সনতে অভিষেক।
- ৩৬। জয়সিংহ* [৩য়] জগৎসিংহের পুত্র, ১৮৭৬ সনতে অভিষেক।
- ৩৭। রামসিংহ* [২য়] ১৮৯২ সনতে অভিষেক।
- ৩৮। মাধোসিংহ [দত্তকপুত্র] ১৯৭৭ সনতে অভিষেক।

০ চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ কতকগুলি জটাই।

ব্রহ্মোত্তর স্থান করিয়া গিয়াছেন। এখন সেই সকল আরগীর ও ব্রহ্মোত্তরের প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা আর।

পূর্বে জয়পুররাজ্যের বিস্তার সৈকত ছিল এবং তাহার বীর ও সূদক্ষ বোদ্ধা বলিয়া গণ্য হইত। এখন জয়পুররাজ্যের অধীনে ৩৫৭৮ জন অধারোহী, ২৫২২ পদাতি, ৭১৬ গোলন্দাজ, ৬৫টা কামান এবং ২২টা চুর্ণ আছে।

জয়পুরের মহারাজ স্বরাজ্য প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এখানকার দাওরাণী ও কোজদারী বিচারাদি সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। তাঁহার অধীনে আটজন সচিবের উপর রাজ্যশালনের ভার অর্পিত আছে। শাসন-সুবিধার জন্য ৪টা বিভাগ আছে, যথা—আইন আদালত, রাজস্ব, সৈনিক ও বহির্বিভাগ। কাউন্সিলের সিন্ধন প্রধান সভ্য সেই চারি বিভাগে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

জয়পুর-মহারাজ অহিকেন ও আব্কারী ব্যতীত আর সকল পণ্যক্রয়ের মানুল তুলিয়া দিয়াছেন।

জলবায়ু। এখানকার জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর। এখানে ম্যালেরিয়া জর নাই বলিলেই হয়। শীতকালে এখানকার আব-হাওয়া অতি মনোরম, কেবল শেখাবতী অঞ্চলেই দারুণ শীত ও অনেক বেলা হইলেও তথায় কুয়াশা ঘূর হয় না। গ্রীষ্মকালে রাজ্যের উত্তরাংশে ও শেখাবতী রাজ্যে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে, দিনের বেলা কষ্টকর হইলেও রাজি বেশ স্নিগ্ধকর। দক্ষিণপশ্চিমাংশে তেমন গরম বাতাস বহে না। এখানকার গড়পড়তা তাপ ৩৬.৮° হইতে ১১৪° পর্য্যন্ত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২.৮১ ইঞ্চি। শেখাবতী ছাড়া রাজ্যের সকল স্থানেই বেশ জল হয়। জয়পুর মহারাজের যত্নে রাজ্যের চারিদিকে সুবন্দোবস্ত হওয়ার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে।

এখানে ২০টা পুরুষের ও ১২টা শালিকার বিদ্যালয়, এবং ২২টা ডাকঘর আছে। এখানে একটি কলেজও আছে। দিন দিন বিদ্যালয়িকার উন্নতি দেখা যায়।

জয়পুর, উক্ত জয়পুর রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৫৫' উঃ ও দ্রাঘি° ২৭° ৫২' পূঃ। রাজপুতানার মালব-রেলওয়ের ধারে ও আগ্রা আজমীর যাইবার বড় রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৫৪২০৫, ইহার মধ্যে হিন্দু ১০২৮৬১, মুসলমান ৩৮২৫৩ ও জৈন ২৭৮০।

এই নগর রাজপুতানার মধ্যে সর্ব বৃহৎ ও প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এখন ভারতে বহুজাতি হিন্দু নগরী আছে, তন্মধ্যে জয়পুর সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সুগঠিত ও মনোহর। মহাত্মা টড সাহেব লিখিয়াছেন,—‘সবাই জয়সিংহের বিভাধর নামে একজন অধিতীয় শাস্ত্রবিদ বাদালাী ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী

ছিলেন, তাঁহারই পরামর্শ মত জয়সিংহ নিজ বাড়ি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করেন।’ একটি শুক ব্রহ্মের গর্তে বর্তমান জয়পুর নগর স্থাপিত। ইহার তিন দিকে নতোরত গিরিমালা বেষ্টিত, তাহার সমুদ্রতীরে গিরিহর্গজশোভিত, উত্তরপশ্চিমাংশে গিরিপৃষ্ঠে সর্বপ্রধান হৃদেত নাহরগড় অর্থাৎ ব্যাঘ্রহর্গ অবস্থিত।

উত্তরাংশে গিরিপৃষ্ঠ প্রাচীন অমর-নগরান্তিকুলে হেলিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে ২০ ফিট উচ্চ ও ২ ফিট পুরু প্রাচীর সমুদ্র নগরকে ঘেরিয়া আছে। প্রাচীর-গায়ে ৭টা সিংহদ্বার আছে, প্রত্যেক দ্বারের উপরে দুইটা করিয়া আরামগৃহ ও ভোপ রাখিবার স্থান। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে উচ্চ তোরণ, শুভ্র ও ত্রিভুজ হইতে গোলাগুলি ছুড়িবার ছিদ্র আছে। নগরটা দৈর্ঘ্যে ২ মাইল ও প্রস্থে ১২ মাইল। ইহার মধ্যেটা পানিরপাটা দেখা যায়, ইহার রাস্তাগুলি বেশ বিস্তৃত। সমুদ্র দেবালয়, মসজিদ ও ধনবান্ বাক্তিদিগের প্রাসাদমালা নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর অথবা লাল বালু পাথরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে বাস্তবিক পরিভূষিত অয়ে। এখানকার বাড়ীগুলি দেখিতে অধিকাংশই পাটলবর্ণ। নগরের মধ্য দিয়া ছয়টা সোজা-সুজি রাস্তা গিয়াছে। নগরের ঠিক মধ্য স্থলে রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান। এখানে কলের জল, গ্যাসালোক, ড্রেন প্রভৃতি কিছুই অভাব নাই।

এখানকার রামনিবাস উদ্যানের মত সুন্দর ও শিল্পকার্য-মর উদ্যান বোধ হয় আর কোথাও নাই। এখানে ডাকঘর, অতিথিশালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, চিত্রশালিকা, কারাগার, টাকশাল প্রভৃতি আছে।

এখানে অনেক বড় বড় ধনীরা বাস। কাহারও ২১০ কোটি টাকার কারবার চলিতেছে। সবাই জয়সিংহের স্থাপিত এখানকার মানমন্দির সর্বপ্রধান। উপযুক্ত লোকের দ্বারাভাবে তাহার যন্ত্রগুলি অনেক নষ্ট হইয়া যাইতেছে। [জয়সিংহ দেখ] জয়পুরের বার্ষিক জলপাত ২৪ ইঞ্চি, তাপ ৩৬.৮° হইতে ১১৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত।

রেসিডেন্টের বাটী, তাহার কার্যালয়, টেলিগ্রাফ আপিস ও ইংরাজদিগের থাকিবার স্থান নগরের বহির্ভাগে নির্দিষ্ট আছে। নগরের দেড় মাইল পূর্বে গিরিশিখরে গুলতা নামে একটি সুন্দর সূর্য্যমন্দির আছে। এখানে একটি প্রত্নবর্ণ হইতে ৭০ ফিট নিরে জল পড়িতেছে। হিন্দুদিগের নিকট ঐ প্রত্নবর্ণের জল অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ। [অমর দেখ।]

জয়পুর, (জয়পুরম্) মাজ্জারের বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটি করদ রাজ্য। ইহার উত্তরসীমা কালহস্তী, পূর্বে

বিশাখপত্তনের সমতলক্ষেত্র, দক্ষিণে রেকপল্লী ও গোলকুণ্ডা এবং পশ্চিমে বস্তার। ভূগরিষা ৯৩৩ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা প্রায় সাত্বে ছয় লক্ষ। ব্রীটশ গবর্নমেন্টকে বোলহাজার টাকা করিয়া কর দিতে হয়। রায়গড়, গুণাপুর, জয়পুর, বা কোটিপাদ, মলকনসিরি, নবরঙ্গপুর ও কোরাপাত এই কয়টা তালুক জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত। সাধারণের নিকট ইহা জয়পুর জমিদারী নামে খ্যাত।

এই জমিদারীর বেনীভাগ রাজা ও সহকারী ব্রীটশ এজেন্টের কর্তৃত্বাধীন এবং অপরাংশ গুণাপুর ও রায়গড় তালুক সিনিয়ার এসিষ্টান্ট কালেক্টরের অধীন, পার্শ্বতীপ্তরে তাঁহার কাছারী।

এই জমিদারীর মধ্যভাগে পাঁচহাজার ফিট উচ্চ নিমগিরি নামে গিরিমালা দণ্ডায়মান, তাহা হইতে স্রোতস্বতী বাহির হইয়া দক্ষিণপূর্বাভিমুখে কলিঙ্গপত্তনে বংশধারা নামে ও চিকাকোলের ধার দিয়া নাগাবলি নামে সমুদ্রে পতিত হইরাছে। বংশধারা নদীর উভয় তীরে যথেষ্ট বাঁশগাছ জন্মিয়া থাকে। পূর্বে ও উত্তরপূর্বাংশে শোরা পাহাড় প্রায় দুইশত বর্গমাইল বিস্তৃত দুইটা অধিত্যকা সহ বিরাজ করিতেছে।

জমিদারীর অধিকাংশ অর্জুনাধীন কল্লজাতির বাস। উত্তরাংশে গোদৈরি, বিষমকটক ও শূঙ্গাপুর এই তিনটা স্থান তিনজন প্রধান সামন্তের অধীন।

জমিদারীর প্রধান নগর জয়পুর, নবরঙ্গপুর ও কোটিপাদ। গ্রামের মধ্যে গুণাপুর, রায়গড়, শূঙ্গাপুর ও কোরাপাত প্রধান।

এখানে কল্ল ও শবর জাতির বাসই অধিক। অধিবাসীগণ সকলেই প্রায় হিন্দুধর্মাবলম্বী। চেহারার গোড়, দ্রাবিড় ও কোলভাব মিশ্রিত। এখানে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অতি কম, এখানকার প্রজাগণ বারজানা প্রায় অনার্য্যভাবাপন্ন। নগরাদির প্রজাগণ অপেক্ষা পাহাড়ীরা অনেকটা স্বাধীন। তাহাদের মধ্যে এক এক গোষ্ঠী-পতি থাকে, তাহাদের আদেশমত সকলকেই চলিতে হয়। জমিদারীর দক্ষিণাংশে জঙ্গলকাটা ও চাব লইয়া সর্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে।

এই জমিদারীর বন্দোবস্ত প্রাচীন হিন্দু-প্রথা অনুসারে চলে। এখানে গোষ্ঠীপতি, তাহার উপর গ্রামপতি, তাহার উপর রাজা। এখানে রাজাই জমির প্রকৃত সত্বাধিকারী, গোষ্ঠী-পতি ও ইচ্ছানুসারে কোন ভূসম্পত্তির কতক অংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারে, তাহাতে রাজার বা রাজপুরুষের অনুমতি লইতে হয় না।

এখানকার রাজবংশ প্রাচীন। প্রবাদ এইরূপ চন্দ্রবংশীয় রাজপুত্র বিনায়কদেবের সহিত কটকের গজপতি বংশীয়

রাজকন্তার বিবাহ হয়। তখন এখানে শিলাবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। শিলাবংশীয় শেষ রাজার মৃত্যু হইলে গজপতিরাজ বিনায়কদেবকে নন্দাপুর রাজ্য প্রদান করেন। বিনায়ক শিলাবংশীয় রাজকন্তারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ষাট পর্বত্তের পাদদেশে এখনও যে সকল পার্শ্বতীর জমিদারী দৃষ্ট হয়, এক সময়ে সে সমস্তই জয়পুর রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রায় ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার ফৌজদার শের মুহম্মদখা ত্রীকাকোলে আগমন করেন। এই সময় বিশাখ-পত্তনরাজ প্রাচীন নন্দাপুর রাজ্যের অনেক স্থান আত্মসাৎ করেন। জয়পুররাজও ফৌজদারকে ২৪০০ টাকা কর দিরাছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উত্তরসরকার অধিকার করিবার পূর্বে জয়পুররাজ বিশাখপত্তনের অধীন ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মনাভের যুদ্ধে জয়পুররাজ ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া জয়পুর জমিদারীর মোরসী সনন্দ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ১৬০০০ টাকা পেশকাস নিদিষ্ট হয়। এ ছাড়া জয়পুররাজকে কোটিপাদ তালুকের জন্ত বস্তাররাজকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা দিতে হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজপরিবার মধ্যে গৃহবিবাদ বাধে। শেষে এই গোলযোগে এতদূর গড়াইয়াছিল যে, ব্রীটশগবর্নমেন্ট জমিদারীর নিম্নাংশ অবরোধ করিতে বাধ্য হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সেই বিবাদ আরও গুরুতর হইয়া রক্তপাত আরম্ভ হইল। শান্তি-স্থাপনের জন্ত ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ব্রীটশগবর্নমেন্ট প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। একজন সহকারী এজেন্ট, ৬ জন সর্ভদারিষ্ট্রেট ও কতকগুলি পুলিশসৈন্য এখন রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকে। সেই অবধি রাজার পূর্ণ কর্তৃত্ব গিয়াছে। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইবার শবর-বিদ্রোহ হয়।

এখানে নানা জাতির বাস হইলেও রীতিনীতি ও ধর্মকর্ম বড় একটা প্রভেদ নাই। যেখানে অধিক অসভ্যজাতির বাস, সেখানকার নবগত সভ্যজাতিরও আচার ব্যবহার অনেকটা আদিম অসভ্যদিগের মত হইয়া দাঁড়াইরাছে। আবার সহরের নিকট যে সকল অসভ্যজাতি বাস করে ও কৃষিধারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারা আবার সভ্য হিন্দুর ছায় অন্ন বরসে কন্তার বিবাহ দিতেছে। কিন্তু ধর্ম কর্মে এখনও আদিম জাতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। অনেকেই কল্লদিগের অল্পজ্ঞিত মেরিয়া কাণ্ডে যোগদান করিয়া থাকে। পূর্বে এই মেরিয়া উৎসবে নরবলি হইত। কিন্তু ব্রীটশ-গবর্নমেন্টের যত্নে এই কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখানকার লোকেরা বহু অসভ্যদিগের ছায় বড়ই ডাইনের ভয় করে। জয়পুর, আসামহ লখিমপুর বেলায় অন্তর্গত একটা নগর।

জরমঙ্গলরস (পূঃ) জয়েন রোগজয়েন মঙ্গলা বস্মাৎ, তাৎপা-
রসঃ। জরনাশক ঔষধবিশেষ। হিজুলের রস, গন্ধক, সোহাগার
খই, তাজ, বঙ্গ, স্বর্ণমাস্তিক, সৈন্ধব ও মরিচ প্রত্যেক ৪ মাষা,
স্বর্ণ ১ তোলা, লোহ ৪ মাষা, রৌপ্য, ৪ মাষা, এ সমুদয় একত্র
মর্দন করিয়া ধূতরাপত্রের রসে ও শেফালীপত্ররসে, দশমূল
কাথে ও চিরতার কাথে যথাক্রমে তিনবার ভাবনা দিয়া দুই
ওজাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান—জীরকচূর্ণ ও
মধু। জরমঙ্গল রস সেবন করিলে নানাবিধ ধাতুজ্বর নষ্ট
হয়। ইহা বিষম ও জীর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যারঃ)।

যতান্তরে—প্রস্তুত করিবার প্রণালী—ত্রিকলা প্রত্যেক দুই মাষা, পিঙ্গলী ২ মাষা, লোহ ৪ মাষা, অজ ২ মাষা, তাজ ২ মাষা, রোপ্য ৫ রতি, বর্ণ ৫ রতি। রস ও গন্ধকের কঙ্কলী করিয়া পপটি পাক করিয়া লইবে। পরে ৪ মাষা পপটি পূর্বোক্ত ঔষধে দিয়া নিরলিখিত ঔষধে তাবনা দিয়া মৃদুপ্রমাণ বটা প্রস্তুত করিতে হয়। এই বটার অল্পপান—তুলসীপত্ররস ও মধু। ভাবনার অল্প জয়ন্তীপত্ররস, বিজয়ারস, চিতারস, তুলসী রস, আদার রস, কেশরাজ রস, তুলসীপত্ররস, নিম্বী-রস, খুলকুড়ীরস, প্রত্যেক রসের পরিমাণ দুই তোলা। এই ঔষধ শোধ করে ও সর্বদা বিবম করে প্রয়োজ্য।

(চিকিৎসাসারসংগ্রহ)

জয়মঙ্গলী, মহিন্দ্র রাজ্যে প্রবাহিত একটি নদী। দেবরায়-হর্গ নামক গিরি হইতে বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে তুমুড় জেলার কোর্টগিরি তালুকের মধ্য দিয়া বেলারি জেলার উত্তর পিনাকিনী নদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার বালুকা-ময় গর্ভে কপিলী নামক কুপ সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

জয়মল, একজন বিখ্যাত রাজপুত্রবীর ও বেদনোরের অধিপতি। ইনি মেবারের একজন প্রধান সামন্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। যখন সঙ্গরাণার পুত্র ভীক উদয়সিংহ অকবরের ভয়ে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যান, সেই সময় বেদনোরের জয়মল ও কৈলবার পুত্র চিতোররক্ষার্থ বাদশাহ অকবরের বিরুদ্ধে অসি-ধারণ করিয়াছিলেন।

উক্ত মহাবীরস্বরের অসাধারণ বীর্যবত্তা-দর্শনে মোগল সেনাপতিগণও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

পরিশেষে জয়মল জননী জমজুমির জন্ত ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অকবরের হস্তে নিহত হন। দিল্লীশ্বর যুগিত উপারে জয়মলের প্রাণবধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অল্পম তেজোবীর্যের মহিমা বিস্তৃত হন নাই। তিনি উক্ত রাজপুত্র বীরস্বরের প্রস্তর-প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া দিল্লীনগরে আপন প্রাণীদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্মিংহামের দিল্লীর সিংহদ্বারে প্রবেশকালে উক্ত দুই মূর্তি দর্শন করিয়া বীরদুগল ও উভয়ের বীর্যবত্তা জননীর বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন।

জয়মল, একজন ধর্মশীল রাজা। ইনি অতিশয় বিকৃত-পরাণ ছিলেন, তাঁহার গৃহে শ্রামলসুন্দর নামে একটি দেব-মূর্তি ছিল। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ দশদণ্ডকাল সেই বিগ্রহের পূজা করিতেন। এমন কি সেই দশ দণ্ড সময়ের মধ্যে যদি

তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইয়া বাইত, তাহা হইলেও তিনি ককপূজা ত্যাগ করিতেন না। তাঁহার এইরূপ স্বভাব জানিতে পারিয়া অল্প এক রাজা সৈন্তে উক্ত সময়ের মধ্যে আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। শত্রুহস্তে তাঁহার রাজ্য লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল, তখন তাঁহার মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে ক্রতবেগে দেবগৃহে আসিয়া জয়মলকে বলিলেন, “বৎস! সর্বনাশ উপস্থিত, শত্রু আসিয়া তোমার রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতেছে এবং সর্বস্ব লুটিয়া লইতেছে, তুমি কেমন করিয়া নিকিস্ত রহিয়াছ, তোমার আশ্রয় ভিন্ন সৈন্তগণ শত্রুসৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেছে না, দাঁড়াইয়া পরাজিত হইতেছে।” জয়মল মাতার এতাদৃশ বচন শুনিয়া কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না, বরং কহিলেন, “মা! কেন আপনি উদ্বিগ্ন হইতেছেন। যিনি আমাকে এই বিপুল সম্পদ দিয়াছেন, তিনিই লইতেছেন, যাহার সম্পদ তিনি লইলে কাহার সাধ্য রোধ করে। সামান্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, এমন কি, এখন যদি শত্রু আসিয়া আমার মস্তক ছেদন করে, তথাপি আমি নিয়মিত পূজা ত্যাগ করিব না।” এই সময়ে জয়মলের ইষ্টদেব শ্রামলসুন্দর ভক্তের হিতসাধনার্থ স্বয়ং বীরবেশে শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে হস্তার করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের রাজা ভিন্ন সমস্ত লোককে শাণিত অস্ত্রে ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর রাজা জয়মল নিয়মিত পূজা শেষ করিয়া যোদ্ধাবেশে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একমাত্র শত্রু রাজা ব্যতীত সকল ব্যক্তিকেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, এরূপ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াগত হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমার কোন্ হিতৈষী বন্ধু এইরূপ শত্রু-দিগকে নিহত করিলেন? এমন সময় সেই পরাজিত রাজা কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “মহারাজ! আমি না জানিয়া যেমন অসৎকর্ম করিতে আসিয়াছিলাম, এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল লাভ করিলাম। আপনার কে একজন শ্রামমূর্তিদারী বীরপুরুষ অধারোহণে আসিয়া আমার সমস্ত সৈন্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিছায়েগে কোথায় চলিয়া গেলেন। এখন আমি আর আপনার সহিত শত্রুতা করিতে চাহি না, আপনি আমার সমস্ত রাজ্যধন গ্রহণ করুন। আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণরূপে বশতা স্বীকার করিলাম। কিন্তু সেই শ্রামলসুন্দর পুরুষকে দেখিবার জন্ত মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব যদি অল্পগ্রহ করিয়া আর একবার সেই বীরপুরুষকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি কৃতজ্ঞতার্থ হইব। আমার সর্বস্ব গিয়াছে, তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কিন্তু সেই মহাবীর মূর্তির ভিতর কি

এক অনির্দিষ্টকালের মূর্তি দেখিয়া অবধি আমার বঙ্গপ্রাণ
কমিয়া গিয়াছে, তাহা একমুখে বলিতে পারি না। আমি আর
একবার তাঁহাকে দেখিব।" তখন জয়রাম সুখিমনে, ইষ্টদেব
ভ্রামরমূর্তিরই সেই বীরপুরুষ। সমস্ত জয়রাম পরাজিত শত্রু-
রাজকে হইয়া ভ্রামরমূর্তিরই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া
বসিলেন, "মহারাজ! আপনি যে বীরপুরুষকে দেখিতে চাহি-
তেছেন, এই দেখুন, ইনিই সেই বীরপুরুষ।" সমস্ত শত্রু-
রাজও হরিজ্ঞান বৈভব হইয়া জয়রামের ভাব হরিপূজার
দিনাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। (তত্বাব।)

জয়মুখ্যক, মুক্তিচর্যমৃত পুত্র একজন কবি।

জয়মুক্ত (পুং) জয়ার্থ বক্ষ, অক্ষমধ বক্ষ।

জয়রথ, সুবিখ্যাত কাশীর কবি জয়রথের ভ্রাতা। ইনি অভি-
নবও প্ররচিত তত্ত্বালোকের তত্ত্বালোকবিবেক নামে টীকা
লিখিয়াছেন। [জয়রথ দেখ।]

জয়রাজ, শরতপুরের একজন বিখ্যাত রাজা।

জয়রাত (পুং) কলিকরাজের পুত্র। কোরব পাঙ্গীর একজন
যোদ্ধা, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভীমের হস্তে ইনি নিহত
হন। (ভারত ৭।১৫৫।২৮)

জয়রাম, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়।

১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ, ইনি কামধেনু-
পদ্ধতি, খেচরকোমুদী, গ্রহগোচর, মুহূর্ত্তালঙ্কার, রমলামৃত
প্রভৃতি কএকখানি জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ কামদাকীর নীতিসারসংগ্রহপ্রণেতা।

৩ কাশীধণ্ডের একজন টীকাকার।

৪ দানচন্দ্রিকা নামে এক নৃতিসংগ্রহকার।

৫ একজন বৈদান্তিক, জয়রামাচার্য্য ও বিজয়রামাচার্য্য
নামেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মাধবসম্প্রদায়ের
মত বিকছে পায়ওচপেটিকা নামে একখানি যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয়
সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

৬ রাধামাধববিলাস নামে কাব্য-রচয়িতা।

৭ শিবরাজচরিত্র নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৮ দংশোদ্ধার নামে সপ্তশতীর একজন টীকাকার।

৯ একজন বৈদিক পণ্ডিত, বলভদ্রের পুত্র, দামোদরের
পৌত্র এবং কেশবের শিষ্য। ইনি পারশ্বরমূর্ত্ত্যুজের সজ্ঞন-
বল্লভ নামে টীকা রচনা করেন।

১০ পভামৃততরঙ্গিনীর সোপানার্চনা নামে টীকাকার।

জয়রাম তর্কবাগীশ, একজন বিখ্যাত বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত।
ইনি ভগবদগীতার্থসংগ্রহ ও ভাগবতপুরাণ-প্রথমসৌক্যার্থা
নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাম তর্কবাগীশ, পাবনা জেলা-নিবাসী একজন বিখ্যাত
নৈরাসিক। ইনি বাল্লভভ্রমরী প্রাক্তন। ইহার শিষ্যক বাব জয়-
বেব, তিনি খুটীয়াভ্রমরী বঙ্গাপত্তিত ছিলেন। বুদ্ধবল্লভে নব-
দীপে অধিবাসি বাস করেন। আল্পলেশপাঙ্কর এখনও জয়রামের
বংশধরেরা বাস করিতেছেন। জয়রাম নৈরাসিক চুড়ামণি
পদধরীর ছাত্র ছিলেন। ইনি পদধরী কৃত শক্তিবাদের
বিশদ টীকা লিখিয়া যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।
জয়রাম স্মারপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, একজন বিখ্যাত নৈরা-
সিক, রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ও জ্ঞানার্জন ব্যাবের গুরু।

ইনি জয়রামীর নামে ভাস্কর্য্য, শিরোমণিকৃত জয়চিহ্না-
বর্ণিনীমিত্তির টীকা; রঘুনাথ-কৃত ভগবৎপ্রকাশনীমিত্তির
টিপ্পনী, জায়কুম্ভাঙ্গলি টীকা, অজ্ঞাখ্যাতিভব, অন্ধাকাঙ্ক্ষা-
বান্দ, আখ্যাতবাদটিপ্পনী, উদ্দেশ্যবিধেয়বোধস্থলী-বিচার,
জাতিপক্ষতাবাদ, নানার্থবাদটিপ্পনী, প্রতিযোগিতাবাদ, বিশিষ্ট-
বৈশিষ্ট্যবাদ, বিষয়তাবাদ, ব্যাপ্তিবাদটীকা, সমাসবাদ, সামগ্রী-
বাদ, সামাজ্যলক্ষণনীমিত্তিটিপ্পনী, হেতুভাসননীমিত্তিটিপ্পনী, ক্র-
রাম তর্কবাগীশের কারকব্যাহের ব্যাখ্যা, পক্ষধর্ম্মমিশ্রকৃত
মণ্যলোকের শব্দালোকবিবেক, শব্দালোকরহস্ত, বৈশেষিক
দর্শনের পদার্থতত্ত্বের পদার্থমণিমালা এবং গোতমমত্বের
ভায়সিদ্ধান্তমালা নামে এক ভাস্কর্য্য রচনা করেন। ১৭৫০ সম্বতে
ভায়সিদ্ধান্তমালা রচিত হয়।

জয়লেশ (পুং) জয়পত্র, বাহাতে জয় লিখিত থাকে।

জয়বৎ (ত্রি) জয়ী, বিজয়ী, জয়শীল।

জয়বন, কাশীরের অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান, তৎকককুণ্ডের
জন্ত বিখ্যাত ছিল। (বিক্রমাব্দ) ইহার বর্তমান নাম
জেবন, শ্রীনগর হইতে ৩ কোশ দূরে অবস্থিত।

জয়বর্ম্মদেব, ১ ধারার একজন মহারাজ। ইনি বশোবর্ম্মদেবের
পুত্র। ভূপাল হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে ইহাদের পরিচয়
আছে। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২ চন্দ্রোদ্ভব-বংশীয় একজন রাজা। [চন্দ্রোদ্ভব দেখ।]

জয়বরাহতীর্থ (স্ত্রী) বর্ম্মদাতীরহ তীর্থবিশেষ। (শিবপুং)

জয়বাহিনী (স্ত্রী) জয়ত জয়ন্ত বাহিনী বহা সমবরসভাধাং
সংগ্রামে বা জয় বহতীতি বহ-গিনি, ততো ভীপু। ১ শতী,
ইজ্যাপী। (হেম) ২ জয়যুক্ত সৈন্ত। (শকার্ণচিৎ)

জয়শব্দ (পুং) জয়শব্দক শব্দ। জয়শব্দ।

জয়শাল, জয়শালমের চূর্ণ ও বরষ-প্রতিষ্ঠান। বহুশক্তি হসা-
ভের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ইনি শিষ্যক মুহুর
পর রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। হসাভের মৃত্যুর পর
সামন্তগণ মেবার-রাজনগিনীর পক্ষপাত হসাভের ও পুত্র

গজবিজয়কে সিংহাসন অর্পণ করেন। মহাবীর জয়শাল আপনাদি প্রাণ্য সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসেন। কিন্তু কিরূপে তিনি আপন পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবেন, সর্বদাই তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজা লজবিজয়ের অন্নদিন মধ্যে বৃহৎ হওয়ার তাঁহার পুত্র ভোজদেব সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু ভোজদেব সর্বদাই ৫০০ সোলাকী রাজপুত্রবীর কর্তৃক রক্ষিত থাকার জয়শাল তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময় গজনীপতি সাহেবউদ্দীন ঠটপ্রদেশ অধিকার করিয়া পট্টন অভিযুগে বাইবার উত্তোগ করিতেছিলেন। জয়শাল আর কোন উপায় না দেখিয়া শেবে অসমসাহসী হুইশত অঝারোহীসহ গজননরাজ্যে আসিয়া সাহেবউদ্দীন ঘোরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জয়শাল জানিডেন, অণহলবারপট্টন বন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভোজদেবের শরীররক্ষী সোলাকী-গণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমিরক্ষার্থ গমন করিবে, তিনিও সেই সুযোগে মরুস্থলী অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। এখানে আসিয়া জয়শাল গজনীপতিকে আপনাদি মনোভাব জানাইলেন। সাহেবউদ্দীন তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্ত তাঁহাকে কএক সহস্র সৈন্ত প্রদান করিলেন। সেই যবনসেনার সাহায্যে জয়শাল লদোবা আক্রমণ করিলেন। ভীষণ সময়ে ভোজদেব নিহত হইলেন। অবশেষে ভট্টসৈন্তগণ জয়শালের বশতা স্বীকার করিল। জয়শালের সহগামী যবনসেনানী করিম খাঁ লদোবা লুণ্ঠন করিয়া বিখার প্রদেশে চলিয়া গেলেন।

বীরবর জয়শাল মহাসমারোহে যাদব-রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন যে লদোবা নগর তেমন সুরক্ষিত নহে, অনায়াসেই শত্রুর আক্রমণ করিতে পারে। এই জন্ত তিনি ১২১২ সন্থে লদোবার ৫ ক্রোশ দূরে নিজ নামে জয়শালমের দুর্গ ও নগর স্থাপন করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে ভট্টজাতির প্রধান শত্রু চন্নরাজপুত্রগণ খাদাল প্রদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু মহাবীর জয়শাল তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রতিকূল দিরাহিলেন। উক্ত ঘটনার পাঁচ বর্ষ পরে ১২২৪ সন্থে তিনি ইহলোক পরিত্যক্ত করেন। তাঁহার দুই পুত্র জগদে, কল্যাণ ও শালিবাহন।

এবল পরাক্রান্ত পাহাড়টি হইতে জয়শাল মজী নির্মাচন করিডেন। কল্যাণ সেই মজীগণের বিদ্যাপভাজন হওয়ার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজ্যলাভ করেন নাই, শেবে

তাঁহাদের দ্বারা নির্মাণিত হইরাহিলেন। জয়শালমের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জয়শালমের (জয়শালীর) রাজপুতানার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তর সীমা বহাবলপুর, পূর্বে বিখানের ও বোহপুর, দক্ষিণে বোহপুর ও সিদ্ধ এবং পশ্চিমে ধরেনপুর ও সিদ্ধপ্রদেশ। অক্ষা° ২৬° ৫' হইতে ২৮° ২৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬২° ২৯' হইতে ৭৭° ১৫' পূঃ। ভূপরিমাণ ১৬০৩৯ বর্গমাইল। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের সংখ্যাসারে এখানে ১১৫৭০১ জন লোকের বাস। আর প্রায় লক্ষ টাকা। এই স্থান মরুস্থলী নামে খ্যাত। রাজপুতানার বালুকামর মরুভূমি নইয়া এই জয়শালমের রাজ্য। জয়শালমের নগরের চারি পার্শ্ব প্রায় ২০ ক্রোশ প্রস্তর ও বালুপ্রস্তরময় এবং অস্বর্কর। রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন বালুকা-সমুদ্র, তাহা কোথায় বা ১৫০ ফিট উচ্চ। পশ্চিমাংশে বালুগিরিগুলি কোণ নামক জললে পরিপূর্ণ। পশ্চিমাংশে বড় বড় তৃণগুচ্ছ দৃষ্ট হয়।

এখানকার গ্রামগুলিতে ছোট ছোট আটচালা ও মধ্যে মধ্যে লবণাক্ত কূপ আছে। প্রতি গ্রামেই লোক সংখ্যা অতি কম। তর্গোৎ ও জয়শালমেরের পশ্চিমাংশে চাষের বন্দোবস্ত হইতেছে। নোহ, বিকমপুর ও বীরশীলপুর নামক গ্রামেই বালুগিরির মধ্যে মধ্যে জোয়ার ও বাজার চাষ হয়। এখানে জলকষ্ট আছে। কূপে যে জল পাওয়া যায়, তাহাও লবণাক্ত। কূপগুলি প্রায় ২৫০ ফিট গভীর। একস্থানে ৪৯০ ফিট গভীর কূপও দৃষ্ট হয়।

এখানকার লোকেরা বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখে, তাহাই পান করে। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মধ্যে কেবল কাকিনি নামে একটা ক্ষুদ্র নদী আছে। সেই নদী কোটুরী, গোহিরা ও লতাবানা গ্রামের মধ্য দিয়া ২৮ মাইল গিয়া হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে। ঐ হ্রদের নাম ভূজঝিল। যে বর্ষে বেশী বৃষ্টি হয়, সেই সময়েই কেবল এই নদীর বেগ পরিবর্তন হইয়া কালখানা ও লোধোরোয়া গ্রাম হইয়া ভূজ হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরে রণ নামক লোণা জলায় গিয়া অন্তর্হিত হয়। পূর্বে এই রাজ্যের মধ্য দিয়া লাঠিকা নদী নামে একটা নদী প্রবাহিত হইত, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহার গর্ভ এককালে শুকাইয়া গিয়াছে।

জলবায়ু। এই স্থান শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। কখন মরু হয় না। জর, প্রীহা, চর্মরোগ ও বসন্তরোগ এখানে দেখা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে চুলহ গ্রীষ্ম পড়ে এবং দারুণ উষ্ণ বায়ু বহিতে থাকে। বৃষ্টি পড়িলে আবার বেশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই রাজ্যের উত্তরাংশেই শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রবল।

ইতিহাস। জয়শালমেরের সর্বপ্রথম বহুতটবর্তী রাজপুত্রগণের বাস। ইহারা সকলেই আপনাদিগকে সুবিখ্যাত বহুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। এখানকার অধিপতিও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ পঞ্জাব ও আকগানস্থান অঞ্চলে প্রবল প্রভাপে রাজত্ব করিতেন। মহাত্মা টড সাহেব রাজপুত ভাটের নিকট শুনিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

‘বহুবংশধরস কালে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র* বজ্র মথুরা হইতে ২০ ক্রোশ আসিয়াই পথে বহুবংশধরস ও পিতৃনিধনবার্তা শ্রবণ করেন। এই দুর্ঘটনা শুনিয়াই তিনি শোকে অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপুত্র নব মথুরার আসিয়া রাজা হইলেন। বজ্রের অপর পুত্র কীর দ্বারকার চলিয়া আসেন। তাঁহার দুই পুত্র জাড়েজা ও যুদ্ধভাহু। রাজা নব উত্যক্ত হইয়া মরুস্থলীতে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহার পুত্র মরুস্থলীরাজ পৃথীবাহু শ্রীকৃষ্ণের রাজচ্ছত্র পাইয়াছিলেন। তৎপুত্র বাহবলের সহিত মালবরাজ বিজয়সিংহের কন্যা কমলাবতীর বিবাহ হয়। রাজা বাহবলের পুত্রের নাম সুবাহু। ইহাকে একবার স্নেহরাজ আক্রমণ করেন। সুবাহুর সহিত অজমীররাজ যুদ্ধের কন্যার বিবাহ হয়। সেই রাজবালাই বিব্রপ্রয়োগে স্বামীর প্রাণ হরণ করেন। তৎপুত্র ঋজু ১২ বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার সহিত মালবরাজ বীরসিংহের কন্যা সোভাগ্যসুন্দরীর বিবাহ হয়। গর্ভাবস্থার সোভাগ্যসুন্দরী খেতগজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই জন্ত নবজাত শিশুর ‘গজ’ নাম রাখা হইল। গজ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে পূর্বদেশাধিপতি যুদ্ধভাহু কন্যার বিবাহ দিবার জন্ত মরুস্থলীরাজের নিকট নারিকেল পাঠাইলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে যবনেরা আবার সমুদ্রতট আক্রমণ করিয়াছে। রাজা ঋজু সসৈন্তে যবনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। গজ যুদ্ধভাহুর কন্যা হংসবতীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। তিনি খোরাগান-পতিকে দুইবার পরাস্ত করেন। তখন যবনরাজ রোমপতির সাহায্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। দূত আসিয়া সংবাদ দিল—

‘কুমিপৎ খুরাগানপৎ হয় গয় পুথুর পায়।

চিন্তা তেরা চিংলেগি শুন বহুপৎ রায় ॥’

রাজা গজপতি ইতিপূর্বে নিজ নামে গজনী দুর্গ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। এখন যবনদিগের আগমন সংবাদ পাইয়া

খোলাপুরে গিয়া কচ্ছাবার স্থাপন করিলেন। উত্তর রাজা সঙ্কুবীন হইলেন। নিশার খোরাগানপতি অতীর্ণরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেকন্দের শাহ সসৈন্তে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। উন্নয়ন যুদ্ধ হইল। কিন্তু বাহবেরাই আজ জয়লাভী অর্জন করিলেন। ৩০০৮ বোধিষ্ঠরাখে বৈশাখ মাসে রবিবারে যুদ্ধপতি গজনীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি কান্দীর-পতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে গজের শালিবাহন নামে এক পুত্র জন্মে। শালিবাহনের দাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যবনেরা খোরাগান হইতে আসিয়া আবার দাদবরাজ্য আক্রমণ করে। এই সময় ভাবী-কল জানিবার জন্ত রাজা গজ তিন দিন কুলদেবীর মন্দিরে অবস্থান করেন। ৪র্থ দিবসে কুলদেবী দেখা দিয়া তাঁহাকে বলেন, “এই যুদ্ধে গজনী তোমার হস্তচ্যুত হইবে বটে, কিন্তু তোমার বংশধরেরাই স্নেহধর্ম গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে এই স্থানে আধিপত্য করিবে। তোমার পুত্র শালিবাহনকে শীঘ্র পূর্বাঞ্চলে হিন্দুরাজ্যে পাঠাইয়া দাও।” তদনুসারে রাজা শালিবাহনকে স্থানান্তর করিলেন। তিনি পিতৃব্য শিবদেবকে রাজধানীতে রাখিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধে গজের মৃত্যু হইল। যবনরাজ গজনী অধিকার করিতে আসিলে শিবদেবও ৩০ দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া শেষে শাকবজ্রের অস্ত্রচালন করিলেন। সেই যুদ্ধে নয় হাজার দাদববীর প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। শালিবাহন সেই দুর্ঘটনার পরে পঞ্জাবে আগমন করেন। এখানকার ভূমিরাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। তিনি ৭২ বিক্রমাব্দে শালিবাহনপুর স্থাপন করিলেন। তাঁহার ১৫টা পুত্র বলন্দ, রসালু, ধর্ম্মাজন, বৎস, রূপ, সুন্দর, লেখ, বশস্কর্ণ, নিমি, মত, গজাহু ও যজ্ঞাহু। ঐ ১৫ জনই এক একটা স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন।

বলন্দের সহিত তোমরবংশীয় দিল্লীপতি জয়পালের বিবাহ হয়। দিল্লীপতির সাহায্যে শালিবাহন গজনী উদ্ধার করেন এবং তথায় জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দদেবকে রাখিয়া আসেন।

শালিবাহনের পর বলন্দ পিতৃঅধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপর ভ্রাতারা পাহাড়ের পার্বত্যপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। বলন্দ নিজেই রাজকার্য্য দেখিতেন। তাঁহার সময়ে যবনেরা আবার গজনী অধিকার করিয়া বসে। বলন্দের সাত পুত্র জন্মে,—ভট্ট, ভূপতি, কল্লর, জিজ, সরমোর, মহিবরোধ ও মজরাও। ভূপতির পুত্র চকিতো হইতেই চকুতাই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। চকিতের ৮ পুত্র দেবসিং, ভৈরব সিং, কেমকর্ণ, নাহর, জয়পাল, ধরসিং, বীজলী-খাঁ, শাহ সম্মল। বলন্দ চকিতের উপর গজনীর আধিপত্য প্রদান করেন।

* টড ভবদ্রমে ইহাকে কৃষ্ণের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যবনেরা তাঁহার নিকট গজনী অধিকার করিয়া বলে যে, “তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাকে বলিচ-বোখারার রাজত্ব দিব।” তাহাতে চকিং স্বেচ্ছধর্ম গ্রহণ করিয়া বলিচ-বোখারার এক রাজকন্ডার পাণিগ্রহণ করেন ও সেই বিবাহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরেরাই এখন চকিতো-মোগল বা চাগুতাই মোগল নামে খ্যাত। চকিতের মতে কল্লরও স্বেচ্ছধর্ম গ্রহণ করেন।

ভটি পিতৃ-অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতেই তৎ-স্ব-স্বীয়েরা সকলেই এখন যত্নভটি রাজপুত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকে।

ভটিরাজের ছই পুত্র মঙ্গলরাও ও মজুররাও। মঙ্গলরাওর সময় গজনীপতি লাহোর আক্রমণ করেন। এই সময় শালি-বাহনপুর (শালকোট) যত্নপতির হস্তচ্যুত হয়। মঙ্গলরাওর পুত্র মধ্যমরাও, কল্লরসিং, মুণ্ডরাজ, শিবরাজ, ফুল ও কেবল। গজনীরাজের আক্রমণকালে মঙ্গলরাও জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাভিমুখে পলাইয়া যান।

তাঁহার অপর পুত্রগণ শালিবাহনপুরে একজন বণিকের ঘরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হন। যজ্ঞীদাস নামে তক (তক্ষক) জাতীয় এক ভূমিয়ার বিজয়ী যবনরাজকে গিয়া সেই গুপ্ত সংবাদ প্রদান করে। এই ভূমিয়ার পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতেই ভটিরাজের পূর্বপুরুষগণ ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যজ্ঞীদাস তাহারই প্রতিশোধ লইল।

গজনীপতি বণিককে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে রাজপুত্রগণকে আমার নিকট হাজির করিবে। সদাশয় বণিক তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, “আমার ঘরে কোন রাজকুমার নাই, একজন ভূমিয়ার দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তাহারই পুত্রগণ আছে।” কিন্তু যবনরাজ সেই পুত্রগণকে উপস্থিত করিবার আদেশ পাঠাইলেন। বণিক তখন রাজকুমারদিগকে দীন কুবকের বেশ পরাইয়া রাজার নিকট আনিল। ধূর্ত যবনরাজও জাঠ জাতীয় কুবককুমারী আনাইয়া তাঁহাদের সহিত বিবাহ দিলেন। এইরূপে কল্লরের পুত্রেরা কল্লোরিয়া জাঠ, মুণ্ডরাজ ও শিবরাজের বংশধরগণ মুণ্ডজাঠ ও শিউরজাঠ; ফুল নাপিত ও কেবল কুন্তকার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সেই জন্য ফুলের বংশধর নাপিত এবং কেবলের বংশধরগণ কুন্তকার জাতিতে পরিণত হয়।

মঙ্গলরাও গড়া জঙ্গলে আসিয়া নদী অতিক্রম করিয়া একটা নবরাজ্য অধিকার করেন। তখন এখানে নদীতীরে বরাহ, ভূতবনে ভূত, পুগলে প্রমার, ধাতে সোদা এবং লদোবানামক স্থানে লোদরা রাজপুত্রের বাস ছিল। এখানে

সোদা রাজকুমারের সহিত মিলিত হইয়া মঙ্গলরাও নিরাপদে রাজ্য করিতে থাকেন।

তৎপুত্র মধ্যমরাও (মজুমরাও) জয়কোটের সোদা-রাজকন্ডার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র কেয়ুর, মুলরাজ ও গোগলি। কেয়ুর নানাহান লুট করিয়া অনেক ধন সংগ্রহ করেন। পঞ্চনদের এক রাজকন্ডার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

কেয়ুর তুর্গদেবীর স্বরণার্থ তর্গোংগড় নির্মাণ করেন। এই গড় সম্পূর্ণ নাই হইতেই মধ্যমরাও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তর্গোংগড় বরাহ-সম্রদায়ের অধিকারের সীমা মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল, সেই জন্য বরাহ-সর্দার তর্গোং আক্রমণ করেন। কিন্তু রাজা কেয়ুরের যত্নে তিনি সসৈন্তে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হন।

১৮৭ সন্থতে মাঘমাসে মঙ্গলবারে রাজা কেয়ুর তর্গমাতার উদ্দেশে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পরে বরাহ * রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। এই সময় মুলরাজের কন্ডার সহিত বরাহ-সর্দারের বিবাহ হয়।

ভটিজাতির ইতিহাসে কেয়ুর সর্কাপেক্ষা সম্মানিত হইয়াছেন। অনেকের মতে কেয়ুরের পূর্ববর্তী ইতিহাস অধিকাংশ উপাখ্যানমূলক, এই কেয়ুর হইতেই প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ।

কেয়ুরের পাঁচ পুত্র—তর্গ, উত্তিরাও, চরর, কাকরি ও দায়েম। এই পাঁচজনের বংশধরের নাম হইতেই ভটিজাতির প্রধান শাখাগুলির নামকরণ হইয়াছে।

কেয়ুরের পর তর্গ রাজা হন। তিনি বরাহ ও মুলতানের লক্ষহা রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই হোসেনশাহ স্বেচ্ছধর্মাবলম্বী লক্ষহারাজপুত, ছদি, মিতি, কুতুর, মোগল, জোহিয়া, যোধ ও সৈয়দ-সৈয়দ সঙ্গে লইয়া তর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ঐ সময় বরাহসর্দারও স্বেচ্ছরাজের সহিত যোগ দেন। তর্গের পুত্র বিজয়রায়ের পরাক্রমে সকলেই পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

তর্গের পাঁচ পুত্র বিজয়রায়, মকর, জয়ভূজ, অল্লন ও রাক্ষস।

মকরের পুত্র দেশাও নিজ নামে একটা বৃহৎ হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। মকরের বংশধরেরা সকলেই স্বত্বধার, এখন “মকর-স্বতার” নামে অভিহিত। জয়ভূজের ছই পুত্র রতনসিংহ ও চোহির। রতনসিংহ বিধবস্ত বিকমপুর নগরের পুনর্সংস্থার করেন। চোহিরের ছই পুত্র কোলা ও গিরিরাজ কোলাশির ও গিরাজশির নামে দুইটা নগর পত্তন করেন।

* এই রাজপুতশাখার আর চিহ্নমাত্র নাই। বহুকাল ইহারা মুলনান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

অন্যের জারি পুজ দেবসিংহ, ত্রিভুজ, ভবানী ও সকেতো। দেবসিংহের বংশধরেরা “দেবরী” অর্থাৎ উত্তরাধিকার গ্রহণের অধিকারেরা এখন কলোন্ডায় বাসে পড়ত।

রাজা তপস্বিরাজদেবী দেবীর কাছাকাছি গুপ্তধন লুণ্ঠন করেন, তাহাতে তিনি বিজয়রায় নামে একটি ছদ্মবর্ষ নির্মাণ করিয়া ১১০ বর্ষতে বার্ষিকীতে প্রোহিতী নকড়ে এই দুর্গে বিজয়রাসিনী নামে দেবী মূর্তি স্থাপন করেন। ইনি ১১০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৭০ লক্ষ্যে বিজয়রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজত্ব করিয়া তাঁহার চিরশত্রু বরাহদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন।

ভূতবর্ষের রাজকুমার সহিত বিজয়রায়ের বিবাহ হয়। ১২২ সন্থতে তাঁহার গর্ভে দেবরাজ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। কিছুদিন পরে বরাহ ও লক্ষ্মীজাতি আবার তট-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু এবারও তাঁহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। অল্প দিন পরে বরাহপতি বিজয়রায়ের পুত্রের সহিত নিজ কস্তার বিবাহ দিবস উপলক্ষ্যে করিয়া নারিকেল পাঠাইলেন। বিজয়রায় শ্রীর পুত্র দেবরাজের বিবাহ দিবস উপলক্ষ্যে বরাহরাজ্যে আসিলেন। এখানে বরাহপতির বড়বয়ে রাজা বিজয়রাজ ও তাঁহার আটশত জাতি কুটম্ব নিহত হন। দেবরাজ বরাহপতির পুরোহিত-গৃহে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এখানে তাঁহার চির-শত্রু বরাহগণ তাঁহার অসুস্থতাই হইয়াছিল। ধার্মিক পুরোহিত বধন দেখিলেন যে রাজকুমারকে আর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি আপন মস্তকুদ্রে দেবরাজের কণ্ঠে অর্পণ ও তাঁহার সহিত এক পাত্রে আহার করিতে থাকেন। এইরূপে দেবরাজের প্রাণ রক্ষা হইল।

বরাহেরা তদর্পে অধিকার করিল। কিছুদিন ভট্টজাতির নাম পর্যন্ত ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইল।

দেবরাজ কিছুদিন ছদ্মবেশে এক বোণীর আশ্রয়ে বরাহ রাজ্যে অতিবাহিত করিয়া ভূতবনে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি ছদ্মবেশে জননীকে দেখিতে পান। উভয়ের অশ্রুধারে উভয়ের বক্ষস্থল ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন শোকাতুরা রাজনন্দিনী বলিয়াছিলেন—

“যেক্ষণে এই অশ্রুধার বিগলিত হইল, এইরূপে তোমার শত্রুকুল বিগলিত হইবে।”

মাতুলালয়েও বীরবর দেবরাজের অধীনতা ভাল লাগিল না, তিনি একখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি মকছুমির মধ্যে অতি সামান্য একখণ্ড ভূমি পাইলেন।

তথায় ২০০ লক্ষ্যে তাটবের-দুর্গ-নির্মাণ করিয়া আসক দিল্লীর রাজারো সিন্ধু নামে দেবপুত্র বা দেওরায়াল নামে দুর্গ নির্মাণ করিলেন।

দুর্গ নির্মাণের সংবাদ পাইয়া ভূতবর্ষে তাগিলেনের দিকদে সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দেবরাজ কোণপুত্রের সেনা-সামর্য্যগণকে দুর্গরক্ষণে আসিয়া সকলের প্রাণ বিদায় করেন।

এবার এইরূপ বরাহরাজ্যে বোণীর আশ্রয়ে বধন দেবরাজ ছিলেন, একদিন বোণীর অসুস্থতাকালে সন্টনাকমে তাঁহার রসকুন্ত হইতে এককোটা রস লাগিয়া দেবের পৌত্রের অসি সুবর্ণে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া দেবরাজ সেই রসকুন্ত সংগ্রহ করেন। তাহারই বসে তিনি দেবপুত্র নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন সেই বোণী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলেন, “তুমি আমার ঋণ-সাধনের ধন ছুঁই করিয়া আনিয়াছ। যদি তুমি আমার চেলা হও, তবে তোমার রক্ষা, নহিলে নিষ্ঠুর নাই।” তিনি তৎক্ষণাৎ বোণীর শিষ্য হইলেন। তিনি গৈরিক বাস, কর্ণে সুত্রো, কটিতে কোপীন ও হাতে একটা কুম্ভার খোল ধারণ করিয়া শুক্ল আদেশক্রমে “আলখ” “আলখ” নাম উচ্চারণ-পূর্বক জাতিকুটম্বের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের খোল সোণা ও মুক্তার পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

দেবরাজ রাজ্য উপাধি পরিত্যাগ করিয়া রামল উপাধি গ্রহণ করিলেন। বোণীর আদেশ মত আশ্রয় জয়শালমের অধিপতি “রাবল” উপাধি গ্রহণ ও অতিথিকের সময় দেব-রাজের মত ভেক লইয়া থাকেন।

দেবরাজের অধস্তন বট পুত্রব রাজা জয়শাল। ইনি নিজ নামে জয়শালমের দুর্গ ও নগর নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি এই মকছুমের নাম জয়শালমের হইয়াছে। জয়শালের পর এই বংশে অনেক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সর্বদাই মুক্তবিগ্রহ ও দুটপাট লইয়া থাকিতেন। এই কারণেই ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভট্টগণ দিল্লীর আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছিল। দিল্লীর বহলখ্যাত সৈন্ত পাঠাইয়া জয়শালমের দুর্গ ও নগর অধিকার করেন। তৎপরে কিছুদিন এই স্থান জন-মানব-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। বহুবংশীর রাজগণ অনেকবার পরাজিত হইয়াও কেহ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। রাবল মলসিংহই প্রথমে শাহজাহানের অধীনতা স্বীকার করেন এবং দিল্লীর একজন সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হন। তখনও জয়শালমের রাজ্য শত্রুকন্যে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে মুলারাজের রাজ্যান্তিমক হইতে

জরশালমেয়র অধঃস্থ ক্রমে অভ্যন্তরগামী হইতে আরম্ভ হয়। ইহা অনেক স্থান বোমপুর ও বিকানেররাজের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

বকসর বসিরাই হুদাদ মহারাজ-সন্তোষণ এই রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মাল মুলারাজের সহিত ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের সন্ধি হয়। কিন্তু সাক্ষ্যকে কেমন কর দিতে হয় নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুলারাজের মৃত্যুর পর এখন পর্যন্ত জরশালমেয়র আর কোন সোভারেনগেট নাই। মুলারাজের পর তৎপুত্র গজসিংহ রাজা হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁহার বিধবামহিষী গজসিংহের ভ্রাতৃপুত্র রণজিৎসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈরিশাল মহারাজ পদ লাভ করেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন। (১)

কৃষি। জরশালমেয়র রীতিমত কোন প্রকার কৃষিপ্রণালী নাই। বর্ষা আসিলে উষ্ট্র দ্বারা বালুকাত্ম পের উপর লাঙ্গল

দেয় ও বেশী বড়ীর দ্বারা বীজ বোমে। এখানে খোঁতার, দলিরা, মুখা ও ভিন্ন প্রভৃতি প্রাচীনতম জন্তু, ঘন, ঘন প্রভৃতি শারদীর পত বড় একটা লেখা লিখা। এখানে তেমন, বেশী বৃষ্টি হয় না বলিয়া কেহে মলমলবরাহের কোন বন্দোবস্ত নাই।

এখানকার কৃষিকাজ প্রায় খারাই এক প্রকার রাজস্ব দেওয়া হয়। গম কি ছোলা জমিতে রাজা জাহার চতুর্থ হইতে বর্ষভাগ পর্যন্ত এবং প্রাচীন পত সপ্তম হইতে একাদশ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজার প্রাপ্য অংশ এই তিন সময়ে আদায় হয়। প্রথম যখন ক্ষেতে থাকে, তৎপরে কটা হইলে (মাক্কির পূর্বে), এবং শেষে মাক্কা হইলে পর। এ ছাড়া কৃষকদিগকে কেতরক্ষক, মাক্কিকর্তারী, ভাণ্ডারপতি ও রাজার জল-সরসরাহকারীকেও কিছু কিছু দিতে হয়। সৈনিক বিভাগে যাহারা কর্ষ করে, তাহারা বড় ইচ্ছা জমি লইয়া চাষবাস করিতে পারে, তাহাদিগকে কিছুই রাজস্ব দিতে হয় না। জাহাঙ্গীরদারেরা এক জোড়া বলদে বতটা জমি চাষ করিতে পারে, সেই পরিমাণ জমির উপর বার্ষিক ২০ টাকা হারে কর লইয়া থাকেন।

বাণিজ্য। এখানে ব্যঙ্গনা বাণিজ্যের সুবিধা নাই। পশম, মৃত, উষ্ট্র, গো, মেবাদি এখান হইতে গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে দীত হইয়া বিক্রীত হয়। শত, চিনি, বিলাজী কাপড়

(২) মাল দেবরাজ হইতে যে যে বাড়ি জরশালমেয়র আধিপত্য করেন, পর্যায়ক্রমে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল—

- ১। দেবরাজ।
 - ২। সুত বা চানুত।
 - ৩। মল্লিক* ১০০৫ সন্থতে অভিষেক।
 - ৪। দুসাজ*—১১০০ সন্থতে অভিষেক।
 - ৫। লজবিজয় রাজ (দুসাজের ৩য় পুত্র)
 - ৬। ভোজদেব* (লজবিজয়ের পুত্র)
 - ৭। জরশাল* (দুসাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১২১২ সন্থতে জরশালমেয়র প্রতিষ্ঠাতা।
 - ৮। শালিবাহন* (জরশালের এক পুত্র, ১২২৪ সন্থতে অভিষেক)
 - ৯। বিজলী* (শালিবাহনের পুত্র)
 - ১০। কল্যাণ (জরশালের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১২৫৭ সন্থতে অভিষেক)
 - ১১। কালিকদেব (কল্যাণের পুত্র) ১২৭৫ সন্থতে অভিষেক।
 - ১২। কলপ (কালিকদেবের পৌত্র ও ভোজসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র)
 - ১৩। লক্ষ্মণলেন* (কলপের পুত্র) ১৩২৭ সন্থতে অভিষেক।
 - ১৪। পুণ্যপাল* (লক্ষ্মণলেনের পুত্র)
 - ১৫। জরংসিংহ বা জরসিংহ (কালিকদেবের পৌত্র ও ভোজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৩৩২ সন্থতে অভিষেক।
 - ১৬। মুলরাজ* (উক্ত জরংসিংহের পুত্র) ১৩৫০ সন্থতে অভিষেক।
- [১৩৫১ সন্থতে আর একবার বহুবংশ লংসে হয়, আর ১৩৫৭ সন্থৎ পর্যন্ত বহুবংশীর কেহ জরশালমেয়র আধিপত্য করেন নাই।]
- ১৭। মালমুল* (জরংসিংহের বহুবীর জরশালের পুত্র) ১৩৬২ সন্থতে মৃত্যু।
 - ১৮। গুজসিংহ (১৪৭ রাজা পুণ্যপালের প্রপৌত্র, লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র ও রহসিংহের পুত্র) দিল্লীর হইতে জরশালমেয়র প্রাপ্ত হন।

- ১৯। কেদুর (গুজসিংহের দত্তকপুত্র, গুজসিংহের মৃত্যুর পর রাণী বিমলা দেবী হইতে সিংহাসন লাভ করেন। তৎপুত্র কল্যাণ ভিন্ন দ্বাদশ রাজস্ব করেন)
- ২০। জরংসিংহ (হারীরের পুত্র ও কেদুরের দত্তক)
- ২১। মুলকর্ণ* (জরংসিংহের কনিষ্ঠ)
- ২২। জীম* (মুলকর্ণের পৌত্র হররাজের পুত্র)
- ২৩। মনোহর দাস* (মুলকর্ণের পৌত্র ও কল্যাণদাসের পুত্র)
- ২৪। মুল সিংহ (মুলকর্ণের সখ্য পুত্র মলদেবের প্রপৌত্র)
- ২৫। অমরসিংহ (মুলসিংহের পুত্র) ১৭৫৮ সন্থতে মৃত্যু।
- ২৬। বশোবন্ত সিংহ (অমরের পুত্র) ১৭৫৮ সন্থতে অভিষেক।
- ২৭। অক্ষরসিংহ (বশোবন্তের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহের পুত্র)
- ২৮। ভোজসিংহ* (বশোবন্তের পুত্র, বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন)
- ২৯। সখাইসিংহ (ভোজসিংহের শিশু পুত্র)
- ৩০। পুরুষোক্ত অক্ষরসিংহ (সুন্দরার)
- ৩১। মুলরাজ* (অক্ষরসিংহের পুত্র) ১৮৮৮ সন্থতে অভিষেক।
- ৩২। গজসিংহ (মুলরাজের পৌত্র) ও মলসিংহের পুত্র।
- ৩৩। রণজিৎ সিংহ (গজসিংহের ভ্রাতৃপুত্র)
- ৩৪। বৈরিশাল (রণজিৎসিংহের সহোদর) এখন বর্তমান।

* চিত্রিত রাজগণের বিবরণ তৎপক্ষে প্রদত্ত।

ও তৈজসপত্র এখানে আমদানী হয়। রাজ্যের উপর প্রচুর দ্বন্দ্বি দ্বারা এখানকার অভাব পূরণ হয় না। এখানে মেঘের লোমে একপ্রকার স্তম্ভ কয়ল প্রস্তুত হয়।

বিচার। এখানে কোন দণ্ডরানী আমদানী হয়। দেওয়ান রাজধানীতে থাকিয়া এবং হাকিমেরা দূরস্থ গ্রামসমূহে থাকিয়া কোজদারী সংক্রান্ত বিচার করিয়া থাকেন। এখানে কোন কারাগার নাই। বিচারক ইচ্ছামুতাবেক হুঁকুম কিবা যে কোন স্থানে অপরাধীকে বন্দী রাখিতে পারেন। লেখাপড়া শিখিবার উপযুক্ত বিদ্যালয়সমূহ নাই, জৈন ধর্মকেবলই সামান্য শিক্ষা দিয়া বেড়ান।

এখানে ভাল রাস্তা বাট নাই। দূরদেশ যাতায়াতের পক্ষে উত্তম একমাত্র তরঙ্গ।

এই রাজ্যে ২২৯টা পরগণার ৪৬১টা গ্রাম আছে। ৭১টা পরগণা জায়গীরদারের অধীন, ৩২টা সনজ দ্বারা ও ১১টা লেখাপড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১০৯টা পরগণার “ভূম” বন্দোবস্ত অর্থাৎ জয়শালমের রাজ্যের বখনই প্রয়োজন, তখনই এখানকার জমিদার রাবলের নিকট উপস্থিত হইতে বাধ্য। কতক দেবোত্তর গ্রামও আছে। কোন অপরাধী দেবোত্তর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইলে তাহার উপর জয়শালমের-রাজের আর শাসনকর্তৃত্ব চলে না।

এখন মহারাবলের অধীনে ৫০০ উষ্ট্রারোহী এবং তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত জায়গীরদারদিগের অধীনে ৪০০ অঝারোহী সৈন্য আছে। অঝারোহীদিগের মধ্যে ৪০ জন শিখ, অপর সকলেই রাজপুত। পূর্বে এখানকার সৈন্যগণ যেমন মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিল, এখন আর সেরূপ অবস্থা নাই। কেহ রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাও করে না। কতকগুলি সামান্য বন্দুক, অসি, ঢাল ও বল্লমই এখনকার প্রধান অস্ত্র। মহারাবলের ১২টা কামান আছে।

জয়শালমের রাজ্যে অক্ষরশাহী টাকা ও দোদিয়া পয়সা প্রচলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাবল অক্ষরসিংহ এখানে টাঁকশাল স্থাপন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এখানকার মোহর ও টাকা প্রচলিত। মুলরাজ নিজ রাজ্যে মুদ্রা চালাইবার অজ্ঞা দিল্লী-সম্রাটের নিকট হইতে ফরমাণ পাইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইত। এখন কেবল অক্ষরশাহী টাকা ও ছদিয়া পয়সা প্রস্তুত হয়।

জয়শালমের, জয়শালমের রাজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৫৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৫৭' পূঃ। একটা বিস্তৃত গিরিমালার পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে রাবল জয়শাল এই নগর স্থাপন করেন। এখানকার গৃহগুলি

হরিৎবর্ণ বাসুপাথরে নির্মিত। ধনী ভট্টসাহাব ও পরিমাল বনিকবিগের গৃহগুলি প্রস্তরময় ও সুন্দর গিরিকার্যবদ্ধ, নগরের পাশেই গিরির উপর জয়শালমের দুর্গ অবস্থিত। ইহার নির্মাণ-কৌশল যত্নমৎকার, বেধিলেই কেবল শুক্ল ও মুরচা বলিয়া বোধ হয়। গড়ের চারিদিকে দুইলাইন দুর্ভেদ প্রাচীর দ্বারা পরিরক্ষিত। দুর্গের সিংহদ্বারের মধ্যেই মহারাবলের প্রাসাদ। প্রাসাদের মধ্যে তিনটা ভাল কুণ আছে। দুর্গের মধ্যেই কতকগুলি প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির আছে। এখানকার প্রাচীন মন্দিরটা ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। নগরের ৫ কোশ মধ্যে প্রতিবর্ষে একটা মহামেলা হইয়া থাকে।

জয়সিংহ, মিবারের বিখ্যাত রাণা রাজসিংহের পুত্র। তাঁহার জন্মের কএক বর্ষ পূর্বে ভীম নামে এক সহোদর জন্মে। যথাকালে উভয় ভ্রাতার রাজ্য লইয়া গোলযোগ বাধিতে পারে তাবিয়া, একদিন রাণা রাজসিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে অসি দিয়া বলেন, “যদি তোমার নিকটকে রাজ্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই শাপিত অসি দ্বারা তোমার কনিষ্ঠ জয়সিংহের মস্তক ছিঁও কর।” সদাশয় ভীম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “সামান্য রাজ্যাগোতে আমি প্রাণাধিক সহোদরের অগ্ন্যাত্ম অনিষ্ট করিতে পারি না। জয়সিংহ রাজ্য গ্রহণ করুক, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি মোবারির সীমা মধ্যে গওষমাত্র জল গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি আপনার ঔরসজাত পুত্র নহি।” এই বলিয়া তিনি জয়ভূমির মায়া বিসর্জন দিয়া মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিলেন ও বাহাদুর শাহের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার একজন সেনাপতি হইলেন।

১৭৩৭ সন্থতে মহাবীর রাজসিংহের মৃত্যুর পর জয়সিংহ নিরীক্সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যখন বাদশাহ অরঙ্গজেবের সহিত রাণা রাজসিংহের ষোরতর যুদ্ধ হয়, সেই সময় জয়সিংহ অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। কুমার আজিম ও দেলবার খাঁ সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ সেই সন্ধিস্থত্র বন্ধন করিলেন। রাজা হইবার পর জয়সিংহ “জয়সুন্দ” নামে একটা পঞ্চদশ কোশ-ব্যাপী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এরূপ বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় আর কোথাও নাই। সরোবর তীরে তিনি “কতারাণী” নামে খ্যাত কমলাদেবীর জন্ম ও একটা স্তম্ভের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।

জয়সিংহের দুইটা প্রধান রাণী ছিলেন—একজন বুদ্ধিমান-বংশীয়া জয়সিংহের জননী এবং অপরজন নাম কমলাদেবী।

কমলাদেবীকেই রাণা অধিক ভালবাসিতেন, কিন্তু কমলাদেবী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি জানিতেন তাঁহারই সপত্নী-পুত্র অমরসিংহ মেবারের আধিপত্য পাইবে, সুতরাং তাঁহার প্রতি রাণার অস্বরাগ বৃদ্ধা; এই ভাবিয়া তিনি সপত্নীর সহিত নানাপ্রকারে বিবাহ করিতেন। বুল্লী-রাজকন্যা তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিন পুত্র অমরকে যথেষ্ট তৎসনা করেন। তাহাতে অমরসিংহ উত্তেজিত হইয়া বুল্লীরাজ্যে গিয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এদিকে মেবারের অনেক প্রধান সামন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। অমরসিংহ প্রথমেই কমলমীরস্থ রাজকোষাগার অধিকার করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাণার পক্ষ হইতে কএকজন প্রধান সর্দার খিলবাড়া গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতেছেন শুনিয়া পিতার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। একলিঙ্গদেবের মন্দিরে পিতাপুত্রে মিলন হইল। জয়সিংহ ১৭৫৬ সন্থতে পুত্রকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

জয়সিংহ (সবাই), জয়পুরের একজন বিখ্যাত রাজা এবং ভারতের একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ। ইনি অশ্বরাজ মীর্জা জয়সিংহের প্রপৌত্র ও বিজুসিংহের পুত্র। বালককাল হইতে ইনি বিদ্যাহুরাগী ছিলেন। ১৭৫৫ সন্থতে (১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাধিরোহণের পরই ইনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতে যান। সেই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া দিল্লীশ্বরের প্রশংসাভাজন হন। সম্রাট ইহাকে প্রথমে দেড় হাজারী, তৎপরে দুই হাজারী মনসবদারী পদ প্রদান করেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে সময় সাম্রাজ্য লইয়া বাদশাহ-কুমারগণের মধ্যে রণানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সেই সময় জয়সিংহ আজিমশাহের পুত্র কুমার বেদারবক্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহাদুরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; সেই জন্ত বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই অশ্বরাজ্য বাজিয়াপ্ত করিলেন। পরে অশ্বরশাসনের জন্ত একজন শাসনকর্তাও পাঠাইয়া ছিলেন। এই সময় জয়সিংহের কনিষ্ঠ বিজয়সিংহ রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন। যখন জয়সিংহ আজিমশাহের পক্ষ গ্রহণ করেন, বিজয় সেই সময়ে বাহাদুর-শাহের পক্ষ হইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই জন্ত বাহাদুর তাঁহাকে তিনহাজারী মনসবদারী প্রদান করেন।

বিজয়ের মাতা জয়সিংহের বিমাতা। জয়সিংহ বাহাতে কোনরূপে রাজ্য করিতে না পারে, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সেই জন্ত সুযোগ বুঝিয়া অনেক মণিমাণিক্য হীর-কাদি সঙ্গে দিয়া বিজয়কে সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে মিষ্ট কথা সন্তুষ্ট করিয়া সৈয়দ হুসেন আলীখাকে অশ্বররাজ্যের ফৌজদার করিয়া পাঠাইলেন।

ঐ সময় জয়সিংহ কিছু দিন রাজসিংহাসনে বসিতে পান নাই। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে মুসলমানদিগের উপর দারুণ বিদ্বেষবাহি প্রজ্জ্বলিত হয়। কি রূপে তিনি রাজ্য উদ্ধার করিবেন, সর্বদাই তাহার উপার অন্বেষণ করিতেন।

যে সময় (১৭০৮ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট বাহাদুরশাহ ভ্রাতা কাম্বকসকে দমন করিবার জন্ত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। জয়সিংহ সেই সময় মারবাররাজ অজিতসিংহের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমান ফৌজদারকে তাড়াইয়া আবার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। অজিতের কন্যা সুর্য্যকুমারীর সহিত জয়সিংহের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বৈমাত্রের বিজয়সিংহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ত বিজয়ের প্রার্থনা মত তাঁহাকে অশ্বররাজ্যের মধ্যে অতীব উর্বরা বসুন্ধা প্রদেশটা প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতে বিজয়ের মাতার মন উঠিল না। তিনি পুত্রকে রাজ্যলাভের লোভ দেখাইয়া উত্তেজিত করিলেন। তদনুসারে বিজয়সিংহ দিল্লীতে গিয়া সম্রাটের প্রধান প্রধান আমীরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিলেন ও জ্যেষ্ঠ জয়সিংহের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলিয়া পুনরায় রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন। উৎকোচে বশীভূত হইয়া সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী কুমার উদ্দীন খাঁ বিজয়ের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

কুমার-উদ্দীন সম্রাটকে গিয়া জানাইলেন, “বিজয়সিংহ বরাবর আমাদের সহিত সদ্ভাবহার করিতেছেন। কিন্তু চতুর জয়সিংহ বরাবর আমাদের বিপক্ষ। এরূপ স্থলে বিজয়সিংহকেই অশ্বররাজ্য প্রদান করা কর্তব্য। বিজয়কে রাজা করিলে তিনি পাঁচকোটি টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন এবং আমাদের আবশ্যিক মত পাঁচহাজার অশ্বারোহী সরবরাহ করিবেন।” মন্ত্রীর কথা শুনিয়া সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন, “বিজয়সিংহ যে তাঁহার কথা মত কার্য্য করিবে, তাহার জামিন কে?” মন্ত্রী উত্তর দিলেন, “আমিই তাহার প্রতিজ্ঞা।” তখনই সম্রাট বিজয়সিংহের পক্ষে সনন্দ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

খাঁ দোরান্ নামে একজন প্রধান আমীরের সহিত পাগড়ী-বদল করিয়া জয়সিংহ মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এখন সেই আমীর গোপনে সকল কথা শুনিয়া জয়সিংহের দয়বাহর উকীল কুপারামকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বেই কুপারাম অশ্বররাজ্যের নিকট সেই কুসংবাদ পাঠাইলেন।

কুপারামের পত্র পাইয়া বীর জয়সিংহও চিন্তিত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা যে যোগলসৈন্তের সহিত তাঁহার বিপক্ষে আসিতেছেন, সেই জন্তই তাঁহার চিন্তা। অস্ত্র কেহ হইলে

তিনি অক্কেপ করিডেন না। তিনি শ্রীজই অঘরের সকল সামন্তকে ডাকাইয়া আশু বিপদের কথা জানাইলেন। সামন্তগণ তাঁহাকে অতর দান করিয়া বিজয়সিংহের নিকট নিজ নিজ মন্ত্রিগণকে পাঠাইলেন ও তাঁহাকে জানাইলেন, “আপনার বস্বা প্রদেশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ছোট ভ্রাতার সহিত আপনার বিবাদ করা ভারতঃ ও ধর্মতঃ উচিত নহে। আপনি বাহাতে সমস্রানে বস্বা প্রদেশ ভোগ দখল করিতে পারেন, তৎক্ষণ্ড আমরা সকলেই প্রীতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম।”

বহু সাধ্য সাধনার পর বিজয়সিংহ সামন্তগণের প্রত্যবে সম্মত হইলেন। বাহাতে উত্তর ভ্রাতার পরম্পর দেখা সাক্ষাৎ হইয়া সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়, সামন্তগণ তাহারও বন্দোবস্ত করিলেন। স্থির হইল, প্রধান সামন্তের রাজধানীতে উত্তর ভ্রাতার দেখা সাক্ষাৎ হইবে। তখন উত্তরপক্ষের লোকেরা চুমু নগরে উপস্থিত হইল। এই সময়ে সংবাদ আসিল, “মহারাজী উত্তর ভ্রাতার নয়নানন্দদায়ক মিলন দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন।” সামন্তগণও মহারাজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সকলের সম্মতিক্রমে তখনই মহারাজীর মহাদোলা ও পুরমহিলাদিগের জন্ত তিন শত রথ সজ্জিত হইল। কিন্তু মহাদোলায় রাজমাতার পরিবর্তে সামন্তবীর উগ্রসেন ও বস্ত্রাবৃত প্রত্যেক রথে রমণীর পরিবর্তে দুই দুই জন সশস্ত্র সৈনিক বসিলেন। সামন্তগণ পূর্বেই রাজা জয়সিংহের সহিত অগ্রসর হইরাছিলেন, তাঁহারা এ আয়োজনের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না।

পূর্বেই জয়সিংহ ও সামন্তগণ সকলনে আসিয়া রাজমাতার আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একজন দূত আসিয়া তাঁহাদের আগমন সংবাদ জানাইল। তখন সকলেই প্রাসাদ-ভিমুখে ছুটিলেন। প্রাসাদে জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ উত্তর ভ্রাতার মিলন হইল। জয়সিংহ বিজয়ের হস্তে বস্বার সনন্দ প্রদান পূর্বক সন্নেহে কহিলেন, “যদি অঘরের সিংহাসন লইতে বিজয়ের ইচ্ছা হয়, তাহাও আমি প্রদান করিতে পারি।” জয়সিংহের স্নেহবাক্যে হঠাৎ বিজয়সিংহের মনও বিগলিত হইল, তিনি উত্তর করিলেন, “তাই, আমার সকল আশা পূর্ণ হইরাছে।”

তাঁহার কণ পরে একজন দূত আসিয়া কহিল যে, রাজমাতা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন সামন্তগণের অস্থমতি লইয়া উত্তর ভ্রাতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশদ্বারে একজন ধোজা ছিল, জয়সিংহ তাঁহার হস্তে আপনার অঙ্গি প্রদান করিয়া কহিলেন, “মাতার নিকট সশস্ত্র যাইবার প্রয়োজন কি?” বিজয়সিংহও জ্যোতের অঙ্গসরণ করিলেন।

পূর্বে প্রবেশমাত্রই মাতার জেহালিননের পরিবর্তে বিজয়সিংহ তটসামন্ত উগ্রসেনের কঠোর আক্রমণে বন্দী হইলেন। তাঁহার মুখ ও হস্তপদাদি বাঁধিয়া তাঁহাকে সেই মহাদোলায় রাখিয়া শুণ্ডভাবে অঘরের রাজধানীতে আনা হইল। সকলে জানিলেন যে, রাজমাতা প্রাসাদে কিরিয়া বাইতেছেন। এদিকে জয়সিংহ এক ঘণ্টা পরে একজন অস্ত্রধারীর সহিত বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিজয়সিংহ কোথায়?” চতুর নীতিজ্ঞ জয়সিংহ উত্তর করিলেন, “আমার উদরে। যদি আপনারদের অভিপ্রায় থাকে যে, বিজয়সিংহ রাজা হইবে, তাহা হইলে আমাকে বিনাশ করিয়া তাহাকে বাহির করুন। বিজয়সিংহ আমার ও আপনারদের শত্রু। নিশ্চয় সে শত্রুদিগকে অঘরে আনিয়া আমাদের সকলকেই বিনাশ করিত।” সামন্তগণ সকলেই বিশ্বাসপন্ন হইলেন, আর কোন উপায় না দেখিয়া সকলে নীরবে চলিয়া গেলেন। যখন বিজয়সিংহ অঘরে আসেন, তৎকালে কয়ার-উদ্দীন খাঁ তাঁহার সহিত একদল মোগল অখারোহী পাঠাইয়া ছিলেন। বিজয়সিংহের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সেই মোগলসেনাদলের নায়ক তাঁহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জয়সিংহ তখনই উত্তর করেন, “তোমাদের আনিবার প্রয়োজন নাই, এখনি চলিয়া যাও। নচেৎ তোমাদের সকলের অস্থ কাড়িয়া লইব।” তৎপ্রবণে মোগল সেনাগণ সকলেই পলায়ন করিল। এইরূপে চতুর রাজনীতিবলে মহারাজ জয়সিংহ আপনাকে ও জগদ্বৃত্তিকে রক্ষা করিলেন। বিজয়সিংহ অঘরদুর্গে বন্দী হইয়া রহিলেন।

দিল্লীর অঘররাজের ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ লাহোরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ার সে খবর জয়সিংহ দিল্লীখবরের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন।

বাহাদুরের পর করুখশিরার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সহিত জয়সিংহের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সত্ৰাট জয়সিংহের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি প্রদান করেন।

সত্ৰাট করুখশিরারও বহুদিন রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি দুর্ভাগ্যবশত ভ্রাতৃঘরের ক্রীড়াপুতলী হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু সত্ৰাট কিরূপে সেই হঠাৎ সৈয়দঘরের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহারও চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সৈয়দ হুসেনখানী দাখিণাত্য হইতে বালাজী বিশ্বনাথের অধীন বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র-সৈন্য লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মহারাজ জয়সিংহ সত্ৰাটকে রক্ষা করিবার জন্ত দিল্লীতে উপস্থিত

হইরাছিলেন, কিন্তু ভীরা ফরুখশিয়ার সৈরদ-পরিচালিত মরাঠা-দিগের ভয়ে অন্তঃপুরে গিয়া লুকাইলেন। সেই বিপত্তিকালে জয়সিংহ বায়রার সত্ৰাটিকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনি বাহির হইয়া আপনার সৈন্যদিগের সমক্ষে প্রকাশ করুন যে সৈরদবায় রাজজোহী, তাহা হইলে আপনার কোনরূপ বিপদ হইবে না, সকলেই আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত, আমিও প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিব।” কিন্তু ভীরা ফরুখশিয়ার হিঁটেবী জয়সিংহের কথার কর্ণপাত করিলেন না, শেষে অন্তঃপুরেই বন্দী হইলেন।

তৎপরে মহম্মদশাহ সত্ৰাট হইলেন। তাঁহার আধিপত্য-কালে প্রথমে জয়সিংহ রাজনৈতিক সংশ্রব ত্যাগ করিয়া জ্যোতিষের চর্চা আরম্ভ করেন। কি যুরোপীয় কি দেশীয় সকল প্রাচীন ও অপ্ৰাচীন বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্গ্রহ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ম্যাক্সএল নামক একজন পর্তুগীজ পাদরীর সাক্ষাৎ হয়। অধররাজ যুরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, আনিবার জন্ত সেই পাদরীর সহিত কএকজন বিশ্বস্ত লোককে পর্তুগালের অধীশ্বর এমাসুএলের সভায় প্রেরণ করেন। পর্তুগালরাজ অধররাজের নিকট জ্যোতিষ্য ডি সিলভা নামে এক সত্ৰাস্ত্র জ্যোতির্বিদকে পাঠাইয়া দেন। ডি সিলভা এখানে আসিয়া জয়সিংহকে পর্তুগালে ডি সোহায়ার আবিষ্কৃত কএকটি যন্ত্র প্রদান করেন। এ ছাড়া জয়সিংহ তুর্কী জ্যোতির্বিদগণের ব্যবহৃত সময়কন্দে স্থাপিত কএকটি যন্ত্র ও বিস্তর বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সংগ্রহ করেন। বাস্তবিক তৎকালপ্রচলিত প্রায় সমস্ত জ্যোতিষ-সমুদ্র মছন করিয়া জয়সিংহ প্রকৃত জ্যোতিষায়ত আহরণ করিয়াছিলেন। জগতের প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিলেও আমরা কোন নূপতিকেই জয়সিংহের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের পারদর্শী দেখিতে পাই না। বলিতে কি, রাজা জয়সিংহই ভারতে প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ও অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন।

জয়সিংহ স্বরচিত “জিজ মহম্মদশাহী” নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি অনবরত সাতবর্ষকাল জ্যোতিষশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রবণ করিয়াই সম্রাট মহম্মদশাহ তৎকালপ্রচলিত পঞ্জিকা-সংস্কারের ভার জয়সিংহের উপর অর্পণ করেন। সেই জন্তই সত্ৰাট তাঁহাকে “সবাই” অর্থাৎ সকল রাজকুমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই উপাধি প্রদান করেন। এই সময়ে (১৭২৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাঁহার মন্ত্রী ও জ্যোতির্বিদ বিজ্ঞানধরের পরামর্শ মত বর্তমান জয়পুর নগর স্থাপন করিলেন। [জয়পুর দেখ।]

ক্রমে সবাই জয়সিংহের সুখ্যাতির কথা ভারতময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নানান্যায় হইতে প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদ ও শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় আসিতে লাগিলেন। জ্যোতির্বিদ কুপারাম ও কবি কাকরাম তাঁহার সভায় থাকিতেন।

সত্ৰাট মহম্মদশাহ তাঁহাকে পঞ্জিকা-সংস্কারের ভার অর্পণ করিলে, তিনি গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, রাশিফুট, গ্রহণ প্রভৃতির বিগুহ গণনা, পরিদর্শন ও অভিনব নক্ষত্র আবিষ্কারের জন্ত নিজ ক্ষমতায় যে সকল যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছিলেন—দিলী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগ্রা ও মথুরায় বহু অর্থব্যয়ে বৃহৎ বৃহৎ মানমন্দির নির্মাণ করিয়া সেই সকল যন্ত্র স্থাপন করিলেন।

পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ সৃষ্টিতত্ত্ব পরিদর্শন করিয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর জয়সিংহ সূর্য্যমুহূর গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-লোচনা করিয়াও সর্বত্রই ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতেন। তিনি স্বরচিত “জিজ মহম্মদশাহী” নামক পারসিক গ্রন্থের প্রারম্ভে মুক্তকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন—

“ভগবানের সর্বমঙ্গলময় অনন্তশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়াই হিপার্কাস্ নির্কোষ কৃষকের জ্ঞান কেবল বিরক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বজ্ঞান মহান শক্তিকল্পনায় টলেমি বাছড়ের মত সত্যরূপ সূর্য্যের সমীপবর্তী হইতে পারেন নাই। ইউক্লিডের সূত্রগুলি (সেই বিশ্বপাতার) অনন্তসৃষ্টির অসম্পূর্ণ আলেখ্যের কল্পিত রেখামাত্র। জম্শেদ দসি অথবা নাসির-তুসি এইরূপে বৃথা পণ্ডিত্য করিয়া গিয়াছেন।”

পর্তুগালের রাজা তাঁহার নিকট যে সকল যন্ত্র পাঠাইয়া ছিলেন, তৎসম্বন্ধে জয়সিংহ বলিয়াছেন—“প্রকৃত পরীক্ষা ও সমালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রে চন্দ্রের যে অবস্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা অর্দ্ধ অংশ কম, সূর্য্য ঠিক নহে। অস্ত্রাশ্র গ্রহগণের অবস্থান সম্বন্ধে যদিও ইহাতে কোন গোল নাই, কিন্তু গ্রহগণসম্বন্ধীয় গণনায় ৪ মিনিট সময় কম বেশী দেখা যায়।” এইরূপ অবিগুহ যন্ত্র হইতেই হিপার্কাস্, টলেমি, ডিলাহার প্রভৃতির গণনায় ভুল হইয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্ষর ও অপূর্ণ কীর্তি স্বরূপ মানমন্দিরগুলি এখনও ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে। [মানমন্দির শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তিনি বিখ্যাত “জিজ মহম্মদশাহী” গ্রন্থ রচনার পূর্বে তাঁহার সভায় জগন্নাথ পণ্ডিত দ্বারা সত্ৰাটসিদ্ধান্ত, রেখা-গণিত নামে ইউক্লিডের এবং নেপিয়র কৃত গণিত পুস্তকের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয়পুরস্থাপিত। পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এখন সেই মতানুসারে রাজপুত সমাজে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এক সময়ে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যে তাঁহারই পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল।

জয়সিংহ যে কেবল প্রধান জ্যোতির্বিদ ছিলেন এমন নহে। তিনি একজন ঐতিহাসিক বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই বন্ধে ও নামানুসারে “জয়সিংহকল্পদ্রুম” নামে সুবৃহৎ স্মৃতিসংগ্রহ সংকলিত হয়।

দোবের মধ্যে জয়সিংহ বৃদ্ধ বয়সে বড়ই অহিকেনসেবী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অহিকেনের দোবেই তিনি মার-বারপতি অভয়সিংহ ও ভক্তসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন ও শেষে বিকানের-রাজকে মারবারের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন। [মারবার ও বিকানের দেখ।]

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদশাহ ইহাকে মালবরাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। সে সময় মহারাষ্ট্রদিগের বল ক্রমেই বাড়িতে ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ক্রমে ঐ মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করিতে পারে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি মহারাষ্ট্রবীর বাজীরায়ের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে মালবশাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। তাহাতে অপর রাজপুতগণ জয়সিংহের উপর বিরক্ত হইলেও সম্রাট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বুন্দীরাজ কবিবর বুধরাও জয়সিংহের ভগিনীপতি ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে জয়সিংহকে উপহাস করেন, তাহাতে বীর জয়সিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) ভগিনীপতির রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমাজসংস্কারে বিশেষ মনোযোগ করিয়া ছিলেন। রাজপুতসমাজে কন্যার বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে সকলকেই সাধ্যাতিত খরচ করিতে হয়। এই জন্ত রাজপুতানায় শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু জয়সিংহ রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া নিয়ম করিয়া দেন, বিবাহকালে কেহ যৌতুক দাবী করিতে পারিবে না, যথাব্যয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় তাহা করিতে হইবে, অকারণ কেহ বেগী ব্যয় করিলে, সে দণ্ডনীয় হইবে। এই নিয়মে যে সমাজের মহা উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন তিনি পথিকদিগের সুবিধার জন্ত ভারতের নানাস্থানে পাছ-নিবাস, হাট ও স্নানর রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। “একশ নরপুংগ জয়সিংহ কা” নামক একখানি গ্রন্থে জয়সিংহের গুণ গরিমার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

বিশ্ববিখ্যাত রাজজ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক ও সমাজ-

সংস্কারক মহারাজাধিরাজ সবাই জয়সিংহ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইহলৌক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল জয়পুর নয়, সমস্ত ভারত এক অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। তাঁহার তিনজন প্রধান মহিষীও তাঁহার সহিত এক চিতায় শয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র জয়সিংহ জয়পুরের সিংহাসন লাভ করেন।

জয়সিংহ ৩য়, জয়পুরের একজন কচ্ছবাহ রাজা। ইহার পিতা জগৎসিংহ। পিতার মৃত্যুর পর জয়সিংহ জয়গ্রহণ করেন। ১৮২১ সন্থতে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) ইহার কামদার জটারামের প্রদত্ত বিষপানে ইনি পরলোক গমন করেন।

[জয়পুর দেখ।]

জয়সিংহ, সম্রাট মহম্মদশাহের সময় ইনি আগ্রার সুবাদার ছিলেন। তিনি আগ্রা নগরের চারিদিকে সহরপাণা অর্থাৎ উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাতে অনেকগুলি তোরণ ছিল, এখন কেবল দুইটা আছে।

জয়সিংহ, সিদ্ধরাজ নামে খ্যাত গুজরাটপট্টনের চৌলুক্য-বংশীয় একজন রাজা। ইনি রাজা কর্ণের ঔরসে ও জয়কেশীর কন্যা মৈণাল-দেবীর গর্ভে জয়গ্রহণ করেন। দ্ব্যশ্রমকাব্য, প্রবন্ধচিত্তামণি, কুমারপালচরিত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে এই জয়সিংহ সিদ্ধরাজের বিবরণ বর্ণিত আছে। ইনি অল্প বয়সেই শত্রু ও শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীর্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে অতীব ক্রীত হইয়া বৃদ্ধরাজ কর্ণ ইহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়া (১০৯৩ খৃষ্টাব্দে) বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। কর্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর দেবপ্রসাদ নিজ পুত্র ত্রিভুবনপালকে জয়সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া চিতারোহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ জৈনরাজ কুমারপাল ঐ ত্রিভুবনপালের পুত্র।

জয়সিংহের আধিপত্যকালে বর্করক নামে একজন যবন-রাজ সিদ্ধপুরে আসিয়া দেব ব্রাহ্মণের উপর অনেক অত্যাচার আরম্ভ করেন, অন্তর্ধান দেশের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও যবন-রাজের পুষ্টপোষক হইয়াছিলেন। মহাবীর সিদ্ধরাজ সেই অত্যাচারের কথা শুনিয়াই সসৈন্তে শ্রীমূলতীর্থে উপস্থিত হইয়া বর্করককে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন।

এক দিন এক যোগিনী আসিয়া সিদ্ধরাজকে বলেন—“উজ্জয়িনী নগরে বিখ্যাত মহাকালীর মন্দির আছে, তাঁহার অর্চনা করিলে মহা যশোলাভ হয়। আপনি উজ্জয়িনীপতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তথায় গিয়া মহাকালীর পূজা করুন।” তাহা শুনিয়া সিদ্ধরাজ সসৈন্তে গিয়া মালবরাজ্য আক্রমণ করেন। অবশিষ্টাংশ বশোবন্দী জয়সিংহের হস্তে বন্দী

হইলেন। অবশিষ্ট ও ধাররাজ্য জয়সিংহের অধিকারভুক্ত হইল। তিনি এই সময়ে উজ্জয়িনীর পার্শ্ববর্তী সিমরাঙ্গকেও পরাজিত ও বন্দী করেন। মালব রাজ্য জয় করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে অনেক রাজা তাঁহাকে স্ব স্ব হুঁহিতা সম্ভ্রদান করিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতাস্থজে আবদ্ধ হইলেন।

তৎপরে কিছুকাল তিনি সিদ্ধপুরে আসিয়া বাস করেন। এখানে সন্ন্যাসীভায়ে রত্নমাল ও মহাবীরস্বামীর মন্দির নির্মাণ করেন। পরে তিনি সোমনাথ ও গিরনরের নেমিনাথের মন্দির দর্শন, ব্রাহ্মণ ও যাচকগণকে দান, সহস্রলিঙ্গসরোবর খনন, নানাহানে দেবমন্দির, সদাব্রত ও শাস্ত্রচর্চার জন্ত বিত্তালয় স্থাপন করেন।

১১৪৩ খৃষ্টাব্দে মহাবীর সিদ্ধরাজ ইষ্টদেবের পদে মনঃ-সংযোগ ও অনশনব্রত অবলম্বনপূর্বক ইছলোক পরিত্যাগ করেন। বিখ্যাত বীর জগদেবপ্রমার সিদ্ধরাজের সেনাপতি ছিলেন। জয়মঙ্গল প্রভৃতি অনেক কবি তাঁহার সভায় থাকিতেন। বিখ্যাত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রও প্রথমে ইহার সভা উজ্জল করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ, কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত রাজা, সুসলদেবের পুত্র। ইনি ১১২৯ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন। কবিবর মন্মথ ইহারই আশ্রয়ে খ্যাতিলাভ করেন।

[কাশ্মীর দেখ।]

জয়সিংহ, বাবেরীর একজন রাজা। সিদ্ধান্ততত্ত্বসর্বস্ব-রচ-রিতা গোপীনাথ মোনীর প্রতিপালক।

জয়সিংহ, মীর্জা, অম্বরের একজন বিখ্যাত রাজা। রাজা মহাসিংহের পুত্র। মহাসিংহের মৃত্যু হইলে কে অম্বর সিংহাসনে বসিবে, এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে। তৎকালে জগৎসিংহের পৌত্র মহানীর জয়সিংহ যোধাবাইএর নিকট রাজ্য পাইবার আশা ব্যক্ত করেন। যোধাবাইয়ের উপরোধে সম্রাট জাহাঙ্গীর জয়সিংহকেই অম্বরের সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতে নুরজাহান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

বীরবর জয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বীর্য্যবলে রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মীর্জা উপাধি প্রদান করেন।

যখন দিল্লীর ময়ূরাসন লাভ করিবার জন্ত দারা ও অরঙ্গজেবের বিবাদ বাঁধে, তখন প্রথমে তিনি দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করার দারার সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

জয়সিংহ অরঙ্গজেবেরও প্রকৃত উৎসাহ সাধন করিয়াছিলেন।

সম্রাট তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসবদার পদ প্রদান করেন। যে সময়ে মহাবীর শিবজীর অধ্যক্ষ্যে মোগল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পাঙ্কিত হইয়াছিল, মোগল সেনাপতিগণ বাহার নিকট পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া ছিলেন, সম্রাট অরঙ্গজেবও বাহার ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন, সেই বীরকুলভিত্তিক শিবজীকে একমাত্র অম্বররাজ জয়সিংহ পরাস্ত ও বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জয়সিংহ মহাবীর শিবজীর কখন অবমাননা করেন নাই, তিনি শিবজীকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়নকালে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দিল্লীস্থর তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন জয়সিংহ দেখিলেন যে দুই অরঙ্গজেব শিবজীকে হাতে পাইয়া তাঁহার প্রাণ-বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শিবজীকে দিল্লী হইতে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। [শিবজী দেখ।]

জয়সিংহের বীর বলিয়া একটু গর্ষ ছিল। তিনি দরবাসে সর্বসমক্ষে স্পর্ধা করিয়া বলিতেন, “আমি মনে করিলেই সাতারার কি দিল্লীর অধঃপতন ঘটাইতে পারি।” সম্রাট অরঙ্গজেবও এই স্পর্ধার কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও জয়সিংহকে ভয় করিতেন, সেই জন্ত প্রকাশে তাঁহার কিছু করিতে পারেন না। তিনি জয়সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কীরোদসিংহকে অম্বররাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে পিতৃ-হত্যার জন্ত উত্তেজিত করেন। নির্দোষ কীরোদসিংহ ধূর্তের কথার ভুলিয়া অহিফেনে বিষ মিশাইয়া পূজনীর পিতার প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু কীরোদসিংহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামসিংহই পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। জয়সিংহদেব, জয়মাদব-মানসোল্লাস নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। জয়সিংহনগর, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ৩৮’ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭’ পূঃ। সাগর নগর হইতে ২১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস।

প্রায় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, সাগরের শাসনকর্তা জয়সিংহ কর্তৃক এই পল্লী স্থাপিত হয়। তিনি সামন্তরাজগণের আক্রমণ হইতে এই স্থান রক্ষা করিবার জন্ত এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সাগরের সহিত এই পল্লীও ব্রীটিশ অধিকারভুক্ত হয়। তৎপরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে অপর সাহেবের বিধবা মহিষী রুস্তাবাইর বাসের জন্ত এই স্থান প্রদান করা হয়। এখানে থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় ও হাট আছে।

জয়সিংহসিঁহ, চতুর্থোক্তের একজন টীকাকার।

জয়সিংহসূরি, একজন বিখ্যাত মৈত্রারিক, মহেঞ্জের শিল্প।

ভারতাব্যবসায়ীপিকা বা ভারতাব্যবসায়ীপিকা-রচয়িতা।

জয়সেন (পুং) জয়বংশ সেনা অন্ত। মগধের একজন রাজা।

“প্রত্যয়শ্চ কালিদো জয়সেনশ্চ মাগধঃ।” (ভারত ৭।৪ অঃ)

২ আবুদুলায়ীর অধীনরাজের পুত্র। (ভাগ ৯।১৭।১৭)

৩ সার্কভোম নৃপতির এক পুত্র। (ভাগ ৯।২২।১০)

জয়নামগণি, একজন বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত। ইনি খণ্ডপ্রশস্তি-
বৃত্তি রচনা করেন।

জয়কঙ্কাবার (স্ত্রী) কোন স্থান জয় করিয়া সেই স্থানে
বিজয়ীরাজের যে শিবির স্থাপিত হয়।

জয়ন্তন্তু (পুং) জয়হৃৎকঃ স্তম্ভঃ। জয়হৃৎক স্তম্ভ। দেশ প্রভৃতি
জয় করিয়া যে স্তম্ভ প্রোথিত হয়, তাহাকে জয়ন্তন্তু কহে।

“ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়ন্তন্তুং চকার সং।” (বয়ু)

জয়স্বামিন্ (পুং) কাত্যায়নকল্পত্রয়ের ভাষ্যকার।

জয়া (স্ত্রী) জীয়েতে হনয়া জি করণে অচ ততটাপ্। হুগা।

“কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।” (ভারত ৬।২২।২২)

“জয়ঃ কল্যাণবচনো হ্যাকারো দাতৃবাচকঃ।

জয়ঃ দদাতি সা নিত্যং সা জয়া পরিকীর্তিতা ॥” (ব্রহ্মবৈ°)

জয় শব্দ কল্যাণবাচক, আকার দাতৃবাচক, অতএব যিনি
নিত্য জয় দান করেন, তিনি জয়া বলিয়া পরিকীর্তিত হন।

২ জয়ন্তীবৃক্ষ। [জয়ন্তী দেখ।] ৩ তিথিবিশেষ।

“ত্রয়োদশষ্টমী চৈব তৃতীয়া চ তথা জয়া।” (জ্যোতি°)

ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া তিথির নাম জয়া।

৪ পুণ্যদারিনী দাদশী তিথিবিশেষ।

“জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।

দ্বাদশষ্টমী মহাপুণ্যাঃ সর্বপাপহরা বিজ ॥” (ব্রহ্মবৈ°)

৫ হরিতকী। ৬ হুগার সখী। ৭ হুগা। বরাহশৈলে পীঠ-
স্থানে ভগবতী জয়াদেবীর মূর্তি বিরাজিত আছে। (দেবী-
ভাগ ৭।৩০।৫২।) ৮ শান্তাবৃক্ষ। ৯ নীলদুর্কা। ১০ অগ্নিমহ বৃক্ষ।

(রাজনি°)। ১১ পতাকাবিশেষ।

“অগ্নিমহো জয়ঃ স জ্যাক্ষীপর্ণী পণিকারিকা।

জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা ॥” (যুক্তিকল্পতরু°)

১২ জয়ন্তী ঔষধবিশেষ।

জয়াদিত্য (পুং) কান্দীরের একজন বিখ্যাত রাজা ও কাশিকা-
বৃত্তিপ্রণেতা। [কারহ, কান্দীর ও জয়পীড় দেখ।]

জয়ানীক (পুং) ১ ক্রপদরাজের এক পুত্র। ২ বিরাটরাজের
এক ভ্রাতা। [জয়প্রিয় শব্দ দেখ।]

জয়পীড় (পুং) কান্দীরের একজন রাজা। সংগ্রামপীড়ের

মুস্তার পর (৭৫১ খৃঃ অব্দে) ইনি রাজসিংহাসনে অবিরোধে
করেন। ইনি রাজা হইয়া দিগ্বিজয় করিবার জন্য মনোভে
বহির্গত হইলে ইহার ভ্রাতাক রাজসিংহাসন অধিকার করেন।
ইনি কএকদিন পরে কিছুদূর গিয়া বেধিলেন, তাহার অনেক
সৈন্য দল ছাড়িয়া রজনীবোণে পলায়ন করিয়াছে। তাহা
দেখিয়া ইনি নিজের করদ রাজগণকে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া
বাইতে আদেশ করিলেন। কেবল কতিপয় অল্পচরবর্গ ও
পলায়িত সৈন্যের অশগুলি লইয়া প্রয়াগধামে উপস্থিত হই-
লেন। ঐ স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মগণকে
২২২২২ অশ্ব দান করেন। ঐ স্তম্ভে লিখিত ছিল, আমি
একোনলক্ষ অশ্ব ব্রাহ্মগণকে দান করিলাম। যদি কেহ লক্ষ
অশ্ব দান করিতে পারেন, তাহা হইলে এই স্তম্ভ তালিয়া
দিবেন। [কান্দীর ও কারহ দেখ।]

জয়াপ্তন (স্ত্রী) স্রোতোজনভেদ, অহোর পাণর।

“স্রোতোহজনং নদীজক কৃকস্রোতোজরাজনম্।”

জয়াহুয় (স্ত্রী) জয়ন্তী ও হরিতকী ঘর।

জয়াবতী (স্ত্রী) জয়ঃ বিদ্যাতে হতাঃ অন্ত্যার্থে মতৃপ্ মত ব
সংজ্ঞার্য দীর্ঘঃ, তত জীপ্। কুমারহুচর-মাতৃভেদ।

(ভারত ৯।৪৩ অঃ)

২ রাগিনীবিশেষ। ধবলশ্রী, বেলাবলী ও সরস্বতীযোগে
উৎপন্ন। (সঙ্গীত°)

জয়াবহা (স্ত্রী) জয়ঃ আবহতীতি আ-বহ-অচ্। ভদ্রদন্তী বৃক্ষ।

জয়াশিস্ (স্ত্রী) জয়ালীকান্দ।

জয়াশ্রয়া (স্ত্রী) জয়ঃ আশ্রয়তি আ-শ্রি-অচ্-টাপ্। জড়রীতৃণ।

জয়াশ্ব (পুং) বিরাটরাজের এক ভ্রাতা। (ভারত ৭।১৫৮।৯২)

জয়াহুয় (স্ত্রী) জয়ন্তী আশ্রা আশ্রা যতাঃ। ভদ্রদন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জয়িন্ (ত্রি) জেতুঃ শীলমন্ত (জিত্বিকবিশ্রীতি। পা ৩।২।১৫৭)
জি-ইনি। জয়শীল, বিজয়ী।

“বলং মে পশুমারারঃ জীমবা জয়িনে দিশাং।” (ভাগ ৩।৩।৩৮)

জয়িযুঃ (ত্রি) জি-শীলার্থে ইফুচ্। জয়শীল।

জয়ুস্ (ত্রি) জি-উসি। জয়শীল। “বিজয়ুসা রথ্যা বতমজিঃ।”

(ঋক্ ৩।৬২।৭) “বিজয়ুসা বযথুঃ সাবজ্রেঃ” (ঋক্ ১।১১।১৬)

‘জয়ুবা জয়শীলেন’ (সায়ণ)

জয়েৎ (পুং) পুরিষা ও কল্যাণযোগে উৎপন্ন রাগিনীবিশেষ।
ইহা পঞ্চমবর্জিত। যথা—

“গ ম ং ধ নি সা ঞ্।” (সঙ্গীতর°)

জয়েৎগৌরী (স্ত্রী) জয়েৎ ও গৌরীযোগে উৎপন্ন রাগিনী-
বিশেষ। (সঙ্গীতর°)।

জয়েন্তী (স্ত্রী) রাগিনীবিশেষ। গৌরী ও জয়ন্তীযোগে উৎপন্ন

হর। ইহা সামন্ত, ললিত ও পুরিয়া অথবা তোড়ী, সাহান্না ও বিভাস বোগেও উৎপন্ন হইতে পারে। (সদীতর*)

জয়েন্দ্র (পুং) কান্দীররাজ বিজয়ের পুত্র। ইহার আজ্ঞা-
হলধিত বাহ ছিল। ইহার মন্ত্রীর নাম সন্ধিবতি। ইনি ৩৭
বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। [কান্দীর দেখ।]

জয়েশ্বর (পুং) এক প্রাচীন শিব লিঙ্গ।

জয়্য (ত্রি) জি জেতুং শক্যঃ। (শকিলিঙ্ ৮। পা ৩।৩।১৭২)
ইতি শক্যোবৎ গুণঃ (অধ্যায়ো শক্যার্থে। পা ৬।১৮১) ইতি
বাস্তাদেশঃ। জয়করণযোগ্য।

“সোহয়ং মহামূলকঃ পুত্রৈণৈব অবোনান্তেন কর্মণা।”

(শতপথব্রা* ১৪।৪।৩২৪)

জর (পুং) জৃ-ভাবে-অপ্। জরা, বয়োহানি, বৃদ্ধাবস্থা।
[জরা দেখ।]

জরঠ (ত্রি) জীর্ঘ্যাত্যনেতি জৃ-রঠ (জৃশমোরপাঠঃ। উজ্জল
দত্ত ১।১০২) ১ কর্কশ। ২ পাণ্ডু। ৩ কঠিন। ৪ বৃদ্ধ।

“নিরীক্ষমানস্তরীলাং যুযুদে জরঠো ভৃশং।” (ভাগ* ৬।১২৫)

‘জরঠো বৃদ্ধঃ।’ (স্বামীট্য*) ৫ জীর্ণ। (হেম) (পুং) ৬ জরা। (বিখ*)

জরড়ী (স্ত্রী) জৃ-বাহুলকাৎ অড় ততো গোরাদিভ্যৎ ঙীষ্।
ভৃগু বিশেষ। (রাজনি*) হিন্দীভাষায় অরুড় বলে। পর্যায়—
গর্মোটিকা, সুনাল, জয়াশ্রয়া। ইহার গুণ—মধুর, শীতল,
সারক, দাহনশক, রক্তদোষনাশক, রুচিকর। ইহা ভক্ষণ
করাইলে পশুদিগের হৃদয় হয়। (রাজনি*)

জরগ (স্ত্রী) জরগতীতি জৃ-গিচ্-ল্য। ১ হিন্দু, হিং। ২ কুঠী-
বধ। (ত্রি) ৩ জীর্ণ। (স্ত্রী) ৪ শ্বেতজীরক।

“অজাজী জরগং দীপাং মাগধী জীরকং সিতং।” (বৈজয়কর*)

(পুং) ৫ জীরক।

“জীরকো জরণোজাজী কণা শ্রান্দীর্ঘজীরকঃ।” (ভাবপ্রকাশ)

৬ কৃষ্ণজীরক। ৭ সৌবর্জলবণ। (শকার*) ৮ কাসমর্দ। (রাজনি*)

জরণক্রম (পুং) জরণো জীর্ণঃ ক্রমঃ। অশ্বকর্ণ বৃক্ষ।

জরণা (স্ত্রী) জরণ-টাপ্। ১ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি*) ২ জীর্ণ।

“পুনর্থে চক্রঃ পিতরা যুবান্না সনা যুপেব জরণা শরান্না।”

(ঋক্ ৪।৩৩৩)। ‘জরণা জীর্ণো।’ (সারণ) ৩ বৃদ্ধত্ব।

“ভদ্রং জীবন্তো জরণামশীমহি।” (ঋক্ ১০।৩৭৬)। ‘জরণাং
বৃদ্ধত্বং।’ (সারণ)

৪ জরা। “বিপ্রস্য জরণামুপেযুঃ” (ঋক্ ১০।৩৯৮)

‘জরণাং জরাং’ (সারণ) ৫ মোক্ষ।

“প্রাক্গ্রহণে যমিন্ পশ্চাদপসর্পণং তু তজ্জরণং।” (বৃহৎসং ৫।৮৮)

৬ জুতি।

“বজ্রজরণা অনাকৃতঃ।” (ঋক্ ১।১৪১।৭) ‘জরণা জুতিঃ’ (সারণ)

জরণি (ত্রি) জৃ-অনি। জুতিকারক।

জরণিশ্রা (ত্রি) জুতিকারক।

“সত্তি স্পৃধো জরণিশ্রা অথষ্টাঃ।” (ঋক্ ১০।১০।১২)

‘জরণিশ্রা স্তোতৃগাং’ (সারণ)

জরশু (ত্রি) জীর্ণ। (সংক্লিপসার উ*)

জরণ্য (স্ত্রী) জরা। “বৃং বন্দনং নিবৃত্তং জরণ্যায়।”

(ঋক্ ১।১১৯।৭)

‘জরণ্যায় জরয়া।’ (সারণ)

জরণ্য (ত্রি) আত্মনঃ জরণং জুতিং ইচ্ছতি কাচ্-উন্। আপনার
জুতি অভিলাষী। “সরৎসরমুখ্যঃ কারবে জরণ্যঃ” (ঋক্ ১০।৬।১২৩)

‘জরণ্য জুতিমিচ্ছন্।’ (সারণ)

জরৎ (ত্রি) জৃ-অতৃন্। ১ বৃদ্ধ। (অমর) ২ পুরাতন। (হেম*)
(পুং) জরতীতি জৃ-শত্। বৃদ্ধ।

জরৎকর্ণ (পুং) একজন ঋষি। “অমিহত্যং জরতঃ কর্ণবায়িঃ।”
(ঋক্ ১০।৮০।৩)

জরৎকার (পুং) একজন ঋষি, যাযাবর।

“জরতি ক্ষয়মাহর্বে দারুণং কারুসংজিতম্।

শরীরং কারু তস্তাসীত্ত্বং স ধীমাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥

ক্ষয়মাস তীত্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।

জরৎকারুরিতি ব্রহ্মনৃবাহুর্কেতগিনী তথা ॥” (ভার* ১।৪০।৩-৪)

জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। সেই
মহর্ষির শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্বী হবার
শরীর ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেই জন্ত তাঁহার নাম জরৎকারু
হইয়াছিল।

জরৎকার ঋষি প্রজাপতি সদৃশ ব্রহ্মচারী ও তপঃপরায়ণ
ছিলেন। সকল সময়েই ব্রতাহুষ্ঠান ও উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত
থাকিতেন। তিনি কোন সময়ে অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণে নিযুক্ত
হইলেন। যেখানে সায়াংকাল উপস্থিত হইত, সেই দিন সেই
খানেই অবস্থান করিতেন। এইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া আহার
নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইত্যন্ত তপস্যার পর্যাটন করিয়া তাঁহার কলেবর
শীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি তিনি বায়ুমাাত্র ভক্ষণ করিয়া কঠোর
ব্রতাহুষ্ঠান করিতেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে কোন
স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি উরুপাদ ও
অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ভে লব্ধমান রহিয়াছেন। তাহা
দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“আপনারা কে? কেনই বা মূবিকচ্ছিন্নমূল উশীরস্তম্ব মাড়
অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ভে লব্ধমান রহিয়াছেন?”
তাঁহারা কহিলেন, “আমরা যাযাবর নামে ঋষিবংশীয়। লন্ডান
ক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি। আমাদের হৃদয়গোচর

পরিসীমা নাই। আমাদের জরৎকার নামে এক হতভাগ্য পুত্র আছে, সেই ছদ্মস্তি দারপরিগ্রহ না করিয়া অর্হনিশি কেবল তপস্তায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষর উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ভে লব্ধমান রহিয়াছি। আমাদের বংশবর্দ্ধন জরৎকার থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুঃস্থের জ্ঞান রহিয়াছি। তুমি কে? কি নিমিত্তই বা বাহুব্ধের জ্ঞান অহুশোচনা করিতেছে।” তখন জরৎকার কহিলেন, “আমিই সেই আপনাদের হতভাগ্য সন্তান জরৎকার। এখন কি করিব, আপনারা আজ্ঞা করুন।” তাঁহারা ইহার বাক্যে অতিশয় সন্তোষলাভ করিয়া কহিলেন, “বৎস! দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনপূর্ব্বক আমাদের কাছে রক্ষা কর।” জরৎকার কহিলেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি কভা আমার স্বনামী হয় এবং তাহার বহুবাহুবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই কভা ভিক্ষা স্বরূপ দান করে, তাহা হইলে তাহাকে আমি যথাবিধি বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিব।” এই বলিয়া তিনি অতীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। একদিন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উঠেঃস্বরে তিনবার কভা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষাবাক্য শ্রবণ করিয়া নাগরাজ বাহুকি নিজ ভগিনী জরৎকারকে আনিয়া মহর্ষিকে প্রদান করেন। ইনিও তাঁহাকে স্বনামী জানিয়া বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিবার সময় এই নিয়ম হইল যে, ইনি কখনও পত্নীর ভরণপোষণ করিবেন না এবং পত্নীও ইহার অপরিগ্রহ চরণ করিলে তৎক্ষণাৎ ইনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, নাগকভা জরৎকার মহর্ষি-সংযোগে গর্ভিণী হইলেন। এক দিন মহর্ষি পত্নীর অঙ্গে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময় সূর্যাস্ত হইতে দেখিয়া স্বামীর ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় ইহার পত্নী স্বামীর নিজ্রা ভঙ্গ করিলেন। মহর্ষি জরৎকার নিজ্রাভঙ্গে ক্রূপিত হইয়া বলিলেন, “তুমি আজ আমার অবমাননা করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে আজ জন্মের মত পরিত্যাগ করিলাম। তুমি তোমার ভ্রাতাকে কহিও, সেই মুন চলিয়া গিয়াছে। আরও বলিও তোমার যে গর্ভ হইয়াছে, ইহাতে প্রদীপ্তভেজা এক পুত্র জন্মিবে।” এই বলিয়া মুন প্রস্থান করিলেন। পত্নীর অনেক কাহুতি মিনতিতেও জরৎকার আর কর্ণপাত করিলেন না। (ভারত আদি)

(জী) ২ জরৎকারের পত্নী, আন্তিকের মাতা, বাহুকির ভগিনী, মনসাদেবী। [মনসা দেখ।]

“আন্তিকস্ত নুনেমতা ভগিনী বাহুকিস্তথা।

জরৎকারমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোহস্ত তে।”

জরৎকারপ্রিয়া (জী) জরৎকারোঃ স্বনামধ্যাত্ত মুনোঃ প্রিয়া (৬৯৭)। মনসাদেবী।

জরতী (জী) জরৎ-জীপ্। (উগিতচ্। পা ৪।১।৬) বৃদ্ধা। (রাঅনিঃ) জরথুষ্ট্র, প্রাচীন পারসিক ধর্ম-প্রচারক। গ্রীকদিগের নিকট ইনি জরত্রেদেস্ (Zarathra) বা জোরোঅস্ত্রেস্ (Zoroastres), রোমকদিগের নিকট জোরোঅস্তার (Zoroaster) (এই নামেই যুরোপে প্রসিদ্ধ) এবং বর্তমান পারস্যদিগের নিকট জরদোস্ত্ নামে খ্যাত। কিন্তু পারসিক জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে “জরথুষ্ট্র” নামেই অভিহিত।

এখন জরথুষ্ট্র বা জরদোস্ত বলিলে কেবল একমাত্র আবৃত্তিক ধর্ম প্রচারককেই বুঝায়। কিন্তু পূর্ব্বকালে একাধিক জরথুষ্ট্র ছিল, অবস্থা গ্রহে তাহার উল্লেখ আছে। তদুপে বোধ হয়, বয়সে ও জ্ঞানে যিনি সর্ব্বপ্রধান ও বৃদ্ধ তাঁহাকেই জরথুষ্ট্র বলা হইত। বৈদিক জরদষ্টি শব্দের সহিত এই জরথুষ্ট্র শব্দের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

এখন যেমন “দস্তুর” বলিলে অধ্যাপক পারসিক পুরোহিতকে বুঝায়, পূর্ব্বকালে জরথুষ্ট্র বলিলেও এই রূপ বুঝাইত।

ধর্মপ্রচারক জরথুষ্ট্রও প্রথমে এই রূপ একজন “দস্তুর” ছিলেন। ইহার পিতার নাম পৌরুষ্প।

ইনি স্পিতমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্পিতম-জরথুষ্ট্র নামেই প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত। স্পিতমবংশ “হএচড়ম্প” নামেও খ্যাত ছিল। এই জন্তই ধর্মবীর স্পিতম জরথুষ্ট্রের কভা যন্ত্র গ্রন্থে “পৌরুচিষ্ট হএচড়ম্পানা স্পিতামী” নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

কোন কোন গ্রন্থে ইনি “জরথুষ্ট্রতেমো” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বোচ্চ জরথুষ্ট্র নামে অভিহিত। ইহাতে বোধ হয় তিনি বর্তমান ছস্তর-ই-দস্তরাণের জ্ঞান সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য ছিলেন।

অপরূপ প্রাচীন ধর্মবীরদিগের জ্ঞান জরথুষ্ট্র-সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস জানা যায় না।

গ্রীকদিগের মধ্যে লিদিয়াবাসী জন্থোস্ (৪৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) সর্ব্বপ্রথম লেখেন যে, জরদোস্ত ট্রয়যুদ্ধের ছয়শত বর্ষ পূর্ব্ব জীবিত ছিলেন। আরিষ্টটল ও ইউডোজাস্ প্লেটোর ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্ব ইহার আবির্ভাবকাল স্থির করিয়াছেন। প্রিন্সির মতে ট্রয় যুদ্ধের ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্ব জরদোস্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ নিকে অধ্যাপক পারস্যগণ বলিয়া থাকেন—“জন্মঅবস্তায় যিনি কব-বীতাস্প নামে বর্ণিত, তিনিই পারস্তরাজ দরায়ুসের পিতা হরস্তাস্পস্। তাঁহারই সময় জরদোস্ত আবির্ভূত হন।” এরূপ স্থলে জরথুষ্ট্র ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের লোক হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ

পারসিক ধর্মশাস্ত্রবিদ্ মাটিন হোমের মতে—“ইরাণীর প্রবাদ-মূলক বীতান্স ও গ্রীক-বর্ণিত হরক্লিস্ এক ব্যক্তি নহেন। বীতান্স কোন্ সময়ে ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। পারসিক ধর্মশাস্ত্রগুলি পর্যালোচনা করিলে জরথুষ্ট্রে ১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দের পরবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।”

পারসিকদিগের ধর্মগ্রন্থসমূহে জরথুষ্ট্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে জরথুষ্ট্রে অসাধারণ দেবাতীত গুণসম্পন্ন ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে ইনি মন্ত্রপাঠক, বক্তা, অহরমজদ-নিযুক্ত দূত ও তাঁহার আদিষ্ট উপদেশাদি প্রচারকারী বলিয়া বর্ণিত। নবম যুগে ইনি ঐর্ষ্য বএজো অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রসিদ্ধ এবং বন্দীদাদ পাঠে ইহাকে বাখ্শি (বাহুলীক) বর্তমান বাল্ধ নামক স্থানবাসী বলিয়া বোধ হয়।

জরথুষ্ট্র একেশ্বরবাদী ছিলেন। যখন দেবধর্মাবলম্বী ভার-তীয় আর্য ও অম্বর-মতাবলম্বী পারসিক আর্যদিগের মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত, যখন অধিকাংশ পারসিক বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা ও কুসংস্কার জালে জড়িত ছিল, সেই সময়ে জরথুষ্ট্র একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। পারসিকদিগের প্রাচীনতম গাথা ও প্রাচীনতর যন্ত্রগ্রন্থে তাঁহার প্রবর্তিত জ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তিনি দৈতবাদী অর্থাৎ প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক জগতের দুইটি মূল কারণ স্বীকার করিতেন। বাক, মন ও কর্ম এই ত্রিতয়ের উপর তাঁহার ধর্মনীতি স্থাপিত। যখন গ্রীকগণ প্রাকৃত জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে শিখেন নাই, মহাত্মা প্লেটোও যখন নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অব-গত হইতে পারেন নাই, তাহার বহুপূর্বে জরথুষ্ট্র জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অহনবৈতি গাথায় জরথুষ্ট্রের মত বিবৃত আছে। তৎপাঠে বোধ হয়, তৎসাময়িক ও তাঁহার বহু শতাব্দী পরবর্তী অনেক ভাবুক জ্ঞানী অপেক্ষাও অনেক গভীর তত্ত্ব সকল তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রভাবে এখনও পারসিকগণ সেই প্রাচীন আবৃত্তিক ধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ। [পারসিক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

জরদষ্টি (জি) ১ অতি বৃদ্ধ। “ময়া পত্যা জরদষ্টির্থাসঃ।” (ঋক্ ১০।৮৫।৩৬।) (স্ত্রী) ২ দীর্ঘজীবন।

“আরম্ভেমানমুত্তম ঋষ্টিমচ্ছিত্তমানা জরদষ্টিরম্ভ তে।”

(অথর্ব ৮।২।১)

জরদগব (পুং) জরকাসৌ গোষ্ঠেতি (গোরতক্তিদুকি। পা ৫।৪।১২)। ইতি ট্। জীর্ণ বৃষ, বৃদ্ধোক।

“জরদগবঃ সমম্মাতি দৈবাহপগতং তৃণং।” (শকুন্তল ৪।৮।৪)।

ধর্মরূপ জীর্ণ বৃষ।

“নৈতত্তেহ বর্ধমানকং শর্বচ্ছাজং জরদগবঃ।” (ভার ১৩।৯৩।৬৮)

জরদগববীধি (স্ত্রী) চত্বের বীধিতেহ, এখানে বিশাখা, অম্বর-রাধা ও জ্যোষ্ঠা নক্ষত্র থাকে। (বৃহৎসং ৯।১) [জরদগব দেখ।]

জরদ্বিম্ব (জি) জরতো বৃদ্ধান্ বেবেষ্টি বিব-কিপ্। বর্ধা জরং বিবং জলং যম্মাৎ। উদক জীর্ণকারী (অগ্নি)।

“স্বাময়ে অতিথং পূর্বং সুশর্মানং সরসং জরদ্বিম্বং।” (ঋক্ ৫।৮।২)

‘জরদ্বিম্ব জরতাং বৃদ্ধাণাং বিবং ব্যাপকং জীর্ণোদকং বা।’ (সারণ)

জরন্তু (পুং) জীর্ণ্যতীতি (জুবিশিত্য্যাক্। উণ্ ৩।১২৬) ইতি ঝ্। ১ মহিষ। ২ বৃদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড।) দ্বিমাং জীব্।

জরমান (পুং) একজন ঋষি।

জরয়িতৃ (জি) জরণকারী।

জরয়ু (জি) বৃদ্ধ হওয়া।

জরস্ (স্ত্রী) ১ জরা। (পুং) ২ ত্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। (হরিবংশ)

জরসান (পুং) জীর্ণ্যতি জরাগ্রস্তো ভবতীতি জু বয়োহানৌ অসানচ্ (হ্রস্বস্ত সানচশ্চজুভ্যাং। উণ্ ২।৮৬) পুরুষ। (উজ্জল)

জরা (স্ত্রী) জীর্ণ্যত্যানরা জু-অঙ্ (ষিদ্ভিাদাহিত্যোহঙ্। পা ৩।৩।১০৪।) (ঋদৃশোহিঙি গুণঃ। পা ৭।৪।১৬) ইতি গুণঃ।

১ বৃদ্ধাবস্থা, বার্দ্ধক্য। ২ কালের কত্থা। পর্যায়—বিস্রসা।

“কালকত্থা জরা সাক্ষাং লোকস্তাং নাভিনন্দতি।

স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ কস্যায় যবনেশ্বরঃ॥” (ভাগবত)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে কালকত্থা জরাদেবী চতুঃবর্জী রোগ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবীতে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইনি অবসর পাইলেই লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ চক্ষু জলদান করে, ব্যায়াম করে, পাদেদ অধোভাগে, কর্ণে ও মস্তকে তৈল প্রদান করে, বসন্তে প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমণ করে, যথাকালে বালা স্ত্রী সন্তোগ করে, খাতজলে বা শীতলজলে স্নান করে, চন্দনদ্রব্য ব্রক্ষণ করে, কদম্বা জল ত্যাগ করে, সময়ে আহার করে, শরৎ-কালে রৌদ্রবর্জন করে, গ্রীষ্মে বায়ুসেবন করে, বর্ষাকালে গরমজলে স্নান করে, বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সেবন করে না; সত্ত্ব মাংস, দুগ্ধ ও দ্রুত ভোজন করে, ক্ষুধার সময় আহার, তৃষ্ণার সময় জলপান এবং নিত্য তাড়ুল ভোজন করে, হৈয়দবীন (সত্ত্ব প্রস্তুত দ্রুত) ও নবনীত নিয়মিত ভোজন করে এবং শুক মাংস, বৃদ্ধাঙ্গী, নবোদিত রৌদ্র, তরুণ দধি ও রাত্রিতে দধি, রজঃশলা, পুংস্‌লী, ঋতুহীনা বা অরজকা নারী সেবন করে না, জরা এরূপ লোকদিগকে ভ্রাতৃগণের সহিত আক্রমণ করিতে পারে না। বাহারা ইহার অন্তর্ধারণ করে, জরা সর্বদা তাহাদের শরীরে বাস করে। (ব্রহ্মবৈবর্ত ১।১৩৩৩৫৫)

২ এক কামরূপা রাক্ষসী, সে মগধের এক অশ্বাসে বাস করিত। এই রাক্ষসীই জরায়ুসকের অর্ধকলেবর বোকা দিয়া তাঁহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। [জরায়ুসক বৈধ.] এই রাক্ষসী প্রতিগৃহে ভ্রমণ করিত বলিয়া ত্রায়া ইহার নাম গৃহদেবী রাখিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ইহার নববোবনসম্পন্ন সপুত্রা সৃষ্টি গৃহে লিখিয়া রাখে, তাহার গৃহ সর্বদা ধনবান ও পুত্রপৌত্রাদিতে পরিপূর্ণ হয়। এই রাক্ষসীই বজ্রী নামে খ্যাত। (ভারত আদি) ৩ একজন ব্যাধ। ঐক্লব বধন বহুবংশ ধ্বংশের পর বৃক্ষমূলে মৌলভাবে বলিয়া ছিলেন, সেই সময় এই ব্যাধ মৃগজন্মে তাঁহাকে বধ করে। কথিত আছে, এই ব্যাধ ষাপরে অঙ্গদের অবতার। (ভাগ) ৪ কীরিকা বৃক্ষ, কীরই গাছ। (শব্দর) ৫ ভূতি। “অচ্ছা বলা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মপ্পতিম্” (ঋক্ ১৩৮।১৩) ৬ অগ্নিরবানিনী স্ত্রী।

“বা চ ভাৰ্য্যা বিক্লপাকী কন্দলা কলহপ্রিয়া।

বচনোত্তরবস্ত্রীচ সা জরা ন জরা জরা ॥” (চাণক্য)

জরাগ্রস্ত (ত্রি) জরয়া গ্রস্তঃ। জরাভিত্তত, জরা বাহাকে গ্রাস করিয়াছে।

জরাতুর (ত্রি) জরয়া আতুরঃ। ১ জীর্ণ। ২ জরারোগগ্রস্ত। (শব্দর)

“মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতিবরটা তপস্বিনী।

গতিস্তরোরব জনন্তমর্দয়রহো বিধে স্বাং কল্পণা ক্লগচ্চিন ॥”

(নৈষধ ১।১০৫)

জরাপুষ্ট (পুং) জরয়া রাক্ষতা পুষ্টঃ ৩৩৭। জরাসক। (শব্দর)

জরাবোধ (পুং) জরয়া জ্ঞাত্যা বুধ্যতে বুধ-অহ। ভূতি দ্বারা বোধমান অসি।

“জরাবোধতবিড়্টিবিশে বিশ বজ্জিয়ার” (ঋক্ ১।২৭।৫)

‘জরয়া জ্ঞাত্যা বোধমানায়েঃ।’ (সায়ণ)

জরাবোধীয় (পুং) জরাবোধেজ্ঞাত্যামৃতি ভাবঃ। সায়ভেদ।

“অথে যুজ্জ্যা হিরেত চেতি জরাবোধীরমরিত্রোমসাম কার্য্যং।

(তাণ্ড্যব্রা ৪।২।১৫)।

জরাতীক (পুং) জরাতঃ তীকঃ। ১ কামদেব। (হেম ২।১৪১)।

(ত্রি) ২ জরা হইতে জরালীল।

জরায়ুনি (পুং) জরয়া রাক্ষতা অপত্যং জরা বাহুলকাৎ কিণ্।

জরাসক। (শব্দর)

জরায়ু (পুং) জরামেতীতি জরা-ইণ্ ঞ্ণ। (কিঙ্করোঃ প্রিণঃ।

উণ্ ১।৪১) ১ গর্ভবেষ্টনচর্চ। পর্বার্য—গর্ভাশয়, উষ, কলল।

“বা তু চর্চাকৃতিঃ স্ত্রীয়া জরায়ুঃ সা নিগন্ততে।” (ভগবতীগী)

২ যোনি।

“জরায়ুণা যুখে জ্বরে কর্ণে চ ককবেষ্টতে।

বাহোর্মার্গনিম্নোবাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্রয়োদ্বিতি ॥” (সুত্র)

২ অমিয়ারবৃক্ষ। (মজ্জিনি) ৩ জটায়ু পক্ষী। (মেঘিনী)

৪ কুমারাহচরসাহুভেদ।

“পক্ষমিকা যৎকৃশিকা জরায়ুর্জরাননা ॥” (ভারত)

জরায়ুজ (ত্রি) জরায়ো জায়তে জন-ভ। গর্ভাশয়জাত, যে গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মহন্ত সো প্রভৃতি।

“বা তু চর্চাকৃতিঃ স্ত্রীয়া জরায়ুঃ সা নিগন্ততে।

ভক্তশোণিতরো বৌগতস্মিন্ সংজায়তে বতঃ।

তত্র গর্তো তবেদ্বন্দ্বাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ ॥” (ভগবতীগী)

বিভক্ত শুক্রশোণিত সংযোগে জরায়ুতে গর্ভ (কুক্কিহ জীব) উৎপন্ন হয়। গর্ভ পরিপূর্ণ হইলে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১০।৮।৬০ মাসে গর্ভ প্রসূত হয়। সেই প্রসূত জীবের নাম জরায়ুজ।

“পশবন্ত যুগান্তৈব ব্যালাশ্চোতরতোমতঃ।

রক্ষাসি চ পিশাচাচ্চ মহত্যাচ্চ জরায়ুজাঃ ॥” (মহ ১।৪৩)

জরাসক (পুং) জরয়া তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধয়া রাক্ষতা কৃত্য সন্ধা দেহসংযোজনমত। মগধের এক বিখ্যাত রাজা। চন্দ্রবংশীয় রাজা বৃহদ্রথের পুত্র। রাজা বৃহদ্রথ পুত্রকামনার চণ্ডকৌশিকের আরাধনা করেন। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক তাঁহার কঠোর তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া এক কল প্রদান করিয়া বলিয়া দেন, এই কল মহিবীকে তক্ষণ করাইলে তুমি অভিলষিত পুত্র লাভ করিবে। রাজা বৃহদ্রথের দুইটা স্ত্রী ছিল, রাজা সেই দেবদত্ত কল দুইথণ্ডে বিভক্ত করিয়া পত্নীদ্বয়কে প্রদান করেন। ঐ দেবদত্ত কলের আশ্চর্য্য প্রভাবে একদা উভয় মহিবীই গর্ভিণী হইলেন এবং যথা সময়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত স্তব্ধ হইলেন এবং অর্দ্ধ পুত্রদ্বয়কে অশ্বাসে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করিলেন। রাজার আদেশে অর্দ্ধ পুত্রদ্বয় অশ্বাসে নিক্ষিপ্ত হইল। এই অশ্বাসে জরানারী কামরূপা এক রাক্ষসী বাস করিত। জরা সেই খণ্ডদ্বয় জোড়া দিয়া জীবিত করিলেন, এই জন্তই ইহার নাম জরায়ুসক হইল। এই কামরূপা রাক্ষসী বালককে জীবিত করিয়া রাজা বৃহদ্রথের নিকট বাইরা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, “মহারাজ এই বালক অতিশয় পরাক্রমশালী হইবে এবং ইহার সন্ধিদেশ ছিন্ন না হইলে মৃত্যু হইবে না, জানিবেন।” ক্রমে জরায়ুসক অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। এই জরায়ুসকের অতি ও প্রাপ্তি নামে দুই কথা ছিল। ঐ কথাদ্বয়কে তিনি ক্রমসেব করে অর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজে ঐক্লবের হতে কংস নিহত হইলে, জরায়ুসক জারাতুবধে নিতান্ত হুংখিত হইয়া শব্দ-নির্বাচন মানসে কোপে অষ্টদিশবার মথুরা আক্রমণ করেন এবং মথুরাবাসীদিগকে অতিশয় উৎপীড়িত করেন,

কিন্তু সপ্তরথংগে কিছুমাত্র কৃতকার্য হন নাই। তিনি কং-
নিধনসংবাদ শুনিয়াই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গিরিব্রজ হইতে কৃষ্ণবধ
মানসে একটা গদা একোনশতবার ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ
করেন। উহা মথুরার নিকটেই পতিত হয়। ঐ গদা যে
স্থানে পতিত হয়, তাহা গদাবানান নামে প্রসিদ্ধ। জরাসন্ধ
রাজস্বর বজ্র করিবার মানসে অনেক রাজাকে ভয় করিয়া
বন্দী করেন। যুধিষ্ঠির রাজস্বর বজ্র করিবার সময় জরাসন্ধকে
পরাসিত করিতে না পারিলে রাজস্বর বজ্র সমাধা হয় না
তাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনের
সহিত স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধ বধের
নিষিদ্ধ মগধে বাজা করিলেন। যথা সময়ে মগধে উপস্থিত
হইয়া ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন, “দেখ অর্জুন! এই গিরিব্রজ
অতীব ভয়সঙ্কুল। ঐ দেখ বৈহার, বরাহ, শ্বভ, ঋষিগিরি ও
চৈতাক, এই পাঁচটা পর্বত নগরীর চারিদিকে শোভা পাই-
তেছে, এই পাঁচটা পর্বত ঐরূপ ভাবে আছে বলিয়া হঠাৎ
শত্রুগণ আসিয়া এই নগরী আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না এবং
জ্ঞানযুদ্ধেও জরাসন্ধকে পরাজয় করা অতীব দুঃসাধ্য। এই
জন্তই অত আমরা নিজ নিজ বেশ পরিভ্যাগ ও ব্রহ্মচারী
বেশ পরিধান করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ঐ যে
তিনটা ভেরী দেখিতে পাইতেছ, রাজা বৃহদ্রথ বৃষকপথারী
দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহারই চর্মদ্বারা ঐ তিনটা ভেরী
প্রস্তুত করেন। ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে এক
মাস ধরিয়া গভীর ধ্বনি হইতে থাকে। এখন তোমরা শীঘ্র
ঐ ভেরী তন্ন কর।” ভীমার্জুন শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া
কালবিলম্ব না করিয়া ভেরীত্রয় তন্ন করিলেন। পরে ক্রতবেগে
কৃষ্ণের আদেশে চৈত্যাশ্রমের নিকট গমনপূর্বক স্তুপ্রতিষ্ঠিত
পুরাতন চৈত্যান্দ্র তন্ন করিলেন এবং হঠাৎ মগধপুরে
প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহার তিনজনে জরাসন্ধ সমীপে
সমুপস্থিত হইলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ দেখিয়া কেহই
তাঁহাদের গতি রোধ করিল না।

জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিয়া
মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ
জরাসন্ধকে কহিলেন, “ইহারা দুইজন এখন নিরমস, পূর্বরাত্রে
অতীত না হইলে আলাপ করিবেন না।” জরাসন্ধ কৃষ্ণের
এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে বজ্রাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে
গমন করিলেন। পরে অর্জুন স্বরয়ে সমুপস্থিত হইয়া
তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণোচিত পূজাদি করিলেন। ভীমা-
র্জুন পূজা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত স্তুতিবাক্য প্রয়োগ
করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগের বেশ দর্শন

করিয়া অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, “হে ব্রহ্মগণ! আমি
জানি, স্নাতকগণ সভাগমন সময় ব্যতীত কখন বাসায় বা চন্দন
ধারণ করেন না। আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ ও সর্বাঙ্গ চন্দনা-
স্থলিঞ্চ। ভূজে অ্যাটিক লক্ষিত হইতেছে। আকার দর্শনে
স্পষ্টই কলভেজের প্রায় পাওয়া যাইতেছে। অথচ আপনারা
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এখন সত্য করিয়া বলুন,
আপনারা কে?” কৃষ্ণ জরাসন্ধের এই কথা শুনিয়া জলদ
গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, “নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্য এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন।
ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে,
ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে ধনশালী হয়, পুণ্ডরী
নিষ্ঠরই শ্রীমান্ হয়। এই জন্ত আমরা পুণ্ড ধারণ করিয়াছি।
ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাঘীর্ষ্যশালী নহে। ক্ষত্রিয়ের
বাহুবলেই প্রধান, এই জন্ত আমরা এই স্থানে যুদ্ধার্থী
হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, অচিরে আমাদেরই যুদ্ধ প্রদান
করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষা করুন। রাজন্! বেদাধ্যয়ন,
তপোমুষ্ঠান ও যুদ্ধে যত্ন এ সকলই স্বর্গের হেতু, কিন্তু
নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না,
কিন্তু যুদ্ধে প্রাণভ্যাগ করিলেই স্বর্গ হইবে, ইহা নিশ্চয়,
অতএব কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও। আমি
বাহুবলবতনয় কৃষ্ণ। আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়
ভীমার্জুন। তোমাকে সংহার করিব বলিয়াই অত এই বেশে
উপস্থিত হইয়াছি, আর সময় নাই, সম্বর আপনার দুহিতের
কলভোগ করিবার জন্ত প্রস্তুত হও।” জরাসন্ধ কৃষ্ণের এই
বাক্য শুনিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ
বোদ্ধবেশ পরিধানপূর্বক ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রস্তুত
হইলেন। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।
ক্রমে প্রাকর্ষণ, আকর্ষণ, অহুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর
পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জরাসন্ধকে
অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষে ভীমকে
সঙ্কেত করিয়া কহিলেন, “হে ভীম! তোমার যে দৈববল
ও বাহুবল আছে, এখন তাহা জরাসন্ধকে প্রদর্শন করাও।”
ভীম কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া জরাসন্ধকে উৎকিঞ্চ করিয়া ঘূর্ণিত
করিতে লাগিলেন, শতবার ঘূর্ণিত করিয়া আহুদ্বারা আহুকন-
পূর্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও নিশ্চেষণপূর্বক তাহার চরণদ্বয়
করকরলিত করিয়া তাহার সন্ধিস্থান বিধা বিভক্ত করিলেন।
নিশ্চিন্তমান জরাসন্ধের আঁতরবে ও ভীমের গর্জনে মগধবাসী
সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে জরাসন্ধ ভীমের
হস্তে নিহত হইলেন। কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন পরে জরাসন্ধ-

তনরকে রাজ্যভিত্তিক করিয়া রাজত্ববর্ণকে মুক্তি প্রদান করিলেন। (ভারত সভা করাসকবধপক্ষাধার)

জরিত (ত্রি) জরা জাতাহত তারকাদিখাদিতহ। জরাযুক্ত।

জরিতা (ত্রি) ১ মঙ্গলশাল ঋষির জী। ২ পক্ষীবিষেব।

জরিতারি (পুং) জরিতাগর্ভজাত মঙ্গলশাল ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

“জরিতারো কুলং হেতৎ জ্যেষ্ঠেন প্রতিষ্ঠিতং।” (ভাঃ ১।২৬ অঃ)

জরিত্ (ত্রি) জৃ-তৃচ। ১ জুতিকারক।

“ইমা ব্রহ্মাণি জরিতা বো অর্জৎ।” (ঋক্ ১।১৬৫।১৪)

(ত্রি) ২ জীর্ণা জী।

জরিন্ (ত্রি) জরাত্যক্তেতি ইনি। ১ বৃদ্ধ। ২ জরাযুক্ত।

জরিন্ম (পুং) জৃ-ভাবে ইমনিচ্। জরা।

“নমো ন রুপং জরিতা মিনাতি।” (ঋক্ ১।৭১।১০)

‘জরিতা জরা মিনাতি।’ (সারণ)

“উত পশুন্নব্দীর্ঘমায়ুন্নমিবেজ্জরিতানং জগম্যাং।”

(ঋক্ ১।১১৬।২৫) ‘এবং জরিতানং জরাং’ (সারণ)

জরীপ্, জরীব্ (পারসী) ১ জমি মাপিয়া তাহার পরিমাণাদি স্থির করা। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।] ২ পরিমাণ। পূর্বে

৪ কফিজ্ অর্থাৎ ৩৮৪ মাড় পরিমাণকেই জরীব্ বলা হইত, তাহা হইতেই দড়ি বা যে কোন প্রকার জমির মাপকে এখন জরীপ্ বলা হয়। কোন স্থানে এক বর্গ জরীব্কে বিঘা বলে।

জরুথ (পুং) জীর্ঘ্যতীতি জৃ-উথন্ (জৃবৃজ্-ভ্যামুথন্। উণ্ ২।৬)

১ মাংস। (ত্রিকাণ্ড) ২ জরগীর। ৩ পরুষভাবী।

“জরুথং হত্মকি রাসে পুরকিং” (ঋক্ ৭।৯।৬)।

‘জরুথং পরুষভাবিণং জরগীরং বা রক্ষোগণং’ (সারণ)

জর্জর (পুং) জর্জতি স্বপুণেনাপরান্নিন্দতি জর্জ-বাহলকাৎ অরঃ।

১ শৈলজ। জর্জতি শব্দজ্-তর্জয়তি। ২ শত্রুধ্বজ। জর্জতে নিন্দ্যতে কর্মণি বহলবচনাদরঃ। ৩ জরাতুর। (ত্রি) ৪ জীর্ণ।

“অথ জর্জরসর্দ্বাং ব্যাবিদ্ধনয়নায়রং।

ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যঞ্জেদমুবাচ হ॥” (ভারত ৩।১।৬৫) ৫ বিনীর্ণ, খণ্ডিত।

“কথা পুং বৎপাতমুচ্চৈর্ভূতো।

মুর্দ্ধি গ্রাণাং জর্জরা নির্জরোবাঃ॥” (মাঘ ৪।২৩)।

জর্জরাননা (ত্রি) কুমারাহুচরমাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

জর্জরিত (ত্রি) জর্জরং কয়োতি জর্জ-গিচ্-কর্মণি ক্ত।

১ জীর্ণীকৃত, বাহাকে জর্জর করিয়াছে। ২ খণ্ডিত।

“কথো জর্জরিতাঙ্গস্ত কুজরভাউচেতসঃ।” (হরিবংশ ৮৬ অঃ)

জর্জরীক (ত্রি) জর্জতি জীর্ণো ভবতি জর্জ-কৈকন্। (কর্মরীকা-দশচ। উণ্ ৪।২০)। ১ বহু ছিদ্রবিশিষ্ট দ্রব্য। যে দ্রব্যের অনেকগুলি ছিদ্র আছে। ২ জরাতুর। (মেদিনী)

জর্জি, ইংরেজের বাহাকে George or St. George বলেন, তিনি মুসলমানদিগের নিকট জর্জি নামে অভিহিত। মুসলমানদিগের মধ্যে ইনিও একজন প্যাগম্বর।

জর্ডন, তুরকে প্রবাহিত একটা বিখ্যাত নদী। হার্ন গিরিপাদ দেশে যেখানে কতকগুলি শিলালিপি আছে, তাহারই নিকট হইতে বাহির হইয়া শেরোম হ্রদ, জুলিয়া নগর, টাইবেরিয়া হ্রদ, এলবোর উপত্যকা প্রভৃতি স্থান দিয়া বহলে-গাট বা মৃত-সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ইহার জল খৃষ্টানদিগের নিকট অতি পবিত্র।

জর্ণ (পুং) জীর্ঘ্যতি জীর্ণো ভবতি জৃ-নন্ (কৃ বৃ জৃ বিজৃপনীতি। উণ্ ৩।১০।) ১ চক্র। ২ বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ জীর্ণ। (হেম)

জর্ন্ত (পুং) জারতে হৃন্মাৎ অন বাহলকাৎ তপ্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ ঘোনি। ২ হস্তী। (সংক্ষিপ্তসার উপাসিহুতি)।

জর্ন্তিক (পুং) জৃ-বাহলকাৎ তিকন্। ১ বাহীকদেশ। সোহতি-জনোহত অচ্ বহু অনপদেবু লুপ্। ২ বাহীকদেশবাসী লোক।

“জর্ন্তিকা নাম বাহীকান্তেবাং বৃন্তং স্তুনিমিত্তং।” (ভারত ৮।৪৪)

জর্ন্তিল (পুং) বনজাত তিল, বুনোতিল।

“জর্ন্তিলঃ কথ্যতে সত্তিররণ্যপ্রভবন্তিলঃ।” (শম্বার্থচিঃ)

“ভ্রাম্যাক্ষত্বনীবাসা জর্ন্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।

তথা বেণুঘবাঃ প্রোক্তান্ত্বন মর্কটকা মুনো॥” (বিষ্ণুপুঃ ১।৬।২৫)

“জর্ন্তিলে জুহোতি” (শতপথব্রাঃ ১।১।১৩)

‘জর্ন্তিলা অরণ্যতীলাঃ।’ (ভাষ্য)

জর্ন্তু (পুং) জারতে হৃন্মাৎ, অন-তু।

(অনেন্তরঃ। উণ্ ৫।৪৬)। রেফচাক্রাদেশঃ। ১ ঘোনি। ২ হস্তী।

জর্দ্দ (বাবনিক) পীতবর্ণ, হরিদ্রা।

জর্জরি (ত্রি) জৃভ-গাভবিনামে অরিঃ। ১ গাভবিনামকর্তা, জৃন্তনকারী। ২ জুতিকারক। “সুধেব জর্জরী তুর্করীতু” (ঋক্ ১০।১০৫।৫)। ‘বিবিধা স্থিতি ভবতি জর্জরি জর্জরা চ হস্তা চ তথাষিনো চাপি তর্জারো জর্জরী-তর্জারো’ (সারণ)

চার্বাক বেদের এই শ্রুত দেখিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, বেদ ভণ্ড খুঁট নিশাচর কর্কট প্রণীত।

“ত্রয়োবেদস্ত কর্তারো ভণ্ডখুঁটনিশাচরাঃ।

জর্জরী তুর্করীতাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্বতঃ॥”

(সর্ববর্শন চার্বাক)

জর্জা (ত্রি) জরাকাক।

জর্জিল (পুং) অরণ্যতিল। [জর্জিল দেখ।]

জর্জর (পুং) একজন নাগপুত্রোদ্ভূত। ইনি বজ্র করিয়া সর্পগণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জন্মগি [জন্মগি দেখ।]

জল (স্রী) জলতি জীবয়তি সৌকান্, জলতি আচ্ছাদয়তি, ভূমাদীন বা জল পচাচ্ছ। পানীয়। পর্যায়—অণু, বাঃ, বাসি, সলিল, কমল, পয়ঃ, কীলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ, উদক, পাথঃ, পুফর, সর্কতোমুখ, অস্তঃ, অর্ণঃ, ভোয়, পানীর, স্রীর, নীর, অম্বু, সধর, মেঘপুষ্প, ঘনরস, আপ, সলিল, সল, জড়, ক, অন্ধ, কপঙ্ক, উদ, দক্ষ, নার, শবর, অজ্ঞপুষ্প, ঘনরস, যত, পীপ্লল, কুশ, বিব, কাণ্ড, সবর, সর, কুণীট, চন্দ্রোয়স, সদন, কর্করূ, বোয়াম, সধ, সরস, ইরা, বাজ, তামর, কঞ্চল, তন্মন, সম্বল, জলপীথ, ক্ষর, ঋত, উর্জ, কোমল, সোম। [বেদোক্ত পর্যায় অপূর্ণ দেখ।] দার্শনিক মতে, পঞ্চভূতের মধ্যে একটি ভূত। ইহা দ্রব্য পদার্থ।

“ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্বোয়াম কালাদিগেহিনোমনঃ দ্রব্যানি।”

(ভাষ্যপরিঃ ৩)

জলের ধর্ম—রূপ, দ্রবত্ব, প্রত্যক্ষযোগিত্ব ও গুরু রস-বিশিষ্ট। ইহার গুণ চতুর্দশ প্রকার—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপারত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস, স্নেহ। জলের বর্ণ গুরু, রস মধুর, স্পর্শ শীতল, স্নেহ ও দ্রবত্ব ইহার স্বাভাবিক গুণ। পরমাণুরূপ জল নিত্য, অবয়ববিশিষ্ট জল অনিত্য। অনিত্যরূপ জল তিন প্রকার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। অযোনিজ শরীর, রসগ্রহণকারী রসন ইন্দ্রিয় এবং সরিৎসমুদ্রাদি বিষয়রূপ। (ভাষ্যপরিঃ)

শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ, শব্দ তন্মাত্র সহিত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণবিশিষ্ট তেজঃ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপ ও রসগুণবিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইয়াছে। (সাক্ষ্যাত্ত্বকৌমুদী)

বৈদ্যকশাস্ত্র-মতে জলের গুণ—আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহা অমৃততুল্য জীবনদারী, তৃপ্তিকর, ধারক, প্রময় এবং ক্রান্তি, তৃষ্ণা, মদ, মুচ্ছা, তজ্জা, নিদ্রা ও দাহ-প্রশমনকর। পৃথিবীতে যে জল পতিত হয়, তাহাকে ভৌম জল বলা যায়। ভৌম জল বর্ষাকালে গুরুপাক, মধুর, সারক। শরৎকালে লঘুপাক। হেমন্তকালে স্নিগ্ধ, বলকর, ধাতুপোষক এবং গুরুপাক। শিশিরকালে কফ ও বায়ুনাশক এবং হেমন্ত কালোপেক্ষ লঘুপাক, বসন্তকালে কষায়, মধুর ও রুক্ষ। গ্রীষ্মকালে সকল জলই পান করা যায়। হেমন্তকালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল পান করা বিধেয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূপোদক ও প্রভ্রবণ জল সেবন করা উচিত। বর্ষাকালে উত্তীর্ন ও অন্তরিক জল সেবন করিবে। যে নদী পশ্চিমবাহিনী

তাহার জল লঘু, যে নদী পূর্ববাহিনী তাহার জল গুরু, দক্ষিণ বাহিনী নদীর জল সমগুণসম্পন্ন। সছাত্রি-উৎপন্ন নদীর জল কুষ্ঠজনক। বিক্ষোৎপন্ন নদীর জল পাণ্ডুকুষ্ঠজনক। মলরোৎপন্ন নদীর জল ক্রিমিরোগজনক। মহেন্দ্রপর্বতোৎপন্ন নদীর জল স্রীপদ ও উদররোগজনক। হিমবৎ সন্নিহিত নদীর জল সেবনে হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, স্রীপদ (গোদ) ও গলগণ্ড হয়। বেগবতী নদীর জল লঘুপাক। মন্দগামী নদীর জল গুরুপাক। মরুদেশ-প্রবাহিত নদীর জল প্রায় তিক্ত এবং লবণরস সংযুক্ত; জৈষৎ কষায়, মধুর, লঘু ও বলকর। সর্বপ্রকার ভৌম জল প্রাতেই গ্রহণ করা উচিত, কারণ সেই সময় জল নিষ্কল ও শীতল থাকে। যে জলে চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ পতিত হয়, সেই জল রুক্ষ কিম্বা নেত্ররোগকর নহে। বৃষ্টির জল ত্রিদোষ-শাস্তিকারক, বলপ্রদ, রসায়ন, মেধাজনক, রুক্ষত্ব, শীতল, প্রফুল্লকর এবং জ্বর দাহ ও বিষরোগের শাস্তিকারক। ইহা পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা কর্তব্য। চন্দ্রকান্তমণি-জল বিকৃত ও বিমল এবং মুচ্ছা, পিত্ত, দাহ, বিষরোগ, মুখরোগ, উন্মাদ-রোগ, ভ্রম, ক্রান্তি, বমনরোগ এবং উর্জগত রক্তপিত্তনাশক। নদীর জল বায়ুবর্জক, রুক্ষ, অধিকর, লঘু। সরোবরের জল পিপাসানাশক, বলকর, কষায় ও কটুপাক। বাপীজল বাত শ্লেষ্মার শাস্তিকর, সন্ধার, কটু ও পিত্তবর্জক। কূপোদক সন্ধার, পিত্তবর্জক, কফ, অমিদীপ্তিকর ও লঘু। ক্ষুদ্রকূপের জল অধিকর, রুক্ষ, মধুর অথচ শ্লেষ্ম-কর নহে। প্রভ্রবণ জল কফ, অধিকর, দীপক, হৃৎ ও লঘু। উত্তীর্ন জল মধুর, পিত্তর এবং অবিদাহী, ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল মধুর, গুরু ও দোষবর্জক। সমুদ্রের জল আমিষগন্ধী, লবণরসযুক্ত এবং সর্ববিধদোষবর্জক। জলার জল বহুদোষাকর। অজল প্রদেশের জল মধ্যম গুণবিশিষ্ট, বিদাহী, প্রীতিকর, দীপক, স্বাদু, শীতল ও লঘু। উষ্ণ জল এক সেরে তিন পোয়া থাকিলে বায়ুনষ্টকর, অর্দ্ধাবশিষ্ট পিত্তনাশক, পাদাবশিষ্ট (এক পোয়া থাকিলে) কফনাশক, লঘুপাক ও অধিকর। শিশির ঋতুতে পাদহীন, বসন্তে পাদাবশেষ, শরৎ, বর্ষা ও গ্রীষ্মে অর্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণোদক প্রশস্ত। দিবাপক জল দিবাতেই ও রাত্রিপক জল রাত্রিতেই বিশেষ উপকারপ্রদ, অল্প সময়ে অনিষ্টজনক। উষ্ণোদক সর্ব ঋতুতেই পথ্য। ইহা কাস, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, কফ, বায়ু ও আমদোষনাশক এবং পাচক, শ্লেষ্মা-নাশক ও বায়ুপ্রশমনকর। রাতে উষ্ণ জল পান করিলে কোষ্ঠতৃষ্ণা হইয়া অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে। নারিকেল-জল স্নিগ্ধ, হিম, মুখ-প্রিয়, অধিকর, বস্তিশোধক, বৃহৎ, তেজস্কর, পিত্তজ, পিপাসার শাস্তিকারক ও গুরু। কোমল নারিকেল জল পিত্তর ও

ভেদক, পক্ষ্মারিকেল জল গুরুপাক, শিথলকর ও কোষ্ঠবর্ধক।
তোষমান্তে অর্ধরাত্রের পর নারিকেল জল পান করা বিধের
নহে। তানজল গুরুপাক, শিথল, গুরুজনক ও তত্ত্বুদ্ধিকর।
জল সমস্ত দিন স্তম্ব্যকিরণে উত্তপ্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি চন্দ্র-
কিরণে শীতল করিলে বৃষ্টির জলের জ্ঞান গুণযুক্ত হয়। করকা-
জল অমৃততুল্য। জ্বগন্ধ বা জ্বাসিত জল তৃকানশিক, লঘু ও
মনোহর। রাত্রিশেষে জলপান কাস, খাস, অতীসার জ্বর,
বমন, কটিরোগ, কুষ্ঠ, সূত্রাঘাত, উদররোগ, অর্শ, খরখু, ঝল,
শিরঃ, কর্ণ, নাসা ও চক্ষুরোগনাশক। আকাশে মেঘ না
থাকিলে রাত্রিশেষে নাসিকা দ্বারা জল পান বুদ্ধিকারক,
চক্ষুর্হিতজনক এবং সর্করোগনাশক। [ভূবার, মেঘ, সমুদ্র
প্রভৃতি দেখ।]

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে—পূর্বে জল প্রাকৃত
জগতের চারিটা মহাত্ম্য মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু এখন উদ্ভাবন
ও অল্পজান সংযোগে জলের উৎপত্তি স্থির হইয়াছে। সুতরাং
জল একটা বৈজ্ঞানিক পদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। জল তরল,
বায়বীয় ও ঘন এই তিন প্রকার অবস্থার দেখা যায়। ইহা বর্ণ
হীন, স্বচ্ছ, গন্ধহীন ও স্বাদহীন; তাপ ও বিদ্যুতের অসম্পূর্ণ পরি-
চালক। বায়ুমণ্ডলের চাপে ইহার অতি সামান্যই সঙ্কুচিত হয়,
কাহারও মতে ৪৬ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সঙ্কুচিত হয়।
ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১। এই এক সংখ্যাহুসারেই অপর
সকল তরল ও ঘন দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়। সম
আয়তন বায়ু অপেক্ষা জল ৮১৫ গুণ ভারি। অপরূপ তরল
পদার্থের জ্ঞান বায়ুর আধিক্যে জলও প্রসারিত হইয়া পড়ে।
৪০° ডিগ্রি ফারেনহাইটে জল শীতলীভূত হয়, ৩২° ডিগ্রিতে অতি
ঘন হইয়া যায়। আবার এইরূপ জলে যতই উত্তাপ দেওয়া যায়,
ততই বিস্ফারিত হইতে থাকে। অপরূপকে এইরূপে বেশী
শীতল হইতে থাকিলে, শেষে কঠিন হয়। জল এত জোরে
কঠিন আকার ধারণ করে, যে সে সময়ে লৌহনির্মিত দ্রব্যও
কঠিনারমান জলের বেগে চূর্ণ হইয়া যায়। বরফ জল অপেক্ষা
হাল্কা, ইহার ঘনত্ব ০.৯৪ মাত্র, এই জন্য বরফ জলের উপর
ভাসিতে থাকে। যুরোপীয়েরা জলকে সচরাচর এই করতালে
বিভক্ত করেন—অন্তরিক জল, ভৌম জল ও বনিক জল।
বৃষ্টি, হিম প্রভৃতি যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা
অন্তরিক। সমুদ্র, নদী ও জলাশয়াদির জল ভৌম এবং বনি
হইতে যে জল বাহির হয়, তাহা বনিক। জল সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-
বহ্য পাত্তা যায় না। ইহাতে লাবণিক, বাষ্পীয়, পচায়মান
জাতক ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তাহার ভারতমাত্রা-
সারে জলে বিভিন্ন গুণ জন্মে এবং এক রকম স্বাদ ও গন্ধ হয়।

মানবের ভেদন জাগ্রতির প্রবল নহে, তাই জলের আশ্রয় ও
গন্ধ অহতব করিতে পারে না। কিন্তু উৎপন্ন মনুষ্যই মধ্যেও
বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পায়। সমুদ্রজ ও বনিক জলেই
লাবণিক উপাদান অধিক, সেই জন্যই উত্তর প্রকার জলের
আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, কোন কোন মহানদীতেও কর্দম ও
অপর পদার্থ বেশী জমিলেও আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়।

সাধারণের বিশ্বাস, বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, কিন্তু
ইহাও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র নয়। বায়ুমণ্ডলে যে সকল বিভিন্ন পদার্থ
থাকে, বৃষ্টিপতনকালে জলের সহিত প্রথমই তাহা পতিত হয়,
এইরূপে বৃষ্টির জলেও বরফারান, অকারকার ও ক্রোয়িন, এ
ছাড়া অণুপরিমাণে লৌহ, নিকেল ও ম্যাঙ্গানিস্ এবং এক
প্রকার অপূর্ণ জাতক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। উত্তরপশ্চিমে
বায়ু বহিলে বৃষ্টির জলে দীপকারও (Phosphoric acid)
দেখা যায়। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগের মতে, সকল বৃষ্টির
জলে আমোনিয়া মিশ্রিত থাকে, তাহাই বৃক্ষের বরফার-
জানের মূল কারণ।

অপর সকল জল অপেক্ষা বৃষ্টির জল অধিক বিশুদ্ধ বটে,
ইহার দ্রাবকশক্তিও অধিক, সেই জন্য রাসায়নিক নানা পরীক্ষা
হলে এই জলই বেশী উপযোগী। এক্ষণে বৃষ্টির জল
কিন্টার দ্বারা শোধিত জলের সমান। মগরাতির নিকটবর্তী
স্থানের বৃষ্টির জল ছাঁকিয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।
বিশেষতঃ সেই জল কোন সীসকের পাত্রে সংগৃহীত হইলে তাহা
দ্রবণীয় ভীষণ সীসক-লবণ (Salt of lead) দ্বারা কলুষিত হয়।

শিশির ও বৃষ্টির জলে বড় একটা প্রভেদ নাই। শিশির
জলে কেবল বায়ুর ভাগ কিছু বেশী। বরফজল প্রথম অবস্থায়
বৃষ্টির জল হইতে প্রভেদ থাকে, ইহাতে আদৌ বায়ু মিশ্রিত
থাকে না বলিয়াই সংশোধিত বরফের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিতে
পারে না। এই জন্যই বরফ জলের স্বাদও নাই ও গন্ধও নাই।
কিন্তু বায়ুসংযোগ হইলেই স্বাধা পরিমাণে গুণিতে থাকে। ভূবার
জলও বরফের মত।

বৃষ্টি হইতেই উৎস বা প্রভবের উৎপত্তি। পৃথিবীর কোন
আলুপা তর মিয়া বৃষ্টির জল ভিতরে চালিত হয়, শেষে বাধা
পাইলেই সেই জল উপরে উঠিতে থাকে, তাহাই প্রভবণ।
প্রভবণের জলেও সেই জন্য বৃষ্টির সমুদায় উপাদান থাকে।
উৎপত্তি-স্থান ও স্তরাদ্বারা সেই প্রভবণের জলের গুণ ন্যূনাবিক
বিভক্ত হয়। ছোট অপেক্ষা বড় বড় প্রভবণের জলই সমধিক
পরিষ্কার। আদিম অন্তরঙ্গের তর অথবা অগ্নি-প্রভব ও ককর
মিয়া যে প্রভবণ বাহির হয়, তাহার জল অতি বিশুদ্ধ। ইহার
আপেক্ষিক গুরুত্ব শোধিত জলের মত।

সকল প্রস্রবণের জলেই কমবেশ অজারক বাষ্প মিশ্রিত থাকে। এই সকল কারণে অজারক বাষ্প সংলগ্ন হয়—নিঃশ্বাস, দাহন প্রভৃতি উপারে বায়ুসঙ্গে অজারক বাষ্প, সকল জলেই অজারক চূষিয়া লইবার শক্তি আছে। সুতরাং বায়ুসঙ্গে উঠিলেই তাহা বৃষ্টির জলে গিয়া মিলিত হয়। এই রূপে যেখানে বৃষ্টি জল বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে, তাহার উপর দিয়া জল গেলেও তাহাতে অজারক বাষ্প সংযুক্ত হয়। আবার পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশে অজারক বাষ্প চূর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া আভ্যন্তরিক উত্তাপ দ্বারা স্তরাস্ত্রিমুখে বাইতে থাকে, এইরূপে প্রস্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেই জল টানিয়া লয়।

স্তরাস্ত্রিমুখে প্রস্রবণের জলেও লবণাংশ থাকে। আবর্জনা-বৃক্ষ স্থান হইতে নির্গত জলে (যেমন সহরের কূপ প্রভৃতিতে) ক্লোরাইড্ অব্ সোডা মিশ্রিত থাকে। যে স্থানে খড়ি থাকে, সেখানকার জলে কার্বনেট অব্ লাইম্ দৃষ্ট হয়। কোন কোন লবণ-খনি-নিঃসৃত প্রস্রবণের জলে অক্সগক (আয়োডাইন্) ও ব্রোমাইন্ মিশ্রিত থাকে। এমন কি প্রস্রবণের জল যে কোন খনিজ পদার্থের মধ্য দিয়া যায়, প্রায় সেই জলে অল্পাধিক পরিমাণে সেই সকল খনিজদ্রব্য সংযুক্ত হয়। একরূপ জল খনিজজল বা খনিজপ্রস্রবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কখন কখন যে গিরিশিলায় অম্ল, লাবণিক ও পার্থিব পদার্থ সকল সংযুক্ত থাকে, একরূপ গিরিশিলায় উপর লবণসংযুক্ত খনিজজল প্রবাহিত হইলেও তাহাতে অম্লাদি দৃষ্ট হয় না। আবার আদিম স্তর হইতে যে সকল খনিজজল বাহির হইয়াছে, তাহার উত্তাপ অধিক, তাহাতে প্রধানতঃ গন্ধকিত উনজান বাষ্প, অজারক বাষ্প, বজ্রকার (Carbonate of Soda), এতডির সোডা, সিকতা ও অবিদ্যুৎ ক্ষার থাকে, অতি অল্প পরিমাণেই লৌহও দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন স্থানে কার্বনেট অব্ লাইম্ আদৌ থাকে না। প্রাচীনতর দ্বিতীয় যুগ-স্তর (Older Secondary formations) হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহার অনেকাংশ শেবোক্ত জলের সমান, বাহিরে গরম বোধ হইলেও তাহার আভ্যন্তরিক উত্তাপ কম, তাহাকে অজারক বাষ্প কমবেশ থাকে, কিন্তু গন্ধকিত অম্লজান আদৌ থাকে না। তাহাতে কার্বলবণ অল্প, কিন্তু সল্ফেট অব্ লাইম্ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে সামান্য সিকতা (Silica) পাওয়া যায়। পৃথিবীর অভিনব দ্বিতীয় বা তৃতীয় যুগ-স্তরের (the newer secondary and tertiary formations) জল শীতল, তাহাতে অজারক বাষ্প নাই। কার্বনেট ও সল্ফেট অব্ লাইম্, সল্ফেট অব্ ম্যাগনেসিয়া ও অক্সাইড্ অব্ আরসেন্ সেই জলের উপাদান।

আধুনিক আয়েরগিরি-শিলায় দানাদার ও অপর আদিম শিলাখণ্ড দিয়া প্রবাহিত জলে গন্ধকিত উনজান, অজারক, কার্বনেট অব্ সোডা, কার্বনেট অব্ লাইম্, সিকতা, বৃক্ষ গন্ধকিকার ও মিউরিয়াটিক অম্ল দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে সল্ফেট অব্ লাইম্, ম্যাগনেসিয়া-জাত লবণ এবং অক্সাইড্ অব্ আরসেন্ থাকে না। আবার জলীয় শিলা (Sedimentary rocks) দিয়া যে সমস্ত প্রস্রবণ উদ্ভিত হয়, একরূপ অনেকগুলি প্রস্রবণ নিকটে থাকিলেও পরস্পর জলের তারতম্য ও ভিন্ন ভাবাদি সংযুক্ত দেখা যায়।

এইরূপে স্তরভেদে প্রস্রবণের জলের গুণাগুণ নানাবিধ হয়, সকল জলে সমান ফল হয় না। প্রস্রবণের জলের উষ্ণতা দেখিয়া স্বভাবতই বোধ হয় যে ঐষথে ব্যবহার করিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, এই জল অপেক্ষা কৃত্রিম উপায়ে যে জল গরম করা হয়, তাহাই অধিক উপকারী। উষ্ণপ্রস্রবণে আয়েরগিরির ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে, ঐ প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ যেখানে যত প্রবল, সেখানকার জল তত বেশী উষ্ণ।

সকল জলেই জাস্তব পদার্থ থাকে। অণুবীক্ষণ দ্বারা জল মধ্যে জীবন্ত কীট ও বৃক্ষ লতাাদি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বৃক্ষ ও কীটাদি বথাকালে প্রাণত্যাগ করে, তাহা জাস্তব পদার্থে দ্রব হইবার পূর্বে পচাসড়া আকারে দেখা যায়। সুতরাং তাহা জলের সহিত জীবদেহে প্রবিষ্ট হইলে রোগ জন্মাইতে পারে। প্রস্রবণের জল অপেক্ষা নদীর জলে এইরূপ পদার্থ অধিক থাকে। এই জন্ত নদীর জল অপেক্ষা প্রস্রবণের জল বিত্তল। বৃষ্টির জলে বর্ধিত হইয়া যে প্রস্রবণ নদীরূপে বাহির হয়, বালুকা অথবা দানাদার পাথরের (Granite) উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে সেই জল অতি পবিত্র, তাহাতে প্রায় অজারক মিশিতে পারে না। কিন্তু এই জল অতি পরিকার হইলেও প্রস্রবণের জলের মত বাইতে তেমন ভাল নহে। এই জলে অম্লজান শোষণ ও গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেই জন্তই নদী ও সাগর-জলের উপরাংশে অন্তরিক জল অপেক্ষা অম্ল-জানের ভাগ বেশী থাকে। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডবেনির মতে, অন্তরিক জল অপেক্ষা সমুদ্র নদী প্রভৃতির জলে শতকরা ২২.১ ভাগ অম্লজান অধিক। বেশী অম্লজান থাকতেই মৎস্তাদি গভীর জল মধ্যে অনায়াসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কেলিতে পারে এবং জলীয় উত্তিঙ্গণও বর্ধিত হইতে থাকে।

হ্রদের জলের উপাদান আবার অন্য প্রকার। যে হ্রদের জল-নির্গমনের পথ আছে, তাহার জল অনেকটা নদীজলের মত, ইহাতে নদী অপেক্ষা অতি অল্প ঘোত বহে বলিয়া জীর ও উদ্ভিদগণের বৃদ্ধি পাইবার সুবিধাও অধিক। কিন্তু যে হ্রদের

জল-নির্গমনের পথ নাই, তাহার জল অধিকাংশ লবণাক্ত এবং ইহার উপাদান প্রায় সমুদ্রজলের মত। কোন কোন স্থানে আবার সোহাগা পরিপূর্ণ থাকে। জলা বা আনু জল হির, ইহাতে জাস্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পরিপূর্ণ থাকে, এই জন্ত এই জল অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর। ইহা হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত বাষ্প বাহির হয়। এই জল পানার্থ ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু সেই জলে কটু ও কষায়যুক্ত শাক কলাই প্রভৃতি জন্মিলে জলের দোষ অনেকটা নষ্ট হয়, তখন গো মহিষাদি পান করিতে পারে। একরূপ জল মানবের প্রয়োজন হইলে তাহাতে কটু ও তিক্ত আশ্বাসযুক্ত লতা পাতা ডুবাইয়া তবে ব্যবহার্য হইতে পারে। একরূপ করিলে জল পরিভুক্ত না হইলেও দোষ অনেকটা দূর হয়।

অপরিস্কৃত জল বালি ও কয়লা সাহায্যে অথবা রৌদ্রে এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে বারবার ঢালাঢালি করিলে শুদ্ধ হয়।

সাগরের জলে প্রভূত পরিমাণে লাবণিক পদার্থ থাকার মানবের একান্ত অভোজ্য। সমুদ্র-জল সিদ্ধ করিয়া, ফিটোর দ্বারা শোধন অথবা তাপ দ্বারা ঘনীভূত করিয়া ব্যবহার্য করিতে পারা যায়। [সোডা, বরক, বৃষ্টি প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বর্তমান বৈজ্ঞানিক মতে—অন্নজান ও উদজান সংযোগে জলের উৎপত্তি। উদজান অন্নজানে দ্রব করিলে জল হয়। মিশ্র উদজান বায়ুতে পোড়াইলে জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। কোন শীতল পাত্র দীপশিখা বা গ্যাসালোকে ধরিলে তাহাতে আর্দ্রবিন্দু দৃষ্ট হয়, সেই আর্দ্রবিন্দু জলভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে পরীক্ষা দ্বারা জল হইতেও ইহার উপাদান পৃথক করিয়া লওয়া যায়। যে উত্তাপে প্লাটিনা-খাতু দ্রব হইতে পারে, জলে সেই উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জলের উপাদান তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হয়। অত্যন্ত উত্তপ্ত রক্তিম লোহের উপরে জল দিলে, ইহার অন্নজান ধাতুর সহিত মিলিত হয় ও উদজান বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এইরূপে যুরোপীয় রাসায়নিকেরা স্থির করিয়াছেন জলে শতকরা ১১.১১ ভাগ উদজান ও শতকরা ৮৮.৮৯ ভাগ অন্নজান থাকে।

জলকর, জল হইতে নানা উপায়ে যে আর হয়, তাহাকে জলকর বলে। বঙ্গ নদী, কুপ, তড়াগ ও মৎস্য ইহাতে যে আর বা কর তাহারই নাম জলকর। পঞ্জাবে কাহারও অধিকৃত পুকুরিণী বা নদীনালায় মৎস্য ফেলিয়া অপরের বে লব্ধ জন্মে, তাহাকেও জলকর বলে। স্থানবিশেষে কেবল জলশয়নাদিকেও জলকর কহে।

জলগার, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার নীচ জাতি। কাহারও মতে ইহারা নাবিক জাতি।

এই জাতির সংখ্যা অতি অল্প। ধারবার জেলায় পূর্বে ইহারা নদীনির্ভরের বালি খুঁইরা সোণা সংগ্রহ করিত। শীত-কালে যখন মজুরী সজা হয়, সেই সময় ইহারা কপোতি পাহাড়ে সিয়া নদী ও নির্ঝর হইতে বালি খুঁইরা সোণা সংগ্রহ করিয়া থাকে। অল্প সময়ে স্বর্ণকারের দোকানে ধূলা খুঁইরা তাহা হইতে সোণার কুচি বাছিয়া বেড়ায়।

এই জাতির সংখ্যা অতি অল্প। সকলেই বড় দরিদ্র। এখন ইহাদের ব্যবসার একপ্রকার মাটি হইয়াছে। মুটে মজুরী না করিলে আর চলে না।

ইহারা অশুদ্ধ কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। কুটীর কিবা সামান্য কোটার বাস করে। ইহারা বৃষভ, কুকুট ও কুকুর পোষে। কান্দি ও শাক সবজি ইহাদের নিত্য আহার। বদ-মাংস সকলেরই প্রিয়। ইহাদের পুরুষেরা কাণে কুণ্ডল পরে। স্ত্রীলোকদেরত কথাই নাই। ইহারা সকলেই পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু, কিন্তু নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন।

ঘেলবা, হলিগেবা ও হনমাল্লা, এই কয়জন জলাগারদিগের কুলদেবতা। ইহারা হোলী, দশরা ও দিবালী প্রভৃতি হিন্দু উৎসব পালন করে। দেব ও ব্রাহ্মণের উপর ইহাদের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। সকল ধর্মকর্মই ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহারা দয়মবা ও দুর্গবা নারী গ্রাম্যদেবীরও পূজা করে। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, দৈববাণী প্রভৃতিতে ইহারা বিশ্বাস করে না ও অথবা হিন্দুসংস্কার পালন করে না।

সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র ইহারা তাহার নাড়ি কাটিয়া ফেলে। পরে পঞ্চম দিনে কাল্মাশ্বেদীর পূজা ও জাতিভোজ দেয়। ধারবার জেলায় ঐ দিনে বম্হরের পীর রাজা বগোবরের গোরের উপর একটা মহিষ বলি দিয়া থাকে।

বিবাহের দিন ইহাদের গাত্রহরিদ্রা হয়। তৎপরদিন জাতিকুটুম্ব ভোজ দেয় এবং তৃতীয় দিনে বর কছাকে খোড়ায় চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করায়। কাহারও মৃত্যু হইলে চিতার কাঠ সাজাইয়া অথবা ঘুঁটের গোড়ে দাহ করে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ চলিত নাই। এই জাতি পরম্পর একতাহুত্রে আবদ্ধ।

জলক (স্রী) শব্দ, শব্দক।

জলকণ্টক (পুং) জলে জাতঃ কণ্টকঃ কণ্টকাবিত্তাদেবোক্ত তথ্যঃ। ১ শৃঙ্গটক, পানীজল। জলে কণ্টকঃ পত্ররিব।

২ কুড়ীর। (হার্যঃ)

জলকন্দ (পুং) কদলী। “কদলী জলকন্দজাতকপুশা যুগপ্রিয়া।” (জাবপ্রঃ)

জলকপি (পুং) জলে কশিরিব। শিশুমার, শুভক। (হার্যঃ)

জলকপোত (পুং) জলজাতঃ কপোতঃ। জলশীরাবত।
জলকরক (পুং) জলপূর্ণঃ করকঃ। ১ নারিকেল। জলে করকঃ
অশতনারিকেলকলাহি ইব। ২ পয়। ৩ শব্দ। ৪ জললতা।
৫ মেঘ। (মেদিনী)

জলকঙ্ক (পুং) জলত করকইব। জবাগ, কর্কম।
জলকাক (পুং) জলে জলত বা কাকইব। জলচরপক্ষিবিশেষ,
পানকোড়ী। পর্যায়—দাত্যাহ, কালকণ্টক। ইহার মাংসপুণ—
মিষ্ণু, শুক্ল, পীতল, বলকর ও বাতনাশক। (রাজনি)
জলকাজুক (পুং স্ত্রী) জলং কাজুকতি অভিলষতি জল-কাজুক-
অণু। ১ হস্তী। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ২ জলাভিলাষী।
জলকাজুকিন্ (পুং স্ত্রী) জলং কাজুকতি অভিলষতি কাজুক-
পিনি। ১ হস্তী। (ত্রি) ২ জলাভিলাষী।

জলকাস্ত (পুং) জলত কাস্তঃ ৬তং। জলাধিষ্ঠাতা বরুণ।
জলকাস্তার (পুং) জলমেব কাস্তারং হুর্গমপথোযন্ত। বরুণ।
(হেম ২।১০২)

জলকামুক (পুং) জলত কামুকঃ অভিলাষুকঃ ৬তং। ১
কুটম্বিনীযুক। (ত্রি) ২ জলাভিলাষী।

জলকিরিট (পুং) জলে কিরঃ শূকরঃ ইব অটতি গচ্ছতি
অট-অহ্। গ্রাহ, জলকন্তভেদ, হাদর।

জলকুকুট (পুং) জলে কুকুট ইব। ১ পক্ষিভেদ, গাজচিল।
“ভূজরাজৈ স্তথা হংসৈর্দাদ্যাহৈ জলকুকুটৈঃ” (ভার* ৩।১০৮ অঃ)
স্ত্রীলিঙ্গে স্ত্রী। গাজচিলী।

জলকুকুভ (পুং) জলে কুকুভঃ পক্ষিবিশেষ ইব। জলচর-
পক্ষিবিশেষ। পর্যায়—কোয়াটি, শিখরী। কোড়াপাখী।

জলকুস্তল (পুং) জলত কুস্তলঃ কেশইব। শৈবাল, জলকেশ।

জলকুজক (পুং) জলে কুজইব কায়তি। জলজাত বৃকভেদ,
পকার।

জলকুপী (স্ত্রী) জলত কুপী। কুপগর্ভ, পুফরিণী। (মেদিনী)

জলকুর্ম (পুং) জলে কুর্ম ইব। শিশুমার। শুকক।

জলকুৎ (ত্রি) জলকার, জলোৎপাদক।

জলকেতু (পুং) পতাকাবিশেষ।

“জলকেতুরপি পশ্চাৎ মিষ্ণু শিখরা পরেন চোন্নতয়া।”

(বৃহৎস* ১।১৪৬)

জলকেলি (পুং) জলে জলে বা কেলিঃ। জলক্রীড়া।

জলকেশ (পুং) জলত কেশইব। শৈবাল। (হার*)

জলক্রীড়া (স্ত্রী) জলসাধ্যা ক্রিয়া। পিজাদির তর্পণ।

“কালিক্যাং বিধিবৎ নান্য কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ।”

(ভাগ* ৬।১৬।১৪)

জলক্রীড়া (স্ত্রী) জলে জলে বা ক্রীড়া। জলে সন্তরণাদিরূপ

ক্রীড়া, জলখেলা। পর্যায়—করপাত্র, ব্যাত্যাকী, কয়-
পত্রিকা। (হার* ১।১৬)

“সহিতা ভ্রাতরঃ সর্কে জলক্রীড়ামবাসুঃ।” (ভাগ* ১।১২৮।১৬)

জলখগ (পুং) জলত খগঃ ৬তং। জলচর পক্ষিবিশেষ।

“হুদিনী বিলাসিনীনাং জলখগনখবিক্রতেষু রম্যেব।”

(বৃহৎস* ৪৮ অ*)

জলগ (পুং) জলং গচ্ছতি। জল-গম-ড। জলগত, জলহরা।

জলগন্ধেভ (পুং) জলহন্তী।

জলগর্ভ (পুং) জলহচকো গর্ভঃ। বুকের প্রধান শিখা আন-
নের পূর্বভাগের নাম, সে সঙ্গে জলবাহনের পুত্ররূপে জন্ম
গ্রহণ করেন।

জলগাঁও, খান্দে জেলার নসিরাবাদ থানার অন্তর্গত একটি
নগর। অক্ষা° ২০° ২৫' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ৩০' পূঃ। এখানে
গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ের একটি স্টেশন আছে।
বোম্বাই হইতে ২৬১ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। লোক-
সংখ্যা ১৪৬৭২, তন্মধ্যে ১২১৪২ জন হিন্দু। প্রত্যেক
অধিবাসী হইতে গড়ে ১।০ পাঁচসিকা করিয়া টেক্স আদায় হয়।

কার্পাস-উৎপাদক ভূমির মধ্যস্থলে থাকার চর্চা বৎসর
হইতে জলগাঁও অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে রেলপথ খোলা হয়। আমেরিকার
মহাসমরকালে (১৮৬২-৬৫ খৃঃ অঃ) জলগাঁও খান্দে মध्ये
প্রধান তুলার আড়ত বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যুদ্ধাবসানে
তুলার বাজার নরম হইলে জলগাঁও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল,
কিন্তু এখন আবার ক্রমে উন্নতি হইতেছে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এখানে ৩টা বাষ্পীয় চালিত বৃহৎ তুলার কল,
একটা বৃহৎ কুঠী ও একটা বস্ত্রবস্ত্রের কল স্থাপিত হয়। সেই
সময় হইতে এখানে লোকসংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। সেই
সময় ইহার পার্শ্ববর্তী পল্লেন্গেট নামে সহরতলী স্থাপিত হয়।
তুলার ব্যবসা ব্যতীত এখানে তিসি ও তিলের বিস্তার
কারবার আছে।

এখানে পুলিশের সহকারী তত্ত্বাবধায়কের বাটী, কালেক্টরীর
কাছারী, সবজজ আদালত, হাম্‌লংদারের বিচারভবন, পাছ-
নিবাস, বাজলা, ডাকঘর, থানা, মিউনিসিপাল আপিস, বোম্বাই
ব্যাঙ্কের শাখা এবং পাটেলের স্কুলের বাটী প্রভৃতি আছে।

সহর হইতে প্রায় এক কোশপথ দূরে মেহরুণ নামে
একটা হ্রদ আছে, ঐ হ্রদের জল দৌহ নলসংযোগে সহরে
আনীত হয়, এই কলের জলই নগরবাসীরা পান করে।

২ মধ্যপ্রদেশের বরধা জেলার অরবি তহসীলের অরবি
একটা গণ্ডগ্রাম। অরবি হইতে প্রায় ৩ কোশ উত্তরপশ্চিমে

অবস্থিত, এখানে স্থানীয় পাণের বরজ, ক একটি মনোহর উদ্যান ও ৯০ টি কূপ আছে। সমগ্র হুইবার হাট বসে। এখানে বিজ্ঞান আছে। লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

৩ বেরার এমেনেশের অকোলা জেলার একটি তালুক। পরিমাণ ৩৯২ বর্গমাইল। অক্ষা° ২০° ১৬' ৪৫" উঃ হইতে ২১° ১৬' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫' হইতে ৭৭° ২৬' পূঃ। ইহার মধ্যে ৩ টি নগর, ১৬২ টি গ্রাম এবং প্রায় বিশ হাজার গৃহ আছে। লোক সংখ্যা লক্ষাধিক। তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী। এখানে ১ টি দাওয়ারী ও ২ টি কোজদারী আদালত, ২ টি থানা এবং পুলিশ ও গ্রাম্য চৌকিদার মহলা আড়াইশত প্রহরী আছে। এই তালুকের মধ্য দিয়া নাগপুর-শাখারেল গিরাছে।

৪ অকোলাজেলার একটি নগর। জলগাঁও-জখোড় নামে খ্যাত। অক্ষা° ২১° ৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫' পূঃ। সাতপুর পাহাড়ের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলওয়ের নান্দুরা ষ্টেশন হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে কিকিদুন ১১ হাজার লোকের বাস। এই জলগাঁও ও বুরানপুরের বিজারা গ্রামে মুসলমান ভীলের বাস আছে। এই বিজারা গ্রাম হইতেই জলগাঁয়ে ভাল পানীর জল আসে। এখানে প্রস্তরবনের জলও বেশ পাওয়া যায়। এখানে অনেক উদ্যানে আম্র, পাণ ও ভাল কদলী গাছ জন্মে। অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের কাছারী, তহসীলের সদর, মধ্যপ্রদেশের বিজ্ঞান, থানা, চিকিৎসালয় ও ডাকঘর আছে।

৫ বরবাগীর রাজ্যের একটি প্রধান পরগণা। ভূপরিমাণ প্রায় ৬২৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ততিয়া ও মেলম নামে দুইটি বৃহৎ গ্রাম আছে।

জলগুলা (পুং) জলস্ত গুলাইব। ১ জলাবর্ত, জলের ঘূর্ণী। ২ কচ্ছপ। ৩ জলচর, জলচাতর। (হেম)

জলক (পুং) জলং গচ্ছতি জল গম-ড ততো যু। মহাকাল-লতা, মাকাল। (রাজনি°)

জলজম (পুং) জলং গ্রামান্তজলভূমিং গচ্ছতি জল-গম-খচ। (গমচ। পা ৩।২।৪৭) চাণ্ডাল।

জলজী (স্ত্রী) নদীয়া জেলার প্রধান তিনটি নদীর মধ্যে একটি। অপর দুইটির নাম মাথাভাঙ্গা ও ভাগীরথী। তিনটিই পদ্মার শাখা। জলচক্র (স্ত্রী) জলেন চরং। চাত্রজল, অন্ন জলযুক্ত দেশ। জলচর (ত্রি) জলে চরতি জল-চর-কৈ-ক। জলচারী প্রোহাদি জলজত।

“বামেন বীজ জলচরকাননহা বহিভরদশ” (বৃহৎসং ৪৬)

জলচরজীব (পুং) জলে চরঃ জলচরঃ যো জীবঃ। মৎস্তজীবী। জলচারী (পুং) জলে চরতি চর-গিনি। ১ মৎস্ত (ত্রি) ২ জলচর, সারসাদি।

“শরাদিহংসকুরৈরাকৌর্ণং জলচারিতিঃ।” (রামা° ৩।১৫৬) জলজ (স্ত্রী) জলে আরতে জল-জন-ড। ১ পদ্ম।

“বাচস্পতিব্রহ্মচরং প্রাণি জলজাননং” (কুমার ২।৩০)

২ শব্দ। “ততঃ প্রিয়ারপাতরসংঘরোচে নিবেত্ত মরৌ জলজঃ কুমারঃ।” (রঘু ৭।৬৩।) ৩ লোণার নামক কার। (রাজনি°) (পুং) ৪ মৎস্ত। (শব্দচঞ্জিকা)

“বরমেব হতঃ পুত্রা জলজেনাশ্রজো যথা।” (রামা° ২।৬১।২২)

জলে নিবাসহেতু কুস্তীর শিশুমারাদিকে জলজ কহে। ইহাদের মাংসগুণ—গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক। (রাজব°)

৬ হিঙ্গলবৃক্ষ। ৭ শৈবাল। ৮ বানীর বেত, জলবেত।

(রাজনি°) ৯ কুপীলু। (ভাবপ্র°) ১০ কর্কট, মীন, কুস্ত-রাশি ও মকরের অর্ধেক। (দীপিকা) (ত্রি) ১১ জলজাত।

“জলজৈঃ কুহুমৈশ্চিহ্নাঃ জলজৈর্হরিতোদকাম্।” (হরিব° ৬।৭।৩২)

জলজকুস্তম (স্ত্রী) জলজঃ যৎ কুস্তমং। জলজাত কুস্তম।

জলজদ্রব্য (স্ত্রী) জলজঃ যৎ দ্রব্যম্। মুক্তা, শব্দ প্রভৃতি সমুদ্রজ দ্রব্য।

জলজন্তু (পুং) জলজাতো তন্তুঃ। জলজপ্রাণী, পর্যায় বাদঃ।

জলজন্তুকা (স্ত্রী) জলজো জন্তুঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ত্রিরাং টাপ্। জলোকা, জৌক। (ভরত)

জলজন্ম (স্ত্রী) জলে জন্মাত। ১ পদ্ম। (হেম)। ২ শাবরকন্দক।

“জন্তুকা জলজয়া চ তথা শাবরকন্দকং” (বাউট ১৮ অঃ)

জলজন্মকা (স্ত্রী) জলপ্রধানা জন্মকা। কুস্তজন্ম, কুদে আম বা বন আম। (ভাবপ্র°)

জলজাজীব (পুং) জলজৈ-আ-জীব-জ্ঞ। জলচরবাতক, জেলে, ধীবর। (শব্দচি°)

জলজাসন (পুং) জলজং আসনং যন্ত। পদ্মাসন, ব্রহ্মা।

জলজিহ্ব (পুং) জলা জড়া বাদপ্রহণাসমর্থী বিহ্বা যন্ত। ডুত ল। নজ, কুস্তীর। (হারা°)

জলজীবিন্ (পুং) জলেন মৎস্তাদিনা জীবতি জীব-গিনি। মৎস্তোপজীবী, জেলে।

“স্বত্রজালৈতথা মৎস্তান্ বরন্তি জলজীবিনঃ।” (ভারত ১২।২অঃ)

জলভিশ্ব (পুং) জলে ভিষ ইব। শব্দক, শামুক।

জলতণ্ডুলীয় (পুং) জলজাততণ্ডুলীয়ঃ। ককটশাক। (শব্দার্থচি°)

জলতরঙ্গ (পুং) ১ জলের তরঙ্গ, ঢেউ। ২ বায়বীয়বিশেষ।

কতকগুলি ছোট বড় ধাতু বা কাচের বাটী সাজাইয়া তন্মধ্যে জল দিয়া স্রব মিলাইয়া বাজাইলে তাহাকে জলতরঙ্গ বলে।

জলভাষিক (পুং) জলভাষিন্ সংজ্ঞায়াং-কন্। ১ ইলিশ মৎস্ত। ২ কাকটী মৎস্ত। ৩ জলতাল। (শব্দর°)

জলতাপিনী (পুং) জলতাৎ শ্বেদরূপেহজলময়তাং আপ্নোতি, জলে তপতি প্রকাশয়তি ইতি বা। জলতা-আপ্নি নি। জল-তপ-পিনি। ইলিস মৎস্ত। (শব্দরং)

জলতাল (পুং) জলতায়ৈ জলতি পর্যাপ্নোতি অল-অহ। ইলিস মৎস্ত। (শব্দরং)

জলতত্ত্বিকা (স্ত্রী) জলা তিক্তা তিক্তিকা, জলপ্রধানা তিক্তিকা। শব্দকৌমুদী। (রাজনিং)

জলত্রো (স্ত্রী) জলাৎ ত্রায়তে ত্রৈ-ক। ১ ছত্র, ছাতা। ২ জলমকুটী। (হার্যং)

জলত্রাস (পুং) জলাৎ তদর্শনাৎ ত্রাসঃ সোহস্ত বা। জল হইতে ভয়, জল দেখিয়া ভয় পাওয়া। শৃগাল কুকুরাদি কাম-ডাইলে পরে জল দেখিয়া অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়, তাহাকে রিষ্ট কহে, দৃষ্ট ব্যক্তির সেই অবস্থা শব্দজনক। [জলাতঙ্ক দেখ।]

জলদ (পুং) জলং দদাতি দা ক। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ জলদাতা। (পুং) ৩ মুক্তক। (মেদিনী ২৯)

“অমৃতানাংগরসহচর ভদ্রোৎকটপঞ্চমূল জলদজলম্।

শ্রুতশীতং মধুযুক্তং নিবারয়তি স্ততিকাতঙ্কং।” (চক্রপাণি)

৪ কর্পূর। ৫ শাকদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ।

“বর্ষাণি তেবু কোরব্য সপ্তোক্তানি মনীষিতঃ।

মহামেরুমহাকাশী জলদঃ কুমুদোত্তরঃ।

জলধারো মহারাজ সুকুমার ইতি স্মৃতঃ॥” (ভারত ২।১১।২২)

জলদকাল (পুং) জলদন্ত কালঃ ৬তং। বর্ষাকাল। “জলদকাল-মবোধকৃতং দিশাং।” (মাঘ)

জলদক্ষয় (পুং) জলদানাং ক্ষয়ো যত্র। শরৎকাল। “সর্বাণি তদুতাং যান্তি জলানি জলদক্ষয়ে।” (হরিবং ৭৩ অং)

জলদতেতালী (স্ত্রী) ক্রতত্রিতালী রাগিণীবিশেষ। কেহ কেহ বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। (সঙ্গীতরং)

জলদর্দূর (পুং) জলং দর্দূর ইব। জলরূপ দর্দূরাদি বাত্ভ ভেদ, তালি দিয়া জল বাজান।

“অবাদয়ন্তা জলদর্দূরাংশ বাত্ভাশুরূপং জগুরেব হৃষ্টাঃ।”

(হরিবং ১৪৮ অং)

জলদাগম (পুং) জলদানাং মেঘানাং আগমঃ আগমনং যত্র। বর্ষাকাল।

“ভজং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।

দর্দূরা যত্র বক্তারম্ভত মৌনং হি শোভনম্॥” (বররুচি)

জলদাশন (পুং) জলদৈরভ্যন্তে ভক্ষ্যতে অশ-কর্ণগি লুটি। শালযুক্ত, মেঘ সকল বর্ষাকালে শালপত্র ভক্ষণ করিয়া বর্ষণ করে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

জলদুর্গ (স্ত্রী) জলবেষ্টিতং দুর্গং। দুর্গভেদ। [দুর্গ দেখ।]

জলদেব (পুং) জলং দেবঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অত্র। পূর্বা-বাচ্য নক্ষত্র। [অগ্নেবা দেখ।]

“মুলেহু মজ্জকপতিজলদেবো-কাশিপোমরণমেতি।” (বৃহৎসং ১১ অং)

১ কেতুগ্রহযুক্ত নক্ষত্রভেদ। জলদেব কেতুগ্রহের সহিত যুক্ত হইলে কাশীপতির নাম হয়।

“ইষ্টানন্দকলত্রো বীরোদুতসৌহৃদশ্চ জলদেবে” (বৃহৎসং ১০১ অং)

২ জলস্থিত দেবতা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

“অধীরমানো জলদেবতাতি নিবেদ্যমাণো জলকৈশ্চ সঠৈঃ” (হরিবং ২৪৩ অং)

জলদেবতা (স্ত্রী) জলত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। জলস্থিত দেবতা।

জলদ্রব্য (স্ত্রী) জলস্থিতং যৎ দ্রব্যং। মুক্তা, শব্দ প্রভৃতি সমুদ্রজাত দ্রব্য।

জলদ্রাক্ষা (স্ত্রী) জলে দ্রাক্ষা ইব। শালিজীশাক। (শব্দার্থচি°)

জলদ্রোণী (স্ত্রী) জলস্ত জলসেবনাথং দ্রোণীব। নৌকার জল-সেচন-পাত্রবিশেষ। (শব্দার্থচি°)

জলদ্বীপ (পুং) জলপ্রধানোদ্বীপঃ। দ্বীপভেদ। (রামাং)

জলধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধুঃ-অচ্ জলস্ত ধরঃ। মেঘ।

“নভো জলধরৈর্হীনং সাদ্রাকর ইবাংস্তমান্।” (ভারং ১।৩৫।১৮)

২ মুক্তক। (অমর) ৩ সমুদ্র। (হেমং) ৪ তিনিশ

বৃক্ষ। (রাজনিং) (ত্রি) ৫ জলধারক।

জলধরমালা (স্ত্রী) জলধরস্ত মালা ৬তং। ১ মেঘশ্রেণী। ২

ছন্দোবিশেষ, ইহার এক একটা চরণে ১২টা অক্ষর। ৪।৮ অক্ষরে যতি। ৫।৬।৭।৮ বর্ণ লঘু। তত্ত্বিন্ন বর্ণ গুরু।

“মো ভঃ স্মোচেজ্জলধরমালাক্যষ্টমঃ।”

জলধরকেদারা (স্ত্রী) মেঘ ও কেদারা যোগে উৎপন্ন রাগিণী-বিশেষ। (সংগীতরং)

জলধার (পুং) জলং ধারয়তি ধারি-অণু উপ। ১ শাকদ্বীপস্থিত পর্বত।

“ততঃ পূর্বেণ কোরব্য জলধারমহাগিরিঃ।

যত্র নিত্যমুপাদন্তে বাসবঃ পরমং জলং॥” (ভারত ৬।১১ অং)

(ত্রি) ২ জলধারক। (স্ত্রী) ৩ জলসম্ভতি।

জলধারা তপস্বী, এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহার নির্দিষ্ট স্থানে বসিবার উপযুক্ত খাত কাটিয়া তাহার উপর মঞ্চ প্রস্তুত করে, সেই মঞ্চের উপর একটা বহু ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র থাকে। সন্ন্যাসী সেই খাতের মধ্যে বসিয়া তপস্তা করেন। তাঁহার কোন শিষ্য সেই জলপাত্রে অনবরত জল ঢালিতে থাকে। সন্ন্যাসীগণ রাত্রি কালেই এইরূপ তপস্তা করে। প্রগাঢ় শীতের সময়ও সন্ন্যাসী পূর্ববৎ অগ্নিষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু বধন তপস্তা তত্ব করিয়া উঠেন, তখন তাঁহার শরীরে কিছুই থাকে না।

জলধি (পুং) জলানি ধীরন্তে হসিন্ জলধা-কি (কৰ্মণ্যধি-
করণে চ। পা ৩।৪।২৩) ১ সমুদ্র, অধি। ২ নদীসমূহসংখ্যা,
একশত লক্ষ কোটিতে এক জলধি হয়।

জলধিগা (স্ত্রী) জলধি সমুদ্রঃ গচ্ছতি গম-ড ত্রিরাং টাপ্।
১ নদী। ২ নদী।

জলধিজ (পুং) জলধৌ জায়তে জন-ড। ১ চন্দ্র। (জি) ২
সমুদ্রজাত জব্য।

জলধেধু (স্ত্রী) জলকরিতা ধেধুঃ। দানের অস্ত্র করিত ধেধু।
বরাহপুরাণে দানের বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।
পুণ্য দিনে বধাবিধি সংযতচিত্ত হইয়া যে এই জলধেধু দান
করে, সে বিকুলোকে গমন করে এবং তাহার অক্ষয় স্বর্ণ
লাভ হয়। তৃত্যগকে পোষ্য দ্বারা পরিমার্জন করিয়া চন্দ্র
করনা করিবে। তাহার মধ্যে একটি কুন্ত সংস্থাপন করিয়া
জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে এবং তাহাতে চন্দন অঙ্কুর প্রভৃতি
গন্ধ দ্রব্য দিয়া তাহাকে ধোয় করনা করিবে। পরে আর
একটি কুন্ত যত দূর পূর্ণ করিয়া দুর্কা পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা
ভূষিত করিবে এবং তাহাকে বৎস করনা করিবে। সেই
কলসীতে পঙ্কজ নিক্ষেপ করিয়া মাংসী, উল্লী, কুষ্ঠ, শৈলের
বালুকা, আমলা ও সর্বপ নিক্ষেপ করিবে। এই রূপে একটীতে
যত, একটীতে দধি, একটীতে মধু এবং একটীতে শর্করা দ্বারা
পূর্ণ করিবে। পরে স্বর্ণ দ্বারা মুখ ও চক্ষু, কৃষ্ণাঙ্কুর দ্বারা
শুণ্ণ, প্রশস্ত পত্র দ্বারা কর্ণ, মুক্তাদল দ্বারা চক্ষু, তাম্র দ্বারা পৃষ্ঠ,
কাংড়া দ্বারা রোম, হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠ, শুভ্র দ্বারা দন্ত, শর্করা
দ্বারা জিহ্বা, নবনীত দ্বারা ত্বন, ইক্ষু দ্বারা পাদ করনা
করিয়া গন্ধপুশ্প দ্বারা শোভিত করিবে। পরে কৃষ্ণাজিনের
উপর সংস্থাপন করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে
গন্ধপুশ্প দিয়া অর্চনা করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান
করিবে। এই জলধেধু যে দান করিবে, সে ব্রহ্মহত্যা, পিতৃ-
হত্যা, হরণান, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি মহাপাতক হইতে বিমুক্ত
হয় এবং যে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে, সেও সকল প্রকার পাতক
হইতে বিমুক্ত হয়। (বরাহপুরাণ)

জলনকুল (পুং) জলে নকুল ইব। জলজন্তবিশেষ, ধাড়িরা,
উদ্বিড়াল। পর্যায়—উল্ল, জলমার্জার, জলাধু, জলদ্রব,
জলবিড়াল, নীরাধু, পানীরনকুল, বগী। (হেম)

জলনিধি (পুং) জগানি নিধীরন্তে হসিন্-ধা-কি (কৰ্মণ্যধি-
করণে চ। পা ৩।৪।২৩) জলানাং নিধিঃ বা। ১ সমুদ্র।
২ চারি সংখ্যা।

“বারে শীতকরং তিথৌ জলনিধিঃ ভেদগ্নিক যোগে ধরং।”

(সংস্কৃত্যমুক্তাবলী)

“জলনিধিরসনারাঃ সানিতাঃ বাতি ভূমোঃ।” (বৃহৎসং ২ অঃ)

জলনির্ম্ম (পুং) জলানাং নির্ম্মঃ বহির্গমনং বহ্মাৎ, ভাবে
অণ্ (এহবৃদ্ধিমিচ্ছিগমন্ত। পা ৩।৪।৪৮) জলনিসেরগর্গর্গ,
পরঃপ্রণালী, ভ্রুন্। পর্যায়—জম, বজ্র, পুটভেদ। (বারী)
জলনীলিকা (স্ত্রী) জলনীলী বার্ধে-কন্, ত্রিরাং টাপ্। শৈবাল।
জলনীলী (স্ত্রী) জলং নীলমতি ভৎ করোতি পিচ্ ততো অণ্
গোরাদিহ্মাৎ ভীষ্। শৈবাল।

জলন্ধর (পুং) জলং ধমতি-দ্বা-ধন্। দানবভেদ।

“অষ্টদংষ্ট্রচতুদংষ্ট্রো মেঘনারী জলন্ধরঃ।” (হরিবং ২৫০ অঃ)

(ত্রিরাং টাপ্।) ২ সত্যভামার গর্ভজাত কৃষ্ণের এক কন্তা।

“অজিরে সত্যভামায়াঃ তাম্রভীমরথঃ কুপঃ।

রোহিতো দীপ্তিমাংশ্চৈব তাম্রজাক্ষো জলান্তকঃ॥

তাম্রভীমরিকা চৈব তাম্রপক্ষা জলন্ধর।

চতশ্রো অজিরে তেবাং বসারো গরুড়ধ্বজাং॥”

(হরিবং ১২৬ অঃ)

জলন্ধর (পুং) জলং ব্রহ্মনেত্র্যাত্মজলং ধরতি ধু-ধচ্ ততো
মুম্। অমুরবিশেষ। একদা ইন্দ্র শিবলোকে শিব দর্শন-
মানসে গমন করেন। তখন এক ভয়ানক আকৃতি পুরুষ
দর্শন করেন। ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ভগবান্ তুতভাবন মহেশ্বর কোথায়?” তিনি ইন্দ্রের বাক্যে
প্রত্যুত্তর দিলেন না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বজ্রদ্বারা
প্রহার করেন। তাহাতে সেই পুরুষের ললাট হইতে অগ্নি
নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইল। ইন্দ্র
তাহাকে রুদ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নানা প্রকার
স্তবে তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট
হইয়া সেই অগ্নি সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অগ্নি
হইতে এক বালক জন্মিয়া উঠিলে:বরে রোদন করিতে লাগিল।
তাহার রোদনে অগ্ন্যং বধির হইল। সেই রোদনে অগ্নির হইয়া
দেবগণের সহিত ব্রহ্মা সমুদ্রকূলে আসিয়া সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “এ কাহার পুত্র?” সমুদ্র বলিলেন, “আমার পুত্র,
আপনি লইয়া বাইয়া জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করুন।” ব্রহ্মা
বালককে কোড়ে করিবামাত্র সে তাহার শরীর ধরিয়া আক-
র্ষণ করিতে লাগিল। যাতনায় ব্রহ্মার নরন বৃগল হইতে
জল নির্গত হইল। ব্রহ্মা সেই বালকের জলন্ধর নাম
রাখিয়া এই বয় দিলেন—“এই বালক সর্কসাত্ত্ববৈরা এবং
কল্প ব্যতীত সর্কভূতের অবধ্য হইবে।” অনন্তর ইনি ব্রহ্মা
কর্তৃক জন্মুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি কালনেমি-
হুতা ব্রহ্মাকে বিবাহ করেন। তৎপরে ইনি ইন্দ্রকে পরা-
জিত করিয়া অমরাবতী জয় করেন। ইন্দ্র হতভাব

ইহা মহাদেবের শরণাগত হন। শিব ইন্দের পক্ষ হইয়া ইহার সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হন। বৃক্ষা পতির প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু অলঙ্কাররূপে তাহার সমীপে আগমন করিলে, পতি অকৃত শরীরে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া বৃক্ষা অসমাপ্ত পূজা ত্যাগ করিলেন, তাহাতে অলঙ্কারের মূর্ত্তা হইল। বৃক্ষা বিষ্ণুর এই কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া শাপপ্রদানোদ্ভবী হইলেন। বিষ্ণু তাহাকে অনেক সাধনা করিয়া কহিলেন, “তুমি সহমৃত্তা হও, তোমার ভ্রমে তুলনী, খাজী, পলাশ ও অম্বথ এই চারিপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।” (পদ্মপুং) ২ একজন ঋষি। ৩ বোগাল বহুভেদ। “বয়সি চ সিরাজালমধোগামি ন ভোজনং।

এব জলকরো বহুঃ কঠে হুঃখোদনাশনঃ ॥

জলকরে ক্রতে বহুঃ কঠসঙ্কোচলক্ষণং।

ন পীব্বঃ পতভ্যমৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি ॥ (কালীখং ৪১ অং)

জলপকিন্ (পুং) জলস্থিতঃ পকী। জলচর পকী, পান-কোড়ি প্রভৃতি।

জলপতি (পুং) জলত পতিঃ ৬৩৭। বরুণ বারাগনী তীর্থে গমন করিয়া শিবমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চদশ সহস্র বৎসর ধরিয়া শিবের আরাধনা করেন। মহাদেব বরুণের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, “আমি তোমার তপস্তায় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।” বরুণ কহিলেন, “যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে জলাধিপতি করিয়া দিন।” “অত্ৰ হইতে তুমি সকল জলের অধিপতি হইলে” এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। (কালীখং ১২ অঃ) ২ সমুদ্র। ৩ পূর্বায়াত্ৰা নক্ষত্র।

জলপথ (পুং) জলমেব পন্থা-অচ্। ১ জলমার্গ।

“বানোমার্থাঃ শিবজলপথা কর্ণেণ নোচরাগাং” (রঘু ১৭।৪১)

জলত পন্থাঃ ৬৩৭। ২ প্রণালী, জলনির্গমমার্গ।

জলপাই, একপ্রকার বৃক্ষ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই গাছ জন্মে। কণাড়ী পেরিকর ও সিংহলে বেরু বনে। (Elaeocarpus Serratus.) ইহার কলের শাঁস বকে ও আলা-মের লোকেরা তরকারীতে ব্যবহার করে। তৈল ও লবণে জরায়ীরাও অনেকে জলপাই ফল খায়। আলাবীরা এই ফল বেশী ভালবাসে, তাহার কাঁচা পাকা উভয় অবস্থায় পাড়িয়া খায়।

জলপাইশুড়ি [জরায়ীশুড়ী দেখ।]

জলপারাবত (পুং) জলে পারাবত ইব। পকিবিশেষ, পর্য্যায়—কোপী, জলকপোত। (রাবনিং)

জলপিলি (স্ত্রী) জলত পিলিবি। অধি। (শব্দরং)

জলপিপ্লী (স্ত্রী) জলজাতা পিপ্লী। পিপ্লীবিশেষ, জল-

পিপ্লু। পর্য্যায়—মহারাত্রী, পার্বতী, ভোমবরতী, মৎস্যজিনী, মৎস্যগন্ধা, লাকলী, শকুনাদনী, অঘিআলা, ফিরিখতী, ঐশ্বরী, তৃণশীতা, বহুশিখা। ইহার ভণ—কই, জীক, কবাক, মৃকশোধক, বীশক, অধকীটাদির ঘোব ও মলক্ষারনাশক। (জারকং)

জলপিপ্লিক। (স্ত্রী) জলপিপ্লী।

জলপিপ্লিকা (স্ত্রী) মত্।

জলপুর (পুং) জলত পুরঃ ৬৩৭। জলসমূহ। “বৃক্ষাবলম্বিনীনে পরিসরপরিগতবয়না জলপুরে বিহরতি।” (শীতগোঃ ১১।২৫)

জলপুর (পুং) জলপূর্ণ নদী।

জলপুষ্ক (স্ত্রী) জলজাতঃ পুষ্ক। পদ্ম প্রভৃতি জলজ পুষ্ক।

জলপৃষ্ঠজা (স্ত্রী) জলত পৃষ্ঠ উপরিদেশে জারতে, জল-ড জিয়াং টাপ্। শৈবাল।

জলপ্রদান (স্ত্রী) প্রোতাদিত্যঃ জলত প্রদানং। প্রোতর উদ্দেশে জলদান, তর্পণ প্রভৃতি।

জলপ্রদানিক (স্ত্রী) জলপ্রদানং যুদ্ধাহতানাং উদ্দেশেন জলপ্রদানং ঠন্। জীপর্কের অন্তর্গত জলপ্রদানিক পর্য্যায়।

“জলপ্রদানিকং পর্শ্ব জীবলাপতন্তঃ পয়ং” (ভারত ১।২ অঃ)

জলপ্রপা (স্ত্রী) জলত জলদানার্থঃ প্রপা। জলদানের গৃহ, জলপ্রদ।

“বাজোবাহজলপ্রপাশিতুলঃস্বারত্বকপটকা।” (যুধিষ্ঠিঃ টীঃ)

জলপ্রপাত (পুং) জলপতন। নদীর স্রোত ঘিরিশ্বে রুদ্ধ হইয়া জল প্রবল বেগে উচ্চ হইতে পতিত হইতে থাকে, তাহাকে জলপ্রপাত বলে। [প্রপাত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জলপ্রাপ্ত (পুং) জলত প্রাপ্তঃ ৬৩৭। জলের সমীপস্থান।

জলপ্রায় (স্ত্রী) জলত প্রায়ো বাহুল্যং বজ্জ। জলবহুলস্থান, অনুগম্যে। (অমর ২।১।১০)

জলপ্রিয় (পুং) জলং প্রিয়ং যজ্। ১ চাতকপকী। (শব্দরং) ২ মৎস্য। (শব্দচং) (জি) ৩ বে জল ভালবাসে।

জলপ্লব (পুং) জলে প্লবতে প্লু-অচ্। জলনকুল, উদ্বিড়াল।

(হারং) জীলিঙ্গে আতিস্যাৎ জীর্।

জলপ্লাবন (স্ত্রী) জলত প্লাবনং ৬৩৭। ১ বজ্জা, জলে দেশ ময় হওয়া। ২ প্রলববিশেষ, ইহাতে মহাদেশাদি সমস্ত জলে ডুবিয়া যায়।

অগতে কতবার এইরূপ জলপ্লাবন হইয়াছে জাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় সকল সভ্যজাতির মধ্যেই জলপ্লাবনের প্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রীয় বৈবস্বত মহা, পারসিক শাস্ত্রীয় হু এবং বাইবেলের প্রাচীন অংশে মুখ্য বর্ণিত কেম্বার জলপ্লাবন হইতে রক্ষার কথাই সর্বজনপ্রসিদ্ধ।

আমাদের পাতপথস্রাক্ষণ, মহাজয়ন্ত ও মৎস্য, ভাণ্ডারত, অধি প্রভৃতি পৌরাণিক প্রাণে জলপ্লাবনের কথা বর্ণিত

আছে। তদন্তে তরুণকুলীর শতপথব্রাহ্মণের বিবরণটাই সমধিক প্রাচীন।

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, এক দিন বহু হাত ধুইবার জলের ভিতর হইতে একটা মাছ ধরিলেন। সেই মাছ বলিল, “আমাকে বন্ধ করিও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।” বহু ভিজালা করিলেন, “কেন আমার রক্ষা করিবে?” মাছ বলিল, “জলপ্লাবনে সকল জীব জন্তু ভাসিয়া যাইবে, আমি তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিব।”

তৎপরে তাহাকে প্রথমে একটা মৃৎপাত্রে, পরে একটা সরোবরে এবং তদপেক্ষা বড় হইলে সাগরে ছাড়িয়া দিতেও বলিল। অনন্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাছ বাড়িয়া উঠিল ও পুনরায় মন্থকে সন্ধান করিয়া বলিল, “এই কয়বর্ষ পরে মহাপ্লাবন হইবে। একখানি নৌকা নির্মাণ কর ও আমার পূজা কর। যখন জল বৃদ্ধি পাইবে, ঐ অর্ণবপোতে ভঠিও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।” মাছের কথা মত মন্থ জলযান নির্মাণ করিলেন, সাগরে মাছ ছাড়িয়া দিলেন ও তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। মেদিনীমণ্ডল জলে প্লাবিত হইল। মন্থ মাছের শূণ্ডে জলযানের দড়ি বাঁধিয়া দিলেন। নৌকা উত্তরগিরির (হিমালয়) উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল। পরে সেই মৎস্তরাজ একটা বৃক্ষে নৌকা বাঁধিতে আদেশ করিল, আর আপনিও জলের সহিত নিরে চলিয়া গেল। মন্থ বৃক্ষে নৌকা বাঁধিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে জলের স্রোতে সকল জীব জন্তু ভাসিয়া গিয়াছে। এক মাত্র তিনিই কেবল জীবিত আছেন। প্রজা-সৃষ্টি কামনার তিনি যজ্ঞ ও তপস্তায় মন দিলেন। প্রথমে এক নারী উৎপন্ন হইল, সে মন্থর নিকট আসিয়া বলিল, “আমি আপনার কন্যা।” তাঁহার সহিত মন্থ সহবাস করিলেন এবং প্রজা-কামনার যাগ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। সেই নারী হইতে মন্থসন্তান লাভ করিলেন, সেই পুত্রই মানব নামে বিখ্যাত।

মহাভারতে লিখিত আছে—মন্থ একদিন নদীতীরে তপস্তা করিতেছেন, এমন সময় একটা মাছ আসিয়া বলিল, “গ্রাহাদি হইতে আমার রক্ষা কর।” মন্থ প্রথমে তাহাকে একটা ক্ষটিক পাত্রে রাখিয়া দেন, কিন্তু ক্রমে সেই মাছ এত বড় হইয়া পড়িল, যে সাগর ভিন্ন আর তাহার স্থান কুলাইল না। পরে সেই মৎস্ত মন্থকে বলিল, “শীঘ্রই মহাপ্লাবন ঘটবে, একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া সপ্তর্ষি সহ তাহাতে আরোহণ কর।” মন্থও তদনুসারে নৌকা প্রস্তুত করিয়া সপ্তর্ষি সহ চড়িলেন এবং সেই মৎস্তের শূণ্ডে নৌকা বাঁধিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। চারিদিক

জলময় বোধ হইল। এইরূপে যখন সমুদর বিধ জলে প্লাবিত হইল, সেই প্রবল ভরজ মন্থো মন্থ, সপ্তর্ষি ও মৎস্ত ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপে সেই মৎস্ত বহু বর্ষ ধরিতা নৌকা লইয়া শেষে হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই মৎস্ত মন্থকে সন্ধান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এই উচ্চ শৃঙ্গে শীঘ্র নৌকা বাঁধিয়া কেল। আমিই প্রজাপতি বিধাতা, তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্তই এই মৎস্তমূর্তি ধারণ করিয়াছি। এই মন্থ হইতেই দেবান্নর নর উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতেই স্থাবর জলম সমুদারের সৃষ্টি হইবে।”

অগ্নি ও মৎস্তপুয়াণে লিখিত আছে—একদিন বৈবস্বত মন্থ কৃতমালা নদীতে গিয়া জলতর্পণ করিতেছেন, এমন সময় একটা ক্ষুদ্রকার মৎস্ত তাঁহার অঙ্গলিতে আসিয়া পতিত হইল। তাহার কথা মত মন্থ তাহাকে প্রথমে কলসে, পরে জলাশয়ে এবং শরীর অতিশয় বৃদ্ধি হইল সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। মৎস্ত সমুদ্রে পতিত হইয়াই কণকাল মধ্যে লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ দেহ ধারণ করিল। মন্থ তাহা দেখিয়া বলিলেন, “ভগবন্! আপনি কে? আপনি দেবদেব নারায়ণ সন্দেহ নাই। হে জনাৰ্দ্দন! আমাকে কেন মারাজালে মুগ্ধ করিতেছেন?” তখন মৎস্তরূপী ভগবান্ কহিলেন, “আমি দুইগণের দমন ও সাধুদিগের রক্ষার জন্ত মৎস্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আজ হইতে সাতদিন মধ্যে এই নিখিল জগৎ সাগরজলে প্লাবিত হইবে, সেই সময় একখানি নৌকা তোমার নিকট আসিবে। তুমি তাহাতে সকল জীবের এক এক নম্পতী স্থাপন করিয়া সপ্তর্ষি-পরিবৃত হইয়া তদন্তে এক ব্রাহ্মী নিশা অতিবাহিত করিবে। তখন আমিও উপস্থিত হইব, সেই নৌকা নাগপাশ দ্বারা আমার শূণ্ডে বন্ধন করিয়া দিও।” কথা সময়ের সমুদ্রে উবেল হইলে নৌকা আসিল। মন্থ তাহার উপর বসিয়া এক ব্রাহ্মী নিশা অতিবাহিত করিলেন। শেষে একশূলধারী নিবৃত্ত যোজন বিস্তৃত কাঞ্চনময় এক মৎস্ত উপস্থিত হইল। মন্থ নৌকাখানি তাহার শূণ্ডে বাঁধিয়া দিয়া বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

খৃষ্টানদিগের ধর্মপুস্তক বাইবেলের মতে সৃষ্টির ১৬৫৬ বর্ষ পরে এবং বীত খৃষ্ট জন্মবার ২২০০ বর্ষ পূর্বে তরানক জলপ্লাবন হইয়াছিল। তৎকালে মহাগভীর প্রলবণ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ, বর্ণের গবাক উন্মুক্ত এবং ৪০ দিন ও ৪০ রাত্রি অনবরত মূলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। ক্রমে জল এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে সমুদ্র গিরিশূল ছাড়িয়া ১৫ হাত জল উঠিয়া ছিল। তাহাতে এই জগতের অধিষ্ঠারী সকল জীবই

দিনট হইল। প্রত্যাদেশ অনুসারে নোয়া এক এক জোড়া সকল জীব লইয়া একখানি বৃহৎ নৌকার উঠিয়াছিল। এখন কেবল নোয়া ও তাহার নৌকাই জীবগণ রক্ষা পাইল। ১৫০ দিন পর্যন্ত সেই জল ছিল, তৎপরে জৈব পৃথিবীর উপর বায়ু বহিতে দিলেন। তাহাতে জল ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। সমুদ্র ও প্রান্তবর্ণের প্রান্ত এবং বর্ণের গবাক বন্ধ হইল। বৃষ্টিও ধামিল। নোয়া ২য় মাসের ১৭শ দিবসে নৌকার উঠিয়াছিলেন, ৭ম মাসের ১৭শ দিবসে নৌকা আগিয়া আরারট গিরিশৃঙ্গে লাগিল। পর বর্ষের প্রথমদিন জল শুক হইতে লাগিল, চাইমাস পরে পৃথিবীও শুকাইল। এইরূপে মহা জলপ্লাবন হইতে নোয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

গ্রীক, পারসী, এমন কি আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরুবাসীগণও জলপ্লাবনের কথা বর্ণনা করিয়া থাকে। পুরোক্ত বিবরণের সহিত কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ করিলেও নৌকা চড়িয়া রক্ষার কথা সকলেই স্বীকার করেন। [মহু দেখ।]

বিখ্যাত চীনজ্ঞানী কনফুচি স্মরণিত ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “সেই ভীষণ বজ্রার জল আকাশ সমান উচ্চ হইয়া সকল ভূবন ও উচ্চ ভূধর জলময় করিয়াছিল। চীনলজ্জাট আসের আজ্ঞায় সেই জল সরিয়া পড়িল।”

যুরোপীয় অনেক ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন—বাইবেলে যে জলপ্লাবনের কথা বর্ণিত আছে, ভূতত্ত্ব দ্বারা তাহার বাথার্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাইবেলে সমুদয় বিশ্বপ্লাবিত হইবার কথা লিখিত থাকিলেও কিন্তু প্রকৃত সমুদয় বিশ্বমণ্ডল প্লাবিত হয় নাই, সেই জলপ্লাবনে এসিয়ার অধিকাংশ ও যুরোপীয়ের কিয়দংশ মাত্র প্লাবিত হয়। এইরূপে ভূতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, সার্কোভোমিক জলপ্লাবন এককালে ঘটতে পারে না, এরূপ ঘটলে কখনই কোন জীব রক্ষা পায় না, সুতরাং সার্কোভোমিক জলপ্লাবন হইলে সমুদয় বিশ্বসংসার একরূপ ধ্বংস হইয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন, পুরাণাদিতে যে জলপ্লাবনের কথা বর্ণিত আছে, তাহাই আংশিক জলপ্লাবন।

বোধ হয়, সেই জন্তই জলপ্লাবনের পর নৌবন্ধনের স্থান ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেই জন্ত পুরাণে হিমালয় ও বাইবেলে আরারট পর্বত নির্দিষ্ট হইয়াছে। হিমালয়ের যেখানে সমুদয় নৌকা বাধা হইয়া ছিল, এখনও সেই স্থান নৌবন্ধনভীর্ণ নামে খ্যাত। কাশ্মীরের নীলমতপুরাণে এই নৌবন্ধনভীর্ণের কথা উক্ত হইয়াছে। কাশ্মীরের কৌসনাগ নামক অদ্ভুত গিরিশৃঙ্গে এই নৌবন্ধন-

ভীর্ণ অবস্থিত। এখনও অনেক বাতী হিমশ্রাশি তের করিয়া সেই ভীর্ণ দর্শনে গিয়া থাকে।

জলপ্লাবিত (ত্রি) জলেন প্লাবিতঃ ৩তৎ। জলে নথ, জলে আচ্ছন্ন।

জলকল (স্ত্রী) জলজাতং কলং। শূকটক, পানীকল।

জলবন্ধ (পুং) জলং বধাতি জীবনবৃন্তো নির্বন্ধেন পরিকল্পয়তি বন্ধ-অচ্। মৎস্ত। (শব্দচঃ)

জলবন্ধক (পুং) জলং বধাতি বন্ধ-ধূল্। জলপ্রোত্তের প্রতি-রোধক দারুশিলাদি নির্মিত সেতু। বিদারক, কৃশক। (শব্দরঃ)

জলবন্ধু (পুং) জলং বধুয়ত বহুতী। মৎস্ত। (শব্দরঃ)

জলবালক (পুং) জলেন বলয়তি জীবয়তি বাশ্রিতবুদ্ধাদীন।

জলং বালইব যত বা, বল-গিচ্-ধূল্। বিদ্যাপর্কত। (হেমঃ)

জলবালিকা (স্ত্রী) জলস্ত বালিকৈব। বিহাৎ। (হেমঃ ৪।১৭১)

জলবিশ্ব (পুং, স্ত্রী) জলস্ত বিশ্বঃ। জলবুধুঃ।

জলবিশ্ব (পুং) জলপ্রধানো বিশ্ব ইব। ১ কর্কট। ২ জল-চক্ষর, চাতর জল। ৩ অন্নজলযুক্ত দেশ। (হার্যঃ)

জলবুধু (স্ত্রী) জলস্ত বুধুঃ ৩তৎ। জলবিশ্ব।

জলব্রাহ্মী (স্ত্রী) জলে ব্রাহ্মীইব। হিলমোচী শাক, হেলাকা। (হার্যঃ)

জলভাজন (স্ত্রী) জলস্ত ভাজনং ৩তৎ। জলপাত্র।

জলভীতি (স্ত্রী) জলাতঙ্করোগ।

জলভূ (পুং) জলস্ত ভূঃ ভবত্যন্থ্য অপাদানে কিপ্। ১ মেঘ।

জলং ভূঃ উৎপত্তির্বত। ২ কঞ্চটশাক, কাঁচড়াদাম। ৩ একপ্রকার কর্পূর। (স্ত্রী) ৪ জলের আধার-ভূমি।

জলভূষণ (স্ত্রী) বায়ু।

জলভূ (পুং) জলং বিভক্তি ভূ-কিপ্। ১ মেঘ। ২ একপ্রকার কর্পূর। ৩ জল রাখিবার পাত্র, ঘট প্রভৃতি।

জলমক্ষিকা (স্ত্রী) জলজাতা মক্ষিকা। জলকুমি, জলের পোকা।

জলমদগু (পুং) জলং মদগুরিব। মৎস্তরজপক্ষী, মাছরাঙ্গা পানী।

জলমধুক (স্ত্রী) জলং মধুকমিব। মধুকরব সূক্ষ্ম বাতকারক।

“অখুর্জলানি জলমধুকবাতবধুঃ” (যাব)

জলমধুক (পুং) জলজাতো মধুকঃ। মধুকরক, জলমোরা।

পর্ষায়—মল্লয়া, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, কোজ্রাশ্রয়, পতঙ্গ, কীরেট, গৈরিকাথা। (ভাবপ্রঃ) ইহার গুণ—মধুর, শীতল,

গুরু, ত্রণ ও বাস্তিনাশক, গুরু ও বলকারক, রসায়ন। (রাজনিঃ)

জলময় (ত্রি) জলাদ্রকঃ জল-মদগু। ১ জলবহুল, জলপূর্ণ।

২ জলময় চন্দ্রাদি। “সলিলময়ে শশিনি রবেদীধিতঃ” (বৃহৎসং)

ত্রীলিঙ্গে ত্রীপ্। ৩ মহাদেবের একটা মূর্তিতে।

“সি বা শক্তোত্তরীয়া বা মূর্তির্জলময়ী মম” (কুমারসং ২।৬০)

জলজাতি (পুং) জলেন জলাকারেণ নভতি পরিপাক্তি বদইন্ ।
১ মেঘ । ২ কর্পূরভেদ ।

জলমার্গ (পুং) জলত মার্গঃ নির্গমনঃ । ১ প্রাণালী, ত্রেখ ।
জলমেঘ মার্গঃ । ২ জলপথ ।

জলমার্জার (পুং) জলত মার্জারঃ । জলমজুল । (ত্রিকাণ্ড)

জলমাতৃকা (স্ত্রী) জলহিতা মাতৃকা । জলহিতা মাতৃভেদ ।
“মংগী কুর্বা বারাহী চ মদুমী নকরী তথা ।

জলুকা জলুকা চৈব মঠেষু জলমাতৃকাঃ ॥”

জলমানবস্ত্র, যে বস্ত্র দ্বারা কোন পদার্থে কত জল আছে,
অথবা জলের আপেক্ষিক ভারত জানা যায়, তাহাকে জলমান-
বস্ত্র (Hydrometer) বলে ।

জলমুচ্ (পুং) জলং মুচ্চতি মুচ্চকিপ্ । ১ মেঘ । “শকা শৃঙা
ইব জলমুচ্চাধুনা যজ জটিলে” (মেঘ) ২ কর্পূরভেদ । (ত্রি)
৩ জলমোচনকর্তা ।

“নাভ্যবুধা জলমুচ্চৈচ্চলসরিকামাঃ” (বৃহৎসং ১৯২)

জলমূর্ত্তি (পুং) জলং মূর্ত্তিরত । শিখ । [অম্বুকেবর দেখ ।]

জলমূর্ত্তিকা (স্ত্রী) জলত মূর্ত্তিঃ ঘনীভূতাকৃতিঃ সংজ্ঞায়াঃ কন্
ভতো টাণ্ । করকা । (শব্দচ) [করকা দেখ ।]

জলমোদ (পুং) জলেন জলসংযোগেন মোদয়তি, ললন-
প্রদানেন আনন্দয়তি । মুদ-পিচ্-অণ্ । উল্লীৰ, খল্ধল্ । (রাজনি)

জলম্বল (স্ত্রী) ১ নদী । ২ অঙ্গন ।

জলযন্ত্র (স্ত্রী) জলানাম উৎক্ষেপণার্থঃ যন্ত্রঃ । ১ ধারায়ত্র,
কোয়ারা । ২ কুপাধি হইতে জল ফুটিবার যন্ত্রবিশেষ ।

“বিলিণ্ডপাতা জলযন্ত্রহতা” (হরিবং ১৪৮ অঃ) ৩ কালজাপক
ঘটীযন্ত্রভেদ, জলঘড়ি । [ঘটীযন্ত্র দেখ ।] স্বার্থে কন্ ।

“হস্তপ্রমুখকৈলয়কৈলৈশ্চ প্রবর্ত্তরূপাঃ সিবিচুস্তপানীঃ” ।

(হরিবং ১৪৮ অঃ)

জলযন্ত্রগৃহ (স্ত্রী) জলযন্ত্রমিব কৃতং গৃহং । জলমধ্যস্থিত গৃহ,
চতুর্দিকে জল মধ্যস্থলে গৃহ । জলটুতি, কোয়ারার ঘর ।
পর্বাণ—সবুজগৃহ, জলযন্ত্রনিকেতন, জলযন্ত্রমন্দির ।

“কচিচিভিভিঃ জলযন্ত্রমন্দিরঃ” (কালিদাস)

জলযন্ত্রনিকেতন (স্ত্রী) জলযন্ত্রমিব কৃতং নিকেতনং ।
জলযন্ত্রগৃহ ।

জলযন্ত্রমন্দির (স্ত্রী) জলযন্ত্রমিব কৃতং মন্দিরং । জলযন্ত্রগৃহ ।

জলযাত্রা (স্ত্রী) জলত ভ্রমারপার্থং যাত্রা । অভিবেকাদি শুভ
কর্মের জন্য জল আনিবার সিংহিত যাত্রা । এখন এসময়ে
“জলসঞ্চা” বলিয়া প্রসিদ্ধ । পশ্চিমবঙ্গে বলেন, জলযাত্রা
ব্যতীত যে কোন শুভকর্ম করা হয়, তাহা সকলই নিষ্ফল ।

জলযাত্রার বিধান বর্ণিতসংহিতার এই প্রকারে লিখিত

হইরাছে । বঙ্গবান পরীর সহিত বর্ণিত হইয়া আত্মীয়জন
অভূতিকে ডাকিয়া লইবে । আর গজ, শব্দজল, প্রাণ
পরিহিত পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ বা নদপ্রবাহের ধরন করিয়া,
তাহাকে গজমাগাধি দিয়া অভ্যর্থনা করিবে । পরে তাহার
তীর দোহর দ্বারা উপলিষ্ট করিবে । সেই দোহরলিষ্ট স্থানে
বসত্ব বা ভগ্নলত্ব দ্বারা বস্তিক ও অভিলম্ব প্রদত্ত
করিবে । পিতৃবাদ্যাদি সামান্যিধ মঙ্গলহটক কনি করিতে
করিতে লৌবণ, রাস্ত, তাম্র বা ধূম্র পাত্র করিয়া জল
লইয়া গৃহে আসিবে । সেই জল দ্বারা অভিষেকাদি
করিতে হয় ।

২ রাক্ষসুতমিগের অঙ্কিত একটী ব্রত । জারি বাস পরে
বিষ্ণুর নিজা ভদ্র হইলে শুক চতুর্দশীতে রাণা প্রভৃতি সকল
সম্মান রাক্ষসুত হ্রদে গিয়া জলদেবতার পূজা করেন । এই
দিন জলের উপর নানাবিধ আলোক দ্বারা সজ্জিত হয় ।

জলমান (স্ত্রী) জলে বাহতে গম্যতেহেনেন করণে-বা-শৃট
৭৩৭ । ২ জলগমনসাধন নৌকা প্রভৃতি ।

“বাসনার্ণবমভোতি জলবানৈর্ধবার্ণবঃ” (ভাগং ৩।১৪।১৭)

জলরক্ত (পুং) জলে সরসি রক্তইব । বকপকী । (হার্য ১৮৩)

জলরক্ত (পুং) জলে রক্তরিব । দাত্যহপকী, ডাকপাখী ।

জলরঞ্জ (পুং) জলে রজতি অমুরকো ভবতি রঞ্জ-অচ্ । বক-
পকী । (হেম)

জলরগু (পুং) জলত রগুইব ভরজনকদ্বাং । ১ জলাবর্ত ।
২ জলরেণু । ৩ লর্ণ । (হেম)

জলরস (পুং) জলজাতো রসঃ জলপ্রধানো রসো বা । লবণ ।
জল জাল দ্বারা লবণ প্রস্তুত হয় এবং লবণও জলের মধ্যে
কেলিয়া দিলে মিশ্রিত হইয়া যায় । [লবণ দেখ ।]

জলরাক্ষসী (স্ত্রী) জলহিতা রাক্ষসী । লবণসমুদ্রহিতা সিংহিকা
রাক্ষসী । রামারণে লিখিত আছে—লবণসমুদ্রে সিংহিকা
নামে কামরূপা এক রাক্ষসী বাস করিত । আকাশপথ দিয়া
যে কোন প্রাণী বাহিত, তাহার দ্বারা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বধ
করিত, তাহার ভয়ে কোন প্রাণী লবণসমুদ্রের পর পারে
যাইতে পারিত না । রামণ লীতাদেবীকে হরণ করিলে, লীতার
ষষ্ঠী আদিবার জন্য হনুমান লবণসমুদ্র পার হইতেছিল ।
সিংহিকা হনুমানের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ করিল ।
হনুমান কামরূপিণী রাক্ষসীর দ্বারা বৃষ্টিতে পারিল অত্যন্ত
কর্মোক্তি হইল । রাক্ষসী হনুমানকে অনায়াসে উল্লম্বাৎ
করিল । মহারীর হনুমান উদরস্থ হইয়া প্রকাণ্ড মেঘ কারণ-
শূলক অথরদ্বারা উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিল ।
তাহাতেই রাক্ষসীর মৃত্যু হইল । (রাম্যং অম্বং ১ অঃ)

জলরাশি (পুং) জলানাং রাশিঃ ৬তং । ১ জলসমূহ । জলানাং রাশিরত্রয়বহুব্রী । ২ সমুদ্র ।

“কমাতলং বলজলরাশিরামশে” (মাঘ)

জলরুণ্ড (পুং) জলন্ত রুণ্ডইব । ১ জলরুণ্ড, জলাবর্ত । ২ জলকলিকা । ৩ সর্প ।

জলরুহ (স্ত্রী) জলে রোহতি রুহ-ক (ইণ্ডপথজ্ঞা) । পা ৩।১।১৩৫ ইতি ক । ১ পয় । “জলং তক্ষুতভেদরং কুর্নৈর্জলরুহৈস্তথা ।” (ভারত ১।১২৮।৪১) (ত্রি) ২ জলরোহ প্রাণীমাত্র ।

জলরূপ (পুং) জলন্ত রূপমিব রূপং যন্ত । ১ মকররাশি । (ত্রিকা) জলন্ত রূপং ৬তং । ২ জলের আকার । ত্রীলিঙ্গে ভীষ্ম হয় ।

জললতা (স্ত্রী) জলে লতেব তদাকারম্ভাং । তরঙ্গ । (হার্য)

জললোহিত (পুং) রাক্ষসবিশেষ । (হেম)

জলবল্লব (পুং) জলং রসস্তৎপ্রধানো বল্লবঃ । জলবল্লব, পানিবল্লব । (হার্য) [মশুরিকা দেখ ।]

জলবল্লল (পুং) জলন্ত বল্লল ইব । কুস্তিকা, পানী । (হার্য ১১২)

জলবল্লী (স্ত্রী) জলজাতা জলপ্রধানা বল্লী । শৃঙ্গটিক, পানী-ফল । (রাজনি)

জলবাদিত (স্ত্রী) জলে বাদিতং । জলবাণ ।

জলবাদ্য (স্ত্রী) জলং বাণমিব । হাতের তালি দিয়া জল বাজান । “আকাশগঙ্গা জলবাণতজ্জ্ঞাঃ” (হরিব ১৪৮ অঃ)

জলবানীর (পুং) জলজাতো বানীরঃ । জলবেতস । (শব্দার্থচি)

জলবায়স (পুং) জলে বায়সঃ কাকইব । মঙ্গুপক্ষী, পানকোড়ী । (হেম ৪।৩৮২)

জলবালক (পুং) বিদ্যাপর্যন্ত । (হেম)

জলবাস (স্ত্রী) জলেন বাসো গন্ধঃ যন্ত । ১ উণীষ । (রাজনি) (পুং) জলং বাসয়তি-বস-গিচ্-অণ্ । ২ বিষ্ণুকন্দ । (রাজনি)

জলে বাসঃ নিবাসঃ । ৩ সলিল-নিবাস, জলে অবস্থান ।

“স চিত্তরামাস মুনি জলবাসে কদাচন ।” (ভারত ১২।২৬০।৫)

জলবাহ (পুং) জলং বহতি বহ-অণ্ । (কর্মণ্যাণ্ পা ৩।২।১)

১ মেঘ । “সাত্ত্বিজলধিজলবাহপথং সন্নিগম্নু বানিব বিশ্বমোজসা” (ভারবি ১২।২১)

(ত্রি) ২ জলবাহক ।

“জলবাহস্তথা মেঘাবয়বস্তনরিরিবঃ” (ভারত ২।৭।২০)

জলবাহক (পুং) জলবহনকারী, ভারী ।

জলবাহন (পুং) জল য়ে বহন করে ।

জলবিড়াল (পুং) জলে বিড়ালইব । জলনকুল, খেড়ে ।

জলবিদ্যুৎ (স্ত্রী) জলবিদ্যুত্যা জায়তে জন-ড জিয়াং টাপ্ ।

১ বাবনানী শর্করা । ২ মেনা । (রাজনি) (ত্রি) ৩ জলবিদ্যু-জাত । (স্ত্রী) ৪ তীর্থভেদ । (বরাহপু)

জলবিদ্যুৎ (পুং) জলপ্রধানো বিদ্যুইব । ১ কর্কট, কাকড়া ।

২ পঞ্চাঙ্গ, কচ্ছপ । ৩ জলচর, চাতর জল । (মেদিনী)

জলবিদ্যুৎ (স্ত্রী) জলপ্রধানং বিদ্যুৎ । তুল্যসংক্রান্তি, আধিন-চিহ্নিত । (শকর) হর্ষা কভারশি হইতে বেদিন তুল্যরাশিতে লঙ্ঘারিত হন, সেই দিনের নাম জলবিদ্যুৎ-সংক্রান্তি । হর্ষোর সঙ্ঘার-সময়ে নক্ষত্রগণের অবস্থিতির বিষয় জ্যোতিষে এইপ্রকার লিখিত আছে, যুগে ১৮—২২, ফলরে ২৩—২৬, দক্ষিণ হস্তে ২৭।১।২, দক্ষিণ পাদে ৬—৮, বাম পাদে ৯—১১, বামহস্তে ৩—৫, যুগে ১২—১৭ । সঙ্ঘার-কালে নক্ষত্রগণের অবস্থানের ফল—যুগে মান, ফলরে সূর্যসংযোগ, দক্ষিণ হস্তে ও দক্ষিণ পাদে ভোগ, বামহস্তে ও বামপাদে জ্ঞাস এবং মন্তকে সূর্য হয় । জলবিদ্যুৎসংক্রান্তি অশুভ হইলে এই প্রকার শাস্তিকরা আবশ্যক—কনকধূতরুবীজ ও সর্কৌষধি জলে দ্বান এবং বিষ্ণুমন্ত্র জপ, ইহাতে সমস্ত শুভ হয় । সংক্রান্তিতে যে কোন পুণ্যকর্ম করিলে অধিক ফল হয় । [সংক্রান্তি দেখ ।] গৃহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা দি কার্য কাল-শুভি হইলেও জলবিদ্যুৎসংক্রান্তিতে করা যায় ।

“অয়নে বিদ্যুবে চৈব তথা বিষ্ণুপদী মতা” (প্রতিষ্ঠাতত্ব)

জলবীর্ঘ্য (পুং) ভরতের এক পুত্র ।

জলবৃশ্চিক (পুং) জলে বৃশ্চিকইব । চিঙ্গট মংস্ত, চিলড়ীমাছ ।

জলবেতস (পুং) জলজাতো বেতসঃ । বানীর বৃক্ষ । পর্যায়—নিকুঞ্জক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী । ইহার গুণ—শীতল, কুষ্ঠনাশক, বাতবৃদ্ধিকর । (ভাবপ্র)

জলবৈকৃত (স্ত্রী) বিকৃতস্ত ভাবঃ বৈকৃতং জলন্ত বৈকৃতং ৬তং । অমঙ্গলপ্ৰচক নদী প্রভৃতির জলবিকারভেদ । বরাহ-মিহিরের মতে—নদীসমূহ নগর হইতে অপসর্গণ হইলে বা নগরস্থ অথবা কোন অশোভ্য হ্রদাদির শোষণ হইলে অচিরে নগরকে শূন্য করে । নদীসকল যদি স্নেহ, রক্ত বা মাংস বহন করে, কলুষ সংযুক্ত হয়, বা প্রতীপগামিনী হয়, তবে ছয়মাস মধ্যে পরচক্রের আগমন প্রকাশ করিয়া থাকে । ক্রূপমধ্যে জালা, ধূপ ও কাথদৃষ্ট হইলে বা রোদনধ্বনি, গীত ও জল্পনা শব্দ শ্রুত হইলে উহা লোকনাসের কারণ । আঘাতে ভোরোৎপত্তি ও জলের গন্ধরসের বিপর্যয় কিম্বা জলাশয় বিকৃত হইলে মহৎ ভয় উপস্থিত হয় । এইপ্রকার জলবৈকৃত উপস্থিত হইলে বারুণ মন্ত্র দ্বারা বরুণের পূজা, হোম ও জপ করিলে এই দোষ শাস্তি হয় । (বৃহৎসং ৪৬ অঃ)

জলব্যাধ (পুং) মৎস্তবিশেষ ।

জলব্যাধ (পুং) জলং বিদ্যাতি ব্যাধ-অচ্ । ককটোট মংস্ত । কাকালমাছ । (ত্রিকাণ্ড)

জলশ্যামল (পুং) জলবিহীন ম্যালং হিংসকন্তুঃ । ১ অলম্বনিক, জলজোড়ো নাপ । (অমর) ২ জলকণী জলজন্তু । (জৈমিনি) জলশয় (পুং) জলে শেতে শী-অহ । বিহু । (হেম) জলেশ্বর এইরূপ শব্দও হইবে । কিন্তু পুং শব্দে বিকরে সন্তানীর অলু হইবে ।

জলশয়ন (পুং) জলে কীরোরসলিমে শেতে শী-লুট্ জলঃ শরক বত বা । বিহু । (হলায়ুধ)

জলশয্যা, একপ্রকার শয়ালী । ইহার উন্নয়ন পর্যন্ত জল সম্যক শরীর রাখিয়া তপস্বী করেন । এইরূপ তপস্বীকে জলশয্যা এক ঐ সকল তপস্বীকে জলশয্যা কহে ।

[জলশয্যা-তপস্বী দেখ ।]

জলশ্যামিন্ (পুং) কবে শেতে শী-মিনি । বিহু ।

“জলজ্যো বরাহক পাবকে জলশ্যামিনম্ ।” (বরাহপুং)

জলশুক্টি (স্ত্রী) জলজরী শুক্টিঃ । শব্দক, শামুক । পর্যায়—বারিশুক্টি, কুমিশুক্টি, ক্ষুদ্রশুক্টিকা, শব্দকা, নরশুক্টি, পুষ্টিকা, তোরশুক্টিকা । (অমর ১১০১২৩) ইহার শুণ—কটু, মিষ্ট, দীপন, শুষ্করোষ ও বিবসোদমানক, রুচিকর, পাচক ও বলদায়ক । (রাজনি)

জলশুক (স্ত্রী) জলে শূকং হস্তাশ্রমিব । শৈবাল ।

“জলশুকঃ স্বয়ং শুণ্য রজস্তো বৃহতীশ্বরঃ” (বাউট)

জলশুকর (পুং) জলত শুকরইব । কুন্তীর । (হেম)

জলসন্ধ (পুং) বৃত্তসন্ধের এক পুং । ইনি সাত্যকির সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তোমরাধাতে তাঁহার বামভূজ ছেদন করেন, পরে তাঁহারই হস্তে নিহত হন । (ভারত ১১১৭১২) জলসমুদ্রে (পুং) জলকরঃ সমুদ্রঃ । লবণাদি সাত সমুদ্রের মধ্যে শেষ সমুদ্র ।

“লবণজলধিরানৌ দুহসিদ্ধন্ত তন্মাং ।

নরো হৃত্তেহুদ্রবন্ত তন্মাং

নদন্তি চ স্বাভজন্ত চান্তঃ” (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

জলসঙ্গ (স্ত্রী) জলমের সঙ্গঃ । সরোবরবিশেষ ।

জলসঙ্গিনী (স্ত্রী) জলে সঙ্গতি গচ্ছতি স্প-বিনি ভীপ্ । জলৌকা । (হেম)

জলসূচি (পুং) জলে সূচিরিব অতিথানাং পুংস্বঃ । ১ কক্কজোট মৎস্ত, কীকালিরা মাছ । ২ শূকটক, পানীকল । ৩ শিশুমার ।

(স্ত্রী) ৪ জলৌকা । (মেকিনী) ৫ কাক । (হেম)

জলন্তন্তু, একপ্রকার নৈসর্গিক ক্যাপার । জলীর বাষ্পের তন্তুকারে দেখা যায় বলিয়া জলন্তন্তু নাম হইরাছে । মাঝে মাঝে এই অপূর্ণ ক্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে । কখন দেখা যায় যে, যোর ঘনঘটাৎ নিরে সমুদ্রের অভিবোগে

১০০ হইতে ১৫০ গজ ব্যাস আকোশিত হইতেছে । উন্নত মালা কম্পিত জলরাশির মধ্যস্থলে গিরা লাগিতেছে, কথার আবার বিস্তীর্ণ জলরাশি হইতে একটি জলীর বাষ্প তন্তু উঠিয়া আবর্তগতিতে রণশৃঙ্গার আকারে মেঘাভিমুখে বাইতেছে । উপরে মেঘের বিপরীতদিকেও উর্জগামী তন্তুর দ্বার আর একটি তন্তু উঠিতেছে । দেবিতে দেবিতে অন্ন সময় মধ্যে দুইটা তন্তু একত্র মিলিত হইয়া পড়িল, সেই স্থানের ব্যাস দুই তিন কিটু মাত্র হইয়া আসিল, ঐ সময়ে শুড়, শুড়, শব্দ আমরা শুনিতে পাই । দুইটা মিলিত হইলে তাহার এক অর্ধকাল দৃষ্ট দেখা যায় । সেই জলীর তন্তুর মধ্যভাগ কিংবা, কিন্তু পার্শ্বভাগ যোর কক্কমর্গ । বায়ুর গতি অনুসারে সেই জলন্তন্তু চালিত হইতে থাকে, কিন্তু বায়ু না থাকিলে কখন যে কোন্ দিকে বাইবে, তাহা কিছুই বুঝা যায় না । জলন্তন্তুর উর্জ ও অণো-ভাগ প্রায় বিভিন্ন পতিতে পরিচালিত হয়, পরে যখন সমস্তটা একটু হেলিয়া আসে, অমনি ভীষণ শব্দ হইয়া পরস্পর ছিন্ন বিছিন্ন হয় । তৎক্ষণাৎ সেই বাষ্পরাশি বায়ুতে মিশিয়া যায় এবং প্রবল ধারার তাহা সমুদ্রে পতিত হয় । কখন ঐরূপ জলন্তন্তু অন্ন সময়ের মধ্যে উঠিয়াই অদৃষ্ট হয়, কখন বা এক ঘণ্টা কাল থাকে । কখন কখন বারবার অদৃষ্ট, আবার বারবার দৃষ্টিগোচর হয় ।

অনেক সময়ে স্থলের উপরও জলন্তন্তু দেখা গিয়াছে । একপস্থলে মির হইতে কোন উর্জগামী রণশৃঙ্গার জলরাশি বা জলীরবাষ্প উঠিয়া উপরে মিলিত হয় না । শূন্ডে বাদ্য-মাকার বাষ্পরাশি হইতে জলন্তন্তু বাহির হয়, তখন ঘন ঘন বিছাৎপাত, প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত এবং গজকের তীব্র গজ অহুত হইয়া থাকে । কখন কখন কেই জলন্তন্তু অতি বেগে উচ্চ ভূমি, উপত্যকা ও নদীপ্রান্তে অতিক্রম করিয়া পর্বতের নিকট আসিয়া তাহার চারিদিকে বিকৃত হইয়া পড়ে । ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ একটি জলন্তন্তু বিলাতে লাকেসায়রে দেখা গিয়াছিল, তাহা কাটিয়া সেখানকার অর্জমাইল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ হইয়া ৭ কিটু গভীর হইয়া বসিয়া যায় । সকল জলন্তন্তুর আকার দেখিতে প্রায় রণশৃঙ্গার মত, মধ্যভাগ লক ও দুইপার্শ্ব অন্ন পরিসর । তবে বেণুলি স্থলে উৎপন্ন হয়, তাহার নিরাংশ থাকে না, সুতরাং একটি রণশৃঙ্গা (তেরী) সোজাভাবে বসাইয়া নিরাংশ বাক দিলে বেরূপ দেখায়, সুতরাংপর জলন্তন্তু ঠিক সেইরূপ হয় । দার্-উইল সাহের স্থলোৎপন্ন অনেকগুলি জলন্তন্তুর বর্ণনা করিয়াছেন । কলিকাতার আটমাইল উত্তরপূর্ব সমদলার ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি জলন্তন্তু দেখা গিয়াছিল । যে সপ্তাহে এই জলন্তন্তু

দেখা যায়, সেই লগ্নাহে দক্ষিণপশ্চিম হইতে এবং উত্তরপূর্ব হইতে বহু বায়ু বহিতে থাকে। এইরূপ বায়ু দুই দিক হইতে বাধা পাইয়া হিরাণ্যের পার্শ্বদেশে, বর্ষায় যে সমস্ত মেঘ জমিয়াছিল, তাহা হানাতর করিতে পারে নাই। ঐরূপ বাধা পাইয়াই দমদমার ক্রমশঃ মেঘ জমিতে থাকে। ক্রমে মেঘরাশি বৃদ্ধাকারে আকাশে ঘুরিতে লাগিল এবং বায়ুর গতি নিবন্ধে দুই তিনবার পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ৭ই অক্টোবর বেলা ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে বায়ুর গতি-পরিবর্তন এবং মেঘের বৃদ্ধাকারে ঘূর্ণন ক্রমেই বৃদ্ধি হইল, সেই সঙ্গে অভ্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি জলন্ত হইতে হইতে নষ্ট হইয়া গেল। ৪টার পর হঠাৎ সমস্ত শান্ত-ভাব ধারণ করিল। এই সময়ে একশত বৃহৎ মেঘ পৃষ্ঠদেশে ধুকের মত ক্রমশঃ মাটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ মেঘখণ্ডের মধ্যভাগ হইতে এক প্রকাণ্ড জলন্ত ক্রতবেগে মাটি পর্যন্ত নামিয়া আসিল। কিন্তু বৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া উহার নিম্নভাগ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ইহার পরেই শুভ্রাটী মাটির একরাশি জলের মত মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন ঠিক যেম একটা জলপ্রপাতের জায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে পর বর্ষেও ১১ই অক্টোবর বেলা ৫টার সময়ে দমদমা হইতে ১০ হাজার ফিট দৈর্ঘ্য একটা জলন্ত দেখা গিয়াছিল। জলন্ত কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেকে অনেকরূপ দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত নিগূঢ় কারণ বোধ হয়, এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। সাধারণ মত এই যে, বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুর ভাঙনে এক প্রকার ঘূর্ণী বায়ু উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে আকাশব্যাপ্ত জলীয় বাষ্পের কণাগুলি ইতঃতত পার্শ্বভাগে বিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যস্থলে একটা কাঁপা স্তম্ভ হইয়া উঠে। স্তম্ভরায় যখন সমুদ্রে এইরূপ ঘটে, তখন উক্ত প্রদেশে বায়ুর ভার অপসারিত হওয়ার জল উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। সম্ভ্রতি ডাক্তার টেলার সাহেবও ঐরূপ কারণ উদ্ভাবন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে ঐরূপও অহুমান করেন যে, বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ ক্ষমতা মেঘ পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয় এবং যখন পরস্পর সংযোগে মেঘ হইতে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে চালিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে জলকণাও পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়। আবার পৃথিবীর বিদ্যুৎ কম হইলে জলকণাগুলি মেঘ কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে থাকে। বাতাসের স্তম্ভ বলিদায়ী জলের ভার প্রতীক্সমান হয়।

জলন্তস্তন (স্রী) জলন্তস্তনে ২নং, স্তম্ভ-করণে স্রুট জলন্ত স্তম্ভনং বা। স্তম্ভাদি দ্বারা জলগতি প্রভৃতি নিবারণ। জল স্তম্ভনের মত, স্তম্ভ নমো ভগবতে জলন্তস্তন স্তম্ভনং সংসংসকে

ককে কচর" (পঞ্চতপু-১৭২১) হর্ষোদন জলন্তস্তন-বিভার দিকিলাভ করিয়াছিলেন। কুরুপক্ষীর সমস্ত সৈন্ত নিহত হইলে হর্ষোদন জলন্তস্তন করিয়া বৈপারনরুদে লুকাইয়া ছিলেন। (ভারত শল্য ২১ অঃ)

জলন্তা (স্রী) জলে জলবহুলপ্রদেশে তিষ্ঠতি, হা-ক জিরাং টাপু। ১ গণ্ডপূর্ণা। (রাজসি) (জি) ২ জলহিত।

"যথা জলহ আভাসো জলহেনাবদুভতে।

যাভাসেন ভবা হর্ষো জলহেন দিব স্থিতঃ ॥" (ভাগ-৩২৭।১২)

জলন্তান (স্রী) জলাশয়।

জলন্তার (পুং) জলস্থান, সরোবর।

জলহ (স্রী) জলে হস্ততে, হন-ড। স্রু জলহস্তপূহ। (ত্রিকাণ্ড)

জলহরণ (স্রী) জলত হরণ ৩তং। ১ জলের হানাতরানয়ন, অভ হলে জল লইয়া যাওয়া। ২ হ্রস্বোভেদ, ইহার চারি চরণে ৩২টা অক্ষর থাকে।

জলহস্তিন (পুং) জলে হস্তীব ৭তং। জলস্থিত হস্তীবিশেষ, জলহাতী। বৃহদাকার একপ্রকার সামুদ্রিক জীব। এই অদ্বুত জীবের নাসিকার অগ্রভাগে শুণ্ড থাকায় ইহাকে জলহস্তী বলে। ইংরাজীতে Sea-Elephant এবং বৈজ্ঞানিক নাম Macrorhinus proboscideus.

আইলাণ্ডিক মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরে, দক্ষিণ অক্ষা ৩৫° হইতে ৫৫° মধ্যে জলহস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের সর্ব-শুদ্ধ ৩০টা দাঁত, উপর পাটীতে ১৬ এবং নীচের পাটীতে ১৪টা।



জলহস্তী।

যখন ইহারা নিজা যার, ইহাদের নাসিকা ও শুণ্ড সজ্জিত থাকে, মুখখানি অতি বৃহৎ দেখায়। কেহ উত্তেজিত করিলে ইহারা প্রবলবেগে মিথস্রা কেলিতে থাকে, সেই সঙ্গে শুঁড়ও বাড়িয়া নলাকারে এক কুটু বিস্তৃত হয়। জলহস্তিনীর শুঁড় হয় না। ইহারা মাংসাদী শুণ্ডপারী জীব মধ্যে গণ্য।

জলহস্তী এক একটা ১৮ হইতে ২৫ ফিটের উপর বড় হয়। জলহস্তিনীর আকার ছোট। এত বড় বলিদায়ী জলহস্তী ক্রত চলিতে পারে না। কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে ইহারা থপু থপু করিয়া চলিতে থাকে, তেলের কুশার মত পেটও নড় বড় করে, খানিক দূর গিয়াই ক্রান্ত হইয়া পড়ে। স্বভাবতঃই ইহাদের চক্ষু নীলাভ সবুজ, কিন্তু কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে লাল জ্বাভুলের মত হইয়া উঠে।

জলহস্তিনী ও তাহার শাবকের স্বর অনেকটা পেচকের ডাকের মত, কিন্তু বৃহদাকার জলহস্তীর ডাক অতি ভয়ানক, প্রাণের ভিতর দিয়া যখন শব্দ বাহির হয়, তখন অনেকদূর হইতেও সে শব্দ প্রতিগোচর হইয়া থাকে।

ইহার নদী, হ্রদ ও জলায় থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু ঘরের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, এই জন্ত যখন জীরে অবস্থান করে, আরই গারে জিহা বালি মাখিয়া থাকে।

অধিক শীত বা অধিক গরম ইহাদের ভাল লাগে না। এই জন্ত ইহার দলবদ্ধ হইয়া শীতের আরম্ভে উষ্ণপ্রধান উত্তরাকালে উঠিয়া আসে, আবার গ্রীষ্মের আরম্ভে দক্ষিণাতি-মুখে চলিয়া যায়।

গ্রীষ্মের পরই জলহস্তিনী সন্তান প্রসব করে। কাহারও মতে এককালে একটা, কাহারও মতে দুইটা শাবক জন্মে। সেই নবজাত শিশু এক একটা ওজনে প্রায় এক মণ।

প্রসূত হইবার পর সমুদ্রকূলে জলহস্তিনীগণ স্ব স্ব শাবকের পার্শ্বে শুইয়া স্তন্য দান করিতে থাকে, জলহস্তিগণ চারি পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। শাবকগণ ৮ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। তৎপরে পুরুষ ও স্ত্রীগণ সকলে মিলিয়া সাগরে গিয়া শাবকদিগকে সাঁতার শিখাইতে থাকে। দুই তিন সপ্তাহ পরে আবার শাবক লইয়া সকলে জীরে উঠিয়া আসে। যতদিন না আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তত দিন শাবক মাতার নিকট থাকে। ২১৩ বর্ষ মধ্যেই পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়, এই সময়ই পুরুষগণের শুঁড় বাহির হইয়া থাকে।

শুঁড় বাহির হইলে শাবকেরা আর জলহস্তিনীর কাছে থাকিতে পায় না। শুঁড় উঠিলেই ইহাদের যৌবন বিকাশ হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহ-সঙ্গম করে না। সঙ্গমকাল হইলে পুরুষগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যে জলহস্তী বীর্য-বলে সকলকে পরাজয় করিতে পারে, সেই স্ত্রীসংবাস করিতে পারে। এই জন্ত অনেক বানরীর মধ্যে যেমন এক একটা বীর থাকে, সেইরূপ ১৯২০টা জলহস্তিনীর মধ্যে এক একটা “বীর জলহস্তী” দেখা যায়। সংগ্রামকালে ইহার কখন স্বজাতিকে বিনাশ করে না, যে পরাজিত হয়, সে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোন এক নির্জন স্থানে গিয়া মনোহুঃখে অতিবাহিত করে।

এই জীব প্রভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি। আপনাদিগের ও শাবকদিগের প্রাণরক্ষা ব্যতীত ইহার কখন মানবকে আক্রমণ করে না। যত্র করিলে ইহার বেশ পোষ মানে এবং প্রতি-পালক ডাকিলে বহুদূরে থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হয়। নাবিকেরা এইরূপ পোষা জলহস্তীর উপর চড়িয়া খেলা করিয়া থাকে। ইহার ৩০১৩২ বর্ষ জীবিত থাকে।

জলহস্তীর মাংস কুকুর্বা, তৈলাক্ত এবং অকীর্ণকর। নাবিকেরা ইহাদের দন্ত লবণে ভরাইয়া কঠিকর ও উপানের খাদ্য বোধে আহার করে। জলহস্তীর চর্ম অতি কঠিন, ইহাতে বোড়া ও গাড়ীর উত্তম সাদা প্রস্তুত হয়। ইহার তৈল বিশেষ উপকারী, সেই জন্তই এই জীব ধরা হয়।

জলহস্তীর ডার সমুদ্রে জলভল্লুক, জলবায় ও জলসিংহ প্রভৃতি দেখা যায়। ইহার সকলেই এক জাতীয়। কেবল যুগের আকার ও মেহের পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকা, কাম্‌চাটকা ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে জলভল্লুক দেখা যায়। ইহার বসন্তকালে কেবল জীরে থাকে, এই সময়ই ইহাদের সঙ্গম ও গর্ভধারণ কাল।

জলহস্তীর মত এক একটা জলভল্লুক ৭০৮০টা স্ত্রী লইয়া উপভোগ করে। সেই ভল্লুকীদিগের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র কর্তা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, কিন্তু যখন সে আপনার প্রাণমিণীগণে পরিবৃত হইয়া অপর কোন দলের নিকট উপস্থিত হয়, তখন উভয়দলে ভয়ানক যুদ্ধ বাধে। স্বভাবতঃ ইহার সমুদ্রতীরে শান্ত গাড়ীর মত আনন্দে চরিয়া বেড়ায়, কিন্তু আহত হইলে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে।

জলহস্তী অপেক্ষা জলভল্লুক অনেক ছোট ৫১৬ ফিটের বেশী বড় হয় না। ইহাদের গারে বড় বড় লোম জন্মে, তাহাতে উত্তম শীত বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

দক্ষিণ সেটলওদীপে জলবায় দেখা যায়। ইহার ভীষণ



জলবায়।

হিংসাসী, ইহাদের গায়ে চিতাবাঘের মত ডোরা থাকে। আকারে জলভল্লুক অপেক্ষা বড়। ইহাদের ৩২টা দাঁত থাকে।

এসিয়া, ক্রিয়া ও আমেরিকার পার্শ্ববর্তী শীতপ্রধান সমুদ্রে জলসিংহ দেখা যায়। কখন কাম্‌চাটকা, কখন কিউরাইল দ্বীপ, কখন বা বেরিংপ্রাণালীতে বেড়াইতে আসে। গ্রীষ্মের শেষে ইহার আমেরিকার উপকূলভিত্তিতে থাকিত হয়। ইহাদের চর্ম তুল, লোম রক্তাক্ত, শীত বা কুকপিঙ্গলাভ বর্ণ; বড় বড় লোমের নিম্নে অতি অম পশমী লোম হয়। পুরুষজাতির কণ্ঠ হইতে পুষ্টি পর্যন্ত কেশর জন্মে। মাথা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উপরের ঠোঁটে বরষ অনুসারে দাঁক

পরিমিত। ইহাদের এক একটা ১০১৫ ফিট বড় হয়। ইহাদের জীর্ণ আকারে খর।



জলসিংহ।

এই সমুদ্রজীব অসীম পরাক্রমশালী হইলেও স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গে খেলা করিয়া বেড়ায়। কিন্তু কোম প্রকারে আক্রান্ত হইলে ভীষণ গর্জন করিতে থাকে এবং দলে দলে আসিয়া ভীম পরাক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ করে। ইহাদেরও মধ্যে এক একটা জলসিংহ বহু জী লইয়া উপভোগ করে। যাহার পরাক্রম অধিক, সেই অপরাপর পুরুষকে জয় করিয়া তাহার উপভুক্ত জীগুলি অধিকার করে। জলসিংহ বৃদ্ধ হইলে স্বজাতীয় কেহ তাহাকে আর গ্রাহ্য করেনা, তাহাকে মারিয়া দল হইতে তাড়াইয়া দেয়। সেও একাকী নির্জনে পড়িয়া কাতরাইতে থাকে।

জলহার (ত্রি) জলং হরতি হ্র-অণ্। ১ জলহরণকারী।

২ জলবাহক, ভারী। জীলিঙ্গে গোরাবিজ্ঞাং ভীষ্।

“শিরসা গুতকৃষ্টাতিবৈদ্বৈরন্তনায়রৈঃ।

যমুনাতীরমার্গেন জলহারীতিরাকৃতঃ॥” (হরিবং ৬১ অঃ)

জলহারক (ত্রি) জলং হরতি-হ্র-খুল্। জলবাহক।

জলহারিন্ (ত্রি) জলং হরতি হ্র-গিনি। জলবাহক। জীলিঙ্গে ভীষ্।

“যাতিরিদং শরীরমারাম ইব জলহারিণীভিঃ কেনারিব।”

(সুক্রত)

জলহাস (পুং) জলানাং হাসইব শুভ্রহাং। সমুদ্রের কেনা।

(ত্রিকাণ্ড)

জলহোম (পুং) জলে ক্রিপ্তঃ হোমঃ ৭তৎ। জলে প্রকিপ্ত বৈশ্বদেবাদির হোমভেদ। বৈশ্বদেবাদির উদ্দেশ্যে জলে আহুতি প্রদান। [হোম দেখ।]

জলহুদ (পুং) জলপ্রচুরো হুদঃ। জলবহুদ হুদ, অনেক জলযুক্ত হুদ, জলশির। জলহুদভেদং শিবান্দিদ্যান্ জলহুদ জিহ্মং ভীষ্।

জলা (শেষজ) জলান্নাবিত হান।

জলাকর (পুং) জলত জাকরঃ। সমুদ্র, নদী, প্রভৃতি।

জলাকা (ত্রি) জলে আকারতি আকাশত আ-কৈ-ক উপ্। জলোকা, জৌক। (শব্দরং)

জলাকাশ (পুং) জলপ্রতিবিম্বিতঃ জলাবচ্ছিন্নঃ অরকাশঃ।

জলপ্রতিবিম্বিত জলবিশিষ্ট আকাশ।

“জলাবচ্ছিন্নে নীরং কুণ্ডত্র প্রতিবিক্ষিতঃ।

লাত্ননক্ষত্রআকাশো জলাকাশ উদীয়তে॥” (শকাধিট্য)

আকাশের রূপ নাই। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। এই জন্ত নক্ষত্র ও মেঘযুক্ত বলিয়া জলাকাশ নাম হইয়াছে। [আকাশ দেখ।] মেঘ ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশ।

জলাকী (ত্রি) জলং অকোতি ব্যাপোতি অক-অচ্। জল-পিপ্লী। (শব্দরং)

জলাখু (পুং) জলে আখুরিব। জলমকুল, জলমার্জার, উদ্ভিড়াল।

জলাকাজু (পুং) হস্তী।

জলাঞ্জল (ক্লী) জলং অঞ্জতি ব্যাপোতি অঞ্জ-বাহলক্যং অলচ্।

১ শৈবাল। জলে অঞ্জলঃ বস্ত্রপ্রাক্তইব। ২ স্বভাবতঃ জলনির্গম, আপনা আপনি জল বাহির হওয়া।

জলাঞ্জলি (পুং) জলপূর্ণো অঞ্জলিঃ। ১ জলের অঞ্জলি, অঞ্জলি-প্রমাণ জল, দাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থ জলদান। ২ তর্পণ, জলক্রিয়া। “কুপুত্রমাদাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ।” (চাপক্য) প্রেত সংশ্রবের জায় বস্ত্র বিধরের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।

“বাপৈর্জলাঞ্জলিং দত্ত্বা হুঃখায় চ সুখায় চ” (রাজতঃ ৪।২৮৪)

জলাটন (পুং) জলে অটতি ভ্রমতি অট-লু। ককপকী।

[কক দেখ।]

জলাটনী (ত্রি) জলে অটতি ভবতি অট-লু ত্রিরাং ভীষ্। জলোকা।

জলাণুক (ক্লী) জলে অগুরিব কায়তি কৈ-ক। পোতাধান। মাছের পোনা।

জলাণ্টক (পুং) জলে অণ্টতে ইতস্ততো ভ্রমতি অণ্ট-খুল্। পূর্বোদরাদিহাং ঠত টঃ। নক্ররাজ, গ্রাহ। (হার্য)

জলাণুক (ক্লী) জলে অগুরিব কায়তি কৈ-ক। পোতাধান। মাছের পোনা। (শব্দরং)

জলাতঙ্ক, রোগবিশেষ। (Hydrophobia) সুক্রতে এই রোগ জলভ্রাস নামে বর্ণিত*। কোন ক্রিপ্ত পণ্ডর লাল্য শরীর যথো

* সুক্রত লিখিয়াছেন—

“দংষ্ট্রীণা বেন হঠত তক্রপং বদি পততি।

অঙ্গু বা বহি বাহর্ষে রিষ্টং তত বিসিধির্ভবেৎ।

অন্ততাকন্দ্রাদোহতীকং অবা দুষ্টপি বা জলম্।

জলভ্রাসত বিঘাতঃ রিষ্টং তদপি কীর্তিতম্।

প্রতিটাই এই রোগ হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় জলপান করিবার কালে কঠিনে এত প্রচণ্ড আক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, সময় সময় খাসকুহু হইয়া যায়, ক্রমে ইহার প্রকোপ এত প্রবল হয় যে জল কথাটী মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়াব্রাহ্মই এই রোগের সমস্ত লক্ষণ পরিষ্কৃত হয়। জল দেখিলে অথবা জলের নাম শুনিলেই মনোমধ্যে অতিশয় ভীতি জন্মে, এই ভীতি এই রোগকে জলাভ্রম কহে। মনুষ্য-শরীরে কোন কিণ্ড পণ্ডর লালা প্রবেশ না করিলে তাহার কখনই এই রোগে আক্রান্ত হয় না। প্রবল অপস্মার বায়ুরোগেও সময় সময় জলাভ্রমের লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা জলাভ্রম নহে। অস্ত্রাভ্রম পণ্ডগণ নৈসর্গিক কারণে এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে কিনা তাহা এখন পর্যন্ত নিঃসন্দেহরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু কুহুর অস্ত্র কোন কিণ্ডপ্রাণী কর্তৃক দষ্ট না হইলে যে এই রোগে আক্রান্ত হয় না, তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বতদূর পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে সকল প্রাণীই এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্যাঘ্র, শূগাল, বিড়াল ও কুহুর ব্যতীত অস্ত্র কোন প্রাণী এই রোগ সংক্রামিত করিতে পারে না। মনুষ্য এই রোগে আক্রান্ত হইলে ইতর প্রাণীর জ্ঞার অস্ত্রকে দংশন করিতে উত্তেজিত হয় না।

মনুষ্য-শরীরের কোন ক্ষত স্থানে কোন কিণ্ড প্রাণীর লালা সংশ্লিষ্ট হইলে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। কিণ্ড পণ্ড-দষ্ট সমস্ত স্থানই বিবাক্ত না হউক; অতি অল্পস্থান বিবাক্ত হইলেই এই রোগ জন্মিতে পারে। সকল পণ্ডর লালা একরূপ বিবাক্ত নহে। কিণ্ড কুহুরাপেক্ষা কিণ্ড ব্যাঘ্রের লালা অধিকতর সাক্ষাতিক। একটা কুহুরে ২১ জন লোককে দংশন করিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবলমাত্র একব্যক্তি জলাভ্রমে আক্রান্ত হয়; কিন্তু একটা ব্যাঘ্রে ১৭ জনকে দংশন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ১০ জন জলাভ্রমে পঞ্চ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অনুটো বা জলজাসী ন কথকন সিদ্ধতি।

প্রহুজোংখোখিতো বাপি বহুহুতো ন সিধ্যতি।*

(হুহুত কর ৬ অঃ)

যে উন্নত পণ্ড (শূগাল, কুহুর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি) দংশন করে, দষ্টব্যক্তি জলে বা আদর্শে বসি সেইরূপ পণ্ড দেখে, তবে তাহা অতিশয় দুর্লভ। জলে দেখিয়া বা জলের বাস শুনিয়া যে রোগী ভয় পায়, তাহাকে জলজাস বলা যায়। এটিও অতি দুর্লভ। পূর্বেও উন্নত পণ্ডদ্বারা দষ্ট না হইয়াও যদি জলজাস জন্মে, সে রোগী কখন রক্ষা পায় না। কিম্বা হুহু অবস্থার সিক্ত বা জারিত হইয়াই সহসা জলজাস জন্মিলেও রোগী রক্ষা পায় না।

এই রোগ পণ্ডদ্বিককেই বেশী আক্রমণ করে, মনুষ্যগণ অতি অল্পই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

শরীর মধ্যে কিণ্ড প্রাণীর লালা প্রতিটাই হইলে ঠিক এক সময়ে সকলের জলাভ্রমের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। কেহ কোন কিণ্ড প্রাণী কর্তৃক দষ্ট হইবার পর বোধশ্রম দিবসে, কেহ বা অষ্টাদশ দিবসে, আর কেহ বা অষ্টবৈশাখ দিবসে জলাভ্রম রোগে আক্রান্ত হয়। লালা প্রবেশের পর এই রোগে কখন যে আক্রান্ত হইতে হইবে, তাহার কোন নির্দিষ্ট কাল নাই; তবে সাধারণতঃ দষ্ট হইবার পর ৩০ ও ৪০ দিবসের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্থল বিশেষে ১৮ মাস পরেও ইহার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, কোন কিণ্ড প্রাণী কর্তৃক দষ্ট হইয়া যদি ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়, তবে দুই বৎসর অতীত না হইলে জীবনের ভয় বিদূরিত হয় না। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, দংশনের পর ষাটশব্দে কোন কোন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

কেহ কিণ্ড প্রাণী কর্তৃক দষ্ট হইলে আরোগ্য লাভও করিতে পারেন, ইহা কোন ছষ্টিকিণ্ড রোগ নহে। জলাভ্রমের লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ক্ষতস্থান রক্তবর্ণ হয় ও ক্ষীত হইয়া উঠে; তথায় অতিশয় বেদনা অহুত হয়; তথাকার স্নায়ুদেশের সর্বত্রই এরূপ বেদনা অহুত হয় যেন সকল স্থানই বিবম ক্ষতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পরে রোগী শিরঃপিড়ায় ব্যথিত হয়, তাহার শরীর সর্বদাই অহুহ থাকে, ক্ষুধা থাকে না এবং কোন তরল পদার্থ দেখিলেই ঘৃণা ও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। এরূপ অবস্থায় জানা যায় যে রোগী জলাভ্রমে আক্রান্ত হইয়াছে। লক্ষণগুলি একবার প্রকাশিত হইলে অতি শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমে জল দেখিলেই তাহার খাসরোধ হয়, শেষে জলের নাম মনে হইলেই কিম্বা এক পাত্র হইতে অস্ত্র পাত্রে জল ঢালিবার শব্দ তাহার কর্ণে প্রতিটাই হইলেই তাহার বোধ হয় যেন তাহার খাসকুহু হইয়া আসিতেছে। পরিশেষে এমন হয় যে, জলরাশি উপরিভাগের জ্ঞার পরিদৃষ্টমান কোন চাক-চিক্যশালী ধাতুর পাত্র দেখিলেই তাহার মৃত্যুকালীন খাস-রোধ ব্রণা অহুত হয়। প্রথমে কোন দ্রব্য পানকালে অথবা ভোজনকালে শিরঃকর্ষণ জন্মে, ক্রমে ক্রমে উহা স্নায়বিক উত্তেজনার পরিণত হয়। রোগী সর্বদাই অস্থির ও ভীতিবিহীন অবস্থার থাকে, তাহার চক্ষু চক্ষুদিক্ প্রকিণ্ড হয় এবং রোগী অনবরত প্রলাপ বকিতে থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত তাহার শারীরিক আক্ষেপও বৃদ্ধি হয়। অতি দুঃখ শব্দ এমন কি নিখাদেশ শব্দেই তাহার শিরঃ-

কর্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, নাকীর খতি ক্ষতভর হয়, শিরঃশীতল ও অসীলভাবার সজ্জা বৃদ্ধি পায়। প্রায়শ্চিকিৎসা-প্রযুক্ত রোগীর বিশ্রামক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়, এই হেতু রোগী পূর্ণ হইতে যে স্বাস্রোধ অনুভব করিয়া আসিতেছিল, তাহার সজ্জাও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা হইতে পরিভ্রাণ পাইবার নিমিত্ত এবং স্ফটিকরূপে নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্ত রোগী কাসিতে আরম্ভ করে এবং কর্শণ ও উচ্চ শব্দ করিতে থাকে। এই জন্ত লোকে মনে করে, যে প্রাণী কর্শ্ব দষ্ট হয়, রোগী শেষে সেই প্রাণীর স্তার রব করে। কেহ গুরুতর পরিশ্রমের পর যেরূপ নিশ্বাসিতকৃত হয়, জলাতকরোগী জীবনের শেষ কয়েকঘণ্টা সেইরূপ নিশ্বাস নিশ্বাসিত হয়; কোন কোন রোগী নিশ্বাসিত না হইয়া অভিশর হিরভাবে অবস্থান করে। এই নিশ্বাস হইতে উঠিয়াই পূর্ণাঙ্গেকা বৃহত্তাবে কঠ অথবা সমস্ত শরীর হই একবার একস্পন্দিত করিয়াই চির-নিশ্বাস নিশ্বাসিত হয়।

জলাতক রোগে আক্রান্ত হইলে পর ৬ দিনের অধিক কাল রোগী জীবিত থাকে না, সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

জলাতক রোগী সহজে অতি কঠিন পদার্থ ভক্ষণ করিয়া কলে। বিভ্রাল কর্শ্ব দষ্ট হইয়া যাহারা জলাতকে আক্রান্ত হয়, জলের প্রতি তাহাদের স্বর্ণা অপেক্ষাকৃত অল্প।

জলাতকের প্রকৃত তত্ত্ব এখনও অজ্ঞাতরূপে নির্ণীত হয় নাই, স্তত্রায় কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে ইহা শান্ত হইতে পারে, তাহাও স্থিরীকৃত হইতে পারে নাই। সাধারণতঃ যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহাদের এই ব্যাধি দূর করিবার শক্তি নাই, তবে উপসর্গ গুলি সময় সময় হ্রাস করিতে পারে। অহিফেন ব্যবহারে কতক উপসর্গ দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু জীবন রক্ষা করিতে পারে না। রক্তমোক্ষণ করিলে প্রকম্পন হ্রাস হইতে পারে এবং হাইড্রোসাইএনিক এসিড (Hydrocyanic acid) ব্যবহার করিলে উপসর্গগুলি কয়েকদিন নিশ্চেষ্ট থাকে। যদি কুফল উৎপাদন করিবার পূর্বেই বিষাক্ত লালা ক্ষতস্থান হইতে বিদূরিত করা যায়, তাহা হইলেই এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া বাইতে পারে। ক্ষত স্থান ছেদন করাই বিশিষ্ট উপায়—বিশেষ সতর্কতার সহিত ক্ষত স্থানের শেষ অংশ পর্যন্ত কর্তন করা উচিত, কারণ সামান্য পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ থাকিলেও রোগীর জীবনের অধিক আশা করা বাইতে পারে না। যদি ক্ষত অধিক স্থানবাপী হয়, কিম্বা যদি কোন বিশেষ আবৃত্তক শারীরিক বস্ত্রের নিকটবর্তী হয়, তবে সে স্থান ছেদন না করিয়া নাইট্রিক এসিড (Nitric acid) প্রভৃতির স্তার

কোন দাহক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। অথবা যে পর্যন্ত কোন ঔষধাদি প্রয়োগ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কতার সহিত ক্ষত স্থান পুনঃ পুনঃ বোত করা উচিত। ৪ কিম্বা ৫ ফিট উচ্চ স্থান হইতে ২০° কিম্বা, ১০০° ডিগ্রী উচ্চ জল কন্ডোপরি ঢালিয়া, ২১০ ঘণ্টাকাল ধৌত করিতে হয়। যে কোন ক্ষিপ্ত প্রাণী কর্শ্ব দষ্ট হইলেই জলাতক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ অধিকাংশ রোগী কুকুর দংশনেই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

কুকুর-দষ্ট জলাতক-রোগী অভিশর বিষয় ও কর্শ্বভাবী হয়, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়, যাহা সমুখে পায় তাহাই দংশন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া অস্ত্রদিকে যাইয়া কাহাকেও দংশন করিতে চেষ্টা করে না এবং সর্বদাই ঘাস, তৃণ, কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি চর্ষণ করে। এইরূপ জলাতকরোগী পূর্বে বাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিত, পরেও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার করে।

ক্ষিপ্ত কুকুর জল দেখিয়া ভীত হয় না। ইহারা জল পানও করে এবং জলে সন্তরণও করে। কুকুর এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যতই মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, ততই ভীষণ হইতে আরম্ভ করে, চারিদিকে যাহা পায় তাহাই দংশন করিতে চেষ্টা করে এবং ইহাদের মুখ হইতে অনবরত ফেন নির্গত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে মনুষ্যগণ যতদিন জীবিত থাকে, কুকুরও ততদিন জীবিত থাকিতে পারে।

কুকুরে কামড়াইলে কলিকাতার নিকটবর্তী লোকেরা গোন্দলপাড়ায় চিকিৎসা করাইতে যায়। (সুশ্রুতে কলহ্বানে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জলাতকের চিকিৎসা বর্ণিত আছে।)

জলাতিকা (স্ত্রী) জলমেব আত্মা যত্নাঃ। ১ জলোকা। ২ কূপ। জলাত্যয় (পুং) জলত্যাগোঃ যত্র বহতী। ১ শরৎকাল। জলানাং অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ জলের অপগম।

জলাধার (পুং) জলানাং আধারঃ ৬তৎ। জলাশয়।

“আকাশমেবং হি যথা ঘটাদিবু পৃথক্ ভবেৎ।

তথাত্মকোহপ্যনেকস্ত জলাধারেষিবাংগমান্ ॥” (বাজ্ঞ* ৩।১৪৪)

জলাধিদৈবত (পুং স্ত্রী) জলত্ৰ অধিদৈবতঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ১ বরুণ। (হলায়ুধ) জলং অধিদৈবতঃ যত্র। ২ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। (জ্যোতিষ)

জলাধিপ (পুং) জলত্ৰ অধিপঃ ৬তৎ। ১ জলের অধিপতি বরুণ।

“নাশকোদগ্রতঃ স্বাতুং বিপ্রচিন্তেজলাধিপঃ।” (হরিব* ২৫২ অঃ)

২ বৎসরবিশেষে রবি প্রভৃতি গ্রহও জলাধিপ হন।

জলাতক (পুং) জলমেবাত্মো ভূমণ্ডলত সীমা যত্র কপ।

১ সপ্ত সর্ষদের মধ্যে একটা সমুদ্র।

“লব্ধব্রহ্মজ্ঞানপরিধিহ্রদজলাবর্ত্তকঃ।” (ত্রিকাণ্ডঃ)।

২. সভ্যভারমার গর্ত্তজাত কবীর এক পুত্র। (হরিক ১৭৩৩ঃ)
জলাপাত (পুং) জলস্ত আপাতঃ। উক্তহান হইতে প্রবল
বেগে জলপতন। [প্রপাত দেখ।]

জলান্দর (পুং) একজন কোষিক, পূর্বে অশ্বের নাম রাখিলেন।
জলাধিকা (স্ত্রী) জলস্ত অধিক মাভাইর। কুপ। (হার্য্য)
কোন কোন স্থলে জলাধিকা এই পাঠ আছে।

জলানুগর্ভা (স্ত্রী) গোপার পরজন্মের নাম।
জলানুকা (স্ত্রী) জলমায়ু রতাঃ কণ্ পৃষোদরাবিদ্যাং সলোপঃ।
জলোকা। [জলোকা দেখ।]

“জলমাসাম্যুরিতি জলানুকা।” (বৃহতঃ)

জলার্ক (পুং) জলপ্রতিবিম্বিতোহর্কঃ। জলপ্রতিবিম্বিত হর্ষা।
“প্রকৃতিহোহপি পুরুষঃ নাজাতে প্রাকৃতিতত্ত্বং।

অবিকারানকর্তৃৎ নিগুণং জলার্কবৎ ॥” (ভাপ ৩২৭।১)

জলার্ণব (পুং) জলময়ো হর্ণবঃ। ১ জল-সমুদ্র। ২ বর্ষাকাল।
(ত্রিকাণ্ড)

জলার্ধিন্ (ত্রি) জলং অর্ধয়তি অর্ধ-গিনি। জলাতিলাধী,
তৃকার্ত্ত, পিপাসাকুল।

জলার্জ (পুং) জলেন আর্জঃ সিক্তঃ। ১ আর্জ বস্ত্র। (হার্য্য)
(ত্রি) ২ জলসিক্ত, জলে ভিজা।

“পুন্ড্রাসাটের অপরতু ভবান্ বোমগঙ্গাজলার্জঃ।” (মেঘ)

জলার্জা (স্ত্রী) ১ ক্লিন্ন বস্ত্র। (হেম ৩৩৪০) ২ আর্জ তালবৃন্ত,
ভিজা পাখা। (ধুব্রিজ তালবৃন্তঃ ত্রাহংক্ষেপব্যজনক তৎ।
জলেনার্জঃ জলার্জা ত্রাৎ। বৈজয়ন্তী)

জলাল্উদ্দীন পূর্বী, বঙ্গদেশের একজন রাজা। ইনি
হিন্দুরাজ কংসের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম জিংবল, কাহারও
মতে বহু। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মুসলমানধর্ম গ্রহণ-
পূর্বক ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাহারও
মতে, ইনি এক মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান
ধর্ম গ্রহণ করেন। পূর্বে হিন্দুধর্মের উপর বিলম্বন আস্থা
ছিল। কিন্তু মুসলমান হইবার পর হিন্দুধর্মের উপর বিলম্বন
অত্যাচার করিতে থাকেন। কিন্তু মুসলমান প্রজাসমূহকে
পুত্রনির্কিংশেবে পালন করিতেন, এই জন্ত তিনি মুসলমানগণের
নিকট “নোসেরবান্” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭ বর্ষ
রাজত্বের পর ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ইনি পুত্র আদমকে রাজ্য দিয়া
ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জলাল্উদ্দীন সমুত্তি, মিশরদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।
ইহার পিতার নাম রহমানবিন্ আবুবকর। প্রবল এইজন, ইনি
চারিশত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হুজুরুস্‌সুন্ন,র,

তকসীর্ জলালইন্, সুবহুউন্ সুবহু, জামাউল্‌জামা, কসুসু-
লুল্লা-উন্-বলুহু জলুল্লা-এই কথখানি প্রসিদ্ধ। পেশোত
পুস্তকখানিতে ১১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার বহু পর্বত বত
ভূমিকণা হইয়াছে, তাঁহার বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৫০৫
খৃষ্টাব্দে এই পণ্ডিতের মৃত্যু হয়।

জলাল্উদ্দীন ফিরোজ খিলজী [ফিরোজশাহ খিলজী দেখ।]

জলাল্উদ্দীন মহম্মদ অকবর [অকবর দেখ।]

জলাল্‌বুখারী সৈয়দ, একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত।
সৈয়দ মহম্মদ কবীরের বংশধর এবং সৈয়দ মহম্মদ বুখারীর
পুত্র। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ইনি অন্নগ্রহণ করেন। সম্রাট শাহ-
জহান ইহাকে অস্তিপর তত্ত্বিজ্ঞা করিতেন। সম্রাটের
অনুগ্রহে ইনি সমস্ত ভারতবর্ষের “সদারৎ” এবং ছয় হাজারী
মুসলমান পদ লাভ করেন। ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া
গিয়াছেন, তাঁহাতে “রজা” নামে তনিভা আছে। ১৬৪৭
খৃষ্টাব্দে (১০৫৭ হিজরার) ২৫এ মে তারিখে ইনি ইহলোক
পরিত্যাগ করেন।

জলালু (পুং) জলজাত আলুঃ। ১ পানীয়লু। (রাজনিং)

জলালুক (স্ত্রী) জলালুরিব কারতি প্রকাশতে কৈ-ক। পদ্ম-
কন্দ, মুণালমূল, পয়ের গেঁড়।

জলালুকা (স্ত্রী) জলে জলতি গচ্ছতি জল-বাহনকাং উক
টাপ্। জলোকা। (শব্দরং)

জলালোকা (স্ত্রী) জলে আলোকাতে দৃষ্টতে আ-দোক
কর্ষণি ঘঞ্। জলোকা। (ভরত)

জলাবর্ত্ত (পুং) জলস্ত আবর্ত্তঃ সত্তমঃ। জলগুণ, জলভ্রম,
সমুদ্র নদ্যাदि-জলের ঘূর্ণী।

সমুদ্র এবং নদীর স্থানবিশেষে প্রায় সমবেগসম্পন্ন হইয়া
স্রোত বিপরীত দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যদি কোন অর-
পরিসর স্থানে পরস্পর প্রতিহত হয় কিবা যদি নানাদিক্
হইতে স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র নিমজ্জিত পর্বত, তট
কিবা বাধু-গতিধারা প্রতিকূল হয়, তবে সেই স্রোতের
পরস্পর বাতপ্রতিঘাতে জলরাশি ঘূর্ণায়মান হইয়া জলাবর্ত্ত
উৎপন্ন করে। যে স্থানে জলরাশি সর্বদা ঘূর্ণায়মান অবস্থায়
থাকে, সেই স্থানকেও কেহ কেহ জলাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন।
সমুদ্রের স্থানে স্থানে জলাবর্ত্তের প্রচণ্ড বেগ পরিলক্ষিত হইয়া
থাকে। গ্রীসীর বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী দুরিগালের জলাবর্ত্ত,
সিচিলি এবং ইটালির মধ্যবর্তী ‘সেরিকভিস’ এবং নরওয়েয়
নিকটবর্তী মেলট্রিন্ নামক জলাবর্ত্তগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।
জাপানের মধ্যবর্তী বিশালাকার বড় এসেমে বিখ্যাত।

পূর্বে যে সেরিকভিস জলাবর্ত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে,

তাহার জল সর্বদাই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে এবং যুগপৎ অধিকাংশ হলেই মণ্ডলাকার আবর্ত দৃষ্টিগোচর হয়। এই জলাবর্ত এত দূরব্যাপী যে এই স্থানকে একটা বৃত্ত করনা করিলে ইহার ব্যাস ১০০ ফিট হইবে। কিন্তু বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইলে ইহার ব্যাস আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই স্থানের শ্রোত অতি প্রবল এবং অনবরত বায়ুর আঘাতে এই ঘূর্ণাবর্ত উৎপন্ন হয়, ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার শ্রোত পর্যায়ক্রমে ৬ ঘণ্টা-কাল উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া, পুনরায় ৬ ঘণ্টা দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। চন্দ্রের উদয় ও অস্তের সহিত শ্রোতের গতিও পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। যে সময় মঙ্গ মঙ্গ বায়ু বহে, তখন যানারোহণপূর্বক এই স্থানে গমন করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু জলের আন্দোলনে যানের সহিত আরোহীদিগকেও আন্দোলিত হইতে হয়; কিন্তু যখন প্রবল বেগে বায়ু বহে, তখন কেহ ক্ষুদ্র যানে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলে ঘূর্ণায়মান শ্রোতের আঘাতোৎপন্ন তরঙ্গবিক্ষোভে যানসহ অতল জলে নিমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু বৃহত্তর যান হইলে তরঙ্গ ও শ্রোতের বেগে ইটালী-দেশের উপকূলভিষ্মুখে চালিত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইতে না হইতে সিকলা নামক পর্বতে আহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

ঘূর্ণায়মান জলরাশির ঘাতপ্রতিঘাতে বিভিন্ন প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। পেলোরো অন্তরীপের সমিহিত পর্বতে প্রতি-হত হইয়া সেখানকার জলরাশি কুকুরের রবের জ্ঞায় শব্দ উৎপন্ন করে। এই জন্তাই বোধ হয়, বহুকাল যুরোপীয়দিগের মধ্যে এই উপাখ্যানটী প্রচলিত ছিল যে পেলোরো অন্তরীপের নিকট একটা রাক্ষসী সেই পথগামী নাবিকদিগকে গ্রাস করিবার জন্ত কুকুর এবং বীপি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বদা তথায় অবস্থিত করিতেছে।

নয়ওরে উপকূলবর্তী জলরাশি একটা প্রবাহে প্রবলবেগে পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরাভিষ্মুখে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহিত বায়ু কর্তৃক প্রতিকূল হইলে জলরাশি সংক্ষুব্ধ হইয়া তীব্র শব্দ উৎপন্ন করে, সে শব্দ সমুদ্র হইতে অনেক দূর পর্যন্ত শ্রুত হয়। এই ঘূর্ণাবর্তের নাম মেলট্রুম। বায়ুর প্রকোপ না থাকিলে যানাদি নির্ভয়ে সে স্থান দিয়া গমন-গমন করিতে পারে, কিন্তু প্রবল বাত্যা হইলে জাহাজাদি সে স্থান হইতে দূরে রক্ষা করা উচিত, নতুবা শ্রোত-বেগে ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতল জলে নিমগ্ন হয়, নতুবা নষ্ট হইয়া যায়। সে স্থানের জলের বেগ এত অধিক যে, তিমি ও অন্যান্য নানাবিধ মৎস্য বৃত্ত অবস্থায় উপকূলে অনেক সময় দৃষ্ট হয়।

অক্সিনী দীপপুঞ্জমধ্যস্থ জলাবর্তগুলি বায়ু এবং প্রবাহের পরস্পর ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন। কিন্তু এই স্থানের আবর্তগুলি সঙ্কটজনক নহে। এক খণ্ড কাঠ কিবা তৃণরাশি এই জলাবর্তে নিক্ষেপ করিলে জলের ঘূর্ণায়মান গতি বিদূরিত এবং জল সহজ অবস্থাপন্ন হয়। সুতরাং নৌকারোহণে এই স্থান দিয়া বাইতে হইলে পূর্বে এক খণ্ড কাঠ কিবা কিছু তৃণ জলে নিক্ষেপ করিলে নির্ভয়ে এই জলাবর্ত অতিক্রম করা বাইতে পারে।

নদীজলে যে আবর্ত হয়, তাহা মণ্ডলাকারে প্রবাহিত হইতে থাকে। নদীজলের স্তরের কোন অংশ নত হইলে অথবা সঙ্কীর্ণ হইলে শ্রোত নদীরেখার সহিত সমান্তরাল অবস্থায় বাইতে পারে না, পক্ষান্তরে অসরল ভাবে মধ্যমিকে পরিবর্তিত হইয়া মণ্ডলাকারে প্রবাহিত হয় এবং নদীর উপরিভাগের জলরাশি তট কর্তৃক প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এই তটও অসমান্তরাল শ্রোতের মধ্যস্থিত জলরাশি ভিন্ন ভিন্ন জল দ্বারা চালিত হয়। এই বক্রৈবিক গতি হেতু শ্রোতের মধ্যাপসারী গতি উৎপন্ন হয়, এই জন্ত আবর্তের কেন্দ্রস্থলের জলরাশি নদীর উপরিভাগের জলরাশির সহিত সমতল নহে।

মনে কর, কোন নদীর নিম্নস্তর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে, সেই স্থানের এক পারে ক বিন্দু অপর পারে খ বিন্দু করনা কর এবং তন্নিকটবর্তী যে স্থানে নদী অতিশয় স্তম্ভায়তন তথায় ক 'খ' বিন্দু করনা কর। নদীর আকৃতিও শ্রোতের গতিতে তটের ক ক ' অংশ দ্বারা কতকাংশে জলের প্রবাহ প্রতিকূল হয়, নিকটবর্তী জলাপেক্ষা অধিক উচ্চ হইয়া উঠে এবং তথায় প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া ক গ অভিমুখে চালিত হয়। জলের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে ক খ স্থানের জলরাশির বেগ অপেক্ষা ক গের জলের বেগ অধিক হয়। ক গ গ ' স্থানের জলরাশি ক ক ' গ অভিমুখে ধাবিত হয় এবং য স্থান হইতে জল তথায় আগমন করে। এইরূপে ক ' গ অভিমুখে একটা শ্রোত প্রবাহিত হয় এবং খ বিন্দু হইতে গ ক এবং গ হইতে ক গ ' অভিমুখে জল যাতায়াত করে। এই বিভিন্ন প্রসারী শ্রোতের বাত প্রতিঘাতে জলরাশি মণ্ডলাকারে ঘূর্ণায়মান হয়। এইরূপে নদীর কোন স্থানে সর্বদাই জলাবর্তের কার্য্য হইতেছে এবং এই জলাবর্ত কেবলমাত্র সেই স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া নদীর স্বাভাবিক শ্রোতে আরও কিয়দূর অন্তর্ভূত হয়।

ক গ চিহ্নিত মধ্যবর্তী ভূভাগের আকৃতির সদৃশ হইলে নদীর অপর পারেও ঘূর্ণাবর্ত হইতে পারে ও চিহ্নিত স্থান যদি সঙ্কীর্ণায়তন হয়, তবে তথা হইতে ক গ ' প্রবাহ-প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া জলাবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে। এই কারণেই বহি নদীর প্রায় অতি অল্প পরিসর হয় এবং তথায় কোন সেতু স্থাপিত হয়,

তবে সেই ক্ষেত্রে তত্ত্বের নিকট আরও উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত আকর্ষণের নিয়মগুলি তাহার চতুর্দিকস্থ স্তরগুলি অপেক্ষা অতি অল্প পরিমাণেই বিকল্প বস্তুর গতিবোধ করিতে পারে। এই সমস্ত তত্ত্বের নীচে যে জল আছে, তাহা জলের সাধারণ ধর্মাবলম্বী সমস্ত অবস্থার থাকিবার জন্য উৎসাহকালে শক্তিক্রিয়া প্রভৃতি উর্ধ্বে উত্তোলন করে এবং সময় সময় সেতু প্রভৃতির ক্ষতিসাধিত উর্ধ্বে প্রকৃষ্ট করে।

নদীর নিম্নস্তরগুলি সর্বত্র সমান নহে; কোন স্তর অপেক্ষাকৃত নিম্ন, কোন স্তর অপেক্ষাকৃত উচ্চ। তত্ত্বের উচ্চতা ও নিম্নতার ভারতমাত্রায়ের অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থানে হইতে জলের গতি প্রতিক্রিয়া হইয়া জলাবর্ত উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রবাহ পরে অসমতল্যাবে উৎসর্গী হয় এবং তরঙ্গাকারে উপরে উঠিতে থাকে। এইরূপ যদি কখন কোন স্থান হঠাৎ নিম্ন হইয়া যায়, তবে সে স্থানেও জলাবর্ত উৎপন্ন হইতে পারে।

জলাশয় (পুং) জলস্ত আশয়ঃ আধারঃ। ১ জলাধার, সমুদ্র, নদ, নদী, পুকুরিণী প্রভৃতি। [পুকুরিণী দেখ।]

“ন নান্যচরেতুত্বং। নাকুরো ম মহানিশি।

ন বাসোক্তিঃ মহাজং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥” (মহু ৪।১২৯।)

(জী) জলে জলবহলপ্রদেশে আশেতে শী-অচ্। ২ উল্লী। ৩ লামজক তৃণ। (রাজনি) ৪ শূলাটক। (জি) ৫ জলশায়ী।

“রুদ্রবানরসিংহাশ্চ মহিবাশ্চ জলাশয়ান্।” (ভার্য ৩।১৪৩।৫৪)

জলাশয়া (জী) শুণ্ডা বৃক্ষ। (রাজনি)

জলাশ্রয় (পুং) জলে জলপ্রচুরপ্রদেশে আশ্রয়ো উৎপত্তিস্থানং যত। বৃন্তশুণ্ডতৃণ।

জলাশ্রয়া (জী) ত্রিমাং টাপু। ১ শূলীতৃণ। ২ বলাকা (রাজনি)

জলাশ (জী) জায়তে জল-ড জঃ লাবো-হস্তিলাবো যত্র অর্শা-দিষাদচ্। ১ জ্ব। ২ সকলের সুখকর। “যো অতি তেবজো জলাশঃ।” (ঋক্ ২।৩৩৭।) ‘জলাশঃ সর্কেষাং সুখকরঃ।’ (সারণ) ৩ জল। (নিমণ্টু)

“গতিমেধপতিং রুদ্রং জলাশভেবজং।” (ঋক্)

জলাবাহু (জি) জলং সহতে সহ-ধি পূর্কপদার্থঃ, পত্র বহু। জলোচ্চ, জলসহনকারী।

জলাভীলা (জী) জলেন অতীলা সংহতা। পুকুরিণী। (হার্য)

জলাত্মকা (জী) জলমেব অসবো বস্তাঃ কপু-টাপু। জলোকা।

জলাহর (জী) জলে আহরঃ স্পর্শা যত। উৎপল। (রাজনি)

জলিকা (জী) জলং উৎপত্তিস্থানং যেনাত্যক্তাঃ জল-ঠন্ (অত-ইনিঠনো)। পা ৫।২।১১৫) ত্রিমাং টাপু। জলোকা। (ভরত)

জলিকাট, মহারাজ্যে অস্থিত এক প্রকার ক্রীড়া।

কতকগুলি গো-মেয়াদির শূদ্রে কাপড় বা গাবড়া বাঁধিয়া

জের, সেই গামছার খুঁটে টাকা কড়ি বাঁধা থাকে। কোন বিত্তীর্ণ মাঠে আশিয়া লবণলিক ঠিক এক সঙ্গে জড়িয়া দেয়। এই সঙ্গে দর্শকবৃন্দ হাততালি দিয়া চিৎকার করিতে থাকে। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া প্রাণপণে পত্তপন ছুটিতে আরম্ভ করে, ক্রতগামী ব্যক্তিরাও তাহার সহিত দৌড়াইতে থাকে। যে অগ্রগামী পত্তকে অগ্রে ধরিতে পারে, তাহারই জয় হয় এবং পত্তর শূদ্রে যে টাকা কড়ি বাঁধা থাকে, তাহাও সে পায়।

ইংরাজেরা যেমন বোড়দৌড়ে উন্নত হয়, মহারা, বিশিরা-পল্লী, পছকোটা ও তত্ত্বোরের লোকেরাও সেইরূপ এই খেলার উন্নত হইয়া থাকে। এই খেলা তাহাদের জাতীয় উৎসব বলিয়া গণ্য হইত, ধনী দরিদ্র সকলেই এই খেলার যোগদান করিত। এই খেলার সময়ে সময়ে অনেক বিপদ হইত বলিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেন্ট এই খেলা বন্ধ করিয়া দেন।

জলুকা (জী) জলে তিষ্ঠতি জল বাহুলকাৎ-উক। জলোকা।

জলুকা (জী) জলমোকো বস্তাঃ পুৰোদারাদিহাং সাধুঃ। জলোকা।

“জলুকেব সদানারী কবিরং পিবতীতি বৈ।

যুথন্ত ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতঃ॥”

(দেবীতাং ১।১৫।১৮)

জলেচর (পুং) জলে চরতি-চর-ট (চরেট)। পা ৩।২।১৬)

তৎপুরুবে অলুকসং। (তৎপুরুবে কৃতিবহলম্। পা ৬।৩।১৪)

১ জলচর পক্ষী, হংস, বক প্রভৃতি। ইহাদের মাংসগুণ—গুরু, উষ্ণ, দ্রিষ্ট, মধুর, বায়ুনাশক, শুক্রবৃদ্ধিকর। (রাজবং) (জি) ২ জলচারী।

“সতমানার কোন্তয়ো বিক্ষুরন্ত জলেচরং।” (ভার্য ১।২১৭।১১)

ট এই অল্পবদ্ধ হইলে জীলিঙ্গে জীপ হয়। বধা জলেচরী।

জলেচ্ছয়া (জী) জলমেতি জল-ই-কিপ্ জলেৎ জলপ্রচুরস্থানং তত্র শেতে উদ্ভবতি শী-অচ্ ত্রিমাং টাপু। হস্তিশুণ্ডা বৃক্ষ, হাতিশুণ্ড। (শব্দরং)

জলেজ (জী) জলে জায়তে জন-ড। ১ পত্র।

“উভাগীনি জলেজানি দ্ব্যস্ত্যদরিতং জনং।” (ভটি)

(জি) ২ জলজাত।

জলেজাত (জী) জলে জাতং সপ্তম্যা অলুক। ১ পত্র। (শব্দরং)

(জি) ২ জলজাত।

জলেজ (পুং) জলত ইজঃ অধিপতিঃ। ১ বক্রণ। ২ মহাসমুদ্র।

৩ জলনাথ মহাদেব। ৪ পূর্ব-বক্র। (মেদিনী)

জলেজ (পুং) জলাজ্জবেকনানি যত। ১ বাতবারি। ২ সৌর-বিজ্ঞানাদি ভেজঃ। (শব্দার্থটিং)

জলেজ (পুং) জলজাত-ইজঃ। জলহতী।

জলেজ (পুং) পুরুষশব্দ-রোজাৎ দৃশ্যতির এক পুরু। (ভার্য ৩।২০।৫)

জলেশ্বর (দ্বী) জলে রোহিতি উদ্ভবতি রূহ-ক লগ্নম্যাঃ
অলুক। ১ কুইখিনী বৃক। (রাজনি) (ত্রি) ২ জলজাত।

জলেশ্বর (দ্বী) কুমারাহুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯৪৭ অঃ)

জলেশ্বর (পুং) জলে জলমধ্যে বাহতে জলময়ব্রব্যস্ত লাতার্থঃ
প্রযুক্ততে। যে জলময় হইয়া জলস্থিত পদার্থ খুঁজিয়া বাহির
করে, ভুবুরি।

“জলবাহানধাহর বহুংস্তত্র ভূবোজরং।

তে কৃষা পরমং বহুমাপুরাতরণং ন তৎ॥” (পদ্মপুরাণ)

জলেশ্বর (পুং) জলস্ত ঈশঃ ৩৩৭। ১ বরুণ। ২ সমুদ্র।

“দিশশ্চ কলৌ রসনং জলেশঃ।” (ভাগৱ ৮।৭।২০) ৩ জলাধিপতি।

৪ বর্ষভেদ। [জলাধিপ দেখ।]

জলেশ্বর (পুং) জলে শেতে শী-অচ্ সপ্তম্যাঃ অলুক। ১ মৎস্ত।

২ বিষ্ণু, সর্গাধার বিষ্ণু জলে শয়ন করেন।

“তুষ্ণরীণো মহাক্রোধ উর্জরতা জলেশ্বর।” (ভারত ১৩।১৭।৯৮)

(ত্রি) ৩ জলে অবস্থানকারী।

জলেশ্বর (পুং) জলস্ত ঈশ্বরঃ। ১ বরুণ। (শব্দরং)

“তমব্রবীৎ ধুমকেতুঃ প্রতিগৃহ জলেশ্বরং।” (ভার ১।২৬।৩)

২ সমুদ্র। ৩ হিমালয়স্থতীর্থবিশেষ। (হিমবৎখণ্ড ৮।৫৪)

৪ জলাধিপতি।

“ভীমোভবাং প্রতি নলে চ জলেশ্বরে চ” (নৈষধ)

জলেশ্বর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এটা জেলার একটি তহসীল।

ঈশান নদী দ্বারা এই স্থান নানা ভাগে খণ্ডিত হইয়াছে। ইহার
পরিমাণ ২২৭ বর্গমাইল। এখানে ১৫৮ খানি গ্রাম ও নগর
আছে। রাজস্ব ২৭৫৩১০।

২ এটা জেলার একটি নগর। জলেশ্বর তহসীলের সদর।

অক্ষা° ২৭° ২৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২০' ৩০" পূঃ। অন্তর্বেদীর
মধ্যে মধুরা হইতে ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে
মিউনিসিপালিটি ও রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। লোকসংখ্যা
১৩৪২০, নগরের আয়তন ২২২ একর।

জলেশ্বর, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রদেশের সীমান্তস্থিত একটি
প্রাচীন নগর। এখন বালেশ্বর জেলার উত্তরপূর্ব সীমা বলিয়া
গণ্য। কলিকাতা হইতে অগম্য পৰ্যন্ত যে পথ গিয়াছে,

১ সেই পথের ধারে অবস্থিত।

অসলমানদিগের আমলে জলেশ্বর একটি সরকার বলিয়া
গণ্য হইত, বর্তমান মেদিনীপুর জেলা ও হিজলী এই সর-
কারের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে কুঠি স্থাপন করেন। তখন
এখানে বাণিজ্য ব্যবসা যথেষ্ট ছিল। কুঠি উঠিয়া দেওয়ার
পর হইতেই এ স্থানে বাণিজ্য ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

জলোক (পুং) কাশ্মীররাজ অশোকের পুত্র, মহাদেবের
আরাধনা করিয়া ইহার জন্ম হয়। ইনি স্নেহমুগ্ধগণকে পরাভূত
করেন। ধর্মবিদ্যার অধিষ্ঠার ছিলেন এবং জলজন্তুবিভাগ
জানিতেন। কেক্রজ্যোতেশ, নন্দীশ ও বিজয়েশ্বর নামক
তিন শিবমূর্ত্তি ইহার আরাধ্য দেবতা। ইনি স্নেহমুগ্ধগণের
সহিত বৃদ্ধকালে তাহাদিগকে সাগরতীর পর্যন্ত তাড়াইয়া
লইয়া গিয়া, যে স্থানে বিশ্রাম করেন এবং পরে নিজ কেশ
বন্ধন করেন, সেই স্থান উজ্জ্বলিডিম্ব নামে প্রসিদ্ধ। কাঞ্চকুজ-
প্রদেশ জয় করিয়া সেখানকার চতুর্বর্ণের কতকগুলি সৎ-
লোককে কাশ্মীরে লইয়া যান। ইনি সামাজিক ও রাজ-
নৈতিক অনেক বিষয়ে উন্নতিসাধন করেন। ইহার পত্নীর নাম
ঈশানীদেবী, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। মহারাজ
জলোক নন্দাপুরাণ শুনিতে ভালবাসিতেন। ইনি গ্রীনগরে
জ্যোতীর্নকেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত আছে, যে
একদিন ইনি বিজয়েশ্বরের মন্দিরে গমন করিতেছিলেন, সেই
সময় একটা জলোক তাহার নিকট আগমন করিয়া কিকিৎ
ধ্বন্য প্রার্থনা করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার
কি খাদ্যে অভিরুচি?” তাহাতে সেই জলোক বিকৃত আকার
ধারণ করিয়া বলিল, “মহারাজ! নরমাংস ভক্ষণ করিতে
আমার একান্ত বাসনা।” তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথচ
অন্ত কোন মনুষ্য বিনাশ করাও অন্তর, এই বিবেচনা করিয়া
জলোক আপনার শরীরের যে কোন স্থান হইতে যত মাংস
তাহার প্রয়োজন, তাহা ভক্ষণ করিতে কহিলেন। রাক্ষসী
রাজার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, “মহারাজ আপনি বিত্তীয়
বৃদ্ধ।” রাজা বলিলেন, “বৃদ্ধ কে?” রাক্ষসী বলিল, “লোক-
লোক পর্ত্তের অপর পারে যেখানে সূর্যের কিরণ কখন প্রবেশ
করে না, সেই স্থানে কৃতীয় নামে এক জাতি আছে, তাহারা
বৃদ্ধের উপাসক। ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না।
যদি কেহ তাহাদের অনিষ্ট করে, তাহা হইলেও তাহারা উপকার
ভিন্ন কখন অপকার করে না। ইহারা পৃথিবীতে সত্য ও জ্ঞান
প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু আপনি তাহাদের মহা অপকার
করিয়াছেন। আপনি চুইলোকের পরামর্শে তাহাদের একটি
দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া এই দেব-
মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিন।” রাজা প্রতিশ্রুত হইয়া সত্বর
সেই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন। পরে তিনি নন্দীকেন্দ্রে
ভূতেশ নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার জীবনের
শেষভাগ ধর্মকার্যে অতিবাহিত হয়। ইনি কনকবাহিনী-
তীরে চিরমোচক নামক স্থানে পত্নীর সহিত মানবলীলা সম্বরণ
করেন। (রাজতরঙ্গিনী)

কোন কোন পুরাবিদ্য বলেন, গ্রীকবীর সেনিউকাসের
মামাইসংক্ৰতে জলোক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। (Ind. Ant.
Vol. II. p. 145.)

জলোকা (স্ত্রী) জলঃ ওকং আশ্রয়ো বভাঃ পূর্বোহরাবিধাৎ
সাধুঃ। জলোকা, জৌক।

জলোকিকা (স্ত্রী) জলোকা।

জলোচ্ছ্বাস (পুং) জলানঃ উচ্ছ্বাসঃ ৩৩৭। ১ জলের
ক্ষীতি। ২ জোরার, নদী প্রভৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া জল
উঠা। ৩ অধিক জল উপার দ্বারা বহিনির্গাসন। ৪ সেতু
তদ্বাদি ভয়ে অধিক জল বহিনির্গাসন। ৫ পুরুষিণী
প্রভৃতিতে জলপ্রবেশ নিমিত্ত উপায়। (ভরত)

জলোদর (স্ত্রী) জলপ্রধানঃ উদরঃ বভাঃ। জঠরামর, উদর-
রোধবিশেষ, উদরী। [উদর দেখ।]

জলোদ্ধতগতি (স্ত্রী) ছন্দঃবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে
১২ করিয়া অক্ষর। ২৩৮। ১২ বর্ণ শুক্ল, তত্ত্বিন্ন লঘু।

“জলো অসমুতো জলোদ্ধতগতিঃ” (ছন্দোম*)

“যদীরহলতো বিলোক্য বিপদং কলিনতনয়া জলোদ্ধতগতিঃ।
বিলাসবিপিনং বিবেশ সহসা করোতু কুশলং হলীস জগতাং”

(ত্রি) জলেন উদ্ধতা গতিরন্ত। ২ জল দ্বারা উদ্ধতগতিযুক্ত।

জলোদ্ভাদ (পুং) শিবের অমুচরভেদ।

জলোদ্ভব (ত্রি) জলে উদ্ভবো অস্ত। জলজাত বস্তু।

জলোদ্ভবা (স্ত্রী) ১ শুভালা কৃপ। ২ কালাহুশারিবা, শীউলী
ছোপ। ৩ লঘু ব্রাহ্মী। (রাজনি*) জলমুত্তবত্যাং অপাদানে
অপ্। ৩ হিমালয়স্থিত স্থানবিশেষ।

“ততো হিমবতঃ পার্শ্ব সমভ্যোত্য জলোদ্ভবঃ।

সর্বময়েন কালেন দেশং চক্রে বশং বলী” (ভার* ২।২২ অঃ)

(ত্রি) ৪ জলজাত।

“গণকীভ সমানান্ত সর্বতীর্থজলোদ্ভবঃ” (ভার* ৩।৮৪ অঃ)

জলোদ্ভূতা (স্ত্রী) জলে উদ্ভূতা। শুভালা কৃপ। (রাজনি*)

জলোরগী (স্ত্রী) জলে উরগী সর্পিণীব। জলোকা। (সারসু*)

জলোক (পুং) কান্দীরাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র। ইনি
পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। ইনি ৩২ বৎসর স্বারসম্রাট
রাজত্ব করেন। [কান্দীর দেখ।]

জলোকস্ (স্ত্রী) জলে ওকো বাসস্থানঃ বস্ত। ১ জলোকা।

জলোকস্ পদ নিত্যবহবচনান্ত। (ত্রি) ২ জলবানী।

“জলোকসাং স সন্ধানাং বভূব প্রিরদর্শন” (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

জলোকস্ (পুং) জলমেব ওকো বাসস্থানঃ তদন্তি জন্ত অর্শ
আদিবাদহ। জলোকা।

জলোকা (স্ত্রী) জৌক। পর্যায়—রক্তপা, জলোকস্, জলুকা,

জলোকা, জলোরগী, জলাবুকা, জলিকা, জলাহুকা, জলজন্তকা,
জলালোকা, জলোকনী, রক্তপারিনী, রক্তসংলিকা, জীকা,
বমনী, জলজীবনী, রক্তপাতা, বেধনী, জলসর্পিণী, জলচি,
জলাটনী, জলাকা, জলপটাস্রিকা, জলিকা, জলাবুকা,
অমৃসর্পিণী, পটাবুকা, বেগীবোধনী, জলাজিকা। হুশ্রুতের
মতে জল বাহাদিগের আয়ুঃ, অথবা জল বাহাদিগের ওকস্
(বাসস্থান) তাহাদিগকে জলোকা বলে।

হুশ্রুত মতে—ইহা দ্বাদশ প্রকার, তদ্ব্যবহৃতকা, অলগর্দী,
ইজ্রাবুধা, গোচন্দনা, কর্ণুরা ও সামুদ্রিক এই ছয় প্রকার বিব-
কৃত্ত এবং কপিল, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও
সাবরিকা এই ছয় প্রকার বিবরহিত। কৃষ্ণা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ
এবং শিরাসমূহ স্থল। কর্ণুরা বাহিন মৎস্তের জায় দীর্ঘ, কৃষ্ণি-
দেশ ছিন্ন ও উন্নত। অলগর্দী—অতিশয় রোমযুক্ত, বৃহৎ পার্শ্ব-
যুক্ত ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ। ইজ্রাবুধা—ইজ্রাবুধের জায় উর্দ্ধ রোমরাজি
দ্বারা বিচিত্র। সামুদ্রিকা—কৃষ্ণ ও জৈবৎ পীতবর্ণ ও বিচিত্র
পুষ্পাকৃতি। গোচন্দন—গো বৃষের শৃঙ্গের জায় দুইভাগে বিভক্ত
ও মস্তক ক্ষুদ্র। মাহুঘের শরীরে এই সকল বিবাক্ত জৌক
দর্শন করিলে দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে, অতিশয় চুলকানি হয়,
মূছা, জ্বর, দাহ, বমন, মনের বিকৃতি ভাব ও শরীরের
অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ছয় প্রকার নির্জিব জৌকের মধ্যে কপিয়ার উত্তর পার্শ্ব
মনঃশিলায়জিত বর্ণের মত, পৃষ্ঠদেশ চিকণ ও মুগের মত
বর্ণবিশিষ্ট। পিঙ্গলার শরীর গোলদকার, বর্ণ জৈবৎ রক্তিম ও
পিঙ্গল এবং গতি শীঘ্র। শঙ্কুমুখী ষষ্ঠতের মত বর্ণবিশিষ্ট,
অন্ন সময় মধ্যে প্রচুর রক্তপান করিতে পারে, দীর্ঘাকার,
ও তীক্ষ্ণমুখ হওয়ার অতি শীঘ্র শরীরে প্রবেশ করে। মূষিকা—
মূষিকের জায় আকার, বর্ণ ও চূর্ণবর্ণবিশিষ্ট। পুণ্ডরীকমুখ
দেখিতে মুগের জায় বর্ণ, ইহার পায়ের মত মুখ। সাবরিকার
শরীর চিকণ, পক্ষপাতার মত বর্ণ ও দৈর্ঘ্যে ১৮ অঙ্গুলি।

হুশ্রুত বলেন, জলোকা সকলের মধ্যে বাহারি বিবাক্ত
মৎস্ত, কীট, ভেক, মূত্র ও পৃথিবী পচিয়া ষোণা-জলে অয়ে,
তাহারা লবিব। বাহারি পক্ষ, উৎকল, নলিন, কুমুদ, খেতপদ,
কুবলর, পুণ্ডরীক ও শৈবাল এই সকল জব্য পচিয়া নির্জল জলে
জয়ে, তাহারি নির্জিব। সকল জলোকার মধ্যে বাহারি বল-
বান, শীঘ্র রক্ত পান করিতে পারে, অধিক আহার করে এবং
জলীয় ও বৃহৎ তাহারি এককালেই নির্জিব হইয়া থাকে। ববল,
পাণ্ডা, লহু, পৌত্তন প্রভৃতি ক্ষেত্র ইহাদের বাসস্থান। ইহারি
ক্ষেত্রমধ্যে এবং জগজ্জি সলিলা মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।
সর্পিণীদ্বানে চরে মাংস পকে পল্লন করে মা। (হুশ্রুত পুত্রহান)

এই ভূমণ্ডলের সর্ব দেশেই জলোকা দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। আরবদেশে ইহাকে সাধারণতঃ আবুক, পারস্য দেশে খেলু এবং ইংলেণ্ডে ইহাকে সাধারণতঃ লিচ্ (Leech) কহে। জলোকা নানাবিধ এবং ইহাদের আকৃতিগত বৈষম্য এত অধিক যে হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে ভিন্নজাতীয় প্রাণী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্যেতু ইহাদিগকে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ পশ্চিমতগণ ইহাদিগকে সাধারণতঃ আনেলিডা (Annelida) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ব্যারণ কুন্ডিলার নামক কোন পণ্ডিত আনেলিডা ও সাধারণ জলোকা এক শ্রেণীভুক্ত না করিয়া ভিন্ন শ্রেণীতে নির্দেশ করিয়াছেন। আনেলিডা জাতি ভিন্ন হইতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সাধারণ জলোকা কোন জলোকা-নিঃসারিত স্বকৃগত বীজকোষ হইতে জন্মগ্রহণ করে। বাহা হউক, 'আনেলিডা' নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং আনেলিডা জাতিভুক্ত হিরুডিনাইডি (Hirudinidae) শ্রেণী হইতে ডেলা (Bdella), হিমাডিপসা (Hæmadipsa), সাংগুইসিউগা (Sanguisuga) প্রভৃতি জলোকা উৎপন্ন। এই সমস্ত জলোকা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকগুলি পরিষ্কার জলে, কতকগুলি লবণাক্ত জলে ও কতকগুলি জলে স্থলে উভয়স্থানে বাস করে। ভিন্নকৃগণ বিশেষ বিশেষ ব্যাধি শাস্ত করিবার নিমিত্ত সময় সময় যে জলোকা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা এই হিরুডিনাইডি শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় জলোকা ভারত-বর্ষের নানা স্থানে রক্তপ্রবাহপঙ্কিল জলাশয়ে অনেক সময় পাওয়া যায়।

চীনদেশে সেন্টিগনি নামে একপ্রকার জলোকা দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার স্বকৃ নানাবর্ণে রঞ্জিত। চীনদেশের অন্তঃপাতী সান্টাঙ্গ প্রদেশে একপ্রকার জলোকা দৃষ্ট হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ১ ফুট। মলবার উপকূলে সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চ স্থানে পর্য্যন্ত জলোকা দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ষাকালে জলোকা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এইকালে কোন বহু প্রকল্পে ভ্রমণ করিলে জলোকার জন্ত অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। অতি পূর্বকাল হইতেই হিন্দুগণ জলোকা ও তাহাদের শুণাশুণ বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন, আরবদিগের গ্রন্থেও জলোকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি জলোকা অতিশয় বিবাক্ত এবং কতকগুলি মল্লুসদিগের অতি উপকারী।

ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে ছই প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর জলোকা দৃষ্টিগোচর হয়, এক শ্রেণীর জলোকার দৈর্ঘ্য এক

ইঞ্চের অনধিক, বর্ণ হরিৎ, পৃষ্ঠোপরি লাভটী রেখা, কিন্তু অসিতবর্ণের কোন রেখা বা ডোরা নাই, বারিষ্ক চকু এবং সেই চকুগুলি চারি রেখার বিভক্ত। এই শ্রেণীর জলোকাগুলি জলে বাস করে। অন্য শ্রেণীর জলোকাগুলির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের ১ অংশের অধিক নহে। বর্ণ ভাস্করের ভায় রক্তাক্ত, পৃষ্ঠোপরি একটি বৃহৎ কালরঙের রেখা আছে এবং সর্ব শরীরে কাল কাল ডোরা। ইহাদের চকু দশটি এবং তাহা অর্ধ বৃত্তাকারে বিভক্ত। ইহাদিগের ওষ্ঠ মৃদু। এই জাতীয় জলোকাগুলি ভূপৃষ্ঠে বাস করে। শেষে যে শ্রেণীর জলোকার বিবর লিখিত হইয়াছে, সেই শ্রেণীর জলোকা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে, সিংহলদ্বীপে এবং মাদাগাস্কারে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে মথেরান (Matheran) জলোকা কহে। এই জাতীয় জলোকাগুলি এত রক্ত-পিপাসু যে, যদি কেহ ইহাদের আবাস স্থানের নিকট দিয়া গমন করে, তবে তাহার শরীর হইতে এত রক্ত শোষণ করে যে, ক্ষত স্থান শেষে পচিয়া উঠে এবং সেই স্থান হইতে পুঁয় পড়ে।

আর্য্য অথচ উচ্চ স্থলে এই শ্রেণীর জলোকা অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ডাক্তার হকার তাঁহার সিকিম-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কর্দময় স্থানে অথবা পর্বতোপরি যেখানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই স্থানেই এই শ্রেণীর জলোকা অতি বহুল পরিমাণে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। তাঁহার ভ্রমণকালে কেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই এই জলোকার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং এই কারণে তাঁহার শরীরে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহার আরোগ্য লাভ করিতে পাঁচ মাস সময় লাগিয়াছিল। বর্ষাকালে জলোকার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং জলোকার উৎপাতে নানাবিধ রোগও আক্রমণ করে। সময় সময় জলোকা মল্লুস এবং পঞ্চাদির শরীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তজ্জন্ত উহাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। জলপান কালেও ইহারা পঞ্চাদির শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ডাক্তার হকার বলেন, পাদদেশে নতু অথবা তামাকু প্রয়োগ করিলে জলোকাগণ নিকটে আসিতে পারে না, লবণও জলোকা-ব্যাধির। ভৈষজ্যার্থ ব্যবহার হেতু দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমপ্রান্তে এক শ্রেণীর হিন্দুগণ গ্রীষ্মকালে জলোকা পোষণ করে। বঙ্গদেশে এবং মাজাজে একপ্রকার বৃহৎ জলোকা পাওয়া যায়, তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

বারাসতের নিকটে কতকগুলি লোক আছে, তাহারা অনাকৃতদেহে জলাশয় কিম্বা নিকলে যেখানে জলোকা বাস

করে তথ্য প্রবেশ করে এবং জলৌকাগুলি তাহাদের দেহে সংশ্লিষ্ট হইবামাত্র তাহাদিগকে ধরিয়া কলিকাতার দান্তব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করে। আশ্রয় মধ্যবর্তী শেখুআবাদের নিকটবর্তী জলাশয়ে শেখুআবাদি নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট জলৌকা পাওয়া যায়।

পঞ্চাব প্রদেশে পাটিয়ালার নিকটবর্তী স্থানেও বিস্তর জলৌকা দেখা যায়। এই শেখুআবাদি জলৌকার রঙ সবুজ এবং ২টা উজ্জল পীতবর্ণের ডোরাবিশিষ্ট। এ ছাড়া ডবার নামেও একপ্রকার জৌক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যুরোপে বায়ু-প্রবেশার্থ পাতলা আবরণ-বিশিষ্ট জলপূর্ণ পাঞ্জে এবং ভারত-বর্ষে আর্দ্রকর্দমাবৃত মৃৎপাঞ্জে জলৌকা রক্ষিত হয়। ভারত-বর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে প্রায় যে সমস্ত জলাশয়গুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না এবং বাহার জল লবণাক্ত নহে, একরূপ প্রায় সকল জলাশয়েই জলৌকা দৃষ্ট হয়।

সাধারণ জলাশয়ের জলৌকা হইতে সমুদ্রের জলৌকা অনেক বিভিন্ন। সমুদ্রের জলৌকার চর্ম অতিশয় ঘন ও দৃঢ়, ইহারা সাধারণ জলৌকার স্তায় সমুদ্র মধ্যে দ্রুতবেগে অথবা স্থলরভাবে গমনাগমন করিতে পারে না, কিন্তু ইচ্ছানুসারে শরীর সঙ্কুচিত অথবা বর্ধিত করিতে পারে। বিশেষতঃ অল্প জলৌকা হইতে ইহাদের আকৃতির অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে সামুদ্রিক জলৌকা আল্‌বিওন্ (Albion) নামে অভিহিত, অল্প একপ্রকার সামুদ্রিক জলৌকা আছে, তাহাদিগকে ব্রাঞ্চেলিয়ন্ (Branchellion) কহে।

আল্‌বিওন্দিগের দেহ অকোমল, ইহাদের পৃথক্ খাঁস যন্ত্র নাই, কারণ ইহারা চর্ম মধ্য দিয়াই শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে। মৎস্তের যে স্থানে রক্তাধার ব্রাঞ্চেলিয়ন্ সেই দিকে সংলগ্ন হইয়া রক্তশোষণ করে। সামুদ্রিক জলৌকাগণের রক্তশোষণ-প্রণালী একরূপ নহে। আল্‌বিওন্ জলৌকাগণ প্রায় চর্ম ছেদন করে, কিন্তু শেবোক্তগণ চর্ম কর্তন করে। ইহারা দিবান্তাগে অলসভাবে থাকে এবং রাত্রি উপস্থিত হইলেই বহির্গত হইয়া বাহার পাঞ্জে সংলগ্ন হইতে পারে, তাহার শরীর হইতেই রক্ত শুষিয়া যায়।

সামুদ্রিক জলৌকাগণ রক্তবর্ণ শোণিত-প্রিয়, স্ত্রুতরাং শব্দক অথবা অপর কোন প্রাণিকে আক্রমণ না করিয়া মৎস্ত-রক্ত পান করিবার নিমিত্তই সর্বদা চেষ্টা করে। ইহারা যত রক্ত পায়, ততই পান করিতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে জলৌকা কর্তৃক অত্যধিক পরিমাণে রক্ত পীত হইলেও মৎস্তগণ দুর্বল হইয়া পড়ে না, কেবলমাত্র তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং সময় সময় তাহাতে মৎস্তগণ পরিপুষ্ট হয়। এই

জলৌকাগণ মৎস্তগণের কোন শারীরিক দ্বন্দ্ব হির করে না, স্ত্রুতরাং তাহাদের জীবনের কোন কতি হয় না।

আল্‌বিওন্ জলৌকাগণ ডিম্বের বীজকোষ হইতে জন্ম-গ্রহণ করে। এক একটা জলৌকার এক হইতে পঞ্চাশটা ডিম্ব উৎপন্ন হইতে পারে। এই ডিম্বের বীজকোষগুলি বর্তুলাকার, ইহার ব্যাস এক ইঞ্চের পঞ্চমাংশ। এই বর্তুলের বহিরাবরণ অতিশয় পাতলা এবং ডিমগুলি বেতবর্ণ। ডিম ফুটিবার কাল বতই অগ্রসর হয়, ততই ইহার রঙ শিল্পবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। অল্প জলাশয়স্থিত জলৌকার ডিম্বের কোনরূপ আবরণ থাকে না। ডিম্বের উপরিভাগ বিদীর্ণ করিয়া সামুদ্রিক জলৌকা বহির্গত হয়, কিন্তু অল্পবিধ জলৌকার বহির্গমনকালে ডিম্বের উত্তর অংশ বিদারিত হয়।

মুসলমানগণ ব্যাধিনিবারণার্থ অধিক পরিমাণে জলৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা এই ব্যবহার হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল।

কোন কোন স্থানে জলৌকা মধুর সহিত একত্র করিয়া ফুটাইয়া লইয়া জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং জলৌকা শুষ্ক করিয়া মুসলমানের সহিত চূর্ণ করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে রক্তার্শ (Hæmorrhoids) শান্ত হয়। জলৌকা ফুটাইয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ জন্মিতে পারে।

আর্য্যচিকিৎসকগণ বাতপিত্ত বা কফ কর্তৃক রক্ত দূষিত হইলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণই সর্বপ্রকারে হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই অল্প জলৌকার জাত্যাতি ও রক্ষণপ্রণালী অতি পূর্বকাল হইতেই এদেশীয়গণ অবগত ছিলেন। এই অল্প কিরূপে জলৌকা চিনিতে হয়, কিরূপে ধরিয়া রাখিতে হয়, স্ত্রুতাদি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইরাছে।

স্ত্রুতের মতে—ভিজা চামড়া অথবা অল্প কোন বস্ত্র দ্বারা জলৌকা ধরিবে। পরে নূতন বড় ঘট, সরোবর অথবা বৃহৎ পুকুরিয়ার জলে পক্ষ পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রাখিবে। শৈবাল, শুষ্কমাংস ও জলজ মূল চূর্ণ করিয়া ইহাদিগকে খাইতে দিবে। তৃণ বা জলজাত পাতার শুইতে দিবে। দুই তিন দিন অন্তর জল ও তক্ষ্য দ্রব্য বদলাইয়া জল ও তক্ষ্য দ্রব্য দিবে। সপ্তাহ অন্তর ঘট-পরিবর্তন করিয়া নূতন ঘটে রাখিবে।

বাহাদিগের মধ্যভাগ হুল, বাহারা অতি ক্ষীণ অথবা হুলতা প্রযুক্ত ধীরগামী, অল্পপারী, বিবাক্ত এবং পীত পীড়িত স্থান ধরে না, এই প্রকার জলৌকা রক্তমোক্ষণে প্রযুক্ত নহে। বিবাক্ত জলৌকা দংশন করিলে মহাগদ নামে ঔষধ পান করিবে।

সাবরিকা নামে জলৌকা হস্তী অথ প্রভৃতির রক্তমোক্ষণে ব্যবহার্য। অপর যে সকল নির্দিষ্ট জলৌকা শীত রক্ত শোষণ করিতে পারে, সেই সেই জলৌকা দ্বারাই মনুষ্যাদির রক্ত মোক্ষণ করাইবে।

রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে পীড়িত ব্যক্তিকে উপবেশন বা শয়ন করাইবে। পীড়িত স্থান যদি বেদনারহিত হয়, তবে সেই স্থানে শুক খোমর ও মৃত্তিকার্চণ অল্প ঘর্ষণ করিবে। পরে জলৌকা আনিয়া সর্ষপ ও হরিদ্রার শিলাপিষ্ট কক্ষ জলে মিশাইয়া তাহাদিগের শরীরে মাখাইয়া দিবে। পরে মুহূর্ত্তকাল এক জলপাত্রে রাখিয়া পরে পীড়িত স্থানে ধরাইবে। ধরাইবার সময় পাতলা শাদা ও ভিজা উত্তম তুলা কিম্বা কাপড় দিয়া সেই জলৌকার শরীর ঢাকা দিয়া মুখ খুলিয়া রাখিবে। যে জলৌকা না ধরে, তাহাকে এক বিন্দু হস্ত বা রক্ত থাইতে দিবে অথবা অল্প দ্বারা বিলেখন করিবে, তাহাতেও যদি না ধরে, তবে অপর একটা ধরাইবে। অথ খুরের মত মুখ ও স্বক উচ্চ করিয়া ভিতরে মুখ প্রবেশ করাইলে ধরিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যখন ধরিয়া থাকে, তৎপরে ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে তাহার উপর জল ছিটা দিবে। রক্তপানকালে দষ্ট স্থানে বেদনা বোধ হইলে অথবা চুকাইলে তখন বুঝিবে যে বিপুল রক্ত পান করিতেছে। তখনই সেই জৌককে শরীর হইতে ছাড়াইয়া ফেলিবে। যদি প্রথমে না ছাড়ে, তাহা হইলে সেই জৌকের মুখে সৈন্ধবলবণের গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। ছাড়িয়া আসিলে তাহার শরীরে চাউলের কুঁড়া ও মুখে তৈল ও লবণ মাখাইবে। বামহস্তের অন্ত্র ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণহস্তের অন্ত্র ও তর্জনী দ্বারা পুচ্ছদেশ হইতে অল্পে অল্পে মুখের দিকে চুষিয়া আনিয়া মুখ দিয়া বমন করাইবে। যতক্ষণ না সম্যক বমন করে, ততক্ষণ এইরূপ করিবে। সম্যক বমন হইলে ক্ষুধাতুর হইয়া জলপাত্রে বেড়াইতে থাকে। কিন্তু সম্যক বমন না হইলে কোন চেষ্টা করে না। এক্ষণস্থলে পুনরায় চুঁচিয়া বমন করাইবে। এক্ষণে বমন না করিলে জলৌকার ইন্দ্রমদ নামে একপ্রকার অসাধ্য ব্যাধি হয়। সম্যক বমন করাইবার পর জলৌকাকে পূর্ববৎ জলপূর্ণ ঘটে রাখিয়া দিবে।

দষ্টস্থানে দূষিত রক্ত আর আছে কি না বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে মধুলেপন ও শীতল জল সেচন করিবে। অথবা সেই ত্রণের উপর কষার, মধুর রস ও শুভযুক্ত শীতল আলেপন প্রলেপ দিয়া রাখিয়া রাখিবে।

জলৌন, (জলাউন) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের

শালনাধীন একটা জেলা। ইহার উত্তরপূর্বসীমা যমুনা নদী, পশ্চিমে গোয়ালিয়ার ও দতিয়ারাজ্য। দক্ষিণে সম্ভার রাজ্য ও বেত্রবতী নদী এবং পূর্বে বাণনি রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ৪৬' হইতে ২৬° ২৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯' হইতে ৭৯° ৫৬' পূঃ। এই স্থান ঝাঁসিবিভাগের উত্তরাংশ মধ্যে গণ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৬৯ বর্গমাইল।

এই স্থান যুনেলখণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। প্রায় ইহার চারিদিকেই যমুনা, বেত্রবতী ও পহুজননী বেষ্টিত। ইহার মধ্য ভূভাগ এক সমরে উর্বরা কৃষিক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল, এখন পরিত্যক্ত এবং প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণাংশে সামান্ত চাষবাস হয়। সীমান্তবর্তীস্থান অনেকটা উর্বরা। ভূভাগের মধ্যস্থানে সোমনামে একটা নদী আছে, তাহার স্রোত নাই, যত গিরিদ্বারী জল আসিয়া তাহাতে পতিত হয়। এক সময়ে এখানকার বনে উত্তম কাষ্ঠ পাওয়া যাইত, এখন কেবল রামপুর ও গোপালপুর-রাজের রক্ষিত বনভূমি ব্যতীত আর কোথাও কাষ্ঠ মিলে না। সেই জন্ত এখানে সকলেই কাষ্ঠের অভাব অনুভব করে।

জলৌনের প্রাকৃতিক দৃশ্য তেমন ভাল না হইলেও স্থানে স্থানে অতি উর্বরাক্ষেত্র আছে, যদি উপযুক্ত লোকের তদ্ব্যবধানে থাকে, তবে এখানে যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানকার লোকদিগের অবস্থা তেমন ভাল নয়, কেহ তেমন ভূসম্পদে যত্নও লয় না। মধ্যে এই জেলার অবস্থা অতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকসংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। আজ বিশ বর্ষ হইতে আবার লোকসংখ্যা প্রায় শতকরা ৩ জন করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে প্রায় সচরা লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কুর্মিজাতির সংখ্যাই অধিক।

এখানকার কচ্ছবাহ রাজপুতরাই প্রধান। এক সময়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ শৌর্য্যে বীৰ্য্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহীর সময় এখানকার কচ্ছবাহেরা লুটপাট আরম্ভ করেন, পরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। এখানে হিন্দীভাষা প্রচলিত, কেবল মুসলমান-গ্রামে অল্প উর্দু প্রচলিত।

এখানে ছোলা, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, তিল, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। এখান হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার কার্পাস রপ্তানী হয়।

এখানে আল নামক লতার চাষ সর্বত্র, এই জেলার অন্তর্গত কুঁচ, কান্দি, সৈয়দনগর ও কোতরা নামক স্থানে ঐ আলের সঙ্গে কাপড় ছোপাইবার বিস্তৃত কারবার আছে।

এখানকার কোন কোন স্থানে কুপ হইতেই জলসরবরাহ হয়। জেলার দক্ষিণাংশে জলসরবরাহের জন্ত পটু নামে একটি খাল আছে। মধ্যে মধ্যে কঁাস কুপ জমিয়া এখানকার ক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট করে। এখানকার কৃষক ও জমিদার সকলেই প্রায় ঋণগ্রস্ত।

ইতিহাস। আৰ্য্যদিগের আগমনের পূর্বে জলৌন জীল প্রভৃতি জাতির বসতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রাচীন ইতিহাস অতি অস্পষ্ট ও মানাবিধ অলৌকিক উপাখ্যানপূর্ণ। খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত নাগবংশীয়দিগের রাজত্ব সময়ে ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়। নাগবংশধ্বংসের বহুশতাব্দীর পরে এইস্থানের পূর্বভাগ চন্দেলগণ এবং পশ্চিমভাগ কঙ্কবাহ নামক রাজপুত্রদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বুলেলা রাজগণ এই স্থান অধিকার করেন।

১১৯৬ খৃঃ অব্দে মুসলমান-সেনাপতি কুতবউদ্দীন দাক্ষিণাত্য-প্রবেশের দ্বার স্বরূপ যমুনাতীরস্থ সুদৃঢ় কামিহুর্গ অধিকার করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুলেলাগণ পুনর্বার ইহাতে অবতরণ করিয়া জলৌনের অনেক স্থানে আসিয়া বাস করে। তাহার কামিহুর্গও অধিকার করে। কিন্তু তাহা পুনরায় মোগল সম্রাটের হস্তগত হয়। অবশেষে বুলেলাগণের মহাবীর ছত্রশাল নৃপতি জলৌন সহ সমগ্র বুলেলাখণ্ডে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন।

১৭৩৪ খৃঃ অব্দে ছত্রশাল তাঁহার রাজ্যের ৬ অংশ মহারাষ্ট্রদিগকে সন্ধিসূত্রে অর্পণ করিয়া পরলোকগত হন। মহারাষ্ট্রগণ কামিতে আড্ডা করিয়া ক্রমে সমস্ত বুলেলাখণ্ড অধিকার করে। তাহাদিগের অধীনে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অরাজকতা প্রবল হইয়া ছিল। বেতবার দক্ষিণস্থ পর্বত-শিখর সকলে দস্যুসর্দারগণ দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রান্তরে অবতরণ করিয়া প্রজাদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। এইরূপে অধিবাসিগণ দরিদ্র ও অনেক গ্রাম জনমানবশূন্য হইয়া যায়। আজও ইহার পরিচয় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। ১৮০২ খৃঃ অব্দে, বেসিন সন্ধির পর ইংরাজেরা পেশবার নিকট হইতে অস্ত্রাশ্রয়স্থানের সহিত কামি প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগকে সাহায্য দানে প্রস্তুত হওয়ার তাহার কামি প্রভৃতি কয়েকটি স্থান রাজা হিন্দতরাওকে দান করেন। কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দে হিন্দতরাও গতানু হইলে অবশিষ্ট জলৌনের অধীশ্বর নানা গোবিন্দরাওকে কামি পরগণা দান করেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে গোবিন্দরাও কতিপয় গ্রামের পরিবর্তে কামি দুর্গ ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন।

জলৌনের অবশিষ্টাংশ গোবিন্দরাও ও তৎপরে তাহার পুত্রের অধিকারে থাকে। কিন্তু ১৮৪০ খৃঃ অব্দে তাহার বংশ লোপ পাইলে সমগ্র জলৌন ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হয়। ক্রমে পার্শ্ববর্তী আরও কএকটি ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার অন্তর্গত হয়। তৎপরে জলৌনের কতক অংশ হামিরপুর, বীসি প্রভৃতি জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে বর্তমান সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দরাও ও তাহার বংশীয়দিগের রাজত্বকালে জলৌনের অধিবাসিগণ অতিশয় দরিদ্র ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় জলৌন পুনরায় বিদ্রোহী দ্বারা দ্বিগুণ ভিন্ন হইয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহ শান্তি হইলে ইহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। তদবধি ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজ গবর্নমেন্ট করসংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ অস্বকুল, তাহাতে শীঘ্রই ইহা ধনধান্য ও জনমানবে পূর্ণ হইবে আশা করা যায়।

জল্প (পুং) জল্প-ভাবে ঘণ্টা। কথন। “ইতি প্রিয়াং বস্তু বিচিত্রজয়ৈঃ” (ভাগ* ১।৭।১৮) আর্ষপ্রয়োগ স্থলে ক্রীতিলিপ্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। “তুক্রীশ্বব ন তে জল্পমিদং কাৰ্য্যং কথঞ্চন।” (ভারত ১।১১৯ অঃ)

ষোড়শ পদার্থবাদী গোতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে জল্প একটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মতে জল্প বিজিগীষু ব্যক্তির পরমত নিরাকরণ পূর্বক স্বমত্তের অবস্থাপক বাক্যবিশেষ। বিজিগীষু ব্যক্তি, বিবাদাদি স্থলে যে বাক্যের দ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়া নিজের মত সংস্থাপন করেন।

“যথোক্তোপপন্নজল্পজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্বঃ জল্পঃ” (গোতমমত্ৰ ১।৪৩) [বাদ দেখ।]

জল্পক (ত্রি) জল্প-স্বার্থে কন্। যে অনেক বকে, যে বৃথা অনেক কথা বলে, বাচাল।

জল্পন (ক্রী) জল্প ভাবে লুট। কথন, উক্তি, অনেক বকা, অনর্থক অনেক কথা কহা, বাচালতা, প্রস্তাব স্থচনা।

“কিং মিথ্যা শতজল্পনেন সত্যতং রে বক্তৃ রামং বদ।” (উদ্ভট)
জম্মাইগুড়ী, ১ রাজসাহী কোচবেহার বিভাগের উত্তরপূর্ব ভাগে অবস্থিত বাঙ্গালার ছোট্টাটের শাসনাধীন একটি জেলা। ইহার উত্তরে ভূটান এবং দক্ষিণে রঙ্গপুর জেলা ও কোচবেহার রাজ্য। পরিমাণ ফল ২৮৮৪ বর্গমাইল। জম্মাইগুড়ী নগরে বিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ নগরে একটি সেনানিবাস আছে।

প্রাকৃতিক অবস্থাতেই এবং বিচার-কার্য্যের সুবিধায় জন্ত এই জেলা দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগ পূর্বে রঙ্গপুরের অন্তর্গত ছিল। উত্তরভাগ ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ভূটান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের

ভূমি অনেকাংশে পার্শ্ববর্তী রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের ভূলা বহুদূরবিস্তৃত সমতল ধাতুক্ষেত্র, তাহার মধ্যে মধ্যে বাঁশ, তাল, আম, জাম ও অল্প ফলভরুর উদ্ভান-পরিবেষ্টিত জোতদারদিগের গৃহাবলী সর্বত্র দৃষ্ট হয়। পতিত জমির মধ্যে প্রায় ৫০৬০ বর্গমাইল বিস্তৃত বৈকুণ্ঠপুরের রায়-কতদিগের একটি শালবন আছে। উত্তরভাগের নাম পশ্চিমঘাট, ইহার বিস্তার প্রায় ২২ মাইল। উহা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত। ইহার ভূমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অসংখ্য পার্শ্বত্যা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং স্থানে স্থানে বিশেষতঃ নদীতীরে শাল ও তৃণশৃঙ্গাদির নিবিড় জঙ্গল দৃষ্ট হয়। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক সিমুল বৃক্ষ জন্মে। ইহা ভিন্ন এই সকল জঙ্গলে অল্প বৃক্ষ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে গ্রাম সকলের চতুর্দিকে অপরিখ্যাপ্ত বংশ, তাল, গুবাক, আম, জাম প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এই গ্রাম সকলের সংখ্যাও অত্যন্ত এবং পরস্পর বহু দূরে অবস্থিত। গ্রামের চতুর্দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ধাতু ও সর্বপক্ষেত্র আছে। জেলার উত্তরভাগে সিঞ্চলা পর্বতস্থ বজ্রা-সেনানিবাসের নিকটস্থ ভূমি পর্বতময়।

নদী সকলের মধ্যে মহানন্দা, করতোয়া, তিস্তা, জলধাক্ষা, ছুছা, মুজনাই, তোর্সা, কালজানি, রায়চক এবং সঙ্কাস প্রধান। এই সকল নদীতে বহুদূর পর্য্যন্ত ৭০৮০ মণ বোঝাই লইয়া নৌকা সকল যাতায়াত করে। পর্বত হইতে অবতরণ-কালে ইহাদের গতি প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

পশ্চিমঘাট উপবিভাগে গবর্নেন্ট-রক্ষিত ৪২৮৬ বর্গমাইল জঙ্গল আছে। জল্লাইগুড়ী উপবিভাগের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হইতে বহুপরিমাণে শাল, কড়িকাঠ প্রভৃতি তিস্তানদীর স্রোতে ভাসাইয়া বহু দূরে নীত হয়। তৃণাদি অপরিখ্যাপ্ত থাকায় নানা স্থান হইতে গো, মহিষ, মেঘাদি প্রভি বৎসর এখানে চরাইতে আনা হয়। অরণ্যে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরঙ্গু, বরাহ, মৃগ, শশক, সজারু, শৃগাল ও বানরাদি দৃষ্ট হয়।

এখানকার অধিবাসিগণ সঙ্কট চিত্ত এবং সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল। খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ। এখনও বহুবিস্তৃত উর্বরা ভূমি অতি অল্প করে আবাদ করিতে পাওয়া যায়।

ধাতুই প্রধান উৎপন্ন শস্ত। সমগ্র শতের শতকরা প্রায় ৬০ হইতে ৭৫ অংশ কেবল আমন ধাতু, অবশিষ্ট আশুধাতু, গোধূম ও ঘব। সর্বপ, তুলা, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে নানাস্থানে উৎপন্ন হয়।

এখানে চা উত্তমরূপ আবাদ হইতেছে এবং রাস্তা ঘাটের সুব্যবস্থা হওয়ায় দিন দিন বহুসংখ্যক ইংরাজ চা-কর তথায় চা-বাগান নির্মাণ করিয়াছেন।

আলাম অপেক্ষা এখানে চা আবাদের সুবিধা অধিক। কারণ এখানকার জলবায়ু উত্তম এবং অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বলিয়া ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কুলি মজুরগণ আপ-নারাই দলে দলে এখানে আসিয়া কাজ করে। আলামের চা-করদিগের জায় জল্লাইগুড়ীর চা-করদিগকে বহু অর্থব্যয় অথবা ডিপো, আড়কাটা প্রভৃতি দ্বারা কুলি সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরুষেরা দেশীয় ও বিলাতী ধুতি চাদর ব্যবহার করে। কিন্তু রমণীরা বিলাতী কাপড়ে তত ভক্ত নহে। তাহারা দেশ-জাত পুরু ৩৪ হাত লম্বা আড়াই হাত প্রশস্ত একপ্রকার রঙ্গিন কাপড় বুক জড়াইয়া পরিধান করে।

অধিবাসিগণ বিশেষ কোন শিল্পাদিতে পারদর্শী নহে। সম্প্রতি রাস্তা ও ভূটান প্রান্তে কএকটি মেলা স্থাপিত হওয়ায় ইহার বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। শণ, পাট, তামাক, কড়িকাঠ, চা ও কিয়ৎ পরিমাণে তুলা রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে বস্ত্র, লবণ ও গুবাক প্রধান। তিস্তানদীর তীরবর্তী বোরানগর তামাক ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা। তথা হইতে নদী দিয়া ইহা সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। জল্লাইগুড়ী নগরও তিস্তানদীর খানিক উপরে অবস্থিত। কেবল বর্ষা ভিন্ন অল্প সময়ে নদীতে নৌকা চলে না। করতোয়া নদী দিয়াও কতক কতক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। দেবীগঞ্জ নগর ঐ নদীর তীরে অবস্থিত, তথা হইতে বহু পরিমাণে কড়িকাঠ স্রোতে ভাসাইয়া দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে আনীত হয়।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। হলদিবাড়ী, জল্লাইগুড়ী, শিকারপুর ও শিলিগুড়ি এই কয়টি প্রধান ষ্টেশন। শিলিগুড়ি ষ্টেশন হইতে দার্জিলিং হিমালয়েন্ রেলওয়ে নামে একটি শাখা বাহির হইয়া দার্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। জল্লাইগুড়ী উপবিভাগে পাকা রাস্তার বন্দোবস্ত ভাল।

এই জেলায় বিভাগিকার সুব্যবস্থা নাই। অধিবাসিগণ ইত্যন্ত নিজ নিজ পরিবারবর্গের সহিত নির্জন স্থানে বাস করে। গ্রামের সংখ্যা অতি বিরল। ইহাও শিক্ষা বিস্তার না হওয়ার একটি কারণ।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত এই জেলা দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত। শাস্তিরক্ষার নিমিত্ত এখানে ৮টি থানা আছে। ৩টি জজ ও ৬ জন বেতনভোগী মাজিষ্ট্রেট থাকেন। কেবল-মাত্র জল্লাইগুড়ী নগরে মিউনিসিপাল আফিস আছে।

জেলার দক্ষিণ অংশের অর্থাৎ জল্লাইগুড়ী নগরের নিকটস্থ প্রদেশের জলবায়ু অনেকাংশ উত্তর বঙ্গের অন্যান্য স্থানের জায়

কেবলমাত্র এখানে বৃষ্টি-পরিমাণ অধিক ও শীতকালে প্রায় প্রত্যহ কুয়াটিকা হয়। সচরাচর পূর্বাধিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ হইতে ১২ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৬.১ ইঞ্চি। গড় তাপ ৭৬° ডিগ্রি। উত্তরভাগে পশ্চিমঘাট প্রদেশে জলবায়ু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তথায় গ্রীষ্ম ঋতু নাই। বার্ষিক বৃষ্টিপরিমাণ গড় ২১৯.২৮ ইঞ্চি। গড় তাপাংশ ৭৪° ফা°।

ম্যালেরিয়া, প্রীহা, বকুণ্ড ও উদরাময় রোগ প্রধান। পার্শ্বত্যা প্রদেশে গলগণ্ড রোগ প্রবল। বক্সার সেনানিবাসের দেশীয় সৈন্তগণ সর্বদা শীতাদ রোগে আক্রান্ত হয়। দীর্ঘব্যাপী বর্ষাকালে টাটকা ফল মূল্যাদি না পাওয়াতেই অনেকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। সম্প্রতি ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

জন্মাইগুড়ী জেলার সকল স্থানে এখনও লবণের ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। সকলেই প্রায় একপ্রকার ক্ষারের জল ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহার দেশীয় নাম ছেকা।

ইতিহাস। জন্মাইগুড়ীর প্রাচীনতম ইতিহাস বেশী কিছুই জানা যায় না। কালিকাপুরাণ পাঠে জানা যায়, এই স্থান পূর্বকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানকার জন্নীশ নামক মহাদেবের বিবরণ কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে।

(কালিকাপুঃ ৭৭ অঃ)

জন্মাইগুড়ী নাম কেন হইল, তাহাও জানা যায় না, তবে জন্নীশ অধিষ্ঠাত্রী দেবরূপে এখানকার প্রাচীনতম শিবলিঙ্গ জন্নীশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। [জন্নীশ দেখ।]

সম্ভবতঃ এই স্থান ভগদত্তবংশীয় প্রাগজ্যোতিষ-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দেও আমরা ভগদত্ত-বংশীয় কুমাররাজ ভাস্করবর্মাকে দেখিতে পাই। তৎপরে কে এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় নাই। বোধ হয়, পরবর্তী কামরূপ বা গোড়ের রাজগণ জন্মাইগুড়ী শাসন করিতেন। কিন্তু পূর্বে এখানে কেবল অসভ্য লোকেরাই বাস করিত, মধ্যে মধ্যে জন্নীশ মহাদেব-দর্শনার্থ অন্ন সংখ্যক উচ্চজাতির হিন্দু আগমন করিত।

কাহারও মতে, পূর্বে এখানে পৃথীরায় নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। অসভ্য কীচক জাতি আসিয়া তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করে। রাজা অসভ্য হস্তে নিগ্রহ ভোগ অপেক্ষা মৃত্যু প্রেরণ ভাবিয়া রাজ-প্রাসাদ মধ্যস্থ একটা দীর্ঘিকায়া খাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এখন সেই রাজধানী কতকটা বোদা ও কতকটা বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অন্তর্গত। এখন চারিটা পরিখা ও চারিটা প্রাচীরের নিদর্শন মাত্র আছে।

প্রথম পরিখার প্রাচীর দৃষ্টিকোণে নির্মিত ও উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ গজ ও প্রস্থ প্রায় ৪০০ গজ। স্থানে স্থানে তন্ন ইষ্টক রাশিও দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে। অনেকে ঐ সকল ইষ্টক-রাশি দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন।

এ ছাড়া সন্ন্যাসীকাটা নামক ভানুকের মধ্যেও কএকটা তন্ন মন্দির আছে। এই মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে বর্তমান রায়কতবংশের আদিপুরুষ শিবদেব বা শিবকুমার এখানে একটা ছুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ছুর্গের ভিত্তি খুঁড়িবার সময় ভূগর্ভে একজন সন্ন্যাসী দেখা যায়। সন্ন্যাসী সমাধিস্থ ছিলেন। খননকারীরা না জানিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্র দ্বারা অনেক আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হইবার পর সন্ন্যাসী তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া তাঁহাকে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে বলেন। সকলে তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিল। শিবদেব সেইখানে একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। সেই সন্ন্যাসী হইতে সেই অঞ্চলের সন্ন্যাসীকাটা নাম হইয়াছে।

কোচবিহারের প্রকৃত ইতিহাসের সহিত জন্মাইগুড়ীর প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ।

বর্তমান কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ বিণ্ডুসিংহের শিশু নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। [কোচবিহার দেখ।] বিণ্ডুসিংহ কামরূপ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শিশু তাঁহার শিরোদেশে রাজচ্ছত্র ধারণ করেন এবং “রায়কত” উপাধি প্রাপ্ত হন। এই শিশুসিংহই বর্তমান জন্মাইগুড়ীর রাজবংশের আদিপুরুষ। শিশু বিণ্ডুর মন্ত্রী ও প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষের কর্তৃক করিতেন। তৎকালে এই শিশুর বাহুবলেই কামরূপরাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ভূটানের দেবরাজকে পরাজয় করিয়া গোড়রাজ্য জয় করিতে আসেন। গোড় রাজধানী আক্রমণ করিতে না পারিলেও এই সময় রঙ্গপুর ও জন্মাইগুড়ী জেলার অধিকাংশ কামরূপরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বিণ্ডুসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঐ সকল নবাবিকৃত স্থান প্রদান করেন। শিশু বর্তমান জন্মাইগুড়ীর অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। সেই বৈকুণ্ঠপুর হইতে বৈকুণ্ঠপুর পরগণার নাম হইয়াছে। বহুদিন পূর্বত জন্মাইগুড়ীর রাজা বৈকুণ্ঠপুরের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শিবদেব বৈকুণ্ঠপুরের রাজা বা রায়কত বলিয়া খ্যাতি-

১. রায়কত নামক কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত ও ইহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ সংস্কৃত ‘রায়কুট’ শব্দের অপভ্রংশে রায়কত হইয়াছে।

লাভ করেন নাই, তিনি কোচরাজের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি বলিয়াই গণ্য ছিলেন।

শিশুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মনোহরদেব রায়কত হন। মনোহরদেবের পর তৎপুত্র মাণিক্যদেব, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শিবদেব রায়কত পদ লাভ করেন। উক্ত মাণিক্যদেবের তিন পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ শিবদেব, মধ্যম মহীদেব ও কনিষ্ঠের নাম মাকতিদেব।

শিবদেব কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং বাধ্য হইয়া মোগলের অধীন হইয়া পড়েন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরাধিপ শিবদেব মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রত্নদেবের রায়কত হইবার কথা। কিন্তু মহীদেব ভ্রাতৃপুত্রকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করেন।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে বীরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক সময়ে কুলপ্রথা মত মহীদেব কোচ-রাজসভায় আগমন করেন। মহীদেবের পূর্ববর্তী সকল রায়কতই কোচরাজের অতিবেককালে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহীদেব কোচরাজকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া ছত্রধারণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় হইতেই রায়কত কর্তৃক ছত্রধারণ প্রথা রহিত হয়। মোদনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছিল, মহীদেব তন্নিবারণেও অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

মহীদেব ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ৪৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ ভুজদেব ও কনিষ্ঠ যজ্ঞদেব।

পিতার মৃত্যুর পর ভুজদেব রায়কত হইলেন। তিনি কনিষ্ঠকে অতিশয় ভালবাসিতেন, অতি সামান্য কার্যও কনিষ্ঠের পরামর্শ না লইয়া করিতেন না। তাঁহার সময়ে ভূটানের দেবরাজ কোচবেহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুজদেব কোচবেহার ভূটান-সৈন্য পরাস্ত এবং বহুদেবনারায়ণকে কোচবিহারের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

ভুজদেব নিজ রাজ্যের উন্নতিকল্পেও বিশেষ যত্ন লইয়া ছিলেন। পূর্বে তাঁহার পিতৃরাজ্যে কোন নির্দিষ্ট সৈন্যদল ছিল না, কেবল রাজবাটীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতি অল্প লোক নিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধকালে মুসলমান ও পার্শ্ববর্তী অসন্তোষিতদিগকে সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু ভুজদেব এক দল বেতনভোগী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন ও তাঁহাদের রীতি-

মত যুদ্ধশিক্ষা দিতে লাগিলেন। কোচরাজ বহুদেবনারায়ণ ভূটানীদের ভয়ে রাজ্য হাড়িয়া পলায়ন করিলে ভুজদেব ভ্রাতার সহিত আসিয়া ভূটানীদিগকে পরাস্ত ও মহেন্দ্রনারায়ণকে কোচ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

কোচবিহার হইতে ফিরিয়া আসিবার অল্প দিন পরেই যজ্ঞদেবের মৃত্যু হয়। প্রিয়তম সহোদরের মৃত্যুতে ভুজদেব অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পীড়িত থাকিয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ই রায়কত বংশের চরম উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই মোগলদিগের অত্যাচারে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য করদ হইয়া পড়িল।

ভুজদেবের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার পর যজ্ঞদেবের দুই পুত্র বিগুদেব ও ধর্মদেব যথাক্রমে রায়কতপদ লাভ করেন।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বিগুদেব রায়কত হন। ইহারই অল্প দিন পরে ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ বৈকুণ্ঠপুরের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করেন। বিগুদেব বিলাসী ও ভীক ছিলেন, তিনি যুদ্ধ না করিয়াই কর দিতে সম্মত হইলেন। অল্প দিন পরেই ভূটানরাজও মোগলের আক্রমণে ভীত হইয়া বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহাররাজের সহিত পূর্বশত্রুতা তুলিয়া যোগদান করেন। এই তিন জনে মিলিত হইয়া মোগলের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মোগলেরা বিপক্ষ সৈন্য বিনাশ করিয়া একস্থানে তাহাদের ছিন্নশির বাঁশে ঝুলাইয়া রাখে, এখন সেই স্থান “মুণ্ডমালা” নামে খ্যাত। যেখানে বিস্তর মোগলসৈন্য নিহত হয়, সেই সেই স্থান এখন “তুর্ককাটা” ও “মোগলকাটা” নামে খ্যাত। কিন্তু সেই যুদ্ধে রায়কতের বহুসৈন্য ক্ষয় হওয়ায় তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে মোগলেরা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ দখল করে।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে শিশুদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বালক মুকুলদেব রাজ্যাভিষিক্ত হন, কিন্তু, ধর্মদেব চক্রান্ত করিয়া ভ্রাতৃপুত্রের প্রাণনাশপূর্বক রাজ্য অধিকার করিলেন এবং রায়কত হইলেন।

ধর্মদেবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা আরও অত্যাচার আরম্ভ করিল। বৈকুণ্ঠপুরের দক্ষিণাংশ ঐ সময়ে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। ধর্মদেব ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জবরদস্ত খাঁর সহিত এক সন্ধি করিলেন এবং মোগলাধিকৃত সমুদয় ভূভাগের জন্ত কর দিতে সম্মত হইলেন। ১৭২৪ খৃঃ অব্দে ধর্মদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপদেব রায়কত হইলেন। তাঁহার সহিত অল্প দিন পরেই ভূটানের দেবরাজের বিবাদ বাঁধিল।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভূপদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্রেরই রায়কত হইবার কথা, কিন্তু পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার জন্ম হইরাছিল বলিয়া রাজপরিবারগণ ভূপদেবের মধ্যম সহোদর বিক্রমদেবকে রায়কত করিলেন। ইহার সময়েও ভূটিয়ায় অনেক স্থান অধিকার করে ও অত্যাচার করিতে থাকে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এক পুত্র রাখিয়া বিক্রমদেব প্রাণত্যাগ করেন। ইহার সহিত রায়কতগণের স্বাধীনতা লোপ হয়। পূর্ববর্তী রায়কতগণ নামে মাত্র মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীখরের নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর বৈকুণ্ঠপুরের রাজগণও ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের প্রকৃত অধীন হইলেন।

বিক্রমদেবের পর তাঁহার কনিষ্ঠ দর্পদেব রায়কত হইলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের উত্তরাংশে দেবরাজ ও দক্ষিণাংশে মহম্মদ আলী আক্রমণ করেন। রাজ্যরক্ষার জন্ত দর্পদেব অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে মুসলমান হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। শেষে অধিক করদানে স্বীকৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহার পরই তিনি সৈন্তসংস্থারে প্রবৃত্ত হন, দেবরাজ ও তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া পূর্বাধিকৃত কএকটা স্থান ছাড়িয়া দেন। প্রবাদ এইরূপ, দেবরাজ এই দর্পদেবের সাহায্য পাইয়া কোচবিহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের নাজিরদেব, দেবরাজ ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থলে আবদ্ধ হন, তদনুসারে দেবরাজ কোচবিহার ছাড়িয়া দেন, কিন্তু দর্পদেব রায়কত সেই সমস্ত গোলযোগের মূল কারণ বলিয়া এখন হইতে তিনি কেবল জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেন। কোচবিহারের রাজকাৰ্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। সন্ধির পরই দেবরাজের সহিত দর্পদেবের বিবাদ বাঁধে, দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বৈকুণ্ঠপুরের অনেক স্থান তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে দর্পদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অল্প দিন পরেই যুদ্ধ করিয়া ভূটিয়াদের হস্ত হইতে অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। দেবরাজ বড় লাটকে সেই সকল কথা জানাইলেন। দেবরাজকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ত দেবরাজ যে যে স্থান দাবী করিলেন, ইংরাজ-অধ্যক্ষ সেই সকল স্থান তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেক অভিযোগের পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ আবার আইনকাল কাটা ও জম্মেশ অধিকার পাইলেন। এইরূপে বিহ্বত বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িতন হইয়া পড়িল। এই সময় রায়কতের দেয় ২৮৩৩৪।। টাকা রাজস্ব

বার্ষিক হয়, কিন্তু দেবরাজকে কতক স্থান প্রদান করার পরবর্ষে রাজস্ব কমিয়া ১৮৮৮০৫০ আনা নির্ধারিত হয়। পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৮০০১১ হির হয়, কিন্তু পরবর্ষে তাহা হইতেও ৩২৩৯ টাকা কমাইয়া দেওয়া হইল। পরে গবর্নেন্ট আবার ৬২৩৮ টাকা বৃদ্ধি করেন, কিন্তু এই রাজস্ব কেন বৃদ্ধি হইল, তাহার এ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

দর্পদেব যে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক গোলযোগে ব্যস্ত ছিলেন, কেবল তাহাই নহে। তৎপূর্বে এখানে কামরূপী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। দর্পদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে কএকজন পাণ্ডা ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিজ রাজ্যে ভূমিদান করিয়া বাস করাইয়াছিলেন, যে গ্রামে তাঁহার বাস করেন, এখন সেইস্থান “পাণ্ডাপাড়া” নামে খ্যাত। উক্ত পাণ্ডাদের বংশধরগণ আজিও এখানে বাস করিতেছেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দর্পদেবের মৃত্যু হয়। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্তদেব রায়কত হইলেন। জয়ন্ত বড়ই নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন, অধিকাংশ সময় দেবপূজায় অতিবাহিত করিতেন। এই সময় দেবরাজ অম্মায়াসে পাঠাকাঠা প্রভৃতি কতকগুলি স্থান অধিকার করেন। জয়ন্তদেব তাহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। পূর্বে বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানেই রাজধানী ছিল, জয়ন্তদেব ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান জম্মাইগুড়ী নগরে রাজধানী নির্মাণ করিলেন। এই রাজবাটীর পশ্চিম দিকে করলা নদী, পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ পরিখাবেষ্টিত, পরিখার উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় করলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, রাজধানী দেখিলেই বেশ সুরক্ষিত বলিয়া বোধ হয়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তদেবের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র সর্কদেবের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র।

সুতরাং জয়ন্তের ভ্রাতা প্রতাপদেবই রাজকাৰ্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনশৃঙ্খলে ইংরাজরাজও সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃপুত্রকে বিনাশ করিয়া নিরাপদে রাজ্যভোগলিপ্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। নিজ অতীত সিদ্ধি মানসে এক চণ্ডীপূজা আরম্ভ করেন। ইচ্ছা ছিল, সেই দেবীর সম্মুখে ভ্রাতৃপুত্রকে বলি দিবেন, কিন্তু তাঁহার হরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ধাত্রী কুমার সর্কদেবকে গুপ্তভাবে রজপুরে আনিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট সকল কথা জানাইল। কালেক্টার সাহেব অবিলম্বে প্রতাপদেবকে হাজির হইতে আদেশ দিলেন। ধৃত প্রতাপ কালেক্টার সাহেবের নিকট আসিয়া সকল দোষ তাঁহার দেওয়ান রামানন্দ শর্মা'র দ্বারা চাপাইলেন। রামানন্দ বন্দী হইলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে সর্কদেব বয়োপ্রাপ্ত হইয়া রায়কত পদ-লাভ করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই প্রতাপদেব রায়কত হইবার জন্ত সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিন্তু অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই। সর্কদেব বুদ্ধিমান ও অতি চতুর ছিলেন। তিনি রায়কত হইয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশই দেবরাজ হস্তগত করিয়াছেন। সে সমুদয় উদ্ধার করা চাই। এই ভাবিয়া অনেক সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এক বর্ষ মধ্যেই তিনি দেবরাজের অধিকৃত অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। দেবরাজ বৃটিশ গবর্নমেন্টের নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। গবর্নমেন্টের বিনামূল্যে তঁাহাদের মিত্ররাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া সর্কদেবের ৭ বর্ষ কারাবাসের দণ্ড হইল। কিন্তু পুনর্বিচারে তিনি ৩ বর্ষের জন্ত দণ্ড পাইলেন। রঙ্গপুরের একটা স্বতন্ত্র বাটীতে এই তিন বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। মুক্তির পর তিনি রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করিয়া সর্কদেবই ধর্মচর্চা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। জয়ন্তদেব জন্মাইগুড়ীতে পরিখাদি খনন করাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সর্কদেবের সময়ই অট্টালিকা, দীর্ঘিকা ও ঠাকুরবাড়ী নির্মিত হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্কদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দশ পুত্র, তন্মধ্যে মকরন্দদেব সর্কজ্যেষ্ঠ। সর্কদেবের মৃত্যুর পর অমাত্যবর্গ চক্রান্ত করিয়া নাবালক রাজেন্দ্রদেবকে রায়কতপদে অভিষিক্ত করেন। সে সময় কুমার মকরন্দদেব মণ্ডলঘাটে চলিয়া আসেন এবং জমিদারী পাইবার অভিলাষে অভিযোগ উপস্থিত করেন। মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রায়কতপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ইচ্ছাপত্র অনুসারে নাবালক চন্দ্রশেখরদেব রায়কত হইলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার শাসনভার কোট অব ওয়ার্ডের অধীন হয় এবং মকরন্দদেব লেখাপড়া শিখিবার জন্ত কলিকাতায় আনীত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাসিতার দোষে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। অল্পদিন পরেই ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার ভ্রাতা বোগীন্দ্রদেব রায়কত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য ভোলা সাহেব ওরফে কণীন্দ্রদেব রাজ্যপ্রাপ্তির জন্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিন্তু প্রথমে তিনি সকল মোকদ্দমায় পরাজিত হন। এই মোকদ্দমার কারণ পূর্বে যে ঋণ ছিল,

বোগীন্দ্রদেবের সময় তাহা আরও বৃদ্ধি হইল। নানা ভাবনার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর ৩ মাস পূর্বে তিনি এক দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জগদীন্দ্র দেব। কিছু দিনের জন্ত তিনিই রায়কত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিবর সন্তোষ ঘটিল না। অল্পকাল পরেই কণীন্দ্রদেব রায়কত পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি দেখা যাইতেছে। ইনি এখনও জীবিত আছেন।

অধিবাসী। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, তৎপরে মুসলমান ও অছাত্র জাতি। হিন্দুর মধ্যে কোচ বা রাজবংশীর সংখ্যাই অধিক। [কোচ ও রাজবংশী দেখ।] অবস্থানসারে, প্রথমে রায়কত ও জমিদারগণ, তৎপরে জোতদার, জোতদারের অধীন চুকানিদার বা মুলানদার।

২ জন্মাইগুড়ী জেলার উপবিভাগ। পরিমাণ ফল ১৪৯৩ বর্গমাইল। ইহাতে জন্মাইগুড়ী, শিলিগুড়ি, বোদা, পাটগ্রাম, মৈনগুড়ি ও কৈরাস্তী এই ৬টা থানা আছে। এখানে কএকটা দেওয়ানী ও ৮টা ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ জন্মাইগুড়ী জেলার সদর ও নগর। এই নগর তিস্তানদীর পশ্চিম তীরে প্রবাহিত। অক্ষা° ২৬° ৩২' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৪৫' ৩৮" পূঃ। পূর্বে এখানে একদল দেশীয় সৈন্য বাস করিত। সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে জন্মাইগুড়ী একটা পৃথক জেলা হইবার পরই এই নগরের সমধিক ক্রীড়াজি হইয়াছে। আবার নর্দারগ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে এই নগর দিয়া যাওয়ার দিন দিন ইহার অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে একটা মিউনিসিপালিটি আছে।

জন্মাক (ত্রি) জন্মতি জন্ম-যাকন্। (জন্মতি কুটুপুটুঃ যাকন্। পা। ৩২। ১৫৫) বহু কুৎসিতভাবী। -পর্যায়—বাচাল, বাচাট, বহুগর্হাভাক্। (অমর ৩। ১৩৬) ক্রীলঙ্গে ভীষু।

“জন্মাকীভিঃ সহাসীনঃ ক্রীতিঃ প্রজবিনা হুয়া।” (ভট্ট ৭। ১৯)

জন্মিত (ত্রি) জন্ম-ক্ত। উক্ত, কথিত। “মিথাজন্মিতমেতৎ।”

(পঞ্চতঃ)

জন্মীশ, কালিকাপুরাণ-বর্ণিত বিখ্যাত শিবলিঙ্গ। [জন্মেশ দেখ।] জন্মেশ, জন্মাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত পশ্চিমদ্বারস্থ একটা নগর। অক্ষা° ২৬° ৩১' উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৫৪' ৩০" পূঃ। জন্মীশ নামক শিবমন্দিরের জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ। কালিকাপুরাণে জন্মীশের উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে—

“কামরূপের বায়ুক্ষেপে মহাদেব জন্মীশ নামে আপনার অতুল লিঙ্গ দেখাইয়া ছিলেন। যেখানে নদী জগৎপতির

পূজা করিয়া জমীন্দার গাণপত্য লাভ করিয়াছিলেন। নজী-
কুণ্ডে স্থান করিয়া নতুন করিবে, তাহার পর দিন জমীন্দার-
দেবের মন্দিরে গমন করিবে। সেখানে হজামতীতে স্থান
করিয়া জমীন্দার দর্শনপূর্বক হবিষ্যাদী হইয়া সেই রাত্রি ঘাপন
করিবে। পর দিন শিবদেবীমণ্ডি সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া
অষ্টমীতে তাহার পূজা ও উপবাস করিবে। সেই দেবী চতু-
র্ভুজা পীনোরতপারোধ্যা, নিম্নরূপ সঙ্গ-আভারী, তাহার
দক্ষিণ বাহুরে কৃতি ও ধর্ম এবং বাম বাহু বৃগলে অস্তর ও
বরহ, মাধার অর্থাৎ, রক্তবর্ণ প্রেতের উপর উপবিষ্ট। পূর্বে
জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি অস্ত্র-সন্তান স্নেহে প্রাপ্ত
হইয়া জমীন্দার শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহার আর্ঘ্য
ভাষা পরিত্যাগ করিয়া স্নেহভাষার কথাবার্তা কহিত ও
জমীন্দার দেবকে গোপন করিয়া রাখে। তাহার জমীন্দার
গণ স্বরূপ। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া জমীন্দার পূজা
করিবে। এই জমীন্দার বরদ ভরহস্ত কুলতুল্য ষেতবর্ণ।
জমীন্দার পীঠ অতি পুণ্যপ্রদ, যে ইহার বিষয় সম্যক জানে,
সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে।” (কালিকা পুঃ ৭৭ অঃ)

জমীন্দার প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হওয়ার, দুইশত বর্ষ
হইল, তাহার উপর বর্তমান ইষ্টক-মন্দির নির্মিত হয়।

শিবরাত্রির দিন এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়, এই মেলা
১০ দিন থাকে, তাহাতে চারি পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত
হয়। এই মেলায় কাপড়, ছাতা, হকা, পিন্ডল, কঁসার বাসন,
কমল প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে।

জলু (পুং) দহ বাহু-পুণ্ডরীকাদিভ্যং সাধুঃ। অধি।

“ন পাশ্রাসো মন্যমহে নাবারসৌ ন জলুহবঃ।” (ঋক্ ৮।৫০।১১)

‘ন জলুহবঃ অনগ্রঃ।’ (সারণ)

জব (পুং) জু-অপ্। বেগ। “জবে যান্তিভূনো অবস্তাব্যবর্তং”

(ঋক্ ১।১২।২১) ‘যান্তিচ জবে বেগে প্রবৃত্তং’ (সারণ)

[বর্গীয় ব যুক্ত জব দেখ।]

জবন (স্ত্রী) জু-ভাবে লুট্। বেগ। [বর্গীয় ব যুক্ত জবন দেখ।]

জবনাল (স্ত্রী) [যবনাল দেখ।]

জবনিকা (স্ত্রী) [যবনিকা দেখ।]

জবনী (স্ত্রী) জুরতে আচ্ছাদ্যে হনরা। জু-করণে লুট্ দ্বিরাং
ভীপু। অগ্ণী, যবনিকা, কানাং। ২ ওমধি ভেদ-। (হেম)
২ যবনজী।

“জবনী নবনীতকোমলাঙ্গী শরনীয়ে যদি নীরন্তে কথঞ্চিৎ।”

(উড়ট) (ত্রি) ৩ বেগলীলা। “ইত্যং দক্ষাঃ ঋতবোধনমুত্তং

শতক্রতুং জবনী নুতানকৃৎ” (ঋক্ ১।৫১।২) ‘জবনো বেগ-

লীলা।’ (সারণ)

জবর আমলা, বাধরগজ জেলার কচুয়া নদীতীরে একটি বৃহৎ
গ্রাম, এখান হইতে ততুল ও ঋত রথানী হয়।

জবস্ (পুং) জু-অপ্। বেগ। “আ জেনন্ত জবসা” (ঋক্
১।১১৮।১১) ‘জবসা বেগেন’ (সারণ)

জবস্ (স্ত্রী) জুরতে তদার্থং প্রাপ্যতে বাহুলক্যং জু-করণি
অল্। বাস। (শকরঃ)

জবহরবাই, রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রত্ন
মেবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রত্নের অকাল মৃত্যুতে
তাহার ভ্রাতা বিক্রমজিৎ ১৫২১ সনতে চিতোরের সিংহাসনে
সমারূঢ় হইয়া নিজ সৈন্য মধ্যে কামান ব্যবহারপ্রথা প্রচলিত
করেন এবং পদাতিক সৈন্যদিগকে সমধিক আদর করিতে
আরম্ভ করিলেন। এই অভিনব ব্যাপারে চিতোরের সামন্ত
ও সর্দারগণ বিক্রমজিতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠি-
লেন। ষষ্ঠরাজ বাহাদুরের পূর্বপুরুষ মজঃকর চিতোরের
পৃথীরাজ কর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। মেবার রাজ্যের
এই অন্তর্বিদ্বেষ দর্শনে বাহাদুর তদীয় চিরলালিত প্রতি-
জ্ঞাধাংসা চরিতার্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

চিতোরপুরী আক্রমণ করিলে সতুপ্রমুখ বীরগণ অকৃত
বীরত্বের সহিত তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাহাদের
বীর্ঘ্যানলে অনেক মুসলমান পতঙ্গবৎ বিনষ্ট হইতে লাগিল।
কিন্তু কিছুতেই কলোদয় হইল না। এই সময়ে রাঠোরকুল-
সম্ভূতা রাজমহিষী জবহরবাই বর্ষ ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত
হইয়া কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে শত্রুসমূহে আসিয়া
রম্প প্রদান করিলেন। তদুহর্ষেই কএকজন বোকা জলবুদ্-
বুদ্ধের ভ্রায় সেই সমস্যাগবে বিলীন হইল। মহিষী স্বদেশ-
রক্ষার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া অগতে চিরস্মরণীয় নাম
রাখিয়া গেলেন।

জবা (স্ত্রী) জবতে রক্তবর্ণঃ গচ্ছতি জু-অচ্-তত্তঃ-ট। স্বনা ম-
খ্যাত রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ, চলিত কথায় জবাকুল। হরিবল্লভ।

[বর্গীয় ব যুক্ত জবা শব্দ দেখ।]

জবান্দি (স্ত্রী) [বর্গীয় ব যুক্ত জবান্দি দেখ।]

জবাধিক (পুং) জবেন বেগেন অধিকঃ। অত্যন্ত বেগশালী
ঘোটক। (অমর ২।৮।৪৫) (ত্রি) অতিশয় বেগযুক্ত।

জবাপুষ্প (স্ত্রী) রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। [জবা দেখ।]

জবাহিরসিংহ, আটবাগীর একজন রাজা। ইহার পিতার
নাম হরবল্লভ জাট। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে তিনেবন্ধ-বালে
(১৭৭৭) হুমায়ুনের মৃত্যুর পর জবাহিরসিংহ ভরতপুর ও
দিল্লের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে
জবাহিরসিংহের গুপ্তহত্যার পর রাও রতনসিংহ সিংহাসনে

আয়োজন করেন। অনেকে সম্মত করেন যে, এই রতনসিংহ তাঁহার জ্ঞাতার প্রাণবধের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

জবাহিরসিংহ, জনৈক শিখ সর্দার। হীরাসিংহের মৃত্যুর পর জবাহিরসিংহ মহারাজ দলীপসিংহের অমাত্যপদে নিযুক্ত হইরাছিলেন, কিন্তু ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোরে সৈন্তগণ কর্তৃক নিহত হন ও রাজা লালসিংহ ইহার পদে নিযুক্ত হন।

জবাহিরসিংহ, মহারাজ, কাশ্মীরের একজন শাসনকর্তা। ইনি ধ্যানসিংহের পুত্র ও মহারাজ গোলাবসিংহের ভ্রাতৃপুত্র। জবাহিরসিংহ, জোহার নামে পরিচিত একজন হিন্দু। জোহার নৈশাপুরের মোল্লা নাতিকের শিষ্য ছিলেন এবং পারস্ত ও উর্দু ভাষার কএকখানি দিবানু লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দেও জীবিত ছিলেন।

জবিন্ (ত্রি) জব অন্ত্যার্থে-ইনি। বেগযুক্ত। (হেম)
“সমকালমিষং ক্ষিপ্তমানীযান্যো জবী নরঃ।” (যাজ্ঞ ২।১১১)
জীলিঙ্গে ভীষ।

“অজবসো জবিনীতি বিবৃশ্চক্স্তো” (ঋক ২।১৫।৩) ‘অজবসো জবহীনাঃ জবিনীতিঃ জবযুক্তাভিঃ’ (সায়ণ)

জবিন্ (পুং) জব বাহ-ইনন্। ১ কোকড় বৃক্ষ। ২ উষ্ট্র। ৩ ঘোটক। (রাজনি°)

জবিলা রামনাগর, একজন হিন্দুশাসনকর্তা, আলাহাবাদে ইহার রাজধানী ছিল। ১৭২০ খৃঃ অব্দে (১১৩২ হিজরা) মহম্মদ শাহের শাসনের প্রারম্ভে জবিলা রামনাগর প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র গিরিধর অযোধ্যার শাসনকর্ত্যপদে নিযুক্ত হন, কিন্তু ১৭২৪ খৃঃ অব্দে (১১৩৬ হিজরা) ইনি মালবের শাসনকর্ত্য পদে এবং বর্হাগ উল্মুলক সাদত খাঁ অযোধ্যার সুবেদারপদে নিযুক্ত হন। ১৭২৯ খৃঃ অব্দে (১১৪২ হি°) মহারাষ্ট্র রাজা সাহ্যর সেনাপতি বাজিরাও মালব আক্রমণ করিলে রাজা গিরিধর পলায়ন প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার জনৈক আত্মীয় রায় বাহাদুর তৎপদে আক্রান্ত হইয়া শত্রুদিগের সহিত প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন; কিন্তু ১৭৩০ খৃঃ অব্দে (১১৪৩ হি°) তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

জবিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন জববান্ জব-ইষ্ঠ। অতিশয় বেগশালী, “অতস্ত মন্যো জববান্ জবিষ্ঠা” (ঋক ৪।২।৩)

জবীয়ল্ (ত্রি) অতিশয়েন জববান্ জব-জীয়ল্ বতোলুৎ। অতিশয় বেগযুক্ত।

“অজবজদেকং মনসো জবীয়ো।” (শুক্রযজু ৪০।৪)

জব্বরখাদ, বিপাশার শাখা চকিনদীর একটি উপনদী। ইহার তীরে হরপুর নগর অবস্থিত।

জব্বলপুর, ১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ৪টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ। এই বিভাগ জব্বলপুরের কমিশনরের অধীন, ইহাতে জব্বলপুর, বাগর, দামো, সিওনি ও মণ্ডলা এই ৫টা জেলা আছে। পরিমাণকল ১৮,৬৮ বর্গমাইল। ইহাতে ১১টা নগর ও ৮৫০১টা গ্রাম এবং তাহাতে ৩৮টা দেওয়ানী ও ২৯টা কোজদারী আদালত আছে। খানার সংখ্যা ৪২, তত্ত্ব ১৩০ টা কাঁড়ী।

২ মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর বিভাগের একটি জেলা। অক্ষা° ২১° ১২' হইতে ২৩° ৫৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪০' হইতে ৮১° ৩৫' পূঃ। ইহার উত্তরে পঞ্জাব ও মৈসর রাজ্য, পূর্বে রেবারাজ্য, দক্ষিণে মণ্ডলা, সিওনি ও নরসিংহপুর জেলা এবং পশ্চিমে দামো জেলা। পরিমাণ কল ৩৯১৮ বর্গমাইল। জব্বলপুর ইহার প্রধান নগর। ঐ নগরেই জেলার প্রধান বিচারালয় ইত্যাদি আছে।

জব্বলপুর জেলার ভূমি প্রায় সমতল। এই অপ্রশস্ত ভূভাগ উভয়দিকে উচ্চ ভূমিধারা অবরুদ্ধ এবং নর্মদানদী-তীরবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একটি শাখার দ্বারা দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্বদিকে বিস্তৃত। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ পলিময়, উহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মে। উত্তরভাগের ভূমি তরঙ্গায়িত ও প্রস্তরময়। জব্বলপুরের মর্ম্মর প্রস্তর সর্বত্র বিখ্যাত জব্বলপুরের নিকট হইতে এইরূপ প্রস্তরের এক পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। গোণ্ডা নামক প্রাচীন নগরের নিকট ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মদন-মহল নামে একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। জব্বলপুরে অল্পমাত্র মৃদ্ধিকা খনন করিলেই জল পাওয়া যায়, এই জল দারুণ গ্রীষ্মকালেও ইহার ভূমি সরস তৃণশুষ্কাদিতে শ্রামল বর্ণ থাকে। এই উর্বর প্রান্তরের উত্তর ও পশ্চিমভাগে ভাঁড়ের ও অল্পচ্চ কাইমুর গিরিমালা এবং দক্ষিণভাগে গোঁড়বন পর্বতের শাখা সকল ইহাকে বেষ্টিত করিয়াছে। নদীসকলের মধ্যে মহানদী নামক শোণের একটি উপনদী, গুরমা, পাটনা, হিরন ও নর্মদা প্রধান। নর্মদা নদী জব্বল-পুরের ৯ মাইল দক্ষিণ দিয়া জেলার মধ্যে প্রায় ৭০ মাইল বিস্তৃত স্থানে প্রবাহিত। জব্বলপুরের দক্ষিণে বিখ্যাত মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড়ে ধুয়ান-ধার নামে ৩০ ফিট নিম্ন নর্মদা নদীর জলপ্রপাত আছে। ঐ প্রপাতের পর প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত নদীর উত্তর তীর ১০০ ফিট উচ্চ চাকচিক্যশালী মর্ম্মর প্রস্তরময়।

জব্বলপুরের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। কএকখানি শিলা-লিপি দৃষ্টে জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই স্থান হৈহয়বংশীয় রাজগণের অধীন ছিল। ১৬শ

শতাব্দীতে গড়মণ্ডলার গৌড়রাজ্য সংগ্রামসা বর্তমান জব্বলপুর প্রভৃতি ৫২টি জেলার আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পোত্রের নাবালক অবস্থায় গৌড়রাজ্য দুর্গাবতীর রাজত্বকালে আসকথা নামে কারা মালিকপুরের শাসনকর্তা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন এবং শিকারগড়ের যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। এই পরাজয়ে লজ্জিত হইয়া তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন। আসকথা প্রথমে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন, পরে দিল্লীর সম্রাট অকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। আইন-ই-অকবরীতে অকবরাধিকৃত দেশ সকলের মধ্যে গড়া মালবের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে সাগরের শাসনকর্তা এই স্থান অধিকার করেন। উদারচরিত প্রজাবংশল ভক্ত বুলন্দ যদিও জব্বলপুর স্বীয় শাসনভুক্ত করেন নাই, তথাপি তাঁহার সময়ে জব্বলপুরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁহার সময়েই পরিশ্রমী লোধি ও কায়স্থগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে পেশবা নাগপুরের ভোন্সলে রাজাদিগকে মণ্ডলা ও নর্মদা প্রদান করেন। তদবধি এই জেলা উদাদিগেরই অধিকৃত থাকে, অবশেষে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ১৯এ ডিসেম্বর ইহা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। ইংরাজ গবর্নমেন্ট ইংলিয়ার রাজা রঘুনাথ রাওকে প্রতিনিধি সুবাদার নিযুক্ত করেন। তৎপরে প্রথমতঃ সাগর ও নর্মদা প্রদেশ নাগপুরের রেসিডেন্টের অধীন জনৈক কমিশনের দ্বারা শাসিত হয়। অবশেষে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে জব্বলপুরে নাগপুরের চিফ কমিশনের অধীন একটি জেলা গঠিত হইল।

দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই জব্বলপুর জাবলপুর নামে উক্ত হইরাছে।

মহারাত্রদিগের সময়ে এখানে নানা কুনিয়ম প্রচলিত ছিল। রঘুনাথরাও সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে ঐ প্রকার কএকটি নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। "উহাতে লিখিত ছিল "বিধবা স্ত্রীলোকগণ পূর্বের স্থায় বিক্রীত ও ঐ মূল্য রাজকোষে নীত হইবে কিনা? কোন ব্যক্তি রাজকর্মচারীদিগের হুকুমত বা মধ্যস্থতা দ্বারা অর্থ পাইলে পূর্বের স্থায় ঐ প্রাপ্ত অর্থের এক চতুর্থাংশ রাজসরকারে দিবে কিনা? কেহ নিজ গৃহ বা কস্তা বিক্রয় করিলে, পূর্বের স্থায় মূল্যের একচতুর্থাংশ রাজাকে দিবে কিনা?" বাহা হউক ইংরাজরাজ ঐ সকল কুপ্রথা শীঘ্র উঠাইয়া দিয়া রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করেন। তদবধি এখানে দিন দিন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে এবং অধিবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে।

এখানে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কার্ব্ব, বেশিয়া, লোধি, কুর্খি, আহীর, চামার, স্বীমার, কাক্রি, তেলী, মেহরা, কোরি, লোহার, নাই, কুমার, গদারিয়া প্রভৃতি জাতি আছে। ভক্তির মূলম্যান, পারসী, বোজ, জৈন, খুটান, য়োশী ও পর্ভুগীজ-উৎপন্ন শকরজাতিও বিস্তর। এখানকার ভাষা বেঘলা নামক এক প্রকার হিন্দী। কিন্তু আদালতে উর্দু ভাষা প্রচলিত। জব্বলপুর জেলায় জব্বলপুর, মুরবারা ও সিহোরা এই তিনটীমাত্র নগর। ঐ তিনটীই নগরেই মিউনিসিপালিটি আছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধাতু, গোধূম, কার্পাস, সর্বপ, লাঙ্গা, তসর ও গোলআলু প্রধান। সম্প্রতি ধাতু চাস হ্রাস হইয়া সর্বপাদির চাস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। জেলার সর্বত্রই জল আছে, কিন্তু বৎসর বৎসর অগ্নিদাহ জন্ত জলশ্রম ক্ষয় কড়িকাঠ জন্মে না। ফলের বাগান বিস্তর আছে।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই জেলার বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করে। অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়া অল্প অল্প আশ্রয় লয়। তৎপরেই আবার দুর্ভিক্ষের আবহুসঙ্গিক মহামারী দ্বারা অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বলা বাহুল্য এই জনপূর্ণ জেলা ঐ সময় যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, মধ্যপ্রদেশের আর কোন জেলাই সেরূপ হয় নাই।

জব্বলপুরনগরই জেলার মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান স্থান। এই নগরে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ে জংসন, স্তুরাং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের জব্বলপুর শাখা আলাহাবাদ হইতে বাহির হইয়া জব্বলপুর গিয়াছে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ে জব্বলপুর হইতে কাঁসিঘাটের নিকট ৩৭১ গজ দীর্ঘ, নর্মদার উপরস্থ সেতু দিয়া বোম্বাই পর্যন্ত গিয়াছে।

আকরিক দ্রব্যের মধ্যে জব্বলপুরের লোহা প্রধান। আকরের মধ্যে জোলি, অগরিয়া, সারোলি ও প্রতাপপুর এই চারিস্থানের আকরই প্রধান। ভক্তির আরও প্রায় ৪০।৫০ টী কুজ কুজ খনি আছে। রামঘাট, ডেড়াঘাট লমতাঘাট ও মহানদী-তীরবর্তী সিঙ্গাপুরের নিকট পাথরিয়া কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ডেড়াঘাটের নিকটই পাথরের পাথরিয়া চূণ অতি বিখ্যাত, মুরবারা নগরে একজন প্রসিদ্ধ আছে, তাহা লিথো-গ্রাফী কন্দের উপযোগী, উহা কলিকাতার বহুশিল্পে বিক্রীত হয়।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এখানকার পিতলের কালস, কার্পাস বস্ত্র ও চর্মনির্মিত নানারূপ দ্রব্য প্রধান। জব্বলপুরে তাম্র ও কাঁপেট তৈয়ার হয়।

রাস্তার মধ্যে জব্বলপুর হইতে উত্তরদিকে মির্জাপুর

পৰ্য্যন্ত রাত্ৰাটী অতি সুন্দর। তাহার উত্তরণার্থে সুন্দর বৃক্ষাবলী বিরাজিত। রাত্ৰার দুই প্রাচীরের জল দুইদিকে বঙ্গোপসাগর ও কাষে উপসাগরে গিয়া পতিত হয়। দক্ষিণদিকে সিওনি পৰ্য্যন্ত রাত্ৰাও ভাল। অবশিষ্ট রাত্ৰাগুলি সকল ক্ষুদ্রতে সুগম নহে।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটি পৃথক জেলা বলিয়া গণ্য হয়। একজন ডেপুটি কমিশনার, সহকারী ও তহসীলদারগণের সাহায্যে এই জেলা শাসন করেন। এখানে গবর্নমেন্ট বিদ্যালিষ্কার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। জব্বলপুরের উচ্চ বিদ্যালয় দিন দিন ভাল হইতেছে।

জব্বলপুরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে শীতগ্রীষ্মাদির আধিক্য নাই। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫২.১৩ ইঞ্চি। সচরাচর পশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। মাঘ কাশ্বনমাসে প্রায় শিলাবৃষ্টি হইয়া রবি শস্তের বিস্তার হানি করে। জর ও উদরাময় সাধারণ ব্যাধি। বসন্ত ও ওলাউঠা মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। এখানে অনেকগুলি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৩ জব্বলপুর জেলার দক্ষিণভাগস্থ একটি তহসীল। পরিমাণ ফল ১৪৪ বর্গমাইল। ইহার প্রধান নগর জব্বলপুর।

৪ জব্বলপুর জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৩ ১১' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫২' পূঃ। এই নগর নাগপুরের ১৬৫ মাইল উত্তরপূর্বে এবং সাগরের ১০৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৪৫৮ ফিট উচ্চে একটি পার্বত্য প্রান্তরে অবস্থিত। নগরের চতুর্দিকে অনেক বৃহৎ বৃহৎ গর্ত থাকায় ঐ সকল সহজেই পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল পুষ্করিণীর চারিদিকে নানারূপ বৃক্ষ ও বাটাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া নগরের চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করিয়াছে। এই নগর অতি আধুনিক এবং সুন্দর-শ্রেষ্ঠ রাজবন্দাদি দ্বারা সুশোভিত। নগরে প্রবেশের পথ একটি সরকারী উচ্চানের নিকট দিয়া গিয়াছে। নগরের মধ্যস্থানে চতুর্দিক মন্দির-বেষ্টিত একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উম্মতি নামে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ অগ্নর ও গবর্নমেন্ট কাছারির মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

জব্বলপুরে একটি জিমনাসিয়াম আছে। এই বিদ্যালয়ে ঠগ ও ডাকাইতি ব্যবসায়ীগণকে এবং তাহাদের পরিবার বর্গকে ভাঙ্গু ও কার্পেট বস্তিতে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে তাহারা বঙ্গদেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। এখানকার ভাঙ্গু ও কার্পেটের কারখানা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান। এখানে একটি সৈন্তনিবাস আছে। জব্বলপুর দিয়া রেলওয়ে হওয়ার ইহার বাণিজ্য ও অর্থের বৃদ্ধি পাইয়াছে। কল্যাণ

তির জব্বলপুরই মধ্যপ্রদেশের মধ্যে নগরীগুলি প্রধান বাণিজ্যস্থান। রেলওয়ে ব্যতীত দ্বারা দিয়াও সিওনি, নামে, মণ্ডলা প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। রেলওয়ে আমদানীর মধ্যে বিলাতী কাপড়, তুলা, গোমুখ ও অন্যান্য শস্ত, নানাবিধ ধাতুজ জব্য, চিনি, লবণ, দেশীয় কাপড়, সর্বপাদি, মসলা, হুত, তৈল, লাক্স ও কার্পাস প্রধান। ঐ সকল আবার নানাহানে রপ্তানী হয়। লোকসংখ্যা ৮৪৪৮১।

জব্বরিয়া ভীল, মধ্যভারতের অন্তর্গত জুশাল এজেলির অধীন একটি জায়গীর। মালব প্রদেশের বন্দোবস্ত করিবার সময় পিণ্ডারী-সদর চীতুর দ্বারা রাজন্থা পিদিয়ানগর, কাছুরি ও জব্বরিয়া ভীল এই তিনটি গ্রামের একটি জায়গীর প্রাপ্ত হন। রাজন্থার মৃত্যু হইলে, শেষদশার তাহার সন্ধ্যাবহারের জন্য ইংরাজরাজ তাহার পক্ষ পুত্রকে চিরস্থায়ী রূপে জায়গীর বিভাগ করিয়া দেন। রাজা বখ্স জব্বরিয়া ভীল ও জব্বরি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র জামাল বখ্স উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

জসানিকাঠি, মালবপ্রদেশের জাতিবিশেষ। কথিত আছে, ইহারা রামকচ্ছের পঞ্চম পুত্র জসের বংশধর বলিয়া জসানিকাঠি নামে বিখ্যাত। প্রবাদ কুন্তীপুত্র কর্ণ কোরবদিগের সাহায্যার্থ গোহরণপটু কচ্ছজাতীর কাঠিদিগকে আনয়ন করেন। কোরবদিগের পরাজয়ের পর ইহারা মালবপ্রদেশে বাস স্থাপন করে।

জসাবর, মথুরার নিকটস্থ অরিজবাসী রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা অধিক নহে।

জসুরি (পুং) অন্ততঃ মৃত্যুতে হস্ততে বাজেনেন জস-উরিন্ (জসি সহোজুরিন্, উণ্ ২।৭০) ১ বজ্জ। (উজ্জলদত্ত) ২ ব্যথিত। (ত্রি) “বিয়া জানাতি জসুরি” (ধক্ ৫।৩।৭) ‘জসুরিং ব্যথিতং’ (সায়ণ) ৩ উপক্ৰমযুক্ত। ‘জসিত্তাভনকর্ষোজ্জকর-কর্ম্ম বা’ (সায়ণ)

জসুস্বামী (পুং) একজন ভক্ত বৈষ্ণব, অন্তর্বর্তীতে (বর্তমান দোয়াবে) বাস করিতেন। ইনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সাধুসেবার জন্য অন্ন ক্রিয়াকর্ম্ম করিতেন। ইহার একখানি লাক্স ও দুইটি বলদ ছিল, তদ্বারা চাষ করিতেন। এক দিন এক চোর তাহার দুইটি বলদ অপহরণ করে। ভগবান্ ভক্তের বলদ অপহৃত দেখিয়া ভক্তের অভাবমোচনের নিমিত্ত অবিকল সেইরূপ এক জোড়া বলদ সেই স্থানে রাখিয়া যান। কিন্তু অল্প তাহার কিছুই বৃদ্ধিতে পারিলেন না। ভগবান্ ভক্তের তাহার অভাব মোচন হইল। কিন্তু সেই ভক্তের কেহ ও তাহার গৃহে অবিকল সেই প্রকার বলদ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

